জীবনানন্দ দাশ

রচনাবলী

জীবনানন্দ জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ

জীবনানন্দ রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

গল্প

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত

গতিধারা

৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

সূচিপত্র

পবিশিষ্ট :

কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়

বিনোদ নিজের জীবনের একটা গল্প লিখছে।

অনেকদিনই সে কিছু লেখে নি।

এখনো লেখবার অবসর নেই, রুচি নেই, সুযোগ নেই, আবেগ নেই। চারদিককার পরিশ্রম অবসাদের দরকার মেটাতে মেটাতে জীবনে আব কিছুই নেই যেন।

তবুও এইটুকু লিখে রাখা যাক।

এইটুকু নিজে লিখে নিজেকে দেখবারও কেমন একটা প্রয়োজন আছে যেন। নিজের জীবনের কথাই, নামগুলো মাত্র বদলে দিয়ে লিখতে শুরু করেছে সে।

অরুণা হিমাংশুকে লিখেছে; আমি কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি, যদি পাব স্টেশনে থেকো। তুমি যে কুঁড়ে থাকবে কিনা জানি না, স্টিমাব আজকাল কটার সময় গিয়ে পৌছয়, নিশ্চয়ই এমন কোনো সময়ে না, যাতে মানুষদের নানাদিক দিয়ে ব্যাঘাত হয়।

চিঠির শেষ দিক দিয়ে এই কয়েকটি লাইন। কিন্তু আগাগোড়া সমস্ত চিঠিটাই এমন তাচ্ছিল্য ও তামাসার মুডে লেখা, এবং তা এতই স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) যে মনে হয় হিমাংশু এতদিন পরে যে এমন ধরনের একটা কাজ করতে যাচ্ছে অরুণার নিজের দিক দিয়ে অন্তত আকস্মিক বা নিদারুণ মনে করা ত দূরের কথা, সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে করে আগ্রহের সঙ্গে সাহানুভূতি করছে, কোনো আঘাত পাওয়া, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া দূরে পড়ে থাকাব কোনো প্রয়োজন নেই যেন অরুণার। সে সকলের সঙ্গে একজন হয়ে হিমাংশুর এই বিয়ে ব্যাপারটাকে পুরোমাত্রায় উপভোগ কবতে পারা বিবাহ শ্রদ্ধার, হিমাংশুর বিয়েতে কি কি তামাসা ও ফুর্তি করতে পাবা যায় তারই এক মর্মান্তিক লিস্টি দিয়ে চিঠিটাকে সে ছেলেমানুষির শেষ সীমায় নিয়ে পৌছিয়েছে।

অথচ এসব সে জোব কবে কিছুই কবে নি। চিঠিটাব একটা লাইনের ভিতবেও কোনো ভান, ঢঙ বা কৃত্রিমতা নেই, অবশ্যম্ভাবী ব্যথাকে চেপে রাখবাব অনুমাত্র প্রয়াসও কোথাও নেই, থাকবে কি করে? ব্যথা যে একটুও পায় নি, গোপন কিছু যে এব মনের ভিতর কোথাও কিছু নেই, সব কথা বলে ফেলতে গিয়ে কারু কাছে বাধবার যে এর কোনো কারণ নেই, চিঠিখানা যতবাবই পড়া যায় ততবারই এ জিনিসগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অরুণা কি ভালবাসে না তাহলে আমাকে? কোনোদিনও ভালবাসে নি? তবে বেসেছিল, শেষ করে ফেলেছে।

সব সময়ই এক ভালবাসা একটা দ্বিধার জিনিস ছিল বটে। কিন্তু তবুও হিমাংশু জানত এ মেয়েটি যদি কাউকে ভালবাসে পৃথিবীতে, তাহলে তাকেই।

নানা কারণেই অরুণাকে বিয়ে করা অসম্ভব। তার ভালবাসাব কুয়াশা নিয়ে একটা জীবন কাটিয়ে দেয়া আবো অসাধ্য যত বেড়ে চলে ততই জীবনের মাত্রাটাকে ঠিক করে বোঝা যায়, সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে পড়ে ফেলতে পাবা যায়। পৃথিবীব প্রয়োজন অপ্রয়োজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন উপকরণগুলো সাহায্য করবে উপলব্ধি হয়।

এক হিসেবে দেখতে গেলে, জীবনেব প্রকৃত প্রয়োজনের হিসেবেব দিক দিয়ে অরুণার সঙ্গে যে কটি বছর তার ভালবাসা গেছে,—বটেই অপচয়েব বছর। যে ভালবাসা কোনো সিদ্ধান্তে পৌছয় না, যেমন বিবাহে বা বিবাহীন দাম্পত্যেও, জীবনকে তাও অভিজ্ঞ কবে বটে, জীবনের কোনো এক সময়ের প্রয়োজনও মেটায়, পরিতৃপ্তিও বোধ করা যায়, কিন্তু কাকের কালো পাখনার ভিতর থেকে—থেকে থেকে যে ময়ূরকণ্ঠী রঙ ফুটে বেরয় তেমনি ক্ষণিকের এ জিনিসগুলো, জীবনের সাদাসিদে প্রচার প্রয়োজনের সম্পর্কে একেবারে অবান্তর। এসবই বোঝে হিমাংশু, কিছুদিন থেকে বুঝে আসছে। কিন্তু তবুও, শিগগিবই বিয়ে কবতে যাচ্ছে যদিও হিমাংশু—তবুও না পারছে সে বিবাহিত জীবনেব আগাগোড়াটাকে

ভাল করে ধরতে। কখনো সেটাকে সম্পদের জিনিস বলে মনে হয়, কখনো কর্তব্য, কখনো বোঝা; না পারছে সে জীবনের প্রয়োজনীয় প্রেমটাকে ছেড়ে দিতে, অরুণার ভালবাসাকে।

কখনো মনে হয় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটার ওপর অরুণারই প্রভাব, কখনো মনে হয় সরোজিনীকে পেয়ে অরুণাকে আর মনে থাকবে না। ভাবছে, এ এক অত্যাশ্চর্য জিনিস—এই বিয়ে? মেয়েটিকে ত এখনো আনি নি ঘরে-আনা যাক। তারপর জীবনের অর্থ একেবারে বদলে যাবে। বদলাতে বদলাতে এরকম থমকে থেমে থাকবে না আর।

অরুণাব চিঠিটা আবার পড়তে পড়তে অরুণার এই মার্মান্তিক উদাসীনতা, তা যদি একটুও কৃত্রিম হত, যদি একটা লাইনেও বুঝতাম যে ও ভান করছে শুধু প্রকৃতভাবে এসব বোধ করছে না! কিন্তু ওর এই সরল সুনিশ্চিত স্বাভাবিকতা বেদনাটাকে আজ আমার ঢের বেশি গভীর করে তুললেও একদিন সরোজিনী আসবাব পর এসবের জন্য কোনো অবসরও থাকবে না আমার, সামান্য একটা মেয়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কয়েকটা লাইন নিয়ে আজকের এই সমস্ত চিন্তাভাবনা অবসন্নতা সেদিন একটা মর্মান্তিক অপচযের স্মৃতির মত আমাকে তামাশা দেবে শুধু-তামাশা দেবে।

চিঠিটাকে রেখে দিচ্ছে হিমাংশু।

ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে সংববণ কবে তুলে রাখছে আবাব। বাকি চিঠিখানা দেখছে। বিয়েতে কেউ কেউ খাবে; বউভাতেব নেমমন্তন্ন খেতে অনেকেই এখানে আসবে। চিঠিগুলো ছড়িযে ফেলে একটা চুরুট জ্বালাল হিমংশু।

ছ বছব সে কলকাতায় বড় ঘরের একটা কাজ করেছে, তাবপর ছমাস আর কাজ ছিল না। পাটনা, মোরাদাবাদ, দিল্লি, এই সব জাযগায় এক আধ বছব কাজ কবে এসেছে তাবপর; এখন কোনো কাজ নেই, বিস্তর টাকা নেই কারু, না তাব নিজের, না তাব বাবাব, ছ মাসেব ভিতর কাজ না পেলে পবিবারেব কোনো স্বচ্ছলতাও থাকবে না, বিবাহে যা ঋণ জমবে তা ভযাবহ, এসবই জানে হিমাংশু। ছবছবেও হযত পরে কোনো কাজ কপালে জুটে না উঠতে পাবে, এও অস্বাভাবিক কিছু নয়-জানা আছে তার, অনেকে তাকে একটু সবুব কবে বিযে কবতে পবামর্শ দিযেছে, তাও শুনেছে হিমাংশু, আব একটুও সময নষ্ট না কবেও কিন্তু তবুও বিয়ে সে করবেই। বিযেটাকে কিছুকাল আটকে বাখতে পাবা যায়, পিছিযে দেযা যায়, কিন্তু পিছবে না সে, যে একমাস সময় বাকি আছে তাব একদিন বেশি হলেও চলবে না।

চুরুট টেনে যাচ্ছে হিমাংশু। অরুণাকে ভালবেসে জীবনটা আজও খেযে যাচ্ছে যেন, এরকম খবচ হযে যাচ্ছে। কেবলই দ্বিধা, কেবলই বাধা, কেবলই যাতনা, অপচয। কোনো শান্তি বা স্থিবতা না পেলে জীবনেব কোনো কাজই যে আবস্তই হতে পারবে না। একটা অপচযশীল অনিশ্চিত প্রেম জীবনটাকে ছাই করে দিযে চলে যাবে শুধু। বাস্তবিক, এভাবে সে একছব আগেও ভেবে দেখতে যায নি, কিন্তু পাটনাব চাকরি খসে যাবার পব পরেই অরুণা যেন হঠাৎ উদঘাটিত হল, কিংবা হিমাংশুব নিজেব জীবনটাও বদলাচ্ছিল বলে, অরুণাও পরিবর্তিত হযে যাচ্ছিল বলে দু'জনাব সেই ছ-সাত বছব আগের প্রতিজ্ঞা করা জীবনমরণের ভালবাসাব কোনো মানে তাই আব থাকছিল না বলে,—এই সমস্ত কারণেই। কিন্তু অপরাধ তবু অরুণারই যে সব চেযে বেশি সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই। সমযেব পবিবর্তনের চেযেও তাব পরিবর্তনেব প্রযোজনটা যেন বেশি হযে পড়ছিল। সেই থেকে অরুণার একটি চিঠিকেই কেটে ছিঁড়ে প্রতিটি লাইনেব রস প্রেম আন্তবিকতা বেব করতে গিযে হতাশ হযে গেছে হিমাংশু।

অরুণাকে অনুবোধ কবতে লিখেছে।

সাহনুভূতি দিয়ে তাকে বুঝতে চেযেছে।

অনেক মার্জনা কবেছে তাকে। তাব জন্য ঢের ছেড়ে দিযেছে, দক্ষিণা ও মমতা নিযে তাকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে। আবছায়া ভেবে আবিষ্কার করতে চেয়েছে—সাধনাব জিনিস বলে উপলব্ধি করতে।

কিন্তু মর্মাহত হয়ে কঠিন সত্যটা স্বীকার করতে হয়েছে, অরুণার ভালবাসা ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সরোজিনী এল জীবনে তারপর। পিছনে তার হযত ভালবাসার কোনো কল্পনা রেখে, না হিমাংশুর জন্য, না কারু জন্যই রূপ নিযে, সাক্ষাৎ দেখাদেখির ভিতর দিয়েও না, আত্মীযস্বজনের চিঠির মারফতে।

বিবাহের পূর্বে হিমাংশুর জীবনে এমন অনেক মেযেরই আসা যাওয়া হয়েছে, কিন্তু যে জিনিসটা একদিন তাকে চেপে রেখে স্বাভাবিক জীবনের সাধাবণ মিমাংসাগুলোকে কৃপা কবতে শিখিয়েছে,

পৃথিবীটাকে কৃপার পাত্র বলে বুঝিয়েছে, সেইটেই আজ সরে যেতে যেতে হিমাংশুর জীবনের কয়েকটা মূল্যবান বছরকেও রঙের পিচকিরির মত উপহাস্যাস্পদ করে দিয়ে ভাঁড় সাজিয়ে চলেছে তাকে, এরপর মানুষ সজাগ হয়, সপ্রতিভ হয়। হিংমাশু সরোজিনীকে দেখে এল, পছন্দ করল, বিয়ে ঠিক করল, পৃথিবীর নিয়ম ও জীবনের এই প্রকৃত মাত্রাটাকে বুঝতে দিচ্ছে অরুণার উপেক্ষা, অবহেলা। শেষের দিক দিয়ে ঢের সাহায্য করেছে হিমাংশুকে।

কে জানে, ভালবাসাটাকে এরকম আঘাত না করলে জীবনটাকে বুঝতে তার আরো এতদিন লাগত?

চুরুট টেনে যাচ্ছে।

জীবনের দ্বিধা যেন এখনই ঢের কেটে যাচ্ছে।

কোথাও যে তার জন্যে স্থির হয়ে বসবার জায়গা ঠিক হয়ে গেছে, নিশ্চিন্ত হয়ে সফল হয়ে উঠবার। এখন তার আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে যেন।

জীবনও ত্রিশে পৌঁছেছে প্রায়। উনত্রিশটা বছর এরকম নষ্ট হয়ে যায় না হয়ত সকলের জীবনে। কিন্তু উনচল্লিশই হোক, উনপঞ্চাশই হোক, অপচয়ের যে শেষ হয়েছে শেষ হচ্ছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা।

অপচয়ের শেষ হয়েছে, যৌবনেরও হয়ত, কিন্তু তাব জন্য কষ্ট কমে যাচ্ছে, কথা হয়ত তেমন প্রবলভাবে আঘাত করবে না জীবনকে কোনোদিনও আব,—কিছুতেই আর।

জীবন তার প্রকৃত মাত্রাব দিকে পৌঁছতে পৌঁছতে এমনই জোর বোধ করছে যে অতীতের বড় বড় ধর্মগুলো যে সব নিয়ে তখনকাব এক একটা দিন উঠত, পড়ত, সে সব আজ আর কিছুই নয় যেন। রূপকে উপেক্ষা করতে পারা যায়, ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করতে, প্রেমের ঈর্ষা,—একদিন তাকে কতই না যাতনা দিত, প্রেমেব ঈর্ষাকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারা যায়, এই চিঠিখানাকে, অরুণার শেষ চিঠি, অপ্রেমের চিঠি মনে করেও নিজেকে অকূল যন্ত্রণার হাতে না ছেড়ে দিয়েও পারা যায়।

জীবনে এমনই একটা শীতল সমন্বযেব সময় এসেছে এখন।

অরুণারা এসেছে।

বাড়িতে নানাদিক থেকেই লোকজনদের আনাগোনা আসন্ন জিনিসটাকে সরগরম করে তুলেছে বটে,—অরুণাও এসবেব ভিতর পরিপূর্ণ আন্তরিক ভাণ বসাচ্ছে, কোথাও একতিলও কাটে না যেন; অভিনয় মনে করে সব সময় অরুণার ফাঁক ধবতে চায় হিমাংশু। প্রতিটি সময়েই সেটাকে জীবন বুঝতে পেরে মাথা হেঁট করে।

হিমাংশু ভাবছে, দুদিন পরে বিয়ে, তারপর সমস্ত জীবন সরোজিনীকে নিয়ে। কিন্তু এখনো বিশ্লেষণের শেষ হল না যাকে ছেড়ে সম্পদ, ছাড়াবাব ভিতর নিস্তার, ছাড়া উচিত প্রয়োজন—বিধিও বটে, দুদিন পবে যার স্মৃতিও হিমাংশুদের দাম্পত্যের চাকায় পিষে গিযে অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও উপেক্ষিত হতে থাকবে। অরুণা যে হিমাংশুর মত প্রেমিকের জীবনের এই কথাগুলো ভাবতে যায় না, কোনোদিনও হযত ভাবে নি, বোঝে নি, বুঝবে না, জানবে না। বিয়েবাড়ির কতকগুলো স্থূল তামাসা চব্বিশ ঘন্টা যাকে অধিকার করে রাখছে মাত্র, গভীর রাতের নক্ষত্র দেখে শিহরিত হয়ে উঠবার ব্যবস্থা যার জীবনে কোনোদিনও ছিল না, কোনোদিনও নেই, সেই মেয়েটির জন্যই এমন ভালবাসা ও কামনা মনের ভিতর পুষতে পুষতে হিমাংশু পদে পদে আজ এমন আঘাত পেতে যাচ্ছে কেন?

হায়, দ্বিধার জীবন না শেষ হয়েছিল? নিশ্চয় না আবম্ভ হয়েছি? কিন্তু, কোথায? কোথায়?

মশারির ভিতব হিমাংশু থাকতেই হঠাৎ ভোরে চা নিয়ে এসেছে অরুণা।—'ঘুমিযে আছ?'

—'কে অরুণা?'

—'চা এনেছি, ওঠ ওঠ।'

চলে গেছে অরুণা।

মুখ ধুয়ে চা নিয়ে বসবা মাত্রই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে বললে, 'কৈ উঠলে! এত বেলা করে যে-কাল রাতে ঘুমিয়েছিলে?'

—'ঘুমিয়েছিলাম বৈকি।'

—'কিন্তু আমার মনে হয় তুমি ঘুমও নি।'

—'কেন একম মনে হয় তোমার' হিমাংশু কথাটা শেষ না করে থামলে, আরম্ভ করবে ভাবছিল,

কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়ে ঘাড় হেঁট করে একটু অপেক্ষা করতেই অরুণা বললে, 'তোমাকে কাল অনেক রাতে আমি পায়চারি করতে দেখেছি।'

হিমাংশু একটু বিমুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

—'কেন পায়চারি করছিলে?'

—'আমি? কোথায়?'

—'আমগাছগুলোর ভিতরে, মাঠে, রাত তখন প্রায় একটা, দেড়টা হবে।'

—'তুমি জেগেছিলে? অত রাত অবদি?'

—'কাল আমরা বোর্ডিঙের চারটি মেয়েতে মিলে দোতলার ঘরে বসে তাস খেলছিলাম।'

—'ওঃ!'

একটু পরে—'রোজ রাতে খেল নাকি?'

—'না। কিন্তু কাল অনেক রাত অবধি খেলেছি, ঠিক জানলাটার পাশে একটা বেতের চেয়ারে বসেছিলাম আমি, গারদে ঠেস দিয়ে। আর মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কাল রাতটা খুব এনজয় করেছি। তাসে আমরা জিতেছি। ছটা ররার করেছিলাম, আর রাত দশটার সময় সেই যে জ্যোৎস্না উঠল সেই থেকে রাত দুটো অবদি যখন ঘুমোতে গেলাম, আকাশ বাতাস মাঠ ঘাট কি ফাইন লাগছিল। এত উপভোগ করেছি। বাস্তবিক, কি চমৎকার রাত্তিরটা, না দেখলে আইডিয়াই করতে পারতাম না। আজ রাতে খেলব ভাবছি, প্রথম রাতটা ভারি অন্ধকার থাকে, তাছাড়া গল্পগুজবে বিয়েবাড়ির হইচই হুড়-হাঙ্গামায় ঢের সময় কেটে যায়, খেয়ে দেয়ে বসতে বসতে জ্যোৎস্না উঠবে ত?'

—'উঠবে।'

—'কিন্তু, চাঁদটা ক্রমে ক্রমে বিছিয়ে উঠবে, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'কদিন এরকম জ্যোৎস্না পাব তবু।'

—'পাঁচ সাত দিন পেতে পাব।'

—'তোমার বিয়েটা তাহলে কৃষ্ণপক্ষের রাতে হবে।'

—'দেখছি ত তাই।'

—'এদিকে হলে ভাল হত, পূর্ণিমার ছ সাত দিন পরে যদি হত, আর আমরা তোমার বিয়ের দিন পনের আগে যদি আসতাম, তাহলে একটানা জ্যোৎস্নারাত যে পেতাম—ওঃ!

—'কী করতে, এত জ্যোৎস্না দিয়ে অরুণা?'

—'মেয়েগুলোকে নাকে টেনে দেখাতাম, কলকাতার বোর্ডিঙে ত থাকে বারটা মাস, সীমা নেই, শেষ নেই এমন মাঠ ঘাট আকাশের জ্যোৎস্নার কি দেখেছে এরা?'

হিমাংশু চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

অরুণা বললে, 'কিন্তু তুমি কি রোজ রাতেই এরকম বেড়াতে নাকি?'

—'না, দূর, যেদিন খুশি হয়, কাল ঘুম পাচ্ছিল না।'

—'কিন্তু তৃপ্তিদি যে কাল বললে এরকম তিন চারদনি ধরে তোমাকে ঘুরতে দেখেছে।'

—'খাওয়াদাওয়ার পর কয়েকদিন ধরে একটু ঘুরছি বটে।'

—'আমাকে দেখেছিলে? কাল?'

—'না।'

—'কিন্তু আমি সব দেখেছি তুমি একট মস্ত বড় মটকার চাদর গায় দিয়ে ঠিক জামাইবাবুটির মত ফিরছিলে।' একটু থেমে নিয়ে বললে, 'সে একটা ভারি জিনিস হল? জামাই! দূর! না ঠিক তেমন নয়—ভাবুক, সংসার ছাড়ার মত, এলোমেলো চাদর, আলুলায়িত চুল, খালি পা, গায়েও কোনো জামা নেই, পরনের খদ্দরের কাপড়টাও কেমন নোংরা হয়ে গেছে। কোনো জিনিসেই যেন মন বসছে না। বেধে বেধে চলছ, চলতে চলতে থেমে যাচ্ছ, আবার এক একবার যখন পায়চারি শুরু করছ তার আর থামাথামি নেই যেন। এক একবার ভাবছিলে, তুমি যেন আমাকে দেখছ না, তাকালেই ত স্পষ্ট দেখতে পারতে, অথচ ফিরে তাকালে না কেন? কতবার মাথা নাড়লাম ঘাড় ঘুরালাম, হাততালিও দিয়েছি, কিন্তু কি রকম বেরসিক বল দেখি তুমি, একবারও ফিরে তাকালে না? যেন মাঠের ঘাসগুলো আর দিঘির জল

আব জ্যোৎস্না আব আকাশ ছাড়া পৃথিবীতে আব কিছুই নেই। আমি এক একবাব ভাবছিলাম যে তোমাকে ডাকি, কিন্তু সহজ ডাক যে তোমাব কানে পৌঁছবে না, সে আমি খুব ভাল কবেই বুঝেছি। বিয়ে বাড়িতে এত লোকজন এতবকম মতামত, নীতি ও ধর্মেব বিচাব, কাজেই গলা ছেড়ে চেঁচালাম না—নইলে অরুণা গলা ছেড়ে হাসতে বাধা কববে না।'

মর্মোদঘাটিত হাসি, সর্ববাদীসম্মত, সব জায়গাই সচল, সকলেই উপভোগ্য, কোনো নতুন পার্থক্য নিয়ে আসে নি, এব ভেতব কোনো আবছায়াব কালিও নেই, কি আবিষ্কাব কববে তুমি?

তবুও মনটা সন্ধান কবতে চায়। অরুণাব মুখেব নিটোল রূপেব যায় শাবীবিকতা মাত্র তাও মানুষকে স্থিব থাকতে দেয় না। সন্ধান কবতে বলে—সন্ধান কবতে বলে।

—'তুমি যে আজ চা নিয়ে এলে বড়?'

—'আমি কোনোদিন চা দেই নি বুঝি তোমাকে?'

—'এ বাড়িতে পাড়া দিয়ে আব না, দিন পাঁচেক হল এসেছি বটে কিন্তু আজ তবু খানিকটা সময় বসলেও।'

— কেন তোমাব এখানে পাঁচদিনেব ভেতব একবাবও কি আসি নি আমি? মিছে কথা বল না, তুমিই ববং উপেক্ষা কবেছ আমাকে, আমাকে দেখলেই মুখ ফিবিয়ে চলে গেছ-একটা কথা পর্যন্ত বলা উপযুক্ত মনে কব নি।

হিমাংশু ভাবছে বাস্তবিকই কি সে তাই কবেছে? যদি কবে থাকে কেনই বা কবেছে?

—'স্টিমাবঘাটেও তুমি আমাদেব গ্রহণ কবতে এলে না।' অরুণা বললে, 'আলাপ পবিচযেব কথা থাকলই না হয়, আমবা তোমাদেব বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছি অথচ কতটুকু ভদ্রতাই বা আমাদেব সঙ্গে কবছ তুমি, বা কবা মনে কবছ।'

—'তোমাদেব বন্ধুবান্ধবকে আমি চিনি না অরুণা, তুমি পবিচযও কবিয়ে দাও নি কিন্তু তাতে আমি তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না, বাড়িব মেয়েবা তাদেব সঙ্গে নিশ্চযই ভদ্রতা কবেছে, তা হলেই হল। কিন্তু তোমাব সঙ্গে—'

অরুণা একটু মৃদু উপহাস কবে বললে, 'আমাব সঙ্গে এতদিনেব পবিচয ছিল বলেই, এত উপেক্ষা কবতে হয়, ধব পাঁচদিনেব মধ্যে তোমাব সঙ্গে কথা না বলে আমি অপবাধই কবেছি, কিন্তু ভেবে দেখ ত তা অগ্রাহ্য কবে আমাকে ডেকে কাছে না বসাও একটা কথাও কি তোমাব বলা উচিত ছিল না? কিন্তু তোমাকে দোষ দেব না। হয়ত তোমাব স্বভাবই ঐ বকম, হয়ত আমাব সঙ্গে কথা বলবাব জন্য ভিতবে ভিতবে তুমি জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিলে, তোমাকে ত আমি জানি, আমাব চাইতে কে বেশি জানে? কিন্তু তোমাব এবকম সংযম আমি আব কোনোদিন দেখি নি।

হিমাংশু চায়েব কাপটা টেবিলেব ওপব বাখল।

অরুণাব জীবন পবিবর্তিত হচ্ছে কি? না, সেই সমস্ত নিয়ে এখন যথেষ্ট খুঁচিয়ে দেখতে পাবা যায় মেয়েটাকে, অনেক দিন ধবে চিঠিব ভিতব দিয়ে যেসব জিজ্ঞাসাবাদ চলেছিল অরুণাকে হাতেব কাছে পেয়ে সে সবেব স্পষ্টাস্পষ্টি বোঝাপড়া অবিলম্বেই হয়ে যেতে পাবে।

এখন প্রচুব অবসব, অপর্যাপ্ত সুযোগও। কিন্তু সময় যে সকলেব জীবনেই পবিবর্তন না আনলেও, আনছে, আনবেই একদিন এ কথাও সত্যি, নিজেও যে হিমাংশু সংকল্প কবে বিবাহকে ডেকে এনে সেই সময়কে প্রবলভাবে তাব জীবনটাকে সাহায্য কবতে বলছে তাও মিথ্যা নয়—অরুণাকে দু'দণ্ডেব জন্য এখন হাতেব কাছে পেয়ে এদেব দুজনেব জীবনেব সম্বন্ধে হিমাংশুব কল্পিত অনুমানটাকে যাচিয়ে দেখতে পাবা যায় বটে, তাতে হয়ত একবকম সিদ্ধান্ত বেরুবে, কিংবা আবেক বকম। কিন্তু যদিও এটা প্রমাণিত হয় যে, আজও মেয়েটি তাকে ভালবাসছে, তাহলেও তা ক্ষণিকেব ছাড়া আব কি? যে পথ ধবেছে হিমাংশু তা দাম্পত্যহীন ভালবাসাব অপচয় নিয়ে জীবন কাটবাব সময় তাব আব নেই, তাতে খেদ, তাতে সন্তাপ, অপবিমেয় যন্ত্রণা, অপবিসীম শ্লেষ, সেসবেব জন্য সময় তাব আব নেই, অন্য কারু প্রচুব অবসব থাকলেও।

এই সমস্তই বুঝেছে হিমাংশু।

কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকলে। আধঘন্টা, একঘন্টা,—অরুণা এমনিই চলে যাবে তাও বোধ হয়।

কিন্তু দু-এক মিনিট যেতে না যেতেই হিমাংশু বললে, 'আগেব কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু

আমি বিয়ে কবতে যাচ্ছি জেনেও তোমাকে যে বকম পবিতৃপ্ত দেখছি তাতে মনে হয় সংযম একটা সোজা জিনিস নিতান্ত, এব চেযেও ঢেব কঠিন জিনিস আছে। কিংবা সোজাকঠিনেব কোনো প্রশ্নই ওঠে না হয়ত। কাবণ যে জিনিস স্বাভাবিক, তা সবচেযে বেশি সহজ। কি বল অরুণা?'

অরুণা ক্ষণকাল চুপ থেকে বললে, 'তুমি কী বলতে চাও? তোমাব বিয়েতে আমাব প্রতিবাদ কবা উচিত ছিল?'

—'অতটা আশা কবি নি। কিন্তু এলে কেন?'

এমন আকস্মিক প্রশ্নেব কোনো জবাব দিতে না দিতেই হিমাংশু বললে, 'এলেই বা যদি তাহলে এত পবিতৃপ্তি পেলে কোথেকে অরুণা? এমনি কবেই কি তুমি আমাকে এ কয বছব ভালবেসেছিলে? কিংবা হয়ত ভালবাস নি-কাবণ প্রেমে আঘাত লেগে মানুষ শত সহজবাদী, সুবিধেবাদী স্বাভাবিক হলেও ভালবাসাকে চূর্ণবিচূর্ণ হযে পড়তে দেখলে ব্যথা পায, স্তব্ধ হযে পড়ে।'

অরুণা মিনিটখানেক চুপ কবে থেকে বললে—'আমি যদি তোমাব আগে বিয়ে কবতাম, কী কবতে তুমি? আমাকে বিয়ে কবতে, না কবতে?'

—'তুমি আমাকে কখনো সেবকম ভালবাস নি অরুণা, যাতে অতটা কবা যায।'

—'কেউ যদি বাসত, তোমাকে সে বকম?'

—'তাহলে অন্যকে বিয়ে কবতে যাবে কেন সে?'

—'সংসাবেব নানাবকম চাপে পড়ে মানুষকে ইচ্ছাব বিরুদ্ধে ঢেব জিনিস কবতে হয।'

—'কিন্তু আমাব জন্য কোথাও কারু কোনো সেবকম গভীব ভালবাসা টেব পেলে সংসাবেব চাপেব চেযে আমাব চাপই আমি তাকে ঢেব আগে বুঝতে দিতাম, অবিশ্যি মেযেটিকে আমিও যদি ভালবাসতাম।

অরুণা হেসে বলছে—'তা ত নিশ্চযই, এবং মেযেটি যদি কুৎসিতও হত।

—'কুৎসিত সুন্দবেব কোনো কথা নেই, দু'জনেব ভিতব পবস্পবেব জন্য গভীব ভালবাসা থাকলেই হত।'

—'তাহলে মেযেটিব অন্য কোনো বকম বিয়েতে তুমি বাধা দিতে? তাব বাপ মা স্বজন পবিজন সংসাব সমাজ সমস্ত তোমাব বিরুদ্ধে থাকলেও?

—'হ্যাঁ, থাকলেও।

—'যদি অন্য কোনো বকম বিয়ে কবে তাব ঢেব বেশি সুখ হত তাহলেও?

—'সুখেব কথা কিছু বলা যায না অরুণা, স্বচ্ছলতা ও সম্পদেব ভিতবেই কি শুধু সুখ? ভালবাসাব কি কোনো মাধুর্য নেই?

—'কিন্তু জানি না-শুনেছি শেষ পর্যন্ত উঠল গিযেই ঠেকে—

—'স্বচ্ছলতাগুলো?

—'হ্যাঁ, দেখেছিও যেন কোথাও কোথাও, যত জাযগাই দেখেছি, এইই দেখেছি যেন, অবিশ্যি ব্যতিক্রম ত আছেই, কিন্তু তা এত তুচ্ছ—

—'তুমি ঢেব দেখেছ তাহলে, কিন্তু ভালবাসায অন্ধ চোখ নিযে পৃথিবীটাকে যাবা দেখে তাবা বিলাসেব কথাও ভাবে না। স্বচ্ছলতাব কথাও না, দিকে দিকে জীবনেব নবম মধুবতাকে দেখে মুগ্ধ হয, কোথাও পাখিব জীবনে, কোথাও মানুষেব ভিতবে, বড় জিনিসেব ভিতব দিযেই শুধু? অজস্র খুঁটিনাটিতে নয কি? তুমি হয়ত বলবে অন্ধেব আবাব পৃথিবীকে দেখা? উপহাস কবে হয়ত বলবে যে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি পাবে, কিন্তু সেবকম এখনো ত আসে নি, এখনো ত জীবনেব মুগ্ধতাবই সময চলেছে, জানি একদিন এখানকাব অনেক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসেব গোড়াই শূন্য হযে থাকবে। বুড়োমানুষেব ভাঙা দাঁতেব গোড়াব মত। কিন্তু সেবকম পাথবেব মত শক্ত মাড়িব সময জীবনে ত এখনো আসে নি, যত পবে আসে, ততই ভাল।'

অরুণা হিমাংশুব শেষ পর্যন্ত শুনে একটু হেসে বলবে, 'তুমি না হয এই ভাবলে, কিন্তু যে মেযেটিকে তুমি ভালবাসলে, যে মেযেটিও তোমাকে ভালবেসে সঙ্গিনীও হল সেও কি শেষ পর্যন্ত তোমাব মতই ভাববে? তোমাব মত তাব ভালবাসাও কি চিবদিনই টিকে থাকবে? ধবলাম, তাও না হয থাকল, বিলাসলালনও তোমাব মুখে চেয়ে সমস্ত জীবনেব জন্য বন্ধ কবে ছিল সে, কিন্তু অস্বচ্ছলতা, এই ল্যাংটা

নোংরা দারিদ্র্যের কামড় কতদিন সহ্য করবে সে?' অরুণার মুখটা খানিকটা বিকৃত হয়ে উঠছে।

বলছে সে—'যদিও বা সে সহ্য করে, তোমার কি ব্যথা লাগবে না? নিজের বেদনাকে গুণী মানুষ মাত্রই নিঃশব্দে হজম করে ফেলতে পারে, কিন্তু প্রেমিক গুণী তুমি পৃথিবীর মানুষদের ক্লেশ দেখেই না জানি কত কষ্ট পাবে, যে মেয়েটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ, বাসছ, বাসবে তার কষ্টের সীমাপরিসীমা নিয়ে কী করবে তখন?'

হিমাংশু দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'তুমি কি আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলছ অরুণা?'

অরুণা হাসতে হাসতে বললে, 'কেন শুধু তা পৃথিবীর কথাই।'

হিমাংশু বললে, 'পৃথিবীতে এখনো অনেক জিনিসেরই অভাব, কিন্তু সত্যিই যেখানে পুরুষ মেয়েমানুষের মধ্যে সেরকম প্রেম আছে সেখানে এ ওর সাংসারিক বেদনায় কষ্ট পায় না, সংসারের ভিতর থেকেই প্রতিদিনই অনেকবার করেই এমন সব মধুর খুঁটিনাটির জন্ম হয় যা অন্য সব দিককার সমস্ত অভাব ও অভিযোগকে স্নিগ্ধ করে রাখে। যদি ভালবেসে বিয়ে করতাম এইরকমই হত, কিন্তু সে মেয়েটি একেবারেই অজ্ঞাত এবং আমার জীবন নানারকম গরমিলে অত্যন্ত জটিল, কিন্তু সেসব থাক, আমরা বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎটা এই সব কারণেই তোমার প্রশ্নের খপ্পর পড়ে না, কিন্তু'—চুরুটটা হাতে নিয়ে হিমাংশু বললে, 'আমার জীবনে আড়ম্বর ঐশ্বর্য না থাকলেও পারে, কিন্তু অস্বচ্ছলতায় বা থাকবে কেন? একটা দায়িত্ব নিয়ে বিয়ে করছি না? বিবাহের নানাদিকই কি মানুষকে ভেবে দেখতে হয় না—দেখি নি কি আমি?'

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে হিমাংশু বললে, 'কিন্তু আমার কথা ত পড়ে রইল অরুণা, সে প্রশ্নের ত কোনো উত্তর দেয়া হল না।'

একবাশ ধোঁয়া উড়িয়ে অরুণার দিকে তাকাচ্ছে হিমাংশু।

—'তুমি ঐ চুরুটটা রাখ।'

—'রাখলাম।'

—'রেখেদিলে টেবিলেব ওপর, মিছিমিছি টেবিলটাকে পুড়িয়ে নোংরা করবার জন্য?'

—'ফেলে দেব?'

—'তারও দরকার নেই, বাইরে গিযে খাবাব প্রযোজন হবে, আমি বললেও, না বললেও, লোকসান কবে দবকার কি? নিবিযে ফেল।'

হিমাংশু একটা পেনসিল দিয়ে খুচিযে খুঁচিযে চুরুটাকে নিভাচ্ছে।

অরুণা বললে, 'কারু প্রশ্নেরই কোনো সমাধান হয নি, মনগড়া নানারকম কথাই শুনলাম, কিন্তু সেসব জবাব নয।'

—'সংসরে জবাব দেওয়া বড় কঠিন। সত্য নির্ধাবিত করাও বড় সোজা ব্যাপার নয, হযত দুঃসাধ্য, হযত অসাধ্য, যখন মনে করলাম এই বুঝি সত্যে পৌছেছি, তখনি ভেবে দেখতে গেলে আবার চমক লেগে যায়। তোমাব সঙ্গে কথা বলে সেরকম চমক মাঝে মাঝে কিছু পেয়েছি বটে, কিন্তু কেউই কোথাও পৌছাতে পারি নি।'

—'তুমি এখনো ঢের ছোট।'

—'কিন্তু তুমি বড় হযে কতদূর পাবলে?'

—'যাক, তোমার কথাটা শোনাও তবু, শুনলেই আমাব হবে শুধু, সত্যাসত্য আমি একটা বের করে নিতে পারবই।'

—'আমার বেশি অবসর নেই আর, তুমি কি শুনতে চাও?'

—'আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি জেনেও তুমি এত খুশি কেন অরুণা? এই জিনিসটা বরাবর আমাকে অবাক করেছে, আজও ভাল করে কিছু বুঝতে পারছি না।'

—'আমি যদি তোমার আগে বিয়ে করতাম, আমার বিয়েতে আসতে না তুমি?'

—'না।'

—'আমাকে চিঠিও লিখতে না?'

—'না।'

—'মনে মনেও কোনো মঙ্গল বাসনা করতে না আমার জন্য?'

—'বিয়ে মানে কি অরুণা? আমাদের বিয়ে শত অন্ধতার ভিতর দিয়ে চলে আসলেও একটা কিছু স্বীকার করেই তার দিকে অগ্রসর হয়, আমাদের ভিতরেও অনেকে ভালবেসে বিয়ে করে, যারা তা করে না তারা ভালবাসার প্রতি উদাসীন হয়ে বিয়ে করে, খুব সামান্য কটি মানুষই দেখবে তুমি যারা একজনকে সত্যি ভালবেসেও আর একজন অজআতকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়, কিন্তু নানাদিককার নিয়ম প্রয়োজন চাপাচাপিতে এরকম ঘটনাও নিতান্ত কম হয় না। কিন্তু যে প্রেমাস্পদ উপেক্ষিত হল, পুরুষই হোক, বা মেয়েমানুষই হোক, স্বভাবত কিভাবে সে এ জিনিসটা গ্রহণ করবে অরুণা। আমি তোমাকে ভালবেসেছি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে না, তুমি আমার কাছে কী রকম যে জিনিস সমস্ত সৃষ্টি আবহমানকাল আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আমাকে সেটুকু বোঝাতে ঠিক যেমন করে কেউ কোনোদিন তা বোঝে নি, কেউ কোনোদিন তা বুঝবে না, বুঝবে না, আমার এ অভিজ্ঞতাটুকু সৃষ্টি নিজের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনাদি বছরের সঞ্চয়ের সঙ্গে সঞ্চয় করে রাখল, এত সঞ্চযের পরও এইটুকুও দরকার ছিল তার, এমনি করেই সে অপরিসীম হতে চলেছে, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই, সৃষ্টির অনন্ত সঞ্চয়ের মধ্যে অতি তুচ্ছতম, কিন্তু তবুও একেবারেই অপরিহার্য, যে ভালবাসছে কোনোদিনও এক কণাও তেমন করে ভালবাসতে পেরেছে কাউকে, সে এ বোঝে, কিন্তু আশ্চর্য সে ছাড়া লক্ষ লক্ষ অপ্রেমিক শত চেষ্টা করেও এ বুঝবে না। আমি ভালবেসেছি, আমি বুঝি, আমি যা এবং তুমি যা এবং আমার প্রেম যা তাত তুমি আমার কাছেই কি একমাত্র আমিই নিজস্ব করে তা জানি, সৃষ্টিও আমার সেই জ্ঞান ও বোধ দিয়ে চরিতার্থ, আমার জীবনের এই বিশেষত্ব এবং সৃষ্টির নিকটও এর এই অবিনশ্বর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে শত টানাটানি করেও কেউ কোনোদিন খসিয়ে ফেলতে পারবে না বটে, আমি একদনি তোমাকে ভুলে গেলেও না। কিন্তু যে সত্য একাবার হয়ে গেছে তা চিরকালের জন্যই সত্য হয়ে রযে গেছে, কিন্তু এ সত্যকে কেউ স্খলিত করতে না পারলেও আমার প্রেমের নিজস্বতাকে কেউ না বুঝে কথা দিতে পারে কিংবা বুঝেও, এখনই তোমাকে আমার নিজস্বতাকে সে অনুমাত্রও লঙ্ঘন কবতে যাচ্ছে, কিংবা তুমি তোমাকে লঙ্ঘিত করতে দিচ্ছ।'

তাকিয়ে আছে অরুণা।

—'তাকিয়ে আছ। যে সুন্দর বইটাকে আমি ভালবাসি কেউ যদি তাতে একটা কালির আঁচড় দেয়, কেমন লাগে? আমার সবচেয়ে ভালবাসার বইযের চেয়ে আমাব সব ভালবাসাব চেযেই ঢের বেশি ভালবাসার জিনিস তুমি। কাউকে তুমি প্রেম দিচ্ছ তোমার শরীর ও মন দিযে, সেই প্রেমেব হযত নানারকম স্থূল, হযত নানা রকম সূক্ষ্ম ব্যবহারই করছে সে, শুনলে কেমন লাগবে আমার? তুমি জিজ্ঞেস করলে তুমি বিযে করতে গেলে মনে মনে তোমার মঙ্গল বাসনা করতে পারব কিনা আমি। বুঝে দেখ, পাবর কিনা। যদি আমাকে না ভালবেসে, তাকে ভালবেসে, আমাকে ভালবেসে, তাকেও ভালবাস, আমাকে না ভালবেসে, তাকেও না ভালবেসে কিংবা আমাকে ভালবেসে তাকে না ভালবেসে, এসবেব যে কোনো অবস্থায়ই যদি বিয়ে কর, সবচেয়ে অনর্থক বিবাহেও ঢের সমর্পণের ব্যাপার রযেছে, তাকে তুমি অন্তত তোমার শীররটাও সমর্পণ করতে যাও বুঝে দেখ তোমার মঙ্গল বাসনা আমি করতে পারব কিনা। কিংবা তুমি হয়ত কিছু বুঝবে না এসব, কারণ এখনো তুমি কাউকে ভালবাসতে পার নি।'

—'কিন্তু এ ভালবাসা কি চিরকাল টিকবে তোমার? কারু জন্যই কারু ভালবাসা কি কখনো চিরস্থায়ী হয়?'

—'নাই বা হল, কিন্তু যতদিন সত্য ভালবাসা থাকে ততদিন যা বলেছি তাই নয়।'

—'তুমি কি এখনো আমাকে ভালবাস?'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে হিমাংশু বললে, 'বাসি বটে, কিন্তু একদিন যে বাসব না তাও বুঝি। এই জ্ঞান এখনো আমার ভালবাসার সেই মাঠের ঘাসেধ মত নিঃসঙ্কোচ স্বাভাবিকতাটাকে হিম করে ফেলছে। আমার মনে হয় আমার জীবনের শেষ ভালবাসাটা এমনি করেই শেষ হতে চলল। কোনো বিস্তৃত জ্ঞান বোধ পাকা হয় না বা অভিজ্ঞতা নতুন কোনো অবিসম্বাদী ভালবাসার অঙ্কুরকে চেপে রাখতে পারে না বটে, হয়ত সত্তর বছর বয়সেও এক অবশ্যম্ভাবী প্রেম ফুটে বেরুল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহ অবিশ্বাস পরিমাণ বোধ স্থিরতা ও শীত আসে জীবনে তাতে নতুন কিছু—'

এই অবধি লিখে বিনোদ থেমে পড়েছে।

আরো ঢের লিখবার ছিল। এই অরুণাকে নিয়ে আরো ঢের কথাবার্তা ছিল, সরোজিনী ছিল। কিন্তু এই সরোজিনীই তাকে তার টেবিলে বসে থাকতে দিচ্ছে না। ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি ঘটি গণ্ডগোলের সংসার থেকে খানিকটা ফাঁক করে কিছুটা সে লিখেছে। চারদিককার হুড়বাড় হাপদাপ অভিযোগ তিরস্কার তাড়না ও ভুগুলের ভিতর চিন্তার স্রোত আর চলছে না, মাথাটা টনটন করছে, চোখ যে অস্পষ্ট দেখছে সব।

খুকুনকে টেবিলের ওপর ছেড়ে দিয়ে গেছে সরোজিনী। সে হামা দিতে দিতে বাতিটাকে উলটে দিয়ে নিবিয়ে দিল। বিনোদ এবার–কলমটা ফেলে অবিশ্যি খুকুনকে কোলে করে বাইরে চলে যাচ্ছে।

আকাশটা বেশ পরিষ্কার। ঢের নক্ষত্র উঠেছে, পৃথিবীর মাঠ খেতে সেসবের আলো এসে আর পৌঁছায় না যদিও বটে। অন্ধকারের ভিতর পায়চারি করতে করতে বিনোদ ভাবছে। আর লিখবারও দরকার ছিল না কিছু। অনেক ঘটনা সে যোগ করতে পারত বটে, কিন্তু তাতে তার নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলোর গায়ে কোথাও কোনো হাত পড়ত না। এখনো সেগুলো ঠিক তেমনিই আছে। কোনো কিছু বদলাবার দরকার হয় নি। আজও ছ–সাত বছর পরে ঠিক সে ঐরকমই ভাবে।

সাত বছর হল সে বিয়ে করেছে। বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতাও তার হল, কিন্তু সে আর এক গল্প। অরুণাও তিন–চার বছর হল বিয়ে করেছে।

নতুন প্রেম জীবনে আর কিছু হয় নি বিনোদের, হবেও না হয়ত কোনোদিন। সেই শেষ ভালবেসে ছিল; অরুণাকে। কিন্তু সে ভালবাসা এখন আর নেই; অরুণাও যখন বিয়ে করল, তখন তেমন কিছু একটা আঘাতও লাগে নি বিনোদের। অরুণার বিয়েতেও সে গিয়েছিল এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই বাবা বড় একটা হয় না, পুরনোগুলো মনে করে প্রাণটা মাঝে মাঝে নরম হয়ে ওঠে,—মধুর—পৃথিবীর শীতের খেতগুলোর মত, গড়বার সময় যাদের শেষ হয়েছে, গড়বার সময়, সঞ্চিত মিষ্টত্বকে কুয়াশার ভিতর শুয়ে শুয়ে অনুভব করবার সময় এসেছে যাদের—তারপর কুয়াশার ভিতরই মৃত্যুর সময় দিয়েছিল।

না, নতুন প্রেম আব কোথাও নেই, সে জানে, হযত বের হবে। জীবন কখন কী যে আবিষ্কার নিয়ে আসে কে জানে।

কিন্তু একটা কথা আজকের জীবনে বেশ খাটছে। জীবনের বেশির ভাগ সময় ভরেই এই সত্যটা জীবকে প্রকৃতিস্থ করে চালিযে নেবে, মধুর করে রাখবে। নিজের লেখা লাইনকটাই মনে পড়ছে বিনোদের। কিন্তু বযসের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহ অবিশ্বাস পরিমাণ বোধ একটা হয় না, পুরনোগুলো মনে করে জীবনটা মাঝে মাঝে নরম হয়ে ওঠে, মধুব, পৃথিবীর শীতের খেতগুলোর মত, গড়বার সময় যাদের শেষ হযেছে, বাড়বাব সময়, সঞ্চিত মিষ্টত্বকে কুয়াশার ভিতব শুযে শুয়ে অনুভব করবার সময় এসেছে যাদের,—তারপর কুযাশার ভিতর মৃত্যুব সময়।

মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে

আসামে ব্যবসায়ের জন্য রওনা হয়েছে প্রবোধ। আসামকে সে কেনোদিন দেখে নি। দেশটার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণাও নেই তার, আসামিরা যে শুধু নিতান্ত ইদানীং অগ্রসর হবার জন্য চেষ্টা করছে, তাও একজোটে বা এক মন দিয়ে কিছু নয়। এ অবধি সে জানে। লোকের কাছে শুনেছে। এও শুনেছে যে দেশটায় ব্যবসায়ের এখনো অনেক সুযোগ-সুবিধা পড়ে রয়েছে। আসামের অগাধ বনগুলোর সংস্রবেই না কত ব্যবসা করা যায়—তার চায়ের ক্ষেতগুলোর সম্পের্কে। তা ছাড়া না ধরা না ছোঁয়াও এমন দশ-বিশ ত্রিশ-চল্লিশ কত বড় বড় ব্যবসায়েরই অবসর পড়ে রয়েছে। খুঁটিনাটিগুলোর ত কথাই নাই।

আসামিরা নিজেদের দেশের স্বাভাবিক নানারকম সুযোগের অপব্যবহার করে এসেছে, ব্যবসায়ের সুবিধা সাহেবদের কাছে ছেড়ে দিয়েছে, মাড়োয়াড়িদের, শিখ-পাঞ্জাবিদের হাতে, পশ্চিমে মুসলমানদের হাতে, বাঙালিদের হাতেও—কিছু কিছু বটে। এই সব শুনেছে প্রবোদ।

সত্যাসত্য জানবার সুযোগ হয় নি তার কোনোদিন।

ব্যবসা সে কোনদিন করে নি।

ব্যবসা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা, কাণ্ডজ্ঞান বা বংশের রক্তের প্রবণতা কিছু তার নেই, রুচি অবদি নেই।

পৃথিবীর এক জায়গার থেকে আর এক জাযগায তাড়া খেযে বাধ্য হযে শেষসম্বলের মত এটাকে ধরতে হয়েছে মাত্র।

কলকাতার ব্যবসায়ের হাঙ্গামা বড্ড বেশি। রাতারাতি বড়লোক হবাবও কোনো উপাযও নেই। আমাকে ইতস্তত দু-এক ঘর আত্মীযস্বজন ত আছেই। আসামের বড় বড় ব্যবসাপ্রধান চা বলে প্রবোধের চেনাজানা জ্ঞাতি বন্ধু সম্পর্ক মন্দ নাই। এদের মধ্যে কেউ কেউ গবর্নমেন্টের বড় বড় অফিসাব।

আসাম মেলের একটা ইন্টার ক্লাস কামরায় দুটো চামড়ার বড় মাঝারি সুটকেস ও বেডিংটা ঠেলে দিযে শেয়ালদা প্ল্যাটফরমে পায়চারি করতে করতে প্রবোধ ভাবছিল সুযোগ ও সুবিধাগুলোকে অকাতরে খাটিয়ে নিলে একটা কি কিছু হবে না?

ইউনিভার্সিটির থেকে পাঁচ-ছয় বছর হল বেরিয়েছে সে, দু-চার বছর কলেজে কাজ করেছে, কিছু টাকা জমে গিয়েছিল, ভাঙিয়ে দু-চার বছর ওকালতিরও চেষ্টা করেছে। তাবপব লাইফ ইনসিওবেন্সের এজেন্সি, এখন আসামে ব্যবসায, হাতে মজুদ টাকা বিশেষ কিছু নেই এখন আর। যা আছে তাও নিজের নয়, পরের, কিস্তিতে কিস্তিতে সুদের হাত থেকে নিস্তাব নেই। বিয়ে করে নি, পরিবারেব ভাবনা ভাবতে হয় না, কিন্তু তবুও জীবনটাকে কারা যেন বেঁধে ফেলেছে, কোথাও কোনো নিস্তার দেখা যাচ্ছে না।

আর এই স্বাস্থ্য, এটাও বা কদিন টিকবে? বুড়ো হতে চলেছে না? বিয়ে—কোনোদিনও কববে না কি সে? নীড় বাঁধবে না কোনোদিন? কোথাও গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসতে ইচ্ছা করে। গভীর শীতেব রাতে শিকারীদের দলে বনের ভিতর একবার ঢুকেছিল সে। ক্যাম্পে সবাই ঘুমিয়ে আছে। বন্দুককে সঙ্গী না করে বনের আশপাশের আসাদটাকে যতদূর জমিয়ে নিতে পারা যায়, চাচ্ছিল, ঘুঘু, বনমোরগ বুনোহাঁস খেঁকশিয়াল, খরগোশ ও দু-চারটা হরিণ ও নানারকম পাখির চমক চারদিকে—নক্ষত্র, নিস্তব্ধতা, টপটপ করে শিশির পড়ার শব্দ—শীত, এই সবের ভিতর খড় ঘাস সুতো কুটো আঁশের বিছানার নিবিড় নিরালায় কাকে যেন চমকে দিয়েছে প্রবোধ। দুটো পাখি তাদের মাটিরই উপরকার বাসার থেকে সরু সাদা ডানা টেনে সুবোধকে দেখছে, সুবোধেরই চমকের অপেক্ষা করছিল, বনের ভিতর আর কোথাও কোনো ভয় নেই যেন, অস্থিরতার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রেমে কোনো বাধা নেই, শান্তির কোনো শেষ নেই-সমস্ত শীতের রাত ভরে পালকে পালক ডুবিয়ে সংসর্গকে বোধ করা—এই এদের। এমন একটা নিশ্চয়তা কি জীবনে পাওয়া যাবে না? হৃত ভালবাসাও নয়, গৃহের ভিতর স্থিরতা একটা—সংসর্গ ও সমবেদনার একটা শান্তি, পৃথিবীর শীতের নিস্তব্ধতার ভিতর নক্ষত্র-নরম বনজঙ্গল, ছায়া, শিশিরের শব্দ, পাখির বাসা, দুটো সাদা ডানার নিচে নিবিড় গরমের আরাম, এই সব।

বুকে লেগে রয়েছে প্রবোধের।

কিন্তু কে তাকে এই সব দেবে?

মানুষের জীবনের চিন্তা ও অপচিন্তার ছটফটানির ভিতর এসবের স্থানই-বা কোথায়? বনকে মানুষ ঠাট্টা করে, বুনোকে, কিন্তু খেঁকশিয়ালের জন্যও তার গুহা রয়েছে, বনমোরগদের জন্য নীড়, মানুষদের শুধু যেন সমস্ত গৃহ সকল ভালবাসা ও সমস্ত শান্তির অতিরিক্ত।

কিন্তু প্রবোধ—মানুষটি।

কে তার জন্যে ভাবছে?

একজন লোকও নেই যে স্টেশনে তাকে উঠিয়ে দিতে এল। অথচ এই কলকাতায়ই জীবনের ত্রস্ত-সন্ত্রস্ত দশটা বারটা বছর সে কাটিয়ে গেল।

সকালবেলায় তিনসুকিয়ায় গিয়ে গাড়ি পৌঁছেছে। প্রবোধ মাকুম জংশনে যাবে। তিনসুকিয়ায় তাকে খানিকটা সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

স্টেশনের বারান্দায় এক কোনায় মালপত্র রেখে প্রবোধ দু-এক পেয়ালা চা খেয়ে আসছে, স্টেশনের রেস্টুরেন্টটা কাঠের তৈরি, বেশ বড়, মাটির থেকে কাঠের পোক্ত মইয়ে চড়ে ওপরে উঠতে হয়, এই সব আসামের নিয়ম, ভূমিকম্পের জন্যই হয়ত কাঠের ঘরদোরের ব্যবস্থা। গরম চা পাতলা, বিশেষ কোনো আস্বাদ নেই, চারদিককার প্রচুর চায়ের বাগানের বাড়াবাড়িটাকে প্রতিহিংসা করে এই হয়ত প্রতিশোধ।

চা যারা পরিবেশন করছে তাদের বাঙালি মনে হচ্ছে। হযত এতদূরে এরাও একটা ব্যবসা ফাঁদতে এসেছে; উন্নতি নিশ্চয় হচ্ছে, জীবনে বে-এক্তার আমোদের স্থান কোথায় হল না হলে? আজকের ঘুঘু, কালকের ঘুঘু, ছোট মাঝারি বুড়ো সব রকমই ইযারই রয়েছে এদের মধ্যে। শীতের সকালে চায়ের চাটেই হয়ত জমেছে। কে কোথাকার কোনদিকে কতদূরে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। উড়ু উড়ু পায়রার মত ক্রমে ক্রমে চারদিকে খসে পড়ছে। রেস্টুরেন্টটা মাটির থেকে যেমন উঁচু, তেমনি অস্বাভাবিক রকমের বড়। একটা মস্ত হলের মত। একটা নিস্তারের আস্বাদ পাওয়া যায়, সবাই চলে গেলে বেশ একটা নিস্তব্ধতার।

দোকান থেকে নেমে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখছে প্রবোধ। বাঙালি এখানে নিজেকে কিছু একটা মনে করে, এও যেন তার নিজেরই দেশ। মন্দ কি?

দু-চারটে শিখ দেখা যাচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে চারদিক থেকে আরো ভিড়ছে। এরাও সেই ব্যবসাযেরই গন্ধে, সেই মোটব পেট্রল টায়ার ও মেশিনিজমের বিশেষজ্ঞতা কাজে খাটাচ্ছে হয়ত।

খুঁড়ে দেখবার সময় নেই। তিনসুকিয়ায় থাকবার কথা নয—মাকুমে যেতে হবে। ব্যবসাটা মড়োয়াড়ি, পাঞ্জাবি, পশ্চিমাবাই ছেঁকে বসেছে সবচেয়ে বেশি।

ক্লান্ত হয়ে বেডিংটার উপর বসেছে প্রবোধ। একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিচ্ছে। স্টেশনের সম্পর্কে রাজমিস্ত্রিদেব কাজ চলেছে, দুজন শিখ কনট্রাক্ট নিয়েছে। ছাপরা মুঙ্গেরের কুলি আর মজুরানীরা খাটছে, এই সব নিয়ে হইচই হট্টগোল, হুড়-হ্যাঙ্গামার আর সময় নেই।

দু-একটা কুলি মেয়েকে চোখে ধরে যায়। নিতান্ত সহানুভূতির সঙ্গে প্রবোধের দিকে তারা তাকিযে ফিরছে। যেন তোমার বক্তব্য আমরা বুঝেছি, নিবেদন কর, তাও শুনব, কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে শ্রান্ত হযে খানিকটা উদাসীন হযে আবার তাকিযে বলতে চাচ্ছে যেন 'নিবেদন কর, আমরা শোনবার জন্য রেয়েছি, কিন্তু তোমার সাহস আছে কি?'

না, তা নেই।

তা থাকলে সহানুভূতি ও খিদের তৃপ্তির জন্য কলকাতা ছেড়ে তিনসুকিয়ার কুলি মেয়েদের কাছে এসে ভিড়তে হত না। জীবনের অনেক সমাধান অনেক আগেই হয়ে যেত। ধিক্কারে মাথা হেঁট করে প্রবোধ ভাবছে, 'আর তাকাব না, পণ্ড অচরিতার্থ অসাহসী জীবনের জানালার ভিতর দিয়ে শেষে কি না কী বের করে ফেলি কে জানে!'

মাকুমের দিকে গাড়ি চলেছে।

দু-ধারে ধানের জমি, চায়ের খেত। রোদ ফসলের প্রকাণ্ড সে এক পৃথিবী। এর যেন কোনো সভ্যতা নেই, ইতিহাস নেই, কোনো স্মৃতির অস্বাদ নেই, পুরনো নরম ছাতকুড়োর জন্য মমতার কোনো গন্ধও নেই, সে সবের জন্য কেউ ঘাঁটাতেও আসে না একে, কিন্তু তবুও এ যেন ঢের পুরনো—সমস্ত নতুন সঞ্জীবতা—ধানের চাযের পরিষ্কার পরিপূর্ণ ভাঁড়ালের ভিতরেই যেন কোনো ঘুম ঘুমিয়ে রযেছে। সেও কি আজকের থেকে? পৃথিবীর সমস্ত মোহই চারদিকে যেন মাছি পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু চারদিককার জাদুর বাতাস এখানে, কবেকার একটা কুহককে পৃথিবীর সমস্ত স্থূল জিজ্ঞাসা সন্দেহ অজ্ঞতা

ও অজ্ঞানের হাত থেকে বাঁচিয়ে চায়ের মাঠ থেকে চায়ের পহাড়ে, চায়ের পাহাড় থেকে আকাশে, আকাশের থেকে ধানের মাটিতে জঙ্গলে, নদীতে, পাথরে, রোদের তীব্রতায় মাখনের মত নরম করে ছড়িয়ে রেখেছে। কোনো এক মেয়ের হাত যেন। কি অলীক মমতাময়ী সে।

ভিজে ভিজে ঘাসে খোঁপা খসে, ছড়িয়ে, মেয়েমানুষদের ঘ্রাণে সমস্ত পৃথিবীটাকে ভরে ফেলে জীবনের সমস্ত উষ্ণতাকে সে যেন স্নিগ্ধ করে ফেলছে।

কার কোলের ঠাণ্ডা নোনতা সংস্পর্শ শীরটাকেই তৃপ্তি দেয়, মনের তৃপ্তিটাকে শারীরিক করে তোলে, কিন্তু তবুও তার শরীরটাকে স্পর্শ করা যায়না। রক্তমাংসরোমের অপরূপতা নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে সে। একটা অপরিসীম খিদে রেখে যাচ্ছে।

চায়ের বাগানে পাখিদের খ্যাঁচখ্যাঁচ—এদিকের মাঠে মাসে কয়েকটা চড়ুই শালিখ মনিযার লুটোপুটি।

মাকুমে গাড়ি থেমেছে।

দু-এক মিনিটের ভিতরেই মাল নামিয়ে নিতে না নিতেই গাড়ি লিডোর দিকে উড়ে চলেছে।

কোথাও মজুর কেউ নেই। স্পষ্ট কুলি বলে কাউকে ধরতে পারা যাচ্ছে না, কলকাতায়, বাংলায় ও পশ্চিমে যারা ফিরেছে তাদের বেকুব বানিয়ে দেয় আসামের এই সব আঘাটাগুলো, মনে হয় যেন এখানকার লোকের না আছে কোনো সহানুভূতি, না আছে ব্যবস্থা, না আছে নিজেদের জন্য কোনো বিবেক, বোধ, না আছে অন্যদের দাবিদাওয়ার উপর কোনো বিচার। কোনোদিক দিযেই এরা মানুষ নয় যেন।

এই স্টেশনে কি মাল নিয়ে কেউ নামে না?

কিন্তু আসামী ও দূরের কথা, দেশোয়ালি এমনকি একটা উড়ে কুলিও চোখে পড়ছে না।

ভিড় কমে যাচ্ছে।

মালপত্র নিযে কি ব্যবস্থা করবে—জীর্ণশীর্ণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষজানোযারদের ভিতর কাকেই-মাল সামলাবার জন্য ডেকে অপদস্থ হতে যাবে এই সব দ্বিধা নিয়ে প্রবোধ দাঁড়িযে রয়েছে।

কিন্তু কেউই এগচ্ছে না তার কাছে। কোনো পযসাব লোভেও না। এমনি সময সিকিমের বড় কালো প্রজাপতির মত একজোড়া গোঁফ, গোঁফের মতই তেলপুষ্ট তাগদের চেহারা, হেঁড়ে গলা ও একগাল হাসি নিযে বোথা এসে হাজির।

পিছনে বিপান। এক হাতে লণ্ঠন, এক হাতে হুঁকো।—'এই যে জেনারেল, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে করে ত হয়রান। প্রায দশ পনের মিনিট হল দাঁড়িয়ে আছি, অথচ একটা—।' বোথা তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে'—ও, তাহলে গাড়ি বোধহয় এতখান লেডো গিয়ে পৌঁছেছে। একটা জংশন বটে, অথচ গাড়ি এখানে এক মিনিটের বেশি থামে না।'

—'তা ত থামে না।'

—'কেন?'

—'কেন আবার কি? আসামের নিয়মই এই, ই বি রেলওয়েতে চড়ে যখন সান্তাহার পেবিযেছে তখনই এইসব বোঝা উচিত ছিল।'

বোথা বিপানের ঘাড়ে বেডিং ও বড় সুটকেসটা চাপিযে দিয়ে বললে, 'বোঝা উচিত ছিল ভাই যে দেশে চলেছি—'ছোট সুটকেশটা হাতে নিযে বোথা বললে, 'হুঁকোটা তুমি ধর প্রবোধ, না হয় লণ্ঠনটা।'

হুকোটা নিচ্ছে প্রবোধ, লণ্ঠনটা বিপান।

এ কি যে সে আঘাটা, একটু হুঁশিয়ার না হলে গাড়ি তোমাকে লিডো নিয়ে ছেড়ে দিত, না হয সারাঘারিটার জঙ্গলে ফেলে দিত, মাকুমের টিকিট কেটে আমাদের এরকম দশ-বারবার নাস্তানাবুদ হতে হযেছে, কিন্তু তুমি প্রথম যাওয়াই উৎরেছ বেশ ভাই প্রবোধ, দাও হুঁকোটা আমার হাতেই দাও'

—'থাক, আমার হাতেই থাক।'

তাই ত এ ত কলকাতার রাস্তা দিয়ে চলছে না, এখানে জীবনটাকে নির্বিবাদে ন্যাংটা করে ছড়িয়ে রাখতার অনেক সুবিধা পাবে, প্রচুর সুযোগ, আমরা। চারদিকে পাড়াগেঁয়ে মানুষ সব, তার ওপর আসামী।'

—'পাড়াগাঁ কি করে হল? একটা জংশন না?'

—'আসামের সব স্টেশনই জংশন।'

—'তাই?'

'আমাদের সকলের কাছেই মাকুম একদিন মোগলসরাযের মত মনে হযেছে, কিন্তু সে যতক্ষণ না

লিডোর গাড়ি স্লিপারের ওপর বুঁচকি-বোঁচকা সুদ্ধ আমাদের ছুঁড়ে ফেলে ছুট দিয়েছে, কেলনায়ের থেকে শুরু করে কুলি অবদি আধঘন্টা ভেতরেও যখন আমাদের খোঁজ নিতে আসে নি, কিন্তু সে আর বলে লাভ কি? আসামে, নতুন জায়গায় এসেছ, অনেক নতুন জিনিস দেখবে। কিন্তু ফের কলকাতায় ফিরে যাবার সময় মনে হবে আসামের জংশনের মত যে নূতনত্বটুকু পাওয়া গেল, জীবনে কোথাও আর তা কোনোদিন পাওয়া যাবে কিনা।'

—'হরেন এখানে আছে?'

—'হরেন, অমিরাংশু আর আমি এই তিনজনে আছি।'

—'আর সব?'

—'ভেগে পড়েছে।'

—'কেন?'

—'চল ঘরের ভেতর, আজ সারারাত গল্প করা যাবে, তোমার শীত করবে না?' সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পুরনো নোংরা মতন একটা ছোটখাট পাকাবাড়ির কম্পাউন্ডে এসে, চারদিককার অবাধ মাঠ নজরে পড়ে।

কুয়াশা জমেছে। শীতের খোঁচা বেশ তীক্ষ্ণ।

সূর্য যে নাহরের জঙ্গলের পিছনে, স্টেশনের পিছে চায়ের বাগানের ওপারে ডুবে যাচ্ছে নতুন আর্টিস্টের রঙ রেখা ও প্রতিবার সম্পূর্ণ আলাদা বিশেষত্বের মত চমকে দিয়ে যায়, নতুন ছবির গোড়ায় জীবনের রসকে আবিষ্কার করে, পুরনো ছবির গোড়াকার জীবনের রসের থেকে পৃথক করে রাখে, ওলটপালট করে ফেলে তারপর-অন্ধকার আসে।

নাহরের শাখা বাতাসে নড়তে নড়তে রঙ্গিলা হয়ে ওঠে, কালো হয়ে যায়। জীবনের পুরনো প্রেম কোনোদিন ছিল কি? পুরনো আগ্রহ, আন্তরিকতা, সাধ, মোহ, কুহক, সমস্তই হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়। জীবন কোথায় ছিড়ে চলে এসেছে?

জীবনের ঢের সময় হয়ে গেল না? এই বার থেকে জীবনটা যেন বোজা চোখের হাতে, অন্ধকারের, শীতের, নিস্পৃহতার, নিরাবলম্বনের ও অজ্ঞানের কুজ্ঝটিকায়।

অমিরাংশু ও হরেন মাস্টারমশাইদের বাড়ি তাস খেলতে গিয়েছে।

ঘরের ভিতর বোথা একটা ডেকচেয়ার পেতে দিয়েছে—'বোসা। স্নান করবে প্রবোধ?'

—'করলে হত।'

—'করলে মন্দ কি? আমিও রোজ বিকেলেই করি। কিন্তু বুঝে দেখ, একে সন্ধেরাত, তার ওপর শীত, তদুপরি জার্নির স্টেন, তায় ঋতু পরিবর্তন, তার ওপব আসাম।'

নিজেকে আমি অতশত কিছু বলি না, যা সাধ হয় করি, কিন্তু হঠাৎ নিমোনিযা বসবার ভয় যে নেই তেমন আশ্বাস আমি দিতে পবব না।—'গরম জলের ব্যবস্থা আছে?'

—'তবে কি ঠাণ্ডা কুয়োর জলে ঝুপ করে ব্যাঙেব মত লাফিযে পড়বার মতলব নাকি?'

—'কোথায় স্নান করতে হবে?'

—'ঘরের সঙ্গেই বাথরুম।'

চান করে গোছগাছ হয়ে ফিরে আসতে না আসতেই বোথা নিজের হাতেই চা-বিস্কুট, রুটি ও গোটাকয়েক কমলালেবু এনে হাজির।

রাত হচ্ছে।

মশা কামড়াচ্ছে।

বোথা বিছানাপত্র রান্নাবান্না খাওযা থাকাব তত্ত্বাবধানের ফাঁকে ফাঁকে এক আধবার ভিড়ে যাচ্ছে।

মাথাটা কনকন করছে।

চুরুট জ্বালাতেই অমিরাংশু এসে হাজির, পেছেনে হরেন। চেযার ডেকচেযার টেনে বসে পড়ছে সব।

—'বিজনেসের কথা হোক হরেন।'

—'তোমার মাথার কোনো প্ল্যান আছে প্রবোধ? না বোথাকে কাঁচা জমিদারের বাচ্চা ও ভাগ্নেজামাই পেয়ে চলে এসেছ?' অমিরাংশু শুধুচ্ছে।

—'অনেকটা সেরকমই।'

হরেন—'আমাদেরও তাই?'

—'কেন, তোমরা কিছু ফেঁদে বস নি এতদিনে?'

—'বসব বসব ভাবছি।'

—'ঘাবড়াচ্ছ কীসে?'

অমিরাংশু—'ডাল মার্কেট। তার ওপর শীররটাই ঠিক থাকছে না হে, একদিনের ছুটোছুটিতেই তিন দিন বেতালা হয়ে পড়ে থাকে, বাতাসের ভেতর একটা নিমজ্বর নিমজ্বর সব সময়েই লেগে আছে। রোজ ভোরে উঠেই শরীর ম্যাজম্যাজ, কলকাতার টিকিট কিনতে পারলে বাঁচি যেন, কিন্তু কলকাতায় কে আছে?'

অমিরাংশু—'তবেই হয়েছে! এক এক সময়ে ভাবি কেন বাংলাদেশে যেতে পারব না আমি, বাঙালির ছেলে কলকাতা না হোক বেঙ্গলের একটা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়ে থাকলেও ত হয়, তবুও নিজেদের ভাষায় কথা বলে মুখ ব্যথা করে ওঠে না আর, নিজেদের মা বোনকে না হোক দেশের মানুষকে দেখতে পারি তবু। কিন্তু বাংলার কোথায়ই বা যাওয়া যায়? যেতেই বা দেবে কে? জায়গাই বা কোথায় পাব? এখানে তবু তোমার ভাগ্নজামাইটির কৃপায় দুবেলা খাবারের চিন্তা নেই।'

—'তাহলে তোমরা দুবেলা খাবার জন্যই শুধু এখানে আছ অমিবাংশু?'

—'এরকমই তাই।'

—'তবে ব্যবসার প্ল্যানটা এখনো চলছে।'

—'কীসের ব্যবসা করবে?'

—'এই ধর টিম্বারের। একবার গোছগাছ করে নিলাম, একটা ফরেস্ট লিজ নেব ভাবলাম, সে ভার বোথার ওপর রেখে আমরা করাতি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, করাতি কি ভাই, যাকে তাকে পাওয়া যায়? আর যে সে করতে চায়? ও নেপালি বাঁদর ছাড়া চলে না। আব বাঁদরগুলোকেও পাকড়ানো কি সহজ? তার চেয়ে বরং খেধায় হাতি ধরা ঢের আযেসের কাজ। তবুও মদের লোভে খানিক মোটা কিছু নজবের কযেকটা এমন সময় বোথা এসে খবর দিলে ফরেস্ট লিজ নেয়া হবে না।'

—'কেন?'

—'বোথার মর্জি।'

হরেন-—'মর্জি ঠিক নয়, এ বড় শক্ত ব্যাপার, ঢের হ্যাঙ্গাব আছে, গবর্নমেন্টকে পাকড়ানো অত শস্তা নয়।'

অমিরাংশু—'আরে ধুত্তুবি তোব হ্যাঙ্গাম, ফরেস্ট অফিসার কালী মুখুজ্যে এক বাঙালি তায বোথাব চেনা, আত্মীয না হলেও জ্ঞাতি কুটুম। কবাতি জোগাড় হল, ছাউনি পড়ল, কাজ শুরু হবে, লিজের জন্য ঠেকে থাকে?'

—'বোথা কী বললে?'

—'বললে যে কি জানি অফিসার হযত ঘুষ খাবে না, খেলেও আমি দেব না, আব দিতে গেলে টাকাই বা কোথায়? আমি বললাম, ও হরি, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি টিম্বারের ব্যবসা করতে এসেছ? আব আমার সঙ্গে করে এই দেশে হিঁচড়ে এনেছ, যা, যা তুই করাতিগুলো সামলা, আমি লিজ নেই গে'—বললে যে—'না ভাই, আর একটা ব্যবসা দেখো' আমি বললাম, 'বেশ বাছাধন, হাতি ধরবে?' বললে 'বড় ব্যবসায় ঝক্কি বড্ড বেশি, লোকলস্কর টাকাকড়ি পঞ্চায়েতি ওসব হবে টবে না বাপু। তার থেকে তোরা ছোটখাট একটা কিছুতে গুটিযে আন না, দ্যাখ, তোদের হাতেই ছেড়ে দিলাম বাবু।'

—'তারপর?'

—'তারপর থেকে বেত, ল্যাক্, লাক্ষা, হে লাক্ষা, তুলো, ইট মাটি অনেক কিছু নিযেই হাত রগড়ানো গেল।'

—'হল কিছু?'

—'তোমার ভাগনিজামাইকে জিজ্ঞেস কর।'

কিন্তু ভাগনিজামই তখন রান্নাঘরের কাজে।

একটা বিড়ি জ্বালিয়ে অমিরাংশু বললে, 'জিজ্ঞেস করলে বোথা কি বলবে জান?'

—'কী'

—'যে দুটো এঁড়েকে নিযে পড়েছি, দাঁড়া কলকাতার থেকে ভাল লোক আনছি, টাকা আমার হুজুম আমার, আমি পাকা লোক আনব।'

হরেন—'কথাটা নিতান্ত মিথ্যে বলে নি।'

—'আরে দেওরি তোর পাকা লোক, কলকাতার থেকে পাকা লোক! রেখে দাও, রেখে দাও, হ্যাঁ

হ্যাঁ, আসামের সীমান্তে ব্যবসা করবার জন্য কলকাতার থেকে পাকা লোক আনছে। তাদের আর খেয়ে বসে কাজ নেই। আজকালকার দিনে।'

বাঁধা দিয়ে অমিরাংশু বললে, 'কোনোদিনও না, সে যারা আসবে নিজের ক্যাপিটাল নিজের কোম্পানিতে আসবে। হয়ত হাতি ধরতেই এল, কিংবা টিম্বারের ব্যবসায় লাখ লাখ মেরে চলে গেল'-নেভা বিড়িটি জ্বালিয়ে নিয়ে—'কিন্তু ওর টাকার গরমে আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে আমাদেরই ফিরিফিরতি, কি বলছে প্রবোধ?'

প্রবোধ কোনো জবাব না দিয়ে নিস্তব্ধভাবে চুরুটটা টেনে যাচ্ছে দেখে অমিরাংশু বললে, 'তোমার ভাগনি জামাইয়ের মুখের ওপরই কতবার বলে দিয়েছি, কিন্তু ও-ও আমাদের মুখের কথায় ছাড়া তাড়াতে পারবে না, আমাদের ও ছাড়া গতি নেই।' একটু পরে—'ব্যবসা-ফ্যাবসা কিছুকাল হল স্থগিত রয়েছে।'

—'এখন আর কিছুতেই হাত নেই?'

—'না, একে শরীরই সকলের? হয়ে গেছে, তার ওপব এই মার্কেট, তাছাড়া ঢের লোকসান হয়ে গেছে কতদিন বসে, অনেক ব্যবসাদারই নার্ভাস হযে পড়েছে।'

হরেন বললে, 'অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

—'দু-চারটে দু-চারটে চা বাগান শস্তায় শস্তায় আসামিরা প্রায়ই খসাচ্ছে, কিন্তু এমনই দুরবস্থা আগে যদি এরকম টাকা বা কোনোদিক দিযেই ভাবতে যেতাম না, সাহসে ফেলে দিতাম। কিন্তু এখন দুদিক দিয়েই গড়াচ্ছে। দেখি কি হয়, দেখি কি হয় এই রকম ভাব আর কি। সাঁ করে খিঁচে একটা কিছু করতে পারা যাচ্ছে না।'

হরেন—'ব্যবসায় সাহসও চাই।'

প্রবোধ—'জীবনেও।'

অমিরাংশু-সাহস বলে সাহস, মারাত্মক রকমের। আমি ত বলিই কিনে ফেল গোটা দুই চায়ের বাগান। আর বেশি দূরে কেন, হাতের কাছেই ত বড়ুযাদের এস্টেট রযেছে।'

—'বোথা কি বলে?'

—'টাকায কামড়ায, না কীসে, কে জানে?'

হরেন—'ক্ষতি হতে হতে ঐরকমই হয, একটা ভযে-চাযের বাগান এ জলের দরে গোটা চারেক কিনে রাখলে একদিন এদিকে ওর ব্যবসা দাঁড়িয়ে যেত, কেউ মারতে পারত না' বিড়িটা ফেলে দিযে-'কিন্তু আমাদের কথাকে ও কেযার কবে না, কলকাতায টেলিগ্রাম করেই চুপ।'

প্রবোদ—'কলকাতায় কীসের টেলিগ্রাম?'

—'গার্ডেন কিনবে কি না।'

—'কাব কাছে?'

—'সে সব ট্রেড সিক্রেট, আমাদেব জানা নিষেধ।'

হরেন—'টি সিডেব কাববারের কথাও একসময ভাবছিলাম। কিন্তু যাদের টাকা আছে তারা টি সিড আর গার্ডেন দুটোই একসঙ্গে চালাতে পারলে ভাল হয, কি বলছে অমিরাংশু?'

অমিরাংশু বললে, 'কুইনিনের টিউবটা তোমার পকেটে?'

হরেন—'কেন, আবার জ্বব এল?'

—'ইড়বিশ ইড়বিশ করছে।'

—'বিছানায শুযে থাক গে।'

—'কে সঙ্গে শোবে?'

—'কেউ না।' ঠাট্টা ও অভিনয়ের সুবে—'আমার কে আছে হরেন?'

—'আমি আছি।'

—'তোমার কে আছে?'

—'তুমি আছ।'

—'বেশ, আর কিছু চাই, না, তাহলে একটা বিড়ি জ্বালানো যাক, টিউবটা দাও ত।' গোটা দুই কুইনিন গলার ভিতর ছুঁড়ে ফেলে কোঁত কোঁত করে গিলতে গিলতে অমিরাংশু বাঘের মুখে পাঁঠার মত চোখ দুটো একবার উলটে নিলে, তারপর মুহূর্তের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে বললে, 'জ্বরেব চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হও।' বিড়িটা জ্বালাতে জ্বালাতে বললে, 'ম্যাজিক লাগিয়ে দিযেছি, দু-চার ফোঁটা ব্রান্ডি পেলে হত হে

হবেন, কিন্তু জামাই তোমাদেব সবদিক দিযেই সেযানা হযেছে আজকাল। কোনো বাজে খবচ কবানো যায না, এই তিন মাস হতে চলল, আব এটা বাজে খবচই বা বলি কি কবে, কুইনিনেব সঙ্গে ব্রান্ডি!'

প্রবোধ চুরুটটা নিভে যেতে দিযে বললে, 'তাহলে তোমাদেব ব্যবসা এখন কলকতায ফিববাব ব্যবস্থা কবছে।'

—'যে কোনোদিনই, অবিশ্যি ব্যবস্থাটা যদি আমাব হাতে থাকত, যিনি ফাইন্যানসিযাব তার মাথা আজও আসামেব মাঠে ঘাটে ঘুবছে, আজ শিখদেব সঙ্গে কী মতলব এঁটে আসছে, কাল মোড়োদেব ফুঁসলাচ্ছে, পবশু বাগানেব শাহেবদেব সঙ্গে ডিনাব খাচ্ছে, একটা কিছু না কবে ছাড়বে না বোথা। কিন্তু তুমি কবেব থেকে ভাতে মবতে আবম্ভ কবলে?'

—'একটা এজেন্সি নিযে এলাম।'

—'কীসেব?'

—'সাবানেব।'

—'বলিহাবি! কী সাবান?'

—'সব বকমেব, কাপড় কাচাব, গায দেওযাব, প্রত্যেকটিবই অনেক ভ্যাবাইটি আছে।'

—'কোন কোম্পানিব?'

—'মর্গ্যান কোম্পানিব।'

—'বিলিতি তাহলে,—আবে ছ্যা?'

—'বিলিতি নয, বিলিতি নয, নামটাই শুধু বিলিতি, সে আমাদেব বিলিতি জিনিসেব ওপব ঘৃণা থেকেও নামেব ওপব এই মোহটুকু আছে বলে।'

হবেন—'কিন্তু তাও আছে কিনা সন্দেহ।'

অমিবাংশু—'চেষ্টা কবে দেখ, আমাব বিজিনেশ ব্রেন নয, কিছু হবে কি না হবে বুঝি না, তবে দিশি বলে এদেব কাছে আব মর্গ্যান কোম্পানি বলে ওদেব কাছে দু-জাযগাযই চালাতে পববে। অবিশ্যি সাবানেব ফিল্ড এদিকে কেমন আছে জানি না, কোনোদিন মাথায খেলে নি। তবে ক্যানভাস কবতে পাবলে মাটি বিক্রি কবেও লাখ টাকা কবতে পাবা যায।' একটু পবে—'কিংবা ওটা যদি ফেঁসেফুঁসে যায তাহলে বোথাকে বোঝাতে এইবাব লেগে পড়, একটা কিছু সামলে চলতে পাব কিনা দেখ।'

খাওযা-দাওযা কিছুক্ষণ হল হযে গেল।

অমিবাংশু ও হবেন তাদেব বিছানায। দুজনেব নাক ডাকাব শব্দে আসামেব শীতেব বাতে হুড়ো একবাব এগুচ্ছে, একবাব পৌছুচ্ছে।

প্রবোধ ডেক চেযাবাটা টেনে চুরুট ধবিযেছে।

বেতেব আবাম কেদাবায বোথা মুখামুখি বসে। দূব সম্পর্কে ভাগ্নিজামাই, তাছাড়া শ্বশুব বযসেও দু-এক বছবেব ছোট, চুরুটেব ধোঁযা প্রবোধেব মুখেব দিকে ফুঁপিযে ফুলিযে দিতে বোথাব কোনো সঙ্কোচেব দবকাব নেই। বলছে—'ওবা আমাব টাকা টাকা কবে চেঁচায, হাতি কবি না কেন, বাগান কিনি না কেন, চল্লিশটা হাজাব ধাব, পৈতৃক ভিটে বিক্রি কবেও ফাঁস এড়াবাব জো নেই, আসামই আমাব গেবো, না হলে ইচ্ছে কবে না কি সব ফেলে দিযে কলকাতায চলে যাই? কিন্তু তবুও এইখানেই মবতে হবে।'

চাঁদ উঠেছে।

ভোব না হতে উঠেই প্রবোধ মাঠে বেরুল।

সবাই তখন বিছানায।

সমস্ত মাঠঘাট কুযাশাব ঢাকা। তবু ইতস্তত যে দু-চাবটে ধূসব বাস্তা চলে গেছে তা এত নবম, এত নিস্তব্ধ এবং মানুষকে চুপিসাড়ে এত ডাকে যে প্রবোধ বাস্তা ধবে কোনো একদিকে চলেছে, কিংবা কোনো দিকেই না যেন, পুব উত্তব দক্ষিণ পশ্চিম কোনোকিছুবই বোধ নেই তাব। জানতেও চায না সে কিছু, পথেব শেষও দেখতে চায না, কোথায শুরু হযেছে সেদিকেও খেযাল নেই, কিন্তু এই শীত ও কুযাশাকে ভাল লাগে, পৃথিবীব যে কোনো নিকটতম বস্তুব থেকে, সে কি প্রবোধ তা জানে না, এই যে দূবে সবে যাওযা; অপ্রার্থিত, অনাবিষ্কৃত, এই, এইই চায সে।

ওপবেব পাতালতাব থেকে টপ্‌টপ্‌ কবে শিশিব পড়ে মাথা ভিজে যাচ্ছে প্রবোধেব। বাস্তাব ডানকে ইনস্পেকশন বাংলো।

বাস্তাব দুপাশেব জনজঙ্গলেব ভিতব পশ্চিমা কুলিদেব কুঁড়ে। হাঁস মুবগি ছাগল গরু, জবাফুলেব

গাছ, বড় বড় না হয়।

আসামিদের কোনো গন্ধও কোনোদিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন নিবিড় গম্ভীর নিস্তব্ধ গ্রামাগুলোর অন্তরের চেয়েও অন্তরের ভিতর আসামের নিজের লোকেরা বুঝতে পারছে না প্রবোধ। চুরুটটা জ্বালাচ্ছে। 'কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই কুহক থাকবে' কেন যেন মনে হচ্ছে প্রবোধের। এমন জাদুর দেশের লোকদের ভিতর তা যদি না থাকে—

মাইলখানেক এগনো হয়েছে।

রাস্তার আউটপোস্ট মোটরের পথ নির্দেশ করে দিচ্ছে। ডিগবয়ের দিকে যেতে হলে কোন পথ ধরতে হবে, লিডোর দিকে যেতে হলেই বা কোন পথ। এই সব পথে প্ল্যানটার্সদের মোটর চলে নিশ্চয়ই, অয়েল কোম্পানির সাহেবদের গবর্নমেন্ট বড়বড় অফিসারদের ব্যবসাদার পাঞ্জাবি শিখ মাড়োয়াড়িদের হয়ত।

চোখের সিদেসিদি আর একটা রাস্তা গিয়েছে। পৃথিবী ফরশা হয়ে যাচ্ছে।

কুয়াশা এখনো ঢের।

রাস্তাটা এখন একটা অনির্দিষ্ট প্রসারেব ভিতব নিজেকে ছেড়ে দিযেছে। বিস্তৃত ধানের জমি মাইলের পর মাইল, এপারে ওপারে গিয়ে আকাশটাকে যেন পৃথিবীর উপর টেনে আসছে। কলকাতায় আকাশটা সব সময়ই ঢের উঁচুতে থাকত, সবচেয়ে উঁচু ছাদে উঠেও তাকে সবচেযে দূরের জিনিস বলে মনে হযেছে। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে না।

এগিয়ে পড়ছে প্রবোধ।

ডানদিকের মাঠে অসংখ্য চিত্রকরদে বিহ্বল বিস্মিত তুলিব হাতে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছে যেন এক একটা বক। পৃথিবীর কোনো আর্টিস্টই কোনোদিন এগুলোকে বুঝোতে পারবে না, না কবিতায়, না ছবিতে। বাংলাদেশের বকদের চেয়ে আরো সাদা, আরো বড়, রূপকারের হাতের ননীর ভিতর থেকে পিঁজে পিঁজে উঠেছে যেন, মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়, ভিতরকার রূপসৃষ্টির প্রবৃত্তিটাকে শ্লেষ করতে থাকে।

সব দিক দিযেই এই প্রবৃত্তিটা আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে যেন আজ। নাহরের নীল শাখায রোদ লেগেছে।

বাড়ি ফেরা যাক।

টেবিলেব চারদিকে সবাই বসেছে।

পরিজ খেতে প্রবোধের ভালই লাগছে। এতখানি হেঁটে এসে যা পাওয়া যায়, নইলে চিঁড়ে দুধ কলারও কোনেদিন ভক্ত নয সে, তৎশামিল এই বিলিতি পবিজেব।

—'কোথায গিয়েছিলে প্রবোধ?'

—'বেড়াতে।'

হরেন—'রাত থাকতেই?'

অমিরাংশু—'হুড়োতে ধরে নি যে এই ভাগ্য।'

বোথা—'রাত মাথায নিয়ে এসব দেশে বেরুবাব বিপদ ঢের, এই শীতকালে।'

হরেন—'বাঘটাগ আসে।'

বোথা—'নেকড়ে চিতেও।'

অমিরাংশু—'কোম্পানি কুলি বলেও চালান দিতে পারে, না হয কুলিরা কোম্পানি ভেবে দু-ঘা হাতের সুখ করে নিতে পারে।' একটু পবে-'আব হাতের সুখই কি শুধু? আসাম হচ্ছে সমাজের সংসারের সবরকম ফেরার নেড়েদের জায়গা, দিনে রাতে আগানেবাগানে সব সময়ই ঢুই ঢুই করে ঘুরছে এরা কখন কোথায কার লুঙি খসিযে মাংস ছিঁড়ে নিতে পারা যায, আজাকাল ত আরো বেশি। একেবারে গাড়লে গণ্ডারে লবেজান হযে পড়েছে।'

বোথা আরো দুটো হাফ বযেল ডিম কিছু নুন গোলমরিচের সঙ্গে মেড়ে নিয়ে বলছে-'মিথ্যে কথা, যারা আসামের এই দুর্নাম দেয়।'

—'বোথার মত পিস্তল নিয়েই বা কজন বেরয়? আর আহা তুমি ত সেই ভেতর একজন, তোমাকে কে না চেনে দাদা? কাক কাকের মাংস খায না? প্রবোধকে বলছে-'পকেটটা ঝেড়ে দেখেছে ঠিক আছে কি না?'

বোথা—'এই গাড়ি আসছে, ধা করে যাও ত অমিরাংশু, পার্শেল বিলগুলো আমার ড্রায়ারে আছে। গোটা দশ-বার চালান আজ যদি না আসে—'

অমিরাংশু কেটলির থেকে চা ঢেলে নিচ্ছে।—'বোস, গাড়ি ত এখনো বড়ুয়াদের চা' বাগানের

পিছনে, ইস্টিশানে ভিড়তেও দাও আগে।'

হবেন চটপট উঠে পড়ছে।

পার্শেল বিলগুলো মিলিয়ে দেখছে। সাইকেলটা তার ইস্টিশন চক্কর দিতে চলল। বোথা চেঁচিয়ে বলছে—'লরিটা ঠিক রেখো হে হবেন, আজ সারাদিনই লাগবে, বুঝলে? মূলবাজকে আমি বলে এসেছি।'

বোথা হ্যাট-কোট আঁটছে।

কারু সঙ্গে একটা কথাও না।

সাইকেল ঘুরিয়ে কোনোদিকে বলল সে?

—'কোথায় ও গেল বলতে পার অমিবাংশু?'

—'বোধ হয় স্যার ডবলিউ ক্র্যাডক কিকিং ওয়ার্ধের সঙ্গে দেখা করতে।'

—'সে কে?'

—'প্ল্যান্টার।'

—'বোথার মতলব বড় শিকার টিকার কিছু?'

—'ওসব আর বলো না, এক কথা একশবার ফ্যাবড়া করতে ভাল লাগে না।' একটু পরে-'আমাদের জীবনটা কী? কলকাতায় চলে যাব ভাবছি, এখানে আর নয়, মরতে হয় সে ধাপার মাঠেই মরব, এই কানিখোরদের রাজ্যে আর না।' দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে—'কী আছে এখানে? একটা কে সেখানে যায়? যাদের পকেটে কুইনিনের টিউব আছে, গিয়ে করে কি? আসাম সমাচার পড়ে, আর কি হয়? বাঙালি কি রকম করে আসামিদের মত নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে তাই বোঝা যায়। হ্যাঁ, বাঙালি হর আমরা, বিধাতা সে জন্য আলাদা জানবার সৃষ্টি করে রেখেছেন, মেড়ো, শিখ, প্ল্যান্টার্স, পৃথিবীর সবদিকেই এদেরই ফিট ফায়দা।' একটা বিড়ি জ্বেলে নিয়ে—'পোস্ট মাস্টারটা আছে, মাস্টারমশাই আছেন, বিকেলের দিকে একটু ভিড় জমে। এই জন্যই যা বিঁধে থাকা। কিন্তু খেলতে খেলতে আবার জ্বর হয়ে পড়ে যেন।' দু-চার মিনিট চেয়ারটায় হেলান দিয়ে ধিকধিক করে বিড়িটা টেনে টেনে খুন হয়ে গিয়ে অমিবাংশু বিড়ি টেবিল চেয়ার মানুষ সমস্ত পৃথিবীটার উপরই খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'ধেত্তরি তার, ধেত্তরি, আমার ভাতারের বিড়ি, ডাকে কি চিঠি এল দেখে আসি।'

অমিবাংশু উঠে পড়ছে।

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'পোস্ট অফিসে।'

—'ডাক আসবার সময় হয়ে গেল?'

—'হু, দেখি কিছু এল টেল নাকি।'

অমিবাংশু তার ধিকপিকে শরীরটাকে কেঁচোর মত এঁচিয়ে পেঁচিয়ে মাঠের কুয়াশা ও শীতের ভিতরে নেমে পড়েছে। যেতে যেতে ফিরে এসে বললে, 'যাচ্ছি ত চিঠির জন্য—এই তিন বছরের ভেতর কখানা পেয়েছি জান?'

প্রবোধ উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছে।

—'একখানা মাত্র।'

—'এই তিন বছরের ভিতর?'

—'একেবারে গোনাগাঁটা তিন তিনটে বছর।'

পকেটের থেকে আর একটা বিড়ি বের করে সেটাকে রগড়াতে রগড়াতে—'কি খবর ছিল চিঠিতে জান? আচ্ছা খবর তোমাকে বলছি আমি, শুনলে অবাক হয়ে যাবে।'

—'বিড়িটা জ্বেলে নিয়ে অমিবাংশু বিশ্বসংসারকে লবডঙ্কা দেখিয়ে বললে, 'আমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর।'

—'তুমি বিয়ে করেছিলে অমিবাংশু?'

—'একটা ছেলেও হয়েছিল।'

—'সেই ছেলেটির কি হল?'

—'সেইই ত মাকে মারলে, নিজেও মরলে, অলক্ষুণে মা-খেগো গুখেগো কোথাকার? বিড়িটা টানতে টানতে অমিবাংশু একটু মজা বোধ করে হাসছে। কিন্তু হাসছে কি কাঁদছে মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই ঠিক ঠাওর করতে পারা যাচ্ছে না, এমনই একখানা মুখ।

হেমের জন্যে একটা বাথরুম তৈরি করতে হয়েছে। বড়লোকের মেয়ে না হলেও হেমের খাওয়া-পরার বড় ঘরের বউ-ঝিদের চালেই হয়েছে। তার জ্যাঠামশায়ের হাজারিবাগের বাসায় এবং কটক কলেজের বোর্ডিঙে তারপর ঢাকায় ইডেনে সে পড়েছে।

শ্বশুরবাড়ি একেই পাড়াগাঁর মত জায়গায়, তার উপর ঘরদোরের যা শ্রী চেহারা, খড়ের ছাউনি, দরমার বেড়া, সিমেন্টের ভিত নেই। হেমের মনে সব সময়ই একটা অশান্তি। গজগজ করছে।

শোবার ঘরের পাশে বরাবরই তার বাথরুম বাহাল ছিল। এ না হলে কী করে চলে? অমূল্যও বুঝছে, সবই জানে সে। পাকাবাড়ি রাতারাতি তুলে ফেলা বড় সহজ ব্যাপাব নয়।

কিন্তু হ্যাঁ কি বললে একটা বাথরুম, তা একটা তৈরি করে দিতে পারা যায় বটে, এমন আর কি।

প্রথমত হেমের শোবার ঘরের সে আলাদা কোঠায় একা এক বিছানায় শোয়। অমূল্যর বিছানা আলাদা ঘবে। পাশেই মাটির ওপর কতকগুলো ইট সাজিয়ে টিনের শেড দিয়ে দরমার বেড়া।

অমূল্য কাজে কিছু করে নি, প্রস্তাবটা করতে যাচ্ছিল হেমের কাছে, কিন্তু এরকম ধরনের অদ্ভুত বাথরুমের আইডিয়াটাকে মূলে হাভাত করে দিয়েছে হেম।

তারপর শানবাঁধানো বাথরুম হয়েছে বটে, পাকা দেয়াল ও টালিব ছাদওয়ালা পুরোপুরি একটা বাথরুম।

হেম একটু নবম হযে বলেছে—'এরকম একটা বাংলো হলে হত, আমার জেঠামশাযের হাজারিবাগের বাড়িটার মত।'

বাথরুমের চৌবাচ্চায় উড়ে ভারী চার ভাব কবে জল দিযে যাচ্ছে রোজ। প্রতিটি ভার চার পয়সা কবে।

কিন্তু বিযে কববার পর পযসাব হিসেব কষ্‌'ত হয না। হিসেবই কষতে হয না পয়সার। না পৃথিবীব, না জীবনেব। দিনগুলো কুহকেব মত চালিযে দিতে হয। কিংবা মেশিনের মত, বিবেককে এসবেব মাঝখানে ডেকে আনা বড় সর্বনেশে-বিবেককে কিংবা ওব বিচারকে, অমূল্যও এসব কিছু কবছে না। যতদূব রক্ষা কবে চলতে পাবা যায, বউযের সঙ্গে এবং যে বিযে জিনিসটাকে জীবনে এই প্রথম আস্বাদ করতে দিল হেম সেইটিব সঙ্গে। হেমের বাথরুমে সেও স্নান করছে। আজকাল আর দিঘির ঘাটে চান কবতে যায না অমূল্য।

হেম রোজই একটু গবগর করছে।—'পুরুষ মানুষ আবাব মেযেদেব স্নানের ঘবে যায নাকি?'

—'যায়।'

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অমূল্য বলছে-বউযের স্নানের ঘরে নাইতে পারে।

'স্বামীর এই সুবিধেটুকু আছে হেম।'

'ঘেন্নায মবে যাই-বামো।'

'কিন্তু আমার কোনো ঘেন্না নেই। স্নানের ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করে নাইতে চির আরাম। এমন আরাম আছে কে জানত।'

সুপুরি কাটতে কাটতে হেম বলছে—'তুমি আবাব পুরুষ মানুষ নাকি?'

'দেখে কি মনে হয?' অমূল্য হেমের দাড়িতে আঙুল দিযে একটা টোকা দিয়ে নিচ্ছে।

হেম চোখ গরম কবে ফোঁস কবে বলে উঠছে—'যাও, মেয়েমানুষের অধম কোথাকার।'

আরশিটা হেমের টেবিলের ওপর রেখে চুল আঁচড়ানো নোংরা চিরুনিটা পরিষ্কার করতে কবতে অমূল্য কিছু আর বলছে না। হয়তো কী বলা যায় ভাবছে, কিংবা কী কবা যায়। অথবা কিছুই করে না, বলে না কিছুই, কিন্তু তবুও সমস্তই কি নরম কি নিবিড়। কিন্তু সে আস্বাদ রক্তমাংসে কোনোদিন পায় নি অমূল্য। জীবনের যে জায়গায় এসে সে বিয়ে করেছে তাতে তা আশাও করে নি, একে একে জীবনে অনেক জিনিস ছেড়ে দিতে হয় কিনা। কিন্তু তবুও তা অনুভব করে বুঝে দেখেছে।

হেমও ত ন ব ধূ। কিন্তু বউদের ঢের রকম আছে। পৃথিবীতে বউ আছে আর বউ আছে আর বউ

আছে। এদেব একটিব থেকে আবেকটি একেবাহে আলাদা। কিন্তু আশ্চর্য বটে, বিচিত্রতাব পক্ষপাতী বলেই হযত এদেব অনেককেই অনেক বকমভাবে উপভোগ কবতে পাবা যায, শেষ পর্যন্ত কোথাও বাধে না।

কিন্তু বিযে জিনিসটা ভুল না হলেও, হেম একটা খটকা যেন, অমূল্য কিছুতেই যেন তাকে সাব্যস্ত কবতে পাবছে না।

দু-এক টুকবো সুপুবি মুখে দিযে অমূল্য দাঁড়িযে থাকবে কি চলে যাবে ভাবছে।

সকালে চা খাওযা হয নি। দেবিতে উঠেছিল বলে তাব জন্য চা তৈবি হয নি। বাড়িব সবাই কাজে ব্যস্ত। কিন্তু হেমকে এক কাপ চা তৈবি কবতে বলা অমূল্যব ভবসায কুলুচ্ছে না, অমূল্য ভীরু, নয, কিন্তু অসোযাস্তি সইতে পাবে না, মেযেদেব ওইসব ফ্যানফ্যাননিগুলো; বিবক্তিব সঙ্গে এক কেটলি চা এনে কাপে ঢালতে থাকবে হেম, গনগন কবতে থাকবে। সেবকম বাটিব চাযেব ভেতব কোনো আস্বাদ নেই। চা নিযেই ত শুধু কথা নয।

কিন্তু হেম কেনই বা এবকম কবে? অমূল্য যদি হেম হযে জন্মাত, এই বাড়িব বউ হযে আসত, অমূল্যকে স্বামীরূপে পেত, এমনতব কবত কি সেও?

কি যেন, কেন যেন, নানাবকম উদ্ভটভাবে ভেবেও এ মেযে কোনো স্বামীব হচ্ছে না, কিন্তু একটা মিটমাট না কবে সে ছাড়বে না। কিন্তু সেসব ঢেব আগেব কথা, বিযেব পবেব দু-তিন মাসেব। প্রায ছ মাস হল হেমেব মেযে হবাব পব থেকেই ছবিটা আব এক বকম হযে উঠেছে।

—'তুমি আমাব চিরুনি দিযে কেন আঁচড়ালে?'

অত্যন্ত অপবাধীব মত অমূল্য বলছে—'পবিষ্কাব কবে বেখেছি ত।'

—'বোজই তোমাকে বলতে হয আমাব চিরুনি দিযে আঁচড়িও না, আমাব সাবান গায মেখো না, অথচ বোজই তুমি তাই কবছ, তোমাকে দিযে যে কি হবে আমি বুঝতে পাবি না।'

অমূল্য চেযাবটা টেনে বসে পড়ছে।—'তোমাব সাবানে তোমাব গাযেব গন্ধ থাকে কি না, সেটা মন্দ কি।'

কথাটা যেবকমভাবে বলবে ভেবেছিল অমূল্য বলা হল, না খাপছাড়া হযে মাঝানেই থেমে গেল। অদ্ভুতই শোনাল নিজেব কানেও।

—'ছি ছি ছি আমি যাব কোথায, ছি ছি ছি কি বলে, এমন বেহাযা ইতব ত আমি কোনোদিন দেখি নি, অসভ্য ইতব এক নম্বব? মেযেমানুষেব গাযেব গন্ধেব কথা বলতে তোমাব লজ্জা হয না।'

অমূল্য কী বলবে বুঝতে না পেবে বলছে—'আমিও কি পবেব সাবানে কোনোদিন স্নান কবি হেম, তাতে আমাবও কেমন খুঁত খুঁত কবে, কিন্তু তুমি এখন সুন্দব ফুটফুটে বলেই হযত নিজেব জন্য আলাদা সাবান কিনবাব পযসা নেই বলেও, মাঝে মাঝে তোমাব সাবানটা ব্যবহাব কবে দেখি। কিন্তু হেমেব মুখেব দিকে তাকিযে বেশি দুব এগতে পাবছে না।—'আমি আব কোনাদিন তোমাব চিরুনিতে আঁচড়াব না।' কিন্তু তাতেও বউযেব সে কঠিন মুখ কৈ একটুও নবম ত হচ্ছে না।—'তোমাব সাবানও কোনোদিন গাযে মাখব না আব, আজই এইসব কিনে নিতে হবে, ববং তোমাকে নতুন কিনে দিযে, এগুলো আমি নিযে নেব, কি বল হেম?'

—'ভাবি বাগেব পুঁটুলি হযে বসেছেন একজন'—হেম একটু হেসে বলছে। তাবপব-'সুপুবি খাবে?''

'দাও।'

খুব মিহি কবে সুপুবি কেটে দিচ্ছে বধূ।

অমূল্য—'আমাব কি দাঁত নেই হেম, সভযে এমন মোলাযেম জিনিস সুপুবিগুলো মুখে দিতেও ছাতু হযে যাচ্ছে।'

—'খাও খাও, ভাল জিনিস কি বুড়ো মানুষবাই শুধু খাবে?' একটু পবে—'আজ চা খাও নি বুঝি?'

'না।'

· 'বেশ ত দেবিতে ওঠ।'

জাঁতিতে আঙুলটা একটু আঁচড়িযে ফেলে হেম বলছে—'উঃ!' তাবপব জানলার ভিতব দিযে বাইবেব দিকে তাকিযে গলা ছেড়ে—'বলি, ও কমলা, ও কমলা ঝি, বাজাব ত ঘন্টা দেড়েক হল এসেছে, পান কি এখনো ধুযে দেবে না নাকি? কাটা সুপুবি নিযে আমি কতক্ষণ বসে থাকব?' তাবপবে—'যত সব ভূত পেতনি নিযে কারবার, জ্বালাতন।' মুখেই শুধু নয, সমস্ত শবীবটাই হেমেব কেমন একটা ধিক লেগে গেছে, একটা ধিক্।

অমূল্য উঠে পড়ছে।

—'কোথাও যাচ্ছ?'

'যাই।'

কোথায় না নিশ্চয়ই, কোথায় আর যাবে? খবরের কাগজগুলো লডভন্ড করবে গিয়ে এই ত শুধু, তাছাড়া আর কি।

হেম একটা দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেলে বলছে—'বোস।'

'কেন?'

'পান নিয়ে যাও, যাও না? ঢের দেরি বলছে। ওকি চললে? শোন, শোনই না?'

'কি?'

'দিনের পর দিন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'আমি?'

'তুমিই ত, আগে ঘন্টার পর ঘন্টা আমার কাছে বসে থাকতে, হাজার খারাপ কথা বললেও তুমি রাগ করতে না, এখন তোমাকে এক মিনিটের জন্যও কাছে পাওযা যায় না, এমন ছাড়া ছাড়া হয়ে যাচ্ছ কেন? কথা বলছ না, তা বলবে কেন? আমি তোমার কে? মরলে পরেই ধেইধেই করে আরেকটা বিয়ে করে আনবে,খু-ব আনবে, জানি আমি, ভাববে আপদ গেছে, বেঁচেছি; এমন বাঁচাই, সত্যিই ত বাঁচা ছাড়া আর কি! সব পুরুষমানুষদের চিনি না? আমাব কথা তোমাব মনের থাকবে না।' একটু পরে -'থাকবে মনে?' হেমের চোখ ছলছল করে উঠছে। বিয়ের পরেই গর্ভ, গর্ভের পরেই সূকিতা, পাড়াপড়শি মেয়েরা বলেছে-এ সুবিধেব সূতিকা নয় গো, শুকনো সুতিকা, সে ত বড় সোজা রোগ নয মা।'

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার (ছেলেমানুষ) বলেছে—'চেহাবার ভেতর কেমন একটা wild look-এর ওষুধ বিষুদে বিশেষ কিছু-বিশেষ কিছু আর কেন? একেবারেও কিছু হবে না। চেঞ্জের দরকার, রাঁচি সুট করবে।'

এলোপ্যাথিক ডাক্তার (সেও ছোকরা) কথা বলে নি বেশি, ঘাড় গুঁজে প্রেসক্রিপশন লিখে গেছে শুধু আর ওষুধ ঠেলেছে।

কিন্তু শুকনো সূতিকায় দিনের পর দিন সুতো পাকিযে যাচ্ছে হেম। হলদে রঙের একগাছি সুতো এঁকেবেঁকে বাতাসের ফুঁযে উড়ে উড়ে হাঁটছে, চলছে, সুপুরি কাটছে, পান সাজছে, শাশুড়ির ঠাসা খাচ্ছে (বিষম জিনিস এখানেও আছে)।

স্বামীব সঙ্গে অভিমান কবছে, ফুলছে, ফুঁপাচ্ছে, গবগব করছে, কষ্ট পাচ্ছে, আদর চাচ্ছে, ঘাট মানছে,-দুঃখ পায, ক্ষমা চায, অনুনয কবে-'ভালবাস না।' সন্দেহে জ্বলে মবে বেদনায়, একটু ঠাণ্ডা লাগলে জ্বর বোধ হলে (প্রবাই হয় তা) গলায় কমফরটাব (হেমের জেঠামশায়ের) বেঁধে চট্‌চট করে চটি জুতো পায দিয়ে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে বেড়ায (এমনি করে অসুখটা তাড়াতে চায হযত, কিন্তু লোকে পিছন ফিরে হাসে, ঠাট্টা করে), শরীরটা একটু ভাল বোধ হলে স্নানের ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে প্রাণ ভরে জল ঢেলে গান গেয়ে উল্লসিত হযে ওঠে।

কিন্তু সব সময়ই হলদে একগাছি সুতো শুধু কৃমির মত দিকে-বিদিকে মোচড় খাচ্ছে আমোদে, নিবিড় ব্যথাযই বেশি।

যেদিন গাটা একটু ভাল লাগে, বাথরুমে অনেকক্ষণ বসে স্নান করে, তারপর সেজেগুজে সে হয একটা কিছু, সুতোটা তখন একটা হলদে রঙের রিবনেব মত মনে হয় বড় জোর।

হেমের সেই মাংস, সেই সৌন্দর্য কি করে এমন ধাঁ করে পড়ে গেল, কেনই বা একে কৃমির মত দেখায় আজ? মাকড়শার পাযের মত? কৃশাযাব পেতনির মত? হঠাৎ হেমন্তের বেলা বিকেলের ঘোরে কমফরটা উড়িয়ে চটপট করে চটি পায দিয়ে কাছে এসে পড়লে মনে হয়,-হায় কি যেন মনে হয়।

মনে হয হিম কুয়াশায মিলে যেতে এর আর বেশি বাকি নেই। মনে হয়—'কি করে থাকব তখন?'

এই বড় বড় বাড়িতে এত লোকজন থাকতেও বাস্তবিক কি করে থাকা যাবে? কিন্তু এই ভেবেই আরো কষ্ট হয, যে তাও থাকা যাবে। অমূল্যের মনে হয় হেম এতদিন মানুষের মত ছিল, বিয়ের পর সেই তিনচারটা মাস, উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্ত ছেলের পৈতৃক ধন ভেঙে খাওয়ার মত এই মেয়েটাকে শরীরে মনে মাংসে ভালবাসায় অভিমানে আবেদনে শুধুই সে ভেঙে থেকে চেয়েছে, কতুটুকু পেয়েছে, কিছু নাই বা পেল, কিন্তু পাওয়ার পথে একটুকুও বাধা সে কী সহ্য করেছে? একটুও ভদ্র সংযম ঠাণ্ডা অবিকৃত চিন্তা, ক্ষমা, রুচি তার মত মানুষের কাছ থেকে যা সব খুবই আশা করতে পারা যেত, কিছুই কি সে দেখিয়েছে? হেমের যখন দিন ছিল, যখন সে নিভতে বসে নি, অমূল্য তখন স্ত্রীর প্রাপ্য কিছুই তাকে দেয

নি, নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছে সে শুধু-প্রবৃত্তির কথা।

এক এক দিন রাগ করে এসে বলেছে—'খ্রিস্টান হতে হবে।'

হেমন আঁতকে উঠে বলেছে—'কেন?'

'তোমাকেও হয় খ্রিস্টান না হয়, মুসলমান করে ছাড়ব।'

আজও মনে আছে হেমেরে মুখ দিয়ে রা-টি বেরতে পারে নি। স্বামী কী বলছে? কিন্তু স্বামী পাহাড়ের মত দুরারোহ, পাথরের চাঙড়ের মত নিরটে নিঃসন্দেহ হয়ে বলছে—যা বলছি, তা বলছি হেম, নড়চড় নেই, হিন্দু সমাজ ডাইভোর্স দেবে না। দিক না কি বয়ে গেল, আমি ক্রিশ্চনা হয়ে তোমাকে ডাইভোর্স করব।'

তারপর হেমের দিকে তাকাতেই সেটা পড়ে রয়েছে একটা মৃতের পিণ্ডের মত। অমূল্য টেবিলেব উপর একটা ঘুঁষি মেরে দাঁত কিড়মিড় করে বলেছে, কি বলেছে সেই জানে, তারপর পিণ্ডটার ওপর, কাম নয়, জন্য কিছু সব ঝেড়ে গেছে, নতুন জীবনের সে নতুন কি একরকম জিনিস, নিজেই তার মানে বুঝতে পারে নি, এমনি করে রোজই সামান্য একটা ছুতানাতা ধরেই অমূল্যর মাথায় ডাইভোর্সের খুন চড়ে গেছে—'তোমাকে মুসলমান করব কি আমি মুসলমান হব।'

তারপর?

রাগটা একটু পড়ে গেলে—'নতুন করে সংসার পাতব, নতুন একটা বউ আনব, হিন্দু, মুসলমান ক্রিশ্চান, ব্রাহ্ম যাই হোক না কেন, তোমার সঙ্গে এ ম্যারেজটা আমার একেবারেই ফেলিওব হযে গেছে, ডিভাস্টেটিং!' আর একটু নরম হবার পর-'জীবনটা কীসের জন্য? ভোগ করতে হবে ত? তাই কি না? তবে আর কি? সেটাকে ভেস্তে দিলে চলবে কেন? কথা শুধু, কথার কথা ফুরিয়ে গেছে, কেউ খ্রিস্টানও হয নি কেউ মুসলমানও হয় নি। ডাইভোর্সও ঘটে ওঠে নি।

মাঝখান থেকে হেমের হযে গেছে। দিনের পর দিন এতটা আঘাত সে সহ্য করতে পারে নি। হেম আজ চলেছেই হযতো, শুধু হেম বাদে সকলেই সে কথা জানে, কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে না বলে মনে হয না। পারবে কি? কেন পারবে না? ছ মাস আগেও যে মাথাটা ডাইভোর্সেব কথাই ভেবেছে শুধু এখন সেইটেই এ আবাব কি অদ্ভুত প্রশ্ন দিনরাত কবছে,—কারু কাছে নয, নিজেব মনের কাছে শুধু, নিজের মনের কাছেই, বাতদিন। কিন্তু কোনো উপায বের করতে পাবছে না। আব যদি তাকে কেউ রাখতে না পারে? কি হবে তাহলে? অমূল্য জানে সময সব মুছে ফেলতে পাবে। হযত একটা নতুন জীবনই তাকে এনে দেবে, এই সময; সাধের, চরিতার্থতার, উল্লাসের, আনন্দব, বিস্তাবের, আশ্বাসের শান্তির।

কিন্তু আজ সেকথা ভাবতে গেলে পুরুষ মানুষ সে নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না, ঝরঝব কবে কেঁদে ফেলে। এমন হয কেন? এ এক বিরাট নালিশ, কিন্তু কার কাছে করবে সে? সমযেব কাছে? কিন্তু সমযের প্রাণ কোথায? ভগবানের কাছে? কিন্তু তার কাছে ভগবান সমযের চেযেও প্রাণহীন। হেমকে যদি বলা যেত! কিন্তু এতে হেমকে শ্মশানের নদীর কাছেই, আর একটু বেশি এগিযে দেয়া হবে, অমূল্য ভাবছে আমাদের দেশের বধূদের ধরনই ওই রকম, কামানেব গোলাও গিয়ে খায, কিন্তু স্বামীব কথাব ফুঁযেও মাছির মত পৃথিবীব থেকে মুছে যায।

ধবনাটা ভাল কি মন্দ সে বিচাব অমূল্য আজ আব করছে না, জানে বটে সে মানুষের এবকম হওযা উচিত নয, বেকুবি।

অঘ্রানের বেলা পড়ে যাচ্ছে।

খবরেব কাগজগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একসময তারপর সমস্ত ঝেপসে যাচ্ছে। দুই চোখ ব্যথা করে উঠছে। ঢেব গু ঘাঁটানো হযেছে যেন সারাদিন ভরে। সামান্য ধানের মত একটা দানাও যেন সংগ্রহ কবতে পাবা গেল না। বুকের ভেতব কেমন একটা অবসাদ, চারদিকে ধান ঝাড়বার সময এসেছে। বাতাসেব ভিতর কেমন একটা শব্দ, সঞ্চযের দিন শেষ হযে যাচ্ছে। কেমন একটা টাটানি।

অঘ্রানের ঠাণ্ডায শরীরটা শিরশির করে উঠছে যেন, অমূল্যের গায কোনো জামা নেই।

হেম কোথায়?

তার ত কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, অনেকক্ষণ ধরেই। সমস্ত দুপুরবেলা সে এঘরে ওঘরে হইহই করে বেড়িযেছে। কখনো তেঁতুলের আচার হাতে, কখনো ডিটেকটিভ উপন্যাস, কখনো গানের খাতা, কখনো কখনো অমূল্যর কাছে দু-মিনিট এসে বসা, নিতান্তই কাজের তাড়ায তক্ষুণি শালিকেব মত ফুড়ৎ। সেই ভাঙা ফাউনটেন পেনটার হিজিবিজি, এরকম করেই সমস্তদিন তার কাটে আজকাল, উৎসাহ ও উত্তেজনা খুব, কেন ঠিক বুঝতে পারা যায না। চড়ুইগুলো দিনরাত কিচির মিচির করে কেন? মনে হয়

বধূর ভিতরে তেমনি একটা প্রাণের বোধ–এ জিনিসটা নতুন জেগে উঠেছে তার জীবনে, একে আর চুপ করে ঠায়ে ঠায়ে ছাড়া থাকতে দিচ্ছে না।

দূরে উঠনের এক কোনার থেকে একটু সাড়া আসছে–অনেক মশা একত্র হয়ে তাদের ক্ষুধার তাড়ানায়, কিংবা মৌমাছিগুলো চাক বাঁধবার আয়োজনের সময় এমনতর একটা প্রয়াসের পরিচয় দেয়। উঠনের ওই শব্দটুকুর ভিতরে একটা প্রয়াসের, একটা অভিনিবেশের ঘ্রাণ রয়েছে, একটা সংযোগের আস্বাদ রয়েছে, নিজেকে নিয়োগ করবার আস্বাদ একটা।

হেম, জীবনে তাব এই সব এসেছে আজকাল উঠনের এক কিনারায় একটা মস্তবড় জামগাছের নীচে লেপ তোষক রোদে দেবার যে একান্ত খাটটা পড়ে আছে তারই এক ধার ঘেঁষে বসে আছে সে, সমস্ত বাড়িটার দিকে পিছন কবে বেতেব বাঁশের বাবলার ওই জঙ্গলটার দিকে মুখ রেখে গানের খাতাটা চোখের নীচে রেখে গাইছে, গানের গলা খুব বড় নয়, গানের পদগুলো ও খাতাটা দেখে সাব্যস্ত করে নিতে হচ্ছে হেমের, তাব গান শুনবাব জন্যও কেউ বসে নেই।

কিন্তু তবুও নিজের আগ্রহটুকু ষোল আনা আছে, হয়ত সতের আনা; আঠার আনা, গানের খাতাটির প্রতি মমতার আর শেষ নেই। প্রতিটি সুর, প্রতিটি টান সংগীতের আইনকানুনের চেয়ে বরং ঢের বেশি হৃদযের আন্তরিকতা দিয়ে ভবে দিচ্ছে হেম। এই জন্যই সকলের কানে তা বেখাপ্পা শোনায় এবং যে শোনে সে বোঝে। অতএব আব শুনতে চায না।

গায়িকার এপাশে ওপাশে চারপাশে তাই পঁচিশ ত্রিশ হাতের ভিতর কোনো লোকজনের গন্ধ নেই, দুটো বাছুর, একটা শিঙভাঙা গরু, একটা পাঁচকিলো ছাগল আব দু-চাবটা শালিক ইতস্তত চরছে মাত্র।

কিন্তু কুযাশা এসে ঘিবল যে।

—'মানিক।'

'আজ্ঞে?'

'বউদিকে ডেকে নিযায।'

অমূল্য চোখ বুঝে বিছানায় আব এক কাতে ফিরেছে, যে কাতে বেড়াটাকে দেখা যায় শুধু, বাহিরটা আবদ্ধ হযে থাকে।

চট চট কবে শব্দ হচ্ছে। চটি আসছে। যেই ডাক, অমনি আসা, স্বামী স্ত্রী দু'জনের জীবনে ছ মাস আগেও এরকম ভোজবাজি কি রকম দুরূহ মনে হত! কি বকম নিঃসন্দেহ অসাধ্য, কিন্তু অঘ্রান সমস্ত নবম কবে দিযেছে যেন। পৃথিবীব অঘ্রান, জীবনেব ভিতবেব অঘ্রান।

—'তুমি ডাকছিলে?'

সেই ফিতের মত শরীর। ঘবেব অন্ধকাবেব ভিতবেও তাব মুখের হলদে রঙ স্পষ্ট ধরা পড়ে, শরীব যে একটা হাড় শুধু, সেই হাড় যে কাঠি, সেই কাঠিই যে গান গাইছে তেঁতুলের আচাব খাচ্ছে, শাশুড়িকে ক্ষমা কবছে, স্বামীব কথা শুনতে চাচ্ছে, মানুষেব উপহাসেব মানে বুঝছে না,খোঁটা খাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে, গ্লানি বোধ কবছে, সেজেগুজে প্রফুল্ল হতে চাচ্ছে, ওষুধ গিলছে, লেপমুড়ি দিযে আরাম বোধ করছে। জীবন সম্বন্ধে আশান্বিত হযে উঠছে।

—'গাইছিলে?'

'তুমি কী কবে জানলে? অদ্দুর থেকে শুনেছ অ্যাঁ?' সমস্ত চোখমুখ উদ্ভাসিত হযে উঠছে হেমের–বক্তে রক্তে ভরে যাচ্ছে যেন।—'কেমন গাইছিলাম বল, সত্যি কথা বলতে হবে।'

কি যেন নিজের গানেব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আশা না কবে সামলে নিযে তক্ষুণি বলছে—'এই দেখ গানেব খাতা, আমি টুকে নিযেছি সব', হেম বিছানার কাগজগুলো সরিযে বসেছে।—'আজ এক দুপুরের ভেতরেই বুলুদিব খাতাব থেকে।'

খাতাটা সবিযে বেখে দিতে ইচ্ছে কবছে অমূল্যব, কযেকটা নোংরা কাগজের সমষ্টি মাত্র, কিন্তু বেচাবার সমস্ত আগ্রহও ত এব ভেতর। খাতাটা অমূল্যব হাতেই থেকে যাচ্ছে,—'কিন্তু সুন্দর সুন্দর গান সব' বেচাবাকে খুশি করবার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করতে হচ্ছে।

'এত তাড়াতাড়ি টুকে ফেললে?'

বেচারির খুব গর্ব অনুভব।

—'ওই অতদূবে লুকিযে লুকিযে গাইছিলে কেন?'

এইবার মুখটা একটু অন্ধকার হযে আসছে বেচারিব।'

এক একদিন সকালে স্নান করতে গিযে অমূল্য দেখেছে ন্যাকড়াগুলো তেমনি দড়ির উপর পরিপাটি

করে টাঙানো। কিন্তু ভিজে ভিজে। তারপর থেকে কদিন ধরেই এগুলো ভিজে ভিজে ছবছবে, যত সকালেই অমূল্য স্নান করতে ঢুকুক না কেন তার আগেই এগুলোর পরিষ্কার স্নান হয়ে গেছে। অসংখ্য চা ছাঁকা ন্যাকড়া মেজে ঘসে ধুয়ে রেখেছে কে যেন। চা ছাঁকা? হয়ত, কিন্তু এত কেন? প্রশ্নটার কোনো উত্তর চাচ্ছে না সে, নির্বিবাদে হাতের তেল মুছে নিচ্ছে তাতে, সাবানের কেসটাকে মুছে নিচ্ছে, শিকনি মুছছে, যার দায় সে ধুয়ে নেবে-রোজই ত সে ধোয়, ভাববার অবসর নেই।

ন্যাকড়াগুলো তারপর অনেকদিন শুকনো কড়কড়ে হয়ে পড়ে থাকে—গুটিয়ে পড়ে এ ত এক বিস্ময়-পুঁছবার পাখলাবার এই সময়ে অবিশ্যি চলে ভাল। তারপর এক একদিন ভোরে হঠাৎ সব আবার ভিজে ছবছব করছে, ভোজবাজিই বটে, মানে কি? এই ন্যাকড়াগুলো বাথরুম ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও যায় না কেন? সেই অনাদিকাল থেকেই এগুলো ঝুলছে না?

তারপর একদিন যখন সব বুঝতে পেরেছে অমূল্য, এইসব প্রশ্নের নিদারুণ ছেলেমানুষি তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

কেউ ওর গান শুনতে চায় না। হজম দূরের কথা, গলাধঃকরন করতে চায় না বলেই ত হেমের ওই জামগাছের নীচে আশ্রয় নেয়া।

কিন্তু হটবার পাত্র সে নয়। বলছে—'অভ্যেস করছিলাম, বুকের জোরটা আরো একটু বাড়ুক, গায় আর একটু বেশি মাংস লাগুক, ওষুধ খেয়ে আর একটু মোটা হয়ে নি, হোমিওপ্যাথ খাব না, এখন থেকে শুধু অ্যালোপ্যাথ ছাড়া আর কিছু নয়, তাতেই শরীরটা সেরে যাবে, তারপর দেখবে কেমন গান গাই, বলতে বলতে মুখের ক্ষণিকের অন্ধকারটুকু সেই ফরশা হয়ে যাছে, হেমের বক্তে ভরে উঠছে। কিন্তু তারপর আবার হলদে মেরে যাচ্ছে।

বাথরুমের ভিতর পশ্চিম দিকটার দেয়াল ঘেঁষে উত্তর দক্ষিণ দু'টো দেয়ালের দু'টো কাঁটায় বেঁধে একটা দড়ি টানিয়ে দেয়া হয়েছে। পুব দিকটার দেয়ালেও এমনি একটা দড়ি, কতকগুলো ছোট বড় নানা আকারের ন্যাকড়া এই বাথরুমের জন্মের থেকেই একরকম দড়ি দু'টোর ওপর ঝুলে আসছে।

প্রথম যেদিন-কোনদিন যে প্রথম মনে নেই অমূল্যর-এতগুলোকে সে দেখেছে কি ভেবেছে সে সেই জানে। জিনিসগুলোকে একটু আচমকা বলে বোধ হয়েছে বটে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকেই জীবনে নানা দিক থেকেই চমকের খোঁচা আসে। কিন্তু এই ছোট বড় বিস্তর ঝুলানো ন্যাকড়াগুলোর শেষ মানেতে গিয়ে পৌছতে একটু সময় লেগেছে অমূল্যর।

কিন্তু বুঝেছে যখন অবিশ্যি একেবারে চট করে বুঝে গেছে। তাই ত জীনবটা যে কত বড় বেকুব তার এই দড়ি দু'টোর দিকে তাকালেই-তারপর থেকে রোজই মনে হয়ে আসছে-জীবনটা চতুর নয়, ছটফটে নয়, চটপটে নয়, অভিজ্ঞ নয়।

অথচ জীবনে এই সমস্ত জিনিসগুলিরই নিতান্ত প্রয়োজন আছে, বিবাহিত মানুষের জীবনে এইসবেব প্রয়োজনীয়তা আরো ঢের; কিন্তু এই সবকে বাদ দিযেই অমূল্যর জীবন বিচাব করছে, বুদ্ধি জোগাচ্ছে, পথ কাটছে, উপায় দেখছে। সংসারের হিসেবে এই উপাযপন্থা বুদ্ধিবিচারেব ফলফল তাই বস্তুতই যেন কিছু নয়, কিছু নয়, একেবারে নিল। জীবনটা চতুর নয়, অভিজ্ঞ নয়, চটপটে নয়, ছটফটে নয়, যাকে তার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে-সেই জন্যই হযত তার কোনো সুবাহা করতে পারছে না অমূল্য। না পারছে নিজের অবস্থাটাকে ফিরিয়ে নিতে।

বাথরুমে ঢুকতেই এরকম অজস্র কথা মনে হচ্ছে অমূল্যব। কিন্তু কথা যাক, একটা ন্যাকড়া চাই, এই এমনতর কদর্য একটা ন্যাকড়াকেও বাধবে না কিছু; চতুরতা না থাকতে পারে, কিন্তু ঘেন্না নেই জীবনে, বেশ একটা বড় দেখে ন্যাকড়া নিয়ে চলেছে সে।

—'ওগো, ওমা একি!' হেম বসে পড়েছে। দড়ির মত হাত পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

—'কি?'

—'ও মা আমি যাব কোথায়। এ ন্যাকড়া তোমাকে কে নিতে বলেছে।'

—'ন্যাকড়ার দরকার।'

—'কিন্তু এসব কেন-ওমা আমি ঘেন্নায় মরে যাই, তুমি শিগগির ওটা ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে এস।' তারপর উত্তেজনাটা একটু কমিয়ে এনে, অত্যন্ত মিনতি করে—'শিগগির ফেলে দাও, লক্ষ্মীটি, শিগগির, শিগগির।'

—'ফেলবার কি দরকার? আমি জানি কীসের ন্যাকড়া এসব, তা কি হয়েছে তাতে, আমার অত ঘেন্না পিত্তি নেই, মোছাও ত সেই জুতো মোছা।' অমূল্য জুতো মুছতে লেগে গেছে সেই কদর্য ন্যাকড়াগুলো দিয়ে।

—'কিন্তু আমি ত ঘেন্নাব মাথা খাই নি, তুমি সব আমাব ঘব থেকে।'
—'যাচ্ছি।'
—'এক্ষুণি যাও।'
কী ভেবে বলছে—'আচ্ছা কব।'
চৌকিব উপব উঠে বসে একটা ঠ্যাং উঁচু কবে দিযে একটু ঝুঁকে পড়ে একটু পবে বলছে-'একটা বুরুশ কিনতে পাব না?' স্বব নবম।
—'বুরুশ কিনব একটা, কিন্তু এবকম চটচটে কড়কড়ে কাদা শুবকিগুলো ভিজে ন্যাকড়া দিযে মুছে নিলেই সাফ হয বেশি,' অমূল্য বলছে—'ন্যাকড়াটা বেশ বড় আছে, ভিজেও বেশ।'
—'ছি।'
—'জানি আমি, বলছিই ত এতে আমাব কিছু হয না।'
—'তোমাব ঘেন্না লজ্জা কিচ্ছু নেই না?'
—'না।'
—'একটুও না?"
—'না।'
—'কিন্তু আমাব বড্ড বেশি,' তাবপব কি যেন কি মনে কবে বালিশে ঘাড় গুঁজে শুযে পড়ছে।
—'শুলে?'
—'হুঁ।'
—'বলছ না যে'
—'শবীবটা কেমন কেমন কবছে যেন।'
—'একটু ঘুবে এস না গিযে বাইবেব থেকে।'
—'তুমি নিযে চল'-হেম বিছানাব উপব উঠে বসেছে।
—'আমি?'
—'হ্যাঁ, গাড়িতে কবে।' তাবপব চুপ কবে বালিশেব ওপব মাথাটা ফেলে দিযে বলছে—'না, যাব না।'
—'কেন?'
—'গাড়িতে উঠলে মাথাটা আবো অস্থিব অস্থিব কববে।'
—'তাহলে এখানেই সুস্থিবে থাক,' জুতো মুছে অমূল্য বলে যাচ্ছিল।
হেম ডাকছে।
আঙুল দিযে মাথাটা দেখিযে দিযে বলছে—'ওগো আমি আব পাবছি না, এটাকে সাবিযে দাও, তুমি ছাড়া আব কেউ পাববে না।' স্বামীব উপব অগাধ নির্ভব দিনেব পব দিন গভীব হযে আসছে, কিন্তু অমূল্যব আজ আব জীবনেব এই ছককাটা নমুনাটা বিশেষ ভাল লাগছে না, অনেকবাব খেলে দেখেছে সে, অনেক বকমভাবে, নূতনত্ব কিছু আব নেই, তাও দশ বাব দিন ধবে এই মেযেটিব পেট, মাথা, কপাল, গিঁট, আঙুল সমস্তেবই মেবামতেব ঢেব অক্লান্ত চেষ্টা কবে এসেছে, খুব আগ্রহেব সঙ্গে না হলেও বেশ খানিকটা নিষ্ঠাব সঙ্গে।
মেযেটিব শবীবটা যাতে ভাল হয স্বামী শাশুড়ি দু'জনেই একমাস ধবে চেষ্টাব কিছু বাকি বাখে নি।
এ এক মাসেব ভিতব মাব অসম্ভব সংযম দেখল অমূল্য। সাধ কবেই বউ এনেছিল, কিন্তু একদিনও কি সেবা পেযেছে? বান্নাঘবেব দুর্দান্ত পবিশ্রমেব একটুও কি লাঘব হযেছে বধূ আসাব পব? সংসাবেব নিত্য তাণ্ডবেব বোঝা একটুও কমেছে? পবিবাবেব ভেতব কোনো কল্যাণেব খুদেব গন্ধও পাওযা গেছে? না লোকেব সমাজেব এমন বউযেব শাশুড়ি হযে একটুও গৌবব বেড়েছে?—'যেই মুখে বক্ত, সেই মুখে বক্তই, তাব উপব একগালে চুন এক গালে কালি'—আজ সকালেই উনুন জ্বালাতে জ্বালাতে জ্বলে-পুড়ে মা অমূল্যকে শুনিযে শুনিযে বলেছে।
তা সত্যিই ত, মাব এবকম কথা বলবাব সম্পূর্ণ অধিকাব বযেছে।
এতবড় পবিবাবেব ভিতব সব দিকই বুঝে দেখতে হয, মা তা যথেষ্ট দেখছে, অমূল্যও কিছু কিছু, কিন্তু হেম সেই যে এ বাড়িতে এসেই নিতান্তই নিজেব জন্য বাথরুম কবিযেছিল, সেই থেকে সে নিজেব দিকটাই দেখে এসেছে। দেবাৎ সে আজ রুগী, কঠিন রুগীও বটে।
কিন্তু তবুও রুগীদেব ভেতবও এমন সকলেব কথা বুঝে দেখবাব এমন একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য থাকে, মধুব সহিষ্ণুতা থাকে, মধুব বোধ থাকে, মৃত্যুব জন্য সুস্থিবভাবে অপেক্ষা কববাব এমন একটা অপরূপ

শান্তি থাকে।

—'আজ কিছু পাবব না আমি হেম, ঢেব কাজ আছে, আমি কমলা ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি-' বিবক্তিতে বিশ্রদ্ধায় বি-বি কবতে কবতে অমূল্য বেবিয়ে পড়ছে। তাব সমস্ত মাথাটা পৃথিবীব অবিচাব, অন্যায, অনিযম, উচ্ছৃঙ্খলতাব অভ্রভেদী পাথবেব উপব আঘাত খেযে ঝনঝন কবে উঠছে যেন, সমস্ত বক্ত শিবায শিবায কট কট কবে উঠছে যেন। কোথায কোনো উপায নেই, নিস্তাব নেই, নিজেব জীবনটা আশ্বিনেব বাতেব জোনাকিব মতন একদনি বেবিযেছিল দুধেব ফেনাব মত বাতাসেব উপব দিযে নক্ষত্রেব দিকে-নক্ষত্রেব দিকে কোথায কোন লণ্ঠনেব ঝুলনো আলোয পাক খেযে খেযে বেহাল হযে গেল সব-তাবপব থেকেই কেবোসিনেব ধোঁযা, চিমনিব চিড়িক, ঘবে গুমোট মাকড়সাব জাল, অন্ধাকাবেব জড়িমড়ি-হিজিবিজি হিজিবিজি হিজিবিজি—

ভাবতে ভাবতে কমলাঝিকে আব পাঠানো হচ্ছে না। বান্নাঘবে মাযেব সাহায্য সে কবছে।, তাকে পাঠিযেই বা কি লাভ? মাথা টিপতে হয, ত অমূল্যই যাবে, কিন্তু বেশ খানিকটা জিবিযে নিযে, কাগজগুলো নেড়েচেড়ে দেখে, দবকাবি চিঠিপত্রগুলো সব শেষ কবে।

তিন ঘন্টা পব।

হেম ঘুমিযে পড়েছে। বিছানাব পাশে দাঁড়িযে দাঁড়িযে বুঝতে পাবা যায যে এ ঘুম ইচ্ছে কবেও নয, একটা আশ্রয খুঁজেও নয, কিন্তু নিতান্ত মাংসেব ক্লান্তিতে আশ্চর্য মানুষটা এত বোগা দড়ি দড়ি কিন্তু মুখটা ববং ভবা ভবা, ডাক্তাব দেখে হযত বলবে ফুলো ফুলো, এও হযত বোগেবই একটা লক্ষণ।

সমস্ত গালে চোযালে চোখেব জল কষেব মত লেপটে বযেছে। মাথাব সমস্ত চুল ভিজে জবজব কবছে, বিছানা বালিশ সমস্ত ভিজে সেঁতসেঁতে হযে ববফেব মত ঠাণ্ডা হযে গেছে। ডাক্তাবিমতে রুগীব পক্ষে এসব আইডিযাল কনশিডন।

সমস্ত মাথায ওডিকোলনেব গন্ধ।

মাথায উত্তেজনাটা খুব বেশি হযেছিল বলেই বোধ হয এতসব। জানলা দু'টো হু হু খোলা। ঘবেব ভেতব মশা অন্ধকাব আব ঠাণ্ডা বাতাসেব উৎকট আড়াআড়ি। বাড়িঘবেব ঘুম ভূমিকম্প ছাড়া ভাঙে না। এই সবেব ভেতবও মানুষ এমন চৌকশ ঘুমে লম্বা হযে পড়ে থাকতে পাবে।

মুখেব ওপব টর্চটা ফেলে দেখছে অমূল্য। অন্ধকাবে সিঁদুবেব ফোঁটাটি ধবা পড়ে নি। টর্চেব প্রখব আলোয সেটা জ্বলে উঠেছে যেন, কিন্তু এটা এব ঠিক আস্বাদ নয।

ও ঘবেব থেকে লণ্ঠনটা ববং নিযে আসা যাক। হযত এই সিঁদুবটাকে ভাল কবে বোধ কবে নেবাব জন্য। ছ মাস পবে আবাব সেই সিঁদুব? কি মনে কবে? সাদা বোগা হাড়েব মত শক্ত মুখটাব ভিতবে পাখিব ঠোঁটেব মত উঁচু শিটে নাকটা যেখানে দুই ভুরুব ভেতবে এসে ঠেকেছে ঠিক তাবই উপবে এই সিন্দুবেব পোঁচ। মাথাব অজস্র যন্ত্রণাব ভেতবেও, অন্ধকাবেব মধ্যেও এমন স্থিব হাতে লাগানো হযেছে যে মনে হয,—না কিছু মনে হয না।

আজ একটা দিন কেমন কব শেষ হযে যাচ্ছে। পিছনেব অনেক দিনও এমনি কবেই সাঙ্গ হযেছিল। সামনেও এমন দিন ঢেব পড়ে বযেছে। শাশুড়ি ও স্বামীব করুণা ও দাযিত্ববোধেব উপব মেযেটিকে নির্ভব কবে থাকতে হবে, করুণা প্রাযই কেটে যাবে, দাযিত্বেব ভাব সুবিধা মত স্বীকৃত হবে, অস্বীকৃত হবে, সুবিধা মত, পৃথিবীব যা স্বাভাবিক যাদেব সুযোগ ও সুবিধা বযেছে, যেমন ওই ফড়িংটাবও জীবনকে তাবা না ভোগ কবে থাকতে পাববে কী কবে?' স্বামী ও শাশুড়িব জীবনেও অনেক নতুন জিনিস এসে পড়বে, অনেক উপভোগেব জিনিস, তাদেব সুবিধা আছে। সুবিধা আছে-হযত খুবই অবজ্ঞেয সুবিধা—মাংসেব সুবিধাটুকু শুধু, কিন্তু তবুও উপভোগেব হিড়িকে হুজুগে হচোটে নতুনকে আস্বাদ বোধ করতে গিযে সেইটুকুও ঢেব কাজে লাগে। আজকেব এই দিনটা অমূল্যকে আঘাত দিযেছে, বিবক্ত কবেছে, ওলোটপালোট কবে ফেলেছে, অবসন্ন কবে ছেড়ে দিযেছে।

এমনি হযত আবো দু'মাস—চাবমাস—ছমাস—হযত অতটা নয—দু'দিন, চাবদিন, ছ'দিন শুধু আব সেই একই হৃদযবৃত্তিগুলোকে নিযে ঘাঁটাতে ঘাঁটতে অমূল্যব ঘেন্না ধবে গিযে মনে হবে এগুলোব কি শেষ নেই?

শেষ আছে, খুব শিগগিবই হযত। না হয একটু দেবিতে, অমূল্যও তা জানে, কাজেই যে চলে যাচ্ছে তাব প্রতি জীবন যতই আশিষ্ট হোক না কেন, অমূল্যব ভদ্রতা দেখাতে হয।

কাবণ, আজই জানে অমূল্য, অনেক দিন পবে এমন এক মুহূর্ত আসবে তাব জীবনে যখন অনেক পবিবর্তনেব ওপাবে গিযে অনেক নতুন জিনিস সংগ্রহ কবে নিযে (জীবনেব সমৃদ্ধিব কিংবা দুর্দশাব ভিতবও বসে) অমূল্য অবাক হযে ভাববে এত ভদ্রতাব কি দবকাব ছিল।

উপেক্ষার শীত

—'তোমার সর্দি করেছে নাকি অরু?' শরবিন্দু মেয়েটির হাতটা টেনে নিয়ে, কপালে হাত দিয়ে খানিকটা তাপ বোধ করছে। হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জা।—'স্টিমারে বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছিল।'

—'হ্যাঁ, ডেকে বসেছিলাম সারারাত।'

—'ভিতরে যাওনি আর?'

—'না, এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল নদীর দু পাড়, নদীর সামনেটা, আকাশটা, বরাবর পাথর কাঁকরের দেশে থেকে এই নদীগুলো বড্ড ভালো লাগছিল। বাস্তবিক যখন আটশো নশো মাইল ট্রেন জার্নি করে বর্ধমান ফর্ধমান এলাম, তখনো কিছু বুঝতে পারিনি—শেয়ালদার থেকে ট্রেনে চড়ে আরো দেড়শো দুশো মাইল এদিকে আসার পর, তারপর স্টিমার। সারারাত স্টিমারের জার্নি আমার এত ভালো লেগেছে—'

শরবিন্দু একটু হেসে বললে—'কিন্তু সব জিনিশের জন্যই দাম দিতে হয়। ভালো লাগার সুদ্ধ শুদ্ধ এখনো আদায় চলেছে।'

—'তাতে আবার কি, এ সর্দি এখনই নেমে পড়বে।' অরু স্মেলিং সল্টের বোতলটা শুকছে: বাঁ হাতে তার পাতলা একটা রুমাল জড়ানো।

—'চা খাবে?'

—'কে, আমি অরু?'

—'আমার জন্য আনতে বলেছি, বুদ্ধি করে যদি একটু .বশি আনে, বিয়ে বাড়ির হ্যাঙ্গাম—আসার ডাকতে লজ্জা করে। চারদিকে কত কাজ। কোথায় কাজ করব না খাটিয়ে মারছি।'

শরবিন্দু বললে—'এসব কথার কোনো উত্তর দেব না আমি। তুমি যা ভেবেই বলে থাক না কেন এসব ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না। সকাল থেকে এই অবদি সাত কাপ চা খেয়েছি। বিয়ের বাড়ি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুশো তিনশো কাপ উড়ছে। তুমি কি এক কাপও পাওনি অরু? ওরা কেমন?' তীব্র বিরক্তিতে শরবিন্দু গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে।

—'পেয়েছি শরৎদা, আমিও অনেক পেয়েছি,ত কোনো দিক দিয়েই কোনো ত্রুটি হচ্ছে না আমার প্রতি। কিন্তু কি জান, তুমি আজ হাজার লোকের মাথায়, সব দিক দিয়েই তোমার ডাক' সকলেই তোমাকে দেখতে চাচ্ছে, তোমার সমস্ত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবরা চব্বিশ ঘণ্টা তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য উৎসুক। তাদের পাটিগুলোতে এমন একশো বার ডাক পড়েছে,—'গ্রামাফোন বয়ে যাচ্ছে—যদু ঘোষাল ও নবীন গুপ্তদের গানের মজলিশ—পাড়ার মেয়ের দল—আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম ইয়ার বন্ধু চাকর বাকর সবাইকে কানা করে দিয়ে তুমি আমার এখানে বার বার আসো কেন?'

—'অপরাধ করেছি?'

—'লজ্জা করে।'

—লজ্জা? কেন অরু?'

—'সব্বাইয়ের চোখ আমার ওপর পড়ে।'

—'পড়ুক গে আমাদের কী আসে যায় তাতে।'

—'ছিঃ, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ, চারদিককার ঢের কর্তব্য আছে তোমার, সবাই তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে, এখনই হয়তো অনেকে কানাঘুঁষো করছে, কাল রাত একটা অবদি আমার এখানে আড্ডা দিচ্ছিলে, হল কি মালতীদি আর বিমলা ভালো করে ঘুমুতে পারল না, লজ্জা করছিল তাদের, আমি কতবার তোমাকে চলে যেতে বললাম, কিন্তু তোমার যেন কোনো দিকেই

খেয়াল নেই। দশ দিন পরে বিয়ে—লোকেরাই বা কি মনে করে। মালতীদি বলছিল এই সব নিয়ে বিয়ে বাড়িআলারা অনেক সময়ই প্রায় ঘুষ ঘুষ করে। করবেই তো, আজ সকালের ভিতরও কম করে সাত আটবার একটানা একটা ছুতো দেখিয়ে আমার কাছে এসে বসে থাকছ,—কথা হচ্ছে না?'

—'তুমি নতুন কিছু বলতে পারবে না অরু। সবই আমি জানি, সব জেনে শুনেই আসি।'

—'আমাকে অপদস্থ করবার জন্য?'

—'আমাদের যশ মান কোনো একটা জায়গায় আটকে নেই অরু, কোনো একটা বিশেষ সময়ের ভিতরেও না, এই বিয়ে বাড়িটা তোমার নিজের জায়গা নয়। তোমার পরিচিত পৃথিবী এসবের ঢের বাইরে। এবং এগুলোর চেয়ে ঢের বিস্তৃত, সেখানে তোমার নাম ঠিক হয়েই রয়েছে, কেউ কোনোদিন তোমার কুৎসা করেওনি, করবেও না। তুমি যে কুৎসার জন্য এত ভয় কর সেইজন্যই তোমাকে বলছি। আর এই বিয়ে বাড়ির কোনো কোনো লোক যদিও বা আজ আমাদের নিন্দে করে, আমাকেই বেশি, তোমাকে বরং কম, তাও একটা নিতান্ত সাময়িক জিনিশ, ঠিক এই বাড়িতেই আর এক সময় এসে ঠিক এই লোকগুলোর কাছের থেকেই তুমি ঢের সুনাম নিয়ে যেতে পারবে। কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না। আমাদের যশ অযশ এমনই সাময়িকতার উত্তেজনার উপর নির্ভর করে, হিড়িকে ভেসে আসে, হুজুগে ডুবে যায়। জান না কি তুমি?'

—'পৃথিবীর যদি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তো বোঝা উচিত এইসব, এবং সবসময়ই এগুলোকে উপযুক্ত রকমের ঘৃণা করা দরকার।' আসল কথা হচ্ছে, আমাদের জীবনের যা দরকার তা মেটাতে হবে, প্রকৃত দরকারগুলো এত কম বোধ করি আমি যে দু একটা সত্যি সত্যিই যখন অনুভব করি, তখন নিজের মজ্জাগত সমস্ত কুঁড়েমি ও উদাসীনতাকে অগ্রাহ্য করবার মতো জোর পাই।'

—'কিন্তু দুঃখ এই, তা বেশিক্ষণ থাকে না।'

চা এসেছে।

অতিরিক্ত এক কাপও হতে পারে।

অরু বললে—'সবই তো বুঝি শরৎদা, আমাদের জব্বলপুরের বাংলোয় হলে তোমাকে কেউই কিছু বলতে আসত না, কিন্তু মানুষের নানারকম পার্থক্যের কথাই শুধু বলছি না, এতগুলো লোককে যে অগ্রাহ্য করে বার বার যে আমার কাছে আসছ, এতে ওদের অভিমানেও তো আঘাত নামতে পারে? ভাবতে পারে আমরা কি কেউ নই? জব্বলপুরী অরু সেনগুপ্তই সব?'

অরু ফিক করে হেসে দিল।

—'আর তোমার জীবনের দরকার শরদিন্দুদা,—কী দরকার? আমার কাছে এসে কী প্রয়োজন মেটাতে পারবে তুমি? চারদিকে লোকজন হৈ চৈ করছে, আমাদের ওপর লক্ষ চোখের লক্ষ নজরবন্দী আমরা।' অরু একটু হেসে বললে—'কিন্তু যদি আমাদের দুটিকে কোথায়ও খুব নিরিবিলি সোয়াস্তিতে থাকতে দেয়া হত, তাহলে কি সাধ মেটাতে পারতে তুমি। বা আমি তোমাকে মেটাতে দিতে পারতাম?' চায়ে একবার চুমুক দিয়ে অরু বললে—'তার চেয়ে বরং তোমার জীবনের বস্তুত দরকারটা এখনই তুমি ঢের ভালো করে বুঝেছ।' একটু চুপ থেকে—'আমিও তোমাকে এই পথেই চালাব ভাবছিলাম।' নিজের প্রশ্ন ও অরুর উত্তর, নিজের জিজ্ঞাসা ও অরুর প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে শরদিন্দু অনেক কিছুই জানে, অনেকদিন ধরেই, শরদিন্দুর বিয়েটাও তার নিজের জীবনের এই সচকিত দৃষ্টির ফলে এত বাধা ঠেলেও আজ ফলতে চলেছে। বয়সের প্রতিভা নিয়ে জীবনটাকে আরো খনন করে আবিষ্কার করার ভিতর অরুকে চেনেনি কি সে?

কলকাতায়, জব্বলপুরে, মোরাদাবাদে, ঢাকায়, পাঁচ সাতটা বছর ধরে কত জায়গায় বে জায়গায় টাল মারা চিঠিপত্রের স্তূপের ভিতর দিয়ে এই মেয়েটিকে সে একদিনেই একশো বছরের চেনা চিনে ফেলেছে যেন, একশো বছরেও একদিনের কোনো একটা খোঁচকে কিছুতেই যে পালিশ করতে পারা যাবে না, তা বুঝেছে। আর সমস্তই ঠিক,—কিন্তু কোথাও কি যেন হয়তো

এতটুকুই একটা কিন্তু তবুও অসাধ্য একটা ঘোঁচ রয়ে গেছে। মানুষের জন্মগত জটের মতো কিছুতেই যা মুছছে না, মুছবে না। অপ্রেমের কথা না অরু হয়তো শরদিন্দুকে ভালোই বাসে, হয়তো বা কেন অরু আর কাউকেই ভালোবাসে না, এ নিশ্চয় কথা এরা দুজনেই জানে। শরদিন্দু ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে এমন নিঃসঙ্কোচে শেষ পর্যন্ত মিলতে পারে না অরু, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্তও। কিন্তু তবুও, শেষ পর্যন্ত আর একটা পরদা বের হয়ে পড়ে। মজলিশের মতোই নরম যেন, কিন্তু তাতে পাহাড়টাও বেধে পড়ে। এই পরদাকে ছিঁড়ে ভিতরে ঢুকতে পারল না আর।

কিন্তু পারবে নাকি কোনোদিন? কে জানে? জীবনের আবিষ্কারের অদ্ভুতত্ব বিষয়কেও বিস্মিত করে দেয়। কিন্তু হয়তো এক জীবনের প্রতীক্ষারই দরকার। না হয় অতটা না হোক কিন্তু প্রতীক্ষার ঢের অপরিসীম দবকার এই মেয়েটির সম্পর্কে একদিন না হয় সমস্ত প্রতীক্ষার পর এই মেয়েটিকে পাওয়াই গেল, কিন্তু তখন হয়তো শরদিন্দুর এ মেয়েটির জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো মেয়েরই জন্য হয়তো না, হয়তো প্রেমের জন্যও না।

জীবন এখন যা চায়, এখনই তা তাকে দেয়া দরকার, এ কোনো তুচ্ছ জিনিশ নয়, লোভের স্থূলতা শরদিন্দুর জীবনে খুবই কম। এ কোনো তুচ্ছ জিনিশ নয়, একটা পরম জিনিশই চাচ্ছে, জীবন আজ, অন্তত আজ সেটাই তাই-ই মনে করছে সে। মানুষের সমস্ত জীবনের দু চারটে মাত্র জিনিশের ভিতর এ ও একটি। তাই বিবাহ করতে চলেছে শরদিন্দু। বিবাহকে গুণী লোক যতই নিরর্থক মনে করুক না কেন, জীবনকে এ ঢের দেয় সাধ তৃপ্তি, অবসাদ, অসাধ, অভিজ্ঞতা, সাহস, দায়িত্ব, ক্ষমতা ও আবিষ্কার। বিবাহের ভিতরে রেখেও বিবাহের অতিরিক্ত জীবনে পৌঁছিয়ে দেয় মানুষকে। যেন মাটির ভিতরে ঘাস হয়ে ফুটে উঠবার স্বাভাবিকতা, ঘাসের বুকে শিশিরের ফোঁটার ভিতর নক্ষত্রকে প্রতিফলিত করবার মতো প্রতিভা বিবাহ, বিবাহের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে জীবনের অনাবিষ্কৃত বিস্তৃত খননের মধ্যে মানুষকে এই সব দেয়। কাজেই অরুর দাম্পত্যহীন ভালোবাসাকে ধরে রাখলে চলবে না। সে যা দিয়েছে, তা দিয়েছে। তা থাক, ভবিষ্যতের জন্যও থাকুক, নানা সময় নানা চাবিরই দরকার হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তাই বলে বিবাহকে বোধ করে রাখা চলবে না। কিন্তু অরুর সঙ্গে এই সময়টুকুরও খুব দাম। কে জানে, একে আর পাওয়া যায় কিনা, কিংবা পাওয়া গেলেও শরদিন্দুর এ তৃষ্ণা তখন আর থাকে কি না।

শরদিন্দু বললে—'তাই নাকি অরু? তুমি আমাকে এ পথে চালাবে ভেবেছিলে?'

—'দু একটা চিঠিতে লিখেছিলাম বোধহয়।'

—'শেষের দিকের চিঠিগুলোতে—'

—'তখনো তোমাব বিয়ে ঠিক হয়নি, কথাও চলছিল না হয়তো, অন্তত আমি কিছু জানতাম না। এই মাত্র জানতাম যে তুমি কোনোদিন বিয়ে করবে না।'

—'তাই তোমাকে বলেছিলাম আমি।'

—'এবং তোমাকে বিশ্বাসও করতাম আমি, সঙ্কল্প করে কেউ যদি তা বুঝতে পারে তা তুমি, এইই জানতাম, কিন্তু মানুষের জীবনের পরিবর্তনকে নয়, তার সংকল্পকে দোষ দেয়া চলে না।'

কিন্তু এ কথাগুলো অরু খুব পবিতৃপ্তির সঙ্গেই বলছে। ওর বেনীর থেকে রিবনটা খসিয়ে নিলে হয়তো এর চেয়ে বেশি ওলটপালট হয়ে যেত।

অরু বললে—'তুমি ভেবেছ, আমার বিশ্বাসে ঘা দিয়েছ, তা নয়, বিয়ের প্রয়োজনের কাছে ওরকম সব প্রতিজ্ঞা অপ্রতিকাব কোনো মানে নেই, সেগুলো নিতান্ত ছেলেখেলা মাত্র। যখন তোমার চিঠি পেয়ে সব জানতে পারলাম তখনই এই কথা মনে করেছি।' এবং একটু পরে—'বরং বিশ্বাস একটুও কমেনি, তাই বলে তোমার ওপর আমার'—ফিক করে হেসে—'বরং বিবাহিত স্বামী হতে যাচ্ছ বলে সবচেয়ে নির্ভয়ে তোমাকে বিশ্বাস করা যাবে এখন। তোমার স্ত্রীই শুধু নয়, আমিও, কি বল?'

কিন্তু বলবে কী শরদিন্দু, মানুষের জীবনের আগাগোড়া সম্বন্ধে শরদিন্দুর চেয়ে অরু ঢের বেশি নিশ্চিত, এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই প্রতিটি কথা বলে যাচ্ছে সে। উত্তরের

জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না তাকে।

অরু বললে—'তুমি না করলে বরং মুশকিল হত, আজ মোরাদাবাদ, কাল দিল্লি, পরদিন জব্বলপুর, তারপর জামরুদ, হয়তো জাহাজে করে জাপান, সিঙ্গাপুর, সাংহাই, চিন, বিলেত, কখন যে কোথায় গিয়ে কি করে যেতে তুমি, এবং পথে পথে কত কি ঘাঁটাতে সেই সব কি ভালো হত শরদিন্দুদা?'

—'এই সবও আমি তোমার কাছে বলেছিলাম হয়তো?' .

—'জব্বলপুরে, সেই বিশে পৌষের কথা মনে আছে তো? তুমি আমাকে তারিখটা মনে করে রাখতে বলেছিলে। তুমি না বললেও সে ভয়াবহ দিন মানুষ ভোলে না কখনো। আমি যখন বললাম তা হবে না, আমার দিক দিয়ে নয় শুধু, চারদিক দিয়ে দেখলে—তুমি বললে 'চুলোয় যাক সব', আমাকে চেপে ধরলে, আমার কথা জানতে চাইলে,—'হবে না'। যতবার জিজ্ঞেস করলে এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারলাম না। তুমি কাঁধের ওপর থেকে ওভারকোটটা টেনে নিয়ে আঁটতে আঁটতে সে সব ভীষণ কথা বলে যাচ্ছিলে, আমার মনে হচ্ছিল তখুনি মরে গিয়ে তোমার জীবনের সমস্ত দ্বিধার হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে নিস্তার দেই।'

—'ডিনার টেবিলের থেকে একটা রুটি কাটা ছুরির বাঁট দিয়ে মেরেছিলাম তোমাকে সেদিন?'

অরু পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললে—'তোমার জন্য সেদিন বড্ড ভাবনা হয়েছিল, কিন্তু তুমিই শেষে আমাকে সান্ত্বনা দিতে বসলে, সাংহাই এই সব দিয়ে?'

অরু শরদিন্দুর চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে মাটিতে নামাল।

—'এই সব বিশ্বাস করেছিলে তুমি? তোমাকে বিয়ে করতে না পেরে আমি ওইসব করতাম?'

—'তখন যা তুমি বলেছিলে, সত্যিই বলেছিলে। আজকের দরকারে তার হযতো কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমার কখন কি সত্যি দরকার হযে পড়ে তা আমি বুঝি, যতদূর আমার সাধ্য মেটাতে চেষ্টা করি, হযতো এতখানি কারু জন্যই পাবি না আব, কিন্তু সেদিন বড্ড যাতনা পেয়েছিলাম। তারপর থেকেই তোমাকে সেই চিঠিগুলো লিখি। বিয়ে ঠিক কবে ফেলেছে শুনে আমি যত খুশি হযেছি আর কেউই বোধহয তা হযনি।'

এই জিনিশটাই শরদিন্দুকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল। অথচ সবচেয়ে স্বাভাবিক আনন্দের তীব্রতায়—প্রেমিকের কষ্টতে অন্তত তাব মেযেমানুষের যা গোপন রাখা উচিত—সবই বলে ফেলছে অরু, বলে স্পষ্ট আবাম পাচ্ছে, ভাব ঢের লাঘব হয়ে যাচ্ছে যেন তার। জীবনকে যে কোনো দিক দিয়ে দেখে এ মেয়েটি! শরদিন্দুকে সত্যিসত্যিই সে ভালোবাসে, শরদিন্দু ছাড়া এ মেয়েটির ভালোবাসার পৃথিবীতে আজও অবদি নেইও আর কেউ। কিন্তু তবুও শরদিন্দুর বিয়ের কথা চিঠিতে জানামাত্রই এই মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, জব্বলপুর থেকে বাংলাদেশের সামান্য একটা স্টিমার স্টেশনে একরকম একা একাই সে চলে এসেছে তারই প্রেমিকের বিয়ে অনুভব করবার জন্য, উপভোগ করবার জন্য—কে জানে এ কেমন উপভোগ? কি রকম অনুভব? বরযাত্রী হয়ে যাবে সে। বিয়ের রাতে ফুর্তি করবে, শরদিন্দু ভাবতেও পারে না এ কি ফুর্তি, অরুর বিয়েতে ভগবান এসে অনুরোধ করলেও খানিকটা উপশম বোধ করে স্বাভাবিক মানুষের মতো এক মুহূর্তের জন্যও দু চারটা কথা বলতে পারত কি সে? সে বিষয়ে কোনোদিনও যেত না কি শরদিন্দু? দূরে থেকেও মানুষের অন্তরাত্মার ব্যথার অতলের অতল থেকে, কোনো বিধাতাই কি তাকে নিস্তার দিতে পারত? শরদিন্দুর বিয়ের রাতে ফুর্তি করবে অরু, যে বিয়ে করছে, আহা, তার চেয়েও বেশি ফূর্তি তার। বউদিকে নিয়ে মজা করবে। জামাইকে ঠকাবার হাত থেকে নিস্তার দেবার জন্য সে একা বরপক্ষের থেকে নাগরীর ওপর নাগরী হয়ে পথ রাখবে, শরদিন্দুদাকে ওদের হাতে অতখানি অপদস্থ হতে দেবে না সে। তারপর এখানে ফিরে এসে আবার বউভাতের মহা সাধ মিটিয়ে নিয়ে—স্টিমারের ডেকে বসে তার বাংলাদেশের গাছপালা নদী নক্ষত্রের শোভা দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত অরুর কাঁকর পাথরের পথে মোটর ঘুরুতে ঘুরুতে জব্বলপুরের বাংলোতে বাপ মা ভাই বোনের ভিতর গিয়ে জীবনের আনন্দ নিষ্কলুষ

উপভোগ কববে সে।

এই তাব প্রোগ্রাম।

পাববে তা, একমাত্র অরুই পাববে, হায়, সে যদি না পাবত, কিন্তু তবুও অরু হতো? জীবনে সে এক গভীব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সৃষ্টি যে এক সত্য ও সফল জিনিশ মানুষকে দিচ্ছে, এমন অতি প্রয়োজনীয় জিনিশটাকেও একটা সম্ভাবনামাত্র কবে বাখল। সুন্দবীব ভ্রূণেব মৃত শিশুব মতো। কাবণ, .যাকে বিয়ে কববে অরু তাব কাছে সে রূপসী মেয়েমানুষ মাত্র কিংবা এমনি আব দু চাবটে জিনিশ, শবদিন্দুব ছ সাত বছবেব গড়া আকাশ পাতাল সম্ভাবনাব কণামাত্র না—হায়' সময়েব ঢেউ এত আগ্রহে এত সব জিনিশ ভাসিয়ে এনে কাউকেই তা উপভোগ কবতে দিল না, সময়েব ভিতবেই ডুবিয়ে ফেলল।

সৃষ্টি–যা অভিজ্ঞতাব অপবিসীমানা চায়, এ প্রবঞ্চনাব ভিতব কী পেল? হয়তো অভাব পেল, ব্যথা পেল, ব্যর্থতাব আব এক অনাবিষ্কৃত অর্থ—বিবহেব বিস্তৃতি।

শবদিন্দু বললে—'তা আমি জানি অরু। আমাব চিঠিব যা উত্তব দিয়েছিলে, সেই দিন থেকেই বুঝেছি।' একটু পবে—'আমি বিয়ে কবতে যাচ্ছি বলে তোমাকে যে খুশি দেখছি এ যেন আমাব মায়েব খুশিব মতো, বোনেব খুশিব মতো, অবিশ্যি কেউ তাবা নেই পৃথিবীতে, কিন্তু তাবা থাকলেও তৃপ্তিব এ আন্তবিকতা তোমাব চেয়ে বেশি দেখাতে পাবত না।'

শবদিন্দু পাঞ্জাবিব হাতাটা গুটোতে গুটোতে বললে—'হেমন্তেব জ্যোৎস্না বাতে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবাব পব নাবকেল গাছেব পাতাগুলো চাঁদেব আলোয় চিকমিক কবে উঠে এইবকমই প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তোমাব এই পবিতৃপ্তিব স্বাভাবিকতা বুঝতে গিয়ে মানুষেব সমাজ সংসাব ছেড়ে বাব বাব আমি ঘাস পাতা নক্ষত্র সৃষ্টিব--বুঝে নিয়েছি।'

অরু একটু অবাক হয়ে বললে—'মনে হচ্ছে তুমি যেন কষ্ট পাচ্ছ।'

শবদিন্দু বললে—'যাকে আমি ভালোবাসি, তাকে যখন সবচেয়ে বেশি ব্যথা দিতি পাবি, সুখটা তখনই প্রবল হয়ে ওঠে।'

অরু অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

শবদিন্দু বললে—'তোমাকে ভালোবেসে সেই অভাবটা খুব বোধ কবেছি।'

অরু ওব চোখেব দিকে তাকাচ্ছে।

শবদিন্দু বললে— কোনোদিন ঈর্ষা কবলে না, আব কাউকে ভালোবাসি কিনা জানতে চাইলে না।

—'উচিত? উচিত বটে নয়তো কি, প্রেমেব ভিতব এইসব জিনিশ আগুন ভবে দেয়।'

—'ঈর্ষা?

—'তাও তো, আবো কত কি? তোমাকে ভালোবেসে যে আমাব ভালোবাসা যে ভেঙে ভেঙে অন্য কোনো দিক যাচ্ছে না সেদিকে তোমাব কঠোব নজব থাকবে না? সে জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে না তোমাব। আতঙ্ক থাকবে না? জ্বালা যাতন' থাকবে না? সামান্য পশুদেব ভিতবেও তো এসব কিছু কিছু দেখেছি, মানুষেব প্রেমে এসব যদি না থাকল, তাহলে ভালোবাসাব জটিলতা এল না তো, যে ভালোবাসা মেদেমজ্জায় অস্থিমাংসে আত্মা পবমাত্মায় জটিল নয় তাব ভবিষ্যৎ কতদূব ভাবতে গিয়ে ভয় হয়েছে। আজো শ্রান্ত হয়ে পড়ি।' শবদিন্দু বললে—'কিন্তু তবুও বলি,আব কিছু না কবছে না কবলে, ভালোবাসতে গিয়ে একটু ঈর্ষা যদি কবতে—'

—'কী হতো?'

—'শান্তি পেতাম, ভাবতাম যে প্রেমটা ঠিক চলেছে ওব।'

—'কিন্তু কাকে ঈর্ষা কবব?'

—'সে কি আমাব কাছ থেকে জিজ্ঞেস কবতে হয়? যেমন কবে ভালোবাসে যাবা তাবা কি নিজেই খুঁজে বাব কবে। কোথাও কিছু না থাকলেও নিজেব ষোলোআনা পাওনাব থেকে এই বুঝি কেই কিছু খসাতে এল, এমনি একটা সন্তাপ, আত্মাব যন্ত্রণা যেন তাদেব ভালোবাসাকে চমৎকাব কবে তোলে। নিজেই আমি ঢেব ঈর্ষা কবেছি। ঈর্ষা কববাব কোথাও কেউ ছিল না হয়তো। কিন্তু তবুও আমাব ভালোবাসাব এই দিকটা নিয়ে তোমাকে খুব বেগ পেতে হয়েছে, এক এক

সময় মনে হতো সারা জীবনটা অরু আমাকে ভালোবাসে না। ওকে ভালোবাসি না, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে না. আমার কথা বিশ্বাস কর তুমি, আমি কি ভাণ করছি? মিথ্যে বলছি? আমি তেমন মেয়েই নয়, আমার ভালোবাসাকে তেমন মনে করো না। দেখ আমাদের শিক্ষা ও চরিত্র। আলাদা, অসত্য ব্যবহার করতে আমি ঘৃণা পাই, ভাণ করে কি লাভ— তোমার কাছে কেন অভিনয় করতে যাব? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলে গাল দিও না। আমার সত্য ভগবান জানেন; জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসিনি, বাসবও না কোনোদিন, আমার ভালোবাসা প্রমাণ করতে ভগবান যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে দেখ, তুমি যা খুশি ভাব গিয়ে কিন্তু আমি যা তা আমিই থাকব, নিজের কাছে খাঁটি থাকলেই হল, তুমি না করলে আমার সত্য ভগবান তো বিশ্বাস করবেন, তিনিই দেখছেন, তিনিই দেখে যাবেন তোমাকে ছাড়া আর কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি আমি; বাসব না কোনোদিন।'

সারা জীবনটা ভরে অরু এই যে সব কৈফিয়ৎ আমাকে দিয়েছে, আমি যখনই আমার নিষ্ঠুর ঈর্ষা দিয়ে আঘাত করেছি তাকে যে সব সাফাইয়ের ভিতর যত সত্য বা যত প্রাণই থাকুক না কেন, উত্তেজিত হয়ে জীবনের অনুপ্রেরণার অত্যাচারে আমার কাছ থেকে দু চারটা তেমন কৈফিয়তের প্রয়োজনও যদি সে বোধ করত তাহলে ওর ভালোবাসার ভিতর অনেকখানি আগুন ভরে দিতে পারত অরু।

অরু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললে—'ঈর্ষা করাটা হয়তো পুরুষমানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক বেশি, পশুদের কথা বললে তাদের ভিতরেও তাই—পুরুষদেরই স্বভাব একটা জিনিশকে একেবারে সম্পূর্ণ করে নিজের জন্য অধিকার করে নেয়া, কিংবা অনেক মেয়েদেরও হয়তো তা থাকতে পারে। কিন্তু সে থাক, সে দরকার আমি কোনোদিন বোধ করিনি, হযতো তোমার ভালোবাসার গুনাগার কোনোদিন আমি কিছুতে দেখিনি।'

বাধা দিয়ে শরদিন্দু হেসে বললে—'আজও হয়তো দেখছ না, দেখবে কী করে? মমতা জিনিশটা খুব স্নিগ্ধ অরু, ওটা নিজেকে স্পর্শ করে না, বাইরে থেকে তুমি আর একজনকে উপশম দিচ্ছ, কিন্তু প্রেম তোমাকে তোমার শত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জীবনের খাডির ভিতর টেনে নিযে তোমাকে দিযে প্রতিঘাত করিযে নেবে। মাতিযে দেবে তোমাকে আগুনেব মতো প্রকৃতির জন্ম দেবে তোমার ভিতর, উল্লাসের, বেদনার, ভালোবাসার বিষের বীজের মতো, পৃথিবীর সমস্ত অসাড়তা নির্জীবতার বিষকে এ না হলে কাটাতে যেতে পারত না আর কিছুতে। ডিম জন্মাত না, বীজ জন্মাত না,- যে সবের থেকে জীবন জন্মগ্রহণ করে সবই অসম্ভব হত।'

অরু তেমনই নিস্তব্ধ রইল।

ভালোবাসার এসব অগ্রসরের কথা, সেদিকে একদিন পৌছুবে হয়তো সে, পৌছায়নি যে এটা অন্তত নিশ্চয়, কে জানে কোনোদিন পৌছুবেই বা কি না। হয়তো ভালোবাসা তার যে রকম ঠিক সেই রকমই থাকবে; কিন্তু তাতে তো সে অতৃপ্ত নয। শরদিন্দুর বিবাহ সে আন্তরিকভাবে উপভোগ করছে।

শরদিন্দুর নতুন জীবন তাকে আনন্দে উৎফুল্ল করে দিচ্ছে। কিছু হারাচ্ছে বলে কোনো চিন্তার ব্যথা নেই; সর্দি জ্বরটা বরযাত্রের আমোদটা নষ্ট না করে দেয় এই ভাবনা।

শরদিন্দু সবই বুঝছে, বুঝছে নাকি? একে এর নিরপরাধ থেকে খসাবার সময এখনো আসেনি, ভালোবাসার দেশে জবরদস্তি খাটে না, হাজার বার লক্ষ বার করেও বলেছে অরু যে শরদিন্দুকে শুধু সে ভালোবাসে, ভালোবাসবে, কিন্তু মমতা যতই মধুর হোক না কেন ভালোবাসার থেকে তা যতই উপরে না নীচে হোক না কেন, স্বর্গীয় হোক, নারকীয হোক, ভালোবাসার থেকে তা একেবারেই আলাদা, এবং মধুরতম মমতাকেও শরদিন্দু আজ চায় না। চায় সে প্রেম।

এই মেয়েটি তাকে তা দিতে পারছে না, তার নিজের দোষে নয়, কিন্তু তার ভাঁড়ারে সে জিনিশের আজও জন্ম হয়নি বলে, জন্ম যে হয়নি তাও জানে না অরু, বোঝে না—কি করে বুঝবে? এত ভালোবেসেও ভালোবাসতে বেধে গেছে যে।

বুঝছে শরদিন্দু—একা।

এ পৃথিবীতে আর কাউকেই বা সে বোঝাবে? একমাত্র যে মেয়েটিকে বলতে পারত, সে এইরকম। যে আসছে, হেমনলিনী, একদিন ছাড়া তাকে আর দেখেনি শরদিন্দু, জীবনে অবসন্ন হয়ে পড়েও রুচিকে তবু যতদূর পারা যায় সজাগ করে শরদিন্দু তাকে পছন্দ করে নিয়েছেও বটে, কিন্তু ভালোবাসার ইতিহাস অরুকে দিয়েই হয়তো শেষ হল। দাম্পত্যের জীবন হেমনলিনী বোঝাবে, তারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রেম জীবনে আর আসবে কি না কে জানে? কে জানে হেমনলিনী অরুর মতো অন্য.কোনো পুরুষের ভিতর প্রেম জাগিয়েছিল কিনা, নিজে তাকে ভালোবাসা ভেবে এই মমতামাত্র দিয়েছিল কিনা! কে জানে! হয়তো তাই দিয়ে থাকবে। না হলে মেয়েটি এমন স্বাভাবিকভাবে তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হচ্ছে কেন, অরু যেমন আর একদিন ঠিক স্বাভাবিকভাবে আর একজনকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত হবে।

হায়?

লোকে বলে জীবনে খুব শৃঙ্খলা, কিন্তু আকাশের ধূমকেতু, ছায়া নীহারিকা, গ্যাসের অন্ধকার থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের অন্ধতা অবদি দাবি দাওয়ার শৃঙ্খলা কোথায়? কতটুকুই বা?

কিন্তু এ নিয়ে নালিশ করলেও তো চলে না, শুনবাব যদি কেউ থাকত, তাহলেও চলত না। শরদিন্দু নিজেই যদি পরমেশ্বরের কাজ হাতে পেত তাহলে শৃঙ্খলা স্বাদ ও আরাম দিয়ে মানুষের জীবনগুলোকে বোঁটকা করে দিত না। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপচয়ের একশেষ করে দিয়েও শেখাত এদের, সৃষ্টিকে শেখাত। আরাম শুধু নয়, উল্লাস ও পরিতৃপ্তিমাত্র নয়, চাই বিস্তৃতি ও গভীরতা। ভয়াবহ অপরিসীম, অপরিমেয়, আনন্দের ও বেদনার।

শরদিন্দু বললে—'তুমি আমাকে কোনোদিন সজ্ঞানে ব্যথা দাওনি অরু।'

—'তাও উচিত ছিল?'

—'ছিল না? তা দিতে পাবনি বলেই তো তোমার অজ্ঞাতসারে আমার যাতনার ভুল কিনারার কিছু বাকি রাখনি তুমি।'

অরু বললে—'কি রকম ব্যথা তোমাকে দিযেছি না দিয়েছি আমি জানি না, কিন্তু যেই জিনিশটা নিয়ে প্রায়ই আমার কাছে উপস্থিত হতে চিঠিতে, সুখে আজও বলছি সে রমক ব্যথার কোনো কারণ নেই তোমার আমি আর কাউকে ভালোবাসি না।'

শরদিন্দু অস্থিরভাবে নিজের কপালে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—'আর কাউকে সত্যি সত্যিই না ভালোবাসলে ভালোই, কিন্তু আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আর কারু সাথে মিথ্যে ভালোবাসার ভাণও কখনো করলে না কেন?'

—'তা আবার কে চায়?'

—'আমি চাইতাম।'

—'কী তৃপ্তি পেতে তা হলে?'

—'নিশ্চই পেতাম—'

বাধা দিয়ে অরু বলছে—'আমার এই কপটতার ভেতরে?'

—'হ্যাঁ, তোমার এই খেলার ভেতরেই অরু, যতক্ষণ তুমি তোমার সমস্ত ভাণকে ভালোবাসা বুঝিযে আর একজনকে নিয়ে নিজেকে বিমুগ্ধ দেখাতে ততক্ষণ আমি মানুষের নির্বিষম ব্যথার তাৎপর্য নিয়ে কি করতাম না করতাম ভগবানই জানেন, কিন্তু খেলা শেষ হয়ে গেলে যখন তুমি আমাকে এস বলতে তুমি আমাকে ভালোবেসে কত ঈর্ষা করতে পার, কত ব্যথা পেতে পার, আমি তোমার জীবনে কতখানি লাগি, তুমি কতখানি পরিপূর্ণভাবে কতকালের জন্য আমাকে অধিকার করে রাখতে চাও, কখন হঠাৎ আমার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ অধিকারের এক চুলও নিতান্ত কল্পনার চোখেও খসে যেতে দেখলে তুমি কত বেদনা পাও সেই সবই বুঝবার জন্য আর একজনকে ভালোবাসার ভাণ দেখিয়ে তোমাকে এত সমস্ত ব্যথা দিয়েছি আমি, তোমার বেদনার পরিপূর্ণতা দেখে আমি তৃপ্ত হয়েছি, কারণ তা তোমার গভীর প্রেমের সমস্ত অতলটা দেখিয়ে দিয়েছে আমাকে। তোমাকে অপরিসীম ব্যথা দিতে পেরে আমি তৃপ্ত হয়েছি, তোমাকে অপরিসীম ব্যথা পেতে দেখে আমি তৃপ্ত হয়েছি। সমস্ত অভিনয়ের শেষে এমন

কথা যদি তুমি বলতে পারতে আমাকে অন্তত একটা দিনও, একট বারও তাহলে ব্যথার নরক থেকে আনন্দের বৈকুণ্ঠে এক মুহূর্তে পৌঁছয়ে দিতে পারতে তুমি আমাকে, তোমার জীবনের প্রেম শুধু নয়, প্রেমের অনির্বচনীয় সূক্ষ্মতার বিলাস তোমাকে পৃথিবীর গাঢ় অবর্ণনীয় প্রেমিকাদের সাথে একসঙ্গে নিয়ে দাঁড় করাত, প্রেমের কাছ থেকে নতুন কিছু চাইবার আবশ্যকতা আমি আর কিছু মনে করতে পারতাম না। কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমাকে, কী দিয়েছে? কুম্ভীপাকের যন্ত্রণাও না, স্বর্গের চরিতার্থতাও না, নির্জীব পৃথিবীর, হয়তো মেরুর দিকের পৃথিবীর খানিকটা অসাড়তা, প্রাণহীনতা, অকৃত্রিম কৃত্রিমতা, তার নিষ্ফলতা, তার শীত, এই তুমি দিয়েছ। কিন্তু তবুও আমার ভালোবাসাকে জাগিয়ে প্রেমে যে কত আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, আগুন, আবিষ্কার, নিজে না বুঝে যে সব বুঝবার সুযোগও তুমিই আমাকে করে দিয়েছ বটে। তা ঠিক। তুমি জীবনে না এলে প্রেমও বুঝতাম না, অপ্রেমকেও না।'

অরু বললে— 'তোমার কথা শুনে আমার কষ্ট হয় শরৎদা,তুমি থামবে? জব্বলপুরের সেই দিনের কথা মনে পড়ে, তখনো তুমি এরকম বকে যাচ্ছিলে, কিন্তু তখনের চেয়ে একটা শুধু মস্তবড় তফাৎ আছে এখন, এইটেই তোমাকে স্থির করে দেবে। এই আমার সান্ত্বনা, তুমি আজও যদি মনে কর— জানি না কোনোদিন সে সৌভাগ্য হবে আমার যখন তুমি এরকম আর মনে করবে না। আজো যদি মনে কর তুমি যে তোমাকে আমি ভালোবাসা দিতে পারিনি তাই কোরো, আমি কী বলব? সব সময়ই যা বলেছি আজও তাই মাত্র বলতে পারি আমার ভিতরের সত্য, সত্যমিথ্যা তোমার সন্দেহ থাকলেও ভগবান তো দেখেছেন। কিন্তু সে যাক, সেজন্য আমার চিন্তা নেই। ভালোবেসেই আমি খুশি, আমি তা দেখাতে চাই না কাউকে, প্রমাণও করতে চাইনে, সে রকম কোনো রুচিও হয় না আমার, যাক নিজের জন্য আমার কোন ভাবনা নেই। তোমার জন্য একদিন ছিল, ভাবছিলাম এ সন্দেহেও ঈর্ষা নিয়ে তুমি কোথায় যাবে? তারপব মনে হল আমাকে ভালোবেসে তুমি খুশি নও। আমি তোমাকে শক্ত ভালোবাসা দিলেও কিছুতেই কিছু হবে না যেন। তুমি বললে ভালোবেসে তুমি নানারকম জিনিস চাও, নানারকম কষ্ট পাও, তোমার ওসব আকাঙ্ক্ষা কষ্টের মানে আমি এখনো ঠিক করে বুঝতে পারছি না, কোনো দিনই হয়তো বুঝব না, কিন্তু ভালোবেসে আমি তো বরাবরই তৃপ্তি আনন্দ পেয়ে আসছিলাম। একটা কষ্ট শুধু পেয়েচি আমি, দিনের পর দিন যা বেড়ে চলেছিল, ভালোবাসা দিয়েও তোমাকে তৃপ্ত করতে পারা গেল না, এই কষ্ট।' একটু থেমে অরু বলল—'কিন্তু যেদিন শুনলাম তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে সেদিন থেকেই তাই আনন্দ পাচ্ছি। যা হোক একজন লোক পাওয়া গেল যে ভালোবাসার সবরকম দেখিয়ে তোমাকে খুশি করতে পারবে, অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা তোমার হাতের কাছে থাকবে তো! আমরা তো দূরেই থাকি। এইজন্যই এত আমার আনন্দ হয়েছে—যেন একটা ভার কমে গেল।

শরদিন্দু এর কোনো উত্তর দিচ্ছে না, অরু যতই বলে যাচ্ছে, ততই বোঝা যাচ্ছে ওর জীবনের ভিতর থেকে সঞ্চিত স্নেহ ও মমতার কথাগুলো বেরিয়ে আসছে শুধু। শরদিন্দুকে এত বছর ধরে যে মমতা ও স্নেহ দিয়েছে অরু সেই সবের ভিতর থেকেই এই কথাগুলোর জন্ম। স্নেহ দক্ষিণা করুণা মানুষের কষ্টের উপশম দেখলেই খুশি হয়—সে উপশম সে নিজেই করুক বা অন্যেই করুক, অপর লোককে সে বাধা দেয় না— অপরে এসেও যদি উপশম দিতে পারে—তাতে যদি ব্যথিত নিস্তার বোধ করে, সুখ পায় তালে নিজেও সে খুশি হয়—নিজের ভারেরও লাঘব হয় মনে করে। কিন্তু ভালোবাসা? একাই সে পৃথিবী জয় করতে চায় না কি? প্রেমাস্পদের জীবন নিয়ে যে গোটা পৃথিবীর মতই একটা বিস্তৃতিগভীরতা তার আনাচ কানাচ থেকেও অধিকারীদের চড়াও করে দূর করে দেবাব শক্তি নিয়ে আসে সে— শক্তি নিয়ে আসে, অধিকার নিয়ে আসে, রুচি আকাঙ্ক্ষা আবেগ প্রয়োজন প্রচুরতা অনুপ্রেরণা তাকে অধিকার দেয়, শক্তি দেয়। ভীষণ করে তোলে, মধুর করে তোলে। ভালোবাসার এই ভয়াবহ মাধুর্য। অরু তাকে ভালোবাসলে শরদিন্দুর এ বিবাহ ঘটত না, সে অরুর জন্যই ঘটল না, যতদিন এ মেয়েটি তাকে ভালোবাসতো, অন্য জায়গায় শরদিন্দুর বিয়ে ঘটলেও ঢের ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে ঘটত—যতদিন মেয়েটি ভালোবাসতো, শরদিন্দুর শক্ত বাধা সত্ত্বেও সে ঝঞ্ঝাট দৌড়ে চলতে থামত না। ভালোবাসার ভয়াবত মধুরতা বিমুগ্ধ করে রাখত শরদিন্দুকে। কিন্তু ঝঞ্ঝাট তো

দূরের কথা অরু আজ তার বিবাহকে সাহায্য করতে এসেছে, জানাচ্ছে যে একটা ভার লাঘব হল, নিজের কর্তব্য শেষ হল বোধ করছে—ম্যারেজ পার্টির ফুর্তি উপভোগ করতে চাচ্ছে সে, বউভাতের মজা মারতে, বউদিকে ভালোবাসতে।

এ যদি হৃদয়হীন দক্ষিণা না হয়। এ যদি স্নেহ না হয়, মমতা না হয়, কিন্তু প্রেম শরদিন্দু আর কোথা পেয়েছিল অরুরও আগে অন্য কোনো মেয়ের কাছ থেকে। একে সে প্রেম দিয়েছে মাত্র।

শরদিন্দু বললে—'আমার জন্য তোমার ভাবনা কমে গেল, তোমার নিজের জন্যও তোমার কোনো ভাবনা তো কোনোদিনই নেই।' একটু থেমে—'আমার বিয়ের পর আমাকে কি আর পাবে ভেবেছ?'

অরু একটু সন্দিগ্ধভাবে বললে—'তুমি কি থাকবে না?'

—'আগের মতোই?'

—'তার চেয়ে নিশ্চিত হয়ে?'

—'যদি চেষ্টাও করতাম তাহলে পারতাম না।' শরদিন্দু একটু থেমে বললে—'নিজেদের ইচ্ছা বা রুচির তাগিদ আমাদের জীবনটাকে ধরে রাখতে পারে না, চারদিককার বিষম প্রয়োজন এসে তাকে দিয়ে কাজ করায়—হয়তো অনিচ্ছায় প্রথম করাতে শুরু করে, কিন্তু এরকম করেই তাকে পরিবর্তিত করে ফেলে। আগের জীবনের সঙ্গে কোনো যোগই থাকে না তার ক্রমে আর, না রুচির, না প্রয়োজনের।

শরদিন্দু বললে—'আমাবও এই হবে সময়কে কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে?'

একটু আক্রান্ত হয়ে অরু বললে—'একদিন তুমি হয়তো— কি বল? ভালোবাসবে না আমাকে আর?'

—'হতেও পারে।'

—'কিন্তু সে জিনিশ কী করে সম্ভব হবে বুঝি না আমি। তোমার ভালোবাসাকে তো আমি দিনরাত পেয়ে পেয়ে দেখেছি, তার প্রচুরতা কখনো আবার ফুরিয়ে যেতে পারে কি না ধারণা করতে পারি না আমি।'

—'আমিও পারতাম না, কিন্তু দেখছি—'

—'এখনই কমে যাচ্ছে?'

—'কমে যাবে যে—ফুরিয়ে যাবে একদিন সেটা বুঝতে পারছি অন্তত।' ক্ষণকাল চুপ থেকে শরদিন্দু বললে—'কিন্তু এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, কষ্ট হবে না অরু, যে সময় তোমাকে ভালোবাসা দিতে পারবো না আর, তার ঢের আগেই আমার ভালোবাসাকে তুমি অপ্রয়োজনীয় মনে করবে, আজই হয়তো করছ--কিছু কিছু অন্তত, এমনি করেই দিনের পব দিন তোমার জীবনে অনাবশ্যক হয়ে পড়ব আমি, এটা তোমাকে পরিষ্কার করে বলে দিতে পারি যে যদিও বিয়ে কবতে যাচ্ছি, একজন সঙ্গী আনছি, জীবনে নানাবকম ঠেকানো খুঁজছি, ভালোবাসাই বল কামনাই বল সেসবের জন্য ড্রেনেজের আর বাকি রাখছি না কিছু। কিন্তু তবুও সমস্ত ফেলে ছড়িয়েও যা উপচে থাকবে আমার, এবং যতদিন থাকবে তোমার চেয়ে ঢের বেশি থাকবে, তোমাকে অনাবশ্যক মনে করবাব ঢের আগেই তোমার জীবনে আগাছা হয়ে পড়ব আমি।'

অরু বললে—'একটা কথা তুমি বার বার আমাকে জিজ্ঞেস করতে। আমি বিয়ে করব কিনা এবং কাকে কবব। বাস্তবিক আমার বড় বিরক্ত লাগত তোমার কথা শুনে। আমি ওসব ভাবতেও যাইনি। কিন্তু যদিও বা বিয়ে করি, তাই বলে আর সব ভুলে থাকব? তুমি যা আমার কাছে, চিরকাল তাইই থাকবে। আমাদের মেয়েদের তুমি চেন না, নিজেদের মতো করে ভাব শুধু, আমার মনের কথা যা আমি জানি, কিন্তু একটা জিনিশে আমার কষ্ট হয়, সত্যিই তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে?'

শরদিন্দু পাঞ্জাবিব হাড়ের বোতামটা মাটিতে পড়ে যেতে দেখে সেটাকে তুলে নিচ্ছে। অরু বললে—'ভুলে যাবেঃ কিন্তু বউদিকে তুমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো এটা আমি চাই, বেচারির যা পাওয়া তাকে দিতে হবে তোমার— না হলেই আমার দুঃখ করবে ওর জন্য। তোমাদের সাংসারিক জীবন সুখী হলেই.আমার শান্তি ও আনন্দ, যেদিন থেকে তোমাকে বিয়ে করতে

বলেছি, সেদিন থেকেই আমি এ ভেবে রেখেছি। কিন্তু বউদিকে ভালোবেসে সাংসারিক আনন্দ ও শান্তি পেয়েও আমাকে ভুলে থাকবার কোনো কারণ আছে নাকি শরৎদা?' অরু স্নিগ্ধ অনুযোগের সুরে বলছে—'বউদিকে স্ত্রীর মতো ভালোবাসবে কিন্তু আমাকে'—কথাটা শেষ করছে অরু— 'নিরাপরাধা বালিকার মতো যে স্নেহ ও মমতা মাত্র দিতে পেরেছে, প্রেম দিলও না চাইলনও না,—চায়, না দিল, কিন্তু গ্রহণ করতে কী দোষ ছিল? নিতে যেটুকু, যা বিন্দুটুকুও লাগে তাও কি এর ছিল না? অরু দক্ষিণাই চাচ্ছে, স্নেহই চাচ্ছে মাত্র, বোনের প্রতি ভাইয়ের মমতার কি কোনোদিন শেষ হয়? এইটুকু চাইছে মাত্র। একজন পুরুষমানুষের জীবনে কামনা অনেক বার আসে, আকাঙ্ক্ষা ও লালসাও সুস্থ মানুষ শেষ বয়স পর্যন্ত জাগাতে পারে, কিন্তু শরদিন্দুই মনে হচ্ছে যে এই পৃথিবী যা, সংসার যা, মানুষের শরীর যা, তাকে ভালোবাসার জন্য একটা উপযুক্ত বয়সের দরকার, কারণ ভালোবাসা আমাদের কাছ থেকে শুধু কল্পনা বা হৃদয়ের অপর্যাপ্ত রং রস বা মনের গাঢ় দুঃখ প্রগাঢ় অমৃত বোধ করবার ক্ষমতা বার আত্মা অবিশ্বাস সন্দেহ ও শীতের চেয়ে তার বিশ্বাস অদ্যমতা আবেগ ও উত্তাপকেই শুধু বেশি করে চায় না, শরীরের ওপরও এর পুরোপুরি দাবি—মাটির ওপরও।

মানুষের জীবনের কোনো একটা সময়ে এই সমস্ত দাবিগুলিই সবচেয়ে বেশি করে মেটাতে পারে সে। কিন্তু এ সময় বেশিদিন টেকে না, নানা দিককার নানা অবস্থা ব্যবস্থার পাকেচক্রে হেজে পুড়ে দগ্ধ হয়ে খসে যায়।

শরদিন্দুর জীবনের এই উপযুক্ত সময়ে অরু এসেছিল। প্রেম বলতে যা কিছু বোঝা যায় এই মেয়েটিকে সবই সে সর্বস্ব করে দিতে পেরেছে, আজও দিচ্ছে, আরো কিছুকাল দিতে পারবে হয়তো। কিন্তু তারপর যে স্নেহ ও দক্ষিণা চায় এই মেয়েটি তাইই সে দেবে। ইচ্ছে করে নয়, কিন্তু তাছাড়া বেশি আর কিছু দিতে পারবে না বলে জীবনের ভিতর প্রেমের বোধ বা প্রয়োজন এবং ক্ষমতা আর থাকবে না বলে। তখন এই মেয়েটিকে মমতা দেবে সে, স্নেহ দেবে হয়তো করুণাও দিতে পারে একে, হয়তো দয়া করবে, কে জানে?

হয়তো একদিন উপহাস করবারও সময় আসবে, কিংবা সেই উপহাসেরও যে প্রয়োজন বোধ করে না সেই উপেক্ষার সময়। পৃথিবীর সবচেয়ে গাঢ় ভালোবাসার গল্প ক্রমে একদিন উপেক্ষার শীতে ডুবে গিয়েছে—এমনই যায়! শরদিন্দুর বুকে আজকেও যে প্রেম আছে, এমনতর এক জিনিশ নিযে শরদিন্দুর কাছে কোনো মেযে আসে যদি ভবিষ্যতে, হযতো অদূব ভবিষ্যতেও, তাহলে প্রেমের গল্পটা আর জমবে না, মেয়েটির কোনো অভাব থাকবে বা বটে কিন্তু নিজেরই নানারকম অবিশ্বাস, শীতলতা, অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছও তামাসাবোধ, অপ্রয়োজন ও পরিমাণ জ্ঞানের অণু কণাগুলোও সেই ভালোবাসকে নষ্ট করে দেবে। প্রেম করতে গিয়ে জীবনের তামাশাবোধটা ছিল না কোনোদিন। কিন্তু এখনই তা জমে উঠেছে, ভবিষ্যতের ভালোবাসার থেকে সমস্ত আবেগ ও প্রাণ এই জিনিশটাই সবচেযে আগে নষ্ট করে দেবে। প্রেমের গল্প জীবনে জমবে না আর। তেমন উপযুক্ত কোনো মেযে এসে পড়লেও—না আর, প্রাণের সেই উপকরণগুলো থাকবে না যে।

অরুকে নিয়েও ভালোবাসার গল্প জমল না আর। উপকরণ গুলো সবই ছিল—মেযেটি ভুল পছন্দের হল।

অরুর আগে যেই মেয়েটি শরদিন্দুকে ভালোবেসেছিল, পুরুষকে তখন সে প্রস্তুত পায়নি, তখনো তাই হল না আর। নিজের জীবনের ভালোবাসার এই হাঁ করা ফোকরের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠেছে শরদিন্দু।

কোনো এক শীতাক্ত প্রদেশের নিশ্চলতায় অসাড় হযে পড়েছে সে। অরুর ঘাড়ের ওপর স্তব্ধভাবে মাথাটা রেখে কর্তব্য অকর্তব্য ভুলে যাচ্ছে সে। আস্তে আস্তে তার মাথাটাকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে অরু বলছে, অরু বলছে—'অনেকক্ষণ তুমি আমার কাছে বসেছ—এখন যাও।'

শুভেন্দু উঁকি দিয়ে বললে, ঢুকতে পারি কি প্রমথ?'

কল্যাণী বললে, 'আসুন-'

প্রমথ অবাক হয়ে তাকালে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শুভেন্দু বললে, 'অমন হাঁ করে থাকার কিছু নেই—' ভাবছ কল্যাণীকে আমি চিনলাম কী করে? তা চিনি হে চিনি—দুনিয়ার নানারকম জিনিসও হয়ে যায়।'

হাসতে-হাসতে আঙুল বুলিয়ে গোঁফজোড়া সাজিয়ে নিয়ে বললে, 'আগে একে মিস গুপ্ত বলে ডাকতাম—শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তখনো, কিন্তু এখন নাম ধরেই ডেকে ফেললাম, ডাকা উচিত, আলাপ আমাদের নিশ্চয়ই এমন ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছেছে', বলতে-বলতে শুভেন্দু থেমে গেল।

কেউ কোনো কথা বলল না।

শুভেন্দু বললে, 'তুমি রাগ কর নি কল্যাণী?'

কল্যাণী মাথা হেঁট করে ছিল।

মুখ তুলে শুভেন্দুর দিকে একবার তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

শুভেন্দু বললে, 'কল্যাণী যে বিরক্ত হবে না তা আমি জানতাম—কিন্তু কেউ-কেউ হয়—তাদের সঙ্গে আমিও অত গা মাখামাখি করতে যাই না। বয়ে গেছে আমার; মানুষ আমি চিনি হে প্রমথ, যারা বেশি-বেশি ভদ্রতা ও সামাজিকতাব ভান করে, না আছে নিজেদের ভিতরে তাদের কোনো অন্তঃসার, না আছে পরের প্রতি কোনো—'

শুভেন্দু থেমে গিয়ে দু জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কল্যাণীর চেয়ে আমি ছ বছরের বড়।'

কল্যাণী ঈষৎ লজ্জিত হয়ে হেসে বললে, 'কৈফিয়তই তো দিচ্ছেন এসে অব্দি—কিন্তু আমরা তো কেউ চাই নি তা আপনাব কাছ থেকে; আপনি ভাল হয়ে বসুন, কেমন আছেন বলুন, অনেক দিন পরে দেখা হল সত্যি, সেই—'

একটু থেমে নিয়ে সে বললে, 'একে তুমি তো খুব চেন প্রমথদা?'

শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু কল্যাণীকে আমি কি করে অতখানি চিনে ফেললাম সেইটেতে তোমার খটকা বাধে হয় তো প্রমথ।'

কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু প্রমথের সঙ্গে তোমার একদিনের আলাপ এত খানি? এও তো এক আশ্চর্য!'

কল্যাণী—'আপনার সঙ্গে সাত-আট দিনের পরিচয় শুভেন্দুবাবু। কিন্তু প্রমথদাকে সাত-আট বছরের বেশি—'

শুভেন্দু কল্যাণীকে কেটে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'সাত-আট বছর! বল কি হে প্রমথ।'

'একটু পরে হেসে বললে, 'তা হলে একে সেই ফ্রক পরার সময় থেকে দেখে আসছ।'

থেমে আবার হেসে বললে, 'বেশ, বেশ! কিন্তু প্রমথর কথা আমাকে তুমি বল নি তো কল্যাণী।'

—'আপনাকে আমি কার কথাই বা বলেছি, ক দিনই বা আলাপ আমাদের।'

—'কিন্তু প্রমথর কথা উঠতে পারত না কি? আমাদের দু-জনেরই এমন চেনা মানুষটা।'

সকলেই চুপ করে রইল।

কল্যাণী বললে, 'এর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ জান প্রমথদা?'

'শুভেন্দু বললে, 'তাও জানাও নি প্রমথকে? তোমরা দু-জনেই তো জানতে যে প্রমথর বিয়েতে আমি আসছি অথচ আমার সম্বন্ধে তোমাদের দু-জনের ভিতরে একবারও কথা হয় নি?'

শুভেন্দু খুব অবাক হয়ে পড়ছে।

প্রমথও বিস্মিত হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকাচ্ছে।

বাস্তবিক, শুভেন্দুর সাথে তার এত যে পরিচয়, শুভেন্দুবাবু যে তাকে চিঠিও লেখেন একথা প্রমথদাকে কেন সে জানায় নি? বিশেষ কোনো বাধায় নয় নিশ্চয়ই, খেয়াল হয় নি বলে, মনেই ছিল না

বলে, শুভেন্দুর পরিচয় বা চিঠিপত্র মনে করে রাখবার মত কোনো প্রয়োজন কল্যাণী বোধ করে নি বলে।

নিরপরাধ নিশ্চিন্ততায় প্রমথর দিকে তাকাচ্ছে কল্যাণী।

প্রমথ বুঝছে, এই মেয়েটির প্রতিটি মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টির মানে সে জানে, সাত-আট বছর ধরে একে কেটে-ছিঁড়ে, এর সম্বন্ধে আজ সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞতায় পৌঁছে গেছে সে।

শুভেন্দুর সঙ্গে কল্যাণীর উড়ো পরিচয় মাত্র, উড়ো চিঠির ব্যবহার মাত্র, কল্যাণী আজও প্রমথেরই জিনিস—বুঝতে দিচ্ছে মেয়েটি।

প্রমথ পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

কিন্তু কেন এ কামনা আজও? কেনই বা এ চিন্তাহীন পরিতৃপ্তি? চার দিকে বিয়ে বাড়ির হুলুস্থুল, মানুষেরা আজ স্থূল জিনিস ছাড়া অন্য কোনো কিছু উপভোগ করবার কোনো রুচিও বোধ করছে না, অবসরও না; সে সবের প্রয়োজনও নেই তাদের; দু-তিন সপ্তাহের ভেতরেই প্রমথের বধূ হয়ে যে-মেয়েটি এই বাড়িতে পা দেবে—এবং সমস্ত জীবন ভরে সমাধানের সার্থকতায়, সমস্যার প্রয়োজনীয়তায় ব্যাপৃত করে রাখবে তাকে, সেই সুপ্রভা, আজই হয় তো, এখনই, এক দিনের স্টিমার ট্রেনের পথের ওপারে কেমন একটা পুলক নিয়ে প্রমথের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এই সব কিছুই প্রমথ ভাবতে যাচ্ছে না কেন?

জীবনের যেন কোনো দায়িত্ব নেই তার।

কল্যাণী যখন আসতে চাইল এখানে, কেন তাকে নিষেধ করে চিঠি দিতে পারল না প্রমথ? মেয়েটিকে কেন এখানে সে ডেকে আনল? প্রমথের জীবনের জন্য এ তো নয়, কল্যাণী তাকে খুবই ভালোবাসে বটে কিন্তু তবুও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে প্রমথ অনেকবার উপেক্ষা করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত কল্যাণী একবারও সাহস পেল না, কেন পেল না? তেমন প্রেম এই মেয়েটির ছিল না বলেই হয় তো; কিংবা প্রেম, সে প্রেমও হয় তো ছিল, কিন্তু পৃথিবীর সামান্য উপকরণ নিয়ে পদে-পদে জীবনের তাড়া খেতে-খেতে দুটো প্রাণীকে অচিরে উচ্ছন্ন যাবার ভয়াবহ স্বপ্ন কল্যাণীকে হয় তো থামিয়ে রেখেছে; এ মেয়েটির সমস্ত ভালবাসার ভিতর দিয়েই পরিমাণবোধ জিনিসটা বেশ তীক্ষ্ণভাবে, তাজা হয়ে, চলে এসেছে; এক-এক সময়ে এর মাত্রাজ্ঞানের অন্যায় কঠোরতায় কষ্ট পেয়ে মনে হয়েছে—বাস্তবিক এ ভালবাসে কি?

ভালবাসে, ভালবাসে বটে, কিন্তু নিজের শরীরটাকে কোনো দিন প্রমথকে ছুঁতেও দিল না সে, প্রমথর বিয়েও সেই ঢের আগেই ঘটাতে পারলে ঘটাত—এখন ঘটছে যে সেই জন্য কল্যাণীই সবচেয়ে প্রসন্ন, নিজেও কল্যাণী সুবিধে পেলে আইবুড়ো হয়ে পড়ে থাকবে না যে এও প্রমথের কাছ থেকে গোপন রাখবার কোনো প্রয়োজন কোনো দিনই সে বোধ করে নি।

কল্যাণীর জীবনের এই তিনটি জিনিসকে প্রমথের স্বীকার করে নিতে হয়েছে—ওদের ভালবাসার সেই গোড়ার সময়ের থেকেই প্রায়।

বড় অদ্ভুত, বড় তামাসারই, তিনটি জিনিস; ভালবাসা ঐ জীবনের সম্ভোগ পরিমাপ দিয়ে খুব নিখুঁত করে গড়া।

কল্যাণীর এ ভালবাসাকে কোনো বিচক্ষণ মানুষ একদিনের বেশি সইত না, প্রমথ না। অবোধ নয় প্রমথ, অনভিজ্ঞ নয়, অস্বাভাবিকতা অসাড়তা তিলমাত্র নেই তার ভিতর—জীবনের রগড় ও রসের প্রবল আকাঙ্ক্ষা একটি ফড়িং কীটের চেয়েও বেশি নয় তার, একটি নক্ষত্রের চেয়েও কম নয়—কিন্তু তবুও তো বেঁধে রেখেছে।

জীবনের কোনো স্থূল স্বাদই মেটাতে পারে নি কল্যাণী—কিন্তু চিন্তা ও কল্পনার ভিতরে কোনো অনুভূতিকেই জাগাতে সে বাকি রাখে নি; নিজের শরীরটাকে ব্যবহারে না লাগিয়েও শরীরের আস্বাদেরও অনির্বচনীয় প্রয়োজন যে-প্রেমিকের—বুঝতে দিয়েছে তা; সমস্ত পৃথিবীর ভিতর প্রেমিক যে এক জনেরই নাক-মুখ-ঠোঁট-চুল চায়—পৃথিবীর বাকি সমস্ত নারীসৌন্দর্য বা লাম্পট্য তার কাছে যে অত্যন্ত কদর্য কুৎসিত নিরর্থক, বুঝতে দিয়েছে তা। এই বোধের ভিতর নিরাশ্রয় ব্যথা—অপরিমেয় অমৃত।

বিয়েবাড়ির সমস্ত ফ্যাসাদ-ঝঞ্ঝাট ফেলে রেখে কল্যাণীর সঙ্গে দোতলার একটা নিরিবিলি কোঠায় দুপুর বেলাটা তাই একটু গল্প করতে এসেছিল প্রমথ। বেদনা পাচ্ছিল, আনন্দ পাচ্ছিল' জীবনের সাত-আটটা বিচ্ছিন্ন, ইতস্তত ছড়ানো বছরের জিনিসগুলোকে কুড়িয়ে এনে এক-একটা মুহূর্তের মধ্যে ভরে পাচ্ছিল যেন সে। এ সবের দরকার রয়েছে—মর্মান্তিক প্রয়োজন আজ; একটা নিদারুণ কদাকার হাতির শুঁড়ের মত জীবনের ভবিষ্যতের গতিবিধিটা প্রতি মুহূর্তেই যেন মাথার ওপরে দুলছে—কোথায় তাকে ছিটকে ফেলে দেয়, কল্যাণীকেই বা কোথায়? কে কাকে কোথায় খুঁজে পাবে তার পর জীবনের কুয়াশাবাতাসে দুজনেই হয় তো বিপরীত দিকে চলতে থাকবে এদের আর—এবং তাইতেই পরিতৃপ্তি থাকবে—।

এই ভালবাসাটার দিক দিয়ে—তার নিজেরই অপরিহার্য নিয়মে এদের দুজনার জীবন এমন স্বাভাবিক ভাবেই অজ্ঞান হয়ে থাকবে এক দিন। এবং তাতে বেদনা তো দূরের কথা, কারুরই কোনো অসুবিধাও হবে না।

জীবনকে বরং ধন্যবাদই দেবে প্রমথও—মানুষকে সে এত স্থির হতে দিল বলে। কিংবা ধন্যবাদ দিতেও ভুলে যাবে হয় তো, নিজের সুস্থিরতা নিয়ে এতই আবিষ্ট হয়ে পড়বে সে। কিন্তু সে সব ঢের দূরের কথা।

কল্যাণী এখনও শূন্যতা নয়, কুয়াশাও নয়—পরিপূর্ণ মেয়ে। শুভেন্দু বরং এখন এখানে না এলেই পারত।

এই লোকটার মোটা কাণ্ডজ্ঞানেব মেদ প্রমথকে.....

কিন্তু কল্যাণী একে অত ভদ্রতা কবে ডাকতেই বা গেল কেন? ডেকে আনল তো, বসিয়েই বা রাখছে কেন?

কিংবা প্রমথর কাছে যা এত প্রয়োজনের, কল্যাণী তার বিশেষ কোনো দবকারই বোধ করছে না হয় তো; নিজেদের ভালবাসাকে—জীবনকে সে আর-কিছু মনে করে বসে রয়েছে; কল্পনাব একটা আজগুবি কিছু।

নিরর্থকতায় বিবক্তিতে জ্বালায় শুভেন্দুব আপাদমস্তকের দিকে তাকাচ্ছে প্রমথ। কিন্তু এই লোকটা থাকবেই।

কল্যাণীও তাতে অস্বস্তি বোধ কবছে না। যেন জীবনের শেষ প্রযোজনেব শেষ রাত্রির নিভৃত মুহূর্তের কোনো গোপনতা নেই,—সেই মুহূর্তই নেই—সেই রাত্রিই নেই—সে-সবের কোনো প্রয়োজনই কারু কোথাও থাকতে পারে না যেন; মানুষের জীবনের পাঠ এর একেবারেই অন্য রকম-ছেলেমানুষিব টোকা দুধের গন্ধে মর্মান্তিক।

কিন্তু তবুও উঠতে পারা যাচ্ছে না।

বসেই থাকতে হচ্ছে—পুরুষমানুষ যে-বযসে বাস্তবিকভাবে প্রথম ভালবাসতে আরম্ভ কবে, এই মেযেটিকে তখনই ভালবেসে এনে নিজেব জীবনে বসিয়ে রাখবার সুযোগ পেযেছিল প্রমথ—পুরুষের ভালবাসা যে বযসে সত্যিই শেষ হয়ে যেতে থাকে, তাব সীমানায়ও এই মেয়েটিকে সেই জাযগাযই দেখতে পাচ্ছে প্রমথ—এই মেয়েটিকে নিয়েই প্রমথেব জীবনেব প্রধান ভালবাসার প্রথম ও শেষ; এর পর যে-সব প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা আসবে, জীবনে বিচাবকে তা এত অভিভূত করে রাখতে পারবে না—কিন্তু এখনো জ্ঞান কিছু নয়; দৃষ্টি, বিচাব সমস্তই আজও প্রেমের আচ্ছন্নতায় লিপ্ত হয়ে একটু বগড় করবাবও সুযোগ পাচ্ছে না। এই মেয়েটাকে একটু ঠাট্টা দিয়ে বেঁধা, নিজেকে খানিকটা উপহাসাস্পদ করে দেখানো, শুভেন্দুব মত গরুব ঠ্যাংকে কল্যাণীব মত বিড়াল ছানার নিষ্কলঙ্ক নির্বুদ্ধিব কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবাব মত একটা বিস্তৃত তামাসা বোধের শক্তি—জীবনে এসব কখনো আসে নি।

প্রেম এখনও; অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞানেব ভাঁড়ামি পবে।

কিন্তু হাতড়ে সে গুলোকে যদি এখনই পাওয়া যেত; হায়! কিন্তু যখন পাওযা যাবে বহু অগ্রসবগ্রস্ত জীবনেব স্নিগ্ধ রুচিব ভিতব সেগুলোকে ব্যবহাব কববার ইচ্ছে হবে না আর, নির্জনে নিজের মনকে দু দণ্ডের আমোদ দেওয়া চলবে মাত্র—

শুভেন্দু বললে, 'তুমি হয তো অবাক হয়ে ভাবছ কল্যাণীর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ হল—এত খানিই বা কী কবে হল—'

কল্যাণী বললে, 'আমি কী বলি নি তোমাকে প্রমথদা? আমাব মনে পড়ছে না কিছু—'

শুভেন্দু বললে, 'আলাপ হল এদের বারাকপুরের বাড়িতে কল্যাণীর দিদি—' সুরমাদিব বিয়েতে; সেখানে তোমাকে দেখি নি তো প্রমথ, প্রত্যাশাও কবি নি, তোমার কথা মনেও হয নি—হবেই বা কী কবে? কল্যাণীদের সঙ্গে তোমার এত আলাপ কে বুঝবে বাবা বল?'

শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু তুমি সুবমাদির বিযেতে যাও নি কেন?'

কল্যাণীকে বললে, 'চিঠি দাও নি?'

—'দিযেছিলাম'

—'তবে?'

কল্যাণী বললে, 'প্রমথদা বড় একটা যায না কোথাও; দেখুন না, নিতান্ত নিজের বিয়ে, তাই রাজশাহি অব্দি যেতে হবে সশরীরে; কিন্তু বদলে যদি কাউকে দিয়ে কাজ চালানো যেত তা হলে এখান থেকে এক পাও নড়াতে পারতেন না প্রমথদাকে; দেখুন এও শেষ পর্যন্ত যায় কি না।'

শুভেন্দু হো হো করে হেসে উঠছে।

আমোদ পেযে বলছে, 'ও, সেই জন্য বুঝি যায় নি সুরমাদির বিয়েতে—'

প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, 'কিন্তু, আমি কিন্তু বাবা বিয়ে আচ্ছা কভি নেই চোরেঙ্গে। একেই

তো নানা ঝঞ্ঝাটে মানুষেব দুর্বিসহ জীবন, তাব পব এই মুহূর্তগুলো, ভাই, বিযেই হোক বা শ্রাদ্ধই হোক, জন্মদিন অন্নপ্রাশন চূড়োকবণ যাই হোক্ না কেন, আসবি তো বাবা চটপট এসে পড়, না সেই টিমিযে টিমিযে-টিমিযে-তাও যদি প্রতিটিতে নেমন্তন্ন চিঠি পাওযা যেত; এও এক বিভ্রাট—'

প্রমথব দিকে তাকিযে, 'বড় দযা কবেই আমাকে শ্রীহস্তে কিছু লিখে দিযেছিল ভাই প্রমথ, শুভবিবাহেব ফর্ম্যাল চিঠি পেলেই আমি যেন চলে আসি—'

হঠাৎ (কল্যাণীব কাছে) নিজেব অতিবিক্ত বাচালতা আবিষ্কাব কবে ফেলে একটু থমকে গিযে বললে শুভেন্দু, 'সুবমাদিবা কিন্তু আমাকে চিঠি দেন নি।'

শুভেন্দু প্রমথব দিকে তাকিযে বললে, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সুবমাদিব বব আমাব পিসতুতো ভাই—'

প্রমথ বললে, 'তোমাবই ভাই?'

—'আপন পিসতুতো; সেই সূত্রেই যাওযা; দাদাব বিযেব ববযাত্রী; যা মজাটাই মেবেছিলাম—জিজ্ঞেস কবো কল্যাণীকে—'

অতিবিক্ত অন্তবঙ্গতায কল্যাণী একটু অস্বস্তি বোধ কবছিল হয তো; কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না তাব; একটু নড়েচড়ে বসে বললে, 'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা, শুভেন্দুবাবু' আমাদেব মেযেমহলেব স্ফূর্তিব আপনাবাও জানেন নি কিছু, আপনাদেবটাও, দুর্ভাগ্যক্রমে, কিংবা বড় সৌভাগ্যই বলতে হবে, আমবা উপভোগ কবতে পাবি নি—'

—'ঐ তো বুঝলে প্রমথ—শুনলে? কল্যাণী বলছে আমাদেবটা সম্ভোগ কববাব তেমন সৌভাগ্য হয নি তাদেব, তাবও হয নি; ঠেস দিযে কথা বলতে চাচ্ছে; উদ্দেশ্য, উপহাস—তা হবে না? সমস্ত বাবাকপুব আমবা ববযাত্রী পুরুষেব দল মাথায কবে নিযে ছিলাম না' মেযেবা সে সবেব কী বুঝবে—'

—'থামুন, থামুন, নেহাত বিযেটা ঠিক হযে গিযেছিল বলে, নইলে আলিপুবেব যে-দল এসেছিল বাবাকপুবেব বাগানে—'

এমনি কবেই চলছে এদেব কথা।

দুজনেই উপভোগ কবছে প্রচুব।

পুবনো কথা মনে পড়ছে সব। দু বছব আগেব স্মৃতিগুলো সমস্ত। এত দিন পবে হঠাৎ আজ সম্মিলিত হতে গিযে এদেব মনেব ভিতব কোথাও কোনো খোঁচ নেই যেন আব। কথায আলাপে পবস্পবকে খোঁচা দিযেও যথেষ্ট আবামই পাওযা যাচ্ছে যেন, যেন এই উপভোগেব থেকে অন্য কোনো অবান্তবেব ভিতব সহসা এবা কেউ ডুবে যেতে চায না, এবা বীতিমত পাচ্ছে।

প্রমথ অনেক ভেবেচিন্তে, বিযে বাড়িব ঢেব ফ্যাকবা ছিঁড়ে একটা নিবালা ঘব খুঁজে, আজ দুপুববেলা যে-প্রযোজনে কল্যাণীকে নিযে বসেছিল এসে মাত্র—সেই ব্যাপাবটাব আগাগোড়াটাকে একটা অনর্থক টঙে দাঁড় কবাচ্ছে যেন কে; কে? কল্যাণী? শুভেন্দু? প্রমথ নিজে?

কিছু বুঝে উঠতে পাবা যাচ্ছে না।

চুরুটটা? কিন্তু থাক।

কিন্তু কী নিযে থাকবে সে?

এদেব কথা শুনবে?

কল্যাণীব কথাবার্তা মর্মাহত কবছে না প্রমথকে—শুভেন্দুও তাকে পাগল কবে তুলছে না, ওদেব দুজনেব ভিতব আব-যাই থাক, ভালবাসাব কোনো অঙ্কুব নেই—কথা, গল্প, দুষ্টুমি ও ধাষ্টোমিব বিমুগ্ধতা বযেছে শুধু, বিমুগ্ধতা বযেছে। কিন্তু যাই কবা হোক না কেন, পবস্পবেব সান্নিধ্যে থেকে পবস্পব বিমুগ্ধ হযে থাকছে তো এবা।

সেও এই মুগ্ধতাই চায, কল্যাণীকে নিযে, নিজেকে নিযে, বিনা আড়ম্ববে এদেব মত বিমুগ্ধ হযে পড়বাব মত জীবনেব সমাবোহ আজ আব নেই যেন তাব, কল্যাণীব সঙ্গে ভালবাসাব কথা বলে জীবনেব আড়ম্বব তৈবি কবতে চায সে, মুগ্ধতা পেতে চায, দুই মুহূর্তেব জন্যই, তাও হোক—তাও হোক। তাব পব একটা দারুণ দাযিত্বপূর্ণ জীবনেব চাপে কিছুবই সময হবে না আব।

শুভেন্দু বললে, 'প্রথম তোমাব সঙ্গে কী কবে আলাপ হল কল্যাণীব আমিই ভুলে যাচ্ছি।'

কল্যাণী বললে, 'আপনি তো সব সমযই সকলেব সঙ্গে আলাপ কবছিলেন, আপনাব প্রথম আব শেষ কোথায?'

—'তোমাকে মিস গুপ্ত বলেও ডাকতাম, কী বেকুবি—'

প্রমথ বললে—'বেকুবি তোমাব এখনই হচ্ছে শুভেন্দু।'

—'আমার?'

—'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।'

একটু দমে না গিয়ে শুভেন্দু বললে, 'বা, বৌদির বোনের সঙ্গে আলাপ করব না? আমি ওর জামাইবাবুর ছোট ভাই—'

শুভেন্দু বললে, 'সুরমাদির বিয়েতে তো তুমি যাও নি, গেলে বুঝতে এরা আমাদের সঙ্গে কী রকম ভাবে মিশেছে।'

—'ওরা কারা শুভেন্দু?'

—'কেন, কন্যাপক্ষ?'

প্রমথ শুরু করলে, 'কন্যাপক্ষ তোমাদের সঙ্গে বিয়ের সময় যা খুশি করুক গে—' কিন্তু কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে থেমে যাচ্ছে প্রমথ—

শুভেন্দু বললে, 'যদি ওর নাম ধরে ডেকে আমি বেয়াদবি করে থাকি, উনিই বলুন।'

কল্যাণী বললে, 'আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেও কিছু হবে না—তুমি বললেও কিছু এসে যাবে না; জামাইবাবু তো সবই করেন' দুষ্টুমি করে চুল ধরে টানেন, আমিও ওর গাল খিমচে দিতে ছাড়ি না, উনি পাল্টে নাক ডলে দেন, আমি তখন কানে হাত দেই, উনি তখন আমার দু গালের মাংস ছিঁড়ে ফেলেন কি আমি ওর ছিঁড়ি—'

প্রমথ স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'সত্যি কল্যাণী?'

শুভেন্দু বললে, 'বগড়-তামাসা আমাদের পরিবারের রক্তে, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি, ললিতদা পেয়েছেন তার বাপের দিক থেকে; ললিতদার ঠাকুর্দা, আমার দাদামশায়ের, ভাঁড়ামোতে সেকেলে নবাবের বাড়িতে তার খুব খাতির ছিল, বাস্তবিক ফূর্তি বোঝে মোসলমান—'

প্রমথ চুপ করে ভাবছে। কে সে সৌভাগ্যবান ললিত বাবু—কল্যাণীর চুল ছিঁড়ে, গালের মাংস খেয়ে হয় তো এর দুর্লভ শরীরটাকে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে যদেচ্ছাক্রমে ব্যবহার করেও, এই মেয়েটির সবিশেষ ভদ্রতাবোধকে যে না পারছে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে, না হচ্ছে একটুও কলঙ্কিত ব্যথিত, এই মেয়েটির শরীরের উপরও এমন অব্যাহত অধিকার যার, হায়, এর দেহের তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি রোমের রস উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও তবু যার নাই। বিধাতা এমনই অপ্রার্থিত জায়গায় গিয়ে কি তার সুধার ভাণ্ড ভাঙেন?

এক মুহূর্তের জন্য একটু তামাসা বোধ হচ্ছে প্রমথের। কিন্তু দিদির জামাইয়ের জায়গায়, নিজের জামাই যখন এর আসবে—ভাবতে গিয়েই প্রবল একটা কুম্ভীপাকের বেদনায় ঘুরপাক খাচ্ছে যেন প্রমথ।

স্বামীর সম্ভাবনা নিয়ে যে—কেউ আসবে নির্বিবাদে তো কল্যাণী তাকে দিয়ে দেবে, হয় তো সে এ শরীরের প্রতি এক মুহূর্তেরও লোভ না করতেই; কিন্তু জীবনের ছ-সাতটা মূল্যবান বছরের দিন গুনে-গুনে যত আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস, কুহকের সূক্ষ্মতা (কল্যাণীর শরীরের দিকটাই যদি ধরা যায় শুধু), ওর জন্য জমিয়েছে প্রমথ, সমস্তই নিজের রক্তটাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে তার, যৌবনটাকে অকর্মণ্য, জীবনটাকে নিরর্থক, আত্মাকে দিয়ে অপচয় করাচ্ছে শুধু, মাকড়সার পেটের নরম রোমের রাশ দিয়ে কুঁড়িটাকে গেলাচ্ছে শুধু, যে কুঁড়িটা মৌমাছিকে পেত, ফড়িঙকে, প্রজাপতিকে, আলোকে, আকাশকে।

এই মেয়েটার সমস্ত মসৃণ সুন্দর শরীরটাকে করে সে মাকড়সার পেটের চটপটে সুতোর গুটিপাকানো ডিম মাত্র মনে করতে পারবে—তেমনই দুর্বৃত্ত, অশ্লীল, কদর্য, বীভৎস।

এখনো যে এর মোহ, মোহই বা বলে কেন প্রমথ, ধর্মের মত এর মাদকতা, দেবতার মত পবিত্রতা, ভগবানের রাজ্যের মত অনির্বচনীয়তা তার, প্রমথকে কল্যাণীর দেহ ধর্মোন্মত্ত করে তুলেছে? ওর আত্মা কি ওর শরীরের চেয়েও পূজ্য? কে বলে, এই সুন্দরকে দেখে নি সে তা হলে' এর মুখের ওপর, ভুরুর ওপর, ঠোঁটের ওর প্রমথ তার চোখের দৃষ্টিটাকে আবেগপ্রবণ চুমোর মত চেপে দিয়ে কতবার বলেছে প্রেম, সুন্দরের থেকে শরীরকে কী করে ছাড়াবে? পৃথিবীর কোথায় কী হয় জানে না প্রমথ, কিন্তু কল্যাণীর সুন্দরী শরীরই ওর আত্মা, ওর মন, ওর অনুপম মোহের সৌন্দর্য দিয়ে গড়া, ভগবান, তাই দিয়েই গড়া শুধু, বিধাতা, পৃথিবীর এই একমাত্র মেয়েমানুষকে এই রকম করে গড়েই ভাল করেছ তুমি।

কিন্তু এমন অনুভবের পরিপূর্ণ সময় চলে যাচ্ছে তার। দুটো বছর যাক, একটা বছর হয় তো, হয় তো অতদিনও না, চলে যাক, তার পর নিজের এই অপরূপ উপলব্ধির থেকে ঢের দূরে সরে যাবে সে।

এ অনুভবের অনেক খুঁটিনাটিই সে হারিয়ে ফেলবে—আবেগপ্রবণ এমন জীবন থাকবে না আর, না কামনার জন্য না ভালবাসার জন্য।

প্রেমের এই বিস্তৃত গভীর অর্থ সে হারিয়ে ফেলবে।

জীবনে প্রেম থাকবে না তখন আর; আকাঙ্ক্ষারও কোনো নিগূঢ় গাঢ়তা থাকবে না; স্থূল একটা

ক্ষিদে মাঝে-মাঝে জেগে উঠে নিভে যাবে মাত্র; সৌন্দর্যকেও তখন মেদ বলে মনে হবে শুধু; সে বাতাসে ভালবাসা বেঁচে থাকতে পারে না।

যখন জীবন সব রকমেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—কল্যাণীকে পছন্দ করতে গেল কেন প্রমথ?

একে ভালবাসতে গেল কেন? হায়, পরিপূর্ণ পাখিটাকে তৈরি করে পাঁকের ভিতর ফেলে দেওয়া? ফুলটাকে বিছের ডিম বিছের বাচ্চা দিয়ে খাওয়ানো? কল্যাণীদের বারাকপুরের বিয়েবাড়িব বর্ণনা এখনো চলছে।

কিংবা কথাটা অন্য কোনো দিকে ঘুরে চলেছে হয় তো।

যাই হোক, এরা খুব ব্যাপৃত রয়েছে; সাংসারিক জীবনের আটপৌরে আঁট-সাঁটের কথায় কল্যাণী খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে— নানা দিক দিয়েই নিজের জীবনের আটপটা এ বেশ বোধ করে—বৈঠক যেমন ভাল লাগে এর, কাজও তেমন, ফুর্তিও যেমন, আমোদপ্রমোদও তেমন; শুধু চিন্তার মুখোমুখি হয়ে এ ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে, ভাবতে চায় না, তেমন ভাবে অনুভব করতেও ভয় পায়, নিজেকে ধরতে পারে না, অপরকে ধারণা করতে গিয়ে পিছিয়ে যায়, চোখ কপালে তুলে ভাবতে বসলে একে বড় কুৎসিত দেখায়, বড় শূন্য; প্রমথের প্রতি কথায়ও তবু একে ভাবতে হয় যে। এর স্বাভাবিক জীবনের স্বচ্ছন্দতার চাবিও প্রমথের কাছে আছে বটে কিন্তু সেটাকে প্রমথ বড় একটা খাটাতে চায় না।

কল্যাণীর সঙ্গে বিয়েবাড়ির বা শাড়ির বা হাঁড়ির গল্প করে কী হবে? সে সব মানুষকে কোথাও পৌঁছিয়ে দেয় না।

সে ভালবাসার পথের যাত্রী—বাস্তবিক জীবনে যে-মেয়েটিব সঙ্গে সঙ্গম এত কম, যে মেয়েটি আজীবন বিদেশের প্রদেশে-প্রদেশেই কাটাল শুধু, কাটাবে শুধু, হাতের কাছে পেয়ে তাকে পাঁচাল করতে ভাল লাগে না, এর রূপের কথা শোনাতে ইচ্ছে করে একে, মানুষের জীবনে রূপের স্থান কোথায়, ভালবাসার সঙ্গে রূপের কী যোগ, নিতান্ত শরীরেই বা কতটুকু; ভালবাসার পথের পবিপূর্ণ অর্থটুকু কী, বাস্তবিক প্রেম কী-ই যে, এর সূচনা কোথায়, পরিণামই বা কতদূব, কোথায়ই বা ব্যথা তার, তাব ঈর্ষা, হিংসা তার, তার শ্লেষ, দৌরাত্ম্য, দুরাচার, মাদকতা, উল্লাস, অমৃত, তারপর কুয়াশা, তার শীত, তাব মৃত্যু।

জীবনের পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে ওব সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা কবে। পবিবর্তনকে ভয় পায় কল্যাণী, এক-এক সময় কৌতূহল দিয়ে ধাবণা করতে চায়—পরিবর্তনকে ও স্বীকাব কবে না, প্রমথেব সন্দেহ ওকে কষ্ট দেয়, প্রমথের অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, পরিবর্তন সম্বন্ধে হৃদযহীন অতিচাব, ওব কাছে বর্বরতা মনে হয়; মুখে কিছু বলে না সে, কিন্তু প্রমথের সমস্ত মতামতের পবেও কল্যাণী তাব একটি সত্যকেও ক্ষুণ্ন করে বুঝে দেখতে কষ্ট পায়, কিন্তু তবুও সেই ফ্রকপরা খুকিব থেকে আজ এই আঠাব বছবেব মেয়ের জীবনেব যে একটা গোপন ব্যবধান টের পাচ্ছে প্রমথ—তাবই কুযাশার নীচে-নীচে প্রমথেব ইতস্তত ছড়ানো চিঠি ও কথার ছেঁড়া টুকবোগুলো জীবনের অঙ্কুর পেযে ফুঁড়ে উঠছে যেন, ওর মনকে আঘাত করে অনাবিষ্কৃত বিস্ময়েব মত তারই এক একটা চমক অনুভব কবতে এত লাগে প্রমথের।

কিন্তু তবুও অন্য কারো জন্য ওকে তৈরি করে দিয়ে গেল শুধু প্রমথ। ফসল যেদিন আসবে সে দিন চাষীকে আর পাবে না কল্যাণী; যে [?] আসবে কে জানে, সে এই সোনাকে কী বকম ভাবে উপভোগ করবে; এগুলোকে আঁটিমাত্র মনে কববে, না রং, না রস, না অনুভূতি? ইঁদুর পেঁচা পঙ্গপাল গাড়ল শুযার মানুষ—জীবনের সঞ্চিত সোনার ছড়ার বিস্তৃত মানে এদেব কাছ।

শুভেন্দু সাদাসিধে পাঁচালি নিয়ে বসেছে।

মেয়েটাকে তার দুর্বল জাযগায় হাত বুলিয়ে আটকে রাখছে। প্রমথও পাল্টা পাঁচালি পড়তে পারে—কমললোচন মোটর কোম্পানির—দুই গোছা দিয়েই শুরু করুক না, কল্যাণীকে নাড়ীর প্যাঁচের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারবে যেন, বৈঠক শুরু করলে শত শুভেন্দুর সাধ্য নেই প্রমথকে হটায়—এই মেয়েটাকে খসায়!

কিন্তু ধ্যেৎ।—ও-সবের জায়গা আলাদা, কল্যাণীর সঙ্গে আজ নয অন্তত, এখন নয়। এই মুহূর্তেব প্রয়োজন একেবাইরে অন্য রকম- পাঁচালি মানুষকে যেই জাযগা দিয়ে শুরু করায় সেই জায়গাযই রেখে চলে যায়, আজ পুলক চাচ্ছে প্রমথ, কল্যাণীকে বাছা-বাছা জায়গায় আঘাত করে চমক চাচ্ছে সে শুধু।

কিন্তু এরা বৈঠক অধিকার করে বসেছে; নড়বে না।

নিস্তব্ধ প্রমথের দিকে কোনো খেয়ালও নেই এদের।

বিয়েবাড়ির কাজ বয়ে যাচ্ছে—কিংক কাজ সামলাবার লোক যদি থেকে থাকে তো—তবুও, তা হলেও, এখান থেকে উঠে গিয়ে কোনো এক বৈঠকে তাস হাতে তুলে শান্তি আছে।

ডেক-চেযার থেকে আলগোছে (পেছনের দরজাটা দিয়ে) সরে পড়ে যদি প্রমথ, শুভেন্দুও বুঝবে না— কল্যাণীও না।

বিবাহিত জীবন

অজিত বিয়ে সেরে এসে বাড়িতে ঢুকতেই লোকাচাব স্ত্রীআচার পৃথিবীর যতরকম আচাব থাকতে পারে ঘিরে ধরেছে তাকে। এক-আধ ঘন্টার ভিতরে নিজেকে কোনো রকমে খালাস করা যায় কিনা তাই ভাবছিল। ধান, দূর্বা, মাথাব চুল নিয়ে টানাটানি পাড়ার বযস্কদের এমনই হিংস্র আশীর্বাদ ও নানাবকম বিতিকিচ্ছিরির ঝকি ছিল না আর কিছু। নিজের পালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রতি মুহূর্তেই তীক্ষ্ণতর হযে উঠলেও সুপ্রভার আঁচলের কোণ থেকে চাদরেব খুঁটটা ফাঁসিয়ে ফেলবার মত কোনো ব্যবস্থাই অজিত কোনেদিকে খুঁজে পাচ্ছিল না। নিজে না খুলে নিলে সাহায্য করবাব জন্য কেউই নেই কি কোথাও? নিজে সে কী করে খোলে?

সুপ্রভাব সঙ্গে সে কথাই বলে না। কথা বলা প্রযোজনও মনে করে না। এই নাবীসৌন্দর্য তাকে স্পর্শও কবে না। একঘব পাড়াপড়শিনীদেব ভেতব বউকে আঁচল চাদবেব গেবোব কথা পাড়াও অসম্ভব। বললেও কতদূর ফল হবে জানা নেই অজিতেব—আসল কথা, বলবাব রুচি নেই তার।

এ মেযেটি তার জীবনে আজ কে? একে বিয়ে কবে এনেছে মাত্র। অবিশ্যি নিজেব ইচ্ছায় ও যত্নে একটা বিবাহিত জীবন থাকা দবকার, জীবনেব ফাঁকে ফোঁকবে নানা সমযই যে আশ্রযটা না হলে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পুরুষ বা নারী কারুই চলে না।

জীবনে সুপ্রভার এইটুকু দরকার।

বাকি সমস্ত কিছুর জন্য একটা অনাবিষ্কৃত পৃথিবী প'থ পথে তাব জন্য অপেক্ষা কবছে। একটা সঞ্চিত জগৎও ছিল, ছোট, কিন্তু সেইটুকুর বিস্মযও ত সমস্ত শেষ হয নি, হযত আরম্ভও হয নি।

পাড়ার গিন্নিদেব কোনো কথাই অজিতের কানে যাচ্ছিল না। সুপ্রভাব শবীরেব সৌন্দর্যে সবাই যে খুব চমৎকৃত হযেছেন, লক্ষ্মীশ্রীব স্তব ও স্তুতিতে চাবদিক যে ঝমঝম কবে উঠছে এবং এগুলো যে কথাব শেষ কথা শুধু নয, অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আগ্রহে ভরা এইটুকু সাধ বুঝছিল অজিত। কিন্তু এমন বরবর্ণিনীর দিকে ফিবে তাকাবাবও কোনো ইচ্ছে ছিল না তার। চোখ দু'টো অনেকক্ষণ ধবেই কাকে খুঁজছিল যেন।

এক বাশ গিন্নিবান্নিদের ভেতর এমনই মজাব আমেজে গা ঢাকা দিযে সতী পিছনেই দাঁড়িযে বযেছে, এতক্ষণ অজিতেব চোখেই পড়ে নি।—'তাই ত, সতী ছিল।'

মেযেটিব কোথাও যেন কোনো আঘাত, বিমর্ষতা বা অবদাসেব চিহ্নমাত্রও নেই অজিত শেষ পর্যন্ত বাস্তবিকই বিয়ে কবে ফেলল বলে কোনো ক্ষোভ নেই তাব। অজিতকে কোনো দিনও হযত আব নিজের জীবনে তেমন কবে পাওযা যাবে না, কে জানে কিছুমাত্রও পাওযা যাবে কি না সমস্ত বুঝেও সতীব মুখে কোনো অপ্রসন্নতা নেই, ববং সে সুখীই হযেছে। প্রগাঢ় পবিতৃপ্ত, বউভাতের চোদ্দ দফা কি ফুর্তি হতে পাবে তাবই মতলব আঁটছে শুধু।

বউদিব প্রতি কোনো ঈর্ষা ত দূবে থাক, সুপ্রভাব নিটোল রূপকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিসাবে গ্রহণ কবা ত একবারেই অবান্তর, এ রূপকে স্নিগ্ধ চোখে প্রশংসা কবেছে সে, আবেশে বউদিব গলা জড়িযে ধরে স্টিমাব ঘাট থেকেই সুপ্রভাব সঙ্গে বন্ধুত্ব পাকিযে ফেলেছে সে, যেন এক নতুন চমকপ্রদ নিবিড় সত্য হল তাব জীবনে, যাব আগ্রহ আন্তবিকতা অপর্যাপ্ত প্রচুবতা ও অক্ষযতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

অজিত সবই বুঝল, এমন যে হবে তা সে জানতও। মেযেটিকে জীবনের ভেতরে এক মুহূর্তেব জন্যও দমাতে পারল না সে। অকপট ভালবেসে, কপট অবহেলা করে, কৃত্রিম ঘৃণার ভান কবে, কিছুতেই না, না বুঝল এই মেযেটির অদ্ভুত ভালবাসাব কোনো অর্থ, অজিত ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত একটা অস্ত্র নিজের হাতে বযেছে তার, অন্য কোনো মেযেব ওপর ভালবাসা দেখিয়ে এর মনে ঈর্ষা জন্মানো; একে ব্যথা দিতে চেযেছিল অজিত, এর অদ্ভুত অবিচল প্রাণস্ফূর্তিকে আজীবন অপমানিত বোধ করে সতীর নিশ্চিন্ত তৃপ্তির শুকনক্ষত্রলোক হতে কাদার উপর আছাড় মেরে খানিকটা উপশম বোধ কবে নিতে চেযেছিল অজিত। অজিতকে ভালবাসে? অথচ ভালবেসে কোনো স্বাধিকারের চিন্তা নেই এব, কোনো ঈর্ষা নেই, সে চলে যাচ্ছে, হাতছাড়া হযে যাচ্ছে বলে কোনো ভাবনা ব্যথা নেই এর? এ কেমন ভালবাসা?

যে ভালবাসার ভিতর হারাবার কোনো আশঙ্কা নেই, হারিয়ে কোনো সন্তাপ নেই, মুহূর্তের জন্যও লোকজনের সঙ্গ ছেড়ে একটু একা হয়ে নিজেকে নিয়ে বসবার কোনো তাগিদ নেই। চিন্তার কোনো প্রয়োজনীযতা নেই মানুষের জীবনের বিরাট পরিবর্তনগুলোর ভিতর দিযে নিরপরাধ নিশ্চয়তার বিরস আমোদ নিয়ে পা ফেলে যা চলেছে—একটুও কাটছে না, আগাগোড়া। নির্বিবাদ ফূর্তির স্থূলতায গড়াচ্ছে যা শুধু সে ভালবাসার কোনো অর্থ বুঝছিল না অজিত।

বিয়ে জিনিসটা অজিতের জীবনে কোনো এক সময়ে আসতই, সতীর সঙ্গে বিয়ের প্রশ্ন প্রথম থেকেই উঠতে পারে না, তা জেনেও অবিসম্বাদ ভালবাসতে কোনো বাধা চলছিল না এদের কারুই। ভালবাসাটাও যখন এমন আবছায়া জিনিস হযে পড়ল তখন নিজের জন্য কিন্তু একটা আসন্ন বিয়ের প্রোগাম নিজেই অজিত একদিন স্থির করে ফেলেছিল, ভেবেছিল মেয়েটা আঘাতে এবার হয একবারে তালপিণ্ড পাকিযে যাবে, না হয় তার ভালবাসার কৃত্রিম অবাস্তবতা সতীকে লজ্জা দেবে, এবং দু'জনের ভেতর এই অস্বাভাবিক জিনিসের শেষ হযে যাবে, তার ভিতরেও একটা স্বস্তি আছে যেন, যে প্রেম এমনই ধোঁযার কুয়াশায় ঢাকা যে তাকে কাটবার কোনা শক্তিই কারু নেই যেন। কেটে দেখলে যদিও প্রেমমুগ্ধতা ছাড়া যেন আর কিছুই পাওযা যায় না, তাব থেকে পরিষ্কার টনটনে মমতার অভাবটাও যেন ঢের ভাল, উপেক্ষাও যেন, ঘৃণাও যেন।

কিন্তু কিছুই হল না। বিয়ের প্রথম প্রোগাম থেকে শুরু করে এই বউ আনা অবদি না বোঝা গেল পৃথিবীর কারু প্রতিই সতীর প্রানের মমতার একটকুও অভাব না দেখা গেল, এক প্রকৃতির গভীর গর্তেব থেকে গভীরতর গহ্বরে ডুবে যাচ্ছিল যেন অজিত। এই সতী! কিই যে এই মেযেটি।

মুহূর্তের মেঘও ওর মুখে, না জমে গেল, এর স্থূল বিয়ে বাড়ির ভোজ বাড়ির এতটুকু আমোদেরও আঁটসাঁট।

সতী লুকিযে এসে চাদরের খুঁটের বাঁধনটা খুলে দিযে গেল।

—'কেউ কি দেখেছে সতী?'

—'আমি তেমন মেয়েই নই।'

বিয়েবাড়ির সমস্ত হুলুস্থূলু টইটম্বুর হাত ছাড়িযে দু'জনে ওপবের ঘরে শেষ সীমায একটা অনাবিষ্কৃত কোঠায় গিয়ে বসেছিল। একটা মস্ত বড় লম্বা খাটের উপর জাজিম পাতা ছিল, তারই উপর বসেছে দু'জনে, দু'জনেই দু'জনেব থেকে অনেকখানি পৃথক হযে সবে বসেছে। এদের দু'জনের মাঝখানে জাযগাটায একজন মাঝারি গোছেব মানুষ নির্বিবাদে শুয়ে থাকতে পাবে।

অজিত বললে, 'কি বিপদেই পড়েছিলাম বল ত।'

সতী বললে, 'আমিও বুঝেছিলাম, স্টিমার থেকে নেমে অবদি তোমাকে দেখছিলাম, কিন্তু বিয়ে কবে এলে কি করে?'

—'সে এক কেলেঙ্কারি! ভাগ্যিস তোমার ইনফ্লুযেঞ্জা হল বলে যেতে পাবলে না।'

—'আমার না যাওযাটাকে একটা সৌভাগ্য মনে করলে তুমি?'

—'তা নয়ত কি? সে কাঠগড়ার সুমুখে তুমি এগিযে কি করতে পারতে?'

—'কাঠগড়া?' সতী একটু আহত হযে অজিতের দিকে তাকাল।

—'বরাবরই ত তোমাকে তাই বলেছি।'

—'বিয়ের আগে সে সমস্ত একরকম তামাশা গিয়েছে অজিতদা, কিন্তু এখন আব ওরকম করে বলো না।'

—'তোমার কষ্ট হয়?'

—'হয বই কি।'

—'কার জন্য?'

—'আহা বউদি বেচাবি! সে ত এসরের কিছুই জানে, না, ওর মিষ্টি মুখখানার ভিতর না আছে কোনো ঢঙ, না আছে একটুকুও কারু দোষ-ত্রুটি ধরবার মত কোনো ইচ্ছে; ইচ্ছেই-বা বলি কেন, সে সব বৃত্তিও ওর নেই, যেন বাস্তবিক এমন ইনোসেন্ট মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি।' সতী বললে, 'তুমিও কি কোনোদিন দেখেছ কোথাও অজিতদা?'

অজিত বললে, 'ওর মুখে দিকে আমি তাকিয়ে দেখি নি।'

—'সত্যি বলছ?'

—'আকাশ থেকে পড়লে? ওকে দিয়ে কি না কি কতটুকু প্রযোজন আমার তা আমি জানি, যতটকু দরকার তা আমি তোমাকে বলেছি, নিজেও জানি।'

সতী সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, 'বিয়ের আগের সেই সব কথা—'

অজিত বললে, 'বিয়ের পরেই কি সে সব অসত্য হয়ে যায়! তখনও ত বিয়ে করতে যাচ্ছি জেনেই বলেছি; কথার নিশ্চয়তা এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত হয় না, সময় লাগে। যাবে অবিশ্যি একদিন সবই বদলে।'

সতী বললে, 'সে সব তামাশার কথা এখন আর বলো না, যা বলেছে না বলেছ সবই আমি ঠাট্টা হিসেবে ধরে নিয়েছি-তাই উচিত, ভেবেছিলুম বউদিকে দেখ নি-তোমার জীবনের ভিতর তার স্থানের উপযুক্ততা অনুভব করবাব সময় যখন তোমাব হবে—'বলতে বলতে হেসে নিয়ে সতী বললে, 'কিন্তু এখনই ত সেই সময় এসেছে, বিয়ের রাত থেকেই সেই সময় আরম্ভ হয়ে গেছে।' সতী বিস্মিত হয়ে অজিতের দিকে তাকাল। বললে, 'এখন তোমার অবহেলা কবলে চলে না'

অজিত বললে 'এখনো আমি কোনো প্রয়োজন বোধ কবছি না,' একটু চুপ থেকে বললে, 'কোনোদিনও বোধ করব কি না কে জানে।'

সতী কষ্ট পেয়ে বললে, 'আমাকে এসব বিশ্বাস করতে বল?'

—'না,, বলব কেন সতী? ।কিন্তু সুপ্রভাকে আমি কোনো কষ্ট দেব না, সে ভয় তোমার নেই।'

সতী সন্দিগ্ধ হয়ে বললে, 'ওব সঙ্গে কি রকম ব্যবহার কববে তাহলে তুমি?'

—'ওকে বুঝতে দেব না কিছু।'

—'সেইটে কি ভাল হবে?'

—'না হলে যে ওর দুঃখ-দুঃখের আব কোনো শেষ থাকবে না, সতী, ও যদি আমাকে ভালবাসে, ও যদি আমাকে নাও ভালবাসে তাহলেও ওব আপসোসেব কোনো অবধি থাকবে না আর, এই সব নিয়ে একটা অশান্তি করে লাভ কি? তাব চেয়ে—'

সতী বললে, 'অজিতদা, এসব ভাল নয়, তোমাকে অশান্তি পেতে বলি না আমি, কিন্তু তুমি না বুঝে কথা বলছ, এমন স্বামী ঢের থাকে যে বিয়ের বাত থেকেই তার যা প্রাপ্য ভালবাসা সবটুকুই স্ত্রীকে দিয়ে ফেলে, শেষদিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী ভালবাসাব একটুও কোথাও অভাব হয না। এ না হয়ে পারেই না। দু'জনে একসঙ্গে সারাজীবন না হলে থাকবে কী কবে? তোমাব না হয প্রথম বাতেই না হল, কিন্তু কয়েকটা দিন যেতে দাও, অজিতদা, ওকে তুমি না ভালবেসে পাববে না, এ যদি না হয, তাহলে ওর কথা ভেবে যন্ত্রণার এক শেষ হবে আমাব, সত্যি বলছি তোমাকে। তোমাদেব দু'জনাব কথা ভেবেই ভাবনাব আব কোনো কূলকিনাবা পাব না আমি। কিন্তু আমি জানি এই ভেবেই আমার শান্তি যে এখন খানিকটা বেঁকে বেঁধে গেলেও শেষপর্যন্ত সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

সতী খুব নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছে।

এ নিশ্চযতা তার আন্তবিক। অনেক্ষণ ধবে একটা সন্দেহ ও বেদনাকে নিয়ে সে থাকতে পাবে না, পৃথিবীটা তাব কাছে উচিত অনুচিতেব একটা বিরাট ক্ষেত্র, চোখ চেয়ে দেখলেই উচিতগুলোকে বোঝা যায-সেইগুলোকেই অনুসবণ কবা দরকার। এত দরকাবই, কিন্তু প্রযোজনীয় জিনিস সেবন কবতে গেলে গলা যে কাঠ হয়ে যায তাও এ জানে, অজিতেব উপব এর পরিপূর্ণ সহানুভূতিও বয়েছে, অজিতকে ভালও বাসে সতী আবেগ প্রাণ প্রেম পিপাসাব জ্বালা দিয়ে নয কিন্তু স্নেহমমতা দিয়ে বটে। অন্য সবার চাইতে একটু পৃথক কবে সুপ্রভাব ওপরেও সেই কাসুন্দির স্টিমাব ঘাট থেকেই সতীব তেমন একটা মাযা ধরে গেছে। কাজেই সুপ্রভাব জন্যও দাযিত্বের অনুরোধেই শুধু নয নিজেব মনের ভেতব থেকে আলোড়িত হয়েই সতী বসলে, 'বাস্তবিক এমন সুন্দর মেয়ে এখনই হযত তোমাব জন্য অপেক্ষা কবছে, গিয়ে একটু দেখলে পাবতে না, চল চাওযা যাক অজিতদা।'

প্রেবণা ওব খুব আন্তবিক। কিন্তু জীবনের ভেতবেব রগড় অজিতের এতে জমে না। সতী উঠতে উঠতে বসে পড়ে বললে, 'থাক, কনেকে নিয়ে এখন বিয়ে বাড়িব লোকদের ঢের প্রযোজন। সে সবের ভিতর তোমাব গিয়ে কোনা দরকার নেই।

সতী বলল, 'আমি হযত যেতে পাবতাম, বেচাবি হযত অকূলে ডুবে ফাঁপরে পড়েছে, পথ দেখাবাব কেউ নেই, গিন্নিবান্নিদের যা হুজ্জোতি, এই ত বাবা এত বড় ট্রেন স্টিমারের ঝক্কির পর সবে স্টেশন থেকে নেমে মেয়েটাকে একটু সুস্থিব থাকতে দে, একটু হাওযা আরামের ভিতর পালাতে দিয়ে বাঁচা, তা না যত সব অদ্ভুত সেই সেকেলে পাড়াগাঁযেব আচালপাচালের আর শেষ নেই, এতে ত ভালমানুষের মাথাই বিগড়ে যায বে! ওই গুমটিটার ভেতব রাত দু'টো অবদি ওবা সকলে মিলে অন্ধকূপ না করে যদি ছাড়ে তা তোমাকে কি বলেছি আমি।'

সতী বললে, 'কিন্তু আমি গিয়েই বা করব কি, ছাড়বে না ত। চাটুজ্জেদের দাক্ষায়ণী এসেছেন, বিন্দে পিসি, জয়নারায়ণবাবুর স্ত্রী, সুমিত্রা ঠাকরোন, বিন্ধ্যবাসিনী, আহ্লাদীর মা, ভদ্রকালীবাবুদের সব কটি–'সতী হাঁফ ছেড়ে বললে, 'তাও পারি, দাঁড়াও যাচ্ছি, কিছুটা সময় যাক আরো।' সতী বললে, 'যদ্দিন আমি আছি এদিকে বউদির ভার আমার উপর।'

অজিত বললে, 'কবে যাবে তুমি?'

—'বউভাতের পরের দিন।'

—'পরের দিনই সতী!' লুণ্ঠিত সর্বস্বের মত অজিতের এই গলার আওয়াজ নিয়ে সতী কখন কি করল কিছু বুঝতে পারা গেল না। যখন কথা বললে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে—'একদিন ত যেতই হবে।'

—'তা হবে বটে।'

দু'জনেই দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

সতী বললে, 'কিন্তু যাবার আগে আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব; মানুষের ঢের ভুল পছন্দ হয় জীবনে, কিন্তু এ মেয়েটিকে তুমি ঠিকই পেয়েছ, আমার একটা আশঙ্কা ছিল, তেমন একজন স্ত্রী এনে বনাতে না পেরে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় নাকি আবার। কিন্তু বউদিকে নদীর ঘাটে দেখেই আমার সমস্ত বাষ্প কেটে গেছে, একে নিয়ে তুমি সুখী না হয়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না।' সতী বললে, 'আমরা মেয়েরা মেয়ে চিনি না? তুমি পুরুষ মানুষ, ততটা তাড়াতাড়ি হয়ত ওকে ধরতে পার নি, দোষ দিচ্ছি না সে জন্যে তোমার' পুরুষরা এইরকমই, আমাদের বুঝতে পারে না সহজে। কিন্তু বউভাতের ত আর দশ বার দিন বাকি, এরই মধ্যে এমন উপকরণ থাকবে তোমাদের সংসার সাজিয়ে দিয়ে যেতে আমার ছেলেখেলার চেয়ে বেশি চেষ্টার দরকার হবে না।'

অজিত বললে,' ছেলেখেলা, এমন ছেলেখেলার জাদুগুলিই জান, তুমি চলে গেলেই ভোজাবাজি ফুরিয়ে যাবে, তা আমি জানি। তারপর খেউড়টাকে হাতের কাছে পেয়েও পাওয়া যাবে না আর, শুধু সাধনা দিয়েই যদি পারতাম তোমাকে বলতাম না কিছু আর, কিন্তু আমার জীবনের যে ব্যবস্থাটা তুমি করে দিয়ে চলে যেতে চাচ্ছ সেটা টেকাতে হলে তোমারই জাদুর দরকার, দশ বার দিনের জন্য নয় শুধু, সমস্ত জীবন ধরে।

সতী এক আধ মিনিট কোনো কথা বললে না। অজিতের দিকে তাকিয়ে একটু বকুনি দিয়ে তারপর বললে, 'তুমি বড্ড অসহিষ্ণু মানুষ, হবে না বলে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে ভালবাস, তোমাকে আমি কি বলব? শুধু ধৈর্য ধরতে বলি, যা আছে রয়েছে থাকবে সেই জিনিসটার মাধুর্য তুমি কেন বুঝে দেখতে যাও না? কিন্তু সকলকেই তাই বুঝতে হয়, জোর করে নয়, নিজের থেকেই, তা আমি জানি। আমাদের জীবনের এইটেই হচ্ছে যাদু। আমি যে ব্যবস্থার কথা বলেছিলাম সেটা আমার নিজের মনের অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়, তুমি আমাকে মস্তবড় এক মন্ত্রীর মত মনে কর, তার আমার পরামর্শ ছাড়া তোমার এক মুহূর্তও চলবে না বুঝি, এক পাও তুমি এগতে পারবে না হয়ত।' সতী বললে, 'কিন্তু কেউ কারুর জন্যে বসে থাকে না,' একটু বিব্রত হয়ে পড়ে উপহাসের সুরে বললে, 'তোমার কাছে এলে মনে হয় এত যে খুঁটিনাটির ফরমাস তুমি আমাকে দিনরাত করছ, আমি না থাকলে কে এসব করত? কিন্তু আমি কদিনই-বা তোমার কাছে থাকি? দু-চার বছরের ভিতর ছ-সাত দিনের বেশি নয়, বাকি দিনগুলো তবুও ত তোমার বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। কিন্তু এসব কথা, নানারকম কথা, আগে কোনোদিন ভাবতে যেতাম না আমি। বরযাত্রী পার্টি নিয়ে তোমরা সকলে মিলে বেশ সার সার করে চলে গেলে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিছানায় আমাকে একা ফেলে রেখেই সমস্ত বাড়িটা তখন এমন ঠাণ্ডা মেরে থাকত, যে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে না ভেবে পারা যেত না। সেই সময়েই এরকম দু-একটা কথা ভেবেছি।'

অজিত বললে, 'ভেবে হয়ত অবসাদ বোধ হয়েছে মানুষের জীবনের প্রতি?'

সতী বললে, 'মাঝে মাঝে একটু অভাব বোধ হত।'

—'কীসের?'

—'বুঝতে পারি না।'

—'পার্টির সঙ্গে গিয়ে যে আমোদটা উপভোগ করতে পারলে না তারই কষ্ট হয়ত, সতী?'

—'তাও, কিন্তু আরো কিছু।'

—'এখানে তুমি একেবারে একরকম একা পড়েছিলে?'

—'হ্যাঁ, তা খুব বোধ হত, বাস্তবিক লোকজনের মধ্যে না থাকলে আমার ভাল লাগে না, মানুষদের

সঙ্গে মিলেমিশে আমোদ করে কষ্ট বোধ করবার কোনো কারণও থাকে না আমার, সময়ও থাকে না।' সতী বললে, 'থাকত না ত অন্তত, কিন্তু এবার কি যেন কি সব গুলিয়ে গেল, একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল।' সতী থামলে।

কি মনে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করবারও কোনো প্রয়োজন নেই, আজ এর বড় দুর্বল মুহূর্ত, কদিন থেকে হয়ত এরকম চলেছে; চাপাচাপি একে নিয়ে জীবনে অনকে করেছে অজিত, কিন্তু না ছুঁতেই আজ যতখানি সহৃদয় হয়ে পড়েছে খুব গভীর আঘাত দিয়েও এ পথে তাকে বড় সহজে কোনোদিন আনা যায় নি।

সতী অপেক্ষা করছিল।

অজিত কিছু বললে না। কি বলবে সে? যা চেয়েছে তা ত পাওয়াই গেছে, এতদিন পরে এত পথ চলে তাবপর এইখানে; এখন এ নিস্তব্ধ ভাবে অনুভব করা যাবে মানুষ আর কী কবতে পারে? এ জিনিস ত কয়েক মুহূর্তের বেশি থাকবার নয়, কিংবা কয়েকটা দিনের বেশি। কিন্তু এই দশ বার দিন ধরে এর সমস্ত হাসি-তামাসা স্বাভাবকিতাব ছেলেমানুষিকেই এ নিজের জীবনের সবটুকু বলে তেমন করে আর ভাবতে পারবে না। কখন কি যেন কি-কি তা? হয়ত কিছুই না। সুচের ভেতর আটকে ধরে, তারপর সুচের কথা আজ না ভেবেই ও তৃপ্তি পাচ্ছিল। সে কেমন অন্যমনস্কতা যাতে হঠাৎ এবকম সৃষ্টিশূন্য হয়ে পড়তে হয় এই ভেবে মাঝে মাঝে ওর বুকে বাজবে,-এই দশ বারটা দিন ধরে এইখানে এবং তারপরেও চিন্‌চিন্ করে-ছেলেমানুষির সমস্ত বক্তকে বদলে দিতে থাকবে। এখন থেকে নতুন সূচনার দিকে ওকে চলতে হবে। নতুন সম্ভাবনার দিকে। জীবনে সতীর চিন্তার জন্ম হল।

এই একটা নতুন আস্বাদ অজিতকে আনন্দ দিচ্ছে। সতীর এই সমৃদ্ধ জীবনের ওপর কোনো অধিকার অজিতের আর থাকবে না যদিও, থাকবে না বটে কিন্তু তবুও যে জীবনটা চিন্তায় ও কামনায় তৈরি হতে চলেছে, ঢালাই পেটাইয়ের প্রথম ব্যথাযই টনটন করে উঠছে অজিতেব নিজের জীবনের আকর্ণ চিন্তাকামনা ব্যথার মমতাময়ী ছোটবোন যেন সে, একে নিয়ে এত আনন্দ, এত বিমুগ্ধতা! মুখচোখেব ভেতর স্পৃহা জেগে উঠেছে সতীর, এ জিনিস যে অজিত একেবারেই না চেনে তা নয়, কিন্তু আগেকার দিনে এসব দু-এক মুহূর্তেব জন্য হঠাৎ কখনো এসে পড়েছে মাত্র। এসেই মিলিযে গেছে, কিন্তু এখন মিলোবার কোনো কথা নেই, তিল তিল কবে জমছে যেন,-একদিন বহুসন্তানবতী হবার পর সতীব জীবনে এ জিনিসেব অবসাদ আসবে, কিন্তু আজ এব প্রথম সময যে।

অজিতকে ভালবাসে বটে-রুগ্ন বিছানায় শুযে অভাব বোধ কবে; কামনাও কবে অজিতকে, অতৃপ্তির খেদ অনুভব করে, সে অসাড় ধাঁধাব কুশাযার ভিতব প্রথম দুপুবেব মৃদু বোদের তাপ জ্বলে উঠছে। কুজ্ঝটিকাব আচ্ছন্নতা কোথাও নেই আব, জীবনেব ভোবেব দিকটা এব অযথা অনেক সময হিম কুয়াশায আবৃত হযেছিল বটে-ভোবেব দিকেব জীবনেব ছেলেমানুষি এব আঠাব বছবেও কাটে নি, কিন্তু এই যে কেটে যাচ্ছে, দারুণ দুপুবেব বোয এখনই যেন এব ভিতব, যে আবেগময অনুভূতিপ্রবণ প্রেমেব স্বাভাবিকতা এতদিন ধবে চেযে চেযে মানুষেব জীবনেব প্রতিই সন্দিগ্ধ হযে পড়েছিল অজিত সবই ত এইখানে, তাকে ধবে প্রকাশিত হযেছে, তাকে চাচ্ছে, তাকে না পেলে ব্যথা পাবে।

কিন্তু এ সমস্তই ত ছিল সতীব। আজ একটা দুর্বৃত্ত উপলক্ষেব অপঘাতে সত্যটাকে জানিযে দিযে গেল শুধু।

অজিত পবম পবিতৃপ্তিব আনন্দে সতীকে যেন চাইছে না আব, একটা জিনিসকে যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণই তার দাম থাকে, পাওয়া গেলে তার আর মূল্য কোথায়!

সতীর এই যন্ত্রণায হৃদযের অনেকখানি জ্বালা উপশম হযে আছে অজিতের। সতীর প্রতি কোনো সহানুভূতির কথা আজ আব নেই, অজিতেব জীবনে ধবতে গেলে এইরকম প্রথমই সতীকে এমন বেদনাব পাকে জড়িযে পড়তে দেখেছে সে। আজ মেযেটা, সবসময়ই একটা স্বাভাবিকতাব উৎসাহে অনিন্দ্য হযে এসে অজিতেব সমস্ত ব্যথাকে উপহাস্যাস্পদ কবে তুলত-তাব প্রেমকে ফুককুরির জিনিস, কামনাকে বুঝতে দিযে গেছে, নিজে সতী যেন অনুরাধা নক্ষত্রেব থেকে নেমে এসেছে বলে ধ্রুবতারার দিকে চলে গিযেছে। বুঝতে দিযে গেছে এই পৃথিবীর কাদামাটির কদর্যতা দিযে অজিতের মনটাও যেন তৈরি, সতীর নিজের মানুষ শরীবটার ভিতব অসুবিধাজনক স্থানও যেন কোথাও নেই, বা সে সবেব দুর্বলতা। আগাগোড়া সমস্তই তার অনুবাধা বোনদেব নিশ্চযতা, নীচকে ঘৃণ্য ও ভ্রূক্ষেপহীনতা দিযে তৈরি যেন, নিজেব সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অজিতকে এতদিন বসে এইসব বুঝতে দিযেছে সতী, মানুষেব জীবন সম্বন্ধে অজিতের মনে ঢের ধোঁকা লাগিয়ে গিযেছে। কিন্তু মানুষেব জীবন বাস্তবিকই আজ চোখের সামনে যা দেখছে অজিত এই, এই-ই মানুষেব জীবন।

অবাস্তবের থেকে জীবনের সত্যে এসে এই মেয়েটি দাঁড়িয়েছে আজ। একে সহানুভূতি করবার কোনো কথা আজ আর নেই। একদিন এ মেয়েটি দুঃখব্যথা কামানা প্রেমের অসম্ভব হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে এর এই মানুষের কোঠায এসে বসা—'প্রেমসন্ততা নারীর কোটায়-যতই বেদনা দিক না একে তা-অজিতকে স্নিগ্ধ করে রাখছে। এখন থেকে মেয়েটির জীবন শুরু হল। যার ঘরে এ বধু হয়ে যাবে তার ঢের সৌভাগ্য।

অজিত বললে, 'এই বিয়ে করবার আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না।'

সতী বললে, 'কেন করলে?'

—'বুঝি নি তখন।'

—'আমি কী অপরাধ করেছিলাম? তোমাব চেয়ে ঢেব ছোট আমি, বুঝতে যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে কোনোদিন, তুমি ত বুঝে নিলে পাবতে,—যা, কি বলছি আমি!' সতী লজ্জা পেয়ে জিভ কাটলে। ঘাড় হেট করে রইল।

কিন্তু তবুও উঠছে না।

অজিত বললে, 'আমি বিয়ে ঠিক করে তোমাকে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখনো যদি বুঝতে পারতাম!'

সতী বললে, 'কেন বুঝলে না?'

—'সে চিঠিতে বোঝবার মত কি কিছু ছিল? এখনো চিঠিখানা আমাব কাছে রয়েছে সতী, তুমি এখানে আসা অবদি আমি সেটাকে ঘুরিযে ফিরিয়ে টেনেমেনে অজস্রবাব পড়ে একটা অর্থ বের করতে চেয়েছি শুধু, কিন্তু সে অর্থ কিছুতেই বের হয নি, কি কবে হবে? তা যে তার ভিতর একেবারেই ছিল না, কাউকে কিছু অনুমাত্র বুঝতে দেবার প্রয়াসও তাতে কি তুমি ভুলেও করেছিলে?'

সতী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললে, 'তা পারি নি, কিন্তু করব কী করে বল? তোমার বিয়ে আমার সঙ্গে হতে সমাজে যখন ঠেকে, অন্য যে কোনো ভাল জাযগায যাতে তা হয় সব সময়ই আমি সেই কামনা করেছি, তোমাকে বলি নি বটে কিন্তু নিজে মেযে খুঁজেছি তোমার জন্যে আমি; এই সমস্ত জিনিসেই আমার একদনি খুব উৎসাহ ছিল। তা একটুও জোরজবরদস্তির জিনিস নয। তোমাব জন্য খুব ভাল বউ পেলে আমি খুব স্বাভাবিক ভাবেই খুশি হতাম, কোনো ঈর্ষা বা ব্যথার গন্ধও আমাব মনে কোনোদিন জাগে নি। এই জন্য তুমি অনেকবাব আমাকে ঠাট্টা করেছ-ব্যথা পেযেছ-আমাকে অস্বাভাবিক বলে গাল দিয়েছ, আমার ভালবাসায সন্দেহ কবেছ। কিন্তু তোমাকে ছুঁযে বলছি আমি, ভালবেসেছি আমি তোমাকেই শুধু এতদিন, কিন্তু তবুও সে ভালবাসা বেসেই তৃপ্ত ছিল, তুমি আমাকে ফিবে ভালবাস কিনা, কিংবা অন্য কাউকে ভালবাস কিনা, কিংবা আমার জীবন থেকে হাবিয়ে যাচ্ছ কিনা, বা হাবিযে গেলে কী বকম হবে, এসব কথা আমাব মনে কোনোদিনও ওঠে নি।'

সতী বললে, 'আগে না হয়ে ছেলে মানুষ ছিলাম, কিন্তু যখন বড় হয়ে উঠলাম তখন এসব বোধ আমাব হল না কেন?'

সতী অজিতের কাছে ঘেঁষে এসেছিল, একটু সবে গিযে বললে, 'তোমাব সেই চিঠিটা যখন পাই তখনো আমার এ উপলব্ধি হযনি, কিছুক্ষণ মনটা খচ্‌ছক্‌, করছিল বটে, কিন্তু তা কযেক মুহূর্তেব জন্য শুধু, শিগগিবই সে ভাবটা কেটে গেল। সে জন্য নিজেব কোনো চেষ্টাও করতে হয নি, নিজের থেকেই মিলিয়ে গুলিযে ঠিক যেমন আমি আগে ছিলাম তেমনই নিজেকে মনে হল। কোথাও যেন কোনো নতুন কিছু ঘটে নি।' সতী বললে, 'আমরা চার ভাইবোনে মিলে তাস খেলছিলাম, তোমাব চিঠিটা পড়ে শেষ কববার দু'ঘন্টা পরে এমন হল যে উপরো-উপরি ওরা দু'টো রাবার করে ফেলল বলেই ববং কষ্ট হল বেশি।' সতী একটা ঢোক গিয়ে বললে, 'মনেব এই অবোধ অবস্থায তোমাকে চিঠিখানা লিখেছিলাম। কি থাকবে তাব ভিতর অনবরত অভাব ত্রুটি ছাড়া? এখন যা বোধ করছি এব একটু যদি বুঝবার মত একটা দৃষ্টি থাকত জীবনে তাহলে সমস্ত সংযম সত্ত্বেও তোমাকে আমি যা লিখতাম তাবপব তুমি কি আব'-সতী হঠাৎ দাঁতকপাটি দিয়ে থেমে গেল। আঁচলটা ঠোটের ওপর চেপে ধরে মাথা হেট করে রযেছে সে। কিন্তু তবুও চলে যাচ্ছে না, কাঠ হয়ে বসে রয়েছে। লজ্জা পেযেছে বটে, কিন্তু তবুও লজ্জাটা ওর কঠিন গাঢ় অনুভূতির কাছে আজ একেবারেই সায পাচ্ছে না।

অজিত বললে, 'আমি তোমার আর একখানা চিঠিব জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম, ভেবেছিলাম ভেবে হযত অন্য কিছু লিখবে। অন্তত আমাকে অপেক্ষা করতে বলবে, কিন্তু সে চিঠিও ত আমি পেলাম না।'

সতী কিছু বললে না।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

অজিত বললে, 'অন্তত আমি মনে করেছিলাম তুমি এখানে আসবে না। যখন শুনলাম তুমি এখানে আসছ তখন মনে হল, সব মানুষরে মনের বৃত্তি একরকম নয়, আমার মনের অভিমানটা হয়ত অতি বেশি তীক্ষ্ণ। কিন্তু তবুও ভেবেছিলাম তোমাকে অন্তত একটু বিব্রত দেখব, কিন্তু তাও দেখলাম না।'

সতী বললে, 'কী করে দেখবে, আমি সেবকম বোধ করি নি।'

অজিত বললে, 'এখানে এসে যদি তুমি আমাকে একদিনও বলতে।'

—'কি করে বলব? বলবার প্রয়োজন অনুভব করলেই ত মানুষ বলে, আমি তা করি নি।'

—'আমিও তা বুঝেছিলাম। খুব ভাল করেই, অজিত বললে, 'সেই জন্যই নিজের মনের ভিতর সব সময়ই একটা দুর্বৃত্ত সন্দেহ থাকলেও, তোমার সঙ্গে এ জিনিসটা নিয়ে খোলাখুলি ঢের কথা বলবার ইচ্ছা থাকলেও আমার মনে হচ্ছিল যে তুমি যখন সত্যি এতটুকুও তাগিদ বোধ করছ না কিংবা তোমার সংযম যখন এমনই মিষ্টি যে ভালবাসা কিছু থাকলেও বুঝতে দেয় না, তখন আমার পক্ষেও চুপ কবে থাকা উচিত।'

অজিত বললে, 'উচিত বটে, কিন্তু পারছিলাম না ত, তোমাকে এই কদিনের মধ্যে আমি এত উৎপীড়িত করেছি সতী, একটু জিনিস শুধু জানবার জন্যে।'

—'জানলে তুমি কী করতে?'

—'জানালে না ত তুমি। সতী বললে, 'তোমাব যেদিন চলে যাবে সে রাতে তোমার সঙ্গে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম, তোমাকে খুঁজেছিলামও, কিন্তু তোমাকে পেলাম না।' সতী বললে, 'কিন্তু পেতামও যদি তাহলে তখন আব কি হত?'

অজিত বললে, 'তাও হত।'

অজিত যখন বলেছে তখন তাতেই, সতী তা জানে, একটা কঠিন বেদনা চেপে সতী বসে রইল।

অজিত বললে,'কিন্তু কষ্ট পেও না সতী, এ ভাবটা তোমাব শিগগিরই কেটে যাবে।'

সতী ঘাড় নাড়ছে। অস্ফুট স্বরে কি যেন বলছে। শোনা যাচ্ছে না। অজিতকে বোঝাবাব জন্য তাই আবার ঘাড় নাড়ছে। একটা অদম্য চেষ্টা কবে সতী বললে, 'তা হবে না। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে আমি খুশি হব না।'

অজিত মনে মনে হাসছে, এও ছেলেমানুষি মাত্র, এক ছেলেমানুষির থেকে আব এক ছেলেমানুষি। অবিশ্যি নিবিড় প্রেমপ্রবণ আগেব মিথ্যা নয়, প্রেমও মিথ্যা নয়, কিন্তু তা উপযুক্ত সময়ে এসে উপযুক্ত সময়ে গুল খায়, মাঝেব সময়টাকে শীতের বেলাব মত অসম্ভব রকমেব ছোট কবে বাখে প্রায়ই, কখনো অন্যায্য বকমের বড় কবে না। মাত্র প্রেমকে সম্বল করে আগাগোড়া জীবন চালাবার ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোথাও নেই—মানুষেব সে শক্তিও নেই, রুচিও নেই, সে সবের প্রয়োজনও নেই। সেই-ই ভাল। স্বামী-স্ত্রীর জীবনেব সুখেও একটা কঠিন চিন্তাব ওপরে নির্ভব করে মাত্র, প্রেম, তা নিজেদেবই হোক বা বাইরেব থেকে আসুক, ব্যাঘাত মাত্র, শুধু ব্যাঘাত। অজিত যদি একটু বেশিদিনই সতীকে ভালবাসে, এ মেয়েটি যখন কারুর দম্পতি হয়ে জীবন সম্বন্ধে সম্যক চিন্তা করতে আরম্ভ করবে, অজিতকে তখন সব দিক দিয়েই সতী একটা ব্যাঘাত মনে কববে শুধু, একটা বিড়ম্বনাই মাত্র। হয়ত হবেও তাই।

আজ এ বলছে, 'তোমাকে ছাড়া খুশি হব না।' কালই কিংবা একটা নিকট সময়েও জীবনেব শীতের মুখ দিয়ে বলাবে হয়ত 'তোমাকে না ছাড়া খুশি হব না।' আমাদেব জীবনের শীত এইরকম। এই ভালই। এ প্রয়োজনীয়।

কিন্তু আজ এব সত্য ভালবাসাটাব জন্য অজিতেব কাছ থেকে যেন কোনো উত্তব নেই আব? কি উত্তর দেবে সে?

যেদিন বরযাত্রা সুপ্রভাবে আনতে চলেছিল, সেদিনও যদি জানাত, কিন্তু তাহলেও একে ত বিয়ে করতে পারা যেত না। কিন্তু তুবও প্রেমকে ধাঁধা বুঝেও খেয়ালি জেনেও তদ্দূর জেনেও সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন দূরের কথা এখন থেকেই অপ্রয়োজনীয় বুঝেও, তার নিজের মত জীবনে বিবাহকে অত্যন্ত শক্তিশালী, শস্যশালী, প্রবোধ উপশমও নিশ্চযতার জিনিস জেনেও, একদিন হয়ত বিবাহিত সতীর টিটকারির প্রতীক্ষা কবেও বিয়ে করত না অজিত, সতীও হয়ত বলত সে বিয়ে করবে না। তারপব তাদের দু'জনের ভবিষ্যৎ জীবন চলতে দূরে দূবে বিচ্ছিন্ন হয়ে, হয়ত পরস্পরেব জন্য ভালবাসা হারিয়ে, কিন্তু তবুও দাম্পত্যহীন নিঃসঙ্গতার ভিতর দিয়ে। সে নিঃসঙ্গতাব ভিতব একটা নিস্তাব থাকত তবুও,

কিংবা সতী তাব প্রেমই শুধু নয়, সঙ্কল্পটাকেও ভেঙে যদি দম্পতি হয়ে বসে গেছে কোথাও তাহলেও অজিতেব আপসোস কববাব কিছু থাকত না। জীবনেব সেবকম সববকম পাঠই অনেক আগেব থেকে কবে বেখে দু'দিনেব সত্য ভালবাসাটাব জন্য এ সমস্তই সে স্বীকাব কবতে পাবত।

ভবিষ্যৎ জীবনেব শীতেব সময় শবতেব জ্যোৎস্নাব কোনো স্মৃতি নিয়ে নয়, কিন্তু এমনিই, এমনিই সে থাকতে পাবত। সতীব মত এই আট দশ বছব ঘাঁটা এভাবেস্টেব ববফেব মত মেয়েটা ববফেব পেছনেব সূর্যেব মত একটিবাব জন্যও যদি এমন বক্তাক্ত হয়ে উঠতে পাবত! কিন্তু বক্তাক্ত হচ্ছে সে আজ, হায়, সমস্ত কলিকাঠিব কাজ শেষ হয়ে যাবাব পবে।

সতী বললে, 'তোমবা যেদিন চলে যাচ্ছ সেদিন এক সময়ে যখন তোমাব সঙ্গে দেখা কবাটা জীবনেব সবচেয়ে দবকাবী জিনিস বলে মনে হল, হয়ত আমাদেব জীবনই বদলে যেত তাহলে, তোমাকে আমি কিছুতেই খুঁজে পেলাম না।' সতী বলছে, 'কেন এমন হল?'

অজিত একটু হেসে বললে, 'হয়ত আমাব ভালব জন্যই তা হয়েছে।

—'তোমাব ভালব জন্য?'

—'তুমি আমাব বিয়ে স্থগিত বাখতে পাবতে সতী।'

—'তাই ত আমি চাচ্ছিলাম, তুমি নিজেই ত ববাববই তা চাচ্ছিলে, একটা অসাড় অপদার্থ চিঠিব ভেতব থেকে সেই জিনিস বেব কবে নিতে পাববাব জন্য তুমি কি না কবেছিলে' সতী বললে, আমাদেব দু'জনেব আবশ্যকতা আমাব ঢেব আগে তুমি বুঝেছিলে।' সতী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললে, আমাবই অসাবধানতায় দু'জনেব জীবনেব পবিণাম শেষ পর্যন্ত এই বকম হয়ে গেল।'

সতী অত্যন্ত অস্থিব হয়ে পড়ছে।

অজিত বললে,'ঠিকই হয়েছে সতী।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে অজিতেব দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি, যেন পৃথিবীব শেষ সময় উপস্থিত। যেন মানুষেব সত্য সাধনা ধর্ম, নিজেব আদবেব আগ্রহেব জিনিসগুলো সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, যাবেই, তাই-ই হতে হবে তাদেব, অথচ এসবেব দিকে কারুব কোনো ভ্রুক্ষেপও থাকবে না।

অজিত বললে, 'তুমি ত আমাকে বিয়ে কবতে পাবতে না সতী।'

—'আমি বিয়ে কবতামও না।'

—'আজীবন একা হয়ে থাকতে?

—'তুমি কি থাকতে না?'

অজিত অনেক্ষণ স্থিব থেকে বললে, 'তোমাকে সাত আট বছব ধবে যা চিনে এসেছি তাতে এইটুকু ভেবেছিলাম যে আমাব বিয়েতে তুমি খানিকটা কষ্ট পাবে বটে, কিন্তু শেষে দেখলাম তাও পাচ্ছ না। একটু থেমে অজিত বললে, কিন্তু আমাব বিয়ে ভেঙে দেবাব মত প্রচণ্ডতা তোমাব ভিতব কোনোদিনই আশা কবি নি, কিন্তু আজ দেখেছি তুমি তাও পাবতে। প্রায় জীবনে ভালবাসা সাথক হয় না। কিন্তু আমাব জীবনে তা হয়েছে। প্রেমেব কাছ থেকে যতখানি পাওয়া যায় সবই আমি পাচ্ছি আজ-হয়ত আজকেব দিনেব জন্যই শুধু, কিংবা একটা দিনেব জন্য, কিংবা আবো কটা বেশি দিনেব জন্য। কিন্তু তা যতই এক আধ মুহূর্তেব জন্য হোক না কেন, যা আমি চাচ্ছিলাম সব পেয়েছি সতী, একেবাবে কানায় কানায় সব।

ঈর্ষা শ্লেষেব সুবে হেসে অজিত বললে, 'হয়ত উপচে পডছে, এ জিনিস নিয়ে সেদিন যদি তুমি আমাব কাছে আসতে, তাহলে আব এক বকম জীবন চালাতে হত বটে, সে জীবনেব মধ্যে ক্লেশ, অভাব, উপদ্রব, উপহাস-তুমিও বিয়ে কবে একদিন হয়ত আমাকে উপহাস কবতে আসতে-উপহাস। নিবর্থকতা সবই থাকত, কিন্তু এই ভেবে স্থিবতা থাকত যে ববফেব ভিতবও আগুন জ্বলে ওঠে, পাথবও বক্তাক্ত হয়ে পড়ে যে প্রেমে সেই প্রেম সতীব মত মেয়ে আমাকে দিয়েছিল।

অজিত বললে, 'দেখ সতী, জীবনে ভালবাসা হয়ত তুমি আবো কোনো কোনো মানুষকে দিতে পাববে পবে-কিন্তু তোমাব এই বয়স, এই কপ, এই শবীব, এই বোধ, এই প্রথম আস্বাদেব অকৃত্রিম অবিকৃতি-অসহ্য ব্যথা অমৃত জীবনে এসব আব কোনোদিন পাবে না তুমি। এবং সব সময়ই তুমি একটা অপ্রয়োজনীয়তাব অবসাদ থাকবে জীবনেব ভিতবে। মানুষেব জীবনেব শেষ পর্যন্ত কি একটা নিবর্থকতা বক্তেব সঙ্গে ক্রমে ক্রমে গভীব ভাবে মিশে যেতে থাকবে তোমাব, কোনো জিনিসকেই তুমি শত আগ্রহেব সঙ্গে ধবে থাকতে চাইবে না। জীবনে মবণে অপবিহার্য বলে মনে কববে না। আজ এসবই তুমি কবছ।

আমাদের জীবনের চিন্তার শীত পৃথিবীকে জীবনকে যা তার সমস্ত কথা কাজের পর অতঃপর নিরর্থক প্রমাণ করে দিযে চলে যায়, তোমার ভিতর তার অনুকণারও আজ নেই। তোমার প্রেম তাই সবচেযে বিস্তৃত ও গভীর আজ–এবং আমাকে তা দিচ্ছ। এই সমস্ত উপলব্ধিই আমাকে স্থির করে রাখত।

সতী ধীবে ধীরে ঘাড় তুলে চোখেব জল মুছতে মুছতে বললে, 'তুমি বিয়ে করতে না তাহলে আর?'

—'না।'

চোখেব জল মুছতে মুছতে বললে, 'আমিও করতাম না।'

হিকি তুলতে তুলতে সতী বললে, 'করবও না আমি কোনোদিন।'

বরযাত্রীর দল কন্যাযাত্রী বন্ধুবা হইচই করে ঘরের বিতর ঢুকে পড়েছে। বাঃ অজিত। বাঃ! বাঃ!

তাদের সমস্ত বক্তব্যই বলে যাচ্ছে তাবা, পবিহাসেব, রসিকতার, তিক্ততার, কঠোরতার, বেকুবিব, বেযাদবির।

মেয়েরা আরো অসংখ্য, সুপ্রভাকেও নিযে এসেছে তাবা।

সতী আস্তে আস্তে আঁচলটা জড়িযে নিজেকে অত্যন্ত সন্তর্পণের সঙ্গে বাঁচিয়ে নিযে ঘরের এক কোনায দু-এক মিনিট কাঠ হযে দাঁড়িযে বইল। সতী জানে, কিন্তু সতীর চেযেও বেশি করে যে আজকের দিনে সবচেযে বেশি অপ্রযোজনীয সে। সতী চলে যাচ্ছে।

বছবখানেক পবে সতীব সঙ্গে আবাব দেখা। বিবাহ বা ভালবাসাব কথা সে কিছু বললে না। অজিতও কিছু বললে না। অজিতও কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

এখনো এই মেযেটিকেই সে ভালবাসে। কিন্তু আগেব মত অতটা নয। একদিন এর ওপব দিযে কত নির্যাতন গিযেছে ভাবছে অজিত। আজও নির্যাতন যাচ্ছে। সতীব সিবিল সার্জেন স্বামী চেষ্টার আব অবধি রাখে নি কিছু, ওর পেটের খোকাটি হযে তবু তিনদিন মাত্র বেঁচেছিল শুধু। মাত্র তিন দিন। কিন্তু ওর এ বেদনার নিকট, পৃথিবীব আব কোনো ব্যথা বা আগ্রহের কোনো অর্থ নেই আজ আব। কিন্তু খোকাব জন্য এ বেদনা ওব চিরকাল থাকবে না, কিন্তু জীবনে ওর নতুন বেদনার সময এসেছে। নতুন সাধেব সময, নতুন উপলব্ধি আগ্রহের সময।

অজিত নিজের জীবনের এই সব জিনিসেব দিকেই চলেছে, সুপ্রভাব সাহায্যে। বউভাতের রাত্তিরটা মনে পড়ে, তাবপব সতীন চলে যাওযার বাত, কিন্তু কেউ কারুব জন্য কোনো প্রযোজনেও চোখেব জল কোনোদিনও আর মুছবে না, হায, অজিতও। এমনই কঠিন জিনিসটা মৃদুভাবে সম্পন্ন কবে ফেলে আমাদের জীবন। চাযেব দোকানে একটা চুরুট জ্বালিযে অজিত ভাবছে।

নকলের খেলায়

মৃণাল বললে, 'বাপের বাড়ি নেই ত কি হয়েছে, সবারই কি তা থাকে?'

দেববত মাথা হেঁট করে ভাবছিল।

মৃণাল বললে, 'বাপের বাড়ি এমন থাকলেও সবাই কি তার অপেক্ষা করে থাকে নাকি? শুনি ক'জন মেয়ে কবার করে ধেই ধেই করে বাপের বাড়িতে যেতে পারে।'

কবারের কথা নয়, মৃণাল একবারও যেতে পারছিল না। দেবব্রত যখন বছর খানেক আগে মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল, মৃণালের রূপ দিয়েই শুধু জীবনকে মুগ্ধ করে নিতে পারবে ভেবেছিল সে, যেন সৌন্দর্য জিনিসটা হচ্ছে তাই যা কিছুতেই তৈরি করে নিতে পারা যায়, না একটা তুচ্ছ জুঁইকেও কি বানাবার শক্তি রয়েছে মানুষের? মেয়েমানুষের রুচি উপলব্ধি চরিত্র এসবই মনের মত করে মানুষ গড়ে নিতে পারে যেন, সংসারের স্বচ্ছলতা সেও আহরণ করে নেবার জিনিস মাত্র। মেয়েমানুষের সৌন্দর্যকে জীবনে ফলাতে গেলে প্রতিভা প্রযাসে সাহায্যে কিছু হয না, অন্ধ অনিযন্ত্রিত সৃষ্টিব। কিন্তু সৃষ্টির কাছ থেকে এ দুঃসাধ্য দক্ষিণা সে পেয়েছিল। সে জিনিস অন্য কেউ অন্য কোথাও বসে সৃজন করছে—এবং খেয়াল মত বিতরণ করছে। দাম্পত্যজীবনে রূপশ্রীময়ী তেমন এক সঙ্গিনীকে পেল ত সে।

এর পর আর সমস্তই সে নিজের শক্তি ও সাধনা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারে। নিজের নিঃস্বতা, মেয়েটির দুঃস্থতা, ওর চরিত্রের অনেক অভাব, অনেক অসঙ্গতি, এই সমস্ত সত্যকেই এই এক বছর ধরে মাথা পেতে নম্র হৃদযে স্বীকার করে নিচ্ছে দেবব্রত। এগুলোকে সে শুধরে ফেলবে। অগাধ টাকা অর্জন করবার শক্তি আছে তার। শুধু নেমে পড়লেই হল। একটি নারী চরিত্রে মধুর কবে গড়ে তোলা তার ক্ষমতার বাইরে নয। মৃণালকে যত অস্পষ্ট, যত কর্কশই মনে হোক না কেন, মেয়েটিকে সে একদিন নিজের জীবনে উপযোগী কোমল ও নিবিড় করে তৈরি কবে নিতে পারবে ভেবেছিল দেবব্রত। যে জিনিস দেযা না দেয়া দেবতার রুচির ওপর নির্ভব করেছে, বিধাতার সে রুচিকে এমন প্রসন্ন দেখল দেবব্রত, কিন্তু মানুষের কর্মক্ষমতা দিয়ে যা গড়ে তুলতে হয, অহবহ মানুষ যা করেছে, সেখানে এই একটি বছব নিজেকে এমন ব্যর্থ দেখল দেবব্রত।

দেবতার প্রসাদে মৃণাল তাব রূপ নিয়ে তেমন অক্ষুণ্ন রযেছে বটে, কিন্তু দেবব্রতের অকর্মণ্যতায জীবনের উপভোগ কোনোদিনই কিছু এগচ্ছে না। দেবব্রত ঘাড় হেঁট কবে ভাবছিল। "এগবে আবাব। কোনোদিন আরম্ভই হল না, হবেও কি কোনোদিন?"

কোনো উপযুক্ত লোকের হাতে মৃণালকে ছেড়ে দিতে পাবলে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে যায় সে।

জীবন আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই তার, না রূপের, না কিছুর। এই অসাধের শীতটাকে নির্বিবাদে বহন করে নেবার মত একটা শান্তি চায় সে শুধু, মৃণালকে পৃথিবীর যে কোনো আশ্রয়ের জায়গায পাঠিয়ে দিতে চায় দেবব্রত, এর কল্যাণ হোক, সম্পদ হোক, ওর রুচি অনুসাবে সে সব হলেই দেবব্রতের পরিতৃপ্তি। নিজের কোনো রুচি ধর্ম মতামত কিছুই নেই তার আজ আর।

কিন্তু দেবব্রতের সান্নিধ্য ছেড়ে একটি দিনের জন্যও এ মেয়েটিকে দাঁড় করাবার একটা জাযগা পৃথিবীতে নেই যে।

মৃণালের বাপের বাড়ির কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। তা নেই। প্রায দশ বার বছর হল পৃথিবীর থেকে তা লুপ্ত হযেছে। মৃণাল ও তার দু-একটি ভাই বোন, তারপর ভবিতব্যতার হাতে বেড়ে এসেছে। এই সব দুঃখের কথা স্বামীর কাছে একসময়ে পাড়লে মৃণালকে সান্ত্বনা দিত দেবব্রত। কিন্তু আজকাল এই সব অস্বাচ্ছল্যতার কথা তুলে মৃণালের সঙ্গে মাঝে-মাঝে আমোদ করে দেবব্রত-মৃদু তামাসা করে নেয়।

কিছুক্ষণ ধরে স্ত্রীর সঙ্গে তেমনি একটি স্নিগ্ধ উপহাস চলছিল দেবব্রতর। যেন এ ঠাট্টাটা স্নিগ্ধ উপহাস চলছিল দেবব্রতর। যেন এ ঠাট্টাটা স্নিগ্ধতাটুকুর জন্যই মাত্র দাযী সে। কোথাও যদি কারু জন্য কোনো কষ্ট লুকিয়ে থাকে এ তামাসার ভেতর তাহলে বাস্তবিক কাউকে সত্যি তেমন আঘাত দেওয়া তার লক্ষ্য ছিল না?

কিন্তু মৃণাল যে খুব ব্যথা পাচ্ছিল, দেবব্রতর তাতে মন্দ লাগছিল না। মেয়েটা জীবনটাকে বুঝুক,

বেদনার ভেতর দিয়ে, আদর আবদারে নষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনকে কোনাদিন বুঝবে নাকি মৃণাল?

দেবব্রত স্ত্রীকে সাংসারিক স্বচ্ছলতা বিশেষ দিতে পারে নি। কিন্তু প্রীতিভালবাসা প্রাণ দিয়ে দিয়ে এসছে। এই একটি বছর স্ত্রীকে চোখের কাছে কাছে রেখেছে সে। দরিদ্রের সংসারকে মায়ামমতা দিয়ে গুছিয়ে যতদূর উপভোগ্য করতে পারা যায় স্ত্রীর জন্য সবই করেছে সে। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত জিনিসটাকে একটা পুতুলখেলার মত মনে হয়েছে দেবব্রতর। একটু আয় উপায়ের পথ যদি থাকত তার কিংবা আরো অনুভূতি অন্তরের টান যদি মৃণাল বুঝতে দিত তাকে তাহলেও এ পুতুলখেলাই থেকে যেত, বাস্তবিক জীবনটা অভিনয় ছাড়া কি আব?

অভিনয় বটে, অভিনয়ই। কিন্তু তবুও মৃণালের সঙ্গে নকলের খেলায় একটা দিক দিয়ে অবসন্নের নেশা ধরে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রকৃত জীবনের একটা পরম দিক দিয়ে। নারীরই জন্য যে কামনা পরিতাপ ও সন্তাপ এতদিন ভুগে এসেছে দেবব্রত সে অগ্নিদগ্ধ জায়গা হৃদয়ে কোথাও আজ আর নেই তার। নানাদিক দিয়ে অবসন্ন ও লুণ্ঠিত হয়েও জীবনটা কঠিনতার পথে চলছে না তবু, কোমল হয়ে পড়ছে। দেবব্রতের হৃদয়ে যে ভালবাসা কামনা এক সময় পৃথিবীর রূপসী মেয়েদের পেছনে অস্পষ্ট হয়ে ঘুরছিল আজ সে জায়গায় এসে স্পষ্ট ও নিবিড় হয়ে উঠতেই দেবব্রতর অন্তরের ভিতর কোনো কামনার তাগিদ পাচ্ছে না আর প্রেমের তাগিদও, নেই যেন, যে প্রেমে সামান্য কামান-বাসনা যথেষ্ট মাত্র সে প্রেম যদি প্রেম হয়, দেবব্রতর হৃদয়ের যে জায়গাটা সমস্ত পৃথিবীর বেদনাব্যথার ভিতর কোনো স্পষ্টতা পাচ্ছিল না, আবছায়ার মত ছড়িয়ে ছিল আজ মৃণালকে পেযে তা পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃত ব্যথিতকে খুঁজে পেয়েছে যেন।

মেযেটি নিজে ত কিছু বোঝে না। কিন্তু পৃথিবীতে সবচেযে দীনতম দয়ার ভিখিরি মৃণাল নিজে নয় কি? অস্পষ্টভাবে সমস্ত পৃথিবীব জন্যই যে দুঃখ একসময অনুভব করেছে দেবব্রত, সে পৃথিবী আজ মৃণাল একেবারে গ্রাস করে ফেলছে, বলছে তোমার সমস্ত সব আমাকে দাও।'

ঘাড় হেঁট কবে দেবব্রত ভাবছে দিচ্ছি ত, তোমাকে ছাড়া আর কাকে দেব? একে দযা বলতে চাও ত দযাই, ভালবাসা বলতে চাও ত তাইই শুধু তোমাব জন্যই। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত লালসা কামনা আকাঙক্ষাব উত্তেজনাই এই অশ্রু প্রবণতার সমুদ্রকে স্পর্শ করতে না করতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে রিক্ততা প্রাপ্ত হয-তুচ্ছ উপহাসের জিনিসের মতও কোনো মূল্য থাকে না সে সবের আর।

মুখ তুলতে তুলতে দেবব্রত ভাবছে তাই থাকে, তুচ্ছ উপহাসের জিনিসের মত কোনো মূল্যও থাকে না যেন সে সবের আর।

দেবব্রতর মনে হচ্ছে এই নিখুঁত রূপসীব জন্যই যদি এত দুঃখ হয তাহলে বিধাতা তাব ঘৃণ্য কীটের জন্য না জাতি কত দরদ বোধ কবেন। কিন্তু সবচেযে ঘৃণ্য কীটও সবুজ ঘাসের পরমাশ্রযেব ভিতর রাজার মত সম্পদ নিযে থাকতে পারে। সবচেযে নিখুঁত রূপসীও সবচেয়ে বেশি কৃপার পাত্র হয়ে উঠতে পারে। জীবন কাকে নিযে যে কি বকম ব্যবহার করে সেইটেই।

কিন্তু কথাটা তা নয। কিংবা হযত তাই। একটা নিবিড় অনুকম্পাব জোরে সমস্ত পৃথিবীটা যে বেঁচে আছে সেইটেই সত্য। কিন্তু মৃণালের ভবা রূপের প্রতিটি খুঁটিনাটিই দেবব্রতের অকর্মণ্য জীবনের ঘোলাজলে প্রতিমার সুখের কাঠখড় বের করতে লেগে গেছে যে, স্বামীর জীবনের নিরর্থকতার কৃমিতে আক্রান্ত হযে বীভৎস হযে উঠছে যে জীবন এই মেযেটিকে নিয়ে মোটেই সদ্ব্যবহার কবছে না।

দেবব্রত বললে, 'শ্বশুরবাড়ি না থাক, তোমাকে আমি কোথাও পাঠিযে দেব মৃণাল।'—'যেখানে খুশি পাঠাও আমাকে, আমাকে ছাড়তে পারলেই ত তুমি বাঁচ, আমি তোমার কে?'

দেবব্রত বললে,'রাগ কোর না লক্ষ্মীটি, দেখ না তোমার শরীর কেমন রুগ্ন হয়ে পড়ছে।

মৃণাল একটু খুশিব ভাব দেখিয়ে বললে, 'তা হোক, এখানই আমি বেশ আছি-আর কোথাও যেতে চাই নে।'

মৃণাল একটু থেমে বললে-'সংসারে ভেসে চলেছিলাম, কোনো দিন যে কিছু উপায়ও হবে ভাবতেও পারি নি, যাদের বাবা মা নেই তাদের কে আছে? বিয়ে করে যে তেমাব পাযের কাছে একটু জাযগা দিযেছে এইই ঢের। নেহাৎ লাথি মারলেও এ আশ্রয় ছেড়ে চলে যাবার শক্তি আমার কোথায? শরীরের আবার ভাল মন্দ।'

দেবব্রত বললে, 'আমার কাছে থেকে তোমার কেনো তৃপ্তি আছে মৃণাল?'

—'উলটোটাই বল, তুমিই আমাকে দেশ ছাড়া করতে পারলে বাঁচ কি না বল? সেজন্যে যদি আমার মৃত্যুও হয় তাহলেও তুমি তা কমানা কর!' মৃণাল বললে, 'আমি মরলেই ত তোমার ভাল। ভাল নয? আমাকে নিযে কোনো আমোদ প্রমোদই ত করতে পারলে না তুমি। শুধু পথ আটকে রেখেছি। চলে

গিয়ে পথটা খালি করে দিয়ে যেতে পারি।' মৃণাল নিজের মনেই বলে চলেছে, 'তা দিয়ে যাব একদিন। বেশি দেরি নেই আর। তোমাকে আর বেশিদিন এমন কষ্ট পেতে হবে না। গত অঘ্রাণে আমাকে বিয়ে করেছিলে, এই শীতেই আবার তারিখ ফেলতে পারতে। সে মেয়েটি কেমন হবে দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই ভেবেই আমার খারাপ লাগে যে এ কৌতূহল ত কিছুতেই মেটানো যায় না। আমি থাকতে থাকতে'–তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'দেখ, হাতটা কেমন সিটে হয়ে গেছে। কিন্তু মুখটা হাতের চেয়ে ঢের বেশি সাদা।

মুখ ফিরিয়ে যতবারই তাকাচ্ছে মৃণাল ততবারই ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছে। মৃণাল বললে, 'দেখ চুড়িগুলো কেমন ঢলঢলে হয়ে গেছে। বিয়ের সময় গোলগাল হাতে এগুলো পরতে কত কষ্ট হত, আর এখন নিজের থেকেই পড়ে যায়। আমার হাতে এগুলো থাকতে চায় না, কেন থাকবে? এগুলোব সময় হয়ে এসেছে না? মড়ার হাতে কি চুড়ি থাকে? মৃণাল মৃত্যুর কথা ভাবতে গিযে আবার শিউবে উঠেছে। সমস্ত নগ্ন শীর্ণ হাতখানা তার কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দেবব্রত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু তবুও আসন্ন মৃত্যুর সাধের কি যেন একটা মাধুরী বোধ করছে মৃণাল, ঘুবে ফিরে সেই মৃত্যুর কথা পেড়ে বললে, 'এই সোনার চুড়িগুলোর কী হবে বল ত মবে গেলে? চিতেয় পোড়াতে আমি দেব না। এত দামের সোনা অমন কালো নোংরা করে ফেলতে কারু সাধ যায়? ছিঃ তা হবে না! মৃণাল একটু আশ্বস্ত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিলে। মুখ ফিরিয়ে একটু কষ্ট পেয়ে বললে—'যদিও তোমাকে একদিন বলেছিলাম যে বরং চিতেয় দিও–তবুও—'মৃণাল এক ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

দেব্রতর দিকে সম্পূর্ণ মুখোমুখি ফিরে বসল। বললে, 'এগুলো বড় কষ্টের জিনিস আমার; তোমার এত দরিদ্রতার ভেতরও বিক্রি করা ত দূরের কথা এগুলো বাঁধা অব্দি ভাবতে দেই নি। এগুলো কাউকে তুমি দিও না কিন্তু তুমি।'

দেবব্রত বললে, 'কাকে দেব আবার?'

—'যাকে বিয়ে করবে। আমি কি ঠেকিয়ে রাখতে পারব, চুড়ি ত চুড়ি তুমি সবই ত দেবে তাকে। যত ভালবাসা আর আদরের কথা বলেছ আমাকে তুমি সবই ত আবাব ফিবে ফিরে বলবে তাকে, ঈস!'

এরপর চুড়ির কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাচ্ছে মৃণাল; গযনার মধ্যে ঐ সোনাব চুড়ি কাঠিই শুধু। লকেটেব মত ছোট একটা হার একগাছি সুতোব মত পবিসব নিয়ে বিযেব বাতে মৃণালেব গলায দুলছিল বটে, ওর পরিপূর্ণ দারিদ্র্যকে এবং না জানি কার কোন ক্ষুদ্র অন্তঃকরণেব সংকীর্ণ দানকে বীভৎস বকমে প্রকাশ করে চলেছিল, কিন্তু বিয়েব বাতেই সেটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। তারপব থেকে মৃণাল নিজের গাযেব স্বর্ণাভা, সোনার মত রঙ নিজের রূপ, এমন কি দেবব্রতের প্রেমমযতা আদরেব চেযেও সোনাব চুড়ি ক-গাচা বুকে জড়িয়ে বেশি তৃপ্তি পেযে এসেছে যেন।

চুড়ির কথা উঠল আবার।

মৃণাল বললে, 'পেটে যদি কোনো মেযে ধরতাম তাকেই দিযে যেতাম। সেইটেই সবচেযে ভাল হত, খুকুনের চুড়িতে তাহলে কেউ আব হাত দিতে পারত না। বাপ হয়ে তুমিও পাবতে না। খুকুনের সৎমাযেরও সাহস থাকত না তোমার চোখের সামনে। সেই-ই সব চেয়ে ভাল হত। কিন্তু তা যখন হল না তখন এগুলোকে চিতেয়ই পুড়ব, কি বল? পুড়তে পুড়তে তৃপ্তি পাব তাহলে। নইলে আর একটি মেযে এসব নিয়ে যাবে আমি কী করে সহ্য করব তা?

দেবব্রত বললে,'আমি উঠলাম।'

মৃণাল স্বামীর চাদর ধরে আটকে রেখে বললে, 'রাগ কোর না, আমি আর কতদিন আছি, আমার উপব বাগ করতে হয না।'

বাস্তবিক এ মেয়েটি যেন তার মৃত্যুব তারিখ অব্দি ফেলে দিয়েছে। তাব থেকে কোনো নড়চড় নেই যেন আর।

মৃণাল বললে, 'এই ক-গাচা চুড়ি আমার সঙ্গেই দিও। কিংবা আমাব কাছে যদি একটা প্রতিজ্ঞা করতে পার তাহলে তোমাকে দিয়ে যাব।' আস্তে আস্তে মুখ তুলে মৃণাল বললে, 'হয বিক্রি করে দেবে, না হয় লুকিযে রাখবে, ওকে দিতে পারবে না, এই কথা রাখতে পারবে?' মৃণাল ঘাড় নেড়ে বললে, 'পারবে না জানি, তোমার বড্ড দয়ামায়ার শরীব। যত ভালবেসেছ আমাকে তা অনেক। জানি না কোনো স্বামী স্ত্রীকে এত ভালবাসতে পারে কি না। আমি খুব তৃপ্তি পেযে গেছি তাতে। কিন্তু তবুও ওকে তুমি আমার দ্বিগুণ ভালবাসবে, তা না হয়ে যাবে না। কেন জান? আমাকে হারিয়ে তোমার মনে এত দুঃখ হবে যে তখন ওকে এক মুহূর্তের জন্য ছাড়তে পাববে না তুমি-ভাববে এও বুঝি গেল চলে।'

মৃণাল বললে, 'আমি যদি প্রথম না এসে দ্বিতীয়বার আসতাম! এত আদরের ওপর আরো কত আদর আবদার থাকত আমার। এখন সেসব ভাবতে পারি না।' মৃণাল একে একে হাতের চুড়িগুলো খসিয়ে খসিয়ে দেবব্রতের পায়ের নীচে রেখে দিয়ে বললে, 'তাই বলছি, ওকে এসব তুমি না দিয়ে পারবে না।' হাতটা মুঠো করা ছিল মৃণালের, হঠাৎ পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিতেই একটা ঠুটো পাখির পায়ের মত দেখাচ্ছিল মৃণালের সমস্ত হাতটাকে। আঙুলের থেকে আংটি খসাতে খসাতে বললে, 'আর এইটে, গয়নার মধ্যে এই আমার সব। কিন্তু এতগুলোও কম নয়। সবাইযের কি আছে?'

জীবনের কমনীয়তারই বা কি মানে থাকত? দাম্পত্য একটা অবোধ জোনাকির মত।

দেবব্রতই জানে কার কিরকম থাকে না থাকে, মানুষরে জীবন সম্বন্ধে মৃণালের অস্পষ্ট অভিজ্ঞতাকে ভাঙবার কোনো সাধ ছিল না দেবব্রতের। মৃণালের নানারকম অন্ধতা ও অন্ধকার দেবব্রতকে পদে পদে ক্ষমা করে জীবনের পথে চলতে দিচ্ছে তবু, না হলে তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপূর্ণ শ্লেষ নিয়ে দেবব্রতের জীবনটাকে বেড় দিয়ে দাঁড়াত যদি মৃণাল তাহলে মাকড়সার বিষের লালার ভিতর আটকে গিয়ে কোথায়ই বা থাকত।

মৃণাল বললে, 'সমস্তই তোমার কাছে রেখে গেলাম। তুমি যা খুশি কর।'

মৃণাল দেবব্রতেব কোলে মাথা রেখে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা শালিকের ছানা যেন। উড়তে জানে না, পথেব ঠিকানা জানা নেই। লাফিয়ে লাফিয়ে জীবনের খানিকটা বিজাতীয় আঁচড়কামড় খেয়ে অবশেষে নীড়ে ভিতর ফিরে এসেছে তাব। মায়ের উষ্ণ পালক রোমেব নীচে শীতের রাতটা কাটাচ্ছে শান্তিতে।

দেবব্রত নিজেব চাদরটা দিয়ে মৃণালের আপাদমস্তক জড়িযে দিযে ভাবছে। পৃথিবীতে যা প্রেম বলে চলে আমি তা অনুভব করছি না, কোনো আকাঙক্ষা কামনা চরিতার্থতা কিছুই এখানে নেই। তবুও এমনি কবে অনন্তকাল যেন বসে থাকা যায়, হৃদয়ের এই অশ্রু নিবিড়তা নিয়ে।

দেবব্রত অনুভব কবছে, প্রণীযর মত একটা প্রণযের তাগিদ মাত্র বোধ করতাম যদি অনেক আগেই ক্ষুণ্ণ হযে যেতাম পৃথিবীব প্রেমিকদের নিছক প্রেমও পুড়ে কুবে যেত সব, কিন্তু মৃণাল যায দিয়ে আমাকে আটকে বেখেছে, সে অশ্রু অনুকম্পা বিধাতারই সবচেযে বড় সৃষ্টিকে এমন কবে গেঁথে রাখতে গিয়ে দেবতা এর চেযে অন্য কিছু কোথাও ত খুঁজে পেলেন না। কোথায পাবেন? কোথায আছে?

মৃণালেব পাশে ঘুমিযে পড়েছে দেবব্রত।

আর একটা শীতেব বাত দু'জনেব কেটে গেল। কিন্তু জীবন ত দু'টো শীতেব রাত নিযে নয। হিম অন্ধকার এ দু'টিব পাশাপাশি ঘুমের অনন্তস্ব নিযে জীবন যদি হত! কিংবা অন্ধকার হিম এ দু'টির পাশাপাশি জাগবণেব অনন্তস্ব নিযে।

কিন্তু এদেব জীবন এদেব রুচি অনুসারে চলবে না, এদের প্রয়োজন অনুসারেও না, সকল জীবন সেই খেযালেব নিযমে চলে, অব্যর্থ নিযমেব খেয়ালের একটা খণ্ডাংশেব অভিনয় করে চলছে এবা।

দেবব্রত বললে, 'আমি ঠিক করে এসেছি মৃণাল।'

—'কী ঠিক কবলে?'

—'নিউ দিল্লিতে অনাদিরা যাচ্ছে, তিন-চার মাস সেখানে থাকবে। সেখানে পাঠাচ্ছি তোমাকে।'

দিল্লি! ভাবতেও পাবে না মৃণাল, কোনোদিন অনেক ভুল করেও এমনতর কল্পনা করতে যায নি সে। আবেদন তাব বড়জোর ধানবাদ বা ঘাটশীলা, (বা শালবনি-খড়্গপুর) অব্দি পৌঁছেছিল।

মৃণাল খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হযে রইল।

দেবব্রত বললে, 'নিউ দিল্লিতেই তোমরা থাকবে। সেখানে অনাদির জেঠামশাই হরীন্দ্রবাবু আছেন, মেযেবাও আছেন চার-পাঁচ জন।'

মৃণাল বললে, 'আমাদের বয়সী মেযেরা আছে ত?'

—'তোমার বযসে ত সব, তাদেব সঙ্গে ঘুরে আমোদ পাবে ঢের, হরীন্দ্রবাবুর স্ত্রী অবিশ্যি বর্ষীযসী, কিন্তু অভিভাবিকার মত ওরকম একজন থাকা দরকার নয় কি?'

মৃণাল অত্যন্ত খুশি হযে বললে, 'হ্যাঁ।'

দেবব্রত বললে, 'নিউ দিল্লিতে দেখার অনেক জিনিস আছে, পুরনো দিল্লিতে ত কথাই নেই।'

দিল্লির গল্প করলে অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে।

দেবব্রত তিন-চার বছর আগে দিল্লি একবার দেখে এসেছিল। একটা টেম্পোরারি কাজে মাস ছয়েক সেখানে ছিল সে। দিল্লি সম্বন্ধে আজও সে খুব উৎসাহী, সে খুব উৎসুক, যেন শহরটাকে সমস্ত কল্পনা দিয়ে

লুটে অপচয় করে মৃণালকে কিছু বোঝাতে পারছে না সে। কি করে বোঝাবে সে? মৃণাল অল্পতেই এই তৃপ্ত হয়ে পড়ে অতি সামান্য জিনিসও এত কম ধারণা করতে পারে। জীবন সম্বন্ধে এমন অনভিজ্ঞ সে।

দু'জনে দিল্লির গল্প থামিয়ে রাখছে অবশেষে।

মৃণাল বললে, 'টাকারও জোগাড় করেছে?'

—'সমস্ত।'

—'গিয়ে থাকব তাতে টাকা লাগবে না?'

'দিলেও রবীন্দ্রবাবুরা কিছু নেবেন না। কিন্তু তবুও তোমাকে তিন-চারশ দিয়ে দেব আমি।'

—'তিন-চারশ!' মৃণাল মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। জীবনে এক থেকে ত্রিশ টাকাও ত সে কোনোদিন দেখে নি।

—'এত টাকা কোথায় পেলে?'

—'সে এক রহস্য।'

—'আমি কি করে রাখব আমার কাছে!'

—'অনাদির কাছে দিয়ে দেব।'

মৃণাল একটু ভেবে বললেন, 'না আমার কাছেই দিও।' মৃণাল বললে, 'বড তোরঙ্গটা নিয়ে যাব, তারই খুব নীচে খুব সাবধানে রেখে দেব। ভয় নেই তোমার।'

এটুকু মৃণালের হৃদয়ের এমন কিছু জিনিস নয়, তার নারীত্বের ক্ষুদ্রতা নয়, সংরক্ষণ প্রবৃত্তি মাত্র, দারিদ্র্যের ভিতর এ জিনিসটা একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে মাত্র। অনাদি [দেবব্রত] বললে, 'তুমিই নিও।'

দেবব্রত বললে, 'গরম কাপড়-চোপড় কলকাতার থেকে অনাদিরা কিনে দেবে তোমাকে।'

—'দিল্লিতে কি বড্ড শীত?'

—'শীত বৈকি, অঘ্রানের শেষ, তাছাড়া আমাদের দেশের চেয়ে ঢের বেশি।'

মৃণাল দেবব্রতের কথাকে শেষ করতে না দিয়েই বললে, 'কিন্তু অনাদিবাবুকেও ত আমি তেমন ভাল করে চিনি নে, তার জেঠামশাই রবীন্দ্রবাবুকে কোনোদিন চোখেও দেখি নি।

—'অনাদির সঙ্গে তোমার এমন যে কিছু আলাপ নেই তা সত্যি নয়। মৃণাল-বিয়ের আগেও একটু-আধটু ছিল নাকি শুনলাম।

—'কে ব'লেছে?

—'শুনেছি, অনাদিই বলেছে।

মৃণাল গালে হাত দিয়ে ঘাড় কাত করে হেঁট একটু ভাবলে। আধ মিনিট পরে বললে, 'ও, সে আর কি, বাসে, করে ইস্কুল থেকে বোর্ডি থেকে ইস্কুল, এমনি ফাকে ইন্দিরাদের বাড়ি দু-চারদিন যা নেমেছিলাম।'

দেবব্রত বললে, 'তুমি তিন মাস থাকবে, অঘ্রান, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুনের প্রথমেই চলে আসতে পার, কিন্তু ওরা সেই সময়ে যদি সিমলা যান, তোমাকেও যদি অনুরোধ করেন, তেমন যদি আগ্রহ দেখ।

মৃণাল একটু ব্যথিত হয়ে বললে, 'তিন মাস তুমি আমার মুখ না দেখে থাকবে, এও কি আমার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি নয়, এর পরেও তুমি আমাকে অন্য জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থার কথা ভাবতে পার।' মৃণাল আচলটা কাঁধের ওপর ফেলে বললে, 'আমি ত ভাবতেই পারি না এ তিন মাসই বা তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব।'

—'সেখানে আমোদ আছে ঢের উৎসব আছে মৃণাল, আমাদের এই জীবনের মত তা মোটেই নয়। পা দিয়েই বুঝতে পারবে তুমি। জীবনের উপভোগের সময়টা দেখতে দেখতেই চলে যায়। ঘরের জন্য কারু দিন গুনতে হয় না।'

মৃণাল কোনো উপশম বোধ না করে বললে, 'আমি ফূর্তি চাই না, অত সম্ভোগ উপভোগেও আমার ভাল লাগে না। তোমার কোলের ভিতর আমি একটু আশ্রয় ও শান্তি চাই শুধু।'

তা ঠিক দেবব্রত তাই-ই চায়। কিন্তু কই তেমন ত হল না আর। মৃণাল বললে, 'তুমিও চল।'

দেব্রত বললে, 'দিল্লিতে গিয়ে তিনমাস সময় নষ্ট করবার মত—'

মৃণাল বললে, 'কেন, সেখানেও ত চাকরি খুঁজতে পারবে।'

দেবব্রত দু-এক মিনিট স্থির থেকে বললে, 'আমি ছ-মাস দিল্লিতে গিয়ে একটা কাজ করেও এসছিলাম একসময়,কিন্তু সেই কাজটাই রাখতে পারলাম না। অন্য কোনো আমাদের উপযুক্ত মত কাজও

একেবাবেই অসাধ্য দেখলাম। তখনও বযস ছিল, সামর্থ্য ছিল, সাধ ছিল, হলে তখনই একটা কিছু হওযা উচিত ছিল। এখন বাংলা বাইবে কাজ নিযে বসবাব কোনো রুচিও আমাব নেই; কোনো সাধ্যও নেই।

মৃণাল বললে, 'তবে আমাকে এতদূব পাঠাচ্ছ কেন?

—'নিকট-দূব বলে নয, এমন একটা ভাল জাযগায এমন একটু ভাল সময এমন উপযুক্ত সঙ্গতি আমি আব কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

—'কিন্তু আমাকে ভাল জাযগায পাঠাবাবই কি দবকাব বলে দাও। তোমাব কাছে কি আমি থাকতে পাবি না' এই তিন চাবশ টাকা এখানে বসেই আমবা দু'জনে খবচ কবতে পাবলে জীবনেব প্রকৃত সুখ ও শান্তি কি ঢেব বেশি পেতাম না?'

দেবব্রত জানে, তা তাবা পেত, কিন্তু দেশেব জলবাতাসে মৃণালেব শবীব কিছুতেই সাবত না যে।

মৃণাল বললে, 'আব একা আমি এত টাকা খবচ কবব, এমন ফুর্তিবাজি কবব বসে, আব তুমি–' মৃণালেব গলাটা ভেঙে যাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে।

দেবব্রত স্ত্রীব বিবর্ণ মুখেব দিকে তাকিযে ভাবল, বাস্তবিক, একি উপভোগ কবতে পাববে, পশ্চিমেব সেই ড্রাই উইন্টাবই ত সব নয, মানুষেব মনও যে অনেকখানি। এমন মন নিযে গেলে এব শবীব কতদূব কি যে সাববে, কি হবে বুঝতে পাবছে না দেবব্রত।

একটা পবিপূর্ণ আশ্বাস দিযে দেবব্রত বললে, 'তোমাকে আমাব শখ মেটাবাব জন্যও পাঠাচ্ছি না মৃণাল, তোমাব সাধ মেটাবাব জন্যও না, নিতান্ত প্রযোজনেই পাঠাচ্ছি, শবীবটাকে সাবা তোমাব এখন একান্তই দবকাব, তা না হলে জীবনেব কোনো সাধ তোমাব মিটবে না মৃণাল।' সে কি যে সব সাধ আকাঙক্ষা মৃণালেব শবীবেব দোষে যা পূবণ হতে পাবল না, মৃণাল অত্যন্ত লজ্জিত হযে তা জানে।—'কোথাও না গিযে তুমি যদি এখনো দেশে থাকতে তাহলে একাই থাকতে হত তোমাকে। আমি আব কযেকদিনেব ভিতবেই কলকতায চলে যাব। এখানে এবকম শবীব মনেব দুঃখ কষ্ট ও অসদ্ভাবেব ভতব একা একা থেকে তখন কি কবতে তুমি?'

মৃণাল উপলব্ধি কবতে পেবে প্রীত হযে বললে, 'তুমি যদি তিন মাসেব আগেই চাকবি পাও তাহলে দিল্লিব থেকে তক্ষুণি আমাকে নিযে যেও নিজে এসে।'

দেবব্রত ঘাড় নাড়ল। বত্রিশ তেত্রিশ বছব বযসেব সময, জীবনেব ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে নানাবকম সুযোগ প্রযাস ও পবিশ্রমেব সাধনা পণ্ড হযে যেতে দেখবাব পব কাঁচি ও কুড়ালেব এই কঠিনতব ভিতব কাজেব খোঁজে কলকতায সে আব যাচ্ছে না, জীবনেব গ্লানি ও ধিক্কাবকে একটা মিথ্যা প্রযাসেব অভিনয দিযে থাকতে চাচ্ছে শুধু। পৃথিবীব কাছেও বটে, কিন্তু মৃণালেব কাছেই একান্ত কবে।

জানে না দেবব্রত, বুঝতে পাবছে না, সে কল্পনা কি যে ব্যথা দেয তাকে, এই তিন মাস পবে মৃণালকেই বা কোথায বাখবে সে? নিজেকেই বা কোথায? জীবনটা তাব বিযেব বাত থেকে এই পর্যন্ত একটি মেযেকে ধাপ্পাব পব ধাপ্পা দিযে চলেছে না কি শুধু? স্ত্রীব কাছে অভিনয কবে মিথ্যা কথা বলে, অসত্য আশ্বাস দিযে, মৃণালেব অন্ধ মনকে, অন্ধ সংস্কাবকে অনভিজ্ঞ জীবনকে তাব সেই চিব অন্ধকাবেব ভিতব ঢেকে বেখে তাবই ছাযায নিজেব পৃথিবীক্লান্ত ক্ষুব্ধ ক্লিষ্ট মানবতাকে একটু উপশম দেবাব জন্য জীবনটা তাব প্রবঞ্চনাব পব প্রবঞ্চনা কবে চলেছে না শুধু? চলেছে বৈকি, আবো চলবে, চলবে না? কিন্তু তাকেই বা পৃথিবী কতটুকু বেহাই দিযেছে? পৃথিবী যদি পদে পদে দেব্রতকে প্রতাবিত কবে, তাহলে সে প্রতাবণাব গোলোক ধাধা চিবকাল ঘুবেই চলবে, ঘুবেই চলবে, ঘুবেই চলবে। মৃণালেব অভিজ্ঞতাব তুচ্ছতা, ওব উপলব্ধিব অন্ধকাবই ওব উপশম, তাই থাক, তাই থাক, তাই থাক। কেন সে সব ভাঙতে যাবে দেবব্রত? কিন্তু দিল্লিব এই তিন মাসেব পব কতদূব তা অক্ষুণ্ণ হযে থাকবে; তাও এক ভাববাব কথা বটে।

কিন্তু মৃণালেব কোনো সন্তান নেই। পেটে কোনো গভ নিযেও দিল্লি যাচ্ছে না সে, সে নিতান্তই পৃথিবীব বিষাক্ত মেযেমানুষ, নিজে যদি আজ সে না বোঝে সেও ভাল, তিন মাস পবে যদি বুঝতে আবম্ভ কবে, বুঝে বুঝে নিজেব বিমুক্তিব বিস্তৃত পথটাও যদি তাব নজবে পড়ে যায সেও ভাল। সেই পথই যেন সে ধবে। তাব রুচি স্বাধীনতা প্রযোজন যেদিকে তাকে নিযে যাবে সেই দিকেই চলে যাক মৃণাল। সেই ভাল, সেই ভাল। নিজেও তখন নিজেব জন্য রুচিব স্বাধীনতা প্রযোজন কবতে কোনো বাধা পাবে না দেবব্রত, তাব মতামত ও প্রযোজনেব একটা অর্থ থাকবে সেইদিন। সেই ভাল, সেই ভাল।

দেবব্রতেব আকাশপাতাল উপলব্ধিব এ পৃথিবীতে মন্দ কি? মন্দ কোথায? বৈচিত্র্যেব বিমুগ্ধতায বেদনাই বা বহুক্ষণ নিবিড় হযে থাকতে পাবে কি কবে?

মৃণাল বললে, 'ভাববাব ঢেব আছে বটে, কিন্তু সমস্তটা বিচাব কবে আমাব যাওযাটাই দবকাব মনে

করছি। আমার শরীরের সুস্থতা আমার জন্যই না শুধু, তোমার জন্যও ত, হয়ত তোমার জন্যই বেশি করে।' একটু থেমে—'তাছাড়া তুমি কলকাতায় চলে গেলে, এখানে এরকম ভাবে আমি কিছুতেই যে থাকতে পারব না সেটা এত সত্য, কিন্তু তবুও তুমি চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিতে যদি!' মৃণাল স্বামীর গা-ঘেঁষে একটু গলে পড়ছে।

দেবব্রত মৃণালের কাধে হাত রেখে বললে, 'হ্যাঁ, এবার দিল্লিতে গিয়ে শরীরটাকে একেবারে সেরে নিয়ে আসবে কিন্তু।'

মৃনাল অনেকখানি আনন্দে ফুটে পড়ে বলছে—'সত্যি; আমার খুব ভাল লাগছে। দিল্লিতে গিয়ে খাব-দাব, টাকা কড়ির কোনো ভাবনা থাকবে না, কিছু না। শহর দেখে বেড়াব দু'বেলা, হরীন্দ্রবাবুরা খুব বড়লোক না? মোটর আছে?'

—'দু-তিনটে।'

—'ইন্দিরাও খুব ভাল। ওর সঙ্গে গল্প করতে বেশ আনন্দ পাওয়া যাবে। ইন্দিরার বোন চারুকেও আমি চিনি। আমার থেকে এক ক্লাস নীচে পড়ত। ওর বড় বোন জ্যোতিদির সঙ্গে আলাপ নেই বটে, কিন্তু তাকে আমি দেখেছি, তিনিও বেশ ভাল মানুষ।'

—'ওরা সবই খুব ভাল, হরীন্দ্রবাবু বেশ মজার লোক দেখবে গিয়ে।'

—'আর তাঁর স্ত্রী?'

—'তিনিও বেশ।'

—'সত্যি গার্জেনের মত। একরম একজন না থাকলে চলে না।'

দেবব্রত বললে, 'যাবার আগে কতকগুলো কথা বলে দিচ্ছি তোমাকে, ওদের সঙ্গে, এমন কি পুরুষদের , ছেলেদের সঙ্গে মিশতেও কোনো আড়ষ্টতা রেখ না। খুবই সহজভাবে মেশো, মনের ত্রিসীমানায়ও কোনো সঙ্কোচ রেখ না। তেমার মনের ভেতর নানাবকম অদ্ভুত ধাবণা বযেছে মৃণাল, যেমন এই আমাকে ছাড়া আর কাউকে—'

মৃণাল দেবব্রতের মুখ চেপে ধরল।

দেবব্রত আস্তে আস্তে মৃণালেব হাতটা সরিযে দিযে বললে, 'কিন্তু ওসব বড্ড ভুল ধাবণা তোমাব মৃণাল, আজকালকার পৃথিবী ওসব একেবারেই গ্রাহ্য করে না। প্রত্যেক মানুষই যে স্বাধীন, স্ত্রীও যে স্বামীব অধীনে নয়, যে খুশি যাকেই যে ভক্তিশ্রদ্ধা আদর প্রীতি করতে পারে, স্বামীর মত বা স্ত্রীব মত কবেও সেইসব অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে গিয়ে স্তম্ভিত হযে পড়ো না মৃণাল। তোমাব আনাড়ি নক্সোবখনা দিযে কাউকে অবিচার করতে যেও না, তাহলেই ব্যাপারটা ঢেব কদর্য হযে পড়বে। তুমি আমাকে বল যে আমাকে ভালবাস তুমি, যতবারই জিজ্ঞেস কবেছি ততবারই বলেছে, হ্যাঁ, এ ভালবাসা মোটেই জোর করে নয়, আমি স্বামী বলে নয়, কোনো সংস্কারের বশে নয়। আমি জানি না তুমি কতদূব ঠিক কবে নিজের মনটাকে বুঝেছ। কিন্তু প্রাণের টানে একজনকে ভালবাসতে পেরেছ বলে আব কাউকে যে পাববে না—'

মৃণাল দু-হাত দিযে দেবব্রতেব মুখ চেপে ধরল।

দেবব্রত এবারও আস্তে আস্তে বরং ঈষৎ জোর খাটিযেই হাত দু'টোকে সরিযে দিযে বললে, 'কাব জীবনে প্রকৃত ভালবাসা যে কখন আসে তা বলা যায় না। যখন মনের ভেতব তখন একটা গভীর তাগিদ বোধ করা যায় তখন সেটাকে চেপে রাখাই অন্যায। হয়ত জীবনেব সবচেযে প্রয়োজনীয সুযোগ ব্যবস্থা তাইতেই হারিয়ে গেল। তারপর আগের মতন আবার তেমনি অন্ধকারে, অনটনে অপ্রার্থিতকে নিয়ে জীবন। দেবব্রত একটু হেসে বললে,'এই এর ভেতব কি সার্তকতা আছে? এমনি কবে পিছিযে পড়ার ভিতর?

মৃণাল বললে, 'এসব কথা বোল না তুমি আর। এসব কথা শুনতে চাই না আমি।'

দেবব্রত একটু বিদ্রুপ করে হেসে বললে, 'অন্তরাত্মা দিযে নাই বা শুনলে, কান দিযে শুনে যাও শুধু। একদিন আমার এ কথাগুলো কাজে লাগবেই।'

মৃণাল একটু ভীত হযে বললে, 'সত্যি তুমি এসব বিশ্বাস কর?'

দেবব্রত মৃণালের কথার উত্তর না দিযে বললে, 'বাস্তবিক কেউই কারু স্ত্রী নয়, কেউই কারু স্বামী নয়, কেউই কারু সন্তানই নয যেন।'

মৃণাল দু-এক মিনিট মাথা হেঁট করে বললে, 'তুমি বলবার জন্যই ঢের কথা বলে যাও যেন। তোমার এসব কথার মানেও আমি কিছু বুঝি না। বুঝে দরকাবও নেই আমার।'

দেবব্রত বললে, 'জীবন ঢের বিস্তৃত মৃণাল, কারু কখন কোনো জিনিসের দরকার হযে পড়বে কেউ কে জানে?'

মৃণাল বললে, 'সারারাত বসে এই সবই কি তুমি আমাকে বলবে?'

দেবব্রত বললে, 'না, আর বেশি কিছু বলব না। কিন্তু যা বলেছি মনে রেখে মানুষ তার পৃথিবীর এই একটা জীবনকে জীবনের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে চালিয়ে নিতে পারে। অন্য কোন ক্ষেত্রে কি হয় জানি না, হয়তো আরো ঢের বিস্তৃত ও গভীর জিনিস সব হয়। কিন্তু পৃথিবীটাও এখনো এত ছোট হয়ে পড়ে নি যে সেসব উপলব্ধি ও প্রয়োজন আমার কাছে সত্য মনে হয়েছে, হয়ত তা সত্য নয়, কিন্তু তবুও আমার কাছে তা সত্য বোধ হয়েছে বলে সেই সব নিয়ে প্রক্রিয়া করে দেখবার মত একটা বিস্তৃত সুযোগ আমাকে দেবে না? পৃথিবী তা দেয়, ধর্মনীতি ও বিচারের কানামাছি চারদিক দিয়ে ভোঁ ভোঁ করতে থাকলেও। জীবন অবকাশ দেয় মানুষকে, সুযোগ দেয়। বুঝো মৃণাল তা, নিজের পরম প্রয়োজনটাকেও খুব ভাল করে তলিয়ে বুঝে নিও। আমি তোমার স্বামী বটে, কিন্তু আমাকে ত দেখলে, সম্পদ সুখ ত দূরেব কথা, কোনো শান্তি, এমনকি কোনো আশ্রয়ও তোমাকে দিতে পারলাম না। হয়ত কোনোদিনই পারব না মৃণাল। চিরদিনই এইসব ভণ্ডুলের ভিতর দিয়ে আমাদের চলতে হবে। এতে জীবন না পায় কোনো পরিতৃপ্তি , না পায় কোন সার্থকতা। যদি ঘাটের মড়া কুৎসিত হাত চেপে এইই সহ্য করতে হত। কিন্তু তোমাব মত সুন্দরী ত জীবনের কাছ থেকে এর চেয়ে ঢের বেশি প্রত্যাশা করে। যদি জানতে তা! সে স্বর্গেব তুলনায কোন বসাতলে পড়ে রযেছ যদি তা বুঝতে?'

মৃণাল দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বললে, 'কেন কেমন তারা?'

—'তোমাদের সেই স্ত্রীর আর স্বামী সেই সব নিয়ে তুমি আজ বসে আছ? কিন্তু কোনোদিনই স্বামী স্ত্রী সোহগ আদর ভালবাসা বিশ্বাস ধর্ম তুমি না ভেবে বেখেছ ঠিক তেমনটি ছিল না। আজ তা ত একবারেই তেমন নেই।'

—'কি রকম হযেছে তাহলে?' মৃণাল দেবব্রতেব কোলের ভেতর মুখ গুঁজে আস্তে আস্তে বললে, 'কিন্তু আমি শুনতে চাই না।'

—'শোনাতেও চাই না আমি, কিন্তু যেখানে খুশি গিযে দেখে আসতে পাব।' দেবব্রত একটু থেমে বললে, 'তাবপর যা খুশি তাই কবতেও পার।'

কিন্তু দেবব্রতেব এই শেষ কথাটা মৃণালের কানে গেল না। স্বামীর কোলেই সে ঘুমিযে পড়েছে। মুখের ওপব মেযেটির এমনই একটা নিবপরাধ অনভিজ্ঞতা, এমনই একটা অজ্ঞান পরিতৃপ্তি, কিংবা এসব কি অজ্ঞানতা শুধু? শুধু অনভিজ্ঞতা? পৃথিবীতে কোথাও আব আশ্রয নেই বলেই কি দেবব্রতের কোলের এই আশ্রযটকু পবমাশ্রযেব মত মূল্যবান? তাই এই তৃপ্তি? শান্তি এই? কিন্তু মৃণালের নিবিড় নিগূঢ় মুখের দিকে তাকিযে তা ঠিক মনে হয কি? যদিও বা তাই হয সে অনভিজ্ঞতার ভিতব এমন নির্দোষ থাকে, এমন পবিতৃপ্তি নিস্তারের নিবিড়তা তা দিযে কি একটা পবম নীড় গড়া যায না? সেটা কি সত্যি হয না? হয বটে, হয বটে, তাও হয। জীবনেব সে অনেক বৈচিত্র্য। কিন্তু এ বিশেষ বিচিত্রতাব বিমুগ্ধ আমোদও ত জীবন তাকে উপভোগ কবতে দিল না, কিংবা দিল হযত এই কযেকটা বাতের জন্য। তারপর দেবব্রতকে কলকাতায চলে যেতে হবে যে! এবং তাবপর? তারপর আর কিছুই নেই। কিংবা যা হযে গেছে, যা হবে তাবই ব্যর্থ পূরণচযন শুধু। এসব নিবর্থকতার ভিতব কোনো নীড় জমে না।

কিন্তু আজকের বাতটা এই গভীর শীতেব ভেতর, মৃণালকে নিযে ওর অন্ধ আবেগেব এই ভালবাসা কাল হযত জ্ঞানের ঘৃণায দাঁড়াবে গিযে। কিন্তু কালও হযতো তা অন্ধ আবেগেব ভালবাসই থাকবে। কোনো জ্ঞান অভিজ্ঞতা কোনোদিন তাকে নষ্ট করতে না পারলেও পেটেরই ক্ষুধায এমন স্থূল জিনিসটাযও আজই হযত তা গভীব বাতেই ব্যথিত হযে উঠতে পারে, চিন্তিত; যেখানে চিন্তা রয়েছে, সেখানে কোনো নীড় থাকতে পারে না। পারবে কি?

আজকের এই রাতটা, এই গভীব শীতেব ভিতর মৃণালকে নিযে, জীবনে এমন বাত আর কয়েকটা আছে শুধু, আজকেব রাতের এই কঠিন শীতেব ভিতর পরস্পরকে লিপ্ত করে এই উষ্ণতা ও শান্তি যদি অনাদি শান্তি ও উষ্ণতা হত, কিংবা যে ঘুম, শীত অন্ধকাব ও পরস্পরের বিচ্ছিন্নতাকেও মনে করে রাখতে যায় না আর তা যদি অনন্ত হযে উঠত। বিধাতা এই দু'টি জীবনে এইখানে যদি শেষ করে দিত তাহলে কার ক্ষতি হত? কিংবা ক্ষতি হত হযত। পৃথিবীর বেদনাসমাকুল অজস্র মানবজীবন, মানুষের আত্মা যা ঘুমাতে পারছে না, ফুরুতে পারছে না, বিধাতাব আর একটি অবিচার দেখে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত।

মা হবার কোনো সাধ

দেশেব থেকে মোটেই সুখবব আসছে না। শেফালী লিখছে সে কযেক বাত ধবে ঘুমুতে পাবছে না। সমস্ত বাতই প্রায পেটেব ব্যথায জেগে বসে থাকতে হয। বসতেও কষ্ট। পা ছড়িযে ছাড়া বসা যায না। খেতেও পাবছে না কিছু। আবো অনেক কথা, ছেলেপিলে হবাব আব বেশি দেবি নেই, অমাবস্যাযেই হত হযত, পঞ্চমীতে হবে আশা কবা যায। এবই আগে প্রমথকে দেশে যেতে লিখেছে।

কিন্তু এখন কি কবে সে দেশে ফিবে যায? কলকাতায দু'টি কাবণেই এসেছে প্রমথ। চাকবিব জোগাড় দেখতে ত এসেছে বটে এবং আবেকটা কাবণ হচ্ছে শেফালীব এ অবস্থা দিনেব পব দিন নিজেব চোখে দিযে দেখবাব ক্ষমতা তাব নেই বলে সে পালিযে এসেছে, এই দ্বিতীয কাবণটাই হচ্ছে আসল। চাকবি জোগাড় সে পাচ্ছে না, চেষ্টাব জন্যও কোনো ব্যবস্থা নেই।

বছব দুই হল প্রমথেব বিযে হযেছে। সন্তান এই প্রথম হচ্ছে। দবিদ্রেব ঘবে সন্তানবতী মেযেমানুষেব কত কষ্ট, নিজেব চোখে সে সাত আট মাস ধবে দেখল এবং নিজেকে বাধ্য হযে বেকাব থাকতে হাওযাব দারুন সে কষ্ট কত দিকে কত বকম কবে বেড়ে গিযেছে, কত অনর্থেব সৃষ্টি কবেছে, কত লজ্জাব, কত ঘৃণাব, কত অবহেলা, উপেক্ষা হৃদযহীন শ্লেষ পবিহাসেব সমস্তই ত সে জানে। সবই সে সহ্য কবে এসেছে।

বিযেব পবই চাকবি একটা পাবে বলেই সে ভেবেছিল, হযত পেত, কিন্তু বাস্তবিক পেল না।

এবং এ দু-বছবেব ফাঁকে ফাঁকে কলকাতয অনেকবাব ঘোবাফেবা কবেও কিছু সে জোটাতে পাবল না।

বিযেব পব এক বছবেব ভিতব শেফালীব কোনো সন্তান সম্ভাবনা হয নি, হয নি প্রমথব জন্যই, শেফালীব জন্য বটে, গবিবদেব ঢেব দাযিত্ব আছে, এদেব দু'জনকেই তা বুঝতে হযেছে, সংসাবে এসে কবিত্ব ভালবাসা বা বস উপভোগ কববাব শক্তি এদেব কারুব চেযেই তেমন বিশেষ কম ছিল না বটে, আগ্রহও অনেকখানি ছিল, কিন্তু অসচ্ছলতা বিবাহেব নানাবকম সম্পদই এদেব সম্ভোগ কবতে দেয নি, বিবাহটাও নতুন বিপদটাকে, এদেব চোখে এমন দুর্বিবহ কবে দাঁড় কবিযেছে, যৌবনেব এই বিমুগ্ধ জিনিসটাব জন্য এতদিনকাব অপেক্ষাকে নিবর্থক কবে দিযেছে, পৃথিবীব কোনো আশ্চর্য জিনিসেবই যেন কোনো মানে বাখে নি আব, না কপেব, না দেহেব, ভালবাসাকেও ভুল বুঝিযেছে।

এক সমযে এদেব মন এমনই কঠিন হযে উঠেছে, পবস্পবেব প্রতি এমনই বিমুখ, যে এবা দু জনেই যেন নিতান্ত স্বচ্ছন্দেই পবস্পবকে ছেড়ে পৃথিবীব অন্য যে কোনো জাযগায যেন চলে যেতে পাবত, গিযে সুখী হোক না হোক (সুখ এবা আব চাচ্ছিল না যেন) পবিতৃপ্ত হতে পাবত ত অন্তত, নিস্তাব পেতে (এই নিস্তাবই এবা চাচ্ছিল)।

এক এক সময এবকম হত।

প্রমথেব মনে হত পৃথিবীব কোনো স্বামী যেন ঠিক তাব মত শান্তি আব পাচ্ছে না, অসচ্ছলতাও ত বযেছে চাবিদিকে, নিজেও ত সে সমস্ত জীবনটা, যতটকু জীবন তাব, এ জিনিসটাকে ঢেল দু'হাত পাযে খুঁড়ে দেখতে বাধ্য হযেছে। হযত শেষ দেখেছে এব, কিন্তু তবুও এত কষ্টেব ভিতব পড়েও বিযেব আগে মনটা তাব নানা বকম সহানুভূতিতে মমতা ও আশায ভবেছিল, শেফালীব বিক্ততা দিনেব পব দিন প্রমথেব জীবনটাকে....। সে ভবে দিচ্ছে যেন, সঙ্কোচ, সংকীর্ণতায, কর্কশতায, যেন কোনো প্রতীক্ষাব কোনো অর্থ নেই আব, যেন তাদেব দু'জনেব জীবনটা এমন দাম্পত্যেব পক্ষেই নিতান্ত একটা উপযুক্ত সমাপ্তিব পবিপূর্ণ শ্লেষে পৌছিযে গিযেছে।

জীবনটা মাঝে মাঝে এই বকম কঠিন হযে উঠত, দু'জনেবই কিন্তু প্রমথেব মনেব এ অবস্থা বেশিক্ষণেব জন্য টিকত না, জীবনেব কোনো কৃত্রিম শেষকে জড়িযে নিযে অনেকক্ষণ ধবে কষ্ট পাওযা তাব ধাতে সম্ভব হচ্ছিল না, সে অপেক্ষা কবত, হৃদযটা তাব আশায ভবে উঠত, শেফালীব জন্য সহানুভূতিতে মমতায করুণায।

বাস্তবিক এই নিপীড়িতা স্ত্রীই যেন সবচেয়ে বেশি বেদনা দিত প্রমথকে। দাম্পাত্য জীবনের সমস্ত নিগ্রহ যেন শেফালীকেই ভোগ করতে হচ্ছে। এমন কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই মেয়েটির যাতে সে ভবিষ্যতের কোনো একটা আশার জন্য অপেক্ষা কববাব মত একটা তাগিদ পায জীবনে, কিংবা অভাব অনর্থেব ভিতর থেকে আজই মধুমমতা জোগাড় কবে নিতে পারে এমন কোনো শিক্ষাদীক্ষা বা আন্তবিকতা মেয়েটি এর বাপেব বাড়ির থেকেও আহবণ করে আনতে পারল না, এর রক্তের ভিতব থেকেও না।

কাজেই জীবনে একে নিয়ে চলতে হলে, ঢেব বুঝে চলতে হবে প্রমথের, প্রতি পদেই ক্ষমা করে ঢের মায়া দক্ষিণা স্নেহ উপলব্ধিব হাত বাড়িয়ে অনেক কিছু মুছে ফেলতে ফেলতে। নইলে শেফালীর কষ্টেব আব অন্ত থাকবে না।

বধূ নিজে যখন কোনো বোধই নিয়ে এল না, মানুষের জীবনকে যখন একটুও চিনল না সে, প্রমথ তখন জীবনের সাথে নিজের সমস্তটুকু পরিচযের অপরিহার্য মধুরতা একে মুহূর্তে মুহূর্তে বোঝাতে থাকবে। বিযেব পর থেকে বুঝেছিল প্রমথ, এইই হল তাব কাজ। শেফালী রূপসী, সংসাবেব আঁটসাঁটেব দিক দিযেও মাথা তাব তীক্ষ্ণ খুব, যে কোনো বড়কর্তাই এই মেয়েটিকে ঘুবিযে বাজিযে দেখে শাবীরিক সাংসারিক সমস্ত স্থূল এবং তৎসম্পর্কে সমস্ত সম্পূর্ণ ব্যাপাবেও খুব পবিতৃপ্তি পেতে পাবতেন। শেফালী অনেক বড় ঘবে পড়লে পাবত। যে বকম বেদনা এ মেয়েটি চায না, যে উপলব্ধি অলক্ষ সহিষ্ণুতা মমতার জীবনকে এ মেয়েটি আপাদমস্তক জ্বলে পুড়ে ভস্ম হযে ঘৃণা কবে, এব কপালেব সৌভাগ্যও ববাববই একে সেই পথ থেকে দূবে বেখেছে, বাখত যেন, আশ্বাস দিযে গেছে যেন, হায কোন আকস্মিকতার দুর্ভাগ্যে সেই সব বিবিধ সম্ভাবনাব সমৃদ্ধিব থেকে মেয়েটি এই সবচেয দুঃসাধ্য পথেই খসে পড়ল। প্রমথের জীবনেব নিষ্ক্রিযতা ও নিরর্থকথাব ভিতর, নিজেব পঙ্গপ্রায জীবনকে উদ্ধাব কবাব জন্য প্রমথের এই সব ঘৃণা তুচ্ছ ষড়যন্ত্রেব ভিতব, এই উপহাসেব মধ্যে, এই কদর্যতাব মধ্যে। (এই সব পঙ্ক অশ্লীলতাব ভিতর!)

কিন্তু মানুষেব জীবন এই সব টিটকাবি নিযেই। তাব নিজেব জীবনেব শ্লেষেব কথাটিই শেফালীও প্রমথের মত সেটাকে তেমন তীক্ষ্ণ কবে ধবতে পাবে নি।

জীবন মবণেব সমস্ত গাঢ় উপলব্ধিব ভাব প্রমথেব উপর, নিস্তাবেব চেষ্টাবও তাবই হাতে। কাজেই প্রমথেব দাযিত্বেব আব শেষ নাই। একটা সুবাহা কববাব জন্য কলকাতায এসে কাজের ফিকিবে প্রাযই সে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু এ দু-বছবেব ভিতব কোথাও কিছু মিলছে না। বিযে করবার আগে ববং দু-একটা কাজ হাতে ছিল। প্রমথেব জীবন এইবকম অনেক পবিহাস নিযে। এ দাযিত্বেব জন্য কোনো স্থূল মুহূর্তেও নিজেকে একেবাবে হাবিযে ফেলে নি প্রমথ, শেফালীকেও হাব মানতে দেয নি, নইলে সন্তান তাদেব ঢের আগেই হত।

এই সংযমেব সাধনা প্রমথেব জীবনে খুব কঠিন হযে চলেছিল। জোব করে কোনো বিবতিব প্রযোজন ছিল না দাম্পত্য জীবনে শেফালীব, ওটা তাব নিজের থেকেই আসছিল, হযত প্রমথেব প্রতিই বিবক্তিতে, কিংবা তাব নতুন জীবনের প্রতিই একটা তিক্ততায। এই বকম করে দু'জনেব জীবন এত নিকটে থেকেও নানাবকম অসাধ অনিচ্ছা ও অমর্যাদার ভিতব দিযে চলছিল। প্রায আট-ন মাস হল কলকাতায একবাব এসে প্রমথ একটা কাজের ব্যবস্থা করে গিযেছিল, ভেবেছিল এ কাজটা সে নিশ্চযই পাবে। উপবওযালাদেব কথা, এমন কি অ্যাপযেন্টমেন্ট লেটার অব্দি সে পেযে গিযেছিল। দিন কযেকের ভিতবেই তাকে এসে যোগ দিতে হবে এই ছিল কথা। খুব সুস্থির মনে এবাব সে শেফালীব সঙ্গে মিশতে পেবেছিল, স্বামীকেও এবাব খানিকটা গ্রহণ কবতে পেরেছিল শেফালী।

এই সবেব থেকেই এই সন্তানটিব জন্ম।

কিন্তু কাজে যোগ দেবাব দু-তিন দিন আগেই টেলিগ্রাম এল, তাবিখ তারা পিছিযে দিলে, তারপব আবো পিছিযে দিলে, তারপব জানাল যে নতুন লোক নেবার মত সামর্থ্য তাদেব আব নেই।

সে যাই হোক, সন্তানটি স্থির হযে বইল, তাব ভূমিষ্ঠ হবার দিনে পৃথিবীতে সে আসবেই। কেউ তাকে চায না, নারীব হৃদযে যদি কোনো মাতৃত্ব থাকে তা থাকুক, তবুও এই সন্তানকে শেফালী চায না। এত অভিজ্ঞতা ও বোধ এবং জীবনেব প্রতি সহানুভূতি ও করুণা নিয়ে তার বাবা অব্দি চায না তাকে। দু'জনেই লজ্জায ঘেন্নায ব্যথায় প্রতি পদেই কুণ্ঠিত হযে মবে যাচ্ছে যেন। এমন অপকর্ম কেন তাদেব জীবনে হল? কেন হল এই পাপ? কেন হল! কেন হল!

বাড়ির লোকজনদেবও কোনো সহানুভূতি নেই এদের ওপব। কি করে থাকবে?

জীবনে বিয়ে করাটাই অনুমোদনের জিনিস নয়, তার ওপর সন্তান! মানুষ কেনই নিজের জীবনটা এমন নিজের হাত দিয়েই গলগ্রহের করে তোলে এ কথা প্রমথই একদিন ভাবত, কিন্তু এখন এই মানুষদের সে-ই এসব ভাবতে দিচ্ছে।

প্রমথকে তারা না জানি কত কি স্থূল, কি রকম কদর্য মনে করে! প্রমথকে আর শেফালীকে। হয়ত এই সম্পর্কে এই অপরিচিত অজ্ঞাত মেয়েটাকেই ঘৃণা করে বেশি। শ্বশুরবাড়ির মস্ত বড় একান্নবর্তী পরিবারের ভিতর এসে শেফালী মুহূর্তে মুহূর্তে নিজের স্বাধীন মতামতের সাহসে চলতে গিয়ে এমনিই যথেষ্ট এদের উপেক্ষা ও বিরক্তির জিনিস হয়ে উঠেছিল। ওর এই পেটের সন্তানটির সংস্রবে শেফালীর প্রতি এদের কঠিনতা আরো ঢের বেড়ে গিয়েছে, মাঝেমাঝে তা কদর্য হয় উঠছে যেন। নানারকম অশ্লীল নোংরা হৃদযহীন ইতরামি প্রমথের কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

কিন্তু কী করবে সে? শিক্ষিত আত্মীয়স্বজন বা পাড়া পড়শিদের ইশারার ঘোলাজল ঠেকিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থা তার হাতে নেই, যারা অশিক্ষিত, জীবন সম্পর্কে ঢের অজ্ঞান তারা অনেকে প্রমথকে নানান সহানুভূতি ও আগ্রহ দেখালেও এ সন্তানের ব্যাপার নিয়ে আগের লোকগুলোর মতামতই যে ঠিক প্রমথ চিরকালই তা জানে। কিন্তু তাই বলেই কি তাদের নির্মল টিটকারির নিরবচ্ছিন্ন অশ্লীলতার এত প্রয়োজন ছিল? বিশেষত এই মেয়েটিকে নিয়ে? একথা ঠিক ঠিকই নয় যে প্রমথের একটু স্বচ্ছলতা থাকলেও এ সন্তানকে তারা একটুও অন্যায্য মনে করত না। শেফালীকে হয়ত আশীর্বাদই করত।

আর যদি জমিদারের উত্তরাধিকারী হত প্রমথ প্রতি বছরই সন্তান জন্মিয়ে চললেও প্রতিটি নতুন সম্ভাবনার সময় এরা জয়ঢাক বাজিয়ে শেফালী প্রমথ দু'জনকেই মানুষের জীবনের ভাগ্যবিধাতারা প্রাপ্য আদর সম্মান অত্যন্ত আন্তবিক ভাবেই দিত। দিত না? না দিয়ে যেত কোথায়? জীবনে এইসব অদ্ভুত বিচিত্র শ্লেষ সমস্ত রয়ে গেছে যে।

জীবনের যে অবস্থার ভিতর প্রমথ নিজেদেব দেখছে তাতে তীক্ষ্ণ ঠাট্টা অপর্যাপ্তভাবে হজম কবা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা তাদের হাতে আর নেই।

তাই সে কবে যাচ্ছে।

মুশকিল শেফালীকে নিয়ে।

রেগে অভিমান করে কেঁদে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখমুখ লাল করে বিরক্তি ঘৃণা লজ্জা অহঙ্কাব জ্বালা প্রতিদিনই এই মস্ত বড় পরিবাবেব নানারকম মানুষদেব সঙ্গে নানাভাবে ঘষা খেয়ে এইসব এক একটি জিনিস নিয়ে নিজের ঘরে এসে খিল দিচ্ছে সে। তারপব প্রবোধ ও উপশমেব ভাব প্রমথেব হাতে।

একটি টাকাযও মানুষের যতখানি উপকাব হত তার বদলে এক হাট কথার স্নিগ্ধতা নিজের জীবনেব থেকে এর প্রতিটি উপলক্ষেই টেনে বেব কবে নিতে হয়েছে প্রমথকে। এক এক সময় মনে হয়েছে যে শেফালী যদি জীবনেব নানাবকম সংঘাতে নিরবচ্ছিন্ন বেদনাই শুধু পায় এবং প্রমথ যদি সেই সবেব নিরবচ্ছিন্ন সান্ত্বনাই দিয়ে যেতে পাবে শুধু তাহলে একদিন এসব প্রবোধেব কোনো আন্তবিকতা থাকবে কি? এখনই কি থাকছে তা সব সময়ই? এই মেয়েটিব প্রতি করুণা সব সময়ই থাকবে বটে, মায়া মমতাও থাকবে, সে সবের মূলও সব সময়ই আন্তরিক হয়ে বইবে বটে, বাইবের প্রকাশ মাঝে মাঝে যদিও কিছু কিছু কৃত্রিম না হয়ে পারবে না; কিন্তু হৃদয়েব এই সব স্নিগ্ধতা নিজেকে নিজেব কাছে যতটুকু গভীর করেই দেখিয়ে বুঝিয়ে করে থাক না কেন, যার জন্য ব্যবহার কবা হয় তাকে প্রায়ই তা করে না। এর চেয়ে শেফালীকে সাংসারিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করে দিলে ঢেব বেশি কাজে লাগত। এইসব জানে প্রমথ।

জেনে চেষ্টাও করেছে। করছে আজও। কতদূব সে কবতে পাবে, কিন্তু কোথাও কিছু হল না।

আত্মীয়স্বজনের শাস্তি ভয়ঙ্কর বটে, শেফালীব শাস্তি একা প্রমথব ওপর আরো ভয়ঙ্কর। কিন্তু অজ্ঞাতসারে যে সব শাস্তি শেফালী প্রমথকে দিচ্ছে সে সবের চেয়ে।

গত সাত আট মাস বাড়িতে বসে বসে সেই সব বেদনা ভোগ করে এসেছে প্রমথ।

সেই প্রমথ মাসের বমি অরুচি, বমি, চাপ, পেটের কষ্ট, দুর্বলতা, ওর সৌন্দর্যের অবিশ্রাম ধ্বংস, তারপর কি রকম একটা বিকৃতি বীভৎসতা শেফালীর জীবনের এই মোটা দিকটাব সঙ্গে ওর আব একটা নিবিড় কষ্টের দিক জড়িয়ে রয়েছে, তা শুধু সংসারের অভাব নিয়েই নয়, মানুষের পরিহাস নির্মমতাও নিয়েও বটে কিন্তু শুধু তা নিয়েও নয়, কেনই এমন তার সন্তান হচ্ছে, এবং যদিও বা হল প্রমথের ভেতর দিয়ে তা কেন হল, এমনতর একটা পরিহাসের ভিতরে এসেই বা হতে গেল কেন, এসবের ভিতর থেকে

কে তাকে বাইরে নিয়ে যাবে, হায় কে? এমনই একটা প্রবল মর্মান্তিক বিষম হাঁফ শেফালীর জীবনে এই সাত আট মাস ধরে দেখে এসেছে প্রমথ।

শেফালীর জীবনের টুকরো টুকরো ব্যথাগুলোকে, তাদের নিতান্ত স্থূলতার থেকে নিদারুণ সূক্ষ্মতা অব্দি জমা দিয়ে তা ওজন করবার ভার প্রমথের ওপর; ওজন করবাব, পরিমাপ করবার, বোঝা বইবার, উপলব্ধি করবার, কি করে শেফালীকে উপশম দেয়া যায় তার পথ খুঁজবার, কোনোদিনও কোনো পথ পাওয়া যাবে না ভেবে অনেকক্ষণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে থেকে তবুও প্রতীক্ষা করবার, আশা করবার, সব সময়ই নিজের ব্যথাকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অনুভূতিপ্রবণ বড় অশ্রুআবেগপূর্ণ বুঝতে পেরে সেগুলোকে জমিয়ে রেখে নিশ্চেষ্টতায় লজ্জা ঘৃণা পেয়ে প্রয়াসে ব্যাকুল হয়ে উঠবার এই সবের ভার প্রমথের ওপর, এই সবেব সার্থকতা ও অসার্থকতা নিয়ে তার জীবন। এ জীবনকে প্রশ্ন করবার কোনো অবসর তাব নেই। ইচ্ছাও আছে কি? শেফালীব প্রতি করুণাব আন্তরিকতায় এমন অশ্রুসমাকুল যে কবে হতে পেরেছে? এরপর আর কোনো দ্বিতীয় কথা চলে না। জীবনটাকে একটা পরিসমাপ্তিতে পৌঁছনো কর্তব্য নয় শুধু প্রমথের, এই তাব মনের একমাত্র বাসনা। শেফালীকে সে একটা সচ্ছল শান্ত পরিসমাপ্তি দিক।

প্রমথ ঢেব চেয়েছিল, কিন্তু এছাড়া জীবনে আব কিছু সে চায় না এখন আর।

শেফালীর জন্য একটা পথ কবে নেবার জন্য কলকাতায় এসেছে।

আবাবও বিধাতাকে ঠিক তেমনই নির্মম দেখছে প্রমথ। কিংবা বিধাতা? কে চেনে তাকে? কে জানে তার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই প্রমথব। সে আছে জানালেও থাকত না, এই সৃষ্টির ভারটা কোনো কিছুকে বহন করে নিতেই হবে। হচ্ছে অন্তত এবং সমস্ত কিছুই খুব জুঁইযের পাপড়িব মত সাজানো গোছানো, তেমনি নরম ও মিষ্টি হতে পারে না, চাযও বা কে তেমনই হতে হবে? এবং হঠাৎই বা আজ যদি তা হযে বসে অতীতেব অপরিমেয গ্লানি ও অপচযকে খোযাবে কে? সে সব যে সত্য হয়ে রয়ে গেছে?

কিন্তু ভাবনাব কোনো কারণ নেই, যা আছে, যেমন ছিল, ঠিক তেমনই থাকবে। না, জীবনের বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নেই প্রমথেব।

নিজেও সে একটা নতুন জীবন সৃষ্টি কবতে চাচ্ছে না। শুধু সহ্য কববাব শক্তিটা যেন তাব থাকে, বিধ্বস্ত হয়ে প্রযাস কববার, যদি অনন্তকাল ধবে এমনি চলে, তাহলে অনন্তকাল ধরেও।

শেফালীব চিঠিটা গুটিযে বাখছে প্রমথ। যে সন্তানকে সে চেযেছিল না সে আসছে; মাকে শিশু কষ্ট দিচ্ছে শুধু, ক্রমাগত কষ্ট দিচ্ছে। বেদনায বেদনায ক্ষয কবে দিচ্ছে, হায পেটে থাকতেই এই বকম? ক্ষয কবছে, অপচয করছে অপোগণ্ডের সমস্ত অত্যাচাব নিয়ে শেফালীর সমস্ত সুন্দব শরীরটাকে। শেফালীকে যখন প্রমথ বিয়ে কবে এনছিল, যেন ডানা কাটা পবীকে ঘবে নামাল।

মাসখানেক আগে সেই শেফালীকে শেষ দেখে এসেছে প্রমথ। সে বিকৃতির দিকে তাকাতেও যেন ইচ্ছে কবে না। চোখ বুজলেও হৃদয কেঁপে ওঠে।

সুন্দর জিনিসকেই ত জীবনে সবচেযে বেশি ভালবাসত প্রমথ, সবচেযে বেশি সংবক্ষণ করতে চাইত সে। এখন কি করে না? কিন্তু পৃথিবীব ভিতব সবেচেযে বেশি যে স্নিগ্ধ সুন্দব জিনিসটা তাকে দেয়া হল তার সে এই পবিণাম করল? অথচ কবি সে। জীবনের সবচেযে হেযহীন সৌন্দর্যগুলোর ভিতর থেকেও সূক্ষ্ম অনুভূতি সে গ্রহণ কবে এবং কাউকে তাব অমর্যাদা করতে দেয না। সে না?

কিন্তু তবুও এমন একটা অনির্বচনীয় লাবণ্যকে নিয়ে কি করল সে? সন্তান আসছে, এ সন্তানকে শেফালী চায নি, না না কোনোদিনও চায নি, কোনোকিছুর ভিতব দিযেই না।

তার এ বিতৃষ্ণায মেয়েটি অত্যন্ত কঠিন ছিল, স্বভাব যে কঠিনতা মানুষকে দেয়।

মা হবার কোনো সাধ ছিল না শেফালীর।

মাতৃত্বের কোনো প্রযোজন এক দু-বছরেব ভিতব এক মুহূর্তেব জন্যও সে বোধ করেনি, হয়ত শেফালীর নিজেরই শিক্ষার বিশিষ্টতায, কিংবা তার রক্তের ধর্মে হযত, কিংবা কে জানে, হযত প্রমথর প্রতি বিমুখতায়, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায, কে জানে? এইসব জিনিসকে প্রমথর শ্রদ্ধা করা উচিত ছিল না কি? নিজে সে অনেক সময় ঢের দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু সমালে নিয়েছে। কিন্তু শেফালী যে সব সময়ই কঠিন, স্বামীর স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখে খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে একবার, তার ঐ কৃত্রিম দুর্বলতার এমন অপব্যহার করল কেন প্রমথ? এ কাপুরষতা যে হৃদযের সমস্ত কামনা বিক্ষোভের

অসংযমের মুখেও কালি মেখে দেয়। দেয় না? সব সময়ই ত সে সজাগ ছিল, ছিল না? সমস্তই ত জানত, বুঝত, কিন্তু তবুও পরিণামটাকে আটকে রাখতে পারল না?

শেফালীর অনুভূতি সংস্কার শিক্ষাদীক্ষা ও প্রয়োজনের খাতিরে তার যে কোনো স্বামীই তাকে এই নিস্তারটা দিতে পারত. ঢের অক্লেশে। তারা জানে জীবনে উপভোগ করবার ঢের সময় আছে, সন্তানের প্রয়োজন অবধি তুচ্ছ, সব সময়ই দুর্বিষহ, অনেক সময়ই নিরর্থক; দাম্পত্যজীবন ঢের বড়, সন্তানের জন্য অপেক্ষা করবার প্রচুর অবসর আছে, আগাম সম্পদগুলোকে নষ্ট করে কী লাভ, জীবনের সুখ সমৃদ্ধিকে নানাভাবে ঢোল করে দেখবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি তাদের রয়েছে, পরিমাপ করে প্রকৃত সুখ সংগ্রহ করে তারা, অপর্যাপ্ত ক্ষুধা মিটিয়ে যায়। লালসাকে অপরিমেয় ভাবে চরিতার্থ করে চলে তারা, কিন্তু কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়ে না, প্রমথের মত একরম কোনো বিপদে। এটাকে তারা বিপদই মনে করে না শুধু। চরিতার্থতার সঙ্গে যে জিনিসের কোনো সম্বন্ধ নেই। একটি অযথা সন্তান জন্মিয়ে যে জিনিস অনর্থক আরো ভারাক্রান্ত, তার কলঙ্ক গ্লানি মূর্খতা ও অপরাধের থেকে এরা এতই সতর্ক যে এদের যে কেউ শেফালীকে পরিপূর্ণ নিস্তার দিতে পারত, গভীর শান্তিতে রাখতে পারত এ মেয়েটিকে।

কিন্তু শেফালীর সংস্কার বা শিক্ষার খাতিরে নয়, নিজের উপভোগ চাতুর্যের পরিপাটি ব্যবস্থায়েও নয়, শেফালীর রূপের প্রয়োজনে অন্তত, প্রমথের ঢের প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। গাছের নীচে একরাশ শেফালীর ওপর যখন একটা কুকুর এসে বিছানা গুটিয়ে বসে? এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছে প্রমথকে।

শেফালীর সেই সুন্দর শরীরটাকে আর সে ফিরে পাবে না। বিবাহের রাতে এ শরীর কি কুহকের জিনিস না ছিল। দীর্ঘ একটা বছর বসে এর-এর বিমুগ্ধতাকে কে না উপভোগ করেছে? তার দরিদ্রের রুদ্রতা দম্ভ বা স্বাধীনতার জন্য পরিবারের অনেকেরই অপ্রিয় সে হয়ে উঠলেও তাদের চোখেও শেফালীর এ রূপ খুবই সন্তর্পণে সংরক্ষণ করবার মত জিনিস বলে মনে হয়েছিল নাকি? নিজেরই কি মনে হয় নি প্রমথের দিনের ফাঁকে ফাঁকে কিংবা কলকাতার থেকে ফিরে ফিরে এসে যখনই শেফালীকে সে দেখত, যে চোখের ক্ষুধাই মিটে যাক এ জীবনটা ভরে, শেফালীর শরীর নিয়ে অন্য কোনো ঘনিষ্ঠতার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো রুচিও নেই, হয়ত তা কদর্যতা।

কিন্তু তবুও ত সমস্তই হল।

শেফালীর আর একখানা চিঠি এসেছে।

তেমনি অনিদ্রা চলেছে তার। রাতে কিছুতেই ঘুমতে পারা যায় না, সন্তানের চাপ সমস্ত পেটটাকে যেন গিলে খেয়েছে। যেন একটা বিজাতীয় টিউমারের মত, সমস্ত রাত বসে থাকতে হয়, স্বাভাবিকভাবে বসবার সামর্থ্য নেই তার। দুই পা না ছড়িয়ে দিলে পারা যায় না। এমনি করে বসে সারারাত সে কাঁদে। ভগবান তাকে কেন জন্ম দিয়েছিল? কেন তার বাবা মা আজ বেঁচে নেই? হলই যদি এমন হল কেন? তাহলেও সন্তান হল কেন? কেন প্রমথ তাকে এমন ফাঁপরে ফেলেছে? জীবনটাকে তার এমন করে নষ্ট করে দিল কেন প্রমথ? আরশিতে মুখ দেখতে গেলে নিজের প্রতি ঘেন্নায় বিরক্তিতে তারপর মায়ামমতায় চোখের জল আটকে রাখতে পারে না, হায়, কি রূপ তার কি হল? বাড়ির লোকেরা তার চেহারা দেখে হাসে। আগে আগে শেফালীর মুখের ওপর থেকে তারা চোখ ফেরাতে পারত না বলে শেফালীর বিরক্তি ও দম্ভের আর শেষ ছিল না, এখন তাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় সে। রূপের অতিতুচ্ছও একটু প্রশংসা পাবার জন্য দিনরাত সে চারদিক থেকে খানিকটা দৃষ্টিলোলুপতার খোঁজে থাকে, কিন্তু শেফালী নিজে থেকে তাকলেও কেউ ফিরে তাকানোটা প্রয়োজন মনে করে না।

প্রমথ একটা ঢোক গিলে ভাবছে—'কই একমাস আগেও কি শেফালী একটা অবহেলার জিনিস ছিল? না জানি আজ কি বিকৃতিই হয়েছে তার।'

প্রমথ ভাবছে—'চোখ? হয়ত দেহ সঁপে দিলেও কেউ আর দেহটা ওর চাইবে না, শেফালীর আজকের এই দেহটা।'

শেফালী লিখেছে;' কেউ আমাকে ভালবাসে না।' প্রমথ ভাবছে, এর রূপকে একদিন অনেকে আকাঙ্ক্ষা করত বটে, এবং সেই জন্যই হয়ত ওর অন্তরাত্মাকেও অনেকে প্রেম দিতে চাইত, গত বছরেও শেফালীর সম্পর্কে এমন সব অনুভূতি ও পিপাসার কথা প্রমথকে জানতে হয়েছে। অপর্যাপ্ত জানতে হয়েছে। প্রমথ চোখ বুঝছে। কিন্তু আজ এই পীড়িতা আসন্নপ্রসবা মেয়েটাকে দক্ষিণা দেখাবার মতও

কেউ নেই হয়ত, মায়া মমতা মধুরতা ত দূরের কথা। কিন্তু শেফালী? সে আজও ভালবাসা চায়,—'প্রেম! কিন্তু প্রমথের ভাণ্ডাবেও ত শেফালীব জন্য এ জিনিসটা আজ নেই। কোনোদিনই ছিল না, প্রেমে পড়ে প্রমথ বিয়ে করে নি, বিয়ে করেও প্রেমে পড়ে নি। জীবনে তার প্রেমের সময় কোনোদিন না ছিল যে তা নয়, কিন্তু অনেক দিন হয় তা কেটে গেছে; প্রেমেব হেমন্ত, শীত, সেও চার পাঁচ বছর আগেব কথা।

কিন্তু এ মেয়েটি সবই পেত, প্রেম-প্রণয় মায়ামমতা স্নেহ সুখ শান্তি সম্পদ ঐশ্বর্য, একটা মর্মান্তিক আকস্মিকতায় জীবনটা তাব কি হচ্ছে, কি হয়ে গিয়েছে?

নিজেকে চাবদিককাব অশ্লীল উচ্ছৃঙ্খল নির্দয় কদর্য পৃথিবীব একটা...মনে করেছে প্রমথ। সৃষ্টির এই সৌন্দর্য প্রেম ঐশ্বর্য শান্তি সম্পদ বিধ্বংসকারী বিপুল স্রোতকে সে যেন সাহায্য কবছে, যতদূব সাহায্য সে কবতে পারে, যত বিস্তৃত, যত গভীর।

এব থেকে কেউ যেন তাকে বক্ষা কবতে পাবছে না। কেউ তিলমাত্র তাঁকে ছাড়ছে না, কত সে দিতে পারে? আর কত? কী সে দেয় নি এখনো? কতখানি বাকি রয়েছে?

শেফালীর চিঠিটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। বাতাসে এখানে থেকে সেখানে, এখান থেকে সেখানে খড় খড় খড় খড় কবে তাড়া খেয়ে ফিরছে শুধু। প্রমথ হঠাৎ উঠে পড়ে চিঠিটাকে চেপে ধবল। তাবপব আস্তে আস্তে শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে চিঠিটাকে পড়ছে সে।—'সেদিন সন্ধ্যাব সময ঘাটেব দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ ক্ষীবোদ মামা আমাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। তাবপর থমমত খেয়ে চলে গেলেন। ঘাটে আব যেতে পাবলাম না, নিজেকেই নিজেব ভয় করতে লাগল।' বাস্তবিক. আবশিতে এব যা একটু আগেই চেহাবা দেখে এসেছি, তাবপব ভর সন্ধ্যাব বেলা নিজেবই কি মনে হয না যে নিজে একটা পেত্নি হয়ে গেছি? শেফালী লিখছে-'সমস্ত গা ছমছম করতে লাগল, ঘন ঘন কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল, মনে হল এখনই বুঝি সন্তান হয়।' প্রমথ পড়ছে-'কিন্তু সে কি বেরুবে? অত সহজে? তাহলে যে আমার হাড় জুড়োয। হাড় কখানা না চিবিয়ে আমাকে নিস্তার দেবে? তুমি না এর কেউ দেবে? পেটেব ব্যথা চাপতে চাপতে অতটা দূব পথের থেকে অত ভয লজ্জা ঘেন্না মাথায নিয়ে ঘবে এলাম।'

তাবপর সারাবাত কেঁদেছি। আমাব জীবনটাকে একটুও নিস্তাব কেউ দেবে না নাকি? হ্যাঁ, কান পেতে শুনেছি ক্ষীবোদ মামা বলছিলেন প্রমথব বউটা দিনেব পব দিন হচ্ছে কি! প্রমোদবাবু বললেন শ্যাওড়াগাছেব, ক্ষীবোদ মামা বললেন আশাশ্যাওড়া—এই নিয়ে ওদেব ঠাট্টা রগড় চলল। এই লোকগুলোকে একদিন কি আমি গ্রাহ্যও কবতাম আজ যে যতবড় মুখ নয ততবড় কথা বলছে এরা?'

প্রমথের মনে হচ্ছে শেফালীব জীবন এই সব বসিকতাব থেকে ঢেব দূরে দুবে তৈরি হয়েছিল, এবং এগুলোব থেকে অনেক ওপবে চলে যেত আজ, কিন্তু পাযবা পাখিকে বাণীও পোষে, মুচিও পোষে, মুচিও কাটে, আমাদেব জীবন এখন উচ্ছৃঙ্খল।

শেফালী লিখেছে—'কিন্তু আমি কিছু বলি নি কাউকে, কাকে আমি কী বলব আর?

তোমাকেও এত কথা লিখতাম না। জানি, পৃথিবীতে আমাব কেউ নেই। কিন্তু তবুও বড় আঘাত পেলে মাঝে মাঝে এক একটা কথা জানাতে ইচ্ছে কবে। কিন্তু কিই বা জানাব তোমাকে? রোজই চোখেব সামনে কত কি যে হচ্ছে সমস্ত জীবন ভবে লিখলেও আমি শেষ কবতে পারব না সেই জন্যই অন্য সব রকম কষ্ট অত্যাচাবেব কথা রেখে নিজেব শ্রীচেহাবার কথাটা লিখছিলাম তোমাকে শুধু। আমি আর বেশিদিন তোমাকে কষ্ট দেবাব জন্য পৃথিবীতে থাকব না। জীবনে কোনো সাধও নেই আমাব আর।

সন্তান যেদিন হবে সেদিনই আমি মরব। আমি তোমাকে ববাবরই বলেছি ওকে তোমাদেব হাতে দিয়েই আমি চলে যাব। এতদিনও এব জন্যই আমি বেঁচে বয়েছি। এই সন্তানটা আমাব একটা দায়িত্ব। লেখাপড়া শিখে এই বোধটুকু অন্তত আমার হয়েছে। কিন্তু মরবাব উপায হাতেব কাছে আমাব অনেকই ছিল। কিন্তু সে সবেব কি প্রয়োজন বল? আমাব মাও সন্তান বিয়োতে মরেছেন, আমি ত তারই মেয়ে। প্রসবের সময়ই আমাব মৃত্যু। আমার সমস্ত মুখ, সাধ, শান্তি, তৃপ্তি সেই দিন—'

দু-তিন দিন পরে এমন বেশি বড় নয় একখানা চিঠি।

'কোনো কাজকর্ম পেলে? আমি থাকতে সে সব আব পাবে না তুমি কোনোদিন। বিধাতা এক একটা জীবনকে এমনি করে সাজিয়ে রাখেন। কেউ তা খসাতে পাবে না। তাই নয ত কি? নইলে আমাব জন্মেব থেকে বোর্ডিঙেব শেষ দিন অব্দি দুঃখ কাকে বলে তা ত জানি নি, কেমন নির্ভাবনায়, হাসিতামাশায

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল আমার। কিন্তু সে যাক, সে সব কথা মনে পড়লে বড্ড কষ্ট। বিয়ে মানুষ সাধ করেই করে, কিন্তু আমি অত সুখের কল্পনা কোনোদিন করতে না গেলেও কোনোদিন কি ভেবেছিলাম ঠিক এরকমটা হবে? বিয়ের পর এই দু'টো বছর যেরকম করে কাটল, বিশেষত এই বছরটা, কলেজে কোনোদিনও তা অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। বুঝতে পারতাম না মানুষের জীবনের ভেতর এত সব তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নোংরামি থাকতে পারে নাকি আবার? কেউ যদি এই সমস্ত আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে-আমাকে বলত যে ভাগ্য এর মধ্যেই আমাকে ফেলে দেবে ঠিক করেছে-ওঃ! ভাবতে আজও আমার সমস্ত গায় কাঁটা দিয়ে উঠেছে।'

আর একখানা জায়গায় লিখেছে সে 'এও আমার দুর্ভাগ্যের আর এক কিস্তি যে বিয়ের আগে চার পাঁচ বছর নানা জায়গায় চাকরি করলে, কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তোমার আর কাজ নেই। কাজের কর্মের কপাল নিয়েও আসি নি আমি। শাশুড়ি দিনরাত এই আমাকে শোনাচ্ছেন। রোজই ঘুমের থেকে উঠে 'বউয়েরে ভাগ্যে ধন, ধন না শন? মার ঝাঁটা মার ঝাঁটা' বলে ঝাঁটা হাতে করে তিনি বাড়ির কাজকর্মে বেরিয়ে যান, ফিরে ফিবে যতবার আসেন একটা সহানুভূতির কথা দূরে থাক আমাকে নিজের মনে নিজে নিরিবিলি একটুও যদি থাকতে দিতেন? তার দাঁতের গোড়া ফুললে আমিই যেন বদপুঁজ, বদপুঁজ, বিষপুঁজ আমিই যেন। ওর জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তেই কটকটিযে কেটে ফেলছি যেন, ওর ছেলেকেও এই ডাইনিটাই নষ্ট করে দিল।' প্রমথ চিঠিখানার নীচের দিকে তাকাচ্ছে-'কিন্তু তোমার কোনো দুঃখ নেই, এমন মা আছেন, আত্মীযস্বজনরা আছেন, আমি মরে গেলে আব একটা বিয়ে কেবো। তোমার জীবনে সুখ-শান্তি আমোদ-আহ্লাদ সবই হবে কিন্তু সন্তানটাকে সে যেন কষ্ট দেয় না। দেখো তুমি, কোনোদিন যেন দেয় না।

তোমার কাছে এই আমার অনুরোধ। আমার আর কিছু সাধ নেই। তোমার বউ হবে, কাজ হবে, সবই হবে। এই আসছে অমাবস্যায় আমার হয়ে গেলে, সন্তানকে তুমি এসে নিয়ে যেও, আর আমাকেও, লক্ষ্মীটি, ওদেব হাত থেকে উদ্ধার কবে তুমিই গিয়ে পুড়িয়ে এস। কপালে এক ধ্যাকড়া সিঁদুরও তুমিই দিযে দিও, আজও যা চুল আছে, বিস্তব, ফুলিযে ফুলিয়ে গুছিযে দিও তুমি, মড়া মানুষটাকে তুমিই সাজিয়ে দিও। তারপর চিতেয তুমিই উঠিও। এ লোকগুলোকে আমার এক চুলও ছুঁতে দেবে না। কিন্তু, তাহলে আমার আত্মা কষ্ট পাবে, খুব কষ্ট পাবে, ওখানে গিয়েও বাবার কোলে বসেও কাঁদবে। তোমাকে বলে রাখলাম কিন্তু। অমাবস্যাব বাতে এখানে একবাব এস তুমি।'

এর পরের চিঠিখানা—'তোমাব মা ত আমাকে অস্থির কবে তুললেন। আঁতুড় ঘর বানাতে হয়েছে-সে নিযে অনেক কিছু। কেন আমি তোমার কেউ বলে বিরানা মানুষের স্ত্রী বলে এই পরিবারশুদ্ধ লোক একটা যা তা ঘর ছাড়া আমাকে আঁতুড় তৈরি কবে দিতে পারল না। তাতেও তাদেব মস মস ভানভানের আর শেষ নেই। আমি এমনই কি চ্যাং ম্যাছের পোনা এলাম বল ত দেখি? যাক, আমাব কথা আমি আর কিছু বলব না, আমি আব কদিন? মরতেই ত চলেছি। এখন মুখটা অনন্ত মধু করে চলে যেতে পারি যেন, মনের মধ্যেও এদেব জন্য কোনো হিংসে আমি আর রাখব না। এদের সঙ্গে অনন্তকালে ভিতব কোনোদিনও ত আমাব আর দেখা হবে না। কিন্তু তবুও একটা কথা মনে হয, এই সেদিনও মেজ খুড়িমা বিয়োলেন। এই সমস্ত বাড়িশুদ্ধ লোক সেইটুকুর তক্কে তক্কে কতদিন কি মুখে ছিল নিজের চোখে দেখি নি কি আমি? যে বাজরাণীর ছেলে হচ্ছে, কত তাঁবেদারী, কত কি আগ্রহ। বাড়িব সবচেয়ে ভাল ঘবটা তার আঁতুড়ের জন্য ছেড়ে দেযা হল। তিন-চার মাস আগেব থেকেই দু-বছরের বাচ্চাটিবও সে কি হাঁক ডাকা হইচই হট্টগোল, যেন পৃথিবীতে কোনোদিনও কারু সন্তান হয নি। যেন আমি নিজেও পোয়াতি নই, কারু এতটুকু অনুকম্পা সেই সম্পর্কে আশা করতে আমার পক্ষে অভদ্রতা। বাপেব বাড়িতে বোর্ডিঙে কলেজে কোনোদিনও ত এই পবিণামের কথা ভাবতে পারি নি আমি। ক্লাসেব দু-একটা মেয়ে কীভাবে গরিবের ঘরে বিয়ে করতে পারে ভেবে অবাক হয়ে যেতাম আমি। ওদের সহানুভূতিও করতে পাবতাম না। ঘেন্না করত শুধু, আমার নিজের দিদি ও খুড়তুতো বোনদের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, ইন্সপেক্টর ব্যারিস্টারদের সঙ্গে বিয়ে হযেছে, জীবনে কত সুখ তাদেব। আর আমি নিজে আমাদের পরিবারেব সবচেয়ে আদরের ও অহঙ্কারের জিনিস ছিলাম বলেই শেষ পর্যন্ত আমার এই হল? আমার বোনদের চাকর হবারও যোগ্য নয় যারা তারা আমার ঘাড়ে ঠ্যাং না চড়িয়ে আজ আর কথা বলে না। কিন্তু বোনদের কথা বলব না আমি আর। তারা কি আমাকে ভুলেও ডেকে জিজ্ঞেস করে? বাবা-মা পর নেই, তার কিছুই নেই, কোনো অভিমান চোখের জল কিছুই তার সাজে না। কিন্তু তবুও কেউ নেই আমার। কিছু নেই।

এই কথা নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব? পারি না ত আমি আর।

কিন্তু তবুও মেজ খুমিড়া ত বাড়ির মেয়ে নন, বউ মাত্র। কিন্তু আমার মত গরিবের কেউ নন ত তিনি, কিন্তু, ছি! আমাকে গরিবের বউ বলতে আমার লজ্জা করে–আমি ঘেন্নায় মরে যাই–আমার কান্না পায়। কেঁদে কেঁদে আমি আর অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে গিয়ে একা একা চিরকালের জন্য কাঁদতে থাকা শুধু।'

এই জিনিসটাকেই আরো খানিকটা টেনে নিয়েছে শেফালী। পরে লিখেছে–'গাভিন গরুটাও সেদিন বিয়োলো তোমাদের। নিজের চোখেই দেখলাম। কিন্তু তার জন্যও আশঙ্কা, আতঙ্ক, চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, আগ্রহ এসবের কোনো ত্রুটি নেই দেখলাম। কিন্তু আমিই জানি, আমিই বা কতটুকু পাব? কিন্তু দুঃখ করে কী লাভ? এ গরুটার মত দুধ দিতে পারি না আমি, আমার স্বামীও কারু দুধের পযসা দিতে পারে না।'

এই চিঠিটা এখানেই শেষ।

পরের চিঠিটা কযেক লাইন মাত্র।; 'পূর্ণিমা ত এসে পড়েছে, সকলেই ভাবে এই পূর্ণিমাতেই হবে। হবার সময় নানারকম জিনিস লাগবে মা বললেন। তার একটা লিস্টি তোমাকে পাঠাচ্ছি কলকাতার থেকে কিনে পাঠাবার দরকার নেই। এখানেও এসব জিনিস পাওযা যায়। কিন্তু টাকাটা তুমি চিঠি পেয়েই পাঠিয়ে দিও। দশ–বার টাকা লাগবে অন্তত। যেখানে থেকে পাব, ধার কারেও এই টাকাটা পাঠাতে একদিনও দেরি করবে না আর।'

'তুমি নিজেই কি করে মেসের খরচ চালাচ্ছ সেই এক আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার কাছ থেকে কোথায় টাকা পাব তাও আমি ধাবণাও করতে পারি না। কিন্তু আমাব এই টাকা কটার জন্য তোমার মা যে কারু কাছে খোসামুদি করতে যাবেন তা ভাবতে গেলেও আমার এই মুহূর্তেই মরে যেতে ইচ্ছা করে।'

শেফালী লিখেছে। 'জীবনে লজ্জা অপমান কলঙ্ক দুঃখ দারিদ্র্য অনেক কিছুই ভোগ করলাম। কিন্তু মরবার আগে এই অপমানটার হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। ও গো, আমিজানি, এতে তোমার কত কষ্ট হবে, আমি সবই ত বুঝি। কিন্তু আমাব জন্য তোমার এই শেষ খরচ। তারপর সমস্ত জীবন তোমাকে তোমার শেফালীর জন্য খবচের থেকে নিবৃত্তি দিয়ে চলে যাব আমি। কিন্তু এই খবচটা যে আমার স্বামী করেছে জীবনেব সমস্ত ছাইভস্মের পব এই সমান ভেবে চিতের আগুনে পুড়তে পুড়তেও আরামে আমার সমস্ত শবীর ভরে যাবে।'

তা যেতে পাবে বটে। তা যাবে নিশ্চযই। প্রমথ লিস্টিটা একবাব দেখছে। গামলা, কাঁচি, বোরিক ইত্যাদি। কোনো যাদুতেই টাকা যাবে না যদিও, কিন্তু এ বাবটি টাকা জীবনে মবণের জিনিস, এ জুটে যায।

এবপর দু–তিন লাইন লিখেছে মাত্র সে। 'কেউ কেউ ভাবছে এই পূর্ণিমাতেই হচ্ছে, কিন্তু একাদশীতেও হতে পাবে, আমাব মনে হয একাদশীতেই হবে। তাহলে আর চাব পাঁচদিন বাকি আছে মাত্র। আমার বড্ড ভয কবছে।'

কিন্তু কীসের ভয? এ ত মৃত্যুকেই চাইছে। সন্তান ধারণেব সেই প্রথম দিন থেকেই প্রমথকেও ত শেফালীর এক এই মৃত্যুব জন্য তৈরি করে বাখছে।

বউকে ছেড়ে প্রমথ কি কবে থাকবে তা নয, শেফালীকে ছেড়ে কি করে তাব চলবে তা নয,কিন্তু এই নির্যাতিতা মেয়েটিকে তার বড় আদবের সুখ–শান্তি–সচ্ছলতা দিয়ে ভরে দেবাব আগে এর মুখটাকে পৃথিবীব নানাবকম অরুচি অত্যাচাব অপমান ও লাঞ্ছনায রক্তাক্ত বীভৎস করে দিয়ে–কি কবে একে সে বিদায দেবে, প্রমথ অনেকদিন বসে তা ভাবছিল। সে মুখটিব লেশ কি তার মনে থাকে? দু'জনের জীবন নানা দিক দিযেই এমনি ঢের বিষম। তাব ওপব কেনই বা এসবের ভালবাসাকে বাদ দিযে জীবন অনেক দিন থেকেই চলেছে। বেশই ত চলেছে। কিন্তু হায, করুণাকেও যদি বাদ দিতে পারা যেত! কিন্তু প্রমথ একদিনও ত তা পারল না। জীবন যত চলছে এ জিনিসটা আরো ঘিরে ধবেছে যেন তাকে। কোনোদিনও তা কি পারবে সে? করুণাকে বাদ দিয়ে জীবন চালাতে? প্রমথেব জীবনের সমস্ত মমতা করুণা এই মেয়েটিকে এর বড় প্রার্থিত সচ্ছলতা বিয়ের পর থেকেই এই দু–বছর ধরে নিজের রোজগারের একটি টাকাও ত সে এই মেয়েটিকে দিয়ে পরিবর্তে শেফালীর পরম আকাঙ্ক্ষিত সাংসারিক তৃপ্তিব সেই সারাংশটুকুও বুঝে দেখে নি। বুঝে দেখবে না কি প্রমথ? যে মেয়েটি পৃথিবীর ব্যবস্থা আশ্রয় শৃঙ্খল ও স্বাধীনতা এত ভালবাসে জীবনের সমস্ত সুখ ও কামনা যার এইটুকুর ভিতরেই তাকে তা পেতে দেবে না কি প্রমথ, বুঝে দেখতে দেবে না?

সংসারের সামগ্রী দু-হাত চেপে বুকে জড়িয়ে ধরে আজ এই মেয়েটির খুশি হয়ে পড়বার মত এমন একটা নিরুপম পবিত্র ও আত্মিক জিনিসকে জীবন থেকে আজ যদি সে কি প্রমথের জানা আছে তা? এমন পরিতৃপ্তি ও আনন্দেব উচ্চতায় উঠবার আর সুযোগও আসবে কি? আত্মাকে ও মনকে এমনকি রক্তটাকেও এমন শান্তি স্নিগ্ধ করে প্রমথের জীবনে (এছাড়া) দ্বিতীয় সুযোগ আর কোথায় কিছু নেই। জীবনে আর কোনো বিধাতা নেই তার, বিশ্বাস নেই, স্বর্গ নেই। শেফালীকে তার সমস্ত রকম অধীনতা ও যন্ত্রণার থেকে উদ্ধার করে সাংসারিক সম্পদ, সাংসারিক মুক্তি, সাংসারিক প্রসন্নাতা ও শান্তি দিক প্রমথ। এই তাব ধর্ম হোক, নীতি হোক, স্বর্গ হোক, বিশ্বাস হোক, বিধাতা হোক। এমনি করে একদিন ভেবে এসেছে প্রমথ।

এর দিদি বা খুড়তুতো বোনদের মত অতটা সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য না হলেও দিতে চেয়েছে একটা সচ্ছলতা, শৃঙ্খলা, সুবিধা, আশ্রয় ব্যবস্থা, এই সবের স্বাধীনতা, শান্তি ও তৃপ্তি দিতে চাচ্ছে শেফালীকে।

ঘন ঘন এত কলকাতায় তাই প্রমথর আসা-যাওয়া, কিন্তু পৃথিবীর চাবদকি অবিশ্রাম খসে পড়ছে যেন। শেফালীর জন্য যে কটি জিনিশ চাচ্ছিল প্রমথ সে সবের একটিরও সুখ দেখতে হলে কত দীর্ঘকাল যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে কেউ জানে না।

পৃথিবীর সম্পদ ত ঢেব দূরের কথা। সাংসারিক সামান্য একটা স্বাধীনতা অর্জন কবে নিতে যে উপকবণগুলোব দরকাব প্রমথ সে সব দিক দিয়ে নিজেকে খানিকটা মূল্যবান এক সময়ে মনে কবলেও দিনের পর দিন তার তোড়জোড়ের সমস্ত দামই কমে যাচ্ছে যেন। কেউ তাকে ভ্রুক্ষেপ করছে না, পুবনো লোকের দল বসে গেছে সব, নতুন যাবা আসছে পৃথিবীব সে এমন অতি তুচ্ছাতিতুচ্চ জায়গাও অধিকার করে নেবার জন্য যে অক্ষর সব সঙ্গে নিয়ে আসছে তারা তাতে ভবিষ্যৎটা তাদেবই জন্য।

অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে মনেব মধ্যে কোনো অযথা অন্যায্য ভবসা পুষে না বেখে ভেবে দেখলে সংসারের সুবিধা বা স্বাধীনতার দিক দিয়ে প্রমথেব কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কোনো নিকট ভবিষ্যৎ যে নেই নিতান্তই নিশ্চযই তা।'

শেফালীকে তাহলে এমনি করে কতদিন টানবে প্রমথ? নিজের জীবনেব মানে যে অধীনতা ও অপমান, যে বেদনা এই মেয়েটিকে একদিন আব প্রমথ জীবনকে বিশ্লেষণ কবে ঠিক এই জিনিসগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলবে?

আর একটা দিনেও যেন পাবা যায না।

শেফালী পূর্ণিমাব জন্য অপেক্ষা কবছিল। কিংবা একদশীব। প্রমথও ওব মতন মরীযা হয়ে নয, কিন্তু গভীর চাপা ব্যথার উত্তেজনায় অপেক্ষা কবছিল কোনো একটা তিথিব জন্য।

এছাড়া মেয়েটির জন্য কোনো নিস্তাবেব পথ পাচ্ছিল না সে। এমন চাকবি কবে সে পাবে যাতে শেফালী সুখেব মুখ দেখবে? এক বছবে? দু বছরে? কে জানে দশ বছবেও হযত না হতে পাবে।

কিন্তু কাজ অন্তত এবচ্ছবকাব তদ্বিবে কিছুই যে সে পাচ্ছে না সে ধ্রুব নিশ্চযকে ত সে দেখবে।

আগামী শীতেও কিছু হবে না। তাব পরেব শীতেও না। তাবপবই বা কি হতে পাবে? জীবন শীতেব থেকে শীতেব প্রদেশে চলতে পাবে শুধু। জীব জীর্ণ হবে, অপবিচ্ছন্ন হবে, বক্তাক্ত শীতাক্ত হয়ে পড়বে শুধু। পৃথিবীর কাছে অপ্রযোজনীযেব থেকে অপ্রযোজনীযতব হযে চলবে।

পৃথিবীর দুঃখবোধকে সে জানাতে চায না। তাব চেযে ঢেব বেশি দুঃখীবাও তা পাবে না। পেরেও যে প্রকৃত উপকারটুকু কেউ পায তার কোন মূল্য নেই। পৃথিবীর মাযামমতাব দিক নয, তাব নিতান্ত কোনো প্রয়োজনের দিক নিজেকে সে প্রযোজনীয করে তুলতে পাববে কি? দু'বছব আগে এই প্রশ্ন নিয়েই ত প্রমথ শুরু করেছিল, আজও সেই প্রশ্ন। এব পব প্রশ্নটা আবো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে. সমস্যা আরো কঠিন হতে চলবে, আবো জটিল, সমাধানটা আবো পিছিযে যেতে থাকবে।

নিজের জীবনটাকে অত্যন্ত শান্ত ও বিচক্ষণভাবে পাঠ কবে প্রমথ এ ছাড়া আব কোনো কিছুই দেখছে না।

কিন্তু জীবনেব এক অনিশ্চযতাব পাকে প্রভাবে শেফালীকে আব নড়াতে চায় না প্রমথ, সে রকম জীবনকে এই মেয়েটি দু'বছব ধবে গ্রহণ করে মানুষের মনপ্রাণের বেদনাকে একটা অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়েছে প্রমথকে। তার থেকে শেফালী নিস্তার পাক, তার থেকে শেফালী নিস্তাব পাক।

টেলিগ্রাম করবার জন্য বাড়িতে লিখে দিচ্ছে প্রমথ। কোনো কিছু হলেই অবিলম্বে যেন টেলিগ্রাম করে প্রমথকে জানায় তারা।

একটা টেলিগ্রামের জন্য অপেক্ষা করছে প্রমথ। হলই বা এমন শেফালীর মৃত্যু, যে জিনিসটাকে প্রকৃতভাবে যেন সে গ্রহণ করতে পারে। এ নিয়ে মুষড়ে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে শূন্য দেখতে দেখতে সত্যকে যেন প্রমথ না ভোলে, শেফালী যে সমস্ত নিরর্থকতার থেকে নিস্তার পেয়েছে এই সত্যটা।

কাল একাদশী গিয়েছে।

কোনো টেলিগ্রাম আসে নি।

আজ বিকেলে শেফালীর একটা চিঠি এসেছে। তার নিজের হাতেই লেখা কি আশ্চর্য, প্রমথ ভেবেছিল না জানি কি নাকি একটা হয়তো কিছু একটা হয়ে গিয়েছে।

যাক, প্রথম বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে খামটা হাতের ভেতর রেখে, শেফালী তাহলে বেঁচে আছে। কি গভীর পরিতৃপ্তি, বেঁচে আছে সে?

শেফালী লিখেছে—'আজ একাদশী শেষ হতে চলল, কিন্তু আজও কিছু হলনা। দাই এসেছিল, অক্সফোর্ড মিশনের একজন সিস্টারও এসেছিলেন। সিস্টার আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পেটটা দেখলেন—ইত্যাদি। একটা ফিতে দিয়ে পেটটা মেপে দেখলেন। বললেন সন্তান বেশ বাড়বাড়ন্ত গড়নের হয়েছে। বললেন—'ভয় নেই কিছু?' ওরা সবাই বলছে—'হয়ত পূর্ণিমায়ই হবে।' যা হোক, এখন হবে, তখন হবে, কাল হবে আজ হবে এই নিয়ে অনেক প্রতীক্ষা করেছি, আর না। আর পারি না রে বাপ। যখন হবে, তখন হবে। এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি কেন? ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা আশ্বস্ত থাকতে পারি না।

শেফালীর চিঠিতে একটা নতুন সুর।

প্রমথকেও আশ্বাস দিচ্ছে।

প্রমথ পড়ে যাচ্ছে—'জানো কিছুদিন হল মাসিমারা এসেছেন, মাসিমা আর মেশোমশায় এসে পড়াতে আমার ঢের সুবিধা হয়ে গেছে। তোমাদের এ বাড়ির যে কোনো লোকের চেয়েই এ দু'টি মানুষকে আমার ঢের বেশি ভাল লাগে। এরা খুব আন্তরিক। আমরা সুখ-সুবিধার জন্য এসে দু'জনের সে যে কি আগ্রহ তোমাকে কি বলব' তোমার মার থেকেও মাসিমার ঢের সহানুভূতি। মেশোমশায় মানুষের কথা এত ভাবেন, মনের ভেতরকার সবচেয়ে টনটনে কথাটা এমন ফট করে ধরে ফেলে চোখের জল না ফেলে আর পারা যায় না। এতদিন নিজের মনে নিজের কাছেই অভিমান করেছি। সে যেন অনেকটা অভিনয়ের মত; তার ভিতর কোনো প্রাণ ছিল না যেন কি, এবার জীবনে প্রকৃত রস এসেছে, দুঃখের মধ্যেও। আশ্বাসের মধ্যেও; ধররার ছোবার বুঝবার বোঝাবার মত দু'জন মানুষকে আমি পেয়েছি বলে। এদের কাছে কেঁদে সুখ-কেঁদেও। কিন্তু এরা আসবার পর কান্না আমার কমে গেছে। বাস্তবিক এরাও ত প্রায় আমাদের মতই দরিদ্র। কিন্তু তেমন কোন উপকরণ নেই ত, তবুও কেন এরা ভাবে যে মানুষের আশ্বাসের দরকার যেখানে যা উপকারের প্রয়োজন সেখানে এদেরই প্রয়োজন? কেন এরকম ভাবে এরা? কিন্তু ভাববে না ত কি?'

কারণ জানাচ্ছে শেফালী। নিজের জীবনের বিশেষ রকমের প্রয়োজনে এদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করছে সে—এমনই অপরিহার্য।

শেফালী তাহলে টিকে থাকতে চাচ্ছে। হয়ত জীবন একরম বদলাচ্ছে। হয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি এসে জীবনের কোনো নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে সে। কিংবা নতুন দৃষ্টি দিয়ে পুরনো জীবনটাকে দেখে সে। কিংবা হয়ত বুড়ি পৃথিবীরই এই বিমুগ্ধতা। মরণমুখো মানুষকে দিয়েও সে ভালবাসার কথা বলায়, আশ্বাসের কথা, মুগ্ধা-মুধরতার কথা, পরিতৃপ্তির কথা।

এসবের ভিতরেই নিস্তার রয়েছে। বেঁচে থাকলে এরপর জীবনটাকে এর শত তিক্ততা সত্ত্বেও মধুর করে বুঝবে হয়ত শেফালী। কিংবা আর একটু কম তিক্ত করে।

শেফালী লিখেছে, 'দেখ মেশোমশায়কে' ছাই তোমাদের বাড়ির লোক সব। মেশোমশায়ের মতন এমন আর একজন লোক দেখবে না কোনোদিন। আমাদের বাড়ির থেকে তিন-চার মাইল দূরে থাকেন, কিন্তু যেই শুনেছিন আমাদের বাড়িতে দুধের ভাল বন্দোবস্ত নেই, বিশেষত সকালে দুধ পাওয়া যায় না, অমনি কোথেকে গোয়ালা জোগাড় করে গাই দুইয়ে সেই শেষ রাতে দুধ গরম করে একটা ফ্লাস্কে করে অন্ধকারের ভিতর তিন-চার মাইল হেঁটে এসে আমাদের বাসার কেউ না উঠতেই ভোরের বেলায় সেই দুধ আমাকে দিয়ে যান। এমনি রোজ। তারপর আমি হাত-মুখ ধুয়ে সেই গরম-গরম দুধ খাই, অনেকখানি খাই। বেশ ভাল লাগে। আজকাল শরীরটা সেরে উঠছে আমার।'

প্রমথ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছে।

এমন আরাম জীবনে সে কদিন পেয়েছে আর একটা আঙুলের কর গুণেই বের করতে পারা যায় যেন।

আকাশ গভীর নীল। সকালবেলার রোদ প্রাণভরে তার আবশ্যকতার প্রিয় কাজ করে যাচ্ছে। জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলোই যেন খুব প্রিয়, খুব নরম। কলকাতার রাস্তার এমন নিতান্ত তুচ্ছ লোকটাকে দিয়েও জীবনের যেন ঢের প্রয়োজন রয়েছে। নিতান্ত গোপন এবং প্রিয়তম প্রয়োজন সব। প্রমথের হৃদয়ের ভিতর কোনো প্রশ্ন নেই আজ, মীমাংসা রয়েছে, তারই কি গভীর আশ্বাস ও পরিতৃপ্তি।

বিকেলের ডাকেই শেফালীর চিঠি আবার।'—'বাড়ির সকলে বলছে মেয়ে হবে কিন্তু কখনো না। তুমিও আমাকে বলেছ যে ছেলে হবে। ছেলে হলে তার জন্যে যে হার গড়িয়ে দেবে তার ফরমাজ এখনই দিয়ে দাও? ভেবেছিলাম যে এর মধ্যে তুমি চাকরি পাবে। তুমি যে চাকরির কথা কিছু লেখটেখ না আজকাল আর; চেষ্টা কর না, খুব খোঁজাখুঁজির দরকার। আজকাল যা দিনকাল পড়েছে। কিন্তু ভগবান আমাদের একটা উপায় করবেনই। তুমি ভেব না, তোমার চাকরি হবেই। আমাকে নিয়ে তুমি সুখে সংসার করতে পারবেই। আমার ভিতর থেকে কে যেন বলে দিচ্ছে যে ছেলে হলেই চাকরি হবে তার বাবার। ও নিশ্চয়ই খুব ভাগ্য নিয়ে আসবে। এতটা আশা ও আশ্বাস এর আগে আমি কোনোদিন পাই নি। এখন যখন প্রতি মুহূর্তেই পাচ্ছি তখন নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্য না ফিরে যায় না। খোকা তুমি আমি আমরা তিনজনে মিলে সুখে সংসার পাবে। এইখানে আর না। খোকা হলেই তুমি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে। খোকা হলে তুমি খবর নেবে। হার গড়াতে দেবে কিন্তু, কলকাতার সবচেয়ে ভাল স্যাকরার দোকান থেকে। আর দেখে নিও সোনায় যেন কোনো খাদ না থাকে। সোনা খারাপ হলে খোকা কাঁদবে কিন্তু। কালও সিস্টার এসেছিলেন, বললেন সন্তান যখন এত বাড়বাড়ন্ত গড়নের তখন নিশ্চযই ছেলে, দাইও তাই বলল। মাসিমারাও বললেন যে সন্তানের মাথাটা (পেটে হাত দিয়ে এরা কেমন করে সব বুঝতে পারে?) যখন বড় তখন খোকাই দেবে। আমি ত জানিই যে খোকা হবে। অবিশ্যি মেয়ে হলে আমার কোনো কষ্ট ছিল না, মেয়েরা কি মানুষ নয়? কিন্তু প্রমথ যেন খোকা হয। তাই হবে না? নিশ্চয হবে। নইলে পেটে এত কষ্ট পাচ্ছি কেন আমি। এই নটা মাস যেরকম যন্ত্রণা পাচ্ছি মেয়ে হলে তা হত না। একটা দুর্বৃত্ত বিষ অত্যাচাবী ছেলে পেটের ভিতর, সমস্ত কষ্ট ব্যথার ভেতব এই ভেবেও খানিকটা সুখ পাওয়া যায়।'

'এখন থেকেই খোকার জন্য সোনার গয়নার তক্কে-তক্কে থেকো। টাকা জোগাড় কবতে তোমাব খুব কষ্ট হবে জানি। কিন্তু সেই বার টাকা ত পাঠিয়েছিলে। অন্যথা মেয়ে হলে ববং কিছু নাই বা দিলে। কিন্তু মেয়ে কি হবে?'

চিঠিখানার এইখানেই শেষ।

পরের দিনই শেফালীর চিঠি। 'পূর্ণিমার আর দু-তিন দিন বাকি আছে। কি জানি, কখন কি হযে যায়। যাক সে সব কথা। তুমি এই চিঠি পেযে আমাকে চারগজ সোনালি জবি পাঠাবে, আর চার-পাঁচ গজ সিল্ক, বুঝলে? সিল্ক খুব লাল টুকটুকে দেখে। কেন এইসব পাঠাতে লিখছি জান? আমার জন্য নয়, কিন্তু যে হবে তার জন্য। তার জন্য সিল্ক দিযে সুন্দর ছোট ছোট বেনিযান আর ফ্রক তৈরি হবে। তুমি হয়ত ভাবছ এই আমি মরতে চাইলাম, এই আবার ফ্রকের কথা। কিন্তু আমি মরে গেলেও এই সিল্ক আর জরি ত আমার সঙ্গে চিতেয পুড়বে না। ওর জন্য এসব দিযে সুন্দর সুন্দব ফ্রক বেনিযান তৈরি হবেই। আমাদের বাড়ির কেউ যদি নাও কবে দেয, তাহেলও তুমি দরজি দিযে ওকে করিয়ে দিও, বুঝলে, তোমার কাছে আমাব এই অনুরোধ। তাহলে আমি খুব শান্তিতে চলে যেতে পারব।'

প্রমথ চিঠিখানা পড়তে পড়তে থেমে একবার ভাবছে।

প্রমথ পড়ছে'—কিন্তু মরব কেন বল? এখন আমাব মরবার ইচ্ছে নেই আর। লাল টুকটুক সিল্ক দিযে ওর জন্য জামা তৈরি করতে ইচ্ছে করছে শুধু জরি বসিয়ে বসিয়ে।'

চিঠিটা এইবকম আকস্মিকভাবেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এইরকম ভাবে শেফালী কোনো দিন চিঠি শেষ করে না, ওর বলবার কিছু কি আর ছিল না? কিন্তু এখন হঠাৎ থেমে গেল যে? খামখানার ওপর পরের দিন লিখছে; '—সময় যত ঘনিয়ে আসছে ততই আমার ভয় করছে। ওগো, কেন আমার এত ভয় করে? যদিও-বা মরি তাহলেও বাবার কাছে ত চলে যাব। কিন্তু তবুও তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। এতদিন তোমার ওপর ঢের খারাপ ব্যবহাব

করেছি। মৃত্যুর আগে তুমি একবার এসে দেখে যাবে না? সব অপরাধ ক্ষমা করে যাবে না? আর মরি যদি তাহলে তুমি আমাকে—দূর! সত্যিই কি আমি মরব? মাসিমারা এসেছেন। আমি আর লিখতে পারছি না। তুমি যে আমাকে টিকিট পাঠিয়েছিলে সব ফুরিয়ে গেছে। চিঠি পেয়ে এক টাকার টিকিট পাঠিয়ে দিও। নইলে তোমাকে লিখতে পারব না।'

ঠিকানা অন্য হাতের লেখা।

পূর্ণিমাব দিন টেলিগ্রামই এল—সন্তান, মেয়ে। বেঁচে আছে। কিন্তু শেফালী চলে গেছে।

আর এক পূর্ণিমা গেল। আর এক পূর্ণিমা গেল, আর কে পূর্ণিমা, আবো দু'তিনটে পূর্ণিমা চলে গেছে।

লাল টুকটুকে সিল্ক জরি, সমস্তই প্রমথ সময় মত পাঠিয়ে দিয়েছিল। দেশের বাড়িতে সবই বয়েছে শেফালীব বাক্সব ভিতর। মৃত্যুর সময় নাকি ওব শিযরের কাছে এইসব রেখে দিয়েছিল শেফালী। অসচ্ছল দরিদ্র জীবনের ভিতব এই ওর খানিকটা সম্পদের মুখ। স্বপ্ন তাব। কল্পনায় প্রমথ পবিতৃপ্তি পাচ্ছে। অনিযন্ত্রিত না জানি কত কি সমৃদ্ধিব ভবিষ্যৎ। পৃথিবীব ঐশ্বর্য নিযেও মানুষ সুখী হয না। কিন্তু এক গজ সোনালি জরিও তাকে অনির্বাচনীয় সন্তোষ দিতে পারে। মানুষের মনটা নিযেই ত কথা।

কিন্তু পরিপূর্ণ সন্তোষ নিয়ে শেফালী যেতে পাবে নি। মেয়ে হয়েছিল বলে ওর দুঃখ হয়েছিল নাকি। কিন্তু সিল্ক জরি পেয়েও ভরা দু'টো দিন অনেক তৃপ্তি ও স্বপ্ন নিয়ে সময় কাটাতে পেবেছিল। মেয়ে হবার দুঃখ। ওর বড় জোর দু-চার মিনিট ছিল। কিংবা সে দুঃখ হযত বোধও করতে পারে নি শেফালী। গভীর মৃত্যুযন্ত্রণায় পৃথিবীব আব সমস্ত কষ্টই প্রলেপের মত নয় কি?

মেয়েকে কোলে নিয়ে বসেছে প্রমথ।

জরি কালো হযে গেছে, সিল্কের বঙ চটে গেছে। তেমন লাল টুকেটুকে আজ আর নেই। গরিব মানুষ কিছুতেই পযসাব জোগাড় কবে না উঠতে পেবে শস্তায় হাতের কাছে যা পেযেছিল তাই কিনেছিল প্রমথ। কিন্তু দোকানদার ত জিনিসগুলোর খুব নিঃসঙ্কোচ প্রশংসা কবেছিল। অনেক দিন বাক্সে থাকায় সিল্ক পোকায় কেটে গেছে, কিন্তু তবুও খুকুনের জন্য বেশ কয়েকটা ফ্রক তৈবি হযেছে। তাবই একটা ফ্রক পবানো হযেছে খুকুনকে আজ। জামাটা ঢলঢলে হযেছে বেশি। খুলে খুলে যাচ্ছে। জামার লাল রঙের দিকে, জরির দিকে বিমুগ্ধ হযে এক একবাব তাকাচ্ছে মেযেটি। ওর মাও এমনি কবে তাকিয়েছিল। কিংবা আবো ঢেব নিশ্চয নিবিড়তা ও পবিতৃপ্তিব সঙ্গে। সে আবো ঢের বিস্তৃত ও ব্যাকুল জিনিস। শেফালীকেই দু'টো দিন, শেফালীব কাছে তা আবো ঢেব পবম। মেযেটি সে সবেব কিছু বুঝবে না। কিন্তু মেযেটা ওব মাব মত হবে না।

জীবনের প্রথম দিন থেকেই ও প্রমথেব হাতে পড়েছে। ওব শিক্ষা দীক্ষা সহিষ্ণুতা ক্ষমা চিন্তা উপলব্ধি দিযে ওকে এমনই কবে গড়ে তুলবে প্রমথ যে পৃথিবীব কোনো দুঃখেই ও একদিনের জন্যও মুষড়াবে না।

দুঃখ এ মেযেটি পাবেই। হযত ওর মাযেব চেযে ঢেব বেশি কবে। কিন্তু তাব জন্য এখন থেকেই শিক্ষা চলেছে।

শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা

সত্যব্রত কিছুকাল হল তার বোনটিকে দেখে আসছে। মাধুরী কলেজে উঠবার জন্য অপেক্ষা করছিল না। এর ঢের আগেই সে জীবনের পরিবর্তন অনুভব করে আসছে। জীবনের বিপুল কুহকও আকর্ষণ।

সত্যব্রতের বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। জীবন তার ক্রমে ক্রমে স্থিবতা ও শীতলতাব দিকে চলেছে।

মাধুরীর বয়স সতের। এই ফার্স্ট ইযারে উঠেছে।

এই মেয়েটিকে কেউ কি আকর্ষণ করছে? কোনো পুরুষ? এ জিজ্ঞাসার বাষ্পও সত্যব্রতের মনের ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন জাগছিল না। হয়ত তার বোনের মনের গতিবিধি সম্বন্ধে এ যুবকটি বরবারই কোনো কৌতূহলেরই প্রয়োজনীয়তাও বোধ করত না। কিন্তু তুবও অনেক মানুষ নিয়ে এই পরিবার। মাধুরী নিজের জীবনের ভিতর যে হাওয়া তৈরি করে তুলেছে সত্যব্রতকে খোঁচা দিযে দেখিযে দিযেছে তারা।

মাধুরীব ভালবাসাটাকে সকলে মধুব চোখে দেখছে না। নানারকম ব্যস্ততা ও ... ফাঁকে ফাঁকে এরপর মাধুরীকে লক্ষ্য করে চলেছে সত্যব্রত।

জ্ঞানবাবুদের বাংলোতে সময়ে অসময়ে গ্রামোফোন বেজে চলে। একটা রেডিও বসিযেছে তারা। পূজোব ছুটিতে সবাই যখন দেশে চলে গেছে, জ্ঞানবাবুর ছেলে বিনযেশ বাংলোটা আঁকড়েই রইল, দিন-রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময়ে বাছা বাছা রেকর্ডগুলো চড়িযে দিচ্ছে বিনযেশ। বাড়িতে লোকজন কেউ নেই। এমনই রেকর্ড পছন্দ কবে নাকি সে, একাই সে নাকি শ্রোতা? সত্যব্রতের জানালাব ফাঁক দিযেও বিনয়েশকে দেখা যায়। কেবিনেট চেযাবে পা ছড়িযে চুরুট টেনে চলেছে, গান শুনছে? হযত, হযত না। কিন্তু নিজের মুখে বেকর্ড বেজে উঠতেই মাধুবী তার পড়ার ঘব থেকে নেমে আসছে। একেবাবে দক্ষিণের বারান্দাব দিকে চলে যাচ্ছে, বেতের চেযাবটা টেনে, চশমাটা আঁচলে মুছে নিযে ভাল কবে এঁটে, শুনছে! শুনছে সে, দেখেছেও বটে, চশমা পরিষ্কাব করবার আবশ্যকতা ছিল তাব।

মাধুবীব মন গানেব দিকে তবু খানিকটা, বিনযেশের অভিনিবেশ না বেকর্ডেব দিকে, না চুরুটেব দিকে, এমনতর বোদ নীলিমাব....শালিখ ও আউশ ধানেব বিস্তৃত পৃথিবীটাকেই ববং যেন সে একটু গ্রাহ্য করছে, কিংবা তাও করছে না। কিন্তু মাধুবীর একটা সামান্য তাব জন্য অতিতুচ্ছ মুগ্ধতাও সৃষ্টি করে চলেছে; এই মেযেটিব সান্নিধ্য, তা ত মোটে নিকটে নয। গিযে বিমুগ্ধ হযে থাকবাব জন্য সমস্ত পূজোব ছুটিটা একা একা মস্ত বড় প্রেতপুরীর মত দালানে পড়ে রযেছে সে। জ্ঞানবাবুব বিপুল অর্থসম্পত্তিব উত্তরাধিকারী এই ছেলেটি। এত ধনসম্পদ নিযেও মাধুরীব চেযে মূল্যবান কোথাও কি কিছু পেল না সে?

মনে ত হয কোথাও কিছু পায়নি আব বিনযেশ, কোনোদিনও আব পাবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ তবুও মানুষের জন্য কত সাধারণ অস্বাভাবিক সত্য ও সিদ্ধান্ত স্থিব করে বাখে। এই দু'টি ছেলেমেযে জীবনের সেই দূর দূবান্তেব দিনে এখনকার এই স্মৃতিটুকুকে মনেও বাখবে না হয়ত, হযত কেউ কাউকে চিনবেও না।

কিন্তু এখন এদের সাধের মুহূর্ত চলেছে। যে ভালবাসা আলাপ চায না, স্পর্শ চায না, পবস্পবের দূর দূরের অনুভব নিযেই তৃপ্ত, সেই ছেলেমানুষি আমেজ চলেছে এদের জীবনে। একেই হযত এবা প্রেম বলে ভাবে। তারই ওপর না জানি কত কি গড়ে এরা, কত কি ভাঙে।

সত্যব্রতের নিজেব জীবনেও এবকম প্রেমানুতা এসে ছিল নাকি? এরকম? না, কোনোদিন এ জিনিস পায় নি সে। ঘুবে ফিবে কতকগুলো ভালবাসার গানেরই বেকর্ডেব ফাঁকে মাধুরীকে দিনবাত্রির যে কোনো অবান্তর সমযেই আটকে ফেলে উপভোগ করতে পাবে বলে বিনযেশেব বিমুগ্ধতার আব শেষ নেই। কিন্তু মাধুরীকে ঠিক বুঝতে পারছে না সত্যব্রত। বোনটি কি তাব এই ছেলেটিকেই ভালবাসে? বোনকে সে জিজ্ঞেস করবে না কিছু। এর জীবনের নিভৃত দিকটাকে খোঁচা দিতে যাবে না।

বিনযেশ-মাধুরী কারু হৃদয়ই হয়ত রক্তাক্ত প্রেমপ্রণযতায় গিযে দাঁড়ায নি এখনো। হয়ত সে-সবেব এখনো দেরি রয়েছে। যেমন সময়ও যখন আসবে হয়ত তখন পরস্পবের নিকট এদের পরস্পরের কোনো প্রয়োজনও নেই। এটা এদের হয়ত ভালবাসার প্রথম হাতেখড়ি মাত্র। কিন্তু হয়ত বিনয়েশ ভালবেসে খানিকটা ব্যথা বোধ কবছে; ছেলেটাকে দিনের পর দিন উন্মুখ (উশখুশ) করে ঘুরেফিরে দেখছে না কি

দেবব্রত? এবং মাধুরী, এটা হয়ত তার ভালবাসা নয়, মনটাকে নিয়ে একটু খেলা মাত্র, কোনো টকটকে রঙ নেই এর তেভর, কোনো রকমেই কোনো ব্যথা নেই, একটু সবুজ আভা রয়েছে শুধু, তারই মধুরতা।

মথুরবাবুদের পরিবার সত্যব্রতদের বাড়িটাকে আর একটু ঘেঁষে রছে। মথুরবাবুরা সাংসারিক সচ্ছলতার অভাবে অনেক দিন থেকেই কষ্ট পাচ্ছে। সম্প্রতি দারিদ্রটা খুঁটিয়ে উঠেছে বেশ।

কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে টাকাকড়ির কী সম্পর্ক? মথুরবাবুর ছেলে অসিত এই প্রশ্নের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না যেন আর। এখনো সে কলেজ থেকে বেরয় নি বটে, জীবনের জন্যে তৈরি হচ্ছে মাত্র। কিন্তু সে জীবন যে তার বিশেষ ভরসাব হবে না সে তা খুব ভাল কবেই জানে। মথুরবাবুদের বাড়ির মানুষদেব জীবন কখনো কোনো পড়তা পরে না, সাংসারিক দুর্ভাগ্যের জন্য এরা বিখ্যাত। কিংবা দুর্ভাগ্যই শুধু নয়, অসিত ভাবছে এটা তাদেব অক্ষমতা। প্রাণপণে চেষ্টা করবে বটে সে নিজের ভাগ্য পরিবাবের ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু দাদাবাও ত চেষ্টা করেছিল তার আগে বাবা জেঠারা, সবচেয়ে হতভাগ্য মথুরবাবু নিজে কোনো প্রয়াসেরই কি কিছু বাকি বেখেছিল? কিন্তু পরিশ্রম সাধনায়ই শুধু হয না, প্রতিভারও যে দরকার। অসিতের এই রকম মনে হচ্ছিল। নিজের ভিতরেও কোনো ক্ষমতা নেই। কোনো প্রতিভা নেই তার। মাধুবীকে সে ভালবাসে। কিন্তু ভালবেসে কোনো সাহস নেই তার। মাধুরী জানেও না অসিত তাকে ভালবাসে কিনা, জানাবাব আকাঙ্খাও যদি না থাকত, অসিতের ভাল হত। কিন্তু সে সাধও মরে গেছে তার। এই হীন তুচ্ছ বিলাসেব আকাঙক্ষাটুকুও। কিন্তু ততটুকুও কোনো সামর্থ্য নেই তার। এই পরিবারের রক্তেই শক্তি বলে জিনিস কোনোদিনই কি ছিল? সাহস বলে একটা জিনিস?

বিনযেশের সমাবোহকে চায না অসিত, কিন্তু ওর মত একটু ক্ষীণ আত্মপ্রত্যযও যদি থাকত তার। ঘুবে ফিরে সেই সাহস স্বাধীনতা। এসবেব একটুও যেন নেই তার।

কিন্তু তবুও সে ভালবাসে, মাধুরীকে।

একচিলতি চিঠি অন্তত মেযেটিকে পাঠাবাব জন্য কতবাব সে ভেবেছে। লিখেছে কতবাব। প্রথমে বড় বড় চিঠিগুলো প্রেমিকেব প্রযোজনীয জিনিসে গাদা কিন্তু তবুও পবিপূর্ণ কি? তাবপর সাহসের অভাবে কোট পকেটে গুটিযে নিযে এক টুকরো কাগজেব প্রাণহীনতা; কিন্তু সে আসাড় জিনিসটাও মাধুরীকে নজরে আনবার মত সাহসে কুলোয নি তাব। সুবিধা ও সুযোগের, অসিতের মত এত কে তা পেযেছিল? অপর্যাপ্ত অপচয কবে গেছে সে শুধু।

কিন্তু তবুও অসিতি যে মাধুবীকে ভালবাসে, জীবনেব দ্বিধায জড়িত যে এই ছেলেটি এই মেযেটি সত্যব্রতদেব বাড়িব কেউ কেউ খানিকটা আঁচ পেযে গেছে বটে তাব। সত্যব্রতও জানল।

কিন্তু মাধুবী কি জানে?

সত্যব্রত অবাক হযে ভাবছে মাধুবী জানে কি?

বোনকে সে এদিক দিযে আবিষ্কাব কবে নিযেছে আবাব। এই ছেলেটির সঙ্গেও কথার্বাতার কোনো ব্যবহার নেই মাধুবীব। ওদেব বাড়িতে সে তেমন যায না। ছেলেটিও এ-বাড়িতে বড় একটা আসে না। কিন্তু তবুও দু'জনে দু'জনকে জানে যেন। অসিতদাকে মাধুবী হৃদযেব কোনো এক জাযগায বেখে দিযেছে বটে, সে জাযগাটা নরমও বটে, নবম, কোমল, মধুব নয কি? কিন্তু তবুও অসতিকে নিযে কোনো প্রেমপ্রবণতা নেই মাধুবীর। কোনো প্রাণ নেই, কোনো প্রেম নেই। বুঝতে পারছে সত্যব্রত।

বোনের হৃদযে প্রেম বযেছে কি?

বযেছে, রযেছে যেন, ডাযেবি লিখছে মাধুবী। দু-এক পাতা চোখে পড়ে যাচ্ছে, কবিতা লিখবাব ছেলেমানুষি একটা প্রচেষ্টা চলেছে, কবিতা কিছু নয। কিন্তু প্রতিটি উপযুক্ত শব্দ খুঁজবার প্রযাসের ভিতর বিষম বেদনা লুকিযে বযেছে ওর, সমস্ত মানবাত্মা আবক্ত হযে উঠেছে যেন ওব। গভীব অনুভূতিপ্রবণ গানেব খাতা ওব বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে। কিন্তু কাকে এ ভালবাসা? বিনযশেকে নয নিশ্চযই, অসিতকেও নয। কে সে তৃতীয?

বিনযেশের বেকর্ডে, ভোরে, দুপুরে, জ্যোৎস্নারাতে নক্ষত্রের সমারোহের ভেতর মাধুরীর প্রেমপ্রবণতা চরিতার্থ হচ্ছে শুধু, গভীর ভাবেই, কিন্তু এইটুকুর বেশি আর কিছুই নয, বিনযেশ ওর লক্ষ্য নয, বিনয যদি না থাকত, তার রেকর্ডগুলো থাকলেই যেন হয, তারপর এই নক্ষত্র রযেছে। অন্ধকার রয়েছে। শরের বন, বাবলাব বনজঙ্গল, আউশ ধানের অনন্ত বিস্তৃত খেতপারের নীচে, নিজেকে নিজে নিযে বসে রইবার একটা অভঙ্গ অবসর এই, এই সবই ত রয়েছে।

পূজোর হুজুকে দেশটা লোকজন ছাড়া হয়ে গেছে একবারে। সকালবেলাটাই ঢের নির্জন, ধানের

খেত ও বনের ঘনিষ্ঠতায়, স্নিগ্ধ রোদে শান্ততায়, না জানি কবেকার আনুপূর্বিক আজও সেই ঘুঘুগুলোর ডাকে, দুপুরের ডাঙা কি মধুর।

সত্যব্রতব মনে হচ্ছিল, নাই বা থাকল জীবনে কোনো প্রেম, পৃথিবীর এই রমনিবিড়তা মমতাটা নিয়ে থাকতে পারা যায় না কি?

সাধনা একটা বেতের চেয়ারে এসে বসল। খাওয়া-দাওয়া ও স্নানস্নিগ্ধতার পরে খানিকটা মমতা নিয়ে এসেছে সে।

মাধুরীর কথা উঠেছে।

পড়েছে সাধনা নিজেই।

সত্যব্রত বরং শুনছে।

সাধনা বললে, 'আমাকে ওর ডায়েরি দেখাল।'

সত্যব্রত স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বললে, 'কিন্তু আমার কাছে সে-সব গোপনীয় কথা চেপে রাখবার অনুজ্ঞা রয়েছে মাধুরীর, তাইই রয়েছে। বাস্তবিক ও কি লিখেছে না লিখেছে আমি শুনতে চাই না।'

সাধনা বললে 'তোমাকে বলতই বা কে? বড় ভেবে বসেছ আমি তোমাকে শোনাতে এসেছিলাম—আমি কেন বলব তোমাকে? সম্পর্কই বা কি তোমার সঙ্গে আমার—স্বামী মাত্র, এব চেযে ত বেশি কিছু নয়।' সাধনা বললে, 'তার চেয়ে ববং মাধুরীর সঙ্গে ভাব বেশি আমার। সত্যব্রত স্ত্রীর দুষ্টুমি ও পরিহাসের দিকে তাকিযে বযেছে। দু-চার মিনিট দু'জনেই চুপ।

সাধনা হঠাৎ একটু খিৎ খিৎ কবে উঠে বললে, 'আমাকে ডাযেরি দেখিয়েছে, বেশ কবেছে, আমি ত চাইনে দেখতে, যখন দেখিয়েছে আমার যাকে খুশি তাকে বলব। দেখাল কেন?'

সাধনা বললে, 'আর স্ত্রী বুঝি স্বামীব কাছে কিছু বলতে পারবে না? জীবনেব সমস্ত দরকাবি কথা স্বামীকেই ত সবচেয়ে আগে এসে বলা উচিত তাব। তাই না?'

সাধনা বললে, 'আমি বলব তোমাকে, মাধুবীবও ত তুমি পর নও। তোমাব বোন।'

সাধনা বললে, 'এবং বলাও দবকাব, মাধুরী কলেজে পড়তে আবম্ভ করেছে বটে। কিন্তু আমি ভেবে পাই নে কদ্দিন আর সে পড়বে। ওব জীবনটা সম্বন্ধে মা বাবা বা তুমি একটুও কি ভাব? আমিও বড় একটা ভাবতে যেতাম না, কিন্তু যখন সমস্ত বুঝলাম, যখন জানাল আমাকে তখন মনে হয ওব আব পড়ে শুনে দরকাব নেই।'

সত্যব্রত স্ত্রীর মুখেব দিকে তাকাল।

সাধনা বললে, 'তোমাকে ডাযেরিটা দেখাব।'

সত্যব্রত বললে, 'কী কবে?'

—'চেয়ে এনে, তোমার নাম কবব না অবিশ্যি, আমি নিজে পড়ব বলে নিয়ে আসব, তা দেবে।'

সত্যব্রত বললে, 'থাক।'

—'ডাযেবিটা তোমাব দেখা উচিত।'

বিনযেশেব গান দেখিযে সত্যব্রত বললে, 'কেন?'

—'মেযেটিব মনের অবস্থা বুঝবে তুমি।'

সত্যব্রত একটু উপহাস কবে বললে, 'চশমা এঁটেও পবেব ডায়েরি খুঁচবাব সাধ, সে তোমাবই থাক। আমাব চশমাও নেই, সাধও নেই, কিছুই নেই।'

সাধনা বললে, 'বোনটি তোমার যদি একদিন কেলেঙ্কারি করে বসে তাহলেও এমনি নির্বিকাব থাকবে তুমি?'

কিন্তু কেলেঙ্কারি কি! সাধনাব কাছে যা কলঙ্ক সত্যব্রতেব কাছে ত তা তেমন কিছু নয়। কিন্তু এ নিযে স্ত্রীর সঙ্গে কথা চালাবাব কোনো প্রবৃত্তি করছে না দেবব্রত।

সাধানা বললে, 'কলঙ্ক একদিন হবেই, আমি বলে রাখছি তোমাকে।'

সত্যব্রত একটু ঠাট্টা করে হেসে বললে, 'তুমি ত বলছ, কিন্তু সে ত তোমাকে ডাযেরি না দেখালেও পারত, চাবি এঁটে দেরাজে লুকিযে রাখলে তোমার এ কলঙ্ক থাকত কোথায়! এমন বড়দিব সঙ্গে বন্ধুতা পাতানোর কি দরকার ছিল মাধুরী। ডায়েরি দেখাবারই বা কি প্রযোজন ছিল।'

সাধনা আধ মিনিট চুপ করে থেকে নিজেকে সংবরণ কবে নিযে বললে, 'তা ছিল। ছিল না? বলছি

তোমাকে, তুমি শোন—'

সাধনা কপাটটা বন্ধ করে দিয়ে এসে নিবিড় কৌতূহল ও তামাশা ও লজ্জাশরমকলঙ্ক বোধে আরক্ত হয়ে উঠে বললে, 'ডায়েরিটা আমি এনেছি, এই দেখ।' আঁচলের ভেতর থেকে সেটা সে বের করলে।—'আমাকে পড়তে দিয়েছে।'

সত্যব্রত বললে, 'মাধুরী এখন কোথায়?'

—'পড়ার ঘরে।'

—'কী করছে?'

—'এই খাতাটা ফুরিয়ে গেছে, আর একটা খাতায় ডায়েরি লিখছে।' দেবব্রত বললে, 'তোমাকে পড়তে দিল?'

সাধনা বললে, 'এবং আমি তোমাকে দিচ্ছি।

—'যদিও আমাকে দেখাবার দস্তুর মত নিষেধ রয়েছে।'

—'তবুও তুমি তার দাদা।'

ডায়েরিটাও মাধুরীর টেবিলে যে সে জায়গায় পড়ে থাকত। যেন যে খুশি সে নিয়ে একটা দেখুক। লেখিকা তা মোটেই চায় নি বটে, কিন্তু মাধুরীর সাংসারিক ছেলেমানুষির সুবিধা পেয়ে পরিবারের কেউ কেউ যে এ জিনিসটাকে না নেড়েচেড়ে দেখেছে তা নয়। সত্যব্রত নিজেও দু-চার পাতা পড়েছে বটে, মাধুরীর লেখায় আড়ম্বর অনাড়ম্বর কোনো কিছু নেই বটে, এ লেখা পদ্যও নয়, গদ্যও যেন না, কিছুই নয়। কিন্তু মেয়েটি নিজের জীবনের নানারকম অনুভূতি ব্যক্ত করবার যে একটা গভীর প্রয়োজন বোধ করছে, (এখনো সে একটা খাতায় ডায়েরি লিখে চলেছে) ও জীবনের সংগঠনের এই অভিনিবেশ ও নিবিড়তা দিয়ে এ পাতা কতখানি ভরা, সত্যব্রতের শীত জীবনটাকেও কি একটা উষ্ণতা দিয়ে স্পর্শ করে যেন। কবেকার কোন কথা মনে করিয়ে দেয়।

ডায়েরিটা হাতের ভেতর তুলে নিল দেবব্রত।

দু-এক পাতা আগে যেমন সে দেখেছিল একবার, আজও দেখছে। এর ভেতর মর্মান্তিক কিছু নেই ত-কোথাও কোনো গ্লানি বেরিয়ে পড়ে না। বরং পাতা উল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে কপাট বন্ধ করবার প্রয়োজনের যোগাযোগ নিজেকেই বিব্রত করে তোলে।

সত্যব্রত খাতাটা রেখে দিল।

—'এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?

—'হ্যাঁ।'

—'সব দেখলে?

—'মোটামুটি।

—'এরকম লেখা উচিত?'

সত্যব্রত বললে, 'মাধুরীকে এটা দিয়ে এস।

—'তা ত দিচ্ছি, এ কি ভাল, এরকম লেখা?

সত্যব্রত নিজের চুলের ভিতর আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, 'জীবনে ওর নতুন সময় এসেছে, এ সময়ে মানুষের প্রাণ এ-রকম হয়।'

—'কিন্তু আমার ত কোনোদিন হয় নি।'

সত্যব্রত মনে মনে বললে, 'সে তোমার দুর্ভাগ্য, সাধনা।'

—'আমি কোনোদিন আজেবাজে লিখে এরকম সময় নষ্ট করি নি। বাস্তবিক মাধুরী কি পড়াশুনো করবে না? শুধু গানের খাতা, বিনয়েশদের গ্রামোফোন, ডায়েরি, কবিতা উপন্যাস নিয়েই রয়েছে ত তোমার বোনটি। আমার কোনদিন এসব ছিল না। কলেজে ত আমিও কয়েকটা মাস পড়েছিলাম, কিন্তু কি করে প্রফেসরের বক্তৃতা লেকচারের একটুও বাদ দেব না। নোট টুকব, বই পড়ব, পরীক্ষায় পাশ করব, এই ছিল আমার লক্ষ্য।'

সত্যব্রত বললে, 'কাউকে তুমি ভালবাস নি সাধনা?'

—'বিয়ের আগে? মাধুরীর মত এইসব? তাহলে তোমাকে বিয়ে করলাম কেন অন্য কাউকে যদি ভালবাসতাম আমি? আমাদের শিক্ষাদীক্ষা একেবারে অন্য রকমের। তোমাদের এ-পরিবারের থেকে একেবারে আলাদা, তোমরা যা ঢিলে।'

সাধনা বিজযগর্বে বললে, 'তোমাব কাকা আমাকে দেখে এলেন, তোমবা পছন্দ কবলে, তাবপব তুমি বিযে কবলে আমাকে, তাবপব তোমাকে চিনলাম। তাবপব।' মাধুবী একটু থেকে নিলে।

একটা ঢোক গিলে মাধুবী বললে, 'কিন্তু এব আগে একদিনেব জন্যও আমি কাউকে ভালবাসতে যাই নি। আমাদেব বাপমাযেব ট্রেনিং সেবকম ছিল না। মাধুবীব মত এবকম ডাযেবি লিখলে বড়দেব হাতে যদি পড়ত একবাব, তাহলে? তাহলে বাড়িব বাব যদি না কবত আমাকে কি বলছি তোমাকে।'

মাধুবী একটু থেমে বললে, 'কিন্তু এবকম ডাযেবি-ফাযেবি ফষ্টিনষ্টি লিখবাব প্রবৃত্তিই কোনোদিন হয নি আমাব। বাস্তবিক, এই যে দিনেব পব দিন লেখা, গান খাতা, উপন্যাস গল্প নিযে আচ্ছন্ন হযে থাকা' মাধুবীব হযেছে কি?'

সাধনা খাতাটা নিযে চলে গেল।

সাধনা বলেছে বিযেব আগে কাউকে সে ভালবাসে নি। বিযেব পবে স্বামীকে ভালবেসেছে কেন? বাসা উচিত, কিংবা আব কাকে বাসবে, এ জন্য, ও জানে না, কিন্তু এই জন্যই। নইলে জীবনেব তাগিদে ও প্রযোজনে তেমন কাউকে যদি ভালবাসত সাধনা তাহলে মাধুবীকে বুঝতে পাবত সে। বোনেব জীবনেব ভিতব ঢুকে সহানুভূতি কবতে পাবত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সাধনাব জীবনে কোনো প্রেম নেই, না আছে অনুভূতিপ্রবণ উত্তেজিত কামনাটুকুও। স্বামীকে নিযে একটা সংসর্গ বযেছে শুধু।

সত্যব্রতেবও তাই বযেছ। সাধনাকে নিযে একটা সংসর্গ মাত্র।

ভালবাসা দু'জনেব জীবনেব ত্রিসীমানাযও কোথাও নেই।

সাধনা নিজেই স্বীকাব কবেছে বিযেব আগে কোনোদিনও প্রেমেকে সে বোধ কবে নি। বিযেব পব যা কবেছে সত্যব্রত ত তা বুঝল। কিন্তু নিজে সত্যব্রত, নিজেও কি কোনোদিন ভালবাসে নি সে? বাসে নি কি? অতীতেব অন্ধকাবেব গভীবেব ভিতব ঢুকে যেতে হয। ছেঁড়া পাতা, চিঠি, প্রযাস, প্রতীক্ষা, দিন ও বাতেব টুকবো-টাকবো একটা মস্তবড় ভাঙাচোবা ভাড়াব ঘবেব মত পড়ে বযেছে। আজ তাব ভেতব কোনো প্রাণী নেই, নেই কি? কিন্তু কোনোদিনই কি ছিল?

সাধানা এসে বললে, 'মাধুবী টেব পেযেছে।'

—'কি?'

—'তোমাকে যে ওব ডাযেবি দেখিযেছি।'

—'কী বললে?'

—'বলে নি কিছু বিশেষ, কিন্তু বুঝেছে।

—'কিন্তু, আমাকে কি ভয পায মাধুবী?

— পাওযা ত উচিত, কিন্তু পায কিনা জানি না।

সাধনা চলে গেল।

সত্যব্রতেব মনে হল-কেন ভয পাবে মাধুবী? সত্যব্রতকে ভয কববাব কোনো কাবণ আছে কি তাব? জীবনে কারু ওপব কোনো কঠিন ব্যবহাব ত কবে না সত্যব্রত, জীবন এমনিই যে মানুষেব ওপব ঢেব রুক্ষ আবো কোন কঠোবতা ফেঁদে বসতে যাবে সত্যব্রত? কিন্তু মাধুবীব জীবন দু'টি পুরুষকে এমন ক'বে আকর্ষণ কবতে পেবেছে যা হযত নিজেই অন্য কারু জন্য বিমুগ্ধ হযে পড়েছে। সমস্ত অন্তবাত্মা দিযে ভালবাসা অনুভব কবছে (সাধনা যা কোনোদিন পাবে নি, সত্যব্রতও না)। এ কলঙ্ক নয, পাপও নয। জানালাব ভিতব দিযে অসীম প্রসাবিত আউশ ধানেব মৃদু স্বাভাবিকতাব মাধুর্য এ, নিজেব জীবনটা হেমন্তেব বিকেলেব কুযাশাব ভিতব গিযে পড়েছে বটে, কিন্তু তবুও বহির্জগতেব আনন্দ ব্যথাবও সবই বোঝে ত সত্যব্রত।

মাধুবীব জীবনটাকে ত সে লক্ষ কবেই চলেছে। কোথাও তবু মাত্রা কেটে যায যদি, যৌবনেব আবেগ অনুবাগেব উষ্ণ ফেনাব সমুদ্রেব ভিতব নিজেব বিচাবস্পৃহাটাকে একটা নিবর্থক মাস্তুলেব মত যদি মনে না হয সত্যব্রতেব, তাহলে মাধুবীকে-কিন্তু সেদিন কখনো আসবে কি?

এবপব দু-তিন মাস চলে গিযেছে।

দেশে এখন শীত-অত্যন্ত গভীব। একটা বাগ জড়িযে সত্যব্রত বাবান্দায ডেক চেযাবে বসেছিল। দূবে বাবলা শেযাকুল ও বেতঝাড়েব ওপব কুযাশা, তাব ওপব মৃদু জ্যোৎস্না, চাঁদটা এখনই উঠে মুহূর্তেই নেমে যাচ্ছে আব। এ পাশে ধানেব খেত শীতে ও মৃত জ্যোৎস্নাব অন্ধকাবে কষ্ট পাচ্ছে। জীবনে পুলকেব দিন শেষ হযে গেছে যেন এই ধানগুলোব। তাদেব যাবা ভালবেসে ছিল, পাখিবা, আশ্বিনেব বোদ, প্রজাপতি, ফড়িং, কীট, কার্তিকেব আকাশ, মানুষদেব বিমুগ্ধতা এই কুযাশাব ছবিব ধাবেব ভিতব

অন্ধকাবেব ভিতব কেউই ত কোথাও নেই আজ আব। শিশিবেব পিছল ধানেব শিসগুলোব ওপব জ্যোৎস্না একটু ঝিকমিক কবে মবে যাচ্ছে, পেঁচাব পাখা ওদেব কান বুলিয়ে বুলিয়ে নিরুদ্দেশেব দিকে চলেছে, চাবদিকেই এমন বহস্য, ধানেব খেতেব মাথাব স্বপ্নেব ভিতব কি যে ব্যথা! কেমন একটা বেদনা, কি যে কাবণ তাব। সত্যব্রতেব নিজেব জীবনে।

সাধনা এসে বললে, 'একটা চিঠি হাবিয়ে গেছে।'

—'কাব চিঠি?'

—'মাধুবীব ডায়েবিব ভিতব ছিল।'

সত্যব্রত সেদিকে বিশেষ মন দিচ্ছিল না।

মবা চাঁদেব আকাশটাব দিকে তাকিয়েছিল সে।

সাধনা বললে 'সেই দুপুব থেকেই খোঁজ খোঁজ, তুমি কি কিছু টেব পাও নি?'

—'না।'

—'পাবে বা কি কবে? তুমি ত সন্ধ্যা মুখে কবে এলে। তাছাড়া মা আব আমি হাউমাউ যাচ্ছি না বেশি। মাধুবী ত কেঁদে কাঠ।'

সত্যব্রত এইবাব একটু বিস্মিত হয়ে স্ত্রীব দিকে তাকাল।

—'কাঁদবে না? আমাদেব কাছে সব বলেছে মাধুবী।'

সত্যব্রত বললে, 'কাব চিঠি?'

—'শুনলে অবাক হয়ে যাবে তুমি।'

—'অসিত লিখেছিল?'

—'না, অসিত বিনয়েশ কেউ না।'

—'তবে আবাব এমন কি চিঠি থাকতে পাবে।'

—'স্বামীব কাছে মুখোমুখি বেতেব চেয়াবটাকে টেনে নিয়ে বসে সাধনা বললে, 'তোমাকে ত আমি আগেই বলেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত এমনই একটা কিছু হবে, তাই হয়েছে; বেশি বাড়াবাড়িতে এইবকমই হয়।'

সত্যব্রত অপেক্ষা কবছিল।

সাধনা বললে, 'শীতাংশুকে চেন?'

সত্যব্রত চিন্তিত হয়ে বললে, 'কোন শীতাংশু'

সাধনা বললে 'মাধুবীব কাছে অনুপমা বলে একটি মেয়ে আসত দেখেছ? না, তাও দেখ নি?'

অনুপমাকে দেখে ছিল বটে সত্যব্রত। সত্যব্রতেব বিয়েব আগেও ত মাধুবীব কাছে সে আসত। সে প্রায় তিন-চাব বছব আগেব কথা। অনুপমাকে দেখে সত্যব্রতেব শেষেব দিকেব হিমায়মান জীবনটাও খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল বটে, জীবনে এক ঝলক তাপ এসে ঝবে পড়েছিল যেন। খানিকটা পুলক, চাবদিকেব পোড়া পাতায় বিমর্ষতা, পাখিব পালক মৃত্যু ও কুয়াশাব ভিতব।

অনুপমাব ভিতবে রূপেব চেয়েও সত্যব্রতেব একান্ত নিজস্ব জীবনেব প্রয়োজনীয় কত গভীব জিনিসই ছিল, আশ্চর্য প্রত্যুত্তব ছিল এই মেয়েটিব, প্রেম ছিল, সত্যব্রতেব জন্য, আজও যেন প্রশ্নেব অভাব নেই, এই মেয়েটিব, সত্যব্রতেব জীবনেব ওপব নীবব মন্তব্য ও পবিহাসকঠিন প্রশ্নেব। কিন্তু সত্যব্রত নিজেই দূবে সবে পড়ছে, আজকেই জীবনেব নিয়মে সবে পড়তে হবে তাকে। কিন্তু তবুও কোনো উত্তব দিতে গেলেই অমনি ওব ক্ষমতাময় মমতাময় প্রত্যুত্তব আসবে জানে সত্যব্রত। আজ এই অবধি, আব কিছু নয়।

কিন্তু কেনই যে এই মেয়েটিকে নিল না সে? জীবনটা প্রেম নিবিড় হয়ে উঠত কিনা তাতে বলা যায় না, কিন্তু প্রশ্ন উত্তবেব চমকে অত্যন্ত চমৎকাব হত বটে, জীবনেব সমস্ত অবদাস ও বিষণ্ণতাব মেঘে সে এক বিদ্যুৎ, হয়ত নিবন্তব, নিববচ্ছিন্ন। আজ না আছে আলো, না আছে আগুন। না আছে কাম, না আছে কামনা, প্রেম কত দূব দূবান্তেব জিনিস। জীবন সেদিনও তাব সাহসী হয়ে উঠতে পাবে নি, নইলে সাধনাব জায়গায় অনুপমাব হাতেই জীবনেব অনুভূতিগুলোকে সংবক্ষণেব ভাব দিয়ে কি একটা গভীব নিস্তাব পেত সত্যব্রত আজ। জীবনটা কি নিবিড়ভাবেই না জমে উঠত। আজ যে তুলোব পুতুল এই তুলোব বস্তাব সঙ্গে কোনো কিছুবই বিনিময় চলে না যে, না উপলব্ধিব, না স্বপ্নেব, না বিচাবেব, না ভাবেব, না কাজেব, না একটা কথাবও।

—'অনুপমাকে চেন বললে?' সাধনা জিজ্ঞাসা কবল সত্যব্রতকে।

—'হ্যাঁ, অনেকদিন দেখেছি।'

'মাধুরীর সঙ্গে অনেকদিনের বন্ধুত্ব।'
—'সত্যব্রত ঘাড় নাড়লে।
সাধনা বললে, 'ওর তিন চারটি ভাই আছে।'
—'তাও জানি, বোধহয় একটিকে চিনতামও।'
—'শীতাংশুকে?'
—'না।
—'সেই অনুপমার বড়দা, এইবার বোধহয় এম. এ দিল।'
—'সেই-ই লিখেছিল নাকি মাধুরীকে?'
—'হ্যাঁ, কি রকম অন্যায় বল দেখি।'
—'মাধুরীকে চিনলে কী করে?'
—'ঐ যে অনুপমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ওদের বাড়িত যেত মাধুরী, আমি কতবার নিষেধ করেছি, শেষ পর্যন্ত এরকম একটা গলায় দড়ি দেবে যে আমি তা জানাতাম।'
—'শীতাংশুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মাধুরীর?'
—'তাও জান না?'
—'সত্যি সাধনা, আমি কিছুই জানিনে, মানুষ সব জায়গায়ই ব্যাপৃত রয়েছে, এই মাত্র জানি। হয়ত আনন্দে, হয়ত ব্যর্থতায়। আমি নিজেও জীবনটাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করছি শুধু। সত্যব্রত মনে মনে নিজের কথাটা গুটিয়ে শেষ করে নিয়ে বললে, 'এর অসংলগ্ন অনর্থক উপকরণগুলো নিয়ে জীবনটাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করেছি শুধু।
সাধনা বললে, 'আলাপ ছিল না বটে তেমন, দেখাদেখি মন্দ ছিল না, দু একটা কথাবার্তা নাকি হয়েছে শুনেছি।'
—'মাধুরীর কাছে?'
—'মাও নাকি জানেন?
— অথচ আমি জানি না।
— আমিও কি জানতাম? ওদের কী হয় না হয় আমাদের জানানো প্রয়োজন মনে করে না।
সত্যব্রত বললে, 'চিঠিতে কী ছিল?'
—'কী লিখেছিল শীতাংশু তাই জিজ্ঞেস করছ?
সাধনা তীক্ষ্ণ রহস্যের সঙ্গে হেসে বললে, 'তা তুমিও যেমন জান আমিও তেমন জানি। চিঠি না হারালে ত আর আমাদের ডাক পড়ে নি। কোনো জিনিস জানাবারও দরকার হয় নি। এখন যখন সবই হচ্ছে, সেটাও আমাদের হাতে চিঠি চলে গিয়েছে কি না, সেইরকম আশঙ্কা করেই তাগিদেই-অন্য কোনো কারণে নয়।
সত্যব্রত বললে, 'মাধুরীর আরো সতর্ক থাকা উচিত ছিল।'
সাধনা একবার ঘুরে এসে বললে, মেয়ের অবস্থা দেখ গিয়ে, একেবারে কেঁদে কেঁদে একাকার। মা সামলে রাখতে পারছেন না।'
বোঝা গেল চিঠিটা সহজ নয়। কিংবা চিঠিজড়িত সেই মানুষ সেই শীতাংশুর অনুভব মাধুরীর জীবনে বড় সহজ নয়। চিঠিটা যে হারিয়ে গেছে, কলঙ্ক যে পাকিয়ে উঠেছে, এর ভেতর যত কিছু ঘৃণা যন্ত্রণা থাকতে পারে তা মাধুরী বুঝুক। মাধুরী আর তার মা। সত্যব্রতের হৃদয়ে সে সব তোলপাড় বিশেষ কিছু নেই। একটা বিমুগ্ধতা রয়েছে শুধু। কে সেই শীতাংশু, কেনই বা সেই চিঠি তার বোনের জীবন, এই নারীজীবনকে যা এমন অভিভূত করে ফেলতে পারে' করে নি কি অভিভূত?
সত্যব্রত ঘুরে একবার দেখে এসেছে মাধুরীকে। বুঝিয়ে এসেছে, বুঝে এসেছে তারপর।
দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।
সত্যব্রতের জীবনের ভিতর ঢুকতে চাচ্ছে না মাধুরী। দাদার জীবনের সাধ অসাধের কোনো কথাই তাকে স্পর্শ করে না। সে এসেছে নিজের প্রতি একটু সহানুভূতি পেতে। দাদা খানিকটা ত জেনেছে, বাকিটুকু জানাতে আপত্তি নেই মাধুরীর, কিন্তু এর পরিবর্তে সে দক্ষিণা চায়, নিজের প্রতি শীতাংশুর প্রতি। একটা মমতাময় মীমাংসা সত্যব্রতের কাছ থেকে সে পাবে না কি?
দু-এক মিনিট চুপ থেকে সত্যব্রত বললে 'কি দেখছ মাধুরী কার্তিকের কুয়াশার ঐ মাঠটা? ন্যাড়া কাঁটাগাছগুলো, শুকনো মাকাললতা, বঁইচি।'

মাধুরী সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিবিয়ে নিচ্ছে।

—'আর ঐ ঘাটেব পাড়ে শামুকগুগলি একবাশ।'

গুগলি শামুকগুলির দিকে মাধুরী তাকাল না আর।'

সত্যব্রত বললে, 'কার্তিকেব সন্ধ্যাটা কি আমচকাই এসে পড়ল একেবারে, কার্তিক মাসটাই। এই বছরটাই। আমি এখনো গেলো বছবেব ভিতব আছি, কিংবা তারও আগেও, তারও আগে। এমনিই বসতাম অঘ্রানেব সন্ধ্যায এইখানে এমনি আউশের খেত কুযাশা, দূবে স্টেশনেব আলো, এঞ্জিনের শান্টিং এক একটা মালগাড়ির সে কি বেদম হাঁসফাঁস। তারপর সমস্ত শীত, শান্ত, তোমার পঞ্জিকার চেনা তাবাগুলো নয, কিন্তু আমারই জ্যোতিষ ও কবিতায-আমিও কবি নয় কি মাধুরী? গোছগাছাল শীতল নিবিড় নক্ষত্রগুলো এমনিই ত ছিল সব।

জীবনে তখন এক অপব্যযেব সময ছিল। অপব্যয কবে এত আরাম ছিল। যেন ঢের ভবিষ্যতেব ডিম প্রসবের স্বপ্ন নিযে পাখির চোখে ঘুম এসে জড় হযেছে, সাধ এসে, সাধ, ঘুম, নক্ষত্র, কুযাশা, হেমন্ত। সমস্ত তাব কোথায চলে গেল? এসব আজ স্বপ্ন নয, ডিম আজ কদর্য যে মাত্র। সমস্ত ব্যাপাবটাকে মানুষেব জীবনটাকেই হযত না জানি কি বকম নতুন কবে বোধ করে মাধুবী তার সমস্ত কান্না থামিযে জানালাব ভিতব দিযে পড়ন্ত বোদেব কোমল মিষ্টতাব কোলে আউশের খেতটাব দিকে অনেকক্ষণ তাকিযে বইল।

তাবপব আস্তে আস্তে দাদাব কাছে গিযে বসল সে।

সত্যব্রত ওকে ডাকে নি। কিন্তু তবুও মাধুবীকে দিযে তাব প্রযোজন বযেছে খুবই।

সত্যব্রত বললে, 'এই শীতাংশু এব কথা ত কোনোদিন শুনি নি আমি।'

মাধুবী ঘাড় হেট কবে চুপ কবে বইল।

—'তুমি চিনতে?'

—'দেখেছি।'

—'অনুপমাব দাদা? আশ্চর্য, আমি জানতাম না যে অনুপমাব এবকম একজন দাদা বযেছে, কী কবে ছেলেটি?'

—'পবীক্ষা দেবাব কথা ছিল, এম এ।'

—'ছিল না?'

—'না।'

—'তোমাব সঙ্গে কথাবার্তাব আলাপ ছিল না?'

—'না, দু-একটি কথা বলেছে মাত্র, কিন্তু আমি, আমি সামান্য দু-একটি উত্তব দিযেছি শুধু।'

—'উত্তব দিযেছ মাত্র, সে ত ব্যাকবণেব জিনিস, শুধু সেমিকোলনে ভবতি, যাবা কমা বসায কিংবা ড্যাস তাবা তবু পথ বাখে খানিকটা। কিন্তু এ নিযে আগ্রহ করে কথা পেড়েছে নিজে শীতাংশু ত সব সমযই?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু ওদেব বাড়িতে আমি খুব কমই গিযেছি, গেলে প্রাযই ওকে এড়িযে চলেছি।'

সত্যব্রত একটু বিস্মিত হযে বললে, 'শীতাংশুকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাব পব?'

—'মন্দ ছিল না।'

—'খুব বেশি বোধ হয।'

—'হযত।'

—'অনুপমাও।'

—'হ্যাঁ, সাহায্যেই কবেছে ওব দাদাকে। ইচ্ছে করলে আমাদেব ভেতর ঢেব কথাবার্তা হতে পাবত কিন্তু তোমারা যখন কেউ কিছু জানো না, এবং কিভাবে এই জিনিসটা বুঝবে আমিও যখন তা জানতাম না তখন আর একটুও বাড়াবাড়ি কবা দবকাব মনে কবি নি। এমনকি ওদের বাড়িতে যাওযা আসা আমি ছেড়ে দিযেছিলাম।'

—'কিন্তু তুমি আমাদের বললে না কেন মাধুরী? বলতে ত পারতে।'

—'তা পারতাম, তোমাকে পারতাম অন্তত, এখন বুঝি সব। কিন্তু ভয করে কাউকে বলি নি কিছু।

মাকে আমি এখনো ভয় করি। তোমাকেও করতাম, এখনো একটু একটু ভয় যে না হয় এমনও নয়।'

—'আমাকে?'

'হ্যাঁ, কিংবা ভয় ঠিক নয় হয়ত, কেমন একটা কুণ্ঠা, বাস্তবিক এরকম সঙ্কোচ লজ্জা স্বাভাবিক নয় কি দাদা?'

সত্যব্রত বললে, 'যদি চিঠিটা হারিয়ে এরকম গোল না পাকাত, তাহলে হয়ত আমরা কোনোদিনই এসব জানতাম না?'

—'বলেছিই ত। তুমি নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছ এটা আর যাই হোক, এমন একটা গৌরবের জিনিস নিশ্চয়ই নয়। নিকটতম আত্মীয়ের কাছেও এসব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমাদের মত মেয়েরে ভয় পাওয়া ত স্বাভাবিক। না হোক সঙ্কোচে মাথা হেট হয়ে ত যাবেই।'

মাধুরী মুখ তুলে বললে, 'তাছাড়া আমাদের পরিবারের এই লোকগুলো, মানুষের জীবনের একটা সামান্য স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় জিনিসেও ওরা কত কি নোংরামির কাদা রস মাটি খুঁজে পায়? ওদের ত তুমি চেনই দাদা। আমি আর কী বলব। এক পরিবারের ভেতর যখন রয়েছি, জীবনের একটা আঁতুড়ের কাজ করতে গিয়েও ওদের মতামতের কথা ভাবতে হয়। এক গাদা গোমড়া সুখের বিচার আচার আমাদের সাধ সংকল্প নষ্ট করে দেয়।' মাধুরী নীচে যেতে যেতে বললে, 'এই আমাদের অবস্থা' মাধুরী বললে, 'কিন্তু এসবেরও প্রয়োজন আছে সংসারে। নইলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। তারপর কদর্য হতে আর কত বাকি থাকে?'

সত্যব্রত বললে, 'তাহলে তুমি ঠিক করেছিলে অনুপমাদের বাড়িতে আর যাবে না?'

—'যেতাম হয়ত, শীতাংশুবাবুর সঙ্গেও কথাও দু-একটা যে হত না তা নয়, কিন্তু তা শুধু একটা 'হ্যাঁ' কি 'না'-হয়ত একটু ঘাড় নাড়া মাত্র; কিংবা ওর বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত নিতান্ত ভদ্রতার অনুরোধেও ঘাড় হেট করে অপেক্ষা করে থামতাম। তারপর নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলে যেতাম আমি অনুপমার সঙ্গে গল্প করতে। কিংবা এমন জায়গায় যেখানে ওর দাদা খুঁজতে পারত না আর।'

—'এমনি করে তোমার দিন কাটত?'

মাধুরী বললে, 'হ্যাঁ।'

—'তাহলে শীতাংশুকে দিয়ে তোমার কোনো দরকার থাকত না আর?'

—'কি করে আর থাকবে?

—'এ জীবনে ওকে একেবারেই বাদ দিয়েই চলতে?'

মাধুরী এখনো ঢের ছোট। মাধুরী হয়ত ভাবছে রক্তমাংসের সার্থকতায় সাংসারিক জীবনে শীতাংশুকে আমি নাই পেলাম। যেন কী আসে যায় তাতে? কী আসে যায়! আমার জীবনের ভেতর সেই ত তবু বেঁচে থাকবে, পৃথিবীর সমস্ত রঙ রস নইলে কি যে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যেত, কিন্তু সে যে রয়েছে, আমি যখন বেদনা পাই তখনো, ব্যথার গাঁজলে মিষ্টি মাদকতার ধোঁয়ার মত আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে অভিভূত করে,আমি যখন আনন্দ পাই সবুজ আউশ খেতের উৎফুল্লতা মাটির রসকে যেমন করে চেনে শীতাংশুকেও তেমন নিবিড় করে একেবারে বস্তু করে চিনি নাকি? জীবন এই নিয়ে থাকতে পারবে নাকি? শুধু মৃত্যু পর্যন্তই নয় অনন্ত আদি নিয়ে মাধুরী আকাশের নরম নিবিড় দুধের বিন্দুগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছে-কেন পারবে না? ভাবছে-জীবন কি মধুর।

কিন্তু যতই ভাবুক মাধুরী, জীবনের কতটুকু দেখেছে মাধুরী? কতদিন ধরেই তা?

কিন্তু তবুও কে জানে ওর জীবন হয়ত একটা স্বপ্নের সংকল্প নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাধুর্যে ভরে থাকবে। কে বলতে পারে? আমাদের প্রতিটি মানুষের অন্তরাত্মাকে পিষে নিয়ে একটা নিরর্থক শীতল পিণ্ড বানাবার প্রয়োজন হয়ত কেউ কোথাও অনুভব করে না। পিণ্ডটা এমনিই যে আকাশপাতাল ব্যাপৃত করে রেখেছে সেটাকে আর কত কে বাড়াবে?

দু'জনে হৃদয়ের আচ্ছন্নতা নিয়ে দু'জনে চুপ করে রয়েছে।

সত্যব্রত বললে, 'শীতাংশু কী লিখেছিল তোমাকে?'

মাধুরী বললে, 'চিঠিখানা থাকলে তোমাকে দেখাতে পারতাম সব, কিন্তু নেই যখন কিছু বলতে পারা যায় না।'

সত্যব্রত বললে, 'চিঠিখানা পৌঁছাল কী করে?'

—'অনুপমাকে দিয়ে।'

সত্যব্রত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'জীবনের এক একটা সময়ে আমরা ভালবাসতে চাই বটে, ভালবাসার পাত্রও পাই, কিন্তু অনেক সময়ই তাকে নিজ জীবনের অন্তর্ভূক্ত করতে গিয়েই মুশকিল। আলাপ পর্যন্ত করতে সাহস হয় না। যাকে প্রাণ দিয়েও ভালবাসা যায় তার সঙ্গে একটা কথা বলবারও ব্যবস্থা রাখে না যথেষ্ট। এখন অনেক সময় হয়, কেন হয়? শীথাংশুর যে সহাস আছে, কিংবা যে আবেগ আছে, যে সংকল্প, অনেকের জীবনেই তা নেই। শুধু আমারই কথাই নয়, শীতাংশু ত তোমাকে চিঠিও লিখল, কিন্তু'—সত্যব্রত দু-এক মুহূর্তে থেমে বললে, 'এই যে অনুপমা প্রায় ছ সাত বছর ধরে আমাদের বাড়িতে আসছে, তোমার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যুত্তর রয়েছে যার জীবনে, যে এমন সচকিত, মাথার ওপরের বিদ্যুতের মত, পায়ের নীচের কাদারসের মত তবুও যে এমন মমতা নিবিড়তায় প্রয়োজনীয় তাকে আমি এতদিন বসে দেখে গেলাম শুধু বুঝে গেলাম। কিন্তু একটা কথাও ওর সঙ্গে পাড়বার মত সে প্রতিভা আমি খুঁজে পেলাম না আমার জীবনে। প্রতিভা? প্রতিভা নয় কি? ভালবাসা করতে হলে সাহসের প্রয়োজন, প্রতিভার দরকার। এসব ছাড়া জীবন জমে না। প্রেম হয় না। কিন্তু আমাদের এসব কিছুই নেই।'

মাধুবী স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'অনুপমার সঙ্গে ভালবাসা' অনুকে? তুমি!'

সত্যব্রত নিজের ভাবাবেগেই বললে, 'কিছুই নেই আমাদের জীবনে, আমাদের জীবনটা ঢের নিচু দরের। তোমারও বোন, আমরাও। আমাদের সাহস নেই আমরা প্রেম করতে জানি না। আমাদের জীবন নিরর্থক।'

মাধুরী সত্যব্রতের এসব কথা কিছু মাত্র গ্রাহ্য না করে নিজের হৃদয়ের বিস্ময়ে তোলপাড় হয়ে বললে, 'অনুপমাকে তুমি ভালবাসতে যাবে কেন?'

সত্যব্রত বললে, 'শীতংশুর চিঠির কোনো উত্তর দেবে না তুমি?'

—'না।'

—'কেন?'

—'মা নিষেধ করেছে।'

—'কেন?'

—'বাবা কাকাদের ও দিকে অনুমতি হবে না বলে।'

সত্যব্রত এক-দু মিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'কিন্তু সে খুব সাধ করেই ত ভালবাসতে এসেছিল।'

—'তা এসেছিল বটে, কিন্তু কী করব? বুঝলেই ত তুমি।'

—'শীতাংশুর ভালবাসা নিশ্চয়ই আন্তরিক ছিল।'

মাধুবী তা স্বীকার করছে।

সত্যব্রত বললে, 'তুমি ওকে একম করে অগ্রহ্য করলে ছেলেটি নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাবে।'

মাধুবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে লজ্জার আড়ষ্টতা ভেঙে বললে, 'কষ্ট আর কি? অবিশ্যি আমি যতখানি বেসেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশি ভালবেসেছেন। শীতাংশুবাবু আমাকে কিন্তু ভালবেসেই কি মানুষের তৃপ্ত থাকা উচিত নয়।'

সত্যব্রত বললে, 'সে যারা খুব ছোট তারা তা পারে, কিংবা যারা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, কিন্তু মাঝখানে দুলছে যারা, পৃথিবীর প্রায় ষোলআনা প্রণীয়মানুষেরই সেই অবস্থা। ভালবাসা তাদের বড় যাতনা দেয়। বিশেষত এমনি আবেগ নিয়ে যখন তা আসে, এবং এমনই ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।'

সত্যব্রত বললে, 'কেন মেয়েটি কি ভালবাসার যোগ্য নয়?'

মাধুবী বললে, 'তা আমি বলছি না।'

—'কিংবা আমি হয়ত উপযুক্ত নই।'

মাধুবী বললে, 'আহা, তা নয়। সে ত তোমার বার-তের বছরের ছোট বোনটির সঙ্গ, তাকে নিয়ে এত বড় দাদার এই সব কি? আমি বুঝি না কিছু।'

মাধুবী জিনিসটাকে উপহাসাস্পদ করে তুলতে চাচ্ছে। ভাবছে যে সে ফল হল। জীবনটায় যে সব পেয়েছে, জীবনটাকে যে অর্থ দিচ্ছে সত্যব্রত, মাধুবী তা গ্রাহ্য করছে না। মাধুবী বুঝতে চাচ্ছে না। ভালবাসার অন্য আর কে মানে পেয়েছে সে। জীবনেরও। সত্যব্রতের সঙ্গে অনুপমার দশ এগার বছরের ব্যবধান, অনুপমা সত্যব্রতের ছোটবোনের সঙ্গী (হয়ত ছোটবোনের মত) সেই জন্য অনুপমার সঙ্গে সত্যব্রতের প্রেম হতে পারে না; এ মেয়েটির জন্য কোনো কামনাও হতে পারে না। কেন কামনা

গ্যাসটিকে ঘির পোকাব মত নয়, যেন প্রেম নিজের পাখনা ও চোখে মাংসে মিষ্টি চোখ ও পাখনার স্বাধীনতায় সার্থক, জড়িঙের মত নয়; প্রজাপতির মত নয়, নিবিড় নরম সের মত যেখানে খুশি সেখানে বেড়ে উঠতে পাবে না। এর জন্য যে একটা ছকের দরকার, মাধুরীর রুলকাটা গ্র্যাফেব খাতার মত, মাধুরীর হাতের বর্ণকিনের মুখে উলের মত যেন প্রেম, একটা মোজা, একটা টুপি, একটা বিনুনির মত নিযেম নির্ধারিত হয়ে উঠতে হবে যেন প্রেমকে। নইলে কিছুই হল না।

মাধুরী বললে, 'উনি আমাকে অমন করে ভালবাসেত এলেন কেন?'

—'মানুষ কি ভালবাসবে না?'

—'বোঝা উচিত ছিল না কি যে আমাদের ভিতর কিছু হতে পাবে না?'

সত্যব্রত ঈষৎ একটু তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে হেসে বললে, 'কেন তুমি কি অমানুষ বা শীতাংশু জানোযার?' একটু হেসে বললে

—'তোমাদের কেউই দেব-দেবতাও নয়, দু'জনেই মানুষ।'

—'মাধুবী অত্যন্ত অশ্রদ্ধভাবে বললে, 'কিন্তু তাইতেই হয না, পবিবাবও ত দেখতে হবে? একসঙ্গে মিলে যখন সবাই আছি, বাবা মা কাকা কাকিমাদের ওপর এখনো যখন নির্ভর করতে হচ্ছে তখন মিলে মিশে সবার সত্যানুসাবে থাকা ভাল। তা না হলে নিজে নিজেব পথ দেখতে হয।' মাধুরী সঙ্কুচিত হয়ে বললে, 'আমি তা পাবব না।'

সত্যব্রত বললে, 'তুমিই শুধু নয মাধুবী, আমাদের পবিবাবও শুধু নয, অনেকেই এ পাবে না, এই যে আমি এত বড়াই কবছি, তোমাব চেযে এত বেশি বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা পেযেও কিছুতেই পাবলাম না আমি, আমিও। কিন্তু এ পাবা উচিত মাধুরী, পারা উচিত, পারা উচিত, এ সাধ ছাড়া এ সংকল্প সাহসকে বাদ দিযে এই সাহস ও আবেগে অর্জিত প্রেমকে জীবনে না পেযে আমাদেব জীবনেব কি মানে থাকছে? কি প্রয়োজন?'

মাধুরী বললে, 'অনুপমাব কথা বিযেব আগে তুলতে পাবতে। তখনো সেটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায হত। কিন্তু এখন ত তা তোলাই উচিত নয তোমাব।'

—'কেন, কী দোষ হযেছে?' সত্যব্রত আস্তে আস্তে মাথা তুলে বোনেব দিকে তাকাল।

মাধুরী বললে, 'প্রত্যেকেরই নিজেব স্ত্রীকে নিযে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'

সত্যব্রত বার্ধক্যেব কুযাশামাখানো জ্যোৎস্নাব দিকে তাকিযে বইল। একটা পেঁচা উড়ে যাচ্ছে।

নাবকোল সুপুবিব গাছ, পাতাব ঝিকিমিকি, আউশ ধান, জ্যোৎস্না কুযাশা, হিমেব বাতাস সবকিছুব ভিতব থেকেই বিগত জীবনেব মবা প্রযোজনগুলো কাঁটা দিযে উঠছে যেন।

এ শিহরণ ব্যথাবও বটে, কিন্তু তুবও কি যে মধুবতাব। মাধুবীও পৃথিবীর এই সমস্ত সমাবেশেব ভিতবেই বসে বযেছে সত্যব্রতেব কাছে। কিন্তু তবুও এছবি মানুষেব জীবনেব অনুভব পবম্পবেব চেযে কত দূবে দূবান্তে-অনুভূতিব লোঁকে এবা কেউ কারু মুখও চেনে না যেন। পুজোব ছুটিতে গণ্ডগোলমুক্ত এই পুরনো বাড়িখানা তাদের, এই আউশ জ্যোৎস্না, শীতেব বাতাসে বেতেব লতার পত্‌পত্‌, শুকনো কলমি কববীর দেশ, মবাপুকুর, শামুকগুগলি পেঁচা কুয়াশা, সাধনাকে পেবিযে অনুপমাকে পেবিযে জীবন কোন বিগত দিনগুলির ভিতব চলে যায-ভালবাসা ছিল? ছিল না কি? হায, সেই দিনগুলি!

মাধুবী বললে, 'প্রত্যেক মানুষই নিজেব জীবনের অনুপাতে কাজ কবতে পারে শুধু, তুমি যে কাজকে ভাল মনে কর, আমাব কাছে তা সব সময সে বকম মনে হয না। কিন্তু তবুও বড়দের কথা শুনতে আমরা বাধ্য। কিন্তু বাবা-মাকে বলেছেন ভাব বাবা জেঠি কাকাদের ওপর।' মাধুবী একটু থেমে বললে, 'তাছাড়া শীতাংশুবাবুব কথাও মা বলেছেন, এবা যেমন সহজে ভালবাসে তেমনি তাড়াতাড়ি ভুলে যায। তা হোক, না হোক, এটা মনে হয যে একটা কিছু তিনি কববেনই, হয আমাকে ভুললে, না হয'-মাধুরী থমকে থতমত খেযে কথাটা বলে ফেললে তবু। এই ভালবাসার স্মৃতিটা মনে বাখবেন।-তাতেও শেষ পর্যন্ত ব্যথা নয, আনন্দই।

মেযেটি জীবনেব আন্দাজে বোঝে ঢেব, যদিও সত্যব্রতেব মতে এসইব মাধুরীব ভুল ধারণা। বযসের সঙ্গে সঙ্গে বোন আবো বুঝবে। তাবপর ভালবাসার স্মৃতিব কথা এবকম চিন্তা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য হৃদয়হীন ছেলেমানুষি করে বলতে যাবে না সে আর। আজই একটা দোষ বোনের সংশোধন করে দিতে চাচ্ছে সত্যব্রত। বললে, 'শীতাংশুর চিঠিতে কি ছিল না ছিল জানালে না ত আমাকে, কিন্তু বলেছ চিঠিটায ঢের আবেগ ছিল, আগ্রহ ছিল, সফল সত্য ছিল, চিঠিটা তাহলে দু-এক পাতায শেষ হয় নি?'

মাধুরী বলল, 'না, প্রায় দশ-বার পাতা হবে।'

সত্যব্রত বললে, 'তোমাব কাছ থেকে একটা উত্তরেরও প্রতীক্ষা কবছে হযত সে।'

সত্যব্রত বললে, 'তাতে আমি দিতে পারি না।'

'কাটাকাটা জবাব না দিলেই ভাল, ওকে যদি তুমি তেমন না ভালবাস, কিংবা ভবিষ্যতে ওর সাথী তুমি হতে পারবে না বলে নিজেকে সংবরণ করে রাখ, তুবও কি এমন স্নিগ্ধ একখানা চিঠি তৈরি করতে পার না কি তুমি বোন মানুষের আত্মা যাতে শান্তি পায়। বিশেষ করে শীতাংশুর মত একরম অবস্থার মানুষ।'

সত্যব্রত এক মিনিট ঘাড় হেট করে থেকে তারপর মাথাটা তুলে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'রোন, আমিও জীবনে ভালবেসেছিলাম একসময়, সে সাধনা নয়, অনুপমাও না (বয়সও আমার তখন শীতাংশুর মতই।) পাঁচ ছয় বছর ধবে একটি মেয়েকে ভালবেসে জীবন যে আমার যন্ত্রণার কদর্যতায় ভরে উঠেছিল সে কাদা আমি চাই না, সেই ক্লেশের স্তূপের ভিতর দু-এক বিন্দু তখনকার তেমন অমৃতের জন্যও সে দিনগুলোকে যেন আব প্রার্থনা কবে না জীবন।

মাধুরী স্তম্ভিত হযে বললে, 'কই, তোমাব জীবনে এত যাতনার বযস হল আবার? মা-বাবা আমার কেউই ত টের পাই নি, তোমাকে ত বরাবব স্বাভাবিক দেখে আসছি।'

সত্যব্রত মাধুরীব সে কথাব কোনো উত্তব না দিযে বললে, 'যাকে আমি ভালবেসেছিলাম সে মেযেটিও তোমার মত, আমাকে সে বুঝল না। তোমার মত তাব কাছেও প্রেম একটা সংকীর্ণ জিনিস। মানুষেব জীবনটা ঘিঞ্জি, সৃষ্টিটা একটা গুমোট।' সত্যব্রত বলতে বলতে থামল। আর কিছু বলবে না সে।

মাধুরী জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি আমাব কাছ থেকে কী চাচ্ছ দাদা?'

সত্যব্রত বললে, 'শীতাংশুকে একটু উপশম দিতে পাব যদি।'

—'তুমি নিজেই বল, কি করে তা পাবা যায?'

—'পাবা যায না মাধু?'

—'না দাদা।'

—'ওব জন্য তোমাব তেমন কিছু ভালবাসা নেই?'

—'আছে, কিন্তু তেমন কিছু নেই, কিংবা যদি থাকতও, তাহলে বাপমাযেদেব মুখেব ওপর কি কবতে পারতাম আমি।'

কিছুই না, কিছুই না, মানুষেব জীবনটা এক যন্ত্রণাব পথ দিযে যাবেই। প্রেম, এমন আন্দের জিনিশ হওযা উচিত ছিল যে বস্তুটিব সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত, এ প্রেমও যাতনা দেয সবচেযে বেশি।

মাধুবীকে শীতাংশুর এ ভালবাসা, এ অনেক দিন ধরে, যুবকটি এ মেযেটির জন্যই এই চাব বছব ধরে পৃথিবীটাকে বিধাতাব, অন্তত ভাগ্যবিধাতাব সোনাফসলেব ভাঁড়াব বলে বুঝতে একবার নিরর্থক বিধাতাশূন্য মানবাত্মার গভীব সংগ্রাম সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাব প্রদেশ বলে মনে কবছে আর একবাব। এসব কোনো কিছুব ভিতবেই কোনো শান্তি নেই, শুধু সাধ, শুধু বক্ত, শুধু ভস্ম।

শীতাংশুব চিঠিটা খুঁজে পাওযা গেছে।

একে একে দাদাব কাছে চার বছবেব চাবখানা চিঠিই এনে দিযেছে মাধুরী। মাধুবীর কাছে শীতাংশুর এই চতুর্থ চিঠি, প্রত্যেকটি চিঠিই খুব বিশদ, খুব আগ্রহভবা, উত্তেজনা বেনা পাঁকে আবক্ত নয তবু, ব্যথাই রক্তাক্ত বরং, কিন্তু তবুও খুব স্থিব। যেন জীবনটাকে পরিমাপ করে ফেলেছে ছেলেটি। কোনোদিকেই কোনো অসম্ভভ কিছুর জন্য প্রতীক্ষা কবে না সে। কিন্তু তবুও প্রতি বছরেব প্রতিটি চিঠির ভিতর দিয়েই এই চার বছর ধবে মাধুরীকে অপেক্ষা করে আসছে সে। অন্তত বোনের একটা উত্তব।

কিন্তু মাধুরী এ ছেলেমানুষ-এ চিঠিগুলোর মানেই বা কি বুঝবে, উত্তবই বা তৈবি করবে কি? এবং প্রত্যুত্তরহীন হযেই নিজেকে সফল মনে করছে, গর্বিত বোধ করছে।

করুক এবং শীতাংশুর বোনের জন্য অপেক্ষা করুক। বছবেব পব বছর চিঠি লিখে চলুক সে। ওব চিঠির ভেতব এত জ্ঞান, এত অভিজ্ঞতা, কিন্তু তবুও প্রেমকে খর্ব করতে গিযে তারা এমনই কাবু? জীবনে প্রেমের এমনই আধিপত্য! কি বিষম প্রেম! কি অন্ধ! কি দূরপনেয রক্তাক্ততায ভযাবহ! প্রেমেব হাত থেকে সত্যব্রতের জীবনটা যে নিস্তার পেয়ে অতিবাহিত হযে চলেছে এর ভিতর কি স্নিগ্ধতা, কি মাধুরী, কি শান্তি!

সকলের সমস্ত বেদনা ব্যথা ভুলে যাচ্ছে সত্যব্রত।

হেমন্তের নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নায, কুযাশায, নিস্তব্ধতায নিজেব প্রেমাস্পদশূন্য জীবনটাকে পবম স্পৃহা ও শান্তির সঙ্গে অনুভব করছে সে। অনুভব করছে।

আকাশের দিকে চেয়ে কাটিয়েছি অনেক দিন। বাইরে বাইরে।... কিন্তু ঘরে ঢুকতে হয়েছিল যে।

বিদায় নিলুম, —আকাশ আলোর দিকে ভালো করে তাকাবারও ভরসা হ'ত না। চমকে উঠতুম,— ঐ নগ্ন আলোর মুখ দেখে — আর ঐ অত বড় অতখানা আকাশ...

দরজা-জানলা বন্ধ।

বিছানায় শুয়েছিলুম।

রেবা মাথা টিপছিল।

আমি তাকে টিপতে বলেছিলাম। এমনতর আব্দার আজকাল প্রায়ই করি।

যদিও কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না।

'অত আস্তে মাথা টিপলে চলে কি?'

রেবা কোনো জবাব দিলে না।

'আর একটু জোর দাও। হ্যাঁ, ঠিক এই রকম।'

তা মুখের দিকে তাকাতে গেলুম।

ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছে।

'হ্যাঁ, ঠিক এইরকম,— ঠিক এমনি... বেশ লাগছে— আ—'

আঙুর মুষড়ে যখন মদের পেয়ালা ভ'রে নেই, —তখনো তো বেশ লাগে,

—আমার।

কিন্তু আঙুরের!

মাটির থেকে কিছু পেতে হ'লে মাটির বুকটাই-না আগে চিরে নিতে হয়।

পেলামই না-হয় দু'মুঠো ভ'রে।

কিন্তু তার জন্যে কতখানি আঁচড়, —কত বড় ক্ষতের চিহ্ন!... তার মাথা টেপাটা আমার ভালো লাগছিল না। সে যত বেশি আপনাকে খরচ করতে যাচ্ছিল আমার দেউলে হবার সম্ভাবনা যাচ্ছিল তত বেশি বেড়ে।

'থাক্,— আর টিপতে হবে না।'

কথাটা শুনতে পায়নি যেন।

'রেবা,— হয়েছে।'

এবার উঠল।

দাঁড়াল,—চাবির রিং-টা ঘুরিয়ে; —বেঁচেছে বৈকি।

আমিও বাঁচলাম। হাঁফ ধ'রে গিয়েছিল।

চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে রেবার মুখের পানে তাকিয়ে আরেক বার চিনে নিলুম, —আমাকে আর তাকে।

কত খুঁটিনাটির ভিতরই যে আমরা ধরা প'ড়ে যাচ্ছি।

তবুও কি শেষ হবে না!

উঠে বসতে হ'ল।

কপালের রগগুলো দপ্ দপ্ করছিল। সমস্ত মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। রুমালটা খুব শক্ত ক'রে মাথার চারপাশে বেঁধে নিলুম। জানলা খুলে দিতেই রাস্তার গ্যাসলাইটের এক ঝলক আলো এসে চোখ টাটিয়ে দিল।

তাকাতে পারলুম না, —সরে যেতে হ'ল।

অতখানি আকাশ অসহ্য।

চুপে চুপে বিছানায় বস্‌লুম।
রেবা চ'লে গেছে,—কখন যে।
ফিরেছে না তো।
না—ডাকলে সে যে বড় একটা আসে না— এই ছোট-খাট কথাটুকুও মনে রাখতে ভালো লাগছিল না।
যা নয়, তাই ভাবতে ভালবাসি।
অন্ধকারের রঙ-এ আলো-কে না-গুলিয়ে নিয়ে চোখ মেলতে সাহস হয় না।
বেবা এল না।
উঠে পড়্‌লুম।
বাবান্দায় এসে দাঁড়ালুম।
তাজা শালপাতায় চড়িয়ে খানিকটা গরম ফ্যান্‌সা ভাত একটা ভিখিরি-ছোঁড়ার হাতে সে তুলে দিচ্ছিল... খানিকটা গবম ফ্যান্‌সা ভাত, আব আলুনি একটু তবকারি।
বাঃ— বেশতো!
অবাক হ'যে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বইলুম।
এমন দবদ যাব, তাকে দিয়ে কী-না হ'তে পাবে!
ছোড়াটা খাচ্ছে, —বেবা একমনে তাকিয়ে দেখছে।
অন্ধকাব ঘরে বেবাব যে-মুখ দেখছিলুম তাব চেয়ে এই মুখখানা আমাব ঢেব ভালো লাগে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঁঝি ধ'বে গিয়েছিল।
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘবে ঢুকে পড়্‌লুম।
... আচ্ছা, এই মেয়েটাকে মুক্তি দেযা যায় না— এর খঁচার বাসাব থেকে!
খুব—খুব!
তবুও, খাঁচাব শিকগুলো যে আমাবই বুকে পাঁজব দিয়ে গড়া।
টনটন ক'বে উঠছিল খুলিব মতো এ মাথাটা। আব ভাবতে পারছিনে।
কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই টেব পাইনি।
বাত ঢেব হযেছে।
জানলাব ফাঁক দিয়ে চাঁদেব আলো।
মেঝেব ওপব ভাত ঢাকা।
বড্ড খিদে পেযেছে,— উঠলুম। আস্তে আস্তে ঢাকনি তুলে তাকালুম।
সাজানোর কী পবিপাটি! চকচকে থালাটা। গেলাসটা ঝকঝক করছে।
মেঝে তকতকে-- আসনখানা পবিষ্কাব।
কে এই সব করেছে, জানতুম।
কেন করেছে, জানতুম তা-ও।
কিন্তু তাতে ভবসা পাচ্ছিলুম না, —ভযই যাচ্ছিল বেড়ে।
নিজেব ওপব ঘেন্না হচ্ছিল।

যদিও বুকেব পাঁজর দিয়ে গড়েছিলুম তবু খাঁচা-যে খাঁচাই।
খাচ্ছিলুম।
পাশের ঘরে কাব নিঃশ্বাস পড়ছে, কেমন যেন এক বকম!
বেমালুম হজম কবতে পাবছিনে।
মাটিটারই কানে কে যেন উসখুস করছে।
অথচ মানুষকে বলবাব মত ভরসা পাচ্ছে না। কেন, মানুষ কি মাটিব চেযেও রদ্দি!
খেতে খেতে উঠে পড়্‌লুম। জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম। অত রাতে আবার টুকটুক ক'রে কে ঘবে ঢুকল! ঝাপ্‌সা ঠেকছিল।
... পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়ে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল— কুনীমাসী। ছাযাটা তার

মেঝের ওপর চাঁদের আলোয় থমকে থেমে গেল।

'মাসীমা—'

'হ্যাঁ ভাই, তোমাকে বলতে এসেছিলুম। তা তোমার এত বাত ক'রে খাওয়া কেন বাপ। তাও আবার এতটা এঁটো যে।... কিছু খেলে না বুঝি'

ঢের দূর-সম্পর্কে মাসী।

বেবার মা... কুন্তীমাসী।

চোখ পাকিয়ে দেখছে— পাতে কী-কী ফেলে রেখেছি, তুড়তুড় ক'রে আউড়ে যাচ্ছে মন্ত্র পড়বার মত,—এই ষাট বছরের বুড়ী।

মাসীমা— 'নিজের গলায় নিজেই চমকে উঠলুম। কী বলতে চেয়েছিলুম,

—মাসীমা নিজেই বললে। 'বেবার একটা হিল্লে হবে না বাপ... ছিঃ'

মাগী-মিন্‌সে এক খোপ্‌রে— অথচ পুরুত এসে মন্ত্র পড়বে না'...

পাশাপাখি ঘরে শোয়া,— রাতের পর রাত'...'

কে যেন আমার জিভটাই নিলে কেটে। কথা বলতেই দিলে না।

মাসীমা বললে... কত কী বললে... অত কে মনে ক'রে রাখে। অনেকক্ষণ পরে বললুম, 'তা হ'তে পারবে না।'

এইটুকু বলতে পেরেছি, খুব করেছি। আর কিছু না-বললেও চলে।...

মাসীমা বললে, 'কালই আমরা চ'লে যাবো... যেদিকে চোখ যায়।'

যেমন এসেছিল, টুকটুক ক'রে বেরিয়ে গেল।...

দিনের মধ্যে বিশবার ক'রে আসছিল। কত কী বলছে,— রটাচ্ছে কত কী মেয়ের নামে। নারীত্বের অপমানে মাথাটা ফিরে ফিরে হেঁট হ'য়ে যাচ্ছিল। বেবা কোনোদিন ওসব গ্রাহ্য করেনি কিন্তু। সত্যকে মিথ্যের চেয়ে ঢের বড় ক'রে সে দেখতে পেয়েছে। সেই জন্যই বোধ হয়।

কবি এল... গরদের পাঞ্জাবী গায়ে, সোনার চেন ঝুলিয়ে,— বাবরিকাটা চুলের বাহারে,— যৌবনের যা-কিছু চঞ্চলতা নিয়ে।

বসতে বলিনি। নিজেই চেয়ারটা টেনে নিলে।

বললে, 'আমার কোন্ কবিতাটা তোমার খুব ভাল লেগেছে?...

'অন্ধকার'-এর ওপর যেটা লিখেছিলুম,— না?'

বললুম, 'তোমার কোন কবিতাই আমার ভাল লাগেনি।— সব চেয়ে যে কবিতা আমার ভাল লাগবে তা আমি নিজেই তৈরি করছি।

কতগুলো কাজের কথা ব'লে সে উঠে পড়ল— আমার এই বাজে কথাটাকে একেবারে গ্রাহ্য করলে না।

বুকের ভিতর যে-ক্ষুধা জমে, তা সহজে মরতে চায় না।... না।

তবুও বেবাকে যতদূর পারি এড়িয়ে চলছি। সেইজন্যেই সে আমার কাছে এসে বসতে সাহস পাচ্ছিল।

বড্ড বেড়ে গেছে সাহস তার।

আমার হাত দু'টো তার হাতের মুঠোর ভিতর টেনে নিয়ে সে আমার বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ছে,— যে—অক্ষয় নির্ভর নিয়ে মেয়ে বাসি—মড়া বাপের বুক জড়িয়ে থাকতে পারে, এ—জিনিসও তাই... অন্য কিছু নয়।

আমি তা জানতুম,— জানতুম।

তবু ভুল ক'রে অন্য কিছু ভেবে বসতে ভাল লাগছিল যেন।

ভুল, কিন্তু তবু ভুল ভেঙ্গে যাচ্ছে, একবার,— দুবার—বারবারই ভেঙে গেল এ-ক'দিনের ভিতরই।...

সেই থেকে বেবা আমার ছায়াও মাড়াচ্ছে না।

আমাকে সে ভালোবাসেনি কোনোদিন।

আজকাল ঘোমটা টেনে স'রে যাচ্ছে, পালাবার পথ খুঁজে হয়রান।
কী-যে ভয়! কত বড় ঘেন্না!

ডাক্তার এল। ছোক্‌রা সাহেব মানুষ।
ঘর-দোর দেখে মুখ ফিরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলে। পাঁচ মিনিটের ভিতর বার সতেরো 'সুট' ঝেড়ে নিলে। আমার খদ্দরের পিরাণের দিকে তাকিয়ে নিজেই সে লজ্জিত হ'ল। রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম চোখ নাক মুখ মুছে কোনো রকমে এ জীর্ণ জীবনের জোড়াতালিটাকে সায়েস্তা ক'রে নিতে হ'ল তার!
... তবুও আসছিল... রোজ।
দিন ফুরুলে যখন ছায়া ঘনায় আকাশে, ঠিক সেই সময়।
ছায়ারই মত আচমকা।...
বললে, 'আপনার চশমাটা দেখি তো।'
খুলে আস্তে আস্তে তুলে দিলুম।
'বাবা, —বড্ড পুরু লেন্স তো, চোখের মাথা খাওয়া!'
'তা নয়তো কী!...' তিরতির করে হাসতে হাসতে বললুম।
চশমাজোড়া ঘুরিয়ে নাচিয়ে ফিরিয়ে দুলিয়ে ঢের কিছু বললে, বোঝালে।
বুঝলুম না।
শুনিনি।
কথা সে ব'লে যাচ্ছে, এটুকু শুধু টের পাচ্ছিলুম।
এইটুকু শুধু'
চশমা ফিরিয়ে দিলে আমাকে।।।
বললুম, 'হ'ল?'
'চোখ গেল কীসে? ... কাঁচা বয়সেই গিয়েছে বোধ হয়।?'
'যা গিয়েছে—!'
আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার ঘেন্না আর ফুরুতে চাইল না যেন'
এ বিকৃত শবদেহ নিয়ে মানুষ ব'লে আপনাকে চালিয়ে দিচ্ছি—
মনুষত্বের এত বড় অপমান তাঁর বড় অসহ্য মনে হ'ল।
আমি কিছু বলবার আগেই রেবা চা এনে দিলে।
পেয়ালাটায় ফাটল ধরেছে; পিরিচেও।
ডাক্তারের চেয়েও এ-জন্যে রেবা অনেক বেশি লজ্জিত। কী ব'লে সে আপনাকে খারিজ ক'রে নেবে, ভেবেই পাচ্ছে না।
অনেক কথা বলছে রেবা।
আমি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার ক্ষুধিত আত্মাটাকে গালিয়ে নিয়ে দু'জনের দিকে একবার তাকালুম।
ওরা আমাকে দেখতে পেলে না।
নোনা-ধরা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে থাকতে ভালো লাগছিল।
এমনি।
ডাক্তার উঠছে না— রেবাও লেগে আছে।
এতদিন পরে সে পেয়েছে।
ওরা অনেক কথা বলছে।
চোখ বুজে বুজে মনে হয়... আমিও বলতে পারি— তোমরা যা বলেছ—, সব; তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি তুমুল ক'রে।... আমি বলতে পারি। আমি বলতে পারি।... আমি যাই হই-না কেন, নিজেকে আমি এমন ক'রে ছেড়ে দিতে পারি তোমরা তা পার না,—পারবই না। ওরা যত গরম হ'য়ে ওঠে, যত নগ্ন হ'য়ে পড়ে— আমার মনে হচ্ছিল, ওঁরা তত আড়ষ্ট হ'য়ে আসে।
আমার কাছে ওরা কী'

এই কি ওদের ভালোবাসা!
আমাকে যদি ভালোবাসতে দিতে!

রেবা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'
মিনিটখানেক সব চুপচাপ।
তারপর চুমোর শব্দ...
দু'জনে উসখুস করছে।
শেষে সব চুপ।
অন্ধকারে একা ঘরটা ঠাণ্ডা মেরে গেছে।
এ বীভৎস না সুন্দর!
বুঝে উঠতে পারছি না।
বেবাকে ডেকে এনে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছি।
পেয়েছি, পেয়েছি, ভরসা পেয়েছি।
সেদিন যে সে শালপাতায় ক'বে ভিখিরিকে ফ্যান্‌সা ভাত দিয়েছিল, সেদিনও তো তার মুখখানা এমন চমৎকাব দেখিনি।... না—না—এ বীভৎস হ'তেই পারে না! এ সুন্দব, —এ পরম সুন্দর!
রেবা বললে, 'কেন ডাকছিলে?'
খাঁচাব পাখি যেন ছাড়া পেয়েছে, —গলাব স্বর এমনি। আমিও আকাশটাকে ফিবে পেয়েছি।
পেয়েছি ফিবে আকাশের যা-কিছু আলো—সবটুকু। অন্ধকাবেব চেয়ে আলোই বড়।
ঢেব বড়।
অত বড় আকাশটাব চেয়ে উচু সত্য আব কিছুই নেই।
'ডাকছিলে তুমি!'
আমাব গায়েব ওপব গড়িয়ে পড়ল একেবারে। কুণ্ঠা লজ্জা ভয় ঘেন্না— সমস্ত উৎবে অনেকখানি ওপবে উঠে গেছে সে যেন।
সেই বড় নির্ভব, — বাসি মড়াটার ওপবেই।
'ডাকছিলে'!... দু'জোড়া চোখেব পাপড়ি মিশেই যেত আবেকটু হ'লে।
না—মিশতেই রেবাব চ'লে যেতে হ'ল।... এমনি।

মলিনা বললে, 'আমার ননদদের সব ভাল'।

প্রভাত বললে, 'কোথায় বা তোমাব ননদ?'

—'বা নিজের ননদ না থাকলে বুঝি আর থাকতে নেই তা'—

প্রভাত কিছু বললে না। শ্বশুর শাশুড়ি স্বামীব থেকে শুরু করে পৃথিবীব প্রায় সমস্ত বকম সম্পর্কেই অবসন্ন হয়ে পড়ে মলিনা ননদদের অভাব বোধ করছিল। শ্বশুববাড়িতে এই জিনিসটি থাকলে জীবনটা এত বিক্ত হতে পারত না।

পাশের বাড়িব মীবাদেব সঙ্গে মিশে এই ধারণা তার আরো দৃঢ় হয়ে উঠছিল। মলিনা বললে, 'মীরা ছুটুরা এমন সাগ্রহ করে আমাকে বউদি বলে ডাকে' মলিনা নবম কোমল হয়ে পড়ছে।

প্রভাতই জানে যে প্রতিবেশিনীদের ছুটু ও মীবা একবাবেই বিভিন্ন পরিবাবের, বিভিন্ন রক্তের জিনিস, নিজেব শ্বশুববাড়িতে মলিনা যে রুক্ষতা ও স্থূলতা দেখে এসেছে—ওব ননদেরা সেই জিনিস নাড়ীতে বেঁধে নিয়ে আসত—মীরাদেব মত কোনো স্বাভাবিক মধুরতা বা মিষ্টি ছেলেমানুষি নিয়ে নয়—ঘনবিস্তৃত পরিবাবের বক্তেই সে সব নেই যে, কোনোদিন ছিল না যে।

এই পরিবারের ননদবাই হযত মলিনাকে সবচেয়ে বেশি জ্বালাত। সে জাযগা যে তাব শূন্য বয়েছে সে ভালই। কিন্তু যা নেই, হবে না, পাওয়া যাবে না মানুষ কিনা সেই সমস্তকেই লোভ করে। নইলে মীবাদেব সঙ্গে সই পাতাতে পারত নাকী মলিনা? ননদ ভাজের চেয়ে কি সম্পর্ক ঢের লঘুজাতীয় হয়ে উঠত কী, ঢেব মধুর।

কিন্তু যাক এসব। মেযেমানুষেব প্রবৃত্তিব মুগ্ধতা কখন কোন পথ ধরে চলে যে!

কিন্তু মীবাদেব সঙ্গে প্রভাতদেব এমন কিছু দূবেব নয একটা সম্পর্কও ছিল বটে। সে আত্মীযতাব ওপব দাবিও চলে এবং প্রভাতও তা কবে এসেছে। মীরাব বাবা প্রভাত-এব জেঠামশাই সপবিবারে কয়েকমাসেব জন্য দিল্লি যাচ্ছেন। মলিনাকেও তিনি নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। জেঠামশাইযের মতে মত দিয়ে জীবনেব সবচেয়ে বেশি নিস্তার পাচ্ছে প্রভাত।

নিজেব এই চাব পাঁচ বছবেব বিবাহিত জীবনেব মধ্যে মলিনাকে জীবনের কোনো দিক দিয়েও কোনো প্রবোধ দিতে পারে নি যে সে, কোনোদিনও যে এই মেয়েটিকে এমন দিনরাত সংগ্রাম অধিনতা অভিমান অপমানের জ্বালাব থেকে উঠিযে নিয়ে একটা গরুব ঘবের খড় বিচালিব ভেতর একটা বাছুরের মতও সহায় সঙ্গ আশ্রয় উষ্ণতা দিতে পাববে না যে সে? আহা শীতেব বাতের একটা বাছুরও—পৃথিবীর পাখি, ফড়িং, কীট—এমন শীতের বাতে সকলেব জন্যই, হোক না তা খুব নির্বোধ-তবু একটা পরম পবিতৃপ্তি বযেছে ত। কিন্তু জীবনেব কত শীত এসে গেছে। শীতাক্ততার ভিতর প্রভাতের নিজেব জীবনেব অকর্মণ্যতা ও এই ঘনসন্নিবিষ্ট দরিদ্র দু'বছব পবিবাবের নিদারুণতাব মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে জীবনের থেকে কি অর্থ সংগ্রহ কবেছে মেয়েটি?

না জানি ওব জীবনের পাঠ কি বকম! একটা ফড়িঙেব পাখা কেটে ফেললে তা ব্যথা পায বটে, কিন্তু সে বেদনা তবু অবোধ। এই মেয়েটিরও যদি ঠিক তেমনটি হত? এই মস্ত বড় সংসাবের দিনের পর দিন মলিনাকে ব্যবহাব করে চলেছে নিজেবই রুচি নীতি অভিযোগ, বিচার কর্তব্যাকর্তব্যের প্রয়োজনে। প্রভাতের কিছু কথা বলবাব নেই। সে দেখতে পাবে, এক কথা কাকচিলেব বিষম জীবনের অভিনয়ের ভিতর একটা চড়ুই সে দেখছে। এরই ভিতর আহার সংগ্রহ করে নিতে হবে তার; জীবনের ক্ষুধা মেটাতে হবে।

জীবনেব এই দুরন্ত খেলা একদিনেব বেশিই বা কি করে সাধা যায। কিন্তু প্রতিটি ভোরেই নতুন কিছুর সূচনা হচ্ছে যেন। মলিনা ও প্রভাত নতুর আশার সঞ্চার করতে চাচ্ছে। মুহূর্তের ভেতরই সে অব্যক্ত পুরনো অভিনযের পট উঠে যাচ্ছে। প্রতিটি রাতই বিয়োগে বেদনায় কঠিন হয়ে পড়ে পরস্পরেব সান্নিধ্যও চাচ্ছে ন যেন আর। সৃষ্টিব দুই বিপবীত মুখে অনন্তকাল ধবে দু'জনে চললেই ভাল হত। তারপর নতুন সকাল

আবার। নতুন সূচনা। নতুন আশা। এ না হলে জীবনে প্রথম রাতের পরেই শেষ হয়ে যেত যে। কিন্তু যাক, এই পরিবারের ভিতর এই দু'টি জীবনের দুর্দশাকে বিশেষ কপচিয়ে লাভ নেই আর।

যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড দিনগুলি নিয়ে সে এক বিরাট বনানি তৈরি হয়ে গেছে। অব্যর্থ সত্য হয়ে বেঁচে রয়েছে তা। যে বেদনা অন্যায় অত্যাচারের অপমান অনন্ত আস্বাদ না পেলে সৃষ্টি পরিপূর্ণ হয় না, দৃষ্টির সেই মূল্যবান ক্ষুধা মিটিয়ে মিটিয়ে সার্থক হয়ে রয়েছে তা।

কিন্তু সৃষ্টির এই ক্ষুধাকে তৃপ্ত করবার ভার তিন চার মাসের জন্য নিজের জীবন থেকে থামিয়ে ভুজঙ্গবাবুদের সঙ্গে দিল্লি চলেছে মলিনা। চেঞ্জে। আমোদ করতে।

উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে মলিনা।

নিস্তার বোধ করছে প্রভাত। মলিনার এই দিল্লির জীবন যদি অনন্ত হত আজই চোখ পুড়তে রাজি আছে প্রভাত। দিল্লি, আগ্রা, জব্বলপুর, মোরাদাবাদ—মৃত্যু—মেয়েটিকে একটা সূচনার ভিতর পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছে প্রভাত। যদি তাতে মেয়েটি নিস্তার পায়—প্রভাত বরং সে অভিনয়ের ভিতর নাই বা থাকল।

মলিনাকে ভালবাসে বটে প্রভাত। ওর প্রতি পরিবারের একটি অতি সামান্য ব্যক্তিরও খুঁটিনাটি অবিচারে সে ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু এই পরিবারের কোনো সচ্ছল প্রেমিক যদি মলিনাকে ভালবাসে, তার হাতেই মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে ওদের সার্থকতার পথের থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রভাতের প্রেমিক মনও বটে,—মানবাত্মার উপলব্ধির সে যে কি এই বিষম বোঝা সে সবের থেকে শান্তি পেত সে। নিস্তার পেত। ওর বাপ মা কেউই যদি থাকত তাহলে সমস্ত দিনটার সমস্ত রকম পরিণামের কথা মনে করে ওকে সে সবের থেকে সামলে রাখত। কিন্তু প্রভাত ওর স্বামী মাত্র। প্রেমিক স্বামীও ত কিন্তু তবুও বাপ-মায়ের সে বিরাট মায়ার টান সে কোথায় পাবে? যা সকল অনধিকারের ভেতর অধিকার তবু না পেয়ে ছাড়ে না। মেয়েটির স্বামী না হয়ে পরিবর্তে পিতা হত যদি সে? তাহলে একে নিয়ে আকাশ বাতাসের নিরুদ্দেশে, আহা, কি অনন্ত আরামের ভিতর চলে যেতে পারত সে।

মলিনার দিল্লি যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

শার্টের পকেট ছিঁড়ে গেছে কোথায়, পাঞ্জাবির আস্তিন ছিঁড়ে গেছে, বোতাম হারিয়ে গেছে, সমস্ত ঠিকঠাক করে দিয়ে যাচ্ছে মলিনা।

—'এর পর কিন্তু এ জিনিসগুলো কার ঘাড়ে তুমি চাপাবে আমি জানি না।'

সারাদিনের অবসন্নতার পর রাতের অন্ধকারে শীতে এবং বিছানায় সংকীর্ণ জায়গাটুকু ছাড়া আর সব স্থানেই সব সময়েই স্বামীকে ভালবাসে মলিনা। কিন্তু শীত রাতের গভীরতাব ভিতর স্বামীকে ভালবাসা দূরে থাক এই কোনো রক্তমাংস কোনো 'অন্তরাত্মা' কোনো কিছুব কড়ে আঙুলেব জন্যও কোনো কামনা থাকে না মলিনার তখন আর। জীবনে ঘুম ছাড়া তখন আর কিছু নেই। ঘুম ছাড়া, মৃত্যু ছাড়া। দিল্লি রওনা হবার দু-তিন দিন বাকি আব। স্বামীর জন্য আদরযত্নের আর শেষ নেই মলিনাব। ধোপাব খাতায় প্রভাতের ময়লা কাপড়চোপড়ের শেষহিশাব লিখে দিয়ে বললে, 'মাস তিন চাবেব জন্য চললাম, সব দেখেশুনে নিও। আমি না থাকলে কী করে যে তোমার চলবে বুঝতে পারছি না। কগণ্ডা কাপড় হারাবে, কার জামা গায়ে দিয়ে বসবে, কার বালিশে গিয়ে মাথা গুঁজবে, কি যে করবে তুমি।'

প্রভাতের বিছানাপত্তর ঝেড়ে পাট করে দিয়ে, ঘরদোর পরিষ্কার করে সংসারের কাজ করতে চলে যাচ্ছে মলিনা। সে এক বিপুল বিরাট বিশ্বগ্রাসী কুম্ভীপাকে চরতে চলল মেয়েটি। আর সেই সন্ধ্যার সময় দু-এক মুহূর্তের জন্য আসবে। কিংবা বাত এগারটা বারটা করে।

আজকের ছুটির দিনটা ছিল। কিন্তু কিছুতেই তবু ওকে পাওয়া যাবে না।

সকলেই ত সৃষ্টির অন্ধ আবেগের অধীন। কিন্তু মলিনা এই পরিবারের (কুড়ি পঁচিশটি মানুষের) অক্লান্ত প্রযোজনীযতার অধীনও বটে। কোনোদিনও সে আশ্চর্য নেই প্রভাতের: থাকবে না কখনো যাতে মেয়েটিকে এইটুকু স্বাধীনতাও সে দিতে পারত।

মলিনা সন্ধ্যার সময় এসেছে একবার। কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না। বাড়ির মেয়েদের চুল বেঁধে দিতে হবে। চলে গেল সে।

পরের দিন বিকেলে একটু সময় হয়েছে ওর। এক ঠোঙা ঘুগনিদানাও নিয়ে এসেছে। হয়ত প্রভাতের জন্যই। কিন্তু ঘরে পা দিতে না দিতেই ছুটু মীরা ওকে ডেকে নিয়ে চলে গেল।

মানুষের জীবনটাকে মলিনা যেন বোঝে না। নইলে দু'দিন পরে যে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবে সে সমস্ত দিনমানের ভিতর সে স্বামীকে একস্বরও কি সে আকাঙ্ক্ষা কবতে পারে না। কোনো কাজের জন্য

নয়, কথাব জন্যও না, শুধু তাব কাছে কয়েকমুহূর্ত বসে থাকবাব জন্য ববং সে কামনা নেই যেন এ মেয়েটিব। মীবা ও ছুটু একে ঢেব বেশি খুশি কবে ফেলেছে। ঘুগনিদানাব ঠোঙাটাও ওদেব দু'জনেব ভিতবেই ভাগ কবে নিচ্ছে সে। ওবাও তৃপ্তি পাচ্ছে। মলিনাও পবিতৃপ্ত হচ্ছে। স্ত্রীব মুখে এই সন্তোষেব শ্রী স্বামীব সমস্ত প্রশ্ন চাপা দিয়ে বাখছে। আশ্বস্ত হচ্ছে প্রভাত। শেষ পর্যন্ত এইটুকুই সে চায়, তা হতে গিয়ে পবস্পবকে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয় তাও হোক। মীবাদেব দেউড়িব ভিতব দিয়ে দেয়ালের ভিতব এই কটি প্রসন্ন মুখ মানুষেব জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। বিবাহেব পব থেকে নিজেব জীবনটাকে যে বকম ব্যবহৃত হতে দিয়েছে মলিনা তাও আজকেব সন্ধ্যাব ওব ওই মাধুর্যটুকু নিয়ে প্রভাতেব কাছে মলিনা যদি শেষ পর্যন্ত হয়ে যেত, সৃষ্টিকে তাহলে আব ধিক্কাব দিত না প্রভাত। নিজেব মবণকেও আব ধিক্কাব দিত না সে, নিজেব জীবনকেও মধুব সুখেই গ্রাহ্য কবে চলতে পাবত।

কিন্তু আজকে গভীব বাত পড়তেই এই মেয়েটি অনেক অপমান অবিচাব অত্যাচাব অভিমান অমঙ্গল মাথায় কবে এনে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকবে যে' নাড়তে চাড়তে গেলে মাটিতে আঁচল পেতে শুয়ে থাকবে। কিন্তু প্রভাতেব কোনো সান্ত্বনাই সে শুনতে যাচ্ছে না। আকস্মিক মৃত্যুব চেয়ে জীবনটাকেই যে ববং সহ্য কবে ক্ষমা কবে উপলব্ধি কবে যাওয়া দবকাব একথা মলিনা কিছুতেই স্বীকাব কববে না।

প্রভাতও কি স্বীকাব কববে?

এব পবেব বাতটা ববং একটু নিবিবিলিব।

চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে বাত দু'টো তিনটে বাজিয়ে। গ্রহণ দেখবাব জন্য বাড়িব সবাই জেগে বয়েছে। মলিনা অবশ্যই।

দু'টোব সময় গিয়ে প্রভাত একবাব দেখে এল। চাঁদটা একটা পোড়া ফানুসেব মত যেন, শিগগিবই ছাই হয়ে যাবে সেটা কালি হয়ে যাবে। চাঁদেব কোনো অস্তিত্ব থাকবে না আব। কিন্তু অতটা সময়েব জন্য সে অপেক্ষা কবতে পাবছে না। বিছানায় এসে ক্লান্ত হয়ে কাত হয়ে পড়েছে। মলিনা নেই আজ যাব-জীবনেব ভাবাক্রান্ত ডানা দু'টোব অজস্র পলকেব বিযাক্ত কলমেব সুখ জীবনটাকে বিঁধছে না আজ আব তত। ডানা দু'টো বুজে বয়েছে যেন। কোনো আশ্রয়ে প্রয়োজন নেই আজ আব। না শিষ্টে না মুখে। কেমন একটা নিশ্চিন্ত আবাম।

তাবপব ঘুম।

মলিনা এসে কখন যে শুয়ে বয়েছে জানে না প্রভাত।

তাবপব যখন ভোব হয়ে এসেছে প্রায়, দু'টি মৃদু হাত তাকে জড়িয়ে ধবে বয়েছে। প্রভাত ঘুমন্ত স্ত্রীব শীণ মুখেব দিকে তাকাল। আজও অনেক অপমান, অনেক অধীনতা ব্যথা অশ্রু নিয়ে এসেছিল মেয়েটি। সেগুলো কি বকম কেমন কতদূব জীবনেব কোনো কোনো দিককে আঘাত কবে, বাতে অন্ধকাব মুছে দিয়েছে সব। অন্তত ভবিষ্যতেব ভিতব কোনোদিনও সে সব উদঘাটিত হবে না আব। হবে কি না হবে প্রভাতও সে কথা ভাবতেও যেত না। কিন্তু কি এক ভবিতব্যতা স্ত্রীব মুখেব বেদনা বিমূঢ়তাব মোচড় ভোবেব প্রসন্নতাব ভিতব প্রফুল্ল হ যে উঠবাব আগে প্রভাতকে সেই বিষম শ্রীটা একবাব না দেখিয়ে ছাড়লই না।

পবেব দিন পিসিমাব জ্বব হয়েছে। ভোবেব থেকে সন্ধ্যা অবদি এক নিশেষেব জন্যও মলিনাকে পাচ্ছে না প্রভাত। বাতেও পিসিমাব সঙ্গে শুতে হবে তাকে।

তাব পবেব দিন মলিনা ভূজঙ্গবাবুদেব সঙ্গে কলকাতায় চলেছে। কলকাতাব থেকে দিল্লি যাবে। মলিনা ভোবেব বেলায় স্নান কবে বাঁধতে চলে গিয়েছে। বেলা দশটাব সময় একবাব এসে বলে গেল। আজ নাকি জেঠামশাইবা কলকতায় যাবে না।

প্রভাত বললে, 'কবে যাবেন?

— দুদিন পবে বোধ হয়?

— তাও বোধ হয়? যাবেন ত?'

—'তা যাবেন বৈকি।'

—'নইলে তোমাবই বা চলবে কী কবে?' প্রভাত একটু ঠাট্টা কবে হাসতে হাসতে বললে।

মলিনা আঁচল দিয়ে কপাল ঘাড় মুছতে মুছতে বললে, 'তাই ত ভাব কেবল। কাল পিসিমাব সঙ্গে শুয়েছি বলে ভোবেব বেলা কত কথা শোনালে। এসবই যেন আমি ইচ্ছে কবে কবি।'

প্রভাত খানিকটা তিক্ততাব সঙ্গে বললে, 'বাতে আমাব সঙ্গে শুতে আসতেও আমাকে বাজি কবে দিয়ে যাও বোজ, তাব চেয়ে পিসিমা মাসিমাই তোমাব ভাল।'

মলিনা গলায় আঁচল জড়াচ্ছিল।

তেমনি শ্লেষের সঙ্গেই প্রভাত বললে, 'মানুষের কবজি টিপতে, খুন্তি নাড়তেই ত তোমার জন্ম হয়েছিল। ভগবান বুঝে বুঝেই মানুষকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে যান। আমরাই শুধু তার ঘাঁট দেখে মরি।'

মলিনা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। গ্রহণের রাত ভোরের সেই বেদনাব্যথিত মূর্তি।

কিন্তু তবুও প্রভাতের কোনো কৃপা নেই। কোনো কোমলতা নেই। কেন থাকবে? এই মেয়েটির ব্যথার কথা ভেবে ভেবেই নিজের জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে সে? এই এত বড় বিস্তৃত পৃথিবীর একটা লোকও ত প্রভাতের খোঁজ রাখে না। নাই বা রাখল। কিন্তু যাকে সে স্ত্রী বলে জেনেছে, যতদূর পারে তেমনি সম্মান ও আদর দিয়ে এসেছে। স্বামীর জীবনের কোনো স্থূল সাধকেও সে সম্মান করল না। কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতিকেও গ্রহণ করল না। করল কি? করে নি ত। কেন করে নি? মলিনার উপর বিশ্বসংসারের সকলের অধিকার আছে। সকলের মন জোগাবার জন্যই এ মেয়েটিকে আনা, এ বাড়িতে এর আগমনের উপলক্ষ মাত্র প্রভাত। এ মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্ক রাত্রির তিক্ততার ভিতর দিয়ে শুধু। গভীর শীত ও অন্ধকারের ভিতর এর বেদনায় দগ্ধ হয়ে উঠবার মন মাত্র। অকৃত্রিম, কৃত্রিম সান্ত্বনা আশ্বাস ও উপযুক্ত স্বপ্নের নতুন নতুন রঙ খুঁজে বেড়াবার জন্য, নিজের অকবি অবিশ্বাসী অকৌশল মনের থেকে কথার পটুতা কল্পনায় চাতুর্য শ্রদ্ধা আশ্রয় নির্ভর মঙ্গলের একটা বিরাট অভিনয়ের যন্ত্রণাকে প্রতিটি রাত্রে সাজিয়ে তুলবার জন্য? কি দরকার এসবের? মলিনাকে কোথায় স্পর্শ করে এসব? নিজেকেই বা কোথায়? শুধু চেষ্টা অভিনয় কথা কথা কথা, কথাই কি অভ্রভেদী হয়ে থাকে না? জীবনের ভব্যতা ও ভবিতব্যতার স্রোতের বিরুদ্ধে কথার যে কোনো দাম নেই মলিনা যেন তা বুঝেছে; বুঝেছে যে স্বামী কথারই মাত্র অধিকারী, নিষ্ফল জীবনের নিরবলম্বনে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে তাই। কিন্তু মেয়েমানুষ কেন এত বুঝবে? জীবন সম্বন্ধেই বা কেন, দাম্পত্যের সম্পর্কেই বা কি জন্যে এত নিস্পৃহ হয়ে পড়বে? উপলব্ধির ভার পুরুষের উপর; তারই অন্তরাত্মা দিনের পর দিন অনাসক্ত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু প্রভাতের ভিতর অনুরাগের এত রাঙ রঙ থাকতেও মলিনাই কি বিমুখ হয়ে পড়ছে না? এমন বিমুখ আত্মাকে কিভাবে দয়া করা যায়?

একটু সহানুভূতির যোগ্য নয় যেন সে।

প্রভাতের হৃদয় কঠিন হয়ে উঠছে।

মলিনা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'দুদিন পরে চলে যাব। যাবার মুখে ওরকম করে কথা বল না।

প্রভাত বিরক্ত মুখে কঠিন কঠোর চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে একটু ভীত হয়ে মলিনা বললে, তুমি যা চাও, আমার দিক দিয়ে যতটুকু জানবার তা আমি জানি। তুমি হয়ত অন্যরকম ভাব। কিন্তু দিনের মধ্যে তোমাকে উপযুক্তভাবে স্মরণ করতে আমার বাদ যাবে না। কিন্তু সকাল থেকে রাত বারটা অবদি কি নিজের সাধে আমি রান্নাঘরে আর ভাঁড়ার ঘরে পড়ে থাকি?'

প্রভাত বললে, 'সে না হয় আমার কপালের দোষেই হল, কিন্তু রোজ রাতে অমন মুখ করেই বা তুমি বিছানায় আস কেন?'

এ প্রশ্নের জবাবে মলিনা বিমর্ষভাবে একটু হাসল মাত্র।

প্রভাত একবার চোখের ডিমটা উলটে নিয়ে মলিনার হাসিটা হজম করে ফেলে বললে, 'দিনের ভিতর এই এক সময়ই যা আমাদের অবসর।' বললে 'কিছু চাই না, অন্তত একটু প্রসন্নমুখে দুদণ্ড যদি বসতে।'

মলিনা বললে, 'সেও আমি সাধ করে কি করি কিছু? রোজই ত চেষ্টা করি শেষ পর্যন্ত কোনো ঘোঁট রাখব না আর। কিন্তু একদিন গিন্নিরা কর্তাবাবুদের এক একজন, এমনকি নিজের শাশুড়ি অবদি সবই পণ্ড করে দেয়। তারপর চোখের জল চাপতে চাপতে তোমার কাছে এসে বসি।'

প্রভাত তবুও কেমন একটা কঠোরতা নিয়ে চুপ করে রইল।

মলিনা বললে, 'মোটের উপর এই হয় যে তোমাকেই সবচেয়ে বেশি জ্বালাই কিন্তু কী করব বল? মেয়েমানুষের স্বভাব, নিজের দুঃখ না জানিয়ে পারি না যে। এ পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কাকে জানাব বল?'

প্রভাত বললে, 'থাক; এখনই যে আবার কাঁদ কাঁদ হয়ে গেলে।'

—'না, কাঁদছি না।'

প্রভাত বললে, 'কিন্তু এটা মনে করে নিতে পার না যে ওদের স্বভাবই ওইরকম নিজের সুখ ও প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে পরের জন্য ভাববার সময় ওদের আর নেই-এবং আমাদেরও এ ব্যথা চিরকালের

জন্যই থাকবে।'

মলিনা বললে, 'কেন থাকবে? সত্যিই কি তাই থাকবে?'

প্রভাত ঘাড় তুলে নিযে বললে, 'যতদিন আমাকে নিযে আছ এইবকমই হবে।'

মলিনা বললে, 'তুমি চেষ্টা কবছ তোমাব উন্নতি হবে নাকি? ভবিষ্যতেব আশা ধবে বযেছি যে।'

প্রভাত একটু উপহাস কবে বললে, 'আশা কবে থেকো, ভবিষ্যৎকেও–কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো ভাগ্যবান মানুষকে যদি আঁকড়ে ধবে থাকতে পাব তাহলে সে সবেব সার্থকতা থাকবে।'

স্বামীব কাছে মলিনা এ ঠাট্টা ঢেব শুনে এসছে। শুনতে শুনতে তবুও মাথাটা হেঁট কবে মুহূর্ত পবেই মুখ তুলে বললে, 'তাহলে বাতেব বেলা তুমি আমাকে এত সান্ত্বনা দিতে যাও কেন? বলবে সেটা আন্তবিক নয, না? কিন্তু তোমাব কোনটা কৃত্রিম কোনটা অকৃত্রিম তবুও যেন আমি তা বুঝতে পাবি। এখনই, ববং ভান কবছ তুমি। বাতেব বেলাই ববং সত্য কথা বল। বল না?'

চোখেব জল যেটকু জমে উঠছে মুছতে মুছতে খানিক প্রসন্নমুখে মলিনা হাসতে লাগল।

প্রভাত বললে, 'সমস্ত দিনেব অবসাদেব পব বাতেব বেলা আমাবও কিছু ভাল লাগে না। তোমাবও না। তখন আমি একটু নিবিবিলিই থাকতে চাই। এব চেযে বেশি কিছু নিতান্তই আব পাওযা যাবে না জেনে। কিন্তু পৃথিবীব যত অপমান জ্বালা মাথায কবে বোজই এসে তুমি হাজিব হও তবু। তখন তোমাকে আশ্বাস না দিযে আমি কী কবতে পাবি? অন্য আব একবম ইচ্ছাও হয বটে, কিন্তু তাতে সমস্ত বাতটা আবো বিষাক্ত হযে উঠত শুধু, একেবাবেই পণ্ড হযে যেত। কাজেই ওদেব ভুল। জানি না কাব কতদূব কি ভুল কি অপবাধ, আমি দেখিযে দিতে থাকি, তোমাব ভাবটাকে হালকা কবে দেবাব জন্য তোমাব যন্ত্রণাকে শান্ত কবে দিতে চেষ্টা কবি, তোমাব জ্বালাটাকে উপশম দিতে, জীবনটাকে–আমাদেব বাতেব দু–দণ্ডেব জীবনটাকে অন্তত একটু মধুব কবে তুলতে।'

—'বাতেব জীবনটাকে শুধু?'

প্রভাত ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

—'এইটুকু মাত্র, আব কিছু না?'

—'না, আব কি।'

প্রভাত বললে, 'এবং এইটুকুব জন্যও যা চেষ্টা আমাব, সমস্ত সান্ত্বনা আশ্বাসেব পবিশ্রম সবই কি মিথ্যা প্রযাস নয?'

নিজেব সায দিযে বললে, 'মিথ্যা প্রযাস বৈকি।'

মলিনা বললে, 'মিথ্যা?'

—'মিথ্যাই ত।'

—'তুমি নিজেব মনেব থেকে এসব কথা বলছ?'

প্রভাত তেমনই নিঃসঙ্কোচে আস্তে আস্তে বললে, 'তাই বলছি।'

মলিনা কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললে, 'আমাকে শুধু আঘাত দেবাব জন্য তুমি এইসব কথা বলছ। আমি জানি আমাব উপব বিবক্ত হযে তুমি বিবক্তিই শুধু নয, বিমুখ হযেছ, বিরূপ হযে উঠেছ। কিন্তু তোমাব দোষ নয, আমাবও অপবাধ বযেছে।' মলিনা একটু থেমে বললে, 'এই যে সাবা দিনবাত খাটছি, কারু মন পাচ্ছি না ত তবু, সকলেবই যেন এই ভাব যে প্রকৃত উপকাব আমাকে দিযে কারুবই কিছু হচ্ছে না। কিন্তু তবুও তোমাবও কেন ওদেব মত সেই বকম ভাব থাকবে? কেনই বা থাকবে না? অনেকদিন বুঝি না। কিন্তু তাবপব থেকে বুঝে আসছি যে সবচেযে তোমাবই কত কম উপকাবে লাগছি আমি।'

প্রভাত কিছু বললে না।

মলিনা বললে, 'কি কবে উপকাব কবতে পাবি বল?'

প্রভাতেব কাছ থেকে কোনো জবাব না পেযে মলিনা বললে, 'কিন্তু এই পবিবাবেব ভেতব থেকে তা ত পাবা যায না। এব বাইবে কোথাও আমাকে নিযে যেতে পাব '

প্রভাত বললে, 'উপকাবেব কথা বুঝি বলছ মলিনা। আমাব শার্টেব বোতাম লাগিযে দেবে, দুবেলা বান্না তৈবি কবে দেবে, কিন্তু এ সবই ত কবছ। বাড়িব সকলেব জন্যও। আমাব জন্যও। হযত আমাব জন্য একটু বিশেষ কবেই। কিন্তু এসব ববং আমি নিজে কবতাম। পবিবর্তে অন্য আব একবকম জীবনেব অনুবোধ তুমি যদি নিজেব থেকেই বোধ কবতে।' বলতে বলতে থেমে যাচ্ছে প্রভাত।

মলিনা তাকালে।

প্রভাত বললে, 'কি বকম অনুবোধ? কিন্তু কেন আমি তোমাকে বলে দেব তা?'

মলিনা বললে, 'তোমাব পাঞ্জাবিব বোতামটাও যখন বসাই অন্যদেব বান্নাবান্নাব কাজেব চেযেও একটু বেশি মাযা লাগিযে তা কবি কি না এবকম ধবনেব প্রশ্ন একসময প্রাযই তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কবতে—যখন প্রথম বিযে হযে এসেছি; কিন্তু এখন তা কব না কেন?'

মলিনা বললে, 'উত্তব পেযেছ বলে?'

প্রভাত একটু হেসে বললে, 'সে সব কাঁচা আনাড়িব বর্বব মোহ ভালবাসাব সময, সেসব অনেকদিন হয কেটে গেছে মনেব ওসব নিবর্থক ধোঁযা নিযে স্ত্রী-পুরুষেব সংসর্গেব জীবনটাকে পণ্ড কবে দেবাব সময এখন আব নেই। এখন আমি বস্তু চাই।'

'বস্তু মানে?' মলিনা ঘাড় হেঁট কবে থেমে গেল।

প্রভাত একটু বিবক্ত হযে বললে, 'কেন মিছেমিছি ঢঙ কবছ, জান না কি তুমি সব?'

মলিনা একটু আহত হযে বললে, 'কিন্তু তখন ত তুমি এবকম ধবনেব কথা বলতে না। শত হলেও তোমাব জীবনটা তখনই মধুব ছিল। কথাবার্তাব চালচলন ত এমন কঠিন ছিল না।'

প্রভাত বললে, 'জীবনে প্রথম নাবীকে পেযে চিন্তাশীল মানুষদেবও ছেলেমানুষিব আব কোনো শেষ থাকে না। কিন্তু সে মর্মান্তিক ভাবনাচিন্তাহীনতা কদিন আব টিকতে পাবে।'

মলিনা বললে, 'তা আমি বুঝেছি।'

আস্তে আস্তে স্বামীব দিকে তাকিযে বললে, 'তোমাকে বল নি আমি, কিন্তু আমি পদে পদে অনুভব কবে এসেছি তোমাব সে আগেব ভালবাসা আব নেই।'

প্রভাত নিজেব বাঁ-হাতেব উপব একটা মশা মেবে নিলে। বক্তশূন্য একটা মশা। খানিকটা কালো দাগ বেখে গেল মাত্র।

মলিনা বললে, 'ডাল চড়িযে এসেছি, অনেকক্ষণ হল। আমি যাই এ বেলা।'

প্রভাত বললে, 'দু'দিন পবেই ত দিল্লিই যাবে।'

মলিনা সে কথাব কোনো উত্তব না দিযে একটু হেসে তামাশা কবতে চেযেই যেন বললে, 'যদি তোমাকেও আমি না ভালবাসি তাহলেও কি তুমি আমাব সংসর্গ স্পর্শ—যাকে তুমি তোমাব বস্তু বল সেই সব জিনিসগুলোকে তেমন কবে চাইবে?'

ভালবাসা এ মেযেটিবও যে কমে গেছে প্রভাতও ত জানে, কিংবা পবস্পবেব প্রতি এতজনেব ভালবাসা মলিনাব দিক দিযে স্নেহমমতা, প্রভাতেব দিক দিযে সংসর্গলিপ্সা ও মেযেমানুষেব নিজস্ব মধুব দিকগুলোকে নিববচ্ছিন্ন অনুভব কববাব একটা প্রবল কামনায দাঁড়িযেছে গিযে। কিন্তু স্বামীব জন্য মমতামাযা মলিনাব যত স্থিব হযে উঠছে, প্রভাতেব কামনা আকাঙক্ষা ততই পড়ে যাচ্ছে যেন, শেষে এ মেযেটিব প্রতি কোনো বোধই থাকবে না যেন প্রভাতেব আব। না ভালবাসা, না ভাল লাগাব। হযত ওব মঙ্গলেব জন্য একটা নিবিড় আকাঙক্ষা থাকবে শুধু। কিন্তু তাও হযত উদাসীন হযে পড়বে, পড়বে না কি? শেষ পর্যন্ত কি অশ্রুও থাকবে না?

প্রভাতেব নিঃসাড় জীবনে কি থাকবে তাহলে? হযত এই মেযেটিকে সবিযে দিযে আব একজনেব জন্য আযোজন সমাবোহ, কিন্তু জীবনে সমাবোহেব দিন শেষ হযে যাচ্ছে যে। কিন্তু আজও কিছুই একেবাবে ফুবিযে যায নি।

মলিনা বললে, 'চুপ কবে বইলে?'

প্রভাত বললে, 'তুমি নিজেকে আমাব প্রেমিকা না মনে কবে আমাকে ভালসাতে না পাবলেও, স্বামী মনে কবে আমাকে মমতা না কবে পাববে কি? পৃথিবীব কোনো স্ত্রীই যে তা পাবে না কিংবা তা যে অনুচিত তা নয কিন্তু তুমি তা পাব নি আজও-জানি না কোনোদিন পাববে কিনা? তুমি তা পাব নি আজও। মাটিতে আঁচল পেতে আমাদেব দু'জনাব বিছানাটা ছেড়ে ক'দিন শুতে পাবলে? শুধু মাটিব শীত ড্যাম্পই নয মলিনা, এব ভেতব আবো কিছু বযেছে। সাবাদিনেব ভেতব আজকাল তোমাকে বড় একটা বুঝে দেখবাব অবসব দাও না, কিন্তু বোজ বাতেই সমস্ত ঝঞ্ঝাটেব পব তোমাব মৃদু হাত দু'টো তোমাব আপাদমস্তকেব নিবিড়তা দিযে আমাকে বেড়ে বাখবাব কি দবকাব তোমাব? আমি ত তা কবতে বলি না তোমাকে। আমাব নিজেব মনেব অভিমান ও সম্মান শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন বাখি। তুমি যে আমাকে তোমাব অন্তবেব সমস্ত মমতা দিযে জড়িযে বযেছ বুকেব ভেতব সবসময তা অনুভবও কবতে পাবি না। কিন্তু যখন জেগে থেকে এ জিনিসটাকে বোধ কবতে থাকি, তখনই মনে হয তুমি আমাকে ভালবাস আব নাই

বাস, তোমার এই মৃদু হাত দুটো, মুখখানা আমার বুকের উপরেই হযত, তোমার অজস্র চুল আমার মুখটার উপরই লতিয়ে লতিয়ে—তোমার আঙুলের হিম, নিঃশ্বাসের উষ্ণতা—'এরকমই কোনো প্রেমলিপ্সার থেকে না হোক যে মমতা নিবিড়তার থেকে জন্মেছে সে সবেরই প্রয়োজন রয়েছে আমার। ঘুমের ভেতর তোমার কোনো রুচি নেই, মন নেই, অনুভব নেই, কিন্তু তবুও আমি ঘুমিয়ে গেলে রোজই যে তুমি একবার জাগ, মমতাময়ী স্ত্রীর মনের মাধুরী নিয়ে শাঁখার মত সাদা দুগাছা শীর্ণ হাত দিয়ে আমাকে যে ঢেকে রাখ অন্তত এইটুকু আজও তার প্রয়োজন রযেছে আমার।'

ডাল নামিয়ে এসে মলিনা প্রভাতের কাছে আবার এল। বলরে, 'বড় বউদিকে বলে এসেছি বড্ড মাজা ব্যথা করছে, তরকারিটা তুমি দেখ ভাই।'

—'বউদি কি বললে?'

—'ঠোঁট ত ফুলুলে। রাগ করেছে। কিন্তু কি করব, আমি আর যেতে পারছি না।'

—'যেও না।'

—'কিন্তু কাজটা ভাল হল না, অনেক কথা হবে।'

—'হোক গে।'

—'এমনি বলে দিলেই হল, একটু বুঝেশুনে কাজও করতে হয়, কথাও বলতে হয়।'

মলিনা বললে, 'বাস্তবিক আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

মলিনা রান্নাঘরের দিকে দৌড়াচ্ছিল। তার আঁচলটা টেনে আটকে রেখে প্রভাত কঠিন মুখে বললে, 'বসো।'

—'বউদি কি মনে করবে?'

—'যা খুশি মনে করুক। তুমি আর ওদিকে যেতেই পারবে না আজ আর।' মলিনা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল; প্রভাতের আপাদমস্তক লক্ষ্য কবে মূর্ছাগ্রস্তেব মত হয়ে ভাবল, স্বামী পাগল হল নাকি?

—'দাঁড়িযে রইলে যে, বসো।'

কলের পুতুলেব মত মলিনা বসল।

প্রভাত যদি বলত উঠে দাঁড়াও, তাহলে তেমনি পুতুলের মতই উঠে দাঁড়াত হযত সে। এই পরিবাবেব সংসাবেব ভেতব লেপটে জীবন একে এই করেছে। মলিনার নিজের যেন কোনো মতামত নেই আব, ধর্মাধর্ম নেই, বিচাব নেই, প্রবৃত্তি নেই, রুচি নেই, অবসরের সময়ও দুদণ্ড ভাববার ক্ষমতা নেই তাব। কোনোকিছু নতুন জিনিসেবই সূচনা নেই। শেষ নেই, নতুন পথ কাটবার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো প্রকৃত বিদ্রোহ নেই। কোনো যথার্থ অনুপ্রেরণা নেই। এর জীবনে কি আছে আব? এই ক'বছরের লেবু কপচানোব পব ন্যাকড়াব মত অসাড় কমলাব ছিবড়েটা পড়ে রযেছে যেন শুধু। একটা কাজ নাই যা দিযে নতুন কিছুব সূচনা হতে পাবে। এই জন্যই শুধু ওর শবীরের জন্যও তত নয়। ওর মনের এই বিপদগ্রস্ত ভীরুতা নিঃসহযতা, মেযেটির বক্তের ভিতব আশাভবসা সূচনাস্বপ্নেব এই মর্মান্তিক কাজশূন্যতার জন্য একে এই পবিবাবেব বাইরে নিয়ে যেকোনো জীবন বিদ্রোহীদের দলে বসানো দবকাব। পরিণামে যাই হোক না কেন, এব চেয়ে ঢের ভাল হবে।

প্রভাত বললে, 'এজন্যে যদি এ বাড়ি আমায ছেড়ে চলে যেতে হয, তাহলেও আমি যাব।'

'কীসেব জন্য? আমি তবকারি নিজে না বেঁধে বড়বউদির ঘাড়ে চাপিযে এলাম বলে যে কথা হবে সে জন্য?'

প্রভাত বললে, 'না, সে শুধু নয, সেই কথা হবে বলে তুমি যে এত ভয় পাচ্ছ? জীবনের একটা সামান্য খুঁটিনাটিতেও ওদেব বিরুদ্ধে দাঁড়াবাব শক্তি তোমার নেই এই জন্য।'

—'কিন্তু এসবই ত আমি তোমাব কথা ভেবে করি। আমি যদি ওদের বিরক্তিভাজন হই তাহলে তোমার জীবনও যে এখানে দুঃসহ হয়ে উঠবে। যদিও এই পবিবারের সঙ্গে তোমারও বক্তমাংসেরই সম্পর্ক, কিন্তু তোমার নিজের আযের পথ যে বিশেষ কিছু নেই।'

প্রভাত বললে, 'আমি তোমাকে বলেছি যে আমার জন্যে ভাবতে হবে না।'

—'তুমি কী করবে?'

—'আমার দাযিত্ব আমি সম্পূর্ণ বুঝে নেব।'

—'কোথায যাবে?'

—'যেখানেই যাই, তোমাকে ফেলে যাব না।'

স্বামীর আকস্মিক সাহসে মলিনা একটু বিস্মিত হয়ে বললে–'তুমি কি তা পারবে?'

মলিনার বিশ্বাস হচ্ছিল না। রক্তাক্ত জীবনকে, জীবনের শীতাক্ততাকে সে স্বীকার করেছিল।

মলিনা বললে, 'এই যে আমি দিল্লী যাচ্ছি এতেই এদের ভেতর কত কথা উঠেছে।'

প্রভাত বললে, 'যে যা খুশি বলুক, দিল্লি যাওয়া তোমার কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

মলিনা বললে, 'শেষ পর্যন্ত এরা সবই পারে।'

প্রভাত বললে,. 'এতদিন অনেক অনাসৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু এখন থেকে আর না।'

মলিনা পুলকিত হয়ে বললে, 'আমার দিল্লি যাওয়া হবে তাহলে?'

প্রভাত বললে, 'হবে, কিন্তু দিল্লি যাবার নামে তুমি এত আনন্দিত হয়ে উঠছ কেন? মানুষের জীবনের এ ত অতি সামান্য একটা সুখ-তুচ্ছ একটা দু'দিনের বাসনা। মানুষের জীবনে আরো কত কি হয়। আরো কত আশার জিনিস, সাধের জিনিস।'

প্রভাতের কথায় মলিনা কান না দিয়ে তেমনি উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'তুমি জান না মীরা ছুটুবা আমাকে এত ভালবাসে বলে ওদের কি হিংসা। যেই শুনেছে জেঠামশাই তাব সঙ্গে আমাকে দিল্লি নিয়ে যেতে যাচ্ছেন অমনি ওদের মাথায় বাজ পড়েছে। সেই থেকে চেষ্টা চলেছে কী করে আমার যাওয়া না হয়।' মলিনা ব্যথিত হয়ে বললে, 'আমি বলেছিলাম শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া যদি ঠেকিয়ে না রাখে।'

প্রভাত বললে, 'দিল্লি যাবার আগে একটি কথা তোমায় বলে দিচ্ছি।'

মলিনা উৎসুক হয়ে তাকাল।

প্রভাত বললে, 'আমাদের জীবনটা আমাব নিজেবাই নষ্ট কবি। কারো সাধ্য নেই আমাদেব ওপব কোনো আধিপত্য কবে। তাকিয়ে দেখে ফড়িং কীট দোয়েল এমনকী একটা কেঁচোও মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে নিজের ইচ্ছে ও সুবিধা মত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এরা নি নিতান্তই নিঃসহায় ও নিরুপায় নয়। এদেব রক্তমাংস প্রতিভা ক্ষমতার জোব কতটুকু? সে সব দিক দিয়ে এবা নিতান্তই উপহাস্যাসম্পদ নয় কি? নিতান্তই ঘৃণ্য। কিছুই কি? কিন্তু আমি দেখেছি সৃষ্টির ভেতব এমনই একটা কথা রয়েছে যে যারা তা বোঝে। বুঝে সেই পথে চলতে পারে তাদের জীবনে মৃদু মুগ্ধতাব আর কোনো বিরাম থাকে না।' প্রভাত থামছে। মলিনা এসব কথা কতদূর অনুসবণ করতে পাবছে বুঝছে না প্রভাত। বললে ত তবু মেয়েটি–'আমার বাস্তবিক তাই মনে হয়।' একটা গভীব উপলব্ধিব নিঃসঙ্কোচতা ও পবিতৃপ্তি মলিনাব গলাব ভেতর নেই যেন। প্রভাতকে যেন এ মেয়েটি খুশি করতেই চেষ্টা করছে শুধু। কাবণ শেষ পর্যন্ত পবিবাবেব চেয়ে স্বামীর নিকটেই যে সে অধীন বেশি। এই জ্ঞানই যেন মলিনাকে অভিভূত কবে বেখেছে। এবং বিশ্বেব অধীনতাব মন জোগাবাব ভাব এই মেয়েটির হৃদযে যেন একেবাবে গভীর করে বসে গেছে।

প্রভাত বললে, 'দিল্লিতে মাস তিন চাব থেকে তুমি ববং বুঝতে পারবে।'

মলিনা জানলার ফাঁক দিয়ে তাকিয়েছিল। মনেব ভেতব একটা উৎফুল্লতা তাব অথচ একটা উৎকণ্ঠা দ্বিধা করে দিচ্ছিল যেন তাকে। কোনো কিছুকেই নিঃসন্দেহে সে গ্রহণ কবতে পারছে না।

প্রভাত বললে, 'ভুজঙ্গবাবুরা খুব সাহসী লোক। ওর ছেলে সমরও কোনো কিছুব পবোযা রাখে না, না সমাজের না ধর্মের, না ভগবানেব এবং অকুতোভয়ে এসমস্ত জিনিস জীবনে ফলিয়ে চলবাব অত সামর্থ্যও তাদের আছে।'

মলিনা বললে, 'টাকাব কথা বলছ কেন তুমি? মানুষের প্রতিভাশক্তিব কাছে টাকা আব কতুটুকু?'

প্রভাত বললে, 'জীবনটাকে নিজের স্বাধীনতা ও রুচি অনুসারে চালাতে হলে কোনো জিনিসটা হযত কোনোটাব চেযে কম নয।'

মলিনা খানিকটা কাত হয়ে পড়ে বললে, 'ভগবান, ধর্ম, সমাজ কিছুই জানেন না ওবা? সত্যি? কে বললে তোমাকে? কই ভুজঙ্গবাবুকে ত তেমন মনে হয না।'

প্রভাত বললে, 'প্রত্যেক স্বাধীন মানুষেরই পৃথিবীটাকে নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে দেখবার অধিকাব আছে। তাবপর নিজেব ধর্ম সে নিজেই তৈরি করে।'

মলিনা জড়সড় হয়ে বললে, 'তুমি এ বিশ্বাস কর?'

প্রভাত বললে, 'মীরা ছুটুদের সঙ্গে তুমি ত এত মিশলে। ওরা কথায় সেসব কিছু না বললেও ওদের ভাবগতিকগুলোকে একটু ভাল কবে বুঝে দেখ। ওদের নিজেদের ধর্মাধর্ম ওদের নিজেদের বুদ্ধি ও রুচিমত।'

মলিনা এক আধ মিনিট চুপ করে থেকে বললে—'তা হযত হবে।'

প্রভাত বললে, 'তাই হওযাই দবকাব।'

মলিনা বললে, 'কিন্তু আমাদেব নানাবকম অসুবিধা।'

—'এখন থেকে সেসব আব থাকবে না।'

মলিনাব খোঁপা খসে যাচ্ছিল, চুপ কবে বাঁধতে লাগল। মেযেটিব মুখেব দিকে তাকিযে ওব অশেষ নির্জীবতায পীড়িত হযে প্রভাত বললে, 'কেন তোমাব এ সঙ্কোচ মলিনা? এ জন্য আমাব বড্ড খাবাপ লাগে। বিযেব আগে তুমি ত মোটেই এবকম ছিলে না। তখনও ত তোমাকে চিনতাম আমি। কিন্তু এ কয বছবেব এই প্রাণহীনতাব ভিতব পড়ে কী হযে গেছ তুমি?' প্রভাত একটু থেমে বললে, 'কিন্তু দিল্লি গিযে জীবনেব পাঠটা নিতে তুমি একটুও দ্বিধা কব না, তোমাব জেঠামশাইযেব কাছ থেকে, মীবাদেব কাছ থেকে, এমনকী সমবেব কাছ থেকেও।'

মলিনা শুনছিল কি শুনছিল না। সে কি ভাবছিল সেই জানে।

প্রভাত বললে, 'জীবনটাকে সমব আমাব চেযেও ঢেব ভাল বোঝে। ওদেব ভিতব থেকে তুমি একটা গভীব উপশম বোধ কবতে পাববে। ওদেব কাছ থেকে যদি আব ফিবে আসাব প্রযোজন বোধ কব, তাহলে তোমাব পবিবর্তিত জীবনেব আযোজন অগ্রসব ও নিস্তাবেব কথা ভেবে নিবিড় শান্তি পাব আমি।'

পবিবাবেব ভিতব একটা গোলমাল উঠেছিল বটে। মলিনাকে ছেড়ে কী কবে চলবে; কিন্তু ছোটবউ বিযে কবে অবদি সুখেব মুখ যে দেখল না, আব এই পবিবাবেব মানুষদেব ভেতবও এই বোধ ও কৃপাব জয হল শেষ পর্যন্ত।

মলিনা আজ কলকাতায চলেছে সেখান থেকে জেঠামশাইযেব সঙ্গে দিল্লি যাবে।

সাবাদিন ধবে ভুজঙ্গবাবুদেব বাড়িতে বাঁধাছাঁদাব কাজ চলেছে। হইচই হুড়োচাপটাব আব কোনো বিবাম নেই। মলিনাব দিক দিযে বিশেষ কোনো আযোজনেব দবকাব নেই। তাব সংসাবেব যতকুটু জিনিস একটা তোবঙ্গেব ভিতবেই এঁটে যায তা।

স্টিমাব ছাড়বাব সময হযে এসেছে।

ভূজঙ্গবাবুদেব মোটবে মলিনাবও জাযগা হযেছে। তাব বিশ্রী বীভৎস বাক্সটাবও। কিন্তু বাক্সটাব চেযে নিজেব জন্যই যেন ঢেব বেশি সঙ্কোচ তাব। এই দ্বিধাকে এড়িযে এই মেযেটি কোথায গিযে কী যে কবে উঠতে পাববে বুঝছে না কিছু সন্তোষ।

কিন্তু সৃষ্টিব অবশ্যম্ভাবী শক্তিকেও স্বীকাব কবে সে। যে শক্তি অপবিবর্তনীযকেও পবিবর্তন কবায নতুন নতুন সমাবোহ ও ধ্বংসেব বিমুগ্ধতায মানুষকে বিস্মিত কবে, আঘাত দেয, শেষ পর্যন্ত মুগ্ধ কবেই বাখে।

মোটবেব পিছনে পিছনে সাইকেলে চড়ে চলেছে প্রভাত। স্টিমাব ছাড়বাব আব দেবি নেই–সে যখন স্টেশনে পৌঁছল। তবুও মলিনাব মুখ ক্যাবিনেব জানালাব ভিতব থেকে গলা বাড়িযে প্রভাতকেই খুঁজছে যে' এজন্য মেযেটিব গলাটাকে কেটে ফেলে জানালাব বাইবেও যদি কেউ ছুঁড়ে দেয তাহলেও যেন সে তৃপ্ত হয। সে প্রক্রিযায প্রভাতেব খোঁজ যদি মেলে। হায, ভালবাসাটা এমনই ছিল? কিন্তু এই চাব পাঁচ বছব বসে কি সদ্ব্যবহাব কবতে পাবল প্রভাত এই প্রেমেব? জীবন তাকে দিল কি কিছু কবতে? কিন্তু আজও সন্ধ্যায এই মেযেটিকে নিজেব ঘবে বসাতে পাবত যদি সে তাহলে কোনো বিরুদ্ধ বিষাক্ত বিদ্রোহী জীবনকেই গ্রাহ্য কবতে কি সে-সমস্ত জীবনেব উপব বাজা হযে বসত নাকি প্রভাত? আহা, এই মেযেটিকে, এব এমন অপবিমেয ভালবাসা নিযে, আজ সন্ধ্যাব থেকেই এক নতুন নিবিড় গভীব জীবন আবম্ভ কবে দিতে পাবত না কি সে?

একেবাবে মলিনাব কাছে গিযে দাঁড়িযেছে প্রভাত। ওব শীর্ণ সাদা মুখে কপালে সিঁদুব, সন্ধ্যাব অন্ধকাব। জীবনেব এতগুলো স্বাভাবিক জিনিসেব সহজ সমবায কেমন বিচিত্র লাগছে যেন আজ। যেন এবকম কোনো দিন হয নি, কোনো দিন হবে না, এ এক মুহূর্তকে অনন্ত মুহূর্ত কবে বাখতে পাবত যদি প্রভাত। তাহলে তা অনন্ত বেদনাব জিনিস হত। এই মেযেটিকে ছেড়ে দিযে যে বিযোগেব কষ্ট, এক মুহূর্তেও, তাব থেকে আগামীকাল নিস্তাব পেত ত সে।

মলিনা বলল, 'স্টিমাব হুইসল দিযেছে।'

প্রভাত বললে, 'যাচ্ছি।'

মলিনা বলল, 'সেকেণ্ড বেল পড়ল কিন্তু।'

ভুজঙ্গবাবু বলেন, 'সেকেন্ড নয থার্ড, তুমি শুনতে ভুল কবেছ মা।'

মলিনাব সিন্দুবসিক্ত মুখটা বুকেব ওভাবকোর্টেব ভিতব জড়িযে ধবে মাফলাবে চেপে ভূজঙ্গবাবু

একটা চুমো খাচ্ছেন। এসবের কি প্রয়োজন ছিল? কি প্রয়োজন ছিল? কোনোই কি প্রয়োজন ছিল? জীবন সম্বন্ধে নিজের কর্তাব্যাকর্তব্য যখন গুছিয়ে এনেছিল প্রভাত তখন ওদের হাতে মলিনাকে কেন সে ছেড়ে দিতে গেল। নিজের প্রতি কেন এত দরিদ্র হল সে মলিনার...

মীরা বললে, 'এখুনি স্টিমার ছাড়বে কিন্তু বউদি।'

ভুজঙ্গবাবু তাঁর লম্বা চওড়া শরীরের ভেতর মলিনাকে আবদ্ধ রেখে গম্ভীর মুখে বললে, 'তুমি এখন যাও প্রভাত।'

আহা, কী গভীর ঠাট্টা। কিন্তু ভুজঙ্গবাবুর কোনো দোষ নেই, প্রভাতেরও কি আছে? জীবনেরই একটা মৃদু তামাশামাত্র, আমোদ বোধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কঠিন গুলির মত ভুজঙ্গবাবুর এ কথাকয়টি অন্তরাত্মার গভীর মাংসের ভিতরেই প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে থাকে যেন।

ছুটু চিৎকার করে উঠে বললে, 'ওই তক্তা সরাচ্ছে, তক্তা সরাচ্ছে।

মলিনা এক ঝটকায় ভুজঙ্গবাবুর কোল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বললে, 'শিগগির যাও, শিগগির যাও, তাহলে জলের ভেতর পড়ে যাবে যে।'

কিন্তু শেষ তক্তা সরাতে এখনো ঢের দেরি আছে। প্রভাত জানে সব। এত ব্যস্ততার কোনো প্রয়োজন নেই। ভুজঙ্গবাবুদের ত নিতান্তই না, কিন্তু মলিনার? স্বামী যদি তার তক্তার সিঁড়ির অভাবে স্টিমারে থেকেই যায়, দিল্লিই চলে যায় তাদের সঙ্গে তাহলে কেমন হত? মলিনার কেমন লাগবে? সে মলিনার তা ভালই লাগবে বটে, কিন্তু সে পরিতৃপ্তি বোধ তার দিল্লি পৌঁছবার আগে হবে না। স্টিমার ছাড়বার আগে না নামতে পারার মত একটা অস্বাভাবিক পরিণামের ব্যথায় সমস্ত পথটা সে কুঁচকে থাকবে কেন? স্বামীর সঙ্গে যে তাকে ব্যথা দেবে সে জন্য নয়। কিন্তু জীবনের অর্থ মলিনার কাছে আজ যে বড় কুণ্ঠিত। স্বামীর মঙ্গল চাচ্ছে সে, স্বামীকে ভালবাসছে সে, সে জন্যই তাকে দিয়ে কোনো অঘটন না হয় তার জন্য এত ব্যস্ত মলিনা। কিন্তু আর একরকম ভাবেও ত প্রভাতকে সে ভালবাসতে পারত। এই অঘটনটাকেই যাতে একটা সৌভাগ্য বলে মনে হত। কোনো ভয় থাকত না সেজন্য, কোনো দ্বিধা থাকত না। মীরা ছুটুরা তাদের স্বামীদের হয়ত তেমনি ভাবেই ভালবাসবে। কিন্তু মলিনার অন্যরকম প্রেম; এত বড় বাস্তবিক প্রেম যে, এটাকে বুকে করেই এখন স্টিমারের থেকে নামা যাক। কিংবা এখনই কেন নামতে যাবে সে? সময় আছে আরো।

তক্তা নিয়ে খালাসিরা টানাটানি করছে বটে, কিন্তু শেষ তক্তাটা একটু দেরিতেই উঠবে।

সমর এসে পড়েছে—'এই যে প্রভাত, এখনো দাঁড়িয়ে?'

মীরাদের নীরদ মামা বললে, 'আমিও ত দাঁড়িয়ে রয়েছি, তক্তা সরাতে ব্যাটাদের এখনো ঢের দেরি।'

ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'না হে না, বেশি বাহাদুরি কোর না, সড়াৎ করে কখন সরিয়ে নেবে টেরও পাবে না। তারপর বাছাধন ডিঙ্গি মেরে একেবারে জলের ভিতর।'

নীরদ বললে, 'স্টিমার ছাড়তে ছাড়তেও লাফিয়ে জেটির ভেতর এমন পঞ্চাশ বার পড়েছি, আমি কি কম অ্যাক্রোব্যাট।'

ভুজঙ্গবাবু ঝাঁঝা দিয়ে বললেন, 'তুমি যেন তা পারলে, কিন্তু প্রভাত।'

প্রভাত বললে, 'আমিও পারব। এই-ই ত আমাদের ব্যবসা।' এ জীবনে একবারও সে লাফায় নি।

স্টিমারটা নড়ে উঠছে যেন।

মলিনা এক কেবিন লোকের ভেতর প্রভাতের একেবারে বুকের মধ্যে এসে বললে, 'ওগো, শিগগির যাও, শিগগির যাও। নীরদ মামার লম্বা ঠ্যাং আছে, লাফিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু তুমি ত সামলাতে পারবে না।' মলিনার কথা শেষ না হতেই একটা তুমুল হাসির ফোয়ারা ছুটেছে, কিন্তু তখন প্রভাত কেবিনের বাইরে চলে গেছে। তারপর একটা তক্তা করে জেটির পাটাতনের ওপর এসে দাঁড়াল সে। মলিনা প্রভাতকে অনুসরণ করে করে কেবিনের রেলিঙের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনেই ভুজঙ্গবাবু, পাশে সমর। এমন পারিপার্শ্বিকের ভিতর মলিনার দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই আর। জীবনের নিবিড়তম প্রয়োজন এই মুহূর্তে রেলিঙের পাশে মলিনাকে একা দেখতে চেয়েছিল যে প্রভাত, ভুজঙ্গবাবুরা যখন তা বুঝলেন না। দলবল তাদের আরো বেড়ে পড়েছে। মলিনাকে তারা নিতান্ত কৃত্রিম দরকারের অনুরোধে নিজেদের অসংলগ্ন কথাবার্তার ভেতর টেনে নিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রভাত করোগেটের টিনের আড়ালে একগাদা পাট ও শুঁটকি মাছের গন্ধের ভিতর অপেক্ষা করছে, কীসের জন্য? স্টিমারটা ছেড়ে

দিক। বিপুল লবেজান জাহাজটা ছেড়ে দিচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে গদাইলস্করী আয়েসের সঙ্গে অনেকখানি ধোঁয়াবাষ্প ছড়িয়ে গেল।

করোগেটের টিনের ছাঁদা দিয়ে যতদূর দেখা যায় মলিনা রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, প্রভাতকে খুঁজছে।

কিন্তু প্রভাতকে কোথায় পাচ্ছে না সে।

তারপর স্টিমারটার অস্তিত্ব যখন কোনোদিকে কোথাও আর নেই, জেটির দরজার পাশে, নদীর মুখে এসে একবার দাঁড়াল প্রভাত। মনে হল, কেউ নেই, কোনোদিন কেউ ছিল না, কোনো মলিনা তার জীবনের ভিতর প্রবেশ করে নি যেন কখনো, কোনোদিন বেরিয়ে যায় নি। সন্ধ্যায় নদীর মুখটা এমন শান্ত, শীত, চারদিকটা এমন বিমুক্ত, জবীনে যেন এই সবের একটা গভীর উপশম এসে পড়েছে এখন। সকলেরই যেন মঙ্গল হল, সকলেই তৃপ্ত হল যেন, সকলেই শান্তি পেল।

দিল্লির চিঠি প্রায়ই আসছে।

মলিনার শরীরটা সেরে উঠছে, মনের অবসাদটাও কেটে যাচ্ছে, সেইটেই একটু দেরি করে।

তিন চার মাস হয়ে গেল। আরো এক মাস চলে গেছে।

নানারকম জিনিস দেখছে সে, শুনছে, জানছে, জীবনে কিছু কিছু আমোদ পাচ্ছে এখন। ফিরতে খুব ইচ্ছা বটে, কিন্তু ভুজঙ্গবাবুরা ছাড়তে চাচ্ছেন না। ওদের কাছে নিজেকে সে এমনই প্রয়োজনীয় করে ফেলল? যেখানেই যায় সেখানেই মলিনা শেষ পর্যন্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে; দিল্লিতে হয়ত নানারকম অর্থেই, কিন্তু তবুও এই উপলব্ধির ভেতর তৃপ্তি বযেছে। মলিনা নিজেও যে খুশি হয়ে থাকতে পারছে তা ভেবেও শান্তি।

শেষে এমন হয়ে পড়ছে যে মলিনাকে না হলেও যেন চলে প্রভাতের। সে তার শান্তি নিয়ে থাক, ওদেবও প্রয়োজনীযতা মিটিযে যাক, এ ছ-সাত মাসের ভিতর জীবনের অর্থ মলিনার কাছে যে ঢের বদলে গেছে সে পরিবর্তন নিযে এখানে ফিবে এসে মেযেটি একেবারে নিষ্কৃতি পাবে না।

কিন্তু তবুও মলিনাকে চাই।

জীবনের সংগ্রাম স্বামী-স্ত্রীর এবার তাহলে খুব গভীব হযে উঠবে। তাই হোক। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে।

মলিনার ফিরবাব সময ঘনিযে আসাতে প্রভাতের মনে একটা কঠিন উদ্বেগ জমে উঠেছে, নিজেব ভাগ্যকে একটুও পরিবর্তন কবে নিতে পাবে নি প্রভাত। সেই অধীনতা ও অত্যাচারেব চাপ জীবনেব ওপর দিয়ে এখনো চলেছে যে তার। এই সবেব ভেতব এই মেযেটিকে? নির্যাতন যে আরো (ভয়ঙ্কর রকম) গাঢ় হযে উঠবে এবার। মলিনাকেও যে একেবাবে অমৃত আনন্দলোকেব থেকে নেমে আসতে হবে।

কিন্তু দিল্লিব থেকে মলিনা ফিরছেই যে (শিগগিরই) এমন আভাসও ত দেয় নি।

বরং ওদিককার চিঠিপত্র শিগগিব আর পাওযা যায় নি।

মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে—বছর ঘুরে এল। মলিনা খুব সুস্থ সুন্দর হযে উঠেছে, বেশ তৃপ্তিতে আছে, শান্তিতে আছে, ভাল আছে সে, খুব ভাল আছে।

চিঠি এল, ভুজঙ্গবাবু কিছুতেই তাকে ছাড়তে পারেন না।

দিল্লি ঘুরে এল একবার প্রভাত; বাস্তবিকই ভুজঙ্গবাবুরা কিছুতেই তাকে ছাড়তে পারেন না।

এদের জীবনে সে অপবিহার্য হয়ে পড়েছে, জীবনের সমস্ত বিবেক বুদ্ধি বিচার খাটিয়ে প্রভাত নিজের চোখে দেখে এসেছে। সমবের সঙ্গে সম্বন্ধেই মলিনার পবিণতি, উন্নতি, আনন্দ, মঙ্গল,—সমস্তই।'

তারপর নিজের দেশে ফিরে এসেছে সে।

স্টিমারটা জেটিতে লাগল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

জেটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল প্রভাত। নদীর মুখ তেমনই বিমুক্ত, শান্ত, শীত। যেন জগতে যেখানে যা প্রয়োজন সমস্তই যথাযথ স্থির ভাবে হয়ে চলেছে,-যথাযথ স্থির ভাবে।

পাতা-তরঙ্গের বাজনা

ছ-মাস এরা মুসুরী পাহাড়ে ছিল—দেবেন খাস্তগির ও মিসেস খাস্তগির। কাল কলকাতায় ফিরেছে। কিন্তু ঘিঞ্জি গলির ভেতর আগেকার সেই পুরনো বাড়িতে আর নয়। সে বাড়ি নব্বই হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে দেবেনবাবু বালিগঞ্জে জাম বকুল কামিনী হিজল গাছের ছায়ায় ও অনেক অনেকখানে সবুজ ঘাসে নরম এমন একনির্বিঘ্ন জায়গায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে একখানা বাড়ি করেছেন।

ছ-মাস চেঞ্জে থেকেও মালতীর শরীর সারে নি। সেজন্য দেবেন যে কত শশব্যস্ত' ভাবছিল আবার চেঞ্জে যাবে কি না।

সকালবেলা প্রথম শীতের মিঠে রোদের ভিতরে দুজনে একই সোফায় বসেছিল, খুব বেশি ঘিঁষে নয়, কারণ মালতী এখন যা হয়েছে তাতে শরীরের কামনার কোনো উদ্রেক হয় না, তাছাড়া টিউবারকুলেসিস—অবিশ্যি মালতীর অসুখ যে বাস্তবিক, ডাক্তারার এখনো তা ধরতে পারে নি। টিউবারকুলেসিসের রোগীকে একটু আলাদা থাকতে দেয়াই ভাল। কিন্তু সেই জন্য স্ত্রীর প্রতি মমতার একটু অভাব নেই দেবেনের। মালতীও দেবেনের সঙ্গে ঘিঁষে বসতে চায় না। কোনোদিনও চায় নি। কিন্তু তার কারণ একবারে আলাদা।

দেবেনের বয়সে পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে। খুব উঁচু মানুষ, বসলেও তাকে দৈত্যের মত মনে হয়। পা দুটোর চেয়ে ধড় যেন তার ঢের বেশি লম্বা, এবং সমস্ত শরীরের ভেতর মাংস ও চর্বির যেন কোনো শেষ নেই। রঙ ফরশা বটে। কানের দুধারে জুলপির চুল একবারে পেকে গেছে, মুখ গোল, মস্ত বড়, সব সময়ই লাল টকটকে, (হয়ত জীবন ভরে দুধ ডিম টাটকা ফল ইমালশন চেঞ্জ...ইত্যাদির জন্য) কিন্তু এ সুখ তবুও কারু ভাল লাগে না, এত বড় শরীর, এত ওজন, এত প্রশস্ততা বুকের ওপর যেন চেপে বসতে চায়, কোনো লঘু আনন্দ যেন দেয় না, হায়, কাউকেই না।

পৃথিবীর আর্টের থেকে তবু দেবেন একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। সে একেবারে সংসারের মানুষ মাত্র যে তা নয়। জ্যোৎস্নায় বসে ইনকাম ট্যাক্সের কথাই শুধু সে ভাবে না, যদিও তাকে ঢের ট্যাক্স দিতে হয়, এবং ট্যাক্স তার বেড়ে বেড়েই চলেছে।

মালতীকে সে বলছিল, 'সকালবেলার এই রোদে আলট্রা ভায়োলেট ঢের আছে। মালতী ঘাড় নেড়ে জানাল সে জানে।

—'শাহেব-মেমেরা এই রোদ খুব পছন্দ করে, একজনও খাঁটি মেম ও শাহেব নেই যে সকালবেলা এই সান-বাথ না নেয়।'

মালতী মাথা নেড়ে জানাল সে জানে।

বস্তুত দেবেনই মালতীকে অনেকবার এইসব কথা বলেছে, কি কলকাতায়, কি চেঞ্জের জায়গায়,—'নানারকম এইসব ছোট ছোট কথা।

দেবেন বললে, 'বিশেষ সমুদ্রের পারে এই রোদের যে কত দাম'—বলতে বলতে সে থেমে গেল।

দেবেনের মনে একটা আঘাত লাগল, স্ত্রীকে সে সমুদ্রের পাড়ের রোদ দিতে পারছ না-ত, সব বিচার করে দেখতে গেলে কলকাতার বাতাস বর্ধমানের বাতাস চন্দননগরের বাতাস, সবই ত এক, বাংলার সেই পচা ম্যালেরিয়ার হাওয়া, এসব হাওয়ায় টনিক কোথায়? বালিগঞ্জের বাড়ি যতই সুন্দর হোক না কেন, আকাশ যতই নীল হোক না কেন আজ, রোদ যতই তাজা হোক না কেন, মুসুরী পাহাড়ে, আলমোড়ায় মেলে নি। শিয়ালকোটে এই কমাস যে তারা বেড়িয়ে এল সে-সবের তুলনায় এ রোদ এ আকাশ কি খেলো, কি পটকা'।

মালতী ত সেরে ওঠে নি, একটুও ভাল হয় নি। তবে কেন আবার তাকে এমন হতাশ জায়গায় ফিরিয়ে আনা? না হলে তার ব্যবসার ক্ষতি হবে? কিন্তু ব্যবসা কি যথেষ্ট হয় নি? টাকা কি যথেষ্ট পায় নি সে?

দেবেন ঈষৎ বিমর্ষ হয়ে এসব ভাবছিল। কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কারণ স্ত্রীর জন্য সমস্ত মায়া-মমতা সত্ত্বেও ব্যবসাও খুব গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে, হয়ত টাকা চাই না তবুও খাস্তগির বিল্ডিঙে গিয়ে পায়চারি করা চাই। চাই না? কেন চাই? কে জানে কেন? কিন্তু তবুও চাই-ই, চাই-ই।

মালতী বললে, 'শাহেব-মেমরা সুইমিং কস্টিউম পরে নেমে গেছে, এখনই হয়ত তারা সাঁতার কাটছে, না?'

দেবেন অন্যমনস্কভাবে বললে, 'হ্যাঁ। এখনই।' কিন্তু মুহূর্তের ভেতরেই স্ত্রীর দিকে আবার যেন

ফিবে এল; ঈষৎ হেসে বললে, 'তুমিও ত কতবাব পুবী গোপালপুব ওয়ালটেযাব গিযেছিলে লতা!' একটু থেমে বললে, 'কিন্তু একবাবও ত সাঁতাব কাটলে না যে।'

মালতী একটু বিব্রত-হযে বললে, 'আমাব শবীব—'

তা ঠিক বটে, এব শবীব কোনোদিনই ভাল ছিল না। বিযেব পবও উপর্যুপবি দুটো ছেলেব মা হযে শবীব আব ঠিক হল না। মাঝে মাঝে দেবেন ভেবেছে এত তাড়াতড়ি এক মা না কবে ফেললে চলত ত, এ যেন কেমন পাড়াগাঁযেব ভাঁড়ামি—এত তাড়াতাড়ি এই মেযেটিকে দুটো ছেলেব মা বানিযে দেযা।

কিন্তু সে প্রায আঠাব-কুড়ি বছব আগেব কথা।

তাবপব থেকেই দেবেন চুপ কবে আছে, স্ত্রীকে বিশ্রাম দিচ্ছে। কিন্তু নিজেব অসংখ্য দুধ ডিম ইমালশন, টাটকা ফল...চেঞ্জে পাহাড়ি মেযে বেছে নেয, কলকাতায আর্মানি, জাপানি, পার্শি বাঙালিবা,—'যা সুবিধা হয, এদিক দিযে তাব কোনো বিশ্রাম নেই। কোনো প্র.যাজন আছে কি? অবশ্যি মালতী এসব জানে না। জানাবাব একেবাবেই কোনো প্রযোজন নেই।

দেবেন ঠিক আর্টিস্ট নয, কোনোদিন কিছু বচনা সে কবে নি, বচনাব আবেগও বোধ কবে নি, সেই স্কুলেব সময থেকে আজ অবদি একদিনেব জন্যও। কিন্তু সে অনেক কথা ভাবে, এবং নানবকম বই পড়ে দেখে যে খটকা ব্যক্ত হযে গেছে।

আর্টিস্টবা ব্যক্ত কবে দিযেছে দেবেনেব মনেব নানাবকম খটকা প্রশ্ন আকাঙক্ষা আবেগ উত্তেজনা—নানাবকম আর্টিস্টবা, এজন্য নানাবকম বিদেশী গল্প উপন্যাস নাটক পড়তে সে ভালবাসে,...থিযেটাব, বিলেতি থিযেটাব, এবং ক্কচিৎ সিনেমায যায সে, দেবেনেব অসংখ্য অজস্র বইযেব লাইব্রেবি দিনেব পব দিন ফেঁপে উঠছে, তবুও সে বইগুলো সুসাধ্য শস্তা মানুষকে বুঝ দেবাব মত জিনিস মাত্র নয। আলাদা কিছু।

দেবেন বললে, 'বোদ মবে যাচ্ছে, দেখি সোফাটা একটু ঘুবিযে দি।'

মালতী বললে, 'না, আমাব মুখ পুড়ে যাচ্ছে, বোদ ভাল লাগছে না।'

—'ভাল লাগছে না?' দেবেন বললে, 'এখনো এ যে তাজা সকালেব বোদ মালতী।'

—'আমাব কেমন জ্বব জ্বব মনে হচ্ছে।'

মালতী খুকখুক কবে কাশতে আবস্ত কবল।

দেবেন এসব চায না। কোনোদিনও চাযনি, এই কাঁশি, এই জ্বব, এই টিউবাবকুলেসিস, এই বিষণ্ণতা, এই চেঞ্জেব প্রযোজন, এই নিস্তব্ধতা। এই সব হৃদয ভেঙে ফেলে এই সবেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে হলে প্রাণেব ভেতব একটা নিবন্তব মমতা থাকা চাই, তা তাব আছে বটে, মালতীব কথা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত দেবেনেব চোখ ভিজে ওঠে। কিন্তু তবুও অবাক হযে ভাবে সে, একদিন যদি এমন না ভেজে আব। এবং যদিও-বা চিবকালই ভিজতে থাকে, তবুও এই ভেজা চোখ নিযে চিবকাল বেঁচে থাকাবাব ভিতব আস্বাদ আছে কি কিছু? নেই, কিছু নেই।

কিন্তু তবুও আস্বাদ চাই। সব সময জাপানি আর্মানিতে হয না, শেষ পর্যন্ত গিযে তাবা মাংস মাত্র। কিন্তু স্ত্রীব একটা আলাদা মূল্য আছে। মালীত যদি আজ সুস্থ হযে থাকত, তাব সঙ্গ, তাব সহানুভূতি, তাব পবামর্শ, তাব আকাঙক্ষা, উৎসাহ, আবদাব উত্তেজনা, সে কত সাধেব জিনিস হত, জীবনকে কত আনন্দ দিত তা।

শুধু লালসা নয, আবো কিছু চাই, সুস্থ স্বাভাবিক স্ত্রীকে চাই।

দেবেন বললে, পুবী যাবে মালতী?

—'না।'

—'কেন সমুদ্রেব পাবে চমৎকাব বাংলো ভাড়া কবব।'

মালতী ভাবছিল।

দেবেন বললে, সমুদ্রেব ওপবে সেই আকাশ, কতবাব দেখেছ তুমি, কতাবাব ভালবেসেছ।'

—'ভাল বাংলো পাবে?'

—'নিশ্চয, এখনি টেলিগ্রাম কবে দিলে।'

—'কিন্তু এখন শীতেব সময সমুদ্রেব পাবে গিযে ভাল হবে?'

—'সব সমযই ভাল, সব সমযই ভাল, সমুদ্র যে সব সমযই ভাল মালতী, চমৎকাব।'

দেবেন দুই হাত ছেড়ে দিযে উৎসাহে হেসে উঠল।

—'কিন্তু পুবীব সমুদ্র বড় একঘেযে, অনেকবাব দেখেছি।'

—'ববং ওযালটেযাবে।'

—'সেও ঢেব দেখেছি।'

মালতীর জ্বর আস্তে আস্তে বাড়ছে। জীবনের একঘেয়েমিতে এসে এত কাতর হয়ে পড়ছে, সমুদ্রের কোনো মানে নেই তার কাছে আজ, সমুদ্রের চারধার ঘিরে আকাশ সে সবের বিস্ময় নষ্ট হয়ে গেছে, ভাল থাকা পরার ভিতর কোনো আরাম নেই, অজস্র টাকার কোনো অর্থ নেই, জীবনে কোনোদিন ভালবাসা ছিল না। দেবেনের চেয়ে কত বেশি সহিষ্ণু হতে হয়েছে যে তাকে দেবেন তা কি জানে? নিজের মায়া-মমতার একটানা একঘেয়েমির কথা ভাবে দেবেন, জীবনের লড়াইয়ের কথা ভেবে মনে বড়াই করে, কিন্তু এই মেয়েটিকে এর জীবনের যুদ্ধের পথে সাহায্য করবার জন্য মমতাও স্বামীর প্রতি কোনো ভালবাসা মমতাও যে ছিল যেখানে শুধু সহিষ্ণুতা, কোনো মমতাও নেই, সে জীবন কেন যে তার হল?

তার ভার লাঘব করবার জন্য কোনো আর্টকেও সে পায় নি কোনোদিন। বিভীষিকার ভিতর দিয়ে দেবেনের মত মানুষের দুটি সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে হয়েছে তার। এবং তারপর থেকে কখনো চেঞ্জে, কখনো স্ট্রেচারে জীবন চলেছে তার। না জানি এ কোন জীবন।

যদিও বালিগঞ্জের বাংলো, লাখ লাখ টাকা, দুজন সুস্থ-সমর্থ আশাপ্রদ সন্তান ওকে নির্ভর করতে বলছে। তবুও এ শান্তি চায়, কোনো এক অন্ধকারে, অসীম ঘুমের ভেতর।

স্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে দেবেন বললে, 'গোপালপুরে টেলিগ্রাম করে দেয়া যাবে, গোপালপুরে আমাদের বড় একটা যাওয়া পড়ে নি, সেখানে তোমার বেশ ভাল লাগবে, বেশ নতুন মনে হবে।'

মালতী বললে, 'থাক।'

দেবেন ব্যথিত হয়ে বললে, 'থাকবে কেন? সব সময়ই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, লক্ষ্মীটি আমার।'

না জানি এ কেমন আশ্বাস।

মালতী দেবেনের দিকে না তাকিয়ে বললে, 'আমার আর নড়তে-চড়তে ইচ্ছা করে না।'

—'তোমায় একটুও নড়তে হবে না লক্ষ্মীটি, এখান থেকে স্ট্রেচারে করে মোটর, মোটরের থেকে স্ট্রেচারে করে ফার্স্টক্লাশে রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টের গদি বিছনায়। সেখানে আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তারপর গোপালপুর পৌঁছলে আবার স্ট্রেচারে করে—'

মালতী ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেবেন স্ত্রীর কপালে হাত দিয়ে দেখল। মুখের দিকে তাকাল তার। তারপর ঘরের ভেতর চুপি-চুপি অনেকক্ষণ পায়চারি করল সে। এ তার বড় ব্যথার সময়।

তিন দিন পরে মালতী মারা গেল।

মালতী চলে গেলে পর দেবেন অনেক দিন একটা পিস্তল নিয়ে খেলা করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিস্তলটা সে রেখে দিল।

কিন্তু তবুও এটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না যে স্ত্রী ঘরে থাকতে মানুষ কেন অন্য জায়গায় গিয়ে লালসার বশবর্তী হয়। সে নিজেও ত তা একদিন হয়েছে। খুব সহজেই হয়েছে, সে জিনিসটাকে খুব স্বাভাবিক মনে করেছে। তাব জন্য একদিনের জন্যও কোনো অনুতাপ হয নি তাব। বরং মনে হয়েছে জীবনকে আস্বাদ করছে সে।

মালতী মরে যাবার পর মানুষের জীবনটাকে ঠিক করে বুঝেছে যেন দেবেন, সে অনেকখানি গুরুতর ব্যথিত হয়ে উঠেছে, পবিত্রতা পেয়েছে, আগের জীবনটাকে এমন অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে দেবেনের—এমন ঘৃণাই, এত পাপও সে করেছিল,—অথচ স্ত্রী ঘরে থাকতে।

স্ত্রী ঘরে থাকতে মানুষ কেন যে বাইরে গিয়ে লালসার বশবর্তী হয় একথা যখন তার মনে হচ্ছিল অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। বাস্তবিক ধারণাই সে করতে পারে না যে মানুষ এরকম কেন করে। মাংসের ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষা, দু-দণ্ডের ফুর্তি, ঘরের স্ত্রীর শুধু নিস্তব্ধ নিশ্বাসটুকুর কাছেও ওসব জিনিস যে কত ছাই, কত ধুলো মানুষ তা বোঝে না কেন? অথচ তাদের স্ত্রী মালতীর মত মরে যায় নি। স্ত্রীরা এখনো বর্তমান আছে, মানুষেরা তবুও তাদের এত অবহেলা করে কেন?

মালতী মরে যাবার পর দেবেনের জীবনে শুধু নয়, এই পৃথিবীটারও যে কি করে লালসা টিকে থাকতে পারে, মাংসের ক্ষুধা থাকতে পারে, ভেবে ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যেত দেবেন। নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষা-শূন্য পবিত্রতাকে এত স্বাভাবিক মনে হত, পৃথিবীর লোকদের এমন অস্বাভাবিক মনে হত। জাপানি, পার্শি, আর্মানি পাড়া পাড়া গিয়ে নিজের জীবনের সেই দিন-রাতগুলোর কথা মনে হলে এমনই আতঙ্ক উপস্থিত হত, এমনই ঘৃণা, এমনই ন্যাক্কার! কত অধঃপতন হলে মানুষের ওইসব হয়? অবাক হয়ে ভাবত দেবেন।

জীবনকে কতখানি অর্থশূন্য করে ফেললে তারপর ওইসব পারা যায় স্তম্ভিত হয়ে ভাবত সে।

কিন্তু মালতীর কথাই সবচেয়ে বেশি ভাবত।

মনে হত যেন দেবেনের জীবনের সমস্ত পাপে ব্যথা নিয়ে মালতী মরেছে। (অথচ তা সত্য নয়) কাজেই দেবেনের হৃদয়ের চেতনা প্রতি মুহূর্তেই এমন একটা অবর্ণনীয় অসভ্যতা বজায় রেখে চলেছে। যার জন্য মমতার আর শেষ নেই তার। তবুও এই পৃথিবীতে কোনোদিন যাকে আর পাওয়া যাবে না সেই মালতীর জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটিই যেন মালতীব নিস্তব্ধ মর্মান্তিক যাতনা সোফায় বিছানায় টেবিলে দেযালে আযনার ভিতরে লেগে রযেছে, এ বাড়ির আনাচেকানাচে মালতী কোনোদিনও যায় নি সেখানেও যেন রযেছে তা-যেন ল্যাভেটারিতেও, ইলেকট্রিক বাল্বের গাযে, ছাতে বাগানে, ভিজিটরদের ঘবে, মালীর বিবর্ণ পাগড়ির ভিতর, আজকে যে ফুল ফুটল তার সহিষ্ণু সৌন্দর্যেব মধ্যেও।

দেবেনের ব্যবসার অনেকক্ষতি হচ্ছিল। এ ছ-মাসের ভিতর একদিনও সে গিয়ে কাজ দেখতে পারে নি। কিন্তু তবুও ব্যবসাযের ক্ষতিবৃদ্ধির কথা সে ভাবতেও যায নি, দু-এক মূহর্তের জন্য যদিও-বা মনে হত দেবেনের বোধ হত ও সব ভাবনা এখন কত অকিঞ্চিৎকর, কত অশ্লীল, কি ঘৃণার্হ। সে সব ভুলে যেত সে।

আরো দু-এক মাস কেটে গেল। মনেব এমনি অবস্থাযই।

একদিন গিযে ব্যবসা দেখে আসল তবু সে, পাঁচ মিনিট ছিল। কযেক দিন পরে দুণ্টা গিয়ে রইল। তারপর চার ঘণ্টা কবে থাকত।

একদিন দশ-বার ঘণ্টা বসে অনেক কাজ সে করে এসেছে।

আজকাল নতুন নতুন বই পড়তে পারে সে রাত্তিরে রাত্তিবে। পড়তে গিযে মালতীর কথাই শধু মনে হয না, লেখকদেব আর্টও তাকে মুগ্ধ করে। ববাবরই সে গম্ভীর ফিনিশওয়ালা বই পছন্দ করে, বেশ উঁচু পাবলিশাবেব দোকানেব বই হবে, ভাল মলাট কাগজ ও ছাপাব ভেতর দিযে জীবনের গভীর কথা প্রগাঢ় বিচাব বিবেক ও ফিনিশের সঙ্গে শেষ হযে গেছে এমনি ধবনেব বই সে বাছছিল। পড়ছিল।

ভাল খাবাবেব দিকে আবাব মন যাচ্ছে, দুধ, ডিম, টাটকা ফল, পরিমিত পবিমাণে খানিকটা মদ।

খাওযা শেষ হযে গেলে পব কফি। তাবপব খুব দামি সিগার। এইসবেব ভিতব আজকাল আস্বাদ পাওযা যাচ্ছে। খাওযা শেষ হযে গেলে নেটেব মশাবির ভিতব শুযে পরিপাটি বুরুশ কবা বইযের চমৎকার বুরুশ করা কথাব ভেতব বেশ গভীবভাবে মনোসংযোগ কবতে পাবে সে। কোনোদিন সে কিছু লেখে নি, মাঝে মাঝে আজকাল কিছু লিখছে দেবেন। তাব নিজেব জীবনের একটা ডাযেরি, যেন তা কতকগুলো এবড়োখেবড়ো শব্দ এড়িনেড়ি চিন্তা না হয, যেন যা লেখা হয তার ভিতব ফিনিশ থাকে, ফিনিশের গভীবতা, কি চিন্তায কি শব্দেব ব্যবহাবে, দেখে নিচ্ছে দেবেন। এই একখানা বই সে বেখে যাবে। খুব উঁচু...দিযে মলাটে কাগজে প্রিন্টিঙে, ...অপবিমেয ফিনিশ দিযে ছাপাবাব জন্য যথেষ্ট টাকা আলাদা কবে বেখে যাবে।

দেবেনেব জীবন নানা দিক দিযে এই বকম স্বচ্ছন্দ হযে আসছে। স্পিবিট লিটাবেচার নিযে এখন আব সে ঘাঁটাঘাঁটি কবছে না। ভূত আছে কি নেই, এব ওপর আট-দশ মাস আগে দেবেনের জীবন-মবণ নির্ভব করত যেন। মানুষেব আত্মা বাস্তবিক বেঁচে থাকে কিনা তাব স্পষ্ট প্রমাণ না পেযে সে ক্ষুব্ধ হযে কেঁদেছে কতদিন কতদিন, কত বাত।

সে এক ভযাবহ সময গিযেছে, তখন পিস্তল দিযে বোজই যেন নিজেকে ফুবিযে ফেলতে ইচ্ছা হত। কাবণ মৃত্যুর পব অন্ধকার ছাড়া কিছু যদি আব না থাকে, এবং দেবেন নিজের সত্য বিচাব দিযে যতদূব বুঝেছে অন্ধকাব ছাড়া আব কিছু নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকবাবই-বা কি কাবণ রইল তাহলে? বিশেষ কুড়ি বছব মালতী নিজেব জীবনের সঙ্গে জড়িযে সেই দাম্পত্য অভিজ্ঞতাকে এমন ফুরুতে দিতে দিযে পৃথিবীতে মিছেমিছি বেঁচে থাকবাব কি মানে বইল আর?

কিন্তু, তবুও ওসব কথা এখন আব ভাবে না দেবেন। সে বেঁচেই ত আছে ববং। একদিন একখানা চিঠি পেল সে।

কোন এক মিস সেন লিখছে, মিস সেনটি বিধবা। দেবেন যে তাকে না চেনে একেবাবে তা নয, মেযেটি ভাল, মেযেটি তেমন সুন্দবী কিছু নয, তবুও বযসে হযত দেবেনেব চেযে দু-এক বছরের বড় সে।

পনের-কুড়ি পৃষ্ঠা ভবে মিস সেন দেবেনকে ভযংকব একটা সেন্টিমেন্টাল চিঠি লিখেছে।

চিঠিখানা পড়ে শেষ করতে তিন ঘণ্টা লাগল দেবেনের, ভালবাসার চিঠি মালতীর কাছ থেকেও সে কোনোদিন পায নি, জীবনের এই হযত প্রথম পেল, কাজেই এ এক নতুন অভিজ্ঞাতা দেবেনের, মিস সেনের চিঠিব প্রতিটি লাইনের প্রতিটি শব্দের তাই একটা আলাদা মানে আছে, চিঠিটা শেষ করবাব আগে চার-পাঁচ বার তাই পাইপ ফুরিযে গেছে, পাইপ ভরে নিতে হযেছে।

চিঠিখানা রেখে দিল দেবেন, বুক-পকেটে।

ঘণ্টা দুই ঘরেব ভিতব পাইচারি কবে অনেক কথা ভাবল সে। সারাদিন ভাবল, সারা রাত ভাবল,

দুদিন—তিনদিন—চারদিন, সাত-আট দিন ধরে এই চিঠিখানা তার মনকে চেপে রেখেছে। কিন্তু তবুও জ্যোৎস্নারাতে সোফায় যখন সে একা বসেছিল মালতী তার মনকে আবার চেপে রাখল।

মিস সেনের চিঠির উত্তর দেওয়া ও চিঠির কথা ভাবাও প্রয়োজনীয় বোধ করল না আর।

বাস্তবিক, একখানা চিঠি এসে তার জ্যোৎস্নার বেদানার দেশ থেকে কোন বিস্তৃত জগতের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে।

সে কি ভীষণ অসাবধান হয়ে পড়েছিল? সে কি ভীষণ অসাবধান হযে পড়েছিল? ব্যবসার জন্য মাস তিনেক মাদ্রাজ গিয়ে থাকতে হল দেবেনকে। আবার শীতের সময় কলকাতায় ফিরে এল।

একদিন এম্পায়ার থিয়েটারে গেল। রোজ সন্ধ্যার সময়ই আজকাল সে থিযেটাব, বায়স্কোপ...বা নাচগানে যাচ্ছে। এতে সে লিপ্ত হযে পড়ছে না বটে, এসবের জন্য কোনো লিপ্সা নেই তার, সে শুধু বিচ্ছিন্ন ভাবুক এক, হৃদযটাকে একটু ভালবাসা দিতে চায, হৃদযটাকে একটু ভালবাসা দিতে চায।

অথবা জোৎস্নার ভিতরে অনেকক্ষণ সোফায় বসে মনে হয মালতী যে তার জীবনের কুড়ি বছরেব বিবাহিত স্ত্রী ছিল, আর সঙ্গে দেবেনের সংযোগ কত নিবিড় এখনো? মালতী আজ বেঁচে নেই, তার আত্মাও হযত অন্ধকারে শূন্য হযে গেছে, কেউ কাউকে কোনদিন দেখবে না আর, তবু কুড়ি বছব ধরে সে মালতীর স্বামী ছিল, মালতীর স্বামী সে, কি গভীর একাগ্র ঢেউযের নিস্তব্ধতা এসে তাকে আচ্ছাদিত কবে ফেলে, দেবেন আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে বলে, 'আমি মালতীর স্বামী, আমি মালতীর স্বামী, আমি মালতীর স্বামী।'

এমনি করে সারাটা শীত কেটে গেল। কি নিবিড় ভাবে।

শীত এখনো ফুরয নি।

মাঘের শেষ দিনগুলো চলেছে। তবুও মাঝে মাঝে বসন্তেব বাতাস দিচ্ছে। একদিন ভোরেব বেলা জানালার কাছে বসে দেবেন তাকিয়ে দেখল গাছেব সেই ডালপালার হাড়গোড় সব ভরে উঠেছে, দু-চারটা গাছে হাড়গোড় যেন কোনোদিন ছিল না, নতুন বছরের প্রথম পাতাগুলো ভোরেব রোদে ছেলেদেব সবুজ ঘুড়ির মত যেন হাড়কালো ডালপালাগুলোকে ঝাঁকিযে ঝাঁকিয ফুর্তি কবতে বলছে। গুরুগুব করে সমস্ত সকাল সমস্ত দুপুর এই পাতাগুলো পাতা-তবঙ্গের বাজনা বাজিয়ে চলেছে-বা।

রাতে একটু অসোযাস্তি লাগে এই বাতাসে। বসন্তেব বাতাস। নিজে যদি সে একেবারে বুড়ো হযে যেত! কিন্তু অতিবিক্ত সুস্থ হযে সে বেঁচে আছে, এক-একসময়ে মাংস-মেদেব তাড়না অত্যন্ত কঠিন বোধ হয। জীবন যদি এসব ভুলে শুধু পাতা-তরঙ্গের বাজনাব মত বাজতে পাবত, গুরগুব...গুবগুব দিন রাত, রাত দিন? কিন্তু মানুষেব জীবন তা পারে না।

দুধ ডিম ইমালশন মদ অনেক কমিযে দিল সে। কিন্তু তবু শবীবে অনেক মধু জমে গিযেছে যে, এই শরীবেই। মনের মধু নিযে পৃথিবীকে ব্যাধিগ্রস্ত করবাব প্রযোজন নেই। তার জন্য আলাদা গোপন সময রয়েছে দেবেনের।

বসন্তের রাতে আবার তার আর্মানি বাই চাপল, আর্মানি জাপানি পার্শি বিলেতি কখনো বাঙালি। সমস্ত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষাকাল কদর্য লালসায কেটে গেল। কদর্য লালসা? কদর্য নয কি? জাযগায জাযগায তা সুন্দর, সময় সময়, কোনো কোনো অন্ধকারের ভেতর, কিন্তু গভীর অন্ধকাবেব ভিতব এক-একটা অসম্ভব জায়গায জেগে উঠে দেবেনের মনে হত নিজের মুখ যেন সে দেখতে পাচ্ছে, কি ভীষণ কুৎসিত, কি দারুণ ভযাবহ। ও মেয়েটি কি করে সে-সব সহ্য করছে, কী কবে, কী কবে, কী করে?

তবু সুন্দরী দেখে অল্প বযসের একটি সদ্বংশজাতা মেযে বিয়ে কবল দেবেন।

অতসী বললে, 'নীচের ঘরগুলো আমাদের দরকাব নেই, ভাড়াটে বাসানো যাক।'

দেবেন বললে, 'না, দরকার আছে, এমনিই থাক না, ভাড়াটে বসিয়ে লাভ কি? নোংবামি শুধু, টাকা কি আমাদের কম আছে?' খুব মোলাযেম ভাবে সে বললে। 'আব কেন মিছিমিছি'—'হাত রগড়াতে রগড়াতে বললে দেবেন।

অতসী বললে, 'টাকাব জন্য নয়, বড্ড একা।'

একা? তাই ত। দেবেন আজ আর বলবে না—'কেন, আমিই ত আছি।' সে ঢের বেড়ে গেছে, সে জানে সব, বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু এই স্ত্রী প্রতি মুহূর্তেই তাকে নতুন বিস্ময দেখাতে পাবে। কিন্তু তবুও অতসীর কোনো ভযাবহ আশ্চর্যতাও দেবেনকে আঘাত দেবে না। দেবেন সব জানে। দেবেন যদি বলে—'আমি আছি, আমাকে নিযে থাক'—তাহলে জিনিসটা এমন অন্যায্য হবে, এমনই হাস্যকর কুৎসিত দেবেন হেঁটে যাচ্ছিল আযনায নিজেকে দেখতে পেল সে, এমনই বীভৎস, কুৎসিত, অসংলগ্ন।

ভাড়াটে পাওয়া যাচ্ছিল না।

কিন্তু চায়ের টেবিলে অনেক লোক হত, সারা সকাল তারা থাকত, দুপুরবেলায় পাড়ার মেয়েরা আসত, বিকেলবেলা চায়ের টেবিলে আবার অনেক লোক হত, ঢের রাত করে তারা যেত।

অতসীর চলছিল মন্দ না।

সেদিন বিকেলবেলা দেবেন চায়ের টেবিলে ছিল না।

শৈলেন সুকুমারকে নিয়ে এল। দুজনেই ত্রিশ-একত্রিশ বছরের মধ্যে।

শৈলেন বললে, 'অতসী, তুমি লেখক দেখতে চেয়েছিলে, আর্টিস্ট, এই দেখ।'

অতসী নমস্কার করল সুকুমারকে। সুকুমার তা ফিরিয়ে দিল না।

ডাক্তার বললেন, 'আর্টিস্ট? ইনি ছবি আঁকেন?'

ডাক্তারের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না কেউ।

মুন্সেফবাবু একটা বিস্কুট চিবুতে চিবুতে উঠে পড়ল, আর্ট বা ছবির জন্য কোনো আগ্রহ নেই তার। ডাক্তার পিছে পিছে গেল।

ব্যারিস্টার বসেছিল,—লেখক, লেখক যে আর্টিস্ট ব্যারিস্টার তা জানে, কিন্তু এসব কোনো কিছু প্রফেশনের পর তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। বরং জার্নালিস্ট হলে সুকুমারের দিকে একবার ফিরে তাকাতে পারত সে। ব্যারিস্টার কারু দিকে না তাকিয়ে উঠে গেল। নিজের সম্মান বাঁচাতে সে জানে।

অতসী বললে, 'আমার স্বামীও আর্টিস্ট।'

বাস্তবিক স্বামীর সম্বন্ধে অতসীর খানিকটা অহঙ্কার আছে। দেবেনকে দেখেছে সুকুমার। অতসীকে আজ দেখল। সে মনে মনে ভাবছিল।

অতসী বললে, 'কিন্তু আমার স্বামী কোনোদিন ছাপান নি।'

শৈলেন বললে, 'ছাপাবার উপযুক্ত হয়েছিল ত?'

অতসী আস্তে একটু চিৎকার করে উঠল।

শৈলেন বললে, 'সুকুমার প্রুফ পকেটে করে এসেছে, ছাপাখানার থেকে একে ধরে এনেছি।'

—'ছাপাখানা?'

—'হ্যাঁ, সমস্ত দুপুর বসে প্রুফ দেখেছে।'

—'কীসের প্রুফ?'

—'একটা বই ছাপাচ্ছে।' অতসী আগ্রহের সঙ্গে বললে, 'কী বই?'

শৈলেন কয়েক ফর্মা প্রুফ অতসীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দিল।

প্রেসের ভিজে ভিজে নরম নোংরা কাগজ নাড়তে নাড়তে অতসী বললে, 'বাঃ, বেশ সুন্দর ত। আমি লেখা অনেক পড়েছি সুকুমারবাবু। কিন্তু যারা লেখা ছাপায় তাদের আমি দেখি নি কোনোদিন। দেখতে এত ইচ্ছা করছিল আমার।'

সুকুমার নিজের মুখাবয়বের কদর্যতার কথা ভাবছিল। বাস্তবিক তা কদর্য, কদর্য নয়? অথচ মেয়েটি এক মনে তার দিকেই তাকিয়ে আছে যেন এমন জিনিস কোনোদিনও সে কোথাও দেখে নি। পৃথিবীতে এই বিহ্বলতা এখনো কি বেঁচে আছে?

আর্টিস্টের নামে অধীর মেয়েমানুষ, এদের কথা পড়েছে সে ঢের। এই প্রথম চোখে দেখল।

অতসী বললে, 'আর্টের কথা জানিও খুব কম, আপনি লিখে নিশ্চয় নাম করেছেন?'

অতসী বলছে 'আর্ট,' 'আর্টের কথা'...সুকুমার বললে, 'না, নাম করি নি, কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আর্টিস্টের কাজ আমি জীবনের চব্বিশ ঘণ্টাই করছি।'

অতসী ছাপানো কাগজগুলো নাড়তে নাড়তে মুখ তুলল। বললে, 'চলুন ভেতরে বসি, সোফায় বসা যাক।'

চা খাওয়া হয়ে গেছল।

তিনজনে দেবেনের চমৎকার ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসল। আরশির দিকে তাকাতেই একটা দারুণ বীভৎস মুখ সুকুমরের চোখে পড়ে গেল। পিছে ফিরে তাকাতেই দেখল দেবেন এসে দাঁড়িয়েছে। অতসী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই যে সুকুমারবাবু, ইনি কবিতার বই ছাপাচ্ছেন।'

দেশি কবিতার জন্য দেবেনের কোনো আগ্রহ ছিল না, বিলেতি কবিতার জন্যও না। তার আর্ট শুধু গদ্য নিয়ে, গল্প নিয়ে। কন্টিনেন্টাল ট্র্যাজেডি, মেলোড্রামা নিয়ে। সুকুমারের দিকে সে একবার ফিরে তাকাল কিনা সন্দেহ।

দু-এক মিনিটের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে নেকটাই খুলতে খুলতে বললে, 'আমাকে চা দাও অতসী।'

—'নিনুয়াকে বলে দিয়েছি।'

—'তুমি দিয়ে যাও।'

—'কেন, নিনুযাই ত বরাবর দেয়।'

দেবেন বললে, 'নিনুয়া বরাবর দেয়?' ঘাড় বেঁকিযে হাঁ করে একটা সাধারণ জিনিসকে ভুলে গিয়েছিল বলে এক-আধ সেকেণ্ডের বিস্ময় মুখে নিযে একা একা চায়ের টেবিলে গিযে বসল দেবেন।

ড্রয়িংরুমের জানালা দিয়ে চায়ের টেবিলটা দেখা যাচ্ছিল। দেখছিল সুকুমার। দেবেনের মুখ তাদের দিকে ফেরানো। কিন্তু তবু ত একবারও সে কারু দিকে তাকচ্ছে না। স্থবিরতা ও কদর্যতা ছাড়া মুখে তার অন্য কোনো কিছুরই ছাপ নেই। না বিস্ময়ের, না বিষণ্নতার, না ব্যথার। সে এমন স্বাভাবিক।

দেবেন চা খেয়ে চলে গেল।

অতসী বললে, 'চব্বিশ ঘণ্টাই আপনি আর্টের কাজ করেন সুকামারবাবু?'

—'হ্যাঁ, এখনো করছিলাম।'

—'এখনো?'

—'আপনার স্বামীকে দেখছিলাম আমি।' সুকুমার একটু হেসে বললে, 'আপনাব স্বামীকে ভেবে দেখছিলাম। আপনারা কেউ তাঁকে বোঝেন নি। দেবেনবাবু, নিজেকে জানেন না। কিন্তু আমি সকলের হযে ওঁকে ভেঙে দেখাব।'

—'ভেঙে দেখাবেন!' অতসী অবাক হযে সুকুমারের দিকে তাকাল।

সুকুমার বললে, 'হ্যাঁ, ভেঙে দেখাব। এই আবাব কাজ, পৃথিবীর অসংখ্য লোকের সঙ্গে বোজই আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, অদ্ভুত ব্যবহার, অদ্ভুত ভষা, অদ্ভুত ধারণা, অদ্ভুত কথা চিন্তা, সবই অদ্ভুত এদেব, অদ্ভুত অপসৃয়মান এদের বিশ্লেষণ করা এক-একসময এমন দুঃসাধ্য এমন কঠিন হযে দাঁড়ায আমার পক্ষে। তবুও যেখানেই মন খটকা খায সেখানেই ভাঙিযে সহজ কবে নিজে বুঝে নেয সকলকে বুঝিযে দেখাতে চায। শুধু অন্য হাজার হাজার মানুষই নয, আমি নিজেও অনেক সময আমাব কাছে দুর্বোধ্য হযে উঠি, একদিন কলকাতার ট্রামলাইন, তাব বাস্তাঘাটের প্ল্যান একজন বিকশোওযালার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো এমন অবোধ্য অসহ্য মনে হয, একদিন দুপুবেব আকাটাশটার কোনো মানেই ধবতে পাবি না আমি, কিংবা বেলিঙের ওপব যে চড়ুই লাফাচ্ছে, পাশের বাড়ির দেযালে, জ্যোৎস্নায যে পাযরাব সাবি ঘুমিযে আছে, এসবের কোনো ইশাবাই বুঝতে পারি না আমি। তাবপব অনেক সময ভেবে ভাঙিযে ভাঙিযে এদেব আমি ব্যক্ত কবি।

—'এই কি আর্টিস্টেব কাজ?'

—'এ-ছাড়া আব কিছুই নয।'

—'শুধু জিনিসটা খসিযে খসিযে ব্যক্ত করা। হ্যাঁ, তা মানুষই হোক, বা পাখিই হোক, বা হৃদযেব আবেগ-আকাঙক্ষা—যা কিছু হোক না কেন, যে জিনিস একটা খটকা নিযে আসে, আমাকে সচকিত করে দেয, আমি তাকে বুঝে দেখি, ভাঙাই, আমাব ভাষায ব্যক্ত কবি।'

—'আপনাব ভাষায?'

—'হ্যাঁ, সাধারণের ভাষাব থেকে তা ঢের পৃথক, তা আর্টিস্টেব ভাষা।'

অতসী ক্লান্ত হযে পড়ছিল। পিযানোর কাছে গিযে বসল।

আধ ঘণ্টা ধবে বাজাল সে। শৈলেন উঠে চলে গিযেছে। কিন্তু সুকুমাব বযেছে। অতসী এসে বললে, 'আমার ঢেব ভাল লাগছে, আজ এইবাব এই পিযানোটা নিযে আপনার—' সুকুমাব বললে, 'বাজিয়ে আপনার ভাল লাগে?'

—'ভাল লাগে শুধু! আমি যেন আর এক পৃথিবীতে চলে যাই।'

—'কেন এ জাযগা আপনার ভাল লাগে না! এই ড্রযিংরুম, সোফা, ছবি, কার্পেট, মর্সলিনেব পরদা, মেহগিনি কাঠেব টেবিল চেযার—এই সব?'

অতসীর অবসন্নভাবে ঘাড় নিচু হযে রইল।

—'এক-একসময এসব ভুলে থেকে ভাল লাগে, হাঁপিযে উঠি, তাই বাজাই। যখন বাজাব তখন কারু কথা আমার মনে থাকে না, কিছু মনে থাকে না। কাজেই এমন ভাল লাগে আমাব।'

অতসী বলেছে যখন বাজাই কারু কথা মনে থাকে না, কিছু মনে থাকে না, এমন ভাল লাগে!

কিন্তু এমন সুন্দরীকে এত তাড়াতাড়িই সব কথা ভুলতে হলে? এমন সুন্দরী যে এমন বঙে রাগে বাজাতে পারে তাকে?

আর্টিস্ট হিসাবে এখানে একটা নিগূঢ় অমর্যাদা দেখছে সুকুমার। যেন তারই একটা কবিতাকে কেউ

কালো কালির আঁচড়ে ভরে দিচ্ছে। তারপর সেই কবিতাকে চেনা যাবে না আর, বোঝা যাবে না কী জিনিস এমন নিগূঢ় সুন্দর করে প্রকাশ করতে এসেছিল কে। এতে আর্টের ক্ষয় হয়।

সুকুমার বললে, 'আপনি গাইতে পারেন নিশ্চযই?'

অতসী বললে, 'এখন আর ইচ্ছে করছে না।'

তাও বটে সব সময বাজাবার ইচ্ছাও এর থাকে না হযত।

সুকুমার ভাবছিল,—'আমরা কবি, আমরা জানি কবিতা লিখবার সময় আর্টিস্ট মনটাকে এত ভাল লাগে। কিন্তু তখন শব্দ সব তৈবি হযে গেছে—চিন্তার আর বাধা নেই। কিন্তু তবুও প্রাযই আমাদের কিছু লেখা হয় না। লিখবাব আগেও আযোজন কি কঠিন কি দুঃসাধ্য সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধরে। এই মেযেটিরও তাই। এব গান-বাজনা এর কবিতা। হযত এও লুকিযে লুকিয়ে লেখে। নইলে কত মেয়েমানুষই ত এ-জীবনে দেখেছে সুকুমার, সে একজন লেখক, সে একজন কবি বলে তার সঙ্গে এত আত্মীযতা কেউ কি আর কবতে এসেছে? এই মেযেটির কাছে সুকুমারের কদর্য মুখও যেন সুন্দর।

বাস্তবিক এই সুন্দরীর পাশে বসে নিজেকে সে সুন্দর ছাড়া ভাবতে পাবাছ না। নিজেব শরীরকে, মুখকেও।

অতসীকে হঠাৎ স্তবির বিবর্ণ মুখে দেখা গেল। সুকুমাব তাকিযে দেখল দেবেন এসে দাঁড়িযেছে।

অতসীর দিকে তাকিযে দেখল সেও পাঁশুটে মেবে গেছে।

বছরখানেকের ভিতব অতসীদেব বাংলোয যায নি আব সুকামাব। শৈলেনেব মুখে একদনি শুনল অতসীর একটি ছেলে হযেছে।

অনেকক্ষণ অবাক হযে বইল সুকুমাব। মনের ভিতব কেমন একটা চমক এসেছে যেন, কবিতায তা হচ্ছে না আজ, বাস্তবিক দিনের পর দিন ছন্দ সে ভুলে যাচ্ছে। সোজা অবিকৃত গদ্যের কযেক লাইনে চমকটা ভাঙাতে চেষ্টা করল সুকুমাব। চেষ্টা কবল বটে, কিন্তু হল না কিছু। লেখা সে অনেক দিন ছেড়ে দিযেছে, তবুও সাবারাত ধরে কেমন একটা ভাব তাব মনকে পেযে বসল।

একে প্রকাশ না কবে উপায নেই।

আর্টের ভাষায না যদি সে লিখতে পাবে, বরং বলুক গিযে কাউকে। কাকে সে বলবে? না, এ বলার জিনিস নয। কবিব আর্ট আযোজন নয, তা শুধু নিস্তব্ধ শব্দ।

অতসীকে বলুক, অতীসকে। অতসীকে কোথায এখন পাবে সুকুমাব? তার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা কবতে হবে। হযত ছ-মাস, হযত এক বছব। এ দিনগুলো কাজেই মোটেই স্বাভাবিকভাবে কাটছিল না—প্রতীক্ষাব এই কঠিন দুঃসাধ্য দিনগুলো।

অতসীকে গিযে একবার দেখতে ইচ্ছে কবছ, সেই যে আধ ঘণ্টা ধরে বাজিযেছিল সেদিন তেমন শুনতে ইচ্ছা কবছে, অবসন্ন হযে ঘাড় নিচু কবে বলেছিল অতসী—'যখন বাজাই কারু কথা মনে থাকে না, কিছু মনে থাকে না। এমন ভাল লাগে!' অতসীর পাশে বসে নিজের শরীরকে সুকুমারেব সেদিন খুব সুন্দব লেগেছিল, নিজেব মুখকেও। আবাব সেই সব ফিবে পেতে ইচ্ছে কবে। সেই বসন্তের দুপুব, চমৎকাব চা, ড্রযিংরুম, অবসাদ, মেহগিনি কাঠের টেবিল-চেযাব, কার্পেট, মসলিনের পবদা, সেই যে দেবেন একা একা বসে কারু দিকে না তাকিযে চা খেযেছিল—সেইটুকুও।

একদিন সুকুমার গিযে শুনল অতসী দেবেনেব সঙ্গে এম্পাযাব থিযেটাব গেছে, কযেক দিন পরে জানতে পাবল দেবেনেব সঙ্গে সোযাবেতে গিযেছে সে। দুপুববেলা গিযে একদিন জানতে পাবল রেসে গিযেছে দেবেনেব সঙ্গে, কযেক দিন উপবি-উরি চেষ্টা করেও অতসী বা দেবেনকে সে ধরতে পারল না।

বসন্তেব বাতাসে মন বড় ক্লান্ত হযে উঠল সুকুমাবের।

একা একা থেকে জ্যোৎস্নায সে ব্যথা পেতে লাগল।

একদিন অতসী আব দেবেনকে মোটরে দেখতে পেল সে। মোটর আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। দেবেনকে স্পষ্ট চেনা যায, তেমনি স্থবির, কুৎসিত, আকাঙক্ষা-ইঙ্গিতশূন্য যেন, কিন্তু তবুও মাছে ডিমে দুধে মাখনে স্ত্রীমাংসে অত্যন্ত তৃপ্ত ও আরক্ত যেন এই লোকটা।

কিন্তু অতসীকে দেখলে অবাক হতে হয। এই লোকটির পাশে বসে সেও তৃপ্ত যেন, কিন্তু এই অদ্ভুত তৃপ্তি অধিকার করে নিতে গিয়ে তার মুখ সাংসারিকভাবে সুন্দর হয়ে উঠেছে, আগের সেই অব্যবসাযী সৌন্দর্য এ মুখের ভেতরে আর নেই।

আর্টিস্ট হিসাবে এখানে একটা নিগূঢ় অমর্যাদা দেখছে সুকুমার। যেন তারই একটা কবিতাকে কেউ কালো কালির আঁচড়ে ভরে দিচ্ছে। তাবপর সেই কবিতাকে চেনা যাবে না আর। বোঝা যাবে না কি জিনিস এমন নিগূঢ় সুন্দর করে প্রকাশ করতে এসেছিল সে। এতে আর্টের ক্ষয় হয।

আর্টের অত্যাচার

অবিনাশ বললে, 'যারা লেখক তারা ছাড়া আর কেউ আর্টিস্ট নয়।'

নিখিল বললে, 'যারা ছবি আঁকে?'

—'ব্রাশ নিয়ে?'

অবিনাশ জিজ্ঞেস করলে, 'ব্রাশ নিয়ে কি না?'

নিখিল বললে, 'হ্যাঁ।'

অবিনাশ নাক-মুখ কুঁচকে বললে, 'না, তারা আর্টিস্ট নয়।'

কেন নয়, অবিনাশকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। সে এমন সব কথা বলবে। তাকে জিজ্ঞেস না করতেই বলছে, 'এরা ছবি এঁকে ফাঁকি দেয।'

—'কাকে?'

—'নিজেদের মনেব ভেতর কখনো-বা যদি কোনো খটকা জমে থাকে সেগুলোকে, কিন্তু ওদের মনের ভেতব কোনো খটকা নেই, তাহলে ওরা ছবি আঁকত না।'

—'কী করত?'

—'লিখত।'

দেবকুমার বললে, 'আমি অনন্ত এটা বলতে পারি যে, যারা খুব ভাল গাইযে বলে বিখ্যাত অ্যামেচার বা প্রফেশনাল মজলিশে বা মুজরোয—ভাল গাইযে কিংবা ভাল বাজিয়ে তাদেব ভেতব অনেকেই প্রায ইডিয়ট, কিন্তু কোনো বিখ্যাত লেখক কোনো...মানুষ কাচেও ইডিয়ট নয।'

দেবকুমার বললে, 'অবিশ্যি এটা ঠিক যে, যে-যুগ চলে গিযেছে আমাদেব কাছে তা নানা কাবণেই ইডিযটিক বলে মনে হতে পারে।' একটু থেমে বললে, 'কিন্তু প্রতিটি যুগের খাঁটি লেখকে তার যুগেব কোনো...মানুষও ইডিযট বলে মনে করতে পারে না।'

এরা সমস্ত সকাল বসেই লেখা ও লেখকদের কথা বলছিল। এবা এক জাযগায থাকে না, কলকাতায়ও এরা বছবের অনেকটা সময় থাকে না। তিন বছব পবে এদেব পবস্পবের দেখা হল। কে জানে আবার ত্রিশ বছর পরে হবে হযত, কিংবা তিন দিন পরেও হতে পাবে।

এরা কেউ কারু জন্যে অপেক্ষা করে না, কেউ কারু সঙ্গ চাচ্ছে না। আজকেব...যে নিতান্তই অপরিহার্য ছিল তা নয, সেই তিন বছর আগে যা হযেছে, তাবপর হয়ত জীবনেব এ তিনজনেব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ মোটেই আর হত না।

কিন্তু তবুও দেখা হল, কথা হল, অবিনাশ যে ছবিকে আর্ট বলে মনে কবে না, নিখিল তা শুনল। আর দেবকুমার সে খাঁটি কবি, লেখক ছাড়া আর সমস্ত আর্টিস্টকেই ইডিযট মনে করে। এদেব এই কথা নিখিলের মনে থাকবে।

নিখিলের নিজের মতামত আজ সে কিছু আলাদা না।

এরা কেউই বিশেষ কিছু লেখে নি। কিন্তু এরা পড়েছে ঢের, অবিনাশ একটা উপন্যাস লিখছিল, কিন্তু শেষ করতে পারে নি, পাঁচ বছর ধরে সে একটা উপন্যাসের পিছনেই লেগে আছে, তার আইডিযা বদলাচ্ছে, স্টাইল বদলে যাচ্ছে, উপন্যাসটাকেও কাটতে-ছাঁটতে হচ্ছে তাই, অবিনাশ জানে যে এবকম করে কোনো লেখা বের করা যায না, তাই এবার তাড়াতাড়ি উপন্যাসটাকে সে শেষ করে দেবে। অবিনাশ বললে, 'আসছে বছরই বেব করব।'

নিখিল বললে, 'তাহলে ছ-বছর লাগল লিখতে?'

—'হ্যাঁ। যখন বের করব তখন মনে হবে তবুও যে আমি যা বিশ্বাস করি না, মানি না, সেই পচা পুরনো জিনিসগুলো, যা আমার স্টাইল নয়,—সেই পচা পুরনো জিনিস, এই সব নিযে এক বই বেরুল। বা!'

নিখিল বললে, 'এত তাড়াতাড়ি তোমার বিশ্বাস বদলে যাবে।'

—'বিশ্বাস, আইডিয়া, স্টাইল—সব।'

অবিনাশ একটা চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'এসব জিনিস কেবলই বদলাচ্ছে। কাজেই আমি ভেবেছি, আর্টিস্টের যা দরকার, প্রতি মুহূর্তেই প্রতিদিনের নিজকার কথাকে ধরে রেখে, সেদিনকার জিনিস বলে তখুনি তা বের করে দেয়া।'

অবিনাশ বললে, 'কিন্তু মুশকিল বড্ড, কেউ তা ছাপাতে চাইবে না, নিজের ছাপাবার পয়সাও নেই, এদিকে লিখে ফেলে রেখেও ছাপাবার মুরোদের অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। কারণ সে সুযোগ যখন আসবে তখন এ লেখার কোনো দাম নেই—আমার কাছে নেই।'

দেবকুমার কয়েকটা গল্প লিখেছে। একটা কি দুটো ছাপিয়েছে। কিন্তু তাতেই তার খানিকটা নাম হযেছে। কিন্তু তবুও অবিনাশের চেয়ে সে ঢের নিচুদবের লিখিয়ে। নিচুদরের খাতা কল্পনার প্রসার ঢের খর্ব।

নিখিল উপন্যাস লিখবে ভেবে রেখেছে, কিন্তু কখন লিখবে সে? জীবন তাকে লিখতে দিচ্ছে না। লিখবার মুহূর্ত এত কম আসে, সেই মুহূর্তও এত অপব্যয় নষ্ট হয়ে যায় যে হঠাৎ আজ যদি লিখিয়েকে মরতে হয় কিংবা একবছর অকাতবে লিখবার পর যদি মরতে হয় তাহলে এ দুটো ব্যাপারের ভেতর আকাশপাতাল তফাৎ হয়ে পড়ে যেন পৃথিবীর কাছে। নিজে সে আজও মরতে রাজি আছে। এরা প্রত্যেকেই আজও মবতে রাজি আছে। কিংবা সত্তব বছর বাঁচতেও আপত্তি নেই। অবিশ্যি এরা কুকুর-বিড়ালের মত বাঁচবে না শেষ পর্যন্ত গিয়ে, এরা তা জানে।

অবিনাশ আর দেবকুমার চলে গেলে পব নিখিলের স্নান হল, ভাত এল। তারপর সে চেয়ারটা টেনে নিযে বারান্দায় বসল, হ্যারিসন রোডের মাথাব ওপর। পাশের ঘরের থেকে ছোকরা দুটো বেরুল। কিছুদিন থেকে এই বোর্ডিঙে এরা আছে। নিখিল এদেব নাম জানে না। কাল সারারাত এরা টেনিসের কথা বলেছে। চিৎকার করে বলেছে। চেঁচিযে হেসেছে। এদের এ আমোদের জন্য নিখিল ঢের কষ্ট পেযেছে কাল রাতে, কাল সাবাদিন একটা ভাব নিযে তার মন আচ্ছন্ন হযে ছিল, সন্ধ্যার সময় লিখবার আবেগ এল, নিখিল তাই বোর্ডিঙে ফিরে এল। রুমে এসে বাতি জ্বালিযে বাত বারটা অবদি এদের টেনিসের কথা শুনতে হয়েছে তাকে। সেই নির্বিবাদ চিৎকাব জীবনেব সেই অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার তোলপাড়ের মধ্যে তার কবিতা তাকে বলেছে আমি এই জানালাব ভিতব দিযে কোথায় চললমাম চেযে দেখ, যদি আজকের মত লিখতে চাও আমার পিছে-পিছে এস। তাবপব সে একরাশ পাযরা-ভরা দেয়ালের পাশ দিয়ে চাঁদের ভিতর-তারার ভিতর হারিযে গেল—নিখিলেব কবিতা। কিন্তু নিখিল রুমেই বযে গেছে।

বোর্ডিঙেব রুমে একা থেকে সে ভেবেছে কবি না হয়ে টেনিস খেলোযাড় হলে জীবনটা কত মুখর হত তাব। কোনো চিন্তা তাকে ব্যথা দিত না। কোনো শব্দেব রাশি এসে তার হৃদয়ে আঘাত করে বসত না। আমাদের সাজাও, আমাদের সাজাও, আমরা নগ্ন কুৎসিত হয়ে পড়ে আছি, তুমি সাজাতে জান, তোমাকে আমবা চিনি। তুমি শৃঙ্খলাব ওস্তাদ, তুমি আমাদেব তুলে ধর—তোমাব হাতে আমরা সুন্দর হব। নিখিলের চোখে জল আসত না। ববং সে টেনিসের ব্যাকেট ছিঁড়ে গেলে একটু অসোযাস্তি পেত।

ব্যাকেট মেবামত করে কত খুশি হত সে। ওই খেলোযাড় দুটির মত কাল সাবারাত ভরে চিৎকার কবতে পাবত সে। জীবনেব না জানি কোন অনাবিষ্কৃত আস্বাদনে। সে কবি। জীবনকে সে নাকি বোঝে। বোঝে বটে কিন্তু আস্বাদ কবতে পাবে কেথায়! সে পারে না, অবিনাশ পাবে না, কে জানে দেবকুমার পারে কি না। কিন্তু এ ছেলে দুটোর মত কেউই তাবা পাবে না, কোনোদিনও পারবে না। অথচ এই ছেলে দুটোর আমোদ ত নিতান্ত সামান্য। তবুও যারা কবি নয়, আর্টিস্ট নয়, পৃথিবীর অসংখ্য সামান্য আনন্দে তাদের জীবন কি নিশ্চিন্ত, তাদেব বিচ্ছেদ আছে বটে, মৃত্যু আছে মানুষের সমস্ত দুঃখ তাদেরও সহ্য হয়, কিন্তু তবুও এ অত্যাচার তারা জানে না। নিখিলকে লক্ষ লক্ষ লোকের থেকে বেছে নিয়ে এই যে চিন্তার পর চিন্তা অজস্র উৎশৃঙ্খল শব্দেব পব শব্দ সঙ্গে কবে নিয়ে এসে দিনের পব দিন তাব বুকে এই যে আঘাত করতে থাকে, নিজেরা এই যে রূপ হতে চায়,—কি গভীর অত্যাচার এই।

ছেলে দুটো শিস দিতে দিতে বেবিয়ে যাচ্ছে।

টেনিস স্যু, পাতলা টেনিস সুট, হ্যাট ও র‍্যাকেটে তাদের কেমন কাটাছাঁটা দেখাচ্ছে। কেমন নতুন, সুন্দর, পালিশ।

দুজনের মুখেই দুটো চুরুট। এরা ব্যাকেট ঘুরাতে ঘুরাতে ঘাড় টান করে চলেছে। এদেব মতন জবিন যদি পাওযা যেত!

এরা জানে না শব্দের অত্যাচাব কাকে বলে, হাজার হাজার শব্দের ভিতর থেকে একটিকে বেছে নিতে নিখিলের রাতের পব রাত কেটে গিযেছে না? তারপর দু-একটা কবিতা বেরিয়েছে, কিন্তু তাতেও

ঠিক ঠিক শব্দ এল কই-চিন্তাই-বা রূপ পেল কোথায়! না না আর্টের অত্যাচার এরা জানে না।

কত কি জানত সে, জীবনে তার নানারকম ব্যস্ততা ছিল। নিখিলও টেনিস খেলতে জানত। কিন্তু তবুও চিন্তা এসে তাকে ধরল। চিন্তা, শব্দ, কবিতা, আর্ট।

জীবনকে বোঝা হচ্ছে, কিন্তু আস্বাদ করা হচ্ছে না। নিখিল কবি, তাই মারাত্মক। সামান্য মানুষের পরম গভীর বিশ্বাসও তার কাছে খেলার জিনিস। কত অসামান্য লোক এই জন্য তার কাছে সামান্য হয়ে যায়।

নিখিল তবুও ঘরের ভিতর ঢুকল।

চামড়ার মস্ত বড় সুটকেশটার কোন কিনারে একটা টেনিস সুট ছিল, তাই এঁটে ক্যানভাসের পার্টিশানের ওপারে ছোকরাদের টেবিলের থেকে হ্যাট ও র‍্যাকেট এক একটা দখল করে দুপুরের রোদে সেও বেরিয়ে পড়ল।

চুরুট জ্বালালে। কোনো গন্তব্য নেই তার।

ঘাড়টা টান করে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে লাগল সে। যদি এই কবে আর্টকে ভোলা যায়, আর্টকে কবিতাকে প্রশ্নকে সন্দেহকে অবিশ্বাসকে, যদি অন্য বকমের জীবনের আস্বাদ এক দুপুরের জন্যও সে পেতে পারে, সামান্য সামান্য কথা সে চেঁচিযে বলবে, যেন এর চেযে বড় কথা পৃথিবীতে কোনোদিন কখনো ছিল, না, শস্তা আলাপেব ফূর্তিতে সে মযদানে মযদানে ঘাসফড়িঙের মত লাফাবে তখন। শস্তা রসিকতায় হো-হো করে হেসে উঠবে, চিৎকারে চিৎকারে দৌড় ঝাঁপ উত্তেজনায় প্রাণপাত, করবে সে আজ, বুঝবে জীবন কাকে বলে, ওদের জীবন নিজের জীবন হবে আজ নিখিলের। তারপব সে ওদেব সিঁড়ি ধরে ওদের দলে ভিড়ে যাবে। যেখানে কোনো কবিতা কোনো আর্ট কোনো শব্দ তাব নাগাল পাবে না আর। আহা, সেই জীবন, যেখানে কোনো সন্দেহ নেই খটকা নেই—না চিন্তা না শব্দের।

নিখিল ট্রামে উঠল।

মুখোমুখি বেঞ্চেই এক টেনিস খেলযাড়।

নিখিল বললে, 'আপনি কোথায যাচ্ছেন?'

—'খেলতে।'

—'মযদানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনাকে কোথায যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।'

—'টেনিস গ্রাউন্ডে। 'হযত... কিন্তু আপনার এই র‍্যাকেটটা যে ছিঁড়ে গেছে।' নিখিলেব সে-সব দিকে নজরই ছিল না এতক্ষণ।

—'এ দিয়ে কী করে খেলবেন?'

—'সারিযে নিতে হবে।'

—'এত তাড়াতাড়ি কোথায সারাতে পারবেন?' ছেলেটি নিখিলের র‍্যাকেটা চেযে নিল।—'দেখি।' বললে, 'জখম বড্ড বেশি।' খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে বললে, 'ব্যাকেটা কত দিনের?'

—'সে অনেক দিনের।'

—'কোন দোকান থেকে কিনেছিলেন?'

—'এদিককারই সে একটা দোকান থেকে—মনে নেই।'

মনে নেই—ছেলেটি নিখিলের ঔদাসীন্য দেখে একটু অবাক হল, নিখিলের টেনিস স্যুব দিকে তাকিয়ে একটু বিব্রত হল। নিখিলের সুটে পুরনো কাটে হযত সে ঘাবড়াচ্ছে, কিন্তু ছেঁড়া র‍্যাকেট নিয়ে মানুষ টেনিস খেলতে যায এই হযত তা সে প্রথম দেখল।

নিখিল ছেলেটিকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে। বুঝেছে জীবন এদের জন্যই। ব্যাকেট যেন এব প্রাণ, ছেঁড়া র‍্যাকেটাটাও, এখনো সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখছে ছেলেটি। একটা র‍্যাকেটকে যদি প্রাণের মত না করে দেখা যায, একটা র‍্যাকেটকে, এক জোড়া জুতোকে। তাহলে জীবনকে উপভোগকরা যায কী করে?

জীবনকে আস্বাদ করতে গিযে প্রথমেই এই ছেলেটির কাছে ঠকে গেল নিখিল, এমন জুতো এমন র‍্যাকেট এমন সুট এই নিয়ে নিখিল চলেছে? মযদানে? এই সব নিযে ফূর্তি? না জানি সে কীরকম ফূর্তি! বরং এই ছেলেটি সব রকমেই ফূর্তির উপযুক্ত, তার মাথায ব্যাকব্রাশের থেকে তার জুতোর ফিতে বাঁধার পরিপাটিটুকুর অবদি।

নিখিল ভাবছিল, এমন পরিপাটি করে ফিতে বাঁধতে সে কোনোদিনও পারবে না, যদিও হাতে অনেকদূর গুছিয়ে আনতে পারবে সে, কিন্তু তবুও হৃদয় গুলিয়ে দেবে তারপর সব, বলবে, জুতোর ফিতের ভিতর কিছু নেই।

ইস্কুলে যখন সে পড়ত তখন থেকেই এসব জানত সে। নিজের বুকের ভিতর থেকে এমন চাবুক বরাবর যদি সে না খেয়ে আসত, তাহলে কত বড় টেনিস খেলোয়াড় হতে পারত সে আজ, কত দিক দিয়েই কত বড় হতে পারত সে আজ। আজ সে ছেঁড়া র‍্যাকেট, চোরাই র‍্যাকেট নিয়ে চলেছে। কার জন্য? আর্ট তোমার জন্য নয় কি? কিন্তু তুমি কি পুবস্কার দিলে? না, না, তুমি কাউকে কোনো পুরস্কার দেও না। তোমার পথে কোটি কোটি লোককে তুমি চলতে দাও না, তারপর একজনকে চলতে দাও, এই অত্যাচাব ছাড়া তুমি আব কিছু জানো না।

ট্রাম অনেক দূর চলে গেছে।

ছেলেটি একটা দোকান দেখিয়ে বললে, 'ওখান থেকে র‍্যাকেট বদলে নিন। নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন। কি বিবাট আগ্রহ তাব কি বিবাটতব আওয়াজ! এ না হলে জীবনের উল্লাস কোথায়?

নিখিল নামল।

ছেলেটি জানালাব ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমি উডবার্ন পার্কে যাচ্ছি, যাবেন?'

নিখিল বায়স্কোপে গেল।

খুব দামি সিটে শাহেব-মেমদের সঙ্গে বসল সে।

তারপর ইম্পিবিয়ালে খুব খাসা খাবাব খেয়ে এল।

ঘবে ফিরে এসেছে যখন তখন রুমেব ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে।

দবজা খুলে এক মুহূর্ত দাঁড়াল নিখিল।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিছানাটাব দিকে অনেকক্ষণ ধবে তাকাল, নোংরা লেপটা এবড়োখেবড়ো হয়ে বিবর্ণ বালিশ দুটোর ওপব শুয়ে আছে জড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন একজন কুষ্ঠেব রোগী শুয়ে আছে।

সমস্ত ঘরের ভেতব এই, কেমন একটা কুষ্ঠেব ছবি যেন, কেমন একটা নোংরামির গন্ধ। কিন্তু এ ছবি এখানে দু-মিনিটেব বেশি থাকছে না, সমস্তই যথাযথ হয়ে আসছে তাবপর।

বাতেববেলা নিখিল স্বপ্ন দেখল কাবা যেন শিকাবে বেবিয়েছে। না জানি কি করে শিকাবীর দলে পড়ে গেছে সে। তাবপব শিকারীবা আব কোথাও নেই, ঝোপেব ভেতব একটা পাখিকে ছটফট কবতে দেখছে শুধু নিখিল, পাখিটা—লাল শিবা। একটা কুকুব এসে পাখিব বক্তাক্ত ডানা: ব্যথা চেটে নরম কবে দিচ্ছে। ওরা দুজনেই মানুষেব মত কথা বলছে। কিন্তু পাখিটা ক্রমে বড় আবো বড় হয়ে উঠছে, তার ডানা পালক টকটকে লাল, যেন আগুন জ্বলছে, তাব যন্ত্রণা দারুণ। ঘবের অসহ্য গুমোট ও গরমের ভিতব নিখিল জেগে উঠল।

একটা বাতি জ্বালাবে কি সে? কিন্তু জ্বালিয়ে কী হবে? এখনো অনেক রাত, কাজের পৃথিবীটাকে যত দূবে সবিয়ে বাখতে পাবা যায়, ততই যেন ভাল লাগে, আবাব অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শীতের আরাম অনুভব কবছে সে, লেপটা বুকেব ওপব টেনে নিচ্ছে, কি গভীব আবাম। পাশেব ঘরের ঘড়িতে তিনটে বেজেছে, বাতেব এখনো ঢেব বাকি, কি মিষ্টি আবাম। আবো অনেকক্ষণ ঘুমবার পর পাঁচটা বাজল, আবো দুঘণ্টা ঘুমতে পাববে সে; কেউ তাকে বাধা দেবে না, চাবদিককাব অনিষ্ট উৎপাতের ভিতর কত নির্বিঘ্ন সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শবীবে নিবিড় মধু জমিয়ে কত সফল সে।

সকালবেলা ম্যানেজাব নিখিলের ঘবে এসে বললে, 'নিখিলবাবু, এই সাত-আট বছবে আপনাব কাছ থেকে আট-দশ হাজাব টাকা নিয়েছি, কি আব বলব।'

তিন-চার মাস হতে চলেছে বোর্ডিঙেব পাওনা নিখিল দিতে পাবছে না, তিন-চাব মাসের টাকা আজকালকাব দিনে ফেলে বাখা ম্যানেজারেব পক্ষে কত কঠিন নিখিল তা জানে। বিশেষত, বোর্ডিঙে মেম্বার যখন দিনেব পর দিন এত কমে আসছে, রুমেব পবে রুম যখন এমন খালি পড়ে আছে!

নিখিল বললে, 'দেখছি ম্যানেজাববাবু, সন্ধানে আছি, সন্ধানে আছি।' এর চেয়ে বেশি কী আর বলতে পারে? কিংবা এর চেয়ে কম? ম্যানেজারও জানে এ টাকাগুলো হয়ত মরেই যাচ্ছে, নিখিলকে এখন সরাতে পারলে সে বাঁচে। আর কেউ হলে ম্যানেজাব যে কবে ভাত বন্ধ করে দিত, নিখিল তা জানে।

এই জ্ঞান আজ তাকে লিখতে দিচ্ছে না, না হলে আজও তার হৃদয়ে লেখা এসেছিল, শব্দ সাজাবার ইচ্ছা, কি একটা চিন্তাকে রূপ দেওয়াব সাধ।

ম্যানেজার মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'আট-দশ হাজার টাকা এই সাত-আট বছরে আমাকে

দিয়েছেন আপনি, ঘবে'—একটু থেমে বললে, 'ধবে নিলাম এ তিন মাস তাব কমিশনেই গেল।' ম্যানেজাব বললে, 'আমি তাই ধবে নিয়েছি, কিন্তু—কমিশন আব বেশি চলে না। এই।'

নিখিল সেই বাতেই বোর্ডিঙ ছেড়ে চলে গেল।

কোথায় যাওয়া যায়? ঢেব বড়, ঢেব সুন্দব, ঢেব চমৎকাব কোনো এক জায়গায় নিশ্চয়ই। তেমনি একটা জমকালো হোটেলে গিয়ে উঠল সে। একজনেব মত একটা রুম পছন্দ কবলে, এটাকে রুম বলা চলে না, একটা কি যেন, ম্যানেজাব বললে একশ টাকা লাগবে, আগাবি কিছু চাইলে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ। নিখিল যখন কিছুই দিতে পাবল না, তখন ম্যানেজাব তবুও কোনো আপত্তি কবলে না আব।

রুম পবিষ্কাব ঝকঝক কবছে, ইতস্তত সোফা ছাড়ানো, দেয়ালে একটা দুটো কবে ছবি বয়েছে মাত্র, অশ্লীল প্রচুবতা নেই। সমস্ত ঘবটা কি গভীব, কত নিস্তব্ধ, কত প্রশস্ত।

এইখানে মন যেন কত বেশি পবিসব পায, মাথা কি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে না আবো? চিন্তা কি সহজে গুছিয়ে আসে না? এই ঘবে বসে লেখা কি সহজ নয? কবিতা এখানে পবিশ্রম নয, টেনিসেব চিৎকাবকে জয কববাব মত লড়াইযেব ষাঁড় নয কবি এখানে আব, আর্ট এখানে প্রবৃত্তি শুধু, পবিশ্রম নয পবিশ্রম নয, একদিনেই সে হয়ত অনেক লিখে ফেলতে পাববে, অনেক লিখেও আবো অনেক লিখতে পাববে। লেখা এমনই সহজ হয়ে উঠবে এখানে। এখানে ভালবাসা যেন আবো সহজ। সে কি আজীবন এইখানে থাকতে পাববে না? ভিতবে তাব যে ব্যথা বয়েছে, যে অবসাদ, তাব জন্যই বাইবেব এই আয়োজন আবামে দাবি খুব গভীবভাবেই সে কবতে পাবে।

নিখিল জানালাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাস্তাব দিকে তাকাল, কি দারুণ উৎপাত সেখানে, কি অনিষ্ট অপচয, নোংবামি, ঘৃণা, কি দারুণ উৎপাত। বিশীর্ণ শুঁয়োপোকাব মত এবা কুঁকড়ে কুঁকড়ে গুটিগুটি চলেছে, এবা। ছি, কে এদেব এমন চলতে বলেছে'

নিখিলেব জানালাব দিকে এক-আধবাব তাকাচ্ছে এবা, বুঝছে নিখিলেব জীবন ওদেব চাইতে কত দূবে, কত উপবে। একজন কুষ্ঠবোগী ঘষড়াতে ঘষডাতে বাস্তা দিয়ে চিৎকাব কবতে কবতে চলেছে, একে চেনে নিখিল, এই বোগীটাকে, পুবনো বোর্ডিঙে থাকতেও এব চিৎকাব সে ঢেব শুনেছে, যাব সমস্ত শবীব খসে পড়ছে। এমন দারুণ বোদে ঘষড়ে ঘষড়ে কি কবে সে বাস্তাব পব বাস্তা পাড়ি দেয ঢাকেব মতন এমন চেঁচাতেই-বা পাবে কী কবে, এমন অনববত, আবাক হয়ে সে ভাবত।

অনেক দিন এই কুঠেকে সে পয়সা দিত না, কিন্তু তুবও এ বোগী পেট শুকিয়ে মবে সটকায নি ত, ভিক্ষে কববাব চিৎকাব কববাব শক্তি তাব আগেব মতই বজায আছে, বাঁচবাব স্পৃহা তাব আগেব মতই প্রবল বয়েছে উঁচু উঁচু বাড়িব জানালাব দিকে আগেব মতন এখনো সে তাকিয়ে তাকিয়ে চিৎকাব কবে, কাবণ লক্ষ লক্ষ জানালাব থেকে অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা হাত তাকে ববাববই বিশ্বাস কবতে বলে। বিশ্বাস কবতে বলে জীবনকে। আজ নিখিলও নিজেব হাত সেই হাতেব ভিড়ে মিশিয়ে দিচ্ছে। এই কুঠেকে ববাববই মনে মনে নিখিল মবতে বলেছে, পৃথিবীব হাজাব হাজাব জিনিসকে থামতে বলেছে, স্থগিত হতে বলেছে নিখিল। কিন্তু তবুও অন্য দিক থেকে আবাব যেন কাবা এই কুঠেকেও বিশ্বাস কবতে বলেছে। ববাববই তাদেব প্রতিবাদ কবে এসেছে নিখিল প্রতিবাদ কবে সুখ পেয়েছে, সফলতা তাব হয়েছিল, কিন্তু তবুও কুঠে এখনো বেঁচে আছে, হয়ত সাত আট দশ বছব ধবে, তাব চিৎকাব এখনো তেমনি প্রবল।

নিখিলেব মনে হচ্ছে কোথাও জীবন যেন তাব সমস্ত প্রশ্ন ও প্রতিবাদেব চেয়ে প্রবলতব হয়ে বেঁচে বয়েছে। এ জীবন যেন তাব সমস্ত প্রশ্ন ও প্রতিবাদেব চেয়ে প্রবলতব হয়ে বেঁচে বয়েছে। এ জীবন কেমন তা সে ভাবতে গেল না আজ আব।

হোটেলটা একবাব ঘুবে দেখল নিখিল।

কোথাও মহাবাজা, কিংবা তাব প্রাইভেট সেক্রেটাবি এক ফ্ল্যাট নিয়ে আছে কোথাও-বা বুড়ো ব্যাবিস্টাব তাব আজীবনেব অগাধ টাকা এইখানে চুপে চুপে খবচ কবছে, কোথাও ইম্পিবিযাল সার্ভিসেব লোক বিটাযাব কববাব মুখে কলকাতায দু-চাবটা কাজ সেবে নিচ্ছে, কোথাও-বা বিদেশীবা, নেপালি, পাঞ্জাবি, পার্শি এক আধদিনেব জন্য এসে চেকেব পব চেক কেটে চলেছে। নিখিল এদেব মধ্যে' এদেব সঙ্গে ' কে জানে সেও হয়ত একজন লাখ টাকাব খদ্দেব, ওই পাঞ্জাবি বা পার্শি কি তা জানে?

এইসব নিবিড় তামাশা, মন নবম হতে থাকে।

হোটেলেব ম্যানেজাবকে এক মাস পব একশ টাকা দিতে হবে। নিখিল তাব সাড়ে তিনশ টাকাব ঘড়ি বিবাশি টাকায বিক্রি কবে এল, একটা হীবে বসানো আংটি পনেব টাকায নামল, আব বাকি টাকাটা

সে লিখে উৎরাবে।

মনের ভিতর কোনো ভাবনা নেই এখন আর তার, ঘরের ভেতর অনেক সোফা আছে, মেহগিনি কাঠের টেবিল-চেযাব। দিন-বাতের নিস্তব্ধতা।

প্রথমে একটা গল্প লিখে তিরিশ টাকায ওৎরাতে চাচ্ছে নিখিল। একটা গল্পের কত দাম? তিরিশ না তিনশ না তিন হাজাব না তিন টাকা? একটা গল্পেব জন্য কতখানি শক্তি খরচ করতে হয, কতখানি ব্যথা? ওই কুঠের ব্যথা ও শক্তির অনুপাতে ধবতে গেলে একটা গল্পেব দাম তিন কড়ি দাঁড়ায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ও সব দেশে—ইওরোপে আমেবিকায এক-একটা গল্প তিন হাজার পাউণ্ডেও কি যায নি? গিয়েছে বৈকি।

নিখিল ভেবে দেখছে সেই সব গল্পেব লেখকেরা কতখানি প্রকৃত ব্যথা পেয়েছিল, কতখানি যথার্থ শক্তি এনেছিল, হয়ত কুঠের চেযে ঢেব কম। কিন্তু তবুও তিন হাজার পউণ্ডে তিরিশ হাজার পাউণ্ডে উৎরে গেল সে-সব। কাজেই ব্যথা বা শক্তি ওজনের কথা আব যেন ভাবতে যায় না সে, যেন একটা গল্প সে-সব। কাজেই ব্যথা বা শক্তি ওজনেব কথা আর যেন ভাবতে যায না সে, যেন একটা গল্প লিখে তাতে তৃপ্ত হতে পারলে মনে কবে নেয যে এটা তিরিশ হাজার পাউণ্ডেও উৎরাতে পাবত, অতএব তিরিশ টাকার দাবি তার মোটেই বেশি নয।

নিখিল লিখতে লাগল।

লিখতে লিখতে একবাব ভাবল আব প্রকৃত ব্যথার কথাও যদি ধবা যায় তাহলেও গত সাত-আট বছরের ভেতর কার চেযে কম ব্যথা পেযেছে সে? বেদনাব বিচিত্রতাযই-বা তার চেয়ে বেশি সফল হযেছে কে?

নিখিল তিন দিন বসে গল্পটা শেষ করল। তাবপব পাঠিয়ে দিল। যে কাগজগুলো টাকা দেয তারা কেউই তার গল্পটাকে রাখল না। নিখিল তখন ভাবল এটাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে কোনো বিলেতি কাগজে পাঠানো যাক, তিবিশ টাকাব বদলে কে জানে, তাতে তিরিশ পউণ্ডও মিলতে পাবে হযত, স্বদেশী বিদেশী সেকালের একালেব ঢের গল্প কবিতা সে পড়েছে, সাহিত্য কী, এবং সাহিত্য কী নয,অনেক নামজাদা শস্তা লেখক ও সম্পাদকের চেযে ঢেব বেশি কবেই সে তা জানে, তার নিজের মতামতকে সে খুব গভীর মনে করে, নিখুঁত বিশ্বাসীর ভগবানেব চেযেও কবিতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের মনেব নিপুণ ব্যবহারকে সে ঢের বেশি শ্রদ্ধা করে।... কান্তার চেযেও তাব জীবনেব এ আবো ঢের নিকটতব জিনিস, এই নিবিড় নিপুণ। বিচার।

কিন্তু তবুও হৃদযে অবসাদ তার।

অনুবাদ সে কবছে না আব। গল্পটা দেবাজেব ভিতব রেখে দিচ্ছে। যাদের বিচাব নেই তাদের পবিশ্রম দিযে অভিভূত কবতে হয। কিন্তু হৃদযে কেমন একটা অবসাদ তাব। ব্যারিস্টার বেরিযে যাচ্ছিল, কোর্টে চলেছে, কাল বাতে তিন হাজাব উড়িযেছে, তিন দিনেই আবাব তা গুছিযে আনবে, চোখে-মুখে লোকটার কেমন একটা বিদ্যুৎ, কোথাও কোনো সন্দেহ নেই, খটকা নেই, মতলব নেই, স্কিমিং নেই, জীবনটা তাব কাছে আগাগোড়া ঠিক টাকা, একটা গুটোনো চার্টেব মত, টান দিলেই তা গুড়ৎ করে খুলে আসে, কোথায কি এ মুহূর্তেই ঠিক কবে নিতে পাবা যায। এমন একজন ব্যারিস্টাব হতে পারত নিখিল। খুব বড় একজন ইঞ্জিনিযাব হতে পারত মনেব ভেতর যা কিছু বিদ্যুৎ তাব যত কিছু শক্তি ইঞ্জিনিযারিঙের আবিষ্কারেব দিকে ফলে উঠত তা। নতুন নতুন আবিষ্কাবের দিকে রোজ রোজ!

যে-কোনো ইউনিভার্সিটিব চেযাব সে এতদিনে দখল করে বসতে পারত। ডাক্তাব হতে পারত সে, ব্যবসাযী হতে পারত, তাব মন, যা আজ প্রশ্ন করছে শুধু, ভাবছে, ছটফট করছে ওই সব জাযগায গিযে ঢের গড়তে পাবত। তবুও আর্ট তাকে কিছু হতে দিল না।

যখন সে ইস্কুলে পড়ত তখন থেকেই মানুষেব জীবনের নানাবকম সাধনার উপর এমন শ্লথ বিশ্বাসী হযে পড়ল।

কলকব্জা জাহাজ ব্রিজেব নিত্যনতুন তৈবি, আবিষ্কাব তাকে চমকাতে পারল না, এ জিনিসগুলোকে এমন শস্তা মনে কবল সে। শস্তা মনে করল ডাক্তারকে, ব্যারিস্টারকে, প্রফেসবকে,—শস্তা নয়? এবা ভাতের ওপবে উঠতে পারল কি কেউ? ভাতের ক্লেদের ওপরে? পৃথিবীকে দেখে, মানুষদের দিকে তাকিয়ে এদের কোনো কৌতূহল (কৌতূহল অনন্ত) হল না, যেন ছবির পরে ছবি আকাশে বাতাসে নক্ষত্রে রাস্তায ঘাটে বাজারে নর্দমায রোজই ব্যক্ত হতে পারে অথচ মনকে তা এমন কোনো আঘাত দিতে পারে না যাতে আদালত অফিস হসপিটাল ডিসপেনসারি কলেজ সবই ছাই হয়ে যায়, ধুলো হয়ে যায, যাকে শুধু সেই ছবি আঁকবার স্পৃহা, হযত বিধাতার চেয়েও নিবিড় করে। হায়, এই স্পৃহা এদের পেয়ে বসে নি। এই মারাত্মক নিরুপম আনন্দ। জীবনের সমস্ত আনন্দ এখানে ধূসর হয়ে যায়।

এই মাবাত্মক নিরুপম স্পৃহাব বেদনা? এব অবর্ণনীয বক্তাক্ততাব কাছে জীবনেব সমস্ত ব্যথা বাববাব ধূসব হযে গেছে।

দেখ তাদেব জীবন কত সহজ, যাবা নিখিলেব মত নয। ইস্কুলেব থেকে মৃত্যুব দিন পর্যন্ত ভগবান স্বর্গ নবক পাপেব প্রতিফল পুণ্যেব পুবস্কাবেব সঙ্গে নিবিড় আত্মীযতা বেঁধে কাটাছাঁটা পথে গভীব শান্তি পেযে এবা চলেছে।

আব সেই ইস্কুলেব দিন থেকে এদেব এই শান্ত সবল...পৃথিবীব থেকে নিখিল সবে চলেছে। তাবপব আজ সে কতদূব এসে পড়েছে।

পৃথিবীব চমৎকাব লোক ধর্মপ্রাণ আত্মা মানুষেব মত মানুষদেবও মনে মনে ঠাট্টা কবতে তাবপব আব বাধল না নিখিলেব আব।

ক্রমে ক্রমে সে বুঝতে পাবল সে কত একা, যে জীবন মনে মনে সে সত্য বলে ধবে বেখেছে পৃথিবীব কাছে তা কত হেয। সে জীবনেব গুরুতব দবকাবেব সময তাকে সাহায্য কববাব জন্য একজনও কোথাও নেই।

দবজায ঘা পড়েছে।

নিখিল লোকটাকে ভেতবে আসতে বলল।

মহাবাজাব প্রাইভেট সেক্রেটাবি। নিখিলকে একটা কথা বলতে এসেছে সে, হাত কচলাতে কচলাতে নিজেব বেযাদবিব জন্য মাপ চাইতে চাইতে সোফাব এক পাশে এসে এই নবম লোকটি বসল।

—'আপনি খুব ভাল টেনিস খেলেন শুনেছি।'

—'খেলতাম একসময।'

—'কত বছব আগে?'

—'দশ, পনেব—'

—লোকটা স্তম্ভিত হযে যাচ্ছে, আঘাত পাচ্ছে।—'শিগগিব খেলেন নি?'

—'না।'

—'আপনি টেনিস সুট পবে বোজ দুপুবে বেবিযে যান?'

—'কে বললে?'

—'ম্যানেজাব।'

—নিখিল একটু থমকাল।— বোজ নয, দু-এক দিন গিযেছি বটে।'

—'টেনিস সুট পবে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায?'

—'এমনি বেড়াতে।'

প্রাইভেট সেক্রেটাবিব বিশ্বাস হচ্ছে না, দুপুববেলা টেনিস সুট পবে ব্যাকেট হাতে এই টেনিস সিজিনে এমনি কে বেড়াতে বেবয? কেউ না, নিখিল ছাড়া।

প্রাইভেট সেক্রেটাবিব খটকা মিটছে না, বললে, 'কথাটা কি জানেন, আমবা দু-তিনজন ভাল খেলোযাড় চাই।'

—'কীসেব জন্য?'

—'মহাবাজা একটা বাঙালি টিম কববেন।

—'বাঙালি?'

—'একজনও বিদেশী থাকবে না তাতে, একেবাবে খাঁটি বাঙালি, টিমটা বেশ বড় হবে। পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি, জাপানি, পার্শি শাহেবদেব ত কথাই নেই, এদেব টেনিসেব বাজাবে বাঙালিব কোনো পাত্তা নেই জানেন, বাংলাব দেশ কলকাতায এসে এবা আমাদেব কিবকম কানমলা দেয জানেন? প্রাইভেট সেক্রেটাবি বললে।

টেনিস গ্রাউন্ডেব ত্রিসীমাযও একটা খেজুব মত খেজু যদি বাঙালি হয তা ঠিক বটে, নিখিল, নিখিল তা জানে, টেনিস, তাব অনেক দিনকাব পুবনো একটা নেশাব জিনিস বলেই হযত, হযত কবিতায গুলিযে না গেলে এই জাপানিদেব, মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, বর্মিদেব সে একটু খেলা বুঝতে দিত। মাঝে মাঝে এই বকম সে ভেবেছে। কিন্তু তবুও জীবনেব কত দিককাব কতবকম সম্ভাবনাই ভেঙে ভেসে গিযেছে,

টেনিস তার ভিতরে আর কি?

প্রাইভেট সেক্রেটারির ধারণা অন্যকরম। সে বললে, 'মহারাজা এক-এক সিজনে এক-এক বাঙালির খেলোযাড়কে হাজার, আড়াই হাজার, তিনহাজার দিতে রাজি আছেন, বাঙালির খাঁটি খেলা দেখাতে হবে, ওদের হারিয়ে দিতে হবে যে এমন কোনো কথা নেই, তবে খাঁটি খেলা দেখাতে হবে।'

বাঙালির খাঁট খেলা, খাঁটি টেনিস খেলা তা বলে কি কোনো জিনিস আছে? নিখিল বললে, 'কদিন খেলতে হবে?'

—'তা মহারাজা ঠিক করবেন, একটা কাপ ডিক্লিয়ার করবে, কয়েক জন ভাল বাঙালি খেলোয়াড় পেলেই হল।'

—'পান নি?'

—'না। এখনো কিছু পাই নি, ...কবতে চাই না, ভেতরে ভেতরে জোগাড় করতে চাই।' একটু থেমে বললে, 'আপনি আপনাব খেলা যদি আজ দেখান, সেটা যদি আমাদের পছন্দ হয, তাহলেই আপনাকে ভরতি কবে নেব।'

—'কোথায খেলা হবে?'

—'মহারাজাব চমৎকাব গ্রাউন্ড আছে, বালিগঞ্জে।'

নিখিল বললে, 'সে টেনিস খেলতে জানে না।'

লোকটা প্রথম খানিকটা সন্দিগ্ধ হয়ে, তারপরে হতভম্ব হয়ে এবং পবে ভ্রূ কুঁচকে উঠে গেল। গম্ভীর ভাবে এবং গম্ভীর ব্যথা নিযে। নিখিল তাব জন্য যদি চমৎকার 'খাঁটি বাঙালি খেলা' দেখাতে পারত, টেনিস খেলোযাড় হতে পাবত, তাহলে তিনদিন বসে লেখা গল্পটাকেও সে ছিড়ে ফেলতে পারে যেন, লোকটাকে বড় নিবাশ কবে দিয়েছে যেন সে।

তাহলে নিখিলের এই গল্পটাব জন্য কেউ এক পযসা দিতে রাজি নয। পযসার কথা যদি বল, তাহলে নিখিল ওই ব্যাবিস্টাবেব মত তিন দিনে তিন হাজাব টাকাও আনতে পারত, কিংবা টেনিস খেলাবার জন্য মহাবাজার কনট্রাক্ট সাইন কবে পাঁচ হাজাব টাকা কি সে পেত না? কিন্তু আর্ট মানুষকে না দেয সুখ, না দেয় সোনা। আর্ট, যার জন্য সমস্ত সাধারণ উদ্দেশ্য ও আস্বাদেব থেকে সে বহুদিন আগেই সবে এসেছে, যাকে বুঝতে ধবতে বিশ্বাস করতে গিযে সকলেব সহানুভূতি হাবিযে বসেছে নিখিল আজ সব খুইযে দিযেছে সব আর্ট আজ নিখিলকে একটা পযসাব মত পুরস্কার দিল না, এ রুমে বসে যদি সে শুকিযে ঘষটে মবে যায, তাব মরা শবীবটাকে লাথি দিয়ে যদি তারা অপমান করে, নর্দমায ফেলে দেয, যদি তাকে কুকুরের মত বিচাব কবে তাহলে আর্টেব কড়ে আঙুলে গিযেও সে সব লাগবে না।

বযস তার এত বেশি বাড়ে নি এখনো। বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশে শোধবাবার ঢের জাযগা আছে। আজ থেকে সে আব কবি নয। তাব মত লোকের পক্ষে নিছক কবিতা আর্টেব ভযাবহ জীবনের ভবিষ্যৎ চমকে দিযেছে তাকে, যদিও ঢের দেবিতে, তবুও এখনো যথেষ্ট সময আছে। সে আর গল্প লিখতে যাবে না। যেন ছবির পব ছবি আকাশে বাতাসে নক্ষত্রে বাস্তায ঘাটে বাজাবে নর্দমায রোজই ব্যক্ত হতে পাবে অথচ মনকে তা এমন কোনো আঘাত দিতে পাবে না যাতে আদালত অফিস ডিসপেনসারি হাসপাতাল কলেজ ইস্কুল সবই ছাই হযে যায, ধুলো হয়ে যায, থাকে শুধু সেই ছবি আঁকবাব স্পৃহা, হযত বিধাতার চেযেও নিবিড় করে। না, সে স্পৃহা থাকবে না তাব আব। জীবনেব অনেকখানি অবসাদ কমে থাকে তাতে, একটা দারুণ বিষণ্ন আঘাত যা সব সময়ই বুকেব ভিতব, প্রাণেব ভিতব চিনচিন কবছে আস্তে আস্তে শান্ত হযে যাবে।

তখন সে সবই পাববে, কবিতা লিখবার প্রযোজন যদি সে আর বোধ কবতে না পারে তাহলে সে যেন জেল থেকে বেরুল, তারপব আকাশ বাতাস মানুষের মুখ তাদের চিন্তা কথা কাজ সবই এমন চমৎকাব, সে চিৎকাব কবে বলবে চমৎকাব! চমৎকাব! চমৎকাব!

এমন বযস তাব তেত্রিশ। গত আঠাব-কুড়ি বছব ধবে সে কি করেছে? সেই ইস্কুলে থাকতেই সে কবিতা পড়তে শুরু করেছে। সাহিত্য আবম্ভ কবেছে, এখনো এ জিনিসটা এমন মারাত্মক হয়ে উঠে নি, কিন্তু তখন থেকেই অন্য সব মানুষদের সান্ত্বনা হতাশা বিশ্বাস তাদের উৎসব ব্যথা সান্ত্বনা, সান্ত্বনা-শান্তি নিখিলকে যেন তেমন স্পর্শ কবতে পাবে নি। সর্ববাদিসম্মত মানুষও তাদের পৃথিবীটাকে এমন বেকুব মনে হযেছে।

তারপর তার মন নিদারুণ ঠাট্টা শিখল, মানুষের আগ্রহ আন্তরিকতা যখন অভ্রভেদী হয়েছে, স্বর্গ পেয়েছে, তখন নিখিলই জানত যে বাস্তবিক তারা কিছুই পায নি, তাদের মনে সরলতা কি বিসদৃশ, কী বীভৎস! কিন্তু তবুও তাদেব জীবন বিসদৃশ সবলতা নিয়ে তারা আনন্দ পেয়েছে, নিখিলের মন তেমন

সাধাবণ হল না কেন? কেন সে মবণেব সঙ্গে মিশে যেতে পাবল না ভিড়েব মাঝে ভিড় হযে? সফল হযে? কিন্তু সাহিত্য মানুষকে ভিড় থেকে টেনে আনে, তাবপব ছবি দেখতে বলে, তাবপব ছবি আঁকতে বলে। এ সবই কি গভীব অসহ্য।

এক-একটা কবিতা পড়ত সে, সেই ইস্কুলেব দিন থেকে, যে কবিতাটা সত্য হযে তাব বুকে এসে বাজত সে যেন নিখিলকে বলত আমাকে তুমিও ত তৈবি কবতে পাবতে, আমি দেখেছি তোমাব ভেতবেও সেই আবিষ্কাবেব চোখ বযেছে, সেই ব্যথা সেই শক্তি যাব আড়ম্ববে আমি গড়ে উঠেছি। নিখিল ভাবত, 'আছে কি? কালে ক্রমে দেখল 'আছে, সবই আছে, এক-একটা ইশাবা এসে তাকে গভীব অন্ধকাব বাতে ঘুমেব থেকে জাগিযে দিযেছে তাবপব বলেছে আমি ছাযা শুধু কতকগুলো এলোমেলো শব্দ, একটা দুঃসাধ্য চিন্তা, তুমি আমাকে সাজিযে দাও, গুছিযে দাঁড় কবাব তুমি ছাড়া কেউ তা পাববে না, তোমায আমি ছাড়ব না।'

এতে মানুষেব জীবন অসহ্য হযে উঠে।

এখন থেকে এদেব কথা শুনবে না নিখিল আব।

নিখিল একটা লিস্টি কবতে লাগল—কী সে কববে। সাধাবণ মানুষেব অনেক সম্ভাবনা, সে এখন সাদাসিদে সাধবণ-আর্টিস্ট নয আব। কাজেই ওই ব্যাবিস্টাবেব মতন হওযা তাব পক্ষে অসম্ভব নয, সে ইঞ্জিনিযাব হতে পাবে, ব্যবসা কবতে পাবে, জার্নালিজম কবতে পাবে বিলেতে গিযে, চা বাগানেব ম্যানেজাব হতে পাব, কোলিযাবি কিনতে পাবে, বেলওযে এজেন্ট হতে পাবে, একটা স্টিম কোম্পানিব প্রোপাইটাব হতে পাবে, কিংবা স্কুলমাস্টাব, প্রফেসব প্রেসেব কম্পোজিটব, ডিসপেনসাবিব কম্পাউন্ডাব কেবানি এসবেব যে কোনো একটা কিছু হওযা এখন তাব পক্ষে খুবই সম্ভব। অসাধাবণেব চাপ তাব মাথাব ওপবে আব নেই, সে বেলওযেব প্রোপাইটাবও হতে পাবে, ডিসপেনসাবিব কম্পাউন্ডাবও হতে পাবে, এবং সব তাতেই আনন্দেব স্বাভাবিকতা পেতে পাবে।

নিখিল ভাবছিল এমন না হোক সে কেবানি হতেও বাজি আছে। সেই ভাল কোনো মার্চেন্ট অফিসে ঢুকে পড়বে সে, সাবাদিন সহজ কথা ভাববে, সোজা কাজ নিযে খাটবে, শস্তা সাধ নিযে ভোব হযে থাকবে, যাবা আলাপে বসিকতায উদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষায ব্যথায বা কল্পনায কোনোদিনও এক মহূর্তেব জন্য সাধাবণকে অপমান কববাব মত শক্তি বাখবে না, তাদেব ভিতব মিশেগুলে সে কি গভীব নিস্তব্ধ সান্ত্বনা পাবে, সে কি নিবিড় শান্তি।

পুবনো বোর্ডিঙেব ম্যানেজাবকে মাসেব পব মাস কেমন সচ্ছলভাবে টাকা চুবিযে দিতে পাববে সে, অফিসেব থেকে এস আস্তে আস্তে বিড়ি টানবে, তাব ভিতব কি আমোদ, হযত একটু আফিমেব নেশা কববে, তাব ভিতব মজা, মনে মনে গুলতানি পাকিযে আড্ডা গাড়বে, তাব ভিতব কি উল্লাস। কিংবা তাসেব আসব বসবে তাদেব সাবাবাত ধবে, তাব ভিতব কি আচ্ছন্নতা। হযত হাবামোনিযাম বাজবে, কোনো কেবানি গাইবে, হযত শস্তা সুব বড় দবিদ্র দবিদ্র কথা, কিন্তু নিখিলও তখন সেদিন দবিদ্র, সাধাবণ, তাই ত সে অমন আর্টিস্ট হযে থাকতে পাববে।

শীতেব দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।

একটা মস্ত বড় ঝাউগাছেব শাখাব পিছনে চাঁদ বোজ সন্ধ্যাব সমযই আসছে। শীত আব নেই।

চাঁদ এখনো আছে। আবো অনেক কটা দিন থাকবে। এই জ্যোৎস্নায, এই বসন্তে শবীবটাকে এত ভাল লাগে,—হৃদযটাকেও।

সোফায শুযে শুযে জানালাব কাছে জ্যোৎস্নায নিখিল যে ধীবে ধীবে চুরুট টেনে চলেছে এব চেযে অনির্বচনীয পৃথিবীতে কি আব থাকতে পাবে।

এক সময সে ভাবত একটা চমৎকাব প্রেস কিনে কোনো একটা সাহিত্যেব কাগজেব সম্পাদক হযে ছাপা কাগজ ও লেখাব চূড়ান্ত ফিনিশ সেধে জীবনটাকে যদি কাটানো যায,—বেশ হয।

এক সময নিখিল ভেবেছে কোনো একটা পাহাড় নদী ভবা পাড়াগাঁব মত জাযগায অনেকখানি মাঠ দখল কবে চাবদিকে ফুলেব বেড়া দিযে একটা নিবিবিলি বাংলো তৈবি কবে বাকি জীবনটা যদি সে ইজিচেযাবে শুযে অবিশ্রাম বই পড়ে কাটিযে দিতে পাবত? কিন্তু এখন সে সব চায না সে আব। আবাব সেই সব শব্দ সাজাবাব অসহ্য ইচ্ছা নিযে নিজেকে বিষণ্ন কবে তোলা? আবাব সেই চিন্তাব জগতে ফিবে যাওযা? আবাব ছবি দেখা? আবাব সেই ব্যথা পাওযা? না, না, সে সব সে চায না কিছু আজ আব। ঝাউযেব শাখায পিছনে চাঁদ, নীচে বাস্তাব ধোঁযা ধুলো বিবর্ণতা। এখানে সোফাব ওপবে জ্যোৎস্না, চুরুটেব গন্ধ দেযালেব ল্যান্ডাস্কেপেব ছবি...অনেক পুবনো কথা মনে হয। কিন্তু কথা ভাবতে গেলেই

ব্যথা। ব্যথার হাতে নিজেকে সে আজ ছেড়ে দেবে না তো? কোনো সহজ সাধারণ মানুষই এই সোফার ওপরে এলিয়ে এমন দামি চুরুট টেনে একই জ্যোৎস্নায় ব্যথা পেত না। পেত কি? তবে কেন নিখিল ব্যথা পেতে যায়? ব্যথা নয়, ব্যথা নয়, এমন বসন্তের বাতে চিন্তার কোনো দরকার নেই। শুধু চোখ বুজে ঝাউশাখার জ্যোৎস্নার ভিতরে নিজেকে সে একটা পাখি মনে করুক যার মাথার ভিতরে কোনোদিনও কোনো কবিতা ছিল না, তাই যার আনন্দ এত সাধারণ হতে পারল, এমন নিরুপম?

. পরের দিন ফাল্গুনের এক আকাশ রোদের ভিতর নিখিল ঘুমের থেকে উঠল। চা খাবার পর সে হোটেলের বারান্দায় পাইচারি করছিল। চারতলার একটা ঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখল একটি মেয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে একবার একটা মস্ত লেদার সুটকেশ খুলে নাড়াচাড়া করছে, একবার দেরাজের চিঠিপত্র · ছিটকে ছড়িয়ে ফেলছে। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না, পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিল নিখিল শুধু, একটা গুজরাটি শাড়ি পরেছে মেয়েটি পার্শি ফ্যাশানে, নিজে সে বাঙালি এবং দেখতে বিশেষ সুন্দর বলে বোধ হচ্ছিল না, হাত পায়ের যতটুকু নগ্নতা নিখিলের নজরে পড়ছিল তা ফরশা নয়, ময়লাই। মেয়েটির অজস্র চুলওয়ালা মাথার জমকালো খোঁপাটি দেখবার মত বটে।

মুখ সে ফেরাল।

নিখিল চিনল তাকে।

এই সেই অমিতা। নিখিলদে পাশপাশি বাড়িতে মেহেরপুরে অনেকদিন এরা ছিল, নিখিলের ছোটবেলার খেলার সাথী। মেয়েটি বরাবরই বদরাগ, জেদ ও চেহারার খানিকটা কদর্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, মেয়েটির নানারকম নিপুণতা, তীক্ষ্ণতা ও বাকচাতুরি ও অন্তঃসার সত্ত্বেও নিখিল কিছুতেই একে ভালবাসতে পারে নি, ইস্কুলে বরাবর মেয়েটি যেন নিতান্ত অবহেলায়ই ফার্স্ট হত বলে নিখিল অনেক সময়ই একে খাতির করেছে। কিন্তু কোনোদিনই ভালবাসে নি। অমিতাও না। নিখিলকে সে কোনোদিনও ভালবাসে নি। পৃথিবীতে কাউকে কোনোদিন এ মেয়েটি ভালবেসেছে কিনা সন্দেহ। অমিতার চেহারার কদর্যতা বড় হয়ে খানিকটা শুধরে ছিল। কিন্তু এখনো এর মুখের দিকে তাকিয়ে নিখিল ভাবছে অমিতা কুৎসিত বটে, কিন্তু তবুও কুৎসিত নয় যেন।

অমিতা বললে, 'তোমাকে কাল সন্ধ্যার সময়ই দেখেছি।'

নিখিল তাকে নিজের সোফায় বসিয়ে বললে, 'তাহলে এলে না কেন?'

—'কিন্তু ঝাপসার ভিতর বুঝতে পারি নি সে তুমি না অন্য কেউ।'

—'খোঁজ নিলে না কেন?

—'সারারাত তুমি দরজা বন্ধ করে ছিলে।'

তা বটে, কাল নিখিল আর বেরয় নি।

—'এখানে তুমি কী করছ নিখিল?'

নিখিল! ছেলেবেলা অমিতা তাকে নিখিলদা বলত, কলেজে উঠেও নিখিলদা বলেছে। বস্তুত নিখিল অমিতার চেয়ে বয়সেও দু-এক বছরের বড়, নিখিলের তেত্রিশ, অমিতার ত্রিশের বেশি হবে না।

তবুও সে নিখিল বলতে শিখেছে। একা এই হোটেলে মস্ত বড় একটা চমৎকার সুট দখল করে আছে? না জানি সে কোন পৃথিবীর মানুষ আজ, এই অমিতা।

অমিতা ফার্স্টক্লাশ অনার্স পেয়ে বি-এ পাশ করেছিল, এই অবদি জানে নিখিল, তারপর এই মেয়েটির কোনো খোঁজখবর পায় নি আর সে।

অমিতা বললে, 'আমি দিন তিন-চার হল এসেছি। তুমি এই হোটেলে অনেকদিন আছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী করছ? নিশ্চয় ওকালতি?'

—'কেন?'

—'বরাবরই বলতে উকিল হব, উকিল হব, অতটুকু ছোট ছেলের মুখে তা কেমন শোনাত!' অমিতা হি-হি করে হাসতে লাগল।

—'বাস্তবিক এমন কথা আমি কোনোদিন বলেছি বলে মনে পড়েছে না অমিতা।'

—'লজ্জা পাও কেন নিখিল?' অমিতা নিখিলের রুমের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, 'বিলেতে গিয়েছিলে?'

'না। বিলেত যাবার কোনো কথাও হয় নি ত কোনোদিন।'

—'কে বললে ব্যারিস্টার?'

—'বাঃ কাল সন্ধ্যার সময় হোটেলের চাপরাশি বেয়ারাকে আমি তোমার ঘর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওই রুমে কে থাকে, বললে ব্যারিস্টার শাহেব।'

নিখিল মাথা নিচু করে হাসতে লাগল।

—'ঠিক বল নিখিল, আমার কাছে মিছে কথা বলে লাভ কি?'

নিখিল সোফাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, 'ব্যারিস্টার আমি হতে পারতাম অমিতা—'

—'ফেল করেছ?'

—'পড়িই নি।'

অমিতা ভুরু কুঁচকে বললে, 'পয়সা ওড়াতে গিয়েছিলে?'

সোফার থেকে খানিকটা ধুলো ঝেড়ে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'কলেজ থেকে বেরিয়ে একটা ব্যাঙ্কে কয়েক বছর কাজ করেছিলাম মাত্র, তারপর সেই ব্যাঙ্কটা ফেল হয়ে গেল,—'এই, এইমাত্র, আর কিছু নয়।'

অমিতা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'এখন কী কর?'

—'কিছু না।'

—'একেবারে চুপচাপ বসে আছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোনো কাজ পেলে না?'

—'না।'

—'ক-বছর?'

—'তিন-চার বছর।'

অমিতা খাকিটা উৎসুক খানিকটা নরম দৃষ্টিতে নিখিলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'কিন্তু শুনেছিলাম তুমি ল পড়?'

—'হ্যাঁ, পড়ছিলাম, বিলেতে নয়, কলকাতায়।'

—'পাশ করেছিলে?'

— না, শেষ পর্যন্ত আর যাই নি, ছেড়ে দিলাম।'

দুজনেই এর পর কিছুক্ষণ চুপ।

নিখিল বললে, 'তোমার খোঁজ অনেক দিন পাই নি অমিতা, আশ্চর্য, এতদিন পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, বাস্তবিক তুমি যে আছ তাও ভুলেছিলাম। নিশ্চয়ই একা আছ।

অমিতা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই কেন নিখিল?

—'জানি তুমি একা থাকতে পছন্দ করতে।

—'জান তুমি তা?'

—'জানি বইকি।'

নিখিল ঈষৎ হেসে বললে, 'এবং বড্ড কটকটে ছিলে।'

—'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমিই অমিতা। নিজের কথা তুমি বরাবরই খুব ভাবতে। সেজন্য পৃথিবীতে তুমি নিশ্চয়ই খুব উন্নতি করেছ। কর নি কি? কিন্তু তোমার এই স্বার্থপরতার কারণও ছিল।'

অমিতা খানিকটা বিস্মিত ও খানিকটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, 'কি কারণ নিখিল?

—জানতে তোমাকে কেউ কোনোদিন ভালবাসবে না।'

অমিতা একটু আমোদ পেয়ে বললে, 'কবে থেকে এ আমি জানতাম?

—'বরাবরই জেনে এসেছ।'

অমিতা হো-হো করে হেসে বললে, 'তাই যদি মনে করে থাক নিখিল, তাহলে এক্ষুনি আমি তোমার ভুল শুধরে দিতে পারি।'

নিখিল মেয়েটির দিকে তাকাল।

—'চল, আমার সঙ্গে আমার রুমে, আমি স্টিলট্রাঙ্কের ভিতর থেকে তোমাকে এমন দুশ-তিনশ চিঠি

দেখাতে পারি, নানারকম পুরুষমানুষের কাছ থেকে এসেছে সে সব আমাকে না পেলে যাদের ভেতর অনেকে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত রাজি হয়েছে।'

—'ওঃ, চিঠিগুলো জমিয়ে রেখেছ দেখছি।'

—'রেখেছি বইকি, ওই স্টিলট্রাঙ্কটা ওই চিঠিগুলোর জন্যই।' অমিতা একটু হেসে বললে, 'জান আমি ইনসপেকটবস অব স্কুলস অথচ সাবোডিনেট ম্যান সাবোডিনেট স্টাফ-এর কাছ থেকে আমি এরকম চিঠি পেয়েছি, তোমাকে খুলে কত বলব আর নিখিল। তুমি ভাবতে পার আমার লুজ অ্যাটিটিউড, সেই জন্যই ওদের অত সাহস হয়েছে, এই চিঠিগুলো সম্ভব হয়েছে। মোটেই তা ভেব না নিখিল।....নই বটে, কিন্তু ....সম্বন্ধে ছোটবেলায় আমার যা....তুমি জানতে, এখনো ঠিক তেমনি।'

—'এখনো তুমি কাউকে ভালবাস না? না অমিতা?'

—'না।'

—'কেন?'

—'কী করে বলব?'

—'কীসের জন্য তুমি বেঁচে আছ?'

—'কাজের ভিতরে আমি সুখ পাই নিখিল।' একটু হেসে বললে, 'সকলেই ত তা পায়, পায় না নিখিল?'

নিখিল বললে, 'জানি না।' একটু পবে বললে—'কি বলছিলাম? 'জানি না' বলছিলাম অমিতা? জানি আমি, কাজ করেই সকলে সুখ পায় অমিতা।'

অমিতার সন্দিগ্ধতা কাটছিল না। সে যেন নিজেকে বুঝতে পারছে না। একটু উসখুস করে বললে, 'কিন্তু মাঝে মাঝে কাজ একঘেয়ে মনে কর না? কাজ, কাজ, শুধু কাজ?'

নিখিল ঈষৎ হেসে অমিতাব দিকে তাকাল।

অমিতা বললে, 'মাঝে মাঝে যেন হাঁফিয়ে উঠি। কাজ, কাজ, শুধু কাজ!' অমিতা বললে, 'তখন কী কবি জান?'

—'কী কব?'

—'অনেক বকম বঙ কিনেছি আব ছবি আঁকবাব কাগজ, আস্তে আস্তে তুলি বুলিযে ছবি আঁকি।'

—'ছবি?'

—'প্রাযই ল্যান্ডেস্কেপেব ছবি, চাটগাঁযেব দিকে বাড়ি কিনা, সেখানে আকাশ পাহাড় নদী সমুদ্র বন সবই এমন সুন্দর, তুমি দেখ নি নিখিল? কিন্তু তুবও অনেক ছবি এঁকে ছিঁড়ে ফেলেছি।'

—'কেন?'

—'মনে হয ঠিক হল না।'

—'কীসের সঙ্গে ঠিক অমিতা?'

—'যা দেখি যা বুঝি এত সুন্দব যে যা আঁকি সেটাকে ঢের নোংবা মনে হয শুধু শযতানি যেন! কিন্তু উপায নেই যে নিখিল, এই আজই আমকে চলে যেতে হবে, তোমার সেঙ্গ একটু ভাল করে যে কথা বলব তারও জো নেই, দু-তিন মাস ধবে এখন শুধু নদীতে নদীতে খালে বিলে ইস্টিমার নৌকায ঘুবতে হবে, এই সময়টাই বড় একঘেয়ে, নিজেকে এমন একা মনে হয...কিন্তু এই সময়ে ত আমি একা... কিন্তু এই সময়ে ছবি আঁকবাবও উপায় নেই যে।'

অমিতা হি-হি কবে হাসতে লাগল, বললে, 'ঠিক বলি নি নিখিল? তুমিও ত কবিতা লিখতে।'

অমিতা বলেছে 'যা দেখি, যা বুঝি তা এত সুন্দর'—নিখিল জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখ তুমি অমিতা?'

—'বললামই ত ল্যান্ডস্কেপ।'

—'ল্যান্ডস্কেপ শুধু?'

—'এর চেয়ে বেশি কিছু ভাল কবে বশে আনতে পারি না।'

—'কেন?'

—'বুঝি না ভাল করে, তবুও আবো নানারকম ছবি আঁকতে ইচ্ছা করে। কাল রাতে দেখলাম ঝাউগাছের পিছনে চাঁদ, জানালার কাছে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, জ্যোৎস্নয়, বসন্তের হাওয়া দিচ্ছিল নিখিল, সেই যে আমাদের ছোটবেলার মাঠঘাটে যে বাতাস, ঠিক তেমনই যেন, তুমি বুঝতে যদি নিখিল, ঢের পুরনো কথা মনে হল।'—বলতে বলতে অমিতার চোখ জলে ভিজে উঠল।

মহিষের শিং

গরমের দুপুর।

শোভনাদের বাংলোর চারদিকে হকি টেনিস ক্রিকেট গ্রাউন্ডের প্রকাণ্ড অবাধ সবুজ মাঠখানা যে নীল আকাশে গিয়ে মিশেছে—মানুষের চোখকে নরম করে দেয—তার হৃদকে। মাঠেব পিছনে খ্রিস্টানদের গোরস্থান।

মাঠে বাংলোয় কি একটি নির্জনতা—কেমন গভীর আস্বাদ। কবরগুলো বড় উঁচু উঁচু শাল ঝাউ লিচু বকুল গাছ মাঠের ইতস্তত—মাঠের ইতস্তত দেশী বিলিতি কিছু ফুল।

ইস্কুল আজ ঢের আগে ছুটি হয়ে গেছে। ইস্কুল থেকে শোভনাদের বাড়ি অবদি এতটা পথ চড়া খাড়া রোদ মাথায় নিয়ে চারু হেঁটে চলেছে। একা।

তিন চারটা বকুলগাছ যেখানে সমস্ত বাংলোটাকে আড়াল করে রেখেছে সেখানে এসে চারু দাঁড়াল। তারপরেই বাবলার বেড়া-সমস্ত মাঠ ঘিরে।

চারু দাঁড়াল, যে জন্য সে এসেছিল তা আজ আর হবে না। বাংলোর সিঁড়ির পাশে ঝাউযের ছাযায আট দশটা সাইকেল কাত হয়ে শুযে আছে, চারু সরে যাচ্ছিল; কিন্তু ছেলেরা তাকে দেখতে পেযেছে। কাজেই ইস্কুলের ছেলেদের সাথে—সেও ইস্কুলের ছেলে। দিনটা আজ তার যে রকমভাবে শেষ হবে তা সে চায় নি, আজ অন্তত নয়।

চারুর বিরক্তি বোধ হচ্ছিল, লজ্জা করছিল, কিন্তু এদের মুখ থেকে ফিরে যাবাব মত সাহস তাব বুকের ভেতর থেকে সব যেন শুকিয়ে গেছে।

শোভনা ও মেয়েরা লিচুগাছের ছায়ায কযেকটা চেযার ছড়িয়ে বসেছে। এত ছেলেমেয়ে, শোভনাকে কতদিন চারু একা পায নি। সে যে কত কত কতদিন! চারু মনে মনে ভেবে দেখল সে প্রায দু-তিন বছর হবে। কিন্তু দু-তিন বছর আগে শোভনাকে সে মোটেই ভালবাসত না, আজ যখন তাকেই শুধু ভালবাসে তাকে মোটেই কাছে পায না। কিন্তু আশ্চর্য এই দু-তিন বছব আগেই শোভনা যেন চারুকে ভালবাসত, এই মেযেটাকে যখন ঘৃণা করত সে, এর মুখ, হাত পা ইজের ফ্রক কি অসহ্য ছিল চারুব কাছে তা। কি রকম অদ্ভুত অপ্রযোজনীয় মনে হত মেযেটাকে। শোভনা আজ কত বাড় বেড়ে গেছে, আজ সে এক বিস্ময, এক বিস্ময সে। মেযেটা আজ জাম রঙেব শাড়ি পরে লিচুগাছের নীচে বসেছে।

রোদে ছাযায কোকিলের গানে, আমের বোলের গন্ধে জীবনকে সে শুধু ভোগ করছে। জীবনকে এরা সকলেই পাচ্ছে- এই ছেলেরা, এই মেয়েরা।

চারুই যদি এদের ভেতর একজন হতে পারত, এমনই ঝাউযেব ছাযায সাইকেল কাত করে তার গদির উপব মাথা রেখে-রূপ কী তা না খুঁজতে গিয়ে ভালবাসা কী না বুঝতে গিয়ে হকি ও ক্রিকেটের আমেজে দুপুরের রোদ ছায়া কুঁড়েমি বাবলা ফুলের গন্ধে ডুবে থেকে, শিস দিয়ে এদের মত জীবন যদি পাওয়া যেত, এই ইস্কুলের ছেলেদেব মত। কিন্তু সে কারু মতই নয।

সাইকেলেব গদির উপর বকুলগাছের দিকে তাকাতে তার ব্যথা লাগে।

এই দুপুর, এমন ছায়া নরম কেন যেন কঠিন হয়ে ওঠে। বিঁধতে থাকে তাকে। রণজিৎ শোভনার ভাই বললে, 'চারু তুমি এখনো সাইকেল চড়তে শিখলে না?' রণজিৎ যেন এই দুপুরের রোদের চেয়ে ঢের বেশি চড়চড়ে, তেমনি কষ্টের কথা বলছে, মানুষকে আঘাত দিতে চাচ্ছে।

শোভনা লিচুগাছের নীচের থেকে ডাক পেড়ে বললে, 'সাইকেল? কে শেখে নি দাদা?'

শোভনার এই ছেলেমানুষি, কিন্তু তবুও ওর মুখের দিকে তাকানো আর নয। ঘাসের উপর ঘাড়টা ঘষড়ে মুড়ে নিয়ে চারু বকুলগাছের নরম ডালপাার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু এ ভালবাসা নরম নয় যেন। বড় কঠিন। গাছেব ওপরে আকাশ। আকাশে অনেক চিল। এ ছেলেরা সে সবের দিকে তাকায না, সে সবের কতদূর কত কি পরিণতির কথা এরা ভাবে না, কিন্তু তা কত সুন্দর...কিন্তু তবুও সুন্দর কি? যেন কেমন কঠিন-কঠিন সব। অন্তত এই জায়গায়, অন্তত আজ-এখন।

রণজিৎ শোভনার কথার জবাব দিয়েছে-কে সাইকেল চড়তে শেখে নি আজও, বোনকে বলে

দিযেছে তা।

শোভনা আগ্রহেব সঙ্গে শুনেছে; তাবপব কি কবেছে কি জানে। চারু ওব মুখেব দিকে অনেকক্ষণ ধবে তাকায নি।

সাইকেল? সাইকেল চড়া সে শিখতে পাবে। সে জানে তা। কিন্তু তবুও সাইকেল শিখলেও, মোটব ড্রাইভ কবতে পাবলেও, এবোপ্লেনেব পাইলট হলেও এদেব মত সে হতে পাববে না। এদেব চেযে সে আলাদা।

আলাদা নয? যদি চারু বুঝতে পাবত সাইকেল চালিযে বাস্তা দিযে মাইলকে মাইল প্যাডেল কবে ওদেব মত সুখ সে পাবে, তবে কবে শিখে ফেলত সাইকেল সে।

কিন্তু সাইকেল চড়ে কি সুখ?

ব্যাট পিটিযেই বা কি আমোদ?

বইযেব পড়া মুখস্থ কবে, এগজামিনে খুব খানিকটা বা কি আনন্দ? আনন্দ, আমোদ, সুখ এসব কোনো কিছুব ভেতবে নেই; পাচ্ছে না সে। তাব চেযে ধানেব খেতেব পাশেব বাস্তা দিযে বেড়িযে অনেক কথা ভাববাব আছে-সন্ধ্যায, একা।

কেমন একটা বিষণ্ণতা মনেব ভেতব জেগে ওঠে। তখন তাব ভেতবেই ববং খানিকটা টিকে থাকবাব মত খোবাক আছ। তখন খেতেব পাশে এক জাযগায বাস যায, মেঘগুলোব দিকে একবাব তাকনো যায-সন্ধ্যায দাঁড়কাকগুলো মাথাব উপব দিযে উড়ে বনেব ভিতব চলে যায তাদেব মিষ্টি লাগে। খেতে ধান নেই, খড় আছে। হলদে খড়, সোনালি খড়, মানুষ তা কেটে নিযে বড় বড় বোঝা মাথায কবে চলে যাচ্ছে, সেই সব বড় বড় সোনালি, হলদে খড়েব বোঝাগুলো যতদূব দেখা যায, এই সব দেখতে ভাল লাগে।

কিন্তু ছেলেবা হইচই কবে কথা বলছিল। কে কি বকম সাইকেল চালাতে পাবে-দু-হাত ছেড়ে দিযে, কিংবা বোঁ বোঁ কবে ঘুবে-ঘুবে, সার্কাসেব খেলোযাড়েব সাইকেলেব কসবতেব কথা হচ্ছিল।

তাবপব বণজিৎ বললে, 'চারু, তোমাকে সাইকেল শিখিযে দেব।'

কিন্তু চারু নিজেই শিখবে, আজ বাড়ি ফিবেই। জ্যোৎস্না বাত আছে। তাদেব বাড়িব পাশে একা মাঠে সে নিজেই শিখবে। তাবপব একদিন দু-হাত ছেড়ে দিযে বাঁই বাঁই কবে প্যাডেল কবতে কবতে শোভনাদেব কম্পাউন্ডে এসে হাজিব হবে-জ্যোৎস্নায।

চারু ভাবছিল, একটু আমোদ পাবে তাতে হযত। বণজিৎ হযত একটু পিঠ চাপড়াবে। কিন্তু তবুও, সাইকেল চারু কোনোদিনও শিখতে চাইবে না। ঘন্টাব পব ঘন্টা বসে এই জানোযাবকে ববদাস্ত কবা' কেন? কীসেব জন্য?

ধানেব খেতেব পাশ দিযে সন্ধ্যাব সময একা একা হেঁটেই কি যথেষ্ট আনন্দ পাওযা যায না? ব্যতিব্যস্ত সাইকেল সেখানে কি গভীব অপ্রযোজনীয।

এমনি কবে ভাবছিল চারু।

শোভনা জীবনকে অন্যভাবে দেখছিল,—'মেযেবা ছেলেবা, শোভনা।

ছেলেবা আজ একটা ক্রিকেট ম্যাচেব জন্য বণজিৎদেব কম্পাউন্ড দখল কবে বসেছিল।

খেলা শুরু হল। বণজিৎকেও নেযা হল।

প্রথমেই সে ব্যাট ধবল। ব্যাট ধবে শোভনাব দিকে একবাব তাকাল। জীবনে এই তাব মুহূর্ত। কে জানে এমন মুহূর্ত কবে ফিবে আসে আবাব? বণজিৎ কেমন পিটনেওযালা শোভনা তা জানে না, কাজেই সে গম্ভীব হযে তাকাচ্ছে, মেযেবা এইবকম,-পুবস্কাবেব উপযুক্ত হও। তাবা উপেক্ষা কববে না। কিন্তু তাদেব হৃদযে কোন জিনিস যে তিবস্কাবেব মত আসে-কোন জিনিস যে পুবস্কাবেব মত'

চারু সেঁটে পিটিযেছে, বলটা যেন আকাশে উঠেছিল গিযে-কিন্তু টিপ কবে সুধীনেব হাতেব ভিতব এসে পড়ল।

ব্যাটটা বেখে দিযে চারু আব কোনোদিকে তাকাল না। মাথা নিচু কবে ফিল্ডেব থেকে বেবিযে যেতে যেতে চারুব মনে হল সে নিশ্চযই জানে কেউই তাব দিকে তাকাচ্ছে না।

পবেশ নেমেছে। জোব পিটোচ্ছে। শোভনা হযত তাব দিকেই তাকিযে আছে।

ফিল্ডেব চারুব এখন কোনো দবকাব নেই।

হাঁটতে হাঁটতে সে মেযেদেব দিকে লিচুগাছেব সাবিব কাছে এসে দাঁড়াল। বোদ সেখানে ঝাঁঝাঁ কবছিল।

চারু ভাবছিল, শোভনা হযত তাকে ছাযায ডাকবে, তাব কাছে, তিন বছব আগে হলে হযত ডাকত সে, কিন্তু আজ সে দাঁড়িযে আছে, দাঁড়িযে আছে মাত্র, সে যে দাঁড়িযে আছে তাও কেউ জানে না। ক্রিকেট পোস্টেব থেকে এতটা দূব সে যে কেমন আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছে, ছবিব তুলিব মত নড়তে

নড়তে একটা ধীর সহিষ্ণু নরম ছবি ফেলে এসেছে সে যে রোদে রোদে ছায়ায় ছায়ায় একটা চোখও এক মুহূর্তের জন্যও সেদিকে আজ তাকায় নি। কি অবহেলা-কি দারুণ অবহেলা এই পৃথিবীর।

চারু সরে যেতে যেতে কোনোদিকে তাকাল না আর।

লিচুর সারি পেরিয়ে বকুলের দিকে তারপর বাবলার বেড়া ছাড়িয়ে রাস্তার উপর গিয়ে উঠল সে।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল।

ফিল্ডিঙের সময় হয়ত তার খোঁজ পড়তে পারে, এমন করে চলে যাওয়া কি তার উচিত?

চারু এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাবল। কিন্তু মাঠে ছেলের অভাব নেই, তার জায়গায় অন্য কেউ ফিল্ডিং করবে। আগ্রহের সঙ্গে করবে, উৎসাহের সঙ্গে, তার চেয়ে ঢের ভাল করে করবে।

বিকেল হয়ে আসছে। ক্ষেতে ধান নেই, ক্ষেতের পথের পাশ দিয়ে নদীর ধারে একটা জাম গাছের নীচে গিয়ে বসছে চারু, নদী অনেকটা দূরে। হাওয়ায় জলের গন্ধ, ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিন নরম হয়ে আসছে। সূর্যের দিকে তাকানো যায়-কি এক গম্ভীর সুন্দর সোনার বল। সূর্যের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে এক নিবিড় রগড়ে চারুর মন ভরে উঠছে। একটা মস্ত বড় ডিম ভেঙে গেছে যেন, তার হলদে কাঁচা কুসুম যেন মেঘের থেকে, মেঘের নীচে ফসকে যাচ্ছে। কিন্তু এই তামাসাটা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়—সূর্য নেই। রঙ আছে শুধু। আকাশে নদীতে মাঠে খড়ে-কেমন একটা লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলেব আভার মত রঙ। গাছের ডালপালা আকাশ বাতাসের রঙের ভিতর সেই মুখে অবিরাম নড়ছে। যেন কালো পাথরের ভিতর থেকে কাটা ডালপালা সব। অশথ, হিজল, জাম, শিমুলের এই ডালপালা পাতাগুলো।

ডালপালার ওপরে, মেঘের গায মুখে, পাখিব ডানা পালক-কালো, কালো না নীল? বেগুনি? হোলিওট্রোপ?

সূর্যের চেয়ে আরো বড়, আরো গোল যেন ওই চাঁদ। বাতাস যেন কার আঁচল, কার হাত যেন পৃথিবীর বেগুনি নীল ডালপালা পাতা নিয়ে চাঁদের মুখের ওপর ঝাড়নের মত ঘা দিচ্ছে-মিষ্টি আঘাত, নরম হাত, কাব হাত, আহা! চাঁদ যেন উচ্ছল হয়ে উঠছে তাই, জ্যোৎস্না কেমন রূপালি। ডালপালা আবো নীল, আরো বেগুনি হয়ে উঠছে।

অনেক বাত অবধি চারু দেখছে।

তারপর এক সময মনে হচ্ছে যে আকাশ বাতাস খেত নদী ডালপালা চাঁদ এই সমস্ত নিযে একটা পাখির মত সে উড়ে চলেছে। উড়ে চলেছে, কোন এক জায়গায।

পবদনি চারু একটা চিঠি পেল-মেয়েলি হাতে লেখা। বুক দুরদুর কবে উঠছিল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। শোভনা নয, তার দিদি রাণী লিখেছে।

চিঠিখানা আস্তে আস্তে ছিঁড়ে ফেলল চারু।

রাণী চারুকে আজ সন্ধ্যার সময যেতে বলেছে।

তিনবছর্র আগে বাণীকেই ভালবাসত চারু। শোভনাকে নয। তিনবছব আগে, দু'বছব আগে, গতবছবও রাণীর কথা মনে হযেছে। কিন্তু আজ রাণী কেউ নয, কিছু নয। হায, যদি তাকে একটা কিছু তৈরি করে ফেলত পাবা যেত, মানুষের এই অদ্ভুত জীবন যা মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে গিয়ে মানুষকে ঠকাচ্ছে, পালটে সেটাকে ঠকানো যেত তাহলে। আজ যদি চারুব কাছে রানী কিছু হত, তাহলে ভালবেসে যে গভীরতা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা পেযে যে লঘুতা, আমোদ উচ্ছ্বাস চারু তা বুঝত।

হয়ত তা বুঝে বিশেষ লাভ নেই।

কিংবা লাভ আছে কিনা চারু তা বুঝবে না। আজও ইস্কুলের ছেলে সে। ভালবাসা পাওয়া এখনো তার কাছে রঙিন বলের মত যেন, শোভনার ভালবাসা যদি সে পায।

কিন্তু চারুর আজই যেন মনে হচ্ছে যে যখন শোভনার ভালবাসারও বিশেষ কোনো প্রযোজন বোধ করবে না সে, তখন হয়ত শোভনা এমনি একখানা চিঠি লিখবে তাকে-তার এক মুহূর্ত আগেও নয।

এমনই যদি জীবনের ব্যবস্থা হয, মানুষ তাহলে কী করতে পারে? কিন্তু মানুষকে নিয়ে সে ব্যস্ত নয, মানুষকে নিয়ে সে ব্যস্ত কি? রণজিৎ সুধীন পরেশ গুপীনাথের মতন মানুষকে নিযে? আহা, না না, এরা চারুর চেযে একেবারেই আলাদা জাতের লোক, এদের ভেতর এখনো কেউ মেয়েমানুষকে ভালবাসে না-এরা সৌন্দর্যকে অগ্রাহ্য করে, এরা ব্যাট পিটেযে সুখ পায়-ইস্কুলে ইস্কুলে ম্যাচের ব্যবস্থা করে, কাল সারাদিন বসে এরা ইস্কুলের ক্লাসে ক্লাসে ক্রিকেটের খেলোয়াড় বেছেছে; আজ একটা জমকালো ম্যাচ হবে। এই এদের জীবনের সব। ম্যাচ শেষ হয়ে গেলে এরা একটু বিষন্ন হবে বটে-কিন্তু কালই একটা নতুন কাজ বের করবে-হযত টেনিস গ্রাউন্ড তৈরি করবে।

তারপর এরাও একদনি মেয়েমানুষকে ভালবাসবে। সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবে। হয়ত বিচ্ছেদের কষ্ট পাবে। কিন্তু তবুও এদের সুখ আনন্দ ব্যথা চারুর মত নয়।

চারুর চেয়ে এরা ঢের সহজ, এরা গভীরভাবে বিশ্বাস করতে পারে। প্রাণের সমস্ত ধার দিয়ে ঘৃণা করতে পার, এরা চিৎকার করে কথা বলতে পারে, চেঁচিয়ে হাসতে পার, জীবনের কোথাও কোনো খটকা নেই যেন, দুই মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার কোনো দরকার নেই। এরা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত যেন, অজস্র মহিষের শিং নিয়ে তীরের দিকে ছুটে আসছে কেন? একটা পাথরকে, পাথরকে-তীরকে আঘাত করতে হবে, তারপর ফিরে যেতে হবে, আবার ফিরে এসে আঘাত করতে হবে, এই নিয়ে আনন্দ ব্যাকুলতা, কেন এমনই কি? আঘাত করতে হবে, ফিরে যেতে হবে, অজস্র মহিষের শিঙের মত ছুটে আসা, ছুটে যাওয়া?

তবুও সমুদ্রের ঢেউ, আজ মহিষের মত ছুটে এসে, ছুটে পালিয়েই সে আস্বাদ পায়। কিন্তু তা নয়। মানুষ অন্য সবারই মত, ধানের ফসল, পাখি, ঘাস, পৃথিবীর মানুষ এদেরই মত, সে কাজ করে, জোরে হাসে, চেঁচিয়ে ফুর্তি করে, সব সময়ই সে দেখায় সৃষ্টির কোনো জিনিসের থেকেই সে আলাদা নয়, ঘাসের সবুজ পুরস্কার তাই সে পায়, ধানের মেলার পুরস্কার। কিন্তু একজন তা পায় না। সেই একাকী লোক জীবনের ভিতর নামতে পারে না। হায়, যদি সে পারত। কিন্তু লক্ষ মহিষের শিং কোন এক বিরাট জালের অজস্র কাঁটার মত একবার আকাশ বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে-আবার গুটিয়ে আসছে-আবার ছড়িয়ে পড়ছে। এর বিরাট তামাসায় সে মর্মাহত হয়ে পড়ে, যদিও সে জানে, এ মর্মান্তিক তামাসাই শুধু নয় কাঁটার কাছে এ প্রযোজনীয়-মহিষেব শিংগুলোর কাছে, মানুষের কাছে।

কিন্তু তবুও এদেব ভিতবে সে নেই।

নিজেব এই অপরূপ পার্থক্য এত অল্প বয়সেই চারু টেব পেয়েছে। নিজেকে কবি বলে বুঝেছে সে।

হযত পৃথিবীর যারা কবি তাদেব সঙ্গে দুদণ্ড গিযে মিশতে পারবে একদিন সে। কিন্তু তাও হযত সম্ভব নয়, এক হল ভরা কবি-মজলিশি বা জুযাড়ি মানুষ নয়, কবি, তারা সেঁটে চিৎকার করে না-এক হলের থেকে অনেক হলে ছড়িযে পড়ে, তারপর কাউকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায না।

জীবনে সে একা নেমেছে। একাই তাকে চলতে হবে, গাল খেযে, দুর্বোধ্য হয়ে, কোনো পুরস্কার না পেযে, সহজ জীবনের জন্য হাঁপিযে উঠে, তবু তাকে সহজেব বাইরে থাকতে হবে।

বাণী বললে, 'শোভনা?'

চারু বললে, 'হ্যাঁ, কোথায সে?'

—'তারা কেউ নেই।'

—'কোথায গেছে?'

—'নেমন্তন্ন খেতে, আজ দীনেশবাবু ইঞ্জিনিযারের মেযের বিযে।'

—'ফিবতে রাত হবে?'

—'খুব।'

—'তুমি গেলে না যে?'

—'মাথা একটু ধবেছে।'

মাথা ধরেছে। শরীরও কালো, রোগা সেই জন্যেই হযত চারুকে ভাল লাগে, শরীর কালো বোগা, হযত ছিপছিপে, লম্বা, চোখ দু'টো ভাসা ভাসা, মাঝে মাঝে কেমন একটা আবেশ আসে যেন তাতে; চারুর কবিতাকে এ যেন ববং বুঝলেও বুঝতে পারে। শোভনাব চোখের ভেতর আযেস রযেছে, কোনো আযেস নেই ত, তা কেমন উজ্জ্বল, কেমন অনেকদূর ছুটে যায, যেন দুবন্ত হবিণ ছুটে চলেছে, কিংবা হরিণের পিঠে আবো দুরন্ততব চিতা, তা কেমন দৃঢ়, সুস্থ কেমন সুন্দব-অথচ কেমন পরিমেয, কেমন সহজ। চারুর কবিতাকে তাই শোভনা অগ্রাহ্য কবে। তার ব্যাটের দিকে তাকিয়েছিল মেযেটি, সাইকেল চড়তে জানে কিনা জানতে চেযেছিল।

আজ সে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছে। তার মাথা ধরে নি। চারুকে চিঠি দিযে দিযে জ্যোৎস্নার রাত খানিকটা একা কাটাবাব মাথাব্যথা পড়ে নি শোভনাব। এসব মেয়েরা খবব দেয না, অপেক্ষা করে না, এদের খবর দিতে হয, এদের জন্যে লোককে অপেক্ষা করতে হয়-পৃথিবীর শোভনাদের জন্য। এরা চিঠি লেখে না, এরা চিঠি পায শুধু, তারপর ছিঁড়ে ফেলে। এরা চিঠি লেখে না, কিংবা খুব সেন্ট মাখানো নোট পেপারে অনেক ভুল বানান করে-একটা একস্‌কার্শনের খবর দিযে।

তবুও এরা মিষ্টি, পৃথিবীর শোভনারা, শুধু এরা-এরাই মাত্র। এদের সৌন্দর্যের জন্যই শুধু নয়, কিন্তু এরা এত সহজ নয যে, এবা ঘাসেব মত সবুজ, আকাশের মত নীল, এরা ধানের মত সমস্ত সোনায

সোনায় এমন নিপুণ। এরা জোরে হাঁটে, জোরে হাসে, পুরুষ সাইকেল নিয়ে কিরকম চিলের মত ছুটে যায়, কিংবা মোটর কিরকম উড়িয়ে নিয়ে যায় এরা তাই দেখে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়।

আজ নিশ্চয়ই বিয়ে বাড়িতে শোভনা সবচেয়ে বেশি সহজ, সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল, সবচেয়ে বেশি ফুর্তিবাজ-সবচেয়ে বেশি-মেয়েটির জীবন ফুলে উঠছে-তারপর একদিন গোলাব ভিতরে চাষাকে শান্তির স্বপ্ন দেবে, শান্তির স্বপ্ন শুধু।

বাণী অনেকটা চারুর মতই, পিছে রয়ে গেছে সে। উৎসব তার ভাল লাগল না। মাথা ধরল। চোখ গভীর হয়ে উঠল। সে ধীরতা ও নিস্তব্ধতার মানে জানে, বাংলোর বারান্দায়, যেখানে জ্যোৎস্না একরাশ কেউড় বাঁশ বাদাম নিম সজনের ডালপালা পাতার ছায়া এনে চুপ করে গুছিয়ে রেখেছে, সেখানে সে বসেছিল-চারু গিয়ে যখন দেখল তাকে আজ। চারু যদি আজ না আসত? তাহলে এমনি করে সারারাত একা বসে থাকতে পারত বাণী,-সে একা বসে থাকতে জানে, সমস্ত জীবনটা ধরেও যদি দরকার হয়।

যারা বসে থাকে, তারা কথা ভাবে, যারা কথা ভাবে, তারা আলাদা হয়ে যায়, কিংবা যারা আলাদা তারা কথা ভাবতে ভালবাসে, বাণীর মতন এমন এক কিনারে বসে থেকে।

—'তাই নয়, বাণী?'

বাণী বললে, 'অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম চারু, প্রায় দু'বছর পর আমাদের বাড়ি এসেছিলে।'

—'ও, সেদিন ক্রিকেটের সময়, তুমি ছিলে?'

—'আমাকে দেখ নি?'

—'তুমি নিশ্চয়ই বাইরে আস নি।'

—'না, ঠিক এই জায়গায় বসেছিলাম।'

—'ঠিক এই জায়গায়? তাহলে কী করে দেখব বল?' চারু একটু থেকে বললে, 'আমি বরাবর যে পজিশনে ছিলাম,—অনেক পজিশনেই গিয়েছি বটে—এই ঝাউগাছগুলো তোমাকে আড়াল করে রেখেছিল।' চারু বললে, 'তুমি বাইরে এলে না কেন? হয়ত বড় হয়েছ, না?'

ঝাউগাছের ডালপালা জ্যোৎস্নায় নড়ছিল বাংলোর বারান্দার ওপর—সেখানে—মেয়েটির মুখে।

চাঁদ আরো একটু এগিয়ে এসেছে। বাণীর মুখের থেকে ছায়া আর একটু সরে যাচ্ছে। মুখ, এই মুখ, মন্দ না, ফরশা নয় বরং কখনো, ঠোঁটদু'টো এমন কাটা কাটা, ঠোঁট সরু, চোখ আর নাক, যেন অত্যন্ত নিখুঁত কঠিন হাত নিজে এসে-তিনটে চারটে জিনিস গড়ে দিয়েছিল, এ মুখ দেখে অতএব কোনো লালসা জাগে না, যারা একে ভালবাসবে, চারু ধারণা করতে পারছে, শেষ দিন পর্যন্ত এই মুখের চমকে তারা আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। পৃথিবীর আর কোনো মুখ দেখতে চাইবে না আর তারা। কিন্তু যারা একে ভালবাসতে পারবে না, অদ্ভুত প্রেম হয়ত তাদের ঠকাল, তবুও এর মুখ দেখে তারা কামনায় আরক্ত হয়ে উঠবে না।

বাণীর মুখাবয়ব এমনই।

কিন্তু তবুও চারু তাকে ভালবাসতে পারছে না।

বাণী বললে, 'আমাকে দেখ নি শুধু নয়, আমি যে আছি তাও হয়ত ভুলে গিয়েছিলে।'

বাণী মিছে কথা বলে নি। গত বছর একবার এই মেয়েটির কথা মনে হয়েছিল শুধু। মনে হয়েছিল জীবনে এমন ভালবাসা যেন এত তাড়াতাড়ি মরে গেল, সেই থেকে ভালবাসার ওপর সন্দেহ হয়ে আসছে, ভালবাসার অস্থিরতাই ঠিক, মানুষের মনের প্রগাঢ় বিশ্বাসঘাতকতাই ঠিক। এই এক বছরের ভেতর একবারও বাণীর কথা মনে হয় নি। সেদিন তাদের বাড়িতে খেলতে এসেও, কোনো একটি মেয়ে কেমন করে হঠাৎ সরে গেল ভেবেও একবারও চমকে ওঠে নি যদিও আরো অজস্র কারণে-অজস্রবার তাকে চমকাতে হয়েছে,-হায়!

এমনি করেই পৃথিবীর বড় বড় লেখকদের, কবিদেরও মানুষ ভুলে যায়, তারা যখন তাদের কাজ শেষ করে চলে গেছে তখন তাদের মৃত বলে মনে করে না; যেন তারা কোনোদিন জন্মায় নি।

বাণী সেদিনকার ক্রিকেটের কথা কিছু বললে না, সাইকেলের কথা কিছু বললে না, রণজিৎ বা শোভনার সম্বন্ধে কোনো কথাই বললে না সে। যেন এই সমস্ত জিনিস, এই সমস্ত লোকের চেয়ে সে কত পৃথক। সে কত আরো পৃথিবীর মানুষ।

তা জানে চারু, বাণীকে জানে।

নিজের কবির বিবেক মেয়েটিকেই ঢের উপযুক্ত মনে করে। কিন্তু তবুও একে ভালবাসতে পারছে না সে।

তার অনেক কবিতা ছিঁড়ে ফেলে রণজিৎ বা সুধীনের মত হতে পারত যদি চারু-সারাদিন ধরে ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে খেলোয়াড় বাছবার মতি যদি থাকত তার, ইস্কুলে ইস্কুলে ম্যাচের ব্যবস্থা করে সপ্তার

পব সপ্তা ফূর্তিতে কাটিযে দিতে পাবত যদি সে-যদি সে ওদেব মত ভ্রূক্ষেপ না কবে মাছেব মাংস কাটতে পাবত, দশ সেব, কুড়ি সেব, যেন দশ মণ, চিৎকাব কবে সেই মাংস খেতে পাবত যদি চারু, তাবপব একটা ফুটবল ম্যাচ খেলে তা হজম কবে ফেলতে পাবত যদি সে। তাহলে কী হত যেন?

তাহলে শোভনাকে হযত দখল কবতে পাবত সে। অন্তত ভালবেসে। জটিলতাব ভিতব বুঝতে চাইত না। না ভালবেসে বাণীকে নিযেও লালসায আবক্ত হযে উঠতে পাবত। ঘাসেব মত সহজ সবুজ হতে পাবত তাহলে সে, আকাশেব মত নীল হযে উঠতে পাবত। ঘাসেব মত সহজ সবুজ হতে পাবত তাহলে সে, আকাশেব মত নীল হযে উঠতে পাবত। কাবণ লালসা সহজ, যে ভালবাসাব ভিতব বীজ ও ফসলেব কথাই তাও সহজ, শোভনাব দিকে যখন চারুব মন ঝুঁকে পড়ে ক্রমশ একটা স্বাভাবিক অনুভূতি বোধ কবে সে।

কিন্তু তবুও প্রেম সহজ নয। জীবনেব সব বকম স্বাভাবিকতাব চেযে চারুও ঢেব দূবে-বাণীও...

বাণী বললে, 'তোমাব কবিতা এক সময আমাকে দেখাতে।'

চারু বললে, 'আজও এনেছি, বাস্তবিক এই দু'বছব ধবে কিছু কিছু লিখেছি; কিন্তু অনেক সময ভাবতাম কাকে আমাব লেখা দেখাই, না দেখিযে কি পাবা যায বানী?'

বাণী দু-চিলতি কাগজ তুলে নিলে। নিযে আস্তে আস্তে ভাঁজ কবে ব্লাউজেব ভেতব বেখে দিলে। মেযেবা ঢেব গোপনীয জিনিস, হযত অনেক নিকট জিনিস ওইখানে বাখে, ব্লাউজেব ভেতব, বুকেব কাছে, চারু মাঝে মাঝে দেখেছে।

কিন্তু তাব কবিতা যখন লিখেছিল একবাবও কি ভেবেছিল চারু যে, এই কাগজগুলো কোনো সম্পাদকেব টেবিলে কোনোদিন গিযে পৌছবে না আব, একটি মেযেব ব্লাউজেব ভিতবেই আটকে থাকবে। আহা'

মন নবম হযে উঠে। আবো নবম হয। আবো নবম হয। ঝাউযেব ছাযা বাণীব মুখেব থেকে সবে যাচ্ছে। তাকে সুন্দব মনে হয, সুন্দব নয কি সে? মানুষ বলে এক ভালবাসা একবাব মবে গেলে আব জীযায না। জীযায না? চারু ঢেব ছেলেমানুষ এখনো। ভাবে বাণীকে সে ভালবাসত একদিন, কিন্তু এখন আব ভালবাসে না, বড় বড় কবিদেব বইযেব পতাব থেকে পড়ে ভালবাসা একবাব মবে গেলে জীযায না আব, তাই বিশ্বাস কবে। ভাবে এখন শোভনাকে ভালবাসে সে। তা বাসে হযত। কিন্তু কে জানে জীবন কতদিন পবে কতদিক দিযে ঘুবে ঘুবে আবাব এই বাণীকেই ফিবে ভালবাসতে আসবে।

তখন হৃদয পেকে গেছে, তখন পেকেছে আঘ্রাণ আস্বাদ হলুদ হবিৎবর্ণ ধবল, তখন অভিজ্ঞতা অনেক, তখন চিন্তা ঢেব প্রগাঢ়। এই মেযেটিব চেযে উপযুক্ত জিনিস পৃথিবীতে কোথায আব পাবে সে তখন? তখন শোভনা একটা সাটা পবচাব খেমনাব মত যেন-এক পযসাব এক পটকা বেলুন-গোলাপি বেগুনি কত আযোজন, কত আড়ম্বব বাঙা নীল কত বঙ তাব। কিন্তু তবুও কি যেন সতর্কতাব বাইবে একটুও অসাবধান পবিমাণেব বাইবে একটু অপবিমেয ফুঁযেই কেমন গ্যাস-গ্যাস মাত্র। আব কিছু নয। তাই নয কি?

কিন্তু তবুও সেদিন এখনো আসে নি।

চারু এখনো ইস্কুলেব ছেলে। বাণী তাব কবিতা পড়বে, পড়ে এই মেযেটি অন্তত-কিছু বুঝবে এই অনুভূতিব চেযে বাণীব কাছ থেকে আবো ঢেব বেশি কিছু পেতে পাবে চারু, কিন্তু চায না সে তা।

এই মেযেটিকে বাস্তবিক, এখন আব সে ভালবাসে না।

কযেকটি মিনিট চলে যাচ্ছে।

দু'জনেই চুপ।

কবিতাগুলোব কোনো কপি নেই। বাণীও আব ফিবিযে দেবে না হযত। এই কবিতাগুলো মেযেটি পুষে বাখবে? কিন্তু তাতে সাহিত্যেব কি লাভ হল? চারু সাহিত্যকে কিছু দিতে এসেছে।

আজ নয, একদিন তবুও সে বুঝবে যে, এ কবিতাগুলো সাহিত্য হয নি। এবপব আবো অনেক কবিতা, আবো অনেক লেখা নষ্ট হযে যাবাব পবও আবো ঢেব নষ্ট কবতে হবেই তাকে, তখন সে বুঝবে যে জীবনেব প্রথম লেখাগুলো যেমন জাযগায বযেছে, জীবনেব সব লেখাগুলোও তেমনি এক জাযগায বাখতে পবত যদি' তখন সাহিত্যেব কোনো অর্থ নেই, প্রশংসা নয, রূপ আবিষ্কাব বা সাহিত্যেব কোনো অর্থ নাই তখন।

বিস্ময়

সুবোধের উপন্যাসখানা কোনো সম্পাদকই নিল না। পাণ্ডুলিপি ওভারকোর্টের পকেটে ফেলে দিয়ে লম্বা ছিপছিপে মানুষটি (যুবকটি) রাস্তার থেকে রাস্তায় রাস্তার থেকে রাস্তায় অনেকক্ষণ পাইচারি করল। মেঘ করে এসেছিল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল, রাত হয়ে গেছে, বৃষ্টির ভিজতে ভিজতে যেখান থেকে চলে এসেছে সেই দিকে আবার চলে গেল, আস্তে-আস্তে আস্তে-আস্তে। কখনো-বা ঘাড় হেঁট করে চোখ বুজে, কখনো-বা মাথা তুলে অস্পষ্ট চোখে অজস্র মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে।

এক-এক সময়ে মনে হচ্ছিল সে নিজে যেন স্থির হয়ে আছে, তার মন কোথাও যেন জলপাইয়ের সবুজ পল্লবের মত অবনীর নীল অন্ধকারের ভিতর ঘুমিয়ে আছে, শান্তভাবে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। অক্লান্ত মাকড়সার মত একটা অপরিসীম দেয়ালের শেষ দেখবার জন্য চলেছে, না দেখা পর্যন্ত স্থিরতা নেই, স্থিরতা নেই, শুধু তার পার দুটো অন্ধকারে ট্রেনের মত চলেছে, যেন কোমরের উপর তার শরীরটা, সমস্ত মানুষটা তার আত্মার এই অক্লান্ত ট্রেনের অপরিশ্রান্ত যাত্রী। অপরিশ্রান্ত যাত্রী।

রাত ক্রমে বাড়ছিল।

একটা বিবর্ণ গলির দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে রইল সুবোধ। গভীর রাতে জায়গাটা অনেকখানি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ছে, যেন এত স্তব্ধতা ও বিমর্ষতা কোনোদিনও সে দেখে নি।

রাত অতিরিক্ত রকমের বেড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক লোক এখন আর বাইরে থাকে না। ওয়েলিংটন স্ট্রিটে একজন সার্জেন্ট ও দু-একটা পাহারাওয়ালা মুখোমুখি হয়ে পড়ল সুবোধ-যেন তারা সুবোধকে কৈফিয়ৎ দিতে বলে। কিন্তু ঘাড় হেঁট করে সুবোধ তাদের এড়িয়ে চলে গেল। কোনো প্রশ্নেব উত্তর দিতে রাজি নয় সে আর। ধর্মলতার গির্জার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল।

কিন্তু চমকাবার কী আছে? এ-জীবনে কিছুই স্বাভাবিক নয়। মুনমেন্টের দিকে চলল সে।

শহরের শেষ গ্যাসলাইট কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল।

দাঁড়াল, তারপর আবার যতখানি পথ হেঁটে এসেছে, সেই পথ দিয়ে আবাব ফিরে চলে গেল।

রাত তখন তিনটে। মনুমেন্টের কাছ থেকে বরাবর এতখানি সে আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছে, কোথাও থামে নি।

হঠাৎ মনে হল কে যেন কোন বাড়িব ওপরের তলাব থেকে তাকে ডাকছে, সুবোধ থমকে থেমে গেল, পিছু ফিরে সেই বাড়িটার দিকে তাকাল, কোথাও কোনো শব্দ নেই, সবাই ঘুমিয়ে আছে, হয়ত কেউ ডেকেছিল, হয়ত কাউকে, কিন্তু সুবোধকে নয়।

এই বাড়ি? এই বাড়িটাকে কোনেদিন বিশেষ ভাবে বুঝে দেখতে যায় নি সে, হয়ত দেখেও নি কোনোদিন; কারা আছে জানে না সুবোধ, কিন্তু তবুও একটা ডাকের শব্দ শুনেছিল বাস্তবিক সে, ওপর দিকে তাকাতেই বাতাসে একটা জানালা বন্ধ হয়ে গেল দেখেছে সুবোধ। এই বাড়িটার কাছে এসে অনেকক্ষণ তাকে থেমে থাকতে হল, একতলাব বারান্দায় উঠে দেয়ালে অনেকক্ষণ চুপ করে কান পেতে রইল সে। এ-জীবনে এবকম বিস্ময় সে কোনোদিন বোধ করে নি।

পরদিন দুপুরবেলা সুবোধ ঘুমের থেকে উঠল।

তারপব দুঘণ্টা চুপ করে শহরের জ্বলন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে রইল, ভাবছিল এমন দুপুবে সমুদ্রের জল কেমন গবম হয়ে উঠেছে, সেই উষ্ণ নীল ঢেউযের গন্ধ পাচ্ছিল যেন সে, পযের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। কি নিবিড়।

বিকেল পাঁচটার সময় স্নান করে একটা চাযের দোকানে গিয়ে বসল সে। দোকানের ছোট্ট ছেলেটি চাযের পেযালা টেবিলে তাব কাছে রাখা মাত্রই সে উঠে পড়ল। হঠাৎ কালকেব রাতের কথা মনে হল তার। সেই বাড়িটার কথা। সে সটান সেই দিকে চলে গেল।

সুবোধ গিয়ে দেখল বাড়ির দরজা-জানালা সমস্ত খোলা। একজন বুড়ো মতন ভদ্রলোক নীচের তলার জানালাব বেলিঙে হাত দিয়ে দাঁড়িযে আছে।

সুবোধ বললে, 'এ বাড়তিতে কে আছে?'

—'কেউ নেই।'

—'খালি পড়ে আছে? কদিন ধরে?'

—'না, আজই খালি হয়ে গছে।'

—'আজ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কাল লোক ছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'কাবা ছিল?'

—'আমি চিনি নে তাদের।'

—'কোথায় গিয়েছে?'

—'তাও জানি না।'

—'কে জানে বলতে পাবেন?'

—'না।'

—'বাড়িটা আপনার?'

—'আপনি ভাড়া নেবেন?'

সুবোধ জানতে চাইল বাড়ি কাব।

বুড়ো ভদ্রলোক তাকে ওপরে নিযে গেল। বাড়িওযালা মিস্ত্রি দিযে দরজা-জানালা মেরামত করিয়ে নিচ্ছিল।

সুবোধ বললে, 'বাড়ি আপনার?'

—'হ্যাঁ, ভাড়া হযে গেছে।'

—'ভাড়া করতে আসি নি আমি, কারা ছিল এখানে বলতে পারেন?'

—'কি এক মজুমদার—মজুমদাব—তারাপদ মজুমদার।'

সুবোধ বললে, 'তাবাপদ মজুমদাব একা?'

—'না, অবিশ্যি পবিবার নিয়ে ছিলেন, এবা দুজনেই ছিল, আব মাঝে মাঝে কৃচিৎ দু-একটি আত্মীযস্বজন আসত, সে সব অত বলতে পারি না আমি। তবে এ দুজনই আমার ভাড়াটে ছিল, প্রায মাস তিনেক এই বাড়িতে ছিল তারা।'

—'মাস তিনেক! মাস তিনেক!' সুবোধ বললে, 'এখন কোথায গেছে?'

—'তা আমি কিছু জানি নে' বলেই বাড়িওয়ালা মিস্ত্রিদের সঙ্গে নিজেও খুটখুট করে হাতুড়ি চালাতে লেগে গেল।'

—'আপনি ছাড়া আর কেউ তাদের কথা জানে?'

—'তা আমি জানি নে মশাই, যতদূব জানি, সব বললাম, আব কোনো খোঁজ খবর বাখি না আমি।'

সুবোধ বাস্তায নেমে অবাক হযে ভাবল, তাবাপদ মজুমদাব কে, এবং তাব স্ত্রী, স্ত্রীই ত? তার স্ত্রী-বা কোথায থাকতে পাবে। তাবা কলকাতায আছে? বাইবে চলে গেছে? কোথায যেতে পারে? কেমন করে খুঁজে বেব কবতে পারা যায়? কিন্তু কি আশ্চর্য তাদেব খুঁজে বেব করবার জন্য এমন স্পৃহা কেন তার? যাদের কোনোদিনও সে দেখে নি, যাদের কথা কারু কাছে কোনোদিনও শোনে নি সে, এই পৃথিবীতে যারা সুবোধের কাছে জন্মায নি, যাদের মৃত্যুব সঙ্গে সুবোধের কোনে সংস্রব থাকবে না, যাদের সমস্ত জীবনেব প্রথম ও শেষ খুঁটিনাটিটুকুও অনন্তকালেব জন্য সুবোধের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে, তাবাপদ কিংবা ঠিক বলতে তাবপদব সেই স্ত্রীব জন্য এ কি আকাঙক্ষা তাব স্ত্রী ত? তারপদর স্ত্রী? তারাপদর!

সুবোধেব উপন্যাস অত্যন্ত বাস্তব ছিল। কথায কাজে নিজের হৃদযের ছোটখাট অজস্র মন্তব্যে সে এইপথ ধরে চলত, এই মাংসল পথ।

এ-জীবনে শুধু একটা রাত তার অন্যকরম কেটেছে। কালকের রাতটা। সমস্ত রাত ভরে কলকাতার শহরে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে হাঁটা, তা সে আরো হেঁটেছে বটে, বিমর্ষ গলির দিকে তাকিযে ব্যথা পেযছে আরো, সুমুখে পুলিশ দেখে ঘাড় হেঁট কবে চলে গেছে, কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় নি। ধর্মতলার গির্জাব ঘড়ির দিকে গভীর রাতে সে আরো ঢের তাকিয়েছে, তাকিযে চমকে গেছে, মনুমেন্টের কাছে গিযে শেষ রাতে আবো অনেক বাব কথা ভেবেছে সে, শহরের শেষ গ্যাসলাইট যে কোথায ফুরুল এই ভেবে সে

,আরো অনেকবার স্তব্ধ হয়ে গেছে।

এই সমস্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু হঠাৎ এক [illegible] বাড়ি এমনি করে তাকে থামিয়ে রাখল, কোথায় একটা জানালা বাতাসে বন্ধ হয়ে গেল, তাই সে [illegible] য় রইল। বিস্ময়, বিস্ময়, গভীর বিস্মষ! জীবনে এমন বিস্ময কোনোদিন বোধ করে নি সে।

আস্তে আস্তে বাড়িটার ভিতর আবার ঢুকল সে।

বাড়িওযালা বললে, 'আপনি এই না এসেছিলেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আবার কী মতলবে?'

সুবোধ লোকটার কথার কোনো জবাব দিল না, যেখানে জানলাটা বাতাসে বন্ধ হয়ে গেছল, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল সে। জানালাব কাছে একটা গোল টেবিল। টেবিলটাকে ঘিবে দু-তিনখানা চেয়ার। দূরে সেই কলেজটা দেখা যাচ্ছে, বছর দশেক আগে সুবোধ যেখানে তার শেষ পড়া সাঙ্গ করেছিল, এই কলেজটার দিকে যখনই সে তাকাত তখনই মন বিষণ্ন হয়ে উঠত সুবোধের। জীবন কি ছিল তার। সমুদ্রেব জলের এক অফুরন্ত রৌদ্র ও আকাশেব ভিতর গিরেবাজের মত ছিল জীবন তার একদিন। তাবপর কবে একদিন তন্দ্রার মোহ পেয়ে আচ্ছন্ন বাদুড়ের মত অস্পষ্ট শাখার অন্ধকার সব আলো ঝরে গেল তার। কি হল এই ভেবে। কিন্তু আজ এখানে দাঁড়িয়ে একটা কথা খুব গভীরভাবে মনে পড়ছে সুবোধের। সেই ছোটবেলাব থেকে যখনই সুবোধ খুব গভীর ব্যথা পেযে অন্ধকারে একা একা কেঁদেছে তখনই যেন মনে হযেছে তার, এই অন্ধকারের ভেতরেই কে যেন বলছে তাকে 'আমি আছি'যে' 'তুমি আছ, তুমি কে?' সুবোধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত, জানত সে একটি নারী সে তাকে কোনোদিন দেখে নি সুবোধ কিন্তু ক্রমে ক্রমে জীবন নানারকম স্বচ্ছজ্ঞান লাভ করলেও অস্তিত্ব অস্বীকার কবতে পারে নি সুবোধ। নিবিড় ব্যথার সময মন যখন ঢের পৃথক/একাকী নগ্ন মেয়েটির মুখ অবদি দেখে ফেলেছে যেন সুবোধ। পৃথিবীতে অনেক মেযেই ত সে দেখল, তাদের আবার অত্যন্ত স্পষ্ট, তাদের শবীর অত্যন্ত পরিচিত, তাদের জীবনের রেখা ও উপরেখার ভিতব কোনো অস্পষ্ট কুয়াশা নাই চুক্ষর অগোচর কোনো অতিসূক্ষ্মতম বয়সের মৃদু ও কঠিন ইঙ্গিত নাই, আছে বিচিত্র স্থূলতা শুধু, স্থূল মাংসের রহস্য মাত্র [।] সুবোধের জীবনেব শাদাসিধে কোনো পবামর্শ, প্রযোজনেব কাজও তাদের দরকাব হল না আর। নিস্পন্দ বনে ঘুমন্ত বাঘিনীর গাযেব ডোবাব মত একটা মাংসল কুহকের আঘ্রাণ।... এদের পিছনে থাকে যে পরদা কোনো দূরতম সমুদ্রেব...বাঘিনীহীন অন্ধকাবেব ভিতব যে অনাদিকালের একাকী...থাকে, কখনো মানবীর রূপ ধরে কখনো সুন্দর ডোবার রূপসী বাঘিনীব, কখনো শঙ্খচিলের, কখনো আমাদের পৃথিবীতে কে আগে চক্ষুব আগোচর কোনো অতিসূক্ষ্মতম বযসের মৃদু ও কঠিন ইঙ্গিতের মত এক-একদিন গভীর দুঃখেব বাতে...ছিল মাত্র, দেখা যায যাব সৌন্দর্যেব শেষ ক্ষোভ মিটায় যে কাল রাতে যেন মনে হযেছিল তাকে মুখোমুখি দেখে ফেলেছে সুবোধ। এই জানালার পিছনে যেখানে আজ সে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই সে ছিল, জানালাা বাতাসে বন্ধ হযে গেছিল কাল।

তাহলে এই মেযেটিই শুধু রইল, এই মেয়েটি যাকে কোনোদিন দেখতে পাবে না সুবোধ। এর জীবনের গভীর আঘাতের সময সে এসে বলবে 'আমি আছি'। মন তখন যদি খুব বিচ্ছিন্ন হযে বইতে পারে পৃথিবীর চিন্তা তর্ক যুক্তির প্রশ্ন বাসনা সমস্ত যদি স্থূল/অসার/অশ্লীল বলে মনে হয় মৃত্তিকা সন্নিবেশ বলে, তাহলে সেই মেয়েটির মুখও হয়ত দেখতে পারবে সুবোধ। সুবোধের মৃত্তিকাবীজ প্রিয় জীবনে এই একটা বিস্ময়, ক্রমাগত মৃত্তিকার থেকে মাংসের থেকে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

উপন্যাসটা তাহলে কোনো সম্পাদকই নিল না।

পাঁচ-ছ মাস আগের কথা মনে পড়ল, কলকাতায তখন দারুণ গরম। দার্জিলিঙে তিনমাস একজন মহাবাজেব ছেলেকে পড়াবার একটা কাজ পেয়েছিল সুবোধ। সুবোধেব জন্য অপেক্ষা কবেছিল তারা। সুবোধ গেল না। তিনমাস ধরে এই উপন্যাসটা লিখল। আজ তিন মিনিটের ভেতবই এটাকে ছারখার করে ফেলল সে।

তিনমাস ধরে এই বইটা লিখেছিল সে। সেই অসহ্য গরমের প্রতিটি দিনেব কথা মনে পড়ছিল সুবোধের। প্রতি ভোরেই মনে হত তার কাল যা লিখেছি তা কত মিথ্যা, চারদিককার পৃথিবীর কাছে তা কত অপ্রয়োজনীয। শহরের আপিস-আদালত স্কুল-কলেজগুলো কেমন বিরাট, শক্তিশালী স্তম্ভেব মত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, সে সবের সঙ্গে সংস্পর্শ হারিয়ে নিজেকে কেমন মিথ্যা মনে হত সুবোদের, নিজের বইটাকে কেমন নিষ্ফল মনে হত।

তবুও রোজই পৃথিবীর কৃতকার্যতার বিরুদ্ধে খানিকটা লড়াই করে সে লিখতে আরম্ভ করে দিত। তারপর সারাদিন তার লেখা চলত। এক-এক সময় কলম থামিয়ে অবাক হয়ে নিজের লেখা পড়ত সে, এক-এক সময় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকত, যেন লেখার স্রোত ফুরিয়ে গেছে, তাকিয়ে দেখত গরমে পায়রাগুলো ছটফট করছে, মানুষ কাতর হয়ে পড়েছে, রাস্তার পিচ গলছে। আবার কলম নিয়ে বসত সে।

কিন্তু কলম তাকে কোনো পুরস্কার দিল না। অথবা দিয়েছে। সেই তিনমাস না জানি কোনো কামনা মিটেছে তার। যদ্দি পাবত আবারও কলম নিয়ে বসে সে। আর একখানা উপন্যাস আরম্ভ করে। এমনি লেখবার জন্য শুধু, তারপব হযত পুড়িয়ে ফেলবার জন্য। কিন্তু তবুও উপন্যাস আর লেখা হচ্ছে না সুবোধের। কিছুই করা হচ্ছে না।

তারাপদ বললে, 'কেন, ভাল করি নি কেন সতী?'

সতী বললে, 'সেই পুরনো বাড়িটাই ভাল ছিল।'

—'কোন হিসেবে?'

—'জানালায় বসে অনেকদূর বাস্তাঘাট আকাশ দেখা যেত।'

তারাপদ টাই বাঁধছিল। একটু ভুল হয়ে গেল, টাইটা খুলে আবার বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'কিন্তু তুমি দেখছ না সতী, এই বাড়িটা কত বড়, কত সুন্দব।'

সতী চুপ করে রইল।

তারাপদ টাই বাঁধা শেষ করে বললে, 'কিছু বলছ না যে?'

সতীকে তাবাপদ ছোটবেলাব থেকেই জানে, ছোটবেলার থেকে তাকে তাবাপদদা ডেকে আসে নি সতী? তাবাপদদাকে পৃথিবীর সকলেব চেয়ে পৃথক করে নেয নি কি? কত মাযা-মমতায জড়িয়ে এসেছে এই মেযেটি তারাপদকে, সেই তাদেব দুজনেব সেই দূর আবছাযার শৈশব থেকে। আজ সে তার স্ত্রী। কিন্তু তবুও সেই মমতামধুবতাব তীব্রতা নেই যেন আজ আর। ক্রমে ক্রমে মেযেটি মরে পড়েছে যেন উপচিযে দূরে চলে যাচ্ছে কোথায যে। তাবাপদ বুঝে উঠতে পাবে না। মাঝে মাঝে সতীকে জিজ্ঞেস করেছে তারাপদ—'তুমি আমাকে ভালবাস'—সতীর অন্য কোনো প্রেমিকই নেই জানে তাবাপদ, স্বামীকেই সে ভালবাসে। কিন্তু তবুও...

এখানে কোনো ঈর্ষার কথা নেই, এমন কোনো তৃতীয ব্যক্তি নেই এদের জীবনের দাম্পত্যসুখকে এক মুহূর্তের জন্যও যে ম্লান কবতে আসবে, তাছাড়া সতীব নিজেরই সংরক্ষণ এদিক দিযে তারাপদব চেযে ঢেব বেশি যে।

একটা কথা শুধু মনে হয তাবাপদব, এই মেযেটির প্রেমই অবসন্ন হযে পড়ছে, প্রেমেবই অবসাদের নিযমে, সে নিযম বড় কঠিন, তাকে লঙ্ঘন কবা যায না, তাব ক্ষতি ফেরানো বড় দুঃসাধ্য।

তারাপদ অফিস থেকে এসে বলল, 'চল সিনেমায যাই সতী।'

সতী বিস্মিত হযে তাকাল।

—'তুমি অনেকদিন গিযেছ ত আমাব সঙ্গে।'

—'কিন্তু আজ ইচ্ছা কবছে না।'

—'কেন?'

—'বুঝি না, ভাল লাগে না।'

—'খুব ভাল ছবি আছে আজ।'

—'আমার আজ ইচ্ছে করছে না সিনেমায যেতে।'

—'আজ শুধু? কাল যেতে ইচ্ছা কববে?'

সতী ঈষৎ ম্লান হেসে বললে, 'বলতে পাবি না।'

—'বলতে পার না!'

সতী বললে, 'সিনেমায মানুষ কি সুখ পায? আমি অনেকদিন তোমার সঙ্গে ছবি দেখতে গিযেছি। দেখে দেখে আমার এই মনে হযেছে যে বাযস্কোপ যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয় তাহলে সে জীবন আমার নয়। অত কোলাহল, অত উত্তেজনা, আমোদ-আহ্লাদের অত বৈভব আমার ভাল লাগে না। যারা এই জিনিসের পেছনে আছে তাবা যে কেমন লোক আমি ভেবে অবাক হই। তোমার সঙ্গে কযেকটা দিন বাযস্কোপে গিযে আমার এই ধাবণা হযেছে যে এ ব্যবসা যারা সম্ভবপর করেছে তারা চিন্তাব দাবি করে কল্পনার দাবি করে, নানারকম সমস্যা সমাধানের শান্ত দাবি করে অথচ এসব কোনো দাবিই তারা মেটায

না, কোনো এক বর্ণ জিনিস নিয়ে স্থির হয়ে অনেকক্ষণ ভাববার ক্ষমতা তাদের নেই। মানুষকে একটা অনর্থক ব্যস্ততা শেখায় শুধু, যেন দুদণ্ড কোনো ভাব বা কল্পনা নিয়ে অপেক্ষা করবার সময় নেই কারু, মোটরকারের মত এও একটা বিকৃতি, আমাদের জীবনটাকে বিকৃত করে দিচ্ছে, নদীর জলে মাছরাঙার ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়, জলের... দল ঘাম জন্মায়, মাঠ ঘাসের সৌন্দর্যে ভরে থাকে, দিনের পর সুন্দর অন্ধকার আসে, আকাশে নক্ষত্র দেখতে পাই, এইসবের চেয়ে অন্য কোনো সৌন্দর্য বা সান্ত্বনা চাই না আমি। আমি জানি যারা অতিরিক্ত সিনেমা ভালবাসে তারা এই বিকৃতিকে ভালবাসে। কল্পনাহীনতা, চিন্তাহীনতার এই বিকৃতিকে। অথচ নিজেদের তারা আর্টের ভক্ত মনে করে। আর্টকে আমিও ভালবাসি।

—'কিন্তু কলকাতার শহরে এসব পাচ্ছ কোথায় তুমি?'

—'যেটুকু পাই সেই আমার যথেষ্ট।'

তারাপদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বললে, 'তুমিই ত একসময় থিয়েটারে আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলে।'

—'চেয়েছিলাম, আমাদের দেশে তেমন নাটক থাকত যদি থিয়েটারের আর্টিস্ট হতে আজও আমি রাজি হতাম। কিন্তু ওদের দেশে সিনেমায় যেমন অপেক্ষার অভাব, ব্যস্ততা বেশি, কাজেই আর্ট পেঁচাব তাড়নার মেঠো ইঁদুরের মত—আমাদের দেশে থিয়েটারও তাই।'

—'তাহলে আর্ট উপভোগ করা আমাদের দেশে কারু পক্ষে সম্ভব নয়?'

—'আমাদের দেশের সাহিত্যে তবু কিছু আর্ট আছে।'

বাংলা সাহিত্য তারাপদ ঘাটায নি।

সতী বললে, 'ছবি গানে আমাদের দেশে ওদের দেশেও ববং আর্ট সিনেমা থিয়েটাবের চেয়ে ঢের বেশি অবসরের সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে, ঘিয়ের বাতির মত...জ্বলতে তাই, চিন্তা ও কল্পনার সৌন্দর্য তাই পাওয়া যায তাতে, শান্তি পাওয়া যায়, গভীর শান্তি, সান্ত্বনা পাওযা যায়।

আর্টের কথা তারাপদর ভাল লাগছিল না।

অফিসের পর এসে কী করবে সে? সতীকে না নিয়ে থিযেটারে বা সিনেমায ক্লাবে বেবিযে যাবে? গেলে তারাপদ কিছু দেখতে শুনতে পায় না। সতী যাই বলুক না কেন সিনেমা তারাপদব খুব ভাল লাগে। বিশেষত আজকালকার টকি। থিয়েটারও। কিন্তু তবুও একা একা এসব সে উপভোগ কবতে পারে না, পাশে এই মেয়েটি থাকা চাই। তারাপদর জীবনের বিশেষ একটা সম্পদকে সতী যেন আজ ফুঁড়ে নষ্ট করে দিল। অফিস থেকে এসে কি করবে তারাপদ?

প্লাজায় চমৎকার টকি ছিল, সতীর সান্নিধ্য সব সময়ই থাকত, চিবিত্রভাবে হেঁটে যেত আজ সন্ধ্যা পথটা। কিন্তু সতীকে খুব ভাল করে জানে তারাপদ। বাযস্কোপের ওপর তার মন বিজাতীয়ভাবে বেঁকে বসেছে। বিজাতীযতার ভেতর কেউ আর তাকে ফিরিযে নিযে যেতে পারবে না।

তারাপদ বললে, 'চল, ময়দানে হাওয়া খেয়ে আসি।'

ড্রাইভারকে সে মোটব তৈরি রাখতে বলল।

দুজনে বেরুল।

একটা সিনেমা হাউসেব সামনে এসে থামল।

সতী অত্যন্ত বিরক্ত হযে স্বামীর দিকে তাকাল।

তারাপদ কাতর অনুরোধ করে বললে, 'আজ একদিনের জন্য শুধু।'

টিকিট কাটল তারাপদ। বললে, 'দেখ, এই বইখানা কেমন, এব ভেতর হযত অপেক্ষা আছে, একেবারে ঘোড়দৌড় নাও হতে পাবে, হয়ত আর্টই।

সিনেমা হাউসের বাইরে দাঁড়িযে সতীর বোধ হচ্ছিল ভিতরে কে যেন আছে—কে যেন?

কাউকে সে দেখতে পাচ্ছিল না, কাউকে সে দেখতে চাযও না। তবুও কে যেন রযে গেছে।

সতী আবার মুখ তুলে তাকাল। কই সমস্ত সধারণ স্বাভাবিক লোকগুলো এদেব কাউকেই ত সে চায নি।

চোখ নামাল সতী। তারাপদ তখন তাকে ভিতরে নিয়ে চলেছে। সে যেই দবজার মধ্য দিযে ঢুকেছে, অমনি কে যেন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হল, ঠিক যে জাযগায সে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই জায়গায়ই। কিন্তু তখন পিছনে তাকাবার কোনো অসবর ছিল না, কোনো সুযোগ ছিল না। তারাপদ তাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে যে!

সিটে বসে সতীর মনে হচ্ছিল সেদিন রাতে সেই পুরনো বাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িযে ঠিক এমনি

বোধ হয়েছিল তার, ঠিক কাকে যখন দেখতে যাবে সে অমনি জানালাটা বাতাসে বন্ধ হয়ে গেল। তারাপদ তাকে বিছানার পাশে টেনে নিল। সিনেমায় সুবোধ নিজের অজ্ঞাতসারে সতীর পাশেই এসে বসল। নিতান্তই দৈবক্রমে। বুঝতেও পাবে নি সে যে একজন মেয়েমানুষ তার পাশে বসে আছে, অভিনয়ের মধ্যে একবারও সে সতীর দিকে তাকায় নি, সুবোধের শুধু ভাল লাগছিল, কোমল লাগছিল, মনে হচ্ছিল পৃথিবীর এমন সুন্দর হৃদয়ে এত সান্ত্বনা, মানুষের জীবন এমন প্রেমে নিবিড়, কে যেন গভীরভাবে তাকে ভালবেসে ঘিরে রেখেছে। সিনেমা দেখে নয়, এমনিই, এমনিই সুবোধের এইসব কথা মনে হচ্ছিল। এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল সুবোধ যে ফিরেও দেখতে যায় নি তার পাশে কেউ বসে আছে কি না, এই বায়স্কোপ হলের সমস্ত মানুষগুলোকে এক অবান্তর মনে হচ্ছিল তার।

সতীর শুধু ভাল লাগছিল।

কে যেন গভীর বনচালতার বনে, শ্মশানের পাশে, নিবিড় বনচালতাব বনে এক খাঁজকাটা অজস্র সবুজ পাতার রহস্যের ভিতর, নবম পাতার কুয়াশার মধ্যে, চালতাফুলের সুগন্ধি মসৃণ পাপড়ির ছায়ায়, রেণুর লোকে মৌমাছির মত তার প্রাণকে ঘিবে রেখেছে।

রাতে সুবোধের মনে কেমন একটা ব্যথা এল। তখন অনেক রাত। সুবোধ দরজা খুলে বারান্দায় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে রইল। ভাবছিল আর্টিস্টের জীবন কি নিষ্ফল। অন্য মানুষেরা যেখানে কাজ করে, কথা বলে, কথা বলে আব কাজ কবে সব, আপসোস মিটিয়ে দেয়, তারপর নির্বিঘ্নে ঘুমায় বা ভালবাসে, আর্টিস্টটা সেখানে লিখতে চায় শুধু। কিন্তু কী লিখবে? স্বাভাবিক মানুষ যা লিখতে পারে তাই? তা যদি হত তাহলে শান্তি থাকত। হৃদয়ের সঙ্গে বনিবনও করে সর্বসাধারণের পথে চলে সকলের মত ভাবনা ভেবে কাজ কবে জীবন কি দ্রুত হত তাহলে, কি শক্তিশালী হত!

আর্টিস্টের জীবন নিষ্ফল। তার চিন্তাব শেষে কোনো সিদ্ধান্ত নাই, তার কাজ পরে কোনো বিশ্রাম আনে না। তাব কথা আজকের মত বাতাসের স্ফুলিঙ্গ....তৃপ্ত হয়ে থাকতে চায় না। যদি সে কথা বলতে আবম্ভ কবে কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবে সে? তাকে মনে মনেই কথা বলতে হয—নিজের সঙ্গে।

সুবোধ ভাবছিল, আশ্চর্য, তিনমাস ধরে একটা উপন্যাস লেখা গেল, এই কদিন আগেও সেটা সে ছাপাতে গিয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হয সেটা ছাপালেও যা হত ছাই হযেও তাই হয়েছে, সবচেযে শেষ গল্প লিখবে সুবোধ তখনো এই কথা মনে হবে।

পরদিন বাতে সুবোধ লিখবে ভাবছিল। সাবাদিন বসে লিখবার জন্য সে প্রস্তুত হযে থাকছিল। সেই জন্য আজ দুপুরবেলা তাসেব আড্ডায যায নি সে আব। নিজেকে নিবিষ্ট করে বেখেছে।

সন্ধ্যার সময তবু একটা হুল্লোড় এল।

পবদিন তার একটা পুবনো লেখা কোথাব থেকে ফিবে এল ঠিক সন্ধ্যার ডাকে, অনেক্ষণ সে অবাক হযে বসে বইল। এই লেখাটাব কথা অবদি সে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু নিজেব স্রষ্টাব কাছে নিজেকে মনে কবিযে দেবার আর কোনো সময কি পেযেছিল না এই রচনাটিব।

দু-তিনদিন সাধাবণভাবে কাটল। যেন সকলের মত হয়ে গেছে সুবোধ। একদিন রাতে বাস্তবিকই সে লিখতে বসল।

ম্যানেজার দরজায ধাক্কা দিযে বললে, 'আপনাব একটা টেলিগ্রাম আছে। আজ দুপুরেই এসেছে, সারাদিন আপনাকে পাই নি, কোথায ছিলেন?'

নটার সময সুবোধ স্টেশনে পাইচারি কবছিল। খানিক বাদে গাড়ি এল। মাসিমার দু-একটি পুঁটুলি খুঁজে বের করতে ঢের সময লেগে গেল। তারপর প্ল্যাটফর্মে তাকে নামিযে সুবোধ একটা ট্যাক্সি ঠিক করলে। কারণ ছ্যাকরা গাড়িতে করে মাসিমাকে কালীঘাটে পৌঁছিযে দিয়ে ফিরতে ঢের বাত হযে যাবে। মাসিমাবও কষ্ট হত।

হাওড়া স্টেশনে দেবাদুন এক্সপ্রেস তৈবি হচ্ছিল। আব একটু পরেই ছাড়বে।

সুবোধের ট্যাক্সিটা যখন খানিকদূর এগিযেছে হঠাৎ মনে হল তার কারা যেন মোটরে করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল, তাদের সে দেখে নি। অবিশ্যি মোটরে করে যে তারা গিয়েছে, তার ট্যাক্সির গা ঘেঁষে গিয়েছে, এই মাত্র গিয়েছে, এই সম্বন্ধে তার বোধ যেমনই তীক্ষ্ণ তেমনই বেদনাদায়ক। হৃদয় বিহ্বল হয়ে ওঠে, ভালবাসা নিবিড় গন্ধে ভরে যায, শ্মাশানের পাশে সেই বনচালতার বীথির কথা মনে হয়। তখনই ট্যাক্সির থেকে নেমে তাদের পিছে পিছে যেতে ইচ্ছা করল সুবোধের, কোথায় গেল তারা? কোথায গেল সে? যাকে সেই পুরনো বাড়িতে খুঁজেছিল সে নাকি? সেদিন সিনেমায় বসে যার কথা শুধু

মনে হয়েছে, সেই জন্য জীবনকে পৃথিবীকে এত ভাল লেগেছে। সে-ই ত পাশ দিয়ে গেল। তাকে দেখা গেল, না, কিন্তু তুবও মনে হল সে ছাড়া আর কেউ নয়, নইলে রাতটাকে এমন নরম মনে হবে কেন? এমন শান্তি সান্ত্বনায় নিবিড়?

সুবোধ বললে, 'মাসিমা।'

মাসিমা শুনতে পেল না।'

ট্যাক্সি প্রতি মুহূর্তেই হু-হু করে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় যে ছুটে চলেছে।

তারপর এই কোলাহল ভিড় শীত ধোঁয়া অন্ধকারের ভিতর কেউ যেন বুঝতে পারে না পৃথিবীতে কে বাস্তবিক কার।

ষ্টেশনে নামতে না নামতেই সতী বললে, 'আজ ফিরে চল।'

—'সে কি এক্সপ্রেস যে এখুনি ছাড়বে। দেরাদুনের ফার্স্টক্লাশ দুখানা টিকিট অবদি কিনে ফেলেছি। তুমি কি বলছ সতী!' টেনে নিয়ে সতীকে কেবিনের ভেতর ঠেলে দিল। তারাপদ বললে, 'পাগলামি আর কাকে বলে!'

সতী বললে, 'লক্ষ্মীটি, এবার আমার কথা শোন, কাল যেও, আজ না, আজ চল আমরা একটু মোটরে করে বেড়িয়ে আসি গে।'

তারাপদ রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হাসতে হাসতে আরক্ত হল।—'বাস্তবিক সতী তুমি কি যে বল।'

—'আমি ঠিকই বলছি, তুমি চল, চল, বেরোও।'

—'দেরাদুনে আমরা একমাসের বেশি থাকব না।'

সতী উঠে দাঁড়াল। হয়ত জানালা দিয়ে টপকাতে পারলে তাই করে সে। তারাপদ তার হাত চেপে ধরল।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

মেয়েটি কাতরভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। যেন ধানের সবুজ শবীর বেয়ে বেয়ে সোনালিগুচ্ছের উপর এসে বসেছে যখন মেঠো ইঁদুর, গুচ্ছেব মাদকতাময় সোনালি গন্ধে মগ্ন হযে ভাবছে একজোড়া ধারালো ঠোঁট তাকে নিয়ে অন্ধকারের দিকে উড়ে চলল।

সুবোধ রুমে ফিরে এসে একটা চুরুট নিয়ে বসতে চেষ্টা করল। চুরুট আধাআধি শেষ কবে সেটাকে টেবিলের ওপর রেখে দিল। সেটা আস্তে আস্তে পুড়তে লাগল। তারপব শীতের ভেতর নিভে গেল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সুবোধ।

আর কিছু? না আর কিছু সে ভাববে না। আজ রাতে কিছু লিখবে না সে। একটু ঘুমুতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু তবুও বসেই রইল।

এমনি একটা নিস্তব্ধ আচ্ছন্নতা, একটা বেদনামধুর আবেশ, একটা দীর্ঘ বেখাযিত প্রশ্ন, একটা বিস্ময় নিয়ে তার অনেকদিন কেটে গেল।

একদিন শীতের শেষে অনেক ভোরে জেগে উঠে মনে হল সুবোদের কলকাতায় সৌন্দর্য আবাব যেন ফিরে এসেছে, সবুজ নোনার (আতার) শরীরে বৈশাখের রৌদ্রে তীব্র ঘন রসের সঞ্চারের মত বাতাসের ভেতর কেমন একটা সতেজ মধুরতা। সে অনেকক্ষণ শেষ রাতেব অন্ধকাবে ছাদের পাঁচিলেব কাছে দাঁড়িয়ে সমস্ত শরীরটাকে দেখতে লাগল। বাস্তবিক সে শহর দেখছিল না, কি যেন ভাবছিল, আর্টিস্টের জীবনের ক্লেশ বা অবসাদের কথা নয়, আর্টিস্টের জীবনের আকাঙক্ষা, আভা সান্ত্বনার কথা।

আকাশ ক্রমে ক্রমে নীল হযে মাথায় উঠছে আরো, সমস্ত শহর রোদে ভবে যাচ্ছে। একটা এরোপ্লেন ওপর দিয়ে চলে গেল। ঢের ওপরে অথচ ঢের কাছে যেন পরিষ্কার বাতাসে স্পষ্ট সেটাকে দেখা যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? আহা! এ যেন কল নয় কব্জা নয়, এক বিস্ময়, আজকের এমন ভোরে।

সুবোধ এমনই একটা টুইশন নিলে যে তাকে রোজ চার-পাঁচ মাইল হাঁটতে হত, বাসে করে অবিশ্যি খানিকদূরে যাওয়া যায়, কিন্তু তারপর বাস বা ট্রামের রাস্তা আর নেই। কাজেই ঢের হাঁটতে হয়। কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই। কারণ অর্টিস্টকেও সাধারণ মানুষের মতন খানিকটা কাজ করতে হয়, যদিও এর বিরুদ্ধে তার ঢের প্রতিবাদ, যথেষ্ট লড়াই, কিন্তু তবুও তাকে শোনে কে?

একদিন শোভাবাজার দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সুবোধ দেখল যে তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন... স্লিপারটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রাস্তার থেকে খানিকটা কফ গুটিয়ে নিয়ে তার নিজের পায়ের ওপবই ছুঁড়ে দিয়েছে। বেশ

করেছে, নিজের গায়ে এমনিই যথেষ্ট আবর্জনা তার। মুছে কি দরকার।

সুবোধের চাদর প্রতিদিনই কিছু না কিছু আহরণ করছিল। অসংখ্য মহিষ, গরু গাড়ি, ও পৃথিবীর সব রকম লোকের ভিড়ের ভিতর দিয়ে তাকে অনেকক্ষণ ধরে চলতে হয়, এক-একদিন চাদরে খানিক গোবর লেগে থাকে, এক-একদিন চাদরের এক-একটা জায়গা অনেকখানি ভিজে থাকে। কেমন, ক্লোদাক্ত যেন, বার্লির জলের মত, কাপড়ে-জামায় নানারকম চিপটে পড়ে যায়, গু লেগে থাকে।

তবুও টুইশনটা ছাড়ল না সুবোধ।

এই টুইশনটার জন্য তাকে ঢের পড়ে নিতে হচ্ছে। কাজেই সে আর কিছু লিখতে পারছে না। সেই উপন্যাসটা লেখার পর নতুন লেখা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

সন্ধ্যারাতে রোজই পাশের ঘরে ব্রিজের আড্ডা বসে। আজকাল ব্রিজের আসরে যেতে পারছে না সুবোধ। কে কি বলে, কে কেমন খেলছে আন্দাজে ধরে নেয় শুধু। হরিপ্রসন্নবাবু বুড়োমানুষ, দিনাজপুরের জমিদার। বালাপোষ গায় দিয়ে রোজ সন্ধ্যার সময় এই বোর্ডিঙে আসেন খেলবার জন্য। মানুষটির মনে গভীর মৃত্তিকার গন্ধ।

খেলবার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি তার। রোজই তার পার্টনার পোস্ট অফিসের কেরানিটি সেঁটে বসছে তাকে। কিন্তু তাতে তার কোনো অপমান নেই। পার্টনার বদলাবারও কোনো প্রবৃত্তি নেই। বরং কেরানি তাকে জিতিয়ে দেয় বলে মনের ভেতর একটা আমোদ আছে। প্রতিটি রাবারেই তার নিজেরই অহঙ্কার বাড়ল যেন, বালাপোষ গায় দিয়ে কোলবালিশে ঠেস দিয়ে শীতের রাতে বুড়ো হরিপ্রসন্নবাবুর আমেজ ও আগ্রহ, এই আনন্দ, এই যে মন যাতে কোনো ধোঁকা নেই, সন্দেহ নেই, বিষণ্ণতা নেই, বিবর্ণতা নেই, এই হচ্ছে স্বাভাবিক হৃদয়, কি যে স্বাভাবিক। আর্টের চেয়ে কত যে দূরে।

এক এক বাজি খেলা হয়ে গেলে এদের প্রত্যেকেরই মন্তব্য শুরু হয়। ঝগড়া আরম্ভ হয়, কি নিখুঁতভাবে সমালোচনা করে এরা। পরস্পরের হাতের ও খেলার ঠিক পরিষ্কার বিশ্লেষণ।

হরিপ্রসন্নবাবু এক ফাঁকে রেসের কথা পাড়লেন, বললেন, '....যে ঘোড়াটায় চাপবে, সেইটেই জিতবে।'

সুবোধ এই টিপটা নেবে কি?

সুবোধ একদিন স্টেশনে গেল। তেমনি রাতে। আজ আর সেখানে কোনো নতুনত্ব নেই। সে জিনিস যেন হারিয়ে গেছে আজ। সে অনুভূতিও মনের ভেতর যেন জাগে না। স্টেশনে চা-কাটলেট খেতে খেতে সুবোধের এক সময় মনে হল এই কাটলেটের তৃপ্তিটাই যেন আজকের রাতের যা কিছু তৃপ্তি। এমনি করে ধীরে ধীরে সর্ববাদীসম্মত পথে চলে আসতে পারে যদি সে, তাহলেই ত লাভ হয়।

কিন্তু তবুও স্টেশনে পাইচারি করতে করতে কেমন একটা বিষণ্ণতা তাকে পেয়ে বসল।

পরদিন ভোরের বেলা আবার স্টেশনে গেল সে। ইঞ্জিন দেখল, কয়লার গন্ধ শুঁকল, প্ল্যাটফর্মের অজস্র নোংরামি নীরবে সহ্য করল সে। অনেক দূরের থেকে যে-সব গাড়ি আসছে সেই সব যাত্রীদের ভেতর কয়েকটা মুখ এমন সুন্দর লাগল তার, কিন্তু তবুও এদের কাউকে অনুসরণ করতে ইচ্ছা করে না। এদের ভেতর সেই অপরিহার্য চমক নেই, আহা, পৃথিবীতে কোথায় যে আছে!

সুবোধ বরফ দিয়ে লেমনেড খেল। ইংরেজি বুকস্টলের সমস্ত রদ্দি বই ম্যাগাজিন নেড়েচেড়ে একটা ডিটেকটিভ নভেল কিনে দুপুর মাথায় করে বাড়ি ফিরল।

রাতে স্বপ্ন দেখল, কে যেন দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখল, তার ভাই, ছোটভাই, বিশ বছরের ছোকরা শিয়ালকোট থেকে এসেছে। সেখান একটা অফিসে চাকরি করত সে। এবং দাদাকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাত। এমন ভাই এই পৃথিবীতে কারু হয় না। সে যতদিন বেঁচে ছিল সুবোধকে টুইশনও করতে হত না। কিন্তু সে ভাই ত মরে গেছে। আবার কী করে এল সে। সুবোধ অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। দেখল ভাই সে আরো অন্ধকারে সেই লম্বা শীর্ণ ছেলেটি কুলির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে। তারপর সুবোধের ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, 'সাতদিনের ছুটিতে এসেছি, আমি দেশে যাচ্ছি দাদা, তুমি কি যেতে পারবে?'

মোম জ্বালিয়ে ছেলেটি দাড়ি কামিয়ে নিল। কি-বা তার দাড়ি। মুখের ভিতর কেমন একটা তৃপ্তি তার। কি আনন্দ। দু-বছর পর দেশে যাচ্ছে মায়ের কাছে। কিন্তু চার-পাঁচ দিনের জন্য মাত্র, তারপর আবার সেই কঠিন শিয়ালকোটে ফিরে যেতে হবে তাকে। দেখতে দেখতে যেন চার-পাঁচ দিন কেটে গেছে, ভাই দেশের থেকে তাই ফিরে এল, তার মুখে এবার কি বিবর্ণতা, মাকে ছেড়ে দাদাকে ছেড়ে যেন কঠিন কঠিন শিয়ালকোটে ফিরে যাচ্ছে আবার।

সুবোধ জেগে উঠল। মৃত ভাইকে সে স্বপ্নে দেখছিল। সুবোধ আশ্চর্য হয়ে ভাবল এই একই স্বপ্ন

বহুবাব দেখে যেন সে। এই স্বপ্ন যা তাব ভাইযেব বাস্তবজীবনেব সঙ্গে এমন প্রকৃতভাবে যুক্ত? তিনবছব আগে একদিন সেই ছেলেটি বাস্তবিকই ত এমনি শিযালকোট থেকে এসেছিল। দবজা ঠেলেছিল, কুলি বিদায দিযেছিল। মোম জ্বালিযে দাড়ি কামিযেছিল। আবাব ফিবে শিযালকোটে চলে গেল। প্লেগে মাবা গেল। যেন বহু যুগ আগে বিলুপ্ত এক নদী, সেই নদীব কাদাও আজ পৃথিবীতে নাই। সেই নদীব খাতে এক শীর্ণ দীর্ঘ মাছ ছিল, ছাযা ভবে কোন সুদূব অন্ধকাবতম স্রোতেব ভিতব থেকে জেগে উঠে একবাব সুবোধেব স্বপ্নেব ভিতব, হাজাব হাজাব বছুব আগেব সেই জলেব কলবব একবাব শোনা যায। কিন্তু অতিদ্রুতই স্তব্ধ হযে যায সব। সুদূবতম সমযেব ধূলিমলিনতাব ভিতব হাবিযে যায। সৃষ্টিব অনন্ত মৃত্যুব অন্ধকাবে। সেই শেষ বাতই ত এমনিই ছিল। কিন্তু তবুও তা কতদূবে।

সেই শেষ বাতেব সেই কুলিকেও যদি এখন পাওযা যেত তাহলে সুবোধ সাবাদিন তাকে কাছে বসিযে বাখত।

সন্ধ্যাব সময সুবোধ বেবিযে পড়ল।

কোনদিকে যাবে বুঝতে পাবছিল না কিছু। কিন্তু ক্রমাগত সে হেঁটেই চলেছে। সামনে কযেক জন লোক খাটিযায কবে একটা মড়া নিযে চলেছে যে সেদিকে লক্ষ নেই সুবোধেব। অথচ সেই মড়াব পেছনে পেছনেই চলেছে সে, বাস্তাব পব বাস্তা, গলিব পব গলি। প্রতি নতুন মোড় বাঁধা এই মডা যেন তাব জন্য ঠিক কবে দিচ্ছে। অথচ কাবা তাব সামনে যাচ্ছে, কি যাচ্ছে, খাটিযা বা মড়া কিছুই সুবোধেব চোখে পড়ল না। সে যেন আকাশেব দিকে তাকিযে ট্রাম লাইনেব দিকে তাকিযে, ধোঁযাব ভেতব কষ্ট পেযে, ভিড়েব ঠেলা খেযে কোনো একদিকে চলেছে শুধু।

ভাবল আজ বাতে ঘুমবে শুধু লিখবে না আব। কাল আব টুইশন কবতে যাবে না।

এক দলা কাদা–গোববসুদ্ধ মহিষেব লেজ ঝটাপট চাবকে গেল তাকে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন গ্রিসিযান শ্লিপাবটা নেচে উঠে নানাবকম কাদা, কফ ও নোংবামি ছিটিযে চলল। সুবোধেব পাযে গাযে, সব জাযগায। তবুও এটা ঠিক নবককুণ্ডেব পথে যাত্রা নয যেন।

একসাব নাবকোলগাছেব সবুজ পালিশ পাতাব কিনাবে চাঁদ উঠেছে। তাবপব পুবোপুবি আকাশটাকে দখল কবে নিল চাঁদ, শহবেব এক প্রান্তে এসে আকাশটাকে আজ অনেক বড় দেখাচ্ছে। যেন চাদ আকাশ নক্ষত্র মানুষেব সুখ মানুষেব জীবন নতুন কবে সব আবিষ্কৃত হল। বসন্তেব বাতাস দিচ্ছে। দলে দলে মেযে বারুণী স্নান কবে ফিবছে। তাদেব এক–একজনেব মুখ এমন সুন্দব, কিন্তু তবুও এসব মুখ অনুসবণ কবতে ইচ্ছা হয না। সে নিজেব পথে হেঁটে চলেছে।

যখন সে থামল, মড়াব খাটিযাব পাশেই এসে থামল। তবুও সেই খাটিযাব দিকে তাব দৃষ্টি নেই। সে জানে না কোথায এসেছে সে। শ্মশান মডা বা সৎকাবেব ত্রিসীমানাযও তাব মন নেই। মন একটু বিশ্রাম নিচ্ছে শুধু। জ্যোৎস্নায, বসন্তেব হাওযায, নদীব গন্ধেব কাছে উন্মোচিত জীবনেব নতুন উন্মোচিত আশ্চর্য আস্বাদেব ভিতব।

এমন ভাল লাগছে সুবোধেব, এমন কোমল লাগছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী এমন সুন্দব, হৃদযেব এত সান্ত্বনা, মানুষেব জীবন এমন প্রেমে নিবিড়, কে যেন গভীবভাবে তাকে ভালবেসে ঘিবে বেখেছে। সতীব মুখেব কাপড় যখন খুলেছে তখন সে মুখ দেখবাব জন্য সুবোধ সেখানে ছিল না। সে গঙ্গাব পাবে চলে গিযেছে। সে জানেই না কেউ মবেছে কি না। কারু মুখেব কাপড় খোলা হযেছে কি না।

তবুও সতীব মুখেব কাপড় খোলা হল যখন আকস্মিক কি একটা পীড়াব আঘাতে হৃদযেব বক্ত ঝঙ্কাব দিযে উঠল যেন। নদীব জলে একটি শীর্ণ করুণ মাছ যেন অকস্মাৎ জলখুম্বিব কামড় খেল। হৃদযেব সমস্ত তরুণ উজ্জ্বল বক্ত মেটুলিব জলঘূর্ণিব ভিতব ধবা পড়ে গেল, ঝঙ্কাব দিযে উঠল যেন তাব। কেমন একটা নিষ্ফলতা তাকে পেযে বসল। কেমন একটা গভীব নিষ্ফলতা। তাকে সবুজ কবে তোলে, কবে তোলে নীল, সবুজ উজ্জ্বল কবে তোলে। দিনেব কর্কশতাব অবসানে....ফুলেব মত নবম সুন্দব কোন এক বাত্তিব দেশে বিকেলেব জোনাকিব নিরুজ্জ্বল হৃদয পাখা ঘিবে যেমন ধীবে ধীবে ছাযা এসে হাত বুলায, অন্ধকাব এসে ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে। কেমন একটা নিষ্ফলতা তাকে পেযে বসেছিল। আর্টিস্টেব নিষ্ফলতাই নয, আবো কিছু। কিন্তু সে নিষ্ফলতা দু–মুহূর্তেব জন্য শুধু। একটা নিবিড় ঘুম এলে তাকে ঘিবে ফেলতে লাগল যেন, খুব ব্যস্ততাব সঙ্গে নয, আস্তে আস্তে জীবন–মৃত্যুব মাঝখানে এই প্রতীক্ষাকে এতে নবম বোধ হতে লাগল সুবোধেব।

নিষ্ফলতা ঘুমেব ভেতব শূন্য হযে গেছে।

শাড়ি

—'দেখ ত তোমার চা ঠিক হয়েছে কিনা। তোমার চা করা যা শক্ত,' উষা পেয়ালাটা স্বামীর টেবিলের ওপর রাখল।

অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠে টেবিলের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল রণজিৎ। কতকগুলো চিঠি লেখবার দরকার।

চায়ের রঙের দিকে একবার তাকাতে বোঝা গেল, চা তৈরি করা শক্ত বটে, কিন্তু উষা তা পারে।

এক চুমুক দিয়ে রণজিৎ বলল, 'ঠিক হয়েছে।'

—'মিষ্টি?'

—'ঠিক।'

—'দুধ আর লাগবে?'

—'না।'

—'লিকার দেব আর? ইচ্ছে করেই একটু কম দিয়েছি; যে গ্যাসট্রিক পেনের কথা বলেছিলে কাল রাতে আমার মনে হয় ওরকম কড়া চা খেয়ে খেয়ে তাই হয়েছে।'

রণজিৎ টেবিলের থেকে পা দুটো টেনে এনে চেয়ারে ঠিক হয়ে বসল। চায়ে ঘন ঘন বার দুই চুমুক দিয়ে একটা প্যাড টেনে নিল, ফাউনটেন পেনটা বার দুই ঝেঁকে রণজিৎ নিজের মনে বলতে লাগল, 'কে জানে এত টিকিট হবে কিনা, তোমার কাছে আছে?'

উষা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আছে।'

রণজিৎ ঝুঁকে পড়ে লিখছিল।

উষা ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে বললে, 'দেখ।'

রণজিৎ ঘাড় তুলে বললে, 'এ আবার কি?'

—'চিঠি।'

অত্যন্ত উদাসীনভাবে পোস্টকার্ডটার দিকে একবার তাকিয়ে রণজিৎ লিখতে লিখতে বললে, 'কবে এল?'

—'কাল বিকেলে।'

—'খোথে কে?'

—'পাটনা।'

—'কে লিখলে?'

—'দেখ না।'

পোস্টকার্ডখানা হাতে নিয়ে এপিঠ ওপিঠ নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রণজিৎ না পড়ল এক লাইন, না দেখাল পড়বার কোনো আগ্রহ, টেবিলের একপাশে সেটাকে ঘুরিয়ে দিল সে। চায়ে আর-এক চুমুক দিয়ে নিজের চিঠি লিখছে রণজিৎ।

উষা একটু ব্যথিত হয়ে বললে, 'দেখলে না?'

—'আরশোলার ঠ্যাঙের মত লেখা, বুঝলাম না কিছু, কে লিখেছে?'

—'একটি ছোটছেলে, এর চেয়ে ভাল হাতের লেখা কি তার? তোমার হাতের লেখাই-বা এমনকি সুন্দর?'

লিখতে লিখতে রণজিৎ বললে, 'কী লিখল?'

উষার অনেক কথা বলবার ছিল কিন্তু রণজিৎ ক্যাশবাক্সের থেকে খাম ও টিকিট বার করে নিয়ে আবার লিখতে শুরু করেছে। উষারও রান্নাঘরের কাজ বাকি পড়েছিল, বললে, 'এখানে দু-চারদিনের জন্য বেড়াতে আসতে চাচ্ছে ছেলেটি।'

খানিক্ষণ নিস্তব্ধভাবে নিজের মনে লিখতে লিখতে রণজিৎ বললে, 'ছোটছেলে?'

—'এইবার আই এ দিল।'

রণজিৎ একটা লাইনের মাঝখানে সেমিকোলন বসিয়ে দিয়ে বললে, 'কিন্তু কী করে আসবে?'

—'কেন?'

—'বাড়ি ত আমাব নয়।'

—'তা জানি, কিন্তু সে ত।'

—'আমাব শ্বশুববাড়িব লোক নিশ্চযই?'

—'হ্যাঁ, আমাব বাপেব বাড়িব সম্পর্কিত।'

বণজিৎ ফাউনটেন পেনে কালি ভবতে ভবতে বললে, 'সবই ত জান।'

উষাব মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কিছুই যেন সে জানতে চায না।

বনজিৎ বললে, 'এ বাড়িব কোযার্টাব মাস্টাব মেজকাকা ও জ্যেঠামশাই।' কালি ভবতে ভবতে বললে, 'এবং তাদেব পবিবাব পবিজন।' কলমেব নিবটা একটা পিন-কুশনে মুছে নিযে বণজিৎ বললে, 'আমাব শ্বশুববাড়িকে তাবা উচিত সম্মান দেয না, তোমাকেও না।'

উষা তা জানত।

বণজিৎ বললে, 'এ বাড়িতে আমি আব কাউকে আনতে চাই না, অন্য কোথাও যদি যেতে পাবি—'

উষা ঠোঁট ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ দাঁড়িযে বইল। মনেব ভেতব ব্যথা না হতাশা চোখেব জল না আক্রোশ কিছুই সে বুঝে উঠতে পাবছিল না।

বণজিৎ 'টি'-এব মাথা কেটে চলেছে 'আই'-এব ওপব ডট বসাতে কোনো ভুল নেই। কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ, সবই ঠিক ঠিক জাযগায বসে যাচ্ছে।

উষা অবসন্ন হযে উঠে বললে, 'তাহলে সে আসতে পাববে না?'

বণজিৎ ঘাড় নাড়ল শুধু।

—'এ-বাড়িতে এটুকু অধিকাবও তোমাব নেই?'

বনজিৎ বললে, 'না।'

—'আমাব বাপেব বাড়িব এবকম অপমান তোমাব সহ্য হয?'

—'দেখছই ত, আমিও গিললাম, তোমাকেও গেলালাম।'

—:এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবাব কোনো ব্যবস্থাও তুমি কবছ না?'

—'টাকা কোথায?'

এসব প্রশ্ন প্রত্যুত্তব এদেব দুজনেব জীবনেই সহজ হযে এসেছে। এব মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই। ব্যথা অনেক কম। দুজনেই জীবনযুদ্ধে হাবতে বসেছে। অত্যন্ত অল্প বযসেই। এক-একবাব সেই কথা ভেবে অত্যন্ত ক্লেশেব চমক লাগে, কিন্তু এক কাপ ভাল চা পেলে, কিংবা পানসুপুবিব আড়ম্ববে, অথবা চুরুট ফুঁকে জীবনটাকে এত বেশি অসহ্য মনে হয না।

উষা বমেনেব কার্ডখানা ব্লাউজেব ভিতব পুবে নিল। ব্লাউজেব ওপব হাত বুলুতে বুলুতে বললে, 'আমাব বাপেব বাড়ি কি দোষ কবেছে যে এদেব তা চক্ষুশূল?'

বণজিৎ বললে, 'বউযেব বাপেব বাড়ি শ্বশুবদেব ববাববই চক্ষুশূল।'

উষা বললে, 'তবু যদি নিজেব শ্বশুব বেঁচে থাকতেন, এঁদেব কি?'

এদেব কোথায পোড়ানি, সে-সবেব ঢেব ঘাঁটাঘাঁটি হযে গেছে, বণজিৎ আব ঘাঁটাতে যাচ্ছিল না। লিখছিল।

উষা বললে, 'আমাব বোনও যখন এসেছিল, তখনো ওবা ওইবকম কবেছে।'

বণজিৎ হাতেব চিঠিটাকে শেষ কবে এসে নাম সাইন কবলে।

উষা বললে, 'মন খাবাপ হযে যায। লোকেই-বা ভাবে কি? ছিঃ, এমন বাড়িতেও থাকতে হয?'

বাইবেব মস্ত বড় শিবীষগাছ দুটো বাতাসে শোঁ-শোঁ কবে উঠেছে, টেবিলেব কাগজপত্র উড়োতে উড়োতে বাতাস থেমে গেল।

মাথাব এলোমেলো চুল সামলাতে সামলাতে উষা বললে, 'ছেলেমানুষ, পবীক্ষাব পব দু-চাবদিন বেড়াতে আসতে চেযেছে, এখানে গেড়ে বসবে না ত—এতে কাব কী আঁচড় লাগে বল ত দেখি?'

বণজিৎ টেবিলেব উৎক্ষিপ্ত কাগজপত্র গোছাচ্ছিল।

উষা বললে, 'এইবাব আই এ দিল, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে। খুব ভাল ছেলে, বোর্ডে হযত প্রথম আট-দশ জনেব ভেতব হবে।'

কাগজপত্র গুছিযে নিযে বণজিৎ একটা সীসেব ঢাকনি চেপে দিলে।

উষা বললে, 'ওপবে স্ট্যান্ড ত কববেই, তাছাড়া কত বই সে পড়েছে।'

আবাব বাতাস ছাড়ল।

বণজিৎ সীসেব ঢাকনিটাব দিকে তাকিযে ভাবছিল, তিবিক্ষে বৈশাখেব বাতাস না উৎবোলে লেখাই

দায় হবে। কিন্তু এই চিঠিগুলো আজকের ডাকের ভেতর শেষ করা চাই।

উষা বললে, 'গত পুজোর ছুটিতে মুঙ্গের গেলাম না? ওদের বাসায় দিন পনের ছিলাম। আমাকে নিয়ে ওরা কি যে করবে ঠিকই পেলে না, উঠতে-বসতে খেতে-দেতে একটা কুটোও যেন আমার নিজের চিরতে না হয়, এমন পঁইপঁই করে দেখাশোনা। কে কার করে?'

রণজিৎ বললে, 'মানুষ হলেই করে।'

—'তোমরা?'

—'দেখছি ত অমানুষ।'

উষা ঈষৎ খুশি হয়ে বললে, 'তাছাড়া আর কি রাবণের বংশও এমন নচ্ছার ছিল না।'

পোস্ট পেপার বানিয়ে নিয়ে রণজিৎ বললে, 'তা ছিল না বটে।'

উষা আরো খানিকটা খুশি হয়ে পড়ল। বললে, 'যাই বল, তাই বল, আমি রমেনকে আনবই।'

রণজিৎ লিখতে শুরু করেছে। স্ত্রীব কথার কোনো জবাব দিল না। হয়ত সে কথা কানেও যায় নি তার।

উষা বললে, 'আমি আজই লিখে দেব রমেনকে সিধে চলে আসতে।'

রণজিৎ চুপ করে রইল। হয়ত উপেক্ষা করছে তাকে। উষা একটু রুক্ষস্বরে বললে, 'শুনছ?' তোমার বিছানায়ই শোবে কিন্তু।'

—'আমার বিছানায? কে?'

—'রমেন।' উষা বললে, 'তুমি কোথায শোবে?'

—'আমি?'

—'কোথায়? এই গরমের দিনে যে কোনো জায়গায়।'

উষা খুব পরিতৃপ্ত হয়ে বললে, 'মশারি যদি না আনে তাহলে তোমার মশারিটা দিও। আমরা আর খুকুনের মশারিটা খুব বড়, না হলে সেটাই দিতাম।' একটু থেমে বললে, 'এখানে যা মশা, ছেলেমানুষ মশারি আনতে যদি ভুলে যায তাহলে একবাতও ত টিকতে পারবে না। ভাগ্যিস তুমি মশারি ছাড়া শুতে পার।' উষা আহ্লাদে টলমল কবছিল। বললে, 'তোমাব সঙ্গে এই কথা রইল কিন্তু'; রণজিতের টেবিল থেকে চাযের পেযালাটা তুলে নিয়ে উষা মুহূর্তেব মধ্যেই রান্নাঘবের দিকে চলে গেল।

চুরুট জ্বালিযে নিযেছে রণজিৎ।

বাকি কখানা চিঠি পড়ে থাকছে। জরুবি বটে। বড্ড জরুরি। দেড়মাস দুমাস ধবে এই চিঠিগুলো উত্তরেব প্রতীক্ষা কবছে। কিন্তু লিখতে ইচ্ছে কবছে না। লিখে কী হবে? প্রতিটি অক্ষর লেখা হবার পরই মৃত্যু এসে যেন তাকে গিলে খাচ্ছে, এই চিঠিগুলো যেন সব জীবন্মৃতদের ঠিকানায় চলেছে, এখনো যেন এরা ঢেব ধূসর পুবনো হয়ে গেছে, যেন ব্যবহৃত হযে গেছে তারা, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। এই চিঠিগুলো দিয়ে পৃথিবীতে কাব কী প্রযোজন আছে? মিছেমিছি প্রযাস শুধু। জীবনের সমস্ত পুরনো চিঠির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রণজিতের। হাজাব হাজার দিন বসে সেগুলো লেখা হযেছিল, কিন্তু তাব একখানাও আজ কোথাও নেই, কোনো মানুষেব কোনোবকম ব্যবহাবেব উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে পৃথিবীতে কি থাকে? চাযের পেযালাব আস্বাদেব মাধুর্য প্রতি সকালে সন্ধ্যায এমন চমৎকাব হযে বেঁচে থাকে, বিশেষত বেঁচে থাকে এই যখন তা রুচিমত তৈবি হযে আসে, চুরুট প্রতি মুহূর্তেই, যত বেশি চুরুট কেনা যায, খাওযা যায়, জীবনের উপভোগ বেড়ে যায তত, একটা বাস্তব জিনিসকে পাওযা যায, চিঠি, উষার ভালবাসা বা ঘৃণা উপেক্ষা, পবের লেখা গল্প কবিতা বই পৃথিবীর অপর সব মানুষদের [...] কথা কাজ, সবই ধোঁযা শুধু, অসাড়তা মাত্র। রণজিৎ অনেকক্ষণ বসে চুরুটটা শেষ কবল। শিরীষগাছ দুটোর দিকে তাকিযে ছিল সে।

রান্নাঘরের কাজ সেরে এসে উষা বললে, 'একখানা পোস্টকার্ড দাও।'

টেবিলেল ওপর একটু ঝুঁকে দাঁড়িযে দাঁড়িয়েই উষা চিঠিখানা শেষ করল হলুদমাখা হাতে। তারপর রণজিৎকে বললে, 'পোস্ট করে দিও, রমেনকে এসে পড়তে লিখলাম।'

রণজিৎ বললে, 'লিখলেই ত হল না।' উষা রণজিতের মুখ চেপে ধরল।

উষার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রণজিৎ বললে, 'কী চাও তুমি?' মুহূর্তেব মধ্যেই কার্ডখানা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে উষা বললে, 'কিচ্ছু না।'

রণজিতের সঙ্গে আর কোনো কথা নেই তার। উষার [...] মুখের দিকে তাকালে মনেও হয় না মুহূর্ত আগেই তার হৃদয়ের ভিতর থেকে ওই হলুদমাখা আগ্রহস্নিগ্ধ কার্ডখানা বেরিয়ে এসেছিল। কিংবা নিকট ভবিষ্যতে বিরসমুখেও হলুদ বাটতে যাবে সে আর।

উষা তার নিজের ঘরে গিযে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সংসার যাক, তার দগ্ধ হৃদযের দাম

সংসারের চেয়ে ঢের বেশি। সেই রমেন যদি এখন 'উষাদি' বলে ডাক দিয়ে দাঁড়াত এসে, তাহলে দরজা খুলে রণজিতের জন্যও এক কাপ চা তৈরি করে নিয়ে আসতে পারে উষা, কিন্তু এখন সে উনুনে চড়ানো ভেটকি মাছের ঝোল পুড়ে ছারখার হল কিনা দেখতেও যাবে না।

আস্তে আস্তে উষার ঘরের দরজা খুলে তার কানে কানে বলা যায় না কি, এত অধীরতা কেন? জীবন যা তা জেনেও—কিন্তু ওসবে কিছু হবে না।

রক্ষা যারা করবে তাদের জাত আলাদা [...] রণজিৎ অত্যন্ত অস্বস্তিব সঙ্গে দেখছিল। তাদের মধ্যেই একজন, সেই বুড়ো কাপড় ফেরিওয়ালা বিশ্বেশ্বর আসছেন। কাপড়ের মস্ত বড় গাঁটরিটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বিশ্বেশ্বরবাবু ডাক দিলেন, 'বউমা!' বিশ্বেশ্বরের গলা উষার কাছে একটা জিনিস, কাপড় কিনুক না কিনুক নানারকম ঢঙের শাড়ি ও ব্লাউজ পিস ঘাঁটিযেও ফুর্তি পায় উষা।

—'বউমা কাপড় এনেছি, বউমা, কোথায় গো বউমা!'

রণজিৎ বললে, 'কি রকম কাপড় দেখি ত বিশ্বেশ্বরবাবু।'

—'খুলব গাঁটরি?'

—'খুলুন না।'

দরজার আড়ালে উষাকে শুনিযে রণজিৎ বললে, 'গাঁটরি খুলবেন, তাতে আবাব একটা কথা, কচি কলাপাতা রঙের একরকম শাড়ি বেরিয়েছে বাজারে, উঃ কি ফাইন, কল্পনাও করতে পারা যায না যে মানুষ বুনেছে।'

বিশ্বেশ্বব হাসতে হাসতে বললে, 'তাহলে বুনল কে?'

রণজিৎ বললে, 'সারি পাখি আব শুক পাখি মিলে।'

বিশ্বেশ্বর গাঁটবি খুলতে খুলতে বললে, 'পরণ কথা ঢেব শিখেছেন, নিন, এখন রাখুন, কাপড় দেখুন।'

রণজিৎ বললে, 'এই সবই ত দেখছি খদ্দর।'

—'খদ্দর কোথায়? বলেন কি আপনি? এই দেখুন না পাটের শাড়ি, এই মাদ্রাজী, এই দেখুন।'

—'ঢাকাই শাড়ি এমন জ্যালজেলে? খাদির মত দেখায যে?'

—'খাদির মত? জ্যালজেলে?' বিশ্বেশ্বরবাবু থ খেযে গেলেন। দু-চাব মুহূর্ত তাব মুখ দিযে কোনো কথাই বেরুল না। পরে নিজেকে সংববিত কবে নিযে বললেন, 'আচ্ছা বেশ, ঢাকাই শাড়ি যদি আপনাব পছন্দ না হয এই দেখুন বুটিদার।'

—'না, না, ওকি বিশ্রী, সরিয়ে রাখুন, সবিযে রাখুন, বিশ্বেশ্বরবাবু।'

বিশ্বেশ্বরবাবু একটা হাঁকডাক দিযে বললেন, 'বটে, শাড়ি বোঝেন আপনি?' শাড়িগুলো টানতে টানতে বললে, 'খুব বোঝেন। বউমা থাকলে'—কিন্তু কথাটা বিশ্বেশ্ববাবু শেষ করলেন না।

বিরাট শাড়ির স্তূপেব ভিতব ত্যর ব্যবসাযী বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখবভাবে কাজ করছিল। বললে, 'ভাগলপুরী নেবেন?'

বণজিৎ মাথা নেড়ে বললেন, 'দূর!'

—'বেনাবসী?'

—'ছাই।'

—'গুজবাটী?'

—'সে ত একেবাবে জাহান্নামেব জিনিস, বাঙালি মেয়েকে কখনো গুজবাটী শাড়িতে মানায?'

—'কেন?'

—'মরদেব মত দেখায, বড় জোর না মবদেব মত, মেযেমানুষের মত কিছুতেই না।' বণজিৎ অত্যন্ত প্রবলভাবে মাথা নাড়ল।

বিশ্বেশ্বব পরাস্ত হযে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'শস্তা নেবেন না দামি নেবেন?'

রণজিৎ চুরুট জ্বালাচ্ছিল।

বিশ্বেশ্বর বললেন, 'তসরের নেবেন?'

রণজিৎ বললে, 'ও ত বামুন পুরুতে পারে।'

বিশ্বেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললে, 'শাড়িজ্ঞান আপনার টনটনে।' চৌকাঠের ওপব আস্তে আঁস্তে বসে বললে, 'বউমা কোথায়?' বিশ্বেশ্বরবাবু বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছে।

রণজিৎ বললে, 'আচ্ছা দেখি খদ্দরের শাড়িই একখানা।'

বিশ্বেশ্বর উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তাই বলুন, আমি খদ্দর নিয়েই ত বেরিযেছিলাম, খদ্দব বেচবার জন্য।' খদ্দরের রঙচঙা শাড়িগুলো বিছাতে বিছাতে বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, 'ও বেনারসী-ফেনারসী ত

টোপ গেলবার জন্য।'

রণজিৎ বললে, 'দেখুন না আমিও খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছি, খুব বড় বড় ঘরের মেয়েরাও খদ্দরের শাড়ি পরে পরে জিনিসটাকে এমন জমকালো করে তুলেছে যে মেয়েদের এ ছাড়া আর-কিছুতেই মানায় না, কি বলেন বিশ্বেশ্বরবাবু?'

বিশ্বেশ্ববাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'খুব, এই দেখুন, বুটিদার খদ্দর।'

রণজিৎ লাল জরদা হলুদ বেগুনি খাদির শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললে, 'খদ্দর হবে শাদা দুধের মত। চওড়া মুগার পাড়গুলো।'

বিশ্বেশ্বর এক ছোঁয়ে রঙিন শাড়িগুলো গুছিয়ে বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি, আচ্ছা দিচ্ছি, যার যেরকম টেস্ট।'

রণজিৎ তাকিয়ে দেখল উষা এসে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে শাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে, মুখে তাব বিবক্তি হতাশা নিষ্ক্রিযতার এক বিন্দু মাত্র অবদি নেই, সে নিজের জিনিস বেছে গুছিয়ে নিতে এসেছে, অনেকখানি লেট হয়ে গেছে তাব, মুখে তার আগ্রহ উৎসাহ একটা খিধা, যেন একটা হিংসার শেষ নেই আর।

এমনি কবে বাঘিনী কি সন্তানের সঞ্চাব গর্ভে গ্রহণ করে না? মেযেদেব এই দারুণ স্পৃহা, জীবনের যে কোনো কামনা জিনিসেব জন্য, বণজিৎকে অবাক কবে দিল, সে নিজেও নিতান্ত বিরাগ মানুষ নয়, কিন্তু তবুও নিজের ইচ্ছাধীনে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কামনার জিনিস থেকে নিজেকে সে কত তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন কবে ফেলতে পাবে। কেন পারবে না। সবাই কি তা পাববে না।

রণজিৎ ঘাড় হেঁট করে জানল বমেনের জন্য একরতি আগ্রহ কখন যে উষাব হৃদয থেকে উবে গেছে, এতক্ষণ বিছানায পড়ে পড়ে, এই গাঁটরিব প্রতি লোলুপতায উষার মন ভরে ছিল। বেনারসী ভাগলপুবী শাড়ির জন্য মন ছটফট কবে ফিরছিল তাব।

উষা উবু হয়ে বসে খদ্দবেব নীল হলুদ ভিড়গুলো শাখাব মত শাদা কঠিন হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'কি সব অনাসিষ্টি বিছিযে বসেছেন,' বিশ্বেশ্ববাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কই বেনারসীর গাঁটটা খুলুন ত দিকি।' বণজিতেব দিকে তাকিয়ে ক্ষমা কৌতুক কোমল চোখে হাসতে হাসতে বললে, 'শাড়ি বাছা হচ্ছিল পুরুষমানুষ হয়ে, যাও, তোমার কাজে যাও, আমি বেছে নেব এখন।'

রণজিৎ বললে, 'এতক্ষণ আস নি কেন?'

উষা সে কথাব কোনো জবাব না দিযে বিশ্বেশ্ববাবুর খোলা গাঁটেব দিকে তাকিযে ঠোঁট উলটে বললে, 'এই, এই আপনাব বেনারসী!'

বিশ্বেশ্ববাবু লজ্জিত হযে বললেন, 'বেশি দামি চাও বউমা?' কপাল মুছতে মুছতে বললেন, 'তা ত নেই এখন আনিযে নিতে হবে।'

উষা বললে, 'দামটাম বুঝি না, এ কি জিনিস, ছিঃ, এ কেউ পরে? বাস্তবিক বড় মন খারাপ হযে যায।'

বণজিৎ তাকিযে দেখল কেমন খাশাই বেছেছে। কিন্তু তবুও এরই ভেতর একটা বেনারসী বেছে নিল সে, হাঁটু ও কোলেব ভেতর গুঁজে সেটাকে চেপে বাখল উষা। বাঘ যেমন থাবা দিযে চেপে মৃত শিকার অধিকার করে রাখে।

রণজিতের দিকে উষা বললে, 'হ্যাঁ, সে একবকম দেখেছিলাম কলকাতায।'

—'এই যে সেদিন গিযেছিলে?'

—'হু।'

—'তাহলে ফ্যাশনটা এখনো হাল, অনেকে পরে? সে শাড়ি নেই আপনার বিশ্বেশ্বরবাবু?'

বাঁ হাতের তেলোব ভেতব খানিকটা খইনি টেপাটেপি কবছিল বিশ্বেশ্বরবাবু, চৌকাঠের দিকে চোখ মারতে মাবতে বললেন, 'আচ্ছা দেখব।'

উষা উৎসাহিত হযে বললে, 'কবে দেখবেন?'

—'আচ্ছা এনে দেব।'

উষা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

বিশ্বেশ্বরবাবু অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, 'আচ্ছা।' গলা খাকরে বললে, 'একটা মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি নাও না।'

প্রলুব্ধ হযে উষা বললে, 'কই দেখি।'

রণজিতের এইবার থামাবার পালা। এত টাকা সে কোত্থেকে পাবে? দুবেলা অন্নসংস্থান করতেই তার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপত্তি করতে গিয়ে তাব গলা কাঠ হয়ে গেল।

উষার হিংস্র লিপ্সার সামনে নিজের ধীরস্থিব ঠাণ্ডা কল্পনা ও চিন্তার পৃথিবীর জীবন বলেই মনে হচ্ছে না। নিজের মানুষ বলেই হচ্ছে না। বিশ্বেশ্বর ও উষা এমন গভীরভাবে মানুষ!

হাতের তাস
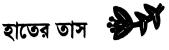
রোদের ভেতর ঘুমের থেকে উঠেই চোখ করকর করে উঠেছে। এক গাল দাড়ি জমে গেছে। প্রমথ আলোর ভিতর শিরিষগাছটার দিকে তাকিয়ে দেখল, আবছায়া দেখাচ্ছে, উঠনে দু-একটা কুকুব ও দু-চারজন লোক যে ঘুরছে তাদেরও কেমন ঝাপসা বোধ হয়।

চোখ তাহলে গেল, এত অল্প বয়সেই, অনেক দিন থেকেই চোখ আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চোখ দেখানো হচ্ছে না। চোখ দেখিয়ে কী হবে? করকরানি অনেক সময়ই থাকে না। পৃথবীকে সব সময়ই ঝাপসা বোধ হয় না। লেখাপড়ার কাজ চলে যাচ্ছে, ভগবান অন্ধ করবেন না। কিন্তু তবু অন্ধ হয়ে যাবার একটা ছাযা।

প্রমথ বিছানার ওপর বসেছিল। উঠিযে দিযেছে তাকে সনাতন, না হলে আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নিত সে।

প্রমথকে উঠতে দেখে সনাতন ঘরেব এক কোণায চুপ মেরে গিয়ে বসল। আবছায়ার মত শিরীষগাছটাকে অনেক গভীর চেষ্টা করেও যখন স্পষ্ট করে দেখতে পারা গেল না প্রমথ খানিকটা বিচলিত হয়ে বললে, 'সনাতন, এর পর খাব কি করে?'

সনাতন বিস্মিত হয়ে বললে, 'কেন বাবু?'

প্রমথ বললে, 'ওখানে থেকে দেখতে পাস, দেযালে পাজির গায কত তারিখ লেখা আজকেব?'

সনাতন চোখ তুলে বললে, 'আজ হল বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবার, তেইশ, তারিখ।'

—'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিস?'

সনাতন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'এর ডবল দূবে গিযেও দেখতে পাব।'

সনাতনের বযস প্রমথেব ডবল হয়ে গেছে।

ডান হাতের আঙুল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে প্রমথ একবার শেষ চেষ্টা করল হাত দশ-বাব দূবে বেড়ার গায ক্যালেন্ডাবের চেনা তাবিখটা বুঝতেও তাকে অত্যন্ত বেগ পেতে হয, কিন্তু তবুও সেটা ঝাপসা হয়ে থাকে। অন্য সব অক্ষবগুলো একেবারেই ধোঁযা।

সনাতন বললে, 'বাবুর দাঁত ঠিক আছে ত?'

চোখ একবার দেখিয়েছিল প্রমথ কিন্তু চশমা তার সুবিধার লাগল না, আজও সে চশমাব কথা ভাবছে না, ভগবান নিশ্চযই শেষ পর্যন্ত তাকে অন্ধ করবেন না। এমনি একটা আশায সে খানিকটা জোর বোধ করল।

প্রমথ বললে, 'দাঁতের কথা আমি ভাবি না।'

সনাতন বললে, 'আসল হচ্ছে দাঁত, মেরেকেটে চশমা দিয়ে চোখ ঠিক রাখা যায, না হয় পরু পাথর দেবেন, কিন্তু দাঁত নষ্ট হয়ে গেলে বড্ড কষ্ট।'

প্রমথ বললে, 'দাঁতের জন্য আমি মাংস ছেড়ে দিয়েছি। একদিন না হয দুধ গিলে খাব শুধু, কিন্তু তাতে ত কোনো বিপদ নেই রে সনাতন, কিন্তু চোখ যদি যায'—প্রমথ বিছানার থেকে উঠে পড়ল।

বাইরের উঠনে গিযে একটু দাঁড়াল সে। কিন্তু এত অজস্র আলো রোদ প্রথম প্রথম ছুঁচের মত মনে হচ্ছে, কিন্তু আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে। মাথার টনটনানিও কমে যাচ্ছে।

মা-বাবা শিগগিরই চেঞ্জে যাবেন। বাবা একটা দেশি ব্যাঙ্কে চল্লিশ বছর ধরে চাকরি করে আসছেন, সেখানে পেনশন নেই, জমেও নি কিছু, প্রমথের নিজের স্থির কোনো রোজগার নেই, বযেস পঁয়তিরিশ হতে চলেছে। বছব তিনেক আগে বিয়ে করে বরং কিছু দেনা জমে গেছে, দেনাটা অবিশ্যি বাবার ঘাড়ে।

বাবার চশমার পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দু-তিন বছর ধরে তাড়া দিযে আসছেন—'ভবতোষবাবু, আর ত চলে না, অঙ্ক যে বড্ড গরমিল হয়ে যাচ্ছে, আমাদের অঙ্ক নিয়েই

কারবার কিনা।' কিন্তু তবুও ভবতোষবাবু আজও আছেন টিকে ব্যাঙ্কে, কিন্তু কাল নাও থাকতে পারেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তবুও অত্যন্ত ভরসাজনক মানুষ, ভবতোষবাবুকে পুরোপুরি মাইনেতে ছমাস ছুটি দিয়েছেন, প্রমথকে ডেকে বলেছেন, 'তুমি বাবা বড্ড ওভারকোয়ালিফাইড; এম এ বি এল না হলে তোমার বাবার জায়গায় তোমাকেই বসাতাম, কিন্তু এত ডিগ্রি-ফিগ্রি দেখলে বড্ড লজ্জা হয়।'

প্রমথ বললে, 'ঠিক বাবার জায়গায় না বসিয়ে একটু ওপরে কোথাও'—ম্যানেজার বললে, 'সেখানে ঢের চৌকশ লোক আছে, কুড়ি পাঁচশি বছর ধরে এই কাজ করছে, কিন্তু তাদেরও ত আমরা রাখতে পারছি না, এত লোকের দরকার ত কিছু নেই।' একটু কাতরভাবে হেসে—'দেশি অফিস কিনা?' নানারকম কাগজপত্রের ভেতর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে—'কোনো বিলেতি অফিসে?'

প্রমথ বললে, 'বয়েস নেই।'

—'বয়স কত হল?'

—'তেত্রিশ।'

ম্যানেজার যেন সাপের ছোবল খেয়ে লাফিয়ে উঠে বললে, 'বল কি?'

—'এই আট-দশ বছর ত প্র্যাকটিশই করছি।'

—'কিছু হল না।'

—'প্রথম গিয়েছিলাম আলিপুর, সেখানে থেকে এলাম দেশে।'

ম্যানেজার ঘাড় কাত করে বললেন, 'জানি।' ম্যানেজার ফাইল নাড়তে নাড়তে বললেন, 'উকিলদের বড্ড কষ্ট, কি নতুন কি পুরনো সব।'

প্রমথ বললে, 'কষ্ট-ফষ্ট কি আর আসল কথা হচ্ছে মন যদি বসত তাহলে—'কিন্তু বলতে বলতে নিজেই থেমে গেল।

ম্যানেজার যেন শুনছিলেন না। এই স্বয়ংসিদ্ধ লোকটির কাছে আক্ষেপ করে জীবনটাকে দেখতে যাওয়া একটা মস্ত বড় ভুল, সে জীবনের প্রতি ম্যানেজারের কেন প্রীতি থাকবে? এম এ বি এল একটা দেশি ব্যাঙ্কের কেরানিগিরির জন্য ওভারকোয়ালিফাইড, প্রমথের সম্বন্ধে ম্যানেজারের এই ধারণা, ধারণাটা নিতান্ত মন্দ নয়, এর থেকে অত্যধিক কিছু তাকে বোঝাতে গেলে এই চমৎকার তাদের বাড়িটা যাবে ভেঙে, নাই-বা ভাঙল, প্রমথ বললে, 'কলকাতায় গিয়ে বাবার চোখ দেখানো হবে।'

—'খুব ভাল ডাক্তারের কাছে যেন দেখানো হয়।'

—'খুব সম্ভব অপারেশন করতে হতে পারে।'

ম্যানেজার একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বললে, 'যদি ছানি পড়ে থাকে শুধু, কাটিয়ে যদি উপকার হয়, আর দু-চার বছর কাজ করবার ক্ষমতা থাকে তাহলে আমার ত তাতে কোনো আপত্তি নেই।'

এতখানি সহানুভূতি পর প্রমথ ভাবছিল, একটু খোশামুদি করলে হয় না কি? ম্যানেজারকে মা বাপ গুরু না বললে চলে এখন আর? এই ম্যানেজারটি ত ইচ্ছে করলেই এখন তাদের সবাইকে পথে বসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কি খোশামুদি করবে সে? এই ম্যানেজারকে? জীবনে কাউকে কোনোদিন সে ত তা করে নি, মনের ভেতর যতবার সে কথা গুছায়, ভাষা কিছুতেই আয়ত্ত হয়ে উঠে না, সেই অদ্ভুত অশ্লীল খোশামুদির ভাষা। সে চেষ্টা রেখে দিল প্রমথ।

প্রমথ বললে, 'চোখ দেখিয়ে যথাবিধি ব্যবস্থা করে তারপর চেঞ্জে নিয়ে যাব।'

ম্যানেজার নাম দস্তখত করতে করতে ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ।'

প্রমথ বললে, 'এমনি শরীর ভাল হলে বিশ্রাম পেলে চোখও'—প্রমথ থামল, সে একটু নার্ভাস গোছের লোক, সব সময় সব কথা শেষ করতে পারে না, তারপর নিজেই একটু অবাক হয়ে ব্যথিত হয়ে সংকল্প করে দুস! এরকম হয় কেন? আর হবে না।

ম্যানেজার বললেন, 'চেঞ্জে তা এই গরমের সময়ই চেঞ্জে যেতে হয়, কোথায় যাওয়া হবে?'

প্রমথ বললে, 'আগে ভেবেছিলাম সমুদ্রের পারে, সমুদ্রর হাওয়া—'

ম্যানেজার নীরবে লিখে যাচ্ছিল।

প্রমথ বললে, 'কিন্তু গোপালপুর পুরী-ফুরী এই গরমে সুবিধে হবে না, তার চেয়ে কোনো হিল স্টেশনেই মনে হল, ভাল, বাবা এবারকার এই গরম যেন আর সহ্য করতে পারছেন না।'

ম্যানেজার বললেন, 'দার্জিলিং-ফাজিংলিং, না আরো দূরে?'

প্রমথ বললে, 'দূরে গেলে ভাল হত, কিন্তু সে আর হবে না, কাছেই কোথাও।'

ম্যানেজার এইবার অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে কাজ করতে লাগলেন।

যখন মনে হ'ল কাজের ভিড় একটু কমে এসেছে প্রমথ একটু ঝালিয়ে নিয়ে বললে, 'তা হলে একটু সুবিধা মত জায়গায় এ ব্যাঙ্কে—'

ম্যানেজার বললেন, 'বললামই ত আমাদের আবো [...] দরকার, এই দু-তিন মাসের ভিতরই আরো কেটেছেঁটে ফেলব ভাবছি।'

প্রমথ বললে, 'তাহলে বাবার জায়গায়, যদি বাবার আর—'

ম্যানেজার বললে, 'ওর জায়গা আর আমরা পূরণ করব না।

ও রকম আট দশটা জায়গায় [....] হয়ে গেছে, সবই উঠিয়ে দিতাম, নেহাত তাতে [...]

আজ আর ম্যানেজার অমায়িকভাবে ওভারকোলিফাইড বলল না।

প্রমথ নিজকে কি যে খাটো করে দিল, এই ব্যথা তাকে সাবাদিন জর্জবিত কবছিল। কিন্তু তবুও কেরানিগিরিটা পেলে হত, মাসে আশি টাকা কে কোথায় পাচ্ছে?

কিন্তু অবস্থা এতটা নিঃসার নয়। প্রমথেব ছোটভাই প্রবোধ আছে। বছর চাব-পাঁচ ধবে জব্বলপুব থেকে তার পঞ্চাশ টাকা প্রতি মাসেই পেনশনেব মত আসছে। এবং প্রবোধ তাব ছোট খাট কাজে পার্মানেন্ট হয়ে যাবে ঠিক।

দুপুর উৎরোতে এখনো দেরি আছে। চারদিকের পাড়াটা এখন নিস্তব্ধ। প্রমথ অনেক দিন থেকেই কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরেব ঘরেব ন্যাওয়েব খাটটার ওপব ঘুমুতে চেষ্টা কবছিল। কিন্তু ঘুমনোটাকে এমন অপচয় মনে হয যেন কুঁড়েমিকে আগলে প্রশ্রয় দেবাব বাকি রইল না আব কিছু। বাস্তবিক সে কুঁড়েই ত। অন্তত বাধ্য হয়ে কুঁড়ে থাকতে হচ্ছে তাকে, কিন্তু তবু হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে কুঁড়েমি হবে না, তাতে হৃদয়ে এত কষ্ট লাগে!

একখানা বই পড়বার চেষ্টা করল প্রমথ, কিন্তু এই বকম বই সে ঢেব পড়েছে, তাতে জীবন কোথাও কিছু এগয় না। কী করবে সে? কোর্টে যাবে? বার লাইব্রেবিতে গিয়ে গল্প? হৃদয়ে এমন ব্যথা লাগে! আব একবার কলকাতায় গিয়ে চাকরিব চেষ্টা কববে? সে-সবের ঢেব দেখেছে সে। প্রমথ অনেক ভেবে দেখল। কিছুই সে করতে পারে না। তার করবাব কিছুই নেই।

ন্যাওবের খাটটাব ওপর পাশ ফিবে শুল সে।

জাম কাঁটাল শিরীষের ভিতর থেকে উপচে পড়ে দুপুরের বাতাসেব আব শেষ নেই, বৈশাখেব বাতাস এমন নীল, কৃষ্ণচূড়াব গাছে হঠাৎ ফুলে ধরে গেছে, বোলতা প্রজাপতি মুনিয়া টুনটুনিব কি সব নবম শব্দ চারদিকে। কিন্তু এসবের দিকে বেশিক্ষণ মন থাকে না।

প্রমথ ভাবছিল আশি টাকার কেরানিনিগিরতেও যদি সে বহাল হয়ে যেত তাহলে একদিন ববিবাবেব দুপুরে এমন জিনিসের মধুরতা কত সত্য মনে হত তার। কিন্তু ভাবতে গিয়েই সে লজ্জা পেল, এখনো জীবন অতটা অপদার্থ হয়ে পড়ে নি। একটু জোর বোধ কবল প্রমথ। ন্যাওয়েব খাটেব ওপর উঠে বসল সে। নস্যের কৌটোর থেকে খুব বড় এক টিপ নেয়া যেতে পারে, একটা ব্যাঙ্কের কেরানিগিবিব কথা ভেবে মনকে কি করে যে সে ছদিন ধরে আবদ্ধ করে রেখেছিল, প্রশস্ত আকাশমাঠের যতদূর অবদি দেখা যায় সেই মন তার ততদূর ততদূর ছড়িয়ে পড়ে। এর পর ব্যাঙ্কের ম্যানেজাবিই-বা কি, জীবন ঢের বড়, ঢের গভীর, ঢের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আঘাত-সংঘাতে অসাধারণ।

প্রমথ আইনেব বইগুলোর দিকে একবার ধীরভাবে তাকাল। এই বইগুলো আজ তার জীবনেব নিষ্ফলতা রটছে না, শধু এসবের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছে, এবা বিভীষিকাময, বইও না, কিছুই নয় যেন, বইগুলির কথা মুহূর্তের ভিতরেই সে ভুলে যাচ্ছে।

অনেক পুরানো একখানা জার্মানি ম্যাগাজিনের বুকের থেকে বছর আষ্টেকের ধুলো ঝেড়ে সেটাকে বুকশেলফের এক কিনার থেকে টেনে বের করল প্রমথ। খাটের ওপর শুয়ে ম্যাগাজিনটা সে পড়তে শুরু করল। যুদ্ধের পরে জার্মানির নিরাপত্তার কথা এর ভেতর ঢের আছে, কিন্তু তবু সে কথাগুলো যাবা সাজিয়ে লিখেছে কলম তারা এমন আশাপ্রদভাবে চালাতে জানে, প্রাণ এমন সাড়া দেয়, চিন্তার জাদুর নিচে হৃদয় এমন অবিষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। জীবনের অনেক কটা দিন যেন লেখাগুলো নিয়ে পড়ে থাকতে পারা যায়।

কয়েকটা জার্মানি কবিতা আছে। পলিটিক্সের বিশেষ কোন ধার ধারে না তারা, রাইনল্যান্ডের এই দুর্দশার ঢের ওপরে, অন্তত ওপারে রূপালি নদীর মত জ্যোৎস্নায় নক্ষত্রে পাইন বনে ছোটাছুটি করছে তারা। কবিতা এমন হবে নাকি? জীবনও এমন হবে নাকি?

বুকের ওপর ম্যাগাজিনটা বন্ধ করে শুযে পড়ে রইল প্রমথ। এই ম্যাগাজিনের আরো দু-চারটে সংখ্যা তাব কাছে আছে। এম এ পাশ করে কলকাতাব এক কলেজে যখন একটা টেম্পোরারি প্রফেসারি পেয়েছিল তখন দুমাসেব ভেতরেই জার্মান শিখে ফেলেছিল সে। কতকগুলো জার্মান বই কিনেছিল। এই ম্যাগাজিনটার গ্রাহক হয়েছিল সে, তারপর দিল সব ছেড়ে।

সে সব আজ কত আগেকার কাথা।

একটা পানকৌড়ি ডাকছিল, মাছরাঙাটা চিৎকার কবে পালিযে যাচ্ছে। হযত অধীর আনন্দে কোথাও মিলিত হতে যাচ্ছে কোন দূব নদীব ওপাবে, রোদ পড়ে আসছে, পৃথিবী হয়ে উঠছে নরম, আম, হিজল, কবমচা, কামরাঙা জামের বাতাসেব ভিতর বিকেলেব মুখে প্রমথ ঘুমিযে পড়ল।

সর্দি হয়েছে বলে খানিকটা গবম গবম দুধেব সুজি খেযে বেলা দশটা না হতেই ভবতোষবাবু একটা ছেঁড়াখোঁড়া পুলওভাবেব গলাবন্ধ একটা জিনেব কোট চাপিযে দিযে পুরু পাথরের চশমাটা পকেটে ফেলে অফিসের দিকে চললেন। এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদেব ভেতব? প্রমথ তাকিয়ে দেখছিল। নোভালিসের একখানা বই আর জার্মান [...] ও ডিকশেনাবি। জার্মানি ভাষাটা আজ সকাল থেকেই খুব উৎসাহের সঙ্গে পাকিয়ে নিচ্ছিল সে। কিন্তু বাবাকে একটা ধ্যাড়ধেড়ে বুড়ো ট্যাড়সগাছের মত নড়তে চড়তে দেখে প্রমথের জার্মানি পড়ে রইল।

কতকগুলো মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল।

তাবপব বইগুলো বন্ধ করে প্রমথ রাস্তাব দিকে আবার যখন তাকিযেছে তখন ভবতোষবাবু আউশধানের পোড়ো খেতটাব ওপাবে আশশ্যাওড়া ঝোপের আড়ালে কোথায চলে গেছে, তাকে আব দেখা যায না। দেখা যখন যায না তখন শান্তিতে কোথাও আছেন নিশ্চয়ই। মরে যখন যাবেন, তখন আকাশে কোথাও শান্তিতে থাকবেন, কিংবা ঘাসেব নিচে, মাটির ভিতর, কিংবা ধোঁয়া আবছাযা কুযাশার মধ্যে। জীবনেব যুদ্ধ তখন ফুরুল। প্রমথেব কাছে এখনো বাবাব জীবনেব যুদ্ধ ফুরুল। তিনি যখন বাড়িব ভিতর নেই আর, বাস্তায যতদূব দেখা যায সেখানেও না। দু-এক মিনিটের ভেতরই বইযের মধ্যে ডুবে গেলে প্রমথ। অন্তত চাইল ডুবে যেতে। কিন্তু ধ্যাড়ধেড়ে বুড়ো। ট্যাড়সগাছের মত সেই দেহটা—

প্রথম বই বন্ধ কবল আবাব।

মাদ্রাজি নস্যেব শিশিটা ফুবিযে গেছে প্রায, খানিকটা ঢেলে শিঙের ভিতর পুরে নিল সে, শিঙ পুরছে না, শিশিও গেছে ফুবিযে। দেবাজেব থেকে একটা কার্ড বের করে মাদ্রাজে একটা রিমাইন্ডার পাঠিযে দেবে? কিন্তু না, প্রতি মাসেই ত ওরা ঠিক মত পাঠায, এখনো ত পাঠাবার সময় হয নি।

ধ্যাড়ধেড়ে ট্যাড়সগাছের মত সেই দেহটা।

থাক, থাক, কী করবে প্রমথ? কী করতে পারে সে?

দিন পনের পবেই ত মাস ছযেকেব ছুটি পাবেন বাবা। চেঞ্জে যাবেন। কলকাতায় গিযে সবচেয়ে ভাল আই স্পেশালিস্টেব কাছে চোখ দেখানো হবে, প্রমথ আশ্বস্ত হয়ে ভাবল বুড়ো বয়সের ছানি, অপারেশন করে অবিশ্যি এমন হবে না সেই যে যুবাবযসের চোখ ফিরে পাবেন। কিন্তু পাঁচ-সাত বছর অফিস-ঘর করতে পারবেন নিশ্চযই, ম্যানেজার বলেছে যদ্দিন ঠিক মত কাজ করতে পারবেন তদ্দিন বাখা হবে।

বাবাকে সঙ্গে কবে প্রমথ যেতে পারবেন না। তাতে ঢের খরচ পড়ে যাবে। মা যাবেন। অনুও যেতে পারে। সুমিত্রা, টুকু ও প্রমথ—স্বামী স্ত্রী মেয়ে এই তিনজনকে এখানেই থাকতে হবে।

পিওন এসেছে। প্রবোধের এক চিঠি। বাবার কাছে। এবং ইনশিওরড কাভারের ভেতর একশটি টাকা, চেঞ্জে যাবার চোখ দেখবার খরচ।

প্রমথ সাইন করে টাকা বাখল। দশখানা নোটই আছে। এই নোটগুলো জব্বালপুর থেকে এসেছে। ভাইযেব জীবনের গন্ধ মাখা। আধ মিনিট বিহ্বল হয়ে সেগুলোর সামনে বসে রইল প্রমথ। তারপর আব ভায়ের কথা কথা নয়, অতি সত্বর প্রবোধের কথা ভুলে যাচ্ছে প্রমথ, হঠাৎ চকিতে মনে হচ্ছে, চেঞ্জের কি আজ সরঞ্জাম করা হল! প্রবোধের একশ টাকা আর বাবার ছ মাসের আগাম মাইনে অনেকগুলো টাকা,

কিন্তু ব্যবস্থাও মন্দ দিনের নয়। টাকাকড়ি বাবার হাতেই থাকবে। তিনিই বরাবর রাখেন। ভালও বাসেন তাই। নিজের অর্জিত টাকা ছাড়া প্রমথ কিছু ছোঁয় না কেন আর? খরচপত্র বিলিব্যবস্থার একটা খশড়া করে দেবে শধু প্রমথ। কে জানে বাবা তা গ্রহণ করবেন কিনা? বাবা নিজেই যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে জানেন।

কোথায় যাওয়া হবে এখনো ঠিক হয় নি। অনেকক্ষণ কঠিন চিন্তার পর প্রমথের মনে কল্পনা এল। প্রমথ ভাবছিল ডাউ হিল? ঘাড় কাত করে ভাবল জিলা স্কুলের টিচাব নবনীবাবু গতবছর সেখানে গিয়েছেলেন, এবারও হয়ত যাবেন। বেণীবাবু গেলে—

প্রমথের হৃদয়ে এ এক চমৎকার প্ল্যান এল ত, নবনীবাবুর সঙ্গে বাবাকে ডাউ হিলে পাঠানো।

বাঃ বাঃ!

সে উঠে দাঁড়াল।

আনন্দের আতিশয্যে টেবিলের বইগুলোকে ওলটপালট কবে ফেলছে সে। অনেকক্ষণ ধরে বইগুলোকে নাড়ছে চাড়ছে। বইগুলোকে সাজাবাব একটা বেদম প্রযাস যেন পেযে বসেছে তাকে। ঘর-দোর বই-বিছানা সমস্ত গুছিয়ে ফেলতে আজ। বাবাকে ডাউ হিলে পাঠাবার মত এমন একটা শৃঙ্খল চিন্তা যখন তার মাথাব ভিতর এল।

কিন্তু কিছুই গুচ্ছচ্ছে না প্রমথ। বারান্দায় পাযচাবি কবে ভেবে ভেবে নিজের মনে হেসে অনেক কটি মহূর্ত কেমন একটা আবেশের ভিতর কাটিয়ে দিল সে।

বেলা প্রায় বারটা হল।

পুরনো একটা তসরেব পাঞ্জাবি পবে একটা চাদব জড়িযে নবীনবাবুব সঙ্গে দেখা করতে বেবিযে গেল সে। জিলা স্কুলে।

কিন্তু এসব জিনিস প্রমথের জীবনের আসল জিনিস নয। যা বাস্তবিকই তাকে ব্যথা দেয এবং তাব আশাকে পঙ্গু কবে ফেলে চোখের ছানি কাটিয়ে ডাউ হিলের ব্যবস্থা কবে তাব সঙ্গে সে লড়ে উঠতে পারবে না।

দুপুব এসে আবার মধ্যাহ্নে গড়িয়ে পড়েছে।

বাইরের ঘরে ন্যাওড়ের খাটে শুযে প্রমথ বাইনল্যান্ডেব হতাশাব কথাগুলো পড়ছিল, কিন্তু লিখবাব ধরন এমন আশাপ্রদ, না জানি কেমন একটা বড় হাতেব ভিতর এই কলম আবদ্ধ ছিল [...] কাছে ববফে পানি বনের ভিতরে কোথায যে সেই মানুষটি তাব বিমর্ষ শান্ত চোখ! হৃদযের বিষণ্ণতা এই আশাপ্রদভাবে কাউকে যদি সে জানাতে পারত! কোনোদিন লেখে নি সে, আজও লিখবার কোনো কথা নেই, কিন্তু লিখে নিজেকে খালাশ করতে পারত যদি সে!

আর্টিস্টবা যতই নিষ্ফল হোক না কেন, সম্রাটেব চেযেও পরিতৃপ্ত তারা। হতাশাব কথাগুলো যখন এমন অদ্ভুত ভবসাজনকভাবে তাদের কলমে ধবা পড়ে! এক একটা প্যাবাগ্রাফ লিখে এক একটা বোঝা নেমে যায় যেন তাদের হৃদযেব ভিতর থেকে—প্যারাগ্রাফগুলো যখন এমন। তারপব তাবা নিজেরা বোঝা বানায় এমনি এবং সেগুলোকে [...] এর ভিতব দিযে ক্ষয় করে এমনি আনন্দে তাদের জীবন চলেছে।

কিন্তু প্রমথ আর্টিস্ট নয়। কিন্তু তবুও কাউকে কযেকটি কথা বলবার জন্য সে আজ বড্ড প্রস্তুত ও বার লাইব্রেরিতে গিয়ে আড্ডা দেবাব কথা ভাবলে, হৃদয়ে হুমড়ি খেযে পড়ে। সে সব কুঠরিব থেকে হৃদয আজ কত দূরে।

বনচাড়ালের গাছে ঘুঘু ডাকছে। আবো দূরে বনমোরগের ডাক।

দুপুরের গরমে চুড়াইগুলো বিলেতি সব গাছের গহনতার ভিতর ঢুকে পড়ছে। সুমিত্রা কোথায়? নিজের জীবনকে প্রমথের স্ত্রী অত্যন্ত অসাড় মনে করে। একটা বেকার উকিলের বউ, একটা উচ্ছন্নে যাওয়া কেরানির একটা দজ্জাল শাশুড়ির পুত্রবধূ—নিজের জীবনটাকে সুমিত্রা একটা পোড়ো ভিটের মবা ধুধুলে লতার মত পঙ্গু মনে করে। এই গরমও তাকে শান্তি দিচ্ছে। টুকুও তাকে যন্ত্রণায় একশেষ করল। কিন্তু তবুও কোনো সান্ত্বনার কথা নিযে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসবার ক্ষমতা প্রমথের নেই, ভালবাসা ত ঢের দূরের জিনিস। কিন্তু তবুও প্রেম বা দম্পতির প্রেম পৃথিবীতে অবাস্তব জিনিস নয়। বিয়ের আগে প্রমথ ভেবেছিল যে তার জীবনেও তা রক্তেমাংসে, আঘ্রাণে, পরমাত্মার পুরস্কারে নিবিড় হযে থাকবে।

কিন্তু কী হল? ঘুঘু যখন ঘুঘুর বুকের ভিতর, মুনিয়া চড়ুই চখা বুনোহাঁস প্রজাপতির লম্পট বঙিন

ডানা যখন পৃথিবীকে স্নেহমুগ্ধ, আগ্রহস্নিগ্ধ চিত্তনিবিড় করে তুলেছে, তখন সুমিত্রা প্রমথের থেকে সবেচেয়ে দূবে থাকতে ভালবাসে। বিয়ের আগে যা অসহ্য মনে হত। সেই নিবিড়তার ভিতরই প্রমথ আজ শান্তি পায়, আরাম পায়।

স্ত্রীর শয্যার কাছে গিয়ে বসবার মত কোনো হৃদয় তার নেই আজ। সহাস নেই, স্বপ্ন নেই, দাক্ষিণ্য নেই, প্রবৃত্তি নেই।

কী করে সে মরে যেতে পারে এই ভাবনায় তার মন আজ ব্যস্ত। ডেস্কের ভিতর থেকে কতকগুলো চিঠি বেরিযে পড়ছে। চার-পাঁচ বছর আগের। কোনো প্রেমিকার অবিশ্যি নয়। প্রমথের জীবনে কোনো প্রেমিকা ছিলনা কোনোদিন। প্রমথেব কবেকার সেই জীবনের কয়েকটি ভাবী বধূর সম্পর্কিত চিঠি এগুলো। এদের যে কেউই তার বধূ হতে পাবত, জীবন, তখনো বড় হয় নি। বধূবরকে অন্ধকারের হেনাব ঘ্রাণের মত মনে হযেছে, হেনার ঘ্রাণ এমন নিবর্থক আজ? বব বলে কেউ নেই এখন আর। বধূ যেন এই কযটি এই চিঠিব ভিতরকাব শ্যামস্নিগ্ধ, রূপলাবণ্যসম্পন্না, পতিপরায়ণা, মমতাকোমল এই মেয়ে কটি। কোনো চিঠি এদেব বাবাব, কোনোটা-বা মামাব, খুড়োর [...] কোনোটা-বা ভবতোষবাবুকে লেখা, কোনেটা-মা প্রমথব বা হেমন্তশশীকে, দু-চাবটা চিঠি সোজা প্রমথকেও। এদের নামাগুলোব ভেতরও কত মাধুরীব মর্যাদা।

এদেব প্রমথ ঠেলে দিল কেন? এই হাতেব লক্ষ্মীদেব, তাব নিষ্করুণ নির্দয চরণাঘাত দিযে?

একটা গভীব গুমরে প্রমথেব মন ভবে উঠল। জীবনকে সে এমন অসম্পন্ন করে ফেলেছে।

জীবন তার আরম্ভই হয় নি। একটা নাগেশ্বর চাঁপাব চারার মত মালতীলতাদের জন্য সে প্রতীক্ষা করেছিল, জীবন আজ কাঁটাঝোপেব ভিতর হাবিযে গেছে। কোনোদিন কোনো অভিসারিকাকে সে ত চায় নি, কৈশোরেব অভিসাব কেমন সে জানে নি কোনোদিন, জানতে চায় নি, যৌবন তাব একেবারেই [...] শূন্য। মেযেদেব থেকে ঢেব দূর, ঢেব, বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু তাব কোনো আক্ষেপ ছিল না তা একটি জিনিসেব জন্যই প্রমথ অপেক্ষা কবে ছিল যে, শান্ত মধুব গৃহধর্মেব জীবন, এ আকাঙক্ষা অত্যন্ত অ-সাধাবণ নয়, কিন্তু তবুও এব প্রসাদ অত্যন্ত গভীব।

কিন্তু তবুও সে স্বাদ চিনল না প্রমথ।

হৃদয তাব গুমবে গুমরে উঠতে লাগল। এই অক্লান্ত নিস্তব্ধ ছাযানিবিড় দুপুব তাকে এমন পীড়িত কবে তুলেছে।

আউশধানেব পোড়ো খেতের কিনাবে দুপুবের নদীব জলেব গন্ধের ভিতব বধূদেব দল, কেউ-বা স্নান শেষ কবেছে, কেউ-বা নামছে, বাতাসেব ভেতব একটা অস্পষ্ট গন্ধ এমন মধুর লাগছে, ভিজে নরম হযে লুটিযে পড়ছে, এদেবই জন্য। এবা না থাকলে দুপুবের নিভাঁজ কঠিনতা স্বামী হৃদযের আকুলির ভিতব দিযে কোথাও যেন একটুও গলত না, একটুও না, একটুও না, কিন্তু তবুও প্রাণেব ভিতব এবাই এমন অপবিসীম আক্ষেপের জন্ম দিল। এবা চলে গেছে।

প্রমথ তাব জীবনেব মালতীলতাদেব গন্ধবিজড়িত চিঠিগুলো ঘাঁটছিল। কিন্তু এও গভীর আক্ষেপে মনটাকে ভরে ফেলে।

জামরুল লিচুগাছেব কালো ছাযা যেখানে জানলার ওপরে এসে পড়েছে পুবের ঘরে সেখানে হেমন্তশশী বসে সেমিজ সেলাই করছে, প্রমথ বাইরের ঘবের থেকে তাকিয়ে দেখল।

প্রমথ উঠল, মা-ব কাছে যাওয়া যাক।

হেমন্তশশী তাকিযে দেখলেন প্রমথকে। কোনো কথা বললেন না।

ছাপর খাটেব ওপর ওঠে বসে প্রমথ আধশোয়া অবস্থায় মাকে বললে, 'বেশ বাতাস ত এখানে।'

হেমন্তশশীব কথা বলবাব কোনো ইচ্ছা ছিল না যেন।

প্রমথ একটু আঘাত পেল।

বিযে করবার পর থেকেও মা-ও প্রমথের ওপর খানিকটা বিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়ত সুমিত্রার [...] সুমিত্রা হেমন্তশশীর সম্মান রাখেন।

সেমিজের থেকে ছুঁচটা টেনে বের করে দুপাটি দাঁতের ভেতর শক্ত করে সেটাকে আটকে নিয়ে হেমন্তশশী বললেন, 'সকাল থেকেই আজ মাথা ঘুরছিল, তবুও রান্নাবান্না আমাকেই করতে হয়, সুমিত্রাকে শুধু বলেছিলাম স্বর্ণসিন্দুরের শিশিটা কোথায় একটু খুঁজে বার করবে বউ?' হেমন্তশশী সেলাই শুরু করল।

প্রমথ বললে, 'দেয় নি বেব কবে?'

—'দেবে আবাব! সেদিন আমাব কপালে চাঁদ—'

প্রমথ বললে, 'বড্ড বেয়াদব ত।'

হেমন্তশশী বললে, 'এই বকমই।' সেলাই কবতে কবতে বললেন, 'ও শোধবাবে না, মেবে কেটে কববে কি তুমি!'

মাববাব কাটাবাব ইচ্ছা প্রমথেব ছিল না। সে পথ তাব নয়, মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে এক-আধটা রুক্ষ কথা বেবিয়ে যায় বটে, তাও মাব সামনে, সুমিত্রাব শয্যাব পাশে বসে, সে যা পায় তাই হজম কবে যত নিবিড় কালকূটই হোক না তা। বউয়েব প্রতি মা-ব একটু সহানুভূতি জানাবাব জন্য মাকে বললে, মুশকিল হয়েছে, ওব দিদি পড়েছে আই এস এস-এব ঘবে কিনা, সে কথা সব সময়ই ওব মনেব ভেতব চাড়া দিয়ে ওঠে। কোথায় সেই মুঙ্গেবেব শাহেবি বাংলো, ব্যাঙ্কেব দু-চাব লাখ, আব কোথায় আমাদেব খড়কুটো। একেবাবে আকাশ-জমিন তফাত কিনা।

হেমন্তশশী সাবেকি মানুষ। অতীতযুগেব বধূ। আধুনিকাব চোখ নেই তাব। এই তফাত তাকে স্পর্শ কবছে না।

সাবেকি আমলেব বধূবা যা বলে, সাবেকিভাবে ভাষায় অলঙ্কাবে, প্রমথেব কথাব প্রত্যুত্তবে একে একে তিনি সবই বললেন।

কিন্তু আজকেব জীবনেব প্রয়োজনে মা-ব এই কথাগুলো নিতান্ত [...]। শুনবাবও উপযুক্ত ব'লে বোধ হচ্ছে না। প্রমথ অন্য কথা পেড়ে বললে, 'কিন্তু বিয়ে হবাব পবই সন্তান হল, মেয়েবা তা চায় না।'

হেমন্তশশী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সুমিত্রা তাই বলে নাকি?'

প্রমথ কথাটা চেপে বাখল, মা-ব সঙ্গে এসব নিয়ে বেশিদূব এগবাব প্রয়োজন নেই, আজকেব মায়েদেবও ইনি বুঝবেন না। প্রমথ বললে, 'ঘুমেব থেকে উঠেই টুক্কুব দু-বালতি ভবা জামা কাঁথা জাঙ্গিয়া [...] মেটে সাবান দিয়ে কেমন ফুসফুস কবে কাচে সুমিত্রা, তাবপব মেহেদিগাছেব বেড়াব ওপব সেগুলো শুকোতে দেয়। আব যাই হোক মেয়েটি বড্ড সাফ, ঘবদোব বেশ ঝবঝবে কবে বাখে।'

হেমন্তশশী ঠোঁট উলটে বললেন, 'ওই নিজেব ঘবদোবই, আমাদেব এদিক ভেসে গেলে ও আমাদেবই সামলাতে হয়।'

প্রমথ বললে, 'ছোটবেলায় নাকি ওব টায়ফয়েড হয়েছিল। তাবপব থেকেই বেশি খাটতে-ফাটতে পাবে না, অল্পেই বুক ধড়ফড় কবে কবে ওঠে।'

হেমন্তশশী বললেন, 'কিন্তু যেটুকুও খাটে, তাব জন্য কেমন হুলো বিড়ালেব মত বাগে ফুলতে থাকে, দেখি নি কি? মনে মনে বিতৃষ্ণ হয়ে ভাবি, বাছা এব চেয়ে তুমি ছাপবখাটেই শুয়ে থাক, আমাদেব শান্তি দাও।'

শান্তি? প্রমথও কি ভাবে নি; সুমিত্রা তুমি যেদিকে খুশি চলে যাও, আমাকে তুমি নিজেব মনে স্থিব থাকতে দাও।

কিন্তু কী কবে এই মেয়েটিকে সবাবে তাবা? সেই মালতীলতাদেব কথা মনে হচ্ছিল তাব। তাবা এখন বিভিন্ন ঘবেব কল্যাণী বধূ হয়ত, কিংবা কি তাবা, কে জানে? তাদেব কথা ভুলে যেতে হয়। অনেকক্ষণ গুম মেবে জামরুলগাছটাব দিকে তাকিয়ে থেকে প্রমথ বললে, 'শত দাবিদ্র্য থাকলেও বিবাহিত জীবনে তোমবা ঢেব সুখী।'

হেমন্তশশী তা অস্বীকাব কবলেন না।

—'কিন্তু কী কবে এই মেয়েটিকে নিয়ে আমি চলব?'

হেমন্তশশী কোনো কথা বললেন না।

প্রমথ বললে, 'আমাকে নিয়েই-বা এই মেয়েটি চলবে কী কবে?'

হেমন্তশশী নীববে সেলাই কবছিলেন।

হেমন্তশশীব মুখেব দিকে তাকিয়ে দেখ, কোনো মীমাংসা কববাব অভিপ্রায়, কোনো সান্ত্বনা দেবাব রুচি তাব মুখেব ত্রিসীমানায়ও নেই। ক্ষুব্ধ না হয়ে পাবা যায়! প্রমথ নিজেকে মায়েব সবচেয়ে প্রিয়সন্তান বলেই জেনে এসেছে, মায়েব এই বিবস উদাসীনতা তাকে আঘাত দিচ্ছে। জীবনে এ একটা নতুন জিনিস, মায়েব এই মর্মান্তিক উপেক্ষা। প্রমথেব যে কোনো সমস্যা অসুবিধাব সমাধানেব জন্য হেমন্তশশী একসময়

অধীব হযে উঠতেন। আজ একটা জীবনমবণেব প্রশ্ন মাযেব কাছে উত্থাপিত হযেছিল। প্রমথ দেখল, হেমন্তশশী সমস্ত শবীবটাকে কুঞ্চিত কবে আছেন। বাপবে' এবপব। দুপুবেব শ্যামস্নিগ্ধ আম জামরুলেব দেহগুলোকে যেন মাযেব চেযে ভাল লাগে, নিকটতব মনে হয, ছোটবেলাব থেকে এই শ্যামল গন্ধ ছাযা কোমল গাছগুলোকে পেযে এসেছে প্রমথ। আজও তাবা নিজেদেব স্থগিত কবে বাখে নি ত'

জামরুলেব বুকেব বাতাসভবা শীতলতাব ভিতব প্রমথ চোখ বুজল।

হেমন্তশশী বললেন, 'এই যে দেশ থেকে বেরুচ্ছি, আব না ফিবলে ভাল হত, প্রবোধেব ওখানে . গিযে থাকতে ইচ্ছা কবে।'

প্রমথ ধীবে ধীবে চোখ মেলে বললে, 'তা থাকতে পাব।'

হেমন্তশশী বললেন, 'তাই দেখব।' আবাব সেলাই ধবে বললেন, 'প্রবোধ বলছে বিযে কববে না।' একটু হেসে বললেন, 'সেই ভাল, আজকালকাব ছেলেমেযেদেব বিযে সার্থক হয না।'

প্রমথ বললে, 'তোমাব কাপড়চোপড় ত বিশেষ নেই, সুমিত্রাব কযেকখানা শাড়ি তোমাকে দেব। সুমিত্রাব একখানা ভাল শাল আছে, তাতে তোমাব খানিকটা শীত মানাবে।'

হেমন্তশশী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'থাক।'

প্রমথ বললে, 'থাকবে কেন? নতুন জিনিস একবস্তা কিনবাব কি দবকাব? তোমাদেব ত অনেকদিন থাকতে হবে। আগেই অনেকগুলো টাকা নষ্ট কবে—'

হেমন্তশশী বললেন, এই কথা বলছ? তবে শোন, আমাব হাতে চাবগাছা সোনাব চুড়ি ছিল দেখেছিলে ত?'

ববাববই দেখে এসেছে প্রমথ, পঁচিশ বছব ধবে, কিন্তু একটু বিস্মিত হযে মা-ব হাতেব দিকে তাকিযে দেখল একগাছাও নেই।

—'চুড়িগুলো কোথায গেল?'

—'কিছুই কি জান না?

—'না ত।'

—'সুমিত্রা সেগুলো ভেঙে কেমন নতুন ঢঙেব ব্রেসলেট বানিযেছে, স্ত্রীব হাতে তাও দেখ নি?'

বাস্তবিক দেখে নি প্রমথ। এসব বিষযে নজব তাব ঢেব কম। সুমিত্রাও তাকে কিছু বলে নি। নিজেব অঙ্গাভবণেব শোভা সুমিত্রা ববাববই মেযেদেব দেখায, তাবপব বাসি হযে গেলে-স্বামীকে। কিন্তু। কিন্তু এবাব সে প্রমথকে একেবাবেই বাদ দিল।

প্রমথ বললে, 'তুমি তাকে দিযেছিলে নাকি চুড়িগুলো'

হেমন্তশশী বিবক্ত হযে মাথা নেড়ে বললেন, 'কখন দিলাম? দিলাম আবাব? প্রমথ বললে, 'তাহলে পেল কী কবে?

হেমন্তশশী বললেন, এ বাড়িতে এসে অবদি এই চুড়ি চাবগাছাব ওপব ওব লোভ, নিজেব হাতে দুগাছা রুলি ছাড়া আব কিছু নেই এজন্য আক্ষেপেব ওব শেষ ছিল না, কিন্তু বাপেব বাড়িব থেকেই যখন ছাই জিনিস পেযেছে তখন পবেব সম্পদে ওবকম হিংসে দেখানো কি মেযেমানুষকে মানায?'

প্রমথ ঘাড় হেঁট কবে শুনছিল।

হেমন্তশশী বললেন, সেই থেকে তা আব হাত থেকে খসাল না, একবাব তাকিযেও দেখল না যে মা মান্যি শাশুড়িব হাতে কোন ছাতাপেড়া বযেছে। হেমন্তশশী একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু তাতেই কুলল না, আমাদেব কিনা সেকেলে চুড়িবালা ভেঙে তিনি ব্রেসলেট বানালেন কলকাতায ফবমাশ দিযে—'

প্রমথ একটু অবাক হযে ভাবছিল এত জিনিস হল, আমি কিছু জানলাম না, কেই-বা সাধ্যেদ সুমিত্রাব ব্রেসলেট বানিযেছিল?

হেমন্তশশী বললেন, 'এখন আমাব হাতে এই চাবগাছা শাঁখা শুধু কিন্তু বলি না কিছু, বললেই ও দাঁতকপাটি শুরু।'

প্রমথ বিহ্বল হযে বললে, 'এসব গড়াল কাকে দিযে?'

—'জানি না, তুমি কিছুই কি জান না বাছা?'

প্রমথ বললে, 'না না, আমি কিছুই জানি না।'

হেমন্তশশী খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে বললেন, 'চেঞ্জে যাচ্ছি, সাধ হল যে সোনা পবি, কেন পবব

না? পরের সোনা নয় ত। সোনা না পরলে এয়োকেই–বা মানায় কী করে? বললাম, বউমা, 'আমার চুড়ি কগাছা দেবে?' আকাশ থেকে পড়ে বললে, 'কীসের চুড়ি মা?' বললাম, 'কেন এই ব্রেসলেট গড়ালে কি দিয়ে! আমার চুড়ি দিয়ে নয়?' ফোঁস করে বলে উঠলে, 'আপনার চুড়িতে সোনা ছিল নাকি আবার? কারিগর গলিয়ে বললে সব ভেজাল, আধভরি অন্দাজও হবে না।' প্রমথের দিকে তাকিয়ে হেমন্তশশী বললেন, 'কথা শুনলে?'

সেমিজের এক কোণে ছুঁচটা ফুঁড়ে রেখে হেমন্তশশী বললেন, 'ইচ্ছে হল দেই দু ঘা চড়িয়ে, দেই চড়িয়ে দু ঘা, কিন্তু নিজেকে সংবরবরণ করে রাখলাম। বললাম, তাহলে এমন চকচকে ফাইন চারগাছা ব্রেসলেট কার পেটের থেকে বেরুল?'

প্রমথ মায়ের দিকে মৃদু অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকাল।

হেমন্তশশী বললেন, 'বললে বাপের বাড়ি থেকে তিনটে গিনি এনেছিল, তাই ভেঙে'—হেমন্তশশী থামলেন। পরে বললেন, 'এর আর কি বলব? ক্ষমা ছাড়া এর আর ওষুধ নেই।'

প্রমথ বললে, 'তিন–চার বছরেই কি তা বোঝা যায়? একটা জীবনের শেষ পর্যন্ত না দেখলে ধরতে পারা যায় না কিছু।' জীবনের এই রুক্ষ সমস্যা নিয়ে নিজেকে এরকম কবে প্রবোধ দেবার কথা ত প্রমথের নয়, এটা ছিল মায়ের কাজ। কিন্তু তিনিই বিষম বিষম কথা বলে ফেলেছেন সব, সব ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছেন, প্রবোধের বিবাহহীন জীবন, শান্তি আরাম সচ্ছলতা এই সবই আজ তার কামনা। প্রমথ কেউ নয় আজ।

ভবতোষবাবু, প্রবোধ, অনুপমা, প্রমথের দিকে পিছ ফিরে যে কোনো মুহূর্তে এই সমবাযেব ভেতর হেমন্তশশীর প্রবেশ করলেই হয়, অপরাজিতার একটা শিশিরস্নিগ্ধ বিরাট জঙ্গলের ভিতর সন্ধ্যাব মুখে একটা প্রজাপতির মত। তা হোক, প্রমথ মাকে আটকে রাখবে না।

অবিবাহের ভিতর জীবন নিস্তার পায নি, বর হযেও পেল না। বিবাহকে ছিন্ন করা? তার ভেতবেও কোনো নিষ্কৃতি নেই, তাহলে টুকুর অবস্থায়–বা হবে কি? তাছাড়া জীবনের থেকে দাক্ষিণ্য, অতদূব মুছে যায় নি এখনো। বড়জোর এইটুকু সে পারে, সুমিত্রা যদি বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে চায আন্তরিক উপলব্ধিতে ও প্রযোজনে, তাহলে প্রমথ তাকে কোনো বাধা দেবে না।

মাযেরা চেঞ্জে চলে গেছেন, সেই মাস থেকে জব্বলপুরে প্রবোধের কাছে গিযে থাকবেন। অপরাশেন করতে গিযে বাবার চোখ নষ্ট হযে গেছে।

প্রমথ ভাবছিল, জীবন কীসের জন্য অপেক্ষা কবছে? সাবেকি লোকদের মত জীবনটাকে ঘুলিযে ফেলা যায় খুব সহজে। কিন্তু জীবনকে ওদের মত করে দেখছে না প্রমথ। জীবন খুব ভরসাজনক কতকগুলো জিনিসের জন্য প্রতীক্ষা করছে, একটা চাকরি, বার্থকন্ট্রোলের ক্যাপ, সুমিত্রার জন্য স্থাযী বকমেব একটা টনিক, যথেষ্ট শাড়ি ও গযনা, নিজেব জন্য প্রতি প্রতি মেইলেই বই, ছবি, হতাশা, আত্মহত্যা, বধূনির্যাতন এসবের দিন চলে গিযেছে, বিবাহকে বিচ্ছিন্ন কবা মানে হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দেযা, জীবনের বিশাল স্থির খেলোযাড়ের ধর্ম তা নয, তাস যা পেযেছি, ঘুঁটিগুলো যেবকম এসে দাঁড়িযেছে, সেই সব নিযেই শেষ পর্যন্ত অগ্রসব হওয়া বিশাল বিরাট মানুষের জীবন।

কোনো গন্ধ

ওপরে ফুটো খড়ের চাল, নিচে মাটির ভিতের ওপর মেহগিনি কাঠের কয়েকখানা বড় বড় টেবিল, তিন চারটা ছাপরখাট, আলনা, দেরাজ, বাক্স, আরশি—ঘবদোরের সাজগোছ বিলাসও দারিদ্র্যের ফেলাছড়ার ভিতর অভিনবরূপে ফুটে উঠেছে।

যে কোনো টেবিল ধরা যাক, সেলাইযের কল, ফুলদানি, চামড়ার ছোট ব্যাটাচে কেশ, অসম্পূর্ণ সেলাই, নতুন পুবনো নোবেল লবিয়েটদের দু-চারখানা বই, বিস্তর রাবিশ লেখার আবর্জনা, স্কুলের ছেলেমেয়েদের অঙ্ক ইংরেজির খাতা সংশোধনেব জন্য টাল মাবা, আধপেযালা চা, সাবান পাউডার, মুড়ির বাটি, খড়কুটো কচি আমেব টুকবো, বিবন, এলোমেলো চিঠি, এলেনবারির ফিডিং বোতলের পেটে খানিকটা দুধ, এইসব অত্যন্ত বিশৃঙ্খভাবে ছড়িযে রযেছে।

ঘরের চারদিকে মোটামুটি তাকিযে দেখলে মন্দ দেখায না, ভোরের বেলা যখন এই সবেব ওপর বোদ এসে পড়ে, রকমারি একটু বেড়ে যায। এই সব বিলাস উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে বসে জীবনটাকে কোনো এক আশাপ্রদ দিকে নিযে যাওযার কথা ভাবতে গিযে মুষড়ে পড়তে হয় না। কিন্তু তবুও সে সব কথা বড় একটা ভাবে না কেউ। ঘরের বেড়া অনেকখানি টিনের, খানিকটা খলপার, ও বাকিটুকু কেউড় বাঁশের ও কঞ্চিব, যথেষ্ট আলকাতরা মাখা।

বৈশাখের রাত। রাত দুটোব সময স্নান করে কলেবার ডিউটি দিযে সুধীশ ফিরল। দরজা খোলাই ছিল। আস্তে আস্তে নিজের বিছানায গিযে ঢুকল সে। বিবাহিত হযেও একা বিছানায় একা শোবার সুবিধা তার হয়েছে। তার কারণ বিযেটা গেল বোশেখের আগেব বোশেখে হযেছে, ছাতকুঁড়োর সোঁদাল গন্ধ ধরে গেছে দাম্পত্য জীবনেব ওপর, বোঝা যায না, সেটা মিষ্টি না তেতো, কিন্তু পুরনো বটে, ঢের পুরানো।

কাঞ্চনমালা খুকিকে নিযে আব এক কোঠায আলাদা বিছানায শোয। সাড়ে তিনটের সময সুধীশের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, খুকি কাঁদছে, কাঞ্চনেব পাখাব ডাঁটা এপাশ-ওপাশ কবে উঠল, এই হচ্ছে ইশাবা, খুকিকে এখন সুধীশেব নিজের বিছানায নিযে আসতে হবে, কাঞ্চনমালা আব বাতাস দিযে পারে না, সে এখন একটু আরামে ঘুমতে চায।

সুধীশ উঠল। স্ত্রীব বিছানাব কাছে গিযে লংক্লথ ও কাঁথাসুদ্ধ মেযেটাকে মশারিব ভিতর থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে বের করে নিতে হচ্ছে, অন্ধকাব নদীর ভেতব থেকে একটা কাতল মাছকে সাপটে চরের দিকে নেয়ার মত।

খানিকটা যেতেই কাঞ্চন ফোঁস কবে বললে, 'খুকুব বালিশ ভুলে গেলে যে।'

সুধীশ আর ফিরল না।

স্ত্রীর ঘরেব দরজা পেরিযেই মার কোঠা।

সরোজিনী বললেন, 'কে সুধীশ নাকি?'

সুধীশ কোনো জবাব দিল না।

সবোজিনী বললেন, 'টুককুনকে বুঝি বউ আব রাখতে পাবল না?'

কাঞ্চনমালা এ ঘরের থেকে গজগজ কবে উঠে বললে, 'খুকুকে তুমি এদিকে দিযে যাও, থাক নিয়ে আব কাজ নেই, কেন মিছেমিছি কথার ভিতব যাব আমি, দশ রাজ্যি ঢাক না পিটোলে আর চলে না বাত দুপুরে।' বলতে বলতে পাশ ফিরে শুযে ঘুমিযে পড়ল কাঞ্চন।

সবোজিনী বললেন, 'টুককুনকে আমার কাছে বেখে যা সুধী'—

—'তোমার মশারি বড্ড ছেঁড়া না মা?'

—'তা আছে, আছে বাতাস দেব।'

—'বাতাসই চায বেটি।' মায়ের মশারির ওপর হাত পড়ল সুধীশের।

কি যেন কী ভেবে সবোজনী বললেন, 'কিন্তু এখানে বড্ড ছারপোকা বে সুধী।'

সুধীশ অন্ধকারের ভিতর আব দাঁড়াল না। বললে, 'আমার বিছানাযই নিযে যাই।'

সরোজিনী বললেন, 'তাই ভাল।' হাতপাখায বাতাস খেতে খেতে তিনিও ঘুমবার চেষ্টা করছেন।

সুধীশ নিজেব বিছানায টুককুনকে শুইযে দিযে মাথাব দিকেব জানলাটা খুলে দিল।

শেষ বাতে চাঁদ উঠেছে। জানলাব ভিতব দিযে চাবদিককাব আম জিওল ভ্যাটশ্যাওড়া ও বেউড় বাঁশেব বনটাকে বেশ পবিষ্কাব দেখা যাচ্ছে, পুবদিকে অপবাজিতাব একটা জঙ্গলেব ভিতব হঠাৎ এক ঝাঁক অজস্র জোনাকিব এলোমেলো ওড়াউড়ি দেখে মনে হয কতকগুলো সাপ মণি মাথায কবে যেন বাতাসে বাতাসে ছোটাছুটি কবছে, কোন পাতালেব মণিকুমাবী মণিমালাব পাযেব নিচে। কোন এক নিতল দিঘিব অতল জলশয্যাব নিচেব স্থিব ঠাণ্ডা পুলকাবিষ্ট পৃথিবীব মত এই বাতেব প্রদেশ।

শিবিষেব থেকে একটা ঝিবঝিবে হাওযা এসে একটা ঝড়েব মত উঠে আবাব থেমে গেল, এবপব অপবিসীম নিস্তব্ধতায কতকগুলো পেঁচা, কতকগুলো পেঁচাকে প্রত্যুত্তব দিচ্ছে শুধু, ওই তাবা বনেব ওপাবে, হযত বেউড় জঙ্গলেব ভিতব। সুধীশ বিছানায বসে দেখল টুককুন দুই চোখ মেলে শুযে বযেছে, মেযেটি কোনো কথা বলবে না এখন, বাপেব দিকেও তাকাবে না, জানালাব ভিতব দিযে জামরুল গাছগুলোব দিকে তাকিযে আছে সে। ডালপালাব ওপব জ্যোৎস্না আব বাতাস সিনেমাব ছবি তৈবি কবছে, এই জন্য।

একটা পেঁচা উড়ে এল, কৃষ্ণচূড়াব চূড়াব ওপব বসেছে সে, ডাকছে।

সুধীশ বললে, 'টুককুন শুনছ মা?'

টুককুন কান খাড়া কবেছে।'

—'এই যে ডাকছে, উ-ই—'

সুধীশ কৃষ্ণচূড়াব ডালেব দিকে হাত ইশাবা কবে দেখাল।

সবোজিনী বললেন, 'কী ডাকছে বে?'

সুধীশ বললে, 'কিছু না।'

খানিকটা স্তব্ধতাব পব টুককুন বললে, 'বু—উ—উই—' খিক কবে সে হেসে উঠল। এই জ্যোৎস্না, বাতাস, সুধীশ, হযত পেঁচাব ডাকও সমস্ত মিশে তাকে প্রচুব আমোদ দিচ্ছে। মাড়িব চাবটে শক্ত দাঁত বেব কবে ধবে উৎসাহে তামাশায সে খিটখিট কবতে লাগল, দাঁতকটা মাসদেড়েক হল উঠেছে, এই চাবটে জিনিস টুককুনকে জীবনেব [...]। সুধীশেব চোখ ঘুমে ভেঙে আসছিল। কিন্তু মেযেটি ববং জাগবেই, বাপকে বসিযে বাখবে, টুককুনকে যদি না পাবে ববং সুধীশকেই খেলা দেবে সে।

মেযেটি ভোব পাঁচটাব সময ঘুমল।

আটটাব সময যখন ঘুমেব থেকে উঠেছে সুধীশ, তখন টুককুনেব জন্য বিছানাব চাবদিকে একবাব তাকাল সে, কিন্তু মেযেটিকে হযত মা নিযে গেছেন, কিংবা কাঞ্চন।

কলেবাব ডিউটি দেযা হল এই তিন বাত। তাব ওপব আবদাবে মেযেব চাড়ে বাত জাগা, সুধীশেব শবীবটা মোটেই ভাল লাগছিল না। ঘুমেব থেকে উঠে বিছানাব ওপব খানিকক্ষণ সে বসে বইল। কেউ চা তৈবি কবে আনে নি। বস্তুত সুধীশ ঘুমুচ্ছে কি জেগে উঠেছে সে সব জেনে দেখবাব কোনো কৌতূহলও কাবু নেই। দূবেব থেকে ভিতববাড়িব অজস্র বকমেব হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে, বাত ফুবলে যেমন বোজই হয, আজও তেমনি না জানি কত কি নিযে তাবা ব্যস্ত হযে পড়েছে। কিছুই না, খুঁড়ে দেখতে গেলে বোঝা যাবে কি সব ফানুষেব [...]। কাঞ্চনকে সে চা বানাতে বলবে না। সুধীশেব স্ত্রী সে, উচিত ছিল না কি তাব স্বামীব জন্য এতক্ষণে চা তৈবি কবে নিযে আসাব, খুব জানে কাঞ্চন যে সুধীশ খুব চা খেতে বেশ ভালবাসে, বোজ চাব-পাঁচ পেযালা খায, এবং এখন বিশেষ কবে চাযেব প্রযোজন তাব। এ সবই জানে, তবুও তাকে ডেকে পাঠাতে হবে, সাধতে হবে, মন একটা বিতৃষ্ণায ভবে উঠল সুধীশেব।

কাঞ্চনমালাব সম্প্রতি আবাব এক ফ্যাকড়া হযেছে চাযেব সঙ্গে সে দোকাড়া চিনি মেশাবে না, কেন, টুককুনেব জন্য এলেনবাবিব ফিডিং বোতল বিলিতি নয, বোঁটা বিলিতি নয, গ্ল্যাক্সো বিলিতি নয। কিন্তু তবুও দোকড়া চিনিবই সব দোষ, অত্যন্ত তিক্ত হযে উঠল সুধীশ। সুধীশেব ছাপবখাটেব কিনাব ঘিষে একটা বনাতেব চওড়া পবদাব ওপাবে সেলাইযেব কলেব শব্দ হচ্ছিল।

সুধীশ ভাবছিল, কে? কাঞ্চনমালা নয ত?

কিন্তু কাঞ্চনেব গলা ভিতববাড়িতে খ্যান খ্যান কবে উঠছে। তাহলে হযত অনুপমা, সুধীশেব বোন, অনুকেই চা দিতে বলা যাক, সে বেশ স্নিগ্ধ চা তৈবি কবতে পাবে, তাজা দুধ আব দোকড়া চিনি মিশিযে।

সুধীশ উঠে দাঁড়াল। দেবাজেব মস্ত বড় আবশিটাতে তাব মুখেব আকাব দেখতে পাওযা যাচ্ছে। কেলি, কেলিন্দি, কে যেন তাকে ঠাট্টা কবতে এল।

কিন্তু পনেব মিনিটেব মধ্যেই চেহাবাটাকে বাগিযে নেবে সে। তখন এই আবশিই তাকে স্নিগ্ধ পুবস্কাব ফিবিযে দেবে।

বনাতের পরদা সরাতেই সুধীশ থ হয়ে গেল। তার মেজশালী শুভা কল চালাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সেরে নিতে নিতে সুধীশ বললে, 'বা, তুমি কোত্থেকে?'

শুভা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কলকাতার থেকে, আজ ভোরের বেলা এসেছি, একেবারে পাঁচটার সময় আপনি তখন ঘুমিয়েছিলেন।' শুভা নিজেই বসল।

সুধীশ একটা চেয়ার ঘুরিয়ে বসে বললে, 'কই খবর-টবর কিছু দিলে না কেন, স্টেশন থেকে একাই চলে এসেছ—'

শুভা বললে, 'ভারি ত লাগে আসতে, কতবার এলাম, কলকাতার থেকে একা জার্নি করতে পারা যায় আর স্টেশন থেকে এটুকু আসতে লোক লাগে!' চোখ সেলাইয়ের কলের দিকে।

সুধীশ বললে, 'কেমন পরীক্ষা দিলে?'

শুভা বললে, 'ভাল দেই নি। সত্যি ঢঙ করে বলছি না সুধীদা, আচ্ছা আপনাকে কোয়েশচেনগুলো দেখাচ্ছি।' শুভা তার সুটকেশ খুলতে যাচ্ছিল।

সুধীশ বললে, 'এখন থাক।'

এই মেয়েটিও খুব ভাল চা তৈরি করতে পারে, তার হাতের চা ঢের খেয়েছে সুধীশ। কিন্তু এই ত ট্রেনের থেকে নেমে এল, কিন্তু তবুও একে বলতে পারা যায়, খুব সহাস্যমুখে সহজে আগ্রহের সঙ্গে করে নিয়ে আসবে সে। কিন্তু এসব মমতাদাক্ষিণ্য হাতের পাঁচ, সহসা খরচ করে ফেলতে হয় না, বার বার ঘাটিয়ে খতিয়ে দেখবার ইচ্ছাও ভুল।

সুধীশ বললে, 'এসেই সেলাই করছ যে।'

শুভা আঙুল দিয়ে হুইলটা একবার ঘুরিয়ে কলের হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে বললে, 'শখ হল।'

—'এটা কি?'

—'একটা ব্লাউজ বানাবার চেষ্টায় আছি।'

—'ব্লাউজপিস ত খাসা।'

—'রঙটা আপনার পছন্দ হচ্ছে? সুধীদা?'

বাংলা কথা বলবার ঢঙের মধ্যে ব্রিটিশ বলে, যেন কোনো [...] মেয়ে কথা বলছে, রঙ তেমনি ফরশা।

সুধীশ বললে, 'এটাকে কি কাপড় বলে শুভা?'

অনুপমা বা কাঞ্চন হলে এতক্ষণে তীব্র উপহাস করে সুধীশকে ঝেঁটিয়ে বলত, 'কী মেয়েমানুষি করছ?' তাকে হাসাস্পদ করে তুলত। অনধিকার চর্চার থেকে তাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিত। কিন্তু শুভা বরং তাকে নানা ধরনের ব্লাউজের কাপড়ের নাম শেখাচ্ছে। নমুনা দেখাচ্ছে তার সুটকেশের থেকে বের করে। যেন এসব সুধীশের জানা মন্দ নয়। জানাতে গিয়ে শুভারই ঢের আনন্দ ও কোমলতা। অবশ্যি যে কোনো সময় কাঞ্চনমালা এসে একটা কঠিন শ্লেষের সুর পিটোতে পারে। তখন পালিয়ে যাবে সুধীশ। যতক্ষণ শুভা একা আছে, একটু বসা যাক। কিন্তু বাসিমুখে মুখাবয়বের অশ্লীলতা, রাত্রি জাগার জড়তা এইসব নিয়ে একটু বাধা পেতে হয়। চায়ের ফরমাশও দেওয়া হয় নি। সুধী উঠে পড়বে ভাবছিল।

শুভা বললে, 'আপনি এতক্ষণ ঘুমলেন যে?'

সুধীশ বললে, 'তুমি এসে অবধি কল নিয়ে বসেছ নাকি?'

—'ট্রেনেই চা ব্রেকফার্স্ট সেরে এসেছি, তারপর এসে টুককুনকে আপনার বিছানার থেকে সরালাম, উঠে বসে বসে কাঁদছিল, তাও আপনি টের পান নি হয়ত।'

—'আমার বিছানার মশারিও তুমি তুলে দিয়েছিলে?'

শুভা বললে, 'হ্যাঁ।'

সুধীশ বললে, 'তাই।' চুপ করল সে।

—'তাই মানে?'

—'কি একটা বোকের গন্ধ পাচ্ছিলাম, আমার বিছানায় আমার মশারিতে, অবাক হয়ে ভাবছিলাম এ ঘ্রাণ এল কোত্থেকে! বড়লোকদের বাথরুম, আট-দশ বছর আগের কথা, কি যেন কি সব রাত, অনেক কিছু মনে পড়ে গেল।' শুভার দিকে তাকিয়ে সুধীশ বললে, 'আমার বিছানায় তুমি এসেন্স ছড়িয়ে দিয়েছেলে না শিশি খুলে? তখন আমি ঘুমিয়েছিলাম, আমর চুলেও ঢের পড়েছে আমার'—অপ্রস্তুত হবার মেয়ে শুভা নয়, তবুও ঘাড় হেঁট করে লজ্জা পেল সে।

সুধীশ বললে, 'এই কদিন ফিনাইল আর স্টুলের গন্ধে ভুলে গিয়েছিলাম যে পৃথিবীতে ভরসাজনক কোনো গন্ধও আবার আছে নাকি?' কিন্তু এত ঘ্রাণ, এই স্নিগ্ধ কোমলতা, এই শুভা, জীবনটাকেও আশাপ্রদ করে তোলে।

বেশি বয়সের ভালবাসা

রাত দুটো।

ড্রয়িংরুমে গল্প চলেছে, ভাই বোনে।

সন্ধ্যার থেকে এই অবদি দুজনের যে কথাবার্তা হয়েছে—এদেরও যেন সে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসিন্ধিৎসা ছিল না। কিন্তু এখন যা শোনা যাচ্ছে!

আভা বললে, 'বি-এ পাশ করে আমি কয়েক মাস টিচারি করলাম, তারপর ডায়োসেশনে গেলাম বিটি পড়তে।

সুহৃৎ বললে, 'বি টি? তার মানে জীবনভর টিচারি করবারই ইচ্ছা শুধু? এই হল শুধু?'

আভা বললে, 'বি টি পাশ করে জলপাইগুড়িতে টিচারি নিলাম, সেখান থেকে দার্জিলিং, সেখান থেকে সিমলা।'

সুহৃৎ অবসন্নভাবে চুরুটটা রেখে দিয়ে বললে, 'বি টি হিলস্টেশনে টিচারি, সেলাইয়ের কল, শাড়ি আর ব্লাউজ পিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, এক ধরনের মেয়ে যেন জন্মের থেকে এসবের জন্য তৈরি হয়েই এসেছে। জীবনের আর কোনো দিনই তারা ধরতে পারে না যেন।' চুরুটটা তুলে নিয়ে বললে, 'বাস্তবিক এদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে না?'

আভা নিজের বেণীর রিবন নাড়াচ্ছিল।

সুহৃৎ বললে, 'এসব কেমন যেন। এসব মেয়েরা জীবনের ওপর ঢের বীতশ্রদ্ধ, না আভা?'

আভা সে কথার কোনো জবাব দিল না।

—'হিলস্টেশন অন্তত আমার ভাল লাগে না, বাস্তবিক সিমলা শিলং দার্জিলিঙের জন্য মানুষদের এত আগ্রহ দেখেই এগুলোর প্রতি কেমন ঘৃণা বোধ হল আমার। যা মানুষের প্রাণের ভেতর এত আদিখ্যেতা জাগায় সে সব জিনিস ভাল লাগে না।'

সুহৃদ একটু তৃপ্ত হয়ে চুরুটে টান দিল। বোনের মতের সঙ্গে তারও মিল। আভা বললে, 'কলকাতার গরম শত অসহ্য হলেও তাই-ই ভাল, লক্ষ লক্ষ লোক যা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে সে-সবের থেকে আমি পালিয়ে যেতে চাই না, কলকাতার গরম তাই আমার সহ্য হয়, বি এ, বি টি-র যথাযথ পুরস্কারের লালসা বুকের ভিতর জেগে ওঠে না আর।' আভা বললে, 'আর এই কেষ্টচূড়া ফুলগুলো কলকাতার চোত-বোশেখের আকাশ ছেয়ে কি মিষ্টি, মেজদা—'

সুহৃৎ বললে, 'আমিও ছোটবেলার থেকে এই রকমই ভেবেছি; দার্জিলিং আমি বার পঁচিশেক যেতে পারতাম, কিন্তু একবার গিয়েছি শুধু, সিমলা শিলং দেখিই নি, বাবার চাড়ে বিলেত গিয়েছিলাম, আট দশ বছর কাটিয়েও এলাম, কিন্তু কোনো নেশা ছিল না, বিলেতও যেমন, দেশের পাড়াগাঁও তেমনি কোনোকিছুই হৃদয়কে এমন পেয়ে বসে না যে সেখানে না থাকলেই নয়।' চুরুটে একটা টান দিয়ে সুহৃৎ বললে, 'শীত উপভোগ করতে লোকে দার্জিলিং যায়? গরমের সময় শীত যে উপভোগ্য তা স্বীকার করি, কিন্তু যেখানে জিমন্যাসিয়াম নেই গবর্নরের ব্যান্ড নেই, রেস নেই, ক্লাব নেই, অশ্লীল ঘেঁষাঘেঁষি নেই, অথচ পাহাড় আছ বরফ আছে এমন কোনো শীতাক্ত প্রদেশে। দুচার জনে মিলে ক্যাম্প ফেলা, সেই বরং ভাল, ঢের ভাল, কী বলো আভা?'

আভা বললে, 'ও-ও একটা লম্পটতা শেষ পর্যন্ত, বিজ্ঞাপন দিলেই ঢের ক্যাবিনেট জুটে যাবে, সিমলা ফেলে তোমার ক্যাম্পের দিকে ছুটবে তারা, যেখানে শান্তি বিচ্ছিন্নতার জন্য বরং কিছুকালের জন্য গেলে হয়, সেটাকে শুধু জাঁকজমক শুধু স্পৃহার জিনিস করে তুলবে তারা। কলকাতাই ভাল।' মুখ তুলে, 'আমি তাই সিমলা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম।'

সুহৃৎ বললে, 'নাইনটিন টুয়েনটিটু-র কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তখন আমি বিলেতে, দু-বছর হল আই সি এস ফেল করে চুপচাপ বসে আছি।' সুহৃৎ পা ছড়িয়ে দিয়ে চুরুট টানতে লাগল।

আভা বললে, 'কলকাতায় টিচারি নিলাম।'

—'না নিলেও ত পারতে।'

—'কী করব?'

—'চুপচাপ আমার মত বসে থেকে পৃথিবীটা দেখতে।'

—'পৃথিবীটা?'

—'কেন অবাক হলে?'

—'অত ঘুরবার টাকা কোথায় মেজদা?'

—'এক পয়সাও লাগে না।' সুহৃৎ বললে, 'কলকাতার একটা সামান্য বস্তিকে একঘণ্টার ভিতর যা কিছু দেখা যায় অনেক মানুষই সমস্তটা পৃথিবী ঘুরেও তা দেখে না। এই দেখ না বাবা যত টাকা পাঠাতেন, ইচ্ছে করলে সমস্ত ইউরোপ টহল দিয়ে বেড়াতে পারতাম, কিন্তু লন্ডনে রইলাম শুধু, শুধু সোহোর দিকে যেতাম, বেশি সময় বিলেতের পাড়াগাঁয়, হাজার হাজার পাড়াগাঁয় নয়, একটি দুটি, সেই পুরনো একঘেয়ে [...] ফিরতাম, কিন্তু তখন যে ডায়েরি রাখতাম, দেখেছি একটি পাতার সঙ্গে তার আর একটি পাতা মেলে না—রোজই কিছু নতুন পাচ্ছি।' চুরুটটা রেখে দিয়ে, 'আর লন্ডনের রাস্তা ধরো যদি, শধু রাস্তা, আর কিছু না, বুঝলে আভা?'

আভা জানত সব। মেজদা তার দশ বছর এমনি করে বিলেতে কাটিয়েছে। আই সি এস ফেল করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফেল করেছেন, ডক্টরেট পেল না, ব্লিচিং শিখতে গিয়ে ছেড়ে দিল, কত কিছুতে হাত দিল, হাত দিল মাত্র, দেশে ফিরবার মুখে লন্ডন ইউনিভার্সিটির থেকে সামান্য একটা ডিগ্রি নিয়ে এল, আর্টসে কলকাতার একটা প্রাইভেট কলেজে রোজ একঘণ্টা পড়ায়, এও ছেড়ে দিতে চায়, ভাল লাগে না। চব্বিশ ঘণ্টা নিজের হাতে রাখবে, পড়বে, চুরুট ফুঁকবে, কথা বলবে, ডায়েরিতে জীবনের নতুন অভিজ্ঞতার নোট রাখবে, নতুন অভিজ্ঞতা কীরকম? একদিন মেজদা ডায়েরিতে নোট করল যে মেজকাকা (বাবার নিজের ভাই) অবিনাশকাকা (বাবার পিসতুত ভাই), অতসী (সুহৃতের জেঠতুত বোন), উৎসতী (জেঠতুতু বোনের মেয়ে) এবং অর্দ্ধেন্দু (বাবার মামাতো ভাইয়ের ছেলে) এরা পরস্পরের সঙ্গে নিকট সম্পর্কিত হলেও একই ডালপালা বংশের ঝাড়ের যেতা বেশ বোঝা যায়, কারণ, কারু সঙ্গে কথা বলতে গেলে সন্দিগ্ধভাবে চোখে ঘুরিয়ে তাকায় তারা। যেন পৃথিবীটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এই বিশেষত্বটা এই পরিবারের জাত জিনিস, যেখানে রক্তের সম্বন্ধ পাতালা, সেখানে তা অটুট হয়ে রইল।

এর পরেই লিখেছেন, পাশের বোর্ডিঙের ডেপুটিবাবু, চব্বিশ পরগনার, এতদিন পরে রিটায়ার করল। বাবা! শাদা দাড়ি চুল নিয়ে সেই এগারটার সময় অফিসে যাওয়া আর পাঁচটার সময় ফিরে আসা। তারপর এসেই গোটা সাতেক কমলা নিয়ে বসা, শেষ না হতেই থিওসফির লেকচার শুনতে বেরুনো, ফিরে এসেই অত্যন্ত বিশ্রী ব্যগ্রতার সঙ্গে ব্রিজ, রাত এগারটা অবদি, এ ঘুমের ভিতরেও কেমন একটা ব্যস্ততা, একটু সবুর করে বসে, বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো জিনিস দেখবার সময় নেই, এক-একদিন অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে আমার মনে হত ওর মত ওরকম বেকসুর ভাবে না চলে জীবনটাকে মাটি করে দিলাম না ত।

এর পরেই এই নোট. একখানা পুরনো বই আবার পড়ছি, ওকেমির জুনো অ্যান্ড দি পেকর হাতের কাছে আর কেউ নেই বলে ফুটপাথের ওদিকের বাড়িটায় একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে 'প্রেম বিলায়ো, প্রেম বিলায়ো' [...]

এমনি নোটের পরে নোট। মেজদা ডায়েরি ভরে, পৃথিবীটাকে দেখে ডায়েরি ধূসর হয়ে উঠলে সগুলোকে ফেলে দেয়।

এর আগের পাতা উলটোলে . চার-পাঁচটা ট্রাম গোটাদশেক বাস হাইকোর্টের দিকে গেল, তবুও লাকটা উঠছে না, লোকটার চেহারা দেখে বোঝা যায় কেরানি, আমি ঘড়ি ধরে বসেছি, নিশ্চয়ই [...] ন্য অপেক্ষা করছে, একটা কি দুটো পয়সা ভিখিরিকে যখন দিই, এদেরও দিলে এরা খুশি হয়, অন্তত আমি খুব খুশি হই, খুব সবুড়ে বিড়ি টানছে [...] ট্রাম আসতেই উঠে পড়েছে। [...] লালদিঘিতে, আমিও বে এলে পারি। কিন্তু আজ একটার সময় কলেজ রয়েছে, রাবিশ!

অথবা সেদিন বিলাস মজুমদার জাইগ্যান্টিক কোম্পানির সেক্রেটারি বলছিল যে তাদের অফিসের করানি বেছে নেয়া হয় একটা ওয়েটিং লিস্ট থেকে, তিনশ পাতার, মাইনে পনের কুড়ি টাকা, জাইগ্যান্টিক দেশি ফার্ম, দুবছর হল খোলা হয়েছে। ওয়েটিং লিস্টে কাদের নাম? বাস্তবিক? একটু আগে. মানীর খুকিকে দেখলাম কাল, ওর মা-র ডেস্ক থেকে আমার ডেস্কে একটা বেয়ারিং চিঠির মত, কোলে নিতে পারা যায় না।

এর আগেব নোটটা: আজকে ইষ্টার ইদের ষ্টেটসম্যান লিখেছে [...] [...] লিখতে খুব বাধে দেখছি এ কলমে, এমন দিন আসছে যখন দাম্পত্য প্রেম সতীত্ব বা [...] এই সবই খুব [...] মনে হবে। কিংবা: এক একটা বেয়াড়া মানুষকে এমন থেঁতলে দিতে ইচ্ছা করে কিন্তু তাদের রক্তমাংস পরিপূর্ণ ভাবে থেঁতলানিব ব্যথা খাবে, আমারই মত। এই কথা মনে হলেই তাদের ওপর রাগ আমার নিভে যায়। একটা নোটবুকে মন ভরে ওঠে। নিজেদের রক্তমাংস আমরা এতবেশি ভালবাসি। লোকটা তার জীবনের সমস্ত বেদনা নিয়ে আমার কাছে উদঘাটিত হয।

আভা বললে, 'টিচারি নিলাম।'

[...] 'টিচারির দুর্দশার কথা আমাকে যখন প্রায় মেলে লিখতে—উনিশশ তেইশে?'

—'হ্যাঁ।'

সুহৃদৎ ঘাড় নেড়ে বললে, 'মনে আছে।'

আভা বললে, 'আমার ধারণা ছিল, তুমি যখন বিলেত থেকে আর ফিরলে না, বাবা মাত্র মারা গেলেন, আবার প্রবৃত্তিও যখন আছে, অবসরও পেলাম, একটা পেশা নেই।'

—'কী ধরনের?'

—'ভেবেছিলাম ব্যারিষ্টার হব।'

সুহৃৎ বললে, 'হলে না কেন?'

—'টাকায কুললো না।'

সুহৃৎ বললে, 'আমায লিখলেই পারতে।'

—'কী লিখব? তুমি কি করতে পারতে? টাকাব টানাটানিতে নিজেই মবছিলে।'

—'সে ব্যবস্থা আমি কবতে পারতাম। আমি তোমাকে সিধে বিলেতে চলে আসতে বলতাম।'

—'সে যাক গে, ভেবে দেখলাম ওসব মনে ধরছে না।'

—'মনে ধবছে না?'

—'তা ঠিক নয, যে মুহূর্তে আবেগ আসে, ঠিক তখনই কাজ কবতে হয, আবেগ উৎবে গেলে আর্টিষ্টের পক্ষে লিখতে বসা যেমন ভুল কারু পক্ষে কোনো সংকল্প খাটাতে যাওযাও তেমনি নিবর্থক।'

আভা বললে, 'ভাবলাম যা এডুকেশন নিযেছি তাতেই লেগে থাকি, অবিশ্যি সামান্য মাষ্টাবি নিযে নয কিন্তু এজন্যও বিলেতে যাওযাব প্রযোজন ছিল।' একটু হেসে বললে, 'বিলেত যে না যেতে পারতাম তা নয, বৃত্তি জোগাড় করা যেত। টাকা ধাব পেতাম। অনেক কিছু করা যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত একজন স্কুল ইন্সপেক্টব না হয খুব বড় ধবনের, কিন্তু তা হয়ে কী হবে?'

সুহৃৎ বললে, 'বাবা গেছেন [...] খেটে [...] পযসা রোজগার করে, সাবাটা জীবন [...] কোনো একদিন তোমার মত প্রশ্ন করতে বসতেন? কিন্তু সাবেককালের লোকদেব মনেব ভেতব কোনো খটকা ছিল না।'

আভা বললে, 'খটকা থাকতে পাবে, কিন্তু তাই বলে আজকালকার লোকদেব মত অবসাদ আমাব নেই, কুঁড়েমি আমার একটুও ভাল লাগে না, কোনো একটা জিনিস নিযে অতিব্যস্ত হযে থাকতে চাই, মুশকিল হচ্ছে কী যে ধরব কী যে ছাড়ব বুঝতে পাবি না। টিচিং লাইনের খুব আশাপ্রদ পরিণতিটাও ভাল লাগল না।'

সুহৃৎ চুরুটটা জ্বালিযে নিল।

আভা বললে, 'মাষ্টাবি ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম লিখব।'

—'কী লিখবে?'

—'গল্প কবিতা প্রবন্ধ।'

—'কবিতা? কোনোদিন লিখতে?'

—'কোনোদিন লিখি নি, তাই একটা কৌতূহল হল।'

—'লিখতে শুরু করলে?'

—'হ্যাঁ, কবিতাই প্রথম লিখলাম।'

—'কী নিযে?'

—'নিজেব জীবনের অভিজ্ঞতা নিযেই অবিশ্যি, যে জিনিস আমি জানি না বুঝি না নিজের জীবনে সে সবের সাথে কোনো পরিচয নেই, সেই সমস্ত কল্পিত ব্যাপার নিয়ে আমি লিখতে পাবি না, যতদিন ভালবেসেছি, ভালবাসার কবিতাও লিখতে পেবেছি, যেই দেখলাম, ভালবাসি না ত আর, অমনি সেই ধরনের কবিতা বন্ধ হযে গেল। স্নেহের কবিতা লেখা হল, দক্ষিণার, করুণার ঘৃণার, উপেক্ষার, কিন্তু

ভালবাসার আর বেরুল না।'

—'ভালবেসেছিলে?'

—'সুহৃতের এ প্রশ্ন আভার কানে গেল না। সে বললে, 'অবশেষে পোলিটিক্স সম্বন্ধেও কবিতা লিখলাম।'

—'কই, আছে সে সব? না ছিড়ে ফেলেছ?'

—'আছে, কিন্তু দেশকে আমি তোমাদের সকলের মত ভালবাসতে পারি নি, বিদেশকেও সিবিল ডিসওবিডিয়েন্সের অর্গানাইজারদেব মত ঘৃণা করতে পারি নি। ঠিক কথা বলতে গেলে মেজদা, বিদেশের অনেক জিনিসই আমি ভালবেসেছি। একটি জিনিস, দেখ, আমাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটির লিটারেচাবের প্রফেসাররাও ড্রাইডেন সম্বন্ধে যত কথা বলবে, দেবেন সেন সম্বন্ধে তার সিকির সিকিও বলতে চাইবে না, হয়ত দেবেন সেনকে চেনেও না, কিংবা যদি-বা চেনে এবং দেবেন সেন বা গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে যদি-বা বলবে বা লিখতে যায় খুব আন্তরিকভাবেই মনে কববে যে একটা উঁচু গদির থেকে নেমে এসে দু-চার মিনিটেব জন্য এই কাজটা করতে এসেছে, অথচ এরা খদ্দরের কাপড় পরবে, বিড়ি টানবে এবং নিজেদের দেশি বলে জাহির কববে। কিন্তু এবাই হচ্ছে বিলেতি। আমাব মনে হয় জর্জেটের শাড়ি পরেও কর্ণফুলি আরিয়াল খাঁ বোরো ধান আউশ বাবলা ভাঁটশ্যাওড়া আম কাঁটাল বট হিজলের এই বাংলাদেশকে খুব গভীবভাবে ভালবাসতে পাবা যায়—এব দেবেন সেনকে ভাল লাগে, এব গোবিন্দচন্দ্রকে, বাংলা সম্বন্ধে অত্যন্ত সত্যিকাবরূপে ভাবপ্রবণ হযে উঠতে পাবা যায়, আমাব বিশেষ [...] কারণ এই যে দেশেব খাঁটি রূপ ও রস সম্বন্ধে আমবা যথেষ্ট ভাবপ্রবণ নই, শুধু তর্কবুদ্ধি দিয়ে ন্যাশনালিস্ট হতে চাই, এ ন্যাশনালিজম কেমন মেজদা? এর পবিণতি প্রায় ত ড্রাইডেন সম্বন্ধে পাঁচশি পাতা নোট ডিক্টেট কবে, ভাসান গান, ময়নামতীব গান, নীতিকবিতা বাংলার প্রাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ থেকে।'

সুহৃৎ বললে, 'কিন্তু ময়নামতীর গানের বাংলা আর নেই।'

—'তা স্বীকার কবি।'

—'দেবেন সেনের কবিতার বাঙালিও আছে কি?'

—'কে জানে? হয়ত নেই, হয়ত সমস্তই বদলাচ্ছে, কিন্তু তবুও রেস্টোরেশন ড্রামা বা ড্রাইডেনেব চেয়ে এরা আমাদের ঢের নিকট।'

সুহৃৎ বললে, 'কিন্তু প্রফেসবদের কথা বলছ কেন, তুমি? বাংলাদেশের জীবিত লেখকদেব ধাবণা [কী?] তাবাও কি হাড়ে-বিদেশি?'

—'প্রফেসবদের কথাই বলছি না শুধু, ওদেব দেশেব আধুনিক সাহিত্যও কিছু ইউনিভার্সিটি সার্কেলের দিকে তাকিয়ে থাকে না, কিন্তু তবুও ইউরোপীয় বাক্যের রোমান্টিসিজম প্লেটোসিজম বা স্পেন্সার নিয়ে ওদের প্রফেসাবরা মাথা ঘামাচ্ছে লেকচাব দিচ্ছে লিখছে বলে আমাদেরও মাথা ঘামাতে হবে লেকচাব দিতে হবে লিখতে হবে? এইগুলো নিয়ে শুধু? আমাদেব প্রফেসরদেব কথাবার্তা বা লাইব্রেবি ঘাঁটিয়ে মনে হয়, যেন তাদের জীবন এসব ছাড়া চিন্তাকল্পনার পৃথিবী অন্য কিছু নেই আর, কোথাও নেই।'

সুহৃৎ বললে, 'কিন্তু আমি যা বলছিলাম, বাংলাদেশের আধুনিক লেখকদের ধবো জর্জিয়ান পোয়েট্রির জগৎটা কি নিকটতর তাদের কাছেও কবিতার কথাই ধবা যাক, তাদেব নিজের কবিতা কি সে সবের রূপান্তর শুধু? শুধু বিলেতি খিস্তি ভালবাসা, বিলেতি স্টাইল, বিলেতি ভাব, বিলেতি ছন্দ?'

আভা বললে, 'বাংলাদেশে এখন কটি কবিই-বা আছে? কিন্তু একটি বা দুটি যাই থাক না কেন ইংলন্ডের রেনেসাঁস যেমন শুধু ইটালির থেকে চোরাই জিনিস নয়, বাংলাদেশের যে কোনো আধুনিক খাঁটি কবিতা বা গল্প কক্ষনো জর্জীয় বা কন্টিনেন্টাল জিনিসের ফিরে ফিরতি নয় শুধু, এই বাংলাকে অন্তর দিয়ে বুঝে না দেখলে এর ভাষা ও মানুষকে ভালবেসে না আযত্ত কবতে পারলে তা বেরয় না।' আভা বললে, 'আমি নিজেও কক্ষনো বাংলায় বাঙালির কথা লিখতে যেতাম না।' বাংলা ভাষায় নিজের কথা ফোটাতে যেতাম না যদি না এই গাছপালা নদী মানুষগুলো আমাব কাছে বিশেষ বলে না মনে হত, এদের জন্য কোনো ভালবাসা বা ঘৃণা কিছুই আমার না থাকত, এদের নিয়ে সেন্টিমেন্টাল হযে না পড়তাম।'

সুহৃৎ বললে, 'কবিতা থামালে কেন?'

—'শক্তিতে কুললো না শেষ পর্যন্ত।'

—'কীবকম?'

—'ভালবাসার কবিতা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, উপেক্ষা অবহেলার কবিতাও লিখতাম, শীতার্থ উদাসীনতার কবিতাও লিখতাম।' আভা একটু হেসে বললে, 'তারপর একদিন দেখি এসবের চেয়ে একটা

ধেনো ইঁদুর সম্বন্ধে বরং লিখতে ইচ্ছা করছে, বুঝলাম সেই ছেলেটি আমাকে যতই ভালবাসুক না কেন ওকে আর আমি গ্রাহ্য করি না, প্রেমের থেকে মন একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে, ধেনো ইঁদর ফড়িং, ঘাস, শুকনো পাতার চট আমের বোল হিজল জোনাকি নিয়ে লিখছি তাই।'

সুহৃৎ বললে, 'লিখে আমোদ পেতে?'

—'খুব।'

—'কিন্তু পোয়েট্রি হত না?'

—'তা জানি না, অ্যান্টি হযে লিখেছি, নিজের চেতনা দিয়ে অনুভব করে।'

—'এখনো লোখো?'

—'বছর তিনেক হল লেখা ছেড়ে দিযেছি।'

—'কেন?'

—'একদিন একটা পায়জামা সম্বন্ধে কবিতা লিখতে বসলাম, তখন কিছুতেই তা লিখে উঠতে পাবলাম না, অথচ পায়জামা এত পরিচিত। সেই থেকে কবিতা থামল।' আভা বললে, 'তারপর থেকে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছি।'

—'কি?'

—'সেই পাযজামার কবিতাটা ফুরুতে, কিন্তু এই তিন বছর ধরে চেষ্টা কবেও পারলাম না।'

সুহৃতের অত্যন্ত কৌতুক বোধ হচ্ছিল।

আভা বললে, 'হাসছ? কিন্তু এ ঠাট্টার জিনিস নয় মেজদা, হাজাব বাব কেটেছেঁটে কবিতাটা যতদূব অবদি লিখেছি তুমি দেখো, কবিতাটা ধাঁধা নয, লিমেরিক নয, ছন্দেব এক একসর্পেবিমেন্টও নয়, তামাশার পিচকারিও না, কযেক লাইন [...]'

সুহৃৎ বললে, 'টিচাবি ছাড়লে, ভালবাসা গেল, সাহিত্য গেল, সাধাবণ বি এ বি টি-দেব মত সিমলা শিলং তোমার অস্পৃশ্য, হিলস্টেশনেব স্কুল ঘৃণার্হ তুমি সেলাই ভালবাসো না, যা তা ব্লাউজ পিস বা শাড়ি হলেই হল, এসবের জন্য কোনো আগ্রহ নেই তোমাব, একটা পিযানো তোমাকে বেশিক্ষণ ধবে বাখতে পাবে না, বাযস্কোপকে তুমি ঠাট্টা কর, থিযেটার উপহাস্যস্পদ, সোযাবে তোমাকে অবসন্ন কবে তোলে, তুমি কি নিয়ে থাকবে আভা?'

—'এই সবেরই কিছু কিছু নিযে, তাহলে বারটা ঘণ্টা চলে যেতে পাবে, বাস্তবিক যারা লেখে বা মাস্টারি করে কিংবা গানবাজনা ছবি সেলাইযে ডুবে আছে, তাদেরও কোনো একটা মাত্র জিনিস নিযে চলে না, অবসাদ তাদেরও যথেষ্ট, জীবনটাকে আমার চেযে খুব বেশি ভালবাসে কি তারা মনে কবেছে মেজদা? আমি সব ছেড়ে দিযেছি বটে কিন্তু তবুও সব কিছুটা খুঁটে বেড়াচ্ছি।' একটু থেমে, 'খাঁচার থেকে ছাড়া পাওযা একটা পাযরার মত সীমা-পরিসীমাহীন আকাশ ও অবসব তাকে যেটুকু অবসন্ন ও বিমর্ষ করে তোলে আমবাও তেমন, সে কি খুব শ্রান্ত খুব বিষণ্ণ? কিন্তু তবুও নিজের কথায় নিজেই যেন কোনো সায় পাচ্ছে না আভা, নিজেকে সেই পায়রার মত বোধ কবতে পারছে না সে।'

সুহৃৎ অনেকক্ষণ থেমে থেকে বললে, 'জানি, আর টিচারি নিতে পারবে না তুমি।'

—'না।'

—'লেখাও কবে আরম্ভ করতে পারবে ভগবান জানেন, 'কিন্তু আবম্ভ কবতে পাবলেও-বা কী? লেখা মানুষকে বড্ড নাকাল করে, আমার মনে হয দু-চারজন লোকের শুধু লিখবাব শক্তি থাকে, এক-একটা যুগে, বাকিগুলো পণ্ড পরিশ্রম করছে শুধু, ওরকমভাবে জীবনকে অপচয় করে কোনো লাভ নেই, ও সবচেযে মারাত্মক বিনাশ, ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয।' সুহৃৎ একটু থেমে বললে, 'যাবা লেখে এই বোধটা তাদের একটু দেরিতে আসে, কিন্তু যখন আসে তখন তাদেব চেযে নিরুপায নির্যাতিত মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। বোন এই ভীষণ নিষ্ফলতার থেকে নিজেকে এখন থেকেই রক্ষা করো।'

আভা বললে, 'আমি যা লিখেছে সমস্তই বিফল?'

—'সব।'

—'তুমি না দেখেই তাই বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি এমনভাবে আমাকে হতাশ করে দিচ্ছ মেজদা?'

সুহৃৎ একটু কোমলভাবে হেসে বললে, 'কিছু ছাপিয়েছিলে?

কিন্তু এই হাসিটা এমন কঠিন মনে হল আভার। অভিমানে কিছুক্ষণ ফুলে উঠে উঠে কোনো উত্তর দিল না। কথা বলতে পারল না। পরে বললে, 'ছাপিয়েছিলাম বই কি?'

—'কীরকম পত্রিকায়?'

আভা দু-চারটে কাগজের নাম করল।

সুহৃৎ দু-এক মিনিট চুরুট টেনে নিয়ে বললে, 'কী ছাপিযেছ?'

—'কবিতা গল্প একাঙ্ক নাটিকা।'

—'বই আছে?'

—'আছে।'

—'কখানা?'

—'খান পাঁচ সাত।'

—'সাতখানা বই [...] মন্দ নয়।' সুহৃৎ থামল। বললে, 'দেখি ত বই কি লিখেছ।'

আভা বই এনে দিল।

মলাটগুলো অনেকক্ষণ ধবে দেখল সুহৃৎ, দেখল কোথায থেকে প্রকাশিত হয়েছে, কাগজ , ছাপা এসবের ভিতর নিবিষ্টভাবে প্রবেশ করল, রবীন্দ্রনাথেব প্রশংসাব ভূমিকা, বাংলা প্রেসের মাতামত দেখা হল, তারপব বোনের বই কখনার ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা। একখানা কবিতার বই-ই প্রথম বুঝতে চেষ্টা করল সুহৃৎ, পনেব মিনিট লাগল, গল্প উপন্যাস, একাঙ্ক নাটিকা, বোনেব বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে ঘণ্টা আধেক নাড়াচাড়া কবল।

চুরুটটা ততক্ষণে নিবে গেছে।

বইগুলো ম্যাটিং করা মেঝেব ওপব রেখে দিযে চরুটটা খুঁজে বেব করতেই যথেষ্ট সময় লাগিযে ফেলল সুহৃৎ। আভা আর্টিস্ট, অন্তত আর্টিস্টিক, মেজদার এই সময়ক্ষেপ তাকে কেমন একটু আঘাত দিচ্ছে, শিল্পীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে আভার বোধ হচ্ছে এরকমভাবে সময অপচয মেজদার পক্ষে এখন সাজে না, এটা ভব্যতা নয, একটু হৃদযহীনাত নয় কি?

সুহৃৎ চুরুটটা জ্বালাল। বললে, 'তোমাব সব লেখাই বইযেব আকারে বেরয় নি? বেরিয়েছে?'

—'না।'

—'শেষ বই ত তেবশ সাঁইত্রিশ সালে ছাপানো, এখন তেবশ চল্লিশ', সুহৃৎ বললে, 'কিন্তু তুমি বলেছ গত তিন বছব কিছু লেখ নি। কিন্তু আগে যা লেখা ছিল তার ভেতব ছাপাবাব মত কিছু নেই?'

আভা আবাব ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

—'অথবা যা ছাপা আছে সে সবের ভেতর থেকে দু-চাবখানা বই বেরতে পারে না আর?'

আভা এবারও বললে, 'না।'

সুহৃৎ হতাশ হয নি, তাব মুখের ভেতব কোনো বিষণ্ণতা নেই, কিন্তু প্রত্যুত্তরহীনতা ঢের।

আভা দেখছে সুহৃতের সমালোচনাহীন সিস্তব্ধতা আঘাত দিচ্ছে তাকে। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার সব প্রশংসা এমন জড় মনে হচ্ছে আভার। কোনো প্রেস মতামতেব খ্যাতি উচ্ছ্বাসই তাকে বক্ষা করতে পারছে না যেন, এই নীরব মুহূর্তগুলো বড্ড বেঁধে। ভাল লাগছে না। নিজেকে কেমন খাটো মনে হচ্ছে, কেমন যেন অবিসংবাদীরূপে উদঘাটিত হয়ে গেছে সে, উদঘাটিত হযে কুশ্রী সেজেছে। আভার মনে হচ্ছিল গর্ব করবার কী আছে আর তার? সে ব্যর্থ সে উঠে যেতে পারে। কিন্তু তবুও চেপে বসে রইল।

সুহৃৎ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'অনেক অচপয অনেক মর্মান্তিক পবিশ্রমেব পর একজন লেখক তৈরি হয়, শুধু তাই? পত্রিকায় একটা লেখা ছাপাবাব আগেও নিজে নিজে কত যে ব্যর্থ গোপন চেষ্টা করে ক্লান্ত হতে হয়, কত যে আবর্জনার স্তূপ ধ্বংস করে ফেলতে হয, তারপর অনেকে আর লিখবারও চেষ্টা কবে না, ছাপানো ত দূরের কথা, খাঁটি লেখক নেচারের মত, মাঠের গাছপালার দিকে তাকিযে দেখ, জাযগায জায়গায় খড়কুটোর হিম আঁশ ঝুলছে শুধু, কোনো পাখি নেই, নীড় নেই, শালিখ চড়ুই বুলবুল মুনিযাদের ওইসব ব্যর্থ চেষ্টা, কিন্তু তাই বলে পৃথিবীতে কি নীড় নেই? কতবার কত জায়গায় কত অক্লান্ত চেষ্টার পর একটি নীড় তৈরি হয, কত অজস্র ডিম ভেঙে যায় তারপর একটি ছানা আসে, লক্ষ লক্ষ ছানা পৃথিবীতে আছে কিন্তু তবুও পরম বিস্ময়ের পাখির জগৎ আজও ত বেঁচে রযেছে, খাঁটি আর্টিস্ট নেচারের মত, অজস্র বীজ গাছের থেকে ঝরে পড়ছে। কতকগুলো পাথরের ওপর পড়ছে, কতকগুলো শুকনো পাতার চটে, কতকগুলো নদীর জলের ভিতব, কতকগুলো পাখিদের পালকে, পশুদের শরীরের লোমে হারিযে যাচ্ছে, জন্তুরা মাড়িয়ে যাচ্ছে, পাখিরা খুঁটে খাচ্ছে। কিন্তু তবুও পরম বিস্ময়ের গাছপালা বনজঙ্গলে

পৃথিবী রয়েছে ভরে। আশ্চর্য।' সুহৃৎ থামল।

বুঝতে পারা গেল না আভার বইগুলোর সম্বন্ধে কী তার ধারণা হয়েছে, সেগুলো নষ্ট ডিম বীজ না বাস্তবিক কিছু। কোনো পরম বিস্ময়ের জিনিস। সুহৃৎকে জিজ্ঞেস করতে আভার বাধছিল। ম্যাটিং করা মেঝের ওপর আভার বইগুলোকে সুহৃৎ এমনভাবে ছড়িয়ে রেখেছে ভুলেই গেছে যেন সেজদা পৃথিবীতে তার বোনের লেখা কোনো বই আছে নাকি, কিংবা সেই বইগুলোর ভেতর কোনো রক্তমাংস প্রাণসম্পদ রইল কিনা।

কিন্তু সুহৃতের মনে আছে। সে বললে, 'কিছু টাকা পেলে এই সব বইয়ের থেকে?'

আভা বললে, 'উপন্যাস তিনটের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে, কিছু টাকা পেয়েছি, ছোটগল্পের বই দুটোর থেকেও পেয়েছি।'

সুহৃৎ প্রীতি হল।

প্রীতি যদি সেজদার এইটুকুর ভিতরেই থাকে তাহলে তাকে টেনে আরো খানিকটা খুশি রাখা যাক, আভা বললে, 'লেখাগুলো যখন মাসিকে ছাপিয়েছিলাম তখনো টাকা পেয়েছিলাম, কম নয়, তাছাড়া আবো অনেক ফরমাশি গল্প, এসেন্স নয় তেল সাবানের দেদার সাহিত্যে পুজো পার্বণের খাতায় পরিবেশন করে বেশ কিছু মেরেছি, কিন্তু সেই সব গল্প নিয়ে বই ছাপাবাব কথা ভাবতেও পারি নি, সেগুলো পড়ে আছে, বিশেষ সময়ের বিশেষ কাজ শেষ করে, হয়ত কোনো পরিহাসপ্রিয় গিন্নি বা আদরিণী বউয়ের আলমারিজাত হয়ে। সেগুলোকে আমি আর কোনোদিন দেখব না, কোনো প্রবৃত্তি নেই মেজদা। কিন্তু কলমটাকে খিঁচে টাকা পাওয়া গেল মন্দ না।'

বাস্তবিক টাকার কথাই ভাবছিল সুহৃৎ, এসব বই বা লেখকেব সম্বন্ধে আর্টেব কোনো কথাও উঠতে পারে না যেন।

সুহৃৎ বললে, 'কবিতা লিখে কিছু পেলে?'

—'না।'

—'কবিতার বইটার গেট-আপটা ত বেশ ছিল, বাংলা বইয়ের আন্দাজে—'

—'কিন্তু এ নিজের পযসা দিয়ে ছাপাতে হয়েছে।'

—'বিক্রি?'

—'বিশেষ কিছু হয নি, প্রকাশ করবার দাম উঠবে কিনা সন্দেহ।'

—'এই অবস্থা!' চুরুটের মুখে গোটা দুই টোকা মেরে সুহৃৎ বললে, 'কিন্তু গল্প লিখে টাকা তাও বড্ড বিপজ্জনক, একটা গল্পে বড়জোব পাবে ত ত্রিশ, হযত দশ-পনেবর বেশি প্রাযই দেয না, আজীবন ভরে যদি পাঁচশ গল্পও লেখা হয় এবং গোটা পঁচিশেক উপন্যাস, অর্থাৎ আর্টের দিক দিযে নিজেকে পৃথিবীব কাছে শস্তার চূড়ান্ত বলে দাঁড় করানো যায়। তাহলে কপিরাইট বিক্রি কবে দিযে কত পাবে? কিংবা কপিরাইট নিজের রাখলেই-বা কত মিলবে?' সুহৃৎ একটা অঙ্কেব হিসাবের ভেতব ব্যস্ত হযে গেল। মুখে মুখেই অঙ্কগুলো কষল সে। তারপর একটা নেহাত তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংখ্যা আভাব মাথাব ওপরে ছুঁড়ে মারল যেন সুহৃৎ। বললে, 'ইউরোপে একজন এইটথ, রেট লেখককও এর সিকির সিকি লিখেও এব চেযে হাজারগুণ বেশি পায়; লিখে কী হবে?'

লিখে কী হবে? মেজদা এই বলল? বিমূঢ় হয়ে ভাবছিল আভা। এবপর এই বইগুলোর কোনো দাম নেই। বাস্তবিক লিখবে না সে আভা। অনেকদিন থেকেই কলমের মুখে কোনো আগ্রহ নেই আব, লিখতে বসলেই বিহ্বলতার ফেনা হৃদযকে জর্জবিত করে ফেলে, তাই সেই নিজে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু কল্পনা ও আবেগের পুনরুত্থানেব জন্য প্রতীক্ষা করছিল, কিন্তু কী হবে অপেক্ষা করে? আবেগ ও শক্তি কল্পনা ত গ্যায়টে বা ভবভূতি নয জর্জ স্যাবের নয, হযত মিসেস হামফ্রি ওয়ার্ডেরও নয, ব্যারেট ব্রাউনিঙেবও নয, তবে আর কেন? লিখে অনেকে একটা টাকাও পায না কিন্তু বদলে মিশর ব্যাবিলনের মত সাম্রাজ্যের চেয়েও ঢের বেশি অধিকার করে নেয তারা, শেক্সপীয়র তেমন করে লিখে গেছে, এবা অনির্বচনীয়। কিন্তু এদেবও ঢের নিচে ফ্লবেয়াব বা শরৎ চাটুয্যেব মত লেখক কিছু খানিকটা সফলতার সৃষ্টি কবেছে; তাদেব পৃথিবীটা চৌকশ নিরেট দেয়ালে ঘেরাবদ্ধ, কিন্তু ততটুকুর ভিতরেও তা চরিতার্থ, মানুষকে খানিকটা কৃতার্থ করছে, কিন্তু আভা এদের কাছে ঢের হেঁট। লিখতে বসলেই নিজের দুর্বলতা বিহ্বলতাকেই উদঘাটিত করবে সে, ঘুরে ঘুরে, ফিরে ফিরে, পর্যাযে পর্যায়ে। তাব চেযে মেজদা যা বলেছে তাই ভাল, লিখে কিছু হবে না। আভা তাহলে কলম থামাল।

সুহৃৎ বললে, 'ছেঁদো মাইনর আর্টিস্টদের চুল যখন পাকতে বসবে তখন যে দারুণ হতাশ আসবে

জীবনে। তার চেয়ে আগের থেকে সরে পড়াই ভাল।'

ঘাড় হেঁট করে আভা বললে, 'ঠিক তাই ভাল।' আভা বললে, 'আগে যেরকম লিখতাম এখন তাও পারি না, নেহাত যদি একু জাদু না হয় জীবনে তাহলে লিখবার কোনো প্রযোজনই বোধ করব না আর, লেখা আগে আনন্দ দিত, এখন লিখতে যাই বিরক্তিতে, ভয়ে, সন্তর্পণে, নাম যাতে ডুবে না যায়, নাম যাতে বাড়ে, এমন একটা হিংসায়, হিংসা নয় কি? কিন্তু লেখা ভালবাসার কাজ।' একটু ভেবে বললে, 'কি জানি বড় বড় লেখকদেরও দেখেছি, বড্ড হিংসুটে, লেখা ঘৃণা ভালবাসাব কাজ হেকা না হোক—শক্তির কাজ অন্তত।'

কিছুক্ষণ সময় গেল।

সুহৃৎ বললে, 'পাশ করলে, টিচাবি কবলে, এখনো আমি তোমাকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি, ট্রেনিং বা অন্য যা কিছু পড়তে চাও, পড়তে পাব দিয়ে—যাবে আভা?'

আভা দু-এক মহূর্ত চুপ থেকে বললে, 'না।'

—'কেন?'

—'শুধু মেহন্নৎ, শুধু—'একটু থেমে বললে, 'বলেছিই ত তোমাকে, একজন স্কুল ইন্সপেকট্রেস হয়ে মববাব সাধ আমাব নেই।'

আভা বললে, 'আমার মৃত্যুশয্যার থেকে আমাব অতীত জীবনটাব কথা ভেবে যেন হতাশা বা নিষ্ফলতা না বোধ করি এমনভাবেই জীবনটাকে এখন থেকে চালাতে হবে সংকল্প করেছি।'

—'কী কববে তুমি?'

—'যেসব জিনিস এতদিন ধবে কবেছি, সেসবেব কিছুই মনকে তৃপ্তি দিল না।'

—'ভালও ত বেসেছিলে?'

—'বেসেছিলাম ত।'

—'কবাব?'

—'বার তিন-চাবেক।'

সুহৃৎ নিভু নিভু চুরুটটায একটা টান দিযে বললে, 'আমি জানি না কাদেব তুমি ভালবেসেছিলে, তোমাকে জিজ্ঞসা কবছি না।'

সুহৃৎ না থামতেই আভা বললে, 'এমনই গোপন যে আমাদের পবিবারেব কেউই জানে না, মা-ও জানত না।'

সুহৃৎ বললে, 'এদেব চাবজনেব সঙ্গেই কথাবার্তা চিঠিপত্র চলত।'

—'যথেষ্ট।'

—'সুহৃৎ একটু ভেবে চুরুটটা জ্বালিযে নিল। হযত সে দু-তিন জনকে ধবতে পেবেছে, কিংবা কে জানে এদেব কাউকেই কোনোদিন সে দেখে নি, তার দশ বছর বিলেতে থাকার অবসরে এক-একদিনে এক-একটা পৃথিবী গড়েছে, ভেঙে গেছে। সুহৃৎ বললে, 'প্রথম যখন ভালবেসেছিলে, সেটা খুব নিবুদ্ধিতাব কাজ হযেছিল নিশ্চযই?'

আভা কোনো উত্তর দিতে পাবছিল না।

সুহৃৎ বললে, 'কবছরে প্রথম ভালবাসতে শুরু কবলে?'

—'পনের।'

—'এখন তোমাব সাতাশ?'

—'আটাশ।'

—'ও, বাপরে, কি তাড়াতড়ি সময় চলে যাচ্ছে।'

চুরুটটা বেশ জ্বলছিল।

সুহৃৎ বললে, 'আটাশ? শেষ ভালবাসাটা কবে শুরু হল?'

—'বাইশ, বছরের সময়।'

—'আর শেষ হল?'

আভা চুপ করেছিল।

সুহৃৎ বললে, 'সেটা কি টিকে আছে এখনো?'

—'না।'

—'ভালবাসা বলে কোনো জিনিস নেই, ছোটবেলা নির্বুদ্ধিতা বেশি, সেক্স এট্রাকশন কম, বযস

হলে এটা উলটে যায়, কিন্তু তবুও ভালবাসা নামেই এ জিনিসটাকে আমরা চালাই, তাই-ই ভাল, অন্য কথাগুলো শুনতে বড্ড বিশ্রী শোনায়, মেডিসিন সেবিকান, জরিমপ্রুডেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আইন এমনকি সাহিত্য বা কবিতাও [...] গুলোকে আমি ঘৃণা করি, এবং দুলাইন কবিতা আমাকে দাও, ছন্দ সম্বন্ধে পঁচিশ পৃষ্ঠায় এক প্রবন্ধ কিছুতেই না—' একটা হালকা বাতাসে চুরুটের মুখ থেকে খানিকটা ছাই উড়ে গেল। সুহৃৎ বললে, 'আমাদের এ ভুল ধারণা যে অল্প বয়সের ভালবাসাই গাঢ়, যত বয়স বাড়ে, ভালবাসা তত জমে, তোমার শেষ ভালবাসাটা খুব এনজয় করেছিলে নিশ্চয়ই?'

আভা বললে, 'কেউ আমরা কাউকে ভালবেসেছিলাম কিনা আজও সেটা জানি না।'

—'বেশি বয়সের ভালবাসার ওই-ই হচ্ছে আরাম, এ ভালবাসার ভিতর সন্দেহ শ্লেষ ঠাট্টা, বৈদগ্ধ ক্ষুধা, লাম্পট্য উপেক্ষা আক্রোশ ঘৃণা সবই থাকে কিনা।'

আভারও তাই বোধ হচ্ছিল। কিন্তু এই ভালবাসাটা তিন বছর হল ফুরিয়েছে। রমেন তার কাছ থেকে বিদায় নিল তাও মনে নেই, না আছে এই মানুষটির গতিবিধি জানবার জন্যও কোনো কৌতূহল। জীবন কোনো নতুন ভালবাসার জন্য অপেক্ষা করছে। আভা ভাবছিল, জীবনে অনেক কিছুতেই ত হাত দেয়া গেল, কিন্তু মেজদা যা বলেছে সন্দেহ শ্লেষ ঠাট্টা বৈদগ্ধ্য ক্ষুধা লাম্পট্য ও ঘৃণা সমবায়ে ভালবাসা নামে যে জিনিস হৃদয়ের ভিতর উদিত হয় তা প্রাণকে এমন নিবিড়ভাবে অভিভূত করে রাখে! জীবন যেন আর কিছু চায় না।

কথাবার্তার মোড় একটু সিধে হয়ে এল।

সুহৃৎ বললে, 'ভোর হয়ে আসছে, আজ সন্ধের সময়ই তৈবি থেকো।'

—'কীসের জন্য মেজদা?'

—'দেখো আর একটি পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেমন লাগে।'

আভা ঘাড় হেঁট করে রইল অনেকক্ষণ। ভাবছিল, কী করবে সে? জীবন কী নিয়ে থাকবে তাব? মৃত্যুব শয্যার থেকে নিজেকে বুড়ো মাস্টাব সার্জেন টিচাব এমন কি স্কুল ইনসপেকট্রেস রূপে দেখতে চায না সে, নিষ্ফল লেখিকা বলে বুঝতে চায না, আর্টের অন্য কোনো বিভাগেও তার প্রবেশ নেই, হিতৈষণী বা নারীমঙ্গলের কোনোরকম কোনো কাজে তার মনই বসে না। কেন বসে না? বাস্তবিক নিজের ওপব মাঝে মাঝে এমন ধিক্কার উপস্থিত হয, কিন্তু তবুও বসে না যে। কিন্তু তবুও শিক্ষিত বাঙালি বিধবা পবের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে ব্যথা পায়। নিজেব যথেষ্ট অন্নসংস্থান তাকে যদি পরমুখাপেক্ষী না কবে তাহলে তাকে বেদনা বোধ করতে হয, নিজের কাছে দিনরাত কৈফিযত দিতে হয। জীবনটাকে নিয়ে সে কী করছে? কী কবছে? কুমারীরও তাই। জীবনটা কোনো একটাা এক মুহূর্তের বঙে চঙে থাকে না, তাই যদি হত কোনো একটা বই নিয়ে থাকা যেত, একটা গান নিয়ে, একটা সেলাই নিয়ে, হযত ঘুম নিয়ে, হযত মৃত্যুচিন্তা নিয়ে, কিন্তু জীবন অজস্র তরঙ্গ প্রতিতরঙ্গের একটা বিবাট মর্মান্তিক কলবর, একে প্রশমিত করা বড্ড শক্ত, প্রশমিত করার কোনো কথাই নেই হযত, কথা এর ভেতর নেমে অবগাহন করবাব, দিনরাত বাতদিন মৃত্যু পর্যন্ত। এক এক জনের কাছে এ জিনিসটা এমন আনন্দদাযক! সকলেব কাছে তবু এ ব্যথাব এক শেষ, নানাবকম ভুল সমবাযেব জঞ্জালেল ভিতর জীবন তাদের দৈবাৎ জড়িয়ে গেছে বলে। নিজেকেও আভা ভুল সংকল্প, ভুল প্রয়াস, ভুল স্বপ্নের ভিতর অত্যন্ত নির্বোধের মত ডুবে থাকতে দেখল যেন, জবিনটাকে যদি আব কয়েক বছর এমনভাবে চালানো যায তাহলে কোনোটিকেই কোনো গতি থাকবে না আর, মৃত্যুশয্যায় নিজেকে সত্তর বছরের বুড়ি মাস্টাব বুড়ি মাস্টার বলে বুঝবার তৃপ্তিটুকুও তাব থাকবে না, কিছুই থাকবে না।

সুহৃৎ বললে, 'দেখো, এই মানুষটিকে বুঝে দেখো, তিনি আজ সন্ধ্যার সময়ই আসছেন।'

মেজদা যখন আনছে তখন মানুষটির ভিতর বৈদগ্ধ্যের থেকে লম্পটতা কিছুই বাদ যাবে না। আভা আশান্বিত হয়ে বলল জীবন এ একটা আলাদা [...] হয়ত জীবনটাকে এব বিশ্রী সমবাযের থেকে খসিয়ে ফেলবে। মেজদা যা বলেছে তাই-ই ঠিক, ভালবাসা নামে যে জিনিসটা চলে, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরকাব নির্বুদ্ধিতা ভাবপ্রবণতার গাদটা অনেকখানি কেটে যায, যাকে সন্দেহ শ্লেষ ঠাট্টা বৈদগ্ধ্য ক্ষুধা লাম্পট্য ঘৃণা—কি চমৎকাব! এই জিনিসগুলো জীবনকে কেমন খণ্ডিত কবে দেয।

আভা বললে, 'তার বয়েস কত?'

—'বছব বত্রিশ তেত্রিশ।'

—'কী করেন?'

—'এতদিন ত ভ্যাগাবন্ড ছিল, বছর দুই হল বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে।'

—'কোথাও কাজ পেয়েছে?'

—'ই আই আর-এ মাস তিনেক হল পেয়েছে।'

—'মাইনে কত?'

—'ছশ সাতশ।'

—'কীরকম গ্রেড?'

—'বোধহয় দু-হাজারে উঠবে। কিংবা বেশিও হতে পারে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সে হয়ত এসব ছেড়ে দিয়ে নিজে কনট্রাক্ট নিয়ে কাজ কববে, খুব বড় ইঞ্জিনিয়াররা তাই করে।'

এই নিয়ে আরো খানিকটা আলাপ চলল। ইঞ্জিনিযার সাহেবেব হ্যাটেব বাছবিছার, টাই বাঁধার রকমারিও আভাকে আন্তরিকতা আগ্রহস্নিগ্ধ কবে তুলেছে। কেমন কোমল পায়বাব মত এই মেযেটি দুই মুহূর্ত আগেই কেমন রুক্ষ মুরগির মত দেখাচ্ছিল—একেই। টাকাকড়ি সম্বন্ধে জীবনেব প্র্যাকটিক্যাল দিক সম্পর্কে বোনের এই আগ্রহ সুহৃৎকে আমোদ দিচ্ছিল, একটা কৌতুকে তাব মন ভরে উঠল কি এদেশের কি ওদেশের সকলেই এরা—এই। শেষ পর্যন্ত সব মেযেমানুষই এইরকম। বিলেতে দু-একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সুহৃতের। বিলেত থেকে দেশে ফিরবাব সময কেন কোনো মেম নিযে এল না সে, আজও কেন সে আইবুড়ো,ঘাড় হেঁট করে তামাশাব সঙ্গে স্বীকার কবে নিল সুহৃৎ। এই বোনই তার কবিতা লিখেছে? আভার কবিতার দু-একটা লাইনও বেশ মনে বাজে। এখনই সে আবাব একজন ইঞ্জিনিযারেব গ্রেডেব কথা জিজ্ঞেস করছে, কোনো খাসা ইঞ্জিনিযাব স্বামী পেলে হযত দুবছব পবে কন্ট্রাক্ট সম্বন্ধে স্বামীব সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কথাবার্তা বলবে সে, ইঞ্জিনিযারিঙেব বিবাট কন্ট্রাক্টের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় তাব জীবন ভবে থাকবে, অপরূপ! অপরূপ!

সকাল হযে গেছে।

আভা বেবিযে গেল।

আভাব বইগুলো মেঝের থেকে কুড়িযে নিযে ধুলো ঝেড়ে সস্নেহে নিজেব টেবিলের ওপর বেখে দিল সুহৃৎ, তাবপব একটা কেবিনেট চেযারে ভোরেব বাতাসে ঘুমিযে পড়ল সে।

একটু পবেই ফিরে এসে বললে, 'সন্ধ্যার সময আসবেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সকাল হযে গেছে মেজদা।'

—'দেখেছি।'

—'বসে আছ কেন?'

—'ঘুমবো।'

—'তোমাব ঘবে গিযে ঘুমোও মেজদা, এই ড্রইংরুমটাকে একটু ফিটফাট কবে নিই।' সুহৃৎ বললে, 'করো কাবো, আমি, একটু বসি, একটু দেখি, আগে চা নিযে এসো।'

—'নানকুকে চা কবতে বলেছি।' আভা বললে, 'কি যাচ্ছেতাই হযে আছে এই ড্রইংরুম, আজ সারাদিন লাগবে এটাকে গুছোতে, তুমি মার্কেট থেকে কতকগুলো জিনিস নিযাসতে পারবে এক্ষুনি? মোটর তৈরি কবতে বলে দিযেছি।' সুহৃতের অবসন্ন চোখেব দিকে তাকিযে আভা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হযে উঠে বললে, 'থাক আমি নিজেই যাচ্ছি মার্কেটে, তাহলে ত আমার হাতে আব এক মুহূর্তও সময নেই।' আগ্রহের আতিশয্যে ম্যাটিঙের পর নিজের বইগুলোকে মাড়িযে চলে গেল আভা। সেগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাবার অবসরও তাঁর ছিল না।

সে চলে গেছে।

সুহৃৎ জানে আভাকে নিযে বিধাতাব মত সেও আজ একটু খেলল, ড্রযিংরুম গুছোনো হবে, সন্ধ্যা উৎবে যাবে, রাত হবে, মেয়েটি ছটফট কববে, কিন্তু তবুও আভাব জীবনে কোনো রাজকুমার মন্ত্রীকুমাব কোটালকুমাবও নেই, ইঞ্জিনিযার নেই, কী আছে? অনেক অলিগলি দিযে হয়ত আরো গল্প লিখে কবিতা লিখে ফ্লার্ট করে একজন বুড়ো মাস্টার হয়ে মবতে হবে আভাকে, একজন বুড়ো মাস্টার হযে মবতে হবে সুহৃৎকে।

তাদের জীবনে আর কোনো জাদু নেই।

মন্দ কী? সে বেশ নির্বিঘ্নে ঘুমচ্ছে।

আভাকে নিযে বিধাতাব মত সেও আজ একটু খেলল।

বিধাতার খেল দিনরাত, অনন্তকালেব জন্য, সুহৃতের শধু একটা দিন নিযে। এমন কি বিশেষ অন্যায কবেছে সে আর?

বত্রিশ বছর পরে

অভয় একটু হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিল তার দেড় বছরের এই মেয়েটিকে এতদিন ধরে কারা মানুষ করল। এবং এখন এক মুহূর্তের জন্যও তাদের দেখতে পাওয়া যায় না কেন?

অবিশ্যি মেয়েটি মানুষ ঠিক হয় নি। শরীরে এর যথেষ্ট চুনের অভাব। দাঁত দেরিতে উঠছে,মেয়েটি খড়ি খেতে ভালবাসে, এখন দাঁড়াতে পারে না।ঠ্যাং দুটো মানুষের চেয়ে পাখির মতই যেন বেশি। এর ঠ্যাংয়ের জন্যই হয়ত কিংবা সমস্ত মুখাবয়বের জন্য এক এক সময় মনে হয় এ মানুষ না পাখি? পেটে লিভার ডিগডিগ করছে, সারাদিন মেয়েটি খিলখিল করতে ভালবাসে।

এই পৃথিবীকে খুকু মোটেই ভালবাসে না, মেয়েটিকে তিনমাসের দেখে যখন অভয় চলে গিয়েছিল তখন বরং ভাল ছিল, খুকুকে দেখে অভয় যখন তৃপ্তি পেত, একরাশ কালো চুলের ভেতব বেল জুঁয়ের মত মুখ, মাখমের দলার মত নরম নিটোল শরীর, তবুও একটা টনকের পরিচয় দিত, পিতার বক্তমাংসকে স্নিগ্ধ করে রেখেছিল। শুধু রক্তমাংসকে? খুকুন ওই আকাশকে যেমন ভালবাসত তখন, কেমন স্থির চোখে অনেকক্ষণ ধরে ওই গভীর আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকত সে, এমন একটা পরিতৃপ্তি পেত তাতে। পেয়ারা নিম কৃষ্ণচূড়া হিজলের সবুজ জ্যোতি আলোর দিকে, ডালপালার নড়াচড়া, নক্ষত্রের রাতে যখন অন্ধকারে বাইরে তাকে নিয়ে যাওয়া হত, কিংবা জ্যোৎস্না রাত, এসবেরই একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল খুকুনেব ওপর, তাই ত হওয়া উচিত। অভয়েরও মানুষদের চেয়ে এদের সৌন্দর্য ও ক্ষমতা ওপব ঢের বেশি বিশ্বাস। কিংবা এই আকাশ গাছ জ্যোৎস্না খুকুনেব কাছে আজ নিরর্থক। কেমন যেন হয়ে গেছে আজ।ধিকপিকে নিকপিকে ধিকপিকে নিকপিকে ধিকপিকে নিকপিকে স্বর্ণ খুকুনকে প্রসব করেছে শুধু আর বিশেষ কিছু করে নি। মেয়েটিকে প্রসব করে সে মবতে চলেছিল, কিন্তু বেঁচে গিয়েছে, একসময়—তখনো এসব হয নি, স্ত্রীর ভয়াবহ সম্ভাবনাব কথা ভেবে অভয প্রতি মুহূর্তেও বিষম বাধা পেত।

কিন্ত এখন এই স্বর্ণ না থাকলেও যেন চলে, খুকুনকে জন্ম দিয়ে সে যদি মরে যেত তাহলে কী আব হত! একটু চুপ কবে বসে চিন্তা কবলেই অভয়ের মনে হয় এসবের পব স্বর্ণ যদি মারা যেত তাহলে হযত ঠিকই হত। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক তাব কাছে এখন অবসাদের মত বোধ হচ্ছে। যে কোনো পুরুষেব যে কোনো স্ত্রী সঙ্গে সম্পর্ক; যদিও জীবন অভযেব অবসন্ন হযে পড়ে নি, অভয় বাঁচতেই চায। জীবনে কোনো প্রেমিকা নেই এখন অভযের , কোনো অভিসারিকা নেই, নেই, আজকেব জীবনে এব একটা চমৎকার অর্জন, মেয়েমানুষের যা কিছু যতকিছু সুন্দর ,অভয়ের কাছে সমস্ত নিরর্থক—আজ। সে অন্য অনেক জিনিস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায।

এই মেয়েটিকেই-বা বাড়িয়ে মানুষ করে শিক্ষা দিয়ে কী লাভ? তাতে নিজের জীবনের নানা রকম চাওযার সুযোগ নষ্ট করে ফেলবে সে শুধু, শিশুদের মানুষ করা সম্বন্ধে অভযের যে ধারণা তা অত্যন্ত কঠিন, এই মেয়েটি যদি বড় হল তাহলে তাকে ভার্জিনিয়া উলফ বা মাদাম কুরির মত হতেই হবে যে ঠিক তা নয বটে কিন্তু সে টিচারি করতে পারবে না। চিন্তা করে চিঠি বা সবকিছু লিখবে,কবিতা [...] করে নয, বাস্তবিক কার কবিতাই বা [...] করা যায়, ইংরেজি বা বাংলায়? [...] করবার প্রয়োজন বা কি, এ জীবনে? জীবন এমনিই ত যথেষ্ট পরিপুর্ণ। আমাদের প্রতিমনের নিজের প্রয়োজন ও সমারোহ নিয়ে লিখবে, মৃদু শ্লেষে এবং একটু কঠিন হয়ে, লোহার মতন কঠিনতা নয়, পাথবের মত বরং বরফের মত উজ্জ্বল পবিত্র একটা কাঠিন্য বেলেমাটির কিন্তু পলিমাটির ক্লেদাক্ততা কোনো লেখাই থাকবে না, তাব প্রেমেব ভিতর থাকবে না। মেয়েদেব এসব অপরাধ দুছত্র খাঁটি ব্যঙ্গ করতে জানে না তারা, উপহাস করতে গিয়েও তোমার আমার কাছে উপহাসিক হয়ে ফেরে শুধু। খুকুনকে এমন উপহাসের খেলার বল করে ছেড়ে দিতে চায় না অভয়। কিন্তু মনের মত করে এই মেয়েটিকে গড়তে গেলে অভয়ের নিজের জীবনেব সুযোগগুলো নষ্ট হযে যাবে যে। সমস্ত জীবন খুকুনের পিছেই খরচ করতে হবে। সে এক গভীর অপচয়।

ঘুমুতে পারছে না অভয়, কী করবে সে? ইতিমধ্যে দিনরাত মেয়েটি তাকে আর কিছু করতে দিচ্ছে না। স্বর্ণ মাঝে মাঝে আসে, এসে ডাকে,' টুকুন'।

খুকুন মায়ের দিকে এক আধবার তাকায, অভযে দিকে তাকায়, এর মধ্যে স্বর্ণ কোথায চলে যায।

অনেক রাত করে স্বর্ণ এল।

অভয় টুকুনকে শেষবারের মত ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পাখা ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল। এইসব তার ভাল লাগে না, তার ঢের কাজ নেই কি? সে গরীবের ছেলে, গরিব বলেই কি জীবনে সমস্ত দিক তার ভস্মীভূত হয়ে গেছে?

স্বর্ণ বলে, 'এখনো জেগে আছ?'

অভয় কোনো জবাব দিল না।

—'মশারি ফেললেই পারতে, খুব পাখা ত ঘুরুচ্ছ।'

অভয় এবারও কোনো কথা বল না।

স্বর্ণ বিরক্ত হয়ে বললে,' এমন ওলটপালট বিছানা, তুমি পেতেছ বুঝি, আহা, মরি, পাতার নকশা, নাও সরো দেখি, আমি একটু বের করে নি।'

ঠিক সে কিছুই বড় একটা করল না। পাখাটা নিয়ে বিছানাব চাদর এক আধবার ঝেঁটিয়ে সবচেয়ে নরম বালিশ দুটো নিজের জন্য বেছে নিল। বরং অভযকে আরো একটু দূরে সরে শুতে অনুরোধ করল, তারপর চোখ বুজে অভযকে ঘুমবার আগে কোনো এক সময় মশারিটা ফেলে দিতে বলল।

অভযেব এখন শোবার ইচ্ছা ছিল না। বরং সে বাইবে গিয়ে একটু বাতাসে বসবে।

স্বর্ণকে বলল, 'জেগে আছ'?

—'কেন?'

—'কাল থেকে টুকুনকে আব আমাব কাছে দিও না।'

স্বর্ণ তেড়ে উঠে বললে, 'তুমি টুকুনকে রাখ যেন।'

'বাখি না? এই দশ-পনের দিন ধরে আমি একমুহূর্তও নিশ্বাস পেলাম না।'

স্বর্ণ বললে , 'দশ- পনের দিন । আর আমি যে এই [...] দুবছর কমুহূর্ত বিশ্রাম পেযেছি শুনি?'

অভয শুনতে লাগল, তাব স্ত্রী বলছিল।

—'বিশ্রাম! বিশ্রামেব কথা আব বলনা, তিক্ত-বিবক্ত লেগে যায।'

চুপ করে বইল অভয।

স্বর্ণ বললে, 'বিশ্রাম'! একটু পবে বললে, 'কে কাকে সেধে বিযে করতে এসেছিল, বিযে না মবণ! বিযে কবেই যদি মেয়ে হওয়া, ঘটা! এখন বলেন টুকুনকে আমি বাখতে পারব না।' স্বর্ণ ওপাশ ফিরে বযেছিল এতক্ষণ, এপাশ ফিরে বললে, 'কেন কাব এমন গবজ পড়েছে যে তোমাব টুকুনকে বাখবে? মেযে তোমাব না আর কাব? জন্ম দিযেছেন নিজে পালবাব বেলা পাড়াপড়শি ?' গবগর করতে করতে ওপাশে মাথা নোযাল সে।

স্বর্ণেব কথাগুলো স্পষ্ট ও পরিষ্কার। এবং সত্যিই সত্য, অভযেব মনে হচ্ছিল। অভযেব বোধ হচ্ছিল, যাক, এই মেযেটাব ধাবণা কল্পনায তাহলে সম্মতি আছে;নিবোর্ধেব মত কোনো কথা এ অবদি বলেনি। নিজেব জীবনেব নাগপাশের উপাযহীনতার জন্য সে নিজেই দোষী, স্বর্ণকে কেউ বুঝবে না। স্বর্ণ মা হযেছে হযত ভেবে দেখলে অভযেরই চাঞ্চল্য ও ভাবনা চিন্তা লেশ শূন্যতার দোষে, চিন্তার এত বড়াই কবে অভয, কিন্তু এই অকাট্য চিন্তাব সুস্থিরতা তখন তার কোথায ছিল? মা হতে হযেছে। এবং নিরবচ্ছিন্ন দেড় বছর মাযের কাজ করতে হযেছে স্বর্ণকে, ভোরেব থেকে বাত, বাতেব থেকে ভোব নিরবচ্ছিন্ন দেড়টি বছর এই মেযেটিকে সামলানোর এর পব অভযেব বলবার কিছু নেই আব।

স্বর্ণের পরিত্যক্ত ধূসর কঠিন বালিশটার ওপর মাথা পেতে শুযে পড়ল অভয।বাইরের বাতাসে গিযে বসবার , হযত ভাববিলাস কববার জন্য কোনো ইচ্ছাই, অভযের আর ছিল না। জীবনে নিজেব অপরাধ হৃদযঙ্গম কবলে ভাবপ্রবণতাকে সুবিধা লাগে না।তাছাড়া পালিযে গিযে সেন্টিমেন্টালাইজ কবা এমনিও ভাল নয।তাব চেযে স্ত্রীর কাছে থেকে মুখোমুখি সব সহ্য করার ভেতর যে সহিষ্ণুতা আছে, সেই সহিষ্ণুতা মানুষেব জীবনের একটা অতি দরকারি জিনিস। অভয বালিশে মাথা রেখে ভেবে চলেছিল।

স্বর্ণ বললে—'ঘুমুলে?'

—'না।'

'বললাম না তোমাকে মশারিটা ফেলে দিতে?'

—'এখুনি ফেলব? গরম লাগবে না? একটু বাতাস আসুক না।'

—'বাতাস! বাতাস বিশ্রাম এই নিযেই থাক তুমি, হঠাৎ ঘুমিযে পড়লে কী হবে?'

—'আমি এখন ঘুমব না।'

—'ঘুমব না! ভোঁস ভোসঁ করে রোজ কে ঘুময় জানা নেই আর। নাও,ওঠো, ঢের রাত হয়ে গেছে।'

অভয় উঠছিল।

স্বর্ণ বললে, 'ও কি, একটু তাড়াতাড়ি কর, মশা যে খেয়ে ফেলল।'

অভয় বাতাস দিয়ে মশারি ফেলল। কিন্তু স্বর্ণের মনের মতন হল না, কয়েকটা মশা ভিতরে ভনভন করছে নাকি। আবার মশারিটা গুটিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে মশা বের করে দিয়ে বাতাস করে মশারি ফেলা গেল। এই রকম তিন চার বছর হল, কিন্তু কোনো কিছুতেই স্বর্ণের মাত্রা বোঝা গেল না।

বললে, 'নিজে না উঠলে কোনো জিনিসই হয় না, দুস্তর ঝামেলা।' উঠে বসে বললে, 'সবই আমায় নিজের হাতে করতে হবে। সামান্য একটা মশারি ফেলা অবদি।' পা দিয়ে লাথি মেরে কোলবালিশটা সরিয়ে ফেলে বললে 'মরণ! মরণ হয়েছিল আমার।'

অভয় জানে মশাবি ফেলতে সে কোনো ভুল করে নি। এ মশারি যা তাতে এর চেয়ে বেশি কিছু সম্ভব নয়, কাজেই স্ত্রীর এই অন্যায় অসংযমে তার কিছু এসে যাচ্ছিল না। মশারি গুজেঁ দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

কোল বালিশ টেনে স্বর্ণও আস্তে আস্তে শোবার ব্যবস্থাই করছিল। অভয় ভাবছিল, অবিশ্যি দোষ মশারিটার, পাঁচ বছরের তেলচিটে ছেঁড়াখোড়া পুরনো জিনিস, কতবার যে কত জায়গায তালি দেযা হয়েছে, তালির ভেতরও ছেঁদা হয়ে গেছে। দারিদ্র্যে তার দোষ, কেন স্বর্ণ এই দারিদ্র্যকে ভালবাসবে? এই দারিদ্র্যের ভেতর থাকবে? এই দরিদ্রতা ত তার বাপের বাড়ির জিনিস নয়।

স্বর্ণ অভয়ের থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে শুতে পারা যায়, শুয়ে রইল। বাস্তবিক, এই মেয়েটির জন্য দুঃখ করছিল অভয়ের।

টুকুন তাদের দুজনার মাঝখানে শুযে রযেছে, তাকে নিয়েও ঢের আপসোস করা যায কিন্তু টুকুনেব বাপ অভয, আজ দিনের বেলায় ত সে ভাবছিল মেয়েটাকে খেলার বলের মত ছেড়ে দেবে না সে জীবনের পথে, উপহসিত হতে দেবে না, কোনো একটা শিক্ষা তাকে সে দেবে। স্বর্ণের কোনো এক বাবা ছিলেন নিশ্চয়ই, অভয়ের মত ঠিক এতদূব না ভাবলেও শাট্‌লকর্কের মত পৃথিবীতে ছেড়ে দেবার উদ্দেশ্য তার ছিল না নিশ্চয়, যার নাম স্বর্ণ রাখা হযেছিল , তাকে ধুলোয ছারপোকায মশা বিছা মাকড়শাব ভিতর গড়াতে দেখলে তিনি কী ভাবতেন ? এবং অভয কি মনে মনে সহস্রবারও তাব স্ত্রীকে উপহাস্য স্পদ বলে ভাবে না। মুখে না হোক,সমস্ত গোপন হৃদয দিয়ে এই মেয়েটিকে ব্যঙ্গ করে যাচ্ছে না কি সে? সে এবং আরো অনেকে? ভাবতে গেলে এইসবে বড় দুঃখ লাগে?

টুকুন এখনো ঢের ছোট, তাব ভবিষ্যৎ এখনো বরং অনাবিষ্কৃত, তার পিতা তার জন্য যথেষ্ট , কেই-বা জানে টুকুন বাঁচবেও কিনা। তার মা যেমন দেখছে? টুকুনের সমস্ত কথা এখনো ঢের আড়ালে। কিন্তু তার মা? তার ছোটবেলার জীবনটাকে একেবারে ভুলে গেছে সে জীবন বলতে স্বর্ণ আজকার এই দিনগুলোকে শুধু বোঝে, এ জীবনকে সে স্বীকাব করে নিয়েছে। যেন কোনো দিন কিছু ছিল না কিছু থাকবে না আর, অন্য কোনো কিছুর জন্য কোনো আকাঙক্ষা থাকতে পারে না আব। এ জীবন থেকে পালিয়ে যাবার অর্থ স্বর্ণ বোঝে না ,জীবনকে ফাঁকি দেযার মানে স্বর্ণের কাছে অজ্ঞাত। যদি এসব বুঝত সে তাহলে হযত অনেক রকম চেষ্টা করত। নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ করে নিজেব হাতে তুলে নেবাব জন্য ক্রমাগত প্রয়াশ পেত। কিন্তু স্বর্ণের অন্ধকার অজ্ঞ হৃদয ঘরের ভেতর একটা অন্ধ গুববে পোকাব মত ডেস্কে চেযারে টেবিলে, চৌকাঠে, কড়িবরগায় থামের থেকে থামে সমস্ত কঠিন জিনিসের ওপর সারারাত ভরে খটাশ খটাশ করে আছাড় খেযে ফিবছে শুধু , ভাবছে জীবন এই সব প্রতিঘাত শুধু।

মশারির ভিতর গরম হযে উঠেছে।

মশাও দু-চারটা ঢুকে পড়েছে।

অভয় অনেক দিন পরে বিদেশেব থেকে এসেছে। এসব অস্বচ্ছন্দে তার অভ্যাস নেই, এর ভিতর ঘুমানো তার পক্ষে শক্ত, কিন্তু মশা মুখে করে গুমোটের ভিতর স্বর্ণ ঘুমুচ্ছে, এবং বিয়ের পব থেকে আড়াইটা বছর এরকম রাতের পর রাত কতনা রাতই সে এমনি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

গরম অসহ্য, মশাও ঢেব। অভয় তার হাত পাখা একটু বন্ধ করেছিল, কিন্তু টুকুন চিৎকার করে উঠল।

স্বর্ণ জেগে উঠে বললে, 'টুকুন কাঁদছে কেন?'

অভয় বললে, 'গরম লেগেছে হয়ত।'

—'বাতাস দেও না কেন?'

অভয় বাতাস দিতে আরম্ভ করল আবার।

স্বর্ণ বললে, আমার গায় একটু লাগিয়ে দাও।

তা দেবে। বছরের ভিতর এরকম অবসর ও বিলাস স্বর্ণ ও টুকুনের জীবনে কয়েক দিনের জন্য আসে শুধু, সারাটা বছর এরা গরমে মরে, শীতে কাঁপে, হয়ত বর্ষায়ও ভেজে। অভয় তখন কলকাতায় মেসের তেতলায় প্রাইভেট টুইশনের টাকার উদ্বৃত্ত দিয়ে চুরুট ফুঁকত। নতুন বইয়ের পাতা ওলটাত, এবং জীবনকে অত্যন্ত একা ও ভারাক্রান্ত মনে করত,একা ও নিপীড়িত মনে করত। একা, স্ত্রী ও মেয়ের অভাবে নয়, বস্তুত মেয়ে ও স্ত্রীর কথা ভাবতেও যেত না, চিন্তা যারা করে স্থির কঠিন নরম চিন্তা করে, চিন্তা করে শুধু তারা যেমন সবকিছু পরিবেষ্টিত হলেও সত্যিই একা, তেমন এক একাকিত্ব তাকে পেয়ে বসত, মনে হত যে বন্ধুত্ব চায়, কোথায় তা পাবে? সে এমন পরিত্যক্ত?তার হৃদয, এই কামরা। সমস্ত কলকাতাব শহরটা এমন নির্জন, এমন নিরর্থক! কোথায সে যাবে? কিন্তু আশ্চর্য এই নিরর্থকতা, নির্জনতাই ফিরে আবার তাকে পুবস্কার দিতে আসত। কিন্তু স্ত্রী বা মেয়ের কাছে যাবার কথা একবারও অভযের মনে হত না। এদের ওপর সে বীতশ্রদ্ধ বা বিবক্ত বলে নয়, নিজেকে সে পিতা ও স্বামীও মনে করে কিন্তু জীবনের কত কী প্রয়োজনীয় স্বামীত্ব ও পিতৃত্বে মিটছে না , স্বর্ণই ও টুকুন এই পৃথিবীতে যদি না থাকে তাহলে কিছুই হয় না যেন, বরং তেতলার এই কামরাটা থাকুক, চুরুট থাকুক, এই বইগুলো থাকুক, ছাদ থাকুক, ছাদের ওপরে সারারাত ডেকচেয়াব চুরুট ও নক্ষত্রগুলো থাকুক।

বাস্তবিক, এক এক সময় মনে হয়েছে, চুরুটও সমস্ত প্রশস্ত ছাদ ভরে সমস্ত দীর্ঘ রাতের সেই নিবালা অবসর যেন জীবনের সবকিছু জিনিসের চেয়ে দামি।

টুকুন কেঁদে উঠেছে।

স্বর্ণ বললে, 'কই বাতাস করছ না যে?'

অভয় মেয়েকে আবাব বাতাস দিতে লাগল।

স্বর্ণ বললে, 'আরো একটু জোরে, আমার গায লাগিযে।'

স্বর্ণ একটু নিকটে এগিযে আসছে। টুকুনকে সে একপাশে সরিযে দিযে স্বামীব পাশাপাশি এসে শুল, বাতাসের জন্য, বাতাসেব জন্য, অন্য কোনো আকাঙক্ষায নয, অন্য কোনো আকাঙক্ষা অভযেব মন থেকেও আজ ঢেব দূবে। কিন্তু এই গরমের রাত দরজা জানলা দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন বাতাসের বিলাস , সজাগ পাপিযার ডাক, নিম কামিনী বাতাসীর হলকা অনেকক্ষণ ধরে একটা ঘুমেব অভাব, স্বর্ণের নতুন নীলাম্বরীব ঘ্রাণ, তার স্বেদাক্ত সুস্থ ববং সুন্দর শরীরের ওম অভযকে নিমেষের ভিতর কোথায নিযে এসেছে যে! কলকাতার থেকে ফিরবাব পর আজ এই প্রথম বাত যখন সে নিজেকে বুঝে উঠতে পারছে না আর, যখন জীবনেব অন্যসব উৎস নিরুদ্ধ হয়ে গেছে যেন, স্বর্ণের মাথার চুল আস্তে আস্তে বুলিযে দিচ্ছে অভয,মুখ চোখ থেকে কেশবতীর গভীর চুলগুলো সরিযে দিচ্ছে সে, সবিযে দিচ্ছে, এই অনতিক্রমনীয অন্ধকাব তাকে যে কোথায নিযে যাবে!

কিন্তু নিল না কোথাও। দরজায ধাক্কা পড়েছে।

কমলকামিনী বললেন, 'অভয'!

অভয উঠে বসল।

—'অভয।'

—'যাচ্ছি মা।'

কমলকামিনী বললেন, 'ঘুমিয়েছিস নাকি অভয?'

—'না।'

—'স্বর্ণ ঘুমিযেছে?'

স্বর্ণ ফিসফিস করে বললে, 'বলে দাও ঘুমিযেছে।' বললে, 'আমার উপুব রাত দুপুরে কোন হুকুম পেড়ে বসে কে জানে বাবা! হাড় কি আর আস্ত রাখতে দেবে?' স্বর্ণ পাশ ফিরে শুল, বুঝতে পারা গেল না এই মুহূর্তের আগের রোমাঞ্চের হাত থেকে মুক্ত হযে সে তৃপ্তি বোধ করছে না অবসাদ, না ব্যথা না বিরক্তি। হয়ত তৃপ্তিই অনুভব করছে সে, কামনা নিষ্ফল হযে যাওযাতে শান্তি পাচ্ছে, মনের ভিতর একটা গুমর নিয়ে অভয় দরজা খুলল।

কমলকামিনী বললেন, 'এসেছিস অভয়, আয বাবা বাইরে অভয়—শোন।'

অভয বারান্দায গিয়ে দাঁড়াল।

—'এত রাতে তোদের ঘুম নষ্ট করতাম না বাপ, কিন্তু মজুমদারদের বাড়ির থেকে এই কিছুক্ষণ হল লুচি-মাংস পাঠিয়েছে।'

লুচি-মাংসের জন্য বিশেষ কোনো উদ্বেগ অভযের ছিল না, অন্তত মুহূর্তখানেক আগেও।

কমলকামিনী বললেন, 'পাঁঠার ঝোল আর লুচি, মিষ্টিও দিয়েছে অনেকখানি, কিন্তু মিষ্টি কালকের জন্য তুলে রেখেছি, তা যদি একটা–আধটা রসগোল্লা বরফি তুমি আর বউমা চাও তা এনে দিতে পারি।'

—'দরকার নেই।' অভয় বললে।

—'কি বেশ, তাই ভাল, কাল সকালে খাবে, মিষ্টি ত পচে যাবে না, কিন্তু এই গরমের রাতে মাংস খসে পড়বে, লুচিও গলে যাবে, তাই তোমাদের ডেকে তুললাম বাবা। বউমা কোথায়?'

—'ঘুমিয়েছে।'

—'আহা ঘুমুলে কী করে হবে? সবাই খেয়েছে,সে খাবে না?'

অভয় অত্যন্ত নিস্পৃহ হয়ে বললে, 'ঘুমিয়ে গেছে।'

—'ঘুমুলে চলবে কী করে, বাড়িসুদ্ধু সবাই খেল, সমবচ্ছরের মধ্যে এই একবার খাওয়া , খুড়োরা খেল, তোমার বাবা খেল, জেঠা, জেঠিমা, খুড়িমা, ভাইবোন সব খেয়েছে; লুচি মাংসের মুখ ত বছর ভরে আর একবারও দেখা হয় না, শুধু থোড়ের চচ্চড়ি আর মুলোর ঘণ্ট, যাও বউমাকে ডেকে তোলো। তোমরা খেলে তবে আমি খাই।'

অভয় তাকিয়ে দেখল স্বর্ণ এসে দাঁড়িয়েছে। হুকুমে নয়, ফরমাজে নয়, তলবে নয়, মাংস খাওয়ার অনুনয়ে শুধু,মশারির ভেতর থেকে সে তা শুনেছে, এসেছে সে।

স্বর্ণের মুখের ভেতর কোনো যৌন রমাঞ্চের লেশস্পর্শও নেই, নিষ্ফলতা নেই, না আছে অবসাদ , ঘুমেরও কোনো কথা নেই, অভয় তাকিয়ে দেখল একটা জিহবার স্পৃহা, নিছক, নিরেট তার চোখ দুটোকেও যেন বিস্ফারিত করে তুলেছে,সমস্ত শরীরটাকে পুলকিত করে দিয়েছে। এই মাংস লুচির থেকে স্বর্ণকে যেন বঞ্চিত যদি করা যায় তাহলে এই মেয়ের আর আপসোসের শেষ থাকবে না। কিছু মুহূর্ত আগে এই মেয়েটি নিজেকেই অন্য আর রকম ক্ষুধার থেকে কত সহজে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করেছিল, কত পরিতৃপ্তি পেয়েছিল তাতে। জীবনের কোলাহল গ্লানির থেকে নিজেকে এত বিচ্ছিন্ন মনে করেও নিজের সুস্থিত শীত চিন্তার আবেশে এত মুগ্ধ থেকেও অভয় তা পারে নি। গুমর এখনো তার হৃদয়ের থেকে সরেনি। চঞ্চলা বাতাসে, নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর বসে মুহূর্তের আগের যৌন আবেগ তার কাছে এমন নিরর্থক মনে হতে লাগল, যে ভযাবহ ভবিষ্যতে তা পরিণত হত তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে এমন শান্তি বোধ করতে লাগল।

স্বর্ণ মায়ের সঙ্গে বাড়ির ভেতর চলে গেল, অত্যন্ত ব্যস্ততায় আগ্রহে,মাংস খেতে। অভযকে পাঠিযে দেয়া হবে, এখুনি, এই পনের মিনিট আগেও কি বেকুবির পরাকাষ্ঠাই না নিয়েছিল সে, নিজেকে এমন উপহাস্যস্পদ মনে হল, সমস্ত মন তার ব্যঙ্গে পরিতৃপ্তিতে, নম্রতায় ভরে উঠতে লাগল, গভীর আকাশে নক্ষত্রের নিচে ঘাসের ওপর নিজেকে বিছিয়ে দিলে সে,—এই ত মানুষের জীবন, কলকাতায় রাতের ভেতর চেয়ার ছাদ চুরুট নক্ষত্র, বাতাসের জীবন, আবার ফিরে পেয়েছে সে, কি একা মারাত্মকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে সে!

কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল অভয় । মাংস এল। দীনু ঠাকুরের চমৎকার হাতের রান্না,কেউ বলে মজুমদাররা বাবুর্চি দিয়ে রাঁধায়। খিদে হয়ত বিশেষ ছিল না, বস্তুত লুচি ও পাঁঠার মাংসের একখানা থালা —কিছুক্ষণ আগে তার মন থেকে সবচেয়ে দূরে ছিল। কিন্তু গভীর রাতের স্নিগ্ধ বাতাস, গরম মচমচে খাস্তা লুচির ঘ্রাণ, ঘি মশলা কোমল জাফরানস্নিগ্ধ মাংসের কোর্মা, আবার সেই পাপিয়ার ডাক। নেবুফুলের ঘ্রাণ। অনেক রাতের চাঁদ কোনো এক সমৃদ্ধির দিকে অভযকে ঠেলে দিচ্ছে এই ভাঙা ঘরদোরগুলোর জাযগায় , একটা দরদালান, নহবত, রসুনচৌকি, পাইক সান্ত্রী থাকত যদি, এই জ্যোৎস্নায় একটা দিঘি, পদ্মফুল রাজকুমারী।

স্বর্ণ এল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে সে। পেট ভরে মাংস খেয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছে। তার চেহারার যা কিছু সৌন্দর্য, এমন স্থূল হয়ে পড়েছে, চোখ দুটো তার তারায় দুটো ডিমের ডেলার মত।

রাতের এই ঝিঁঝি,শিশির, জোনাকি,বাতাসের থেকে সে এমন স্বচ্ছন্দভাবে হারিয়ে গেল, ওই ছেঁড়া মশারি বিছানার নোংরামির ভিতর গুটুলি পাকিয়ে রয়েছে সে।

আড়াইটা বছর এমনি করে রয়েছে সে। আরো আড়াই হাজার বছর, অনন্তকাল যেন থাকতে পারে। অভয় ঘরের ভিতরে আর গেল না। ভিতর থেকে কোনো ডাকও এল না। বাইরে একটা ক্যাম্পখাট পড়েছিল। সেটার ওপর শুয়ে রাত কাটাবে ভাবল অভয়।

কিন্তু টুকুন কেঁদে উঠেছে, এখন যদি থামিয়ে না দেয়া যায়, তাহলে এ কান্নার কি পরিণতি হবে জানে অভয়,এ রাতের সুস্থিরতা এ মেয়েটি একেবারেই নষ্ট করে ফেলবে, এই বাড়ির অনেককেই যে স্বর্ণকে ও টুকুনকে দেখতে পারে না তার একটা কারণ বোধহয় এই, একজনে অপ্রয়োজনীযভাবে কাঁদে,

আর একজন অন্যায্য ভাবে কাঁদায়।

অভয় গিয়ে দেখলে স্বর্ণ বিছানার একপ্রান্তে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, টুকুনকে মাঝখানে রেখে দিয়েছে, বালিশে মাতা রেখে অত্যন্ত চুপচাপে সে শুয়ে পড়ল। বাতাস দিতেই টুকুন চুপ করল, কিন্তু এ মেয়েটির যেন একটা নতুন নেশা ধরেছে,এক মুহূর্ত পাখা থামালেই সে কেঁদে উঠবে। সারারাত ধরে অভয়কে বাতাস দিতে হচ্ছে তাই, ঘুম তার অনেকক্ষণ পায় নি বটে, কিন্তু বাস্তবিক যখন ঘুম পেল, তখনো টুকুনের কান্নার জন্য ঘুমনো সম্ভব হচ্ছে না তার,বার বার চটকা ভেঙে যাচ্ছে,সারারাত তাকে জাগতে হল।

চার-পাঁচ রাত জেগে অভয়ের শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না। কিন্তু তবুও টুকুনকে বাতাস দিতে দিতে মনে হতে লাগল স্বর্ণ এমন কত রাত জেগেছে,সন্তান প্রসব করা এক অমানুষিক কষ্টের ব্যাপার কিন্তু শিশুকে পালন করার বিধি আরো কত কঠিনতর, মা এক বিচিত্র জিনিস, প্রকৃতির হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে সে তৈরি হয়। অভয় ভাবছিল, কিন্তু পিতাকেও জীবন ছেড়ে দেয় কি? যাবা পিতা নয়, কিংবা যেসব পিতা ফাঁকি দেয় মাকে তা সম্পূর্ণরূপে বোঝে না। সামান্য একটা চড়ুই পাখি চড়ুই মা-র কিই-বা খোঁজ নিতে যায় তারা। জীবনেরও অসংখ্য আশা প্রযাস আশঙ্কা আকাঙক্ষারও কথা ভাবতে ভাবতে ভোবের বেলা অভয় ঘুমিয়ে পড়ল। কতটুকুই-বা চিন্তিত মুগ্ধ হয় তাতে? তার নিজের মা কমলকামিনীকেও এতদিন যেন সে বোঝে নি, যতদিন অভয শিশু ছিল,কোনোদিন মাকে; তাবপর তার বাল্য গেল,ক্রমে ক্রমে বয়স্ক হল সে, বিয়ে করল,সন্তানের জন্ম দিল কিন্তু তবুও মাকে বোঝে নি, না কমলকামিনীকে না টুকুনেব মা স্বর্ণকে।

এতদিন পরে টুকুনকে পালতে এল। কতদিনের কত যে পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার, এইসব কোনোদিনই কি উদঘাটিত হত? কতদিনের কত পুরনো কথা টুকুনকে বাতাস দিতে দিতে অভয় ভাবছিল। যেদিন সে টুকুনের মত ছিল সে আচ্ছা ঘোর বত্রিশ বছর আগেকাব সেই ছাযাচ্ছন্ন শিশুকে, নিজেকে যে দেখতে পাচ্ছে,স্পষ্ট মনে পড়ছে এমনি ছেঁড়া মশাবির ভিতব এমন অসংখ্য গবমে মাযেব কোলের কাছে শুযে বাতাস খেযেছে সে, সাবারাত মাকে ক্লান্ত,উত্যক্ত নিদ্রাহীন করে রেখেছে সে, ভযেব স্বপ্ন দেখলে মাকে গিয়ে জড়িযেছে সে, মাকে এক মুহূর্ত জাগিযে দিতে কসুব কবে নি, এ যে তার প্রাপ্য, নিজের [....] একটুকুও ছেড়ে দেয নি অভয, ঘুমতে দেখলে পাযেব আঘাত দিয়েই জানিযেছে সে, স্পষ্ট মনে পড়ছে একটা গবম দুধের বাটি সামনে বেখে কমলকামিনী তার আঁচল দিযে অভযেব গলা জড়িয়ে নিয়ে, কিনাব দিযে ঢকঢক করে দুধ খাইযে দিত তাকে, স্বর্ণ যেমন টুকুনকে খাইযেছে, স্বর্ণেব মত কমলকামিনীও তুচ্ছ একবাটি জল খাওযাতে গিযে প্রতিটি বারই কত যে বেগ পেযেছে.লাথি দিযে কতবাব বাটি ছিটকে ফেলেছে অভয, থুতু করে সমস্ত দুধ উগবে ফেলে মাযেব সমস্ত কাপড় ভাসিযে দিযেছে, ঝিনুক ছিটকে ফেলেছে, মাযের সমস্ত মুখ দুধের বিন্দুতে কতবাব মণ্ডিত করে দিযেছে অভয, কমলকামিনীর সেই মুখ এই অন্ধকাবে বত্রিশ বছব পবে আবাব পবিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অভয, পাওযা যায, গবম দুধেব গন্ধে নিবিড় মাযের সমস্ত মুখ। কেঁদে আকাশ আকাশ উজাড় কবে দিয়েছে, এইসব ঝক্কি মাকে দিনেব ভিতর কতবার কবে দুধ খাওযাতে গিযেও সহ্য কবতে হযেছে, তারপরই মা-ই ত প্রথম অভযেব জন্য স্বপ্ন কল্পনার জানালা-দবজা খুলল, দুধের বাটিটাকে প্রিয করবাব জন্য শালিখ খঞ্জনা কুকুর বিড়াল গরু ঘোড়াব থেকে শুরু কবে শ্যাওড়া তেলাকুচো তেঁতুলের ভীতিপ্রদ আকাশ আকাশের চাঁদ তারা বনের জোনাকি ঝিঁঝি বাস্তব অবাস্তবেব কোনো গল্পের কিছু কি বাকি বেখেছে মা? স্বর্ণ সেও কি কিছু বাকি বেখেছে?

কলকাতার মেসেব ছাদে চুরুট হাতে ডেকচেযাবে বসে সাবাবাত, বাতেব পর রাত, জীবনের অনেক নরম মুগ্ধতার কথা অনেকবার ভেবেছে অভয কিন্তু এসব কথা কোনোদিন সে ভাবে নি, না কমলকামিনীব কথা, না স্বর্ণের কথা।

বত্রিশ বছর আগের সেই শিশু, সেই কটা রঙেব ছেঁড়া মশারি, অন্ধকারেব ভিতর যা ভালুকের মত জবুথবু হযে থাকত, হিংস্র চিতার মত হঠাৎ ভয খাওযাতে আসত তাকে, লাথি মেবে মাকে জাগিযে দিয়ে যাব কঠিন অস্পষ্টতা ও হিংস্র আবছাযার হাত থেকে নিজেকে সে বাঁচাত, এই সবেব ওপব এমনই একটা ধূসর, বঙশূন্য আববণ পড়ে গিযেছিল, এমনই ধূসর, এমনই রঙশূন্য যে তার বর্ণহীনতার কথা কোনোদিন ভাবতে যায নি সে, মনেও হয নি এইখানে, এইখানে বর্ণহীন হযে আছে। কিন্তু বর্ণ ধরেছে আবাব, এই টুকুনই যেন সে, স্বর্ণ যেন কমলকামিনী, এই নোংরা ছেঁড়া মশারিটা বত্রিশ বছর আগের সেই ছেঁড়া কটা মশারিটারই মত, ভালুকের মত জবুথবু হয়ে রয়েছে যেন, গভীর অন্ধকারের ভিতর হিংস্র চিতাব মত কখনো-বা বিভীষিকার উৎপাদন করছে! একটা গভীর আমোদে ও তামাশায অভযেব হৃদয ভরে উঠল, খামকা চোখের জলে হৃদয নরম হয়ে যাচ্ছে,ভোরের রোদের ভিতর স্বর্ণ ও টুকুন ঘুমুচ্ছে।

তিমিরময়

এ বছরটা জ্যোৎস্নার চেঞ্জে চেঞ্জে কেটে গেছে, গত বছরেও আট দশ মাস,প্রায় দুবছর হল।

একটি ছেলে হওয়ার পর থেকেই রোগা রোগা শরীরটা ওর দড়ির মত গুটিয়ে যাচ্ছিল,সেই সুতোপাকানো সরু সলতের মত চেহারার দিকে তাকিয়ে অচ্যুতের দুঃখ হত,অবসাদ বিরক্তি বোধ হত। একটা রফা হয়ে গেলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু না এদিক না ওদিক এই শীর্ণ সলতেকে ঘিরে জীবনদীপ কেমন অলক্ষভাবে জ্বলে যাচ্ছিল দেখে দেখে সে ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু মেয়েটিকে নিজের হাতে খুন করবার মত জীবনের প্রতি কোনো দৃঢ় বিশ্বাস অচ্যুতের ছিল না, চেঞ্জে পাঠিয়ে সারিয়ে ফেলবার সম্বলও তার ছিল না। সে শুধু এই প্রতিজ্ঞা করতে পারে যে কোনো দ্বিতীয় সন্তান অন্বেষণ করতে যাবে না আর। কিন্তু এই মুমূর্ষু রোগীটির মুখের দিকে তাকিয়ে এই প্রতিজ্ঞার কল্পনাও কি অদ্ভুত! জ্যোৎস্না শুনলে শিউরে উঠত।

অচ্যুত উঠে দাঁড়াল।

বিলাসদের বাড়িতে সন্ধ্যার আড্ডায় গিয়ে পুরো এক বোতল কনিয়াক খেল। সারারাতের ভিতর বাড়িতে ফিরবার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না, হয়ত তার মনেই ছিল না, তার কোনো বাড়ি আছে কিনা।

পরের দিন সকালবেলা জীবনটা তাব অনেকখানি তৃপ্ত হযেছে, হযত জীবনের পরিতৃপ্তিব বাকি নেই কিছু আর, চৈত্রের রোদে আকাশ আর পৃথিবীটাকে অত্যন্ত ক্ষমতাময় ঐশ্বর্যশালী মনে হচ্ছে।

অচ্যুত বিলাসকে একটা তরমুজ কাটতে বলল,মিশ্রি দিযে একগ্লাশ রস খেযে ঠাণ্ডা জলে স্নান কবে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত বক্তমাংস নিযে বেরিযে পড়ল।

জীবনটা তার এরকম নয।

ওরকম জীবনের জন্য তার একেবারেই আগ্রহ নেই,বিলাসকে সে একজন অন্তঃসারশূন্য মাতাল বলে জানে, জানে ওর ওই সন্ধ্যোব আড্ডার থেকে প্রাণ তাব ঢের দূবে। সমবচ্ছরেব মধ্যে বিলাসের আড্ডায একদিন কি দুদিন সে যেত চারদিককার লোকজন যখন ঘৃণা ও আক্রোশে বিলাসকে ক্রমাগত বিঁধতে থাকত হযত তার কোনো একটা নতুন কীর্তির জন্য তখন এক-আধবার অচ্যুতেব পাযেব ধুলো পড়ত সেখানে, বিলাসকে সম্মান করতে নয, তাকে শোধরাতে নয, লোকটাকে কেমন কৌতূহলময মনে হত বলে,এবং কনিযাক-এর পুরোপুরি একটা বোতল সাবারাত বসে নিরিবিলি খেতে পাবা যাবে বলে। মদ খেতে খেতে বিলাসের দিকে এমন স্থির কঠিনভাবে চেযে থাকত অচ্যুত যে বেচাবি ভয পেযে যেত,অচ্যুতের মুখের ভিতর অবিশ্যি ভযংকরতা কিছু ছিল না, কিন্তু তবুও যেন স্তব্ধ এমন প্রশ্নোত্তরের সম্পর্কহীন হয়ে তিমিরময সারারাত নিববচ্ছিন্ন বসে থাকত সে।

বিয়ে হল এই ছ বছর, এর ভেতর বিলাসের মজলিশে একদিনেও আর যায নি অচ্যুত,মদ একদিনও ছোঁয় নি, চুরুটও ছেড়ে দিয়েছে,বিযেটা একেবারেই অপছন্দসই,নিজেকে নানাভাবে রূপান্তরিত করেও জ্যোৎস্নাকে নিযে কোনো সুবিধা হল না, জীবনটাকে চমকপ্রদ কবতে কোনোদিনই অচ্যুত চায নি,না বিয়ের আগে, না বিয়ের পরে, কিন্তু বিয়ের পরে অনেক জীবনেব সেই শান্ত সুবিধাটুকুও রইল না আর,আত্মাকে কেমন পরাধীন মনে হতে লাগল। জ্যোৎস্না তাকে বাধ্য কবাতে যায না, কিন্তু তবুও অচ্যুতের জীবনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি চিন্তা এ মেয়েটি যেন তার জন্য পরিমাপ করে দিচ্ছে। জ্যোৎস্না বলে না কিছু, কিন্তু তবুও এর অস্তিত্বই যেন বড্ড অস্বস্তিকব। অচ্যুত হয়ত একটা বই কিনে আনল,জ্যোৎস্না দেখল না কী বই, দেখবার জন্য কোনো ঔৎসুক্যও প্রকাশ করল না, সে দূরেই সরে রইল, কিন্তু তবুও বাতি জ্বালিয়ে বইটা পড়তে গিযে কেমন বাধা বোধ হয়। একুশ শিলিং দামের বই, যেটা কিনতে অচ্যুতকে অনেক রক্তপাত করতে হয়েছে,তার একপাতাও সে পড়তে পারে না। এর পর জীবনকে কার ভাল লাগবে?

বইয়ের বদলে জ্যোৎস্নাকে দুল গড়িযে দিলে ভাল হত! অনেক কষ্ট করে 'বউযের জন্য এক-আধবার খাসা শাড়ি কিনে এনে দেখেছে অচ্যুত,কই শাড়িও ত সে চায না,এমন সুন্দর শাড়ি! এই মেয়েটি

জীবনকে এমন উপেক্ষা করতে ভালবাসে! কোনো কিছুই যেন তার প্রাপ্য নয়, এ সন্তান তার প্রাপ্য ছিল না, এমন বিবাহকে সে আশা করে নি, এমন নারীজীবনকেও কি সে প্রত্যাশা করেছিল?

একটা সেলাইয়ের কলের মত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কোনো কোনো মেয়ে জীবনের থেকে পালিয়ে বেড়ায়, বাঁচে, স্বামীকেও বাঁচায়। কিন্তু জ্যোৎস্না একেবারেই আশ্রয়হীন, কোনো টোপেই সে ধরে না, ধরল না। সন্তান জন্মের পর সে মরতে চলেছিল, মরলে মন্দ হত না, কিন্তু তাও মরল না ত।

নিজের জীবনকে এমন ভাবাক্রান্ত কোনোদিন দেখে নি অচ্যুত। বিলাসের আড্ডার থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে সে ফিরল। জ্যোৎস্নাকে নিয়ে সেদিনই অচ্যুত তার জেঠামশাইয়ের কাছে আম্বালায় চেঞ্জে চলে গেল। বউকে জেঠামশাইয়ের জিম্মায় রেখেই অচ্যুত ফিরে এসেছিল, আম্বালায় জ্যোৎস্না দুমাস রইল, তারপর দার্জিলিঙে ইস্কুলের টিচার অচ্যুতের পিসিমার কাছে চারমাস, তারপর দেরাদুনে অচ্যুতের ছোটভাই অমিতের কাছে আট-ন-মাস। এই দুদিন হল জ্যোৎস্না অমিতের সঙ্গে দেশে ফিরছে।

অচ্যুত অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিল ট্রেনের থেকে যে [...] মেয়েটি নামছে, সেই জ্যোৎস্না।

ফিটফাট সুট পরে লম্বা-চওড়া অমিত দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ি শিশুর মত কোলে তার খোকা—পাশে জ্যোৎস্না। মেয়েটা এবার জীবনে খুব বিশ্বাসী। নানারকম উৎসাহ ও আশা আছে তার। কিন্তু অচ্যুত বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছে না। দেরাদুনেই ত জ্যোৎস্না বেশ ছিল, জীবনে এমন নিয়ম হল না যাতে আম্বালায় বা দেরাদুনে দার্জিলিঙে জ্যোৎস্না দিন দিন থাকতে পারে?

স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে এ দেড় বছর অচ্যুত খাসা ছিল, বেশ পড়তে পারছিল, সকালবেলা সে চারখানা খবরের কাগজ পড়ত; দুপুরটা সে অফিসে ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাত। বিকেলে চায়ের দোকানে, রাত, বিছানায়। অবিশ্যি বই নিয়ে এবং বাকি রাতটা চুরুট নিবিয়ে দিয়ে খোলা দরজা জানালা বাতাস অন্ধকার চুরুট ফুঁকে ঘুমিয়ে জীবনটাকে সে মনের সাধে ফুঁকে দিচ্ছিল। আর কি চাই? জ্যোৎস্নাকে কামরাঙার মত যত টকটকে তকতকে দেখাক না কেন অচ্যুতের সংসর্গে এসে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে যাবে সে, শিগগিরই আবার সেই মনমরা মেয়ে ও একদম অবসন্ন ভীরু পুরুষের জীবনের ফিরিস্তি আরম্ভ হয়ে যাবে।

দিনকয়েক ঠাকুরপোতে বউদিতে বেশ কেটে যাচ্ছে, অসিতের পাহাড়ি খোকাকেও রাখছে।

অচ্যুত পড়ছে, লিখছে, লিখছে পড়ছে, কোনো বাধা নেই। কিন্তু অসিত চলে যাচ্ছে, খাবার সময় খোকাকেও সে নিয়ে গেল। জ্যোৎস্নার তাতে বিশেষ কোনো আপত্তি ছিল না, অচ্যুতের ত আপত্তি নেই-ই, সব চেয়ে কম আপত্তি খোকার।

বাবার চেয়ে মার-র চেয়েও কাকাকে ঢের ভালবাসে সে। সেটা ঠিকই বুঝেছে খোকা; বিয়ে অসিতের করা উচিত ছিল। [...] পৃথিবীতে এমন চমৎকার স্বামী ও বাপ হবার উপযুক্ত মানুষ অচ্যুত কমই দেখেছে, একদিন খোকাকে ও বউদিকে সে ছেলেভুলানো ছড়া গেয়ে ঘুম পাড়াবার মত মুগ্ধ করে রেখেছে তার অক্লান্ত ফুর্তি ও তৎপরতা দিয়ে।

খোকাকে নিয়ে সে চলে গেল।

স্টেশন থেকে ফিরে এসে অচ্যুত দেখল জ্যোৎস্না আরশির ধারে দাঁড়িয়ে বেণী বাঁধছে, একটা উঁকি দিয়েই সে চলে গেল।

কয়েকখানা বই রিভিয়ু করবার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে, এর মধ্যে একখানা বই বেছে নিয়ে সে পড়ে ফেলছিল, বইটা তাকে অত্যন্ত হতাশ করেছে, এই ধরনের বই ও লেখকদের আক্রমণ করে সে মস্ত বড় একটা সমালোচনা লিখবে, কাগজ বের করল, কলম ধরল, মন তার অত্যন্ত বিরক্তি ও বিষণ্ণতায় ভরে রয়েছে, নিজের জীবনের নিষ্ফলতায় নয়, বাস্তবিক নিজের জীবন সফল কি নিষ্ফল সে কথা ভাববার সময়ও ছিল না তার, হয়ত তার নিজের জীবনটাও গ্রাস হয়ে গেছে এই সমালোচনার সমারোহে।

মন তার ব্যথায় ও বিরক্তিতে ভরে উঠেছে এক অদ্ভুত বইটার সংঘাতে এসে, কিন্তু বইটার অসারতার চেয়েও এর জনপ্রিয়তা অচ্যুতকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। যদিও অসার যা তাই জনপ্রিয় তাও জানে অচ্যুত।

অচ্যুত লিখছে, এক লাইন, দুলাইন, এক প্যারাগ্রাফ হয়ে গেছে তার।

এক প্যারাগ্রাফ লিখতে আধঘণ্টা লাগল।

এবার সে একটু তাড়াতাড়ি লিখতে পারবে, মেরুদণ্ডের ডাঁট একবার খাড়া করে বাইরের পৃথিবীর

দিকে তাকাল সে। অন্ধকারে ভরে গেছে, এ অন্ধকারে জোনাকি নেই, আছে গ্যাসলাইট, একটা তিক্ততায় তার মন ভরে উঠল, জীবন যেন কৃত্রিমতায় ঢঙে, নকশায় [...] ভরে গেছে, রাস্তায় ঘাটে মানুষের জীবনে বইয়ের ভেতরে।

কলমটায় একটু ঝাঁকি দিয়ে সে লিখতে শুরু করল, কিন্তু ঘাড়ের ওপর একটু মৃদু চাপে চমকে উঠল অচ্যুত, জ্যোৎস্না এসে তার কাঁধের ওপর ভর করে দাঁড়িয়েছে। চোখে যেন তার অনেক নালিশ, কিন্তু কোনো নালিশই কর্কশ নয়, এবং সুস্নিগ্ধ, প্রণিধান করতে পারা যায়, সমাধানযোগ্য। জীবনে স্ত্রীর এরূপ দেখে নি কোনোদিন অচ্যুত। জীবন কি তাহলে আজ থেকে ধরাছোঁয়ার পথ দিয়ে চলবে? প্রশ্নের উত্তর এনে, উত্তরের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে, সহানুভূতির পথ ধরে জীবন কি মমতাময় হতে চলল? আশ্চর্য!

কাগজ কলম রেখে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল অচ্যুত।

—'বোসো।'

অচ্যুত আবার বলল।

—'লিখবে না আর?'

—'না।'

—'কেন?' জ্যোৎস্না টেবিলের একরাশ বইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এতগুলো বই এরকম করে ছড়িয়ে রেখেছ কেন? গুছিয়ে দেব?' সে একটু মিষ্টি করে মুখোমুখি সময় কাটাতে এসেছে, এই বই বা লেখাগুলোকে সুমুখে রেখে না, কিন্তু এগুলোকে সহসা পেরিয়ে উঠবার কোনো উপায় যেন করতে পারছে না।

অচ্যুত বললে,'না, গোছাবার দরকার নেই।'

—'কেন?'

—'এখন লিখতে গিয়ে এই বইগুলোকে অনেক নাড়াচাড়া করতে হবে।'

—'কী লিখছ?'

অচ্যুত বললে, 'এই আরম্ভ করেছি, শেষ হলে না হয় দেখো।'

—'কতক্ষণ লাগবে শেষ করতে?'

—'আজ সারারাত হয়ত লিখতে হতে পারে।'

জ্যোৎস্না চমকে উঠে বললে, 'সারারাত! তাহলে আমি কী করব?'

—'ঘুমবে।'

—'কোথায়?'

অচ্যুত কলমটা হাতে নিয়ে বললে, 'কেন,তোমার খাটে?

—'আর তুমি?'

—'আমি ত এই লিখছি।'

জ্যোৎস্না কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিল না।

অচ্যুত তাকিয়ে দেখলে তার স্ত্রীর মুখের ভিতর কেমন একটা ভাবহীনতা এসে পড়ছে; টেবিলের ওপর থেকে একটুকরা কাগজ নিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে অজস্র খণ্ড করছে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার মুখ কেমন আবেগহীন হয়ে পড়েছে,এক মুহূর্তের আগের প্রেরণা ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে তার। এই জিনিসটাকেই চেঞ্জে যাবার আগে, বিয়ের পর থেকে বরাবরই ভয় করে এসেছে অচ্যুত, এই ভাবহীন আবেগহীন মুখের শ্রী,এই।

অচ্যুত একটু ত্রস্ত হয়ে বললে, 'লেখাটা হয়ত এখনই শেষ হবে।'

—'তুমি লেখ কেন?'

—'লিখব না?

—'না।'

—'কেন?'

—'এ ত তোমার অফিসের কাজ নয়।'

—'তা নয় বটে।'

—'তবে কেন মিছেমিছি সেধে লেখ?'

সেধেই লেখা বটে।

—'পযসা পাও? লিখে?'

—'লিখে? না'

—'তবে এই নিযে সাবাবাত জাগতে চেযেছিলে?'

অচ্যুত তাই ত চেযেছিল।

—'আম্বালায জেঠামশাইও লেখেন বটে, কিন্তু তিনি ডিষ্ট্রিক্ট জজ। আদালতেব বায অনেক বাত অবদি লিখতে হয মাসে মাসে, কিন্তু সে ত অফিসেব কাজ, বাধ্য হযে কবতে হয,না হলে চাকবি যাবে।'

জ্যোৎস্না বললে, 'আব ঠাকুবপো' না দিনে, না বাতে কক্ষনো লেখে না, পড়ত না,বাইক কবে টেনিস খেলতে যায, আমাদেব নিযে বেড়ায, জঙ্গলে গিযে শিকাব কবে, সাবাবাত গল্প আব ফুর্তি কবে কাটায।' জ্যোৎস্না চুপ কবল ক্ষণকাল। অচ্যুতকে বললে, 'তুমি তেমন কবো না কেন, ঠাকুবপোব মত?'

অচ্যুত বললে,'ঠাকুবপো আমাব সৎমাযেব ছেলে,আমাব মাযেব ধাত পায নি,ওব মাযেব পেটে যদি আমি জন্মাতাম তাহলে হযত বিভিযু লিখে সময নষ্ট কবতাম না, জীবনেব এ অর্থও আমাব কাছে থাকত না।'

জ্যোৎস্না বললে, 'সেই ত ভাল হত।'

অচ্যুত বললে, 'আমাব মনে হয, এও একবকম মন্দ আছি না, দু-প্যাবাগ্রাফ লিখে বই দুটোকে [...] কবা।

অচ্যুত একটা সুন্দব মার্জিত বাঁধাই ও ঝবঝবে ছাপা কাগজওযালা বই জ্যোৎস্নাকে তুলে দেখাল।

জ্যোৎস্না বইটা একবাব হাতে নিযে বেখে দিল। 'এই সব বই দিযে কী হবে?'

অচ্যুত বললে, 'বাস্তবিক, শেষ পর্যন্ত এটা একটা বই মাত্র।'

কামানেব মাথায ঘুমতে ঘুমতে হঠাৎ জেগে উঠে পৃথিবীটাব দিকে দুর্দমযী তাকিযে বোনাপার্ট কী ফুর্তি পেত, কী প্রযাস, কোন মন্ত্রে পৃথিবীব মতই বিশাল হযে উঠত সে—সমালোচনা কববাব,লিখবাব জীবন শুরু কবে অচ্যুত খানিকটা বুঝেছে তা। জ্যোৎস্নাব চিন্তাশূন্যতায কিছু এসে যাচ্ছিল না তাব। কিন্তু সে তাব যুদ্ধেব মাঝামাঝি চলে এসেছিল প্রায,এমনি সময তাকে থামিযে দেযা'

কিন্তু জ্যোৎস্নাকে সে চলে যেতে বলতে পাবে না,এই মেযেটিকে নিযে যখন তাব হযত অনেক দিন,হযত সমস্ত জীবনই চলতে হবে,তখন একে বিবক্ত বিচ্ছিন্ন কবে কোনো লাভ নেই,প্রথম যখন জ্যোৎস্না অচ্যুতেব জীবনে এসেছে তখন বাপেব বাড়িব সংস্কাব সংসর্গ ও শিক্ষাব গন্ধ এব বক্তেমাংসে,তাবপব দেবাদুন ও ঠাকুবপোব ঘ্রাণ, কিন্তু এখন অচ্যুতেব নিজেব লেখাপডা সৃষ্টিব ও সমালোচনাব চিন্তা ও আবিষ্কাবেব খানিকটা বর্ণ দিযে একে অবিভক্ত কবে নিতে হবে,পাববে না কি অচ্যুত?

জ্যোৎস্নাকে বললে, 'দেখো,কী লিখেছি?'

জ্যোৎস্না এ পাশে চোখ তুলে বললে, 'থাক, তুমি লেখো,আমি বাধা দেব না, যাই।'

—'যাবে? দেখবে না?'

—'না।'

—'আচ্ছা দাঁড়াও,যেও না।'

জ্যোৎস্না দাঁড়াল।

অচ্যুত বললে, 'থাক, এখন আব লিখব না। খাতা সে বুজে,কাগজ সে মুড়ে ফেললে। কলমটা বেখে দিল।

জ্যোৎস্না বললে, 'লিখছিলে, থামলে কেন? লেখো,লেখো।'

অচ্যুত পড়াব ঘবেব সুইচ টিপে দিল।

—'আমাব জন্য লেখা থামালে আহা, কে বলেছে তোমাকে? যাও, যাও, লেখো গিযে। আমাব জন্য ভাবনাব কোনো দবকাব নেই, সাবাবাত আমি বেশ ঘুমতে পাবব।'

অন্ধকাবেব ভিতব মুখোমুখি দুইজনে দাঁড়িযেছিল।

অচ্যুত বললে, 'চলো।'

জ্যোৎস্নাকে সে অনুসবণ কবে চলল।

দেবাদুনেব কথা,ঠাকুবপোব কথা,পাখি শিকাব,মোটেব বেড়ানো, দার্জিলিং, পিসিমা, আম্বালা, জেঠামশাই, নানাবকম শস্তা উৎসাহ ও চিন্তাশূন্য আবেগ ও অর্থহীন উত্তেজনায অনেকটা বাত কাটিযে দিল

জ্যোৎস্না।

সাত আট বাত এমনি কবে কেটে গেল।

বিভিযুব বইগুলো ফিরিয়ে দিল অচ্যুত। কী সে বিভিযু কববে? মাথা তাব একেবাবে খালি হয়ে গেছে,হাতেও কোনো সময নেই। এবং অন্ধকাব না হতেই খাটে শুয়ে পড়ে ছোট ছেলেমেয়েদেব মত জ্যোৎস্নাব হাতে বাতাস খেযে গল্প শুনে জীবনে তাব সব প্রযাসেব হাত থেকে বেচে গিযেছে সে, একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। ভাববাব কী দবকাব? বই লিখবাব কী প্রযোজন? লেখা বই নিয়ে অত মাথা ঘামাবাব সংকল্প কে শিখিযেছিল তাকে? গত দুবছব কেমন জীবনযাপন কবছে সে? তাব চেয়ে এই অন্ধকাব কি ভাল নয, জ্যোৎস্নাব হাতেব পাখাব বাতাস চুড়িব ঝনঝন শব্দ, ছেলেমানুষি গল্প, অবিবাম কাকলি, একটি মেযে আযত্ত হয়ে আসছে এই বোধ।

একদিন সবই ত অন্ধকাব হযে যাবে, কোনো বই কোনো লেখককে কেউ মনেও বাখবে না। পৃথিবীব সবচেযে দামি বই, সবচেযে গভীব চিন্তাব পিছনে যে ক্ষমাহীন অক্লান্ত কাজ কবে গেছে, অচ্যুত ও জ্যোৎস্নাব এই অন্ধকাবেব অলসগন্ধেব চেযে সে সবেব মূল্য কি সেদিন এক ক্রান্তি বেশি? যে সব মানুষ পৃথিবীব পথে পথে গিয়ে ক্রমাগত কাজ কথা চিন্তা খুঁজছে, যাবা আক্রান্ত, যাবা অসন্তুষ্ট তাবা কোনোদিনই কিছু পাবে না। যাবা তৃপ্তি চায তাদেব তৃপ্ত হযে শুরু কবতে হবে, যাবা শান্তি চায, সবকিছুব আগেই প্রথম তাদেব শান্ত হয়ে নিতে হবে না কি? সবচেযে চিন্তামণ্ডিত লোকও এও জানে, কিন্তু তবুও কেন চিন্তাব ব্যথা ও ব্যস্ততা হাবাতে পাবে না?

একমাস , দেড়মাস সব হাবিয়ে অচ্যুতেব কেটে যাচ্ছিল। জ্যোৎস্নাব শবীবেব দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল অচ্যুত। অবিশ্যি [...] ভযে খেযেদেযে যখন সে এসেছে তখন চেহাবাটা বদলে গেছে আবাব। কিন্তু তবুও চেঞ্জ ফেবতা সে চেহাবাব অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে, কেন যে তা অচ্যুতেব চেযে বেশি আব কেউ জানে না।

জ্যোৎস্নাকে এখন থেকে ঘুমতে দেবে সে, ববং সে আলদা বিছানায শোবে, এই মেযেটিব [....] শবীবেব বিশেষ কিছু সয না, ঠাণ্ডা পাহাড়েব জাযগা, ভাল খাওযা ভাল থাকা, দশজনে মিলে আমোদ ফুর্তি বেড়ানো, সাবাদিন বাতে একটা নিবালা বিছানা, সুস্থিব ঘুম, এই মেযেটি শুধু এইসবেব জন্য তৈবি। তাহলে শবীব বা কল্পনা, বিচাব, কোনো দিক দিযেই এই মেযেটিব ওপব একটু স্থিব বা স্থাযী নির্ভব কবতে পাববে না অচ্যুত, একজন স্বামী সবই চায, কিন্তু অচ্যুত চলতি স্বামী নয, সে খুব কম চেযেছিল, কিন্তু জীবন ততটুকুও তাকে দেবে না।

[...] শিশিটাব দিকে তাকিয়ে অচ্যুত বললে, 'এই ওষুধটা নিযমিত খাচ্ছ ত?'

—'খাচ্ছি।'

আজকাল একটু সের্লাই ধবেছে সে, একদিন কল কিনে দিতে বলল, অচ্যুত ইনস্টলমেন্টে একটা কিনে আনল, খোকাব জন্য নানাবকম জামা ইজেব সেলাই কবে জ্যোৎস্না, ঠাকুবপোকে চিঠি লেখে, জীবনেব ঢেব পুবনো বন্ধুদেব সঙ্গে চেঞ্জেব নতুন আলাপীদেব সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিযে চিঠি লিখতে শুরু কবেছে, বন্দি মাসিক পত্রিকাব গল্পেব আবর্জনা আবদ্ধ কবে বেখেছে তাকে এই সবেব ধোঁকা দিযে।

পাড়াঁগায়ের শহরও নয়, কয়েকখানা খোড়ে ঘর ও অনেকখানি বিস্তৃত জায়গা। সে সময় জায়গার বেশি দাম ছিল না। সুন্দরবনের জঙ্গলের একপ্রান্ত এসে এখানে পড়েছিল। দিনেরবেলা হুড়োর ডাক শোনা যেত, শীতকালে দু-একটা বাঘ আসত, কিন্তু সে ঢেব আগের কথা—সে-সব কথা। দিদিমাই শুধু পাড়তেন, গেল শীতে তিনি মারা যাওয়ার পর ওকথা এখন কারু মনে নেই। এ পাড়াগাঁ শহরের নাম বলে কী লাভ?

পূর্ববাংলায়, সুন্দর নদীর পারে, সবচেয়ে বড় স্টিমার ডিপো একটা, স্টিমার ঘাটের কাছ দিয়ে লাল আঁকাবাঁকা রাস্তা ঝাউয়ের সারির সাথে খেলার ময়দানের পাশ দিয়ে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের গির্জার আশ্বাস বুকে নিয়ে নিস্তব্ধ শান্ত আম বকুলের বন উৎরে বাংলাব কোনো এক পাড়াগার দিকে চলে গেছে।

সে পাড়াগাঁ আবিষ্কার করতে প্রবোধ কোনোদিন যায় নি, জীবনের অনেক অনাবিষ্কৃত বিস্ময়ের মত আজও তা ডাকছে শুধু, শুধু জড়িয়ে যাচ্ছে। বছরেব অনেকটা সময়ই প্রবোধকে কলকাতায় থাকতে হত, নানারকম দুঃসাধ্য উপায়ে কিছু টাকা বোজগাব কবার জন্য। বাকি সময়টা দেশের বাড়িতে এসে সেই টাকা ভেঙে খেতে হত।

কলকাতাকে প্রবোধ ভালবাসত, এমন অবিচল সংকল্প ও প্রয়াসের জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলে। দেশকে ভাল লাগত এই অন্ধকার শিশির জোনাকি ও পেঁচা, কুমড়ো শশার লতা, ক্ষীব গাছ একটা একাকিত্ব নিস্তব্ধতা, পায়ের নিচে ঘাসের পোকাগুলো যে কোনো তুচ্ছ জিনিসই জীবনের স্থিরতাকে এমন বুঝেছে, এমন শান্তভাবে অপেক্ষা কবতে পাবে, প্রতীক্ষাকে এমন প্রয়াসহীনতা ও কল্লায় শান্তিতে ভরে রাখতে পারে। খোড়ো ঘরগুলো এক পবিবারেবই, লোকজন ঢের, পরিবারের উপার্জনক্ষম লোককযটি দেশেব বাড়ি ছেড়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ-বা কিছু পাঠায়, কেউ-বা পাঠায় না, কেউ-বা পাঠাবে না আর, দেশে ফিববেও না।

প্রবোধেবও এক-একসময় মনে হত বাপ মা বোনদের নিয়ে সেও কলকাতায় বা অন্য কোথাও ওদের মত পরিপাটি হয়ে থাকে, কিন্তু ইচ্ছে কবলেই হয় না, টাকাব জোব কোথায়? নিজের এত শিক্ষাদীক্ষা শক্তিও ত সব জায়গায় পরাস্ত হয়েই ফিবছে, এই কচি কলাপাতাব বন, মাটিব সোঁদাল গন্ধ, নীল মাছিব পাখাব মত এই অজস্র ঘাস, বাবলাব ঝাড়, জামিব বাতাবি কাঁটাল জাম লিচু সারা দুপুর, সারারাত ভরে মধুব কপাল ঠোকাঠুকি কবে প্রবোধকে বলে, অধীব বক্তাক্ত জীবনের পথে নিয়ে কী করবে আব? একটা চড়ুই টুনটুনি মুনিযার জীবন নিয়ে আমাদের ভিতব এসো, আমবা তোমাকে ঠাকুমার গল্প বলব।

শুধু ঠাকুমাব গল্পই নয়, এই গাছগুলোব কথা গান ইশাবা দুপুরবেলার থেকে দুপুর বাত অবদি, দুপুব বাত থেকে ভোর পর্যন্ত পৃথিবীব যে-কোনো গল্পের লাইব্রেবিব জগৎ থেকে দুরে সরে এক অতি প্রাচীন নিববচ্ছিন্ন পাতাব পাণ্ডুলিপিব মত পড়ে আছে—পাখিবা নক্ষত্রেবা যাকে পড়ে শেষ করতে পারবে না, মিশরি আববি অক্ষরের, সারাদিন সারাবাত যা পৃথিবীব সব বইযেব সব পাতাব বাইরে এক বিচিত্র বিজন সোনার রূপার পাণ্ডুলিপি, রূপার সোনাব, কাচের মুক্তার, কুয়াশার, অন্ধকারের।

বৈশাখ মাসে প্রবোধ কলকাতাব থেকে ফিবে এসেছে। এবার প্রায বছব দেড়েক পরে সে ফিরল, এতটা কাল কলকাতায় থাকা হল, কিন্তু কাজ হল না কিছু । বছর দুই আগে বিয়ে করে পাঁচ-ছ মাস দেশে থেকেই সে কলকাতায় চলে যায়, এবার একটু দূর সংকল্প করে সে এই যে চলে গেল আর বাপ মা বউকে কলকাতায় নিয়ে যাবাব জন্য একবার ফিরবে সে। কিন্তু কিছুই হল না। টাকাও প্রায় সে সবই সে খুইয়ে বসেছে।

যাক, এসে পড়েছে যখন সে টাকাকড়ি প্রয়োজনের কথা ভাববে না আর, দুপুরের একটা অলস মৌমাছির মত জীবনের নিরিবিলি নরম সব আস্বাদ চুপেচুপে মেটাবে।

তবুও স্ত্রীর কোঠায় সে নিজের ক্যাম্পখাট পাতল না, একটা ছোট আলাদা কোঠার থেকে হাঁড়িকুড়ি বেব করে টেবিল চেয়ার ও ক্যাম্বিসের খাটেব বিছানাটা গুছিয়ে নিল, বরাবরই এইটে তার একটা জীবনেব শোবার ঘর ছিল, শোবার বসবার চিন্তা করবার লিখবার। বিয়ের পর থেকে [...] [...] অথবা জঞ্জালের ভাঙা চেয়ার বেঞ্চি এই ঘবটাকে ভরে উঠতে দেখেছে সে, আজ আবার সে আগের জায়গায় ফিরে এল।

এই জানলা দরজার থেকে গাছ পাখিগুলো প্রজাপতি জোনাকি পেঁচা সবই পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়, মাটির ও মাঠের আঘ্রাণে বৃষ্টির ছাঁট এইখানেই সবচেয়ে আগে হৃদয়ে এসে লাগে।

উর্মিলা বললে, 'বাঃ ফিরলেন দেড় বছর মেরে তাও বাবুর এখানে থাকা হবে।' প্রবোধ বললে, 'তুমিও ত তাই চাও।'

—'থাকো, থাকলেই হল, যেরকম গুছিয়ে নিয়েছ শিগ্‌গির আর কোথাও নড়বে-চড়বে বলে বোধ হয় না?

—'না।'

—'শ্রাবণ মাসের আগে কলকাতায় যাবে না?'

—'না।'

—'সিদে 'না', তাহলে চলবে কী করে?'

স্টিমার থেকে নামতে না-নামতেই স্ত্রীর এই কথাগুলো প্রবোধকে একটু দমিয়ে গেল, এ অস্বস্তি দুবছর আগে জানত না সে, একেবারেই জানত না। উর্মিলা জিজ্ঞেস করল, 'হাতে কত আছে?'

—'আছে কিছু।'

—'বাবা কাকা ভাসুরদের ওপর কি চিরকালই নির্ভর করে থাকতে হবে?'

—'তা কেন?'

—'তা ছাড়া কী?

উর্মিলা গলা খাকরে দাঁড়াল, ঠোঁটে আঁচল টেনে।

প্রবোধ বললে, 'আজকালকার দিনকাল যা, চাকরি যাচ্ছে, ছাড়া হচ্ছে কার?'

উর্মিলা বললে, 'সে-সব খোঁজ আমরা কি রাখি? সকলেরই ত চলে যাচ্ছে দেখি।'

—'তোমাদেরও যাচ্ছে।'

—'ছাই।' আঁচলটা ঠোঁটের থেকে সরিয়ে ফেলে উর্মিলা বললে, 'কই, তোমার থাকা না-থাকা ত শেষ পর্যন্ত সমানই হল।'

—'থাকা না থাকা? মানে বেঁচে থাকা?'

উর্মিলা একটু লজ্জিত হয়ে বললে, 'কী বলছ যে!'

স্প্রিঙের দুলের ওপর আস্তে আস্তে টোকা দিতে দিতে বললে, 'এরকম হলে চলবে না আর।'

ঘাড় নাড়তে-নাড়তে মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করে পেলল উর্মিলা।

প্রবোধ বললে, 'সুবিধা হয়ে যাবে! সুবিধা হয়ে যাবে, সব দিনই কি আর সকলের এক থাকে? টানাটানি সকলেরই হয় গভর্নমেন্টের তবিলও কয়েক বছর ধরে কাতরাচ্ছে (অমন যে গভর্নমেন্ট!) ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সবদিক দিয়ে শ্যাওলা পড়েছে, সব দিক দিয়ে ভেবে দেখলে আমরা এমন খারাপ আছি কি আর?'

উর্মিলা কানের থেকে স্প্রিঙের দুল খুলে ফেলে বললে, 'এ আমি পরব না আর।'

প্রবোধ তাকিয়ে দেখল উর্মিলা হাতের থেকে সোনার চুড়িগাছা খুলে ফেলবার প্রয়াস পাচ্ছে, প্রবোধ ধীরে-ধীর স্ত্রীর হাত দুটো ধরে তাকে সুমুখে টেনে এনে বললে, 'কী যে তুমি!'

উর্মিলা বললে, 'আমি বড্ড খারাপ, তুমি ঘরে এসে বসতে না বসতেই তোমাকে জ্বালাতন করে তুলেছি' প্রবোধের বুকের ভেতর হঠাৎ মুখ গুঁজে ফেলে বললে, 'কিন্তু কী করব, পারি না আমি আর।'

উর্মিলার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে প্রবোধ বললে, 'এই দেড় বছর তোমাকে কি খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল উর্মিলা?'

মুখ না তুলে উর্মিলা বললে, 'আমি আর এ বাড়িতে থাকতে পারব না।'

থাকা কঠিনও বটে, এখানে গাছপালা আকাশ পাখি যত সুন্দর মানুষ ততই নোংরা ও কঠিন ক্ষুদ্রও।

অনেক সময়ই প্রবোধের মনে হয়েছে এ বাড়ির এত লোকজন শুধু এ বাড়ির জন্যই সৃষ্ট, পৃথিবীর অন্য কোথাও গিয়ে তারা সুবিধা করতে পারবে না, কিন্তু তার চেয়ে কঠোরতর যা তা হচ্ছে এই, বাইরের লোক কী করে এসে এখানে থাকবে? সে নিজে বাড়ির ছেলে, কিন্তু দুদিনের ভেতর সেও যে হাঁফিয়ে ওঠে। এই শ্লীল নীতিপরায়ণ বিচার মমতাহীন কল্পনাশূন্য নির্বোধ সমাজব্যাকুল পরিবারের এই মানুষ কটির ভিতর।

কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রবোধ বিশেষ কোনো সম্পর্ক রাখত না। সে পুরুষমানুষও, জীবনও তাকে ঘাতসহ ও মধুর করে তুলেছে। (কোনো কিছুতেই তার কিছু এসে যেত না) (তার হৃদয়ের ভিতর নানারকম আশ্রয় রয়েছে।)

প্রবোধ বললে, 'বাবাও ত আছেন, মা ও ছোট ভাইবোনরাও ত আছে, তারা ত সবই সহ্য করছে, তুমি কি পারবে না ঊর্মিলা?'

ঊর্মিলা বললে, 'না।'

প্রবোধ বললে, 'এই তিনমাস ত দেখ, আমি রয়েছি।' পাঁচটা দশটাকার নোট ঊর্মিলাকে দিল।

ঊর্মিলা একটু স্থির হল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, 'এগুলো কি খরচ করতে হবে?'

প্রবোধ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না, তোমার কাছেই থাক।'

ঊর্মিলা কৌতূহল দীপ্ত হয়ে উঠে বললে, 'তাহলে? বাবাকে কিছু দেবে না?'

—'দিয়েছি।'

—'দিয়ে দিয়েছ? কত?'

—'হাতে যা বাকি ছিল।'

—'সব।'

—'হ্যাঁ।'

—'নিজের জন্য কিছু রাখো নি?'

—'না।'

ঊর্মিলা ক্ষণকালের জন্য বিষণ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'তাহলে যাবার সময় কোত্থেকে টাকা পাবে?'

প্রবোধ বললে, 'সে আসবে এক দিক থেকে, কলকাতায় কিছু টাকা পাওনা আছে আবো, মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে।'

স্ত্রীর মুখ থেকে মেঘ কেটে গেল।

কিন্তু মেঘ এল আবার।

'তোমাব কাপড়খানা ছিঁড়ে গেছে যে! জামাও-বা এত কম কেন? এই দুটো পাঞ্জাবি আর এই গরম কোটটা দিয়ে কলকাতায় তুমি চালিয়েছ? কেন তোমাব সেই মটকাব পাঞ্জাবি দুটো আব তসরের কোটটা কোথায় গেল?'

প্রবোধ বললে, 'ছিঁড়ে গেছে।'

—'ছিঁড়ে গেছে! কোথায় সে সব! বাক্সেব ভিতব দেখছি না যে? বিলিয়ে দিয়েছ নাকি?'

প্রবোধ ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

—'না চুবি গিয়েছে?'

—'তাই হয়ত হবে।'

—'ইস, চুরি যায় নি আব! অত দামি জিনিস, ববং বিলিয়ে দিয়েছ, সেই ভাল। কিন্তু সেগুলো ত নতুন ছিল।'

—'দেড় বছর আগে, তখন আমরাও বরং কিছু নতুন ছিলাম।'

ঊর্মিলা প্রবোধেব টেবিল থেকে একটা খাতা-পেনসিল টেনে নিয়ে আঁক কাটতে কাটতে বললে, 'শোন, তোমার অন্তত একজোড়া কাপড় কিনতে হবে।' প্রবোধের জীবনে যা সব হারিয়েছে, খোয়া গিয়েছে, যা সবের প্রয়োজন তার একটা লিস্টি তৈবি কবছিল ঊর্মিলা।

লিস্টি তৈরি কবতে অনকে সময় লাগল। ঢের বড় হয়েছিল, ঢেব ছোট করতে হল।

প্রবোধকে দেখিয়ে বললে, 'আর কিছু দরকার?'

প্রবোধ বললে, 'না।' ঊর্মিলা প্রথম যে তালিকাটা কবে কেটে ফেলেছিল, সেইটে দেখছিল প্রবোধ, পৃথিবীর ভাল জিনিসগুলোর জন্য বিশেষ কোনো ইচ্ছে আকাঙক্ষা নেই তার, কিন্তু এই মেয়েটির এত আগ্রহকে এরকম স্তব্ধ হতে দেখে সারাদিন মনেব ভেতর একটা আচ্ছন্নতার বিমর্ষ কুয়াশাকে কাটিয়ে উঠতে পাবছিল না সে।

৩রা বৈশাখ।

রাতের বেলার খাওয়াটা বিশেষ সুবিধার হয় নি। নুন ভাত আর বড়া। কিন্তু টাকাকড়ির যা সংস্থান তাতে এর চেয়ে বেশি কী আর হবে। মন্দ কী?

খিদে ছিল, সেইজন্য পরিতৃপ্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু কাল রাতেই ত স্টিমারে খেয়েছিল প্রবোধ, বাবুর্চিদের কোঠায় বসে দু-থালা বালাম চালের ভাত আর দু-ডিস মাংস, একটা ডিমভাজা, একখানা

কাটলেট, পেঁয়াজ প্রচুর, মুসুরির ডাল, ভিনেগার চাটনি, অসহ্য গরমের রাতে পাঁচ গ্লাশ জলও টানতে হয়েছে, প্রতিবারই বাবুর্চির ছোকরা জলের সঙ্গে বরফ মিশিয়ে দিয়েছে। সেই ইলেকট্রিক বাতি, স্টিমারের বাতি, নদীর জল, নদী, সে এক পৃথিবী, কিন্তু সে তার নিজের পয়সার পৃথিবী, কিন্তু সে পয়সা আজ আর নেই।

রাত অনেক হয়েছে।

দরজা জানালা খুলে অনেকক্ষণ ধরে ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে প্রবোধ। ঊর্মিলা একবার এসেছিল, আর একবার আসবে বলে নিজের খাটে গিয়ে সে শুয়েছে, প্রবোধ গিয়ে তার মশারি ফেলে গিয়ে এসছে। ঊর্মিলা অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

৪ঠা বৈশাখ।

একটি মহিলা বেড়াতে এসেছেন। তাঁর সাত বছরের মেয়েটির চুল বেড়ার লোমের মত, কিন্তু চোখ দুটো বড় সুন্দর। ছেলেটি কোলের, ফরশা সুন্দর ও রেশমি চুলের, দেখলে সার ওয়ালটার র‍্যালেকে মনে পড়ে। সার ওয়ালটার র‍্যালে নীল সমুদ্রের পাশে বসে ছেলেবেলা নাবিকদের কাছে সেই যে দূর-দূরান্তের বিস্ময়ের গল্প শুনত, তেমনি একটা বিস্ময় এর চোখে। এমনি একটি ছেলে পেলে হত।

কিন্তু তবুও এ আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখতে হয়, এসব বিষয়ে তার মাথা খুব স্থির। ঊর্মিলাবও, তারা সন্তান চায় না।

দুপুর না পড়তেই অসহ্য গরম। খলফার বেড়ার ভিতব দিয়ে আগুনেব হলকা যেন বেরিযে আসে। মাঠে আগুন।

বিয়ে করবার বছর দুই আগে যে মেয়েটিকে ভালবাসতে বাসতে উদাসীন হযে পড়ল প্রবোধ, পাঁচ-ছ বছরের ভালবাসা সাঙ্গ করে ফেলল, সেই মেয়েটি এখন দার্জিলিঙে থাকে। দার্জিলিঙ সিমলা মিলং কেমন যে কোনদোনি দেখবার সুযোগ পায নি প্রবোধ, হযত দেখলে সেগুলোকে ঘৃণা করবে, কিন্তু একসময়, প্রতিটি গরমের সময়ই প্রবোধ শিলং দার্জিলিঙের কথা ভাবত। কোনো রকমে সেখানে যাওয়া যায কিনা। প্রতিবারই সে দেশে ফিরে আসত, এসে ভাবত একদিন নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন সেরকম কিছু ভাবেন না আর। এখন জীবন ঢের এগিযে গেছে। কি হবে না হবে সবই ধরে ফেলেছে প্রবোধ, শিলং দার্জিলিং যাবার সাধ বা সময জীবনে আর নেই। যদি কোনোদিন কথা ওঠে, বরং ওদের পাঠিযে দেবে সে। বাবা মা ঊর্মিলাকে। দার্জিলিঙ শিলঙের পাহাড় পর্বত মেঘ বরফ, চড়াই উৎরাই পাইনবন ফার তাদের জন্য অগোচরে সৃষ্ট হয়ে বযেছে শুধু, যারা সেগুলোকে কল্পনাব গোধূলি সমুদ্রের ভেতর সৃষ্টি করতে পারে নি, সৃষ্টি কবে ভস্ম করে ফেলতে পারে নি। যেমন তাবপব অঙ্গার হযে থাকে। [...] সেই যে মেয়েটি উষা, যখন তাকে ভালবাসত, তখনো এই মেয়েটির কলকাতার গ্রীষ্মতাপ এড়াবার মর্মান্তিক চেষ্টায প্রবোধ রুক্ষ কর্কশ আঘাত পেত, লক্ষ লক্ষ লোক যা সহ্য করছে উষাব কাছে এক মুহূর্তের জন্যও যদি তা এমন অসহনীয হযে ওঠে, যদি ভাল জিনিসই শুধু তাব ভাল লাগে তাহলে জানি সে কেমন মেয়েমানুষ? উষাব জীবনের থেকে দূবে সরে গিয়ে প্রবোধ জীবনের অবধারণ্যযোগ্য ব্যবস্থার ভিতর চলে গিয়েছে। যেখানে প্রতি মুহূর্তেই কষ্টকে গ্রাহ্য করতে গিয়ে জীবন প্রীতিপদ মনে হয়— সুখলালসা উপভোগের।

উষা এখন দার্জিলিঙে। জীবনে বিশেষ কোনো বেদনা নেই তাব। প্রবোধকে অনেক আগেই সে ভুলে গেছে।

এখন হযত বরফ পড়ছে দার্জিলিঙে। একটা শাল জড়িয়ে তাব জামাইবাবুর সঙ্গে হযত আলাপ করছে সে। কিংবা তার দিদির দেবরদের সঙ্গে ব্রিজ খেলছে, কিংবা—উষার কথা ভাবতে গেল না প্রবোধ আর।

প্রবোধের আর এক জীবনের মানুষ এই উষা। সেই জীবন নেই, উষা নেই। তাতে কোনো ব্যথা নেই আজ। আজকের জীবনের সমস্ত প্রয়াস ও আশা ছোটখাট একটা মাঠ খুঁজছে মাঠেব ভিতব ছোট বাংলোবাড়ি একখানা এদের সবাইকে নিয়ে, টাকাকড়ির সচ্ছলতা, একটু শান্তি।

খুব বর্ণহীন আকাঙ্ক্ষা নয কি? কিন্তু তবুও প্রবোধ জানে এ সাধ তাব মিটবে না। নাই-বা মিটল, নাই-বা মিটল।

৫ই বৈশাখ।

একটা ছ্যাকবা গাড়ি ব্যান্ড বাজিযে চলে যাচ্ছে। রোজই সকালে ঘটা করে যায। প্রবোধ বললে, 'এ আবার কি? সার্কাস-টার্কাস এসেছে নাকি?'

ঊর্মিলা বললে, 'টকি।'

প্রবোধ বিস্মিত হয়ে শুনল।

'দুটো বায়স্কোপ কোম্পানি এখানে এসেছে জানো না?'

প্রবোধ ঘাড় নেড়ে বললে, 'কবে এল?'

—'তুমি চলে যাবার পর থেকেই কেমন চমৎকার পিকচার হাউস তুলে ফেলেছে ওরা, নদীর পারের কাছে।'

প্রবোধ বিস্মিত হয়ে শুনল।

উর্মিলা বলল, 'গোড়ার দিকে পিকেটিং হত। বায়স্কোপ বয়কট করা হয়েছিল।'

—'কেন?'

—'কেন তা জানি না, আমাদের বাড়ির ছেলেবাই সারাদিন পিকেট করে ফিরত।'

—'সারাদিন?'

—'হ্যাঁ রামদা, ড্যাগরা, লাটু, হরিশ,—হরিশ আর ড্যাগবা ত আস্তিন গুটিয়ে দস্তুর মত মারপিট করতে যেত।'

—'কাদের সঙ্গে?

—'যারা বাযস্কোপ দেখতে যায।'

প্রবোধ খানিক্ষণ থেমে থেকে বললে, 'কিন্তু তবুও ত সিনেমা কোম্পানি টিকল।'

উর্মিলা বললে, 'তুমি হলে কী কবতে, পিকেট কবতে যেতে?'

প্রবোধ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'তা হলে এ বাড়িতে তোমাকে যে উদ্বাস্তু কবে ছাড়ত ওবা। অসচ্চরিত্র বলত, শুধু কি তাই, কত বেমক্কা ইংরেজিতে গাল দিয়েছে শুনতে যদি। উর্মিলা বললে, 'কিন্তু আমাব সব সমযই মনে হযেছে এব অত্যন্ত স্বভাববিরুদ্ধ ব্যবহার করেছে, অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় নিবর্থক কথা বলেছে শুধু।'

প্রবোধ রাস্তার দিকে তাকিযে ছিল। এক এক ঝাপটা বাতাসে ভোবাণ্ডা গাছের বেড়া শুবকিতে লাল হযে উঠছে। উর্মিলার দিকে ফিবে তাকাল। শুনলে এই মেযেটি বলছে, 'জীবনে আমি বাযস্কোপ দেখি নি কোনোদিন, হযত টকি অর্থহীন প্রমাণ, টকিব জঘন্যতা অশ্লীলতা ও বিষ সম্বন্ধে দিনবাত এবা যা তর্কবিতর্ক করেছে তাবপব টকি দেখবাব জন্য কোনো আগ্রহ নেই আমাব। কোনো আপত্তিও নেই।'

উর্মিলাব কথা শেষ না হতে দিযেই প্রবোধ বললে, 'তাহলে ত খবু সাফ তর্ক কবেছে, কিন্তু কাব সঙ্গে? তর্ক কবতে হলে পক্ষ অনন্ত চাই।'

উর্মিলা বললে, 'পক্ষ দুটো তিনটে চাবটেও ছিল, একদল টকিকে ভালগাব বলেছে, আর একদল ভালগার, আব একদল মোস্ট ভালগাব, আর একদল মোস্ট ভালগাব অ্যান্ড মোস্ট কোরাপটিভ বলেছে, আব একদল মোস্ট ভালগাব মোস্ট কোবাপটিভ এবং মোস্ট ডিসইনটিগ্রেটি বলেছে।'

উর্মিলা না থামেতই প্রবোধ বললে, 'ডিস ইনটিগ্রেটিং?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু এই শব্দটি এই তর্কেব ভেতব চালিযে গেছেন যিনি, তিনি একজন বাইরের লোক, মাঝে মাঝে আসতেন তিনি, এবং তর্ক শুধু তর্কেব খাতিরে কবতেন, আমাব মনে হয ঠাট্টার খাতিবে, বাযস্কোপ দেখে এসে তিনি তর্ক কবতেন কিংবা আনাড়ি তর্ক শুরু করলে নটাব পারফরমেন্সে গিয়ে দেখে আসতেন।'

প্রবোধ তাকিযে দেখল বাতাসের ঝাপটায বাস্তার পাশেব উলুঘাস শুবকিতে লাল হযে উঠছে। বলবে, 'কিন্তু এমন লোককে হরিশ বা তার বাবাখুড়ো এই পরিবারের ভিতর ঢুকতে দিত?'

—'তা দিত, ভদ্রলোকটি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিযাব, বিযেও কবে নি এই অবদি। মেয়েদের জন্য চেষ্টা কবা হচ্ছিল একে।'

—'কোনো বিশেষ মেযেব জন্য নয?'

'না, যাকে পছন্দ হয এর।'

—'কাউকে হল?'

'কই তিনি বদলি হযে চিঠি লিখলেন না আব।' উর্মিলা বললে, 'এবার তার ছোটভাইযের পালা, সেও বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ কবে এসেছে, এখনো চাকরি পায় নি বটে, কিন্তু চাকরি ত এরা পা দিযে ঠেলে হাত দিয়ে লুফে নেয, এ ছেলেটি এখানকার টকি দেখে না, বলেছে এসব জংলি জিনিসে যে দাদার রোচ ধরল সে জন্য সে খুব লজ্জিত। এ বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই তাই এই সদ্বংশজাত সচ্চবিত্র ছেলের খুব বাহবা দেয যদিও সকলেই দেখেছে যে সিগারেট নিবিয়ে ওই খেজুরগাছটার খাঁজের ভেতর রেখে এ বাড়িতে সে ঢোকে, এবং ফিববার সময় সেটাকে তুলে নিযে যায়।'

প্রবোধ বললে, 'চুরুট? ওঃ তা ত আমিও খাই।'

ঊর্মিলা একটু হেসে বললে, 'রামদার থেকে ড্যাগরা অবদি, তৃতীয় পুরুষ সবাই খায়, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ জানে ও জানতে ভালবাসে যে এই পরিবারের কেউই তা খায় না এবং পৃথিবীতেও কারু তা কোনোদিন খাওয়া উচিত নয়।'

প্রবোধ বললে, 'প্রথম পুরুষের খুব জোর হুঁকাবরদার ছিল।'

—'কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষের ধারণা আলাদা। জীবনে দিবারাত্র চায়ের মজলিশ আছে কিন্তু পান সুপারি তল্লাটে নেই, হুইলারের নভেল অজস্র পড়া হচ্ছে, কিন্তু বাংলা গল্প অশ্লীল, তুমি চরুট টানলে তোমার নির্যাতনের আর শেষ থাকবে না, কিন্তু বিলেত থেকে পাশ করে এসে চাকরি নিয়ে বসলেই এ বাড়িতে বসেই তুমি অবাধে সিগারেট খেয়ে সিনেমা মেরে আধুনিক জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত সাংঘাতিক মতামত আপ্রাণ ব্যক্ত করেও এদের হাতেই তোমাব চরিত্র গুছিয়ে রাখতে পারবে, তোমায় [....] এরা আপত্তি কববে না।'

প্রবোধ হো হো করে হেসে বললে, 'বাস্তবিক।'

ঊর্মিলা বললে, 'এদেব জীবনের এই অন্তঃশূন্যতা কর্মনীতির শিক্ষা কল্পনা সৌন্দর্যবোধ সবকিছুকেই পরিবারের ভিতর ফোঁপরা করে ফেলেছে, এমনই, এবা এই শব্দগুলোও যখন উচ্চারণ করে তখন মনে হয় পৃথিবীর জনস্রোতের জীবনেরও এই সব জিনিসের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়তে হয়। মনে হয় কোথাও যেন আন্তরিক স্ফূর্তি নেই আর, কল্পনা নেই, সৌন্দর্য নেই, শিক্ষা নেই, বিস্তীর্ণতা নেই, রহস্য বোধ নেই, নক্ষত্রের নিরাকুল শান্তি নেই, সুন্দর তিমির রাত্রিব কোনো গোপন কথা নেই।'

৬ই বৈশাখ।

প্রবোধের এই গরমের রাতগুলোকে খুব ভাল লাগে। মাঝখানে একদিন বৃষ্টি পড়ে খুব কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছিল। চালের ফুটো দিয়ে জল পড়ে মেঝেটা কাদা হয়ে গেল, ক্যাম্পখাট বিছানা সব ভিজে গেলে, কম্বল গায় দিয়ে সারারাত বসে থেকে মনে হচ্ছিল বর্ষা বা শীতকে উষার মত মেয়েরা এত ভালবাসে কেন? প্রবোধও ত এখন শীতবোধ করছে, গরমের ভিতর যে শীতবোধ পাওয়ার জন্য লোক সিমলা যায়, আলমোড়া কুমায়ুন ঘুরতে যায়, কিংবা [কিন্তু] এই শীতের ভিতর কোনো প্রিয়স্পর্শই ত সে বোধ করছে না।

সমস্ত আবর্জনাময় ঘরেব দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি থেমে যাওযাব জন্য সে প্রতীক্ষা করছে, আজ রাতে বর্ষার সঙ্গেও এইটুকু মাত্র তার সংস্পর্শ। অথচ এই বর্ষাকে কতদিন কত জাযগায তার ভাল লেগেছে, এমন গভীর রাতে যখন সে এসেছে প্রবোধকে কতবাব জেগে জেগে রোমাঞ্চবোধ কবতে হযেছে। আজ জীবনে বর্ষার সে মানে নেই।

দরজা জানলা খুলে ঝিঁঝির ডাকে নিস্তব্ধ, জোনাকি ও বাতাসের পটভূমিকায সঙ্কেতবিলাসিনী অনুরঞ্জিনী উত্তপ্ত বৈশাখের রূপসী কঙ্কাবতীর মত রাতের কুহক জীবন থেকে কোনোদিনও ফুরবে না তার, এই ভাল পরিষ্কার আকাশ, অজস্র নক্ষত্র, মাটির তাত, বাতাসেব অবাধ শিকার অন্বেষণ। তিমির তালবনে বাজপাখি যুবতীর মূর্ছামুগ্ধ নিবিড় নিদাঘ নিদ্রালতা, বাতাসের আরক্তিম চুম্বন শিখাময সমুদ্র, আমেব ঘ্রাণ, লক্ষ্মী ধূসর স্বপ্নকুয়াশার পেঁচার পাখা, শেষ রাতে শিশির খালের জলে খলখল শব্দ।

জীবন যত বাড়ে, শিশুর কল্পনা তত অস্পষ্ট হয়ে আসে না। কিন্তু এই তেত্রিশ বছর বযসের জীবনে রাতের স্বপ্নগুলো এখনো এত স্পষ্ট। ঘুমন্ত উৎসেবপুরীর অজস্র বাতিদানে বিলাসী ক্ষীযমাণ শিখাব মত এখনো এত স্পষ্ট। বাস্তব জীবনেও লেহন করছে, লালন করছে। এই স্বপ্নগুলি কোলাহলহীন ভাষায় প্রবোধের অস্পষ্ট নিভৃত কি এক জীবনকে এমন আন্তরিক রোমাঞ্চ কোনোদিন আর বোধ করবে না। প্রবোধ।

বুঝতেই পারা যাচ্ছে না জেগে জেগে হিজল শিরীষ উলুঘাস মাঠনক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আছে সে, না ঘুমিযে সেসবের চিত্রনিবিড় প্রেতপুরীর গোধূলিতে এসে পড়েছে।

অতি কৃচিৎ মেয়েদের ডেস্কের স্বপ্ন। কে যেন চিঠি লিখছে প্রবোধকে। সেই লেখিকার এক একটা অক্ষর সুন্দরীর কপালে কাঠপোকার টিপের মত নোট পেপারের কাগজের ওপর বুনোনো হচ্ছে প্রতিটি ছন্দ ও শব্দ। চিঠির কাগজের নরম গন্ধটুকু সবই যেন জেগে উঠলেও ধোঁযার মত হারিয়ে যায় না, অনেকক্ষণ অবদি নাকে লেগে থাকে।

বড় বড় পাখিগুলো তাদের পায়ের নখে জিনিস আটকে নিয়ে কি করে আকাশে উড়ে যায়, সেই স্বপ্ন, একটা মস্তবড় পাখি, শকুনের চেয়েও ঢের বড়। মাঠের ভিতর থেকে প্রবোধকে তুলে নিয়ে বাতাসের ভিতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে যাচ্ছে, এমন চমৎকার লাগছে! জেগে উঠেছে যখন প্রবোধ, সাঁই সাঁই করে ঝাউয়ের বাতাস প্রবোধের দরজা, জানালা ও বিছানাসুদ্ধ উড়িয়ে নিযে যেতে চাচ্ছে যেন।

কোথাও যুদ্ধের দামামা বাজছে। *যেন বেবিলনে, আজ রাতে বেবিলন যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, বেবিলনের যুবা প্রবোধের বুকে একটা অদমনীয় ইচ্ছা জেগে উঠেছে। ধ্বংসের স্পৃহার রণোন্মত্ততার অন্ধকারে জেগে উঠে প্রবোধ শুনছে একসঙ্গে অনেকগুলো স্টিমার নদীর পথে ঝক ঝক করছে। নিরীহ ফেরিস্টিমারগুলো শুধু পূর্ববাংলার একটা [...] নদীর বৈশাখের রাত তার থেকে বেবিলন বানাল, ধ্বংস করে দিল।*

আকাশের ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে তবু মনে হয় বেবিলন ধ্বংসের শেষ, ধোঁয়া যেন নিস্তব্ধ সমারোহে মিশে যাচ্ছে।

৭ই বৈশাখ।

অনেকদিন পরে মালতীলতা এসেছে।

তিন চারটি সন্তানের মা, একজন গেঁয়ো বর নিয়ে পাড়াগাঁয় থাকে সে।

এমন সুন্দরী, অথচ এত সুলভ, বরাবরই মালতী খুব সুপ্রাপ্য ছিল। কিন্তু এইসব দিয়ে কী আব হবে?

অনেক স্বাধীন ও সাংঘাতিক বই ও চিন্তার সংস্পর্শে এসেও হৃদয়টা বস্তুপ্রিয় হয়ে উঠল না। আজ সন্ধ্যায় বাড়ির সকলে গাঙ্গুলিদের মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে চলে গেছে, মালতীলতা সাতকোশ দূরের থেকে উর্মিলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, ঠিক আজকের সন্ধ্যায় টিপ্ করে। আশ্চর্য!

প্রবোধকে মালতী পেয়ে বসেছে, এই মেয়েটিব হাত থেকে কিছুতেই প্রবোধ নিজেকে ছাড়াতে পাবছে না, তাবপর মেয়েমানুষ যখন অন্ধকাবে ব্যাঘ্র হয়ে পড়ে! প্রবোধ পালিয়ে গেলে, তাকে দিয়ে কিছু হবে না, সমস্ত পৃথিবীর রূপকে এ মেয়েটি যেন কাদা কৃমি করে দিয়েছে। মেয়ে মানুষেব সৌন্দর্য এব পর থেকে বিস্ময় ও কল্পনার প্রয়াসের জিনিস কিছু নয় যেন। যেন স্তরে স্তরে তার পাক চেপে আছে।

অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল প্রবোধ।

সমস্তটা জ্যোৎস্নার মাঠই রাস্তা পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্রমাগত এই কথাটাই প্রবোধেব মনে হয়েছে, এত, সাংঘাতিক ও স্বাধীন বই ও চিন্তার সংস্পর্শে এসেও হৃদযটা তাব বস্তুপ্রিয় মাংসপ্রিয় হয়ে উঠল না কেন?

মালতী সাতকোশেব পথ আবাব ফিবে চলে গেছে। প্রায় আট–ন বছব পরে এই ছোটবেলাব বন্ধুর সঙ্গে দেখা আট–ন বছব আগে তখন কৈশোবেব শেষ কমলাফুলেব মত মেঘ মধ্যাহ্নেব জীবনে বিকেহীন করুণ রৌদ্রেব উলঙ্গ আগুনে দগ্ধ হয়ে যায় নি।

প্রবোধ মালতীর মুখে সেই সব দিনের কথা শুনবাব জন্য সারাবাত জেগে থাকতে পারত। কিন্তু মালতী এল পরিষ্কার দ্বিধাহীন হৃদয় নিয়ে। সেখানে স্বপ্নের এতটুকু কুয়াশা নেই। এই কৈশোরের সঙ্গিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না তাই। গোধূলিব আবছায় লক্ষ্মীপাখির শিশিরাক্ত ডানা দেখে মেঠো ইঁদুব যেমন ধানের সোনার শিষ ছেড়ে পালায় তেমনি পালিয়ে যেতে হল। সারারাত ক্যাম্পখাটটায় এপাশ ওপাশ কবেছে প্রবোধ। সাতকোশেব পথ, অনেকগুলো মাঠ, দু–চারটে বাজার, তারপর এক মোহনাব নদী পেবিয়ে, তাবপরে হযত একটা ধূসর কঞ্চিব ঝোপেব আড়ালে মাটির ওপর বসে টসটস করে চোখের জল—তাব ক্ষান্তি নেই, নেই।

১৩ই বৈশাখ।

কয়েকটা ভোর। নির্জন কয়েকটা দুপুব। শুকুনের ডানার মত পল্লিগন্ধময়, বিষণ্ণ মরণসুপ্তি মধুব কযেকটি রাত্রি সুদূর দিগন্তিকা মালতী প্রবোধেব হৃদযে ধরে বেখেছে।

একদিন সন্ধ্যার পরে উর্মিলা বিনুনি করে কাচপোকাব টিপ পরে এসে দাঁড়াল। স্বামীর কাছ থেকে তার প্রাপ্য পুরস্কার পেল, আদায় কবে নিতে হয নি. স্ত্রীকে দেযাই নিযম, সেখানে বস্তুপ্রিযতা অপ্রিযতাব কোনো কথাও ওঠে না। বাস্তবিক এখানে প্রিযতা কোথায–বা? কোনো রোমহর্ষ নেই, নতুন আবিষ্কাব নেই, চমক নেই, ডেকচেযারে বসে একবাব চুরুট ঠোঁটে গুঁজবার ভিতব যেমন কোনো বিদ্যুৎ দীপ্তি নেই, না আছে কোনো বিরক্তি, তেমনই একটা জিনিস।

দুজনের তা সাঙ্গ হয়ে গেছে।

উর্মিলা ঘুমতে চলে গেছে। প্রবোধ ঘুমিয়ে পড়েছে।

চাকরি নেই

ভোর হয়ে গেছে।

স্টিমার চলছিল।

কাল বিকেলেও সুকুমার কলকাতায় ছিল। কিন্তু আজ ভোরে কলকাতার গঙ্গার থেকে ঢের চওড়া ঢের নির্জন এই নদীর ভিতর থেকে যে পৃথিবী দেখা যাচ্ছিল, তাও কি বাংলাদেশ?

বাংলাদেশ! বাংলাদেশের একেবারে হৃদয়ের ভিতর এসে পড়েছে সে। হয়ত সুন্দরবন কাছে কোথাও হবে। স্টিমারের গতি সেদিকে নয়, নদী ক্রমে ক্রমে আরো ঢের বড় হয়ে যাচ্ছে, আকা আরো পরিষ্কার, নদীর ডান কিনার দিয়ে পাড় ঘিঁষে স্টিমার চলেছে। শাদা পাল তুলে একটা শান্ত নৌকার মত যেন এই স্টিমার, এই গতি, নদীব জল কেমন গভীর সান্ত্বনাময়। নদীর পথে স্টিমারের এই একঘেয়ে চলাফেরায় ঢের দেখেছিল সুকুমার, কিন্তু তবুও এই নদীগুলো, এই স্টিমারের এই একঘেয়ে চলাফেরায় ঢের দেখেছিল সুকুমার, কিন্তু তবুও এই নদীগুলো, এই স্টিমার, প্রতিবারই তাকে নতুন আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করতে বলত। আবিষ্কারের শেষ হয়নি আজও।

ভোর না হতেই স্টিমারের মুখের কাছে এসে বসেছে সুকুমার। গরমেব দিন। কোথাও কুয়শা নেই। উঁচু পথ দিয়ে একটা দুটো টিয়া উড়ে যাচ্ছে। এক চমকে ছেলেবেলার এক সাধ মুহূর্ত হৃদয়কে পেয়ে বসেছে যেন, যতদিন এই নদী, আকাশ, পাখিগুলো রয়েছে, হৃদয়ে জরাব কোনো জায়গা নেই।

দুধারে সবুজ মাঠ অনেকদূবে চলে গিয়েছে। ভোরেব ছাগল গরু মহিষগুলো পাথরের মত মনে হচ্ছিল।

নদীর জল এখন ঢের ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা, ননীর মত নরম আলোর ভিতরে নরম ধূসর অবিস্মরণীয় জল ও রৌদ্রের তৈরি মূর্তির মত নদী এখানে হৃদয়কে এমন স্থির কবে দিয়েছে, স্টিমারের ডেক থেকে যেদিকে তাকানো যায় সেইখানেই এই নদী, এই নিশ্চেষ্টতা, নিশ্চেষ্ট সৌন্দর্য, অবসাদ।

ছায়া ছাযা মেঘেব ওপারে সূর্য আজ আর ইস্পাতের মত কঠিন কিছু নয়। চিতাব ছালেব মত উজ্জ্বল সুন্দর অবর্ণনীয় জিনিস সে, এই মেঘগুলো একরাশ বাজহাঁসের ডানার রোমেব মত দুলে দুলে সূর্যকে ঘিরে রেখেছে। তাকে শান্ত করে রেখেছে, আলো নদী, মাঠ আকাশকে এমন নরম করে তুলেছে।

অনেকক্ষণ ধরে ডেকের মুখে বসে রয়েছে সুকুমাব। এই স্টিমারে চড়ে দেশের দিকে অনেকবাব সে গেছে, প্রতিবারই ভোরের বেলা এমনি করে এই একই জায়গায় এসে বসেছে। চারদিককার বন মাঠ গভীর ইন্ডিগোনীল আকাশকে আস্বাদ কবেছে সে। উজ্জ্বল বোদের ভিতব নদীব জলে এক একটা মাছ লাফিয়ে উঠছে, উড়ছে যেন, এমনি মাছ হওয়া যেত যদি।

সবুজ পাখনা মেলে অসীম নীলের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা টিয়াপাখিব জীবন কি চমৎকার! এই সব দু-চার মুহূর্তের আকাঙক্ষা ও হতাশাব ভিতর আজকের ভোরের বিষণ্ণ তৃপ্তি আটকে বেখেছে সুকুমারকে।

এক-আধঘণ্টার ভিতরেই এই নদী মাঠ আকাশ মিলিয়ে যাবে সব। তারপব দু-একখানা টিনের আটচালা, কযেকটি প্রাণী, তাদের নিয়ে সে কি করবে? কেনই-বা সেদিকে যাচ্ছে সে?

কলকাতায় থাকাব সামর্থ্য নেই সুকুমারের। একটা টিউশন কিছুদিন তাকে খোরাক দিচ্ছিল....

নদীর পথে তার বেড়াবাব মত বিলাসের থেকে জীবন তাব কত দূবে।

দূরের থেকে [....] ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে। দেশে দু-তিন বছর ধবে খুব বসন্ত লাগছে, এইখানে রোগী এনে রাখা হয।

স্টিমার চলেছে, কতকগুলো স্টিমারের চোঙা দেখা যাচ্ছে দূবেব থেকে। নদী এখানে স্টিমাবের ডিপোর ভিতর চলে যাচ্ছে, এক-একটা স্টিমারের নাম পেঙ্গুইন কিংবা অফ্রিদি কিংবা চিতা। রোদ উজ্জ্বল, স্টিমারের মাস্তুলে চিল উড়ছে, আকাশ গভীর নীল।

জীবন কেমন একটা দৃঢ়তার জন্য অপেক্ষা করছে যেন এইখানে। বুকের ভিতর জীবনের দৃঢ় সৌন্দর্য কোমল হয়ে পড়ছে তবুও, ধোঁয়ায়, কয়লায় মেড়ে যাচ্ছে, রাস্তার শুরকিতে গুলিযে যাচ্ছে।

সুকুমার মোট নামিযে দাঁড়াতেই মা খুকিকে নিয়ে এল। এক বছর আগে মেয়েটিকে দেখে গিয়েছিল সুকুমার। আজও সে যেন তেমনই আছে। বড় হয় নি আর। কলকাতায় মাঝে মাঝে খুকির কথা মনে

হত সুকুমারের। স্টিমারেও ভেবেছে, না জানি মেয়েটি কেমন হয়েছে, মুখখানা মেয়েটির সুকুমারের মতই, মোটেই চমকপ্রদ নয়, হয়ত আশাপ্রদ নয়, তবে কেন সুকুমার এত আশা করেছিল? দেখে নি কি সে যে জীবনের প্রতটি জিনিসই যে অব্যহাত নিয়মে গড়ে ওঠে তাতে আশার কোনো স্থান নাই।

মেয়েটি রিকেটে ধিক্‌পিক্‌ করছে।

সুকুমার তাকে কোলে নিল না।

বড় বড় চোখ তুলে সুকুমারের দিকে তাকাল খুকি; হাসল, খুকির দাঁত কটা বেরিয়ে পড়েছে, সুকুমার একটি দাঁতও দেখে যায় নি, দাঁতওয়ারা শিশুর এক নতুন শোভা দেখল সে। এ শোভা নাকি?

দু-এক ঘণ্টার ভিতরেই খুকিকে সে যেন আর চায় না। সুকুমার এখানে একটু নিরিবিলি থাকতে এসেছে, দেশে বরাবরই সে নিজের বিমর্ষতা নিয়ে শান্ত হয়ে পড়ে থাকবার জন্য চলে আসত, কেউ কোনো গোলমাল করবে না এখানে, সে কাউকে প্রশ্ন করবে না, কেউ কোনো উত্তর দেবে না, নদীর পাড়ের বড় বড় ঘাসের ভিতর, কাশের শিষে বিমর্ষ বিকেলবেলার মত জীবন এখানে শান্ত, নরম—মধুর। এত রকম ছিল না কি?

কিন্তু দু-বছর আগে সে বিয়ে কবেছে। তারপর থেকেই জীবনটা বদলে গেছে।

খুকি সারাদিন বড্ড অস্থিরতা কবল।

নিজের জীবন ঢের অপরাধী। ঢের বিমুখ। ঢের অপারগ। কিন্তু তাই নিয়ে সুকুমার এতদিন কাউকে ভারাক্রান্ত করতে যায় নি। আকাশেব দিকে উধাও একটা ভারী বেলুনেব মত নিজের বোঝাও সে বুঝছিল না। সে কবিতা লিখতে, নদীর পাড়ে গিয়ে বসত, একা একা সারাদিন সাইকেলে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু বিয়ে কবার পরের থেকেই বেলুনটা নামছে যেন, নামছে, নামছে, নেমে পড়ছে।

কবিতা সে লিখছে না আর, অনেকদিন হয় থামিয়ে দিয়েছে। এক একটা বই পড়বাব মত প্রাণের সাধ এখনো বয়েছে তার, কিন্তু কোথায় সে বসবে? কোথায় বসে পড়বে? কতক্ষণ পড়া যাবে? ওরকম ধরনেব পড়ে কোনো আনন্দ নেই। ঘরদোরেব ব্যবস্থা বদলে গেছে। সুকুমাবকে এখন অনেক দেবতার ওপর নির্ভব করতে হচ্ছে। সুকুমারের বাবা, তিনি তবুও যদি প্রধান দেবতা হতেন! কিন্তু এ পরিবাবের ভিতর সুকুমারের বাবাব জায়গা আজকাল কোথাও যেন নেই। তিনি উপার্জন করেছেন বটে, কিন্তু উপার্জন করেছেন শুধু। ষাট টাকা, সত্তর টাকা, আশি টাকা। হয়ত আব বেশিদিন ওইটুকু ক্ষমতাও তার থাকবে না, আর কোনো ক্ষমতা তার নেই।

সুকুমাবের নিজের বয়সও পঁযতিবিশের দিকে চলেছে। এ জটিল পবিবাবের ভিতর অনেক জেঠাখুড়োদেব রাজ্যে অনেক আগেই সে নিজেকে পরাস্ত বুঝতে পেবেছে। তারপব অনেকদিন ধবে সে চুপে চুপে লড়াই করে চলেছে, কিন্তু জেতা হল না, হবেও না কোনোদিন।

এই পরিবাবেব থেকে নিজেকে খসিয়ে—স্বাধীনতা, তাও হল না। সে শুধু নিজেকে নানা দিক দিয়ে ঢেব তৈরি করে গিয়েছে, ইউনিভার্সিটিব থেকে উঁচু ডিগ্রি নিল, ঢেব পড়াশুনা কবল, লিখল খানিক, শিখল এই যে বিধ্বস্ত কববার ক্ষমতা যাদেব নেই তারা সেই আকাঙক্ষা দিয়ে কী কববে। হৃদযকে নম্র নরম কবে নিতে শিখল তাই সুকুমাব। সৈনিক জীবনও হযত তাবই মতন, সৈন্যের মনেব ভিতর যত বড় তুমুল সমুদ্রই থাকনা কেন ব্যাবাকেব প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়মই প্রতি মুহূর্তেই তাকে হিমের মত জমিয়ে জমিয়ে গড়ছে, এই পবিবাবেব কর্তাদেব নানাবকম অবিচাব ও অন্যায়ও তেমনি পবিবাব দেবতার চোখের নিচে সুকুমারকে গভীব সহিষ্ণু অবিচল এক সৈনিক করে তুলছে যেন।

কোথায় সে বসবে? কোথায় সে পড়বে? কতটুকু সময় সে পাবে? তার স্ত্রী কোথায় থাকবে? তার মেযেব কী হবে? আশিটি টাকার জন্য বাবা কতদিন অফিসে যাবেন আব?

এই সমস্ত প্রশ্নেব উত্তব তাব নিজের হাতে নেই আব, এই বিবাট জটিল পবিবার এই সব প্রশ্ন এব নিজেব সুবিধা বুঝে সাধবে। এই ব্যারাকেব এক বাধ্য সৈন্য সে শুধু। জীবন তাকে বাধ্য আরো বাধ্য—

বছরখানেক আগে তাই আরেকবাব কলকাতায় গিয়েছিল সুকুমার। এক বছব চেষ্টা কবে দেখল দেশের বাড়িব ব্যবস্থাব থেকে দূবে কোথাও থাকতে পারা যায় কিনা। আজকেব স্টিমারে সে খালি হাতে শূন্য মাথায় ফিরে এসেছে। ববাববই তাব নিজেব একখানা কোঠা ছিল দেশের বাড়িতে। এসে দেখল সুকুমার এবার তার জন্য আব কোনো কোঠা নেই, তার বইগুলো প্রাযই হাবিয়ে গেছে। সেগুন কাঠেব টেবিলটার জাযগায় একটা কেরোসিন টেবিল। আলমাবিটা কোঠায় চলে গেছে।

সারাদিন নির্মলা স্বামীকে বাতাস দিচ্ছে, কিন্তু সুকুমার জানে, এ দরদটুকু শুধু আজকেব দিনেব জন্য, কাল, হযত আজ রাতেই নির্মলার যা হবে সুকুমারের তা ভাল লাগবে কি?

চোখ বুজে সুকুমার একটু গুছিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল। বাত যখন দুটো বেজেছে তখনো জীবনটাকে

কোনো সম্বন্ধে বা প্রয়াসের ওপর দাঁড় করাতে পারছিল না সুকুমার। কীসের জন্য প্রয়াস করবে সে? কী সংকল্প হবে তার? এই ভাবতে ভাবতে ভোরের বেলা সুকুমার জেগে উঠল। এই কথাই কি সে জীবন ভরে ভেবে আসে নি? কী সংকল্প হবে তার? কিসের জন্য সে প্রয়াস করবে?

কিন্তু কল্পনার বুদবুদে কিংবা কোনো এক দিনকার ভালবাসার কথা মনে করে কিংবা সেই বই কবিতা সাইকেলের নিরিবিলি নিরবচ্ছিন্ন শান্তির দিনগুলোর কথা ভেবে ভেবে সবই কি গুলিয়ে যায় নি সুকুমারের?

সাইকেলটা আজও রয়েছে। দু-চারটে নাট খসে গেছে। পাম্পটা হারিয়ে গিয়েছিল, খানিকটা মেরামতেরও দরকার হয়েছে, অনেকটা সকাল সাইকেলটার পিছনে লেগে রইল। সুকুমার। তারপর সেটাকে যখন তৈরি করা হয়ে গেছে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

সুকুমার সাইকেলটা নিয়ে ঘাসের পথ দিয়ে তবু খানিকটা ঘুরে আসার জন্য চলছিল।

নির্মলা ডাকল। সাইকেলটাকে একটা ঝাউগাছের গুঁড়ির ওপর ঠেলে রেখে সুকুমার ফিরল। কিন্তু এত বেলা মাথায় করে কোথাও সে আর বেরুতে পারল না।

আজকের দিনটাও কালকের মত ফুরিয়ে গেছে। একটা বই পড়া দূরের কথা, সেই বই কবিতার দিনগুলোর কথা ভাল করে ভাববারও সে অবসর পেল না। এমন আবহাওয়ায় আগেকার সেই জীবনের কোনো কিছু গভীর আস্বাদের কথা ভাবতে যাওয়াও কেন যে বিষম বেকুবি বলে মনে হয় আজ! নির্মলা একটু গভীর রাত করে এসে বললে, 'তুমি এই বিছানায় কেন?

সুকুমার উঠে বসল। তার নিজের নির্দিষ্ট খাটে সে চলে গেল। নির্মলা তাকে ফিরে ডাকল না আর। না, নির্মলার মনে না, সুকুমারে হৃদয়ে পৃথিবীতে কোথাও কোনো রঙের রসের ভাবের ফেনার ছন্নাংশও যেন নেই আজ আর। যে যার খাটে শুয়ে পড়েছে, ঘুমুচ্ছে।

পরদিন দুপুরবেলা নির্মলা যখন বোকা কথা বলছিল একটা বোকা লোকের সঙ্গে সাইকেলটা হাতে নিয়ে সুকুমার ভাবছিল বিরজার কথা। বিরজাকে বিয়ে করতে পারত সুকুমার, যদি করত তাহলে বিরাজও হয় দু-চার মাস পরে সুকুমারের জন্য একটুও কেয়ার করত না। কিন্তু তবুও মেয়েটি অনেক চৎকার কথা বলতে পারত, নানারকম চালাক লোকের সঙ্গে।

জামরুল গাছের ডালপালা বাতাসে ঝটপট করছে, দুপুরের চড়া রোদে বোলতার প্রাণ অধীর হয়ে উঠেছে, ঝাউগাছের শাখা পাতা আকাশের দিকে উড়ে চলেছে যেন, অনেকক্ষণ সাইকেলে সাইকেলে ঘুরল সুকুমার। সুকুমার ইচ্ছা করে জীবনকে অপচয় [....]। কলকাতায় থাকতে সে ভেবেছিল দেশের বাড়িতে গিয়ে কিছু লিখবে। জীবনে অনেক কথা জমে গেছে। ধরো, এই পরিবারটা নিয়েই অনেক কথা লেখা, অনেক লিখবার রয়েছে, মন্তব্য, সমালোচনা, বং, হয়ত বক্রোক্তভার বাকি নেই আর কিছু।

কিন্তু কোথায় বসে লিখবে সে? কতক্ষণ বসেই-বা লিখতে দেবে? নিস্তব্ধ জায়গা বা সময় কেউ তাকে দেবে না। জীবনে যে এই পঁয়তিরিশ বছর ধরে এত কম প্রসব করল, এত বেশি নষ্ট হয়ে গেল তা সুকুমারের শক্তির অভাবেও নয়, আকাঙক্ষার তুচ্ছতার জন্যও নয়। এ সবই তার ছিল, কিন্তু জীবনে সে ঢের ভুল করেছে, জীবনের নিকটতম পছন্দগুলো তার ভাল হয় নি, বরাবর কবিতা, বই আর অক্লান্ত ঘুরে বেড়াবার সাধ, অগাধ যাযাবর ধারণাকে সে তার দেবতা মনে করেছে, লেখাকে, পাণ্ডুলিপি তৈরি করাকে পাণ্ডুলিপিকে দেবতা মনে করেছে সে তার, একটা দুঃসাধ্য পরিবারকেও দেবতা মনে করতে হয়েছে। জীবনের দেবতা যার এইসব তার পক্ষে তাল সামলানো বড্ড শক্ত, কিন্তু তুবও সে চলছিল। কিন্তু সুকুমারের শেষ পছন্দগুলো নির্মলা আর খুকুন তার জীবনটাকে নিয়ে কাকের বাসা তৈরি করতে চলেছে।

সাত-আট দিন কেটে গেছে। কাকের বাসা তৈরি হচ্ছে শুধু। নির্মলাকে নিয়ে খুকুনকে নিয়ে। কোকিলকে যখন কাকের বাসা তৈরি করতে হয় না।

রাত এগারটার সময় ভিতরের বাড়ির থেকে ফিরে এসে নির্মলা মশারি গুঁজছিল। এখানে সে ঘুমবে। সুকুমার অনেকদিন পরে আজ বাতি জ্বালিয়ে টেবিলে বসছিল, কিন্তু বাতি সরিয়ে দিতে হবে। না হলে নির্মলার চোখে লাগবে। লণ্ঠনটা হাতে করে সুকুমার চলে গেল।

বাইরে বিরাট নক্ষত্রের রাত, বৈশাখের বিশাল আকাশ। সাইকেল নিয়ে একটা টহল দিয়ে আসতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বেড়ার ওপাশে সুকুমারের সাড়া যদি না পায় তাহলে নির্মলার ঘুম হবে না সে ভয় কাতুরে।

সুকুমার অন্ধকারের ভিতর নিজের খাটের ওপর গিয়ে বসল।

নির্মলা স্বামীকে ডাক দিয়ে বলল, 'কী করছ?'

—'এই বার শুয়ে পড়ছি নির্মলা।'

—'ঘুমুবে?'

—'না, এখন না।'

—'মাশারি ফেলেছ?'

—'না।'

—'ফেল না।'

—'কেন নির্মলা?'

—'তাহলে ঘুমিয়ে পড়বে।'

সুকুমার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, 'কিন্তু সারারাত ত আমি জেগে থাকি না।'—'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঘুমিও না।' নির্মলা একটা অমায়িক শালিখ পাখির মত মাথা নেড়ে বললে, 'আগে আমি ঘুমিয়ে নি, তারপর তুমি ঘুমিও, বুঝলে?' (একটা অমায়িক শালিখ পাখিব মত।)

তারপর একটা নিশ্চিন্ত শালিখেব মত নিজের নীড়ের ভিতব ঘুমিয়ে পড়েছে সে। খুকুন ঘুমিয়েছে।

এইসব নিয়ে সুকুমারের, সুকুমারেবও ত নীড়, খাটের ওপর শুযে নরম নবম অন্ধকারের ভিতর খোলা জানালা দজার স্নিগ্ধ বাতাসে যত ভাবা যায় তত মনে হয় এও বা মন্দ কি, যদি বাবাব আশির ওপর নির্ভর না করে নিজেও অন্তত ষাট পঞ্চাশ গুছিয়ে আনত, পারত সুকুমাব। কোনোদিনই কি তা সে পারবে? যদি পাবত তাহলে জীবন যে সংযম নম্রতা পবিতৃপ্তি ও ধৈর্য শিখিয়ে তাকে তা দিয়ে সে জীবনেব মধু তৈরি কবতে পারত না কি? সে পড়তে পারত, লিখতে পারত, বই লিখতে পারত সে।

রাত অনেকখানি টেনে গেছে। নির্মলা তার খাটের থেকে ডাক দিল, 'ওগো।'

সুকুমাব বললে, 'বলো।'

—'জেগে আছ?'

—'আছি।

—'ঘুমিও না।'

—'ঘুমই নি ত।' বাস্তবিক, একটা সময সুকুমার জেগেই ছিল। কোনো এক সংকল্পেব কথা ভাবছিল সে, কোনো এক প্রযাসেব কথা, যাব ওপব জীবনকে দাঁড় কবানো যেতে পাবে।

নির্মলা বললে, 'কীসেব শব্দ হচ্ছে?'

—'শব্দ?'

মেজকাকার আটচালাব ওপব অনেকক্ষণ ধবে একটা পেঁচা ডাকছিল, বাতাসে নিমগাছেব ডালপালা নড়ছে, নদীর দিকেব থেকে জলপাযবার সাড়া পাওযা যাচ্ছে। আরো দূবে বনমোবগেব ডাক। বাতকে এরা নিবিড় কবে তুলেছে নাকি? নিবিড় স্বপ্নময? যখন বিরজাব ভালবাসাব কথা ভাবা যায়, কিংবা তাবও আগের কোনো প্রণযের আবছাযার কথা কিংবা জীবনে যখন কোনো ভালবাসা ছিল না, গভীব জ্যোৎস্নারাতে বুনো মুবগিব ডাকে যখন বিছানার থেকে উঠে মাঠে মাঠে বেড়াতে ভাল লাগত, একা।

কিন্তু নির্মলা পাড়াগাঁব কিছু বোঝে না, এমন জ্যোৎস্নাবাত, গাছপালা, পাখিপাখালি, এই ঢেউ তাকে ভয়ে জাগিযে রাখে।

নির্মলা সুকুমারকে ডাক দিয়ে বললে, 'ঘুমিও না।'

সুকুমার খাটের ওপর উঠে বসল। জানালার ভিতব দিযে দূরে জ্যোৎস্নার মাঠ বনেব দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বইল।

নির্মলা বললে, 'তুমি ঘুমিযে পড়লে নাকি?'

সুকমার বললে, 'কাছে আসব নির্মলা?'

নির্মলা একটু ইতস্তত কবে বললে, 'না।'

বউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুকুমার জেগে থাকলেই সে ঘুমুতে পাবে। এইটুকু মাত্র ভবসা স্বামীর কাছ থেকে সে চায। সুকুমারকে নিজের খাটেব পাশে এনে বসাবার কোনো প্রযোজন নেই নির্মলার। রোজ রাতেই কযেকবার স্বামীকে সে ডাকে। স্বামী তাব খাটে জেগে কিনা? পাহারাওযালা অন্ধকারে ধাঁধা খেযে যেমন ডাকে তেমনই একটা ভীতি বিহ্বলতার সঙ্গে।

এই তার স্ত্রী।

এবং এই খুকুনের মা।

কিন্তু তুবও এই সব দিযেও নীড় গড়া যায়, শালিখবধূও ত অধিকাংশ সমযই এমনইতর। যদি ষাটটা টাকা রোজগার করতে পারত সুকুমার, পঞ্চাশটা টাকা।

ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া

বিরাজ কলম থামিয়ে বললে, 'না, লেখা একেবারেই অসম্ভব।' মাথায় কথা ঢের ছিল, হাতও প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তবুও হৃদয় আর চায় না।'

দু-এক লাইন লিখে খাতাটা সরিয়ে রাখল বিরাজ। ফাউনটেন পেনটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আটকাতে আটকাতে কমলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে। বিরাজের লেখাপড়া কমলার কাছে সব সময়ই অন্ধকার জিনিস। সে জানেও না জানতেও চায় না স্বামী কী লেখে, কী লিখতে চায়, কী পড়ে, কী পড়তে ইচ্ছা, বোঝে শুধু সে পৃথিবী একটা ঢের দূরের জিনিস। কেমন যেন অসংলগ্ন। কোনো পৃথিবীর সঙ্গেই যেন তা খাপ খায় না। হয়ত সে পৃথিবী, অক্ষমদের, বাস্তবিক অপারগদের নয় কী?

কমলা বললে, 'লিখতে পারলে না?'

—'না।'

—'কেন? খুকুনের চিৎকার?'

বিরাজ বললে, 'কোনো ব্যতিব্যস্ততার ভিতর আর্ট টিকতে পারে না, দরিদ্রতাব ভিতর তা পাবে না, জটিল পরিবারের তোলপাড়ের ভিতর আর্ট কী কবে টিকবে?' একটু থেমে বললে, 'বিয়ে করা আর্টিস্টেব পক্ষে মারাত্মক—'

বিরাজ একটা জটিল কঠিন পরিবারের ছেলে। এই পরিবারের অজস্রপ্রাণী দিনরাত ব্যতিব্যস্ত থাকতে ভালবাসে, জীবনকে মনে করে ব্যতিব্যস্ততা, আর্টিস্টও হয়ত তাই মনে করে, কিন্তু সে অবসর ও শান্তি চায়। টাকাকড়ির কোনো সুবিধাই কোনোদিন বিরাজেব হচ্ছে না। এই কঠিন জটিল পরিবার দিন আনে দিন খায, উড়িযে দেয সব। শেষ পর্যন্ত বিবাজকে এদেব করুণার ওপর নির্ভর করতে হয়।

অথচ সে আর্টিস্টের প্রাণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে।

চার-পাঁচ বছর আগে যখন জীবনে একটু পড়তা এসেছিল, বিরাজ বিয়ে করেছিল। সেই ঘোব টিকতে টিকতেই সে অনকে অবাধ্য দুষ্প্রাপ্য কাজ করে ফেলেছিল। আর্টিস্টের পক্ষে যে বিচার সংযম ও শান্তির দরকার অত্যন্ত বর্বরের মত নষ্ট করে বসেছে সে। আজ তাই কমলা, এই খুকি এই সব ব্যতিব্যস্ততা ও শালীনতার ভিতর জীবন (নষ্ট হয়ে) ঘুলিয়ে যাচ্ছে তার। মুখে এক ক্লান্ত ক্ষুধা নিযে ডেকচেযারটা টেনে দরজার পাশে বসল বিরাজ। কল্পনাব বদলে অন্য কোনো স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সহানুভূতিকোমল মেয়েকে যদি সে বিয়ে করত এমন প্রশ্ন? এমন কথা অবিশ্যি কোনোদিন সে ভাবতে যায় নি। শেষ পর্যন্ত সব মেয়েই কমলা। কোনো বধূকে দিয়েই আর্টিস্টের একাকী জীবনের কোনো সাহায্য হয় না। আর্টিস্টকে একাই থাকতে হয, সাংসারিক সচ্ছলতা নিযে।

ডেকচেযারে বসে বাইরের দিকে তাকিযেছিল বিরাজ। কৃষ্ণচূড়া গাছটা যে কারা কেটে ফেলেছে? বরাবরই বিদেশ থেকে যখন সে বাড়ি ফিরত দূবের থেকে এই নিবিড় সবুজ গাছটাকে দেখে তৃপ্তি পেত। এই গাছটা কোনোদিনও এক মুহূর্তের জন্যও বিরাজকে হতাশ করে নি, তাকে জাগিয়েছে। স্নিগ্ধ করেছে, আঘাত দিয়েছে, অপেক্ষা করতে বলেছে। এখন ফুল ফুটবার সময ছিল। এর ফুল বরাবরই এক বিস্ময়েব জিনিস ছিল।

ডেকচেয়ারে বসে ভোরে, অন্ধকারে, কতদিন সে সব দেখেছে বিবাজ। এই গাছটার অজস্র অধীর ডালপালাগুলোকে কাকাতুযার ডানার মত উড়তে দেখেছে। নক্ষত্রের দিকে সেই অগণ্য কাকাতুযার দল। এই গাছটাকে কে কেটে ফেলল? এ পরিবারের যে-কোনো লোকের পক্ষেই এ জিনিস খুব সহজ, খুব সম্ভব। আশ্চর্য, এনে পরিবারের ভিতর কি করে যে সে জন্মেছিল। কমলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছটা কাটবার সময় সে নাকি বাধা দিযেছিল। কিন্তু অনেক নাকি কাঠ হযেছে।

কমলা বললে, 'তোমার পক্ষেও লেখা শক্ত, আমিও পড়তে পারি না।' কমলা বললে, 'আমি ঢাকায় ইন্টারমিডিয়েট পড়ব, বাস্তবিক এ বাড়িতে থেকে কারুপক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়, ইডেনে থাকব।'

—'ইডেনে?'

ইডেনে থেকে কমলা কিছুদিন আই এ পড়েছিল, আবাব সে ইডেনে চলে যেতে চায়। পড়বাব জন্য ঠিক নয়, কিন্তু এই পবিবাবেব থেকে, এই বিবাহিত জীবনেব থেকে খালাশ পাবাব জন্য, কমলা জানে, ইডেনে হলে খুকিকেও ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু খুকিও আজ তাব পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বিবাহ এদেব দুজনেব নিকট একদিনও হযত মোহেব রূপে আসে নি, একদিনেব জন্যও হযত এবা মেযে বা পুরুষ জীবনেব কুহককে বুঝতে পাবে নি পবস্পবেব সংসর্গে। বিযেব চাব-পাঁচ বছব পবে এবা কেউই কাউকে ঢেকে কথা বলবাব প্রযোজন বোধ কবে না, স্বামীব কাছ থেকে নানাবকম পবিষ্কাব কথা শুনে কিংবা স্ত্রীব কাছ থেকে পবিষ্কাব জবাব পেযে কেউই কোনো ব্যথা বোধ কববে না আজ আব। জীবন কোন এক হেমন্তেব স্থিবতায পৌঁছেছে যেন, জীবনেব হেমন্তেব ঢেব আগে। এবা পবস্পবেব থেকে এমনই আন্তবিকভাবে বিচ্ছিন্ন আজ। অনেক সময বিবাজ অবাক হযে ভেবেছে সব বিযেই কি শেষ পর্যন্ত এই আন্তবিক বিচ্ছেদে দাঁড়ায গিযে? দাঁড়ায নাকি? তা না হলে কী হয? কোনো বন্ধুত্ব বা বিযেব কোনো সম্বন্ধই শেষ পর্যন্ত প্রযোজনীয হযে বেধে থাকে না আব। মানুষ শেষ পর্যন্ত একা। একা নয কি?

অন্তত শিল্পী—সমযহীন এমনকি সমসামযিক শিল্পী প্রাণও একা। তাকে কে বুঝবে? কমলা হযত নিজেকে নিযে পবিশ্রান্ত, এই পবিবাবকে নিযে, হযত অন্য জীবন, অন্য মানুষ, অন্য সম্বন্ধ আব এক ধবনেব বন্ধুত্ব, দাম্পত্যতৃপ্তি দেবে এই মেযেটিকে।

কিন্তু বিবাজ এসব কিছু আব চায না। এবপব স্বামী-স্ত্রীব ভিতব খোলাখুলি কথাবার্তা শুরু হল।

বিবাজ কমলাকে বললে, 'তোমাবও পড়াই উচিত ছিল।'

কমলা বললে, 'পড়তামই ত, এতদিনে আমাব বি এ পাশ কবা হযে যেত।' একটু হেসে বললে 'তাবপব না হয টিচাবি কবতাম।'

এ পবিবাব ও এমনি জীবনেব গলদেব হাত এড়িযে সে বেশ ভাল জিনিস ছিল।

বিবাজ বললে, 'কিংবা অন্য কোথাও,কোনো মুগ্ধ সচ্ছল স্বামী ও উদাব পবিবাবে বিযে হলেও ঢেব ভাল হত।'

কমলা সে কথা অস্বীকাব কবতে পাবল না।

বিবাজ বললে, 'তুমি শান্তি পেতে, নিজেকে ফোটাতে পাবতে, মানুষ বিলাস লালসা লাম্পট্য বা সুখ তত চায না, ববং শান্তিতে মনেব সাধে কথা বলে কাজ কবে লিখে তাব ভাল লাগে বেশি। জীবনেব এইসব মৃদু বঙেব গভীব আকর্ষণ আর্টিস্টেব জন্যই নয যেন শুধু সকলেব জন্যই।'

কমলা ঘাড় হেঁট কবে পাযেব নখ দিযে মাটি খুঁড়ছিল।

বিবাজ বললে, যদি তেমন কোনো জাযগায বা তেমন কোনো লোকেব কাছে তোমাকে যদি রূপান্তবিত কবতে পাবতাম।'

বিবাজ বললে, 'তাহলে আমাদেব জীবন খুব সচ্ছল হত কমলা।' একটু থেমে বললে, 'এই সচ্ছলতাই ত চাই, হৃদযেব সংসাবেব, যেখানে হৃদয হাঁপিযে ওঠে কাজ পদে পদে বাধা পায, কথা মুখেব ভেতব আটকে থাকে, লিখতে গিযে কলম ফেলে বাখতে হয, সেখানে তোমবা বড় জোব ঢেঁকিব স্বর্গ তৈবি কবতে পাব, কবি দার্শনিকেব ত নবক।

কমলা বললে, আমি ঢাকাযই পড়ব। ঠিক কবেছি ইন্টাবমিডিযেট পাশ কবে টিচাবি কবব, টিচাবি কবতে কবতে বিযে পড়ব।'

বিবাজ বললে, 'তাহলে একটা চিঠি লিখে দাও।'

—'কাকে?'

—'বমেনকে।'

—'ঠাকুবপোকে লিখেছিলাম।'

—'জবাব পেযেছ?'

—'লিখেছে যে মাসে পনেব কুড়ি টাকা কবে দিতে পাববে।'

—'তাতে হবে?'

কমলা বললে, 'বোর্ডিঙে আট টাকা, মাইনে তিন টাকা।'

বিবাজ যেন নিস্তাব পেযে বাঁচল।

কমলা বললে, 'তুমি না হয় রাজি হলে, ঠাকুরপোও টাকা দিল, কিন্তু তোমার কাকা জ্যেঠারা রাজি হবেন ত?'

বিরাজ বললে, 'তাদের ত টাকা দিতে হচ্ছে না।'

—'কিন্তু আপত্তি ত সবচেয়ে আগে তারাই তুলবে।'

বিরাজ বললে, 'সে যখন তুলবে আমি দেখব।'

—'সত্যি পারবে তুমি? তাদের বোঝাতে পারবে? .

বিরাজ কমলাকে বললে কেন এই সামান্য জিনিস সে ঘাবড়ায়, অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে বললে বিরাজ।

কমলা নিজেকে খুব বেশি পরিতৃপ্ত বোধ করছে, বাড়ির কাজে সে চলে যাচ্ছে, পিছনে একটা গভীর স্বস্তির নিশাস সে রেখে গেল।

বিরাজ আধাআধি খাওয়া চুরুটটা পকেট থেকে বের করে স্থির হয়ে ভাবতে লাগল। জ্যেঠামশায় বলবেন, 'বউ মানুষ মেট্রিকুলেশন পাশ করেছে, এই ঢের, কোথায় সে আবার যাবে? কোথাও যেতে পারবে না।' কাকারা বলবে, 'কোথায় আবার যাবে!' ইডেন হস্টেল, কলেজ তাদের কাছে শযতান সাপের ইডেনের মতই দুর্বোধ্য, পৈশাচিক।

এই বিরাজদের পরিবার। এই পরিবারেব ভিতর কেন সে জন্মাল, কমলাকেই-বা আনল কেন? ভাগ্যিস নিজের অশ্লীল কবিতা ও নোংরা লেখা এত কম ছাপাতে গিয়েছে বিরাজ। ইচ্ছে করলে ঢের ত সে ছাপাতে পারত, ভাগ্যিস কলম থামিযে ফেলেছে সে। না হলে এবা পবিবারের থেকে বিরাজদেব তাড়িয়ে দিত, কিন্তু এমন পরিবারে থেকেই-বা কী লাভ? কিন্তু নতুন কোথাও গিযে বসবার জো নেই বলেই শুধু নয়, কি যেন কেন বাপ-মা বউ মেযে বোনকে নিযে আলাদা কোথাও বসবার কথা মনে হলেও নিজেকে কেমন সুবিধাবাদী মনে হয, মনে হয সে যেন সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। বিরাজ যেন ছোট, সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। কেন এরকম মনে হয? বাস্তবিক সংকীর্ণতাও এই পবিবাবটাকেই ঘিরেই, বাইবেবই ত প্রসাবতা।

বিবাজ চুরুট জ্বালিযে অনেক রাত অবদি জেগে বইল।

দিনের পর দিন, সারাদিন রাত। এক মুহূর্তেব জন্যও বিরাজ নিস্তাব পাচ্ছে না, গভীর রাতেও খুকি না হয় কমলা। খুকিকে যত সহজ মনে হয়েছিল সে মোটেই তা নয, মেযেটির জন্য বিরাজেব হৃদযেব আকর্ষণ যত কম মনে হযেছিল সে মোটেই তা নয, মেযেটির জন্য বিবাজেব হৃদযেব আকর্ষণ যত কম মনে হযেছিল তাও নয, কিংবা আকর্ষণ হযত বাস্তবিকই কম, তবুও মেযেটাকে মেঝের ধুলোব থেকে বার বার উঠিযে ঝেড়েপুছে দিতে হচ্ছে বিরাজের, সে নোংরামি পছন্দ করে না, মেয়ের নাকভবা কফ ঝেড়ে ঝেড়ে নিজের কাপড়কে পুঁটলি বানিযে ফেলেছে বিবাজ, মেযেটিকে যখন তখন হযত নিজের অজ্ঞাতসারে ইচ্ছায অনিচ্ছায নিজের কোলেই খেতে পাচ্ছে বিরাজ, এ সমস্ত জীবনের অপব্যযেব সময, কখনোই এরকম অবশ্যম্ভাবিতার জীবন প্রস্তুত ছিল না বিরাজের। এখনো যে কোনো মুহূর্তে এসব ছেড়ে চলে যেতে পারলে সে যেন নিস্তাব পায। তবুও মনে হয খুকুকে [...] কিছু খেলনা কিনে দিলে হত। বড্ড রোগা মেয়ে, এক শিশি ভাইরল কিনে দিলে কেমন হত? ভাইরল? ভাইরলের কথা সে অনেক বার ভেবেছে, ভাইরল খেযে খেযে মেয়ে তার মোটা বেবি হয়ে বসবে। দেখতে কেমন সুন্দর, চমৎকাব হবে। হয়ত এই জন্যই। মেয়েটিব রুগ্ণতার কষ্ট সেরে যাবে বলে নয। বিরাজ মনে মনে হেসে ভাবল, আর্টিস্ট, আর্টিস্ট, পিতাও এমন সৌন্দর্যের কাছে হৃদযবৃত্তিকেও খুন করে উৎসর্গ করে।

কিন্তু হৃদযবৃত্তি কি তার কিছুই নেই? খুকুনের সম্পর্কেও সৌন্দর্যই কি সব? এই খাতা কাগজপত্রের বদলে মেয়েটিকে টেবিলেব ওপর বসিয়ে এইসব কথা অনেকক্ষণ ধরে ভাবত বিবাজ, বুজে উঠতে পারত না মেয়েটিকে সে সুন্দর স্ফুট চমৎকার দেখতে চায শুধু না কোনো এক স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও উৎসাহ নিযে এ কুৎসিত হলেও হত!

পিতার প্রাণ তার সন্তুষ্ট হতে চায়। না আর্টিস্টের প্রাণ? বুঝে উঠতে পারছে না সে পিতা কতখানি, আর্টিস্টই-বা কতটুকু? ভাইরল হল না, [....] নয কযেকটা কাঠের খেলনা খুকুনকে কিনে এনে দিল বিরাজ।

গরমের দুপুরবেলা খুকুন ঘুমত না। মাকে বিরক্ত করত। খিটখিট করত শুধু। বিরাজ দরজার ধারে

বাতাসের মুখে টেবিলে তাই খুকুনকে নিয়ে বসত, হঠাৎ হুট করে মনে হত এই টেবিলে নানারকম বই থাকত তার একদিন, এই টেবিলে বসে ঢের লিখেছে সে মানুষের জীবনের জন্য রস জমিয়েছে। জমাতে চেষ্টা করে গেছে। নিজের জীবনকে নেশায় জমিয়ে তুলেছিল, সেইসব দিনগুলো উপে গেছে কি তার? এক দল সন্তান কখনোই একটা মর্মান্তিক কবিতার চেয়ে দামি নয়, দামি কি? খুকুনকে নিয়ে এই দুপুরবেলা সে কতদূর তৃপ্ত? আগেকার দিনের সেই সব তৃপ্তি কী গভীর ছিল। সেইখানে কোনো মাংসের ঘ্রাণ ছিল না ত।.

ঘুমিয়ে পড়লে এই মেয়েটিকে একটা দলার মত মনে হয়, মাংসের, একটা দলা শুধু। জেগে জেগে চুপচাপ খেলা করতে থাকলে খুকিকে একটা অপ্রয়োজনীয় বিড়ালছানায় রূপান্তরিত করে ফেলতে পারা যায়, খুব সহজে। কিন্তু গরমের দুপুরে মেয়েটি যখন খেলনা ছুঁড়ে ফেলে আর খেলনা ফিরে চায় না, যখন সে উৎসুক্যহীন হয়ে পড়ে, কোনো কিছুই যখন তার ভাল লাগে না, শিশুদের এত বিস্ময়ের প্রথম পৃথিবীও যখন তার কাছে ঢের পুরনো জরাজীর্ণ নিরর্থক তখন বিরাজের হৃদয়ে আঘাত লাগে, মনে হয যেন রোগা খুকিটির এই ব্যথা যদিও লেখকের কলমের ঢের আদরের জিনিস তবুও পিতার প্রাণের এক গভীরতর আবিষ্কারের জিনিস। খুকুন ঘুমিয়ে গেলে পরে এই বিস্ময় ও ব্যথা নিয়ে বিরাজ অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকে।

যদিও লিখবার জন্যই সে এসেছিল তবুও এই পরিবারের নিয়মানুবর্তিতা, এই লোকগুলো এদের অদ্ভুত দাবি দিনরাত্রির ভণ্ডুল, কমলা খুকি কেউই তাকে লিখতে দিচ্ছে না।

সেই অতীতের দিনগুলো—চলে গেছে তার। এখন সেও এদের ভিতরেও একজন হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হত কমলা দু-এক বছরের বেশি বাঁচবে না। এই রোগা মেয়েটিও বেশিদিন কি বাঁচতে পারে? তারপর জীবন ছটকে পড়বে বিরাজের। কৃষ্ণচূড়ায়র এমন নিবিড় গাছটাকে যারা কেটে ফেলেছে তারা তখনই বিরাজকে বিদায় দিয়েছে। বিরাজ চলে যাবে। হয়ত শীতের দেশে মাঠের ভিতর শাদা ছোট একটা বাংলোয়। ঠিক করে বলতে গেলে হয়ত কলকাতার কোনো মেসের একটা নিরিবিলি কামরায়। কিংবা একটা শস্তা বাড়ির নিচের সেইখানে তলার ফ্ল্যাটে সে জীবন গুছিয়ে নেবে। একা। সে আজকের চেযে ঢের ভাল হবে।

কিন্তু কমলা ত টিকে থাকছে, মনে হয যেন তাব মন ফোপবা হযে গেছে। কিন্তু শবীরে তবুও তার এতটুকুও নোনা ধরে নি, সে বরং বিবাজেব চেযে যেন ঢের সুস্থ, জীবনে ঢের দৃঢ়তা, এই মেযেটির যদি বিরাজেব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে? দুজনে মিলে তাবা যদি বুড়ো হযে যায? হযত, তাই হবে, বিরাজ একদিন দেখবে সে অদ্ভুত ভযাবহ [....] সম্ভব হযে গেছে।

বিরাজের ছোটশালী অমলা কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসতে চাচ্ছে। জ্যেঠামশায বলেছেন, তা হতে পারে না। কাকাবা বলেছেন, অসম্ভব, কী করে হয?

বিরাজ ভাবছিল, কী করে হয? হবার প্রযোজন-বা কী? কিন্তু তুবও জ্যেঠামশাইকে অনেক কষ্টে রাজি করাতে হয়েছে। বিবাজ আগেও দু-একবাব অমলাকে দেখেছে, কিন্তু এবার যখন সে এল, বিচিত্র সে, কমলার চেয়েও লম্বা, ছিপছিপে, দেখতে আব এক পবদা সুন্দব, ফরশা, বঙ, চুলগুলো তার আরবি ঘোড়ার লেজের মত যেন। একটা দ্রুতগতিব পেছনে সবমযই হিল্লোলে উড়ছে। কিন্তু বিকেলের দিকেই দ্রুতগতি থেমে গেল মেযেটির। হিল্লোল একটু ম্লান হল। বিবাজ চোখ তুলে তাকিযে দেখল মেয়েটি গোমড়া-মুখে দাঁড়িযে রযেছে। তাব টেবিলেব পাশে।

বিরাজ সাইকেলটা পাম্প করছিল।

অমলা বললে, 'বেরুচ্ছেন?'

মেযেটি এই বাড়িতে এসে এবার বিরাজেব সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল। বিরাজও প্রথম উত্তর দিল।

অমলা বললে, 'আমাকে বেড়াতে নিযে যাবেন?'

—'তোমাকেই শুধু?'

—'না, হয় ছোড়দিও যাবে।'

—'কোনদিকে যাবে? কী বললে, স্টিমার ঘাটের দিকে? কতকগুলো চোঙা দেখতে? নদী? 'হ্যাঁ সুন্দর বটে। কিন্তু সে ত অনেক দূরে।'

—'হোক না।'

বিরাজ সাইকেলটা পাম্প করতে-করতে বললে, 'গাড়িতে যাবে?'

—'কক্ষনো না, হেঁটে বেড়াতেই ত ফুর্তি?'

ফুর্তি, তা বটে। এই মেয়েটি ব্যাকুল চিতার মত চমৎকার ছুটতেও পারে। ছিপছিপে সুন্দর চেহারা, ফরশা রঙ, চুলগুলো আরবি ঘোড়ার লেজের মত একটা দ্রুতগতির পিছনে হিল্লোলে উড়বে। নক্ষত্রের রাতে, মৃদু জ্যোৎস্নায় নদীর পারে এই সুন্দর চিতাকে নিয়ে ঢের আমোদ হত বটে, আমোদ, উল্লাস, অতিশয্য।

বিরাজ বললে, 'কাকারা বাড়ির মেয়েদের বেরুতে দেন না।'

হঠাৎ আঘাত পেয়ে অমলা বললে, 'কেন?'

বিরাজ সাইকেলটা পাম্প করতে লাগল।

অমলা বললে—আপনার সঙ্গেও যেতে দেন না?'

—'না'

—'গাড়িতে গেলে? ছোড়দিকে নিয়ে? দু-একজন কাকিমাকে যদি নেই?'

বিরাজ কোনো কথা বলল না। তাব সাইকেল পাম্প করা শেষ হয়েছে। আস্তে আস্তে সাইকেল চড়ে অন্ধকারের ভিতর বেরিয়ে গেল সে। ঝাউগাছের সাবির পাশ দিয়ে শনশন করে বাতাস নিয়ে চলেছে সে, এই সন্ধ্যার সময় জীবন একটু নিস্তার পায়, সবকিছুকে ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ক্ষিপ্র নিরবচ্ছিন্ন সাইক্লিস্ট সে যেন নক্ষত্রগুলোর দিকে চলতে থাকে, তারপর একবার সেখানে পৌছুলে সেই অনন্ত নক্ষত্রেব মাঠে, না আছে পরিবারের ব্যথা, কাকারা জ্যেঠামশাই, কমলা খুকি বা নিরর্থকতা। জীবন সেখানে মস্ত বড় একটা গভীর পরিসরের কথা পেয়েছে। প্রশস্ত জানালার পাশে বিস্তৃত একটা টেবিল নিয়ে নক্ষত্রেব বাতি জ্বালিয়ে রাতের বাতাসেব ভিতর যেন সে বসে আছে ঐশ্বর্যময় লেখকসম্রাট। তারপব যতকিছু ভাবতে পারা যায়, যতকিছু লিখতে পারা যায়! এমনি করে অনেক পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যেতে পারে তার। জিলাস্কুলেব কম্পাউন্ড ঘেরা বাংলাব বেড়ার কিনাব দিয়ে সাইকেল ধীরে ধীরে চলেছে, অন্ধকাবে এক হলকা বাতাসে বাবলা ফুলের গন্ধ প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা মনে কবিয়ে দিচ্ছে, সেই ইস্কুলেব দিনগুলো! সেই বোদ ছায়া, কোলাহল, আকাশ, নদী, সংকল্প, চেষ্টা, কোথায় আজ সেই সব?

সাইকেল আস্তে আস্তে চলেছে।

জিলাস্কুলের মস্ত বড় দালানটা ধূসব হয়ে উঠেছে। অনেক দিন পবে এই পথে আবাব সে এসেছে, এমন নিষ্ফলতা, এমন নিষ্ফলতা হৃদয়কে এইখানে পেয়ে বসে। তবুও তা প্রখব নয় মোটেই, এমন নবম! এমন নবম!

স্টিমাব ঘাটের দিকে চলেছে বিবাজ। স্টিমার ঘাট, স্টেশন ছাড়িয়ে দূবে আবো দূরে ঝাউগাছেব বাতাসে নদীর ধারে সবুজঘাসের ওপর সাইকেলটাকে কাত কবে ফেলে বিবাজ ঘাসেব নবম ঘ্রাণ ও রঙের কোলে হারিয়ে গিয়েছে।

শেষ পছন্দের সময়

সন্ধ্যার সময় স্টিমার নোঙর করল।

সুবোধ জেটির দিকে একবাব তাকাল। স্টেশনে তার জন্য কেউ এসেছে কি? কেন আসবে? কোনোদিনই কেউ আসে না। এই পৃথিবীতে সে বিশেষ কিছু দামি জিনিস একটা নয়। জীবনে অনেক সে ঘুরেছে বটে, কিন্তু এই দেশের ঘাটেই বার বাব তাকে ফিরে আসতে হয়। এমনি সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রতিটি বার, তারপর মালপত্র নিয়ে নেমে পড়া এত সহজ, কুলি এত সুপ্রাপ্য, ভাড়াটে গাড়ি এত সুলভ, কিন্তু তবুও এমন একটা লোক একটা হৃদয় [নিয়ে] সুবোধেব জন্য এই সহজ কাজগুলো কবে দেবার জন্যে এই জেটির পাটের গুদামের এক কিনারে একটু অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারত? এই গুমোটের ভিতব শুঁটকি মাছের গন্ধে টিনের চালেব তাতের ভিতব এই ঠাণ্ডা নবম নদীর মাথার কিনারটুকু ঘিঁষে কযেকজন লোক পাইচারি করছে। এরা অপেক্ষা কবছে। স্টিমাবেব ভাগ্যবান প্যাসেঞ্জাবদের সঙ্গে চেঁচিযে এবা আলাপ শুরু করে দিযেছে। সেই ভাগ্যবান বন্ধুবান্ধবদেব গ্রহণ কববার জন্য এবা এসেছে।

মনে হয এদের কথাবার্তা, অপেক্ষা আলাপ, খাঁটি খুব। এমনকি একটা খাঁটি সুরের প্রয়োজন বার বার বোধ করছে সুবোধ—বিশেষ কবে দেশের নদীব ঘাটে স্টিমার এসে যখন লাগে, কেউ তাকে কোথাও গ্রহণ করুক এমনই অন্তঃকরণ দিযে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। কোনোদিন থাকত না। কোনোদিন থাকবে না।

এই কৌতূহলময নিস্তব্ধ বিষণ্নতা শিগ্‌গিবই কেটে যাচ্ছে সুবোধের। সব প্যাসেঞ্জারদের পেছনে। অনেকক্ষণ পরে স্টিমাব ছাড়ল। রাতের নদীব জল এমন নিস্তব্ধ। জেটিব গরমেব থেকে বেবিযে এক হলকা ঠাণ্ডা হাওযা ও ঝিবঝিরে নদীব জলেব ঘ্রাণ, ববিশাল স্টেশনেব ইলেকট্রিক বাতিব সাবি, দূবে কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়ে লেমনেড আইসক্রিম বড়ি পানের অজস্র ছন্দা বসে গেছে। আর একটু এগিযে ভাড়াটে গাড়ির সাব, ঘোড়াব নাদ ও পেচ্ছাপের গন্ধ, এখন নানাদিকেব স্টিমাবের আসা-যাওযার সময, স্টেশনে গেঁযো মুসলমানদের অত্যন্ত কোলাহল, এপাশে-ওপাশে রুটি বিস্কুটওয়ালাদেব চিৎকাব, এমন সব জিনিস জীবনে কতবাবই-না, সুবোধ দেখেছে, এব ভিতবকার সবচেযে গভীর দুর্বলতা ও ক্লেদও তার কাছে কত-না নরম, মধুব। গাড়োযানগুলো প্রায সবই তার চেনা।

আজিজেব গাড়িতে সে চড়ল। কলকাতার ছ্যাকবা গাড়ির চেযে এই গাড়িগুলো কত মজবুত বেশি, কত সুন্দব। ভারতবর্ষেব অনেক জাযগায় সে ঘুবেছে কিন্তু বরিশালের ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ির মত চোস্ত খাসা জিনিস আর কোথায দেখেছে? এব কাছে ঢাকা কলকাতার গাড়িগুলো কী বেকুব, দিল্লি আজমির মিরাটের টোঙা কী জঘন্য।

আজিজ ছুটিযে নিযে চলেছে ঝাউযেব সারির পাশ দিয়ে জিলাস্কুলের পাশ দিযে। 'আজ রাতে একটু ঘুবেই বরং যাওযা যাক কি বলিস আজিজ।'

—'হুঁজুর!'

কলকাতার থেকে আসলেই 'হুঁজুর' ঢাকাব থেকে এলেও, এই গাড়োয়ানদের এই 'হুঁজুর' ও 'মহারাজ' খিস্তি বেশ ভাল লাগে। বত্রিশ বছর ধরে শুনে আসছে সুবোধ। জীবনে সে ভগবানের ভ্যাগাবন্ড 'হুঁজুরের' চেয়ে ঢের দূরে। কিন্তু তবুও এই মুসলমান ছোকরা কুড়ি মিনিট আধ ঘণ্টার জন্য সুবোধকে যা নবাবির অবসর দিচ্ছে, গাড়ির গদির ওপর বসে এমন সচ্ছল শান্ত রাতে কেন সে তার অপচয় করবে?

সুবোধ আজিজকে আরো একটু ঘুরিযে নিতে বলল। চুরুটটা সে ফুরুচ্ছে।

রমাসুন্দরী বললেন, 'চৈত্র মাসে এসেছিস, হাতে কি কিছু নেই তোর?'

সুবোধ বললে, 'না মা।'

রমাসুন্দরী বললেন, 'এ আট-দশ মাস কি করলি তাহলে?'
—'ঘুরেছি ঢের, মা, ঢাকা, কলকাতা, পাটনা, মুঙ্গের।'
—'কেন?'
—'ব্যবসা করে দেখলাম।'
—'কিসের ব্যবসা?'
—'ব্যবসা ঠিক নয়, লাইফ ইনসিওরেন্স।'
মালতী এক কাপ চা নিয়ে এস বললে, 'কোনো কেস পেয়েছিলে না গাঁটের টাকাই খোয়ালে শুধু ঘুরে ঘুরে?'
সুবোধ পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে মর্মাহত হয়ে বললে, 'এ কি চা!'
রমাসন্দুরী বললেন, 'চায়ের পাতাটা ভাল নয।'
সুবোধ বললে, 'এরকম খারাপ পাতা পয়সা দিযে কেন আনা হয়।'
—'দাম খুব শস্তা।'
—'খুব ঢের ঢের শস্তা নিশ্চয়ই।'
কেউ কিছু বললে না।'
সুবোধ বললে, 'এর থেকে চা না খেলেই হয়।'
এবারও কোনো কথা হল না।
—'তোমরা সকলেই এ চা খাও মালতী?'
মালতী বলল, 'আমি পাঁচ-ছমাস হল চা ছেড়ে দিয়েছি।'
রমাসুন্দরী বললেন, 'আমিও ছাড়বার মুখে। কেবল তোমার বাবা ও খুড়োবা কজন খান, আব ছোটরা মাঝে মাঝে।'
এর চেয়ে দামি পাতা ব্যবহার করবার অবস্থা এ পরিবারের আর নেই। সুবোধ কলকাতাব থেকে কিছু ভাল চা আনতে পারত। কিন্তু চায়ের পাতা বলেই নয়, কোনো দামি কোনো ভাল জিনিস, ব্যবহাব করবার মত ক্ষমতা এ পরিবারের আর নেই, বাড়িতে পা দিতে না দিতেই সুবোধ বুঝতে পেরেছে এরা আরো খারাপ খাচ্ছে, খারাপ থাকছে। টাকার অভাবে চিন্তার জগৎ থেকেও বিচ্ছিন্ন হযে পড়ছে যেন এবা। এখানে কোনো ভাল বই নেই, আজকাল আব খববের কাগজ রাখা হয় না। কালকাতাব স্টেজ বা সাহিত্যের কথা পড়তে গেলেই সুবোধের মনে হয় সে অবান্তর স্বপ্নবিলাস কবে কতকগুলো লোককে যেন ব্যথিত করে তুলেছে। স্টেজ, অবিশ্যি স্টেজের খবর নিতেও সে বেশি কিছু বাখে নি কোনোদিন, ইদানীং নিচ্ছিল। কিন্তু মালতীর সঙ্গে অভিনয়ের টেকনিক নিয়ে কথা বলবাব মিথ্যা খামখেযালি এক মহূর্তেব ভিতরেই সুবোধের কাছে ধরা পড়ল। কিন্তু সাহিত্যে? মালতী ববং লাইফ ইনসিওরেন্সের কথা জিজ্ঞেস করছে।
সুবোধ বলল, 'কেন? দু-একটা পেয়েছিলাম।'
—'হাতে কিছু আছে?'
—'নেই মালতী।'
মালতী বললে, 'চৈত্র মাসে—'
—'তা জানি।'
—'বাবা কোনোদিকেব থেকেই কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না।'
সুবোধ বললে, 'মেজকাকা কিছু পাঠান নি?'
—'না।'
—'বড়কাকা?'
—'বাবার চিঠির উত্তর তিনি দেন না।'
সুবোধ ঘাড় হেঁট করে ভাবছিল একশ টাকা তার কাছে রয়েছে। লাইফ ইনসিওরেন্সের কেস জুটিয়ে অবিশ্যি নয়, গোটা কয়েক গল্প সে ছাপাতে পেরেছিল, এবং একটা নভেলেটের থেকে কিছু রয়্যালটি পেয়েছে, এ টাকা, এ টাকা যেন নিজের গায়ের রক্তের মত। জীবনে সে ঢের উপার্জন করেছে, টিচারি কবেছে সুবোধ, প্রাইভেট মাস্টারি করেছে, এলাহাবাদে ছবছর গার্জিযান টিউটর হয়ে অনেক রোজগার

করেছিল, লাইফ ইনসিওরেন্সের দালালি করেও এক সময় মন্দ কিছু পায় নি কিন্তু বরাবরই লিখতে চাইত সে, এত বছর লিখল কেনো সুবিধা সে পায় নি, কোনো প্রয়োজনও হয়ত সেই বোধ করে নি। কিন্তু অনেক ভেবে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সুবাধ ঠিক করল সে লিখবে শুধু, লিখে যাবে।

মানুষের খেয়ে বাঁচতে হবে বটে। কিন্তু খোরাকের জন্য সে যে কাজ করবে তাতে তার হৃদয়ের সায় থাকা চাই, সুবোধের হৃদয় আর কিছুতে নেই যেন। প্রথম চেষ্টায়ই পুরস্কারও পেয়েছে বটে। কিন্তু এও বুঝেছে লিখে খাওয়ার চেষ্টা কি ভয়ঙ্কর, তাতে কাউকে খাওয়াবার কথা মনে থাকে না। নিজের খাওয়ার কথাও মনে থাকে না, সমস্ত পৃথিবীটাই যেন সরে যায়, মানুষ তার সহজ জীবন আর ফিরে পায় না। স্ত্রীর কাছে কোনো চিঠিতেই সুবোধ নিজের জীবনের নিকটতম জিনিসগুলোর কথা জানাতে যেত না।

স্ত্রী ও বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে জীবনের অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাও অনেকের কাছে চমকপ্রদ হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু জীবনের বাস্তবিক ঢের চমকপ্রদ অদ্ভুত মধুর জিনিসও বন্ধুদের কাছে, স্ত্রীর কাছে চেপে গিয়েছে সুবোধ। এক সময় সে খুব প্রগল্‌ভ ও বিহ্বল ছিল, কিন্তু তার পরের এক সময়ে আমাদের জীবনে সংহতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বুঝেছে সুবোধ।

গল্পগুলো ছাপানো হয়ে গেছে। একখানা নভেলও ছাপা হতে চলল। মালতীকে এইসব খবব দিযে সুবোধের নিকটতম ও প্রয়োজনীয় জীবন একতিলও কোনোদিকে অগ্রসর হত না, বরং একটা বিশ্রী বিহ্বলতায় [...] তাকে একটু লজ্জিত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে হত।

[....] আজকাল আব ভালবাসে না। সে সবের ঢের হয়ে গেছে, জীবন এখন নিষ্কম্পও। মালতীর ভিতরেও কোনো [....] নেই, এটা খুব ভাল। সুবোধের খুব মনে ধরে। শুধু স্টেজ সম্বন্ধে এ মেয়েটি যে উদাসীন? সাহিত্য সম্বন্ধে? কালচার সম্বন্ধে এর কি মানে সুবোধ তা বুঝে উঠতে পারে না। কোনো একটা জিনিস মালতীর জীবনকে আচ্ছন্ন করে নেই। না প্রেম, না গৃহস্থালি অবদি। কী নিযে তাহলে সে বেঁচে রয়েছে? সে কি বেঁচে থাকতে চায না? কিংবা অত্যন্ত নিচুদরের জীবন তার? সুবোধ ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পাবছে না। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তাব খুব কম। শুধু টাকার হিসাব নিযে, চাযেব পেযালার মাধুর্যে ও নিষ্ফলতা নিযে। খানিকটা মাংস নিযে, আবার সেই টাকাব হিসেব নিযে। সুবোধ মাঝে মাঝে তার লেখা দেখিযেছে মালতীকে। মেযেটি কোনো কৌতূহল বোধ করে নি, বলেছে সে আর কোনো উচ্চাশা পোষণ করে না। জীবন এখন একটা মোড়ে দাঁড়িযেছে। এখন শেষ পছন্দের সময। সে দরিদ্রতার পথই নিল। সে লিখবে শুধু, শুধু লিখবে। জীবনেব শেষ দিন অবদি, মালতী সুবোধেব এ সংকল্প বিশ্বাস করে নি, এ প্রতজ্ঞা তার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে।

সুবোধের কত কী জিনিস যে পাণ্ডুলিপিবদ্ধ নেই আব, ছাপা হয়ে গেছে, ছাপা হতে যাচ্ছে, সে গতির খবর মালতী কিছুই জানে না। শুধু কি তাই? সে হযত এ গতিকে ঠেকিযে দেবে। রমাসুন্দরীও তাই কববেন।

বনের চিতাকে এবা সার্কাসেব চিতা হতে বলবে না কি? বলবে না কি প্রাইভেট মাস্টাব খুঁজতে, গার্ডিযান টিচারি বেছে নিতে, টিচাবিতে লেগে যেতে, লাইফ ইনসিওবেন্স, মনোযোগ দিয়ে লাইফ ইনসিওরেন্সের কেস ক্যানভাস করে বেড়াতে? বলবে বই কি, কেন বলবে না? চাযের পাতা যে এত বিশ্রী হযে গেছে, খববেব কাগজ উঠে গেছে, মালতীও যে চৈত্র মাসের ভযে ভীত এসব অনেক দূর পর্যন্ত সুবোধের এই কঠিন অপ্রয়োজনের জন্য নয কি? এদেব এই আকুতিব মাঝখানে বসে কি লিখবে সে, কী করে লিখবে? কলকাতায় পালিয়ে গিযেও, কিন্তু কলকাতার থেকেই ত সে পালিযে অবসন্ন হযে এসেছিল। মালতী বমাসুন্দরী বাবা কাকাদেব সবুজ নীল গহনতার ভিতর, ধান এখন নেই, কিন্তু মধুকুপী পরখুপি কামসোনা রয়েছে, কাম এখনো ফুরাযনি, বাবলা বিচি ধুন্দল ও তেলাকুচোর পাড় বাতাসে ফাঁক হযে যায়। জোনাকিতে ভরে উঠে, উঠত ত, এই চৈত্রে, উঠত না কি? আবাব সে দেখবে না কি? লেখাকেও সে ভুলবে, তেলাকুচোব নিবিড় পাতার ভিতর চৈত্রেব সন্ধ্যায মখমলের মত নরম জোনাকি হবে সে এক, হৃদয়ে তার মাখমের ঘ্রাণ। সারাদিনের রোদপোড়ানির পর অন্ধাকর রাতে পৃথিবী তার কাছে মস্তবড় একটা তরমুজের ঠাণ্ডা মাংসের মত, বসের মত। দেশেব পথে এক জোনাকি হতে এসেছে সে।

মালতী বললে, 'আর সব না হয নমো নমো করে চলবে কিন্তু খাজনার পঞ্চাশটা টাকা কে দেবে?'

সুবোধ কিছু বলল না।

মালতী বললে, 'তোমাব হাতে কি কিছুই নেই?'

—'না।'

—'তাহলে কী করে হবে?'

—'কাকারা কেউ কিছু পাঠালেন না?'

—'না।' একটু হেসে মালতী বললে, 'আমাদের ওপর তাঁরা রাগ করেছেন।'

—'কেন?

—'হয়ত চৈত্রমাসে কিছু দেবার মতলব নেই, এই জন্য বৈশাখেও রাগ থাকবে না আশা করি।' মালতী বললে, 'কিন্তু বাড়ির খাজনার দায়িত্ব ত সবাকার, যেখানেই যত বাংলো থাকুক না কেন, এ বাড়ির দাবি ছাড়তে ওরা কেউ রাজি নয়, জানো?'

সুবোধ জানত।

মালতী বললে, 'দেখো, এই পঞ্চাশটা টাকা বাবা কোত্থেকে পাবেন? আমরা ভেবেছিলাম কলকাতার থেকে তুমি কিছু হাতে নিয়ে আসবে।'

সুবোধ জানে বাবাকে কোনোরকম করে চালিয়ে দিতে হবে, চিরদিনই ত তিনি চালিয়ে এসেছেন, সামান্য কটি টাকার রোজগার নিয়ে এই বাড়টাকে অনেক দিন থেকে এই মানুষটি আগলে আসছে। জীবনে তাই তাঁর খাটতে হল ঢের, ঢের। এবং নিরবচ্ছিন্ন, অনেক বাজে খাটতে হল। জীবন ভুষির মত হয়ে গেল লোকটার, এক বস্তা ভুষি, ভুষি ভুষি ভুষি। বাবার শক্তি সুবোধের চেয়ে কম ছিল না হয়ত, সে শক্তির পরিচয় সুবোধ অনেক পেয়েছে, কিন্তু শক্তির মর্যাদাবোধ কম ছিল নিশ্চয়ই, কিংবা মর্যাদার মানে আলাদা ছিল, একটা বাড়ি আগলে রাখা, একটা পরিবারের গাধার গড্ডলিকা তাড়িয়ে নেয়া আধ শতাব্দী ধরে এবং এমনি সব স্থিরতা, ধৈর্য ও বিশ্বাসের কাজ। মন্দ কি? কিন্তু আর্টিস্টের কাছে এসব ভুষি শুধু। সুবোধ তার জীবনকে এমন অপচয়ের ভিতর হারিয়ে দেবে কি?

মালতী বললে, 'দেখো চাল কেমন ইঁদুরে কেটে ফেলেছে, ভাগ্যিস এ দুমাস জল হয় নি, ঝড় বাদলা হলে কী যে হত! কিন্তু এসব সারাবার সংস্থান বাবার কবে যে হবে বুঝতে পারি না।'

সুবোধ চালের বড় বড় ছ্যাঁদাগুলোর পিছনে নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বেশ ফরশা বাতাস ভরা রাত, থাক না, এ যেন এমনি আরো তিন-চার মাস না পড়ে থাকতে পারে, এখন ত মোটে চত্তির।'

মেজকাকা দেখে গিয়েছেন এইসব, তবুও কিছু সাহায্য করলেন না। সুবোধ বললে, 'সাহায্য যখন করলে না তখন বড়াইও করতে পারবেন না কারু কাছে, ওদের সাহায্য মানে কি—ভাইকে ভাই সাহায্য করছেন না রাজা ভিখিরিকে দিচ্ছে?'

মালতী, 'বাস্তবিক আমাদের ওরা নিরন্তর ভিখিরির মত দেখে।' মালতী বললে, 'কিন্তু তাই কি দেখা উচিত? বাবা যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যান তাহঁের দুদিনের ভেতর সব পোড়োভিটে হয়ে যায় না? জঙ্গলের থেকে এ বাড়িকে উদ্ধার করে নিতে ওদের কম খরচ হবে?'

সুবোধ বলল না কিছু।

অথচ বাবা একা ত সব করেছেন, নিজের জন্য করছেন শুধু? ওদের জন্য নয়? অথচ এ ওরা বুঝতে চায় না।

সুবোধ বললে, 'থাক।'

মালতী বললে, 'উলটে আমাদের কানা—'খোঁড়াদের মত দেখে।'

সুবোধ বললে, 'থাক।'

—'ভাবে নাকি? এই জন্যই বড় দুঃখ হয়।'

সুবোধ, 'ভাবুক।'

মালতী বললে, 'কিন্তু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আরো বেশি খারাপ লাগে, দেখো আমি ত তোমাদের পরিবারে পাঁচ বছর ধরে এসেছি, এবকম নির্যাতন কোনোদিনও দেখি নি। নির্যাতনে নির্যাতনে মানষের মুখ কেমন হয়ে গেল দেখো ত।' মালতী বাবার দিকে আঙুল ফিরিয়ে দিলে।

বুড়ো ভাত খেয়ে পান মুখে দিয় উঠনে হাঁটছিল, রোদের ভিতর, বেলা একটা-দেড়টার সময়, চৈত্রের এই টাটাপোড়া রোদের মধ্যে একটা অন্ধ গুবরে পোকার মত অবিশ্রাম [....] অনুসরণ করে পিছে কাকে ঘিরে? হঠাৎ নিজের জীবনে একটা ভয়ঙ্কর গ্লানি ও ক্লেদ সুবোধকে পেয়ে বসল, আর্টিস্ট? একটা কি

বিরাট মিথ্যা বিলাপ। জীবনকে এড়াবার কি এক মর্মাহত চেষ্টা। পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয় বেদনার কাছে, জীবনের কাছে আর্ট কি ভীভৎস! কি জঘন্য কাপুরুষ! অন্তরাত্মার যন্ত্রণায় সুবোধের মাংস পর্যন্ত কুঁচকে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল।

মালতী বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

বাবা মুখ তুলে মালতী সুবোধের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'গরমে সিদ্ধ হয়ে গেলাম যে, এখন একটু ছায়ায় যাই কি বল বউমা?' তারপর একটু টেনে টেনে হাসতে লাগলেন।

বাতাবি নিমের পাতলা ছায়া পেরিয়ে মধুবাবুদের আটচালাব ছায়ায় গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। একটু অন্যমনস্কভাবে।

মালতী বললে, 'বাবা, আপনি ঘবে আসুন না। আপনাব বিছানা পেতে দিয়েছে।'

বাবা ঘরে এসেছেন।

মালতী তাকে বাতাস দিচ্ছে।

এই শান্তিটুকু বুকে করে সুবোধ পালিয়ে গেল। সটান নদীব দিকে।

ফিরে এসে শুনল খাজনা দেযা হয়ে গেছে।

—'কী করে হল?'

মালতী বললে, 'এস পি বোসের দোকান থেকে টি এম ও-তে দেড়শ টাকা পাঠিযেছে।'

—'সুরেশবাবু?'

—'হ্যাঁ। বাবার সেই ট্রানস্লেশনের বইযেব টাকা।' মালতী বললে, 'কিন্তু এটা আশা করেন নি।' মালতী বললে, 'তুমিও এরকম বইটই লেখ না কেন?'

হয়ত তাই হবে, এই রকম বই লিখে এই রকম সন্তান উৎপাদন করে, এই বকম বাড়ির সংরক্ষণের ভাব নিয়ে বমাসুন্দবী ও মালতী তাদেব সন্তানসন্ততিব আকুতি-কাকুতিব ভিতব নিজেকে হাবিয়ে ফেলে সুবোধ তেলাকুচো পাতাব নীল গুচ্ছেব পিছনে নিকষ কালো জোনাকিও হতে পাববে না। না হতে পারবে কলকাতার আর্টিস্ট। আকাশ-পাতাল এই দুটো জিনিসের ব্যবধানেব ফোকবেব ভিতর সামান্য একজন মানুষ হবে সে, কিন্তু কতদূর অসামান্যতাব প্রযোজন তাকে কেউ কি তা জানে? ইতিহাস অদ্ভুতভাবে নিজেকে তৈবি কবে, পৃথিবীকে যাবা অপচয কবে কিংবা জীবন থেকে যারা পালায তাদের বিস্তৃত বেকর্ড ইতিহাস আবো বিস্তৃততব কবে তোলো যেন কোনো পবিসবই তাদেব পক্ষে যথেষ্ট নয। মিউজিযমেব থেকে নতুন তথ্য বেবয, গভর্নমেন্ট অফিস-লাইব্রেবি ও সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব জাযগার থেকে নিরবচ্ছিন্ন দলিল বেরয, এদেবই জন্য। কিন্তু জীবনকে যাবা দিনেব পব দিন বক্ষা করছে, একটা জীবনকে পাঁচটা জীবনকে, কোনো নটবাজনিক তাণ্ডবে নয, সামর্থ্যেব দারুণ ঘূর্ণি লাম্পট্যেও নয।

জ্যোৎস্নার মৌমাছিদেব মধু ও মোমেব নবম লালসা ও অসমতায আতিশয্যেও নয, কিন্তু বিবাহ কববাব, সন্তান জন্ম দেবার, শিশুদের মানুষ কববাব পবিবাবেব ভিতর একটা সুপ্তির শান্তি রাখবাব কঠিন জন-অপ্রিয প্রযাসেব দুবন্ত দুর্গমতাব ভিতব দিযে জীবন যাদেব থেকে গেল তাবা কত বড়, তারা কত বড়!

সারারাত ধরে সুবোধ ভাবছিল এই উপেক্ষিত অপুবস্কৃত জীবনেব মর্যাদাকে ধববার সাহস তার থাকবে কি? এ বড় কঠিন।

সকালবেলা বাবার একখানা জীবনী সুবোধ লিখতে লাগল। পৃথিবী যে মানুষগুলোকে অবহেলা কবে তাদের উচিত দাবি যতদূর পাবে সে খানিকটা মেটাবে। পৃথিবীকে শেখাতে যাবার কোনো মানে নেই। পৃথিবী কোনোদিন শেখে না। উপেক্ষিতদেবও পুরস্কৃত করবার কোনো মানে নেই। হযত তারা মনে করে না, অন্তত সুবোধের মতন এমন তীব্র ভাবে, যে তাবা উপেক্ষিত। নিজেদেব জোর জয় উৎকৃষ্টতা হযত তারা সকলেই জানে। হযত অন্য কোথাও পুরস্কারেব জন্য অপেক্ষা করে। এই পৃথিবীতেও ইতিহাসকে হয়ত তারা অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু খানিক লিখে থামিয়ে রাখল সে। বাবার জীবনী লিখে যাওয়ার মত জীবন ধরা যায না, তার চেয়ে সে টিচারি প্রাইভেট চিটারি খুঁজুক। লিখতে যদি চায স্কুলের কোনো ম্যানুযাল লিখুক।

মালতীকে বললে, 'সুরেশবাবুকে চিঠি লেখা যাক।'

মালতী বললে, 'ধন্যবাদ জানিযে?'

সুবোধ বললে, 'না, তা নয়, আমি ভাবছি একটা ম্যানুয়াল লিখব? মালতী অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠে বললে, 'বেশ ত, তুমি লিখতে আরম্ভ কর, আমিও তোমায় সাহায্য করতে পারব।'

মালতীর চোখ এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, এমন বিস্ফারিত।

সুবোধ বললে, 'সাহায্য? কী সাহায্য করবে?'

—'বাঃ, বাবাকেও আমি সাহায্য করি নি বুঝি! কত হাজার হাজার পৃষ্ঠা কপি করে দিয়েছি, তারপর সেগুলো প্রেসে পাঠিয়েছেন তিনি।'

—'কপি, ওঃ'—একটু ভেবে বললে, 'আমার হাতের লেখা বড্ড বিশ্রী, তাছাড়া লিখে ঢের কাটি আমি।' পরে বললে, 'তা সাহায্য, সাহায্য কম নয় আমার কাটাকুটি লেখার আবর্জনা ওদের কাছে পাঠালে হয়ত দেখেই একটা যাচ্ছেতাই ধারণা হয়ে যেত।'

মালতী বাধা দিয়ে বললে, 'সে ভয় নেই।'

—'তা নেই, তোমার ফাইন লেডি হ্যান্ড যে দেখবে তার চোখই জুড়াবে।' একটু থেমে বললে, 'কিন্তু আমি যখন গল্প লিখতাম তোমার এই হাতের লেখার ঐশ্বর্যের কথা পাড় নি কেন মালতী? কোনো সাহিত্যের কথাও এক মুহূর্তের জন্য বলতে আস নি।'

মালতী এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। প্রযোজন মনে করল না সে। সুবোধকে বলল আজই যেন সে সুরেশবাবুকে চিঠি লিখে দেয়। এবং কীরকম ধরনের ম্যানুয়েল লিখবে, কীসে বেশি টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা সবই ঠিকটাক করে ফেলে যেন।

সুবোধের বাকি জীবন এইবার থেকে শুরু হল। ক্রমে ক্রমে সে তার বাবার মত হতে পারে। তা পরাজয় নয়, আহুতিও মোটেই নয়। অলসতার চেয়ে তা ঢের দূরে, নরম পাপ ও লালসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মাৎসর্যের লাম্পট্য ও নটরাজনিক তাণ্ডবের স্থূলতা অশ্লীলতা তার ভেতর নেই। এ জীবনে জোর জয় ও উৎকৃষ্টতা অন্য কোথাও পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করে, কিংবা পুরস্কারকে নিতান্ত হীন মনে করে। পৃথিবী ও ইতিহাসকে নিতান্ত হেয় মনে করে। বিপথের নিরবচ্ছিন্ন যোগকে অক্ষুণ্ন রাখবার, সন্তান জন্ম দেবার, শিশুকে মানুষ করবার, পরিবারের ভিতর একটা সুস্থির শান্তি রাখবার কঠিন জন-অপ্রিয় প্রযাসের অক্লান্ত অসম সাহস ও সহিষ্ণুতার ভেতর দিয়ে জীবন যাদের পেকে যায় নিষ্ফলতাব ওপরে যোজন যোজনান্ত থেকে আকাশের নক্ষত্রের মত উপরে তাবা, আকাশের নক্ষত্রের মত অজস্র তারা। জীর্ণ ধূসব ইতিহাসকে ঠাট্টা করবার মত অবসরও তাদের নেই।

প্রণয় প্রেমের ভার

তিন বছর ধরে বিয়ে হয়েছে-কিন্তু এর মধ্যেই যেন সব ঢের পুরনো হয়ে গেছে।

বিয়ের দু-তিন দিন পরেই সুবোধের মনে পড়ে-কী যেন একটা

কি সামান্য শখের কথা পাড়তেই হেমলতা বলেছিল,'আমাদের কি আর সেই বয়স আছে!'

সুবোধ এক-আধ মিনিট থ হয়ে চুপ কবে ছিল। তারপর বলেছিল 'কেন, আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম নাকি—'

—'তা না ত কী!'

সুবোধ বলেছিল, 'বুড়ো হয়েছি কোন হিসেবে শুনি?'

হেমলতা কোনো জবাব দেয নি।

সুবোধ বলেছিল, 'তোমার বয়েস ও মোটে সতেব। এতেই কি মানুষ বুড়ো হয?'

কিন্তু তবুও হেমলতা কোনো উত্তব দেয় নি।

সুবোধ তখন নিজের বয়সেব কথা পেড়ে বলেছিল, 'ত্রিশ, এটা কি-আব এমন একটা বয়েস?'

স্বামীর বযসের কথা শুনে হেমলতার বিরস মুখ যেন আরো কঠিন হয়ে উঠল। এ মেয়েটির ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষাব জগৎ থেকে সুবোধকে আরো অনেকখানি বিচ্ছিন্ন করে দিল সে।

—'আমি ত দোজবর নই। এই প্রথমই ত বিয়ে কবেছি। যারা জানে না তারা আমাকে দেখে বলে যে বযস চব্বিশ-পঁচিশের বেশি না...বুড়োর বুড়ো হয় মানুষ ষাট-সত্তর বছবে। সে ঢের দেবি আছে হেমলতা-আমাদেব বুড়ো হতে—'

হেমলতাব হাত নিজেব হাতেব ভেতব আনল সুবোধ; কিন্তু তুবও তেমন কোনো তীব্র প্রত্যুত্তব নেই এই মেযেটিব ভিতব। সে নিজেকে বিবাহিত স্ত্রী মনে কবলে, কর্তব্যবোধেবও পবিচয দিলে-কিন্তু তুবও যৌবনের সাধ-উল্লাস তার ভিতরে যেন কিছু নেই। কেন নেই? এ-বকম?

জীবনে সুবোধ অনেক ঘা খেযেছে বটে-অনেক ঠকেছে-অনেক কষ্ট পেযেছে-বুঝেছে জীবনেব প্রযোজনেব সে একটি তুচ্ছ সামান্য ক্রীড়নক মাত্র-কোথাও যেন তার প্রতি জ্ঞান নেই-সকলেই যেন তাকে পিষে চলেছে। কিন্তু তবুও মনের আশা, স্বপ্নের ঘোব কেটে যান নি ত তাব। কে জানে জীবন তাকে ঢেব বিমর্ষতার ভিতব ঠেলেছে কিন্তু তবুও মনেব ভিতর কেমন একটা লাবণ্য রযেছে যেন! পৃথিবীব দিকে তাকিযে নরনাবীর খেলা কৌতুকেব ভিতব এ জিনিসটা মাঝে-মাঝে তৃপ্তি খোঁজে; নবপবিণীতা বধূকে ত সে আগ্রহেব সঙ্গেই গ্রহণ কববে।

. কিন্তু এ-মেয়েটিকে দিয়ে কিছুতেই সে-রাতেব সে-শখ মেটানো হল না। সেই রাতেই উচ্ছ্বাস একটু জমাতে দিলে না হেমলতা। পদে পদে সে বাধা দিল।

সুবোধ ক্ষুব্ধ হযে বলেছিল, 'কেন, এ-বকম কবছ?'

হেমলতা বলেছিল, 'তুমি এত বড় হযেছে অথচ তোমাব কোনো বোধ নেই যে, এ-বযসে এ-বকম সব ছেলেমি করবার সময কি আব আমাদের আছে?'

সুবোধ অনেকক্ষণ চুপ করে রযে ছিল।

তাবপব বলেছিল, 'ছেলেমি বলছ, আচ্ছা ছেলেমি তুমি কোনোদিন কি কব নি জীবনে?'

—'কবেছি বই কি-কিন্তু সে-সব বিয়ের আগে!'

—'কাদের সঙ্গে?'

—'ছোট-ছোট ছেলেমেযেদের সঙ্গে-আমাব মত বযস যাদের; তখন আমাব বযস ত এত হয নি।'

—'কত হযেছিল?'

হেমলতা বলেছিল, 'তা আবার শুনতে চাও নাকি? জানো না বুঝি ছেলেমেয়েদের খেলাধূলো ফুর্তি কোন বয়স অবধি চলতে পারে?'

এ—মেযেটিব ধাবণাব অনুপাত সুবোধ একটা বযস আন্দাজ কবে নিলে; হযত বাব কিংবা তেব-কিংবা আবো কম। সেই অবদি এব হাসিতামাশা ফুর্তিব বযস গিযেছে। তাবপব থেকেই-হযত নিজেব মনেব দাযিত্ববোধে কিংবা অন্য কোনো কাবণে এব কর্তব্যেব জীবন আবম্ভ হল। সতেব বছবে এ মেযেটি প্রবীণ, বিবাহিতা, অবগুণ্ঠিতা, দাযিত্ববোধসম্পন্না, কর্তব্যভাবাক্রান্তা, বিরূপা, বিবসনযনা, ছেলেমিব সময এব জীবনে আব নেই।

তাবপব আবো তিন বছর চলে গেল। হেমলতা এখন ঢেব বুড়ো। সুবোধেব হৃদযেও ছেলেমানুষি ঢেব কম; কিন্তু তবুও সমস্ত দিনেব ভিতব হযত অন্ধকাব বাতে হেমলতাব সান্নিধ্যে এক-আধবাব যদিও তা উদ্বেলিত হযে ওঠে এই মেযেটি তৎক্ষণাৎ তা নিবোধ কবে ফেলে।

সমস্ত দিনটা ছুটি ছিল।

হেমলতাব ভযে সুবোধ অনেক কিছুই কবতে পাবে না। খাওযা-দাওযাব পব জানলাব পাশে একটা ইজিচেযাবে বসে একদনি যে সে ভালবেসেছিল সেই কথা ভাবতেছিল সুবোধ। কাকে ভালবেসেছিল'

জীবনে বেশি কাউকে ভালবাসাব সুযোগ পায নি সে। তবুও বিযেব আগে কোন একটি মেযেব সঙ্গে মনটা ঈষৎ গাঢ় হযে উঠেছিল যেন তাব সেই কি প্রণয?

সুবোধ ঠিক বলতে পাবে না তা প্রণয কিনা। কিন্তু এটা ঠিক, সেই মেযেটিকে খুব ভাল লেগেছিল সুবোধেব। তাকে ভালবাসতে গিযে জীবনটা এক-আধ বছবেব জন্য বেশ জমে উঠেছিল যেন। অবশ্যি সেই মেযেটিকে হাবিযে মনেব ভিতব কোনো ক্ষোভও নেই যেন আজ সুবোধেব; আজ সে অনেক দূবে পৌঁছে গেছে-প্রায সাত-আট বছবেব অদ্ভুত অপবিহার্য পবিবর্তনেব ভিতব দিযে জীবন তাব বাস্তবিকই, বুড়ো হযে গেছে যেন।

হেমলতাব সংস্পর্শে এই স্থবিবতাটা আবো প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যেন। কিন্তু তবুও এক-একবাব সেই সাত-আট বছবেব আগেকাব কথা মনে পড়ে।

সেই মেযেটি-সেই সবোজিনী-জীবন সেখানকাব সেই খুঁটে আটকে থাকলেই ত বেশ হত। কিন্তু একটা বছবেব পব আব-একটা বছব জীবনটাকে যেন ষাট বছব সত্তব বছবেব জবাব দিকে টেনে নিযে চলেছে' জবা যেন স্থিব-নির্নিমেষ; সে আসবেই জীবন জুড়ে একদিন স্পষ্ট হযে ফুটে বেরুবে; তাকে কেউ বোধ কবতে পাববে না। কিন্তু মাঝখান থেকে এই যৌবনেব দিনগুলোও একবাবে জবায ফোঁপবা শুধু-একেবাবে স্থবিবতায জীর্ণ। সবোজিনীব চিঠিগুলো ছোট একটা ক্যাশ বাক্সে কবে বেখে দিযেছিল, সুবোধ।

তেপযেব ওপব বাক্সটা এনে বসাল। একে-একে চিঠিগুলো পড়ছে সে।

হেমলতা বোধ হয অন্তঃপুবেব ভিতব সংসাবেব কাজে আটকা। সে খুব ভাল কবেই জানে যে সুবোধেব আজ ছুটিব দিন কিন্তু তবুও তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সাবাব প্রতি তেমন কোনো আকর্ষণ এখন যেন নেই আব।

তবুও দু'টি জীবন দু'টিকে এমন জড়িযে চলেছে কেন? জানে না সুবোধ। সে আব-একখানা চিঠি খসিযে পড়তে লাগল। কিন্তু সবোজিনী এখন অবিনাশেব স্ত্রী। চাব-পাঁচটি ছেলেমেযেব মা এই কথা ভাবতে গিযেই সুবোধ কেমন একটা মৃদু মোচড় খেযে থমকে গেল। চিঠিগুলোব ভেতব থেকে একটি নাবীব নবম স্পৃহা বড় কোমল অনুভব দিযে যে একটু মধুব জন্য সে জগৎকে তৈবি কবে তুলেছিল, তা কোথাও নেই আব। না। এবকম ভাবে নিজেকে সে আব প্রলুব্ধ কববে না। না, হয না ভালবাসা পেযে। কিন্তু ভালবাসা পেতে গিযে ভালবাসাব প্রতিধ্বনিব কাছে সে আব যাবে না।

চিঠিব বাক্সটা সবিযে বেখে দিল সুবোধ।

এ-সব আব সে খুলবে না কোনোদিন। সাত-আট বছব হল এগুলো মিথ্যা হযে গেছে। ইজিচেযাবে বসে-বসে ঘুমনো যায বটে কিন্তু ঘুম আব পায নি। সমস্ত ছুটিব দিনটা জেগে জেগে কী যে কববে? অফিস হলে এতক্ষণ ডেস্কে চলে যেত সে; অনেকখানি কলম চালানো হযে গেছে; হযত টাইপবাইটাবটা ধবেছে, উর্ধ্বশ্বাসে টাইপ কবছে-মাথাব পবে বনবন কবে ফ্যানটা ঘুবছে; জীবন কী দ্রুত-ফ্যানে ফ্যানে টাইপবাইটাবে নিজেব মনেব ব্যস্ততাব·উৎকর্ষ সাধনাব ভিতবে। সেখানে কি অন্য কথা ভাববাব সময আছে।

জীবনেব একঘেযেমি ও নিষ্ফলতাব থেকে এই অফিসটা কী মর্মান্তিক ভাবেই না তাকে বক্ষা কবেছে' মনে-মনে অফিসটাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে সুবোধ। অবসবেব মুহূর্ত সে তাব গভীব ব্যাধি কাটাতে পাবে না-এই জানালাব ফাঁক দিযে বাইবেব হিজিবিজি তাবগুলোব দিকে তাকাল সুবোধ-ট্রামেব তাব, টেলিগ্রাফেব তাব, কত কিছুব। ছুটিব দিনে পথে লোকজন ঢেব কম। ট্রামবাসও যেন ঢেব দেবি কবে আসছে-সমস্ত শহবটা অবসব নিচ্ছে। অনেক কথা লিখতে ইচ্ছা কবে বটে তাব-নিজেব জীবনেব গোপন নির্জন কথাগুলো তাব চিঠিব মতন কবে। কিন্তু সে-সব চিঠি কাকে সে পাঠাবে? তাব কেউ নেই।

সুবোধ ভাবছিল যাবা লেখে তাবা নিজেব মনেব খুশিতেই লেখে-কাউকে দেখবাব জন্যে নয। কিন্তু লিখে সে তৃপ্তি পায না, কথা গোছাতে কষ্ট হয। যে লেখা হৃদযটাকে পবিতৃপ্তিতে ভবে দেয তা তাব সাধ্যাযত্ত নয।

অনেকবাব কলম তুলে ধবে এসব বুঝেছে।

কলম তাকে ফেলে বেখে দিতে হযেছে।

হেমলতা এসেছে।

সুবোধ জানলাব ফাঁক দিযে কাদেব একটা একতলা বাড়িব ছাদে ছোটছোট ছেলেমেযেদেব খেলা দেখছিল, স্ত্রী হেমলতা আসছে তবুও তাব দৃষ্টি ফিবল না। ওদেব এই খেলাটাই তাব কাছে ঢেব ভাল লাগছে যেন।

হেমলতাও সুবোধেব দিকে ফিবে তাকায নি। স্নান খাওযা-দাওযা শেষ হযে গেছে তাব, গাল ভবে পানও বযেছে, কিন্তু মাথাব চুলগুলো বিস্রস্ত জলেতেলে ছবছব কবছে। হেমলতা একটা শুকনো গামছা দিযে চুলগুলো পাঁচ মিনিট বসে ঝাড়ল-নিঃশব্দে। তাবপব সমস্ত গামছাটা ভাল কবে মাথায মুড়ে নিযে দু হাত দিযে চেপে ঘুবিযে-ঘুবিযে শেষ জলটুকু নিংড়ে ফেলল। এইসব নীবব প্রসাধনেব ভিতব মনটা তাব প্রসাধনেব দিকেই হযত, কিংবা অন্য কোনো দিকে; কিন্তু ফাঁক কবে স্বামীব সঙ্গে একটা আধটা কথা বলবাব অবসব খুঁজে পেলে না সে। কী কথা বলবে সে? খাওযা-দাওযাব পব খববেব কাগজ কোলে নিযে ইজিচেযাবে স্বামী ত বেশ ফর্মেই বযেছে; কোনো একটি বিচ্যুতি যদি দেখত একটা সিগাবেট বা চুরুট, একটা নস্যিব কৌটা, কিংবা হো হো কবে খানিকটা হাসি-একটা গ্রামোফোনেব ভঙুল বা কতকগুলো ইযাব বা এবাড়িব ওবাড়িব অফিসবাবুদেব মত বউকে নিযে অপ্রাসঙ্গিক উচ্ছ্বাস তাহলে হেমলতা মাস্টাবমশাযেব চেযেও ঢেব সেযানা কথা বলতে পাবত।

কিন্তু এ স্বামীটি ভালই, একে নিযে সে-সবেব কোনো প্রযোজন হয না। স্বামীকে দু-চাবদিন নেড়েচেড়েই হেমলতা বুঝেছে যে এ ঢেব বিশ্বাসযোগ্য। বই, কাগজ, অফিস ও নিজেব অবশ্য কর্তব্য নিযেই সে থাকে; বিশেষ কোনো তবলতা ফাজলামি এ-মানুষটিব ভিতব নেই। মাঝে-মাঝে একটা জানোযাবেব মত দুর্দমনীয হযে ওঠে যেন-কিন্তু সে খুব ক্বচিৎ।

হেমলতা চিরুনি নিযে আবশিব কাছে দাঁড়াল। মিনিট দশেক ধবে চুল আঁচড়ে খোঁপা বাঁধল সে। তাবপব বিছানায গিযে শুল।

সুবোধ তাকিযে দেখল হেমলতা ঘুমিযেছে। কযেকদিন আগে কতকগুলো ইংবেজি বই কিনে এনেছিল সুবোধ, সে সবেব ভিতব থেকেই একখানা বই খসিযে নিল সে। পড়তে শুরু কবেই-ভালবাসাব কথা। ভালবাসাব গল্প ওদেব জমল একটা হোটেলেব ভিতব-ভিযেনায। মেযেটিব বযস উনচল্লিশ-ইংবেজ সে, ছেলেটিব বযেস-সাতচল্লিশ-জার্মান।

এই সামান্য শুরুটুকু। দু-চাবটা ভালবাসাব কথাবার্তায এসে পৌঁছেছে সুবোধ। মেযেটি নাকি উনচল্লিশ বছবে এই প্রথম প্রেমিককে খুঁজে পেল। ছেলেটিও নাকি সাতচল্লিশ বছবে এই প্রথম প্রেমাস্পদকে পেযেছে-গল্পেব এই সামান্য আবম্ভেই সুবোধ একটা খোঁচা খেযে বইটা বন্ধ কবল। সাতচল্লিশ বছবেও প্রেম আবম্ভ হয-প্রথম আবম্ভ? উনচল্লিশ বছবেব মেযেকে নিযে জীবনেব মধু জমে ওঠে।

তা ওঠে বটে; এই ত উঠেছে। জার্মান পুরুষেব কথাগুলো এমন আন্তবিক আব ইংবেজ মেযেমানুষটিব প্রত্যুত্তব এক আগ্রহ উচ্ছ্বাসে ভবা-যৌবনেব মধু এদেব মনেব থেকে এখনো ফুবয নি। এদেব সবস অকুতোভয প্রেমেব সুব যেন বহুদূব থেকে সুবোধেব কানে এসে বাজছে।

একটা সামান্য বই নয়; একজন মস্ত বড় গ্রন্থাকারের লেখা বই। বইটা আবার খুলল সুবোধ।

কিন্তু তখুনি আবার বুজিয়ে রেখে দিল–বুকের ওপর। চোখ বুজল সে।

জীবনে সুবোধ ভালবাসা কি আর পাবে না? সবই কি ফুরিয়ে গেছে তার? সরোজিনী তাকে ভালবেসে ছিল একবার। কিন্তু পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ের অহোরাত্র তাণ্ডবের ভিতর দিনান্তেও বোধহয় সুবোধের কথা একবার মনে পড়ে না তার। পড়ে কি? পড়লেই–বা কী হবে? সরোজিনীর জন্য সুবোধের মনে কোনো আবেগ নেই আজ আর। মেয়েটির কথা এমন শান্ত.শীতলভাবে ভাবা যায। এই সরোজিনী বেঁচে থেকে এই পৃথিবীকে কি আরো বেশি সবুজ করেছে, আকাশকে আরো বেশি নীল? তা করে নি। এই পৃথিবীর থেকে সে চলে গেলেও আকাশ যেন বিবর্ণতর হবে না। এ ভালবাসা নয।

বাস্তবিক জীবনে কোনো ভালবাসা নেই। নেই–হবে না কোনোদিন। পরের ভালবাসার গল্প শুধু আঘাত দিতে আসে; জীবনের নিষ্ফলতাকে পর্যাযে–পর্যাযে সাজিযে তোলে। তবুও বিয়ের পর ঢের ভালবাসার গল্প পড়েছে সুবোধ–কিন্তু আজ ঘুমন্ত হেমলতার ভাবহীন, প্রেমহীন, অনুভূতিহীন মুখের দিকে তাকিযে প্রেমের গল্প কী করে পড়বে সে?

বইটা সে বুকের ওপরও রাখতে পারছে না যেন আর। এই বিপুল প্রণয প্রেমের ভাব তাব অতলস্পর্শী প্রণয়হীন জীবনকে এমন টিটকারি দিচ্ছে।

সমস্ত চোখ মুখ কুণ্ঠিত হয়ে উঠল সুবোধের।

বইটা তাকের ওপর রেখে দিল সে।

না, প্রেমের বই কোনাদিন কিনবে না সে আর। মনে কববে পৃথিবীতে কত লোক আছে–কত কোটি–কোটি লোক যারা প্রেমমুখী নয, তবুও ঢেব সার্থক ও তৃপ্ত, সেই সার্থকতা নিযে সেও শান্তিতে চলতে পারবে–কেন পারবে না?

পাশের ভাড়াটাদের টাঙানো চিকের আড়াল থেকে একটি খোকা বেরিযে এল।

সুবোধের কাছে এসে ঘুমন্ত হেমলতার দিকে একবাব তাকিযে বললে, 'এই নিন হেম মাসিমা চেযেছিলেন।'

—'আচ্ছা বেশ।'

খোকা চলে গেল।

একটা বাংলা মাসিক। কোনো মাসিক রাখে না সুবোধ। সাহিত্যেব খবর সে এত কম জানে। যেটুকু জানে তাও বিদেশী লেখকদেব কথা। এ মাসিকখানা এদেশের মানদণ্ড অনুসাবে উঁচুদবের নাকি।

খুলল সুবোধ।

একটা গল্প নজরে পড়ে গেল। মন আজ ছোটছেলের মত গল্প চায শুধু–গল্পটা পড়তে শুরু করে দিল সুবোধ। এখানেও কী এক ভালবাসার কথা, গল্পটার গোড়াতেই প্রেম; খটকা বাধিযে দিল কি যে এখানে ভালবাসাটা স্বামী–স্ত্রীর। স্বামী বি–এ ক্লাসে থার্ড ইযারে পড়ে, স্ত্রীটি পনেব বছরেব কিশোরী, দেখতে নাকি অনিন্দ্যা, খুব গভীর প্রেমমমতামযী নাকি। ছেলেটি কলেজের লম্বা ছুটিতে বাড়িতে এসে প্রথম রাতেই জ্যোৎস্না–মাখা শয্যায স্ত্রীর সঙ্গে যে কত কি আবেগের বিরাট বিচিত্র হাট পেতে বসেছে সে সব অসহ্য রোমহর্ষ উগ্রমদের মত মনে হল যেন সুবোধের। জীবনে এক গ্লাস জলও পায নি সে।

কিন্তু এই ছেলেটি উনিশ বছর বয়সেই জীবনের নানারকম স্নিগ্ধ ও নিষিদ্ধ মদ নিযে কী নিববচ্ছিন্ন ভাবেই না খেলাছড়া করছে। জার্মান বইখানা মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে খোঁচা দিচ্ছিল। কিন্তু এ–বইখানা যেন জীবনেব শান্তি ও বিরতির স্নিগ্ধ পদ্মবনের ওপর হাতি চালিযে দিল।

কিন্তু এই হাতিই সত্য, তার পদ্মবন মিথ্যা; এখানে এই গল্পের ভিতর–এই হাতি কেমন খানিকটা মদকলমত্ত; কিন্তু তবুও নিজের প্রেম ঐশ্বর্যহীন জীবনের কাছে, এই মদকল, মদকলউন্মত্ততাও, কী অপরূপ–জ্যোৎস্না মেঘ বিলাসী ঐরাবতের মত যেন। যেন এ হাতির পাযেব নীচে তার সমস্ত হীন পরিতৃপ্ত জীবন একটা ব্যাঙের মত কুৎসিত নিস্তেজ হয়ে আসে।

গল্পটাকে নিযে সে দেড় পাতার বেশি এগতে পাল না। পত্রিকাটা বন্ধ করে সরিযে বেখে দিল।

সুবোধের প্রেমঐশ্বর্যহীন জীবন নিষ্ফল হয়ে আসে।

সুবোধ চেয়ারটা রাস্তার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিল। সোজাসুজি দক্ষিণ দিকের জানালা দিযে পাশের বাড়িটা চোখে এসে পড়ে। পাশের বাড়ির দিকে তাকাবার কোনো মতলব ছিল না সুবোধের। নিজের

জীবনের কথা ভাবছিল শুধু সে-যা নিয়ে কোনো প্রেমের গল্প তৈরি করতে পারা যায় না। পৃথিবীর প্রেমের গল্পগুলোর কথা ভাবছিল-সে সব এমন ইন্দ্রিয়াতীত অলৌকিক দেশের বলে মনে হয় আমাদের রক্তমাংসের জগতের থেকে যেন ঢের দূরে-তবুও নাকি রক্তমাংসেই পৃথিবীর সঙ্গেই অত্যন্ত সাধারণ সুলভ হয় মিশে রয়েছে।

গল্প তাই ভালবাসার গল্প শুধু। এগুলো যারা লিখেছে কী করবে তারা? প্রেমকে ত তারা বাদ দিতে পারে না; রচনার ভিতর জীবনকে ত প্রতিফলিত করতে হবে। কিন্তু জীবন যে প্রেমময়; প্রণয়ের গল্পের মত প্রণয় ত যেন ঘাসপাতালতার মত সুলভ।

পাশের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে জার্ডিন লিকনারের কেরানি বুড়ো শঙ্করবাবুকে দেখা যাচ্ছে, তার তৃতীয় পক্ষর স্ত্রী, তামাক সেজে দিয়ে বুড়োর কোলের পাশে গিয়ে বসল-যেন গৌরী মহাদেবকে অধিকার করে বসেছে। অনেকক্ষণ ধরে তামাক খাওয়া-বিশস্ত্র আলাপ ও পরস্পরের গায়ে ঈষৎ অশ্লীল কামনাজাত আদর। তারপর তামাক খাওয়া শেষ হল। তৃতীয়া বিছানা পাতল। সুবোধের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই শঙ্কর কটমট করে জানালা বন্ধ করে দিল-তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটি লিখখিল করে হেসে উঠল। এক শঙ্করকে মনে মনে কতদিন ধিক্কার দিয়েছে সুবোধ। কিন্তু-জীবনের তৃতীয় নারীটিকে নিয়ে শঙ্করের এই ষাট বছর বয়ক্রমের দু'টো মিনিটের সামনে সুবোধের সমস্ত জীবনের শিক্ষা অভিমান সুস্থতা সচ্চরিত্রতার কি মূল্য আছে? এটকুও কি আছে! এই শঙ্কর তার চেয়ে ঢের বেশি জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছে; জীবনের মন্ত্র সে যেন ঢের গভীরভাবে জানে; জানে নাকি? না হলে এই সুরূপা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির হৃদয়ে কী করে অমন প্রেমপ্রবণতা সে আনল; এমন আন্তরিক মাধুর্যের শান্ত কলরবহীন সংসারেই বা কী করে চলেছে তাদের?

পাঁচ মিনিট বসে তাকিয়ে-তাকিয়ে সবই ত দেখেছে সুবোধ। এরপর এমন একটা কঠিন উদাসীনতায় সুবোধের মন ভরে উঠল।

উদাসীনতা কার ওপর? কোনো মানুষের ওপর নিশ্চয়ই নয়। নিজের কর্তব্য সে অটল অচল ভাবে করে যাবে। কিন্তু নিজের বিড়ম্বিত জীবনটাকে অত দায়সারা করতে যাবে না সে আর। হোক না জীবন বিড়ম্বিত; হোক না। প্রেম নেই, নাই বা থাকল। কেউ ভালবাসল না কোনোদিন-কেউ ভালবাসবে না। নাই বা ভালবাসল। ছুটির দিনে ভালবাসা ও প্রেমসম্পদশালিনী নারীকে মহার্ঘ অতুল বলে মনে হয়েছে। জীবনে তাকে নিকটতমা করবার সাধ কতবার মনের ভিতর জাগল। আজও সে অনুপমা-দূরতমা।

কিন্তু তবুও সুবোধের মনের ভিতর সে ক্ষোভ নেই যেন আর। হেমলতার কর্তব্যকাজ করে গেলেই সংসারটা বেশ চলবে; প্রেমকে বেশ নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হয়।

বেলা পড়ে গেছে।

সুবোধ একটা হাই তুলে বললে, 'কই চা দিলে না!'

হেমলতা বললে, 'দাঁড়াও উনুনটা জ্বালিয়ে নি।'

'বেলা ত ঢের হয়েছে।'

'রাখমণি যে আসে নি, সে হিসেব আছে!'

সুবোধ একটা আরামে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে আঙুল মটকাতে মটকাতে খবরের কাগজটা ধরল।

খানিক বাদে হেমলতা এসে বললে, 'চা নেই।'

সুবোধ বললে, 'আচ্ছা, আনছি, দাঁড়াও।'

'না, তোমায় যেতে হবে না।'

'কেন?'

'তুমি ওই বিলেতি ফিলেতি কিছু একটা এনে বসবে।'

সুবোধ বললে, 'কেন? দেশী চা আমি আনি নি বুঝি?'

'ছাই এনেছ-তোমার মুখে দেশের জিনিস কিছু রুচলে ত?'

'চাটা অন্তত বিলেতি খেতে দাও আমাকে।'

সুবোধ খবরের কাগজটা নাড়তে লাগল।

হেমলতা বললে, 'এই সেদিন অবদি বিলেতি চা গিলেছ; আমি না এলে আজীবন গিলতে। কত সাধ্যসাধনা করে তবে তোমাকে ছাড়তে হয়েছে—(একটু হাঁটিয়ে উঠে) 'বাপরে, এ যেন আমার কাজ।

কোনো বিবেক বুদ্ধি নেই যেন নিজেব।'

একটু কেশে বললে, 'ইচ্ছে কবে পেটে যে চব পড়েছে তা ঢেকে দি।'

সুবোধ বললে, 'এক কাপ ভাল চা দিলেই ত সব মিটে যায়।'

হেমলতা বললে, 'তাহলে চা ছাড়ো।'

'দেশী চা ভাল হয না?'

'না।'

'কেন?'

'কেন তা ত তুমি নিজেই বোঝ, বুঝতে পাবছ এক চুমুক খেযেই কেন সবিযে বাখ? ও পাপেব জিনিস-বিদেশী জিনিস ওসব আমবা ভাল কবতে পাবি না। ওব চেযে চা ছেড়ে দাও তুমি।'

সুবোধ বললে, 'সিগাবেটও ত তুমি ছাড়ালে।'

হেমলতা জ্বলে উঠে বললে,'বটে সিগাবেট! কলকাতাব তেতলায বসে এই কথা তোমাব মুখে মানায। বেশ স্বচ্ছন্দে যা খুশি বলে যেতে পাব তুমি। গিযে দেখ ত একবাব আমাব বাপেব বাড়িতে-কেউ সিগাবেট বেব কবেছে কি সাত দিক থেকে লাঠিসোঁটাব চোটে মাথা আব আস্ত থাকবে?'

সুবোধ বললে, 'আমি চুরুট খেতে পাবি না, বড় কড়া লাগে।'

—'কিচ্ছু খেও না।'

'পান খাওযাবও ত অভ্যেস নেই আমাব।'

'সে ত ভালই।'

'কী নিযে থাকব তাহলে আমি?'

এ প্রশ্ন নিযে হেমলতা নিজেকে ব্যতিব্যস্ত কবতে গেল না। সে যেন এ শোনেই নি-শোনবাব যোগ্যও নয এমনি মূল্যহীন অবোধ শিশুব মত জিজ্ঞাসা। হেমলতা সে নিজে কী নিযে থাকে? নিজেও ত সে কোনো নেশা কবে না-এমন কি গল্পেব বই পড়বাবও কোনো বাই নেই তাব। কেউ যদি গছিযে মাসিক পত্রিকা দেয তাহলে নেড়েচেড়ে এক-আধঘন্টা দেখে সে। তাবপবেই প্রবৃত্তি তাব এসবেব থেকে অবসন্ন হযে ফিবে যায। কিন্তু তবুও জীবনকে সে এক মিনিটেব জন্যও বোঝা মনে কবে না ত। জীবন ত এমনই হবে। সকালবেলা ঘুমেব থেকে উঠে বাখমণিব সঙ্গে সংসাবেব কাজ গুছোতে-সে না এলে একাই-সকালবেলাব থেকে বাত অবদি; একদিনেব পব আব-একদিন। এমন কবে তিন বছব কেটে গেছে। তিনশ বছব কাটিযে দিতে পাবে সে। কালীচবণ দোকান থেকে চা কিনে এনে বান্নাঘবেব দিকে যাচ্ছিল।

সুবোধ ওকে ডাক দিল।

চাযেব মোড়কটা দেখল এবাব। সেই কেমন একবকম ধূলোব মত জিনিস; অনেক দিন থেকে এই খেযে আসছে সে। কিন্তু আজ যেন জিনিসটা অসাবতাব চবমে পৌঁছেছে। না সে আব খাবে না। এটাও ছেড়ে দিতে হবে।

এক সময চা তাব খুব সাধেব জিনিস ছিল বটে; কিন্তু তখন সে বিযে কবে নি। হ্যাবিসন বোডেব ওই চাবতলা বোর্ডিংটায থাকত। বোর্ডিংটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। যে-কামবায সে থাকত-সেটাব খড়খড়ি এখন রুদ্ধ। হযত বোর্ডাবটি ঘুমুচ্ছে এখনো। সুবোধও অমনি ঘুমতো-ঢেব দেবি কবে উঠত সেও। খুব দামি সিগাবেট খেত সে।

চমৎকাব না হলে চলত না তাব। তাবপদ ছিল ভাগীদাব। সেই এসে বানিযে দিত। দু'জনে মিলে তাবা কত বিলেতি চা কিনেছে, কফি কিনেছে, সিগাবেটেব নামজাদা টিনগুলোব শ্রাদ্ধ কবে ছেড়েছে। তাবপব তাবাপদ তাব নিজেব ঘবে চলে যেত।

ডেকচেযাবে একা বসে-বসে সুবোধ নাবীব স্বপ্ন দেখত-যে-নাবী এই তাবাপদব চেযে ঢেব বেশী গৃহিণী। ঢেব বেশি পবিহাসোজ্জ্বল হবে এ, ঢেব বেশি কামনাব আবাধনাব জিনিস হবে সে; তাব তুলনায কফিব কাপ বা সিগাবেটেব টিন চাযেব পেযালা কিছুই নয।

সুবোধ ফাউন্টেন পেনটা দিযে তেপযেব ওপব ঠকঠক কবতে লাগল।

কালীচবণ চা এনেছে।

সুবোধ বললে, 'তুই বানিযেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কী দিয়ে বানালি?'

'গুড় দিয়ে।'

'দুধ?'

'বাসি দুধ ছিল।'

কালীচরণ চলে গেল.।

পেয়ালাটা ঈষৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কাল রঙের তরলতার ওপর ঈষৎ সর গুঁড়ি গুঁড়ি ভাসছে; ধোঁয়া ও বাসি দুধের কেমন একটা হ্যাপসা গন্ধ।

সুবোধ ফাউনটেন পেনটা হাতের ভিতর ঘুরাতে লাগল, চায়ের পেয়ালা থেকে মন তার অনেক দূরে সরে গেছে। সুবোধ ভাবছিল সিগারেট সে আর খাবে না কোনো দিনই।

কফিও তিন-চার বছর হল ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ের পর থেকেই বিলিতি চায়ের টিন এ বাড়িতে আসে না। খুব ভালই। সাধ ও বিলাসের জিনিস আর সে পাবে না বলে আজ ভোরেও তার মনের ভেতর যেটুকু আফসোস ছিল-এখন আর ত নেই। কেন নেই জানে না সে।

চায়ের পেয়ালাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

গুড়, বাসি দুধ ও দেশী চা বলে যে দেশী জিনিস হেমলতা আজ দিল তা কোনো দেশেরই জিনিস নয। দেশী চা সুবোধ ঢের খেয়েছে-বিয়ের আগেও। তারাপদব উগ্র বিলাসিপনায অবসন্ন হয দু-চার পাউণ্ড দেশী চা কতবার সিসের মোড়কে ভরে নিয়ে এসেছে সুবোধ; তাজা দুধ দিয়ে নিজের হাতে দরদ দিয়ে বানিযেছে; পরিতৃপ্তিতে বাধে নি ত। আজও সে এই সব করতেই প্রস্তুত, হেমলতা তা দেবে না।

কেন যে দেয না বোঝে না সুবোধ। টাকাকড়িব স্বচ্ছলতা ত রয়েছেই। কিন্তু তবুও আর-সব দিককার সকল রকম বাহুল্য কমিযে এনেছে হেমলতা। ভালই। নিজে হেমলতা কষ্ট কৃচ্ছের ঘর থেকে এসেছে। জীবনেও কোনো কল্পনা বা স্বপ্ন নেই তার। শরীরের রূপ-কাঠখোট্টার মত। খুব কাজকর্মের ঝক্কি সহ্য কবতে পারে সে। ভালই-ত ভাল। কিন্তু সুবোধকেও কি এই রকম হতে হবে? কোনো বাহুল্যই থাকবে না? মনের ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস অনেক আগেই দমে গেছে; কিন্তু বাইরেও কি একটুও ফেলাছড়া থাকবে না? চাযের সঙ্গে একটা টোস্টও এল না-ডিম ত অনেক আগেই বিদায নিযেছে। সুবোধের মনটা অনেকক্ষণ খিঁচড়ে বইল। নিজের জীবন যেন তার প্রেমহীন হযে গেছে, নইলে ডিম টোস্টও বিশ্রী। তারপব মনে হল-বাঃ তার কথাই সে ভাবছে কেন ঘুরে ফিরে; স্ত্রীব প্রতি এ-রকম বিরক্তিই-বা জমে উঠছে কী করে? হেমলতাকে ভালবেসে ত সে সব ক্ষমা করে নিতে পাবত এক সময়। সে মমতার দিনগুলো কোথায গেল।

অফিসের থেকে সুবোধ এসে বললে, 'আমাদেব একটা নেমতন্ন আছে।'

হেমলতা বললে, 'কোথায?'

'নেবুতলায অভযবাবুর বোনের বিযে, যাবে নাকি?'

হেমলতা বললে, 'চল।'

কিন্তু একটু ঘুরে ভেবে এসে বললে, 'থাক।'

'কেন?'

'আমাকে নিলে ত গাড়ি কবতে হবে?'

'মোটরেই যাব দু'জনে।'

—'ওরা মোটর পাঠিযে দেবে?'

'না, আমিই ভাড়া করব। ফিরবার সময বেশ একটু ঘুরে-বেড়িযে ফিরব; সেই যে বিযের পর থেকেই এসে হেঁসেলে ঢুকেছ বাইরের হাওযা ত একটু লাগাও না হাড়েমাংসে। চল—বেশ ভাল লাগবে।'

সুবোধ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে হেমলতার হাত ধরল।

কিন্তু স্ত্রী খুব শীতল; তার মুখের সমস্ত পরিধির ভিতর কোথাও একটু প্রসন্নতা বা কৃতজ্ঞতা নেই; কৌতূহল নেই, সাধ নেই; আরো কী নেই যেন! যে-সব জিনিস বারবার এক সুখের ভেতর থেকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছে সুবোধ নেবুতলার বিযে বাড়িতে নতুন বধূর মুখে তা দেখতে পাবে সুবোধ-কিন্তু হেমলতার মুখে তিন বছর আগে সেই বিযের রাতেও দেখে নি। বুকের ভেতর কেমন

একটা ব্যথা টনটন কবে উঠল সুবোধেব। বিয়ে বাড়িতে সে আব গেল না। যাবে কী কবে? নতুন বধূব মুখেব দিকে তাকাতে পাববে না সে। তাকালেই জীবনেব প্রথম মোহাবেশে যে প্রণযাশিখাব পবম সুন্দব প্রগাঢ় মুখখানা দেখবে সে তাব প্রতি লোভ হবে, সুবোধেব হৃদযেব ভিতব অনেক অপ্রাসঙ্গিকতা ভেসে উঠবে, নিজেব বিবাহকে অবাস্তব মনে হবে হেমলতাব প্রতি বিরূপভাব আবো বেড়ে চলবে যেন। এ-বকমই ত হযেছে, বিযেব আসবে ছ'মাস আগে ত গিযেছিল সুবোধ। বধূববকে বাসবে ঢুকতে দেখল। সকলেব সঙ্গে একপ্রাণ হযে হাসি-তামাসা কবতে পাবল না সে; এক কোণে একটু বিমর্ষ হযে দাঁড়িয়ে বইল। মনেব ভিতব কি জেগে উঠেছিল তাব? হেমলতাব জন্যে প্রেম? দাম্পত্যজীবনেব বৈচিত্র্যবহুল মাধুবী? ঢেব নিভৃত মধু? না, সুবোধেব জীবনে সে সব সত্য নয। বিবাহ তাকে নিষ্ফলতা দিযেছে শুধু।

ইজিচেযাবে অনেক বাত অবদি সে জেগে বইল।

হেমলতা একবাব দেখে গেল-কিছু বললে না।

তাবপব বাত যখন আবো ঢেব বেড়ে গেছে তখন সে খেতে ডাক দিল। কালীচবণ খেতে দিল। হেমলতা বললে, 'আমাব কলিক ব্যথা উঠেছে-যাই, আব দাঁড়াতে পাবি না।' হেমলতাব মুখেব দিকে একবাব তাকিযে দেখল-কেমন কুঁচকে উঠেছে, বিশ্রী। কিন্তু কলিকেব বোগীব মুখেব কদর্যতাই কি সব? সবই যেন। ওব বেদনাব জন্য কোনো সহানুভূতি বোধ কবছে না সুবোধ। একটুও না। গবম জলেব বোতালটা নিযে কালীচবণ যে ঢেব দেবি কবছে-তাতে সুবোধেব কিছু এসে যাচ্ছে না। স্ত্রীকে এড়াবাব জন্যে অনেকক্ষণ ছাদেব ওপব পাযচাবি কবল সুবোধ।

আব-এক বাসব বাত। অভযেব বোন সেই নিরুপমাব আজ বিযে। সমস্ত ছাদ জ্যোৎস্নায ভবে গেছে। ওদেব বাসবঘবেব জানালা দিযেও ত এই জ্যোৎস্না। নিরুপমা মেযেটি কেমন চমৎকাব, অভযেব বোন, রূপে গুণে মানুষেব মন জুড়িযে দেয যেন। এই মেযেটি সন্ধ্যাব মত যেন। এই মাঝবাতেব অকলুষ জ্যোৎস্নায ওব ববেব কি গভীব বিলাস? বিলাসেব চেযেও কি অপবিসীম শান্তি-স্নিগ্ধতা। মাধুবীব ভিতব মধুমালতীব একটা ঝাড়েব মত যেন।

তিন বছব এমনই এক জ্যোৎস্নায যখন সুবোধ বাসবে ঢুকতে যাচ্ছিল-মনে হযেছিল সবই যেন পাবে সে। এইসব-এইসবই।

আজ আবাব ঢুকতে ইচ্ছে কবে-নতুন কোন এক বাসব ঘবে; সমস্ত পুবনোকে ভুলে যেতে ইচ্ছা কবে। জীবনটাকে নতুন কবে তৈবি কবতে ইচ্ছা কবে আবাব। ভেবেছিল, তাব বযস ত এখন তেত্রিশ-নিরুপমাব ববেব বযস আটত্রিশ। কিন্তু তবুও জীবনেব হিসেবে ওব চেযে সুবোধ আজ কত স্থবিব। লোকেব কাছে সে আজ প্রাজ্ঞ স্বামী। মানুষেবা তাব কাছ থেকে একজন সর্ববাদিসম্মত সফল স্বামীব অনেক বযস গুণ একটি একটি কবে কী মর্মান্তিক ভাবেই না দাবি কবে।

সচ্চবিত্র-সফল স্বামী সে। সুবোধ নিজেব মনেব নিভৃত হাসি নিযে একটু খেলা কবে নিল, সফল সচ্চবিত্র স্বামী সে-তাব স্ত্রীও তা স্বীকাব কবে।

কিন্তু তবুও সমস্ত বিশ্বসংসাবকে তৃপ্ত কবলেও এ বিচিত্র বৈধতাকে নিযে সে নিজে কতদিন খুশি থাকতে পাববে? নিজেকে বড় সন্দেহ হয-এমনই গতানুগতিক মন যে হেমলতাব স্বামী হযেই সে হযত বুড়ো হযে যাবে-জীবনেব কাছ থেকে এব চেযে অধিকতব বস একটুও সে পাবে না। তাইই হবে। কী আব হতে পাবে?

সুবোধ একটা গভীব সহিষ্ণু নিশ্বাস বুকেব ভেতব চাপল। আকাশেব তাবাগুলোব দিকে তাকাল সে। সে সবেব থেকে আশা স্বপ্ন কুহক কল্পনা সঞ্চয কবে নেবাব জন্য নয। যে জীবন সে চালাতে যাচ্ছে তাতে এসবেব কিছু দবকাব প্রযোজন হবে না।

এত বাতেও কাব যেন ফানুস জ্বলে উঠে আকাশে পবিক্রম কবে চলেছে। এই পৃথিবীতে ওই ফানুসটি ছাড়া সুবোধেব কাছে আব কিছুই যেন নেই।

ভোববেলা সুবোধেব সমস্ত চোখ-মুখ ঘুমে ভেঙে পড়লেও তাব মনে হল এমন সমযে সে যদি বিছানা নেয হেমলতা উত্যক্ত হবে।

সুবোধ হাত-মুখ ধুযে বেতেব চেযাবটায গিযে বসল।

হেমলতা মোড়ামুড়ি দিযে উঠে বললে, 'কে? তুমি নাকি?'

সুবোধ বললে, 'তুমি এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে নাকি? এত ঘুমোও না ত কোনোদিন?'

হেমলতা একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি কবে বললে, 'দবকাব হলেই ঘুমোই।'

সুবোধ বলল, 'একটু-একটু শীত পড়েছে, না?'

—'কাল সাবাবাত কোথায় ছিলে?'

'ছাদে।'

'তা ত থাকবেই; বললাম কিনা আমাব কলিকেব ব্যথা উঠেছে।'

সুবোধেব মনে পড়ল; সে একবাবে ভুলে গিয়েছিল যে, সে ঈষৎ লজ্জাবোধ কবল। লজ্জাটা কেমন ফিকে, মোটেই আন্তবিক নয়, যে-কোনো মুহূর্তে ধবা পড়ে যেতে পাবে। কিন্তু তবুও ধবা পড়ে গেলেই ভাল; হেমলতাকে আঘাত দিতে চায না সুবোধ।

বাস্তবিক একটু আধটু লজ্জা সে বোধ কবছে বটে। কিন্তু দুঃখ সে মোটেই পাযনি। কাল বাতে ছাদটাকে-জ্যোৎস্নায সে খুব উপভোগ কবেছে। খেযেই সে ঠিক কবেছিল কলিক বোগীব বিছানাব পাশে বসে ককানি শুনে কাটাতে পাববে না; এতে যদি তাব অপবাধ হযে থাকে তাহলে জীবন দেবতাব কাছে ক্ষমা চায সে। কিন্তু কালকেব বাতে ছাদেব জ্যোৎস্না-শান্তি ও স্বপ্নই যেন তাব পাওনা ছিল। এসবেব তুলনায হেমলতা আব তাব কলিক এত ক্ষুদ্র যে সে তাব ভুলেই গিযেছিল। সমস্ত বাতেব ভিতব একবাবও মনে পড়ে নি। আজ সকালে হেমলতাব মুখে না শুনলে অনন্তকালেব ভিতব এই জিনিসেব বুদবুদ সুবোধেব জীবনেব থেকে মুছে থাকত।

হেমলতা বললে, 'এমনই বাড় বেড়েছে তোমাব যে গবম জলেব বোতলটা অবদি নিজে দিযে যেতে পাবলে না।'

সুবোধ কোনো জবাব দিলে না।

–'একটা চাকবেব হাতে এটা পাঠাতে তোমাব লজ্জা কবল না।'

সুবোধ ঘাড় হেট কবে বইল।

হেমলতা বললে, 'ওই আনাড়িটাকে এ-সব কাজ কবাতে তোমাকে একশবাব নিষেধ কবেছি, তবুও তোমাব কোনো বোধ হয না।'

হেমলতা বললে, 'মববে মববে-নিজেব হাতেই ত সব কবি, কাল দাড়াতে পাবছিলাম না-বললাম-দেখল চোখেব সামনে-তবুও এই।'

অসহ্য তিক্ততায গা ঝাড়া দিযে বসল সে, বললে, 'সোডাব বোতল ত একটি গিযেছে।'

'ভেঙে গেছে।'

'যাবে না? ওই কালীচবণটা কি মানুষ?'

'তাহলে কিসে কবে গবম জল নিলে?'

'আচ্ছা, সে সব যাক;' বলে হেমলতা উঠে দাঁড়িযে বললে, 'বাব আনা পযসা ওব মাইনেব থেকে আমি কাটব।'

সুবোধ বললে, 'তাহলে পালিযে যাবে।'

—'যাক।'

—'তাহলে চাকব কোথায পাবে?'

—'চাকব চাই না আমি। তুমি বাজাব কববে। নিজেব কাপড় কটা ধুযে নেবে, একটু ফুট-ফবমাসে থাকবে; বাকিটা আমি চালিযে নিতে পাবব।'

হেমলতা একটা বাজে-খাওযা তালগাছেব মত সমস্ত শবীবেব বিবস কঠিন দণ্ডটি এক মুহূর্তেব জন্য সটান খাড়া কবে বান্নাঘবেব দিকে ধাঁ কবে চলে গেল।

বান্নাঘবেব থেকে হেমলতা বললে, 'আজ চা পাবে না।'

গলা চিঁচি কবছে; কালকেব বাতেব অসুখেব জন্যই হয ত। কালও খাযও নি কিছু। আহা!

হেমলতা আবাব বললে, 'চা আজ পাবে না-বুঝলে-'

হেমলতা কলতলায বসে বাসন মাজছে, কাল সাবাবাত কলিকেব ব্যথায একা-একা মোচড় খেযে পড়ে বযেছে, খেল না। আজ ভোরের ওর শুকনো চিমসে মুখ, সাবাদিন কেমন একা থাকে এ-মেযেটি, ক্বচিৎ সহানুভূতি ভিক্ষা কবে। [illegible]ও সুবোধেব কাছ থেকে দাবি কবতে আসে না। বিশেষ কোনো নালিশেব কলবব নেই এব [illegible]-হেমলতাব দিকে তাকাতে তাকাতে সমস্ত প্রাণ এমন দযার্দ্র

হয়ে ওঠে–কোন ভিখিবিকে দেখে কোনোদিনও এমনি অনুকম্পা হয়নি তাব–যেন–এ মেয়েটি যা চায় সব তাকে দিয়ে দিতে পাবে সুবোধ; দেওয়া উচিত বলে নয়–কিন্তু দেবাব একটা সুললিত আগ্রহকে কিছুতেই থামাতে পাবা যাচ্ছে না বলে।

এই মেয়েটি কী চায়?

আজকেব দিনে একটা সোডাব বোতল ছাড়া আব কিছুই সে চায় না। তাকে তা দেবে সুবোধ। সোডাব বোতলেব কথা ভাবতে–ভাবতে ইজিচেযাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুবোধ।

হেমলতা একটা ঠোনা দিয়ে সুবোধকে জাগাল।

হাতে তাব একখানা ডাকেব চিঠি।

সুবোধ বললে, 'ডাক এল বুঝি?'

—'হ্যাঁ,–অনেকক্ষণ।'

—'কাব চিঠি?'

—'সুধাব একখানা।'

—'সুধা? এত দিন পবে লিখেছে–কাকে লিখল?'

—'তোমাকে না।—'

সুবোধ একটু দমে গেল; এক মাস হল সুবোধেব এই বোনটি–স্কুল টিচাব–আব একটি মেয়ে টিচাবেব সঙ্গে পুবী বেড়াতে গিয়েছে। বউদিকে এব আগে আব একখানা চিঠি লিখেছে সে–আজ একখানা; কিন্তু দাদাকে একখানা চিঠিও লিখতে পাবল না।

চাবদিককাব সমস্ত প্রাণসাগবেব থেকে কোন জিনিস সুবোধকে এত বিচ্ছিন্ন কবে নিয়ে যাচ্ছে? ব্যবহাবে বা কথায় কাউকে সে আঘাত দেয় নি কোনোদিন; ভালবাসা বা স্নেহ নিয়ে ভণ্ডামি কবতে যায় নি ত কখনো সুবোধ–এই জিনিসগুলো স্বতোৎসাবিত হয়ে তাব প্রাণেব ভিতব এসেছে।

কিন্তু তবুও স্ত্রী তাব থেকে দূবে থাকে–বোন তাকে চিঠি লেখে না–জীবনে কোনো আগ্রহসম্পন্না আত্মীয়ও জোটে নি তাব।

হেমলতা বললে, 'ভাবছ কী–সুধা তোমাকে গ্রাহ্যও কবে না।'

সুবোধকে ঠুকে একটু প্রীত হয়ে প্রসন্ন মুখে হাসতে লাগল হেমলতা।

হেমলতা বললে, 'তুমিই ত বোন–বোন কবে মব শুধু?'

ঠিক মবে না সুবোধ–তবে সুধাকে সে ওব বাপ–মায়েব মতই স্নেহ কবে বটে–তাবা আজ নেই কেউ।

হেমলতা বললে, 'এ দেখ কী লিখেছে।'

সুবোধেব একটু অভিমান হল, তাকে ত লেখি নি–হেমলতাকে যা লিখেছে সে তা দেখতে যায় না।

হেমলতা বললে, 'দেখবে না?'

সুবোধ চিঠিটা সবিয়ে দিয়ে বললে, 'না'।

হেমলতা ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'বাপবে, তবে শোন, আমি পড়ি।'

'থাক।'

'থাকবে কেন, খবব কী শোন।'

সুবোধ চুপ কবে বইল।

হেমলতা বললে, 'কয়েকটি লাইন পড়ে শোনাচ্ছি শুধু।'

হেমলতা মুচকি–মুচকি হাসতে–হাসতে খামেব ভেতব থেকে আব–একখানা চিঠিব ভাঁজ খুললে, সুবোধ বললে, 'এ আবাব কাকে লিখেছে? এও কি তোমাকে নাকি?'

হেমলতা মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

—'তবে কাকে?'

—'আমাদেব পাশেব বড়িব অনুকে।'

হেমলতা কেমন হৃদয়হীনভাবে চিঠিখানাব দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

সুবোধ বললে, 'অনুপমাব চিঠি অনুপমাব নামে লিখলেই ত পাবত।'

হেমলতা বললে, 'পাবতই ত; কিন্তু চট কবে অতটা হয়ত সাহস হয় নি।'

সুবোধ একটু অবাক হয়ে বললে, 'সাহস?'

হেমলতা বললে, 'অনুপমার মেজদা নীরদ-গত বছর যে এম-এ পাশ করেছে তার সম্বন্ধে কী লিখেছে সুধা, শোনো।'

সুবোধ বললে, 'নীরদের সঙ্গে সুধার আলাপ হল কবে?'

—'তুমিও জান না, আমিও জানি না; এসব ধূলোর মন্তরে ঘটে। যুবক-যুবতীর প্রণয় আমরা বুড়োবুড়ি ঘরগেরস্ত মানুষ কী বুঝব বল।' হেমলতার এই গেঁয়ো সুর সুবোধের ভাল লাগল না। এক কারণে নয়; নানা কারণে। সুবোধ নিজেকে ঘরগেরস্ত মনে করে না, বুড়োও সে নয়। হেমলতা বুড়ো হতে পারে-কিন্তু নিজে সে শ্রাবণেব সবুজ ধানের মত সচ্ছল, যৌবনময়, সে; তার প্রাণ প্রণয়মুখী-যুবকযুবতীর প্রেমের ব্যাপারে তাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখতে পারে; তাকে দিয়ে অনেক কথা ভাবায। হেমলতা এক কথায় এসব উড়িয়ে দিলও বলে ক্লেশ বোধ হযেছে-কিন্তু সবচেযে বিহ্বলতা বোধ করতে হচ্ছে নীবদের সঙ্গে বোনের ভালবাসার কথা শুনে। নীরদকে তাব ভাল লাগে না। ছেলেটাকে অত্যন্ত 'দয়ামাযাহীন ফ্লার্ট' বলে জানে সুবোধ, এর কবলে সুধা কী করে পড়ল।'

হেমলতা বললে, 'শোনো, অনুপমাকে লিখেছে, সুধা; অনুভাই, এর আগে তোকে দুতিনখানা চিঠি দিযেছিলাম-পাস নি বোধ হয।'

সুবোধ দাঁত কিড়মিড় কবে বললে, 'কী ইডিযট! এমন নির্বোধ মেযেমানুষ ছাড়া আর হয'-কিন্তু তখনই নিজেকে সংযত করে নিযে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বললে, 'ছিঃ'।

হেমলতা বললে, 'দু'তিনখানা চিঠি ইতিমধ্যে অনুকে লেখা হযেছে-হযত নীরদকেও দু-একখানা; আর তোমাকে?'

সুবোধ ঢোক গিযে একটা কটিন ব্যথা ও অভিমান চেপে রাখল।

হেমলতা বললে, 'দশ-বার লাইন ভরে পুরী আর সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের কথা চালিযেছে; তাবপর লিখেছে-আমার বাবা-মা নেই, পৃথিবীতে কেইবা আছে? আমি সম্পূর্ণ রকমে মুক্ত। কিন্তু তবুও এই পরম বিস্মযকর সমুদ্রকে আমি এক মুহর্তের জন্যেও ত উপভোগ কবতে পারি না। মনে হয আমার মতন বন্ধনেব বিলাস পৃথিবীতে কেউ পায নি যে; তাব সঙ্গে জীবনকে-সমস্ত নারীত্বকে-আমাব হৃদয়কে লক্ষ কোটি শৃঙ্খলে বেঁধে নিজেও কি অবোধভাবে মুক্ত বলে ভাবি। শুনেছি তিনি নাকি পুরীতে আসবেন, আমার কপালে কি তত সৌভাগ্য হবে? এই চিঠি পেযেই তাকে পাঠিযে দিস; তিনি কাছে নেই বলে এই একমাস থাকাতেও সমুদ্রটাকে একদিনেব জন্যও আমি বুঝতে পাবলাম না-অথচ সুরমা ত সমুদ্রের ভাবগতিক ধরে ফেলেছে। বাস্তবিক, সুবমার মত detached হতে পারতাম যদি। কিন্তু প্রেম কি মানুষকে আর-কিছু হতে দেয। এমন দুর্দান্ত দেবতা? সমুদ্র এর কাছে একটা শান্ত ঘুঘুব মত যেন।'

হেমলতা থামল। বললে, 'থমকে রইলে যে; বিশ্বাস হয না? দেখ।'

সুবোধ চিঠিখানা তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বইল।

হেমলতা বললে, 'কী কববে? অনুকে দেব এই চিঠি?'

সুবোধ কোনো জবাব না দিয়ে বললে, 'আমি জানি না।'

হেমলতা বললে, 'বাঃ, তোমার ছোট বোন; ভেবেচিন্তে একটা কাজ করবার ভার ত তোমার ওপরেই।'

সুবোধ চুপ কবে রইল।

হেমলতা বললে, 'যাই। উনুন বযে যাচ্ছে।'

সুবোধ বললে, 'চিঠিখানা রেখে যাও।'

হেমলতা নাকমুখ সিঁটকে বললে, 'যা তোমার কর্তব্য বুদ্ধিতে কুলোয় করো বাপু।'

বেশি কথা বলবার লোকও সে নয, চলে গেল।

বাপ মা নেই-কেউই নেই; বিচার করবার ভার সুবোধের ওপর। কিন্তু কি বিচার করবে সে? বিচার কববাব.কোনো প্রবৃত্তি তার নেই। সুধা যা খুশি তাই করুক, নীরদকে নিযে ওর জীবনটা কেমন হবে-ধারণা করতে পারছে সুবোধ। স্বেচ্ছায এমন ছেলের হাতে বোনকে দিত না সে। এরা ভালবাসে বটে-কিন্তু প্রেম এদের কাছে দুর্মূল্য জিনিস নয। ছেলেটিব বযস বাইশ-তেইশ হবে-কিন্তু এই বযসেই অনেক প্রেম পেযেছে সে, পেয়েছে, ভুলে গেছে, অপব্যবহার করেছে।

এবপর ভালবাসার কী মানে থাকে-রূপ বা নারীত্বের কোনো মূর্ল্য থাকে না আর।

প্রেমের জন্যে ওকে পথে-পথে ফিরতে হয় না। রূপ-রস খুঁজে নেবার নিষ্করুণ শ্লেষে এর জীবন বিড়ম্বিত নয়। নারীকে অধিকার করে নেবার জন্যে জীবনবিধাতা-এর কাছ থেকে এক মুহূর্তের একাগ্রতাও দাবি করেন না।

কে জানে এই ছেলেটি বিবাহকে ঘৃণা করে কিনা? হয়ত করে। এরা ত শান্তি ও স্নেহ মমতার শীতল ছায়া চায় না।

বসুধার বহু বিচিত্র রস চায়। একটি পরমা সুন্দরী সহৃদয়া বধূ যার জন্য সুবোধের সমস্ত জীবন মাথা খুঁড়ে মরছে বিধাতা নীরদকেই হয়ত দেবেন দিনরাতের অপব্যবহার ও অবিচারের জন্য।

নীরদ বেরুল। ছিপছিপে লম্বা ফরশা চেহারা, সুন্দর ডৌলের নাকমুখ শরীর, টেনিশ সুট পরেছে। র‍্যাকেট হাতে সাইকেলে চড়ল। এই ছেলেটিকে সুধা ভালবাসে-এও কি ভালবাসে সুধাকে? বাসলেও বধূরূপে গ্রহণ করবে কি? যদি করে-তা করুক, শেষ পর্যন্ত অনেক বিশ্রী গ্লানি বেরিয়ে পড়বে। যদি না করে তাহলেও অনেক বিশ্রী গ্লানি ও অবসাদ সধুার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবে

সুবোধ সব জানে।

তার সম্বন্ধেই বা কে ভাবে' কেউ না। ভাবতে আর গেল না সে। সে আর ভাবতে গেল না। কোনো সুন্দরতর ব্যবস্থা তার হাতে নেই। নিজের জীবনকেও ত অবসাদ গ্লানিতে ভরে দিয়েছে সে। জীবনের বিরাট ব্যঙ্গের মুখোমুখি সে একজন কৃপার পাত্র শুধু। সুধা একটি কৃপার পাত্র। হেমলতা একটি। অথচ আশ্চর্য, পরস্পর থেকে পরস্পর তারা এমনি বিচ্ছিন্ন। কেউ কাউকে সাহায্য মমতা করবার জন্য একটুও উন্মুখ নয়। কাল সারারাত হেমলতা কলিকের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছে-সুবোধ রইল ছাদে চড়ে, আর সুধা একটা বিচ্ছেদের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে-হয়ত কী এক প্রখর ব্যথা-প্রেম অনভিজ্ঞ সুবোধ তা বোঝে না, কিন্তু সুধার এই বেদনার জন্য সে বা হেমলতা কোনো ক্লেশ বোধ করছে না, গল্পের নায়িকার বিরহ-ব্যথার মত তাদের কাছে এসব অবাস্তব মনে হয়।

আজ সমস্ত সকাল ভরে এক কাপ চা এল না-সুবোধের জন্য একটু খাবার আনিয়ে দিল না হেমলতা।

নীরদদের লিখল; হেমলতাকেও লিখল-কিন্তু তবুও সুবোধকে একখানা চিঠি লিখতে পারল না সুধা। এমনি করে এরা পরস্পর কেউ কাউকে ছোয় না-প্রত্যেকে প্রত্যেককেই আঘাত দেয় শুধু। তারপর একসময় হেমলতা ও সুধার আঘাত বেদনার কথা আর ভাবতে গেল না সুবোধ। নিজের দুঃখেই তার সমস্ত মন ভরে রইল। উঠল।

এক কাপ চায়ের জন্য-একখানা চিঠির জন্য ছোট শিশুর মত অভিমানে কষ্টে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল সে। হেমলতাকে নিজের জীবনের থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিল সে। সুধাকে সরিয়ে দিল।

এমন সময় হেমলতা এক পেয়ালা গোলাপি রঙের চা ও দু'খানা টোস্ট নিয়ে এসে হাসিমুখে বললে, 'কী ঠিক করলে?'

সুবোধ ঘাড় হেট করে না হেসে পারল না-জীবন তার ওপর এমন প্রসন্ন হয়েছে বলে। খুব সামান্য উপকরণেই এই ছেলেটি প্রসন্ন হয় হেমলতা বা সুধা বোঝে না কেন? অন্তত জীবন দেবতার বোঝা উচিত; এই তুচ্ছটুকুও সুবোধকে দিতে চায় না সে।

হেমলতা বললে, 'চিঠিটা দিয়ে আসব অনুকে?

সুবোধ হাসিমুখে বললে, 'তোমার খুশি।'

বাসরশয্যার পাশে

রাত অনেকটা এগিয়ে গেছে।

দেবব্রত তাকিয়ে দেখল নববধূ এখনো আসে নি।

যখন সে এল, বাত তখন বেশ গভীর।

বধুকে দেখবার সে কোনো অবসরই পায নি; সে নিজের চোখে দেখে বিয়ে ঠিক কবে নি। নম্র নিষ্ঠাবান বংশের সন্তান সে; পিতৃপিতামহ পুজনীযদের অনুগত হযে চলা তাদের চিরদিনেব প্রথা। তার কাকা মেয়েটিকে দেখে পছন্দ কবে বলেন যখন, দেবব্রতেব বিয়ে তখনই ঠিক হযে গেল।

বিযেব আসরে দেবব্রতেব মনটা কেমন আচ্ছন্ন হযেছিল-সমস্তটা সমযই পৃথিবীব কিছুই যেন তার ভাল লাগে না। বিয়ের আগে কে একটা উড়োখবব দিয়ে গিযেছে যে জানালাব ফাঁকে দেবব্রতকে দেখে মেযে নাকি কেঁদেকেটে অস্থিব হযেছে-কিছুতেই সে এ-ছেলেকে বিয়ে কববে না। খববটা ববপক্ষেব থেকে ববযাত্রীদেব মধ্যেই কে যেন দিযেছিল; কিন্তু কন্যাপক্ষেব ভাবগতিক দেখে সে কথা ত কিছু মনে হল না। বিয়েব আসব তৈরি হল; বধু এল; সবই ত হল।

দেবব্রত ভাবছিল কেন চেহাবা তাব অসুন্দব কী? নাকি, কই কেউ কোনোদিন এমন কথা ত তাকে বলে নি? লম্বা দোহাবা চেহাবা-ফর্শা বঙ, নাক চোখ ঠোঁট চিবুকের কমনীযতার জন্যই ত অনেকেব কাছে সে আদর পেযে এসেছে। নিজেকে পুরুষোচিত সুন্দব বলেই ত এতদিন সে জানত?'

দেবব্রত একরাশ নক্ষত্রের দিকে তাকিযে ভাবল-চেহাবায মার তাব নেই; চেহারার কোনো খুঁত বা অসঙ্গতিব জন্য নীহাবের মন যে তার প্রতি বেঁকে বযেছে একথা কিছুতেই সে বোধ কবতে পাবল না।

ববং কাবণ হযত আর-কিছু হবে-যদি বাস্তবিকই বেচাবাম গুঁইয়েব কথার ভিতর কোনো যথার্থতা থাকে-লোকটা বড্ড বাচাল-বড্ড কুচুটে।

নীহাব চৌকিব এক কিনারে বসে দেবব্রতেব দিকে পিঠ কবে কতকগুলো জামরুল জিউল বাবলাব বিশাল অন্ধকাবেব দিকে তাকিযে রযেছে।

পাড়াগাঁর রাত। অনেক রাতে একটু ম্লান জ্যোৎস্না উঠেছে। একজন বব ও বধূ যে কোনো নবীন উৎসাহ ও অনুবাগেব ব্রত উদ্‌যাপন কবতে যাচ্ছে আকাশ বা জঙ্গলেব এ-বঙ টুকু এ-নিস্তব্ধতা যেন মোটেই সে-সবেব মত নয; কিন্তু তবুও এই মধুব বিমর্ষতাকে বড্ড ভাল লাগছে দেবব্রতেব। হযত কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ; নদীব পাড়েব আমবনেব অন্ধকাব তাতে একটুও ঘুচল না; আগণন নীল ডালপালা একটু ঝিরঝিবে বাতাসে নড়ছে-দোল খাচ্ছে আকাশেব পাতলা নীল রঙেব সঙ্গে যেন মধুব খুনসুটি চলেছে তাদের। কখনো-বা একটু বাবলাফুলের গন্ধ, এই নীহাবদেরই গভীব গেরস্তালি বাগানের একটু বজনীগন্ধার ঘ্রাণ খানিকটা শিশির ভেজা ধূলো ঘাসের সোঁদা গন্ধ যেন। গরমের বাতে কাটা তবমুজেব ঘ্রাণ কোথায থেকে আসছে যেন, একরাশ মশার ভন ভন শব্দ, একটা বেজি বার বার ছুটে এসে পালিযে যাচ্ছে, ইঁদুরগুলো ঘাসের ভিতর দিযে সুড়সুড় করে চলেছে। নীহারদের গোযালের গাইটা সারারাত জেগে আছে যেন-জ্যোৎস্নার দিক মুখ করে কান নাড়ছে। লেজ দিযে আস্তে-আস্তে পিঠ বুলিযে নিচ্ছে-তারপর অনেকক্ষণ সাড়াশব্দহীন হযে গভীর চোখ তুলে তার বিচালি খইলেব জগৎ ছেড়ে কোন নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা কবেছে যেন।

নীহারকণা দেবব্রতের দিকে ফিবে তাকাল না।

ঐ কেউড় বাঁশের বনের ভিতব এত রাতে যেখানে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে, পাতালতাব ভিতর দিযে মাটি ঘাসের ওপর ছক কেটে চলেছে সেই দিকে, ঘাসেব নদী শ্মশানের দিকে, আবিষ্ট হয়ে তাকিযে রয়েছে মেয়েটি।

তাকিয়ে থাকুক।

দেবব্রত তাকে বিবক্ত কববে না। বাসর রাতে বিছানায নবীন বর বধূর কাছ থেকে কিছু আশা কবে

নাকি? একটু ইযার্কি তামাশা লঘু আমোদ? হযত একটু মমতাব পবিচয? খানিকটা সমবেদনা? প্রথম দাম্পত্যেব একটু নিবিড়তাব স্বাদ? কে জানে বব কিছু আশা কবে কিনা? বধূ কিছু আশা কবে কিনা? দেববত জানে না কিছু। হযত এ পৃথিবীব সকলেব সমস্ত বাসবশয্যাই ববং একটু বিমণ্ডিত হয। কে জানে?

দেবব্রত এই মেযেটিকে ত্যাগ কববে না।

তাকে একটু ফিবেও বসতে বলবে না; এব মুখ ত এই মুহূর্তে একটু ভাল কবেও সে দেখতে পাবল না; নাই-বা পাবল-তাতে কী হযেছে? এই মুখ দেখবাব ঢেব সময তাব হাতে বযেছে; কিন্তু নিজেব কুমাবী পাড়াগাঁ জীবনেব এমন শেষ বিদাযবিধুব বাত এ মেযেটি হযত অন্তবালেব মধ্যে আব-এক দিনেব জন্যও উপভোগ কবতে পাববে না। তাব জীবন পবিবর্তিত হযে যাবে-এখনই পবিবর্তিত হযে যাচ্ছে; আজ বাতেব বাকি কটা দণ্ড নীহাবেব কাছে অত্যন্ত গভীব কবে দুর্লভ; কাল বাতে সে ট্রেনে থাকবে-স্টিমাবে থাকবে। এবপব আবাব যখন সে বাপেব বাড়ি আসবে-নীহাবেব জীবন রূপান্তবিত হযে গেছে। শেযালকাঁটা ফণিমনসাব আব কেযাব কাঁটাব ঝোপে মাঠেব দূব প্রান্তে অনেকখানি জাযগা অন্ধকাব হযে বযেছে-তাবি পাশ দিযে উঁচু-উঁচু কালজাম কামবাঙা কবমচা নাগকেশব চাঁপাব গাছ-এপাশ দিযে নদী; সবকিছুব ওপবই মাযামাখা বিষাদযুক্ত বিবশ জ্যোৎস্না-যেন একে একে পল্লিগ্রামেব সমস্ত রূপ ও সমস্ত প্রাণকে সে বিদায দিতে দিতে চলেছে কোনো দূব অন্ধকূপেব ক্ষুধাব প্রযোজনে।

দেবব্রত মুহূর্তেব জন্য চোখ খুলল। চোখ যখন মেলল নীহাবদেব বাগানেব টগবেব গাছ কযেকটা বিবর্ণ ফুল দিযে তাকে সম্ভাষণ কবছে। দেবব্রতেব মনে হচ্ছিল সব ছেড়ে দিযে সে কলকাতায চলে যাক। এ পাড়াগাঁব কোনো রূপসীকে কাঁদিযে সে কলকাতায নিযে যাবে; আকাশ জঙ্গল মল্লিকা কেযা কাঁটাব বন সবাই মিলে যে তাকে মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে আপ্রাণ অনুযোগ কবছে। ভুঁইচাঁপাব গন্ধ নিযে খানিকটা বাতাস বযে গেল। এই মাটিবই ভিতবে যেন কাব উষ্ণ মধুব নিঃশ্বাস-শিকবে শিকবে সমস্ত পল্লিসমাজ পবিব্যপ্ত হযে বযেছে। এমন জিনিসটাকে খসিযে ছিঁড়ে নেবাব ভাব দেবব্রতেব উপবে পড়ল। দেবব্রতেব উঠে বসতে ইচ্ছা হল; নীহাবকে হযত সে বলবে; বল ত লক্ষ্মীটি তোমাব কিসেব কষ্ট।

কিন্তু মুখ দিযে দেবব্রতেব কোনো কথা ফুটে বেরুতে পাবছে না। সে শুযেই আছে। কখনো-বা দূব ছাযা নীহাবিকাব পথ, কখনো-বা এই স্নিগ্ধ বিষণ্ন ব্যথাবিধুব পাড়াগাঁটাকে পবিক্রমা কবে আসছে।

দূবে কেউব গাছেব জঙ্গলেব পাশাপাশি নদীব কিনাবে যেখানে জ্যোৎস্না নেমেছে মৃদু বাঁশিব শব্দ শোনা যাচ্ছে-খুবই মিহি; নীহাব একটু নড়েচড়ে উঠল-সে যেন এখন কিছু একটাব জন্যই অপেক্ষা কবছিল।

দেবব্রত একটু বিস্মিত হযে জিজ্ঞাসা কবল, 'বাঁশিব শব্দ শুনছি না?'

নীহাব কোনো জবাব দিল না। সে একমনে শুনছে।'

দেবব্রত বললে, 'ক্লাবিওনেটেব মত মনে হচ্ছে না?'

একটু থেমে বললে, 'আমাব মনে হয-তোমাদেব পাড়াগাঁযেব কযেকজন ছেলে মিলে ক্লাবিওনেট বাজাচ্ছে।'

একটু পবে, 'এখানেও এসব এসেছে নাকি?'

একটু থেকে, 'এই খাজা পাড়াগাঁয?'

কিন্তু কোনোবকম ইশাবা কবেও নীহাবেব কাছ থেকে দেবব্রত কোনো প্রত্যুত্তব আদায কবতে পাবল না। এ যে ক্লাবিওনেটও নয-অনেক মিলেও যে বাজাচ্ছে না সেটা যেন স্পষ্ট বুঝতে পাবল দেবব্রত; একটা শাদাসিধে বাঁশেব বাঁশি কেউ বাজাচ্ছে, হযত ঐ বাঁশবনেবই একটা আঁচল ছিঁড়ে এই বাঁশিটি তৈবি হযেছে। সুবেব উৎলানিতে নীহাবকে কেমন যেন একবকম অভিভূত কবে বেখেছে।

নীহাব একেবাবে মোহাবিষ্ট হযে শুনছে।

হযত কোনো ভালবাসাব ইশাবা হবে। এই মেযেটিব জীবনেব মনে হযত কোনো গাঁযেব ছোকবাব প্রণয জড়িযে বযেছে। সেও হযত বাঁশেব ঝাড়েব ওপাবে নদীব কিনাব থেকে বাজাচ্ছে। এসব জিনিস বাস্তবিকই কি সত্য? এমন অসত্য মনে হয-এমন নবম জ্যোৎস্না, সেই বাঁশি এই কিশোবীব ঐ ছেলেটি। কিন্তু তবুও একবাবে প্রত্যক্ষই ত বোধ কবছে দেবব্রত। নীহাবেব কান্নাব খানিকটা মানে বোঝা যায যেন।

দেবব্রতও জীবনে ঢেব ভালবেসেছে। বাঁশিব শব্দে জ্যোৎস্নায সে যেন কোন এক জাযগায ভেসে যেতে থাকে-কিন্তু দু-এক মহূর্তেব জন্য শুধু, সে পৃথিবী তাব ফুবিযে গেছে। জীবন তাব বত্রিশ-তেত্রিশে

গিয়ে পড়ল-বাঁশি যে বাজাচ্ছে এত রাতে নদীর কিনারে-তার মত টলমল ফুর্তি জীবনে আর নেই।

একদিন সেও ভালবেসেছিল বটে-একে-একে অনেককেই। কিন্তু এতটা আত্মহারা হয়ে হয়ত নয়। কিংবা-হয়ত নিজেকে সেও অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছিল। ভালবাসা তাকে অনেক ব্যথা দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে-সব দিন জীবনে আজ আর নেই ত। আজ সে কেমনই উচ্ছ্বাসহীন।

কিন্তু এই মেয়েটি তার চেয়ে কত ছোট-জীবনের রঙচটা হেমন্তের শীত ও স্থিরতায় পৌঁছুতে এখনো তার কত দেরি। অত্যন্ত গভীর সহানুভূতি দিয়ে নীহারকে পর্যবেক্ষণ করে দেখল দেবব্রত। কোনো এক বাঁশি হাতে ছেলে হয়ত এই মেয়েটিকে ব্যথিত করে রেখেছে, সে ছেলেটি হয়ত কিশোর, হয়ত এর সমবয়স্ক, সাথী, প্রলুব্ধ প্রণয়ী, বিচ্ছেদ বেদনাতুর।

দেবব্রত নিজেও কি এই ছেলেটির মত ছিল না?

পাড়াগাঁয়ের পথে বাল্য শেষ না-হতেই এক-একজনের প্রাণে প্রণয় কি অসহ্য হয়ে ওঠে জানে না কি সে? জানে বটে-কিন্তু বইয়ের থেকে জানে, কবিতার থেকে জানে, নিজের কোমল প্রাণের অনুভূতি দিয়ে ধারণা করে বোঝে। কিন্তু এসব বাস্তব বাস্তবজীবনে কোনোদিনই অনুভব করে নি সে।

পাড়াগাঁয়ের পথে জীবনে বহুদিন তাকে আসতে হয়েছে-দু-চারটে দুপুর বিকাল উদাসীনভাবে এর পথে-পথে ঘুরে একটা আচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা ক্ষীর নরম মমতা মনের, মাখিয়ে নিয়ে গেছে সে। কিন্তু তুবও আপ্রাণ শহরের ছেলে সে-এসব বিস্ময় তার হৃদয়ের ভিতর বেশিক্ষণ টেকে নি।

বাঁশির শব্দ থেমে গেছে-গুনগুন করে কে গাইছে যেন।

হয়ত সেই ছেলেটি।

নীহার ঘাড় কাত করে শুনছিল।

দেবব্রত বলল, 'কে গায়?'

নীহার কোনো কথা বললে না।

দেবব্রত বললে, 'বেশ সুন্দর গাইছে ত; একটি অল্প বয়সের ছেলে মনে হচ্ছে।'

নীহার গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়েছিল।

দেবব্রত বললে, 'গানের পদটা শোনা যাচ্ছে না ত—'

নীহার কোনো সাড়া দিলে না।

দেবব্রত বললে, 'গানটা শ্যামা-রাধিকার বিচ্ছেদ নিয়ে।'

নীহারের দিকে সে তাকাল; নীহারের আপাদমস্তক একটুও নড়ছিল না। দেবব্রত বললে, 'সেই কানুর গান। এসব গান প্রায়ই শোনা হয় না। শহরে বর্ষামঙ্গল আর হেমন্ত শীতের গানই শুনি শুধু -কেমন একটা রঙচঙা সুর ও ভাব সে সবের ভিতর। প্রের গান শুনি; কিন্তু কানুর গানের এমন মর্মস্পর্শী আঘাত-এমন বিরহ প্রেমের ব্যথা যুগ-যুগান্তের গানের যমুনা বৃন্দাবনের কথা, আজও এই পাড়াগাঁয়ে ও পল্লীগ্রামের-নদীর ধারে, এমন জ্যোৎস্না রাতে—'

দেবব্রত থামল।

ভাবছিল হয়ত নীহার কিছু বলবে; খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করছিল দেবব্রত-এই নববধূর অন্তত একটি মুখের কথা শুনলে এই বাসর রাতের একটা সার্থকতা খুঁজে পায় যেন সে, না হলে এই রাতের ব্যর্থতা তাকে চিরদিন কষ্ট দেবে।

কিন্তু নীহার দেবব্রতের দিকে আরো সম্পূর্ণভাবে পিছু ফিরে বসল।

ছেলেটি বিরহী ব্রজবধূর আর-একটি গান ধরেছে।

নীহার আস্তে-আস্তে উঠে গেল।

দেবব্রত শুয়েছিল-তার শিয়রের পাশ দিয়ে খসখস করে নীহারের শরীরটা অন্তর্হিত হচ্ছিল।

দেবব্রত বললে, 'শোনো।'

কেউ থামল না।

'শুনছো, নীহার' শুনছো না?'

না, সে চলে গেছে, শোনবার কোনো রুচি বা অবসরই তার নেই। কাছে এসে বসা যে দূরের কথা। যাক ভালই হয়েছে। কিন্তু তবুও সব বাসররাতই কি এমন হয়? অনেক ব্রীড়াবনতা মেয়ে থাকে বটে-স্বামীর কোনো কথায়ই যেন তাদের লজ্জা ভাঙতে চায় না। কিন্তু তবুও তারা পাশেই ত শুয়ে

থাকে-সহানুভূতি করতে বাজি-স্বামীর জন্য দাক্ষিণ্যের হাত তাদের তৈরি। কিন্তু এ মেয়েটি মুহূর্তের জন্য শয্যার পাশে এসেছিল, বাসরশয্যার একটা অতি তুচ্ছ কিনার ঘেঁষে বসবার জন্য। কয়েকমুহূর্ত আকাশপাতালের দিকে তাকিয়ে কাঠের মত বসে থেকে চলে গেল সে। বাপরে! বিয়ে হতে না-হতেই দেবব্রত হাঁপিয়ে উঠেছে যেন। দেবব্রতের বিবাহিত জীবন। গান থেমে গেছে।

কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। বেশি দূরে নয়-খানিকটা দূরেই একটা গাছের গুঁড়ির ওপর কারা যেন বসে-বসে কথাবার্তা বলছে, হাসছে, ইয়ার্কি করছে, তাদের তামাশা আমোদের আর শেষ নেই। কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে থেকে-থেকে সব ফূর্তি শুকিয়ে যাচ্ছে, কেমন একটা অশ্রুসিক্ত গলার খাকরি। তারপর হয়ত অশ্রু-যার কোনো শব্দ নেই।

দেবব্রত পাশ ফিরে চোখ বুজল।

বাকিটা রাত সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে হঠাৎ যেন সে স্বপ্ন দেখল কারা গলায় খাকরি দিচ্ছে বড্ড ব্যথায়। কিন্তু স্বপ্ন নয়-সে জেগে-জেগেই ত শুনছে হাঁসের গলার মত সাদা পাঁসুটে জ্যোৎস্নায় ছেলেটি আবার গাইছে-সেই ব্রজবধূর বিচ্ছেদের গান-হয়ত মেয়েটিরই ফরমানে কিংবা কানু পিরিতির গান হয়ত নিজের হৃদয়ের অনুরোধে। দেবব্রত তামাশা বোধ করে ভাবছিল এই গ্রাম্য মূর্খ-দু'টি কি একটা অগাধ বিচ্ছেদের গানের এই ক্ষণিক সময়টুকু এমনি গেয়েই কাটাবে?

অনেক্ষণ ধরে দুইজনে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে একটা গলার খাকরানি-'যেন এই মৃত জ্যোৎস্নাকেও কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। ভোর হয়েছে।

হঠাৎ একজন বর্ষীয়সীর আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু চাপা গলায় ফ্যাচফ্যাচ করছে-ছেলেটি উঠে গেল, নীহারকেও ঠেলতে-ঠেলতে বাসরশয্যার এক কিনারে খুঁট গেড়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু তখন একেবারেই ত ভোর হয়ে গেছে। শয্যাতুলুনির দল এসে হাজির।

সানাই বাজছে।

বাসর রাতটা বিশ্রীভাবেই কাটল।

কিন্তু দেবব্রত যা ভয় করেছিল-তা এখন আলগোছে কেটে যাচ্ছে। এক রাত ত মাত্র বউকে নিজের বাড়িতে এনেছে সে, আকাশ-পাতাল আশঙ্কায় বিবাহের জীবনের নিষ্ফলতায় দেবব্রতের মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। বধূর বাপেরবাড়ি থেকে কলকাতা অবদি সমস্ত পথটা দেবব্রত একটা বগলেশহীন মালিক ছাড়া কুকুরের মত অজস্র এঁটুলির কামড় খেয়ে খেয়ে বরযাত্রীদের মধ্যে কী যে রঙতামাশা করেছে, কেমন করে সমস্তটা দিন কাটল, তার খবর যেন ভুলে যেতে হয়। রাত প্রায় এগারটা।

শোবার ঘরে ঢুকে দেবব্রত দেখল নীহারও সবে ঢুকেছে, ছাপর খাটের ওপর বসে একদিককার একটা হাতল ধরে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান চিবুচ্ছিল মেয়েটি।

দেবব্রত একটা রেখা টেনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে বসল। মনে-মনে নীহারের পল্লিপ্রেমের তাৎপর্যটা বুঝবার চেষ্টা করছিল। সেটা কিছু মুহূর্তেই ধোঁয়ার মত কেটে গেল।

নীহারই বললে, 'বেশ পান ত!'

—'কী রকম?'

—'কী রকম আবার কি! বেশ পান। দেখো ত আমি এই পানের ডিবোটা ভরে এনেছি।'

দেবব্রত দেখল।

ভাবছিল, 'তাহলে হৃদয় ভরে কানুর গান নিয়ে আসে নি মেয়েটি?' তা হোক; বেশ স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে।

নীহার বললে, 'তোমরা এত মশলা ব্যবহার করো পানের সঙ্গে?'

দেবব্রত বললে, 'করি।'

দেবব্রত নিজে পান খেত না। নীহার তা জানত না, জানবার কোনো ইচ্ছাও প্রকাশ করল না সে। দেবব্রতকে না বলতেই সে আজ একটা পান মুখে দিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে ওর জীবনের এই ক্ষেত্রেও আবার বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক মশলা দেওয়া হয়।'

পরিতৃপ্তিতেই দেবব্রত যথেষ্ট খুশি হয়েছে নববধূর অনুরাগে, অন্তত আদবকাযদা ক্ষুণ্ন হল বলে সে বিশেষ দুঃখবোধ কবল না।

বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক মশলা দেওযা হয।'

নীহার বললে, 'তাই ত বেশ খেতে লাগে-এমন মশালাগুলোর সব নামও জানি না।'

দেবব্রত বললে, 'এলাচ-লবঙ্গ-পিপাবমেন্ট।'

নীহব হসে গড়িযে বললে, 'ও এত সব!'

—'কেন তোমাদের দেয না?'

নীহার বললে, 'না, আমাদেব পাড়াগাঁয কোথায এসব পাওযা যায-কে দেবে?'

দেবব্রত বললে, 'তাম্বুল বিহাব জবদা কিমাম এইসব আমবা ব্যবহাব করি, তোমাকে এক শিশি জবদা কিনে দেব এখন।'

নীহার আপ্লুত হয়ে বললে, 'সত্যি দেবে?'

—'তুমি কোনাদিন জবদা খাও নি?'

—'না।'

—'তাহলে তাম্বুল বিহাব খেযে দেখ।'

—'সে কেমন হবে?'

—'সেই ভালো হবে, মাথা ঘোবাবে না।'

—'আমি হামানদিস্তায পান ছেঁচে খেযে দেখেছি ঘোষাল বাবুদেব!'

দেবব্রত বললে 'ঘোষালবাবুরা কে?'

—'আমাদেব দেশেব।'

নীহাব বললে, 'আমাকে একটা হামানদিস্তা কিনে দেবে?'

দেবব্রত বললে, 'এখনই কি? ত দাঁত পড়ে গেছে?'

—'কই? ঘোষালদের ত দাঁত পড়ে নি।'

দেবব্রত বললে, 'আচ্ছা দেব।'

—'আব, এক শিশি তাম্বুল বিহাব?'

—'হ্যাঁ।'

নীহাব ডিবে খুলে অতি সন্তর্পণে আব-একটি পান তুলল, গুনে দেখল বাকি পান বয়েছে আব। বাব দুই গুনল, আবার একবাব গুনতে হচ্ছে তবু। বললে, 'আবো আটটা পান আছে।'

দেবব্রত মুখের ভেতর একটা বীতস্পৃহাব ভাব এনে বুঝিযে দিতে চাইল সে পানে ভাগ বসাবে না।

নীহাব বুঝল কিনা সন্দেহ। একটু উসখুস কবছিল সে।

দেবব্রতকে স্পষ্টাস্পষ্টি পান নিযে সাধছিল না তবু।

দেবব্রত বললে, 'আমি পান খাই না।'

নীহার নিষ্কৃতি পেয়ে বললে, 'খাও না সত্যি?'

দেবব্রত বললে, 'কোনোদিনও না।'

—'সত্যি? তোমার জন্যও ত এনেছিলাম; তাহলে আমি সব খাই?'

দেবব্রত বললে, 'খাও।'

সেদিন এই মেযেটিই বাসরশয্যাব পাশে কাঠ হয়ে বসেছিল? কানুব গান, ব্রজবধূর বিরহ, বাঁশি, ফোঁপানি, সেই আবহাওযা মুহূর্তেব মধ্যেই আবাব এ-বকম রূপান্তরিত হয়ে যায?

দেবব্রত অবাক হয়ে ভাবল-ঘুষ শুধু এক ডিপো পান? আব, একটা ছাপব খাট? দেবব্রত নিজেকে চেযাবে এলিযে দিল। নীহাব পা দুলুতে-দুলুতে বললে, 'আমায বেণী বাঁধতে হবে শোযাব আগে।'

দেবব্রত বললে, 'বাঁধো।'

নীহার বললে, 'তোমাদের সবঞ্জাম বেশ পবিপাটি; দেওযালে কেমন বড় আযনা টাঙানো; কুলুঙ্গিতে চিরুনি, ফিতে, চুলের কাঁটা, বিবন, সিঁদুবের কৌটা, সব বয়েছে, বাঃ!'

নীহার গোটা দুই আরো পান গালে দিযে চিবুতে লাগল; দেখতে সে অসুন্দব নয়; মেযেটি নির্বোধও নয়। দেবব্রত ক্রমে ক্রমে তাব সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

নীহাব বললে, 'উঠি।'
উঠে দাঁড়াল সে।
একটা ধূসব, চন্দনকাঠেব চিরুনি দিযে চুল আঁচড়াতে লাগল; আবশিব পাশে দাঁড়িযে অনেক্ষণ ধবে বিনুনি বেঁধে নিল; তাব পবে বললে, 'বিবন বাঁধব, দেশে ত বেঁধেছি।'
—'বাঁধবাব খুব শখ?' দেবব্রত বললে, 'বাঁধো। বিবন বাঁধবে?'
নীহাব বললে, 'একটা সুন্দব গোলাপি দেখে আমাকে এনে দিও। ফুল পাতা পাখি আঁকা।'
—'বিবন?'
—'হ্যাঁ'
দেবব্রত বললে, 'আচ্ছা।'
নীহাব বললে, 'পাউডাবেব কৌটো কোথায?'
—'নেই?'
—'না ত।'
দেবব্রত বললে, 'পাউডাব এনে দেব কাল তাহলে।'
নীহাব বললে, 'আব দেখ, স্নানেব ঘবে গিযে দেখি একটুও জল নেই।'
—'কখন?'
—'এই ত এই সন্ধ্যেবেলা।'
—'সন্ধ্যেবেলা কলে জল ছিল না?'
—'না, তখন সন্ধ্যেউৎবে গেছে-একটু বাত হযেছে।'
দেবব্রত বললে, 'ও।'
নীহাব বললে, 'ও কী? বিকেলবেলা চৌবাচ্চায জল ধবে বাখা হযেছে। সেই জল কোথায গেল?
দেবব্রত বললে, 'গোলমালে হযত খবচ হযে গেছে। বাড়িতে লোকজন অনেক।' নীহাব ফোঁস কবে বললে, 'খবচ কববে কেন? জানেই ত বাড়িতে নতুন বউ এসেছে।'
দেবব্রত বললে, 'আমাব বাবা মা পিসিমা ঠাকুবমা বুড়োমানুষবা হযত—' নীহাব গজগজ কবে বললে, 'না বুড়োমানুষ ফুড়োমানুষ আমি বুঝি না, গবমেব সন্ধেবেলা গা ধোব-তা একফোঁটা জল নেই; এ কীরকম অনাসৃষ্টি বলো তো।'
দেবব্রত বললে, 'পাড়াগাঁযও গা ধুতে?'
—'কেন নদী ছিল না বুঝি?'
—'যেতে?'
সে কথাব কোনো জবাব না দিলে নীহাব বললে, 'কাল যদি আমি জল না পাই তাহলে ভাল হবে না কিন্তু বলে বাখছি, আমি কাউকে কেযাব কবে কথা বলি না।'
দেবব্রত খানিকক্ষণ নীবব থেকে বললে, 'কলে জল থাকতে-থাকতে না হয এক বালতি লুকিযে বেখ।'
—'এক বালতিতে আমাব কী হবে? লুকিযেই-বা বাখতে হবে কেন? আমি এ বাড়িব বউ না চোব?'
দেবব্রত লজ্জিত হযে বললে, 'না, না-অনেক লোকজন কিনা?'
নীহাব বললে, 'আছে আছে লোকজন; কিন্তু নতুন বউ এসেছে-তাব একটু পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকা উচিত তা এবা বোঝে না?'
দেবব্রত বলবে, 'বোঝে বই কি।'
—'তাহলে?'
দেবব্রত কোনো জবাব দিল না।
নীহাব বললে, 'ওদেব বলে বেখ কিন্তু চৌবাচ্চা ভবতি জল যেন বেখে দেয।'
—'চৌবাচ্চা ভবতি?'
—'তা বই কি, গা বোধ, মাথা ধোব-একজন নতুন বউযেব কত কী দবকাব?'
এসব দবকাব নীহাবকে কে শিখিযেছে-দেবব্রত জানে না· বললে, 'ওদেবও ত কিছু জল লাগবে।'

নীহার বললে, আমি স্নান করে ওদের জন্যে রেখে দেব, আমি কি তেমন অবুঝ যে চৌবাচ্চা ঠনঠন করে ফেলে রাখা, তোমাদের বাড়ির লোকের কাণ্ডজ্ঞান বলিহারি-নতুন বউ এসেছে।'

বলতে বলতে ছাপবখাটেব গদিব ওপব উঠে বসল নীহাব। এই কথাটাকেই সে ঘুরিযে বাড়িযে ক্রমাগত টানতে লাগল।

কথা বাড়িযে একটা নতুন মোড় দেবার জন্যে দেবব্রত বললে, 'বাসরবাতের দিন বাঁশি বাজিযেছিল কে?'

নীহাব গমগম কবে বললে, 'কে জানে কে বাজিযেছিল।'

আজকে সন্ধ্যাবেলায শূন্য চৌবাচ্চার ব্যথা এখনো তাকে বিঁধছিল।

দেবব্রত বললে, 'বাঃ!'

—'বাঃ আবাব কী?'

—'তুমি জানো না? সেই কানুব গানই-বাব গেযেছিল কে?'

নীহাব বললে, 'সেই বাসববাতেব কথা দিযে কী হবে?'

—'কিছু হবে না?'

—'না।'

—'কেন?'

—'ওসব ভুলে যেতে হয।'

—'সত্যি?'

—'সত্যি আব কি? ঢঙ কোবো না, ঢঙ আমাব ভাল লাগে না।'

ঢঙ কববাব কোনো মতলব দেবব্রতব ছিল না; বললে, 'কই আমি ত ভুলতে পাবি নি-'

নীহাব পানেব ডিবেটা আবাব খুললে।

দেবব্রত বললে, 'ভাবি সুন্দব গায কিন্তু-ছেলেটি কে?'

নীহাব একটি-একটি কবে পান খেতে-খেতে বললে, 'ছেলেটি আবাব কি! আমাদেব পাড়াগাঁব চাব-পাঁচজন ছোকবা, ভাল ছেলে, কোনো খাবাপ অভিসন্ধি ত তাদেব নেই। থাকলেও-বা, কি, যখন ভেবেছে আমি বিবাহিত।'

—'চাব-পাঁচজন?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু আমি ত একজনেব গলা শুনেছিলাম।'

নীহাব বললে, 'থাক ও-সব।'

দেবব্রত বললে, 'বলো না।'

স্বামীব সুবেব ভিতব যথেষ্ট ভবসা ছিল; নীহাব একটু সন্দিগ্ধ হযে বললে, 'এখন ত আমি পবেব স্ত্রী।'

—'তখন ত তা ছিলে না।'

—'কখন? যখন বাসব শিযবে এসে বসেছিলাম? যাক গে-এসব কথা ফুবিযে গেছে।'

দেবব্রত বললে, 'ফুবয নি।'

নীহাব বললে, 'আমি ঈশ্বব সাক্ষী কবে বলছি।'

দেবব্রত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কী, বলছ?'

—'চারুকে আমি ভালবাসি না।'

—'চারু কে?'

—'ঐ যে ছেলেটি গেযেছিল।'

দেবব্রত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হযে বসে বইল।

বাস্তায এক সাব গ্যাসলাইট দেখা যাচ্ছে-আকাশে গুটিকযেক তাবা। রাত হযত অনেক হযেছে। দেবব্রত বললে, 'ঐ ব্রজবধূব গান গেযেছিল সেই ছেলেটি কি?'

—'হ্যাঁ।'

—'বযস কত?'

—'উনিশ-কুড়ি।'

—'*এখনো পাড়াগাঁয় থাকে কেন?*'

—'পাড়াগাঁয় গবমেব ছুটিতে গিয়েছিল, কলকাতাব কলেজে পড়ে।'

একটু পবে দেবব্রত বললে, 'বাধাব গান তুমি গাইতে বলেছিলে— না নীহাব?'

নীহাব বললে, 'মনে নেই।'

—'শ্যামেব গান?'

নীহাব কিছুই জানে না, চারু বা বাসববাত সম্বন্ধে তাব একটুও কৌতূহল নেই।

দেবব্রত বললে, 'অনেক বছব ধবে ত তাকে ভালবেসেছ।'

নীহাব বললে, 'তখন আমি ছোট ছিলাম।'

—'ভালবাসাটা চলেছিল তোমাব বিয়ে অবদি ত?'

নীহাব চুপ কবে বইল।

দেবব্রত বললে, 'বিয়ে কবেই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলে?'

নীহাব বললে, 'বাঃ, এখন আমি গিন্নি যে, ঘব-সংসাব ছাড়া, বাস্তবিক এখন কোনো দিকেই আব আমাব মন নেই।'

এক-আধ মিনিটি চুপ কবে থেকে দেবব্রত বললে, 'গিন্নিদেব মন আব কোনোদিকেই যায় না?

নীহাব বললে, 'না।'

—'এই ঘবেব ভিতবেই থাকে শুধু?'

নীহাব ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

—'বাপেব বাড়িব কথা মনে হয় না?

—'বাঃ, বাপেব বাড়িব কথা ভুলে যাব নাকি?'

—'চারুদেব কথা?'

নীহাব বললে, 'বাবা, পেয়ে বসেছে এক চারু! চারু! আমাকে হযবান কবে ছাড়বে দেখছি। ভাবি ত মটকা মেবে শুযে পড়েছিলেন-যেন মড়াব ধড; ওদিকে মিটমিট কবে সব তাকিযে দেখা হচ্ছিল।

দেবব্রত বললে, 'কী বলছ?'

—'বলছি আমাব মুণ্ডু! কে আবাব? কী বলব আবাব? দেখ নি তুমি? আমাব গা ছুঁয়ে বল ত?'

কেউ কারু গা ছোঁযাতে গেল না। ছাপবখাটেব গদিব ওপব বসে থেকে বুকে দু'টো নবম বালিশ. টেনে নিযে নীহাব বললে, 'কে জানে দেখেছ কি না, কিন্তু না দেখলেও তোমাকে বলা উচিত, সবই বলা উচিত।'

নীহাব বললে, 'তোমাকে সত্য কথাই বলছি। বিযেব বাত অবদি এই ছ'টা বছব চারুকে আমি ভাইযেব মত ভালবেসেছি।' খানিকটা পানেব পিচকি ঝেড়ে ফেলে বললে, 'যখনই চারু আমাকে আদব কবে জড়িয়ে ধবে চুমো খেতে যেত তখনই আমি তাকে বলেছি; আমি না তোমাব ছোট বোন?

—'কিন্তু বোনকেও ত চুমো খায মানুষে।'

—'কিন্তু তবুও সে আমাকে খায নি।'

—'খাবাব ইচ্ছে ছিল যথেষ্ট।'

—'কিন্তু আমাব একটুও ভাল লাগত না।'

নীহাব পান চিবুতে-চিবুতে বললে, 'কিন্তু বিযে শেষ হবাব পব সেই বাতে অনেকক্ষণ সে আমাব পিছ পিছ নিল।'

নীহাব বললে, 'কেন জান? আমাকে ভালবাসাব কথা বলবে-আদবেব কথা বলবে, সেইজন্যে, কীবকম বেল্লিকপনা-দেখ ত-আমাব বিযে হয়ে গেছে সেই বাতেও! অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ কবে নীহাব-ভুরু কুঁচকে উঠল। তাবপব না-না কবে হেসে বললে, 'কিন্তু এক ঘব কন্যাপক্ষীযদেব মধ্যে চারু কোনো ফাঁকই পেলে না; কেমন জব্দ হল বল দেখি।'

দেবব্রত আন্দাজ কবছিল।

দেবব্রত বললে, 'চারু কি অনেকেব সঙ্গেই ফ্লার্ট করে?'

—'ফ্লার্ট মানে কি?'

—'প্রেম কবে বেড়ায?'

নীহার বললে, 'না।'

—'সত্যি জানো তুমি?

নীহার বললে, 'ও আমার পেছনেই লেগেছিল।'

দেবব্রত বললে, 'ছেলেটির কিন্তু মেয়ে পটাবার খুব ক্ষমতা আছে।'

—'বিয়ের পরও আমাকে যা পটাবার চেষ্টা!'

—'কেন? ছ-বছর বসে হল না?'

নীহার বললে, 'তা হবে কী কবে? আমি ত বরাবরই ওকে বলেছি যে আমি ওকে ভাইয়ের মত ভালবাসি।'

দেবব্রত বললে, 'ভাইযের মত ভালবাসা ত মানুষ নিজেব বোনেব কাছ থেকেই পায়; সে ভালবাসায় অবসন্ন হযে মানুষ অন্য জাযগায যায়।'

নীহাব বললে, 'তাহলে আমায কী করতে হবে?'

দেবব্রত বললে, 'তোমাকে সে একটু আলাদা করে পেতে চেয়েছিল হযত!'

—'চাইলেই পায়? তাহলে ত ওকেই বিযে করতাম।'

—'করলেই ত পারতে।'

—'চারুকে? বিযে?' নীহার হতভম্ব হযে বসে রইল।

দেবব্রত বললে, 'কেন, সে কি মানুষ নয?

সব প্রেমিকারাই কিছু একটা কবে থাকে-আমি প্রেম বুঝতাম না, তুমিও না-আমরা তাই শাদাসিধে স্বামী-স্ত্রী আছি।'

নীহার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'চারুকে আমি ছ-বছব ভালবেসেছিলাম ঠিক ভাইযের মত; কিন্তু সে চেযেছিল আমি তার স্ত্রী হই; কিন্তু আমি জানতাম পাড়াগাঁয আমি বিযে করব না।'

দেবব্রত বললে, 'কেন?'

নীহার নাক সিঁটকে বললে, 'এ-রাম, চারুদের সেই খোড়ো ঘব; আব একটা ধিঙ্গি ধ্যাড়ধেড়ে মাগী দিনবাত হাঁড়ি ঠেলে-সে হত আমার শাশুড়ি। যেই না বউ হযে যেতাম-আর একেবাবে পেযে বসত আমাকে-কাকে যেমন কবে ময়নার বাচ্চা ঠোকবায।'

ঠোঁট উলটে বললে 'তারপর আব কি-দিনবাত হাঁড়ি -হেঁসেল সামলাতে-ভাতেব ফ্যানে পা পুড়ে যেত, উনুনের আগুনে মুখ পোড়া। সে কপালপোড়া অদৃষ্ট নিযে যে জন্মেছে সে জন্মেছে। জন্মাব আমি?'

দেবব্রত বললে, 'কেন এখানে তুমি রাঁধবে না?'

—'আমি কেন রাঁধতে যাব-একটা বামনি ত টিকটিক কবছে দেখলাম।'

দেবব্রত বললে, 'তা আছে কি বামুনদিদির এক-আধদিন ত অসুখও কবতে পাবে।'

নীহাব মুখ কাঁচুমাচু করে-'বাড়ি ঢুকতে না-ঢুকতে বান্নার কথা?' দেবব্রতকে সাবধান করে দিযে বললে, 'উনুনের ধোঁযা আমার সহ্য হয না আগেব থেকে বলে রাখছি। আমার বড্ড কাঁচা শরীর। সুন্দরীদের যা হয়-কষ্ট করবার ধাত নেই। সবদিকই হবে কি করে? সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই-আবার রান্নাবাড়িও চাই-তা কি কখনো হয!'

বলতে-বলতে ঘুমিযে পড়ল নীহাব।

ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছিল।

দেবব্রত অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

তারপর একটা বাতি অন্ধকার করে ঘুমন্ত বধূকে আদর কবতে গিযেই বাতিটা তৎক্ষণাৎ জ্বালিযে ফেলতে হল দেবব্রতকে।

নীহার বললে, 'ভাল হবে না কিন্তু বলে রাখছি-তুমি আলাদা বিছানায শোও গে।'

কুষ্ঠের স্ত্রী

সে অনেক আগে। প্রায কুড়ি বছব আগে সুশোভনেব মুখ জাযগায জাযগায আগুনে পুড়ে গিযেছে। সেই থেকে কযেকটা বিশ্রী দাগ ধবলকুষ্ঠেব ছোপেব মত এমন নিটোল মুখখানাকে মানুষবে চোখেব দৃষ্টিব সামনে লাজুক ব্যথিত কবে বেখেছে। লম্বা ছিপছিপে ছোকবাটি। ফবশা বঙ। নাক-চোখ-ঠোঁট সবই তাব সুন্দব ছিল। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই ধবলগুলো কুষ্ঠেব দাগ বলে প্রতিভাত হযে এই পোড়াঘাযেব ছাপ ছাপ দাগগুলো চেহাবাব দব অনেকখানি কমিযে দেয।

কিন্তু তবুও শধু দৃষ্টি দিযে উপভোগ কববাব পক্ষে এ মুখেব সৌন্দর্যেব আকর্ষণ এখনো ঢেব প্রবল। একেবাবে সহানুভূতিহীন হযে মানুষেব মুখেব দিকে তাকানো যাদেব অভ্যাস তাবাও প্রথম ধাক্কাটা আসলে একটু বিমুগ্ধ হবাব পক্ষ পায। আব যাদেব সহানুভূতি আছে প্রথম থেকেই এ মুখেব কুহক তাবা উৎবাতে পাবে না। কিন্তু তবুও এই রূপেব আশাহীনতাব জন্য সুশোভনেব ভাল ভাল সম্বন্ধ সব ফসকে যাচ্ছে—অনেকদিন থেকেই গেল।

কন্যাপক্ষদেব যতই বোঝানো যায এ পোড়াঘাযেব দাগ শুধু, আব কিছু নয, তাদেব কিছুতেই বিশ্বাস হয না, কেন মিছেমিছি জেনেশুনে একটা কুষ্ঠবোগগ্রস্ত ছেলেব কাছে মেযে দেবে তাবা। গঙ্গাযাত্রীব কাছে কন্যা বিসর্জনেব মত এও এক নিদারুণ তামাশা। বাপ-মা থেকে কন্যাব নিজেব আপাদমস্তক শিহবিত হযে ওঠে যেন।

সুশোভন সম্ভ্রান্ত ঘবেব ছেলে। টাকাকড়িব অভাব তাদেব নেই, সংসাবেব শান্তি, সদ্ব্যবহাব বুদ্ধিবিচাব অমাযিকতাব জন্য এদেব পবিবাব প্রসিদ্ধ। মজুমদাবদেব বাড়িব প্রতিটি মানুষেব চেহাবাই এই ছাঁদে শ্রদ্ধাবান কুমোবেব হাতেব তৈবি মূর্তিব মত যেন। চেহাবাব উৎকর্ষে শুশভবনই এদেব মধ্যে সবচেযে নিখুঁত হযে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তবুও সময সময দেবতা তাকে নিযে এমন মজাব খেলা খেলল।

বিযে কবতে এ ছেলেটিব কোনো অসাধ ছিলনা। এবা সুন্দবেব বংশ। অনেক থেকে নানাবকম বিলাস লালসা সৌকুমার্যেব চর্চা কবে এসেছে। বক্তেব ভিতব কেমন একটা কমনীয আকাঙক্ষা বযে গেছে এদেব গ্রহণেব ভিতব বিবশ আবেশ কিছুতেই যা [....] পাবা যায না। জীবনেব শূন্যতাব মানে সুশোভন স্পষ্ট কবে বোঝে নি কোনোদিন। সে জিনিসকে স্বীকাব কবতে চায নি কোনোদিন।

অবিশ্যি এদেব বক্তেব সুকুমাবতা ববাবব শৃঙ্খলাব ভিতব দিযে ধবাবাঁধা স্বাভাবিক কঠিন বিধিব পথ কবে চলেছে। সুশোভনেবও আকাঙক্ষা কোনোদিন লাম্পট্যে গড়ায নি গিযে, না অত উষ্ণ হযে ওঠে নি হৃদয। কিন্তু নিজেব সংকীর্ণ রুচি অনুমোদিত সীমাব ভিতব সৌন্দর্যকামনাই তাব সব হল। কিন্তু তুবও এই সচ্চবিত্র হৃদয মনেব সৌন্দর্যাভিমানী অমাযিক সুবংশেব ছেলেব জন্য কোনো উপযুক্ত মেযে জুটছে না। একটু মৃদু বঙেব উচ্ছ্বাস সুশোভনেব, তবলা ও মদেব হইচইযেব থেকে বিচ্ছিন্ন দূব এস্রাজবাদিনীব অভিনিবিষ্ট প্রাণেব মত।

কালো কদাকাব মেযেদেব পক্ষ অবশ্য বাজি। কিন্তু বিবাহ কববাব যথেষ্ট স্পৃহা থাকলেও কদর্যকে বিযে কববে না কখনো সুশোভন। তাব চেযে সে ববং নাবীহীন জীবন কাটাবে।

সে জিনিসটা বড় কঠিন সুশোভনেব পক্ষে। এই কঠিনতাব বিরুদ্ধে পাঁচ-সাত বছব ধবে লড়াই কবে এসেছে সে, আজও কবছে। কখনো-বা চিন্তাব্যথাযুক্ত উদাস মানুষ হযে একটা একাকী জীবনেব কঠোব নিস্তব্ধতাকে স্বীকাব কবে নিযে কখনো-বা নতুন নতুন সম্বন্ধেব ব্যবস্থা দেখে একটু আশাভবসা মনে পুষে।

এ বছব কটিব ভেতব ইউনিভার্সিটিব অনেক বড় ডিগ্রি পেযে যায সে। আবো কান্তিমান হল। গভীবতব ভাবে পুরুষ হযে উঠল। নানাবকম অভিজ্ঞতা বিচাব কল্পনায সম্পদশালী হল। কিন্তু তবুও সুপাত্রী জুটল না। অবশেষে মেযে পাওযা গেল।

মেযেটি দেখতে খুব নিখুঁত সুন্দবী নাহলেও মুখে একটা লাবণ্য আছে বলে বোধ হয। মেযেটিব মা-বাপ-খুড়ো-জ্যাঠা কেউ নেই। একটি ভাই আছে, অতসীব চেযে দু-এক বছবেব ছোট সে। যে

মামার আশ্রয়ে অতসীরা ছিল, তিনিও হাঁপানির মানুষ, নিরেট অসচ্ছলতার ভিতর দিয়ে মেয়েটিকে তিনি কিছু কিছু শিখিয়েছেন। লোকটার মন খুব কৃতার্থপরায়ণ। মেয়েটি এই পরিবারের উপযুক্ত হবে কিনা এই ভয়েই তার প্রাণ একবার আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সুশোভনের মুখের দিকে তাকিয়ে পুরু পাথরের চশমা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে কি যেন মনে হয় তার। আগুনেও যে এমন বিশ্রী দাগ রেখে যায় তা তিনি জানেন, বিশ্বাস করেন।

বিয়ের রাতে সমস্ত মুখ ভরে ফোঁটা ফোঁটা চন্দন মেখে সুশোভনের মুখখানা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অতসীর খুব ভাল লাগল।

পরদিন ভোরবেলাও চন্দনের দাগ মুখে নিয়ে সুশোভন বসেছিল। অতসী এসে বললে, 'ওগুলো ধুয়ে ফেলবে না?'

সুশোভন মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

—'কেন?'

—'থাক না।'

সুশোভনের মুখের চন্দনের ফোঁটাগুলো অতসী নখ দিয়ে খুঁটছিল। সুশোভন বাধা দিয়ে কোমলভাবে বললে, 'থাক।'

অতসী ঠোঁট উলটে বললে, 'ও মা একি উদাসী বৈরাগী মানুষ, এক গা ফোঁটা তিলক নিয়ে বসে আছ, দেখতে এমন বিচ্ছিরি—'

কিন্তু তবুও সুশোভনের মুখখানা ভাল লাগছিল তার, সে আর চন্দনেব প্রলেপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কবতে গেল না।

বিয়েবাড়িব কোনো ধুমধাম নেই। লোকজন একেবাবেই শূন্যও। কলকাতাব একপ্রান্তে একটা ছোটখাট ভাড়া বাড়ির জীর্ণ মণ্ডপের থেকে ভোব না ফুরতেই বউকে নিয়ে নেবুতলায় নিজের বাড়িতে চলে এল।

ববের বাড়িতে গণ্ডগোল বিশেষ ছিল না। সারাদিন বউ ভিতব বাড়িতে। সুশোভনেব সঙ্গে দেখা হয় নি তাব। সন্ধ্যাব মুখে মেয়েদের মধ্যে চৌবাচ্চার জলে খুব নিভৃতভাবে স্নান কবে সুশোভন স্নানের ঘবে টাঙানো আরশিতে নিজের মুখখানা দেখছিল। চন্দনেব সমস্ত দাগ মুছে গিযে পরিষ্কার মুখখানা বেবিযে পড়েছে। দাগগুলোকে এক-একবার মনে হয রঙেব সঙ্গে মিশে গিযেছে যেন, এক-একবাব তবু কেমন খচ করে ওঠে। সমস্ত সংকল্প সাধ স্বপ্ন কাহিল হয়ে যায়। মৃত হযে থাকে। এমন হল কেন!

সুশোভন প্রসাধন কবে বেরিযে যাবাব আগে আরশিতে মুখখানা আব-একবার দেখল, থুতনিব নিচ দিযে গলা অবদি যে দাগটা গিযেছে সেটাকে উপেক্ষা কবতে পারা যায, জুলফিব পাশেব দাগটাও খুব সরু আব লম্বা। চুলে খানিকটা ঢাকা পড়ে। এও যেন কোনো অপরাধ করে নি। কিন্তু কপালেব বাঁ পাশেব আর ডান চোযালেব দাগদুটো নিযে এমন বাজশ্রী মাথা মুখখানা কিছু যেন করে উঠতে পাবছে না।

সুশোভন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল কিন্তু বন্ধুরা ত তাকে খুব ভালবাসে। তাব সৌন্দর্যেব খুব প্রশংসা করে। এ দাগগুলোব ইতিহাস তারা একবার শুনেছে শুধু, তারপর ভুলে যাচ্ছে। মনে কবে বাখবার মত এ দাগগুলো নয নিশ্চযই চোখে পড়বাব মতও নয। তার নিজের প্রখর মার্জিত রুচি বলেই হযত একটু বাধে, নিজেব মুখের দাগ বলেই সে একটু অস্বস্তি বোধ কবে।

সুশোভন আবশিব দিকে আর তাকাল না। মনটা তার শান্ত হযে গেছে। অতসী নাবী, নারী শুধু নয, সুশোভনের বধূও সে। এ দাগগুলো দু-এক মুহূর্তের জন্য [...] বা তার চোখে একটু আঘাত দেয পবক্ষণেই। সে তা ভুলে যাবে। তাবপব সাবা জীবনেব মাযামমতার ভিতর এ দাগের কোনো স্থান থাকবে না আর অতসীর ভালবাসার চোখে। তার চোখেব করুণা দাক্ষিণ্য প্রেম দিয়ে ধুয়ে মুছে স্বামীর মনেও ওই দাগেব কথা আর জানতে দেবে না অতসী এ দাগেব জন্য এ দাগের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কোনো বেদনা বোধ করতে দেবে না।

পিসিমাব হাতে লুকিয়ে নীরবে খেযে শোবার ঘবে ঢুকল সুশোভন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়, ঘর অন্ধকার।

অতসী আসে নি তখনো।

সুশোভন হাতপাখাটা নিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস খাচ্ছিল। একটু তন্দ্রামগ্ন হযে, চটকা ভাঙতেই দেখল অতসী দাঁড়িয়ে তার মুখের দিতে তাকিযে আছে।

সুশোভন অস্বস্তি বোধ করে বলল, 'কী দেখছ?'

অতসী বললে, 'খুব রূপের অহঙ্কার হয়েছে বুঝি।'

সুশোভন উঠে বসল। এ মেয়েটি তার মুখের রূপ ছাড়া আর কিছু দেখছে না। নারীর প্রকৃতিই এই, এমন কোমল।

সুশোভন একটা পরম শান্তি বোধ করে বিছানার উপর উঠে বসল। প্রেমের জীবন, পরিণয়ের জীবন সার্থক হয়েছে তার, একটি সহানুভূতি গভীর সাধ্বীকে পেয়েছে সে।

এই কঠিন বাস্তব পৃথিবীতে কত কি দুর্ভোগ কপালে জুটতে পারত। সুশোভন বললে, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

হাত বাড়িয়ে টেনে অতসীকে কোলের ওপর এনে বসাতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তবুও এ পরিবারের ছেলেরা আদবকায়দা বহুক্ষণ অবধি রক্ষা করে।

অতসী খানিকটা দূরে একটা কুশনে বসে পান চিবুতে চিবুতে বললে, 'আমার বর ভাগ্য খুব ভাল।'

সুশোভন প্রীত হয়ে বললে, 'সত্যি?'

অতসী বলবে, 'হ্যাঁ তাই ত বল্‌সে।'

সুশোভন একটু চমকে উঠে বললে, 'বললে, কে বলেছে?'

—'কেন সবাই?'

সুশোভন একটু গম্ভীর হয়ে বললে, 'কারা শুনি?'

—'তোমর পিসিমা খুড়িমা ঠাকুরমা—এ বাড়িতে খুব লোকজন আছে। বাবা, এমন সাত সংসারের মানুষ পৃথিবীতে দেখি নি কোনোদিন।'

সুশোভন চুপ করে ছিল।

অতসী বললে, 'বাপরে বরের বাড়িতে আবার বরের এত সুখ্যাত এমন ফ্যাকড়া ত কোথাও দেখি নি কোনোদিন।'

সুশোভন বললে, 'তোমার সুখ্যাত করেছে।'

অতসী বললে, 'থাক, তোমার আর অত ভদ্রতা করে দরকার নেই, যাদের হাতে সে ভার ছিল তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছি।' বললে, 'নিন্দাস্তুতি আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে।'

সুশোভন বললে, 'মেয়েমানুষের প্রশংসা মেয়েরা আড়ালে করে।'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অতসী বললে, 'সাধ করে ত আর এর বাড়িতে আসি নি।' অতসী থামল।

সুশোভন একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বউয়ের দিকে তাকাল।

অতসী বললে, 'বাপ-মা নেই বলেই ত।'

সুশোভনের বুকের ভিতর একটু ছ্যাৎ করে উঠল। এ মেয়েটি তাহলে একদিন স্বামীঘর করতে এসেই অবসন্ন হয়ে পড়েছে। যদি হয় সে, সুশোভন কি করতে পারে? সুশোভনকে নিয়ে ব্যথিত তিক্ত হলে এ মেয়েটিকে কোনো অপরাধ দিতে পারবে না ত সে। যে-কোনো সাধারন স্বাভাবিক মেয়েই হয়ত এমন হত, কে জানে এ মেয়েটির রুচি হয়ত আরো ঢের শৌখিন তারে বাঁধা। জীবনের কাছ থেকে মেয়েটি হয়ত ঢের আশা করছিল, সে-সব আকাঙ্ক্ষা সাধ তার অন্যায্য নয়, সেই সব তৃপ্ত করবার জন্য উপযুক্ত কল্পনাবুদ্ধি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা রয়েছে ত অতসীর।

অতসী বললে, 'আমাকে যদি মনে না ধরে তাহলে আনতে বলেছিল কে? আমি কি সেধে এসেছি?'

সুশোভন বললে, 'তোমাকে মনে ধরে নি আবার কার? ভাল লেগেছে বলেই ত তোমাকে আনলেন।'

অতসী বললে, 'জানি না তোমার জ্যেঠামশায় আমার মামার কাছে কদ্দিন উপোস মেরে ধরনা দিয়ে পড়েছিলেন। তোমাদের বাড়িসুদ্ধ গলবস্ত্র হয়ে দিনের মধ্যে কতবার হাত-পায় গিয়ে ধরত মনে আছে'

সুশোভন ঘাড় হেঁট করে এই অতিরঞ্জনটুকু গ্রহণ করল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত কোনো একটা উত্তেজনা বা অভিমানও তার মনের ত্রিসীমানায়ও ছিল না। অতসীকে বরং তার নিজের বক্তব্যটা যত খুশি রঙ চড়িয়ে বলতে দেবে সে—তারপর কোনো প্রতিবাদ করবে না আর। মেয়েটি তাকে ভালবাসলেই হল। নারী পুরুষকে যে-রকম করে ভালবাসে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্ত্রীর ভালবাসা

স্বামীর জন্য, তাতেও সুশোভনের প্রাণ ভরে উঠবে।

অতসী বললে, 'আমাদের মত ছোট মন নয় তোমাদের বাড়ির গিন্নিদের মত, মামার কাছে হাতে-পায় ধরে পড়লে তিনি কাউকে অগ্রাহ্য করেন না। মামা আমার দেবতা।'

সুশোভন ঘাড় হেঁট করে শুনল। হয়ত স্বীকার করল।

অতসী বললে, 'তোমার কাকা জ্যেঠামশাইদের চেয়ে তিনি ঢের উঁচুতে। আর তোমাদের বাড়ির গিন্নিদের স্বভাবচরিত্র যেন ছোট জেতের মত।' অতসী নাক-চোখ মোলায়েম করে বললে, 'আমার মা মাসিমারাই-বা কেমন ছিলেন, যেমন ভগবতীর মত চেহারা তেমনি দশ হাত খোলা প্রকৃতি।'

সুশোভন মৌন শ্রদ্ধা দিয়ে বিশ্বাস করল। এমন রূপ মাধুর্যের দাবি ভাল লাগল তার।

অতসী বললে, 'উঁচু জেতের সুন্দর মেয়ে ছাড়া তুমি নাকি বিয়ে করবে না, এত অহঙ্কার কেন তোমার?'

সুশোভন বললে, 'তা তোমাকে কে বলেছ?'

—'শুনলাম।'

—'কার কাছে?'

সে কথাব জবাব না দিযে অতসী বললে, 'অনেক নাকি খুঁজেছিলে?'

সুশোভন চুপ কবে বইল।

অতসী বললে, 'আমাব মামা হাঁপিকাশেব মানুষ বলে, ঘরেব এক কোণে পড়ে থাকেন বলে—'

সুশোভন কি যেন কি শঙ্কা কবে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

অতসী বললে, 'নইলে তোমাদেব মত আকাশ-পতাল খুঁচিয়ে মেয়ে যদি খুঁজতে পারতেন তাহলে আমার মামাতো ভাইটার কপালে কেমন লক্ষ্মীর মত বউ জুটত।'

সুশোভন যা আশঙ্কা কবেছিল, তা নয়, কেন সুশোভনের জন্য এত সম্বন্ধের চেষ্টা দেখা হযেছে, কেন এত খসে গেছে, অতসী সেসবের কিছুই জানে না। এ বাড়ির কেউ হযত অতসীকে বলেছে যে অনেক মেযে খুঁজে তারপর অতসীর সঙ্গেই বিযে ঠিক হল। এই মেযেটির মনেও বড়াই অভিমান তাইতে হযত খানিকটা তৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু সুশোভনেব আগাগোড়া ইতিহাসটুকু এ মেযেটি কিছুই জানে না। কে তাকে জানাবে? জানিযে লাভই-বা কি?

অতসী বললে, 'আমাব মামাতো ভাইটার তাই আর বিয়ে হল না।'

সুশোভন বললে, 'হয নি বিয়ে?'

—'কি করে হবে? কেই-বা দেবে, কেই-বা খোঁজে।'

—'ছেলেটির বযস কত?'

—'বেশ বিয়ের সোমথ বযস, এমন সুন্দর নাক-মুখ চেহারা, আমাদেরই বংশের।' সুশোভন বললে, 'কই তাকে ত দেখলাম না কাল।'

—'থাকে নাকি আবার এখানে? বাপের সঙ্গে বনলে ত।'

—'কোথায় থাকে তাহলে?'

—'বাজে শিবপুরে তার দিদিমার কাছে।'

সুশোভন বললে, 'ও!'

অতসী বললে, 'আমাব বড় দুঃখ লাগে দাদার জন্য, এমনি বিয়ে করতে ইচ্ছে তার—'

সুশোভন বললে 'কী করে কাজ? কাজটাজ কিছু করে?'

অতসী বললে, 'করবে কী আবার! দিদিমার টাকা আছে কত, নাড়ে চাড়ে খায়।'

সুশোভন বললে, 'বাঃ তাহলে ত বেশ বিয়ে হতে পাবে।'

অতসী বললে, 'তুমি কোনো কিছু শোন না গো।'

সুশোভন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'কেন?'

অতসী বললে, 'বললাম না হাজারবার করে তোমার না হয জ্যেঠামশায় খুড়োমশাই একশ রকম চর আছে, আমার দাদার কে আছে, পটপট করে এত মেয়ে খুঁজবার জোগাড়-জাগাড়ও আমাদের নেই। আমরা ভালওবাসি না। আমার এমন সুন্দর ভাইয়ের বিয়ে হল না আহা তাই।' একটু পরে, 'কিন্তু তোমাকে বলে আর কি হবে? তোমার তাতে কি এসে যায়?' বলতে বলতে অতসী বিছানার চাদরের

ওপব নাগবাইসুদ্ধ একটা পা তুলে দিযে বললে, 'বাবা বসে বসে কোমব ধবে গিযেছে।'

ভাইযেব জন্য আব কোনো ক্লেশ নেই তাব। ক্লেশ যা তা প্রকাশ কবা হযে গেছে। এখন সে নিযুক্ত। সুশোভনেব এই সুন্দব ঘবটাকে চোখ-নাক, সমস্ত লোলুপতা দিযে উপভোগ কবছে সে। পবিষ্কাব শয্যাব থেকে পা-টা নামিযে ফেলে বললে, 'বাবা এবই মধ্যে নাগবাইযেব ছাপ পড়ে গেল চাদবে, একটা সুজনি দিযে বিছানটা ঢেকে বাখলেও ত পাবতে।'

সুশোভন বললে, 'আমি শুযেছিলাম।'

এমন ঘবে এই মেযেটি কোনোদিন থাকে নি। এবকম দেখেই নি হযত। এই খাট মশাবি দেবাজ, আবশি, ছবি, এলবাম, মেহগিনিব টেবিল চেযাব তেপয, শেলফ, মবক্কো লেদাবেব বাঁধানো পবিপাটি বইগুলো সমস্তই তাব কল্পনাব বাইবে। এ ঘব সাজাবাব রুচিও তাব অবিদিত। কোথায কোন জিনিস বাখতে হয মানাতে হয সেসবেব কিছুই বোঝে না অতসী। লোলুপতা চোখে চাবদিক তাকাচ্ছে সে। এ ঘবেব উপকবণ, আযোজন ব্যবস্থা সবই যেন তবু তাব, তাবই অধিকাবেব ব্যবহাবেব জিনিস শুধু, সুশোভনেব সমস্ত আযত্ত জিনিস দখল কবে নেবাব জন্য এ মেযেটিব প্রাণ যেন একদিন ছটফট কবছিল, নিজেবই কবতলে এসব বিচিত্র জিনিস পেযে গেছে এখন সে, তাই কেমন একটা বিবশ অহঙ্কাব আবেশ পেযে বসেছে তাকে।

অতসী বললে, 'এই নাগবাইটা বেশ দামি বলে মনে হচ্ছে, কত নিলে?'

সুশোভন বললে, 'জানি, না।'

অতসী বললে, 'কেন, বিযেব জিনিস তুমি কেন নি?'

সুশোভন মাথা নেড়ে বললে, 'না।'

অতসী বললে, 'কেন, টাকা তোমাব নয?'

সুশোভন ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

অতসী উত্তেজিত হযে বললে, 'টাকা তোমাব, তবে আবাব জিনিস কিনল কে?'

সুশোভন বললে, 'যে যেটা পেযেছে, কিনেছে।'

অতসী বললে, 'তুমি কোনো হিসেব বাখ নি?'

—'না।'

অতসী চোখ কপালে তুলে বললে, 'এইবকম কবে বুঝি তুমি টাকা নষ্ট কব। আমি আব এমন হতে দিচ্ছি না। অন্যেব টাকা যে-যা খুশি করুক গিযে। কিন্তু তোমাব টাকায আমি কারু হাত দিতে দেব না।' সুশোভনেব টাকাব বাক্স আজই যেন সমস্ত বুক দিযে চেপে ধবেছে এই মেযেটি, সুশোভন আজীবন যত উপার্জন কববে তাব একটি পযসাবও হিসাব অতসীকে দিতে হবে। এই মেযেটিব কল্পনা ইচ্ছা প্রবৃত্ত, জীবনেব দযাদাক্ষিণ্য লালিত্য ও মাধুর্য জিনিসগুলোকে কতখানি বাঁচিযে বাখতে দেবে সুশোভনকে?

সুশোভন শুধু ভবসা কবতে পাবে। গভীবভাবে আশা কবে অতসীব কাছ থেকে অনেকখানি পাবাব জন্য অস্থিব হযে সে বইল।

এই মেযেটি তাব স্ত্রী। জীবনে বধূর্দেব ন্যায্য দাবি আছে, সুশোভন তা অস্বীকাব কবতে পাবে না। এই মেযেটিব আবদাব হযত এমনতব যাব পবিধি পেবিযে যাবে। শুভোভন শান্তি চায, বউকে সে অনেকখানি ছেড়ে দেবে। কিন্তুএ মেযেটি তাব প্রেমেব সদ্ব্যবহাব কববে বলেই বোধ কবে সুশোভন।

কথায কথায বাত হযে পড়েছে।

ঘবে কোনো আলো নেই। গবজ কবে সুইচটাও টিপে দেয নি কেউ। প্রযোজনও ছিল না। অন্ধকাবেই কথা চলেছে দুজনেব। গবমেব দিনে অন্ধকাবটাই ভাল লাগছিল। স্নিগ্ধ বাতাস আসছে।

বাতি আব জ্বালানো হল না।

এদেব কক্ষেব কাছে কেউ আব এল না। বিযেব পবে স্বামী-স্ত্রীব এই প্রথম কথাবার্তাব সম্ভ্রম ভাঙবাব দবকাব হযত কেউ বোধ কবে নি। কিংবা কি যেন কেন আসছে না ত কেউ; সুশোভন অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তাব খুড়তুতো জেঠতুতো বোনবাও কেউ এল না। কেন এল না? সুশোভনকে তাবা ভয কবে না, ভালই বাসে, নতুন বউদি দিযে দাদাব ঘবে এসে আব একটু ফুর্তি কবলে পাবত যেন তাবা, সেটা উচিত ছিল যেন।

কিন্তু সন্ধ্যাব থেকেই বাড়িটা যেন এদিক থেকে সবে বযেছে। পিসিমা জেঠিমা কাকিমাবা কেউ

এলেন না। ঠাকুমা দুপুরবেলো কালীঘাটে গিয়েছেন। আজ কেন গেলেন? এখনো কি ফেরেন নি?

ঘরটা অন্ধকার হয়েই বইল।

অতসীর প্রাণে দেহজাত কামনা বিশেষ নেই। সুশোভনও খুব সংযমী ছেলে। অনেক গভীব পরিচযের পর বাঁধ ভাঙবার নির্দেশ আসে, কিন্তু তখনো সে দূবে সরে থাকে, এই পরিবারসুলভ সহজাত একটা অভিমান রযেছে তার। প্রথম তাকে আদর কর, ব্যবহার কবতে যাও, তারপর সে তোমাকে অভিভূত করবে।

দুজনেরই ঘুম পেয়েছিল।

একটা মস্তবড় ছাপড়খাটে সারারাত দুইজনে পাশপাশি অন্ধকারে ঘুমল, কারু দেহেব কোনো কড়ে আঙুল দিযেও কেউ কোনো প্রযোজন বোধ কবল না। আজ রাতে তেমনতব প্রযোজন এদেব কাবো মনেব ভিতরেই অধীর হযে জেগে ওঠে নি।

শান্ত নির্বিবাদ ঘুমেরও কোনো বাধা হয নি।

পবদিন ভোরবেলা অত্যন্ত রূঢ় ধাক্কা খেযে জেগে উঠল সুশোভন। তাকিযে দেখে অতসী নাকমুখ সিঁটকে তাব দিকে চেযে আছে। অতসীব মুখটাও দেখতে কেমন বিশ্রী বোধ হচ্ছে, কাকেব বাসার মত এক মাথা চুল, চোখে পিঁচুটি, জল, পানেব কসি রঙ দাঁতে, জিভে, ঠোঁটটাকে যেন পুরু করে ফেলেছে। সমস্ত মুখটা বুড়োমানুষেব মত ঝুলে পড়েছে যেন। মেযেটি কটমট কবে সুশোভনেব দিকে তাকিযে।

সুশোভন বলল, 'কী দেখছ?'

'এগুলো কি সব তোমাব মুখে?'

সুশোভনেব বুকের ভিতব ঢিবঢিব কবে উঠল। সে উঠে বসল।

অতসী ভযে বিরক্তিতে বললে, 'এসব কীসেব দাগ?'

সুশোভন কাপড় দিযে মুখেব ঘাম মুছে ফেলে বললে, 'কেন, খুব ফকফক করছে নাকি?'

অতসী বললে, 'এ কি চন্দনেব দাগ নাকি?'

সুশোভন বললে, 'না।'

—'তবে কি, কিছু মেখেছ-টেখেছ নাকি?

সুশোভন বললে, 'এ চামড়াবই দাগ।'

অতসী ভীত হযে বললে, 'বল কি, ছুলি?'

সুশোভন ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

অতসী আব পারল না, এ কুষ্ঠেব দাগ তাহলে, সুশোভনেব মুখের দিকে তাকিযে চোখ বুজে ভেঙে পড়ল কযেক মুহূর্তের জন্য। তাবপব চোখ মেলে বললে, 'এমনি করে আমাব মামাকে ঠকালে তুমি?'

সুশোভন বললে, 'আমরা কাউকে ঠকাই না, তিনি দেখেছেন।'

—'কী দেখেছেন?'

—'আমাব এই মুখ।'

—'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

—'তোমাব মামা ত নিচে রযেছেন, জিজ্ঞেস কর না গিযে তাঁকে।

অতসী খাট চেপে বসে থেকে বললে, 'জিজ্ঞেস করবই ত, তারপর তাঁব সঙ্গেই আমি চলে যাব।'

সুশোভন বললে, 'কেন, আমাকে কি খুব খাবাপ দেখাচ্ছে অতসী?'

অতসী খাটেব থেকে নেমে মেঝেব ওপব ঘাড় হেঁট কবে বসে রইল। কিন্তু সে কোনো গভীব বেদনাই হোক তা জানিযে নীববে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পাবে না অতসী, নড়েচড়ে উঠে বললে, 'একজন কুষ্ঠবোগীর সঙ্গে আমার বিযে হল!'

—'বিয়ে যখন হল, কি করতে পার তুমি আব?'

অতসী বললে, 'ভেবেছ আমাকে নষ্ট করলে না? তা একবারও ভেব না।'

সুশোভন বললে, 'নষ্ট করব কেন? যাকে মানুষ স্ত্রী কবে অনেক ভেবেই করে। সে ত তার সাধের জিনিস। সাধের জিনিসকে কি কেউ খোযাতে যায়?'

অতসী বললে, 'আমার মামার হাতে অনেক উকিল আছে।'

সুশোভন আস্তে আস্তে হাসতে লাগল।

এই মেয়েটির শিশুসুলভ প্রতিশোধ নেবাব চেষ্টা।

অতসী বললে, 'ভেবেছে সহজে সেবে যাবে?'

সুশোভনেব মুখেব দিকে পবিপূর্ণ বিরুদ্ধাচাব নিয়ে তাকাল সে। অতসী বললে, 'যখন আমাব পবকাল নষ্ট কবেছ, তোমাব সমস্ত সম্পত্তি আমাকে লিখে দিতে হবে।'

সুশোভন ভাবছিল, এ মেয়েটিব নজব আগোগোড়া শুধু সম্পত্তিব দিকেই, যদি নিস্পৃহ হয়ে সব ত্যাগ কবে চলে যেতে চাইত সে তাহলে অতসীব সম্বন্ধে ভরসাব ঢেব ছিল। কিন্তু এ মেয়েটিব অন্তবাত্মা আঘাত পেল না, সৌন্দর্যবোধও না। অতসীব প্রণয় জমল না মনেব লালিত্য তৃপ্ত হল না। রুচি বা লালসা মিটল না বলে যদি সে বেদনা পেত! কিন্তু তেমন বেদনা এ মেয়েটি পায নি, সে সব পাবে না, সে ঢেব আলাদা জিনিস। মাধুর্য কামনা কল্পনা ও স্বপ্নেব দেশেব থেকে ঢেব দূবে।

স্বামী তাকে ঠকাল এই কথাই শুধু মনে হল অতসীব। কীসে ঠকাল? প্রেমে না সৌন্দর্যে? হায, টাকায ঠকিয়েছে, টাকায শুধু? সমস্ত সম্পত্তি লিখে নিতে চায এই মেয়েটি। একে নিয়ে জীবনে কতদূব এগতে পাববে সুশোভন!

অতসী বললে, 'কী সম্পত্তি আছে তোমাব আমি উকিল লাগিযে তা দেখে নেব।'

সুশোভন অনেকক্ষণ চুপ কবে বইল।

অতসী আবাব বললে।

সুশোভন অবশেষে বললে, 'দেখ।'

নিজেব মাথাব চুলে আঙুল চালাতে চালাতে চুপে চুপে, 'তুমি ফাঁকি দিতে পাববে না।'

অতসী উঠল। সুশোভনেব হাত ধবে বললে, 'আমাকে ছুঁযে বল আমাকে ঠকাবে না?'

সুশোভন ছুঁযে বললে, 'না।'

. অতসী সন্দিগ্ধভাবে দ্বিধাব সঙ্গে বললে, 'একবাব ত ঠকিযেছ, তোমাকে তাই বিশ্বাস কবি না।'

সুশোভন কিছু বলে না।

অতসী বললে, 'কী সম্পত্তি আছে তোমাব?'

সুশোভন বললে, 'অবসব মত দেখো।'

অতসী তৃপ্ত হল। কিন্তু পবক্ষণেই সন্দিগ্ধ হয়ে বললে, 'শত হলেও আমি মেয়ে মানুষ, তোমাব সঙ্গে পাবব কেন, কিন্তু তোমাব ধর্মন্যাযেব কথা ভেবে আমাকে ঠকাতে যেও না। সত্যি যাবে না? তোমাব পবিবাবেব কাউকে কিছু বলবে না বল?'

সুশোভন বললে, 'না, বলবাব কোনো দবকাব নেই।'

অতসী বললে, 'গোপনে সব ঠিক হবে?'

—'হ্যাঁ।'

অতসী খুশি হয়ে বললে, 'তোমাব কুষ্ঠবোগ কবে হল?'

সুশোভন বললে, 'সে কাব মনে আছে?'

—'তোমাদেব বংশেই বুঝি এবকম?'

সুশোভন বললে, 'না, কারু নেই।'

—'তোমাব বাবাব ছিল না?'

—'না।'

—'তোমাব মা-ব?'

সুশোভন ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

—'তাহলে আব কারু ছিল বল।'

সুশোভন বললে, 'না, কুষ্ঠ কারু ছিল না।'

—'সত্যি? বল কি? তাহলে তোমার হল কী কবে?'

সুশোভন বললে, 'আমাব কুষ্ঠ হয়েছে?'

অতসী বললে, 'সমস্ত মুখ ভরে গিযেছে কুষ্ঠে। শবীরেব অন্য কোনো জাযগাযও আছে নাকি?'

সুশোভন বললে, 'না, নেই।'

—'কিন্তু মুখে ত হল, কেন হল যে? এ বড় বদ বোগ। শুদ্ধ শক্ত মানুষদেব এসব হয না।'

অতসী ডেকচেয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুশোভন বললে, 'এই দাগগুলোর জন্য খুব খারাপ দেখাচ্ছে নাকি আমাকে?'

সে কথার জবাব না দিয়ে অতসী বললে, 'বিয়ের রাত এ দাগ দেখি নি কেন?'

—'চন্দন দিয়ে ঢাকা ছিল কিনা।'

—'কালও ত দেখি নি।'

—'কাল ত অন্ধকারে কথা বলেছি দুজনে।'

অতসী ঘাড় হেঁট করে চুপ করল।

সুশোভন বললে, 'মুখটা খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে?'

অতসী বললে, 'কুন্দ ত বলেছিল তোমার মুখ বেশ।'

সুশোভন বললে, 'কুন্দ কে?'

—'কুন্দকালী, বিয়ের সময় নিতকনে সেজেছিল।'

সুশোভন বললে, 'কিন্তু তখন ত চন্দন দেয়া ছিল, এখন কেমন দেখায়?'

অতসী বললে, 'দেখায় ত এমন কিছু খারাপ না, কিন্তু কুষ্ঠের কথা বড় খারাপ, সমস্ত নাক-মুখ-হাত-পা দুমড়ে-মুচড়ে গলিয়ে যা করে তুলবে, বাপ রে!'

—'তাই তুমি ভয় পেয়েছিলে?'

—'বাপরে, না ভয় পেয়ে পালিয়ে কেউ আবার থাকত, ওসব সতী শুধু সুস্থ সুন্দর টাকাওয়ালা মানুষের ঘরেই বরং সম্ভব, হাঁপিকাশ বা যক্ষ্মারোগী বা কুষ্ঠের স্ত্রী ঘরে কখনো সতী থাকতে পারে!'

কিন্তু কি যেন কি ভেবে অতসী থামল। বললে, 'তুমি রাগ করো না।'

সুশোভন বললে, 'না, তুমি ঠিক কথাই ত বলেছ।'

অতসী বললে, 'আমি সারা জীবন সতীর মতই থাকব, তুমি যা সম্পত্তি লিখে দেবে তার থেকে পশ্চিমে একটা বাড়ি করে একা-একা পুজোপাজা করব। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন পরজন্মে তোমার এমন না হয়।'

—'পরজন্মে তোমার স্বামী হব'?

অতসী বললে, 'জানি না।'

—'কেন, তোমারাই ত বল জন্মে জন্মে একই স্বামী থাকে।'

—'তা হতে পারে, কিন্তু আগের জন্মের কথা ভুলে যায় সব। সেও যা নতুন স্বামীও তা। তখন কি মনে থাকবে আগের জন্মে তোমার কুষ্ঠরোগ ছিল না কি ছিল।'

সুভোজন বললে, 'যদি ইনজেকশন করলে সেরে যায়?'

অতসী বললে, 'সারবে নাকি তাতে?'

—'এ ত কুষ্ঠ নয়, শরীর খসবে না কোথাও।'

—'কি রকম কুষ্ঠ? ধবল?

—'ধবল হলে এ দাগও হয়ত সারাতে পারতাম, ইনজেকশন না করে।'

—'ধবল নয়?'

—'না, এ আগুনে পোড়া দাগ।' সুশোভন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শোভন স্নান করে ফিরে এসে দেখল অতসী ঘরের ভিতর নেই। অনেকক্ষণ পরে অতসী স্নান করে ফিরে এসে বললে, 'আমার একটা সোনার দাঁত দেখেছ?'

তিনটে সোনার দাঁত—দাঁতের পাটির বিভিন্ন জায়গায় হাসতে গেলে বা কথা বলতে গেলে সুশোভনের সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করে। কিন্তু এ সোনার দাঁত নিয়ে অতসীর ঢের গর্ব।

বললে, আমার কাকা যদি বেঁচে থাকতেন, আমার সব কটি দাঁত সোনার হত। মরতে মরতে তিনটি দাঁত সোনায় বাঁধিয়ে তবে তিনি মরলেন।'

সুশোভন তাকিয়ে দেখল, অতসীর দুপাটি দাঁতের ক্ষয় ধরেছে। হাসলে শিঁটে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। দাঁতগুলো এমন নোংরা যে অতসীর মুখের ভিতরটা পায়খানার গহ্বরের মত একটা গভীর বিকৃত রাজ্য যেন উঁচু-নিচু ছোট-বড় জামের বিচির মত আবর্জনার ভেতর, ছোট বড় প্রেতযোনিকে নিয়ে একটা কুম্ভীপাক। সেদিকে তাকাতে ঘৃণা লাগে, ভয় লাগে। অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়।

সুশোভন জানালাব পাশে বেতেব ইজিচেয়াবটায গিযে বসল। সুশোভনেব মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যবক্ষা কোনোদিনও আব মিটবে না তাব। পৃথিবীতে কত রূপসী বধূ বযেছে, কত নিখুঁতরূপসী, জীবনে সৌন্দর্যেব স্বার্থকতা যে নেই তা নয, তা আছে, সে খুব গভীবভাবে বিশ্বাস কবে আছে। কিন্তু তাব জীবনে নেই। সেই কেন এত সৌন্দর্য ভালবাসতে গেল? কত লক্ষ লক্ষ লোভ বযেছে এই অতসীকে নিযে পবম শান্তিতে কাল কাটিযে যেতে পাবত। এই মেযেটিব মুখ ক্লেদেব মাড়িব দিকে তাবা ফিবেও তাকাত না। হযত তাবই ওপব নিঃশব্দে নির্বিবাদে চুমো দিযে চলত :। এই দুর্গন্ধ টুকবাটাকবা দাঁতগুলো এদেব কাছে চিড়েমুড়ি মাছ মাংস চিবোবাব উপযুক্ত বলে উপযুক্ত জিনিস বলে বোধ হত। আব কিছু নয। সে সবেব ভিতব রূপকে তাবা খুঁজতে যেত না।

অতসীব সিঁথিব ভিতব ফাঁক বেবিযে পড়েছে। বোগা লাগে তাকে বড্ড। কেমন খাঁচাব মত বুক নিযে কুঁজো হযে বসে বযেছে সে, চিমসে মুখ। কিন্তু রূপ কেন চায সুশোভন? তাব নিজেব রূপ কতদূব? একদিন ছিল বটে। কিন্তু পোড়া চামড়াব সঙ্গে সঙ্গে রূপস্পৃহাটাকে না পুড়িযে সে অদ্ভুত অবাস্তব জাযগায এসে পৌঁছেছে। এসব জাযগা তাব পক্ষে আজ অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হযে দাঁড়িযেছে। তাকে অপমান কবে তাব অভিমানকে ফুলিযে তোলে শুধু। এখনো স্নান কবে আসবাব পব নিজেব মুখটাকে দেখে এসেছিল সে। ওবকম মুখেব জন্য প্রেম অনুভব কবা কোনো মেযে মানুষেব পক্ষেই সম্ভব নয, সে নিজে যদি মেযেমানুষ হত, অত্যন্ত পতিপবাযণা কোমল মাযামমতাময়ী বধূ হত যদি সে তবুও একবম স্বামীব সঙ্গে প্রণয হত না তাব। হযত তাকে, সে স্বামীকে সে সহানুভূতি কবত দাক্ষিণ্য অনুভব কবত, দুঃখবোধ কবত তাব জন্য, কিন্তু ভাল সে বাসত না। না, এমন মুখাবযবেব মানুষ নিযে নাবীদেব জীবনেব বোমান্স জমে না। হায, বোমান্স নেই জীবনে তাব। বধূকে নিযে যে সুলভ সহজ বোমান্স—জীবনকেই বা কিছুকালেল জন্য কুহকাবৃত্ত কবে ফেলে, তাও তাব নেই। ভাবতে ভাবতে সুশোভনেব হৃদয একটি পেঁচাব মত মোচড় খেযে উঠল।

জীবনে প্রণয সে কোনোদিন পায নি। কেউ তাকে বিবহিণী হযে ভালবাসে নি। তাব জন্য কোনো সুন্দবীব জীবনে বিচ্ছেদেব বাত নেই, কোনো নাবীব জীবনেও না। একটি মেযেকেও সে কুহকাবৃত্ত কবে বাখতে পাবে নি। এক মুহূর্তেব জন্যও না। যতগুলো নাবীব কথা মনে পড়ে সকলেই তাব জন্য সমবেদনা বোধ কবেছে। সব বেদনা সহানুভূতি খুব কোমল আন্তবিক জিনিস বটে, কিন্তু সে-সবেব ঢেব হযেছে তাব। মানুষেব হৃদয যে পবেব জন্য সত্য সত্যই ব্যথা বোধ কবে সে সব অনেক জেনেছে সুশোভন। আব কাউকে সে ব্যথা দিতে চায না। এই মুখখানা পথেঘাটে ফিবিযে নিযে সে কতবকম মানুষকে আকর্ষণ কবল, কীসেব জন্য? ভালবাসাব জন্য নয, পুলক প্রণযাবেশেব জন্য একবাবও নয। সুশোভনেব জন্য দুঃখবোধক কববাব জন্য শুধু। এমন দুঃখ সে কাউকে আব দিতে চায না। দুঃখ বা ব্যথাব কোমলতা নিযে মানুষ যেন তাব কাছে আব আসে না।

পৃথিবী খুব কঠিন হযে উঠতে পাবে। পৃথিবীব বেদনামুগ্ধ হৃদয পদে পদে অসাড় হযে আসে। ব্যথা একটা বিলাস যেন, এই সহানুভূতিব ব্যথা। অবাস্তব জাযগায নিজেকে অপব্যবহাব। নিজেব জীবনে সুশোভন এই বিলাসেব পবিচর্যা আব গ্রহণ কববে না। অতসী ডেকচেযাবে বসে একটা ছোট্ট আযনা নিযে নিজেব মুখ দেখছে। নিজেব রূপটা কেমন ভাল লাগছে না যেন তাব। সুশোভনেবও কি ভাল লাগছে? সঙ্কুচিত হযে স্বামীব দিকে মাঝে মাঝে সে তাকাচ্ছে। কেমন অসন্তুষ্ট যেন তাব স্বামী। কথা বলছে না আব। অতসীকে ভাল লাগল না নাকি? অতসী এই সব ভাবছিল।

কিছুক্ষণ আগেই কত কি আবোলতাবোল কথা সুশোভনকে সে বলেছে, সেই সব ভেবেও কেমন থমকে থমকে বযেছে অসতী। সে বড় অসহিষ্ণু, একটু অসুবিধা হলেই বা ব্যথা পেলেই বিহ্বল হযে ওঠে, যা-তা বকতে থাকে। বিগড়ে যায। কেন যে সে বলেছিল' আব কোনোদিন অমন কবে বলবে না। অতসী আবশিব দিকে তাকিযে নিজেব মুখটাকে কিছুতেই উপযুক্ত কবে তুলতে পাবছে না। কোথায যে খুঁত তা ভাল কবে বুঝতে পাবা যায না যেন তেমন। তবুও খুঁত যেন অনেক। মাড়িব কদর্যতা ধবতে পাবছে না সে। সোনাব দাঁতগুলোকেই সুন্দব মনে হচ্ছে। কাটাছাঁটা মুখটা মন্দ কি? বঙও মযলা নয। কিন্তু তবুও মোটেব উপব নিজেব মুখটাকে ভাল লাগছে না তাব। এই আবশিতে হযত ভাল দেখাচ্ছে না।

আশিটা বেখে দিল সে।

সুশোভনেব মুখেব সুন্দব ডৌলটাব দিকে বিস্মিত হযে আধ মিনিট তাকিযে বইল সে। কিন্তু আধ

মিনিটের বেশি নয়। রূপের মর্ম সে বোঝে না। কামনাও করে না সে। কুৎসিত চেহারাকেও বিশেষ ঘৃণা করে না অতসী। প্রাণে তার যথেষ্ট মমতা আছে বলে নয়। এমনিই। অনেক কদর্যতার মধ্যে এ অবদি থেকে এসেছে সে। নানারকম কদাকার মুখও তাকে দিনরাত ঘিরে রয়েছিল। তাকে শিক্ষা দিয়েছে, দীক্ষা দিয়েছে, সাহায্য করেছে, ভালবেসেছে, ক্লেশ দিয়েছে, জীবনের নানা রসে আবৃত করে রেখেছে তাকে, নিজেদের মধ্যে অতসীকে এমন সহজাত করে নিয়েছে, এই মেয়েটির জন্মগত উপকরণও এমন সামান্য সাধারণ যে, জীবনের কাছ থেকে তুচ্ছ শাদাসিধে এই জিনিসগুলোই সে প্রত্যাশা করে। এগুলোকেই আশা আহ্লাদের জিনিস বোধ করে। কোনো কামনা কল্পনা প্রতিভার স্পৃহা নেই এ মেয়েটির। কোনো নিষ্ফলতা নেই। কোনো আজীবনের দুঃখ নেই। এর হৃদয়ের জমিতে কিছুতেই তা অঙ্কুরিত হবে না। অনেকক্ষণ ধরে এ মেয়েটি একা পড়ে থাকতে পারে না। বহুক্ষণ বিমর্ষ হয়ে বসতে পাবে না। সে খুব আশাবাদী অরুণোদয়স্রাবী বিরাট বানসাগরে উদ্ভাসিত মেয়ে বলে নয়, সে এমন সাধারণ সামান্য মেয়েমানুষ বলে।

অতসী ঘাড় নেড়ে বললে, 'তা আমি পাবব।'

সুশোভন মেয়েটির দিকে তাকাল।

অতসী বললে, 'এতে আব কুষ্ঠের দাগ নয়, মেছেতাও নয়, তাহলে আর কি? কোনো ছোঁযাচের ভয়-টয নেই?'

সুশোভন ঘাড় হেঁট কবে শুনছিল।

অতসী বললে, 'তা ছাড়া আমি ভেবে দেখেছি তোমাব কুষ্ঠ হলেও তোমার কাছেই আমাব থাকা উচিত।' একটু পবে, 'কিন্তু পুড়ে গিয়েছিল ত আগুনে, না?'

সুশোভন বললে, 'হ্যাঁ।'

অতসী বললে, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয, কুষ্ঠের দাগ কি ভীষণ থাকে! তেলেনিপাড়ার একটা মাসিকে দেখেছি, ন্যাপা হয়েছিল, বাবা গো কি দেখতে। কিন্তু তোমাব এ আগুনে পোড়া দাগ!'

সুশোভন চুপ করে বইল। সুশোভন বললে, 'কি কবে বুঝলে?'

—'খুব নবম দাগ কিনা।' অতসী দাগেব ওপব হাত বুলুতে এল। বললে, 'আমাব কোনো ভয নেই, এই দেখ আঙুল বুলুচ্ছি।'

সুশোভন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

অতসী বললে, 'কবে পুড়েছিল?'

—'উনিশ-কুড়ি বছব আগে।'

—'সত্যি, এত আগে? সেই দাগ এখনো থাকে?'

সুশোভন বললে, 'বযেছে ত।'

—'আচ্ছা পোড়ার দাগ মুছে যায না কোনোদিন?'

—'না।'

—'শঙ্খচূর্ণ মাখলেও না?'

—'না।'

—'তুমি যে ইনজেকশনের কথা বলেছিলে?'

—'তাতে এ গাদেব কিছু হয না।'

অতসী একটু গম্ভীর হয়ে বললে, 'আগুনে হেজে যাওযাব দাগ, ও আজন্ম থাকে', খানিকক্ষণ নীরব হয়ে এই আজন্মের দাগটাকে গ্রহণ করল সে। অতসী বললে, 'কি কবে পুড়ল? গরম ফ্যান ছিটকে বুঝি?'

সুশোভন বললে, 'বিছানায় আলো নিয়ে পড়ছিলাম।'

—'কিসের আলো গা, ডিজ হেরিকেন?'

—'না।' একটু থেমে, 'হঠাৎ আলোটা উলটে—'

—'একেবারে চিমনিসুদ্ধ ঝনঝনাৎ, না কাচে চামড়া পুড়ে গেল? আহা হা—বাপরে কি অঘটনটাই না হল।'

সুশোভন আর কোনো কথা বললে না।

অতসী বললে, 'আহা, একটু সাবধান হতে যদি!

সুখের শরীর

নিরুপম খুব ভোবে ঘুমেব থেকে উঠে একটা স্টিক হাতে কবে বেড়াতে বেরুল। বাঁশঝাড়েব আগায় চাঁদ তখনো বশে উজ্জ্বল হয়ে বয়েছে। পথঘাট চাবদিক সব ঘোব ঘোব। বেত আশশ্যাওড়া ভাঁটেব জঙ্গলেব ভিতব থেকে একটা কোবা বেবিয়ে এসে ঘাসেব ভিতব থেকে পোকা খুঁটে বেড়াচ্ছিল। নিরুপম দেখে আবাব বেতেব জঙ্গলেব ভিতব উড়ে পালিয়ে গেল। দোয়েলটাব মন এখন ফড়িং পোকাব পিছনে নয়। একটা বাবলাগাছেব সরু ডালে দুলতে দুলতে ভোবেব বাতাসে নিজেব মনে নিববচ্ছিন্ন শিষ দিয়ে চলেছে সে, শিস দিচ্ছিল সে। পাখিব পৃথিবীটা বেশ জেগে উঠেছে।

নিরুপম ধানেব ফাঁকা খেতটাব পাশ দিয়ে সরু ফালিব মত আলপথটা ধবে নদীব ধাবে গিয়ে দাঁড়াল। নদীব এক কিনাবে গোটা দশ-বাব পানসি নিঝুম মেবে পড়ে বয়েছে। হুঁকোব ভবভব শব্দ ও তামকেব ঈষৎ আঘ্রাণ ছাড়া জনমানবেব বিশেষ কোনো সাড়া এখানে পাওয়া যায় না। বেশিক্ষণ দাঁড়াল না নিরুপম। একটু হেঁটে বেড়ানোব তাব মতলব, বাঁ-হাতি নদীটাকে বেখে লক্ষ্যহীন হয়ে সে হাঁটতে লাগল। ভোবে সে জাগে বটে, কিন্তু এটা তাব বক্তজন্মগত অভ্যাস নয়, ববং সে একটু বেশিই ঘুময়। ভোবে উঠে বেড়াবাব শখ তাব প্রাযই তৃপ্ত হয না।

নিরুপম এগিয়ে গেল। দত্তবাবুদেব দিঘিটা ঘিবে জলেব কিনাবে কিনাবে বকেব সাবি, মাছ শিকাব কবতে গিয়ে দু-চাবটা বক থেকে থেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে, এক-একটা শ্বেত পদ্মফুলেব মত ওদেব শাদা বুক পালক বেবিয়ে পড়ছে সব। কেমন কমনীয়' দিঘিব কিনাবে কিনাবে জামরুল হিজলেব নামানো ডালে এক-একটা মাছবাঙা—এমন স্তব্ধ, অথচ হঠাৎ ধাঁ কবে গগনশূন্যে লাটিমেব মত পাক খেতে খেতে কি অধীব কলবব কবছে, মাছ শিকাবেব একি অনুপম গান।

আট-দশ দিন হল বিয়ে কবে বউ ঘবে নিয়ে এসেছে নিরুপম। এখন থেকে সে ভোবে নিরুপম আজ অনেকখানি বেড়িয়ে প্রায বেলা আটটাব সময ফিবল। যেমন বোজই পবে উঠনে তিন-চাবটা বঁাট পড়ে গেছে। কুমড়ো-লাউ-মোচা-থোড় গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিছু কোটা হয়েছে, কিছু বাকি আছে। একদিকে একটা পুঁইমাচা, তাবই পাশে দুটো কুমড়ো গাছ লতিয়ে গড়াচ্ছে।

জেঠিমা কুমড়ো ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে কি যেন বলে যাচ্ছিলেন। পিসিমা-খুড়িমাবা বঁটিব পাশে হাত উঠিয়ে বসে শুনছিল, প্রত্যুত্তব দিচ্ছিল। দূব থেকে নিরুপমকে দেখে এ কলবব কেমন থেমে গেল। নিরুপম এব কোনো কাবণই খুঁজে পেল না, সবাই নিস্তব্ধ হয়ে তবকাবি কুটছে। মুখ ভাব অবিশ্যি এদেব কারুবই নয। সবাই ঈষৎ গম্ভীব।

নিরুপম এক-আধ মিনিট স্টিকাব ঘুবিয়ে দাঁড়াল।

মেজখুড়িমা বললেন, 'কৈ আজ ভোবে ত তোমায দেখি নি নিরুপম।'

পিসিমা বললেন, 'বেড়াতে গিয়েছিলে?'

ছোটখুড়িমা বললেন, 'এ কদিন থেকেই ত বেড়াচ্ছে, খুব ভোবে উঠে চলে যায।'

জেঠিমা বললেন, 'বা, সে কি যে সে ভোব, এত ভোবে নিরুপম কোনোদিনও উঠত না।'

নিরুপম সন্দিগ্ধভাবে সকলেব মুখেব দিকে তাকাল। না, জিনিসটা আব চাপা নেই, সে চাপাতে চেয়েছিল। প্রাণপণ চেষ্টা কবে সে চেয়েছিল। কিন্তু এও কি আব চাপা থাকে বউকে ঘবে আনবাব পব থেকেই নিরুপম এবকম গৃহহাবা পথহাবা পথউদাসী হয়ে গেল কেন, এমন ধাঁধা নিয়ে এবা আক্ষেপ কবেছে। এ অসার্থকতা ব্যথা একান্তই তাব নিজেব জীবনেব জিনিস, লুকতে চেয়েছিল নিরুপম, কিন্তু গোপন বইল না। ববকে বিবাহকে আশীর্বাদ কবতে গিয়ে এবা থমকে গিয়েছে যেন। বধূকে এবা উদঘাটিত কবে ফেলেছ। উঠানে দাঁড়িয়েই ত দেখা যাচ্ছে নিরুপমেব ঘবেব মশাবিটা এখনো তোলা হয নি। মশাবিব ভেতব যে ঘুমুচ্ছে তা নির্বিবাদ তৃপ্ত মুখটাও একটু উঁকি দিলেই ধবা পড়ে। বাস্তবিক [....] পেতে নয। ইন্দিবা এমন অবাধে ঘুমিয়ে আছে, এত বেলা অবদি, একটা মস্তবড় সংসাবেব এত কাজ এত

ব্যস্ততার মুখোমুখি দিব্যি আবামে মাথা পেতে যে এই মেয়েটিব হৃদযেব পবিচয কোনো স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষাব মানদণ্ড দিয়ে খুঁজে পাওযা যাবে না।

নিরুপম স্টিকটা তেমন সজীবভাবে ঘোবাতে পাবে না আব, খানিকটা চিন্তাব্যথাযুক্ত হযে জেঠিমা পিসিমাদেব মুখেব দিকে একবাব তাকাল সে, ছড়িটা দিয়ে পেঁপে গাছটাব ওপব আস্তে আস্তে কযেকটা ঘা দিয়ে নিজেব কক্ষেব দিকে চলে গেল সে।

পিসিমা বললেন, 'নিরুও বুঝেছে।'

কাকিমা বললে, 'বুঝেছে না আবাব, প্রথম দিন থেকেই, বিয়ে কবে আসবাব পবেই আমি দেখছি ওব মুখটা কেমন বিমর্ষ, আমি ভাবলাম যে কামিখ্যোদাদাকে ত ববযাত্রী নেযা হযেছিল, সেই কোনো গোলমাল কেলেঙ্কাবি কবে এল নাকি। নিরু খুব রুচিবাগীশ ছেলে কিনা। একটু ইতবামো কবতে গেলে ওব লাগে।'

জেঠিমা বললেন, 'না, কামিখ্যোদাদা আব কি কববেন, সেজ ঠাকুবপো যখন গিযেছিল তখন কি আব ওইসব হইচই অশ্লীলতা কববাব সাধ্যি আছে? আমাদেব পবিবাবেব লোক ওসব নোংবামি কবে না।'

নিরুপমেব জ্যোঠতুত বোন কমলা বললে, 'ও বুঝেছে, হযত ফুলশয্যাব বাতেই' একটা ছোটখাট কুমড়ো বঁটিতে আধখানা কবতে কবতে কমলা বললে, 'ব্যাপাবটা কি বুঝলে কাকিমা, এসব হৃদযহীন নির্মম মেযে কাব হয—না ছুঁতেই ধবা পড়ে যায।'

সকলে চুপ কবে বইল। চুপ কবে কমলাব কথা স্বীকাব কবল।

কুমড়োটা দুভাগ কবে ফেলে একটা মস্ত বড় থালেব উপব বেখে দিয়ে কমলা বললে, 'হযত ফুলশয্যাব বাতেই নিরুদা বুঝেছে যে কি স্বার্থপব মেযে কপালে এসে বিঁধল।'

মেজখুড়িমা বললেন, 'ফুলশয্যাব বাতটা হযত ভালয ভালযই গিযেছিল।'

কমলা বললে, 'নিরুদা এমনি ত খুব চাপা, কিন্তু যে সব জাযগায ওব ভালবাসা সেখানে খুব সাহস, অনেক কথা বলতে পাবে।'

পিসিমা বললেন, 'তাই নাকি?'

কমলা একখণ্ড কুমড়ো ফালি ফালি কবে কাটতে কাটতে বললে, 'হুঁ।' কে জানে নিরুপমেব জীবনেব কি সব প্রণয-ভালবাসাব ইতিহাস কমলা পড়ে দেখেছে, তাব কতটুকু জানে—কতদূব জানে।

সন্ধ্যা বললে, 'সত্যি নিরুদা এমন ভাবুক যে ফুলশয্যাব বাতেই হযত বউযেব সঙ্গে ভাব কবতে গিযেছিল।'

জেঠিমা বললেন, 'থাম।'

সন্ধ্যা বললে, 'কেন, সেটা কি অপবাধেব হল? নিজেব বউযেব সঙ্গে ভাব কবতে যাওযা?'

পিসিমা বললেন, 'না, অপবাধ আব কি।' সস্নেহে তিনি সন্ধ্যাব দিকে তাকালেন।

কমলা বললে, 'ফুলশয্যাব বাতে এ বউকে নিয়ে ভাব কবতে গিয়ে নিরুদা বিযেব সুখ আচ্ছা কবে বুঝেছে।'

জেঠিমা সমবেদনা প্রকাশ কবে বললেন, 'বাস্তবিক, বিযেটা এমন মাটি হযে গেল, এমন সচ্চবিত্র সদ্বংশেব ছেলেব—'

মেজখুড়ি আক্ষেপ কবে বললেন, 'একটি লক্ষ্মীশ্রী বউযেব জন্য ত আমবা কত খুঁজলাম, খোঁজা কি কম হযেছে দিদি, কিন্তু, অবিশ্যি এব কি যে নেই তা নয, কিন্তু কি দেমাক! রূপ দগ্ধ হযে ছাই হযে গেল।'

ছোটখুমিড়া বললেন, 'হ্যাঁ রূপ ত বড়।'

রূপেব গর্ব নিরুপমেব ছোটখুড়িমাব ছিল, তিনি আব কিছু বললেন না। পিসিমা বললেন, 'না, বউমাব রূপ আব এমন কিছু নয, যেমন পাঁচপাঁচিদেব হযে থাকে শাদাসিদে ঘবেব বউ আব কি, কিন্তু চবিত্রটাও তেমন হলে মানাত।'

মেজখুড়িমা বললেন, 'বিযেব পব ত এই আট-দশ দিন গেল, এখনো যেন সে বাসববাতেব আবেশ এব গা থেকে ঘুচল না, এখনো যেন বউ সে বিযেব বাতেব কনে, সকলেব আদব সমাদবেব জিনিস, সবাই মিলে তাকে প্রশংসা কববে। মাটিতে পা পড়লে চলে না তাব।'

ছোটখুড়িমা বললেন, 'হ্যাঁ, আমবা যেন সবাই তাব তাঁবে বযেছি, এমনি একটা ভাব' ছোটখুড়িমা

একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু আমি ওসব ঢেঙেব প্রশ্রয দিই না, তাই আমাকে একটু সমীহ কবে চলে।'

পিসিমা বললেন, 'আহা মুখ ঝামটা-টামটা সেও নাকি নতুন বউকে তা দিও না। শত হলেও নিরুব বউ, ছেলেটাব মা-বাপ নেই।''

জেঠিমা বললেন, 'তাই বলেই ত, না হলে এতবেলা অবদি আমাদেব মুখেব সামনে ঘুমিযে থাকতে পাবে! মেজ পেবেছে? ছোট পেবেছে?'

মেজখুড়িমা বললেন, 'আমাদেব কোনোদিন প্রবৃত্তিই হয নি, এসেই ঘানিতে লেগে গেছি। নিজেকে একটি বাতেব জন্য শুধু কনে মনে কবেছিলাম, তাবপব থেকেই দাসী হযে আছি।'

পিসিমা বললেন, 'বধূ মানুষ এতেই ত সুখ পাবে, তাব নিজেব আবাম আলসেমি বিসর্জন কবে সংসাবেব জন্য সে খাটবে, স্বামী শ্বশুব শাশুড়ি সবাইযেব জন্য একটা প্রাণেব টান থাকবে তাব। আমাদেব সংসাবে ববাবব এবকম হযে এসেছে, এ বড় সুশৃঙ্খলাব সংসাব। বড় বাধ্যতাব, কমনীযতাব, কেমন ফটফটে মাধুর্যেব। এমন ভালবাসা আশা শান্তিব সংসাব আমি কোনোদিন কোথাও দেখি নি। সেই চল্লিশ বছব আগে বিধবা হযে ভাইদেব কাছে এলাম, সেই থেকে আজ অবদি।' পিসিমা থামলেন।

কিছুক্ষণ সকলে চুপ কবে বইল।

সেজখুড়িমা বললেন, 'ব্লাউজ কাটাব বকম দেখেছ কমলা নতুন বউযেব?'

কমলা বললে, 'দেখেছি।'

—'তোমাব ওবকম কাট?'

কমলা চুপ কবে বইল।

ছোটখুড়িমা বললেন, 'তোমাব না হয কুমাবী মেযে যা খুশি তাই কবতে পাব, কিন্তু বাড়িব বউ হযে ওবকম ছোট হাতাব ব্লাউজ—'

জেঠিমা গালে হাত দিযে বললেন, 'ছোট হাতা, আবে বাম, হাতা ত নেই-ই, বলল না পৌছুতেই ফুবিযে গেছে।'

পিসিমা বললেন, 'কি ঘেন্নাব কথা।'

কমলা লজ্জিত হচ্ছিল, 'কুমাবীবা না হয নিজেদেব বাড়িতে বসে দু-একদিন পবল, কিন্তু বউ মানুষেব একবম ব্লাউজ পবা—' সে বুঝে উঠতে পাবছিল না, অন্তত সে বউ হলে এবকম সব অকিঞ্চিৎকব কাটছাঁট নিযে ব্যাপৃত থাকত না কখনোই, আবাম ও অহঙ্কাব দূরেব কথা। সে বউ হলে তাব অনেক গভীবতব ও মধুবতব জিনিস বযেছে।

মেজখুড়িমা বললেন, 'বউযেব বাক্সভবা যে একশ বকমেব শাড়ি আছে তা সকলকে জানিযে তেতো কবে তবে যদি সুতিব কাপড় সে পবে।'

জেঠিমা, 'তা পাববে না, নামতে নামতে নীলাম্ববী অবদি, এব নিচে আব না।'

ছোটখুড়িমা বললেন, 'আব এমনও প্রাণ যে এত গাড়ি গাড়ি শাড়ি একটা সন্ধ্যাকে একটা কমলাকে দেবাব জন্য কোনো প্রবৃত্তিই হল না, সে বোধই হযত মাথায আসে না।'

পিসিমা বললেন, 'এ জিনিসটা আমাকেও আঘাত দিযেছে, বাস্তবিক কমলা সন্ধ্যা এবা শাদামাটা শাড়ি পবছে আব তাদেবই সঙ্গে তসব গবদেব শাড়ি বাগিযে বেড়াতে যায, এটা কি ভাল দেখায?'

ছোটখুড়িমাব দেখাক আব না দেখাক মনেব থেকেও কি একটা অনুবোধ নিরুপমেব ছোটজেঠিমাব নিজেদেব জিনিস অন্য সবাইকে দিযে এসেছে।

পিসিমা একটু থেমে বললেন, 'শাড়ি ত শাড়ি।'

কিছুক্ষণ ধবে এবা চুপ।

ছোটখুড়িমা বললেন, 'আব শাড়িব পবাব ধবনাটাই-বা কি? ওবকম ধবন কবে শাড়ি কি বউ মানুষদেব পবতে হয?'

নিরুপম ইন্দিবাব মশাবিব কাছে এসে দাঁড়িযে দেখল মেযেটি বেশ অকাতবে ঘুমুচ্ছে।

এক-আধ মিনিট ইতস্তত কবে মশাবিব একটা কিনাব তুলে নিযে নিরুপম বললে, 'শুনছ, বেলা হযে গেছে।'

কোনো সাড়াশব্দ পাওযা গেল না। মেযেটি নাক ডাকিযে তেমনি প্রগাঢ়ভাবে ঘুমুচ্ছে। নিরুপম একবাব গলা খাকবে নিযে একটু জোবে বললে, 'এই ওঠ, শুনছ, ওঠ, ওঠ, বড্ড বেলা হযে গেছে।'

বউয়ের হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিরুপম বললে, 'ওঠ'।

ইন্দিরা গা মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে, 'কে?' নিরুপমের দিকে একবার তাকিয়ে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ তুলে বললে, 'আঃ কি যে! যাও যাও সব এখান থেকে।'

নিরুপম বললে, 'লক্ষ্মীটি ওঠ। এইবার।'

প্রায় মিনিট পনের পরে অনেক অনুনয়-বিনয় সাধ্য-সাধানার পর নববধূ অত্যন্ত বিরস তিক্তমুখে বিছানার উপর উঠে বসল। বললে, 'সাধে কি মানুষ শ্বশুরবাড়ি করতে চায় না? এই জন্য চায় না, এখানে এমন সাতপাকের গেরো—উঃ।'

নিরুপম চুপ করে রইল।

ইন্দিরা বললে, 'বাপের বাড়ি হলে কারু সাধ্য ছিল এমন ঘুম ভাঙায়, ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিতাম না।'

নিরুপম নীরবে জানালা দরজাগুলো খুলছিল।

ইন্দিরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, 'বা, একেবারে আলোর চিড়িক মেরে দিলে দেখছি, এই ঘুমের থেকে উঠলুম, রোদটা কি ফট করে চোখে সয়?'

নিরুপম জানালা খুলতে খুলতে থেমে গেল। ইন্দিরা কুঁড়েমি ভাঙতে ভাঙতে বললে, 'এই বেনারসীটা পরেই শুয়েছিলাম, কি বুদ্ধি আমার!'

নিরুপম বললে , 'এটা ছেড়ে শুলেই ত পারতে!'

—'তা পারতাম ত; কিন্তু আলসেমি করে আর ছাড়া হল না।' শাড়িটার দিকে ব্যথিতভাবে একবার তাকিয়ে ইন্দিরা বললে, 'বাপরে, কি রকম কুঁচকে গেছে, এটা পাট করতেই ত একঘণ্টা লাগবে।

নিরুপম বললে, 'এখন আবার পাট করবে?'

ইন্দিরা বললে, 'মুখ ধুয়ে।'

নিরুপম ভাবছিল, একি সর্বনাশের কথা বলছে বধূ, সে কি শুধু সব নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, জেঠিমা-পিসিমারা কি ভাববেন তাহলে?

ইন্দিরা বললে, 'এই শাড়ি পাট করতেই আমার হাড় ব্যথা হয়ে যায়, কিন্তু কাকেই-বা বলব একটু সাহায্য করতে! এ বাড়ির মেয়েরা যেন এক নমুনা, ওদের কোনো কথা বলতে আমার গায় সয় না, বউ মানুষকে যেচে এসে মান-মর্যাদা দিতে হয়, আমি ত ভিখিরি নই।'

নিরুপম বললে, 'শাড়ি না হয় ঘুমবার আগে পাট করো, কিন্তু এখন—'

ইন্দিরা একটু ফিক করে হেসে বললে, 'তাহলেই হয়েছে, ঘুমবার আগে বিশ্বসংসারের বোধ থাকে কারু? চোখে ঘুম নামলে বিছানা পাতবারও চাড় থাকে না, হাত-পা মড়ার মত এড়িয়ে আসে।' ইন্দিরা বললে, 'হাতের কাজ আগেই সেরে রাখা ভাল।' একটু ভেবে বললে, 'কিন্তু বেনারসীটা খসিয়ে একটা পছন্দমত শাড়ি পরে নিতে হবে।' শাড়িটার বাক্সোটার দিকে একবার সতৃষ্ণ তাকিয়েই ইন্দিরা আপাতত স্থগিত হল। বিছানা থেকে উঠবার ইচ্ছা তার নেই।

নিরুপম অবাক হয়ে ভাবছিল এ মেয়েটি নিজের দিনের রুটিন নিজেই ঠিক করে নিচ্ছে। কারু কোনো সুখ-সুবিধার কোনো খোঁজও নিচ্ছে না। একটা দশকর্মান্বিত মস্ত বড় সংসারে যে সে এসেছে সে-সবের কোনো আভাসও এর কথাবার্তার থেকে বুঝতে পারা যায় না, বেলা আটটার সময়ে উঠে প্রশাধন শাড়ি পাট তারপর হয়ত স্নান, খাওয়া-দাওয়া শয্যার আরাম এই আট-দশ দিন ধরে এমনি করে এই মেয়েটির দৈনন্দিন চক্র চলেছে। এমনই চলবে হয়ত।

ইন্দিরা বললে, 'কাল রাতে ট্যাঁ ট্যাঁ করছিল কে গা?'

অনেক ছেলেপিলে কাচ্চাবাচ্চার সংসার, দিন রাত গোলমাল হয়ে থাকে। নিরুপমের সে সব সহ্য হয়ে গেছে। কাল রাতে তার ঘুম ভাঙে নি। কে কেঁদেছে জানে না নিরুপম।

ইন্দিরা বললে, 'কারু আবার একটা বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে নাকি শিগ্‌গির?'

নিরুপম চুপ করে রইল। খুড়িমার ছেলেটির বয়স সাত মাস, এ বাড়িতে সে-ই সবচেয়ে ছোট, সে-ই হয়ত কাঁদছিল।

ইন্দিরা বললে, 'ওই মেজখুড়ির ঘরেই বোধ হয়, বছর বিয়ানি বউ, এমন অনাছিষ্টি। ইন্দিরা নাক সিঁটকে বললে, 'হয়ত ষাটের কাছে হল প্রায়।'

নিরুপম বললে, 'কই মেজখুড়ির ত এখনো পঞ্চাশও হয় নি।'

ইন্দিরা গালে হাত দিয়ে বললে, 'ও মা, কিন্তু দেখায় ত সত্তরের মত। তা দেখাবে না? অত সন্তান হলে কারু শরীরের মাধুর্য থাকে? ইন্দিরা মাটিতে একটা পা দিয়ে বললে, 'বাবা, একটি ছেলেপুলেরও প্রয়োজন নেই আমার। সত্তর বছরেও যুবতী মেয়েমানুষের মত কেমন ফিট চেহারা থাকবে!'

এ মেয়েটির বেশ সুখের শরীর। নিজের নাক-মুখ চেহারা সুস্থতায় সে ঢের আরাম উপভোগ করছে। এ শরীরটা যে সে নষ্ট করতে দেবে না, কোনো ভাবে অপব্যবহার করবে না, শরীরটা তার সন্তান জন্মাবার মন্ত্র কিছুতেই নয়; সন্তানের কথা ভাবতেও ওর এমন একটা অসাধ, এমন গায়ের জ্বালা। সন্তান ইন্দিরা ভালবাসে না। জেঠিমা-খুড়িমার সন্তান শুধু নয়, নিজের জন্যও সন্তান সে চায় না। এ মেয়েটিকে বিয়ে করবার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে সে কথা খুব গভীরভাবে বুঝেছে নিরুপম। নিরুপম অবাক হয়ে ভাবছিল, ছোটকাকার বেলির মত একটি কমনীয় করুণচোখের মেয়ে যদি তার থাকত কিংবা মেজকাকার ছেলে মিন্টুর মত প্রচুর জীবনী শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলে—কিন্তু সেই অনাস্বাদিত বিস্ময়ের সন্তানের জগতে এ স্ত্রীর সাহায্যে কোনোদিনই সে ঢুকতে পারবে না। আজই তা জানে নিরুপম, ফুলশয্যার রাতেই জেনেছিল।

নিজের অভিমান সমস্ত কামনার চেয়ে তার কাছে বড়। ঢের বড়। জীবনে অভিমানকে বাঁচিয়ে চলতে নিরুপম ক্ষুধাকে সে বিসর্জন দেবে। ক্ষুধাকে বাসনাকে দাম্পত্য-সম্বন্ধে কুহক বিবাহিত জীবনেব স্বপ্নকেও কোনো বিচিত্র সন্তানস্নেহের পালনের জগতে পৃথিবীতে সে প্রবেশ কবতে পারবে না। কোনেদিনও পারবে না। আচ্ছা, নাই-বা পারল, আচ্ছা, নাই-বা পাবল, আত্মবিনাশী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হয়ে অসীম সহিষ্ণুতা নিয়ে স্বামীর জীবনযাপন কববে সে, এই নারীটিব কাছে পুরুষের ক্ষমা ও সম্মান অত্যন্ত সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলবে সে। হয়ত একটা অবিশ্বাস বহুদীর্ঘ বিসর্পিত জীবন ভরে।

ইন্দিরা উঠে দাঁড়িয়ে দেযালে টাঙানো একটা আরশিব কাছে বিনুনি খুলতে খুলতে বললে, 'চাযেব জল এখন উনুনে পাব কিনা কে জানে? বামুনটা আবার ফ্যাচফ্যাচ করবে—হয়ত ডাল চড়িয়ে বসেছে।'

নিরুপম বললে, 'উঠনে ত তরকারি কোটা শেষ হয়ে গেল প্রায়। তুমি যাবে না একবার?'

ইন্দিরা বললে, 'শেষই যদি হয়ে গেল, তবে আর যাব কী কবতে?'

নিরুপম বললে, 'যাবার সব সময় একটা মূল্য আছে।'

ইন্দিরা চোখ কপালে তুলে বললে, 'আছে নাকি?'

নিরুপম বললে, 'তুমি এ বাড়িব বউ, তোমাকে সকলেই কাছে পেতে চায়।'

নিরুপম উঠছিল, ইন্দিবা বলল, 'শোন।'

—'কি?'

—'চায়ের জল হল কিনা দেখ ত।'

নিরুপম বললে, 'সেটা তুমি নিজে গিযে দেখো।'

ইন্দিরা বললে, 'চা আমি নিজেই তৈরি কবব, গরম জলটা তুমি একটু বান্নাঘব থেকে এনে দাও, লক্ষীটি!'

নিরুপম বললে, 'তাহলে লোকে ভাববে কি?'

—'ভাববে যে আমার মাথা ধরেছে, সারাটা দিন বেশ গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে, বিকেলে একটু বেড়িয়ে হাওয়া খেয়ে আসবারও সুযোগ পাযা যাবে।'

নিরুপম বললে, 'কই, স্টোভটা কোথায়?' এঘর ওঘর ঘুরে স্টোভটাকে নিজেই উদ্ধার করে আনল সে। ইন্দিরাকে বললে, 'ওই টেবিলের নিচে স্পিবিটের বোতল রযেছে, স্টোভটা জ্বালিযে নিও।' ইন্দিবা বললে, 'তুমিই জ্বালিযে দিয়ে যাও লক্ষীটি।'

চা-ও নিরুপমের করে দিতে হচ্ছে।

মিনিট চার-পাঁচ পরে ইন্দিরা বললে, 'ব্যস এখন কেটলিটা চড়িযে দেও। না, ওটা না ছোট কেটলিটা।'

—'সেটা আবার কোথায়?'

—'চা ভরতে নিয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, আর ফিরিয়ে দেয নি। তোমাদের যা শ্রীছাঁদের সংসাব!'

নিরুপম এককোণে দাঁড়িয়েছিল।

ইন্দিরা আঙুল দিযে দেখিয়ে বললে, 'মেজখুড়ির ঘরে, এমন ভিখিরি, একটা কেটলি অবদি কিনতে

পাবে না।'

কেটলিটা ধুয়ে নিরুপম কুঁজো গড়িয়ে জল ঢালছিল।

ইন্দিবা বললে, 'ব্যস, এক কাপ আন্দাজ এতই হবে, হবে না?'

নিরুপম ঘাড় নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

নিরুপমেব জন্যও যে এক কাপ এইসঙ্গে হলে বেশ হত সে খোঁজও ইন্দিবা নিল না, দম্পতি-জীবন-দেবতাও নিরুপমেব বুক থেকে বিবস মুখে বললেন, 'ওঃ সে কাপ কমলাও ত তৈবি কবে দিতে পাবে।'

আজ ভোববেললা অনেকখানি ঘুবে এসে একটু চাযেব প্রযোজন ছিল নিরুপমেব। মা গত বছবও বেঁচেছিলেন, তিনি নিজেব থেকে আদব কবে নিরুপমকে ডেকে চা দিতেন, কোথায কখন কি জিনিসেব দবকাব মা যেমন বুঝতেন' তাকে বলতেও হত না, মমতা-ভালবাসাব সবচেযে পবিচয হচ্ছে এইখানে। জানতেন এই ছেলেটি তাজা দুধ দিযে ঈষৎ একটু কড়া চা খেতে ভালবাসে, দিনেব মধ্যে বাব বাব। ততবাবই তিনি পবমস্নেহে প্রযোজন মিটাতেন। কোনো কোনো বউ নাকি মাযেব মমতা নিযে আসে, নিরুপমবে বোধ হচ্ছিল এ পৃথিবীব থেকে সে কোনো পবম অনুপমা নাবীকে বধূরূপে পেলেও যদি সে পেত তবুও তাব গত বছবেব দিনগুলো আব ফিবে আসবে না। কমলাকে কেন চা কবতে বলবে সে?

নিরুপমেব মাযেব অভাবে নিরুপমেব জন্য কমলা অনেক কবেছে, বটে, হাসিমুখে বাববাব মনেব মতন চা তৈবি কবে এনে দিযেছে, কিন্তু ইন্দিবাকে বিযে কবে আসবাব পব কমলাকে নিরুপম একটা ফবমাজও দেয নি, কেন দেবে?

কমলা নিরুপমেব মা নয, স্ত্রী নয, প্রেমাস্পদাও নয। জীবনে অনেকদিন আগে প্রণযিনী ছিল, একজন, দুজন, আজ তাবা কেউ নেই, মা ববাববই ছিলেন, তিনিও আজ নেই, কমলা অনেক ভাইযেব বোন, বোন খুব প্রগাঢ় ভাবেই, তাবপব, নিরুপমকে বিশেষ খাতিব কববাব জন্য তেমন একটি টান এব কাছ থেকে দাবি কবতে যাবে কেন সে? এব বিশেষ খাতিব দিযেও-বা কি হবে? তা না প্রণয, না প্রেম, না কিছু, এক কাপ চাযেব ব্যবস্থাযও আজ এইসব জিনিসেব যে আগেকাব নগণ্য স্থান আব নেই। কমলাব বযসে মেযেবা প্রণযিনী হয, কে জানে কোনো প্রেমিক এই মেযেটিব জন্য অপেক্ষা কবছে কিনা। আজ না কবলেও কাল কববে, প্রেমিককে না পেলেও এক ববকে পাবে এ মেযেটি। এক বাসববাত্রিব ফাঁক দিযে এই কমলা একদিন অন্তর্হিত হযে যাবে। ওবা চলে যাবে। যতদিন তাকে ততদিন এদেব ছোযাচ খুব আলতো, মন খুব কর্তব্যপবাযণ। কিংবা অকর্তব্য-পবাযণ। কিন্তু এব চেযে।

নিরুপম কমলাকে ডাকছে না আব।

খুব ভোবে বেড়াতে গিযে নিরুপমেব চা খাওযা এই কযেকদিন থেকেই হচ্ছে না। বিযেব আগে এমন হলে অনেকেই হযত খোঁজ নিত, কিন্তু আজ কেউই এগচ্ছে না। পিসিমা না, সন্ধ্যা না, কমলা না, এবা টেবও পায না নিরুপম চা পায না, পান পায না। কোনো আদব দবদ কিছু না। এসবেবই ভাব আজ ইন্দিবাব ওপব। চা খেযে সে চান কবতে চলে গেছে।

দাম্পত্য-জীবন-দেবতা নিরুপমেব বুক থেকে কি বললে এখন? সে কি চুপ হয গেল? না। আগে যা বলেছে তাই-ই আবাব বাক্যে বাক্যে অবিকল অনুমোদন কবে দেবতা। ইন্দিবাব খুব সুখেব শবীব। ছোটকাকাব বেলিব মত। নিরুপমেব আঘাত।

নষ্ট প্রেমের কথা

অনেক যুবকেবও যেমন হয, অনেক দিন থেকে মনেব ভেতবে একটা নিস্ফল ভালবাসাব ঘা পুষে মোহিতেব জীবনেব প্রতি অরুচি ধবে গিযেছিল। যাকে সে ভালোবেসেছে সে তাকে ঠকাল এই দুঃখ পৃথিবীব সমস্ত বেদনাব চেযে তাব কাছে এমন গভীবতব অন্ধকাবেব রূপ নিযে এল, তাব মনেব ভেতব ব্যঙ্গেব ঝোঁক এত কম যে এক আশাহীন হৃদযবৃত্তি নিযে এসেছে। জীবন পদে পদে অসঙ্গত ও অভদ্র ব্যবহাব কবলেও সে তবুও এত... ... সফলতাব মুখাপেক্ষী হযে বযেছিল যে জীবনেব সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইযে নিতে খানিকটা দেবি হযে গেল এই অন্তব বৃত্তিটিব।

কিন্তু সে শান্তসৃষ্ট দেবতাব দিনে শেষ হযে গেছে তাব, এখন সে পুবোপুবি দেবতা। দেবতা না কি? কোনো বিবাটতাব নিকট মাথা নোযাবাব কোনো প্রযোজন নেই।

সে সব শিখে ফেলেছে। এই সৃষ্টিটাকে সেও চালাতে পাবে, ঠিক এমনি কবে মেলাত বটে। অনেকে অনেক নতুন নতুন সুন্দব সুন্দব সৃষ্টিব পবিকল্পনা কবে। কিন্তু মোহিত অনেক ভেবে দেখেছে যে সে সব অকথন, অসাড় সৃষ্টিব পবিকল্পনা কবে। কিন্তু মোহিত অনেক ভেবে দেখেছে যে সে সব অকথন অসাড় সৃষ্টিব কল্পনা তাদেব পাণ্ডুলিপিকে সবস কবে বাখে শুধু, তাদেব হৃদযকে তৃপ্ত কবে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিব বাইবে বাস্তবে নতুন কবে কিছু ঘটবাব কোনো উপাদান তাদেব আযত্তে দেখা হয নি। ভালোই হযেছে। পৃথিবীটা একটা ভণ্ডলেব হাত থেকে বক্ষা পেযেছে। এই বেশ চলেছে। এই পৃথিবীটা। এখানে রূপ আছে ভালোবাসা আছে (পুকুবেব জলে) চাবেব মতো সুগন্ধে মানুষেব জীবনটাকে একবাব বিমুগ্ধ কবে ফেলবাব জন্য তাবপব আবাব বড়শিব মতো জীবনটাকে বিঁধে ফেলবাব জন্য। কিন্তু তাবপব আবাব সহিষ্ণুতা বযেছে প্রতীক্ষা বযেছে, মনেব দযাদাক্ষিণ্য আছে। বহুদূব বিসর্পিত চিন্তা আছে, নিভৃত শ্লেষ আছে গোপন উপহাস আছে সমস্ত কিছুকে সহ্য ও ক্ষমা কববাব জন্য। এবং এই সবেব ভেতব থেকে যে বস জমে ওঠে অতল গভীব গাজনেব বস। মোহিত অনেক কল্পনা কবে দেখেছে যে আব কিছুতেই কোনোবকম সম্ভাবনাব ভেতবেও তা মিলত না। এই সৃষ্টিকে সমর্থন কবে মোহিত। বিধাতাব বৈদগ্ধ্য ও প্রখবতা তাব এত ভালো লাগে।

যতদিন সে শুধু ভালোবেসেছিল, লক্ষ কোটি প্রেমিকেব মতো সাধাবণ একটি মানুষ ছিল ততদিন। ভালোবাসা তাকে পথে পথে ঘুবিযেছে, ব্যথা দিযেছে, একটি প্রেমিকাব জন্য সে অনন্তকাল অপেক্ষা কববে ভেবেছে ... ... অপেক্ষা কববে না, সঙ্কল্প কবেছে আব একটি প্রেমিকাকে গ্রহণ কবেছে, অত্যন্ত গভীবভাবে জীবনকে শ্রদ্ধা কবেছে, নিবেটভাবে সমস্ত বিশ্বাস হাবিযে ফেলেছে, একবাব নিজেকে নক্ষত্রেব আকাশেব বঙিন ফানুস মনে কবেছে, একবাব কাচেব খেলনা শুধু, যাব পবতে পবতে চিড় ধবেছে। সে সব দিনেব অবসান হল জীবনে।

প্রেম তাকে ব্যথা দিযে দিযে ঢেব শিখিযেছে।

জীবনকে পবিপূর্ণভাবে গড়ে তোলবাব পক্ষে এবই দবকাব ছিল এই প্রেমহীন মমতাহীন সহানুভূতিহীন মেযেটিব শেষ প্রেমাস্পর্দা তাব সবচেযে কঠিনতম হল। জীবনেব সকলবকম আশা বিশ্বাস স্বপ্ন কল্পনাব মূল্য দিযেও মোহিত দেখেছে সেই রূপসী প্রতিমাব বুকেব ভেতব খড় আব ধুলো শুধু। শিশুসুলভ একটা বিহ্বলতা ব্যথা নিযে বছবেব পব বছব এই খড় আব মাটিব কথা ভেবেছে সে। তাবপব মনে হল এ পৃথিবী কেমন বৈদগ্ধবতী,এই পৃথিবীতেই থাকতে হয, এইখানে বেঁচে ভালোবেসে নিস্ফল হযে নষ্ট প্রেমেব কথা ভেবে ভেবে এমন একটা অপবিসীম চেতনাব বস বুকেব ভেতব জেগে ওঠে, সমস্ত সৃষ্টিব গভীব অন্তবেব ভেতব প্রবেশ কবা সহজ হযে ওঠে।

মোহিতেব জীবনে এমনি নীবব চেতনা ও অর্ন্তদৃষ্টি জেগে উঠেছে। নিজেকে এখন সবচেযে বেশি কবে কি মনে হয মোহিতেব ? প্রেমিক ? ও বড় আবছাযাভবা শব্দ। ওব সমস্ত দিককাব সমস্তটুকু মানে মনকে নানাবকম কুজ্ঝটিকাব বাজ্যে নিযে যায। নিজেকে একজন অনন্যসাধাবণ ক্ষমাহীন পুরুষ বলে মনে

হয়, কোমলতা সহিষ্ণুতা কিছুতেই যেন ভাঙবে না আর।

ঠাকুমা বলেছিলেন 'মোহিত, তুমি কলকাতার থেকে দেশে এলেই আমার মন যেন কেমন একরকম হয়ে যায় দাদা'।

মোহিতের পিঠে তিনি হাত বুলুচ্ছিলেন।

ঠাকুমার মনে যা হয় মোহিত তা জানে, ঠাকুমার যে সাধ সে এতদিন পূর্ণ করতে পারে নি, কখনো মোহিত প্রণয়ী, তার প্রণয় একটা রক্তাক্ত পৃথিবীর মতো দিনরাত্রির অবসরের ভিতর। ছটফট করছিল মন তখন তার কিছুর জন্যই উপযুক্ত ছিল না। ভালোবাসা তাকে অগাধ ব্যথা দিচ্ছিল। কিংবা এখন সংসারধর্মের জন্য মন তার তৈরি হয়েছে যেন, বিবাহের জন্য একটা স্পৃহা জেগে উঠেছে।

ভালোবেসে দেখেছে সে নারীকে, ঘৃণা পেল, কিন্তু ঘরের বধূর মমতা ও সমবেদনার রূপ আজও সে বুঝল না। কিন্তু এখন সে আচ্ছন্নতা নেই আর, সে এখন মুক্ত মানুষ, মানুষের স্বাভাবিক সুখ দুঃখটাকে সে খুব গভীর করে পেতে চায়।

ঘরের বধূ জিনিসটা দুর্লভ নয়। অভিসারিকার চেয়ে ঢের সুপ্রাপ্য, কিন্তু তবুও তাকে নিয়েই আগ্রহ ও আন্তরিকতার জীবন বেশি যেন চলে,—অনেকদিন চলে।

ঠাকুমা বললেন, 'শিবরতনের মেয়েটি বেশ হয় কিন্তু মোহিতের পক্ষে, কি বলিস নিশ্চিন্দি?

মোহিতের বিধবা পিসিমা নিশ্চিন্তময়ী, তার মায়ের শিয়রের কাছে বসে বসে তাকে পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন, বললেন, 'আহা, বড় সুন্দর মানায়।'

মোহিতের কাকিমা অনুপমা বললেন, 'কিন্তু ওরা এখানে মেয়ে দেবে না।'

ঠাকুমা বললেন, 'দেবে না কে বললে? মোহিতের মতো ছেলে পাবে কোথায় তারা যে অত বড়াই? দেবে না তোমাকে কে বললে বউমা?'

অনুপমা বললেন, 'শুনেছি তার সম্বন্ধ নাকি ঠিক হয়ে আছে।'

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

—'একজন আই সি এস-এর সঙ্গে।'

নিশ্চিন্তময়ী গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলেন একদিন, সত্যি সে মেয়ের বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে আছে।

ঠাকুমা ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'শুদ্ধ সাত্ত্বিক ঘরের থেকে লক্ষ্মীর মতো মেয়ে আনব, অত দেমাকওয়ালা ঘরের থেকে মেয়ে এনে দরকার নেই।'

কিন্তু না, দেমাকের দিকে এরা আর গেল না। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের থেকে সুলক্ষণা লাবণ্যযুক্তা বধূ আনল সে। সকলে তৃপ্তি পেল।

মোহিত মনে মনে ভাবছিল, কীই-বা তার গুণ, কীই-বা রূপ, ঠাকুমার কাছে অনেক হতে পারে, কিন্তু সংসারের হিসাবে সংসারী মানুষের চোখে তা ঢের সাধারণ। খুব জাঁকজমকওয়ালা শ্বশুরবাড়ি, পরমাসুন্দরী রাজকন্যা দিকে করবে কী সে? নিজের জীবনের পক্ষে সে-সব জিনিসের জন্য কোনো প্রয়োজন নেই, আকাঙক্ষা নেই।

তার মা নেই, বাপ নেই, তাছাড়া এই সম্পত্তির কোনো ভাগও তাকে দেয়া হবে না।

মোহিতদের এ বাড়িটা একটা বিপুল সংসার। নানারকম রোগশোক আধিব্যাধি নালিশ অভিমান এ বাড়িতে লেগেই আছে, সে-সব এদের গা সওয়া হয়ে গেছে, অসংখ্য ছেলেপিলের ক্যাচক্যাচ। সুরূপা এসেই ভ্রূকুটি করল। বউয়ের গৃহবেশের প্রথম হুকুমটা চলছিল। পাড়াপড়শি মেয়েরা সবে এসেছে। আচার অনুষ্ঠান খানিক হয়েছে, খানিক বাকি আছে। সুরূপা ওষ্ঠাগতপ্রাণ তাকিয়ে দেখল একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে তাকে প্রাণপণে বাতাস দিচ্ছে।

সুরূপা তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কে গা?'

পরিমল বললে, 'বাঃ, আমাকে চেন না? আমি তোমার ননদ।'

সুরূপা বললে, 'যাই হও বাবা, তুমি আমাকে নিয়ে চলো তো।'

—'কোথায়?'

—'আমার শোবার ঘরে।'

পরিমল বললে, 'তোমার খুব কষ্ট হল নাকি বউদি? এই তো আমি বাতাস করছি।"

সুরূপা বললে, 'রেখে দাও তোমার বাতাস, আমি এখন না শুয়ে পারব না। হাত পায় খিল ধরে

গেছে।'

শোবাব ঘবে ঢুকেই সুরূপা খিল আটকে বিছানায় শুযে পড়ল। পাড়াপড়শিবা একটু অবাক হযে বলাবলি কবতে লাগল, বউযেব মূর্ছা বোগ আছে নাকি? নতুন প্রতিবেশিনীবা একটু পবে এসেছে, বউকে তাবা দেখতেই পায নি। পিসিমা জেঠিমা এসে সুরূপাব দবজায মৃদু আঘাত কবল। ভেতব থেকে সুরূপা বললে, 'কে বে বাপু, আমাব ভূতেব হাড়গোড় নাকি যে।'

অনেক বাত অবধি সে খিল আটকে বাখল। তাবপব যখন সব নিশ্চুপ হযে গেছে মোহিত একসময এসে দবজায ধাক্কা দিযে বললে, 'আমি।'

সুরূপা দবজা খুলতে খুলতে বললে, 'জ্বালাতন, যত সব ভূতপেত্নীব আড্ডা হযেছে আমাব শোবাব ঘবটাব পাশে। চলে গেছে ওবা সব ? না এখনো আড়িপেতে বসে আছে?'

মোহিত বললে, 'না।'

সুরূপাব চোখেব দিকে সে কী যেন বলতে গিযে অগত্যা থেমে গেল, নববধূব চোখেব মতো এ চোখ একেবাবেই নয।

সুরূপা বিছানায শুযে আড়মোড়া দিযে বললে, 'আমাব নিকুচি কবেছে, নতুন বউ দেখতে এসেছে, নতুন বউ যেন সঙ, যত সব ন্যাকামো, ওই পিসিটাবই বেশি, কি নাম যেন ওঁব ?'

ঘবেব গুমোটেব ভেতব মোহিতেব বড্ড গবম বোধ কবছিল। হাতপাখাটা দিযে সুরূপা নিজেই বাতাস খাচ্ছে।

মোহিতেব ধাবণা ছিল এই জ্যোৎস্নায সাবাবাত জেগে বধূ তাকে তাব আজীবনেব গল্প বলবে, যত কবিতা উপন্যাস গল্প পড়েছে মোহিত সকলেব থেকে সুরূপাব এই বিবৃতিটুকুই যেন সবচেযে বেশি সবস হযে মোহিতেব হৃদযটাকে ধবে বাখবে। কিন্তু সুরূপাব যেন কোনো অতীত নেই। কোনোদিনও ছিল না।

পবদিন সকালবেলা একেবাবে আটটাব আগে আব উঠল না সুরূপা। মোহিত কোন ভোবে বেবিযে গেছে। কাউকে সে খবব দিযেও যায নি। সুরূপা উঠেই দেখল একপাল ছেলেমেযে—তিনমাসেব খোকাব থেকে শুরু কবে ত্রিশ বছবেব ননদ অবধি তাব ঘবেব চাবপাশ অববোধ কবে অপেক্ষা কবছিল। কীসেব জন্যই অপেক্ষা-বা? জেঠিমা পিসিমা সেই কাকিমাটাও একদলেব ভেতব বযেছে বোধহয। সুরূপা কটমট কবে একবাব তাকাল। বউবা নেই। কিন্তু ছোটদেবও ভালো লাগল না তাব।

পবিমলকে এদেব ভেতব দেখতে না পেযে সুরূপা বললে, 'কই সে ননদটি কোথায ?

বিনোদিনী মোহিতেব খুড়তুতো বোন। বছব চোদ্দ বযেস, সে বললে, 'কাব কথা বলছেন ?'

—'পবিমল না কি তাব নাম ?'

—'ও মেজদি'

তিন-চাবটি ছেলেমেযে ধাঁ কবে পবিমলকে ডেকে নিযে এল।

সুরূপাব মুখে একটু হাসি ফুটল। বললে, 'বাপবে, কাল তো খুব বাতাস দিচ্ছিলে, আজ যে একেবাবে দেখাই নেই।"

পবিমল বললে, 'তবকাবি কুটছিলুম বউদি।'

—'ও বউযেব তবকাবি কোটা, শোনো আমাব নাইবাব জল আলাদা কবে বাখা হযেছে?'

পবিমল সকলেব দিকে একবাব হাঁ কবে তাকিযে মাথা নিচু কবে বললে, 'বেখেছে বোধহয।'

—'বোধহয কি, তুমি একটু খবব নিযে এসো তো।'

পবিমল যাচ্ছিল।

সুরূপা বললে, 'আব না বাখা হলে, বেখে দিতে বলো। বলবেই-বা কি, তুমিই চাকববাকব দিযে ও জিনিসটা কবিযে বেখো বাপু।'

সুরূপা ছেলেমেযে সকলেব দিকে একবাব তাকিযে বললে, 'বাপবে, এবা যে এক গুষ্টি।'

এদেব ভেতব বিনোদিনীই একটু বড়, সে লজ্জিত হযে ঘাড় ফিবাল।

সুরূপা বললে, 'এত কাচ্চাবাচ্চা কাদেব গা ?'

বিনোদিনী বলল, 'আমাদেবই।'

—'মানে এ বাড়িব ? এই সব?'

বিনোদিনী বললে, 'হ্যাঁ।'

সুরূপা বললে, 'সন্তান বিয়োতে বিয়োতে ওই এক ধাত হয়ে যায়, গরুছাগলের মতো; ছিঃ, মানুষের একটু সংযম থাকা দরকার।'

বিনোদিনীরও হয়তো সেই মত, কিন্তু নতুন বউদিদির কথাটা শুনে সে একটু গম্ভীর হয়ে পড়ল।

ছেলেমেয়েদের দিকে একবার তাকিয়ে সুরূপা বললে—'বাবা, জংলি পায়রার বাচ্চা দিয়ে ঘরদোর যেন ভরে ফেলেছে একেবারে, শুনেছি নাকি এ টানের সংসার, এখানে কি এত অবুঝ হলে চলে? ছিঃ, কি নির্বুদ্ধি।'

বিনোদিনী চুপ করে রইল।

সুরূপা ঠোঁট উলটে বললে, 'আমার পিসতুতো ভাইদের তো একটি ছেলে মোটে, তার জন্য হিন্দুস্থানী ছোকরা, তো উড়ে বেয়ারা, তো ঠেলাগাড়ি, বলেছিল নার্সও রেখে দেবে।'

ছেলেমেয়েরা বিস্মিত হয়ে শুনছিল।

সুরূপা বললে, 'তাই না আমার ভাইপোর মুখ ফুলের মতো সুন্দর, কেমন ননীর মতো হাত-পা নাক-মুখ, গায় সবসময়ই পাউডার আর পমেটের গন্ধ, হবে না? এ-সব তো আর কুকুর বিড়ালের বাচ্চা না।' একটু থেমে বললে, 'কিন্তু তবুও ও ছেলেপুলেদের ঘাঁটাতে আমি পারি না বাপু, মন্টুকেও বেশিক্ষণ কোলে রাখতে পারি না।'

বিনোদিনী বললে, 'ওই পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে বুঝি?'

—হ্যাঁ।'

সুরূপা বললে, 'সেই ছেলেটার আবার রিকেট, রিকেট তো ... ...? প্যাকাটির মতো হাত পা, এমন হালকা,পাখিটির মতো, কিন্তু তবুও পাঁচমিনিট কোলে করলেই এমন কোমর কাঁকাল ভেঙে আসে'— সুরূপা মুখ কাঁচুমাচু করে সকলের দিকে তাকাল।

দুপুরবেলা।

মোহিত বললে, 'খিল আটকে আর কি হবে?'

সুরুপা বললে, বাবা হনুমানের দল যদি একবার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে তাহলেই হয়েছে।'

মোহিত একটু হেসে বললে, 'হনুমান? কাদের বলছ?'

—'আর কাদের, ইজের ফ্রক পরা ন্যাড়ান্যাড়া মাথা এ বাড়িতে বিস্তর রয়েছে। শুধু একটা করে লেজ লাগিয়ে দিলেই হল।'

মোহিত বললে, 'ওরা কী করেছে তোমার?'

সুরূপা বললে, 'বিশ্রী দেখতে।

মোহিত ঘাড় হেঁট করে ভাবছিল, কালোয় ধলায় সৌন্দর্য কদর্যতায় এ বাড়ির ছেলেপিলেরা প্রায় যে কোনো সাধরণ বাঙালি বাড়ির মতোই, সুরূপাও সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের ঘর থেকে পারিপার্শ্বিক থেকে এল, এসব কি সে দেখে নি ? কতবার, কত জায়গায়ই হয়তো দেখেছে। হয়তো প্রতিটি বারই এমন ঘৃণা করেছে। মনে মনে ঠাট্টা করে এসেছে।

সুরুপা বললে, 'পরিমলটি মন্দ নয়, ও তোমার খুড়তুতো বোন, না'

মোহিত বললে, 'হ্যাঁ।'

সুরূপা বললে, 'ওকে ফরমাজ করি বেশ শোনে।'

—'বিনোদিনী অবধি —ওর বয়েস কত হল?'

—'চোদ্দ, পনেরো।'

সুরূপা বললে, 'বিনোদিনীর কোলে কোলে ওই ছ-সাত মাসের মেয়েটি যে থাকে, ওটি কে?'

মোহিত বললে, 'ছ-সাত মাসের?'

—'আঃ, ওই যে টেকোটা, মাথায় এখনো চুলই উঠল না।'

মোহিত বললে, 'ছ-সাত মানের নয় তো, ও তো দেড় বছরের।'

—'ও মা, ওই পুঁটলি দেড় বছরের, আমি যাব কোথায়?'

মোহিত বললে, 'ওর বাড় একটু কম, এখনো কথা বলতে পারে না, থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না।'

সুরূপা বললে, 'তোমার জেঠিমার মেয়ে বুঝি?'

— 'হ্যাঁ।'

—'তোমার জেঠামশাইটির বয়স সত্তরের কম হয় নি, মরতে মরতেও কি শখ দেখো।'

মোহিত ভাবছিল। বললে, 'ডাক্তাববা বলেছে দু-এক বছবে মধ্যেই ছুটকুন চোখেও দেখতে পাবে না, এখনো অনেকে সন্দেহ কবে যে খুবই সামান্য দেখে, হযতো দেখেও না।'

জেঠিমা ছুটকুনকে নিযে মোহিতেব ঘবে ঢুকল।—'কই, বউমা কী কবছ, একটু কথা বলতে এলাম।'

সুরূপা কুশনটা চেপে বসেছিল, উঠল না, কোনো জবাবও দিল না। তাব ঘুমোনোব কক্ষে মানুষ দেখে সে কেমন বিবক্তি বোধ কবছে।

মোহিত বললে, 'বসুন জেঠিমা।'

চেযাব মোড়া জলচৌকিও ছিল, জেঠিমা বললে, 'আমি খাটেই বসি।'

খাটে বসলেন। ছুটকুনকে খাটেব ওপব ছেড়ে দিলেন।

সুরূপাব মুখেব দিকে মোহিত তাকাল না। ছুটকুন খাটে বসে নড়ছিল না, চড়ছিল না, ... খাটেব ওপব শুইযে দিযে জেঠিমা বললেন, 'মাড়িস-টাড়িস না কিচ্ছু, ছুটকুন, তোমাব বউদিদিব কেমন ধবধবে শাদা খাট।'

সুরূপা একটু হাসবাব চেষ্টা কবে বললে, 'ছেলেমেযেদেব কি বললেই তাবা শোনে, দেয কাপড়চোপড় নোংরা কবে।'

জেঠিমা যেন কথাটা বুঝলেন না।

সুরূপা বললে,'বিনোদিনী কোথায?'

জেঠিমা বললে, 'কেন?'

সুরূপা বললে, 'ছুটকুনেব লং-ক্লথ আব কাঁথা এনে দিক।'

জেঠিমা বললেন, 'লং-ক্লথ ভিজে ছবছব কবছে, এই বোদে ঝুলিযে দিযে এলাম।'

মোহিত বললে, 'দেখি তো ছুটকুন, বাঃ, বাঃ, ছুটকু নাকি বে।' মোহিত তাকে কোলে তুলে নিল। আদব পেযে মেযেটি হাসতে লাগল।

জেঠিমা বললেন, 'যাও ছুটকু, তোমাব বউদিব কাছে যাও।'

ছুটকু মোহিতেব কোলে একটা দলাব মতো বসে বইল। আব কিছু সে দেখছেও না। বুঝছেও না। চাচ্ছেও না যেন।

জেঠিমা বললেন, 'দেখি মোহিত।' মেযেটিকে তিনি নিজেই কোলে তুলে নিযে বললেন, 'ওই দেখ ছুটকু তোমাব বউদি, ওই দেখ।'

মেযেটি যেন দেখল এবাব। সুরূপাব দিকে যাবাব জন্য হাতও বাড়াল, কিন্তু সুরূপা কোনো আগ্রহ প্রকাশ কবলে না। কোনো আদবেব শব্দ ব্যবহাব কবলে না। এমন ঠোঁট মেবে চুব কবে বসে বইল।

জেঠিমা হযতো খানিকটা বুঝতে পাবলেন। এক-আধ মিনিট পবে মেযেটিকে নিযে চলে গেলেন তিনি।

সুরূপা দুযাবে খিল আটকে দিযে এসে বিছানাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, 'দুপুববেলা নতুন বউযেব শোবাব ঘবে কেউ কোনোদিন এবকম ঢুকে পড়ে নাকি?'

মোহিত বললে, 'দবজাটা খোলা ছিল বলেই।'

সুরূপা বাধা দিযে বললে, 'বলেছিলামই তো বাঁদবগুলো ঢুকে পড়বে, তুমিই তো খিল দিতে দিলে না।'

অনেকক্ষণ পবে মোহিত বললে, ছুটকুনেব জন্য কষ্ট লাগে না? আহা, অতটুকু মেযে চোখে দেখতে পাবে না।'

সুরূপা বললে, 'কিবকম বেআক্কেল লোক দেখ, বললে লং-ক্লথ ভিজে ছবছব কবছে, আব দিব্যি আমাব ফটফটে বিছানায চড়িযে দিযে গেলেন। এসব লোককে আস্কাবা দিলে একেবাবে জ্যান্ত চিবিযে শেষ কবে দেবে।'

সুরূপা ঘুমল।

ঠাকুমা তাঁব লম্বা মযূবপঙ্খী বিছানায শুযে আছেন। শাদা ধবধবে পাতলা ধাবালো চেহাবা। সেকেলে মেযেদেব মতো কপালে উল্কি। ডান হাতে উল্কি, বাঁ হাতে উল্কি, না জানে আবো কত জাযগায।

মোহিতকে পাশে বসিযে ঠাকুমা বললেন, 'বিযে কবে তুমি খুশি হও নি নাকি দাদা?'

মোহিত বললে, 'কে বলেছে?'

—'আমারই যেন মনে হয়।'

মোহিত নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে, 'কেন নাতবউকে বুঝি তোমার ভালো লাগে না দিদি?'

ঠাকুমা একটা নিশ্বাস ফেললেন, দীর্ঘনিশ্বাস হয়তো নয়। বললেন, 'কই, কাছে আসে না যে।'

মোহিত বললে, 'তোমার কাছে আসে না সুরূপা?'

ঠাকুমা বললেন, 'বিয়ের পর সাত-আট দিন চলে গেল, একবাব শুধু এসেছিল।'

মোহিতের বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করে উঠল। বললে, 'সেই যে আমি আর সুরূপা এসে প্রণাম করে গেলাম তারপর আর আসে নি?'

—'কই, আসে নি আব।'

মোহিত অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে চুপ করে বসে রইল। একটু চাড় করে বউকে ঠাকুমার কাছে পাঠাতে সেও তো মোটেই যত্ন নেয় নি। কেন নেয় নি? আহা, এমন ভুলেছিল কেন?

মোহিত ভেবে দেখল, জীবনে কর্তব্যেব দিকগুলো, এই বিয়ের পর তাকে যেন একেবারে ছেড়ে চলে গেছে। জীবনটা যেন একটা নিস্ফলতাব সঙ্গে যুদ্ধ করছে শুধু, বিজযেব কোনো লক্ষণ দেখছে না, পরাজযের মধ্যে মাঝে মাঝে একবার ক্লেশ অনুভব করছে। মাঝে মাঝে এক একবার তামাশা বোধ করছে। কিন্তু জীবন, শুধু সুরূপাকে নিয়ে খেলা কবার চেয়ে ঢেব বড়, বিস্তৃত। মানুষেব-কাছে অহোরাত্র তার অজস্র রকমের দাবি চলেছে।

ঠাকুমা বললেন, 'তোর পিসিমাকে পাঠিয়েছিলাম চাব-পাঁচ দিন।'

—'কেন ?'

—'নাতবউকে ডেকে আনবাব জন্য।' ঠাকুমা বললেন, 'কিন্তু রোজই গিয়ে খিল বন্ধ দেখে ফিবে এসেছে।'

মোহিত খুব অপ্রস্তুত বোধ কবে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'দুপুরবেলা পাঠিয়েছিলে হযতো।'

ঠাকুমা বললেন, 'সকালবেলা খুব দেবিতে ওঠে শুনলাম, ভাবলাম যে আহা ঘুমোক, এবপব যখন ঘানিতে জুড়বে ঘুম যাবে কোন আখালে, ঘুমেব থেকে উঠে স্নান কবে—দিঘিতে গিয়ে কবে না শুনলাম। এ বাড়িব কোনো মেয়ে জল তুলে স্নান কবে না। এক আমি ছাড়া। নাতবউতে আমাতে খুব মিলেছে।' ঠাকুমা প্রসন্নভাবে হাসতে লাগলেন। ঠাকুমা বললেন, 'তাবপব নিজে চা কবে খায়? তারপব কাগজপত্র পড়ে বুঝি ? বেশ।' ঠাকুমা বেশ প্রীত মুখে জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশটাব দিকে তাকালেন। বধূ সেবাপবাযণা হচ্ছে না, সংসারে সুধা ঢালছে না, তবুও ঠাকুমাব এ তৃপ্তি কোথেকে? অভিনয়? মোহিত কাউকে বিশ্বাস কবে না, তবুও ঠাকুমাব স্নিগ্ধ প্রসন্নতাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হচ্ছে মোহিতেব, তাব ভেতব সত্যের একটা ধাঁচ রযেছে যে।

ঠাকুমা বললেন, 'দুপুবেবেলা খিল আটকে তোব সঙ্গে গল্প কবে বুঝি, না ঘুমোয?'

গল্প, পাঁচ মিনিটের বেশি করত না কোনোদিন, আগে ঘুমত, মোহিত জেগে থাকত। কিন্তু আজকাল মোহিত ঢুকবার আগেই খিল আটকে দেয। কোনোদিন গল্প পড়ে, কোনোদিন সেলাইযেব কলটা নাড়েচাড়ে, কোনোদিন-বা পাড়ায খেলতে যায। মোহিত একটু অভিমান ভরে চোখ বুজল।

ঠাকুমা বললেন, 'তাবপব সন্ধ্যা হয়ে আসে, বুড়োমানুষ, চোখে কি দেখি? একটা পুতুলকে বিছানার পাশে বসিযে কি আব হবে?' ঠাকুমা বললেন, 'সন্ধ্যাব সময ছোট ছোট ছেলেপিলেদের গিয়ে ও গল্প বললে পাবে।' একটু ভেবে বললেন, 'ধ্যেৎ তা-কি হয়, নতুন বউ-মানুষের তা কি ভালো লাগে?'

মোহিত বললে, 'দেখতে কেমন ? সেদিন যে দেখলে ?'

ঠাকুমা ফিক কেব একটু হাসলেন। বললেন, 'নাকটা বোঁচা।'

মোহিত বললে, 'ওইতেই সর্বনাশ কবে দিয়েছে, আমার নাকও বোঁচা কিনা ।'

ঠাকুমা বললেন, 'কিন্তু চোখদুটো তো বেশ ডাগর।'

মোহিত বললে, 'তাতে কি নাকের আফশোস মেটে? তোমার মতো বাঁশির মতো নাক যদি থাকত, এব আগে যাকে আমি ভালোবেসেছিলাম তাব নাকটা ঠিক তোমার মতো।'

ঠাকুমা বললেন, 'আমার তো লম্বা মুখ।'

—'তোমাব তো এমন সুন্দব মুখ, কিন্তু আমাব বাবাব এবকম ছিল না, আমাবও না, আমাব বউযেবও হল না।'

মোহিত বললে, 'হ্যাঁ ঠিক সেই সেকালেব বাদশাজাদিব মতো, এই মুখটা বুকে এসে এমন আঘাত কবে।'

ঠাকুমা দু-এক মিনিট চুপ থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, এক-একজন এমন আখখুটে লোক থাকে এমন রূপ চায, শুধু রূপেই নয, তাদেব পছন্দমতো জিনিসটা না হলে হবে না। তোমাব ঠাকুবদাদা ঠিক তেমনি ছিলেন। আমাব চেহাবাটাকে তিনি এমন ঘেন্না কবতেন।'

মোহিত আশ্চর্য হযে বললে, সত্যি?'

ঠাকুমা বললেন, 'নাক-মুখ সিঁটকে বলতেন ধ্যেৎ কি এক লম্বা মুখ, মেহেব আলি খানসামাটাব মতো মুখ হবে, হবতনেব টেক্কাব মতো, একেবাবে ধামা ... ..., আমাকে তিনি যথেষ্ট কষ্ট দিযে গেছেন।'

মোহিত বললে, 'তুমি ঠাট্টা কবছ না তো দিদি?'

ঠাকুমা ভাঙা গলায বললেন, 'বড় কষ্ট পেযে গেছি, বিশ্বাস হয না দাদা? এই দেখো।' কপালেব বাঁপাশেব খানিকটা চুলি সবিযে মস্ত বড় একটা ক্ষতেব দাগ দেখালেন তিনি। বললেন, 'তোমাদেব বংশে বড্ড বাগ।' একটু থেমে, 'কিন্তু নাতবউযেব সঙ্গে এমনটি ব্যবহাব একদিনেব জন্যও কোবো না।'

মোহিত একটু চুপ কবে ভাবছিল। ভাবছিল, তাব ঠাকুমাব বক্ত তাব বুকেব ভেতবও যথেষ্ট বযেছে, কিন্তু পৃথিবীব কত জাযগা থেকে কত গানেব থেকে গল্পেব থেকে নিজেব পবম চিন্তিত নিস্তব্ধ জীবনেব থেকে জীবনকে যেন তাব মাঘেব শেষেব একবাশ মৌমাছিব মতো ইতস্তত উড়ে উড়ে অনেক মধু জমিযে ফেলেছে। বুকেব ভেতব অনাদিকালেব বক্ত মনটাকে ঢেব তেতো উগ্র কবে ফেলে বটে, দুর্বিষহ কবে তোলে, কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত ধবতে গেলে হৃদযটা তাব শান্ত ও নিস্পৃহ চিন্তাব অমৃতলোক।

মোহিত বললে, 'উঠি।'

ঠাকুমা বললেন, 'কাকে আবাব ভালোবেসেছিলে?'

—'ও, সে একটি মেযেকে।'

—'কবে?'

—'সে প্রায তিন-চাব বছব আগেব কথা।'

—'খুব চোখা নাক ছিল বুঝি মেযেটিব?'

—'হ্যাঁ।'

একটা নিশ্বাস ফেললেন ঠাকুমা। এবাবও দীর্ঘনিশ্বাস নয, জানালাব ফাঁক দিযে বাইবেব দিকে একবাব তাকালেন। ঠাকুমা জিজ্ঞেস কবলেন, 'তাবপব কী হল?'

মোহিত বললে, 'তাবপব তিন-চাব বছব পবে বিযেব মতলব হল।'

ঠাকুমা কিছু জিজ্ঞেস কবলেন না, মোহিতেব এই ভালোবাসাব গল্পেব মাঝখানেব মস্তবড় ফাঁকটা তিনি মনে মনে পূবণ কবছিলেন হযতো।

বুড়োমানুষকে ভাববাব জন্য সমস্ত দিন সমস্ত বাতেব খোবাক দিযে মোহিত উঠে পড়ল, না ভাবলে এবা সময কাটাবে কী কবে? আজকালকাব ছোকবাদেব ভালোবাসাব কথাই না হয ভাবুক। কিন্তু ঠাকুমা আব এক মিনিটও ভাবতে গেলেন না যেন, মোহিতেব জীবনে এসব হ্যাঁচকা ভালোবাসাব কোনো গল্প ছিল না, থাকলেও সেটা তাব জীবনেব ভেতব নয যেন। বললেন, 'বউ তোব খুব পড়তে পাবে শুনলাম, কী পড়ে বে?'

মোহিত বললে, 'কে জানে।'

—'কাল আমাব কাছে নিশ্চয নিশ্চয পাঠাবি কিন্তু, তুই নিজেই নিযে আসিস, পড়বে।'

মোহিত বললে, 'বামাযণ?'

ঠাকুমা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না-না, এসব সেকেলে খবব দিযে কবব কি? আজকালকাব বইটই কিংবা খববেব কাগজই আমাব ভালো লাগে। পবিমল একদিন শবতেব একটা বই পড়ে শোনাল, ওব বাবা এসে ধাঁ কবে বললে এইসব পড়িস তুই, অমনি বমেনেব সঙ্গে আমাব ঝগড়া কবে তবে ছাড়ি। এই সব বুড়োখোকাদেব দিযে কী হবে বে? সুজাতা সেদিন যে ইংবেজি বইটা তর্জমা কবে পড়লে/অজিত অনেকদিন নেই। এদিক সেদিক থেকে বাজ্যেব বই এনে আমাকে পড়িযে শুনিযেছে।' ঠাকুমা একটা

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ঠাকুমা বললেন, 'তোর জেঠামশাই বলে বুড়িটা শেষে ম্লেচ্ছ হয়ে মরল। এই বলে আর হাড়গোড় বের করা বউটার পেট ভারী করে তোলে। নচ্ছার! নচ্ছার!'

মোহিত নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতেই সুরূপাকে পেল। বললে, —'শোনো।'

বৈদগ্ধ্যবতী ঠাকুমার জন্য তাকের থেকে একটা আধুনিক নমুনার বই বের করে, মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে মোহিত বললে, 'এইটে ঠাকুমাকে পড়িয়ে শোনাও।

সুরূপা আকাশ থেকে পড়ল যেন। বইটার দিকে সে একবার তাকালও না। বললে, 'ঠাকুমা, ওই খুলি বুড়িটার কাছে গিয়ে আবার বই পড়তে হবে, তবেই হয়েছে।'

মোহিত বললে, 'ছিঃ।'

সুরূপা বললে, 'আমি কাউকে কোনোদিন বই পড়ে শোনাই না।'

মোহিত বললে, 'আচ্ছা ঠাকুমার কাছে দু-দণ্ড এই বইটি নিয়ে বোসো তো ঢের আমোদ পাবে।'

সুরূপা সব মাটি করে দিল। ঠাট্টা সে কবলও না। এক ঝটকায় মোহিতেব হাত সরিয়ে দিলে, তাবপব পানের বাটা নিয়ে বিছানাব ওপব গিয়ে বসল।

মোহিত একটা চেযাবের ওপর বসে বললে, 'যাবে না?'

সুরূপা বললে, 'না।'

মোহিত বললে, 'কেন তোমাব তো খাওয়াদাওযা হযে গিযেছিল, এই দুপুবেলা তো বেশ হত?'

সুরূপা বললে, 'আমাকে তুমি বকিও না।'

মোহিত বললে, 'লক্ষ্মীটি, আজকেব দুপুবটা শুধু।'

সুরূপা ভ্রূকুটি করে বললে, 'তোমাব কথা শুনলে গাযে বোদ পড়ে, একে তো গরমের জ্বালায মরছি, আবাব কথার টালবাহানার জ্বালা।'

মোহিত বললে, 'তাহলে সন্ধের সময যেও।'

সুরূপা বললে, 'আমি যাব না।'

—'গা ধুয়ে ঠান্ডা হযে যেও এই বইখানা নিযে।'

—'আমি কিছুতেই যাব না।'

—'কেন?'

—'ওসব বুড়িধেড়িদেব আমার ভালো লাগে না।'

মোহিত বললে, 'তবুও তিনি তো তোমাব ঠাকুমা।'

—'আমার ঠাকুমা না হাতি?' সুরূপা তীব্র প্রতিবাদ কবে উঠল।

মোহিত থমকে গিযে ভাবল, তাই তো।

সুরূপা বললে, 'আমাব নিজের ঠাকুমা ছিল, আমাব বাবাব মা, এমন খাটে আরামে পা ছড়িযে দিযে বগবগানি কবা তাব অভ্যেস ছিল না। পরকে দিযে পড়িযে গল্প গেলবার বাই ছিল না বাপু। সুরূপা বললে, 'বাবা তাব একটিমাত্র ছেলে, শুধু এক ছেলের মা, বেশ হাত-পা ঝাড়া, একেবারে ব্রহ্মাণ্ড সংসার ফাঁদিয়ে বসেছিল, সাতশো বাড়ির হাঁড়িব খবর নেযা চাই।' একটু থেকে সুরূপা বললে, 'ওমা সেই একদিন গিযে প্রণাম কবতে দাঁড়িযেছিলাম, তখনই বুঝেছি কি।'

মোহিত সহিষ্ণুভাবে বললে, 'এই বইখানা দেখ।'

সুরূপা বইটা ঠেলা দিযে একদিকে সরিযে দিযে পান বানিযে বানিযে নিজেব ডিবাটা ভরিযে ফেলে ডাক দিল— 'বিনোদিনী।'

বিনোদিনী এল।

সুরূপা বলে, 'নাও বাপু, নিযে যাও তোমাদেব পানেব বাটা, কাল একটু এখানে পড়েছিল বলে কত কথা হল। অমন ফড়ফড় করে কথা আমরাও ঢেব বলতে পারি। পানের বাটা যেন আর এলাকা ছেড়ে বেরতে পারে না, ইস!'

বিনোদিনী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হযে বাটাটা তুলে নিযে গেল।

পানের বাটা নিয়ে কী হযেছে মোহিত সে-সব খুঁজতে গেল না আর। আস্তে আস্তে সে ঘরের থেকে বেরিয়ে গেল।

কি যেন কি মনে করে পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে দেখল খিল আটখানো।

পবদিন মোহিত আবাব সুরূপাকে চেপে ধবল। ঠাকুমার কাছে চলো। সুরূপাব মুখঝামটা খেযে আজও সে নিবস্ত হল। এমনি চাব-পাঁচ দিন ধবে বলে বলে সে নিজেও এমন অবসন্ন হযেছে, সুরূপাব মনটাকে বিড়াল আঁচড়ে কাঁটাজঙ্গলেব মতো কবে দিযেছে যেন।

একদিন ঠাকুমা মোহিতকে চট কবে ধবে ফেলে বললে, 'এই যে দাদা মোহিত এবাব আব এড়াবাব ফাঁক খুঁজে পেলে না।'

বসবার তাব একটুও ইচ্ছা ছিল না, ঠাকুমা নিজেব হাতে ধবে খাটেব পাশে বসালেন। বললেন, 'কই সে তো এল না।' মোহিতেব মুখ গম্ভীব দেখে ঠাকুমা সে গুমটটাকে কাটিযে ফেলবাব জন্য হাস্যবসোচ্ছলে বললেন, 'আঃ, নাতবউ তো, ঠাকুমা তাব কে? কেন আসবে? আমি নাতবউ হলেও ওই বুড়ী ফ্যাবফেবিগুলোব কাছে যেতাম নাকি?'

মোহিত আস্তে আস্তে মুখ তুলল।

ঠাকুমা বললেন, 'পবিমল তাব মামাব বাড়ি বেড়াতে গিযেছে, বিনোদিনীব জ্বব, অনেকদিন পবে তাই নিজেই চশমা খুলে এই বইখানা তুলে নিলাম। কিন্তু সমস্ত সকাল বসে দশটা লাইন পড়তে পেবেছি শুধু, তাবপব থেকেই ঝাপসা দেখছি সব, একটা অক্ষবও বুঝতে পাবছি না। আমাব চোখেব দৃষ্টি নষ্ট হযে গেল নাকি বে।'

মোহিত ঠাকুমাব চোখেব পুরু পাথবেব চশমাটাব দিকে তাকাল। বললে, 'কিচ্ছু দেখছ না?'

—'তোব মুখ দেখতে পাচ্ছি শুধু, কিন্তু কেমন ধোঁযা ধোঁযা, এই চশমাটা খুললে তাও হযতো দেখতে পাব না।'

মোহিত বললে, 'একদিন ধবে খুব পড়েছ বুঝি?'

ঠাকুমা বললেন, 'ছ-পৃষ্ঠা।'

একটা নগণ্য সামান্য বইযেব অকিঞ্চিৎকব কযেকটা পাতা, এইজন্য এই বুড়ো মানুষটাব চোখ গেল। মোহিত অনেক বকম সম্ভাবনাব কথা ভাবতে লাগল যাতে এমন জিনিসটা হত না, অন্তত এত তাড়াতাড়ি তো কিছুতেই না। কিন্তু যা হযেছে তা হল। কলকাতায গিযে চোখ কাটাবাব সম্ভাবনা নেই। অনেক কাবণেই নেই। সেই কাবণগুলো নিজেব মনে খুঁচিযে খুচিযে দু-এক মুহূর্তেব জন্য মোহিতেব মনে হল একদিন তাবও ঠিক এই অবস্থা হবে। একখানা বইও আব পড়বাব ক্ষমতা থাকবে না আব। কেউ তাকে পড়িযে শোনাতেও আসবে না। ঠাকুমাব চশমা আটা মুখেব দিকে তাকিযে কত কথা যে মনে হয, সুতো দিযে চশমা কানেব সঙ্গে আটকানো। ওদিকে দুটো পুরু পাথবেব মাঝখানে নাকেব ডগাটি যেন বিশ্ববিজয কবতে চাচ্ছে। এ আব কোনো ঠুলি বা বলগাব বাঁধনে আটকাবে না যেন, সমস্ত মানুষটিব যেন প্রতিনিযত এই প্রখব চক্ষু, এইটি বাগিযেই তিনি নীল আকাশেব থেকে নীল পাহাড়ে, নীল পাহাড়েব থেকে নীল আকাশেব দিকে উড়ে যাবেন যেন।

মোহিত মনে মনে আশ্বাস পেল।

ঠাকুমা ঘুমিযে পড়েছেন।

বইটা কি আবাব একবাব ধবে দেখল সে। বাতে—জ্যোৎস্নাবাত ছিল। মোহিত সুরূপাকে বললে। ঠাকুমাব চোখেব তো এইবকম এইবকম। আনুপূর্বিক সমস্ত বললে সে সুরূপাকে।

সুরূপা বললে, 'তবু ভালো বুড়ো বযসে চোখ গেল, ছুটকুনেব তো এখন মোটে দেড়বছব, আহা বেচাবিব এই ভয নেই।'

মোহিত এতক্ষণ এসব তো কিছু ভেবে দেখে নি, ছুটকুনেব কথা তাব মনেই ছিল না। অত্যন্ত শ্রদ্ধাব সঙ্গে সুরূপাব দিকে সে তাকাল, স্ত্রীব মনেব ভেতব কোথায কি সহানুভূতি লুকিযে বযেছে কে জানে।

বাসররাত

বাসব ভাসিযে মাঘেব জ্যোৎস্না।

শীত তেমন একটা নেই আব। ববং বসন্তেবই হাওযা দিচ্ছে। প্রেমনীহাব বাসবশয্যাব ওপব অনেকক্ষণ ধবে শুযে আছে। পাশেই বিবাহবাতেব নানাবকম অবর্ণনীয গন্ধ ও বিলাস বিজড়িত বধূ, অনেকটা সময অপ্রাসঙ্গিক বাসবেব খাটশয্যা চাঁদোযা ঝালব দিযে চোখটাকে অপব্যয কবে বউকে থেকে থেকে অনেকখানি সমযেব অন্তবালে এক-একবাব দেখে নিচ্ছে প্রেমনীহাব। এক আধ মুহূর্তেব জন্য। তাবপব যেন সে অনন্তকাল আবিষ্ট হযে থাকতে পাবে। বধূব বং একটু কালো হবে, কিন্তু এখন নাক-চোখ-মুখ, এমন অপরূপ চেহাবাব মেযেমানুষ কোনোদিনও যেন সে দেখে নি।

এই মেযেটিকে নিযে এখন থেকে চলতে হবে। এ পুলকেব সময তাব এক আধ মুহূর্তেব জন্যই নয, এক দু-বছবেব জন্যও না, সে যে কতদিন প্রেমনীহাব কল্পনা কবেও তা ফুরুতে পাবছিল না। প্রেমনীহাবেব বযস হল পঁচিশ, আব এই নববধূব হযতো ষোলো।

মেযেটি তাবই, সম্পূর্ণভাবে তাব। এই পৃথিবীতে যতদিন সে বেঁচে আছে, হযতো মবণেব পবও এই মণিকা আব কাবো নয, কাবো নয। একটা গভীব প্রসাদ পবিতৃপ্তিতে প্রেমনীহাবেব মন ভবে উঠল। আজ সে বিযেববাড়িব বাসবশয্যায শুযে আছে, কিন্তু দু-একদিনেব ভেতবেই কলকাতায নিজেব কক্ষে মণিকাকে নিযে যাবে সে, খঞ্জনা যেমন নীড়েব খড়খুটো দুই ঠোঁট দিযে প্রাণপণে আঁকড়ে ধবে আকাশ দিযে উড়ে যায, এই স্নিগ্ধ নিখুঁত রূপকে সেও তেমনি বহন কবে নিযে যাবে। শান্তিতে সান্ত্বনায ভালোবাসাব দাক্ষিণ্যে এই মেযেটিকে নিযে জীবনেব মধুবতাব কি আব বাকি থাকবে প্রেমনীহাবেব?

রূপ কি কোনোদিন দেখে নি প্রেমনীহাব? যথেষ্ট দেখেছে, কিন্তু সুন্দবী মেযেমানুষকে বড়জোব সে ভালোবেসেছে, তাকে অধিকাব কববাব, নিজেব বুঝবাব সার্থকতা তো জীবনে তাব কোনোদিনও আসে নি। রূপেব পেছনে পেছনে সে ঢেব ঘুবেছে বটে কিন্তু নিস্ফলতা নিযে কল্পনা নিযে কামনা নিযে ব্যথা নিযে ফিবেছে শুধু। তাবপব একদিন তাকে বুঝতে হযেছে যে একদিককাব একটা পৃথিবী আছে, তাব মতনই ঘোবে ঘুবে ঘুবে অবসন্ন হয শুধু।

কিন্তু সেই রূপও আবাব তাব জীবনে সম্ভব হল! জীবনেব কি আশ্চর্য আড়ম্বব। আগাগোড়া বাসববাতটাকে একটা মাযা বলে মনে হয না? যেন এ একবাতেব জন্য শুধু, কাল ভোবেই আবাব সব ঝাপসা হযে মিলিযে যাবে।

প্রেমনীহাবেব নতুন বউযেব দিকে আবাব তাকাচ্ছে, মণিকা কি বকম রূপসী? এত রূপসী যে এই মুখেব থেকে একটা পটেব দিকে ফিবলেও যে চোখ আঘাত পায, চোখ বুজে কল্পনা দিযে কিছুতেই এ মেযেটিকে অনুপম ডৌলটাকে গড়ে তুলতে পাবা যায না, এব মুখেব দিকে আব একবাব ফিবে তাকালেই বুঝতে পাবা যায কি লজ্জাকব চেষ্টা চলেছিল।

রূপকে বক্তমাংসেব যেন একটা নিখুঁত দারুচিনি গাছেব মতো পৃথিবীব পথে উৎফুল্ল হযে উঠতে দেখছে সে, কতবাব দেখল, কত পথে, কখনো-বা টবে, কখনো-বা বাগানে, কখনো বনেব প্রান্তে কিনাবে, কিন্তু সব সমযই কেমন একটা অহংকাব ও নির্দযতা মাখা, যেন কিসব জিনিসেব মমতামধুব পবিচর্যাব রূপেব থেকে জন্ম, জীবন পেযে এবা গন্ধেব বিলাসে পৃথিবীকে স্ফুবিত কবে ফেলল। আভবণ ও রূপেব গর্ব পেল শুধু, দযা পেল না মাযা পেল না কিছু না। কেনই-বা পাবে? রূপসীব কাছ থেকে মাযা দাক্ষিণ্যও-বা কে চায? প্রেমনীহাবও ওসব কিছু চায নি, একজন রূপসীব হাত ধবে সে শুধু নিখিল চন্দ্রমল্লিকাব গন্ধে জ্যোৎস্নায অবশ হযে হাবিযে যেতে চেযেছিল। এমনি কবে রূপেব পেছনে ফিবে তাব কতদিন কত বাতেব অসার্থকতা।

বং ফবশা তো নযই, শ্যামও নয, কিন্তু তবুও কালিন্দীব পাবে কিশোব কৃষ্ণেব মতো যেন এই মুখখানা, নাকেব ডগাটি কেমন খাড়া হযে উঠেছে বাঁশিব মতো, টানা টানা চোখদুটোকে যেন কোকিলেব কালো পালক দিযে একে একে কানেব পাশে জুলপি অবধি টেনে এনেছে। ঠোঁট এবং চিবুক যেন

তীক্ষ্ণতায়, নাকের মতোই।

বউয়ের মাথাটা যেন একটা গোক্ষুরার নীড়, মেয়েটি এপাশ-ওপাশ করছে আর নাকে কপালে বুকে শাড়ির ওপর সাপশিশুদের মতো অজস্র চুল ভেঙেচুরে ফণা তুলে ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুম থেকে জেগে ফণা বিস্তার করে দিচ্ছে।

অপলক হয়ে এই রূপ দেখা যায়। প্রতিবারেই মনের ভেতর অসহ্য বিদ্যুৎ খেলে, হয়তো দৃষ্টির শেষ দিন অবধি এ রূপের সংস্পর্শে এমনি পুলকবিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়ে চলবে। প্রেমনীহার হাঁ করে তাকিয়ে চোখ বুজে অনেকক্ষণ ভেবে দেখে।

প্রেমনীহারের বোধ হচ্ছিল, মণিকা যেন তরুণী নয়, যেন একটি ছেলে, কিশোর এমন সুন্দর কিশোর যেন মেয়েদের সৌন্দর্যের ভেতর ছাড়া আর পাওয়া যায় না।

কিংবা সুন্দরকে পাওয়া গিয়েছিল শুধু একবার। এই সুন্দর জ্যোৎস্নায় আকাশটা যেন যমুনার মতো টলমল করছে, ভাট শ্যাওড়া বাবলা বাঁশের জঙ্গল যখন মাঠের কিনারে নদীর এধারে একটা কুঞ্জের মতো তৈরি করেছে, ঐসবের ভেতর থেকে এই কিশোর রাখাল যেন উঠে এল, এই অপরূপ রাখাল কিশোর। সে রূপ শুণ যেন প্রেমনীহারের বাসরশয্যার ওপর। না জানি তার ময়ূরপাখা কোথায় রেখে এল, তার বাঁশিই-বা কোথায়, তার রাধাই-বা কোথায়? কেন এল? সেই কি এসেছে না? এই একাদশীর জ্যোৎস্নার এক অনির্বাচনীয় কৃষ্ণসুষমা বেঁচে রয়েছে শুধু। শুধু রূপের কুহকেই প্রেমনীহারের মন আর ভরে নেই, দু-এক মূহূর্তের জন্য কেমন একটা গভীর সম্ভ্রম বোধ করছে সে। সে কিছু বিশ্বাস করে না। কারু প্রতি তার কোনো ভক্তি নেই, সকলেই তার ঠাট্টার পাত্র, কিন্তু তবুও দু-এক মিনিটের জন্য সবই যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সময় যেন উনিশশো একত্রিশ সালে নেই যেন আর। হাজার হাজার বছর আগে চলে গেছে। বাংলার একটা নগণ্য পাড়াগাঁ দূর বিবর্ণ বৃন্দাবন হয়ে দাঁড়াল। এই জ্যোৎস্না বহু যুগ আগের, ঐ নদী কালিন্দী কিংবা যমুনা, এই শয্যা কৃষ্ণের মধুমিলনের। প্রেমনীহার পাশাপাশি শ্যামবর্ণ এই নিখুঁত সুন্দর ঘুমন্তের দিকে তাকাতে পারা যায় না যেন আর, সে যেন ঢের বড়, বিরাট, তাকে অনুসরণ করতে পারা যায় না। ধারণা করতে পারা যায় না।

এমনি একটা নিস্তব্ধ রসের মূর্ছার ভেতর অনেকটা সময় কেটে গেল প্রেমনীহারের।

কিন্তু ধীরে ধীরে সবুজ জগতে ফিরে আসা যায়। কে জানে মণিকা সেই রাখাল কিশোর কিনা? হয়তো তাই, কিন্তু তবুও তার দিকে তাকানো যায়, সম্ভ্রম ও শিহরণ নিয়ে নয়, আগের মতো বিস্মিত হয়ে শুধু, অসাধারণ রূপ দেখে।

তবুও সেই কৃষ্ণের লেখনটুকু এর রূপের ভাঁজে ভাজে বেশ লেগে আছে, সহজে উতরোনো যায় না। উতরোতে চায়ও না প্রেমনীহার। কলকাতার বাড়িতে নিজের কোঠায় নিয়ে গিয়ে সেদিনও গভীর রাতে একে ছেলের পোশাক পরিয়ে দাঁড় করাবে প্রেমনীহার। তারপর এর চুলের ভেতর দেবে ময়ূরপাখা গুঁজে, হাতে বাঁশি তুলে দেবে, বাঁকা হয়ে দাঁড়াতে বলবে মণিকাকে। কিংবা পাশে এসে বসতে বলবে। কিংবা- সে অনেক রকম হতে পারে, ভাবতে ভাবতে প্রেমনীহার বিমুগ্ধ হয়ে পড়ছিল। এমন একজন সহচরীকে পেয়ে জীবনকে তার বৈশাখের প্রথম কৃষ্ণচূড়ার মতো রাঙা হয়ে উঠবে, এ রূপ সে এমন রাখালের এমন মুখের ছাঁদ জীবনটা নিবিড় রসে অভিসিক্ত করে দেবে। যুগ যুগ ধরে কি করে আসে নি?

কিন্তু শুধু রূপ যা প্রেমই নয়। শুধু রূপ? এ মুখের টোলের ভেতর পরিহাস, ছলনা ও বৈদগ্ধ্যের দুষ্টুমি ফুটে উঠেছে! অনুপম, প্রেমনীহারের হৃদয় এতদিন উপবাসে থেকে চিরবিচ্ছেদ ব্রত নিয়ে অপ্রেমিকাদের বিমুগ্ধতায় সমস্ত কিছুর ওপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। একটা স্নিগ্ধ নিশ্বাস ফেলে আজ এই জ্যোৎস্নামাখা বাসররাতটাকে সে স্বীকার করে নিল? জীবনে এ নতুন অর্থ নিয়ে এসেছে। এখন আর জীবনকে উপহাস করবে না সে, মানুষকে শ্লেষ করবে না, রূপ প্রেম এসবের ওপর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনবে সে।

প্রেমনীহার ভাবছিল, কেন সে এতদিন বিয়ে করতে চায় নি, কতবার কত লোক, তার জন্য মেয়ে খুঁজে আনতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। সে সবাইকে থামিয়ে দিয়েছে, কত মানুষ অত্যন্ত স্নিগ্ধ মমতাময়ী, মেয়েদের ভালোবাসা আস্থা বিশ্বাস গৃহস্থালির কথা বলে তাকে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তবুও একটা পাহাড়ের চাঙড়ের মতো নিরেট হয়ে ছিল সে, কেন ছিল? জীবনকে কতটুকু বুঝেছিল? মেয়েদের সম্বন্ধে জ্ঞান তার কি রকম অস্পষ্ট দাক্ষিণ্যহীন ছিল। এই সব দিয়ে জীবনকে পণ্ড করে ফেলবার জন্য কেমন দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিল সে!

মণিকার দিকে ফিরে তাকাল প্রেমনীহার।

জীবনের প্রতি সম্ভ্রমে ভালোবাসায়, মন ভরে উঠেছে তার, এখন থেকে জীবন পৃথিবীর পথে পথে নয় আর, কলকাতায়, কক্ষের থেকে কক্ষান্তরে। জীবন তেমনই হওয়া উচিত, বাহিরের থেকে ফিরে এসে একটা নিভৃতি থাকবে, পরমাত্মার মতো কারু-বা ঈশ্বর সেখানে থাকে। কারু-বা ধর্মকর্ম সমাজ, জীবনের নিভৃতটা প্রেমনীহার ভালোবাসা দিয়ে ভরে রাখবে, শুধু ভালোবাসা দিয়ে, অন্তত, ভালোবাসা দিয়ে সব চেয়ে বেশি করে। এ জিনিস দুদিন আগেও সবচেয়ে বেশি অসম্ভব মনে হত, কিন্তু বাসররাত জীবনের মানেটাই বদলে দিয়েছে প্রেমনীহারের। এই পল্লীগ্রামের মেয়েটির মতো এমন রূপই সে কামনা করেছিল, রূপের ওপর এমন বুদ্ধির ছাপই চেয়েছিল সে।

মণিকাকে দেখবার আগে যে একটি মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে গিয়েছিল তারা কেউই সম্ভারে এত মধুর করে সাজিয়ে উপস্থিত হয় নি তো, অথচ তাদের পেছনে বাত্রিদিন হেঁটেছে প্রেমনীহার। রাত্রি আব দিন। ক্লান্ত হয়ে, কিছুই পায় নি তবু।

আর এই মেয়েটি নিজের থেকেই সম্পূর্ণরূপে ধবা দিতে এল। মণিকা হয়তো ঘুমিয়ে আছে। ধীরে ধীরে ওব মাথায নিবিড় আকুতিতে হাত রাখল প্রেমনীহার। চুলের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে আঙুল বুলিযে নিতে লাগল, কিন্তু মণিকার মাথাসুদ্ধ সমস্ত চুল যেন তারের মতো কঠিন হয়ে উঠল, মেয়েটি ঘাড় ফিরিযে বললে, 'আঃ কি রকম।' বিড়ালের মতো ফোঁস কবে ওঠে।

প্রেমনীহার বিহ্বল হযে বললে, 'কি?'

—'আঃ, আমার চুলে লাগে না?' মণিকা এক ঝটকায মাথাটা সরিযে নিল, পারে তো খাটের থেকে উঠে যায়।

না, না, ওঠে না যেন সে, তাব চেযে প্রেমনীহারই বরং একটু সরে শোবে, সভয়ে মণিকাব চুলের ভেতর থেকে হাত গুটিযে নিযে প্রেমনীহার খুব সন্তর্পণে অনেকখানি দূরে সরে গেল। সমস্ত বিছানাটাই প্রায় মণিকার জন্য ছেড়ে দেয নি কি? চায যদি আবো ছেড়ে দেবে। বুকের ভেতর কেমন ঢিবঢিব কবে উঠল প্রেমনীহারের।

মণিকা গজগজ কবতে করতে বললে, 'ধেত্তর, কেমন থাক থাক করে সাজানো ছিল, দিল আমার চুলেব পাট নষ্ট করে।' চাঁপার মতো এক থোকা আঙুলের শিস্ দিযে খবু সাবধানে চুল ঝুলিযে গুছিযে নিচ্ছিল মণিকা। গুছোতে গুছোতে ফোঁস ফোঁস করে উঠে বললে, 'কেমন অসভ্য মানুষ, একটু লজ্জাশরম অবধি নেই, চেনা নেই, শোনা নেই, একজন পরের মেযে অমনি ধাঁ করে তাব মাথায় হাত তুলে দেযা !'

একটা মর্মভেদী দুঃখকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছে না এই মেয়েটি। চুলের যন্ত্রণায সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কবছে।

প্রেমনীহার খানিকক্ষণ পরে বললে, 'কেন, চুল তো তোমাব ঠিকই আছে।'

—'ছাই আছে।'

—'এর চেযে আব কি ভালো থাকবে, কেমন সুন্দর ঢেউ খোলানো চুল।' প্রেমনীহার মেযেটির মুখেব দিকে তাকিযে নিজেব থেকেই থামল। এ চুলেব সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকাবও তার নেই, অন্তত আজ নয়। এই মেযেটি প্রবোধ চায় নাকি? হয়তো চায়, কিন্তু প্রেমনীহারের কাছ থেকে নয়।

প্রেমনীহার পাশ ফিরে শুল।

রাত গভীরতর হচ্ছে, আরো গভীর, শীতের বাত। শেষরাতে শীত পড়েছে। পায়ের কাছে শালটা পড়েছিল, তাই দিযে আস্তে আস্তে খুব আদরের সঙ্গে মেয়েটিকে ঢেকে দিতে চেষ্টা করছিল প্রেমনীহার। কিন্তু অমনি সড়াক করে লাফিয়ে, সে একেবারে বাসরঘর ছেড়েই পালিযে গেল।

সমস্ত রাতের মধ্যে আব ফিরল না।

কয়েকদিন হল বউকে শ্বশুববাড়ি আনা হয়েছে, কলকাতায়। সঙ্গে প্রেমনীহারের ছোটশালা পীযূষ এসেছে, এবং মণিকার মায়ের মামা বুড়ো হরকান্তবাবুও এসেছেন। নীচের তলায় রাস্তার দিকে একটা কোঠায় এদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।

বউভাত একরকম হয়ে গেল।

বউ এখন ছ-সাত দিনের পুরোনো হতে চলেছে। কাছেই একটা পড়শি বাড়িতে একটা নতুন বিয়ের উপলক্ষে প্রেমনীহারদের বাড়ির সকলের নেমন্তন্ন। আজ রাতে যেতে হবে।

সকালবেলা, মণিকা বললে, 'ঘোষালরা খুব বড়লোক, না?'

প্রেমনীহার বলে, 'হ্যাঁ।'

—'তা তো বোঝা যায়, কেমন সুন্দর ময়ূরপঙ্খী বাড়ি, উঁচু, একেবারে আকাশ ছুঁয়েছে গিয়ে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।'

প্রেমনীহার খবরের কাগজের থেকে মুখ তুলে পাশের বাড়িটার দিকে তাকাল একবার।

একটু চুপ থেকে বললে, 'কলকাতায় এত বাড়ি থাকতে কেউ এরকম বাড়ি ভাড়া করে?'

প্রেমনীহার বললে, 'বাবা বলেছিলেন বাড়ি বদলাবেন।'

—'বাবার ওপরই সব বরাদ্দ, কেন নিজে দু-হাত নেড়ে দেখতে পার না?'

প্রেমনীহার বললে, 'দেখব, আজকাল বাড়ি শস্তায়ও পাওয়া যেতে পারে।'

—'কেন ? শস্তায় আবার ভালো বাড়ি হয় নাকি?'

মণিকা তার বুকের অতল থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। ঘোষালবাবুদের বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'কলকাতায় তোমাদের একখানা বাড়ি নেই?'

—'না।'

—'শুধু এই ভাড়াটে জীবন?'

গালে হাত দিয়ে বললে, 'ওমা আমি ভেবেছিলাম ফিট একখানা চারতলা শাদা বাড়ি হবে, গাড়ি বারান্দা-ফারান্দা কত কি?'

প্রেমনীহার বললে, 'তোমাকে কে এসব বলেছিল?'

মণিকা বললে, 'বলবে আবার কে ? মনে একটা আশা থাকে না?' এ প্রশ্ন প্রেমনীহারকে আঘাত দিচ্ছে, এই সুন্দরী অকুণ্ঠিতা মেয়েটির এই আশা, প্রেমনীহার নিজেও কি ঢের বার আশা করে নি জীবনে? শুধু এই কুৎসিত ভাড়াটে বাড়িগুলোর অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথাই নয়, আশা অনেক সময় হৃদয়কে জাগাতে এসেছে, কল্পনা করতে বলেছে প্রেমনীহারকে, স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে, অন্তত সুস্থ সচ্ছল, বিমুক্ত হয়ে জীবন চালাতে কতবার বলে গিয়েছে, কিন্তু তাকে বহুক্ষণ ধরে পোষণ করা তো দূরের কথা তার ক্ষণিকের বর্তমানতাকেও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে প্রেমনীহার। আশাকে সে তাড়িয়ে দিয়েছে। আশার ভাষাও তার কাছে সমস্ত জীবন ধরে এমন অবান্তর নিরর্থক বলে মনে হয়েছে শুধু, যেন মিশরের কাগুগিরির চেয়েও দুর্বোধ্য অপ্রাসঙ্গিক তা। এই মেয়েটির এই সহজ আশা করবার সাধ প্রেমনীহারের এত ভালো লাগল, কিন্তু তবু কি করবে সে? ঘোষালবাবুদের মতো লগ্নির কারবার থাকত যদি তার, তাহলে বালিগঞ্জে এই মেয়েটির জন্য একটা সুন্দর বাড়ি সে তৈরি করে দিত। কিন্তু প্রেমনীহার তার বাবার চেয়েও নিঃস্ব।

মণিকা বললে, 'মানুষদের তো পুরী দেওঘর কত কি জায়গায় বাড়ি থাকে শুনি, তোমাদের তাও নেই?'

প্রেমনীহার বললে, 'না।'

মণিকা নিজের জীবনটাকে অত্যন্ত নীরস মনে করছে, বললে, 'সব বিয়েতেই কি পয় থাকে?'

প্রেমনীহার বললে, 'না, তা থাকে না বটে।'

মণিকা বললে, 'অপয়া যারা তাদের ওরকমই হয়।'

মণিকা পাঁচতলা বাড়িটার দিকে আবার তাকাল।

প্রেমনীহার তাকাল। ছেলেবেলার থেকেই তো চণ্ডীঘাটের ঘোষালদের এই প্রাসাদ দেখে আসছে সে, কিন্তু কোনোদিন এত বিব্রত বিস্মিত হয়ে দেখে নি সে আর। পাঁচ ছটা তলার বিপুল পুরী যেন ভোরের আলোয়। ছাদের ওপর একটা আকাশপ্রদীপ দেবার দীর্ঘ ভাঁট আগুনের শিষের মতো সরু হয়ে আকাশকে ছুঁতে চলেছে কিনা। আকাশটাই-বা কী নীল। কী গভীর অপরিমেয়।

প্রেমনীহার ঘাড় হেঁট করে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল। এক গভীর হতাশা প্রেমনীহারকে অভিভূত করে ফেলেছে। এ মেয়েটি এত আশা করে কেন? ঘোষালদের রাজপুরীর সঙ্গে প্রেমনীহারদের এই ভাড়াটে বাড়িটাকে সে কেন তুলনা করতে যায় ? এই মেয়েটি জীবনের কেন্দ্রে ঢুকতে পারে না নাকি? ঘোষালদের চেয়ে প্রেমনীহাররা যে তুচ্ছ নয়, ছোট বাড়িতে থেকেও না, সে তা বুঝতে পারে না। অতি অত্যল্পের মধ্যেও নিজেকে হারিয়ে ফেলে খুশি হয়ে উঠতে পারে এমনই একটি প্রাণ খুঁজেছিল প্রেমনীহার।

নিজের তার বেশি আশা নেই যে। অতি অল্প অর্থ পদ সম্মানের ভেতর সমস্ত জীবন ঘুরে ঘুরে ফিরতে হবে তাকে, সে তা জানে। জীবনটা তার অদ্ভুত, বিরাট হয়ে উঠবে না কিছু। আশা কল্পনা ক্ষুধা বা সাধের এই বিশালত্বের থেকে তার সহচরীকেও ফিরে আসতে হবে।

মণিকা জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে অনেকদূর অবধি তাকাচ্ছে।

মণিকা বললে, 'দেখছি এই কলকাতার শহরটা ।'

—'কেমন?'
—'আর কেমন, কত সুন্দব সুন্দব বাড়ি চাবদিকে, কিন্তু আমাদেব বাড়িটা এমন পিত্তি চটকানো।'
প্রেমনীহাব বললে, 'দূব থেকে ওই বাড়িগুলোকে সুন্দব দেখায মণিকা, কিন্তু কাছে গেলে সবই প্রায আমাদেব মতো। হাড়পাঁজব বেবিয়ে পড়েছে।
মণিকা বললে, 'আমি কক্ষনো বিশ্বাস কবি না।'
প্রেমনীহাব বললে, 'আমাদেব বাড়িটাব চেযে হযতো একটু-আধটু ভালো হবে।'
মণিকা বললে, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ।'
প্রেমনীহাব একটু হাসতে চেষ্টা কবল। কিন্তু তাবপবে.মনে হল মিছে কথা সে তো বলেছেই স্ত্রীকে প্রবোধ দেবাব জন্য। প্রবোধ দেবাব তো অনেক বকম উপাযই ছিল শাদাসিধে সঙ্গত কথা বলে চিন্তাব উন্নতি, প্রগতিব জন্যই তো জীবন তাব মূল্যবান, কিন্তু একি অপব্যবহাব সে কবেছে।
মণিকা বললে, 'আমি চোখ দিযে দেখছি না কত খাসা বাড়ি সব, তুমি কি ভাষণ মিথ্যাবাদী!'
প্রেমনীহাব চুপ কবে বইল।
মণিকা বললে, 'বাবা, মিথ্যেবাদী লোকদেব আমি বড্ড ঘৃণা কবি।'
প্রেমনীহাব বললে, 'আমিও।'
মণিকা বললে, 'মেযেমানুষ চায যে স্বামী হবে সচ্চবিত্র, গুণবান, রূপবান।'
প্রেমনীহাব বললে, 'চাযই তো।'
—'কেন আদিখ্যেতা কবে চাইতে যায?'
—'আদিখ্যেতা কি হল?'
—'শ্বশুবেব ফিট চাবতলা বাড়ি, দাসদাসী, গাড়িবাবান্দা, মোটব, স্বামীব মস্তবড় চাকবি, এবকম সব কামনা, এসব আদিখ্যেতা নয?'
প্রেমনীহাব বললে, 'কিন্তু মেযেদেব সচ্চবিত্র স্বামী কামনা কবা কি আদিখ্যেতা?'
—'তা না তো কি, জানেই তো সে অসৎ ছাড়া কপালে জুটবে না।'
প্রেমনীহাব অবাক হযে বললে, 'কেন?'
মণিকা বললে, 'কেন কি? যাদেব মনেমুখে মিল নেই, ফাঁকি দিযে ভোলাতে চায নিজেবা কাযক্লেশে যে সংসাব চালাতে পাবে না সেখানে একজন পবেব মেযেকে এনে কষ্ট দেয তাবা কি সৎ?'
প্রেমনীহাব বুঝে উঠতে পাবছিল না মণিকাব বিতর্কেব ভেতব কোনো গলদ আছে কিনা, না, গলদ কোথাও নেই, বধূ ঠিক কথাই বলেছে। তবে সে আব একটু সহিষ্ণু হলেই পাবত। এমন অনেক নম্র কমনীয মেযে হযতো পৃথিবীতে পাওযা যায, যে প্রেমনীহাবদেব এই পোড়াব সংসাবে এসেও এত বিবক্ত হযে উঠত না, সংসাবটাকে মধুমাখা কবে তুলত। ভাবতে গিযেও প্রেমনীহাবেব হৃদয স্নিগ্ধ হযে উঠছে যেন।
মণিকা বললে, 'ঘোষালবা এত বড়লোক হল কী কবে?'
প্রেমনীহাব বললে, 'জানি না।'
—'আবাব মিথ্যে কথা!'
সত্যিই প্রেমনীহাব জানত না।
মণিকা বললে, 'ব্যবসা কবে বুঝি?'
—'হতে পাবে।'
—'ব্যবসা ছাড়া আব কিছুতে কি এতবড় হওযা যায?' এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মণিকা বললে, 'কত লোকে কাঁচা টাকাব ব্যবসা কবে।'
প্রেমনীহাব নির্বোধেব মতো মণিকাব দিকে তাকাল।—'কাঁচা টাকাব ব্যবসা কি?'
—'সুদেব ব্যবসা গো, কড়া সুদে টাকা খাটায।'
—'ও।'
—'যাকে বলে গিযে তেজাবতিব কাববাব।'
প্রেমনীহাব বললে, 'তেজাবতি হ্যাঁ শুনেছি।' প্রাণটা তাব এসবেব থেকে অনেক দূবে।
মণিকা বললে, 'জান না তো কিছু, কেন যে শহবে থাক বুঝি না।'
শহবেব কঠিন সুন্দব প্রবাহেব থেকে প্রেমনীহাব দূবে সবে যাবে বলে মণিকা তাকে কলকাতায থাকাব পক্ষে অনুপযুক্ত বোধ কবছে। প্রেমনীহাব মোটে ভালো টেনিস খেলতে পাবে না বলে আব একজন

স্ত্রী হয়তো তাকে শহরের অনুপযুক্ত মনে করত। জীবনের সব ঘাট কি ছুঁয়ে আসা যায়? এইসব ঘাট সে ছোঁয় নি কোনোদিনই। ছোঁবে না, কিন্তু তাতে তার কোনো অস্বস্তি নেই।

কিন্তু মণিকা মনমরা হয়ে বললে, 'তোমার বাবার দিব্যেবুদ্ধির দৌড় তো বোঝা গেল, তোমার ঠাকুরদারও?' বললে যা মনে আসে তা বলে।

প্রেমনীহার অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

মণিকা বললে, 'বাবা যে কালের মানুষ, তখন চট করে টাকা করে নেয়াটা কিরকম সহজ ছিল।'

—'ছিল তো কি হল?'

—'কত হাজার হাজার টাকা জমিয়ে যেতে পারতেন তোমার বাবা-ঠাকুরদা।'

প্রেমনীহার বললে, 'টাকাই কি সব?'

মণিকা বললে, 'তোমরা যদি আজ মরে যাও তাহলে কালই তো আমাকে লোকের বাড়ি বাড়ি হাতা বেলুন নেড়ে খাবার ব্যবস্থা দেখতে হয়। তবে, টাকার অপরাধ দিচ্ছ কেন? আমরা ছোটবেলার থেকেই টাকার কষ্ট, টাকার দাম বুঝে এসেছি।'

প্রেমনীহার ঘাড় হেট করে স্বীকার করল টাকার অভাবে কষ্ট, ভয়ানক কষ্ট পেতে হয়, টাকার অসম্ভব মূল্য রয়েছে। ছেলেবেলার থেকে আজ অবধি সেও তো এসব বুঝে এসেছে। কিন্তু তবুও মুহুর্মুহু ভুলে যায় কেন? মণিকাকে প্রশ্ন, কেন যে জিজ্ঞাসা করেছিল? হয়তো পবক্ষণেই জিজ্ঞেস করবে আবার একশোবার হাজারবার, আমরণকাল। এই ছেলেমানুষি অদ্ভুত জীবনের হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা তাদের সংসারটাকে পণ্ড করে ফেলেছে, কিন্তু তবুও এ দুর্বলতাকে কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কোনোদিনও পারবে না। অর্থহীনতার বেদনা এখনই আবাব ভুলে যাচ্ছে।

মণিকা মুখ ভার করে বললে, 'বনেদি ঘর ছাড়া সুন্দরী মেয়েদেব কক্ষনো বিয়ে দিতে হয় না। বাপমায়ের এটা বোঝ উচিত।'

প্রেমনীহার বললে, 'তা ঠিক।'

চোখ কপালে তুলে মণিকা বললে, 'কুৎসিত মেয়েকে আবার কে নেবে? কিন্তু লাখ লাখ টাকাব বনিয়াদি ঘরেব ছেলে আমাব মতো সুন্দরী মেয়েকে পাবার জন্য জিভে ঝল বার করে বসে আছে।'

প্রেমনীহার শিহরিত হয়ে উঠল।

মণিকা বললে, 'এই কলকাতাযই কত।'

প্রেমনীহার তা শুনেছে বটে। কিন্তু বধূ এসব কথা বলে কেন শুধু?

কৌতূহল ও আকাঙ্ক্ষার জিনিস জীবনে আর কি কিছু নাই? কিন্তু মণিকাব কাছে কোনো আশাপ্রদ নবীন কথা সে নিজেই যে পাড়বে বুঝে উঠতে পালছিল না প্রেমনীহার।

মণিকা ঠোঁট উলটে বললে, 'হ্যাঁ, বড় বড় টাকার কারবাবি ছাড়া সুন্দবীকে আবাব কেউ পাবে? আগে যা পেয়ে গেছে গেছে, আজকাল আর না। শুধু যাদের কপালে কাঁটা তাদের দু-একটা ফসকে যায়।' এই বলে সে রাজবাড়িটার দিকে লালাযিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইল।

বেশ রাত করে মণিকারা বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরল।

প্রেমনীহার যায় নি। তাব ভাইপো মিন্টু বছব দশেকের ছেলে, দিন সাতেকের জ্বরে ভুগে উঠেছে, একে নিয়ে বসল ঘরের কোঠায়, নিরিবিলি বাড়িসুদ্ধ, এই তার ভালো লাগছে। সকলে চলে যাচ্ছে বলে সে কাঁদছিল। সেই সন্ধ্যের থেকে মিন্টুর সঙ্গে সে লুডো খেলছে, বাইবে একটু একটু বাদলা, শীত করছে বেশ লাগছিল, প্রেমনীহারের মনে হচ্ছিল জীবনকে এছাড়া অন্য অতিরিক্ত দশরকম হতে যায় কেন? কেনই-বা মানুষ নিজের কামবার থেকে বেরিয়ে যায়—অন্ধকাব বাতে, বাদলার রাতেও? কেনই-বা মানুষ হাজার হাজার জোনাকির মতো উত্তেজিত হয়ে জ্বলে উঠে নক্ষত্রের শান্তি নক্ষত্রের সম্পদ ও স্থিরতাকে নকল করতে যায়, ব্যঙ্গ করতে যায়? নক্ষত্র যা তা নক্ষত্রই—এই ঘরের ভেতর একা বসে থেকে তাকে বরং ঢের গভীরভাবে বোধ করা চলে। কেনই-বা মানুষ বিয়ে করতে যায়? আজ রাতেই হয়তো লক্ষ লক্ষ লোকে পৃথিবী ভরে বিবাহের উৎসবে খেতে গিয়েছে, কোটি কোটি লোক তাদের জয়জয়কার করছে, কিন্তু কাল তাদের কাছ থেকেই ঢের খাঁটি সত্য কথা শোনা যাবে। সে কথাগুলো মোটেই ভরসাজনক নয়। তার প্রথম থেকে শেষ অবধি এ কয়দিনে প্রেমনীহার সব শিখে ফেলেছে।

অনেকদিন নিস্তব্ধতা ও একাকিত্ব বোধ করে নি প্রেমনীহার, বিয়ের পর এই কয়দিনের ভেতর যেন একটা যুগ চলে গিয়েছে। জীবনের অতীত দিনের ঘাসগুলো সহজ হয়ে আজও ফলে রয়েছে, সবুজ,

অনুপম, অপবিমেয সেই ঘাসেব দেশে চৈত্রেব দিনেব একটা ফড়িঙেব মতো জীবনকে সে কি আব ফুকে বোড়াতে পাববে না?

মণিকা ঘবে ঢুকেই ঠোঁট উলটে বললে, 'বা!'

লুডোব বোর্ড না উলটে দেয, মিন্টু বোধহয এমনই একটা কিছু ভয কবছে, কাকিমাকে দেখে সে ফ্যাকাশে হযে যাচ্ছে।

—'বা, তুমি বিযেবাড়িতে যাও নি?'

—'না।'

—'কেন।'

—'মিন্টুব সঙ্গে খেলছি।'

মণিকা গালে হাত দিযে বললে, 'ও মা, একি অদ্ভুত।'

প্রেমনীহাব বললে, 'বিযে কেমন হলে?'

মণিকা সে কথাব কোনো জবাব না দিযে বললে, 'বাবা, আমি এমন লোককে কেন বিযে কবব। এমন লোকেব স্ত্রী হতে যাব কেন!'

প্রেমনীহাব বললে, 'কি হল?'

—'মনেব ভেতব কোনো ফুর্তি নেই, জীবনে কোনো সবসতা নেই, সেই সন্ধ্যাব থেকে দাঁতকপাটি মেবে খেলা।'

প্রেমনীহাব ঈষৎ তামাশা কবে, 'ঘাড়ে ভূত চাপলে এবকমই হয।'

—'বড্ড মন খাবা হযে যায এসব দেখলে শুনলে। কত হাজাব হাজাব লোকজন আসছে যাচ্ছে, কত জানলাম কি হইচই, কত ছোকবাবা এসে তামাসা কবল, ইযার্কি কাটল, পাবিবেশন কবল, খেল, আব তুমি এই মুখ থুবড়ে পড়ে আছ একটা আশি বছবেব ত্রিকালনষ্ট বুড়োব মতো?'

প্রেমনীহাব বললে—'তুমি তো ফুর্তি কবেছ।'

মণিকা মুখ ভাব কবে একটা চেযাবেব ওপব বসল।

প্রেমনীহাব একটু হেসে বললে, 'আমি না গেলে তোমাব ফুর্তিতে কোথায বাধা পড়ে?'

মণিকা বললে, 'ধেৎ ছাই ঘেন্না ধবে গেছে।

প্রেমনীহাব সন্ত্রস্ত হযে স্ত্রীব দিকে তাকাল।

মণিকা বললে, 'আমি যাকে বিযে কবব সে হবে ফুর্তি-তামাশাব সমুদ্র, তাস খেলবে, আড্ডা পিটোবে বৈঠকখানা বাসব বিযেবাড়ি মাত কবে নিতে তাব কোনো জুড়ি মিলবে? ছোটবেলাব থেকে যখনই ভোজেব বাড়ি গিযেছি তখনই এই কথা আমাব মনে হযেছে, সেই সাধ কিনা আমাব এই হল।' মণিকা কাঁদো কাঁদো হযে গেল।

মণিকা চোখ ছুবিব ন্যায চকচক কবছে।

প্রেমনীহাব কেমন আচ্ছন্ন হযে বইল। এবকম অভিযোগ কেমন নতুন মনে হল তাব।

রুমাল দিযে মুখ মুছে নিযে মণিকা বললে, 'সে-বকম কত কত ছেলেদেব দেখলাম আমি আজ, দেখলে চোখ জুড়িযে যায, তাদেব একটা কথা কানে গেলে এমন ভালো লাগে, তবু এত দুঃখ কবে, মনে হয কি জিনিস চেযেছিলাম, কি জিনিস পেতাম, কি জিনিস আমাব হল না।'

প্রেমনীহাব বললে, 'এতই যদি কষ্ট পাচ্ছ, আমাকে বললেই পাবতে।'

মণিকা ভব ভব কবে খানিকটা কফ ঝেড়ে নিলে— কফ এবং অশ্রু।

প্রেমনীহাব বললে, 'এই বিযেতে আমি না গেলে তুমি কষ্ট পাবে সে কথা তুমি আমাকে আগে বললে তো পাবতে মণিকা।'

মণিকা বললে, 'বলব কেন, বিযেবাড়িব থেকে নেমন্তন্ন এসেছে, তুমি যাবে না কেন? শ্মশানঘাটায মড়া পোড়াতে তো যেতে হচ্ছে না। আমোদ উৎসবেব থেকে মানুষ এবকম বিমুখ হযে থাকে একি কেউ কল্পনা কবতে পাবে!' মণিকা একটু থেকে বললে, 'ষাট-সত্তব বছবেব বুড়োবাও তো বিযেবাড়িব নামে পাগল।' মণিকা বললে, 'আব গিযেই-বা তুমি কবতে কি! শালগ্রামেব মতো বসে থাকতে বই তো নয, ওবকম যাওযা না যাওযাব জন্য আমি কেযাব কবি না।'

প্রেমনীহাব বললে, 'এবকম কষ্ট পাচ্ছ কেন?'

মণিকাব কষ্ট অত্যন্ত প্রগাঢ়। প্রেমনীহাবেব কথাব জবাব দেবাব মতো প্রবৃত্তি তাব নেই।

প্রেমনীহার বললে— 'আমি তো কত সময়ে কত জায়গায় যাই নি, ইচ্ছা হয় নি, আমাকে আদেশ নির্দেশ দেবার তো কত লোক ছিল, কিন্তু কেউ তো কোনোদিন এরকম অভিযোগ করে নি, বা দুঃখবোধ করে নি। এবকম শোক করছ কেন তুমি?

মণিকা বললে, 'আমার হাত ধোরো না তুমি, সরো।'

প্রেমনীহার সরে গেল।

মণিকা লুডোর বোর্ডটা উলটে ফেলে দিল। বললে, 'ফেব্ যদি দেখি এই পাজি নচ্ছার খেলা নিয়ে তুমি বসেছ'—মণিকা কথাটা শেষ করে বললে, 'বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের ধিঙ্গি হয়ে।'

প্রেমনীহার একটু হেসে বললে, 'আজই তো খেলছিলাম শুধু, মিন্টু বড্ড আবদাব কবছিল বলে, ওকে একটু খেলা দেয়ার জন্য।'

—'সে জন্য, তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন ভেস্তে গেল?'

প্রেমনীহার বললে, 'নইলে ছ-সাত বছবের মধ্যেও লুডো খেলি নি আমি।'

মণিকা বললে, 'হ্যাঁ দেখলাম বরযাত্রীরা তাস খেলছে, একটা দেখবাব মতো খেলা বটে। চাব-পাঁচটা পার্টি বসে গেছে। সব চোখা চোখা নাক-মুখেব ছোকরা, সিগাবেট টানছে, ইযার্কি কাটছে, আসর গুলজার করে নিয়েছে— একটা খেলা বটে।'

প্রেমনীহার লুডোর বোর্ড ও গুটিগুলো গুছিয়ে কুলুঙ্গির ভেবত রেখে দিল।

মণিকা বললে, 'সেইখানে গিয়ে বসবাব যোগ্যতা তো তোমার নেই।'

প্রেমনীহার বললে, 'তাস আমি ঢের খেলেছি।'

—'তোমাব পিসিমা জেঠিমার সঙ্গে?'

—'কেন,তাসেব আড্ডায় আমি কোনোদিন যাই নি ভেবেছ নাকি?'

—'যাদের সে রোখ থাকে তাদের কোনো আড্ডাই বাদ যায় না, সেইরকম চাঁই যদি হতে হে'—মণিকা বললে, 'তাহলে বিয়ে বাড়ির এমন সুযোগটা হাতছাড়া কবতে? কোনো চাঁই কবে?' মণিকা একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'ওদেব দলে তোমাকে ভিড়তে দেখলে আমিও বুঝতাম যে হ্যাঁ একবোবে গোবেচারি নষ্টির নিয়ে সংসাব করি না।' মণিকা থামল। কেমন একটা ঝাঁঝে তাব সমস্ত শবীব কাঁপছে যেন। কি যে বেদনা তার! মণিকা বললে, 'তাস পাশা দাবা এইসব শিখতে হয, ওস্তাদ হতে হয, আমাদেব দেশের হারাণ চক্রবর্তীকে কেউ দাবা খেলায় হটাতে পারে না। সেই জন্য তার স্ত্রীব মুখও উজ্জ্বল।

কিছুক্ষণ চুপ।

প্রেমনীহার বললে, 'বউ কেমন দেখলে?'

—'বড়লোকের বউ, কালো কিষ্টিপাথর হলেও তো তা সোনা।'

প্রেমনীহার বললে, 'খুব কালো?'

মণিকা বললে, 'যা পেন্ট করেছে কার বুঝবাব সাধ্যি!'

প্রেমনীহার বললে, 'তোমাকে বড্ড পবিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।'

মণিকা ঠোঁট উলটে, 'পবিবেশন ফরিবেশন করতে বলেছিল আবাব।'

'করেছিলে নাকি?'

—'করবার ইচ্ছা ছিল।' মণিকা বিছানার উপব গিয়ে বসল। প্রেমনীহাবকে বললে, 'বাতাস দাও।'

প্রেমনীহার হাতপাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছিল।

মণিকা বললে, 'বিয়েব পর বউকে যে-ঘরে নিয়ে গেল সেখানে তিনটে ইলেকট্রিক ফ্যান।' পাশেব বাড়ির বধূব সুখাবেশ মণিকাকে অনেকক্ষণ আবিষ্ট করে বাখল।

মণিকা একটু থেমে বললে, 'সেখানে কি যে সুন্দব বাসব সাজানো হয়েছে, আহা আমারও শুয়ে থাকতে ইচ্ছা কবে। সেইখানে গিয়ে বউ শোবেন। কেন এমন কী পুণ্য কবেছেন তিনি যে এত সুখ পাবেন! আব আমরা এত কষ্ট পার।' বলতে বলতে মণিকা ঘুমিয়ে পড়ল।

দশ বারো দিন কেটে গিয়েছে।

মুণকা দুদন্ডের বেশি বাড়ি থাকে না। বিয়েবাড়িতে তার অনেক কৌতূহল ও আকর্ষণেব জিনিস জমে গেছে। মেয়েব বাড়ির পর দু-চারখানা বাড়ি ফেলেই বাপের বাড়ি। দু-বাড়িতেই মণিকার খুব আসা-যাওয়া। হয়তো খাতিরও যথেষ্ট। বউয়ের সঙ্গেও খুব ভাব। সারাদিন সে সেখানকাব মেয়েমহল উজাড় করে বেড়ায। বাটা ভরে ভরে পান সাজে, খায, বিন্তি খেলে, আড্ডা দেয।

একদিন প্রেমনীহারের জেঠিমা বললেন, 'বউয়ের এত বাইরের বাই তো ভালো নয়। শত হলেও বড় মানুষের বাড়ি।'

কাকিমা বললেন, 'তার ওপর আবার নানা গোলমালের হিড়িক।'

জেঠিমা বললেন, 'না না, মোটেই নিরাপদ নয়।'

প্রেমনীহার বললে, 'কি আর হবে?'

বাস্তবিক সারা দিনরাত মণিকার কাছ থেকে অনেকখানি দূরে সরে থাকবার অবসর পেয়ে প্রেমনীহার একটা স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতার ভেতর গভীর আরাম করে ভাবত তার যেন বিয়ে হয় নি। কোনো বধূ যেন তার জীবনে নেই। মেয়েমানুষকে নিয়ে আশ্রয় খুঁজতে যাবার মতো আকাঙ্ক্ষা সে যেন কোনোদিনও বোধ করে নি। সে যেন বুঝেছে এ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিধাতার এক জীর্ণধূসর কৌশল সেই ধূসরতার অঙ্গার দিয়ে বিধাতা কাব জীবনে খুশি তার অনাদি পাণ্ডুলিপি লিখুক গিয়ে। প্রেমনীহার সে পাণ্ডুলিপির একটি অক্ষরও তার নিজের জীবনে বসাতে দেবে না।

সন্ধ্যার বাতাসে ঝাউগাছটা ঝিরঝির করছে। অনেকগুলো তারা উঠেছে আকাশে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি কেমন একটা শীতের কাঁটা দিচ্ছে আবার। প্রেমনীহার তার বালাপোষটা টেনে নিল।

অনেকক্ষণ ধরে ইজিচেয়ারে বসে সে একটা বই পড়ছিল। বইটাকে বেখে দিল। জানালার ভেতর দিয়ে উন্মুক্ত বাহিরের জীবনটা, দূরে দূরে চিমনি ধোঁয়া, চিলগুলো আকাশ থেকে নামছে, তাদের গলায় কেমন একটা বিষণ্ন আওয়াজ। তবুও আজ সন্ধ্যায় জীবন বিমর্ষ নয়। প্রেমনীহারের জীবন তো কিছুতেই নয়, আজ সারাদিন অবাধে একটা বইয়ের ভেতর থেকে পাইনবন পাহাড় সমুদ্র ও দুটি অতিবাহিত প্রেমিকের সুধা সে পান করল, মন কোন দূরদূরান্তরে চলে যেতে চেযেছে, গিযেছে চলে, একটা সোনালি ঈগলের মতো ডানা মেলে আকাশে আকাশে উড়ে এসেছে সে আজ, বুঝতেই পারে নি সে এমন ইট বের করা ঘরের ভেতর ছিল, চুনকালি টুপটুপ করে খসেছে, তার চুলে বালিশে জামায, সে শুধু মনে ফুর্তিতে নিরবচ্ছিন্ন অন্যমনস্কতায ঝেড়ে ফেলেছে সব। একটা মস্তবড় পবিবারের ঘটি গণ্ডগোল তণ্ডুল রোগ শোক হাজার বকম নালিশ নিকাশ স্পর্শও করে নি তাকে। সে সব কোনেদিনই তাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু মণিকা যে হাজার বার এসে তাকে বিক্ষিপ্ত করত, নিজের নিস্ফলতা, নিজের নিরাশা, নিজের ক্ষুদ্র বৃদ্ধি, তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা, পণ্ডপ্রায় জীবনের সমস্ত দোষ যে প্রেমনীহারের ঘাড়ে চাপাত, প্রেমনীহারকে যে সব নির্যাতন ধর্মত স্বীকার করে নিতে হত, নিজেকে পরমদায়ী স্বামী বলে স্বীকার করে যে অনেক তিক্ত কথা, তিক্ত কাজ তিক্ত সংস্কাব গ্রহণ কবতে হত, সেই সব আজ আর নেই, কোনো বাধা নেই, নেই ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা কল্পনাব আড়ষ্টতা চিন্তাব জড়তা সংস্কার আচারের প্রবল পীড়া কিছু নেই, কোনো মিথ্যা নেই।

মণিকা থাকে না, জীবনকে এ আট-দশদিন সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা গেছে।

ছ-সাতখানা নতুন বইযেব নানারকম চবিত্র সমাবেশ সে খুব সহানুভূতিব সঙ্গে ভেতরে ঢুকে বুঝে দেখেছে, বই-ই শুধু নয জীবনটাকে কম দেখে নি তার এই তেত্রিশ বছর ধরে।

দাম্পত্যকে সে অসার্থক বলে মনে করে মা। গোটা দুই শান্ত, প্রীতিপদ, পরম রমণীয় দাম্পত্যের ছবি সে দেখল। কালকে একখানা বইযের থেকে, এই ছবি কাল্পনিক নয, সত্যের আন্তরিকতা নিযে হৃদযকে আঘাত করে গেছে। কাল সারাটা দিন এই দাম্পত্যের স্বপ্ন নিয়ে যে আচ্ছন্ন হয়েছিল। অনেক রাতে মণিকা যখন এল, এসেই ঘুমিযে পড়ল, তখন এই ঘুমোনো মেযেটির মুখেব দিকে তাকিযে অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছিল প্রেমনীহার, তেমন দাম্পত্য একে দিযে কী হবে?

কি জান হবে কিনা! সে উপকরণের সমবায মণিকার ভেতর আছে কি? হয়তো নেই। হৃদয় কেমন ব্যথা বোধ করেছিল। বিশেষত শেষবাতে মণিকা যখন বিছানা ছেড়ে মেঝেতে গিয়ে আঁচল পেতে শুল। বউকে একটু আদর করতে গিয়েছিল বলে প্রেমনীহার। এই তার অপরাধ।

আদর সে আর করবে না।

প্রেমনীহারের কাছ থেকে মণিকা ভালোবাসা চায় না। মমতা চায় না, দাক্ষিণ্য চায় না, সহানভূতি চায় না। মনে মনে বধূকে সহানুভূতি করবে প্রেমনীহার। সারাজীবন একে মায়ামমতা দিয়ে ঢেকে রাখবে। আদর ভালোবাসা প্রণয় অনেকদিন ধরে প্রেমনীহারের হৃদয়েও আর তেমন স্ফীত হয়ে ওঠে না। কিন্তু যখনই সে আবেশ বোধ করবে প্রেমনীহার বুকের ভেতর চেপে রাখবে তা।

আজ সারাদিন একটা ভালোবাসার গল্প সে পড়েছে। সেই পাইনবন সমুদ্র পাহাড়, গভীর নীল ইটালির আকাশ, সেই বিচিত্র চিত্র সমাবশের ভেতর সারাদিন সে ঘুরে ঘুরে ফিরেছে। এখানে বাদলরে হাওয়া

দিচ্ছিল, সমস্ত বাড়িটা এমন নিস্তব্ধ ছিল। সাবা দুপুব কার্নিশেব পাযবা ডেকেছে শুধু। আব দেযালেব থেকে চুনবালি ঝুবঝুব কবে খসেছে। এই নিস্তব্ধতাব ভেতবেই অমন নিবিড় বইটাকে সে পেযেছিল। অমন কুহকমাখা প্রণযী–প্রণযিনীব পাইনবনেব ভালোবাসাব গল্পটাকে শেষ কবতে পেবেছে সে।

তেমন ভালোবাসা প্রেমনীহাবেব জীবনে নেই কি? কোনোদিনও হয নি? না, ওবকম প্রেম কোনেদিনও তাব পথে আসে নি। এলেও তাব চিন্তাব্যথাযুক্ত কোনো অভিসাবিকাকে দিযেই অমন একটা প্রেমেব কাহিনী নিজেব জীবনে ফুলিযে তুলতে পাবত না। সে হযতো অভিমান কবত, শ্লেষ ভবে বসত, উদাসীন হযে উঠত, বিচ্ছিন্ন হযে যেত। মনেব ভেতব এই গভীব উদাসীনতাকে নিযে তাব একটা সহানুভূতিশীল মমতামধুব স্নিগ্ধ জীবন চলত তবু, এই মেযেটি সাংসাবিক মনুষ্যত্বেব দিক দিযে এমন আশাপ্রদ। বইখানা নাড়তে চাড়তে লাগল প্রেমনীহাব। কতকগুলো প্যাবাগ্রাফ ফিবে ফিবে পড়তে লাগল।

মিন্টু এসে বললে, 'লুডো খেলবে কাকা?'

—'আয খেলি।'

—'কাকিমা কোথায কাকা?'

প্রেমনীহাব বললে, 'জানি না, হযতো বিযেবাড়িতে।'

মিন্টু লুডোব বাক্সোটা এনে সুইচ টিপে দিল।

দুজনে খেলছে।

প্রেমনীহাবেব বুকেব ভেতব ঢিবঢিব কবছে তবু। কি যেন একটা গভীব অপবাধ কবছে সে, এ নির্দোষ খেলা একটা শিশুব সঙ্গে। কিন্তু একটু 'স্বচ্ছন্দ প্রযাসও' যেন তাব জীবনে নেই আব। অত্যন্ত অস্বস্তিব সঙ্গে সে খেলছে। খানিক খেলে মিন্টুকে বললে, 'থাক।'

মিন্টু বললে, 'কেন কাকা, তুমিই তো জিতে যাচ্ছ।'

জিতছে বটে সে, তাব খুব ভালো ভালো দান পড়ছে, কিন্তু তবুও সে আমোদ, আজকেব খেলাব ভেতব আব নেই।

প্রেমনীহাব বড্ড অন্যমনস্ক হযে বযেছে।

মিন্টু বললে, 'বা, কাকা, আমাব এই গুটিদুটো তো তুমি খেতে পাবতে, খেলে না যে?'

প্রেমনীহাব বললে, 'কি কবে খেতাম?'

মিন্টু প্রবল চেষ্টা কবে প্রেমনীহাবকে বুঝিযে দিল।

মিন্টু বললে, 'বাপ বে, তোমাব কতকগুলো ছয পড়ল।'

—'কতকগুলো বে?'

'বাঃ পাঁচবাব, আমাব তো একবাবও পড়ে না।'

প্রেমনীহাব বললে, 'তোমাব পড়ে না মিন্টু?'

—'কই পড়ে, দেখো না এখনো কতকগুলো গুটি ঘবে বসে আছে।'

প্রেমনীহাব বললে, 'ধ্যেৎ, তাহলে আব খেলে কাজ নেই।'

সে আব খেলল না।

মিন্টু আশ্চর্য হযে গেল। গভীব গভীব আশ্চর্য হযে গেল।

প্রেমনীহাব বললে, 'বাত অনেক হযেছে, তুই তোব বোর্ড নিযে চলে যা।'

বাক্সো গুছিযে নিযে কদমফুলেব মতো মাথাব ওপব সেটাকে চড়িযে মিন্টু চলে গেল।

বাত মোটেই হয নি।

প্রেমনীহাব একটু চুরুট বেব কবে নিল বউ সেদিন চোখা চোখা নাকমুখেব ছোকবাদেব সিগাবেটেব প্রশংসা কবেছে, নাক তাব চোখা বযেছে, মুখও হযতো, সিগাবেট অবধি চলবে না, কিন্তু একটা চুরুটকে জ্বালাতে পাবে।

চুরুট জ্বালাল প্রেমনীহাব।

এই সবই মণিকাকে প্রীত কববাব জন্য। এ কেমন অদ্ভুত জীবন, সে চালাচ্ছে পদে পদে মণিকাকে খুশি কববাব খুঁটিনাটি তুচ্ছ প্রযাস নিযে? কিন্তু কি কববে সে? অশান্তি তাব ভালো লাগে না। যখন দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ কবেছে সে সেটা সার্থক কবা কর্তব্য তাব। একজন পৃথক ধবনেব ভবসাজনক বধূকে নিযে দাযিত্বেব ভাব তাব ঢেব কমে যেত বটে। কিন্তু আজও দাযিত্বকে একটু ক্ষুণ্ন কবতে পাবে না। মণিকাকে কষ্ট দেযা যায অশেষ কষ্ট দেযা যায, নির্যাতনেব চূড়ান্ত অবাধে নিজেব হাতে তুলে নিতে

পারে সে, এর মাথা দেয়ালে ঠুকতে পারে, একে লাথি দিতে পারে এর দাঁত ভেঙে চুল চিরে পিণ্ডি চটকে বোবাটোবা বানিয়ে দিতে পারে একে। এমনই যে জীবনে আর টু শব্দ করবে না মেয়েটি। এই রকমই প্রেমনীহারের হাতে। কেউ বাধা দেবে না। এই বাড়ির সকলেই বউয়ের উপর বিরক্ত প্রেমনীহারকে তারা অত্যন্ত স্নেহ করে।

কিন্তু তবুও প্রেমনীহার কোনো কিছু করতে যাবে না। একদিনের জন্যও না। এই সব কথা ভাবতে যাওয়া তো শিক্ষাদীক্ষা বিচার বিবেকহীনতার চরম। সদ্বংশজাত শিক্ষিত যুবক সে। তাছাড়া আর্টও তো জীবনে তাকে একটা অপরিমেয় উৎকর্ষ দিয়েছে। চুরুটটা নিভে যাচ্ছিল, জ্বালিয়ে নিল প্রেমনীহার। না, এসব পথ তার নয়। কেনোদিনও এক মুহূর্তের জন্যও না। দাম্পত্য জীবনটাকে দক্ষ সহিষ্ণু খেলোয়াড়ের হাতের তাসের মতন যেমন সে পেয়েছে তেমনিভাবেই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। এটা তার কর্তব্য, কর্তব্যই শুধু নয়, কল্পনা মমতা সহানুভূতি সমস্তই নিবিড়ভাবে তার হৃদয়ের ভেতর গিয়ে তাকে সজীব করে তুলেছে যেন, সবুজ ঘাসের মতো যেন।

রাত প্রায় এগারোটার সময় মণিকা এল।

প্রেমনীহার তখন তার তৃতীয় চুরুট ফুঁকছে।

টেবিলের ওপর পা ছড়িয়ে মাঝরাতের বাতাসটাকে বেশ লাগছিল তার, গ্যাসলাইটগুলো নীরবে জ্বলে যাচ্ছে, রাস্তার ভিড়ে কেমন টান পড়েছে, এক এক সময় মনে হয় সবই যেন ফাঁকা। আকাশের নক্ষত্রগুলো যেন মখমলের জমিতে ফুলের মতো সুন্দর, নরম। কিন্তু মখমলের সঙ্গে আকাশের তুলনা করা চলে না। নক্ষত্রও ফুলের মতো নয়। ফাল্গুনের এ আকাশ, আকাশই, নক্ষত্র শুধু। প্রেমনীহার অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে শুধু। চুরুটটা দাঁতের ভেতর গুঁজে দিল।

মণিকা ঘরে ঢুকেছে। চুরুটটা নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না প্রেমনীহার।

মণিকার এসব দিকে নজর নেই। অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে ইজিচেয়ারটার ওপর বসলো সে।

প্রেমনীহার মণিকার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিল।

অধিবাসের সেই বেনারসীটা পরেছে সে। গলায় মস্তবড় দোদুল্যমান সোনার হার। একটা ছোট লকেটওয়ালা হার অবধি। গয়নাগাটির পরিপাট্য যেন পরিষ্কার, পায় বিজাপুরী লাল চটি জুতা। মুখখানা বাসররাতের মতো নেই আর, দশ বারো দিন আগের মতোও নেই দুটো চোখকে ঘিরে কেমন একটা কালিমা চাকার কালো রেখার মতো ফুটে উঠেছে। কি যেন ক্ষুধা বাসনার নিরবচ্ছিন্ন আকুতির ইশারা দেয়। এই বধূ যেন তাও নয় আর, যেন কারা ওকে ব্যবহার করে চলেছে, তাদের উপভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়ে গভীর পরিতৃপ্তি পাচ্ছে এ মেয়েটি। এর দীর্ঘ অবসন্ন নিশ্বাসের ভেতরেও কি আবেশ, কেমন গভীর আরামের মাদকতা।

চুরুটটা একটু ঝেকে নিচ্ছে প্রেমনীহার। যাক মণিকাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না সে। মেয়েটি এখনই হয়তো বিছানায় গিয়ে শোবে প্রেমনীহারের সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমাক।

প্রেমনীহার টেবিলে পা ছড়িয়ে এই রাতের বাতাসের ভেতরই বসে থাকবে। নক্ষত্র দেখবে। দূর পাইনবনের কথা ভাববে শুধু। এই চুরুটটা তাকে রাত কাটাতে সাহায্য করছে, হয়তো জীবন কাটাতেও।

মণিকা চোখ তুলে ইজিচেয়ারে বসে রয়েছে। ঘুমোয় নি। অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে গদগদ হয়ে বললে, 'হাতে ওটা কি তোমার?'

—'কেন?'

—'কি ধরনের করে টানছ।'

দু-চার মিনিট পরে প্রেমনীহার একটা বই টেনে নিয়েছে।

মণিকা বললে, 'বাতিটা নিভাও।'

প্রেমনীহার আস্তে আস্তে বইটা টেবিলের ওপর রেখে দিল। তারপর সুইচটা নিবিয়ে দিল।

বিদ্যুতের বাতির জায়গায় জ্যোৎস্নার আলোয় ঘরটা কমনীয় হয়ে উঠেছে। মণিকার মুখের খানিকটা হাড়মাংসের কর্দম স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। সৌন্দর্যে সেই বাসররাতের মতোই অবর্ণনীয়া উঠেছে যেন সে।

মণিকা বললে, 'ভালো লাগে না।'

প্রেমনীহার বললে, 'শরীর খারাপ লাগছে তোমার?'

—'না।'

প্রেমনীহাব চুপ কবে জ্যোৎস্না উপভোগ কবতে লাগল।

মণিকা বললে, 'কিছু ভালো লাগছে না কেন?'

প্রেমনীহাব বললে, 'ঘুমোও না।'

—'ঘুম পাচ্ছে না।'

—'চলো, আমি ঘুম পাড়িযে দিচ্ছি।'

মণিকা আড়ষ্ট হযে বললে, 'না।'

প্রেমনীহাব বললে, 'কী কববে তাহলে?'

—'তাই তো ভাবছি কি যে কবি।' নিস্পৃহতা বিমুখতা ও ঘৃণায একটা গভীব আলস্য ও তিক্ততায সমস্ত শবীব কাঁটা দিযে কুঁচকে উঠছে যেন তাব।

—'এসো, এই জ্যোৎস্নায একটু বসো এসে, আমাব কাছে।'

মণিকা বললে, 'না আমাব ইজিচেযাবটা তাব চেযে একটু জানলাব দিকে টেনে দাও, হ্যাঁ আমাকে সুদ্ধই টানো না। ও, জোব তো তোমাব খুব দেখছি। আচ্ছা এই এইখানেই বাখ।' মণিকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

প্রেমনীহাব বললে, 'ইজিচেযাবে ছাবপোকা, না? কাল আমি গবমজল দিযে যা ধুযেছি এক চোট।' হে হে কবে হেসে উঠল সে।

মণিকা কোনো কথা বললে না। ছাবপোকাব বাজ্যেব থেকে সে ঢেব দূবে।

প্রেমনীহাব বললে, 'বেশ বাতাস দিচ্ছে— ফাগুন মাস পড়তেই যা গবম পড়ে গেছে।'

মণিকা বললে, 'এই গবমে কলকাতায, কেউ থাকে? ওবা তো চলে গেল।'

—'কাবা?'

—'বিযেবাড়িব লোকেবা।'

—'কোথায গেল?'

—'কোথায, মিশৌবি একটা জাযগা আছে না কি।'

প্রেমনীহাব বললে, 'ও মুসুবি পাহাড় কবে গেল?'

—'আজই তো গেল, অবিশ্যি আজ মুসুবি যায নি, আজ গেল পুবী, সেখান থেকে অনেক ঘুবেটুবে তাবপব যাবে, আমাকে স্টেশনে নিযে গেল। শাডিব ভেতব থেকে একটা শ্বেতপদ্মেব তোড়া বেব কবে বললে, 'সুষমাবাবু আমাকে দিযে গেছেন।'

প্রেমনীহাব বললে, 'সুষমাবাবু?'

—'হ্যাঁ, ববেব মেজভাই। কেমন দিব্যি মানুষেব মতো দেখতে, পুরুষমানুষ যাকে বলে। কথাবার্তায কাজে কর্মে বিযে বাড়িটাকে এতদিন মাত কবে বেখেছেন, জমাট কবে বেখেছেন।'

প্রেমনীহাব বললে, 'সুষমা, কেমন মেযেমানুষেব মতো নাম।'

'সুষমাবঞ্জন কত পুরুষেব নাম এবকম থাকে।' মণিকা শ্বেতপদ্মেব তোড়া ঘুবাতে লাগল। বললে, 'প্রেমনীহাব নামটাই তো মেযেমানুষেব মতো, কোনো পুরুষেব নাম আবাব প্রেমনীহাব হয নাকি? কেমন অদ্ভুত মেযেমানুষেব মতো নাম তোমাব। কী মূল্য আছে এই নামেব?' তাব প্রাণেব ভেতব থেকে একটা অসহ্য বোধে টিটকিবি দিযে হেসে উঠল মেযেটি।

প্রেমনীহাব বললে, 'দেখি তো তোড়াটা।' সে হাত বাড়িযে দিলে। পদ্মফুলেব ওপব ধীবে ধীবে হাত বুলুতে বুলুতে অত্যন্ত কোমল ভাবে।

মণিকা বললে, 'না ছিঁড়ে যাবে। সুষমাবাবু নিষেধ কবে দিযেছেন, কাউকে দিতে।' এই নিষেধটাই মেযেটিব ব্রত যেন। শ্বেতপদ্মেব তোড়াটা নিজেই দোলাচ্ছে, তাব জীবনেব যা কিছু কমনীযতা ভালোবাসা সুধা ফুলকটিকে ঘিবে জড়ো হযেছে এসে, জ্যোৎস্না এই শাদা শাদা ফুলগুলিকে যেন দোলাচ্ছে। ব্রতনিবদ্ধ অভিনিবিষ্টা মোহিত পবম মণিকাব মূর্তি এব আগে আব একবাবও দেখবাব সুযোগ হয নি প্রেমনীহাবেব। এখন স্তব্ধ হযে দেখছে সে।

বড় বড় পাপড়িগুলো যেন কোনো দিগন্ত সাগবেব সমুদ্রঘুঘুব শাদা শাদা পালক।

—'বেশ বেশ।' প্রেমনীহাব অবাক হযে পদ্মগুলোকে একবাব দেখছে, মণিকাকে একবাব।

প্রণয়ী-প্রণয়িনী

১

বিরজাদিদি বলে কিছুদিন ডেকেছে—এখন আবাব বিরজা বলে ডাকে রমেশ। রমেশকে বিরজাও কিছুদিন ঠাকুরপো বলে ডেকেছে—এখন আবার বমেশ বলেই ডাকে।

বিরজার সঙ্গে রমেশের প্রায় পনেরো -কুড়ি বছরের চেনা। রমেশের বয়স এখন ত্রিশ। বিরজার তেইশ কি চব্বিশ। সাত-আট বছর হল বিরজার বিয়ে হয়েছে—তার স্বামী শশধরের বয়স বছর আটচল্লিশেক।

বিয়ের পর কযেক বছর রমেশের সঙ্গে দেখা হয নি আর বিরজার; কিন্তু কলকাতাই যখন ক্রমে-ক্রমে ঘাঁটি ঠিক করল—দেখা হতে লাগল। রমেশ রোজই সন্ধ্যার সময় আসে—রাত দশটা-এগারোটা অবধি বিরজার সঙ্গে কী যে গল্প চলে তার, সে-ই জানে— তবে বিরজাদিটা খসে গেছে। নিজেকেও ঠাকুরপো আখ্যাত হতে শোনে না সে আর। কিন্তু ব্যাপার এর চেয়ে একটুও বেশি দূর এগোয না। বিরজা মাঝে-মাঝে যখন খুব কঠিন হযে ওঠে, রমেশ কযেক মুহূর্তের জন্য তাকে দিদি বলে ডাকে; মনের গুমর তাতে কিছু পরিতৃপ্ত হয; সতীকে তার সতীত্ব নিয়ে উচ্চ সমারোহেব জাযগায বসিয়ে দেয় রমেশ। বাস্তবিক কী গভীর সতী এই মেযেটি। তবুও অনেক সমযই মনে হয রমেশের সে নিজেই একটা ডাফার...

যাক, রাত দশটা এগারোটা অবধি রোজই গল্প চলে—প্রাযই দেশের অবস্থা নিযে। গল্প যখন ফুরিয়ে আসে প্রায, বিবজা একটু ঘেঁশে বসে—নারকেল তেল, হলুদ, ধনে, গবম-মশলা-সিক্ত শাড়ির ঘ্রাণ নিযে অন্ধকাব এমন স্নিগ্ধ নিবিড় লম্পট হযে ওঠে।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই রমেশ বুঝতে পারে যে বিবজাদিকে ঘাঁটানো চলে না। তাব চেযে এই সব আঘ্রাণ উত্তেজনাব সম্ভাব একটু-একটু কাঁচা নস্যি নিয়ে ভুলতে চেষ্টা কবে সে; নিজেই একটু সরে যায়; জানালার কাছে গিযে শিকনি ঝাড়ে—রুমাল নিযে নাক মোছে; আবার নস্যি নেয়—যায় ফুরিযে! হলুদ ধনে গরম মশলা সিক্ত শাড়িব গন্ধ আর কোথাও নেই; সে অন্ধকাবও নেই—বিরজা পবিপূর্ণভাবে শশধরেব স্ত্রী হযে এক প্রান্তে বসে বযেছে।

ত্রিশটা বছর আইবুড়ো জীবন কাটিয়ে দিযেছে বমেশ। বিবজা বমেশেব জীবনের প্রথম ও শেষ মেযেমানুষ, বিরজার সঙ্গে সম্বন্ধটা তার খুবই ন্যায্য—বউদি-ঠাকুরপোর। সেই শৈশবে কৈশোরে পল্লীগ্রামের জীবনে রমেশই অবিশ্যি ছিল বিরজাব দাদা—না-জানি আরো কত কী— কিন্তু আজ এই অর্চনীযা বধূটির অনুগত ঠাকুরপো হযে সে যাবে বুড়িয়ে!

একটা বিপুল তামাসায বমেশের মন ভরে উঠল; নিজেকে সে শ্লেষ করে বিঁধতে চাইল; বাঃ বাঃ সে কী করে হয়।

এই বেকুবির হাত থেকে নিজেকে সে রক্ষা করতে চেষ্টা করল; সঙ্কল্প করল বিরজার কাছে আর সে যাবে না। এই বিরাট পৃথিবীর থেকে সে তার নিজের স্ত্রী, না হয় নিজের মেয়েমানুষ, একটা কিছু বেছে নেবে। না হয সব কিছুর থেকেই বঞ্চিত হযে একাকী দূরে-দূরে ফিরবে—অত্যন্ত নিরেট ভাবে নিজেকে বিরজাসম্পর্ক বিচ্যুত করে।

কিন্তু শেষ অবধি সন্ধ্যার সময় গুড়ি গুড়ি শশধরবাবুদের বাড়িতে গিযে বিরজার সঙ্গে দেশের কথা পাড়তে বসে গিয়েছে রমেশ। গল্প বলতে-বলতে কেমন একটা বিহ্বল সময় আসে—হয়তো দুজনের—হয়তো একজনের; সেটা উতরে যায। রোজই দশটা-এগারোটার সময় বিরজা রমেশকে ভাত খাইয়ে দেয—একজন স্নেহশীলা মাতার মতো। এই সময় বিরজা বউদিও নয় যেন, আরো ওপরে উঠে গেছে।

একদিন গল্প চলছিল—বিরজা রমেশের একটু বেশি কাছে ঘেঁষে বসেছে। এমনি সময় শশধর ঢুকল।

বললে,—'ঘর অন্ধকার কেন?'

রমেশ একটু সরে গেল।

শশধর দেখছে।

বিরজা বললে—'জানালা দিয়ে আলো আসে মিছেমিছি লাইট জ্বালিয়ে আর কী হবে?'

শশধর অন্ধকারেই একটু দাঁতে দাঁত ঘষে নিচ্ছে।

ইলেকট্রিক সুইচ টিপে দিল সে। হঠাৎ রূঢ় আলোতে রমেশ ও বিরজার চোখ খোঁচা খাচ্ছে; দেখল শশধর। অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধা হল দেখে; দাঁত কড়মড় করে বললে—'রাবিশ।'

বললে 'জানালা দিয়ে লাইট আসছে?'

'আসছে না কি? জানালা দিয়ে লাইট!'

একটা চেয়ার টেনে বসল সে।

বললে—'জানালা দিয়ে লাইট'—লাইট?'

একটা কড়া বর্মা চুরুট নিজের কোটটার পকেট থেকে বার করে নিল। আর-এক পকেটে দেশলাই—সেটাও হাতড়ে বার করা গেল; ঘরে ঢুকে এই অবধি দুটো চোখ রমেশ ও বিরজার থেকে সে আর টেনে নেবার অবসর পাচ্ছে না।

চুরুটটা জ্বালাতে জ্বালাতে রমেশকে বললে—'কী হে ছোকরা!'

'কী?'

রমেশ মেরুদণ্ড খাড়া করে বসল।

'ও! বড় যে তেজীয়ান দেখছি; তেজ!'

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল শশধর।

বললে—'আররি ঘোড়া-ঠেঙিয়ে খোঁড়া; ঠেঙিয়ে খোঁড়া ঠ্যাং! তারপর!'

খানিকটা ধোঁয়া ছাড়ল শশধর।

কেউ কোনো কথা বলিছল না: শশধরও দু-এক মিনিট নিস্তব্ধে চুরুট টেনে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিল।

রমেশকে বললে—'শোনো ছোকরা।'

রমেশ বললে,—'আমাকে ছোকরা বলবেন না।'

'তাহলে কী বলব? তোমার নাম তো আমি জানি না বাপু।' রমেশ নিজের নাম জানালে।

শশধর বললে—'তোমরা অনেক পড়াশুনা করেছ নিশ্চয়ই—'

রমেশ ঘাড় নেড়ে বললে—'তা করেছি বইকি শশধরবাবু।'

'বি-এ, এম-এ ডিগ্রি নিয়েছ; নাও নি? নিয়েছ? আচ্ছা—'

চুরুটটা একটু টেনে নিলে।

স্থির ভাবে বললে—'আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না রমেশ, তুমি শিক্ষিত ছেলে; কিন্তু তোমার এ কীরকম ব্যবহার?'

'কীরকম?'

'এই কি তোমার শিক্ষাদীক্ষা?'

রমেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শশধরের দিকে তাকাল।

শশধর নিজের কথার পুনরুক্তি করে বললে—'তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা এই কি?'

রমেশ বললে—'কেন, কী হল?'

শশধর বললে—'আমি জানি আজকালকার লেখাপড়ার কোনো মানে নেই; যত এডুকেশন পায় ততই এরকম হয়।'

চুরুটে একটা টান দিয়ে বললে—'মনে করে, ধিঙ্গি হয়েছি, পরের স্ত্রী তো আমার খেলার জিনিস।'

করুণ কঠোর চোখে রমেশের দিকে তাকিয়ে শশধর বললে—'বাস্তবিকই কি তাই রমেশ?'

কাউকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে শশধর বললে—তুমি কি তাই মনে করেছ রমেশ?'

বললে—'পরের স্ত্রীর কথা জানি না, কিন্তু, ভেবেছ কি আমার স্ত্রী এত শস্তা? ঘেঁষে বসেছিলে কেন!'

বিবজা শশধবেব দিকে তাকিযে বললে—'এসব কি ছাইপাশ, থামবে তুমি?'
'কেন থামব?'
'কী বলছ সব?'
'ঠিক বলি নি?'
বিবজা বললে—'বমেশ ঠাকুবপোকে চেনো না তুমি?'
'ঠাকুবপো?'
'ঠাকুবপো না তো কী— তোমাব থেকে কুড়ি বছবেব ছোট।'
'কুড়ি বছব' বাপবে, তাহলে তোমাব থেকেও ছোট।'
বিবজা ঘাড় নেড়ে বললে—'না।'
'না'
'আমাব চেযে বমেশ ঠাকুবপো বড়।'
'বড়?'
'তুমি আমাব চেযে পঁচিশ বছবেব বড় কি না—'
'ও, ভুলেই গিযেছিলা,'—শশধব খ্যাক খ্যাক কবে হাসতে লাগল। জীবনেব গভীব বং তামাশাব নানাবকম সুতোব খেই পেযে সে তৃপ্তি বোধ কবছিল। মনটা তাব ক্রমে ক্রমে ঝুনো [?] হযে আসছে।
চুরুটে একটা টান দিযে শশধব বললে—'এই তোমাব ঠাকুবপো? নিজেব? নয? ও গ্রামসুবাদে বুঝি? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু—'
বমেশেব দিকে ফিবে বললে—'তোমব বউদিব বিযেব সময তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না তো হে ছোকবা।'
বিবজা বললে—'বাঃ, আমাব বিযেতে কত খেটেছিল।'
শশধব বললে—'একটা চোযাড়কে মনে আছে; হেড়ে গলায ববযাত্রী পার্টিব সঙ্গে কথায-কথায তেড়ে আসত; সেটা কে?'
বিবজা বিবক্ত হযে বললে—' আমাব বাপেব বাড়িব কথা ওবকম কবে বলো না তো।'
—'আহা, গ্রামোফোনেব শিঙটা টেনে বেকর্ড মুচড়ে সে মহীবাবণেব কাববাব কবে তুলেছিল।
শশধব বললে—'কন্যাপক্ষেব সব কটাই চোযাড়-চামুণ্ডা ছিল—বাসববাতটাকে অমন কবে নষ্ট কবে ফেলে? মনে নেই তোমাব বিবজা?'
বিবজা ঘাড় ফিবিযে কী ভাবছিল সে-ই জানে।
শশধব বললে —'বমেশ কি তোমাদেব গ্রামেব?'
বিবজা বললে—'হ্যাঁ।'
'ছোটবেলাব থেকে চেনাশোনা বুঝি?'
বিবজা ঘাড় নাড়ল।
চুরুটটা নিভে গিযেছিল; সেটাকে জ্বালিযে নিযে শশধব কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হযে টানতে-টানতে ভাবছিল।
একটা কড়া ধোঁযাব গন্ধে সমস্ত ঘবটা ভবে উঠছিল। ধোঁযাটা একটু প্রশমিত হলে শশধব বললে 'বোজই কি তুমি আস বমেশ?'
বমেশ বললে—'আসি।'
'একদিনও বাদ পড়ে না?' বমেশেব একদিনও বাদ পড়ছিল না।
—'বউদিকে খুব ভালো লাগে? না?'
নিজেই জবাব দিযে বললে—'আমাবও বেশ লাগে তোমাব বউদিকে। কিন্তু উনি আবাব স্ত্রী এই বিবজা ন্যাযত আমাব পত্নী। তাকে নিযে আমি যা খুশি তাই কবতে পাবি—সেই অধিকাব ধর্মত ন্যাযত আমাব আছে। ভগবান দিযেছেন আমাকে। কিন্তু তাই নিযেই আমি তৃপ্ত। অন্যেব স্ত্রীব কাছে তো আমি যাই না। এই পঞ্চাশ বছব বযস হল। একদিনেব জন্যে পবেব স্ত্রীব ওপব এক মুহূর্তেব জন্য এক বিন্দুও লোভ কবি নি। সেটা ধর্মত অন্যায —বুঝলে বমেশ।'
বমেশ বুঝছিল।

বিবজাও ঘাড় হেট কবে শুনছিল।

কেউ কোনো কথা বললে না।

শশধব বললে—'ন্যাযত ধর্মত সেটা উচিত নয; বাধে, ধর্মে আঘাত লাগে। ধর্মকে আমি আঘাত কবি না; হৃদয বাধে তাতে—বুঝলে বমেশ?'

চাকব সনাতন তামাক এনেছে; চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিযে হুঁকোব নলটা মুখে তুলে নিযে শশধব বললে—'এইবাব শবীব ঠাণ্ডা হল।'

শশধব বললে—'বুঝলে বমেশ, তুমি শিক্ষিত ছেলে তাই বলছি, নইলে এতগুলো কথা বলবাব কোনো প্রযোজন বোধ কবতাম না আমি। ব্যবস্থা আলাদা হত। আমি সন্ধ্যাব সময বাড়ি থাকি না। লগ্নিব কাববাবে কলকাতা ছেযে ফেলেছি—মাকড়সাবা সুতো দিযে যেমন মাছি ধবে। একটু দেখতে শুনতে হয, খুঁজতে হয। বাত দশ-এগাবোটাব আগে বাড়ি ফেব্বা চলে না আব, স্ত্রীব দিকে নজব দিতে পাবি না— কিন্তু তাই বলে—'

শশধব নলটা মুখে তুলে নিযে খানিকক্ষণ টেনে নিলে। তাবপব হঠাৎ একফাঁকে নলটা নামিযে স্নিগ্ধ অনুবোধেব কণ্ঠে বললে—'তোমবা এডুকেটেড, তোমাদেব দশবকম কাজ আছে, এসব তোমাদেব মানায না: এতে শিক্ষাদীক্ষাবও গ্লানি হয—মানুষেব শেষে এডুকেশনেব ওপব কোনো শ্রদ্ধা থাকবে না।'

নলটা মুখে তুলে নিল শশধব।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটাকে নামিযে বললে—'বোজ সন্ধ্যাব সমযই এখানে তুমি আস? কতদিন থেকে আসছ? তিনমাস! ও বাবা; তিনমাস ধবে বোজ-বোজ আসা তো সোজা কথা নয। আমাব স্ত্রী অতি বড় সতী হলেও—'কথাটা না ফুবিযে বিড়বিড় কবে চিবুতে-চিবুতে শশধব নলটা আবাব মুখে তুলে নিলে।

খানিকক্ষণ তামাক টেনে অবশেষে বললে—'আজকালকাব মেযেবাও আগেকাব মতো নেই। সতীত্ব আছে বটে—থাকবে না কেন? কিন্তু এ সতীত্ব কি সেই সতীত্বেব মতো? সে তেজ কোথায? সে তেজ আব নেই। কালে-কালে সত্যি মিইযে যায—যেমন ব্রাহ্মণ—তেমন সতী।'

নলটা নাড়তে-নাড়তে শশধব বললে—'এই তো দেখো না—এসে দেখলাম ঘব অন্ধকাব; তোমবা দুটিতে বসে আছ। তা, কিনা, পাশাপাশি-একেবাব গাযে গাযে ঘেঁষে। আমি খড়ম পাযে দিযে হড় হড কবে ঢুকলাম—তবুও এই, যদি টিপি টিপি ঢুকতাম?'

নলটা ঠোঁটেব ভেতব গুঁজে শশধব বললে—'তাই বলে এগাবোটা-বাবোটাব আগে আমি বাড়ি ফিবতে পাবব না: কিন্তু তুমি ভাই আব এসো না বমেশ।'

বমেশ বললে—'বেশ। আমি আব আসব না।'

'বাগ কোবো না, ব্যাপাবটা বুঝলে তো?'

বমেশ বললে—'কিছু বুঝিটুঝি নি শশধববাবু, আপনি নিষেধ কবছেন।'

—'বোঝো নি? ব্যাপাবটা তো তাহলে বড় সর্বনেশে হল।'

বমেশ শশধবেব দিকে বীতশ্রদ্ধা হযে তাকিযে বললে—'কীবকম?"

শশধব বললে—'বাগ কবো না, কিন্তু তোমাদেব এডুকেটেড লোকেব কথায আমাব বিশ্বাস নেই; যত এডুকেশন পাবে তত বদ মতলব' এই না বললে আইন পাশ কবেছ? কবো নি? কবোনি, কেমন? তা নাই-বা কবলে—কিন্তু আব দুটো তো হযেছে? যথেষ্ট হযেছে; ওই বি-এ, এম-এ, ভেজে খাওযা আমাদেব মতো লোকেব সাধ্য নেই। শোনো—'

বমেশ ফিবে তাকাল।

শশধব বললে—'তোমাব ধর্মবুদ্ধিতে যা কবে—তাই কবো; এসো তুমি —তোমাকে আমি 'না' বলব না।'

নলটা ছেড়ে দিযে বললে—'কিন্তু এটা তোমাব মনে বাখা উচিত ছিল যে সেই পাড়াগাঁযেব দিনে বাল্যে যৌবনে যাই হোক না, যত পিবিতই থাকুক না কেন, তোমাদেব বিবজা এখন পবেব স্ত্রী, তোমাব বউঠাকরুন বাচ্য। শুধু তাই-বা কেন? একজন পবস্ত্রী— তোমাব মাযেব মতো।'

এক ছিলিম তামাক টেনে শশধব বললে— 'কিন্তু ওই এডুকেশনই তোমাদেব মেবেছে। ওই সব শিক্ষাদীক্ষা বুঝলাম না কোনোদিন, থার্ডক্লাস অবধি পড়েছি; সেই যথেষ্ট। বেশি পড়াশোনা কবতে গেলে

নিজেকেই নিজে যমেব মতো ভয় কবতাম। ধর্মবুদ্ধিফুদ্ধি, সব চুলোয় যেত— আজকাল তবুও একটু ধিকি ধিকি কবছে।'

শশধব বললে—'তা এস্নো তুমি; তোমাব ন্যায় বুদ্ধিতে যা কুলোয় তাই কোবো। কিন্তু আমিও ভিটেব ঘুঘুব মতো টিকটিক কবে লেগে বইলাম। ফস কবে উড়ে যাব—ফস কবে উড়ে আসব। ভিটেসিদ্ধ ঘুঘু—কী আব কববে? ভিটেব মাযা বড্ড।'

বমেশ বললে—'উঠি।'

বিবজা বললে—'বোসো।'

শশধব বললে— 'কী, বসতে বললে? আমিও বলছি হ্যাঁ বোসো—শোনো—'শশধব নলটা মুখে দিয়ে খানিকটা তামাক খেয়ে নিয়ে বললে—'বিয়ে কবেছ বমেশ?'

বমেশ বললে—'না।'

'কেন কবো নি?'

বমেশ নস্যেব শিংটা বেব কবলে; ওব জবাব পাবাব কোনো বকম আশা নেই দেখে শশধব বললে—'কবো নি—বিয়ে কববাব সাধ নেই বলেই তো? তাই না? ও—এখনকাব ছেলেদেব বকমই এই,না বললেও বুঝি। কিন্তু তাই বলে পবেব স্ত্রী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কববাব সাবটা তো গেল না, ও যায় না; আবো বেশি বাড়ে। এই হচ্ছে আজকালকাব ধর্ম , শোনো বমেশ—'

বমেশ শুনছিল।

শশধব বললে—'তাই যদি তোমাব মতলব তো পাড়াগাঁ ছেড়ে কলকাতা—এ ভালো জাযগাযই এসেছ; শিকাব এখানেই মেলে। কিন্তু ভালো শিকাব চাও তো ভালো জাযগাব ব্যবস্থা কবে দিতে পাবি তোমাব; অবিশ্যি হাতেকলমে কে কাব ব্যবস্থা কবে—কিন্তু মুখে বলে দিতে পাবি, হ্যাঁ, তাবাও বধূ বটে—অন্য কিছু নয় , না অন্য কিছু নয়—সে ইত.ামি তোমাদেব এডুকেটেডদেব সহ্যও হবে না; আমিও তা বলছি না, সেসব আমি জানি।'

তামাকে দু-চাবটা টান দিয়ে শশধব বললে—'আব সে কি যে -সে বাড়ি—এখানে একটা নোংবা ছাপব খাটেব তুলোতোলা গদিতে তুমি আব তোমাব বোঠান দুটিতে বসেছ; কীই-বা সাজসজ্জা এ ঘবেব? দেযালে অঙ্গাবেব দাগ, সেগুন কাঠেব ভাঙা টেবিল চেযাব থেকে পালিশ গেছে উঠে, ধ্যাড়ধেড়ে জামাকাপড় ন্যাকড়াব ফালিব মতো তাবে তাবে ঝুলছে, মেঝেতে পানেব পিচকি, টিকে , তামাক, শুকনো ফল-ফলাদিব ছিবড়ে, তোমাব বোঠানেব কাপড়ে হলুদ-জিবে-কাঁচালঙ্কা বাটা পাঁচ মিশেলেব দাগ। সেখানে সোফায-সোফায ঘব ভর্তি—সোফা কুশন, ম্যাটিং ইলেকট্রিক ফ্যান, আতবদান, গোলাপদান সোনাব ফুলদানি মখমলেব পর্দা—কেস ভবা সিগাবেট—চাও তো হুইস্কি—কর্ণিযাক—

শশধব নলটা মুখেব কাছে নিয়ে বললে—'এমন বাড়ি কলকাতায অনেক মিলবে তোমাব।'

বমেশ উঠবাব উপক্রম কবেছিল। শশধব বললে—'লগ্নিব কাববাবেই যাওযা হয—মায বৈঠকখানা অবধি বাড়ি আমি কম বেআব্রু কবি নি; কিন্তু ওই অবধি—নিজেব সুদেব টাকা গুনে এসেছি। সোফায - কুশনে মাঝে মাঝে ডাক পড়ে নি কি? তাও পড়েছে। কিন্তু ন্যাযত ধর্মত ও-সবে আমাদেব বাধে—'

তামাকে এক টান দিয়ে শশধব বললে—'কিন্তু তাই বলে তুমি—তোমায বাধবে কেন? তোমাব এডুকেশন আলাদা; তোমাব শিক্ষাদীক্ষা এ-জিনিসটাকে ববং ভালো চোখে দেখে, তা আমি জানি।তোমাদেব মতো ছোকবাদেব অনেক বিতর্কও আমি শুনেছি। বুঝেছি তোমবা কিছু জানো না; তাই হযতো জানবাব কিছু নেই-ই বোধহয—পৃথিবীতে। জ্ঞানেব জোবে সৃষ্টি ভেসে চলেছে, ভগবান নিজেও তো জ্ঞান এড়াতে পাবেন না। ভাগ্য আব জ্ঞান—ও দুটো জিনিসকে যমেব মতো ভয কবি আমি—আমাব কিছুই নেই।'

বমেশ উঠে দাঁড়াল।

শশধব বললে—'চললে? হ্যাঁ ঢেব বাত হযেছে- যাও; তা এসো, জ্ঞানী লোকেব গায নোংবা ছুঁড়ে মেবে কোনো লাভ নেই; ও হাতিযাব আমাব নিজেব মুখেই এসে লাগবে।'

বিবাজ বললে—'বমেশ ঠাকুবপো—'

বমেশ ফিবে তাকাল।

বিবজা বললে—'বাঃ, ওই দোব দিয়ে যাচ্ছ যে।'

শশধব বললে—'তাহলে কোন দবজা দিয়ে যাবে? সদব বাস্তাব আব দবজা কোথায়?'

বিবজা বললে—'ঠাকুবপো তা জানে।'

বমেশ ইতস্তত কবে দাঁড়াল।

বিবজা বললে—'জানো না তুমি, কোনখান দিয়ে ঢুকতে হবে?'

শশধব অবাক হয়ে এদেব দিকে তাকাচ্ছিল-হাতেব থেকে নল পড়ে গিয়েছে তাব।

বিবজা বললে—'খাবে চাট্টি , এসো, এই দোব দিয়ে বান্নাঘবেব পথে।'

শশধব এতক্ষণে ব্যাপাবটি বুঝতে পেবে ঠাণ্ডা মাথায় নল কুড়িয়ে নিয়ে বললে— 'বান্নাঘবেব পথে? এই দোব দিয়ে? হুঁ।'

একটান দিয়ে বললে—'কী খাবে?'

বমেশকে বললে—'বোজ খাও নাকি?'

বিবজা বললে—'চাট্টি ভাত খাবে—এসো এসো ঠাকুবপো শিগ্‌গিব—'

দুজনে চলে গেল।

শশধব নল মুখে দিয়ে বললে—'ধেত্তব শালা তামাক।' নলটা সপাৎ কবে মেঝেব ওপব পড়ে গেল। শশধব হাঁক দিয়ে বললে—'এই শালা।'

সনাতন এসেছে।

শশধব বললে—'লে যাও শালা।'

সনাতন হুঁকো নিয়ে চলে গেল।

২

পবদিন সন্ধ্যাব সময় বমেশ এল আবাব।

শশধব ছিল না।

বমেশ এসে দেখব বিবজা খাটেব একপাশে পড়ে আছে—অত্যন্ত জড়োসড়ো ভাবে। বমেশ সন্ধ্যাব সময় প্রতিটি দিন বিবজাকে বান্নাব কাজে ব্যস্ত দেখত।

ডাক দিল—বিবজাবউদি।'

'কে, বমেশ।'

'বিবজা , তুমি এ-বকম লোপাট হয়ে আছ যে বিবজা?

বিবজা উঠে বসে বললে—'ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আজ আসবে না; একটু দেবিতে এসেছ, না? ঘুমুচ্ছিলাম—'

'ঘুমিয়ে পড় নি নিশ্চযই

বমেশ একটা চেযাব টেনে বসল।

বিবজা বললে—'ঘুমোতে চেষ্টা কবছিলাম।'

'এই ভব সন্ধ্যায?'

ঘুমিযেও পড়েছিলাম বোধ হয—না হলে কেউ স্বপ্ন দেখে?'

'স্বপ্নও দেখছিলে নাকি? না দেযালা?'

'কেমন বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম সব।'

বমেশ বললে—'চোখে কাঁচা ঘুম লেগে বযেছে তোমাব বিবজা, এখন আমি না এলেই পাবতাম।'

বিবজা হাই তুলে চোখ-কপাল কচলাতে-কচলাতে বললে—'না, এ অবেলায ঘুমিযে শবীবটা মাটি কবা শুধু; এসেছ, ভালোই কবেছ—তোমাব সঙ্গে কথা আছে।'

বমেশ নস্যেব শিঙটা বেব কবল।

বমেশ বললে—'মনটা বড্ড খিঁচড়ে আছে।'

বমেশ বললে—'কাল বাতে তো আমি চলে গেলাম —তাবপব?

'তাবপব আব কিছু না।'

'সত্যি কিছু না?'

'না।'

'বলবে না বিরজা?'

বিরজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললে—'আ।'

'অস্বস্তি বোধ করছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ঘুমোও।'

'ঘুমনো চলবে না আর।'

'তাহলে একটু চুপ করে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকো।'

'চুপ হয়ে ঘর অন্ধকার করে শুযে থাকব কেন?'

'যেমন ছিলে—'

'তেমনই থাকতে হবে?'

'হয়তো নিউরেলজিয়া।'

—নিউরেলজিযা?'

'অন্ধকাবে মেযেরা যখন বিছানায একা পড়ে থাকে হয নিউরেলজিয়া , না —হয—'

রমেশ বিরজার দিকে তাকিয়ে কথাটা শেষ করল না আব।

বিরজা বললে—'নিউরেলজিয়া আমার নেই।'

রমেশ কিছু বললে না।

বিরজাকে আজ একটু কনকনে বোধ হচ্ছে; কেন যেন? এ যেন অনেকেব ওপরই বিবক্ত ও কঠিন হয়ে রযেছে।

শশধরের সম্বন্ধে আজ এর কী ধারণা ? বরাবরই তো নিখুত সতী এই বিবজা। কিন্তু কাল এই সতীর স্বামীকে এমন পুরোদস্তুর উপভোগ করেছে রমেশ। উপভোগ করবে না? একটা ভাঁড়কে কে না উপভোগ করে?. কিন্তু তবুও এ ভাঁড়ের সাথে সাতবছর চলেছে বিবজাব,— বিরজার কাছে সে ভাঁড় নয়—স্বামী, সতীর স্বামী। কালকের বাতটা এই স্বামী ও সতীর অজস্র নির্বিঘ্ন যামিনী-যাপনের একটা খণ্ডমাত্র, আর কিছু না। আর কিছু না? রমেশ মনে-মনে একটা অদ্ভুত তামাসা বোধ করছিল,—কি কবে এ অন্য কিছু না হযে যায়? কিন্তু তবুও বাস্তবিক অন্য কিছু নয়! শশধব বাস্তবিকই বিরজার প্রযোজনীয় স্বামী, বিরজা শশধবের সতী—এদের এই মর্ত্যলীলাব শেষদিন অবধি।

রমেশ খুব জাঁকালোভাবে খানিকটা নস্য নিল।

'বাগ করবে না তো বিরজা?'

'কেন? কী?'

—'যদি তোমাকে একটা কথা বলি ? তখনই কেমন অস্বাভাবিক মনে হয , ঠাকুরপো ঠাকুবপো করে অব অল পার্সনস আমাকে ডাক যখন তুমি! দি আযরনি—আমাকে?'

—'কেন, তুমি কে?'

সে কথার কোনো জবাব না দিযে বমেশ বললে—'কাল শশধরবাবুর কাছে বিশেষ করে রান্নাঘরে গিয়ে এত ঠাকুরপো ঠাকুরপো করছিলে যে বাস্তবিক আই ওযাজ পেট্রিফায়েড টু ঠাকুরপো।'

—'কেন, ঠাকুরপো কি ঘৃণার জিনিস।'

—'দি মোস্ট অ্যাবজেক্ট থিং ইন দি ওয়ার্ল্ড।'

'সত্যি?'

'আমার কোনো দাদা নেই; আমাব নিজের খুড়িমা জেঠিমা মাসিমা ছাড়া কোনো বাড়ির কোনো প্রণম্যাবধূদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। মেযেমানুষেবই আমি ধার ধারি না—বোঠান মেযেমানুষেব কথা তো ঢের দূরে—'

বিরজা কেটে দিয়ে বললে—'বোঠান-দেবরের সম্পর্কের মতো এমন মিষ্টি জিনিস—'

বিরজা তার কথা শেষ না করতেই রমেশ বললে—'সে সব তুমিই ভালো বোঝো; পৃথিবীতে সব রকম মিষ্টি দামি পূজনীয়, রুচিসম্মত সম্বন্ধ বজায় রাখাটাকে তুমি কর্তব্য বলা মনে করো না শুধু—প্রিয প্রেমের কাজ বলে ভাব। দেবর বোঠান, সতীসাধ্বী, তোমার অনেক কিছু কমপ্লেক্স আছে বিরজা—কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই বোঠান মনে করতে পারব না।'

বিবজা ঠিক আধ মুহূর্ত চুপ কবে থেকে বললে—'কী মনে কববে তাহলে?'
—'শুধু বিবজা।'
'তাতে যদি আমি বাজি না হই।'
'তা হবে না জানি; তাই আমি তোমাকে শশধববাবুব স্ত্রী বলে মনে কবি।'
বিবজাব গায কাঁটা দিযে উঠল—এক-আধ মুহূর্তেব জন্য। মিলিযে গেল।
দেখল বমেশ । বুঝল না কেন? মেযেটি কি পুলকিতে হযে উঠেছে? পুলকিত হোক না-হোক—ব্যথা পায নি। সেই ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি বিবজা কোনোদিনই ভড়ং কবে না। সতীত্ব নিযেও এখন সে ভড়ং কবে না; এটা তাব বক্তমজ্জাব জিনিস।
বিবজা বক্তমজ্জায অনেক দুঃসাধ্য অলৌকিক জিনিস জন্মায—অনেকদিন থেকে জেনে এসেছে বমেশ।
বমেশ বললে—'কিন্তু যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম বিবজা , বাগ কবো না, তোমাকে আঘাত দেবাব বা অপমানিত কববাব কোনো উদ্দেশ্যও আমাব নেই।—আমাব জিজ্ঞাসা এই যে—' একটু চুপ কবে বমেশ বললে—'কাল যখন চলে গেলাম—তাবপব কী হল?
—'ও,এই কথা?' বিবজা ঠোঁটে আঁচল টেনে অধোমুখে একটু কঠিন হযে বসল। সহসা ফিক কবে হেসে বললে—'ধেৎ।'
'বলো না।'
'কী কববে শুনে তুমি?'
বমেশ বললে—'বাস্তবিক এটা জানবাব জন্য কাল সাবাবাত ছটফট কবেছি।'
বিবজা বললে—'মিছেমিছি কবেছ ছটফট, বিশ্রী কৌতূহল তোমাব।'
'কেন?'
'কোনো খ্যাঁকশিযালেব গর্তে হাঁসেব মতো পড়ে যাই নি তো—স্বামীব ঘবে তাব স্ত্রী সাবাবাত ছিলাম।'
অনেকক্ষণ চুপ কবে বিবজা বললে—'এব ভেতব ভাবনা -আশঙ্কাব কী আছে। এ তো সবচেযে স্বাভাবিক স্বাধীন জিনিস—এ নিযে ছটফট কোবো না তুমি বমেশ। '
বমেশ বললে—'এই' এব বেশি কিছু বলবে না?'
'কী আছে? কী বলব? কী শুনতে চাও তুমি?'
'যা হযেছিল তাই শুনতে চাই।'
'কোথায, কী হযেছিল?'
বিবজা অত্যন্ত বিবক্ত হযে উঠল।
বমেশ বললে—'শশধববাবু শেষ পর্যন্ত কী কবলেন?'
'কী কববেন আবাব?'
'তোমাব গাযে হাত বুলোতে লাগলেন? সমস্ত শবীব ঠাণ্ডা—স্নিগ্ধ হযে গেল তোমাব; বাস্তবিক লোকটিব খুব দাক্ষিণ্য আছে।'
বিবজা বললে—'দাক্ষিণ্যেব কোনো কথা উঠছে না।'
—'প্রেমেব? আমাব কৌতূহল অত্যন্ত নোংবা—'
বমেশ বললে—'তা জানি—কিন্তু তা না মিটিযে আজ যাচ্ছি না এইটুকু জেনো তুমি?'
—'কি কবে মেটাবে তুমি?'
—'বলবে তুমি।'
—'আমি? আমি আমাব স্বামীব কথা বলব?'
—'কেন বলবে না?'
—'এ কী বিশ্রী আবদাব তোমাব বমেশ!'
—'কী ভীষণ জেদ তোমাব বিবজা!'
—'আমাকে তুমি সুস্থিবে থাকতে দেবে না দেখছি—'
—'বললেই তো মিটমাট হযে যায।'

—'তোমার কাছে কেন আমি বলতে যাব?'

—'আমাকে ছাড়া বলার লোক কোথায় তোমার?'

বিরজা দু–এক মুহূর্তের জন্য রূপান্তরিত হয়ে চুপ করে রইল, তারপরেই নিজের স্বরূপে ফিরে এসে বললে; ভেবেছ নাকি তাই?'

রমেশ বললে—'বরাবরই তাই ভাবি।'

বিরজা বললে—'বেশ ভাব ভালো করো; কিন্তু বলব কেন? কাউকেই আমি বলব না।'

—'আমাকে অন্তত না বলে পারবে না তুমি।'

বিরজা দুদণ্ড অত্যন্ত উত্ত্যক্ত কৌতুকাবিষ্ট হয়ে বসে রইল। বললে—'আমাদের কথাবার্তা অবশেষে যদি এই রকমই হয় তাহলে আর কথা না বলাই ভালো রমেশ।'

—'আমি যা জানতে চাইব আমাকে জানাতে হবে।'

—'কী ভীষণ আস্পর্ধা তোমার!'

দু–এক মিনিটের জন্য স্তম্ভিত হযে রইল বিবজা; যেন একটা বিষম ঘুষির চোটে তার চেতনা ফুরিয়ে গেছে প্রায়।

রমেশ বললে—'তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিতে চাই।'

'আমাকে স্বাধীনতা?'

বিরজা ধারণাও করতে পারছিল না।

'তুমি অন্যায়ভাবে নিজেকে বেধে রেখেছ।'

বিরজা আকাশ থেকে পড়ে বললে—'আমি!'

বিরজা স্তম্ভিত হয়ে বললে—'নিজেকে বেধে রেখেছি!'

বিরজা যেন সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে বললে—'অন্যায ভাবে!'

কী ভীষণ! রমেশ তাকে, কেউ তাকে, এমন কথা বলবে সে কল্পনাও কবতে পাবছিল না। বিরজা অত্যন্ত.... বললে—'আমি অন্যাযভাবে নিজেকে বেধে রেখেছি?

আমি?

বিরজা আবাব বললে—'আমাকে তুমি এই কথা বলছ; আমাকে?

—'হ্যাঁ তোমাকেই।'

রমেশ বললে—'নইলে কাল যে সারাবাত শশধরবাবুব কাছে এত গঞ্জনা সহ্য করলে অন্তত যতটুকু রাতে আমি ছিলাম আমি নিজেব কানেই তো সব শুনেছি—তুমি উনিশশো বত্রিশ সালেব একজন চব্বিশ বছরের মেযে হয়ে ওই পঞ্চাশ বছরের মানুষটির কাছ থেকে এসব কী শুনলে! এ কীরকম ব্যবহাব তুমি পেলে—সাত বছর ধবে এ কী জীবন তুমি চালিযে আসছ!'

বিরজা বললে—'তুমি তো চালাও নি রমেশ—চালিযেছি আমি। আমি বেশ স্বস্তিতে চালিযেছি। আমাদের সংসারের গোছগাছেব কথা তুমি কী জান? না জেনে এ কী তুমি বলো? তুমি অনেক অন্যায কথা বলেছ; তুমি তোমার কথা—'

রমেশ বলল—'এতদিন আমি শশধরবাবুকে দেখি নি; কাল দেখলাম। শশধরবাবুর এতগুলো কথার জবাবে কাল আমি একটাও কথা বলতে পারি নি। বলব কী? এ ধরনের মানুষের সঙ্গে চলাফেবা করি নি। মিশি নি কোনোদিন। তাছাড়া কোনো কথাই এদের গায় বসে না।

বিরজা বললে, 'অনেক হযেছে রমেশ ঠাকুরপো——এখন ওঠো।'

'উঠব?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায যেতে হবে?'

'তা তুমি জান।'

'যদি এখানে বসে থাকি ?'

'না।'

রমেশ চেয়ারটায় বসে রইল; বিরজাও কিছু বললে না।

রমেশ বললে—'তোমার স্বামী পঞ্চাশ বছরের নয?'

'আবাব ওইসব।'

'না ওইসব নয়; একটা সোজা কথা— তোমাব স্বামী পঞ্চাশ বছবেব নয়?'

'হলই—বা।'

'তাকে ষাট—সত্তবেব মতো দেখায় না?'

'বিবজা অত্যন্ত ধৈর্যেব সঙ্গে বললে—'ওই সব প্রশ্নে তোমাব লাভ কী বমেশ?'

বমেশ বললে—'আমাব তো মনে হল প্রায় সত্তব হযেছে শশধববাবুব।'

বিবজা অত্যন্ত বৈবাগ্যেব সঙ্গে বললে—'জানি না কত হযেছে।'

—'আমি কাল প্রথমে দেখলাম কি না; তুমি বলেছিলে পঞ্চাশ; পঞ্চাশ বছবেব মানুষ কি এত বুড়িযে যায়?'

বিবজা অত্যন্ত সহিষ্ণুতাব সঙ্গে বললে—'চেহাবাই কি সব বমেশ?'

'কিন্তু তোমাব স্বামী তোমাব কাছে এতদিন বলে এসেছে যে তাব বযস পঞ্চাশেব বেশি নয়।'

বিবজা বললে—'হ্যাঁ তাই বলেছেন; কিন্তু তা কি হতে পাবে না? অনেক লোককে তো অল্প বযসেই খুব বুড়ো দেখায। আব যদিই-বা বাস্তবিক তাব ষাট হয, সত্তব হয, তাতেই-বা এমন ক্ষুব্ধ হবাব কী আছে? মানুষেব বযস, চামড়া, বক্তমাংসই কি সব বমেশ?

বমেশ বললে—'কিন্তু তিনি যদি বযস চেপে না যেতেন তাহলে ভালো হত নাকি বিবজা? কেন চাপলেন? তোমাব কাছে সাত বছব ধবে বযস ভাঁড়িযে তোমাব বিশ্বাস ভেঙে একটুও কি এগোল তাব?

বমেশ হেসে বললে—'কিন্তু হযতো এগিযেছে-—একজন সত্তব বছবেব বুড়ো চেযে একজন পঞ্চাশ বছবেব মানুষ সব সমযই বেশি কাম্য। কাম্য না বিবজা?'

বিবজা কোনো জবাব দিল না। বমেশ তাকে বুঝতে পাবছে না যেন। বিবজা তো ববাববই বলে আসছে চেহাবা বক্তমাংস কতটুকু?

বমেশ বললে—'আজ যে তোমাব মনে খটকা বেধে গেল যে তোমাব স্বামীব বযস পঞ্চাশ না সত্তব এই খটকা নিযে তাব সঙ্গে আগেব মতো উপভোগ আব চলবে না।'

বিবজা বললে—'জীবনটাকে তুমি উপভোগ মনে কোবো না শুধু বমেশ।'

বমেশ বললে—'আগেব মতো উপভোগ আব চলবে না। উপভোগ মনে কবব না কেন? সাত বছব ধবে তোমাব কাছে বযেস ভাঁড়িযে কি উপভোগ কবতে শশধববাবু একটুও ছেড়েছেন? তোমাকে উপভোগেব জিনিস ছাড়া আব কী ভাবে দেখেন তিনি? তুমি নিজেকে নিযে অনেক আকাশপাতাল তৈবি কবতে পাব, কিন্তু তোমাব ক্ষুধিত স্বামীকে কাল আমি ঝেড়ে-ঘেঁটে দেখেছি।'

বমেশ বললে—'কিন্তু ভোগে এখন একটু বাধবে। যখনই তোমাব মনে হবে যে একজন সত্তব বছবেব বুড়ো তোমাব সঙ্গে এই সব-এই সব কবছে, এই সব এই সব কবতে চাচ্ছে, তখনই তুমি একটু না—জড়োসড়ো হযে পাববে না বিবজা।'

বিবজা কোনো কথা বললে না।

বমেশ বললে—'আগেও তো জড়োসড়ো হতে—হতে না?'

বিবজা মুখ তুলে বললে—'জড়োসড়ো?'

'হ্যাঁ শশধববাবুব কাছে।' বিবজা সব ব্রহ্মাণ্ড আকাশেব মতো বড় বড় কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জেদ অনেকটা কেটে যাওযাতে বললে—'কেন জড়োসড়ো হব একটুও না।'

বিবজা চুপ কবে বইল।

বমেশ বললে—'ভোবেব বেলা একটা বিশ্রী মুখ দেখে তোমাব ভয কবত না?'

বিবজা বললে—'কাব মুখ?'

'এই সাত বছব কাব মুখ দেখছ? ভয কবত না?'

বিবজা বললে—'ভয?'

বললে—'চেহাবা কি সকলেবই সুন্দব থাকে, বমেশ?'

বমেশ বললে—' সুন্দব-কুৎসিতেব কথা নয—সত্তব বছবেব সব মুখই বিশ্রী হযে যায; কুৎসিত লোককে ভোববেলা আবো বিশ্রী দেখায—সাবাবাতেব কাদাকালি নিযে বিছানায যখন সে বসে থাকে?'

বিবজা শিউবে উঠল।

রমেশ বললে—'এমন একখানা মুখ রোজ ভোরে তুমি দেখছ; এই সাতটা বছর ধরে রোজ সকালবেলা শশধরবাবুব কদর্যতার একশেষ নিয়ে তোমাকে তৃপ্ত থাকতে হয়েছে।'

অস্ফুট স্বরে বিরজা বললে—'তৃপ্ত থেকেছি তো—'

রমেশ সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে—'কিংবা যখন রোগের পীড়ায় মুখটা আরো কুঁচকে, চিমশে হয়ে গেছে—তখনো তোমাকে তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকতে হয়েছে।'

বিরজা কিছু বলল না।

রমেশ বললে—'কিংবা রাত্রে—গভীর রাতে যখন তা ক্ষুধায় আরো বীভৎস হয়ে উঠেছে—'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

রমেশ বললে—'শুধু তৃপ্তি নয়—সে সুখকে ভালোবাসতেও চেষ্টা করেছ তুমি; করো নি? তার সুখকে—সে মানুষকে ভালোবাসতে চেষ্টা করো নি?'

বিরজা ঘাড় নেড়ে বললে—'ভালোবেসেছি।'

'ভালোবাস নি।'

'ভালোবাসার কী জানো রমেশ?'

'ভালোবাস নি। দাক্ষিণ্যবোধ করেছ—'

বিরজা বললে—'তুমি কি আমার মনের ভেতর ঢুকেছিলে বমেশ?''

'ঢুকেছিলাম। ঢুকে দেখেছি তুমি কী গভীব অদ্ভুতভাবে তৈবি। জানি আরো ঢেব মেয়ে আছে তোমারই মতো—কী অদ্ভুত ভাবে তৈরি তোমরা! অনেক জিনিসের জন্যই মমতা বোধ কবো; স্বামীব জন্য সবচেয়ে বেশি মমতা বোধ কবো। কিন্তু মমতা মানুষ একটা কুকুরেব জন্যও বোধ কবতে পারে—একটা বিড়ালেব জন্যও তাব দাক্ষিণ্য থাকতে পাবে। এসব জিনিসেব সাথে প্রেম প্রণয হয কি কখনো?'

'ভালোবাসা তুমি বোঝো নি—পাও নি কোনোদিন—দাও নি কাউকে। বোঝো নি।'

বিরজা ঠাট্টা করে বললে—'তোমাকে ভালোবেসে বুঝতে হবে? কিন্তু তোমাকে আমি কোনদিন ভালোবাসা না বমেশ।'

রমেশ বললে— 'আমাকে না ভালোবাসলে, কিন্তু আমাব মতো অনেক লোকেব সঙ্গেই প্রেমে পড়া তোমার সম্ভব; উচিতও তোমার তাই; খুব গভীরভাবেই উচিত।'

রমেশ একটু থেকে বললে-—'ষোলো-সতেরো বছবেব সময তোমাব বিয়ে হল। আমাদেব পাড়াগাঁয়েই হল। ছোটবেলাব থেকেই তোমাকে দেখে এসেছি—এমন মমতাময়ী ছিলে তুমি। কত না দিকেই—কত কিছুর জন্যই তোমার দাক্ষিণ্য ছিল! কত অল্প কারণেই কত জীবলোকের ব্যথায় তুমি কেঁদে ফেলতে।' পল্লীবাংলাব পুরোনো কথা সেদিনকাব পল্লীগ্রামেব ধূসব পুবোনো খেলার সাথীব মুখে শুনতে পেযে বিরজার চোখ নরম হয়ে এল।

বমেশ বললে—'সেই ষোলো বছল ধরে তোমাকে আমি যত চিনেছি-—দেখেছি আর কেউই তা দেখে নি।—কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করে দেখেছি চিত্তবৃত্তিব সমস্ত মাধুর্য ও কোমল গুণই তোমার ফুটেছিল বিবজা, কিন্তু তোমার কোনো প্রণয়ী জোটে নি; জুটেছিল? বিয়ের আগে?'

—'না।'

—'আমি অবাক হয়ে অনেক সময ভাবতাম কেন জুটল না।' বিবজাও হযতো বিস্মিত বোধ করে থাকবে। কে জানে কী সে ভাবছিল।

বমেশ বললে—'প্রণযী চেয়েছিলে। কিন্তু তুমি নিজে একদিনের জন্যও প্রণযিনী হতে পাররে না। তোমার চেহারার মধুরতা অনেককেই আকৃষ্ট করেছে। তোমোদের, বাড়ির ভেতরও অনেক ছেলে-ছোকরার অবাধ আনাগোনা হত। সকলের সঙ্গেই তুমি খুবি অবাধে মিশেছ; অনেকে তোমাকে ভালোবেসেছ—তোমার জন্য ঢের ছোকরাকে পাগল হয়ে যেতে দেখেছি; তোমার কানে-কানেও অনেক কিছু ঢেলেছে তারা, লুকানো চিঠি ছুঁড়েছে, তোমাকে নিয়ে শেষদিক দিয়ে কী মর্মান্তিক জ্বালাযন্ত্রণা, কী সব কত সব পুড়ে দগ্ধে যাচ্ছিল সবই মনে আছে আমার বিরজা।'

বিরজা ঘাড় হেট করে সেই সাত বছরেব আগের কথা শুনছিল; কী ভাবছিল সে নিজেই জানে।

রমেশে বললে—'এরা সবাই তোমার প্রণয়ী ছিল; এই পাড়াগাঁর দল এমন হিংস্র প্রণযীও আমি

কোনোদিন দেখি নি। আমার নিজের মনের কঠিন হিংসার কথাও মনে পড়ে। বাস্তবিক প্রণয় দাক্ষিণ্যের চেয়ে ঢের আলাদা; হিংসা যত মর্মান্তিক প্রয়ণ তত বেশি তীব্র।'

বিবজা বললে—'কাকে হিংসা?'

'পরস্পরের ভেতর আমাদের হিংসা—তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য।'

বিরাজ বললে—'কই? আমি তো কিছু জানতাম না।'

'জেনেছিলে ঢের—ছোকরারা তোমার হাতেও তো কত চিঠি দিয়েছে, কত নাকিসুরে কেঁদে গেছে। মনে পড়ে না?'

বিরজা বললে—'মনে আছে। কিন্তু সে সব চিঠির কোনো উত্তর দেই নি তো আমি; ওদের কান্নারও কোনো মানে বুঝি নি।' রমেশ বললে—'ওরা তোমার চেয়ে একটু আগে পেকেছিল; সাধারণত দেখা যায় তোমরা আগে পাকো; কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার মতো দ-চার জন আসে যারা না ভালোবাসতেই স্বামীর ঘর করতে চলে যায়; তাপর সতী হয়। এরা প্রণয় জিনিসটাকে কোনোদিন বোঝে না।'

—'কিন্তু ওদের ভেতর কোনো ছেলেকে যদি ভালোবাসতাম—'

—'তাহলে শশধরবাবুকে বিয়ে করে দাম্পত্যজীবন হয়তো তোমার খানিকটা নষ্ট হত— হয়তো পুরোপুরি; কিন্তু তবুও তোমার এই গোছগাছ শৃঙ্খলা ও তৃপ্তির চেয়ে সে ঢের ভালো হত বিরজা।'

'প্রণয় জিনিসটা কি কলঙ্ক নয়? যেখানে প্রণয় সেইখানেই বিয়ে করতে হয় নাকি?'

রমেশ বললে—'প্রণয় একটা অনির্বচনীয় মোহ; প্রণয় কুহক; অসহ্য পুলকে দিনযামিনী যাপন; যে তা না বোধ করেছে তাকে আমি কী বলে বুঝাব তা?

রমেশ থামল।

সাত বছর আগে এই মেয়েটিকে মনে-মনে কত গভীর ভালোবেসেছিলাম—কত রাত নদীর পাড়ে বাবলা জিউলির জঙ্গলের ভেতর চাঁদের আলোয জোনাকির আলোয কত যন্ত্রণায কেটে গেছে মনে হল সব রমেশের; কিন্তু তবুও সে সবেব ভেতর অসহ্য সুখ ছিল—বসন্তের বৈশাখের রাতের গন্ধ বাতাস উষ্ণতা ফেনা অন্ধকার সেই সুখকে কত তীব্র করে তুলেছিল।

রমেশ মাথা তুলে বললে—'কলঙ্কের কথা বলছ? প্রণয় কলঙ্কে ওতপ্রোত হয়ে থাকে, কিন্তু তবুও সে সব কলঙ্ক—কিশোরের প্রথম তরুণের; বিধাতার নিজের হাতে তৈরি; তাই দিয়ে দিনি জীবন তৈরি করেছেন—জন্মরক্ষা করছেন, রূপ কুহক বিচ্ছেদ বিনিদ্র রাত্রিও কামনা কলঙ্ক ও বেদনা দিয়ে কিশোরকে তৈরি করছে, কিশোরীকে। সে কিশোরীকে কোনোদিন দেখো নি বিরজা; সে কিশোবকে বরাবর না বুঝে না গ্রাহ্য করে পায়ে ঠেলে আজ এই অবধি তুমি এসেছ।'

—'তুমি কি বলতে চাও আমি ভালোবাসি না?'

—'না, কই আর বুঝলে—'

—'আমি তো স্বামীকে ভালোবাসি।'

'ভালোবাস না; মমতাবোধ কর—কতবার একথা বলব তোমাকে বিরজা?'

বিরজা স্তব্ধ হয়ে শুনল।

রমেশ বললে—'বোঝো নাকি বিরজা যে এ স্বামীকে নিয়ে প্রণয়ের কোনো কথাও চলতে পারে।'

—'কেন?'

—'এ স্বামীর কিশোর বয়স ঢের আগে পেরিযে গেছে।'

—'আমিও তো কিশোরী নই।'

—'চব্বিশ বছরে এখনো তুমি কিশোরীর মতোই একটা কিছু।'

—'প্রণয এখনো বোধ করতে পারি?''

—'খুব'।

—'কিন্তু কিছুতেই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না রমেশ, যে স্বামীকে আমি যা ভালোবাসি তা প্রেম নয়!'

রমেশ বললে—'হয়তো কোনোদিনই তা বিশ্বাস করবে না।'

—'কেন?'

—'একটা অস্বাভাবিক জীভন কাটাচ্ছ বলে।'

—'অস্বাভাবিক? আমার তো মনে হচ্ছে না?'

—'কোনোদিনই হবে না; তোমার যদি বিয়ে না হল পাড়াগাঁয়ে আমাদের ভেতর আরো কিছুদিন থাকতে তাহলে জীবনটাকে ঠিক করে বুঝতে পারতে।'

—'কী করে?'

—'কোনো একটা ছেলের রূপের ফাঁদে পড়ে; বাস্তবিক কোনো একটা ছোকরার ঠোঁট নাক চোখ রং কোনোদিনও তোমার মনে ধরে নি?"

—'মন্দারডাঙায় ছেলেদের কথা বলছ?'

—'যে-কোনো ডাঙার।'

—'যতদিন মন্দারডাঙায় ছিলাম এসব চিন্তা আমার মাথায় আসত না।'

—'বিধাতা সেইখানেই তোমাকে মেরেছেন; কিন্তু মন্দাবডাঙা ছেড়ে?'

—'ক্বচিৎ আমি পুরুষমানুষদের দেখেছি—দেখবার আগ্রহও হয নি। যখনো-বা দেখেছি তাদের শীররের রূপে কোনোদিন কৌতূহল বোধ করি নি। কিন্তু তুমি কেবল পুরুষ-মেয়েদের রূপের কথাই বলছ কেন রমেশ?'

—'তুমি নিজে যথেষ্ট রূপসী হয়েও রূপের দাম ইশারা বুঝলে না?'

—'রূপের কি মূল্য, রমেশ?'

—'আরো কিছুদিন মন্দারডাঙায থাকলে বুঝতে পারতে; অনিলকে মনে আছে?'

বিরজা একটু ভেবে বললে—'হ্যাঁ।'

বলতে-বলতে মুখ চোখ ঈষৎ আবেশে পুলকিত হয়ে উঠল বিরজার।

রমেশ বললে—'দেখতে কেমন ছিল অনিল?'

—'বেশ তো।'

—'খুব পছন্দ করতে?'

—'ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই ভাবি নোংরা ছিল; নোংরামিকে বড্ড ঘেন্না করতাম, কিন্তু অনিল বেশ শাদা ফিটফাট ছেলে ছিল, আতর মাখত; ফুল কুড়িয়ে আমাকে দিত। গায়ে সবসময একটু সুগন্ধ মেখে থাকত তার; মুখেও এলাচি চিবত বলে।'

'এই শুধু?'

বিরজা ভাবছিল। বললে—'আর কী?"

'চোখ ঠোঁট বং মনে পড়ে কিছু অনিলেব?'

রমেশ বললে বলে মনে হচ্ছে বিরজাব, বাস্তবিক এই ছেলেটির কথা মাঝেমাঝে ভেবে দেখেছে বিরজা,—মন্দাবডাঙায থাকতেও শশধরেব সঙ্গে ঘর করতে এসেও। এক-একদিনে আচ্ছন্ন হযেও অনিলেব কথা ভেবেছে বইকি বিরজা। কিন্তু সে ভাবা একটি সুন্দর খেলার সাথীর কথা ভাবা শুধু; ভেবে চরিতার্থ হযেছে; ওই সুন্দর কিশোর—যে তাকে এত ভালোবাসত কোথায সে গেল আজ—সেই দিনগুলোই বা কোথায গেল ভেবে অবাক হযেছে বিরজা। সেই দিনগুলো—সেই অনিল শঙ্কর-দেবীদাসের জন্য মমতা বোধ হযেছে। এদের কথা ভাবতে গিয়ে মাধুর্যে ভরে উঠেছে মন; কিন্তু এদের প্রতি কোনো কর্তব্যবোধ করে নি তো বিরজা। এরা ভেসে যেতে পারে—মরে যেতে পারে, তাতে বিরজার কী? শশধরকে তো বিরজা ভেসে-মরে যেতে দিতে পারে না।

রমেশ বললে—'আমি শুধু শরীরের রূপের কথা বলছি না। শুধু অনিলেব কথাও না। সে সব দিন তোমারও পার হযেছে। আমারও। কয়েক বছব পবে আমরা আবো বুড়ো হযে যাব; প্রণযের জন্য আরো অনুপযুক্ত হযে পড়ব—হযতো প্রেমের জন্যও। অবিশ্যি বেশি বযসে প্রেম যে সম্ভব নয—তা বলছি না, কিন্তু প্রণয-জীবনেব প্রথম কুহক ও মাদকতার মোহ একেবাবে অসম্ভব। অথচ জীবনের পক্ষে সে জিনিসের যে কী গভীর প্রয়োজন আছে তোমাকে আমি কোন্ ভাষায় বলে বোঝাব বিরজা?'

বিরজা বললে—'এই চব্বিশ বছরে এখনো কি আমার প্রণয সম্ভব?'

'হয়তো সম্ভব; কিন্তু কঠিন। কাকে নিয়ে তা তোমার সম্ভব হবে? সে মানুষ কোথায়? সে ব্যবস্থাই-বা কোথায়? মন্দারডাঙায সবই এত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল—বিধাতা তোমাকে নিয়ে এরকমভাবে খেললেন কেন তখন!'

—'তুমি দেখছি আমার অতীত জীবনটাকে কোথায় ডুবিয়ে ডুবিযে নিরর্থক করে দিচ্ছ!'

'তোমার জীবনটা আগাগোড়া নিরর্থক।'

'তুমি মনে করতে পারো।'

'আমি ঠিকই মনে করেছি; প্রণয়ের কুহক তুমি আর বুঝবে না, অনিলও তোমার কাছে একজন অপরূপ কিশোরের ব্যথা বিধুর স্মৃতি পর্যন্ত না। কালও সে মোহময় ছিল না। আজও এক মুহূর্তের জন্যও কোনো কুহক ছড়াচ্ছে না তোমার জীবনে। শশধরকে নিয়ে তোমার প্রতিদিনের অজস্র খুঁটিনাটির একটিতেও সে বাধা দিতে আসে না। কেউ কি আসে? বুক কখনো ভেঙে পড়ে না—কোনো কান্নার জোয়ার তোমার জীবনে নেই অনিলকে পেলে না বলে? বিজয় সেই মন্দারডাঙাতেই পল্লীগ্রামের জীবনেই তুমি বিয়ে করে চলে আসার পরেই ধীরে ধীরে যক্ষ্মায় ভুগতে -ভুগতে মরে গেল বলে?'

বিরজা বললে—'বিজয় মারা গেছে? কেউ তো আমাকে বলে নি।'

—'কেউ কোনোদিন বলত না; বললেও—তোমার মায়া দয়া নিয়ে বিজয় কী করত? আজ তার ভূতই-বা কী করবে? সে তোমার ভালোবাসা চেয়েছিল। ডালিমের মতো ভেঙে দলে তাকে চূর্ণ কবে দাও—তাই চেয়েছিল।'

—'আমি বিয়ে করে চলে আসার পরও?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা কী করে সম্ভব হয়।'

বিরজা বললে—'তোমাদের পক্ষে হয়তো হয়।'

রমেশ বললে—'কিন্তু আমরা তোমার চেয়ে জীবনটাকে ঢের বেশি উপভোগ করেছি, আমাদের কাউকে নিয়ে একটা কলঙ্কের জীবনও যদি তুমি যাপন কবতে।'

—'এ-রকম উপভোগ আমার কাম্য নয়।'

—'তা জানি।'

—'জীবনে আমি স্বামীকে ভালোবাসতে চাই শুধু।'

—'শশধবকে ভালোবেসে তুমি গভীর প্রেম বুঝবে না।'

—'ওই-ই আমার প্রেম।'

—'প্রণয় অন্তত নয়।'

বিরজা কঠিন হয়ে বললে—'প্রণযও।'

রমেশ কৌতূকে সঙ্গে বললে—'কীবকম?'

'তুমি তা বুঝবে না।'

'আমিই সবচেয়ে ভালো করে বুঝব।'

বিরজা কোনো জবাব দিল না। বমেশ বললে—'এই সাত বছরের ভেতব তো তোমার সন্তানও হল না।'

বিরজা বললে—'তাতে কী?'

রমেশ বললে—'সন্তানেব স্নেহও তুমি বুঝলে না—জীবনের কী আছে তোমার?'

অতি কষ্টে ধৈর্য রক্ষা করে বিরজা বললে—'সবই আছে রমেশ—প্রেম—প্রণয।'

রমেশ বললে—'সাত বছর ধরে রাতের পর রাত একটা সত্তর বছরেব বুড়োব সঙ্গে সন্তান জন্মাবাব ব্যর্থ চেষ্টা আছে শুধু।'

মেয়েমানুষের রক্তমাংস

অনেকদিন থেকেই একটা বোট-একস্‌কার্শনের কথা চলছিল। সেই বিয়েব পব থেকেই প্রায়। দুবছব ধরে। কিন্তু নৌকোবিহার আজও অবধি হল না। কথাটা তুলেছিল অজিত প্রথম। লীলার বিশেষ শখ ছিল না। কিন্তু বিয়েব আগেব আরো অনেক সংকল্প ও স্বপ্নেব মতো এ জিনিসটাকেও সে ভেসে দিতে দিয়েছে, এই লীলাকে নিয়ে বোট-একস্‌কার্শনে গিয়ে হবে কি?

লীলা বললে—'আজই চলো।'

অজিত বললে—'যেতে আবার আপত্তি কি, কিন্তু বমেশকাকা বলেছেন নৌকো কেবাযাব আজকাল খরচ বড্ড বেশি, পুজোব সময় কিনা!' এক টিপ নস্য নিল অজিত।

পুজো কেটে গেছে তারপব আবো ছমাস গেল।

বৈশাখ মাসেব মাঝামাঝি একদিন লীলা বললে—'বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে, চলো কাল মন্দাবডাঙার খালে বেড়িয়ে আসা যাক।'

মন্দারডাঙাই বা কি তার খালই বা কি কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখে নি লীলা। শুনেছে শুধু। বিয়েব আগে মিরাট ক্যান্টনমেন্ট থেকে অজিত যে তাকে চিঠি লিখত সে সবেব ভেতব নানারকম দাম্পত্য শিহরণ ও পুলকের কথা যাতে মন্দাবডাঙাব খালে নৌকোয চড়ে মাইলেব পব মাইল জ্যোৎস্না বাতে ভেসে ভেসে বড় নদীর মোহানায় গিয়ে উৎরোত।

লীলাকে ভাঁওতা দেবার কোনো সাধ অজিতের ছিল না। বিবাহ যে কতদূব মোহ সয, বিয়েব পব জীবনটা যে কি নিবিড় কুহকাবৃত্ত মিবাট ক্যান্টনমেন্টে একটা নীবস টেম্পবারি চাকবিব লগি ঠেলে ঠেলে অজিত যেন তা আব ভেবে শেষ কবতে পারছিল না।

তখন সে ঢেব কিছুই লিখেছিল লীলাকে। আজ সে সব কথা ভাবতে গেলে সমস্তই যেন অবাস্তব মনে হয, এত ব্যথা পেতে হয।

বধূকে সে ফবাসি উপন্যাসেব অনুবাদ কবে শোনাবে লিখেছিল, ফবাসি রিযালিজম ও অশ্লীলতাব চূড়ান্তে তাকে ভর্তি কবে নেবে ভেবেছিল। যে লীলা বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়া আব কিছু বুঝেই উঠতে পাবল না, জীবনটা কি একটা অদ্ভুত ঠাট্টা!

দু-চারখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা লীলা বাখে। সে সবেব গল্পই সে পড়ে। পড়ে ভুলে যায, আবাব পড়ে, যে কোনো সাধাবণ শিক্ষিত বধূব মতো সহজবোধ জিনিস নিয়ে সে খুশি, গহনা চায, অবিশ্যি একটা মার্জিত রুচির শাড়ি ভালোবাসে, খুব বেশি দামের নয, সাধাবণ গৃহশ্রী জিনিসটাকে ফুটিয়ে তুলতে চায। লীলাকে নিয়ে সত্যিই বেশ চলত—বাঙালি প্রায যে কোনো স্বামীর। কিন্তু অজিতেব কাছে এ মেয়েটি শাদা সেদ্ধ শালগমেব মতো মনে হচ্ছে, না আছে নুন না আছে কাসুন্দি। সাহেবপাড়াব একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেম বিয়ে করলেই হত।

বাত অনেকদূব গড়িয়ে গিয়েছে। কামিনী ঝড়েব কাছে স্বামী-স্ত্রীব শোবার ঘরেব জানালা। পাতালতাব ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে অজিতেব ছাপব খাটখানা ভবে ফেলেছে। বাতাস খুব খেলছে। গবম কিছুতেই কেটে উঠতে চাচ্ছে না, অজিত মশাবিটা তুলে দিল।

লীলা স্বামীকে বাতাস কবছিল।

অজিত বললে—'থাক।'

—'কেন?'

—'অনেকক্ষণ থেকেই তো দিচ্ছ, হাত ব্যথা কবে না মানুষের?'

লীলা হাতপাখাটা বালিশের কিনাবে রেখে দিল। বললে—'উঠে বসলে হয।'

অজিত বললে—'ঘুম পাচ্ছে না।'

—'শোও, বাতাস করি।'

—'না।'

—'কী করবে তাহলে?'

—'একটু মাঠে ঘুরে আসি, বেশ হাওয়া দিচ্ছে।'

—'আর আমি?'

অজিত এক আধ মিনিট কামিনী ঝোপের দিকে তাকিয়ে বললে—'যাই।'

—'আমি কী করব? এখানে একা একা শুয়ে থাকব?'

—'বেশ, আমার সঙ্গে চলো।'

—'মাঠে?'

অজিত ঘাড় নেড়ে বললে—'যাবে তো ওঠো।'

লীলা বললে—'পাগলামি আর কাকে বলে, দুপুর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো গোভূতের মতো।'

অজিত—'তাহলে যাবে না তুমি?'

—'তুমিও বা কেন যাবে!' লীলা অজিতের কাপড়ের খুঁট শক্ত করে আটকে ধবল। বললে— 'তার চেয়ে শোও, বাতাস দিচ্ছি।'

অজিত শুল।

লীলা উঠে বসল।

অজিত বললে—'উঠলে?'

বসে বসে বাতাস করতে চায়। লীলা। তাহলে স্বামীর গায় লাগবে ভালো।

অজিত পাশ ফিরে এক আধ মিনিট ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু জীবনে এত বিলাসের ভেতর ঘুমোনো অভ্যাস নেই তার। ছারপোকার বিছানায় তেলচিটে ছেঁড়া মশারির ভেতর আগুনতাতা রাতে বছরের পর বছর কত রাত সে অঘোরে ঘুমিয়ে এসেছে, এমন হাওযাব রাত তো তখন ছিল না, থাকলেও জানালায় গরাদ ছিল না বরে চোরের ভয়ে মা আর দিদি দরজা জানালা সমস্ত আটকে দিতেন, তারপর সেই গুমোটের ভেতর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোত তারা সারাটা বাত, হাতপাখাও তখন প্রায় সময়ই পাযেব কাছে পড়ে থাকত, জীবনে শাস্তি, তৃপ্তি বেশি ছিল বলে।

অজিত নড়েচড়ে আর এক পাশ ফির।

লীলা বললে—'কষ্ট হচ্ছে?'

অজিত কিছু বললে না।

লীলা বললে—'মাথায় সেই ফুলের তেল আব খানিকটা জল ঢেলে মুছে দেই?'

মৃগীরোগ অজিতের চোদ্দপুরুষে নেই। এই জল তেলেব ব্যবস্থা কোথায় যে লীলা শিখেছে এবং পৃথিবীতে কোন মাথার জন্য যে এ জিনিস উপযুক্ত অজিত ভেবেই ছিক করতে পাবল না, যতগুলো পরিচিত মাথার কথা তার মনে সে সবের কলকব্জাব ভেতর এর সন্ধান পেল না অজিত। হয়তো কোনো লঘু উপন্যাসের জগৎ থেকে এই সব আযত্ত করেছে লীলা।

অজিত বললে—'দেখি তো পাখাটা।'

—'কেন?'

—'আর দরকার নেই, জানলা দিয়ে প্রচুর বাতাস আসছে। সরিযে বাখে পাখাটা।

অজিত বললে—'জানলা দিয়ে বাতাসের যা ঝাপটা।'

লীলা বললে—'তুমি ঘুমোও আগে।'

—'ততক্ষণ অবধি বসে বসে বাতাস কববে?'

—'করব তো, তোমার তাতে কি?'

বাইরেব বাতাস থেমে গেছে। ভেতরেও লীলা ঢুলছে। ঠকাস ঠকাস করে মেয়েটির হাতপাখা আধ মিনিট অন্তর অজিতকে ঠুকে যাচ্ছে। মশার কামড়ও বেশ। তারপর একসময় লীলাব পাখা বন্ধ হল।

অজিত দেখল দেয়ালের গায় লীলা লুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঢিলে হাতের ভেতর পাখাটা, আস্তে আস্তে সেটাকে তুলে নেয়া গেল। সন্তর্পণে বাতাস দিয়ে মশারি ফেলে দিল অজিত।

তারপর বাকি রাত নিজে আস্তে আস্তে বাতাস খেল। লীলাকে দিল। মশারির ভেতর গুমোট জমল না তাই আর। মেয়েটি ঘুমোতে পারল, ভোর অবধি।

অজিত ঘুমোল ভোরবেলা।.

নারকেলের মতো রাঙা চোখ মেলে ফিরে তাকাতেই লীলা দাঁড়িয়ে, ঠেলছে তাকে।
অজিত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পাশ ফিরল।
—'এখনো ঘুমোচ্ছ, আটটা বেজে গেছে।'
—'বাজুক।'
অজিত পাশ ফিরে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।
লীলা দু-চারবার জোরে ঠেলা দিয়ে বললে—'চা এনেছি।'
অজিত জড়ানো গলায় বললে—'এই বিছানায় রাখো।'
—'জুড়িয়ে যাবে।'
—'না জুড়োবে না।'
অজিত যখন উঠল চা জুড়িয়ে গেছে। কিন্তু চায়ের জন্য বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই তার। তার মনের মতন করতে পারে না। নানা দিক দিয়েই আজকের এই পেয়ালাটা একেবারে নিরর্থক। চা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে রইল অজিত। দ্বিতীয়বার ফরমাজ দেবার মতো কোনো ইচ্ছা তার নেই।
লীলা বললে—'খেলে চা? এখন বেড়ানো একটা কথা'—অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে সে বললে—'আজ বোটে বেড়াতে যাব কিন্তু।'
অজিত বললে—'জালিবোট জুটানো বড্ড শক্ত।'
লীলা বললে—'বজরা পাবে তো?'
—'বজরা?' অজিত উদাসভাবে একটা নিশ্বাস ফেলল।
—'নিশ্চযই পাবে, মন্দারডাঙার মাঠে অনেক বজবা থাকে।'
—'বজবাব কি দরকাব, আমি আর তুমি তো।'
—'তাই বলে একটা জেলে-ডিঙিতে যাব নাকি?'
—'না, জেলে-ডিঙিতে কে যাচ্ছে।'
—'এই তো সেদিন বলছিলে নবকিশোরবাবুর জালিকেই পাবে।'
—'নবকিশোর!' অজিত সহসা ভুলে গেছে যেন সব।
—'বা, খাসমহলেব ডেপুটি।'
—'ও।' অজিত গা মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে—'তিনি তো মফস্বলে চলে গেছেন।'
—'মফস্বলে কোথায়?'
—'ময়নাদিঘিব চরে।'
—'কবে ফিরবে?'
—'সে ঢের দেরি।'
—'তাহলে কেন তিনি থাকতে থাকতে গেলে না?'
অজিত বললে—'ওসব বড়লোক মানুষ, ওদেব কাছে কে যাবে খোসামুদি করতে। তাব চেয়ে বিস্তর নৌকো ঘাটে রয়েছে, ভাড়া করে নিলেই হল।'
—'কিন্তু কই, এতদিনেও তো তা পারলে না।'
পারছিল না বটে, নৌকাঘাটের দিকে অজিত দু-বছবের ভেতর যায় নি, কি হবে গিয়ে! লীলাকে সঙ্গে নিযে বোট-একস্‌কার্শন? ভাবতে গেলেই হৃদয়ে এমন একটা জড়তা আসে!
লীলা বললে—'একটা বিশমাল্লা হলেও চলে, কিন্তু আমি বজরার কথা বলছিলাম কেন জান?
অজিতকে সে- কথা অনেকবার বলেছে লীলা, আজও বললে—'যার তো আমি আর তুমি, এমন বড় নদী কিছু নয়, মন্দারডাঙার খাল শুধু, এমন ঝড়বৃষ্টির রাত কিছু নয়, ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত'—লীলা একটু থামল। বললে—'কিন্তু তবুও বজরায় না গেলে মন ওঠে না, রাজরানীরা সেকালে যেমন যেতেন স্বামীদের নিয়ে।' একটু থমকে গিয়ে বললে—'অবিশ্যি রাজরানীদের কথা তাদের আমি ধবছি না, বড়ঘরের মেয়েরা স্বামীদের', লীলা থামল, বললে— আজও তো নৌকাবিলাস করে, করে না? তারা বজরাযই করে, কেন জান? বজরা জিনিসটা অনেক অনেক যুগের প্রেম ভালোবাসা সোহাগ সুখেব বুকেব ভেতর জড়িয়ে রয়েছে, নাম শুনলেই হৃদযের ভেতব'—একটু থেকে লীলা—'বরাবরই কলকাতায় রয়েছি, কিন্তু তবুও যেদিন গঙ্গার ধারে যেতাম বড্ড বড় ছইওয়ালা নৌকাগুলো দেখলেই বুকের ভেতর একটা চাড় দিয়ে উঠত। মাঝে মাঝে দু-একটি বধূকে দেখতে পেতাম, আর তাদের স্বামীদের, ভাবতাম

এই নদী বেয়ে হয়তো একটা নির্জন মোহানায় জ্যোৎস্নারাতে—তাদের কপালে কত সমুখ সাধ যে রইল। ভাবতাম বিয়ে যদি করি—'

অজিত বললে—'বজরা পাওয়া যাবে না।'

লীলা বললে—'একটু খুঁজে দেখ লক্ষ্মীটি।'

—'বড় বেশি হাঁকবে।'

—তা হাঁকলই বা, একদিন বই তো নয়।' একটু থেমে—'যদি বড়লোক হতাম, রোজ রোজ যাওয়া যেত, অমবস্যায় একরকম দেখতাম, জ্যোৎস্নায় আর একরকম, না?'

অজিত কোনো জবাব দিল না।

লীলা বললে—'আমার বাক্সে একটু সোনা আছে সেটুকু বিক্রি করে—'

—'কই দেখি কীরকম সোনা।'

সোনার একটা লকেটের খানিকটা অজিতের হাতে তুলে দিয়ে বললে—'ভালো দেখে একটা বজরা কোরো, যেন ঘুলঘুলি থাকে, ভেতরে আলো হাওয়া যেতে পারে। আর বাইরের সমস্তটুকু দেখতে পাওয়া যায়, আর ছই যেন বেশ শক্ত হয়।'

অজিত বললে—'ফরমাজ তো অনেক, কিন্তু আজ আর কিচ্ছু হবে না।'

—'কেন?'

—'দু-চারদিন দেখতে হবে, ঘুরতে হবে তবে তো, ভালো বজরা কি আর সহজে মেলে?'

লীলা একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে—'আচ্ছা, কিন্তু পূর্ণিমের আগে জোগাড়জাগাড় করে ফেলতে হবে কিন্তু।'

পূর্ণিমা গেল, অমাবস্যা গেল, তবুও কিন্তু ব্যবস্থা হল না।

অনেক রাতে অজিত বাড়িতে এলে লীলা বললে—'কোথায় ছিলে?'

অজিত বললে-'কিছু খাবার আছে নাকি? দাও।'

খাওয়া হয়ে গেলে লীলা বললে—'এত রাতে বাতি জ্বালছ কেন আবার?

—'পড়ব।'

—'এখন তো অনেক রাত।'

অজিত কোনো জবাব দিল না। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে চেয়ার টেনে একটা বই নিয়ে বসল।

লীলা বিছানার থেকে বললে—'কী পড়ছ?'

—'বুঝবে না।'

—'ইংরেজি?'

অজিত কোনো উত্তর দিল না।

লীলা বললে-—'ইংরেজি উপন্যাস আমিও পড়েছি।'

অজিত একটু আমোদ বোধ করে ঘাড় ফিরিয়ে বললে-—'বাস্তবিক?'

স্বামীর গলার ভেতর ঈষৎ শ্লেষের সুর লীলা ধরতে না পেরে বললে—'[...] অব ওয়ে ফিল্ড, সুইস ফেমিলি রবিনসন ক্রুশো।'

অজিত হো হো করে হেসে উঠল।

লীলা একটু আহত হয়ে থামল।

অজিত বইয়ের পাতায় মন নিবিষ্ট করল।

লীলা একটা আস্ত সুপুরি মুখে নিয়ে গাল ফুলিয়ে ভাবতে লাগল আর কি ইংরেজি উপন্যাস সে পড়েছে, স্বামীই-বা হাসল কেন, অবশ্যি এটা স্বীকার্য যে অজিতের তুলনায় কিছুই সে পড়ে নি, কিন্তু তাই বলে অমন হেসে ঠাট্টা করতে হয়?

অজিতকে বললে—'পান খাবে না?'

—'না।'

—'সুপুরি?'

—'না।'

লীলা আবার থামল খানিকক্ষণের জন্য। অজিত পড়ছে। এমন কোনো ইংরেজি বইয়ের নাম করতে পারবে না কি লীলা যা শুনে অজিত প্রশংসামুগ্ধ হয়ে তার দিকে নজর দেয়? লীলা অনেকক্ষণ ধরে কঠিন

ভাবে ভাবল। কোনো বইয়ের নাম তাব মনে আসছে না।

অজিত আবিষ্ট হয়ে পড়ছিল।

লীলা বললে—'সংসারে তোমাব বই ছাড়া আব কিছু নেই নাকি?'

অজিতের কানে গেল কিনা সন্দেহ।

একটু জোরে—'শুনছ?'

অজিত বললে—'কি?'

—'সংসাবে তোমাব বই ছাড়া আব কিছু নেই কি?' বলেই লীলা টেনে টেনে হাসতে লাগল।

এরপব লীলা কী বলবে অজিত তা জানে। বললেও তাই।

বললে লীলা—'বইগুলোকে বিয়ে কবলেই পারতে।' তাবপব—'মিছেমিছি কষ্ট কবে আমাকে আনবাব কি দবকাব ছিল?'

এরকম দু'চাবটে আবো কিছু বললে লীলা। তাব প্রত্যেকটি প্রাণেব ভালোবাসাব কথা ফুরিয়ে, লীলা টেনে টেনে হাসছিল, তাকাল, এই কথাগুলোকে বলে স্বামীকে হয়তো সে খানিকটা আঘাত দিতে পেরেছে, টেনে টেনে হেসে অজিতকে সে হয়তো পবাস্ত কবে ফেলবে, স্ত্রীর দিকে মন না দিয়ে বইয়ের দিকে মন দিচ্ছে বলে হয়তো অজিত শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝবে। কষ্ট পাবে। অজিত ভাবছিল যে যখনই সে অনুপযুক্ত সময অবাস্তব কাজ নিয়ে বসে তখনই এইসব হচ্ছে লীলাব অস্ত্র, সমস্ত জীবনেব বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে এইসব কথাব ক্ষুব শানিয়ে বেখেছে লীলা। কিন্তু তবুও এগুলো মোটেই ক্ষুবধাব নয, কি কবে হবে? লীলাব হৃদযেব ভেতব শ্লেষেব বিষ নেই মোটে। কঠিন নির্মম অনড় কতে পারে না সে। সর্বদাই ক্ষমা কবতে বাজি। কাজেই কারু কিছু এসে যাচ্ছিল না।

লীলাব টানা হাসিব শব্দ শুনে অজিত ঘাড় হেট কবে ভাবছিল, এ হাসি অজিতকে বিঁধবাব জন্য তৈরি, বাস্তবিক টেনে টেনে এই যুক্তিহীন উপাযহীন মুক্তিহীন হাসি বিঁধতে থাকে।'

সময কেটে যাচ্ছে।

লীলা বিবক্ত অস্থিব হয়ে বললে—'তুমি কবছ কি?'

—'দেখছই তো পড়ছি।'

—'অনেক তো পড়েছ।'

—'পড়েছিই তো।'

—'বাত তো ঢেব হল।'

—'হোক গে।'

—'এখনো পড়বে?'

অজিত ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ।'

—'কতক্ষণ?'

—'অনেকক্ষণ।'

লীলা বালিশে মাথা পাতল। এক পাশ ফিবে দেযালেব কাছে নালিশ কবে বললে—'কতদিন বললাম, একটু বেড়াতে নিয়ে যাও, বোট তো দূবের কথা, একদিন বসে একটু গাড়ি করে যে নিয়ে যাবে তাও নয।' একটু পরে—'বাবা, মানুষেব প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে না! চব্বিশ ঘণ্টা এই দেযাল আর দেযাল—কাজ আর কাজ!' তাবপবে—'নিজেব তো বাত বাবোটা কবে বাড়িতে আসা হয, তাবপব বই নিয়ে বসা। যদি বলি কী বই পড়ছ, শুনে হো হো কবে হেসে উঠবে। এতই যদি ঠাট্টার পাত্র হলাম অবহেলাব জিনিস হলাম, তাহলে বিয়ে কবেছিলে কেন আমাকে? জানি, আমাকে আব ভালোবাস না। আমাকে আর স্ত্রী বলেও মনে কবো না, সে-সব আমি অনেক আগেব থেকে বুঝেছি।'

একটু, চুপ।

লীলা উঠে বসল। বললে—'কেন আমি মিছেমিছি তোমাব জীবনে গলগ্রহ হব?' একটু জোবেই সে বলল।

অজিত তবুও নড়েচড়ে ওঠে না।

ঈষৎ রুখে লীলা বললে—'শুনছ?'

—'কি?'

—'কেন আমি মিছেমিছি তোমাব জীবনেব জঞ্জাল হব?'

—'কে বললে তুমি আমাব জীবনেব জঞ্জাল?'

—'মিছে কথা বোলো না, তাই নই?'

অজিত ঘাড় নেড়ে বললে—'না।'

—'মিছে কথা বোলো না, তাই নই?'

অজিত বলে—'কি যে বলছ?'

লীলা বললে—'তুমি আমাকে এড়াতে চাও শুধু, আমি বুঝেছি।'

কৌতুকেব সঙ্গে অজিত বললে—'কেন এড়াতে চাব?'

—'চাও, চাও, আমি জানি, মনে কবো যে আমাব ভেতব কিছু নেই, তা না হলে এত বাত কবে কেউ ফেবে? ফিবেই স্ত্রীকে আদব না কবে পড়তে বসে?'

অজিত বললে—'এই বইটা'—

'থাক, কোনো স্বামী, স্ত্রীব চেয়ে বইকে বেশি ভালোবাসে?'

বিপুল বিবাট স্বামীদেব দুর্দান্ত জগৎ সম্বন্ধে লীলাব মন্তব্য শুনে অজিত গভীব তামাশা বোধ কবছিল, এক আধ মিনিট এই অনভিজ্ঞ বধূব পৃথিবী থেকে ঢেব দূবে মনে মনে পবিক্রম কবে অজিত ফিবে এসে বলল—'কে বললে তোমাব চেয়ে বইকে বেশি ভালোবাসি?'

—'ফিবে এসে বই নিয়ে বসো কেন তাহলে?'

—'কী কবব?'

—'কেন, আমি কি নেই?'

—'তুমি তো আছই আমাব হৃদয়ে স্বর্গ হয়ে।'

—'সত্যি ঠাট্টা কোবো না।'

—'সত্যি ঠাট্টা কবছি না।'

লীলা একটু প্রীত হয়ে বললে—'আমাকে আদব কবো না কেন?

—'আদব? সে তো মশাবিব ভেতব গিয়ে।'

—'আস না কেন?'

অজিত বললে—'বইটা আগে পড়া হোক।

লীলা অসহিসষ্ণু হয়ে বললে,—'আব ক—পাতা?

—'অনেক।'

—'কতক্ষণ লাগবে?'

—'অনেকক্ষণ।'

—'তাবপব আসবে?'

—'কেন আসব না?'

—'কালও তো পড়তে পাব এই বইটা।'

—'কাল ফিবিয়ে দিতে হবে।'

লীলা কিছুক্ষণ চুপ কবে বইল।

অজিত পড়ছিল।

লীলা খাটেব থেকে নেমে এসে বললে—'তাহলে আমি বিনুনিটা বাঁধি।' স্বামীব গলা জড়িয়ে ধবে বললে—'বুঝলে বিনুনিটা বাঁধি তাহলে।'

অজিত বললে—'বাঁধো।'

দেয়ালে মস্তবড় আবশি ঝুলছিল। লীলা বললে—'বাতিটা একটু এদিকে সবাও তো।'

অজিত সবাল না।

—'তোমাব অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

—'না।'

অজিত চেয়াবটা একটু ঘুবিয়ে নিল।

বেণী বেঁধেও কিছুক্ষণ বসে বয়েছে লীলা। খাটেব একপাশে বেণী বাঁধা একটি ছোট মেয়েব মতো দুলতে দুলতে। ভয়ে না বিস্ময়ে না জীবনেব অবসন্নতায়? বাস্তবিক কি গভীব অবসাদ এই মেয়েটিব

জীবনে। অজিত বইযেব পাতায চোখ বেখে ভাবছিল, এই মেযেটিব প্রাণ একটা একাকী কুকুবেব মতো যেন, শুকনো পাতাব পিছনে ছোটে, প্রজাপতি দেখে ঘেউ ঘেউ কবে, আকাশেব নিস্তব্ধ চাঁদেব দিকে তাকিযে বিড়ম্বিত হযে ফেবে। কোথাও কোনো মুনিব নেই। জীবনে কোনো কাজ নেই, কিছু নেই, সাবাদিন ডালপালা শোঁ শোঁ শব্দ কবছে শুধু ধুলো উড়বে, পাতা খসছে, মানুষেব আশা প্রেম ঘৃণা মৃত্যুব জগৎ তৈবি হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু তাব যেন কোনো কাজ নেই, কোনো মালিক নেই কোনো নির্দেশ নেই জীবনে। অবিশ্যি কাজ যথেষ্ট আছে লীলাব, সকাল থেকে গভীব বাত্রি অবধি সংসাবেব একটানা কাজ, কিন্তু সে-সব অনুভূতিহীন মাংসপেশী চালনা শুধু। প্রেমেব একটু কাজও তাব হাতে নেই, অজিত তাকে একটা ফবমাশ কবে না, নিজেব কোনো আকাঙ্ক্ষা জানায না। বাস্তবিক বলতে গেলে এই মেযেটিব ওপব সে সম্পূর্ণরূপে বীতস্পৃহ। মালিকহীন একটা কুকুবেব মতো কেমন কবে ওই দম্পতি জীবন লীলাব। শুকনো পাতাব পেছনে ছুটছে, জোনাকি দেখে ঘেউ ঘেউ কবছে, আকাশেব নিস্তব্ধ চাঁদেব দিকে তাকিযে বিড়ম্বিত হযে ফিবছে।

ঘাড় গুঁজে ভেবে দেখল অজিত।

চেযাবটা লীলাব দিকে ঘুবিযে দেখল বেণী বেঁধে বসে বযেছে সে, চেহাবা এমন সুন্দব নয, হযতো বিশ্রী, বোগা, বেঁটে, একটি ছোট মেযেব মতো দেখাচ্ছে লীলাকে। পা দুলছে, বেণী দুলছে, প্যাট প্যাট কবে বইগুলোব দিকে আলোটাব দিকে তাকিযে আছে সে। মনেব ভেতব কি যেন একটি সম্ভ্রম ও ভয তাব। যেন এ অজিতেব নিজেব মেযেও হতে পাবে, একটা করুণা ও বাৎসল্য অজিতেব মন ভবে উঠল। পিতাব মতো দৃষ্টিব নীচে কুণ্ঠিত হযে বসে বযেছে।

অজিত বললে—'লীলা।'

প্রায ঘুমিযে গিযেছিল বধূ, অজিতেব গলাব সাড়ায চোখ মেলল।

অজিত বললে—'যাও, আব বোসো না ঘুমোও গে।'

লীলা বললে—'তোমাব হযেছে?'

—'না।'

—'তবে?'

তবে আব কিছু না, অজিত চেযাবটা আগেব মতো টেবিলেব দিকে ঘুবিযে নিল।

খানিকটা সময গেল।

লীলা বললে—'মিবাট থেকে কী লিখতে তুমি আমাকে?'

—'কী লিখতাম?'

—'লিখতে নাকি যে বিযে কবেই আমাকে নিযে বোজ জ্যোৎস্নাবাতে নৌকোয চড়ে বেড়াবে?'

—'তাই লিখেছিলাম?'

—'লিখেছিলে না আবাব? একশো দেড়শো দুশো বাব লিখেছিলে।'

এ মনে কবে নিতে হয না, অজিতেব সবই মনে আছে, কিন্তু এই জ্যোৎস্নাব জগৎ ঢেব আগে যে তাব ভেস্তে গেছে। বিবাহকে সে বোঝে নি। সেদিন বিযে কবে বিদ্যাজ্ঞানে বুঝেছে সব—একেবাবে সমস্তটুকু। মমতাজকে বিযে কবলেও সে তাজমহল গড়ত না, এমনকী, চোদ্দ বাত জ্যোৎস্নায নৌকোবিহাব কবে পূর্ণিমাব বাতে আব যেত কিনা সন্দেহ। কি আছে? নেই কিছু এই বিবাহেব ভেতব। বিশেষত স্ত্রী-পুরুষেব নিববচ্ছিন্ন দীর্ঘ সংসর্গেব পব বধূ বলে কোনো জিনিস থাকে না যেন আব। বব বলে কোনো জিনিস থাকে না। লীলাব সঙ্গে একটানা দু-বছব তাকে থাকতে হযেছে। দিনেব পব দিন বাতেব পব বাত যদিও-বা কোনোদিন এ মেযেটিব জন্য মনেব ভেতব মোহ ছিল অজিতেব, অথবা প্রেম, এখন দাক্ষিণ্য ছাড়া আব কি থাকতে পাবে, শুভ মুহূর্তে? অকল্যাণেব মুহূর্তে মর্মান্তিক ঘৃণাও জ্বলে উঠতে পাবে।

লীলা বললে—'শুধু লেখাই পাবো। মিবাট ক্যান্টনমেন্ট কি নামজাদা ঠিকানা, ভাবলাম কি যেন কি।'

অবিশ্যি এসব কথা যা স্বতঃসিদ্ধ মানে লীলা সে সবেব থেকে ঢেব দূবে, সে সব অর্থ বা উদ্দেশ্য তাব মনেব ত্রিসীমানাযও নেই, বিবাহ বা অজিতেব ওব সে মোটেই বীতশ্রদ্ধ নয। ববং প্রাযই ভাবে তাব স্বামী এত গুণবান, টাকা বোজগাব কবতে পাবে না বটে, কিন্তু তবুও এত গুণবান, গুণী জ্ঞানী স্বামীব বধূব উপযুক্ত মর্যাদাবোধ লীলাব এত প্রগাঢ় যে এক এক সময অবাস্তবেব কিনাবায এসে দাঁড়ায সে, আকাশেব অজস্র তাবাব গবিমায গৌববান্বিত একটা নিঃস্বার্থ নিবাশ্রয জোনাকিব মতন মনে হয তখন

তাকে। সব সময়ই এই জোনাকির আদল এই মেয়েটির জীবনের ভেতর রয়েছে যেন।

লীলা বললে—'বোট তো দূরের কথা, গাড়ি করে যে একদিন বেড়াতে নিয়ে যাবে তাও তোমার মায়ের ভয়ে তুমি এতদিনে পেরে উঠলে না।'

—'কিন্তু গাড়ি করে তুমি কোথায় যেতে?'

লীলা বললে—'দেয়ালির দিন তোমাকে বললাম, চলো, একটা গাড়ি ভাড়া করে আমরা শহরটা দেখে আসি, কিন্তু তা শুনলে? শুনবেই বা কেন? আমি তোমার কে?' লীলা বললে—'গাড়ি করে কেউ কি কোথাও যায়; কেউ যায় না, না?' প্রবলভাবে সে মাথাটা নাড়ল।

একটু ভালোবাসে বটে, কিন্তু স্বামীকে বড্ড বিরক্ত করে। বোঝে না অজিতকে, কত বিরক্ত করছে লীলা।

অজিত অনেকক্ষণ ধরে পড়ায় বাধা পাচ্ছিল। বইটার অজস্র পাতা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে, চোখে আজ কোনো ঘুম ছিল না, বেশ পড়া যেত, তার জীবনের পক্ষে এই বইটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়, অজিতকে বিয়ে করেছে বলেই লীলা যেন বিশ্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আটকে রাখছে অজিতকে। বিবাহের এই যুক্তিহীন অত্যাচারকে সহ্য করবে কেন সে? মনে মনে বিবাহকে তো সে মানেই না, স্ত্রীকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে না, তবুও মাসের পর মাস একি অসহ্য ভার বহন করতে হচ্ছে তাকে, গাড়ি, বোট একসকার্শন, বেড়ানো, ঘরের থেকে বেরিয়ে যেতে বাধা, ঘরের ভেতর ঢুকে বাধা, লিখতে পড়তে চিন্তা করতে সব সময়ই কেমন একটা বিড়ম্বনায় তার হৃদয় ভরে উঠেছে। হৃদয় তার অসহিষ্ণুও খুব। সে জানে তা। বিরক্তি তার মনের ভেতরই পুষে রাখে, লীলাকে কিছু জানতে দেয় না। নিজেকে একটু সংবরণ করে নিয়ে অজিত বললে—'তোমার বাপের বাড়ি তো এ তিনমাস খুব বেড়িয়ে এলে।'

—'কিন্তু মিরাট থেকে কি এই কথা লিখেছিলে তুমি? বাপের বাড়ির বরাদ্দ দিয়েছিলে?'

তা দেয় নি বটে। কিন্তু সেই মিরাটের জীবন, সে করেকার! যেন আর এক জন্মের জীবন! তার সঙ্গে আজকের কোনো সংযোগই দেখছে না অজিত।

লীলা বললে—'খুব বেশি করেই নিজের ওপর সমস্ত ভার নিয়েছিলে তুমি, আমি যা কল্পনাও করি নি সেই সমস্ত ভার, তুমি লিখেছিলে—'

অজিত বললে—'থাক।'

লীলা ঈষৎ আহত হয়ে থামল।

এক আধ মিনিট একাগ্রচিত্তে টেবিল ল্যাম্পটার দিকে বিরস চোখে তাকিয়ে থেকে বললে—'আচ্ছা, বেড়ারার কথা বলব না আমি আর, কিন্তু তুমি লিখেছিলে যে আমাকে ইংরেজি পড়িয়ে শোনাবে, আমি যদি তা না শুনতে চাই সমস্ত গল্প বাংলা করে মুখে মুখে বলবে তুমি, সে সব আদর সোহাগের দিন কোথায় গেল?'

আনাতোল ফ্রাঁসের মাদার অব পার্লখানা টেবিলের থেকে টেনে বের করে অজিত বললে— এই তো ইংরেজি গল্পের বই—এই তো একটা গল্প—[...] কিন্তু এসব গল্প তোমাকে কী পড়ে শোনাব? কী বুঝবে তুমি?'

একটা অমায়িক পাখির মতো ঘাড় নেড়ে লীলা বললে—'বুঝব না?

অজিত বললে—'এসব? হোপলেস।'

—'কেন বুঝব না, ইংরেজি তো আমি বুঝি।'

—'তবু এ ইংরেজি বুঝবে না, তাছাড়া এসব ধারণার জগৎ থেকে তুমি ঢের দূরে।'

— একটা গল্পের বই তো?'

—'হ্যা গল্পের'—

—'গল্পের আবার কি ধারণা?'

—'তাই তো!' অজিত হাসতে লাগল। আনাতোল ফ্রাসখানা বুজিয়ে ফেলল সে, রেখে দিল। বাতিটা একটু চড়াল।

লীলা বললে—'তোমার সব কাজই যেন কেমন হৃদয়হীন।'

বাতাসে অজিতের বইয়ের পাতাগুলো ওলোটপালোট হয়ে গেছে, কতদূর অবধি পড়া হল, অজিত জায়গাটা খুঁজে বের করছিল।

লীলা বললে—'স্ত্রীর সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করে নাকি? একটা গল্প শুনতে চাচ্ছি, পড়ে

শোনালেই হয়।'

অজিত দস্তুরমতো রূঢ় হয়ে উঠে বললে—'না।' অজিত অত্যন্ত তৃপ্ত হল। যেন অজস্র সপাৎ সপাৎ করে কাঁটার ঘষড়ানিতে এই আখখুটে মেয়েটাকে ফালা ফালা করে দিয়েছে যেন।

কিন্তু একটা কাঁটাও যেন বেঁধে নি, লীলা মুহূর্তের মধ্যেই নড়েচড়ে উঠে বললে—'না বললেই হল' পড়ে শোনাও দেখি কেমন আমি বুঝি না?'

অজিত অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে লীলার দিকে তাকাল। বললে—'আচ্ছা শোনো।'

বইটা সে টেবিলের থেকে টেনে নিলে, [...] এর থেকে খানিকটা পড়ল, লীলাকে জিজ্ঞেস করল—'কী বুঝলে?'

লীলা বললে—'কিন্তু গল্পের বই তো এরকম নয়।'

—'কিন্তু এটা গল্পের বই।'

—'সব গল্পের বই-ই এরকম?'

অজিত আর একটা বইয়ের থেকে আরো খানিকটা পড়ল।

লীলা বললে—'সব বই-ই এই? এত অভদ্র অশ্লীল জটিল? মাথা মুণ্ডু ধড় স্কন্ধ কোথায় কি? এই তোমাদের বই?'

অজিতের চোখ করকর করছিল। চোখে হাত বুলুতে বুলুতে বললে—হ্যাঁ।'

—'এই নিয়ে তুমি রাতের পর রাত কাটাও?'

—তোমার বৈধব্য অবধি কাটবে ভাবছি।'

লীলা বালিশ পেতে শুয়ে পড়ল আবার। আস্ত সুপুরির ক্ষয়ে ক্ষয়ে অনেক টুকরো বালিশের পাশে পড়েছিল, কয়েক টুকরা তুলে নিয়ে কট কট করে চিবুতে চিবুতে ভাবছিল লীলা। শুধু কি করলে কি হবে। পৃথিবীর কল্পনাকাহিনীর জগৎ থেকে সে ঢের দূরে। স্বামীর কল্পনা ধারণার জীবন থেকেও সে কত বিচ্ছিন্ন। স্বামী তাকে নিয়ে কেন তৃপ্ত হবে? এই চিন্তা তাকে চৌকশ করে শুয়ে থাকতে দিচ্ছে না। ঘুম যা এসেছিল, গুলতি খাওয়া শালিকের মতো মুমূর্ষু হয়ে মরে গেছে।

লীলা উঠে বসল।

খানিকটা সুপুরি কুড়িয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে জীবনের তালমাত্রা স্থির করে আনতে চেষ্টা করল। কিন্তু সবই গুলিয়ে যাচ্ছে, অত্যান্ত বিমূঢ়ভাবে টেবিলে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

আরো কতক্ষণ কেটে গেছে। মশা কামড়াচ্ছিল। আজকের রাতটা বড় গুমোট। অবশেষে লীলা বললে, 'এই যদি হল তাহলে মিরাট থেকে প্রতি চিঠিতেই এইসব বইয়ের গল্প আমাকে পড়ে শোনাবে, লিখবে কেন?'

অজিত বললে—'সে সব দিনে একট মোহ ছিল।'

—'কার ওপর?'

—'পুরুষের সঙ্গে মেয়েমানুষের বিয়ে এই জিনিসটার ওপর'—

লীলা ঠিক বুঝল না।

অজিতকে বললে—'কি বললে, কি?'

অজিত বললে—'কিছু না।'

অনেকক্ষণ ধরে অজিতের কথাটা কানে বাজিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে লীলা বললে—'বিয়েকে একটা মোহের মতো মনে হত?'

—হ্যাঁ।'

—'আমাকে?'

—'তোমাকেও।'

'—'কিন্তু কই, তোমার মোহাবেশের কোনো লক্ষণ তো দেখছি না।'

—'আমি মোহাবিষ্ট লোকই, একবার ভুল ভাঙে, আবার ভুলি, কিন্তু মনে হয় এবার ঠিক জিনিস ধরেছি, যা বলেছিলাম, তোমার বৈধব্য অবধি ওই সব বই ঘেঁটে ঘেঁটেই জীবনটাকে ফুঁকে দেব।' অজিত থামল।

লীলা প্রশ্ন করল না আর।

কিন্তু অজিতের বলবার ছিল। সে বললে—'তোমার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে মিরাট ক্যান্টনমেন্টে

আমি চলে গেলাম একগাদা বই নিয়, দিনরাত বই পড়ে সিগারেট ফুঁকে আর তোমার কাছে চিঠি লিখে আমার চলত, সে এক গভীর অভিনিবেশের সময় গিয়েছে আমার জীবনে, এখন বইয়ের থেকে স্বাদ কুড়োই, প্রায়ই আমার মাথা দিয়ে।' তখন কোথাও একটা সিগারেট পাওয়া যায় কিনা খুঁজছিল অজিত, বড় একটা খায় না সে, কিন্তু এখন এক আধটা পেলে হত। দেরাজ ঘাটাতে ঘাটাতে অজিত বললে—'জীবনে আমি একবার ভালোবেসেছি।' একটা সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া গেল—গোটাপাঁচেক আছে। অজিত বললে—'সেই মিরাট ক্যান্টনমেন্টে জীবনে সেই একবার প্রেম বোধ করেছি, সেই বইগুলো, তোমার চিঠি, মিরাটের কাজকর্মের বিস্তর অবসরের ফাঁকে তোমার চিঠি হাজারবার করে পড়া, হাজাররকম করে।' লীলা অনেকক্ষণ থেমে বললে—'তুমি কি একবারই ভালোবেসেছিলে?'

—'শুধু একবার।'

—'কতদিনের জন্য?'

—'যতদিন মিরাট ছিলাম।'

—'এখানে এসে?'

—'যুক্তিযুক্ত সমীচীন মানুষ হতে লাগলাম।'

—'কি করে তা হয়?'

—'তাই হয়।'

—'আমাকে আর ভালোবাস না?'

অজিত বললে—'বাঃ।'

লীলা বললে—'না, সত্যি বলো।'

—'সত্যিই বলছি সমীচীন মানুষের মতো বোধ করি তোমার জন্য।'

—'বোধ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তার মানে?'

অজিত একটা সিগারেট গড়িয়ে নিয়ে বললে—'তার মানে তুমি তো রোজই অনুভব করছ।' সিগারেট জ্বালায় সে।

লীলা বললে—'হয়তো সকলের জন্যই বোধ করো তুমি, সমীচীন মানুষেব মতো।'

অজিত বললে—'করি বইকী।

লীলা বললে—'স্ত্রীকে পৃথক চোখে দেখো না।'

অজিত বললে—'প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেকের চেয়ে পৃথক পৃথক চোখে তাদের প্রত্যেকেই দেখি।'

লীলা ব্যথা পেয়ে বললে—'আমাকে কষ্ট দিও না,' আমি তোমার স্ত্রী।'

—'তুমি ছাড়া অনেক কেউই তা হতে পারে, তাদের সকলের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার কবতাম তোমার সঙ্গেও তাই করছি।'

লীলা বললে—'কিন্তু এ ব্যবহারে আমি সুখ পাই না যে।'

—'সুখ চাও তুমি!'

—'অন্তত শান্তি চাই।'

—'পাচ্ছ না?'

লীলা বললে—'কী করে পাব? দিনে পর দিন তুমি একি বিমুখ হয়ে উঠছ।'

—'কেউ কারো প্রতি মোহান্ধ হযে চিরকাল থাকতে পারে না, শাজাহানও যদি আর পঞ্চাশ বছর বাঁচত তাহলে হয়তো তাজমহল আর তৈরি হত না, তৈরি হলেও হয়তো তার নতুন বেগমের হুকুমে ভেঙে ফেলতে হত তা, জীবনে যারা বিহ্বল হয়ে ফেরে তাদেব গতি এই। আমাকে কি তুমি তেমনি দেখতে চাও, তাহলে এর মধ্যেই নতুন প্রেম নিয়ে বসতাম আমি। কোনো এক নতুন মেযেমানুষের উত্তর প্রত্যুত্তরের তাৎপর্য মাখিয়ে সমস্ত নতুন বইগুলো পড়তাম, নতুন জিনিস দেখতাম, জীবনটাকে অর্থসম্পন্ন করে তুলতাম, সেটা কি এর চেয়ে ভালো লাগত তোমার লীলা?'

—'সে আরো গভীর যন্ত্রণা হত', লীলা অধোমুখে স্বীকার করল।

—'তার চেয়ে এই তো ভালো, কোনো নতুন অভিসার নিয়ে ব্যস্ত নই, সমস্ত অভিসার ভালোবাসা রূপ ও মেয়েমানুষের ধূসরতা বুঝতে পেরেছি, সবই পুরোনো, কোনো নতুন পয়েন্ট নেই এসবের ভেতর,

একজন সমীচীন মানুষের বোধ দিয়ে কাউকে স্নেহ করছি, কারু জন্য মমতা অনুভব করছি, কেউ আমার দাক্ষিণ্য অনুভব করছে, কৃপার পাত্র কাউকে বা দয়াকরুণা করতে ইচ্ছা করে, কারুর জন্য বা কষ্ট হয়, ক্বচিৎ ঘৃণা বোধ করি, কিন্তু মোহ প্রেম আর নেই।'

লীলা বললে—'আমার তরে তা রইল কেন?'

—'আমার জন্যই শুধু?'

—হ্যাঁ।'

অজিত বললে—'এ প্রেমকে আমি নষ্ট করে ফেলতে পারি।'

লীলা শিহরিত হয়ে উঠল।

অজিত বললে—'কিন্তু তাতে ঢের সময় লাগে। মেহনত বড়।' সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললে—'কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও এই বিচার বোধের ওপরই হওয়া উচিত, বাস্তবিক অনেক দাম্পত্য সম্বন্ধই এরই ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, অতি গোঁড়া দম্পতিও মনে মনে বোধ করে, যাক এ বাঁধন খসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেগে থাকে।'

অজিত একটু থেমে বললে—'তাতে ভালো হয় কি মন্দ হয় আমি তা জানি না। কারণ সেদিকেই ঘোর মানুষের জীবনের দুঃখ ও সমস্যা পদে পদে।' সিগারেট খণ্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'আমিও হয়তো শেষ পর্যন্ত লেগে থাকব, কারণ লীলাকে ছেড়ে নবলীলাকে গ্রহণ করলে জীবনের সমস্যা ও দুঃখ মুছে যাবে না, জীবন তো দাম্পত্যজীবনই নয় শুধু, জীবন আরো কত কি।'

আর একটা সিগারেট বের করে নিয়ে অজিত বললে—'দাম্পত্যে তুমিও যা নবলীলাও তাই, নূরজাহান মালবিকা মহাশ্বেতা সবই এক, হয় রূপ না হয় বৈদগ্ধ্য, না হয় মেয়েমানুষের রক্তমাংস শুধু এগুলোর কোনো একটা বা সবকটা মানুষকে কদিন তৃপ্ত করে রাখতে পারে? মানুষের আত্মা এমন করেই গড়া যে আজ খলিফা কাল ফকির পরশু একটা পাখি কিংবা আজ বাঁদর কুত্তা কাল ফকির এবং পরশু একজন খলিফায় রূপান্তিরত হলেও তার তৃপ্তি ও দুঃখ এক থাকবে। যে লম্পট আজ ঘরের ভেতর তৃপ্তি পাচ্ছে না কাল সে হারেমের ভেতরও পাবে না, তৃপ্তি কোথায়? জর্জ স্যান্ডকে তোমার জায়গায় পেলে তৃপ্তি পেতাম?'

অজিত অনেকক্ষণ ধরে নীরবে সিগারেট টানল। বললে—'এই বেশ আছি, একজন প্রণয়িনী স্ত্রী যে অপ্রেমের কোনো মানে বোঝে না, স্বামীর কাছে দেহ যার পাত্রের মতো উন্মুখ, যে অবিশ্যি করে সতী থেকে শেষ দিন অবধি কাটাবে। সিগারেটটা একটু ঝেড়ে অজিত বললে—'এই জন্য কত জীবন যে ক্ষুধা নষ্ট হয় গেল তুমি তার কিছু জান না লীলা, কত বিচিত্র সমৃদ্ধ জীবন পণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু সে নিস্ফলতা আমার নেই। এ এক গভীর সার্থকতা আমার আছে। পৃথিবীর প্রায় স্বামীরই যে আজন্ম ভরেও তাদের স্ত্রীর শরীরের ওপর বিন্দুমাত্র অধিকারও থাকে না।' একটা অপরিসীম পরিতৃপ্তিতে অজিতের মন ভরে উঠল।

সিগারেটের অবশিষ্টটুকু টেবিলের ওপর রেখে অজিত বললে—'দাম্পত্যের আনন্দ স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় মনের নিরবচ্ছিন্ন উত্তর প্রত্যুত্তরের চমক নিয়ে নয় শুধু, দেহকে নিয়ে অনেকখানি, দেহের অবাধ অগাধ আদান-প্রদান নিয়ে অনেকখানি।'

আর একটা সিগারেট বের করে অজিত। কিন্তু সিগারেটটা টেবিলের ওপর পড়ে রইল, জ্বালায় না সে আর। বইটা খোলা পড়ে রয়েছে। দুশো পাতা পড়া হয়েছে, তিনশো পাতা একটা অপরিহার্য রক্তশোষার মতো তাকে আকর্ষণ করে শুষে ফেলতে চায়। কিন্তু এক মুহূর্তেই এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেল। লীলা তার গভীর চোখ নিয়ে পরিপূর্ণ সঘন হয়ে বসে আছে, অজিত ইচ্ছুক হয়ে চোখ দিয়ে তাকালেই লীলার সমস্ত দেহ অবশ অধিকৃত হয়ে আসে। পৃথিবীর কত সম্পদশালী রাজা কত বিজয়ী সেনাপতি কত ভাবপ্রবণ প্রণয়োন্মুখ কবি মোহ বিমুগ্ধ ক্ষুধাহীন কঠিন স্ত্রীর হাতে পড়ে দাম্পত্য জীবনে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু অজিতের স্ত্রী তা নয়। বাতি কমে গেল, নিভে গেল, অন্ধকার মশারির ভেতর সে আর লীলা। জীবন যে প্রবাহের জোরে আজও বেঁচে আছে সেই বিরাট সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেতর এই গল্পের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তারা অবারিত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

'বউকে তোবা কতক্ষণ ধবে সাজাবি।' হেমপ্রভা একেবাবে ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়লে।

বললেন, 'বাঃ হল না কি এখনও?'

অমলা অত্যন্ত বিবক্ত হয়ে বললে, 'আপনি এখানে কেন?'

হেমপ্রভা বললেন, বাগ কোবো না মা-হয নি এখনও-'

অমলা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'না হয নি।'

—'কী বাকি আছে?'

টুনি বললে, 'সব হয়ে গেছে মা, শুধু শাড়ি পছন্দ হচ্ছে না।'

হেমপ্রভা বললেন, 'কেন, বউ ভাতেব জন্য যে-বেনাবসি শাড়িটা দেযা হয়েছে সেইটিই ত ঠিক আছে।'

বিভা বললে, 'বউদিব সেটা পছন্দ হচ্ছে না।'

হেমপ্রভা বললেন, 'সে -আবাব কেমন কথা, ওব খুড়শ্বশুব দিলেন বউভাতেব জন্য বিশেষ কবে' এমন চমৎকাব শাড়ি!'

অমলা ফোঁস কবে বললে, 'ছাই।'

সকলেই তাজ্জব মানলে।

আপাদমস্তক অমলাব দিকে তাকিয়ে হেমপ্রভা বললেন, 'তবে কেন শাড়ি পববে তুমি বাছা।'

আভা বললে, 'অধিবাসের শাড়িটাও পছন্দ হচ্ছে না।'

হেমপ্রভা বললেন, 'কী ছাই মাথামুণ্ডু বলছিস? অধিবাসেব শাড়ি বউভাতে পবে নাকি?'

হেমপ্রভা পালঙ্কেব ওপব স্তূপীকৃত একপাহাড় শাড়িব দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে বললেন।

বললেন, 'এতগুলো শাড়িব ভিতব একটাও পছন্দ হল না?'

টুনি বললে, 'না।'

আভা বললে, 'আমবা বেশ কতকগুলো বেছে দিলাম কিন্তু বউদিব কিছুতেই মনে ধবছে না।'

বিভা বললে, 'কী কববে তাহলে বউদি?'

হেমপ্রভা বললে, 'এই বেনাবসীই পববে আব-কি!'

বউ-এব মুখ কাঠ হয়ে উঠেছে।'

হেমপ্রভা বিশেষ কঠিন প্রকৃতিব মানুষ নন, অমলাব পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মীটি, পবো মা।'

অমলা বললে, 'ও আমি পবব না।'

—'কেন?'

—'পছন্দ হয না, বিচ্ছিবি।'

—'তবে তোমাব যা-পছন্দ, পবো!'

অমলা আবাব তোবঙ্গ খুলে বাছাবাছি কবতে লাগল।

হেমপ্রভা অমলাব মাথায হাত দিযে বললেন, 'বা, খোঁপাটি ত বেশ পবিপাটি বাঁধা হয়েছে-একে না জানি কী খোঁপা বলে?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

হেমপ্রভা বললেন, 'বা দিব্যি বউ। গযনাগাটি পোশাকে কেমন মানিয়েছে' এখন শাড়িটা বউমা চট কবে পবে ফেল ত।'

চট কবে কাজটা সেবে ফেলবাব কোনো ইচ্ছাই ছিল না অমলাব; সে ভুরু কুঁচকে শাড়িব পব শাড়ি নিযে নাড়াচাড়া কবতে লাগল-যেন শাড়িব দোকানে এসে বসেছে-সাবাটা দিনে কুঁড়েমি কবে কাটিয়ে দিলেও তাব চলে।

আযেসে অবসাদে পা ছড়িয়ে বসল অমলা।

হেমপ্রভা উসখুস করতে-করতে বললেন, 'ঐ হেলিওট্রোপ রঙের শাড়িটাই নাও না।'

অমলা হো-হো করে হেসে উঠল, বললে, 'এটাকে বুঝি হেলিওট্রোপ বলে?' আভা আঁচল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছে একটা শাড়ি তুলে নিয়ে ফেলে বললে, 'এই দেখ মা-এটা হচ্ছে হেলিওট্রোপ।'

হেমপ্রভা বললেন, 'তা এটাই পরো না।'

অমলা অবজ্ঞায় কঠিন হয়ে বললে, 'সঙ সাজবার সাধ নেই ত আমার; দেখি ত শাড়িটা-কেমন করে ধরেছে আভা! এরকম করে নাকি শাড়ি ধরতে হয়? বাঘের মাসি এসেছেন হেনস্তা করতে, ছি-ছি, শাড়িটাকে কেমন লোপাট করে দিল।'

বাইরে বউভাতের নিমন্ত্রণের রান্নার বিপুল আয়োজন। হেমপ্রভা গলদমর্ঘ হয়ে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দু-চাব মিনিটের ছুটি নিয়ে বউকে একটা তাড়া দেবার জন্য এই তার আসা-বউ-এর পরিচয় যতই তিনি পাচ্ছিলেন ততই তার হৃদয় কেমন একটা ব্যথায় টনটন করে উঠছিল। যা দেখেছেন তিনি, যা শুনেছেন, বাস্তবিকই কি সত্য? না কোনো কাল্পনিক শ্লেষ অভিযনের ভিত ঘটিয়ে ছ'দিন ধরে বউ-এর সঙ্গে তাদেরও যাত্রা চলছে?

হেমপ্রভা বললেন, 'তা বেশ শাড়ি এখন থাকুক।'

বউমা—'এখনো যথেষ্ট সময় আছে, বিভার বাবা, এসে ঠিক কবে দেবেন; চলো এখন তুমি একটু আমার সঙ্গে—'

অমলা বললে, 'কোথায় যেতে হবে?'

—'চলো, একটু রান্নার দিকে যাই-'

অমলা বললে, 'এই ত আমি টয়লেট করে উঠলাম-এখন আগুনের তাপে যেতে পাবব না।'

—'একটু না গেলে কি হয় বউমা? এত লোক এসেছে, খাটছে, পোলাওটা আমি চড়িয়ে এসেছি-তুমি একটু নেড়েচেড়ে আসবে বৈ নয়-'

অমলা ফুঃ ফুঃ করে হাসতে-হাসতে বললে, 'পোলাও রাঁধব আমি? এখন? এই টয়লেটের পর? পেন্টিং অবদি হয়ে গেছে।'

ধীরে ধীবে চোখের তারা কপালেব দিকে উঠছিল অমলাব।

বললে, 'বাপ রে, এ-বাড়িব কি আক্কেল!'

হেমপ্রভা সহাস্যে বললেন, 'চল তাহলে, একটু দাঁড়াবে এস।'

অমলা বললে, 'শাড়ি না-পরে আমি কোথাও যাচ্ছি নে।'

হেমপ্রভা বললে, 'তা হলে শাড়ি পরো।'

ব্যাপারটা ঠিক আগের জাযগায এসে দাঁড়াল।

হেমপ্রভার সময় ছিল না; তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, বললেন, 'আভা-বিভা, বউমাকে মানানসই একটা শাড়ি বেছে দিও ত-'

অমলা বললে, 'হ্যাঁ? তোমবাই বাছবে শাড়ি?'

বিভা বললে, 'একটা খদ্দর পরো-না বউদি-'

অমলা বললে, 'তাই করব।'

অমলা বড় ট্রাঙ্কটা খুলে অনেক নীচের থেকে একটা অপরূপ জর্জেটেব শাড়ি বের করে এন সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে বললে, 'পবতে হয ত এই-'

আভা বললে, 'জর্জেট?'

অমলা ডবল করে শাড়িটা পবতে শুরু করেছে।

আভা বললে, 'এ ত বিলিতি শাড়ি বউদি-'

—'দেশী বিলিতি-এসবের খবর দিয়ে কী হবে? কে জানে কী! কেমন পছন্দসই দেখছ ত।'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

অমলা বললে, 'এতক্ষণ পরে মন উঠল।'

টুনি বললে, 'ডবল করে পরলে বউদি?'

—'কেন? তাও আবার অপরাধের নাকি!

অমলা শাড়ি পরে খুশি হয়ে বসল।

বিভা বললে, 'চলো বউদি-এবার একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।'

দবজাব কাছে ডাক পড়ল–'বউমা।'

আভা বললে, 'কাকা নাকি? আসুন।'

বোহিণীবাবু ঢুকে পড়ে অমলাব দিকে তাকিযে বললেন, 'বাঃ, দিব্যিটি ত।' অমলাব পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, 'এইবাব বউমা একটু যেতে হবে।'

অমলা বললে, 'কোথায?'

—'লোকজন এসেছে সব-পাত পড়ে গেছে কিনা।'

বোহিণীবাবু থামলেন।

অমলা বললে, 'তাতে কী হযেছে?'

বোহিণীবাবু বললেন, 'তোমাকে একটা কিছু পবিবেষণ কবতে হবে।'

অমলা বললে, 'ও আমি পাবব না।'

বোহিনীবাবু অবাক হযে বললেন, 'বলো কী তুমি; আমি সঙ্গে থাকব।'

—'ও বাবা, পবিবেষণ-কোনো জন্মেও কবি নি।'

খুড়শাশুড়ি এসেছিলেন; বললেন, 'এমন কি বাজবানীব ঘব থেকে এসেছ তুমি?' বোহিণীবাবু কোমল গলায বললেন, 'অন্তত বাজবাড়িব বধু হযে ত আসো নি বৌমা; যে-বাড়িতে পড়েছ সেখান এইটুকু তোমায কবতেই হবে।'

অমলা বললে, 'আমি পাবব না।'

বোহিণীবাবু বললেন, 'মিষ্টিটা দিও শুধু-মিষ্টিই দিও।'

অমলা ঘাড় নেড়ে বেঁকে দাঁড়াল।

বোহিণীবাবু বললেন, 'দু'টো-দু'টো কবে বসগোল্লা শুধু-আব কিছু না; সন্তোষেব হাতে হাঁড়ি থাকবে-তাব থেকে দু'টো দু'টো কবে তুলে; আমি এগিযে-এগিযে পথ দেখিযে নিযে যাব।'

অমলা বললে, 'কেন মিছেমিছি বলছেন আপনি? আমি কোনোদিনও কবিও নি, পাবব না।'

প্রসাদ এল, বললে, 'কী হযেছে বাবা [কাকা]? মা আমাকে পাঠিযে দিলেন।'

বোহিণীবাবু বললেন, 'বউভাতে বউমা পবিবেষণ কববেন কি না সে তোমবা স্বামী-স্ত্রীতে বুঝে দেখ; আমাব যা বলবাব আমি বলেছি।'

প্রসাদ অমলাব দিকে তাকাল।

অমলা বললে, 'ভিতবে এস।'

প্রসাদ বললে, 'ও বুঝি কিছু দিতে চায না কাকা?'

বোহিণীবাবু অত্যন্ত বিবক্ত মুখে বললেন, 'না।'

প্রসাদ বললে, 'তা না দিতে চায, না দিল-দিতেই হবে এমন ত কথা নেই।'

খুড়িমা বললেন, 'তুমি এ-বকম বলো না প্রসাদ, বংশেব তুমি একমাত্র ছেলে।' অমলা ঠোঁট উলটে বললে, 'ভড়ং সব' আজকাল ত কত্ত মেযে সিঁদুবও দেয না।'

সকলেই নিজেকে কলঙ্কিত বোধ কবল।

প্রসাদ একটু ব্যথিত হযে বললে, 'তোমবা আব এইখানে থেকে কী কববে কাকা?' বযস্কবা চলে গেলেন-ছোটবাও চলে গেল।'

প্রসাদ বলে, 'সকলেই কি তোমাব প্রতি বিরূপ হযে উঠবে অমলা? তুমি-

অমলা বললে, 'শ্বশুববাড়িব আদব-ভালবাসা দিযে আমি কবব কী?'

অভিমানে ফুলে উঠে বললে, 'আমি বাবাব খুব আদুবে মেযে ছিলাম।' অমলাব চোখেব কোণে এক ফোঁটা জল দেখা দিচ্ছে।

প্রসাদ বললে, 'তোমবা বাবা ত এখন নেই।'

অমলা বললে, 'তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন আমাব সমস্ত আবদাব সহ্যি কবে গেছেন।'

প্রসাদ দেখছে এই নববধূ এক অবাস্তবেব বাজ্যেব দিকে যাত্রা কবছে; হযত এব সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা এই সব অদ্ভুত অপ্রাসঙ্গিতা নিযে।

প্রসাদ অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট কবে বসে বইল।

অমলা ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল।

প্রসাদ ভাবছিল, বাইবে প্রচণ্ড উৎসোহ ও ক্ষুধা 'লুচি কই' মাংস দাও' 'আবো পোলাও'-এব বিবাট

আড়ম্বর কি তাদের দু'জনকে ঘিরে? বউভাতের ভোজ ফুরুচ্ছে।

প্রসাদ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ভাবছিল, যে-নমনীয়তা নিয়ে তার মাকে বরাবর সে চলতে দেখেছে, তার বোনদের যে-নম্র মাধুর্য তার এত ভাল লাগল-মেয়েমানুষের জীবনের ভিতর সবচেয়ে বেশি করে যে জিনিসটা খুঁজেছে সে, পেয়েছে সে, আর তাকে তা পেতে হবে না। রাগে অভিমানে ঘৃণায় কান্নায় অমলার মুখ টসটস করছিল। এমন সুন্দর মুখ চোখ নাক ছুঁচলো চিবুক-বাসররাতে গুলেবকাওয়ালির বাগানের এক কুহকিনীর মত মনে হয়েছে এখনই যেন তার ভেতর কোনো কুহক ইন্দ্রজাল নেই আর-'

কিন্তু জীবনে সে-কুহক চায় নি ত-কহক দিয়ে কী করবে সে? প্রণয়িনীর আলিঙ্গনের মোহাবেশ দিয়ে কী রচনা করবে সে? এ-সব জিনিস কোনোদিনই ফলাতে পারে নি সে।

সচ্চরিত্র সফল যুবক সে-একটি বধূর চরিত্র সহচরী নিয়ে জীবনের সুলভ রসে হৃদয় তার ভরে থাকত।

বউভাতের রাত চলেছে।

এঁটোপাতা ও কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি ঘিরে কয়েকটি কুকুর ছাড়া বাইরে আর কোনো সাড়া শব্দ নেই; যে যার ঘরে খিল এঁটে শুয়ে পড়েছে।

প্রসাদ অনেক রাতে ভয়ে-ভয়ে শোবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। অমলা এতক্ষণে বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়-খাটের একেবারে কিনারটা ঘেঁষে শরীররটাকে দড়ির মত গুটিয়ে নিয়ে কোনোরকমে বাকি রাতটা ঘাড় গুঁজে থাকবে সে। অমলা কী মনে করবে-না হলে আজ এ-ঘরে ঢুকতে ভাল লাগছিল না প্রসাদের।

ছাদের ওপর একটা ক্যাম্পখাটে পড়ে থাকবে ভাবছিল। কিন্তু তবুও বধূরও কেমন একটা আকর্ষণ আছে। প্রসাদের ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ল-সন্ধ্যা হলেই মাকে ছাড়া মন তার আর চলত না। কেন যেন অমলা ছাড়াও মনটা চলতে চায় না। অমলা যতই হোক-তবু যে কত কী সে। এর মায়া যেন কিছুতেই এড়াতে পারা যায় না।

ঢুকে দেখল বাতি জ্বলছে।

অমলা চমকে উঠে বললে, 'কে?'

প্রসাদ বললে, 'এখনও বাতি যে-'

অমলা বললে, 'বাতি নিবিয়ে আমি ঘুমতে পারি না।'

—'কিন্তু বাতি জ্বালিয়েও ত জেগে আছ।'

—'বায়ুচড়া ধাত কিনা; ঘুম আসছিল না।'

প্রসাদ বললে, 'তাহলে টেবল ল্যাম্পটা জ্বেলে দি?'

অমলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, 'বাবা-'

প্রসাদ টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একটু কমিয়ে তেপয়ের ওপর রেখে দিল-তারপর সুইচ নিবিয়ে দিয়ে খাটের এক কিনারে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করল। আদর করে বা কথা বলেও অমলাকে সে বিব্রত করতে যাবে না, মেয়েটি যাতে শান্তি পায় তাই সে করুক। প্রসাদ বাধা দেবে না। খাটের কিনারে এইরকম অন্ধকারে সে যত তাড়াতাড়ি পারে ঘুমের দেবদেবীদের তার চোখের ওপরে এসে বসবার জন্য অনুরোধ করছিল।

অমলা বললে, 'অন্ধকার হয়ে গেল।'

প্রসাদ কোনো জবাব দিল না।'

—'বললাম অন্ধকারে ঘুমনো আমার অভ্যেস নেই।'

মাথাটা বালিশের থেকে একবার একটু তুলে প্রসাদ বললে, 'অন্ধকার কোথা, ঐ ত টেবল ল্যাম্প জ্বলছে।'

—'ওতে কী হয়?'

—'আরো আলো চাই?'

—'বললাম অন্ধকারে আমার ঘুম হয় না।'

অমলা অত্যন্ত উসখুস করতে লাগল।

প্রসাদ বললে, 'কেন? অন্ধকারে ঘুম হয় না কেন?'

—'তোমারই-বা আলোতে ঘুম হয় না কেন?'

প্রসাদের মনে হল অমলা ঠিকই বলেছে, এক দল লোক আছে বটে-আলো না জ্বালিয়ে ঘুমতে পারে

না। প্রসাদ নিজেও ছোটবেলা আলো ছাড়া ঘুমতে পারত না; কিন্তু তারপর অন্ধকার ঘরে ঘুমতে অভ্যাস করেছে যে বাইরের একটা গ্যাসের লাইটও তাকে ব্যথা দেয়।

প্রসাদ বললে, 'অন্ধকারে তোমার ভয় করে নাকি অমলা?'

অমলা একটু হেসে-'ভয় না হাতি।' এরকম হাসির জন্য প্রসাদ মোটেই তৈরি ছিল না। অমলার হাসি শুনে বুকের ভেতর ধড়াস-ধড়াস করে উঠল।

সে খুব তৃপ্তি বোধ করল।

অমলা হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি বোঝো না-'

'আমার চোখে বড্ড খারাপ লাগে।'

—'কী?'

—'এই অন্ধকারের বিজবিজানি।'

প্রসাদ উঠে টেবিল ল্যাম্পটা একটু চড়িয়ে দিযে বললে, 'দেখ ত এই আলোতে চলবে কি না।'

অমলা বললে, 'ইলেকট্রিক লাইটটা জ্বালিয়ে দাও।'

প্রসাদ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অমলা বললে, 'দাও-না লক্ষ্মীটি।'

এমন মিষ্টি অনুনয় এই নববধূব, হয়ত এই প্রথম, কে জানে হয়ত এই শেষ-প্রসাদ অবজ্ঞা কবতে পারল না; সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিল।

অমলা বললে, 'বাবা বাঁচালে।'

প্রসাদের ইচ্ছে হচ্ছিল ছাদে চলে যায়। কিন্তু তবুও সে দাঁড়িয়েছিল।

খাটের বাকিটুকু সমস্ত জায়গায়ই অমলার জন্য ছেড়ে দিয়েছে সে; বধূ তার অবাধ রাজত্ব খুব স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করেছে।

এরপর স্বামীর সঙ্গে যখন সম্ভাষণ হল তার; অমলা বললে, 'বউভাতটা কেমন হল?'

প্রসাদ বললে, 'ভালই।'

অমলা মুখ বিকৃত করে বললে, 'ভালই না হাতি; মা আমাকে হাবিজাবি কতগুলো কী খাবার এনে দিলেন-এইসব নাকি বউভাতে করে?'

প্রসাদ বললে, 'হাবিজাবি কি! পোলাও, মাংস, মাছের কালিয়া, ছানাব পায়েস—'

প্রসাদকে শেষ করতে না দিযে অমলা বললে, 'ও আবাব একটা পোলাও হযেছে নাকি? পোলাওযের যে আলাদা চাল থাকে তাও এরা জানে না!'

প্রসাদ বললে, 'পোলাওযের চাল দিয়েই ত করা হয়েছে—'

—'তাহলে পোলাও এমন কড়কড়ে হয়? ঘি কিনে ছিল কোন মুদ্দাফরাসের দোকান থেকে?'

—'তাড়াতাড়ি হয়ত নামিযেছে—'

-'তাড়াতাড়ি কখনো নামাতে হয়? তাহলে সরেশ জিনিস হয় কখনো?'প্রসাদ স্বীকাব করল যে তা হয় না।

অমলা বললে,'কিন্তু আনাড়িদের কিছুতেই শিক্ষা হয় না, দশবাব একটা রান্না শেখলেও বার বাব ভুল করবে, তোমাদের বিষ্টু ঠাকুরটকে দেখলাম এঁটো হাতে রান্না শেখাচ্ছেন। বাবা বুড়োধাড়ি মেয়েমানুষকে আবার রান্না শেখাতে হয়।'

পোলাও রেঁধেছিলেন প্রসাদের মা; অমলাও তা জানত-প্রসাদও জানত; মাকে লক্ষ্য করেও বিশেষ করে এই খোঁচাটা নাকি সে হানে? হয়ত তাই! কিন্তু প্রসাদ সেসব হজম করে ফেলতে চাইল-অনেকক্ষণ চুপ করে রইল প্রসাদ। এক-আধা মুহূর্ত চুপ করে থেকে—

শুধু এইটুকু বলে প্রসদা—'তুমি ত তেতলার টেবিলের ওপর বসে খেলে কিন্তু যারা সাবাদিন খাটল তাদের কী খুঁত হয়েছে একটু সহানুভূতির চোখে দেখতে পাব না অমলা?'

অমলা বললে,'তাই ত!' একটু কেশে বললে,'আর আমাকে? আমাকেই-বা কে সহানুভূতি কবছে শুনি? এই নেমতন্নবাড়িসুদ্ধ লোক ত এ-ওর আঁতের টানে গলায-গলায় ঢলাঢলি কবে রইল-'কিন্তু আমি যে রক্ষঃপুরীতে বন্দিনী সীতার মত বসে আছি-? এ বাড়ির একটা গোভূত এসেও খোঁজ নিল?'

প্রসাদ বললে,'তুমি ত নিজে জেদ করেই বেরুলে না অমলা।'

—'আমি পরিবেষণ করতে চাই নি-এই ত আমার অপরাধ?'

প্রসাদ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। পরে বললে,'কিন্তু সবাই মিলে যখন সাধছিলেন তখন একবার বেরুনো উচিত ছিল না তোমার?'

অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে অমলা বললে,'সাধছিলেন! সাধছিলেন না ঘোড়ার ডিম!এ যেন একজনকে নিঃসহায় পেয়ে চেপে ধরা হল সাধা? এর নাম সাধাসাধি? অনুরোধ?'

অমলার সমস্ত গা.দিয়ে কেমন একটা রাগ বেরুচ্ছে।

প্রসাদ বালিশে মুখ গুঁজে রইল।

অমলা বললে,'একা মেয়েমানুষ তোমাদের বাড়ি এসেছি কি না তাই বীরত্ব ফলানো হচ্ছিল।'

প্রসাদ চুপ করে রইল।

অমলা—'বউভাতে এই শাড়ি পরা যায় না, সেই শাড়ি পরা যায় না; এর বেনারসী পরতে হবে-তার খদ্দর পরতে হবে-একেবারে ঝালাপালা!'

প্রসাদ বললে, 'কোন শাড়ি পরেছিলে?'

—'কেন জর্জেট?'

—'বিলেতি নয়?'

—'যাক গে বিলেতি, আমার যা ভাল লাগবে-তাই আমি পরব।'

প্রসাদ বললে, 'তাই-ই ত পরলে; তোমাকে অন্য কিছু ত পরতে হয় নি।'

—'রেখে দাও! সবাই মিলে কি হয়রানি!ফোঁসফোঁসানি-সক্কলে আর আসে নি।'

—'কেন?'

—'তাদের মনের মত শাড়ি পরি নি কেন! একা মেয়েমানুষ পেয়েছে কিনা! কিন্তু আমার সাথে লাগতে আসা? মজাটা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছি।'

প্রসাদ বললে, 'কাকে মজা বুঝিয়েছ অমলা?'

—'তোমার মাকে, বোনগুলোকে, খুড়োকে, খুড়িমাকে আর ঐ সন্তোষ চোয়াড়টাকে।'

প্রসাদ হ্যা হ্যা করে একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

অমলা বলল, 'হত আমার বাপের বাড়ি—দেখিয়ে দিতাম।'

প্রসাদ বললে,'সারাদিন তুমি কী করেছ অমলা? জর্জেটের শাড়ি পরে ড্রেসিং রুমে বসে কাঁদলে শুধু?'

—'সে-খোঁজ নিয়ে আর কী দরকার?'

—'আমি ত দেখলাম কাঁদতে-কাঁদতেই জর্জেটের শাড়িটা খুলে ফেললে-তারপর কোন শাড়ি পরেছিলে?'

অমলা কোনো উত্তর দিল না।

—'জর্জেটের শাড়ি খুললে কেন?'

—'রা, না-হলে কুঁচকে যাবে না।'

—'যেতই-বা কুঁচকে।'

—'বা, দামি শাড়িটা

—'কতই-বা আর দাম?'

—'চারশ টাকা! দেবে কিনে?

—'চারশ টাকা? এমন একটা অসম্ভব মূল্য কিছু নয়!'

—'তোমার কাছে না হতে পারে'—অমলা বললে,'বেহেড মানুষ তুমি বাপু। শাড়ি তৎক্ষণাৎ ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি বটে কিন্তু তবুও ঘোঁজ কি একটু-আধটু পড়ে নি? আর তোমার বোনেরা শাড়ি নিয়ে,যা দমবাজি করে, ওদের বলে দিও বাপু আমার শাড়িটাড়ি না ধরে।'

প্রসাদ বললে,'সারাদিন ড্রেসিং রুমে বসেছিলে?'

—'আমাকে অপমান করেছে, আমি বেরুব কেন?'

—'ভাল লাগল বসে থাকতে?'

'ভাল না থাকবার কোনো কথা নেই ত?'

প্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,'এমন করে কি নিজের আত্মাকে সাজা দেওয়া উচিত অমলা!'

অমলা বললে,'সাজা কী? আমি খুব এঞ্জয় করেছি!'

—'ড্রেসিং রুমে বসে থেকে?'

—'হ্যঁ।'

প্রসাদ বললে,'ঘরের খিল আটকে দিয়েছিলে বুঝি'

—হ্যাঁ।

—'কেউ দোরে ঘা দিয়েছিল?'

—'না।'

—'কেউ না?'

—'না।'

প্রসাদ বললে, 'সবাই ওদিকে ব্যস্ত ছিল কিনা; কিন্তু বাস্তবিক-এমন একটা উৎসবের বাড়িতে তুমি একা বিমর্ষ হয়ে রইলে-জিনিসটা ভাল হল না। তোমার ভাল লাগল না-আমাদেরও অস্বস্তি বোধ হল। ভেবে দেখ তুমি আজ একটা সুন্দর দেশী শাড়ি পরে নম্র রমণীয় বধূ হয়ে বেরুলে কত ভাল লাগত আমাদের-নিজেও কত ফুর্তি বোধ করতে; যারা নেমন্তন্নে এসেছিল তারাও কত তৃপ্তি পেত।'

অমলা বললে,'সুন্দর দেশী শাড়ি! কেন দেশী শাড়ি ছাড়া কি আর সুন্দর নেই?'

প্রসাদ বললে, 'আছে।'

অমলা বললে,'তবে?'

প্রসাদ বললে, 'আমিও মাঝে-মাঝে বিলিতী হ্যাট কোট'—

অমলা অত্যন্ত, প্রীত হয়ে বললে,'তাহলে ঐ সব ছাইপাশ বলছিলে—'

অমলা বললে, 'আমার একটুও ভাল লাগল না।'

প্রসাদ বললে, 'কেন?'

—'এই সব লোকজনেব ভিড় হইচই-ফেলা-ছড়া-পযসা নষ্ট-আমার দু'চোখে সহ্য হয না।'

প্রসাদ বললে, 'কী চাও তুমি?'

অমলা বললে, 'একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া কবতে পার তুমি? সেখানে তুমি ছাড়া আব অতিবিক্ত কেউ থাকবে না-তোমার মা-খুড়িমা কেউ না, বুঝলে?'

প্রসাদ চুপ করেছিল।

অমলা বললে,'আর বললে না চাবশ টাকা দামেব জর্জেটের শাড়ি-এমন একটা বেশি দাম কী আব? বললে না?'

প্রসাদ-এব মুখ দিযে কোনো কথা বেরুল না।

—'আমাকে কাল একটা কিনে দেবে?'

প্রসাদ বিব্রত হয়ে বললে,'কালই?'

—'হ্যাঁ, তোমার কিনতে হবে না, আমি নিজে গিযে কিনে আনব। টাকাটা শুধু আমাব হাতে দেবে।'

খুব গভীর পরিতৃপ্তি বোধ করে এইবার অমলা খাটের ওপর উঠে বসল। তারপর আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে গিযে সুইচটা নিবিযে দিযে চলে আসে।

প্রসাদ বলল,'আলো নিবিয়ে দিলে যে?'

অমলা বললে,'এতক্ষণ ঘুম পাচ্ছিল না বলে জ্বালিযে রেখেছিলাম, এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে। দেযালা করছিলাম এতক্ষণ। জানো পেত্নীরাই অন্ধকারে জেগে বেড়ায। যক্ষিণীরা পড়ে ঘুমিযে।'

ফোঁস ফোঁস করে হেসে অমলা চোখ বুজল।

—'ঘুমচ্ছ? ঘুমও।'

—'কথা বলো না—, তুমি ছাদে শোও গে যাও।'

—'ছাদে? কেন?'

—'একটা ইঁদুরের হাঁচিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বুড়ো খোকার দেযালা আমার ভাল লাগে না। একটু নিরিবিলি ঘুমতে চাই আমি।'বলে দ্বিরুক্তি না করে এ দেয়ালের দিকে শুল। কিন্তু প্রসাদ ছাদে গেল কি না গেল সেটুকু ভ্রূক্ষেপ করারও অবকাশ ছিল না অমলার। সত্যিই সে অচেতনের মতন ঘুমতে লাগল। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ জেগে উঠে প্রসাদকে দেখে সে যদি অস্বস্তি বোধ করে এই ভাবনায় সঙ্কুচিত হয়ে ধীরে ছাদের দিকে চলে গেল যুবকটি।

মেয়েমানুষ

বৈশাখের দুপুরবেলা।

চপলা আধ ঘন্টা না ঘুমোতেই জেগে গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো দেখা যায়—ফুল ঝরছে।

পাশের রুমে কড়া চুরুটের গন্ধ পাওযা যাচ্ছে-স্বামী অফিস থেকে ফিরে এসেছে তা হলে?

চপলা উঠে দাঁড়াল; চুরুট হাতে হেমেন্দ্র ঢুকলে; চপলার দিকে একবার তাকিয়ে বললে-'মোটর ফিট করতে বলে দিয়েছি।'

চপলা আড়মোড়া দিয়ে বললে—'থাক, আজ আর যাব না।'

—'বাঃ তুমিই তো বলেছিলে আজ শনিবার আছে।'

—'বলেছিলাম তো; কিন্তু কোথায যাব? সিনেমায? কী আছে আজ?' হেমেন বললে—'দেখি, কাগজটা নিয়ে আসি।'

কাগজ নিয়ে হেমেন ঘরে ঢুকতেই চপলা বললে—'থাক, সিনেমা ভাল লাগে না।'

হেমেন ঈষৎ হতাশ হয়ে বললে—'মনসুনের আগে বেস তো আর শুরু হবে না—'

—'থাক বেস-ফেসে আর দরকার নেই-অনেক টাকা খুইয়েছ-দেখি কাগজটা।'

হেমেন কাগজটা স্ত্রীর দিকে ঠেলে দিয়ে অবসন্ন হয়ে একটা কুশনের ওপর বসে চুরুটটা হাতে করে হাঁফাতে লাগল। একটা কোলা ব্যাং যেন টাই বেঁধে ছিটের কোট ঝুলিয়ে বসেছে।

চপলার বযস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে-হেমেনের উনপঞ্চাশ। দু জনেরই শরীর মোটা হয়ে চলেছে-মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে।

হেমেনের প্যান্টের বেল্ট তার ভুঁড়িটাকে যেন আর সামলাতে পারে না; হেমেনের মুখও যেন তার ভুঁড়ির মতই; চপলার মুখও মেহেনের মতই যেন-কল্পনা বা স্বপ্নের কোনো চিহ্ন যেন এদের মুখাবয়বের ত্রিসীমানাযও কোনোদিন ছিল না। হেমেনের নিজের অফিস। কযেকখানা মাঝারি গোছের ট্রাক। ইট, সুরকি ও সিমেন্ট নিয়ে কলকাতার শহরে ছোটাছুটি করছে দশ বছর ধরে। আরো নানারকম ব্রাঞ্চ বিজনেস আছে। সামান্য কনট্রাকটর হয়ে চব্বিশ পরগনায় জীবন শুরু করেছিল সে। এখন তার সমস্ত ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায়-দু-তিন লাখ টাকা খাটছে।

চপলা কাগজখানা দেখছিল।

ঢনঢনিয়া মাড়োযাড়ি মস্ত বড় এক ভোজ দিয়েছে; নিমন্ত্রিত লোকজনের ভিতর প্রায় শতখানেক নাম উঠেছে; চপলা অত্যন্ত গভীর অভিনিবিষ্ট হয়ে একটি-একটি করে নাম দেখছিল-সমস্তটুকু দেখতে তার আধ ঘন্টা লাগল। হেমেনের চুরুট ফুরিয়ে গেল; চপলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাগজটা রেখে দিলে। না, এখনো তারা এত বড়লোক হয নি যে ও-সব কলমে নাম তাদের উঠবে কিন্তু ঢনঢনিয়ার বাড়ির ভোজে তার স্বামীও তো গিয়েছিল, চপলা নিজেও তো গিয়েছিল। না-নিজেদের যতটা তারা মনে করে ততটা নয়, এখনো তার ঢের পেছনে। একশটা নামের লিস্টের ভিতর তাদের নাম কোথাও নেই, আজও নেই-এখন তাদের বযস প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল।

চপলা ঈষৎ অস্থির হয়ে উঠল। চুপচাপ বসে থাকলে মনটা কেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে মানুষদের ওপর, পৃথিবীর ওপর, নিজেদের জীবনের অকৃতকার্যতার ওপর।

চপলা নড়েচড়ে উঠে-বসে বললে—'চলো, লীলাদের বাড়ি যাই।'

—'বেশ টয়লেট করে এসো।'

আধ ঘন্টার ভেতর টয়লেট সেরে সাজসজ্জা করে চপলা এসে বললে—'চা খেয়েছিলে?'

হেমেন মাথা নেড়ে বললে—'না।'

—'তা হলে ইয়াসিনকে বলি; একটু করে দিক।'

—'থাক, আমি আর-একটা চরুট জ্বালাই তার চেয়ে, কোথায যাবে?'

—'চলো, লীলাদের ওখানে যাই।'

—'লীলা? দ্বিজেন ওকে নিয়ে চলে যাবে শুনেছিলাম।'

—'কোথায়?'

—'শিলঙে।'

—'কেন?'

—'কলকাতায এই গরমে আমরাও তো দু-চাব দিনেব জন্য কোথাও গেলে পারতাম; সবাই তো যাচ্ছে।'

—'একটু চেপে থাকো, কয়েকটা বড় অর্ডার এসেছে-ভাল ছেলেটির মতো এখন একটু চেপে থাকো তো লক্ষীটি। কিন্তু লীলাকে নিয়ে দ্বিজেন যাচ্ছে?

সত্যি!'

হেমেন একটু হাসল।

চপলা বললে-'ওদের দু জনে তো একদম বনে না-জানো?'

দ্বিজেনের জন্য দুঃখ করতে লাগল চপলা। হেমেনেবও দুঃখ-দ্বিজেনের জন্য।

মোটর কাবটা কেমন বিগড়ে গেছে; হেমেন হতাশ হয়ে কারটাব দিকে একবাব তাকাল,—'মোটব কাব-এর কী হয়েছে যেন!'

চপলা বললে—'এই যা-তা হলে আব—, চলো ওপবে চলে যাই—'

হেমেনের যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার কবে ঘাঁটিয়ে দেখল, মোটর কারটার দিকে হাঁ করে একবাব তাকাল, পাঁচ মিনিটের মত নটখটি করলে সে, কিন্তু গাড়ি একচুলও নড়ল না। ড্রাইভারেব হাতে গাড়িটা ফেলে দিয়ে হেমেন বললে-'চলো, বাসে যাই।' বাসেই গেল তারা।

হেমেন বাসা করেছে বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউতে-দ্বিজেন এখনও সেই সাবেকি শ্যামবাজাবে থাকে; অনেক বলে-কয়েও তাকে অ্যাভিনিউব দিকে টেনে আনা গেল না; সে কেবল বলে, আচ্ছা আসছি আসছি; কিন্তু আসে না, এই দশ বছরেব ভিতবেও সে আসতে পাবল না; টাকা দ্বিজেনেব কম কী? কঞ্জুষ সে একেবারেই না-লীলাও না। কিন্তু আসলে এদেব বনে না। কেন যে পবস্পরের ভিতর এ-বকম বনে না, স্বামী-স্ত্রীতে, হেমেন বুঝে উঠতে পাবছিল না। কেন যে এরা পবস্পরকে আঘাত কবে শুধু?

বাস ভর্তি, চপলাকে দেখে কেউ উঠে দাঁড়াল না। পবেব স্ট্যাণ্ডে একজন উঠে গেল-হেমেন চপলাকে সেই দিকেই পাঠিযে দিল। দু-এক মিনিট পবে যখন তাব বোধ হল যে একটা কুলি না কী চপলার পাশে বসে আছে তখন তাড়াতাড়ি স্ত্রীর হাত ধরে তাকে বাস থেকে নামিয়ে ছাড়ল হেমেন। এরপর এবা ট্যাক্সি কবল।

তেতলায না-পৌছতেই লীলার গলা।

হয তো চাকরবাকর ধমকাচ্ছে। খুব বেযাড়া বেয়াদব চাকবই বটে-লীলার আওযাজও তেমনি খনখনে। হেমেনের মনে হল এই হচ্ছে জাঁদবেল আওযাজ-তার স্ত্রীর যা নেই। এ না হলে ঘরের চাকরবাকবগুলোই লাই পেযে যায়, দাবড়ে রাখতে পারা যায না। কিন্তু তার নিজের এ-বকম গলা নেই। পদে-পদে কত ব্যবসার কাজ জলের মত হাসিল হয়ে গেছে। এ-রকম ভাবতে-ভাবতে হেমেন তৃপ্তির সঙ্গে দোতলায় পা-পোষে নিজের বুটজোড়া ভাল কবে ঘষে নিলে, চপলা হাই হিল ঘষলে।

চপলাকে বললে—'লীলার সঙ্গে খবরদার লেগো না কিন্তু। ফর্ম ঠিক রেখো কিন্তু, বুঝলে?'

চুরুটটা জ্বালাবে কি না বুঝতে পারলে না সে; পকেটের থেকে বের করলে অন্তত; কিন্তু তেতলায উঠতে না-উঠতেই সেটা পকেটের ভিতর ফেলে দিল। লীলার গলার আওযাজ ডাইনিং রুমের দিক থেকে আসছে-হয তো চাকর বাকর নিযে কী-না-কী—হেমেনরা সেদিকে গেল না। দ্বিজেনটা হয তো ড্রয়িং রুমে আছে-চপলাকে নিযে ড্রয়িংরুমের ভিতর ঢুকল হেমেন। কিন্তু কই, কেউ তো এখানে নেই।

—'দ্বিজেন—'

কোনো শব্দ নেই।

ঘড়িতে পৌনে তিনটে।

বেডরুমেও কেউ নেই।

অগত্যা ডাইনিং রুমেব দিকে গেল তাবা। ঢুকে দেখল ডিনার টেবিলের ওপর লীলা বসে-এ কী দারুণ বণচণ্ডী। হাতে তাব দু খানা রুটিকাটা ছুবি নাচছে। দ্বিজেন এক পাশে একটা চেয়ারে বসে এক স্লাইস পাঁউরুটি হাতে কবে চুপ কবে বযেছে।

—'দ্বিজেন।'

—'দ্বিজেনবাবু।'

লীলা আগবাড়িয়ে বললে—'হযেছে-হযেছে, ওকে আব আশকাবা দিতে হবে না।'

একটা রুটিকাটা ছুবি ডিশেব ওপব ছুঁড়ে ফেলে দিল লীলা; আব-একখানা নিজেব হাতেব ভিতব বেখে বললে—'এই আমাদেব চা খাওয়া শেষ হল।'

চপলা বললে—'ভালই।'

হেমেন একটা চেযাব টেনে এনে দ্বিজেনেব গলায় হাত জড়িয়ে ফিসফিস কবছিল।

লীলা বললে—'ওকে আব আশকাবা দিও না ঠাকুবপো।'

চপলা বললে-আহা বেচাবা সাবাদিন খেটেখুটে আসে-'

লীলা চোখ গবম কবে বললে—'বেচাবা মানে?'

—'আমি বলছিলাম, দ্বিজেনবাবু—'

—'দ্বিজেনবাবু বেচাবা, আব আমি?'

চপলা কোনো কথা বললে না।

—'বেচাবা সাবাদিন খেটেখুটে আসে-তাবপব?'

চপলা চুপ কবে বইল।

লীলা বললে—'সাবাদিন খেটেখুটে আসে বলে তাকে নিয়ে কী কবতে হবে ঠাকুবঝি?'

চপলা বললে—'তোমবা না কি বেড়াতে যাচ্ছ?'

ছুবিটা দিযে নখ কাটতে-কাটতে লীলা বললে—'কে বলেছে? কোথায? দ্বিজেন বললে—'ছুবিটা দিযে নখ কেটো না।'

লীলা দৃঢ়মুষ্টিতে ছুটিব বাঁটটা ধবে দ্বিজেনেব দিকে তাকাল-হেমেনেব প্রাণ কেঁপে উঠল; দ্বিজেনেব গলাব থেকে হাত তুলে নিযে অত্যন্ত দাক্ষিণ্যেব সঙ্গে লীলাব দিকে তাকাল সে।

দ্বিজেন বললে-'এটা রুটিকাটা ছুবি নয? ভুলে যাও কেন?' হেমেন দ্বিজেনেব কাঁধ আস্তে চাপড়ে দিযে বললে—'আহা থাক, থাক না।'

—'থাকবে? কেমন থাকবে দেখাচ্ছি আমি!'

দ্বিজেনেব কপাল লক্ষ্য কবে লীলা হঠাৎ ছুবিটা ছুঁটে মাবল। ছুবিটা ফসকে দেওযালে গিযে লাগল।

কযেক মিনিট সকলেই স্তম্ভিত হযে বসে বইল।

আবো একটা ছুবি ছিল টেবিলে-কিন্তু লীলা সেটা আব তুললে না। দ্বিজেন চশমাটা চোখ থেকে খসিয়ে নিযে মুছতে-মুছতে বললে—'ভোঁতা একটা রুটিকাটা ছুবি কপালে লাগলেও বা কী হত?'

লীলা বললে—'কিন্তু চোখে লাগত যদি।'

—'তা হলে কী হত?'

—'কী হত-ডিম বেবিযে যেত, আব কী হত!'

হেমেন বললে—'ছি!'

চপলা বললে—'তোমাব স্বামীব ও-বকম হলে তোমাব ভাল লাগত না কি লীলা?'

লীলা বললে—'স্বামী আমাব! বড্ড স্বামী!'

হেমেন আশ্চর্য হযে বললে—'বলে কী?'

চপলা হেমেনকে চোখ ইশাবা কবে বললে—'চুপ'।

দ্বিজেন মাথা নিচু কবে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। লীলা খানিকক্ষণ গোঁজ হযে চুপ কবে বইল। তাবপব বললে-'সকলে মিলে ছোটছেলেব মত তুইযেবুইযে নজব দিযে মাথা একবাবে খেযে ফেলেছে।'

হেমেন বললে—'কাব মাথা? দ্বিজেনেব?'

— আব কাব!'

—'কে খেযেছে?'

—'কেন তুমি-আব তোমাব স্ত্রী।'

হেমেন বক্তাক্ত জমাট মুখে লীলাব দিকে তাকাল। সেও হয তো একটা কাণ্ড বাধিযে বসবে, চপলা সভযে হেমেনেব দিকে তাকিযে দম বন্ধ কবে দাঁড়িযে বইল।

দ্বিজেন হেমেনকে একটা ঠোনা দিযে বললে-'চা খাবে না কি?'

চপলা বললে—'দ্বিজেনবাবুব ভাল খাওযা হয নি বুঝি? আচ্ছা আমি তৈবি কবছি।'

লীলা আগুন হযে বললে—'কেন? তুমি তৈবি কবে দিলে ভাল খাওযা হবে আব আমি তৈবি কবে দিলে হবে না?'

চপলা সে কথাব কোনো জবাব না দিযে স্টোভ জ্বালাতে গেল। লীলা চপলাব কব্জি চেপে ধবে বললে—'জ্বালাও তো দেখি স্টোভ-জ্বালাবে' হ্যাঁ?'

দারুণ মোচড় খেযে চপলা টপকাতে টপকাতে নিজেকে সামলে নিযে একটা চেযাবে গিযে বসল-সমস্ত শবীবে তাব বিমঝিম কবে উঠেছে যেন।

দ্বিজেন ফ্যানটা খুলে দিযে চেযাবশুদ্ধ চপলাকে তুলে নিযে ফ্যানেব নীচে বসাল। তাব পব আস্তে-আস্তে চপলাব মাথায হাত বুলোতে লাগল। লীলা বললে-'জানি নে আবাব' এই সবই তো কবো তুমি'...সাধে কি আমি চটি তোমাব ওপব-যেই একটু নজব দিতে ভুলেছি—'

লীলা উঠে দাঁড়াল।

দ্বিজেন আস্তে-আস্তে সবে নিজেব জাযগায গিযে বসল।

লীলা বললে-তোমাব লজ্জা কবে না? চপলাব সঙ্গে তোমাব বক্তেব কোনো সম্বন্ধ নেই-কী কবে চেযাব শুদ্ধ তুমি তাকে টেনে নিলে? তাব গাযে হাতই-বা দিলে কী কবে'!

হেমেন নড়ে চড়ে উঠল; চপলা চোখ ইশাবা কবে তাকে থামতে বললে। লীলা বললে-'আব যদিও-বা কোনো আত্মীযতা থাকত, সে তো তোমাব স্ত্রী নয, বোনও নয, কী কবে তাব গাযে হাত দিলে তুমি? আমাব চোখেব সমানেই এত; চব্বিশটা ঘন্টা হাইকোর্টেব নাম কবে তুমি কী কব জানি না?' হেমেন বললে-'কী কবে?'

লীলা বললে—'এব ওপব আবাব বিজনেস ফেঁদেছে—'

হেমেন বললে—'বিজনেস কবেই তো—'

চপলা বললে-'কীসেব বিজনেস? দ্বিজেনবাবুব?'

—'কেন জে-বি-এ্যাণ্ড কোং-তুমি জানো না?'

এতক্ষণ পবে কথাবার্তা ব্যবসাব দিকে মোড় নিযেছে দেখে হেমেন যথেষ্ট শান্তি বোধ কবল। সে চুরুটটা এতক্ষণ পবে বেব কবলে; জ্বালিযে নিযে একটা টান দিযে অত্যন্ত আযেসেব সঙ্গে বললে-'জে-বি-এ্যাণ্ড কোম্পানি হচ্ছে—'

লীলাব মুখেব দিকে তাকিযে চপলা বললে-'থাক——'

হেমেন বললে—'বাঙালি ফার্ম; এব ভেতব এক জনও বিলেতি মানুষ নেই, না ইওবোপেব না আমেবিকাব, এমন-ম্যাড়োযাড়ি অব্দি নেই।'

হেমেনেব মনে হল সকলকে সে কোম্পানিব বহস্য উদঘাটন কবে স্তম্ভিত কবেছে, কিন্তু কেউই স্তম্ভিত হয নি; কেউ তাব কথা শুনছিল না।

হেমেন বলে চললে-'মাড়োযাড়ি নেই, ভাটিযা নেই, পশ্চিমা মুসলমান নেই-শুধু বাঙালি হিন্দু-ব্যস'!

হেমেন বললে—'ওযাব-এব সময এই কোম্পানি স্টার্ট কবা হয; প্রথম হয বেঙ্গুনে, তখন অনেক কিছুই বুজরুকি হযেছিল বটে, কিন্তু এটা বুজরুকি নয, তখন দ্বিজেনেব সঙ্গে এব কোনো সম্পর্ক ছিল না।'

দু মিনিট গভীব আনন্দেব সঙ্গে চুরুট টেনে পবম পবিতৃপ্ত হযে হেমেন বললে—'দ্বিজেন তো এব গুডউইল কিনেছে তিন বছব আগে'—লীলাব দিকে অত্যন্ত প্রসন্ন হযে তাকাল হেমেন।

বললে—'প্র্যাকটিস শিগগিবই ছেড়ে দেবে।'

চপলা বললে—'কেন?'

হেমেন জ্বলন্ত চুরুটটাব দিকে সস্নেহে তাকিযে বললে-'এই বিজনেসেব কাছে প্র্যাকটিস আবাব কী?

লীলা বললে—'বিজিনেস কবে টাকা জমিযে হবে কী?'

হেমেন অত্যন্ত বিস্মিত হযে লীলাব দিকে তাকাল।

লীলা বললে—'এই তো চোখেব সমানে দেখলাম চপলাব সঙ্গে কী বকম ব্যবহাব কবল। চপলা তাব কেউ না-মাথায হাত বেখে পিঠ বুলিযে ফিস-ফিস কবে কানে-কানে কথা বলে কী নোংরামিব পবিচয দিল, বলো তো ঠাকুবপো? আমাব চোখেব সামানেই এই—বাইবে কী কবে কেউ কি জানে? আমি ঘড়ি ধবে দেখেছি এগাব-বাব ঘন্টা বাইবে থাকে।'

হেমেনেব মন গজগজ কবে উঠছিল—লীলাব কথা ফুবতে না-ফুবতেই ফুক ফুক কবে হেসে উঠল।

চপলা বললে—'উনি তো আঠাব ঘন্টা বাইবে থাকনে।'

লীলা বললে—'হ্যাঁ উনি-তোমাব ওঁব ঐ টেকো মাথা আব বোঁদা চেহাবা দেখে কোনো মেযে ওব সঙ্গে গাঁট বাঁধতে আসবে?'

হেমেনেব দিকে তাকিযে ফিক কবে হেসে লীলা বললে—'ঠাকুবপো, তোমাব নাক যেন বুড়ো আঙুলেব মত উঁচিযে আছে-বাপবে বাপবে!'

লীলা হো-হো কবে হেসে গড়াতে লাগল—'ট্যাবা-ট্যাবা মুখ, নাক টেবু-টেবু, চোখ দুটো প্যাঁট-প্যাঁট কবছে, কোনো মেযে এসব দেখে এগোয?'

হেমেন লাফিযে উঠে বললে—'বটে। খুব দমফাই হচ্ছে বুঝি? আজও যদি চোখ মাবি তো কুড়ি-পঁচিশটা মেযে এমন ফ্যা-ফ্যা কবে আমাব পাযেব কাছে এসে গড়াবে।'

লীলা হেসে কুটিকুটি হযে বললে—'চোখ মাবি! ঠাকুবপো মাববে আবাব চোখ—তা হলেই হযেছে।'

চপলা বললে—'ছিঃ! চোখ মাবাটাবা আবাব কী। তুমি কক্ষনো যা কব না সেই সব নিযে আবাব বড়াই কবে বলো কেন?'

লীলাকে বললে—'না, কক্ষনো না, বুঝলে দিদি, এই কুড়ি-পঁচিশ বছব ধবে ওঁব সঙ্গে আছি, এক দিনেব জন্যও কোনো মেযেমানুষেব দিকে উনি ফিবেও তাকান নি, ওঁব ব্যবসাযেব সমস্ত লোক জানে যে ওঁব কী কবম অকলঙ্ক চবিত্র, কলকাতা শহবেব সমস্ত লোক জানে—'

হেমেন অত্যন্ত অপমানিত হযে বযেছিল-চপলাব কোনো কথা তাব কানেও গেল না। লীলা তাব পুরুষত্বকে কী কঠিনভাবেই না আঘাত কবেছে! আপাদমস্তক গা জ্বলে যাচ্ছিল তাব। বাগে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়িযে টেবিলেব ওপব দড়াম-দড়াম কবে ঘুঁষি মাবতে-মাবতে হেমেন ক্রোধান্ধ হযে বললে—'চুলোয যাক চবিত্র! মেযেবা আবাব আমাব ফোঁপব দালাল আছে না? আমাব সমস্ত হাঁড়িব খবব আমি বেব কবে দিচ্ছি।'

চপলা বললে—'তুমি পাগল হলে না কি?

হেমেন হুংকাব দিযে বললে—'কলকাতাব সমস্ত বড় ঘবেব মেযেদেব আমি পথে দাঁড় কবাতে পাবি, জানো লীলা?'

চপলা বললে—'দ্বিজেনবাবু।'

দ্বিজেন বললে—'চলো, তোমাদেব মোটবে দিযে আসি।'

হেমেন এক ঝটকায দ্বিজেনকে ঠেলে দিযে বললে—'ভেবেছ একেবাবে চবিত্র হাতে ধবে বসে আছি, হেমেন খুব সচ্চবিত্র ছেলে, মেযেবা তাকে একটা গযাবাম বলে ভাবে-কলকাতাব শহেব তিন দিন পবে সাঁওতাল পবগনা বানিযে দিতে পাবি।'

কাঁপতে-কাঁপতে বললে—'কলকাতা তো কলকাতা....লীলাব মত যত সব প্যাঁচা-পেঁচি, চপলাব মত যত সব প্যাঁচা-পেঁচি-সেবাব যখন জযপুবে গেলাম পাথবেব বাড়ি দেখতে-ফিবছি, এমন সময—'

কিন্তু বাজপুত্রবাঘিনী দেবলা দেবী-চঞ্চলকুমাবীদেব সঙ্গে বোমান্সেব কথা শেষ কবলে না আব হেমেন; শুরুই শুধু কবে বাখল। কেউ কোনো জবাবও দিচ্ছে না দেখে, লীলাকেও যথেষ্ট প্যাঁদানি দেওযা হযেছে বলে, মনটা তাব নিবস্ত হযে আসছিল।

নতুন একটা চুরুট বাব কবে হেমেন শান্তি পাচ্ছে। চুরুটটা জ্বালিযে, টেনে, মনটা তাব ঠাণ্ডা হযে উঠছে, চপলাব প্রতি, দ্বিজেনেব প্রতি, এমন-কি লীলাব প্রতিও অনুকম্পায তাব সমস্ত প্রাণ ভবে উঠল।

বললে—'চলো দ্বিজু, চলো লিলি, বাযোস্কোপ দেখতে যাই।'

কিন্তু ঘড়িতে তখন চাবটে বেজে গেছে; প্রথম শোতে গিযে আব লাভ নেই। ছটাব পাবফবমেন্সেব জন্য এদেব সবাইকে সে তৈবি হতে বললে। তাবপব নিজেই স্টোভটা টেনে নিলে।

লীলা বললে-'কেন?'

—'গবম জল কবব।'

—'কেন?'

—'বাঃ, দ্যাখো না? তোমবা মেযেবা তো আব কববে না, এখন পুরুষ দেবই মশলা পিষতে হবে, চা বানাতে হবে, দেখো, কী কবম খাশা চা কবি।'

কিন্তু লীলাব কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি বা আশ্বাস পেলে না হেমেন। চপলা বললে-'এখন আবাব চা খাবে কে? কাবো খাবাব দবকাব নেই।' হেমেন বললে-'আলবাত খাবে।'

চপলা বললে—'কেউ খাবে না-তুমি স্টোভ নিবিযে ফেলো।'

হেমেন একটু চোখ টিপে মুচকি হেসে বললে—'দিদিমাবা খাবে।'

চপলা বললে—'কাবা?'

স্বামীব দিকে তাকিযে দেখল সে-বাস্তবিকই হেমেনকে সুন্দব দেখাচ্ছে না মোটেই-টেবু-টেবু নাক, ট্যাক-ট্যাক মুখ. চোখ প্যাট-প্যাট কবছে। হেমেন বললে—'তুমি আব লীলা।'

লীলা বললে—'আমবা দিদিমা?'

হেমেন বললে-'জানলে দ্বিজেন, এবা আবাব আমাদেব চেহাবা নিযে ঠাট্টা কবে, কে বলবে এবা আধবযেসি মেযেমানুষ? একটু হ্যাঁচকা দেখলেই মনে হবে বাপবে বাপ, ঠানদিদি-ঠাকমা এল আবাব, মনে হয না দ্বিজেন?'

কিন্তু দ্বিজেন কিছু বলবাব আগেই লীলা এক ঝটকায স্টোভসুদ্ধ প্যান উল্টে ফেলে দিল। গবম জলটা হুস কবে চাবদিকে ছিটকে পড়ল। হেমেন পুড়তে-পুড়তে বেঁচে গেল। স্টোভটা দাউ দাউ কবে জ্বলে উঠেছিল। দ্বিজেন, আব প্যানট্রিব থেকে ননকু এসে সমস্ত নিভিযে নিস্তব্ধ কবে দিল।

সিনেমায আব যাওযা হল না।

দিন তিনেক কেটে গিযেছে।

জে-বি-আর্মস্ট্রং কোম্পানিব পাশ দিযে হেমেনেব মোটব আস্তে-আস্তে চলছিল; একবাব ভিতবে ঢুকে শ্রীমানকে দেখে যাবে না কি ভাবছিল হেমেন। বড় বাস্তায একটা গলিব কাছে মোটব থামিযে আর্মস্ট্রং কোম্পানিব দিকে তাকিযে দেখতে লাগল হেমেন। ব্যবসাযেব যে-কোনো পত্তনেব দিকে তাকাতে গিযেই সে কোমল সবুজ হযে ওঠে-তাব জীবনেব সমস্ত কল্পনা ও কুহক পৃথিবীব সমস্ত সওদাসদাযেব বাজ্যেব ভিতবে শুধু।

হেমেনেব মনে হল আর্মস্ট্রং-এব ফ্ল্যাট এমন বড় না কিছু—'স্টিফেন হাউসেব কিংবা একশ নম্বব ক্লাইভ স্ট্রিটেব একটা কামবাব মত শুধু যেন।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল হেমেন; তাব নিজেব অফিসটাই-বা কতটুকু? কিন্তু চুনকাম কবে নিযেছে সে, হুইটলি আর্মস্ট্রং-এব মত এটা বাঙালি কোম্পানি এসে কাজ কবে দিযে গেছে কিন্তু আর্মস্ট্রং এখনো তেমনি বিবর্ণ, জাযগায জাযগায চুনবালি খসে পড়েছে' মোটব থেকে নামল হেমেন।

হাঁটতে-হাঁটতে মনে হল সমস্ত ব্যবসাই আজকাল বসে যেতে বসেছে-গত দেড় বছব ধবে ক্রমগত ক্ষতি দিযে আসছে সে। আব কিছু কাল এ-বকম চললে ব্যবসা বন্ধ কব দেবে সে। ব্যাঙ্কে এখনো যা টাকা আছে তাব সুদ দিযে তাদেব দু জনাব এখনো বেশ চলবে। কোনো ছেলেপিলে হয নি তাদেব। একটা অপবিসীম শান্তিতে চুরুটটাকে জ্বালাল।

দ্বিজেন উঠে পড়বে ভাবছিল।

'হ্যালো খাস্তগিব'—অত্যন্ত আগ্রহেব সঙ্গে হেমেনেব দিকে তাকাল সে। আজ শুধু ব্যবসাযেব কথাই হল, তিন দিন আগেব ঝক্কি ঝকমাবিব বেদনাব নিবাশাব কেউ কোনো উল্লেখই কবল না। ব্যবসাযেব দুর্গতিই দু জনকে সব থেকে বেশি বিষণ্ন কবে দিযেছে, ব্যর্থ কবে ফেলেছে।

চাব-পাঁচ দিন পবে হেমেনেব অফিস থেকে তাকে নামিযে নিযে গেল দ্বিজেন। সাহেবপাড়াব একটা গ্রিল-ফিলেব দিকে মোটব ঘুবিযে চলল দু জনে।

—'নাঃ ঢুকেই পড়া যাক।'

গিযে বসল। শুযোব, ভেড়া, মুবগিব মাংসেব নানা বকম জিনিশ, কফি, কিছু পুডিং, ফল, আইসক্রিম একে-একে আসছিল। হেমেন বললে, 'ব্যাপাবটা কী জানলে দ্বিজেন, ব্যাঙ্কে এখনো লাখ দেড়েক বযেছে।'

দ্বিজেন বললে—'লাখ দেড়েক'

হেমেন বললে—'এখনো ট্রাকগুলো দস্তুব মত অর্ডাব নিযে কলকাতা শহবে ছুটে বেড়াচ্ছে।'

হেমেন বললে—'এই দেড় লাখ টাকাব ইন্টাবেস্টে, আমি আব চপলা দু জন মানুষ তো শুধু, এলাহি চালে যেতে পাবি-বালিগঞ্জেব বাড়ি তো বযেছেই।'

একটু থেমে—'কববও তাই। ব্যবসা-কী হবে ব্যবসা কবে আব? ভাল লাগে না কিছু-সত্যি।'

দ্বিজেন জিজ্ঞেস কবতে গেল না, কেন ভাল লাগে না। ব্যাঙ্কে দ্বিজেনেবও লাখখানেক বযেছে। বালিগঞ্জে না হোক, শ্যামবাজাবে তাবও বাড়ি বযেছে। বেশ ভাল বাড়িই। কিন্তু তবুও কেমন একটা বিমর্ষতা নিবর্থকতা পেযে বসেছে তাকে। অনেক দিন ধবে। হেমেনেব এই সদ্যোজাত ভাল না লাগাব চেযে সে ঢেব আলাদা জিনিশ।

হেমেন বললে-'সত্যি কিছু ভাল লাগে না কেন, বলো তো দ্বিজু?'

—'কেন ভাল লাগে না বলো তো হেমেন?'

—'কী যেন, মনটা কেমন টসকে গেছে—'

—'কেন?'

—'বাস্তবিক, টাকাই কি সব দ্বিজু?'

দ্বিজেনেব কাছ থেকে কোনো জাবাবেব অপেক্ষা না কবেই হেমেন বললে—'বাস্তবিক, লীলা যা বলেছিল ঠিকই, আমাকে একটা খটকা লাগিযে দিযেছে—'

দ্বিজেন ঘাড় হেঁট কবে খাচ্ছে।

হেমেন বললে—'এই ভুঁড়ি, টাক মাথা, ট্যাবা-ট্যাবা মুখ, টেবু-টেবু, নাক, চোখ দুটো প্যাঁট-প্যাঁট কবছে, বাস্তবিক আমি কী হযেছি বলো তো?'

দ্বিজেন বললে—'একটু হালকা হযে নাও না।'

—'হালকা হযে কী হবে, চেহাবাই অত্যন্ত বদ নজবেব। সেদিন একজন মেযেব পিছনে লেগেছিলাম।'

—'সে কী।'

—'মেযেদেব ফেবে-ফেবে আমি না থাকি যে তা নয। কিন্তু চপলা তা জানে না। কিন্তু এদ্দিন অ্যাংলো ইণ্ডিযান ছুঁড়িদেবকে এনে বাযস্কোপ দেখিযে ভাবতাব সব সাধ মিটল বুঝি। কিন্তু তাতে শুধু হয না-আবো কী একটা জিনিশেব প্রযোজন যেন।'

দ্বিজেন বললে—'কেন চপলাই তো বযেছে।'

—'কিছু না।'

বোস্ট খেতে-খেতে ছুবিটাব দিকে একবাব তাকাল।

হেমেন বললে-'না চপলা তো বযেইছে; এমন চমৎকাব গিন্নি, ও না থাকলে কি আব চলত, এ-সব মেযেদেব নামে কোবনা নালিশ চলতে পাবে না।'

একটু থেমে—'কিন্তু আমি চাই কী জানো?'

দ্বিজেন মুখ তুলল, একটা ভাল ছুবি বেছে নিলে।

হেমেন বললে—'মেযেবা আমাকে দেখে ভুলে যায, আমাব কাছে এসে নিজেদেব নিবেদন কবে-এসব কোন পুরুষ না চায দ্বিজেন?'

এবপব দু-তিন মিনিট স্তব্ধ হযে খুব তাড়াতাড়ি কবে কাঁটা-ছুবি চালিযে নিতে লাগল হেমেন।

হেমেন তাবপব বললে—'কিন্তু লীলা যা বলেছে-ঠিকই। সে পুরুষ আমি নই যাব পেছনে মেযেবা পইপই কবে ঘুববে। কেন ঘুববে? আমাব পেছনে? আমি কী?'

দ্বিজেন বললে—'আমি-বা কী?'

—'নাও-নাও-তোমাব সুন্দব চেহাবা আছে' আমি আমাব গুডউইল দিযে দিতে বাজি, তোমাব চেহাবা যদি পাই।'

হেমেন বললে—'তুমি তো ববাববই মেযে পটকে এসেছ, আমি জানি না না কি' বিলেতে, ইণ্ডিযায। বড়লোকেব ছেলে, নিজে বোজগাব কবেছ, তাব ওপব এই এমন চেহাবাখানা। সে আমি জানি-তুমি ঢেব মেযে পটকে এসেছ'

হেমেন কিছুতেই এই ব্যথা উতবে উঠতে পাবছিল না আব, এ বেদনা তাকে অভিভূত কবে

ফেলেছে।

দ্বিজেন বললে—'মেয়ে পটকানোই কি সব?'

—'এসেছ তো পটকে-অনেক মেয়ে!'

—'মেয়ে পটকে আর কী হয় হেমেন?'

—'ওঃ, অনেক হয়; জীবনে অনেক ফুর্তি করেছ। এখন তুমি চোখ বুজে তৃপ্তিতে মরতে পার, পার না কি?'

হেমেন বললে—'পার না কি।'

কোনো জবাবের প্রতীক্ষা না করেই বললে—'পারা উচিত তোমার; আমি হলে তো পরম শান্তিতে চোখ বুজতে পারতাম।'

গভীর ক্ষোভে হেমেন কফির পেয়ালা ধরল।

বললে-'এই যে এখনো আধবুড়ো হয়ে গেছ, চার-পাঁচ জন ব্যারিস্টার গিন্নির সঙ্গে এখনো তোমার ইয়ার্কি চলে, আমি দেখেছি না নিজের চোখে?'

দ্বিজেন বললে—'ইয়ার্কি শুধু, আর কিছু না হেমেন?'

—'কিন্তু ইয়ার্কিটাই ঢের মিষ্টি। আমি তো নিজেই চেয়ে-চেয়ে কতবার দেখলাম। আমাদের সঙ্গে ও-রকম ইয়ার্কিই-বা কে করতে আসে?

—'কেন, চপলা?'

—'ঠাট্টা করো না দ্বিজেন।'

দ্বিজেন বললে—'নিজের বধূর সঙ্গে হাসি-তামাশাই তো সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।'

হেমেন একটা চুরুট ধরিয়ে বললে—'অবিশ্যি সেখানে তুমি ঠকেছ।'

দ্বিজেন কোনো এক জায়গায় খানিকটা ঠকে গেছে বলে কয়েক মুহূর্ত যেন তৃপ্তির সঙ্গে হেমেন চুরুট টেনে নিল।

কিন্তু তাবপরেই দ্বিজেনের সুন্দর মুখ, চমৎকার টাই ও সুন্দর-সুন্দর ব্যাবিস্টার বধূদের সঙ্গে এব ছেনালির কথা ভেবে হেমেনের মুখ গম্ভীব হয়ে উঠল। মনেব ভিতব একটা আঘাত পুষে খানিক ক্ষণ সে চুরুট টেনে গেল। তারপর বললে—'তোমার ব্যবসা গেলেই-বা তোমাব কী হয় দ্বিজেন? মানুষেব জীবনের আসল জিনিশটাই তো তুমি পেয়েছ-মেয়েবা তোমাকে ভালবাসে। নিজের সেন্টিমেন্টালিজম তুমি কত জায়গায় গিয়ে মেটাতে পার।'

দ্বিজনে সিগারেট কেস বের করলে।

হেমেন বললে—'তোমার বেশ মজা, লীলা তোমাব মনটাকে দিয়েছে খিচড়ে—'ওদিকে তাই তোমাব জমে ভাল। লীলা যদি ভাল গিন্নি হত তাহলে মেয়েদেব সঙ্গে ছেনাল করে বেড়াবার তাগিদও থাকত না তোমার। সেটা তেমন ভালও লাগত না হয় তো। লাগত?'

একটু পরে—'অবিশ্যি ছেনালপনা সব সময়ই ভাল লাগে, বিশেষত যে-বকম বাগিয়ে নিয়েছ চারদিকে। কিন্তু এখন যেমন লীলার ওপব বিমুখ বৈবাগ্য কবে একা মোটরখানা নিয়ে বিবহীব মত ঘুবে-ঘরে উচ্ছ্বাস করবার সুবিধে পাও, লীলা অন্যবকম হলে কি পেতে?'

ক্ষোভ-আকাঙ্ক্ষায় মেহেনেব মন ভবে উঠল। দ্বিজেনের একদিনের জীবনও যদি সে পেত। হলই-বা দ্বিজেনের নিজের স্ত্রী ফটফটে-পরের স্ত্রীদের এমন হাতে পায়ে গুছিয়ে বাখতে ওর মত কে পেরেছে!'

হেমেন বললে—'সেন্টিমেন্টালিজম শুধু? ওদেব সঙ্গে তুমি কী কর না কর-আজীবন তুমি পথেঘাটে কত বাড়ি ভেঙে এসেছ কেউ কি তার খবর রাখে?'

একটু থেমে—'আমি যদি সমস্ত জীবনও ক্ষয় করি তবু একটি মেয়েব সাচ্চা খাঁটি ভালবাসা পাব না, আর তোমাকে কত মেয়ে যেচে ভালবাসতে আসে—' একটু পরে—'কেন এমন হয় দ্বিজু?'

হেমেনই বললে-'অবিশ্যি আমার চেহাবাটা! এ নিয়ে মেয়ে পটকানো যায় না দ্বিজেন।'

নিরাশার অতল অন্ধকূপের ভিতব ডুবে গিয়ে হেমেন স্তব্ধ হয়ে চুরুট টানতে লাগল। জীবনে প্রেম হল না, প্রণয় হল না, ছেনালি অব্দি হল না। এক জন পরের স্ত্রীকে আটকে রেখে মোকদ্দমায় যদি সে পড়ত তাহলেও যেন একটা ক্ষোভ মিটত। এখন যেন রক্ত মাংস বিবেচনা বুদ্ধি বিবেক সমস্তই কামড়াচ্ছে তাকে-হালু-হালু করে কামাড়াচ্ছে। কেন এমন হল? সারা জীবন, জীবন বলে জীবন, এমন গযারাম সেজে গেল কেন সে! মেয়ে পটকানোর একটা সময় থাকে; ত্রিশের পর ও-সব কথা আর না।

হেমেনের সমস্ত মুখ, মাথা, টাক টস-টস করে ঘামতে লাগল।

ভুল করে চুরুটের জ্বলন্ত দিকটা একবার কামড়ে ধরে হেমেন শরীরের যন্ত্রণাও যথেষ্ট পেল। সব রকম যাতনার একশেষ হল তার।

দ্বিজেন বলে—'বলাই ভাল, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, ও-সব দিয়ে আমাদের আর কী হবে—'

—'কে বুড়ো? তুমিও না-আমিও না।'

—'পঁচিশের পর সকলেই বুড়ো—মেয়ে-মানুষ নিয়ে খেলা করবার দিক দিয়ে সতের-আঠার, কুড়ি-বাইশ এই হচ্ছে বয়স।'

হেমেন হাঁ করে তাকাল।

দ্বিজেন বললে—'আমারও যা হয়েছে-এই বয়সেই।'

—'কেন, এখনও তো—'

—'কিছু না, কিছু না, আমি তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি-আমি এখন শুধু একটু শান্ত চাই-মেয়েদের পিছু-পিছু ঘুরে নয় হেমেন, নিজেরই ঘরে, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে, জানো না তুমি, কেউ আমাকে ভালবাসে না!

—'কেউ না?'

—'না।'

হেমেন হাঁ করে তাকিয়ে বইল।

দ্বিজেন বললে—'কুড়ি বছরের মেয়েরা আমাকে ভালবাসবে কেন-আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে চলল। সে ভদ্রলোকেব মেয়েরাই হোক বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানই হোক! আঠার-কুড়ি-বিশ-বাইশ বছরের মেয়েদেরগুলো হৃদয়ের ওপর কোনোরকম কিছুদাবি আমবা অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের তাবা জ্যাঠামশাই ভাবে; হয় তো ঠাকুদ্দাও।'

হেমেন আমোদ পেয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল। দ্বিজেনেব এই সব সাফ কথা শুনে মনের ভাবটা যেন তার অনেকখানি কমে গেছে। বাস্তবিক দ্বিজেন যা বলে তাই। না হলেও ব্যাবিস্টার তো। এমন মিঠে কবে জিনিশের আঁশটি বার করে নিয়ে আসে!

একটু পবে হেমেন খুব অভিনিবিষ্ট হয়ে বললে—'কুড়ি না-হোক, পঁচিশ না-হোক-অন্তত ত্রিশ বছবেব মেয়েরা?'

—'তাও না। তাদেব জন্য ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছবেব ছোকবারা রয়েছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্যেরও অভাব নেই। আমি ঢের দেখেছি। এমন-কি কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছোকবাদেব সঙ্গে তাবা প্রেম কববে-প্রেম কববে একেবারে মবিয়া হয়ে। আমি দেখেছি-ঢেব।'

দ্বিজেন বললে—'একজন চল্লিশ-পয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছবের গিন্নি হয় তো এক-আধ মুহূর্তের জন্য তোমাব প্রতি একটু নবম হতে পারে, তুমিও যেমন একটু গদগদ হয়ে উঠতে পাব তাকে দেখে-কিন্তু তা ভালবাসা নয়, কিছুই নয়, একেবাবে রাবিশ।'

দ্বিজেন মাথা তুলে বললে—'ভেবে দেখো, হয় তো মোটরে চড়ে চলেছি, একটি বিশ আব একটি ত্রিশ বছবেব ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে। আঠার বছবের, চল্লিশ বছরের, পঞ্চাশ বছবেব তিনটি মেয়েমানুষ দেখলাম পাশেব মোটরে; ধরো, তিন জনেই বেশ দেখতে। কিন্তু তবুও, হয় তো আঠাব বছরের দিকেই আমাব মন যাবে।'

হেমেন বললে—'তা যাবে।'

—'কিন্তু সেই মেয়েটির মন কি এই পঞ্চাশ বছরের বুড়োব দিকে আকৃষ্ট হবে

—'সমস্ত পৃথিবী বিকিয়ে দিলেও?'

হেমেন হাঁ করে তাকাল।

তারপর হি হি কবে হাসতে লাগল।

দ্বিজেন বললে—'আমাব ভাইপোকেই সে ভালবাসবে না হয় আমার ছেলেকে-আমাকে কিছুতেই নয়। ভালবাসা, রোমান্স, এমন-কি কামনার কথাও আর বলো না হেমেন! ও-সব ভাবতে গেলেও ঢেব ব্যথা।'

পকেটের থেকে দেশলাই বেব করে দ্বিজেন বললে—'আমাদের এই পড়ন্ত বয়সে সৌন্দর্য আর ভালবাসার কথা চিন্তা করতে গেলেও জীবনকে এমন থুককুড়ি মনে হয়!'

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল; জ্বালিয়ে নিয়ে দ্বিজেন বললে—'আমাদের পকেটে এখন আর কিছু উঠবে না, শুধু ঘরের বধু ছাড়া, আমাদের জন্য আব-কিছু নেই।'

দ্বিজেনেব সেই ঘরের বধু যে লীলা এবং নিজেব চপলা—এই ভেবে হেমেন ঢেব পবিতৃপ্তি পেলে।

বিল সে নিজেই মিটিয়ে দিল।

দ্বিজেন বললে—'খোকা তুমি, আহা তোমাব মা নেই বোন নেই-তোমাব জন্য ভাবি কষ্ট হয।'

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হেমেন বললে—'দ্বিজু, চলো আমবা টালিগঞ্জ, আলিপুব, চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসি।'

—'সত্যি এত সব জাযগা ঘুববে তুমি?'

—'নিশ্চযই।' হেমেন সজোবে মাথা নেড়ে বললে।

—'কেন?'

—'এমনিই।'

—'কোনো ব্যবসা-ট্যাবসাব সুবিধেব জন্য?'

—'না।'

—'এমনিই?'

—'অনেক বদভ্যাস বসেছিল মনেব ভিতবে—'

—'ফিবতে যে অনেক বাত হয়ে যাবে।'

—'হোক।'

দ্বিজেন বললে—'তুমি যাও; আজ আমাব দবকাব আছে।'

বিজনেস! তা হলে দ্বিজেনকে ছেড়ে দিতে পাবে সে। হেমেনেব সমস্ত মন এখন প্রেম, কামনা ও মেযেমানুষেব থেকে উঠে এসে আবাব ব্যবসাব গতিতে পবম আবামে ও নিবিড় শ্রদ্ধায প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে গিযে। জীবনটা তাব কাছে ব্যর্থ নয আব, প্রাণেব ভেতব কোনো খোঁচ নেই, সমস্ত পৃথিবী অসীম অর্থে ভবা।

হেমেন আকাশটাব দিকে তাকাল-আতাব বিচিব মত অন্ধকাবে সমস্ত কলকাতায আকাশটা গেছে ভবে; মেঘেব অন্ধকাব-টিপ-টিপ কবে বৃষ্টি পড়িছল। তাব এখন ভাল লাগল, চপলাব কথা মনে হল। বধূব মমতা ও ভালবাসায তাব সমস্ত মনটা ভবে উঠল। হেমেনেব মতন এমন নিবিড় পবিতৃপ্ত মানুষ কলকাতাব বাস্তায আজ আব-একটিও নেই যেন। আজ সমস্ত বাত চপলাকে ভালবাসবে সে-আজ সমস্ত বাদলেব বাত ভবে এমন একটা অপবিসীম শান্তি পাবে না।

কিন্তু তবুও এখনই চপলাব কাছে যাবে না সে।

বিজনেস ইজ বিজনেস। সে বিজনেসেব মানুষ। সে সঙ্কল্প কবেছে, দ্বিজেনেব কাছে স্বীকাব পেযেছে যে টালিগঞ্জ, আলিপুব, চেতলা, বেহালা বেড়িয়ে আসবে। বেড়ানোটা এমনিই-কোনো ব্যবসাব উপলক্ষ নিযে না, হোক তাই। ফিবতে-ফিবতে বাত এগাবটা বাজবে; বাজুক। কিন্তু দ্বিজেনকে বলেছে সে যে টালিগঞ্জ, আলিপুব, চেতলা বেড়াবে। বলেছে যখন নড়চড় নেই, সেটা দুর্বলতা; এক জন ব্যবসাযীব পক্ষে সে-বকম ঢিলেমি ব্যবসাপথটাই অপবিষ্কাব কবে দেয।

স্টিযাবিং হুইল ঘুবিয়ে হেমেন চলল।

একটা ট্যাক্সি নিযে দ্বিজেন পিছু-পিছু চলল।

বালিগঞ্জ অ্যাভিনিউ-এব দিকে দ্বিজেন যখন মোড় নিল-হেমেন তাব ঢেব আগেই টালিগঞ্জেব দিকে ছুটে চলেছে। দ্বিজেন এ-গোঁযাবকে খুব ভাল কবেই চেনে; বাত বাবটাব আগে ও আব ফিববে না।

দ্বিজেন তেতলায উঠে দেখল চপলা-গড়াচ্ছে।

এই বিবাট মেদকে দেখে প্রথমটা তাব মন কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল; কিন্তু তবুও এই মেদেব নীচে যে হৃদয বয়েছে তা এমন চমৎকাব-এত নমনীয। এই মেযেটিকে নিযে আধ ঘন্টা-এক ঘন্টা-দু ঘন্টা কাটল দ্বিজেনেব। কিন্তু তাব পবে-বাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে-বুকটা কেমন ঢিব-ঢিব কবতে লাগল দ্বিজেনেব। হেমেন যে-কোনো মুহূর্তেই এসে পড়তে পাবে-খট-খট-খট-খট কবে-একটা বেতো টাট্টুব মত।

এমন বিবক্তি লাগতে লাগল তাব।

কিন্তু তবুও বেবিয়ে যেতে হবে-। ড্রযিং রুম থেকে ড্রযিং রুমে অনেক ঘোবে সে বটে, কিন্তু তবুও তাবপব বেবিয়ে যেতে হয। গিন্নিবাও চায যে তাদেব স্বামী আসুক-এ অতিথি বেবিয়ে যাক, বেবিয়ে যাক। বেবিয়ে সে গেলই।

হিশেব-নিকেশ

বাত তিনটে বেজে গেছে-অবনীশেব ঘুম ভেঙে গেল।

এব মধ্যে জীবনেব পঞ্চাশ বছব পেবিয়ে গেছে। এই সেদিনও সে যেন ইস্কুলে পড়ছিল। কিন্তু ইস্কুলেব কথা ভেবে তাব মনেব ভিতব কোনো খাদ নেই; কিশোব দিনগুলো হাবিয়ে গেছে, যৌবন সে আব ফিবে পাবে না এ-সব ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে যায না অবনীশ।

এই পঞ্চাশ বছব কেটে গেল বলেই না ব্যবসা তাব আস্তে-আস্তে এত উন্নত হযে উঠতে পাবল। বছবেব বোঝা এমনি কবে তাব কাছে খুব সহজ হযে ফেঁসে গিযেছে, বর্তমানটা এমনি ভাবহীন, ভবিষ্যত কোনো বোঝা নয।

অবনীশেব ছেলেটি কলেজে পড়ছে-মেযেটি পোস্ট গ্র্যাজুযেট ক্লাশে। ছেলেমেযে এই দুটিই; অনেক চেষ্টা কবেও আব হল না। হয তো হবে- ষাট সত্তব বছব বযসেও মানুষেব ছেলেপুলে হয না কি?

অবনীশেব একটা ফার্মেসি ছিল কিন্তু সেটা তিন বছব হল উঠিযে দিযেছে সে। আবও আগে সে চামড়াব ব্যবসায হাত দিযেছিল। কিন্তু কোথায যেন বাধল। মুর্গি-হাঁস ছাগল-ভ্যাঁড়াব ব্যবসাব চেষ্টা কবেছিল। কিন্তু একদিন অনেক বাতে হঠাৎ উঠে বসে স্ত্রীকে বললে. দেখো এই হাঁস-মুর্গিগুলোব মত আমাদেবও যদি কেউ পুষ্টোলো মুটিযে ডিম পাড়িযে নিযে একসময খাঁচায ভবে হাটে পাঠিযে দেয কেমন হয সেটা? দুজনেই শিহবিত হযে উঠল।

ও সব ছেড়ে দিলে তাবা।

তাব পব থেকে এই এজেন্সিব বিজনেস; অনেক কিছু ছোট লটবহবেব এজেন্ট সে আজ, ব্যবসা ধাপে-ধাপে চলেছে।

এবই মধ্যে দু-একবাব বিলেত ঘুবে এসেছে সে।

অবনীশ উঠে দাঁড়াল।

মাঘেব মাঝামাঝিই শীত নেই আব-কেমন বসন্তেব হাওযা দিচ্ছে, শোবাব ঘবেব জানালাগুলো যা দু-চাবটা বন্ধ ছিল খুলে দিল অবনীশ।

জানালাব পাশে দিযে তাব মস্ত বড় শবীবটাকে বজায বাখল সে। বযস পঞ্চাশ পেবিযে গেছে, মাথায টাক পড়েছে, কিন্তু তবুও মুখখানা কেমন ছেলেমানুষেব মত, গালফোলা একটি খোকা যেন-এমন নিবীহ' অথচ ব্যবসাব মাবপ্যাঁচ এব চেযে বেশি কেউ জানে কি?

সমস্ত মেদচর্বিব শবীবটা যেন একটা তুলোব গদি; গালদুটো তুলোব গদি, পুরু ঠোঁট তুলোব কোলবালিশ; খাঁদা নাক-তুলোব গদি; চোখেব বড় বড় ড্যালা দুটোও যেন দুটো গদি-তুলোব অথবা ভুসিব।

ত্রিশ বছব হল বিযে হযেছে অবনীশেব, সমস্ত গাযেব থেকেই মজে যাওযা বিবাহেব ঘ্রাণ ছড়িযে পড়ছে যেন; এক-এক সময সেটাকে কেমন দুর্গন্ধেব মত মনে হয। কিন্তু তবুও সবসময়ই স্ত্রীই সব নয এমন এক-আধ মুহূর্ত আসে জীবনে-হয তো আজ এই বসন্তেব শেষ বাত্রিই এসেছে যখন মনটা একটু উড়তে চায-কিন্তু কাকে নিযে উড়বে? সমস্ত জীবন ঝেড়েও একটি সুন্দবী মেযেমানুষ খুঁজে পায না সে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে নিযেই যে সর্বদা তৃপ্ত হযে থাকতে হবে শুধু, তাও তো নয। না, না, তা মোটেই নয। কী কববে সে? কোথায সেই মাধুবীময়ীকে পাবে? কিন্তু এ সব খেযাল তাব বেশিক্ষণেব জন্য থাকে না। এখনই সে ভুলে গেছে।

বাস্তাব মোটবগুলোকে দেখছে সে—এত অন্ধকাব থাকতেই এত মোটব বাঁই বাঁই কবে ছুটেছে কেন? হয তো ব্যবসাযেব হিড়িকেই। কী কী ব্যবসাব ফ্যাকবায এগুলো ছুটতে পাবে আন্দাজ কবে ভেবে দেখছে অবনীশ-মস্ত বড় এক লিস্টি হযে গেল-সেই পুবনো লিস্টিটা। যখনই বাত থাকতে জেগে উঠে জানালাব কাছে এসে এই মোটবগুলোব দিকে তাকায অবনীশ এক একঘেযে নিববচ্ছিন্ন লিস্টিটাকে কিছুতেই ছাড়াতে পাবে না সে। এ তাকে আকাশেব তাবা দেখতে দেয না। ভোবেব হাওযাটাকে উপভোগ কবতে দেয না, তাব সুন্দবী মেযেমানুষকেও মাড়িযে ফেলে।

মোটবগুলো কী হতে পাবে?

এক-এক কবে চিনে নিচ্ছে অবনীশ।

সব সময়ই যদি এ-বকম মাথা খাটাতে হয়?

ভোবেব বাতাসে মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা কবে নিতে পাববে না নাকি? -এমন দখিনে বাতাস ছেড়েছে আজ' বিছানাটাব দিকে তাকাল অবনীশ; বিছানাটাকে সে বিশেষ ভালবাসে না। একবাব উঠে পড়লে বসতেই চায না সে-শোযা তো দূবেব কথা।

কিন্তু ক-বাত থেকেই ঘুম ঢেব কম হচ্ছে'

বিছানায গিযে বসল সে।

ঘুমোতে চেষ্টা কবল; হয না। খববেব কাগজেব ছোকবাগুলো চিৎকাব কবছে-বাংলা কাগজ; বাংলা কাগজই সবচেযে আগে বেরুল? অন্ধকাব থাকতেই? বাঙালিব এই ব্যবসাবোধ সে ঈষৎ খুশি হযে চিৎ হযে শুল। অবিশ্যি বাঙালিব একেবাবেই কোনো ব্যবসাবোধ নেই-একটা কামড় খেযে ডান কাৎ ফিবে শুল অবনীশ।

কাব যেন মোটব এসে পাশেব বাড়িব দেউড়িতে ঘ্যাড়-ঘ্যাড় কবছে; মোটবটা কী? ফোর্ড নিশ্চযই; হয তো পেট্রল ফুবিযে গেছে। ঐ তো পেট্রল ভবছে-ভবছে না?

মোটবটাব আওযাজ থেকে সেটাকে মনে-মনে অনুসবণ কবল অবনীশ।

বেলা দুটোব সময অফিস থেকে বেরুল সে।

একটা দিকে যাচ্ছিল-অফিস থেকে মিনিট তিনেকেব পথ হেঁটে গেলে। যাচ্ছিল মোটবেই, খুব আস্তে-আস্তে চলছিল, এমন সময বাখালেব মোটবটা মুখোমুখি।

আন্তবিক আগ্রহে স্টিযাবিং হুইল ছেড়ে দিযে গদিব থেকে উঠে দাঁড়াল সে; মোটবটা ঘ্যাঁচ কবে থেমে গেল অবনীশেব-একটা মহিষেব গাড়িব চাকায ঈষৎ টক্কব খেল।

চোখ গবম কবে গাড়োযানেব দিকে তাকাতে না তাকাতেই চোখ নবম হযে গেল অবনীশেব। মোষটা হয তো তাব নিজেবই-বাখালকে দেখে সে এমনই বেসামাল হযে পড়েছিল। গাড়োযানেব দিকে হেসে তাকিযে তাকে বিদায দিল অবনীশ-মহিষেব গাড়িটাব ওপব পাহাড়প্রমাণ চামড়াব দিকে একবাব হাঁ কবে তাকালে।

এই সবই এক-আধ মুহূর্তেব ভেতব।

আসল হচ্ছে বাখাল; বাখালেব দিকে বিদ্যুৎ ক্ষিপ্রতায ফিবে তাকাল অবনীশ; তাকে সে সঙ্গে নিযে যাবেই-হ্যাঁ যাবেই।

মোটব থেকে মুখ বাড়িযে ছোকবাব (বাখালেব বযস সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ) পাঞ্জাবি চেপে ধবলে অবনীশ।

—'আচ্ছা চলো,' অবনীশেব নাক ববাবব বাখালও চলল। দু-জনেই মোটব বাগিযে আস্তে-আস্তে কাছে গিযে থামল।

চেহাবায তাগদ বযেছে-কিন্তু মনে তেমন কোনো ফূর্তি নেই।

সেও ব্যবসাযী লোক, খুচ-খুচ-খুচ-খুচ কবে কিসেব ব্যবসা কবে সেই জানে; কাউকে বড় একটা বলতে চায না। হয তো সব কিছুব ব্যবসাই কবে, হয তো টাকাব ব্যবসাযই কবে। কাবো চেযে কম চালে থাকে না তো; জীবনে তাব পড়তা ঢেব আছে, অবনীশেব সঙ্গে এমন বনে?

দিন তিনেক পবে একদনি সন্ধ্যাব সময অবনীশেব বাসায গিযে হাজিব হল বাখাল।

শীত একেবাবে কেটে গেছে। অবনীশ তসবেব সুট পবে বেতেব ইজিচেযাবটায পা ছড়িযে বসে চুরুট টানছিল।

বাখাল আব-একটা ইজি চেযাবে বসে পা ছড়িযে দিলে। সেও সুট পবেছে। শীত যে ফুবিযে গেছে মাঘ মাসেই এই তসব তাই প্রমাণ কবে-ভাবছিল অবনীশ।

বাখালকে চুরুটেব বাক্স ঠেলে দিলে অবনীশ। কিন্তু সে সিগাবেটেব কেস বেব কবে বসেছে।'

—'কোথায, বাড়ি এমন থম থম কবছে কেন?'

—'কেউ নেই?'

সিগারেট জ্বালিয়ে রাখাল বললে—'কোথায় গেল?'

—'যেমন যায়-বিকেল হলেই এরা উড়নচণ্ডী সাজে; সন্ধ্যার সময় আমি অফিস করে ফিরে আসি-সন্ধ্যার ঢের এগুতেই এরা বেরিয়ে পড়ে; কোনোদিন আমাকে বা একটু চোখ চেয়ে দেখে, কোনেদিন দেখেও না—, আমি যেন কেউ নই।'

—'এত দেরি করেই-বা অফিস থেকে আস কেন? গোটা তিনেকের সময় ফিরতে পার্ না? এরা কটার সময় ফিরবে?'

—'এম্পায়ারে ছটার পারফরমেন্সে গিয়েছে-সেখান থেকে নিউ এম্পায়ারে নটায়।'

—'এম্পায়ারে কী আজ?'

দুজনেই হাসল; প্রাণ খুলে হাসি রাখালের সঙ্গেই হয়।

রাখাল বললে—'এম্পায়ারে?'

—'নিগ্রো স্পিরিচুয়াল-শুনেছ কোনেদিন?'

—'না, তুমি?'

—'না।'

রাখাল বললে—'ওরা বারটা-একটা করে আসবে তাহলে?'

—'তার আগে কী করে হয়?'

অবনীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে

—'রোজ হয় এই রকম?'

অবনীশ ঘাড় নেড়ে বললে—'হ্যাঁ।'

—'বড্ড একা—'

অবনীশ গলা খাঁকরে বললে—'কর্পোরেশনের সেই টেণ্ডারটা নিলে?'

—'না'

—'আর ই-বি-রেলওয়ের?'

—'পাগল, ও কি কখনো হয়?'

—'না?'

অবনীশ ডান হাতে চুরুটটা তুলে ডান ঘাড়টা নাচাতে-নাচাতে ঠোঁট মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলে-রাখালের জন্য সহানুভূতি বোধকরে দুঃখ পেয়ে-প্রায় মিনিট দুই।

তারপর, রাখালের গলার আওয়াজ শুনেই চুরুটটা মুখে তুললে। কিন্তু ততক্ষণে চুরুট নিভে গেছে।

রাখাল বললে—'ব্যবসায়ের মানে কি জান?'

অবনীশ জানে না কি? তবুও কৌতূহলের সঙ্গে রাখালের মুখের দিকে তাকালে।

রাখাল বললে—'তুমি বলবে জোচ্চোরি।'

—'কক্ষনো না-ব্যবসাকে ডাউন করব আমি? আমার ফার্মকে জোচ্চোর বলব?'

রাখাল বললে— ঠিক জোচ্চোরি নয়, কিন্তু বিদ্বেষ-হিংসা, এই দেখ না'—অবনীশের চরুটটা নিভে গিয়েছিল, কিন্তু সেটাকে সে আপাতত জ্বালাচ্ছে না; তাজ্জব মেনে রাখালের দিকে তাকাল সে।

রাখাল বললে—'এই দেখ, আমি তোমাকে বলছি। সিমেন্টের ব্যবসা তো অনেকেই করে, সকলেই বলে আমার চেয়ে ভাল সিমেন্ট সমস্ত এশিয়ার মার্কেটে নেই। বটে? কিন্তু তবুও জেতে কারা বল তো? ভাল সিমেন্ট যারা চালাতে চায়? ধুত' ভাল কোনো জিনিশ কেউ আবার চালাতে চায় না কি? একি জামাইষষ্ঠী? চালাতে চাইলেও সে আহাম্মক কখনো ব্যবসায়ে জেতে না। জেতে তারাই যারা ভাল-মন্দ পচা-তাজা সমস্ত জিনিশ টিকিয়ে রেখে নিজেদের জাহির করতে পারে। টাকা, টাকা, টাকার জোর আছে যাদের তাদের জিনিশও ক্যাপিটালের জোরে, প্রপাগাণ্ডার চোটে, বড় ফার্মের মার্কা মেরে, সমস্ত বাজার ছেয়ে বসবে। ব্যবসা হচ্ছে এই।'

অবনীশ চুরুটটা জ্বালিয়ে গম্ভীর মুখে বললে—'সিমেন্টের ব্যবসা আমি কোনোদিন করিও নি, জানিও না।'

রাখাল বললে—'ব্যবসাই হচ্ছে এই সিমেন্ট তার পাটকেল।'

অবনীশের চুরুটটা ভাল করে জ্বলে নি; সে আবার জ্বালালে।

রাখাল বললে-'মানুষের ঘরে-ঘরে ভাল জিনিশ পৌঁছিয়ে দেব সে আইডিয়া নিয়ে ব্যবসা চলে না।

আমি সিমেন্টেব ব্যবসা কবছি, তুমি সিমেন্টেব ব্যবসা কবছ, আবো সাতজন কবছে। আমবা কে কাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পাবি এই নিয়ে হচ্ছে কথা। বুঝলে অবনীশ, বাজাবে কে কাকে ঠেকিয়ে বাখতে পাবি খাশা জিনিশেব কেবামতিতে-আব নেহাতই গাযেব জোবে, এই নিয়ে হচ্ছে ব্যবসাব জিত। গাযেব জোব আসে কোথে কে? টাকায। যাদেব ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে তাদেব সঙ্গে পেবে ওঠা তাই এত শক্ত। তাহলে তুমি সিমেন্টেব ব্যবসা কবছ না?'

—'না।'

অবনীশ দু কাঁধ নাচিযে চুরুটে একটা টান দিলে। বললে—'কোথাও স্ট্রাইক ফাইক বাধাবে নাকি? কথাবার্তাব ধাঁচ তো সেই বকম।'

—'স্ট্রাইক বাধাবাব মত শক্তি আমাদেব আছে?'

—'শক্তি লাগে না কি আবাব?'

—'লাগে না? সোজা কথা?'

—'লেবাব ইউনিযনেও তোমাব নাম নেই?'

—'না।'

—'ব্যবসাযীদেব পক্ষে ও-সবেব ভিতব মাথা না গলালেই ভাল।'

অবনীশেব সে কথাব কোনো জবাব না দিযে (বাস্তবিক অবনীশেব লেবাব ইউনিযন-অশ্রদ্ধাকে বাখাল একটুও শ্রদ্ধা কবে না, বাখাল বললে—'বোজ তো টোস্ট খাচ্ছ চাযেব সঙ্গে, কিন্তু কাব পাউরুটি?'

—'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলেব।'

—'না-হয অন্য দশ পাঁচটা হোটেলেব; কিন্তু এগুলো কোনটা যে কোনটাব চেযে খাবাপ বা ভাল তা ঠিক কি পাও?'

—'অত ভাবাব সময আছে না কি? না অত তুলনা কববাব সময আছে?'

—'তা হলে কেন খাও? রুটিওযালা এসে দিযে যায-তাই না? এ রুটি চালাতে পাবে আব অন্যদেবটা পাবে না কেন? তাব পেছনে একটা বড় ফার্মেব, তা সাহেবেব হোক, মুসলমানেব হোক, মাড়োযাড়িব হোক, যাবই হোক না কেন, একটা ফার্মেব জোব আছে বলে? না? কিন্তু নানা বকম রুটি খেযে দেখ, হয তো কোনো ওঁচা মুসলমানেব দোকানেব রুটিই ভাল লাগবে-কলকাতাব, কিংবা ঢাকাব বা ববিশালেব। কিন্তু চালাবাব জো নেই তাব। সে নাজেহাল। যা বলছিলাম। দেখি তো একটা চুরুট।'

—'রুটিব ব্যবসা কবছ নাকি?'

—'কে? আমি? না।'

—'কী কবছ তাহলে?'

বাখাল চুরুট জ্বালালে।

—'কী কবছ আজকাল?'

বাখাল সে কথাব কোনো উত্তব না দিযে বললে—'আবাব আব-একটা জিনিশ তোমাকে দেখাচ্ছি—এও ঠিক ঐ-বকমই।'

অবনীশ বললে-'চা খাবে?'

—'না।'

—'কেন, আবদুলকে বলি।'

—'বলো।'

চাযেব অর্ডাব গেল।

বাখাল একটা ভাবি নিঃশ্বাস ফেলে বললে—'আজ বাঙলা টাইপ বাইটাব হয না কেন?'

অবনীশ চোখ কপালে তুলে বললে—'সে কী কবে হয? বাঙলায?'

—'কেন হবে না?'

—'গা-জোযাবি কবো কেন?'

—'মোটেই গা-জোযাবি না, আমি তোমাকে দেখিযে দিচ্ছি।'

বাধা দিযে অবনীশ বললে—বাঙলা বাইটাবেব দবকাবই বা কী?'

—'খুব দবকাব আছে।'

—'ও নিযে ব্যবসা চলে না অন্তত।'

—'প্রেস নিযে যদি চলে তো এ নিযেও চলবে।'

—'গৌজুবি।'

—'মোটেই না, দেখ না বিলেতে—'

—'বিলেত আবাব—'

—'কথাটা শোনো, টেলিফোন চলল, বেকর্ড গ্রামোফোন চলল, সাইকেল চলল, ড্যাফোল্ড পার্কাব, টর্চ কী না দেশে চলছে? বাঙলা টাইপ বাইটাব চলবে না? এ জিনিশেব একটা দস্তুব মত দবকাব আছে তা তুমি বোঝ না হে অবনীশ?'

অবনীশ একটু ভেবে বললে—'হ্যাঁ, তা চলবে না যে তা নয়; আমি অন্তত একটা কিনতাম। যা হাতেব লেখা বাঙলাব—বেঁচে যেতাম না বাখাল? অমনি অনেকেই কিনত-তা অবিশ্যি বেমিংটনেব মত যদি হত।'

বাখাল বললে—'ঠিক তাই; আমবাও মতলব ছিল তাই; কিন্তু একদিনেই কি বেমিংটনেব মত হয়? আমি যখন প্রথম শুরু কবি টাইপ বাইটাব বানাতে—'

—'টাইপ বাইটাব বানাচ্ছ নাকি!'

—'বছব তিনেক আগেব কথা বলছি-বাংলা টাইপ বাইটাব বানাব ঠিক কবেছি। দু একটা হ্যাঁচকা মেশিন বানানোও হয়ে গেছে এমন সময় খবব পেলাম তিন-লাখ টাকা নিয়ে নাকি কাবা বাঙলা টাইপবাইটাবেব ব্যবসায় নেমেছে-ঠিক বেমিংটনেব মত কল বেব কববে—'

—'বাপবে!'

বাখাল চুরুট টানতে লাগল।

অবনীশ বললে—'বটে? বেমিংটন! কই শুনি নি তো। কী কবলে তাবা? তাদেব কল কোথায় গেল? কিনতে পাওয়া যায়?'

—'ছাই।'

—'বানায় নি?'

—'কী বানাবে? আমাকে চেপে বাখবাব জন্য এত সব। আমাকে হাতই দিতে দিলে না; তিন বছব ধবে পাঁচ-পাঁচবাব চেষ্টা কবলাম-পাঁচবাবই মিইয়ে দিলে। একবাব আমাকে নিয়ে তো গেল তাদেব ফার্ম দেখাতে। দেখলাম। অবিশ্যি তাবাও চেষ্টা কবছিল কল বানাতে, কিন্তু একটা চমৎকাব জিনিশ ঘবে-ঘবে চলতি কবে দেবাব উদ্দেশ্য ওদেব মোটেই ছিল না-ইচ্ছে বাঙলা টাইপ বাইটাব একচোট কবে নিয়ে দো হাতি মেবে নেয়। লাভ-লোকসানেব ধন্দ নিয়ে আর্ট ক্রিয়েশন চলে না। একটা নিখুঁত টাইপ-বাইটাব আর্ট নয় কি? আমাব মন ছিল সেই দিকে, হয়তো বিস্তব লোকশান দিতে হত, লোকশানেব কথা আমি ভাবতে যাই নি। ভেবেছিলাম ক্রমে-ক্রমে ক্রমে-ক্রমে ওদেশী বেমিংটন পোর্টেবেলেব মত বাঙালা পোর্টেবেলেব কদব সকলেই একদিন বুঝবে।'

—'ও-বকম ক'বে কি ব্যবসা চলে?'

এব পব অবনীশেব সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে কোনো কথা বলবাব রুচি ছিল না বাখালেব।

তবুও বললে—'বছব পাঁচেক আগে এক জন ইয়াঙ্কি আমাব কাছে এসে দুঃখ কবছিল।'

'ইয়াঙ্কি মানে?'

—'আমেবিকান।'

—'তোমাব কাছে গিয়েছিল দুঃখ কবতে কী বকম?'

—'হ্যাঁ, ব্যবসা কববে বলেছিল বেঙ্গলে।'

—'বাপবে। আমেবিকা ছেড়ে এইখানে?'

—'ব্যাবাকপুবে গঙ্গাব ধাব দিয়ে অনেকখানি জায়গা অ্যাকোযাবা কববে ঠিক কবেছিল।'

—'কিসেব ব্যবসা?'

—'তেলেব।'

—'তেলেব?'

—'হ্যাঁ।'

—'পেট্রল বলো।'

—'নাবকোল তেলেব।'

—'নাবকোলেব তেল?'

বাখাল বললে—'অবিশ্যি এক জন বিদেশী এসে আমাদেব দেশী ব্যবসা কেড়ে নেবে এ আমাদেব

সহ্য হয না। সে আমাদেব খাঁটি তেল দিলেও, খুব শস্তাতে দিলেও সেটা সত্যিই বড় বিশ্রী লাগে, নিজেদেব এমন হীন মনে হয। কিন্তু ব্যবসাকে যদি একটা অ্যাবষ্ট্রাকট জিনিশ বলে ধবো, বাস্তবিক বিজনেস একটা আইডিযাল আর্টেব মত একটা আইডিযাল, এভাবে দেখতে গেলে, এই ভাবেই দেখা উচিত, সেই আমেবিকান বেচাবিব তিন লক্ষ টাকা সমস্ত লোকে মিলে যে নষ্ট কবে দিলে সে জন্য দুঃখ হয না।'

—'ইযাঙ্কিটা গাধা।'

—'গাধা তো বটেই।'

—'মাদ্রাজে ফাঁদা উচিত দিল।'

—'তা হলে আবো গাধামি হত।'

—'মাদ্রাজেই তো নাবকোলেব গাছ।'

—'কিন্তু বাঙালিব চেযে মাদ্রাজিবা ঢেব ছুঁচো। আমাব ষোল হাজাব টাকাব মবিচও একবাব ঐ বকম কবে নষ্ট হযে যায।'

—'ষোল হাজাব টাকা দিযে কিনেছিলে মবিচ?' হো-হো কবে হেসে উঠে অবনীশ বললে।

বাখাল বললে—'তিন বাব কিনেছিলাম; প্রথম দফায দু লাখ টাকা নেট প্রফিট।'

অবনীশেব চক্ষু স্থিব হল। বললে—'মবিচ বেচে?'

—'শুকনো মবিচ।'

অবনীশেব এক-এক সময মনে হয ব্যবসাব সে কিছু জানে না-শুধু কলেব মত এজেন্সিই কবে যাচ্ছে; শুধু বিল কাটছে; নাম সই কবছে শুধু। টাকা আসছে অবিশ্যি-টাকা আসছে ঢেব। কিন্তু তবুও জীবনটা কি শুধু এই?

বাখালেব কাছে, ব্যবসা, সে বললে, একটা আর্ট। বাস্তবিক আর্টেব মানে কি জানে অবণীশ? পোস্ট গ্র্যাজুযেট ক্লাসেব স্টুডেন্ট কুন্তলা তাব চেযে ঢেব বেশি জানে; সে প্রাযই বলে 'আর্ট' কিংবা 'আর্ট মাটি কবলে'—এক-একটা গান শুনে, এক-একখানা বই পড়ে। গভীব অভিনিবেশেব ভিতব ডুবে যায মেযেটি। নিশ্চযই খুব নিখাদ বস পায-নিখাদ-অতল-কিন্তু ব্যবসা কবতে গিযে এবকম বর্ণনাতীত পবম বস কোনোদিন পেল না তো সে। চুরুটটা জ্বালালে অবনীশ; ব্যবসা তাব কাছে বিজনেশমাত্র। লেনদেন, হিশাবপত্র, অনেক খানি পবিশ্রম, ঢেব ঝক্কি; কখনো-বা শুধু খোলা পাখাব নীচে ঘন্টাব পব ঘন্টা ঝিমুতে-ঝিমুতে বসে থাকা। তাব ফার্ম না হলে তাব চলে না বটে—কিন্তু তাতে পেট-ভাতেব প্রশ্নটাই নাড়া দিযে ওঠে বেশি। কিন্তু কুন্তলাব যেন ভাত-ডাল না হলেও চলে। চলে এমনই সব আর্ট, আর্ট ক্রিযেশন, আর্ট কনসেপসনেব নানা বকম বস দিযে। জীবনকে নানা দিক দিযে ভবে বেখেছে তাবা। এ সব বোঝে না অবনীশ। যদিও সেও গ্র্যাজুযেট।

কিন্তু তবুও জীবনে তাব কোনো আর্ট নেই। বাখাল সেদিন বলেছিল ব্যবসাকে যদি একটা আবসট্র্যাকট জিনিশ বলে ধবো, ব্যবসা একটা আইডিযাল, আর্টেব মত একটা আইডিযাল।

এ সব বোঝে না কিছু সে।

অনেক দিন হয নভেল পড়া ছেড়ে দিযেছে সে।

বই পড়াই এক বকম ছেড়ে দিযেছে-মাঝে-মাঝে এডনাব ওযালেসেব দু-এক-খানা চলে, বাস্তবিক, এডনাব ওযালেসেব শ দেড়েক বই তো প্রায শেষ কবেছে সে-এমন চমৎকাব, আবো কিছু-কিছু এ ধবনেব চমৎকাব বই-এব নাম কবতে পাবে সে।

এই বইগুলো নিযে সময তাব বেশ কেটেছে।

কিন্তু কুন্তলা ঠাট্টা কবে অবনীশেব হাতে এই সব বই দেখলে। কেন? বোঝে না অবনীশ।

কুন্তলা এসে প্রাযই এক-একখানা নতুন বই অবনীশেব হাতে তুলে দেয। বলে, 'এবাব প্রাইজ পেযেছে, পড়ে দেখো।'

—'না।'

— সে আবাব কী?'

কুন্তলা এমন ঠোঁট কোঁচকায' বাখালও বলতে পাবে না এ-সবেব মানে কী। অবনীশদেব এজেন্সিব কোনো লোকই জানে না।

কুন্তলাকে সে জিজ্ঞেস কবে না।

বইগুলো দু-এক পাতা উল্টে দেখে অবনীশও বোঝে না কিছু। বাস্তবিক কিছু বোঝে না কেন?

সৌমেনও তো বোঝে।

এই কি আর্ট? এই বইগুলো? এই সব বই আর্ট নিয়ে জীবনটাকে খুব মস্ত বড় সাধানায় ভবে ফেলেছে না কি ওবা? অবনীশেব চেয়ে কি তাব ছেলে-মেয়ে এতই উঁচুতে চলে গেছে?

সকলেব চেয়েই উঁচু ওবা? ওদেব সাধনা, সাধ, কল্পনা বড়?

হোক তাই।

করুক ঠাট্টা। আজও হুইলাবেব স্টলেব থেকে একটা বই এনেছে সে। পড়ে শেষ কবেছে। এ বই যদি আর্ট হয় তা হলে আর্টেব বস পেয়েছে সে। আর্টেব মানে বুঝেছে সে তা হলে?

অবনীশ চুরুট জ্বালালে। মনে তৃপ্তি পাচ্ছে।

কিন্তু তবুও সে জানে এ আর্ট নয়—অন্তত কুন্তলা-সৌমেনেব সাধেব জিনিস এ-বই নয়; আগ্রহ কবে এ বই কিছুতেই পড়ত না তাবা। কুন্তলা ছিঁড়ে ফেলে দিত। -ইস!

মনেব ভিতব কেমন উশখুশ কবতে লাগল অবনীশেব। দু মিনিটে মনেব পবিতৃপ্তি হাবিয়ে গেল তাব।

সন্ধ্যাব সময় আজও বাড়িতে কেউ নেই। বইখানা পড়ে সে আবাম পাচ্ছিল অবনীশ। আস্তে-আস্তে তাও নাই হয়ে গেছে।

অমলা তাকে এমন একা বেখে চলে যায় কেন? এই-ই বধূ ভালবাসে যেন। অবিশ্যি অবনীশেব জীবনে অমলা যে একেবাবে অপবিহার্য তা নয়; বাস্তবিক -দেখতে গেলে অমলাব কাছ থেকে কতটুকুই-বা চায অবনীশ? এই চায যে সে বেঁচে থাকুক-অবনীশেব ঘবে অবনীশেব বধূ হয়ে বেঁচে থাকুক সে, এইটুকু মাত্র। এইটুকু ঠিক বযেছে জানতে পাবলে দিনমানেব ভিতব স্ত্রীব সঙ্গে একবাব না দেখা হলেও চলে যেন তাব।

অমলা তাব বধূব কর্তব্য কবে গেলেই শুধু হয় যেন; স্বামীকে সে না ভালবাসলেও হয় যেন; বাস্তবিক স্বামীকে ভালবাসে কি সে?

নিজেও কি অমলাকে ভালবাসে অবনীশ?

বেশ বেশ, কেউ কাউকে না ভালবাসলেও চলে; ভালবাসাবাসিব বযস শেষ হয়ে গিয়েছে—দু জনেবই। এখন অবনীশ শুধু চায যে অমলা অন্য কোনো পুরুষেব সঙ্গে ফ্যাকবা না বাধিয়ে বসে-কেলেঙ্কাবি না কবে। এই-ই কি শুধু চায? আবও চায। চায, অবনীশেব অসাক্ষাতে অন্য পুরুষেব সঙ্গে অমলা একটু-আধটু উচ্ছ্বাস কবলেও করুক—কাবো কিছু বয়ে যায না তাতে; কিন্তু অবনীশেব চোখেব সামনে তাকে উপেক্ষা কবে অন্য কোনো পুরুষেব জন্য একটুও আগ্রহ দেখাতে যায না অমলা। সেটা অবনীশ সহ্য কবতে পাববে না—বধূকে সে ভালবাসে বলে নয, কিন্তু অন্যেব সামনে স্বামীব প্রতি তাব ভালবাসাব নিদর্শন অমলা ক্ষুন্ন কবছে বলে। মনে-মনে অবনীশকে যতই অপ্রেম করুক না কেন বধূ, পবেব সামনে একচুল ত্রুটিও বড় অপমানজনক।

এমনি কবে প্রেম বিসর্জন দিয়ে এবা দু জনে চলেছে-কিন্তু কেউ জানে না। অবনীশ তাই তৃপ্ত।

ব্যাপাবটা মোটামুটি এই।

সিগাবেট কেস বেব কবলে অবনীশ।

অমলা আজও হয তো বাযস্কোপ দেখতে গিয়েছে, কিংবা থিয়েটাবে গিয়েছে, কিংবা কোথাও বেড়াতে গিয়েছে, সিগাবেটটা না জ্বালিয়ে দাঁতেব ফাঁকেব ভিতব অনেক ক্ষণ ধবে সেটাকে চেপে বাখল অবনীশ, ঘবদোবেব ভিতব চাবদিকে কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই, মনটা তাব আজ কেমন গম্ভীব বিষন্ন হয়ে উঠেছে, এমনি হৃদযেব ভিতবই ভালবাসাব জন্ম হয। হয তো ক্ষণিকেব জন্য। কিন্তু তবুও মনেব এই গুরুতা, বিষাদ নিয়ে কোনো এক জনকে এমন গভীবভাবে ভালবাসা যায! মনে হচ্ছিল অবনীশেব।

কাকে ভালবাসবে সে?

লক্ষ বাবেব মত আজও একবাব মনেব অতলে খতিয়ে দেখল সে যে জীবনে তাব কোনো ভালবাসাব পাত্রী নেই, কোনোদিনই হয তো ছিল না। কিন্তু এমনি সময অমলা এসেও যদি পাশে দাঁড়াত, একা, এই অন্ধকাবে, এমন নিস্তব্ধতায, যে-বেনাবসি শাড়ি পবে সে বেবিয়ে গেছে সেই শাড়িব গন্ধে এই বাতাসটাকে ভবে ফেলে, তা হলে বধূকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসাতে পাবত, অবনীশ তাকে বুকেব ভিতব নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধবে এমন নিঃসঙ্কোচে বলতে পাবত তোমাব চেয়ে পৃথিবীতে আব কাউকেই ভালবাসি না আমি অমল-কোনোদিনও বাসিনি!

তিন-চাব দিন বিশেষ কাবো সঙ্গে আব দেখা-সাক্ষাৎ হল না অবনীশেব। তাবপর এক দিন দুপুববেলা বাখালেবই মোটবটা বোধ হয-অবনীশেব মোটবটাকে কেটে যাচ্ছে।

বাপবে বাখালেব কী ব্যস্ততা—'এই।'

অবনীশেব ডাক বাখালেব কানে পৌঁছল না।'

গলা খাঁকবে অবনীশ ডাক দিল—'এই-এই-এইযো বাখাল?'

বাখাল হাত তুলে হাসি মুখে বললে—'বড্ড ব্যস্ত; সন্ধ্যাব সময যাব; সন্ধ্যাব সময বাড়ি আছ না কি?'

আজও তসবেব সুট পবে পা ছড়িযে চুরুট ফুঁকছে অবনীশ। আজও বাখাল এল সেই পামবিচেব সুট পবে।

সব দিকেই এমন একঘেযেমি, এমন বিমর্ষতা, শূন্যতা। শুধু সাবা দুপুব বাখাল কী নিযে ব্যস্ত হযে ঘুবছে জিজ্ঞেস কবতে গেল না অবনীশ। মনেব ভেতব তাব পবেব ব্যাপাব নিযে বিশেষ কোনো কৌতূহল নেই আজ আব। নিজেব অন্তবেব ভিতবে ঢুকে আজ বিকেলেও যত ঢুই-ঢুই-ঢুই-ঢুই করে মাথা খুড়ে মবছে সে কিসেব জন্য, না জানি কিসেব জন্য এই বাতাস, বসন্তেব সন্ধ্যা, নিস্তব্ধতা, অন্ধকাব, মানুষকে ডেস্কে বসে বাতি জ্বালিযে স্বাধীন সহজভাবে কাজ কবতে দেয না, পড়তে দেয না, কিছু না। অমলা আজও নেই।

থাকলেও তাকে দিযে কিছু হত না যেনও-কোনো সাহায্য পাওযা যেত না একেবাবেই যেন। তাকে দিযে কী আব হত।

গুমবে মন ভবে উঠছে।

আবদুল দুজনেব জন্যই ঢেব রুটি-মাখন-কাটলেট-মাংস-কলা-আম-কেক-চা নিযে এসেছে।

অবনীশই আগে শুরু কবল-বাখালও ছুবি কাঁটা ধবল।

অবনীশ বললে—'জানলে বাখাল, বুঝি না কিছু। কেন যে এমন হয?'

—'কী হয?'

—'বলছি তোমাকে। উনিশ শ তিন সালে বি-এ পাশ কবলাম। সেই থেকে আজ অব্দি ব্যবসা কবছি। ব্যবসাতে যথেষ্ট উন্নতি হয নি খুব? হযেছে তো হযেছে। ধাপে-ধাপে উঠে গেছি, উঠে গেছি, উঠে গেছি; এই ট্রেড ডিপ্রেশনেব দিনে একটু থমকে গেছি বটে। কিন্তু এ সবে আমাব ব্যবসায কোনো লোকেব ক্ষতিও হয না। দেদাব টাকা বোজগাব হযে গেছে। এখন ছেড়ে দিলেও পাবি।'

বাখাল বললে—'ছাড়বে কেন?'

—'না। ছাড়ব না। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই-কেমন ভাল লাগে না যেন।'

—'সত্যি?'

—'কেন ভাল লাগে না বলো তো?'

—'কী ভাল লাগে না?'

অবনীশ সবাসবি কোনো জবাব দিলে না।

সে ভাবছিল।

খানিকক্ষণ পবে বললে, 'আগে এ-বকম ছিল না। অফিসে যেতাম, ফিবে আসতাম, ফুবিযে যেত। টাকা ব্যাঙ্কে জমত, পবিবাবেব বেস্পেক্‌টিবিলিটি বজায থাকত, ব্যস্‌ আব চাই কী?'

বাখাল বললে—'আবাব কী চাই?'

অবনীশ বললে—'তোমাব এখনো তাই মনেহয? আমাব হত। কিন্তু এতদিন ধবে—

একটু থামলে অবনীশ, তাব পব বললে—'দেখো, যতদূব সাধ্য সবই তো কবেছি। গবিবেব ঘবে জন্মে পবিশ্রম ও চবিত্রেব জোবে আজ আমি নানা বকম ফার্মেব ফার্মাসিব জিনিশেব এজেন্ট-হয তো বেশ বড়ই। কী বলো? প্রায দেড়-দু লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে; দু-চাব বাব বিলেত ঘুবে এলাম। একটা পজিশন হযেছে। কোনো বদ খেযাল নেই। ছেলেমেযেদেব ভাল এডুকেশন দিচ্ছি; ওবাও কেউ বিগড়ে যায নি। সৎ লোকেব সঙ্গে মিশি, ওবাও মেশে। সাধুপ্রসঙ্গ কবি-ওবাও তাতে যোগ দেয। সমাজেব ভিতব এ পবিবাবেব আদব বযেছে; একটা মোটব গাড়ি আছে, ফোর্ড, সেটাকে বদলে—'

—'হুইপেট কিনো।'

—'তুমি এজেন্ট না কি-হুইপেটেব?'

—'না, তবে সুবিধে কবে দিতে পাবি।'

—'যা বলছিলাম। ফোর্ডটা পাল্টে একটা অস্টিন কিনব ভাবছি; মানে অবস্থা আরো ভাল হচ্ছে। বালিগঞ্জে বাড়ি করলাম। শরীর বেশ সুস্থ। ক্লাবে যাই। ব্রিজ খেলায় প্রায়ই রাবার করি। প্রায়ই ব্রিজ খেলি। চুরুট খেয়ে তৃপ্তি পাই। অনেক চুরুট খাই। কিন্তু তবুও এ কয় দিন ধরে কেমন একটা—'

আবদুল এসে বললে—'আর কাটলেট দেব? গরম ভাজা হয়েছে।'

অবনীশ বললে—'নিয়ে এসো।'

অবনীশ বললে—'কী হল আমাব বলো তো রাখাল।'

—'অমলা কী বলে?'

—'কী বলে তা তো দেখছই, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কত খানি সে বাড়ি থাকে?'

—'আজও নেই?'

—'কেন জিজ্ঞেস করছ মিছে?'

—'এম্পায়ারে?'

—'কোন ড্যাম্পায়াবে কে জানে।'

রাখাল অনেক দিন থেকেই এদের দু জনকে আন্দাজ কবে আসছিল। এদের সম্বন্ধেব মধ্যে যে রাখা ঢাকা চমৎকার বিচ্ছিন্নতা আছে তা সে বুঝেছে। অবশ্যি কোন সম্বন্ধের ভিতরই-বা বিচ্ছিন্নতা নেই? ভালবাসা কোথায় আছে জানে না রাখাল। থাকলে ক-দিনই-বা তা টেঁকে? একটা জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হয়। নিজেও তাই সে চালাচ্ছে। রাতদিন দিনবাত তেমনি করেই চালাচ্ছে সে। কিন্তু তবুও স্ত্রী তার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু অবনীশ আব অমলা এমন ভাবে চালিয়েছে যে এদের সম্পর্কের ভিতর কোথাও কোনো চিড় কারো চোখে কোনোদিন ফুটতে পাবে নি।

—'এ কদিন ধরে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে ছিল না।'

—'না।'

—'ও কেটে যাবে'

—'সত্যি?'

—'তা না তো কী? এ বকম গজকন্দা চেহাবার মানুষেব মনেব বিমর্ষতা বেশি দিন টেঁকে না।'

অবনীশ ফ্যা-ফ্যা কবে হেসে উঠল।

বাখাল বললে-'এদেব মনের কথা আহলাদি পুতুলেব দুঃখ-শোকের মত-আহলাদি পুতুল দেখেছ?'

অবনীশ ফুঃ-ফুঃ করে হাসতে-হাসতে বললে—'দেখেছি। বাস্তবিক, আমার মনে হয় গোমড়ামুখো হয়ে থাকব কেন? এ বকম পজিশন, টাকাকড়িও যদি না থাকত, শুধু যদি এই জানতাম যে সারাজীবন ভগবানে বিশ্বাস বেখে, সৎপথে চলে, অক্লান্ত পবিশ্রম কবে এসেছি তা হলেও, ব্যস, আমাব মুখেব হাসিটা কেউ কাড়তে পাবত না—'

কুড়ি-পঁচিশ বছবের বিবাহিত জীবনেব অপ্রেমটাকে বেশ কৌশলেব সঙ্গে ঢেকে দিয়েছে-অমলা। সংযমও যথেষ্ট দেখিয়েছে অবনীশেব বধূ। তাব নামে কোনো কলঙ্কেব কথা নেই তো-কোনো ইশাবা অব্দি নেই। আব অবনীশটা!

এই কোলাব্যাঙ আবাব কী কলঙ্ক কববে?

তত দূব কল্পনা আছে তার? বুদ্ধি আছে? শক্তি আছে? সাহসই-বা কোথায আছে?

সংযম ও সহিষ্ণুতাব কথা অবনীশের সম্বন্ধে তাই একবারেই ওঠে না; অন্তরাত্মাব গভীব বেদনা যে কী এ লোকটি জন্মে-জন্মেও তা বুঝবে না। অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছুবি কাঁটা ছেড়ে দিল বাখাল। খাওযা শেষ হয়ে গেছে। রুমালে মুখ মুছে কী করবে অতঃপর? অবনীশের সিগারেটের টিনের থেকে একটা সিগাবেট টেনে, জ্বালিয়ে, ফুঁকতে-ফুঁকতে সে বিদায হল। খুব অভদ্রতা হল বটে-কিন্তু তবুও এ লোকটিব জন্য কোনো সান্ত্বনা বা কৃতজ্ঞতাব কথা মুখ ফুটে বেরুতে চায না যে!

রাস্তায নেমে রাখাল ভাবল-এর পর থেকে অমলাকে অবসব মত একটু-আধটু দেখবে সে-না-হলে মৃত্যু অব্দি এমন একাদশী করে মববে মেয়েটা?

কথা শুধু—কথা, কথা, কথা, কথা, কথা,

ভবশঙ্কর একটা মস্ত বড় বাঙালি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান কিন্তু প্রত্যেক মিটিঙেই সেক্রেটারি তাকে প্যাঁদায়।

প্যাঁদাবে। বিজনেসের কী জানে সে?

সেক্রেটারি একটা ছেকরা-বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর হবে। কোনোদিন বিলেত যায় নি, কোনো ডিগ্রি নেই। কিন্তু তবুও সবাই তাকে এমন সমীহ করে চলে। আঠার বছর বয়স থেকে সে নাকি ব্যবসা করছে; এমনই চাঁই হয়ে উঠেছে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে।

ভবশঙ্কর ভাবছিল এ-রকম সেক্রেটারির তাঁবেদারিতে চেয়ারম্যান থেকে কী হবে? প্রত্যেক মিটিঙেই তার অপমানের আর শেষ থাকে না; সে রিজাইন দেবে ঠিক করেছিল। তিন-চার বছর ধরে সে রেজিগনেশন লেটার পকেটে করে মিটিঙে যায় কিন্তু সেক্রেটারি যখন তার নাক-কান কেটে অপমানের চূড়ান্তও করে তখনও চিঠিখানা সে বের করে না, কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে থাকে, গলা খাঁকরে নিয়ে এই বোধ করে যে তবুও সে-ই তো চেয়ারম্যান। সেই পরম প্রতিষ্ঠার চেয়ারেই বসে রয়েছে তো সে, তাকে রিজাইন দিতে ডিরেক্টর বোর্ডের কেউ কোনোদিন তো ইশারাও করে না। দেশের কাছে এত বড় একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান সে-মৃত্যু অব্দি তাই সে থাকুক। এ সার্থকতার [লোভ] কিছুতেই সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সেক্রেটারির হুমকি হজম করে যায় ভবশঙ্কর।

কিন্তু ভবশঙ্কর যে ব্যবসা না জানে তা নয়-অন্তত তার সমস্ত প্রাণমন এই-ই বুঝতে ভালবাসে যে ডাক্তারিতে যেমন তার দক্ষতা ছিল, ব্যবসায়ও ঠিক তেমনি মাথা আছে।

গঙ্গাধর মিত্তির, নর্টনের আমলের ব্যারিস্টার, বছর দশ-পনের হল হাইকোর্ট বন্ধ করে ব্যবসা করছে-ভবশঙ্কর, বাবুর দেউড়িতে এসে মোটর থামাল। এই গরমে তসরের সুট পরে বেরিয়েছে মিত্তির। স্টিক ঝুলিয়ে সোজা তেতলায় চলে গেল।

ভবশঙ্কর নাম সাইন করছিল-চোখ বুজে নয়-প্রত্যেকটি চিঠিপত্র, দলিলের প্রতিটি শব্দ, চোখের ফরশেপ দিয়ে বিঁধে-বিঁধে। এ খুব গভীর অভিনিবেশের কথা, মিত্তির তাকিয়ে দেখে একটু হাসল।

মিত্তির এসেছে-তাকে খাতির করে বসালে ভবশঙ্কর।

কথা, সেই পুরোন কথা শুরু হল। মিত্তিরের সঙ্গে ভবশঙ্করের জমে বেশ, একে তো মিত্তির সেই নর্টনের আমলের ব্যারিস্টার, নিজে যেমন ভবশঙ্কর মহেন্দ্র সরকারের সঙ্গেও ডাক্তারি করেছে। এর ওপর ভবশঙ্করের মত মিত্তিরও দু-তিন লাখ জমিয়ে রেখেছে প্র্যাকটিস করে। দু জনেই গরিবের ছেলে ছিল- দু জনেই বড়লোকের বাপ হয়েছে। শেষ বয়সে দু জনেরই ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। এত সব তো হল কিন্তু আসল হচ্ছে মিত্তিরের মতন এমন লোক আর নেই। শুধু ব্যবসার দুঃখ-শোকই নয়, শুধু ডাক্তারির দুঃখ-শোকই নয়,-ভবশঙ্করের পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের, যে-কোনো সুখ-দুঃখের কথা এমন নিঃসঙ্কোচে মিত্তিরকে বলতে পারা যায়, সে এমন হাসিমুখে গ্রহণ করে, এমন সহৃদয়ভাবে সান্ত্বনা দেয়, যে মনে হয় পৃথিবীতে আর-কোনো বেদনা নেই যেন!

অথচ সব এমন গোপন রাখতে পারে।

কতকগুলো কপচানো কথা আবার হচ্ছে।

—'ডাক্তারিতে কেমন করে রাইজ করলাম জানো মিত্তির?'

মিত্তির অনেকবার এ কথা শুনেছে তবুও আর-একবার শুনবার জন্য মুখ তার আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল।

ভবশঙ্কর বললে-'বিলেত গেলাম না, কিছু না, এখানেও এম-ডি ডিগ্রি অবদি নিলাম না। ও-সব শুধু ফোঁপরদালালিতে কী হবে? এম-এম-বি-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট-এই নিয়েই—'

ভবশঙ্কর কাশলে।

মিত্তির বললে—'আমিও তো শুধু ডিনার খেয়ে ব্যারিস্টার'।

ভবশঙ্করের মানে একটু আঘাত লাগল, বললে—'না, না। এটা ঠিক যে তোমাদের সাবেকি ব্যারিস্টারি বিদ্যার চেয়ে সেকালের এম-এ-এম-বি-তে কাঠখড় পোড়াতেই হত ঢের!'

মিত্তির স্বীকার করলে, বললে—'তা তো বটেই, তা তো ঠিকই-তাছাড়া তুমি নিজেও স্টাডি করেছ কত, শুনেছি আয়ুর্বেদও পড়ো, নাকি বেদও পড়েছ। চর্মচক্ষেও কোনোদিন দেখলাম না।'

—'বেদ দেখ নি?'

—'না।'

—'কী যে বলে!'

—'কিন্তু কথা হচ্ছে যে মেডিসিনের প্র্যাকটিসেও এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি-তে যেমন কিছু এগোয় না ব্যারিস্টারিতেও তেমনি ডি-এল, সি-সি-এলে কুলোয় না কিছু—'

ভবশঙ্কর ঘাড় নেড়ে বললে—'না।'

—'আসল হচ্ছে...মাদার উইট-এর বাংলা কী বলো তো?'

—'কিসের?'

—'মাদার উইটের—'

ঈষৎ অভিনিবিষ্ট হয়ে বললে—'মাদার উইটের?'

—'হ্যাঁ; তোমার তো ঢের দেশী ভাষা জানা আছে। বেদ-টেদও তো পড়েছ।'

ভবশঙ্কর ঘাড় নোয়াল; মাথা চুলকোল, মিনিট পাঁচেক পরে বললে—'ও বিলিতি বুকনি—ওর কোনো বাংলা নেই মিত্তির।'

—'আমিও তাই ভেবেছিলাম-''কাণ্ডজ্ঞান,'' ''বোধ'', যাই বলো আর তাই বলো মাদার উইটের মত জোর ও-সব শব্দে ভিতর নেই।'

—'এক হিশেবে; অন্য হিশেবে আবার ও-সব শব্দই মাদার উইটকে মাদার কাটা দিয়ে প্যাঁদাবে।'

এদের দু জনের তফাৎটা শুধু এইখানে। দেশী, দেশজ জিনিসের ওপর ভবশঙ্করের ভয়ানক টান; মিত্তির মনে-মনে এই-ই হৃদয়ঙ্গম করে।

ভবশঙ্কর বললে,—'ছোট একখানা আটচালা ছিল যখন শুরু করলাম।'

—'মফস্বলে প্র্যাকটিস করতে বুঝি?'

—'ফরিদপুরে।'

—'আমারও আলিপুরে প্রথম শুরু।'

—'আলিপুর আর ফরিদপুর? আলিপুর তো একটা জায়গার মত জায়গা।'

—'আ-হা ভবশঙ্কর! তখন শ্যামবাজারের থেকে ঘোড়ার ট্রামে করে নামতাম গিয়ে তোমার—'

—'তবুও তো ট্রাম। আমি কত কাদামাঠ আদার-পাঁদাড় ভেঙে প্র্যাকটিস করেছি তা জানো তুমি?'

সবই জানো সে।

মিত্তির সে-সব ঢের শুনেছে; আরো একবার ভবশঙ্করের জীবনের গোড়া-পত্তনের দুঃসহ দুঃখ ও সংগ্রামের কথাগুলি শুনছে; বাস্তবিকই নিজের জীবনে এত যুদ্ধ করে নি সে; কিন্তু তবুও বিদেশী বড়-বড় লোকদের কাছে ভবশঙ্করের এই দেশী দুঃখকষ্ট এমন চিটে গুড়ের মত মনে হয়। এই ভবশঙ্কর এত টাকা জমিয়েও আজও মোটর করল না-ঘোড়ার গাড়িতেই সে তৃপ্ত, আজীবন গলাবন্ধ গরদের কোট পরেই কাটাল সে, সমস্তটা জীবন কলকাতা শহরের দেশী পাড়ায়ই থেকে গেল। এ সবের জন্য অবিশ্যি ভবশঙ্কর, মিত্তিরের কাছে, কম আদরের জিনিশ নয়। কিন্তু তবুও এ মানুষটির সঙ্গে গলায়-গলায় খাতির জমাতে গিয়ে মিত্তিরের রসপ্রবণ প্রাণ মাঝে-মাঝে কোথায় কেমন যেন একটু হুঁচোট খেয়ে ব্যথা পায়।

ভবশঙ্কর বললে-'কিন্তু চেষ্টাই সব নয়-কপাল বলেও একটা জিনিশ আছে, মিত্তির। এই দেখো, আমার ছেলে এখান থেকে এম-ডি ডিগ্রি নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করল। কত ব্যাক করলাম, কত কী, কিন্তু কিছু না। তার পর দিলাম বিলেত পাঠিয়ে। দু-চারটে ডিগ্রি এনেছে, হার্লি স্ট্রিটের ডাক্তাররা অবদি তারিফ করেছে। কিন্তু কই, সপ্তাহান্তে একটি-দুটি কল টিক-টিক করে কি না সন্দেহ, হয় তো পনের দিন হা করে বসে আছে।'

মিত্তির বলল—'ক-বছর হল প্রাকটিস করছে?'

—'এই তো দশ বছর।'

মিত্তির একটা চুরুট বের করে বললে—'ব্যবসাতেও যেমনি, ডাক্তারিতেও তাই, ব্যারিস্টারিতেও তাই। মেরিটের ওপর বিশেষ কিছু নির্ভর করে না, ভবশঙ্কর। আমি যখন ব্যারিস্টারি শুরু করলাম এটা ঠিক সত্য জেনে নিলাম যে আমি কারো চেয়ে খাটো নই। বাস্তবিক দু-একজন একসেপশনাল লোক ছাড়া আর-সবাই সমান। সবাই যখন সমান তখন এগুতে হলে এদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

—'ঘাড় ধাক্কা কী রকম?'

—'তুমি নিজের জীবনেও যথেষ্ট দিয়েছ।'

—'কাদের?'

—'অন্য ডাক্তারদের।'

উত্তেজিত হয়ে ভবশঙ্কর বললে—'অন্যায়ভাবে কোনোদিনও চলি নি।'

—'চলেছ, কিন্তু বোঝো নি।'

বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভবশঙ্কর মিত্তিরের দিকে তাকাল।

মিত্তির বললে—'বছরের পর বছর প্র্যাকটিস যতই জমতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম যে স্তূপীকৃত উকিলেব শবের উপর দিয়ে চলেছি; এদের আমিই মেরেছি, স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়; কিন্তু তবুও মারতে হয়েছে; নিজের জন্য সফলতা পেতে হলে অপরকে না মেরে উপায় নেই।'

ভবশঙ্কর বললে—'ফেরেব্বাজ উকিলদেব ধর্ম তো আর আমাদের নয়।' মিত্তির ঈষৎ হেসে বললে—'হাকিমদের ধর্মই শোনো, লোকে তো তাদের ধর্মাবতার বলে, কী করম কবে তারা তৈরি হয়, শোনো—'

এ ধবনের প্রসঙ্গ শুনবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না ভবশঙ্কবের। অন্যায্যতার ওপর খানিকটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার সম্পর্কে কিছু-কিছু তারও তো মনে হযেছে। কিন্তু সে জিনিশটাকে এমন উদঘাটন করা কেন? ঘাঁটিয়ে-ঘাঁটিয়ে শোনানো কেন তবে? লোকসমাজে, এমন কি মিত্তিবেব কাছেও, নিজেব নিছক বৈঠকখানাযও, নিজেকে একজন ধর্মন্যাযের চাঁই বলেই তো জানে ভবশঙ্কব! অন্তত অন্যবা তা সম্পূর্ণরূপেই জানুক এই-ই বুঝতে ভালবাসে ভবশঙ্কর।

মিত্তিব শুরু কবলে—'আমাব সেজো ছেলেকে তো হাকিম কবেছিলাম—'

—'হাকিম করেছিলে?'

—'মুন্সিগঞ্জে পোস্টেড্; মুন্সেফ—'

—'ওঃ'

—'সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ; সেকেণ্ড ক্লাস বি-এল। কত ফার্স্ট ক্লাস বি-এল, ফার্স্ট ক্লাস এম-এদেব উতরে সে পেলে। হয বিধাতা মাবলেন, না-হয আমার ছেলে মাবল, না-হয আমি মারলাম। কিন্তু ওদের মরতে হল যে সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি ভবশঙ্কব, এই যে-ফার্স্ট ক্লাস গ্র্যাজুযেটগুলো মুনসেফি পেলে না, বুড়ো বযস অবদি কোনো একটা দেশী স্কুলেব হেডমাস্টারিতে ঘষড়াবে আর আমার ছেলে হবে তখন ডিস্ট্রিক্ট জজ-ঘাড়ধাক্কা আব কাকে বলে?'

ভবশঙ্কর বললে—'কথাবার্তা বড় খারাপ হচ্ছে মিত্তির—'

মিত্তির চুরুট জ্বালিযে বললে—'ধড়িবাজ উকিল-মুন্সেফদেব ছেড়ে ব্যবসাব কথা বলি-অল বেঙ্গল সু ফ্যাক্টরির তুমি চেযারম্যান ছিলে, না?

ভবশঙ্কর অত্যন্ত অপ্রীত হযে বললে—'ও কথা আব তোলো কেন, ধ'রে-বেঁধে আমাকে চেযাবম্যান করলে-আমি কি কিছু জানতাম?'

—'না, তোমার কোনো দোষ নেই ভবশঙ্কব। একটা শেযাব অব্দি তোমাকে দিযে না কিনিযে ও-রকম একটা নামজাদা কোম্পানিব চেয়াবম্যানেব জন্য তোমাকে বেছে নিলে সে লোভ তুমি সামলাবে কী করে?'

চুরুটে একটা টান দিযে মিত্তির বললে—'কিন্তু মানুষের জীবনে কী গুখ্খুরি, দেখো! তুমি চেযাবম্যান হবার তিন মাস পবেই কোম্পানি দেউলিযা হযে গেল।'

ভবশঙ্কর দাঁতমুখ খিঁচে বললে—'ও রাস্কেলদেব কথা আব বলো না—' মিত্তিব বললে—'জীবনটা এই

বকমই, কে কাকে ঠকাবে-কে কাকে ঠকাবে।'

ভবশঙ্কব বললে—'সু ফ্যাক্টাবি আমাকে ঠকাতে পাবে নি' আমি আগেই বিজাইন দিয়েছিলাম।'

—'কিন্তু তবুও কত লোককে ঠকিয়েছে।'

—'তা ঠকিয়েছে।'

—'অথচ সেই সু ফ্যাক্টবিব লোকবাই আবাব আইন এড়িয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।'

—'বসেছে, শুনেছি।'

—'জুতোবই দোকান।'

—'শুনলাম।'

—'এবা প্রত্যেকেই কী বকম বড়-বড় বাড়ি খিঁচে ফেলেছে।'

—'কোথায়?'

—'পার্ক সার্কাসে।'

ভবশঙ্কব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, সেও পাবত, তাকেও অনেক টাকা বলানো হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে নিজেকে মিথ্যাচাবী দেউলিয়াব দলে ফেলে দেওয়া? আজীবন যে ন্যায়ধর্মেব দণ্ড ধবে এসেছে সে তা হলে সেটা তো ভাগাড়ে গোহাড়ে লুটোত; লোকে চোখ পাকিয়ে দেখত। অনেক কথা ভেবে সবে এসেছে সে।

বাস্তবিক এই ধর্মন্যাযেব দণ্ড এমন গুরুভাবেব। তা ছাড়া, একজন ধার্মিকেব দিকে এই পৃথিবীব লোকগুলো এমন প্যাঁট-প্যাঁট কবে সর্বদা যদি না তাকিয়ে থাকত তা হলে মাঝে-মাঝে এই সাধুতাব বোঝা গর্দানেব থেকে নামিয়ে-আঃ—এমন আবাম-আয়েস কবে নেওযা যেত। কিন্তু বাস্তবিক ভবশঙ্কব এতদূব খাবাপ লোক নয—।'

পৃথিবিতে যদি সে একা থাকত-তাব অন্যায অন্যায্যভাবে ধবে ফেলবাব জন্য আব-একটি লোকও যদি না থাকত তা হলেও, এমনই ধর্মেব মুদ্রাদোষ তাব, যে বিশেষ কোনো খাবাপ কাজ সে কবতে পাববে না। মোটামুটি, মিত্তিব ঘুঘু-ভবশঙ্কব ঘুঘু নয। মাঝে-মাঝে ঘুঘু হবাব ইচ্ছাটা তাব মনেব অত নিভৃত প্রকোষ্ঠে, তাব স্ত্রীবও অগোচবে, চুপেচুপে চাড়া দিয়ে ওঠে শুধু। কিন্তু ভবশঙ্কব জানে না যে ও-পাখিব জাত আলাদা-এ জন্মে সে আব তা হতে পাববে না।

লাইফ ইন্সিওবেন্স কোম্পানিব সেক্রেটাবিব কাছে প্যাঁদানিও খায এই নিবেট ঘুঘুত্বলেশহীনতাব দরুন।

কিন্তু মিত্তিব যে ঘুঘু অথচ তবুও ভবশঙ্কবেব এত অনুগত, ভবশঙ্কব এই জন্যও মিত্তিবকে অত্যন্ত স্নেহ কবে, ভালবাসে। ধর্মধ্বজ অনেক বন্ধু আছে বটে ভবশঙ্কবেব; জীবনেব অনেকটা সময তাদেব সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কাটায বটে সে, কিন্তু তবুও তাব পব এক-এক সময এই সব ধর্মনীতিবানদেব দিকে তাকিয়ে মনে হয চৈতনেব দল যত সব। এদেব মিটিমিটি মুখেব দিকে তাকিয়ে এমন বিবক্তি ধবে যায। এত হাসি পায-জীবনেব অর্থ এবা এত কম জানে বলে এমন অবজ্ঞা কবতে ইচ্ছা কবে। মিত্তিবকে তখন ঢেব মূল্যবান মনে হয। কাজেই নানা বকম ঘাটতি-পড়তিব ভিতব দিয়েই চল্লিশ বছব ধবে মিত্তিবেব সঙ্গে তাব গভীব বন্ধুত্ব চলেছে। চবম বন্ধুত্ব মিত্তিবেব সঙ্গেই; তাব কাছেই ভবশঙ্কব সবটুকু কথা বলে।

সেই মিত্তিব যখন দু দিনেব কলেবায মাবা গেল ভবশঙ্কব চোখে অন্ধকাব দেখল। এই পৃথিবীতে কী নিয়ে থাকবে সে—কী নিয়ে থাকবে সে।

অ্যালবার্ট হলে একটা মস্ত বড় পোলিটিক্যাল মিটিং ছিল। ভবশঙ্কব এসেছে বলে জনসভা বিহ্বল হয়ে উঠল না। ভাবতে গিয়ে নিবাশ হয়ে কী হবে? দু-তিন খানা চেযাব খালি ছিল। তাবই একটায বসল সে।

জননাযক সে হতে পাবে নি-নাই-বা পাবল। কিন্তু জনেব হিত তো সে চায। আজ একটু খুক-খুক কাশি হয়েছিল-কাল সাবাবাত ঘুম হয নি। এখানে না এলেও তো সে পাবত। দিব্যি বিছানায পড়ে থাকলে তাকে ঠেকাত কে? কিন্তু তবুও এসেছে সে। খ্যাতি-প্রতিপত্তিব উদ্দেশ্য নিয়ে নয-এই বুড়ো

বয়সে তা বাড়বেও না কমবেও না; দেশের লোকের কাছে তার প্রতিপত্তি কদ্দূর, হলে ঢুকেই তা বুঝতে পারা গেছে। সমাদর-অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক-দু-একজন মহিলা ছাড়া কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। কচি-কচি কংগ্রেসের ছোকরারা ডায়াসের সুমুখের দিকের চেয়ার দখল করে বসেছে। সে এতদিনের একটা বুড়ো মানুষ, দেশকে সে নিজের সাধ্য অনুসারে সেবাও তো করেছে কম নয়, তাকে একটা চেয়ার এরা ছেড়ে দিলে পারত না কি? না, লোকের কাছ থেকে মান কুড়ুতে আসে নি সে, এসেছে সে দুটো কথা বলে লোকের কল্যাণ সাধন করতে।

প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে হাঁড়িমুখে, হাঁড়িমুখ কালো করে, ডায়াসের নগণ্য প্রায় এক কিনারে অবহেলায় পিছনে বসে বক্তৃতার পর বক্তৃতা শুনে যাচ্ছে সে। ছোকরারা দিচ্ছে বক্তৃতা। সে আনন্দমোহনও নেই, লালমোহনও নেই। তাদের সঙ্গে এক প্ল্যাটফরমে একদিন বক্তৃতা দিয়েছে সে, অবিশ্যি সেদিনও তাকে কেউ একটা চিনত না, আজও চেনে না। সে যাক, কিন্তু সে পরিতৃপ্তির দিন চলে গেছে। এসেছে ছ্যাবলামির যুগ-শুধু তেরিয়া হয়ে ওঠা, মানুষকে অবজ্ঞা করা শুধু। কথা শুধু—কথা—কথা—কথা—কথা—কথা।

এরা নিজের কথা নিজের কানে বাজিয়ে নিতে খুব ভালবাসে বুঝি? এই-ই শুধু ভালবাসে, কথাই ভালবাসে শুধু, কথাই ভালবাসে; কথাই ভালবাসে।

না, অমন পিছিয়ে থাকলে চলবে না। ভবশঙ্কর উঠল। হুড়মুড় করে কয়েকজনকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে দু একটা খালি-চেয়ার ঠকাস-ঠকাস করে আছড়ে ফেলে, ডায়াসের সামনে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। নার্ভাস হয়ে গেছি? না হলে এমন দুড়দাড় করে এলাম কেন? এটা কেমন বেখাপ্পা হল-এই ভেবে মনে-মনে নিজেকে একটু বকলে সে।

মাথা নুইয়ে ভগবানের কাছে স্থিরতা ও শান্তি ভিক্ষা করলে-আধ মিনিটের জন্য; কিন্তু ততক্ষণে গোলমাল এত বেড়ে গেছে যে তাড়াতাড়ি তাকে শুরু করতে হল। ডান হাত উঁচুতে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে হেঁকে বললে-'মাননীয় সভাপতি ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ—আজ এ সময়ে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের আমি স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিতে চাই যে আমি বলশেভিক নই—'

অমনি সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

ভবশঙ্কর অনেক-অনেক বক্তৃতা দিয়েছে, অনেক বড় প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েছেও বটে, একবার জনতাকে বিগড়ে দিলে ব্যাপার কী মর্মান্তিক হয়, তা সে খুব ভাল করেই জানে। এই বিগড়নো বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে পা দুটো তার ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

ভবশঙ্কর বুঝতে পারলে যে সে ঢের ভুল করেছে। ও-রকম হুড়মুড় করে ছুটে আসা তার ঠিক হয় নি। মানুষকে ধাক্কা দিয়ে, চেয়ার পাল্টে বক্তৃতার গোড়াঘাটেও সে ভুল করে ফেলেছে। 'আমি বলশেভিক নই'-এ কী সঙ্গতিহীন কথা? বিশেষত কংগ্রেসের লেফটদের সামনে। আবার এই কথা বলেই থেমে যাওয়া?-এ কী ভীষণ বেকুবি, বেল্লিকপনা তার?

নাক, কপাল, কান গরম আগুন হয়ে উঠল ভবশঙ্করের। আজকালকার ছেলেদের নজর বড় তীব্র; ঠাট্টার একটা জিনিশ পেলে তারা আর ছাড়ে না; তাদের উপহাসাস্পদকে তারা কাঁদিয়ে ছাড়ে, জুতো ছুঁড়ে মারে, সোডার বোতলও কি ছোঁড়ে না? শুয়ার, গাধা, বনশোর, খাটাশ, ছাগল কী না বলে? ডায়াসের থেকেই দু-একটি উঁচুদরের ভদ্রলোক, দেশ জুড়ে এদের খ্যাতি, তাকে ইতিমধ্যেই ব্যাটাচ্ছেলে, শালার ব্যাটা, বলে বাপান্ত করেছে। এখনও কুচলি কাটছে। বীতরাগে ভবশঙ্করের মন ভরে উঠল।

একদিকে বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতায় সভা আয়ত্ত করবার টেকনিক শিখেছে বলে ভবশঙ্করের মনে প্রসন্নতা ও সাহসের আর শেষ ছিল না।

কি বেল্লিক—কি বিরাট বেল্লিখ!

তবুও তার গলা ছিল। ভবশঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে বললে—'আজকাল বলশেভিক ইজম বলে একটা কথা শোনা যায়, সোভিয়েট রাশিয়াকে কেউ প্রশংসা করে কেউ নিন্দা করে। সোভিয়েট রাশিয়া কী জানি না আমি। কিন্তু এটা জানি যে ওরা না কি আমাদের এই পূর্বদেশের লোকের মতই। আমাদের সঙ্গে পৃথিবীতে যদি কারো নিকটতম সম্বন্ধ থাকে-তবে এই রাশিয়ার। সমাজনীতি, রাজনীতি, জীবননীতির অপরাজেয় আদর্শে—'

নিতান্তই নিজের রুচির বিরুদ্ধে এমন সব অনেক কড়া-কড়া কথা বলে গেল ভবশঙ্কর। রাশিয়ার

চাষাভূষোর গুণগান করলে ভবশঙ্কর। নিতান্ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোভিয়েটের গুণগান করলে, বলশেভিকদের জয়-জয় করলে। জয়জয়কার পড়ে গেল ভবশঙ্করের।

রোখ চেপে গেল তারও, এখন আর কী কেয়ার করে সে? রাইট উইঙ্গারদের মধ্যে সে একজন রাইট ইউঙ্গার, লেফট উইঙ্গারদের ভিতর সে একজন লেফট ইউঙ্গার। কাকে এড়াবে সে? সবই তো তার দলের লোক। তাই সব দলেরই দলমতনির্বিশেষে সে দলপতি। গলা তার দামামা বাজিয়ে উঠল। ভবশঙ্কর ইউরোপকে বসালে-জীবনে অতটা কোনোদিন কাউকে বসায় নি সে-অল বেঙ্গল সু ফ্যাকটরিকেও না; কিন্তু তবুও লেফট উইঙ্গ রাইট উইঙ্গ সব উইঙ্গের প্রশংসমান হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে ইউরোপকে বসাতে হল তার। আরো বসাতে হল। আরো বলতে হল।

বিবাট বাজখাই গলায় যত জোর ছিল তার, যত বিক্রম ছিল জীবনে, য‌ে ক্রোধ ছিল, ক্রোধান্ধতা ছিল, সবই আজ নিজের কাজে এনে লাগাল ভবশঙ্কর। কিংবা এই ছোকরাদের কাজে—নাক-চোখ ঘেমে উঠল ভবশঙ্করের। কী করছে সে? কোথায় যাচ্ছে? এত জোরে যে-জযঢাক বাজাচ্ছে তা তো তাব নিজের দেউড়ির বাদ্যি না.....।

ঢের হযেছে-ঢের হয়েছে-সে এখন থামতে চায়।

কিন্তু কে তাকে থামতে দেবে?

পশ্চিমেব সমস্ত সভ্যতাকে রসাতলের অন্ধ তিমিরে পাঠিয়ে দিলে, ইকনমিক সিস্টেমের নিন্দা কবলে, ধরে চাবকালে, ভবশঙ্কর বললে তার সাযেন্স মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায শুধু, দেশে-দেশে শুধু ঘৃণা জাগিয়ে তোলে, শুধু যুদ্ধ-প্রলযকে খোরাক যোগায, মেডিসিনকে গাল দিলে, মেডিক্যাল কাউনসিলকে, সিনেমা-থিযেটাব রয্যাল অ্যাকাডেমি সেন্ট পলের গির্জা, এমন কি ফ্লিট স্ট্রিট অবদি সবই যেন ভবশঙ্করেব হুঙ্কাবেব ভিতর দিযে গুঁড়ি-গুঁড়ি হযে মিলিয়ে গেল। তাবপর ভবশঙ্কর আমেবিকাকে ধরলে।

আমেরিকাবও ইউরোপেব মত দুর্গতি হল ভবশঙ্করের হাতে। কিন্তু তবুও আজ আর ভবশঙ্কবেব জোশ মিটছে না। আবাব সে চেপে ধরলে; মেডিসিনকে, মেডিক্যাল কাউনসিলকে পিজে ধুনে শেষ করে দিলে।

সমস্ত রাত বিছানায পড়ে ছটফট কবতে লাগল ভবশঙ্কর। নিজেব ব্যক্তিত্বের ওপর গভীর ধিক্কাবে, জীবনের এই দুবপনেয মিথ্যাচাবে-কিন্তু সবচেয়ে বেশি কংগ্রেসেব আহলাদিকে তার নিজেবই মাথায তুলে এমন ন্যাংটা-নাচনার ক্ষোভে দুঃখে অন্ধতায় বেল্লিকপনায বিছানায পড়ে ছটপট কবতে লাগল ভবশঙ্কর।

পবদিন সকালবেলা মাথা ঠাণ্ডা হযেছে।

মনেব ভিতর ধিক্কাব এখন আব-কিছু নেই—একটা বিমর্ষ গর্ব। কালকের কাজের জন্য সে পুবস্কাব চায। এক রাতেই সে ঢেব নাম কবে ফেলেছে নিশ্চযই। দেখা যাক ওবা কী বলে; ওরা কি তাকে সপ্তমস্বর্গে তুলে দিযে ছেড়েছে। দেশের নেতা হওয়া কিছু এমন নয়! হয তো সে এখন থেকে এই পথই ধরবে।

ইংবেজি-বাংলা সমস্ত ন্যাশনালিস্ট কাগজ ভবশঙ্কর কিনলে, কই এমন বিশেষ কিছু প্রাধন্য দেয় নি তো তাকে। ভবশঙ্কর মুশড়ে গেল। তবে দু-একটা কাগজ ভবশঙ্করকে অল্পবিস্তর তাইযেছে। একটা তাকে ঠাট্টা কবল না কি। কাম ব্যাক? বলতে চায কি ওবা? কোনোদিনই কি সে লেফট উইঙ্গার ছিল যে আবাব গরুব মত হাবিযে গিযে-ফিরে এসেছে? ভবশঙ্করবাবু তার জীবনের গত ত্রিশটা বছর খতিযে দেখল। আটাশ থেকে আটান্ন অব্দি-কই, কোনোদিন পবম এক্স্ট্রিমিস্টেব দলে সে তো ছিল না। বাংলার স্বদেশী যুগে সে ডাক্তারি করত, ভিজিট দু টাকার থেকে চার টাকা, চার টাকাব থেকে ছ টাকা, আট টাকা, দশ টাকা, বার-চোদ্দ-ষোল এই দিকেই তো তাব মন ছিল। সে সাধনা সফলই হযেছে তার। ষোল অব্দি উঠতে পেরিছিল সে। বক্তৃতাও সে দিযেছে বটে-মিডওযাইফাবি, নাইটস্কুলের প্রযোজনীযতা, চাল ও চিড়ে এই সব নিযেই তো; বড় জোর ব্যাক করেছে-বিদ্যেসাগরের আওতায়. নিজের ধর্মবুদ্ধিতেও বটে-বিধবাদের। এক-আধটা বক্তৃতাও ঐ প্রসঙ্গে দিযেছে বটে সে।

কিন্তু—

অবিশ্যি কংগ্রেসে সে এক-আধবাব ঢুঁড়েছে—উনিশ শ পাঁচে-ছযে-সাতে। কিন্তু সে তো একজন নগণ্য দর্শক হয়ে শুধু।

প্ল্যাটফরমেও সে দাঁড়িযেছে বটে, কলকাতায়, কলকাতাযই শুধু, উনিশ শ আটে-নযে-দশে-কিন্তু

সে তো তাব জীবনেব মজ্জাতে দাঁড়াবাব মুদ্রাদোষেব জন্য শুধু, শুধুই দাঁড়াবাব জন্য, দু-চাব মিনিটেব জন্য শুধু।

তাব পব পলিটিকস একেবাবে ছেড়ে দিয়েছে সে। বক্তৃতা সে সেই থেকে আজ অব্দি মাঝে-মাঝে কিছু কিছু [দিযেছে] কিন্তু সে সব পাবিবাবিক-সামাজিক জীবনেব গুড়-চাল-চিনি নিযে, শুধু জীবনেব পবম অপবিহার্য জিনিশগুলো নিযে অবজ্ঞা কবে, সর্বনাশী পলিটিকসেব বিষয নিযে একেবাবেই নয। ও-সব মাতলামিকে এড়িযে এসেছে সে-বহুদিন ধবে।

যেন ভবশঙ্কব একজন বক্সিং চ্যাম্পিযন, না টেনিসেব কিছু। একটা জকি? একটা সং না কি সে?

ভবশঙ্কব দাঁত কড়মড় কবতে লাগল।

জার্নালিজমকে সে বাববাব ঘৃণা কবে-কী বিদেশী কী স্বদেশী জার্নালিজমকে ববাবব অবজ্ঞা কবে সে। কিন্তু তবুও তো বোজ তাকে খববেব কাগজ পড়তে হয-পড়ে বীতশ্রদ্ধ হতে হয। কিন্তু তবুও আবাব পবদিন ভোবে খববেব কাগজেব ভাঁজ খুলে সবচেযে আগে তাকে বসতে হয-তাব পব দিনও তাই। এ-বকম এ বিষম ব্যাধিব হাত থেকে বক্ষা আব পেলে না সে। এ বড়ি বোজই গিলতে হয তাকে-গিলে ওগবাতে হবে। কেউ তো বলে না তাকে গিলতে; কিন্তু তবুও গেলে যে সে' না গিলে পাবে না যে' কেন এমন-কেন এমন'

বটে।....সস্তা গ্র্যাজুযেটদেব ভিতব থেকে এই সব দিশি জার্নালিস্ট তৈবি হয; এদেব ইংবেজি পড়ে-পড়ে খুন হযে গেছে সে। ন্যাশনালিজমেব বড়াই কবে? বটে' বিলেতি পাগলামিতে এদেব মগজ ভবা; বিলেতি বিঙেব ভাষা, টার্মক্লাবেব উপমা, ফুটবল গ্রাউণ্ডেব অলঙ্কাব এই সব জঘন্য সম্বল নিযে জীবনেব সমৃদ্ধ মূল্যবান জিনিশগুলোব ওপব এবা শিশুব মত মন্তব্য কবে-নিজেদেব বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ পিতামহ বলে ভাবে। ভাবে না কি? জানে না কি ভবশঙ্কব সব? ত্রিশ বছব ধবে নিববচ্ছিন্ন খববেব কাগজ পড়ে ন্যাশন্যালিজমেব, বাঙালিযানাব, সমস্ত জাবিজুবি ধবে ফেলেছে সে।

এব পব জীবনেব গুরুত্ব থাকে কোথায? অথচ এই তবল খোকাবাই দেশেব কাগজেব জগতেব নেতা; দেশেব বাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সবই এদেব হাতে।

বিরূপতায, ঘৃণায, আস্ফালনেব ভবশঙ্কব দাঁত মুখ খিঁচিযে উঠল। বধূ চা নিযে এল।

স্বামীব মুখেব দিকে তাকিযে সহসা কিছু বুঝতে পাবলে না মৃণালিনী। বুঝবাব দ্বিতীয চেষ্টা না কবে চলে গেল সে; সে কেযাব কবে না। ভবশঙ্কব কাগজেব স্তূপ ঠেলে ফেলে দিল।

চাযেব পেযালা নিযে বসল সে-চা, জেলি মাখানো টোস্ট, ডিম, গোটা দুই কলা। খেতে মিনিট দশেক লাগল।

তাব পব কী কববে সে?

কাগজগুলো? কক্ষনো না। ববং কালকেব ডিবেক্টব মিটিঙেব জন্য এখন থেকেই তৈবি হযে থাকা ভাল। ভবশঙ্কব ইজিচেযাব থেকে উঠে গিযে সেক্রেটেবিযেট টেবিলেব পাশে শিবদাড়া খাড়া কবে বসল-মেহগিনি কাঠেব চেযাবে। শুধু লাইফ ইনসিওবেন্স কোম্পানিব চেযাবম্যান সে। ডিবেক্টবও বটে-আবো দু-তিনটা কোম্পানিব। এ-ছাড়া ব্যবসাব জাল মাকড়েব মত আবো জড়িযেছে তাকে, কাগজপত্র চিঠি-ফিটি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে চক্ষু স্থিব হল তাব। দু-চাব দিনেব গাফিলতিতে এমনই কাজেব ভিড় জমে গেছে—হা ভগবান।

দবজাটা বন্ধ কবে দিযে অত্যন্ত স্থিব শান্তভাবে স্বভাবসিদ্ধ সাধুতাব সঙ্গে ভবশঙ্কব কাজ কবতে শুরু কবে দিলে। কিন্তু পাঁচ মিনিটেব বেশি পাবল না। কী হবে কাজ কবে? মান? মান তাব কোথায? এই সব কাজ কবে মানুষেব আবাব সম্মান হয? হোক না খুব গুমগুমে কোম্পানি, এ চেযাবম্যানেব মূল্য কী? দুটো দিশি কোম্পানিব চেযাবম্যান-পৃথিবীব চেযাবম্যানদেব মূল্য কী? কে তাদেব নাম জানে? বিবাট পৃথিবী, ভাবত, এমন-কি বাংলাও আযত্তেব বাইবে। ভবশঙ্কব চেযাবম্যানেব নাম কলকাতাবই-বা কটা লোক জানে-জেনেও-বা কটা লোক গ্রাহ্য কবে? কাল যখন অ্যালবার্ট হলেব মিটিঙে ঢুকেছিল সে কেউ তাব দিকে ফিবেও তাকায নি। গলাবন্ধ গবদেব কোটপবা একটা হেমডাস্টাব কিংবা সেক্রেটাবিযেটেব হেড এ্যাসিসেটন্ট বলে ভেবেছিল হয তো। হা ভগবান' ফিবেও তাকায নি কেউ তাব দিকে, তাকাবে কি? তাকে চিনলে তো? সে একটা মানুষেব মধ্যে ধর্তব্য হলে তো? চেযাবম্যান হযে, ষোল টাকা ভিজিটেব ডাক্তাব হযে, মানুষেব কাছে নিজেব মুখচেনা অব্দি হতে পাবা যায না' মান-যশ তো দূবেব কথা'

কাল যখন এ্যালবার্ট হলে এক অনামা চেয়ারম্যানমাত্র ডাক্তারমাত্র হয়ে ঢুকেছিল সে, ডায়াসের সব চেয়ে পিছনের চেয়ারটাকেও নিজের হিম্মতে দখল করে নিতে হয়েছিল তার; হয় তো তখনই যদি কোনো মহত্তর ব্যক্তিত্ব এসে হাজির হত-ও-চেয়ারটুকুও সে পেত না।

ত্রিশ বছর ধরে ডাক্তারি ও চেয়ারম্যানশিপ করে এই তো হল তার। অবিশ্যি টাকা হয়েছে-ভালই হয়েছে। যে-টাকা হয়েছে তাতে সাত পুরুষ দুধ-ভাতে কাটিয়ে দিতে পারে। বিজনেসে লেগে থাকলে এই হবে শুধু-টাকা হবে, আরো টাকা হবে, আরো টাকা হবে, আরো টাকা হবে।

কিন্তু সে টাকা দিয়ে কী করবে?

এখনই যে-টাকা আছে নিজের জীবনটাকে পাঁচ দিয়ে সাত দিয়ে গুণ করলেও তো সে টাকা শেষ করতে পারবে না সে। আরো টাকা জমাচ্ছে সে শুধু পরের খাবার জন্য; তাদের জন্য ব্যবস্থা করে যাচ্ছে সে। তারা কাজকর্ম নাও করতে পারে-সংগ্রাম কী, সহিষ্ণুতা কী, নাও বুঝতে পারে তবুও ভবশঙ্করের টাকার উপকার পাবে তারা-টাকা বাড়ানো মানে এই সব জীবনকে প্রশ্রয় দেওয়া।

এ-রকম দরজা বন্ধ করে কাজ করে যাওয়া মানে এদের জন্য টাকা বাড়িয়ে যাওয়া শুধু, গভীর বিতৃষ্ণায় ভবশঙ্করের মন ভরে উঠল; কলমটা রেখে দিলে সে।

সমস্ত জীবনটা তার হিতসাধনের দিক দিয়ে এইটুকুতে এসে দাঁড়ায়? পরিবারের জন্য টাকার ভাণ্ডার রেখে যাওয়া শুধু?

এদের জন্য কেন সে টাকা রেখে যাবে? এরা নিঃসঙ্কোচে সন্তানের জন্ম দিতে সুবিধা পাবে বলে? পরবর্তী সন্তানেরা আরো সন্তান নিয়ে আসবে। তার পর আরো সন্তান আরো সন্তান। আরো সন্তান। সন্তানই শুধু। হয় তো ভবশঙ্করের মত এক চেয়ারম্যান সন্তান। কিংবা মিত্তিরের মত এক ব্যারিস্টার সন্তান কিংবা মিত্তিরের ছেলেটা'র মত এক মুন্সেফ সন্তান, এক সাবজজ সন্তান, কিংবা কালকের মিটিঙের লেফট-রাইট উইঙ্গারদের মত বেয়াড়া সন্তান সব, কিংবা যারা তাকে 'বেটাচ্ছেলে' বলেছিল কাল তাদের মত ডায়াস-বিলাসী ফোঁপরদালাল সন্তান সব।

একটা গভীর অবসাদে ভবশঙ্করের মন ভরে উঠল। কাগজপত্র ডেস্কে বন্ধ করে রেখে দিলে সব। দরজাটা খুলে দিলে সে।

ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল।

কী চায় সে? জানালা দিয়ে অতিদূর বিস্তৃত নীল আকাশ। মাঘের সকাল বেলায়ই আকাশের দিকে এমন স্তব্ধ হয়ে জীবনে কোনোদিনও তাকায় নি সে। ছেলেবেলার থেকে কোনো কল্পনা স্বপ্নের মানে বোঝে নি সে, প্রেম-বা নারীও কোনোদিন চায় নি।

বাবা তার সামান্য উকিলের মুহুরি মাত্র ছিল; একটা ভঙ পাড়াগাঁয় খড়ের ঘরে জন্মেছিল ভবশঙ্কর; কিন্তু ছোটবেলার থেকেই চোখ ছিল তার বিদ্যার দিকে। টাকা জমাতে-জমাতে মান-সম্মান পদগৌরবের দিকে রোখ চাপল তার। মনে হল, মান বুঝি হয় চেয়ারম্যান হয়ে। যাই হোক কিন্তু প্রেমের দিকে কোনোদিন রোখ তো চাপে নি তার। নারীকেও কোনোদিন সে চায় নি; সৌন্দর্য চায় নি; স্বপ্ন-কল্পনার মানে বোঝে নি। প্রমুক্ত নীলাভ আকাশের দিকেও-ঠিক আকাশটাকেই দেখবার জন্য, সুদ বা ডিবিডেন্টের, ডিবিডেন্ট বা সুদের চিন্তা করবার জন্য নয়-আজকের মতন এমন ভাবে কদাচিৎ তাকিয়েছে সে। আজও সে চোখ নামাল; আকাশের ভিতর কোনো আশ্রয় খুঁজে পেল না সে।

বধূ আর-একবার এল চায়ের বাসনপত্র কুড়িয়ে নিয়ে যেতে কিন্তু ভবশঙ্কর সে দিকে নজর দিল না।

কী করবে সে?

কাগজের স্তূপ নিয়েই সে বসল আবার; একটার পর একটা কাগজ দেখছে সে। কোনো কাগজেই ভবশঙ্করের বক্তৃতাটাকে তেমন কোনোই গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, সেই মিটিঙটাকেই না যেন। কালকের কলকাতার আর-বিশ-পঞ্চাশটা খুঁটিনাটি এটা-সেটা জিনিশের ভিতর আরো একটা দৈনন্দিন জিনিশ শুধু, খবরের কাগজের কলম ভরাবার মশলা মাত্র।

একজন লোককে কে আসরে নামিয়েছে ভবশঙ্করের স্বপ্নাতীত অনেক প্রবল দুঃসাধ্য অলৌকিক কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। এ নিয়ে কোনো কাগজের কোনো ত্রিসীমায়ও কোনো উচ্ছ্বাস নেই, কোনো রোমাঞ্চের লেশ-অব্দি নেই। এ যেন হতই-এ যেন হতই; কালকের তারিখে এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হত যেন; এ এমন সাধারণ; এ এমন উপেক্ষিত।

এ রকম কত হল, হবেও কত, দিনরাত দণ্ডে-দণ্ডেই হয়ে যাচ্ছে যেন।

সমস্ত দিন ভবশঙ্কর কোনো কাজ করতে পারে নি। সেক্রেটারি ছোকরাব খোঁচা খেয়ে নয়-এমনিই দুটো রেজিগনেশন লেটার লিখে রেখেছে সে-কাল ডিরেকটরদের কাছে পেশ করবে; ব্যস্-সারা!

কিন্তু তার পর কী নিয়ে থাকবে সে? জানে না। কিন্তু তবুও ব্যবসা নিয়ে থাকবে না আর। টাকা রোজগারের ঢের হয়েছে তার; টাকার প্রতি আর কোনো মায়া নেই; চেয়ারম্যানের সম্মান বেঁটে খেয়েও জীবন তার এখন তৃপ্তি পাচ্ছে না, জীবনের নেশা চড়ে গেছে ভবশঙ্করের।

সকালবেলা এতদূব ভেবে রেখেছে।

কিন্তু দুপুর বেলা মনে হল-

কতকগুলো মানুষের যাতে মঙ্গল হয় এমন কোনো কাজ করতে পাববে কি সে? কিন্তু কোন মানুষদের মঙ্গল সে করবে! সমস্ত জগৎ-এমন কি সমস্ত বাংলা-কলকাতা-বা তাদের পাড়াটুকুব সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করতে যে শক্তির দবকার তা তার আজ আব নেই, পরিধি ঢের কমে গেল তাই।

ঘুরেফিরে আবার পরিবারে এসে দাঁড়াল। পরিবাবের মঙ্গল? টাকাই তো জমিয়ে গেছে সে; হ্যাঁ সবই পরিবারের নামেই রেখে যাবে। সকলেই তো তাই করে, গৃহধর্ম কি সবচেয়ে আগে নয়? পরিবারকে ঠকিয়ে কখনও ন্যায় হয়-না ধর্ম বলে? পৃথিবী এখনো তাই ঠিকই তা হলে? পরিবাবের ওপরই তো দেশ দাঁড়ায়, জাতি দাঁড়ায়।

ভবশঙ্করের মন ঢের আশ্বস্ত হল; পৃথিবীতে একটা কাজ কবেছে সে-নিজের পরিবাবটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। নিজের বাবার কথা মনে হল; অতীত জীবনেব দৈন্য ক্লেশ সংগ্রামের ভিতব কতবাব পিতাকে মনে-মনে অভিশাপ কবেছে ভবশঙ্কর-কেন বাবা তাব জন্ম দিল।

বাস্তবিক পক্ষে দেখতে গেল আজও পিতাকে ক্ষমা কবা যায না-এমন দীনহীন পরিবাবে কেন সে বারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল-এ সব লালসা মাত্র-আজও সে বলবে; মানুষেব জীবনেব মহত্তব উদ্দেশ্যেব চেয়ে এ-সব প্রক্রিয়া ঢেব-ঢেব বিচ্ছিন্ন; আজও সে বলবে।

কিন্তু ভবশঙ্কবের নিজেব জীবনে এ কেলেঙ্কাবি নেই। পাঁচ-সাতটি সন্তানের পিতা হলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তবুও তাব একটি সন্তান শুধু। সে সন্তানকেও মানুষ কবে গেছে সে।

পবিতৃপ্তিতে ভবশঙ্করের মন ভবে উঠল। ঘবেব চাবদিকে তাকালে সে। কলেজ স্ট্রিটেব স্বস্তিকা সিমেন্ট দিয়ে তৈবি তেতলা বাড়ি--আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিযাব মার্টিন কোম্পানি-আগাগোড়া বাড়িখানা তাব। এমন আরো দু খানা বাড়ি তার কলকাতায রয়েছে-ভাড়ায খাটছে। ঘরেব চাবিদিকে তাকালে ভবশঙ্কব-ইঞ্জিনিযাবিঙেব কিছু সে জানে না বটে, আর্কিটেকচার সম্বন্ধে তো সে আরো অন্ধ; নিখুঁত বিশেষজ্ঞতা নিয়ে উপভোগ বা বিতৃষ্ণা কববাব ক্ষমতা তার নেই; তা নেই-নেই বটে; না-আছে কবিব নিবিড় স্বাদ-বিস্বাদ গ্রহণেব ক্ষমতা-কিন্তু একজন সাধাবণ পবিতৃপ্ত মানুষেব নির্বোধ আমোদে কড়িকাঠগুলোব দিকে সে তাকালে-কী পবিপাটি! তাব আজীবন অর্থকরী পাবিপাট্যের প্রতিনিধি যেন এরা। কার্নিশের দিকে তাকাল ভবশঙ্কব; জানালাগুলোর দিকে তাকাল-আকাশটাব দিকে আবেকবাব তাকিয়েই মার্বেল পাথরের নিরেট মেঝের দিকে তাকিয়ে এই তেতলায, সমস্ত থেকে ঢের দূরে, স্বস্তিকা সিমেন্টের দৃঢ়তার ভিতর, এই নিভৃতে, নিজেকে সে এমন নিবাপদ মনে কবলে-নিজেব জীবন এমন মূল্যবান মনে হল তাব।

কিন্তু কেন মূল্যবান?

মূল্যবান নয়? মস্ত বড় ফার্মকে সে খাটিয়েছে, মার্টিন কোম্পানিকে, খাটিয়েছে, রাতদিন, দিনরাত; সে, একজন মুহুবির ছেলে। বিবাট সেক্রেটাবিয়েট টেবিলটাব দিকে তাকালে সে, ঘবের ভিতব চেযারের দিকে তাকালে, পাযেব নীচে কার্পেটেব শৌখিনতা বোধ করলে ভবশঙ্কর।

পাশের ঘবে চলে গেল সে-ড্রয়িংরুম; এখানে কার্পেট আছে ঢের দামি। পাবসিযাব থেকে এক কাবুলি এনে বিক্রি কবে গেছে। লেসেব পর্দা, তেপয, আতবদান-বড়-বড় ফ্রেমে নামজাদা ছবি সব! বিশেষত ঘরের ভিতর বিশ-পঁচিশটা।

একটা সোফায পরম আয়েশে গা এলিয়ে দিল সে; জীবনে এ-রকম অলস বিলাসিতা খুব কম করেছে ভবশঙ্কর, সময আর টাকা এতদিন গিলে ফেলেছিল তাকে, নিজেব মূল্য সে বোঝে নি; অবসরই পায নি বুঝবার জন্য; আজ এই অবসরের ভিতর এই মহৎ সত্য সে বুঝে ফেলেছে—

নিজে কত মূল্যবান সে; তাব এই সমস্ত শরীবটা অত্যন্ত দামি; এই উপযুক্ত আযেস আরাম একে দিতে হবে। সোফায গড়িযে স্বাদ পেযে নিল ভবশঙ্কব। একটা মস্ত বড় ছবিব কাছে গিযে দাঁড়াল—পঁচিশ বছব ধবে ছবি-খানা দেওযাল জুড়ে বযেছে—একবাব ফিবেও তাকাতে যায নি ভবশঙ্কব। কিন্তু এ তাব নিজেব জিনিশ—টাকা দিযে কিনেছে সে; উপভোগ কববে না? আজ সে উপভোগ করবেই; এব পবম আস্বাদ না পেযে ছাড়বে না সে। ছবিখানাব পাশে দশ মিনিট—পনেব মিনিট—পঁচিশ মিনিট দাঁড়াল সে। তাব সমস্ত জীবনেব শত সহস্র ক্লেশ সংগ্রাম সহিষ্ণুতাও যেন এব চেযে ঢেব সহজ ছিল—আজ বিধাতা তাব কাছ থেকে এ কী নিদারুণ ধৈর্য চাচ্ছে; এ ছবিব পাশে এমন কবে তাকে দাঁড় কবিযে বাখছে কেন? সে দাঁড়াতে চায না, দাঁড়াতে পাবে না, এব কোনো বস সে উপভোগ কবতে পাবে না—পৃথিবীব ভিতব এ ছবিখানাব কোনো অর্থ, কোনো কাবণ, খুঁজে বেব কবতে পাবে না সে।

কিন্তু অনেক দাম দিযে এই ছবিখানা কিনেছে যে সে; জীবনে তাব অবসবও ঢেব কম; এখনই এব মূল্য আদায কবে নিক সে—না—হলে মৃত্যুব পবেও যেন নিস্তাব পাবে না ভবশঙ্কব।

কিন্তু আবো খানিকক্ষণ দাঁড়িযে বুঝল সে যে ও-বকম কবে মূল্য আদায কবা চলে না: তাব অর্জিত সমস্ত জিনিশই বিধাতা তাকে ভোগ কবতে দেয নি। এ ছবিকে উপভোগ কবতে পাববে না—এ পঁচিশখানা প্রসিদ্ধ ছবিব একখানাও না। পৃথিবীতে এ-সব ছবি যদি কেউ নাও আঁকত তা হলেও ভবশঙ্কবেব নিজেব জন্মটা বেশ নির্বিবাদে চলে যেত। তেপযেব ওপব কতকগুলো এলবাম নেড়েচেড়ে কোনো সুখ পেলে না সে মেহগিনিব শেলফে বইগুলো বযেছে—কবিতাব বই, গল্পেব বই, শুধু উল্টেপাল্টে কোনো পবিতৃপ্তি পেল না সে।

এ বাড়িতে আব কী আছে?

ছেলে বযেছে; কিন্তু ছেলেকে পুত্রবধূব হাতে অনেক আগেই ছেড়ে দিযেছে সে। বধূব চেযে বাবা নিশ্চযই বড় নয—ছেলেব কাছে, ভবশঙ্কব চাযও না তো।

শ্বশুব মশায ড্রযিংরুমে তো কোনোদিন আসেন না। পুত্রবধূ চলে যাচ্ছিল—ভবশঙ্কবকে ড্রযিংরুমে দেখে থমকে দাঁড়াল। বৌমাব মাথায হাত বেখে আশীর্বাদ কবল ভবশঙ্কব—কনেব মত, প্রণাম কবে সে চলে গেল—

এ মেযেটিব কথা ভুলে গেল ভবশঙ্কব; আবাব না দেখা হলে আব মনে হবে না।

বাড়িব ভিতব উপভোগেব জিনিশ খুঁজতে গিযে নিজেব বধূব কথা তাব মনেই হল না।

ভবশঙ্কব তাব নিজেব কামবায চলে গেল। গত দু দিনেব ভিতব অনেক গুখখুবি হযে গেছে। নিজে সে বাস্তবিক কী, কতটুকু, কী বকম আশা কবতে পাবে, না পাবে, বুঝেছে সে।

চেযাবম্যানেব কাজ নিযেই বসল সে। টাকা জমবে শুধু। জমুক। টাকা জমানোটা তাব মতলব নয।

ব্যবসায উন্নতি দিযেই বা কববে কী সে? চেযাবম্যানেব নামেব ভড়ংও কিছু না। কিন্তু তবুও ব্যবসাযের যাতে উন্নতি হয, চেযাবম্যানেব মর্যাদা বজায থাকে, টাকা জমে, সেই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কবতে হবে তাব।

এ কেমন?

কিন্তু যেমনই হোক, একটা ছবি বা সাহিত্য বা কংগ্রেসেব আহ্লাদি, বা খববেব কাগজেব প্রশংসা বা স্ত্রীকে উপভোগ কবতে যাওযাব চেযে—এ ঢেড় ভাল।

একঘেয়ে

ব্যবসা করতে করতে ভাদুড়ি এমনই ফেঁপে গিয়েছিল একসময় যে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলো কোলিয়ারি কিনে ফেললে সে। আবার ব্যবসা করতে করতেই সে কোলিয়ারিগুলো তার হাতছাড়া হয়ে যেতে লাগল। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ব্যবসা করছে সে। অবশেষে কোলিয়ারি মালিকত্বে পৌঁছেছিল গিয়ে সে। ভেবেছিল—

অনেককিছু ভেবেছিল। কিন্তু কয়লার খনিগুলোকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, বুদ্ধিমানের মতো। এসবের ভেতরের খবর কি কেউ জানে তো; ভাবে ভাদুড়ি বুঝি খুব দেনায় জড়িয়ে পড়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হল। না, সে-রকম ছেলে সে নয়, ঠিক যাকে বলে ব্যবসাযের নেশা, জুয়ো খেলার মতো, মদের মতো, মেয়ে মানুষ করার মতো, ব্যবসায়ের নেশা? নেশা বলতে পার, হুজুক হিড়িক বলতে পার, ভাদুড়ির তা নেই।

ব্যবসা করতে গিয়ে অকুতোভয় নিয়ে নামে নি সে, খুব লোভও নেই তার, এ খেলা তাকে পেয়েও বসে নি, সে বরং টাকাটা হাতে হাতে চায়, ব্যাস! ভাদুড়ির বয়স প্রায় সাতচল্লিশ, কিন্তু দেখায় প্রায় ছাপান্ন-সাতান্নর মতো। মাথার চুল এই বয়সেই পাতলা হয়ে গেছে। মুখখানা বেশ ফরশা, কিন্তু যৌবনের রোদে ঝকমারিতে তারাবাঁকা হয়ে ভাদুড়ির মুখখানাকে এক একসময় লাল টকটকে কাঁচা মাংসের চাঙড়ের মতো দেখায় যেন। মানুষের হৃদয়ের আমিষ লোলুপতাকে যেমন একটা কদর্যভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে যায়। ভাদুড়ির চোয়াল খুব জোরালো, টাক খুব নিরেট, যতটুকু পড়েছে। ঠোঁটদুটো খড়গধার। নাকটা ঈষৎ চোঙা। সমস্ত মুখখানাও থ্যাবড়া গোছের। দিনরাত খাকির হাফপ্যান্ট ও খাকিব শার্ট পরা অভ্যাস। মাথায় একটা শোলার টুপি, কখনো কখনো চড়ায়। হাতে ছড়িটা সবসময় থাকে। পাযে বুট; আজকাল বেটিয়া কোম্পানির। বুট ববাবরই থাকত, এ জীবনে অনেক ফ্যাশান, অনেক কোম্পানি বদলেছে সে। অবিশ্যি একটি অতিরিক্ত টাকাও উড়োয় নি তাই বলে। ব্যবসার খাতিরেই সমবেশেব সঙ্গে আলাপ। সমরেশ, ভাদুড়ির চেয়ে দু-এক বছরের ছেট হবে। পঁযত্রিশ-ছত্রিশ বছবেব ছোকরার মতো। বড়লোকের ছেলে, অনেক বিষয়-সম্পত্তি, উত্তরাধিকারীসূত্রে পেযেছে,ব্যবসা করাটা তার একটা শখ শুধু, বস্তুত কোনো ব্যবসাযেই একাগ্র হয়ে লেগেও থাকে না সে, যখন যেটা কল্পনাকে জাগিয়ে দিয়ে যায় তাইতে হাত দেয। নতুনত্ব ঘুচে গেলে ছেড়ে দেয। এমনি করে অনেক টাকাই খোয়াল সে। কিন্তু তবুও টাকা এখনো তাব ঢের আছে টাকাকড়ির প্রতি মাযা তার স্বর্গগত পিতাব চেয়েও ঢের বেশি।

সমরেশ পাতলা লম্বা ছোকরা মতো দেখতে। পামবিচের শুট পরে। মোটর বাগিযে ভাদুড়িব অফিসে প্রাযই সে আসে। মাথা ভরা কালো পালিশ চুল, ক্রিম মাখানো। পিছনের দিকে ঘুরনো, নিখাদ ব্যাকব্র্যাশিং। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দাড়ি গোঁফ কামানো। এমন একটা স্নিগ্ধ লাবণ্য সমরেশের মুখেচোখে, দুটো শাদা শাদা হাত, আঙুলগুলো যেন চাঁপাফুলের মতো, মুখেব কথা এমন কমনীয় অমাযিক যে কাঠখোট্টা বিরূপ মানুষেরও কতকটা সময বেশ ভালো লাগে।

সমরেশ খুব ভালো সেতার বাজাতে পারে। ভাদুড়ির এক এক সময মনে হয যে ছেলেটা ওই সব দিকেই গেলে পারত। ওইসব গানবাজনা ছবিটবি আঁকার দিকে ছেলেটাব চেষ্টা ছিল। ব্যবসায তো কাঁচাটাকা মেরে ভূত করছে শুধু। নিজে সে ব্যবসা ফাঁদতে পারে বটে, ঘোর ব্যবসাযী সে নয, সে রকম হতে গেলেই মাটি হয়ে যেত, সে সমীচীন ব্যবসাযী, খুব খাড়াখোড়া তাই আজও সে টিকে গেছে। খুব ভালো হাতেই বাঁচোয়া হয়ে আছে সে। ভাবতে ভাবতে ভাদুড়ি হাফপ্যান্টের পকেট থেকে এক স্তূপ বিড়ি বের করলে। একটা বিড়ি জ্বালাল সে। কিন্তু কেমন দুর্গন্ধ বোধ করে ফেলে দিল। বাড়িতে সে সিগারেট খায়, কিন্তু অফিসে অনেক দিশি কর্মচারী কেরানি আছে বলে সিগারেট প্রায়ই বের কবে না।

ডেস্কের থেকে চুরুটের বাক্সটা টেনে বের করলে ভাদুড়ি। ডাচ চুরুট, এসব জিনিস একটু ভালো,

না খেলে , তা ভালো লাগে না, বর্মা চুরুটের জগৎ অনেক দিন হয় পেরিয়ে গেছে সে। ডাচ চুরুট, বিদেশী অবিশ্যি, কিন্তু চুরুটের দেশী বিদেশী কেউ ধরতে যায় না, ভাবে সবই বুঝি বর্মার থেকে আসে।

ভাদুড়ি চুরুটটা জ্বালালে। 'কিংবা ভাবে মাদ্রাজ থেকে আসে।' 'এদের ভাবাভাবি।' চুরুটে একটা টান দিল সে। আজকের দিনের কাজ প্রায় ফুরিয়ে গেছে। টাইপিস্ট মিস হ্যানবারি, ডবকা অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ছুঁড়ী। টাইপ করা চার ছ-খানা চিঠি প্রত্যেকটার পাঁচ-পাঁচটা কার্বন কপিসুদ্ধ এনে হাজির হয়ে ভাদুড়ির কাছে পেশ করে চলে যাচ্ছিল।

ভাদুড়ি মেয়েটিকে ডাক দিলে। অত্যন্ত সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে বললে— 'আর একটা!' ভাদুড়ি উঠে ইজিচেয়ারে গিয়ে বসল, অফিসেও এর একটা রেখেছে সে।

মিস হ্যানবারি বসল ডেস্ক চেয়ারে। চিঠিটা যাচ্ছে রানীগঞ্জের কোলিযাবির এক সাহেবের কাছে। চিঠিটা ডিক্টেট করতে পনেরো মিনিট লাগল। আট লাইন চিঠি। দু-তিন মিনিটের ভেতর টাইপ করে চিঠিখানা ভাদুড়ির হাতে এনে দিলে মেয়েটি। কার্বন কপিও পাঁচখানা। চিঠিগুলো খুব গভীর মনোযোগের সঙ্গে আধঘণ্টা বসে পড়ল ভাদুড়ি। তারপর এক এক করে সাইন করে পাঠিয়ে দিল। এইবার ছুটি। অফিসের চারদিকে ঘুরে এল ভাদুড়ি। চাব-পাঁচটি কেরানি কর্মচাবী নিয়ে,অফিসে তাদের আব তেমন কাজ নেই। বিদেয় দিয়ে দিল ভাদুড়ি। হ্যানবারি না বলেই চলে গেছে। ওইবকমই ও করে, বললেও শোনে না। মেয়েটাব ভযঙ্কর দেমাক। তবুও যদি দো-আঁশলা না হত। পরের মাসে ওকে আব রাখবে না সে। অফিসেই দেবে গুটিয়ে। কেই বা থাকবে? কেউ না। এদের উপায হবে কি? মেয়েটা খুব নতুন, সাত-আট মাস হল এসেছে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দেখতে সুন্দর। বযস কম, চোস্ত কাজ করে এমন। বড় সৌভাগ্যে তাকে সে পেয়েছিল। এ মেয়েটির কী হবে না হবে এ নিয়ে ভাদুড়ি একটুও ভাবে না। আজ ওকে ছেড়ে দিলে আজই ও লটকে যাবে। কিন্তু এই বুড়ো মুখগুলো কী করবে? কুড়ি-পঁচিশ [...] বছর তার কাছেই হাত পাকিয়েছে এবা। পেনশন দিয়ে দেবে? অত টাকা তার কোথায? অন্য কোনো অফিসে যেতে বলবে। আজকের বাজারে এদেব কে কাজ দেবে আবার? এবা তো আর ছেলেছোকবাও নয়, বযস সর্বনাশের কোঠায চলে গেছে।

ইজিচেযাবে বসে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট ধরে অনেক ভাবল ভাদুড়ি। কোনো কিনাবা পেলে না সে। তারপব মনে হয পৃথিবীতে এমন কত নিবাশ্রয় লোক বযেছে, ভগবানই তাদেব দেখেন, বাজ্যটা ভগবানের তো? যদি তাই হয তাব এত ভাববাব কী আছে? সে উঠে দাঁড়াল। মোটরটা একটা পেট্রলের দোকানেব কাছে নিয়ে ট্যাঙ্ক ভরিযে নিলে। তাবপব নিজেই স্টার্ট দিযে উঠে বসে স্টিযাবিং হুইল ঘুবিযে চলল। কোথায? নিজেব বাসাব দিকে নয।

মোটব চালাতে চালাতে হ্যানবাবির কথা আবাব মনে হল। এই মেয়েটিকে অফিসে বেখে কেমন মর্যাদা, মাধুর্যই বা কত! কিন্তু সবই যাবে টসকে। কোনোবকমে অফিসটা বজায বাখতে পাবত যদি ভাদুড়ি। কিন্তু সে একেবাবেই দুঃসাধ্য। এখন কোলিযাবিগুলো বিক্রি করে কতকগুলো থোক টাকা নিয়ে সবরকম ব্যবসার জাল থেকে সরে পড়া ছাড়া আর উপায নেই। হ্যাঁ, হ্যানবারি—খুব ভদ্রতা করে চলেছে এই মেয়েটির সঙ্গে ভাদুড়ি। জীবনেই কোনো মেয়ের সঙ্গে একদিনের জন্যও একটু বে-আব্রু ব্যবহার করে নি সে। সর্ববাদীসম্মত সমস্ত জীবন ধবে নীতির পথে চলেছে সে। আজীবন চবিত্রের সুখ্যাতি বজায রেখে চলেছে সে। কিন্তু এক এক সময মনে হয এ সুখ্যাতি দিয়ে হবে কি? এক একটি সুন্দরী মেযেমানুষ দেখে [...] মনে হয়, কত কি মনে হয। কিন্তু সচ্চরিত্র লোক সে। জানে, এসব বেদনা কামনা জয করতে হয। জয সে করে। পৃথিবীব সমস্ত রূপ ভালোবাসা কামনা ধোঁযাব মতো মিলিযে যায, তাব জীবনে এসব কিছু নেই।

সমবেশ বললে—'সব কোলিয়ারিগুলো বিক্রি কবে দিচ্ছ?'

ভাদুড়ি বললে—'সব আব কি, কটাই—বা!'

—'বিক্রি শেষ হযে গেছে?'

—'একটা বাকি।'

—'ওইটেই রাখবে বুঝি?'

—'না, হাতে আর একটাও রাখব না, মিছেমিছি পুষে কোনো লাভ নেই, খদ্দের জোটানো বি সোজা, ভালো খদ্দের চাই তো। জলের দরে ওগুলো ছেড়ে দেই নি।'

সমরেশ বললে—কিন্তু ছেড়েই-বা দিলে কেন? সাতচল্লিশ বছরের ব্যবসা গুটোলে?'

ভাদুড়ি বললে—'ওই তো মজা সমরেশ, পঁচিশ বছর ব্যবসা করলাম, কিন্তু তবুও পাকা ব্যাপারী হলাম না।' বলে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল ভাদুড়ি। একটা গোটা চুরুট বেব করলে।

সমরেশ বললে—'কী রকম।'

—'ঠিক রেস খেলার মতো।'

সমরেশ সিগারেট কেস্ বের করলে।

কথা চলছিল সমরেশের বৈঠকখানায়। শীতের রাত। অনেকটা রাত হয়ে গেছে।

ভাদুড়ি বললে—'পাকা রেস খেলোয়াড় কী করে জান?'

সমরেশ সিগারেট জ্বালালে।

ভাদুড়ি বললে—'পাকা মানে দুফলে তো?'

—'খুব চটকদার।'

—'হ্যাঁ, ঘোড়ার নাড়ীনক্ষত্র সব জানে, অনেকদিন বেসে আছে জিনিসপত্র বাঁধা দিযেছে।'

সমরেশ কৌতুকের সঙ্গে তাকাল।

ভাদুড়ি বললে—'জিনিসপত্র বাঁধা দিযে টাকা জোগাড় কবে রেসে জিতবার জন্য।' ভাদুড়ি চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে—'কলকাতার দু-চারখানা বাড়িও বিক্রি করে ফেলেছে তাবপর।'

'বাজি খেলবার জন্য? এইসব আহম্মুখী পাক্কা খেলোযাড় তৈবি হয়, হ্যাঁ। ভাদুড়ি? তা আমিও এঁচেছিলাম।'

—'তুমি তো বলছ আহম্মক, কিন্তু সে নিজেকে মোটেই তা মনে করে না। বাস্তবিক আহম্মক সে নয়ও। সে ভারি তালেবব, মাথা তার খুবই পরিষ্কার, সে রোজ [...] খবব নেয, নোট টোকে, নানাবকম পুঁজি পাতা ছক রেস টিপের ভেতর দিযে মাথাটা তার যথেষ্ট বোধ বিবেচনাব সঙ্গে কাজ কবে—টাকা কি রেস খেলে দেদার পায নি জীবনে, তাও পেযেছে, কিন্তু নজর তাব টাকার দিকে নয। বেস খেলবার দিকে শুধু। তাই তার এ দুর্গতি। আমি দেখেছি, অনেক বড় বড় ব্যবসাযীও ঠিক এই বকম কাবণেই লাট হয়ে যায।' একটু থেমে—'ব্যবসার নেশা তাদের পেযে বসে, টাকার থেকে ব্যবসাকে পৃথক কবে ফেলে, ব্যবসা যেন ভগবানের মতো একটা কিছু। ওতে হেবে যেতে হয, এমন কবে অনেক কাববার নিলেমে চড়ল।'

সমরেশ বললে—'তা হলে তুমি নেট সাড়ে তিন লাখ গছালে।'

ভাদুড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—'কযলার ব্যবসাটা এমন পড়ে না যেত তাহলে—'

—'পড়ে কি গেছে বাস্তবিক ভাদুড়ি?'

—'এখনো পড়ে নি, পড়বে কিনা তাও বলা যায না, সেটি তো মাবাত্মক , এই দোটানাই তো ধনেপ্রাণে মারে আমাদেব, কিন্তু ঠিক এই সমযই মাথাটা ঠিক বাখতে হয, ব্যবসাযেব নেশাব থেকে নিজেকে বাঁচতে হয়, লোকের মতামত নিন্দে টিটকারিকে কেযার কবতে হয না। বড় বড় পাকা পাকা ব্যবসায়ীর মতো হলে আমাদের কি আর চলে? আমরা তাদের মতো দেউলিযা হবার জন্য মনকে তৈরি করতে পেরেছি? তা পারি নি। তবে আর টাটা রাজেন মুখুজ্যেব স্বপ্ন দেখে কি লাভ সমবেশ?' ভাদুড়ি একটু থেমে বললে—'বড় তো আদার ব্যাপাবী, ঘাই মতো খানিকটা খিমচে নিযে একসময আমাদেব সটকে পড়তে হয।'

—'কত নিলে? সাড়ে তিন লাখ না?' ভাদুড়ি বললে—'সাড়ে তিনশো লাখও হযতো পেতে পারতাম, যদি ব্যবসায় লেগে থাকতাম।'

—'হুঁ।'

—'কিংবা হযতো দেউলিযা হয়ে যেতাম।'

কী হত না হত সে অন্য কথা বাস্তবিক ভাদুড়ি কততে তৃপ্ত হয়ে ইস্তফা দিল সমবেশকে সেটা আর জানালে না সে। সমরেশও জিজ্ঞেস কবতে গেল না আর।

সমরেশ বললে,—'আমিও ব্যবসা না করলেই পারি ভাদুড়ি।'

—'করো কেন?'

—'কবি কেন জান?'

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে মনে মনে একটা হিসাব করতে করতে ভাদুড়ি বললে—'বলো।'

সমরেশ বললে—'বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন কিনা, ওই হচ্ছে বিপদ।'

অন্যমনস্কভাবে ভাদুড়ি বললে—'হুঁ।'

সমরেশ বললে—'লোকে বলবে ছো জমিদারের ছেলেটা সেতারসংগত করে মদ বাঈজি নিয়ে টাকা উড়িয়ে দিল।'

ভাদুড়ি নোটবুক বন্ধ করে বললে—'ব্যোম।' সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললে—'হুঁ, তারপর।'

—'না, একটা কিছু না নিয়ে থাকলে দশরকম লোক দশকথা বলত, বলত হয়তো, ব্যাটাচ্ছেলে কেমন সেতারসংগত করে বাঈজি পুষে মদ খেয়ে পয়সাগুলো উড়োলে দেখত, এর বাপের এজন্য মুখে রক্ত ওঠে নি?'

—'মেয়েমানুষ তো তুমি কোনোদিন করো নি ভাই।'

—'করি নি বটে, কিন্তু ওই যে সেতারসংগত জমে মাঝে মাঝে, মানুষের মন জানো না তো ভাদুড়ি।'

ভাদুড়ি বললে—'সংগতও তো কতদিন শুনি নি টুনি নি, সেও তো ছেড়েই দিলে।'

সমরেশ বললে—'দিয়েছি ছেড়েই প্রায়।'

—'কেউ আজকাল আসে না বড় একটা?'

সমরেশ আবার ব্যবসার কথা শুরু করে বললে—'আসে, কিন্তু ভালো লাগে না, জমে না ভালো। একে একে আট-নটা ব্যবসা করে দেখলাম, সব গেল ফেল মেরে।'

—'সেইজন্য তোমার দুঃখ?

—'দুঃখ কিসের জন্য বলতে পারি না ঠিক।' অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আর একটা সিগারেট বের করল সমরেশ কেসের থেকে।

ভাদুড়ি বললে—'ব্যবসা তুমি ছেড়ে দাও, ওদিকে তোমার রুচি নেই হাতযশও নেই।'

একটা আঘাত লাগল সমরেশের, ভাদুড়ি বললে হাতযশ নেই। ব্যবসায় একদিন খুব জেঁকে উঠতে পারে ভেবেছিল সমরেশ—বছর পনেরো-কুড়ি আগে—চৌরঙ্গিতে ফ্ল্যাটভাড়া করে ফার্ম খুলে যখন সে জমিদারের ছেলেমাত্র আর ছিল না, বিজিনেশ ম্যানেজার,ডিরেক্টার চেয়ারম্যান সবাই হল সে নিজের ফার্মের, টেলিফোনে কত বাজ্যের লোকের সঙ্গে কথা বলত, কত দারুণ স্পেকুলেশন করে বসত সব, কথায় কথায় বিলেতে কেবল পাঠাত, মোটরটাকে নিয়ে সারাদিনরাত রাস্তায় রাস্তায় কতরকম কসরৎ করত সে। পরিশ্রম কম কি করেছে সমরেশ? সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, প্রতিক্ষা কম দেখিয়েছে সে? কামনা করল, আশা করল, কিন্তু কি হল, এতদিনে সাত লাখ টাকা লোকসান হয়ে গেল, ভাগ্যিস বাবা বিস্তর বিষয়-আশয় রেখে গিয়েছিলেন তাই রক্ষা, না হলে এতদিনে কোন রসাতলে তলিয়ে যেত সে। আর এই ভাদুড়ি, একদিন কলকাতার পথে পথে খুচরো চা বিক্রি করত শুধু, পুঁইশাকের চচ্চড়ি খাবার পয়সাও জুটত না, এখন সে সাত-আট লাখ টাকা কামাই করে ফিরছে। ট্যাপ ট্যাপ করে সিগারেটটা বাঁ-হাতের তেলোর ওপর কয়েকবার ঠুকে নিলে সমরেশ। ভাদুড়ি যা বললে, ব্যবসাতে হাতযশ নেই তার। কীসে হাতযশ আছে? সেতারে? এই জীবনের ব্যবস্থায় একটা সেতারের কি প্রতিষ্ঠা রয়েছে? একজন জমিদারের ছেলে, খুব ভালো সেতার বাজাতে পারে, সার্টিফিকেট হিসেবেও এ জিনিস উপহাস্যাস্পদ, যে প্রতিষ্ঠা চায়, তার কাছে এ একেবারেই অর্থহীন।

ভাদুড়ি বললে—'মনমরা হয়ে গেলে যে?'

সমরেশ কোনো জবাব দিলে না।

ভাদুড়ি বললে—'কষ্ট পেলে?'

সমরেশ সিগারেটটা জ্বালালে।

ভাদুড়ি বললে—'ব্যবসা ছেড়ে দাও তুমি, সাহিত্যফাহিত্য একটা কিছু করো, কিংবা ছবিটবি যদি আঁকতে পার, ওসবেরও একটা মর্যাদা আছে।'

—হুঁ।'

—'আছে বইকী, এই দেখো না।' সে আর কিছু দেখিয়ে ওঠাতে পারলে না।

—'ছবি আঁকার দিকে আমার ঝোঁক নেই।'

—'সাহিত্য?'

—'বাংলা?'

—'বাংলা ইংরেজি যা—'

—'ওতেও লোকে অলস অকর্মণ্য বলবে।'

ভাদুড়ি বললে—'কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়।'

একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে ভাদুড়ি ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পথ বাতলাতে চেষ্টা করল। ছোকরাটা কি যে করবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারলে না সে। সমরেশের বয়সও ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ। কম বয়স থাকলে না হয় কোনো গভর্নমেন্টের চাকরিতে ঢুকত, সাইন করতে পারলে এর ভেতব দিয়ে অনেক হয়, ডেপুটি ম্যাচিস্ট্রেটিতে গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি হয়েছে এমন লোকও সে জানে। চুরুটে অল্প খানিকটা ছাই জমেছিল, ভাদুড়ি তা ঝেড়ে ফেললে। বললে—'বেশ শীত পড়েছে।'

সমরেশ বললে—'বিলেতে গেলে কেমন হয়?'

—'তা যেতে পার, কিন্তু কী পড়বে?'

সমরেশ দমে গেল আবার। বললে—'এত বয়সে আবার পড়া-টড়া কীসের ভাদুড়ি?'

ভাদুড়ি বললে—'অন্তত গিয়ে লিখবে তো কিছু, না হলে এখানে শুধু হাতে ফিরে এলে লোকে আরো ঠাট্টা করবে।'

সমরেশ বললে—'কোনো একটা টাইটেল জোগাড় করা যায় না এমনি এমনি?'

—'ও, সে তো, এখানে বসেও হয়।' ভাদুড়ি বললে—'জোব তোমার সেতাবে, আমার মনে হয় সংগীত নিয়ে থাকলে তোমার বেশ হত।'

সমরেশের মনে ধরল না। অবিশ্যি সেতার নিয়ে বসে যখন নিরালায়, মনে হয় সমস্ত পৃথিবীব সাধারণ মানুষদেব চেয়ে ঢের উচ্চগ্রামে চলে যাচ্ছে সে। অথচ পৃথিবী জিনিসটাকে এত উপেক্ষা কবল কেন? কেন কবে জানে না সে। কিন্তু উপেক্ষা কবে। নিজেব মনে নিজে কল্পনাব আকাশে চড়ে বেড়াতে চায় না সে কি। কি হবে তাতে? পৃথিবী যে জিনিসকে সম্মান দেয়, খাতিব কবে তেমন কোনো একটা জিনিস চায় সে। সমবেশ কর্পোরেশনেব কাউন্সিলার হতে চাইল।

ভাদুড়ি বললে—'পাববে না।'

—'কেন?'

—'দেশেব জন্য খেটোছ কোনোদিন? কংগ্রেস তোমাব মুখ চেনে?'

তা চেনে না বটে, কিন্তু সমরেশ চেনাতে চেষ্টা করতে পাবে এখন থেকে।'

ভাদুড়ি বললে—'তাহলে এ হ্যাট টাই সাহেবি ব্যবসাফ্যাবসা ছেড়ে দিতে হবে।'

সমরেশ ভাবছিল। সমবেশ একটু পরে বললে—'না যদি ছাড়ি?'

—'তা হলে নমিনেশনের চেষ্টা কবতে পার, কিন্তু—'

—'আচ্ছা দিলাম না হয়।'

ভাদুড়ি মুখ বিকৃত করল।

—'ছেড়ে, তাইতেই কী হবে?'

—'বলা যায় না, চেষ্টা করে দেখতে পার।'

সমরেশ ভাবছিল। একটু পরে বললে—'কাউন্সিলবেব খুব মান?'

—'তেমন আর কি!'

—'তাব চেয়ে এই মোটর ট্রাক ভাড়া দেযার ব্যবসাটাব যদি হিল্লে কবতে পাবতাম—'

ভাদুড়ি খুব তাঁবেদাবি করে বললে— হ্যাঁ হ্যাঁ।'

—'কিন্তু শালাবা ট্রাক ভাড়া নিয়ে টাকা তো দেয়ই না, কল বিগড়ে ফেলে, ট্রাক ভেঙে ফেলে, চুবি করে।'

—'ওই ঝামেলা নিয়েই তো ব্যবসা, ঝামেলা খিচে যে উঠে যেতে পারে সে উঠল।'

সমরেশ অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে বললে—'সত্যি?' কিন্তু পরক্ষণেই মুষড়ে গিয়ে বললে—'ড্যাম। ওসব আর না। এই পনেরো বছর হজ্জোতি করে হয়রান হয়ে গেছি ভাদুড়ি, ঢেব গুণাগার হয়েছে।' একটু

পরে—'যা বলছিলাম তোমাকে, ধরো কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হলাম।'

—'বেশ।'

—'বেশি মান নেই স্বীকার করলাম।'

—'হ্যাঁ নেই।'

—'কিন্তু তারপর তো অলডারম্যান হতে পারি'—

—'সে ভারি শক্ত।'

সমরেশ ঈষৎ চটে গিয়ে বললে—'না কোনেদিন, সাবাজীবন ব্যবসাব গ্যাসখুরি করলাম; শক্ত না সহজ আগেব থেকে কে বলতে পারবে? যার যা লাইন।'

—'তা বটে।'

—'তোমার লাইন হল গিযে ব্যবসা—সাত লাখ পকেটে মেরে চলেছ।'

ভাদুড়ি কোনো জবাব দিলে না।

সমরেশ বললে—'মনে কোরো না অলডারম্যান হওয়া আমাব পক্ষে নিদেন অসম্ভব।'

ভাদুড়ি দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে বললে—'অলডাবম্যানেব থেকেই মেযর হয।'

সমরেশ বললে—'তা জানি।"

ভাদুড়ি বললে—'কিংবা বেঙ্গল কাউন্সিলেও স্ট্যাণ্ড কবতে পারো। কপালে চাঁদ থাকলে মিনিস্টারও হওয়া যায।'

—'হযেছে। কর্পোবেশনের কথা বলছিলাম। আবাব কাউন্সিল এল কোথে কে? খুব ঠোকবাঠুকবি কবতে শিখেছ বুঝি ভাদুড়ি। কথা হচ্ছে সেই পনেবো-কুড়ি বছব আগে সাত তাড়াতাড়ি ব্যবসায না নেমে এইসব দিকেই চেষ্টা করা উচিত ছিল আমার।' সিগাবেটটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বললে—'কিন্তু একজন পরামর্শ দেবার লোকও আমাব ছিল না। নইলে এই বযসে জীবনেব অকৃতকার্যতা নিযে এমন কষ্ট হতে পেতে হয।'

সমবেশেব গলায আন্তরিকতা ভাদুড়ি ঈষৎ চমকে উঠল। কত কিছু হতে পাবে নি বলে এই মানুষটিব এমন সত্যিকারেব বেদনা! সমবেশকে সান্ত্বনা দিযে ভাদুড়ি বললে—'বাঃ, একদিনে তোমাব মতো অত টাকাব মালিক হলে আমি কোনো অধঃপাতে চলে যেতাম সমব, টিকি তুলে দাঁড়াতে পাবতাম নাকি আবাব! তুমি তো সেই থেকে মাথা চাড়া দিযে রযেছ। মানুষের জীবনেব যা ভালো, যা সহজ ন্যাযানুমোদিত ধর্মসম্মত, যে সব মান সম্ভ্রম যশ, যেমন দেশেব লোকদেব দিক থেকে কর্পোবেশন বা কাউন্সিলে ঢুকে বাইজ করা, এইসবই তো তুমি চাচ্ছ। তুমি মজলিশ-মুজবো কবে মদ খেয়ে বাঈজি নাচিযে সব ফুঁকে দিতে পাবতে না? কে তোমাকে ঠেকাত?'

সমবেশ শিহবিত হযে উঠল।

ভাদুড়ি বললে—'কিন্তু তা কবলে না তুমি, খুব সত্যানুমার্জিতভাবে ব্যবসা করে এসেছ তুমি। আমাব মনে হয, তাই তা জমল না। কিন্তু জীবনেব বড় বড় কাজে এই সব সত্য, ন্যায চবিত্রেব আদব রযেছে।

সমবেশ আর একটা সিগাবেট জ্বালাল।

ভাদুড়ি বললে—'আসছে বছব কর্পোরেশনে ঢোকো না তুমি।'

—'এখন আব হযটয না ওসব।'

—'কেন?'

'বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল।'

—'ষাট-সত্তর বছরেব লোকও ওসবেব ভেতবে বিস্তব বযেছে।'

—'তাবা অনেকদিন থেকেই আছে।'

ভাদুড়ি বললে—'না না, ঢুকে পড়ো তুমি। আমি তোমাকে ব্যাক করব।'

সমবেশ হো হো করে হেসে উঠে বললে—'তুমি করবে ব্যাক, এই খাকিব হাফপ্যান্ট পরা অ্যাংলো ইণ্ডিযান! চেন না তো, তোমাকে বক দেখিয়ে মুরগি ডাকিয়ে তোমার চোদ্দগুষ্টির নিকুচি কবে ছেড়ে দেবে।'

ভাদুড়ি বললে—'আচ্ছা কি করতে পারি না পারি দেখো তুমি।' ভাদুড়ি উঠে দাঁড়াল। একটা চুরুট জ্বালিযে বললে—'আমাকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মতো দেখতে নাকি?'

সমরেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—'রাত মোটে দশটা এখন যাচ্ছ কোথায়?'

সমবেশ বললে—'এখনো দুঘণ্টা বেশ বৈঠক দেয়া যায়।'

ভাদুড়ি বললে—'আমাকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মতো দেখতে নাকি?'

—'তেমনি বং।'

—'কেউ কেউ তা বলে—কেউ বলে ন্যাবা হয়েছে। কিন্তু এরকম বং আমাব ছোটবেলাব থেকেই।'

—'তা জানি।'

—'এ রং আমার ভালো লাগে না।'

—'কেন?'

—'ধ্যাৎ।'

পারে তো নাকের থেকে মুখেব থেকে সমস্ত শবীবের থেকে সমস্ত এ রং এখনই খুইয়ে ফেলে ভাদুড়ি। কিন্তু ভগবান সে জো যে রাখেন নি, অনেক জো বাখেন নি যে, অনেক জীবনেব জন্যই ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল ভাদুড়ি।

পরদিন ফুরসত করে নিতে সমবেশেব তিনটে বেজে গেল। গোটা সাড়ে তিনটেব সময় মোটর নিয়ে ভাদুড়ির অফিসেব সামনে গিয়ে থামল সে। অফিসে ঢুকতেই মিনস ব্যানার্জি সমবেশেব ফিটফাটে আপাদমস্তকের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তারিফ কবলে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সমবেশের দিকে ফিবে ফিরে তাকাল সে।

মেয়েটিকে সমরেশ গ্রাহ্যেব মধ্যে আনল না। মেয়েমানুষ ঘটিত কোনো ব্যাপাবেব মধ্যে সমরেশ বা ভাদুড়ি কেউই কোনোদিন নেই। মাঝেমধ্যে কখনো-বা ভাদুড়িব কামনা-লালসা জেগে উঠেছে—সমরেশ একেবারেই সেসবের থেকে নির্মুক্ত। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভাদুড়িব কামবায় গিয়ে ঢুকল, ডেক্স খালি, কেউ কোথাও নেই। ফিরে এসে পঞ্চাননকে জিজ্ঞেস কবলে—'মুরুব্বী কোথায়?'

পঞ্চানন কিছু সুবিধামত জবাব দিতে পাবল না।

হবিচরণ বললে—'এই তো আধঘণ্টা হল বেরিয়ে গেছে।'

সমবেশ সিগারেট বের করে ভাবলে, এবা এবকম জবাব দেয় কেন?"

অবিনাশ বললে—'বোধহয় ব্যারাকপুরে গেছেন।'

সমরেশ বললে—'ব্যাবাকপুর? কেন? কখন ফিরবে?'

কেউ কিছু বলতে পারল না।

সমরেশ ফের ভাদুড়ির কামরায় ঢুকে সিগারেট জ্বালিয়ে বসল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবা যাক।

হ্যানবারি এসে বললে—'ওয়ান্ট বস?'

—'ম্যাডাম ইয়েস।'

—'হি ইজ ইন দা গ্রিল—'

—'হুইচ গ্রিল?"

—'দা নিউ আন দা পার্কস্ট্রিট।'

—'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফেল্ট হ্যাট মাথায় চাপিয়ে সমবেশ স্টিক ঘুবাতে ঘুবাতে বেবিয়ে পড়ল। কিন্তু মোটরে চেপে মনে হল তাব গ্রিলে গিয়ে কি কববে সে? ভাদুড়ি সেখানে খাচ্ছে, এমন সময় ঢুকে কি কববে সে? হয়তো বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাচ্ছে, হয়তো কোলিযারিব শাহেবকে নিয়ে, না হলে গ্রিলে ভাদুড়ি বড় একটা যায় না। এ সময় কেন মিছেমিছি যাবে সে? তাব নিজেব লাঞ্চ দুটোতেই শেষ হয়ে গিয়েছে, খাদ্যেব কোনো প্রবৃত্তি তাব নিজেব তো একেবারেই নেই। না, গ্রিলে আব সে যাবে না। মোটরেই বসে রইল সে।

হ্যানবাবি বেরিয়ে গেল। সমবেশকে দেখে একটু হাসল।

ভাদুড়ি হ্যানবাবির এ হেন হাসি নিয়ে অনেক কিছুই গড়তে পাবত, নিজেবই মনে মনে, অসংযমেব পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারত সে, নিজের গোপন মনে ক্ষুধায় কামনায় উদ্বেগে যাতনায় নিজেকে একটা শুযাব কা বাচ্চা মনে করতে পারত ভাদুড়ি। সমরেশ হ্যানবাবিকে হাসতে দেখল শুধু; দেখে ভুলে গেল।

আধঘণ্টা অপেক্ষার পরও ভাদুড়ি এল না।

পঞ্চানন, অবিনাশ, হরিচরণ একে একে চলে গেল সব। সূরযরতন আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তালা লাগাবে কিনা ভাবছিল। সমরেশকে একটা সেলাম করে বললে—'পতা নেই হোগা, জরুর ব্যারাকপুর'—

সমরেশ মোটর স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

ভাদুড়িকে সন্ধ্যার সময় পাওয়া গেল। অ্যাকসেসরি ক্লাবে। মোটর অ্যাকেসেসরি নয় অবিশ্যি—কীসের অ্যাকসেসরি কে জানে! ভাদুড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল, সমরেশ বললে—'চলো, আমার ওখানে।'

নিজের ড্রয়িং রুমটাকেই সমরেশ সবচেয়ে বেশি নিরাপদ [বোধ] করে—সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা অবধি, এ সময় স্ত্রী তার বাড়ি থাকে না। কোথায় যায় কে জানে? জানবার জন্য কোনো চাড়া নেই সমরেশের। এই সময়ই সে একটু পরিতৃপ্তি পায়—হয়তো সেতার বাজিয়ে—যদি সম্ভব হয় একটু সংগত করে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফলতা ক্ষুদ্রতা ধুয়েমুছে নিরবচ্ছিন্ন খেয়ালে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে, এইটিকেই জীবনের একমাত্র জিনিস বলে, এই কয় মুহূর্তের জন্য অন্তত স্বীকার করে, হয়তো ভাদুড়ির মতো দু-একটি ভবসাপ্রদ বন্ধু আসে, এই সময়। সিগারেট ও চুরুট পুড়িয়ে এই সময়ই সুখ। অন্য সময় সেগুলো দুটো ঠোঁট দগ্ধ করে যেতে থাকে যেন শুধু। জীবনটাকেই শুধু হেজে ফেলতে থাকে যেন।

বাড়িতে প্রেমদা আজও নেই, ছেলেমেয়েরাও নেই। সমরেশের মনটা এই নির্জনতার ভেতর বেশ হালকা লাগল। ড্রয়িং রুমের দরজা এঁটে দিয়ে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল দুজনে। সিগারেট কেস বের করে ভাদুড়ির হাতে তুলে দিয়ে সিগারেট-লাইটারটা পকেট থেকে বের করলে সমরেশ। ভাদুড়ি একটা সিগারেট ঠোঁটে পুরে দিল। সমরেশ লাইটার দিয়ে জ্বেলে দিলে সেটা।

ভাদুড়ি একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল।

সমরেশ সস্নেহে বললে—'গ্রিলে গিয়েছিলে?'

—'কে বললে?'

—'তোমার ওই টাইপিস্ট ছুঁড়ীটা।'

—'ও, না।'

—'সত্যি যাও নি?'

—'বাট, কী করতে যাব? কোনোদিন যাই নি।'

—'ভাদুড়ি, ফোঁফরদালালি করলে তো টাইপিস্ট মেমটি।'

'ওই ছুঁড়ীটা ওই রকমই।'

এক মুহূর্তের ভেতর ছুঁড়ীটাকে দুজনেই ভুলে গেল।

সিগারেট কেসটা সমরেশকে ফিরিয়ে দিলে ভাদুড়ি। সমরেশ একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের ভেতর গুঁজলে—ভাদুড়ি নিজের লাইটার বের করে জ্বালিয়ে দিল।

এই সব খুঁটিনাটির ভেতর দিয়ে দুজনের মাখামাখি অত্যন্ত প্রগাঢ় হয়ে উঠল। সমরেশ বললে—'ভাই বিজিনেসে টাকা করেই-বা কী হবে, কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হয়েই-বা কি হবে, জীবনে কোনো সুখ নেই।'

ভাদুড়ি বললে—'এই তো দেখো, আমি সাত লাখ টাকা জমালাম—'

—'সা—ত লা—খ!'

—'গুনেগেঁটে দেখলে হয়তো প্রায় সাড়ে আট লাখ, কিন্তু খুশি হতে পারলাম না তো—'

—'কেন, তোমার কষ্ট কি ভাদুড়ি?'

—'তোমারও যা আমারও তাই।'

ভাদুড়ি সিগারেটে এক টান দিয়ে বললে—'ছেলেপিলেগুলোর দিকে তাকালে তবু মাঝে মাঝে মনে হয় যা হোক টাকা যা করেছি, কোনো এক দিকে গড়াবে, আমি না হোক এরা তো সুখ করতে পারবে. তাই হোক, খাস্তগির, এদের জীবনটাও যেন এমন একঘেয়ে হয়ে না উঠে।'

—'একঘেয়ে কি বলে, একঘেয়ে—সেই পঁচিশ বছর আগে বিয়ে করলাম প্রেমদাকে, সেই বিয়ের রাতের কথা এখনো আমার মনে পড়ে, কই এমন কি বিশেষ পুলক ছিল তা ভাদুড়ি?'

—'বিশেষ কি আর, তোমার বিয়ের রাতও তো তোমার মনে আছে।'

—'আছে বইকী।'

—'একশেষ হয়েছিল?'

ভাদুড়ির নিজের বিয়ের রাতের কথা সেই পঁচিশ বছর আগের মনে হল, বাসরের কথা আনুপূর্বিক চোখের সামনে ভেসে উঠল তার, মুখ বিকৃত করে বললে—'হয়েছিল ফোঁপরা।'

সমরেশ বললে—'এর চেয়ে যখন বিয়ে করি নি, মানুষদের বিয়ে দেখতে গিয়ে তখন ঢের ফূর্তি পেয়েছি, তুমি পেতে না ভাদুড়ি?'

ভাদুড়ি ঘাড় নেড়ে বললে, সে পেত।

সমরেশ বললে—'তখন আমার কতদিন মনে হত যখন নিজের বিয়ের দিন আসবে আমাব, অমনি বাসররাত, অমনি একটি রূপসী বধূ না জানি সে কি গভীর উপভোগেব জিনিস হবে—সে সব—এত বেশি সুখস্বর্গ পাব যে তা যেন ধারণাও কবতে পারা যায় না।'

ভাদুড়ি বললে—'সকলেই তা ভাবে।'

সমরেশ বললে—'কই, রূপসী বউ তো পেলাম, কিন্তু রূপের প্রতি হতশ্রদ্ধ হলাম কেন?'

—'আমার সহধর্মিণী মহীনেব মা-ব রূপও তো কম ছিল না, কিন্তু জানলে সমব—''ভাদুড়ি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ফু ফু করতে করতে বললে—'জানলে বিশ্বসংসার সুদ্ধ সকলেই বলতে পারে এ রূপসী, কিন্তু আমি জানি আমার চোখে ও রূপ অনেক দিন থেকেই ক্ষয় হযে গেছে।

সমরেশ সিগারেটকেসটা ভাদুড়িকে আবার এগিযে দিয়ে বললে—'এখন ঠিক কথা বলেছ!'

ভাদুড়ি বললে—'সিগারেট থাক।' একটু চুরুট জ্বালাল সে। সমবেশকে বললে—'জানলে সমর, আমিই শুধু জানি ও দেহেরও কোনো মূল্য নেই, ও মানুষটাবও কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।'

সমরেশ চমকে উঠে বললে—'স্পষ্ট কথা বলেছ'—

—'কিন্তু এ কথা বলবাব কোনো জো নেই তো কারু কাছে—অথচ আমাদেব জীবনেব এ সবচেযে সত্য কথা।'

সমরেশ অত্যন্ত অশ্রদ্ধায় ঘাড় হেট কবল। কেসের থেকে একটা সিগাবেট বেব কবে গম্ভীর ধিক্কাবে বললে—'এমনই পৃথিবী।'

ভাদুড়ি বললে—'মৃত্যু পর্যন্তই, এমন একঘেযে জীবন আমাদেব কাটিযে যেতে হবে।'

সমবেশ প্যাট প্যাট করে তাকাতে লাগল।

ভাদুড়ি বললে—'কিংবা এই স্ত্রীদের ভালোবাসতে চেষ্টা করতে হবে।'

সমরেশ বললে—'অসম্ভব।'

ভাদুড়ি একটু হেসে বললে—'কিন্তু তাই বলে অন্য কাউকে তো ভালোবাসতে পাববে না—'

—'তা পারব না জানি।' সিগাবেটটা হাতের ভেতব বেখে দিয়ে সমবেশ বললে—'প্রেম কবাই কি অপরাধ? সে কোনো কেলেঙ্কাবি কবে নি, দেখতে খাবাপ নয, অসুস্থ নয, বুদ্ধিমতী, তবুও কিছুতেই তাকে আর ভালোবাসা যায় না ভাদুড়ি।'

ভাদুড়ি বললে—'অপবাধ কারু নয। প্রথমপক্ষ দ্বিতীয়পক্ষ খুইযে তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীকেও শেষে একসময আর ভালো লাগে না।'

—'তাই কি?'

—'আমার তো পঁচিশ বছব ধরে একপক্ষ নিযেই চলছি শুধু।'

—'অন্য মেয়েদেব সঙ্গে ছেনাল করাটা কেমন?'

—'করেছ কোনোদিন?'

—'না, তুমি?'

—'মিস হ্যানবারিকে দেখেছ?'

—'সে কে?'

—'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছুঁড়ীটা, আমার অফিসের।'

—'ও সেই টাইপিস্ট ছুঁড়ী।'

—'আমার এক এক সময মনে হয় সব ফেলে দিয়ে ওকে নিয়ে সটকে পড়ি।'

সমরেশ হা করে উঠল।

ভাদুড়ি বললে—'কিন্তু তারপর মনে হয় ধ্যেৎ সেই বাইশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আটাশ ত্রিশ বছর থেকে জীবনের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এমন কত সুন্দর মেয়েমানুষই তো দেখলাম। সুযোগ তো কম পেলাম না, কিন্তু তবুও সর্বপক্ষসম্মত ধর্মনীতি সচ্চরিত্রতার পথেই তো নিজেকে দেখে আসছি। পথটাকে বিপথ বলে বুঝে এসেছি। হয়তো দুটোই পথ। কিন্তু তবুও মনের এ সংস্কার ছাড়াতে পারি নি।'

—'শেষে এই বুড়ো বয়সে একটা ধাড়ি মেমসাহবেকে বগলে বাগিয়ে নিয়ে এমন কল্পনাও তুমি করেছিলে? হ্যানবারি!' সমরেশ অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে চুপ করে বইল।

দুজনেই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে চুরুট টানল।

তারপর একটা মোটর দুয়ারে লাগল বলে, প্রেমদার ভয়ে ড্রয়িংরুমের দরজাটা খুলে দিল সমরেশ।

প্রেমদারা এসেছে। প্রেমদা সটান বাড়ির ভেতর চলে গেল। সমরেশ বা ভাদুড়িব দিকে ফিবেও তাকালে না।

সমরেশ বললে—'এতক্ষণ যা বললাম প্রেমদা যদি তা জানত?' ভাদুড়ি বললে—'তা জানবে না তো কিছুতেই।'

—'তুমি তো খুব ভালো ছেলে সমরেশ কিন্তু আমাদের মধ্যে যা কথা হল প্রেমদাকে বলবে?'

সমরেশ আধ মিনিট চুপ করে বললে—'যখন স্ত্রী তখন বলা উচিত নয় কি ভাদুড়ি?'

—'হয়তো উচিত, কিন্তু তবুও সে উচিত ব্যক্ত করতে পারবে কি তুমি?'

—'তুমি পারবে তোমার স্ত্রীর কাছে?'

—'না।'

সমরেশ একটু ভেবে বললে—'আমিও হয়তো পরব না।' সমরেশ আবাব ভেবে বললে—'বেঁচে থাকতে পারব না।'

প্রেমদা তো এই দুঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে এল, হয়তো সমস্ত পথ সেও ভেবেছে এই দুঘণ্টাব সমস্ত ইতিহাসটা স্বামী যদি জানত? কিন্তু জানাবে সে? বেঁচে থাকতে আর না? কেউ কাউকে কিছু বলি না আমবা, জীবনের বিষয় নিয়ে কোনো বোঝাপড়া করতে যাই না। আমরা স্বামীরাও যেমন জীবনটাকে একঘেয়ে মনে করি, ওরাও তাই মনে করে, ভদ্রলোকের মতো পালিয়ে যেতে পারলে ওরা পালিয়ে যেত। কিন্তু একঘেযেমি ও দাঁতকপাটি মেবে সহ্য কবে যাওযাই ভদ্রতা—এবই ভেতব চরিত্র, নীতি ন্যায, ধর্ম সমাজ ভগবান সমস্ত?'

ভাদুড়ি একটা চুরুট জ্বালিয়ে কমফাবটার জড়িযে বেব হযে গেল।

সমবেশ প্রেমদাব ঘরে ঢুকে বললে—'কে?'

কোনো জবাব পাওযা গেল না।

—'কোথায তুমি?'

—'কেন?' অত্যন্ত বিরক্ত হযেছে বধূ। কেন যে বুঝল না সমবেশ। সে তো কোনো অপরাধ কবে নি।

সমরেশ খুব কোমল কবে বললে—'খেযেছ?'

প্রেমদা তেমনই তিক্তভাবে বললে—'না, বাকি আছে।'

—'আমাকে খেতে দেবে না।'

—'সুধাকে বলো।'

—'সুধা ঘুমিযেছে।'

—'সুধা ঘুমিযেছে বেশ করেছে, মকবুলটা আছে কি করতে?'

সমরেশ আস্তে আস্তে চলে গেল।

মকবুলই পরিবেশন করছিল। সমরেশের মনে হল ভাদুড়ি যে বলেছে ভদ্রলোকের মতো পালিযে যেত পারলে ওরাও পালিয়ে যেত, লোকসমাজের ভেতরে গিযে কতদূর সত্য জানল সে? হযতো সত্যই। কিন্তু ঘরেব ভেতরে ওরা অভদ্রের মতোও পালিযে যেতে চায, পালায।
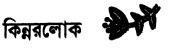
একখানা মাটির ভিটে ও একখানা শানবাঁধানো মেঝের ঘর। পরিবারে লোকজন অনেক আসাযাওয়া কিরে। পাকা ভিতের ঘরখানাযই তারা থাকে বেশি। সম্প্রতি, পরিবারের ভেতর মানুষ বিশেষ কেউ ছিল না। আশ্বিন কার্তিক মাসের ড্যাম্পে ভিটেখানা বিশেষ [...] বলে মনে হয় না। সুবোধ তার বধূ ও শিশু মেয়েটিকে দক্ষিণের পোতায শানবাঁধানো ঘরখানায পাঠিয়ে দিল। বধূও খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই গেল। আশ্বিন-কার্তিক মাসের মাটির মেঝের ড্যাম্পকে সে খুব ভয় করে। অবিশ্যি জ্বরবিকাব এ অবধি হয নি সরযূর, তার শরীর বেশ সুস্থই। কিন্তু তবুও পাকামেঝেব খটখটে ঘরখানাব দক্ষিণখোলা সুন্দর একটা কামবায নিজের জিনিসপত্তর বিছানা অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে গুছিয়ে নিল সে। পাশেব কামাবায সুবোধের পিসিমা থাকেন। অন্য অন্য কোঠাগুলিতে ছেলেমেয়ে কাকা-কাকিমারা দু-চারজন রয়েছে।

সুবোধ পুবেব ভিটেব স্যাঁতসেঁতে ঘবখানায একাই রইল। ম্যালেবিয়ার ভয় তারও বিশেষ কিছু নেই। শরীরও তার বেশ সুস্থই। স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেব ওপর খানিকটা বালি ছড়িযে নেবে ভাবছিল সে। বালি ছড়িযে কযেকখানা হোগলা পেতে দেবে। কিন্তু কিছুই সে করল না। দু-এক দিনের ভেতবই ড্যাম্পের কথা ভুলে গেল সুবোধ। কিন্তু সেই যে সবযূ এ ঘব ছেড়ে দক্ষিণের দিকে ঘবটায় গেল সেই থেকে সে আর নড়ছে চড়ছে না। বধূব সমস্ত আশা আহ্লাদ যেন এদিক থেকে সরে গিয়েছে। ওই ঘরে ননদ ঠাকুরপো পিসিমা কাকিমাদের সঙ্গে কথা যেন সবযূব আর ফুরোতে চায না। এক একসময সুবোধের মনে হয়, বেশ ভালোই তো, এত হাসিখুশিব ভিতর থাকলে সরযূর শরীব খুব শিগগিবই সেবে উঠবে কিন্তু—বাস্তবিক—শবীব সারবার তো কোনো কথা নেই, বধূব শরীর তো খুব ভালোই।

পুজোর ছুটি প্রায দেড়মাস। সাবাদিন রাত সুবোধেব হাতে কোনো কাজ নেই। যে কোনো মুহূর্তেই বধূর প্রতীক্ষা করে। হযতো মেযেটিকে কোলে নিযে কিংবা একাই সবযূ এসে হাজির হবে, বলবে—'কি গো কেমন আছ?'

সুবোধ বলবে—'বা, তোমার যে দেখাসাক্ষাৎই আব নেই, সেই যে গেলে আব'—

বধূ বলবে—রাগ কোবো না লক্ষ্মীটি, কত কাজ আমাব।'

সুবোধ জিজ্ঞেস কববে—'কী কাজ?' হযতো একটু অভিমান কবে কিংবা রাগেব ভান করে।

সরযূ হযতো তখন লম্বা একটা কাজেব লিষ্টি দেবে।

সুবোধ তবুও বলবে—'কিন্তু এব ফাঁকেও কি এক-আধ মিনিটেব জন্য অবসর কবে আসতে পারা যায না?'

সরযূ তখন সুবোধের মাথাব চুলে হাত বুলুতে বুলুতে হযতো বলবে—'লক্ষ্মীটি, আমি কি ইচ্ছে করে আসি নি'—কেন আসে নি তার কত কাবণ দেখাবে সে, সরযূর কথাগুলো সুবোধের খুব ন্যায্য মনে হবে। সুবোধের মাথা টিপে দেবে বধূ। গায বাতাস দেবে। হযতো পাও টিপে দিতে পারে। কিংবা এগারো মাসের ছোট মেয়ে হাবানিকে নিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রীতে বেশ খানিকটা আমোদ করে নেবে, তাবপর হযতো একসময বধূ যখন অন্যমনস্ক ছিল সুবোধ তাকে একটা আলতো চুমো দিয়ে ফেলেছে। সবযূ হঠাৎ হয়তো রযেছে, ওই পিসিমা ডাকছেন, যাই এবাব হবিষ্যি ঘরে রাঁধতে,—হারানিকে তাব বাবার কাছে ফেলে দিযে চলে যাবে সরযূ। তাবপব মেযেটিকে নিয়ে সময কাটবে সুবোধের।

এইসব তাঁর কল্পনা। এমন নাও যে হাত পাবত তা নয। সরযূ অপ্রেমিকা নয তো। এই চার বছর হল তাদের বিযে হযেছে। বধূ সুস্থ সুন্দরী বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা—স্বামীকেও সে ভালোবাসে জানে সুবোধ। ভালোবাসে নাকি? অবিশ্যি খুঁটিনাটির ভেতর দিয়ে সে ভালেবাসা বড় একটা দেখাতে যায় না সরযূ। কিন্তু তবুও এই মেযেটির হৃদযে প্রেম রয়েছে। তিনদিন হল দক্ষিণের ভিটেব ঘরে চলে গিযেছে সরযূ এই তিনটে দিন সুবোধের কাছে তিনটে বছরের মতো মনে হল যেন। সকাল থেকে দুপুর থেকে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত হারানীকে ছেড়ে সরযূকে ছেড়ে কি নিয়ে থাকবে সে?

খবরের কাগজগুলে কতবার পড়া যায? কিন্তু তবুও বার বার সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখে সুবোধ।

একটু খুট করে শব্দ হলেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে সরযূ এল কিনা। কেউ কোথাও নেই, একটা ইঁদুর পালিয়ে যাচ্ছে। বিড়ালের ছানাটা উড়ো কাগজপত্রেব ভেতর খচখচ করছে, ফবফর করে আরশোলা উড়ছে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বধূকে নিয়ে ফিরে আসবার সময় কলকাতার থেকে অনেকগুলো বই কিনে নিয়ে এসেছিল সুবোধ। একমাস দিনরাত পড়েও এত বই শেষ করতে পারা যায় না। তাছাড়া সুবোধ খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারে না। প্রতিটি পাতাই অনেক ভাবনাচিন্তা করে পড়ে সে।

একখানা বই সে ধরল।

দুপুব অবধি বইটা নিয়ে বেশ চলল জীবনটা । সরযূকে সে ভুলে গেছে, হারানিকেও সে ভুলে গেছে। বৃহত্তর আদর্শ জীবনের তুলনায় সুবোধের মেয়েও বধূ হয়ে কোথায় কখন হারিয়ে গিয়েছে, সে খোঁজও সে বাখে না। সমস্ত হৃদয় তার অভিভূত হয়ে বয়েছে।

দুবেলাই দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর দক্ষিণের ঘবে সবাই একসঙ্গে মি.ল যায়। সরযূ রোজকার মতো সুবোধের পানের ডিবে ভবে দিলে। দু-একটা পান বেশি ছিল। তাম্বুলরঞ্জিত মুখে সমহাস্যে স্বামীব হাতে তুলে দিতে গেল সরযূ সবোধও গ্রহণ করল অবিশ্যি, কলেব মতো হাত চালিয়ে পান—পানের ডিবে নিল সে। কলের মতো দু-চারটা পান মুখে দিল। সবযূর দিকে ফিরেও সে তাকাল না। হারানিকে নিয়েও আদর কববার কোনো অবসব আজ আব নেই যেন তার। সটান পুবেব ঘবে গিয়ে উঠল। কিন্তু তাবপবেই ভুলে গেল সব। দুজনই দুজনকে ভুলে গেল।

জিজ্ঞেস করলে অবিশ্যি দুজনেই এবা বলবে যে এবা পবস্পরকে ভালোবাসে। সেইরকমই এদেব বোধ হয। অবিশ্যি এটা ঠিক যে অন্য কোনো পুরুষ-বমণীব সঙ্গে এদেব প্রেম নেই। কিন্তু তবুও নিজেদেব ভিতবেও কতদূব বয়েছে? আছে কি? দুপুবেব থেকে বিকেল অবধি ঝবঝরে ঢালা বিছানাব ওপব শুযে বইটাকে নিয়ে বেশ কাটলে সুবোধের।

এক এক সময ফাঁক কবে জানালাব ভেতর দিয়ে সবুজ বকুল গাছটাব দিকে তাকাচ্ছিল সে। নীল আকাশটাকে দেখছিল। দূবে কাঁসা বাজছে যেন কোথায় পুজো এসে পড়েছে সেই ছোটবেলাব জামেব গাছটা কি উঁচু হযে পড়েছে। বাপরে, কত উঁচু, অজস্র পাতাব ভেতব কত পাখি লুকিয়ে কিচিরমচিব কবছে। চারদিকেই পাখিব ডাক, কোন ডাকটা কোন পাখিব চুপে চুপে হৃদযঙ্গম করতে চেষ্টা কবল সুবোধ।

এমনি কবে জীবনের সুস্থতা তাকে পেযে বসেছে। এমন একা থাকতে পাবছে সে, একা থাকতে এখন ভালোবাসে। বধূ বা কোনো কিছুবই কোনো দবকার নেই যেন তার। বিবাহ না কবলেও তো পাবত সে, বেশ হত তাব। সেই-ই যেন বেশ, ভালো হত।

স্তূপীকৃত চিত্তাকর্ষক বইগুলোব দিকে তাকাল সে। একটি একটি কবে এমন বই পড়ে যাবে সে, কাসাব সানাইযেব বাজনা শুনবে, আকাশটাব দিকে তাকিয়ে থাকবে, এই সবুজ গাছগুলো তাব হৃদযকে প্রীত কবে বাখবে, এক একদিন গ্রামের পথে ধানেব জমির পাশ দিযে সবুজ খেতের দিকে তাকাতে তাকাতে বেড়িযে আসবে সে।

অত্যন্ত গভীব মোহাবেশে চোখ বুজল সুবোধ। আস্তে আস্তে ঘুমিযে পড়ল সে।

জাগল যখন কার্তিকের বেলা পড়ে গেছে প্রায়। সমস্ত শবীব ঘামিযে উঠেছে তাব। ধীবে ধীবে বিছানায় উঠে বসল সে। একটা দোয়েল ডাকছিল। বাতাস বেশ মধুব। ঘরেব ভেতব কোথাও কেউ নেই, সেই বিড়ালের ছানা দুটো ছাড়া। এমন শাদা শাদা সুন্দর ছানা! সুবোধেব সমস্ত মন এই বাচ্চা দুটোর প্রতি কেমন একটা গ.ভ.ব মাযায় স্নেহে ভরে উঠল। এই বাচ্চা দুটোই সুবোধেব নির্জনতা ঘোচবার জন্য সাবাদিন সারারাত এই ঘবেব ভেতব থাকে, খেলা কবে, শব্দ করে। জীবন—জীবনের উৎসাহ আবেগ ও প্রসন্নতা বাইরের পৃথিবীতে শুধু নয়, মাটির ভিটেব অন্ধকার হিম অসাড় ঘবেব ভেতবেও যে বেঁচে রয়েছে এরাই সে সবেব প্রতিনিধি হযে সুবোধকে সে খবর জানিযে দিযে যায়।

সুবোধকে জেগে উঠতে দেখে বাচ্চা দুটো অত্যন্ত বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বয়েছে। না, বাচ্চা দুটোকে হাত দিয়ে ধরে ছেনে চটকে ঘাটাতে যাবে না সে, ওরকমভাবে এদের সোহাগ করলে এবা বুঝবে না, আর একটু বড় হযে নিক, তারপর। কিন্তু ততদিনে সে কলকাতায চলে যাবে নাকি?

সুবোধ খানিকটা আলস্য ভেঙে আবার শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

দক্ষিণের ঘরে হাসিগল্পের প্রচুর আওয়াজ। সরযূর গলা মাঝে মাঝে অনর্গল শোনা যাচ্ছে। বাপবে, সবযূ এত বকতে পারে জানত না সে সুবোধ। এমন হড় হড় করে কথার পর কথা হাসির পর হাসি

বিছিযে চলতে পাবে এই বধূ? কই সুবোধেব সঙ্গে তো কোনোদিন এতদূব হয নি, এই চাব বছবেব বিবাহিত জীবনেব ভেতব।

কাদেব সঙ্গে কথা বলছে সবযূ? সুবোধ কান পেতে ধবতে চেষ্টা কবল। পিসিমা আছেন, সেজ খুড়িমা, ছোট খুড়িমা, সুলতা, মিনু নবেন, অনেকে জুটেছে আজ। কিন্তু সন্ধ্যায এবা বোজই এমন জোটে। দক্ষিণেব ঘবে ওদেব আড্ডা বেশ জমে। কথা, কথা, কথা, কথা, কথা শুধু, কী কথা? বুঝতে পাবে না সুবোধ। কিন্তু কথাগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক হবে, প্রতিটি গলাই অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, হাসিও জবব।

সুলতা চা নিয়ে এল।—'উঠেছ নাকি সেজদা?'

—'উঠেছি বইকী।'

—'আমি ভাবছিলাম ঘুমুচ্ছ তুমি, বাপবে, তুমি যা ঘুমোতে পাব।'

সুবোধ ঢালা বিছানাব থেকে টেবিলেব কাছে গিযে বসল।

সুলতা বললে—'দিনবাত এই কবো বুঝি? এই ঘুম, বাপবে, এত ঘুমও ঘুমোতে পাবে মানুষ।'

সুবোধ কোনো জবাব দিলে না।

সুলতা বললে—'কই আমাদেব চোখে তো একটু ঘুম আসে না।' সুবোধেব টেবিলেব ওপব বইযেব গাদাব দিকে তাকিযে খুড়তুতো বোনটি বললে—'আব এই বই? না? সাধে কি বউদি তোমাব কাছে আসে না?'

সুবোধ দাঁত বেব কবে একটু হাসল।

সুলতা বললে—'লম্বা ছুটি পেযেছ, বই পড়ে আব ঘুমিযে দেবে উতবে, ব্যস।' এবং বললে—'কোথাও বেববে টেববে না আব, না? এতে শবীব আবো মুটিযে যাবে সেজদা, বেতো মানুষ হলে বউও কিন্তু আব পছন্দ কববে না। একটু নড়তে চড়তে হয বাপু দিন বেতেব ভেতব দক্ষিণেব ঘবেও তো এক আধবাব গেলে পাব, আমাদেব সঙ্গে না হয নাই-বা কথা বললে, বউকেও কি বযকট কবে চলেছ!' এব ভাঁড়ে যতটুকু আছে তথা প্রচলিত সমস্ত বসিকতা শেস কবে মুচকি হাসতে হাসতে সুলতা অন্তর্হিত হল। এ ঘবে তাবও বেশিক্ষণ দাঁড়াবাব প্রযোজন নেই যেন, সমস্ত দিনেব ভেতব এক আধবাব আসলেই চলে যায।

একটা অ্যালুমিনিযমেব গেলাশে কবে খুঁজোব থেকে খানিকটা জল গড়িযে নিযে সুবোধ হাতমুখ ধুলো। চা-টা ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হযে গেছে। এমন পাতলা যে, সব ভাসছে, ধোঁযা আব পোড়া দুধেব গন্ধ। খাবে সে? খেল।

বেকাবিতে কযেকখানা লুচি দুটো পটলভাজা, এমন ঠাণ্ডা, নেতিযে গেছে সব। গবম ফুলকো লুচি তাকে কেউ ভেজে দিতে পাবে না? সুলতা ছাড়া আব কি কেউ তাকে চা দিযে যেতে পাবেত না? সবযূ জানে না কি যে সুবোধ টাটকা দুধ দিযে স্ট্রং কবে চা খেতে ভালোবাসে? অন্য কেনাবকম চা সে স্পর্শও কবতে চায না। লুচি হোক, নিমকি হোক সিঙাড়া আলুভাজা পটলভাজা যাই হোক না কেন গবম গবম ছাড়া সুবোধ যে কিছু খেতে চায না খুব ভালোভাবেই জান সবযূ।

কিন্তু খাওযা প্রস্তুত কবা দূবেব কথা বধূ কোনো তত্ত্বতালাশ নিতেই এল না। তবুও লুচিগুলো খাচ্ছিল সে, বাইবে একটা নেড়ি কুকুব কখন এসে আড়ি পেতে তাকিযে বযেছে। বাদাম গাছেব নামানো ডালেব ওপব চাব-পাঁচটা কাক সুবোধেব লুচি খাওযা দেখছে। এমন নিভৃত আমোদ বোধ কবল সুবোধ। আধখানা লুচি ছিঁড়ে কুকুবটাব দিকে ছুঁড়ে ফেললে সে। বাকি আধখানা কাক কটাব জন্য। এমনি কবে একে একে সমস্ত লুচি বিলিযে দিলে সে। কাবু প্রতি অভিমান কবে নয নিশ্চযই, কিন্তু এমন ঘেযো কুকুব কাককে খাওযাবাব অবসব কৌতুক জীবনে সে খুব কম পেযেছে বলে। কুকুবটা চলে গেল। আবো কিছু চাচ্ছিল, কিন্তু সমস্ত ঘবেব ভেতব এক টুকবো বেশি রুটি অবধি নেই। বাদামগাছেব ডালে কযেকটাবাব ঠোঁট ঘষে কাকগুলো একসময উত্তবেব দিকেব ধানেব খেতেব ওপব দিযে নদীব ওপব দিযে কোথায যে চলে গেল।

সুবোধ উঠে দাঁড়াল। লুচি তবকাবি ভাজা না হলে তাব যে চলে না এমন নয। চাকবি পাবাব আগে কতদিন মুড়ি খেযে কাটিযেছে সে। সবযূ যদি আদব কবে একব মুড়িও এনে দিত আজ তাহলে হৃদযরূপহীন গবম লুচি ও খাসা চাযেব চেযে ঢেব ভালো জিনিস হত। কিন্তু এ ঘবেব ত্রিসীমাব ভিতবেও সবযূ কোথাও নেই।

ওই ধানেব খেতেব ওপব দিযে নদীব ওপব দিযে কাকগুলো যে দিকে উড়ে গেল, আকাশেব

মেঘগুলো যেখানে লাল টকটক করছে, নদীর ফুলের ঝাউয়ের শাখা নড়ছে শুধু, সেই দিকে চলে যাবার বাসনা এমন একটা বিষম ইচ্ছা পেয়ে বসল সুবোধকে। এক আধ মুহূর্ত অবাক অসংবদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সে। কিন্তু তারপরেই মানুষের কাজের বিচারের হিসাব নিকাশের প্রকৃত জগতে চলে এল সে। ওই নদীর ওপারে, মেঘে বিবর্ণতায় স্বপ্নে মানুষ পাখিব মতো হারিয়ে যেতে পারবে না। ওসব কবিদের জন্য শুধু। বাস্তব জগতের কেনো ধাবই ধাবে না যারা, যাদের অনেক অবসর আছে যারা নিঃসঙ্কোচে সাংসারিক জীবনের অনেক সাধের সামগ্রী দিনবাত বসে খোযাতে পারে। কবি সে নয, কবি নয সুবোধ। সংসারেই তার সাধ। ঘবটাতে দুদিন হল কেউ ঝাঁটও দিতে আসে নি। মেঝেব চারদিককার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আবর্জনার দিকে এক আধ মিনিট নিরাশ্রযেব মতো তাকিয়ে বইল সে। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে ঘরের ভেতর থেকে। ইচ্ছে হল সুলতাকে একবাব ডাকে, না হয সবযূকে, এদেব কাউকে ঘব ঝাঁট দিযে ধূপ দিতে বলে। কিন্তু এসব জিনিস তো এদেবই নজব দিযে দেখে নেযা উচিত, নিজেরা সেনা কবে অন্তত চাকরবাকর দিযেও এটুকু কাজ করিয়ে নেয়া প্রযোজন, কিন্তু এবা নিজেবাই যদি এসব ব্যাপারে নিজেব থেকে গা না দেয় সুবোধ কেন বলতে যাবে? তা সে বলবে না।

তসরেব পাঞ্জাবিটা গায দিয়ে—স্টিক হাতে কিছুক্ষণ ঘবেব ভেতব দাঁড়িযে বইল সে। পান কি দিযে যাবে না কেউ?

সুবোধ বেরিযে পড়ল।

রাত হযে এসেছিল। আকাশেও কোনো জ্যোৎস্না নেই। একে একে ঢেব তাবা উঠছে। ধানখেতের পব ধানখেত, ধানেব শিষগুলো অন্ধকাবের ভেতর জ্বলজ্বল কবে উঠেছে। এরা যে সবুজ, নিবিড় সবুজ এ যে এক গভীর কোমল অনির্বচনীয় সবুজের রাজ্য, এই অন্ধকারের ভেতবেও যেন তা বোঝা যায। হাঁটতে হাঁটতে সুবোধ মিউনিসিপ্যালিটিব লাল রাস্তা ছাড়িযে গেল। এবপর গ্রামের পথ। শাদা একফালি রেখাব মতো, পথের দুধারে আম কাঁঠাল বেতেব লতা ফণীমনসা বাঁশ বঁইচি জিউলি আকন্দ বনধুধুলের জঙ্গল মানুষকে যেন গিলতে আসে। কিন্তু তবুও এসব নিস্তব্ধ জঙ্গলের ভেতব কেমন একটা গভীব সবস প্রাণ যেন লুকিযে রযেছে। ঝিঁঝি ডাকছে, জোনাকি উড়ছে বহুদিন এসব এমন স্থিবভাবে দাঁড়িযে তাকিযে দেখেনি তো সে, এই নিববচ্ছিন্নন বনানীরাজ্য ও গ্রামমযতা কোন গ্রামবধূব মতো সুবোধকে মাযামমতা কবতে চায শুধু। সে কি আব দুদণ্ড সব ভুলে সব ছেড়ে আসক্ত হযে দাঁড়িযে থাকবে না?

দাঁড়িযে সে বইলই।

এত জোনাকিব ভেতব সে কি একটা জোনাকি হতে পারে না? এই অজস্র নরম পল্লবেব কোলেব ভেতব গ্রামের কিনাবে এই গোপনে একটি ঝিঁঝি বধূব বুকেব কাছে একটি ঝিঁঝিব জীবন যদি সে পেত?

সুবোধের বোধ হল পৃথিবীর নির্জন বহস্য কি চিরাবৃত বস ও প্রাণধাবার কাছে এসে পড়েছে যেন সে। শুধু মানুষেব দেহ ধরে আছে বলে সেই বিপুল বস সৌন্দর্যেব ভেতব ডুবে সে তলিয়ে যেতে পাবছে না। মানুষ সে, যেন জোনাকিবও অধম, কাঁচপোকার ও অধম,-ফিরতে হবে তাকে। সুবোধ মুখ ফেরাল।

শিশিব ঝরছে।

দূবে নদী কুযাশায ঢাকা। এই কুযাশা কুহেলি পবিবৃত কার্তিক বাতেব নদীটাই যেন একটা আলাদা জগৎ। একে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার কবতেই যেন মানুষেব এক জীবন লেগে যায, নদীব দিকে আবার তাকাল সুবোধ, যেন জন্মে জন্মেও এই কুযাশামাখা বাংলাব কার্তিকেব নদীকে আবিষ্কাব কবতে পারা যায না। নদীর দিকে তাকাতে তাকাতে একটা নিষ্ফল বেদনা পেযে বসল সুবোধকে। যেন কত জন্মের ফাঁকে ফাঁকে কত কি তাব হারিযে গেল, কত কি তার হল না, এই সবের অপবিস্ফুট কলবব কুযাশার সাথে সাথে নদীব সাথে সাথে ভেসে ভেসে কচি কচি হাত তুলে ... জঙ্গলেব ঘোমটাব ভেতব দগ্ধ হযে শেষ হযে গেল আবাব, জীবনে জীবনেও যেন সে সব খুঁজে সে আব পাবে না।

নদীর দিকে চোখ ফেরাল সুবোধ।

বন গাছে, তেলাকুচোর জঙ্গলে, ধানের মাঠে মনসাকাঁটার ঝোপেব ভেতব জোনাকি দেখতে দেখতে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার উপব আবার সে উঠল। এরপর সেই আধা শহরের দেশে আবার, পুরোনো প্রাসাদখানা নতুন বাজার হাট, খালের ওপর কংক্রিটের পোল, পোলের নীচে খালেব ওপর হাটুবে নৌকাব ভিড়, ছিপনৌকা, শালতি , এক আধখানা বজবা। তারপবেই শহবের মস্ত জেলখানা, সেই বিবাট বাড়িটাব দিকে একবাব তাকাল সে, কোনোদিন সেখানে যাবে কি সে? জীবনটাকে যতদূব খতিযে দেখতে পাবা যায ও-দুযাব তার কাছে রুদ্ধ।

পুলিশ লাইনের ভেতর এসে পড়ল। দুধারে দোকান পশরা কেরোসিন ও ক্বচিৎ গ্যাস ইলেকট্রিক লাইটের স্রোতের ভেতর দিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে বাড়ি ফিরল সে।

ঘরে ঢুকে সবই ভুলে গেল সুবোধ। বনজঙ্গলের ভালোবাসা, নদীর রহস্য, নৌকা, খাল, শহরের পথঘাট দোকানপাটের কোনো কথাই আর মনে রইল না তার।

বারান্দায় একটা লণ্ঠন রয়েছে। সুবোধের মনে হল, যে দিয়ে গেছে, সে এই জিনিসটাকে বারান্দায় রেখেই কসুর। ঘরের ভেতর ঢুকবার কোনো তাগিদ আর সে বোধ করে নি। সুবোধের মনে হল কে এই লণ্ঠনটা রেখে গেল? হয়তো চাকরবাকরদের কেউ। কিংবা সুলতা, হয়তো সরযূই রেখে গেছে। যেই রাখুক না কেন, ঘরের মধ্যে সে আর ঢুকতে চায় নি। লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল সুবোধ। টেবিলেব ঘরের চারদিকের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই রযেছে সব, কেউ এসে কিছু নাড়বার চাড়বার প্রয়োজন বোধ কবে নি। এমনকী বালিশ দুটোও তেমনি হন্তদন্ত হযে পড়ে রয়েছে। বিছানার চাদর ঠিক সেই সন্ধের মতন কুঁচকেবুঁচকে লণ্ডভণ্ড হয পড়ে রযেছে।

জামাকাপড় ছাড়ল সুবোধ।

দরজা জানলা খুলে দিয়ে চেয়ারে বসে ধীরে ধীবে সমস্ত মুখেব গাযের ঘাড়ের ঘাম মুছল সে। তারপর কুঁজোর থেকে একগ্লাশ জল গড়িয়ে খেল।

ঠাকুর এসে বললে—'আপনি ঢেব রাত কবে এসেছেন বাবু।'

সুবোধ অবাক হয়ে বললে—'তাই নাকি?'

—'ঘড়িতে কটা?'

সুবোধ টেবিলের ওপর থেকে অ্যাটাচে কেসেব ভেতব থেকে ঘড়িটা খুবে দেখে বললে—'সাড়ে নটা।' সুবোধ বললে—'সাড়ে নটা এমন আব বাত কি ঠাকুব।'

ঠাকুর একটু হেসে বললে—'ওবা সব খেযে ঘুমিয়ে পড়েছেন তো দাদাবাবু।'

সুবোধ একটু ভেবে বললে—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ।'

রোজ দক্ষিণেব ঘবেব বাবান্দায সানেব মেঝেব ওপব পাত পেতে ছেলেবা খায, ছেলেদেব পাত উঠে গেলে মেযেবা।

সুবোধ বললে—'সুলতা খেযেছে?'

—হ্যাঁ সক্কলের খাওয়া হযে গেছে।'

সুবোধ একটু অপেক্ষা কবে বললে—'হাবানিব মাও?'

—হ্যাঁ।'

অবিশ্যি না খায যে তা নয, সুলতা, সবযূও সুবোধকে বা বাবুদেব ফেলে অনেক সময়ই আগে খায। খাবেই না বা কেন? মেযেবা সব বিষযেই যে পুরুষেব চাপ খেযে চলবে সুবোধ তা চায না, ভালোবাসে না।

সুবোধ বললে—'আচ্ছা, তাহলে চলো।' উঠে দাঁড়িযে সুবোধ বললে—'ওবা সব ঘুমিযেছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'দবজা বন্দ করে দিযে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে থাক, ও ঘরেব বাবান্দায গিযে মিছেমিছি গোলমাল কবে কি দবকাব, বান্নাঘবে'—

—'বান্নাঘবে বড্ড মযলা দাদাবাবু, কুড়োতে একটু দেবি হবে। বামচবণও আবাব কথকথা শুনতে গেছে।'

চাকববাকবও তাকে অবহেলা কবে যেন। সুবোধ চেযাবে বসে পড়ে বললে—'কি হবে তাহলে?'

ঠাকুর ব্রাহ্মণ মানুষ, বান্নাঘবের এঁটো কুড়োতে পারবে না। বামচবণ কথকথা শুনে কখন ফেরবে কে জানে? হযতো রাত দুটো তিনটে বাজাবে। অতক্ষণ বসে থাকা অবিশ্যি কোনো কাজের কথা নয়। অভিমান যদি সুবোধ করতে চায এখন প্রচুব অভিমান কববাব সুযোগ তার হাতে এসে পড়েছে। অভিমান করা, রাগ করা, মোটেই অন্যায্য হবে না এখন তার। অনেকের ওপবই সেসব করতে পারে সে। পিসিমার ওপর করতে পাবে, কাকিমাদের ওপর পারে, সরযূর ওপব পারে, এই রামচরণটার ওপরও পারে, একমাত্র এই ঠাকুব বেহাই পায।

সুবোধ ঠাকুবকে বললে—'এই টেবিলেব ওপব একটা কাগজ পাতছি, আমাব ভাতটা তুমি এইখেনে নিয়ে এসো।'

—'তাই হোক।' বলে ঠাকুব চলে গেল। সেও কথকথা শুনতে যাবে। নেহাৎ বাবুকে না খাইযে গেলে ভালো দেখায না বলে এতক্ষণ সে টিকে গেছে। সুবোধ চেযাবে বসে নখ খুটতে খুটতে ভাবছিল, না বাগ অভিমান সে পিসিমা কাকিমাদেব ওপব কবতে পাবে না, সুলতাব ওপবও না, মনে মনে অবধি না। তাব নিজেব স্ত্রী থাকতে তাব নিজেব ভাব এবা নিতে যাবে কেন? সবযূ যদি নিজে খাত খেযে বাতাবাতি ঘুমিযে পড়তে পাবে তাহলে পিসিমা কাকিমাদেব কি মাযা কোথায কি ঠেকেছে? বামচবণেব পক্ষেও সহজপ্রাণে কথকথা শুনতে যাওযায বাধে কি কোথাও? তা বাধে না, সে গিযেছে, ভালোই কবেছে। সুবোধকে না খাইযে বামচবণ যে কথকথা শুনতে পালিযেছিল একথা সুবোধ কাউকে বলবে না কাল।

ভাত এসেছে। বড্ড ঠাণ্ডা হযতো উনুনে আগুন নেই এখন আব। থাকলে ঠাকুবকে একটু গবম কবে দিতে বলত সুবোধ। ডাল দিযে হিমেব মতো ভাত মাখতে মাখতে সুবোধেব মনে হল উনুনে আগুন এখনো থাকতেও বা পাবে। কিন্তু কথকথা শুনতে যাওযাব জন্য এমন তটস্থ ঠাকুবকে কি কবে সে এখন ডাল মাছেব ঝোল গবম কবে দিতে বলবে?

সুবোধেব জন্য ভাতেব থালা টেবিলেব ওপব বেখেই ঠাকুব উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিযেছে। হযতো বান্নাঘবে গিযে নিজেব ভাত গিলছে, আহা বেচাবা। সমস্ত বাড়িখানাব ভেতব সেই-ই তো আজ সুবোধেব ব্যবস্থাটা অবশেষে নিজেব হাতে তুলে নিযেছে, হযতো নিতে বাধ্য হযেছে, কিন্তু তবুও, নিযেছে তো' সুবোধ, এক গেবাস ভাত মুখে দিল। সুবোধেব মনে হল বামচবণেব মতো ঠাকুবটাও পালিযে কথকথা শুনতে গিযে এ বাড়িব ঘুমন্ত বধূটিব ওপব ববাদ্দ চাপিযে দিযে যেতে পাবত, ন্যাযত ধর্মত তা সে পাবত বটে। কিন্তু সেসব কবতে যায নি সে। সুবোদেব ঘবেব ভেতব ঢুকে আজ বাতে সুবোধেব অদ্ভুত একটা একাকিত্ব ও নিঃসহাযতাকে ঘাড় নেড়ে নেড়ে তবুও খানিকটা হৃদযঙ্গম কবতে গিযেছে সে। এই সমস্ত বাড়িখানাব ভেতব শুধু একটা মাত্র লোক।

গেবাসেব পব গেবাস খেযে চলেছে সুবোধ। বধূব ওপব অভিমান কবে ভাত খাবে না কেন সে? একদিন অবিশ্যি কথায কথায মাযেব ওপব অভিমান কবে ভাত খাবে না বলে দাঁতপাটি মেবে পড়ে থাকত সুবোধ। কতদিন মাযেব ওপব বাগ কবে বাতেববেলা, এমনকী কটকটে দুপুবেও বিছানা নিযে বসত সুবোধ। কিছুতেই ভাত ভাবে না সে। কিন্তু তাব প্রতিটি দিনেব প্রতিটি ধনুর্ভাঙা পণ মা বিছানায বিছানায পথেঘাটে ঘবেব কোণে গাছতালায এ পৃথিবীব অত্যন্ত অগোচব অন্ধতম জাযগাযও সুবোধকে অনুসবণ কবে কবে ভেঙে ফেলেছে। কি কবে? জোব কবে নয অবিশ্যি। বাপবে সে কি কবে যে ভাবতে গেলেও চোখ ফেটে জল আসে। একদিনেব জন্যও সুবোধকে না খাইযে বাখে নি মা।

জননী ছিল ....

আব এই বধূ? অপস্রিযমাণা, অপস্রিযমাণা, অপস্রিযমাণা, অপস্রিযমাণা। জানলা দিযে তাকাতেই সুবোধ দেখল ঠাকুব একটা কম্বল গায দিযে হেবিকেন হাতে চলে যাচ্ছে।

সুবোধ ডাক দিযে বললে—'খেযেছ ঠাকুব?'

—'হ্যাঁ।'

—'এবই মধ্যে হযে গেল?'

ঠাকুব একটু এগিযে এসে বললে—'আমি তো আগেই খেযেছি দাদাবাবু।'

—'আমি আসবাব আগে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বামচবণ?'

—'ও খায নি, এসে খাবে, ভাত ঢাকা দিযে বেখে গেছি।'

ঠাকুব দাঁড়িযেছিল।

সুবোধ বললে—'কথকথা শুনতে যাচ্ছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায হচ্ছে?'

—'গাঙ্গুলিদেব বাড়িতে, সুদর্শন গাঙ্গুলি।'

—'আচ্ছা যাও।'

—'ওরাও তো সব গেছেন।'

সুবোধ চমকে উঠে বললে—'কারা?'

—পিসিমা গেছেন।'

—'হ্যাঁ, পিসিমা? কে নিয়ে গেল?'

—'নরেন দাদাবাবু গেছেন।'

—'নরেনও গেছে?'

—'মন্টুবাবু।'

—'হ্যাঁ, মন্টুও?'

ঠাকুর বললে—কাকিমারা গেছেন।'

সুবোধ মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বললে—'ও সবাই গেছে তাহলে?' মনের ভেতর একটা সান্ত্বনা বোধ করল সে। ঘর হয়তো সেজন্যই ঝাঁট দেয়া হয় নি। হেরিকেনটা সেজন্যই হয়তো বারান্দায় ছিল। রামচরণটা রেখেছে নিশ্চয়ই। সরযূ হলে টেবিলে এনে রাখত। সুবোধকে ঘরে না দেখে সরযূ হয়তো ভেবেছে যে স্বামীও কথকথায় গিয়েছে বোধহয়। সবাই চলে গেলে একা বাড়িতেই বা সরযূ কি করে থাকে, সেজন্যও হয়তো বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে তার। পিসিমা হয়তো চেপে ধরে নিয়ে গেছেন। ভালোই হয়েছে, কথকথা সংকীর্তন-টঙ্কীর্তন এক আধদিন গাইয়ের মুখে শোনা উচিত, দিনরাত ঘরের ভেতর অবিশ্রান্ত একঘেয়ে ঝিমিয়ে এরা যা জাঁতচাপা হয়ে থাকে। সুবোধের হৃদয়ে গভীরতম স্থান অবধি স্নিগ্ধ হয়ে এল। অত্যন্ত সস্নেহে ঠাকুরকে সে বলল—'যাও তুমি, না হলে দেরিতে গিয়ে কি শুনবে ছাই।'

ঠাকুর বললে —'যাই।' দু-একপা এগিয়ে বললে—'দিদিমণি যান নি।'

—'দিদিমণি, সুলতা? যায় নি?'

—'না।'

—'কেন?'

—'বউঠাকুরুন গেলেন না কি না!'

মাছের ঝোলের বাটিটা হাত থেকে উলটে গেল সুবোধের, সুবোধ হাঁ করে বললে— 'কে?'

—'তানারা দুজনে রয়েছেন।'

—'কেউ যায় নি?'

—'না।'

—'আমার বউ হারানির মা?'

ঠাকুর পানজর্দার রসে আপ্লুত হয়ে হেসে ঘাড় নেড়ে বললে—'সেই বউঠাকুরুনের কথাই তো বলছি আমি।'

—'যায় নি?'

—'না।'

ঠাকুর বললে—'ওঁদের একটু দেখবেন, বাড়িতে পুরুষমানুষ তোর আর কেউ নেই।' ঠাকুর গাঙ্গুলিদের হাবেলির দিকে দমবন্ধ করে ছুট দিল।

সুবোধ হাত গুটিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। এইবার সমস্ত অভিমান ও ক্রোধ সরযূরই ওপরে গিয়ে পড়ে শুধু। পিসিমা কাকিমারা থাকলে ব্যাপারটা যে কিছুতেই এরকম হত না নিজের হাতেই তাদের কেউ না কেউ পরিবেশন করত যে ভাত ডাল গরম গরম পাওয়া যেত, এই ভেবে মনের ভেতর এমন লজ্জা, এত ক্ষোভ জমে ওঠে। কেন এমন যে পিসিমারা থাকলে তাঁরা প্রতীক্ষা করে থাকবেন সুবোধকে—কতক্ষণে আসবে তারই ধুয়ো ধরে থেকে সে এলে নিজেদের হাতে গরম জিনিস পরিবেশন করে তাকে খাইয়ে তবে তাঁরা হাতছাড়া হবেন, আর বধূকে দিয়ে সে সব কিছু হবে না? এ কেমন? পিসিমারাও তো একদিন বধূ ছিলেন ছোটকাকিমা তো আজও বধূ, এখনো কাঁচা বয়স তার। তাদের সকলকে দিয়ে যা হত সরযূকে দিয়ে তা হয় না কেন? অথচ সুবোধ তাদেরই বা কে—সরযূর তুলনায় পিসিমা কাকিমাদের কে হয় সুবোধ? কি হয়? অথচ এই বধূ নাকি তাকে ভালোবাসে, স্বামীর সমস্ত পাওনা সুবোধকে দিয়ে মনে মনে সে নাকি সুবোধকে কল্যাণী লক্ষ্মী-স্ত্রীর মতো ভালোবেসে এসেছে। এই নিজের মনের কাছে চার বছর থেকে দিয়ে এসেছে সুবোধ।

সুবোধ ভাবছিল, কই ভালোবাসে না কি?

সরযূর নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এই নাকি কল্যাণী বধূ?

অভিমান হতাশা বেদনা নিয়ে বসে থাকলে অনেক অতলে তলিয়ে যেতে পারা যায়, সে সবের যথেষ্ট সুযোগ বধূ আজ দিয়েছে। কিন্তু তবু ব্যথা পেয়ে কি লাভ? বেদনা পেতে যাবে না সুবোধ। মেয়েমানুষ নিজের জীবনে অনেক ব্যথা পেয়েছে সে। মানুষও তাকে ঢের বহুমুখী বেদনা দিয়েছে। বেদনাকে গ্রাহ্য করবে না সে আর, নিজের মনের সমস্ত হতাশাকে আস্তে আস্তে মুখে ফেলতে লাগল সুবোধ। স্ত্রীর ওপর অভিমানও করবে না সে। হয়তো প্রেম ওর হৃদয়ে নেই, সুবোধের জন্য নেই। ওর কাছ থেকে প্রেম আর ভিক্ষা করতে যাবে না সুবোধ। মান থাকবে না। সরযূ যতটুকু দেয় তাই সে গ্রহণ করবে। যদি কিছু না চায় কেয়ার করবে না সে। এ সবের চেয়ে বড় সে। মহত্তর অমূল্যতর জীবনের ওপর প্রতীক্ষিত সে। অনেকক্ষণ স্থিত হয়ে বসে রইল সুবোধ। যদি কিছু না দেয় হাত গুটিয়ে রেখে সুবোধের মনে হল সরযূ কতটুকু দেয়.... যদি কিছু সুবোধ আবার ভাবতে লাগল। নিজের অনুভূতি কল্পনার গোপন জগতে পৃথিবীর বিপুল রসস্রোতের অপ্রতিহত সংগীতের ভেতর সুরবিলাসী কিন্নরের মতো ঘুরে বেড়াবে সে। সেখানে বেদনাও সুর, হতাশাও গান সেখানে, সমস্ত ম্লান অবসাদ পরাজয় রূপান্তরিত হয়ে তাল হয়ে ওঠে যেন। ....হয় সুর হয় সংগীত হয—রূপ হয। এমনি একটা নবজীবন হবে তার। বরং বিযের আগে কবি সে খুবই ছিল। এখন সে খুব সাধাবণ। মন আবার বাস্তব হয়ে পড়ল। নিরবিচ্ছিন্ন কবি সে নয়। মুহূর্তের আগের কিন্নবলোক ভেঙে পড়ল তার। না, কিন্নরলোক নিয়ে থাকা যায না। সাংসারিক সমীচীন বিচারের ওপর জীবনটাকে খাড়া কববে সে। ভাতেব থালায আবার হাত দিল সুবোধ। এইবারে ভাতগুলো একেবাবেই ভড়ভড়ে হযে গিযেছে। তবকারি দিযে মেখে নিল সে। তারপর টক খাকে, দুধ খাবে—কিছুই সে হাত দেবে না। হারানির জন্য দুধ জল গরম করবে বলে স্টোভটা ওই ঘরে নিযে গেছে সবযূ, স্টোভটা থাকলে ডাল তরকারি মাছের ঝোল দুধ গরম করে ভদ্রলোকের মতো খেত সুবোধ। স্ত্রী তাকে ভালোবাসে না, নাই-বা বাসল, সেইজন্য জীবনেব সমস্ত দিকই খোযাতে যাবে নাকি সে? খাবে দাবে বেড়াবে সে ভদ্রলোকেব মতোই, জীবনের সমস্ত দিক উপভোগ কবতে কোনো কসুব হবে না তাব। অপ্রেম অবহেলা অনেক পেযেছে সে, জীবনে অনেক সে একা থেকেছে, এ ব্যথা তাব নতুন নয। বিবাহ যখন কবেছিল, ভেবেছিল এ বেদনা কেটে যাবে তার। বিযেব পর থেকে বউকে কলকাতায নিযে গিযে অবধি কাজেব চাপে থেকে সুবোধেব মনে হযেছিল পাড়াগাঁয ছুটিতে গিযে প্রেম জমবে,পাড়াগাঁয এসে দুদিনেই সে বুঝতে পেরেছে, প্রেম কোথাও জমে না।

দুধ দিযে ভাত মেখে নিল সুবোধ। জানালার ভেতব দিযে বাইরের অথই অন্ধকারের দিকে তাকাল সে। সেই মাঠ চব নিভৃত ধানখেত আকাশে বাদুড়ের সমাবোহ নক্ষত্র, এই জানালার ভেতব দিযে সেই ছোটকাল থেকে এমনি বাতে রাতে জীবন ভবে কতবাব সে তাকাল, এই একই জিনিস সব দেখে এসেছে সে। বাববাব, বাববাব। তবুও জীবনেব ক্ষেপে ক্ষেপে এই অন্ধকাব নিস্তব্ধতা আমনের খেত তার মনকে নিবাশ কবেছে। কখনো স্বপ্নে ভবে দিযেছে, কখনো বেদনা দিযেছে, কখনো আবাব প্রতীক্ষা কবে থাকতে বলেছে, কখনো আগ্রহে জীবন প্রসন্ন কবে তুলেছে তাব, কিন্তু মনেব ভেতব যে ভাবই জেগে যেত না কেন সুবোধেব সব সময়ই সে যেন সোনার কাঠি রূপার কাঠির বাজকন্যার জন্য প্রতীক্ষা কবে থাকত, সে ভাবত বিবাহেব ভেতব দিযে কেমন একটা জীবন যেন সে পাবে। ববৰধূর মিলনেব ভেতব দিযে জীবনের অনির্বচনীয় শিহবণেব সুরা অনিবার পান কববে সে। পুলক বোধ করবে সে। বধূর ভেতর দিয়ে কেমন একটা গহন গভীর ভালোবাসা পাবে সে, সে ভালোবাসা কোনোদিনও, বোধ করে দেখে নি যেন যেন সে, সে ভালোবাসাব মুখও দেখে নি, নামও, যেন জানে নি, সে বধূর আস্বাদ, জননীর সবচেযে অপর্যাপ্ত স্নেহমমতাব ব্যাকুলতাব ভেতরও কোনোদিন পায় নি যেন সে। সে যেন আবো অভিনব আবো প্রগাঢ়, অনুপম। এমন এক লোকাতীত লোকের ভালোবাসা হবে তা।

সেই বাজকন্যাকে তারপরে তো সে পেল। ঘুমন্ত পুরীর হীরের পালঙ্কেও যদি এই বধূ শুয়ে থাকে তবুও তাকে মানায়, খুবই মানায সরযূকে। সুন্দরী সে বটে। হ্যাঁ, সে রাজকন্যাকে পেয়েছে বটে সুবোধ, এখন এই জানালার ভেতর দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকালে আগের মতো কোনো রূপ সৌন্দর্য প্রেম ও অপরিসীম মায়া মাখানো স্বপ্নের মাধুরী মনের ভেতর জেগে উঠবে না তার। সেই রাজকন্যাকে সুবোধ পেয়ে গেছে যে।

হৃদয়হীন গল্প

একখানা টিনের আটচালা ও একখানা মাঝারি গোছের দোতলা দালান নিয়ে এই পরিবার।

টিনের ঘরখানায় অমরেশ ও তার বধূ নীলিমা থাকে। এর আগে অমরেশের মা-বাবা ছিলেন। দালানখানা অমরেশের পিসিমা কাকিমা কাকারা ইত্যাদি পরিবারের অন্য অন্য লোকজন থাকে। দালানখানা বিস্তর কামরা। ছাদের ওপরও তিন চারখানা ঘর। পরিবারের সমস্ত লোকজন এসে দেশের বাড়িতে জড়ো হলেও দুতিনখানা বেশ বড় বড় কোঠা খালি পড়ে থাকে। কিন্তু তবুও অমরেশ কোনেদিন দালানে গিয়ে থাকবার প্রবৃত্তি বোধ করে না। নীলিমার খুবই ইচ্ছা, সে দালানে গিয়ে থাকে, স্বামী যদি না যায় তাহলেও সে যেতে প্রস্তুত। দালানের দক্ষিণ দিককার একখানা সুন্দব কামরায তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বসতে সে এত লোলুপ। কিন্তু তবুও অমবেশ বিযের পর থেকেই চেপে এই টিনের ঘরে রেখেছে নীলিমাকে। তিন বছর ধরে।

তারপর একদিন মনে হল, 'থাক ও'—এর পর যখনই নীলিমা দালানে যাওযার কথা পাড়বে অমরেশ কোনো আপত্তি করবে না আর। নিজে সে অবিশ্যি এই টিনের ঘরে থাকবে ইচ্ছে কবে অমরেশ যে যেতে না পারে তা নয়, এ পরিবারের অন্যদের যে অধিকার তারও প্রায তেমনি। কিন্তু তবুও এই দালানটি অমরেশের পিতার অর্থে তৈরি হয় নি। তার পিতার অর্থে এই পরিবারের বিশেষ কিছুই হয নি। নিজেও সে বিশেষ কিছু করতে পারল না। অনেকদিন থেকেই তাই একটা গভীর দীনতা অমরেশকে পেয়ে বসেছে।

বহুদিনের থেকেই অমরেশের বোধ হযেছে যে লোভেব জগতে আকঙ্ক্ষাব জগতে প্রবেশ কবতে যাবে না সে আর, যদি-বা কোনোদিন প্রবেশ করতে হয়, মাথা হেট করে অবনত মনে চলবে সে, নিজের দীনতম হৃদযের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গভীর সহিষ্ণুতার সঙ্গে এ পৃথিবীটাকে গ্রহণ করতে যাবে সে।

এমনিভাবেই জীবন চলেছে তার।

কিন্তু একদিন মনে বধূকেও কেন সে এমন দীনা আকাঙ্ক্ষাহীনা থাকতে বলবে?

প্রাণের ভেতর সে তাগিদ নেই তো নীলিমার। কেন জোর করতে যাবে অমবেশ! না, জোর সে আব করবে না। বহু দিনের জীর্ণশীর্ণ ঘরটা তাদের এইবার একটু মেরামত করতে হবে। কাজেই নীলিমাকে সে দালানে গিয়ে থাকতে বলল। নিজেও ঘর মেবামতের কটা দিন্ন দালানেই কাটাল অমরেশ। তারপব ঘরটা যখন বেশ ঠিকঠাক হয়ে গেছে, দালানের থেকে নেমে সেই সাহেবি টিনের আটচালাটার ভেতবেই আবার ফিরে এল অমরেশ। নীলিমা স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে এল না।

বধূকে কোনো অনুরোধ আর করল না অমরেশ।

নিজের দেড় বছরের মেযেটিকে নিয়ে নীলিমা দালানে বড় খুড়িমার ঘরের পাশে দক্ষিণ দিক বেছে একটা কায়দামতো খটখটে সুন্দর ঘরে নিজের বিছানা তোরঙ্গ কাপড়চোপড় গুছিয়ে বসল। শুধু খুকুকে নিয়ে থাকতে পারবে কি সে? সমস্ত রাত কাটাতে পারবে? অমরেশের এতরকম আদর সোহাগ হারিযে সমস্ত রাত থুবড়ে পড়ে থেকে থেকে বধূ পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে।

দু-একদিন একা একা আটচালার ঘরে কাটিযে কাটিয়ে অমরেশের মনে হল নীলিমা হয়তো পাঁচ সাতদিন পরেই ফিরে আসবে। এই আটচালাটাই বা এখন মন্দ হযেছে কি? এত বড় ঘরে তাবা দুজনে বেশ থাকতে পারে তো এখন। কিন্তু অবিশ্যি দালানের সুখের সঙ্গে এ আটচালার কোনো তুলনা হয় না। নীলিমা দালানের দক্ষিণের দিকের একখানা খোলামেলা কোঠায থাকে। হু-হু করে সারাদিন ধানের খেত ভেসে হাওয়া আসে, চোখের সামনে এমন দশ-বিশটা ধানের খেত নীলিমার, যেন পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে সেগুলো। বাদল কেটে গেছে, চোখ তুললেই আকাশের নীলিমাকে যেন পৃথিবীর সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে নীলিমা। শরতের আলো রোদ বধূর ঘরের ভেতর এমন সম্পূর্ণভাবে খেলে। ঘরের পাশেই মস্তবড় দুটো শেফালি গাছ। ভোরের বেলা কচি কচি ঘাসের ভেতর থেকে নীলিমা

শেফালিগুলো কুড়োয়। আঁকশি দিয়ে বড় বড় স্থলপদ্ম পাড়ে। মাছবাঙা ও বকেব পাখায় তখন ঝিকমিক কবছে আকাশটা। নীলিমাব ঘবেব বাঁ দিকে আধা শহবেব দৃশ্য। মিউনিসিপ্যালিটিব লাল বাস্তাব একধাব দিয়ে ঝাউগাছেব সাবি অনেকদূব অবধি গিয়েছে। সাবাদিন গ্রামেব ইট সুবকি বাঁশ খড় বোঝাই কবে গরুব গাড়ি আসছে। মাঝে মাঝে দু-একটি মটোব। দূবে নদীব ওপব কালেক্টব সাহেবেব স্টিম লঞ্চ দেখা যায়। নীলিমাব কাছে একটা গভীব কৌতূহলেব জিনিস। এদিকে লোহাব কাঁটাবেড়া দিয়ে ঘেবা অনেকখানি সবুজ ময়দানেব এক কিনাবে জিলা ইস্কুল, ইস্কুলেব বাগান, হেডমাস্টাবেব কোয়ার্টাব, নীলিমাব কাছে এ সমস্তই ঢেব আগ্রহেব জিনিস।

তিন চাবদিন আবো কেটে গেল। নীলিমা দালানেই টিকে বইল। বেলা বাবোটাব সময় দালানেব উত্তব দিকেব বাবান্দায় বাবুদেব জন্য ও ছেলেদেব জন্য পাত পড়ে। অমবেশ আস্তে আস্তে উঠে খেয়ে আসে। কোনেদিন হয়তো বধূ পান সাজছে—অমবেশেব সঙ্গে কথা কইবাব অবসব নেই তাব। কোনোদিন ননদ খুড়িমাদেব সঙ্গেই জমিয়ে বসেছে। স্বামী যে এসেছে সেদিকে খেয়ালই নেই তাব। কিংবা যদিই বা খেয়াল থাকে কি আসে যায় তাতে, এত লোকেব মাঝখানে অমবেশেব সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা কবে না নাকি? তা ঠিক বটে, অমবেশ তা জানে। কিন্তু তাই বলে স্বামীব চোখেব নজবেব ভেতবে একবাব নীববে ঘুবে যাওয়াতেও কি অপবাধ আছে? অমবেশ চোখ তুলে দেখে চাবদিকে তাকায়, নীলিমাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। একটু কান পাতলেই ননদ ভাজদেব সঙ্গে তাব হাসি গল্পেব তুফান ধবা পড়ে। এমন অকুণ্ঠিত নিঃসঙ্কোচ হাসি, এমন পবিতৃপ্ত অবসিংবাদী গলায় গল্প চলেছে জীবনেব, এত মর্মান্তিক সাধাবণ খুঁটিনাটি জীবন ধবে যে অমবেশ যেন তাঁব স্বামীহীনতাব সত্য জীবনটাকে নিয়ে পেবে ওঠে না আব।

সে বোঝে না স্বামীব জীবন কেমন হবে, বধূকে ইচ্ছেমতো হাতেব কাছে পেতে আকাঙ্ক্ষা কবতে পাবে কি স্বামী? না তাকে অনুসবণ কবতে হবে? অনেক পবিশ্রম কবে অনেক চেষ্টাব পব বধূকে আবাব আয়ত্ত কবতে হবে। আবাব হাবিয়ে যাবে, আবাব নিয়ে আসতে হবে। জীবন কি এই অনুকবণই শুধু? একটি বমণীব পিছে পিছে সাবা জীবন এমনি কবে চলতে হবে নাকি পুরুষেব? তা যদি হয় তাহলে হয়তো এবকম সে পাববে না। নীলিমাকে সে ভালোবাসে বটে, কিন্তু পদে পদে বধূকে সে জিনিস বোঝাতে যেতে পাববে না সে।

তাব চেয়ে ববং নীলিমাকে বাদ দিয়েও যেন থাকতে পাবে অমবেশ। দবদালানেব উত্তব দিকেব বাবান্দায় বাড়িব পুরুষদেব মধ্যে খেতে বসেছে সে। ঘাড় হেট কবে খাচ্ছে। চোখ তুলে নীলিমাকে আজ আব খুঁজে বেব কবতে গেল না সে। ঘবেব ভেতবে কেমন একটা লোলুপতাবই অবসাদ শুধু। কোনো প্রেম নেই, মঙ্গল নেই, সার্থকতা নেই।

খেয়ে সে চলে যাচ্ছিল। কাকিমা পান দিলেন, হাতেব মুঠোতে কবে নিয়ে চলে গেল অমবেশ।

ভোবেব বেলায় অমবেশ ঘুমুচ্ছিল। একটু শীত পড়েছে। কম্বলখানা অমবেশেব পায়েব নীচেব থেকে আব একটু উপবে উঠে এসেছে প্রায় বুক অবধি।

ঘবেব জানালা সমস্ত খোলা।

দবজায় একটা ঘা পড়ল। একটা দুটো তিনটে।

অমবেশ বললে—'কে বে?'

—'আমি।'

—'সীতানাথ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আয়, দবজা খোলাই তো'—

একটু জোবে ধাক্কা দিয়ে সীতানাথ দবজা খুলে ঘবেব ভেতব ঢুকল। হাতে এক পেয়ালা চা ও এক বাটি মুড়ি বাতাসা।

অমবেশ বলল—'টেবিলে বাখ।'

চা মুড়ি টেবিলে বেখে সীতানাথ বললে—'দবজা খুলে শোন নাকি আপনি?'

—'না।'

—'এই যে খোলা দেখলাম।'

—'ও চাবটেব সময উঠেছিলাম একবাব, তাবপব আব ছিটকিনি লাগাই নি, সাবাবাত খুলে বাখলেও হয কি আব।'

অমবেশ উঠে মুখ ধুযে নিল।

সীতানাথ বললে—'সব জানালাই দেখছি খোলা।'

—'হ্যাঁ, জানলাগুলো সাবাবাত খুলে বাখি।'

—'সেটা ভালো কবেন না।'

—'কেন?'

—'দেশেগাঁযে আজকাল বড্ড চোব।'

—'হলই—বা।'

—'কবে কি জানেন—'

চেযাবে বসে অমবেশ বললে—'কী কবে?'

—'প্রথমত বেড়াব ফাঁক দিযে দেখে, কিন্তু আপনাবা তো খোলা জানলাই আছে। নজব দিযে ঘবেব জিনিসপত্র দেখে নেয সব।'

অমবেশ দাঁত বেব কবে হাসল। বললে—'তুই নতুন মানুষ, তুই কি জানিস, আমি বত্রিশ বছব ধবে এই ঘবে আছি, এখন আমাব বযস পঁযত্রিশ।'

সীতানাথ অমবেশেব কথায কোনো কান না দিযে বললে—'তাবপব জানলা দিযে ল্যাজা ছুঁড়ে মাবে।'

অমবেশ টেবি কাটতে কাটতে বললে— তাবপব?'

সীতানাথ বললে—হাসছেন? আপনি বিশ্বেস কবেন না। কিন্তু —

অমবেশ চিরুনিটা বেখে দিলে।

সীতানাথ বললে—'এখন থেকে জানালা বন্ধ কবে শোবেন বাবু।

—'আচ্ছা।

—'ছোট ঠাকুরুন দিদি থাকলে খুলে শুতে পাবতেন জানালা?

অমবেশ মিছে কথা বললে না। সত্যি কেউ তাকে জানালা খুলে শুতে দিত না। কাবণ ঢেব, একটা হযেছে বধূব ভয, আব একটা হচ্ছে ঠাণ্ডা না লাগাব ভাবনা,—এই বকম সব কাবণ।

সীতানাথ বললে—'কেমন তো দেখলেন, যদ্দিন বউ ঠাকুরুন ছিলেন একটা জানলাও খোলা বাখতে পাবতেন?'

অমবেশেব মনে হল যদিও-বা চুবি কবে এক আধটা খোলা বাখত সে, বধূ এক ঘুম দিযে উঠেই বন্ধ কবিযে নিত।

সীতানাথ বললে—'নিন, চা ধরুন দাদাবাবু।

—'মুড়িই আগে খাই।' মুড়িব বাটিটা ধবল অমবেশ।

—'চা ঠাণ্ডা হযে যাবে।'

—'তাই তো।' চাযেব পেযালাটা হাতে নিল।

—'বউ ঠাকরুন তো বোজ সন্ধ্যেব মুখে এসে আপনাব জানালা সব বন্ধ কবে দিযে যায।'

—'না।'

—'দেন না?'

অমবেশ চাযে আবাব চুমুক দিযে বললে—'না।'

সীতানাথ চুপ কবে বইল।

অমবেশ বললে—'আমাব তো আব ভয নেই যে বউ এসে সন্ধ্যাসন্ধি জানালা বন্ধ কবে দিযে যাবে।' অমবেশেব মনে হল তা পাবে বটে, হিমও তো লাগতে পাবে, কিন্তু নিজেব গায যাতে হিম না লাগে তাব ব্যবস্থা কবে নেযা তো পৃথিবীব এমন কিছু কঠিনতম কাজ নয, এমন কোনো জিনিসও নয যে নাবী হাতেব স্পর্শ না হলে চলবে না, হিম বাস্তবিকই কোনো অপকাব কবছে এমন বোধ হযে থাকে যদি অমবেশেব তাহলে নিজেই তো সে অনাযাসে সন্ধ্যাব মুখোমুখি জানালাগুলো বন্ধ কবে বাখতে পাবে।

অমবেশেব মনেব ভেতবেও কেমন একটা গুমড় পাকিযে উঠল, বধূ হিম হিম কবত বটে খুব, ঠাণ্ডা

লাগবার ভয় যথেষ্ট ছিল তার, সে কি সমস্তই তার নিজের জন্য ভয়? নিজের শরীরটার জন্যই শুধু এতদিন তাগ্‌বাগ্‌ করে গেছে মেয়েটি। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল অমরেশ।

সীতানাথকে ঠিক এই কথাগুলিই বললে অমরেশ।

সীতানাথ কোনো উত্তর দিল না।

একটু পরে বললে—'চা করেছে কে রে?'

—'আমিই।'

—'ও পাড়ায় তো কেউ চা খায় না।'

—'না।'

—'আমার জন্যই এক পেয়ালা তো শুধু?'

সীতানাথ ঘাড় নেড়ে বললে—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু টাটকা দুধ দিয়ে করিস নি কেন?'

—'দুধ এখনো দোয়ানো হয় নি।'

—'কিন্তু বাজার থেকে এসেছে তো।'

—'সে সব কাকিমা গরম করে নিয়ে গেছেন।'

—'আমার মেয়ে দুধ খেয়েছে?'

—'কে, ছোটখুকী?'

—'হ্যাঁ।'

সীতানাথ বলতে পারল না, খুকীটার খবর কেউই তাকে দিতে পারছে না।

অমরেশ বললে—'খুকীর মা কী করছে?'

—'ঘুমুচ্ছে।'

—'এখনো' ঠিক জানিস?'

—'দেখে আসি—'

—'থাক।'

অমরেশ বললে—'মুড়ি কে দিল?'

—'পিসিমা।'

অমরেশ মুড়ি চিবুতে চিবুতে বললে—'খুকীর মা এখনো ঘুমুচ্ছে তাহলে।'

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ।

অমরেশ বললে—'জেগে উঠে কী করবে?

সীতানাথ আড়মোড়া দিয়ে চুপ করে রইল।

মুহূর্তের মধ্যেই নিজের প্রশ্নের অপ্রাসঙ্গিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেল অমরেশ, একই পরিবারের এলাকার ভেতর থেকে তার নিজের বধূ কি করে না করে সে খবর চাকরটার কাছ থেকে নিতে হবে তার?

নীরবে মুড়ি খেতে লাগল অমরেশ। নিতান্তই কোনো কথার মানুষ পায় না অমরেশ, অথচ বধূ চব্বিশ ঘণ্টাই তো কথা মুখে নিয়ে আসে, কার জন্য? পিসিমা কাকিমা ননদ ভাজ সকলের জন্যই—অমরেশ একটু কান পেতে শুনল—নীলিমা জেগে উঠে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

মুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে। অমরেশ জানালার ভেতর দিয়ে ধানখেতের দিকে তাকাল।

শরতের এই আকাশ বাতাস পৃথিবী বেশ সুন্দর বটে কিন্তু দিনরাত এই একঘেয়ে দৃশ্য তার ভালো লাগে না। এই আটচালা আর বই, আর খবরের কাগজ, দিন আর রাত, রাত আর দিন মানুষ কি তার জীবনে আর থাকবে না?

কী চায় সে? একজন মেয়েমানুষ বা পুরুষ পেলেও চলে তার। সীতানাথকে পেলেও হয়। নিজে সে বিশেষ কিছু তেমন কথা বলতে পারে না, কিন্তু অন্যের কথা খুব শুনতে পারে সে, শুনতে চায়ও।

দালানের কোঠার ভেতর বসে বধূ অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।

দুপুরবেলা দরদালানের বারান্দায় খেতে বসে অমরেশ আজ আর ঘাড় গুঁজে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। চোখ তুলে চারদিকে না তাকিয়ে কিছুতেই সে পারল না। নীলিমাকে দেখতে পেল না

অবিশ্যি। কিন্তু তবুও কয়েকবার এক কোঠা ছেড়ে অন্য কোঠার অন্তরতম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফিরতে লাগল এই স্বামীটি। অবিশ্যি কেউ কিছু বুঝতে পারে নি। (এমন জিনিস বোঝা যদি কারু সাধ্যে থাকে!) খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে জ্যোৎস্না পান দিতে এল, অন্য অন্য দিন পান নিয়ে সিধে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় অমরেশ, আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার সঙ্গে একটু পরিহাসোচ্ছলতা শুরু করে দিল অমরেশ। এর ফাঁকে নীলিমাকে কোথাও যদি দেখা যায়, সে হয়তো চলেও আসতে পারে। নীলিমাকে ত্রিসীমানায়ও পাওয়া গেল না।

পরিহাসে বিশেষ সিদ্ধহস্ত নয় অমরেশ। কয়েকটা কথা বলবার পর কোনো কথাই আর খুঁজে পেলে না সে। জ্যোৎস্নাও গেল চলে।

পিসিমা বললেন—দাঁড়িয়ে আছিস কেন অমর?'

—'না।' দাঁড়াচ্ছি না।'

—'বোস।'

—'না বসব না।'

—'কি করবি? ঘরের দিকে দৌড়?'

—'না, ঘরে এখন যাব না।'

—'দাদা থাকলে বরং এখানে একটু আসতি টাসতি, এখন যে একেবারেই আসাযাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস।'

অমরেশ ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। তারপর দাঁত বের করে হেসে বললে—'আমিই বরং তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছি পিসিমা, তাই না?'

—'যা ভাবিস বাছা।'

পিসিমার অবসর ছিল না, তিনি চলে যাচ্ছিলেন। যাবার আগে বললেন—আসিস বাছা, আসিস, অনেক সময় তোকে এত কাছে পেতে ইচ্ছা করে।' পিসিমা চলে গেলেন। পিসিমাকে অমরেশ ভুলে গেল। কি একটা কাজ নিয়ে জড়িয়ে পড়ে অমরেশকেও ভুলে গেল পিসিমা।

কাকিমা মাঝের কোঠার ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—'অমর!'

—'এই তো।'

—'তোমার কাকা তোমাকে কাল খুঁজছিলেন।'

—'আমাকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন বলো তো কাকিমা?'

—'জানি না।'

—'কখন কাকিমা?'

—'সন্ধের সময়।'

—'আমি তো ঘরেই ছিলাম।'

—'উনি আর গেলেন না।'

বড়কাকা এসে পড়লেন।

কাকিমা বললেন—'এই তো, কাল সন্ধ্যার সময় অমরকে ডেকে দিতে বলেছিলে না?'

অমরের দিকে তাকিয়ে বড়কাকা বললেন—'ও হ্যাঁ, তাস খেলব বলে।'

অমর বললে—'তাস?'

বড়কাকা বললেন—'হ্যাঁ, রোজ আমাদের ব্রিজপার্টি বসে।'

—'কোথায়?'

—'ছাদে।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অমরের বড়কাকা বললেন—'কাল ভেবেছিলাম মুনশেফটা আসবে না, আসবেই বা কি, ওটার কোর্টের কি অন্ত আছে। সিভিল কোর্ট, পেটি কোর্ট,' যুগপৎ স্ত্রী ও অমরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে বলতে থমকে গেলেন।

বড়কাকিমা বললেন—'মুনশেফবাবু কাল এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, কাছিমের মতো গড়াতে গড়াতে এল।'

অমবেশেব দিকে তাকিয়ে বড়কাকিমা বললেন—'সেই জন্যই আব তোমাকে ডাকা হল না শেষ অবধি।'

অমবেশ কিছু বললে না।

বড়কাকা বললেন—'ওই মুনশেফটা আবাব খেলতে জানে?'

—'জানে না?'

—'ছাই, কতকগুলো বাবাব নষ্ট কবে দিলে আমাব।'

—'ওকে পার্টনাব কবে নিয়েছিলে কেন? যেমন তোমাব আক্কেল।'

বড়কাকা অমবেশকে বললেন—'ব্রিজ খেলতে জানিস?'

বড়কাকাদেব সঙ্গে ব্রিজ খেলে কোনো সুখ পাবে না অমবেশ, এই অবধিই জানে সে। জীবনটাও তাব এমন জায়গায় এসে পৌছায় নি এখনো, কিংবা হয়তো বহুদিন হয় সে সব জায়গা পেবিয়ে গেছে সে। যেখানে ব্রিজ খেলা মাছ ধবা অনেক জিনিসই একটা গভীব নেশাব মতো হয়ে দাঁড়ায়, সে সব না হলে মানুষেব আব চলে না যেন।

বড়কাকিমা বললেন—'চুপ কবে বইলে যে অমব।'

বড়কাকা বললেন—'ও জানে না খেলতে।'

বড়কাকিমা চোখ কপালে তুলে বললেন—'সত্যি অমব?'

অমবেশ বললে—'বিশেষ ভালো জানি না।'

বিজয় একটা ছিপ হাতে এসে বললে—'কে অমবদা, খুব চমৎকাব ব্রিজ খেলতে পাবে বাবা।'

বড়কাকিমা মাথা নেড়ে বললেন—'ভালো পাবে না।'

বিজয় বললে—'গ্র্যাণ্ড খেলতে পাবে।'

বড়কাকিমা বললেন—'ও নিজে বলছে জানি না, তুই তবু সাউকাবি কববি?'

বড়কাকা বললেন—'হ্যাঁ তেমন খেলতে পাবলে ওই আটচালায় চেপে বসে থাকতে পাবত কিনা।'

'মুনশেফটা সাত মাইল দূবেব থেকে ব্রিজেব গন্ধ পেয়ে আসে, একটা ধাড়ি কচ্ছপেব মতো, একি যে-সে খেলা!'

বিজয় কোনো কথাকাটাকাটি কবলে না আব। ছিপ হাতে ঝা ঝা বোদেব ভেতব বেবিয়ে পড়ল সে।

বড়কাকা বললেন—'বিজে!'

মুহূর্তেব জন্য থামল বিজয়।

—'কোথায় মাছ ধবতে যাচ্ছিস?'

—'উত্তব সাগবে।'

বড়কাকা খুব উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে বললেন—'যা যা।'

কাকিমা বললেন—'উত্তব সাগব খুব বড় দিঘি?'

—'ও সে কি যে-সে দিঘি! আব রুই মৃগেল কালীবোশ কাতল, সে প্রায় হাজাব পঞ্চাশেক হবে।' বড়কাকাব সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল।

'পঞ্চাশ হাজাব!'

অমবেশ তাকিয়ে দেখল হঠাৎ ধা কবে এতগুলো মাছেব কথা শুনে ব্লাউজেব বাইবে কাকিমাব দুহাত কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। পুলকে আশায় আকাঙ্ক্ষায় দুহাত অনেকক্ষণ বোমাঞ্চিত হয়ে বইল।

বড়কাকা বললেন—'শোন নি তুমি?'

—'কি কবে শুনব? আমবা কি এখানে থাকি?'

—'বছবেব মধ্যে তিন চাবমাস থাকা হয় তো।'

—'তাতেই কি একটা জায়গা চিনতে পাবা যায়?'

বড়কাকা বললেন—'দেখবে উত্তব সাগব।'

—'কদ্দূব এখান থেকে?'

—'মাইল তিনেক, ভয় নেই বমণী বিশ্বেসেব মোটবটাকে ঠিক বাখতে বলব।'

বড়কাকা ছাদেব সিঁড়ি ধবে বললেন—'তাহলে ব্রিজ খেলা আব হয় না আজ।'

—'না হল একদিন—'

—'কিন্তু আজ মস্তবড় পার্টি।'

—'পার্টি তো রোজই মস্ত, তোমরা দুভাই, মুনশেফ আর আহ্‌মদ মিঞা' কাকা বললেন—'আ গোলাম মিঞা আসবে।'

—'সে কে?'

—'নবাব, আবার কে।'

—'কোথাকার নবাব?'

—'কোথাকার আবার কি, এমন পঞ্চাশ লাখ চর নিজের আছে।'

—'পঞ্চাশ লাখ কি?'

—'চর।'

—'চর কাকে বলে?'

—'আহা খুকী আমাব, নদীর ভেতর যে চর পড়ে জানেন না যেন।'

অনেকেই হেসে উঠল।

বড়কাকিমা নাক কুঁচকে বললেন—'নদীব দেশে আমরা থাকি, যে জানব?'

বড়কাকা বললেন—'হয়েছে।'

কাকিমা বললেন—'পঞ্চাশ লাখ চর নিয়ে মানুষ আবার নবাব হয় নাকি?'

কাকা বললেন—'পঞ্চাশ লাখ পাটকেল নিয়েও হয়। পঞ্চাশ লাখ একটা কথার কথা হল নাকি? প-ঞ্চা-শ-লা-খ-!'

কাকিমা বললেন—'গোলাম মিঞাকে কী খাওয়াতে হবে?'

—'কিছু না। ঝালচানা হলেই চলবে।'

—'এই নবাব?'

—'ডিসপেপসিয়া যে—'

—'ডিসপেপসিয়ায় ঝালচানা খুব ভালো, না?'

—'তাহলে কি দেবে?'

কাকিমা বললেন—'ওসব বলতে হয় আগের থেকে আমাকে, ব্যবস্থার ভার তো আমাব হাতে, আগে কিছু বলো নি আলুর চপ দিলাম আলুভাজা সিঙাড়া দিলাম, পোলাও দিলাম, মিষ্টি দিলাম, চা দিলাম, মুনশেফ কিছু খেলে না বললে চা-তে চিনি খাই না, সিঙাড়াব আলু খাই না, আলুব চপে আলু খাই না, পোলাওয়ে কি বললে যেন—'

—'মির্চা।'

—'শেষে বিনে চিনিতে চা আর আধখানা চাটিম কলা খেয়ে বললে এই আমাব ঢেব হয়েছে, এমন করে লোক বাঁচে?' বড়কাকিমা চক্ষুস্থিব করে তাকালেন।

বড়কাকা বললেন—'ওর যে ডাইবেটিস, গোলাম মিঞা আরো চমৎকার, একটা পান অবধি হজম করতে পারে না।' বড়কাকা বললেন—'আজ আমাবও কেমন চোঁয়া ঢেকুব উঠছে, আমাকে কি খেতে দেবে বলো তো?'

কাকিমা গালে হাত দিয়ে বললেন—'এই তো খেয়ে উঠলে।'

—'না, বিকেলে তাসের সময়ের কথা বলছি, কী খেতে দেবে তখন?' বড়কাকা ঢেকুর তুলতে লাগলেন।

কাকিমা বললেন—'তুমি আজ আর কিছু খাবে না।'

—'ও সে হয় না।'

—'হয় নাকি? অনিয়ম কবে করে তোমাকেও গোলাম মিঞাব মতো ডিসপেপসিয়ায় ভুগতে দেব কি না আমি।'

বড়কাকা বললেন—'বিজন যদি মাছ ধরে আনে তাহলে না হয় দু-চারটা ভেজে পাঠিও।'

—'তোমাকে পাঠাব না।'

—'না হয় ঘি দিয়ে ভেজো।'

—'অমৃত দিয়ে ভাজলেও তোমাকে দেয়া হচ্ছে না।'

—'কেন?'
—'এই না বললে চোয়া ঢেকুর উঠছে।'
—'যদি সেরে যায়, যদি ভালো বোধ করি—'
—'তা হলে না হয় দেখা যাবে।'
বড়কাকা আবার ছাদের সিঁড়ে ধরলেন।
বড়কাকিমা বললেন—'শুনে যাও আগে, একটু এদিকে এসো।'
কাকা নেমে এসে দাঁড়ালেন।
কাকিমা সট করে তাদের ঘরের থেকে কাচের গেলাশে করে খানিকটা জল ও সোডামিন্টের দুটো বড়ি এনে দিয়ে বললে—'এই খাও।'
কাকা গব গব করে গিললেন।
কাকিমা বললেন—'কাল থেকে আর ব্রিজ ফ্রিজ কিছু নয়।'
—'কেন?'
—'ওতে তোমার হাঁটাচলা আর হয় না, পেট ফেঁপে ওঠে, ওসব আমি হতে দেব না।'
কাকা বললেন-'না না ব্রিজ বন্ধ কোরো না, না হয় সকালবেলা আমি হাঁটব।'
কাকিমা বললেন—'হাঁটবে, না বাড়িতে বাড়িতে আড্ডা দিতে যাবে।'
—'আড্ডা নয়, হাঁটব। সত্যি বলছি তোমাকে, হাঁটব।'
কাকা বললেন—'তিন-চার মাইল হন হন করে রোজ সকালে হাঁটি যদি তাহলে যেটুকু বা পেট ফাঁপাফুঁপি, উইন্ড, থাকবে না কিচ্ছু, সব যাবে ভস্ম হয়ে।'
কাকিমা বললেন—'কিন্তু একদিনও বেনিয়ম হয় না যেন।'
—'এক চুলও হবে না।'
—'হলে আমিই আছি।' কাকিমা অত্যন্ত প্রীত হলেন।
কাকা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে ওপরে চলে গেলেন।
কাকিমা ডাক দিয়ে বললেন—'কোলবালিশ আর একটা লাগবে নাকি?'
ওপর থেকে কাকার জবাব এল—'না, দুটোই তো আছে।'
কাকিমা বললেন—'বিছানার চাদর আজ বদলে দিয়েছি।'
—'বেশ ধবধবে সিট আছে, শুয়ে আরাম, আঃ।'
বোঝা গেল মানুষটি আরামে শুয়ে পড়েছে।
—'গল্পের বইটা বিছানার পাশে আছে কিনা দেখো তো, আমার তো মনে হয় রেখেই এসেছি।'
—'আছে।'
—'আর একটা বইটই দেব?'
—'কী বই?'
—'তোমার সেই ডিটেকটিভ গল্প আর কি।'
—'নতুন?'
—'হ্যাঁ।'
—'কোথায় পেলে?'
—'এ মাসের কয়েকখানা মাসিক পত্রিকা এসেছে কিনা, সেখানার ভেতর কয়েকটা বেরিয়েছে।'
—'আচ্ছা আচ্ছা, পাঠিয়ে দিও।'
—'পাঠিয়ে দেব কেন, আমিই যাচ্ছি।'
কাকিমা পত্রিকাগুলো দু-মিনিটের ভেতর সট করে গুছিয়ে এনে সাঁ করে আরো গোটাকয়েক পান তৈরি করে ওপরে চলে গেলেন।
অমর ভেবেছিল শিগগিরই হয়তো ফিরবেন কাকিমা, তিনি খান নি, বেলাও প্রায় একটা দুটো। নীলিমা এতক্ষণ সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে, কাকা কাকিমাদের কথাবার্তা শুনছিল। কাকিমাকে ওপরে যেতে দেখেই সে অন্তর্হিত হল। অমরেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বধূর প্রতীক্ষা করল, অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু সে আর ফিরল না। কাকিমা আর নামলেন না।

সীতানাথ ছাদেব থেকে নেমে আসছিল। নীচে নামতেই অমবেশ বললে—'কাকিমা কী কবছেন বে সীতে?'

—'কর্তাবাবুব মাথা টিপছেন।'

—'মাথা ধবে গেল নাকি আবাব?'

—'তাই কি ধবে, ওসব শখ, বাড়িতে গেলে আমাব বউও আমাকে সুখেব বাদশা বানিয়ে দেয।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীতানাথ চলে গেল।

আস্তে আস্তে নীলিমাব ঘবেব ভেতব গিযে ঢুকল অমবেশ। খুকী ঘুমুচ্ছে, নীলিমা কোথাও নেই। কোথায গেল সে?

এমনি সময একটা গলা শোনা গেল, গোসলখানাব থেকে নিশ্চযই, নীলিমাবই গলা, স্নান কবতে কবতে কথা বলছে সে।

অমবেশ অভিনিবিষ্ট হযে শুনছিল।

নীলিমা বললে—'আজ একটা মজা হযেছে, তুমি কোথায ছিলে ঠাকুবঝি?'

চপলা বললে—'কখন?'

—'এই তো এক্ষুনি।'

—'কি মজা ভাই।'

—'সে বলব ভাই স্নানটা কবে নি।' খিল খিল কবে হেসে উঠল বধূ।

চপলা বললে—'ও বাপবে, কি হল, হেসে যে উলটো পড়লে গো।

—'বড়কাকা আব কাকিমাব কাণ্ড।'

—'তাই নাকি, কী আবাব হল?'

—'কাকা তো ওপবে গেছেন খেযেদেযে কাকিমা নীচেব থেকে চেঁচিযে বলেন কি—

—'কি বলেন?'

—'বলেন কি, বলেন কি, বলেন কি'—হাসতে হাসতে দমবন্ধ হযে নীলিমা কিছুই বলতে পাবলে না।

অমবেশও হাসতে হাসতে বিদায নিল।

তাবপব নিজেব ঘবে বসে বসে অনেকবাব নীলিমাকে প্রত্যাশা কবতে লাগল অমবেশ। বধূ হযতো খেযেদেযে একবাব আসবে। হযতো খুকীটাকে তাব বাপেব কাছে বেখে যেতে আসবে, হযতো একমুঠো পান নিযে অমবেশেব ডিবেটা ভবে দিতে আসবে। কিন্তু এল না সে। কই কোনোদিনই কি আসে, এই বাবো দিনেব মধ্যে দুবাব এসেছিল মোটে, তাও চপলা জ্যোৎস্নাব সঙ্গে। একা বধূ একদিনও আসে নি। ভাবতে গেলে প্রাণ অসাড় হযে যায, মানুষেব দেহ ছেড়ে ওই খেতেব ধান হযে অন্ধকাবে অন্ধ হযে পড়ে থাকতে চায।

বিকেলেও সীতানাথ যেমন চা দিযে যায, তেমনি চা দিযে গেল।

সন্ধ্যাব অন্ধকাবে অমবেশ একা একা বসেছিল। অমবেশেব মনে হচ্ছিল পৃথিবীব কোন জিনিস সবচেযে গভীব কবে এখন সে চায? চায নীলিমাকেই, সে আসুক। অন্য কিছুই যদি বধূব ভাণ্ডাবে না থাকে সে এসে কাকা কাকিমাব গল্পটা অন্তত হাসতে হাসতে গড়িযে পড়ে অমবেশকেও বলে যাক। সেই দুটি আন্তবিক মানুষেব দাম্পত্যেব মাধুর্য্যকেও ঠাট্টা কবে যাক, পৃথিবীতে যেখানে একটু প্রেম যেখানে একটু দাক্ষিণ্য বা সহানুভূতিই জমেছে সমস্তই উপহাস কবে উড়িযে দিযে যাক নীলিমা, কিন্তু তবু এই সন্ধ্যাব অন্ধকাবে সমস্ত এই শবতেব কমনীয শিশিব তিমিবাহত বাতভবে অমবেশেব কাছে সে থাকুক, তাব গল্প বেঁচে থাকুক, সেই পবাঙ্মুখ মেযেটি সমস্ত হৃদযহীন গল্প তাব।

বিবাহ অবিবাহ

সবযূব কাছে এক গ্লাশ জল চাওযাতে সবযূ হবিচবণেব ওপব ববাদ্দ দিযে চলে গেল।

অমূল্য লিখছিল। কলমটা থেমে গেল। কেমন একটা বিমুখতা ও অবসাাদেব মুহূর্ত এই লিখতে ইচ্ছা কবছে না, কাজ কবতে ইচ্ছা কবছে না।

অমূল্য টেবিলেব ওপব কলমটা বেখে দিযে চুপ কবে বসে বইল। জানা৺.ব ভেতব দিযে কার্তিকেব ধানেব খেত অনেক দূব অবধি দেখা যায, অনেক দূব অবধি অনেকবাব তাকিযে দেখল সে।

হেমন্তেব দুপুব চলেছে।

আকাশে খানিকটা দূব অবধি একটা মাছবাঙা গা ভাসিযে উঠে তাবপব ভুস কবে সবুজ বনেব সমুদ্রেব ভেতব [...] ঢুকে পড়ল। অনেক উঁচুতে একপাল বক শো শো কবে উড়ে গেল। খুব কাছেই কোথায বালিহাঁসেব নির্বিবাদ কণ্ঠেব আওযাজ পাওযা যাচ্ছে। অবিশ্যি কারু চোখেই ঘুম নেই, অবসাদ নেই যেন। পাতা হলুদ হচ্ছে, প্রকৃতি মনে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত পাখি পাখালি ফড়িং কীট তাদেব খেযাল ও উৎসাহ নিযে ব্যস্ত বযেছে। মুমূর্ষু প্রকৃতি মৃত্যুব ভেতব দিযে যেন নবজীবনেব পুনরুত্থানেব জন্য প্রতীক্ষা কবছে। যেন সেই সমাহিত সুপ্ত মুখেব ভেতব লেগে বযেছে তাদেব এই হেমন্তেব ম্রিযমাণ গাছপালা পাতা ঘাস। এই সমস্ত বিশ্বজগতেব মাধুবী আশা ও অপেক্ষাব ভেতব নিজেকে হঠাৎ এমন খাপছাড়া মনে হল অমূল্যব। হেমন্তেব অসাবতা যদি কারু জীবন এসে ছুঁযে থাকে তো যেন অমূল্যবই।

খুব জলপিপাসা পেযেছিল অমূল্যেব। কুঁজোটা কাছেই ছিল, নিজে উঠে জল গড়িযে নেযা বেশ সোজা। কতবাব এমন নিযেছে সে। কিন্তু তবু বধূব কাছ থেকেই এবাব জল চেযেছিল অমূল্য।

হবিচবণ এসে বললে—'আপনি জল চেযেছিলেন?'

অমূল্য মাথা নেড়ে বললে—'না।'

—'বউদি যে বললেন।'

অমূল্য কলমটা হাতে তুলে নিল।

জল অবিশ্যি দিযে গেছে হবিচবণ। কিন্তু কই সে পিপাসাব অধীবতা যেন নেই আব।

জল সে খেল না।

অমূল্য কলমটা আবাব টেবিলেব ওপব বেখে দিল। কপাটটা বন্ধ কবে ফেলল। জানালাগুলো খোলা বযেছে। কলমটা গড়াতে গড়াতে টেবিলেব কিনাবায এসে থেমে গেছে। থাক, লিখবে না সে আব। কীই-বা সে লিখছিল? একটা মেমোবিযাল তৈবি কবেছিল শুধু। ম্যাজিস্ট্রেটেব কাছে পেশ কবতে হবে। একটি বিধবাব ফবমাজ। এসব লিখে কি মানুষ কোনোদিন কাব্য তৈবি কবতে পাবে না'

অমূল্য উত্তব দিকেব জানালাব কাছে গিযে দাঁড়াল। একটা হতশ্রী নাগকেশবেব গাছ কার্তিকেব হিম হাওযায ছেঁড়াফাঁড়া ডাল মেলে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন।

প্রজাপতিকে তাড়াচ্ছে, ভোমবাকে বসতে দিচ্ছে না, চড়ুইযেব সঙ্গে তাব আবু আব খুনসুড়ি চলবে না।

অমূল্য দাঁড়িযে দাঁড়িযে গাছটাকে দেখছিল। দবজায ধাক্কা পড়ল।

দবজা খুলতেই সবযূ ঘবেব ভেতব ঢুকে-বললে—'বেশ'। অমূল্য জানালাব দিকে সবে দাঁড়াল। ভাবল সবযূ হযতো কৈফিযত দিতে এসেছে, কেন সে নিজেব হাতে জল ভবে দিতে পাবে নি স্বামীকে। অমূল্যেব মন নবম হযে এল। সবযূকে ক্ষমা কববে সে।

সবযূ ছগমগ কবতে কবতে বললে—'বড্ড গোলমাল কব তুমি।'

বধূব দিকে অবাক হযে তাকাল অমূল্য। কী গোলমাল কবে সে?

—'কি যে কাজেব ক্ষতি কবো, আবাব দবজা আটকে বসেছিলে কেন?'

—'কী হযেছে তাতে?'

—'এই তো ধাক্কাধাক্কিব পব খুলতেই তো পাঁচ মিনিট সময গেল।'

অমূল্য বললে—'তুমি এখনো চান কবো নি?'

—'দেখছই তো যে বাপু, কই সেই এলাচ লঙ্গ-এব মোড়কগুলো কোথায? দেবাজেব ভেতব?'

অমূল্য ঘাড় নেড়ে বললে—'হ্যাঁ।'

—'কোন দিকেবটায?' বধূ বাঁদিকেব দেবাজ খুলছিল।

অমূল্য বললে—'হ্যাঁ ঐটেয়।'

দেবাজ খুলে সবযূ বললে—'এত সব সাবাড় কবলে কে?'

—'সাবাড় আমি ছাড়া আব কে কববে?'

সবযূ একটু কৌতুকেব সঙ্গে হেসে বললে—'তা আমাব কাজ এতেই হবে।'

—'কী কববে?'

—'এ বাড়িব কর্তাবা গিন্নীবা বোজা বলেন কিনা, এই বউ পানে তেমন জোব লাগে না কেন তা আজ লাগাচ্ছি। এতক্ষণ বসে পানেব মশলা তৈবি কবছিলাম, এলাচ লঙ্গ কম পড়ে গেল।' সবযূ একটা গোটা লঙ্গ মুখে পুবে দিযে বললে— ভাগ্যিস তোমব ড্রযাবে ছিল, না হলে এখন আবাব গিবীনকে পাঠাতে হত নতুন বাজাবে—তাহলে আজকেব দিকে পান কাউকে পেতে হত না আব।'

অমূল্য বললে—'কেন, এখনো কারু খাওযা হয নি?'

—'কর্তাবা খেতে বসেছেন।'

—'আমিও তো একজন কর্তা।'

সবযূ একটু অপ্রতিভ হযে বললে—'তা যাও, খাও গে, খাও নি তুমি?'

অমূল্য খেযে এসেছিল—'আমি খেযে এসেছি।'

সবযূ বললে—'বাবাবে, এক্ষুনি পানেব ডাক পড়ল বলে, আমি এখানে দাঁড়িযে আব গল্প কবতে পাবি না।'

তা পাবে না বটে।

চলে গেল।

হবিচবণ যে জল দিযে গিযেছিল অমূল্য এখনো তা খায নি। গেলাশটা সেই তখন থেকেই টেবিলেব ওপব জলভবতি পড়ে বযেছে। সবযূ দেখেছিল এই গেলাশটা? তা সে দেখে নি। দেখলেও টেবিলেব ওপব বাসি জলটা কতক্ষণ ধবে তাব জন্য এমন পড়ে বযেছে, কেন সে স্পর্শ কবছে না, এমন প্রশ্ন এ বধূব মনে কোনোদিনও উঠত না। কিন্তু তবুও পৃথিবীতে ঢেব বধূ বযেছে, ঘবে ঢুকে সবচেযে আগে এই জলেব গেলাশটা নিযে যাবা চেপে বসত, এব একটা মীমাংসা না কবে কিছুতেই ছাড়ত না তাবা। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হযে ভাবল অমূল্য। অবহেলাকে উপক্ষো কবে যাবে সে। জীবনেব খুঁটিনাটি দেখা নিযে নিজেকে ব্যস্ত কবতে যাবে না সে আব, কবে কী আব হবে। গেলাশটা ধবল অমূল্য, পিপাসা তাব তেমন নেই অবিশ্যি। কিন্তু তবুও জল সে খাবে, এই জলটাই। কিন্তু খেতে গিযেই কেমন বিক্ষুব্ধ হযে গেল মনটা। অত কবে বধূব কাছে চাওযা জল তাই কিনা চাকবটাকে দিযে পাঠিযে দিল সবযূ। স্বামী জল খেযেছে কিনা সে জিজ্ঞেসা সবযূ কবতে এল না।

গেলাশটা টেবিলেই পড়ে বইল।

চেযাবে বসেই জানালা দিযে দেখল অমূল্য বড় ঘবেব বোযাকে বসে সবযূ পান সেজে খাচ্ছে। মুখে কেমন একটা শান্ত প্রীতিব ভাব তাব। সবাইকে সে পান দেবে। মশলা দিযে সেজে ভালো পান দেবে, তাই এই প্রীতি, এই পবিবাবেব সকলেব প্রতি, মশলাওযালা পানগুলোব প্রতি, নিজেব প্রতি। একটা পান চাইবে ভাবছিল সবযূব কাছে, এদিকে কোথাও তো কেউ নেই এখন। একটু গলা খাকবে ডাক দিলেই তো হয, 'এই' তাবপব বাকিটুকু সবযূই কববে। কিন্তু নিজেব থেকেই একটা পান অমূল্যকে দিযে যাবে না কি সে? অমূল্য অপেক্ষা কবছিল।

পানেব বাটা নিযে বাড়িব ভেতব চলে গিযেছে সবযূ। ঠিকই কবেছে বধূ। এ পান যাদেব জন্য তাদেব জন্যই। অমূল্য নিজে কোনোদিনই তেমন পান খায না। মাঝে মাঝে একেবাবেই খায না। বধূ তা জানে। কিন্তু তবুও মশলাওযালা এক আধটা পানেব জন্য অমূল্যব মন উশখুশ কবছিল আজ। ভাবছিল হযতো সবযূ আসবে। নিশ্চযই আসবে। সাধাসিধে কবে বলবে আজ একটা খেযেই দেখ-না। অমূল্য

প্রতীক্ষা করে রইল। স্নান করে ননদ ভাজদের সঙ্গে খেয়ে ফিরতে সরযূর এখনো ঢের দেরি। তখন আর হয় না।

বাঁ দিকের জানালা দিয়ে তাকাতেই আবার সেই নাগকেশর গাছটার দিকে চোখ পড়ে, গতবছর কেমন সুন্দর ছিল। গাছটা কি আর আজ আছে, আহা! আবার সেই ধানের খেত, বাঁশ ঝাড় কলার বাগান সজনে যগডুমুর, গাব, কামরাঙা, শেয়াকুল ময়নাকাঁটা বড় একঘেয়ে লাগে। তার চেয়ে বিধবার মেমোরিয়ালটা শেষ করা যাক।

অমূল্য টেবিলে বসে একমনে লিখতে লাগল। একবার লিখে খাড়া করল সমস্তটা কিন্তু এ যেন ঠিক হয় নি। পড়ে পড়ে মন কিছুতেই তৃপ্ত হচ্ছে না। আবার নতুন করে লিখতে লাগল অমূল্য। যে কাজে সে হাত দেবে তা ভালো করে করা চাই। মেমোরিয়ালটা খুব লম্বা। ভালো করে গুছিয়ে যখন সে শেষ করল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পানও আসে নি, সরযূও আসে নি।

কার্তিকের আকাশ গেছে মেঘ ভরে। আজ সে বেরুতেও পারছে না।

বিছানা ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল অমূল্য।

আজ এই সমস্ত ছুটির দিনটা কোনোরকম আয়েসই করল না সে। একটি বিধবার খটমট প্রকাণ্ড মেমোরিয়াল লিখে নিজেকে কষ্ট দিল শুধু এ কথা কে বুঝবে?

কারু বোঝা চাই যেন। চাই-ই তো, কিন্তু কে বুঝবে? বুঝবার ভার তো সরযূর ওপর। হয়তো অমূল্যর নিজের ওপরই শুধু। হ্যাঁ অমূল্যর নিজের ওপর। আজকের সমস্ত দিনের অবসাদ অতৃপ্তি ও শূন্যতাকে নিজেই সে বুঝতে চেষ্টা করছে। আজকের শুধু নয়, বিয়ের পর সাতটা বছরই এমন করে কেটে গেছে যেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক একটা দিনের কথা মনে হচ্ছে অমূল্যর, তারপর একটা দিন—তারপর আর একটা—তারপর আর একটা—এমনি করে অনন্তকাল অবধি যেন তারা চলতে পারে, তবুও আজকের সারাদিন একটা মেমোরিয়াল ঘষে যেটুকু তামাশা সে পেয়েছে, তার চেয়ে একটুও বেশি কিছু পাবে না সে। এই রং তামাশাটুকু পাবে সে শুধু।

খেয়ে দেয়ে এসে অমূল্য দেখল আকাশের মেঘ কেটে গেছে সব, হেমন্তের রাত চারদিকে ফুটে উঠেছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাং বাদামগাছ দুটোর ছায়া অনেকখানি নক্ষত্রের আকাশ ঢেকে ফেলেছে ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে যে কটা তারা দেখা যায়, দূরে বনমোরগের শব্দ, ধান খেতে কি ডাকছে? হুড়ো নাকি? হয়তো কেউ! হিমের মধ্যে শিশিরের মধ্যে নিস্তব্ধতার ভেতর কেমন যেন ছমছম করে ওঠে বুক। এক আধ মুহূর্ত কেটে যায়। অশ্বত্থগাছের ভেতর থেকে লক্ষ্মী পেঁচা ডাকে, নিমগাছের পাতা কাঁপিয়ে শিশির ঝরে, প্রকাণ্ড বড় সজনে গাছের পাতার জালের ভেতর দিয়ে একঝাড় উড়নচণ্ডী জোনাকি কোত্থেকে উড়ে এসে বন ধুঁধুলের পাতা বেয়ে কোথায় নেমে পড়ে আবার। আস্তে আস্তে কৃষ্ণানবমীর চাঁদ ওঠে। অনেক রাত হয়ে গেছে এখন। মাঠের ঘাসে কাশের নিরবচ্ছিন্নতায় হেমন্তের হিমে কুয়াশায় ধানজ্যোৎস্নার লাবণ্যে মন এমন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

সরযূ এখনো ঘরে আসে নি।

আর একটু জেগে অপেক্ষা করছে অমূল্য।

তারপর খট করে একটা শব্দ। পুবের দিকে কামরায় সরযূ শোয়—একা। অনেকদিন থেকে। এমনি রাত করে এসে পান চিবুতে চিবুতে মাঝের কোঠা দিয়ে সিধে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা আটকে শুয়ে পড়ে সে। এল নাকি? কখন এল। সমস্ত দিন কি হল না হল কোনো কথাই অমূল্যকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করে না সে।

অমূল্যকে ভালোবাসে বধূ। কিন্তু সে ভালোবাসা কোনো এক দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছে বধূ, সেদিন স্বামী হয়তো তার মরে গিয়েছে, তার মৃতদেহটা নিয়ে মেয়েটির প্রেম সেদিন অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক হয়ে উঠবে, কিংবা স্বামীর কোলে মাথা রেখে সিঁদুরে সিঁদুরে মাথা রক্তাক্ত করে অবর্ণনীয় প্রেমের পরিচয়ট দিয়ে অক্ষয় সতী চলে যাবে একদিন।

কিন্তু আজ এর ভালোবাসা অমূল্যকে বড় একটা ছুঁতে আসে না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সরযূ। মাঠের কোঠায় মাও অনেকক্ষণ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। অমূল্য একা বই নিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু দুলাইন চার লাইন পড়েই বইটা বন্ধ করে রাখল সে। বিছানার উপর উঠে বসল সে। এ জীবনে তার সঙ্গী কারা? অফিসের ওই কলমটা, একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপরাইটার, চেয়ারটা, টেবিল, ডেকচেয়ার, বিছানা, অফিস,

দু-চারখানা বই। মা আছেন, ছোকরা মুনশেফ হরেন্দ্র আছে, এখানকার কলেজের ইংরেজির প্রফেসর নিমাই সান্যাল আছে, বিধু মাষ্টার আছে, আবার [...] মধু গাঙ্গুলি আছে, অবিনাশ সেরেস্তাদার বুড়ো মানুষ হলেও রয়েছে—আরো দু-চারজন আছে। এরাই সঙ্গী।

কিন্তু এখন এদের কোথায় পাবে সে? সমস্ত দিনের মধ্যেও এদের কারুর সঙ্গে দেখা হয় না অমূল্যর। নিজেদের অফিস রুটিন নিয়ে অমূল্যর মতো এরাও পড়ে থাকে, প্রত্যেকে। তারপর সন্ধ্যায় প্রায়ই হয়তো হরেন্দ্র নিছক ডেপুটি মুনশেফদের ঘাঁটিতে গিয়ে ভিড়েছে। অমূল্য নিজে কিন্তু মুনশেফ ডেপুটি নয়, সেই সন্ধ্যাটা মাটি হল তাহলে। নিজে প্রফেসর হত যদি অমূল্য তাহলে যেন নিমাইদের আড্ডায় খুব চমৎকার জমত। কিন্তু প্রফেসর হয়ে এ জীবনে সে আসে নি। একে একে এসব আড্ডা ছেড়ে দিয়েছে সে।

তারপর কি রয়েছে? জীবনে একটা নিস্তব্ধতা রয়েছে যেন শুধু। একটা অবসাদ রয়েছে। একটা গভীর নিস্তব্ধতা রয়েছে যেন শুধু। এই হেমন্তেব মতো কী ভীষণ নীরব। জীবন যেন তার চেয়েও নীরবতর।

বইটা আবার পড়তে আরম্ভ করল অমূল্য। একটা ইংবেজি গল্পেব বই। গত পুজোব ছুটিতে যখন কলকাতায় গিয়েছিল অমূল্য, হাওড়া স্টেশনের হুইলারেব স্টল থেকে এই লম্বা লম্বা শিলিঙ নভেলগুলো নিয়ে এসেছে সে। জানে অমূল্য এই বইগুলো অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য—খুবই পচা জিনিস—খুবই পচা। কিন্তু তবুও মন তার গল্প চায় যে। যে কোনোরকম একটা গল্প হলেই হল যেন। কতকগুলো মানুষ মিলে একটা ডিনার টেবিলেব চারদিকে বসে ফুর্তি কবছে, কিংবা রেসকোর্সে মোটরে, ববফের ওপর স্কেটিং করতে করতে ছুটোছুটি কলরব করছে। তাই সেই হল যেন, তাদের কোলাহল, হাসি, গান, ফকস্‌ট্রু এই নিস্তব্ধতাকে ধ্বংস করে দিয়ে যায়—মানুষের জীবনের আঘ্রাণ রক্ত উষ্ণতা দিযে তারা অমূল্যকে ঘিবে ধরে, প্রতি মুহূর্তেই যেন তাকে বলে যায় মানুষের কোলাহল কলরবময় এক উচ্ছ্বসিত পৃথিবী বেঁচে রয়েছে—বেঁচে বযেছে। সে পৃথিবীব রস যদিও সস্তা, কথাবার্তা সঙ্গতিহীন, স্বপ্ন কল্পনা সাধারণ, আদর্শ শাদাসিধে—কিন্তু তবুও তারা পবস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে এত অনর্গল গল্প করে, জীবনকে নিযে এত তৃপ্ত, এত আগ্রহে আন্তবিকতায মুখর যে এই নিঃসাড় হেমন্তেব বাতে মশাবিব ভেতর তাদেব গলাব আওযাজ বড় ভালো লাগে। হবেন্দ্র মুনশেফও তো এদের মতোই শস্তা, নিমাই সান্যালও, বিধু মাষ্টার, মধু গাঙ্গুলি, অবিনাশ ঘোষ সকলেই এইসব উপন্যাসের মানুষদের মতোই সাধারণ, জীবনকে নিযে এদেব মতোই খুশি, পথেঘাটে অফিসে আড্ডায এদের মতোই মুখর।

এই মুখরতা ও আলাপ প্রসঙ্গের সংসর্গই চায অমূল্য। হবেন নিমাইযেব কাছে গিযে কিংবা হুইলাবের একটা বই খুলে—কোনো নিবিড় নাক্ষত্রিক জগতের স্বপ্নের পৃথিবী অবিশ্যি বাইবে, স্বপ্নেব পৃথিবী কল্পনার পৃথিবী হাস্যের পৃথিবী, হেমন্তের নিববচ্ছিন্ন মাধুবী ও মোহের পৃথিবী। কিন্তু সে পৃথিবী নিয়ে অমূল্য অনেকক্ষণ বসতে জানে না। আজ রাতে এখন একেবারেই বসতে ইচ্ছা কবে না তার। সে পৃথিবী এই শিলিঙ নভেলেব সার্থকতাব থেকে ঢের দূবে। [...] নদী ধান জোনাকি হিমের নিশ্চলতাব ভেতর মুখ থুবড়ে পড়ে রযেছে যেন।

নভেলটা খুব ধীরে ধীরে পড়ছে অমূল্য। একটু একটু শীত কবছে। মশারিব ভেতব মাযেব ঘরের পাশে প্রতি মুহূর্তের মাযের নিশ্বাস উপলব্ধি কবে কবে এই হেমন্তের রাতে একা একা বেশ ভালো লাগছে নাকি? বাস্তবিকই লাগছে বেশ। কম্বলটা পায়ের ওপব একটু টেনে নিল অমূল্য। একটা সিগাবেট জ্বালাল। কযেক মুহূর্তের জন্য বইটা বিছানার ওপর বেখে দিল সে। ভাবছিল।

অমূল্য ভাবছিল তার জীবনের সবচেয়ে বেদনার সময হচ্ছে অফিস থেকে ফিরে রাত সাড়ে দশটা এগারোটা অবধি সবযূ যখন নিজের কোঠায গিযে খট কবে দরজা আটকে শুযে পড়ে, এইটুকু হচ্ছে সবচেযে হতাশা অবসাদের সময তার—সবচেযে বেদনার সময়। তাবপর কিন্তু তার সাধের মুহূর্ত আরম্ভ হয, সবযূ নিজেব কোঠায় ঢুকে ঘুমোতে থাকে, বধূকে আর আশা করা যায় না। আলমারির থেকে একখানা উপন্যাস বেছে নেয়। বিছানাটা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে একটা সিগারেট ধরায়, একটি মেয়েব সারাদিনকার উপেক্ষা উদাসীনতার কথা চুপে চুপে ভুলে যায সে। বিছানার পাশের কুলুঙ্গিতে লণ্ঠনটা রাখে, তারপর মশারিটা দেয় ফেলে, ননীর মতো নরম বালিশ দুটো মাথার নীচে রেখে কোলবালিশ চেপে হয়তো এডগার ওয়ালেসের একটা নিরেট রদ্দি বই শুরু করে সে। ডানদিকে একখানা দরমার বেড়ার

পার্টিশনের ওপাশে মায়ের কোঠা। ঘুমন্ত মা। মায়ের নিশ্বাস। সমস্তটা হেমন্তের শীতের রাত ধরে সেই কবেকার ছোটবেলার সেই মায়ের এমন নিকটতম সান্নিধ্য... আনো বিধাতা? অমূল্য মনে হয় সে যেন কোন স্বর্গে চলে গেছে।

বইটা আবার তুলে ধরল অমূল্য।

সিগারেটটা ফুরিয়ে গেছে।

মনে হল সরযূ এখনো জেগে রয়েছে যেন। অমূল্য একটু কান খাড়া করে শুনল বধূর চারির রিং ও চুড়ির আওয়াজ হচ্ছে, জেগে রয়েছে তবে। থাক জেগে। হয়তো সেও একটা বাংলা গল্পের বই নিয়ে বসেছে। মানুষের আশা ও অবাস্তবতার জগৎ, সাধের জগৎ, জীবনে যা হল না সেই সবের সফলতার সময এই এমনিতর বাতের নীববতায় নিবিড়তায হিমাচ্ছন্নতার ভেতর বাস্তবিক তাকে নিয়ে সরযূই বা কৃতার্থ হযেছে কতটুকু? বধূর মনের ভেতরও হয়তো সারাদিন সমস্ত কাজের ভেতর দিযে কথার ভেতর দিয়ে একটা ধূসর নিঃসঙ্গতা শুধু। সেও হয়তো স্বামীকে চায়, পায না। কিংবা অমূল্যকে চাযই না হযতো বধূ, যাকে চায় এমনতর রাতের নির্জনতায়, গল্পের পৃথিবীতেই তাকে যেন পায শুধু সে। এমনতর হতে পারে নাকি? তা হতে পারে।

ইংরেজি নভেলটা বুকের ওপব পড়েছিল। সরাসরি সেটাকে তুলল না অমূল্য। বাইরের আকাশে জ্যোৎস্না এবার বেশ খেলছে খানিকটা, মশাবির জালের ভেতব দিয়ে দেখা যায জানালাটা আলো হয়ে গেল যেন, শিমুলগাছেব হাড়েব মতো শাখাগুলো দেখা যায় তাদেরই ভেতর লক্ষ্মী পেঁচাটা ডাকছে হয়তো। সরযূর চুড়ি মাঝে মাঝে বিন রিন করে উঠছে।

অমূল্য ভাবছিল। কে জানে এই মেযেটি নিস্ফল কিনা? এব কাছ থেকে কতদিন ঘুবে ফিরে ভালোবাসা দাবি করে এসেছে অমূল্য, যেন এই মেযেটিব জীবনই শুধু প্রেম বিলাবার জন্য তৈবি হযেছে। যেন অমূল্যব জন্যই সমস্ত প্রেম গচ্ছিত কবে রাখতে হবে তাকে। অমূল্যকেই সমস্তটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিতে হবে তাব। না যাদ দেয তাহলে এ বধূর যেন কোনো মূল্যেই নেই। সে যেন নাবীও না, সেন যেন ঢের নীচ, ঢেব হীন। ঘৃণার পাত্র শুধু, কৃপার পাত্র শুধু।

এইবকম কবে এই মেযেটিকে নাবীধর্মহীনা বলে কতদিন মনে কবেছে অমূল্য, কতদিন কৃপা কবেছে বধূকে, কতদিন ঘৃণা কবেছে। নিজেকে অপ্রেমিকার উপেক্ষিত স্বামী বোধ কবে কেমন একটা মহান দুঃখ অনুভব করেছে অমূল্য। নিজেকে কত সহিষ্ণু ক্ষমাহীন স্ত্রীব মঙ্গলময স্বামী জেনেছে সে। সবযূব চেয়ে কত বেশি মহত্তব বোধ করেছে নিজেকে সে। কত বেশি মহত্তব।

কে জানে এই মেযেটিও হযতো এমন কিছুই ভাবছে, ববাবব ভেবে এসেছে।

ধরা যাক এই মেযেটিব দিনেব পব দিন দিনেব জীবন, সকালবেলা উঠে সে সংসারেব কাজে চলে যায। দুপুববেলাও অনেকক্ষণ কাজে আটক থাকে সে। তাবপব বধূব মন একটু বিশ্রাম আমোদ চায়, পাযও সে। বাড়ির মেয়ে ও বড় পিসীদের সঙ্গে। অমূল্য তখন অফিসে থাকে। কিংবা ছুটির দিন যখন বাড়িতে থাকে তখনো বধূব অপ্রীতিকব না জানি কি কবে নিজেকে জানিয়ে ফেলে সে। কি কবে? হযতো সাত বছর ধবে একে বিযে কবে এব কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে দিযেছে বলে। তা দিয়েছে সে। নিজের জীবনের কোনো অনাবিষ্কৃত গুপ্ত প্রকোষ্ঠ বধূব কাছ থেকে সে অদৃশ্য করে বাখে নি। যার সবস সজীবতা একদিন আবার এই মেযেটিকে নতুন কবে বিমুগ্ধ কবতে পাবে। বংছুট হযে গেছে তাব, বধূব কাছে সে একেবাবেই একঘেযে, পৃথিবীব হাজার হাজাব স্বামীব মতো, সেও একজন স্বামী শুধু। সরযূও একটি স্ত্রী মাত্র। তাদেব দুজনের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু। একঘেযে ভাবহীন অনুভূতিহীন প্রেমহীন।

সরযূর চুড়ির বিন রিন আব শোনা যায না। সে নাক ডাকাচ্ছে গভীব রাতে শীতে আরো বাড়ল যেন। পেঁচাও যেন শালগাছেব মোটা পাতার ভেতর ঘুমিযে পড়েছে। এমন নিস্তব্ধ পৃথিবী, শিশির ঝবাব শব্দ শুধু। মাযেব নিশ্বাস। নিজে সে স্বামী নাকি? কার স্বামী? সরযূব? কার স্ত্রীর সেসব কথা আর ভাবতে গেল না সে। এমন রাতে স্বামী-স্ত্রীর কথা, প্রেমের কথাও যেন অপ্রাসঙ্গিক। ডানদিকে জানালার পাশে একটা মস্তবড় ঝাপড়া কামিনী গাছের ভেতর কতকগুলো টুনটুনিব চড়াইযের বাসা, পাখিগুলো এমন অগাধ ঘুমে পবিতৃপ্ত। বাঁ দিকে দরমাব বেড়ার ওপাশে মাযেব নিশ্বাস গভীর ঘুমের ভেতর এমন শান্ত, এত সফলকাম! কোথাও কোনো ব্যর্থতা নেই যেন আর।

পবম স্নেহে কম্বলটা আর একটু টেনে তুলতে গিযে তুলতে পারল না যেন আর অমূল্য। অকাতবে

ঘুমোতে লাগল।

সাত বছরের এমন অনক অগণ্য রাতের মতো আজকেরও রাতেও সরযূকে নিজেকে নিয়ে প্রেম বিবাহ অবিবাহ ইত্যাদি অনেকে জিনিস নিয়ে সেই একঘেয়ে একসেট প্রশ্ন তুলে একঘেযে পুরোনো পথে ঘুরে, মরছিল বেচারা, বেচারা অমূল্য। রাতের এই কয়েকটা ঘণ্টার জন্য সে একটু নিস্তার পাবে। সরযূ একটু নিস্তার পাবে। মা একটু নিস্তার পাবে, বাবা পাবেন, টুনটুনি চড়ুইগুলো পাবে।

শীতের রাত চলেছে।

গোটা চারেকের সময় অমূল্যর ঘুম একবার পাতলা হয়ে এসেছিল, ঘুমের জড়তা আস্বাদ এই সময়ই খুব গভীরভাবে গ্রহণ করতে পারা যায়। এমন অনুপম মধুর মনে হয় এই সুসুপ্তিকে। ধানের খেতের ওপারে অনেক দূরে এক আধটা কোকিল ডাকছে, কাছে কদমগাছে লক্ষ্মী পেঁচাটা, বাঁশের ঝাড়েব পাশে জিউলি বাবলা বেতকাঁটা শিরীষ শিশুর বনে ঘুঘু ডাহুক সচকিত হয়ে উঠেছে। ভোবের তাহলে বিশেষ বাকি নেই। কিন্তু ভোর সে চায় না। ভোর একেবারেই চায না সে। অমূল্য তাকিয়ে দেখল জানালার ভেতর দিয়ে কেমন একটা পানসে আলোর রং, ভোরের রং এ নয—এ সেই কাকজ্যোৎস্না। আলোব দিকে তাকাবে না আর সে। আবেশে চোখ বুজল অমূল্য রাত তাব জন্য যেন স্থিত হয়ে চলুক, জীবন একটা দীর্ঘ রাত হোক শুধু। সেই ঘনাযমান গভীর রাতের ঘুম যেন আর না ভাঙে, বিধাতা ভাঙে না যেন আর। মাথার নীচে বালিশ দুটোর পুলকস্পর্শ বোধ কবল অমূল্য। কোলবালিশটাকে চেপে ধবে ঘুম মৃত্যু যা হয় একটা কিছুর ভেতর ঢুকে পড়তে চায যেন সে।

বেলা আটটা অবধি এই পবমপ্রিয ঘুমকে যে সে উপভোগ করল, জেগে উঠে সে জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা নেই প্রাণের ভেতর।

দিনটা এমন কঠিন। এই কঠিনতার নিস্পৃহ মূর্তি পেযে বসেছে তাকে।

আবার আর একটা দিন।

কোথাও কোনোদিন পালিযে যাবার আর পথ নেই। না, প্যালযে সে যাবে না। ববং যা হযে গেছে তা গেছে, এখন থেকে জীবনটাকে মঙ্গলতর, মধূরতব সুন্দবতব কবতে পারা যায় নাকি? বাতাবাতি মশারির ভেতর ঢুকে সিগারেট খেয়ে বাজে নভেল পড়ে বেলা আটটা অবধি ঘুমিযে দিনেব পব দিন এ কিবকম বিশ্রী হতচ্ছাড়া জীবন চালাচ্ছে সে। প্রেম মমতা স্নেহ মাযাব আদানপ্রদান থেকে নিজেকে সবিযে রেখে বউযের সঙ্গে সম্পর্ক বহিত হযে সারাদিন অফিস গুঁতিয়ে সমস্ত সন্ধ্যা একা একা আকাশ পাতাল নিযে বসে থেকে—এবকম আর হবে না। হতে দেবে না সে— কিছুতেই হতে দেবে না সে।

সবযূ চা নিযে এল।

অমূল্য বললে—'বোসো।'

—'তুমি খেপেছ।'

—'কেন? বসবে না তুমি?'

—'ছেলেমানুষি কোবো না।'

বধূ চলে যাচ্ছিল।

অমূল্য আঁচলটা চেপে ধরল সরযূব।

সরযূ আঁতকে উঠে বলল—'কি কবছ, ছাড়ো।'

—'বোসো।'

—'লক্ষ্মীটি, ছাড়ো।'

অমূল্য ছাড়ল না।

সরযূ বললে—'আঃ, কেউ দেখে ফেলতে পারে।'

অমূল্য কপাট বন্ধ করে দিযে স্ত্রীকে একটা কৌচের ওপর জোর করে বসাল। এমন বিবর্ণ বিষণ্ণ নারীমূর্তি কোনোদিনও আর দেখে নি যেন সে। এই দুই মিনিট আগেও তো বধূর মুখ বেশ প্রসন্ন ছিল। স্বামীর কাছে তাকে বসতে হচ্ছে বলেই কি সে এত কষ্ট পাচ্ছে? এক আধ মুহূর্ত অমূল্যর মনটা কেমন দমে গেল যেন। মনে হল, যাক সরযূকে দিক সে ছেড়ে। ও যেখানে গিয়ে খুশি হয, যাদের ভেতব ওর মনের প্রসন্নতা অক্ষুণ্ন থাকে, সেইখানেই চলে যাক বধূ।

অমূল্য বললে—'আচ্ছা যাও।'

সরযূর চোখে নিস্তারের শান্তি নেমে এল যেন। হাঁফ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সে। অমূল্য আবার বাধা দিয়ে বললে—'আচ্ছা একটু শোনো।'

সরযূ দাঁড়িয়ে রইল।

অমূল্য বললে—'বসই না।'

সরযূ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপাট খুলতে খুলতে বললে—'কী, বলো।'

—'লক্ষ্মীটি, এই কৌচে বস।'

অনিচ্ছায় অনাসক্তিতে কি যেন কত কিছুর ক্ষতি ও অপচয়বোধ ক্ষুব্ধ হয়ে বসল বধূ।

অমূল্য বললে—'আমার এখানে দু মুহূর্ত বসতে গিয়ে অমন হাঁশফাঁশ করে ওঠো কেন তুমি?'

সরযূ বললে-'কি বলতে চাচ্ছিলে বলো।'

—'এই-ই শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে দুদণ্ড বসতে গিয়ে কেন অস্থির হয়ে ওঠো?'

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বধূ বললে—'এই?'

—'হ্যাঁ, এছাড়া আর কি।'

একটা বিষম ঠাট্টায় প্রতারিত হয়ে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল বধূ। চট করে উঠে পড়ে বললে—'যাই।'

—'কোথায় যাবে?'

—'তরকারি কুটতে হবে।'

—'তরকারি তো কুটে এলে অনেক।'

—'সে তো তোমাদের, আরো বাকি আছে, হবিস্যি ঘরের তরকারিতে হাত দেয়া হয় নি।'

—'কুটে একবার আসবে?'

—'তোমার অফিসের আগে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি করে, এক্ষুনি যে বাজার এসে পড়বে।'

—'বাজার এলে কী করবে?'

—'জান না তুমি কী করব?"

অমূল্য জানে। বললে—'সারাদিন এইসব কাজ করে খুব সুখ পাও তুমি সরযূ?'

সরযূ ঠোঁটের ওপর আঁচল টেনে বললে—'সুখ?' আবার পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে—'কেন পাব না? আমরা ভাজেরা সকলে মিলে কাজ করছি, তোমাদের রোজগারের সংসারটাকে কেমন জীবন্ত করে তুলেছি।' একটু ভেবে বললে—'খাওয়াদাওয়ার পর ননদ ভাজ শাশুড়ীদের সঙ্গে বড়ঘরের মাঝের কোঠায় গড়িয়ে নেই, আড্ডা মারি, ফুর্তি করি, কোনোদিন বিন্তি খেলি, আমার তো মন্দ লাগে না, আমার তো বেশ লাগে।'

অমূল্য বললে—'একঘেয়ে লাগে না?'

—'একঘেয়ে?'

—'হ্যাঁ, দিনের পর দিন একই রকম।'

সরযূ বললে—'একরকম কোথায়?'

—'একরকম না? সেই এক রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া সেই এক বড়ঘর মাঝের কোঠা তেলচিটে তাস।'

সরযূ হো হো করে হেসে উঠল। অমূল্য নিশ্চয়ই তামাশা করছে। অমূল্যর কথার ভেতর কোনো কিছু গুরুত্ব আছে বলে স্বীকার করল না সে।

অমূল্য বললে—'হাসলে?'

—'হাসব না? বেলা হ‍ে আসছে, আর তুমি করছ এই মশকরা। নাও এখন উঠি।'

—'না।'

—'কেন?

—'তোমাকে দিয়ে আমার দরকার আছে।'

—'তরকারি কুটতে হবে যে।'

—'হবে না।'

—'তুমি বললেই হল?'

—'হ্যাঁ আমি বললেই হবে, আমি তোমার স্বামী।'

সরযূ থ খেয়ে অমূল্যর দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পবে বললে—'একি পাগলামি তোমার'? কোনোদিন তো এরকম পাগলামি করো নি তুমি?'

অমূল্য স্ত্রীকে কৌচের ওপর আবার বসিয়ে দিয়ে বললে—'মিছিমিছি কেন ধড়ফড় করে ওঠো, একটু শান্ত হয়ে বোসো, আজ·তরকারি না হয় নাই বা কুটলে।'

সরযূর মাথায় বজ্রপাত হল যেন, চোখ কপালে তুলে বললে—'লক্ষীটি, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও আমাকে।'

—'কেন ছাড়ব?'

—'আমায় যেতে হবে যে লক্ষীটি।'

—'কোথায়? তরকারি কুটতে?'

সরযূ কাঁদো কাঁদো বললে—'হ্যাঁ তরকারি আমার জন্য এতক্ষণ বসে আছে কিনা—এতক্ষণ হয়তো বাজারও এসে গেছে।'

অত্যন্ত নির্বিকারভাবে অমূল্য বললে—'আসুক।'

একটু বিরক্তি হয়ে সরযূ বললে—'আসুক? কি পিণ্ডি খেয়ে যাবে অফিসে শুনি।'

অমূল্য একটু মুচকি হেসে বললে—'অফিসে যদি না যাই?'

—'কেন যাবে না?'

—'আমার কত তো ছুটি পাওনা আছে, অফিস পালাতেই তো আমাব ভালো লাগে, অফিস পালিযে স্ত্রীকে নিয়ে এমনি মুখোমুখি কৌচে বসে গল্প কবতে—সেই নাগকেশব গাছটাব কি হযেছে দেখেছ সরযূ?'

সরযূ বললে—'পিণ্ডি তোমার নাগকেশবের, ঐ তো প্রসন্নব গলা, বাপবে বাজাব এসে পড়েছে, তুমি আমাকে মারতে চাও নাকি?'

জোব কবে কৌচের ওপর বধূকে বসিযে দিযে অমূল্য বললে—'বললামই তো, অফিস যাব না, বাজার দিয়ে কি করবে তুমি?'

চক্ষুস্থিব করে সরযূ বললে— তুমি ছাড়া আব ইস্কুল কলেজ অফিম কববাব লোক নেই এ বাড়িতে?'

অমূল্য বললে—'তাদেব জন্য ভাববাব ঢেব লোক আছে, ভাজেবাই তো তোমবা পাঁচজন, ভাজে ননদে শাশুড়ীতে মিলিযে জন পনেরো হবে।'

—'এ কেমন কথা তোমার? আমাব নিজেব কাজটুকু—চিবকাল যা কবে আসছি ওদের ঘাড়ে চাপাতে যাব কেন?'

অমূল্য বললে—'চিবকালই তো নিজের কাজটুকু করে এসেছ, একবেলাব জন্য স্বচ্ছন্দে চাপাতে পারো তুমি, কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।

সবযূ মরীয়া হযে বললে—'কি চাও তুমি?'

—'কাদছ কেন?'

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সরযূ বললে—'কাঁদছি কোথায়, বলো কি কবতে হবে তোমার, পা টিপে দিতে হবে?'

—'কোনোদিন টিপেছ?'

—'বলও নি তো টিপতে।'

—'যে বউরা স্বামীদের মাথা টেপে পা টেপে তাবা কি বলাবলির অপেক্ষা রাখে সবযূ?'

সরযূ নিজেকে অত্যন্ত নিপীড়িত বোধ করে বললে—'শোও তুমি, আমি তোমার পা টিপে দিচ্ছি।'

অমূল্য একটু মুচকি হেসে বললে—'আমার পা ঠিক আছে।'

—'কি করব তাহলে, মাথা টিপে দেব? গায় হাত বুলিয়ে দেব?'

—'ফবমাজ করে এ জিনিসগুলো ভালো লাগে না সরযূ, যদি কোনোদিন'—বলতে থেমে গেল অমূল্য। নিজের মনে মনে বললে—'যদি কোনোদিন নিজের থেকেই আমার মাথা টিপতে ইচ্ছে করে,

তোমার গায় হাত বুলুতে ইচ্ছে করে, আমার জন্য এক গ্লাশ ভালো নেবু দইয়ের বেল পানা তৈরি করে আনতে ইচ্ছা করে, তাহলে কোরো তা তুমি। কিন্তু সেসব তুমি কোনোদিন করবে না সরযূ। আমাকে তুমি ভালোবাস না, তবুও তোমার সান্নিধ্য চাই আমি, না ভালোবাসলে তবুও সংসর্গ দাও, কথা বলো, কথা বলো, কথা বলো, ননদ ভাজদের সঙ্গে যেমন আকাশপাতাল গল্প কর দিনরাত তেমনি সঙ্গতিহীন যুক্তিহীন সামান্য সাধারণ গল্প ও আলাপের ভেতর নিমগ্ন করে রাখ আমাকে।' সবযূ বললে—'তোমার কোনো অসুখ করে নি তাহলে?'

—'না।'

—'অফিসেও যাবে না?'

অমূল্য বললে—'না, আজ আব যাব না।'

সবযূ অবাক হয়ে ভাবছিল, এ কেমন খেয়াল এ লোকটিব? এ খেয়াল তার কাছে অত্যন্ত অসার বোধ হল—অমূল্য যেন দিনেব পব দিন সারবত্তা হারিয়ে ফেলছে।

অমূল্য পশ্চিমেব দিকে দরজাটা খুলে দিয়ে বললে—'দেখো, এই ধানখেতেব দিকে আমি অনেকে সময় তাকিয়ে থাকি।'

সরযূও এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, দু-এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত ছটফটানি কেটে গিয়েছে তার, বাজাবেব সংসাবের প্রলাপ বকছে না সে আব, এমন শান্ত সুন্দব দেখাচ্ছে বধূকে, জীবনেব বৃহৎ সুন্দর কল্যাণ আহ্বানে এমন অন্যবকমভাবে সাড়া দিয়ে বসে রয়েছে সে? অমূল্যও এই-ই চায়, দু-এক ঘণ্টাব জন্য, অন্তত প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এক আধ ঘণ্টাব জন্য প্রতিদিন বাতে তাব কোঠায় এসে পশ্চিমেব দবজাটা খুলে বধূ যদি এমনি কবে বসত, নানাবকম শাদামাঠা সাধারণ কথা বলত যদি তার সঙ্গে, এতে ওদেব সংসাবেবও কোনো ক্ষতি হত না। তার স্বামীপ্রাণও স্নিগ্ধ হয়ে বাঁচত।

হৃদয় অমূল্যর সবস হয়ে উঠেছে। বললে—'কেমন, এ ধানখেতগুলো দেখতে বেশ, না?'

সবযূ মাথা নেড়ে বললে—'হ্যাঁ।'

—'আমি অনেক সময় তাকিয়ে দেখি, তুমি আস না কেন?'

—'আমার যে ঢেব কাজ।'

—'সন্ধ্যাব দিকে অফিস থেকে যখন আমি ফিবি তখন তো তুমি হাতঝাড়?'

সবযূ বললে—'কই, তবকাবি কুটতে বসতে হয়।'

—'তখনো আবাব?'

—'বা, বাতেব বান্না হবে না?'

—'কুটনোব ভাব তোমাব ওপবেই নাকি শুধু?'

—'বা, তা হবে কেন? লোকজনের পবিবাব, প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন খাইয়ে, কত জনেব কতদিকের কাজ আছে।'

অমূল্য নীববে স্ত্রীব দিকে তাকিয়ে বইল, ধানখেতের ওপব খোলা দবজাটা বন্ধ কবে দিয়েছে সে, কেউ যদি দেখে ফেলে তাকে, তাকে আর অমূল্যকে, একসঙ্গে, এই ভেবে বন্ধ করে দিয়েছে দবজাটা সরযূ। অমূল্য ঘাড় হেট কবে স্বীকাব কবল, তাদেব স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে একটু কথাবার্তাব ফূর্তি ওড়াতে যদি কেউ দেখে জীবনেব কাছে সে একটা অপবাধ। ধানখেতের আকর্ষণ বধূকে তাহলে দু-চার মিনিটের বেশি আটকে রাখতে পারল না, আবাব সেই সংসারের কথা পেড়েছে সে।

সবযূ বললে—'গেল শনিবাবেব হাটে পঁচিশটা চালকুমড়া কেনা হয়েছিল, আজ তো মঙ্গলবাব, এই তিনদিনেই সব ফুবিয়ে গেছে।,

অমূল্য বললে—'এত চালকুমড়ো খেলাম আমবা?'

—'তুমি কি একা খেয়েছ? চল্লিশটি মানুষ দুবেলা বসে খেয়েছে, তিনদিন ধবে উড়ে তো যাবেই।'

—'চালকুমড়ো দিয়ে কি রান্না হয়েছিল?'

—'কেন চচ্চড়ি, শুক্তো—'

—'চালকুমড়োর ডালনা হয় না নারকোল দিয়ে?'

সরযূ ফিক কের হেসে বললে—'সে [...] বেশ হয়।'

—'চালকুমড়োব টক হয়?

ফিক করে হেসে সরযূ বললে—'সাধ হয়েছে নাকি খেতে?'

বধূর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। গল্প তার জমে উঠেছে। ছেলেবেলায় সরযূদের বাপের বাড়ির চালের ওপর কয়েকটা চালকুমড়োর দীর্ঘ কাহিনীর আদি ও অন্ত নিয়ে বসল সে। গল্প বলতে বলতে আরো আধ ঘণ্টাটাক সময় এমন প্রাণের লাবণ্যে মুখে ভঙ্গিমার মুগ্ধতায় সুষমায় কাটিয়ে ফেলল সরযূ। এই-ই চায় অমূল্য, অফিস থেকে যখন সে ফিরে আসে অমূল্যকে চা খাবার দিয়ে নিজেরই মনের ইচ্ছায় আগ্রহে এমনি সব.প্রসঙ্গ নিয়ে দু-ঘণ্টা যদি স্বামীকে সে একটু সংসর্গ দেয়, কিংবা তখন যদি অবসর না হয়, তাহলে রাতে দুজনায় ঘুমোবার আগে, তখনো দু-এক ঘণ্টা বেশ জেগে থাকা যায়, দুটো কৌচে মুখোমুখি দুজনে বসবে, কিংবা বিছানায়, হুইলারের নভেলগুলোব চেয়ে সে ঢের ভালো হবে। এই যে ঘুমোবার আগে রোজ রোজ অমূল্য সিগারেটের পর সিগারেট ধরায়, শুধু মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে, ওদিকে সরযূ পানদোক্তায় একাকার হয়ে বিছানাব এপাশ-ওপাশ করতে থাকে শুধু একা একা, এ কেমন অস্বাভাবিক, ভীষণ অস্বাভাবিক।

এখন থেকে একটা শান্ত সুন্দর কল্যাণের জীবন ধরবে তারা, প্রেম প্রেমালাপ নাই-বা থাকল, তা চায়ও না অমূল্য, সরযূ ও তার পরস্পরের মধুর সান্নিধ্য দিয়ে একটা মঙ্গল সুন্দর শান্ত জীবন বরণ করে নেবে তারা।

অমূল্য বললে—'অফিসের পর যখন ফিরে আসি তখন তোমার সময হয না, না?'

—'কীসের সময়?'

—'এই এইরকম এসে গল্প কববার।'

সরযূ অবাক হয়ে বললে-'তোমার সঙ্গে?'

—'হ্যাঁ, আমার সঙ্গেই।'

সরযূ ঠোঁটে কাপড় দিয়ে বললে—'সে আবার কীরকম।'

—'কেন?'

সরযূ সংক্ষেপে বললে—'না, অফিসের পর হয না।'

—'তখন তো তোমার ঢেব কাজ।' অমূল্য বললে—'আচ্ছা কাল আমার কাছ থেকে পানের মশলা নিলে, একটা পান দিয়ে গেলে না যে বড়?'

—'তুমি পান খাও নাকি?'

—'ভালো করে পান তৈবি করলে খাই না?'

সরযূ চুপ কবে রইল।

অমূল্য বললে—'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তুমি পান নিয়ে আসবে।'

—'আমার অতটা খেয়াল হয় নি।' সরযূ ঈষৎ লজ্জা পাচ্ছে। সরযূ বললে—'আমি তো একটাব বেশি পান খেতে পারি নি।'

—'কেন?'

—'ওদেরই সব লেগে গেল।'

অমূল্য বললে—'আহা।'

সরযূ বিললে—'আজ পান খাবে?'

'এনো।'

সরযূ মনে মনে সংকল্প করল অমূল্যকে আজ দিয়ে যাবে সে।

অমূল্য বললে—'কাল তোমার কাছে জল চেয়েছিলাম মনে আছে?"

—'কখন?'

—'ঐ যে দুপুরবেলা।'

—'ও, সে তো হরিচরণ দিয়ে গেল, না?'

—'দিয়েছিল'—একটু চুপ থেকে অমূল্য বললে—'কিন্তু তোমার কাছে চেয়েছিলাম তো।'

সরযূ চোখদুটো বিহ্বলতায় ডাগর করে অমূল্যর দিকে একবার তাকাল। হরিচরণের দেয়া জলে খাকতি পড়ে নাকি? অমূল্যর এরকম ধরনের বিলাপের কোনো মানে বুঝল সে, কোনো প্রশ্রয় দিতে চাচ্ছে না তার মন। অতএব গেলাশের জলের ব্যাপারটা এখানেই থামিয়ে রাখল অমূল্য।

অমূল্য বললে—'কাল তো ছুটির দিন ছিল।'

সরযূ আবার ডাগর চোখ তুলে তাকাল।

অমূল্য বললে—'সমস্ত দিনটার মধ্যেও একবারও এলে না যে এদিকে?'

সরযূ বললে—'আমাদের কাজের ছুটি হল তিনটেয। তারপর একটু ঘুমিয়েছিলাম।'

—'কোথায়?'

—'বড় ঘরের মাঝের কোঠায়, মেঝের ওপর পাটি পেতে ননদ ভাজ আমবা সবাই কটিতে মিলে।' বলতে বলতে অপূর্ব পুলকের বিভা সরযূর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ওদের ঘেঁষাঘেঁষিতে ঘুমিয়েও সে যে আনন্দ পেয়েছে অমূল্যের কাছে এসে তা কি পেত? তবুও বললে অমূল্য—'আমার ঘরে এসে ঘুমোলে তো পারতে।'

সবযূ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাতে স্বামী আঘাত পাবে ভেবে বললে—'ভেবেছিলাম বিন্তি খেলব ওদের সঙ্গে।'

—'খেল নি তো।'

দুজনেই চুপ করে রইল। এই প্রসঙ্গটাকে কেউই আর তারা ততদূব পর্যন্ত অনুসবণ কবল না।

অমূল্য বললে—'কাল বাতে কটার সময ঘরে এলে?'

—'কি জানি অনেক রাত।'

—'একবার এ ঘর হয়ে গেলে না যে?'

এবাবও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সবযূ, কিন্তু থমকে গিয়ে পরে বললে—'তুমি ঘুমিযে পড়েছিলে না?'

—'তোমাব আগে কোনোদিন ঘুমোই?'

—'আমি কখন ঘুমোই কি কবে জান তুমি?'

—'নাক ডাকো যে।'

—'ইশ, নাক ডাকি আমি?'

—'ডাকো ডাকো, শুনতে পাই।'

—'বোজ?'

অমূল্য ঘাড় নেড়ে বললে—'বোজ।'

—'এত রাত অবধি করো কি তুমি?'

—'পড়ি, ভাবি, গাছপালা ধানখেতগুলোব দিকে চেয়ে থাকি কখনো, আবার পড়ি।'

সরযূর ইচ্ছা হচ্ছিল অমূল্যকে জিজ্ঞাসা কবে সাবা দিন রাত এবকম একা একা থেকে বই পড়ে পড়ে ভালো লাগে নাকি তার? কিন্তু জিজ্ঞাসা সে কববে না। কেন মিছেমিছি জিজ্ঞাসা কবতে যাবে আব? স্বামীকে তো সে প্রফুল্ল প্রসন্ন সঙ্গ অনেকক্ষণ ধবে দিতে পাববে না, সারাদিন সে সংসাবেব কাজে ব্যস্ত থাকে। অনেক রাত করে যখন ঘরে ঢোকে তখন দুচোখ ঘুমে ভেঙে আসে একেবারে। মনে হয় যেন কেউ কারু স্ত্রী নয, কেউ কারু স্বামী নয, পৃথিবীতে স্নেহ ভালোবাসা সেবার কোনো প্রযোজন নেই আব। মাথায় বালিশ চেপে অকাতরে সারারাত ঘুমোতে থাকে সে। গুছিযে ভাবতে পারে না, খতিযে বলতে পারে না কিন্তু তবুও মনে হয যেন সরযূর রাত তার জন্য বিলম্বিত হয়ে চলুক জীবন একটা দীর্ঘ রাত হোক শুধু, সেই ঘনায়মান গভীর বাতের ঘুম যেন আর না ভাঙে, বিধাতা ভাঙে না যেন আর।

হেমন্তের দিনগুলো

হেমন্তের দিনগুলো কলকাতায় কেটে যাচ্ছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে— এখন যুদ্ধের পরের পৃথিবী। প্রকাণ্ড উৎকণ্ঠার পব এসেছে তত বড় অবচনীয় অবসাদ,— উৎকণ্ঠা তো রযেই গেছে। অসিত মাঝে মাঝে স্বীকার কবতে ভুলে যায় যে তার জীবনের অবসাদ বাইরের (কোন) পটভূমির সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু তা কি সম্ভব: নিজের মনোপৃথিবীতে সমান্তরাল শাসন কি কেউ চালাতে পারে যা ব্যবহারিক পৃথিবীকে চেনে, কিন্তু তার চেয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

দক্ষিণ কলকাতায— লেক বাজারের থেকে বেশি দূরে নয়— একটা নতুন দেড় তলা বাড়িতে সম্প্রতি রয়েছে অসিত, তার স্ত্রী সীতা ও তাদের একটি (মাত্র) ছেলে-এ বাড়িটা তার নিজের নয, তার আত্মীয় রমেশের। রমেশ প্রাযই কলকাতার বাইবেই থাকে—কলকাতায় বাড়িটা কাউকে ভাড়া দেওয়া পছন্দ করে না সে, আগে ভাড়া দিত, আগের ভাড়াটেবা বড় গোলমাল কবত ; এক সময এক থাইসিস রুগীও এ বাড়িতে ছিল ; এ বাড়ির শেষ ভাড়াটেদের উঠিযে দিতে ঢেব বেগ পেতে হযেছে বমেশের, মোকদ্দমা পুলিশকোর্ট আলিপুরকোর্ট এবং শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টেও চালাবার কথা ছিল। অত মোকদ্দমা বরদাস্ত না করতে পেরে ভাড়াটে নিজেই স'রে গেছে। বমেশের নিজেব দোষ ছিল বৈ কি—যখনই সে কলকাতায় ফেরত তখনই ভাড়াটেদেব উঠে যাবাব নোটিশ দিত, ঘরদোর কমবেশি মেরামত করা বা হোয়াইটওয়াশ করার ভার যে কার ওপরে এ নিয়ে তার অতিবিক্ত চুলচেবা তর্কের ধোঁয়া ফুলকি ষোল চোঙা ঝেড়ে বেরুতে থাকত। ইলেকট্রিক পাম্পেব মেইন সুইচ তালা দিয়ে বন্ধ কবে সে জলেব ববাদ্দ তার নিজের মর্জি অনুসারে নিযমিত করত, কখনো বা একেবারেই বন্ধ করে দিত; মেজাজ বেশি খাবাপ হলে পাম্পটাকে কেটে ফেলবাব সঙ্কল্পও কবত।...ভাড়াটে সব তাড়িয়ে দিল সে। বাড়ি ভালো ক'বে মেরামত ও চূণকাম করে অসিতের হাতে ছেড়ে দিল। ভাড়া লাগবে না। তবে অসিতদা যেন ছোট ভাড়াটে না বসায—দু চারটে ঘব খালি পড়ে থাকলেও।

রমেশ কলকাতার বাইরে চ'লে গেল-চাব পাঁচ বছবেব ভিতব ফিবে আসা অসম্ভব জানিযে দিযে।

যুদ্ধের শেষের দিকে এ সব ঘটনা ঘটেছিল। অসিত মফস্বলে কাজ কবত। দু তিন বছব আগে একবার কলকাতায় যে এসেছিল সপবিবাবে—বেড়াতে ঠিক নয, চাকবি বা ব্যবসা কবতেও নয—কিন্তু, কেমন একটা অদ্ভুত প্রাণসরিৎসাগরের উচ্ছলতা অনুভব কবে—কলকাতা-জীবনের গতিবিবতি ও ভাবপ্রতিভায় নিজেকে মথিত ক'রে নেবার একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণ অনুভব ক'রে।

মফস্বলের চাকরিতে অসিত জমাতে পারে নি কিছু—দেনা হযেছিল। এবাব—মাস ছ সাত আগে—কলকাতায এসে সে প্রথমে অন্য কারু গলগ্রহ হযে কাটাচ্ছিল—সুবিধা পাচ্ছিল না-মফস্বলেই ফিরে যেতে হবে ভেবে নিরাশ হযে পড়েছিল—এমন সময শুনতে পেল রমেশেব বাড়িটা খালি প'ড়ে আছে। রমেশের কাছে প্রস্তাব করতেই বাড়িটা পাওয়া গেল। তারপর এই কযেক মাস ধ'বে রমেশের বাড়িতে সে আছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সব টাকাই প্রায খরচ হয়ে গেছে অসিতের। প্রথম ছ মাস পুবো মাইনেতে ছুটি পেয়েছিল— তারপর মাইনে অর্দ্ধেক ও সিকি হয়ে গেল—এখন সে মাইনে পায না আব। মফস্বলের অফিসের কর্তৃপক্ষ তাকে জানিয়েছে যে বিনে বেতনেও তাকে আব ছুটি মঞ্জুব করা যেতে পারে না। সে ফিরে এসে চাকরিতে যোগ দিতে চায় কি না আগামী মাসেব পনেরোর ভিতবেই জানাতে হবে।

আজ সকালবেলা অসিত লেকের পাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। কী চমৎকাব জল-পাড়াগাঁব জলেব কথা স্মরণ করিয়ে দেয বটে—কিন্তু তবুও এর মহিমা আলাদা, ও দিক দিযে বালিগঞ্জেব ট্রেন ধোঁযা উড়িয়ে গর্জ্জন ক'বে চলে যাচ্ছে। গোটা বড় পৃথিবীটা কাছেই। অবিশ্রান্ত মোটরের হর্ন সেই কথাই জানিযে যাচ্ছে। পেট্রলের গন্ধের ভিতর তারই মহিমা। তবু দুটো কাক মেহগিনির মত কালো ডানা মেলে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে-ওদের প্রতিফলন জলের ভিতরে। শাদা বক জলেরই পাখি—ঘন গাছগুলোকে ধূসরিত করে উড়ে যাচ্ছে। সে পাখি নয—অনাদির বিস্ময়কর প্রেতাত্মা-সূর্য্যের বর্ণালিতে উদ্ভাসিত হযে

কী গভীর করুণানিঃসৃত এই পাখি মানুষকে আলো দেখিয়ে তবুও মানবতার অহেতুক অন্ধকারের কাছে বার বার চাপা পড়ে যেতে হচ্ছে ব'লে।

উপরে একটা গাংচিল উড়ছে-না তাকিয়েও অনুভব করা যায়—তাকাতে গেলে জানা যায় সূর্যোৎসারিত পৃথিবী সময়ের হিসেব শেষ ক'রে অসিতকে দান ক'রেছে সুখদুঃখের সত্ত্বশূন্য সময়ঘড়িব অস্তিত্বশূন্য আলোব দেশ—...মেঘে বাতাসে মর্ম্মরিত আনন্দসূর্য। সময়ের কোন হিসেব নেই এখন আর। গোছানো নির্জ্জন পথ। পথের দু ধারের ঝোপের বেড়া। বড় উঁচু গাছ চোখে পড়ে। সৈন্যেবা, সৈন্যনারীরা কোথায় চলে গেছে আজ; সাহস, প্রাণ ও বিরংসার অবসানে মিলিটাবি ব্যারাকের টালি asbestos চালার দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে; জল ওখানে নেই—এখানে আছে। কিন্তু তবুও জল ওখানে নেই—এখানে আছে-এ কথা বলতে পারে না অসিত।

প্রকৃতি ও নগরীর চোখের পাপড়ি যেন সব; তাদেব চোখেব তাবা জলের মতন কালো জল—সূর্য্যনাশন জল—সূর্যমর্ম্মরিত জল—ঐ দিকে জলশিশুদের বীথি—ঘাসেদের। এদিকে এসে জল উড্ডুক্কু পাখিদের, উড়ন্ত রৌদ্রের।

তবুও ডুবে মবেছে যাবা, যাবা না ভালবেসে মরেছে, নগরীর থেকে অনেক দূবে ইতিহাসেব কালো সময় কেটেছে যাদেব ভালোবাসাকে চিনে অথচ গ্রহণ করবার পথ (না) খুঁজে না পেয়ে—অসিত একটু বিমর্ষ হেসে ভাবল জীবন যাদের কাছে ত্রৈলোক্য মুখুজ্যেব কঙ্কাবতীর গল্প কিংবা জীবন যাদের কাছে অন্নের ক্ষুণ্নিবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু কিংবা ঘেটোব ইহুদীদের মত অথবা কোলাহলেব নারী ও শিশুশাবকদের মত অথবা অন্ন ঠকিয়েছে, ছেনেছে, ছিঁড়েছে শকুনের মত খারাল কত ১৩৫০-এব তাবিখ উড়িয়ে গেছে পৃথিবীব পথে পথে—জল, সহজ তবঙ্গের সরল নির্দ্দোষ অন্তর্জ্জলী। এই বিবাট নগবীর পটভূমি আশ্রয করে হ্রদ এখানে অশান্ত নয—শান্ত নয—সহজ কঠিন দক্ষিণ—ভোবের অন্তহীন—অবর্ণনীয জলেব বেবিলন, লন্ডন, চুঙকিঙ, কলকাতা, ক্রেমলিন কাকলীর ভিতর। বাড়িতে ফিবে এসে অসিত একটা চিঠি পেল—মফস্বলেব অফিসেব কর্ত্তৃপক্ষেব কাছ থেকে এসেছে। লিখেছে ছুটি তাব সাত মাস হয়ে গিয়েছে প্রায়। এ বকম এক টানা ছুটি এত ব্যস্ত কাজকর্ম্মেব দিনে কাউকে তাবা দিতে পাবে না—পনেবো বছব ধ'বে অসিত যে তাদেব অফিসে ভাল কাজ করেছে সে কথা অস্বীকার কববাব মতন আবশ্যকতা তাদেব নেই—তারা তাব চাকবির সুখ্যাতি স্বীকার কবেছে—সত্যিই অসিত তাদের অফিসেব মর্যাদা বাড়িয়েছে। তাকে ববখাস্ত করবাব কথা তারা ভাবতে পাবে না। এ জিনিস মনে রেখেছে বলেই অফিসেব নিযম শিথিল কবে অসিতকে এত দিন ছুটি দিয়েছে তারা।—

প'ড়ে অসিতেব আত্মমান আত্মমূল্য চেতনায বেশ খুশি হযে উঠবার কথা ছিল, কিন্তু সে অস্বস্তি অনুভব কবতে লাগল।

চিঠিব নিচের দিকে আবো কিছু লেখা আছে-তাও আবাব জাযগায জাযগায লাল পেনসিল দিয়ে দাগানো। আপাততঃ সেদিকে তাকাতে সে দ্বিধা বোধ করছিল। চিঠিটা মুড়ে খামের ভিতর বেখে দিয়ে সে স্থির করল আজই একটা কিছু উত্তব পাঠানো দবকার-অবিশ্যি সমস্ত চিঠিটা সম্পূর্ণভাবে পড়বাব পর। পড়া তো (সাঙ্গ) হয নি এখনও—

সিঁড়িতে পাযেব শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

ওপরের থেকে সীতা নেমে এসে বলল, 'তোমার একটা চিঠি আছে।'

'লোক্যাল?'

'না ডাকের চিঠি—মফস্বল থেকে এসেছে—টেবিলেব ওপবেই ছিল—পেয়েছ নিশ্চয—'

'ওঃ—সেটা—' অসিত ক্ষ্যামা খেসারত দেবার মত ভঙ্গীতে বললে, 'ওটা কিছু নয—বোধ হয রামচরণ লিখেছে—'

'চিঠি খোলা হযনি এখনও—'

—'রামচবণেব হাতের লেখাই মনে হল। ভাল কথা—ওর একটা ব্যবস্থা কবতে হবে তো। রামচরণ চাকব ভাল—সাত মাস ধ'রে ওকে মাইনে পাঠাচ্ছি—কিন্তু—'

সীতা একটা জলচকীর উপর বসে বললে—'রামচরণকে হাতছাড়া করা অসম্ভব। ও রকম চাকব কপালে মেলে—কারু কারু তিন পুরুষেব ভাগ্যি আছে—যেমন খোকনের আছে—তোমার বাবাব ছিল—কাজেই ও সব চাকর তিন পুরুষ আগলে থাকে। না—না—' বিশ্বকর্ম্মা পূজোব দিনে তড়াসে ঘুড়ির

মত মাথা নেড়ে সীতা বললে—'দেখছ না কলকাতায় চাকর নিয়ে কী ঝামেলা—এমন লোক দেখলুম না যে ১৫/২০ টাকাও কবুল করছে কিন্তু পাচ্ছ না মনের মত চাকর। রামচরণ যা চায় তাকে তাইই দিয়ে দিও। মদনগঞ্জে ফিরতে হবে তো আবার আমাদের।। তখন রামচরণকে না পেলে চোখে অন্ধকার দেখতে হবে যে। কী চেয়েছে ও? লিখেছে কী!'

—ঠিক কথা সীতা। ওর মতন চাকর আর নেই।—

(চুপ করে গেল অসিত।)

চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে নিয়ে অসিত বললে— ও রকম ধরনের চাকর সব টস্‌কে যাচ্ছে পৃথিবীর থেকে—এটা শ্রেণী কাটাকাটির যুগ কিনা। বিপ্লবের দিন এগিয়ে আসছে—রামচরণ কোন্ ছার—অনেক চেনাজানা শৌখিনতাই ছেড়ে দিতে হবে আমাদের।

—'যে কোন কথা বলতে গেলেই কী যে ঐ এক দ্যাকড়ার তোমার।' বললে সীতা, 'রামচরণ তো বিপ্লবী নয়।'

—'তা নয়। কিন্তু ওব নির্ব্বুদ্ধিতা যে ভাঙিয়ে খাওয়া উচিত নয়—' নিজেকে শুধরে নিয়ে অসিত বললে—'উচিত হবে না, যখন বিপ্লব আসবে—মানে ইসারা ক'রে জানিয়ে দেবে যে সে সত্যিই আসছে।'

'এর আগে', অসিত বললে, 'ওকে ঠকিয়ে ভাঁড়িয়ে যাওয়া চলে। বিবেকের দংশন খেয়ে। এ বিষয়ে যে আমরা একা নই, সব শয়তানদের সাগরেদ, এই কথা মনে রেখে রামচরণেব সেবা আমরা ভোগ করব সীতা।'

অসিতের এ তত্ত্ব—স্থূল নয় ঠিক—সীতা অন্য জিনিস ভাবছিল বলে—সূক্ষ্ম নয় ঠিক—ধোঁযার মতন মনে হচ্ছিল তার।।

অসিতের শেষ কথাটা অন্যমনস্কতা ভেঙে ফেলবাব মত। শুনে সীতা বললে—হ্যাঁ, ভোগ করব বৈ কি—কবে যাচ্ছ মদনগঞ্জ?

—যাব এক দিন।।

—চলো তবে পর্শুই।

—এতটা তাড়াহুড়ো তোমার শরীরে সইবে না সীতা। তা ছাড়া সেখানে তো টিনের ঘরে গিয়ে থাকতে হবে। এখানে প্রাসাদে রয়েছ—লেক কাছে—লেকের বাজারও।

সীতা বিরক্ত হয়ে বললে—ভাঁড়ামির বেশ একটা হৃদয়গ্রাহিতা আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের ষাঁড় যখন ফক্কুরি করে—

—তখন গা জ্ব'লে যায়, না সীতা? কলকাতাই আসল কথা নয়, মদনগঞ্জও নয়; টাকাব গরমেই সীতা পাতাল প্রবেশ করে—না হ'লে বনবাসে যায়—এই তো আজ পর্যন্ত মধ্যবিত্তদের মনেব কথা।। মাস তো ফুরিয়ে এল—কত টাকা আছে আব?

সীতা দাঁতে দাঁত ঘষছিল।

অসিত মুখ তুলে বললে—কেন, কথা বলি বুঝি নচ্ছাবের মত—এই সীতার সঙ্গে সেই সীতার তুলনা দেয? উপমা ভুল করি। সময় সমাজ যুগের হিসাব খেয়াল থাকে না।

খুবই শান্ত নম্র নির্দ্দোষ ভাবে বললে অসিত।

দাঁতে দাঁত ঘষা ঢিলে হযে আসছিল সীতার। কিন্তু—মনের ভিতব হিংসার ভাষা ছটফট করছিল—অতি কষ্টে নিজেকে নিবস্ত করে রাখছিল সে।। না হ'লে অসিতকে এতক্ষণে কিছুটা পশুস্পর্শের পরিচয় পেতে হত—পশুর মতন তার কানের মাংসে।

অসিত চুপ করে গেল।

সীতাও নিভে আসছিল। সে বললে—রামচরণ কলকাতায় আসে না কেন

—ও আসবে না।

—বসে বসেই ওখানে মাইনে খাবে?

—তাই তো মতলব দেখছি। চালও রেখে এসেছি দশ মণ—

—ও তো ভয়ঙ্কর পাঁজি পুরুৎ মানে, লিখে দাও না স্বপ্ন দেখেছি—কালীঘাটের দেবী ওর কাছ থেকে মানত চেয়েছেন এইখানে—তাঁর নিজের এলাকার ভিতরে—ওর উত্তর পেলেই ভাড়ার টাকাটা পাঠিযে দেবে।

অসিত আড়ামোড়া ভেঙে বললে—এ সব ফাঁদে ধরা পড়বার ছেলে রামচরণ নয়, তা ছাড়া মিথ্যে

কথা কেন লিখতে যাব?

—উঠি এখন—বললে সীতা।

কিন্তু বসে রইল।

অসিতের মনে হ'ল সীতার দু পাটি দাঁত কথা ভাবছে। এ রকম অস্বাভাবিক ভাবনার অভিব্যক্তিতে সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এক মুহূর্ত্ত আগেই সীতাব অনুরোধেও বামচরণকে মিথ্যা কথা লিখবার মানুষ সে ছিল না। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই মনের ভিতরে মিথ্যা সাজিয়ে নিয়ে সীতাকে (প্রবোধ দেবার জন্য) তার সুন্দর দু পাটি দাঁতেব দিকে তাকিয়ে অসিত বললে—আমাব হাতে ভাল চাকর আছে—থাকে গড়িয়াহাটা—আজ পাববে না—পবশু পেরিয়ে—তরশু—তাব আসবাব কথা। তাকে আগাম কিছু দিয়ে বুক ক'বে এসেছি সীতা (আমি)।

—কত টাকা দিয়েছ?

—সাত টাকা, মাইনে হবে ১৫

—এত টাকা কোথায় পাবে তুমি?

অসিত একটু হেঁচে কেশে হাঁচল আবার। বললে, সত্য ঘটনা হচ্ছে তোমাব পাঁচ পাঁচটা ঝি পালিয়ে গেছে, মোদ্দা কথা আমাদেব চাকরের দরকার—স্ত্রীলোক না হয়ে পুরুষ হ'লেই ভাল হয়—এবং সৎ পুরুষ হ'লে আবো ভাল—সে বকম পুরুষমানুষ আমি পেয়েছি—তাকে যে পনেবোটা টাকা দিতে হবে ওটা অপ্রাসঙ্গিক।

সীতা তার স্বামীকে না চেনে যে তা নয়, তবুও মোটামুটি তৃপ্ত হ'ল।

বললে—একটা কথা শোন বলি।

—বল

—বামচবণকে আর টাকা পাঠাতে পাববে না ব'লে দিলাম।

অসিত হাঁচি ঝেড়ে নাক মুখ লাল ক'বে বললে—সে হয না সীতা। সে কি কখনও হয। সে আমার বাপেব কালেব চাকব।।

—কিন্তু কিছুতেই সে কলকাতায় আসবে না? আমবা লোকেব অভাবে মবে হেজে গেলেও সে মুখ তুলে তাকাবে না। এটা নিদেন অন্যায় নয় কি,—এখানে শ্রেণীব বেষারেষি কোন কথাই উঠতে পাবে না না।

অসিতেব হঠাৎ সর্দ্দি লেগেছে, ভাবি গলায় বললে— সে যা খুশি হোক্ চাকব তো তোমাকে দিচ্ছিই।

সীতাব চোখেব ভিতব থেকে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেবিয়ে গেল— বললে— আগে আসুক। দেখি কেমন আসে। কলকাতায় এসে এই সাত মাসে তুমি অনেক খেলো হয়ে গেছ। (তোমাব) কথা মানে কথাব খেলাপ।

—আসবে। আসবে।

সীতা উঠে দাঁড়াল। —আজ বেলা তিনটেব আগে ভাত পাবে না।

—তা হোক্; চান কবে আসছি। — আমি তোমাকে সাহায্য করব।

—না সে সবের দবকাব নেই। গাযেব চামড়া একটু দূরে থাকলেই আমাব ভাল লাগে। সীতা চলে যাচ্ছিল— দু এক পা গিয়ে ফিবে এসে বললে— বাকী একশো টাকা দিয়ে দাও।

—কিসেব টাকা?

—দাঁড়াতে পারছি না। —সীতা বললে, খোকনকে এখুনি পাঠাতে হবে রেশনের জিনিস আনতে।

—কেন, এ মাসের গোড়ার দিকে দুশো টাকা দেই নি তোমাকে

—দুশো টাকায তিন জনের সংসাব চলে? চক্ষুস্মান উচ্ছলতায অসিতেব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে সে।

সেই উচ্ছলতাব আবহাওয়া ধ্বকের ভিতরে— গনগনে আঁচের ভেতবেই যেন একটা সিগারেটে জ্বেলে নিয়ে অসিত বললে:— আমাদের খাওয়াদাওয়া তো তেমন কিছু আর নয়— বাড়িভাড়া লাগে না— স্টাইল নেই—

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অসিত কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে বললে— সিগাবেটটা বাতাসে নিভে গেল। জ্বালাই আবার। জ্বালানো দেশলাই কটাব দিকে তাকিয়ে বললে— ও একশো টাকার ব্যাপার তোমাকে বিকেলেই মিটিয়ে দেব। আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি।

কাঠিটা নিভে গেল।

দেরাজ খুলে কতকগুলো জাপানী নোট পাওয়া গেল— পাশেব বাড়ির রসিক মিত্তিবের ছেলে পোর্ট

ব্লেয়ারের থেকে নিয়ে এসেছে। পনেরো শো টাকার জাপানী নোট এক টাকায় বিক্রি করেছিল সে অসিতের কাছে।

'এ সব নোট দিয়ে খোকনকে বুঝ দেওয়া চলে— খোকনের মাকে নয়— 'নিঃসহায় উৎসাহে এক আধ মুহূর্ত ভাবল অসিত।

বললে— বেভুল মন আমার — দেরাজে নেই তো— রয়েছে ক্যালকাটা কমার্শিয়ালে—দুপুরে ওঠাব— বিকেলে পাবে।

সীতা চলে গেলে অসিত বাইরের দেয়ালে চিঠির বাক্সটা ভাল ক'রে হাতড়ে দেখল। একটা পোস্টকার্ড যেন কাঠের সঙ্গে পালিশ হয়ে মিশে আছে। (কত দিন পড়ে আছে কে জানে?) সুখবর নিশ্চয়ই নয়। বুক পকেট থেকে চশমা বার করে দু এক লাইন পড়েই কার্ডটা সরিয়ে রাখল অসিত;— রামচরণ লিখেছে: তিন মাসের মাইনে বাকি তার, অবিলম্বেই যেন মনিঅর্ডার করে টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম তিন চার মাস তো বাবু কলের মতন নিয়মে মাসের প্রথমেই টাকা পাঠিয়েছেন— এখন এরকম করছেন কেন—

একটা পোস্টকার্ডে গুঁড়ি গুঁড়ি অক্ষরের অজস্র সর্ষে ছড়িয়ে দিয়ে বেশ লম্বা ফর্ট্টাই ইস্তাহার।

সিগারেট জ্বালাল অসিত। ভাত খেতে তিনটে বেজে যাবে বলে গেছে সীতা। পাঁচটা ছটা নাগাদ পাত হয়তো পড়তে পারে। খোকন কোথায়? সিগাবেটে এক টান দিয়ে অসিত ভাবল— ঠিক এ বকম জীবন আমি চালাতে চেয়েছিলুম কিনা। সীতাব মধ্যে জিনিস ছিল— কিন্তু এই যে তার শরীব আমার মনের ভেতর কোন ভাবই জাগায় না, এক আধ মুহূর্তের স্বভাব ছাড়া, এই যে তার মন আমাকে নাড়া দিতে পারে না আর চুম্বক হারিয়ে গেছে ব'লে— এব জন্য সবটা দায় আমার নয় বটে, কিন্তু তবুও— আমিই দায়ী। ওরা আবো ভাল-মন্দ— বিয়ে হতে পাবত কিনা সে প্রসঙ্গ অবান্তব। কিন্তু যা হয়েছে সেটাকে আমি সফল করে তুলতে পারি নি। উদ্যম হয়তো আমাব চেয়ে বেশি ছিল তার, কিন্তু তবুও সীতাও পারে নি। এ বকম জীবন আমি চাই নি।

এ জীবনে বহুতা সৌন্দর্যকে ভালোবেসেছি প্রকৃতির— নাবীব— মননের—এবং স্থিরতাকেও। সেটাকে সৌন্দর্য ঠিক বলে না; বলা চলে চেতনা অভিনিবেশের; এ আমাবও আছে, আমি যাকে চাই তাবও আছে; পরস্পরকে এক জন ক'রে নেওয়া চাই। কিন্তু তবুও তো প্রকৃতিকে ভালো কবে কাছে পেলাম না টাকা নেই বলে। এ কথা উনবিংশ শতাব্দির। বিশ্বাস করত? কিন্তু আমার জীবনে— আজকেব আমাদের সকলেরই জীবনে— এই অবস্থায় পড়লে এই শতকে পূর্ব্বজ মনীষীদের জীবনেও প্রকৃতি অর্থবশ্যতা স্বীকাব করত না কি? আজ পৃথিবীর সর্ব্বমানবের সংকট যে অসচ্ছলতাব অবধূতবাষ্প্রে তার থেকে প্রকৃতি সরে যাচ্ছে, নারী নেই, ভাবনাব উদাবতা নেই, চিন্তার সঙ্গতি নেই—

এই হেমন্ত কাল আমি ভালবাসি। কত পাড়াগাঁয়ের হেমন্ত মনে পড়ছে আমার। অঘ্রাণেব বিকেল বেলা— নদীর নিঝুম জল— মাঠে খড় প'ড়ে রয়েছে—বাঁয়ে তাকালে অনেক নৌকোর কমলা ধূসব ফিকে নীল ফিকে সবুজ পালে রোদ এসে পড়েছে দেখা যায়— বোদের ভিতর শাদা পালেব অপবিসীম উজ্জ্বলতা মানুষের নয়—হৈমন্তী সূর্য্যের: মাঝিদের ভিড়— এখানে সেখানে— বিকেল যেন ঘরানা প্রেতের মত, পেযে গেছে নিঃশব্দ নিঃস্পৃহ মানবীয় মাপ হেমন্তেব মাঠের বাজাবে। আবার নদীর জল— আবার খড়ের মাঠ— বাছুরের সোনালি পশম খড়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে—চাবিদিকে কৃষক— গোরুব কজ্জলশ্রী ভেদ করে এক মাধ্বী শাদা গাভী পূর্ণিমার মত— আকাশে হরিয়াল— উঁচু আকাশে রোদেব ফাঁদের ভিতর চাতকের ডানা খেলা করছে— কয়েকটা চাতকের — সব সময়ই তাদেব বিমুক্তি ধবা গেছে জেনে— নিকোনো রোদকে ধরে রাখতে চেয়ে— রোদকে নিভে যেতে দিয়ে—

হেমন্ত নাবীর দেখা পেয়েছি কি কোন দিন?

পেয়েছি। কিন্তু যে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম, অথচ হেমন্তলোক তাকে কোথায় রেখে দিয়েছে?' কোথাও রেখে দিয়েছে এই উপলব্ধি ছেদ ক'রে ফেলে তবু হেমন্তের জল—বিকেল— ও আকাশের নিচে চলতি পথের প্রতিভা নষ্ট হতে দেয় নি। আজো চলেছি তো তাই— অথচ কেউ নেই— কিছুই নেই— মানুষও অধঃপতিত—হেমন্তের বিবৃতি বেঁচে রয়েছে শুধু—বিবেক জেগে আছে; আজ সকালে ধাকুরিয়ার লেক যা বলেছে এখন দুপুরে অন্বিষ্ট মানুষেব উৎসাহ নিয়ে প্রকৃতির কাছ থেকে বুঝে

মানবীব মত। কিন্তু দুপুব— শূন্য লক্ষ্যহীন যুদ্ধহীন মিলিটাবি ট্রাক-মিছিলেব জিনিস তো তা'।
নির্জ্জনেব ভিতব বসে বইল সে।

গভীব বাত্রে একা বিছানায় শুযে অসিত ভাবছিল: বামচবণকে টাকা পাঠানো চাই। তিন মাসেব মাইনেব জন্য ত্রিশ টাকা। সীতাব সঙ্গে আমাব যে মিথ্যা সনাতনী খেলা চ'লেছে এটা আজকেব পৃথিবীবই ধূমাযিত কালিমা— না কি সমযেবই নিজেব কথাই এই?

বামচবণেব ব্যাপাবটা চাপা দিযেছি তাব কাছে, অফিসেব চিঠি চাপা দিযেছি। কিন্তু তাকে যে ভালোবাসি না সেটাও এত অতলে চাপা দেওযা জিনিস যে চেপেছি বলেই মনে ভাবতে পাবছি না। আমাব সম্পর্কে তাব তো ঠিক দাযধাবাও এমনি পবিষ্কাব— স্বাভাবিক।

সীতাকে আমি ছেড়ে দিতে পাবি— সেও আমাকে; কিন্তু তাবপব এখনকাব এই সমাজসংস্থানেব তাড়াতমসায কোথায দাঁড়াব গিযে আমবা। ওদেব লাঞ্ছনা সহ্য কবে দাঁড়ানোও যায। কিন্তু জন্তুব যা ছিল না— মানুষ তা ফুটিযে তুলেছে— উত্তবমানুষ তাকেই অতিক্রম ক'ববে হযতো। কিন্তু এখনও তো আমবা সূত্রপাতেব মানুষ মাত্র। সীতাব প্রতি যে করুণাবোধেব বিলাসিতা সাংসাবিক দাযিত্ব কালেব কাছে নষ্ট হযে যাচ্ছে আজ প্রতি মুহূর্ত্তে— সেই দাযিত্ব স'বে গেলে করুণা তাব মৃত মসৃণ মুখোস খুলে ফেলবে না কি?

ফেলবেই তো।

দুপুববেলা অসিত— নিজে টেব পেল না— কিন্তু ট্রাম বাস লবিব গর্জ্জনেব থেকে অপব কি এক মনোনিবেশেব প্রসাদে মুক্তি পেযেছিল। সে যে ভাবছে টেব না পেযে ভাবতে লাগল: দেহে ম'বে যাবাব অনেক পথ আছে—মনে ম'বে যাওযাব আবো ঢেব বেশি। কিন্তু তবুও— আশ্চর্য— সীতাও কি কবে বেঁচে থাকাই সঙ্গত মনে কবে?'

দু দিক দিযেই অজস্র মৃত্যু প্রবেশ ক'বেছে ওব সত্তাব ভিতব। তবুও কিনা আগুনে পুড়ে এখন বাঁধছে। কেন? ওবা দেহ খাবে। সন্ধেবেলা খোঁপা ভেঙে— চান ক'বে— মাথাব অজস্র চুল বুনে ফেলবে দুটো বিনুনিব শিঙেব ভিতব— যাবে লেকেব ধাবে বেড়াতে খোকনকে নিযে।

কেন?

প্রতিদিনেব তিমিব মৃত্যুকে পবিষ্কাব কবে নেযা চাই। —বুঝে নেযা চাই যে জীবন বযেছে। খড়খড়ে শুকনো পাতাব মতন সাবাদিন বৌদ্রে ধুলোয উড়ে— অবশেষে শাখা থেকে খসে ছিঁড়ে জলেব (বুকেব) ওপব দিযে উড়ে যাওযা চাই— বিমুক্তি আছে যে তা' জানাব জন্য, নিজেকে পবিচ্ছন্ন ক'বে নেবাব জন্য জলেব ভিতব দিযে নিববচ্ছিন্ন— জলস্রাবেব উপব দিযে উড়ে গিযে—হেমন্তেব জলেব।

বামচবণকে চিঠি লিখতে বসল অসিত।

লেখা শেষ হ'লে অফিসেব চিঠিটা পড়ে শেষ কবল। লাল পেনসিল দিযে দাগ কেটে কেটে ওবা জানিযেছে মেডিকেল প্রযোজনে অসিত যে আবো দু মাস ছুটি চেযে ডাক্তাবেব সার্টিফিকেট পাঠিযেছে— সে সার্টিফিকেট নিবেস কি না সে প্রশ্ন না তুলেও ওবা সে বকম ছুটি বিনে বেতনে দিতেও বাজী নয। পনেবো দিনেব মধ্যে কাজে ফিবে না এলে ওবা নতুন লোক বাখবে ঠিক কবেছে।

ও কাজে সে আব ফিবতে পাববে না এই মর্ম্মে চিঠি দাখিল ক'বে দিল অসিত। কোন ব্যাঙ্কে বা কোথাও তাব টাকা মজুদ নেই অবিশ্যি কিন্তু তবুও দুপুব মাথায ক'বে কলকাতাব বাস্তায বেবিযে পড়ল সে টাকা যোগাড় কববাব জন্য।

অসিত টাকা পেল না কোথাও— প্রতিশ্রুতি এক আধটা না পেযেছে যে তা নয। কিন্তু তা তেমনই প্রতিশ্রুতি। ও জিনিস এ বযসে চিবিযে খাওযা চলে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডেব অবশিষ্ট দেড়শো টাকা ছিল— সামনেব মাসে এই টাকা দিযে নিজেব হাতে সংসাব চালিযে দেখবে ভেবেছিল সে। এক মাস সমযেব ভিতব যা হোক একটা চাকবিব ব্যবস্থা কবে দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু একশো টাকা সীতাকে দিতে হবে— ত্রিশ টাকা বামচবণকে। বামচবণকেই দেওযা দবকাব— তাব জাৎবিবেক এই কথাই বলে। অথচ সীতাকেই দিতে হবে— অসমর্থ স্বামীব অবচেতনা তাকে অস্বস্তিকব ভাবে বুঝিযে যায।

দেবাজ খুলে দেখা গেল— পনেবো শো টাকাব জাপানী নোট। এ সব নিযে কাউকে ভাওতা দেওযা যায না খোকনকে ছাড়া' জাপানীবা যদি কলকাতায চলে আসত তা'হলে অবিশ্যি এ নোট অসিত পেত

না। এ সব বসিক মিস্ত্রিবেব ছেলেবাই প্রায়— জাপানীবা এলেও না এলেও।

মিলিটাবি কন্ট্রাকট নিয়ে— কালো বাজাব ক'বে ছেলেটা কত জায়গায় ঘুবেছে— কত লাখ টাকা কবেছে— কত মেয়ে চষেছে নিজেই অসিতেব কাছে সে সব গল্প অনেক বাব ক'বে গেছে সে। অসিতেব হাতে যখন টাকা ছিল মনোহবকে প্রশ্রয় দিত না সে— বলত, আমি দবকাবী বই পড়ছি বা লিখছি— তুমি খোকনেব সঙ্গে গল্প কব গিয়ে মনোহব। মনোহব খিড়কীব পথ দিয়ে না ঢুকে সদব দবজা দিয়েই সীতাব কাছে যাওয়াটা সমীচীন মনে কবেছিল; সীতাব কাছে চলে যেত সে। এই এমনি যাওয়া—আসা যাওয়া— গল্প কবা— সব জায়গায়ই (যে) সব জিনিসই যে নানা ছেদ অনুচ্ছেদেব ভিতব দিয়ে এই মর্ম্মে—মর্ম্মস্নায়ুতে ফিবে আসে এ কথা মনে কবত না মনোহব। মনে কবতে ভাল লাগত না তাব। সীতাব সঙ্গে তাব সম্বন্ধ ছিল অপব বকম ভালো লাগাব। আস্বাদ নেবাব—ভালো লাগাব শক্তিব পবিধি অবিশ্যি বড় ছিল না তাব, লীলায়িত ছিল না; ঘুবে ফিবে চিনিব দানাব পিঁপড়েব ব্রহ্মদর্শনেব মতন সীতাব আবহেব দিকে মুখ ঘুবিয়ে বসে থাকত সে।

মনোহব বোধ হয় শেয়াব মার্কেট থেকে ফিবেছে খোকন? অসিত জিজ্ঞেস কবল।

— জানি না। দেখে আসব?

—হ্যাঁ।

—ডেকে আনব।

—ডেকে আনবি? কটা বেজেছে?

—ছটা বেজে গেছে। পেলে ডেকে আনব মন্টুদাকে?

অসিত শেলফেব থেকে একটা মোটা বই বেব কবে নিয়ে ইজিচেয়াবে বসে বললে— না, ডাকিস নে— এমনি দেখে আয় আছে কিনা।

খোকন চলে যাচ্ছিল। অসিত বললে— আচ্ছা বল গিয়ে যে আমি ডাকছি।

সিল্কেব শার্ট সিল্ক ট্রাউজাবেব পকেটে দু হাত চালিয়ে দিয়ে ঘবেব ভিতব ঢুকে মনোহব বললে— কী খবব' বৌদিব কিছু হয় নি তো'

— না। কী হবে।

ঘবে কয়েকটা চেয়াব থাকতেও মনোহব একটা টেবিলেব কিনাবে এঁটে বসে বললে— ছেলেটা একটা ক্যাবলা— আমাব ছেলেটা।

— কেন, কি কবেছে

—কববে আবাব কী। উদোব মতন হঠাৎ কোত্থেকে এল দেখলুম, বললে আমাদেব বাড়িতে ডাকছে আপনাকে। তাকিয়ে দেখি ওঃ চোখ টসটস কবছে। ঐ তো ভ্যা ভ্যা ক'বে কাঁদছে

—কাঁদছে? কেন কি হয়েছে? অসিত কান পাতল সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, কোন কান্নাব শব্দ কানে এল না তাব।

—কি — হয়েছে কি মনোহাব। অজিত কবেছে কী।

—কি কবেছে আব কি কবেনি তা আমি জানি না। শেয়াব মার্কেটে আজ জান কবুল হয়েছে। সে চুলোয় যাক— মেজাজ আমাব তিবিক্ষে হয়ে ছিল বলেই নয়— এমনিই ওকে কষে জমিয়ে দিলুম— দু ঘুষো—

অসিত একটু দাঁতে হেসে বললে— আমিই ওকে পাঠিয়েছিলুম।

—না সেজন্য নয় অসিতদা— একশো বাব আমাদেব বাড়িতে যাব, কিন্তু ছেলেটা ও বকম নোনছা বোষ্টম কেন। কথা বলতে গেলে চোখে জল। আহা, কীই যে তৈবি কবেছেন ওকে।

মনোহবেব গলায় কফ আটকে গিয়েছিল। টেনে নিয়ে জানালাব ভিতব দিয়ে এক দলা কফ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে— আজকালকাব পৃথিবীতে ও সব ছেলে দিয়ে কিসসু হয় না।

'হয় কি না হয় অসিত নিজে তাব প্রমাণ নয়। অসিত নিজে ক্যাবলা ছিল না কিন্তু কিছু হল না তাব। পৃথিবী ক্রমাগত বদলাচ্ছে। টাকাব দিক দিয়ে এখন মনোহবেব মতন ছেলেদেব জন্য স্বর্ণযুগ এসেছে। আবাবও বদলাবে পৃথিবী। তখন বেঁচে থাকলে অসিত বা তাব ছেলেব অন্য রূপ জীবনচেতনাব একটা মোটা মূল্য থাকবে হয়তো। বুঝিয়ে বলতে চাইল মনোহবকে।

কিন্তু তত্ত্বকথাব চেয়ে দবকাবী কথা ভাল।

—তোমাকে একটা কাজে ডেকেছি মনোহব। বললে অসিত।

মনোহর কলকাতার পথঘাটের সে এক রকম সেয়ানা ধাড়ির মত হেসে বললে— কী কাজ আমি বুঝেছি।

—না, সে তুমি জান না, বলি নি কোন দিন তোমাকে।

মনোহর তাতে তালি দিয়ে বললে— কী ক্যাবলা— বলার দরকার হয় না কি অসিতদা। আমি দেখেছি যে বৌদির ক দিন থেকেই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

শুনে বিস্মিত হলেও বিমূঢ় হল না অসিত। এ সব ছেলেদের সঙ্গে .সে কিছু দিন থেকে কথা বলে অভ্যস্ত হয়ে আসছে।

মনোহর বললে— আমার উপরই তার দিয়ে দিন।

—হ্যাঁ তোমার উপরেই ভার। আমাকে দু হাজার টাকা দিতে হবে।

মনোহর হেড়ে গলায় হেসে বললে— না না অত লাগবে না। কোন পুরুষ ডাক্তার ডাকবেন না। আমার চেনা খুব ভাল লেডী ডাক্তার আছে— নাম আছে। মিলিটারি—

অসিত হেসে বললে— ওটা তোমার ভুল মনোহর, বৌদির কিছু হয় নি, দু হাজার টাকা আমি নিজের জন্য চাচ্ছি।

মনোহর ভুরু কুঁচকে চুপ থেকে কি যেন ভাবছিল। অসিত ভাবল, টাকাটা দেবে কিনা— কত দিতে পারবে হিসেব করছে হয়তো। কিন্তু অসিত যে টাকা চেয়েছে মনোহর হয়তো সেটা শোনেই নি; অন্য আরেক রকম চিন্তার খেপলা জাল গুটিয়ে ঝেড়ে চোখ চেয়ে মনোহর বললে— ভুল আমি করিনি। আমার কাছে জিনিসটা চাপতে চাইছেন আপনি।

—কোন্ জিনিস? অসিত (কিছুটা বিরক্ত হলেও) বিস্মিতের ভান করে বলল।

—বৌদির কথা বলছি আমি

—কি হয়েছে তার?

—লেডি ডাক্তারের কথা তার জন্যেই তো বলেছিলুম।

—কেন, লেডি ডাক্তাব কী হবে

মনোহর একটা সিগারেট বেব করে বললে— এ বাড়িতে কোন মেয়ে নেই। বৌদি পুরুষ-মহলে থাকতে ভালোবাসে; আপনি মেয়েঘেঁষা পুরুষ মানুষ নন; কোন মেয়েকেই কি প্রত্যাশা করতে পারেন অসিতবাবু যে আপনাব সংসারের মেয়েলি ব্যাপারে এসে আপনাকে সাহায্য কববে। আমাকে আপনার ছোট ভাইযেব মতন কবে মনে করে নিতে পারেন না কি আপনি।

অসিতেব মনে হ'ল ছেলেটা আজ মদ খেয়েছে। কিংবা কি জানি মদ হয়তো খায়নি সে। কিন্তু কী বলতে চায় ছেলেটা।

—তা যদি না পাবেন তবে গুণময়ীকে ডেকে দেব

—গুণময়ী কে?

—আমার দিদি

—দিদি; তোমার আপন বোন?

মনোহর মাথা নেড়ে বললে— না, খুড়োর মেয়ে; আপন খুড়ো; আমাদের বাড়িতেই থাকে গুণময়ী— বিধবা বত্রিশ বছর বয়স—কিন্তু দেখায় আঠাবো উনিশের মত এমন প্রজ্বলন্ত সুন্দরী—

মনোহর সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল। অসিতও জ্বালিয়ে নিল একটা।

মনোহর ধোঁয়া ছেড়ে বললে— সে চুলোয় যাক্, কিন্তু— মনোহর টেবিলের থেকে একটা লাল মলাটের বই তুলে নিয়ে তার ওপর সিগারেট সমেত ডান হাতের মুঠো দিয়ে আস্তে আস্তে তাল ঠুকতে বললে— সে কারণে গুণময়ীর উল্লেখ কবেছিলুম আপনার কাছে তা হচ্ছে এই যে বৌদির এই ব্যাপারে— তাকে দিয়ে আপনার খুব সাহায্য হবে।

শুনে অসিত সিগারেটে মন দিল।

মনোহর বললে— জিনিষটা আগাগোড়া মিনিকচ্ছপের পেটে সেঁধিয়ে রাখতে চান যখন আপনি তখন গুণময়ীকে দিয়েই আপনার কাজ হাঁসিল হবে।

'তা ছাড়া' নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে মনোহর বললে— গুণময়ী খুব ভাল ধরতে পারে।'

"'ধরতে পারে' ওটা হল পারিবারিক প্রয়োগ— না ম্যাড্? অনেক দিন শুনিনি" অসিত ভাবছিল। মনোহরের দিকে তাকিয়ে বললে— সে হবে। গুণময়ীকে ডাকা হবে। সবই হবে। কিন্তু সম্প্রতি আমাকে দু হাজার টাকা দিতে হবে তোমায়।

সিগারেটটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ট্রাউজারের ভিতর সবেগে দু হাত ঢুকিয়ে ফেলে ঘাড়ে গদ্দানে দোর্দ্দণ্ডি সুখ সুবিধা বলাধান ঝাঁকিয়ে তুলে মনোহর বললে— দু হাজার টাকা— দু লাখ টাকা দিয়ে প্যাঁদাতে পারি সীতাসাবিত্রীর স্বামীদের— কিন্তু কেন— কেন— দিতে হবে কেন? কোন ক্ষতিপূরণের কথা ভাবছেন আপনি।

—না ক্ষতিপূরণ আর কিসের—

বাধা দিয়ে মনোহর বললে— যেমন ধরুন যখন ভেসেলিন দেবার দরকার থাকে না আর, মানে বুড়িয়ে গেছে বড়, এর ওর স্ত্রীকে এর ওর স্বামী খেসারৎ দেয়। কিংবা দুজনেই যখন স্বামী তখন গোস্বামীকে ভূস্বামীর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

যেন খানিকটা আবর্জ্জনা গিলে ফেলে অসিত বললে— না, না কোন ক্ষতিপূরণের কথাই ওঠে না, আমি ধার চাচ্ছি।

শুনে মনোহর একটা ভারি বাঁদরলরি মজার কথাই শুনেছে বুঝতে পেরে অসিতকে বললে— ব্যবসা চলে —Bank-এর overdraft-এ? ব্যবসা করবেন তো? সেই ক্যাপিটেল নিয়ে ব্যবসা করবার—এটা তো cash নয় যে ধার দেওয়া থোওয়ার গুথখুরি। মাইফেল্পী। — এক পয়সাও সঙ্গে নিতে হবে না আপনাকে। চলুন আমার সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে —বিনে টাকায় টাকা পাইয়ে দেব। কথায় কথায় সব হয়ে যাবে। ছালা বার করবার দরকার হবে না। আমায় দেখুন সব টাকা কথায় কনট্রাক্টে ঘুরছে— ক্যাশে দানা বাঁধতে দিয়েছি কি মরেছি। আমি কি ক'রে ক্যাশ দেব আপনাকে। তবে বাবার কাছে চেয়ে দেখতে পারেন। আমরা হলাম পথ—ঘাটের— আর উনি হ'লেন দাখিলা পরচা বন্ধকী তমসুকের—

মনোহর চলে যেতে যেতে বললে— উনি হ'লেন সৎ শ্রী ভারতীয় খাসমহলের ঘুঘু।

রামচরণকে টাকা পাঠাল অসিত। সীতাকে এক শো টাকা দিলে।

বললে— মনোহর তোমার এখানে আসে?

—আসে মাঝে মাঝে

— কী বলে?

সীতা নোটের তাড়া গুনে নিতে নিতে বললে— আমি কি মনে করে রেখেছি।

—ওর কথা ভুলে যাবার মতন নয়!

—কি রকম?

—ও রকম ধরণের কথাবার্ত্তায় আমরা অভ্যস্ত নই তো।

—আমার টাকা পেলেই হ'ল—

—তার মানে? অসিতের নাক মুখের চামড়ায় সাঁ করে চোখা চোখা ভাঁজ পড়ে গেল।।

সীতা একটু থতিয়ে বললে— এই যে তুমি এক শো টাকা দিলে—

—হ্যাঁ দিলুম— কিন্তু তার সঙ্গে আমি যা বলছিলাম সে কথার সম্পর্ক কোথায়?

—তুমি কি বলছিলে খেয়াল করি নি—

—মনোহর মাসে মাসে তোমাকে টাকা দেয়?

সীতা আবছা অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়িয়ে একটা টেবিল হাৎড়ে ধরে তাতে ভর দিয়ে বললে— মাঝে মাঝে আমি চেয়ে নেই

—ওর কাছ থেকে?

ঘাড়ের ঘাম মুছে ফেলে গায়ে আঁচলের বাতাস লাগিয়ে সীতা বললে— আমি শোধ করে দেব।

—কোথায় পাবে তুমি?

—মনোহর বলেছে আজকাল সিনেমায় ভদ্রঘরের মেয়েদের দাবী চড়া দামে মেটানো হয়—

সীতা তার কথাটা শেষ না করতেই অসিত বললে— "ভদ্রঘরের মেয়েদের দাবী চড়া দামে মেটানো হয়" এ ভাষা তুমি কোথায় শিখেছ সীতা?

সীতা তার সুন্দর সুস্থ দাঁত বের করে নিজের কথার পথে অগ্রসর হয়ে বললে—আমি ভেবে দেখেছি; চেহারা আমার মন্দ নয়, ভালো বলতে পারি। অনেক প্রোপ্রাইটার, প্রোডিউসার, ডিরেক্টরের সঙ্গে মনোহরের আলাপ— একজন প্রোপ্রাইটার আসতেও নাকি রাজি হয়েছিল আমাদের বাড়িতে— কাল সন্ধ্যা নাগাদ।

—কিসের জন্য?

—কনে—দেখা—আলোয় কিসের জন্য আসে মানুষ?

চায়ের ব্যবসায় নানা রকম চা আস্বাদ ক'রে ঠিক করা হয় কোনটা কি রকম। একজন মানুষেরই মুখ ও কণ্ঠ যদিও সীতার —তবুও এরই ভিতর নানা রকম বৈষম্য ধরা পড়েছিল। হিসেব করে নিতে নিতে অসিত বললে— তা এল না কেন?

—মনোহর বললে আমাকে না কি আজকাল একটু মোটা দেখাচ্ছে—

তাই তো— এই তো এক্ষুনি এই সব বলছিল মনোহর, অসিতের মনে পড়ল।

সীতার দিকে তাকিয়ে সে বললে—আজ কি বললে মনোহর? বললে হয়তো, হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে— এটা ওদের পছন্দ হবে না?

— হ্যাঁ হ্যাঁ— তুমি কি করে জানলে।

—চর্বি গালিয়ে একটু রোগা হলে ডিরেকটর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।— এই তো আমার ধারণা?

—কার— মনোহরের ধারণা?

— না— না— আমার— অসিত ডান হাতের তিনটের আঙুল দিয়ে নিজের বুক চিহ্নিত করে চেপে ধ'রে বললে— আমার— আমার— অসিতের।

সীতা খুশি হয়ে বললে— তা হলে এতে তোমার সমর্থন রয়েছে?

—আমি তোমাকে রোগা বানিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুমি কি মোটা? মনোহর তোমাকে মোটা বললে কেন? —আপাদমস্তক সীতার দিকে — শুধু স্বামীর নয়— ব্যবসায়িকতার কেন্দ্র থেকে তাকিয়ে দর্শকদের চাহিদা মিটিয়ে লেহন ক'রে দেখে নিয়ে অসিত বললে— এর চেয়ে খারাপ চেহারা সিনেমায় সুনাম কিনেছে ঢের— তুমি তো সুন্দর।

— সে কথা আমি ওদের মুখে শুনতে চাই— তার পাপড়ির মত শাদা সাজানো দাঁত বের করে বিষন্নভাবে বললে সীতা। আমি আরো রোগা হতে চাই। পায়ে হুঁচোট খেয়ে আমার একটা হাড় নষ্ট হয়ে গেছে হয়তো— সেটা ঠিক করে দাও।।

—তোমার চলতে কষ্ট হয় কি?

—ব্যথা লাগে

—এমনি কোন অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে— চ'লতে গেলে? মনোহর বলছিল তুমি খুঁড়িয়ে হাঁট— কিন্তু আমার চোখে তো তা' পড়েনি। এই তো বেশ হাঁটছ— কোন আফশোষ খুঁৎ নেই তো—

সীতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বললে— সব ভেঙে যাচ্ছে— মনে হয়। কি রকম বেগ পেতে হচ্ছে ধারণা করতে পারবে না তুমি।

—কিন্তু সিনেমায় কতক্ষণই বা হাঁটতে হবে— কতটুকুই বা জায়গা— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো প্রায় কথা বলা।

—আমার বড় কষ্ট হয় পায়ে, একজন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিলে ভালো হয়। পা আমার মচকে গিয়েছিল মনোহরকে ঠেকাতে গিয়ে— আমার মনে হচ্ছিল ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বুঝি। কিন্তু পা পিছলে প'ড়ে পায়ে চোট লাগার পর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে বললে ওটা ওর মুদ্রাদোষ, দোষটা ওরই ও স্বীকার করলে, কিন্তু এত বেশি ভয় পাওয়াটা মেয়েদের স্বভাব নয়— বলছিল আমাকে।

স্থির হয়ে শুনে ঘাড় হেঁট করে পায়চারি করতে করতে অসিত মুখ বেঁকিয়ে সুইচটা টিপে দিল। সমস্ত ঘর আলোয় ভরে গেলে অসিত বললে— পঞ্চানন চাটুর্য্যেকে দেখাব। আমার দু একজন চেনা শোনা লোক আছে— সিনেমার বড়দের কাছে যারা মুরুব্বির মত। তারা বললে সিনেমার বড়বাবুরা এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। না কি ওদের ওখানে যাবে। মনোহর নয়, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব তাহ'লে।

কিন্তু জলঝঙ্কারের ব্রহ্মাস্বাদ কুয়াশায়— নীরবতায় ফুরিয়ে গেল সব। সহজ সাংসারিক চেতনায় ফিরে আসতেই অসিত শুনল সীতা তাকে বলেছে

—সিনেমায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে স্বামীর স্বত্ব হাতে রেখে তুমি যে কারচুপি করবে সে একেবারেই সম্ভব হবে না বলে দিচ্ছি তোমাকে। হতে দেব না আমি। ও নামিয়ে দেওয়া মানে নামিয়ে দেওয়া।

অসিত সেই মিলিয়ে যাওয়া জলের রোলকে আবার ফিরে পাবার বৃথা চেষ্টা করে অবেশেষে কযেক মুহূর্ত পরে বললে:

—করে যেতে হবে তো। আমি এতদিন করেছি— এই বার তুমি কর। তুমি নিজেই যাও। এ ছাড়া আর কি চায় মানুষ মানুষের কাছ থেকে এই আকাশ-জল-নক্ষত্রের আশ্চর্য পৃথিবীতে—

কিন্তু লোকটার এই অস্বাভাবিক উক্তির কোন মানে হয় না— এই অস্বাভাবিক, কর্ম্মমুখর, স্থিতিসংস্থানের পৃথিবীতে।

সিনেমায় নামার প্রধান বাধা হ'ল সীতা নিজে। অসিত কোন চাকরি পেল না— দেনা জুটল কম— রমেশের অনুমতি নেওয়া দূরে থাক, তাকে না জানিয়ে বাড়িতে ভাড়াটে বসিযে হেমন্তের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দিল খেয়ে— না খেয়ে—

সীতা মারা গেল তিন মাসে মেয়ে প্রসব করে— খোকন মাবা গেল পাঁচ দিনের জ্বরে। এক অন্ধকার রাতে লেকের জলে পা ডুবিয়ে বসে ছিল অসিত— নক্ষত্রের আলোয ডানে বাঁযে কাছে অতি দূরে জলের ব্রহ্মস্পর্শে তার মৃত্যু হ'ল না। কেমন একটা সমাধির ভিতর অস্পষ্ট হয়ে পড়ল সে। অনেক রাতে চাঁদ উঠতে দেখে সেই স্বর্গীয় খোকন-পাখি, সীতা-পক্ষিণী, রামচরণ-গিরেবাজটাকে ভালো লাগল তার— জলের না কি বিল্বাঘাসের মঞ্জুরীকে বাতাসের আঘাতের মত ঝঙ্কার চারিদিকে— কিন্তু তবুও গভীরতর পরিচ্ছন্নতায়— শ্বাস রোধ হযে যায় মধ্যহ্রদের জলের ভিতর। বুঝতে পারল না সে ডাঙায় রযেছে— না জলের ভিতরে?— ঐ যে কার কটি লোক চাঁদের আলোয় ফিরছে ওরা কি জলের অন্তেবাসী— না মাটির পৃথিবীর জিনিস— চাঁদ চারিদিককার ধূ—ধূ জলে নেমে এসেছে— এখানে ওখানে এই ওই ধূসর জলের সীতা— ফিকে জলের অজিত— কালো জলের রামচরণ। এমন কেন কালো জলের ভিতব এখনও রামচরণ? সবই সবুজ জল হয়ে গেল তাই— স্ফটিকের জলের মতন হযে গেল। অসিত টের পেল হ্রদের পারে সে বসে আছে— চাঁদের কিরণ এসে পড়েছে তার চোখের উপরে। সে তাকিযে দেখল কোথাও কেউ নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললে— আশ্চর্য, রামচরণকেও দেখলাম। অজিতকে, সীতাকে। তীব ঘিরে টলটলে ডুব জল ঝর্ণার উড়ো জলের ভিতর সংসারের সফেন ভাত স্বাদু মমতাব গন্ধ খুব ভালো ক'রে ফুটে উঠল। আহা, ঘাস, জল, সৃষ্টির অন্তহীন সময়—তোমাদের ছকের ভিতর আমাকে টেনে নিয়েছিলে। কোথাও রয়েছে সীতা—আমারি মতন কথা বলছে। নাকি, আমার কথা তার কথারই প্রতিধ্বনি ; নিববচ্ছিন্ন সমযেব দিকে তাকিয়ে? কোথাও রয়েছে অজিত রামচরণ—কথা বলছে আজ রাতে—এখনই তাদের কথা আমার কথারই প্রতিধ্বনি ; সময়ের অনিঃশেষ প্রবহমানতার ভিতর তবুও নাড়ীর যোগ অক্ষুণ্ন রেখে—হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবতে লাগল—ও পৃথিবী সকলের জন্য নয়—আমার জন্যও নয় হয়তো। এ সব ভুলে যেতে হবে—ছেড়ে দিতে হবে—যেতে হবে আমাকে কালো বাজার আর শাদা ইযার্কির মেরুনা রঙের দেশে।

কিন্তু সে পৃথিবীতে অসিত মানিযে নিতে পারল না নিজেকে—কোন দিক দিয়েই শেষ রক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। একটা চাকরি পেল—৩০০ টাকাই দিত—কিন্তু ৭৫ দেওয়া হল।। চাকরিটা নিল সে; কাজ করতে লাগল। যেন ভুল হয় নি, পাপ হয় নি, কোথাও কোন ছেদ অবচ্ছেদ খণ্ডিত করেনি তাকে। অসিতের এই ভাবটা রপ্ত হয়েছে দেখে একজন আলাপী জুটে গেল তার। (রমেশের বাড়ির) ভাড়াটেদের একটি বাজে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অসিতের বেশ জমে উঠল। সুযোগ পেলেই বিধবাটি অসিতের কাছে আসত। এ কোন মিলন নয়—সঙ্গম নয়—আলাপ পরিচয়ও নয়।

অদ্ভুত এই খেলা—এর কোন বিষময় পরিণতিও নেই।

শীতরাতের অন্ধকারে

বধূ একেবারে বালিকা, অবিশ্যি বয়সে নয়, কিন্তু মনের ছেলেমানুষিতে। বয়স তার কুড়ি–একুশ, বছর চার–পাঁচ হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। অঘ্রাণের সকালবেলা বারান্দায় একটা ছোট্ট চেয়ারে বসে লজিক পড়ছিল। আলকাতরা মাখা শুকনো টিনের বেড়ায় ঠেস দিয়েছিল। আলকাতরা এখন শুকিয়ে গেছে, প্রায় মাসতিনেক আগের পোঁচড়। হাতে পায় মাথায় হেমন্তের নবম রোদ এসে পড়েছে। চকোলেট রঙের একটা খদ্দরের শাল।

উঠোনে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলাম, যাক বেশ একটু শান্তিতে আছে। সজনে গাছটার গায় বেশ খানিকটা রোদ এসে পড়েছে। পাতাগুলো শিশিরে ভেজা। কয়েকটা নিকষকালো দাঁড়কাক ডালে ডালে বসে খুনসুটি করছে, পাতা ঝরছে আর একটু–আধটু শিশির। দেখছিলাম, হঠাৎ চমকে তাকিয়ে দেখি কনক সমস্ত বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁড়িমুখ কবে বসে আছে। কি হল আবার!

কনকের কাছে এগিয়ে যাই, বারান্দায় অবিশ্যি উঠি না। উঠান থেকেই নরম স্নেহেব সুবেই বলি—'থাক, আর পোড়ো না।'

আমার দিকে সে ফিরে তাকায় না। মাটির ওপর বিক্ষিপ্ত বইগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে, চোখে জল। কালকে রাতে বাঁধা বেণী আব খোলা হয় নি। পিঠের ওপর ঝুলছে। মাথায় চুল উস্কোখুস্কো। মুখ কেমন খড়িমাটিব মতো পানসে ফ্যাকাশে—কেমন ভয় [...]

'আমি পড়বই।'

বললাম—'খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা না হয় পোড়ো, এখন এসো খানিকটা রোদে বেড়াই, চলো।'

বারান্দাব থেকে একটা মাদুর নিযে উঠানে রোদেব মধ্যে পাতলাম। এখানে কনক বসবে। আর আমি পায়চারি কবতে করতে তাব সঙ্গে গল্প করব। কিন্তু সে বইগুলো গুছিযে তুলে নিযে সেই ছোট্ট জারুল কাঠের চেযারে ঘাড় হেট করে বসল আবার।

আচ্ছা, শন্তিতে থাকলেই ভালো।

আমি তাকে পড়তে বলি নি। এ সংকল্প তাব নিজেবই—পড়বে, পরীক্ষা দেবেই।

বাধা আছে ঢেব। একটা বাধা আমাদেব অসচ্ছলতা। অনেকদিন থেকেই আমার কোনো রোজগাব নেই। রোজগারেব উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝ কলকাতায় যাই। টোটকা কাজ দু–একটা জোটে। কিন্তু সে সবেব মেযাদ শিগ্‌গিরই ফুরিযে যায। তাবপব দেশেব বাড়ির নিস্তব্ধ অলস দিনগুলো, শান্তি দেয় না বেদনা দেয বুঝে উঠতে পাবি না।

জ্যোৎস্না রাতে উঠানে পাযচারি করি। হিজল গাছের ভেতরে লক্ষ্মী পেঁচা ডাকে, ঝুপ করে বাদুড় এসে করমচার পল্লবে এক আধবার নাচানাচি করে যায। নারকোলের পাতা চাঁদের আলোয় চিকচিক করতে থাকে। চারদিকে নিস্তব্ধতা—মনে হয জীবন কি যে সান্ত্বনাব জিনিস, কিন্তু পরের মুহূর্তেই হয়তো মিনি কেঁদে ওঠে—কনক তাকে দুম করে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে দেয়,শাশুড়ী বধূতে ঝগড়া লেগে যায়, একটা দুধের বোতল ভাঙে, কিংবা কতকগুলো দুপদাপ করে শেলফের বইগুলো ঘরময় লুটিযে ছড়াতে থাকে। উত্তরের ঘরে কাকা তার মা মরা ছেলেটাকে পেটায। তারপর নিজে হাঁপানিতে ধুঁকতে থাকে।'

বিধবা পিসিমা তার ছোট্ট একচালার রোয়াতে বসে ধানশস্য হেমন্তের মাঠটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চয জড়পিণ্ডের মতো বসে থাকে। তারপর প্রাদীপ জ্বালিযে ছাতু গুড়ো করে তার বিধবা মেয়েটিকে খেতে ডাকে। দুটি বিধবা মুখোমুখি বসে খায়। তারপর খড়ের চালের নীচে শীতরাতের অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে থাকে।

এইরকম।

এ সংসারে যারা ভরসার মানুষ তাদের কথাই বলি।

তারা সকলেই বুড়ো। এই শীতে যদি তারা সকলেই শেষ হয়ে যায় তো তা খুব স্বাভাবিক। এতদিন পর্যন্ত যে তারা পৃথিবীতে বেঁচে আছে, যতদূর বুঝি, তা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তারা মরে

যেতে চায, বিদায নিতে চায।

কিন্তু তবুও তাবা যে বেঁচে আছে, কাজ কবছে, এ সংসাবেব পক্ষে তা খুব সান্ত্বনাব কথা। ভাত খেতে পাচ্ছি তাই। কিছু কিছু কবিত্ব কবতে পাবছি। বাবাব বযস সত্তব পেবিযে গেছে। বাবাব একটা প্রেস রযেছে। যখন এই প্রেস কেনা হযেছিল তখন আমি জন্মাই নি। তাহলে— এই প্রেসটা চৌত্রিশ-পঁযত্রিশ বছব ধবে চলছে। যখন এটা প্রথম কেনা হযেছিল, তখন এব খানিকাটা মূল্য ছিল। এখন টাইপ ভেঙে গেছে, কলকব্জা সহজেই বিগড়ায, বাইবেব প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যথেষ্ট। চাবদিককাব ব্যবসাব দুর্দিনও তেমনি। যে মাসে খুব বেশি পাওযা যায চল্লিশ, যে মাসে খুব কম, দশ-পনেবো টাকা আন্দাজ হয।

এই প্রেসেব তত্ত্বধান নিতে আমি ভয পাই। বাবাব জিনিস, বাবাবই হাতে থাকুক। আমাব বেকুবিতে আমি এটাকে নষ্ট কবে ফেলব বলে মনে হয।

দেশেব বাড়িতে যতদিন থাকি প্রেসেব কাজে যতদূব সম্ভব সাহায্য কবি। কিন্তু বঝুতে পাবি না বাবা মাবা গেলে এ প্রেস নিযে আমি কী কবব? আমাব ইচ্ছা একটা নতুন সুন্দব প্রেস কিনে চালাই। দামি কাগজে ভালো টাইপে বাঁধাই ও মলাটেব সুস্বাদে নিজেব বিবেককে তৃপ্ত কবে নিবিড় কবিতা ও গল্পেব বই সব ছাপাই। নিবিড় একখানা গল্প ও কবিতাব কাগজ বেব কবি। কিন্তু এসবই মনেব বুদবুদ মাত্র। এ কোনোদিন হবে না।

জেঠামশাযেব ম্যাপেব ব্যবসায কোনো পযসা নেই। কুড়ি-পঁচিশ বছব আগে নিজে ম্যাপ তৈবি কবে মন্দ পযসা পেতেন না। কিন্তু উড়িযে দিযেছেন সব। আঁকতে পাবেন বেশ। সামান্য একটা পেনসিল হাতে নিযে চোখেব সামনে দিব্যি জাভা বা চীন বা বাংলাব ছবি ফুটিযে তুলতেন। কিন্তু ব্যবসা কবতে হলে আবো যে অনেক জিনিসেব দবকাব, সবচেযে বেশি কবে একগুঁযেমিকে বাদ দিতে হয, অনেক নতুনি জিনিস গ্রহণ কবতে হয, খুব বেশি আত্মবিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তি থাকলে যে চলে না। এ-কথা তিনি মানতে চান না। যতদূব বুঝতে পেবেছি জেঠামশায শিল্পী, ব্যবসাযী নন। কাজেই তাব আব চলল না। পাড়াগাঁযেব ইস্কুলে একটা মাস্টাবি কবছেন। মাইনে পঁচিশ টাকা । অবিশ্যি ভূগোলই পড়াতে হয, আব ইতিহাস। কিন্তু ভূগোল পড়াতে হয নীচেব ক্লাশে, ওপবেব ক্লাশে ভূগোল পড়াতে দেযা হয না। এই হচ্ছে তাব আফশোস। এবং তাব জীবনেব সবচেযে আমোদ হচ্ছে ওপবেব ক্লাশেব ভূগোল পবীক্ষাব খাতাগুলো যখন তাকে দেখতে দেযা হয।

বিযে কবে নি। সেও খুব ঐকান্তিক শিল্পীবই লক্ষণ। আমাব অনেক সময তাই মনে হয।

জেঠামশাই ছিপছিপে লম্বা মানুষ। দাড়ি বযেছে, বেশ অনেকখানি। শবীব সবসমযই অসুস্থ। শীতে গবমে সবসময এমনকী, জ্যৈষ্ঠ মাসেব দুপুবেও গলায একটা কমফবটাব বেঁধে বাখেন। গবম চা খেতে খুব ভালোবাসেন।

ইস্কুলেব কযেকটা ঘণ্টা ছাড়া মুখে তাব সব সমযই চুরুট লেগে বযেছে। আব প্রাণে বযেছে অনেক সমযই একটা সজীব বিবক্তি। ম্যাপেব ব্যবসাটা নষ্ট হযে গেল বলে হযতো। কিংবা যাদেব ম্যাপ আজকালকাব বাজাবে যে কতখানি চলছে সেই কথা ভেবে কিংবা উপবেব ক্লাশে জেঠামশাইকে ভূগোল পড়াতে দেযা হয না বলে। মানুষ খুব খাঁটি। গলায কমফবটা চড়িযে লাঠি হাতে কবে যখন তিনি বেবিযে যান, তখন তাব চলাব বকমেই তা বুঝতে পাবা যায।

কাকা হাঁপানিব মানুষ। গবর্নমেণ্ট অফিসে একটা কেবানিব কাজ পেযেছিলেন। সে বহুদিন আগে। কিন্তু দুবছব কবেই দিলেন ছেড়ে। বেশ টাইপ কবতে পাবেন। মাঝে মাঝে দু-একটা অফিসে টাইপিস্টেব কাজ জুটত, তাব কিন্তু সেগুলো [...] অনেকদিন ঘবে বসে থাকতে হল। তাবপব ইস্টিমাব অফিসে পাবসেলবাবুব কাজ। টাইপও নাকি কবতে হয। যাক, গোটা কুড়ি টাকা পান।

কাকিমা মবে গেছেন। একটি ছেলে আছে মাত্র, কাকাব। ছেলেটি খুব নিবীহ, খুব নির্জীব। কিন্তু তবুও বাপেব কাছে উঠতে বসে মাব খায।

এই হল পবিবাবেব ভবসাব মানুষ সব। কাকা বোজই বাত কবে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায ফেবেন। মাথায থাকে একটা ছাতা, হিম না পড়ে সেইজন্য। উত্তবেব ঘবেব বাবান্দায উঠে চালেব বাতায ছাতা টাঙিযে তালেব গুঁড়িব সিঁড়িটাব ওপব নেমে এসে বসেন, উবু হযে। চাবদিকে তাকিযে নেন। কোথাও কেউ থাকে না বড় একটা। তখন বাদুড় উড়ছে, লক্ষ্মীপেঁচা কবমচা গাছে ডাকছে, কিংবা হিজ্জলেব মাথায। চাবদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নাবাত, পাড়াগাঁব। তালেব গুঁড়িব ওপব একা একা বসে কি

যেন কি মনে হয় কাকার। অনেকক্ষণ নীরবতার পর গলা ছেড়ে ডকরে ওঠে—'জানলেন দাদা?'

কেমন কাতর রব। আমি চমকে উঠি।

জেঠামশায তাঁর ঘরের থেকে বলেন—'কে, ভবনাথ এলে নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'অফিস হয়ে গেল?'

—'বিলক্ষণ।'

—'তাবপর?'

—'আর খিদে নেই।'

—'বেশ কথা'—

—'সকাল থেকেই পেটটা বুটবুট করছিল, তারপর সাবাদিন অফিসে ধোঁযা গিলেছি তিন মণ।'

জেঠামশায কোনো জবাব দেন না, হযতো পেনসিল দিযে ম্যাপ আঁকছেন।

—'শুনলেল দাদা?'

—'বলো।'

—'জাকুজা বিড়ি জাপান থেকে তৈবি হযে আসে, চমৎকাব জিনিস, আজ প্রায তিন প্যাকেট শেষ কবেছি অফিসে?'

—'কত কবে প্যাকেট?'

—'তা বেশি নয, দু-পযসা।'

—'কটা থাকে?'

—'এই গোটা বাবো।'

—'সিগাবেটেব মতন কেসে বুঝি?'

—'এত শস্তায কি কবে দেয?'

—'আপনি ব্যবসাযী মানুষ আপনিই জানেন। শস্তায ম্যাপ দিতে পাবলেন না বলে এমন ব্যবসাটি কবলেন মাটি।' একটা হাঁপানিব টান সামলে নিযে কাকা হাঁপাতে হাঁপাতে—'জাবিজুবি জানতে হয ঢেব। এই বেকুব জাকুজা বিড়ি, পিজবোর্ডেব কেসে ভবে দেবে যেন চাযেব মতন কবে—'তেমনি সিগাবেটেব মতন খেতে, মুখে দিযে মনে হয তাই তো।'একটু কেশে বললেন—'কোথায যে জোচ্চোবি ঠিক ধবতে পাবি না।'

—'কে বললে তোমাকে জোচ্চোবি আছ এব মধ্যে?'

—'নইলে কি আব দু-পযসায দিতে পাবে?'

দুজনেই নীবব।

একটু পবে— 'এক পযসা দু-পযসা জিনিস না দিতে শিখলে ব্যবসা হয না। আপনাব ম্যাপেব দাম খুব বেশি, বাজাবে চলল না। মাথা নেড়ে কাকা বললেন—হ্যাঁ স্বীকাব কবি অবিশ্যি আপনব জিনিস খুব খাঁটি, কিন্তু একটু-আধটু জোচ্চোবি না কবলে হয না।'

জেঠামশায গলা খাকবে বললেন— 'আচ্ছা আচ্ছা হযেছে ভবনাথ, তুমি একখন একটু থাম তো দেখি।'

গোটা কযেক সুজি রুটি ও খানিকটা গুড় একটা থালায কবে এনে মা কাকাব সামনে বাখেন।

কাকা গলাটা একটু খাটো কবে বলেন—'বুঝলেন বউঠান? দাদা যেন বেগে'—

—'কেন?'

—'ওই ম্যাপেব কথা বললে।'

—'থাক, ও নিযে কেন আব।'

—'একটু জোচ্চোবি দবকাব না?'

—'কীসেব জন্য?"

—'ভালো কবে ব্যবসা চালাতে হলে।'

মা একটু হাসেন।

—'বলুন আপনি।''

—'আমি কী করে জানব?'

—'হ্যাঁ বেশ খানিকটা জোচ্চোরির দরকার , না আছে দাদার, না মেজদার। কি করে কি হবে বলো?'

—'আমাদের যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

—'তা তো হয়েছে, কিন্তু আমি আজ পাঁচটি টাকা ঘুষ পেতাম।'

মা কাকার দিকে তাকালেন।

—'এমন পাঁচবার করে সেধে গেল।'

—'তোমাকে?'

—'মাইনে যার পেনেরো টাকা, তাকে পাঁচটি টাকা ঘুষ, চোখের পাতা না ফেলতেই একটা চকচকে পাঁচ টাকার নোট, অ্যাঁ?'

হাঁপানির একটা বেদম টানে ব্যথিত হয়ে কাকা বললেন—'কিন্তু নিলাম না।'

—'বেশ করেছ ভাই।'

চোখ পাকিয়ে বললেন— ভাবলাম দাদা মেজদার কানে যদি কোনোরকমে যায়' একটু থেমে—'কিংবা এই ধরো তোমারই কানে বউঠান—

অন্ধকার আরো বেড়ে ওঠে। তালের গুঁড়ির ওপর নিঃশব্দ হয়ে বসে কাকা নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকান। তারপর হঠাৎ আবার হাঁক দেন—'দাদা!'

পড়ছিলাম, চমকে উঠি। মনে হয় কে কাকে খুন করল বুঝি। উপলব্ধি হয়, কাকা ডাকছেন জেঠামশায়কে। গলার ভেতর কাতরতা ও বেদনার কি আশ্চর্য রোমাঞ্চ।

কনক বলে—'তোমার কাকার কি হল?'

উত্তর দেই না। অবাক হয়ে অন্ধকারে বারান্দায় এসে দাঁড়াই।

জেঠামশায় বললেন—'ভবনাথ ডাকছিল না?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখনো বসে আছ?'

—'হ্যাঁ দাদা।'

—'কোথায়?'

—'এই তালের গুঁড়িটার ওপর।'

—'তুমি হাঁপির মানুষ ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ?'

—'কোথায় যাব বলুন দাদা।'

—'ঘরে ভেতর যাও।'

—'কোনো শান্তি পাই না গিয়ে।'

—'শান্তি ?' জেঠামশায় চুপ করেন। একটু পরে বলেন—'কই ঘরের ভেতর গেলে?'

—'না, গিয়ে শান্তি নেই।'

—'শান্তি!' (জেঠামশায় আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়েন।)

বুঝতে পারছি না তিনি কি করছেন, ম্যাপ আঁকছেন না বই পড়ছেন, না গায়ে কম্বল জড়িয়ে জীর্ণশীর্ণ বিছানাটার ওপর বসে আছেন।

আগের সে তেজ বা উৎসাহ জেঠামশায়ের এখন আর নেই। আজকাল বসে থাকেনই প্রায়।

—'তুমি খেয়েছ ভবনাথ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী খেলে?'

—'সিদ্ধ রুটি আর গুড়।'

—'বেশ ভালোই করেছ।'

—'দেখলাম পেটে খিদে ছিল।'

—'তা থাকে।'

—'হ্যাঁ প্রায় আট দশখানা রুটি খেলাম, আর এক পোয়া আন্দাজ গুড়।'

—'আজ বাতে আব ভাত খাবে না তাহলে?'
—'খাব।'
—'তোমাব মেজদা এসেছেন?'
—'না।'
—'হাবলু কি কবে?'
—'অঙ্ক কষাচ্ছে।'
—'তোমাব বউঠান কি কবছেন?'
—'বাঁধছেন।'
—'সৌদামিনী কোথায?'
—'ঘুমিযেছে।'
—'এত সকালেই ঘুমোলো।'
—'বিধবা মানুষ কববে কি?'
—'খেযেছিল?'
—'হ্যাঁ, ছাতু খেতে দেখলাম তো।'
—'কমলা কোথায''
—'কমলী? সেও ঘুমিযেছে। বিধবা মা আব বিধবা মেযে। বা! ভগবান যাকে মাবেন একেবাবে নাস্যিব গুঁড়ো কবে ছেড়ে দেন। জানলেন দাদা! শুনুন!'
—'তুমি আব কতক্ষণ বাইবে বসে থাকবে?'
—'আমি? সে অনেকক্ষণ।'
জেঠামশায একবাব গলা খাকবে চুপ কবলেন।
—'ঘবেব ভেতবে আছে কি যে ঘবে যাব?'
—'কে আবাব থাকবে?'
—'তাই তো কথা। আপনাব তো কেউ কোনোদিন বইল না। তাই আপনি নিঃসন্দেহে বলে ফেলেন।'
—'হাবলুকে পাঠিযে দাও।'
—'কেন?'
—'একটু পড়াব।'
—'অঙ্ক নিযে বসেছে যে।'
—'তা বসেছে নাকি? থাক তাহলে।'
—'ওকে আমি জিওগ্রাফিব নেশা ধবতে দেব না।'
—'কেন?'
—'ঠিক আপনাব মতো অবস্থা হবে তাহলে?'
—'আমাব মতন? কী অপবাধ হয তাতে?'
—'না অপবাধ নয, তবে'—ভবনাথ ভুরু কুঁচকে বললে—'ওই কেমন একটা নিজেব ভাবে থাকা। কেবল ম্যাপ আব সার্ভে আব হাতেখড়ি আব গায ধুলো, না পবিবাব, না সংসাব, না কিছু দুত্তোব।'
—'হাবলু তো তোমাব ঘবেই বসে পড়ছে।'
—'হ্যাঁ।'
—'যা বলছ তুমি সবই তো শুনতে পাচ্ছে।'
—'তা পাবেই তো। এঁড়েটাব কান বাইবেব দিকেই বেশি।'
—'পুঁচকে ছেলে কবে তাব পবিবাব সংসাব হবে এসব কথা তাকে শুনিযে শুনিযে বলো কেন তুমি?'
কাকা চুপ কবে বইলেন।
—'এতে ছেলেদেব মাথা বিগড়ে যায।'
—'এসব ডেঁপোমি ইস্কুলেব ছেলেদেব কাছ থেকেই ওবা ঢেব শেখে।'
—'হাবুলও শিখেছে?'

—'তা অসম্ভব নয়।'

—'ডেকে দাও তো আমার কাছে।'

—'এই রে হাবলা, তোর জেঠামশায় ডাকছেন তোকে।'

জেঠামশায়—'ভবনাথ।'

—'আজ্ঞে।'

—'থাক পাঠিও না।'

—'এই তো যাচ্ছে আপনার কাছে।'

—'না, থাক।'

—'কেন চান তো দুঘা লাগিয়ে দিতেন, মন্দ হত না।'

—'ঘা আমি কোনোদিন লাগিয়েছি কাকে?'

—'এই হতচ্ছাড়াকে না হয় লাগাতেন।'

—'না না ছিঃ।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

—'ভবনাথ।'

—'আজ্ঞে।'

—'শান্তি পাও না কেন বলো তো?'

—'তার অনেক রকম কারণ।'

—'তোমার অসুখ বেড়ে গেছে বলে?'

—'না, অসুখ আমার বাড়ে নি, গত শীতের চেয়ে এবার বুকটা বরং ভালো আছে।'

—'তবে?'

—'একটা কারণ হচ্ছে সদি বিধবা হযে গেল তো তার মেযেটাও হল—বাঃ!'

—'হ্যাঁ যখনই ভাবি বড্ড অদ্ভুত লাগে।'

—'ভববান বিশ্বেস করতে ইচ্ছে করে?'

—'না, ভগবান অবিশ্যি কোথাও না কোথাও আছেন।'

—'কিন্তু আমাদের এ রাজত্ব দেখবার অবসর হয় না তাঁর।'

—'রোগে শোকে তোমার মুখ দিযে এবকম কথা বেবোয বটে, তোমাকে আমি দোষ দেই না, কিন্তু'—বলে জেঠামশায চুপ করলেন। একটু পবে বললেন—'কিন্তু সৌদামিনীর ধর্ম ও ভগবানে অগাধ বিশ্বাস।'

—'তা তো হবেই।'

—'কেন?'

—'মেযেমানুষ যে। ওরা কি বিচার করে দেখে?'

—'আপনি যদি একটা চড়ুই পাখির ঠ্যাং ভেঙে দেন, তারপর তাকে খাঁচার ভেতর ফেলে বাখেন তাহলেও সে আপনার হাতেই দানা খাবে, আপনার বিরুদ্ধে কোনোদিন যে তার কোনো অভিযোগ আছে সে কথাও মনে হবে না। মেয়েরা জীবনের দানা এইরকম করে খায়।'

—'এ-কথা তো প্রত্যেক মানুষের জীবনের সম্বন্ধেই খাটে।'

—'তা খাটে কী করে?'

—'আমবা সকলেই তো ঠ্যাং ভাঙা পাখিব মতো খাঁচার ভিতরে আছি।'

—'কিন্তু তাই বলে অভিযোগ তো সকলেব নেই। খাঁচার ভেতর ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছি যে এ জ্ঞানও নেই। এ জ্ঞান মেয়েদের থাকে না।'

—'সকলেরই অবিশ্যি ঠ্যাং ভাঙা নয়। অনেকে বেশ সুঠাম খাঁচায়ও থাকে, বেশ আরামে, বেশ শান্তিতে।'

—'থাক।' জেঠামশায একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

—'হাবলু ঘুমিযেছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ ঘুমোক, আর জাগিও না।'
—'এখন ঘুমলে চলবে না তো।'
—'কেন?'
—'এই তো মোটে আটটা বাজল।'
—'শীতের রাত ঢের পড়া হল আজ।'
—'দু-চারটা অঙ্ক আরো করতে হবে যে, অঙ্কে বুদ্ধি ছেলেটার খাসির মতো একেবারে। এই এক্ষুনি কানে ধরে তুলছি আমি।'
—'কি দরকার?'
—'এই সন্ধ্যারাতেই পড়া খতম দেবে।'
—'ছোট ছেলেদেরও ঢের কষ্ট আছে। যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণ তবু একটা শান্তি। তারপর ঘুম ভাঙলে আবার জীবনের পাট নিয়ে বসা। তুমি নিজেই ভেবে দেখ তো ভবনাথ। আমরা তো উতরে দিলাম প্রায়, কিন্তু এদের তো সবে শুরু হল।'
কাকা চুপ করে থাকেন। একটু পরে বললেন—'দাদা জেগে তো?'
—'হ্যাঁ।'
—'এই হাবলুর কথাই ভাবছিলাম।'
—'কী ভাবছিলে?'
—'ছেলেটার যদি আমার মতো হাঁপি না হয়, আমার মতো বউ না মরে যায়, আর আমার মতো ভগবানে অশ্রদ্ধা না হয় তাহলে জীবনটা বর্তে যাবে, কি বলেন?'
—'আমাব তো খুব আশা আছে ওব সম্বন্ধে।'
—'আমিও তাই ভাবি।'
কাকা একটু কেশে বললেন—'আচ্ছা দাদা যাই বলুন আর তাই বলুন ভগবানে অবিশ্বাস আপনাব নেই। আছে?'
—'না।'
—'তাহলে কেন বললেন আমবা সকলেই খাঁচাব পাখির মতো?'
—'হলামই বা। তাই বলে ভগবান থাকবেন না কেন?'
—'বেশ সেই ভগবানেব বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আপনাব?'
—'না।'
—'বাপরে, আপনাবা যেন কোন চূড়োব থেকে কথা বলেন।'
অনেকক্ষণ পরে জেঠামশায় বললেন—'তুমি এখনো চুপচাপ বসে আছ যে?'
—'হ্যাঁ, সেই তালগাছেব গুঁড়িটার ওপর ভাবছিলাম।'
—'বাইরে কে আছে আব?'
—'কেউ না।'
—'ঘরে যাও।'
—'লাগুক ঠাণ্ডা । ঠাণ্ডায় আর ভয় কি? ভগবানে বিশ্বেস করব আব কমফাবটাব জড়াব সেরকম ধরনের লোক আমি নই।'একটা বিড়ি জ্বালিয়ে কাকা বললে—'দাদা যে চুপ?'
তবুও জেঠামশায়ের নিস্তব্ধতা ভাঙে না।
—'আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলি না। তাই জন্যই কমফাবটাবেবি কথা তুলেছিলাম।'
জেঠামশায় চুপ।
—'দাদা করলেন রাগ। যাই বান্নাঘবে গিয়ে একটু বউঠানের সঙ্গে আড্ডা মারি।'
জেঠামশায়ের ঘরের থেকে ডাক এল—'ভবনাথ'—
—'আজ্ঞে।'
—'তুমি বোসো। কথাবার্তা বলা যাক। এই শীতের বাতে একলা পড়ে থাকতে সবসময় ভালো লাগে না। চোখ খারাপ হয়ে গেছে, না পারি পড়তে, না পারি আঁকতে।'
—'রাত্তিরে কিছুই দেখেন না বুঝি?'

—'না।'

—'আমার মনে য় চোখটা কাটালে হত।'

—'সে জন্য কলকাতায় যেতে হয়।'

—'চলুন যাওয়া যাক'—

—'কোন ভরসায়? আর আমি একা কাটিযেই বা কি করব? শিবুরও তো আমার মতনই অবস্থা।'

—'আপনার মতন অতটা চোখ খারাপ হয নি মেজদাব।'

—'কিন্তু আমার চেয়ে ঢের বেশি চোখের কাজ করতে হয়।'

—'তাই তো দেখি।'

—'দু-এক বছরের মধ্যে আমার মতোই হবে তার। বুড়ো বয়সে এইবকমই হয়।' কাকা বিড়ি জ্বালালেন।

জেঠামশায়—'নির্মল অবিশ্যি খুব সাহায্য করছে তার বাবাকে । কিন্তু শেষ প্রুফগুলো শিবনাথ দেখবেই। গাদা গাদা প্রুফ রোজ। এ কর্তব্যবোধ ভালো। কিন্তু চোখ নিয়ে এরকম খেলা পাপ না পুণ্য বুঝতে পারি না।'

জেঠামশায়—'শিবনাথের সংযমও আশ্চর্য, খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিযেছে। খবরের কাগজ আর নতুন নতুন বই, ছোটবেলার থেকে এই সবই ছিল তাব নেশা, যেমন আমার ম্যাপ আঁকা। কিন্তু এই সব ছেড়ে দিযে নিজেদেব জীবন্মৃতের মতন বোধ করছি না কেউ আমরা। মানুষের জীবনের কাজ একটা নির্ধারিত সময় অবধি, তারপর আমাদের কুঁড়েমির জন্য আমরা দাযী নই।'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ।

জেঠামশায় বললেন—'শিবনাথকে আমি বলি কলকাতায় গিযে চোখ কাটাতে। তার চোখের এখন তবু খানিকটা ভরসা আছে।'

—'তা যাওযাই তো উচিত।'

—'তা যাব যাব করেও যায না।'

—'কেন?'

—'পয়সা হাতে এলেই খরচা হয়ে যায।'

—'সে তো মৃত্যু অবধি হবে।'

—'অথচ আমরা কোনো কাজে খরচ করি না ভবনাথ। একটা চাকর অবধি নেই।'

—'দেখছি তো।'

—'তোমার বউঠান সমস্ত সংসার সামলাচ্ছেন।'

—'হুঁ।'

—'কিন্তু পযসা খরচ হযে কীসে জান? তুমি আমি আর শিবনাথ আমাদের তিন রুগিব ওষুধ তো আছেই। সে বেশ শুভ খরচ। কাবণ আমাদের বেঁচে থাকা দবকাব। না হলে সংসারটাই তো চলে না। অতএব ওষুধ চাই-ই। আমাদের বাসায় তো দশ-বারোজন লোক আছি, খেতে বেশ কটি টাকা খরচ হযে যায়। ভাবি কেউ আমরা ভালো ভাত খেয়েও থাকতে পারতাম। কিন্তু বিধবাদের জন্য [...] দরকাব ছোটদের জন্যও।

—'কিন্তু বিধবা শিশু বুড়ো রুগি এই নিয়েই অবস্থা। এই সংসার। কাজেই নুন ভাত খাওয়াব জো নেই।'

—'বড্ড বিপদ।'

—'জীবনটাকে ভগবানের দান বলে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে মোটামুটি যে নিতান্ত ন্যায্য খবচ আছে তা মিটাবার ঢের আগেই পয়সা যায় ফুরিয়ে।'

—'থাকবার মতো এরই মধ্যে করে নিতে হয়।'

—'হ্যাঁ আমরা মরলে আমাদের শ্রাদ্ধও তো তোমরা করবে। নির্মল গযায গিযে পিণ্ডি দেব। এখান থেকে গযাযাত্রার খরচই বা জুটবে কোত্থেকে? শ্রাদ্ধের টাকাই-বা পাওযা যাবে কোথায? তারপর তোমরা দুবেলা খাবে, পাখি তো নও, যে পড়তে পার বলে রানীমা আদর করে চানাছোলা দেবেন মানুষ। হেঃ হেঃ হিঃ হিঃ— হিসেব করে বিশেষ সুবিধা পাই না। কিন্তু তবুও জানি সবই হয়ে যাবে।'

—'জানলেন দাদা, নমো নমো কবে হয়ে যাবে।'
—'হয়ে তো যায।'
—'হ্যাঁ তা যায।'
—'তবে আব কি?'
কিছুক্ষণ পবে জেঠামশায বললেন—'আমি শিবনাথকে বলি তাই ভুল কবে একবাব কলকাতায চলে যাক, চোখ কাটিয়ে আসুক।
—'হ্যাঁ, তাই তো, মেজদা কি বলেন?'
—'ভয পায। বলে চোখ কাটাতে গিয়ে অন্ধও তো হয়ে যেতে পাবি।'
—'তাই হয নাকি?'
—'তাও হয। কোনো কোনো সময ব্রেনও খাবাপ হয়ে যায।'
—'চোখ কাটাতে গিয়ে?'
—'ব্রেনেব পর্দা চিবে যেতে পাবে।'
—'বাবে!'
—'মানুষ হয়ে যায পাগল।'
—'ইস।'
—'তুমি বলেছিলে ভগবানেব মঙ্গলে বিশ্বাস কবি তবু কমফাবটাব বাঁধি কেন। তা বাঁধা দবকাব। জীবনেব কতকগুলো নিয়ম আছে। তাব সঙ্গে সুবিচাব কবলে ভগবান কি কববেন। ইচ্ছে কবলে ঠাণ্ডা লাগালে নিউমোনিযা হবে না? চোখ কাটাতে গিয়ে আমাব অসাবধানতাযই হোক, ডাক্তাবেব অপবাধেই হোক, বেফাঁস পর্দা চিবে যেতে পাবে তো। তখন পৃথিবী হয়ে যায অন্ধকাব। ভগবান কি কববেন?
একটু জ্যোৎস্না ওঠে। মহানিমেব ডালপালায পেঁচা এসে বসে। ঢেব দূবে বনশ্রেণীব মাথায চাঁদটাকে দেখা যায। জানালাব ভেতব দিয়ে তাকিয়ে থাকি।
টেবিলে প্রেসেব প্রুফগুলো ছড়ানো। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলাম। এক প্যাবাগ্রাফও দেখতে পাবি নি। দোযাতেব ভেতব কলমটাকে ভালো কবে ডুবিয়ে নেই।
কাকা বললেন—'বাগ কবলেন নাকি দাদা?'
—'কেন?'
—'জীবনটাকে অবজ্ঞা কবলাম বলে?'
—'কে জানে তোমাব মতন হলে আমিও হযতো অবজ্ঞা কবতাম।'
—'তাহলে আপনি মনে কবেন আপনি আমাব চেযে ঢেব ভালো আছেন?'
—'তাই তো মনে হয।'
—'কোন হিসেবে?'
জেঠামশাই কোনো উত্তব দিলেন না।
—'বেশ, ভালো থাকলেই ভালো। ডানা ভেঙে আছি তো খাঁচায। তবুও ভাবি ডালে ডালে লাফাচ্ছি। মন্দ কি?'
—'মেজদাব তাহলে আব চোখ কাটাতে কলকাতায যাওয়া হব না?'
—'মনে তো হয না।'
—'চোখ আমাদেব তিন ভাযেবই খাবাপ।'
—'কেন তোমাব তো চশমাও লাগে নি।'
—'লাগাই নি বলে লাগে নি।'
—'চোখে ঝাপসা দেখো?'
—'এই দেখুন চাঁদ তো উঠেছে।'
—'হ্যাঁ।'
—'মনে হচ্ছে যেন বিবাট চাঁদ। তিনখানা আধ-খাওয়া লুচিব মতো গায গায ঘেঁষে।'
—বা!'
—'তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছে আপনাব ঘবটা কাঁপছে।'

—'সত্যি?'
—'অথচ ভূমিকম্প নেই তো কোথাও।'
—'না ভূমিকম্প কোথায় এখন আর?'
—'আপনার বাতিটার চারদিকে দেখছি রামধনুর মতো ছ-সাতটা রং।'
—'তাই দেখছ নাকি?'
—'সবজে নীল বেগুনি হলদে লাল—'রংগুলো কাঁপছে।'
—'থাক। চোখই গেছে।'
অনেকক্ষণ পর্যন্ত চারদিক নিস্তব্ধ।
প্রুফ দেখছিলাম। প্রায় তিন পৃষ্ঠা দেখা হয়ে গেছে।
কাকা বললেন—'তাই বলে আমি জীবনটকে ভালোবাসি।'
—'বেশ।'
—'ঘরে স্ত্রী নেই। কিন্তু এই শীতের রাতে লেপ তো রয়েছে। কি বলেন, দাদা?'
—'হ্যাঁ।'
—'বেশ গরমে ঘুমনো যাবে।'
—'ঠিক।'
—'মেজদা আবার গতবছরই এই লেপটা তৈরি করিয়ে দিলেন। বেশ পুরু। বললেন 'কাশিব মানুষ, লেপের দরকার।'
—'ঠিক কথাই।'
—'হাবলু আবার সারাদিন লেপটা রোদে রেখে দেয়। কেমন সোনার ছেলে দেখুন তো দিকি। ছেলের শ্রদ্ধাভক্তির জন্যও বটে লেপটা সারাদিন ভাজা ভাজা হয়ে থাকে বটে গায় জড়িয়ে বেশ আবাম।' কাকা বললেন—'বউঠানকে রোজ বলি কি জানেন?'
—'কি।'
—'কড়াইশুঁটি ভেজে রাখতে।'
—'কেন?'
—'আধসের করে ভেজে রাখে। মরিচ দিয়ে বেশ চমৎকাব ভাজা। মস্তবড় একটা কাগজেব ঠোঙা বানিয়ে ওই ভাজা নিয়ে লেপেব ভেতর ঢুকি, বুঝলেন দাদা?'
—'বুঝলাম।'
—'তাবপর চিবুতে থাকি।'
—'বেশ।'
—'জীবনকে আমি অবজ্ঞা করি না।'
—'কী দরকার করে?'
—'এই যে জাকুমা বিড়ি খাচ্ছি দেখছেন।'
—'হ্যাঁ।'
—'দু-পয়সায় পিজবোর্ডের প্যাকেটে দশটা বিড়ি দেবে। প্যাকেটের ওপব জাপানি ছবি রয়েছে। বেশ সুন্দরী একটি মেয়েব, দেখলেও ভালো লাগে। জাপানিদের ভেতবেও বেশ লম্বা ছাঁদের সুন্দর মুখ আছে।'
—'থাকবে না কেন?'
—'আর প্রজাপতি খোঁপার ঢংটাও মন্দ নয়।'
—'আচ্ছা দিনের বেলা দেখিও তো আমাকে।'
—'দেখেন নি বুঝি?'
—'না।'
—'আর জাকুমা বিড়ির চায়ের মতো গন্ধ, জানেন তো?'
—'চায়ের মতো?'
—'যতক্ষণ না দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়িটা ধরাব, একেবারে খাঁটি দার্জিলিং পাতার মতো গন্ধ ছড়াবে।'

—'আর বিড়িটা ধরালে?'

—'ঠিক সিগারেটের মতো খেতে লাগবে।'

—'বেশ।'

—'অফিসে এর তিন প্যাকেট খাই, আর সামার এলে রাত্তিরে দু-প্যাকেট।—দাদা ঘুমালেন নাকি?'

—'না।'

—'জীবনটা আমার মন্দ কি? কি বলেন?'

—'ভালোই।'

একটা বিড়ি জ্বালিয়ে কাকা বললেন—'কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে।'

—'কেন?'

—'এই বুড়ো বয়সে আর পারা যায় না।'

—'তুমি কি আমাদের থেকেও বুড়ো?'

—'রোগে রোগে আপনাদের বাবার মতন হয়ে গেছি।'

—'চাকরি ছাড়লে কি করে চলবে?'

—'আপনারা দুভাই আমার ভার নিতে পারেন না?'

জেঠামশায় ভাবছিলেন।

কাকা—'যার এরকম দু দাদা আছে তার চাকরি কি দরকার, আপনিই বলুন।'

জেঠামশায় কোনো সাড়াশব্দ দিলেন না।

—'টাকা তো ঢের, মোটে পনেরো, এরই জন্য ওই রাসকেলদের গোলামি?'

—'কেন, তোমার সঙ্গে কোনো অসদ্ব্যবহার করে নাকি?'

—'আমি আমার নিজেব মনে এক কোণে পড়ে থাকি. বিড়ি জ্বালাই, খাই কাজ করি।'

—'তবে আর কি?'

—'কিন্তু দশটা থেকে দুটো অবধি বসে বসে [...] বিড়ি টানা আর লেখা। এতে জীবনের প্রতি ঘেন্না ধরে যায় না!'

—'ছোটসাহেব যদি নেহাত তোমাকে কানে ধরে না তাড়ায় তাহলে এ অফিসে কাজ ছেড়ো না।'

—'আপনি এমন কথা বললেন?'

—'চাকরি ছেড়ে দিলে আমরা তোমার ভার নিতে পারব না।'

—'আপনারা তো কাজ করছেন।'

—'সে বড় জোর দু-তিন বছর আর।'

—'সে দুবছরই আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন।'

—'কি করবে তুমি?'

—'খুব দেরিতে ঘুমের থেকে উঠব।'

—'এই তোমার শান্তি?'

—'আর হাবলুর মা-র একটা জীবনী লিখব।'

জেঠামশায় হেসে উঠলেন। —'জীবনী লিখে কী করবে?'

—'হাসলেন দাদা? এই হিন্দু বধূটির যথেষ্ট সদগুণ ছিল।

—'বেশ তো।'

—'তার একটা জীবনীর দরকার।'

—'কি করে ছাপাবে?'

—'মেজদার প্রেসে।'

—'শিবুর অত পয়সা নেই।'

কাকা অত্যন্ত আঘাত পেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

প্রুফ দেখছিলাম। প্রায় ফর্মা দুই দেখে ফেলেছি। খড়ের প্রান্তরে গোটা দুই শিয়াল ঘুরছে। সমস্ত আকাশ মাঠ জ্যোৎস্না মাখা। চোখ ব্যথা করছিল, চশমাটা খুলে রাখলাম।

কাকা বললেন—'দাদা, জেগে?'
—'হ্যাঁ।'
—'বলুন তো এ বছর চাকরি ছেড়ে একটু শান্তিতে ঘরে এসে থাকি।'
—'চাকরি ছেড়ে দিলে তোমাব ভার তাহলে আমবা নিতে পাবব না।'
—'কিরকম?"
—'তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পাব।'
—'দুবেলা খেতেও দেবেন না আমাকে?'
—'না।'
একটা বিড়ি জ্বালিয়ে কাকা বললেন—'আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন?
—'কিন্তু তিনি তো বেঁচে নেই।'
—'তাই তো, ওই শীতে মাত্র গেলেন। কিন্তু মা যদি আজ থাকতেন?'
—'তিনি নেই আজ।'
—'আচ্ছা যদি বাতব্যাধি হয়ে আমি বিছানায পড়ে থাকতাম?'
—'তা তো তোমার হয নি।'
—'তাহলে কিছুতেই চাকরি ছাড়া যায না?'
—'না।'
—'জীবনটা বড্ড কঠিন।'
আবার প্রুফ নিয়ে বসা গেল। এই রাতে আবো পনেবো ফর্মা শেষ কবতে হবে।
কাকা নিজের মনেই বললেন—'জীবনটার থেকে পালাবারও কোনো পথ নেই।' বিড়িতে এক টান দিয়ে বললেন—'শুধু মরতে পারি।'
—'তাও তুমি পাব না"
—'আপনি কি যে মনে করেন, বীমার অফিসে কাজ করি, নদী তো কাছেই। জলে ঝাঁপ দিলেই হল।'
—'এই পাঁচ বছরের মধ্যে তাও তো দিলে না।'
—'সে দেই নি আমি আপনাদের কেলেঙ্কাবী হবে বলে।'
—'ভালোই করেছ।'
—'কিন্তু এটাও মানবেন ঝাঁপ দেযাটা আমাব নিজেবই হাতে।'
—'নিশ্চয। কিন্তু নদীর জলে কি দরকাব, খিড়কির পুকুরই আছে।'
—'আচ্ছা দেখা যাবে।' বলে কাকা উঠলেন।
প্রুফ দেখতে দেখতে কলমটা বাখলাম। কাকা খিড়কির পুকুবেব দিকে যাচ্ছেন নাকি? তাকিয়ে দেখলাম রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসেছেন।
খেযে দেযে এসে কাকা বললেন—'দাদা!'
—'বলো।'
—'আপনি আজ খাবেন না?'
—'না।'
—'একাদশী বুঝি?'
—'হ্যাঁ।'
—'বউঠান বলছেন কযেকটা লুচি ভেজে দেবেন।'
—'না।'
—'এক কাপ চা খাবেন?'
—'তা দিতে পারে।'
—'আর দু-স্লাইস পাঁউরুটির কথা বউঠান বললেন।'
—'কোনো দরকার নেই।'
—'হ্যাঁ হ্যাঁ দু-টুকরো পাঁউরুটি সেঁকে মাখন মাখিয়ে—'

—'তোমার বউঠানকে বলো বড় এক পেয়ালা চা হলেই হবে। একটু মুড়ি দিতে পারে।'

—'আচ্ছা, বড্ড শীত পড়েছে। এরকম রাতেরবেলা যারা মরবার জন্যে খিড়কির পুকুরে ঝাঁপ দেয়, তাদের কিরকম কনকনে লাগে বলুন তো দিকি।'

জেঠামশায় কোনো উত্তর দিলেন না।

—'গরম বিছানা রয়েছে, লেপ রয়েছে। এসব ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরে। জীবনটা কি বিচিত্র।'

একটা চরুট জ্বালালাম। প্রুফ দেখছিলাম।

কাকা বললেন—'জীবনটাকে আমি অবজ্ঞা করি না।'

—'বেশ ভালো।'

—'বেশ দশ-বারোখানা গরম গরম হাতেগড়া রুটি, ছোলার ডাল, কইমাছের ঝোল আর দুধ খেয়ে এলাম। এর বদলে ঠাণ্ডা পুকুরে জলে পেট ভাসিয়ে মরে থাকা।'

—'বেশ, এখন শুযে পড় গিয়ে।'

—'তার পর দেখুন হাবলু ছেলে না হয়ে মেযেও তো হতে পারত, কিন্তু তা হয় নি। ভগবান একটা মঙ্গল করেন বলেই তো'—

জেঠামশায় কোনো উত্তর দিলেন না।

—'আমি ভাবি, এই হাবলু তো আই সি এস-ও তো পাশ করতে পাবে।'

—'তা পারেই তো।'

—'তাহলে খুব ভালো বধূও পাবে।'

—'তা পাশ করলে পাবে।'

—'আমার স্ত্রী মরে গেছে, কিন্তু বউমা এসে যত্নআত্তি করে সে সব শোক ভুলিযেও তো দিতে পাবে।'

—'তা পারে বৈকি।'

—'দেখুন জীবনে এসব আশা ও শান্তি আছে।'

—'তা আছে বৈকি।'

এবকম কবে শীতের মাস কটা কেটে গেল, ব্যথায, নিস্তব্ধতায। কিন্তু বিশেষ কোনো বিপদ হল না। কাকা জেঠামশায দুজনেই বেঁচে বইলেন। প্রেসটাও ভেঙে চুরমার হযে গেল না। বুড়ো মানুষদেরও কাজেকর্মে চাকরিতেও কোনো ব্যাঘাত পড়ল না।

শীত কেটে গেছে। জেঠামশাযদের ইস্কুলের একটা সেশন শেষ হল। আর একটা সেশন শুরু হতে চলেছে। কিন্তু নতুন সেশনের আবম্ভেই জেঠামশায একদিন ইস্কুলের থেকে এসে বললেন—'আমি চাকবি ছেড়ে দেব।'

বাবা বিমূঢ় হযে জেঠামশাযেব দিকে তাকালেন।

আমি প্রুফ দেখছিলাম। কলমটা রেখে দিলাম।

বাবা বললেন—'তা বুড়োমানুষ, এত খাটুনি এখন সয না হযতো আব।'

—'না, তা নয।'

—'তবে? চোখের জন্য?'

—'চোখ আমার ঠিক আছে।'

—'কি হল তবে?'

—'হেডমাস্টারমশায বললেন কিনা আমি জিওগ্রাফি পড়াতে পারি না। সেদিন তাই জিগ্যেস করেছিলাম বল তো হে বাছা, পুনাকা কেথায? হাঁ কবে আমার মুখের দিকে তাকিযে রইল :

—'কাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

—'হেডমাস্টারকে।'

বাবা ঘাড় হেট কবে বললেন—'যাক, জিজ্ঞেস করবার কি দরকার, আপনি সঙ্গতভাবে পড়িয়ে যাবেন। সকলেই তো জানে এ অঞ্চলে আপনার মতো ভূগোল কেউ জানে না।'

জেঠামশায় প্রীত হলেন। কমফারটার জড়িয়ে লাঠি হাতে বেরিয়ে গেলেন।

বাবা বললেন—'দাদাব ওপব বড্ড অবিচাব কবা হয।'

প্রুফ দেখতে দেখতে বাবাব দিকে তাকালাম।

—'এমন একজন পাকা লোক, বিলেত হলে—'কিন্তু কথা শেষ না কবতেই হেডমাস্টাব মশায ঘবে ঢুকে বসলেন।

—'আপনাব দাদা বাসায আছেন?"

—'না।'

—'তাব সম্পর্কেই কথা।'

—'বলুন।'

—'এতদিন তো বেশ ছিলেন, কিন্তু বুড়োও হযেছেন, পঁচাত্তব ছিযাত্তব আন্দাজ বযেস?'

—'হ্যাঁ তাই হবে। আমাদেব সকলেবই প্রণম্য' কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—'কদিন ধবে দেখছি মাথাটা বড্ড দুর্বল।' বলে হেডমাস্টাব চুপ কবে বইলেন।

বাবা বললেন— 'মাথা দুর্বল দাদাব?'

—'হ্যাঁ।'

বাবা বললেন—'কেন, কবেন কি, পড়ান না?'

—'ইস্কুলে গিযে নিজেই ঘণ্টা বাজান।'

—'তাই নাকি?'

—'সাড়ে দশটাব সময ঘণ্টা বাজাবাব কথা, তা উনি ঠিক দশটাব সমযই ঘণ্টা বাজিযে দেন।'

—'তাই বেশ, তাতে আমাদেব কোনো আপত্তি নেই। দশটাব থেকেই ক্লাস বসাচ্ছি এ কদিন।'

বাবাকে দেখলাম বড্ড বিব্রত বোধ কবছেন।

হেডমাস্টাব—'কিন্তু ঘণ্টা বাজিযেই ম্যাট্রিক ক্লাসে গিযে বসেন।'

—'কে দাদা?'

—'হ্যাঁ।'

—'ওঁব তো ফোর্থ ক্লাস অবধি পড়াবাব কথা না?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু ঘণ্টা বাজিযেই ক্লাস টেনে নিযে বসেন। তখন আমাব সেখানে ইংবেজি পড়ানোব কথা। উনি গিযে জিওগ্রাফী পড়াতে থাকেন।'

তিনজনেই চুপ কবে বইলাম।

হেডমাস্টাব বললেন—'হযতো দু-তিন ঘণ্টা জিওগ্রাফীই পড়িযে যাচ্ছেন।'

—'ক্লাস টেনে?'

—'হ্যাঁ। তাবপব হঠাৎ যখন মর্জি হল কম্পাউন্ডেব নাবকেল গাছেব নীচে দপ্তবিকে দিযে একটা ব্ল্যাকবোর্ড আনিযে ম্যাপ আঁকতে লাগলেন। বাংলাব মাদ্রাজেব বার্মাব।'

—'বড় বিপদেব কথা।'

—'চাবদিকে ভিড় জমে যায। ইস্কুলে ডিশিপ্লিন বাখা শক্ত হযে দাঁড়ায। বাস্তায মানুষ পর্যন্ত মজা দেখতে আসে।'

—'এই বকম হল?'

—'বুঝলেন, ওঁব নিজেবও কলঙ্ক, আমাদেবও কলঙ্ক।'

—'ভালো ওষুধপত্র খেলে কিছু হবে?'

—'কিচ্ছু না।'

—'ডাক্তাব দেখালে?'

—'পৃথিবীব কোনো ডাক্তাবেব সাধ্যি নেই। বুড়ো বযসে ব্রেন নষ্ট হযে গেছে কিনা।'

—'তাহলে কি কবব বলুন।'

—'বিদেশে নতুন জাযগায কোনো আত্মীযস্বজন আছে?

—'আমবা তিন ভাইই তো আজীবন এই দেশেব বাড়িতে। বোনটিও বিধবা হযে এখানেই।'

—'তাহলে কোথাও পাঠাতে পাবেন না এঁকে?'

—'দেখছি না তো।'

—'কিন্তু এখনে রাখলে বেঁধে রাখতে হবে।'

—'দাদার মতন একজন লোককে বেঁধে রাখব!' বাবা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন।

—'কিন্তু তা না হলে ইস্কুলের কিরকম অবস্থা হয় ভেবে দেখুন। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ।'

—'কিন্তু আপনি আপনার দাদাকে বেঁধে রাখতে পারবেন?'

—'কিন্তু সে কথা তো ওঠে না।'

—'দাদাকে যে আমরা বাবার মতো দেখি।'

—'সে খুব ভালো কথা।'

—'বাবা যখন মারা গেলেন, সমস্ত সংসারের ভার একলা ওঁব ওপর পড়ল; বিয়ে অবধি করত পারলেন না আমাদের জন্য। সেই থেকে'—

হেডমাস্টার বাধা দিয়ে বললেন—'কিন্তু ভগবান মারলে মানুষ কি করবেন বলুন।'

—'ভগবান একটা উপায় করে দেবেনই।'

হেডমাস্টার সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়তে নাগলেন।

—'উপায় করেন না তিনি? মঙ্গল করেন না?'

সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না হেডমাস্টার। বললেন—'আপনারাই যদি এঁর ভার না নেন, তাহলে সেক্রেটারি যা বলেছেন তাই করতে হবে। পাগলাগাবদে পাঠাতে হবে এঁকে। কিংবা ইস্কুলের কম্পাউন্ডে যাতে ঢুকতে না পারে সেইজন্য গভর্নমেণ্টের সাহায্য নিতে হবে। আমাদের অবিশ্যি সরকাবি ইস্কুল নয়। কিন্তু তবুও aided তো বটে। ও সাহায্য আমবা পেতে পারি।'

বাবা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন—'আমার মনে হয এই করলেই ভালো হয।'

—'কি?'

—'দাদাকে বরং ইস্কুলে কম্পাউন্ডে ঢুকতে না দিলেন।'

—'কিন্তু তাতে লাঞ্ছনাও আছে।

—'কেন?'

—'মারও তো খেতে পাবেন।'

হেডমাস্টার চলে গেলেন।

বাবা বললেন—'নির্মল সেরে যাবে না?'

কোনো উত্তব দিলাম না।

—'আচ্ছা তুমি প্রুফ দেখ, আমি একটু বিছানায় গিয়ে ভেবে দেখি।'

ঘণ্টা দুই পবে চুপে চুপে বাবার বিছানার কাছে গিয়ে দেখি কাঁদছেন। খুব বিশ্বাসী শান্ত স্থির লোকেরা যখন নিরাশ্রয়ের মতন হয়ে কাঁদে, হযতো ভগবানে অবিশ্বাস করে, জীবনটাকে মনে করে ভুল— তখন কেমন যেন লাগে। মনে হয এই অবিরল অন্ধ জীবনস্রোত মানুষকে নিয়ে যতরকম অশ্লীল খেলা খেলতে পাবে, একজন পরম বিশ্বাসী সাধুকে নিমূঢ় করে তোলা হচ্ছে তার ভেতর সবচেয়ে বিজাতীয় বিশ্রী বীভৎস মর্মান্তিক। আমি তো চিরকালের অবিশ্বাসী, চিরকালের সন্দিগ্ধ, জীবন আমাকে বিশেষ কিছু অপদস্থ করতে পারে না। কোনোদিন কোনা তাসেব বাড়ি তৈরি করি নি। জীবনের আঘাতে যা ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু যাবা করেছিল তাদেব হতাশ ও অপমানিত হতে দেখলে বড্ড দুঃখ লাগে।

আমি চাই বাবা এখনো করজোড়ে ভগবানেব কাছে প্রার্থনা করে বলেন—'তুমি মঙ্গল কর।' জানি মঙ্গল চাইলেই পাওয়া যায় না। ঢের জীবন প্রতাবিত হয়ে ফেরাটাই জীবনের বিধান বলে স্বীকার করি। সে প্রার্থনা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যিনি জীবন ভবে বিশ্বাস করে এসেছেন, গভীর বিপদের মুহূর্তে খুব গাঢ় ঐকান্তিকতায় ও নিবিড় আত্মনিবেদনে তাকে প্রার্থনা কবতে দেখলে বড় ভালো লাগে। কযেক মুহূর্তের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে নক্ষত্রময রজনীর মতন কেমন রহস্যময, কেমন মৃত্যু তিমিরাতীত অনির্বচনীয় জিনিস বলে মনে হয। কত গভীর নিস্তব্ধ রাতে রোগশোকের ভিতর বাবার যে প্রার্থনা শুনেছি আমি, ভালো লেগেছে।

আজও রাত্ত গভীর হোক, বাবা অকম্পিত শান্ত সজীব গলা শুনব বঁলে আশা করি, তারপর সমস্ত রাত ধরে জীবনটাকে একটা ভরসার জিনিস বলে মনে হবে। একট প্রেম পরিপূর্ণতার জিনিস।

কিন্তু বাধা আছে ঢেব।

একটা বাধা হচ্ছে আমাদেব সংসাবেব অসঙ্গতি। আব একটা বাধা হচ্ছে কনকেব শীতেব নিঃসহায অবস্থা, নিজেব অসুস্থতা সুস্থতাব মালিক সে নয। সে অনেক সমযই সংকল্প কবে বসে যে এ একাদশী বা অম্যবস্যায উপোস দিযে জ্বব তাড়িযে ফেলবে। কিন্তু জ্ববে অভিরুচি আব এক বকম। এই মেযেটিব শবীবে ধীবে ধীবে সে বেশ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

বিযেব আগে কনক তাব মামাবাড়িব খটখটে শানবাঁধানো মেঝেতে মানুষ হযে এসেছে, এখানে স্যাঁতা মাটিব মেঝে, চাবদিকে খাল বিল, ভিজে বাতাস পাঁকেব গন্ধ, মশাব ভনভনানি।

পড়াশুনাব পথে আব একটা বিপত্তি হচ্ছে কনকেব ছেলেটি, বযস বছব দেড়েক হযেছে, হাঁটতে শিখেছে, পৃথিবীব দেড় বছবেব ছেলেমেযেদেব মতো মানুষেব অভিনিবেশ সাধনা ও কর্তব্যেব [প্রার্থী]।

তাবপব আমবা কনককে কেউ উৎসাহ দেই না। ইংবেজি বাংলা সে বেশ লিখতে পড়তে পাবে। শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তাব এইটুকু উপার্জনই আমবা যথেষ্ট মনে কবি। আমবা চাই, সে খুব সকালে ঘুমেব থেকে উঠে উনুন জ্বালিযে ভাত চড়াক। বাজাবেব হিসাব ঠিক করুক, আমাদেব চা দিক, বাসন মেজে, মশলা বেটে মাছ তবকাবি কুটে দস্তুবমতো বান্না শুরু কবে দিক। সকলকে পবিবেশন করুক। কাপড় জামা সকলেব কেচে শুকোতে দিযে না হয দুটো পান মুখে দিযে হলুদ মবিচ মাখা শাড়িখানা নিযে ছেলে কোলে পাড়াব সমবযসী বধূদেব সঙ্গে দুদণ্ড গল্পগুজব কবে আসুক। তাবপব বেলা পড়বাব মুখে খিড়কিব পুকুবে কযেকটা ডুব দিযে খেযেদেযে আবাব বিকেলেব জন্য, বাতেব জন্য তৈবি হোক।

বিযেব আগে ভাবতাম বধূমানুষেব এবকম দৈনন্দিন জীবনেব ভেতব জ্বব না আসে। কিন্তু এখন যখন দেখছি কনক বই আব ম্যালেবিযা ছাড়া আব কোনো কাজেই এল না, এখন মনে হয—বাঃ 'পাড়াগাঁব সাধাবণ গৃহস্থ বধূদেব সুস্থতা কর্মক্ষমতা—এইসব আমি ভাবি। কিন্তু কনকেব কাছে এসব কথা তুলে কোনোদিন আঘাত দিতে চাই না আমি।

কনক তাব সমস্ত শবীবে কাঁপুনিকে অগ্রাহ্য কববাব জন্য কম্বলেব ভেতব থেকে তাব সুন্দব ম্রিযমান মুখখানা বেব কবে নাবকোলেব চিকণ পাতাব দিকে অস্পষ্টভাবে তাকিযে আছে।

মাঝে মাঝে এইবকম অনক বিচিত্র করুণ জিনিস দেখি আমি।

মেযেটিও খুব ভাবে।

বিবাহেব প্রথম উচ্ছ্বাস খুব তাড়াতাড়িই আমাদেব কেটে গেল তাই। বিযেব কযেকদিন পবেই কনক আমাকে বললে—'জীবনেব একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই।'

কোনো উত্তব দিলাম না।

—'তুমি কী কববে বলে ঠিক কবেছ?'

—'সাধ তো অনেক আছে।'

—'শুধু সাধ থাকলেই তো হয না।'

—'তা তো হয না।'

—'তুমি একটা কিছু কব।'

—'চাকবিব কথা বলছ?'

—'এই পাড়াগাঁব ইস্কুলে চল্লিশ টাকা মাইনায তুমি মাস্টাবি কবো এ কথা যখনই মনে হয বড্ড কষ্ট লাগে।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললাম—'আমাব কপাল বড্ড খাবাপ, নইলে গবর্নমেন্ট অফিসে খুব একটা ভালো চাকবি পাবাব কথা ছিল।'

কনক বাধা দিযে বললে—না, কপালেব কথা তুলো না।

—'কেন?'

—'ভালো লাগে না। জীবনেব অন্ধ স্রোতে নিঃসহাযেব মতো ঘুবছি একথা ভাবতে গেলে খুব

খাবাপ লাগে।'

মেয়েটি শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে মন্দ না, কাজেই গ্রাম্য বালিকাব মতো কথা বলে না। বেশ। এবকম মেয়ে না হলে জীবন কি জমে?

কনকেব দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে সন্দিগ্ধভাবে আমাব দিকে চেয়ে আছে।

—'নিঃসহায়েব মতো তুমি তো ঘুবছ না।

—'কে ঘুবছ তবে?

—'এক একজন ঘোবে; নইলে যাদেব জীবনে উদ্দেশ্য আছে ভগবান তাদেব মাবেন না।'

বিয়েব দশ-বাবোদিন পবেই এসব কথা।

বললাম—'জীবন তো আমাদেব শুরু হল মাত্র কনক।'

—'তুমি তাই ভাব বুঝি?'

—'তাই না?'

—'সেই ভেবেই তুমি নিশ্চিন্ত।'

—'না, এইবাব চেষ্টা আবম্ভ কবব।'

—'তোমাব বয়সে অনেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'

আবাব কপালেব কথা এসে পড়ে। কিন্তু কনকেব কাছে কপালেব কথা তুলি না আব।

—'গবর্নমেণ্টেব কোন চাকবি হবাব কথা ছিল?'

—'সেক্রেটেবিয়েটে।'

—'কত মাইনে হত?'

—'দেড়শোতে আবম্ভ।'

—'পেলে না কেন?'

অত্যন্ত অসতর্কভাবে বললাম—'কপালে ছিল না, নইলে'—

মেয়েটি মুষড়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধবে নিয়ে কনককে আশ্বাস দিয়ে বললাম—'না কপাল খাবাপ নয়, জিনিসটা আমি কীবকমভাবে গ্রহণ কবেছি জান?

দেখলাম জানবাব জন্য কোনো ঔৎসুক্য তাব নেই। তবুও বললাম—'আমি মনে কবি এব ভেতব ভগবানেব কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে—'

কনক ঘাড় হেঁট কবে নিস্তব্ধ হয়ে ছিল।

—'আমাব মনে হয় সে চাকবি না পেয়ে ভালোই হয়েছে।'

একটু টিটকাবি দিয়ে বললে—'ভালো!' চোখ তুলে বললে—'কথা তো বলো বেকুবেব মতো।

—'জিনিসটা কীবকমভাবে আমি গ্রহণ কবেছি জানাচ্ছি তোমাকে।'

—'কি কাজ, জেনে। যা পাও নি, যে জিনিস তোমাকে বঞ্চিত কবল। এই হল সত্য, নিজেব মনকে কি বলে প্রবোধ সান্ত্বনা দিয়েছ সে সব শুনে তো কোনো লাভ নেই, পুরুষেব মুখে পাঁচালি শুনতে আমি ভালোবাসি না।'

একটু চুপ থেকে বললাম—'কিন্তু আমাব মনে হয় ও চাকবি পেলে আমি ওখানেই খতম হয়ে যেতাম।'

—'তাব মানে?'

—'হয়তো ওব ঢেব বেশি উন্নতি ভবিষ্যতে হবে। সেই জন্য ভগবান জিনিসটি আমাকে দেন নি।'

—'কিন্তু যাকে দিয়েছেন তোমাব চেয়ে তাব ওপব ঢেব কৃপা কবেছেন।'

চুপ কবে বইলাম।

কনক বলে—'ভগবানকেই বা টান কেন?'

—'আমাদেব জীবনেব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তাঁব?'

কনক কোনো জবাব দিল না।

—'কেউ কেউ অবিশ্যি বলে যে তিনি নেই।'

—'কিন্তু আমি জানি যে সব সময়ই তিনি আছেন, কিন্তু এক মুহূর্তেব জন্যও কারু মুখ চেয়ে চলেন না।

এই মেয়েটিব তীক্ষ্ণ বাস্তবজ্ঞান দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট কবে বইলাম।

—'এই ইস্কুলেব কাজ কদিন ধবে কবছ?'

—'এই চাব বছব হল।'
—'চাব বছব!' কনক চোখ কপালে তুলে আমাব দিকে তাকাল।
—'তাহলে ভালো কাজ পাবাব আব উপায নেই?'
চুপ কবেছিলাম।
কনক বললে—'এত বযস হল ভালো চাকবি না দেযাবই নিযম।'
—'দেয না অবিশ্যি।'
—'বযস কত হল?'
—'ত্রিশ।'
কনক খানিকক্ষণ অপদস্থ হযে বসে থেকে শেষে বললে—'এতগুলো বছব ধবে তুমি হযতো স্বপ্ন দেখছিলে?' বললে—'পৃথিবীতে একবাব জন্ম নিলে বযসকে ঠেকিযে ও বাখে কি কবে?'
একটু হাসলাম।
কনক বললে—'বযস বাড়ে, বেড়েই চলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা তো নিযে আসে।'
—'সমস্ত জীবনটা শেষ হযে গেলে তবে এসব বোঝা যাবে।'
—'যাদেব কোনো উদ্দেশ্য নেই তাদেব হল এইবকম ধবনেব কথা।'
—'কেন?'
—'তাবা অনেক দূব ভবিষ্যতেব দোহাই পাড়ে।'
সজনে গাছেব ডালে দুটো শালিক বসে খুনসুটি শুরু কবে দিযেছে। অঘ্রাণেব নবম বোদ গাছটাকে বেখেছে ঘিবে। দেখছিলাম।
কনক বললে—'এক এক ধবনেব লোক থাকে, যাবা যাবা বাবা মাব পযসা খবচ কবে অনেকদূব অবধি পড়াশুনা কবে।' বলে থামল।—'পড়াশুনায খুব মনও তাদেব।'
কনক একটু চুপ কবে থেকে বললে—'শেষে এই হযে যায যে মনে হয লিখে পড়েই তৃপ্তি বুঝি। অনেক কষ্ট স্বীকাব কবে বটে, কিন্তু কীসেব জন্য? কতকগুলো অসাব পবীক্ষায পাশ কববাব জন্য। তা তাবা কবে। কিন্তু তাবপব আব কিছু কবতে পাবে না।'
—'কিন্তু পাশ তো কবা চাই।'
আমাব কথাব কোনো উত্তব না দিযে কনক বললে—'এই জাতেব লোকই শেষে না পেবে ইস্কুলেব মাস্টাবি নেয।'
চুপ কবেছিলাম।
কনক বললে—'ছোটবেলাব থেকেই সভা সমিতিতে ঘোবে, সুন্দব সুন্দব কবিতাব লাইন মুখস্থ কবে, বড় বড় লোকেব দোহাই পাড়ে, জীবনটাকে একটা অবাস্তব আদর্শেব জাযগা ববে বোধ কবে এবা ঠকে।'
মাথা হেঁট কবে কনকেব কথা ভাবছিলাম।
কনক বললে—'কিন্তু এদেব জীবনেব সবচেযে বিড়ম্বনা হচ্ছে এদেব আত্মতৃপ্তি। একবাব ভেবেও দেখে না যে সমস্ত বড় বড় লোকেব জীবনেব ধুয়া ধবে তাদেব এত পবিতৃপ্তি, এত প্রবন্ধ, এত পাড়াগেঁযে সভা সমিতিব আযোজন, এই সব ফাঁকা আদর্শেব চেযে সংসাবেব প্রকৃতি তাঁবা ঢেব বেশি চিনেছিলেন। তাঁদেব চেষ্টা চিন্তা পবিশ্রম ও জীবনেব উদ্দেশ্য নিযে তাঁবা টাকা কবেছেন, ঐশ্বর্য বাড়িযেছেন, পদসম্মান পেযেছেন, কোথাও ভুল নেই বিচ্যুতি নেই, ভাববিলাস নেই, এইজন্যই তাঁবা বড়।'
না, প্রতিবাদ কবতে গেলাম না। সমস্তটুকু সত্য না হলেও কনকেব কথাব ভেতব অনেকখানি বাস্তবতাও বযেছে বটে।
কনক বললে—'এই বকম কবে ত্রিশটা বছব তো গেল।'
—'হ্যাঁ।'
—'তাবাব এখন পথে দাঁড়াবাব মতন অবস্থা আব কি।'
—'অনেকে পাঁচশো টাকা মাইনে পেযেও নিজেকে ফকিব বলে মনে কবে, আবাব অনেকে—'
কনক বাধা দিযে বললে—'থাক, বড় কথা ঢেব শুনেছি, কোনো মুবোদ নেই।' অত্যন্ত বিবস মুখে কনক সদব বাস্তাব পাশেব অশ্বত্থ গাছটাব দিকে তাকিযে বইল। বললে—'একটা বাংলা বা ইংবেজি বই হাতে কবলে নানাবকম চিত্তাকর্ষক কথা চোখে পড়ে, জীবন সম্পর্কে নানাবকম উপদেশ। কিন্তু সে সবেব কি মূল্য আছে?'
—'নেই?'
—'বইটাব যদি খুব কাটতি হয তাহলে লেখকেব দু-পযসা হয এই যা।'

একটু হাসলাম।

কনক বললে—'ছোটবেলায মনে হত এইসব বইযেব লেখকেবা হযতো পযসাব সম্বন্ধে খুব উদাসীন, টাকাকে ঘৃণাই কবে বোধ কবি।'বলে লাল সুবকিমাখা বাস্তাটাব দিকে তাকিযে একটু বিদ্রুপেব সঙ্গে হাসল।

—'ভাবতাম খুব সুন্দব সুন্দব আদর্শেব গল্প বা কবিতা বা শিশুদেব ভোলাবাব মতো ভালো ভালো উচ্চ উচ্চ কথা চযন কবে এদেব নিজেদেব মনেবও প্রসাদ বেড়ে গেছে, ছোটোখাটো আত্মিক পৃথিবীতে এবা বাস কবে বুঝি, থাকে, আধ্যাত্মিক আত্মীযতাব সৌন্দর্যেব ভেতব টাকাকড়ি বাসনাকামনাব গন্ধ বং এতটা নেই যেখানে।'

কনক বললে—'এবকম ভাবতাম ছোটবেলা—'একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখতে পেলাম এঁবা বেশ নিপুণ সাংসাবিক এঁদেব আদর্শবাদটুকু শিশুদেব জন্য শুধু।' কনক একটু কেশে বললে,—'এই বকমই।' আঙুল মটকাতে মটকাতে বললে—'জীবন এইবকম।' বললে, 'প্রাণে প্রাণে সকলেই আমবা টাকা চাই, প্রতিষ্ঠা চাই (হযতো পবকে পথিকৃৎ কবেও নিজেদেব সুবিধাসুখ চাই) কিন্তু আমাদেব সমস্ত আচবণেব ওপব একটা সুন্দব সৌজন্য বেখে দেই।' কনক খদ্দবেব শাড়িব লুণ্ঠিত আঁচলটাকে মাটিব থেকে তুলে একটু ঝেড়ে বললে—'যাবা বুড়ো হযেও জীবনেব এই সুন্দব মিথ্যাটুকুকে আত্মসাৎ কবতে পাবে না তাদব বড্ড দুর্গতি।'

সেদিনকাব কথা এইখানে থামল।

পবদিন বললে—'তোমাব শেলফে দেখলাম নানাবকম বই।'

—'হ্যাঁ।'

—'কবিতাব বই-ই তো অনেক।'

—'তা আছে।'

—'এই বকম সব বই সেই প্রথম যৌবনে উত্তবাধিকাবসূত্রে অনেকেব আলমাবিতে পড়ে থাকে বটে।'

চুপ কবেছিলাম।'

—'পোকায কাটে, ছাতাকুড়ো পড়ে যায, মাকড়সাব জালে ঢাকা পড়ে। আবো কত কি হয।'

ধীবে ধীবে মাথা নেড়ে সায দিলাম—'তা হয।'

—'এও বুঝি সেই বকম?'

—'না।'

—'তবে?'

—'এ সব বই প্রাযই আমি পড়ি।'

—'প্রাযই পড়?' কনক একটু চুপ থেকে বললে—'এবকম ধবনেব নতুন নতুন কই কেন আজকাল?'

—'কিনবাব সাধ খুব।'

—'এই পযসাব অভাব হয না?'

—'না।'

—'গল্প উপন্যাসেব বইও তো অনেক দেখলাম, একটা ভবসাব কথা, বইগুলো সব ইংবেজি।'

কোনো উত্তব দিলাম না।

কনক বললে—'ইস্কুলেব কাজকর্ম শেষ হযে গেলে এই সমস্ত বই নিযেই তাহলে তোমাব জীবন?—

—'অনেকখানি।'

—'এ বেশ ফাঁকিব খেলা।'

—'কীবকম?'

—'বাস্তবজীবনেব অন্তঃসাব যাদেব ফুবিযে গেছে তাবাই গল্প দিযে নিজেদেব ভোলাতে চায।'

—'কিন্তু অনেকেই তো এ সব গল্প উপন্যাস পড়ে।'

—'অনেকে নয।'

—'তবে?'

—'বাছা কযেকজন।'

—'তাই নাকি?'

—'তা আমি খুব ভালো কবেই জানি, কত দেখলাম।'

কনক বাঁ হাতের একটা আঙুল মটকে বললে—'কেউ বা অল্পসল্প পড়ে, কেউ-বা তোমার মতো এইসব বইগুলোকে তাদের জীবনের সাথী করে নিয়েছে।' আঙুল মটকাতে মটকাতে বললে—'বাইরের কাজকর্ম আশা উৎসাহের নিয়মিত দৈনন্দিন জীবন যেটা তা তাদের কাছে হয়ে গেছে মরীচিকা।'

একটু অপেক্ষা করে বললাম—'আমার কাছে মরীচিকা হয় নি এখনো।'

—'আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।'

—'আমার মনে হয় আর এক কথা। এই বইগুলো পড়ে পড়ে বাইরের জীবনের প্রতি ঢের সহানুভূতি বেড়ে গেছে আমার।'

কনক অত্যন্ত বিশীর্ণভাবে একটু হাসল।

—'সন্দেহ হয় তোমার?'

কনক মাথা নেড়ে বললে—'না।'

—'তবে?'

—'কিন্তু সহানুভূতির বালাই নিয়ে আমরা কী করব বলো?'

—'কেন?'

—'আমরা নিজেরাই যে ঢের সহানুভূতির পাত্র।'

চুপ করে রইলাম।

—'ত্রিশ বছর বয়সের একজন মানুষ'—একটু চুপ করে থেকে কনক বললে—'খুব গরিবের সন্তান হয়ে জন্মালেও এতদিনের ভেতর জীবনটাকে অনেকদূর পর্যন্ত সাজিয়ে ফেলতে পারে।'

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ।

কনক বললে—'ত্রিশ বছর কি কম!'

অশ্বত্থ গাছের পাতা অঘ্রাণের নিভৃত বাতাসে মরমর করে উঠছিল। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই। বড় শান্ত দুপুর।

—'কিন্তু এই ত্রিশ বছরের ভেতর কোনো সঞ্চয় হল না তোমার। জীবনে শুধু স্বপ্ন ভেঙেছে। আশা নষ্ট হয়ে গেছে, ভরসা শুকিয়ে গেছে, এই তো জীবনের কথা তোমার।'

—'অনেকটা এই রকমই।'

—'ত্রিশ বছর বয়স—পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে চল্লিশ টাকার মাস্টার, জীবনের গল্পটা তো তোমার এইটুকু।'

—'কিন্তু গল্পটা তো এখনো ফুরোয় নি। আশা করি—

—'গল্প সকলেরই অসম্পূর্ণ। আশা সকলেই করে। কিন্তু তাই বলে বর্তমানের বিড়ম্বনা ঘুচে যায় না।

—'আমি ভেবেছিলাম আমার জীবনে এর চেয়ে ঢের ভালো হবে।'—'সকলেই সেইরকম ভাবে। কিন্তু তারপর—তোমার আমার মতো পরের সহানুভূতির পাত্র, সকলে অবিশ্যি তা হয় না।'

চুপ করে রইলাম।

কনক বললে—'সেদিন একখানা বই আমাকে পড়তে দিয়ে বলেছিলে এর ভেতর জীবন খুব গভীরভাবে ফুটে উঠেছে।'

—'ওঃ, সেই বইখানা?'

—'কিন্তু সে বইখানা আমি পড়ি নি।'

—'কেন? খুব একজন উঁচুদরের লেখকের লেখা তো।'

—'বেশ। জীবনও বোধ করি খুব গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমার বিশ বছর বয়স আর তোমার ত্রিশ, এই খড়ের আটচালার ভেতর আমাদের জীবনও খুব কম গভীরভাবে ফোটে নি।' কনক বললে—'একটু কম গভীরভাবে ফুটেছে।'

—'না, সরঞ্জাম তো ঢের আছে।'

—'চাই একজন লেখক।'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি এসে যদি লিখতেন তাহলে অনেক জীর্ণশীর্ণ জিনিস, অনেক আশা স্বপ্নের ছাইভস্ম, অনেক অপব্যয় অপচয় ব্যথা ও করুণা বেরিয়ে পড়ত।'

এক ঝটকা বাতাসে ঘরের ভেতর কতকগুলো শুকনো অশ্বত্থের পাতা উড়ে এল।

কনক বললে-'আমার মনে হয় লেখকের এসে দরকারও নাই লিখবার, সে উপন্যাসের পাতা আমি

প্রতিপদেই উলটে চলেছি, এই শ্রীহীন ঘবদোবও বাড়ি নিঃসম্বল মানুষ, এদেব ভীরু অস্ফুট আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতি মুহূর্তে মনকে চোখ ঠাব দেবাব চেষ্টা এইসব নিয়ে।

কনক নিস্তব্ধ হল।

একটু চুপ থেকে বললাম—'এই অশ্বত্থ গাছটা তোমাব কেমন লাগে?'

—'কোথায়?'

—'এই যে বাস্তাব পাশে মস্ত গাছটা দেখছ না?'

—'বেশ তো সজীব।'

—'আমাব বড্ড চমৎকাব লাগে।' বললাম—'প্রাযই তাকিয়ে থাকি।'

—'এই গাছটাব দিকে?'

—'সেই ছোটবেলাব থেকেই। অনেক মুহূর্ত এমনি কবে অপচয কবেছি।'

কনক ঘাড় হেট কবে বইল।

—'বড্ড অচযেব জীবনে এসে পড়ে তুমি কনক, শুধু উদ্দেশ্যহীন আত্মবিলাস, শুধু স্বপ্ন-এই সবেব ভেতব তোমাব স্থান হল।'

কনক একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া কবতে লাগল।

—'কই গাছটা দেখলে না?'

—'দেখেছি।'

—'বাঃ, এইটুকুতেই দেখা হযে গেল তোমাব?'

কনক তবুও বইযেব পাতাব থেকে চোখ তুললে না। কিন্তু বইযেব পাতাব দিকেও তাব মন নেই। নতুন জীবনেব নিবিড় অসঙ্গতি ও ক্ষতিব কথা ভাবছে বোধকবি।

বললাম—'এক একটা অশ্বত্থ গাছ কেমন নষ্ট হযে যায কিন্তু হাজা হাজা ডালপালায আব পাতাব ফনায এটা কেমন ফুটেছে।'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—'আচ্ছা কনক বল তো ও দুটো কী পাখি?'

—'কোথায?'

—'অশ্বত্থ গাছেব ডালে।'

—'কোনদিকে?'

—'ডালপালাগুলো যেখানে সজনেগাছেব ওপব গিয়ে পড়েছে।

অত্যন্ত অন্যমনস্ক হযে বললে—'চড়াই হযতো।

—'না। চড়াই নয।'

—'নয? কী হবে তাহলে? কত বাজে পাখি থাকে।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বইযেব পাতাব দিকে তাকাল।

বললাম—'বুলবুল।'

কোনো উত্তব দিল না।

—'শুনছ কনক?'

—'কি?'

—'পাখি দুটো বুলবুল।'

—'বুলবুল? তা হবে। কত পাখি তো আছে।' মুখখানা আবাব বইযেব দিকে।

—'কোনোদিন দেখেছ এই পাখি?'

—নিস্তব্ধ।

—'কোনোদিন দেখ নি বোধকবি?'

—'কি?'

—'বুলবুল।'

—'বুলবুল। না। পাখি খুব কম দেখেছি।'

—'এই অশ্বত্থ গাছে বুলবুল দেখে আমাব একটা কথা মনে পড়ে গেল।' কোনো সাড়াশব্দ নেই।

—'শুনছ কনক?'

—'কি আবাব?'

—'এই অশ্বত্থ গাছে বুলবুল দেখে আমার গোলদিঘির কথা মনে পড়ল।'
—'আবার গোলদিঘি নিয়ে পড়লে?'
—'হ্যাঁ।'
—'সেই কলকাতার গোলদিঘি তো?'
—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'
—'সেখানে আবার অশ্বত্থ গাছ আছে নাকি?'
—'বিস্তর।'
—'জানতাম না তো।'
—'গোলদিঘিতে ঢুকেছে কোনোদিন?'
—'কতবার। কিন্তু গাছপালার দিকে কে আবার তাকায়।'
—'ও, গোলদিঘির পাশেই তো তোমাদের মামার বাসা।'
—'হ্যাঁ, দিনের মধ্যে এমন বিশবারও তো গোলদিঘি বেড়িয়ে এসেছি, সেই ছোটবেলার থেকে।'
—'তা অশ্বত্থ গাছগুলো দেখ নি বুঝি?'
—'যা দরকার নয় সে সব জিনিস দেখে কী হবে?'
—'একবারও তাকিয়ে দেখ নি?'
—'আমি যেতাম মাছ দেখতে। দিঘির পশ্চিমদিকের ঘাটে [...] এক একটা করে ছোলা, ঝালচানা, চানাচুর চিনেবাদামের গুঁড়ো এই সব দিতাম, আর টপ করে গিলে খেত। মনে হত মাছগুলো তো সব মরে পচে ভেপটে, কিন্তু কেউ যদি দিঘিটা [...] নিয়ে মাছগুলো ধরে বিক্রি করে অনেক লাভ হয় কিন্তু।'
—'খুব!'
—'কলকাতার যা বাজার।'
—'বেশ গরম।'
কনক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।
আমি বললাম—'এমনি দুপুরবেলা ঠিক একটা বেঞ্চিতে বসতাম সেই গোলদিঘির। মাথার ওপর গোটা দুই অশ্বত্থ গাছের ডালপালা ক্রমাগত বাতাসে নড়ছে আর চারদিকে ছায়া খেলছে। বড্ড বিলাসে সে সব দিন কেটে গেছে।'
—'কেন, টাকাকড়ি ছিল?'
—'এক পয়সাও না।'
—'বিলাস তবে কোথে কে?'
—'বিলাসটা অবিশ্যি মনের—অশ্বত্থ গাছের নীচে বেঞ্চিতে বসে এক একদিন দুপুরবেলা দেখতাম ডালপালার ভেতর গোটা দুই তিন বুলবুল লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।'
—'চোখ দুটো খুব বড় বড় করে ফেললে যে?'
—'বড্ড আশ্চর্য লাগত, ছায়াঘন নিবিড় ডালপালার ভেতর। কলকাতার রাস্তাঘাট অফিস আদালতের জঘন্যতম হিংসা কারসাজির থেকে অনেকখানি দূরে সরে শীতের দুপুরে এই পাখিগুলো।'
—'তোমার মতন আর বোধকরি কেউ সে পাখিদের দিকে তাকিয়ে থাকত না?'
—'জানি না।'
—'কেই—বা থাকে। কি দরকার!'
—'কিন্তু তিনটে বছর চাকরির [...] চেষ্টা করে কলকাতার মেসে মেসে যে জীবন কেটেছে আমার, তারই ফাঁকে গোলদিঘির বেঞ্চি, অশ্বত্থ গাছ কটা পাখিগুলো, বেশ, এগুলো বেশ ছিল কিন্তু। আজও মনে করলে বেশ ভালো লাগে।'
—'চাকরির চেষ্টা করেছিলে তিন বছর?'
—'হ্যাঁ।'
—'তা কেমন চেষ্টা করেছিলে তা তুমিই জান।'
—'না খুব হাড়ভাঙা চেষ্টা করেছিলাম।'
—'কেন হল না?'
—'হল তো না দেখি। একদিন কলেজ স্কোয়ারে গোলদিঘির সেই অশ্বত্থ গাছ কটার বেঞ্চিতে বসে আছি—'

—'থাক।'

—'হঠাৎ একটা বুলবুলি টপ করে আমার বেঞ্চির ওপর পড়ল। পাখায় রক্তমাখা। দেখি গুলিবাঁশ হাতে একটা ছেলে ছুটে আসছে। সে কি আনন্দের চিৎকার তার। কলকাতার শহরটা এইরকমই। একটা বুলবুলির অবধি শান্তি নেই। আমার মনে হয় আমাদের জীবনটাই এই ধরনের। এই ধরো তুমি, আমার মনে হয় সেই বুলবুলিটার মতো, আর আমি সেই গুলিবাঁশহাতে ছোকরাটার মতো। কি বলো কনক?'

কিন্তু সে অনেকক্ষণ হয় চলে গেছে।

ব্যথা কৌতুকে হেসে উঠে ফিরে তাকালাম। কিন্তু চেয়ে দেখলাম সে নেই।

পরদিন বললে—'তুমি কি করবে ঠিক করেছ?'

—'এই তো মাস্টারি করছি।' তাকিয়ে দেখলাম কনকের মুখে সমস্ত প্রবৃত্তি ও অভিরুচি বিদায় নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। বললাম—'সঙ্কল্প অবিশ্যি আমার ঢের।'

কনক কোনো উত্তর দিল না।

—'কিন্তু কোনো উপায় দেখছি না।'

কনক মুখ ফিরিয়ে গোটাদুই পুরোনো তোরঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইল। সে দুটো এত বেশি জীর্ণশীর্ণ নগ্ন কঙ্কালসার যে আমার লজ্জা করছিল।

—'তুমি যা ভাব তা নয়, এই চার বছর ধরে প্রতি মুহূর্তেই আমি ভেবে আসছি। এ কাজটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।'

কনক নড়ল চড়ল না।

—'বাস্তবিক এ কাজটা ভালো লাগে না আমার।'

—'এ চার বছর আটকে রইলে কি করে তাহলে?'

—'কি জানি' কেমন রহস্যের মতো মনে হয়।

—'রহস্য নয়—'

—'চারটা বছর যেন আমাকে নিশ্বাস ছাড়তেই দিলে না।'

একবার গলা খাকরে বললাম,—'তারপর পলকে দেখি চার বছর চলে গেছে।'

—'এই রকম চোখের পলকেই দেখবে যে বিশ বছর ত্রিশ বছর চলে গেছে।'

—'না, তা নয়।'

—'তাই, যে জায়গায় ছিলে দেখবে ঠিক সেই জায়গায়ই আছ।'

—'ত্রিশ বছর পরেও?'

—'হ্যাঁ।'

—'না না, অত প্রতারণার খেলা ভগবান আমাকে নিয়ে খেলবেন না।'

—'আবার ভগবানকে টানলে?'

চুপ করে রইলাম।

—'ভগবানের অনেক কাজ আছে, প্রত্যেকটি কাজই নিক্তির হিসেবে মাপা, তিনি নিজেই তাতে বাঁধা। কাজেই আমাদের মুক্তি দেবেন কী করে? দোহাই দিয়ে কোনো লাভ নেই—প্রার্থনা কইে-বা কি বেলো?'

কনক বললে—'শিক্ষাদীক্ষা তো পেয়েছ ঢের, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার সম্মান আদর যেখানে সে সব জায়গা বেছে নিতে পারো নি।' একটু চুপ থেকে বললে—'কারু কারু সৌভাগ্য থাকে বটে, কিন্তু বাকি যারা তারা তা গড়ে। কই, গড়তেও তো পারলে না।'

আবার ভাঙা তোরঙ্গ দুটোর দিকে তাকাল। মিনিট দুই পরে মুখ তুলে বললে—'তোমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার কত মাইনে পান?'

—'নব্বই টাকা আন্দাজ।'

—'বয়স কত?'

—'এই সত্তর।'

একটু চুপ থেকে বললে—'এই তো অবস্থা।' বাঁ হাতের একটা আঙুল মটকে বললে—'এরকমই হবে আর কি। ঠিক সময়ে পালাতে যখন পারলে না তখন কি হবে আর, ঠিক জায়গার খোঁজ যখন পেলে না, জায়গা ঠিক করে নিতে যখন পারলে না।'

—'এ তোমার অস্বাভাবিক নিরাশার কথা।'

—'কিংবা একটুকুও বা হবে কিনা, তাও বা কে জানে।'

ছাড়ি ছাড়ি করে দেশের বাড়ি কিছুতেই ছাড়তে পারছি না।

ছোট হেমন্তের দিনগুলো দেখতে দেখতেই বেলা ফুরিয়ে যায়। চারদিকে কেমন একটা নিস্তব্ধতা ও নিঃশেষের গন্ধ। বাড়ির আশেপাশে ধানের খেত সব হলুদ হয়ে গেল। তারপর ধান কাটার পালা সব শেষ হয়ে গেল। চারদিকে বাদামি খড় পড়ে আছে। যেখানে সবুজ ধানের খেতগুলো ছিল সেখানে এখন অনাদি বিস্তৃত ফাটলওয়ালা মাঠ। মাঠের পর মাঠ। খানিকটা খড় ছড়িয়ে বসি। কিংবা হেটে চলি। ধুলোমাখা মাঠের পাশ দিয়ে শাদা গাঁয়ের রাস্তা বিধবার সিঁথির মতো কেমন করুণভাবে কোথায় যে চলে গেছে! রাস্তার পাশে একটা নিঃসঙ্গ কুলগাছ। আঁকাবাঁকা গুটিকযেক ডালপালা কোনো ব্যথিত কবির কলমের আঁচড়ের মতো। তারই ভেতর গোটা দুই ঘুঘু শীত রাতের অপেক্ষা করছে। কিংবা হযতো এখুনি উড়ে যাবে। কে জানে?

সন্ধ্যা হয়, কুযাশা নামে। (কোনোদিন চাঁদ ওঠে, কোনোদিন ওঠে না) অনেকটা সময আমি বেড়াই। তারপর যখন বাসায ফিরে যাই, দেখি সাতটা কি সাড়ে সাতটা শীতের রাত এমনি ধীর মধুরভাবে হেঁটে চলে।

এই সব রাতকে আমি বড্ড ভালোবাসি।

বাসায় ফিরে এলেই মা রান্নাঘরে ডাক দেন। গবম গরম ভাত পাওযা যায—আর-অন্ধকাবের ভেতর নেমে খিড়কির পুকুরে মুখ ধুতে গিযে দেখি, যেমন অন্ধকার তেমনি শীত আর আকাশ ভবে তেমনই নীহার স্রোত। এই সব ছেড়ে সহসা ঘরের ভেতর ঢুকতে ভালো লাগে না। অনেকক্ষণ উঠানে একা একা পাযচারি করতে থাকি। নেবুগাছটা খুব বড় হয়ে গেছে এতদিনে। তারই ঘন ডালপালাব ভেতব থেকে পেঁচা ডাকে। খেজুর গাছের গলায টাঙানো হাঁড়িব খোঁজে ঝুপ কবে বাদুড় এসে নেমে পড়ে। কে যেন ঢিল ছোঁড়ে। অবিনাশবাবুর মেজছেলেটি হযতো। বাদুড় যায উড়ে। কিন্তু তবুও আবার অনেকক্ষণ পরে বসের হাঁড়ির মাথায ঘুরে এসে বসে। ছেলেটি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

মস্তবড় উঁচু জাম, অশ্বত্থ গাছেব ডালপালায মাখা মাখা জোনাকিব দল। এদের ভাষা ও গল্প জানবাব জন্য সমস্ত জীবনটাকে উৎসর্গ কবে ফেলছে ইচ্ছা করে। কযেকটা শিশিরমাখা ঘাসের ওপব নেমে এসেছে, এদের আলোয় ঘাসেব শিষ আবাব মবকতের মতো সবুজ হয়ে উঠল। ঘাসেব গোছার ভেতব কোথায শ্যামা পোকা ঘুমিয়ে রযেছে, কিংবা শুক জমেছে, কিংবা ফসলেব গুঁড়ি ছড়িযে আছে কিংবা অন্য কোনো প্রেম বা স্বপ্ন জমে আছে জোনাকিবাই তা জানে। এদেব নিস্তব্ধ জীবনের প্রবাহ শিল্প দেখি আমি, বড্ড স্নিগ্ধ ও সুন্দব। কোনো কোলাহল নেই, কাড়াকাড়ি নেই, রক্তাক্ততা নেই। একদিন বাতের পৃথিবী এদেরই হবে। এদের আর ওই নিমগাছের লক্ষ্মীপেঁচার আব ওই গোয়ালেব নীচেব ইঁদুরের। মানুষের শেষ হাড়গোড় তখন ঝোপে জঙ্গলে বিস্তৃত। এই আমার মনে হয। সে খুব সুন্দব দিন হবে তাহলে। তখন খুব নীরব ঠাণ্ডা, ঘন নিবিড় নারকেলেব পাতায নিবিড় জোনাকির মালায় মালায় ভবা খুব চমৎকাব শান্তিব রাত আসবে তখন। একদিন আসবেই। মানুষ তখন থাকবে না।

মা বলেন—'খোকা ওষ লাগবে যে।'

—'তাই তো।'

—'তোর বাবা কমফাবটারটা নে না।'

—'আচ্ছা দাও।'

কমফারটার এনে দেন। মাথা কান গলা ভালো করে জড়িযে নেই। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে দেখেন। বুঝি এইসব সাবধানতার কোনো দরকার নেই। রাত করে হিমে বেড়ালে আমার কোনো অসুখ হয় না। তবু মার মন তৃপ্ত করা চাই। আমি হিমে বেড়াচ্ছি না ঘরে ঢুকেছি উমা সেসব খবর রাখে না। বছর দুই হল আমাদের একটি ছেলে হযেছে। নাম রেখেছি। তার খবরও বড় একটা রাখে না উমা। আঁতুরঘবে

কিছুকাল খোকা তার মায়ের সঙ্গে ছিল। কিন্তু কখনো মায়ের বুকের দুধ পায় নি। গরুর দুধ খেতে হয়েছে তাকে। তারপর থেকে সে ঠাকুমার সঙ্গেই থাকে। ঝিনুকে করে গরুর দুধ খায়। তৃপ্তি পায় না। সমস্ত ঘরদোর অনেকদিন অনেক অসন্তোষে ভরে দিয়েছে। এ জীবন সে চায় নি, মনে হয় নেয় মৃত্যু পর্যন্ত তার এই রুগ্‌ণ অসহায় জীবনের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে চলবে। মায়ের দুধের অভাব, টাকাকড়ির অভাব, রিকেট, ভবিষ্যৎ জীবনের কোঠায় কোঠায় শূন্য আর শুষ্কতা শুধু। মনে হয় যেন এই দেড় বছরের ছেলে আর প্রবঞ্চিত জীবনের আগাগোড়া সমস্ত কঠিন গন্ধ ধরে ফেলেছে। মুখে তার এই বয়সেই কেমন একটা বিমর্ষতার অবসাদ।

উমার চোখে এসব ধরা পড়ে না। ভালোই। তাই হয়তো ছেলেকে সে যখন খুশি তখন পেটায়।

আমি পেটাতে পারি না। ছেলেটিকে ধমক দিয়ে কথা বলতেও আমার ভয় করে। বাস্তবিক একে পৃথিবীতে কেন এনেছি? কিন্তু তবুও মনে হয় না আনলেও চলত না যেন। একে পেয়ে ভালোবাসার একটা নতুন দিক খুলে গেছে, ব্যথারও। কোনো প্রেম বা বিবহ কোনোদিন আমাকে এ জিনিস দিতে পারে নি। এক সময় মনে হত শুধু প্রেমিক হলেই চলে। কিন্তু এখন মনে হয় পিতাও হতে হয়—না হলে জীবনের ভালোবাসা অসম্পূর্ণ থেকে যায়—জীবনের দুঃখও।

পৃথিবীতে মাত্র দেড় বছর হল এই ছেলেটি এসেছে। কিন্তু এই সময়ের ভেতর জীবনের নানারকম ভুল শুধরে দিয়েছে সে। অনেক বিস্ময়কর কথা শিখেছি।

এই ছেলেটির খেলাধূলা, কান্না গলার স্বর, হাসি, ঘুম—একদিন নারীকে নিয়ে যে অভিনব স্বপ্ন ও মোহের রাজ্যে থাকব বলে ভাবতাম, যেখানে আর কোন কিছু প্রবেশ করত পারবে না। সে খেয়াল আমার ভেঙে গেছে। বাস্তবিক এই শিশুটিকে বাদ দিয়ে সেই মোহের রাজ্যের কোনো মানে আছে? বিচ্ছেদ মানে প্রেমিকার বিয়োগই শুধু নয় এই শিশুটিরও। ভালোবাসা মানে কোনো প্রণয়িনীর জন্য তিমির রজনী ভেঙে অভিসারই শুধু নয়,বার বার এই ছেলেটির কাছে ফিরে আসা। বাস্তবিক, একে বাদ দিতে পারি না আমি, অনেক সময় বাদ দিতে চাই যদিও।

শীতের গভীর রাতে পাশের ঘর থেকে কাঁদে, উঠে যাই, আমার বিছানায় নিয়ে আসি। অন্ধকারে আমার পাশে শুয়ে হাসতে থাকে। হৃদয়ের সে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। কণা কণা আঙুল নেড়ে আমার সঙ্গে খেলা করে। চেয়ে দেখি আমার শাদা মশারিটার দিকে অবাক হয়ে ছেলেটি তাকিয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়ে। মাথাভরা কোঁকড়া চুল বালিশে লেগে থাকে। জীবনের থেকে এসব জিনিস বাদ দেওয়া যায় না।

কি যে ছোট ছোট আঙুল লাল লাল নরম হাতে, বার বার স্পর্শ করে আমি শান্তি পাই। ভালোবাসায় একসময় উত্তেজনা ছিল, পিপাসা ছিল, কিন্তু এমন [...] নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সান্ত্বনা যে থাকতে পারে কোনোদিন ভালোবাসার ভেতর কোনোদিন তা আমি বোধ করি নি।

উঠানে পায়চারি এবার থামে।

আমাদের খড়ের আটচালাটার দিকে একবার তাকাই। চালের উপর একটা পাখি এসে বসেছে, পেঁচা হয়তো। মনে হয় পেঁচা বড্ড অলক্ষুণে। বিশেষত গৃহস্থের চালে এসে যখন বসে। খোকার কোনো অমঙ্গল হবে না তো? কিন্তু এসব মানুষের সংস্কার আমি বিশ্বাস করি না। ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ি।

খোকা তার ঠাকুমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। মশারি কেউ ফেলে দেয় নি। ছেলেটাকে মশায় কামড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে বাতাস করে মশারি টেনে দিই। মাথাভরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল বালিশ ছেয়ে আছে, কপালে চুলে একটু হাত বুলোই। চুমো দেই না, বাড়ির মেয়েরা পাড়ার মেয়েরা যখন তখন এই শিশুর ঠোঁটে গালে মুখে অবিশ্রাম চুমা খেয়ে ফেরে। তারা একটু সাবধান হলে পারত। কিন্তু অনিষ্ট যা হবার হয়ে গেছে। আমি আর নিষেধ করতে যাই না। ছেলেটির জীবনশক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখবে আশা করি। আমিও একদিন অনেক প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে বেঁচে উঠেছি।

উমা তার খাটের উপর শুয়ে পড়েছে। পাশেই কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল; তার ওপর লণ্ঠন। একটা বই পড়ছে। উপন্যাস নিশ্চয়ই, খুব সম্ভব একটা ডিকেকটিভ উপন্যাস, বাংলা। অবিনাশ মুন্সেফের ছেলে কমল, উমাকে বউদি ডাকে, এইসব বই জোগায়ও সে। মন্দ নয়।

আমি চলে যাচ্ছিলাম, উমা বললে-—খাত খেয়েছ?

—'হ্যাঁ।'

—'পান পেয়েছ?'

—'না।'

—'এই তো এখানে আছে।' শিয়রের কাছ থেকে ডিবের ভেতর সে পান বের করল।

আমি বললাম—'থাক, লাগবে না।'

—'নাও না, এলাচ দিয়েছি।'

—'থাক, লাগবে না উমা।'

—'কেন?'

—'কেন আর কি, জানই তো আমি বড় একটা পান খাই না।'

হাতের পান দুটো গালে পুরে দিয়ে মেয়েটি খুব কৌতুকের সঙ্গে হাসল। মনে হল পরিতৃপ্তিও সে যথেষ্ট পাচ্ছে। নিছক এলাচ-ভরা পানের পরিতৃপ্তিই। এরকমই সে চায়। ইচ্ছামতো খাওযাদাওযা, যথেষ্ট অবসর, একটার পর একটা উপন্যাস, ডিবে ভরা পান, সারারাত খুব চৌকশ ঘুম—আহা বেচারা! জীবন যে অনেককে এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু দেয়। তাকেও দিতে পারত, তা সে জানে না। কিন্তু জানলে তারও বিপদ হত, আমারও।

উমা মন্দ নেই। জীবনটাকে পর্যালোচনা করে ভেবে দেখবার ধাত তার নেই। সেই ভালো। সে যে দরিদ্র পরিবারে এসে পড়েছে, স্বামীর চাকরি নেই একথা ভেবে হটাৎ এক একবার যখন তার মন খাবাপ হয়ে পড়ে আমি তাকে নিয়ে বিধবার সিঁথির মতো করুণ সেই পাড়াগাঁয়ের রাস্তাটার ভেতর দিয়ে সেই কুলগাছটার কাছ দিয়ে অঘ্রাণের বেলাবেলি একটু বেড়িয়ে পড়ি।

তারপর ভালো লাগে তার। জীবন যে খুব কষ্টকর ব্যাপার বিশেষত অসচ্ছলের জীবন সে কথা সে একেবারেই ভুলে যায়। হেমন্তের বিকেলে ম্লান রোদ উপভোগ করি দুজনে। হালদাবদের পরিত্যক্ত ঘাটে গিয়ে বসি। সেখানে কোনো জনমানব আজকাল আর আসে না। উমা আমার পাশে হাঁটতে থাকে। দুখানা ধলা রঙের পা তার শাদা ধুলোয় ভবে যায়। কপালেব ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মাঝে মাঝে সে আঁচল দিয়ে মোছে, কখনো-বা আমি মুছে দেই। প্রত্যেকটি গাছেব নাম জিজ্ঞেস করে। বাবলা, সাঁইবাবলা, শ্যাওড়া, আশশ্যাওড়া, ফণীমনসা, বৈঁচি, কামবাঙা, তেলাকুচো, হিজল। এইসব নাম শুনে সে হেসে ওঠে। এইসব নাম সে কোনোদিনও শোনে নি। কোনোদিন ঘুঘু দেখে নি। দেখানো এক দুষ্কর ব্যাপার। এক একদিন চোখে পড়ে যায় ঘুঘু দেখে সে নিরাশ হয়—এই নাকি ঘুঘু?' তাকে ময়ূব কিংবা বিড় বড় বংচঙা কাকাতুয়া একদিন দেখাব আলিপুরের চিড়িয়াখানায গিযে। মনে মনে সংকল্প করে রাখি। আপতত ফিঙেব ওড়াউড়ি দেখাই, হলদে বউ কথা কও-এর রূপ তার ভালো লাগে। কেন বউ কথা কও নাম হল সেই সম্পূর্ণ গল্প সে শুনতে চায—বলি। ছোট মেযের মতো অবাক হযে শোনে। হোগলার বনে বাবুইযের বাসা দেখে উমার আর এক বিস্ময, কিন্তু নীড়টা আমি ভাঙতে গেলে সে বাধা দেয। বলি,—'এর ভেতর কোনো পাখি নেই, ডিমও নেই—দেখছ না কোনো ডিম নেই, পাখি নেই।' কিন্তু সে বিশ্বাস করে না। অদ্ভুত বাসা দেখেই তার তৃপ্তি। আবিষ্কারের পক্ষপাতী সে নয়।

এমনি করে হেঁটে চলি আমরা। ধানকাটা মাঠের ভেতর একেবারে আট-দশটা শকুন। যেমন ভয তেমনি বিস্ময় মেয়েটির। শকুনগুলোর গাযের বীভৎস গন্ধের চোটে একবার সরে যায, আশ্চর্য হযে আবার পাখিগুলোর কাছে অনেকদূর অবধি এগিযে যায।

বলি—'কোথায় যাও উমা?'

—'দেখছি।'

—'পাখি দেখছ?'

—'না, কি খাচ্ছে বলো তো?'

কিন্তু সেদিকে তার নিজেরও চোখ নেই শকুনদের কিম্ভূতকিমাকার গলা, ডানা ও ঝুঁটির দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হযে দাঁড়িযে আছে।

—'কাছে যেও না উমা।'

—'কি খাচ্ছে বলো তো?'

—'একটা মরা কুকুর তো দেখছি।'

—'আহা, কোন কুকুবটা আবার মরল?'

—'তাই তো!'
—'অবিনাশবাবুদের বিলেতি কুকুরটা নয়তো?'
—'না, এ দিশি।'
—'কার?'
—'বাজারের কুকুর হয়তো।'

একটা পাখি তেড়ে এল, উমার দিকে নয় ঠিক, একটা হাড় ছিটকে এসেছিল, সেই দিকে।

উমা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে আমার বুকের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ আমার কাঁধে মাথা রেখে মুখ হেট করে দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত চোখমুখ আরক্ত, বুকে হাত দিয়ে দেখি, ঢিব ঢিব করছে। নিশ্বাস ফেলতে অবধি কষ্ট। ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলি—'চলো ফিরে যাই।'

এইবাব আবার তার সমস্ত সাহস ফিরে আসে। একপা-দুপা কবে শকুনগুলোর দিকে এগোতে থাকে।

অঘ্রাণের শীত বিকেলবেলায, সন্ধ্যার মুখোমুখি সোনালি রোদেব ভেতর এই দূর প্রান্তরে আমিও এই পাখিগুলোর আকর্ষণ কেমন যেন বোধ করি। কতদিন একা একা এই শকুনের মাঠে দাঁড়িযে দাঁড়িযে এই পাখিগুলোকে দেখেছি। লাফালাফি, পাখশাট চিৎকার কাড়াকাড়ি। সহসা চলে যেতে পারা যায না। দাঁড়িযে দেখতে হয। এ জাযগা ছেড়ে চলে যেতে পাবা যায না।

উমা বললে—'বড় বিশ্রী গন্ধ।'
—'এস যাই।'
—'কীসের গন্ধ?'
—'মবা কুকুবটাব।'
—'কুকুরটাকে তো খেযে ফেলেছে।'
—'এই পাখিগুলোব গাযেব দুর্গন্ধও দারুণ।'
—'কেন এরকম বিশ্রী গন্ধ হয?'
—'সব সময় মড়া খায কিনা।'
—'মড়া খেতে ভালো লাগে?'
—'না হলে খাবে কেন?'
—'মড়া খেতেও আবার ভালো লাগে? কত যে মজা আছে!'
—'তা আছে বইকি।'
—'পৃথিবীটা ভারি মজার।'
—'হ্যাঁ।'
—'আচ্ছা মড়ার মাংসের স্বাদ যা তা তো সব জাযগায একই তো?
—'তা এক।'
—'কিন্তু শকুনদের জিভটা আলাদা'

হাসছিলাম।

উমা বললে—'ভগবান শকুনদের স্বাদের বোধটা অন্যরকম করে দিয়েছেন। এই না?'

মাথা নেড়ে বললাম—'হ্যাঁ।'

উমা একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—'তাহলে মড়া খায় বলে শকুনদের দোষ দেয়া যায় না। খেতে আমাদের যেমন ভালো লাগে, মড়া কুকুর বিড়াল খেতে এদেরও তেমনি লাগে।'

হালদারদের ভাঙা ঘাটের আগাছার ওপর গিয়ে বসি। সেখানে কোনো জনমানব আজ আর আসে না। বিশেষত এই সন্ধ্যার সময়। এখানে নাকি ডাকিনীর মেলা বসে। গাঁয়ের লোকের সংস্কার, আমি বিশ্বাস করি না। উমা সে গল্প জানে না। তাকে বলিও না। বেচারি ভয় পাবে।

শানবাঁধানো ঘাটের সিঁড়ির ওপর বসতে তার খুব ভালো লাগে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যামণির মতো নিবিড় লাল মেঘগুলো স্থলপদ্মের মতো গোলাপি হয়ে গেছে।.

উমা বললে—'আচ্ছা, সেই দশ-বারোটা শকুন যদি আমাদের দিকে তেড়ে আসত?'
—'এখনো তুমি সেই পাখিদের কথা ভাবছ বুঝি উমা?'

—'এত শকুন আমি কোনোদিন দেখি নি।'
—'চিবকাল কলকাতায় থেকেছ, কি কবে দেখবে?'
—'বাপবে, কি ভীষণ! পাখিও আবাব জানোযাবেব মতো হয?'
—'তাও তো হয।'
—'যদি তেড়ে আসত কি কবতে তাহলে?'
—'বড় একটা তেড়ে আসে না।'
—'যদি আসত?'
—'মানুষকে ভয পায।'
—'ওবা?'
—'পায তো দেখি।'
—'কি কবে বলো?'
—'ধবো যদি তাড়া দিতাম।'
—'কি হত তাহলে?'
—'হযতো উড়ে যেত।'
—'এই বাবো-তেবোটা শকুন, সব?'
—'একবাব উড়তে আবম্ভ কবলে সবই হযতো উড়ে যেত।'
—'মানুষকে সবই জীবই ভয পায, না?' উমা অত্যন্ত গর্বিতভাবে আমাব দিকে তাকাল। সেও যে মানুষ। সে মানুষ তাব [...] দশ-বাবোটা শকুনকে হাতেব তুড়ি দিযে উড়িযে দিতে পাবে।

উমাব সমস্ত নগ্ন বাঁ হাতখানা তুলে দেখলাম, কাঁটা দিযে উঠেছে। বাবোটা শকুন একটা মানুষেব তাড়া খেযে উড়ে যাচ্ছে এই বোমাঞ্চে হযতো। উমা এখনো জীবনেব কৈশোব উতবোতে পাবে নি। কোনোদিনও পাববে না হযতো, সেই ভালো।

—'মানুষকে এত ভয পাবাব কোনো কাবণ নেই, কিন্তু শকুনদেব।'
—'না, তা নেই উমা।'
—'আমাব মনে হয একটা শকুন যদি তেমন তেডে আসে তো একটা মানুষকে ঘাযেল কবে দিতে পাবে, পাবে না?'
—'একজন মেযেমানুষকে তো পাবে।'

উমা মাথা হেট কবে একটু হাসল। এবপব শকুনদেব কথা বলল না আব সে।
—'আচ্ছা এমন সুন্দব শানবাঁধানো দিঘি, কেউ আসে না কেন?
বললাম—'কে আসবে আব, এখানে লোকজন তো তত নেই।'
—'কলকাতা হলে এতক্ষণে এসব সিঁড়ি ভবে যেত, লেক বোডে।'

কিন্তু কলকাতাব লেকেব গল্প কবল না আব সে। কুড়ি বছব কলকাতায ছিল। কিন্তু লেক দেখে নি। বাপ-মা নেই উমাব। শ্যামবাজাবে মামাবাড়িতে থাকত। কলকাতায সে শ্যামবাজাব ছাড়া আব কিছু দেখে নি তাই। কিন্তু খেত পবত বেশ ভালো, মামাবা তাকে ম্যাট্রিক অবধি পড়িযেছিল। আমাব সঙ্গে বিযে না হলে কলকাতাব অনেক ভালো বনিযাদি ঘবে পড়তেও পাবত সে। মেযেটিব লাবণ্য আছে, লক্ষণও ভালো, বকমসকমও বেশ। বৈদগ্ধবর্তী নাবী অবিশ্যি আব এক জাতেব জিনিস।

উমা বললে—'আচ্ছা লোক তো তুমি দেখেছ?'
—'হুঁ।'
—'এই দিঘিটাব চেযে সুন্দব না?'
—'বলতে পাবি না।'
—'কি যে বলো তুমি।' উমা বললে—'সমস্ত বাংলাদেশেব মধ্যে লেকেব মতন এমন একটা জিনিস নেই।'
—'নেই নাকি?'
—'তা তুমি জান না?'
—'এই দিঘিটাই মন্দ কি?'

উমা খানিকক্ষণ দিঘিটার দিকে তাকিয়ে তারপব আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'বাস্তবিক, বেশ সুন্দর, কিন্তু হাঁস চরছে না কেন?'

—'কাব হাঁস চরবে?"

—'কোনো ঘববাড়ি নেই এদিকে?'

চুপ করেছিলাম।

—'দিঘিটাকে সকলে এরকম কবে ফেলে বেখেছে কেন?'

—'যার যা কপাল।'

উমা হেসে উঠল।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল।

উমা বললে—'একটা দিঘিবও আবার কপাল!'

খানিকটা দূবে তালেব বনেব দিকে তাকিয়ে মনে হল এইবাব ডাইনিদেব সময় হয়েছে। দিঘিব কিনাব ঘিবে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আশশ্যাওড়া গাছগুলোকে যদি আমি গাছ বলে আব না ভাবি? কিন্তু তবুও বসে থাকি। রাত নটাব সময চাঁদ উঠবে; তখন বাসায ফিবব। মনে হল এ আমি এক অদ্ভুত খেলা খেলছি, ভূতেব জন্য নয, এদিকে সন্দেহজনক নানারকম লোক থাকে, উমাকেও তো এনেছি। কিন্তু এটুকু সাহস ও সাধ জীবনে যদি না থাকল। এমন লক্ষত্রেব সুন্দর রাত, দিগন্ত ঘেবা মাঠ প্রান্তব চাবদিকে, হালদারদেব এই দিঘি, শানবাঁধানো চমৎকাব ঘাট, কোনো বাঘেব ভয নেই ভালুকেব ভয নেই, বড় জোব এক-আধটা গোখবা ঘাটলা বা সিঁড়িব ফাটলেব থেকে বেরুতে পারে, কিন্তু এই শীতে না বেরুবারই কথা।

উমা বললে—'ওঠো।'

—'কেন?'

—'কেমন ভালো লাগছে না।'

—'শরীব খাবাপ লাগছে?"

—'না।'

—'তবে'?

—'কেমন ছমছম কবছে।'

—'আমিই তো আছি।'

—'কিন্তু তা যথেষ্ট নয।' উমা উঠে দাঁড়াল।

—'বোসো না—'

—'চলো তুমি।'

—'শোনো, চাঁদ উঠুক।'

—'কটাব সময উঠবে?'

—'এই রাত নটা আন্দাজ।'

—'এখন কটা?'

—'গোটা সাতেক।'

—'বাপরে দু-ঘণ্টা বসে থাকব এই জাযগায?'

—'কেন, এখানে কি?'

—'কোনো লোকজন নেই যে।'

—'আমিই তো আছি।'

উমা একটু হেসে বললে—'আচ্ছা বসি। আমাকে কলকাতাব মেয়ে ভেবে মনে কোরো না খুব ভীরু।'

—'না, ভীরু বরং গাঁযেব মেযেবাই হয।'

—'তাই নাকি?'

—'তাই তো দেখি।'

উমা বললে—'কেন কীসেব ভয তাদের? সাপের?'

—'তাহলে তো হত।'

—'তবে কীসের? এখানে তো বাঘ নেই।'

—'এই ছায়াটায়া দেখে ভয় পায়।'

—'ওঃ ভূত?' উমা হেসে উঠল। বললে—'ভূতে বিশ্বাস করো তুমি?'

—'মানুষ মরলে পরে তার সব শেষ হয় কিনা সে কথা আমি এখনো বলতে পারি না।'

উমা বাধা দিয়ে বললে—'সব শেষ হয় না?'

—'হয় না।'

—'না,। তা নাই-বা হল। কিন্তু তাই বলে তাকে ভূত হতে হবে এমন কথা আমি বিশ্বাস কবি না। তুমি করো?'

উত্তর দিচ্ছিলাম না।

উমা বললে—'চুপ করে রইলে যে?' কিন্তু পরক্ষণে সে আমার কোলে মাথা গুঁজে বললে—'আমি আর অন্ধকারের দিকে তাকাতে পারছি না।'

—'কেন?'

—'বড্ড ভয় করছে।'

ম্যালেরিযার রুগির যখন জ্বর আসে তেমনি করে কাঁপছিল উমা। কি জানি কিছু দেখল টেখল নাকি?

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—'চলো।'

কিন্তু অনেকটা দূর অবধি তাকে পাঁজাকোলা কবে নিয়ে যেতে হল। পথে কোনো লোক ছিল না। দূরে একটা গরুর গাড়ির শব্দ শুনেই উমা বললে—'আচ্ছা ছাড় তুমি এখন।' এইবাব তার সাহসের আর কোনো শেষ নেই।

পানের ডিবে বেখে দিয়ে উমা বললে—'একটা গল্প পড়ছি।'

—'বইটা তো খুব বড় দেখছি।'

—'হ্যাঁ, সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠা'।

—'অনেকগুলো গল্প আছে বুঝি?'

—'না, একটা

—'উপন্যাস?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডিটেকটিভ?'

—'না।'

উমা একজন নামাজাদা বাঙালি লেখকের নাম কবল। কিন্তু তাব নাম আগে সে কোনোদিন শোনে নি।

বললে—'ইনি কি ডিটেকটিভ লেখেন?'

—'না।'

—'এটাও নয।'

—'বেশ কথা।'

—'বইটা কোথায পেলে?"

—'কমল দিযেছে।'

—'সেই অবিনাশ মুনশেফের ছেলে কমল?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ।'

—'বইটা কী নিয়ে জান?' উমার দিকে তাকালাম।

—'স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিযে।

—'ওঃ কি লিখেছে?'

—'লিখেছে, বড় সব হাবিজাবি কথা।'

—'কি বলে তো উমা।'

—'বড় হাবিজাবি, ছি—!' উমা জিভ কাটল।

দেখলাম মুখ তার লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। বললাম—'তাহলে পড় কেন?'

—'পড়া উচিত নয়। সত্যি।'

—'বইটা নিয়ে যাই আমি তাহলে।'

—'না, নিও না।'

—'কেন?'

—'আমাব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শেষটুকু পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

—'ও, সেই কথা।' বললাম—'কিন্তু বইটা তো খাবাপ, অনেক আগেই ফেলে দেয়া উচিত ছিল, কি বলো?'

—'বড্ড খাবাপ বাস্তবিক।'

—'তবুও পড়লে?'

—'একটা ক্যারেকটাব বেশ ভালো।'

—'খুব সাধু?'

—'চবিত্রে কোনো দূর্নীতি নেই।'

—'তারই আদর্শ সামনে রেখে বইটা পড়লে তুমি?'

—'কিন্তু লেখক এই ক্যারেকটারকে ঠাট্টা করেছে, কেন যে বুঝলাম না।' বললে—'এই লোকটাকে তুমি চেন?'

—'কোন লোকটাকে?'

—'যে এই বইটা লিখেছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আলাপ আছে?'

—'আছ।'

—'কিন্তু এব সঙ্গে তুমি মিশো না।'

—'কেন?'

—'এর মতামত বড্ড খারাপ।'

—'তাতে আমার কি?'

—'কাজ কি? সচ্চবিত্র লোকদেব সঙ্গে মিশবে।'

—'গল্পে অনেক নোংবা কথা লিখেছে বুঝি?'

—'না এব ভাবই নোংরা।'

—'কি নিয়ে লিখেছে বলো তো?'

—'বোসো না।'

উমাব খাটের পাশে বসলাম। লেপের ভেতব থেকে তাব হাত বেব করে আমাব হাত সে টেনে নিল। কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললে—'একজন ভদ্রলোকেব একটি স্ত্রী' বলেই থামল।

—'বেশ তো।'

কিন্তু সে অন্যন্ত জড়োসড়ো হয চুপ কবে রইল। গল্পটা তাকে খুব সঙ্কুচিত করে বেখেছে মনে হল। এ যেন তার নিজের লজ্জা।

—'তারপর কি হল?'

উমা কোনো জবাব দিল না।

—'আচ্ছা আমি বইটা পড়ে দেখব।'

—'আচ্ছা, শোনো না।'

—'বলো।'

—'সমস্ত গল্পটা বলব?'

—'বেশ বেশ।'

—'না, গল্পটা সব বলতে পারব না।'

—'যতটুকু খুশি তাই বলো না।'
—'মোটামুটি বলছি।'
—'আচ্ছা।'
—'যা লেখকের উদ্দেশ্য সেই কথাই আমি তোমাকে বলছি, শোনো।'
শুনবার জন্য উমার দিকে তাকালাম।
কিন্তু সে ঠোঁটে আঁচল টেনে বললে—'বড্ড খারাপ।'
—'গল্পটা?'
—'মাথা নেড়ে বললে—'হুঁ! ছিঃ এমন'—
—'কিন্তু তুমি তো লেখ নি।'
—'আমি কল্পনা করতে পার নি কোনোদিন।'
—'ব্যাপাবটা কি বলো তো?'
—'একটি বেশ শিক্ষিত সদ্বংশেব মেয়ে, স্ত্রী তাব স্বামীব মাসতুতো ভাইকে ভালোবেসেছিল'—
—'বেশ তো, তাবপব? এই কথা?' হো হো কবে হেসে উঠলাম।

উমা বিদ্যুতেব গতিতে পাশ ফিবে লজ্জায় লেপেব নীচে মাথা ঢাকল। অনেকক্ষণ আমাব কোনো কথার জবাব দিল না সে। যখন মুখ বের কবেছে চোখ কপাল একেবাবে লাল হয়ে গেছে তার। খানিকক্ষণ চুপ থেকে আমাব চোখেব দিকে তাকিয়ে বললে,

—'কিরকম অস্বাভাবিক বল তো দেখি।'
—'তোমাব তাই মনে হয?
—'তোমাব মনে হয না?'
—'যাব যেখানে ভালোবাসার সে সেখানে বাসে।'
—'কিন্তু ভালোবাসাব জন্য স্বামীই তো আছে।'
—'তা আছে বটে।'
—'তাতে কুলোয না।'

—'এসব পুরোন কথা, এসব নিয়ে তর্ক চালাবাব কোনো চাড় নেই আজকাল আর। একটা মীমাংসা ঢেব আগেই কবে ফেলেছি এই যে ভালোবাসা বা বিয়ে বৈধতা বা অবৈধতা এক একটা জীবনেব খুব খাঁটি সত্যেব মতো খেটে যায।

—'অবৈধতাও?'
—'হ্যাঁ, আব একটা জীবনেব বৈধতাও যেমন অবৈধতাও তেমনি, সবই চুলোয যায।'

লেপের ভেতর থেকে যে হাত বেব কবে উমা আমাব হাত ধবেছিল মেয়েটিব সে হাতটা একেবাবে গেছে ঠাণ্ডা হয়ে। সেজন্যই কিংবা কিসের জন্য জানি না আমি আমাব হাত ছেড়ে দিয়ে নিজেব হাতটা লেপেব ভেতর ধীরে ধীবে টেনে নিল সে। আমিও বড্ড অবসাদ বোধ করছিলাম। বললাম—'আর কোনো কথা আছে?'

—'কেন, উঠবে নাকি তুমি?'
—'হ্যাঁ।'
—'কোথায যাবে?'
—'শোব গিয়ে এখন।'
—'ঘুম পেয়েছে?'
—'রাত তো কম হয় নি উমা।'
—'কালেকটবেটেব ঘড়িতে তো দশটা বাজল।'
—'কিন্তু শীতের বাতে এই ঢের বিশেষত পাড়াগাঁযে।'
—'কলকাতায হলে কী কবতে?'
—'তা হয়তো বাইরেই থাকতাম, হেঁটে বেড়াতাম, কিংবা একটা পার্কে গিয়ে বসতাম।'
—'এত রাত অবধি বসে থাক?'
—'হ্যাঁ তা থাকি মাঝে মাঝে।'

—'কোথায় বসো?'

—'বেঞ্চিতে কিংবা ঘাসের উপর, পার্কে বা মনুমেন্টটার কাছে।'

—'একা?'

—'একাই তো।'

উমা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে— 'বসে বসে কী কর?'

—'মতলব আঁটি।'

—'কীসের?'

—'ভবিষ্যতে কী করব।'

—'বাস্তবিক, একটা চাকরি-টাকরি পেলে না।'

এইবার খানিকক্ষণের জন্য অন্তত উমা মন খারাপ করে বসে থাকবে। বললে—'কি দিয়ে যে কি হবে জানি না।'

দেখলাম বধূর মুখ হাঁড়ির মতো হয়ে উঠেছে। উমাকে এই সময় বড্ড কুৎসিত দেখায়, কেমন নির্বোধও মনে হয় যেন। মেয়েটিকে ভোলানো দরকার। ভুলিয়ে তার আগের আনন্দ ও উৎসাহের পথে তুলে দেয়া নিতান্তই উচিত। না হলে আমার নিজের ঘুমেরও ব্যাঘাত হবে।

উমার মনখারাপ বেশিক্ষণ থাকে না। তাকে ভোলানো যায়ও খুব সহজে।

বললাম—'তাই ভাবছি কালই কলকাতায় যাব।'

—'হ্যাঁ, কালই যেও।'

—'যেতে হবে কালই।'

—'একদিনও দেরি কোরো না আর।'

—'না।'

—'গড়িমসি করলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, বুঝলে না?'

মাথা নেড়ে বললাম—'খুব বুঝি।'

মেয়েটি তৃপ্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে তৃপ্তি বাড়ছে তার। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে আকাশে একরাশ নক্ষত্র, যারা কোনোদিন কোনো পরাজয় জানে নি, যারা সুন্দর উজ্জ্বল এক দিগন্ত সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু তবুও এই ভাঙা আটচালা ঘরের থেকে এক রাশ কলাগাছ ও বেউড় বাঁশের জঙ্গলের মাথায় এই তারাগুলোকে বিশেষ ভরসাপ্রদ মনে হয় না আমার।

উমার কি মনে হয় কি জানে। নিশ্চয়ই খুব আশার কথা মনে হয়। তিনশো টাকার একটা চাকরি আর ভবানীপুরের দিকে ছোটোখাট একখানা বাড়ি এ বায়না সে আমার কাছে গতবছর ধরে রোজই প্রায় পেড়েছে। কিন্তু আজও কোনো অবসাদ বোধ করে না। টাকা তিনশোর থেকে পঁচাত্তরে এসে ঠেকেছে, বাংলোর বদলে দুখানা ভাড়াটে ঘর হলেও চলে, উমা রাজি আছে তাতে। এ মেয়েটির মনের নির্মলতা আশ্চর্য।

বললে—'চাকরি একটা সত্তর টাকার হলেও চলে।'

—'চলে?'

—'হ্যাঁ, আমি ভেবে দেখেছি।'

—'কি ভাবলে?'

—'আজকালকার যা বাজার তাতে সত্তর টাকার বেশি পাওয়া যায় না।'

চুপ করে রইলাম।

—'ধরো কুড়ি টাকা দেব বাড়ি ভাড়া, আর পঞ্চাশ টাকা আমাদের চলবে না?'

যেন চাকরি পেয়ে গেছি আমি। কিন্তু মনের আনন্দ ফিরে এসেছে তার। এইবার আমার বিদায় নেবার সময়।

সে কাগজ পেনসিল নিয়ে বসল। ভবিষ্যৎ সংসারের একটা খশড়া করবে। এমন কত খশড়া তার বসন্তের বাতাসে লেখা হয়েছে কালবোশেখীতে উড়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠে তৈরি হয়েছে আবার আষাঢ় শ্রাবণের জলে ভিজে গেছে। আশ্বিনে গড়া হয়েছে ফের হেমন্তের হিমে হিমে চিমসে গেছে।

জানালাটা তার খোলাই থাক। এই আটচালার বেড়ার দিকে তাকিয়ে না খুলবে উমার হিসাবের মন, না জমবে তার স্বপ্নের সাধ। জানালাটা খোলা খোলা থাক। জানালার ভেতর দিয়ে নক্ষত্রগুলোর মানে

আমার কাছে যত শুষ্ক শূন্য হোক না কেন, উমার কাছে সে সব অপরূপ।

বললে—'খোকার জন্য একটা নতুন ফিডিং বটল কিনতে হবে—বোতলটা ছমাস হল ভেঙে গেছে। তারপর আর কেনা হল না। ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানো, আহা বেচারির যা কষ্ট!'

—'টুকলে ফিডিং বোতল একটা?'

বললে—'কত দাম হবে?'

—'দাম অবিশ্যি খুব শস্তা।'

—'তারপর দুধ, কলকাতায় ভালো দুধ পাওয়া যায়?'

—'গোয়ালার বাড়িতে গিয়ে চোখের সামনে দুইয়ে আনলেই হল, কিংবা ভালো ভালো স্টোরও তো আছে।'

—'না, স্টোর নয়।

—'থাক তাহলে।'

—'শেষে বিষ খেয়ে ছেলেটা মরবে।' উমা বললে—'মামাদের পাঁচ-সাতটা গাই, আমাদের জন্য একটা গাই কিনলে হয় না কলকাতায়?'

—'তা কেনা যায়।'

—'কীরকম গাই কিনবে?'

—'মূলতানী আছে।'

—'সে কেমন?'

—'বেশ, ভাগলপুরী আছে।'

—'হ্যাঁ, পশ্চিমের গাই-ই ভালো, কত দাম হবে?'

উমা বললে—'দেখো এই শীত, অথচ খোকার মাথায় কিছু নেই, আহা বাছার কান নাক দিয়ে কত ঠাণ্ডা যে ঢোকে। এত বেশি যে কাঁদে আমার মনে হয় মাঝে মাঝে কান কামড়ায় ওর।' উমা থামল। বললে—'একটা টুপির দরকার খোকার জন্য।'

—'হ্যাঁ একটা উলের টুপি।'

—'উল? সে আবার বেশি দাম হয়ে যাবে না? একটা কাপড়ের টুপি হয় না, কোনোরকমে মাথা কান ঢেকে রাখা।'

—'শীতে উলের টুপিই ভালো।'

উমা খুব খুশি হয়। 'কীরকম দাম হবে বল তো?'

—'বেশি কি আর হবে কীরকম রঙের টুপি তোমার পছন্দ হয়?'

উমা একটু ফিক করে হেসে বললে—'খোকার পছন্দ নিয়ে কথা।'

—'ওর তো আর পছন্দের বয়স হয় নি।'

—'আমার মনে হয় ওর লাল ভালো লাগবে, লাল উলের টুপি।

—'ছেলেপিলেদের লাল রং ভালো লাগে বটে।'

—' তা লাগে, না?'

—'হ্যাঁ, খুব চড়া রং কিনা।'

—'তবে লালই কিনো।'

—'তোমার কোন রং পছন্দ হত উমা?'

উমা একটু চুপ করে থেকে বললে—'আমার?' একটু ভেবে বললে—'কেন বাসন্তী রংটা মন্দ কি?'

—'টুপির জন্য?' হেসে উঠলাম।

উমা অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—'আচ্ছা বাসন্তী রঙের টুপিই দেব।'

—'না, ওই ডগডগে লাল রংই দিও, তাই খোকার ভালো লাগবে।'

—'আচ্ছা।'

—'আমার অবিশ্যি বাসন্তী রং বেশ লাগে, কিন্তু সেটা শাড়িতে খাটে, টুপিতে না, তাছাড়া'—উমা থামল।

—'কি বলতে যাচ্ছিলে?'

—'বাসন্তী রঙের টুপির দামও বেশি হবে হয়তো।'

—'মোটেই না, হয়তো আরো কম।'

—'তাই নাকি? তাহলে এই কিনো?'

—'বেশ।'

—'আচ্ছা লিখছি উলেব টুপি একটা, বাসন্তী রঙের, খোকার জন্য। 'লিখে পেনসিল তুলে নিয়ে উমা বললে—'ছোট ছোট ফুল টুপির চারদিকে থাকলে বেশ দেখায়।'

—'ফুল? না বল?'

—'ফুল।'

—'আচ্ছা দেখব। বাজারে পাওয়া যায় হয়তো।'

—'এই গেল টুপি, তারপর খোকার জন্য একজোড়া মোজার দরকার। শীতে কীরকম পা ফেটে গিয়েছে দেখেছ। আহা অতটুকু ছেটো। কলকাতায় হয়তো শীত আরো বেশি।'

পাড়াগাঁয়ের চেয়ে অবিশ্যি কম কিন্তু তবুও বললাম—'হ্যাঁ, কলকাতায় শীত বেশ। মোজা একজোড়া খোকার লাগবেই সেখানে।'

—'সুতোর হলেই হবে।'

—'না, না, উলের লেখো।'

—'দাম বেশি হয়ে যাবে না?'

—'সেজন্য তোমার ভাবনা নেই উমা।'

—'মোজার রং কিন্তু গোলাপি হবে।'

—'বেশ।'

উমা লিখলম, একজোড়া উলের মোজা, গোলাপি রঙের, খোকার জন্য।

বললাম—'লেখো আর একটা গরম কোট, ওভারকোট।'

—'কার জন্য?'

—'খোকার জন্য।'

—'খোকা পরবে ওভারকোট?'

—'কলকাতার শীতে তা লাগবে।'

—'কিন্তু খরচ যে বড় বেশি হয়ে যাবে।'

মাথা নেড়ে বললাম—'না না ছোটদের পোশাক-আশাকের দাম এত কম যে শুনলে তোমার হাসি পাবে।'

—'সত্যি?' বেজায় কৌতুক বোধ করে উমা হাসতে লাগল। বললে—'আচ্ছা, আমিই কিনব কিন্তু খোকার ওভারকোট, আমি জানি কলকাতার মেয়েরা দোকানে গিয়ে জিনিস কিনে আনে।'

—'বেশ তুমিই পছন্দ করে এনো।'

—'তুমিও সঙ্গে থাকবে অবিশ্যি। আমাকে, দোকান চিনিয়ে দিতে হবে কিন্তু, যেখানে ভালো আর শস্তা জিনিস পাওয়া যায়।'

—'আচ্ছা, কলেজ স্ট্রিটে তেমন ঢের দোকান আছে।'

উমা লিখল—'একটা ওভারকোট খোকার জন্য।' বললে—'তোমাকে শুধু কষ্ট দেই।'

—'কীরকম?'

—'মোজা লিখেছি, কিন্তু জুতো তো লেখা হয় নি।' অত্যন্ত অপরাধীর মতো আমার দিকে তাকাল উমা।'

তার ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে আশ্বাস দিয়ে বললাম—'আমারই ভুল হয়ে গেছে তখন। আমারই বলা উচিত ছিল।'

—'খোকা এখন একটু একটু হাঁটতে পারে।'

—'জুতো পায় না থাকলে মোজাও তো ছিঁড়ে যাবে।'

—'তাই যায়।'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু অতটুকুন জুতো কিনতে পাওয়া যায়?'

—'কত হাজার হাজাব।'

—'বাপবে অতটুকু পাপড়ির মতো পায়ের জন্য জুতো, ভগবান কিন্তু সবরকম উপায়ই করে রেখেছেন।'

—'এটা অবিশ্যি ভগবান করেন নি উমা।'

—'তবে কে?'

—'কেন জুতোওয়ালাবা।'

উমা ঘাড় নেড়ে একটু হেসে বললে—'তাই তো জুতো তো আর গাছের ফল নয়, মুচিবা তৈবি করে।' মুখ তুলে বললে—'কিন্তু মুচিদেব ওবকম সুন্দর বুদ্ধি তো ঈশ্বর দেন।'

অবিশ্যি এ সম্বন্ধে আমার মতভেদ ছিল। কিন্তু চুপ করে রইলাম।

উমা লিখল—'ছোট জুতো একজোড়া, খোকার জন্য।'

বললাম— 'লেখো, বোতামওয়ালা।'

—'বোতামওয়ালা জুতো?' উমা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে—'সে কীবকম?'

—'যেমন শার্ট কোর্টের বোতাম সেই রকমই অনেকটা।'

—'জুতো বা বে!'

—'জুতো তো কোনোদিন পবো নি উমা, একজোড়া চটিজুতো অবধি না, খালি পায়েই তো বাইশটা বছর কাটালে।'

উমা ঘাড় হেট করে পেনসিল দিয়ে খানিক কাটাকুটি কবে লিখল—'বোতামওয়ালা ছোট্ট জুতো একজোড়া, খোকাব জন্য।' বললে—'বাদামি বং লিখলাম কিন্তু।'

—'শুনলাম তো।'

—'ভালোই হল না?'

—'চকোলেট বঙেরও তো লিখতে পাবতে।'

—'চকলেট?' উমা হতবুদ্ধি হয়ে আমাব দিকে তাকিয়ে বললে—'চকলেট বং আবাব কীবকম?'

—'চকলেট খাও নি কোনোদিন?'

উমা চকলেট দেখে নি কোনোদিন। ব্যাপাবটা তাই এখানে স্থগিত হল।

কিন্তু উমা লিখছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—'কী লিখছ?'

—'বাদামি বঙেব ওপব ছোট ছোট করে লিখে দিলাম 'অথবা চকলেট বঙেব'।

—'বেশ।'

উমা বললে—'বাসনকোসন হাঁড়িকুঁড়ি কিছু লাগবে। সে হিসেব আমি নিজেই কবতে পাবব।' কাগজ পেনসিল সে সরিয়ে রাখল।

বললাম—'আব কিছুব দবকাব নেই?'

—'আর তো সব আমাদেব আছে।'

—'আছে?'

—'খোকাব তো সব হল।'

—'হ্যাঁ সেই একটা মোটা লাভ।'

—'তারপব তোমার আর আমাব। তা মাসে মাসে সত্তর টাকা মাইনে তাতে বেশ ভদ্দরলোকের মতো থাকতে পাবব আমরা। মানুষকে কিছু কিছু জিনিস দিতে থুতে পারব।'

—'কাকে আবার দেবে থোবে?'

—'ধরো পাশের বাড়ির ভাড়াটেদের।'

—'কী দেবে?'

একদিন একটু মোচাব ঘণ্টা বেঁধে দিলাম, একদিন একটু ফুলকপিব ডালনা, কিংবা পোনামাছ কালিয়ার মতো করে।'

—'বটে?'

আমি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলাম।

—'হাসছ যে?'

ভাবছিলাম পাশের বাড়ির ভাড়াটেরা উমার এ দান কতখানি গ্রহণ করবে। যদি প্রত্যাখান করে তবে এই মেয়েটিরই-বা অবস্থা কি হবে! কিন্তু এই সবই অবান্তর। আমার চাকরিও যেমন অসম্ভব, এ জিনিসগুলোও তেমনি কোনোদিন ঘটবে বলে মনে হয় না। কাজেই ভাবতে গেলাম না আর কিছু।

উমা বললে—'ঠিক জিনিস হচ্ছে ভিখিরিদের আগে যায়। ভিখিরিদেরই আগে দেব। তারপর যদি কিছু বাকি থাকে তো পাশের বাড়িতে যাবে।'

যেন মেয়েটি মহারানীর দানছত্রের অধিকারী। সে অধিকার একে দিলে পৃথিবীর উপকার হত অবিশ্যি।

উমার খাতায় খুব একটা শস্তা অঙ্ক লিখতে বলল। তাকিয়ে দেখি, সে এখন প্রসন্ন হয়েছে। বছরের পর বছরের নিস্ফলতায় প্রবঞ্চনায়ও জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি সে। ভগবানের প্রতিও না। জীবনের অন্ধকার মুহূর্তে মাঝে মাঝে মনে হয় এই কথা যে বধূ এত আশা করে এত অপেক্ষা করে এত বিশ্বাস করে, জীবনকে উপভোগ করবার সাধও যার এত বেশি তার কাছে জীবনের নিশ্চয়ই মান দায় আছে। নইলে তাকে দিয়ে এত আশাঅপেক্ষাও বিশ্বাস করায় কেন সে? আমার মতো তাকেও নিস্তব্ধ তিক্ত অবসন্ন করে রাখলেই তো পারে। মেসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকার রাতে এমনি ধরনের আলোচনা চলে আমার। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝি এসব আলোচনা কীরকম অসার। জীবনের সঙ্গে কোনো তর্ক করা চলে না। তার ধারার ভেতর কোনো সমবেদনা বা স্বপ্ন বা মুখ চাওয়াচাওয়ি নেই। এমনই এই মেসের প্রকাণ্ড লবেজান তেতলা বাড়ি ভূমিকম্পে দুমড়ে উঠে আমাকে কোন অতলে তলিয়ে দিতে পারে। সেখান থেকে অনন্তকালের ভেতরও কেউ আমাকে খুঁজেও বের করতে পারে না।

জীবন এইরকম। সে আমাকে আজ বাঁচতে দিয়েছে, খেতে দিচ্ছে, জীবনের অন্ধতা ও ভয়ঙ্করতার সম্বন্ধে কলম ধরে লিখতে দিচ্ছে। এই তার যথেষ্ট কৃপা। আমি এই মনে করি।

কিন্তু উমা জীবনটাকে আর একরকম ভাবে দেখে। পাড়াগাঁয়ের পথে রোদে রোদে সর্ষের খেতে অপরাজিতা ফুলে প্রজাপতির জীবনটাকে আমার মতন করে দেখে না। এরা বেঁচে রয়েছে, বেঁচে থাক। এদের বিচিত্রতা আমাকে মাঝে মাঝে বড় মুগ্ধ করে। কিন্তু তবুও জানি, উমা মৌমাছি প্রজাপতি এদের চেয়ে আমি ঢের আলাদা জীব। এদের স্বপ্ন আশা ভরসা ও বিশ্বাসের জাল দিয়ে আমি আমার দিনরাতকে ঢেকে রাখতে পারব না। হয়তো আমি এদের চেয়ে ঢের বৃহৎ বলে, কিংবা ঢের তুচ্ছ বলে।

উমার বিছানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াই।

কিন্তু উমা আমাকে উঠতে দিল না।

বললে—'বোসো।'

বসলাম।

রাত বারোটা অবধি হিসেব চলল। খুব সহানুভূতির সঙ্গে তাকে আমি সাহায্য করলাম। সব সময়ই মনে হল এই চার বছরের ভেতর একটা টাকাও তো উমার হাতে দিতে পারি নি আমি। কাগজপত্রে টাকার হিসেবের সুবিধাটা যদি করে দেই মন্দ কি? কলকাতার জীবনের ও ভবানীপুরের বাড়ির বিলি বন্দোবস্ত কাগজপত্রে শেষ হয়ে গেল সব। মনে হল যেন সে আর এ খড়ের আটচালায় নেই, ভবানীপুরেই আছে, বেশ স্বাধীনভাবে আমিও চাকরির টাকাগুলো সব তার হাতে দিয়ে দিয়েছি।

রাত একটার সময় উমার শেষ হল।

উমা বললে—'উঠবে?'

—'হ্যাঁ সবই তো হল তোমার।'

'ঘুমুবে?'

—'হ্যাঁ তুমিও ঘুমোও।'

—'কিন্তু এই বইটা?'

—'এখন পড়বে নাকি আবার?'

—'গোটা চল্লিশেক পাতা বাকি আছে। তুমি আমার কাছে বোসো, আমি শেষ করি।'

—'কিন্তু আমার বসবার কি দরকাব?'

—'আচ্ছা, যাও তাহলে।'

রাত চারটার সময একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল্ল। কিন্তু পাড়াগাঁব বাতে এমন অনেক শব্দই হয়। আমি সহসা বিছানা থেকে উঠলাম না। বাবা নাক ডাকাচ্ছিলেন, মাবও নাকেব নিশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। খোকাও নিস্তব্ধ। খুব আরামে লেপ টেনে নিযে আমি আরো অনেকক্ষণ শুযে বইলাম।

কিন্তু ঘুম আর হল না। কেমন একটা গভীব অবসাদ ও শূন্যতা যেন চাবদিকে, তাব মধ্যে একমাত্র আশার জিনিস হচ্ছে উমা আমার স্ত্রী। মেয়েটিব মনেব নির্মলতা আশ্চর্য। কিছুতেই তিক্ত বিবক্ত হতে চায না। শত নিস্ফল হযেও নিস্ফলতাকে স্বীকার কবল না। আশা কবে, অপেক্ষা করে, বিশ্বাস কবে, জীবনকে শ্রদ্ধা করে, ভগবানেব উপব নির্ভর কবে, সমস্ত বাত নির্বিঘ্নে ঘুমিযে শবীবটা বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে একদিন আমিও হযতো উমার মতো হযে যাব। নিস্ফলতাকে নিস্ফলতা বলে মনে কবব না। আশা করব, অপেক্ষা করব, জীবনকে শ্রদ্ধা করব।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে আবছাযাব মতো অন্ধকার। ঘুড়িতে দেখি পাঁচটা।

কম্বল জড়িযে উমাব ঘবে গিযে দেখি দরজা খোলা, সে নেই। আমিই খুঁজে বাব কবলাম। খিড়কিব পুকুরে তার মড়া শরীরটা ভাসছে। কেন মবল,কাল বাতেই বা কেন মবল, একখণ্ড চিলতি কাগজেও কোথাও সে লিখে যায নি।

তারপর মেসের জীবন চলে। জীবন সম্বন্ধে আমব ধাবণা আগেব মতোই আছে অন্ধকার রাতে মেসেব ঘবে শুযে থাকতে থাকতে মনে হয এখনই এই প্রকাণ্ড তেতলা লবেজান বাড়ি ভূমিকম্পে দুমড়ে উঠে আমাদের সকলকে নিযে কোনো অতলে তলিযে দিতে পাবে। সেখান থেকে অনন্তকালেব ভিতবেও কেউ আমাদের খুঁজে বের কবতে পাবে না। উমাব মৃত্যুব আগেও আমি এই কথা ভাবতাম। এখনো ভাবি। জীবন সম্বন্ধে আমাব মতামত স্থিবই আছে।

জীবন এইরকম। সে আমাকে আজও বাঁচতে দিযেছে, খেতে দিযেছে, জীবনেব অন্ধতা ও ভযাবহতার সম্বন্ধে কলম ধরে লিখতে দিচ্ছে, এই তার যথেষ্ট দান।

এতদিন লিখতে দিচ্ছে, লিখে চলি। আব কি কবব? আব কিছু কববাব নেই। মাঝে মাঝে দেশেব বাড়িতে গিযে খেতে মাঠে বোদে বোদে প্রজাপতি মৌমাছিগুলোব দিকে তাকিযে দেখি, কিন্তু তাদেব উজ্জ্বল চঞ্চল জীবন সত্যি না মুখোশ বুঝতে পাবি না। খুব গভীব সন্দেহ হয। কিন্তু মুখোশ হোক, সত্যি হোক মৌমাছিকে দাঁড়কাক ঠুকবে খাচ্ছে এ আমি দেখেছি। দেখেছি ছোট ছোট ছেলেবা প্রজাপতিব পাখনা ছিঁড়ে খেলা কবছে।

কলকাতায় কোনো কাজ নেই, কলকাতা জাযগাও অত্যন্ত অসাব। হেমন্ত শীত বসন্ত জীবনটাই পাড়াগাঁযেব পথে কাটাতে ইচ্ছা করে।

অশ্বত্থের ডালে

রাত যখন খুব গভীর হয়, সবাই অবিশ্যি ঘুমিয়ে থাকে। পাড়াগাঁয় ঘুম খুব চট করে আসে। রাত নটা বাজতে বাজতে চারদিক যায় নির্জন হয়ে। মানুষ তখন পৃথিবীর পিঠ ছেড়ে ঘুমের জগতে চলে গেছে। রাজ্যটা তখন পেঁচার বাদুড়ের জোনাকিদের, জ্যোৎস্নার অন্ধকারের নক্ষত্রের। আমাদের এ খড়ের ঘরের সব কটি প্রাণীই ঘুমিয়েছে। বাবা-মা আমার মেয়েটি, মেয়েটির মা, আমার বোন।

ঘরের উত্তর দিকের একটা কোণে আমার কোঠা। ছোট্ট একটা কোঠা। একটা টেবিলে রয়েছে, একটা চেয়ার, বইয়ের আলমারি একটা, আর খাট একখানা। আমি একাই এখানে থাকি। বিয়ের আগে যেমন ছিলাম, তেমনই আছি। নিজেকে অবিবাহিত একাকী মানুষ ভাবতে বেশ লাগে। বিশেষত এই শীতের রাতে এই পাড়াগাঁয়ে।

নটার থেকেই সকলে ঘুমুচ্ছে। রাত এখন এগারোটা। খাটের বিছানার কাছে চেয়ারের ওপর ডিটমারের লণ্ঠনটা, বিছানায় শুয়ে আমি পড়ছি। নতুন বই কোথাও কিছু নেই। পাড়াগাঁর মতো জায়গা বই থাকবে কোত্থেকে। কলকাতার থেকে নতুন নতুন বই কিনিয়ে আনবার জন্য সঙ্গতি আমার নেই। অনেকদিন হল ঘুচে গেছে। কোনো সংগ্রহ নেই বছরের পর বছর ঘুরে যায়। কলকাতার মুখ দেখতে পারি না। নতুনতার খোঁজে খবরের কাগজ পড়ি তাই। সেই পাঁচটার থেকে পড়তে শুরু করেছি। তারপর এই এগারোটার সময় কাগজটা ভাঁজ করে রাখলাম। চোখ ব্যথা করছে। এতক্ষণ ধরে খবরের কাগজ পড়ার কোনো দরকার ছিল না। গত দশ বছরের ভেতর দেশে বিদেশে যে সুন্দর সুন্দর বই সব বেরিয়ে গেছে সেগুলোর কোনো খবরই আমি রাখি না। সবগুলোই পড়তে ইচ্ছা করে, কিন্তু একটাও পাবার আশা নেই। বর্জাইস টাইপের দু-চারটা নতুন ইংরেজি উপন্যাস আছে, হুইলারের দোকানের, চোখের কষ্টের জন্য এতদিন পড়ি নি, কিন্তু আজ ঘুম পাচ্ছে না, গল্প পড়তে ইচ্ছা করছে। আলমারির থেকে একটা হুইলারের নভেল বের করে নেব নাকি ভাবছি।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। দুটো জানালাই খোলা। শুয়েছিলাম যখন, তখন অন্ধকার। এখন দেখি চমৎকার জ্যোৎস্নায় চারদিক ভরে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, কোথাও একটি লোকও নেই। যতদূর চোখ যায় চারদিককার ধানের জমি, এক মাস দুমাস হল ধান কাটা হয়ে গেছে। মাঠে মাঠে খড় পড়ে আছে শুধু।

আমার জানলার পাশের মস্তবড় চালতা গাছটার ডালপালা নড়ে উঠল, কয়েকটা বাদুড় এসে পড়েছে। চালতার বড় বড় পাতার কিনার থেকে ঝর ঝর করে শিশির ঝরে পড়ল।

খড়ের মাঠ দিয়ে দুটো খেঁকশিয়াল দৌড়ে চলেছে। জ্যোৎস্নায় অনেক দূর অবধি তাদের দেখা যায়। ঢের দূরে বনমোরগ ডাকছে। শেয়ালেরা সেই উদ্দেশেই চলল নাকি?

মজুমদাররা তাদের পরিবারের কারু কারু চিতার ওপর মঠ দিয়েছিল। ছোট ছোট মঠ, অনেকদিনকার। ইট চুন খসে গেছে। চার-পাঁচটা মস্ত মস্ত পেয়ারা গাছের ঘন ঘন ডালপালা জ্যোৎস্নায় মঠের উপর ঝুলে পড়েছে। বড় সুন্দর দেখায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখি।

মজুমদারদের শেষ নাতিটি কলকাতায় গিয়ে দেশে আর ফিরে আসে নি। শোনা যায়, সেখানে সে বড় দুর্দশায় আছে। কিন্তু তবুও কালকাতা নাকি ভালো লাগে তার। বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকি, এ কেমন কথা! মজুমদারদের মস্তবড় বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। জোৎস্নায় কেমন একরম রূপ যেন ওই বাড়িটার। এই সব ফেলে ছেলেটি কলকাতায় রইল।

মঠগুলোর গায়, গলায়, পেয়ারা গাছের ডালপালা আর জ্যোৎস্না, শীতের রাত্রে এ-এক গভীর আকর্ষণের জিনিস আমার। তাকিয়ে তাকিয়ে এর সৌন্দর্য আমি শেষ করতে পারি না।

একটা চুরুট জ্বালাই।

মজুমদারদের উঠানের জামরুল গাছে লক্ষ্মী পেঁচা ডাকছে। মনে হয় যেন হরনাথ মজুমদার মশায়।

বেশ গাইতে পাবতেন। জামরুলেব ডালে বসে সুব সাধছেন। সুব এবা, আবো খানিকটা গভীব। কেমন কাতব যেন। তবুও অবসাদেব ব্যথা নেই। কেমন একটা নিদ ্রুণ প্রশ্নেব মতো যেন এক একবাব-পবক্ষণেই—

দবজা খুলে নেমে পড়ি। মজুমদাবদেব উঠানেব দিকে যাই। পাখিটা এবাব ক্রমাগত কয়েকটা মর্মান্তিক জিজ্ঞাসা কবে উড়ে যায়। বেউড় বাঁশেব জঙ্গলেব দিকে চলে গেছে। বাঁশগুলো মজুমদাবদেব। একটি ভদ্রলোক মুজমদাবদেব দবদালানেব বাবান্দায় বসেছিলেন।

বললেন—'কে?'

—'আমি।'

—'তুমি কে?'

—'আমি নির্মল।'

বংশলোচন চকিব থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চশমা এঁটে আমাব দিকে খুব নজব দিয়ে তাকাল। তাবপব ধীবে ধীবে চশমা খুলে ফেলে বললে—'হ্যাঁ।'

—'বিশ্বেস হল তো?'

—'তা হল।'

—'গলাব স্ববে চিনতে পাবেন না?'

—'তা পাবি, তবু চোখ দিয়ে মীমাংসা কবে নিতে হয়। এত বাত কবে এখানে যে?'

—'একটা পেঁচা ডাকছিল।'

—'পেঁচা ডাকছিল?' বংশলোচন সন্দিগ্ধভাবে আমাব দিকে তাকাল।

—'হ্যাঁ, এই তো আপনাদেব জামরুল গাছে।'

—'কই শুনি নি তো।'

—'আপনি হয়তো ঘুমিয়েছিলেন।'

—'না ঘুমোই না আমি, কোনোদিনও ঘুমোই না তো।'

—'কোনোদিনও না?'

—'এই তো তুমি সুড় সুড় কবে চলে এলে, অমনি টেব পেয়ে হাক দিলাম কি কবে? সাবাবাত এই বকম।'

—'সাবাবাত?'

—'এক বাত দুবাত শুধু?'

—'তবে?'

—'এই বাবো বছব হল ঘুমোচ্ছি না।

—'বাবো বছব না ঘুমিয়ে মানুষ বাঁচে বংশলোচন দা?'

—'সাধাবণত বাঁচে না।'

—'তবে?'

—'সিদ্ধ হতে হয়।'

—'গবম জলে?'

বংশলোচন তাব এক চোখ তুলে কটমট কবে আমাব দিকে মিনিট তিনেক তাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠে বললে—'ফেব!' হুকোটা ধবে বললে—'যা বলছি, চলে যা এখান থেকে, যা নয় তাই।'

—'দিন, তামাক সেজে দিচ্ছি।'

—'এঃ আবাব ভালমানুষি কবতে এসেছে।'

কলকেটা দিল, টিকে জ্বালিয়ে নিয়ে ফুঁ দিচ্ছিলাম।

বংশলোচন বললে—'গবম জলে কি মানুষ সিদ্ধ হয নাকি বে হতভাগা।'

—'তবে?'

—'সিদ্ধ হয ছোট ডিম।'

—'এই নিন এবাব তামাক ধবেছে।'

কলকেটা তুলে নিয়ে বললে—'একটা ওষুধ খেতে হয।'

—'কীসের জন্য?'
—'ঘুমটাকে জয় করতে হলে।'
—'কি ওষুধ?'
—'তা তোমাকে আমি বলব কেন?'
—'আপিং?'
—'মুখে নুড়ো তোমার। আপিঙে তো আবো ঘুম বাড়ে বে?
—'তবে কী ওষুধ আবার?'
—'তা আমি সকলকে বলি না।'
—'এই গাঁয়ে কেউ জানে?'
—'না, এই মুল্লুকে কেউ না।'
—'তবে?'

বংশলোচন তামাক টানতে টানতে মাথা নেড়ে বললে—'উহু, এসব খবব আমি কাউকে দেই না। হুকোটা নামিয়ে কলকেতে দু-তিনটা ফুঁ দিয়ে বললে—'তবে তুমি একজনকে ধবে ফেলেছিলে প্রায।'

—'আমি? কখন?'
—'এই তো একটু আগে।'
—'কাকে ধরেছিলাম?'
—'তা আব বলব না।'

ঘাড় হেট কবে অত্যন্ত কঠিনভাবে চিন্তা কবতে লাগলাম। একটু আগে কাকে আবাব ধবে বেখেছিলাম, কে আবাব পথে এল?

বংশলোচন—'এ তুমি ভেবে বেব কবতে পাববে না। মিছিমিছি মাথা গবম হবে, যাও যাও, ঘুমোও গে যাও, বউটাকে মিছিমিছি কষ্ট দাও কেন?'

—'সে আবাব কি কষ্ট পাচ্ছে?'
—'ট্যাকটেঁকে বউ কষ্ট পায না? এই শীতেব বাতে সোযামী বেবিযে গেলে?'
—'ট্যাকটেঁকে?'

বংশলোচন কোনো উত্তব দিল না।

বললাম—'বউ ঘুমিযেছে।'

—'চুলোয যাক।'
—'আমাব মেযেও ঘুমিযেছে।'
—'হুঁ।'
—'কাব পাশে শোয সে?'
—'কে?'
—'তোমাব খুকি?'
—'তার মায়ের পাশে।'
—'আর তুমি?'
—'আমি এই উত্তরেব দিকে ঘবটায শুই।'
—'একা?'

মাথা নেড়ে বললাম—'হ্যাঁ।'

—'ও, ও তাহলে বউযেব সঙ্গে বনে না বল। থাক বলতে হবে না কিছু। আজকালকাব ছেলেদের কারুবই বনে না, সে আমি জানি।'

মাথা হেট করে আবার ভাবতে লাগলাম। মুখ তুলে বললাম—'আচ্ছা, পথে আসতে আসতে একটা খেঁকশিযাল দেখলাম, সেইটে?'

বংশলোচন দাঁত মুখ খিঁচিযে—'এই হুঁকো ভাঙব তোমাব পিঠে।'

তামাকে টান দিয়ে বললে 'নইলে এমন শীতের বাতে একা এক কোণে শুযে পড়ে থাকা? আব এইখানে আড্ডা দিতে আসা? সে আমি জানি।' হুকোটা দেযালে ঠেশ দিযে বেখে বললে—'মজুমদাব

মশায় মারা গেলেন পঁচানব্বই বছর বয়সে।'

—'কে হরনাথ ঠাকুদ্দা?'

—'আজ্ঞে।'

—'না অত বয়স হয় নি।...'

—'তার গিন্নীর হয়েছিল নব্বই।' বংশলোচন বললেন—'গিন্নী মরবার ছমাস পরেই কর্তা গেলেন। যাবাব সময় আমাকে বলে গেলেন—'এই ছটা মাস শুধু আলাদা ঘরে আলাদা বিছানায শুয়ে গেলাম। আর এক ঘরে এক বিছানায শুতে যাচ্ছি।'

—'ইস।'

—'এই সব সাবেককালের লোক। আকজাল আব এবকম হয না। সব ফাজিল ফক্কড় চোব বদমাসে শহর বাজাব গেছে ভবে। ধর্ম আছে? না নিয়ম আছে? না'— বংশলোচন—'তামাটা আব একবার ধরাও তো।'

ধরাচ্ছিলাম।

—'তোমার বয়স এখন কত?'

—'পঁয়ত্রিশ।'

—'আর পাঁচ বছর।'

—'পাঁচ বছর?'

—'হ্যাঁ।'

—'তারপর?'

—'তারপর পৃথিবী ধ্বংস।'

—'কেন?'

—'কলি ফুরিয়ে গেল।'

—'এত তাড়াতাড়ি?'

—'কলির আর তো বেশিদিন নয়, অধর্ম অবিচার বেশিদিন টিকতে পাবে না।'

তামাক সেজে দিলাম।

অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বললে—'কাউকে বলি নি, কিন্তু তোমাকে বলছি।'

—'কি কথা?'

—'এই যে একটু আগে তুমি জানতে চাচ্ছিলে—'

—'ঘুমের ওষুধ?''

—'ওষুধের কথা অবিশ্যি আমি বলব না। কিন্তু পেঁচাব ডাক শুনেই তো তুমি এখানে এসেছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমাকে ডেকে এনেছে।'

—'কে?'

—'এই পেঁচা।'

-'সত্যি।'

—'তোমাকে আসতেই হত।'

—'তাই নাকি?'

—'নিজের চোখেও তো দেখলে না এসে পাবলে না।'

—'তাই তো।'

—'কোন গাছে পেঁচা ডাকছিল বলো তো? এই জামরুল গাছটায়?'

—'উহুঁ জামরুল গাছে নয।'

—'তবে?'

—'তুমি ঠাহর করতে পার নি। তা এরকম ভুল হয। মহানিমগাছেব মগডালে চড়ে ডাকছিল।'

—'তা হবে।'

—'কটা পেঁচা ডাকছিল বলো তো?'

—'একটা।'

বংশলোচন মাথা নেড়ে বললে—'না গো না।'

—'তবে?'

—'একজোড়া।'

—'অতটা তো আমি শুনি নি।'

—'ডাক শুনেছ এই যথেষ্ট, সবাই শোনে না।'

—'কি রকম?'

—'মজুমদার মশায যার ওপব অনুগ্রহ করেন সেই শোনে।'

—'তবে লোকে যে বলে মজুমদার মশায পেঁচা হযে গেছেন, তা সত্যি?'

—'কোন লোকে বলে আবার?'

—'দু-একজনের কাছ থেকে শুনেছি।'

—'মিথ্যে কথা বলো না, আমার কাছ থেকে শুনেছ শুধু। এসব তথ্য এ গাঁযে আমি একা শুধু জানি। খবরদার আব কাউকে বলো না কিন্তু এসব। মজুমদার মশায পেঁচা হযে গেছেন এ নিযে তাবা হাসাহাসি কববে, কিন্তু হাসি তামাশার জিনিস নয।'বংশলোচন মিনিট তিনেক তামাক টেনে নিযে—'মজুমদাব মশাযকে বাধ্য হযে পেঁচা হতে হল।'

বংশলোচন মুখের দিকে তাকালাম।

কালো চোখ ঘুরিযে বললে—'গিন্নী ছমাস আগে মরে এই অশ্বথেব ডালে পেচকী হযে বসল কি না।'

—'এই অশ্বথ গাছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাপরে! আপনি কী কবে জানলেন?'

—'আমি ঘুমোই না কিনা, সব টের পাই।'

—'তারপর?'

তামাকে এক টান দিযে বললে—'কাজেই মজুমদাব মশায আব মানুষেব শবীব ধবতে চাইলেন না। নইলে বাজপুতনাব এক মস্তবড় বাজাব ঔরষে জন্মাবাব কথা ছিল।'

—'কার? মজুমদার মশাযেব?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তা চাইলেন না। তাহলে গিন্নীকে হাবাতে হয যে।'

—'তাই নাকি? এ তো খুব গভীব ভালোবাসব কথা।'

—'এই রকম ভালোবাসা সাবেক কালে হত।'

—'আজকাল হয না?'

—'তাব নমুনা তো তুমি। বাত দুটো অবধি একটা কানার সঙ্গে ইযার্কি দিচ্ছ।' বলে হো হো কবে হেসে ফেলল।

লোকটা এমনিভাবে শীতের বাত জমাতে পারে।

জীবনে কোথাও কোনো অবলম্বন পেলাম না। একেবারে সিঙ্গাপুব অবধি গিয়েছিলাম— ডাক্তারি করতে নয়, জীবনটাকে ঠিক বুঝে দেখতেও নয়। কিন্তু পেটেরই তাড়ায়।

সে এক মস্ত ইতিহাস। তার জায়গা এখানে নয়। কিন্তু সিঙ্গাপুব থেকে ফিবে আসতে হল। কলম্বোতে প্রায় বছর দুই ছিলাম। না সুবিধা হল চাকরির, না ব্যবসার।

দেশ-বিদেশেব মানুষেব জীবনেরও সেই একই ফিরে ফিরতি দেখেছি। পঁচিশ বছব পর্যন্ত কলকাতার পথে পথে ঘুরে জীবনটাকে যতদূর বুঝেছি শিখেছি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই, তার চেয়ে বেশি কিছু শিখতে পারি নি। কি করে পারব? নিস্ফলতা ও বেদনার ভেতব দিয়ে জীবনের মূলসূত্রগুলো কলকাতার অলিগলিতে রাস্তাঘাটে অনেক আগেই ধরে ফেলেছি, সে সূত্র কোথাও বদলায় নি। ঘটনাব বহুলতা বিপর্যয় সমারোহ চাকচিক্য চমক জীর্ণতা ও কলঙ্ক যতই নতুন রূপ নিয়ে আসুক না কেন সব সময়ই বুঝেছি মানুষের জীবনে এইবকম হয়। জেনেছি এইবকম সব হওয়াই যে সম্ভব স্বাভাবিক সেই পঁচিশ বছরেই আমি সবই তো জানতাম।

তাহলে চব্বিশ-পঁচিশ বছবেই আমি শিখেছিলাম যে আমাব নিজের বা অন্য কোনো মানুষেব জীবনের জন্য করুণা বা বিচাব প্রার্থনা কবে কোনো লাভ নেই। শিখেছিলাম জীবনের স্রোতেব সঙ্গে কোনো তর্ক করা চলে না। তা সমুদ্রের স্রোতের মতোই। তেমনি অন্ধ ও অর্থহীন। তেমনি সুন্দব অথচ ভযাবহ। কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বিচিত্র জীবনকে দেখতে মন্দ লাগে না। কিন্তু তাব জন্য সৌভাগ্যের দবকাব, সৌভাগ্য আছে কিনা জানতে হলে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু জীবনেব অন্ধকাব মুহূর্তে, অন্ধকার মুহূর্ত দিনের শেষ স্তিমিত আলোর মতো বাত্রিব প্রথম স্তিমিত আলোব সঙ্গে মিশে যেতে মরণকে খুব প্রিয়, অনুপম ও ভরসার জিনিস বলে মনে, এবং এরকম অন্ধকাব মুহূর্ত প্রায়ই আসে। কিন্তু অনেক সময়ই মববার সাধ হলেও অসময়েব মৃত্যুকে যতদিন পর্যন্ত এড়িয়ে থাকতে পাবা যায় ততদিনই সুবিচেনাব কাজ হয়। একটা কারণ, যে মবেছে তাব অবস্থা অপগণ্ডেব মতো, মানুষেব হৃদযেব দুয়াবে দুয়াবে তাকে নিয়ে প্রবঞ্চনাব খেলা, জীবিতদেব প্রাণবান জীবনেব একটা লক্ষণ, তারা যে মৃত নয়, মুছে যায় নি সেই গর্বেব পরিচয় তাব প্রমাণ। মৃত বিস্মৃতরি সঙ্গে যখন নিজেব আত্মতৃপ্তিব তুলনা করা যায় তখন জীবনটাকে একটা আত্মতৃপ্তির জীবন বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়,— অনেক সময়ই নয়। কিন্তু এই শেষ কাবণটিব জন্য নয় অন্য অনেক কাবণে মরণকে অনেক অন্ধকাব মুহূর্তে সুন্দর স্বাধীন স্বাভাবিক জিনিসই বলে মনে হলেও আমি মরতে যাই নি।

হতে পাবে মরণ খুব সুন্দব স্বাধীন স্বাভাবিক জিনিসই বটে, হতে পাবে মৃত্যুর পর যা ভাবি সেই অন্ধকার নেই, মৃত্যুকে কে কি ভাবছে তার বিসর্জিত জীবনটাকে ভুলে পরাজয় গ্লানির জিনিস মনে করে জীবিতদেব মধ্যে কি ভযাবহ শিহরণ চলেছে, সে কথা ভেবে আমাব কোনো ক্ষোভ থাকে না হযতো। হয়তো তাব জন্য নক্ষত্রলোক রয়েছে, আব শান্তি। এই সবই হতে পাবে।

কিন্তু তবুও আমাব জীবনের খুব নিস্তব্ধ মুহূর্তে আমাব মনে হয়েছে মানুষেব জীবন গাছেব মতো যেন, অন্ধকাব হোক, কুযাশা হোক, অনেক দিন পর্যন্ত ক্ষমানত ডালপালা ছড়িয়ে সে তাব দিনে শেষ দেখে নেয়। জীবনের সকালবেলাই কাঠুবিয়া এসে তাকে কেটে ফেলবে এরকম আশা সে কববে না। তাবপব বনেব প্রবীণ গাছ হয়ে ধীরে ধীরে মরে যাবার ভেতর কেমন একটা মহিমা বয়েছে না? আব সৌন্দর্য?

প্রাচীন বুড়ো মানুষদেরও আমাব খুব ভালো লাগে। আমারও বুড়ো হয়ে মববার সাধ। মাথাব সমস্ত চুল শাদা হয়ে যাবে। শাদা দাড়ি। আশ্বিন বা কার্তিকের বিকেলবেলা নবম রোদেব ভেতর বসে থেকে চারদিককার সবুজ নীলাভ পৃথিবীর দিকে তাকাতে চুপে চুপে মরে যাব। অনেকদিন মনে হয়েছে এইরকম মরণ খুব মধুর। কিন্তু কে জানে কি হবে?

কলম্বোর থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম। সাত-আট বছর পর কলকাতায় ফিরে এসে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখছি। নানারকম ওম্নিবাস দেখছি। আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন এসব ছিল না। রেল ডেকার বাস ও অনেক রয়েছে দেখছি। ট্রামের রং সবুজ-হয়ে গেছে। তখন বাদামি রং ছিল। রেডিওব খুব চল দেখছি—এসব ছিল না। কলকাতার পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট শহরটার মুখ খানিকটা খানিকটা বদলে দিয়েছে মন্দ না। অনেক খোলা জায়গা রয়েছে। শহর বেড়েছে, কতকগুলো অ্যাভিনিউর সৃষ্টি হয়েছে। বেশ। অনেকগুলো নতুন সিনেমা হাউস হয়েছে। থিয়েটারের দিকেও লোকের ঝোঁক খুব। বড় বড় দেশের নেতারা অনেকে মরে গেছে, বাকি অনেকে বন্দী। পৌষের দিন, শেষ তত বেশি নেই। আকাশ মেঘলা, কলকাতার ওপর কেমন একটা কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে।

এই শহরটা আমি ভালোবাসি। সিঙ্গাপুরে থাকতে রোজই কলকাতার কথা মনে হত, অনেকবার করে। আর কলম্বোতে গিয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য আমি অনেক অভাজন লোককেও চিঠি লিখেছি।

কলকাতায় থাকতে পারা যায় না?

নানারকম অব্যবস্থা এসে আমাকে যেন আবাব বিদেশের দিকে না ঠেলে দেয়। তারপর একদিন ফুটপাথেব থেকেই হোক কিংবা কাশী মিত্তির ঘাটের থেকেই হোক অন্ধকার নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা করা যাবে। অবিশ্যি সেরকম যাত্রা আমি খুব তাড়াতাড়ি করতে চাই না। বলেছিই তো মাথাব চুল শাদা হয়ে যাবে, মস্তবড় লম্বা দাড়ি হয়ে যাবে, গোছাভরা পাটের মতো ধূসর। আশ্বিন বা কার্তিকেব নবম বোদের ভেতর বসে চারদিককার সবুজ নীলাভ পৃথিবীর দিকে তাকাতে তাকাতে আমি মরব।

কলকাতায় ইস্কুল আছে ঢেব। একটা মাস্টাবির জন্য ঢেব ঘোরাঘুরি করলাম। কিন্তু কোথাও পোস্ট খালি নেই। ইস্কুলেব সেক্রেটাবি ও হেডমাস্টারবা চান মাস্টার কমাতে আরো। এক জায়গায় একটা মাস্টারি খালি হল বটে, কিন্তু একজন ফাস্টক্লাস বিটি-কে নেয়া হল। আমার বিটি নেই। তখনকার দিনে শুধু এমএ হলেই হত। বিটি-র বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু আজকাল বিটি নাহলে চলে না। তারপব এমএ পাশ করেছি বটে, কিন্তু সে তো পনেবো বছব আগে। তারপব একদিন একাদিক্রমে মাস্টাবি করি নি তো, তাতে অনুপযুক্ত হয়ে পড়তে হয়। এঁবা এই সব কথা বললেন। কাজেই মাস্টাবির আশা ছেড়ে দিতে হল আমার।

কলেজেব টিচারি পাওয়া তো আবো ঢেব কঠিন। যদিও সে টিচাবি কবা খুব সহজ। মেসের ভদ্রলোকেবা যখন অফিসে চলে যেত, দবজা বন্ধ করে একলা কামরায বসে কযেকদিন বিএ ও ইন্টাবমিডিয়েটেব দু-চারখানা বই ধরে লেকচাব দিতে থাকতাম। মন আবক্ত হয়ে ওঠে, চোখদুটো সমুদ্রের পাখিব মতো বিস্তাব খুঁজে পায। আস্বাদ জমে ওঠে। কিন্তু তাই বলে কলেজেব স্টাফেব কাজ পাওয়া যায় না।

গভর্নমেন্টের কোনো অফিসে ঢোকা অসম্ভব। বযস নেই, বযস থাকলেও পাবতাম না, আমি কারু কেউ নই, বাজেটেরও কোনো সংগতি নেই। কোথাও কেরানিগিবি কেউ দিতে চায না। আগে কেরানি ছিলাম বলে।

কেউ-বা মুরুব্বিগোছের কিছু কাজ দিতে চায কিন্তু দু-হাজার বা আট হাজার টাকা জমা রেখে দিতে হবে তাদের কাছে। আমি আমাব চুরুটটা জ্বালিযে এসব আড্ডার থেকে বিদায নেই।

কোনো টুইশন পাওয়া যায না। শোনা যায আইন ক্লাসের ছেলেরা দশ-পনেবো টাকা কিংবা তার চেযেও কমে পকেট খরচ পেলেই দুবেলা পড়াতে বাজি। কতদূব সত্য তা আমি জানি না। কিন্তু আমাকে সে টাকা নিযেও কেউ সাধে না। উনিশশো বত্রিশ সালের এইবকম একটা স্থিব উদাসীনতা লক্ষ্য করি। উনিশশো একুশ-বাইশ সালে এই শহরটার আতিথেযতা অন্যরকম ছিল।

একজন মস্তবড় পাবলিশার্সের সঙ্গে কলেজে পড়বার সময়ে চেনা ছিল। তাঁর কাছে যাই, তিনি স্কুল-কলেজের টেক্সটের নোট লেখান। ফর্মায শুনেছি কুড়ি-পঁচিশ টাকা করে দেন। এই একটা মস্ত আশার কথা হয়তো। নোট লিখতে আমি খুব পারব। মেসের ঘরেব দরজা বন্ধ করে, ডিকশনারি আর রেফারেন্স ঘাঁটিযে মাঝে মাঝে চুরুট জ্বালিযে। তাঁকে গিয়ে ধরি। কিছু নোট লেখার কাজ চাই-ই। আমাকে দেখে তিনি খুশি হন, কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম সমস্ত খবর জিজ্ঞেস করেন। তাবপর মাথা নেড়ে বললেন, কলেজের প্রফেসর বা স্কুলের হেডমাস্টাব টিচার দিয়ে নোট ম্যানুয়েল লিখিয়ে নেবার

ব্যবসা আছে তাঁদের। কলেজ স্কুল স্টাফের ঢের লোক তাঁর হাতে রয়েছে। অন্য লোকের প্রয়োজন হয় না। আমাকে নমস্কার জানিয়ে কাজে মন দেন।

তাঁর শান্তি আর আমি ভাঙাতে চাই না। কিন্তু তাঁর দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার সময় একটা গভীর সাধ আমি বড় অনুভব করি। মনে হয় আমিও যদি এরকম মস্তবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর পাণ্ডুলিপি প্রুফ হিসেবের খাতা, চার্ট ম্যাপ, বই ইত্যাদি ছড়িয়ে এঁর মতো একমনে নিরবচ্ছিন্ন কাজে ডুবে থাকতে পারতাম! ইনি অবিশ্যি একদিন মরে যাবেন। কিন্তু বাবুই পাখি যে তৃপ্তি নিয়ে বহুক্ষণ ধরে তার নীড় গড়ে, ডিম পাড়ে, আবার ডিম পাড়ে, আবার নীড় গড়ে তারপর মরে যায়, সেই রকম পরিতৃপ্তি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে। সে কি কম জিনিস?

বাস্তবিক জীবনে আমরা টাকা তত চাই না। কাজ যত চাই। হাঁস বা বাবুই চড় ই বা শালিখ সোনাদানা চায় না তো, আমাদেরও তেমনি টাকার তত দরকার নেই। কাজের কথা, নীড় গড়বার, ডিম পাড়বার, খড়কুঁটো কুড়োবার, পুরোনো বাসা মেরামত করবার, ডালের থেকে ডালে নেচে বেড়াবাব, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও স্পন্দন ছাড়না বাঁচে পাখি না বাঁচে মানুষ।

বড় পাবলিশারের সঙ্গে দু-মিনিট কাটিয়ে এসে জীবনের এই পরিশ্রমের সমারোহ ও পরিতৃপ্তির বিস্ময়কর জগতে চলে যেতে ইচ্ছা করে।

ইচ্ছা কবে। তাকিয়ে দেখি কলকাতার অনেক বড় বড় আলিশায ছাদে কার্নিশে পায়বাদেরও দৈনন্দিন কাজ ঢের। কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে অনেকটা সময বিছানায় শুয়ে থাকতে হয।

মাথা চুন-সুরকি ও কাঁকরে ভরে গেছে। সমস্ত শবীর তেলচিটে, কাপড় পাঞ্জাবি জামা বিছানার চাদর বালিশ সমস্তই নোংরা, ছেঁড়া তুলো বের কবা, এবং এই সবের ভেতর আমি নিস্তব্ধ ও অলস।

উঠে পড়ি।

রাস্তার একটা গ্যাসপোস্টের কাছে এক মুহূর্ত দাঁড়িযে চুরুটটা জ্বালিযে নেই। সে পাবলিশার্স ছিল খুব বড়, দু-চারজন ছোট ছোট পাবলিশারদের কাছে যাই। এরাও কিছু কিছু নোট ম্যানুযেল ইত্যাদি বেব করে। আমি যে বই কিনতে আসি নি এই জেনেই তাদেব প্রথম আঘাত। ব্যাপারটা কেমন অস্বস্তিকর। চেযারে বসি। তবুও আমি যে একজন এমএ অনেকদিনকার এমএ একথা বলে তাদের মনের ওপব ছাপ ফেলতে পাবব। তা পারব না। তার কারণ স্পষ্ট। তবুও বলি, যা ভেবেছিলাম তাই। কী চাই সে কথাও জিজ্ঞেস কবে না। নিজেদের কাজ করে চলছে, আমার প্রতি তাবা অত্যন্ত উদাসীন ও অন্যমনস্ক এরকম ধরনের গুমোট আবহাওযাটা একটু সরস করে নিতে চাই। চুরুট বের করে তাদেব দেই, বলি এ সিঙ্গাপুরের চুরুট। এর পর খানিকটা আন্তরিক কথাবার্তা হয। স্পষ্ট বুঝতে পারি আমরা কেউই ভান করছি না এখন আর। পরস্পর পরস্পবের হিত চাচ্ছি। আমাদের চুরুটের ধোঁযায সমস্ত ঘরখানা ভবে ওঠে।

কিন্তু সময তো বেশি নেই। খুব তাড়াতাড়ি নোট লেখার কথা এসে পড়ে। তাবাই কথা বলে, আমি শুনি। দু-চারখানা নোট মাঝে মাঝে বের করে মাত্র। এটা তাদের ব্যবসা নয। দু-চাবখানা নোট, তাও তো চলে না, বাজার বড্ড খারাপ। চুরুট নিভিয়ে ফেলে এইবার। প্রুফের তাড়ার ভেতর মন দেবার সময হল।

চেযারে বসে নিঃশব্দে খানিকক্ষণ সিগার টানি। বলি 'প্রুফরিডারের দরকার আছে?'

—'না।'

—'আপনারাই দেখেন বুঝি?'

—'খুব।'

হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে এসে মনে হয কেমন শকুনের ব্যবসা ধরেছি যেন। বেচারি প্রুফ দেখছিল, জিজ্ঞেস করলাম প্রুফরিডারের দরকার আছে কি না। মুখের খাবারের জন্য এ যেন কেমন বন্যজন্তুর মতো লোভ। হাঁটতে থাকি। কিন্তু খিদে আছে বলেই তো লোভ । না হলে লোভের কথা উঠত কোথায আর?

হেঁটে চলি। কিন্তু খিদে যাবে কেন? বেঁচে থাকতে চাই বলেই তো। হ্যাঁ বেঁচে থাকতে চাই। পৌষ মাস। দুপুরের রোদে জল। দিঘির এক কিনারে গোটা দুই বোট পড়ে আছে। ছেলের দল বিকেলবেলা এসে বোট খেলিয়ে দিঘিব জলে চক্কর দিযে বেড়াবে। আমি নিজে কোনোদিন তা করি নি। ছেলেদের

অনেকদিন করতে দেখেছি।

প্রাণের ভেতর চুপে চুপে একটা সাধ জমে ওঠে। আমিও একদিন এক বোট নিয়ে কোনো এক দিঘির বুকে ভেসে বেড়াব। এই নবীন ছেলেদের মতো খানিকটা নতুনত্ব ও উৎসাহ বোধ করব। করব না? কারণ তো কিছু নেই। পৃথিবী তো রয়েছেই। জীবনও সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। জীবন সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। দিঘিভরা দুপুরের গভীর রোদ, বাতাস, ডালপালার কাঁপন, নাচুনি, আকাশে ডোরাকাটা শাদা মেঘ— কোন বেবিলনের আকাশের মতো,. তিন হাজার বছর আগের। সুইমিং ক্লাবের ঘড়িতে একটা। দিঘিব রেলিঙের ধার দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটি। দিঘির চারপাশ ঘিরে জলের কাছে। ঘাসের বিছানায় নানারকম নরম সবুজ লম্বা ফুলের গাছ ছড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছে। এদের আরাম আমাকে স্পর্শ করে। অনেকরকম রূপ দেখি, অনেক রকম রং, ডালিয়া চন্দ্রমুখী, পপি, ফরগেট মি নট, সুইট উইলিযাম। একদিন আমিও এরকম ফুলের কেয়ারি তৈরি কবব। একদিন আমি বাংলাদেশের দেশের নদীব ধারে একটা পাড়াগাঁর মতো জায়গায় খানিকটা জমি কিনব। সেখানে ছোট বাংলার মতো একটা বাড়ি করব। সামনে থাকবে মস্তবড় একটা মাঠ, আর মাঠ ভরা এইরকম সব ফুল।

সংকল্প স্থির হল। এই ফুলগুলো আমাকে যা দিতে পারে, দিয়েছে জীবনেব সাধের দিকে উৎসবের দিকে আমাকে আরো খানিকটা অগ্রসর করে দিতে সহাযতা করেছে ঢের। একদিন যখন সুদিন আসবে, এদের কথা মনে থাকবে আমাব।

ঝড়ের মতো একটা বাতাস বইতে থাকে। হাওয়া কেমন ঠাণ্ডা কনকনে হযে পড়ে। আকাশ মেঘলা। কলেজ-স্কোযারের বড় বড় গাছের শুকনো পাতা চারদিকে ছড়িযে পড়ে।

রেলিঙেব ওপর কাকের গলার ধূসর বোম শীতের হাওয়ায় শিবশির করে কাঁপে। একটা উঁচু দেবদারু গাছের ভেতব থেকে চিল টেনে টেনে ডাকে। কলম্বোর একটা শীতের কথা মনে পড়ে যায়।

স্কোয়ারেব দারোযান খদ্দবের কোর্ট পরে লাল পাগড়ি মাথায় রেলিঙে বসে নিজের বাজত্ব দেখছে। রাজত্ব তার এই দিঘিটা। দুপুববেলা রোজই তাব বাজার মতো ঠাট। বোজই আমি দুপুরবেলা এক একবাব করে দেখে যাই। কোনো বেয়াদব মেড়ুযা বা মুসলমান ছোকবাকে ধমকায়, ফুল ছিঁড়েছে বলে হযতো। কেউ এপারের জলে স্নান করতে নামলে ওপাবের রেলিঙেব থেকে হাঁক ছাড়ে। সিঁড়ির ওপব ঝুঁকে পড়ে নেমে দিঘির মাছ যারা দেখতে এসেছে তাদেব পানে টেরচা চোখে তাকিযে থাকে হযতো কখনো। তবুও বিস্তর লোক স্নান কবে যায। ফুল ছিঁড়ে নেয! ছেলেবা জলেব ভেতব নৌকা ভাসায। বল ছুঁড়ে ফেলে। দারোযান সব সময এসব দেখেও দেখে না। মানবোচিত সহানুভূতি না থাকলে এ জীবনে যে চলে না, সে তা জানে । লোকটাকে আমি পছন্দ করি।

আজও তাকে দেখা গেল দক্ষিণ দিকেব বেলিঙেব ওপর বসে আছে। বিবর্ণ খদ্দবেব কোট। কোটের ভেতব অজস্র ছাবপোকা নিশ্চযই, ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া একটা খদ্দবেব কোট। খাকি বঙেব খদ্দবেব কোট গায। লাল পাগড়ি মাথায। পায নাগরাই। চোখে বিষম কর্তব্যবোধের চিহ্ন। বাজপাখিব মতো দিঘির এপাব ওপার চক্কর খেযে ফিবছে। বেশ মানুষ।

আমার দিকে সে তাকাল না। কিন্তু তাকে দেখে আমাব ভালো লাগে। লম্বাচওড়া বুড়োমানুষ। পাগড়ির নীচে মাথার পিছনে যতখানি চুর দেখা যায শাদা, খদ্দবেব কোটটা নোংবা, লাল পাগড়িও। নাগরাই ছেঁড়া, ধুলোকাদা মাখা। দুপুরবেলা ঘুমোবার সময নেই। সচকিত কাজেব তাড়া আছে মন্দ না। সেই জন্য লোকটাব মনের ভেতর আযোজন প্রযোজনের বারুদ আছে যথেষ্ট।

মিড ডে-র ট্রাম ধরা যায। পযসার ভযে ট্রামে শিগ্‌গির চাপি নি। আজও জিনিসটাকেও বড্ড বিলাস্ মনে হয। কিন্তু জীবনের বিলাসেরও দবকাব বয়েছে। সব সময চুলে সুরকি কাঁকর মাখিযে চোখ রক্তাক্ত কবে ফুটপাত দিযে হাঁটতে হয না। আজ না হয বিকেলে চা খাব না।

কিন্তু ট্রামের কনডাক্টর আমার কাছ থেকে পযসা চাইতে আসে না। জানি না কী ভেবেছে সে। হয়তো আমাকেই নজরই করে নি। হয়তো ধরে নিয়েছে আমার কাছে পাশ আছে। গাড়ির এক প্রান্তে বেল টানবার দড়ির কাছে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িযে দাঁড়িযে সে ঝিমুচ্ছে। ট্রাম চৌরঙ্গিতে এসে পড়ল প্রায, কিন্তু তবুও কোনো খোঁজখবব নিতে সে এল না। জীবন আমাদেব আগ্রহ করে ডেকে পযসা দেয? শত চেষ্টা করে ছিনিযে নিতে গেলেও সে ভ্রুক্ষেপ করে না। বার বার প্রতারিত করতে ভালোবাসে। চলতে গেলে এ কনডাক্টরকে উপেক্ষা করে চলে যেতে হয। সিঙ্গাপুরে যাবাব আগে আমাব স্ত্রী মারা যায ট্রামের সিটে

বসে বসে। মুখখানা মনে পড়ে। যক্ষ্মা হযেছিল। শাদা চুপসানো মুখ, পাখিব ঠোঁটেব মতো নীল শিবাব মুখখানা, কপালে সিঁদুব, সেই মুখখানা মনে ধীবে ধীবে আবির্ভূত হয যেন। কেন যে এখন সে মুখেব কথা মনে পড়ছে বুঝতে পাবি না। কিন্তু এই কনডাক্টবকে পযসা দেযা না দেযা সম্বন্ধে সেই মুখখানাব কি যেন যোগাযোগ আছে মনে হয। যক্ষ্মাব বিছানা, কাতব চোখ, অনুযোগেব দৃষ্টি। কাপড়েব খুঁট দিযে একবাব চোখ মুছে নিতে হয। অদ্ভুত' উঠে পড়ি। ঝিমুচ্ছিল, তাব কাঁধেব ওপব দুটো টোকা দেই, পযসা দিযে টিকিট কেটে নামি। সমস্ত দিন [...] দেন, মিউনিসিপাল মার্কেট [...] এব জ্ঞানালা [...] ভেতব বাড়িব দিকে উঁকিঝুঁকি দিযে বেড়াই। বড়দিনেব সময চাবদিকে ঐশ্চর্য ও আযোজন ঢেব। বাতাসে চমৎকাব সিগাবেব গন্ধ, কিংবা কফিব কসমেটিকেব সেন্টেবও। মদেব দোকানেব বোতলগুলো বিশেষ কবে দেখবাব [...] [...]

বোতলে বোতলে গাঢ় মদ জমে বযেছে সব। একদিন যেদিন বেশ সুদিন আসবে আমাব, সেই ফুলেব বাগানেব পাশেব আমাব বাংলাতে এমনি শীতেব দিনে খুব দেবি কবে ঘুমেব থেকে উঠব আমি। তাবপব বাবান্দায ইজিচেযাবে পৌষেব গবম বোদেব ভেতবে এসে বসব। একটা চুরুট জ্বালিযে নেব। সবুজ ঘাসে তখন শালিখেবা খেলা কবছে। আমাব [...] ঝাড়ে একবাশ টুনটুনি আব চড়াই, উঠানেব দেবদারু গাছেব ভেতব থেকে ঘুঘু ডাকছে। আব উঁচু উঁচু ঝাউযেব ডালপালাব চাবদিকে বোদেব ভিতব কালো কালো দাঁড়কাকগুলোকে দূবেব থেকে ছো'ট ছোট কোকিলেব মতো দেখাচ্ছে। সেই সময আমাব ইজিচেযাবেব সামনে ছোট একটা ওক কাঠেব তেপযেব ওপব একটা পেন বাখব। আব এক বোতল কনিযাক।

এক বোতল কনিযাক?

ঘাড় হেট কবে ভাবতে থাকি। হ্যাঁ কনিযাক, কিংবা হেনেমি, হোযাইট লেবেল। আমাব স্ত্রী বিভাব কাছে প্রাযই আমি গল্প কবতাম যে এখন আমাদেব দুর্দিন হলেও একদিন ভালো সময আসবে। কলকাতাব থেকে সবে গিযে বেশ নিভৃত পাড়াগাঁব মতো জাযগায বক্তেব মতো লাল টালি দিযে বেশ সুন্দব একটা বাংলো কবব। দূবে থাকবে নদী, বাংলোব সামনে থাকবে মস্তবড় সবুজ মাঠ। জামরুল বা লিচুব মতো ডালপালাওযালা বড় বড় গাছ সেখানে থাকবে। আব মাঝে মাঝে ফুলেব কেযাবি । কিন্তু মদেব বোতলেব কথা কোনাদিন তাকে বলি নি তো। সেও ধাবণাও কবতে পাবে নি যে কোনদিন তা বলতে পাবি।

মদেব বদলে একটা প্ল্যানচেট আনা যাবে। তাবই সাহায্যে বিভাকে আকাশ থেকে নামিযে আনব। তাবপব এই বকম শীতেব পৌষেব বিকেলবেলায কিংবা সন্ধ্যায বা বাতে আমবা অনেকক্ষণ এক সঙ্গে থাকব।

অন্ধকাব হযে আসে। মিউজিযাম দেখতে পাবি না। কাল আব এদিকে আসা হবে না। সেই বাবো বছব আগে মিউজিযাম দেখেছিলাম। আজ আবাব একটু দেখবাব স্পৃহা ছিল। মনে পড়ে এব আগে একবাব যখন এসেছিলাম আমাদেব সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মিউজিযামেব ভেতব বিভা গেল কোথায হাবিযে। তাবপব দেখি যে ঘবে বাজপুতানা হাযদ্রাবাদ কাশ্মীবেব পোশাক-আশাক শাল ইত্যাদি বযেছে সেখানে সে একটা শো-কেসেব কাছে দাঁড়িযে একমনে একটা চমৎকাব একটা শাড়িব কারুকার্য দেখছে। অবাক হযে ভাবি মিউজিযামটাব ভেতব ঢুকে গেলে সেই ঘবেব শো-কেশেব পাশে আজও বিভাকে পেতাম না তো' কিন্তু কেউ এখন আমাকে ঢুকতে দেবে না। বাত হযে গেছে। আমাব মনেব ধাঁধা নিযে একা একা মেসেব দিকে ফিবি। কিন্তু বাব বাব থমকে দাঁড়াই। কেন যেন মনে হয মিউজিযামেব সেই ঘবটায একবাব ঘুবে আসা উচিত ছিল।

একটা বাস চলে যাচ্ছে। শ্যামবাজাবেব দিকে। কিন্তু আমাকে হেঁটে যেতে হবে।

ধর্মতলায একটা হোটেলেব বাবান্দায একটি বুড়ো মুসলমান কতকগুলো বই নিযে বসেছে বিক্রি কববাব জন্য। একটা ইংবেজি ম্যাগাজিন আমাব পছন্দ হল। এব একটা প্রবন্ধ মৃত্যুব সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। মোটামুটি খুব আশাব কথাই বলেছে হযতো। মস্তবড় প্রবন্ধ, লেখকও খুব নামজাদা। মেসেব ঘবে গিযে লেপেব নীচে এমন শীতেব বাতে এ প্রবন্ধ পড়ে বেশ আস্বাদ পাওযা যাবে। দাম বড্ড বেশি চায— এক টাকা। আমাকে এতক্ষণ ধবে এই ম্যাগাজিনটা নাড়তে চাড়তে দেখেই হযতো বুড়ো আমাকে এবকম চেপে ধবেছে। দবকষাকষি কবি। বলি, বড় জোব আট আনা দিতে পাবি। সে বাজি নয। চলে যাই। কিন্তু তবুও সে আমাকে ফিবে ডাকে না। কাজেই কিছুক্ষণ ঘুবে এসে দশ আনাব পযসা তাব কাছে বাখি। সে এক টাকাব কম কিছুতেই নেবে না। আবাব খানিকটা

ঘুরে এসে বারো আনা বলি। চোদ্দ আনায় ঠিক হয়।

বড্ড বেশি খরচ হয়ে গেল। কিন্তু এত বড় একজন পণ্ডিত মানুষ জীবন মৃত্যুর সম্বন্ধে কী লিখেছে জানা দরকার।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, রাত নটা। মেসটা একটা গলির ভেতর ঢুকে। গলির মোড়ে একটা চায়ের দোকান। পাঁচ মিনিট গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম চা খাব কি না? এই শীতের রাতে চা খুব আদরের জিনিস। আরো তিন চার মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি। শেষে ঠিক করি এই যে মেসের ভাত যখন তৈরি হয়ে গেছে তখন এই অযথা খরচ করে কোনো লাভ নেই।

খেয়েদেয়ে বিছানায় শুতে এগারোটা বেজে গেল। মেসের ইলেকট্রিক বাতি এইবেলা নিবিয়ে দেবে। হরিহরবাবুর একটা লণ্ঠন আছে, তিনি দিতে রাজি, কাল অবিশ্যি তেলটা তাকে পুরিয়ে দিতে হবে, এই কড়ার।

লেপ টেনে ম্যাগাজিনটা নিয়ে শুয়ে পড়লাম। মৃত্যুর অমৃত আছে যে লেখক তা বিশ্বাস করেন। বাইবেল তা বিশ্বাস করে বলে, এবং তিনি বাইবেলে বিশ্বাস করেন বলে আগাগোড়া প্রবন্ধই বাইবেলের নজির। এবং ইতিহাস বা উপন্যাসের দু-পাঁচটা ভূতের গল্প।

বাতিটা নিবিয়ে ফেলি। ম্যাগাজিনটাকে চৌকির নীচে ঠেলে দিই। সমস্ত মন ব্যথায় ও তিক্ততায় ভরে ওঠে।

হরিহরবাবুর রুমমেট বললেন—'ওসব চাকরি-বাকরি খুঁজবেন না?

—'কিরকম?'

—'চুপচাপ ঘরে বসে থাকবেন—দেখুন না আমি কিরকম আছি। অফিস থেকে এসে কোথাও বেরুই?'

নেহাতই মজা পেয়েছে যেন। ভদ্রলোকটি সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়ে গভর্নমেন্টের কোনো এক অফিসে ঢুকে গেছে। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগে। এখন দেড়শো টাকা পায়।

আমি যে এমএ, তাও প্রায় বারো বছর হল পাশ করেছি। এ ব্যাপার তার কাছে চেপে যাই। মনে হয় চেপে নিয়েই আমার নিভৃত শিক্ষাদীক্ষার খানিকটা সম্মান আমি বজায় রাখতে পারি।

হরিহরবাবু বললেন— আপনার মতো হুটহাট মুখে রক্ত তুলে কোথাও ছুটে বেড়াই আমি। কোনো শ্যালকুকুরের খোশামোদ করি? তবুও তো দেখুন মাসের প্রথমে দেড়শোটি টাকা করে পাচ্ছি।

কিছু জবাব দিলাম না।

একটা চুরুট জ্বালালাম।

—'রাত কটা এখন?

—'দশটা আন্দাজ হবে।

—'তা চুরুট মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন?

—'পড়লাম তো।'

—'আজ আর লণ্ঠন চাই না?'

—'না।

—'বলি ওসব ইংরেজি প্রেমের উপন্যাস পড়ে তো অনেক জাগতে পারেন। আমার একটা কাজ করে দেবেন?'

—'কী কাজ?

—'না, এমন কিছু কাজ নয়।

চুরুট টানছিলাম।

—'গোটা দশেক টাকা ধার'—

—'টাকা নেই আমার কাছে।'

—'না থাকে, ওরকম করে বলতে হয় নাকি? এ তো হল চোয়াড়ের মতো উত্তর। মির্জাপুরের চিনাবাজারের এই ভাষা কলকাতায় এসব চলে না।'

দুজনেই চুপচাপ।

—'জানলেন?'

—'আমাকে বলছেন?'

—'হ্যাঁ আপনাব সঙ্গে এক কামবায আছি। সদ্ভাবে থাকতে হয। শুনুন চাকবি কী কবে পেতে হয।'

—'বলুন।'

—'গভর্নমেন্টেব চাকবি চান?'

—'আমাব বযস নেই।'

—'আ, মেলো যা' বলে হবিহববাবু বেজায মজা পেযে হাসতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট পবে হাসি থামলে একটা বিড়ি জ্বালিযে নিযে বললেন—'তাহলে মার্চেন্ট অফিসে ঢুকুন।'

—'কেবানিগিবি?'

—'এলে বিলে খালে পাশ কবি নি তো আমবা যে হাকিমগিবি পাব।'

—'তা কেবানি আমাকে নেবে কেন?'

—'তা নেবে, ম্যাকিননে যান, মার্টিনে যান, বড়বাবুদেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিতে বলেন তো আমাব শালাব ভগ্নীপোতেব শ্বশুবকে দিযে পাবি।' বলেই ফ্যাস ফ্যাস কবে হাসতে লাগল। খানিকক্ষণ পবে—'না ন্যাকড়া নয, কেবানিগিবিব চেষ্টা আপনি করুন বাবা লিঙ্গেশ্ববেব জোবে হযে যাবে।' বলেই আবাব সেই হাসি।—'আচ্ছা, চেষ্টা কববেন না?

—'কীসেব চেষ্টা?'

—'এই যা বললাম মার্চেন্ট অফিসে।'

—'নেবে না আমাকে।'

—'কেন?'

—'মার্চেন্টদেব ব্যবসাযেব আজকাল বড্ড দুদশা। তাছাড়া এ লাইনেব অভিজ্ঞতাও নেই।'

একটু পবে [...]

—'আমি কবেছিলাম ব্যবসা।'

—'সেই সিঙ্গাপুবে গিযে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কীসেব?'

—'চাযেব।'

—'আচ্ছা ওখানে কি বার্মা [...] শস্তা?'

চুপ কবে বইলাম।

—'আমাব একবাব যাবাব ইচ্ছা আছে সিঙ্গাপুবে।

কার্নিশেব দিকে তাকিযে চুরুট টানছিলাম।

—'মনে ভাববেন না যে আপনাব কাছ থেকে খোঁজখবব না পেলে আমাব কিছু এসে যাবে। একটা [...] খুলে নেব।'

[...]

—'একটা [...] খুলে নেব [...] অফিসে চাকবি কবি মশাই কেযাব কবি কাকে?

প্রথমে বাজাব জাত, তাবপবে আমবা [...] ?

আজকাল ছুঁড়ীবাও আমাদেব তাঁবেদাব, যত চান আপনি। শুনবেন একটা ঘুযেব ব্যাপাব?

—'সেটা শুনেছি তো।'

—'না না সেটা নয, আব একটা নতুন।'

—'থাক, একবকমই তো সব।'

—'এ ছুঁড়ীটা কালো নয, একদম ফবশা। একেবাবে মেমসাহেবদেব মতো।'

—'যদি বলি আপনাব এসব কথা আমি বিশ্বাস কবি না।?'

হবিহব অত্যন্ত গোঁজ হযে বসল, গলা খাকবে বললে—'হুঁ।'

কিন্তু এসব লোককে থামাবাব এছাড়া কোনো উপায নেই। এসব গল্প শুনবাব কোনো স্পৃহা নেই আমাব।

পরদিন রাতের বেলা।

হরিহর বললে—'চাকরিটাকরি কিছু জুটল?'

ঘাড় নেড়ে বললাম—'না।'

পেটের নুদি দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললে—'খোসামোদ করবার সে রকম আছে। সে করেছিলাম আমি [...] আমার শ্বশুর —পনেরোটা কই মাছ দিয়ে [...] —দুটো আস্ত কচি পাঁঠার মাংস, মুরুব্বিব গিন্নীর জন্য গরদের এক জোড়, মুরুব্বির নিজের জন্য জোড়া জোড়া গরদের পাঞ্জাবি চাদর আব নগদ পাঁচশো টাকা। নইলে অমনি চট করে দেড়শো টাকার চাকরি জোটে!'

লেপটা বুক অবধি টেনে নিলাম।

হরিহব বললে—'তাছাড়া পূর্বজন্মের পুণ্যফলও আছে।'

—'তা থাকতে পারে।'

—'নইলে দুজনেই তো আমবা বড়জোর এমএ অবধি পড়েছি, একজনে ১৫০ পায একজনে বকলম এরকম কেন?' বলেই গরম চাযের পেযালায ছোট্ট একদলা আপিং ফেলে দিল।

—'থাক সিঙ্গাপুরের খোঁজ আমি পেযেছি।'

—'পেলেন নাকি।'

—'অফিসে এমন দুশো লোক ওসব চিনেবাজারের খবব জানে। যা বললে—

চুপ করেছিলাম।

—'ঘেন্নাব কথা—'

—'ঘুমোবাব আযোজন করছিলাম।

—'জানলেন!'

—'কি?'

—'এমন দুশো লোক চিনেবাজাবেব খবর রাখে আপিসে।'

—'বেশ কথা।'

—'তাবা কি বলে জানেন?'

—'বলুন।'

—'বলে যে মানুষ ওখানে ব্যবসা কবতে যায না।'

—'তবে?'

—'যায চিনে ছেলেপিলেদেব বাপ হবাব জন্য।'

—'ক্ষতি কি?'

—'একটা চাইনিজ কলোনি খুলে তারপর দেশে পালিযে আসে।' বলে বিড়ি জ্বালালেন। —'আমিও যাব।'

—'কোথায?'

—'সিঙ্গাপুবে।'

—'কবে?'

—'এই দু-বছর প্রিভিলেজ লিভ পাচ্ছি, তাব পবেই বিটাযাব। সিঙ্গাপুবে গিযে থাকব ছমাস, আব সাংহাইতে ছমাস, তারপর কলম্বো হযে কলকাতায।' চাযে এক চুমুক দিযে বললেন—'জানলেন? এ আমি যাব। শুধু কলোনির জন্য নয, দেশ বিদেশ না ঘুরলে মানুষ কি মানুষ হয? কেবল কলকাতা বানাঘাট, রানাঘাট কলকাতা? কোনো কাজের কথা হল? জানলেন?

—'বলুন।'

—'আচ্ছা বর্মিগুলো বেশি হাঁড়িমুখো দেখতে না চাযনাগুলো? বিড়িতে এক টান দিযে বললে—'সাহেব বাঙালিদের সংস্পর্শে ওদের ভেতর যে জাতের সৃষ্টি হয়েছে তাই বা কেমন? চাযে এক চুমুক দিয়ে বললে—'সে দো-আঁশলাগুলো কত বড়ই-বা হল?' বিড়িতে এক টান দিযে বললে—'ফবশা দেখতে তো?' চাযে আর এক চুমুক দিযে বললে—'যাক, হলদে হোক শাদা হোক হাড়ি হোক ডেচকি হোক কালো তো নয।' বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালবেলা আমি এগারোটাব সময ফিবে এসেছি।

হবিহব—'এই আমি উঠলাম।'

—'ঘুমেব থেকে?'

—'তবে কি?'

—'এত দেবিতে যে?'

-'আমাব কি কোনো চাকবি খুঁজতে হয নাকি? নিন বিড়ি।' নিলাম।

—'যেদিন অফিস থাকে সেদিন নটাব সময উঠি, তাবপব শিবেব মাথায একটু জল দিযে [...] খেযে অফিস ঝেড়ে আসি। কিবকম চালে যাই দেখেছেন? ফ্লানেলেব শার্ট তাব ওপব পঁচানব্বই টাকা দামেব শালটি। সিল্কেব ইষ্টকিং কিড লেদাবেব বাদামি জুতো, চোদ্দ টাকা জোড়া।' চোখ পাকিযে আমাব দিকে তাকাল।—'আব যেদিন অফিস নেই সেদিন সাবাদিন লেপেব নীচে, সাবাদিন চা, সাবাদিন চুরুট আপিং। [...]

—'বেশ।'

—'জিজ্ঞেস কবলেন না আমাব জীবনেব উদ্দেশ্যটা কি?'

—'না না আব জিজ্ঞেস কবে কি লাভ তা তো দেখছি।'

—'কেন, জানেন?' বিড়িতে এক টান দিযে বললে—'ঠিক জানেন না।' হাত নেড়ে বললে—'টাকাকড়ি ধনজন কিছু না। যতক্ষণ না মানুষ বোঝে যে ম্যান ইজ [...] [...] ততক্ষণ কিচ্ছু হবে না।' বিড়িটা আবাব মুখে তুলে নিযে বললে—ঠিক বলি নি?'

—'ঠিক।'

ঘাড় দুলিযে হবিহব বললে—'নিন একটা বিড়ি।

নেযা গেল।

—'অফিসে যাই, চুবি কবি, ঘুষ খাই কিন্তু বাবোটি ছেলেপিলেব বাবা আমি সেই কথা মনে কবেই তো ওইসব কাজ কবি।'

—'বাবোটি ছেলেপিলে বুঝি?'

—'হ্যাঁ, পেটে আব একটি আছে। আজকালই আসবে। তাই আব এ শনিবাব বাড়ি যাই নি। ছেলে হোক মেযে হোক আসছে শনিবাব তেবোটি হাতড়ে পাওয়া যাবে। এদেব মানুষ কবতে হবে তো। সেই বাবদ যা কিছু মাবা যায কিছুই অধর্ম নয। যদি তা হত তাহলে ভগবান ঢেব আগেই খসাতেন। কিন্তু তা তিনি কবেন নি। তিনি যে নেংটি পবে সন্ন্যাসী হলে ধর্ম হয না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধর্ম সংসাবেই। বিড়িতে এক টান দিযে বললে—'ভালো গৃহী হও। ও সিঙ্গাপুব সিঙ্গাপুব আব নয, বউ-ব কাছে ফিবে যাও। বাঁছা? কুৎসিত? তা কি কববে? ভগবান যা দিযেছেন তা গ্রহণ কবো। সব সমযই মনে বেখো [...] ।'

[...]

বাত্তিবে হবিহব হুঁকো টানতে টানতে বললে—'তেবোটি ছেলেপিলেব সব অবিশ্যি বেঁচে নেই।'

খববেব কাগজ পড়ছিলাম। কাগজ বেখে দিলাম। মোটামুটি দেখা হযেছে।

—'উঁহু নটি গেছে।'

—'এত ছেলেপিলে মবে গেল আপনাব?'

—'আঁতুড়েই মবে—'

—'কীসে—'

—'এই পেটেব থেকে মবা দামোদব নেমে আসবেন আব কি—'

—'এদেব মাযেব তাহলে বড্ড কষ্ট?'

—'হিঃ এক মা নাকি?'

—'তবে?'

—'তিন পক্ষ।' খানিক ধোঁযা কার্নিশেব দিকে উড়িযে দিযে বললে—'তা ভালোই হযেছে, মেযেব ঝাড়ই মবেছে, ভগবান বুঝেই মাবেন। জানলেন?'

—'বলুন।'

—'একবাব আমাব চোখ দিযে ঝবঝব কবে জল পড়ত, তাবপব গেলাম সাহেব ডাক্তাবেব কাছে চোখ কাটাতে। একশো টাকা হেঁকে বসল। কাটাব কি না-কাটাব ভেবে একটু পিছু হটে গেলাম। আমাব

বদলে আব এক মক্কেল গেলেন এগিয়ে, সাহেব তাব চোখেব অপাবেশন শুরু কবে দিল, কিন্তু এক মজাব [...] তাবপব কাটবেন আমাব। হযে গেল।'

—'কি হল আবাব?'

—'চোখেব এমন এক পবদা কেটে দিল সেই মেড়োশালাব যে [...] এব [...] ছিঁড়ে গেল।'

—'তাই নাকি?'

—'তক্ষুনি পাগল।'

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

হবিহব অত্যন্ত প্রসন্নভাবে তামাক টানতে টানতে বললে—'সেই থেকেই বুঝেছি [...] [...]

পবদিন অফিস থেকে ফিবে এসে হবিহব ব্যাগেব থেকে চকচকে পনেবোটা দশ টাকাব নোট বেব কবে আমাকে দেখাতে দেখাতে চোখ পাকিয়ে বললে—'জানলেন? [...] [...]

অবাক হযে ভাবছিলাম এমন ইংবেজিনবিশ কাপ্তেনকে গভর্নমেন্ট মাসে মাসে দেড়শো টাকা কবে দেয। কিন্তু গভর্নমেন্ট দেয না, দেয জীবন। জীবন বড় বিচিত্র জিনিস।

বাংলা খববেব কাগজে সুবিধা হবে না, বাংলা ভালো লিখতে পাবি না আমি। কলকাতাব কোনো ইংবেজি কাগজেব স্টাফে ঢোকা যায কিনা।

একটি খববেব কাগজেব পবিচালকেব বাসায গেলাম। বেলা তখন প্রায এগাবোটা। কিন্তু ছুটিব দিন ছিল। মাববেলেব মেঝে প্রকাণ্ড বড় ফিটফাট চমৎকাব বাড়ি। শহবেব এক প্রান্তে, নির্জন, নিবালা।

[...] গন্ধ আসছিল। খুব সম্ভব কাটলেট ভাজা হচ্ছে। ডিনাব তৈবি হচ্ছিল হযতো। কিন্তু ভদ্রলোককে পাওযা গেল। তিনি তখনো ড্রযিংরুমে একাই বসে লিখছিলেন।

নমস্কাব জানিযে নিজেব নিবেদন জানালাম। চাকবি চাইতে হলে যা যা যেমন যেমন জানাতে হয সমস্তটুকু।

সম্পাদকেব সঙ্গে দেখা কবতে বললেন। সেদিন দুপুব বেলাযই কাগজেব অফিসে যাই।

সম্পাদককে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখি।

বললেন—'একটু বসুন।'

লিখছিলেন, টেলিফোন কবছিলেন, কোযার্টাব তিনেক পব আমাকে বললেন—'কী দবকাব আপনাব?'

—'আপনাদেব কাগজে স্টাফে—' চুপ কবলাম।

—'কাজ চান?'

—'আজ্ঞে।'

—'কীবকম কাজ?'

—'কম্পোজিটবেব নয অবিশ্যি।'

—'লিখতে চান?'

—'হ্যাঁ।'

—'এব আগে কোন কলেজে ছিলেন?'

—'কোথাও না, এমএ পাশ কবে—'

—'কীসে এমএ?'

—'ইংবেজিতে।'

—'এমএ পাশ কবে কি কবছিলেন?'

—'সিঙ্গাপুবে গিযেছিলাম।'

—'বাপবে!'

—'সেখানে আপনাদেব [...] আছে বোধ কবি।'

—'না না।'

—'তা থাকলে মন্দ হত না, নানাবকম [...] খবব আছে। ফেব সিঙ্গাপুবে যাবেন নাকি?'

—'কোনো মতলব নেই।'

—'সাংহাই গিযেছিলেন?'

—'একবার।'

—'চায় না সব—' বলে দুটো পান মুখে দিয়ে বললেন—'সিঙ্গাপুরে কেন গেলেন?'

—'গিয়ে পড়লাম তো দেখি।'

—'হারা উদ্দেশে?'

—'একটা চায়ের স্টল খুলেছিলাম।'

'ইন্টারেস্টিং খুব।' বলে এক তাল কাগজপত্র নথি দলিলে মন দিলেন। একটু পরে চোখ তুলে বললেন—'তা ব্যবসাই করুন না, সম্পাদকী করে কোনো লাভ নেই। সটকে পড়তে পারলে বাঁচি।'

এইরকম কথা বলে হয়তো। পৃথিবীতে সব মানুষেরই অস্তিত্ব। সম্পাদকীয় কাজ পেলে আমি তো বেঁচে যাই। ইনি চাচ্ছেন পালাতে। আশ্চর্য হয়ে জানলার ভেতর দিয়ে বাইরে পৃথিবীর দিকে তাকালাম।

কাজ করতে করতে সম্পাদক বললেন—'স্টাফে যে কজন আছেন তাঁদেরই ভেতব ছাঁটকাট হবে। মাইনে দিতে পারি না। আপনি অন্য কোনো কাগজে গিয়ে দেখুন।'

একে একে সমস্ত কলকাতার ইংরেজি কাগজের অফিস ঘুরে এলাম। দু-এক জায়গায় প্রেসম্যান কিংবা কম্পোজিটরের দরকার আছে। কিন্তু টেলিগ্রাম সাজাবার, বাংলা বা ইংরেজি লিখবার জন্য বিস্তর লোক বযেছে। বিনি পয়সাও বিস্তর পাওয়া যায়। বড় বড় দেশী ইনসিওরেন্স কোম্পানি ঘুরে দেখি দেয়ালে দেয়ালে সবাই নোভ্যাকান্সি টাঙিয়ে দিয়েছে। তবুও ম্যানেজার বা সেক্রেটারিদের দেখা না করে বিদায় নেই না। এজেন্সি দিতে সকলেই রাজি। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো কিছু দিতে কেউই সম্মত নয়। [...] হাতে নিজেও আলোচনা কবে দেখি এজেন্সি হচ্ছে টঙের প্রথম ধাপ, তারপর আস্তে আস্তে উঠতে হবে।

কিন্তু যদিই বা এজেন্সি নেই কাজের জীবনবীমার জন্য দালালি করব আমি? সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে এই বাবো বছব পরে কলকাতা আমাব কাছে ঢের অপরিচিত হযে গেছে। কিন্তু তবুও যতটি লোকের সঙ্গে পরিচয আছে, তাদের সচ্ছলতা এমনই অস্পষ্ট যে যদিও বা চক্ষুলজ্জাব খাতিরে কেউ আমার ওপব কৃপা করে—তা কেউ কববে বলে মনে হয না, তা হলেও দু-একটা প্রিমিযাম অবধি দিতে পারবে মাত্র। কিংবা ডাক্তারের ফি দেবে শুধু। কিন্তু অতখানি আন্তরিকতা ও আপ্যাযিত করবার প্রবৃত্তি তাদেব কারু যে আছে তা আমার মনে হয না। যদি থেকে তাকে তাহলে অন্য কোনো এজেন্ট এসে তা কি উজাড় করে যায নি? শহর যে এইসব লোকে গিজগিজ কবছে।

এইসব ভেবে ইতস্তত করতে থাকি। সন্দেহেব থেকে হতাশাব জন্ম হয। হতাশা মানুষকে অকেজো করে ফেলে। কাজেই নিজেকে হতাশ হতে দেই না। যুক্তি কবতেও যাই না। তাবপব একদিন বাস্তবিক এজেন্সি নেই। সকাল থেকে অনেক রাত অবধি পরিচিত অপরিচিত অনেক দুযাবে ঘুবি। গভীর রাতে মুখেব ওপর লেপ টেনে ভাবি লজ্জা গ্লানি আজ সারাদিন অনেক পেযেছি কিন্তু তার বদলে এক আধটা পযসার আশা ভরসাও অন্তত পাওয়া উচিত ছিল।

বিচ্ছেদের কথা

স্টিমার স্টেশনে গাড়ি এসে থামে।

তাকিয়ে দেখি চার নম্বর ফ্ল্যাটেব স্টিমারেব থেকে গাঢ় বঙেব ধোঁয়া উড়ছে। স্টিমার ছাড়বার আর দেবি নেই। মাথার ওপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি অঘ্রাণের আকাশ মেঘে থমথম করছে। টিকিট ঘরেব দিকে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিযে যেতে হয। ছোট্ট ঘুলঘুলির ভেতর দিযে একটা দশ টাকাব নোট ঠেলে দিই। নেট ফেরৎ হযে আসে। চেঞ্জ নেই তাদের। কাছে একটা মস্তবড় চাযেব দোকান, কিন্তু দশ টাকার রেজগি দিতে পারে না তারা। পানের দোকানেব উড়ে-মালিকেব নাম ভগবান, তাকে দু-এক আনা পযসা কবলাতে সে গুনেগেঁথে দশটা টাকা বের কবে দেয। মেকি কি খাঁটি বুঝতে পাবি না। বাজাবার সময নেই। সব টাকাযই মহারানীর মুণ্ডের ছাপ। কিন্তু ভগবান খুব পাকা ব্যবসাযী। কাজেই অস্বস্তি ছিল না।

টিকিটবাবু টাকা বাজিয়ে নেন। সব টাকাই বাজে বটে।

জিজ্ঞেস করি—'স্টিমার ছাড়তে কত দেবি?

—'এখনো পনেরো-কুড়ি মিনিট।'

গভীব আশ্বাস পাই।

একটা হলদে রঙেব থার্ড ক্লাসের টিকিট হাতে নিযে ছ্যাকড়া গাড়িটাব কাছে এগিযে গিয়ে দেখি চাব-পাঁচজন কুলি মালপত্র ছেঁকে ধবেছে।

একটা বেডিং, মাঝাবি গোছেব একটা সুটকেশ টিনেব পিজবোর্ডেব ছোট একটা অ্যাটাশে কেস। একজন তাগড়া উড়ে-কুলি সমস্ত মালপত্র গ্রেপ্তাব কবে দাঁড়িযে আছে। একটি ছোট্ট ছেলেব চোখমুখ বড় সকরুণ, সমস্ত শরীব অনাহাবে সলতেব মতো।

অবাক হযে জিজ্ঞেস করি—'তুমি মাল টানতে পার?'

সে খুব ভবসা পেয়ে এগিযে আসে। তাব মাথায বাক্স আর বিছানা তুলে দেই। বোঝা বিশেষ ভারী নয তেমন। কিন্তু ছেলেটিব সমস্ত শরীব কাঁপতে থাকে।

একটু বিস্মিত হযে বলি—'তুমি পাববে না তো খোকা।'

কিন্তু পাছে অন্য কেউ এসে তাকে বঞ্চিত কবে এই ভযে মাল নিযে সে স্টিমাবেব দিকে দৌড় দিযেছে।

সেকেন্ড ক্লাসেব কিনাব ঘিষে থার্ড ক্লাসেব যে ফ্ল্যাটটুকু সেইখানেহ বিছানা পাতি। জাযগাটা বেশ নিবিবিলি। একেবাবে নদীর বুকেব কাছে। কিন্তু এখন শীতেব সময, অঘ্রাণ মাস, স্টিমাবেব এই কোণটুকুতে ঠাণ্ডা বড্ড বেশি। সারাবাত কনকনে নদীব জলেব আঁচ মাঠপ্রান্তবেব হাড়ভাঙা হাওযাব ঝাপটা এইখানেই সমস্ত বাত ধবে সোঁ -সোঁ করতে থাকে। কিন্তু এই শীতেই আমার ভালো লাগে, এত ভালো লাগে যে বেলিঙেব চটের পবদাটা আমি আর টেনে দিতে চাই না। সঙ্গে কম্বল আছে, নদীর বুকেব সাথে পাশাপাশি হয সমস্ত বাত এই কম্বল মুড়ি দিয়ে শোযা যাবে। এখন আবাম! যাবা বুদ্ধিমান তাবা সব বযেলারেব চাবপাশ গিরে বিছানা পেতে নিয়েছে। শীতেব সময যে কোনো অসহ্য গবমের সংস্পর্শে থাকতে এবা ভালোবাসে। এদের দিকে তাকিযে পাড়াগাঁব দুপুরেব কথা মনে জেগে ওঠে। প্রচুব মাছি ও মিঠে তরমুজেব কথা।

বয়েলাবের পাশে একজন লম্বা চৌড়ো ব্যবসাযী মাড়োযাবি যুবা সেই সন্ধ্যার থেকেই শুযে আছে। মাথায মস্তবড় গোলাপি রঙের পাগড়ি, গাযে মলিদাব চাপকান, একজোড়া কালো গোঁফ দাঁড়কাকেব বাচ্চার দুটো পাখার মতো ছড়িযে রযেছে যেন। মানুষটিব চোখেমুখে হাবভাবে নিবেট আত্মলালসা ও আত্মতৃপ্তি, অনেকখানি জাযগা জুড়ে সে নির্বিবাদে গড়াচ্ছে।

এ প্রবৃত্তি রুজি ও জীবনধারণের নিয়মেব থেকে আমার কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা যে কত দূবে অবাক হযে ভাবি তাই। কেমন যেন বেদনা বোধ হয়। বিছানার থেকে কযলাব গুড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে মাড়োযারিটাব দিকে তাকাই একবার। বাস্তবিক পৃথিবী ওই মানুষটিকে এত পুবস্কার দিল কেন? পৃথিবী আমাদেব কাছ থেকে কী চায? কাদেব সে উপযুক্ত বোধ কবে? মনোনীত কবে? এই মাড়োযাড়ি তো খুব গভীরভাবে

মনোনীত। অথচ কল্পনাব অঙ্কুব এব মনেব ভেতব একটুও আছে কী? তা নেই। কল্পনা ও প্রেম মানুষকে আঘাত দেয শুধু, নিবাভবণ কবে।

স্টিমাব চলছে।

ফ্ল্যাটেব উপব হেঁটে পাযচাবি কবি।

ভিড় বেশি নেই। একজন চিনেম্যান নীল পেন্টুলুন ও চককাটা জামা গাযে দিযে মস্তবড় একটা গাঁটবি পিঠে নিযে [...] দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে।

থার্ড ক্লাসে ঢুকতেই বাটলাবেব এক গলাধাক্কা খেল। তাবপব [...] আব এক প্রান্তে সেকেন্ড ক্লাসেব কেবিনগুলোব দিকে তাব যাত্রা। [...] সবগুলো প্রায ফাঁকা। একটাব ভেতব গাঁটবি ফেলে পালাল সে। কিন্তু কিছুক্ষণ পবে স্টিমাব অফিসেব (?) চাপবাশি এসে বেব কবে দিল তাকে। তাবপব বেচাবা থার্ড ক্লাসেব ফ্ল্যাটে আসে। [...] কিনাব ঘিষে অল্প একটু জাযগা কবে নেয। গাঁটবি খুলবাব কোনো আগ্রহ আব নেই তাব। কাছেব পাটাতনেব উপবেই চুপ কবে বসে, কাবো দিকে তাকাবাব ভবসা আব নেই তাব। তাকায সে নদীব দিকে। একটা সিগাবেট জ্বালায। নাইট ক্যাপটা মাথাব থেকে একবাব খুলে ঝেড়ে নেয়। খানিকক্ষণ টুপিটাব দিকে তাকিযে থাকে। তাবপব ধীবে ধীবে মাথায আঁটে আবাব।

ফার্স্ট ক্লাসে চড়বাব সাধ অবিশ্যি সকলেবই কিন্তু সেজন্য যে অত্যন্ত মূল্যবান টিকিটেব দবকাব এ চিনেম্যান কী তা জানে না?

পকেটেব থেকে ছোট একটা মানিব্যাগ বেব কবে সে। হাতেব ওপব ঢেলে পযসা গুনতে থাকে। একটা হলদে বঙেব টিটিক বেবিযে পড়ে, থার্ড ক্লাসেব। যাক, টিকিট সে কিনেছে। তাব বকমসকম দেখে মনে হযেছিল বিনা টিকিটে ফার্স্ট ক্লাসে চড়বাব স্বপ্ন ও সাহস বুকে নিযে ভ্রমণে নেমেছে সে। সাহেববা যে বলে যে এশিযাব লোকগুলো চোব বাটপাব নোংবা নিযমহীন শৃঙ্খলাহীন মেরুদণ্ডহীন— নদীব দিকে তাকিযে সেই কথা ভাবতে থাকি। এশিযাব কোটি কোটি নোংবা নিবক্ষব নিঃহায জনসংখ্যা চোখেব সামনে গিজ গিজ কবতে থাকে । বড্ড অবসাদ বোধ হয।

জাহাজেব বেলিঙেব দিকে এগিযে যাই। অঘ্রাণেব আকাশ ঘিবে কিছুক্ষণ আগে যে শ্রাবণেব মতো মেঘ কবেছিল সে সব মেঘেব কোনো আভাসও নেই। এখন আব। সমস্ত আকাশ ঝাড়াঝাপটা পবিষ্কাব, অনেক তাবা উঠেছে। নদীব ওপবেব ভাঁটশ্যাওড়া কবমচা ও কুলেব জঙ্গলেব ভেতব থেকে চাঁদ উঠছে। কোন তিথিব চাঁদ?

কেমন যেন বিচ্ছেদ বিমর্ষতাব কলববহীন কক্ষেব থেকে জেগে উঠেছে সে। আজ বোধকবি কৃষ্ণা চতুর্থী। শীত কবছে। নদীব দিকেব বসে থেকে চোখ ফেবাই। বেলিঙে ঠেশ দিযে দাঁড়াই। প্যাসেঞ্জাবদেব দিকে তাকাই। দুজন নেপালি একটা ফ্ল্যাশলাইট নিযে খেলা কবছে। কখনো নদীব ওপব, কখনো নদীব ওপাবেব গাছপালার ভেতবে, কখনো-বা প্যাসেঞ্জাবদেব দিকে ফ্ল্যাশ ছড়িযে আমোদ তাদেব। প্যাসেঞ্জাব সমস্তই প্রায বাঙালি।

আবাব নদীব দিকে তাকাই।

হঠাৎ একটা ঝগড়াব শব্দে ফিবে তাকিযে দেখি কযেকটি বাঙালি ছেলে নেপালি দুটিকে ছেঁকে ধবেছে। চোখেব উপব টর্চেব আলো ফেলছিল বলে। যাক, বাকবিতণ্ডা বেশিক্ষণ চলে না। কেউ কাবো গাযে হাত দেয নি। কিছুক্ষণ পবে সমস্তই আবাব নিস্তব্ধ।

নেপালিবা পাটাতনেব উপব কম্বল বিছিযে নিযেছে। টর্চটা বাক্সেব ভেতব বেখেছিল। একটা পুঁটুলিব ভেতব থেকে কমলা বেব কবে নিল। কমলাব বাকল ও ছিবড়ে চোখ যেদিকে চায সেদিকেই ছুঁড়ে ফেলছে। আমি অনেক দূবে বেলিঙে ঠেশ দিযে দাঁড়িযে। নেপালিদেব এ ব্যবহাবেব প্রতিবাদ কবতে ইচ্ছা কবে। কিন্তু প্রতিবাদ কবল চিনেম্যান। তাব গাঁটবিব উপব একটা বাকল এসে পড়েছে। তাবপব দু-তিনটে ছিবড়ে। গাঁটাবিব ভেতব থেকে সে একটা ছুবি বেব কবে ফেলেছে। নেপালি দুটিও ভোজালি নিযে তৈবি।

নেপালি দুটিব দিকে কটমট কবে তাকিযে নিজেব মনে বিড় বিড় কবে বকতে বকতে চিনেম্যান ধীবে ধীবে ছুবিটা গুটিযে নিল তাব। এছাড়া কী আব কবা যায? চিনাবা ঢেব পুবোনো জাত। কি কবে বেঁচে থাকতে হয তাবা তা জানে। কাজেই সে সব ভুলে যায, সব ক্ষমা কবে। গাঁটবিব ওপব মাথা বেখে ঘুমেব ভান কবে । এমন অভিজ্ঞ, জ্ঞানী জাত।

নেপালিবা ভোজালি আস্তে আস্তে খাপেব ভেতব বেখে দেয। চিনে ঘুমায নি, ঘুমেব ভড়ং কবে পড়েছিল। আড়চোখে নেপালি দুটিকে এতক্ষণ ধবে ঠাওব কবছে।

এখন সে ঘুমের চটকা ভেঙে উঠে বসে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে জ্বালায়, ফুঁকতে থাকে।

খানিকক্ষণ পরে, দেখলাম চিনে ভাঙা হিন্দুস্থানিতে নেপালিদের সঙ্গে আলাপ করছে, সিগারেট সাধছে। তারপর যুদ্ধের গল্প [...] ও জাপানিদের কথা। এতও সে জানে। একজন সামান্য চিনেম্যান কত হাজার হাজার বছরে সভ্যতা ও সংরক্ষণের প্রতিনিধি যে অনেক সময়ই আমরা ভুলে যাই। তাকে মগ বা বারমিজদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ফেলে বিচার করি। কিন্তু এরকম উপেক্ষার পাত্র সে নয়। নদীর দিকে তাকিয়ে ভাবি আমি।

শীতে নদীতে বেশি ঢেউ নেই। জলের স্রোতের ভেতর চাঁদটা ভেঙে দুমড়ে একটা সোনালি জিজ্ঞাসাচিহ্নের মতো আমাদের পিছু নিয়েছে। মুখের থেকে বুকে তার ঢের উজ্জ্বল উৎফুল্ল প্রশ্ন—জলেব কলকলানির থেকে অনবরত ঝরে পড়ছে। সমস্ত প্রশ্নের সমাধানই যেন এক একবার অজস্র সোনার গুঁড়ির মতন জলের ভেতর ছিটিয়ে ফেলছে সে। আবার গুটিয়ে নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে। না, সব কিছু নয়, স্টিমারের মস্তবড় চাকাদুটো জল পিঁজে চলেছে তারই শব্দ শুধু চারদিকে। ঢেউয়ের ভেতর যে আলোর খিলিখিলি তা লক্ষ যোজন দূরের হিমশুভ্র চাঁদটার। এই শুধু, এছাড়া অন্য কোনো রহস্য কোথাও নেই আর। মাড়োয়াড়ি ভদ্রলোককে যদি জিজ্ঞেস করা যায় সে-ও এই কথাই বলবে। নেপালি চিনে জাহাজের সমস্ত পাসেঞ্জারই। স্টিমারের জাকার দীর্ণ বিদীর্ণ জলের আওযাজ শুনছে শুধু। কোনো কুহকিনীর হাসির ঝংকার তাদেব মনের ত্রিসীমানাযও নে। ঢেউযেব ভেতর সোনালি। জিজ্ঞাসাচিহ্নেব বিরবিচ্ছিন্ন কুহক সে যে সৃষ্টি করে চলেছে তাও তারা অস্বীকাব কববে। তাদের কথাই সত্য।

ফ্ল্যাটের একদিকে স্টিমারের চায়ের স্টল। স্টলের বেঞ্চিতে গিযে বসে এককাপ চাযের অর্ডার দেব কিনা ভাবি। শুকনো পেয়ারা পাতার রসের মতো এ চা অনেক খেয়েছি আমি। আজ আর খেতে প্রবৃত্তি হয না।

ইশারা না করতেই চা তৈরি হয়ে যায আমার জন্য। চামচ দিয়ে পেযালাটা একটু ভালো করে ঘুঁটিযে এক চুমুক খেয়েই পেযালা সরিযে রাখি। পুরোনো সোঁদা বার্লির জলে ঢের গুড়ের মিষ্টি মেশানো হযেছে যেন। কিন্তু ববাববই তো এইরকম। মিছেমিছি চেযেছিলাম কেন?

স্টলের দোকানদারকে জিজ্ঞেস কবি—'চাযেব পাতা পেলে কোত্থেকে?'

—'ব্রুকবন্ডের।'

—'বটে, তাছাড়া আর কি?'

—'কখনো লিপ্টনের মাল রাখি, কখনো ব্রুকবন্ডের।'

একটা চুরুট জ্বালাই।

—'বলেছি পাঁচ-সাত বছব আগের কথা হুঁজুর, এখন বিলিতি চা কেউ খায না।'

—'কী খা?'

—'দার্জিলিঙেব চা খায।'

—'কিন্তু তোমাব এগুলো করমচা পাতা গুঁড়ো।'

—'হবে। অসম্ভব কি!'

চুরুটে একটা টান দিলাম।

—'একটা মেড়ুযা এসে ডাস্ট টি বলে বিক্রি করে গেছে। তখুনি দেখলাম চাযেব কোনো গন্ধ নেই। কিন্তু বড্ড শস্তা, হয়তো কবাতের গুঁড়ো।'

চাযে চুমুক দিতে দিতে একজন প্যাসেঞ্জাব—'হযতো ঘোড়াব নাদ শুকিযে গুঁড়ো করে নিযেছে।'

—'খাচ্ছেন তো।'

—'চা বলে যা দেবে নাভিশ্বাস পর্যন্ত না খেযে পাবব কি আব? ভদ্রলোক আগ্রহেব সঙ্গে খেতে লাগলেন।

বেঞ্চে চুপ করে বসে আছি।

স্টলওয়ালা বললে—'চায়ের পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে আপনার।'

—'না খাব না আর।'

—'এক চুমুক তো খেলেন শুধু।'

—'পেয়ালাটা তুমি নিয়ে যাও, কত দাম?'

'পেযালা মাথায চার পযসা।'

দাম চুকিয়ে নেভানো চুরুটটা জ্বালাই আবার। নিভে গিয়েছিল। কালেক্টরেটের বেয়ারা হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ আমার বেঞ্চ জুড়ে এসে বসল। আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না।

চায়ের দোকানদার বললে—'দারোয়ানজি, মুরগির ডিম খাবে?'

ঝগড়া বেঁধে গেল। ঝগড়া যখন মাঝপথে তখন বোঝা গেল মুরগির ডিম দূরের কথা দারোয়ান হাঁসের ডিমও ছুঁতে, এমনকী সে ডিমের দিকে তাকাতেও সে রাজি নয়। ডিম মুরগির বা হাঁসের বিধাতা যে কেন তৈরি করলেন এই মর্মান্তিকতা নিয়ে কথাবার্তা খুব আন্তরিক হয়ে ওঠে। পরমাত্মার কথা বলে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত বেড়ে গেছে। চাঁদ আকাশের অনেক উপরে উঠে গেছে। এখান থেকে দেখা যায় না আর। অনেকদূরে জঙ্গলের রেখা, নদীর ওপার কেমন কুয়াশায় আবছায়া, অনেকটা অন্ধকারের মতন দেখায়।

চায়ের দোকানদার খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে সব কথা শুনছিল, কিন্তু এসব শুনতে ভালো লাগে না তার। সে বরং অন্য কথা পাড়ে। বলে—'জানেন দারোয়ানজি বাটপাড়দের কাণ্ড?'

দারোয়ান একটা বিড়ি জ্বালিয়ে দোকানির দিকে তাকায়।

—'ইস্টিমারের সারেং খালাসি কেরানি কোনো শালাকে বিশ্বাস করবেন না।'

দারোয়ান বিড়িতে টান দিয়ে ঘাড় নাড়ে। এক পরমাত্মা ও ভগবান ছাড়া কাউকে সে বিশ্বাস করে না।

স্টলওয়ালা বললে—'সারেং খালাসি কেরানি সব শালা দু মণ আড়াই-মণ করে বেগুন আর পালংশাক রোজ খুলনার হাট থেকে কিনে ইস্টিমারে লুকিয়ে চালান দেয়।'

—'ভাড়া কি দেয় না?'

—'আ, বললাম যে লুকিয়ে বাটপাড়ি করে।'

—'ওহি এইরকমই হোবে, কুছ ফয়দা তো হোগা নেই। ওহি ভগবান সব বিচার করবে।'

—'ভগবানের মুখে মাথায় লাঠি।'

—'খুলনার বাজারে বাইগন খুব মিষ্টি আছে? সের কেতনা?'

—'চোখের মাথা খেয়ে আমি অ্যাদ্দিন চুপ করে আছি, এবার দশমণ বেগুন চালান দেব।'

—'বাইগনের ব্যবসা হোবে।'

—'আর পাঁচমণ পালং শাক।'

—'ইস' পাঁচ মণ তো হল, চেকার কুছ ঘুষ মাঙবে।'

উঠে দাঁড়াই। যেখানে বিছানা পেতে রেখেছিলাম সেখানে গিয়ে দেখি আমার বিছানাটা গুটিয়ে সরিয়ে রেখে সেইখানেই বিছানা পেতে শুয়ে আছেন একজন ভদ্রলোক। ভদ্রলোক বুড়ো মানুষ। কেমন নিঃসহায়ের মতো।

আমাকে এসে দাঁড়াতে দেখেই উঠে বসলেন। বললেন—'আপনি সরকারি চাকরি করেন?'

—'কে আমি?'

—'আজ্ঞে।'

—'কই না তো।'

ভদ্রলোক একটু ভরসা পেয়ে—'আপনি যথার্থ বলেছেন তো।'

পাশের একজন আধবয়েসী লোক—'আঃ এইজন্য আর মিছে কথা কেন বলবেন?

—'না, আপনার বিছানার আশেপাশে দেখলাম স্ট্র্যাপ, এগুলো আপনার?'

—'হ্যাঁ।'

—'ট্র্যাপ দিয়ে বিছানা বেঁধে এনেছিলেন বুঝি?'

—'আজ্ঞে।'

—'তাই ভাবছিলাম।'

আধবয়েসী লোক—'আঃ স্ট্র্যাপ দিয়ে বিছানা বাঁধলেই বুঝি সরকারের চাকর হতে হবে। বলে একটু সন্দিগ্ধভাবে হাসলেন। বুড়ো—'না, আমরা বাঁধি নারকেলের দড়ি দিয়ে কখনো-বা আউট দিয়ে। আমি ভাবছিলাম কি—' কিন্তু মাথা দু-একবার চুলকে নিয়ে দু-একটা হাই তুলে কিছু বললেন না আর। একটু থেকে—'আহা, আপনি বসুন বসুন, দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

আমার গুটানো বিছানায় এক কিনারে বসলাম।

বুড়ো—'তারপর কুমিরের চামড়ার সুটকেশ, ওটাও কি আপনার?'

—'*হ্যাঁ। কিন্তু এটা তো টিনের।*'

—'টিনের?' বুড়ো সহসা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন—'এই যে দেখেছি আমি চামড়ার?' বলে যথাসম্ভব চোখ বিস্মিত কুঞ্চিত কের সুটকেশটার দিকে তাকাতে লাগলেন।

বুড়ো লোকটা পকেটের থেকে একটা পেনসিল বের করে বললেন—'আচ্ছা, টিনের? আমার মনে হয় রঙ্গ করছেন আমাদের সঙ্গে। আচ্ছা নেবেন এই পেনসিলটা? নিন না. বড্ড বেয়াড়ামো করছি, মাপ করবেন, আচ্ছা এই পেনসিলটা নিয়ে একটু বাজিয়ে দেখবেন আপনার বাক্সটা। যদি বাজে তাহলে অবিশ্যি টিনের।'

বাজবে না কেন? পেনসিলের ঘা দিতেই সুটকেশটা টিন.টিন করে বেজে উঠল। দুজন ভদ্রলোকই আশ্বস্ত হলেন। আমার প্রতি সমীহ তাদেব অনেকটা কমে গিয়েছে বলে টের পেলাম।

বুড়ো আমর শার্টের বোতামের দিকে তাকিয়ে—'এগুলো কি সোনার বোতাম?'

—'আজ্ঞে না।'

আধবয়েসী—'রোলগোল্ডের?'

—'জানি না কিনা কি।'

—'কত দাম নিলে?'

—'একসেট চোদ্দ আনা নিয়েছিল। ঠিক মনে নেই আমাব।'

ভদ্রলোকই অনেকখানি উদাসীন হয়ে পড়লেন। বুড়ো একটু চুপ থেকে বললেন—'তাহলে আপনি সরকারি চাকরি পেলেন না?'

—'কই, পেলাম না তো।'

—'কিন্তু পেলে ভালো হত।'

—'তা ভালো হত বটে।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'কিন্তু আমর যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। হাত নেড়ে হেসে— 'আমি বুড়োধাড়ি মানুষ আমার কাছে ছাপিয়ে আব লাভ কি? কোথায? সিভিল কোর্টে?'

—'সিভিল কোর্টে কি?'

—'বড়টাই সবচেয়ে আগে ধরি, জ্ঞান গুণ আপনার কম হবে কেন? মুনসেফ বোধ করি?'

—'কে আমি?'

—'হ্যাঁ, কোথাকাব মুনসেফ বলুন তো?'

—'মুনসেফ হলে হত বেশ কিন্তু।' মাথার চুলে হাত বুলিযে নিযে—'আমি মুনসেফ নই তো।'

—সত্যিই নন?'

আধবযেসী—'আঃ, এজন্য কেন ইনি আমাদেব কাছে ছাপতে যাবেন আর? মুনসেফ হওযা তো কলঙ্কেব কিছু নয।'

—'আমিও তাই তাবি, যেবকম বিজ্ঞ চেহারা আপনাব [...] কিছু হলে মানাত। তা কিছুই নন আপনি?'

মাথা নেড়ে বললাম—'না।'

আধবযেসী—'হেকিম হলে থার্ড ক্লাসে কি আসতেন আর আপনি?'

জিজ্ঞাসু চোখে দুজনেই আমার দিকে তাকান।

চুপ করেছিলাম।

আধবযেসী—'হয়তো জ্যাঠামো হল, মাপ করবেন।'

হাত কচলাতে কচলাতে উভযেই আমাব দিকে তাকিযে বইলেন।

হেসে উঠে বললাম—'কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?'

সহসা এদের কেউ কোনো উত্তর দিল না।

'কোথে কে আসছেন আপনারা?'

কোনো জবাব নেই।

অনেকবার অনেক জাযগায ঘুরেছি, এ মানুষ দুটিকে বিচিত্র বোধ হল। কিন্তু মুখের ওপর এদের অমানুষের ছাপ নেই। নেহাৎ গোবেচারি ভালোমানুষও এরা নন।

নদীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলাম।

বুড়ো—'তুমি জান না কৈলেসে, না জেনেশুনে একটা কথা বলে ফেললে। আজকালকার বিদ্বান যুবকেরা সে সাবেককালের সং নয়তো আর। কোনো ভড়ং এঁরা ভালোবাসেন না। সে ঘটিরাম ডিপটির যুগ মরে হেজে গেছে হে। সে যুগ এখন আর আছে কি কৈলেস? তা নেই। হলামই বা মুনসেফ হাকিম

ব্যারিস্টার, তাই বলে মানুষের হৃদয়ের মানুষ্যত্বও চুলোয় দিতে হবে নাকি? শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান সবই ভুলে যেতে হবে? তা পেতে হবে না। আজকালকার গণ্যমান্য লোকেরা এসব কথা সেকালের হারামজাদাদের চেয়ে ঢের বেশি বোঝে হে।

—'তা ঠিক দাঠাকুর।'

—'সেকালের ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে বামুনের ছেলে খেত গরু। আজকাল এম,বি পাশা করেও গরুকে ভগবতী বলে প্রণাম করে।'

অবাক হয়ে শুনছিলাম।

—'জুতোর জামড়া ছুঁয়ে শপথ করে, বলে ভগবতীকে ছুঁতে বলছি।'

—'বাস্তবিক দা ঠাকুর।'

বুড়ো একটা হাই তুলে উদাসীন গলায়—'মা সিদ্ধেশ্বরী দিন দিও মা? আমার দিকে তাকিয়ে—'হলামই বা অভাজন, তবুও যে আমরা মানুষ একথা আপনারা যেমন বুঝেছেন—'এই দেখুন আমি বুড়ো মানুষ—তাই বলে তো আমার সাতখুন মাপ নয়, আপনার বিছানাটা একটু গুটিয়ে আমার বিছানাটা পাতলাম, তাই বলে আপনার চোখ তো ছানাবড়া হয়ে উঠল না। দিব্যি এলেন, বসলেন, মানুষকে ক্ষমা করলেন, আমাদের আদিখ্যেতায় চোখ দুটো একবারও তো চড়কগাছ হযে উঠল না আপনার। এইসব হচ্ছে আকজালকার গণ্যমান্য লোকদের রকম। মানুষকে তাব মহিষ বলে অগ্রাহ্য করে না আর।'

চুপচাপ।

—'কোথায় চললেন আপনারা?'

বুড়ো পকেট থেকে এক প্যাকেট বিড়ি বের করে একটা আমাকে সাধলেন—'নিন।'

—'বিড়ি আমি খাই না।'

—'ও, তা আমি আগেই এঁচেছিলাম কৈলেস।'

—'আজ্ঞে?'

—'তোমার কাছে সিগারেট আছে হে?'

—'না, ফুরিয়ে গেছে সব।'

—'সব গেল। যে সিগারেট ছিল তাও কি ইনি খেতেন?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ সেও এক কথা, মজাদার বিলেতি সিগাবেট নযতো আর, মাড়োযাড়ি না ভাটিযা কাদের তৈরি, ও কি মানুষে খেতে পারে? ওসব বাঁদরে খায়।' বুড়ো বিড়ি জ্বালিযে—'তা হল কি জানেন?' বিড়িতে একটান দিয়ে—'বড় মজা হল।' আর একটানে দিযে—' সিগাবেটেব প্যাকেটটা নিযে গেল ইন্দুবে।'

—'ইন্দুরে?'

—'হ্যাঁ। সন্ধ্যাব সময় চুরি কবে নিযে উঠোনে ফেলল। খানিকটা খুবলেখাবলে যখন বুঝল যে না পাঁউরুটি ফুটি নয়, কিছু চিড়েও না, মুড়কিও না রসানই নেই তখন উঠোনের এককোণে আমরু লঙ্কাব জঙ্গলের ভেতর ফেলে চলে গেল। সেখান থেকে পরদিন কুড়িযে নেই। অঘ্রাণ মাসেব বাত, সাবারাত হিমে ভিজে সিগারেটগুলোর যা অবস্থা।'

—'বাঁধাকপি নয়তো যে শিশিরে ফগফগ করে উঠবে।'

—'সারারাত উষ পেযে একেবাবে বুড়োমানুষেব দাড়িব মতো মিইযে গেছে।'

পকেট থেকে আধখাওয়া চুরুটটা বের করে জ্বালাই।

বুড়ো—'চুরুট খাচ্ছেন?'

মাথা নাড়লাম।

—'হ্যাঁ বড় মানুষেরা এই সবই খায়। ফকফক করে [...] টানতেন যদি বুঝে নিতাম আপনি ফোতোবাবু, কিন্তু প্রথম থেকেই আপনার চালচরিত্র দেখে বুঁঝেছি যে আপনার ভেতর জিনিস আছে। [...] আপনি খাবেন না। কই খেলেন না তো। ওই চায়ের দোকান থেকে এক বান্ডিল কিনে নিয়ে আসবেন; কই তা তো আনলেন না। তখনই বুঝেছি বিড়ি সিগারেটের ঢের ওপরওয়ালা আপনি।' একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ,ঢের ওপরওয়ালা।' বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বুড়ো—'আচ্ছা, এই চুরুট তৈরি হয় কোন কারখানায়?'

—'বর্মায়।'

—'মাদ্রাজে চুরুট হয় না?'

—'তাও হয়।'

—'বর্মায় নাকি মেয়েরা চুরুট বানায়?'
—'তা বানায় বটে।'
—'আপনি গিয়েছেন? বর্মায়?
—'না।'
—'জমিজমা ফেলে কোথাও নড়তে-চড়তে পাবেন না বোধহয়?'
'জমিজমা আমাব আছে কে বললে?'
—'ভগবানের আশীর্বাদে তা আছে।'
—'বাস্তবিক নেই।'
—'সুন্দরবনে দুশো বিঘা জমি আছে ধরুন।'
—'কাব? আপনার?
—'হ্যাঁ, আমার আবাব থাকবে! মাথার বালিশটা আছ এই। তা দুশো বিঘা জমি নেই আপনাব সুন্দরবনে?'
—'সুন্দরবন আমি কোনোদিন চোখেও দেখি নি।'
বুড়ো খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'এই যে নদীব মধ্যে চারদিকে চব এমন চারশো-পাঁচশো চব তো আপনাব নামেই লেখা!'
কোনো উত্তব দিলাম না।
—'কী বলেন?'
চুপচাপ চুরুট টানছিলাম।
—'লিখে দিয়েছে না আপনার নামে?'
—'কে লিখে দেবে?'
—'কালেক্টর।'
—'কীসেব জন্য?'
—'জমিদাব মানুষ আপনি।'
চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিযে নিলাম।
—'কত মুনাফা?'
নিস্তব্ধ ছিলাম।
'জমিদাবদেব এবার বড্ড ফ্যাকড়া, সমবচ্ছবেব খাজনা আদায় হয কি করে, এই এক ভাবনা। তা ভাববেন না সিদ্ধেশ্বরীব কৃপায উতরে যাবেন। এই দু-তিন মাসেব ভেতবেই দেখবেন খাসা পড়তা।'
—'কলকাতায আমি একটা চাকবি খুঁজতে যাচ্ছি।'
বুড়ো সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকালেন।
কৈলেস—'কী চাকরি?'
—'এই চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার যে কোনোবকম একটা চাকবি।'
—'জমিদারদের কি এতই দুর্গতি হল?'
—'জমিদারিব স্বপ্ন আমাদেব সাতপুরুষেও দেখে নি কোনোদিন।'
—'দেখে নি? এই বামুনের গা ছুঁয়ে বলুন তো দিকি।'
গা ছুঁয়ে বলতে হল। বছর তিন-চার আগে হলে এদেব সঙ্গে কথাবার্তা আমি অনেক আগেই স্থগিত করতাম। কিন্তু বযস যত বাড়ে জীবনের দৈন্য দুর্দশা যত বিস্তৃত হযে ওঠে দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতিব বৈধতা ও অবৈধতা ততই বেড়ে চলে। রোধ কববাব কোনো উপায নেই। এ ভালো না মন্দ? মন্দ কি?
বুড়ো কেমন বিরস হয়ে ওঠেন। কথাবার্তা বলতে ভালো লাগে না আব তাঁর। আলাপ-পরিচযেব জোশ নষ্ট হয়ে গেছে যেন। আর কেন? তিনি হাতের বিড়িটা নদীর ভেতরে ফেলে দিয়ে সটান শুযে পড়লেন।
কৈলাস—'চাকরি খুঁজতে যাচ্ছেন, কী চাকরি? আপনার বযস কত?'
—'এই তেত্রিশ-চৌত্রিশ।'
—'এই বযসে যাচ্ছেন চাকবি খুঁজতে?'
—'যাচ্ছি তো।'
—'কী চাকরি?

বুড়ো—'এই মাস্টারি কেরানিগিরি, এছাড়া কী আর পাবে?'

দুজনেই চুপচাপ।

কৈলাস শোয়ার ব্যবস্থা করছিল। আমাকে বলল—'বিছানাটা আপনার যদি বাঁদিকে একটু সরিয়ে নেন, তাহলে দাঠাকুর একটু পা ছড়িয়ে শুতে পারেন।'

বিছানা সরাতে গেলাম না। কোনো উত্তর দিলাম না।

—'শুনলেন আমার কথা?'

চুরুটটা ভালো জ্বলছিল না, পকেটের থেকে দেশলাইটা বের করলাম।

কৈলাস—'কথা কানে গেল?'

—'আমাকে বলছেন?'

—'আজ্ঞে, খোদ আপনাকেই।' কৈলাসের গলা খানিকটা কঠিন।

—'বলুন।'

—'বুড়ো মানুষ, বামুন মানুষ, ভালো করে শুতে পারছে না, বিছানাটা আপনার একটু সরিয়ে নিন।'

—'কেন, বেশ তো শুয়ে আছেন উনি।'

—'আমিও তো শোব।'

—'বিছানা আমার কোথায় বা সরাই?'

—'কেন বাঁদিকে টেনে উত্তরমুখে একটু এগিয়ে যান।'

—'ওদিকে তো পায়খানা।'

—'কী করা! ইস্টিমারে তো বরযাত্রার ঠাট চলে না!'

বুড়ো—'টিকিট তো থার্ড ক্লাসেব! পায়খানা দেখে উঁচু করলে মানায় না বে বাপু।'

—'ওখানে কে যেন জল ঢেলে রেখেছে, বিছানাই বা পাতি কী করে?'

—'আঃ ভিজবে তো আপনার শতরঞ্জি, ও ট্রেনে উঠেই শুকিয়ে যাবে।'

একটু চুপ থেকে—'আপনারা কোথায় যাবেন?'

—'কলকাতায়।'

—'ভেবেছিলে সামনের কোনো এক স্টেশনে নেমে যাব বুঝি? তা তোমার দরকাব মতো তো আব পৃথিবী চলে না। আমি আর কৈলেস সারারাত এইখানেই কায়েম। নাও, এবার নিজের জায়গাটা খুঁজে পেতে ঠিক করো গে, যাও।'

—'কোথায় যাই?'

বুড়ো—'না, যাবাব জায়গা কোম্পানি রেখেছেন কি আব? এমনি এমনিই জাহাজের কারবাব খুলেছিলেন। এইবার ব্যবসাটা গুটিয়ে নেবেন!' বুড়ো পাশ ফিরে ফক ফক করে হাসতে লাগল।—'হ্যাঁ উতরাই না আর!'

দুজনে খানিকক্ষণ মিট মিট করে হেসে হঠাৎ খুব নিস্তব্ধ হয়ে উঠল।

কৈলাস বিবক্ত হয়ে—'কই বিছানা তো আপনার শালগ্রাম হয়ে রইল যে।'

'দেখি কী করা যায়।'

—'কোথায় নামবেন আপনি?'

—'আমিও কলকাতায় চলেছি।'

—'তবেই মরেছি, এখানে আপনার সুবিধা হচ্ছে না।'

—'কী করব?'

—'এ স্টিমারে তো বিশেষ ভিড় নেই, জায়গা বেছে নিতে আপনাব কী কষ্ট?'

—'না, কষ্ট বিশেষ কী আর?'

—'বয়লারের কাছে একটা জায়গা আপনাব হয়েই যাবে। নিন এখন বিছানাপত্র গরজ করে একটু উঠিয়ে নিন।'

—'বয়েলারের পাশে শুয়ে কী লাভ?'

বুড়ো—'শোনো হে কৈলেস, কথা শোনো।'

—'শুনেছি।'

বুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে—'ওই ভুঁড়ো মারোয়াড়িটা যে তিন কাঠা জায়গা মেরে বয়লাবের

পাশে শুয়ে আছে জীবনের লাভ–লোকসানের খবর কি ওর চেয়ে তুমি বেশি জান রে বাপু!'

চুরুটা আবার জ্বালাই।

বুড়ো—'তা জান না, যদি জানতে তাহলে আমাদের সঙ্গে এত কথাবার্তার আবশ্যক হত না তোমার। শ্যাল–কুকুরের মতো উচ্ছিষ্ট হাড় নিয়ে এত কামড়াকামড়ির দরকার হত না। চল হে কৈলেস রয়লারের পাশে। একটা জায়গা বেছে নেয়া যাক।'

কিন্তু কেউই উঠল না।

তাকিয়ে দেখলাম আমার বিছানার ওপর দিয়েই কৈলাস তার বিছানা পেতে নিয়েছে। দুজনেই লেপমুড়ি দিয়ে নিঝঝুম হয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ পরে বুড়ো লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে—'হন্তদন্ত হয়ে বসে আছ যে তুমি?'

আপনারা যা ভেবেছেন তা নয়, ভিড় নেহাৎ কম নয় আজ।'

—'গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা চলেছে বোধ করি।'

—'হবে। কোথাও বিছানা ফেলবার জো নেই।'

—'তা তুমি দেখো না গিয়ে। একটা না একটা জায়গায় স্থান তোমার হয়েই যাবে। একা মানুষ তো।'

—'আচ্ছা দেখব।'

—'না, এখনই গিয়ে দেখো।'

—'কেন?'

—'না, হলে সব জায়গা দখল হয়ে যাবে।'

—'তা এমন হয়, আমার এই বাক্সটার ওপর বসেই থাকব না হয়।'

—'তুমি কি বামুনের ছেলে?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তা না হয় মানুষ তো, সারারাত তুমি এখানে ঠায় বসে থাকবে, লেপমুড়ি দিয়ে ঘুম পাকবে না যে আমার!'

—'কেন?'

—'না, ওতে কেমন অস্বস্তি লাগে আমার।'

—'আপনি বুড়ো মানুষ।'

—'হলামই বা, কেমন অস্বস্তি লাগে যে।'

একটু চুপ থেকে—'এটা আপনার মনের বিলাস। দিব্যি আরাম করে ঢালা বিছানায় শুয়েছেন, আমার কথা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করবার, এই যে প্রবৃত্তি আপনার এটা বড্ড মিথ্যা জিনিস। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

কিন্তু বুড়ো ঘুমোতে পারল না।

আমার জন্য একটু জায়গা ছেড়ে দেয়াও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল বেচারার। উশখুশ করতে লাগল। বললে—'জায়গা দেখে এলেন?'

—'এ স্টিমারে এরকম বসে বসে আমি ঢের গিয়েছি।'

—'কবে?'

—'কতবার তো চড়লাম।'

—'সারারাত বসে কাটিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ, ভিড় হলেই বসে থাকতে হয়।'

বুড়ো একটু চুপ থেকে—'কিন্তু এবারে তো আপনি বিছানা পেতেই ছিলেন।'

—'বিছানা পাতলেই শুধু হয় না, ভিড় হলে প্যাসেঞ্জাররা বিছানা গুটিয়ে সরিয়ে দেয়। সবাই তো বসবে।'

—'খুব কি ভিড় এবার?'

—'মন্দ নয়।'

—'আমরা তো বেশ শুয়ে গড়িয়ে যাচ্ছি তাহলে।' বলে বুড়ো চুপ করল।

মিনিট পনেরো কেটে গেল। ভাবলাম ঘুমিয়েছে বুঝি। কিন্তু ঘুমোয় নি। লেপের থেকে মুখ বের

কবে বুড়ো—'আপনি মনে কবতে পাবেন আপনাব জাযগা আমবা অধিকাব কবে বসেছি, তা হবে হযতো। কিন্তু এ জাযগায শুযে আপনি আবাম পেতেন নো।'

—'কেন?'

—'বড্ড কযলাব গুঁড়ো।'

—'তা ঠিক।'

—'দেখছেন না কেমন উড়ে আসছে?'

—'মুখটা লেপেব বাইবে বাখবেন না, আপনাব চোখে ঢুকে পড়বে।'

—'কি কাঁকব? না তা ঢুকবে না।'

—'পকেট থেকে আস্ত একটা চুরুট বেব কবলাম।

বুড়ো—'তাছাড়া এখানে যা শীত, শুযে মানুষ সুখ পায না।' কম্বল মুড়ি দিযে এবাব অনেকক্ষণ নিঃসাড় হযে পড়ে বইলেন। কিন্তু তবুও গা ঝাড়া দিযে লেপেব থেকে মুখ বেব কবতে হল অবশেষে; বললেন—'বাঃ, বসেই আছ যে!'

—'হ্যাঁ, চুরুট টানছি।'

—'এইবকম কবে সাবাবাত কাটাতে পাবে মানুষ!'

—'শুনুন, একবাব মাঘমাসে মোবাদাবাদ থেকে কলকাতায ফিবছিলাম।'

—'আবে ধো শালা মোবাদাবাদ!'

—'এবাব তো তবু বসে চলেছি, সেবাব সবাবাত ট্রেনে দাঁড়িযে দাঁড়িযে কাটাতে হযেছে।

—'সমস্তটা বাত?'

—'সমস্তটা বাত, আব পশ্চিমেব যা হাড়ভাঙা শীত!'

—'তা ঘুমোতে পাবলে? ঘোড়াগুলো তো দাঁড়িযে ঘুমায।'

কৈলাস—'ঘুমে যখন চোখ ভেঙে আসে তখন মানুষ দৌড়ুতে দৌড়ুতে ঘুমোতে পাবে দাঠাকুব।'

বুড়ো—'ভিড় কি খুব বেশি হে আজ?'

—'হ্যাঁ, বেশ ভিড়।'

—'মা, দযাময়ী দিন দিও মা, দিন দিও। কেন কীসেব এত ভিড়?'

কৈলাস—'গঙ্গাসাগবেব মেলায যাবে হযতো।'

—'মেলা তো মাঘ মাসে।'

—'এখন কলকাতায চলেছে, কলকাতায গিয়ে জোট পাকবে।'

—'দিন দিও। আচ্ছা তুমি একটু ঘুবে দেখে আসো না বে বাপু, তোমাব জাযগা হয নাকি?'

অগত্যা উঠলাম।

উপবে নীচে মিনিট পনেবো পাযচাবি কবে দেখলাম, জাযগা কোথাও নেই। চুরুটটা ভালো কবে জ্বালিযে নিযে উপবেব ফ্ল্যাটেব একটা বেলিঙেব কাছে গিযে দাঁড়ালাম। আবো মিনিট পনেবো কাটিযে নিজেব জাযগায ফিবে গিযে দেখি বুড়ো ও কৈলাস দুজনেই এবাব বেশ মবণান্ত ঘুমুচ্ছে। বেশ ভালো কথা। টিনেব সুটকেশটাব উপব গিযে বসলাম। এখানেই সাবাবাত বসে কাটাতে হবে। খানিকক্ষণ ধবে ঝিমুচ্ছিলাম হঠাৎ একট থাবা খেযে চেযে দেখি বুড়ো উঠে বসে বন-মুবগিব মতো টকটকে বাঙা চোখে আমাব দিকে তাকিযে আছে। বললাম—'কী হল?'

—'বাঃ, তুমি এখনো বসে আছ যে?'

—'এই তো।' তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চুরুটটা বেব কবে ছাই ঝেড়ে নিয়ে জ্বালাতে জ্বালাতে বললাম—'এই চুরুট টানছি বসে বসে আব কি।'

—'চুরুট টানছিলে না হাতি, দেখি নি যেন সব আমি আব?'

—'না, এইবাব থেকে টানতে শুরু কবলাম।'

—'তা টানলেই বা, চুরুট টেনে মানুষ যদি সুখে শান্তিতে জেগে থাকতে পাবত, তাহলে ভগবান বিছানাবও সৃষ্টি কবতেন না। বর্মিবা হত বাজা। যাও ন্যাকড়া দ্যাখো। সাবাবাত এমনি বসেই কাটাবে নাকি?

—'এই তো ঘুবে দেখে এলাম।'

—'কী দেখলে?'

—'কোথাও জায়গা নেই।'

বুড়ো একটু চুপ থেকে বললে—'একটা কাজ করো।'

—'বলুন।'

—'ইন্টারক্লাসে ঢুকে পড়ো।'

—'সেখানে গিয়ে কি হবে?'

—'বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়ো গে, আবার কী।'

—'ঘুম কিন্তু আমার একটু পায় নি।'

—'চেকারের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছ বুঝি। চেকার ওসব ক্লাসে বড় একটা ঢোকে না। ঢুকলেও তোমাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখলে জাগাতে যাবে না আর।

[...]

—'কিন্তু ইন্টারেও খুব ভিড়।'

—'ভিড় নাকি?'

মাথা নেড়ে—'কত লোক বসে আছে।'

—'বড্ড অসুবিধায় ফেললে দেখছি।'

—'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন না, মিছেমিছি বসে আছেন কেন?'

—'বলছ তো, কিন্তু মন নিরস্ত না হলে আমি ঘুমুতে পারি না।'

চুরুট টানছিলাম।

বুড়ো—'কোথাও একটু জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে চোখবুজে বাঁচো, এই আমি চাই। আমাকে যতটা অমানুষ ভাব আমি তা নই।'

একটু চুপ থেকে বললাম—'আপনার সঙ্গে আমার কোনোদিন কোনো পরিচয় ছিল না। আপনার নাম জানি না, ঠিকানা জানি না, কয়েকঘণ্টার জন্য পাশাপাশি এসে পড়েছি। এর পরে ইহজীবনেও হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না আর। আমি যদি আপনাকে অমানুষ মনে করি তাহলে কি ক্ষতি আপনার?'

বুড়ো ফোঁস করে উঠে বললেন—'তুমি তাহলে আমাকে অমানুষ ভেবে বসে আছ?'

—'যদি বা ভাবি কয়েক ঘণ্টার জন্য তো শুধু ভাবব, তারপরেই তো সব ফুরিয়ে যাবে।'

—'কেন, আমাদের আর দেখা হবে না?'

—'কই, তা আর হয় কোথায়?'

বুড়ো একটু চুপ থেকে বললে— 'হবে না দেখা আবার? কি করেই বা বলো তা তুমি?'

—'কত জায়গায় তো ট্রেনে স্টিমারে ঘুরলাম, কিন্তু একবারের যাত্রীরা অন্যবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।'

বুড়ো একটু চুপ থেকে—'ভাবতে গেলে এর ভেতর বেশ একটু বিচ্ছেদের কথা আছে কী বলো?'

—'তা আছে বইকী।'

—'শুধু স্ত্রী-সন্তান আত্মীয়স্বজন মরলে যে মানুষের জীবনে বিয়োগ, তা তো শুধু নয়।'

—'না, তা নয়।'

—'এই ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে ট্রেনে স্টিমারে যাদের সঙ্গে মুখ চেনাচেনি হল, কথাবার্তা হল, ভালো করে ভেবে যদি দেখি তাহলে এই ভাব নিয়ে অনেকটা সময় বসে থাকা যায়' কী বলো?'

—'তা যায় বইকি।'

বুড়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর—'মানুষের জীবনের বিচ্ছেদ নিতান্ত একঘেয়ে নয়, একঘেয়ে?'

—'না, একঘেয়ে কোথায় আর।'

—'স্ত্রী মরে সন্তান মরে নাতিনাতকুড়ো আত্মীয়স্বজন মরে যায়, আমরা দুঃখ করি। কিন্তু তাছাড়া আরো যে কত শত লোক আমাদের জীবনের থেকে খসে যায়! কোনো একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে চুপ করে যদি এই সব ভাবি, বাস্তবিক!'

চুরুটের দোষ, বার বার নিভে যায়, আবার জ্বালালাম।

বুড়ো—'এই যে তুমি, কোনো আত্মীয়স্বজনের চেয়ে কম?'

চুরুটে টান দেই। বাইরের শীতের ঝাপটায় রক্তের ভেতর কাঁটা দিয়ে ওঠে।

—'তা কম নও। কিন্তু তুমি তো বললে আমি নিজেও জানি যে আমাদের পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ হবে না হয়তো আর। মৃত্যু পর্যন্ত মাঝে মাঝে এই কথা কি মনে হবে না আমার? চণ্ডীমণ্ডপ থেকে যখন লোকজন সব চলে গিয়েছে তখন একা বসে বসে কিংবা দুপুরবেলা জামরুলতলায় যখন ছিপ নিয়ে বসি মনটা কেমন হু-হু করে ওঠে। কত কথা মনে হয়!'

চুপ করে চুরুট টানছিলাম।

বুড়ো—'বছর পঁচিশেক আগে মধুখালি যাচ্ছিলাম।' পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে জ্বালালেন। —'এই স্টিমারেই, এমন একখানা মুখ দেখলাম।'

কৈলাসের একঘুম হয়ে গেছে, সে বললে—'মাঝে মাঝে ভারি মর্মস্পর্শী মুখ চোখে পড়ে।' বলেই যে পাশ ফিরে ভালো করে লেপ জড়িয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

—'মেয়েটির মাথায় সিঁদুর, টকটকে লালপেড়ে শাড়ি, কার যেন বউ, বিশেষত এই পাড়াগাঁর দিকে স্টিমের ট্রেনের—কিন্তু কার যে বউ, কোথেকে এল, কোথায় বা যাবে, বিধাতা এই পঁচিশ বছরের ভেতর সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। টুপ কের একটা ফোঁটার মতো কোথায় কখন যে সে তলিয়ে গেছে ভগবানও বোধহয় খুঁজে বের করতে পারবে না আর। এইরকমই। আমরা বড্ড নিঃসহায়।'

একটু চুপ থেকে—'এই মেয়েটি হযতো এখন আপনার মতো বুড়ো হয়ে পড়েছে।'

—'তা হয়েছে।'

—'হয়তো নাতি-নাতনিও হযেছে ঢের।'

—'তা হবে না কেন লক্ষ্মীমন্ত সংসার হোক, আমি তাকে আশীর্বাদ করি। মনে মনে কতদিন আশীর্বাদ করেছি। বিড়িতে একটা টান দিয়ে—'সেই বউটা বলেই বা কি এমন কত নারী-পুরুষেব সঙ্গে এরকম পথে-ঘাটে দেখা হল—ভালো লাগল—কোথায় আজ তাবা সব!'

—'হয়তো নানারকম সাধারণ সম্ভব জাযগায়ই রয়ে গেছে।'

—'অথচ তাদের সঙ্গে দেখা হয় না।

বুড়ো একটু চুপ থেকে—'জীবনমৃত্যুর এপাবে ওপাবে কোনোদিকে কোনোদিন তাদের সঙ্গে দেখা হবে আর!'

চুপ কবে চুরুট টানছিলাম।

বুড়ো—'হয়তো এই ভিড়ের ভেতবেই তাদেব কেউ কেউ আছে। সেই মেয়েটিও থাকতে পারে। অথচ উপায় নেই। পরস্পরের কাছাকাছি বসেও আমরা কেউ কারু খোঁজখবব পাই না, কাউকে আদর ভালোবাসা জানাতে পাবি না। ভগবান এমনি কবেই মানুষকে অন্ধ কবে রাখেন।' খানিকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বিড়ি টেনে একদিকে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বুড়ো—'একটা কথা, আমরা নিজেদের যতটা নিবাশ্রয় মনে কবি ভেবে দেখলাম বিধাতা নিজে তার চেয়ে ঢের বেশি অসহায়। শেষ পর্যন্ত সকলকে নিয়ে কোনো একটা মিলন উৎসব আনন্দের লীলা তিনি দেখাতে পারেন না তো। বাস্তবিক আমাদেব চেযেও কত যে তিনি—!' বলে মস্তবড় ঢালা বিছানার থেকে কযলাব গুঁড়িগুলো জেড়ে লেপ টেনে শুযে পড়লেন।

কিছুক্ষণ টানি নি, চুরুট নিভে গিযেছিল আমার, জ্বালিয়ে নিলাম।

বুড়ো—'সেই বসে বসেই রইলে, তোমরা কেমন কথা শোনো না যেন।'

চুরুটে এক টান দিয়ে ঘাড় হেট করে একটু হাসলাম।

—'একটা কম্বল গায় দিযে নাও।'

—'শীত কই আর।'

—'না, শীত নেই! আমার লেপেব নীচে হাযরান হয়ে গেলাম।' আপদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে দু-চাব মিনিটের ভেতরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভয়ে ভয়ে ছিলাম বসে ঝিমুতে দেখে কখন জামা ধরে হেঁচকা টান দেন তারপব আমার বিছানাটা পেতে নেবার অনুমতি দেবেন হযতো আমাকে। এবার আর জাগলেন না। অবাক হযে তাকিয়ে দেখলাম সমস্ত রাত এমন নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত পরম সুন্দব ঘুম!

তাসের ছবি

শ্রীবিলাসবাবু অফিস থেকে বাসায় ফিরে এসে টাই খুলতে খুলতে স্ত্রীকে বললেন, "খোকা কোথায়?"

—"কই, সেই দুপুরের থেকে ত আর দেখছি না।"

—"কোথায় থাকে যে!"

টাই খুলে বললেন, "আমি ওর জন্য একটা চাকরি জোগাড় করেছি।"

—"কোথায়?"

—"গভর্মেন্ট অফিসেই—"

—"চাকরি ঠিক হয়ে গেছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"মাইনে কত?"

—"আপাতত পঁচাওর; কিন্তু ভাল কাজ করতে পারলে, এগজামিনে পাশ কবতে পারলে দেড় হাজাব হতে পাবে।"

দুইজনেই খুব তৃপ্ত হল।

বাত প্রায় গোটা দশেকের সময় বিজন ফিরল।

কোনো-কোনোদিন বারটা-একটাব সময়ও ফেরে, শ্রীবিলাস খানিকটা অনুযোগ কবেন; তাবপর যায় চুকে।

ছেলেটিকে তাঁবে রাখবাব মত কোনো ভরসা পান না; বিজন তাঁবে থাকবাব মত ছেলেও নয়। কিন্তু বাপ-মা আশা কবেন ছেলেটি বিগড়বে না। ত্রিশ বছরেব দাম্পত্যজীবনের এই একটিমাত্র সন্তান। একে আঘাত দিতেও ভয় হয়-অবহেলায় হাবিযে ফেলতেও।

শ্রীবিলাস বললেন,"বিজন—"

ছেলেটি চোখ তুলে তাকাল।

—"তোমাকে কাল একটু সাহেবেব সঙ্গে দেখা কবতে হবে।"

—"কোন সাহেব?"

—"আছে, গভমেন্টের এক ডিপার্টমেন্টেব খুব একজন মুরুব্বি।"

—"ইন্টাবভিউর জন্য?"

—"হ্যাঁ।"

—"আবাব সেই চাকবি বুঝি!"

—"এ বেশ ভাল চাকরি।"

—"তা, চাকরি ত আমি করব না তোমাকে বলেছি।"

—"কেন করবে না"

—"আমি হলাম আর্টিষ্ট-এই-ই আমার পথ। সাহেবদের সঙ্গে দেখা কবতে বলো ত পেরি ব্রাউনেব সঙ্গে দেখা করতে পারি-অবিশ্যি ব্রাউন সম্বন্ধে আমার বিশেষ যে খুব শ্রদ্ধা আছে তা নয়-তবে তিনি যনি আর্ট সম্বন্ধে কিছু-কিছু জানেন দু'দণ্ড বৈঠকি হয, মন্দ না।"

বলে হো হো করে হেসে ফেলল। বিজনের গায়ের থেকে সিগারেটেব গন্ধ আসছিল। ময়ূরকণ্ঠী বঙের সুটে তাকে বেশ মানিযেছিল। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, চোখমুখ উজ্জ্বল-ও ছটফটে, আগাগোড়া ফিটফাট; মাথায় ফেল্ট হ্যাট।

হ্যাটটা খসিযে সে একটা সোফার ওপর ফেলে দিল আর একটা সোফায় বসল নিজে। মাথাভরা অগাধ কাল চুল বেরিযে পড়েছে, বাঁ-দিকের সুঠাম টেরি মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। জানালা দিযে হাওযা আসছিল-এলোমেলো কাল চুল-বশ মানছিল না তাই আর। কাল ভুরু-কাল চোখ।

বিজন বললে,"বুঝতেই পারি না তোমাদের এই সংসারে আমি জন্মালাম কেন। কিন্তু তবু জন্মেছি ত।"

বললে, "ভগবান কাকে কোথায় যে বসিয়ে দেন-স্ট্রেঞ্জ!"

বললে, "তা সাধারণ মানুষের মত হলে তোমরা খুব তৃপ্ত হতে জানি। আমি নিজেও খুব খুশি হতাম তাহলে। কারণ আর্ট আমার কাছে তখন তোমাদের সেক্রেটেরিয়েট অফিসের মত একটা মস্ত বড় নির্জীব বেকুবি বলে মনে হত। আর কী মনে হত?" বলে সোফাব ওপর ডান পা ছড়িয়ে দিয়ে ঘাড় কাত করে বিজন খানিকটা হাসল। সমস্ত চোখমুখে ভিতর থেকে তার.সহৃদযতা, আমোদ ফুটে বেরুচ্ছে, যেন পৃথিবীটা একটা মজার জাযগা; যেন তাকে ছবি আঁকা ছেড়ে চাকরি নিতে বলা নমাস-ছমাসেব একটা উল্লেখযোগ্য তামাশা।

শ্রীবিলাস দমে গেলেন

—"সাহেবের সঙ্গে দেখা কববে না তাহলে? কী করবে! হুঁম! দেখা করবাবও দরকার নেই। তুমি চাকরিতে গিয়ে বসলেই হল!"

বিজন কৌতুক করে বললে, "মাইনে কত?"

—"পঁচাওর আরম্ভ।"

বিজন খুব প্রসন্ন সরলভাবে হেসে বললে,"বেশ! মাইনে অবিশ্যি পাঁচশ টাকা আমি আশা করি নি। কিন্তু চাকরি যদি কবতাম-পাঁচ টাকাযও ঢুকতে বাজি হতাম। কিন্তু যখন চাকবি কবব না ঠিক করেছি-"

শ্রীবিলাস হতাশভাবে ছেলেব দিকে তাকালেন।

বিজন বললে"তখন পাঁচ হাজাবেও করব না।"

—"কী যে বলো।"

বিজন হঠাৎ গম্ভীর হযে বললে, "না, বাবা,ঐকান্তিকতাব দবকাব।"

—"কীসের জন্য?"

—"ছবি আঁকতে হলে।"

শ্রীবিলাস একটা চুরুট জ্বালিয়ে বললেন, "চাকবি নিলে ছবি কি আব আঁকতে পাববে না?"

—"এই তুমি ভাব?"

—"খুব।"

বিজন আমোদ বোধ কবে হেসে বললে,"চাকবি নিলে ছবি আঁকা দু'টো এক সঙ্গে চালানো?"

তাবপব শ্রীবিলাসেব দিকে ফিবে ভুরু তুলে বললে, "তোমাব যে এই যুক্তি এ হচ্ছে সংসাব পবিবাবে নিযুক্ত শতকবা একশটি মানুষেব যুক্তি। কিন্তু আমবা যাবা এই একশটি মানুষের বাইবে, আমবা জগৎটাকে একটু আলাদাভাবে দেখি।"

—"কী বলতে চাও?"

—"ছবিই আঁকব শুধু।".

—"এই ঠিক করলে?"

—"আমি কি ঠিক করি নাকি?"

—"তবে কে?"

—"ঠিক করে আমাদেব জীবন।"

একটু হেসে বললে,"আমাদেব জীবনের সৌন্দর্য ও বিচিত্রতা এত বেশি! কিন্তু আমাদেব অন্ধতাও কি কম! সার্কাসের আফিমখেকো একটা বুড়ো বাঘ দেখবাব জন্য হাজাব-হাজাব লোক ছুটবে। কিন্তু পাশে যে সব ছোট ছোট সুন্দর শ্যামা পোকা উড়ে আসছে কিংবা যে ঘাসের ওপব দিয়ে চলেছি-এসবের দিকে কেউ তাকাবে না—"

অনুপ্রাণিত হয়ে বললে,"একটা মস্ত বড় খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিককাব রোধ নীল আকাশ ডালপালা আর পাখির ভিতর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বারবার গভীব করে জেনে নিতে হয জীবন কী সুন্দর-কী অনির্বচনীয়।"

উৎসাহের প্রাবল্যে দু-হাত শুন্যে নেচে উঠে ছড়িয়ে পলড় ছেলেটির। তারপর আতিশয্য যখন কাটল, ধীরে ধীরে বুকে হাত বেঁধে বাঁ ভুরু তুলে শ্রীবিলাসের দিকে তাকিয়ে বিজন বললে,"কিন্তু কী দুঃখের কথা, চাকরি পরিবার সংসার নিয়ে অল্প বয়সেই লটকে পড়ি আমরা,পৃথিবীর এত জাযগা থাকতে বেছে নিই মারকুট্টিমারা শহর, খোপের মত বাসা, খোঁয়াড়ের মত অফিস—"

বাঁ ভুরু আরো কপালেব দিকে তুলে বিজন বললে,"এই রকম করে আমাদের একটা তৃপ্তি হচ্ছে এই

যে আমরা খাচ্ছি—"

বললে,"আব একটা তৃপ্তি এই যে ঘুমাচ্ছি—"

থামল।

বললে, "কী মজাই?"

নিজেই উত্তর দিযে বললে,"আনন্দ? আশা ? না দুঃখ? বেদনা? না অভিজ্ঞতা? না অনুভব করাব, কল্পনা করার শক্তি, কিছু না। এসব কিছু আমাদেব সঞ্চযেব উপযুক্ত বলে মনে হয না। পৃথিবীব সমস্ত ইনসিওবেন্স কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, অফিস ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে কবে আমার।"

—"তাহলে খাবে কী?"

বিজন কৌতুকেব সঙ্গে হেসে বললে, "আবাব সেই খাবাব কথা!"

শ্রীবিলাস ঘাড় হেঁট করে চুরুটেব ছাই ঝাড়ছিলেন। ভাবলেন খাবার কথা নিযে এ ছেলেছিকে খোঁচা দিযে কোনো লাভ নেই। এব ছোটবেলার থেকে এ অব্দি কোনোবকম দবকাবি-অদবকাবি খাওযার অভাব এ ছেলেটিকে অনুভব কবতে হয নি। কাজেই এর মন ঢেব অবসব পেযেছে-নানারকম বিচিত্র কথা ভাবাবব জন্য। সে কথাগুলো সত্য বা মিথ্যা সে সব বুঝে দেখতে যান না শ্রীবিলাস-অনেক সমযই যে-সব কথা তাব কানে এসেও লাগে না।

ভাবছিলেন এই সংসাবেব সচ্ছলতা ও নিবাপদ নির্বিঘ্নে অবসরের পথ চেযে এই ছেলেটি ঢেব অধঃপাতেও ত যেতে পাবত। কিন্তু তা যায নি। ছবি আঁকা একটা খেযাল হতে পাবে, সাংসাবিক মানুষেব পক্ষে এ বড্ড ক্ষতির জিনিস, কিন্তু তবুও অধঃপাত নয।

ভাবছিলেন বিজন মবেও ত যেতে পাবত-কিন্তু সুস্থ্য সবল সৎ হযে টিকে আছে-যাই করুক না কেন-এও একটা ভবসাব কথা।

তাবপব ছেলেটি বিযে কববে, সন্তান-সন্ততি দেবে, তৃতীয পুরুষ অবিশ্যি বাপেব মত হবে বলে মনে হয না-ঠাকুরদার মতই হবে, এও একটা ভবসা। তারপর আবো খানিকটা বড় হলে, সংসাবেব বাস্তবতাব সম্পর্কে এলে এর মন মানুষের জীবনেব প্রকৃত মূল্য বুঝবে-এও আশা করা যায।

এই সব ভাবছিলেন তিনি।

কিন্তু তবুও এই ছেলেটিব কথা ভাবতে গিযে অসোযাস্তি দুঃখও ছিল।

তিনি তাই বললেন, "আমার দেনা প্রায চোদ্দ হাজাব।"

—"ও চোদ্দ হাজাব বুঝি,"বিজন নিশ্চিন্ত মনে টাই খুলতে লাগল।

—"হ্যাঁ। তেমন বেশি কিছু নয যদিও—"

—"না; বেশি কী আব? দেড় লাখ-দু'লাখ দেনা থাকে সব।

—"তাও থাকে বটে।"

—"দেউলিযা হযে যায!"

—"না, অতটা বিপদ আমাব নয, তবে মনে হয যেন এখন আব শোধ করতে পাবব না।"

—"কত মাইনে না তোমাব?"

—"সাড়ে চারশ।"

—"বেশ ত, দেড়শ টাকা কবে ফি মাসে ফেলে রেখে দাও।"

—"তাই দেব ভাবছি। কিন্তু বড্ড কঠিন—"

—"কেন?"

—"ভেবে দেখ-চাবটে সংসাব আমাব চালাতে হয, কলকাতায একটা আব এ-জাযগায সে-জাযগায তিনটে।"

টাই খুলে বিজন ড্রেসিং রুমেব দিকে চলে গেল। মিনিট দশেক পবে পাঞ্জাবি আব পাযজামা পবে এস বললে,"বাবা যে চুপ করে বসে!"

—"ভাবছিলাম।"

—"কী? আমার ভাবনা।"

—"কী কবে কী হয!"

—"তা চোদ্দ হাজার টাকা যখন, এ নিযে কেন আর মন খারাপ করা? মাইনেও ত প্রায পাঁচশ—"

—"কিন্তু চারিদিককার দাযিত্ব মিটিযে এ মাইনের ত কোনো মূল্য থাকে না।"

—"মাঝে মাঝে অল্প যা-হোক কিছু শোধ কবে দাও।"

বিজন বাঁ ভুরু কপালেব দিকে উঁচকে নিয়ে বাবাকে বললে, "একটা মাসও বাদ দিও না-তাহলে দেখবে আট দশ বছবেই শোধ হয়ে গেছে।"

সান্ত্বনাব সুবে হেসে বললে, "এ একটা সামান্য জিনিস। এ নিয়ে তোমাব মত বুড়োমানুষেব মুখ ভাব কবে থাকা উচিত নয়।"

—"কী বকম?"

—"জীবনে কত সুন্দব চিচিত্র জিনিস দেখলে। টাকাকড়িব হিসেবে সেসবেব দাম কষা যায় না এমন কত অনুভূতি উপলব্ধি কবলে। এ সময়টা হবে সেই সবেব স্মৃতি নিয়ে অবাক হয়ে বসে থাকবাব।"

—"ওঃ!"

বিজন সোফাব ওপব বসে বললে, "আজ ভিক্টোবিয়া মেমোবিয়ালে গেছলাম—"

—"তাই নাকি?"

—"দেখলাম তাজমহলেল একটা নতুন ছবি এসেছে।"

শ্রীবিলাস চুপ কবে বইলেন।

—"কাব আঁকা জান বাবা?"

—"কাব?"

—"উইলিয়াম ড্যানিয়েল"

—"সে কে?"

—"R A ছিলেন।"

—"তা হবে।"

—"প্রায় একশ বছব আগে বয়াল অকাদেমিতে এ ছবিটা একজিবিট হয়েছিলই ছবিটা।"

শ্রীবিলাস বাঁধা দিয়ে বললেন, "তাবপব বিট্যায্যাব কবতে হবে দু-বছবেব ভেতবেই—"

—"পেনশন পাবে ত—"

—"বড় জোব ২৫০ টাকা—"

—"মন্দ কি।"

—"এ দিয়ে চাবটে সংসাবকে আমি কী কবে চালাব? ঋণই-বা শোধ দেব কি কবে?"

বিজন বললে, "ঋণ কাব কাছে?"

—"সে ত অনেকেব কাছেই।"

—"বেশ ত, আমাকে লিস্টিটা দিয়ে দিও।"

—"কেন? তুমি কী কববে?"

—"তুমি নিজেব মনেব শান্তি চাবদিককাব সঙ্গতি বেখে যতটা পাব শোধ দিও। বাকিটা আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দেবে।"

—"তুমি দেবে?"

—"দেব বইকি। আমাদেব সকলেব জন্য যে দায়িত্ব তুমি গ্রহণ কবেছ তা ফেলে আমি পালাব?

—"কিন্তু কী কবে দেবে বাবা?"

—"আমি?"

বিজন বাঁ ভুরু কপালেল দিকে নিয়ে বাবাব দিকে তাকাল—

শ্রীবিলাস "তাহলে চাকবি নিতে হয়—"

—"চাকবি অবশ্য আমি নেব না।"

—"তাহলে কী কবে শোধ দেবে।"

—"কেন, ছবি বিক্রি কবে।"

—"কোন ছবি?"

—"যা আমি আঁকব।"

শ্রীবিলাস ব্যথিত হয়ে ঘাড় হেঁট কবলেন।

বিজন বললে, "তাজমহলেব সে ছবিটা সে প্রায় একশ বছব আগেব-যমুনাব পাড়ে গোটা দুই তালগাছ এঁকেছে। আছে কিনা জানি না। তালগাছ যমুনাব পাড়ে?"

শ্রীবিলাস কোনো উত্তর দিলেন না।
—"আজকাল নেই বোধ করি?"
—"নেই বোধ করি।"
—"কিন্তু তখনও কি ছিল? সেই একশ-সোয়াশ বছর আগে?"
—"কি জানি।"
—"তালগাছ থাকে বাংলার নদীর পাড়ে। যমুনার পাড়েও বটে!"
বিজন কৌতূহলের সঙ্গে হাসতে লাগল।
বললে, "যাই নি অবিশ্যি ওদিকে কোনোদিন, দেখি নি।"
—"খেয়েছ?"
—"কে, আমি?"
—"খাও নি?"
"না, আজ আর খাব না।"
—"কেন?"
—"কযেকটা কাটলেট খেয়েছিলাম—"
—"কোথায়?"
—"একটা ইটিং হাউসে——"
—"ছিঃ! যেখানে সেখানে খেও না—"
—"তা অবিশ্যি আমি খাই না বড় একটা——"
—"উচিত নয—"
—"খিদে পেয়েছিল কিনা—"
—"বাসায চলে এলেই পারতে—"
—"ঢেব দূবে ছিলাম কিনা বাসার থেকে—"
—"একটা বাসে চড়লেই ত হত—"
—"তাবপর খেলাম একটা সোডা—"
—"দু'টি ভাত খাও।"
—"না ভাত খাব না। তবে একগ্লাস দুধ খেতে পাবি—"
—"তবে খাও গিযে—"
—"শোবাব আগে খাব—"
—"দেখো, যেন গবম হয—"
—"তা হবে বৈকি—"
—"একটু ওভালটিন বা হবলিকস্ মিশিযেও নিতে পাব—"
—"না, ওসব অস্বাভাবিকতা আমার ভাল লাগে না—"
—"বেশ; তাহলে এমনিই খেও—"
বিজন বাঁ ভরুটা কপালের দিকে খানিকটা উঁচকে নিয়ে বললে, "একটা তালগাছ এঁকেছে বেশ খাড়া খুব উঁচুও বটে; গাছটার চারপাশে ঘন খানিকটা লতাব পাক, লতাটা কি আমি বুঝতে পারলাম না—"
—"কত বকম থাকে—"
—"গোলদিঘিব পুব-দক্ষিণ কোণে একটা ম্রিয়মাণ নাবকোল গাছ দেখেছ বাবা—"
—"নারকোল গাছ? আছে নাকি?"
—"হ্যাঁ আছে—"
—"চোখে পড়ে নি ত—"
—"অনেকেরই চোখে পড়ে না-কিন্তু আমি বরাবরই ত দেখে আসছি—"
—"কোনদিকে বল ত—"
—"জলেবই ধারে রেলিং ঘেঁষে।"
—"ব্যাস! মনেও ত পড়ে না কোনোদিন দেখেছি"
—"কিন্তু আছে—"

—"কাল দেখতে হবে ত গিয়ে—"

—"তা দেখো, গাছটা কেমন উদাস-বড্ড বিমর্ষ"

শ্রীবিলাস একটু চুপ থেকে বললেন, "তা, গাছের কথা উঠল যে—"

—"বেশ ফুলফুলে একটা লতা নারকোল গাছটাকেও জড়িয়ে আছে। ভিক্টোরিযা মেমোরিযালে দেখেছিলাম যমুনার পাড়ে সেই তালগাছ ঘিরে লতা—"

শ্রীবিলাস চুরুট জ্বালালেন।

—"ঢোলকলমির লতা বোধ করি?"

—"তা হবে"

—"কুঞ্জলতাও হতে পারে"

—"তা কত রকমই ত লতা থাকে।"

—"আর একটা তালগাছ এঁকেছে বাঁকা-বেশ ছিপছিপে, আব যমুনার পাবে হাতি হাওদা ফোযারা লোকলস্কর সেপাই বর্শা-সেই সেকেলে ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডেব মত-ঢেব জমেছে।"

—"আজকাল অবিশ্যি এসব নেই—"

—"না।"

বিজন বললে, "আচ্ছা ছবিটা এঁকে তোমাকে দেখাব একদিন—"

—"কি করে আঁকবে? কোথায বসে?"

—"সেই ভি এম এ—"

—"তা আঁকতে দেয?"

—"স্কেচ আঁকবে ত। তা কতক্ষণ আব!"

—"ছবি এঁকে পযসা পাওযা যায—"

–"এক এক ধবনের লোক আছে সেইজন্যই ছবি আঁকা শেখে।"

শ্রীবিলাস চুপ কবে বই্লেন।

—"কিন্তু আমি আঁকি আমার নিজেব অনুভূতিকে তৃপ্ত কববাব জন্য। এর আইন্দই ত ঢেব বেশি।"

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল বিজনেব—

বললে, "তেমন তৈরি কবে তুলতে পাবলে এক একটা ছবিকে এখন বিশ-পঁচিশ হাজাব দিযেও কিনে নিযে যায-"

—"কে কেনে?"

—"ধব কোনো রাজদববাবেব লোক কিনল, কিংবা কোনো আমেবিকান মিলিযনেযাবেব পছন্দ হল—"

বিজন বললে, "উঠি।"

বাবাব সঙ্গে আর্টের কথা বলতে গিযে বাববাব ওঠে ব্যবসা আব টাকাব কথা। খাওযা-দাওযা, টাকা উপার্জন, দব কষাকষি, ধাব শোধ-এই সমস্ত চিন্তাব থেকে মুক্ত হযে সে চায নিশ্চিন্তে ছবি আঁকতে-কিংবা ছবিব সম্বন্ধে আলোচনা কবতে।

কাজেই পরদিন দুপুবেবেলা হ্যাটকোট পবে একটা অ্যাটাচি কেস হাতে নিযে সে মাকে বললে, "চললাম।"

—"কোথায?"

—"ইমপিবিয্যাল লাইব্রেরিতে।"

বললে, "ছবির সম্বন্ধে নানাবকম বই আছে সেখানে। ইমপিবিয্যাল লাইব্রেরিতে অবিশ্যি অনেক বই-ই আছে, বেছে নেওযা মুশ্‌কিল। কিন্তু এক একটা বই এমন হাতে এসে পড়ে। চমৎকাব! খুঁজে নিতে হয। ও চমৎকাব!"

রাস্তায নেমে ট্রামে উঠল—কিন্তু ট্রাম খানিকটা দূব যাবার পবই চোখে পড়ল মাধবীদেব বাড়ি—অমনি টুক করে নেমে পড়ল সে। দুপুবেবেলা। মাধবীকে ড্রযিংরুমে বেশ নিরালা পাওযা গেল।

—"এই যে বিজনবাবু"

—"বাবু আর কেন?"

—"তবে কি মুখার্জি সাহেব"

—"সাহেব ত আরো জঘন্য"

—"পরেছ ত হ্যাটকোট টাই-ই—"

—"বুঝলে মাধবী রোজই ভাবছি এ পোশাক আমি ছেড়ে দেব—"

—"কেন?"

মেয়েটি সন্দিগ্ধভাবে বিজনের দিকে তাকালে।

বিজন—"একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আব সিল্কেব উড়ানি-আব পায়ে থাকবে লপেটা। সেই ত বেশ। কিন্তু ছোটবেলার থেকেই সুট পবার অভ্যাস-এ না পবলে দম বন্ধ হয়ে আসে যেন—"

বাঁ ভুরু কপালের দিকে খানিকটা উঁচকে নিয়ে বিজন মাধবীর দিকে তাকাল-বললে, "কীবকম অসঙ্গতি আমাদের জীবনে বল ত দেখি—"

—"এক-একজনকে চেকসুটে বেশ মানায। সে সব ছেড়ে বাঙালিব মত ধুতি চাদব পবে কে তাবা বাঁদব সাজতে থাকে—"

বিজন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

মাধবী কৌতুকেব সঙ্গে দেখে—"তোমাকে মিঃ মুখার্জি বলে ডাকব তাহলে?"

—"না"

—"তবে?"

—"একটা? বিলেতি কাযদা আমার বেশ ভাল লাগে—"

—"কি?"

—"বযসে বড় হলেও ওরা নাম ধবে ডাকে। ধব আমাকে যদি বিজন বলে ডাকতে তুমি।"

মাধবী "চালালেই হয।"

এ প্রসঙ্গ অবিশ্যি বিজন এখানেই থামল।

বললে, "জান মাধবী কাব ভি এম এ গিযেছিলাম-একটা ভাবি মূল্যবান জিনিস দেখে এসেছি।"

—"কি?"

—"তাজ মহলেব একটা ছবি—"

—"ও, আমি ভেবেছিলাম কি না যেন!"

—বলল, "তা তাজের ছবি। হ্যাঁ, সেও কি কম?"

—"ছবিটা ভাবি সুন্দব-অন্তত আমাব ত তাই মনে হল—"

—"দেখে আসতে হবে-কবে এল?"

—"সম্প্রতি এসেছে বোধ কবি। দেখে এস। না হয আমি একটা স্কেচও এঁকে আনতে পাবি—"

বাঁ ভুরু কপালে দিকে উঁচকে তুলে অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে মাধবীব দিকে তাকাল বিজন—"স্কেচ এঁকে আনব তোমাব জন্য।"

—"তা এনো।"

—"জান, কে এঁকেছে?"

—"কে?"

—"উইলিযাম ড্যানিযেল"

—"সে কে?"

—"আব এ"

—"আর্ট হিসেবে তাহলে লাভলি?"

—"লাভলি—"

—"আচ্ছা ছবিটা—"

—"বলছি তোমাকে। সচবাচব তাজের ছবি যেমন দেখ তেমন নয।"

—"বেশ ওরিজিন্যাল তাহলে?"

—"খুব।"

—"তাই ত বড় আর্টেব নকল—"

—"সাধারণত দেখ ত যে তাজের চারিদকে বাগান কেযাবি ঝবনা এমনকি যমুনা নদীটি অবদি বেশ গোছানো-পরিপাটি-ওপবে আকাশ বেশ নীল-সাদা মেঘগুলো ঝাড়ুদাব যেন গুছিযে রেখেছে—"

—"হ্যাঁ"

—"কিন্তু এ ছবিতে এরকমই একটা আশ্চর্য জিনিস দেখবে; যমনুা পাড়ে দু'টো তালগাছ—"

—"তালগাছ!"

মাধবী চোখ কপালে তুলে হো হো করে হেসে ফেললে—"মনে হয় আজগুবি কি বল! ভাবি, যমনুার পাড়ে আবার তালগাছ থাকে নাকি!"

—"আছে?"

বিজন বললে, "তালগাছ দেখা যায় বাংলাদেশের নদীর পাড়ে। কিন্তু এ ছবিটাতে যমনুাকে ঠিক বাংলার কোনো নদীর মত লাগে-কিছুটা ঠিক বলতে গেলে বিলের মত"

—"কিন্তু যমুনাকে এরকমভাবে সাজানো ত মিথ্যে। আর্টে এরকম অবাস্তবতা চলে?"

—"কিন্তু যমুনা আমরা কেউ দেখি নি ত-হয়ত তালগাছ থাকতেও-বা পারে।"

—"আজকাল অবিশ্যি নেই—"

—"এ ছবি হচ্ছে একশ বছর আগের; হয়ত তখন ছিলও বা—"

—"কে জানে!"

—"আজকালও হয়ত থাকতে পারে—"

—"তাও ত পারে—"

—"কি দুঃখের বিষয় আমরা কেউ আগ্রা যাই নি, নিজের চোখে দেখে তাহলে জিনিসটার ঠিক অর্থ আমরা বুঝতে পারতাম। তুমি আগ্রা গিয়েছিলে কোনোদিন মাধবী?"

—"না।"

—"বাস্তবিক, আমাদের দেশের আর্টের জিনিসগুলোকে আমরা এমনি করে অবজ্ঞা করি—"

—"বাস্তবিক, দার্জিলিং এমন দু'শ বাব গেলাম-শিলং গেলাম-কালিম্পং দেখলাম-এমন কি সিমলে অবদি গেলাম-মুসুরী দেরাদুন নৈনিতালেও ত কতবার—"

—"কিন্তু আগ্রা দেখলে না"

—"তুমিও না আমিও না।"

দু'জনেই খানিকটা নীরব ও অপরিতৃপ্ত হযে বসে রইল।

মাধবী বললে, "একটা কাজ কব না—"

—"কি?"

—"আগ্রায় যাও—"

—"তাই যাব ভাবছি—"

—"গিয়ে তাজমহলের কযেকটা স্কেচ এঁকে আনো—"

—"ভিক্টোরিযা মেমোরিযালেব ছবি দেখহেই সে সঙ্কল্প আমি ঠিক কবে ফেলেছি—"

—"এই সেদিন ত সিমলার থেকে এলাম-না হলে আমিও যেতাম—"

—"বেশ ত চল না।"

—"বাবা এখন যেতে দেবেন না।"

মাধবী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "কবে যে নিজের ইচ্ছামত চলতে পারব তাই ভাবি—"

কিন্তু বিজন এ ইঙ্গিত অনুসরণ করতে গেল না। প্রেম-প্রেম সম্বন্ধে আলাপ-ভালবাসাব প্রসঙ্গ তার কাছে বরং একটু অবান্তর জিনিস; মেযেদেব সঙ্গে কথা বলতে সে অবিশ্যি ভালবাসে-বিশেষত ছবি-আর্ট ক্বচিৎ গান বা কবিতা নিযে কিন্তু এই পর্যন্ত। তারপর সব ফুরিযে যায তাব।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর মাধবী বললে, "আজকালই যাবে?"

—"কোথায? আগ্রা?—না"

—"কেন?"

—"এখন হল তোমার শ্রাবণ মাস-এই বর্ষাব ভেতব সুবিধা হবে না-তাজ আঁকতে হয খুব ভোরের বেলা যখন সূর্যের সোনালি পিঁয়াজি রঙ নিটোল গম্বুজ মিনারে এসে পড়ে—"

মাধবী একটু চুপ করে থেকে—"আমি একটা কথা ভাবছি—"

—"কি কথা?"

—"তাজের তিন রকম ছবি আঁকলে হয় না?"

—"কি রকম?"

—"একরকম হচ্ছে সেই ঝরঝরে ভোরের বেলায় সোনালি পিঁয়াজি রঙের কথা যা বললে-আর একটা হচ্ছে জ্যোৎস্নায়-"

—"সেটা বড্ড হ্যাকনিড হয়ে গেছে—"

—"আর একটা হচ্ছে এই বর্ষায়ই—"

বিজন খানিকটা বিস্মিত হয়ে মাধবীর দিকে তাকাল।

মাধবী-"ভেবে দেখে ত এই মেঘে বর্ষায় জলে ছায়ায় কখনো বা ফ্যাকাসে খানিকটা রোদে তাজের রূপ আর এক রকম ভাবে খুলে যায় না।"

বিজন বাঁ ভুরু কপালের দিকে অনেকখানি উঁচকে তুলে স্তম্ভিত হয়ে বললে, "ঠিক কথাই তুমি বলেছ মাধবী—"

"ভেবে দেখ—"

বুকে হাত বেঁধে গম্ভীর হয়ে বিজন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে, "কালই আমি আগ্রা যাব ভাবছি—"

মাধবী—"তাহলে তিনরকম ছবিই পাবে। কারণ এসব জায়গায় আমাদের দেশের মতন এমন ঝামেলা করে বৃষ্টি পড়ে না। মাঝে মাঝে বেশ রোদ ওঠে-জ্যোৎস্নাও—"

—"চা খাবে?"

—"না।"

—"আচ্ছা তাহলে একটু কফি খাও—"

—"না। তোমার কাছে এসেছিলাম একটা কাজে-ভেবেছিলাম সেটুকু সেরেই লাইব্রেরিতে চলে যাব। তা কথায় কথায় সময় যায় কেটে, কিন্তু তোমার কাছ থেকে ভারি একটা চমৎকার সাজেশন পেলাম। বাস্তবিক বড় চমৎকার। তা কালই আমি আগ্রা রওনা হয়ে যাব।" একটু থেমে বিজন বললে, "এখন তোমার পড়ার ঘরে একটু যাবে?"

—"কেন?"

—"অনেকদিন থেকেই ভাবছি-কিন্তু সুবিধা হয়ে ওঠে না-আজ তোমার একটা ছবি আঁকব—"

—"এখানে বসে হয় না?"

—"এখানে নানারকম লোকজন আসে কিনা?"

—"তোমার কাছে সরঞ্জাম আছে?"

—"সব।"

—"আচ্ছা চল।"

মাধবীর পড়ার ঘরে ঢুকে বিজন দরজা বন্ধ করে দিলে। একটা শোফায় বসে বললে, "কোথায় বসবে তুমি?"

—"আমি কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারব না।"

—"তাকাবার কোনো দরকার নেই—"

—"তোমার বাঁ ভুরুর ঝাঁপাঝাঁপি দেখে বড্ড হাসি পায় আমার—"

—"ভরুটা আমার সহজেই কপালের দিকে যাত্রা করে বুঝি?"

—"হ্যাঁ, বিশেষত যখন তুমি এক মনে কিছু ভাব, মিথ্যা সঙ্কল্প কর, কিংবা খুব মন দিয়ে কাজ করতে থাক—"

মাধবী বিজনের মুখোমুখি একটা সোফায় গিয়ে বসল।

বিজন—"দাঁড়াতে পার?"

—"তাও পারি।"

—"ধর ওই দেওয়ালের দিকে যে ছবিটা আছে সেই দিকে তাকিয়ে?"

—"আচ্ছা বেশ।"

দাঁড়াল মাধবী—

—"মাধবী?"

—"বলো"

—"আচ্ছা অমিই তোমার গায়ের শালটা সাজিয়ে দিচ্ছি—"
মাধবীর গায়ের শাল বিজন তার মনের রুচি মত সাজিয়ে দিলে—
সোফায় গিয়ে বসল আবার—
এক মিনিট এঁকে বললে, "মাধবী?"
"কি বলো।"
—"তোমার চুল কিন্তু এরকম থাকলে চলবে না; একটু এলিয়ে দিতে পার? না না, ওরকম না। হ্যাঁ; এই আবার নষ্ট করে ফেললে। আচ্ছা আমি দিচ্ছি—"
মাধবীর চুল তার ঘাড়ে গালে বিছিয়ে রুচিসঙ্গত কল্পনাকে তৃপ্ত করে বিজন সোফায় এসে বসল আবার।
মিনিট পাঁচেক এঁকে সে একটা চুরুট জ্বালাল।
বললে, "বাস্তবিক তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"
—"কথা বলো না কিন্তু—"
—"কেন?"
—"তাহলে আমার চুপ করে দাঁড়াতে অসুবিধা হয।"
—"আচ্ছা বলব না।"
আঁকা চলছিল—
মাধবী—"এই!"
—"কি?"
—"কদ্দূর হল?"
—"কথা বলো না।"
—"কিন্তু চুরুট জ্বালিযেছ যে?"
—"বেশ জ্বালালামই বা!"
—"ধোঁযা গিযে ছবিব ওপব পড়ে না?"
বিজন হো হো করে হেসে উঠল।
—"হেসো না।"
—"কেন?"
—"আমাব যে হাসি পায।"
—"আচ্ছা চুপ কবলাম—"
বিজন আঁকছিল।
—"শুনছ?"
—"কি আবাব।"
—"চুরুটটা নিবিযে ফেল—"
—"গন্ধ ভাল লাগছে না—"
জানালা দিযে চুরুটটা বাইবে ফেলে দিল বিজন।
খানিকক্ষণ পরে মাধবী-"এই"
—"কি?"
—"কদ্দূব আঁকা হল?"
—"খানিকটা সময লাগবে অবিশ্যি"
—"খালি চোখে তাকিযে তাকিযে আমাব চোখ ব্যথা করছে—"
—"একটু সবুর কর মাধবী"
—"আমাব চশমাটা পবিযে দাও"
—"তা হয় না"
—"তাহলে মেনথলের শিশিটা দাও"
—"কপালে ঘষবে?"
—"কিন্তু তাহলে যে পোজ নষ্ট হযে যাবে"
—"তুমি ঘষে দাও না তাহলে?"

—"একটু অপেক্ষা কর না—"

—"একটা অ্যাসপিরিন বরং দাও আমাকে"

—"কোথায আছে?"

—"দেবাজেব ভিতর—"

বোতলটা বের করে বিজন বললে, "কিন্তু জল দিয়ে গিলতে হবে ত?"

—"আমি এমনিই গিলতে পারি—"

একটা ট্যাবলেট মাধবীব মুখে ছেড়ে দিয়ে–"বেশ নাও" মাধবী গিলে ফেলল। বিজন শোফায বসে আঁকতে আঁকতে একটু বিমর্ষ হয়ে বললে, "তোমাদের জড়িবড়ি ঢেব। অ্যাসপিবিন খেলে আবার!"

আর একটু এঁকে বললে, "কাহিল হয়ে পড় যদি?"

মিনিটখানেক এঁকে বললে, "চেহাবায যে স্বাভাবিক সজীবতা তাহলে ত আব থাকবে না। আর্টের পক্ষে তা অবিশ্যি ক্ষতি নয। কিন্তু তোমার ড্রপিং ফিগাব আঁকতে চাই নি ত আমি–"

এমন সময দবজায পড়ল ধাক্কা।

মাধবী লাফিয়ে উঠে বললে, "বাবা এসেছেন–দরজা খুলে দেই—"

বিজন অত্যন্ত বিবক্ত ব্যথিত হয়ে কার্নিশের দিকে তাকিয়ে বইল।

প্রভাতবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, "এই দুপুববেলা!"

মাধবী—"আমাব ছবি আঁকছিল"

সোফাব ওপর বসে প্রভাতবাবু—"ছবি! কেন, লাটসাহেবেব মেম হয়ে গেছ নাকি যে, তোমাব ছবি আঁকবার জন্য লোক চাই।"

মাধবী ঘাড় হেঁট কবে চুপ করল।

বিজন বললে, "ছবি শুধু লাটসাহেবেব বা তাব মেমেবই আঁকা হয না। ড্রেনেব পাশে একটা মবা বিড়ালেরও ছবি আঁকা চলে।"

প্রভাতবাবু বললেন, "ড্রেনেব পাশে একটা মরা বেড়াল!"

—"হ্যাঁ"

—"কেন সে ছবির বিশেষত্ব কি?"

—"মনেব ভেতব একটা ভাব জাগায–"

—"কি বকম ভাব"

—"এক কথায ত বলতে পাবি না আপনাকে। তবে বাজামহাবাজাদেব ছবিই শুধু আর্টিস্টবা আঁকে না। অতি সামান্য দৈনন্দিন জীবনেব কত ঘটনা যে তাদেব আঁকবাব বিষয তা যদি আপনি শোনেন বিস্মিত হবেন—"

প্রভাতবাবু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সন্ধিগ্ধভাবে জীবনেব দিকে তাকালে।

বিজন—"মুবিলোব একটা ছবিব কথা বলছি আপনাকে, ব্যাপাবটা তাহলে একটু সহজ হয়ে আসবে আপনাব কাছে—"

—"মুবিলো কে?"

—"একজন আর্টিস্ট"

—"কোথাকার?"

—"সে সব কেন জিজ্ঞেস কবতে যান? আর্টিস্টেব কি কোনো দেশকাল আছে নাকি? রাজা বা বাজনীতিবিদদের মত এবা পবস্পবেব ভিতব খোঁচাখুঁচি কবে না ত। কিংবা ব্যবসাবদেব খানিকটা জাযগা নিয়ে–বিষয নিয়ে–টাকা নিয়ে না তা কবে না। জীবনের সৌন্দর্য ও বিচিত্রতা নিয়ে এবা নিযুক্ত। অন্য কিছুব সময আছে কি এদেব?" বলতে বলতে বিজনের দু'চোখ বড় বিস্ফারিত হয়ে উঠল; হাত দু'টা শূন্যেব ভিতর নেচে উঠল—।

মাধুরী লক্ষ্য করছিল এই যুবকটির কি আন্তবিকতা। কিন্তু শঙ্কিত হয়ে বাবার দিকে তাকাচ্ছিল সে। প্রভাতবাবু বীতশ্রদ্ধ হয়ে চুপ করেছিলেন।

বিজন—"অবিশ্যি জীবনেব সৌন্দর্যের কথা বলছিলাম আপনাকে–তার মানে আপনারা সে সব কিছুকে সুন্দব মনে করেন তা শুধু নয—"

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, "আচ্ছা হয়েছে—"

—"ধরুন ব্যথাও ত অনেক সময় সুন্দর হতে পারে-এমন কী ভীবৎসতা পর্যন্ত—"

বলে বিজন কৌতূহলে আমেজে পরিতৃপ্তিতে হেসে উঠল।

বড্ড নিঃসঙ্কোচ হাসি। কিন্তু মাধবী নার্ভাস হয়ে বিজনকে চোখ ইসারা করে বললে, "চুপ করবে!"

চুপ করল ছেলেটি।

প্রভাতবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, "মুরিলোর কথা জানতে চেয়েছিলেন? তিনি হচ্ছেন স্প্যানিশ আর্টিস্ট—"

প্রভাতবাবু বললেন, "তুমি কি গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এ পড় নাকি?" বিজন হো হো করে হেসে উঠে বললে, "কেন তা পড়তে যাব! আমাদের দেশের বা কোনো দেশের কবিরা কি গভর্নমেন্ট স্কুল অব পয়েট্রিতে পড়তে যান। কি বিপদ!"

বলে সমস্ত ঘরটা মাথায় তুলে হেসে উঠল আবার। হাসি তার কিছুতেই থামছিল না—

হাসতে হাসতে বললে, "এ জীবনের বিচিত্রতার মূল সূত্রই আপনাবা জাননে না—না"

কিন্তু মাধবীর দিকে তাকিয়ে থমকে গেল বিজন।

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, "আর্টের অ্যানাটমি শিখতে গিয়ে সময় নষ্ট করে কী দরকার! কবিতাব ছন্দও কেউ কারু কাছে শিখতে যায় না। যাদেব কিছু শিখবার আছে-কিংবা আঁকবার-তাদেব কাছে এই পৃথিবী [?] আর তার মানুষগুলো ঢেব।"

বাঁ ভুরু কপালের দিকে উঁচকে তুলে প্রভাতবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীবভাবে বললে, "যারা বাস্তবিকই কিছু আঁকতে এসেছে তাদেব পক্ষে এই পৃথিবীর চারদিককাব সবঞ্জামই যথেষ্ট।"

বললে, "এই পৃথিবীটা-প্রভাতবাবু-বাস্তবিকই বড় চমৎকার। উঃ, কি যে বিচিত্র।"

বাঁ ভুরু একেবারে কপালের প্রান্তে উঠেছিল বিজনেব। মুখখানা গম্ভীব ও ঐকান্তিক। প্রভাতবাবু-"তুমি ফোটো তোল না?"

—"না"

—"কেন"

—"ফোটো তুলে কি হবে!"

—"কে বললে আপনাকে?"

—"বলে ত সব আর্টিস্ট।"

বিজন এবার আর হাসল না। কিন্তু অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বললে, "আমার বড্ড কষ্ট হয় এই সব কথা শুনলে। ব্যবসাও যদি আর্ট হয়!"

মাধবীর দিকে তাকয়ে বললে, "বাস্তবিক ফোটোগ্রাফাবেব দোকানেব সাইনবোর্ডেব দিকে তাকালে এমন লজ্জিত বোধ করি—"

—"তা বোধ করতে পাব, কিন্তু তারা ঢের পয়সা পায—"

—"সে ত পাটের দালালবাও পায। কিন্তু এদের মত মৃত জিনিস নিয়ে আমরা ত কাববাব কবি না-"

সকলেই চুপ করেছিল।

বিজন—"আচ্ছা তাহলে তোমাব ছবি এখন আব হবে না মাধবী?"

প্রভাতবাবু বললেন, "না।"

—"তাহলে লাইব্রেরিতে যাই—"

বলে সে উঠে পড়ল।

ইমপিবিয়্যাল লাইব্রেবিতে গিয়ে প্রভাতবাবুর কথা মনে কবে এমন হাসি পেল তাব-বলে কিনা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টের কথা! অবনীবাবু পড়েছিলেন সেখানে না মোলবোম পড়েছিল? না রাজপুত আর্টিস্টরা? না মুঘল শিল্পীদের দল? আশ্চর্য, চীনে সুঙ যুগে যে এত সব ছবি তৈরি হল সেগুলোর মালিকেরা কোন স্কুলে পড়েছিলেন? স্কুল! কলেজ! এসবেব সঙ্গে আর্টের সম্পর্ক কি! শেকসপীয়র থেকে শেলী অবদি চণ্ডীদাস থেকে সত্যেনবাবু পর্যন্ত স্কুল বা কলেজের সঙ্গে সংস্রব তাদের?

কিন্তু সবচেয়ে হাসি পেল তার প্রভাতবাবুর ফোটো আর্টিস্টদের কথা মনে করে। ভাবল-বাস্তবিক। ভাবল-মানুষের জ্ঞান কত কম থাকে!

কিন্তু পরের মূহর্তেই মাইকেল এঞ্জেলো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধের ভিতর ডুবে গেল।

পড়তে পড়তে বিজনের মনে কতকগুলো ছবিব নকশা তৈরি হতে লাগল-বেশ নতুন নিবিড় কিন্তু অস্পষ্ট অসংবন্ধ কতকগুলো ছবি—

এগুলোকে রূপ দিতে হবে যে!

কাজেই সে বই বন্ধ করে লাইব্রেরি ছেড়ে চলে গেল।

যাবে বালিগঞ্জের দিকে-সেইখানেই তাব বাসা-কিন্তু ধবলে শ্যামবাজারের ট্রাম-গোলদিঘির কাছাকাছি এসে সে তার ভুল বুঝতে পারল-নেমে পড়তে হল তাই। একটা পানের দোকানের কাছে এসে গোটা দুই চুরুট কিনে সে তার টাকা ভাঙাল। খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে দেখে দেশলাই নেই। কাজেই দেশলাই কিনবার জন্য অন্যমনস্কভাবে আর একটা টাকাও ভাঙাল। অনেক খুচবো পয়সা হয়ে গেল বটে-গোলদিঘির থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ অবদি-প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃষ্ণদাস পালেব স্ট্যাচু পর্যন্ত অনেক কুষ্ঠরোগী ভিখিরি খোঁড়া এমন কি সিঁদুর মাখা দরিদ্র কুলবধূ অবদি বসে গেছে-ভিক্ষাব জন্য।

বিজন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ভাবল-কি যে ব্যাপাব! একানি-দোযানি-সিকি-পয়সা-আধুলি যা হাতে উঠতে লাগল তাব মাথায-মাথায প্রত্যেক ভিখিরিকেই বেচারার কপাল অনুযায়ী বিলিযে দিযে চলতে লাগল বিজন।

তারপব আশ্বস্ত হয়ে দেখল-একজনও বাদ নেই আর।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গোলদিঘির পুব-দক্ষিণ কিনাবেব দিকে তাকিয়ে দেখল-সেই ম্রিয়মাণ নারকোল গাছটা! একবাব দেখে আসতে হয়।

গোলদীঘিব ভিতব ঢুকল তাই-নাবকোল গাছটাকে জড়িয়ে একটা নিবিড় লতা-কিন্তু ফুলগুলো বড় বিশীর্ণ-বড্ড কম। খনিকক্ষণ নিস্তব্ধ হযে এই সবেব পাশে দাঁড়িয়ে রইল সে।

তাবপব ঘুবে দিঘিব উত্তব দিকে অশ্বত্থ গাছ দু'টোর কাছে যখন এসেছে সে দেখল একটি ছেলে গুলিবাঁশ হাতে নিয়ে ডালপালার ভিতব ক্রমাগত ছোট ছোট ডিমের মত শুকনো মাটিব গুলি ছুঁড়ছে।

ডালপালাব ভিতব তাকালে দেখা যায দু-একটা বুলবুল। ছেলেটার হাত খপ কবে ধবে ফেলল তাই বিজন। গুলিবাঁশটা ফেলল ভাঙে।

বিজনেব হ্যাটকোট প্রমাণসই আত্মপ্রতিষ্ঠা চেহাবা দেখে ছেলেটা না পাবল গাল দিতে না পাবল কাঁদতে। কোনোবকম কিছু ভরসা না পেয়ে সে মাথা হেঁট কবে চলে গেল।

স্কোযাবেব দাবোযান বিজনেব দিকে প্রশংসা ভবে একবাব তাকিয়ে দেখল; অশ্বত্থ গাছেব ডালপালাব ভিতর বুলবুলিগুলো মৃত্যুকেও দেখতে পায নি-এই নিস্তাবকেও অনুভব কবতে পারল না। শাখায শাখায তাদের লাফালাফি-গান-খুনসুটিই মুহূর্ত নীবব হয়ে তাকিয়ে দেখল বিজন।

তারপব বললে, "বাঃ। জীবন কি বিচিত্র! কি সুন্দর!"

খুব আয়েসের সঙ্গে সিগাবেট ধবিয়ে টানতে টানতে দিঘির থেকে গেল বেরিয়ে। কলেজে স্ট্রিটেব একটা বইযেব দোকানে ঢুকে একটা ইংবেজি নভেল কিনল-তাবপব ফুটপাথে নেমে কালিঘাটেব বাস ধবলে।

বিজনেব কাচে এসে কনডাকটাব তৎক্ষণাৎ টিকিটেব দাম চাইল-সে পকেটে হাত দিয়ে দেখল এগাবটা পয়সা আছে মাত্র-দু-আনা বাসওযালাকে দিয়ে টিকিট কিনে নিলে; বাকি বইল তিন পয়সা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে-বাত্রি আসছে।

সন্ধ্যা হয হয-সমস্ত শ্রাবণের আকাশ মেঘে গেছে ভবে। সাবাদিন বৃষ্টি হয নি-কিন্তু বাত্তিবে খুব ঝরবে। বাসের জানালাব ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল বিজন চাবদিকে গ্যাস লাইট-ট্রাম-মোটব-লবি-বাস মানুষেব কাল কাল মাথা সব। আর ওপবে থমথমে মেঘেব ফাঁকে কালীদহেব ঢেউয়ে বিব্রত ময়ূবপঙ্খীব মত চাঁদ—

বড্ড চমৎকাব-কিন্তু দেখতে হলে নেমে পড়তে হয। স্থিব হয়ে এক জাযগায় গিয়ে দাঁড়াতে হয।

ঝট করে বেল টেনে নেমে পড়ল সে; সাত শিলিং দু-পেন্স দামেব বইখানা অবিশ্যি বাসের গদিব ওপরেই ফেলে এল।

কিন্তু ফুটপাথে নেমে চাঁদটাকে যখন সে দেখতে গেল-তখন চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে-

কাজেই আবার সেই বালিগঞ্জের বাসাব দিকেই ফিরে যেতে হয। কিন্তু পকেটে আছে তিনটে পযসা মাত্র। হাতে অবিশ্যি বইখানাও নেই; কোথায যে গেলে-তাও সে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

বড্ড খিদে পেযেছে-একটা ছোটখাট নোংরা চাযের দোকানে ঢুকল সে।

দু-পয়সার একটা কাপ চা-আর এক পয়সার বিস্কুট খাবে বলে ঠিক করল। কিন্তু চায়ের দোকনের পাশেই একজন পশ্চিমে ফুলুরি বেগুনি ভাজছিল-বেগুনিই খাওয়া যাক। লোকটার দু-হাতের আঙুলই খসে খসে পড়ছে-পায়ের আঙুলেরও সেই অবস্থা কুষ্ঠ নাকি! হতে পারে-কিন্তু কত লোকই ত খাচ্ছে-বিজনও খেল—

ফুলুরি বেগুনি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে যখন তখন বেশ বৃষ্টি নেমেছে-ফুটপাথ ধরে হেঁটে হেঁটে বালিগঞ্জে বাসার দিকে চলল বিজন।

পৌঁছতে এক ঘন্টা লেগে গেল। মা বললেন, "সারাটা পথ ভিজলি!"

তারপর আগ্রা যাওয়ার পালা—

বিজন-"আমি কালই আগ্রা যাব মা"

—"কেন?"

"তাজমহলের তিন রকম ছবি আঁকতে—"

আগাগোড়া সমস্ত শুনে শ্রীবিলাস-"আচ্ছা যেও-কিন্তু আগ্রায় নিয়ে কোনো হোটেলে না থেকে জানকীবাবুদের বাসায় থেকো। আমি জানকীকে একখানা চিঠি দিচ্ছি-আমার অনেক দিনের বন্ধু-বেশ আদর করবে।"

—"চিঠি দাও, কিন্তু প্রথম গিয়ে হোটেলেই উঠব—"

—"কিন্তু তাতে বড্ড খরচ যে বাবা"

—"এমন কি আর!"

—"কদিন থাকবে আগ্রায়"

—"দশ-বার দিন ত থাকতে পারি-দরকার হলে হয়ত চার-পাঁচ মাসও লেগে যেতে পারে—"

—"এ্যাদ্দিন অবিশ্যি লাগবে না—"

—"মানে তাজমহলের তিনটে এফেক্ট চাই, আর তার ছবি-এফেক্টগুলো বড্ড ফ্লিটিং। ছবি আঁকা ত তোমাদের সেক্রেটারিয়েটের সিডিউল উলটে যাওয়ার মত সহজ নয়—" বলেই হো হো করে হেসে ফেলল—

কিন্তু তারপরেই ভুরু উঁচকে খুব গম্ভীরভাবে তার বাবার দিকে তাকাল।

আগ্রায় গিয়ে একটা সাহেবী হোটেলেই উঠল বিজন-এবং দু'দিন পরেই আরও তিনশ টাকা তার করিয়ে বাবার কাছ থেকে আনিয়ে নিল-আগ্রায় এসে দেখল শ্রাবণের মাসের এখানে কোনো মানে নেই; মেঘ নেই-দারুণ গরম; তরবারের ফলার মত রোদ ঝলকায়; দিনরাত ধূলো ওড়ে, খুব ভোরের বেলা সূর্যের পিঁয়াজী সোনালি রঙে তাজের নিটোল গম্বুজ মিনার স্বপ্নের পাতের [?] মত মনে হয় বটে-তা মনে হয় বটে-আর জোৎস্নায় সেই হ্যাকনিড তাজ-কিন্তু মাধবী যা বলে দিয়েছিল বাদলের অন্ধকারে ঘোরে ছায়ায় জলে কখনো বা তরমুজের রসের ধোঁয়াটে রঙের মত বৃষ্টির করুণ আলোয় যে তাজ-সে তাজ সে দেখতে পাচ্ছিল না। দিল্লি চলে গেল তাই—

কয়েকদিন টাঙায় টাঙ্গায় ঘুরে ঘুরে জামা মসজিদ আঁকলে-দিল্লির ফোর্ট-হুমায়ুনের কবর-চাঁদনীর চক-দরিযার দিকটা-দিল্লির যমুনার শ্রীছাঁদ-পুরনো শহরটা-চারদিকের ভাঙা প্রাচীর, কাঁটাগাছ ভরা। পাথরের চাঙড়ময় দূরের কাল পাহাড়টা। তারপর পুরনো শহরের দৈনন্দিন জীবনের নানারকম খুঁটিনাটি আঁকবে বলে ভাবছিল যখন তখন বৃষ্টি শুরু হল।

চলে গেল আগ্রায়—

আগ্রায় গিয়ে দেখে ঝাঁঝাঁ রোদ।

বৃষ্টি অবিশ্যি আগ্রায় হয়েছিল—কিন্তু বিজন তখন দিল্লিতে—কিংবা পথে ট্রেনের কেবিনে। দিনের বেলা একদিন খেয়েদেয়েই ঘুমল-জেগে উঠে দেখে বেলা পড়ে গেছে প্রায়; হোটেলের রেলিঙে যে পেন্টালুন শর্ট শুকুচ্ছিল ভিজে ছবছব করছে-রেলিঙ, জানালার কপাট, শার্সি, চারদিককার ঘরদোর বাড়ি সমস্ত আগ্রার শহর জলের ভিতর ডুব দিয়ে উঠেছে যেন-হোটেলের কেউ কেউ ওয়টার প্রুপ গায় দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, আকাশের পশ্চিম কোণে দু-তিনটে কাল মেঘ—

বাসায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল বিজন। এমন বাদলে তাজ দেখা হল না তার। নাই বা আঁকত ছবি, মেঘবৃষ্টির পারিপার্শিকে তাজের কি নতুন রূপ হয় নিরিবিলি দেখে নিয়ে তারপর হোটেলের দরজা বন্ধ করে ছবি আঁকাও চলত ত—

হোটেলটা সে ছেড়ে দিলে। বাবার চিঠি নিয়ে জানকীবাবুর বাড়িতে উঠল গিয়ে। জানকীবাবুব বাড়িতে লোকজন বেশি ছিল না তখন; জানকীবাবু, তার স্ত্রী, আর মেয়েটি-নাম তাব সন্ধ্যা-এরা তিনজন ছিলেন।'

বিজন তাজ আঁকতে আগ্রায় এসেছে শুনে এবা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বইলেন। তারপর অবিশ্যি উৎসাহের কথা অনেক বললেন।

খাতির করলেন খুব।

বিজন এদের কাছে আর্ট সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিল। জানকীবাবু আব তার স্ত্রী প্রথম প্রথম মন দিয়ে শুনতেন বটে। কিন্তু কিউবিজম, ফিউচাবিজমেব অন্ধকাব গহ্বর যখন আবম্ভ হল তখন তাবা বিদায় নিলেন। রইল পড়ে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা একদিন বললে, "এ কল্পনাটা আপনার বেশ-তাজমহলেব তিনকরম ছবি নেওয়া"

—"কিন্তু এ কল্পনা আমার নয়"—

—"না?"

—"এ হচ্ছে মাধবীর আইডিয়া—"

—"মাধবী কে?"

বিজন পরিচয দিল; মাধবীব কথা বললে বলতে এ উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়ল যে সন্ধ্যাব কাতরতা চোখেই পড়ল না বিজনের—।

কিন্তু রাতের বেলা বিছানায শুয়ে ঘুমবার সময় বিজন ভাবত-সন্ধ্যা মেয়েটি বেশ; কেমন ঠাণ্ডা; শান্ত, এমন স্থির ভাবে চিন্তা করতে জানে; যে সব কথা বলে কি গভীর! খুব মূল্যবান ভাবে জীবনযাপন না করলে পৃথিবী বা মানুষেব জীবন সম্বন্ধে একটা অটুট পবিচয লাভ করতে পাবা যায না।

সংযমও কতদূব! পরেব উপকার কববার জন্য সব সমযই এমন উন্মুখ; নিজেব জাযগা সকলকে ছেড়ে দেবাব জন্য সব সমযই যেন প্রস্তুত!

বাস্তবিক মেয়েটি!—

ভাবতে ভাবতে ঘুমিযে পড়ে বিজন।

একদিন খুব গভীব বাতে চমকে জেগে উঠে বিজন দেখলে সন্ধ্যা তাব বিছানার পাশে দাঁড়িযে।

আশ্চর্য হয়ে বললে, "তুমি যে এখানে!"

সন্ধ্যা হাসতে হাসতে বললে, "রাগ কববেন না, কিন্তু খুব দবকাবেই এসেছি—"

—"কি বল ত দেখি—"

—"শুনছেন না বৃষ্টি পড়ছে!"

—"ও তাই ত!"

ধড়মড় করে বিছানায উঠে বসে বিজন—"এখুনি তাহলে ত যাওয়া দরকাব" একলাফে দাঁড়িযে উঠে, ওযার্টাব প্রুফ গায দিতে দিতে বললে, "তুমি এসে খুব ভাল কবেছ সন্ধ্যা-তুমি কি কবে টেব পেলে!"

—"আমি জেগেছিলাম"

—"কেন?"

—"এমনিই জেগে থাকি।"

—"রাত দু'টো অবধি ছিলে জেগে?"

—"কথা বলে সময নষ্ট কবছ না।"

—"কি দবকার।"

—"বৃষ্টি থেমেও যেতে পারে—"

—"তাই ত—" জানালাটা খুলে গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিজন বললে, "চমৎকার!"

সন্ধ্যার দিকে ফিরে বললে, "আমার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল—যখন ঢুকলে!"

—"হ্যাঁ"

—"খুলতে বোধহয একটু সঙ্কোচ বোধ কবছিলে?"

—"না কেন করব"

—"আমাদের বাংলাদেশের মেয়েবা করে—"

—"আমিও ত বাঙালি"

—"কিন্তু আগ্রাব বাঙালি"

বলে বিজন হো হো করে হেসে উঠল।

—"আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না?"

—"না, বৃষ্টি দু-ঘন্টা থাকবে আরো—"

—"বলতে পারা যায় না?"

—"এই ত শুরু হল সবে!"

—"হ্যাঁ"

—"তবে আর কি"

একটু চুপ থেকে বললে, "তাজও পঞ্চাশ মাইল দূবে নয—"

সন্ধ্যা বললে, "টাঙ্গা যদি না পান!"

সে কথার কোনো উত্তর না দিযে বিজন বললে, "তারপর আমাব বিছানাব পাশে এসে দাঁড়ালে বুঝি?"

সন্ধ্যা কোনো জবাব দিলে না।

—"আমাকে?"

কোনো উত্তর দিলে না মেযেটি।'

বিজন—"বেশ করেছ। এই যে তোমার সাবাবাত জেগে থাকা কখন বৃষ্টি হবে এই অপেক্ষায়—তারপর আমাকে এসে জাগানো-এ বড় চমৎকাব জিনিস।"

জুতোর ফিতা বাঁধতে বাঁধতে বললে, "আমাদেব জীবন বড় বিচিত্র জিনিস সন্ধ্যা—"বলেই বেরিযে গেল।

সন্ধ্যা-"শুনুন"

—"কি"

—"হেটে যাচ্ছেন কেন"

—"দেখছি টাঙ্গা কোথাও পাওযা যায কিনা—"

—"কিংবা ট্যাক্সি-"

—"হ্যাঁ সে পাওযা যায।"

বলে অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিব মধ্যে ডুবে গেল ছেলেটি।

সন্ধ্যা চুপে চুপে ফিবে এস বিজনের বিছানাব ওপর পড়ে তাবই কম্বলে আপাদমস্তক জড়িয়ে বইল এমনি অনেকক্ষণ—

কিন্তু খট করে জুতোব শব্দ শুনতেই সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নিজেকে সামলে নিযে এক কিনাবে সোফায গিযে বসল।

দরজা খুলল। বিজন ঢুকে পড়ে বললে, "দেখে এসছি তাজ-এখন ছবি আঁকব"

—"এখনই?"

—"এখনই।"

বেন কোটটা খুলতে খুলতে বিজন—"তুমি আমাকে একটা আলো দেবে সন্ধ্যা"

—"দিচ্ছি"

মিনিট তিনেক-চারেক পরে খুব চমৎকাব একটা টেবল-ল্যাম্প এনে মেহগিনি কাঠেব টেবিলটাব ওপর রেখে দিল সন্ধ্যা—

তারপর বিদায হল।

আধঘন্টা পবে এক পেযলা কফি আর কতকগুলো টোস্ট, কেক, ফল ইত্যাদি এনে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিজনেব পেছনে এসে দাঁড়াল মেযেটি—

কিন্তু বিজনের তন্ময়তা দেখে থমকে গেল। চোখে চশমা লাগিযে বাঁ ভুরু কপালের দিকে উঁচকে তুলে—এই যে বিজনের ধ্যান-একে ভাঙতে সে ভয পেল। নিঃশব্দে যেমন এসেছিল তেমনিভাবেই ট্রে হাতে করে ফিরে চলে গেল।

দিনকযেক কেটে গেছে—

একদিন দুপুরবেলা বিজন বললে, "আমার রেন কোটটা ইঁদুব কেটে ফেলেছে বোধ করি"—

সন্ধ্যা—"কোথায রেখেছিলে!"

—"সেদিন বৃষ্টির ভেতর তাজ দেখে ফিবে এসে এটাকে মেঝেব ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম—" বলে হো হো করে হেসে উঠল।

বললে, "আমাদেব জীবনটা এইরকম—"

—"কি রকম?"

—"যে জিনিসের কাজ শেষ হয়ে যায়-তাব আব কোনো দবকার থাকে না—"

—"দেখি ত কোটটা-উঃ খুব বড় বড় ফুটো কবে ফেলেছে. দেখি—"

—"হ্যাঁ এটাকে ফেলে দাও।"

—"ফেলবেন কেন? এটাকে সাবিয়ে দিচ্ছি—"

—"মেয়েমানুষেব অবিশ্যি একটু গিন্নিপনার সুযোগ জুটলেই ভাল লাগে—"

সন্ধ্যা বাড়িব ভিতব থেকে সুচ-সুতো ও তালির কাপড় নিয়ে এসে বেন কোটটা নিয়ে বসল।

বিজন কিছুক্ষণ মেয়েটিব দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, "আপনাকে দেখে আমার একটা ছবি আঁকাব ইচ্ছা হয়েছে—"

—"আঁকুন"

—"এই যে আপনি মেঝেব ওপবে বসে সেলাই কবছেন এতে সেই ছবিব ভাবটা ভাবি চমৎকাব জমেছে-"

—"কি ছবির?"

একটা চুরুট জ্বালিয়ে বিজন-"ভাবটা হচ্ছে এই যে, একজন নিঃসম্বল বিধবা জীবনেব পথে পথে তাড়া খেয়ে তারপব দিনান্তে অন্ধকাব এক কোণে এসে বসেছে। তাব মুখে তবুও মববাব কোনো সাধ নেই—জীবনেব সঙ্গে সংগ্রাম করবাব রুচি—বাঁচবাব জন্য করুণ লোভ।"

সন্ধ্যা প্রথম আঘাতটা সামলাল খানিকক্ষণ বসে: তাবপব তাব স্বীকৃত সাধাবণ-সম্ভাবনাব জীবনে ফিবে আসতে লাগল। সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসা অবিশ্যি একটু কঠিন। হয়ত ছ-সাত মাস লেগে যেতে পাবে—কে জানে ছ-সাত বছবও।

কিন্তু মন তাব খুব কর্তব্যপবাযণ; এ জীবন কতটুকু জিনিস তাব কাছ থেকে চায—কোন কোনে জিনিসই-বা প্রত্যাখ্যান কবে সবই জানে সে। চায ঢেব; দিতে চায খুব কম। এই বিজনকেই ত সে অনেকখানি দিয়েছে; তাব বদলে এই ছেলেটি আজ তাকে জীবন লোভাতুব একটি কুৎসিত বিধবাব ছবি দেবে।

সন্ধ্যা ইঁদুবে কাটা ফুটোগুলো খুব মমতাব সঙ্গে সেলাই কবতে লাগল।

সে নিজে যে কুৎসিত তা সে জানে—বেশি লোকে মুখ ফুটে যদিও একথা তাকে বলে নি বড় একটা। বিয়ে কবে নি—তাই বিধবা হতে পাবে নি। কিন্তু তার কদর্যতাব ধবনেব ভিতব হয়ত একটি কুৎসিত বিধবাব আদল এসে পড়ে। বিজনবাবু এসব সত্যি কথাই বলেছেন।

আর্টিস্ট মানুষ—তাব সব কথাটুকুই সত্য। কাবণ, নিজেকে কুৎসিত ও অনাদৃত উপেক্ষিত বলে জানলেও সন্ধ্যা বাস্তবিকই মবতে চায না—এ জীবনটাকে বাস্তবিকই সে চালিয়ে দেখতে চায। জীবনেব প্রতি এই ভালবাসা বা লোভ মাঝেমাঝে বোধ কবি তার মুখেও ফুটে উঠে।

এইসব ভাবতে ভাবতে সেলাই কবে যাচ্ছিল মেয়েটি—আব বিজন তার কাঙাল কুৎসিত জীবন লোভাতুব বিধবাব ছবি আঁকছিল—

এইবকম কবে আগ্রার দিনগুলো কেটে গেল বিজনের।

একদিন মনে হল সন্ধ্যাকে বিয়ে কবলে মন্দ হত না। এই সান্ত নিবৃত্ত বিবেচক নিঃস্বার্থ মেয়েটি—এর স্নিগ্ধতার দয়া দাক্ষিণ্যে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধায—নিববচ্ছিন্ন অকুণ্ঠিত কাজে অনেকখানি সহায হতে পাবে যেন বিজন। এব কাছে বসলে অনেক ভবসা পাওয়া যায যেন—

কিন্তু তারপব ছেলেপিলে হবে। হয়ত সেজন্য একটি চাকবি নিতে হবে তার। মেয়েটিও তার মিষ্টত্ব ও চিত্তাকর্ষক হৃদয বিলিয়ে বিলিয়ে বিজনকে সাধারণ সাংসাবিক মানুষের নির্বিবাদ নিশ্চিন্ত জীবনমৃত স্রোতের দিকে টানবে। সেখানে শান্তি আছে—কিন্তু জয নেই ত। আবিষ্কারেব জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার নেই—আছে শুধু বর্তমানকে নিয়ে অন্ধতা; বাবাব যেমন—কিংবা ঠাকুর্দার যেমন ছিল। এবা বেশ নির্বিঘ্ন—নিরিবিলি মানুষ—তাজের ছবি আঁকবার জন্য আগ্রায় আসাব কথা কোনোদিন কল্পনাও কবতে পারত কি? জীবনেব সাহস ও স্বপ্নেব আনন্দ এড়িয়ে গেছে তাই এদেব জীবন থেকে।

বিজন তার বাঁ ভুরু কপালের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত টপকে তুলে খুব গম্ভীর মুখে ঐকান্তিকভাবে এইসব কথা ভাবছিল।

কলকাতা ফিরে এসে ছবিগুলো মাধবীকে অবিশ্যি সে দেখাল—এসব ছবি নিয়ে এই মেয়েটি লুটে পড়ল খুব।

কিন্তু কোনো নামজাদা আর্টিস্টই বিজনের কোনো ছবিরই বিশেষ কোনো প্রশংসা করল না। একে একে তার সমস্ত ছবি বড় বড় বিচারককে দেখাল—কিন্তু কেউই বড় একটা মনোযোগও দেখাতে গেল না। সকলের কাছেই মনে হল ছবিগুলো ছেলেমানুষী মাত্র; ছেলেটির উৎসাহ আছে—কিন্তু প্রতিভা নেই।

কেউ কেউ বা তার মুখের ওপর সে কথা বললেও। তাকে গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে গিয়ে পড়তে বললে—যদি কিছু হয়। ছেলেটির হৃদয় গেল মুষড়ে।

সে অনেকক্ষণ ধরে ছাদের ওপর একটা ডেক চেযাব পেতে স্তব্ধ হয়ে চুরুট টেনে যেত শুধু—মাঝে মাঝে আগ্রার সেই সন্ধ্যার কথা ভাবত—মাঝে মাঝে মাধবীব কথা।

আগ্রার থেকে ফিরে এসে দু-মাসের ভিতব একটা ছবিও সে আঁকল না। তারপব একটা আর্ট স্কুলে ভরতি হল সে। সেখানে বিজ্ঞাপনেব ছবি আঁকতেও শেখায—থিয়েটারের সিনেরও। এইসব সঙ্কীর্ণতা।

জীবনটা কী হয়ে গেল তার ভাবতে গিয়ে ব্যথা পেত সে—সম্পূর্ণ একে—কিন্তু প্রতিভা যাব নেই তার এই রকমই ত হবে এই ভেবে নিজেকে সে অনেক অবহেলা উপেক্ষা ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিতে লাগল। মনে সবমযই একটা ভরসা ছিল তার বটে—যে প্রতিভা তার আছে—এবং একদিন তা ফুটে বেরুবেই।

মা গেলেন মারা। শ্রীবিলাস তাবপর আর বেশিদিন বাঁচলেন না। চৌদ্দ হাজার টাকা ঋণ তিনি কি এক ইন্দ্রজালে শোধ করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু ছেলেব অন্য কিছু রেখে যেতে পাবেন নি।

বিজন এবার মেসের কামরায থাকে—চারদিকে চারখানা খা—তারই ভিতর এক খাট বিজনের—বাকি তিনটি অপর তিন সাহেবের। জীবন যখন এইবকম হযে দাঁড়ায—তখনই বিয়ে করতে ইচ্ছা করে—সংসার পাতবার জন্য কেমন একটা আকুলতা বোধ করে হৃদযে। সাধারণ সাংসারিক মানুষের সচ্ছল দিনগুলো—একটি বধূ—ছেলেপিলে—শান্তি—এইসব কথাই অনেক্ষণ ধরে ভাবত বিজন।

বহুদিন কেউ কারু খোঁজ খবর রাখে নি—আজ তাই একবাব মাধবীব কাছে গেল বিজন—উদ্দেশ্য তাব এই মেয়েটিকে নিজেব জীবনের সঙ্গিনী সে কববেই; বিজন খুব ভাল করেই জানে মাধবী তাকে কতদূব ভালবাসে—সে ভালবাসাব কোনো ইয়ত্তা নেই; অভিমান কবে এতদিন মেয়েটি নিস্তব্ধ হযে আছে শুধু—

কিন্তু মাধবীদের বাসায গিয়ে বিজন শুনল সে তাব শ্বশুববাড়ি চলে গেছে—দু'টি ছেলেকেই সঙ্গে নিয়ে গেছে—

মেসে ফিরে এসে সন্ধ্যাকে একখানা চিঠি লিখল বিজন-অবিশ্যি পোস্টাকার্ডে। উত্তর পেযে খামে খুব বড় করে লিখবে—হযত পঁচিশ পৃষ্ঠাও লিখতে পারে।

কিন্তু জানকীবাবুর উত্তর এল সন্ধ্যা ত কলকাতাযই—তার স্বামী বালিগঞ্জে থাকে—জানকীবাবু সে বাড়ির নম্বরও দিয়েছিলেন।

সকালবেলার বোদে গোলদিঘিতে ছুটতে ছুটতে বিজন দেখল ঠিক সেই ছেলেটাই বোধকবি গুলিবাঁশ হাতে অশ্বত্থ গাছের দিকে ক্রমাগত শুকনো কঠিন মাটির ডিমের গুলি ছুঁড়ছে।—বুলবুলি মারবার জন্য—কিন্তু খপ করে—ছেলেটির হাত ধরে ফেলে—গুলিবাঁশটা ভেঙে ফেলবার ভরসা আজ আর পেল না। তার গায নোংরা খদ্দরের জামা, পায ছেঁড়া স্লিপাব-ছেলেটা তাকে শ্রদ্ধাও করবে না।

সুন্দর বুলবুলি পাখিগুলো মারা হচ্ছে—অথচ বাধা দেবার কোনো ক্ষমতা তার নেই—এই নিবিড় ব্যথা নিয়ে মেসে সে ফিরে এল।

সেখানে তার রুমমেটেরা তিনজনেই বিড়ি টানছিল—আর ক্রমাগত মেঝের ওপর দেযালের গায যেখানে সেখানে থুথু ছিটিয়ে ফেলছিল—কিন্তু এরা সকলেই অফিসে চাকরি করে—মাইনে পায়; বিজন বুঝে দেখেছে পৃথিবীব যা ব্যবস্থা তাতে এই সব লোকেব মর্জিকে বাধা দেবার মতন কোনো শক্তি তার মতন মানুষের নেই—তা সে মর্জি যতই কুৎসিত হোক না কেন।

পালিয়ে যেতে

মাদ্রাজ থেকে প্রায় তিন-চাব বছর পর কলকাতায ফিরলাম। ব্যবসাব প্রথম বছরে হাজার পনের টাকা লাভ হযেছিল; পরের বছবে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা নষ্ট হযে গেল। তার পর থেকে ক্রমাগত লোকসান; দেনা শোধ দিতে-দিতে দেখা গেল কলকাতায যাবার টিকিট কিনবার পযসা পর্যন্ত হাতে থাকে না। কাজেই নরসিং চেট্টির কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে কলকাতায এলাম। আমার ব্যবসার যখন সুদিন ছিল তখন চেট্টি রোজই আমার ফ্ল্যাটে এসে ডিনার খেত, দামি-দামি জাভা চুরুটগুলো পকেটে ভরে নিযে যাওয়া ছিল তার অভ্যাস। এই সবের জন্য কোনো দিন বিল দেই নি আমি তাকে, দিলে কোনো দেড় হাজার-দু হাজাবে না দাঁড়াত? অবিশ্যি চেট্টি অন্য দিক দিযে আমাকে ঢেব সাহায্য কবেছিল; ব্যবসাব সুপবামর্শ তার কাছ থেকে ঢেব পেযেছিলাম। নিজের শবীর খাটিযে এক-এক সময সে ঢেব উপকাব কবেছে আমার। তামিল, তেলেগু লিখতে খুব সাহায্য কবেছে আমাকে; মাদ্রাজে অবিশ্যি ইংরেজিতেই অনেক দূর চলে।

চেট্টিকে বলে এসেছি, ছ-সাত মাসের মধ্যে মাদ্রাজ ফিবব আবাব।

চেট্টি বলেছে,—'না ফিরলেও বাকি এই পঞ্চাশ টাকাকে ধার বলে মনে করো না। দেখ, কলকাতার ব্যবসা করতে পার কি না। কিংবা চাকরি পেলে ঢের ভাল হয।' বাস্তবিক, মাদ্রাজি বড্ড চালাক জাত। কী হবে-না-হবে ধূর্ত শাবদের মত তা ধবে ফেলে।

আমাব যে আর মাদ্রাজ যাওয়া হবে না, ব্যবসাও করা হবে না হয় তো, পঞ্চাশটা টাকা তার কিছুতেই শোধ দিতে পারব না যে, চাকবিই যে আমার খোঁজা উচিত, আমার চেযেও কে তা ঢের ভাল করে জানে?

কলকাতায এসে হাতে কুড়ি-পঁচিশ টাকা রইল শুধু; মাদ্রাজে এ তিন বছব বেশ আদব-কাযদায থাকাব অভ্যাস কবে ফেলেছিলাম; সমস্ত দিন ফিটফাট সুট পবে থাকতাম। আট-দশ রকমেব সুটও ছিল আমার। দিনেব মধ্যেই তিন-চাববার কবে বদলাতাম। সাবা দিন হ্যাভেনা চুরুট, কফি ও চা না হলে চলত না। দিনেব মধ্যে দশ-বারটা মুরগির ডিম ভাঙতে হত আমাব জন্য, পোস্ত অমলেট হবে। বযেল কাবিব জন্য রোজ চাবটে মুবগি মাববাব ব্যবস্থা ছিল; টিনেব মাংস খেতাম ঢেব; বিলেতি মাছও বাদ দেই নি, টোস্টে খুব পুরু মাখনেব ওপর জ্যামেব পালিশ না থাকলে চলত না; সারা দিন টিনের ও তাজাফল নানা বকম খেতাম! বোজ দুপুরে ঘণ্টা দুই টেনিস খেলতাম বলে হজমেব গোলমাল হয নি কোনো দিন! শরীবটা বেশ! কলকাতায এসে এ জীবনের কোনো কিনারাই পাওয়া যায না আর; সঙ্গে আমার দামি-দামি কুমিবেব চামড়াব সুটকেশ প্রায আট-দশটি। হ্যাট-কোট, পাতলুন ও জীবনের শৌখিন আসবাবপত্রে ভরা গোটা দুই চকোলেট রঙের হোল্ড-অল, তিনটে গ্লাডস্টোন ব্যাগ, দুটো মস্ত বড় টুরিষ্ট ট্রাঙ্ক, ঝুড়ি বাস্কেট, ক্যাশবাক্স, লটবহর ইত্যাদি ঢের কিন্তু হাতে যা টাকা আছে তাতে কলকাতার একটা ফার্স্টক্লাস হোটেলে উঠলে দিন-ছয়ের বেশি থাকা যায না। হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অবাক হযে এক-আধ মিনিট ভাবি; হাতের ছড়িটা এক-আধবার নাচিয়ে নেই; পকেটের থেকে চুরুট বের কবে জ্বালানো যায, চুরুটে এক টান দিয়ে দেখি অসংখ্য হোটেলের চর আমাকে ছেঁকে ধরেছে। হাত নেড়ে ভিড়টাকে বিদায দিযে একটা ট্যাক্সি কবা যায; একটা মাঝারি গোছের বোর্ডিঙে গিযে উঠি, ম্যানেজার দিনে পাঁচ টাকা হেঁকে বসেন। আড়াই টাকায ঠিক হয। মস্ত বড় একটা অন্ধকার ঘর আমাকে দেওযা হয। আলো-বাতাস খেলে এ-কবম ছোট একটা কামরা ঘব পছন্দ করে বদলে নেই; নীচের তলায গোয়ালের মত একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে একটা চৌবাচ্চা, এরই নাম বাথরুম; জলের ভিতর ইঁদুর মরে আছে না কি আরশোলা পচছে, বোঝা যায না। কেমন একটা চামসে গন্ধে স্নান করতে হয়।

খাবারের সঙ্গে পুঁইশাকের চচ্চড়ি অনেক আসে, মাছের নাড়িভুড়ি।

আঁশটে তরকাবি, কাঁচকলা ভাজা, খেশারির ডাল, ট্যাংরা মাছের ঝোল, ভাতের থালা ফেলে চুরুটটা জ্বালাই আবার। বছর দুই আগে দেশের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম, তখন আমার ব্যবসায়ের ঢেব পড়তা?। বাড়ি গিয়ে মাস দুই ছিলাম। পুরনো জমির পাশাপাশি নতুন জমি খানিকটা কিনেছিলাম। খড়ের

ঘর। আটচালা দুটো ভেঙে ছোট-খাটো একটা টালির বাংলা তৈরি করার সঙ্কল্প ঠিক করে এসেছিলাম।

কিন্তু হল না কিছু আর।

বছর দেড়েক আগেও একবার দেশে গিয়েছিলাম; তখন আমার ব্যবসায়ে ঢের লোকসান চলছে; দিন পনের ছিলাম তখন।

এবারও দেশেই যেতে হবে; মাঝখানে একবার খবর পেয়েছিলাম বাবার ভয়ঙ্কর হার্টের অসুখ চলছে-মরতে-মরতে বেঁচে রয়েছেন। বড্ড আশঙ্কার কারণ; এখন খানিকটা ভালবোধ করি। সঠিক খবর পাওয়া যায় না। নীলিমা? মা কেমন আছেন? খুকিই বা কত বড় হল? সারা দিন-রাত কী কচ্ছে? বিশেষ কিছু লেখে না বড় একটা কেউ। ব্যবসায়ের প্রথম দু বছর বাবাকে তিন শ টাকা করে মাসে পাঠাতাম গত বছর এক পয়সাও পাঠাতে পারি না। অবাক হয়ে ভাবি, দেশের বাড়ির ব্যাপার কদ্দূর?

শুনেছি, বাবাকে আবার ইস্কুলে যেতে হচ্ছে; অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টার, যদিও প্রাইভেট ইস্কুলের; কিন্তু তবুও ইস্কুলের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়; বাবাকে মাসে আশি টাকা করে দেয়।

সত্তর বছরের বুড়ো মানুষ। ইস্কুল আমাদের বাসার থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। গাড়ি চড়ে যান? চড়েন কী বাবা? তা যান না; যাবার উপায়ই বা কোথায়? আশি টাকার।

দেশের বাড়িতে পেটও অনেক; মানুষের নানা রকম তাগিদ সেই খানে। বেতের আরাম কেদারায় বসে আছি। হ্যাভেনা চুরুটের নীল ধোঁয়া জানালা দিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যায়। রেলিঙের উপর রোদের ভিতর গোটাকয়েক চড়াই।

সুটকেশগুলো বিক্রি করে ফেললেও হবে সব। নিজের কাজের জন্য একটা রেখে দেবে শুধু; গ্লাডস্টোন ব্যাগগুলো হোল্ড-অল, ট্রাঙ্ক, গোটা দশের সুট বিক্রি করে কত পয়সা পাওয়া যাবে? মনে-মনে একটা হিসেব করে নিই। এসব জিনিস যারা কেনে তাদের সঙ্গে বড্ড দরদস্তুরের দরকার; পুরস্কার খুব কম-এক-একবার মনে হয়, বিক্রি করে কী লাভ? জিনিসগুলোর ওপর মায়া ধরে যায়।

কিন্তু দুপুরবেলাই বিক্রি করে বসলাম। বাড়ির জন্য ধুতি, শাড়ি, ছাতা, ফ্রক, ব্লাউজ কিনে যখন ট্রেনে উঠলাম, হাতে তখন পাঁচ টাকা সোয়া ছ-আনা পয়সা বাকি শুধু।

হুইলারের স্টলের নভেলটা ধীরে-ধীরে খুলে পড়তে শুরু করি; কিন্তু আধ ঘণ্টা ধরে প্রথম প্যারাগ্রাফটাই পড়লাম শুধু—সাত লাইনের একটা প্যারা। বইটা বন্ধ করে রাখতে হয়; মাদ্রাজ যে খুব ভাল লেগেছিল তা নয়; কিন্তু কলকাতায় এসে কেমন একটা অবসাদ, চুরুটে একটা টান দেই। এখানেই ব্যবসা শুরু করব? না চাকরি খুঁজব? যা হয় করা যাবে একটা কিছু। মনের ভিতর চিন্তা, স্বপ্ন, কোনো রং নেই এখন আর। কোনো তাড়া নেই। একটা নভেল অব্দি পড়তে ইচ্ছা করে না, দেশের বাড়িতে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। সেই মস্ত বড় সবুজ সতেজ লেবু গাছটা সেখানে আমার জানালার পাশে ডালপালা ছড়িয়ে নিবিড় হয়ে রয়েছে, পুবদিকের আটচালার সেই ছোট্ট কোণ টুকুর ভিতর খাটের উপর মাদুর ফেলে শুয়ে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তার পর ফাল্গুনের আমের বোলের গন্ধের ভিতর, দুপুরের ঝিঁঝির ডাকে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। নীলিমা হয় তো খাটের পাশে এসে বসবে—বেশ ভাল কথা; স্নান হয়ে গেছে স্নিগ্ধ নারকেল-তেল মাখা ঠাণ্ডা চুল; খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে।

হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি স্নিগ্ধ জলের ভিতর চাঁদের আলোর মত ঝিলমিল করছে।

হয় তো সে একা-একা বসবে না। খুকিকে এনে আমার বালিশের পাশে বসিয়ে দেবে কিংবা খুকি একা আসবে, সমস্তটা দুপুর আমার খাটে তার কাজ। কিংবা মা আসবেন। খুনসুড়ি, খেলা, ঘুম, করুণ নিবেদন, ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না, তৃপ্তি।

সন্ধ্যার পর বাবার সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলা যাবে অনেক রাত অব্দি। বাবা কতকগুলো বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে খুব ভাল বাসেন : আত্মা-অমরতা, ভগবান, ধর্ম, থিয়জফি, হিন্দু মিশন, এডুকেশন ও নানা রকম সাহিত্য উপপন্যাস কবিতা।

একখানা নতুন ইংরেজি নভেল যদি বাবাকে দেওয়া যায় ভারী প্রসন্ন হন তিনি; অমনি চশমা লাগিয়ে সন্ধ্যার আবছায়ার ভিতর বিনা লণ্ঠনেই পড়তে শুরু করে দেন; যতক্ষণে আমি পাতা দশেক পড়ে উঠতে পারি ততক্ষণে বাবার পঞ্চাশ পাতা হয়ে যায়।

মাদ্রাজে রেঙ্গুনে কলকাতায় যখনই যেখানে রয়েছি অনবরত লোকের সঙ্গে ঘেষাঘেষি হয়, কথাবার্তা ফুরুতে চায় না, কাজ জমে ওঠে, কাজ নিকাশ হয়। সমস্ত সকাল, সমস্ত দুপুর, সারা দিনরাত কাজকর্মের

ভিতব নিজেকে বক্তমাংসহীন পুতুল বলে মনে হয় শুধু।

তাব পব দেশেব বাড়িতে এক-একবাব চলে যাই। মা কাছে এসে বসেন, চাবদিককাব খবব জানতে থাকেন, যত বলি তাব চেয়ে ঢেব বেশি গল্প শুনি। নীলিমা আসে, খুকি আসে, আমাব বোন অমিয়া এসে হাজিব হয়, বাবাব সঙ্গে অনেক বাত অবধি কথাবার্তা চলে, মনে হয়, আবাব যেন শিশুব মত কোনো এক আদিকালে এসেছি। চাবদিকে নবম অন্ধকাব, খাপবাব আগুনেব স্নিগ্ধ আঁচ, মুখে মধু, প্রাণেব ভিতব আশা-সাহস, জীবনেব সাধ-স্বপ্ন আগ্রহ কলবব।

মানুষেব জীবনেব আগ্রহ ও আস্বাদ অনেক দিন পবে ঐকান্তিক হয়ে জমে ওঠে আবাব।

এক-একবাব দুপুববেলা জানালাব কাছে লেবু ফুলেব গন্ধমাখা বাতাসেব ভিতব বসে দিনান্তেব দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এই মাঠ-প্রান্তব, দুপুববেলাব তারুণ্য-দীপ্ত বোদেব স্ফূর্তি ও নির্জন গন্ধ, চাবদিককাব শুকনো বাদামি খড়, শব্দ, নীল আকাশেব নীচে শাদা সজনে ফুলেব বাশি, বাসন্তী, কমলা, হলদে ও পাটকিলে বঙেব প্রজাপতিগুলো, ময়না কাঁটাব ঝোপে অক্লান্ত ফড়িং, তেলাকুচোব জঙ্গলে লাল মাকাল ফলেব মোহে টিয়াব ডানাব ছড়াছড়ি, খড়েব চালেব উপবে শূন্য আকাশে আচমকা মাছবাঙাব চিৎকাব। মাঠেব ভিতব গোসাপ দেখে শালিকগুলোব উত্তেজিত কলবব সাবা দুপুব দুটো বেজিব অক্লান্ত খুনসুড়ি, কামিনী গাছেব ভিতব সাবা দিন টুনটুনিদেব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি, মাঠেব এক কিনাবে পুবনো ইটেব পাঁজা ঘিবে শাদা লাল দ্রোণ ফুল, মযে হয় প্রাণেব তৃপ্তিব পক্ষে এইগুলোই যথেষ্ট। মানুষেব কোনো দবকাব নেই আব। নীলিমা চলে যেতে পাবে, মাকে দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত ঘব-দোব যদি প্রাণীহীন হয়ে পড়ে থাকে তা হলেও দেশেব বাড়িব এই মাঠ-প্রান্তবেব আস্বাদ, জোনাকি-জ্বলা সন্ধ্যা, ভুতুম পেঁচাব ডাকে-ভবা বহস্যময় বাত, পথপ্রান্ত, মানব-আত্মাকে অনেক দিন পর্যন্ত নিবিষ্ট কবে বাখতে পাবে।

কিন্তু তবুও দেশে যাচ্ছি এবাব মানুষ কটিব জন্যই। বাবাব জন্য অনকেগুলো নতুন নভেল নিয়েছি। হুইলাবেব নভেলই প্রায়—কিন্তু নামজাদা ইংবেজি উপন্যাসও প্রায় আট-দশ খানা আছে।

এবাব আমাব হাতে ঢেব প্রমাণ আছে যে মৃত্যুব পব মানুষেব কপালে শ্মশানেব ছাই, হাড় ও অন্ধকাব ছাড়া আব-কিছু নেই; শুনে বাবা হয় তো খুব কঠিন ভাবে ঠেকে বসবেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্তেব জন্য; কিন্তু তাবা পবেই আমায় অন্তবীক্ষে ক্ষমা কবে যুক্তিব অবতাবণা কববেন; ক্রমে-ক্রমে বলবেন যুক্তি-তর্কে কিছু হয় না, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চাই। তবুও অনেক দূব পর্যন্ত তর্ক করেন তিনি, অনেক জানেন, ঢেব দৃষ্টান্ত আছে যাতে মাঝে-মাঝে তাব মনেব পবিষ্কাব উজ্জ্বলতা দেখে আশ্চর্য হতে হয়, অনেক বাত পর্যন্ত কথাবার্তা জমে বেশ।

এই দেড় বছবেব মধ্যে এ-পাড়াব ও-পাড়াব খবব ঢেব জমে গেছে মাব কাছে, অনেক গল্প শোনা যাবে; গল্পেব বিষযেব চেয়ে শোনবাব আগ্রহটুকুব দামই বেশি, খাওয়া-দাওয়াব পব দুপুব বেলা আমাব ঘবেব দবজা খোলা থাকলে আমাব খাটেব পাশে এসে বসেন। দবজা কেনই-বা খোলা থাকবে না আমাব?

খুকি নাকি অনেক কথা বলতে শিখেছে; টুক-টুক কবে হাটতে পাবে বেশ; মোটা আব হল না; সেই যে সূতিকা ঘবে যে চুল নিয়ে পৃথিবীতে নেমেছে মাথাব থেকে এখনও তা কাটা হয় নি নাকি; আমি গিয়ে নাপিত ডেকে কাটিয়ে দিতে বলব। কিংবা নিজেই কাঁচি দিয়ে ছেটে দেব ও বলব, কি, তোমবা এত দিন ছাটোনি কেন? কে জানে, সূতিকা ঘবেব সেই সুন্দব নবম অপার্থিব চুলে আমিও কাঁচি লাগাতে পাবব কি না। থাক, লাগাব না। খুকিব পেটে না কি ঢেব কৃমি জমেছে। শবীবও কৃমিব মতই বোগা।

জ্বালানো যাক চরুটটা—

তাব পব নীলিমা?

গতবাব যখন আমি পাড়ায় ব্রিজ খেলতে যেতাম প্রথম দুই-তিন দিন সে কিছুতেই যেতে দেবে না আমাকে। শার্ট ধবে আটকে দিত। সাবা দিন ব্রিজ খেলে সন্ধ্যাব সময় যখন বাড়ি ফিবতাম আমাব পথেব থেকে সবে যেত, ডাকলেও উত্তব দিত না, শেষে গলা জড়িয়ে ধবে বলত, সাবাদিন আমাকে একা ফেলে ছেড়ে থাকতে এত ভাল লাগে তোমাব?

তাইতো?

ট্রেন এতদিন পবে এবাব আমাব দেশেব দিকেই ছুটছে। না, এবাব আব পাড়ায় গিয়ে ব্রিজ খেলতে যাব না দুপুব বেলা; এনু আছে, অমিয়া আছে, আমি আছি, আমাব পিসতুতো ভাই, ভগ্নীপতি আছে। এদেব ব্রীজ শিখিয়ে দেব। না যদি পাবে বিন্তিই খেলা যাবে—

পূর্বজন্মের স্মৃতির মত বিন্তি খেলার ভিতরে একটা নরম করুণতা রয়েছে যেন—বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে বসে যদি খেলা যায়, সমস্ত ঝাঁ-ঝাঁ খটখটে গরম দুপুর বেলাটা সেই দক্ষিণের ঘরে দিনান্তেব নিষ্করুণ আকন্দ ও ভেরেণ্ডার জঙ্গলের বাতাসের মুখোমুখি বসে।

গতবার এই বিন্তি খেলার জন্য কত বায়না ধরেছিল সে; কিন্তু ব্রিজের চার ছিল ঢের বেশি আমার! কাজেই বাকি দু জন লোক জোগাড় করে আনতে বলে শার্টটা গায় দিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। এই উপেক্ষা ও প্রতারণার ব্যথা গত দেড় বছর মাদ্রাজে কাজ-অকাজের ভিতর কতবার জেগেছে।

ট্রেন থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ি—গোড়ার গাড়ি আমাদের বাড়ির দুয়ারে এসে থামল। থামে; গাড়ির থেকে নামতেই একটা নেড়ি কুকুর আমাকে খেঁকিয়ে আসে।

'অবাক হয়ে ভাবি, কুকুরটা কোথেকে এল?'

পথের এক পাশ থেকে একটা ঝামা তুলতেই কুকুবটা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়—

মাদার গাছের নীচে গিয়ে আকাশ মাথায় কবে কাঁদতে থাকে।

আহা! এত করুণ তা!

কেমন অস্বস্তি লাগে। বাড়ির দুয়ারে একটা গাড়ি থেমেছে বলেও ভিতর থেকে কোনো লোক আসে না।

গাড়োযানের জিম্মায় মালপত্র রেখে বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকি, বাবাকে দেখা যায়। দেখলাম একটা টুলের ওপর উবু হয়ে বসে ছেলেদের খাতা দেখছেন। প্রণাম করি, মা এসে হাজির হন। মাকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম—'কেমন? ভাল আছ মা?'

—'তুমি আসছ তা তো শুনি নি।'

—'এই তো দেখো, এলাম।'

—'তমি তো আসবার আগে ববাবব টেলি কর।'

—'এবার আর—'

—'কেন?'

—'তাক লাগিয়ে দেব বলে।'

বাবা বলেন—'ব্যবসার খবর কী রকম?'

কোনো জবাব দিলাম না।

মা—'শরীব ভাল আছে তো?'

—'হ্যাঁ, বেশ আছে মা।'

—'শরীর ভাল থাকলে ভাল, ঘবেব ছেলে ঘবে এসেছিস। পবে বাবা ব্যবসা কবতে যাস নি—'

—'কেন?'

—'দূর! সেই মাদ্রাজে ব্যবসা করে মানুষে?'

—'মাদ্রাজের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

—'না, মাদ্রাজে-ফাদ্রাজে আর না। যদি করো কলকাতায। তোর জিনিস-পত্র কোথায?'

—'তোমার জন্য দুটো শাড়ি এনেছি।'

—'শাড়ি আবার আমার জন্য! নীলাম্বরী নয় তো?' মা একটু টিটকারি কেটে হাসলেন।

—'এক জোড়া চটি জুতোও এনেছি তোমাব জন্য।'

—'কী জুতো?'

—'চটি।'

—'কার জন্য?'

—'তোমার জন্য মা—'

—'ছেলের কাণ্ড দেখ? সাত জন্মে জুতো পরলাম না।'

—'মাদ্রাজে স্ত্রীলোকেরা কী করে জান মা—?'

—'রেখে দে তোর মাদ্রাজের কথা'—চোখ কপালে তুলে—'হিলওযালা জুতো এনে বসবি করে আবার একদিন আমার জন্য। তা জুতো তোর বৌকে পরাস। এখন বরং—'

—'তুমি খালি পায়ে হাঁটবে, তা হবে না; কিংবা কোনো দিন যদি বৃষ্টি পড়ে—'

মা বাধা দিয়ে—'হয়েছে বে, আমি তোমাব মেয়ে ইস্কুলেব গুরুমা নই যে চটি পায দিয়ে বাস্তা দিয়ে ফটব-ফটব কবে বেড়াব।'

গাড়ি থেকে জিনিসপত্রগুলো ফটিক নিয়ে এল। মা বললেন,—'চা খাবি?'

—'হ্যাঁ, ভাল চাযেব পাতাও নিয়ে এসেছি।'

বাবা জিজ্ঞেস কবলেন,—'ক পাউণ্ড?'

—'এই দশ পাউণ্ড আন্দাজ।'

বাবা একটা তৃপ্তিব নিঃশ্বাস ফেলে—'বাঁচা গেল।'

—'তোমাব জন্য কতকগুলো নভেল এনেছি বাবা।'

—'নভেল আমাব জন্য! কেন; আমি কি নভেলখোব!'

বাবা খাতাব গাদি ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—'কই? কী নভেল? দেখি তো।'

—'বাংলা অবিশ্যি নয।'

—'তাবক গাঙ্গুলিব স্বর্ণলতা পড়েছিলাম, আছে এক বকম—জোলো দুধ আব চিনি; যাক, তাব পব থেকে বাংলা নভেল পড়া ছেড়ে দিয়েছি আমি—'

—'তোমাব বযসেব সকলেই তাই কবেছে—বযসও তো কম নয, এই বুঝি একাত্তব।'

—'না, বযসেব জন্য নয, এই দেশী নভেলগুলো কোনো কালেই ভাল লাগে না আমাব, বযসেব জন্য কি আব? ত্রিশ-চল্লিশ বছব বযসেও ভাল লাগত না, বাবা মাথা নেড়ে—'অখাদ্য। চিবকাল।'

বেশ-বেশ।

ইংবেজি নভেল বেব ক'রে বললাম—'কিন্তু এই হুইলাবেব পুলেব বইগুলো আমি কোনো দিনও ক্ষমা কবতে পাবলাম না; একে তো খিটমিটে টাইপ, চিন্তাব অসাবতাও এমন মর্মান্তিক। এই টাইপেব মতন!'

—'মূল্যবান চিন্তাব জন্য কেউ নভেল পড়ে?'

—'কেন পড়বে না?'

—'চিন্তাব জগৎ আলাদা। সে-জন্য থিওসোফি আছে, উপনিষদ আছে।'

বাব খানা নভেলই বাবা ডান হাতে তুলে নিলেন, বললেন—'একমাসেব খোবাক।'

—'ইচ্ছে কবলে পনেব দিনেও শেষ কবতে পাব—

—'না, ইস্কুলেব কাজ এখন বড্ড বেশি—'

—'তা ছাড়া চোখে আগেব মত জোব নেই তোমাব; গতবাব দেখলাম নাকেব কাছে নিয়ে বই পড়ছ।

—'ক্যাটাবেক্ট। চোখে কেমন ছানি পড়েছে।'

—'তা হলে এই বইগুলো এনে অন্যায হয়ে গেছে দেখছি; সাবাদিন ইস্কুলেব কাজকর্ম, খাতা দেখা, বই পড়ানো, বোর্ডে লেখা, তাব পব বাড়ি ফিবে সন্ধ্যাব সময অক্ষবগুলো, খানিকটা অন্ধকাব হয়ে না গেলে তোমাব সন্তানেব কথাও মনে পড়ে না। এতে তো গড়ুবেব চোখও নষ্ট হয।'

—'অপাবেশন কবলে চোখ আজই অন্ধহয়ে যায; যদ্দিন চোখে দেখি অপবাশেনেব কী দবকাব! ধীবে-ধীবে অন্ধ হয়েই যাব—কিন্তু তাব আগে চলে যেতে হবে যতটা দিন বেঁচে আছি সময কাটাতে হবে তো।

ম—'কী যে বলো?'

একটু চুপ থেকে—'কেন, সময তোমাব আমাদেব সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাটতে চায না বুঝি!'

বাবা কোনো উত্তব দিলেন না।

মা বললেন—'না হয ভগবানেব নাম কবে সময কাটালেই পাব। কতকগুলো বই পড়ে কী লাভ!'

বাবা একে-একে বইগুলো দেখছিলেন—কোনো জবাব দিলেন না।

মা—'না এই সব পড়বাব সময তোমাব এখন?'

মা চলে গেলেন।

আমি—'আচ্ছা তুমি যে দিনেব অনেকটা সময ভগবানেব নামে কাটাও, মা কি তা জানেন না?'

বইগুলো নাড়তে-নাড়তে নীবব হয়ে বইলেন, কোনো উত্তব দিলেন না। বাবা একটা বই খুলে নিস্তব্ধ হয়ে ছিলেন—নীববই হয়ে বইলেন।

বুঝলাম এ প্রশ্ন বড় অস্বস্তির হয়েছে।

বললাম, 'বইগুলো কেমন মনে হয় তোমার?'

—'এইসব বইযেব কোনো তাবতম্য নেই তো।'

—'স্টলের থেকে একখানা উঠিযে আনলেই হল।'

—'ভাল লাগে তোমার?'

—'আমার বেশ লাগে—'

—'বইগুলোব একটা বিশেষত্ব এই যে এগুলোর বড় একটা নোংবামি থাকে না।'

—'নোংরামি মানে?'

—'মানুষেব জীবনেব অনেক জাযগায নোংরা থাকে না?' বলে বাবা নিরুত্তর বইলেন।

বুঝলাম এ বিষযে তিনি কথা বলতে চান না।

একটু চুপ থেকে বললাম—'কিন্তু মানবজীবনের বিশেষ কোনো জ্ঞানও নেই এদেব।'

—'সে বকম জ্ঞান তুমি নভেলিস্টদের কাছ থেকে কোথায পাবে?'

—'কেন তাদের তো থাকে।'

বাবা মাথা নেড়ে—'না, সে জ্ঞান উপনিষদেব ঋষিদেব ছাড়া আব কাবো নেই।' অবাক হযে চুপ করলাম; কিন্তু তর্ক করতে গেলাম না আজ আর।

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু উপনিষদেব ঋষিরা তো মবে গেছেন কবে; সেই থেকে এ পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে মানবজীবন সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। কাবো?'

—'তা আছে নিশ্চযই।'

—'কাদের?'

—'এই ঋষিদেব সাথে যাদেব আত্মাব মিল আছে।'

—'কাবা তাবা?'

—'পৃথিবীব সব জাযগায সব খানেই তাবা জন্মায"—এর চেযে বেশি বাড়াতে গেলেন না বাবা।

নভেলের কথাই পাড়লাম আবাব। বললাম—'এ-সব লেখকদেব চবিত্রজ্ঞানও বিশেষ নেই—'

—'মানবচবিত্রজ্ঞান?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোনো ঔপন্যাসিকেব তা নেই।'

—'তবে কাদেব আছে?'

—'টলস্টযেব অবিশ্যি খানিকটা ছিল, কিন্তু তিনি তো নিছক ঔপন্যাসিক নন, মানুষের চবিত্রজ্ঞান যিনি এ চবিত্রগুলো সৃষ্টি কবেছেন তাবই শধু আছে, আমরা পুতুলেল চবিত্র জানি শুধু।'

বাবা বইগুলো বেখে দিযে—'প্রত্যেক লেখকই তাব নিজেব মনেব পুতুলগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন—বলেন, এই মানুষেব মনেব ভিতর এই ভাব হযে ছিল, এই নাড়ি দিযে প্রাণেব ভিতব এই বকম-রকম চিন্তাব তিক্ততা কিংবা স্বপ্নসাধ জেগেছিল। যদি জিজ্ঞেস কবি, কী করে তুমি জানলে? এ তোমাব নিজেব মনেব ভুল নয? আশ্চর্য! এ পৃথিবীতে কে কাব কথা জানে!'

আমাব অবিশ্যি মতভেদ ছিল; কিন্তু প্রতিবাদ কবতে গেলাম না।

একটু চুপ থেকে—'এইই যদি তুমি ভাব বাবা, তা হলে এই বইগুলো পড়ে কী লাভ—?'

—'বেশ নিরপবাধ ভাবে খানিকটা সময় কাটে।'

—'ভাল শতরঞ্জ খেলে যেমন?'

বাবা মাথা নেড়ে-'হ্যাঁ, যে খেলাগুলো শিখলাম না কোনোদিনও; শিখলে মন্দ ছিল না।'

একটু চুপ থেকে, 'সে-সব খেলা শিখলে মোটামুটি এই সব নভেলই বেশি ভাল লাগত। উত্তেজনা আক্রোশ দরকার হয না, হৈ-চৈ নেই। ইস্কুলের ছেলেদের মাথামুণ্ডুহীন ইংরেজি ঘাঁটার পর সাহেবদেব এই সব নির্ভুল, নির্বিবাদ ইংরেজি পড়ে বেশ একটা নিস্তাব পাওযা যায।'

মা চা নিযে এলেন।

বললেন—'মুড়ি খাবি?'

—'না।'

—'রুটি নেই।'

—'থাক।'

—'ভাবলাম দুটো পরটা করে দেই কিন্তু ঘি নেই, ময়দাও গেছে পচে-পোকায় ঘিনঘিন করছে, এখনই তো ভাত খাবে।'

—'হ্যাঁ।'

—'তা চা খেয়ে নাও, মুখ ধোবে না?'

—'মুখ আমি ধুয়ে এসেছি।'

—'কোথেকে?'

—'গাড়িতেই পাঁচটাব সময় আমার ঘুম ভাঙল,' চায়েব পেয়ালাটা হাতে তুলে—'একটা পাশেব স্টেশন থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসেছি।'

বাবা খাতা দেখতে-দেখতে—'এবাব থার্ডক্লাসে এলে তুমি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাবও তাই মনে হচ্ছিল।'

একটা খাতা বেখে দিয়ে—'তোমাব সে সব হোল্ড-অল সুইটকেসগুলোই-বা কোথায়?'

—'সেগুলো বেখে এসেছি।'

—'মাদ্রাজে?'

—'না, কলকাতায়ই।'

—'কলকাতায় নেবে বরাবর এ-অব্দি থার্ড ক্লাসে এলে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'বরাবব ফাস্ট ক্লাসেই তো আসতে।'

—'তা আসতাম—'

—'এবাব ইণ্টাবেব টিকিটও কুলোল না বুঝি?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'ব্যবসা বড় সাধনার জিনিস; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বকমই হয। আমি বুঝেছি তুমি ফতুব হয়ে গেছ।' একটু চুপ থেকে—'যা-ক্। খাওদাও, বিশ্রাম কবো কিছুদিন। এর পব কী কববে ভেবে দেখো।'

বাবা কোনো কথা বললেন না আর।

মা দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন—'চা খাচ্ছ না যে?'

—'এই বার খাব।'

—'চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে—ব্যবসায খুব লোকসান হচ্ছে এবাব?'

একটা ঢোঁক গিলে—'হ্যাঁ বাজাব বড় খাবাপ।'

—'তা চা খাও।'

—'খাই।'

চায়ের পেয়ালাটা একবার থুতনি অবধি নিয়ে—'এ-বছব তোমাদেব কিছু পাঠাতে পাবি নি।'

—'আহা, তাতে আব কী হয়েছে? তাতে আর কী?'

—'কবে যে পাঠাতে পারব তাও বুঝে উঠতে পারছি না।'

দু জনেই নিস্তব্ধ হয়ে বইলেন।

মা একটু চুপ থেকে—'তা, ব্যবসাব অবস্থা এই বকম হল!' একটা ঢোক গিলে-'দেখছি তো।'

—'প্রথম বছর তোমার কত লাভ হয়েছিল যেন?'

—'ব্যবসায লাভ-লোকসান ও-রকম ভাবে হিসাব করা যায না।'

বাবা—'পনের হাজার টাকা লাভ হয়েছিল।'

—'টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলে তুমি?'

—'না, ব্যাঙ্কে কেন, ব্যবসায খাটালাম।'

মা মাথা নেড়ে, তোমার করা উচিত ছিল না।'

—'না হলে ব্যবসা কী করে চলে?'

—'তাই বলে পনের হাজাব টাকা জলে দিতে হবে?' মা অনেকখানি দমে গেলেন।

—'ব্যাপারটা তুমি ঠিক করে বুঝলে না মা।'

—'তুমিই বা কী বুঝলে? শেষ পর্যন্ত লোকসানই যদি দিতে হয়, ঠকেই যদি আসতে হয় শুধু—তা হলে বোঝা না-বোঝা কোনো কথাই ওঠে না।' বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—তিনি ঘাড় নিচু করে খাতা দেখছেন। বেখাপ্পা তর্কের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা নেই তাঁব, কিংবা তিনিও হয় তো মার মতই ভাবছেন।

চায়ের পেযালায এক চুমুক দিয়ে—'ঈস্, এই চা খাও নাকি তোমরা?'

—'কেন চায়ে কী হয়েছে!'

—'যা হয়েছে তা হয়েছে'—মুখ বিকৃত করে নাক-মুখ খিঁচে চায়ের পেযালা সরিয়ে রেখে দিতে হয।

—'আমবা তো ছ মাস ধরে এই চাই খাচ্ছি।'

—'এ-গুলো কী, চা, না, শুকনো পাতা গুঁড়ো।'

বাবা—'এখানে এই-ই নিযম: আমবা খুব শাদাসিধে ভাবে থাকি, এই-ই আমরা ভালবাসি, মানুষের, বস্তুত জীবনেরও কোনো ক্ষতি হয় না এতে।'

মা—'তা, এ চা তুমি খাবে না?'

—'না।'

—'এখটুও না?'

—'থাক।'

—'এক পেযালা চা নষ্ট করে ফেললে?'

—'একটু চুপ থেকে—'কাউকে দিযে দাও না।'

—'কে খাবে?'

বাবা—'এখন বেলা বাজে দশটা—এ সময চা খাবাব নিযম এ-বাড়ির আব কোনো লোকেবই নেই।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'ফেলে দিলেই হয।'

—'তাই বলছিলাম মিছিমিছি অপচয হল।'

—'অপচয আব কী? আমাকে খাবার জন্য দেওযা হযেছিল, মনে কবো আমি খেযে ফেলেছি।'

বাবা—'সে বকম মিথ্যে মনে কবতে যাব কেন? তা তো সত্যি নয?'

—'তা অবিশ্যি।'

মুখ তুলে হেসে—'এটুকু চাযেব দাম কতই-বা? বড় জোব পাঁচ পযসা; তোমাকে দিচ্ছি মা।'

বাবা—'এটা পারিবারিক জীবন—দেনা-পাওনাব জাযগা নয তো? এখানে এ-বকম কথা তোমাব শোভা পায না।'

—'তা ঠিক।'

একটু চুপ থেকে—'কিন্তু আমি—'

—'না, কোনো কৈফিযৎ তো চাই নি তোমাব কাছ থেকে।'

তবুও বললাম—'এটকু ঠাট্টা কবে বলেছিলাম মাকে।'

বাবা একটু হেসে—'তা বেশ, বেশ; কিন্তু কেমন একটা অসংযম দেখা যায আজকালকার যুবকদেব মধ্যে। তারা যদি পাঁচ পযসা বোজগাব করে তা হলে মনে কবে বসে জীবনেব সব জিনিসই পয়সা দিযে কেনা যায বুঝি? তা যায না। শেষ পর্যন্ত পযসাব দাম ঢেব কম।' বাবা চলে গেলেণ।

খানিক ক্ষণ চুপচাপ।

মার দিকে তাকিযে ভবসাব সুবে বললাম—'দু-তিন বছরেব মধ্যে ব্যবসাব সুবিধা হবে আশা করি।'

—'আসছে বছবে লাভ হবে?'

—'না, তার পরের বছরে।'

—'ঢের দেনা জমে গেছে। খুকি বোজ প্রায দেড় সের দুধ খায এখনো; দুধেব যা দাম।'

—'দেড় সেব রোজ? বাবা!'

—'বাঃ, এর আগে তো দু সের-আড়াই সের খেত।'

—'অতটুকু মেযে?'

—'খিদে থাকলে খেতেই হয। মার বুকে তো এক ফোঁটাও দুধ পায না। সেই আতুর ঘর থেকেই তো এক রকম। এ সব মেয়েদের যে কী ধাঁচ—'ছেলে বিযোবে, বাঁটে দুধ থাকবে না; একটা মরা গরুরও তো থাকে। অক্ষয় ডাক্তার খেতে বলেন।'

—'তাই না-কি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কাকে?'

—'নীলিমাকে—'কেন?'

—'তখন থেকেই গরুর দুধ খেয়ে আসছে বুঝি?'

—'গরুর দুধ ছাগলের দুধ কত কী? ফিডিং বোতল ভাঙল কতকগুলো; কিছুতেই দুধ খাবে না; ছবি চাই; ছেলেমেযে বড় করা কি কম হ্যাঙ্গাম।' চাযেব পেযালাব দিকে তাকিযে দেখি একটা মাছি পড়েছে, মাছিটা মবে নি এখনো। ধীরে আঙুল দিয়ে তুলে পেযালার কিনাবে রেখে দেই। মাছিটা আস্তে-আস্তে পেযালার গা বেয়ে-বেযে টেবিলের ওপব নেমে চুপ করে বসে থাকে।

মা—'টাকার শ্রাদ্ধ! তার পর এই তিন মাস আমাশায পড়েছিল।'

—'কে?'

—'খুকি! রক্ত আমাশায যায-যায়।'

—'তা হলে তো ঢের ঝঞ্ঝাট গিযেছে তোমাদেব?'

—'টাকাও জলের মতন খরচ।'

মা—'ফুড, গ্ল্যাক্সো, বার্লি, টিনে-টিনে একেবারে ঘব বোঝাই হয়ে গেছে; সেই আমাশায থেকেই দুধ আর পেটে সয না, ফুডেব সঙ্গে মিশিযে খেতে হয।'

মা একটা ঢোঁক গিলে,—'ডাক্তাব একটা বাঁধা; আমি বলেছিলাম কবরেজেব কথা, কিংবা আমাদের বিধু, ক্যাম্বেলেব পড়া, ছেলেটিও বেশ ভাল। কিন্তু বৌযেব চোখ কপাল ফুঁড়ে আকাশে গিযে ওঠে। এম-বি ডাক্তাব না হলে তাব চলে না।' পেযালাগুদ্ধ চা দরজার ভিতব দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে মা, 'তা এম-বি ডাক্তাব এক-একবাব আসে দুই-দুই টাকা কবে ভিজিট নিযে যায। এমনই যে ভিজিটেব টাকা একবাব বাদ পড়ে গেলে ত পবেব বাব সাধ্য-সাধনা কবেও তাকে আনা যাবে না। তা আমি ভাবি, টাকাব চেযে মেযেব প্রাণ ত বেশি; জীবনে টাকাই ত সব নয। একটা টাকাব গাছ না হলেও চলে না যে।'

—'একটা গাছের দবকাব কম নয। না হলে সংসাবের কী দিযে কী হয।' পেযালাটা এক দিকে সবিযে বেখে—'তোমাব বাবা দেনায-দেনায ত ডুবে গেলেন।'

—'কত দেনা?'

—'থাক'

মা—'জুতো, জামা, পেনি, ফ্রক, ইজেব, পাউডাব কত কী, আমি বলি মেযেকে মেমদেব বেবীব মত সাজিযে লাভ কী! কিন্তু তোমার বৌযেব যা মর্জি। কত ধানে কত চাল হয একটুও যদি বুঝত! শালিকের বাচ্চাকে দিযে ময়ূরেব পেখম উড়ানো চাই!'

—'খুকিব জন্য তা হলে তো তোমাদের ঢেব খবচ।'

—'ওর মাব জন্যও কি কম? তুমি গতবছর চৈত্র মাসে শেষ কিস্তিতে যে তিন শ টাকা পাঠালে, বৌ কপালে চোখ তুলে বললে, মাসে-মাসে আমাব স্বামী এতগুলো কবে টাকা পাঠান অথচ আমাব আর্শি নেই, সিন্দুর নেই, ভাল হাড়ের চিরুনি নেই, সিল্কেব ব্লাউজ নেই। সে এক কাণ্ড বাধালে। চৈত্র মাসে এই তাণ্ডব বাযনা।'

খাবাব টেবিলের উপর একটা শুকনো পান ছিল। মুখে দিলাম।

মা—'আমাদের জন্য ওব সহানুভূতি এত? কেন এমন হাতিপোষা বাচ্চা! সুন্দববনেব হাতি, বাজ-বাজড়ার দেউড়ি ছেড়ে।'

—'টাকা তো ঢের খরচ হল, মেযেটা দেখতে কেমন হযেছে?'

—'সেই এক রত্তি, আর বাড়ে না।'

—'তাই না কি?'

—'তা আমি ভাবি, বামনবীর হবে না কি আবার।'

—'না তা হবে না; এক বছর মোটে বযস। কত বাড়বে আর?' একটু চুপ থেকে, 'এখন হামাগুড়ি

দেয়? না হাঁটে?'

—'হাঁটতে পারে। টুকটুক করে হাঁটে, সলতের মত হাত পা, খানিক হেঁটেই ধোঁকে।'

—'তা হামা দেয় না আর, টুকুটুক করে হাঁটে?'

দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে খুঁজছিলাম। কোথাও পেলাম না।

বললাম—'গাছটা কেথায় গেল?'

—'কোন গাছ?'

—'সেই কৃষ্ণচূড়াটা।'

—'কে জানে?'

—'কেন গাছটা দেখ নি তুমি কোনোদিন?'

—'মনে আছে কার?'

—'বাঃ কেমন সুন্দর ফুলে ভবে থাকত বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সমস্ত দুপুব ভবে ডালে-ডালে শালিখগুলো কিচিরমিচিব করত; বাতের বেলায় নিস্তব্দে লক্ষ্মীপেঁচা এসে বসত।'

—'গতবার তো তুমি প্রায বাব চৌদ্দটা সুটকেশ এনেছিলে। বেশ সুন্দব চকোলেট বাদামি বঙেব চামড়াব। সেগুলো কই?'

—'রেখে এসেছি।'

—'কোথায়?'

একটু চুপ থেকে—'মাদ্রাজে।'

—'কেন, আনলে কী ক্ষতি হত?'

—'অত মালেব ভাড়া দেয কে?'

—'কেন, আমাকেও তো দু-চারটা দিলে পাবতে।'

—'তুমি গত বারেই তো তিনটে নিলে।'

—'তা বলে আর-বুঝি লাগে না।'

-'পরে নিও।'

—'তোমার বিছানাপত্র একটা ইকড়ি-নিকড়ি শতবঞ্জিতে বেঁধে আনলে যে বড়। কেমন একটা লোকসানি শতরঞ্জিং! হিন্দুস্থানি ধোপাদের মত, খোট্টাদেব মত।'

একটু থেমে, 'মাদ্রাজে এই-ই চাল—'

—'কী?'

—'ব্যবসাযীরা এই রকমই করে।'

—'নাপতের মত বিছানা-বাক্স নিয়ে চলাফেবা করে?'

—'ব্যবসা কবতে হলে একটু কষ্ট স্বীকার করতে হয়।'

—'ও সব হল ছোট দোকানদারদের কথা। যাবা টাকার পুবস্কাব পেযেছে জীবনটাকে সাজাতে তাবা ছাড়বে কেন?'

—'তা ঠিক, আমিও তো সাজিযেছি।'

—'কোথায?'

—'কেন মাদ্রাজে।'

—'তোমার দোকানটা সেখানে খুব সুন্দব বুঝি।'

—'বেশ সুন্দর তো।'

—'কী কী জিনিস বিক্রি করো?'

—'কত জিনিস।'

—'সাইকেলের টাযার বুঝি?'

—'তোমাকে কে বললে?'

—'জানি না বুঝি আব? হ্যাঁ—মাদ্রাজিরা খুব সাইকেলে চড়ে?'

—'খুব।'
—'টায়ার তো এক দিন আমাকে দেখালেও না। কী রকম জিনিস? রবাবের তৈরি?'
একটু চুপ করে থেকে—'আর কী বিক্রি করো?'
—'চা।'
—'খুব কাটতি?'
—'খুব।'
—'দিনের মধ্যে দশবারও হয তো চা খায় ওবা?'
—'যাদের মর্জি তাবা খায়।'
—'একটা মাদ্রাজিকেও কোনোদিন দেখলাম না।'
—'দেখে কী লাভ?'
—'আমি ভাবি কি, যাদের কাছে জিনিস বেচে তোমার এত পড়তা তাদেব কাছে আমাব ঢের ঋণী।'
—'তুমি তো এই কথা বলছ, শুনতে ভাবী সুন্দর তোমার কথা, ব্যাপারটাকে ঘুরিযে-ফিবিযে নানা ভাবেই দেখা যায; যদি মানুষের ব্যবসার ভিতরের খবর জানতে।'
সে বাধা দিয়ে বললে—'থাক, হাজাব-হাজাব টাকা যে তাবা আমাদের কবে দিচ্ছে। সে সত্য তো তুমি মুছে ফেলতে, পারবে না। মাদ্রাজি মেযেবা কেমন দেখতে?'
—'মন্দ কী?'
—'খুব সুন্দর বলো?'
—'রুচিভেদে। সংসারে কারো কাছে সুন্দব লাগে, কারো কাছে সাধাবণ বলে মনে হয।'
—'তোমাব কাছেই-বা কেমন লাগল?'
—'এক-একজন ছিপছিপে মেযে, বেশ তো।'
—'মাদ্রাজি শাড়ি পবে?'
—'তাই তো দেখলাম।'
বললে—'আর কী বিক্রি কবো?'
—'মাখন, পাউরুটি, বিস্কুট, জ্যাম।'
—'জ্যাম কাকে বলে?'
—'ঐ জেলিই।'
—'কত দিন কুঁচি দিযে শাড়ি পবি নি।'
—'কেন?'
—'না, এই সব পাড়াব লোক বড় কুচুটে। ছিচকে শাশুড়িও একটি কম নন।'
একটু চুপ থেকে—'পাযে আলতা দিয়েছ দেখছি।'
—'সুন্দব দেখাচ্ছে না?'
ঘাড় নেড়ে—'বেশ।'
—'মেহেদি পাতা ঘষে দিয়েছি।'
—'তাইতে। তাতে এত লাল হয?'
—'তা হয় বই কি।'
—'বিকেলে তোমাকে এক শিশি আলতা কিনে দেব।'
—'থাক।'
—'কেন থাকবে?'
—'আলতা আমি বড় একটা পরি না।'
একটা নিশ্বাস ফেলে—'যখন দরকাব হয, মেহেদিব জঙ্গলই তো বযেছে।'
নিস্তব্ধ দুপুব ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল।
—'বড্ড গ্রামোফোন শুনতে ইচ্ছে করে আমাব।'
—'গ্রামোফোন?'
—'যেন আকাশ থেকে পড়লে! এত দিন পরে মাদ্রাজ থেকে এলে একটা গ্রামোফোনও তো আনতে

পাবতে, সে আঙুল মটকাতে-মটকাতে, 'আজকাল তো খুব শস্তায় পাওয়া যায়। এক শ পঞ্চাশে একটা খুব ভাল কল হয়।'

—'তা হয় অবিশ্যি।'

—'বেকুবেব মত মাথা নাড়ছে; আনলে না তো'। জানলাব পাশ থেকে একটা লেবু পাতা ছিঁড়ে নিলাম।

—'আজকাল কত নতুন বেকর্ড বেবিয়ে গেছে।'

—'পাড়ায় কাবো গ্রামোফোন আছে?'

—'তা দিয়ে তোমাব কী হবে?'

—'দু-তিন দিন এসে শোনা যেত।'

—'তা তুমি এনে শুনেত পাব; কিন্তু ও-বকম কবে গান শোনবাব লোভ আমাব নেই। লোকে তো সাত শ টাকা দিয়েও গ্রামোফোন কেনে। একটা দেড় শ টাকা দামেব জিনিস। এই জন্য যাব আমি পাড়াব লোকেব কাছে চাইতে? সব্বাই জানে যে মাদ্রাজে তুমি হাজাব-হাজাব টাকাব ব্যবসা কবছ।'

—'না, পবেব জিনিস চেয়ে ফুর্তি কবাব পক্ষপাতী আমিও বড় একটা নই।'

—'ভিক্ষে কবে যাবা ফুর্তি কবে তাদেব জীবনে তৃপ্তিব চেয়ে ধিক্কাবই ঢেব বেশি।'

—'অনাড়ম্বব নিস্পৃহ জীবনও তাদেব চেয়ে ঢেব ভাল।'

—'তা ঠিক।'

দু জনেই কিছুক্ষণ নীবব বইলাম।

—'বড় তো বললে জীবনটাকে সাজাচ্ছ; কিন্তু এই চাব বছবেব মধ্যেও এই খড়েব ঘবদোবেব জীর্ণশীর্ণতা ঘুচল না। পশ্চিমে একটা দালান তুলবে বলেছিলে, তাব ইঁটেব পাঁজা এখনো পুড়ছে হয় তো?' একটা নিশ্বাস, ফেলে, 'সে বাবণেব চিতাব মত চিবকালই পুড়বে।'

একটু হেসে, 'দেখ না, কী হয়।'

ঈষৎ ঔজ্জ্বল্যে চোখ তুলে, 'জাযগা কেনা হয়ে গেছে?'

মাথা নেড়ে, 'না, কোথায় কিনব ভাবছি।'

—'ভাবছ? তা ভেবেই যাদেব মনখালাশ মিছিমিছি কষ্ট কবে কিনবাব প্রযোজনই-বা কী তাদেব? জীবনেব শেষ পর্যন্ত মনেব নিববচ্ছিন্ন ভাবনা নিয়ে বেশ বিলাসেই তো দিনবাত কেটে যাবে। জাবব কেটে চোখে বুজে লেজ নেড়ে।'

—'ভাবছি মুঙ্গেবে কিনব, না আবো পশ্চিমে যাব—ধবো দেবাদুনে।'

—'থাক।'

—'না, কথাটা হচ্ছে কী জানো।'

—'মিছিমিছি কথাব অপব্যহাব কবে জাহাজ বানিয়ে কী লাভ।'

একটু চুপ থেকে বললে—'আমাদেব বিয়েব পব থেকেই বলে আসছ মানুষেব জীবনটা একটা শ্রীছাঁদেব জিনিস। এখানকাব গরু-ছাগলেল খোঁযাড়েব দিকেও তো একটু তাকাতে হয।'

—'তা আমি ভেবেছি।'

—'সেই বিয়েব থেকেই আমাকে শোনালে মানুষেব জীবন খুব একটা সুন্দব বচনাব জিনিস। তা আজ অবধি একটা কোঠা বাড়ি হল না, গ্রামোফোন নেই, অর্গান নেই, সেলাইযেব কল নেই, মেহগিনি কাঠেব চেযাব, টেবিল, দেবাজ নেই, ছাপাব খাট নেই, ঝালব বাতি নেই। একটা সেলাইযেব কল অব্দি নেই।'

—'তুমি বড্ড বোগা হযে গেছ এ দেড় বছবে।'

—'হযেছিই তো, আবো হব।'

—'কেন?'

—'বোজ জ্বব হয়, হাত-পা ফোলে, ফুলে লাল হযে যায, কট-কট কবতে থাকে।'

—'তাই নাকি?'

—'তবে আবাব কী? এ বকম স্যাঁতস্যাঁতে ঘবে থাকলে কী আব হবে। বিযেব আগে বাপেব বাড়িতে যাবা আমাকে দেখেছে তাবা আমাকে চিনলে হয।'

একটা নিশ্বাস ফেলে সে—'ডাক্তাব বললে ভিটামিন খেতে। দুধে ভিটামিন আছে, কমলালেবুতে

আছে। কিন্তু পযসা কোথায। খুকিব দুধ জুটিযেই বাবা হযরান। আমাব জন্য আবাব দুধ? মুখ ফুটেই-বা বলি কী কবে বাবাকে? গত বছবে তো তুমি বাড়িতে একটা টাকাও পাঠালে না।'

—'আমাকে লিখলেই পাবতে মাদ্রাজে।'

—'যাক্, আমাব জন্য এক সেব দুধ আলাদা বেখো তো বোজ।'

—'তা বাখব।'

—'মাছ মাংস, ডিম, মাখন, টমেটো, কমলালেবু ভিটামিন তো অনেক জিনিসেব আছে, কী বলো?'

—'তা আছে।'

—'বাজাব থেকে বোজ নিযে এসো এগুলো; কাবো ওপব দিও না। তুমি নিজেই নিযে এসো। টাটকা-টাটকা জিনিস আনতে পাববে তা হলে।'

—'তা পাবা যাবে।'

—'ডাক্তাব আমাকে দুটো ওষুধ দিযেছিলেন; কিন্তু কেনা হযনি।'

—'কেন?'

—'বড্ড দাম ওষুধেব। প্রায দশ-বাব টাকা। আজ একটু সন্ধ্যাব সময ঘুবে কিনো এনো। আনবে কি?'

—'আনব বই-কি।'

—'এখন গবম পড়ে গেছে। জামা পবে বেচাবা ঘেমে হাঁসফাঁস কবে, সাবাদিন বড্ড কষ্ট পায, মোটা খদ্দবেব জামা ছাড়া কিছু নেই খুকিব। ওব জন্য দুটো সিল্কেব ফ্রক নিযে কিনে এনো। মুনকাব দোকান থেকে, চকেব মোড়ে।'

—'সিল্কেব?'

—'হ্যাঁ, নকল সিল্ক বা চাইনিজ সিল্ক এনো না, যা খাঁটি জিনিস তাই আনবে। অতটুকু শিশুকে ঠকিযে কী লাভ?'

—'তা তো ঠিকই।'

—'এক টিন পাউডাব আনবে খুকিব জন্য; বাজাবে যা সব চেযে ভাল জিনিস তাই। বাজে জিনিস মেখে অনেক সময—'

—'তা নয।'

—'আব এক জোড়া বাদামি জুতো লাল ভেলভেটেব নাগবাই এনো। বেচাবা সাবা দিন খালি পাযে টুক-টুক কবে হাঁটে। সেদিন একটা কাচ না কী ফুটে গিযেছিল।'

—'জুতো পায দিলে আবাব ফোশকা পড়বে না তো?'

—'না, পাযে দেওযাব অভ্যাস আছে। মাস তিনেক আগে এক জোড়া কিনে দিযেছিলেন বাবা—কোথায হাবিযে গেছে।'

—'সে-জোড়া খুঁজে বেব কবলে হয না?'

—'কেন তাই পবাবে না কি ওকে? অতটুকু মেযেব ওপব এ-বকম জুলুম কবতে তোমাব রুচি হয?'

একটু হেসে—'না, পাযেব মাপেব জন্য চেযেছিলাম।'

সে একটু হেসে-'সে জন্য তোমাব এত ভয কী। একটা পেন্সিল দিযে এক চিলতি শাদা কাগজেব ওপব এঁকে নিলেই তো হবে।'

—'তা হবে।'

—'এই যে চেককাটা খদ্দবেব ব্লাউজ গাযে দিযেছি, গবমেব ভেতব একেবাবে চিড়বিড় কবে ওঠে যেন; আমাব জন্য কতকগুলো ব্লাউজ পিস এনো তো—সিল্কেব, নকল সিল্ক হলেও চলবে আমাব। জীবনটা প্রাযই আমাব নির্জীব হযে পড়ে থাকে। যেন জ্বব আসছে আবাব-হাত-পা ফুলতে শুরু কবল বুঝি। ওকী তুমি ঘুমিযে পড়েছ? ঘুমিযে পড়লে অবশ্য মানুষ এত কথা শোনে না।'

কযেকবাব হাই তুলল, কযেকটা তুড়ি দিল; মটমট কবে আঙুল মটকাল। জানলাব কাছে গিযে খানিকক্ষণ বমি কবল, তাবপব ধীবে-ধীবে উঠে চলে গেল।

রক্তমাংসহীন

রাত প্রায় তিনটের সময় মশারিটা তুলে গায় ঠেলা দিয়ে জাগাল।

উষার হাতে একটা...হ্যারিকেন—আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে—হাসতে বললে—'মহাপুরুষের ঘুম ভাঙবে না বুঝি আজ—'

আড়ামোড়া দিয়ে উঠে জানালার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম—মনে হয় কোথায় একটা চিতা অনেকক্ষণ যেন জ্বলে-জ্বলে নিভে গেছে; তাই এত অন্ধকার আর চুপচাপ।

একটা হাই তুলে বললাম—'তুমি বুঝি সারারাত জেগেই আছ!'

—'তা জিনিসপত্তর ঠিকঠাক করতে গিয়ে দেখলাম এটা নেই, ওটা নেই, এটা ভুলে গেছি, সেটা নেওয়া হয় নি—তার পর সব ঠিকঠাক করে শুতে গিয়ে দেখি ঘড়িতে তিনটে—'

—'তা হলে শোয়া হল না আর?'

—'ইস্টিমারে গিয়ে ঘুমোব এখন।'

—'তা ঘুমোবে। তিনটে বাজল?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার তৈরি তা হলে সব?'

—'কী জানি, ইস্টিমারে উঠে আবার না জানি কত জিনিসের কথা মনে হবে!'

—'হিমাংশু উঠেছে?'

—'না, সে সেই দশটার থেকেই পড়ে-পড়ে ঘুম—'

—'যাক, একটা গাড়ি আনি আর-কি, তুমি কাপড়-চোপড় পরো, তোমার ভাইকে জাগাও—'

স্যান্ডালে পা চালিয়ে গিয়ে শার্ট গায় দিচ্ছিলাম। উষা—'স্টিমার কটার সময় ছাড়ে?'

—'সাড়ে তিনটের সময় তো ছাড়ার কথা; দশ-পনের মিনিট দেরিও করে ফেলে—'

—'তা হলে আর তো সময় নেই—'

—'হিমাংশুর সব গুছনো হয়েছে?'

—'আমিই গুছোলাম; ও হতভাগার কি কাণ্ডজ্ঞান আছে?'

—'আমারও কি আছে? আমি তো ঘুমুচ্ছিলাম উষা, বিছানাও তুমিই বাঁধলে!'

—'হ্যাঁ।

—'বাঃ, বেশ মানুষ তুমি। একটু আগে জাগালে না কেন?'

—'ঐ যা! লণ্ঠনটা নিভে যাচ্ছে; ধেৎ, আবার কোরোসিনের তেলের বোতল বের কর।'

—'কেরোসিনের বোতলও প্যাক করেছ?'

—'প্যাক আর কি? বড় বালতিটা ভিতরে নিয়ে চলেছি।'

বালতিটার দিকে তাকিয়ে বললাম—'ভিতরে কী জিনিস?'

কেরোসিনের বোতলটা টেনে তুলে নিয়ে উষা হ্যারিকেনের পেটে খানিকটা তেল ভরে ফিতেটা উশকে—'প্রথমেই নানা রকম দেনা জাঁকিয়ে বাপের বাড়িতে উঠতে পারা যায় না, তাই কতকগুলো খুঁটিনাটি সাংসারিক জিনিস নিলাম। এগুলো যতদিনে ফুরুবে ততদিনে আমার সাংসারিক নিঃসম্বলতা তাদের গা সওয়া হয়ে যাবে—'

বলে, উশকানো বাতিটার মত খানিকটা উজ্জ্বল হয়ে হেসে আমার দিকে একবার তাকাল। হাসির ভিতরে ঢের ক্ষমা, সহানুভূতি ও চাপা ব্যথাও অনেকখানি।

অন্ধকার নিস্তব্ধতার মধ্যে বুকের রক্তের গ্রন্থিগুলো কেমন টনটন করে ওঠে।

—'বাঃ দাঁড়িয়ে রইলে যে!'

—'এই তো যাচ্ছি; তা এক বোতল কেরোসিনে—'

—'না, সে ভয় তোমার নেই। অনেকদিন টিকবে আমার।'

কেরোসিনের বোতলটার ছিপি এঁটে—'এই আজ তো অমাবস্যা কেটে গেল, এখন থেকে তো ফটফটে চাঁদনি আরম্ভ হবে; চলাফেরার জন্য বাতি লাগবে না। যেটুকু পড়াশোনা তা দিনের বেলা। পড়ি আর কই আমি। পড়িই না। রাতে জ্যোৎস্নায় বোযাকে বসে আড্ডা কিংবা ঘবে-ঘরে ঘুরে বেড়ানো—হয়ত জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নামাখা মাঠটার দিকে একা-একা তাকিয়ে থাকব—তোমাদের কথাই ভাবব হয়ত। এই রকম। জীবন তো এই!'

—'তারপর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাতে বাইবে চলাফেবাব জন্য বাতিটা লাগবে। সে চলাফেরা কতক্ষণই-বা আর—বড় বেশি হলে পাঁচ-সাত মিনিট রোজ। তা ও এক বোতলে আমাব পনেব-কুড়ি দিন চলে যাবে—'

ছুট করা সুপুরি মুখে দিয়ে উষা—'কথা বললে তুমি একেবারে লেগে থাক। নাও, এখন পা চালাও দেখি। এ পাঁচ মিনিটের ভেতর তুমি তো গাড়ির আড্ডাযও চলে যেতে পাবতে—'

'যাচ্ছিলাম।'

উষা—'শুধু একটা পাতলা শার্ট গায়ে দিয়ে চললে, শার্টেব জানালা তো গুটি পঁচিশেক!'

—'কে-ই বা দেখবে অন্ধকাবে?'

—'শোনা, এদিকে এসো দেখি।'

—'আবাব কী?'

—'বলি, শার্ট নেই তোমাব?'

—'কোথায শীত, মাঘ মাস যায ফুরিয়ে।'

—'হ্যাঁ, এ যেন ঘড়িব কাঁটাব হিসেব। মাস ফুবোল, শীতও পালাল। হাত-পা কালিয়ে ববফ হয়ে যায় মানুষেব, তুমি মানুষ না পাথব? আলোযানটা কোথায?'

—'কোথায রেখেছি, মনে নেই আমার!'

—'দেখ কাণ্ড।'

—'থাক, তুমি খুঁজতে যেও না উষা।'

—'কী রকম যে পুরুষ মানুষেব জাতটা; এদের নিয়ে আমাদেব মেয়েদের একেবারে—'

লণ্ঠনেব ফিতেটা একটু উশকে নিযে উষা হাঁটতে-হাঁটতে—'ভাগ্যিস মেযেমানুষেরা অজস্র-অজস্র জন্মেছিল। ধানখেতেব ধানেব মত তাদেব ব্যবহাব। নিজেব হাত-পা নিযে তোমাব যে কত পঙ্গু—'

লণ্ঠনটা নিয়ে অন্ধকারের ভেতব এ-ঘব সে ঘব খুঁজতে লাগল—

দবজার ছিটকিনি খুলে চৌকাঠেব উপব বসলাম—দূবে অন্ধকাবে বাতাবি গাছটাব দিকে তাকিয়ে।

দু-তিন মিনিট পবে উঠে দাঁড়িয়ে—'পেলে?'

কোনো উত্তব নেই।

—'বিছানার চাদরটাই ববং দাও।'

—'আমি যে কী বকম মেয়েমানুষ তা তো তুমি চিনলে না! কথাই বল শুধু—' সঙ্গে-সঙ্গে আলোযানটা সে আমাব হাতে তুলে দিল।

—'নাও ভাল করে জড়িয়ে নাও।'

বাইরের রাত্রিব দিকে এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ তাকিয়ে উষা—'যা ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাতিটাও নাও-'

—'কী আর দরকার...'

—'ঐ তো তোমার বকম, চিবটাকাল দেখলাম!' চিরকাল? আমাদের মাত্র তিন বছর হল বিয়ে হযেছে। বারান্দার পাশে তুলসীর গাছের দিকে তাকিয়ে—

—'বাতি নিয়ে গেলে এ অন্ধকারেব মধ্যে কী কবে থাকবে?'

—'আমি এই বারান্দায একটু হাঁটা-চলা কবি—এই দেশলাইটা আছে, যাও, আব, কথা বলো না—'

...লণ্ঠনটা নিতে হল।

গাড়ির আড্ডায় গিয়ে শুনলাম ষ্টিমার সাড়ে পাঁচটাব সময় ছাড়ে; গাড়োযান বললে, সে পাঁচটার সময় গাড়ি নিয়ে আসবে।

বাসায় ফিরে এসে দেখলাম উষা আবার খাঁটের ওপর বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—

—'কই, তুমি কাপড়-চোপড় পরো নি দেখি, এতক্ষণ কী করলে? হিমাংশু কোথায?'

—'খাটেই শুযে আছে।'

—'ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন?

—'আমি আব জাগাই নি।'

চুপ থেকে—'তুমিও সেই ময়লা সুতিব শাড়ি আব ছেঁড়া ব্লাউজ পবেই বযেছ! কী যে তোমবা ভাই-বোন দুটি! নাও, ওঠো কাপড়-চোপড় বদলাও—'

উষা বিছানাব ওপব ওঠে বসে একটু হেসে—'গেল বুঝি বাজত্ব নষ্ট হযে' বাপবে, কী যে তোমাব তাড়া' আমবা চলে গেলে এ অন্ধকাবে তুমি কাকে নিযে থাকবে'

কোথাও যাবাব সময উষা এই বকমই কবে।

ঘবেব একপাশে দাঁড়ভাঙা একটা তিন ঠেঙো কাঠেব চেযাব পড়েছিল—চুপ কবে গিযে বসলাম।

উষা—'বসলে যে বড়!'

—'একটু জিবিযে নেই।'

—'তা দশ মিনিটেব মধ্যে গাড়ি এনে ফেললে; হাঁফ ধববাবই তো কথা। দেড় মাইল দূব আস্তাবল। দেড় মাইল না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাব মনে হয বেশি হবে' কোনো জবাব দিলাম না।

—'তোমাকে গাড়ি আনতে পাঠিযেই ভাবলাম ফিবে ডাকি। কিন্তু কে ডাকবে? হিমাংশু একটা মানুষ? তা ছাড়া, ছেলেমানুষ, ঘুমুচ্ছিল—এ দেশেব পথঘাটও তো চেনে না, কোথায যেতে কোথায যায—বিপদ!'

একটু চুপ থেকে—'এমন চুপ কবে বইলে যে?'

—'কী বলব, বলো?'

—'আজ আমি চলে যাচ্ছি, কোনো কথা নেই?' বিবহ নিস্তব্ধভাবে উপলব্ধি কবাই আমাব অভ্যাস। মিলনেব আনন্দকেও কোনোদিন কলববে অভ্যর্থনা কবতে পাবি নি। নাবীটিব অন্য বকম কথাবার্তা, হাসি, দীর্ঘশ্বাসেব বিনিময, অশ্রু, এই সমস্তই উষাব প্রাণেব উপাদান, মানবজীবনেব বক্তমাংসেব মত, তেমনি সত্য উষা, কার্পণ্যহীন সবল, আত্মপ্রকাশে পবিস্ফুট।

চুপ কবে ছিলাম।

কিন্তু চুপ কবে থাকাটাকে বড় অনিযম বলে মনে হল।

—'বাপেব বাড়ি গিযেই একটা চিঠি দিও উষা।'

—'এই হল তোমাব বলবাব একমাত্র কথা!'

—'অনেক কথা আছে—তুমি ফিবে এলে হবে সব।'

—'এখন তুমি বলতে পাবো না?'

—'পবস্পবকে ছেড়ে কী কষ্ট, কী বকম কষ্ট, কতদিনেব কষ্ট, সে-সব কথা বলে এখন নিজেদেব আঘাত দিযে কী লাভ?'

একটু চুপ থেকে বাইবেব অন্ধকাবেব দিকে তাকিযে—

—'এই বাস্তিবটাও এমন মনমবা; মানুষেব প্রাণ শুকিযে যায কেন?'

একটু চুপ থেকে—'তা এই বাস্তিবেও তো কত লোক ফূর্তি কবছে!'

—'তা কবে।'

—'কত জাযগাযই তো হাসি, কথাবার্তা, আমোদ, তাই না?'

—'হ্যা।'

একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু কেমন গুমোট যেন বাতটা। তোমাব কিছু হযে গেছে নাকি?'

—'কী হবে?'

—'এ বাতটাকে খুব মনে থাকবে আমাব!'

—'কী বকম?'

—'বাবা, এ যেন খেতে আসে একেবাবে; একটু সোযাস্তিতে যদি থাকতে দেয' একটু শুযেছিলাম, উঠে বসতে হল। বসেছি—তো এ-ঘবে সে-ঘবে পাযচাবি কবে বেড়াতে ইচ্ছা কবে—'

—'কেন?'

—'কেমন যেন ছটফট কবে, নাঃ, শান্তি নেই আব মানুষেব জীবনে। উঠি,' কিন্তু বসেই বইল উষা।

বললে—'তোমার গায়ের আলোয়ানটা খুলে ফেলো।'

—'কেন?'

—'গরম লাগে না তোমার? কোথাও একটু বাতাস নেই, গাছের পাতাও তো নড়ে না—'

আলোয়ান খুলে ফেললাম।

—'হাতপাখা কই?'

—'হাতপাখা দিয়ে কী হবে?'

—'বাতাস করি একটু,এই ছটফট করে ঘুমের থেকে জাগলে, গাড়ি আনতে গেলে, এলে, ঘামিয়ে গেছ—'

—'না ঘামাই নি।'

—'এসো, বাতাস করি।'

—'বাতাস করলে আমার শীত করবে।'

—'কী যে বলো তুমি! এমন গুমোট রাত তো আমি চোখেও দেখি নি কোনোদিন! শীত করে মানুষের?' আমাব দিকে তাকিয়ে, 'করছে না কি শীত?'

—'একটু-একটু শীত আছে।'

—'তা হলে আলোযানটা গাযে দিযেই বসো। আবার ঠাণ্ডা লেগে একটা কিছু না হয। আমিও তো এখানে থাকব না। বিপত্তি। নাও, আলোযানটা এঁটেসেঁটে গায়ে দিযে নাও।'

দিলাম।

উষা—'মানুষ যে শান্তিতে কোথাও স্থিব হযে থাকবে তাব জো নেই। বিধাতাব কী দোষ? তিনি তো আমাদের সবই দিয়েছেন, কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে জানি না—'

চুপ করে ছিলাম।

—'তাই মাথা খুঁড়ে মরি।'

—'কী হল?'

—'তোমাকে মশায কামড়াচ্ছে না?'

—'কই, না তো?'

—'না আবার? দেখি, হাতপাখাটা নিযে আসি।' উষা উঠে দাঁড়াল।

—'পাখা আনতে যাচ্ছ নাকি?'

কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছিল।

—'পাখা এখন মিছিমিছি খুঁজে কী লাভ?'

—'কেন?'

অন্ধকারের ভিতর এদিকে-সেদিকে ঘুরতে-ঘুবতে উষা-'হাবিযে গেছে বুঝি; কালও তো বাতাস দিযে তোমার মশারি ফেলে দিলাম! অন্ধকারে কোথায় যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে! এ ঘবের পাখাব জন্যেও এমন মাযা হয আমার!' জীবনেব পুরনো পরিচিত জিনিসগুলোর দাম এক-এক সময এমন বেড়ে উঠে!

অন্ধকারের ভিতর খানিকটা চুপচাপ।

তার পর পাখা হাতে বেরিয়ে এসে উষা—'নাও, তুমি নিজেই বাতাস করে মশা তাড়াও, আমার আর সময় নেই।'

—'না, সময় তো হয়েই এসেছে।'

—'গাড়িটা এসেছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম, কটা বেজেছে?'

টেবিলের থেকে ঘড়ির দেখে এসে উষা—'চারটে।'

—'চারটে বাজল?'

—'ইস্টিমার ছাড়বার কথা না কটার সময?'

উষা একটু হেসে—'সেই সাড়ে তিনটের সময তো স্টিমার চলে গেছে—কী যে ভিজে ন্যাকড়া ধরিযে বসেছিলাম। কথায-কথায কোন দিক দিযে যে সময ফেঁসে গেল তুমিও বুঝলে না, আমিও, বুঝলাম না। হিমাংশুটা তো পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে, কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে কি ওর? দাও হাত পাখাটা।'

—'কেন?'

—'একটু বাতাস করি তোমাকে? রাত তিনটব সময মানুষকে ঘুমের থেকে উঠালাম! নাও, শোও

এসে খাটে, আমি বাতাস দিযে তোমাব মশাবি ফেলে দিযে যাই।'

—'কোথায যাবে?'

—'বাঁধাছাঁদা বিছানা খুলি গিযে, তাব পব মেঝেব ওপব গড়াগড়ি দেই, এক্ষুনি তো বাত পোযাবে।'

একটু চুপ থেকে, নাঃ, তোমাব বিছানাব পাশে বসব?'

—'কেন?'

—'একটু কথাবার্তা বলি, হাওযা কবে মশা তাড়াই। দেখতে-দেখতে বাতটা কেটে যাবে। আচ্ছা, আজ আমাব যাওযা হল না বলে মনটা তোমাব এখন খুব ভাল লাগছে না?'

চুপ কবে ছিলাম।

উষা—'নিজেবাই আমবা ইচ্ছে কবে নিজেদেব কষ্ট দেই; এই দেখ, আজ যদি ইস্টিমাবে কবে চলে যেতাম এখানে তুমি থাকতে বঘুবাসেব মত, আব সাবাদিন ইস্টিমাবেব জানালায আমি...'

—'কিন্তু এ বকম বেদনা পাওযাটা জীবনেব নিযম নয।'

—'নয?'

—'না, জীবনটাকে আমি খুব বুঝেছি।' একটু হেসে বাতাবি গাছটাব দিকে তাকালাম-অন্ধকাবে তাকিযে-তাকিযে মনে হয আমাদেব ছেলেবেলাকাব মাস্টাব শ্রীধববাবু, তাব আত্মা যেন দাঁড়িযে আছে।

উষা—'এই যে বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা পুঁটলি বোচকা ঝটবপটব এক-এক সময সাবা দিন বসে এগুলো বেঁধেছেঁদে গোছাতে-গোছাতে ভাবি কোন চবম তৃপ্তিব দিকেই চলেছি বুঝি' কিন্তু কী ভুল' মনেব এই ছেলেমানুষিই আমাদেব দুঃখ দেয' এই ঘবদোব, উঠান, মানুষ—এই সব ছেড়ে যাবাব বিড়ম্বনাব কথা ভাবছিলাম এতক্ষণ, ইস্টিমাবটা এখন অনেক দূবে চলে গেছে—কী বক্ষা' চা খাবে?'

—'কে? আমি?'

—'হ্যাঁ, এইখানেই স্পিবিট স্টোভে জ্বালিযে কবি।

—'স্টোভটা তো তুমি প্যাক কবেছে।'

—'একটা কাগজ মুড়ে ঐ বড় বালতিটাব লটবহবেব ভিতব বেখে দিযেছি।'

—'মিছেমিছি বেব কবে কী হবে?'

—'বাঃ, জিনিসপত্তব সব বুঝি বালতিতে পড়ে থাকবে; যাওযা তো হল না।

—'মিছেমিছি কতকগুলি স্পিবিট খবচ কবে কী লাভ? যাচ্ছ তো আব বোতল স্পিবিট নিযে মোটে।'

—'স্পিবিট আমি এক দম না নিলেই পাবতাম, সেখানে স্টোভ-স্পিবিট দিযে কী কাজ?'

—'মাঝে-মাঝে লাগতে পাবে।'

উষা একটু হেসে বললে—'কিসেব মাবফত?'

চুপ কবে ছিলাম।

উষা হাসতে-হাসতে বললে—'তবুও আমাব কোলে যদি একটি ছেলে থাকত, ইস্টিমাবে স্পিবিট-স্টোভ জ্বলিযে দুধ গবম কবে খাওযাতে হত বটে,' গম্ভীব হযে বললে—'ছেলেপিলেব সুখ আব পেলাম না, আমাদেব দুজনেব মাঝখানে এই শূন্যতাটা বযে গেল—'

তাব পব খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তাব পব চা কবতে চলল।

আমি—'দেখ তো ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

—'সোযা চাবটে?'

—'কোথায চললে?'

—'যাই, চা কবে আনি, দুখানা লুচি ভাজি।'

একটু থেমে, 'বাপেব বাড়ি থেকে যখন ফিবে আসবে, তখন এই সব হবে আবাব। এখন তো সময নেই বেশি আব—'

উষা হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়িযে—'তাব মানে?'

—'আজকাল সাড়ে পাঁচটাব সময স্টিমাব ছাড়ে।'

—'কে বললে?'

—'গাড়িব আড্ডাব থেকেই শুনে এসেছি,' হঠাৎ মুখচোখ বসে গেল যেন উষাব। ধীবে-ধীবে সবে এসে খাটেব এক কোণে বসে বললে, 'কী বললে?'

—'স্টিমাব আজকাল সাড়ে পাঁচটাব সময ছাড়ে; নতুন নিযম হযেছে।'

—'কবেব থেকে?'

—'কবেব থেকে তা তো জানি না, হযত ছমাস ধবেই এ-বকম চলছে—'

—'সাড়ে পাঁচটায?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা তুমি আগে জেনে এলে না কেন?

—'ঠিক সমযেই তো জেনে এসেছি; এখনও তো এক ঘণ্টাব ওপব সময আছে।'

উষা একটু চুপ থেকে 'আমাকে কেন তুমি জোব কবে পাঠাবেই, এই তোমাব বকম? বাপবে, গলা টিপে পাঠানো যেন, একদিন হযত আমাকে খুনও কববে, তুমিই কববে'

লণ্ঠনটা টেবিলেব ওপব ছিল, আলো দেখেই বোধ হয একটা ঝিঝি উড়ে এল।

—'চুপ কবে আছ যে'

খানিকক্ষণ ঘাড় হেঁট কবে থেকে—'আমাব জীবনেব ওপব অধিকাব আমাব নিজেব নেই?'

—'হ্যাঁ, তা তো আছেই।'

—'তা হলে মিছিমিছি নিজেকে আমি দুঃখ দিতে যাই কেন? এই তো ইস্টিমাব ছেড়ে গেছে ভেবে কত ভাল লাগছিল, আবাব তুমি বলছ ইস্টিমাব ছাড়ে নি। শুনে অব্দি মন খবাপ হযে গেছে। কিন্তু অপবাধ তো ইস্টিমাবেব নয, দেখবাবও নয, তোমাবও নয, দ্বিধা-অপবাধ বেদনা সবই তো আমাব মনেব। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে যদি আমাব না ভাল লাগে, না গেলেই পাবি—

একটু হেসে—'ভেবে দেখ।

—'কী ভেবে দেখব?

—'কী কববে না-কববে, বুঝে দেখ'

— কেন আমিই কি শুধু বুঝে দেখব, তুমি আমাকে কোনো সাহায্য কবতে পাববে না?

—'তোমাব যদি যেতে ইচ্ছা কবে তা হলে তোমাকে স্টেশনে নিযে যেতে পাবি।

— যেতে যদি না ভাল লাগে?

— তা হলে থাক।

— বলছ তো, কিন্তু ঘুমিযে ঘুমিযে লগি গুতনোব মত বলছ। আমাব খাওযা না-খাওযা, থাকা না-থাকা, যেন তোমাব জীবনেব তেমন একটা বিশেষ কিছু জিনিস নয— উষা একটা নিশ্বাস ফেলে— দুটি মানুষেব সম্বন্ধ যখন এই বকম হযে দাড়ায —

— সম্বন্ধ ঠিকই আছ; কোথাও কোনো খামতি নেই।'

—'তোমাব আন্তবিকতা ঢেব কম।

—'চলে যেতে যখন তোমাব কষ্ট হচ্ছে—আমি তোমাকে থাকতেই বলি।

— এ যেন ভিজে দেশালইযে আগুন জ্বালাবাব চেষ্টা মানুষেব হৃদযেব ঐকান্তিক প্রেবণা অন্যবকম। একটু চুপ থেকে হেসে—'আমি স্টেশনে যাব না।'

— তাতে কী হবে।

-'তুমিও যদি বা যাও, তোমাকে আটকে বাখব।'

—'এ অভিনযও পবাস্ত হবে, প্রাণহীন অভিনয তো শুধু—সত্যিকাবেব আন্তবিকতা কোথায?'

—'তুমি চাও যে আমি চলেই যাই।'

চুপ কবে বইলাম।

উঠে, উষা,—'যাই'

—'কোথায চললে?'

—'কাপড়-চোপড় বলদাই গি   সময তো আব বেশি নেই, এক ঘণ্টাও আছে কি না সন্দেহ।

—'তা হলে যাওযাই ঠিক কবলে?'

—'যাই, ঘুবে আসি গিযে একবাব, বাপেব বাড়ি তো অনেক দিন যাওযা হয না। দাদাও অত কবে লিখেছেন।'

আমাব দিকে তাকিযে, 'তুমি কী বলো?'

—'যাও, বেড়িযে এসো, কত দিন সেখানে থাকবে?'

—'একবাব গিযে পড়লে, শিগগিব ফিবতে পাবা যাবে না আব—'

—'যাও, কিছুদিন গিযে থাকো, অনেকদিন তো বাপেব বাড়ি যাও নি।'
-'তাই বুঝি তোমাব চক্ষুশূল হযেছি—'
একটু হেসে—'ওঁবা তোমাকে দেখতে চান কি না, তোমাকে—'
—'আব আমি অদৃশ্য হলে তুমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ।'
—'আজকেব দিনটা তুমি থেকে যাও, কাল যেও, না হয পবশু। অথবা পাঁচ-সাত দিন পবে—'
—'নাঃ উঠি, হিমাংশুটাকে গিযে জাগাই, আধ ঘণ্টা বাদে ইস্টিমাব ছাড়বে, এখনো মড়াব মতন ঘুম! কী যে হাড়হাভাতে ছেলে!'
কিন্তু হিমাংশুকে জাগাল না, অন্ধকাবেব ভিতব এ-ঘব সে-ঘব পাযচাবি কবল। বাবান্দায গেল, সমস্ত উঠানটা ঘুবে এসে তাব পব খাটেব উপব এসে বসে বললে, 'মানুষেবও কোনো দোষ নেই, দোষ তাব আখখুটে মনেব; যতদিন এই মনটা বুকেব ভিতব আছে, ততদিন তৃপ্তি নেই—'
—'কী হল আবাব।'
—'সেই যে বেলা দুপুব থেকে বাত তিনটে অব্দি এত উৎসাহে জিনিসপত্র সব গোছালাম, সেই বকম উৎসাহ আগ্রহ নিযেই তো যাওযা উচিত; মবতে তো যাচ্ছি না, নির্বাসনেও না, খুব ভাল জাযগাযই যাচ্ছি। কিন্তু তবুও ঘড়িটাব দিকে তাকাতে ভয, ঘোড়াব গাড়ি কখন আসবে ভয, স্টিমাবকে ভয, অন্ধকাব বাত্তিবটাকে [ভয], এ কী বকম?'
—'কোথায গিযেছিলে?'
—'উঠোনে ঘুবছিলাম।'
—'স্টিমাবে উঠলেই ভাল লাগবে।'
—'এই তোমাব সান্ত্বনা; আব কোনো বকম আশ্বাস দিতে পাব না তুমি—'
চুপ কবে বইলাম।
—'তবুও যদি থাকতে বলতে।'
নিস্তব্ধ হযে বইলাম।
—'আমি নিজে ইচ্ছে কবেও থাকতে পাবি। অন্ধ মাছি তো নাই—মানুষ; যাই, বাক্স বিছানা খুলি গিযে—'
কিন্তু শুল না, ঘুমোল না, ঘাড় হেঁট কবে ফুঁপিযে-ফুঁপিযে কাঁদতে লাগল। মা নেই, বাবা নেই, বেচাবিব জন্য মন যেন কেমন কবে।
কিন্তু তবুও কিছু বলতে পাবি না তাকে। কাঁদতে-কাদতে সে উঠে দাঁড়ায; চোখ মোছে, দবজাব কাছে গিযে আবাব কান্না শুরু কবে, হিক্কা তুলতে-তুলতে কাপড়-চোপড় পবে সাজগোছ কবে, সেফটিপিন আঁটে খোলা টেপে, হিমাংশুকে জাগায, গাড়ি আসে, কাঁদতে-কাঁদতে উষা গিযে ওঠে, আমাবও উঠি, ধুমধড়াক্কাব মধ্যে স্টিমাবে গিযে প্রবেশ কবি—ফিমেল থার্ড ক্লাশ কেবিনে ভিড়েব মধ্যে উষাব জন্যে একটা জাযগা বেছে নেই, স্টিমাবেব ভিতব চাবদিকে জীবনেব কঠিন কলবব দেখে হৃদযেব ভিতব আশা ও স্বপ্ন শুকিযে যায, সময হযে আসে, উষাব সঙ্গে শেষ কথা বলতে গিযে সব চেযে অপ্রযোজনীয বিশুষ্ক দু-চাব কথা মুখে আসে, আব কিছু খুঁজে পাই না, বিদায নেই, সমস্ত ছাযাবাজিব ছবিব মত একটাব পব একটা তাদেব নিজেদেব অধিকাবেই শেষ হযে যায—আমবা যে বযেছি একবাব গ্রাহ্য ভবে দেখতেও যায না। দিনেব পব দিন কেটে যায।

মনে হয যেন মানুষেব জীবন বক্তমাংসহীন পুতুলেব মত—হাত-পা, বুদ্ধি-বিচাব কল্পনা আমাদেব বযেছে, কিন্তু এ জিনিসগুলোকে নিজেব ইচ্ছামত ব্যবহাব কবতে পাবা যায না—কোনো এক অজ্ঞাত হাত এসে আমাদেব বাধা দেয। তা দিক—কিন্তু উষা যেন ফিবে আসে।
সে যদি কোনোদিনও না ফিবে আসে আব, তা হলেও তা অস্বাভাবিক হবে না—

অজ্ঞাত অন্ধকাবে হাত তাব নিজেব নিযমে চলে—
উষা ফিবে এল না আব।
দিন দশেক পবে উষাব মৃত্যুব খবব পেলাম।
মানুষেব মবণ অবিশ্যি অস্বাভাবিক কিছু নয। কিন্তু যতদিন উষা বেঁচে ছিল, তাকে নিযে বেঁচে ছিলাম, জীবনটাকে আবো ঢেব স্পষ্ট কবে সুন্দবভাবে চালাতে পাবতাম।
সন্ধ্যাব সময কলেবা হযেছে—শেষ বাতে মাবা গেছে; কলেবায এ বকম প্রাযই হযে থাকে।

অনেক লোকজন, অনেক লোকজন নিয়ে সংসার; কিন্তু ধীরে-ধীরে জীবনের প্রযোজনে সকলকেই প্রায় ছড়িয়ে পড়তে হযেছে।

এ পরিবারের বেশির ভাগ লোকই এখন কলকাতায কাজ করে; কাজই শুধু করে না তারা, সেখানে, আস্তে-আস্তে ধীরে ধীরে কলকাতা শহরের খুব মাড়ু বাসিন্দা হযে গেছে তারা; ফিরতে চায না আর। দেশের বাড়িটাকে তারা মানবজীবনের চূর্ণ-বিচূর্ণ আশা ও স্বপ্নের একটা ভগ্নস্তূপ বলে মনে করে। কলকাতা শহরের পথঘাট প্রাচীরের নিশ্বাস, সমাজ জাতি সভ্যতা ও জীবনের নিত্য নবীন প্রসন্ন মুখ দেখে তারা।

না, অতটা ফেনিযে দেখবাব শক্তি বা স্বপ্ন, প্রকৃতি কিছুই তাদের নেই। শাদা সাধারণ মানুষঃ কলকাতা তাদের দিনরাত্রির জৈব দেহে চর্বির মত এসে জমা হচ্ছে।

মা অনেক দিন পর্যন্ত দেশের বাড়িতে ছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি বোনের অসুখ হওযাতে কলকাতায দাদাব কাছে গিযে আছেন।

মৃত্যুর আগে এদিকে তিনি আর ফিরবেন বলে বোধ হয না।

মাস ছযেক আগে শোভনাও তার বাপের বাড়ি চলে গিযেছে; মাসে-মাসে সেখান থেকে চিঠি পাই তার—জানিযেছে তার বাবাব বড্ড অসুখ। তবে সম্প্রতি ভযের কোনো কারণ নেই। ডাক্তাবরা বলছে তিন-চার বছর অকর্মণ্য হযে পড়ে থেকে শেষে হযত মাবা যেতে পারেন। তা, শোভনা একটা বছর বাপেব বাড়িতেই কাটাতে চায়। বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই।

পশ্চিম ভিটার মস্ত বড় টিনেব ঘরটা খাঁ-খা করছে। শান-বাঁধানো মেঝে, কবগেট টিনেব বেড়া, ঘবেব ভিতর আট-দশটা বড়-বড় কোঠা, প্রায সাত-আটটা খাট পড়ে আছে। টেবিল-চেযার আলনা-আবশি সমস্তই আছে কিন্তু মানুষ যোটে দুটি—মেজকাকা আর পিসিমা।

চাব-পাঁচ বছব আগে প্রায কুড়ি-পঁচিশ জন লোক এই ঘরে থাকত। গত বছবেও পাঁচ-ছজন ছিল। কিন্তু এবাব এই দুটিতে এসে ঠেকেছে একেবারে। এবা মবে গেলে এ ঘবটায মাকড়সা, টিকটিকি, ইঁদুব—।

মেজকাকা কোনোদিন বিযেই করলেন না, পিসিমা বিযে করার দুবছব পরেই, সে প্রায বিশ বছর আগে, বিধবা হযে সেই যে বাপের বাড়ি এসেছেন, আশা করি মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই থাকবেন।

এ বড় ভরসার কথা; বাড়িব ভিতরে একটি মেযেমানুষ যে সদাসর্বদাই নড়াচড়া করছে তাই উপলব্ধি করতে পারি। জীবনেব বালির চরে খানিকটা অবসন্ন জল তিবতির করছে। পিসিমা ঘরের ভিতরেই থাকনে না শুধু, উঠানে আসেন, রোদ পোহান, বড়-বড় কচুর পাতায তেল মাখিযে খেসারির ডালের বড়ি দেন, তরকারি কোটেন, আমচুর তৈরি করেন, পুঁইমাচার তদারক করেন, লাউয়ের ফনফনে লতাগুলোকে ছোট্ট একটা পরিত্যক্ত একচালার খড়েব ছাদের উপর চড়িযে দেন। বেগুন, লঙ্কা, টমেটো খেত তৈরি করেন—দেখি আমি, বেশ ভাল লাগে।

পুব দিককার এই খড়ের ঘরটায আমি একাই থাকি; মাস দুই আগেও সবাই ছিলেন; আবো কযেক মাস আগে শোভনা, খুকি দুজনেই ছিল। বাড়িটা কম বড় নয, এক সময প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক এই উঠানে বসে মজলিস করত; চাঁদনি রাতে তাকিযা-ফবাস পেতে বসত, দাবার আড্ডা চলত, মেযেবা মাদুর পেতে বিন্তি খেলতে বসত।

অবাক হযে এক-একবার উঠানটার দিকে তাকিযে দেখি হরিচরণের আস্তাবলের দুটো মরকুটে ঘোড়া এসে ঘাস খাচ্ছে। চারদিকে গরুর গোবো। তিন-চারটি বাড়ির ছাগল-গরুর সমাবেশ, আগাছাব জঙ্গল, শুকনো কুল ও পেযারা পাতার ওড়াউড়ি—গাঙশালিকের কিচিরমিচির।

উঠানটাকে পরিষ্কার করতে ইচ্ছা হয, এক-একদিন কাস্তে নিয়ে নামি; কিন্তু কী লাভ; কাস্তেটা একটা লেবু গাছের ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে ফেল দিই।

. আমার জানলার সামনে—বাড়ির উঠানটা ঘুরে, একটা মস্ত বড় মাঠের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এই মাঠটাও (এই সংসারের কর্তাদের), বাড়ির পুব দক্ষিণ উত্তর সীমানা ঘিরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে; সকালবেলা মাঠের মত মনে হয়, পুরবেলা প্রান্তরের গন্ধ পাই, জ্যোৎস্নারাতে তেপান্তরের আস্বাদ জেগে ওঠে।

মাঠের উত্তর কিনারে কতকগুলো আমগাছ, মাঝামাঝি দুটো অশ্বত্থ গাছ, এখানে-সেখানে সজনে, পেয়ারা, জামরুল কৃষ্ণচূড়া, মাদার, হিজল, পলাশ, অর্জুন, আমলকি, ছাতিমের গাছ।

কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে সমস্ত দুপুর একপাল ভেড়া বসে থাকে; মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্নারাতেও ওগুলোকে দেখা যায়। পাশের কোনো এক বাড়ির ভেড়া হবে; হয়ত মজুমদারের। ওগুলোকে তাড়িয়ে দিতে একটুও ইচ্ছা করে না আমার; নিস্তব্ধ দুপুরবেলা ছায়া-উদাস ছাতিম-কৃষ্ণচূড়ার নীচে এদের এই নিরিবিলি জীবনধারনা, পরস্পরের এই নিকট সংসর্গ, বিচ্ছেদহীন নীলাভদিন মৃগনাভি [?] গন্ধময় রাত-তৃপ্তি, শান্তি, দেখতে-দেখতে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একটা কিনারা পাই যেন। (সমস্ত দুপুর ডালপালার ভিতর বাতাস উচ্ছলিত হয়ে ফেরে। মনে হয়·যেন পাতা পল্লবের ভিতর মস্ত বড় একটা জনসমাজের কলরব চলেছে চারদিকে।) শালিকগুলো এক-একবার ভিড় পাকিযে আকাশ-বাতাসের কাছে বিষয় নালিশ জানিযে যায়; তীবেব মত উর্ধ্বশ্বাসে আকাশের-পথে ছুটতে-ছুটতে মাছরাঙা খেলা ছেড়ে চিৎকার করে ওঠে, আমাব জানলার পাশে একটা মুহুবি গাছ ঘেবা। তেলাকুচার জঙ্গলেব ভিতর দুর্গা টুনটুনির জীবন বেশ নরম; কিন্তু লতার গন্ধ-মমতার ছাযায কোকিল তৃপ্ত হযে পড়ে থাকে। সে গাছের থেকে গাছে, ডালের থেকে ডালে, ছাযায, রোদে, না জানি কী খুঁজে মরে সে! শান্তি নাই! 'চোখ গেল'-র একঘেয়ে ডাক কিছুক্ষণ পরে আর ভাল লাগে না; একটা ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচি, এক-একটা কোকিলও যখন জানলার কাছাকাছি ছাতিম গাছটাব ডালে বসে নিঃসঙ্কোচে আত্মানুবঞ্জনে নির্বিবাদে ডাকতে থাকে তখন তাকে সম্প্রীতিকর অতিথি বলেই যেন মনে হয বেশি।

গানকে সম্ভ্রম করে কিছু বলি না তাকে; পালিযে গেল নিস্তার পাই।

কিন্তু তুবও অনেক সময কৃষ্ণচূড়ার পত্রহীন ডালপালাব ভিতর এক-একটা নিস্তব্ধ কোকিল যখন দুপুরের দিগন্তের দিকে তাকিযে চুপচাপ বসে থাকে, বিষণ্ন মধুব কুহকে হৃদয ভবে ওঠে, তাকে খুব সমীচীন, বিমর্ষ রূপসীব মত মনে হয; মনে হয অনেক অভিজ্ঞতা হযেছে তার। তাই এখন সে নীবব কাহিনীহীন, নিরুত্তর, সম্বলবিমুখ, মৃত্যুর নিরুত্তব নৈঃশব্দ্যে ক্ষুবধাব ও সুন্দব। অন্ধকাব রাতে মৃত রাজকুমারের তরবারির খাপের মত স্তব্ধ ও সুন্দর। তাব পব আবার নবীন অনুভূতিঃ কোকিলটা ডালেব সাথে বাতাসের ভিতর নড়তে থাকে; ছেলেবেলাকার রূপকথাব গুলেবকাওলির কথা মনে পড়ে। রূপকথার এক রাজ্য, রূপসী ও পরীর স্বপ্ন দেখি, তার পর মানুষের সংসারের প্রেম ও উপেক্ষার অনেক ঘটনা বাতাসে ভাসতে থাকে; উষার কথা মনে পড়ে, রানীব কথা, নির্মলাব কথা। এরা সকলেই ছিল খুব সুন্দবী অভিমানিনী, বেশ প্রখর বুদ্ধিমতী, কেমন অপ্রসন্ন হৃদযহীন...[?] অনুভবময় কঠিন নারী। কিন্তু তবুও এরা ছিল বলেই প্রেমহীন বিচ্ছেদহীন সৌন্দর্যের মূল্যবোধহীন জীবনের চিরসত্য আমাকে ঠকাতে পারল না। এরা কে কোথায চলে গেছে জানি না; কিন্তু এদের কথা মনে হলেই চাবদিককাব শাদা সাধারণ শুষ্ক বৈধতার হাত থেকে অনেকখানি মুক্তি পাওযা যায়; হৃদযেব রঙ আশ্বিনের ঘাসের মত হযে ওঠে।

এই জানলাটার পাশে আমি একটা টেবিল ফেলে নিযেছি; টেবিলটা বেশ বড় সেগুনকাঠের; টেবিলের ওপর বইযের বোঝা চাপাবার অভ্যাস আমার নেই; বই নেইও বড় একটা; টেবিলটা তাই যেন ঝর্ঝরে। এক কোণে একটা দোযাত আর কলম পড়ে রযেছে।

টেবিলের পাশেই জারুল কাঠের একটা চেযার। এই ঘরের ভিতর। ঘরটায তিনটে কোঠা রযেছে, পুব দিকের এই কোঠাটায বরাবরই আমি থাকি; টেবিলের থেকে খানিকটা দূরে শোবাব চৌকিটা; চৌকির ওপর সারাদিন মাদুব পাতা থাকে। রাতের বেলা কোনোদিন বিছানা পাতা হয, কোনো- কোনোদিন মাদুরেই শোয়া যায।

(বড্ড মশা, ছারপোকার কামড়ও খুব।)

বাকি দুটো কোঠায় শোভনা, খুকি আর মা থাকত, তারা চলে যাবার পর সে ঘর দুটিব সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব কম;

মা ও শোভনা যখন ছিল দাদা কলকাতার থেকে মাসে-মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাতেন; শোভনা

ও খুকি চলে যাবার পর চল্লিশ টাকা করে দিচ্ছিলেন; এখন মা কলকাতায় যাওয়ার পর থেকে বিশ টাকা করে পাঠাচ্ছেন। এই বিশ টাকাতেই আমাদের তিনজনের খুব চলে যায়—

দাদা সাড়ে তিনশ'ট টাকা মাইনে পায়—কিন্তু তার খরচ ঢের। কলকাতায় এবং মফস্বলে, এ সংসারের অনেকেই বেশ নামজাদা চাকরি করেন, কিন্তু নিজেদের পরিবারের ছোটখাট ব্যয়ই তারা কুলিয়ে উঠতে পারেন না' মাসে পাঁচশ-সাতশ টাকায় তাদের কিছুই হয় না—দেনা জমে। মাঝে-মাঝে এদের জীবনপ্রণালীর কথা একটু আশ্চর্য হয়ে ভাবি আমি, ভাবতে-ভাবতে কেমন খানিকটা অবসাদ বোধ হয়; কিন্তু মন্তব্য করবার আমার নেই কিছু;

এদের আচার-ব্যবহারে প্রতিহত হয়ে সৃষ্টির কাছ থেকে খটকা ও বেদনার মাধুর্য দাবি করতে যাই মাঝে-মাঝে গভীর ভাবে।

এরপর জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। আমার চেয়ে ঢের অক্ষম আত্মভ্রষ্ট লোকগুলোও যখন নির্বিচারে জীবনের কাছ থেকে আড়ম্বরে পুরস্কার পাচ্ছে আর আমি পাচ্ছি..' কিন্তু তবুও এই কথাই আমার বারবার মনে হয় যে জীবনের সংগ্রাম শুরু হল শুধু, শেষ হতে এখনও ঢের দেরি, তারপর:

অবশ্যি অনেকেই বলে জীবনটা তোমার কেমন নষ্ট হয়ে গেল যেন; এরা ভাল বুঝেই বলে; কিন্তু আমার মনে হয় এরা ভুল বুঝে; পঁয়ত্রিশ বছরে জীবন পূর্ণও হয় না, নষ্টও হয় না। তবুও অনেক সময় মনে হয় আমিও কি চিন্তার প্রসাদ নিয়ে নিজেকে প্রবঞ্চিত করছি না? কী জানি, জীবনটাকে ভুল বোঝালেই গোলমাল, সত্য উপলব্ধি করে এর ক্ষতি-ক্ষয় বরং সহ্য করা যেতে পারে।

এখানে একটা ক্লাব আছে। ক্লাবে আমি এক পয়সাও চাঁদা দেই না অবিশ্য; সন্ধ্যার সময় যখন সকলে ক্লাবে গিয়ে বসে তখন সেখানে কী কথাবার্তা, হাসি, তামাশা, খেলা হয় জানি না—আমি যাই নি কোনোদিন। আমি যাই বিকেলবেলার কিছুক্ষণ আগে খবরের কাগজগুলো দেখবার জন্য। একজন লোকও থাকে না তখন সেখানে। ক্লাবের বেয়ারা হরকান্ত মাঝে মাঝে একটু প্রতিবাদ করে (কিন্তু দিনের পর দিন দেখে আসছে আমি কোনো জিনিস চুরিও করি না, কিছু ভাঙিও না, কাগজগুলি নেড়েচেড়ে কোয়ার্টার তিনেক দেখে যাই। এখন সে আর কিছু বলে না তাই)। সমস্ত খবরের কাগজের, কাজের, চাকরিখালির খবরগুলো দেখি, তার পর টেলিগ্রাম ও অন্যান্য সংবাদের উপর চোখ বুলিয়ে যাই। কলেজে থাকতে আমার অভ্যাস ছিল অন্য রকমঃ খবরের কাগজে আর্টিকেল ও টেলিগ্রাম-ছাড়া।

নানা রকম চাকরি খালি থাকে অবিশ্যি। নিজেকে কোনো-কোনো রকম চাকরির জন্য বেশ উপযুক্ত মনে হয়, কিন্তু জানি এ-সব কিছুই আমি পাব না। কারণও জানা আছে, ছ-বছর ধরে নানা রকম চেষ্টা ও ব্যর্থতার পর অভিজ্ঞতা জমে গিয়েছে ঢের। রোজই সমস্ত কাগজগুলো দেখি বটে কিন্তু ছমাস চার মাসের মধ্যে এক-আধখানা দরখাস্ত করবার প্রয়োজন বোধ করি। নিজেকে খুব সমীচীন মনে হয়; টিকিটও ঢের বাঁচে। দরখাস্তের কোনো উত্তর আসে না অবিশ্যি। কিন্তু দরখাস্তের ইতিহাস বরাবরই এই রকমই।

বারটা মাস কলকাতায় থেকে চাকরির চেষ্টা করলে মন্দ হত না; কিন্তু মেজকাকা বলেন, একা তিনি দেশে থাকতে পারবেন না। মেজকাকাকে মাঝে-মাঝে বলি, চলো না কলকাতায় আমার সঙ্গে; তিনি চার হাত-পা এগিয়ে উন্মুখ' কিন্তু পিসিমা কিছুতেই দেশের ভিটে ছাড়বেন না।

অতএব আমাকেও থাকতে হয়। গত চার-পাঁচ বছর অবিশ্যি দেশের বাড়িতে অনেক লোকজন ছিল, মেজকাকা-পিসিমার জন্য ভাবনা ছিল না; কাজেই নির্ভাবনায় কলকাতায় প্রায়ই যেতে পারতাম। গিয়ে এক-এক সময় অনেকদিন থেকেছি।

চাকরির মর্মান্তিক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুই হয় নি। কাজেই কলকাতায় যাওয়ার চাড় আমারও ঢের কমে গেছে।

জানলার পাশে অবাক হয়ে ফাল্গুনের দুপুরবেলা এক-একদিন তবুও ভাবিঃ নাঃ, কলকাতায় না গেলে চলেই-বা কী করে। মেজকাকা, পিসিমার জন্য নিজেকে এখানে আটকে রাখব কতদিন আমি? কেন, মেজকাকা কি পুরুষমানুষ নন?

কলকাতায় আজকালই চলে যাব আমি। না হলে ভবিষ্যৎটা মাটি হয়ে যাবে যে। কিন্তু রাতের বেলা টেবিলের পাশে বসে চুরুট টানতে-টানতে মনে হয়, কলকাতায় গেলেই—

কতবার তো গেলাম আমি।

হ্যাঁ, এই চুরুট; ত্রিশ টাকার মধ্যে চুরুটের বরাদ্দও রয়েছে। তবে বেশি চুরুট আমার লাগে, না; চুরুট মাঝে-মাঝে বাইরের থেকেও আসে, চুরুটের দোকানে কিছু পয়সাও বাকি পড়ে থাকে বার মাস আমার।

ত্রিশ টাকায় তিনজনের বেশ চলে।

পিসিমার বাগানের তরি-তরকারি বিশেষ পাওয়া যায় না। ছাগল-গরুই শেষ করে দেয়। তিনজন মানুষ, ছাগল প্রায় ত্রিশটি। যতই সজাগ হয়ে থাকি না, অন্যমনস্কতার মুহূর্ত দিনের ভিতরে অনেকবারই আসে (আমাদের)। ছাগলগুলোর তখনই সুযোগ। সে সুযোগের একটুও অপব্যবহার করে না তারা। বাগানের চারদিকে ঘিরে বাখাড়ির বেড়া রয়েছে। বেড়া তৈরি করেছিলাম আমি আর মেজকাকা, বিশেষ পরিপাটি হয় নি তেমন। জায়গায়-জায়গায় ছাগলগুলো বেশ ফাঁক করে নিয়েছে; নেহাত মোটা ধাড়িগুলো মাঝে-মাঝে ঢুকতে যদিও কষ্ট পায়, মাঝারি ও বাচ্চা ছাগলগুলোর দিনরাত অবাধ গতি। ভেল্কির মত যাওয়া-আসা।

এর মধ্যে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশটা ছাগলই ডঃ হরিনাথ বিশ্বাস-এব; হোমিওপ্যাথির ডাক্তার অবিশ্যি। কিন্তু তবুও বিনা ভিজিটের ডাক্তারও বটেন। অভিজ্ঞ মানুষ, চাহিদা আছে; আমাদের কাছ থেকে ভিজিটও নেন না; কাজেই ছাগলগুলোকে কিছু বলতে পারা যায় না। এক-একদিন মেজকাকা এক-একটা বাখাড়ি নিয়ে পালসুদ্ধ তাড়া করেন। কিন্তু অদূরে খিড়কির পুকুবের ওপাবে হবিনাথবাবুর স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকেন। কাজেই নিরস্ত হতে হয়। আমরা দুজনে লজ্জাও পাই বড্ড; হরিনাথবাবুর ফাইলকে ফাইল দাম এখনও বাকি ফেলে রেখেছি।

পিসিমা বলেন ছাগলেই যখন সব খায়—খাক, তখন আমাদের খেয়ে আর দরকার কি? পাড়ায়ই বিলিয়ে দেওয়া যাক।

মেজকাকার একটু আপত্তি; আমি উদাসীন: পিসিমার আগ্রহ পাড়াব মানুষদেব জন্য।

মাঝারিগোছের একটি ধামা বেগুন, কাঁচালঙ্কা, বুড়ো লাউ ও নিম শাকে ভরে তিনি পাড়ায়-পাড়ায় দিয়ে আসেন।

দিয়ে এলেন হরিনাথের গিন্নিকেও। বললেন, 'সময-অসময়ে হাতেব কাছের ডাক্তাব বলতে তো হরিনাথই রয়েছে।' শুনে মেজকাকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তার মুখেব দিকে তাকিয়ে মনে হয়-অনেক কথাই মনে হয়।

পিসিমার তরিতরকারির ইতিহাস এই রকম। দাদার কাছ থেকে ত্রিশটা টাকা মেজকাকার নামেই আসে। এক-আধদিন আমি বাজার করতে চাই, কিন্তু মেজকাকা নিজেই বাজাব করতে ভলবাসেন; বলেন, যাই, সকালটা বাজারেই যাই। একটু ঘুরে-ঘুরে আসি গিয়ে—না হলে সারা দিন-মাস কাটেই-বা কী করে?

তা ঠিক। সময় মেজকাকার কাছে একটা সমস্যাব মত, সকালবেলা বাজাবেব দু-তিন ঘণ্টাব আমোদ তাই তিনি ছাড়তে চান না। দু-তিন ঘণ্টাই লেগে যায। আলুর আড়তে বসে অনেক্ষণ আড্ডা দেন, বেনেব দোকানে হুঁকো হাতে চাটে ডুবে পড়েন। বাজাবে উপস্থিত ভদ্রলোকদের সঙ্গেও নানা রকম ইযার্কি-ফক্কড়ি কথা চলে। মাছের হাটের চামসে গন্ধ গিলে-গিলে দু-তিনটা বিড়ি পুড়িয়ে তার পব মাছ কেনা হয়।

বাজারের জিনিস ধুযেকুটে রান্না শেষ করে পিসিমা যখন আমাদেব খেতে ডাক দেন, দেখে সেই পুঁইশাকের চচ্চড়ি, কুচো চিংড়ির ঘ্যাঁট, কোনদিন মাসকলাইযের ডাল আছে, কোনোদিন নেই। মেজকাককাকে বলিঃ আজও বুঝি সেই একই বকম বাজাব করলে।

—রুইমাছ একটা দেড়টাকা চাইল।

—তার পর?

—দশ আনায় নাবিযেছিলাম।

—হুঁ?

—বরফ দেওয়া মাছ, জারুল কাঠেব মত খেতে, পযসা দিয়ে কাঠ কেউ চিবোয? দূর।

—তা চিবোয় না বটে কিন্তু বরফ দেওয়া মাছের রেওযাজ তো এ মুল্লুকে নেই মেজকাকা, বরফই-বা মিলবে কোত্থেকে?

—মেলে না?

—ববফ? দশ-বাব মাইলেব মধ্যে নেই।

—তুই জানিস ভারি। বোজ ভূতোষবাবুবা সোডা ববফ খায।

—সে ববফ নয—হুইস্কি।

—হুইস্কি নয, ববফ।

—আমি জানি, হুইস্কি।

—ভূতোষবাবু খাচ্ছেন না কি?

—না, এমনি একটু-আধটু শখ কবে খায।

—যাকগে, মাছটা আমি কিনলাম না।

—সোডা, লেমনেড, শববতেব আন্দাজ ববফ আসতে পাবে এখানে, কিন্তু ববফ দিযে মাছ—তবকাবি জিইযে বাখবাব ব্যবসা এখনো শুরু হয নি এখানে।

—ববফ না দেয, নাকে দড়ি দিযেছে—নাকেব দড়ি মাছে বড় চামসে গন্ধ, বসনু পেঁযাজেব পাহাড় ফুঁড়ে বেবয—খেযেছ নাকে দড়ি মাছ কোনো বাড়ি?'

—না।

—না, খেও না। ঢেকুবে ঢেকুবে গঙ্গাপ্রাপ্তি হযে যাবে, খেলে। আনলাম না তাই। নইলে দশআনা পযসা এমন আব কী।

খাওযাব থেকে উঠি।

পিসিমাকে বলি—গবম মশলা, ঘি ছিল?

—সে তো প্রায বছবখানেক ধবে নেই।

—তা হলে আব কপি কিনে আনলে কী লাভ হত।

পিসিমা—না, কপি না এনে মেজদা ভালই কবেছেন। পযসা পিণ্ডি শুধু।

আধ সেব, কি তিন পো, দুধ পিসিমাব জন্য থাকে। বাকি এক পো দিযে চা হয। দুবেলাই চা হয। চা আমাদেব দুজনেব জীবনেব একটা মাবাত্মক অসংযম—যাদবদেব মদ খাওযাব মত ঠিক নয, অশ্বত্থামাব দুধ খাওযাব মত। পযসাকড়িব নানাবকম অনটনেব মধ্যেও মধুবতা আমবা কেউই কাটিযে উঠতে পাবলাম না, যদিও শুকনো কবমচা পাতাব গুঁড়োব মত চা, চুনেব জলেব মত দুধ আব আখিগুড়ে তা তৈবি হয।

আমাদেব তিনজনেব সবচেযে ঘনিষ্ঠতা খাবাব সময। বাকি সময আমবা যে যাব অভিরুচি নিযে সবে থাকি। পিসিমা নাকেব ডগায চশমা ঝুলিযে চিঠি লেখেন, ইংবেজি অক্ষব ও বানান লেখেন, উপন্যাস-গল্পেব হুদ্দাব [?] বাইবে যত বাংলা বই পাওযা যায পড়েন, আমচূব তৈবি কবেন, জিবে সর্ষে তিল বোদে শুকোতে দেন, বঁটিতে তেতুল কাটেন, মাঝে-মাঝে একটা কঞ্চি নিযে ছাগল-গরুব পিছনে সমস্ত উঠোন ঘুবে বেড়ান, এক-একবাব বোযাকে দশ-পনেব মিনিটেব জন্য মুখ হাঁ কবে ঘুমিযে থাকেন, হঠাৎ ধড়মড় কবে উঠে বসে চাবদিকে তাকিযে নিযে দিনেব নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেব কোনো একটা শুরু কবেন। ইংবেজি অক্ষবগুলো শ্লেটে এঁকে-এঁকে শিখতে হয, হযত ইংবেজি বানানগুলো আযত্ত কববাব চেষ্টাই চলে। মোটা পঞ্জিকাখানা নিযে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া-তাব পব মস্ত বড় লতাপাকুড়ব গাছটাব বিবাট ডালপালাব দিকে তাকিযে চুপচাপ। দক্ষিণেব ঘবে মেজকাকাব নাক-ডাকাব শব্দে দুপুববেলা আমি ঘুমুতে পাবি না।

পুবেব জানলাব কাছে জারুলকাঠেব চেযাবে চুপচাপ বসে থাকি। সামনে সমস্ত টেবিল জুড়ে কোথাও কিচ্ছু নেই, এক কোণে একটা দোযাত আব কলম।

লিখতে ইচ্ছা কবে।

কী লিখব? গল্প?

তা লিখতে পাবা যায, শুরু কবলেই তো হয, নিস্তব্ধ বৌদ্র গনগন দুপুব। কাকা নাক ডাকাচ্ছেন। পিসিমা হযত শিবিষ গাছেব পাতাগুলোব দিকে তাকিযে কিংবা এতক্ষণে ঘুমিযে পড়েছেন হযত। ঝিঁঝি ডাকছে, ঝুঁটি মাথায একটা কাঠঠোকবা উড়ে এসে কৃষ্ণচূড়াব ছাল ঠোকবাচ্ছে।

সোঁদাল গাছেব ডালে একটা কৃষ্ণ গোকুলি।

এই বকম কবে আবম্ভ কবা যাক—কিন্তু লিখতে গেলে কাগজেব দবকাব। শোভনাব ঘবে, মা-ব

ঘরে, আমার বাক্স-দেরাজে কাগজের জন্য খোঁজাখুঁজি করতে থাকি, ধুলো ময়লা ওড়ে, টিকটিকি গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, মাথার চুলে ঝুল উড়ে এসে পড়ে, চোখে-মুখে হাতে-পিঠে সাপের মত মাকড়সার জাল আটকে বসে। ছাড়াতে যাওয়া এক হ্যাঙ্গাম। সময় কেটে যায়। কাগজ কোথাও নেই, কেমন ক্লান্তি।

হাত-পা ছেড়ে চুপচাপ বসি, খানিকক্ষণ গেল। মনের সুন্দর ভাবটা কেমন নষ্ট হয়ে গেল। খাটে গিয়ে নির্জীবের মত শুয়ে পড়ি। মিনিট পাঁচেক পরে উঠে গিয়ে মা-র ধোপার হিসাবের খাতাটা নিয়ে এলাম। শাদা পাঁচ পৃষ্ঠা আছে বাকি সব লেখা। কিন্তু ঐ পাঁচ পৃষ্ঠায় গল্প হয় না। একটা কবিতা অবধি শেষ হয়ে ওঠে কি না সন্দেহ।

দেরাজের থেকে দুটো পয়সা বের করে স্যান্ডেলে পা ঢুকিয়ে ব্রজেনের দোকানে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াই। এমন নচ্ছার পাড়া যে আধমাইলের মধ্যে একটা দোকান নেই। তার পর ব্রজেন মুন্সির মুদির দোকানটা।

ব্রজেনের দোকান থেকে এক দিস্তা কাগজ এনে টেবিলের ওপর রেখে একটু নিস্তার পাওয়া যায়। একটা গল্প এ কাগজে হবে নিশ্চযই। তার পর আরো গল্প লিখবার ইচ্ছা যদি হয়, সময মত, কাগজ আনা যাবে।

মিনিট দশেক জিরিযে নিলাম।—এক গ্লাশ জলেব দরকার। শোভনাব ঘরে কাচের গ্লাশ আছে। ধুয়ে-পাখলে এক গ্লাশ জল খাওয়া গেল। আর এক গ্লাশ ভবে এনে টেবিলের ওপর রাখলাম—

কাছেই নস্যির কৌটোকা—পাশে একটা চুরুট আর দেশলাই, ব্যাস। এখন গল্প শুরু কবে দিলেই হয়।

কলমটা হাতে তুলে নেই—

গল্প লিখবার ঘণ্টা—মুহূর্তগুলো মানুষের জীবনের খুব একটা সুন্দর উৎসর্জনের জিনিস বলে মনে হয়। মানুষ ভাত খেয়ে বাঁচে না শুধু। সে পুঁইশাকের চচ্চড়ি ও কুচো চিংড়ির ঘণ্ট খেতে পারে, কিন্তু চিন্তা ও কল্পনা তবুও তার। পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ আবিষ্কার কবতে পারে, অদৃশ্য সমুদ্রের শব্দ শুনতে পারে, ভোরের রাঙা সূর্যে অর্ধনারীশ্বরের ভযাবহ সুন্দব রূপ দেখতে পারে। চাই উপলব্ধি ও কল্পনার গভীরতা ও সাহস; ভাবতে-ভাবতে জানলার ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিযে বইলাম, বাতাসের ভিতর খেজুরের ছড়ি নড়ে, মাদারের ডালপালা মর্মর করে ওঠে, প্রজাপতিগুলো ওড়াওড়ি করতে থাকে।

কই, গল্প লিখছি না তো।

কাগজগুলো সাজিয়ে ঠিক করে নিই। কলমটার দিকে তাকিযে দেখি নিবের কালি শুকিযে গেছে, অনেক বাংলা গল্প অনেক জাযগায তো পড়েছি; গল্পটা আমার সে সমস্ত গল্পেব কোনো একটির মত হবে না কি? হয়ত কোনো মাসিক পত্রিকায় ছাপানো হবে। কেউ পড়বে, কেউ পড়বে না। যারা পড়বে, তাবাও দুদণ্ড পরেই ভুলে যাবে। মানুষ তার দৈনন্দিন দিনেব পব দিনেব জীবনে যে-সব সাধাবণ খুঁটিনাটি চিন্তা ও ভাবের সংঘাতে আসে এই গল্পটিকেও সে সবের ভিতবে অবাধ মটরের খেতের একটি খেতস্থ মটর বলে মনে হবে হযত। এই শুধু, এই মাত্র আর কিছু নয়! তাবা হৃদয নিযে গুরুতর আঘাত করে না, মানুষের ভাবুকতা বাতাসে আগুনের মত দু-মুহূর্তের জন্য চলকায় শুধু। তার জীবন ব্যবসাকে সে রৌদ্ররক্তের পথ থেকে ডেকে নিযে কোনো ধূসর বিকেলের ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কের দেশে চিরকালের জন্য জন্য হারিযে রাখতে পারে না।

যাক—গল্পটা যদি একটা সুন্দর জিনিস হয—ভাল লাগে যদি আমার—সাবাদিন গল্পটা লিখতে গিযে যদি এই দীন গ্রন্থিমাংসের পুনরুক্তি ও জীবনের জীর্ণশীর্ণ পুরনো বিষণ্নতাব ও মূল্যবোধেব হাত থেকে নিস্তার পেযে দূরে কোথাও চলে যেতে পাবি তা হলে আমাব কাজ হবে।

কলমটা টেবিলের থেকে তুলে নিলাম।

সঙ্গে-সঙ্গেই নির্মল এসে হাজির।

—কী হে, তোমাকে তো অনেকদিন দেখি না; খবর কি?

তাকিয়ে দেখলাম, তার মুখ গেছে পুড়ে, ঘামে ঘর্মাক্ত; রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে সে হাঁপিযে একেবারে খাটের উপর বসে পড়ল। নিজের শার্টের কানাত দিযে বাতাস খেতে-খেতে—সাইকেলটা চুরি যাবে না তো?

—না, সাইকেলে করে এলে বুঝি?

—ঐ অশ্বত্থ গাছটাব গায ঠেস দিযে বেখে এসেছি; একটু চাবি দিযে এলে হত।

—না, কেউ নেবে না।

—তোমাব এই জানলা দিযে সাইকেলটাকে দেখছ তো?'

তাকিযে বললাম-হ্যাঁ।

—একটু নজব বেখো। সেই ছেলেটা মাবা গেছে।

—কোন ছেলে?

—সেই অবনী?

একটু চুপচাপ থেকে—ঐ যে গীতাব টীকা লিখত?

—হ্যাঁ।

—সন্ন্যাসী হবে বলেছিল?

—রুচি বদলাচ্ছিল।

—কী বকম?

—চাকবি খুঁজছিল।

—তাই না কি?

—কে সন্ন্যাসী হতে যায' জীবন মুলোখেতেব মুলো নযত।

সে একটু গলা খাখবে—একবাব মবে গেলে বেঁচেও তো উঠতে পাবা যায না।

—তা ঠিক।

—মিছিমিছি সন্ন্যাসী হযে এঁটুলিব মত বেঁচে থেকে কী লাভ?

—কুকুবেব গাযেব এঁটুলি যে।

—হ্যাঁ, কুকুবেব গলায ছাড়া আবাব এঁটুলি কোথায?

—শেষ পর্যন্ত এইসব বুঝেছিল বোধ কবি অবনী?

—হ্যাঁ, গেরুযা কাপড় ছাড়ল, চুল বাব আনি-চাব আনি ছাঁটত, দুবেলা সাবান মেখে স্নান, দিনে দুবাক্স সিগাবেট; মানুষেব মত হযে উঠেছিল। বাজবাজড়াব মত চেহাবা নিযে পৃথিবীতে এসেছে—কেন কুকুব-বিড়ালেব মত কাটিযে যাবে।

—কে? অবনী? হ্যাঁ বেশ ছিল দেখতে।

—মনেব ঐশ্বর্যও কতখানি তাব পবিচয তুমি বোধ হয পাও নি, কিন্তু ওব নিকট ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাবা এসেছে তাবা তো সব জানে' একটা সিগাবেট বেব কবে—জীবনেব এই বকম আদিধাতু, মাঠে সন্ন্যাস নিযে, শুকিযে মবল না যে তাই ভেবে আমবা আশ্বস্ত হচ্ছিলাম। দেশলাই আছে?

দেবাজেব থেকে দেশলাই বাব কবে দিলাম।

—দবকাব ছিল একটি নাবী।

—তা পায নি বুঝি?

—পেযেছিল—পাবে না কেন? অবনীব মত মানুষ যদি না পায তা হলে নাবীপুরুষেব সৃষ্টি, প্রেম ও লাবণ্যেব কোনো কৈফিযত থাকে না পৃথিবীতে, থাকে স্বামী আব স্ত্রীব শুধু। আব তাব কচ্ছপেব মত কদর্যতা; সৌন্দর্য থাকে না। কবিত্ব থাকে না, বিচ্ছেদ থাকে না।

একটু চুপ থেকে—মেযেটি কে?

—হাবানি।

—কোন হাবানি?

—হাবানিকে তুমি চেন না হযত।

একটু চুপ থেকে ভেবে—একটি ছিপছিপে সুন্দব খুকিকে মনে পড়ে, প্রায দশ বছব আগে দেখেছিলাম, তখন তাব বযস সাত কি আট।

—তা হবে, হাবানিব বযস এখন ১৮।

—চৌধুবীদেব মেযে?

—হ্যাঁ।

একটু হেসে—কী আশ্চর্য, সেই খুকি এমন মহিলাবত্ন?

—শুধু কি তাই, মানুষের জীবনের রঙ পর্যন্ত বদলে দেয়।

—হ্যাঁ-তাই তো দেখছি।

—অবনীকে সন্ন্যাস থেকে সেই তো বাঁচাল। বিধাতা যে-সব বিশেষ জীবন রচনা করে হৃদয়ানুরঞ্জন বোধ করেছে এরা সেই সব নিয়ে খেলা করে, ভাঙে, গড়ে।

নির্মল—বাস্তবিক, ভেবে যদি দেখ, ভগবানের চেয়ে এদের কাজ একটুও কম, বিচিত্র, ইনটারেস্টিং নয়।

—আমাদের এই জামরুলতলায় ঠিক দুপুরবেলা আসত; খচমচ করে পাতার শব্দ হত। দেখতাম, মেয়েটি,দশ বছর আগের কথা—মনে হয় যেন কালো হয়ে গেছে সব। বাপ রে, হারানির বয়স এখন ১৮ বছর হল?

—হ্যাঁ, সতের-আঠার।

—ঐ যে মাদার গাছ দুটো দেখছ, ওর পিছনে টিনের ঘরটা, ঐখানে থাকত।

—ঐ টিনের ঘরটা? তা হলে তো খুব কাছাকাছি ছিলে; হারানিকে চিনবার বিস্তর সৌভাগ্য ঘটেছিল তোমার, বেশ ভাগ্যবান তুমি!

একটু চুপ থেকে—হুঁ, বেশ ছিল মেয়েটি।

—দেহের সৌন্দর্য ঢের।

—শুধু সুন্দরী বলেই তো নয়, ভিতরের কতদূর কারুকার্য মাখা—জয়পুরী শাড়ির মত।

—ডেকে আমি কোনোদিন আলাপ করে দেখি নি অবিশ্যি।

—তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি?

—খুব।

—দুপুরবেলা এই জানালার পাশে টেবিলের কাছে বসে লেখাপড়া করছি হঠাৎ জামরুলের ডালপালার ভিতর ছড়ছড় করে উঠত একটা পাটকেল, তাকিয়ে দেখতাম, হারানি এসেছে। কলমটা আস্তে-আস্তে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম।যতক্ষণ সে মাঠে থাকবে, যতক্ষণ তার শাড়ির পাড়টা অব্দি দেখা যায় ততক্ষণ মনঃসংযোগ করে লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। জামরুল তলা ছেড়ে নোনা গাছটার দিকে হারানি এগিয়ে আসত। একটা-একটা করে পাকা নোনা ছিঁড়তে কোনো দ্বিধা নেই তার। হঠাৎ একবার জানলার দিকে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেত। এক-আধ মুহূর্ত ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে-দাড়িয়ে নখ খুঁড়ত। তার পরেই এক-একটা করে নোনা ছিঁড়তে আরম্ভ করত আবার। এক-এক ফাঁকে মুখ তুলে চেয়ে দেখত, আমি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। মুখ টিপে মুচকি হেসেই হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে ঘাড় ফেরাত; কী যে গম্ভীর, কী যে গম্ভীর। অন্ধকার রাতে সুদূর একাকী সুমাত্রার সমুদ্রের মত—তার পর হারিয়ে যেত। দুঃখের রাতে অন্তর্হিত বিশালাক্ষীর মত। আমাদের পরিচয় এই রকম।

চরুরটটা টেবিলের থেকে কুড়িয়ে নিলাম।

নির্মল—কথাবার্তা হয় নি কিছু?

—হারানির সঙ্গে? না। এ কেমন বল দেখি?

চুরুটটা টেবিলের ওপর গড়িয়ে ছেড়ে দিয়ে—ঐ মুখ টিপে হাসাহাসি পর্যন্ত। তা অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শেষ পর্যন্ত যে চামসে গাজন রসিয়ে ওঠে তার চেয়ে এ ঢের ভাল ছিল। অনেক সময় মনে হয়, সেই নোনা গাছটাও নেই, সেই হারানিও নেই, জীবনের সেই বিড়ম্বনাহীন দিনগুলোও নেই এখন আর। সম্পূর্ণ অতীতের জিনিস এখন, ভবিষ্যতের জন্য রয়েছে। বিলেতি দার্শনিকের সেই থিওরি—যা বলে অতীত-ভবিষ্যৎ বলে কোনো জিনিস নেই, সমস্ত বর্তমান। হ্যাঁ; বললেই হল। চুলোয় যাক। স্মৃতি তো কল্পনার সম্বল। হারানি করছে কী এখন?

—বি-এ পাশ করেছে।

—হুঁ! সেই বি-এ পাশ করল? চাপলি মাছের মত সুন্দর মুখখানা গেল...ঘানিতে? কোথায় আছে, এখানেই? সেই কোতয়ালি থানার পাশে তাদের বাসা। একটা একতলা দালান তৈরি করেছিল, প্রায় ছ-সাত আগের কথা। সে দিকে অনেকদিন যাওয়া পড়ে না।

—না, এখানে তারা নেই কেউ এখন।

—কোথায় তবে?

—কলকাতায়।

—কী করছে?

—ট্রেনিং পড়ে, পড়ছিল; বি-টি।

—বিয়ে হয় নি?

—না, করে নি।

—টিচাবি করবে বুঝি।

—তা করতে পারে।

—হারানিদের টাকাকড়ি তো বেশ ছিল।

—হ্যাঁ, অবস্থা ভাল।

—বিলেতে যাবে?

—কী যে বল তুমি? তাব যে-রকম মনের অবস্থা তাতে বেঁচে থাকটাই একটা সমস্যার ব্যাপার।

—এই রকম না কি? বেশ সুন্দর তো তা হলে তার আত্মসমর্পণ। মূল্যবান ধাতু এই বকম ভাবেই নিজেকে সমর্পিত করে।

সে আর-একটা সিগাবেট জ্বালিযে বলল—তা হবে। আমার অবিশ্যি মতভেদ ছিল। একটু চুপ থেকে—অবনী কিসে মাবা গেল?

—ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেবিযা না, কী যেন। ডাক্তাবরা ঠিক ধবতে পারে নি।

—কলকাতাযই তো ছিল সে?

—হ্যাঁ এই ছ-সাত মাস ধবে কলকাতায়।

—তুমিও কি কলকাতাব থেকে এলে?

—হ্যাঁ, এই চাব মাস কলকাতায় ছিলাম।

—এদ্দিন কী করছিলে সেখানে?

—এই রুগীকে নিযেই ছিলাম—প্রায় সাত-আট জন আমরা।

—তাহলে তাব তো কেউ ছিলও না।

—অশথের মতন অতবড় একটা গাছেবই-বা আব কে সহায-সুহৃৎ থাকে মাটির বসাযন ছাড়া। হারানিও আবক্ষ পৃথিবীব রস। অবনীকে সে এসে ধবল যখন তখন তিনদিন তিন বাত জেগে চারদিনের দিন আমাদের আর উঠতে হয না। কিন্তু এই মেযেটি সাত মাস ধবে দিনবাত কী যে সেবা কবল। দেখলে কাঠ হযে যেতে হয, পাথর হযে যেতে হয।

—অবনী হাসপাতালে গেল না কেন?

—কী যে বল তুমি? হাসপাতালে আমি থাকতে পারি। কিংবা তুমি। আমরা সামান্য মানুষ, দাম্পত্যজীবনের একটা কব্জা মাত্র; মানুষও নই হযত, আমাদেব একমাত্র সহায আমাদের নিজেদেব হাতের টাকা বা চাকরি। অবনীর মা ছিল না, বাপ ছিল না, টাকা ছিল না, শুধু মেদিনীরসের আশ্রয় পেযে জীবনটা ওর রাজত্ব করে গেছে।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। চুরুট টানছিলাম।

যেখানে নিবিড় নোনা গাছটা ছিল—দশ বছর আগে—সে দিকে নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। গাছটা নিশ্চিহ্ন; জায়গাটা সবুজ ঘাসে ঢেকে গেছে; তাব ওপর ডুমুরের কতকগুলো বড়-বড় হলদে পাতা ছড়িয়ে আছে। দুপুরেব বাতাস বড় উদাস, পল্লবে-পল্লবে উচ্ছিত হযে ওঠে দশ বছর পনের বছর বিশ বছরের আগের কথা মনে পড়ে। জীবনটা স্মৃতি হতে চায়। অভিজ্ঞতা অনেক হযেছে। অনেক বুঝেছি। শিখেছি। এখন একটু চুপচাপ বসে থেকে অতীতের কড়ির বাক্সে আর হাড়ের পাহাড় নিয়ে খেলা কবতে ভাল লাগে; যেন কোন প্রেতের দেশ থেকে ভেসে আসছে সব কিন্তু তবুও কেমন যে অনুপম।

—অবনী চৌধুরীদের বাড়িতেই রইল এ সাত মাস?

—হ্যাঁ।

—চৌধুরীমশাই ছিলেন?

—ছিলেন; তার গিন্নিও।

—তারা বড় কঠিন মানুষ।

নির্মল তার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বললে—নোংরাও, উঠানের পুরানো তালের আঁটির মত; কিন্তু মেয়েটি তালের শাঁসের মত মোলায়েম মিষ্টি।

—শুধু দাক্ষিণ্যমমতা নয় কিন্তু কি করে তা চরিতার্থ করতে হয় তার চারুকলাও সে জানে। তেতলার সবচেয়ে সুন্দর নিরিবিলি ঘরে অবনী থাকার জায়গা পেল; দিব্যি আলো-বাতাস রোদ-নীরবতা।

নির্মল একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে—অবনীকে চেঞ্জেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে।

—তারপর?

—না, অবনী গেল না। প্রেম তার অর্ধনারীশ্বরেব ঈশ্বরের মতই বটে, মোক্ষম, কিন্তু তবুও খুব সমীচীন।

নির্মল সিগারেটে একটা টান দিয়ে—এত সমীচীন যে হারানি ব্যথা পেত।

—তাই নাকি?

—প্রেমে চাই নিজেকে উন্মোচন, বেলার কাছে সমুদের মত আত্মোৎসর্জন। মেয়েটি তাই দিয়েছিল। কিন্তু ছেলেটির, যা বললাম তোমাকে-হযত তার অসুখ, হযত তার সন্ন্যাসেব শেষ ফুলকি, হযত তাব মনের কাঠামো তাকে শুশুকের মত প্রবল সমুদ্রের জীব করে তুলতে পারে নি। দড়ি ছেঁড়া স্বৈরিণীও তাই সে হতে পারে বা, না হতে পারল জাহাবাজ প্রেমিক।

চুপ করেছিলাম।

—একটা জিনিস এদের দুজনের আমার বেশ ভাল লাগত।

—কী?

—এক-এক সময় দেখতাম অবনীর সমস্ত গাল দাড়িতে ভরে গিয়েছে, বললেই আমরা কামিয়ে দেই। কিন্তু সেদিকে কোনো লক্ষ্যই নেই তার। রুক্ষ জটাব মত মাথার চুল—ওদিকে একহাবা লম্বা সুন্দর, সুশ্রী হারানি। এদেব দুজনকে নাযক-নাযিকা বলে মনে হচ্ছে না আর; অবনী যেন জীর্ণ অসুস্থ পিতা। হারানি যেন নিবেদিত অনুপম কন্যা। উপলব্ধি করে দেখতে গেলে নরনারীর প্রেমের ভিতব এমনি কত যে বিচিত্রতা বেরিয়ে পড়ে। প্রেমের স্বপ্ন ও কুহকের চেয়ে তার দীনতা, দযা অশ্রুব দাম ঢেব বড় হয়ে ওঠে।

একটু চুপ থেকে বললাম—তোমার স্ত্রীব খবর কি?

—কলকাতায় আছে।

—কদ্দিন থেকে?

—প্রায় দেড় বছর।

—কোথায় থাকে কলকাতায?

—আমার অবিশ্যি শ্বশুব-শাশুড়ি মরে গিয়েছেন অনেক দিন। বৌ তার বিধবা মাসির কাছে থাকে। শ্যামবাজারে। মাসিব ঢের টাকা।

—এবার বৌকে আনলে না যে? দেড় বছব তো রইল কলকাতায। মাসি আরো বাখতে চান না কি?

—না!

—তবে?

—এনে কী লাভ।

—কেন?

—বড্ড অসুখে ভুগছে।

—কী অসুখ?

—কোথায় একটা টিউমার না কী হয়েছে।

নির্মল বিকৃত মুখে জানলার দিকে তাকিয়ে রইল।

—কোথায় টিউমার হয়েছে, পেটে?

—হ্যাঁ পেটেই তো, আবার হবে কোথায়?

সিগারেটে একটান দিয়ে—নড়তে পারে না, চড়তে পারে না, রাবিশ!

—তাহলে তাকে এ-বকম অবস্থায কলকাতায ফেলে তুমি যে চলে এলে?

—একটা বিকশায কবে একদিন মেডিক্যাল কলেজে নিযে গিযেছিলাম।

—তাবপব?

—ডাক্তাব দেখে বললে, অপাবেশন কবাতে পাবা যায।

—তা অপাবেশন কবালেই তো পাবতে।

নির্মল মাথা নেড়ে—ডাক্তাব বললে অপাবেশন কবলেও বাঁচবে না, না কবলেও বাঁচবে না। আট দশ দিনেব মধ্যেই মাবা যাবে।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে—তা তাব মববাব আগে তুমি একবাব কলকাতায যাবে না?

—ন-না।

মাটিব ওপবকাব জ্বলন্ত সিগাবেটেব টুকবোটা জুতো পা দিযে পিষতে-পিষতে-সাইকেল আছে তো অশ্বত্থ গাছেব গায, যা হাওযা দিযেছে?

—আছে।

—যাই এবাব।

মাথাব পাতলা লম্বা চুল দুহাত দিযে সাজাতে-সাজাতে নির্মল দাঁড়াল।

—কোথায চললে?

—এই ঘুবি আব কি? বিপত্নীকেব জীবন। আচ্ছা, শালী মববে যখন টিউমাবটা পোড়াতে কতক্ষণ সময লাগবে বলতে পাবো?

সিগাবেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিযে—চুলোয যাক। বলে দাঁত মুখ খিঁচে হেসে উঠল।

—কলকাতায আমি তোমাব যাচ্ছি নে। যাব গবজ পোড়াক গে, না হয হাড়িডোমে টেনে নিক। তাই নেবে শেষ পর্যন্ত। পিসিটা একটা চামাব, কে যাবে মবা পোড়াতে ওব বাড়ি।

—তা হলে তোমাব নিতান্তই কলকাতায যাওযা উচিত যে।

নির্মল পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বাব কবে—এই তো পবশু দুপুবে এসেছে টেলিগ্রাম, পবশু সকালেই মবেছে।

—কে? তোমাব বৌ?

—হ্যাঁ শুকনিটা গেছে, পোড়াবাব লোক পাচ্ছে না—তাই আমাকে খিঁচে টেলি।

কলম বেখে দেই। কী লিখব। গোধূলিব বিষণ্ন সুন্দব মাঠেব পথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ভাঙা শামুকেব বিষম কামড় খেযে থমকে যেতে হয যেন। কী লিখব। জীবনেব বিপুলব্যঙ্গ এসে আমাব সমস্ত গল্পেব পবিকল্পনাকে আঘাত দিযে যায।

সবুজ পল্লবিত জারুলেব ঐশ্বর্য, হেলিওট্রোপ বঙেব ফুল, মেহেদি পাতাব বনে স্বপ্নাতুব ঝিঁঝি, ছাতিমেব ডালপালায গাঙশালিকগুলোব জীবনোচ্ছ্বাস, কৃষ্ণচূড়াব অজস্র কুঁড়ি, হাবানিব প্রেম, চাবদিককাব সফল, প্রচুব, সজীব জীবনেব কালীদহ কলবব কিছুই আমাকে সাহায্য কবতে পাবে না।

অনেক দিন আগেব একটা বাতেব কথা মনে পড়ল। শোভনাব সঙ্গে সেই আমাব শেষ বাত। সেদিনই ভোব বাত সাড়ে পাঁচটাব সময সে বাপেব বাড়ি যাবাব জন্য স্টিমাব চড়ল।

চোখ তুলে বললাম—'আমি চেষ্টা করব।'

—'না চেষ্টাফেষ্টা নয়, আপনাকে যেতেই হবে।'

—'আমি তো গানও গাইতে পারি না, হাসিতামাশা মজলিশেও দক্ষ নই, তোমাদের সম্মিলনীতে গিয়ে—' মুখে একটা বিশুষ্ক কথা এসেছিল, নিজেকে দমন করে চুপ করে বইলাম।

তিনকড়ি বললে—'আপনি যাবেনই, কটার সময় মোটর পাঠাব?'

—'মোটরও পাঠাও নাকি?'

—'তা পাঠাব না, হ্যারিসন রোড থেকে বেহালা অব্দি হেঁটে যাবেন নাকি? বেশ তো বিচাব আপনার?'

—'হেঁটে কেউ যা না, ট্রামই তো ছিল।'

তিনকড়ি মাথা নেড়ে বললে—'পাঁচ-সাতটা মোটর জোগাড় করেছি এই উপলক্ষে। আমাদেব নিজেদের দুটো। এ পাড়ার থেকে আরো তিন-চাব জন যাবেন।'

—'তোমাদের মজলিশে?'

—'ভয় নেই, মেয়েমানুষ নয়, আপনার মতনই পুরুষ, ইয়ংম্যান সব।' তিনকড়ি—'একটা [...] বড়ি পাঠিয়ে দেব। ধরুন পাঁচটার সময়।'

চুপ করেছিলাম।

—'না, একটু আগেই পাঠাব।'

—'কটার সময় মজলিশ আরম্ভ হবে?'

—'এই গোটা সাতেক।'

—'কি হবে মজলিশে?'

—'গান হবে, সঙ্গত, হাসি-তামাশা, কথাবাতা, ব্রিজ—এই আর কি।'

—'এতে কার কি লাভ?'

তিনকড়ি এক আধ মুহূর্ত চক্ষুস্থিব কবে তাঁকিয়ে রইল। তারপব বললে—'আপনি অবিশ্যি সেই দলেব লোক নন, তা নন যে, তা আমি খুব ভালো করেই জানি।'

—'কোন দলের তিনকড়ি?'

—'এই যারা বলে পৃথিবীতে এক ধবনের মানুষ অনাহারে মরছে বলে আব এক দল মানুষেরও উপোষ করা উচিত।'

চুরুটটা টেবিলের থেকে তুলে নিয়ে—না, তা আমি বিশ্বাস করি না, সে রকম প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কি করে থাকে। বেদনা গতি সদ্‌গতি মানুষের জীবনে চিবকালই থাকবে, তাই বলে আনন্দ গ্রহণ করতে বাধা কি? ভগবান দুঃখ সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু ফাঁপব সৃষ্টি কবেননি, বিমর্ষ বীতশ্রদ্ধ মানুষেরা পুরস্কার তাহলে সবচেয়ে বেশি পেত। কিন্তু তারা নিজের মনের দুঃখেই মবে। বিমর্ষ বীতশ্রদ্ধ মানুষদের উপর কৃপা তার খুব কম। সমস্ত সুখসুবিধার ভিতরেও তাই তাদের শুকিয়ে মবতে হয়। না কবতে পারে পরের দুঃখের বেদনার কোনো সাহায্য, না পাবে নিজেদেব জীবনটা একটু সাজাতে। ঢের অভাব অশ্রু যাদের তারাও আনন্দ করতে জানে, কিন্তু পৃথিবীর বেকুব।

—'কে কে যাবে তোমাদের মজলিশে?'

—'প্রায় শতখানেক লোক হবে আন্দাজ করছি, বেশিও হতে পারে।' তিনকড়ি পকেটের থেকে পানের ডিবে বের করে খুলে টেবিলের ওপর রাখল, বললে, —'নিন।' গোটা দুই পান মুখে দিয়ে তিনকড়ি—'আমার মনে হয় শতখানেক পুরুষ আর গুটি পঞ্চাশেক মহিলার সমাবেশ হবে। জায়গা যা করেছি তাতে তিনশো লোকও এঁটে যায়, আমাদের তেতলার সেই হলঘরটা— মনে পড়ে?'

—'খুব।'

—'অনেক দিন তো যাননি।'

—'না, যাই না কোথাও বড় আজকাল আব।'

—'তা প্রাইভেট টিচাবিই কবেন?'

—'পেলে কবি। তোমাকে যে কদিন পড়িয়েছিলাম, বেশ ছিলাম তিনকড়ি।'

তিনকড়ি একটু হেসে—'ভেবেছিলাম আমাব ছোটভাইটাব জন্যও আপনাকে বলব। কিন্তু দড়ি ছেঁড়া গরুব মতো তাব ভাবগতিক। তাকে পড়িয়ে আপনাব সুখ হত না। কি যে কববেন, ভগবান জানেন।' তিনকড়ি আসন কেটে আমাব খাটেব উপব বসল। বললে—'আপনাব যাওয়াই চাই।'

একটু হাসলাম।

তিনকড়ি—'ফাকি দেযাব অভ্যাস আপনাব বড্ড বেশি। গত বছবেব ভিতব আমাদেব বাসায দশ-বাবোটা বড় বড় কাজ হয়ে গেল, আপনি দুটো কি তিনটেয গেলেন শুধু, এতে আমি কিবকম আঘাত পাই, তা কি বোঝেন না?' তিনকড়ি বললে—'আমাব জীবনেব লাভক্ষতিব ছকেব ভিতব আপনাব স্থান যে কিবকম পাকা জাযগায তা আমিও জানি বিধাতাও জানেন। কিন্তু আপনাকে দেখি সম্বন্ধটা বাববাব ভুলে যেতে। একি বকম?'

হাসছিলাম।

—'যা শিখেছি না শিখেছি আপনাব কাছ থেকেই। সময থাকলে এখনো ঘণ্টা দুই বোজ এসে বসতাম আপনাব কাছে।' পানেব ডিবাটা খুলে ধবে বললে—'নিন।'

নিজেও গোটা দুই আবো পান মুখে দিল তিনকড়ি। হ্যাঁ, বেশ পানগুলো। তিন বছব আগে বোজই এব দু-চাব দশটা খেতাম, তাবপব আব খেতে পাবিনি।

—'বিয়ে কবলে তো জানতেই পাবতাম।'

—'তা পাবতে বইকী।'

—'কিন্তু একদম যে বিয়ে কবলেন না, এটা কি ভালো হল?'

—মেয়ে বেছে দাও না তিনকড়ি।'

—'আপনাবা প্রেমিক মানুষ, বাছানিব মেয়েদেব সঙ্গে আপনাদেব কি সম্পর্ক।' হাসছিলাম।

—'সে সব মেযেবা আপনাবে উপলব্ধি কবতে পাববে না।'

—'কিবকম?'

—'টাকা চাইবে, সচ্ছলতা চাইবে, তাদেব কামনা বাইবেব সাংসাবিক—মানুষেব ভেতবেব জীবনটাকে তাবা অগ্রাহ্য কবে। উঠি, আপনাব সময নষ্ট কবলাম।'

—'বোসো, আমাব সময অফুবন্ত।

—'টেবিল চেযাবে বসে কি কবছিলেন?'

—'এমনিই বসে বসেছিলাম।'

—'হাতে তো একটা কলম। হ্যাঁ, সামনেও কতকগুলো কাগজ ছড়ানো বযেছে বটে। কী লিখছিলেন? নোট?'

—'না, নোট লেখা আমি ছেড়ে দিযেছি।'

—'কেন?'

—'সুবিধে পাইনে।' একটু চুপ থেকে —'একটা অ্যানুযাল বিপোর্ট লিখবাব ভাব।'

—'কিসেব?'

—'এই, একটা সমিতিব।' তিনকড়িব দিকে তাকিযে বললাম—'অবিশ্যি সে সমিতিব আমি মেম্বাব নই, তাদেব সঙ্গে আমাব কোনো সম্পর্কও নেই।'

—'তবে কি কবে লিখবেন?'

—'কাগজপত্র সব দিযে গেছে, এব থেকেই তৈবি কবে লেখা যায বেশ।'

—'কতক্ষণ সময লাগবে?'

—'এ একটা ধর্মসমাজেব বিপোর্ট, কিন্তু লিখতে লিখতে আমি অনেক অবান্তব কথা ভাবি, সাহিত্যেব, কবিতার —তিন চাবদিন সময লেগে যায তাই।'

—'এই মেসে এখনো আছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, বেশ শস্তা।'

—'চাকবি-বাকবিব কিছু সুবিধা—'

—'না, হল না কিছু তিনকড়ি।'

—'অ্যানুয়াল বিপোর্ট লিখছেন বলে কিছু দেয়?'

—'ধন্যবাদ দেয়।'

—'পযসাটযসা কিছু?'

—'তাদেবই পযসাব দবকাব। এই ছোট্ট সমিতিটুকুবও বাজেটেব ব্যাপাব, অভাব-অনটনেব একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস।'

—'টিউশন কবছেন?'

—'পাচ্ছি না তো।'

—'তাহলে চলে কি কবে?'

—'মেসেব সাত আটমাসেব টাকা আমি ফেলে বাখি। তাবপব কোনোকিছু জুটলে একসঙ্গে দিযে সেইসব—'

—'টাকাকড়িব এবকম অসংগতিব জন্যই বিযে কবছেন না নাকি?'

—'তা ভেবে নিতে পাব।'

—'কিন্তু তা হলে সে আপনাব বড্ড ভুল।'

—'কেন?'

—'আমবা নানাবকম উপলব্ধি কবি, কল্পনা কবি নানাবকমভাবে নিজেদেব ব্যস্ত বাখি। বই পড়ি, লিখি, পবিতৃপ্তি পাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সব আত্মপ্রবঞ্চনা। সমস্ত জীবন নাবীহীন হযে বেঁচে থাকবাব প্রযাস জীবন বিধাতাব দুযাবে একটা গভীব অনিযম। এবকমভাবে নিজেকে প্রতাবণা কবে কি লাভ?'

ডিবেটা টেবিলেই খোলা পড়েছিল। একটা পান তুলে মুখে দিলাম।

তিনকড়ি পকেটেব থেকে কিমামেব শিশিটা বেব কবে টেবিলেব ওপব বেখে বললে —'পানেব সঙ্গে মলিযে নিন, ভালো লাগবে। আপনাব বযস কত হল?'

—'কাব? আমাব? তেত্রিশ।'

—'আমাব চেযে বেশি বড় নন তাহলে।'

—'কত তোমাব?'

—'আটাশ।' একটা পানেব বোঁটাব মুখ দিযে খানিকটা কিমাম টেনে নিযে তিনকড়ি—'বাইশ বছবে বিযে কবেছি, চাবটি ছেলেপিলে হযেছে এই অব্দি। এখন আমাব পদে পদেই মনে হয একটি নাবীব কতবকমই যে দিক। নাবীব যে কোনো তুচ্ছ দিকেব সঙ্গেও নাবীব সঙ্গে সবদিক দিযেই অপবিচিত থেকে যাবা এ পৃথিবীতে জীবন চালায, চালাতে পাবে, চালিযে তৃপ্তি পায, তাবা হয মহাপুরুষ, না হয পশু।'

একটু হেসে—'মনেব কথা তুমি বেশ গুছিযে বলতে পাব তিনকড়ি।' হাসতে লাগলাম।

—'ঠিক আপনাব মনেব কথাও কি প্রকাশ কবিনি, যা বললাম, এই-ই কি আপনাব মনে হয না?'

—'মহাপুরুষ আমি নই।'

—'অমানুষ নন, নাবীকেব অগ্রাহ্য কবে নিজেকে বঞ্চিত কবে, ব্যথিত কবে কি লাভ?'

—'তোমাব নিজেব দাম্পত্যজীবনটা তাহলে বেশ আশীর্বাদেব?'

—'খুব।'

—'শুনেছিলাম স্ত্রী মবে গিযেছিল।'

—'আবাব বিযে কবেছি।'

—'বেশ। তৃপ্তি পাচ্ছ?'

—'না হলে এত কথা বলতে আসতাম আপনাকে?' তিনকড়ি—'দেখুন, বইযেব কণিকা ঘেঁটে বক্তমাংসহীন প্রেমিক সেজে একবকম পুতুলখেলা আছে। তা খেলে কাবা জানেন? যাদেব জীবন মরুভূমি হযে আছে অথচ দ্বিধা নেই, অবিশ্বাস নেই, নতুন পবিকল্পনা নেই। মঙ্গল নিযন্ত্রণেব অস্পষ্টতাকে প্রশ্ন কববাব মতো সাহস নেই সেইসব অভাজন—'

শুনছিলাম।

তিনকড়ি—'ভগবানের কাছে তারা প্রেমিক,—নারীর কাছেও। অথচ নারী তাদের নামও শোনেনি কোনোদিন! এইরকম! দেয়ালের ছায়ার সঙ্গে সংসাবে কাজকর্ম আশা সফলতার যা সম্পর্ক নরনারীর ভালোবাসার সঙ্গে এইসব প্রেমিকদের সম্বন্ধও ঠিক সেইরকম। জীবনের বাইশটা বছর এরকম ছায়ার মতো কাটালাম, তারপর স্বামী-স্ত্রী বৈধ আশা-আকাঙক্ষাব তৃপ্তি, স্বাভাবিক সুশ্রী সাংসারিকতা এইসবের ভিতর দিয়ে জীবন তাব সুশ্রী বাস্তব রূপ পেযেছে।'

জীবনের এই বাস্তব সুর নিয়ে দেখলাম এ খুব তৃপ্তই, টেবিলের কলমটার দিকে একবার তাকিয়ে মনে হল দ্বিতীয় বার বিয়ে করে তিনকড়ি এই সুরেব বাস্তবতা পাকাবাব বেশ অবসব পেযেছে। বেশ। তিনকড়ির দিকে তাকিযে—

—'বেশ ভালো কথা তিনকড়ি। কিন্তু মেয়ে পাই কোথায়?'

—'সেইজন্যই আপনি বিযে করছে না?'

—'মেযে না পেলে কি করে বিযে হয।'

তিনকড়ি একটু হেসে—'মেযে পাওয়া না-পাওযাটা আপনার বাধা নয়।'

—'তবে?'

—'মেযে পেযেও আপনি বিযে করবেন না। এই আপনাব বকম।'

—'কি করে বুঝলে তুমি?'

—'বিযে তো করবেন না, মেযেদেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিলেও দ্বিতীযবার তাদেব পরিচয নিতে আপনি বিমুখ।'

চাব-পাঁচ বছর আগেব কথা মনে পড়ল। আমাকে দাম্পত্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখবাব জন্য তিনকড়ি খুব উদগ্রীব হযে পড়েছিল। কযেকটি মেযেব সঙ্গে সে আমাকে আলাপ কবিযে দিযেছিল, আমবা একত্রে চা খেযেছিলাম, কথাবার্তাও বলেছিলাম। বেশিবভাগ কথা তিনকড়িই বলেছিল। কিন্তু এ মেযেদেব একটিও মানুষের মনে বিশেষ কোনো ছাপ বাখতে পাবে না যেন। অবিশ্যি এদেব ভিতরেই একজন দু-চাবদিনেব মধ্যে তিনকড়ির দ্বিতীযপক্ষেব বধূ হল। তিনকড়ি বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। তার রুচিও খুব পাকা। কিন্তু যে কটি মেযেকে দেখেই ভুলে যেতে ইচ্ছা করে তাদের মধ্যেই একজনকে তিনকড়ি তার চিবজীবনের সাথী করল। মানুষের জীবন বড় বিচিত্র! হয়তো এই স্বাভাবিক, আমি নিজেই বিচিত্র।

সন্ধ্যার সময তিনকড়ির মজলিশে গেলাম।

তেতলাব মস্তবড় হলে লোকজন জমেছে মন্দ না। চারদিককাব গভীব আলো ও হৃদযস্পর্শী গন্ধেব মধ্যে একটা বেশ নবম কুশানে চুপচাপ বসে বেশ ভালো লাগছিল।

গান চলছিল।

ব্যস্ততা-ভিড়ের মধ্যে তিনকড়ি আমাকে ভোলেনি। এদিক-সেদিক ছুটতে ছুটতে ঝাঁ কবে আমাব কাছে এসে ঘাড় নিচু কবে কানে কানে কথা কয়, ট্রে-তে কবে পান আর চুরুট দিযে যায। সামনেব শ্বেতপাথরের টেবিলটায সববৎ এনে রাখে। জিজ্ঞেস কবে, কোনো মহিলাব সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই কিনা। হলের ভেতর ইতস্তত অসংখ্য সোফা ছড়ানো। এক একটা শ্বেতপাথবের টেবিল ঘিরে চার-পাঁচটা মেহগিনির চেয়ার। এদিকে-সেদিকে সমস্ত হল ভরে এরকম অজস্র চেযাবে টেবিলের সমাবেশ। অবাধ হাঁটবার চলবার জায়গা তবুও অনেকখানি অপ্রতিহত।

এক তিনকড়ি আর তার পরিবাবের দু-চাবজন লোক ছাড়া আর কাউকেই চিনি না। বেশিক্ষণ থাকবার মতলব নেই আমার। কলকাতার বিস্বাদ জীর্ণশীর্ণ জীবনেব ভিতরে গিযেও বিশেষ তৃপ্তি নেই বটে, কিন্তু তবুও এখানকার এ জীবনও আমরা নিজের নয।

আমি না এলে তিনকড়ি খুব দুঃখ পেত। এখন চলে গেলেও খানিকটা বিক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু সে জানে [...] মজলিশকে নিজের প্রাণের জিনিস করে নেবার মতো চরিত্রের সুন্দর সচ্ছলতা আমার নেই।

গাইতে পারি না, বাজাতে পারি না, ইয়ার্কিতেও এক হাত নেবার মতো কোনো প্রবৃত্তি মনেব ভিতর খুঁজে পাই না, যে সমস্ত শস্তা সাধারণ কথাবার্তা ও হাসি-তামাশা মজলিশের উপরকণ সেগুলোকে বেশ একটা উঁচুগ্রামে চড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করে। মানুষেব উপলব্ধি ও কল্পনার যে সমস্ত নিবিড় পবিচয ভালো ভালো কাব্যে বড় বড় উপন্যাসে পাই এইখানেও এক একবার সেই সবের জন্য উন্মুখ হযে উঠি, অবসন্ন

হয়ে পড়ি। যে কোনো মুহূর্তেই উঠে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু যতক্ষণ বসে থাকি ততক্ষণই তিনকড়ি প্রসন্ন, কাজেই চুরুট টানতে থাকি।

হঠাৎ ঘাড়ের উপর একটা হাত পড়ল। তাকিয়ে বললাম—'কে সুবোধ?'

—'চুপচাপ বসে যে?'

—'এই এক্ষুণি উঠে যাব ভাবছিলাম।'

—'কোথায় উঠে যাবে?'

—'চলে যাব ভাবছি।'

—'বাসায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'না না, বোসো।' আমার সোফার পাশে সে বসল। পকেটের থেকে একটা চুরুট বের করে জ্বালাতে জ্বালাতে—'খাবে?'

—'কি?'

—'হাভানার ভালো কতকগুলো চুরুট আছে আমার কাছে।'

চোখের সামনে টেবিলের দিকে তাকিয়ে—'চুরুট তো রয়েছে, এই ট্রে-তে কতকগুলো।'

সুবোধ নাক সিঁটকে—'দূর। ওগুলো কি আর চুরুট?'

—'কেন, মন্দ নয়তো, দুটো তো শেষ করলাম।'

—'শত হলেও তিনকড়ি পাটের দালাল, টেস্ট তার এইরকমই হবে।'

—'কিন্তু এই বর্মা-চুরুটগুলো অনেক বড় বড় লোকেও তো খায়।'

—'হ্যাঁ খুব উঁচুদরের, অলরাইট আমি স্বীকার করি। এমন একটা খেয়ে দেখো তো।' একটা নিলাম।

—'দু-একটা হাভানা নাও না, বাড়ি গিয়ে খাবে।'

—'আচ্ছা, যাবার সময় দিও।'

—'তারপর দেখাসাক্ষাৎ হয় না যে?

—'এসব মজলিশে আমার বড় একটা আসা পড়ে না।'

—'মজলিশেই কি মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয়?'

—'তোমার সংসারের সফল মানুষ। ফুটপাথে তোমাদের সঙ্গে কি করে দেখা হবে?' সুবোধ একটু হেসে চুপ করল। মাথা নেড়ে—'না। বড্ড লোকসান চলেছে, এই তিন বছর ধরেই এরকম। কতদিন আর ভরসা করে থাকতে পারা যায় বলো?'

—'কীসের ব্যবসা হে তোমার?'

—'পাথরের। স্টোনের।'

—'ও, আমি ভেবেছিলাম তুমি ব্যারিস্টারি করছ বুঝি, তোমার, বাবা এতবড় ব্যারিস্টার।'

—'দাদা ব্যারিস্টারি করছেন। আমার মনে হয় একটা ইউনিয়ন করলে হয়।'

—'কিরকম?'

—'আমরা যে কটি ছেলে একসঙ্গে বিএ ক্লাসে পড়েছিলাম বছরের মধ্যে একদিন কোনো এক জায়গায় এসে বেশ মেলামেশা করি, কেমন, বেশ হয় না?'

চুপ করেছিলাম।

—'বিলেতে তো এইরকম হয়।' সুবোধ চারদিকে তাকাতে তাকাতে—'সমীরকে দেখেছ?'

—'কোন সমীর?

—'আমাদের সমীর বাঁড়ুজ্যে। একসঙ্গেই তো পড়েছিলে, মনে নেই?'

—'ও, সে এসেছে?'

—'এসেছিল তো, কোথায় খসে পড়ল।'

—'সমীরের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।'

—'আমার কাছে রোজই যায়।'

—'ব্যবসা করে বুঝি?'

—'সেটা সেকেন্ডাবি, আমাব শালীব সঙ্গে প্রেম কবাই—' সমীব সম্পর্কে বিশদ কথাবার্তাব আশা কবে আমাব দিকে সে তাকাল।

নীববে চুরুট টানতে লাগলাম।

—[...] দেখেছ?'

—'না।'

—'দেখো। মার্লিন ডিয়েট্রিক এমন বিশ্রী দেখতে [...] দেখলে? সমীব পালাল নাকি?'

—'তোমাকে না বলে চলে যাবে না অবিশ্যি।'

—'হুইস্কি খাবে?'

—'কে, আমি, কি দবকাব?'

—'তিনকড়িকে তুমি চেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি করে চিনলে?'

—'এই বাড়িতে আমি মাস্টাবি কবতাম।'

—'মেয়েদেব পড়াতে?'

—'না, তিনকড়িকে।'

—'আচ্ছা, তোমাব ইংবেজিতে অনার্স ছিল?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাই তো অনার্স ক্লাসে তোমাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কজন ছিলাম আমবা?'

—'গুটি চল্লিশেক।'

—'প্রায় পনেবো-ষোলো বছব তো চলে গেল, কলেজ থেকে বেরুবাব পব। কিন্তু এখনো সব মনে পড়ে। এমন প্রেম' মাঝে মাঝে ধোঁযা হয়ে যায বটে, কিন্তু যখনই দু-একজন ভদ্রবযকে দেখি বাস্তবিক মনে হয যেন কলেজে পড়ছি আবাব। সাহেবকে মনে পড়ে?'

—'হ্যাঁ।'

—'নোট টুকতে হাত ব্যথা হয়ে যেত।'

—'প্রফেসব ইউ [...] কথা মনে হয?'

—'খুব। কিনা পড়াতেন আমাদেব।'

একটু ভেবে—'বোধ কবি কবে না?'

—'কলেজেব?'

—'ও, ভুলে মেবে দিয়েছি সব।'

—'চোখ খুব খাবাপ হয়ে গিয়েছিল, খুব পুরুপাথবেব চশমা পবতেন। ব্যাঙ্কে টাকা বেখেছিলেন, প্রফেসব মনোমোহনেব গেল সব। তোমাব বিয়ে হয়েছে?'

—'না।'

—'কি না—নাম তোমাব? মনে থাকে না কিছু।'

—নলিনাক্ষ।'

—'কিছু মনে কোবো না নলিনাক্ষ, এ কিন্তু ভযংকব অভদ্রতা।'

—'কোনটা?'

—'এই নলিনাক্ষ পুবোনো নামেব নাম মনে না থাকা।'

—'কিন্তু মনে না থাকলে কি কববে তুমি? মুখ যে চিনেছ, এসে বসছ, কথা বলছ এইসব ঐকান্তিকতাব স্মৃতি মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে আমাব।'

—'তুমি আমাব বাসায যেও না মাঝে মাঝে, আমাব নাম মনে আছে তো তোমাব, সুবোধ দত্ত, স্পোর্টিঙেব সেক্রেটাবি ছিলাম। উঃ কি যে গুমোট নলিনাক্ষ, দু-চাবটে হাভানা খাও না।'

—'পবে দিও।'

—'ডিগ্রি নিয়ে লাভ নেই কিছু আজকাল, কি বলো?'

—'না।'

—[...] এব দবকাব। মেযেবা তো ঢেব এসেছে, চেন নাকি কাউকে?'

—না।'

—'আমাদেব বাড়িব মেযেদেব আনিনি কাউকে। বউদিব শিগ্‌গিবই ছেলেপিলে হবে কিনা, হযতো আজও হতে পাবে, মেযেবা আটক বইল তাই।' সুবোধ পোড়া চুরুটটা জ্বালিযে নিযে—'দাদাব ব্যবস্থা বড্ড কড়া। আমি হলে ছেড়ে দিতাম এদেব, নার্স বযেছে, ডাক্তাব বযেছে। বাড়িব মেযেদেবই থাকতে হবে এমন কি কথা। তোমাব ছেলেপিলে কটি?'

—'বললাম যে বিযে কবিনি।'

—'ও, তাই বললে নাকি? এই দেখো, কিবকম আমাব মন। কি যেন ভাবছিলাম, তোমাব কথাটা না শুনতেই ভুলে গেলাম। আমাব তিনটিই মেযে।'

—'তাই নাকি?'

—'বব্‌-কাটা চুল, বেশ সুন্দব দেখতে। কিন্তু একটি অন্তত ছেলে হলে মন্দ হত না। ছেলে বলেই তো নয, কিন্তু বাববাব একবকম সন্তানেব এই যে বিপিটিশন—এ কেমন একঘেযে, না জীবন, না আর্ট।' একবাশ ধোঁযা ছাড়ল সুবোধ। বললে—'একটা কলেজ ইউনিযন হলে বেশ হত।'

—'মন্দ কি।'

—'আমবা চল্লিশটি ওল্ড বয বাঃ' কলেজেব পব সাংসাবিক জীবনেব এই চোদ্দ-পনেবো বছবেব অভিজ্ঞতাব কত কথা জমে গেছে আমাদেব মনে।'

তিনকড়ি এসে বললে—'এতক্ষণ আসিনি, কেন জানেন?'

তিনকড়িব দিকে তাকালাম।

—'দেখলাম আপনি সুবোধবাবুব সঙ্গে কথা বলছেন, এখন খুব একা লাগছে।'

—'হ্যাঁ, তিনকড়ি এবাব আমি যাই।'

—'এইবাব খুব ভালো গান হবে, কালী চক্রবর্তী এসেছে, বসুন না। এক গ্লাস সববৎ এনে দেই?' কথা না বলতেই তিনকড়ি অন্তর্হিত হল।

মনে হল সামনেব সোফাব থেকে একটি মেযে বাববাব আমাব দিকে তাকাচ্ছে। ভালো কবে চোখ ফিবিযে চেযে দেখলাম—তাই তো, অমলা নয? কোথাব থেকেই-বা এল অমলা এই মজলিশে?

তিনকড়ি সববৎ এনে দিল। বললে —'এক্ষুণি খাবেন।'

—'বাত কটা বাজল?'

—'পোনে দশটা।'

—'আচ্ছা বসি।'

—'হ্যাঁ কালী চক্রবর্তীব গান না শুনে ওঠে কখনো মানুষ' তাহলে আপনাব খাওযা-দাওযাটা এখন সেবে নিন চলুন।'

—'কি আবাব খাব?'

—'এই সামান্য আযোজন, লুচি পাঁঠাব মাংস।'

—'এখন থাক তিনকড়ি।'

—'তা বেশ, আধঘণ্টা বাদে খবব নিযে যাব এখন। গানটা শুনুন—'ওই ধবেছে।' তিনকড়ি অদৃশ্য হযে গেল।

অমলাব সঙ্গে শেষ দেখা আট-দশ বছব আগে। প্রথম দেখা যখন স্কুলে পড়ে অমলা। তাকিযে দেখলাম চেহাবাব বিশেষ কোনো পবিবর্তন হযনি অমলাব। মানুষেব মন নিযে খেলা কববাব সাধ-আকাঙ্ক্ষা যাদেব প্রবল অমলা সেই দলেব মেযে মানুষ নয। তীক্ষ্ণ হৃদযস্পর্শী রূপ, সুন্দব উজ্জ্বল উপলব্ধি, কম কথা, মৃদু হাসি সংযত প্রাণেব উচ্ছ্বাস। কিন্তু আজ এই বাতে দশটাব সময এই মজলিশেব ভিতব অমলা এমন কলবব কবে হাসে, বাববাব তাব হীবেব আংটিব দিকে তাকায, গলাব নেকলেশ দুলিযে দুলিযে আত্মতৃপ্তি বোধ কবে, নানাবকম বেযাড়া ইযার্কি উত্তেজনাব আতিশয্য ঝবে ওঠে তার। কেমন যেন লাগে। ঘাড় হেঁট কবে চুপ কবে বসেছিলাম।

অমলা কোনো এক পলকে নিঃশব্দে আমাব সোফাব কাছে এসে দাঁড়িযেছে।—'কি ভাবচ তুমি?'

—'বোসো।'

—'না, বসব না, তুমি ববং এসো।'

—'কোথায?'

—'ওই তো ওইখানে বসেছি আমবা তিনজনে।'

—'সেই যে বেঙ্গুন যাবাব জন্য জাহাজে চড়লে না, তাবপব বেঙ্গুন গিযে একখানা চিঠিও তো দিলে না।'

—'তাতে কি হল?'

—'না, ভাবছিলাম তাই। কোথায-বা গেলে তুমি।'

—'বেঙ্গুনে আমি ছমাস ছিলাম মোটে।'

—'তাবপব?'

—'কলকাতা হযে ভাওযালি গেলাম।'

—'ভাওযালি কেন?'

—'যক্ষ্মা হযেছিল।'

—'কাব—তোমাব?'

—'হ্যাঁ।'

—'কই, তাও তো জানি না।'

—'সব কথাই কি জানতে হবে, এ তো বড় আখ্‌খুটে মন তোমাব।'

—'কিন্তু তোমাব যক্ষ্মা হল, অথচ কিছু জানব না।'

—'যাক, যক্ষ্মাটা এখন পাঁচ-ছ বছব আগেকাব জিনিস।'

—'একেবাবে সেবে গেছে?'

—'তোমাব সঙ্গে কে কথা বলছিল এতক্ষণ?'

—'এই মাত্র?'

—'না, এব একটু আগে।'

—'ও সুবোধ, একসঙ্গে পড়েছি আমবা।'

—'তোমাকে বর্মা চুরুট বদলে হাভানা দিল?'

—'হ্যাঁ'

—'যাবাব সময়ও দু-চাবটে হাভানা দিযে গেল বুঝি?'

—'হ্যাঁ'

—'বেশ লোকটি তো।'

—'চেন নাকি?'

—'না। দেখলাম জীবনেব অভিরুচি এ মানুষটিব ভাবী সুন্দব তো। দিব্যি পা দুলিযে সোফায ঠেশ দিযে বসল। জীবনটাকে ব্যবহাব কবতে গিযে কোনো কার্পণ্য নেই। চুরুট টানল, ছড়াল, নির্বিবাদ সংসর্গেব দাক্ষিণ্য দিল তোমাকে। তাব পাশেই তুমি দেখলাম কুঁকড়ে বসে যেন নিশ্বাস টানা একটা দারুণ সংকোচেব জিনিস। জীবন্মৃত হযে থাকাই নিযম।'

—'দাড়িযে বইলে যে?'

—'দেখে আমাব এমন অভক্তি ধবে গেল।'

—'আট বছব পবে দেখলে তো।'

—'শস্তা বর্মা চুরুটই টানছিল কেন?'

—'আবাব হযতো আটবছব পবে দেখবে।'

—'চুরুট খাবাব যদি এতই শখ, ভালো জিনিস কিনে নিতে হলে চলে না তো। এই বকম আত্মকুণ্ঠা কেন? জীবনেব যত শস্তা সেকেন্ড হ্যান্ড লোকসানি জিনিস তাই নিযে তোমাব খুব তো আত্মতৃপ্তি।'

—'না, বেশি জিনিস সংগ্রহ কবিনি এখনো আমি।'

—'তা আমি বুঝেছি, কিন্তু যতদূর কবেছ তাইতেই জীবনটা তোমাব একটা জীর্ণশীর্ণ বাজেযাপ্ত গুদাম হযে দাঁড়িযেছে।'

—'তাবপব ভাওয়ালিতে কতদিন ছিলে?'

—'বছব খানেক।'

—'বেশ জায়গাটা?'

—'হ্যাঁ বেশ পাহাড় আব পাইন গাছ।'

—'যেতে ইচ্ছে কবে—'

—'ফুসফুস ফেটে বক্ত পড়বাব সম্ভাবনা নেই তো তোমাব। না, আছে?'

—'না' এমনিই বেড়াতে যেতাম।'

—'ভওয়ালিতে? পাগলেও যায় না।'

—'স্যানেটোবিযামে ছিলে?'

—'আবাব কোথায় থাকব, ভবঘুবে কল্পনা নিয়ে জীবনটাকে চালাই না তো।'

—'না, অনেক সময় বেড় পাওয়া যায় না নাকি?'

—'না পাওয়া গেলে কি কবে স্যানেটোবিযামে থাকি। বললাম যে স্যানেটোবিযামে ছিলাম।কোনো কথা কান দিয়ে শোনো না তুমি। না, এমনিই হাওযায় হাওযায় উড়িয়ে কথা বলতে ভালোবাস।'

—'এক বছব ভাওয়ালিতে , তাবপব কোথায় গেলে?'

—'কলকাতায় আবাব এলাম।'

—'কলকাতায় কতদিন বইলে?'

—'এ ছ-বছবই কলকাতায়।'

—'ছ-বছব? আশ্চর্য । অথচ একদিনেব জন্যও কোথাও তোমাব দেখা পাওয়া যায় না।'

—'ভজু কুণ্ডুব চাযেব দোকান, ফুটপাথ আব মেস, এই নিয়ে তো তোমাব কলকাতা। এ খাঁচাব ভিতব থেকে'—

তিনকড়ি খুব সমীহেব সঙ্গে এসে বললে—'কালী চক্রবর্তীব গান শুনছেন তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেমন লাগছে?'

—'বেশ।'

—'আবো ঢেব গান হবে।'

—'কতক্ষণ?'

—'সাবাবাত ধবেই চলবে।' অমলাব দিকে তাকিয়ে তিনকড়ি—'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, সোফায বসে পড়ুন।'একটা সোফা সে শশব্যস্তে নিজেই টেনে দিল।

অমলা বসল।

তিনকড়ি—'দেই দু-গ্লাস সববৎ এনে আপনাদেব দুজনেব জন্য?'

অমলা মাথা নেড়ে—'কিছু দবকাব নেই। তাবপব কলকাতায টিচাবি কবছ?'

—'টিচাবি কবব কোন দুঃখে?'

—'তোমাদেব জীবনে দুঃখ নেই কিছু , শখ ঢেব আছে।' অমলা একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ, ট্রেনিং ক্লাসে ভবতি হলাম।'

—'কোথায়?'

—'[...]

—'তাবপব?'

—'তাবপব বি.টি ডিগ্রি নিয়ে এই পাঁচবছব কলকাতাব একটা ইস্কুলে হেডমিস্ট্রেস।'

—'বেশ।'

অমলা একটা হাই তুলে—'না, শখ না, সাধ কবে এই ফ্যাসাদ কেউ মাথায নেয না। ইস্কুলেব মেয়েদেব মতন এমন নির্বোধ জাত এ পৃথিবীতে আব নেই। এদেব মানুষ কববাব ভাব যাবা নিয়েছে তাবা ছোটখাটো একটি দেবতা।কিন্তু তবুও বিধাতাব সৃষ্টিব ছক যা তাতে আমাব মতো নাবীব পক্ষে সবচেয়ে কম বিড়ম্বনা এইখানে। কিন্তু তবুও জীবন ঢেব বেশি অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পাবত এদেব মধ্যে থেকেই।'

—'কিবকম?'

—'না, ভাওয়ালিতে থাকতে সব বুঝে নিয়েছি আমি। সেখান থেকেই আমি ঠিক করেছি কলকাতায় গিয়ে ট্রেনিং পড়ব, মাস্টারি নেব, দিনরাত ব্যাপৃত থাকব। মানুষের জীবনের সবেচেয়ে শাস্তি হচ্ছে নির্বিবাদ অবসর ভোগ।মানুষ চুপচাপ যখন বসে থাকে দিনরাত নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে টুকরো টুকরো করে ছিড়তে থাকে শুধু। তারপর একটা প্রেতাত্মা দেখলেও মানুষ হয়তো অত ভয় ও যন্ত্রণা ভোগ করে না।'

—'ভাওয়ালিতে'—

—'হ্যাঁ ভাওয়ালিতে যক্ষ্মার চেয়ে এই অস্বাস্থ্যকর চিন্তার যাতনা ছিল ঢের বেশি।'

—'তোমার সঙ্গে এ মেযে দুটি কে?'

—'এরাও ইস্কুলে টিচার।'

—'তা বেশ ধরা পড়ে।'

—'কেন?'

—'পরিশ্রমের ছাপ এদের মুখে। আমার মনে হয় নিজেদের জীবন নিয়ে এবা খুব তৃপ্ত নয়। যা চায়, খুঁজে পায না কোথাও, তাই না অমলা।

—'মজলিশে এসেছ বটে, কিন্তু উপভোগের আনন্দ এদের হৃদযের থেকে ঢেব দূরে। কেমন একটা করুণ বিশুষ্ক দায়িত্বের মুখোমুখি এসে পড়লে মানুষের মুখের অবস্থা যেরকম হয বেচাবিদের দেখছি তাই। তুমি কোন সূত্রে এই মজলিশে এলে নলিনাক্ষ?'

—'তিনকড়িকে চিনতে?'

—'তিনকড়ি কে?'

—'ও তাও চেন না তুমি। কি কবে এলে?'

—'নেমন্তন্ন পেযে এসেছি।'

—'কে কবল?'

—'বামচরণবাবুব মেযে।'

—'ও তিনকড়ির পিসিমা, তাকে তুমি চেন? চেন দেখছি। নেমন্তন্ন পেলেই মজিলেশ আস বুঝি? ভালো লাগছে?'

—'উঠি এই বেলা।'

—'বোসো না, এতক্ষণ তো বাজে কথাই হল, এবাব চক্রবর্তী মশাইযেব দু-চারটা গান শোনা যাক। গাইতে গিযে লোকটাব গলা কিবকম ফুলে উঠছে দেখছ?'

—'কি গায পদও তো বুঝি না।'

—'ওস্তাদ মানুষ, এদেব বাহাদুরি হচ্ছে মুখের ভঙ্গিতে, গানেব ভাষা ও সুব তোমাব না বুঝলেও চলবে।'

—'তারপর, তোমার খবর কি? চিঠি না পত্র না, একটা তত্ত্বতলব কিচ্ছু না। কোথায থাক, একেবারে ভিড়ের নীচে?'

—'না, রেঙ্গুনে আমি আর চিঠি লিখিনি তোমাকে।'

—'কেন, ঠিকানা তো দিয়ে গিয়েছিলাম।'

—'তা দিতে গিয়েছিলে প্রাযই মনে করতাম লিখব। কিন্তু লিখতে বসলেই কেমন একটা ধিক্কার পেযে বসে। জীবনটাকে ঢের বিক্রি করেছি, তাবপব স্খলিত হতে হয। অনবাবশ্যক গ্লানির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোই মানুষের স্বভাব। তার ধর্মও তাই।'

—'আমার হাতের এই হীরের আংটিটা দেখেছ?'

—'দেখেছি।'

—'বলো তো কত দাম?'

—'পঞ্চাশ হাজার হলেও-বা ক্ষতি কি?'

—'আচ্ছা, এই সোনার হারে আমাকে বেশ মানায় না?'

—'একটা একথা অমলা, মাস্টারি তো করছ, এরকম পোশাক পরিচ্ছদ পরে ক্লাসে যাও? থিয়েটাব বায়স্কোপ মজলিশেও খুব যাওয়া আসা।'

—'আমার যা খুশি তাই করি। কারু কাছে কৈফিয়ৎ দেযা দরকার মনে করি না।'

—'তারপর তোমাকে যদি ছাড়িয়ে দেয়?'

—'কীসের জন্য?'

—'চরিত্রে আতিশয্য এসে জমেছে বলে।'

—'দিক। কার্পণ্য করে জীবন চালিয়ে কি লাভ। ভাওয়ালিতেই তো সব শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সুন্দরী নারী হয়ে পৃথিবীতে আমার অনেক অধিকার। সেগুলো চরিতার্থ করাই প্রয়োজন। কতকগুলো অন্ধসংস্কার নিয়ে নিজেকে প্রতারণা করে জীবন চালাতে গেলে আমারও ক্ষতি। আমাকে যারা ভালোবাসে, তাদেরও অপচয়।'

চুপ করেছিলাম।

অমলা—'মনের আত্মসম্ভ্রম যদি আমার জীবনের বড় কথা হত তাহলে তোমার পাশে এসে বসতাম না। কিন্তু তা তো নয়। দুদণ্ডের ফুর্তি সচ্ছলতা নিয়েই জীবন। এলাম তাই কথাবার্তা বললাম, গল্প করলাম এ আধঘণ্টা।

অমলা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'এ আধঘণ্টা ওই দুটি মেয়ে কেমন কুণ্ঠিত হয়ে বসে আছে দেখলে। যেন জীবনটাকে ব্যয় করতে গেলেই অপচয় হয়। এরা ভাবে জীবনটা এদের বাপের জমিদারী। কারু দিকে তাকালে কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদে বিমর্ষ কোনো অভাজন মানুষকে অভ্যর্থনা করলে তা নিলামে চড়বে, এমন বেকুব।'

তিনকড়ি হা হা করে এসে বললে—'কোথায় গেলেন?'

—'কে?'

—'যিনি আপনার কাছে বসেছিলেন?'

—'এই তো চলে গেল।'

—'না খেয়েই?'

—'খেতে তো আসেনি।'

—'গানও শুনলেন না, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হল বুঝি? আশ্চর্য এই বরদাবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার এত আলাপ?'

—'ইনি বরদাবাবুর স্ত্রী বুঝি?'

—'তাও জানেন না?'

—'বরদাবাবু কে?'

—'মফস্বলে কোথায় সাব-জজ ছিলেন, অনেক দিন হয় রিটায়ার করেছেন।'

—'বয়স কত?'

—'সত্তর।'

—'আমি তো বুঝিনি ইনি তাঁর স্ত্রী। তুমিও চেন নাকি এঁকে?'

—'হ্যাঁ, দেখেছি অনেক, মৌখিক আলাপ-পরিচয় নেই বিশেষ।'

—'কি নাম এঁর?'

—'বাঃ, নামও জানেন না আপনি! অমলা ঠাকরুন।'

লোভ

মস্তবড় সংসারের এক কিনারে সে পড়ে থাকে, সাতাশ-আটাশ বছরের বেকার যুবকটি পড়ে থাকে। কেউ-বা কেরানিগিরি করে ত্রিশ টাকা পায়। কেউ-বা মাস্টারি করে পঞ্চাশ টাকা আনে। শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা এদের প্রায় সকলের থেকেই অনেক বেশি থাকলেও কোনো স্থায়ী চাকরি যুবকটির কপালে জুটল না। স্রোত আসে প্রত্যেক মানুষেরই জীবনেই। বৈষয়িক সচ্ছলতা উন্নতি ও সাংসারিক আড়ম্বরের দিকে তাকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য নৃপেনের জীবনের সে স্রোত কবে যেন এসে চলে গিয়েছে। তার কোলাহল এখন অনেক দূরে। প্রতিধ্বনির মতো, এই ক্ষীণ শব্দটুকুও যেন শিগ্‌গিরই মিলিয়ে যাবার মুখে স্রোত তাকে বড় প্রবঞ্চিত করে চলে গেছে।

সমস্ত সকালটা নৃপেনকে বড় ব্যাপৃত থাকতে হয়।

বছর দুই হল সুচারু একটা হাইস্কুলের মাস্টারি নিয়েছে। মাসে সত্তর টাকা পায়। সুচারুই খুব চারু একেবারে, ভোরবেলা সবচেয়ে আগে সে এসে হাজির হয়, রোজ। এসে বলে—'আমি যখনই আমি নৃপেন তখনই দেখি তুমি চুপচাপ চেয়ারে বসে রয়েছ। কখন যে ঘুমোও কখন জাগো কিছু বুঝবার জো নেই।' বলেই সুচারু কাজ নিয়ে বসে। বলে—'এ চেয়ারটা আর মেরামত করা হয়ে উঠল না, দুটো তো চেয়ার তোমার ঘরে, দুটোরই এই দশা।' ভাঙাচোরা দীনদরিদ্র চেয়ারটার দিকে একবার আক্ষেপ করে তাকায় সুচারু তারপর সন্তর্পণে ধীবে ধীরে বসে পড়ে বলে—'দিন দিও মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিও, মট মট করল নাকি নৃপেন, না কাঁঠাল কাঠের, বেশ শক্ত আছে।'

নৃপেনেব সঙ্গে পরামর্শ কবে ইংরেজি হিস্ট্রি তৈরি করে, তাবপর [...] কপিগুলো দেখে নেয়। বলে 'মাস্টাবমশায়দেরও কাণ্ড, আমাকে দিল অঙ্ক পড়াতে? ভাবে যে কত ভালো অঙ্কই আমি জানি, তাই কি, ইংরাজিও কি আমি এমন নির্ভুল পড়িয়ে আসতে পাবতাম নাকি যদি সমস্ত সকাল বসে বিড়ি কানে ভজহরিদের তাসেব আড্ডায় পড়ে থাকতাম। জীবনটাকে খুব ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে পুরস্কার পাওয়া যায় না তো।' একটা বিড়ি জ্বালিযে বলে—'তুমি জান না, আজকালকার ছেলেরা কত রঙে চড়ে থাকে।'

নৃপেন চোখ তুলে সুচারুর দিকে তাকায়।

সুচারু—'আমবা যখন স্কুল কলেজে পড়তাম, জীবনে আমাদের একটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ছিল, আজকালকার এই শযতানদের ধারণা আমরা তাদের ইযার। অঙ্কেব ক্লাসে আমাকে একেবারে তটস্থ হযে থাকতে হয়।' চুপ করে বিড়ি টানতে লাগল সুচারু। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে—'বলি ভালো করে একটু একস্‌ট্রাগুলো দেখে নিয়ে যাই। এই তো কাজটা পাকা হল, সত্তর টাকাও মাইনে হল। ফাঁকি দিয়ে কি দরকার? জীবনটাকে নিজের অনুভূতির সাধারণ সাংসারিকতায সচল করে নিতে পারলেই কাছে (?) কৈফিয়ৎ দিতে পারব। বড় আশা, বড় কথা, বড় কল্পনা তো আমাদের জন্য নয়। আমাদের শুধু ছোটর ভেতরে নিষ্ঠার তৃপ্তিটুকু।'

—'তোমাদের ইস্কুলে আমাকেই-বা একটা কাজ জোগাড় কবে দাও না কেন।'

—'তা বিধাতারও সাধ্য নেই।'

—'কিরকম?'

—'সেকেন্ড মাস্টার এর ছেলেটি এবার ভালো এম এ পাশ করেছে, হেডমাস্টারের ভাগনেরও কোনো চাকরি নেই, সেক্রেটারিও তার শালাটিকে এই ইস্কুলে বসাতে চান, অথচ একটা কাজও খালি নেই।'

—'সুচারু চলে যেতেই ছোট ছেলেমেযেবা হুড়হুড় করে এসে হাজির হয়। হেমমালার অঙ্ক, সাবিত্রীর শুভঙ্করী আর্যা, মন্টুর ইংরেজি ইতিহাস, বিনয়েশের লজিক। নৃপেনের ঘরের ভিতর বেলা এগারোটা অব্দি একটা হাট বসে।

হাট নিস্তব্ধ হলে মা এসে বলেন—'আজ সকালে চা খাসনি নৃপেন?'

মাথা নেড়ে নৃপেন—'না।'

—'কেন?'

—'কই, কেউ দিয়ে গেল না তো।'

—'বাঃ, সকলে, খেল, তোকে দিতে ভুলে গেল?'

—'থাক গে, তোমাদের যা চা তৈরি হয় কেমন যেন মুখে রোচে না আমার। এ সংসারে এব অপচয় তবু চায়ের ফেনা এরকম বিড়ম্বনা কেন, বাজারের সবচেয়ে পচা পাতা কিনে এনে কি লাভ? নির্বিবাদে এ চা নিয়ে যারা দুবেলা চালায় তাদের নিস্পৃহতাও। সমস্ত উপায় হাতে থাকতেও উপভোগকে পায় মাড়িয়েই তাদের আনন্দ।'

মা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন—'আমি ভুলে গেলেই সকলে ভুলে যায় দেখছি, একটু যে মনে করে কেউ তোমাকে চা এনে দেবে, কই তা তো দেয় না।'

নৃপেন—'এই সংসারের ভার যদি আমার হাতে থাকত তাহলে এই টাকার ভিতরেই সবাইকে আমি কেমন সাংসারিক সুখসুবিধার ভিতর রাখতে পারতাম দেখতে তোমরা। টাকা পেলেই তো হল না, খরচ করবার সুশ্রী নিয়ম থাকা চাই। এরা তো কম ব্যয় করে না, কিন্তু—'বলতে বলতে নৃপেন লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল। কানাকড়িও যে রোজগার করে না। সজ্জিত সংসারের সুন্দর পরিকল্পনায় সংযমের দরকার।

দুপুরবেলা খেতে বসে কেমন অস্বস্তি। এ বাড়ির পুরুষদের মধ্যে নৃপেনই সবচেয়ে শেষে খায়। বাড়ির বউঝিরা কেউ হয়তো উঠানে বসে বেণী খোলে, কেউ কাপড় কাচে, কেউ স্নান করতে চলে যায়। মা নৃপেনকে কাছে নিয়ে বসে খাওয়াতে চান। নানা রকম আদরের কথা বলবার ইচ্ছা তাঁর। কাজেই ছেলের খাওয়া শেষ না হতে তিনি স্নান করতে যান না। কিন্তু নিজের মনটাকে নিজে বোঝেন না তিনি। বললেন—'চাকরি-বাকরি নেই, কিছু রোজগার করিস না, বসে বসে খেতে তোর যেন কেমন লাগে, নারে?'

সামনেই নীলমণির মা, বাড়ির ঝি দাঁড়িয়েছিল মেজগিন্নীর কথা শুনে মুখ টিপে হেসে ফেলল।

নৃপেন, চিন্তিত গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল।

ঝি দাঁড়িয়েছিল।

খানিকক্ষণ বাদে মুখ তুলে নৃপেন—'কি চাও তুমি এখানে?'

—'কিচ্ছু না।'

—'তবে দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও চলে।'

ঝি—'ও মা, দাদাঠাকুর, যা রাগ।'

সেজগিন্নী বড় ঘরের শানবাঁধানো সিঁড়িব ধাপে বসে তেল মাখছিলেন, বললেন—'কি হল নীলমণিব মা, কি হল আবার।'

ঝি কোমরে হাত দিযে দাঁড়িযে মাজা দুলিযে বললে—'হবে আবার কি, ঢং হল।' ঈষৎ মাজা দুলিয়ে—'দাদাবাবু আমাকে বললে যা যা ফ্যাচ ফ্যাচ করিসনি মাগী।'

—'এই কথা বললে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন, কি করেছিলে তুমি?'

—'ইস্, আমি কি করব! মেজঠাকরুন তাঁর ছেলেকে বললেন বসে বসে খাস, একটু লজ্জাশবম রাখিস। শুনে দাদাবাবু খেঁকিযে এলেন আমার ওপর।' বলে খিল খিল করে হেসে উঠল নীলমণির মা।

সেজগিন্নী বললেন—'যাও যাও চুপ কবো। তুমিই-বা কেন খাবার ঘরে ওই সময়ে দাঁড়িযে, থাক, কি দরকার তোমার।' তেল মাখতে মাখতে বললেন—'যেমন মেজগিন্নী তেমন তার ছেলে। দুনিযার বাব মানুষ দুটি জান না বুঝি?'

মা কানে কম শোনেন; কোনো কথাই শুনতে পেলেন না, জননীর মুখ তাই যেমন নির্বিকার তেমনই প্রসন্ন, কিন্তু নৃপেনের কানে সবই গিযে ঢুকল। সবে ডাল দিযে ভাত মেখে নিযেছিল সে, থেমে থেমে খাচ্ছিল সে। সেজ-খুড়িমা ও ঝিযের কথাবার্তা শেষ হওয়াব পর আবার স্বাভাবিকভাবে খেতে আবম্ভ করল। এসব কথা গাযে মাখে না সে। ববং খাওয়া-দাওযার পব সেজ-খুড়িমার কাছেই গেল সে। গিযে বললে—'খুড়িমা, দুটো পান দিন না।'

—'পান তো নেই বাছা।'

—'একটাও না?'

—'না তো, তা দু-আনাব পান বাজার থেকে রোজ আনা হয বটে কিন্তু সংসারের লোকজনও তো মাছির মতো ভন ভন করে। খেযে দেযে অফিসের বাবুরা পান খেলেন, তাদের ডিবে ভরে দেযা হল সব, তা তুমি বুঝি একদিনও পান পাও না?'

জানালা দিয়ে লীলাদি মুখ বাড়িয়ে—'নৃপেন নাকি?'

—'এই তো।'

—'তা, খাওয়া-দাওয়া হল তোমার?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি দেখছি বেদম কত্তা মানুষ।'

—'কি রকম?'

—'কটা বেজেছে হিসেব আছে?'

-'কটা?'

—'হুইসেল বেজে গেছে।'

—'স্টিমার অফিসের?

—'আজ্ঞে বাছাধন।'

—'তাহলে দুটো বেজে গেল এর মধ্যে।' নৃপেন কটাক্ষে সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

সেজ-খুড়িমা বললেন—'আ তোমার আর দুটো আব তিনটে। সময়ের গোলাম তুমিও বাছা, যত গোলামি আমাদের কপালে।'

ঘর ঘর করে সেলাইযের কল নাড়তে নাড়তে লীলা—'কি খেলে ভাই?' জবাবেব কোনো প্রতীক্ষা না করে বললে—'পান পাওনি বুঝি? আমি বলি চার আনা ছ-আনার পানগুলো বোজ পাখা মেলে কোথায় উড়ে যায। ওই জাঁহাবাজ চাকর ঝি বাচ্চাদেবই কাজ। নীলমণির মা একটি কম নয।'

—'তা হবেও—বা।'

—'আমাকে একটু লঙ্গ টঙ্গ দিতে পার লীলা?

—'কোথায পাব ভাই?'

—'সুপুরির কুচিটুচি?'

—'দেখছি বাটায আছে হযতো।' কল ঘোরাতে ঘোবাতে—'এই ব্লাউজটা শেষ করে নেই, একটু অপেক্ষা কবতে হবে।'

সেজ-খুড়িমা—'তা তোমার হাত পা আছে, তুমিও তো নিযে আসতে পাব। পানেব বাটা তো মা-দেব কৌটাযই আছে, সমুদ্র ডিঙোতে হবে না তো।

লীলা নিস্তব্ধ হযে সেলাই কবিছিল।

নৃপেন নাবকোলগাছেব সবুজ উজ্জ্বল পবিষ্কার পাতাগুলোর দিকে তাকিযে বৈশাখেব নীল আকাশেব মুখোমুখি দু-এক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থেকে বললে—'বা, ভাবী সুন্দব দিনটা।' নৃপেনেব এই অনুভূতিকে কেউ প্রতিসহানুভূতি কবতে গেল না। বলে ফেলে নিজেও নৃপেন কেমন সংকোচ ও কুণ্ঠা বোধ করতে লাগল। যে দুপুবে, বাড়ির পুরুষমানুষেরা টাকা বোজগাবেব বিরস কর্তব্যে জীবনেব সুন্দর দিকটাকে অলস হৃদয বিলাসের মরীচিকা বলে উপেক্ষা কবে চলে গেছে সে সমযে তাদেব বধূদেব কাছে এরকম বিহ্বলতা প্রকাশ কবা উচিত হযনি তাব।

নীল আকাশ, আকাশেব অদ্ভুত আভা, শঙ্খচিলের সুন্দব তির্যক পক্ষ বিস্তাবেব—নাবকোলের স্নিগ্ধ সবুজ মাথা, মর্মাহত বটেব উচ্ছ্বাস, জিওলের জঙ্গলে ঝিঁঝিব কলরব, বাসন্তী নীল ও কমলা রঙের প্রজাপতির ওড়াউড়ি, দিনান্তেব বৌদ্রেব অপরূপ মাদকতা, এই সমস্তব থেকে চোখ গুটিয়ে এনে নিজেব ছেঁড়া ধূলিধূসর মাদ্রাজি চপ্পলেব স্ট্রাপগুলোব দিকে ব্যথিত মর্মাহত হযে তাকিয়ে বইল নৃপেন।

হীরালালকে সামনে দাঁড়িযে থাকতে দেখে নৃপেন চোখ তুলে—'হীরু, আমাকে দু-একটুকবো সুপুরি এনে দাও তো।'

হীবালাল বললে—'পান আপনি ছেড়ে দিলেন নাকি দাদাবাবু?'

—'না, ছেড়ে দিইনি তো।'

—'দেবারই তো জোগাড়, কদিন থেকে কই খাচ্ছেন বলে দেখছি না তো।'

লীলা—'পান থাকে না।'

—'ইস্, থাকে না আবার! সেজঠাকরুন মস্তবড় এলুমিনিব কৌটো ভরে রেখে দেননি বুঝি! বলি চার আনার পান, জঙ্গলসুদ্ধু বাদার মেয়েও তো খেযে শেষ করতে পারে না।'

সেজ-খুড়িমা স্নান করতে চলে গিয়েছিলেন।

লীলা—'তুই বড় বেশি কথা বলিস বাপু। কৌটোয় করে পান রেখেছে, গিন্নী মানুষ খাওয়া-দাওযার

পর এসে খাবে না, সেজ কাকাকেও টিফিনের সময় না পাঠালে চলবে কি করে? উঠতে পান, বসতে পান নাহলে তার কাজে যায় জট পাকিয়ে। যাও হিমাংশুবাবুদের বাড়িতে নীলমণির কাছে আমার রেশম সূতোর ডিমটা আছে, চট করে নিয়ে এসো তো।'

হীরালাল চলে গেল।

নৃপেন উঠি উঠি করেও বসেই রইল। যাবার আগে দু-টুকরো সুপুরি হীরালাল দিয়ে গেলে পারত তাকে। সুপুরি কয়েক টুকরো সে নিজেই নিয়ে এল। বললে— 'খাবে লীলা?'

—'কি ভাই?'

—'সুপুরির কুচি'।

—'না'।

চুপচাপ।

কল ঘোরাতে ঘোরাতে লীলা— 'দিনের পর দিন তুমি খুব মোটা হয়ে যাচ্ছ না নৃপেন?'

—'কে আমি?'

—'মনের ফুর্তিতেই তো মানুষ মোটা হয়, কি বলো?'

নৃপেন আস্তে আস্তে বললে— 'মনে আনন্দ থাকলে।'

—'তা আছে তোমার। খুব আছে। ভেবেছিলাম আমি, অনেক দুঃখ বহন করে বেড়াচ্ছ বুঝি। ভুল ভেবেছিলাম। যা ববিনটা গেল উড়ে।'

নৃপেন চুপ করেছিল।

লীলা ববিনটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে—'আচ্ছা, আনন্দের মন্ত্র কি বলে দাও তো ভাই।' কিন্তু জবাব শুনবার জন্য সে প্রতীক্ষা করতে গেল না, মহেন্দ্রবাবুর গলার আওয়াজ পাবা মাত্রই কল ছেড়ে উঠে চলে গেল।

লীলার স্বামী, এ বাড়ির মেজজামাই। পশ্চিমে অনেক দূরে চাকরি করেন। চিরটাকাল বিদেশে বিদেশেই থাকেন।

• নৃপেন নিজের ঘরে গিয়ে ঘাটের ওপর চুপচাপ বসে রইল। ঘুমোতে পারা যায় না, ঘুম পায় না, শুতেও ভালো লাগে না। খাটে অনেক ছারপোকা, দু-একটা মারল সে। কিন্তু তারপরেই মনে হল, থাক, মিছেমিছি প্রাণীগুলো মেরে কি লাভ!

হ্যাঁ, যেমন রোজ আজও তেমনি ভিখিরির পর ভিখিরি দলে দলে ভিড় পাকিয়ে আসছে। দুপুরবেলা এমনই রোজই আসে, নীলমণির মা একটা মস্তবড় ধামার থেকে অজস্র চাল বিলিয়ে দিচ্ছে তাদের—এত চাল! তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন বেদনাবোধ হয় যেন নৃপেনের। চালের অভাবে অবিশ্যি এ বাড়ির লোক মারা যাবে না। কিন্তু সে ভাবছিল অন্য আর এক কথা, পথে পথে হেঁটে সে তো দেখেছে জীবনের যুদ্ধ কত কঠিন, কোথাও ক্ষমা নেই, স্নেহ নেই, মানুষের হৃদয় অত্যন্ত বিশুষ্ক বিমুখ, অত্যাচার প্রতাবণাই নিয়ম, সুবিচার স্বাভাবিক দেনাপাওনার রীতি বইয়ের নীতিকথার মধ্যেই লুপ্ত, জীবনের ব্যাপারে সে সব জিনিসের অভাব বড় তীক্ষ্ণ, আর এই ভিখিরিরা! তার চোখের সামনেই তো হেসেখেলে চাল উজাড় করে নিয়ে যাচ্ছে, দেখে মনে হয় যেন মানুষের জীবনযাত্রার প্রসন্ন পরিচালক হয়ে একজন ক্ষমাসুন্দর দেবতা হাসিমুখেই কাছে কোথাও বসে রয়েছেন। সেও ভিক্ষুক হয়ে নামবে নাকি? এই অন্ধ অন্ধকারের দেশে ভিখিরি এখনো না খেতে পেয়ে মরে না হয়তো, ভিখিরি সন্ন্যাসী, ভিখিরি ভিখিরি ফকির, ভিখিরি সাধু, ভিখিরি দেবতা। ভারতবর্ষের কোনো দূর প্রদেশে লাঠি কম্বল [...] নিয়ে সেও বেরিয়ে পড়বে নাকি? নিজের হাতে রাঁধাবাড়া, গাছের ছায়া প্রান্তর মন্দিরের খোড়ল, আকাশ নক্ষত্র ভাবতে ভাবতে ঝিম এল।

নৃপেন বালিশে মাথা রেখে একটু শুতে চেষ্টা করল। কিন্তু ভিখিরিদের কোলাহলে উঠে বসল আবার।

রোজ রোজ এত ভিক্ষে কি রে বাবু! সেই দুপুর বাজতে না বাজতেই শুরু হয়েছে, আর সন্ধে গড়িয়ে গেলে নিকেশ নেই, মানুষকে সুস্থির রাখবে না দেখছি এরা। কেঁদে কঁকিয়ে, নাকি সুরে, হাঁদিয়ে গুছিয়ে হইচই হম্বাচম্বা চাল ডাল নুন লঙ্কা আদায় না করে ছাড়ছে না কেউ, এক এক জনের পুঁটুলি ছোটখাটো একটি বেলুনের মতো কেঁপে উঠেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাগ্যও আকাশের দিকে যাত্রা করেছে। ভিতরটা যাদের অসংযমে আড়াআড়িতে হিংসায়, এত কুৎসিত তাদের উপরই—বা দেবতার এমন পক্ষপাত কেন?

উঠে বসে নৃপেনের মনে হল মানুষ ভাতের খিদেয় কষ্ট পায় বটে, কিন্তু এই ভিখিরিদের মতো এই সেই মূলমন্ত্রকে পরিতৃপ্ত করে বেড়াবার রুচি ও উল্লাস শেষ পর্যন্ত [কি আর] যদি তার থাকে, তাহলে সে কষ্টও ঢের কমে যায়। দেহের লালসাক্ষুধার ব্যথা। সবচেয়ে গভীর মানুষের মনে বেদনা।

নীলমণির মা একজন লম্বা সুন্দর দোহারা চেহারার বৈরাগীকে সাত মুঠো চাল দিল। বৈরাগীর মুখে কোনো ভাব পরিবর্তন নেই, যেন তার ন্যায্য পাওনাটুকু মাত্র সে পেয়েছে। পেয়ে চলে যাচ্ছিল—

নীলমণির মা—'ঠাকুর, দুটো বেগুন নাও না।'

—'তা দাও।'

—'ভালো কথা বলি, সেদিন যে বলেছিলেন তেল নেবে, শিশি আছে?

—'না, শিশি নেই, তুমি একটা জোগাড় করে দাও না, সর্ষের তেলের বড্ড দরকার।'

—'তা আমি জানি না কি.আর! সব আমি সাজিয়ে রেখেছি ঠাকুর। তেল, বেগুন, নুন, কাঁচালঙ্কা, খানিকটা খেসারি ডাল।' সাজানো জিনিশগুলো বৈরাগীর হাতে তুলে দিয়ে নীলমনির মা—'তা তুমি খেসারি ভালোবাস না মুগ?'

বৈবাগী এবার খানিকটা উদাসীনতা দেখাল। বললে—'না, খেটে দিন চালাই, যা পাই তাতেই হয়, বৈরাগীর জীবন, রাধারাণী পদভরসা, ভালো মুগের ডাল থাকলে খানিকটা দিও।'

—'মুগের ডাল, ঠাকুর আজ নয় আর একদিন'—

বোষ্টম এবার মুখ বিক্ষুব্ধ হয়ে [করে] বললে—'সেবাইতেব যা রুচি, তার চেয়ে বড় কথা তো কিছু নেই আর'—একটু হেসে বললে—'এই কাঁচালঙ্কাগুলোব তেমন সুবাস নেই তো ঝি, মুষড়ে গেছে, না?'

—'কই, না আজই তো বাজার থেকে আনা হয়েছে।'

—'তা বেশ, তাহলে আমি আসি এখন।' দু-একপা এগিয়ে গিয়ে ফিবে এসে—'তোমাদের ওই কাঁটালগাছটায় ভারী চমৎকার এঁচোড় হয়েছে।'

নীলমণিব মা—'তা তুমি দু-একটা ছিঁড়ে নিয়ে যাও না, কেই-বা দেখবে, কেই-বা গেবাহ্যি করবে। ভয় নেই কিছু তোমার, যদি কেউ কিছু বলে বোলো নীলমনির মা নিতে বলেছে।'

হ্যাঁ, পৃথিবীটা বড় ক্ষমাময়, খুব সুন্দর। বৈশাখের নির্মল দুপুবটাই-বা কি সুশ্রী! ঝিলেব থেকে জলপিপির স্নিগ্ধ সরস ডাক কি একটা গভীর পরিতৃপ্তি বহন কবে আনে, বিলেতি গাবগাছেব নীচে কাদাখোচাগুলো বড় বড় শুকনো বাদামি পাতা উলটিয়ে পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তারপব মাঠের সবুজ ঘাসের উপর একদল নৃত্যপবা বেদিযা মেয়েদের মতো কি তাদের আনন্দের কলরব! কোনো এক মুহূর্তে ঝা করে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে নদীর দিকে উড়ে গেল সব। জীবনস্রোতের ওপর একটা গভীর ধন্যবাদ বর্ষণ কবে।

দুপুবের গবম বাতাসেব ভিতর কি যেন একটা গুঞ্জন। কোথায় যেন মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। খানিকটা দূবে কাব যেন পোষা তিতিরেব চিৎকাব। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালায় পাতা নেই, আসছে অজস্র বক্তিম ফুল। দিঘির উলুঘাস নীলফুল সমস্ত জলেব শরীর মায়াকার কাচের জানালার মতো সুন্দব-অপার্থিব!

ভিখিবিরা নীলমনির মাকে ছেঁকে ধরেছে।

—'আমরা তিনজন, তুমি আমাকে একমুঠো চাল দিলে যে বড়?'

—'কোথায় তিনজন? আর দুজন কই?'

—'আর দুজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।'

—'দাঁড়িয়ে আছে, ডেকে আন মুখপুড়ী! তোর মুখ দেখে আমি তোকে তিন মুঠো দিব?' কিন্তু তিনমুঠো দিতেই হল।

আর একজন বললে—'আমার বেলায হাত কাচিয়ে একমুঠো যে? বৈরাগীকে তুমি সাতমুঠো দিলে—দেখিনি!'

—'বেগারী নিকুচি! ভাগ হারামজাগী!' চার-পাঁচ মুঠো দিয়ে দিল তাকে নীলমণির মা।

একটি আধবযেসী ছোকরা কিছুতেই নড়বে না, বললে—'তোমাব বাড়ি নাকি [...] অনামুখো মানুষ, আমার চাচির কাছ থেকে আমি আধসেরটেক চাল চেয়ে নেব—তোর তাতে কিবে!'

'কে তোর চাচিবে উল্লুক?'

একটা অসাড় অপ্রীতিকর বচসার সৃষ্টি হল। তার শুরু নেই, শেষ নেই, না, কোনোদিনও শেষ হবে না।

নৃপেন চশমাজোড়া তুলে নিয়ে চোখে এঁটে উঠানে নেমে—'কি হয়েছে তোমাদের কি হয়েছে শুনি! সমস্তটা দুপুর তোমরা এরকম করে জানোয়ারের মতো পাড়া মাথায় তুলে নাচবে! যাও, ভাগো সব এখান থেকে।' ভাগো, ভাগো! ধামাসুদ্ধ নীলমণির মা ভাড়ার ঘরে তুলে রেখে দাও গিয়ে, যাও, একমুঠো চালও কাউকে দেয়া হবে না।' জানালা দিয়ে পিসিমা এতক্ষণে মুখ বাড়ালেন। বললেন—'কে, নেপেন নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কি বলছ?'

নৃপেন চশমাটা খুলে মুছছিল। কোনো জবাব দিল না। পিসিমা—'কে না আধসের চাল চাচ্ছিল নীলমণির মা?'

—'ওই ফকরে।'

—'তা দিয়ে দাও, কত আগেই তা দিতে পারতে, মিছে মিছি কথা বাড়াও কেন ঝি!'

নীলমণির মা এক গাল হেসে—'দাদাবাবু বললেন ধামা নিয়ে ভাড়ার ঘরে চাল যাও, ইস, একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে খাস খাবার সখ যে বড় নৃপেনবাবুর। আচ্ছা দিদিবাবু, ফকরেকে তিন পো চাল দিই, কি বলো তুমি?'

—'দাও, এ বাড়ির কত্তা, আমার বাবার হুকুম কি জান না তুমি? মরাব সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন কোনোদিন দরিদ্র আতুরদের বিমুখ কোরো না। সব সময় মনে রেখো এই কথা নীলমণির মা।' নৃপেনের দিকে ফিরে পিসিমা—'তোমার বাবার চাল যে কথা বলছিলে বড়! ভাগ্যিস বিধাতা তোমাকে কর্তৃত্বের সামনে বসাননি, বসালে যে কি অনিষ্ট হত তা তো চোখের সামনেই দেখছি।'

ফকির হো হো করে হেসে উঠে—'ঠিক সাজা হয়েছে!'

ঘরে এসে নৃপেনের মনে হল, না না এরকম করতে নেই। কোনোদিন এরকম করতে যাবে না সে আর। তবে, একটা চাকরি পেলে তার মাকে নিয়ে পৃথিবীর শেষ সীমানাও সে যে ফিঙে পাখির মতো ডানা মেলে আনন্দের তীব্রোচ্ছ্বাসে নেচে উড়ে চলে যাবে, কোনো কি সন্দেহ আছে তাতে! না, এ বিষয়ে সে একেবারে নিঃসংকোচ! তবে, একটা চাকরি পাওয়া চাই। ভিখিরিরা আসছে, যাচ্ছে, কে আবার যেন একটু হইচই করে উঠেছিল, কিন্তু এবার আর রক্ষা নেই। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যান অমিয়কান্ত এসে পড়েছে। সেজঠাকুরনের ছেলে। সাইকেল থেকে নেমে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে অমিয়—'এই সব রাস্কেল এসে জুটেছে আবার!'

ভিড়টা থমকে গেল।

অমিয়—'তোদের কাদের বাবার শ্রাদ্ধরে যে বস্তা বস্তা চাল নিয়ে ভাগছিস?' বলে এগিয়ে এসে—'থাম, হটিস, না, যে এক পা নড়বে তার ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখে নেব আমি।' সিগারেটে এক টান মেরে—'এইযো নীলমাধব!'

—'হুজুর' বলে নীলমাধব এসে হাজির হল।

অমিয়—'এই শুয়োরের বাচ্চাগুলো যে বাড়ির ভিতর ঢুকে গোলাসুদ্ধ বিশ গাঁ যজমানের চাল নিয়ে সটকাচ্ছে তার দায় ধারা কে দেবে শুনি!

—'আমি তো কিছু জানি না হুজুর।'

—'তুমি জান না বেল্লিক পাজি কোথাকার! পিঠে যখন জুতো পড়বে তখন তোমার বাবা জানবে। আর এই মাগীটা, তুই মিটমিট করে হাসছিস যে, তিন ধামা চাল নিয়ে বসেছিস বেহদ্দ মাগী, এই সব ইতর জানোয়ার চরিয়ে খাওয়াচ্ছিস, তোমার পেটে-পিঠে যখন সমান করে দেব উল্লুকের ডিম, তখন বুঝবে।'

সেজঠাকরুন এসে বললেন—'কি হল অমিয়, আমি এক হাত বিন্তি নিয়ে বসেছিলাম, এরই মধ্যে।'

পিসিমা একেবারে উঠনের কাছে এগিয়ে এসে—'হ্যাঁ হে অমিয়, কি হল বাবা?'

অমিয় দাঁতমুখ খিঁচে পিসিমার দিকে তাকিয়ে বললে—'হল তোমাদের মায়ের পিণ্ডি, [...] [...] তিন সংসার মেয়েমানুষ রয়েছে বাড়িতে, একেবারে শিবলিঙ্গের জংলি পায়রা সব, এই যে ভাড়ারসুদ্ধ চাল উজাড় করে মাগীটার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, কার বাবার চাল শুনি? তোমাদের বাবার?'

পিসিমা বলে—'তা আমাদের কি দোষ অমিয়, বাড়ির মেয়েরা সব পাড়ায় চলে গেছে, তোমার মা হিমাংশুবাবুদের দক্ষিণের ঘরে বসে বিন্তি খেলছিলেন, তোমার ডাক শুনে নাড়াইপাড়াই দৌড়ে এলেন। মেজগিন্নী তো কানেই শোনেন না, ভগবানের নাম করতে করতে বাড়ির প্রহরাদার যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তাতেই হল সর্বনাশ, এই জেগে উঠে ব্যাপার দেখে, তো আমার চক্ষুস্থির, আহা, এর মধ্যে এতবড় অনাচারটা হয়ে গেল।'

বুক টিপ টিপ করছে।

মালা টিপতে টিপতে পিসিমা নীলমণির মা-র দিকে তাকিয়ে—'কত ধামা চাল নিয়ে তুই ছাগল খাওয়ালি ভাতারখাগী।'

নীলমণির মা চুপ করে রইল।

নৃপেনও নিজের ঘরে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তা এইরকমই তো হয়, এ আর নতুন কথা কি? পড়ছিল। তার মা ঘুমিয়ে আছেন। ঘুমোন। জেগে থাকলেও কোনো কথাই তেমন কানে যায় না তার।

তাব ইচ্ছা কবে এসবেব ভিতব থেকে পালিযে গিযে কোনো গ্রামপ্রান্তে দুদণ্ড গিযে বসে। কিংবা কোনো শহবেব ভিতবে সাবাদিন ঘাড়গুঁজে চাকবিজীবীব সঙ্গত সুন্দব কতর্ব্যটুকু নিযে থাকে। সন্ধ্যাব দিকে এসে নিজেব রুচিমতো কথা বলে। পড়ে, চিন্তা কবে, মানব জীবনেব একাকিত্বেব সৌন্দর্য একান্তে বসে নীববে উপলব্ধি কবে।

সুচারুকে বললে—'তোমাদেব ইস্কুল লাইব্রেবি থেকে কিছু বই আমাকে এনে দাও না।'

—'কী বই চাও তুমি?'

তাই তো মফস্বলেব একটা সামান্য ইস্কুলেব জীর্ণশীর্ণ আলমাবি তিনটাব ভিতব এমন কী বই আছে আব' এমন কীই-বা থাকতে পাবে। অনেক ভেবেচিন্তে নৃপেন কযেকটা বইযেব নাম লিখে দিল।

সুচারু ফিবে এসে বললে—'তোমাব তাক তো খুব চমৎকাব, এসব বই তো কলকাতাব কলেজেব লাইব্রেবিতেও নেই। এ আছে গিযে তোমাব ইম্পিবিযাল লাইব্রেবিতে।'

মাসেব শেষে সুচারু মাইনে পেল।

নৃপেন—'সত্তবটা টাকা তো পেলে, কী কববে এত টাকা দিযে?'

'এত টাকা' তেমাব আন্দাজ তো খুব সুন্দব' এক একটা ঘটিবাম ডিপটি মাসে সাতশো-আটশো মেবে নিচ্ছে, কি কবে অত ঐশ্বর্য দিযে তাবা—'

নৃপেন একটু গম্ভীব হযে বললে—'তাই তো।'

'দশ হাজাবই পাক, বিশ হাজাবই পাক, টাকা দিযে তবু ছিনিমিনি খেলতে যায না কোনোদিনও মানুষ। তবুও ঐশ্বর্য যত পায পাওযাব প্রযোজন তত বেড়ে চলে।'

এবপব নৃপেন আব কোনো কথা বললে না, তাব ইচ্ছা ছিল সুচারুব কাছ থেকে দু-দশ টাকা নেয। কাপড় কাচা সাবান কেনে, চুরুট, আব কিছু কাগজ, একটা দোযাত। হ্যাঁ কাজ আব দোযাতও। মানুষেব মাঝে মাঝে লিখতে ইচ্ছা কবে বড়। হযতো অনেক হিজিবিজি; কিন্তু তবুও তাই-ই ভালো লাগে। চুপ কবে বইল নৃপেন।

সুচারু-'কুড়ি টাকা পাঠাব এল আই-তে।'

—'প্রত্যেক মাসে মাসেই পাঠাও?'

—'হ্যাঁ কযেক হাজাব টাকা এল আই কবে বেখেছি, হঠাৎ মবেটবে যাই যদি।'

—'গেলেই-বা, বিযে তো কবোনি, কি লোকসান'

সুচারুব মুখ অন্ধকাব হযে উঠল।

নৃপেন নিজেকে শুধবে নিযে—'অবিশ্যি তোমাদেব জীবনেব একটা দাম আছে।'

— বিযে কবিনি বটে, কিন্তু কোনোদিন কবব না তা তো নয। চাকবিটা পাকা হল, বছব না ঘুবতে বিযে না কবলে চলবে না তো।' একটু চুপ থেকে— আমি অনেক ভেবে দেখেছি যতদিন নাবী না আসে জীবনটা আশা-আকাঙ্ক্ষাব ভগ্নস্তূপ নিযে একটা মবীচিকা হযে থাকে কিন্তু এক জীবনেব সৌন্দর্য ও চবিতার্থতা সে তাব সঙ্গে কবে নিযে আসে। আমবা যা চাই সেইসব আকাঙ্ক্ষাব শেষ চাবিকাঠি নাবীব কাছেই তো।'

দুজনেই চুপচাপ।

সুচারু—'তুমি হযতো এ কথাব মূল্য উপলব্ধি কবো না।'

—'কোন কথা?'

—'এই যা বললাম।' জানলাব ভিতব দিযে তাকিযে সুচারু— দিনবাত্রি সংসাব, নিজেব জীবন ও নিজেব বক্তমাংসেব ভিতবেব যে আনন্দ নিযে অন্ধেব মতো পবিতৃপ্ত হযে থাকি আমবা সবই মিথ্যা ছেলেভুলানো ছড়া, যতক্ষণ অব্দি না নাবী সত্যিকাবেব আনন্দ ও অমৃত নিযে পুরুষকে এই অবাস্তব খেলাঘবেব থেকে জানায, তাবপব এক বহস্যেব বাজ্য, কি বলো?

নৃপেন মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

সুচারু—'তা দেখো নাবীকে বাদ দিযে জীবনটা যেন কাটিও না নৃপেনদা। সুচারু—'ত্রিশটা টাকা বেখে দেই ব্যাঙ্কে, দশ টাকা দেই সংসাব খবচেব জন্য, বাকি দশটা টাকা হাত খবচেব জন্য থাকে। একটা সিগাবেট জ্বালিযে বললে—'সংসাবেব বাবুগিবি বলতে এই দশটা টাকায মেবেকেটে যা হয। কীই-বা হবে, সিগাবেটেই তো মাসে পাঁচ টাকা লেগে যায। তাবপব ছেঁড়া জুতো জামা বদলে যে কেডস পায দেব কিংবা গবদেব পাঞ্জাবি পবব তাব জো থাকে না।' সিগাবেটে একটা টান দিযে বললে—'যাক, ভগবান শেষ পর্যন্ত বিশেষ নির্মম হবেন বলে মনে হয না। সুবিচাবেব আশায তো বসে আছি। আমাব জীবনেব উপব তাব কৃপা কম নয তো? বললে—'কাপড় কাচা সাবান নেই বুঝি তোমাব

নৃপেনদা? তা আমার ঠেঞে চেয়ে নাও না কেন?'

—'আছে নাকি সাবান তোমার?'

—'সাবান নেই, সাবানের বাবা আছে।'

—'কি রকম?'

চোখ টিপে দিয়ে একটু হেসে—'দেখো মজা'

নৃপেন সুচারু বসেছিল। লোকজন যখন সব এদিক-ওদিক চলে গেছে, কেউ নেই, আর তখন চট করে কোটের থেকে একটা টাকা বের কবে—'এই নাও।'

নৃপেন মাথা নেড়ে—'না, এ নিয়ে আমি কি করব।'

—'মনে কোরো না সাবানের জন্য দিলাম, চুরুট খেও।'

—'হাঃ হাঃ চুরুট' নৃপেন হেসে হেসে মাথা নাড়তে লাগল। নৃপেনকে টাকাটা নিতেই হল। জীবনে টাকার বড় দরকাব।

পরের মাসে যখন সুচারু মাইনে পেল, নৃপেন—'ব্যাঙ্কে এবাব কয়েকটা টাকা কম বেখে একটা বই কেন না তুমি।'

—'কি বই?'

—'একখানা উপন্যাস।'

—'কার?'

—'ইংরেজি।'

—'কত দাম হবে?'

—'এই দশ শিলিং ছ-পেনস বোধ হয়।'

সুচারু একটু বিচক্ষণভাবে মাথা নেড়ে— 'মাগো, তাহলে তো কম দাম নয়, এ আবাব কোন গুলিখোরের বই।?'

নৃপেন একটু হেসে—'কিন্তু পড়ে বইটা তুমি খুব উপভোগ কবতে পারবে, শুনেছি নাকি খুব চমৎকার হয়েছে।

—'আমার দোহাই আর পাড় কেন, তুমিই পড়ে দাও বস পাবে। কিন্তু দশ শিলিং ছ-পেনস দিযে বই কিনে তোমাকে পড়াব, এমন লাটসাহেব আমি নই নৃপেনদা, আমি একজন সামান্য স্কুলমাস্টার মাত্র।'

'যাক, দরকাব নেই।' নৃপেনের যেন কেমন লাগল। চুলোয যাক একটা বই তো! কাপড় জামা নেই, জুতো নেই, বিছানা বলতে একখানা পাটি, সিগাবেট চুরি কবে আর পবের আধপোড়া চুরুট খেযে জীবনের সবচেযে বড় শৌখিনতা মেটে, বইয়ের জন্য চিন্তা স্বপ্ন ও কল্পনার মূল্যবান সুদূর সুন্দর জগতের জন্য এ লোভ তার সাজে না। হয়তো কতকগুলো দুর্বোধ্য চিন্তা, কতকগুলো কুযাশাবৃত স্বপ্ন, মাকড়সাব তন্তুর মতো কতকগুলো অস্পষ্ট অনুভূতির জন্য।

দিন দুই পরে সুচারু—বইটা তুমি চাও?'

—'না, ভাবছিলাম আমাদের দুজনের খুব ভালো লাগবে।'

সুচারু ঘাড় নেড়ে—'ওরকম কথা বোলে না, সোজাসুজি বললেই পার বইটা যদি তুমি আমাকে কিনে দাও সুচারু, আমার বড় উপকার হয়।'

নৃপেন একটু হেসে বললে—'থাক না, দরকার নেই।'

'না, চাচ্ছ যখন একটা অর্ডার দিয়ে দেই। তোমার কাছে পোস্টকার্ড আছে?

হ্যাঁ, একখানা পোস্টকার্ড নৃপেনের বালিশের নীচে অনেকদিন থেকেই আছে, জিনিসটা এমন মূল্যবান যে করি করি করেও এটা খরচ করে ফেলতে এতদিন ভরসা পায়নি নৃপেন। কার্ডটা সুচারুকে এনে দিল সে।

সুচারু বললে—'তুমিই লিখে দাও, হ্যাঁ, আমার নামই দিযে দাও, না হয় তোমার লেখা

শেষ হয়ে গেল।

সুচারু—'পোস্ট করবে?

—'তোমার ইচ্ছা।'

—'আচ্ছা এ কার্ড আমার পকেটেই থাক, দেখি ভেবেচিন্তে।'

কার্ডটা পকেটেই থেকে গেল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে যাওযার পর সেই বইটার জন্য লোভও ঢের কমে গেল নৃপেনের। কোনো লোভ রইল না শেষ পর্যন্ত আর।

মানুষ-অমানুষ

আগ্রার থেকে ফিরবার পথে আবার নারী। হেমন্ত সেকেণ্ড ক্লাস কামরার এক কিনারে গুছিয়ে বসতেই সামনে মোটা মহিলাটি বললেন—'আপনি আগ্রার থেকে এলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তাজ দেখতে গিয়েছিলেন!'

'না, তাজ আর কি—'

শুনেই মহিলা দুটি হেসে উঠলেন, হেমন্তের কথাটাও শেষ করতে দিলেন না তাঁরা।হেমন্ত দ্বিতীযটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, বাঃ বেশ তো মেয়েটি।এ রকম রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না তো! ভুরু দুটিই-বা কী সুন্দর! রূপ অন্তর্মুখীন ধ্যানের প্রদেশে পাওয়া যায না। পাওযা যায় পৃথিবীর পথে। [...] হেমন্ত একরকম। কিন্তু এই মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে মনে হয় নেপথ্যেব প্রক্রিয়া একটা অন্ধকারেব স্রোত নয় শুধু। অনন্ত নীলাকাশের সফলতা নাগার্জুনেব সিদ্ধি যে সফলতা তুলনায নক্ষত্রেব ছাযাব নীচে জোনাকিরই মতো।

হেমন্ত স্তব্ধ হইযা জানালার ফাঁক দিযা বিরাট আকাশটার দিকে চোখ তুলিল। না তুলিযা পারছিল না সে। পৃথিবীর দশজনের মতো মানুষ সে নয। অনুধ্যানই হইল তার প্রাণেব প্রথম ও শেষ কথা। চিন্তা করিযা জীবনটাকে সে কাটাইযা দিতে পারে।

মোটা মহিলাটি বললেন—'ঠিকই বলেছেন, আমবা এই দশ বছর ধবে বোজই তাজ দেখছি। তারপর এখন সারনাথের বৌদ্ধ মন্দির দেখতে পারলে বাঁচি যেন। কিংবা পুবীর জগন্নাথেব মন্দিরটাও।'

তন্বী বললেন—'না, জগন্নাথের মন্দির নমস্কার!'

—'এই কথার কথা বলছিলাম, ধরো ভুবনেশ্বর—'

—'কতদিন কোনারকেব মন্দির দেখিনি।'

হেমন্তের দিকে তাকিযে মোটা গৃহিনী বললেন—'তাজ যে বড্ড শিল্প তা কে না স্বীকাব কবে, কিন্তু আগ্রার যারা অফিসার তাদের বড় দুর্দশা। দু-দশ বছর ধবে আমার স্বামী আগ্রায কাজ করছেন ফলে হল এই তাজের যা এমন একটা স্বপ্নের জিনিসকে আমরা সাংসারিক জীবনে হাবিয়ে ফেললাম। জীবনটা তো আমাদের সংসাব নিয়েই। কিন্তু স্বপ্নও যখন সাংসারিকতায চাপা পড়ে যায় সে যে কী বিষম!'

—'যাক, এখন তো দিল্লিতে যেতে পেবেছে।'

হেমন্তকে লক্ষ্য করে গিন্নি বললেন—'আপনি কোথায় যাবেন?'

—'কলকাতায।'

—'ও, তাহলে তো অনেকদূর। উমা আমাব দেওরঝিও কলকাতায যাচ্ছে। আপনার কি বার্থ রিজার্ভ?'

হেমন্ত মাথা নেড়ে—'না।'

—'কার নিলেই পারতেন।'

—'খুব ভিড় হবে।'

—'হতেও তো পারে।'

—'তা না হলেও আমাব চলে, বসবার জাযগা পেলেই আমার হবে।'

—'রাতে ঘুমোবেন না?'

—'না হয় জেগেই রইলাম। আসার সময় সমস্তটা পথ ঘুমিযেছি। জ্যোৎস্নার রাত আছে, ইউ-পির মাঠ প্রান্তর দেখা যাবে।'

মহিলারা চুপ করে রইলেন।

হেমন্ত—'আপনাদের বার্থ রিজার্ভ করা আছে?'

—'আমি আর কতদূর? দু চারটা স্টেশন পরেই নেমে যাব। উমার বার্থ রিজার্ভ, আচ্ছা হেরম্ববাবু আসছেন না যে উমা?'

—'আসবেনই, আসবেনই, তুমি এত ব্যস্ত কেন?'

—'গাড়ি তো ছাড়ল।'

—'জিনিসপত্র লাগেজ সব এসেছে তাব মানুষটি আসবেন না?'

—'হ্যাঁ, হেবম্বব আবাব জিনিসপত্তব।'

—'হেবম্ব' বলছ কেন? তোমাব থেকে-'অন্তত দশ বছবেব বড়।'

—'একটা চকোলেট বঙেব [...] সুটকেশ আব একটা নোংবা বুঁচকি এই তো ওব সম্পত্তি। তুমি ওব জন্য সেকেণ্ড ক্লাসেব টিকিট কাটলে যে বড়?'

—'তবে কি উনি থার্ড ক্লাসে যাবেন?'

—'কেন যাবে না? বার্থ বিজার্ভ কবে দিব্যি গদিব ওপব ঘুমিয়ে থাকবে তুমি, তোমাব ভয কীসেব? কত বাঙালি ভদ্রলোক সেকেণ্ড ক্লাসে কলকাতায যাচ্ছে, তোমাকে তো তাবাই দেখতে শুনতে পাবত, মিছেমিছি ওটাকে একটা গলগ্রহ বানাতে গেলে কেন?'

—'আচ্ছা, থামো তো তুমি এখন।'

—'এ তোমাব বড্ড বাড়াবাড়ি উমা। ও নিজেব পযসাযই তো থার্ড ক্লাসে যেত। কলকাতায ওকে যেতেই হবে। তুমি না হয ভালো বুঝে বাজাব বাড়িব মেযেব ভদ্রতা দেখিয়ে ওকে থার্ড ক্লাসেব পযসাটাই দিতে একেবাবে আস্কাবা দিযে সেকেণ্ড ক্লাসেব টিকিটই দিলে কিনে?'

উমা চুপ কবে বইল।

তাব জেঠিমা বললে—'কুকুবকে মাথায চড়ালে পদে পদে লাঞ্ছনা পেতে হয। দেখবে তুমি।'

—'আঃ, বুড়ামানুষ, ওব সম্বন্ধে এবকম কবে কথাই-বা বলো কেন তুমি?'

—'বেশ, তোমবা হলে গিয়ে নবাবেব মেযে, যা ভালো বোঝো তাই কবো।' দুজনেই চুপচাপ।'

জেঠিমা—'বার্থও বিজার্ভ কবে দিযেছ নাকি?'

—'হ্যাঁ কবেছি।'

—'হ্যাঁ, তা কববে, ছাগল এনে গমেব খেতে না ছেড়ে দিলে' জানলাব ভিতব দিযে দুজনেই তাকিয়ে বইল। গাড়ি অবিশ্যি ছাড়েনি।

উমা বললে—'ওই বিবাজবাবুও তো আসবাব কথা ছিল স্টেশনে।'

—'বিবাজকে আমি আসতে না কবে দিযেছি।'

—'কেন?

—'কেন কি আবাব। ওসব ঢলানি আমি ভালোবাসি না।'

উমা আবক্ত মুখে জেঠিমাব দিকে তাকিয়ে-'বিবাজবাবুকে আমি কাকাবাবুব মতো শ্রদ্ধা কবি-তুমি এই কথা বলছ''

—'বড্ড নষ্ট ছেলে' তুমি চেন না। তোমাদেব হল দযামাযাব শবীব, ভিতবে কাব কত অন্ধকাব ও কদর্যতা টেব পাও না তোমবা তা, বড় অন্ধতা' বলে আস্তে আস্তে উমাব পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে—'তোমাদেব যা বযেস তাতে বড় সতর্ক থাকতে হয বানী, হৃদয নিযে পথে-বিপথে খেলা কবতে যাওযা— ওই না হেব' আসছে।'

— হ্যাঁ।'

—'ভগবানকে লোকে বলে রূপেব ভাণ্ডাবী, কিন্তু মানুষকে তিনি এত কদাকাব সৃষ্টি কবেন কেন?'

উমা কোনো জবাব দিল না।

জেঠিমা—'শুনেছি এ লোকটাব ভিতবটা ভোঁতা নয।'

উমা কোনো কথা বলল না।

—'অনেক জানেন শোনেন নাকি?'

—'হ্যাঁ, লেখাপড়াব চর্চা আছে বেশ।'

—'মাথায ছিটও আছে ঢেব, পাগল-ছাগলেব এক গুণ, কি, লেখেন কি?'

—'ওব লেখা তো তুমি পড়েছই।'

—'ওই তো গল্প-কবিতা ফুক্কুবি যত সব—এই নিযে ওব এত নাম।'

—'আগ্রায তো ওকে তোমবা চিনলে না, কিন্তু কলকাতায গিয়ে দেখো, এক-একটা সাহিত্য আসবে সুধী সমাজে এব কতখানি নিঃসংকোচ মর্যাদাব অধিকাব-— '

—'কি জানি রে বাপু, তোমাদের সাহিত্য আর্টের কিছু বুঝিটুঝি না, কিন্তু আগ্রায়ও তো তোমরা ওকে নিয়ে কম হম্বাচম্বা করলে না।'

—'আগ্রায় উনি রইলেনই না।'

—'বটে! থাকলে তাজমহলের ডোমের ওপর ভোগের থালা নিয়ে হাজির থাকতে হতো, আজকাল ছেলেমেয়েদের বিচিত্রতাই-বা কত!'

উমা নিস্তব্ধ ছিল।

জেঠিমা—'পড়ে দেখলাম তো কতকগুলো কবিতা গল্প—'

—'কেমন লাগল?'

—'মানুষটার মনের ভিতর নানারকম অপ্রীতিকর রুচি, অবৈধ রসের খিচুড়ি, বাস্তব জীবনটাই-বা কেমন তার? এইরকম বৈধতাহিবীন?'

হাঁপাতে হাঁপাতে হেরম্ব ঢুকলেন। মাথায় মস্তবড় টাক, কালো রং, নাক থ্যাবড়া, গোঁফ-দাড়ি কামানো অভ্যাস কিন্তু কয়েকদিনে ক্ষুর চালানো হয়নি। সমস্ত সময় পান চিবুচ্ছেন। নীল চোখের জমিনে খাড়া ঝিলকির মতো কালো মুখে কিন্তু অসাধারণ হাসি সব সময়েই লেগে রয়েছে, কখনো-বা হাসি সাধারণ প্রসন্নরূপ ধারণ করে শাদাসিধে স্তরের মানুষের সঙ্গে সাংসারিক কথা বলতে গিয়ে, হাবভাব খুব চটপটে, হাতে মোটা একটা বাঁশের লাঠি, পায়ে কেম্বিশের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছে, তালি নেই; শুরকি মাখা, পরনে নোংরা, তেলচামসে [...] পাঞ্জাবি, গলার চাদরটা ধোপদুরস্ত, আজ বিকেলেই বোধকরি ধোপার বাড়ির থেকে এসেছে। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। শরীর খুব সুস্থ ও সরস। শরীরটাকে নিয়ে অত্যাচারও কম হয় না। অনেক খাঁজ ও ভাঙানের ছাপ, সেকেণ্ড ক্লাসে এ রকম বেশভূষায় থাকা বড় একটা চড়ে না, অবিশ্যি মাড়োয়ারি বাদে।

হেরম্ব'—'রানীমা, বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার।' বলে উমার জেঠিমার দিকে তাকালেন। বললেন—'ওরা কি ছাড়ে শিগ্‌গির, একেবারে ভূতে পেয়েছে যেন, যা কদাকাব চেহারা আমার এই তিন দিনে একেবাবে দশগুণ কদর্য বানিয়ে দিল—আগ্রাব ছেলেমেযেরা মিলে।'

শুনে জেঠিমা খুব প্রীত হলেন। বললেন—'রানীমা আর আমাকে ডাকছেন কেন? বাজার বাড়ির মেযে হচ্ছে উমা।'

—'ওকে আমি উমাই ডাকি।'

—'নিজেকে তো খুব কদর্য বললেন, আমরাও আপনার থেকে সুন্দর নাকি, একটুও সুন্দর মনে করবেন না, দেখুন না কেমন ভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, একেবারে বুড়ী-হাবড়ি হয়ে গেছি।'

হেবম্ব হে হে করে হেসে—'কিন্তু এর ভেতর থেকেও আমবা রূপ খুঁজে বেব করতে পাবি। যে জিনিস সুশ্রী হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল তার যেরকম রূপান্তরই হোক না কেন, সৌন্দর্যের আস্বাদ একটা না একটা থাকে। কিন্তু শুয়ারকা বাচ্চা যে তার ভিতর বুদ্ধের আত্মা থাকলেও সে হতভাগ্য জাতিস্মর কুরূপের প্রাপ্য মূল্যই এ পৃথিবীতে পেয়ে বেড়াবে শুধু। তার স্বপ্ন মিথ্যা, প্রেম মিথ্যা।'

জেঠিমা খুশি হয়ে বললেন—'হলেই-বা কুশ্রী কিন্তু আপনার মতো'—কিন্তু আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি। বললেন—'আপনার বার্থ রিজার্ভ রাখা হয়েছে।'

—'বেশ।'

—'সেকেণ্ড ক্লাসে বসে আপনার তো কেনো অসুবিধা হবে না? থার্ড ক্লাসে চড়া অভ্যাস।'

—'আমি ফার্স্ট ক্লাসে চড়ি।' একটু চুরুট জ্বালিয়ে নিযে হেবম্ব'—'উমা, আমার বোঁচকাটা কোথায়?'

—'এই তো আমার কাছেই।'

—'একেবারে কোলে করে নিযে বসেছ দেখছি।' চুরুটে এক টান দিযে—'দেখি তো।'

—বোঁচকাটা?'

—'হ্যাঁ।'

—'আবার এখন দেখবেন কি করতে?'

—'কই, পকেটে আমার রুমাল নেই তো, বোধহয বোঁচকার ভিতর রেখে দিয়েছি।'

—'বোঁচকাতেই থাক, এই রুমালটা নিন।' বলে নিজের সিল্কের রুমালটা হেরম্বের হাতে তুলে দিল। হরম্বরও বিনা দ্বিধায় রুমালটা নাকের কাছে নিয়ে যাক ঝেড়ে নিল খানিকক্ষণ। হেমম্বর মনে হল হয়তো জেঠিমাকেই শোনাবার জন্য।

তাকিয়ে দেখল হেরম্ব উমার দামি সুন্দর রুমালটা যে এরকম মাটি হয়ে গেল সেজন্য একটুও পীড়া নেই মেয়েটির মুখে। হেরম্ব রুমালটা পকেটে রেখে দিয়ে—'কার যেন বাজে জায়গায় বসেছি, এ ফুলকাটা বিছানার চাদর তো আমার নয়, এ বালিশই-বা কার? আমার বিছানা কোথায় রেখেছে উমা?'

—'ঠিক জায়গায়ই তো বসেছেন আপনি।'

—'কিন্তু এ কার বিছানা?'

—'আপনারই তো।'

হেরম্ব একটি চোখ টিপে—'সেবার যখন রামেশ্বরে গিয়েছিলাম, বুঝলে উমা, তীর্থ করতে নয়, আমি তীর্থ মানলে তো, ভগবানও অনেকদিন থেকে লিঙ্গের হাতে, শিবলিঙ্গের হাতে পৃথিবীটাকে ছেড়ে দিয়ে কোথাও ঘুমিয়ে নিস্তার পাচ্ছেন। রামেশ্বরে গিয়েছিলাম আমি বেড়াতে, একদিন ট্রেনে ফিরে এসে দেখি আমার সেই ছেঁড়া-খোঁড়া দুটো এলোকেশী গামছার বিছানা আর নেই, ঠিক এইরকম বিছানা পাতা রয়েছে, একটা বেশ প্যাডের মতো নরম সুন্দর বালিশ অব্দি, দুটো কোলবালিশ পর্যন্ত।' চুরুটে এক টান দিয়ে—'কে সঙ্গে ছিল আমার জান? অভয় আর রানী। অভয়ের তো কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিন্তু আজও অবাক হয়ে ভাবি সেই বেঘোরে রাঙামাটি রানী কোথেকে বের করল। কিন্তু মেয়েরা সব পারে' বলে চুরুটের মুখের থেকে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে পকেটের থেকে দেশলাইযেব বাক্সটা বের করল হেরম্ব। বললে—'পশ্চিমে শুনেছি বর্ষাকালেও বৃষ্টি হয় না, কিন্তু যে তিন দিন আগ্রায় ছিলাম বৃষ্টির ভোগ আমার কপালে খুব হল তো। হয়েছে কি জান, ঠাণ্ডা লেগে এই পায়ের কড়া দুটো এমন চিবুচ্ছে যে কেটে খসিয়ে একটা হামানদিস্তায় ছেঁচে মজুত করতে ইচ্ছে করে।'

উমা একটু হেসে—'কি করবেন—ভাবুন—'

—'কোনো মালিশ আছে তোমার কাছে?'

—'এসব আমি সঙ্গে রাখি না।'

জেঠিমা—'[...] নেই তোমার কাছে উমা?'

—'কে বয়ে বেড়ায় বাপু।'

জেঠিমা—'[...] থাকলেও তো হত, গরম জলে [...] করা যেত।'

হেরম্ব' চরুট জ্বালিয়ে নিলেন।

—'এরকম যখন বাতের ধাত, তখন একটু তার্পিনও তো সঙ্গে রাখলে পারতেন আপনি' জেঠিমা বললেন।'

—'ওই বোঁচকার ভিতর আছে।'

—'কী?'

—'কী একটা বিলেতি মালিশ; বের করে দাও না উমা।'

—'নিন আপনার বোঁচকা।' বলে বোঁচকাসুদ্ধ হেরম্বের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল উমা। বোঁচকা খুলতে খুলতে হেরম্ব—'কেন যে বাত হয় বুঝি না, কত বুড়োই তো বৃষ্টিতে ভেজে, কিচ্ছু হয় না, দিব্যি হাত পা ছড়ানো, আগ্রাতেও দেখলাম, কলকাতায়ও দেখেছি আমার ধাতটা এরকম কেন?'

জেঠিমা—'বাত হয় দুরকম জাতের মানুষদের।'

বোঁচকার থেকে একটা [...] খুলে নিয়ে হেরম্ব'—'কাদের?'

—'এক হয় বড় মানুষদের, যারা খুব ডিম মাংস এই সব বেশি খায, আপনার তো আর সে কারণে হয়নি—'

[...] থেকে খানিকটা ক্রিম বের করে হেরম্ব মালিশ করতে লাগলেন।

জেঠিমা —'আর বাত হয় গরিব মানুষদের, খেতে পায় না, খাবারের ভিতর ভাইটামিন কিচ্ছু থাকে না।' একটু গলা খাকরে—'বাতের কিবা দোষ, দরিদ্রতার জন্যই তো বাত, মানুষ দরিদ্র হয় ইচ্ছা করে—জীবন বিধাতার কাছে এই যে অপরাধ কলকাতায় গিয়ে এবার স্খালন করে নেবেন।'

উমা—'গন্ধ আপনি ছড়াবেন দেখছি হেরম্ববাবু, চুরুটের মালিশের, ফার্স্ট ক্লাসে চড়েন, সেকেন্ড ক্লাসটাকেই একটা খোঁয়াড় করে তুললেন দেখছি।' বলে সে একটু চোখ মুছতে চেষ্টা করল।

হেরম্বর চুরুট নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিলেন। বললেন—'এবার আমাকে একটু মালিশ করে দাও তো উমা।'

—'আসছি।'

জেঠিমা—'বড্ড বেপরোয়া লোক তো আপনি, আপনার বলতেও সাহসে কুলোল? উমা দেবে আপনাকে মালিশ করে?' আপনি আর এক গাড়িতে চলে যান।'

উমা উঠে এসে একটু হেসে—'নয়তো নেমে পড়ুন এই সামনের স্টেশনে, কলকাতায় আমি একাই যেতে পারব।' বলে [...] নিয়ে মালিশ করতে লাগল।

জেঠিমা অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন—' আমাকেও কলকাতার টিকিট কাটতে

হেরম্বের দিকে তাকিয়ে জেঠিমা—'আপনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন।'

হেরম্ব-'আমিও ভাবছি মালিশটা আমিই করি।'

—'না না সে কথা নয়, মালিশটা অবিশ্যি লাটসাহেবের বাবাই করছেন, আপনি আমি সেখানে পাত্তাই পাইনে, আমি বলছিলাম কলকাতা অবদি একটা টিকিট কিনে দিতে হবে আমাকে।'

হেরম্ব'—'তা আমিই পারব।'

হেরম্বের দিকে তাকিযে বললেন—'ভালো কবিতা লেখেন, গল্প লেখেন, স্বীকার করেছিলাম, চিন্তা করবার ধারণা করবার শক্তি আমাদের চেযে ঢের বেশি। কিন্তু তা বলেই সব হবে! যাকে চেনেন না শোনেন নাই একরকম আগ্রার তিনদিনের পবিচয সেই মেয়েব ওপর তাব এরকম অধিকার জন্মাবে।'

হেবম্ব নিস্তব্ধ রইল।

জেঠিমা—'এই বুঝি নতুন নিয়ম।'

মালিশ অব্যাহত চলছিল।

যাক যার যা ভালো লাগে তাই করুক। মানুষের রুচি একরকম, মাছির রুচি আরেক রকম।' গোটা দুই আঙুল মটকে বললেন—'কিন্তু এই কথাটা আমি অগ্রায গিয়ে রটায।' কেউ কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেল না। জেঠিমা—'যাতে সেখানকার মেয়েবা ভবিষ্যতে সাবধান হয, তা আমার করা কর্তব্য।'

হেরম্ব একবার চশমা খুলে কী যেন বলবে ভাবছিল, কিন্তু বলতে গেল না। আর চশমার পাথর দুটোর দিকে একবার ভালো কবে তাকিযে নিয়ে চশমাজোড়া আবার সে চোখে তুলে নিল।

জেঠিমা—'আব তোমার বাবার কানেও এ কথাটা যায যেন উমা, ট্রেনে তুমি এ যা কীর্তি করলে কলকাতায গিয়ে সেটা বেমালুম গিলে ফেল না। না, আমি চিঠি লিখতে যাব না। দেওরের কাছে সুখদুষী হযে আমাব কী লাভ! তাঁব হাঁড়ির জিনিস তিনি সামলাবেন—কিন্তু সামলান যেন। যা করলে, এ কথাটা তাকে তুমি স্পষ্ট কবে বলো।'

উমা একটু হেসে—'হ্যাঁ, তারপর তোমাকে চিঠি লিখব।'

হেরম্ব'—'এই তিনদিন আগ্রায এসে আমার কী কী হল জান?'

উমা—'আবার পাঁচালি নিয়ে বসলেন।'

—'না। খুব সংক্ষেপেই বলি।' চুরুটটা জ্বালালেন, বললেন—'দুর্নীতির একশেষ হল আজ।'

—'কখন?'

—'এই দুপুরে পথেব থেকেই।'

—'কীবকম?'

—'প্রথম ভাবলাম প্রায তিনদিন তো আগ্রায রইলাম, অথচ তাজ দেখা হল না, যাই এবার দেখে আসি গিয়ে।'

—'কখন ভাবলেন এমন কথাটা?'

—'ঘুমের থেকে উঠেই।'

—'তারপর?'

—'উপেনবাবু বললেন কী সকালবেলা যাবেন খামোখা তাজ দেখতে তার চেয়ে চায়ের 'আড্ডায বসে কমিউনিজম সম্বন্ধে খনিকটা বক্তৃতা দিন।'

—'কমিউনিজম?'

—'কোনো ইজমেরই ধার ধারি না আমি, তবে সব ইজম সম্বন্ধেই খুব কৌতূহল আমার। সেই লোভে লোভে ঢের বক্তব্য জমিয়েছি—উপেন কমিউনিস্ট—কমিউনিস্ট না ছাই, প্যাডে বাঁধানো কবিতার বই, না ছাপালে যার চলে না তার আবার কমিউনিজম কোথায়? অথচ কবিতাও কত অসাড় ভদ্রলোকের, ছন্দের মিল অব্দি নেই, চিন্তার সংগতি তো দূরের কথা, মনে যার সুন্দর অনুভূতি বা উপলব্ধি নেই, জীবনে প্রকাশ করবার

অমৃতই যিনি অর্জন কবতে পাবলেন না, টাকা বা মবোক্ক বাঁধাই তাকে কতদূব এগিযে দেবে বলুন।'

জেঠিমা—'উপেন সম্বন্ধে তুমি এই কথা বল, অথচ এই উপেন তোমাব জন্য না কবেছে কি উমা।'

উমা—'আঃ সেই সব কথা তুলে তুমি তাঁকে অপমান কবছ কেন জেঠিমা, এই ট্রেনে যেকজন লোক বসেছি সকলেব চেযে হৃদযেব মহত্ত্ব তাঁব ঢেব বেশি' ভিজে গলা খাকবে নিযে বললে—'এত বেশি যে মনেব বেদনাবোধ তেমন নেই, অথচ মানুষকে সমবেদনা কবতে তিনি সবসমযেই অগ্রসব। তাব টাকা ও ঐশ্বর্য এইবকম নানাবকম সহানুভূতি ও পবিচর্যাবই ক্ষয পায সব। বাকি যা থাকে তা দিযে তিনি সেকেন্ড হ্যান্ড [...] কেনেন, আব প্যাডে বাঁধিযে লেখা ছাপান।' সহৃদয পবিহাসেব সঙ্গে উমা খানিকটা হাসল। হাসতে হাসতে গম্ভীব হযে গিযে বললে—'তাবপব কী হল হেবম্ববাবু?'

—'উপেনেব চাযেব আড্ডায সকালটা কাটল।'

—'যে জাযগায বসেন সেই জাযগায লেগে থাকেন, এই হচ্ছে আপনাব বকম। হাঁটুব ব্যথাটা কমেছে?'

—'অনেকটা।'

—'তাহলে আমি উঠি।'

—'ওঠো, আচ্ছা এই বাঁ-পাটা একটু-'

—'তাবপব দুপুববেলা তো মেঘ কবে এল, বেদম বৃষ্টি এই সন্ধ্যা অবদি, তাজ দেখা হল না আপনাব আব?'

—'না।'

—'আব একদিন থেকে গেলেই পাবতেন।

—'তাজেব ছবি আমি ঢেব দেখেছি। সেই বকমই তো অনেকটা, উমা, কী বলো?'

—'হ্যাঁ সেইবকমই পুবোপুবি।'

—'তা আমি জানি, তাজ দেখতে আব আগ্রায আসতে হয না। এদিক দিযে ক্ষতিটা আমাব বেশি কিছু হযনি। কিন্তু বাদলায যেমন সর্দি হল, নাক গলা সুড়সুড় কবে, নস্যিব কৌটোটা গেল হাবিযে, কিন্তু এমনই বিপদ একটা কবিতা লিখতে যেমন বসেছি তখন ব্যাপাবটা টেব পেলাম।'

—'কবিতা লিখতে পাবলেন না আব?'

—'অসম্ভব, কী কবে লিখি?'

—'নস্যি আনিযে নিলেই পাবতেন।'

—'হ্যাঁ আগ্রায পাওযা যায আবাব নস্যি, অত বাদলাব ভিতব কেই-বা এনে দেয শুনি' যতক্ষণ আনে ততক্ষণেব ভিতব আমাব কবিতাব ভাবই-বা থাকে কি কবে।' চুরুটে একটা টান দিযে বললেন—'আঃ, এমন একটা অক্ষয জিনিস নষ্ট হযে গেল আজ। এ কেউ কোনোদিন লেখেনি তো, ধাবণাও কবতে পাবেনি। আগ্রায যদি আমি না আসতাম, কতকগুলো ঘটনা যদি না ঘটত, তাহলে আমাব মনেও এ পবিকল্পনা কোনোদিন জাগত না । জাগল, অথচ লোপ পেযে গেল, বিধাতা এ ক্ষতি কী দিযে পুবোবেন বলো তো?

উমা একটু হেসে—'সৌন্দর্যেব ভাবেও পৃথিবী যে জর্জবিত হেবম্ববাবু , আপনাব একটা কবিতা কিংবা নির্মলাদিব মতো এক আধজন রূপসী নষ্ট হযে গেলও পৃথিবীব কিছু আসে যায না।'

হেবম্ব' চুরুটেব ছাই ঝেড়ে ফেলে—'কোন নির্মলা?'

—'আহা, ওই যে শ্রীপতিবাবুব বোন।'

—'শ্রীপতিবাবু ? দিল্লিব?'

—'হ্যাঁ।'

—'হ্যাঁ মেযেটি রূপসী বটে।'

—'দিল্লিব থেকে আপনাদেব সঙ্গে আগ্রায এসেছিল।'

—'হ্যাঁ, এসেছিল, আমাব কবিতাব খুব ভক্ত।'

—'তাবপব একদিন থেকেই দিল্লি চলে গিযেছিল আবাব।'

—'হ্যাঁ, যাবাব সময প্রণাম কবে গেল, অ্যালবাম দিল আমাকে, আমাব অটোগ্রাফ নিলে, কযেকটা কবিতাব পাণ্ডুলিপিও বোধকবি দিযে দিযেছি, অবিশ্যি সেগুলোব কপি আমাব কাছে আছে।'

—'আপনি জানে[illegible] হযতো, সে মাবা গেছে।'

—'মাবা গেছে ! কবে?'

—'কী করে মারা গেল?'
—'ট্রেনে চাপা পড়ে।'
হেরম্ব কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে দেশলাই জ্বালালেন।
উমা—'তা, চুরুট জ্বালাবার প্রবৃত্তিও হয় এই কথা শুনবার পর?'
—'কী আর করব, এই রকমই তো হয়।'
—'মানে সুন্দরীরা পথে-বিপথে জীবন খোয়ায়?'
—'হ্যাঁ, আমরাও কবিতা লিখি, চুরুট খাই। নির্মলা ইচ্ছে করে মরেছিল?'
—'তা তো বলতে পারি না কিছু—'
—'যাক, তোমাকে যা বলছিলাম শোনো—'
—'নির্মলা আপনাকে অ্যালবাম দিয়েছে?'
—'হ্যাঁ।'
—'কী আছে তার মধ্যে?'
—'তার কতকগুলো ফটো।'
—'দিতে গেল যে আপনাকে?'
—'হয়তো দিতে ভালোলেগেছিল তার, কিংবা নিজের রূপকে একজন গুণীর চোখ দিয়ে দেখতে ভালোলেগেছিল বেচারীর। তার সৌন্দর্যকে লক্ষ্য করে অন্তত কবিতার দু-এক টুকবো লিখব, এও হয়তো আশা করে থাকবে।'
—'লিখবেন নাকি?'
—'লিখলেই হয়, মুড এসে নিক, লিখব। কলকাতায় মেয়ে নেই। মাঝে মাঝে বড় একা হয়ে পড়তে হয়। তখন অন্ধকারে সাংসারিক অসচ্ছলতাব ভিতর মশার কামড় খেতে খেতে বন্ধু তো জোটে এক চুরুট, সঙ্গে সঙ্গে দু একটা সুন্দর অনুধ্যানের জিনিসও জুটে যায়, আগ্রার উপেন কিংবা দিল্লির নির্মলা। উপেন নিয়ে গল্প লেখা চলে। কিন্তু নির্মলাকে নিয়ে মিথ্যা গল্প বানিয়ে লাভ কী? তাকে নিয়ে খুব সত্য সরস সুন্দর কবিতা সৃষ্ট হতে পারে যে।'
উমা একটু চুপ করে থেকে—'তবে তাই লিখবেন।'
—'লিখবার তো কতই আছে, কিন্তু বিধাতা দয়া করে সত্তর বছর পরমায়ু দিয়েছেন মোটে। স্রষ্টাদের অনন্তকাল পরমায়ু না হলে চলে না। নিজের বেলাই তো দেখছেন তিনি অসীম অতীত ও অপরিসীম ভবিষ্যৎ না থাকলে সৃজনরসের গাজন হয় না।' বলে পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করলেন। পকেট থেকে একটা ভোঁতা পেনসিল বের করে কী যেন লিখতে লাগলেন।
উমা—'ওটা কী?'
—'নোটবই আমার।'
—'কবিতা লিখছেন নাকি?'
—'তুমি পাগল হয়েছ?' লিখতে লিখতে 'ট্রেনে চড়ে কেউ কবিতা লিখতে পারে।
লিখতেই নাকি পারে আবার!'
—'অনুপ্রেরণা এলে শুনেছি অনেকে যেখানে-সেখানে বসেই লেখে।'
—'সে সব পাগল মানুষ নয় তো!'
—'তাই নাকি?'
—'তা ছাড়া আর কী, লেখা বড় শক্ত জিনিস উমা, অনেক আড়ম্বরের প্রয়োজন, সামান্য একটু ত্রুটি হলেই গেল। দেখলে তো একটা নস্যির কৌটো হারিয়ে কী কাণ্ডটা হয়ে গেল!'
—'আপনার নোটবইই তো প্রকাণ্ড একটা খাতা, পকেটের ভিতর এটা আঁটে কী করে?'
—'পকেটটা ছেঁড়া।'
—'বোধহয় এটাকে ঢুকাবার জন্যই ছিড়েছেন। এটা পকেটে রাখবারই—বা কী দরকার আপনার।'
—'ছোট একটা অ্যাটাচে-কেস কিনেছিলাম, এইসব জিনিসপত্র রাখবার জন্য, কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল অ্যাটাচে-কেসটা, বিশেষ কোনো দরকার জিনিস ছিল না সেটার ভিতর।'
—'কী?'

—'কোনো অপ্রকাশিত কবিতা বা গল্প হাবিয়ে না যায় যাতে।' বলে [...] সুটকেসটা খুলতে আবম্ভ কবলেন।

—'কী খুঁজছেন?'

—'কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছি।' অনেকক্ষণ বসেই দেখলেন, বললেন,—'এই যে গোলাপি বঙের চিঠিব কাগজটা দেখছ, এটা নিয়েছিলাম উপেনেব কাছ থেকে, চিঠি লিখবাব জন্য।'

—'কাকে?'

—'খিদিবপুবেব শান্তিকে চেন?'

—'না, পুরুষ না মেয়েমানুষ তাও তো বুঝতে পাবলাম না।'

—'কে শান্তি? নাবীজন্ম সার্থক তাব।'

হেবম্ব' কাগজটাব দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে—'কিন্তু চিঠি লেখা তো হল না। লিখলাম কী জান? কতকগুলো নোট টুকলাম।' চুরুটটা মুখেব কাছে তুলে নিয়ে বললেন—'কলকাতায় গিয়ে একটা গল্প লিখব বলে।' চুরুটে অবিশ্যি আগুন ছিল না, নামিয়ে নিয়ে বললেন—'যাক, কাগজটা দেখছি হাবিয়ে যায়নি, এ বড় গভীব আশ্বাসেব কথা।'

—'জীবনে কোনো কাগজই কী কোনোদিন হাবিয়েছে আপনাব?'

—'না।' চুরুটটা জ্বালিয়ে—'তবে পঞ্চাশ বছব অবদি যা লিখেছি তা হাবালেও ক্ষতি ছিল না।'

জেঠিমা—'কেন পঞ্চাশ বছবেব মধ্যে আপনাব বাবো-চোদ্দ খানা খুব চমৎকাব বই তো তৈবি হয়ে গেছে।'

—'হ্যাঁ আপনাদেব কাছে বইগুলো খুব সুন্দব, কিন্তু আমাব কাছে ওব জলেব মূল্যও নেই।' চুরুটে একটান দিয়ে বললেন—'চুরুটটা কোথায় বাখি বলো তো? যেখানেই বাখি সেই জায়গাটা পুড়ে যাবাব সম্ভাবনা।'

—'জানালাব ভিতব দিয়ে ফেলে দিন।'

—'না এখনো ঢেব খাবাব আছে। তোমাব ওই ডিসটা দাও তো।'

জেঠিমা—'ডিসটা সেগুন কাঠেব ওতো দেয়া চলে না।'

উমা হেমন্তেব দিকে ইশাবা কবে তাকাতেই হেমন্ত ডিসটা এগিয়ে দিল।

তাব ওপব চুরুটটা বাখলেন হেবম্ব। সুটকেসেব ডালাটাকে দিয়ে বললেন—'এই কাগজটা আছে না হাবিয়েছে দেখছিলাম তাই।' তাবপব পকেটেব খাতাটা ভালো কবে খুলে নিয়ে বললেন—'এব ভেতব দশ-বাবোটা চিঠি আছে, পঁচিশ-ত্রিশ বছবেব পুবোনো চিঠিও আছে।' এক এক খানা খাম বেব কবে বললেন—'দেখছ উমা, কীবকম অবস্থা এই খামগুলোব, তেল, তামাক, চোখেব জল, পানেব বস, সবই এদেব সাজিয়েছে।' এক একখানা খামেব ভিতব থেকে কুড়ি-পঁচিশ পৃষ্ঠাব চিঠিব কাগজ বেবিয়ে পড়ে।

উমা বললে—'কে লিখেছে এসব মহাভাবত আপনাকে?'

—'কত লোকে লিখেছে।'

—'বাঃ এক একটা পৃষ্ঠাব কাগজও তো বেশ ভাঁজ কবে বেখেছেন দেখছি।'

—'হ্যাঁ ভাঁজ কবে বেখেছি, লাল পেনসিল দিয়ে দাগিয়েছি, পাশে পাশে নিজেব নোট লিখে বেখেছি। এ চিঠিগুলো সব সময়ই আমাব পকেটে থাকে।'

—'কেন?'

—'মানুষদেব পড়ে শোনাই। কলকাতাব ফুটপাথে হাঁটতে হাঁটতে [...] নীচে দাঁড়িয়ে ছোকবাদেব পড়িয়ে শোনাতে বড্ড আবাম পাই। একটা ভিড় জমে যায়।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, আমাব নতুন কবিতাও এমনি কবে বাস্তায় বাস্তায় পড়িয়ে শুনাই মানুষদেব [..] আলোব নীচে দাঁড়িয়ে । মানবজীবনেব এই সমস্ত মূল্যবান জিনিসগুলোকে এই বকম কবে পথে ঘাটেই প্রচাব কবা উচিত। মাসিক পত্রিকাব মাবফত আমাব লেখা তো কতকগুলো শৌখিন লোকেব কাছে গিয়ে পৌঁছায়, আমি সকলকে ডেকে এইসব লেখা পড়িয়ে শোনাই। কলকাতায় এমন ঢেব মানুষ পথে পথে নিস্পৃহ হয়ে ঘোবে। পড়তে পড়তে দেখি, তাদেব মুখ পবিতৃপ্ত, উদাসীনতা ঢেব কমে গেছে, প্রসন্ন মানুষ সব।' জেঠিমাব দিকে তাকিয়ে বললেন—'এটা হচ্ছে [...] মহাবাণীব চিঠি।'

—'তাকি নাকি?'

—'দেখবেন?'

—'ওমা, তাব চিঠি আপনাব কাছে?'

—'মহাবানী মহা চমৎকাব মানুষ। শুনেছি কলকাতায় এসেছেন। আমি যখনই তাঁব সঙ্গে দেখা কবতে যাই, আব সবাইকে বিদায় দিয়ে ড্রয়িংরুমে আমাকে নিয়ে বসেন। ঘণ্টাব পব ঘণ্টা আলাপ।'

উমা—'এইবাব আমি উঠি হেবম্ববাবু।'

—'ওঠো, অনেক তো মালিশ কবলে, চিবিদিন মনে থাকবে।'

—'আমাব হাতেব ব্যথাও চিবিদিন মনে থাকবে আমাব।'

জেঠিমা—'কই দেখি তো মহাবানীব চিঠি।'

জেঠিমাব হাতে তুলে দিয়ে হেবম্ব—'বেশ চিঠি।' বললেন—'যখনই তাঁব সঙ্গে দেখা হয় বলেন একটা কবিতা লিখবেন আমাব নামে, এই ত্রিশ বছব ধবে বলছেন আমাকে, একটু ক্লান্তি বা অতৃপ্তি একবাবও দেখলাম না মুখেব ভিতব, প্রতিটিবাব নবীন প্রসন্ন আগ্রহ।'

—'লিখেছেন কবিতা?'

—'মহাবানীব নামে? না, কোনোদিন বসিনি লিখতে।'

—'কেন?'

—'কালেব মানুষ, দম দেয়া দুঃখ অশ্রু বেদনা আনন্দ তাঁব, কিন্তু আমি তো কলেব মতো বচনা তৈবি কবতে পাবি না, লিখব যা তাব ভিত্তিতে থাকবে মানুষ কিংবা অমানুষ, আগ্রাব উপেন কিংবা খুবদাপুবেব গুপীনাথ—গুপীনাথকে চেন উমা?'

উমা বাথরুমেব থেকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসেছিল, বিছানাব উপব বসে মাথা নেড়ে বললে—না।'

—'একটা অমানুষ।'

জেঠিমা—'বেশ, কী কবেছে?'

— বামুনেব ছেলে, বড বংশেব, দিব্যি চেহাবা, বিএ পাশ কবল, গভর্মেন্টেব ভালো চাকবি কবত, গেল কতকগুলো কুষ্ঠবোগীব সেবা কবতে।

উমা— বেশ তো, এব ভিতব মনুষ্যহীনত্বেব কী আছে হেবম্ববাবু?'

— শোনোই না তাবপব একটি রুগিনী ভালোবাসল তাকে।'

— কাকে?

— গুপীকে। চুরুটটা তুলে নিয়ে জ্বালিয়ে বললে—'গুপীটা আমাকে বললে যে বিনোদিনী আত্মহত্যা কবতে চায়।

জেঠিমা— 'বিনোদিনী কে?'

—'ওই কুষ্ঠ রুগিনীটি। গুপীনাথ যদি তাকে না বিয়ে কবে তাহলে সে আত্মহত্যা কববে। শুনেছেন এবকম পৈশাচিক কথা কোনোদিন?'

জেঠিমা—'গুপীনাথ কী কবল?'

—'আমাব কাছে এল পবামর্শ চাইতে। অনেক কথা শুনে আমি বললাম অত যদি সহানুভূতি থাকে তোমাব যা খুশি তাই কবো গিয়ে। লোকে তোমাকে সব দেবতাব বড় দেবতা বলে পুজো কববে। ছেলেটা এমন অবোধ এক বছবেব মধ্যেই নিজেও কুষ্ঠ বাঁধিয়ে বসল, শুনলাম একটি সন্তানও হয়েছে তাদেব।'

জেঠিমা শিহবিত হয়ে উঠে—'ওমা, কী সর্বনাশ।'

—'গুপীনাথ সেদিন আমাকে বলে, আমাকে যত মূর্খ ভেবেছেন তা আমি নই।' হেবম্ব চুরুটে টান দিয়ে বললেন—'আমি হাত দিয়ে তাকে খানিটকা দূবে সবে দাঁড়াতে বলে বললাম—'কীবকম?' বললে—'বিনোদিনীব সঙ্গে আমাব ছোটবেলাব থেকেই আলাপ। যৌবনেব শেষ পর্যন্ত এই মেয়েটি আমাব বড় ভালোবাসা-আবাধনাব জিনিস ছিল। কে জানে বেচাবীব স্বামীব কুষ্ঠ ছিল কিনা, হতভাগিনীব কুষ্ঠ হবে, কিন্তু হল যখন তখন জীবনস্রোতেব পাশে বসে সবচেয়ে কৃপাব পাত্রদেব দলে সে চলে গেল। এই সময়ই আমি একদিন দেখলাম তাকে, যা সচবাচব হয় আমাবও তাই হল, এই নাবীটিব জন্য বুকেব এক কোণে একটা প্রেম খুঁজে পেলাম না আমি, কিন্তু প্রেম যত কম অনুভূতি সেই পবিমাণেই [...] । কী কবব আব, আব কিছু কবতে পাবলাম না তো আমি।'

হেমন্ত তাকিয়ে দেখল একে একে সবাই চুপ কবে আছ শুধু হের্বম্ব বোঁচকাটা খুলে একবাশ পুবী ও দইবড়া বেব কবে খাচ্ছেন।

দিল্লি স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে এমন সময ভগবানবাবুব দেখা। একদল আফগান ও পাঞ্জাবিদেব ভিড় ঠেলে লম্বা-চওড়া বিবাট কুৎসিত বাঙালি ভদ্রলোকটি একটি সেকেন্ড ক্লাস কামবাব দবজাব হাতল ধবে লাফিযে উঠতে উঠতে বললেন—'কোথায, বানী আছে নাকি এই গাড়িতে?'

—'আছি, আসুন।' বলে মেযেটি এগিযে এসে ভগবানবাবুকে অভ্যর্থনা কবে নিযে ভিতবে বসাল। বললে—'এই জাযগায আপনাব বিছানা কবে দিযেছি।'

—'বেশ কবেছ।'

—'হাওড়া অবদি কোনো ঝামেলা নেই, আপনি নির্বিঘ্নে পা টান কবে ঘুমোতে পাববেন। শোবেন নাকি?'

—'না।' হাতেব সাইড ব্যাগটা বিছানাব একপাশে বেখে কাঁধেব ছোট্ট বেডিংটা ভগবানবাবু গাড়িব এক কিনাবে ছুঁড়ে ফেললেন।

গাড়িব ভিতবে বানীদেব দলেব মহিলা তিনটি, অমূল্যবাবুও ছিল।

অমূল্য বললে—'ভগবানবাবু, বেশ বেশ, এতক্ষণ বসে কবছিলেন কি আপনি, আমবা তো আব একটু হলে চাবিটা বন্ধ কবে দিচ্ছিলাম।'

অমূল্যব দিকে ভ্রুক্ষেপ না কবে ভগবানবাবু—'দিল্লিতে আমি নাদিব শাহব মতো এসেছিলাম, জানো বানী।'

—'এই সাতদিন ধবে চোখেব সামনে দেখলামই তো।'

—'চলে আসছি, তখনো সকলে আমাকে নিযে মোটবে কবে কুতব দেখতে যাবে।'

—'তা দেখেননি বুঝি কুতব?

—'না।'

—'হুমাযুনেব কবব?'

—'শুধু যমুনা দেখলাম। আব ফোর্ট। যদি কোনোদিন গা ঢাকা দিযে আসতে পাবি আবাব দিল্লিতে তাহলে দেখব সব, নচ্ছাব ভিড়েব সঙ্গে হইচই কবে কবে কিছু কি দেখা হয বানী? বেশ বোশেখেব দুপুবটা ছিল—চাবদিকে ঝাঁ ঝাঁ বোদ যেন। যমুনাব যে জাযগায দাঁড়িযে নূবজাহান প্রজাদেব দর্শন দিত, যমুনাব দিকে তাকিযে সে জাযগায অবাক হযে একটু দাঁড়িযেছি গিযে মাত্র। রুহিণীবাবুব স্ত্রী সেই পান জর্দা খেযে বুড়ী এসে কাঁধেব ওপব এক থাবা মেবে বললেন, পান খাবেন, এই ডিবেসুদ্ধ এনেছি। একটা বর্মা-চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে রুহিণীবাবু নিজে এলেন এগিযে, বললেন, আমাব স্ত্রীকে তো আপনি বশ কবে ফেলেছেন দেখছি, মন্ত্রটা কি বলে দিন তো, তোমাদেব অবিনাশ একটা খববেব কাগজ বেব কবে চীন জাপানেব যুদ্ধ যে হল কথা বলতে লাগল ক্রমাগত, এইসব ছোট মানুষ, ছোট কথা, তুচ্ছ ধাবণা, কল্পনা এদেব সম্বল কবে পৃথিবীব কোনো বড় জিনিসেব কাছে গিযে লাভ নেই। বিড়ম্বনা আব বেদনা পেতে হয শুধু।'

অবলা ঠাকুরুন বললেন—'তা কুতবওযালাদেব ফাঁকি দিলেন কী কবে?'

ভগবানবাবু কোনো উত্তব দিলেন না।

সুষমা বললে—'যাক, পালিযে এসে খুব ভালো কবেছেন ভগবানবাবু, এ সাতদিন একটু ভালো কবে আহাব-নিদ্রাও তো হল না আপনাব, শুধু সাহিত্যেব বৈঠক আব সাহিত্যেব বৈঠক। কেন যে তিবিশ বছব ধবে এতসব গল্প-কবিতা লিখতে গিযেছিলেন আপনি, দেখলেন তো হাতে হাতে কতদূব তাব শাস্তি?'

অবলা ঠাকরুন বললেন—'আপনি যে চলে এসেছেন কেউই জানে না হযতো।'

বানী মাথা নেড়ে বললে—'না।'

অমূল্য—'ষড়যন্ত্রটা বানীদিব বুঝি?

অবলা ঠাকরুন—'তাছাড়া আব কাব হবে? বানী বেঁচে থাকতে ভগবানবাবুব কষ্ট নেই—অথচ

আলাপ তো পরস্পরের ভিতর এই সাতটি দিনের মাত্র।'

সুষমা—'যেখানে জমে সেখানে সাত মিনিটেই জমে যায়, যেখানে তা নয় সাতশো বছর একত্র থেকেও রোজ রাতেই নতুন করে মুখ চিনতে হয়।'

অমূল্য অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল এই ভগবানবাবু মানুষটির কি চেহারা, বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে বোধহয়, লম্বা-চওড়া, কালো, মাথায় অজস্র চুল তেলে কচকচ করছে, চোখে পুরু পাথরের চশমা, মুখে সবসময়ই একটা ঈষৎ হাসি লেগে রয়েছে যেন, সমাজ সংস্কার পরিদৃশ্যমান জগৎটাকে সময়ে-অসময়ে অশ্লীলভাবে ঠাট্টা না করে নিলে যেন মুখে অন্ন রোচে না মানুষটির, পায়ে মাদ্রাজি চটিজুতা ভগবানবাবুর গলা খুব লম্বা, খদ্দরের শার্টের উপর গলা জড়িয়ে একপ্রস্থ সুন্দর মাদ্রাজি উড়ানি, পরেছে ঢাকেশ্বরী মিলের শস্তাদরের একটি কাপড়, ছিঁড়েছে, নোংরা হয়ে গেছে। অমূল্যর মনে হল পাঞ্জাবি পেশোয়ারিদের ভিড়ের ভেতর হঠাৎ কেমন কদর্য মনে হয়েছিল, কিন্তু কুৎসিত তো নয় লোকটা, তারপর গল্প-কবিতা-উপন্যাস, মানুষের জীবনের সরসতা জমাতে উনি সিদ্ধহস্ত।

কবি যে চিরযুবক এ কথাটা ভগবানবাবু নিজে মুখে কোনোদিন বলেননি বটে, কিন্তু তার চোখ মুখ ভাবভঙ্গি পর্যালোচনা করতে পারলে বুঝতে পারা যায়, বাস্তবিক এ কথাটা কতদূর সত্য। রক্তমাংসের জীর্ণতা-বিশীর্ণতার নীচে করিব অক্ষয়যৌবন অটুট হযে রযেছে।

ভগবানবাবু—'আমার ব্যাগটা কোথায় গেল? অমূল্য—'এই যে আমার কাছে রয়েছে।

—'তুমি নিয়ে রেখেছ বেশ, দাও তো একটু ঝপ করে দেখে নিই।'

ব্যাগটা খুলতে খুলতে—'আমার ট্রাঙ্কটা কি দিযেছিলে অমূল্য?'

—'না, সঙ্গেই আছে, রানীদি দিতে নিষেধ করলেন।'

—'হ্যাঁ ভালোই করেছে, রানী আমাকে যেমন বোঝে।'

অবলা ঠাকরুন—'কেন, ট্রাঙ্কে এমন কি মহামূল্য জিনিস রযেছে আপনার ভগবানবাবু যে কড়া পাহারাকেও বিশ্বাস হয না?'

ভগবানবাবু—'সেই দরিয়াগঞ্জেব থেকে স্টেশন অবদি আসতে আসতে আমার এই ভয়ই হচ্ছিল শুধু রানী, যে ট্রাঙ্কটা আবার ট্রাঙ্কে গিয়ে না পড়ে। ভাবছিলাম রানীকে তো বলে দেয়া হযনি, সে কি বুঝে উঠবে তো? রাণী মানুষেব অন্তর যেমন চেনে!'

রানীর—'আপনি স্টেশনে থাকলে এটাকে আমি দিযে দিতাম।'

—'কেন?'

—'এমন নোংরা ট্রাঙ্ক সেকেন্ড ক্লাসের উপযুক্ত নয।'

—'ও, সেই কথা! আমি এটাকে নিযে হামেশা ফার্স্ট ক্লাসে চলাফেবা কবি যে। বাস্তবিক প্যাসেঞ্জাররা ভাবে নাকি কিছু, ভাবে হযতো মানুষের টাকা যদি থাকে তাহলে চেহারা বা রুচির কদর্যতাযও কিছু আসে যায না কি বলো?'

রানী—'কিন্তু মানুষদের এইসব ভাবনাকে আঘাত দেবার জন্যই তো আপনাব জন্ম। এই তো আমার তিরিশ বছব বযস, কিন্তু আপনাব সঙ্গে পবিচিত হলাম বলেই এত পাকা বয়সেও আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য হল।'

ভগবানবাবু—'থাক, পাঁচালি নিযে বোসো না রানী।' একটু গলা খাকরে—'বিশেষত মেয়েদের সামনে।'

রানী একটু মুখ টিপে হেসে—'মেযেরা বুঝেছে সব। তারা এমন বোকা নয়।'

ভগবানবাবু চোখ তুলে বললেন—'হ্যাঁ, বোঝা উচিত অন্তত, বুঝলেন অবলা ঠাকরুন রানী বলতে চায় যে এ তিরিশ বযসে আমার মতো কুশ্রী কুৎসিত হতভাগ্য পুরুষ মানুষদের সঙ্গে গাড়ি বিজার্ভ করি যাত্রা করবার দুর্ভাগ্য তার হযই না।'

অবলা ঠাকরুন জিভ কেটে বললেন—'ছি, রানী এ কথা কখনোই ভাবে না, কি বলেন আপনি ভগবানবাবু?'

ভগবানবাবু—'কিন্তু দুর্ভাগ্য এবার যে সাধ করে মাথায় পেতে নিয়েছে। কারণ, মানুষের যত বয়স হয় তত তার অভিজ্ঞতা বাড়ে। রানীর বক্তব্য এই।' বলে ব্যাগটার ভিতর থেকে একটা চুরুট আর দেশলাই বের করলেন। বললেন—'দিল্লিতে আমার সঙ্গে সাতদিনের পরিচয়েই তার জীবনে এই রূপান্তরটুকু

এসেছে। এটাকে সে লাভ বলে মনে করে। জীবন প্রসারিত হল, গভীরতা পেল, দৃষ্টি তাই প্রসন্ন হয়ে উঠল।' চুরুট জ্বালিয়ে বললেন 'ট্রাঙ্কটা হজম হল তাই, ট্রাঙ্কের মানুষটাকেও।' চুরুট টানতে লাগলেন।

অবলা ঠাকরুন—'একটা কথা বলব আপনাকে ভগবানবাবু' কিছু মনে করবেন না?'

বানী—'এই চুরুটটা ফেলে দিতে বলবে তো?'

অবলা ঠাকরুন—'না, ফেলে দিতে না, কিন্তু আমাদের কর্তারা যে অত সিগারেটখোর, আমাদের সুমুখে তারা টানেন না তো।'

—'আচ্ছা নিবিয়ে ফেলছি।'

বানী—'এই তো তিনজন আমরা' আপনার গল্পগাথার নারী। চুরুটটাও চলল না, পদে পদে আরো কত বাধা ও হিসেব-নিকেশ হবে যে তার কি কিছু ঠিক আছে? আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে কোনো পুরুষ-কামরায় গেলে আপনি নিস্তার পেয়ে বাঁচতেন।'

ভগবানবাবু—'ট্রেনের কামরায় তো শুধু নয়, গত তিরিশ বছর ধরে জীবনের কত জায়গায়-বেজায়গায় তোমরাই হয়ে এসেছ আমার সঙ্গী, কখনো চুরুট টানতে দাও কখনো দাও না, কখনো অবৈধ আলোচনা আগ্রহের সঙ্গে শুনতে চাও, কখনো সহানুমোদিত কথা ছাড়া বলতে চাও না। সেদিন অমলার সামনে খেলাম সে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল, পরদিনই হেমদিদির সঙ্গে দেখা, তিনি বললেন, পুরুষমানুষ হয়ে গোঁফ কামিয়েছেন, লজ্জা করে না আপনার' আমার লজ্জা করে না সত্যি, ভয়ও করে না, দুঃখও করে না।' বলে ব্যাগের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন—'এই দেখো বানী, দিল্লীতে একটা কাগজে আমার একটা কবিতা ছাপিয়েছে, কত যে ছাপার ভুল। এইসব দেখলেই দুঃখ করে শুধু আমার, বাস্তবিক বড় দুঃখ করে।' বানীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'আচ্ছা, আমি বরাবর দন্ত স দিয়ে শুরু লিখি কেন এরা 'শুরু' ছাপালে? কি অপরাধ করেছিলাম আমি?' একটু চুপ থেকে বললেন—'এখনো আমি এত আধুনিক হইনি যে কয়ে দীর্ঘ ঈ-কার লিখবার মতো কলমের বানানের জোর থাকবে আমার জীবনে। কিন্তু এই ছোট্ট কুড়ি লাইনের কবিতার ভিতর যেখনেই এরা ক খুঁজে পেয়েছে তারই মাথার উপর দীর্ঘ ঈ-কার দিয়েছে চাপিয়ে, কীরকম বিপদ দেখে তো বানী।'

অমূল্য—'আপনি কোনোদিন 'কী' লেখেন না? কই, তা তো জানতাম না।

—'আমি নিজেও জানতাম না। একদিন একজন আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—'কি ভয়াবহ লিখেছেন অথচ কয়ে দীর্ঘ ঈ-কার দেননি কেন? দিন দিন, শিগগির দিয়ে দিন।

অবলা ঠাকরুন—'দিলেন?'

ভগবানবাবু—'না।'

—'কেন?'

—'রুচি হল না।'

সুষমা—'উনিই একমাত্র বাঙালি সাহিত্যিক যিনি এ বিষয়ে সাবেক খুঁটির আশ্রয়ে আছেন।

অবলা ঠাকরুন—'কিন্তু মতামত তো আপনার অতি নবীনের চেয়েও অবৈধ।'

ভগবানবাবু—'শুধু কি এই, আরো কত কীর্তি করেছে যে আমার কবিতাটা নিয়ে, বুঝলে বানী কোরো, বোলো, চোলো, হোয়ে, দিলো, ছিলো, নিলো, এইসব তো আমি কোনোদিন লিখি না। তুমি বলো, কেন 'ও-কার' দিতে যাব?' তর্ক করতে চাই না। এসব শব্দের পিছনেই সম্পর্ক এইরকম কিন্তু ও-কার বসাতে আমার ভালো লাগে না। অন্যরা যদি বসায় তাহলে উপেক্ষা করে যেতে পারি। কিন্তু আমার পাণ্ডুলিপিতে যেরকম বানান তা ছেটে এরকম বাহাদুরি যারা করল তারা বড় অভাজন।' বলে কাগজটা ভাঁজ করে ব্যাগের এক কিনারে রেখে দিলেন।

বানী—'এতই যখন ভুল তখন অত সন্তর্পণে ওটা ব্যাগের ভিতর রেখে দেবার কি দরকার আপনার ভগবানবাবু?'

অমূল্য—'ছিঁড়ে ফেললেই তো পারেন।'

ভগবানবাবু—'এ কবিতার কোনো কপি আমার কাছে নেই।'

অমূল্য—'দিন না আমি কপি করে দিচ্ছি।'

—'আমার সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ মন্তব্য আছে এই কাগজটার ভিতর, দিল্লি আগ্রায় নেয়া অনেকগুলো ফটোগ্রাফও আছে আমার, কাগজটা ছিঁড়তে চাই না। এটা আমার পক্ষে খুব গভীর আত্মপ্রতারণা হবে

হয়তো, তা জানি। কিন্তু যারা মনে করে আমি ভালো কবিতা-গল্প লিখি বলেই মানুষের স্বভাবতও ভুলে গেছি তারা বড্ড নির্বোধ।'

অবলা ঠাকরুন চুপ করে শুনছিলেন। বললেন—'ঠিকই বলেছেন আপনি, এক একজন খুব বড় সাহিত্যিক হয়, কিংবা বড় দেশসেবক অথবা নানাদিক দিয়েই মহাপুরুষ হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাই বলে দেবতা নন তো।' একটু চুপ থেকে বললেন—'কতকগুলো বানান ভুল রয়েছে বলে আপনি ছেলেমানুষের মতো ন্যাকরা করলেন নিজের ফটো ও প্রশংসা রয়েছে বলে একটা 'ঘুড়ির কাগজ' ছিঁড়তে আপনার মায়া বসে গেল। শত বড় হই, কিন্তু তবুও আমাদের ভিতর এইসব নিঃসম্বলতা ও কদর্যতা বেরিয়ে পড়ে।' একটু হেসে বললেন—'তবুও বলিহারি আপনাকে, যা বোধ করছেন ছেলেমানুষেব মতো প্রকাশ করে ফেলেছেন। ভড়ং করে সত্য চেপে নিয়ে প্রতিবেশীকে প্রবঞ্চনা করবার মতো ইচ্ছা আপনার নেই। বুঝলে সুষমা, আমার মনে হয় ভগবানবাবুর মহত্ত্ব এইখানে। আচ্ছা, কি নিয়ে আপনার কবিতাটা ভগবানবাবু?'

—'দেখুন।' বলে, ভগবানবাবু ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে এগিয়ে দিলেন।

সুষমা হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে বললে—'কই দেখি তো।' খুব আগ্রহ ও রহস্য মেয়েটিব মুখে। কিন্তু কবিতা সে দেখতে গেল না। কবিতাটা প্রথমেই ছিল, একেবারে উপেক্ষা করে পাতা উলটে যেতে লাগল। দিল্লিব খবরাখবরগুলো পড়ল, ভারতীয় সংবাদ পড়ল, ফটোগ্রাফগুলো ঠোঁট কুঁচকে খানিকক্ষণ দেখল। বললে—'মা গো সবই তো কালি! পশ্চিমেব বাঙালিগুলোর পয়সা নেই নাকি? না হলে এরকম বাসি কাগজে কালির চ্যাপমাকে ফটোগ্রাফ বলে চালায়।'

অবলা ঠাকরুন খুব মনোযোগেব সঙ্গে কাবিতাটি পড়ে—'তা এই নাকি আপনার কবিতা?'

—'হয়ে গেল পড়া এর মধ্যে আপনার?' ভগবানবাবু হেসে অবলা ঠাকরুনের দিকে তাকালেন।

অবলা ঠাকরুন—'ছি, এরকম কবিতা লেখা উচিত নয় আপনাব।'

রানী—'অবৈধ হয়েছে বুঝি অবলাদি? তা ভগবানবাবু নিজেই তো বলেছেন খুব সহানুমোদিত মানুষের জীবনেবও ভিতরেব কথাগুলো অবৈধ রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা, কখনো কুশ্রী, কখনো অমৃতেব মতো অপরূপ।'

অবলা ঠাকরুন—'স্বামী তার স্ত্রীটিকে সন্দেহ কবেন, কেউ কাউকে বিশ্বাস কবে না, পবস্পরের মধ্যে না আছে ভালোবাসা, না আছে মনের মিল, এইসব নিয়ে কবিতা।'

রানী—'এই সবই তো পচা গল্পের খোবাক, এ নিয়ে আপনি কাব্য করতে গেলেন, হুমায়ুনের কবর সম্বন্ধে লিখলেই পাবতেন।'

সুষমা—'হুমায়ুনের কবব তো উনি দেখেননি।

রানী—'দেখাব কি দবকাব ছিল! আমাব কাছে জিজ্ঞেস কবলেই আমি জ্ঞাতব্য বলে দিতাম সব, অ্যালবামেব ছবিও দেখিয়ে দিতাম। বাকিটুকু তো কল্পনাব খেলা।'

ভগবানবাবু—'ওরা চেয়েছিল যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে আমি একটা কিছু লিখি।'

অমূল্য—'প্রবন্ধ লিখলেই পারতেন।'

প্রবন্ধ আমার হাতে আসে না।

সুষমা—'কেন, প্রবন্ধ তো আপনি ঢের লিখেছেন।'

রানী—'ছোট গল্প না হয় লিখতেন।'

—'এসব নিয়ে ঢের গল্প লেখা হয়ে গেছে। আমি নিজেই তো কত লিখেছি।'

অমূল্য—'না হয় একটু রং ফলাতেন।'

রানী—'একজন সাহিত্যিককে নিয়ে এরকম পীড়াপীড়ি করা তোমাদের অন্যায়। তাঁর যা ভালো লাগে তিনি তাই তো লিখবেন। খুব বড় লেখক হলেই যে তার সমস্ত লেখায় মর্যাদা গুণ থাকে তা তো নয়। ফরমাজি লেখাব কপালও খারাপ! যখন লিখবার মুড নেই, তখন কি করেই-বা লিখবেন।'

এতক্ষণে সুষমা কবিতাটি দেখছিল, এই জিনিসটা সবচেয়ে গভীর আলোচনা ও কৌতূহলের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন, সকলেই কিছু না কিছু বলছে, সেই-বা বলবার লোভ কি করে বিসর্জন দেয়? কবিতাটি পড়ে সুষমা—'ঠিকই বলেছেন ভগবানবাবু শুরু দেখে হাতির শুঁড়ের কথা মনে হয়, কেন এরকম বানান ভাঙতে যায় ওরা?'

কেউ কোনো উত্তর দিলে না।

—'তারপর 'দিলো' 'ছিলো 'মোরে' 'বোলে' 'হোয়ে' এই যে এক ধরনের নকশা বেরিয়েছে, আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।' কবিতাটি সম্বন্ধে বিশেষ আর কিছু বলবার নেই সুষমার। বললে—'তা মনে কোরো না নীচ, যে এরকম না হয়, এরকম খুব হয়। স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করে, স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করে, সন্দেহ শুধু? কেউ কাউকে ভালোও বাসে না। বাস্তবিক ভালোবাসে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সন্দেহ শুধু। মাঝে মাঝে এমন ঘৃণা করে যে মানুষ শত্রুকেও তত দূর করে না।' ভগবানবাবুর দিকে তাকিয়ে সুষমা—'কিন্তু তবুও একথা ঠিক ভগবানবাবু, যে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনই সত্য, এর ভেতরে শত নির্যাতন পেলেও, বাইরের জগতে পালিয়ে গিয়েও কোনো অমৃত পাওয়া যায় না।' একটা নিশ্বাস ফেলে—'কথাটা কি জানেন? জীবনের দেবতাই ক্ষমাহীন। জীবনটাকে সাজাতে চেষ্টা করলে কি হবে, এটা শুকিয়ে যাবার জন্য তৈরি।'

অমূল্য কবিতাটি পড়ছিল। বললে—'এই যে মৃতের কথা লিখেছেন ভগবানবাবু, ইনি কে?'

সুষমা—'ইনি হচ্ছেন স্ত্রীটির আগেকার প্রণয়ী, আগেই এ প্রেম শুরু হয়ে গেছে, এরকমই হয়!'

রানী মাথা নেড়ে—'না, তা নয়, আমরা যা চাই ভালোবাসতে গিয়ে আমরা যা আকাঙ্ক্ষা করি সেই কম্ম-জিনিসের জন্যও যৌবন আমাদের নিজের মনের ভিতরেই, সাংসারিক জগতে তা মৃত ও নিঃশেষিত।'

অমূল্য—'তার কোনো অস্তিত্ব নেই?'

—'না।'

—'তাও কি সম্ভব?'

—'ইনি তাই বলেন।'

—'তুমি কি তাই বিশ্বাস করো রানীদি?'

রানী একটু হেসে—'কবিতাটির মানে তোমাদের কাছে ভাঙাবার দরকার ছিল, তাই ভাঙালাম, এখন রেখে দাও তো এটা, অনধিকার চর্চা করতে যেও না।' বলে কাগজটা অমূল্যর হাত থেকে তুলে নিয়ে ভগবানবাবুর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রানী।

সুষমা—'কই, তুমি তো রানী, কবিতাটা একবারও পড়ে দেখলে না।'

—'আমি দিল্লিতেই পড়েছি।'

সুষমা—'বোধকরি ভগবানবাবুর পাণ্ডুলিপির থেকে?'

ভগবানবাবু—'আমি এ কবিতাটা রানীর কাছে ডিক্টেট করেছিলাম।'

—'মুখে মুখে!' সুষমা কাঠ হয়ে বললে—'বাপ রে, এ ত কম আশ্চর্য নয়, আপনি মুখে মুখে কবিতা তৈরি করতে পারেন!'

অমূল্য চশমা জোড়া খুলে মুছতে মুছতে—'কতক্ষণ সময় লেগেছিল আপনার?'

রানী—'ঘণ্টা তিনেক, না চার ঘণ্টা ভগবানবাবু?'

—'ওইরকমই।'

—'এই তিরিশ লাইন লিখতে চার ঘণ্টা, তাহলে অবিশ্যি বিমুগ্ধ হবার কিছু নেই, কবিতায় মিলও তো নেই, লাইনগুলো গদ্যের মতোই তো। এত সময় লাগল যে আপনার?'

—'ভেবে লিখতে হয় তো।'

সুষমা—'ও, তাহলে কি আর কবি আপনি! অত ভাবলে আমরাও লিখতে পারি।'

অমূল্য চশমার পাথর মুছে মুছে ঝক ঝক করে নিয়ে বললে—'আমারও অনেক সময় এই কথাই মনে হয় যে একজন বড় লেখক গুণী সমাজ বা দেশের কর্ণধার, এমনি সব নামজাদা মানুষদের জীবনে সাধনা যত আছে, প্রতিভা তত নেই।'

সকলেই চুপ করে রইল।

অমূল্য—'ও, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, এত ছাপার ভুল কেন হয়েছে'

সুষমা—'কেন?'

—'যারা ছাপিয়েছে, তাদের কি দোষ, রানীদি যা লিখে দিয়েছে তাই তো ছাপিয়েছে তারা।'

সুষমা হেসে উঠে—'ওমা, তাই তো! রানী তুমি এইরকম বানান লেখ, 'হোয়ে' 'কোরে' ভগবানবাবুর দিকে তাকিয়ে অমূল্য—'কোথায়-বা রানীদিকে পেলেন আপনি—একেবারে নির্বিবাদ চার ঘন্টা তার সঙ্গে—আমরা তো ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলাম না—'

ভগবানবাবু —'কেন, অনেক লোকই তো ছিল সেখানে।'

অমূল্য—'অনেক লোক! কোথায়?'

—'অক্ষয়বাবুর বাড়ির মজলিশে।'

অমূল্য— 'সেই সন্ধ্যার মজলিশে? সোমবারের কথা বলছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সেই যে সাতটার সময় আরম্ভ হয়েছিল?'

—'আর এগারোটার সময় ভাঙল।'

অমূল্য একটু হতবুদ্ধি হয়ে বললে—'এই চার ঘণ্টার ভিতর এই কবিতাটা তৈরি করলেন আপনি?'

—'হ্যাঁ, এই চারটে ঘণ্টাই লাগল, কি করব সেদিন অনেক বিষয় নিয়েই কথাবার্তা হয়েছিল যে।' একটা হাই তুলে বললেন—'ফাঁকে ফাঁকে যে অবসর পেলাম, রানীকে বলছিলাম, সে টুকে নিল।'

অবলা ঠাকরুন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এইবার খনখন করে উঠে—'ও মা, সত্যি তো অক্ষযবাবুর মজলিশে আমিও তো ছিলাম সেদিন অমূল্য, দেখলাম রানী ভগবানবাবুর ডান দিকে বসে আছে ঠিক হাতের কাছে, একসময় উনি রানীর দিকে মুখ ফিরিযে কি বলছেন যেন রানী লিখে নিচ্ছে, তুমি দেখোনি সুষমা?'

—'আমি ভেবেছিলাম সভাব নোট টুকছে বুঝি।'

—'কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বাদে বাদে তো টোকা, রিপোর্ট কি ওইরকমভাবে টোকা হয! আমার বড় কৌতূহল হয়েছিল রহস্যটা বুঝবার জন্য। জিজ্ঞেস করি করি করেও রানীকে সেদিন হাতের কাছে না পেয়ে জিজ্ঞেস কবতে পারলাম না আব। তাবপর গেলাম ভুলে। ওমা, তা ব্যাপারটা যে এইরকম তা কে বুঝতে পেরেছিল?' ভগবানবাবুর দিকে তাকিযে অবলা ঠাকরুন—'তা আপনারা চিরকালই আমাদের কল্পনার বাইরে। কি করেন, কি ভাবেন, কি উপলব্ধি করেন,—কি কবেই-বা ভাষা খুঁজে পান, এক একটা সম্পূর্ণ জিনিস সৃষ্টি করে বসেন ধাবণাও কবতে পারি না। সেই অক্ষযবাবুব বৈঠকের হল্লার ভিতর এই কবিতাটি তৈরি করলেন আপনি।' চক্ষু স্থির করে ভগবানবাবুর আপাদমস্তকের দিকে তাকিযে অবশেষে দু-হাত জোড় করে একটু হেসে অবলা ঠাকরুন—'আমার প্রসন্ন নমস্কাব গ্রহণ করুন আপনি—আশ্চর্য আপনি, আশ্চর্য—'মাথা হেট কবে ভগবানবাবুকে নমস্কার জানাবার ভঙ্গিটি অবলা ঠাকরুনের চমৎকার হল। একটু চুপ থেকে—'কিন্তু কবিতাটিব বিষযবস্তু নিযে আমাব বড্ড ধোকা আছে ভগবানবাবু।'

অমূল্য—'তা এ নিয়ে কবিব সঙ্গে লড়ালড়ি চলে না তো। দেখতে হয রচনা হিসেবে জিনিসটি মূল্যবান হল কিনা'

সুষমা—'মূল্যবান হযনি অমূল্য?'

—'কি প্রাণের কথাটি বলেছেন ভগবানবাবু।'

অবলা ঠাকরুন মাথা নেড়ে—'দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাব তো একটুও নেই বাচ্চা। প্রেম বলতেও ফক্কুরি বোঝে শুধু। এই চব্বিশ বছর বয়সেই বটিযে বেড়াচ্ছ বিয়ে কবব না, প্রেম মানে দাম্পত্য প্রণয নয, নিত্যনতুন নারী নিয়ে বিচিত্রতা, কত কি! থাক'—ভগবানবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'কিন্তু আমরা যারা পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর জীবনটাকে চালিযে এসেছি, সাংসারিকতার অনেক জেনেছি, আপনার কবিতায বক্তব্যটাকে অন্তঃসারশূন্য মনে হয়।' গলা খাক্‌রে বললেন—'আমার প্রথম স্বামীর কথাই বলি।'

রানী—'অবলা মাসিব দুবার বিয়ে, জানেন না হযতো ভগবানবাবু?'

ভগবানবাবু—'শুনেছি তা আমি। আপনার প্রথম স্বামী এই সেদিন তো মারা গেলেন।'

সুষমা—'না সেদিন এমন নয, দেখতে দেখতে দশ বছর হতে চলল। স্বামী মারা যাবার পর ইনি একজন এঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেছেন।'

অবলা ঠাকরুন—'তিরিশ বছর তার সঙ্গে ঘর কবেছি আমি। ষোলো বছরে আমার হল বিয়ে' একটু চুপ থেকে—'প্রথম স্বামীর কিন্তু আমাদের দাম্পত্যজীবনের শেষের দিকের কথাই বলি। জানেন তো আমার স্বামী বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেছিলেন।'

ভগবানবাবু মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ শুনেছি।'

—'কিন্তু কোর্টে একদিনও প্র্যাকটিশ করেননি। তার ধারণা ছিল ওকালতি করলে মানুষের চরিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।'একটা নিশ্বাস ফেলে—'এইরকম চরিত্রবান স্বামীর বধূ ছিলাম আমি। একদিনও আমাদের ঝগড়া হয়নি আপনি যে লিখেছেন পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করে, সে সন্দেহের ব্যাপারটা আমার মনে একটুও ছিল না—কি করেই-বা থাকবে? জানতাম যে পৃথিবীতে আমার স্বামী আমাকে যতখানি ভালোবাসেন কাউকেই ততটা ভালোবাসেন না আর।'

অমূল্য—'এই আপনি জানতেন বুঝি? কিন্তু আপনার এই সরলতার জন্য কবি দায়ী নয় তো।'

অবলা ঠাকরুন—'চুপ করো ভাই অমূল্য, একটা সুন্দর জিনিস বলছি, কেন খিঁচড়ে দিচ্ছ?' ভগবানবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'এই গেল আমার কথা। নিজে তিনি প্রেমের কথা ভাবতে গিয়েও পাকা বিষয়ী মন নিয়ে জিনিসটা পর্যালোচনা করে দেখতেন কিনা। কাজেই কেমন একটু আধটু সন্দেহ করতেন আমাকে।'

সকলেই চুপ করে ছিল।

ভগবানবাবু—'সেই সন্দেহ তো ফলল।'

অবলা ঠাকরুন আরক্ত মুখে বললেন—'এইরকম কথা বলেন আপনি!'

অমূল্য—'কেন মিথ্যে তো বলেননি।'

অবলা ঠাকরুন—'থাক, লোকের দুর্নামে কিছু আসে যায় না ভাই অমূল্য, অন্তরে খাঁটি থাকলেই হল। আমার প্রথম স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্যস্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।'

অমূল্য—'কপালে যে সিঁদুর পরেছেন সে কি তার স্মৃতির উদ্দেশে? তিনি মরে গেলে সিঁদুর তো মুছে ফেলেছিলেন একবার।'

অবলা ঠাকরুন—'তর্ক আমি করতে পারব না ভাই অমূল্য, তর্কের মানুষ আমি নই। আমি বুঝি শুধু প্রেম-বিচ্ছেদের আনন্দ ও বেদনার আন্তরিকতাটুকু।'

খুব খাঁটি কথা, তর্ক কেউ করতে গেল না আর।

শুধু রানী বললে—'একথাও জানবেন ভগবানবাবু, দ্বিতীয় স্বামীকেও অবলা ঠাকরুন ঠিক তেমনি একনিষ্ঠের সঙ্গে পুজো করে আসছেন।'

অমূল্য—'এক হিসাবে অবলাদি তুমি আমাদের সকলেব উপরে। জীবনে তাই তুমি আমাদেব সকলের চেয়ে সুখী হযে গেলে। মনেব ভিতর তোমাব অবসাদ নেই, সন্দেহ নেই, প্রশ্ন নেই, সাংসারিক সচ্ছলতা ও স্থূলতা তুমি চাও, পাও, পেযে তৃপ্ত হও, পৃথিবীর সব মানুষই যদি তোমাব মতো হত তাহলে বিধাতার কাজ ঢের সহজ হযে যেত। বৈষযিক আড়ম্বব ও সংসাবেব সাধ মহিলাদেব সাধ মিটযেই মানুষকে তৃপ্ত করে বাখতে পাবতেন তিনি। মানবমনের ভিতর নানারকম অপ্রাসঙ্গিক মবীচিকা, মাযা, নক্ষত্র, স্বর্গ ও নরকের জন্য লোভ দেখে এরকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হযে থাকতে হত না তাকে।'

অবলা ঠাকরুন—'বুঝলেন ভগবানবাবু, ঘটকালি করে বিয়ে হযনি তো, বিযে কবেছিলাম ভালোবেসে।'

সুষমা—'তাই নাকি?'

—'ও মা, তা তুমি জানো না সুষমা, সেই তিরিশ বছব আগের কথা মনে পড়ে আজও দেখলাম লম্বা চওড়া সুপুরুষ ব্যরিস্টার যুবার মস্তবড় ব্যরিস্টারের ছেলে বাবা ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলছেন, দেখেই ভালোবেসে ফেললাম, বাবা আমাকে ডাকলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন, দেখলাম অপরপক্ষও মুগ্ধ।'

সুষমা—'তারপর?'

—'তারপর বিয়ে হযে গেল।' অবলা ঠাকরুন—'জানো ভাই অমূল্য, তিনি আমার নামে কবিতাও লিখতেন।'

সুষমা—'আছে অবলাদি সে সব কবিতা তোমার কাছে?''

অবলা ঠাকরুন ঘাড় নেড়ে—'আছে ভাই, সিল্কের ফিতে দিয়ে বেঁধে রেখেছি, ভেলভেটের বাক্সটার মধ্যে।'

সুষমা—'দেখাবে আমাদের?'

—'সময় মতো গিয়ে দেখলেই পার। তিনি কিন্তু কাউকে দেখাতে নিষেধ করেছিলেন।'

সুষমা নিস্তব্ধ হয়ে রইল। বললে—'তবে থাক।'

অবলা ঠাকরুন—'তিনি বড্ড খাটতেন। কোর্টে যেতেন না। বাপের মস্তবড় এস্টেট সেইসবই দেখতেন বসে বসে। এস্টেটের পিছনে প্রাণপাত করেছিলেন, কিন্তু তবুও সব কি করে যে খোয়া গেল বুঝতে পারলাম না, মরলে পর দেখা গেল পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনা।'

সুষমা—'আপনার স্বামীর?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু জবাবদিহি দিতে হবে তো আমাকে। সম্পত্তি বিক্রি করেছিলাম তাই। তারপর আর কিছু রইল না' বলে জানলাব ভিতর দিয়ে দুই মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন অবলা ঠাকরুন।—'ভগবানবাবু, স্বামী আমার কীসে মারা গেলেন জানেন? বেশি খেটে খেটে। হার্ট ডাইলেট করল, শুতে পারতেন না, সে সমস্ত সময় আরাম-চেযারে বসে থাকতে হত। হাতেব কাছে কতকগুলো বই থাকত, প্রায়ই আমি পড়ে পড়ে শোনাতাম তাকে। প্রাযই ধর্মপুস্তক, সাধু-পুরুষেব জীবনী, পবলোকেব কথা, আহা মাটির মানুষ ছিলেন।--শুধু একটা দোষ, নারীর চরিত্রেব একনিষ্ঠতাকে বিশ্বাস করতেন না।'

গাড়ি কি একটা স্টেশনে খানিকটা থেমে আবার চলতে লাগল।

অবলা ঠাকরুন—'এই জন্য আমি বড্ড বেদনা পেতাম। তাঁর সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে কোনোদিনও কোনো পুরুষের সঙ্গে ছিলাম না আমি। তবুও তিনি বিবসমুখে সর্বদাই বলতেন এ পৃথিবীতে কারু ওপর কারু অধিকার নেই, যে সুন্দর সেই আত্মপব সুন্দবী নারীব ভবিষ্যৎ একটা ভযাবহ রহস্যেব জিনিস ইত্যাদি।—এইসব বলতে বলতেই তিনি মারা গেলেন।' অবলা ঠাকরুন একটু চুপ কবে থেকে—'তাবপর তো'-—চুপ করে রইলেন।

ভগবানবাবু ব্যাগটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছিলেন। চোখ তুলে তাকিয়ে—'রানী, সূচ-সুতো পাচ্ছি না তো।'

—'কি হবে?'

—'এই জামাটা সেলাই কবব।'

—'কি দরকার?'

—'বসে বসে থেকেই-বা কি লাভ?'

—'অবলাদির কথা শুনুন, এখনো ঘুমোয়নি।'

অবলা ঠাকরুন মাথা নেড়ে—'না, আমাব যা বলবাব তা শেষ হযে গেছে, ভগবানবাবু, আপনি সেলাই কবতে পারেন।'

সূচ-সুতো পাওয়া গেল অবশেষে, রানী এমন জাযগায বেখেছিল যেত খুঁজে পাওয়া মুশকিল, রানী এসে বের করে দিয়ে গেল।

ভদ্রলোক সেলাই করতে লাগলেন।

সুষমা—'আমাকে দিন না, আমি সেলাই করে দেই।'

অবলা ঠাকরুন—'বুঝলেন ভগবানবাবু, ব্যাবিস্টার সাহেবেরও ঠিক এই আপনার মতো রকম ছিল। মাঝে মাঝে তিনিও এমনি সেলাইযের পাট নিযে বসতেন, কিন্তু সেসব হত আমার ওপর অভিমান করে। আপনার তো কোনো স্ত্রী নেই, প্রণযপাত্রী নেই, আপনি যে বড় সেলাই করতে বসলেন?'

ভগবানবাবু—'কেউ নেই বলেই কাজটা নিজেকে কবে নিতে হচ্ছে।'

অবলা ঠাকরুন—'নভেল আছে আপনার কাছে?"

—'আছে।'

—'দিন তো আমাকে একখানা।'

—'রানী, ওঁকে আমার একখানা উপন্যাস দাও তো।'

অবলা ঠাকরুন—'আপনাব লেখা?'

—'হ্যাঁ।'

—'না, আমি চেয়েছিলাম অন্য কোনো নভেল।'

—'বাংলা?'

—'না, ইংরেজি।'

—'গাড়ি তো শিগ্‌গিরই আগ্রায থামবে, হুইলারের দোকান থেকে কিনে দেয়া যাবে দু-একখানা।'

ভগবানবাবু ঘাড় হেঁট করে সেলাই করে চলেছিলেন।

অমূল্য চশমা জোড়া খুলে মুছতে মুছতে—'শত চেষ্টা করেও চা াতে পারা যায় না ভগবানবাবু, মানুষের ওপর অভিমান করেই মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে আপনার মতো এরকম ঘাড় গুঁজে প্রাণহীনভাবে সেলাই করে চলে। দিন না, জামাটা রানীদির কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিন, যার যা কাজ সে তা আপনার চেয়ে ঢের ভালোবেসে করবে। আপনাদের দুজনের ভিতর এ গুমর ভাঙলে আমরাও বাঁচি।'

অবলা ঠাকরুন একটু হেসে—'ঠিকই বলেছ ভাই অমূল্য, তুমি এত বোঝো অথচ প্রেমও স্বীকার করো না, দাম্পত্যও না, তুমি—'

অমূল্য—'এই পনেরো মিনিট ধরে রানী ছটফট করে হয়রান হয়ে গেল, আপনি অনুভূতি ও উপলব্ধির কারবার করে এত বড় হলেন, অথচ এ মানুষটির দিকে তাকিয়েও দেখলেন না।'

রানী—'চুপ করো অমূল্য। দিল্লিতে দরিয়াগঞ্জের একটি পাঞ্জাবি মেয়েমানুষ ভগবানবাবুর জামাকাপড় সব সেলাই করে দেবে বলেছিল, দিতও, মেয়েটি এর গল্পের নারী যে! কিন্তু সৎনাম সিং না কে এসে মেয়েটিকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল। সেই থেকে কবির জীবনে প্রেম নেই আর, কল্পনা নেই, সাহসও কমে গেছে যেন ঢের। রানীর সঙ্গে কবির কোনো সম্পর্ক নেই।'

অমূল্য—'এ কবেকার কথা রানী?'

—'কালকের।'

—'কালকেই দেখা হয়েছিল?'

—'দেখা বিদায় সমস্ত।'

ভগবানবাবু ধীরে ধীরে মুখ তুলে—'একথা তোমাকে কে বলেছে রানী?'

—'দিল্লিতে কে না জানে!'

—'খুব কলঙ্ক রটেছে বুঝি?'

অবলা ঠাকরুন—'ঘাবড়াবেন না ভগবানবাবু, কবিদেব জীবনে এইরকমই হয়ে থাকে।'

ভগবানবাবু—'সৎনাম সিং কলকাতার একজন মোটর ড্রাইভার, আমি বিশ বছর ধরে তাকে চিনি। পাঞ্জাবি মেয়ে মানুষটিকে সৎনাম ভাগিয়ে নেযনি, মেয়েটি বিধবাও নয়, সৎনামেরই মেয়ে। তার স্বামীটা একটা অমানুষ, দরিয়ায় থাকে। মেয়েটার জীবনটাকে একটা নরক করে তুলেছে। কাল সকালে চন্দ্রাবতী আমার কাপড় সেলাই করেছিল। অক্ষয়বাবুর ভাই নবীন এসেছিল তখন। সৎনাম গলা ছেড়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িযে পাঞ্জাবিসুলভ পৌরুষের সঙ্গে জামাইযের কথা বলতে গিযে হম্বাচম্বা কবছিল। আমাকে নিযে একটা গল্পের সাজসজ্জা চলেছে বুঝি?' একটু চুপ করে থেকে—'সৎনামকে আমি বলেছি, মেয়েটিকে নিয়ে লাহোরে চলে যেতে। কালই চলে গেছে তারা। জীবনের এই পঞ্চাশটা বছর এই তো বসে বসে করি আমি। কবিতা লিখি, গল্প লিখি এর ওর মোড়লি করে ফিরি। বাজারে আমাব নামে প্রেম কলঙ্কের যে গল্পগুলো চলে তার একটাও সত্যি হয়ে আমার বাস্তবজীবনে ফলে উঠুক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি।'

অমূল্য তাকিযে দেখল, রানী ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঐকান্তিক অতীত

ববদাবাবু হেডমাষ্টাব আমাকে বললেন—'নীচেব ক্লাসে পড়াতে হবে আপনাকে।'

—'ক্লাস এইট-সেভেন।'

—'না, না, না একেবাবে নীচেব দিকেব ক্লাসগুলো। এই ক্লাস ওযান টু থ্রি-ফাইভ সিক্সও পড়াতে পাবেন।'

একটু সমীহ কবে বললাম—'আমি তো এমএ।'

—'তা আমি জানি।'একটু গলা খাক্‌বে—'না জেনেশুনে চোখ বুজে আমি কাজ কবি, তা মনে কববেন না।'

—'কাঁচা এমএও তো নই।'

—'সব জানি আপনি নাইনটিন টোযেন্টি টুতে পাশ কবেছিলেন, তাই না?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আব এখন নাইনটিন থার্টি থ্রি, এই তো বলতে চান আপনি?'

চুপ কবেছিলাম।

ববদাবাবু—'বলতে চান যে আপনি বাবো বছবেব পাকা এমএ, কেমন, এই না?'

একটু মাথা নেড়ে নিস্তব্ধ হলাম।

—'কিন্তু বছবেব পব বছব গড়িযে গেলেই তো শুধু হয না, এই বাবো বছব কী কবেছিলেন, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস কবি?'

এবাবও চুপ কবে বইলাম।

ববদাবাবু—'বলি, কোনো ইস্কুলে ছিলেন?'

একটু অভিমানেব সঙ্গে—'পাশ কবেই আমি একটা কলেজে কাজ পেযেছিলাম।'

ববদাবাবু গ্রাহ্যও কবলেন না, যেন কথাটা কানে যাযনি তাঁব। কাগজেব দিকে চোখ বেখে বললেন—'কোন ক্লাস না আপনি?'

—'সেকেন্ড ক্লাস।'

—'কলেজে তাহলে খাতিবে ঢুকেছিলেন।'

কোনো জবাব দিলাম না।—'হ্যাঁ, এমনি খাতিবে ঢেব অপাত্র ঢুকে যায, কোন কলেজ বলুন তো।'

—'থাক।'

—'থাক গে চুলোয যাক, জাহাজেব খবব দিযে আমাদেব কি হবে।' একটু চুপ থেকে—'মফস্বলেব কোনো কলেজ বোধ হয, আপনাব শ্বশুব কিংবা সম্বন্ধীব কোনো হাত আছে?'

না, উত্তব দিলাম না।

ববদাবাবু—'এই বকমই তো হয। তা কী আব আমি আঁচ কবতে পাবি না, কত অভাজন উতবে যায। কলেজে কাজ! বেশ গালভবা কথা! কোনো ববণটবণ নেই, একেবাবে খাঁটি কথা কী বলেন?' দাড়িতে হাত বুলিযে—'কী কাজ কবতেন কলেজে? লাইব্রেবিযান?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তাহলে কেবানি?'

—'লেকচাবাব ছিলাম।'

একটু চুপ থেকে—'কলেজটা তাহলে খুব ডাকসাইটে বলুন।'

—'না, এমন মিনমিনেও নয।'

—'টিকে আছে এখনো?'

—'আছে তো।'

—'বেশ বেশ থাকলেই ভালো। ছোট মানুষ আমবা, বড় ঘবেব বড় কথা দিযে আমাদেব কী দবকাব।' ববদাবাবু—'তা কলেজেব কাজ গেল যে বড়?'

—'টেম্পবাবি কাজে ছিলাম।'

—'তা, পাকল না যে? একদিনেই তো আস্তে আস্তে পেকে যায, এই তো নিযম।'

—'একজনেব বদলে গিযেছিলাম।'

—'কাব বদলে?'

—'আপনি কি চিনবেন। শ্রীধব সাহা বলে একজন লেকচাবাব।'

—'থাক থাক, তিনি কোথায গিযেছিলেন।'

—'বিলেতে।'

—'কী কবতে?'

—'স্টাডি লিভে।'

—'সে আবাব কি?'

—'একটা ডিগ্রি নিযে এলেন আব কি।'

—'কোথেকে?'

—'লন্ডনেব ডিগ্রি।'

—'এমএ বুঝি?।

—'পিএইচ-ডি।'

—'থাক, ঘোড়া ডিঙিযে ঘাস খায যাবা তাদেব জাত আলাদা। তাদেব সঙ্গে আমাদেব জীবনপ্রণালীব কোথাও কোনো মিল নেই তো বে বাপু' তা বদলি কাজ কদিন কবেছিলেন?'

—'প্রায দু বছব।'

—'বেশ।' একটু চুপ থেকে—'ইংবেজিব লেকচাবাব ছিলেন বুঝি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তা আমি আগেই এঁচেছিলাম।'

—'কীবকম?'

—'ফাঁকি দেযাব মতো এমন জিনিস তো আব নেই। কযেকখানা নোট নেড়েচেড়ে ঝেড়ে দিলেই হল। আমাদেব এই ইস্কুলেব অনেক কটি এমএ আছেন, ভেবেছিলাম বিদ্যাবুদ্ধিব পবিচয পাব। কিন্তু কই' ব্যাপাবটা হল আজকালকাব পৃথিবীটা বড় ফোঁপবা হযে গেছে। না আছে সাবেককালেব সেই শ্রদ্ধাসম্ভ্রম, না আছে জীবনেব গুরুত্ব। তবুও যদি জ্ঞানেব সাববত্তা থাকত। কিন্তু কই, তাও অচল।'

ববদাবাবু—'তা কলেজ থেকে তাড়া খেযে কোথায গেলেন?

—'কিছুদিন ল পড়লাম।'

—'তা উকিল হলেই পাবতেন।'

—'মুরুব্বি জোটাতে পাবলাম না'।'

—'আপনাব বাবাব জাতব্যবসা কী?'

—'জাত ব্যবসা বলে কিছু ছিল না তাঁব।

—'বেঁচে নেই?'

—'কে বাবা? প্রায বছব পনেবো হল মাবা গেছেন।'

—'কী কবতেন?

—'সার্ভে ডিপার্টমেন্টে কাজ কবতেন।'

—'তাহলে অঙ্কে খুব মাথা ছিল?'

—'এই একবকম।'

—'না, অঙ্কে যাদেব থাকতি তাবা জবিপে সুবিধা পান না।'

একটু হেসে—কতটুকুই-বা অঙ্ক লাগে।'

—'আপনি বুঝছেন না পাটিগণিতে টেস্ট না থাকলে এসব কাজ কারু হযও না, কেউ কবতেও পাবে না।' একটু চুপ থেকে—'ও সার্ভে ডিপার্টমেন্টে, বেশ বেশ, তা কেবানিগিবিব চেযে ঢেব সম্মানেব

কাজ, সাহসেরও দরকার।'

—'সাহস অবিশ্যি এমন বিশেষ কিছু—'

—'আপনি জানেন না খুব নির্ভীকতার দরকার, কত লোককে বাঘে খেয়ে ফেলে।'

—'কিন্তু'—

—'আপনার বাবা কীসে মারা গেলেন! অপমৃত্যু তো হয়নি? শুধু কি জানোয়ার, ভূতের হাতেও মবে মানুষ জরিপ করতে গিয়ে।'

বিশুষ্কভাবে একটু হাসতেই বরদাবাবু—'আপনি বুঝি বিশ্বাস কবেন না?'

—'ভূত?'

—'হ্যাঁ।'

—'কই, দেখিনি তো কোনোদিন।'

—'আমিও দেখিনি। তাদেব অস্তিত্বও হযতো নেই। কিন্তু আমাদের মনে বিভীষিকা তাদেব বানিয়ে তোলে।' বরদাবাবু—ঝিল-জঙ্গলের মতো নিস্তব্ধ জাযগায, একটু অন্ধকার হলে আমবাই তাদেব সৃষ্টি করি।'

—'তা অবিশ্যি সম্ভব।'

—'এরকম অভিজ্ঞতা, আপনাব বোধকরি নেই।'

—'না ববাবর শহবেই থাকি।'

—'পাড়া গাঁ অঞ্চলে যাননি কোনোদিন?'

—'বড় বিশেষ যাওযা পড়ে না।'

—'এক আধবাব যাবেন।'

—'কেন?'

—'গিযে দেখুন বিভীষিকাকে জয করতে পারেন কিনা।'

—'তা হযতো পারব।'

—'তা পাবতে পাবেন। সাহস থাকলেই যে তা খুব ভালো তা নয। যাদেব কল্পনা নেই, সাহস কবা তাদেব পক্ষে বরং সোজা। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ মানুষ যখন ভযকে অগ্রাহ্য কবতে পারে, তখন অনেকখানি ভিতবেব সম্বলের দবকাব।'

ভাবছিলাম।

—'ববদাবাবু—'পাড়াগাঁব মাঠ বিল ধানখেত পোযালগাদা গিয়ে একবকম জ্যোৎস্না আছে। কল্পনাব চোখ দিয়ে দেখি, ভাবী সুন্দব লাগে, কিন্তু সেই কল্পনা আবাব বড় চালাক কবে তাকাতে তাকাতে কেমন মনে হয যেন শাদা শাড়ি পরে কে এক প্রেতিনী চলেছে। খানিক চলছে, থামছে, চলছে, থমকে দাঁড়ালে ভুস করে মিলিযে গেল—এই আবাব শাড়িব আঁচল।' ববদাবাবু হঠাৎ থেমে বললেন—' যাক বড্ড অপ্রাসঙ্গিকতা। না, এসব কথা আপনাদের সঙ্গে চলে না, তা আপনাব বাবা কীসে মরে গেলেন?'

—'ডাইবেটিসে।'

—'ডাইবেটিস! ও, সে তো আমারও আছে, না আছে কাব?' একটা নিশ্বাস বদলে বরদাবাবু—'কোথায়ই-বা বিল জঙ্গলেব জ্যোৎস্না অন্ধকাব উপলব্ধি? যাতনা ও অবসাদ কোথাযই-বা। তা ডাইবেটিসে গেলেন, খুব অল্প বযসেই তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'মরবার সময বযস কত হযে ছিল?'

—'ছেচল্লিশ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ববদাবাবু—'ইংরেজিতে আপনি এমএ দিতে গেলেন কেন?'

—'দিলাম তো'

—' [...] ভালোই লাগে?'

—'ডেভিড কপারফিল্ডের খুব নাম আছে শুনেছিলাম। তাই শুরু করেছিলাম পড়তে।'

—'তারপর?'

—'নানারকম হিড়িকে বইখানা শেষ করতে পারলাম না আব।'

—'তাব মানে ডিকেন্স ভালো লাগে না আপনাব?'

—'অনেক তো নতুন বই বেবিযে গেছে।'

—'ডিকেন্স ভিড়ে চাপা পড়ে গেছে বুঝি?'

—'তাই তো মনে হয।'

—'ডিকেন্সেব নভেলগুলো পড়েছেন?'

—'না।'

—'টেনিশনেব কবিতা কেমন লাগে?'

—'বিশেষ তৃপ্তি পাই না।'

—'কাব কবিতা ভালো লাগে আপনাব?'

—'আমি অবিশ্যি বলব না, লবেন্সেব কবিতা সবচেযে—

—'লবেন্স কে?'

—'পুবো নাম কি বলুন তো?'

—'ডি, এইচ লবেন্স।'

একটু ভেবে ববদাবাবু—'ভিক্টোবিযান?'

—'না।'

এলিজাবেথেব সমযেব। অনেক গুলিখোব জন্মেছিল তখন। লিখেও গেছেন।'

—'না, এই সেদিন মাবা গেলেন লবেন্স।'

—'ইংবেজি সাহিত্যকে ধন্য কবেছে হযতো বাড়িব ভিতব ল্যাদা ঢুকিযে।'

—'কে? লবেন্স?'

—'থাক, এদেব কথা যত কম বলা যায ততই ভালো। নভেল বলুন, কবিতা বলুন স্কটই লিখে গেছেন সব। তাবপব আব কিছু হযনি ইংবেজি সাহিত্যে। ডিকেন্সকে অবিশ্যি ধবতে পাবা যায, কিন্তু সে তো নভেলেব দিক দিযে।'

'ইংবেজি কবিতা [...] পব আব কিছু বেব হযনি।' ববদাবাবু দাঁত মুখ খেঁচে— 'বেরুবেই-বা কি, একটা জাতিব উদ্যম ও প্রতিভা তো অনন্তকাল টিকতে পাবে না, অবসন্ন হযে আসে।'

—'তা ঠিক।'

—'ঠিক, বড় ঠিক।'

—'অনেকে কিন্তু এলিযটকে শেকসপিযবেব ওপবেও জাযগা দিচ্ছে।'

—'এলিযট কে? [...] এলিযটেব কথা বলছ?'

—'না, টি এস এলিযট।'

—'তিনি পুরুষ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'ই এলিযেট তো মেযেমানুষ, নিজেকে ভাঙালেন। জানেন না তো, ই এলিযটেব ভাই।'

মাথা নেড়ে-'জানি, [...] সেই বকম।'

[...] চিনি বে বাপু। আজকাল কত উল্লুকও লিখছে।'

—'আজ্ঞে না, ইনি বেঁচে আছেন, এখনো লিখছেন।'

—'থাক, তুমি বড় একটা ভুল কবেছ।'

নিস্তব্ধভাবে নখ খুঁটছিলাম।

ববদাবাবু—'তোমাব বাবা যখন পাকা জবিপওযালা ছিলেন তখন তোমাদেব বংশেব ধাবা অঙ্কেব দিকেই। দেখো, সাহিত্য বড় কঠিন জিনিস, আমি ববাবব এব সাধনা কবে এসেছি, বিধাতা যথেষ্ট রুচি বিচাব দিযেছিলেন, নিজেব একাগ্রতাও আমাব অনেক। এই সব সম্বল নিযেই প্রায ত্রিশবছব ধবে আমি সাহিত্যেব চর্চা কবে আসছি [...] এব নোট লিখেছি, [...] এব নোট লিখেছি, [...] এব নোট লিখেছি।'

চুপ কবেছিলাম।

ববদাবাবু—'এই ত্রিশ বছব সাধানায আমাব প্রায গোটা পঁচিশেক ভালো দবেব নোট তৈবি হযে গেছে।' বরদাবাবু একটু চুপ থেকে—'বাজাবে খুব কাটে।' আমাব নিস্তব্ধ মুখেব দিকে তাকিযে—'হ্যাঁ

যা বলছিলাম, ভুল বুঝে সাহিত্যের জীবন গ্রহণ করতে যেও না তুমি, ও ভারী ক্ষমাহীন পথ। টেস্ট থাকা চাই, কিন্তু সকলের তো তা থাকে না। ভগবান যাদের ওপর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাদেরই সাহিত্যিক শক্তি থাকে। শুধু শক্তি থাকলেও তো হল না। আপ্রাণ ঐকান্তিকতারও বড় দরকার। সারাদিন ইস্কুল খেটে রাত্তিরে মানুষ চায় একটু বিশ্রাম । কিন্তু নিজেকে ওরকম রেহাই দিলে সাহিত্যের সফলতা হয় না। মন বড় একনিষ্ঠ করে নেয়া চাই। রাতের পর রাত জেগে ডিকশেনারি উলটেপালটে গ্রামের ঘেঁটে রেফারেন্স নেড়েচেড়ে মাসের পর মাস খেটে তবে একখানা সফল নোট বা ম্যানুয়াল তৈরি হয়। সাহিত্যের সেবা এই রকমই মারাত্মক জিনিস। আমি একজন বড় ভুক্তভোগী। তবে ব্যর্থতা পাইনি, তা আমার সাধনা ছিল বলে, বিধাতা দয়া করে প্রতিভা দিয়েছিলেন বলে। সাহিত্যের জীবনে তাই আমি চরিতার্থ। আমার [...] নোট খানা দেখেছ?'

—'না।'

—'দেখো। বেশ উঁচুদরের জিনিস হয়েছে।'

—'কবে লিখেছিলেন?।

—'এই তো চার-পাঁচ দিন হল শেষ হয়েছে, আমি যত কিছু রচনা করেছি তার মধ্যে এই বইখানাই সবচেয়ে গভীর প্রতিষ্ঠা পাবে।'

অবাক হয়েই ভাবছিলাম, এ লোকটি কোন দেশে থাকে, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্যিক জীবন সাহিত্য সাধনা বলতে [...] একখানা নোট, তা যত ভালোই হোক, তার কথা কেউ কি ভাবে!

চুপ করে বসেছিলাম।

বরদাবাবু-হ্যাঁ [...] ভালো লাগল না, স্কট পড়তে পারলে না, ডিকেন্স বিভ্রম বোধ হল, ইংরেজিতে এমএ দিতে গিয়ে তুমি করলে একটা ঝকমারি। খুব ভালো জরিপের মাথা ছিল তোমর বাবার, তোমাবও অঙ্কেই খুলে যেত। আমার মনে হয় এখনো পাটিগণিতের একখানা বই লিখলে পারো।'

দেখলাম 'আপনি' খসে গেলে 'তুমি' ধরলেন। একটু বিস্মিত হয়ে বললাম—'কে, আমি?'

—'যাদব চক্রবর্তীর মতন হবে না অবিশ্যি কিন্তু তবুও চুনোপুঁটিদেব চেয়ে ঢের ভালো হবে। একটা হাই তুলে বললেন—'আইন নিলে না, ভালোই করেছ। তোমাদেব বংশে কেউ কোনোদিন উকিল ছিল না বুঝি?'

—'না।'

—'তবে আর কেন বিড়ম্বনা? এক-একটা পরিবাবের এক-একরকম ধাত থাকে।'

—'আমাবও তাই মনে হয়?

—'হ্যাঁ, বংশ পরম্পর এক-একটা বিশেষ বকম আবহাওযার সৃষ্টি হয। কোনো পরিবার ওকালতি করে, কোনোটা ডাক্তাবির, কেরানিগিরি, ব্যবসা। নিজেদের ধাতেব বাইরে গিযে লাভ নেই, বড্ড আর্থিক ক্ষতি, মনেরও অবসাদ। অবিশ্যি প্রতিভা যাদের আছে।' চশমা জোড়া খুলে মুছে নিলেন একবার বরদাবাবু। তারপর চোখে এঁটে বললেন—'এই দেখো আমি, আমি অবিশ্যি উকিল হলেও পারতাম। অনেক সময় আফশোস হয বড়, টাকার দিক দিযে সে বড় লাভের জীবন ছিল।' একটা নিশ্বাস ফেলে—'কিন্তু ন্যায় ধর্মসংগত জীবন চুলোয় যেত। না, টাকা সব নয। শরীরটা আমকাঠে চড়বে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জল জল করে ঘুরে মবব। টাকা তখন খোলামকুঁচিরও অধম। মানুষকে শেষ পর্যন্ত রাখে তার ধর্ম।' একটু চুপ থেকে—'কিন্তু বিষয-আশয়ের কথা বলতে গেলে এটা খুব বলতে পাবা যায এই যে [...] নোট লিখছি যে দরেব শক্তিসাধনা লেগেছে তাতে সেগুলোকে অন্যদিকে চালালে [...] [...] মোকদ্দমায় খুব নাম করতে পারতাম। অনেক সময়ই এই সব কথা ভাবি আমি। মুনসেফও তো হতে পারতাম আমি। হলে এতদিনে দাযরার জজও হওয়া যেত, যাক'—আমার দিকে তাকিয়ে —'আইন কদিন পড়লে?'

—'বছর দুই।'

—'তারপর।'

—'ছেড়ে দিলাম।'

—'পরীক্ষা দাওনি?'

—'না।'

—'তাবপব এই কটা বছব কি কবলে? খদ্দব প্রচাব?'

—'না, সেদিকেও রুচি নেই।'

—'বাঙালি ছেলেদেব এসব বিশেষত্ব তো খুব আছে, নিজেদেব উৎসর্গ কবে দিতে তাবা খুব ভালোবাসে। বেশ ভালো জিনিস তো। তা তোমাব বুঝি রুচি নেই ওসবে? কীসে রুচি? টাকায? বেশ বেশ। পৃথিবীতে জন্মে মধুভাণ্ড যদি না চিনলে'—বলে টিটকাবি দিযে খুব খানিকটা হাসালেন ববদাবাবু। একটু চুপ থেকে—'হিন্দু মিশনেব সম্পর্কে কোনোদিন ছিলে?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'এই কয বছব তাহলে বিশুষ্ক চাকবিব চিন্তাযই মবেছ বোধ কবি? সে সব কাজে নিজেব হৃদযেব লোভ ভুলে যেতে হয। পবেব উপকাবেব দিকে তাকাতে হয সে সব হিসেবেব মধ্যেই গণ্য কবোনি?'

চুপ কবেছিলাম।

ববদাবাবু—'আমাব একটি ভাইপো অনেকদিন থেকেই জেলে। কিন্তু তাদেব ধাত অন্যবকম। আমাদেব পবিবাবেব ভিতব আত্মপবতা নেই কোথাও। মানুষেব জন্য, মনুষ্যত্বেব জন্য নিজেদেব বিতবণ কবে দিতে একটুও কুণ্ঠা নেই এ সংসাবেব লোকদেব । চাব পুরুষেব কথা আমাব মনে আছে, একটিও অমানুষ নেই।'

—'কদিন থেকে জেলে?'

—'নিখিলেশ, এই ছ বছব হতে চলল।'

—'তবে তো অনেকদিন।'

—'কারু ঘবে আগুন দিযে জেলে যাযনি তো। স্বদেশী কবত। দেশকে ভালোবেসেছিল, এই হল তাব দোষ।' বলতে বলতে থেমে ববদাবাবু-'হযতো কোনো দোষ ছিল, কতদূবই-বা জানি আমবা। ছেলেবা বড় বেযাড়া হয আজকাল। শ্রদ্ধাব জিনিস সম্ভ্রমেব জিনিস জীবনে যেন কিছু নেই আব তাদেব। ভাববিলাসই যেন দেশপ্রীতি। কিন্তু তাই কী হয কখনো, তা হয না। জীবনটাকে রূপান্তবিত কবে নিতে হয আগে। এদেব জীবন কেমন যেন বিশুষ্ক, স্নেহ নেই, মাযা নেই; করুণা নেই, নিষ্করুণ কর্তব্যই যেন সব, কাজ খুব ফেঁপে ওঠে, কিন্তু হৃদয হযে থাকে ফোঁপবা। বিধাতাব সৃষ্টিটা এবা চিনল না।'

ববদাবাবু আমাব দিকে তাকিযে—'আমাদেব কি দবকাব জান?'

চোখ তুলে তাকালাম।

—'এইসব ছাগল দিযে ধান যেন না মাড়াই আব। যাবা নিজে অন্ধ তাবা পবকে চালাবে কী কবে? অথচ এইসব ছেলেতেই দেশ গেছে ভবে, যেদিকে ফিবি সেদিকেই এবা লিডাব, ধর্মে পলিটিকসে সাহিত্যে সমাজে শিক্ষাদীক্ষাযও শান্ত সমীচীনতা হযে দাঁড়িযেছে বিড়ম্বনা, অন্ধতাই হযেছে নিযম। আমাব দিকে তাকিযে—'বেশ, মাঝপথে থেকে ভালোই কবেছ, টাকা বোজগাব কবতে হবে বইকী, লক্ষ্মীছাড়া হলে সংসাবেব কাছেও অচল। নিজেব কাছেও নিজে খুব দুঃসহ হযে ওঠে মানুষ। কিন্তু দেখো টাকা বোজগাবটাকেও জীবনেব বড় জিনিস মনে কোবো না। অত্যজনেব মতোও বোজগাব কবতে যেও না। অনেক দিক দিযে জেলেব লোকগুলো আমাদেব চেযে ঢেব ভালো, তাদেব লোভ নেই। টাকাব জন্য লোভ নেই, ভালো খাওযা, ভালো ব্যবস্থা, নাবী, যে সব জিনিস উপভোগ কববাব জন্য বাঙালিবা চাকবি কবে কবে মবছে তা তাবা পাযে দবে মাড়িযে গেল। জেলে যেতে পাবতে? থাক, তোমাকে এসব জিজ্ঞেস কবে লাভ-বা কী। চাকবিজীবী সাধাবণ সাংবাদিক মানুষ হতে চলেছে। জীবনেব এই অল্প বযসেই আদর্শেব চেযে আমোদকেই বড় মনে কবলে' হ্যাঁ, আইন ছেড়ে দিযে কী ধবলে তাবপব?'

—'এক আধটা টিউশন নিলাম।'

—'টিউশন' ভদ্দব কুঁড়েদেব এ একটা বড় সুখেব স্বর্গ। বড় লোকেব ছেলেকে গাঁথতে পাবলে তো আব কথাই নাই, মাসেব মধ্যে পঁচিশ দিন বকলমে হলেও গোনাগুনতি টাকা, তা কত নিতে টিউশন পিছু? দশ-পনেবো? যা পাওযা যায?'

—'হ্যাঁ, পনেবো-কুড়িব বেশি দিতেও পাবে না কেউ আজকাল।'

—'খুব পাবে দিতে, কিন্তু তোমবা দিতে দিলে না। টিউশনেব জাত মেবে ছাড়লে। চল্লিশ টাকায টিউশন কবেছি, এখন পঁচিশেব বেশি কেউ দিতে চায না। বছব বছব হাজাব হাজাব [...] বেরুচ্ছ তোমবা, তোমাদেব খিদে যেন সর্বগ্রাসী। পাঁচটাকা সাতটাকা একটা প্যাদাব মাইনেয তোমবা টিউশন

নিচ্ছ, যে সব অভিজ্ঞ বুড়োমানুষ শকুনেব কাড়াকাড়িতে যোগ দিতে পাবে না। বক্তমাংসেব খিদেও যাদেব জীবনে বড় কথা নয়, অথচ মস্তবড় পবিবাবেব বোঝা নিয়ে যাদেব বিড়ম্বনাব একশেষ তাদেব কথা একবাবও ভেবে দেখো তোমবা! বাস্তবিক জীবনেব সংগ্রামটাই যখন বড় হয়, বিচাব ও দাক্ষিণ্য যায় চাপা পড়ে। কিন্তু এইই তো নিয়ম সংসাবেব কী বলো?'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'এ কয় বছব ঘুবে ঘুবে খুব বুঝলে?'

—'হ্যাঁ, খুব।'

—'মানুষকে ক্ষমা কবতে ইচ্ছা কবে?'

—'মানুষ অবিশ্যি ক্ষমা-অক্ষমাব অতীত'—

—'কোন হিসেবে? দুঃখ পেয়ে পেয়ে পাথব? শালগ্রামকে কে ক্ষমা কবে, কে ঘৃণা কবে, সেই কথাই?'

আমাকে একটু মৃদু হাসতে দেখে ববদাবাবু—'যাক মনেব স্নেহপ্রীতি যেন শুকায না। ছোট ছোট ছেলেদেব পড়াতে এসেছ কিনা। জীবন সংগ্রামেব এই কঠোব অভিজ্ঞতাব পব শ্রদ্ধা হাবিয়ে বিশ্বাস হাবিয়ে এদেব সুন্দব সংস্কাব নষ্ট কবে দেবাব লোভও হতে পাবে। কোবো না তা।'

—'আমি তো এদেব জিওগ্রাফি পড়াব, কিংবা অঙ্ক, এসব সম্পর্কে জীবনেব কথা কী কবেই-বা ওঠে?''

—'তা উঠতে পাবে, তোমাদেব মতো যুবকদেব পক্ষে সব চেয়ে বড় লোভ হচ্ছে মানবজীবন নিয়ে আলোচনা কবা কিছু লেখটেখ?'

—'না।'

—'লিখলেই তো ভালো ছিল।'

—'কীবকম?'

—'মনেব ক্ষোভটা লেখাব ভিতব দিয়ে মিটে যেত।'

নিস্তব্ধভাবে ববদাবাবুব দিকে তাকিয়েছিলাম।

তিনি বললেন—'কিন্তু যখন লিখবাব অভ্যাস নেই, তখন কথা বলবাব শখ বেশি হয়ে দাড়াবে। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে যেন না বেশি। ভগবানে বিশ্বাস কব?'

—'কে আমি?'

—'না, অবিশ্বাস কব?'

নীবব ছিলাম।

ববদাবাবু—'ভয় নেই, অবিশ্বাস কবলে চাকবি মাবব না।' একটু হেসে বললেন—'তোমাদেব অবস্থা হয়েছে কি জান, তোমাদেব অবস্থা বড় [...] এই দশ-বাবো বছব চাকবি না পেয়ে পৃথিবীব সমস্ত চামাবদেব দুযাবে ঘুবে ঘুবে মানুষকে তাব মুখোশ খোলা পিশাচেব মূর্তিতে চিনতে পেবে তোমাদেব মনেব ভিতব অবসাদও জন্মে গেছে। আত্মহত্যা তোমবা যখন তখন কবতে পাবতে। অনেকে কবেও বটে। কিন্তু বেশিব ভাগই এত জীবন্মৃত যে একটা দড়ি গলায় জড়াতে গিয়েও তাদেব দ্বিধা ও অবসাদেব একশেষ। কোনোবকমে কাযক্লেশে বেঁচে যাবে তাবা।'

ববদাবাবু—'তোমাব বযস কত হল?'

—'তেত্রিশ।'

—'তাহলে তেমন সুবিধাব চাকবি পাওয়াব সম্ভাবনা তোমাব আব নেই। বযসেই তো ঠেকে যায। এখানে তো সেক্রেটাবি চল্লিশেব বেশি দেবেন না, অবিশ্যি কিছু না পাওয়াব চেয়ে এ ঢেব ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবকম জীবন কত যে শ্রীহীন তুমিও বোঝো, আমিও বুঝি, কি কবি বলো তো?'

—'দেখা যাক।'

—'হয়তো বুড়ো বযসে আমাব মতন হেডমাস্টাব হবে, মাইনে হবে একশো। এবকম জীবন কাম্য মনে হয?'

তা অবিশ্যি মনে হয না, কিন্তু ববদাবাবু কী কবেই—বা বলি তা?

ববদাবাবুব দাড়িতে হাত বুলিয়ে—'আবাব ভয পাচ্ছ বুঝি? ভাবছ আমাব জীবনটাকে আমাব মুখেব

ওপর নিষ্ফল বলে দিলে খুব বেয়াদবি করা হবে। কিন্তু সত্য কথা বলতে এই যে তোমাদের ভয়, মানুষের মন জোগানোর এই মিথ্যা প্রবৃত্তি এই মেরুদণ্ডহীনতা নিয়ে যৌবন তোমাদের শুরু হয়নি, অথচ যৌবন ফুরুতে না ফুরুতেই সব রকম জরা এসে তোমাদের গিলেছে। কি করবে?'

—'এই চাকরিটাই তো নিয়েছি।'

—'তা তো নিয়েছ, চাকরিও তোমার পাকা। কিন্তু এই ভাঙা কুলো কোলে চেপে নিয়ে তুমি খুশি?'

—'কী আর করি, না খেতে পেয়েই তো মরছিলাম।'

—'তারপর আমার মতোন হেডমাস্টার হয়ে উঠবে।'

—'আপনি তো বেশ নিঃসংকোচ কর্তব্যপরায়ণ মানুষ, সাধু পুরুষ।'

—'দূর ভিড়ই তো মাড়ালাম শুধু। শেষ পর্যন্ত খেযেদেয়ে মেথরের মাথায় আবর্জনা চড়িযে দিলাম শুধু। কোনো পথ দেখতে পারলাম না, আমাদের জীবনের ব্যাপারটা কোনো আশাউদ্যম সংগ্রামের ইতিহাস নয়, নির্জীব মানুষের মনে স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয না, কোনো সুন্দর জিনিস রেখে যেতে পারলাম না। কত সত্যকে মিথ্যা বলে মনে করে গেলাম। মিথ্যাকে সুন্দর। সত্য বলে পুজো করলাম। এই তো আমাদের ছন্দহীন শ্রীহীন ইতর জীবন। কোনো একজন মানুষ ধীরে ধীরে এই জীবনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে দেখলে ছোটবেলায কী আমি ভাবতাম জানো?'

বরদাবাবু দিকে তাকালাম।

—'ভাবতাম [...] প্রেসিডেন্ট হব, বঙ্কিমবাবুর মতো নভেলিস্ট হব, সুবেন বাঁড়ুজ্যেব মতো বক্তা হব, রামমোহন রায়ের মতো সমাজ সংস্কারক হব, পঁচিশ বছর বযসেও এসব হাতের পাঁচ মনে হযেছে, তারপর-যখন ত্রিশ–একত্রিশ হল, বুঝতে পারলাম সভাসমিতির করিৎকর্মা, জীবন আশাতীত জিনিস, ঘরে বসে যদি কোনো সফলতা পাওয়া যায়। তো তা লিখে সাহিত্যিক হব, তাই হওয়া যাক, ম্যানুযাল আব নোটই লিখতে লাগলাম আগে, ভবিষ্যতে কবিতা আর উপন্যাস লিখব বলে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ জীবনে আর এল না। কারণও স্পষ্ট, কবিতা আমি কোনোদিনও লিখতে পারি না। মিল দেয়া একেবারেই অসম্ভব। সামান্য কটা মিলের জন্য যতটা রাত জাগতে হবে তাতে দু-চার ফর্মা নোটের জিনিস তৈবি হয়ে যায। তা ছাপিয়ে কী লাভ!'

যাক বরদাবাবুর এই জ্ঞানটুকু আছে।

—'বঙ্কিমবাবুর মতো নভেল লিখতে হয বঙ্কিমবাবুব যুগে। এ যুগে তা চলবে কেন? কী বলো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বরদাবাবু—'তার চেয়ে আমার [...] নোটটা ঢেব বেশি মৌলিক, কি বলো?' আলমাবির থেকে নোটটা বের করে বরদাবাবু আমার হাতে দিলেন।

পড়তে পড়তে—'হ্যাঁ, যা মনে করেছিলাম তাই, আপনার সময় ও শক্তিব সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ হযেছে এই বইখানাতে। নিজের প্রতিভার যতদূর সদ্ব্যবহার করতে পারা যায় তা আপনি কবেছেন। ত্রিশ বছরের সাধনায এই বুঝি শেষ দান?'

—'হ্যাঁ।'

তাকিয়ে দেখলাম খুব পরিতৃপ্ত। সরল শিশুব মতো প্রশ্নহীন প্রসন্নতায় মুখখানা। বড় বিচিত্র। মানুষ না কাদার পুতুল ঠিক উপলব্ধি কবতে পারা যায না।

ক্ষমা-অক্ষমার অতীত

কয়েকদিন থেকেই ক্লাস নিচ্ছি। মফস্বলের একটা এইচ এল স্কুলের নীচের দিকের কয়েকটা ক্লাস পড়াতে হয়। আমি অবিশ্যি ইকনমিকস্‌-এ এমএ—তারপর ইংরেজি ভাষা সাহিত্য আমার ভালো লাগে। বাসায় সময় পেলেই ইংরেজি নভেল নিয়ে বসি, যেকোনো-রকম একটা নভেল পেলেই হয়। এমএ পাশ করবার পর আমার গত দশ বছরের পড়াশুনার ইতিহাস এইরকম। বাজে ইংরেজি বইগুলো আমি পবের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে পড়ি। ভালো বইগুলো নিজেরই কিনতে ইচ্ছে করে। পয়সা জোটে না, তবুও আকঙ্ক্ষা কল্যাণ রয়েছে, সুবিধা পেলেই দু-তিনখানা পছন্দমতো বই কিনে ছাড়ি না। তারপর দেখি এক মজা, যে বইগুলো কাল খুব ভালো লেগেছিল, আজ সেগুলোকে কেন অসাব ও অসংগত বলে মনে হয়, নতুন বইয়ের জন্য মন কামড়ায়। কিন্তু আমার মনে অসংযম। এ ক্ষুধাকে প্রশ্রয় দেই না অনেকদিন থেকে আর। প্রায় চার বছব ধরে কোনো নতুন বই কিনিনি। বদলে দু-জোড়া নতুন জুতো কিনতে পেরেছি। ছেঁড়া কাপড়চোপড় পরবাব রেওযাজ উঠে গেছে আমার। চয়নসুকের পাঞ্জাবি ও টুইলেব শার্ট কটা বেশ ধোপদুরস্ত হযে থাকবার অবসর পায়। জামাকাপড় ছিড়ে গেলে গোটা দুই চিকন সিল্কের পাঞ্জাবিও তৈরি করতে পেরেছি। একটা তসরের কোর্টও হল। একটা মটকাব চাদর অবধি। একা মানুষের হাতে আমার যা টাকাকড়ি তাতে ভদ্রলোকের মধ্যে বেশ মানুষের মতো চলতে-ফিরতে পারছি। জীর্ণশীর্ণ কাপড়চোপড়, একগাল দাড়ি ও বড় বড় সুন্দর পরিকল্পনা স্বপ্ন নিয়ে জীবনে যে কুণ্ঠা ও বেদনা জমে যায় সে সব ফুবিয়ে গেছে এখন। না, বই কিনি না এখন আব। কাপড়চোপড় তেল সাবান টুথপেস্ট জুতো মানুষের জীবনটাকে খুব সহজে সুন্দর করে এরাই সাজিয়ে দিতে পারে দেখেছি।

স্কুলটা শহবেব এক টেরে। আম কাঁঠাল বাবলা জিউলি ও বাঁশের পাশে নিস্তব্ধ রেলের লাইন। দুজোড়া লাইন এঁকেবেঁকে দিগন্তেব অরণ্য ও আকাশের দিকে চলে গিয়েছে। লাইনেব ওপাশে দু-তিন খানা মাঠ পেরিযে তাবপর স্কুল। একটু প্রান্তবেব মতো জাযগায। এই বেশ, খুব ভালো লাগে আমাব।

যেদিকে তাকাই মাঠ আব মাঠ। এক-একদিকে আম জাম কাঁঠালেব বন বাগানবাড়িব মতো দাঁড়িয়েছে। স্কুল কম্পাউন্ড ও মাঠের ভিতব হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ে বটের লাল পাতা হলুদ সবুজ রং মাথানো কাঁঠাল পাতার বাশি, শুকনো পাঠকিলে বঙের আম কুল, অশথ, চালতার পাতা, মেহেদির বস মাখানো দাড়িব মতো অজস্র ডেপো। বড় বড় ডুমুবেব পাতা নিরেট হলদে হযে টকটেকে সবুজ ঘাসগুলোকে ঢেকে বেখেছে হযতো কোথাও। তাবপব পাতাহীন ছাযাহীন নিরবচ্ছিন্ন সবুজ ও কটা বঙেব মাঠ, ধূসর ধুলোয় ঢাকা মাঠ—যতদূব চোখ যায।

দুপুবেব বাতাসে নানাবকম শব্দ ভেসে আসে। বাঁশেব জঙ্গল থেকে একরকম, খেজুরের ছড়িগুলো অন্যবকম, সুপুবি বনের ঝুটির ভেতব থেকে কেমন কি একরকম কলরব বেরোয়, বট খুব নিবিড় উচ্ছ্বাসে এক-একসময মর্মভেদী হযে ওঠে। প্রাণেব নিবেদনে অশথের কাছে পৌছে দেয যেন। তারপর অশ্বত্থরা হু হু করে গাংচিলের কানে কানে রৌদ্রের বুকের ভিতর মেঘে মেঘে সেই বার্তা বহন করে।

অপরূপ!

জীবনে সব কটা বছরই শহেব কাটিযেছি প্রায়। এই তেত্রিশ বছব বযসে দুপুরবেলা অশথেব ডালে কাকের ডাকও তাই খুব ভালো লাগে আমাব। ছোটবেলা দশ বছব অবদি বাবা মা-র সঙ্গে পাড়াগাঁযে ছিলাম, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। মনে যেন কেমন ঝাঁকুনি লাগে, যা হারিযেছি তার বেদনা তো বটেই কিন্তু যা ছিল তার!

মনটাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখে।

ছেলেদের পড়াতে পড়াতে হঠাৎ জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখি একটা বিশীর্ণ সুপুরিগাছের গাযে যে পরগাছা জন্মেছে তারই ওপর এসে বসেছে একটা কাঠঠোকরা। দুপুরের ছাতিফাটা রোদে তাব খটখট খটখট শব্দ; আদি নেই শেষ নেই। এ গান নয, সুর নয়, তবুও অভিভূত হয়ে শুনি, কেমন আমেজ

বোধ হয়। অন্য কোনো এক পাড়াগাঁ-র কবেকার কোনো বিলুপ্ত রৌদ্রফাটা দুপুরের কথা মনে পড়ে যায়। হৃদয় কেমন গুমরে ওঠে। ঝুঁটিওয়ালা সুন্দর পাখিটা কোনো এক ফাঁকে ডানা মেলে গরম বাতাসের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই বিশ বছর বাইশ বছর আগেকার পৃথিবীটাব দিকে বোধ কবি? সে পৃথিবীটাকে আজও সে চেনে নিশ্চয়! ওই দিগন্তেব পলাশ শিমূল জঙ্গলের ওপার থেকে খুঁজে বের করে ফেলেছে হয়তো এতক্ষণে।

তাকিয়ে দেখি খেজুরেব ছড়িব ওপব একটা দোয়েল বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে অনেকক্ষণ ধবে শিস দিয়ে চলেছে। পাশেই তার দুটো মাখন রঙের প্রজাপতির ওড়াওড়ি। ময়নাকাঁটার ঝোপেব ভিতব থেকে ঝিঁঝি-র ডাক আসে। পেয়ারাগাছের এলোমেলো পাতা ভিতর লুকিয়ে, মিষ্টি গান গায়, একটা সুদর্শন পোকা উড়ে যায়, ভেরেন্ডা গাছের থরে থরে শাদা শাদা ফুল ঘিরে বড় বড় নীল ভোমবা গুন গুন গুন গুন করতে থাকে। একখণ্ড শাদা মেঘ খানিকক্ষণের জন্য সূর্যটাকে ঢেকে দিলে তারপরেই রোদ জ্বলে ওঠে আবার। একটা ফিঙে উড়ে যায়। ধীরে ধীবে উপলব্ধি করি আমের কুঞ্জে অনেকক্ষণ ধরে যে বউ কথা কও ও কোকিল ডাকছিল আমবা যেন তা গ্রাহ্যই করিনি। চেযারে ঠেশ দিয়ে অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে শুনতে থাকি।

অপরূপ!

কয়েকটা আটচালা খোড়ো ঘব নিয়ে এই স্কুল। খড়েব ছাউনি ভাবী নিবিড় ও সুন্দব। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সব ঘরগুলোরই শানবাঁধানো মেঝে, বাঁশের কঞ্চির খুব পরিপাটি বুনুনি দিয়ে বেড়া তৈবি, কবে তৈরি হয়েছিল জানি না, কিন্তু বেড়ার কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালে এখনো ছেঁচা বাঁশেব গন্ধ পাওয়া যায়। বেশ লাগে।

কদিন থেকে কাজ করছি, এই চারদিন পাঁচদিন, এক হপ্তাও এখনো পেরোয়নি।

হেডমাস্টার আমাকে নীচেব দিকের ক্লাসগুলো পড়াতে দিয়েছেন। ভূগোল পড়াই, অঙ্ক কবাই।

হেডমাস্টারকে বলেছিলাম—'উপরের দিকে দু-তিনটে ক্লাস আমাকে পড়াতে দিন না, ধরুন ফার্স্ট ক্লাসে সপ্তাহের এক-আধদিন ইংরেজি পড়ালে কেমন হয়?"

—'ফার্স্ট ক্লাস নয, ক্লাস টেন।'

একটু হেসে—'তা আমি জানি খুব, কিন্তু আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম—'

—'ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস বলতে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

হেডমাস্টাব একটু হেসে—'সেই বেশি ছিল, কিন্তু বেঁচে থাকলে অনেক মজাই দেখতে হয়।

—'কবে না ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলে'—

—'১৯১৪ সালে।'

—'হ্যাঁ, তখন সবে বড় যুদ্ধটা লাগে।'

—'বা-স! সে কি আজকের কথা, এক যুগ চলে গিয়েছে যেন আমরা অবিশ্যি তাবও দু-যুগ আগের মানুষ।' হেডমাস্টার একটা হাই তুলে '১৮৭৪ সালে পাশ কবি এন্ট্রান্স।'

একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ, শুনেছি।'

—'হ্যাঁ, এই ইস্কুল থেকেই পাশ করেছিলাম আমরা তিনজন—'

—'বলেন কি এই ইস্কুলটা এতদিনের?'

—'এটা আগে ছিল কলকাতায, সেখান থেকে ভেঙে ঢাকায নিয়ে যায, তারপর আমি এখানে এনেছি।'

একটু হেসে—'ও, তাহলে তো নতুন জিনিস হল।'

—'না, কংকাল ঢেব বদলেছে, কিন্তু আত্মা একই। কলকাতায যখন ছিল ইস্কুলটা সে প্রায পঞ্চাশ বছর আগের কথা, তখনো শহর ছাড়িয়ে গিয়ে আম কাঁঠালের বনের পাশে ধু ধু মাঠের ভিতর ঠিক এইরকম।' বলে দুপুবের বোদে দিগন্তের দিকে পরিতৃপ্তিব সঙ্গে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। আমাব দিকে তাকিয়ে—'ঠিক এইরকম ঘুঘু ডাকত, শুনছ না?'

—'হ্যাঁ শুনছি।'

—'বলো তো কোত্থেকে ডাক আসছে, তুমি তো শহরের মানুষ।' একটু কান পেতে—'হিজল

শিবিষেব জঙ্গলেব ভিতব থেকে।'

হেডমাস্টাব খুশি হলেন, বললেন—'বেশ।' একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ কেবল লিখলে পড়লেই হল না, বিদ্যা বহুরূপী, নানা জিনিসই উপলব্ধি কবতে হয।'

একটা আঙুল মটকালাম।

হেডমাস্টাব—'দেখো ছেলেবা যেন ঘুঘু না মাবে।'

—'তাই মাবে নাকি আবাব?'

—'আমাব কড়া নিষেধ, কিন্তু তবুও সব টিচাবদেবও বেশ সতর্ক নজব বাখা দবকাব।'

—'ইট ছোড়ে বুঝি?'

—'না, না, গুলি–বাঁশ আনে এবা।'

—'গুলি-বাঁশ আবাব কি জিনিস?"

—'জান না বুঝি? ওই একবকম জিনিস আছে ছোট্ট বোদে পোড়া আঁটসাঁট মাটিব গুলি ছুঁড়ে মাবে— মানুষেব গাযে ছুঁড়ে মাবলেও জখম হয।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ, তাই বইকী। অনেকদূব থেকেও ছুঁড়ে মাবলেও তাগড়া মানুষেব গাযেই বেধড়ক চোট লাগে, ঘুঘু তো ঘুঘু।'হেডমাস্টাব দাড়িতে হাত বুলিযে—'গুলি-বাঁশ কোনো ছেলে ক্লাসে আনলে তাকে সাতদিন অ্যাবসেন্ট কববে আব ফাইন, গুলি-বাঁশ তাব পিঠে পিটিযে ভাঙবে।'

একটু চমকে গেলাম। কিন্তু নিঃসহায নিবপবাধ পাখি ফড়িঙেব জীবনেব প্রতি করুণা ও বিচাবেব ভাব নেয যাবা এ বিষয পৃথিবীতে তাদেব এমনি একটি কঠিন না হলেও চলে না যে।

হেডমাস্টাব—'শুধু কি ঘুঘু, কত পাখিই তো চাবদিকে একটু দু-দণ্ড গান শুনলেও তো কত আমোদ পাওযা যায, ভালো লাগে, মন উঁচু হযে ওঠে, কিন্তু তা এবা শুনবে না। কিন্তু ওদেব চেযে দশগুণ বযসে বড় হযেও তো দোযেল কোকিলেব সংগীতেব বিচিত্রতা আমাদেব কাছে পুবোনো জিনিস হল না। যতবাব শুনি, ততবাবই ফূর্তিব ভেতব মোচড় দিযে ওঠে যেন।'

—'আপনাদেব মতন যখন বযস হবে তখন ওদেবও এইবকম হবে।'

—'না, আজকালকাব ছেলেদেব জীবনে সাবেককালেব শ্রদ্ধা' সম্ভ্রম নেই অনুভূতিব সে আন্তবিকতাও হাবিযে ফেলেছে, কল্পনা গেছে শুকিযে।'

চুপ কবেছিলাম।

হেডমাস্টাব—'কাকেব বাসা ঝেঁটিযে বেড়ায, কোকিলেব ডিম চুবি কবে, ছানাসুদ্ধ চড়াইযেব বাসা পকেটে কবে নিযে যায। কুলকাঁটা দিযে ফড়িঙেব দাঁড়া ফুটো কবে তাব মধ্যে সূতো চালিযে বেঁধে উড়োতে থাকে। কতবকম যে অনর্থ কবে এবা।'

তা ঠিক। মনে মনে ভাবছিলাম. আপনবাও কি কবেননি একদিন।' হযতো কবেননি, কিন্তু আমবা কবেছিলাম। একটু চুপ থেকে বললাম—'শিশুবা দেখি স্বভাবতই নিষ্ঠুব হয, কোনো বযস্ক লোক আমোদ কবে ফড়িঙেব ডানা ছিঁড়তে যাবে না। সে যদি ভালো শিক্ষাদীক্ষা পায তাহলে মাছ মাবতে বা পাখি শিকাব কবতে কষ্ট পাবে। শিক্ষাদীক্ষা অভিজ্ঞতাব গুণে এই যে মানুষেব দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতিবোধ এ তো মানুষেব হাজাব হাজাব বছবেব অর্জিত জিনিস। কিন্তু তবুও এদ্দিন পবেও সন্তানেবা প্রথম বযসে এবকম নিষ্ঠুব কেন? একটা পোকাব পা ছিঁড়তে গিযে তাদেব কোনো দুঃখ নেই, বিবেক নেই, পাখিব ডিম চুবি কবে সুখ, ইঁদুবটাকে বিড়ালেব মুখে ছেড়ে দিযে খুব নিষ্কলুষ নির্বিবাদ তৃপ্তি, কোনো এক বর্বব যুগেব সংস্কাব এখনো তাদেব প্রাণেব ভিতব নষ্ট হল না কেন?'

হেডমাস্টাব দাড়িতে হাত বুলিযে—'থাক। মোদ্দাকথা তুমি দেখো যেন কোনোবকম বাঁদবামি না হয। নীচেব ক্লাসগুলোব ভাব তোমাব উপব। পড়াশুনাব দিকে যেমন নজব দেবে এদিকেও তেমনি।'

—' তা দিতে হবে বইকী।'

—'হ্যাঁ, কোনোটা কোনোটাব থেকে কম প্রযোজনীয নয।' হেডমাস্টাব একটু চুপ থেকে—'মানুষ গোড়াব থেকেই যদি চবিত্র নষ্ট কবে বসে তাহলে বড় হলে তা গড়ে তোলা-বড় শক্ত।'

আমাব অবিশ্যি মতভেদ ছিল।

হেডমাস্টাব—'আমাব অনেক সময মনে হয মানুষ ডিগ্রি না পেযেও একটু শান্তশিষ্ট

সহানুভূতিপবাযণ হয। সেই যেন ভালো।' হেডমাস্টাব একটা হাই তুলে—'আমাব [...] সম্বন্ধে [...] টা পড়ে দেখেছ?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তাও পড়োনি?'

—'কোথায আছে?"

—'আমাব [...] বইতেই আছে।'

—'ও পড়ে দেখব তাহলে।'

—'বইখানাব নামও শোনোনি বোধকবি?' মাথা নেড়ে —'না।'

বিক্ষুব্ধ হযে—'পবিষ্কাব না।' হেডমাস্টাব আমাব দিকে তাকিযে—'বইখানা ক্ল্যাসিক হযে বযেছে। অথচ তুমি নামও জানো না, আমাব ইস্কুলে কাজ কব।'

অবাক হযে ভাবছিলাম কী জবাব দেব।

হেডমাস্টাব—'আর্থাব সাহেব দিলেন ইন্ট্রোডাকশন লিখে।'

—'বইখানাব?'

—'হ্যাঁ, কম বই নাকি ভেবেছ তুমি!'

—'ম্যাকমিলান ছাপিযেছে?'

—'না না।'

—'তবে এস কে লাহিড়ী বুঝি?'

—'এই তো এখানকাব কুন্ডু ব্রাদার্স।'

একটু চুপ কবে—'আর্থসাহেব কে?'

—'তাব নামও শোনোনি, বেশ মানুষ।'

[...] নাম শুনেছি

হেডমাস্টাব মাথা নেড়ে [...]—'অবিশ্যি বাঙালি ছিলেন তিনি।'

—'বাঙালি?'

—'সাহেবি বক্তও ছিল, বাপেব নাম নিবাবণ ঘোষ। মা মেবী [...] ছেলে হল [..] কিন্তু ত্রিশ বছব বযসেব সমযেই ঘোষ বদলে [...] কবে নিল।'

বইখানা দেখলাম, বেশ পবিপাটি বাঁধাই, ছাপা মন্দ নয, দু-এক পাতা নেড়ে দেখলাম হেডমাস্টাবেব ইংবেজিতে ভুল নেই বড় একটা, কিন্তু সাহেবি গন্ধ খুব। বইখানা বেখে দিলাম।

—'কেমন হযেছে বইখানা? বেশ হযনি বইখানা?'

—'বেশ।'

—' [...] টা পড়লে?'

—'পড়ব একসময?'

—'তা পোড়ো।'

—'বইখানা দু-একবাব নেড়েচেড়ে টেবিলেব এক কোণায ছুঁড়ে ফেলে দিযে যেও না তুমি। নাও তুমি। আজ বাসায নিযে যেও। যতদিন খুশি বেখো।'

বইখানা গুছিযে তুলে নিলাম।

একটু চুপ থেকে—'আমি যা বলছিলাম—'

—'হ্যাঁ মনে আছে আমাব—' দাড়িতে হাত বুলিযে—'তা ক্লাস টেনে ইংবেজি পড়াতে চাও?

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কিন্তু তা তো হয না।'

—'সপ্তাহে একদিন অন্তত।'

—'অসম্ভব।'

একটু বিমর্ষ হয়ে বসলাম।

—'ইংবেজি তো দূবেব কথা, হিষ্ট্রি বা বাংলা পড়াতে দিতে পাবি না, তোমাকে ম্যাথমেটিক—'

—'ম্যাথ অবিশ্যি আমি পড়াতে পাবব না, ম্যাট্রিকেব পবেই ম্যাথ আমি ছেড়ে দিযেছি।'

—'ম্যাথম্যাটিক্স যদি তুমি ভালো জানতে তাহলে আমাদেব সুবিধা হত।'

—'ইংবেজি আমি বেশ ভালো পড়াতে পাবি।'

হেডমাস্টাব—'বলছ তুমি, তোমাব নিজেব বোধহয তাই-ই মনে হয, কিন্তু ইংবেজি পড়ানো কত যে শক্ত জিনিস তা আমবাই জানি।'

—'আমাব অনার্স ছিল ইংবেজিতে।'

—'তাতে হয় না।'

অবাক হযে ভাবছিলাম কী সে হয।

হেডমাস্টাব—'ন-জন এমএ আছে এ ইস্কুলে।'

—'তিনজনই তো বাংলাব।'

—'হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাসও বটে—সমস্ত ইস্কুলেব বাংলা সংস্কৃত তাবাই দেখে, পঁযত্রিশ টাকা মাইনা পায, পন্ডিতমশায ক্লাস টেনেব সংস্কৃত পড়ান ও এদেব ওপব তদাবক কবেন।'

—'তদাবক? কিন্তু এঁদেব বিদ্যা তো কম না।'

—'এদেব অপমানিত কবা আমাব উদ্দেশ্য নয, কিন্তু একজন বাশভাবী বুড়োমানুষ হাল ধবে বসে না থাকলে শান্তি পাওয়া যায না।'

হেডমাস্টাব—'এবা অনেক সময শাসায যে কলেজে কাজ নিযে চলে যাবে। পন্ডিতকে পবোক্ষে প্রাযই বলে তোমাব ওপব মামদোবাজি কবে ছাড়ব। সব কথাই কানে আসে। তা যাক না কলেজে চলে। করুক না মামদোবাজি। কিন্তু যতদিন আমাদেব ইস্কুল আছে পন্ডিতেব নীচেই থাকতে হবে। পঁযত্রিশ থেকে পঞ্চাশ অবদি তোমাদেব গ্রেড, নিজেদেব যত বিদ্যানই মনে কবো না কেন, ছেলেদেব সে সব নতুন বিদ্যা শেখাবাব ভাব নিতে যেও না। আমবা যেবকম বাংলা পড়েছি, শিখেছি, বুঝেছি, সেই পথেই চলতে হবে, ভাষা বা সাহিত্যেব কোনো নতুন তত্ত্ব দিযে আমাদেব ভড়কে দিতে যাবাব চেষ্টা একেবাবেই বৃথা।

—'পন্ডিতমশাই অবিশ্যি সংস্কৃত জানেন।'

—'বাংলা খুব জানেন।'

—'কিন্তু এঁবা—'

—'হ্যাঁ এদেব চেযে ঢেব ভালোই জানেন পন্ডিতমশাই।'

—'বাংলা?'

—'তবে আব কি? তিনি কোনোদিনই ইংবেজি পড়েননি তো, টোলেব থেকেই খুব গভীব বিদ্যা আযত্ত কবে নিযেছেন। কাজেই আমাদেব এদেশেব ভাষা তিনি যা শিখেছেন তা খুব আন্তবিক, কোনো বিদেশী জিনিসেব বসে গন্ধে তা আবর্জনা হযে ওঠেনি।' হেডমাস্টাব—'এই তো গেল ভাষাব কথা, তাবপব তোমবা এও জেনো, যতবড় ডিগ্রিই নাও না কেন, জীবনেব মূলসূত্রও তোমাদেব চেযে আমাদেব ঢেব ভালো বুঝি।'

—'অবিশ্যি অভিজ্ঞতা আপনাদেব আছে অনেক।

—'অভিজ্ঞতাই তো শুধু নয, তোমাদেব এই চৌত্রিশ-পঁযত্রিশ বযসেব সমযও তোমাদেব চেযে ঢেব বেশি সর্বজ্ঞ ছিলাম আমবা।'

একটু চুপ কবে থেকে—'পৃথিবী তাহলে দিনেব পব দিন নির্বোধ হযে যাচ্ছে।'

হেডমাস্টাব কোনো উত্তব দিলেন না।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে পঁযত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছবে কত কবে বাড়ছে তাহলে?'

—'দু বছব অন্তব দু টাকা।

—'না, হিসেব কবতে যেও না। পঞ্চাশ বাহান্ন বছবে পঞ্চাশ টাকা পাবে। মাইনে বৃদ্ধি স্থগিত হযে থাকবে তাবপব থেকে।'

—'পঞ্চাশেব বেশি কেউই পাবে না আব?'

—'না।'

জানতাম হেডমাস্টাব ১২৫ কবে পাচ্ছেন। এও অবিশ্যি জানি আমবা কেউই এ ইস্কুলে চিবকাল থাকব না, এই যা একটা ভবসাপ্রদ আশ্বাস। কিন্তু কে জানে! থাকতে তো হতে পাবে, যখন চৌত্রিশ-

পঁয়ত্রিশ প্রায়, জরা জিনিসটাকে খুব দূর ভবিষ্যতের বস্তু বলে মনে হয় না এখন আর। মাঝে মাঝে কেমন যেন তার নিকট ছোঁয়াচ প্রাণে এসে লাগে। রক্তমাংস কেমন নিস্তব্ধ হয়ে উঠছে বোধ করি। হৃদয় অবসন্ন বিমুখ হয়ে থাকে। তাকিয়ে দেখি চারদিকের জীবন সংগ্রামও, দিনের পর দিন কেমন কঠিন গভীর হয়ে উঠছে। হেডমাস্টারের দিকে তাই খুব শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকাতে হল। নিজের জীবন ও পৃথিবীর সমস্যাকে যদি দুই মুহূর্তেও স্থিরভাবে উপলব্ধি করে দেখি তাহলে এই আত্মতৃপ্ত লোকটিকেও রাজার মতো ভক্তি ও ভয় করা দরকার। পাশ করবার পর এই এগারো বছরের অন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জীবন আমার এইটুকু বেশ শিখেছে।

'হেডমাস্টার—'বাকি দুজন হিস্ট্রির এমএ, সমস্ত ইস্কুলের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তারাই পড়ায়।'

—'হ্যাঁ, খুব ভালো পড়াতে পারেন।'

—'আমার তা মনে হয় না।'

—'কেন?'

—'যতদিন রসময়বাবু ছিলেন, একটা নিশ্চিন্ততা ছিল। তিনি মারা যাবার পর ওপরের ক্লাসের হিস্ট্রি আমি নিজেই পড়াতাম, মাঝারি আর নীচের ক্লাসে পড়তে যোগেশ আর শ্রীনাথ। তবুও অনেকখানি শান্তি ছিল। কিন্তু সেক্রেটারির কি যে খেয়াল এই ছোকরাদের হাতে এইসব টিচিঙের ভার দিয়ে ভার দিয়ে ইস্কুলের গুরুত্বটা তিনি ঢের ক্ষুণ্ন করলেন।' দাড়িতে হাত বুলিয়ে—'এসব সেক্রেটারির কাছে বোলো না আবার তুমি।'

—'না, তা কেন বলতে যাব।'

—'মানুষের মন ভারী করবার অভ্যাস আছে কিনা অনেকের।'

চুপ করে রইলাম।

—'তা যদি তুমি বলো গিয়ে সেক্রেটারির কাছে আমি তো জানতে পারব। আমার তাতে কোনো অসুবিধে হবে না তো ভাই। তোমারই চাকরি যাবে।'

একটু অবসন্ন হয়ে বললাম—'জীবনের অভিজ্ঞতা তো আমাদের কমা নয়, মিছেমিছি কথা বলে কেন বেড়াব।'

—'বিশ্বেস হয় না, তোমাদের ডিগ্রিওয়ালা লোকদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না। তোমাদের দম্ভ ঢের বেশি। জ্ঞান একেবারেই শূন্য। তোমাদের ধর্ম মানুষকে প্রতারণা করা। নিজেরা ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরেছ। নানারকম পিশাচের মূর্তি নানা জায়গায় দেখেছ। বই পড়ে পড়ে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ। নানারকম অস্পষ্ট উপলব্ধি তোমাদের মনে, না বুঝে বিদ্রোহ করাই তোমাদের স্বভাব। ক্ষমা প্রেম শ্রদ্ধা সব তোমাদের হৃদয়ের ভেতর থেকে লুকিয়ে গেছে। তোমরা অমানুষ।'

না, কোনো উত্তর দেওয়া চলে না। এই চৌত্রিশ বছর বয়সে নানারকম অদ্ভুত অগ্নিপরীক্ষায় মানুষের সঙ্গে তর্ক বড় একটা করি না আর। বিশেষত, মুরুব্বির কাছে নিস্তব্ধ প্রসন্ন মুখে পাথরের মতো বসে থাকবার অভ্যাস হয়ে গেছে।

হেডমাস্টার গলা খানিকটা নরম করে বললেন—'অভাজন তোমরা নিজে ইচ্ছে করে তো হওনি। সংসার তোমাদের এই রকম করেছে।'

গৃহদীপের মতো নয় পাদপ্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল হৃদয় হেডমাস্টারের কথা শুনে।

হেডমাস্টার—'এই তো এমএ পাশ করেছ, ইকনমিকসের মতন এমন একটা সাবজেক্টে, তাও বছর বারো হতে চলল। প্যাদার মাইনেয়, [...] করে, ভিক্ষে করে চুরি করে এদ্দিন কাটালে অথচ কোনো চাকরি পেলে না বাকরি পেলে না, মানুষের মতো মুখ তুলে পৃথিবীর দিকে তাকাবার ভরসা দিল না বিধাতা, একদিনের জন্যও এতটুকু উপভোগের আনন্দ মিলল না। এক মুহূর্তের জন্যও জীবন প্রসন্ন হল না তোমাদের। ভিতরটা যদি সবশেষে ফোপরা হয়ে যায় তোমাদের, তোমাদের নিজেদের দোষ তাতে বড় বেশি নেই।'

খানিকটা তৃপ্তি পেয়ে মাথা তুলে হেডমাস্টারের দিকে তাকালাম।

হেডমাস্টার—'এরকম হতাশা ও মরীচিকার ভিতর দিয়ে আমাদের জীবন কাটাতে হয়নি কোনোদিন। যেটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছি সেটুকু পুরস্কার পেয়েছি অন্তত। বড় লাভ হয়নি বটে। কিন্তু বিচারবিহীন ক্ষতির এ বিকৃত পরাকাষ্ঠা আমাদের জীবনে কোনোদিন হয়নি। না-'বিরস মুখে আমার

দিকে তাকিয়ে—'যদি হত মুনষ্যত্ব বক্ষা কবতে পাবতাম বিধাতা জানেন, কিন্তু তোমবা যে অমানুষ অভাজন সে অপবাধ তোমাদেব ঢেব বেশি কবে আজকালকাব এই নচ্ছাব পৃথিবীটা, দাঁত মুখ খিঁচে পৃথিবীটা দিনেব পব দিন পিশাচ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

একটু হেসে—'এই পাড়াগাঁয়েব এক কিনাবে বসে পৃথিবীব কতখানিই–বা দেখা যায়।'

—'খুব বেঁশিখানি নয়। কিন্তু যেটুকু দেখা যায় তাবই ভিতব এক পৃথিবী ভবা নবাধমতা বিষাক্ত বাষ্পেব মতো জমা হয়ে আছে।' হেডমাস্টাব দাড়িব ভিতব কয়েকবাব আঙুল চালিয়ে —'যাক, আমি কাউকে ডবাই না। যা বলবাব তা বলব। এক উকিল হয়ে বসেছে স্কুলেব সেক্রেটাবি, অভিজ্ঞ বুড়োটিচাব যখনই একটি মবছেন সেই জাযগাযই তিনি এক একটি ছোকবা এনে আঁটছেন, আমি অবাক হয়ে যাই তোমাকে কেন নিল।'

—'আমিও খানিকটা অবাক, এই তেত্রিশ বছবেব মধ্যে পঁযত্রিশ টাকাব মাস্টাবিও তো কোথাও জোটেনি।'

—'তোমাকে নেওযাব বিরুদ্ধে আমি ঢেব প্রতিবাদ কবেছিলাম।'

—'কমিটিতে?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু তবুও তো নিল। শান্ত স্থিব জ্ঞান যাকে বলে, যা লাভ কবতে হলে এক জীবনেব অভিজ্ঞতা ও সতর্কতাব দবকাব, ওই উকিল ছোকবাটি তাব মূল্য বোঝে না।

সেক্রেটাবি তাহলে একটি নবীন উকিল। কিন্তু সেক্রেটাবি কেন হল? যে স্কুলেব বুড়ো হেডমাস্টাবেব নীচে নবীন সেই স্কুলেব হেডমাস্টাবেব ওপবও তাব এত অধিকাব!

হেডমাস্টাব—'গতবাব যখন হেমন্তবাবুকে কাজে লাগানো হয তখনই আমি বলেছিলাম ছোকবা আব নেওয়া যাবে না। এবাব কোনো কাজ খালি হলে সাবেকি। সেক্রেটাবি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। অথচ কিবকম নেমক হাবাম! বুড়ো মানুষ হলে এবকম বেল্লিক হতে পাবতেন তিনি? নাক টিপলে দুধ বেবোয। বাব লাইব্রেবিব একটা ছোকবা তাই না এবকম।'

—'কতগুলো আর্জি পড়েছিল?'

—'আমি নিজে প্রায দুশো অবদি ঘেটে হবিপ্রাণ ভট্টাচার্যকে ঠিক কবেছিলাম।

—'সাবেকি মানুষ বুঝি?'

— হ্যা সেকালেব।'

—'কি কবছিলেন?'

—'গভর্নমেণ্ট ইস্কুলে বছব তিনেক মাস্টাবি কবে বিটাযাব কবেছেন, চুপচাপ বসে আছেন, মস্তবড সংসাব, কাজেব জন্যও খুনসুড়ি, কাজ না হলে পবিবাব চলে কি কবে?' ঘাড়টা একবাব চুলকে নিয়ে—'শুধু তাই তো কথা নয, চমৎকাব ইংবেজি জানেন।

—'তাই নাকি?'

—'এদিকে ম্যাথমেটিকস–এ সিদ্ধান্ত।

—'এত বড় গুণী মানুষ—'

—'সাবেককালেব মানুষ সবই এই বকম। লিখতে–পড়তে উঠতে–বসতে মানুষেব মনে একটা গভীব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মায। তোমাদেব দিকে যখন তাকাই তখন কান্না আসে আমাব। তোমাদেব মতো অপগণ্ডেব ওপব আমি কি কবে নির্ভব কবি! তোমাদেব মুখেব দিকে তাকিয়ে কোন আশ্বাস পাই না। তোমাদেব সঙ্গে কথা বলে কোনো শান্তি পাই না। একদল হাড় হাভাতে দুগ্ধপোষ্যেব মাঝখানে একটা সুন্দব ঐকান্তিক অতীত যুগেব ছিন্নবচ্ছিন্ন বটগাছেব মতো পড়ে আছি আমি।'

একটু চুপ থেকে—'সেকালেব মাস্টাব একটিও কি নেই আব?'

—'আছেন তো শুধু পণ্ডিতমশাই, তিনি আব কদিন।'

—'যোগেশবাবু অবিশ্যি আছেন।'

—'যোগেশ শ্রীনাথ এবা বযসে তবু বুড়ো না হলেও মনে বুড়িয়ে গেছে খুব। কথা বলে তাই পবিতৃপ্তি।'

একটু হেসে—'এখানে দু চাব বছব থাকলে আমবাও মনটাকে পাকাতে পাবব।'

—'তাব মানে?'

—'আমাদেব সঙ্গে কথা বলে আপনিও খুব আশ্বাস পাবেন।'

হেডমাস্টাব খানিকটা প্রসন্ন হযে—'এই যে হবিপ্রাণ ভট্টাচার্যেব কথা বলছিলাম—'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এই যে নতুন দুটি ইংবেজিব এমএ এসেছে তাদেব চেযে ঢেব ভালো ইংবেজি শেখাতে পাবতেন ছেলেদেব তিনি। অনেক বেশি জানেন কিনা।'

—'কি? ইংবেজি?'

—'হ্যাঁ, তোমবা পড় নভেল, আমবা পড়ি গ্রামাব।'

—'গ্রামাব অবিশ্যি আজকাল পড়তে হয না আব আপনাদেব।'

—'কেন হবে না?'

—'এই চল্লিশ বছব ধবে কত লোককে গ্রামাব শিখিযে গেলেন, তাই তাবা আজ মানুষ।'

হেডমাস্টাব অনেকখানি প্রীত হযে একটা গভীব নিশ্বাসেব উপলব্ধি কবে নিলেন। তাবপব নবম গলায—'না, গ্রামাব পড়তে হয বোজ।'

—'বোজ?'

—'হ্যাঁ বোজই তো।'

—'নতুন নতুন গ্রামাব বেবোচ্ছে বুঝি? তা বটে, বিলেতে প্রত্যেক দশ বছব অন্তব গ্রামাব নানাবকম পুবোনো সূত্র বদলে যায, অন্তত সেগুলো নিযে আলোচনা কববাব সময সে পড়ে।'

—'তা পড়তে পাবে । সে হল বিলেতি মানুষেব ঢং। আমাদেব কর্তব্য খুব কঠিন।'

—'কিবকম।'

—'আমাদেব সাহেবদেব কাছ থেকে যে গ্রামাব শিখেছি আমবা তাব আব তুলনা নেই। তাবপব [...] আব [...] বযেছেন। এইসবই পড়ি আমবা। পবস্পবেব মতদ্বৈধতা দেখি, দেখে অবাক হই, আমোদ পাই। সমন্বযেব চেষ্টা কবি। শেষপর্যন্ত গ্রামাবও যেমন জীবনও তেমন সমন্বয নিযেই তো?'

মাথা নেড়ে—'আমিও তো তাই ভাবি।'

—'ইস্কুলেব পব খাওযা-দাওযাব পব বোজ বাতে গ্রামাব কখানা টেবিলে ছড়িযে এক যুগ কেটে যায আমাদেব। কিন্তু অনন্তকালও তো ডুবে থাকতে পাবা যায।'

—'এতই সুন্দব?'

—'তোমবা তো ধাবণা কবতে পাববে না। দাড়িতে হাত বুলিযে—'কি-বা পড়। এই তো এবা দুটিতে নভেল পড়ে বসে বসে কিই-বা বস পায?' একটু গলা খাকবে—'এক [...] পড়ে হয [...] আমি আব মন দিতে পাবি না। হযতো কোনো খুন বা জখম্মি অথবা ভালোবাসা বা ষড়যন্ত্র কিংবা স্বামী-স্ত্রীব জীবনে দীনতা, মানুষেব জীবনেব অভাব-অপবাধ অথবা আনন্দেব কথাও বোধ কবি। কিন্তু এসব পড়ে আমাদেব কি লাভ?'

কোনো জবাব দিলাম না।

হেডমাস্টাব—'জন ও মেবিব জীবনে কিনা কি হল তাব সঙ্গে বাংলাদেশেব একপ্রান্তে দবিদ্র কর্তব্যপবাযণ ইস্কুল মাস্টাবেব কি সম্পর্ক? এসব অপ্রীতিকব কৌতূহল কেন তোমাদেব পেযে বসে বলো তো? পেযে বসে শুধু? তোমাদেব জীবনটাকে একেবাবে অভিভূত কবে বাখে। এবকম আত্মপ্রতাবণা কবতে তোমবা ভালোবাস।' দাড়িতে হাত বুলিযে—'একটু চুপ কবে ভেবে দেখো যদি তাহলে বুঝতে পাববে এতে তোমাদেব নিজেব জীবনেব কতখানি অপচয।'

একটা জবাব দেবাব জন্য হেডমাস্টাবেব মুখেব দিকে তাকালাম।

বললেন—'আমবা যা পাচ্ছি বা পেতে পাবি, আমবা যা কবেছি কিংবা যা কবা উচিত আমাদেব তাব বাইবে কোনো কিছু নিযেই জীবনটাকে সংশ্লিষ্ট কবতে গেলে আমাদেব ক্ষুদ্র জীবনেব ক্ষুদ্র সম্ভবনাটুকুকেও মাটি কবে দেযা হয। আমবা শুধু অমানুষ হই না, নির্বোধ হযে দাঁড়াই। তুমিও-বা কি বই পড়?'

—'আমিও নভেল পেলে পড়ি মাঝে মাঝে।'

—'পোড়ো না আব।'

—'ইংবেজি সাহিত্যে আবো নানাবকম বই আছে।'

—'ইংরেজি সাহিত্য ঘাটতে যেও না।'

—'বাংলা সাহিত্যে'—

—'টেকচাঁদের 'আলালের ঘরে' বইখানা পড়ো। ছেলেরা কেমন করে নষ্ট হয়ে যায়, মানুষের জীবন বিড়ম্বনার জিনিস হয়ে দাঁড়ায় তার একখানা নিখুঁত ছবি আছে।'

—'তা আছে তো।'

—'বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধগুলোও পোড়ো। অবিশ্যি তার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে।' একটু চুপ থেকে—'লোকটার জীবন নানারকম জ্ঞানে খুব পরিপুষ্ট কিন্তু নানারকম অসার ফক্কুড়িও ছিল।' আমার দিকে তাকিয়ে হেডমাস্টার—'ইস্কুলের ছেলেদের যা যা পড়াবার ভার তোমার ওপর সে সব রোজ ভালো করে শিখে যাবে। টাস্ক দেবে, খাতা দেখবে, কারেক্ট করে ভালো করে বুঝিয়ে দেবে সব। দেখবে এইসব কাজে সারা দিনরাত এত ব্যাপৃত থাকতে হয় একজন কর্তব্যশীল কর্মনিষ্ঠ মাস্টারকে যে অন্য কোনো কিছু ভাববার বা পড়বার সময় থাকে না তার। রুচিও থাকে না। এইসব কাজেই সে গভীর আমোদ পায়।'

ইস্কুলের ঘরের জানালার ভিতর দিয়ে গোটা দুই চড়াই রৌদ্রোজ্জ্বল জামগাছের দিকে উড়ে গেল। পলাশগাছের ডালপালার ভিতর বসে একটা কুচকুচে কালো দাঁড়কাক চারদিককার মাঠ দিগন্ত ও আকাশের দিকে তাকাচ্ছে ডানা মেলে দিলেই হল। হ্যাঁ, মেলে দিয়েছে ডানা, বিকেলের নরম বাতাসেব ভিতব দিয়ে গা ভাসিয়ে সবুজ উলুঘাস, কটা রঙের মেঠোঘাস ধূসর ধুলোয ঢাকা মাঠের সমুদ্র পিছে ফেলে বেগুন ফুলের মতো নীল আকাশের দিকে কোথায় সে উড়ে গেল তাকে চোখেও দেখা যায না আব।

—'এই ইস্কুলের ছেলেদের মতো বয়স যখন আমার ছিল তখন আমার জীবনও এরকম ছিল। আজ আমি প্রসন্নবাবুর তাঁবেদাব।'

—'বিয়ে কবেছ?' বযস কত না বললে?'

—'চৌত্রিশ।'

—'এতদিনেও করোনি যে বড়? না প্রথম পক্ষ গেছে?'

—'না, করিনি একদম।'

—'আজকালকাব ছেলেদের ঢেব বিরহ থাকে।'

—'না সেইসব করবারও সময পাইনি, যা ঘূর্ণির ভেতবে ছিলাম।'

—'এখন তো চাকবি পেলে, কি করবে? করবে বিযে?'

—'এখন ভাবছি আস্তে আস্তে একটু গুছিযে বসব—'

—'বাপু, বিয়ে করতে যেও না।'

—'তা না-ও কবতে পারি। ঠিক নেই, কবব বলে বোধহয না আব।'

—'হ্যাঁ একটু যুক্তি বিচাব কবতে শেখো। বিয়ে করলেই ছেলেপিলে হয জানো। সেদিন যদি তা এত ভাবতে জানতাম তাহলে আজ এ দু-পক্ষের ভোগ আমাকে সহ্য কবতে হত না।'

—'ছেলেপিলেরা কি করছে আপনার?'

—'তবুও যা হোক শোযাশো টাকা মাইনে পাই, কিন্তু পঁযতিরিশ টাকার থেকে পঞ্চাশ-এ বিযে চলে না। বধূ আসলেই যে গণ্ডেপিন্ডে যে হবেই, অনেক হবে সেটা মানবজীবনের সত্য বলে ধরে রাখতে পার। তারপর কী করবে? ধার? ধার-কর্জ করে শোধ দেবে কোথেকে? মাস্টারি জীবনটাকে প্যাদা আর উকিলের চিঠির বিড়ম্বনায় ভরে ফেলো না ভাই, আদালত জেল, মানুষের কাছে লাঞ্ছনা আত্মধিক্কার, কেন এসব দুঃস্বপ্নের ভিতর যাবে। এমনিই তো মাস্টারেব দিন গুজরাণ। তাক এত কদর্য কবে দুর্দশার একশেষে নিয়ে হাজির হযো না।

স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ

মফস্বলের একটা এইচ এল স্কুল। ইস্কুলের ঘরখানা ছোট্ট ঘরের এক পাশে দিগন্তছাওয়া কতকগুলো মাঠের ভিতর। প্রায় কুড়িখানা ছোটখাটো ঘর নিয়ে সমস্ত ইস্কুল। সব ঘরগুলো একরকম নয়। কয়েকটা ঘরের শানবাঁধানো মেঝে, ইটের পাকা দেওয়াল ও গোলপাতাব ছাউনি। বাকিগুলোর ভিটে মাটির। বাঁশের কঞ্চি অথবা খলফার বেড়া। খড়ের ছাউনি। এমনি একখানা মাটিব মেঝের ঘরে নীচের দিকে একটা ক্লাসে ধীরে ধীরে ঢুকলাম। এ জীবনে নানারকম কাজ কবেছি। কিন্তু মাস্টারি এই প্রথম।

জীবনের এই তেত্রিশটা বছর ধরে সংকল্প করে এসেছিলাম এ জিনিস কোনোদিন গ্রহণ করব না। কিন্তু নানারকম সাধ ও স্বপ্নের ভগ্নস্তূপেব ওপর দিযেই জীবন চলে। ঘবের ভিতর ঢুকে জারুল কাঠেব একটা চেযারে বসে মনে হল।

নীচের দিকের একটা ক্লাস। বারো বছর আগে ইউনিভার্সিটি থেকে যখন পাশ করে বেরিয়েছিলাম তখন যদি মাস্টারি নিতাম, তাহলে হযতো হেডমাস্টারও হতে পাবতাম। কিন্তু এখন ভিড় বেড়ে গেছে। আমার ওপরে যে কজন টিচার তারা অনেকেই বযসে আমার চেয়ে ছোট বটে, কিন্তু মাস্টরিব অভিজ্ঞতা তাদের আমার চেয়ে ঢের বেশি। ট্রেনিং ডিগ্রিও প্রায সকলেবই আছে। পাঁচজন এমএ বিটি ও তিনজন বিএ বিটি আমার ওপরে। তারপর আমার জাযগা। প্রায বারো বছর আগে আমি এমএ পাশ কবেছিলাম ইংরেজিতে। তারপর অনেককিছু করেছি আমি। কিন্তু একদিনের জন্যও মাস্টারি কবিনি। কাজেই সবচেযে নীচের ধাপের থেকে শুরু কবতে হল।

একেবারে প্রথম দিন মাস্টারির প্রথম দিন।

চেয়ারে বসে চাবদিকে একবাব তাকিযে দেখলাম খলফা বেড়ার বুনুনি ভাবী সুন্দব চারদিকে। ক্লাস রুমে অনেকগুলো জানালা। ভিতটা মাটির বটে কিন্তু তেমন স্যাঁতসেতে বলে মনে হল না। আমি যে জাযগায বসেছি, সেখানে মাটিব ওপর খানিকটা বালি ছড়িযে দেওয়া হযেছে। দু তিন খানা ছোট চাটাইও ছড়ানো আছে।

বড্ড গবম। টেবিলেব ওপব তাকিযে দেখি একপাশে একখানা হাত পাখা বযেছে। পাখাটা থাক, ধরতে গেলাম না।

ধোপাবাড়িব পাঞ্জাবিব ওপব একখানা ধবধবে কোঁচানো শাদা চাদব ঝুলিযে এসেছিলাম। ইচ্ছে কবে চাদবটা চেয়ারেব হাতলের ওপর ঝুলিযে রাখি। কিন্তু রাখতে গেলাম না। একবাব তাকিযে দেখলাম পাযেব বাদামি পাম্পশু জোড়া বেশ পালিশ করা, চকচকে। গালে হাত বুলিযে নিলাম একবাব। হ্যাঁ, দাড়ি বেশ নিখুঁতভাবে কামানো। গোঁফ ছাঁটার অভ্যাস আমাব অনেক দিনকাব। কিন্তু ইস্কুলে কাজ করবার সম্ভাবনা আছে বলে ছাঁটিনি। অনেক দিন স্থগিত রেখেছি। বেশ একজোড়া কালো পাকানো গোঁফ জমে গেছে তাই।

হঠাৎ একবার মুখ তুলে তাকিযে দেখলাম সামনের বেঞ্চেব কযেকটি ছেলে আমার গোঁফেব দিকে তাকিয়ে আছে, বেশ সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায।

সমস্ত ক্লাসটা একজন অপরিচিত মানুষের চেহারা পর্যালোচনা কবে নিস্তব্ধ হযে আছে। থ মেবে গেছে যেন। বেশ এরকম চুপ কবে থাকলেই ভালো। হযতো আত্মতৃপ্তির সঙ্গে আমাকে স্বীকার করে নিযেছে। কিংবা নতুন মানুষ দেখে নীরব।

দপ্তবি রেজিস্ট্রার দিযে গেছে। টেবিলেব এক কিনারে আধাআধি কালিভবা একটা চীনেমাটিব দোযাত এবং জীর্ণশীর্ণ একটা কলম বেখে গেল।

বিশ-পঁচিশ বছর আগেব কথা মনে পড়ে যায। ইস্কুলে পড়তাম তখন নীচের ক্লাসে। ঘণ্টা বাজলেই টিচার ক্লাসে ঢুকতেন। দপ্তবি সঙ্গে সঙ্গে প্রায় রেজিস্ট্রার নিযে হাজির হত। একটা নোংরা কলাই কবা বড় লোহার ডিসের থেকে একটা মাটির দোযাত আর একটা কলম টেবিলের ওপর রেখে যেত।

কিছু বদলায়নি, সবই সেইবকম আছে দেখি। সেই পঁচিশ বছর আগের মতো। মাটির দোযাতটা অবিশ্যি চীনমাটির হযেছে। আর ছেলেগুলো? ছেলেগুলো কি বকম হল? তা অবিশ্যি আস্তে আস্তে বোঝা যাবে। এ

ক্লাসে দুটো ঘণ্টাই আমাকে থাকতে হবে। প্রথম ঘণ্টা পড়াতে হবে ইংবেজি, দ্বিতীয় ঘণ্টা ইতিহাস।

প্রায় ছাব্বিশ বছব আগে আমাদেব সেই ঠিক এই ক্লাসেবই মাস্টাব হবিচবণবাবু একটা আল [...] পাতাব গলাবন্ধ কোট গায় দিযে ক্লাসে ঢুকতেন। তাঁব বযস কম ছিল না। আমাদেব যখন তিনি পড়ান তখন তাঁব মাথাব চুল বেশিবভাগই বগেব কাছ দিযে একেবাবে পেকে গেছে, সমস্ত মাথাটাযও। শুযোবকুচি চুল বেশিবভাগই পাকা ছিল। দাড়ি ছিল হবিচবণবাবুব কাঁচাপাকায সে একবকম। বিড়বিড়ে পাতলা মানুষ। ভাবী বদমেজাজ ছিল হবিচবণবাবুব। ইংবেজি পড়াতেন আমাদেব। অঙ্ক কবাতেন দবকাব হলে ইতিহাস বাংলা—তিনি না জানতেন কি? এন্ট্রান্স ফেল কবেছিলেন অবিশ্যি। কিন্তু আমবা সেটাকে একটা ধর্তব্য অভাবেব মধ্যে গণ্য কবতাম না। জ্ঞানে গুণে চবিত্রে কতই না বিশ্বাসভাজন তিনি ছিলেন আমাদেব। আমবা ভাবতেই পাবতাম না তিনিও আবাব ভুল কবতে পাবেন। কিংবা তাঁব চবিত্রেব কোনোবকম ব্যবহাবকে স্খলন বলে ধার্য কবে নেওযা যেতে পাবে। তাঁ ‧ আমবা যমেব মতন ভয কবতাম। বাপ-ঠাকুদাব মতো শ্রদ্ধা কবতাম।

সেই হবিচবণবাবুব জাযগায এসেছি আমি। পঁচিশ বছব আগে স্বপ্নেও ভাবিনি যে এইবকমই হবে। কিন্তু তাও তো হল।

হ্যাঁ, হবিচবণবাবু ক্লাসে এসেই বেজিস্ট্রাব খুলে নাম ডাকতে বসতেন। প্রথম দুপুবেব গবম বাতাসেব ভিতব সুব কবে তাঁব সেই নাম ডাকা, শুনে শুনে ইস্কুল ঘবেব পাশেব মেহেদি জঙ্গলেব ভিতব ঝিঁঝিও যেন ঝিমিযে পড়ত। এমন ঘুম পেত আমাব'

আহা, সেই ছাব্বিশ বছবেব আগেব পুবোনো দিনগুলো কোথায গেল সব। সেই হবিচবণবাবু-বা কোথায? বেঁচে আছেন না মবে গেছেন? প্রায কুড়ি বছব হল তাঁব কোনো খোঁজ খবব পাই না। যে ইস্কুলটায তিনি পড়াতেন, আমবা পড়তাম সেটাও কতদূবে কোন পাড়াগাঁব কিনাবে বহস্যাবৃত হযে পড়ে আছে।

হ্যাঁ, দু-ঘণ্টা এই ক্লাসে থাকতে হবে। বেজিস্ট্রাব খুলে নাম না ডাকলেও এখন চলে। বিস্তব সময। কোনো এক ফাঁকে বোল ডেকে নেওযা যাবে।

বেজিস্ট্রাবটা যেমন ছিল, তেমনি পড়ে বইল।

খুবই গবম। গলাব থেকে চাদবেব ভাঁজ খুলে নিযে চেযাবেব পিঠেব ওপব বেখে দিলাম। হাত পাখাটা তুলে বাতাস খেতে খেতে উঠে দাঁড়ালাম।

সামনে ব্ল্যাক বোর্ড। দপ্তবি বোর্ডটা এসে পবিষ্কাব কবে মুছে দিযে গেছে। বোর্ডেব ডান কানেব কাছে [...] নোংবা চেককাটা ছোট গামছাব মতো ঝুলছে। বোর্ডেব পাযেব কাছে একটা ছিপছিপে লম্বা জিনিস, এতক্ষণ দেখিনি। হাতপাখাটা টেবিলেব ওপব বেখে দিযে ধীবে ধীবে জিনিসটাকে তুললাম। একটা তেলে-পাকানো সুন্দব ছড়ি। ছড়ি ঠিক নয, কোনো হাতল নেই। উডুনিও নেই। আড়াই হাত লম্বা বেশ চমৎকাব একখানা বেত। যে তৈবি কবেছে তাব বেশ বাহাদুবি আছে। কিন্তু ক্লাসেব ভিতব এ জিনিস কেন? আমি যে পৃথিবীতে এতদিন ছিলাম, তা অনেক দিক দিযেই অবাস্তব, বেতেব স্মৃতিও আমাব মন থেকে মুছে গিযেছিল এতদিন, কিন্তু এ জিনিস তা বলে মবে যাযনি যে, সত্য হযে আজও বেঁচে আছে দেখছি তাই। কত নতুন জিনিস শিখি, পুবোনো জিনিস ভুলে যাই। তাবপব অবশেষে এমন একটা সময আসে আবাব, যখন অতি পবিচিত পুবোনো বিস্মৃত জিনিস তাদেব বাস্তবতা ঘোষণা কবতে আসে। দু-এক মুহূর্তেব জন্য পৃথিবীটাকে কেমন আজগুবি বলে মনে হয। বেতটা হাতে তুলে নিযে একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস কবলাম—'এটা এখানে বাখা হযেছে কেন?'

সে কেমন ভড়কে গেল। হযতো ভেবে বসেছে তাব ভাবনাবিশ্বেব হঠাৎ কোনো অসংগতি ধবে ফেলেছি আমি, দু-এক ঘা তাব পিঠে বসিযে দেব হযতো।

কোনো জবাব সে দিল না।

দু তিনটি কচি কচি মাথা পেবিযে আবো একটি কচি মাথা কিন্তু সাহস খানিকটা বেশি। সে উঠে দাঁড়িযে বললে—'ওটা বেত।'

—'তাই তো, দেখছি তো।'

—'ওই ব্ল্যাকবোর্ডেব পাশে দপ্তবি বেখে গেছে।'

—'কীসেব জন্য?'

—'ইচ্ছে কবলে আপনি আমাদেব মাবতে পাবেন।'

জবাব বড় করুণ। গলাব ভিতবেও কোনো কর্কশতা নেই। ছ-সাত বছবেব ছেলে, গলা এখনো ধবেনি, তাকিযে দেখলাম মুখখানাও খুব নিবপবাধ। কালো কালো চেককাটা ছোট্ট গলাবন্ধ কোট পবে

এসেছে। মাথায় অপর্যাপ্ত তেল কপাল বেয়ে দুই গালে বেয়ে পড়ছে। নাকের ভিতর খানিকটা [...] তবে মুখখানা দেখে মনে হয় নিপীড়িত হওয়া নিষ্পেষিত হওয়াই অভ্যাস।

সমস্ত ক্লাসটা একেবারে নীরব।

পায়চারি করতে করতে মনে হল ছোকরার অনেকেই নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে যেন। নড়তে পারছে না, চড়তে পারছে না। শান্ত সুস্থিরভাবে নিশ্বাস ফেলা যেন একটা অনিয়ম। জীবন যেন একটা দুঃস্বপ্ন।

বাস্তবিক দুঃস্বপ্নই বটে। এদের কাছেও দুঃস্বপ্ন?

চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভালো করে ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে দেখি, পাঁচ-ছয়-সাত বছরের ছেলে সব, বড়জোর দশ-এগারো বছর হবে হয়তো কারুর। এর চেয়ে বড় কেউ নেই।

ছোট ছোট নোংরা নয়নসুকের পাঞ্জাবি, মাত্র এক হাত লম্বা ছোট ছোট শার্ট, নানারকম অদ্ভুত গলাবন্ধ কোট, কিংবা ঘামে ভেজা কালিমাখা ছেঁড়া তসরের পাঞ্জাবি, এই সব চারদিকে, এই সবের ভিতর থেকে যে মুখ চোখ নাক ফুটে বেরিয়েছে তাদের এরকম দমবন্ধ নিস্তব্ধ সমাবেশ এ জীবনে আমি আর কোনোদিনও দেখিনি, যেন অনেকগুলো ক্কচিৎ কোনো মাথায় টেরির আভাস, প্রায়ই কদম ছাঁটা চুল; ধুতি ছেঁড়া, নোংরা, কালির চ্যাপকা। পায়ে জুতো নেই, লাল সুরকি মাথা। একটি ছেলেকে বড্ড রোদে পোড়া মনে হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার বাসা কতদূর?'

উত্তর দিতে গিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, দেখলাম সামনের হাইবেঞ্চটাকে দু হাত দিয়ে আঁকড়ে নিয়েছে। বললে—'দু-কোশ আন্দাজ হবে।'

—'ইস্কুলের থেকে তোমার বাসা দুই কোশ?'

মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

—'এক কোশ কতখানি জানো তো?'

খুব চিন্তিত হয়ে চুপ করে রইল।

তার পাশের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি জানো?'

কেঁচোর মতো পাক খেতে খেতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'দু-কোশ?'

—'হ্যাঁ।'

দেখলাম ভাবনা করে অসীম হয়ে উঠেছে, মুখের হাসিটুকু শুকিয়ে গেছে, মুখ খুব গম্ভীর, বিমর্ষ।

দুজনকেই বসতে বললাম।

অতর্কিতে একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে—'আমি বলতে পারি।'

তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটি মাথায় এ ক্লাসের প্রায় সব ছেলের চেয়েই বেঁটে, বয়স কত হবে? পাঁচ?

ছেলেটি বললে—'দু কোশ? ঠাকুর পুজোয় কোশাকুশি থাকে না, তারই দুটো আন্দাজ মতন।

ভেবেছিলাম অনেকেই হাসবে, কিন্তু একটি ছেলেও হাসল না। বরং এই ছেলেটির বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রমাণ পেয়ে অনেকেই বিস্ময়ে হাঁ করে ছেলেটির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল।

এই সব সরল আত্মবিস্মৃত শিশু সব।

বেশ কথা। কিন্তু আমিই-বা কেন এদের মধ্যে এসে পড়েছি, এদের নিয়ে আমারই-বা পরিতৃপ্তি কোথায়? কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে—'দু-কোশ মানে চার মাইল।'

একসঙ্গে কয়েকজন কলরব করে উঠল—'এক কোশ দু-মাইল হয়, আমরা জানতাম মাস্টারমশাই। বিধুবাবু আমাদের বলেছিলেন ক্লাসে।'

ক্লাসটা দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল আবার।

রোদে পোড়া ছেলেটির দিকে তাকিয়ে—'তোমাকে তাহলে অনেকদূর থেকে আসতে হয়।'

একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে—'দূর থেকে আমাকেও আসতে হয়, আমাদের অনেককেই।'

—'তাই নাকি?'

—'দেখুন কী রকম কাণ্ড, ইস্কুলটা কোথায় শহরের ভেতরে থাকবে, তা না, হেঁটে হেঁটে আমাদের পা খোয়ে যায়, আধঘণ্টা আন্দাজ হাঁটলুম, তবে বটতলা এলুম, তারপর আবার আধঘণ্টা হেঁটে চামারপটি, তারপরে চক, তারপরে ইস্টিশান, তারপর গোটাকতক মাঠ পেরিয়ে তবে না ইস্কুল।' বলে সে এক ঢোক গিলে বসে পড়ল। স্বরের ভিতর বিশেষ কোনো নালিশের গন্ধ নেই, বিদ্রোহ নেই, খানিকটা নরম ঘটনা বিবৃতি শুধু, যেন নতুন মাস্টারের সঙ্গে গুছিয়ে একটু কথা বলে নেয়া, বেশ একটা গভীর সার্থক কাজ। তা সে বলতে পেরেছে। দেখলাম সে খুব পরিতৃপ্ত।

যা বলেছে তা ঠিক। অনেক দূর থেকে এই ছেলে কটিকে রোজ হেঁটে আসতে হয়। কড়া রোদ

আর ধুলোবালির ছাপ এদের সকলেরই প্রায় সর্বাঙ্গে।

বুক পকেটের থেকে ঘড়িটা তুলে দেখলাম, প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেছে। ছেলেরা সকলেই প্রায় মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছে, মুখে কোনো কথা নেই, আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ গতিবিধি এদের খুব গভীর লক্ষ-র জিনিস, আমার মুখের ভাবগতিক খুব নিবিড় ঐকান্তিকতার সঙ্গে পর্যালোচনা করছে। এই চল্লিশটি ছেলে এমনভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এতগুলো একনিষ্ঠ দৃষ্টির সামনে বড় সংকুচিত হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু তবুও বিশেষ কোনো কুণ্ঠা বোধ করি না, চল্লিশটি বিষয়ী–পাকামানুষ তো নয়, চল্লিশটি তরুণীও নয়, চল্লিশ–পঞ্চাশটি ছাগল বা খরগোশের ছানা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তাকে যতদূর বিব্রত হতে হয়, তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু তবুও পঞ্চাশটি খরগোশের বাচ্চা নিঃশব্দে নিষ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে থাকলে কেমন একটু অস্বস্তিও লাগে বটে।

হ্যাঁ একটু অস্বস্তি লাগছে। কি করা যায়!

দেখলাম, আমার পোশাক পরিচ্ছদ, বুরুশ করা বাদামি পাম্পশু, কিংবা কোঁচানো চাদরের দিকে এদের তেমন বিশেষ দৃষ্টি নেই। পোশাক–পরিচ্ছদের বাইরে সমস্ত মানুষটির বাস্তবিকতার সত্তাই এদের অনুধ্যানের জিনিস। আমাকে নিয়ে এরা ব্যস্ত, আমার জুতো জোড়া নিয়ে নয়। কম নয় এরা!

হ্যাট নেকটাই ও উঁচু ডিগ্রির ভাঁওতায় কলেজের ছেলেদের ভোলানো যেতে পাবে, কিন্তু এই ছেলে কটির আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে হলে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের খানিকটা মূল্য নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। ফাঁকি দিলে চলবে না। এদের কাছে নামজাদা মাস্টারের নাম চেনা এমন কিছু শক্ত জিনিস নয়, নিজেকে একটু সংযমের সঙ্গে চালালেই এরা ভয় করবে, শ্রদ্ধা করবে। মূর্খের মতন পড়িয়েও এদের কাছে পণ্ডিত বলে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু এদের ভালোবাসা পাওয়া, এদের অবিচলিত বিশ্বাস আকর্ষণ করা, এদেব আত্মাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রসন্ন করে রাখা খুব কঠিন তা।

জীবনে অনেকটা বছর তো কাটিয়েছি, সেই হয়ে গেছে দোষ, ক্লাসে এসে তাই নির্বিবাদ ইংরেজি আর ইতিহাস পড়িয়ে আমিও যেন কেমন তৃপ্তি পাব না। আরো যেন কিছু দরকার, হযতো এদেব জন্যই শুধু নয়, আমাব নিজেব জন্যও। না হলে মানেব ভিতব কেমন একটা বিমর্ষতাব বোঝা আমিও কাটিযে উঠতে পাবব না।

খুব একটি ছোট ছেলে এককোণে বসে আছে। অনেকক্ষণ থেকেই সে খুব ম্রিয়মান। প্রসন্নতার উচ্ছলতা এদের অনেকের মুখেই নেই। কিন্তু এব মুখে একেবাবেই নেই যেন। কিন্তু একে আমি ঘাটাতে যাব না। কী করে এর সঙ্গে ব্যবহার করলে যে এর বিষণ্নতা কেটে যাবে বুঝতে পারি না। এ ছেলে বকের শিশু নয়, আমিও গাছ নই, মানুষের বিধান মানুষের জন্য সভ্য বিমর্ষতার পথই রচনা করে দিয়েছে—মানুষশিশুর জন্যও। হযতো ইস্কুলে আসতে হযেছে বলেই এর প্রাণ কাঁদে। মাস্টাব ক্লাসে ঢুকেছে বলেই এর জীবনেব সমস্ত স্বপ্ন শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। তাবপব ছুটি যখন হবে আম কাঁঠালেব ছাযার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোকিলের গান শুনে শুনে বাসার দিকে অগ্রসর হতে হতে ছেলেটি হযতো নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধির সুন্দর মনটাকে ফিরে পাবে আবার। কেউ কেউ আবাব এই ক্লাসটার সঙ্গেও খানিকটা বনিবনা করে নিয়েছে। তারা কচি নয়, বিরহী নয়, ছোটখোটো কর্মী। উত্তরকালে হয়তো তারা উকিল হবে, ব্যবসায়ী হবে, কিংবা আরো অনেক কিছু হতে পারে।

এদের মধ্যে একজন পকেটের থেকে একটি পেযারা বের করে নিয়ে চিবুচ্ছে; ছিবড়েগুলো সে জানালার ভিতর দিযে ফেলে দিচ্ছে। পাকা আব একটা পেযারা সে কতকগুলো ছেলেকে পেরিয়ে একটি বিশেষ ছেলেকে উপহার দিযে এল।

হ্যাঁ, সফল জীবনের কলকাটি দেখলাম এই বয়সেই তার মুখস্ত। জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতে বিশেষ ভুগতে হবে না তাকে। নিজের রূপকে দরকার মতো রূপান্তরিত করে নিয়ে জীবনের প্রতি মুহূর্তের জয়গান গাইতে পারবে সে।

তাকিয়ে দেখলাম একটি ছেলে মুখে কাপড় দিয়ে হাই বেঞ্চের আড়ালে মাথা নীচু করে আছে।

আস্তে আস্তে এগিযে গেলাম। কাছে এসে দাঁড়াতে ছেলেটি হকচকিয়ে মুখের কাপড় ফেলে দিল তার। দেখলাম ধুতির খুঁটটা রক্তে ভিজে রয়েছে। অনেক রক্ত।

বললাম—'একী, কাপড়ে তোমার রক্ত কেন?'

বেদনাকুঞ্চিত মুখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে ছেলেটি 'বলি' 'বলি' করেও কিছু বলতে পারল না।

একটু অপেক্ষা করলাম। কিন্তু মুখ ফুটে শেষ পর্যন্ত কিছু বলত পারল না সে। পাশের (একটি) ছেলেটি যে কোণের ব্যাখ্যা দিয়েছিল, সে বললে-'ওর দাঁত ভেঙে গেছে।'

—'ভেঙে গেছে? কী করে?'

—'গুরুদাসের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল।'

—'গুরুদাস কে?'

কেউই কোনো জবাব দিল না।

আমি বললাম—'এসেছে সে ক্লাসে?'

খুব একটি বেঁটে ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে—'এসেছে বইকী, ওই যে দক্ষিণ দিকের বেঞ্চে হি হি করে হাসছে, ওই ঢ্যাঙা ছেলেটা।' আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দিল।

না ঢ্যাঙা বেশি নয়, সাত-আট বছরের, কতদূরই-বা মাথায় হবে? শিশু। সবই শিশু।

আস্তে বললাম—'তোমার নাম গুরুদাস?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তুমি ওর দাঁত ভেঙেছ?'

গুরুদাস অনিশ্চয়তার বিহ্বলতার ভিতব হ্যাঁ করে তাকিয়ে রইল।

—'কেন দাঁত ভাঙলে?'

—' আমার সঙ্গে মারামারি করতে এসেছিল।'

—'কীসের জন্য?'

—'আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছিল।'

গায় খদ্দরের একটা লাল ফতুয়া। পর্যবেক্ষণ কবে বললাম—'কই তোমার জামা তো বেশ আস্তই আছে।'

—'এই যে দেখুন না ফুটো।'

ফুটো একটা বেরিযে পড়ল বটে, কি তা অতি সামান্য, অনেক দিনের পুবোনো ফুটো বলেই মনে হয। সদ্য ছেঁড়া জিনিসের মতো বোধ হয না।

—'আচ্ছা যদিই-বা জামাতে এতটুকু ফুটো কবে দেয, তাই বলে তুমি দাঁত ভেঙে দেবে?'

—'আমার পেনসিল কেড়ে দিযে গেছল।'

—'কে?'

—'ওই বিজেয বুঝি?'

—'আজ্ঞে না বিজন।'

—'কই দেখিনি তো, তারপর তুমি ছিনিযে আনলে বুঝি তোমার পেনসিল?'

খুব ইতস্তত করে পকেট থেকে একটা সুন্দর ভেনাস পেনসিল বেব কবল। পেনসিলটা হাতে তুলে নিযে নেড়েচেড়ে দেখলাম ছুরি দিয়ে খোদাই করে লেখা আছে 'বি' জিজ্ঞেস করলাম—'এ কে লিখেছে?'

—'ও আমার পেনসিল চুরি করে নিযে নিজের নাম খুদে বেখেছিল।'

—'কবে?'

—'আজ।'

—'আজই?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ক্লাসে আসবার ঠিক মুখোমুখি।'

—'ছুবি কোথায পেল?'

—'ওর পকেটেই আছে।'

যাক পেনসিলটা গুরুদাসকে ফিরিযে দিলাম।

বিজয উঠে দাঁড়িযে বললে—'আমাব পকেটে ছুরি নেই তো, ছুরি এই ক্লাসে কারু নেই, আমি—'

পশ্চিম কোণ থেকে একটি ছেলে বাধা দিয়ে—'আমার কাছে আছে, আমি কাউকে দেই না।'

বিজন—'আমাব পেনসিল আমার কাকাবাবু কিনে দিযেছিলেন, রথের মেলার সময়। আমি ওব জামা ছিঁড়িনি। ও আমার চুলের ঝুঁটি ধরে একেবারে মোছলমানদের মুরগির মতো আমাকে হকচকালে, তারপর ঘুষি মেরে আমার দাঁত ভেঙে দিল।'

গুরুদাস ঝংকার দিযে উঠে—'হ্যাঁ ঘুষি মেরে না হাতি, ওর দাঁত ফোঁকরা ছিল মাস্টার মশাই,

নড়বড় করত, নিজের থেকেই গেছে পড়ে, পেনসিলটা আমার মাস্টারমশাই, আমার কাকাবাবু আমাকে রথের মেলার সময় কিনে দিয়েছিলেন।

কন কন কন কন শিশু দুটির গলা বেজে উঠছে মিষ্টি তীব্র, যেন যাত্রাদলের অভিমন্যু দুটি।

আমি হাত ইশারা করে দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—'আচ্ছা বোসো এখন তোমরা। গুরুদাস কিন্তু ইস্কুল ছুটির পর আমার কথা শুনে যাবে।'

দেখলাম ছেলেটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—গুরুদাসের।

যে ছোট ছেলেটি গুরুদাসকে শনাক্ত করেছিল সে দাঁড়িয়ে—দাঁত ফোকরাই ছিল, একটু হাতাহাতি করতে গিয়েই খসে পড়েছে। তা ওরকম খসে! ওর পানসে দাঁত মাস্টারমশাই, দাঁত কুড়িয়ে পকেটে রেখে দিয়েছে, কেমন যে কেমন না, পকেটে রেখে দিসনি?' বিজনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে—'পকেটে রেখে দিলি কেন রে?'

—'তুই চুপ করে—'

—'দাঁতটা পকেটে কেন রেখে দিয়েছে মাস্টারমশাই?'

বিজন—'পকেটে রেখে দিয়েছি ইঁদুরের গর্তে ফেলে দেব সেইজন্য। না হলে ভালো দাঁত উঠবে কী করে? যেখানে-সেখানে দাঁত ফেলে দিতে হয় না যে।'

চেযারে গিয়ে বসলাম। বললাম—'লেখো তো ডিকটেশন।'

মুহূর্তের মধ্যে খাতা কাগজের ফড়ফড় শব্দে সমস্তটা ঘর ভরে উঠল। ধপ করে বই মাটিতে পড়ে, পেনসিল পড়ে যায়। শিশুরা নিজেদের সামলাতে পারে না।

গোটা দশেক শব্দ লিখতে দিলাম।

ডিকটেশন দেয়া শেষ হতে না হতে বেঁটেছেলেটি তার কালি কলমের লম্বা খাতাটা নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে আমার কাছে এসে হাজির হল।

—'কী হয়ে গেছে?'

—'হ্যাঁ সব।'

—'এরই মধ্যে?'

—'আপনি বলেছেন আর লিখেছি।'

—'ভুল করোনি তো? কই দেখি?'

—'বানান আমি বেশ পারি, ইংবেজিতে সবচেযে বেশি নম্বর রাখি।'

আর একটি ততোধিক বেঁটেছেলে এসে তাকে ঠেলে দিয়ে বললে—হ্যাঁ ইংবেজিতেই তুমি সবচেযে বেশি নম্বর রাখ কিনা। নতুন মাস্টাবমশাইকে যা তা বলে দিয়ে খুব ভোগা দেযা মুখ তো তোমার।' আমার দিকে তাকিয়ে—'ও বড্ড ধাড়ি, নিন মাস্টারমশাই আমার খাতাটা দেখুন আগে।'

—'আচ্ছা দেখছি, টেবিলেব ওপর রাখো।'

কিন্তু আমাকে তার খাতাটা সে আগে দেখাবেই, হ্যাঁ সবচেযে আগে। বললাম—'প্রথম যে এসেছে তার খাতাটাই প্রথম দেখি, তারপর তোমারটা দেখব।'

ছেলেটি বিক্ষুব্ধ হযে—'অঙ্কে আমি প্রথম।'

—'তাই নাকি?'

মাথা কাত করে অপরিতৃপ্তভাবে—'হ্যাঁ ইংরেজিতেও, ও আগে আনলে হয় কী, দুটো বানান বাদ দিয়েই এনেছে, না হয ভুল করেছে একগণ্ডা। এমন আদিখ্যেতা, পাংচুযেশন একদম পারে না, সেদিন বলেছিল ইন্টু ভার্ব। ভার্ব মাস্টারমশাই?'

খাতা দেখতে দেখতে মাথা নেড়ে—'না।'

—'অ্যাডভার্ব, কেমন, না?'

—'না, প্রিপোজিশান।'

আগের ছেলেটি বললে—'কেমন আচ্ছা জব্দ।'

তাকিয়ে দেখলাম টেবিল ঘিরে অনেক ছেলে জমে গেছে। বললাম—'তোমরা খাতা রেখে যে যার যাযগায় গিয়ে বোসো।'

খুদে ছেলেটি—'আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

—'যাও, জল খেয়ে এসো গিয়ে।'

—'আপনি খাতা দেখে নিন, তারপর যাব।' নইলে কোত্থেকে ছিঁচকে-মিচকে চোর এসে নিয়ে

যাবে।'

অনেকগুলো খাতা দেখে ব্ল্যাকবোর্ডে শুদ্ধ বানানগুলো লিখে দিলাম। বললাম—'তোমরা এগুলো টুকে নাও।'

গভীর উৎসাহে টুকতে লাগল সকলে চোখ মুখ ছাপিয়ে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা, বোর্ডের দশটা শব্দ শিক্ষা এরা সবে আরম্ভ করেছে, জীবনটাকেও। প্রাণের ভিতর অবসাদ খুব কম। ছেলেরা টুকছিল।

আমি ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলাম। আড়াচোখে একটা খাতার দিকে তাকাই দেখি একটা বানান টুকে একটি ছবি এঁকে নেবা আকাঙ্ক্ষা একজনের, একটা ঘোড়ার মাথা আঁকল, নাকের ছ্যাঁদা দুটো ফুটিয়ে তুলল, দুটো কান খাড়া করল, লাগামটা টেনে এঁকে দিল।

তারপর। হ্যাঁ, তারপর আর একটা বানান টুকতে হয। তারপর আর একটা, তারপর আর একটা।

হাঁটতে হাঁটতে সেই খুদেছেলেটির বেঞ্চির কাছে এসে পড়ি। সে মুখ তুলে তাকায। জিজ্ঞেস করি—'কী নাম তোমার?'

—'আমার নাম?' একটা ঢোঁক গিলে—'রামকান্ত।'

—'রামকান্ত! এতটুকু ছেলের নাম!

কয়েকজন ছেলে হেসে উঠল।

বললাম—'হাসে না, চুপ চুপ। তোমাদের নামই—বা কী?'

কেউ অক্ষয়, কেউ হরকান্ত, কেউ প্রসন্ন, বরদা, হেরম্ব'—এ সমস্তই তো বুড়ো মানুষের নাম।

হরকান্তর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম আবার। সেই ছাব্বিশ বছর আগে আমরা যখন ছোট ইস্কুলে পড়ি তখন হরকান্ত বলে একজন মস্ত উকিল ছিলেন। আমাদের ইস্কুলের সেক্রেটারি তিনি মিউনিসিপ্যালেব চেয়ারম্যান ছিলেন, চেযারম্যান, বযস তখন তাঁর প্রায আশি। ছিযাশি বছর পর্যন্ত অক্ষত মনোযোগে ও পরিশ্রমে জীবনের বিষয-আশয হিসাবপত্র, দলিল-দস্তাবেজের তদারকি করে গেছেন তিনি। সব সমযই চোগা চাপকান পরে থাকতেন। সমস্ত মুখ কতকগুলো কুঞ্চিত ভাঁজেব সমষ্টি। বৈষযিক মানুষের বক্র ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বিরস। এই হরকান্ত, এই শিশু, সেও একদিন হযতো সেইরকম হযে দাঁড়াবে। অবাক হযে ছেলেটির মুখের দিকে তাকাই। চোখেব ভিতর কেমন একটা গাম্ভীর্য ও কঠিনতা ধবা পড়ে যায যেন তাব, সমস্ত মুখ ক্ষমাহীন হযে ওঠে। বানান লিখতে গিযে যেন হিসাবপত্র সুদ-বন্ধকীব দলিল ও দাখিলাব ভিতব কল্পনাহীন কবিত্বহীন প্রেমহীন কঠোর এক কাঠেব মূর্তি চাড়া দিযে উঠেছে।

পাযচারি করতে থাকি।

তা অসম্ভব নয়, এইরকমই হয়তো হবে। পঞ্চাশ বছব পবে হবকান্ত হযতো একটা [...] কর্ণধাব, উকিল লাইব্রেরির মাতব্বর, খানদান কমিটির পাণ্ডা—কত কী!

আমার ভস্ম কংকালের উপর গভীর উলুঘাস জন্মে গেছে হযতো তখন। বন অপরাজিতা ছেযে গেছে, লাল বটের পাতা ঝরেছে, ঝিঁঝি ডাকছে, জোনাকি উড়ছে।

পায়চারি করতে করতে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িযে।

একটি ছেলে ঝিমোচ্ছে।

আস্তে আস্তে গিযে তার মাথাটা তুলে ধরি—'ঘুমোও কেন?'

সে চমকে উঠেছে, চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল।—'বাত জেগে খুব পড়াশোনা করো বুঝি?'

মাথা নেড়ে চুপ করে রইল।

—'বিনয় যাত্রা দেখতে গিযেছিল মাস্টারমশাই।'

—'যাত্রা?'

—'হ্যাঁ। এই তিন বাত্তির ধরে দেখছে।'

—'কোথায যাত্রা হচ্ছে?'

একসঙ্গে অনেকেই বললে—'শ্রীমন্ত চক্রবর্তীদেব মাঠে। মস্তবড় চাঁদোযা তোলা হযেছে, দেখেননি মাস্টারমশাই?'

বলতে গিয়ে সকলেরই খুব আগ্রহ ও উল্লাস। অপ্রসন্নতা বোধ করছিলাম না। এ কলরবকে নিরস্ত করারও কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

বললাম—'পালা কীসের?'

—'মানভঞ্জন।'

—'ও, তাই বুঝি। আচ্ছা তোমরা লেখো।'

মুহূর্তের মধ্যেই সকলে নিস্তব্ধ হয়ে লিখতে লাগল। দরজার কাছে ঘাসের ওপর যে ভেরেন্ডা গাছটা তারই দুধের মতো শাদা ফুলের ভিতর একটা অপরিক্লান্ত নীল ভোমরা অনেকক্ষণ থেকে বুনবুন বুনবুন করে কাঁদছে।

ঘণ্টা পড়ার শব্দে চমকে ক্লাসে ফিরলাম।

রেজিস্ট্রারি ডেকে ইতিহাসের পড়া নিচ্ছিলাম।

ক্লাসের এককোণে খানিকটা গোলমাল। বললাম —'কী হয়েছে ওখানে?'

হরকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে—'মাস্টার মশাই কেমন শুটকি মাছের গন্ধ এখানে।'

—'শুঁটকি মাছের?'

তিন্‌-চারজন ছেলে সমস্বরে বলে উঠল—'আজ্ঞে হ্যাঁ, বসতে পারা যায় না।'

—'কী যে বলো তোমরা।'

চেয়ার থেকে আস্তে আস্তে উঠে—'ইঁদুর ব্যাঙ কি যেন পচেছে হয়তো, তাকে বলো শুঁটকি মাছ, এরপর লালকে বলবে কালো, হলুদকে বলবে সবুজ।' এগিয়ে গিয়ে মনে হল, না ব্যাং পচা গন্ধ নয় গন্ধটা চিমসে নয়, আঁসটেই বটে।

বললাম—'তাই তো এ গন্ধ আসে কোথে কে?'

ছেলেরা মুখ টিপে হাসছিল।

দেখলাম হেরম্ব কাঁদছে।

—'কাঁদো কেন তুমি?

কান্না তার একেবারে উথলে উঠল।

বললাম—'এ কাঁদে কেন বলতে পারো তোমরা? কি এই রামকান্ত বলো কী?'

রামকান্ত—'গন্ধটা এর ছিটের কোটের থেকে আসছে মাস্টারমশাই।'

—'কার ছিটের কোটের থেকে?'

—'হেরম্বর।'

চোখ কপালে তুলে — 'কীবকম?'

ভবরঞ্জন—'হেবম্ব শুঁটকি মাছ খায মাস্টারমশাই।'

বাঙা চোখে কান্না সামলাতে সামলাতে হেরম্ব উঠে দাঁড়িযে বললে—'আমি শুঁটকি মাছ খাই? আমি খাই? মাস্টাবমশাই ওরা আমাকে খ্যাপায় শুধু। আমাব কী চাটগাঁয বাসা, না মগ আমি?' বলে ভ্যাক কবে কাঁদতে লাগল হেবম্ব। পাশেই পণ্ডিতমশাইযেব ক্লাস। হাত নেড়ে বললাম,—'চুপ চুপ কাঁদে না, কাঁদে না, আরে দূব হেরম্ব, ক্লাসে কী কাঁদতে হয নাকি?'

বামকান্ত উঠে দাঁড়িযে—'ব্যাপারটা কি হযেছে জানেন।'

হেবম্ব হঠাৎ কান্না থামিযে দিযে বললে—'ও জানে ছাই, ওর মিছে কথা শুনবেন না। হযেছে কী জানেন, হযেছে আমি—আমাব এই ছিটের কোটটা আজ সকালবেলা ভিজে গেছল।'

রামকান্ত—'বৃষ্টি নেই বাদলা নেই ভিজে গেছল, বা রে! মাস্টাবমশাই এমনি বললেই শুনবেন কীনা।'

বামকান্তকে বসতে বলে হেরম্বের দিকে তাকালাম।

হেরম্ব—'ভিজে গিযেছিল, আমার আর জামা কোট কিচ্ছু নেই, মাকে তাই বললাম এটা শুকিযে দাও না মা। মা বললেন, যা কাঁটাগাছেব ওপব বোদে বেখে যায। কিন্তু দেখলাম তাতে শুকোয় না। মা বললেন, তবে আন। উনুনের ওপর একটা দড়ি টাঙিনে ঝুলিযে দি। তাই ঝুলিযে দিলাম।' হেরম্ব ফোঁপাতে ফোঁপাতে একবাব মাটির দিকে তাকাল। তারপর চোখ তুলে বললে—'কড়াইযে তখন কুঁচো চিংড়ি ভাজা হচ্ছিল। আমরা তো কেউ বুঝিনি, সেই ধোঁযার গন্ধ -স-ব এই কোটে গিয়ে বসেছে।' বলে ঝপ করে বসে পড়ে হাইবেঞ্চে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল।

—'এতে কাঁদবার কী আছে শোনো—'

হেরম্ব মুখ তুলে বললে—'ছেলেরা আমাকে ঠোনা দেয শুধু, খুনসুড়ি করে।'

—'না, না, করবে না আর।'

—'বলে, এই মগ।'

—'না, ছিঃ আমি নিষেধ করে দেব। একে তোমরা মগ বল বেশ আক্কেল তো তোমাদের যত সব বেযাড়া ছেলের দল! দাঁড়াও তোমাদের বেত মেরে ঠিক করছি।' নিজের গলা নিজের কানে বাজতেই

কেমন হাসি পেল আমাব। মনে হচ্ছিল অনেকগুলো ছেলে মুখ লুকিয়ে মিট মিট কবে হাসছে হযতো—বক দেখাচ্ছে আমাকে, মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।

চাবদিকে তাকিয়ে দেখলাম কিছু না, মুখে চুনকালি লাগিযে বসে আছে বেচাবিবা। হাসি বা বহস্যেব কোনো গন্ধও কোনোদিকে নেই, জীবন যেন একটা সমস্যা, মাস্টাবমশাই একটা দুঃস্বপ্ন।

অবাক হযে ভাবছিলাম এই ক্লাসেব এই সব পাবাবতেব বাচ্চা মানবজীবনেব চিব প্রত্যাশিত নিযমেব মতো নয, কেন যেন গভীব সুন্দব অনিযম যাকে ধীবে ধীবে ধ্বংস কবে ফেলতে পাবে।

হেবম্বকে বললাম—'যাও তুমি, বাসায গিযে কোট বদলে এসো।' গুরুদাস হি হি কবে হাসছিল, এক ঘা বেত লাগালাম গিযে তাকে। দেখে বিজন বক্তাক্ত মুখে হাসতে লাগল। চুলেব ঝুটি ধবে খানিকটা নাড়া দিযে দিলাম ছেলেটাকে।'

বললাম—'কই কোথায দাঁত লুকিযে বেখেছ বেব কবো দেখি।' সে বিহ্বল বিমূঢ় মুখে আমাব দিকে তাকিযে বইল।

—'বেব কবো বলছি, যত সব হাড়-হাভাতেব আড্ডা জুটেছে আমাব ক্লাসে, কই দাঁত কোথায?'

পকেট হাতড়ে একটা বক্তাক্ত দাঁত হাইবেঞ্চেব ওপব বাখল সে।

বললাম—'দাও, জানালা দিযে ছুঁড়ে ফেলে। পকেটে দাঁত নিযে বসে আছেন। যত সব অনামুখো।'

হ্যাঁ, দাঁতটাকে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হল। খালেব কাছে যেখানে কলমিব শাকেব নিবিড় জঙ্গল, তাবই ভিতব গিযে পড়ল তাব দাঁতটা। কিংবা হযতো স্রোতেব জলে ভেসে গেল। যাক।

চেযাবেব দিকে এগিযে যেতেই দেখি একটি ছেলে কী একটা বইযেব ভেতব ফেলে গুলেবকাওযালিব গল্প খুলে বসেছে। দাঁত কড়মড় কবে বললাম—'বটে, ইতিহাসেব ক্লাসে তোমাব এইসব হয।'

বইটাকে দিলাম ছুঁড়ে ক্লাসেব এক কোণায। তাবপব বললাম—'আনো, কুড়িযে আনো।'

কুড়িযে এনে আমাব হাতে যখন দিল, বললাম— এই বই তোমাব বাজেযাপ্ত হল। আব একমাসেব মধ্যেও পাবে না।'

গুলেবকাওযালি পবীব স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন সবস মুহূর্তগুলোব তাব এইবকম পবিণাম হল, তাকিযে দেখলাম ছেলেটিব চোখেব ভেতব থেকে শেষকল্পনা ও স্বপ্ন শুকিযে একেবাবে হতোদ্যম ও বিশ্রীবিকাব। কিন্তু তবুও দ্বিধা কবলে চলবে না তো, আমাব কর্তব্য আমাকে কবতে হবে, নিশ্চযই কবতে হবে, বইটা টেবিলেব ওপব বেখে দিলাম।

চেযাবে বসেই দেখি যে ছেলেটা যাত্রা দেখে ঝিমুচ্ছিল, সে ঝিমুচ্ছেই, ঝিমুচ্ছেই।

ধড়মড় কবে চেযাব থেকে উঠে পড়ে—'নাক টিপলে দুধ গলে, তিনি আবাব মানভঞ্জনেব পালা শুনতে গিযেছিলেন। তোমাব গান শোনা বেব কবি আমি।'

দুই থাবাব মতো দুটো হাত বাড়িযে ছেলেটাব দু কান আটকে ধবে হিড় হিড় কবে টানতে টানতে টেবিলেব কাছে এসে বললাম—'থাক, দাঁড়িযে থাক এখানে। চোখ পাজলেছিস কী বেত পেটা কবব। বলে বেতটা ব্ল্যাকবোর্ডেব পাশ থেকে কুড়িযে নিযে টেবিলেব ওপব ঘা দিযে দু চাব বাব আওযাজ কবে নিলাম। ছেলেদেব দিকে তাকিযে বললাম—'তোমবা ক্লাসে এসে যদি গল্প উপকথা পড়ো, কিংবা বাইবে গিযে গান শোনো, ডিকটেশন লিখতে লিখতে ঘোড়াব ছবি আঁকো যদি, কিংবা ফুলেব তেল মেখে ক্লাসে আসো, অথবা টেবি কাটো, তাহলে তোমাদেবও এইবকম অবস্থা হবে।' বলতে বলতে অনেক অতিবিক্ত কথা বলে ফেললাম।

চোখ তুলে দেখি একটি ছেলে পেযাবা খাচ্ছে, গুরুদাস তাব দিকে তাকিযে হি-হি হাসছে, হেবম্ব খাতা খুলে পেনসিল চালিযে ছবি আঁকতে ব্যস্ত, বিজন কলমিব জঙ্গলেব দিকে তাকিযে আছে। দু চাবটি ছেলে ইতিহাস খুলে ফিস ফিস কবে পড়া মুখস্থ কবে নিচ্ছে, কযেকটি ছেলে হাইবেঞ্চেব আড়ালে মাথা লুকিযে ঘুমুচ্ছে। মেঝেব এক কিনাবে একটা মার্বেল গড়িযে পড়ল, ঘবেব ভিতব প্রবিষ্ট একটা বাসন্তী প্রজাপতিব দিকে দু জোড়া হাত লাফিযে উঠল, একজন সূতোয বেঁধে একটা ফড়িং নাচাচ্ছে। বেড়াব এক কোণে মাঝাবি গোছেব একটা জালেব ভিতবকাব মাকড়সাব সঙ্গে একটি ছেলে পেনসিল দিযে খেলা কবছে। হবকান্ত সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায আমাব দিকে তাকিযে। হাসি পায। বেদনা বোধহয। গভীব অবসাদে মন ঝিমিযে আসে।

দুটো ঘণ্টা কেটে যায।

তাকিযে দেখি বিজন কলমিব বনেব দিকে বক্তাক্ত মুখে তাকিযে আছে।

প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে

মস্তবড় কোঠা বাড়ি, দোতলা। অনেকগুলো কামরা। কিন্তু লোকজন কেউ নেই। আছি একা শুধু আমি।

অনেকদিন আগেই চুনকাম করা উচিত ছিল। অনেক জায়গায় ইট খসে পড়ে গেছে। দেওয়ালের ফাটলের ভিতর আগাছা জন্মেছে। ঘরে ভিতরে দেওয়ালের গায় নোনা ধরে গেছে। শ্যাওলা জন্মেছে। বাড়ির ভিতরে-বাইরে হাঁটতে হাঁটতে ষাট সত্তর বছরের পুরোনো জীর্ণ গন্ধ পাওয়া যায় শুধু। চারদিকে আগাছার রাজ্য। বিড়াল আঁচড়ায় জঙ্গল, শিয়ালকাঁটা, কাজললতা—

গত বছর বাবা মারা যাবার পর থেকেই বাড়িটা ভেঙে গেল। হিসাব করে দেখা গেল বাবা সাড়ে পঁচিশ হাজার টাকা দেনা রেখে মারা গেছেন। সংগতির মধ্যে রেখে গেছেন শুধু বাড়িটা আর আশেপাশে বিঘাখানেক জংলা জমি।

এ নিয়ে কেউ প্রলুব্ধ হয়ে থাকতে চায় না।'

বাবাব মৃত্যুব পর খাতকদের তাড়ায় মাল ঢের কমিয়ে দিতে হয়, চাকর-বাকর উঠিয়ে দিতে হয়। এ সংসারের মূল্যবান জিনিস যা কিছু বিক্রি করে ফেলতে হয সব।

তবুও এখনো দশ হাজার টাকা দেনা পড়ে আছে। একটা স্কুলমাস্টাবি নিলাম, স্কুলটা বেশি দূরে নয়, হেডমাস্টার মাটির মতো মানুষ, তিনিই সহানুভূতি করে ডেকে কাজটা দিলেন। বেশ কাজ। ছ-ঘণ্টা পড়াতে হয় রোজ। চল্লিশ মাইনে। সমস্তটা দিন নিযুক্ত হয়ে থাকবার সৌভাগ্য ঘটে। এ না হলে বাড়িতে বসে বসে সারা দিন-রাত একা একা কি করে কাটাতাম। আমি!

মা গত বছর অবদি ছিলেন। আমার ছোট বোন নির্মলাও ছিল। কিন্তু দেশেব বাড়িতে থেকে থেকে তাবা কেমন অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল। গত বছর চৈত্রমাসে তাই তারা কলকাতায চলে গেছে, আমাব ছোটভাই সুধীরের কাছে। সুধীব কলকাতায কনট্রাকটরি ব্যবসা ধীরে ধীরে গুছোচ্ছে। দেশে সে কখনো আসেন না। একেবারেই একা মানুষ। একবার মেজমামাকে লিখলাম কিছুদিনেব জন্য এখানে এসো না, পিসিমাকে লিখলাম, আমার শালাকে লিখলাম, আমার খুড়ার সংসার মুঙ্গেরে, সেখানেও চিঠি দিলাম।

কিন্তু কেউই আসতে চায় না। একটা না একটা ছুতো, অনেক লেখালেখির ওপব স্পষ্ট করে জবাব দেয়, পাড়াগাঁর একেবারে এক কিনাবে অতিবড় একটা একা বাড়িতে থাকতে যেন কেমন লাগে তাদের।

চিঠিব মাবফত জিজ্ঞেস কবি—'আনক্যানি?'

জবাব আসে,—'হ্যাঁ অনেকটা সেইরকম।'

আমাকে তারা কলকাতায় সুধীবের কাছে গিয়ে থাকতে বলে। কিংবা তাদের কারু কাছে কিছুদিন কাটিযে যেতে অনুরোধ কবে। তা বেশ, কিন্তু আবার ফিবে আসতে হবে তো? এই বাড়িতেই ফিরে আসতে হবে। এ বাড়ি ছেড়ে কোথায-বা যাব আমি? এ বাড়িতে আমার বাবা ছিলেন, ঠাকুরদা ছিলেন। এ বাড়ির উঠানে পাযচারি করে দিঘির পাশে বসে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরে, নিশ্বাস ফেলে নিজের গভীব অধিকার বোধ করি আমি। কোনো আনুগত্য নেই, পরমুখপেক্ষিতা নেই, পরগাছার মতো অন্য জীবনকে আশ্রয় করে যে বেদনা ও অকিঞ্চিৎকরতা এখানে তাব কোনো আভাসও নেই। আমি কাউকে কোনো কৈফিয়ত দেই না। যে কক্ষে ইচ্ছা সেইখানেই রাত্রিযাপন করি। কখনো-বা ছাদের উপব শুযে থাকি। কখনো কাকার পুরোনো মুহুরিব ঘবে একতলাব বাঁ-দিকের কোঠাটায়, কখনো যে ঘরে আমার স্ত্রী মারা যায় সেইখানে, সেই পুরোনো পালঙ্কটার উপর যতক্ষণ খুশি রাত জেগে কাটিয়ে দেই। বাতাবি ফুলেব গন্ধ আসে। এক-একদিন হযতো ঝাড়বাতিটা জ্বলে, পুবোনো চিঠিগুলো পড়ি। কখন আকাশে মেঘ কবে আসে। মেঘ ভেবে যায। চাঁদ গড়িয়ে পড়ে। বৈশাখের রাত হু হু করতে থাকে।

অন্যমনস্ক হয়ে জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকি। অন্ধকারে, গভীর অন্ধকারে পলাশগাছের থেকে হিজলগাছে, হিজলগাছের থেকে কোনো একটা গভীব জটাওয়ালা গাছেব ডালপালার ভিতর আওয়াজ কবে ফেবে। পেঁচা একা? মনে হয় কে যেন নিঃশব্দ সঞ্চারে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। চোখ তুলে দেখি জোনাকিব দল নিবিড় অর্জুন গাছটাকে ঘিরে ফেলেছে। মনে হয কে যেন এসেছে ওখানে: এই পেঁচা ও জোনাকিদেব

মধ্যে। জোনাকিগুলো নিভে যায়, জ্বলে ওঠে, ডালপালার ভিতর পিছলে পিছলে পড়ে, যেন কোনো শিশু খেলা করছে তাদের সঙ্গে। খুব শিশুসুলভ হৃদয় ছিল কল্যাণীর কত খেলাই না সে খেলত। এখন মৃত্যুর পর বুঝি জোনাকি পেঁচা আর জটাওয়ালা গাছের পিছু নিয়েছে। তা নিক । নিক সে।

দড়াম করে জানালাটা বন্ধ করে দেই। খেলুক, খেলুক, সে বাইরেই খেলুক চিরদিন এইরকম জোনাকি অন্ধকার ও আমের পল্লব নিয়ে খেলা করে বেড়ায় যেন সে। নিচে কালমেঘের জঙ্গলে কাচপোকাদের সঙ্গে অমাবস্যা রাতে খুনসুড়ি ফুরায় না যেন আর তার। জ্যোৎস্নায় বাতাবি ও চালতাফুলের মধু খেয়ে পদ্মবনে দিঘির জলে, শানবাঁধানো বসবার ঘাটে বাতসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফেরে যেন সে। যা খুশি তাই যেন করে।

জীবনে সংসর্গ সে খুব ভালোবাসত। মানুষের জীবনের উৎসবও আড়ম্ববেব দিকগুলোর মানে খুব ভালো করেই বুঝত কল্যাণী। কিন্তু মানুষের অন্তরের নিঃসঙ্গতা বিচ্ছেদ এগুলো কোনোদিনই উপলব্ধি করতে পারত না সে।

না, কোনোদিনও পারত না।

যদি পারত, তাহলে গায় জ্বর নিয়ে দিঘির জলে স্নান করে, অনেকক্ষণ ধবে স্নান কবে, তারপব পান্তাভাত আর তেঁতুলের অম্বল খেযে সান্নিপাত ঘটাতে যায কেউ? এতটুকু বুদ্ধি তো একটা সাত বছবের মেয়েরও থাকে। আমাকে সে সাজা দিতে চেযেছিল। কেন সাজা? কী কবেছিলাম আমি? কথাব মধ্যে মা শুধু বলেছিলেন, পাঁচ বছর বিয়ে হল তোমাদের বউমা, কোনো সন্তান হল না তোমাব। এটা বড় সুখেব কথা নয়, তোমারও না, আমারও না। পিতৃপুরুষদের বংশ বক্ষাই-বা হয কী কবে? শাশুড়িবা এইবকম বলেই থাকে।

কিন্তু আমি কি বলেছিলাম? কিছুই তো বলিনি আমি। বংশবক্ষার কথা আমি কোনোদিন তুলতেও যাইনি। এ পাঁচ বছর কল্যাণীর সঙ্গে ব্যবহারে আমি ববং সহিষ্ণুতাব ক্ষমার আতিশয্যই দেখিযেছি। উপলব্ধি করেছিলাম যে স্ত্রীলোকের প্রেম পুরুষের কাছ থেকে সংযম ধীবতা দাক্ষিণ্য এই সব জিনিস চায। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার নরনারীর প্রেম ধন্য হয। আরো কত কি উপলব্ধি কবেছিলাম। কল্যাণীব সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে কোনোদিন কোনো তুচ্ছ কথা বলতে যাইনি তাই। আকাঙ্ক্ষা বা অনাসক্তিব কোনোরকম কোনো ক্ষুদ্রতা যা নারীকে ব্যথা দেয মনেব মধ্যে পোষণ করবে ভয পেযেছি—কিন্তু তবুও সে অভিমান করল।

অভিমান করার খুব গভীর অভ্যাস ছিল কল্যাণীব। পদে পদে মানসম্ভ্রমেব ক্ষযেব কথা উঠত। একেবারে গাল ফুলিযে বসত সে, তারপব বিছানা নিত। কোনো কোনোদিন বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদত। মনে হত বিচ্ছেদের ব্যথাব চেযেও অভিমানের বেদনা কঠিন যেন তাব।

কিন্তু একটা ভারী সুন্দর গুণ ছিল তাব। বিছানাব পাশে বসে আস্তে আস্তে কপালে-চুলে হাত বুলিযে দিতে গেলে কল্যাণী বাধা দিত না, কোনোদিনও বাধা দিত না। ধীবে ধীবে বালিশেব ভিতব থেকে মুখখানা বের করে ফেলত তার, প্রতিবাবই বের করত, সুন্দব সুঠাম পবীব মতো মুখখানা তাব, আঁচলের খুঁট দিযে নিজেই চোখের জল মুছে ফেলত সে।

আমিও যে মুছিয়ে দিতে পারি, মুছিযে দেওয়া উচিত আমাবই এ প্রশ্ন সে তুলতে যেত না। এমনই অনুপম। আমার পাঞ্জাবিটা ধবে বসত, কিংবা আমার বাঁ-হাতটা। খুব আমি পালিযে যাই এই ভয, আহা! তারপর বাদলেব পর মেঘভাঙা প্রসন্ন আকাশের মতো মুখ টিপে সে হেসে ফেলত।

কল্যাণী ছিল এইরকম!

শাশুড়ির কথা শুনে সেদিন খুব বেশি অভিমানই কবল। দেখলাম মেঝেব দিকে তাকাতে তাকাতে মুখে একরাশ অন্ধকাব নিযে কল্যাণী শোবার ঘবে গিযে ঢুকল। তাবপব কপাটটা দিল বন্ধ কবে।

দু-একবার ঘা দিলাম গিযে। কিন্তু খুলল না, আমাকেও সে আজ আব বিছানাব পাশে বসাতে রাজি নয়, হয়তো আজ মনের দুঃখ খুব গভীর। কোনো সান্ত্বনা মানে না আজ আর। আশ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই। বেঁচে থাকাটাই যেন বিড়ম্বনা। যে জীবিত অথচ সন্তানের জননী নয় সে যেন না বাঁচলেও পারে। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে হযতো সে আজ আকাশ-পাতাল একাকাব কবে ফেলছে।

ছাদে পায়চারি করছিলাম।

বিশ্বেশ্বর এসে বলল—'দাদাবাবু!'

—'কি রে?'

—'বউঠাকুরুন আপনাকে ডাকছে।'

—'যাই।'

যেতেই বললে—'তুমি আসোনি যে।'

বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম।

বালিশটা চোখের জলে ভিজে একাকার। সমস্ত মুখে গালে চিবুকে তখনো অশ্রুর গঙ্গা, অশ্রুর মন্দাকিনী।

কল্যাণী বিছানার উপর উঠে বসল। বেগুন ফুল রঙের শাড়ির আঁচলটা ধীরে ধীরে নিজের গলায় জড়িয়ে বললে—'কোথায় ছিলে তুমি?'

—'ছাদে।'

—'ছাদে? অতদূরে? আর এখানে আমি কষ্টে খুন হয়ে গেলাম। আমার কিছুতেই তোমার কিছু হয় না! তা হবেই-বা কেন! আমি কে?'

বালিশটায় পিঠ উলটে দিয়ে বললাম—'শোও, জানালাগুলো খুলে দেই। একটু ঝিরঝিরে বাতাস আসুক।'

জানালা খুলে দিয়ে এসে দেখলাম শুয়েছে।

বাঁ-কাত ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'তোমাব যদি ডানা থাকত তাহলে ছাদ তো সামান্য উড়ে উড়ে হয়তো মেঘের ভিতর গিয়ে আরাম কবতে তুমি। তা তুমি কবতে। আমার খবব নিয়ে তোমার কি কাজ! কোথাকার কে পরের মেয়ে, তোমার কি?'

একটু হেসে বললাম—'তাই বুঝি কল্যাণী?'

—'তাই, তাই, আমার জন্য তোমার কি মাথাব্যথা!'

কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—'তুমিই তো দবজা আটকে রাখলে।'

একটু ফিক করে হেসে বললে—'আটকাব না? আমি যে কাঁদি তা যদি কেউ ঘরের ভেতর ঢুকে দেখে ফেলে!'

এইরকম শিশু। মুখখানা দেখলাম শিশুসুলভ আমোদ ও কাতরতায় ভবে উঠেছে।

বললাম—'কে আবার ঢুকবে কল্যাণী? ঢুকলে তো আমিই ঢুকতাম।'

—'তোমাকেই-বা আমাব কান্না দেখাতে যাব কেন? আমার লজ্জা করে না? একটু ঠাট্টা কবে হেসে,—'তোমাব কান্না সে তো খুব দুষ্প্রাপ্য জিনিস কল্যাণী। কোনোদিনও দেখেছি কি আমি আর?'

—'যাও।' বলে হাতটা সরিয়ে দিল।

কিন্তু পরমুহূর্তে কপালে চুলে হাত বুলুতে বুলুতে—'মুখ চোখ তো খুব লাল দেখছি তোমার।'

—'হবে না? জ্বালা কি কম পেয়েছি?'

—'কেন? কী হয়েছিল কল্যাণী? কেনই-বা দরজা আটকালে, কেনই-বা কাঁদলে? ব্যাপার কি?'

—'ইস্ যেন কিছু জানেন না।'

একটু চুপ থেকে বললে—'মা আমাকে বকছিলেন, বললেন, পাঁচবছর তোমাদেব বিয়ে, বউমা, এর মধ্যে একটিও সন্তান হল না। পিতৃপুরুষের বংশবক্ষাই—বা হবে কি করে?'

—'আহা, এই বুঝি? এব জন্য তোমার এত কান্না?'

—'কাঁদব না? আমাকে তিনি বকলেন কেন?'

—'বকেননি, সাবেককালের মানুষদেব কথাব ধাতই এইরকম। মনে হয যেন আঘাত করে কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবিক আন্তরিকতা যে কতখানি তা যদি তুমি উপলব্ধি করতে পাবতে!' একটু চুপ থেকে—'এদের কতকগুলো সাধেব আশা আকাঙ্ক্ষা আছে; সে সবের কোনো মর্ম বুঝি না আমরা। বুঝে হবেই-বা কি? এই যে বংশরক্ষার কথা বললেন, এ বড় অদ্ভুত কথাই বললেন।'

—'কেন? অদ্ভুত কেন?'

—'দূর! বংশ রেখে হবে ছাই।'

কল্যাণী একটু চিন্তিত হযে বললে—'তা তুমি বলতে পারো না।'

দেখলাম চিন্তায় আস্তে আস্তে তার সমস্ত মুখখানা ছেয়ে উঠেছে। মুখখানা হয়ে উঠেছে অন্ধকার। আবার অন্ধকার? হয়তো কেঁদে উঠবে আবার। এবার নিজেব দুঃখে। জীবন আছে অথচ সন্তান নেই বলে। নারীজন্ম আছে অথচ জননীর সার্থকতা নেই সেই কথা ভেবে। কাজেই কল্যাণীকে ভুলোতে হল।

বললাম—'একটা গল্প শোনো।'

—'বলো।'

—'একটা বউকাঁটকি শাশুড়ি ছিল।'

—'বউকাঁটকি ক'কে বলে?'

—'তাও জানো না ছাই' তেমন শাশুড়িব হাতে যদি পড়তে।'

কল্যাণী—'থাক, বউকাঁটকিব গল্প শুনে কোনো দবকাব নেই।'

—'কিন্তু এই শব্দটাব মানে শিখে বাখো। নিজে যদি কোনোদিন শাশুড়ি হও'—

—'হ্যাঁ শাশুড়ি, মেযেই হল না-আচ্ছা,আমাব ছেলেমেযে হবে না কোনোদিন?'

—'বউকাঁটকি মানে বউকে যে ঠোকবায।'

—'মা যা বলেছেন ঠিকই তো বলেছেন, বংশবক্ষা যদি না হয'—

—'নাই-বা হল।'

—'তোমাদেব এত বড় বংশ।'

—'কোন হিসেবে বড় তা তো আমি বুঝি না, বাবাব কুড়ি বাইশ হাজাব টাকা ঋণ, আমাব কোনো চাকবি নেই, বাবাব আমলেই নাযেবমশাই ঘুষ খেযে জমিদাবি ভেঙে গুড়িযে দিলেন। যে অনাদাযী জমিগুলো ছিলও-বা একে একে তাও খসে গেছে সব। দবদালানটা এবকম হতশ্রী, আশেপাশে এক বিঘা আন্দাজ জমি তাও আগাছা জঙ্গলেব বাজ্য। বড় বংশেব এই তো গেল বিষযিক দিকেব হিসেব।'

—'না, বৈষযিক দিকেবও এটুকু সমস্ত হিসেব নয।'

—'কিবকম?'

—'টাকাই কি সব? তোমাদেব কুলেব মর্যাদা কত বড়। তোমাব পিতৃপুরুষেবা কত কাজ কবে গেছেন।

—'বেশ তো। সার্থক হযে গেছে তাঁবা, মানুষকে কৃতার্থ কবে গেছেন। পৃথিবীব একদিককাব পর্যায বেশ সফলতাব সঙ্গে শেষ হযে গেছে। তাবপব যদি তা বন্ধ হযে যায কাব কি ক্ষতি? কোনো ভালো কোনো মন্দ জিনিস চিবকাল টিকে থাকে না। উন্নতি হয, ধ্বংস হযে যায, মৃত্যুব নিস্তব্ধতায মানুষ দেশ-কাল স্নিগ্ধ হযে থাকে।'

কল্যাণী—'এই তুমি বল?

—'এইই তো ঠিক।'

একটু চুপ থেকে—'যদিও-বা ঠিক, মানুষেব মন এত সহজে কি বাগ মানে?'

—'তা মানে না অবিশ্যি, সেইজন্যই মা মাঝে মাঝে তোমাকে দু-একটা কথা না শুনিযে পাবে না।

—'মা বলেই কি শুধু, আমাব নিজেবও তো কত সমযে মনে হয।' কল্যাণী মুখ ফিবিযে- হ্যাঁ কত সমযই তো ভাবি আমাবও যদি একটি ছেলে থাকত।'

একটু চুপ থেকে—'তা তোমাব মনে হতে পাবে বটে কিন্তু —

—'মনে হয, মনে হযে বড্ড দুঃখ হয।'

—'বংশেব জন্য?'

—'তাও আছে বটে, কিন্তু নিজেব জন্য যে দুঃখটা তাই সবচেযে বেশি। আমি এত বড় ঘবে পড়ে না যদি গবিবেব কুড়ে ঘবে পড়তাম তাহলেও মা না হবাব কষ্ট সব ব্যথাব চেযে বড় হযে উঠত আমাব। কি হবে বলো তো?' আমাব হাতখানা বুকেব ওপব তুলে নিল কল্যাণী।

বললাম—'ধবো যদি একটি মেযে হত আমাদেব তাহলে'—

—'না, মেযে নয ছেলে—'

—'বেশ একটি ছেলে যদি হত, অত্যন্ত অপোগণ্ড সে তো হতে পাবত।'

—'কী বকম?'

—'হযতো একটা ঠ্যাং খোঁড়া নুলো কিংবা ট্যাবা চোখ—কালা'—

—'ছিঃ তা হবে কেন?'

—'হতে পাবত অবিশ্যি, সববকমই হয।'

—'না, ও বকম কথা ভাবি না আমি। হলে খুব সুন্দব হত, তোমাব মতন আব আমাব মতন' আমাব দিকে তাকিযে কল্যাণী—'দুজনেব মিলনে যা হয তা তো কদাকাব হবাব কথা না। কদাকাব তো

নয়ই, তা বেশ দামী জিনিসই হত। বিধাতা তুমি যদি হতে দিতে।'

কল্যাণী একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলে জানালার ভিতর দিয়ে পলাশগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম—'ধরো ছেলে যদি খুব মূল্যবান সৌন্দর্যের মানুষও হত, তাহলেও তার ভিতরটা যে ফোঁপরা না হত তাই-বা কে বলতে পারে! ফোঁপরাই হয় প্রায়।'

—'তার মানে?'

—'হয়তো হৃদয়ের কোনো ঐশ্বর্য থাকত না, মানুষের জন্য কোনো সহানুভূতি নেই। প্রাণের ভিতর কোনো বোধ নেই। জীবনের দুঃখস্রোতের দিকে তাকিয়ে দাক্ষিণ্য অনুভব করবার অবকাশ নেই।

কল্যাণী চুপ করে রইল।

—'হয়তো আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি হত তার, হত পঙ্কিল। যে যে কামনা মানুষের দেহকেও দুঃখ দেয়, রক্তমাংসকে জর্জরিত করে রাখে, তারই যাতনাই বেচারি জীবনটাকে একটা অভিশাপ বলে মনে করত।'

কল্যাণী অপ্রসন্ন হয়ে উঠে—'মানুষের জীবনের দুঃখ ও দুর্দৈবের দিকটাই দেখো শুধু তুমি। এটা কেন মনে করো না যে আমাদের ছেলে দেখতে-শুনতে সব দিক দিয়েই মানুষের মতো হত।'

একটু চুপ থেকে-'অবিশ্যি, বলা যায় না কিছু, সমস্ত সম্ভাবনার কথা ভাবতে হয়।'

—কেনই—বা ভাবতে হয়? তোমার বাপ মা খুব ভেবেছিলেন নাকি? তুমি তো জন্মেছ। তুমি কি? অমানুষ?' ঘাড় নেড়ে বললে—'তোমার মতোই তো হত আমাদের ছেলে, হত গো হত, হত। সে ছেলেকে আমি দিনের মধ্যে কতবার কামনা করি, শত শত লক্ষ বার, কিন্তু তবুও হয় না। বিধাতার এই তো মজা।' আমার দিকে তাকিয়ে—'কী ভাবছ? তুমি আছ বলে আমার জীবনের মূল্য কত যে বেড়ে গেছে তা কি তুমি জানো না? তুমি রয়েছ, বেঁচে আছ বলে পৃথিবীর কত মানুষ পরিতৃপ্ত। বিধাতার পৃথিবীতে এতখানি প্রসন্নতা ও পরিপূর্ণতা তা তুমি আনলে। বংশরক্ষার কথা বলেন যে সাবেককালের গিন্নিরা তা তুমি উড়িয়ে দিতে পার না? এইসব বুঝেই বলেন। তোমাকে জন্ম দিয়ে তাঁরা তাঁদের কাজ শেষ করে গেছেন, তাঁদের সরলতা যেমন সুন্দর তেমন করুণ। করুণ কেন জানো? নিজের জীবনেই তাঁরা দেখে গেলেন ধারা শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল না আর মাঝপথেই গেল থেমে। কিন্তু এই শূন্যতার দুঃখ তোমার আমার বুকে বাজে তাদেরও কি ততদূর?' কল্যাণী মাথা নেড়ে বললে—'না, আমার তা মনে হয় না।' একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু এ কষ্ট আমার নিজের একার যতদূর তোমার ততটুকুও না।'

কল্যাণীর একগোছা চুল আমার মধ্যমায় জড়াচ্ছিলাম।

কল্যাণী—'কে জানে, আমি বেঁচে থাকতেই আবার বিয়ে করবে হয়তো, বড় মানুষদের মর্জির কথা বলা তো যায় না। মর্জিটা অসংগত নয়, ছেলেপিলে হয় না যে বউর। রূপ তো তার শিমূল ফুল। মানুষ হিসেবে সে একটা তুলোর পুতুলের চেয়ে একটুও কি যোগ্য?'

কল্যাণী বললে—'কিন্তু আমি নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেলতে পারি। তখন তোমাদের পথ তো আরো সোজা হবে।' বলে ছল ছল চোখে আমার দিকে তাকাল। চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে—'নিজের কল্পিত দুঃখে নিজেই যদি এত কাঁদো, তাহলে কে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে বলো।'

কল্যাণী আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে—'তার মানে?'

—'নিজে কেন মিছেমিছি দুঃখ সৃষ্টি করতে যাও?'

—'আচ্ছা তোমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তোমাদের শুভ তোমরা বুঝবে কিন্তু—'ছেলে নেই বলে আমার কি একটুও কষ্ট হয় না?'

—'ছেলেপিলে মানুষকে কষ্ট দিতে আসে, প্রায়ই হতচ্ছাড়া হতভাগা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একটা জিনিস উপলব্ধি করে নিতে পারলে অনেক গোলমাল চুকে যায়।'

—'কী আবার?'

—'পৃথিবীর যেখানেই খুব সুন্দর প্রতিভাবান ছেলে দেখো, মনে করে নিও, তুমি তার জননী।'

কল্যাণী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—'কিন্তু তা কি করে মনে করে নিতে পারা যায়? এ তো অসংগত হয়, আমার রক্তের সঙ্গে তার তো কোনো সম্পর্ক নেই।'

—'আছে বইকী, তুমিও রূপসী, সে ছেলেটিও সুন্দর, রূপের ভিতর দিয়ে তোমাদের দুজনেরই মিল রয়েছে, সমস্ত রূপেই চিরন্তন রূপের ভাণ্ডার থেকে আসে নাকি?'

কল্যাণী একটু নিস্তব্ধ থেকে—'কিন্তু তার বুদ্ধি দীপ্তি সে সমস্ত সে তো অন্য মানুষদের কাছ থেকে

পেযেছে।'

—'তোমাব কাছ থেকেও পেযেছে, আমাব কাছ থেকেও পেযেছে। আমবা এই-ই তো চাই কল্যাণী যে আমাদেব সন্তান গুণে জ্ঞানে খুব অনির্বচনীয হযে উঠুক। আমাদেব এই আকাঙ্ক্ষাব গভীবতা এত ঐকান্তিক যে যেখানেই কোনো রুচি প্রতিভাব তীক্ষ্ণ শিশুকে দেখা যায তাকে আমাদেব নিজেদেব জিনিস বলে বুঝে নেবাব অধিকাব আমাদেব আছে।'

কল্যাণী খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'এইসব ছেলেদেব দেখে খুব পবিতৃপ্তি হয।'

—'সন্তান কামনা কবতে গিযে আমবা চাই যে উজ্জ্বলা ও সৌন্দর্য, আমাদেব ঘবে তা নাই-বা এল, কিন্তু পৃথিবীব কত দিকে দিকে ছেলে মেযেব দল এ জিনিসগুলোকে বাঁচিযে বেখেছে। এইসব সন্তানদেব আমাদেব প্রতিনিধি মনে কবে নিলেই হল। ছেলেপিলেদেব কাছ থেকে আমবা যা প্রত্যাশা কবি সুসন্তান বলতে আমবা যা বুঝি, পৃথিবীব শেষদিন পর্যন্ত মানুষেব ঘবে ঘবে সেইসব এইসব সন্তানদেব দল সেই ঐশ্বর্যেব স্রোত বাঁচিযে বাখবে। স্থিব হযে যদি ধাবণা কবে নেই তাহলে এই সুন্দব নিববচ্ছিন্ন ধাবণাব দিকে তাকিযে আমাদেব সাধ ও আকাঙ্ক্ষা একটা নিস্তাব পায, পায না কল্যাণী? স্বপ্নসজীব হযে উঠে।'

কল্যাণী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হযে বইল। তাবপব হাত ইশাবা কবে আমাকে সবিযে দিযে—'তুমি এখন যাও, আমি একটু একা থাকতে চাই।'

ছাদেই পাযচাবি কবছিলাম।

মিনিট পাঁচেকেব মধ্যেই বিশ্বেশ্বব এসে বললে—'বউ ঠাকুরুন আপনাকে ডাকছে।'

ঢুকে দেখলাম কল্যাণী শুযেই আছে।

বললাম—'চলো, একটু বেড়িযে আসি।'

—'না, সেজন্য তোমাকে ডাকিনি, বোসো।' বললে—'বসেছ? একটা কথা শোনো।'

—'কি?'

—'আমি আব বেশিদিন বাঁচব না, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে তুমি বিযে কবো।'

কোনো উত্তব দিলাম না।

—'বড় জোব একবছব আছি আব। তাবপব না মবি যদি আফিং খেযে মবব।'

এ কথাটাকেও অগ্রাহ্য কবলাম।

—'জবাব দাও না যে বড়?'

—'বলবাব মতো কথা বললে তবেই তো জবাব দেব।'

—'তা হযতো না।'

—'তবে?'

—'বউ মানুষবা ববং এবকম বলে থাকে, শতকবা পঁচানব্বই জন, বধূদেব জীবনেব বেদনা কতবকমই তো।'

কল্যাণী—'হুঁ।' বলে কল্যাণী চোখ মুখ চেপে আমাব দিকে তাকাল। বললে—'থাক, তোমাব সঙ্গে এসব কথা বলে কি লাভ?' বলে হাসতে লাগল। বললে— 'আফিং খাব না আমি।'

—'খাবে না?'

—'না।'

—'খেও না। তাব চেযে ববং বিশ্বেশ্ববকে চা কবতে বলি।'

—'কাব জন্য— তোমাব জন্য?'

—'না, তোমাব জন্যই।'

—'না থাক, তুমি খেলে ববং বানিযে দিতে পাবি। বিশ্বেশ্ববকে কেন, আমি নিজেই যাই—খাবে?'

কল্যাণী উঠছিল।

আমি তাকে শুইযে দিযে বললাম—'অশথ গাছেব ডালপালাব ফাঁক দিযে ওই যে দেখা যায ওটা কি?'

কল্যাণী তাকিযে—'বাবে, জানি না যেন আমি আব।'

—'কিন্তু বললে না তো কি?'

—'বলব কেন বাপুবে, চাঁদ যেন আমি কোনদিন দেখিনি। আমাকে তুমি কি পেযেছ বলো তো?'

—'চাঁদে তো ঢেব দেখেছ, কিন্তু এবকম দেখেছ কোনোদিন? মনে হয যেন অশথেব ডালেব থেকে জাপানি লণ্ঠনেব মতো ঝুলছে।'

—'জাপানি লণ্ঠন কীরকম?'
—'ঠিক এই রকম।'
—'বাঃ, ভারী তো সুন্দর তাহলে জাপানি লণ্ঠন।'
—'চাঁদটাকে বরং দেখো মনে হয় যেন সোনার ডিমের মতো।'
—'কিন্তু বড় ডিম আবার কোনো পাখির থাকে।'
—'উটপাখির থাকে হয়তো, রক পাখির থাকে।'
—'কিন্তু তারা তো সোনাব ডিম পাড়ে না।'
—'যদি পাড়ত—'
—'আচ্ছা, লায়লী-মজনুর গল্প জানো?'
—'জানি।'
তাই তো কল্যাণী অনেককিছু জানে।
—'রক পাখি কাকে বলে আমি জানি, বলব?'
—'বলো তো।'
—'আরবোপন্যাসে পেয়েছি, ঠিক না?'
—'ঠিক, বইটা পড়েছ?'
—'কতবার। এমন ভালো লাগে আমার। আচ্ছা আনারকলিব গল্প আমাকেও কিনে দিতে পার?'
—'কেই-বা আনারকলি। নামও তো শুনিনি কোনোদিন।'
—'বা রে নামও শোনোনি, বেশ তো মানুষ।'
—'আনাবকলি, ও, সেলিম যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, আকবর নিষেধ করেছিল।'
—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।'
—'তুমিও আবার এইসব জ্যানো?'
—'বা রে, তুমি দেখছি আমাকে নেহাৎ অপোগণ্ড মনে করে বসেছ।'
রাতের খাওযা-দাওযার পর হাত দিয়ে দেখলাম কল্যাণীর কপাল গবম। তেপযেব উপর নীল ডোমওযালা একটা বাতি রেখে বিছানায় শুযে বধূ একটা বই পড়ছিল।
বললাম—'কী বই ওটা?'
হেসে বইটা লুকোনার চেষ্টা করল কল্যাণী। একেবাবে বালিশের নীচেই লুকিয়ে রাখল। কিন্তু ঝপ করে যে মেযেমানুষরা বই বা চিঠি লুকিয়ে ফেলতে পাবে কল্যাণী সে জাতেব নয। হেসেই ফেলল অনেকখানি। বইটা আমি দেখেও ফেললাম।
চঞ্চল-কুমারীব কাহিনী।
—'এই বই তুমি কোথায় পেলে?'
—'কী বই?'
—'এই চঞ্চলকুমারীর কাহিনীর?'
—'তুমি কি করে বুঝলে?'
—'তা আমরা বুঝি।'
—'নিশ্চয়ই দেখেছ।'
—'দেখবার সুযোগ দিলে কোথায়?'
—'ভানুমতীর মতন পড়তে পার তুমি?'
—'ভানুমতীর খবরও তুমি জানো?'
—'জানি বইকী, জানি গো জানি সবই জানি। কিন্তু এই চঞ্চলকুমারীর কাহিনী এমন হৃদয়বিদারক। শোনো, শুনলে কান্না আসে।' বইখানা বালিশের নীচের থেকে টেনে নিয়ে গভীর আগ্রহ ও ঐকান্তিকতাব সঙ্গে উঠে বসল কল্যাণী। যেন জীবনের এক মহামূল্য ময়ূর সিংহাসন পেয়ে গেছে সে। কিংবা যখন ব্যাপারটা অশ্রুঘটিত যেন পরমাত্মার সন্তান অন্তর্দহন ও তজ্জনিত আনন্দ বিরহে অভিভূত হয়ে পড়েছে নারীটি।
কিন্তু শ্রোতার কাছে এই বইয়ের মূল্য কানাকড়ির চেয়েও অধম।
কল্যাণী—'শোনো। মহারাণা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। পরিদৃশ্যমান জগৎ তখন গভীর

তমিস্রায় অবলুপ্ত। কেবল নক্ষত্রখচিত নীলাম্বর—'
—'আচ্ছা, বেশ।'
—'শোনো।'
—'নক্ষত্রখচিত নীলাম্বর বাদ দিয়ে যাও।'
—'কেন, বর্ণনাগুলি তোমার ভালো লাগে না?'
—'একটুও না।'
কল্যাণী খানিকটা হতোদ্যম হয়ে বললে—'আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছিল। আচ্ছা বাদ দিয়ে যাই, যখন তুমি যখন শুনতে চাও না। আহা এমন অপরূপ বর্ণনা ছিল।' আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'বর্ণনা বাদ দিতে বলো?'
—'হ্যাঁ।'
—'কিন্তু সাংসারিক জীবনে তুমি তো এমন নিরস নও।'
—'কিন্তু বইয়ের ভিতর কদাচিৎ রস খুঁজে পাই।'
কল্যাণী খানিকটা ভগ্নোৎসাহী হয়ে বললে—'থাক, বর্ণনা থাক, আচ্ছা শোনো—অনেক দূরে মোগল শিবিরে অজস্র মশাল জ্বলিতেছে।'
—'কিন্তু চঞ্চলকুমারী কোথায়?'
—'দাঁড়াও বলছি।'
—'চঞ্চলকুমারী কে?'
—'আঃ শোনো না।'
—'চঞ্চলকুমারীর কি হয়েছিল?'
কল্যাণী খপ করে বইটা বুজিয়ে ফেলে বললে—'তোমার মুণ্ডু হয়েছিল।'
কিন্তু উপন্যাসের নায়িকার বেদনা আবার পেয়ে বসল তাকে। গল্পটা আমাকে সে শোনাল। কথায় কথায় চোখ মুছতে হয়, নাকে জল জমে যায়, সেগুলো ঝাড়বার প্রয়োজন হয়, গলা ভারী হয়ে আসে কল্যাণীর। মহারাণার ও চঞ্চলকুমারীর প্রেম ও বিচ্ছেদ, ঘাতকের হাতে রাণার মৃত্যুর, চঞ্চলকুমারীর আত্মহত্যা, বইখানা যখন শেষ হল জ্যোৎস্নারাত তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে।
কল্যাণী ধরা গলায়—'একজন মন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী থাকলে হত।'
—'কীসের জন্য?'
—'রাণাকে বাঁচাবার জন্য।'
—'তাতে কি লাভ হত?'
—'রাণাকে সে পুনর্জীবন দিতে পারত।'
—'ও, সেই কথা?'
—'চঞ্চলকুমারীও তাহলে আত্মহত্যা করত না।'
—'তা বটে।'
কল্যাণী গলা খাকরে বললে—'বাতিটা নিভিয়ে দাও।'
নিবালাম।
কল্যাণী—'কোথায় চললে?'
—'শুতে যাই।'
—'আজ রাতে লক্ষ্মীটি আমার বিছানায় শোও।'
—'কেন? তোমার ভয় করে?'
—'তাই যদি মনে করো, তাহলে শুয়ে দরকার নেই।'
আঘাত পেয়েছে বধূ। আঘাত পাবারই তো কথা। ব্যাপারটা রাণা ও চঞ্চলকুমারীর প্রেম বিচ্ছেদ নিয়ে-ভয়ের সঙ্গে তো এর কোনো সম্পর্ক নেই। যে ভালোবাসা চিরদিন সে আমার জন্য বহন করে এসেছে আজ রাতে এই বইখানা পড়ে কল্যাণীর মনে তা একটা বিশেষ মূল্য সংগ্রহ করে এনেছে। অথচ সে উত্তাপ ও অনুপ্রাণনার মর্মকে তাচ্ছিলের সঙ্গে উপেক্ষা করলাম আমি। মাঝে মাঝে এরকম হয় কল্যাণীর। যখনই সে বই পড়ে এরকমই হয়। অন্য কোনোদিন হলে হত না। কিন্তু আজ রাতে অবিশ্যি আমার এ তাচ্ছিল্যকেও সে ক্ষমা করে নিল।

বললে—'শোনো।'

—'এই যে রাণা, এই রাণা কেমন করে যে মারা গেল, কষ্টটা আমার বুক চেপে বসেছে।'

—'শুধু রাণার জন্যই কষ্ট? চঞ্চলকুমারীর জন্য?'

—'চঞ্চলকুমারী অবিশ্যি—'

—'কেন, সেও তো মরণ—'

—'সে তো মরল আত্মহত্যা করে।'

—'কিন্তু তবুও মরল তো।'

—'কিন্তু রাণা যেমন বধ্যভূমিতে মারা গেল, চারদিকে মোগল সৈন্য, মশাল জ্বলেছে, অন্ধকার, কোনো নিস্তার নেই। পালিয়ে যাবার পথ নেই।'

—'কিন্তু সে তো চারশো-পাঁচশো বছর আগের কথা?'

কল্যাণী চুপ করে রইল।

—'সেই রাণা বা রাণীর সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক?'

—'আছে গো আছে। আমি বরাবরই মনে করে নিয়েছি সেই রাণা তুমি, আর চঞ্চলকুমারী আমি।'

মাঝরাতে কল্যাণী—'জেগে আছ?'

—'আছি।'

—'আমিও এতক্ষণ ঘুমোইনি। বাস্তবিক ওদের কি দুর্ভাগ্য?'

—'কাদের?'

—'প্রেম খুব বড় ছিল। কিন্তু না পেল সফলতা, না পেল জীবনের আশীর্বাদ। আমাদের তো দুইই আছে। বিচ্ছেদ নেই, বেঁচে আছি। বাস্তবিক, আমাদের আনন্দ ওদের চেযে ঢের বেশি।'

কিন্তু এই গল্পের ভাব বেশিদিন কল্যাণীর জীবনটাকে অধিকার করে রাখতে পারল না। তিন-চারদিন পরেই একদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম কল্যাণী তার শোবার ঘরেব বোযাকে বিমর্ষ হযে বসে আছে।

বললাম—কী হল?'

কোনো জবাব দিল না। অনেক সাধ্য সাধনা কবেও তার মুখ থেকে একটি কথাও আদায কবতে পারলাম না। বললাম—'এসো একটু গল্প পড়ি। সেই বইটা, কেমন বেশ না? সেই চঞ্চলকুমারীর গল্প?'

না, এ কোনো উৎসাহের খবর নয। সন্ধ্যার অন্ধকাবে ভাব-কল্পনাহীন মুখে আম বনের নীচে ঘাস আমরুল কালমেঘের জঙ্গলের দিকে তাকিযে রইল। বইটা আমি কুড়িযে আনলাম। পড়তে শুরু করলাম। বিশেষ করে বর্ণনাগুলো। সেই 'নক্ষত্রখচিত নীলাম্বব' সেই জাযগাটাও। বাজধানীর প্রেম বিচ্ছেদ, সমস্ত। কিন্তু কল্যাণ নিষ্প্রাণ।

তারপর কালমেঘের জঙ্গল থেকে কাচপোকা কুড়িযে এনে বললাম—'এসো, টিপ দিয়ে দেই।' কতদিন তো দিয়েছি, একসঙ্গে কাচপোকা কুড়িয়েছি কিন্তু কল্যাণী আজ না করল আমার অনুসরণ, না তাকাল পোকাগুলোর দিকে।

অনেক পোকা ধরে এনে দিলাম। অন্ধকারের ভিতর ছেড়ে দিলাম জীবনগুলোকে। একজন মানুষকে সাজাতে গিয়ে এত প্রাণী মেরেই-বা কি লাভ ছিল? মৃত্যু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুরই পুরস্কার আনে বোধকরি। এই পোকাগুলির ভিতর রাণা ও চঞ্চলকুমারী নেই কে বললে? এই কাচপোকাদের ভিতরেও কল্যাণী ও আমার প্রণয ও বিলাসের ইতিহাস হযতো খুব গভীরভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠে। ঠিক এমনই সন্ধ্যায কালমেঘের স্নিগ্ধ নিবিড় দামের ভিতর।

—'কই, তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?'

—'না তো।' থেমে দাঁড়ালাম।

—'কাছে এসো।'

আমার কোলের ওপর মুখ রেখে কল্যাণী—'আপিং আমি খাবই।'

—'আবার মাথা চড়ে গেল নাকি?'

—'চড়বে না! আমার ছেলে হয় না, সে কি আমার দোষ? আমাকে আপিং কিনে দিতে হবে। কিনে দিতেই হবে তোমায়।'

—'আপিং খাওয়ার নিয়ম বুঝি এইরকম? স্বামী কিনে দেয়, বউ খায়?'

—'তুমি না এনে দিলে আমি পাব কোথায শুনি? কে এনে দেবে আমাকে? মা তো অপরাধ দিয়েই

খালাস।' কিন্তু আপদ বিদায়ের পথটা আমার নিজেরই বেছে নিতে হবে তো। নিজের বলতে এক তুমিই তো আছ পৃথিবীতে আমার।'

কাজেই আমায় আপিং কিনে দিতে হবে কল্যাণীকে। মৃত্যুর একমাত্র উপায়ও—আপিং খাওয়া শুধু। এই নিঃসহায় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে—

শুনলাম আজ দুপুরবেলা আবার খানিকটা কথাবার্তা হয়ে গেছে। কথা বলতে গিয়ে মা কোনোদিন সম্বিৎ হারান না। খুব সংযমের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু কথাটা বড় মর্মান্তিক। বাড়ির বধূকে তার সন্তানহীনতার উপলক্ষ করে কথা বলা।

যার সন্তান নেই নিজের কাছে নিজেই তো সে ঢের শাস্তি পায়, মা হবার আকাঙ্ক্ষাও খুব গভীর আকাঙ্ক্ষা এদেশের অনগ্রসর হিন্দু বধূদের সকলেরই প্রায় আছে। না যদি হতে পারে, নিজেকে সে কতদূর হতভাগ্য ও কতখানি বঞ্চিত মনে করে যে!

বললাম—'তোমার কপাল তো পুড়ে যাচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, কদিন থেকেই আমার জ্বর।'

—'কই, জ্বর তো সেরে গিয়েছিল।'

—'আবার হচ্ছে।'

—'কখন হয়?'

—'রাতে খাওয়া-দাওয়ার পব গা কাঁপিয়ে আসে। শেষ রাতে ছেড়ে যায়।'

—'কদিন এইরকম?'

—'এই কদিন থেকেই তো। তুমি আলাদা বিছানায় শোও, কিছু টেব পাও না। তোমাকে বলি নাও আমি। মিছেমিছি তোমার মনে কষ্ট দিয়ে কি লাভ! এ জ্বরটা সাবাতে পাববে না তুমি। এ সাববার জ্বব তো নয়। একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত এই আপিঙেই কাজ করবে।'

সেই রাতেই ডাক্তার ডেকে দেখালাম। ডিসপেনসারি থেকে তিন-চারটা ওষুধ নিয়ে আসলাম। ওষুধ খেয়ে কল্যাণী — 'ডাক্তার কদিনে অসুখ সেরে যাবে?'

—'তুমি নিযমিত খাও তো!'

—'তুমি না হয কাছে বসে খাইও, তাহলে আমার ভুল হবে না।' একটু কেশে—'দিনে কবাব খাবার কথা?'

—'চার বাব।'

তিনদিন খুব যত্নের সঙ্গে কাছে ডেকে নিয়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিযে খাওয়ালাম।

চতুর্থ দিন—দুবার ওষুধ খাওয়া হযে গেছে কল্যাণীব। তাবপব তাস খেলায আমাব ডাক পড়ল। মস্তবড় ব্রিজের আড্ডা। যাবাব সময কল্যাণীকে বলেও যেতে পারলাম না। দুবাবেব ওষুধ খাওযাবাব সময উৎরে গেল। তবুও ফিরে আসতে পারলাম না আমি। বিপক্ষ দুটো বাবাব কবেছে। আমবা কবেছি একটা। এই নিষ্ফলতা যেন আকাশ ছুঁয়ে পৃথিবী আবৃত করে রাখে।

কিন্তু আমার এ অন্যমনস্কতাটুকু কল্যাণী উপেক্ষা বলে ধরে নিল। না, স্বামী তাকে ভালোবাসে না আর। তার জীবন মৃত্যুতে স্বামীব কিছু আসে যায না আর। কেনই-বা এসে যাবে? শুধু কি সন্তানহীনা? সেই শিমূলফুলের মতো রূপও তো আর নেই আজ তাব। হাড়গিলার মতো চেহারা বেবিযে পড়েছে। শাশুড়িব সঙ্গে এতদিন পরে স্বামীবও তাব আজ তাই ষড়যন্ত্র বুঝি? তাই, তাই, তাছাড়া আর কি? বধূকে তারা পথের কাঁটা মনে করে। এ বংশের উন্নতি ও মঙ্গলতার মুখে সে বাধা বিভ্রম বাঁধিযে দাঁড়িয়ে আছে। সরে পড়া উচিত তার— যতশিগ্‌গিব সবে পড়তে পারা যায, বিদায সে নেবেই।

আড্ডার থেকে ফিরে এসে শুনলাম গরমের আতিশয্যে কল্যাণী দিঘিব ঘাটে স্নান করে, তেঁতুলের অম্বল খেযে সুস্থির।

ওপরে উঠে দেখলাম দারুণ গরমের মধ্যে মস্তবড় একটা লেপেব ভেতর কোথায যে সে পড়ে আছে, তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া শক্ত।

কল্যাণীকে হাতড়ে বের করে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—'মরবেই যদি তাহলে লেপেরই-বা কি দরকাব ছিল?' ঝাঁকুনি দিযে—'দিঘিতে নেমেছিলে? ডুবে মরলেই পারতে। ফিরে আসতে তোমাকে কে বলেছে?'

কিন্তু বেশি দুর্ব্যবহার করতে পারলাম না বধূর উপর। তিন ঘণ্টার ভিতরেই সে শেষ হয়ে গেল।

প্রণয়হীনতা

কোথায় যাবে?

হ্যাঁ দিল্লি যাওয়া যাক। এই তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাংলাদেশের পাড়াগাঁখানা নিয়েই সে অভিভূত হয়েছিল। অনেকদিন কংগ্রেসে ছিল। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনে, হিন্দু মিশনে, তারপর নিজের নিযুক্ত কর্মী হয়ে বাংলার পাড়াগাঁয় পাড়াগাঁয়।

তারপর সব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ চিন্তা নিয়ে থাকতে, চিন্তা করতে ভালো লাগল। জীবনে চিন্তা ও কল্পনার [...] হল যখন সব চেয়ে বেশি, তখন সে কিছু কিছু লিখতে লাগল। লিখল, কাগজপত্র ছাপাল। দু-একখানা বইও বেরোল তার।

যারা তার লেখা পড়েছে, তারা বুঝেছে লোকটার কতদূর পরিবর্তন হল। এক সময় সে গীতার টীকাও লিখত, এখন সে ভগবানও হয়তো জানে না, যে সব গল্প রচনা করে সুধাংশু তার ভেতর মানুষের জীবনের নানারকম অবৈধ জিনিসকেই সে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়।

যতদিন দেশের কাজে মানুষের কাজে ব্যাপৃত ছিল সুধাংশু ততদিন তালপাতার সেপাইয়ের মতো লম্বা চেহারার ভিতর ঢের কঠিনতা ও তিক্ততা ছিল, কিন্তু ভিতরে ছিল অপরিমেয় প্রীতি। অকারণেই প্রসন্ন হয়ে উঠত মানুষটা। কিন্তু এখন চেহারায় ঢের শ্রী ও স্নিগ্ধতা জমে গেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঢের আশ্বাস সন্দেহ ও অন্ধকার বাসা—না, এই তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে পশ্চিমে সে কোনোদিন যায়নি। ঢের আগে একবার গিয়েছিল বটে, মুঙ্গেরে, হিন্দু মিশনে কোনো একটা কাজ উপলক্ষে। গিয়ে দু-তিন দিন থাকতে হয়েছিল সেখানে তাকে। হ্যাঁ, মুঙ্গের পর্যন্ত, তাও চোখ বুজেই গিয়েছিল সে। শহরটাকেও অন্ধের মতো উপলব্ধি করে এসেছে। তখন জীবনটা ছিল অন্যরকম কিনা। তখন যদি দিল্লি আগ্রা অবন্তী বারানসী বিদিশা ঘুরত সে তাহলে—

কোঁচানো ফরাশডাঙার ধুতি, তসরের পাঞ্জাবি, মটকার চাদর, কেডস এইসব নিয়ে এখন তার পোশাক-আশাক বেশ পরিমার্জিত হয়ে সেকেণ্ডক্লাসের কামরায় গিয়ে সে বসে, কুমীরের চামড়ার সুটকেশ দুটো বেঞ্চির একপাশে সরিয়ে রাখে। স্টিকটাও। ছোট্ট বিছানাটা খুলে পেতে নেয়। ফুলকাটা অড়ের বালিশটার ওপর মাথা রেখে শোয়। চুরুট বের করে টানে। টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়ে।

হাওড়ার থেকে ট্রেন ছাড়বার আগে সেলুন কারে গিয়ে সে খেয়ে এসেছিল। অনেক কিছুই খেয়েছে, সোডার সাথে মিশিয়ে এক বোতল হুইস্কি অবদি।

মদের দোকানের সামনে চিৎ হয়ে শুয়ে একদিন সে পিকেটিং করত, কত অশিষ্ট লোক তাকে মাড়িয়ে গেছে। পুলিশের ব্যাটন খেয়েছে। একবার একজন মাতাল তাকে বোতল ছুঁড়ে মেরেছিল। মাথা কপাল কেটে সে এক অমানুষিক ব্যাপার। কপালের এক পাশে সে জখমের দাগটা এখনো আছে। আজ নিজেই সে তারই এক বোতল খেয়ে এল। সোডার সঙ্গে মিশিয়ে খেতে খেতে পিকেটিঙের সেই দুর্দৈব ব্যাপারটা মনে পড়েছিল সুধাংশুর। মনে করে হেসেছিল। ভেবেছিল, বাস্তবিক মানুষের জীবন কেমন যে একরকম! একদিন সে পিকেটিং করেছিল, এখন সামান্য মদ খায়, একদিন হয়তো জিনিসটা বে-আন্দাজি হয়ে উঠবে। পাঁড়-মাতাল বলে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তারপর হয়তো মদের দারুণ ব্যবসা খুলে বসবে সে, একদিন হয়তো সব ফুরিয়ে যাবে আবার। নেংটি পরে তালগাছের পর তালগাছ কেটে সাবাড় করে দেবে সে। সঙ্গে সঙ্গে মাতালদেরও উচ্ছন্ন দেবে। হ্যাঁ, মানুষের জীবন এইরকমই। কোনো কিছুরই স্থিরতা নেই। কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় শুধু। আর জীবনের রহস্য বোধটাকে। বৈশাখ মাসের দিন, তবুও আকাশ খুব মেঘলা। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়া ছাড়তে না ছাড়তেই বেশ বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি ক্রমে ক্রমে কমে গেল অবিশ্যি, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের আমেজটা রয়ে গেল।

তারই ভেতর ঘুম যা তার হল ভারী সুন্দর। শুধু ধানবাদে ঘুমটা একবার ভেঙে গিয়েছিল। সুধাংশু তাকিয়ে দেখছিল তারই মুখোমুখি একটি মেয়ে বসে আছে। কি একটা বই না অ্যালবাম নাড়ছে এক-একবার। সুধাংশুর দিকে এক আধবার তাকিয়ে দেখছে। দেখুক।

সুধাংশু ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। মেয়েটি এবার সুধাংশুর ঘুমের ভিতর স্বপ্নের দেশে।

সারাটা রাত এইরকম নিঃসাড় ঘুম।

এলাহাবাদ ছাড়িয়ে গেল যখন, সুধাংশু ধীরে ধীরে উঠে বসল।

মুখ হাত ধুয়ে এসে এক কাপ চা খেতে হত তার, কিন্তু গাড়িটা তখনো চলছিল। কাজেই চায়ের জিনিসের আসা ছিল না শিগ্‌গির।

টাইমটেবলটা খুলে দেখল গাড়ি শিগ্‌গির থামবেও না। টাইমটেবলটা সরিয়ে রেখে দিল, অবাক হয়ে ভাবল, একটা ফ্লাস্কে করে খানিকটা গরম চা নিয়ে এলেও তো পারত সে। অবিশ্যি চায়ের জন্য তৃষ্ণা এমন একটা কিছু মারাত্মক জিনিস নয় সুধাংশুর জীবনে। কোনো জিনিসই খুব অনতিক্রমনীয়ভাবে কাম্য নয়। না নারী, না প্রেম, না চুরুট, না মদ, না সাহিত্য, না লিপি-সফলতা, না দিল্লি, আগ্রা যেখানেই এই প্রথম যাচ্ছে সে। একটা জিনিস মাত্র দরকার।

হাত মুখ ধুয়ে এসে পকেট থেকে গোটা দুই চুরুট বের করল সে। জ্বালানো যায়, না জ্বালালেও হয়।

সামনে তাকিয়ে দেখল, সেই মেয়েটি বসে আছে; চুরুট জ্বালাতে জ্বালাতে রেখে দিল সে।

মেয়েটি বললে—'বাঃ, আমাকে দেখে স্থগিত করলেন নাকি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কেন?'

—'আপনার সামনে খেয়ে পরিতৃপ্তি পাব না।'

—'কেনই-বা?'

—'মেয়েদের সামনে আমি না খাই যে তা নয়, কোনো ভুঁড়িওয়ালা কদর্য স্ত্রীলোক যদি এখানে বসত, কিংবা কোনো মাড়োয়ারি মেয়েমানুষ, অথবা এদেরই মতন আর কোনো মেয়েলোক, তাহলে খেতে পারতাম অবিশ্যি।'

মেয়েটি একটু হেসে—'কেন তারা কি মানুষ নয়?'

—'মানুষ বটে, কিন্তু কদর্য রূপ। সৌন্দর্য দেখে আমরা থমকে যাই। এই হচ্ছে আমাদের নিয়ম। এমনকী শরীরে মাত্র সৌন্দর্য সম্বল নিয়ে যদি কেউ আমাদের সামনে বসে থাকে তার সুমুখে কোনো কুশ্রী কাজ করতে বড় দ্বিধা করি।'

—'কিন্তু মানুষের ভিতরের সৌন্দর্য, যা ঢের বড় জিনিস, তা তো প্রায় লাঞ্ছিত হয়েই ফেরে।

—'ভিতরের সৌন্দর্য নিয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকবার শক্তি সকলের নেই যে, বিধাতাই দেননি হয়তো। সংসারের মানুষদের স্বাদ সাধারণত তিনি বড় স্থূল করে তৈরি করেছেন।

মেয়েটি নখ খুঁটতে খুঁটতে চুপ করে রইল।

সুধাংশু—'কিংবা স্থূলও বলতে পারি না হয়তো কারুশিল্প হিসেবে দেহের লাবণ্য, মনের সৌন্দর্যের চেয়ে উঁচু নীচু দরের জিনিস বলা ঢের শক্ত। চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্য দুটোতেই হয়তো সমান মাত্রায় রয়েছে।' গলা খাকরে বললে—'এই তো দেখুন আমি, কত পড়েছি, বুঝেছি, চিন্তা করেছি, আমার কি ইচ্ছে হয় না মানুষের বাইরের কদর্যতাটাকে ভুলে যেতে? তার ভিতরের রূপ পূজা করতে? কিন্তু পারি কি?'

মেয়েটির দিকে চোখ তুলে বার বার দেহের লাবণ্যের সামনে মাথা নুয়ে পড়ে জানলার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে সুধাংশু—'এ বিভ্রম, জীবনে কোনোদিনই কি ঘুচবে?'

টাইমটেবলটা হাতে নিয়ে বললে—'কিন্তু বিভ্রমই বা বলি কি করে? বিভ্রম কি?'

মেয়েটি একটু হেসে বললে—'মুখে তো আপনার কথাই [...] যায়, কিন্তু কাল সারাটা রাতই তো ঘুমিয়ে কাটালেন।'

—'হ্যাঁ, কালকে রাতের ঘুমটা বেশ পরিপাটি হয়েছিল আমার।'

—'দেখলাম তো।'

—'না।'

—'কেন?'

—'ট্রেনে-ফেনে আমার ঘুম হয় না।'

—'সারাটা রাতই বসেই কাটালেন?'

—'ও মা, তা কি করে পারে মানুষ!'

—'তাই তো, বিছানাটাও তো পাতা আছে দেখছি। বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবছিলেন হয়তো?'

সুধাংশু সুটকেশ খুলতে খুলতে বললে—'জীবন নিয়ে ভাবতে যাওয়া বেশ একটা সুন্দর খেলা, বিশেষত আপনার মতো মানুষের পক্ষে।' বলে সে মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকাল। সুটকেশটা খুলে আরশি আর চিরুনি বের করল সে আর একটা।

পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে জিনিসগুলো সুটকেশের ভিতব রেখে দিল আবার সুধাংশু।

মেয়েটি বললে—'চুরুট তো খেলেন না, চা খান।'

—'দিন। ফ্লাস্কে করে এনেছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

একটু খাবারও ছিল। নিজেও খেল, চা আব খাবার। আট-দশ মিনিটের মধ্যে দুজনের খাওয়া শেষ হয়ে গেল।

সুধাংশুকে বললে—'নির্মলবাবু তো এখনো ওঠেননি, তাব জন্য বেখে দিলাম।'

—'কোথায় তিনি?'

—'তিনি আব কেন বলেন—আপনার চেয়ে বযসে ঢেব ছোট, আমার চেয়েও, ছোকরাব পনেরো বছর মোটে।—এই নিমে!'

ছেলেটি কোনো সাড়াশব্দ কবল না।

সুধাংশুর দিকে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হাসতে হাসতে—'এ আমাব ছোটভাই নির্মলকান্ত, এব ঘুম আপনার চেয়েও লম্বা, হযতো কানপুব গিয়ে জাগবে।'

—'কানপুব যাচ্ছেন আপনারা?'

—'না, লাহোব।'

—'সে তো বিষম লম্বা পাড়ি।'

—'হ্যাঁ সেইজন্যই অঘোবে ঘুমুচ্ছে বাচ্চা আমাব, আপনি কোথায় নামবেন?'

—'দিল্লি।'

—'আজই পৌঁছে যাবেন তাহলে?'

—'সন্ধ্যাব সময বুঝি।'

—'হ্যাঁ, কোনোদিন যাননি হযতো।'

—'না, পশ্চিমে এই প্রথম।'

—'তা, বৈশাখে মানুষ পশ্চিমে যায?'

—'চলছি তো।'

—'সহ্য কবতে পারবেন না এত গবম।'

—'মরুভূমিতে তো মানুষ থাকে।' একটু চুপ থেকে মেয়েটি—'গবম অবিশ্যি ড্রাই, বাংলাদেশেব মতো ড্যাম্প নয।'

—'এই বিকট গবমে আপনাবাও লাহোব যাচ্ছেন কেন, সে তো দিল্লিব থেকেও এককাঠি—'

—'আমি আব নিমে যাচ্ছি দাযে পড়ে। না হলে দার্জিলিঙে আমবা বেশ ছিলাম।'

—'লাহোবের কাছে তো সিমলেও আছে।'

—'কিন্তু সিমলে তো যেতে পাবব না লাহোবেই থামতে হবে।'

দুজনেই চুপচাপ। 'দার্জিলিঙে বেশ ছিলাম' দাযে পড়ে লাহোবে যেতে হবে' লাহোবে থাকতে হবে' এইসব প্রসঙ্গে অনেক কথাই জিজ্ঞেস কবা যেতে পাবে মেয়েটিকে। কিন্তু জিজ্ঞেস কবতে গেল না সুধাংশু। সে দেখেছে, অনেকদিন থেকেই দেখেছে, কৌতূহলকে সংযমের বাঁধেব ভিতব বেখে দিলে শেষ পর্যন্ত বড় নিস্তাব পাওয়া যায। মিছেমিছি কথা বাড়িয়ে, গল্প বাড়িয়ে মাযা বাড়িযে কি লাভ? হৃদযাবেগ নিয়ে খেলা করতে গেলে দুঃখ পেতে হয শুধু। জীবনেব সবচেয়ে সাধেব জিনিস হচ্ছে—শান্তি, প্রেম, প্রণযহীনতার সুস্থির সুস্বপ্ন।

এই মেয়েটিব কপালে সিঁদুব নেই, হাতে নোযা নেই, হযতো সহিষ্ণু বিধবা, হযতো বিলাসিনী কুমাবী, দেহেব লাবণ্য তীক্ষ্ণ, তীব্র-মনেব সৌন্দর্য উজ্জ্বল। আজ দিন ফুবাতে ফুবাতেই এই মেয়েটি তাকে ঢের বেদনা দিতে পাবে।

মুখ ফিবিয়ে বসেছিল সুধাংশু। লাইনেব দুধারে দিগন্ত অবদি বোদ ও প্রান্তর ধক ধক করছে। সবুজ ঘাস নেই, ছাযা নেই, পাথবের চাঙড়, মাঠ-পৃথিবী সমস্ত যেন মগ্ন কঠিন যজ্ঞেব উপযুক্ত গেরুযা মাংসের

স্তূপ বেব কবে বসে আছে।

বাহিবটা এইবকম বিষম।

—'ওব নাম নির্মল, আমাব নাম নির্মলা, আপনাব নাম কি?' ভিতবটা এই বকম স্নিগ্ধ।

সুধাংশু মুখ ফিবিযে বললে—'আমাব নামও আপনাব নামেব কাছাকাছি।'

—'কীবকম?'

—'সুধাংশু।'

—'কাছাকাছি কিবকম কবে হল?'

—'সেও তো নির্মল।'

—'ও হ্যাঁ।'

সুধাংশু একটু মাথা নেড়ে—'না, হ্যাঁ নয, চাঁদে অবিশ্যি একটু কলঙ্ক আছে, আপনাবা দু ভাই বোন, একেবাবে নিখাদ।' চোখ তুলে বললে—'সুধাংশু চৌধুবী নাম শোনেন নি, আমি যে লিখিটিখি।'

—'লেখেনও নাকি? কোথায?'

—'অবিশ্যি [...] তে নয।'

মেযেটি একটু হেসে—'দেখুন সুধীব চৌধুবী, সুধীব বাযচৌধুবী, সুধীব কুমাব চৌধুবী, সুধীব কুমাব বাযচৌধুবী, সুধাংশু চৌধুবী, সুধাংশু বায চৌধুবী, সুধাংশু কুমাব বাযচৌধুবী, এই সব নাম এত বেশি মানুষ বাংলাদেশে কবিতা লেখে, গল্প উপন্যাস ছাপায, ছবি আঁকে কাঠেব খোদাই চিত্রেব প্রতিলিপি বেব কবে যে কে যে কি তা আমি এখনো বুঝে উঠতে পাবলাম না।'

—'তাব মানে ভিড় ঠেলে উঠতে পাবিনি এখনো?'

—'সেটা হযতো আপনাব দোষ নয, নামটাবই অপবাধ। একটা পেননেম নিন না।'

—'পেননেমেব বেওযাজটা পছন্দ হয না আমাব।'

—'আমাবও হয না। একটি বৃহস্পতি থাকলে তো ক্ষতি হত না, কিন্তু একাদশ বৃহস্পতিব যেখানে, সেখানে কী আব কববেন' ধরুন অনেকগুলো 'যতীন' যদি বাংলা সাহিত্যে একসঙ্গে চাড়া দিযে উঠত, তাহলে বেচাবাদেব বিড়ম্বনাব আব শেষ থাকত না।'

—'হেঃ হেঃ হেঃ তা বটে। কাল আমি কী খুব ঘুমিযেছিলাম?'

—'একেবাবে নির্ঘন্ট ঘুম যাকে বলে।'

—'আঃ, বাদলা কবে কি মিষ্টি ঠান্ডাটাই না পড়েছিল। আব এখন, এখন যেন লুযেব মতো গবম একেবাবে।' চাবদিকে তাকিযে সুধাংশু—'একটা কথা ভেবে আমি সমস্ত সকালটা অবাক হযে আছি —

—'কী বলুন তো?

—'বিছানাব পাশে জানালাটা খুলেই তো শুযে ছিলাম, কিন্তু এতবড় বৃষ্টিতেও বিছানা ভিজল না মুখে চোখে একফোঁটা জলও পড়ল না। এ কী বকম?

—'হযতো ভিজে ছিল, ঘুমেব ভিতবেই শুকিযে গেছে আবাব।'

—'না না, আজ সকালে উঠে দেখলাম জানালাটাব কাঠেব শার্সি ভেজা বযেছে।'

—'তাই নাকি?'

—'নিশ্চয কারু সমবেদনাব কাজ।'

—'তা হবে, কে কখন কী কবে যায, আমবা টেবও পাই না।'

—'এ গাড়িতে তো দু-জন পাঞ্জাবি একজন আফগান ও একটি ফিবিঙ্গিকে দেখছি। এদেব মুখেব দিকে তাকালে তো মনে হয না যে নিজেব জীবনেব কেন্দ্র ছেড়ে এবা—

নির্মল কোনো এক ফাঁকে উঠে বসেছিল, বাসি মুখেই খাচ্ছিল বসে বসে, সুধাংশুব দিকে তাকিযে বললে—'জানাল' বন্ধ কববাব কথা বলছেন? খুব যখন বৃষ্টি পড়ছিল কাল, দিদি দিলে বন্ধ কবে, তাবপব যখন বৃষ্টিটা কমে গিযে কেমন কনকনে ঠাণ্ডা পড়তে লাগল, কাচেব কপাটটা তুলে দিলে।'

নির্মলা—'নইলে আমাব ঠান্ডা লাগত যে।'

—'হ্যাঁ, তোমাব ঠাণ্ডা, বৃষ্টি পড়ে ওঁব বিছানা ভিজে যাচ্ছিল, তাই না তুমি জানালা বন্ধ কবলে, আমি বললাম তোমাব এত মাথাব্যথা কেন, কিন্তু মাথাব্যাথা কি যে সে মাথাব্যথা, সমস্ত বাত জেগে জেগে এইই তো কবলে বসে বসে। তাবপব ভোববেলা আবাব কাঠেব শার্সিটা ফেলে দিযে কাচেবটা তুলে দিলে, জেগে উঠে উনি যাতে স্টেশন দেখতে পাবেন।'

বলতে বলতে নির্মল খাওয়া শেষ করে আবার লম্বা হয়ে পড়ল। বললে—'কাচেবটাও ফেলে দিত, কিন্তু এলাহাবাদে একটু বৃষ্টি পড়ছিল কিনা, সেইজন্য এটুকু সাবধান। জেঠামশাই যদি দেখতে পেতেন, তাহলে তোমার মুরুব্বিগিরি বের করে দিতেন, কম হনুমান তুমি!'

—'তুমি যদি এই রকম কবে কথা বলো, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, তাহলে আমি তোমাব জিভ ছিঁড়ে ফেলব।'

নির্মল নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

একটু চুপ থেকে সুধাংশু—'কিন্তু তবুও কী করে ঠাণ্ডা লাগল? সকালবেলাব থেকেই হাত পাযেব গিটে গিটে ব্যথা।'

—'তাই নাকি? একটু [...] নিন না।'

—'না [...] কোনো দবকাব নেই, এমনিই সেবে যাবে।' বলে একটা হাঁচি দিল সুধাংশু।

—'ঠাণ্ডাও তো লেগেছে দেখছি।'

—'কিন্তু উপায তো নেই তো কিছু, স্টেশন না থামলে তো আব গবম জল পাওযা যাবে না।' বলে রুমাল নাকে নিয়ে খানিকটা কফ ঝেড়ে নিল সুধাংশু।

—'দেখি, ফ্লাস্কে চা আছে হযতো।'

নির্মল ঘুমোতে ঘুমোতে বললে—'চা নেই দিদি।'

—'সব খেযে ফেলেছিস, হতভাগা?'

নির্মল ঝপ করে উঠে বসে—'তুমি কেন আমাকে হতভাগা বলবে জ্যাঠাইমা আমার জন্যই তো চা দিযেছিলেন। পথে-ঘাটে যাকে নিযে মোসাযেবি কববে আব আমাকে বলবে হতভাগা।' নির্মল কেঁদে ফেলে বললে—'কেমন বোন তুমি আমাব।'

নির্মলা ঘাড় হেট করে হাসতে হাসতে নবম গলায— 'থাম, খুব দেখি অভিমান। বড় হযে কী হবে যে অবাক হযে ভাবি আমি।'

নির্মল ফোঁপাচ্ছিল, নির্মলা বললে—'নাও শোও দিকি, আবাব ঘুমুবে? তা ঘুমোও। কানপুবে গিযে জেগো।'

নির্মল শুযে পড়ল।

নির্মলা সুধাংশুর দিকে তাকিযে—'পেপস খাবেন?'

—'না, থাক।'

—'খান, সেবে যাবে।'

নির্মলা তাব একটা সুটকেশ ধবে টান দিল।

সুধাংশু—'পেপস তো লাঙের জন্য, আমার—'

—'ও নাক গলা সুড় সুড় করছে বুঝি?'

—'অনেকটা তাই।'

—'তাহলে নস্ট্রোলিন নিন।'

—'তাও আছে নাকি আপনাব কাছে?'

—'একবাজ্য ডিসপেনসাবি নিযে বেরুই।'

—'কেনই-বা ?'

—'জেঠাইমা, জেঠাইমাব এইসব বাতিক। বড্ড বাযুচড়া বাতিকেব মানুষ তিনি। কিন্তু কাজে তো লাগল বেশ।'

নস্ট্রোলিনেব বোতলটা সুটকেশে ছিল না, বাক্সেব এক কিনাব থেকে বের কবে এনে নির্মলা —'দিযে নাকেব ভিতবটা চালিযে দেন।'

সুধাংশু দিল চালিযে।

নির্মলা একটু হেসে বললে—'আমি সিদ্ধহস্ত, প্রাযই নাক সুড় সুড় কবে আমার। বলে সে বোতলেব ছিপিটা খুলতেই নির্মল উঠে বসে বললে—'থাক দিদি, আমি দিচ্ছি, দেখো তো ওই আফগানটা কীবকম কটমট করে তাকিযে আছে, তোমাকে নিযে আমাব জ্বালাব এক শেষ।'

আফগানকে না হলেও নির্মলকে উপলব্ধি কবা গেল। বযস পনেবো বছব বটে, কিন্তু জন্তুর মতো অভিভাবক সে। সুধাংশুকে দিল, নিজেব নাকেও সে খানিকটা নস্ট্রোলিন টেনে নিল। বললে—'তুমিও দেবে নাকি দিদি? এক যাত্রায পৃথক ফল বানিযে কী লাভ? সকলেরই কিছু নাক সুড় সুড় করছে নিশ্চয!'

দু-চার মিনিট পরে নির্মলা বললে—'কেমন লাগছে আপনার?'

—'বেশ।'

—'সামনের স্টেশনে নেমে চা খেয়ে নেবেন।'

—'তা খাব অবিশ্যি।'

—'দেখুন তো টাইমটেবল, কতক্ষণ থামবে সামনের স্টেশনে?'

সুধাংশু টাইমটেবল খুলে—'তিন মিনিট।'

—'তাহলে আর নামতে যাবেন না, ট্রেন মিস করাবর সম্ভাবনা। এর পবেব স্টেশনটায় কতক্ষণ থামে? সেলুনের খানসামাই আসে না কেন? তার তো উচিত একটু ঘুরে দেখে যাওয়া।'

—'কিন্তু নস্ট্রোলিনেই তো সেরে গেল সব। চা খাবেই-বা কে?'

—'তাই নাকি? হাত পায়ের ব্যথা?'

—'তাও সেবে গেছে।'

সুধাংশু পকেটের থেকে চশমা জোড়া বেব কবে—'এখন একটা বই খুলে পড়া যাক।'

—'আমি আপনার সামনে এসে বসেছি বলে আপনার ঢেব বিবাদ।'

—'কীবকম?'

—'প্রথমত চুরুট খেতে পারলেন না।'

—'না, খেতামও না, কেমন একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছে, গলায় এ অবস্থায় চুরুট ভালোও লাগত না, খাওয়া উচিত হত না।'

—'কিন্তু এটাও ঠিক আমি যদি আপনাব মুখোমুখি না বসতাম তাহলে দু চাবটা চুরুট এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত আপনার, আরো একটা জ্বালিয়ে বসতেন হযতো। কিছুই তো হল না আপনার।

—'চুরুটই কী জীবনের বড় কথা?'

—'হযতো বই পড়া বড় কথা?'

—'সুধাংশু হেসে বললে—'না, তাও নয়।' চশমা জোড়া সে পকেটের ভিতর ফেলে দিযে—'আপনি যে মুখোমুখি বসে আছেন এর সার্থকতা এখন যত বুঝছি, আপনি বিদায় নিলে তাব চেয়ে ঢেব বেশি টেব পাব। যাতে খুব কম কবে টেব পাই, সেই ব্যবস্থাই এখন থেকে কবা আমাব ভালো।'

নির্মলা একটু চুপ থেকে—'তা যদি আপনি মনে করেন, তাহলে ভুল বুঝেছেন, আমাকে অনেকেই এবকম ঠিক উপলব্ধি করতে পাবে না। আমি খুব আলাপি, কিন্তু এটাকে তারা মনে কবে আগ্রহ। মানুষেব জন্যই আমাব সহানুভূতি, কিন্তু বিশেষ সমবেদনাব পাত্র কেই নেই তো আমাব। এইখানে গোলমাল কবে ফেলে। কত কী ভাবে--কিন্তু এইসবই তাদেব ভুল।'

—'তা আমি জানি। কিন্তু আমি ভুল বুঝিনি কিছু। আপনি কী মনে কবেন না করেন তা দিযে আমি কী করব, আমার কারবার আমার হৃদয় নিয়ে।'

নির্মলা—'একটি বিমুখ নাবীব সঙ্গে দু-ঘণ্টা কাথাবার্তা বলেও আপনাব হৃদয অভিভূত হয়ে পড়ে?'

—'না, তা আর পড়ে না অবিশ্যি।'

—'তবে?'

সুধাংশু চুপ কবে রইল।

নির্মলা—'হযতো আমি অন্য গাড়িতে থাকলে আপনার সুবিধা হত।'

সুধাংশু একটু হেসে—'না তা মনে করছেন কেন? জিনিসটা অত বেশি কিছু নয।' বলে সুটকেশেব থেকে একটা বই বের করে নিল সে।

নির্মলা একটা ঢোক গিলে—'কী বই?'

—'ও অনেক পুরোনো বই একখানা।'

—'শুনিই না নাম?'

—'বইখানা মাধাম অবেলিয়াসের।'

—'নভেল?'

—'না।' পকেটের থেকে চশমা বের করে মুছতে মুছতে সুধাংশু—'মাধাম অবেলিযাস ছিলেন রোমের রাজা, তারই কতকগুলো মতামত সিদ্ধান্ত রযেছে এই বইতে।'

—'এরকম বই পড়ে কী আপনি তৃপ্তি পান?'

—'তবে কী পড়ব?'
—'কেন হুইলারের স্থলে কত তো ইন্টারেস্টিং নভেল আছে।'
—'দূর ওসব বই ভালো লাগে না আমার।'
চোখে চশমা এঁটে বইটা পড়তে লাগল সুধাংশু।
নির্মলা—'আপনাব কী লং সাইট?'
বইয়ের থেকে মাথা তুলে সুধাংশু—'হ্যাঁ।'
—'পড়বার সময় চশমা লাগে বুঝি?'
—'হ্যাঁ।'
—'দূরের জিনিস খালি চোখেই বেশ দেখতে পান?'
—'তা পাই একবকম মন্দ না।'
—'বাপবে আপনি কীরকম মানুষ!'
—'কেন কী হল?'
—'বই পড়ছেন তো পড়ছেনই, কথাও বলছেন বইযের দিকে তাকিযে। আপনার সম্পর্কে যাবা আসে তারা তো ঢের বঞ্চিত হয়।'
সুধাংশু মুখ তুলে হেসে বললে—'নির্মল তো খুব নাক ডাকাচ্ছে।'
—'আবার ঘুমিযে পড়ল আব কী! ওর কী কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে?'
—'ঘুমোবে না, করবেই-বা কী?'
—'আপনিও বই পড়বেন বসে বসে—কীই-বা কববেন আব।'
—'না বইটা বেশ ভালো।'
—'আমিও কী তা না বুঝেছি? সবচেযে মূল্যবান আপনার হাতের বইখানা। মানুষ মানুষকে নিযে জানতে চায না। অন্যসব জিনিস তাব কাছে গভীর অর্থপূর্ণ হযে ওঠে।'
সুধাংশু কোনো উত্তব দিল না।
নির্মলা—'অনেক সমযই এই বকম হয।'
সুধাংশু চশমা খুলে মুছতে লাগল। নির্মলা—'এবই ভেতব চশমা মযলা হযে গেল আপনাব?'
—'ভালো কবে মোছা হযনি।'
—'দিন, আমি মুছে দিই।'
শাড়িব আঁচল দিযে চশমা মুছতে মুছতে নির্মলা [...] লেদাব বাখেননি না?'
—'না।'
—'কেন?'
—'মনে থাকে না কিনতে।'
—'শুধু এই চুরুট আব বইই হযতো সর্বস্ব।' চশমা জোড়া সুধাংশুব হাতে তুলে দিল সে—'নিন। দেখুন কেমন ঝকঝক করছে এখন।'
চশমা এঁটে সুধাংশু—'বই পড়ব্ না বন্ধ কবব, বন্ধ কবলেও তো পাবি।'
—'চশমা এঁটেছেন যখন তখন পড়ুন।'
—'আপনি-বা কী করবেন?'
—'আমি একটু শুই, সাবাবাত জেগে, মাগো, কী যে ঘুম পেযে গেছে আমাব।'
বিছানায় শুযে দু-একবাব নড়েচড়েই ঘুমিযে পড়ল নির্মলা। দিল্লি উৎবে যায তাব ঘুম ভাঙেও না। বাস্তবিক নির্মলা ঘুমোচ্ছে না আবো কিছু? সুধাংশু আস্তে আস্তে হাত দিযে নির্মলার মুখটা ঘুরিযে তাকিযে দেখল কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে, সমস্ত মুখে ঘাম, কাপড়-চোপড় দেহের সুগন্ধি স্বেদে অপরূপ, নির্বিবাদ অকাতর সুন্দব ঘুম। কাপড়-চোপড় সুগন্ধি স্বেদেব কমনীযতা।
চলে যেতে হয।
পৃথিবীতে এর তো কোনো দুঃখ নেই।
জীবনে এই নারী কোনোদিন দুঃখ পাযনি।
এই নারী জীবনে কোনাদিন।

উপমার বিবাহ বিশেষ সুবিধার জায়গায় হয় নাই। স্বামীটির মনের কল্পনা ও উপলব্ধি ও অন্তঃকরণের সহৃদযতা ঢের, এই দম্পতির জীবনে কোনো অসংলগ্ন আশা বা অবৈধ আকাঙ্ক্ষার ঘাত-প্রতিঘাত নাই,—সাংসারিক সচ্ছলতা যদি তাহারা পায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাধাবণ সাংসারিক স্বামী-স্ত্রীব মতো সংগত, বর্ণবিহীন বৈচিত্র্যহীন জীবন তাহারাও চালাইয়া যাইতে পারে।

বিবাহের সূত্রপাতে প্রেমও ছিল না, অপ্রেমও ছিল না। তিন-চার বছব দাম্পত্য জীবন চালাইযাও ভালোবাসা ইহাদের কাছে রহস্যের জিনিস রহিয়া গেল, প্রেম প্রণয অভিসার স্বপ্ন এই সমস্তকেই ইহাবা কল্পলোকের অনুকূল সংসারের অনুপযুক্ত অবাস্তব জিনিস বলিযা বিদায় দিল। কিন্তু তবুও বাস্তব সংসারও ইহাদেব বড় একটা গ্রাহ্য করিল না। মস্তবড় একান্নবর্তী পবিবারের এক কোণে এই মানুষ দুটি। ইহাদেব ছোট্ট সংসারটুকু গুছাইযা পাতিবার ভরসা ইহাদেব নাই, মানুষেব জীবনটাকে ব্যবহার কবিতে হইলেই প্রতি পদক্ষেপেই যে অর্থের প্রয়োজন সেইখানে ইহারা নিঃসম্বল।

উচ্ছৃঙ্খল জীবন উপমা বাপের বাড়িতে একদিনের জন্যও চালায় নাই। একটি সংযত স্বাভাবিক জীবনের শ্রী তাহার চোখেমুখে পরিস্ফুট, মানুষের জীবনেব অন্ধস্রোতের নিয়ম তাহার অপরিজ্ঞাত নয়। ইহার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিযা কোনো লাভ নাই, নীরবে ইহাকে সহ্য কবিতে হয়। অনেকটা নিজেব অজ্ঞাতসারেই উপমার হৃদযেব এই নিস্তব্ধ সহিষ্ণুতা আশ্রয কবিযা এই সংসারেব আনাচে-কানাচে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমনি করিয়া দিনেব পর দিন, অনেক দিনরাত্রি কাটিযা গেল। সাংসারিক সংগতিব দিক দিয়া এ দুটি মানুষেব কোনোই উন্নতি দেখা গেল না তবু, না জানি কি বহস্য—হযতো ইহাই স্বাভাবিক, এই মিলনেব ভিতর দিযা একটি সন্তানেরও জন্ম হইল। জট খুলিতে গিযা জটটা আবো ঢিল হইযা পাকাইযা বসিল আবো বেশি।

একটি শিশু আসিযাছে বলিযা বিরাট সংসাবের বিশেষ কিছু আসিল গেল না; শিশুকে ববং তাবা হাসিমুখে অভ্যর্থনার সঙ্গে গ্রহণ করিল, সমস্ত দিন, অনেক রাত্রি অবদি এই সংসাবেব নানাবকম মানুষেব কোলে-কাঁখে মেয়েটি ঘুবিযা ঘুরিয়া ফিবিতে লাগিল।

কিন্তু মেয়েটির বাপ-মা বড় লাঞ্ছিত হইল, তবুও যদি লজ্জামাত্র সম্বল কবিযা দিনরাত্রি কাটাইতে পাবা যাইত—কিন্তু মেয়েটির অনেক বাস্তব বকমেব দাবিও যে! যে ঘবে বিভূতি ও উপমাব শোবাব ব্যবস্থা সে ঘরেব পরিসর বড় বেশি নয, এইখানেই তারা বসে, কথাবার্তা বলে, লেখাপড়া কবে, জামাকাপড় ছাড়ে বদলায, টেবিল চেযাব বই তাক আলনা অনেক জিনিসেব বোঝায এতটুকু ঘরটা দম আটকাইযা মরিতেছিল।

কিন্তু শিশুটি আসিবাব পর বিভূতিব জন্য আব একটি দড়ির খাটের দবকাব হইল। বিভূতি—'দিব্যি চমৎকাব চোত ফাগুনের বাত, আমি তো বাইরে গিযে উঠানেও শুতে পারি।'

উপমা— 'তাহলে খুকিকে নিয়ে আমি পেবে উঠব না।' একটু চুপ থাকিযা উপমা—'আচ্ছা, শুযো বাইরে'—

বিভূতি একটু চিন্তা করিয়া—'না, আমি বুঝে দেখলাম ঘবে একজনেব থাকা দরকাব, তুমি তো এই সেদিন আঁতুড়ের থেকে এলে, কাঁচা শরীর, কত রকম কি প্রযোজন হতে পাবে, তোমারও ওরও।'

দড়ির খাটটা জননী ও তার সন্তানের চেয়ে যতদূর সম্ভব দূরে ঘরেব এক কোণে অনেকখানি ঝুল ও মাকড়সার পাশে আনিযা রাখা হইল। স্যাঁতসেঁতে মেঝে না হইলে মেঝের ওপব পাটি পাতিয়াই কাটাতে পারিত বিভূতি, খাটের কোনো দরকাব হইত না।

বাড়ির গিন্নিরা আসিয়া বলিলেন—'বিভূতি, যেদিকে তাকাই, সেখানেই দেখি তোমার বই গিজগিজ করছে, ঘব নয় যেন একটা দপ্তবির দোকান—এত বই তোমার?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কি যে করো দিনরাত বই নিয়ে তুমি।'

—'লিখি, পড়ি, সুন্দর কল্পনা ও উপলব্ধি সম্বল করে ভিতরের জীবনটাকে আমি একটু গোছাতে চাই, বাইরের জীবনে বিশেষ কিছু হল না তো বউদি।'

বউদিদিরা চুপ করিয়া রহিলেন।

বিভূতি—'মানুষ কি ভাতে-কাপড়ে বাঁচে শুধু। সুন্দর জীবনধারণেব জন্য চাই উপযুক্ত চিন্তাব জগৎ, এই দেখুন, আজকের কাগজে দেখলাম চীনেরা তাদেব সিংবাজাদেব কবব খুঁড়ে মণিমুক্তো নিয়ে পালাচ্ছে। বৈষয়িক ঐশ্বর্যেব লোভই তাদের কাছে বড় হল।'

বউদিদি বলিলেন—'সিং কে আবার?'

—'ও, তাও জানে না বুঝি?'

বউদিদি বলিলেন—'কেন, চিনেরা এবকম কবছে কেন বিভূতি?'

—'বাঃ, জাপানেব সঙ্গে চীনেব যুদ্ধ লেগেছে যে!' জানেন না আপনাবা ! না, দুনিযাব কোনো খববই রাখেন না দেখছি! আপনাদের নিয়ে যে কি হবে!' অত্যন্ত কৃপাব কটাক্ষে বউদিদিদেব দিকে তাকাইযা হাসিতে হাসিতে বিভূতি হঠাৎ গম্ভীব হইযা বলিল—'জাপান হচ্ছে একটা ভযংকব হিংসাপবাযণ জাত, রক্তমাংস বস্তু ও বিষযেব কদর্য বাস্তব জগৎটাব আড়ম্বব তাদেব এত বেশি যে ভাবতে গেলে যেমন লজ্জা হয বউদি, তেমনি দুঃখ করে। বাস্তবিক, এবা বড় কৃপাব মাত্র!'

ছোট বউদিদি—'জাপানিবা?'

বিভূতি মাথা নাড়িযা—'হ্যাঁ। একাই তো যুদ্ধ বাধাল।' বউদিদিদেব দিকে তাকাইযা বিভূতি—'যুদ্ধ হচ্ছে মানুষেব হৃদযের সবচেযে সেই কুশ্রী রূপ, সভ্যতার ভিতরে যে একটা [...] লুকিযে বযেছে তাব জঘন্য আত্মপ্রকাশ। স্বপ্ন নেই, ক্ষমা নেই, দাক্ষিণ্য নেই, নিষ্ঠা নেই, শিল্প শুকিযে যায, মহান পবিকল্পনা পথেব ধুলাব চেযেও নগণ্য হযে পদদলিত হযে ফেবে, প্রেম হযে দাঁড়ায উপহাসেব জিনিস।

মেজখুড়িমা বলিলেন—'থাক, বিভূতি, তোমাব কাছ থেকে আমবা অনেক শিখলাম বাবা, এখন এই ঘবেব একটু সংস্কাবেব দবকাব।'

—'কি কববেন বলুন খুড়িমা?'

—'যা ঝুল মাকড়সাব বাসা আব কেবোসিনেব বাতিব কালি পড়েছে দেওযালে! এর ভেতব সে কি মানুষেব ভালো লাগে বাছা?'

বিভূতি—'মাকড়সাব বাসা ঝেঁটিযে দেবেন বুঝি, তাহলে বেচাবিবা যাবে কোথায?'

—'কিন্তু শিশুব ঘবে এত মাকড়সা থাকলে চলে না তো, কে জানে কখন'—

ব্যাপাবটা উপলব্ধি কবিযা বিভূতি—'হ্যাঁ, আমাবও এক সময এই কথাই মনে হয, আমি অনেক ভেবে দেখেছি সৃষ্টিটা শেষ পর্যন্ত কেমন একটা বিশৃঙ্খলাব জাযগা। একেব স্থান অপবকে ছেড়ে দিতে হয, সদ্ভাবে সকলেব মিলে থাকবাব উপায নেই। মানুষেব একটি শিশু এসেছে, তাই বলে এ ঘবেব যত কীট পোকা ফড়িং তাদেব জীবনেব ঐকান্তিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হযে গেল। একী রকম!'

মেজখুড়িমা বলিলেন—'অনাবশ্যক বাক্সপত্র তো অনেক জমেছে তোমাব ঘবে, এগুলোও সরিযে নেওযা দবকাব।'

বিভূতি নির্বিকাবভাবে—'আচ্ছা।'

—'কেবোসিন কাঠেব আলমাবি দুটো, শেলফ, বইগুলো সমস্তই কিছুকাল ওই পাশের গুদামটায থাক।'

বিভূতি চক্ষুস্থিব কবিযা বলিল—'বই খুড়িমা? এমন বিশ-পঁচিশ হাজাব বই তো নয, হদ্দ দু তিনশো, এগুলো তো আমি কাছ ছাড়া কবতে পারি না।'

বেশ কাছ ছাড়া করিতে পারে না তাহা সকলেই জানে, কিন্তু তবুও বিভূতি কৈফিযৎ দিযা বলিল—'এই যে সংসার দেখছ, যেখানে টাকাকড়ি দেনা-পাওনার লেনদেনই সবচেযে বড় কথা জীবনের অন্য কোনো রহস্যের কোনো সন্ধান নেই, এ সংসারের সঙ্গে আমার ঘেঁষাঘেঁষি কতটুকু সমযেব জন্যই-বা। এ সংসারেব দিকে তাকাতে গেলেই আমাব হৃদয বিমুখ হযে উঠে। এব গণ্ডগোল কানে এসে

পৌঁছলেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে—বইয়ের ভিতর দিয়ে আমি সুন্দর প্রতিষ্ঠিত সত্যের ভিতর চলে যাই, সেখানে এই যুদ্ধবিগ্রহ কাড়াকাড়ি, অভাব, অপরাধ, কিছুই আমার নাগাল পায় না।

বইগুলি গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার ভিতর মস্তবড় ফাঁক বাহির হইয়া পড়িল।

বিভূতি—'বইগুলো আমার দড়ির খাটেব নীচেই বরং রেখে দেব—কিংবা ওই কুলুঙ্গিটাব ভিতর।' চারদিককার বিবর্ণ দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া বিভূতি—'এই যে কেরোসিনেব ধোঁযায কালি পড়ে গেছে সব এ সমস্ত আমার অতীত জীবনের সাক্ষ্য, যখন জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল দিনরাত পৃথিবীব নিত্যনবীন রস ও রূপের আরাধনা নিয়ে বিমুগ্ধ হয়ে থাকা, কত রাত কেবোসিনের বাতি জ্বালিযে কত বই পড়েছি আমি।' বলিয়া বিক্ষুব্ধ আত্মপ্রসাদে দেওযালের দিকে তাকাইয়া রহিল বিভূতি।

ঘরটা ঝাড়িয়া-ঝাঁটিয়া পরিষ্কার করা হইল, বোঝা কমানো হইল ঢের এমনকী টেবিলটা অবদি লইযা গেল তাহারা, উপমা খুকি বিভূতির দড়িব খাটের নীচে বইগুলো, এক কোণে একটা আলনা। কুলুঙ্গিতে আরশি, চিরুনি, তেল সাবান ইত্যাদি, গণেশের একটা নতুন মাটির মূর্তি ও দু চাবটি বাক্স-প্যাঁটরা রহিল মাত্র।

বিভূতি একটা নিশ্বাস ফেলিযা—'আমিও চলে গেলে পাবতাম।' উপমা কোনো জবাব দিল না।

বিভূতি—'টেবিলটাও নিয়ে গেল, দুপুরবেলা একটু লিখতাম।' খানিকক্ষণ চুপ কবিযা থাকিযা—'থাক, আমাদের আকাঙ্ক্ষার জগৎ খুব তাড়াতাড়িই ফুবিযে যায, বাস্তব ধীরে ধীবে নিজেকে ব্যক্ত করে ফেলে।'

দড়ির খাটের ওপর শুইযা অনেকক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া রহিল বিভূতি। তাকাইতে তাকাইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম যখন ভাঙিল তখন সন্ধ্যা।

টেবিলটার বদলে কে যেন একটা ছোট টিপাই বাখিযা গিযেছে, টিপাযেব ওপব চাযের পেযালা ঠাণ্ডা হইযা পড়িযা আছে।

বিভূতি বিরস মুখে শিশুটির দিকে, চারদিকে, ঘবটাব দিকে, জানালাব ভিতব দিযা পাড়াপড়শিব ইট বাহিব কবা দেওযালগুলির দিকে এক-একবাব তাকাইযা লইযা বলিল—'কি হযেছিল, জানো উপমা?'

—'তোমাব চা অনেকক্ষণ হয দিযে গেছে।'

—'তা দিক। স্বপ্ন দেখছিলাম আমি, মস্তবড় একটা সবুজ মযদানে চলে গিযেছি, মাথাব ওপব দিকে প্রকাণ্ড একটা সোনালি ঈগল সাঁই সাঁই কবে উড়ছে, অনেকদূরে একটা পিবামিড।'

উপমার যেন কানেও গেল না কিছু। বলিল—'দিনেব এই ঘবে বেজায মশা, সমস্তটা দুপুবে মশাবি ফেলে শুতে হয়েছে খুকির জন্য, তুমি বেড়িযে ফিববাব সময একটা ছাতা মশারি নিযে এসো তো ওব জন্য।'

বিভূতি অন্যমনস্কভাবে-'কোন রঙেব আনব?'

—'বং একরকম হলেই হয।'

শুনিযা বিভূতি বলিল—'কেন, তোমাব নিজেব কি কোনোরকম রুচি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযতো আছে, কিন্তু প্রকাশ কবতে চাও না, আমি তোমাব স্বামী, তোমাব এ বিমুখতা দেখলে মনটা আমাব কেমন থমকে যায় উপমা।'

—'লাল রঙের এনো।'

বিভূতি চাযের পেযালা হাতে লইযা মাথা নাড়িয়া বলিল—'বং হচ্ছে সবুজ আব নীল, গাছপালা আব আকাশের রং, মানুষেব চোখ স্নিগ্ধ করে রাখবাব জন্যই এই রং দিযে পৃথিবীটাকে সরস করে রেখেছেন বিধাতা। যখনই শহরেব ধোঁযা ধুলোর ফাঁকে ফালি আকাশটাব দিকে তাকাই তখনই মাথাব ওপবকাব চিরন্তন ক্ষমা ও করুণাব প্রথা দেখে অবাক হযে থাকি।'

উপমা বলিল—'চিৎপুরে হয়তো পাবে।'

বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিযা ভাঁজ করা চাদবটা আলনায রাখিযা দিযা বিভূতি—'দেখলাম, কত লোক ফুটপাথে শুযে আছে।''

উপমার চোখে কোনো সহানুভূতিব আভাস খুঁজিযা পাওয়া গেল না। দু চোখ তুলিযা দেখিল বিভূতি মশারি আনে নাই, এই ভযই এতক্ষণ কবিযাছিল সে, যা হইবাব ঠিক তাহাই হইযাছে।

বিভূতি—'ধুতিব খুঁটটা গায দিযে নাক মুখ বুঁজে পথেব একপাশে পড়ে বযেছে, আমবা আমাদেব নিজেদেব সুখ-দুঃখেব কথা নিযে অনেক ঘটা কবি, বেদনা, আমাদেব একটা সমাবোহেব জিনিস, তা নিযে আছে আমাদেব আকাশ-পৃথিবী-জোড়া বিস্তৃত আত্মপ্রকাশেব আড়ম্বব শুধু। কিন্তু যে ব্যথাব মর্ম শুধু ভগবান ছাড়া আব কেউ বুঝল না, তা কি যে ভযাবহ আমবা তা কল্পনাও কবতে পাবি না, তা শুধু ওবা বোঝে।' একটু চুপ থাকিযা—'আমাদেব জীবনে কোনো কষ্ট অশ্রু নেই, আছে বেদনাব বিলাস। দুঃখেব পবীক্ষায আমবা ঢেব নীচে পড়ে আছি।'

উপমা—'এ দড়িব খাটিযাটা তুমি জোগাড় কবলে কোথাব থেকে?'

—'কেন, তিনদিন ধবেই তো এখানে আছে।'

—'ওটা তুমি বদলাও।'

—'কেন?'

—'একটা কাঠেব খাট আনো।'

—'কাঠেব খাট তো এ সংসাবে অপর্যাপ্ত নেই।'

—'আমি বলি একটা কিনে আনতে।'

বিভূতি চুপ কবিল।

উপমা একটু হাসিযা বলিল—'চুপ কবলে যে?'

বিভূতিব চোখ মুখ করুণ হইযা উঠিল। খাট তো দূবেব কথা, একখানা কাপড় বা এক জোড়া জুতা, নিজেব কিনিবাব সামর্থ নাই তাব, এমনকি কাপড় কাচা সাবান পর্যন্ত। এ সংসাব হইতে তাহাকে কিনিযা দেওযা হয। চাব বছব আগে বাবা মাবা যান, তখনো বিভূতি চাকবি পান নাই। চাবটি বছব গড়াইযা গেল, গত বছব মা মাবা গেলেন, তবুও বিভূতিব চাকবি হইল না। জীবনেব সংগ্রামটা অবিশ্যি কোনোবকমে চলিযা যাইতেছে, বাহিব হইতে বিভূতিকে যোগ দিতে হয না। মাথাব উপবে দাদাবা আছেন, তাহাবাই চালাইযা নিতেছেন। কিন্তু ভিতবেব সংগ্রামটা নিজেবই দেখিতে হয, সে যেন এক কঠিন বিবস বিপর্যযেব জাযগা পদে পদে চাবদিককাব সংগত নিযমানুযাযী পৃথিবীব ধাক্কায ধাক্কায ভিতবেব জীবনটা যেন তাহাব হাঁপাইযা ওঠে। এই যে উপমা, এও সেই সংগত নিযমানুযাযী পৃথিবীব জীব, এই শিশুটিও, সুযোগ পাইলেই বিভূতিব অন্য জীবনকে লইযা ইহাবা নাড়াচাড়া কবে, ধূলিসাৎ কবিযা দেয সেই জীবনটাকে। সে যদি তাহাব মনেব সমস্ত ঐশ্বর্য জলাঞ্জলি দিযা একজন সাধাবণ তুচ্ছ চাকবিজীবী হইযা সংসাবেব পথে পাকা বৈষযিক হইযা বেড়াইতে পাবিত, তাহা হইলে উপমা ও তাহাব মেযেটিব পক্ষে সে যদি ঢেব আশীর্বাদেব জিনিস হইত, ভাবিতে ভাবিতে কেমন ব্যথা বোধ হয বিভূতিব। বসিযা বসিযা সে অস্বস্তি অনুভব কবে, কপালেব দুই দিকেব বগেই কেমন যেন একটু ব্যথা। এক ঠাযে বসিযা বা-পাযে ঝিঁঝি ধবিযা গিযাছে।

পা টা সে একটু ছড়াইযা দেয।

উপমা—'তোমাব তো পেশোযাব যাবাব কথা।'

—'কে বললে?'

—'মেজখুড়িমা বলছিলেন।'

—'কেন?'

—'কি জানি, হযতো একটা চাকবিব সন্ধান আছে।

বিভূতিব মুখ ফ্যাকাশে হইযা গেল, হযতো ত্রিশ টাকাব একটা কেবানিগিবি, ইহাব জন্য তাহাকে পেশোযাব যাইতে হইবে? সে ঢোক গিলিযা বা পা গুটাইযা লইযা মুষড়াইযা বিছানাব ওপব শুইযা পড়িল।

উপমা—'শুলে যে?'

—'বড্ড ক্লান্ত।'

—'কেন, কোথায গিযেছিলে?'

—'যে যেদিকে টেনে নিযে যায, বেড়াবাব সময ভালো সঙ্গী পেলেই হল।'

—'পথে বেরুলে এত লোকেব সঙ্গে দেখা হয তোমাব?'

—'তুমি তো কিছু জানো না উপমা, যদি আমাব সঙ্গে বাস্তায বেরুতে, তাহলে বুঝতে পাবতে

সব। হয়তো ফুটপাথ ধরে দশ পা এগিয়েছি, এমন সময় গেল একজন ে গটি চেনা মুখ, চোখে পড়ে যায়, হাতে হাত রেখে কথা কলতে বলতেই আধঘণ্টা।' একটা নিশ্বাস যে শ—'তারপর আরো কত কথা বাকি পড়ে থাকে!' বললে—'জীবনে এত বিনিময়ের জিনিস আছে, এত লোকের সঙ্গে, একটুকুই-বা সঙ্গ হয়।'

উপমা—'দু তিন দিনের মধ্যেই হয়তো পেশোয়ার যেতে হতে পারে।'

. বিভূতি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

উপমা—চুপ করে আছ যে?'

বিভূতি কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া কহিল—'পেশোযাব যাওযার কথা বলছ, হযতো পঁচিশ ত্রিশ টাকাব একটা কেরানিগিরির জন্য, কিন্তু জীবনে টাকাই কি সব? আচ্ছা তুমিই বলো উপমা, মানুষ এটা উপলব্ধি করে দেখে না যে জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে গভীর সম্ভাবনা ও সফলতার জিনিস বযেছে তাব মূল্য সমস্ত টাকার ওপরে, এই তো খুকিকে দেখছি, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, বাস্তায কত বন্ধুবান্ধব রয়েছে আমার, এই সবের বদলে যদি আমি একরাশ টাকার মালিক হযে বসতাম শুধু নিজেও দুঃখ পেতাম, তোমাদেরও দুঃখ দিতাম, সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্যও সফল হত না আমাকে দিয়ে।'

পেশোয়ার অবিশ্যি যাইতে হইল না। পেশোয়ার যাইবার কোনো কথাও ওঠে নাই, উপমা শুধু মানুষটিকে একটু আচড়াইয়া দেখিল। দেখিল ভিতবেব সেই চিব পবিচিত রূপই আছে, একটি শিশু জন্মাইয়াছে বলিযা কোনো রূপান্তর হয নাই।'

উপমা—'আমি কেমন সুন্দর কাঁথা সেলাই কবছি দেখব?' কাঁথাটা সে আলোর সামনে একবাব মেলিয়া ধরিল।

বিভূতি—'পদ্মের নকশা আঁকছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ সুন্দর তো, কাঁথা সেলাই কবতে শিখলে কোথায?'

—'বাপের বাড়িতে।'

অনেকক্ষণ উপমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল বিভূতি। তারপব বলিল—'তোমার মুখেব দিকে তাকিযে তাকিয়ে কেমন দুঃখ কবে আমাব উপমা।'

—'কেন?'

—'বাজারে কত সুন্দব বাতি আছে। কিন্তু একটা শস্তা হ্যাবিকেনেব পাশে বসেছ তুমি, কেরোসিনের ধোঁযা উঠে উঠে চিমনি কালো হযে গেছে। এই বিবস আলোব ভিতবে বসে কাঁথা সেলাই করছ তুমি, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তুমি তো খুব উজ্জ্বল যেমন রূপে, তেমনি মনেব বিশিষ্টতায।'

উপমা একটু হাসিয়া বলিল—'একটা দিয়ে আর একটা কাটিয়ে নিতে হয।'

বিভূতি খানিকক্ষণ চুপ কবিয়া কি যেন ভাবিল। তাবপর বলিল—'কটা বাত হযেছে বলতে পাব?'

—'রাত খানিকটা হযেছে।'

—'এই দশটা কি বলো?'

—'তা হবে হযতো।'

এ ঘবে কোনো ঘড়ি ছিল না, কোনোদিনই নাই, কিন্তু উপমাকে সময-অসময়ে ঘড়ির কাজ কবিতে হয।

বিভূতি উঠিযা বসিয়া বলিল—'বাত দশটা, তাহলে তো বান্না হযে গেছে, কি বলো?'

—'হবারই তো কথা।'

—'যাই, খেতে যাই।'

—'যাও।'

—'তুমি খেযেছ?'

—'না।'

—'কি খাবে? তোমাব তো অসুখের শবীর, কি বলব গিযে ঠাকুবকে?' ঠাকুবকে গিযা কিছু বলবার দরকার ছিল না, এদিককাব দেখা শোনাটুকু এ বাড়ির গিন্নিরাই খুব সযত্নে সন্তর্পণে কবিয়া আসিতেছেন। বান্না হওযামাত্রই উপমাকে ডাকিযা লইযা খুড়িমাদেব একজন মেয়েদেব খাবার ঘবে তাহাব কাছে বসিযা

তাহাকে পাখাব বাতাস কবিযা খাওযান। ইহা যে বিভূতিব দৃষ্টি এড়াইযা গিযাছে তাহা নয—কিন্তু সব সময সব কথা মনে থাকে না তাব। আগ্রহেব আতিশয্যে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিযা ফেলাই তাহাব স্বভাব। উপমাব জন্য আগ্রহ তাহাব কম নয তো। সে দাঁড়াইযা ছিল।

উপমা—'না, ঠাকুবকে বলতে হবে না।'

—'তুমি কি খাও না খাও তাও তো আমি দেখি না, হযতো কতদিন উপোস কবেই থাক।'

উপমা দাঁত দিযা সূতা কাটিযা বলিল—'নিজেব শবীবেব ওপব নিজেব দবদ আছে আমাব, খিদে থাকতে মিছেমিছি উপোস কবতে যাই না কোনোদিন।'

বিভূতি প্রসন্ন হইযা উঠিযা— বেশ, মেযেদেব আবাব বড় অভিমান কিনা। স্বামীব আদবযত্নেব হিসেব বাখে তাবা।'

—'বাখে নাকি?'

—'খু-ব,—এই তো তুমিই হযতো মনে কবতে বসতে পাবতে, তোমাব জন্য আমাব কোনো আগ্রহ নেই।'

উপমা চুপ কবিযা ছিল।

বিভূতি—'কিন্তু তোমাব জন্য দিনবাত কত ভাবি আমি, তা যদি বুঝতে।

মিথ্যা নয, তা ঠিক, এ মানুষটি যাহা বলে তাহা সত্য। ইহ'ব আন্তবিকতা সম্বন্ধে উপমা কোনোদিন নিজেব মনে প্রশ্ন তুলিতে যায নাই। বিভূতিব একান্তিকতাব প্রণালী সম্বন্ধে অবিশ্যি তাহা যথেষ্ট দ্বিধা, এ পুরুষটিব আন্তবিকতা ও ভালোবাসাব বকম এত বিচিত্র ও অদ্ভুত যে উপমাব হৃদয অবশ অবসন্ন হইযা পড়ে।

বিভূতি— তুমি তা বোঝো না উপমা?

স্বব এত করুণ যে উপমাব হাসি পাচ্ছিল। সেলাই কবিতে কবিতে হাসি চাপিতে গিযা সে কোনো জবাব দিতে পাবিল না।

বিভূতি আমাব হৃদযেব ভিতব সমস্ত মানুষেবই প্রবেশেব অধিকাব আছে কিন্তু তোমাব অধিকাব সব চেযে বেশি। কিন্তু কি দুঃখ, এতদিন কাছাকাছি থেকেও আমাব হৃদযেব খবব তোমাকে জানাতে পাবলাম না।

উপমা হাত তুলিযা বিভূতিব চোখে-মুখে হাত বুলিযে দিযা বলিল— আমাদেব দুজনেব যা সম্বন্ধ তাতে এসব বিষয জানবাব বা জানাবাব প্রযোজন হয না। আমবা জানতেই পাবি। বলিযা ধীবে ধীবে শাদা হাতটা গুটাইযা লইযা সূচ তুলিযা লইল

বিভূতি আশ্বস্ত হইযা বলিল—'বিচিত্র মানুষ তুমি। সংযমেব ভিতব দিযে তুমি যা প্রকাশ কবতে পাব, হৃদযাবেগেব গভীব উচ্ছ্বাস নিযে আমি তো তাব শতাংশেব একাংশও পাবি না উপমা

উপমা মাথা হেট কবিযা সেলাই কবিতেছিল, হাসিতেছিল না কাঁদিতেছিল, বিধাতা জানেন।

বিভূতি—'বেশ, শুনে খুব সুখী হলাম যে খিদে থাকলেই তুমি খাও। মিথ্যা অভিমান বা মানমর্যাদাব অসাড়তা তোমাব নেই।'

উপমা মাথা নাড়িযা— দুধ আমি খাই।'

— বোজ কতটুকু খাও? আধ সেব?

কথাব পাচালি কাটিযা সংক্ষেপ কবিযা দিবাব জন্য উপমা— হ্যাঁ।

—'তাহলে তো বেশ, আধ সেব দুধে কম ভাইটামিন নয, মাখনও খেও

—'আচ্ছা।

— বাজাবেব মার্গাবিন নয, মেজখুড়িমাকে বলো যেন গোযালাব কাছ থেকে মাখন আনিযে দেয

উপমা ঘাড় নাড়িযা সম্মতি জানাইল।

বিভূতি— আব টোম্যাটো—বিলিতি বেগুন—কাচা বিলিতি বেগুন খেতে পাব।

—'পাবি।

—'হযতো ভালো লাগবে না, টক বেধে দিতে বোলো।'

— বলব।'

বিভূতি বলিল—'খুকি কেমন সুন্দব ঘুমিযে আছে দেখো তো।'

উপমা কাঁথাব দিকে তাকাইয়া সেলাই কবিয়া যাইতেছিল।

বিভূতি নিজেই খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়া লইল, তাবপব বলিল—'ওব দিকে তাকিয়ে যত আজগুবি কথা মনে পড়ে আমাব।'

—'কি বকম?'

—'মানুষেব জন্ম ও জীবনেব কথা ভাবি। তোমাব আমাব সঙ্গে ওব যে কোনো সম্পর্ক আছে তা আমি কিছুতেই স্বীকাব কবতে পাবি না। আমাব মনে হয নিখিল জীবনস্রোতেব সঙ্গেই তাব চেযে ঢেব বেশি সম্বন্ধ এই মেযেটিব।'

উপমা—'হ্যাঁ, সেই কথাই সত্যি।'

—'তুমিও উপলব্ধি কবতে পেবেছ দেখছি। বাস্তবিক এ সত্য এমন পবিস্ফুট যে ধবা না পড়ে ছাড়ে না; বিশেষত তোমাব মতো নাবীব কাছে।'

উপমাব পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিভূতি–'জীবনেব তথ্য আবিষ্কাব কববাব অন্তর্দৃষ্টি তোমাব আমাব চেযে ঢেব বেশি, তোমাবও তা মনে হয না উপমা?'

উপমা বলিল তাহাবও তা মনে হয।

বিভূতি—'সেই যে চিবাচবিত গতানুগতিক হিসেব বযেছে যে ছোট ছোট শিশুবা পাখিদেব মতো হিসেব নয কিন্তু, অন্য কোনো এক আমি তোমাকে কেমন ভাঙিযে বলতে পাবি না, বহস্যময হিসেবে বুঝলে? আমাব মনে হয চড়াই আব খুকি যেন ভাই বোন।'

উপমা সুচেব ভিতব বঙিন সূতা ভবাইতেছিল।

বিভূতি—'তাবপব বাত্রে ছাদে গিযে ছাযাপথ ও তাবাগুলোব দিকে তাকিযে মনে হয শিশুটি যেন ওই সব জাযগাব থেকে এসেছে আসলে, আমাদেব কদর্য বক্তমাংসেব সঙ্গে বাস্তবিক তাব কোনো সম্পর্ক নেই।' বলিল—'জগৎ সংসাব চবাচবব্যাপী নীল নবম বাত্রি আকাশভবা নক্ষত্র ছোট ছোট শাদা শাদা মেঘ খুকি মনে হয যেন এব পবস্পবকে যতখানি চেনে আমিও তোমাকে ঠিক ততখানি চিনি না উপমা। বলিযা ধীবে ধীবে শিশুটিব স্নিগ্ধ কোমল বেশমেব মতো চুলে ধীবে ধীবে হাত বুলাইতে লাগিল বিভূতি।

উপমা—'যাও, খেতে যাও।'

—'যাই।'

খাওযা-দাওযাব পব বিভূতি বাড়িব অফিসেব বাবুদেব সঙ্গে এক হাত তাস খেলিযা লইল। ঘবে ঢুকিল যখন তখন তাহাব দু চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন। ডান বাঁযে তাকাইবাব শক্তিও তাব নাই।

ঝপ কবিযা দড়িব খাটিযাব ওপব পাতা বিছানাটায শুইযা পড়িল সে। শুইযাই ঘুম। এই বকমই বোজ হয। শিশুব মতো সবল শান্ত ঘুম তাব। যেন পৃথিবীতে কোনো ব্যথা, কোনো বিড়ম্বনা, কোনো অপবাধ নাই, যেন বিধাতা আকাশে বহিযাছেন, তাবই চোখেব নীচে মানুষ বহিযাছে পৃথিবীতে। বেশ গোলমাল চুকিযা গেল সব। উপমাব অবিশ্যি অত সহজে ঘুম আসে না। অনেক বাত জাগিযা বিভূতিব জামাকাপড় বিপু কবিযা বাখে। খুকিব জন্য ইজাব জামা তৈবি কবে। কাঁথা সেলাই কবে। আব কবিবেই কি? কবিবাব বিশেষ কিছু নাই তাব। বাত বাবোটা বা বাবোটাব পব একটা। হ্যাবিকেনেব চিমনিটা ধোযা ধোযা কালো হইযা উঠিল। নীল সূতা লাল সূতায কাঁথাব ওপবে পদ্মেব নকশা বেশ অপরূপ হইযা ফুটিযা উঠিযাছে।

এমন সুন্দব জিনিসটাব দিকে তাকাইযা উপমা ঝব ঝব কবিযা কাঁদিযা ফেলিল।

সঙ্গ, নিঃসঙ্গ

বাপের বাড়ি গিয়া এবার তুমি খুব কায়েমি হইয়া বসিয়াছ দেখিতেছি। অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই—বিবাহ আমাদের তিন বছরের পুরান—তিন বছর অবিশ্যি এমন বেশি কিছু সময় নয়— অনেকের বিবাহ দশ-পনের, কুড়ি পঁচিশ, এমন-কি পঞ্চাশ বছব অবধি, নবীন ও সজীব থাকে। প্রতিদিন, অন্তত সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিন, চিঠিপত্রেব বিনিময় না হইলে তাহাদেব চলে না।

কিন্তু তুমিও জান, আমিও জানি—ইহাদেব মত যদি আমাদের জীবনেব ব্যবস্থাও হইত তাহা হইলে এ পৃথিবীতে পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

এই যে দীর্ঘকাল তুমি আমার কোনো খোঁজ খবর নেও নাই, আমিও তোমাকে কিছু লিখি নাই—এই শূন্যতা আমাব কাছে বড় গভীব পরিতৃপ্তিব জিনিস। জীবনটাকে এই রকম নিস্তব্ধতা ও শূন্যতাযই ভরিয়া রাখিতে ইচ্ছা কবে আমাব। আমাব কামনা কী জান? বইচি, মযনাকাঁটা, বাবলা, ফণীমনসা, বন-অপবাজিতাব পাশ দিয়া এক একটা সাদা ধুলা মাখা ভারী স্নিগ্ধ আঁকাবাঁকা গ্রামের পথ থাকে—তাহাবই পাশে থাকে এক-একটা প্রান্তবেব অপরিসীম নিশ্বাসের নিস্তার—সবুজ ঘাস আছে সেখানে, ঘাসেব ভিতব শ্যামাপোকা আছে, দিযালিপোকা আছে, গঙ্গাফড়িং আছে, কাঁচ পোকা আছে, সুদর্শন উড়িয়া আসে, হলুদ, কমলা, জর্দা নীল রঙেব প্রজাপতি কাশফুলেব ভিতব সমস্ত দুপুর ঘুরিযা-ঘুরিযা বেড়ায়—কোথাও হয তো কতকগুলো পলাশ, অর্জুন গাছ, উলুখড়ের জঙ্গল, মাছরাঙাব ডানাব শিবশিরানি, এমনই এক জাযগায, ঘাসেব নবম গন্ধেব কাছে, প্রান্তবের এক টেবে বনেব দেবতা অশ্বত্থ যেখানে অনেক দিন হইতে ছাযা বচনা কবিযা বাঁচিযা আছেন, বাত্রি দিন শালিখ, বুলবুলি, কোকিল ও কাককে আশ্রয় দিযা আসিতেছেন, সেইখানে, খড়ের একখানা ঘব তুলিযা পড়ি, লিখি, চুরুট ফুঁকি, দিন কাটাইযা দেই—

জীবনেব ব্যবস্থা যদি আমি এই বকম কবিযা লইতাম, আমি জানি তুমি ইহাতে কোনো আপত্তি কবিতে না। আমাকে নিঃসঙ্গ মনে কবিযা আমাকে তোমাব সাহচর্য দিবাব আকাঙ্ক্ষাও অনুভব করিতে না তুমি। নিজেকে সব বিষযেব, অন্তত আমাব সম্পর্কিত সমস্ত বিষযেব থেকে বিদূবিত বাখিবাব এই যে তোমাব উদাস চমৎকার উন্মনস্কতা, ইহার কথা যখনই ভাবি, তখনই দ্রোণফুলেব নিভৃত মধুব মত মাধুর্য আসিযা আমার মনকে সিক্ত কবিযা দিযা যায—আমি চুপ কবিযা বসিযা থাকি। চিলেব সোনালি ডানা, ডালপালাব ভিতর হইতে প্রসাবিত হইযা, উড়িযা-ঘুবিযা, নীল আকাশে কোথাও মিলাইযা যায—দেখিতে কী যে ভাল লাগে আমাব!

তুমি জান কি না জানি না, কিন্তু আমি অনেক দিন হইতেই দেখিতেছি, ভালবাসিতে যদি-বা চাই, কেহ আমাকে ভালবাসুক, আমাব কাছে আসিযা বসুক, আত্মসমর্পণ কবিযা আমাব পবিচর্যা শুরু করুক, আমাকে অবলম্বন করিযা নিজেব মনোমাযার সোনালি কপালি কমলা বঙেব তদন্তে সবুজ ঘাসেব শরীব ও বুটিদাব নীল আকাশকে ভবিযা বাখুক, বিচিত্র অলৌকিক নিভৃত নীড় তৈবি করুক, এ সব ভাবিতে গেলে আমাব বড় পীড়া বোধ হয, পৃথিবীব শেষে পলাইযা যাইতে ইচ্ছা করে আমাব—

তোমাব মনে আছে কি না জানি না, তুমি এখানে থাকিতেও আমাব নিজেব ঘরের ভিতব একটা জলেব কলসী সব সমযই বাখিতাম; তৃষ্ণা পাইলে নিজেই গড়াইযা নিযা জল খাইতাম, তোমাকে কোনো দিন জল ঢালিযা দিতে অনুরোধ করি নাই। তুমিও অনুগ্রহ করিযা ঢালিযা দিযাছ বলিযা মনে হয না। কিন্তু ইহাই আমাব ভাল লাগিযাছে। এখনো যখন মনে হয, বুঝিতে পারি, তোমাব সঙ্গে আমাকে গভীব নিঃসঙ্গতার নিস্তাব দিযাছিল; সেই নিস্তাবেব পথে এখনো চলিতেছি; চিবকালই চলিব। ইহাব চেযে অনুপম উপলব্দি পৃথিবীতে আব কিছু আছে কি? অবিশ্যি, আট বছব আগের ধারণা আমার অন্য বকম ছিল। তখনো আমি বিবাহ কবি নাই। মনে হইত বধূকে দিযা পা টিপাইযা লইব, কপালে চুল বুলাইযা দিবে সে, পাখা দিযা বাতাস কবিবে—আরো কত কী!

কিন্তু তুমি যখন আমার জীবনে আসিলে, এ সব কিছুই কবিলে না তুমি; আমিও চাহিলাম না। ধীরে-ধীরে হৃদযেব ভিতর সাপ-খেলানো বাঁশিব সুর কেমন যেন বাজিযা উঠিল আমাব। বুঝিতে পারিলাম না, এ সুর কাহার নিকট হইতে আসে। দিন-রাত্রির ভিতব হইতে, গ্রামের পথের প্রান্ত হইতে উলুখড়েব জঙ্গল হইতে, আকাশ হইতে, নিস্তব্ধ অপরূপ দুপুর বেলাব বুক হইতে, এ সুর কে যে পাঠায

ভাবিয়া-ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। কিন্তু কেমন অচেনা গভীর; বড় ভাল লাগিল আমার। কোনোদিন কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলাম, হারাইয়া ফেলিয়াছি—এ কি তাহারই হ্লাদিনী? না, তা নয়। এ তুমিও নও—আমিও নই; এ শুধু দিন-রাত্রির গভীর রঞ্জনী ধ্বনি—অনন্ত অপরিসীমের দিকে চলিতে-চলিতে নারিকেলের পাতায়, চিলের ধবল গলায় খয়েরি ডানায়, ভোরের নৌকার রঙিন পালে, খর রৌদ্রে, মেঘনা-ধলেশ্বরীর স্ফীত স্তনের বন্যায়, মধুকূপী ঘাসে, কাশের সমুদ্রে, দ্রোণফুলের ভিড়ে, মৃতা রূপসীর ললাটের সিন্দুরে, গোধূলির মেঘে, শীতসন্ধ্যার কুয়াশায়, স্থবিরের বিষণ্ন চোখের নির্জন স্বপ্নতন্তুর ভিতরে, তাহারা যে সুর বাজাইয়া যায়—এ শুধু তাহারই ধ্বনি।

এ সুর তোমার জীবনে আছে কী না জানি না; যদি না থাকে—আহরণ করিয়া লও, জীবনে এক গভীর অবলম্বন পাইবে।

চিঠিখানা এই পর্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। দুপুর বেলা। করমচা, কুল, কদমের জঙ্গলের ভিতর হইতে নিরবচ্ছিন্ন ঘুঘুর ডাক আসিতেছে—শুনিতে-শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে হয়। কলম রাখিয়া দিয়া অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। তার পর কলম তুলিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে লিখিতে লাগিলাম আবার।

তুমি অনেক দিন হয় বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছ বটে, কবে আসিবে জানি না, সেখানে কোনো এক ছন্দ নিশ্চয় পাইয়া বসিয়াছে তোমাকে, যাহা দিয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া চলে। আমিও ভাবিয়াছিলাম, যখন আমার সঙ্গে মিলিত হইলে এই রকম কোনো একটা ছন্দের পথ ধরাইয়া দিব তোমাকে—দেখিতেছি নিজেই খুঁজিয়া পাইয়াছ।

মাও এখানে নাই, তিনি কয়েক মাস হইল কাশী চলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন আমাদের সংসারের অবশিষ্ট নারী—আমার বিধবা বোন চারুকে। মার ইচ্ছা, চারুকে লইয়া অনেক দিন কাশীতেই থাকেন। বুড়া বয়সে কাশী থাকিবার সখ যে তাহার হইল, মন্দ হইল না; কিন্তু এখানে বাবা রহিলেন-দিনের মধ্যে অনেক বার তাহার নানা রকম তত্ত্ব-তলবের দরকার; অসুস্থ মানুষ, মনও খুব চিন্তিত, বুঝি না এ সব কাহাকে দিয়া করাইয়া লইব।

একটি চাকর আছে অবিশ্যি, ছোকরা, নাম অর্জুন, চেন তো তুমি তাহাকে? সে অবিশ্যি অর্জুনও নয়, শিখণ্ডীও নয়—মাঝামাঝি একটা কিছু। এক-এক সময় খুঁটিনাটি খানিকটা কাজ বেশ মন দিয়া গুছাইয়া করে; কিন্তু তার পরেই আসে তার অবসাদের সময়, পালাইয়া গিয়া ছাতিম তলায় চাকরদের দলে মিশিয়া তাস খেলিয়া দিন উজাড় করিয়া দেয় সে, কিংবা মনসাতলায় নিরিবিলি অশ্বত্থ গাছের নীচে ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া চৈত্রের দিনটা সাঙ্গ করে। পূজা-পার্বণ বা কোথাও কথকতা-যাত্রা হইলে অর্জুনকে তিন-চার-পাঁচ দিনের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তার পর এক দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কাপড়ে ধূলায় ধূসরিত হইয়া দেখা দেয়।

আমি বলি না কিছু তাহাকে। বেচারার মা নাই, কেহ নাই; পৃথিবীর মাটির জন্য টান রহিয়াছে; পৃথিবীর পথে-পথে ঘুরিতে ভালবাসে সে। ঘুরুক। আমার যদি কোনো সন্তান থাকিত তা হলে এই রকম ঘুরিতে দেখিলেই ভাল লাগিত আমার—

দুই বিঘা জমির উপর আমাদের এই বাড়ির ঘর-দোরের পরিসর যে নিতান্ত কম নয় তাহা তো তুমি বিবাহের পর কয়েক মাস থাকিয়া দেখিয়াই গিয়াছ। বাড়ির এমন পড়ন্ত অবস্থা, এ পরিবারেরও, আমার তো মনে হয় দুই-তিন পুরুষের মধ্যেই সব ধ্বসিয়া যাইবে। তুমি দেখিয়া গিয়াছ, নোনা-ধরা দেয়াল, ইট ফাটিয়া-চুরিয়া পাটকেল হইয়া খসিয়া পড়িতেছে, মেঝের ভিতর ফাটল, আগাছা, সেখানে ইন্দুরও থাকে, সাপও থাকে, জীর্ণ শীর্ণ খাট ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দিঘির জল পঁচিয়া উঠে, বাড়ির চারিদিকে জঙ্গল, ভিতরের কোঠাগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া ফাটা-টুটা বেওয়ারিশ জিনিসের ভাঁড়ার শুধু; যেখানে-সেখানে ছুঁচা ছোটাছুটি করিতে থাকে। হাঁটিতে-হাঁটিতে অতীত স্মৃতিকে মাড়াইয়া চলি শুধু, গলিত চন্দন কাঠের মত বিচিত্রতার আস্বাদ পাই কখনো; কখনো বা গোখুরার ছোবলের মতই কেমন কী সব আঘাতে মানবাত্মা শুকাইয়া নীল হইয়া উঠে যেন; ইহাদের মাঝামাঝি আরো কত অনুভূতি দিনরাত তাহাদের ছায়ার শরীর, ছবির শরীর, রেখা ও তন্তুর উজ্জ্বলতা ও অন্ধকার লইয়া বুদ্বুদের মত স্ফুরিয়া ওঠে—মুছিয়া মিশাইয়া যায়।

বিশ-পঞ্চাশ বছর পরে এ বাড়িতে কে থাকবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। বাড়ির চারিদিক ঘিরিয়া জঙ্গলের ভিতর শিয়ালে কাঁদিবে শুধু; আর ঐ পলাশের ডাল হইতে জামের শাখায়, সেখান হইতে হৃদয়ের প্রশাখায়, মেঘের রসের মত মলিন মধুর কামিনীর ঝোপের ভিতর, লক্ষ্মীপেঁচা, জোনাকি, নক্ষত্র-মাখা চৈত্র-বৈশাখের রাতের সমস্ত শিশির আলো আঘ্রাণ [করিয়া] ও অন্ধকার কুড়াইয়া লইয়া রহস্য

সৌন্দর্যাবৃত এই জীবন ব্যাপারটাকে মাদুরের চেয়ে ঢের সুব্যবহারে লাগাইয়া যাইবে। এই ভাঙা দরদালানের সেই শেষ অতিথিদের কথা ভাবিয়া বেশ ভাল লাগে আমার।

অনেক পুরুষের সুখ-দুখের আস্বাদ মাখানো এই প্রাচীন জিনিসটাকে তাহারা এক সুন্দর পরিসমাপ্তি দিবে।

কিন্তু সে দিন এখনো খানিকটা দূরে।

জানই তো, লোক নাই-নাই করিয়াও এ বাড়িতে বছরের চারটি মাস ধরিয়াই আত্মীয়-স্বজনের ভিড় নিতান্ত কম নয়। তুমি চলিয়া গিয়াছ, মা চলিয়া গেলেন, চারুও গেল বটে, এখনো পিসিমা আর ছোট কাকা ছিলেন, সুশীল ছোকরাটি ছিল, আমাদের রাঁধুনি হিমাংশুর মা ছিল—

ইহাদের লইয়া দিন চলিতেছিল মন্দ না।

মা চলিয়া যাবার পর হইতে রান্নাবান্নায় অবিশ্যি খানিকটা অসুবিধা হইয়াছিল—হিমাংশুর মা রাধিতে গিয়া একদম মশলা এড়াইয়া চলিত; বাটনা বাটিতে গেলেও তাহার মাজায় রস আসে। কাজেই জলের মত তরকারি ঝোলের দিকে তাকাইয়া কত কী কথা ভাবিতাম, মার কথা মনে হইত, চারুর কথা, তোমার কথা—

ভাবিতাম অনুপমা আমার বধূ; সে যদি এখানে থাকিত তাহা হইলে এই জিনিস কি আর হইত? ভাল করিয়া স্বামীকে রাঁধিয়া খাওয়াইবার জন্য যে তোমাদের জীবন সে কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু হিমাংশুর মার হাতে তৈরি ডাল তরকারি ও কাদা ভাতের নমুনা যদি তুমি দেখিতে, দেখিতে যদি যে সব কিছুতেই লবণ ও কাঁচা লঙ্কা ঘষিয়া খাইতে হইতেছে তাহা হইলে দূর হইতে সহানুভূতি বোধ করিতে নিশ্চয়। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সুব্যবস্থার জন্যই নয়, তোমার মনে সমবেদনা জাগাইবার জন্যই এক-একবার ইচ্ছা হইত তোমাকে এখানে আসিতে বলি, মনে হইত, অনুপমা আসিয়া দেখিয়া যাক, একদিন পোড়া ভাত ও একদিন ভাতের লপসি ও আঁশটে কাঁচা ট্যাংরা মাছের ঝোল দিয়া, কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছি আমরা'। কিন্তু তবুও তোমাকে, মাকে, চারুকে কিছু লিখিলাম না আর। তোমাদের সহানুভূতির মমতা লইয়া খেলা করিবার এই যে সাধ, এই যে নমনীয়প্রবণ হৃদয়, ইহার বহির্মুখিনতার কথা ভাবিয়া বড় লজ্জিত হইলাম। নমনীয়প্রবণ মন যেন হাটে-বাজারে উথলাইয়া উঠিয়া বন্যার ঝলসানি না আনে, যেন অন্ধকার শিরার ভিতর ঢুকিয়া, নিভৃত উপশিরায় লুকাইয়া, জীবনকে সজীব রাখে সবুজ রাখে—শান্তি দান করে যেন, গর্ভার শান্তি পায়।

শুনিয়া তুমি হয় তো ঠোঁট কুঁচকাইতেছ—ভাবিতেছ, সামান্য খাওয়া-দাওয়া লইয়াই এত কথা ফাঁদিয়া বসিলাম। মার হাতের মোলায়েম রান্না খাওয়ার চিরদিনের অভ্যাস; বিবাহের আগের দিন পর্যন্তও মা কাছে বসিয়া বাতাস দিয়া সাধিয়া-সাধিয়া খাওয়াইতেন। তার পর ভাবিলেন, তুমি আসিয়াছ তাই সরিয়া পড়িলেন। সহসা তোমাদের...হান নিস্তব্ধ বাড়ির ভিতর হিমাংশুর মাকে আবিষ্কার করিয়া আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। অবিশ্যি কয়েক দিনের জন্য মাত্র। এখন স্বাভাবিক চোখ ফিরিয়া পাইয়াছি হিমাংশুর মা যা খাইতে দেয়, তাহা পাইয়াই পরিতৃপ্তি। আমার এ নবীন তৃপ্তির কথা শুনিয়া তুমিও যে বেদনা পাইবে না, খুশিই হইবে, সেই জন্যেই এত কথা তোমাকে লিখিলাম। কথার পর কথা তোমাকে জানাইয়া সুখ আছে খুব; জানি মমতা ও অশ্রুর আড়ম্বর লইয়া তুমি আমাকে আক্রমণ করিতে আসিবে না। পিসিমার আলাদা চাকর। চাকরটি রাঁধিতে পারে বেশ। ভিন্ন চুলায়, ভিন্ন উপকরণে নিজের চাকর দিয়া রান্না তৈয়ার করাইয়া খান তিনি; আমরা কী খাই, না-খাই সে সব দেখিবার জন্য বড় একটা ঘেঁষেন না। শুনিয়াছি পিসেমশায় খানিকটা টাকা রাখিয়া গিয়াছেন; এই পরিমার্জিতা বিলাসিনী বিধবার দিন গুজরান হইবে মন্দ না। এক-এক সময় মনে হয়, বিলাসিতা তিনি কোথাও গিয়া করিলে পারিতেন; এই যে অষ্টপ্রহর আমাদের চোখের সামনে...' তার পর যখন আজ মাংস, পেঁয়াজ, হালুয়া, লুচির গন্ধ—কিন্তু হৃদয়কে অন্তর্মুখিন করিতে পারিলে ক্ষুধিত অন্তরের মাংস ও লুচির গন্ধে বিভ্রম জাগে না।

জীবনকে আমি অন্তর্মুখী করিবার একটা গভীর প্রয়াস পাইতেছি। দুপুর-বেলা ময়ূরাক্ষীর জল দেখিয়াছ? অশ্বত্থের ছায়ায় কেমন ছটা করিয়া পদ্মের নাল জড়াইয়া ঘুমাইয়া আছে—জীবনকে তেমনি স্থির ও শান্ত করিতে চাই। সময় কাটিতেছিল মন্দ না—

পিসিমার সমারোহের দিকে তাকাইবার কোনো প্রয়োজন বোধ করিতাম না। পিসিমারও একটি বিশেষ গুণ আছে, যখন এ বাড়িতে লোকজন তেমন থাকে না, গল্প-গুজব জমাইবার সুবিধা নাই, তখন তিনি আমাদের নির্বিবাদ জীবনের কোনো কাজে আমাদিগকে বাধা দিতে আসেন না, নিজের মনের ভাবে নিজে থাকেন। আমাদিগকেও থাকিতে দেন।

সমস্ত সকালবেলা আমি আমার কোঠায় বসিয়া থাকিতাম, পড়িতেই চাই, কিন্তু কী বই যে পড়িব ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতাম না। সাধক বৈষ্ণবদের পুঁথি, রসাত্মক কবি বৈষ্ণবদের বই, বাবার ভাল

লাগে—যে-কোনো খববেব কাগজ—ইংবেজি-বাংলা, কি কোনো উপন্যাস পড়িবাব স্পৃহাও, তাহাব কম নয়—একটি বই অনেকবাব পড়িবাব মত বিবাট ক্ষমা ও মাধুর্য তাহাব হৃদযেব ভিতবে আছে। এ সব সম্বল আমাব কিছুই নাই। যা চাই সে বকম বইযেব অভাবে খববেব কাগজই আমাকে পড়িতে হইত—সমস্ত সকাল চুরুট জ্বালাইযা, জানালাব কাছে চেযাবটা টানিযা লইযা, একবাব আমি আমেব ডালপালাব ভিতব হলুদ বৌ-কথা-কও পাখিটিব দিকে তাকাইযা দেখিতাম—বহু ক্ষণ অন্য-মনস্কতাব পব বাইনে নাজিদেব কাণ্ডকাবখানা, হিটলাবেব বিচিত্রতা, মস্কো ট্রাযাল, লুযাংসিব কাছে জাপানিদেব অমানুষিক যুদ্ধ—এই সব দূবদূবান্ত, দিগন্তেব এবং নিকটেব ঘবেব নানা বকম চিত্তাকর্ষক সংবাদ ও অসংলগ্ন মন্তব্য লইযা সমস্ত সকালবেলাটা জমিযা উঠিত মন্দ না।

সমস্ত দুপুব চোগাচাপকান পবিযা বাব লাইব্রেবি ও অশ্বত্থতলায কাটাইযা দেই। বাব লাইব্রেবিতে কম—অশ্বত্থতলায বেশি। মস্ত বড় অশ্বত্থগাছটাব নীচে শান-বাঁধানো কযেকটা বসিবাব জাযগা আছে; কযেকখানা টিনেব চেযাবও আছে। বাব লাইব্রেবিতে বসিযা-বসিযা যখন কিছুতেই শিকাব মেলে না আব—উকিলদেব কাহাকেও শিযাল, কাহাকেও শকুন, কাহাকেও দাঁড়-কাক বলিযা মনে হয, জীর্ণশীর্ণ উকিলেব গাউনে নিজেকে কোনো এক বিগত পৃথিবীব কিম্ভূতকিমাকাব জীব বলিযা বোধ হয, চাবিদিককাব আবহাওযা অসম্ভব ও অপ্রাসঙ্গিক হইযা ওঠে, তখন লইব্রেবিব থেকে হাত-পঞ্চাশেক দূবে অশ্বত্থ গাছটাব দিকে চলিযা যাই, কোনো দিন বগলে একটা পেনাল কোড থাকে, প্রাযই কিছু থাকে না সঙ্গে, চাপকান খুলিযা ফেলিতে ইচ্ছা কবে, চাবিদিক হইতে বাতাস ঘনাইযা উঠিযা উড়াইযা লইযা যাইতে চায আমাকে, পাশেব একটা পুকুবেব কিনাবে ঝোপজঙ্গলেব ভিতব হইতে ডাহুকেব শব্দ আসে, সবচেযে উঁচু নাবিকেল গাছগুলোব মাথায দু-একটা বাজ পাখি আসিযা পড়ে—সাদা পেট, সাদা গলা, গলাব বং খযেব-গলা জলেল মত—বেশ লাগে দেখিতে; দুপুবেব চিকচিকে নাবিকেল পাতাব ভিতব বোদ মাথায কবিযা অপবিসীম নীল আকাশেব নীচে কাহাকে যে ডাকিতে থাকে তাহাবা। চাবিদিককাব জীবনমৃত্যুব স্রোতেব ভিতব, বহস্যবেদনাহত প্রেমিক পবমাত্মাকে ইহাবা যেন নতুন কবিযা দুঃখেব, বিবহেব, করুণ কাতবতাব, পুলকেব সঙ্গীত শুনাইতে চায। আমিও শিহবিযা উঠি। অনেক ক্ষণ বসিযা থাকি টিনেব চেযাবে—হাতেব চুরুট নিভিযা যায—বাতাসে শিমুল, কৃষ্ণচূড়া ও নিম-সজিনাব গুঁড়ি-গুঁড়ি হলুদ পাতা ঝবিযা পড়ে, বিন্ধ্য-চিত্রকূটেব মত বিবাট এক-এক খন্ড সাদা মেঘ আকাশেব এক প্রান্ত হইতে আব-এক প্রান্তে সবিযা যায।

কেন যেন দণ্ডকবনেব কথা মনে হয, অশোকবনে সীতাব কথা' কেন যেন নাবীকে অশোকেব মত বক্তিম ও সুন্দব বলিযা মনে হয—কোনো এক নাবীকে যেন; যেন কোন সুদূব সুবর্ণবেখাব তীবে, কমলা বঙেব মেঘেব সন্ধ্যায, যেন কোনো বেবাব তীবে বাবীব বালুকায, ত্রিস্রোতাব পাবে, আবাব ঝিলমেব কিনাবে ভাবতেব দেবীপীঠগুলোকে দেখিযা আসিতে ইচ্ছা-কবে—পাযে হাটিযা কড়িব মত সাদা ধুলা গাযে মাখিযা, দেবীতীর্থেব থেকে দেবী তীর্থে ঘুবিযা বেড়াইবাব জন্য প্রাণ বিকালেব বৌদ্রে পল্লিব চিলেব মত কাঁদিযা মবে।

নীল আকাশ বাহিব হইযা পড়ে আবাব। মনে হয জীবনে যত সুব সাধিতে চাহিযাছিলাম সব যেন জড়ো হইযা বুকেব মধ্যে তাহাদেব আত্মবিহ্বল আবেদন জানাইতেছে, এত বড়....একসঙ্গে বহন কবিতে পাবি না আমি, কাজেই মাটিব দিকে তাকাই, ছেঁড়া প্যান্টেব দিকে নজব পড়ে, পোড়া চুরুট জ্বালাইযা লই—এই পৃথিবীতে ফিবিযা আসি আবাব। পকেটেব থেকে বাহিব কবিযা, ভাঁজ কবা খববেব কাগজেব দু-একটা শিট উল্টাই, গালেব খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাই। ফৌজদাবি আদালতটাব লাল ইটেব দেযালগুলোব দিকে তাকাইযা, নিঃশব্দে গোঁফ চুমবাইতে থাকি। খানিকটা দূবে ঝাল-চানা-ওযালা বসিযা-বসিযা ঝিমায, কিন্তু পযসা খবচ কবতে যাই না আব। বেশ গবম, চাবিদিকে পানিতাল-ডাব-তবমুজ ও পানিফলেব অনেকগুলো হুদ্দা, অসংখ্য লোক দব কষাকষি কবিতেছে, কিনিযা খাইতেছে। ছেলেবেলা বাবা এখানে আমাকে অনেক সময বেড়াইতে লইযা আসিতেন—গোলাপজাম ও পানিফল কিনিযা দিতেন—এখন কিনিযা খাইবাব দবকাব নাই আব, ছেলে-মানুষ নই তো আমি। ঢেব বড় হইযা গিযাছি। চাবিদিকাব খাওযা-দাওযাব ব্যাপাবেব থেকে চোখ সবাইযা, গবম, বাতাস মাখা দূবেব প্রান্তবেব দিকে ফিবিযা তাকাই—অনেকখানি নিস্তব্ধতাব ভিতব কযেকটা শকুন বসিযা আছে দেখি। মনে হয সমস্ত দুপুব এই প্রান্তব ও শকুনটাব দিকে তাকাইযা কাটাইতে পাবা যায' জীবনেব সমস্ত প্রেম, বিব-, বেদনা ও স্বপ্ন দুপুবেব বৌদ্রে শকুনচবা তেপান্তবেব দিকে তাকাইযা যেন অভূতপূর্ব নবজীবন পায—কী যে হয ভাষায আমি কাহাকেও বুঝাইযা বলিতে পাবি না—কিন্তু মনে হয, উহাদেব দিকে তাকাইযা জীবনেব শেষ দিন পর্যন্ত অভিভূত হইযা বসিযা থাকিতে পাবি, চাবিদিকে লেমনেড সোডা ভাঙাব শব্দ,

চীনেবাদামের খোসা, বাদামি গন্ধ, মজা তরমুজের আঘ্রাণ, একজন মুসলমান ফকিরের পিছনে-পিছনে একটা তিতির পাখি চিৎকার করিয়া দৌড়াইতেছে, কাঠঠোকরা ধাঁ করিয়া উড়িয়া আসিয়া নারিকেল গাছের গায়ে ছাতকুড়ার উপর বসিল, সিভিল কোর্টের বারান্দায় চড়াই লাফাইয়া বেড়ায়, অশ্বত্থের ডালপালায় বৌ-কথা-কও, পাপিয়া, মাছরাঙা, দাঁড়কাক, ফিঙ্গার সমাবেশ ভারী সুন্দর। কত শুকসাবীর দলকে ফেলিয়া যাব আমি—তিনশ বছর আগের পুরনো কথা—ও নীলকণিকার দেশ বৃক্ষেব ভিতর জাগিয়া ওঠে। যে দিকে তাকাই, হৃদযকে নরম করিয়া রাখিবার জন্য জগতে অনেক জিনিসই তো ছিল।

সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া ক্ষুধা পাইত বটে; ইহাব ব্যবস্থাও ছিল মন্দ না। হিমাংশুর মা আমাদের জন্য সুজি তৈরি করিয়া রাখিত; প্রায়ই চিনি কম হইত, কোনোদিন ঘি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, এক দিনও কিসমিস দিত না। হিমাংশুর মা সুজিই বা কেন রাঁধে যে রোজ, বুঝিতে পাবিতমান না। হাত গড়া রুটি তৈরি করিয়া রাখিলে হয় না? লাল আটার রুটি আর খানিকটা তরকাবি—বেশ জিনিস। এক-আধ দিন লুচি করিলেও তো হয; কিন্তু হিমাংশুর মাকে আমিই বা কী বলিব? নিজেব বিধান সে নিজেই। সে মনে করে মা ও চারু চলিয়া যাইবার পব এই সংসাবে সেই একমাত্র নারী। কথাটা মিথ্যা নয। আমবা পুরুষ, চুপ করিয়া থাকি তাই। সে চলিয়া গেলে এই সংসারটা হয তো একেবাবে লক্ষ্মীছাড়া হইযা পড়িবে। কাজেই তাহাব নারী-ধর্মে যাহা ভাল বোঝে তাহাকে তাহাই করিতে দেই। শেষ পর্যন্ত বুঝি যে নারী সে খুবই—তাহার একমাত্র অভাব এই যে, সে আনাড়ি। ইহা ক্ষমা কবিযা লওয়া যায। যতই খাবাপ জিনিস কুশ্রী কবিযা বাঁধুক না সে, খুব নিষ্ঠার সঙ্গে আসন পাতে, ভালবাসিযা পরিবেশন করে, নিজেকে বঞ্চিত কবিযাও আমাদের খাওযাইতে চায় সে; আমাদেব সুখ-সুবিধা খুঁজিযা বেড়ায; তাহার হৃদযের পবিসব দেখিযা অবাক হইযা থাকি।

পিসিমা এক-আধদিন লুচি, পটলভাজা পাঠাইযা দেন, কিংবা পাউরুটি টোস্ট, অমলেট—

যে-ডিশে এ সব খাবাব আসে তাহাও খুব সুন্দর; খুব সতর্ককতাব সঙ্গে ব্যবহার করি। ভয হয পাছে ভাঙিযা যায। ক্বচিৎ তিনি নিজেব হাতেই খাবার সাজাইযা লইযা আসেন। বলেন, তোমাদেব রেকাবিতে সাজাইযা লও। তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন, সাজাইযা লই, তাহাব ডিশ ফেবত দেই—তিনি চলিযা যান, খাইতে শুরু কবি, ভাল লাগে বটে, কিন্তু কেমন একটা আচ্ছন্নতা বোধ করি যেন—

কাছাবিব থেকে সন্ধ্যার সময ঢলঢল করিযা ফিবিযা আসিযা নিজেব ঘবে চুপ-চাপ বসিযা খাইতেছি। সমস্ত ঘবে ইন্দুর খচমচ কবিযা ঘুবিযা বেড়ায, জানলাব ভিতব দিযা চামচিকা সাঁ করিযা ঢুকিযা ঘরের ভিতব পাক খাইতে থাকে, একটা তেলাপোড়া উড়িয়া আসিযা খাবাবের থালাব উপব পড়ে, হয তো হিমাংশুব মাই নোংবা বিধবাব কাপড়, জর্জরিত জীবনেব জীর্ণশীর্ণ ও এক রাশ ছোট-ছোট পাকা চুলের সাদা মাথা লইযা দবজাব কাছে দাঁড়াইযা আমাব খাওযা দেখিতেছে, কেমন যেন লাগে, আমি থালা সবাইযা ধীবে-ধীবে বাহিব হইযা যাই।

অন্ধকাবে মাঠের পথে হাঁটিতে-হাঁটিতে মনে হয, আমি এই বংশেব শেষ পুরুষ—আমাব কোনো সন্তান হইল না। আচ্ছা, নাই-বা হইল, কিন্তু মনে হয অশবীবী পিতৃপুরুষেবা আমাব চাবিদকি ঘিবিযা দাঁড়াইযাছেন, বলিতেছেন—'প্রেম, বিচ্ছেদ, বেদনা ও কাতবতা এ সব তো আমাদেব অজানা জিনিস নয; কিন্তু তুমি ইহাদেব যে রূপ দিযাছ তাহা তো আমাদেব বক্তেব স্রোতে কোনো দিন ছিল না। বিধাতা প্রথম যেদিন মানুষ সৃষ্টি করিযাছিলেন সেই হইতে আজ পর্যন্ত, গৌরবে ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে সাংসাবিকতায আমাদেব বংশ বক্ষা কবিযা আসিতে পাবিযাছি। কিন্তু তুমি, সে সব মুছিযা দিতে চলিলে দেখিতেছি। যাও, ঘরে ফেরো, প্রাচীনদেব জীবন-প্রণালীব নিযম আযত্ত কবিতে শেখো, এক-একটা বটগাছ যেমন অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে, অনেক সন্তান-সন্ততি বিলাইযা যায, পৃথিবীব রৌদ্র, অন্ধকাব, কুযাশা, বৃষ্টি, হিমেব ভিতর হইতে বিচ্ছেদ ও অন্যতম অকৃতকার্যতা খুঁজিয়া পায না, পায আত্মবঞ্চনাহীন পবিতৃপ্ত পবিস্ফূর্ত জীবনের সবসতা ও কলবব, তুমিও তাহাই পাইবে—তুমিও তাহাই পাইবে—'

. অন্ধকার জমিযা ওঠে—এই ছাযার দলকে আমি উড়াইযা দেই। মাঠের পথে দূরে, আবো দূবে, হাঁটিতে-হাঁটিতে মুখোমুখি অর্জুনের সঙ্গে দেখা হইযা যায। বলি—কোথায ছিলি বে? এ চার-পাঁচ দিন কাজ করতে আসিস নি যে!

ছেলেটি কোনো জবাব দেয না—বাপ নাই, মা নাই, কেউ নাই, কিছু নাই, কৃষ্ণপক্ষেব অন্ধকাবের ভিতব গ্রাম-বাড়িব ফাঁকে সেও কোথায মিলাইযা যায়। যাক। কেহই থাকিবে না। অশবীবী পিতৃপুরুষেরা যোগের সৌন্দর্য অনুভব করিযাছিলেন, কিন্তু বিযোগের শূন্যতা ও মাধুর্য যে কত দূর তাহা তাহারা বুঝিতে পাবিতেন, পল্লবিত বটগাছেব দিকে না চাহিযা, একটা দীর্ঘ অগ্নিশিখা আকৃতির ঠুঁটো মঠেব দিকে নক্ষত্রমাখা নিবিড় রাতে যদি একবার তাকাইযা দেখিতেন।

মৃত্যুর গন্ধ

স্টিমার স্টেশন জেটির ভিতর গুদামের এক কিনারে একটা চটের বস্তার উপব হেমন্ত গিয়া বসিল।

গুদামবাবু চশমার ভিতর দিয়া আড়চোখে তাহার দিকে একবার তাকাইলেন, তারপবে বিড়ি মুখে দিয়া নিজের কাজ ব্যস্ত রইলেন।

বৈশাখেব সন্ধ্যা, অসহ্য গরম, কিছুক্ষণ আগে খানিকটা মেঘ করিয়া গুমোট হইয়া গরম যেন আবো ঢের বাড়িয়া গিয়াছে।

মেঘ তো করিয়াছিল, সমাবোহও কম হয় নাই; কিন্তু আকাশ কালো [...] লোমের মতো মেঘে গেল ভরিযা, বিদ্যুৎ ঢের চমকাইল, মেঘের ডাকে ডাকে আকাশ-পৃথিবী ছাইযা গেল। দু-একবাব একটু ঝড়ের মতনও উঠিয়াছিল। নদীর জলেব উপর দিযা কোনো ডাইনীব তিরিক্ষে ঝাঁটা যেন ঘুরিযা গেল। শো-শো—, শা-শা—তারপবেই সব চুপ। মেঘও কাটিযা গিযাছে, নক্ষত্রগুলো বাহিব হইযা পড়িযাছে, তাকাইলেই বেশ স্পষ্ট দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দিকে কালপুরুষের তাবাগুলো সাজসজ্জা, তাহার আর একটু উপরেই ছায়াপথ।

গরম আরো বাড়িযা উঠিল। জেটিব কবোগেট টিনের বেড়া। স্টিলেব ছাদ সমস্ত দিন ভবিযা রহিয়াছে, অন্ধকাবে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির কবিতেছে যেন। চারদিকে কেমন শুঁটকি মাছের গন্ধ, পাটের বস্তার ঘ্রাণ, মাঘের নদীর জল ছুঁইযা একটা ঝিবঝির ঠাণ্ডা হাওযা উঠিতে না উঠিতেই ফুবাইযা যায। মুখে চোখে কপালে সান সান করিয়া নিববচ্ছিন্ন ঘাম ঝরিয়া পড়ে।

স্টিমারটা সন্ধ্যার সময আসিযা পৌছিবাব কথা ছিল। দেখিতে দেখিতে বাত অনেক হইযা গেল, তবুও স্টিমাবেব দেখা নাই। কতদিক হইতে কত স্টিমাব তো আসিযা গেল, গুদামেব একপাশে জেটিব দরজার কাছে যেখানে সে বসিযাছিল কতবার তো সিঁড়ি ফেলা হইল, সিঁড়ি গুটাইযা নেওযা হইল। দিকদিগন্তের হইতে বাজ্যেব লোক আসিল, চলিযা গেল, ঘণ্টা বাজিল, ঘণ্টা থামিল, ঝকঝক কবিযা কত স্টিমার আসিযা নোঙব করিল, নোঙব খুলিযা চোঙেব আওযাজ বাজাইযা লাল নীল বাতি জ্বালাইযা দূর-দূবান্তের নদী ডিঙাইযা চলিযা গেল।

কিন্তু তবুও সন্ধ্যাব সময যে স্টিমাবটি আসিবাব কথা বাত বাবোটাব সমযও তাব দেখা নাই।

মশার কামড় খাইতে খাইতে হেমন্ত একটা চুরুট জ্বালাইযা লইল, পকেটের থেকে পোস্টকার্ডখানা বাহিব কবিয়া পার্সেলবাবু টেবিলেব পাশে একটা ধুমশো হ্যাবিকেনেব কাছে গিযা আব একবাব পড়িযা দেখিল।

মহেশবাবু লিখিযাছেন—'শুক্রবার দিন সন্ধ্যাব সময আমি গিযা পৌছিব। তুমি অবিশ্যি অবিশ্যি স্টেশনে থাকিও, বযসেব গতিকে চোখে আজকাল কিছুই দেখিতে পাই না, তুমি স্টিমাব ঘাটে না থাকিলে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে।'

চুরুটে এক টান দিযা আবাব ভাবিতে লাগিল, মহেশবাবু তো আসিবেন, কিন্তু নীলিমাও কি আসিবে?

কি জানি, এই চিঠিখানাব চাব-পাঁচ লাইনের ভিতর হইতে ব্যাপারটা কিছুই বুঝিযা উঠিতে পাবা যায না।

চিঠিতে মহেশবাবু একটু বিশেষভাবে সমস্ত খুলিযাই লিখিলেই পারিতেন। মহেশবাবুর সঙ্গে অবিশ্যি হেমন্তর কোনো আত্মীযতা সম্বন্ধ নাই, কিন্তু পবিচয আছে ঢেব। হেমন্তব শ্বশুববাড়ির সংসাবেব সঙ্গে মহেশবাবুদেব ঘনিষ্ঠ মেলামেশা খুব গভীব। কে জানে হযতো নীলিমাকে তিনি সঙ্গে লইযাই আসিতেছেন। না হইলে একা একা এ সময়ে এক দেশ ছাড়িয়া আর এদেশে আসিবাব কি দরকার তার? এখানে তাহার কাজ কিছু নাই। পথটাও তো কম দীর্ঘ নয, পুরোপুরি একদিন এবং এক রাত লাগে।

বধূও অদ্ভুত মানুষ, ছ-মাস বাপের বাড়ি গিযাছে, ছ-খানা চিঠি লিখিযাছে কিনা সন্দেহ। চিঠিব বাড়াবাড়ি অবিশ্যি হেমন্ত চায না, মানুষের হৃদয়ের আগ্রহটুকু হইলেই তাহার চলে, নীরবতাকে সে খুব নিঃসংকোচে ক্ষমা করিযা লইতে পারে। কিন্তু গত ছ-মাস হইতে হৃদয়েব এ ব্যাপারেও কেমন যেন সে গাফিলতি দেখা যাইতেছে নীলিমাব, আন্তরিকতায কি যেন কেমন ভাঁটাব টান আসিযা পড়িযাছে।

শ্বশুরবাড়ি সে কি আর আসিতে চায় না?

প্রায় ছ-বছর হইল বিবাহ হইয়াছে তাহাদের। বিবাহের পরের বছরেই একটি মেয়ে হইল তারপর আর হয় নাই, হেমন্তর ইচ্ছা বধূরও। সন্তান বলিতে একটি মেয়েই যেন তাহাদের আগামী সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটাকে পূর্ণ করিয়া রাখে, অতিরিক্ত কোনো সন্ততির দরকার নাই আর। এক মেয়েতেই নীলিমার শরীর যেমন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল সে শরীর আজও ভালো করিয়া জোড়া লাগিল না। যতদূর মনে হয় এ শরীর তার জোড়া লাগিবারও আর নয়। নীলিমাকে খুব তাকেবাকে রাখতে হয়ই, সামান্য অনিয়ম তাহার সহ্য হয় না। তিরিশ দিন ওষুধ না খাইলে চলে না তার। অসচ্ছল সংসারে সাধারণত যেরকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তাহাতে তাহার শরীর ক্ষয় পায়। অথচ হেমন্তদের মস্তবড় সংসারের অসংগতি নিদারুণ। বিবাহের পর হেমন্তর কোনো চাকরিও ছিল না, তারপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে তিনমাসের জন্য একটা কাজ পাইয়াছিল, সে কাজ খতম হইবার পর এখানকার একটা হাইস্কুলে মাস্টারির কাজ জুটিয়াছিল, কিন্তু চার-পাঁচ মাস হইল সে কাজ খোয়া গিয়াছে। ইস্কুলটা চলে না, ইস্কুলবাড়িতে এখন শনি-মঙ্গলবার হাট বসে।

হেমন্তদের এই মস্তবড় একান্নবর্তী পরিবারটাকে যাহারা চালায় তাহারা তাহাদের নিজের নিয়মে চালাইয়া নয়। নীলিমাকে তাহারা বিবি সাব্যস্ত করিয়াছে, এ বধূকে দিয়া সংসারের কাজ বিশেষ কিছু হয় না, এমনই অদ্ভুত যে সন্তান যখন হইল তখনো তাহার দুধ হইল না, মেয়েটির জন্য ফিডিং বোতল কিনিতে হইল, কত রকম ফুড [...] দরকার হইল। এ অনটনের সংসারে কেমন করিয়া এতসব অনিয়ম চলে?

নীলিমার নিজের জন্যও তো ডাক্তার বাঁধা, ডাক্তার অবিশ্যি এমন বিশেষ কেউ নয়, একজন বুড়োমানুষ, হোমিওপ্যাথ, ভিজিটের পয়সা লাগে না, ওষুধের দামও সবসময় দেওয়া হয় না তাকে। কিন্তু তবুও বাড়ির বধূর জন্য উঠিতে-বসিতে এই যে ডাক্তারের দরকার ইহা এ সংসারে কাহারই পছন্দ হয় না।। বাস্তবিক, হইবেই-বা কেন, মাঝে-মাঝে হেমন্ত নিজেও কী বড় অবসন্ন বোধ করে।

ডাক্তারটিও একটু মজার। নিজের বিদ্যা তার বিশেষ নাই। কিন্তু আন্তরিকতা খুব। হোমিওপ্যাথ ওষুধ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না, টনিক চাই, সমস্ত সকাল রোদে বেড়ানো দরকার, রান্নাবান্না যেন কিছুই না করে, সংসারের কোনো ভারই ইহার উপর দিও না তোমরা। গাড়ি করিয়া বিকালবেলা একটু নদীর পাড়ে বেড়াইতে লইয়া যাইও, ভালো খাওয়া, ভালো ঘুম এবং মনের শান্তি বড় দরকার। এইরকম সব ব্যাপার।

হেমন্তর কাকা-কাকিমা-বউদিদিদের ভিতর এইসব লইয়া সবসময়ই একটা বিমুখ বিরস কথার স্রোত। তাই-ই তো হইবে, খুবই তো স্বাভাবিক তাহা, একটা দরিদ্র বিরাট বিশৃঙ্খল সংসারের বোঝা বড় ভয়াবহ জিনিস, দিন রাত এইসব সংগ্রামের ভিতর যাহাদিগকে থাকিতে হয় যত আজগুবি বিচিত্র চিন্তা ও কল্পনা করিবার না থাকে তাহাদের রুচি, না থাকে ক্ষমতা। জীবনের রস মজিয়া শুকাইয়া জীবনধারণে মাত্র গিয়া দাঁড়ায়।

হেমন্ত নিজে যতদিন চাকরি করিয়াছে দরকার হইলেই ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছে, সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার নীলাম্বরবাবুকে। লজ্জার মাথা খাইয়া নীলিমার জন্য আধসের করিয়া দুধ রাখিয়াছে রোজ। নিঃসম্বল নিষ্করুণ সংযুক্ত পরিবারের নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া রুগির খাতিরে আরো দু-তিনটা জিনিস করিয়া দিতে হইয়াছে তাকে, বেদানা কিনিয়া দিয়াছে, মাঝে-মাঝে কমলালেবু আনিয়াছে, বাজারে কমলার যখন খুব চড়া দর তখন তাহা আনিত, দেখিয়া এই সংসারের চক্ষুস্থির হইয়াছে অনেকের। তারপর একসময় ওপর ওপর তিনমাসের মধ্যেই সে ছটা বিলেতি টনিক কিনিয়া দিয়াছিল নীলিমাকে।

টনিক নীলিমা খায় নাই, আজও তাহা হেমন্তর খাটের নীচে পচিতেছে। টনিকের ভিতর ছিটেফোটা মদ যে রহিয়াছে সেজন্য বধূর যে আপত্তি ছিল না তাহা নয়। নীলিমা লেখাপড়া জানা মেয়ে যতদিন তাহার বাবা-মা বাঁচিয়াছিলেন, বাপের বাড়ির অবস্থাও তাহার মন্দ ছিল না। এরকম জিনিস সেখানে অহরহ খাওয়া চলিত একদিন। কেউ চোখ কপালেও তুলিত না। গায়ে পড়িয়া কোনো অবাঞ্ছিত মন্তব্য জানাইবার জন্যও হাজির হইত না। কিন্তু এখানে যেন অন্যরকম। যে যার গ্লাসে সে যদি ওষুধ ঢালিয়া খায়, পাঁচজনে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, নানারকম বিচিত্র কথা বলে।

টনিক নীলিমা খাইল না আর। প্রথম বোতলটা পচিয়া গেলে হেমন্ত আর একটা বোতল আনিয়া দিয়াছিল, অভয় মিশ্রের ইস্কুলে মাস্টারি ছিল তখন তার। মাসে পঞ্চাশ টাকা পাইত। কিন্তু নীলিমা সেই বোতলটাও পচাইল। সে এত উদাসীন হইয়া পড়িল যে হোমিওপ্যাথ ওষুধগুলিও খাইতে চাহিল না। সকালবেলা উঠানের রোদে নীলিমাকে হেমন্ত কতদিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে বলিয়াছে, কিন্তু বলিয়াই মনে মনে নিজেই ভাবিয়াছে, আবার থাক, বেড়ায় না যেন এ সংসারের লোকজন ভাবিবে কি? বধূকে অবিশ্যি

মুখ ফুটিয়া এসব ভিতবেব কথা কখনো বলিতে যায নাই সে। কিন্তু নীলিমা নিজেব থেকেই বেড়ায নাই, একদিনেব জন্যও না।

বান্নাঘবে বা সংসাবেব কাজেব দিকেও বড় বেশি সে যায নাই, চুপচাপ খাটেব উপব বসিয়া জানালাব ভিতব দিযা আকাশটাব দিকে চাহিয়া থাকিত, যেন মানুষেব প্রাণপাখিব মতো, যেন এই জীবন পিঞ্জবেব মতো একটি, যেন ওই সবুজ আমকুঞ্জেব ভিতব হলুদ পাখি, হিজলেব ডালপালায ফিঙা, আকাশেব বৌদ্রে মাছবাঙা এইসবেব মতনই হওয়া উচিত ছিল।

হেমন্ত তাহাব দিকে তাকাইযা দেখিত। সেই দুধে-আলতাব বং ঝবিযা গিযা কেমন একটা অস্বাভাবিক চামড়া যেন বাহিব হইযা পড়িযাছে। মনে হয যেন নীলিমাব ন্যাবা হইযাছে, কিংবা শ্বেতী, হাঁসেব গলাব নলিব মতো সমস্ত ধড়টা, হাত, পা, পথেব শাপলাব নলেব মতো যেন- লক লকে কবে শাদা শাড়িব মতো মুখ ভোবেব আলোয যেন প্রেতিনীব মতো বসিয়া আছে, বধূ যেন এই পৃথিবীব লোক নয আব। দেখিযা দেখিযা কত কথাই মনে হইত। প্রতেকটি কথাই বেদনা অবসাদ ও স্বপ্ন অবসানেব। যেন জীবনেব চাবিদিক ঘিবিযা শূন্যতা হাহাকাব কবিযা ওঠে। না, কিছুই থাকে না যেন আব, দিনবাত্রিব ফাঁকেব ভিতব দিযা মিথ্যা লইযা ফুবাইযা যায। এইবকম।

হেমন্ত বলিত—'আজ সকালে কি হল আবাব তোমাব?'

—'কিছু না।'

দুইটি মাত্র শব্দ, কিন্তু ইহাব ভিতবেই সমস্তই জবাব পাওযা যায। নীলিমাব হৃদযেব ভিতব দিযা শব্দ দুটি ধ্বনিত হইল বোঝা যায তাহা কতদূব ফোঁপবা হইযা গিযাছে।

হেমন্ত বলিত—'ওষুধ এক দাগ খাও।'

—'থাক।'

—'টনিকও তো খেলে না।'

—'দবকাব নেই।'

—'এবকম উপেক্ষা কবলে চলবে কি কবে?'

—'আমাব তো বেশ চলে যাচ্ছে।'

—'কিন্তু একটা কথা তোমাব বোঝা উচিত।'

বধূকে এই কথাই হেমন্ত বুঝাইতে চেষ্টা কবিত যে স্বামী হিসাবে সে কিছু প্রত্যাশা কবে। ঘব যদি সে না বাঁধিত তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু ঘব যখন সে বাঁধিযাছে তখন সে চায বীতিমতো সুন্দব সুস্থ দাম্পত্য জীবন চালাইতে, সে চায স্ত্রী বোগমুক্ত হউক, স্বাস্থ্য ফিবিযা আসুক তাব, দবিদ্র হিন্দুঘবেব স্বাভাবিক নাবীব মতো হউক সে, দুর্দিনকে সামযিক মেঘ ও কুযাশা মনে কবিযা প্রতীক্ষা কবিযা থাকিবাব প্রসন্নতা লাভ করুক, সুদিন কি আসিবে না? তাঁহা আসিবে, কিন্তু ইতিমধ্যে নিজেব শবীব ও হৃদয নীলিমা যদি ভাঙিযা জবাজীর্ণ কবিযা ফেলে তাহা হইলে শুধু কি নিজেব অনিষ্ট কবিবে সে? তাহাকে সম্বল কবিযা সে স্বামী-সন্তানটি জীবনেব আনন্দ ও তৃপ্তি গুছাইযা লইতে চায মানুষেব জীবনেব সে সুশৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষা প্রেম ও স্বপ্নেব কোনো মূল্যই দিবে না সে, সমস্ত মানবজীবনকে সে অপমানিত কবিযা ছাড়িবে।

ইহাব ভিতব নীলিমা বলিযাছিল—'কত মেযেমানুষ তো বিধবা হয।

হেমন্ত বধূব দিকে তাকাইযা চুপ কবিযাছিল।

—'কত শিশুও তো বাপ-মা হাবিযে ফেলে, অনাথ হযে জীবন চালায।

—'তা চালায অবিশ্যি।'

—'পৃথিবীতে এবকম অনেক সহস্র কোটি নিঃসহায জীবন বযেছে। মানুষ ৩ চেষ্টা কবলেও জীবন সাজাবাব অধিকাব সব মানুষেব ভালো কবে ঘটে না। বঞ্চিতদেব সংখ্যাই ঢেব।

ঠিক কথাই ইহাব পব আব কথা চলে না।

কিন্তু সহানুভূতি বেশ ছিল মেযেটিব। চেহাবাব ভিতব মৃত্যুব গন্ধ প্রেতলোকেব অস্বাভাবিকতা আসিযা পড়িলেও বাস্তবজীবনেব উপযুক্ত হৃদযেব বিবেচনা খুব ছিল তাব।

হেমন্ত ঘবে থাকিলে জানালাব ভিতব দিযা বেশিক্ষণ চুপচাপ তাই সে তাকাইযা থাকিত না, অসাড় নীবস কথাব বোঝাও খুব সংক্ষেপে সাবিযা লইত। হেমন্তেব দিকে ফিবিযা বলিত—'তুমি এমন মুখ ভাব কবে বসে আছ যে?' মুখে হাসি জমাইযা তুলিযা লইযা বলিত।—'কি ভাবছ?'

বধূব শবীবেব কথাই ভাবিতেছিল হেমন্ত।

—'ও, আমাব শবীব, ওপব দিযে যত খাবাপ দেখায বাস্তবিক ভেতবে তত নয। দিন দিন ভালোই বোধ কবছি।'

—'তাই নাকি?'

—'মববাব যদি হত তাহলে খুকি হবাব সমযই শেষ হযে যেত, বিধাতা বাখলেন। ভালোই। আমি বেঁচে থাকতেই চেযেছিলাম।'

শুনিযা খুব ভালো লাগে হেমন্তব।

—'যখন আমি একটু গালে হাত দিযে ভাবতে থাকি, তুমি যেন কেমন মুষড়ে পড়, কেন কি ভাব বলো তো দেখি।' একটু চুপ।

নীলিমা ফিক কবিযা হাসিযা বলিল—'গালে হাত দিযে ভাবছ সব নাবীবই স্বভাব যে' কেন অমঙ্গলেব কথা ভাবতে যাব। নানাবকম সুন্দব কথা ভাবি আমি।'

হেমন্তব অতদূব বিশ্বাস হয না।

—'তোমাব বড্ড সন্দেহ। হযতো ভাব নিজেব জীবনেব সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল অশুভ চিন্তা কবছি আমি। কেন কবতে যাব? আমি কি জানি না, মানুষেব জীবনেব সম্ভাবনা কি বকম সুন্দব, শেষ পর্যন্ত জীবন কত কল্যাণে ভবে উঠতে পাবে।'

কিন্তু তবুও হেমন্তব মনে হয এসব কেন যেন সাজানো কথা, নিতান্তই বাহিবেব জিনিস, এই নাবীটিব জীবনেব ভিতবেব সত্যেব সঙ্গে হযতো মিল নাই।

—'আমাকে নিযে সেদিন তুমি পুবোপুবি সার্থক হবে, সব দিক দিযেই।' শুনিযা হেমন্তব অন্তঃকবণ কানায কানায ভবিযা ওঠে।

নীলিমা—'এই যে তুমি বলছিলে তুমি আব খুকি আমাকে অবলম্বন কবে জীবনটাকে সাজাতে চাও, সব স্বামী সব পিতা এবকম বলে না। তাবা হযতো কক্ষভ্রষ্ট হযে ব্যথা পেতে ভালোবাসে। কিন্তু [...] দবকাব আছে, তোমাব এই মুগ্ধ আত্মসমর্পণ, দেখো একদিন সুসময এলে এব কত সদ্ব্যবহাব কবি আমি।'

বড় চমৎকাব কথা তো।

—'কিন্তু তুমি যা চাও, আজ তা তো সম্ভব নয, ঘব আজ অন্ধকাব ম্রিযমান হযে থাকবে। থাকবে না?'

—'বড্ড ঠিক কথা বলেছ নীলিমা, তোমাব মতন এমন নাবী জীবনে এল আমাব অথচ আমাব অর্থেব সম্বল এত কম।'

চোখ তুলিযা হেমন্ত বলিল—'এই সংসাবে এসেই তো তোমাকে পদে পদে অভাব ও অস্বচ্ছলতা উপলব্ধি কবতে হযেছে।' বলিল 'তোমাব যা মূল্য তাতে এব চেযে ঢেব বেশি পুবস্কাব পাওযা উচিত ছিল তোমাব। বাস্তবিক তোমাব ভাগ্য বড় খাবাপ।

নীলিমা একটু হাসিযা—'এক কথা বলতে গিযে কত কথা বলে ফেললে দেখো তো দেখি, তোমাব যত মনগড়া কল্পনা। পৃথিবীতে সবচেযে সৌভাগ্যবতীকে আর্থিক হিসেবে নিরুপায দেখলে তুমি ভাগ্যহীনা বলে মনে কববে? বেশ মানুষ তো তুমি!'

ইহাব পব কাজেব কথা।

নীলিমা বলিত—'নালাম্ববাবু কি ওষুধ বদলে দিযেছেন?'

—'না, সেই পুবোনো ওষুধটাই চালাতে বলেছেন।'

—'এক দাগ খাওযা যাক।'

—'দাঁড়াও আমি দাগ কেটে দেই।'

—'দাও, বাস্তবিক আমি কেমন ফোটা পাবি না, হাত কাঁপে।'

ওষুধ খাইযা নীলিমা বলিত— বেশ জিনিস হোমিওপ্যাথ ওষুধ, এতে যদি মানুষেব অসুখ সেবে যায তাহলে তো এব গুণ ব্যাখ্যা কবে শেষ কবা যায না।'

শুনিযা হেমন্তব যেন কোথায কেমন খোচা লাগিত। বলিত—'যাই নবেনবাবুকে গিযে ডেকে আনি।'

—'নবেনবাবু কে?'

—'অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জেন।'

নীলিমা মাথা নাড়িযা—'মিছেমিছি তাকে ডেকে কি লাভ, তাব ঝাঝালো ওষুধ আমি খেতে পাবব না তো। বমি হযে যাবে।'

আসল কথা নবেনবাবুকে ভিজিট দিতে হয। তিনি আসিলে এই সংসাবেব ভিতবেও কেমন একটা

দাক্ষিণ্যহীন চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তাহার ওষুধ খাইলে শরীর হয়তো খানিকটা সারিতে পারে, কিন্তু পরিবারের চারদিকে যে অশান্তি ও অক্ষমার সৃষ্টি হয় তাহাতে মানুষের দেহ মন দুই-ই বিচূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া যায় আবার। না, নরেনবাবুকে আনা হয় নাই।

নীলিমা বলিত—'যাই সংসারের দু-একটা কাজ করি গিয়ে।'

দেখিতে দেখিতে বিরাট পরিবারের ভিতর ধীরে ধীরে ঢুকিয়া পড়িত সে, কিন্তু খানিক বাদেই দরজার কাছে চুড়ি ঝন ঝন করিয়া ওঠে, হেমন্ত তাকাইয়া দেখে বধূ ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে আবার।

—'কি? এলে?'

হ্যাঁ, আসিয়াছে বটে, মাথায় জল, কানে কপালে জল, সমস্ত আঁচল শাড়ি জলে ভিজিয়া গিয়াছে—হাতে একখানা পাখা।

—'কি হল?'

কথা বলিবার মতো শক্তি নাই নীলিমার। বালিশের উপর উপুড় হইয়া গোঙরাইতেছে। আচল দিয়া ধীরে ধীরে বাতাস খাইবার প্রয়াস। হাতপাখাটা পাশে পড়িয়া আছে, উঠাইয়া নাড়িবার শক্তি নাই হয়তো।

হেমন্তর উচিত কাছে গিয়া একটু বসা, ধীরে ধীরে পিঠে কপালে হাত বুলাইয়া দেওয়া পাখাটা আস্তে আস্তে নাড়িয়া পাখার বাতাস করা। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা অবসাদ ও বিশুষ্কতা পাইয়া বসিত তাকে। এসব কিছুই সে করিতে যাইত না।

ডেকচেয়ারে বসিয়া তেমনি খবরের কাগজ পড়িতেছে, তেমনি পড়িয়াই যাইত, পাতা উলটাইত, ভাঁজ করিত, খুলিত চুরুট টানিয়া যাইত, ব্যস। কিংবা টেবিলে বসিয়া লিখিত, লিখিত, লিখিয়াই যাইত, মনে হইত হেমন্তর যাক, এই নারীটি বিদায় লইয়া চলিয়া যাউক, যদি পারে মেয়েটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় যেন সে, যেখানে খুশি চলিয়া যাউক। কোনো আশাতীত সুন্দর আকাশে দূরনক্ষত্রগুলোর ভিতর, কিংবা কোনো নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের রহস্যে মৃত্যুর চিরন্তন বিস্মৃতি ও নিদ্রার দেশে—অনাদি অসীম শয্যার ভিতর। চলিয়া যাউক নীলিমা। বাঁচুক, মানুষকে বাচিতে দিক। নিজে সে পৃথিবীতে একাই বাচিয়া থাকিবে। তাই-ই চায় সে। ভালো লাগে তার। এইসব কর্তব্য ও দায়িত্বের জঞ্জাল থাকিবে না। জীবনের আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস, মানুষকে যাহা ব্যথা দেয়, ভুল পথ দেখাইয়া দেয়, অন্য, স্রোতে অবগাহন করায় অবাঞ্ছিত কলরবে ও কোলাহলে জীবনটা ভরিয়া ফেলে তার—সে সব থাকিবে না আর।প্রেম— নিজের অসারতা ও উদ্দেশ্যহীনতার ইতিহাস লইয়া সমাপ্ত হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও বিদায় লইবে। থাকিবে শুধু শান্তি। পথে পথে পথচারীর আনন্দ দিন-রাত্রির সুন্দর সুবেশ স্নিগ্ধ আগমনও বিদায়।

—'ওগো'

শুনিয়া হেমন্তর চমক ভাঙিয়া যায়।

বালিশের উপর মাথা মুখ গুজিয়া নিমীলিত চোখে রোগা হাত আন্দাজ করিয়া হেমন্তর দিকে বাড়াইয়া দেয় বধূ। শূন্যের ভিতর হাত, হাতের আঙুল পাখির ছানার মতো নিঃসহায়ভাবে নাড়াচাড়া করিতে থাকে।

—'ওগো, এই।'

খবরের কাগজটা ধীরে ধীরে ভাজ করে ফেলে হেমন্ত।

—'শুনলে?'

হ্যা, শুনিয়াছে বটে, হেমন্ত, এ যেন নারীর সম্ভাষণ নয়, যেন অসহায় দিকহারা শিশুকন্যা অন্ধকারের ভিতর হাত বাড়াইয়া পিতার কোল ভিক্ষা করিতেছে। হেমন্তর মনের ভিতরও নরনারীর প্রেম নয়, মানুষের জন্য মানুষের সহানুভূতিটুকু শুধু নয়, কেমন নীরব নিবিড় পিতৃত্ব জাগিয়া ওঠে যেন। এই নীলিমার জন্য।

—'তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো।

—'এই তো এসেছি।'

হেমন্ত বিছানার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়। বলে—'সমস্ত মাথার চুল ভিজিয়ে ফেলেছে দেখছি যে।'

করুণ সুরে জবাব আসে—'হ্যাঁ, জেঠিমা মাথায় জল ঢেলে দিলেন।'

—'কেন?'

—'রান্না করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আগুনের কাছে বসেই হাত-পা ছেড়ে দিল একেবারে। উনুনের

পাশে গড়িয়ে পড়লাম।'

হ্যাঁ এইবকমই হয। ইহা অস্বাভাবিক নয। বধূব যে বকম শবীব তাতে আগুন তো দূবেব কথা, অনেক নবম জিনিসও সহ্য হয না তাব।

এই পবিবাবেব বধূ হইযা আসিযা আটদিন কি দশদিন মাত্র পবিপূর্ণভাবে বাঁধিতে পাবিযাছে নীলিমা, তাবপব হইতেই এই নিষ্ফলতাব ইতিহাস। সন্তান হইযা শবীব ভাঙিযা গিযাছে বলিযাই নয, পিত্রালয হইতে প্রথম যখন শ্বশুব ঘব কবিতে আসিল নীলিমা তখন থেকেই এইবকম। মেযেটিব শবীব খুব নবম জাতেব।

দেখিতে বেশ সুন্দব ছিল বটে নীলিমা, কিন্তু প্রথম হইতেই বোঝা গেল সংসাবেব কোনো কঠিন কাজ তো দূবেব কথা সাধাবণ স্বাভাবিক কর্তব্যগুলিও ইহাকে দিযা সম্পন্ন কবা দুষ্কব। বিশেষ কিছু নয, বউভাতেব বাতে কি একটা সামান্য জিনিস পবিবেশন কবিতে কবিতেই মাথা ঘুবিযা গেল নীলিমা, একেবাবে নিমন্ত্রিত লোকদেব মধ্যে মূর্ছিত হইযা পড়ে আব কি। জেঠামশাই তাড়াতাড়ি ছুটিযা আসিযা ধবিযা ফেলিলেন—নীলিমাকে বাড়িব ভিতব লইযা যাওযা হইল। মাথায জল, কপালে জল, চোখে-মুখে জলেব ছিটা, পাখাব বাতাস, তাবপব ধবাধবি কবিযা তাহাকে অনেক দূবে নিবিবিলি ছোটখাটো কোঠায লইযা গিযা খাটেব উপব শোযাইযা দিযা দবজা-জানালা খুলিযা দিযা অনেক বাত অবদি টানা পাখাব বাতাস চলিল। এবকম ঘটনাব অভিনয আবো অনেকবাব হইযা গিযাছে।

বিবাহ কবিযা আসিবাব সময সেই স্টিমাবেই তো, দুপুবেব গবম অসহ্য হইযা উঠিল নীলিমাব। বড় নদীব উপব স্টিমাবেব ঘুবপাকে সে মাথা ঠিক বাখিতে পাবিল না। ববযাত্রীদেব কাছে সেদিন গোলাপ জল অডিকোলন নানাবকম জিনিসই ছিল, লেবু কাটিযা কাটিযা খাইতে দেওযা হইল। হুকুমেব ভিতব নতুন বধূব পবিচর্যা সেদিন বেশ জমিযাছিল।

কিন্তু বাসববাত্রিব আবেশ নববধূব জীবনেই খুব তাড়াতাড়ি ফুবাইযা যায। বাহিবেব লোকজনদেব তো কথাই নাই। এই সংসাবেব লোকজনেব হৃদযে এই বধূটিব শেষ অবলম্বন দাক্ষিণ্য অনুভূতিও আজ হাবাইযা গিযাছে। শুধু কি তাই? হেমন্ত মাঝে-মাঝে নিজেও বড় বিব্রত হযে উঠে, ভালো লাগে না তাব, প্রেমেব জাগায দাখিন্য, দাক্ষিণ্যেব জাযগায সহিষ্ণুতা আনিযা ম্লান কবিযা লয, সাহিষ্ণুতাব পবীক্ষা বাববাব ব্যবহৃত হইযা কেমন বিবস লাবণ্যহীন হইযা ওঠে, এইবকম হয।

—'তোমাব শাড়িও ভিজিযে ফেলেছ দেখছি।'

—'হ্যা, অনেক জল ঢালতে হযেছিল।'

—'দাড়াও, আমি মুছে দেই।

—'না থাক, জলে বেশ আবাম লাগছে '

হাত পাখাটা তুলিযা হেমন্ত ধীবে ধীবে বাতাস দিতে লাগিল।

—'দেখো তো আমাব সিঁথিতে সিঁদুবটা ধুযে গেছে নাকি '

—'না, ধুযে যাযনি।'

—'কোনোদিন মুছে যায না যেন, আমাব অক্ষয নাবীত্ব চিবকাল যেন এবকম বজায থাকে।' বলিযা স্নিগ্ধ আবেশে বালিশ আকড়াইযা পড়িযা থাকে নীলিমা।

অক্ষয নাবীত্বেব কথা--বেশ সুন্দব কথা বলিযাছে বধূ। শুনিতে প্রেমিকমাত্রেবই ভালো লাগে। কিন্তু সব সমযে শুধু প্রেম ভালো লাগে না যেন, নালিমাব এই হৃদযাবেগেব কথা শুনিযা এই বিছানাব পাশে বসিযা হেমন্তব মন বড় একটা ভিজিযা উঠিতে চায না। একজন মুগ্ধ সুন্দব গৃহবধূনিপুণা সেবাবতা উৎসবমুখব স্বাভাবিক নাবীব জন্য প্রাণ হাপাইযা ওঠে হেমন্তব। নীলিমা কি কোনোদিন সেইবকম হইবে? না, তাহা হইবে না। তাহা কি কখনো হয? তেমন রূপান্তব সম্ভব হয না কখনো।

—'আব বাতাস দিও না।'

—'কেন?'

—'কেউ যদি দেখে ফেলে।' একেই তো এই সংসাবে যথেষ্ট খাবাপ নাম হযেছে তোমাব।'

—'কেন?'

—'এবা বলে আমাকে ভালোবাসতে গিযে শোভনতাব মাত্রা ছাড়িযে যাও তুমি, কতবকম বাড়াবাড়ি কবে ফেল।'

—'তাই বলে নাকি?'

—'হ্যাঁ, থাক, যা খুশি বলুক গিযে। এদেব কথায কি আসে যাবে? এবা তো বলবেই। স্নেহপ্রেমেব

স্বপ্নও কোনোদিন এদের জীবন শুভ আশীর্বাদে ভরে দেয়নি যে।'

হেমন্ত চুপ করিয়া থাকে।

নীলিমা—'জীবন বলতে এরা বোঝে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা। যেখানে নবনারীর হৃদযের বিনিময় অপূর্ব হযে বেঁচে আছে তার দুয়ারে এসে উঁকি দিতেই এদের মনের রাজ্য ফুবিযে যায সব। তাবপর নিঃসম্বল বিচার কল্পনা নিয়ে এবা অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাই বলে।

হেমন্ত হাওয়া করিতেছিল।

নীলিমা—'কত ভালো হত যদি আমাদের দুজনেব এই সুন্দব মিলিত হৃদযের জন্য সাংসাবিক উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিতেন ভগবান।' একটু চুপ থাকিযা—'খুব ভালো হত না?'

—'হ্যাঁ।'

আরো খানিকক্ষণ চুপ কবিযা থাকিযা—'কিন্তু ভগবান তো করেন না, আমাদের নিজেদেবই কবে নিতে হয়, কি বলো?'

হেমন্ত মাথা নাড়িয়া বলিত—'তাই।'

—'এখানে তো একটা মেয়ে ইস্কুল আছে।'

—'আছে।'

—'সেখানে আমাকে একটা মাস্টাবিব কাজ জুটিযে দাও না।'

—'আমি নিজে পেলেই তো কবি।'

—'থাক, তুমি কবে কাজ পাবে বিধাতা জানেন। কিন্তু মেযে ইস্কুলে একটা কাজ যদি পেতাম কয়েকটা টাকা পাওয়া যেত।'

এমনি করিয়া প্রেমের থেকে টাকা, টাকাব থেকে প্রেম, দু-চাব মিনিটের মধ্যেই কথাবার্তা অবলীলাক্রমে জীবন্ত ঘাট ছুঁইযা ঘুরিয়া-ঘুবিযা আসে।

—'উনুনের কাছে হুমড়ি খেযে পড়ে গিযেছিলে, এত শবীর খাবাপ নিযে বাঁধতে কেন গিযেছিলে নীলিমা।'

—'আজ ন-খুড়িমার বাঁধবাব কথা ছিল, তার কেমন জ্বব জ্বব হল, তবু তো হেঁসেলে ঢুকলেন, বললাম খুড়িমা আমিই থাকি।'

—'তা বেশ করেছিলে। গুরুজনদের অসুবিধাব সময এইবকমই হাতেব কাজ কেড়ে নিযে কবে দিতে হয, এ সংসাবেব থেকে একথা কোনোদিন ভুলো না নীলিমা।'

—'তা আমি ভুলব না।'

—'যাক, আজ কি বিশেষ সাহায্য কবতে পাবলে না, তোমাকেই শেষে সাহায্য কবতে হল সকলেব মিলে। কেই-বা রাঁধছে এখন?'

—'জেঠিমা হযতো।'

দুজনেই চুপ।

নীলিমা—'তুমি কী ভাবছ আমি বলতে পাবি। বলব?'

হেমন্ত কোনো জবাব দিল না।

নীলিমা—'ভাবছে মনে মনে, জীবনে কোনো সুখ হল না তোমাব, না হল ঘবেব ভিতবে তৃপ্তি, না পাওয়া গেল ঘরেব বাইবে, দুই-ই সমান। বাস্তবিক আজ সকালে যা হল তাতে আমিই কী বেকুব সেজেছি শুধু, তুমিই তো মর্যাদা হারালে।' কুঞ্চিত কাতব মুখে হেমন্তব দিকে তাকাইযা বহিল নীলিমা।

হেমন্ত একটু হাসিযা বধূকে সান্ত্বনা দিতে গিযা দেখে সান্ত্বনার ভাষা হৃদযেব ভিতব শুকাইযা গিয়াছে তার, নীবস হাসিই সম্বল মাত্র। একটু চেষ্টা করিযা বলিল—'উনুনের পাশে পড়ে গিয়েছিলে, উনুন কি তখন জ্বলছে?'

—'হ্যাঁ খুব।'

—'তাহলে তো আগুনও ধবে যেতে পারত।'

—'আর একটু হলেই কাপড়ে-চোপড়ে ধরে যেত বইকি, বড় বিপদ হত তাহলে, তোমাকে তাহলে খুব ভাসিয়ে যেতে পারতাম আমি।' স্বামীর দিকে করুণ পীড়িত চোখ তুলিয়া তাকাইযা বহিল নীলিমা। ভাসাইয়া যাইত। তা অবিশ্যি। হেমন্ত খটখট কবিয়া দুই মুহূর্ত দাঁতে দাঁতে হাসিযা বহিল। তারপর বলিল—'রান্নাঘরে কে ছিল তখন?'

—'ভাগ্যিস জেঠিমা ছিলেন। না হলে তো গিয়েছিলাম এবার। যখন পড়লাম ঠিক অজ্ঞানের মতো, না আছে হাত-পা নাড়বার শক্তি, না পারি কথা বলতে।'

হেমন্তর মনে হইতেছিল, এতদূরই যখন হইযাছিল তখন উনুনের আগুনে পুড়িয়া সমাপ্ত হইযা গেলেই-বা ক্ষতি কি? এক সময়ে জীবন তার সব ভুলিয়া নিত্য এই এক গভীর উপাসনা করিত, নারীর সাথে পবিচয কবিযা দাও বিধাতা। সেই পবিচয তো তার ঘটিয়া গিযাছে, খুব বিশদভাবেই ঘটিযা গিযাছে, এই দুই পক্ষের শান্ত বিচ্ছেদেব সময আসিয়া পড়িযাছে জীবন হেমন্তেব গন্ধে ভবপুব হইযা উঠিযাছে, জীবনেই হোক, মৃত্যুতেই হোক, দুইজনে দুইজনকে স্পর্শ করিয়া আনন্দও পাইবে না, ব্যথাও পাইবে না। পবস্পবে পরস্পরেব নিকটে থাকিযাও কোনো এক তৃতীযেব জন্য ব্যথিত হইযা দিন কাটাইবে। কে সেই তৃতীয? বিধাতা? দিনবাত্রিব সুন্দর নিঃশব্দ সঞ্চবণ? হযতো নিজেদেবই পুনর্জীবন? একদিন যাহা ছিল, আজ নাই, আগামীকাল আবাব সাজিযা আসিতে পাবে। না সে আগামীকাল আব আসিবে না, নীলিমা আশা করে বটে, কিন্তু সংসাব জীবনের স্বপ্নেব সঙ্গে পবিচয তার কম।

নীলিমা—'কথায কথায তুমি ভাবনাব পাট নিযে বস। আকাশেব দিকে মুখ তুলে কি ভাবছ বলো তো দেখি?'

—'জেঠিমা তোমাকে পড়ে যেতে দেখে, তাবপব চিৎকাব দিলেন?'

—'না বেশ সংযম ও সুন্দর রুচি আছে, আমাকে তিনি নিজেই কোলে তুলে মাথায মুখে জলেব ঝাপটা দিতে লাগলেন। বাতাস কবলেন।'

—'আব কেউ ছিল সেখানে?'

—'না'।

—'একটু গবম দুধ খেলে বুঝি।'

নীলিমা মাথা নাড়িযা বলিল—'না, তা আব লাগল না।'

—'সেধেছিলেন?'

—'সাধেননি অবিশ্যি।'

—'মাথায সুস্থ বোধ কবছ?'

—'এখন? অনেকটা।'

—'মাথাটা মুছে দেই তাহলে?'

—'দাও।'

মাথা মুছিতে মুছিতে হেমন্ত—'একটা গোলাপ জলেব বোতল ছিল না আমাদেব?'

—'সেটা তো ফুবিযে গেছে।

নীলিমাব মাথা মুছিযা দিযা হেমন্ত—'এখন তুমি এক কাজ কবো নীলিমা।'

—'কি?'

—'এই শাড়িটা বদবে ফেলো। না হলে গায জল বসে জ্বর হবে তোমাব। একটুতেই তো জ্বব হয।'

—'কিন্তু পববাব শাড়ি আব নেই তো, দুটো আস্ত শাড়িই তো ধোপাবাড়ি।'

—'আব একটাও শাড়ি নেই?'

নীলিমা—'একটা শুধু আছে। তুমি আমাকে অধিবাসে যেটা দিযেছিলে সেই গোলাপি বেনারসিটা।'

—'তাহলে সেইটেই পবো।'

—'কি যে বলো, এখন পবব সেই শাড়ি। এই এক সংসাব লোক আমার পেছনে উলু দিযে বেড়াক। মাথা তো আমার খাবাপ হযনি।' নীলিমা একটা ছেঁড়া শাড়ি পরিযা আসিল। গুছাইযা পবিতে জানে, নিঃসম্বল জীবনের রিক্ততা তেমন খোঁচা দিযা বাহিব হইযা পড়ে না।

সেদিনই সন্ধ্যার সময হেমন্ত—'একটা গাড়ি ডেকে আনি।'

—'কেন?'

—'চলো, বেড়াতে যাই।'

—'আমরা দুজনে?'

—'হ্যাঁ, ছোট ছেলেমেযেবাও যাবে।'

—'ওদেরই নিয়ে যাও, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেও আর একদিন। এখন সব দিকে থেকেই তাগিদ আসবার সম্ভাবনা।'

না, গাড়ি করিয়া নদীর ধারে বেড়ানো হইল না আর। শুধু যে বেড়ানো হইল না তাহা নয়, ছোটখুড়িমা দুজনের এই কথাবার্তা শুনিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাতাবি গাছটার কিনারে তিনি যে দাঁড়াইযাছিলেন হেমন্তও দেখিতে পায নাই, নীলিমাও না।

দেখিতে পাওয়া গেল যখন তখন হেমন্ত তার স্ত্রী দুজনেই বড় লজ্জা পাইল। ছোট খুড়িমা নাক উঁচু করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ির পাশেই ছোট্ট মাঠটুকুতে বেশ একটু জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল।

হেমন্ত—'এসো, এখানেই একটু বেড়াবে নীলিমা।'

খুঁ মার মেয়ে পুঁটি—'দাঁড়াও আমি এক্ষুণি জেঠামশাই আর জেঠিকে গিযে বলে দিযে আসছি।'

হেমন্ত বলিল—'থাক, যাস নে তোকে আমি গল্প বলি শোন।'

গল্প বলিতে বলিতে রাত গভীর হইযা পড়িল।

রাত গভীর হইল বটে পুঁটিকে লইযা গল্প করাই সার হইল শুধু, কিন্তু ইহার চেযেও গভীর অনিষ্ট হইল এই যে গল্প করিতেই ভালো লাগিল হেমন্তের। যতসব তুচ্ছ ছেলেমানুষি অসাড় গল্প।

বেড়ানো, ওষুধ খাওযানো, স্ত্রী-র সঙ্গে বসিয়া ভাবি সুন্দর জল্পনা-কল্পনা সে সবের ঢের হইযা গিযাছে, তারপর দুই জনের হৃদযই হইযা গিয়াছে ফোঁপরা। চেহারাও এমন ঘুণ ধরিযাছে নীলিমার যে এ শরীরের ভিতর মূল্যবান হৃদয় থাকিলেও তাহার মূল্য নষ্ট হইযা যায যেন। একদিন এইসব সন্ধ্যা ও রাত্রে যাহা আগ্রহের সঙ্গে সম্পন্ন হইত। একদিন ওই পুঁটি কিংবা বাড়ির ছোট ছেলেমেযেরা সন্ধ্যার সময হেমন্তর ঘরে ঢুকিলেই বড়ই বিরক্ত হইত সে। কিন্তু আজ অনেকটা রাত অবদি নির্বিবাদে মেয়েটি সে অধিকার করিযা লইযা চলিয়া গেল। মেযেটির কাঁধে হাত রাখিযা গল্প বলিতে বলিতেই হেমন্ত খাইতে গেল, খাইযা আসিয়া ঘুম। এত কাজের ভিতর নীলিমা যে কোথায হারাইযা গিযাছে তাহাকে খুঁজিযাও দেখিতে গেল না। স্বামীর জীবনের এই পট পরিবর্তন যেমন বিচিত্র তেমনই আন্তরিক। পরের দিন সকালবেলা নীলিমা ঘোমটা টানিযা ঘর হইতে বাহির হইযা যাইতেছিল।

হেমন্ত—'কোথায় যাও।'

—'যাই একটু রান্নাঘরে।'

—'রাঁধতে?'

—'দেখি পারি কিনা শরীরটা একটু—'

কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইলে ভূতপ্রেতও চমকাইযা ওঠে। মনে হয যেন যক্ষ্মা তার শেষ সীমায আসিয়া পৌঁছিযাছে।

কিন্তু এত বড় বিলাসের রোগ লইযা কি করিবে হেমন্ত? পুরী, ধর্মপুর, ভাওয়ালি বেড়াবার কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। একমাত্র আশ্রয় আছে, মৃত্যু। হেমন্তকে লইযা এই সংসারের ভিতর যত কটি মানুষ আছে, যাহাদের সঙ্গে নীলিমার দিন-রাতের ব্যবহার এই মেযেটির বোঝা বিবেক ধর্ম ও ন্যায সংগতভাবে বহিবার ক্ষমতা ও রুচি সকলেই হারাইযা ফেলিযাছে আজ, মেযেটিও এই ইহাদের সকলের জীবনের বাহিরে চলিয়া যাইবে। যত শীঘ্র যায ততই ভালো; যেখানে যাইতেছে, যে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিযাছে সে তাহার বিশ্বাস ও শান্তির নিরবচ্ছিন্ন নিঃসহাযতা এত বেশি সুন্দর যে নিঃসংকোচে বধূকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দেখিল নীলিমা দাঁড়াইযা আছে।

হেমন্ত খবরের কাগজের থেকে একবার চোখ তুলিয়া বলিল—'আজ না তুমি রাঁধতে যাবে বলেছিলে?'

—'হ্যাঁ, যাই।'

—'রাঁধলে তাড়াতাড়িই যাও, উনুনটা যদি অন্য কেউ ধরিযে বসে, ডালটা চড়িযে দেয, বলো, তাহলে নিজেরই-বা তোমার কেমন লাগবে?'

না, তাতে এমন বিশেষ খারাপ লাগিত কি আর নীলিমার?

[...] বিছানায শুইযা থাকিবার কথা যাহার, উনুনের ডাল তরকারির থেকে জীবনের গতি তাহার ঢের দূরে।

নীলিমা—'হ্যাঁ, যাই, এই ফোঁটা ওষুধ চটপট করে খাইযে দাও তো আমাকে।'

—'দেরি হয়ে যাবে।'

—'কেন?'

—'কোথায় কি আছে কিছুই তো কাছে নেই, শিশিটাই-বা কোথায় রেখেছি, ফোঁটা ঢালতেও কি কম সময় লাগবে! এসে খেও—'

—'আচ্ছা।'

—'আজ আবার কোনো কীর্তি করে বোসো না।'

—'কীর্তি কি আর ইচ্ছা করে করি, ভগবান আমাকে ন-খুড়িমার মতো শরীর দিতেন যদি তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমি তোমাদের রেঁধে খাওয়াতে পারতাম। আগ্রহ বা নিষ্ঠা এ বাড়ির কোনো বউয়ের চেয়েই আমার একটু কম বলে মনে করো না।'

—'বেশ ভালো কথা। আজকের রান্নাটা তুমি শেষ পর্যন্ত সেরে এসো দেখি, তাহলে কম খুশি হব না আমি।'

গেল তো। কিন্তু মিনিট পনেরো বাদে ফিরে আসিল, সেই ন-খুড়িমার কোলে চড়িয়া, যার মতন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন রাঁধিয়া খাওয়াইবার দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল নীলিমা।

খুড়িমা বলিলেন—'এ বিড়ম্বনা কেন করো হেমন্ত?'

—'কেন, আমার কথা বলেছে নাকি?'

—'না, তা বলে না, কিন্তু আমরা কি বুঝি না?'

—'কি রকম?'

—'এতদিন এ বউয়ের মোহে আটকে ছিলে, এখন উঠতে বসতে গলায় কাঁটা ফুটিয়ে মরছ। এই রকম তো হবে। এ আমরা সেই প্রথম দিন থেকেই বুঝেছিলাম। তুমি তো শুধু তর্ক করতে।' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মাথা হেট করিয়া হেমন্তকেও চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া নীলিমার রুগ্ন বিশীর্ণ দুই হাত লক লক করিয়া মাজাভাঙা সাপের মতো কাতরাইয়া উঠিয়া স্বামীকে ধরিয়া ব্যর্থ প্রয়াস করিল কয়েকবার। কিন্তু ঝটকায় নিজেকে সরাইয়া লইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন [...] [...] করিতে করিতে একেবারে শীতল বাবুদের ব্রিজের আড্ডায় গিয়া জুড়িয়া বসিল হেমন্ত।

ফিরিয়া আসিল যখন হেমন্ত সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে। আসিয়া দেখিল নীলিমার শরীর অনেকটা ভালো, কথাবার্তায়ও কোনো লোভ নাই তার, খুব প্রসন্ন মুখে খুকিকে জীবনের সুন্দর উজ্জ্বল কথা শুনাইতেছে, মা ও শিশু সন্তানের এরকম সম্বন্ধ যেমন স্নিগ্ধ তেমনই অপরূপ।

জানালার ফাঁক দিয়া চতুর্দশীর চাঁদটাকে দেখা যায়, বেশ, বেশ তো। হেমন্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নীলিম—'কেমন, এখন ভালো লাগছে না?'

হেমন্ত মুখের থেকে আধপোড়া চুরুটটা ফেলিয়া দিল।

নীলিমা—'ঘরের ভিতর এইরকম তো চাও তুমি, তা কি আমি বুঝি না? বিধাতা সবসময়ই কি অপ্রসন্ন থাকবেন? ওর মুহূর্ত প্রতিদিনের ভিতরেই অনেকবার আসে, দেখো তো আসে কিনা। এই দেখো আমি খুকি চাঁদ—শরীরটাও ভালো লাগছে এখন আমার—নিজেকে কিনা। এখন আর তুমি অসার্থক মনে করতে পার না? বোসো,

আমার কাছে, হ্যাঁ এইখানে।'

কহিল বটে, কিন্তু ইহাও বুঝিয়া লইল সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন বধূ পরিত্যক্ত। এই শূন্য ঘরেই বসিয়া থাকিতে হইবে তাহাকে। আজিকার এই রাতের কথা মনে করিয়া কিংবা এই খুকিটা যদি বাঁচিয়া থাকে ইহার মুখের দিকে তাকাইয়া সেইসব শূন্য অন্ধকার, ঝিঁঝি ডাকা গ্রাম রাত্রি ভরিয়া করিবে কি সে? কিন্তু ইহা তাহার মনের সাময়িকভাব মাত্র, দিন আসে, রাত্রি চলিয়া যায়। হেমন্তর মনে হয় জীবনে প্রেম নাই, স্নেহ নাই, উৎসাহ নাই, আয়োজন নাই, কিছু নাই তার, বেদনাও নাই তার, আছে বেদনা বিলাস শুধু। এরকম অসাড় লালিত্যহীন জীবনের সঙ্গে এই বধূকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনেক ভয়াবহ নির্যাতন তাহাকে দেওয়া চলে শুধু, জীবনের যে স্রোতগুলি সুন্দর ও মধুর তাহার কলরবের পাশে নিরুপায়ের মতো বসিয়া মিথ্যা মরীচিকা লইয়া দুঃখিনী নারীকে ভুলানো চলে মাত্র। না, আর কিছু সম্ভব হয় না।

কাজেই বিধান যাহা হইল তাহা হইল, রাত তিনটার সময় স্টিমার হইতে নামিয়া মহেশবাবু বলিলেন—'না, সে আর নেই।'

প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা

রাত এগারোটার সময় ট্রেন এল। স্টেশনে তিন মিনিট মাত্র ধরে, বিশেষ কেই নামল না।

অজয় হ্যারিকেনটা হাতে করে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে—'কই আপনি এসেছেন নাকি? চারদিকে তাকাতে তাকাতে—'রাজচন্দ্রবাবু এসেছেন? রাজচন্দ্রবাবু?'

রাজচন্দ্রবাবু বুড়োমানুষ, গাড়ির থেকে নামতে একটু দেরি হল। ট্রেন যখন আবার ছাড়ে ছাড়ে ঠিক সেই সময়েই তিনি একহাতে একটা ছোট্ট বিছানা আর এক হাতে গ্লাডস্টোন ব্যাগ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। অজয়ের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে বললেন—'এই যে আমি এখানে, ও হ্যারিকেনওয়ালা।'

অজয় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম করতে গেল।

রাজচন্দ্রবাবু সরে গিয়ে বললেন—'থাক থাক থাক থাক।'

—'বা রে প্রণাম করতে দেবেন না?'

রাজচন্দ্রবাবু দু-এক মুহূর্ত স্থির থেকে—'আচ্ছা করো, কিন্তু কথায় কথায় অত ভক্তি বাড়াবাড়ি দেখাতে যেও না, যাদের ভিতর ফোপড়া সমাজসম্মত আইন-কানুনে কায়দায় তারাই সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ।' বলিয়া বিরসভাবে একবার হাসিলেন।

অজয় কুলি ডাকিতেই রাজচন্দ্রবাবু—'না, সে সবের কোনো দরকার হবে না তো।'

—'এই বেডিং ব্যাগ রয়েছে যে।'

—'বেডিং। একটা সতরঞ্চি আর বালিশ, এ আমার কাছেই রাখতে ভালোবাসি আমি। হ্যাঁ গ্লাডস্টোন ব্যাগটাও হাতছাড়া করতে চাই না।'

অজয় হাত বাড়াইয়া বলিল—'কুলি নিলেন না, [...] তাহলে আমাকে দিন।'

—'তা তুমি নেবে নাও।'

বিছানাটা দিলেন। বলিলেন—'ব্যাগটা নেবে?'

—'দিন।'

বলিলেন—'কষ্ট হচ্ছে না তো তোমার?'

অজয় মাথা নাড়িয়া হাসিয়া—'কি যে বলেন আপনি, আমি অবাক হয়ে ভাবি এইরকম সামান্য জিনিস নিয়ে আমরাও কেন চলাফেরা করতে পারি না। এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে একেবারে লটবহর সঙ্গে না নিয়ে পারি না।'

—'এখানে খুব মশা আছে নাকি হে অজয়?'

—'আছে কম না।'

—'হ্যাঁ খুব ভালো বুঝে মশারিটা নিয়ে এসেছি তাহলে, শেষ পর্যন্ত ভাবছিলাম, রেখে আসি।'

—'না মশারি, এক-আধটা মশারি—'

রাজচন্দ্র কোনো জবাব দিলেন না। নিস্তব্ধ মুখে টিকিট দেখাইয়া ওভার ব্রিজ পার হইয়া অজয়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে একটা অন্ধকার দিগন্তজোড়া মাঠের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড় হইলেন। একটা মস্তবড় বটগাছের কাছে একটা লণ্ঠন টিম টিম করিতেছিল, তাহারই চারপাশে কতকগুলি লোক হইচই করিতেছিল, কেউ তামাক টানে, কেউ বিড়ি ফোঁকে। দু-একজন একটু দূরে সরিয়া গাঁজায় দম দিয়া লইতেছে। একদিকে উনুন জ্বালাইয়া একটু রান্নার জোগায়, পাশে একটি লোক একটি নোংরা গামছার উপর সাজানো সাজানো পান বিড়ি ও দেশলাই লইয়া ঝিমাইতেছে। ইহারই কাছে গোটা দুই তিন ঘোড়ার গাড়ি।

অজয় মাঠের এক প্রান্ত হইতে গলা ছাড়িয়া চেঁচাইয়া বলিল—'অক্রুর তোর গাড়ির কেরায়া হবে না রে?'

—'খুব হবে হুঁজুর, তাই ভাবছিলাম আমি, লানঠিন হাতে করে ইস্টিশান থেকে বেরুল কারা—তা দাদাবাবু তুমি?' বলিতে বলিতে হ্যাট হ্যাট করিয়া গাড়ি লইয়া এগাইয়া আসিল অক্রুর।

রাজচন্দ্র মাথা নাড়িয়া—'গাড়ি লাগবে না।'

—'রাত তো কম হয়নি রাজদাদামশাই, এ তিন মাইল আপনি বুড়োমানুষ হেঁটে যেতে পারবেন না তো।'

কিন্তু তিনি মাঠের ভিতর নামিয়া পড়িলেন। বলিলেন 'তিনি—'ও গাড়ি তুমি বিদায় করে দাও, হ্যারিকেন নিয়ে এগিয়ে এসো।'

তাহাই হইল।

রাজচন্দ্র—'দাও, হ্যারিকেনটা আমার হাতে দাও, বোঝা তো অনেক হয়ে গেল তোমার।' হ্যারিকেনটা তিনি নিলেন। বলিলেন—'ডাকবাংলো এখান থেকে কতদূর?

—'ডাকবাংলো এখানে আছে কিনা সন্দেহ।'

—'আছে, খুব আছে, বছর পনেরো আগে যখন একবার এখানে এসেছিলাম তখনো ছিল, আজ নেই!'

অজয় একটু হাসিয়া—'থাকলে ঢের দূরে রাজদাদামশাই।'

—'থাক, আছে তো? থাকলেই হল, আমি ডাকবাংলায়ই উঠব।'

অজয় চক্ষু স্থির করিয়া—'কি রকম?'

—'যে রকমই হোক, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

অজয় হাঁটিতে হাঁটিতে—'বেশি কথা আমি বলব না, রাজদাদামশাই আপনি যদি ডাকবাংলোয় ওঠেন তাহলে আমরা বড় দুঃখিত হব।'

—'তোমরা দুঃখিত হবে, বেশ বেশ, তোমরা কারা শুনি? কথাটা তো বেশ গাল ভরে বললে—একটু বুঝিয়ে বলো অজয় কে দুঃখিত হবে?'

—'আমরা সকলেই।'

—'হয়তো তুমি দুঃখিত হবে, তা হতে পারে, কি আর করা যায়? কিন্তু অন্য কেউ যে হবে এ কথা আমিও বিশ্বাস করি না, তুমিও কোরো না।'

—'নির্মলা যদি থাকত এখন এখানে, তাহলে আপনার এই কথা শুনে কত কষ্ট পেত তা তো আমার চেয়েও ঢের বেশি বোঝেন আপনি।'

রাজচন্দ্র একটু হাসিয়া—'হেঃ হেঃ তা নির্মলার কথা তো জিজ্ঞেস করলে না তুমি।'

অজয়—'আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গেই সে আসবে।'

রাজচন্দ্র—'ও, তাই ভেবেছিলে বুঝি? কত জিনিসই ভাবতে ভালোবাসি আমরা।'

অজয় একটু চুপ থাকিয়া—'এল না যে?'

—'কে নির্মলা? কার সঙ্গে? আমার সঙ্গে? আসার কি প্রয়োজন তার?'

—'আনলেই তো হত, আমি তো লিখে দিয়েছিলাম একটা সংগতি পেলেই এসো।'

—'তাই লিখেছিলে বুঝি?'

অজয় মাথা নাড়িয়া জানাইল সেইরকমই লিখিয়াছিল সে।

—'কি জবাব দিল?'

—'না, কোনো উত্তর তো দিল না।'

রাজচন্দ্র হাসিয়া— 'চিঠিপত্রই-বা কেমন চলে তোমাদের মধ্যে?'

অজয় কোনো উত্তর দিল না।

রাজচন্দ্র—'খুব ঘন ঘন লেখালেখি হয়?'

অজয় মাথা নাড়িয়া—'না।'

রাজচন্দ্র—'পনেরো দিন অন্তর একখানা, এই?'

অজয় চুপ করিয়া রহিল।

রাজচন্দ্র—'না, তাও হয় না?'

অজয়—'তা এল না কেন নির্মলা?'

—'আসবার হলে তো আসতই।'

—'ভালো আছে?'

—'কে নির্মলা? এখান থেকে যে ঘাটের মড়া পাঠিয়েছিল, হাড়মাংস ঢের লেগেছে। দিনের পর দিন তো লাবণ্য ফুটে উঠছে দেখলাম।' রাজচন্দ্র একটা বিড়ি জ্বালাইয়া লইয়া—'চেহারার দিক দিয়া সে আজকাল মানুষের মতো হয়েছে।'

অজয় বলিল—'কই, সে কথাও তো লেখেনি কিছু।'

—'কতদিন আগে তার চিঠি পেয়েছিলে?"

—'মাসখানেক হয়ে গেল।'

—'তারপর পাওনি?'

—'না।'

বিড়িতে একটান দিয়া রাজচন্দ্র—'হয়তো লেখা দরকার মনে করেনি।'

অজয় একটু চুপ থাকিয়া—'তাহ'লে শবীবটা একটু ভালো হয়েছে নীলিমাব?'

—'একটু কেন, বেশ সেরেছে। দস্তুর মতো চর্বি হয়েছে গায়ে, এর চেয়ে বেশি মানুষ কি আর সারবে বলো?'

রাজচন্দ্র পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন—'নাও দিকি।'

অজয় ভাবিল হয়তো নির্মলা চিঠি লিখিযাছে তাকে। রাজচন্দ্র চিঠি বাহির করিলেন। কিছুক্ষণ পরে—'দেশলাইটা।' বলিলেন—'নাও, আমি জানি এসব খাওযার অভ্যাস আছে তোমাব।' রাজচন্দ্রেব নিকট হইতে বিড়ি দেশলাই লইযা অজয় নীববে মাথা হেট করিয়া হাঁটিতেছিল।

—'কই জ্বালিযে নাও, আমাব কাছে লজ্জা কববাব কোনো কাবণ নেই তো তোমার। সেবকম বিদ্‌ঘুটে রস-কল্পনাহীন মানুষ আমি নই।'

বিড়িটা জ্বালাইলা অজয। নির্মলাব কথাই ভাবিতেছিল সে, একটু চুপ থাকিয়া বলিল—'বাজুদা, নির্মলার আমার বিয়ে হল এই আট বছর।

—হ্যাঁ।'

—'ছেলেপিলে একটিও হল না।'

—'হবেও না আব।'

—'এখন দেখছি হলে মন্দ হত না।'

—'কিন্তু এব ওপব তো তোমাদেব হাত নেই ভাই। বিধাতা দেবেন না, কি করে হবে?'

—'তা তো ঠিক।'

—'হলেও সে এক ফ্যাসাদ হত অজয।'

—'কেন বাজুদা?'

—'আজকালকার দিনে একটা ছা-পোষা কি সোজা কথা, তোমাদেব তো কোনো চাকবি-বাকবি নেই।

—'ও সে এক হিংসেব আছে বটে।'

বিড়িতে মৃদুভাবে একটা টান দিযা অজয—'কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য আব এক দিনেব কথা।' রাজচন্দ্রর দিকে তাকাইযা অজয—'আমার মনে হয কি জানেন রাজদাদামশাই, আমাদেব যদি একটি ছেলে বা মেয়ে থাকত তাহলে নির্মলাব সঙ্গে আমাব ঘনিষ্টতাব ঐশ্বর্য বেড়ে যেত।'

বাজচন্দ্র কোনো উত্তর দিলেন না।

অজয—'ছেলেপিলে কিছু নেই বলে নির্মলা কেমন হাঁপিযে ওঠে মাঝে মাঝে, স্বামী-স্ত্রীব সম্বন্ধটা যেন শূন্য হয়ে যায তাব কাছে, মাধুর্য যায শুকিয়ে।'

বাজচন্দ্র—'হাঁপিযে ওঠে শুধু? তোমাব নিজেব কি হয না?'

—'আমার? অজয হাসিতে হাসিতে চুপ কবিল।

রাজচন্দ্র—'কই নীরব হলে যে?'

অজয় আর একবাব মুখ ফুটিযা হাসিযা গম্ভীব হইয়া হাঁটিতে লাগিল।

রাজচন্দ্র—'দাম্পত্যেব লালিত্য বাড়াবাব জন্য সন্তানেব প্রযোজনীযতা তুমিও খুব গভীরভাবে বোধ করেছ হয়তো অজয।'

অজয বড় বড় চুলেব মাথাটা নাড়িযা একটু হাসিযা—'না বাজুদাদামশাই, নির্মলাকে আমি এমনিই

তো খুব ভালোবাসি।'

রাজচন্দ্র—'কিন্তু সকলেই তো জানে বিধাতা তাকে চিরদিন সন্তানহীনা করেই রাখবেন।'

অজয় কোনো উত্তর দিল না।

রাজচন্দ্র—'এ নিয়ে ঢের বিরসতাব সৃষ্টি হতে পারে।'

—'কার মনে?'

—'তোমার মনে, নির্মলার মনে।'

—'আপনাকে একটা কথা বললাম, তাব ধুয়ো ধরে আপনি অনেকদূর এগিয়ে গেলেন দেখছি বাজুদাদা।'

একটু চুপ থেকে অজয়—'আমাব মনে হয সন্তান থাকলে নির্মলার বিমুখতা বড় সহজে কাটত না। মন যখন মোচড় দিয়ে বসে তখন কোনো বিধাতাই সাহায্য কবতে পারে না।' আব একটু চুপ কবে থেকে—'প্রথম থেকেই মনেব মোচড় তাব এইবকম। আমি তাকে যে-বকম ভালোবাসি কোনো মানুষকেই কোনোদিন হযতো সেরকম ভালোবাসতে পারিনি। প্রেমেব ভাণ্ডাব অনেকের থেকেই তার ঢের কম।' বিড়িটা ফেলিযা দিযা অজয—'এই যে কতদিন ধবে চলে গিয়েছে, বিচ্ছেদ আমি যেবকম অনুভব কবি নির্মলা কিন্তু—'বলিতে বলিতে থামিযা গিযা অজয চুপ থাকিযা বলিল—'বিচ্ছেদ জিনিসটাকে বেশ সুন্দব ও মধুব কবে তোলা যায, কিন্তু বিবহকে নির্মলা যেন কেমন কদাকাব কবে ফেলে।'

—'কি রকম?'

—'এই তো বললেন মুটিয়েছে ঢেব, চর্বিও অনেক জমে গিয়েছে নাকি?' বলিযা হো হো কবিযা হাসিযা উঠিল অজয।

বাজচন্দ্র লণ্ঠনটা তুলিযা ভালো করে তাকাইযা দেখিযা বলিলেন—'ও তুমি বুঝি সেই হাবগিলাই আছ, না শুকিযে গেছ?' লণ্ঠনটা নামাইযা বলিলেন—'তাই তো, তিন বছব আগে তোমাব যা রূপ দেখেছিলাম তা তো আব নেই।' বললেন—'চুল এত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাখ কেন?'

—'এমনি-ই।'

ভালো কবিযা তাকাইযা দেখিযা—'চুলে তেল পড়ে না বুঝি?' একটু চুপ থাকিযা বলিলেন—এতই বিচ্ছেদ।'

অজয ভাবে, একটু হাসিল।

এর মুখে আবাব হাসি। বাজচন্দ্র লণ্ঠন নামাইযা একটু তাকাইযা —'কত বাজ্যের ধুলো সুবকি যে লেগেছে তোমাব পাযে, দিনবাতে ঘোব বুঝি? নির্মলার না হোক বিধাতাব অন্তত কৃপা হওযা উচিত ছিল।' এটটু চুপ থাকিযা—'থাক, বিচ্ছেদকে তুমি কদর্য কবনি, সেইজন্যই হযতো বিধাতা তোমাকে নিয়ে এই সুন্দব খেলা খেলছেন।'

বাজচন্দ্র পাযেব দিকে তাকাইযা বলিলেন—'জুতোও নেই যে বাছা।'

—'জুতো আমি পায দেই না।'

—'কেন?'

—'পযসায কুলিযে ওঠে না বাজুদা।'

—'খালি পাযে পথে-বিপথে বাউণ্ডুলে হযে হাঁটতে হযতো খুব ভালো লাগে, মনটা বিচ্ছেদেব মাধুর্যে ভরে ওঠে, কি বলো অজয?' হাঁটিতে হাঁটিতে বলিলেন—'পাঞ্জাবিতে তো তোমার রং উঠেছে কি রং ছিল?'

—'লাল বং।'

—'খদ্দবের?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নিজেই তৈরি করেছ বুঝি?'

অজয একটু হাসিযা কহিল—হ্যাঁ।'

—'এক টুকরো কাপড় কাচার সাবান পাও না অজয, জামাটা তোমার কেচে নিতে পার না, এ যে সাত সংসারের ধুলো এসে জমেছে জামাটাতে।'

—'বাইরে বসে বসে কি কর?'

—'বিশেষ কিছু না।'

—'এখানে তো একটা হাইস্কুল আছে?'

—'তিনটেই আছে!'

—'মাস্টারি করলেই তো পার।'

—'রাজুদা বেশ মনের মতো কথা বলেন, মাস্টারি পাওয়া কি অতই সহজ!'

—'একটাতেও পেলে না?'

—'কই আর পাই।'

—'তোমার তো অনক পড়াশুনা ছিল।'

—'থাকলেই-বা।'

কিরকম একটা ঢালু মাঠের মধ্যে দুজনে আসিয়া পড়িল।

—'আমি হয়তো অনেক পড়াশুনা করেছি, কিন্তু এমন হাজাব হাজাব লোক আছে আমার চেয়েও ঢের বেশি পড়েছে, শিখেছে, শিক্ষা তাদের যেমন সুন্দর, তেমন গভীর, শুধু তাই নয়, লোকানুমোদিত শিক্ষা তাদের।' হাঁটিতে হাঁটিতে অজয়—আমার শিক্ষা তো হয়েছিল আমার নিজেব কাছে, সেইখানেই শুরু, সেইখানেই শেষ।'

—'কেন, কলেজে পড়নি তুমি?'

—'পড়েছিলাম, কিন্তু বিএ পড়বার সময়ই দিলাম কলেজ ছেড়ে।'

—'ছাড়লে কেন! সেটা ভালো করনি অজয়।'

—'সে কী আজকের কথা! তাবপর বারো-তেবো বছর কেটে গেল।' একটু চুপ থাকিয়া—'জীবনের এক কোণে একান্ত বৈষয়িকতা যে কত সুন্দর সুফল পায় তখন তো তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারতাম যদি—'

দুজনেই হাঁটিতে লাগিল।

অজয়—'ইচ্ছে হল পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষটা ঘুরে আসি, অমনি চললাম গেরুয়া পাঞ্জাবি আর কাপড় পড়ে, গেরুয়া পাগড়ি মাথায় এঁটে, কত জায়গায় গেলাম, সেতুবন্ধেই আটমাস।'

—'ও বাবা, সেই রামেশ্বর, অদ্দূর গিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ, তখন তো খুব ভালো লেগেছিল এসব। পথে পথে দিনরাত্রিব আগমন ও বিদায়কে মানুষেব জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয় বৈষয়িক বিষয় আড়ম্বব ঢেব বেশি সুন্দর জিনিস। আগেকার সেসব উৎসবের জিনিসের স্মৃতিও এখন কদাকাব হয়ে আসে।'

—'মাস্টারি পেলে না তাহলে?"

—'না।'

—'একেবারে চুপচাপ বসে আছ?'

—'না, কাপড়কাচা সাবান তৈরি করতে শিখেছি, একেবারে ভালো কবে শিখিনি অবিশ্যি।

—'তারপর?'

—'যদ্দুব শিখেছি মন্দ নয়, কাজ চলে যায়।' বলিয়া অজয় হাসিতে লাগিল।

—'কি কব, সাবান বানিয়ে বিক্রি কব?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

—'একটা পুঁটুলিতে ভরে নিয়ে আগে আমাদের বাড়ির চাকব চিন্তাহবণকে দিতাম, খাওযা-দাওযাব পব দুপুববেলা পাড়ায় পাড়ায় যাতে বিক্রি কবে আসতে পারে। কিন্তু দেখলাম তাতে ব্যবসা চলে না। নিজের মনেব বিলাসিতা নিজেকে সংকুচিত করে বাখে, বাড়ির লোককে অপ্রসন্ন কবে, কাজেই এবাব নিজেই বাড়ি বাড়ি ফিরি কবে বেড়াই।'

—'রোজ?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিরকম লাভ থাকে?'

—'মাসে গিয়ে বারো-চোদ্দ টাকা হয়।'

—'নির্মলা জানে এইসব?'

—'না।'

—'এই সাবান বিক্রি, রোজগারের আর কোনো পথ খুঁজে পেলে না বুঝি?'

—'চোদ্দটা টাকা তো উপায করি মাসে—এরকম কবে জীবন চালাচ্ছি বলে অনেকে দযা করে আমার মনুষ্যত্বকেও স্বীকার কবে নেয়।' নিজের পকেটের থেকে একটা বিড়ি বাহির করিয়া জ্বালাইযা লইযা অজয—'কিন্তু কি জানেন, রাজুদাদামশাই, এই তুচ্ছতাব ভিতর আটকে থেকে আমার হৃদয়ের ঢের ক্ষতি হল।'

—'কোন হিসেবে?'

—'সে এক হিসেব আছে সংসাবেব অধিকাংশ লোকই তা বুঝবে না। কাজেই আমাব বেদনাব কথা মানুষের কাছে আমি বলতে ভয পাই।' একটু চুপ থাকিযা—'কিন্তু যাবা মনে করে এ সাবানেব ব্যবসা দিযে শুরু করে ক্রমে ক্রমে নানাবকম ব্যবসায আমি ফেঁপে উঠব, তাবা আমার ভিতরটাকে বোঝে না। সংসাবে অকৃতকার্য হতেই আমি এসেছি।' আবাব একটু চুপ থাকিযা বলিল—'কিন্তু হৃদয নিয়ে নানারকম বিচিত্র ও সুন্দর খেলার একটা দাম থাকত যদি, তাহলে আমার জীবনটা একেবারে ঐশ্বর্যহীন ছিল না।'

রাজচন্দ্র—'কিন্তু তাই-বা বুঝি কীসে?'

—'কেন রাজুদাদামশাই?'

—'এমন বিচিত্র সুন্দর হৃদযই যদি তোমার থাকত, তাহলে এই যে ধর্মসাক্ষী করা বউ তোমার এতদিনের পরিচযের পর তোমার কাছে আব আসতে চায না!'

অজয—'ও, সেই কথা?'

—'কিন্তু কথাটা তো কম নয।'

অজয চুপ কবিযা বহিল।

রাজচন্দ্র—'এই তো তিন বছব হল তোমাকে ছেড়ে গেছে নির্মলা।'

—'হ্যাঁ, তিন বছর।'

—'দু-বছর ধবে একখানা চিঠিও তো লেখে না।'

—'না।'

বাজচন্দ্র-'ডাকবাংলো আব কতদূবে?'

অজয চারিদিকে একবাব তাকাইযা কহিল—'এখনো আধ ঘণ্টা হাঁটতে হবে।'

—'এতই দূর!'

অজয—'কথা বলতে বলতে ভুল পথে এসে পড়েছিলাম।'

বাজচন্দ্র লণ্ঠন তুলিযা একবাব নিস্তব্ধ পথেব সমুদ্রেব দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'আচ্ছা।'

—'হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে আপনাব বাজুদাদা?'

রাজচন্দ্র মাথা নাড়িযা—'বোজ সকালে বিকালে পাঁচ সাত মাইল, হাঁটা আমাব অভ্যাস।'

—'এত বযসেও? শবীরেব স্বভাবটা আপনাব বেশ সুন্দর তো রাজুদা। বাঁচবেন অনেক কটিদিন।'

—'এক এক সময মনে হয বিধাতা বাঁচালেনই শুধু, আব বিশেষ কিছু হল না।'

—'ছেলেপিলে নাতি-নাতনি নিয়ে বেশ আছেন তো আপনি।'

রাজচন্দ্র মাথা নাড়িযা—'আছি।'

—'তবে আব কি?'

—'না, এমন বিশেষ কিছু নয। কিন্তু শেষপর্যন্ত অতৃপ্ত হওযাই মানুষেব অভ্যাস। মনে হয যেন সমস্ত নষ্ট হযে বসে আছি।'

দুজনেই চুপ কবিযা খানিকক্ষণ হাঁটিতে লাগিল।

অজয—'আপনি যে এলেন নির্মলা জানে তো?'

—'বা, সেই-ই তো আমাকে লুচি মোহনভোগ পটলভাজা তৈবি কবে দিল।'

—'কখন?'

—'আসবাব সময, পথেব জন্য। নিজের হাতে সন্দেশ তৈরি কবে দিল।'

অজয় মাথা হেঁট করিয়া হাসিয়া—'বুড়োমানুষ আর তার নাতনির বয়সী মেয়েমানুষের সঙ্গে এরকম প্রীতির সম্বন্ধ আমার ভারী সুন্দর লাগে।' বলিয়া অন্ধকারের মধ্যে নিজের মনে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

—'আমি তাকে নিয়ে আসতে চাইলাম।'

—'তাও চেয়েছিলেন বুঝি?'

—'বললাম, তিন বছর বাপের বাড়ি আছ, এখন চলো দিদি শ্বশুরবাড়ি যাই।' অজয় হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল—'বাতির তেল ফুরিয়ে গেল নাকি বাজুদা?'

—'না।'

—'কেমন ম্যাট ম্যাট করছে যে। দাঁড়ান, আমি উসকে দেই।' ফিতা উসকাইয়া দিয়া লণ্ঠনে একবার ঝাঁকুনি দিয়া অজয়—'না তেল ঢের আছে।'

বাতিটা রাজচন্দ্র হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—'তিন বছর বাপের বাড়ি রয়েছ দিদি, এখন শ্বশুরবাড়ি চলো, নির্মলা বললে—'শ্বশুরবাড়ি তার শরীর ভালো থাকে না।'

রাজচন্দ্র হাঁটিতে হাঁটিতে—'আমি বললাম,—'মেয়েমানুষের শরীরের কি মূল্য, সিঁথিতে সিঁদুর মেখে বাইরে যে সৌন্দর্য ও পরিতৃপ্তির বিকাশ তার ভিতরের বিচিত্র ইতিহাস নিয়েই তো নারীর জীবন।'

দুজনেই নিঃশব্দে হাঁটছিলেন।

রাজচন্দ্র অনেকক্ষণ পরে—'আমার কথা শুনে নির্মলা বড় ছেলেমানুষি করলে, বললে বুড়োমানুষ হয়েছেন, চোখ অস্পষ্ট, কিন্তু বিচার কল্পনার অন্ধতাও আপনার এইরকম। আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রাজচন্দ্র—'নির্মলার মুখের দিকে বিমূঢ়ভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চশমা জোড়া পকেটের থেকে বের করে নিয়ে পরলাম। যা আঁচ করেছিলাম তাই, না আছে হাতে নোয়া, না আছে সীমান্তে কপালে কোথাও এক ফোঁটা সিন্দুর। শাড়ি তবু বিধবার মতো নয়, বেশ দামি বেনারসি, হাতে চারগাছা সোনার চুড়ি।' হাঁটিতে হাঁটিতে বলিলেন—'কুমারী নয় এয়োস্ত্রীও নয়, নির্মলা কি যে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এ জীবনে তুমিও কোনোদিন বুঝতে পারবে না অজয়।'

ডাকবাংলোর বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক গভীর রাত অবদি অনেক কথা ভাবিবার পর নির্মলার কথা মনে হয় আবার রাজচন্দ্রর,—মনে হয়। শেষ পর্যন্ত অনেক দুঃখ আছে নির্মলার। ছোকরাটা সারাটা জীবন বসিয়া করিবে বেদনাবিলাস, কিন্তু নগ্ন বেদনায় পচিবে এই মেয়েটিও। একদিন ইহার বাবা মা ভাইবোন সকলেই ইহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। এ দেশের সমাজ ও মানুষ ইহার এই জীবনের ব্যবস্থাকে অসুন্দর ও অমানুষিক বলিয়া পদে পদে ইহাকে কণ্টকিত করিয়া ছাড়িবে, তারপর একদিন নিরুপায় হইয়া নিজের জীবনের গ্লানি নির্মলা আরো অনেক বাড়াইয়া তুলিবে হয়তো। কিংবা, কে জানে, অপ্রেম, অরুচি, অধর্ম লইয়া স্বামীর ঘরে থাকিলেই হয়তো গ্লানি বাড়িত সবচেয়ে বেশি— প্রেম আকাঙ্ক্ষা ও দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা যেখানে গিয়া মিটিবে তার সেইখানেই প্রসন্ন সুন্দর নারীদেবতার আসন অনুপম হইয়া উঠিবে।

রাজচন্দ্র এইরকম মনে করিলেন।

লোকসানের মানুষ

সনাতনেব কথা আজও মনে পড়ে আমার। আমাদের বাসায় সাত আট টাকা মাইনায় চাকরের কাজ কবিত। খুব কঠিন কাজের ধকল সহ্য কবিবাব মতো শরীর ছিল না তাহার। রোগা পাকসিটে ধবনের চেহাবা। আমাব অনেক সময সন্দেহ হইত, সনাতনেব ভিতরে ভিতবে কোনো অসুখ আছে নিশ্চযই, হয়তো ক্ষয়রোগ আছে। আমার বযস তখন বেশি ছিল না, দেশেব বাড়িব হাই ইস্কুলে পড়িতাম, অবিশ্যি উঁচুদিকের ক্লাসে।

মাঝে মাঝে জ্বব হইত, দু-চার দিন আট-দশ দিন কামাই দিত সে। ওই যে যেখানে মজুমদার বাবুদের পরিত্যক্ত ভাঙাচোরা একতলা দালানটা, ইট বাহির হইয়া পড়িযাছে, দেওযাল ধসিয়া গিযাছে বনচাড়াল ও শিয়ালকাঁটাব ভিতব দালান যাইতেছে ঢাকিযা। বড় বড় বাজ গোখুরা সাপ, ফুটা পাইলে বাঁধিযাছে বাস, তারই পাশে বস্তবড় বাঁশের জঙ্গলের ছাযায সনাতনেব ছোট্টখড়েব একচালাটা। মজুমদাব বাবুদের বাসায যখন সে কাজ করিত তখন তাহারা ইহার জন্য ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ির থেকে প্রায় আধক্রোশ দূবে একটু বনজঙ্গলেব ভিতব এইসব। অসুখ-বিসুখ হইলে সনাতন এইখানেই গিযা পড়িয়া থাকিত, মাঝে মাঝে গিযা তাহাকে দেখিযা আসিতাম আমবা। আজও মনে আছে সনাতনেব আস্তানা লক্ষ্য করিযা হাঁটিতে হাঁটিতে দুপুবেলাই দিনের আলো ডালপালার ছাযা ও অন্ধকাবে ভবিযা উঠিযাছে দেখিতাম। সনাতনেব ঘবের পাশে মযনাকাঁটা শিযাকুল ফণিমনসা জঙ্গলেব ভিতর হইতেই আম পেযাবা পাতাব খচমচ শব্দ শোনা যাইত, যেন কত কী পাখি চবিযা বেড়াইতেছে, ওইসবেব ভিতব, নবম নিহিত ভাটফুল ও বনমল্লিকাব গন্ধেব স্ফূর্তিও মনে আছে আমার।

আমাব চোখেব আড়ালে। হ্যাঁ, সেইখানেই সে পড়িয়া থাকিত। এর স্ত্রীকে বড় একটা খুঁজিযা পাওযা যাইবে না। সাবাদিন সে কোথায থাকিত, বিধাতাই জানেন। সনাতনের এবকম অসুখ-বিসুখেব সমযেও একদিন এক মুহূর্তেব জন্যও স্বামীব বিছানা বা শিযবেব পাশে মেযেমানুষটিকে দেখি নাই আমি, দেখিতাম শুধু তিন-চার বছবেব একটি ছেলেকে, সনাতনেব ওই এক ছেলে শুধু দেখিতাম ঘবেব মেঝেব ভিতব ছোট ছোট গর্ত করিযা জল ঢালিযা পাতা ছিঁড়িয়া নিজেব মনে একা একা খেলা কবিতেছে ছেলেটি। কিংবা বাপেব শিযবে বসিযা হাতপাখা তুলিযা আস্তে আস্তে বাতাস কবিতেছে। সনাতনের বড় জ্বরেব সময। কিংবা বনজঙ্গলেব কখনো কুল, কখনো কামরাঙা, বঁইচির ফুল, কখনো নাটাফল খুঁজিযা বেড়াইতেছে।

অবাক হইযা ভাবিতাম, সাপে কামড়ায না। সনাতন বলিত, ছেলের হাতে তাব সিদ্ধ পুরুষেব দেওযা তাবিজ বহিয়াছে, উহাব কোনো ক্ষযক্ষতি হইবাব নহে। সেদিন বিস্মিত হইযা ইহাই বিশ্বাস কবিযাছিলাম। কিন্তু আজ মনে হয দৈব ইহাকে দযা করিযা ছাড়িয়া দিযাছিল, কোনো কোনো জীবনেব উপব এইরকম অনুগ্রহ তাব। তাহাদিগকে বাঁচাইযা বড় কবিযা তোলে সে, জীবনেব বেদনাকে বুঝিযা লইবাব জন্য। আমাদের বাসায বড় একটা আসিত না সে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতাম—'তোমাব ছেলেকে কোথায বেখে এলে সনাতন?'

—'বাসাযই আছে।'

—'একা?'

—'একাই তো।' গলা খাকবাইযা ধবা গলায বলিত—'তাবিজ আছে সঙ্গে।'

মাদুলি-তাবিজে তখন আমাদেব খুব বিশ্বাস থাকিলেও ছেলেবেলাযও ওই ভয়াবহ জঙ্গলের ভিতব তাবিজমাত্র সম্বল শিশুটিকে খুব সুবক্ষিত বলিযা মনে হইত না আমাদেব। এখন যখন কিছুই বিশ্বাস করি না।

চিরকালই দড়ির মতো শবীব সনাতনের। মাঝে মাঝে অসুখও লাগিয়াই থাকিত। আমাদেব মস্তবড় সংসাবেব খাটুনিও অনেক, নানাবকম বিচিত্রতাও তাহাব ভিতব ঢের। কিন্তু তবুও দেখিতাম সকালবেলা অন্ধকার থাকিতে আসিয়া অনেক গভীব রাত অবদি সনাতন নিরবচ্ছিন্নভাবে খাটিয়া সমস্ত কাজ শেষ কবিযা দিয়া যায, কোথাও কোনো খোচ থাকে না।

একই মানুষ উনুন ধরায, বাজাবে যায, জল টানে, মাছ তরকারি কোটে, বাটনা বাটে, বাসন মাজে,

কাপড় কাচে। আরো কত কী করে সনাতন, সামর্থহীন শরীরে প্রায় বছব দশেক ভরিয়া আমাদের বাড়িতে সে যে নিষ্ঠার গল্প শুরু ও সমাপ্ত করিয়া শেষ করিয়া গিয়াছে তাহা স্নিগ্ধ সুন্দর অবর্ণনীয়।

মানুষটি নিজে ছিল অবিশ্যি জীবনের বিরস অন্ধকার পথের পথচারী। জীবনের ভিতরে উৎসবের কলরবের পাশে আসিয়া বসিতে সে খুব দ্বিধাবোধ করিত। বসিত খুব কুণ্ঠিত হইযা। আনন্দেব ধ্বনি যে তাহার জন্য নয় সে যে প্রতিধ্বনি শুনিতেই পৃথিবীতে আসিয়াছে এই ব্যর্থতা বোধই হযতো তাহাকে সবচেয়ে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। এমনই যে আমাদের সংসারে ঘটা করিয়া যখন কাহাবও বিবাহ হইত, সনাতনকে খুঁজিযা পাইতাম না। নরনারীব মিলন যেখানে সুন্দর ও মধুর।

এক-একদিন মা বলিতেন—'তারপর সনাতন?'

—'আজ্ঞে বলুন।'

—এমন গোঁজ হয়ে বসে আছ যে?'

সনাতন হাসিবার চেষ্টা করিয়া নিজেই ধরা পড়িয়া যাইত,—সে যেন কেমন এক ধরনেব হাসি। বলিত—'আপনাদের চোখেই যত ধরা পড়ে মাঠাকরুন, আমি নিজেই তো বেশ আছি।' বলিযা আবার হি হি করিযা হাসিত—এইবার কলরব করিযা। কিন্তু আওয়াজ ফুটিয়া মাত্রই বসিয়া যাইত। তাকাইযা দেখিতাম রান্নাঘরের চালের বাতায হাত দিয়া ডোবাকাটা গামছা কাঁধে কে এক কংকাল দাঁড়াইযা আছে, হাসিতেছেও অপার্থিব ধরনে—যেন দিনের মধ্যে কযেকবার করিয়া বৈতরণী ইহাব অভ্যাস।

—'তোমার বউ এখন কোথায সনাতন?'

কোনো জবাব দিত না।

—'বাসায আছে বুঝি?'

—'মাঠাকরুন, বাসায থাকা তার অভ্যাস নেই।'

—'কোথায থাকে?'

—'ভগবান জানেন।'

—'তুমি গিযে তাকে খুঁজে নিযে আসতে পাব না?'

—'কি দবকার আমাব?'

—'এ কথা কেন বলো সনাতন?'

—'আসবার যখন ইচ্ছে নেই তার তখন তাব উপর জুলুম করে কী লাভ? মা একটু চুপ থাকিযা বলিতেন—'ইচ্ছে নেই?'

সনাতন মাথা নাড়িযা বলিত— 'না।'

আবার একটু চুপ থাকিযা মা বলিতেন— 'ইচ্ছে নেই যে তা তুমি কী কবে বুঝলে সনাতন?'

সনাতন—'তা আমি খুব সহজেই বুঝতে পাবি।' সনাতন একটু খুক কবিযা কাশিযা— 'আমাকে যা ভাবেন মাঠাকরুন, তা আমি নই, রোগা মানুষ কাজ ক..ত কষ্ট হয়। কিন্তু আমি নির্বোধ নই।'

হ্যাঁ, তা আমরা জানতাম, সনাতন নির্বোধ ছিল না। একবাবেই না।

—'কোথায় থাকে সে?'

—'কে? বিলাসী?'

নাম তাহার বিলাসীও বটে। প্রথম যেদিন শুনিলাম, সনাতনেব দিকে একটু বিক্ষুব্ধভাবে তাকাইযাছিলাম। এই লোকটির বধূর নাম বিলাসী? নামটা সেদিন ভালো লাগিযাছিল। আজও বেশ লাগে। বিলাসী, বেশ নাম। কিন্তু তবুও এইবকম সনাতন।

সনাতন—'বিলাসী মদনগোপালেব আখড়ায় যায।'

—'ওঃ, বোষ্টমী হযেছে?'

—'না, হযনি এখনো'—

—'হবে বুঝি?'

—'তা হতে পাবে।'

—'বোষ্টমী হযে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।'

সনাতন একটু শুষ্ক হাসি হাসিযা—'মাঠাকরুন, ছেড়েছে সে কি আমাকে আজ?'

—'তাও তো বটে—তাহলে আখড়ায যায়,—ইদানীং যাচ্ছে?'

—'আজ্ঞে না দু-তিন বছর ধরেই যায।'

—'তোমাদের বিয়ে-বা ক বছর ধরেই হয়েছে?'

—'বছর দশেক।'

—'বিয়ের পর কয়েকটা বছর কাছে কাছেই থাকত তোমার?'

সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল—'না। মাস-ছয়েক চির। তাবপব থেকেই নানারকম প্রবৃত্তি হল তাব।'

চুপ করিয়া ছিলাম সকলে।

মা বলিলেন—'এবার যে আখড়ায় গেল, সেবাদাসী হতে?'

—'তা একটা কিছু হতে পারে।'

—'তুমি বললে এখনো ফোঁটা তিলক কেটে ফিট্ বোষ্টমী হয়নি?'

—'আজ্ঞে না মাঠাকরুন, সে সব এখনো মনের ভিতর নাড়াচাড়া করছে ওর । এমনি সুতির শাড়িই পরে সে, মাছ খায়, সাধারণ মেয়েমানুষেব মতোই। আমাদেব ঘরের পাশে কযেকটা তুলসী গাছ আছে—ঝোপজঙ্গলের চাপে গাছগুলো মারা যাবারই জোগাড়। কিন্তু কই বিলাসীর সেদিকে কোনো নজর তো দেখলাম না।' খুক করিযা কাশিয়া সনাতন—'হতে পারে হয়তো সেবাদাসী, কিন্তু সে হল ওর ধর্মের কথা, ওব ভালোবাসার কথা নয় তো।'

—'আখড়াব কাউকে ভালোবাসে বুঝি?'

—'বলতে চান গোঁসাইযের কাউকে?'

—'হ্যাঁ।'

সনাতন প্রবলভাবে মাথা নাড়িযা—'না না না—আখড়াই ওর ধর্ম। বিলাসীর মন মাঠাকরুন অন্য জাযগায।'

চুপচাপ।

মা বলিলেন—'স্বামীকে যে পরিত্যাগ করে তাব আবাব ধর্ম!'

শুনিযা খুশি হইল না সনাতন,—'ওর উপব অবিচাব কববেন না।' গলা খাকরাইযা লইযা বলিল—'আমি কি স্বামী হবাব মতন একজন মানুষ! তা আমি নই।' বিবাহ করিলেই মানুষ হয স্বামী না হয স্ত্রী বলিযা পবিচয পায, সেদিন এ ধারণা ছিল। সনাতনের এই কথা শুনিযা তাক লাগিযা গেল।

সনাতন—'দেখছেনই তো ভিজে বিড়ালেব মতো চেহাবা, কখানা হাড় আছে শুধু, আমি হাসি যখন লোকে বলে মড়া মানুষ হাসছে।' একটা হাই তুলিযা—'বিলাসীব মতন অমন সুন্দর স্ত্রীলোক কি কবে থাকে আমাব কাছে?' এ কথাব তাৎপর্য সেদিন খানিক বুঝিযাছিলাম।

সনাতন—'স্বামীব মতন উপযুক্ত এ বাড়িব বাবুবা, আমি তো একজন লোকসানেব মানুষ মাঠাকরুন।'

—'সুস্থ সুন্দব নাবীই কী সব সনাতন? কিন্তু বিলাসী তোমাদেব খুব সুন্দব নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বযস কত হবে?'

—'আঠারো বছবে বিযে হযেছিল বিলাসীব, এখন আটাশ হবে।'

মা—'থাক, মানুষ হিসেবে তোমাকে না চিনে বিলাসী ভেগে পড়ল সেটা কি উচিত হয়েছে তাব? তোমার স্ত্রী হযে'—

সনাতন মাথা নাড়িযা—'ভুল আমাবই হযেছে, তাব কোনো অপবাধ নেই।'

—'কি রকম?'

—'আন্নাকালীকে দেখেছেন মা?'

—'কুমোর পাড়াব?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'দেখেছি বইকী।'

—'তাব সঙ্গেই বিযে হওযা উচিত ছিল আমাব।'

মা হাসিযা—'কেন?'

—'অত্যন্ত কদাকার দেখতে মেযেটি, দেখেছেন তো আপনি। সেই জন্য আজও বিযে হল না তাব। কিন্তু মানুষকে মানুষ হিসেবে চেনার কথা যা আপনি বললেন তা এই মেযেটি যেমন'—বলিতে বলিতে থামিযা গেল সনাতন।

মা—'চুপ করলে যে?'

সনাতন মাথা নাড়িয়া—'না, মিছেই বলছি এসব। স্ত্রী এসে আমার ভিতরের খবর নেবে, আমাকে সহানুভূতি মমতা করবে সে সবদিয়ে কি দরকার মাঠাকরুন? সুন্দরী বিয়ে করতে পেরেছিলাম। সেই বালাই নিয়ে আমি চিরকাল টিকে থাকতে পারব।'

হাসিয়া একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ল সনাতন।

. আমরা চুপ করিয়া ছিলাম সকলে।

সনাতন—'শুধু কি রূপে? এই যে আন্নাকালীর কথা বলছিলাম, তার চেয়ে মানুষকে একটুও কি কম ভালোবাসার ক্ষমতা বিলাসীর? দয়া একটুও কম?'

মা অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া—'তার দয়া-মায়া প্রেমে তুমি তো শতমুখ সনাতন, কিন্তু সে তো তোমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করল।'

—'কিন্তু দ্বিজেনকে বিলাসী যা ভালোবাসে তা নিজের চক্ষে দেখলে এ মেয়েটির সম্বন্ধে আপনাদের খুব উঁচু ধারণা হতে পারত,—হত আপনাদের।'

মা খুব সহানুভূতির মানুষ, এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। এইবার উঠি উঠি করিতে লাগিলেন। তবুও বসিয়া থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—'দ্বিজেন কে?'

—'দ্বিজেন জাতে হচ্ছে হাঁড়ি, থাকে মশানের কাছে।'

—'তার সঙ্গেই বিলাসীর এত ভালোবাসা হল?'

—'হাঁড়ির কাজ তো সে এখন করে না, একটা ছোট্ট পান-বিড়ি দেশলাইয়ের দোকান আছে তার, লেখাপড়া শিখে রুচিবৃদ্ধি আজকাল আগের চেয়ে ঢের ভালো হয়েছে দ্বিজেনের।

'পরের স্ত্রীকে নিয়ে যে এইরকম খেলা খেলে তার লেখাপড়া পাঠশালায় থাকতেই চুলোয় গেছে সনাতন।'

সনাতন একটু হাসিয়া বলিল—'মনে করতে পারেন তাই, কিন্তু আমি তা মনে করি না। দ্বিজেন অনেকদিন আমাকে ডেকে বলেছে তোমার জন্য বড় দুঃখ করে সনাতনদা। আমি এ দেশ থেকে পালিয়ে চলে যাই?'

মা একটু চুপ থাকিয়া—'তুমি কি জবাব দিয়েছ সনাতন?'

সনাতন—'আমি বলেছি ঢের ঢের মজা দেখালি তো তোরা দুজন, যা এখন আর নকশা করিস না। দ্বিজেনের পিঠ চাপড়ে বলে দিয়ে এসেছি, তবুও যা হোক, তোমার মতন মানুষের কাছে গেছে বিলাসী, এর চেয়ে ঢের খারাপ অদৃষ্টও তো তার কপালে থাকতে পারত।'

—'কি রকম?''

—'এই ধরুন আমার কাছে যদি তাকে থাকতে হত।'

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল আবার।

মা চোখ তুলিয়া—'দ্বিজেন দেখতে কেমন?'

—'তা আর জিজ্ঞেস করেন কেন মাঠাকরুন, চেহারার ভিতর একটা মাধুর্য না থাকলে মেয়েমানুষ কেন তার কাছে যাবে? এই পৃথিবীতে তো অনেক ভালোবাসার কাহিনী আছে—রূপ তাদের প্রাণ দিয়েছে।'

—'তাহলে সে ছেলেটি বেশ সুন্দর?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, রং ফরশা নয়, লম্বা একহারা গড়নের মধ্যে বেশ সুন্দর মানুষ।'

—'থাক বাজে কথা সব সনাতন, আমরা ভাবি তোমরা কি নীচের স্তরে, মানুষের ওপরের খোলস নিয়ে ব্যস্ত।'

সনাতন কোনো জবাব দিল না।

মা বলিলেন—'আচ্ছা, এই যে দ্বিজেন পালিয়ে যেতে চায়, বিলাসীকে সে কি ভালোবাসে না?

সনাতন একটু হাসিয়া—'এরা দুটি যে মানিকজোড় মাঠাকরুন।'

—'তবে পালিয়ে যেতে চায় যে বল।'

—'সব সময় তো পালিয়ে যেতে চায় না। এক এক সময়, যখন অনুশোচনা হয়। আজও সব পুরোপুরি শেখেনি দ্বিজেন, এক এক সময় অনুতাপকে তার সত্য মনে হয়, ভালোবাসাকে মনে হয় কলঙ্ক, মিথ্যা, আগুন নিয়ে খেলা।'

—'কলঙ্কই তো করছে দ্বিজেন।'

—'আমি তা স্বীকাব কবি না।'

—'কেন?'

—'বিয়ে কববাব পব বছব ঘুবতে না-ঘুবতেই বিলাসীব অবস্থা যদি দেখতেন না কেঁদে পাবতেন না আপনাবা কেউ। সেই সোনাব শবীব পুড়ে কালো হয়ে গেছে। মাংস বক্ত শুষে নিয়ে শবীবেব হাড় কখানা ধকধক কবছে শুধু। সাত বুড়ীব এক বুড়ী। দেখে আমাবই এক এক সময় ঘেন্না ধবে যেত' খাওয়াই-দাওয়াই, সেবা শুশ্রূষা কবি কিছুতেই কিছু না।'

—'কোনো অসুখ-বিসুখ কবেছিল?'

—'কিছু না মাঠাকরুন—বাঁশ জঙ্গলেব পিঠে আম গাছে তিনবাব গলায় দড়ি দিতে গেল—তিনবাব ধবে ফেললাম।'

—'কেন গলায় দড়ি দিতে যাওয়া কেন?'

—'জীবনেব প্রতি শ্রদ্ধা নেই আব।'

—'ঝগড়াঝাটি হয়েছিল তোমাব সঙ্গে?'

—'এক মুহূর্তেব জন্যও না। বিলাসীকে বিয়ে কবে যত সহিষ্ণুতা সংযম শিখতে হয়েছে বিধাতা নিজে নেমে এলেও তা অর্ধেক শেখাতে পাবতেন না।' একটু চুপ থাকিয়া সনাতন।

—'শেষবাব যখন গলায় দড়ি দিতে গেল, সেদিন ছিল কৃষ্ণাঅষ্টমী, অনেক বাতে চাঁদ উঠেছে, আমি ঘুমিয়েছি ভেবে ঘব থেকে বেবিয়ে গিয়ে আম জঙ্গলেব দিকে চলে গেল।' খানিকক্ষণ নীবব থাকিয়া সনাতন—'পিছনে পিছনে গেলাম আমি, আমগাছেব ডালপালাব নীচে বিলাসীকে ধবে ফেলে বললাম—'খুলে বলো সব। সে কাঁদতে লাগল।' সনাতন—'তাবপব এই দ্বিজেন। আমি কোনো বাদ সাধতে গেলাম না। এ ভালোই হল। আমি যে কতবড় নিস্তাব পেয়েছি, আপনাদেব বলে বুঝাতে পাবব না।' স্নেহমমতায় বিচলিত হইয়া সনাতন—এখন একদিন দেখে আসবেন বিলাসীব চেহাবা, অমন সুন্দব মেয়েমানুষ কলকাতায়ও আমি দেখিনি—এসব ঝাঁকড়া পাড়া গাঁ—'বলিয়া পবিতৃপ্ত হইয়া সকলেব দিকে তাকাইল সনাতন, বোধ হইল মনে তাব একটু অহংকাব হইয়াছে যেন।

মা বলিলেন—'নিজেব স্ত্রীব কাহিনী তুমি এইবকম কবে বলো সনাতন' তুমি কী বকম লোক'

সনাতন কোনো জবাব দিল না। জবাব দিবে কি সে? তাহাব চোখ মুখেব দিকে তাকাইয়া মনে হয় সবচেয়ে আত্মবক্ষাহীন সুন্দব সুপবিচিত জবাব দেওয়া হইয়া গিযাছে, বলিবাব কিছু নাই এখন আব।

মা—'বিলাসীকে তাহলে স্ত্রী হিসেবে দেখবে না?'

সনাতন মুখ তুলিযা তাকাইল।

—'দেখতে অনেকটা নিজেব মেয়েব মতন।'

সনাতন—'কেন, স্ত্রীব ভালো কি মানুষ চাইতে পাবে না?'

—'তা পাবে বটে, কিন্তু স্বামীব কাছে থেকে তাব ঐশ্বর্য বাড়ুক, এই তো মানুষে চায়'—

—'আমি তো আগেই বলেছি আপনাকে, স্বামী হবাব মত যোগ্যতা আমাব নেই।'

—'কেন, তুমি তো চাকবি-বাকবি কবছ, নিজেব ঘবদোবও আছে, শুনেছি মজুমদাববাবুবা তোমাকে ওই দবদালানে জাযগাটুকু দিয়ে গেছে সব।'

—'তা দিয়েছেন তো ঢেব।'

—'তবে আব কী, স্বচ্ছলতা তো তোমাব কম নেই।'

সনাতন চুপ কবিযা বহিল।

মা বলিলেন—'বড় হলে অবিশ্যি দেখিনি, কিন্তু ছোট্ট যখন ছিল বিলাসীকে আমিও তো দেখেছি, ওব রূপ। বাবা ভিখ কবে খেত, তোমাব কাছে গিয়ে ওব সাংবাবিক বিধি ব্যবস্থা ভালো হয়েছিল।'

—না, তাও ভালো হয়নি, বিলাসী যা মেয়েমানুষ, আমাব মনে হত বাজাব বাড়িতে গেলেই ওকে মানায়।'

—'এমনি ঠাট?'

—'না, বিলাসীব ঠাট নয়, আমাব মনে আফশোস।'

মা একটু চুপ থাকিয়া—'দ্বিজেনেব কেমন চলছে?'

—'টাকাকড়িব বড্ড টানাটানি মাঠাকরুন, বিড়িব দোকানটাই ভালো কবে চলে না, মশানেব কাছে একটু জমি ছিল তাও বিক্রি কবে ফেলেছে—মানুষেব সহানুভূতি পায না। লোকে বলে তুই পবেব স্ত্রীকে

বেব কবে নিযেছিস যে বে হাবামজাদা!'

—'লোকে তো সত্যি কথাই বলে।'

—'সেই জন্যই দ্বিজেন সেদিন আমাকে ডেকে বলেছিল 'এবাব আব একলা পালানোব প্রস্তাব নয সনাতনদা, বিলাসীকে নিয়ে যদি চলে যাই তাতে তোমাব আপত্তি আছে?'

—'এই বলেছিল নাকি দ্বিজেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আস্পর্ধা তো কম নয তাহলে।'

সনাতন একটু হাসিযা—'এই সব হৃদযেব ব্যাপাবে একজন যখন আব একজনকে পবিত্যাগ কবে দু-মাইল দূবে থাকতে পাবল—তখনই তো দু-হাজাব দশ হাজাব মাইল দূবে চলে গেছে।' বলিযা মুখ তুলিযা মাযেব দিকে তাকাইযা সনাতন—'তিন তিন বাব যে গলায দড়ি দিতে গিযেছিল সে তো একদিন মৃত্যুব দেশেই গিযে পৌছত, এখানকাব থেকে সে তো অনন্ত ব্যবধানেব পথ হত তাহলে। বিলাসীব পক্ষে এদেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চাওযাব ইচ্ছা অশ্রদ্ধাও নয, নিবাশাও নয, গুছিযে সাধ কবে সংসাব পাতবাব ইচ্ছা।'

মা একটু ভাবিযা—'বিলাসী যেতে চায?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি বললে তুমি দ্বিজেনকে?'

—'এখনো কিছু বলিনি, টাকাকড়ি কিছু নেই ওদেব, দূবে যাবে ভবসা হয না।'

—'তাবপব?'

—'তাবপব এখন তো বসে বসে আধপেটা খাচ্ছে আব লোকেব লাঞ্ছনা সহ্য কবছে।'

—'তাও কি তুমি বলো সনাতন যে মানুষ এমন মুখ বুজে ক্ষমা কববে?'

—'আমাব চেযে আঘাত কাব বেশি লেগেছে,—কিন্তু তবুও' বলিতে বলিতে সনাতন থামিযা গেল। একটা ঢোক গিলিযা—'দ্বিজেনেব বিড়িব দোকানেব আশেপাশে যাবা থাকে, তাবা তো চব্বিশ ঘণ্টা দেখছে, কত খুঁটিনাটিতে দ্বিজেনকে কি গভীবভাবে ভালোবেসে চলেছে বিলাসী। অসচ্ছলতায যে ভালোবাসা ও ঘুচল না, কলঙ্কে মবল না, নিজেব সন্তানেব দিকে তাকিযে দমল না, নানাবকম নিত্য-নতুন প্রলোভন তাকে একচুলও টসকাতে পাবল না, তাব এ জিনিসটা সাধনা ও সৌন্দর্য মনে না কবে উচ্ছিষ্ট ও কলঙ্ক বলে মনে কবে কেন তাবা, ভাবী অস্বাভাবিক দুর্বৃত্ত লোক সব। কিন্তু পৃথিবীটাই এইবকম। শকুনেব সঙ্গে মানুষেব সম্পর্ক ঢেব বেশি, দেবতাব সঙ্গে ঢেব কম।'

এমনি কবিযা দিনেব পব দিন কাটিযা গেল।

একদিন মা বলিলেন—'বিলাসীবা এখানে আছে এখনো সনাতন?'

—'আছে।'

—'কেন গেল না কোথাও?'

—'না। টাকাকড়ি নেই যেতে সাহস হচ্ছে না।'

—কেন, তুমিই কি যেতে দেবাব কর্তা নাকি?

—'হ্যাঁ অনেকটা কন্যাকর্তাব মতোই যায।' বলিযা সনাতন ঢোক গিলিযা কাশিযা খানিকটা হাসিযা লইল।

—'তা টাকা নেই, টাকা তুমি দিলেই পাব।'

—'আপনিও তো বেশ মাঠাকরুন, এই সেদিন বিলাসী আব দ্বিজেনকে গালাগাল দিলেন, আব আবাব টাকা দিতে বলছেন,—সেই বেল্লিকদেব। আপনাব আবাব কোন জাযগায আঘাত লাগল?'

—'বিলাসী আজকাল আখড়ায যায?'

—'যায।'

—'বৈষ্ণবী হযেছে?'

সনাতন মাথা নাড়িযা—'না।'

—'আমাব মনে হয দ্বিজেন আব বিলাসী মঠে গিযে বোষ্টম-বোষ্টমী হলেই পাবে।'

সনাতন একটু বিশুষ্কভাবে হাসিযা—'আপনাব সহানুভূতি তাহলে ওদেবই দিকে।'

মা একটু চুপ থাকিযা

মাকে এই চিঠিখানা লিখিলাম। মামা আজকাল কেমন আছেন?

কয়েকদিন আগে মামির চিঠি পাইয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছেন, ওঁর শুনিলাম নিউমোনিয়া সম্পূর্ণ রকমে সারিয়াছে। ভয়ের কোনো কারণ নাই। তবে শরীরটা খানিকটা দুর্বল, ওভালটিন হাফবয়েল ডিম ও রুটি মাখন খান সকালবেলা, দুপুরবেলা মাংসের সুপ, টেবিল রাইস, মাছ মাংস দুধ ও ফলমূলাদি খান—বিকেলবেলা ওভালটিন বা আঙুর বেদানার রস হাফবয়েল ইত্যাদি—রাত্তিরে আবার সুপ ভাত ফল ইত্যাদি, ঘুমোবার আগে হরলিক্‌স। ইদানিং কিছুদিন ধরিয়া স্পেনসারের চুরুট খাইতেছেন নাকি। মামির ছোট্ট চিঠিখানার ভিতর খাবারের জিনিসের লিস্টই অনেকখানি জায়গা দখল করিয়া আছে, বাকি স্থানটুকু মামার শরীরের সুস্থতা অসুস্থতার কথা লইয়া, শরীর ধীরে ধীরে সুস্থই হইতেছে, তবে বেগড়াইয়া যাইতেছে—বা কতক্ষণ, মামা হাঁচি দিলেও মামি ভয় পাইয়া থাকেন। ইহাদের দাম্পত্যজীবন তাহা হইলে বেশ সুখের দেখিতেছি। মামি তবুও এই চিঠিখানা লিখিয়াছেন, লিখিয়াছেন তুমি ভালোই আছ। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তোমার নিজের কোনো চিঠি পাই না। পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরিয়া আমাদের এ সংসারে তোমার হাড় জ্বলিয়াছে কম না। সেই সূতিকাঘর হইতে নামিয়াই তো দেখিতেছি ভোররাতে তুমি হেঁসেলে ঢোক, দুপুরে রাতে বাহির হইয়া আস, প্রতিটি দিন আসিয়াছে চলিয়া গিয়াছে উৎসাহে আশা মঙ্গল ও আনন্দের কথা যাহাদিগকে শুনাইবার শুনাইয়া গিয়াছ, তোমাকে দিয়া গিয়াছে, তোমাকে দিয়া গিয়াছে উনুনের কালি, জীবনের ভিতরে বাহিরে এই ছাই লইয়া তুমি কম খেলা কর নাই, দেখিয়া দেখিয়া আমার চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে। ছেলেবেলা হইতেই সংকল্প করিয়াছিলাম, তোমার জীবনের এই অসংগতির ধারা আমি ফিরাইয়া দিব, তোমাকে নিস্তার দেব, শান্তি দেব, জীবনমন্দিরে যে ভুশির মতো কালিমা ও অসাড়তার ছবি দেখ তুমি যাহা তোমার জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তরকে ধূমায়িত ও মলিন করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে, ভাবিয়াছিলাম আশ্বিনের বাতাসের মতো সুন্দর প্রবাহে সে-সব ঝাড়িয়া সরাইয়া ফেলিব আমি একদিন। কতই তো ভাবিয়াছিলাম। আজ মনে হয়, সবুজ ঘাস, কাশ ও ফিঙা দোয়েল শ্যামাপোকার গল্প তোমার জীবনে নাই। সে পথে আমিও তোমাকে লইয়া যাইতে পারিলাম না, তুমি নিজেও নিজের বাধা হইয়া দাঁড়াইলে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে নিরস্ত হইয়া আনন্দের সংগীত শুনিবার প্রবৃত্তি তোমার নাই, তুমি মনে কর দুঃখের আগুন সাধ করিয়াই বরণ করিতে হয়; তাহার ভিতর আজীবন নিজেকে দগ্ধ করিয়া লইতে পারিলেই জীবনের সুন্দর উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। কাজেই বেদনা ও রিক্ততার পথ ইচ্ছা করিয়াই বার বার খুঁজিয়া লইয়াছ তুমি, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিতে ভালো লাগে তোমার, চারহাতপায়ে খাটিয়া আনন্দ পাও। রাজবাড়িতে গেলেও ঘুটেকুড়ুনি সাজিতে ভালোবাস, চাকর-বাকরের হাতে থেকে কাড়িয়া কাজ করা তোমার অভ্যাস, কাজকর্মের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িতে সুখ। যেখানেই যাও তুমি নিজে ভাঙা হ্যাংলা শরীরটাকে বাতাসের আগে উড়াইয়া বেড়াও তুমি। হাতে হয়তো একটা ঝাঁটা, কিংবা কাঁখে জলের কলসি। স্থির বসিয়া থাকিতেও তুমি মুহূর্তে মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া খিলি খিলি পান তৈরি করিতেছ, জলচকিতে উপবিষ্টা বেনারসি সজ্জিতা নিকটবর্তিনীর জীবনের সুখ-দুঃখের খবর জিজ্ঞাসা করিতেছ। নতমুখে সে তোমাকে জানাইতেছে, কাঠ হইয়া পাথর হইয়া অশ্রুজলে সরস হইয়া শুনিয়া যাইতেছ তুমি। মানুষ তুমি এইরকম ধাতের। জীবন বলিতে তুমি আশ্বিনের রৌদ্রে দীপ্তিমান শঙ্খচিলের কথা কল্পনাও করিতে পার না, জ্যোৎস্নার পরে জঙ্গলে শিশু অর্জুনের ছায়ায় সুন্দর উজ্জ্বল চিতাবাঘকেও না—কাদা ধূল ঘাস ও পানকৌড়ির ডানার গন্ধে ভরা অষ্টপ্রহর ব্যবহৃত খিড়কির পুকুর হল তোমার জীবন, পুকুরের মতো হল তোমার জীবন। একদিন ছিল বটে, কিন্তু পানকৌড়িরাও আজ আর সেখানে নাই। উপবনে জমিয়া উঠিয়াছে, কাদা হইয়াছে স্তূপীকৃত, জল নীল নিস্তেজ। এক ঐকান্তিকতা ও আত্মত্যাগ আত্মবিলাপ সত্তেও আমাদের এই বিরাট সংযুক্ত সংসারে তুমি যে তেমন কোনো পাত্তা পাইলে না তাহার কারণ এক এক সময় তুমি ঢোক গিলিয়া চোখের জল ফেলিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কান্নাকাটি করিয়া খুঁজিতে চেষ্টা কর, গত বিশ বছর ধরিয়াই দেখিতেছি

প্রতিটিদিনের মধ্যে এরকম একটা বেদনা ও অবসাদের মুহূর্ত তোমার আসে—দু-পাঁচ মিনিটের জন্য অবিশ্যি। চিন্তা তখন তোমার নিজের জীবনের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করে হয়তো। আমি অবাক হইয়া ভাবি নিজের জীবনের সত্য কথাটা তুমি ধরিয়া ফেলিতে পারিবে তো? কিন্তু তাহা তুমি পার না। এই বিশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও পারিলে না। চিন্তার ঐশ্বর্যও তোমার নাই, কল্পনাও প্রগাঢ় নয়, প্রখর নয়, কোনদিনও দেখিলাম না। কাজ ও কলরবকে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি জাগিল তোমার মনে, দু-দণ্ডের নীরবতাকে ভালো লাগিল, কোনোদিনও দেখিলাম না ভীড়ের মোহ কাটাইতে পারিলে তুমি, কে কি বলে না—বলে সেইসব তুচ্ছতাকে অগ্রাহ্য করিতে শিখিলে না, এসব দেখিলাম না কোনোদিন।

আমাদের এই জানালার কাছে ডালপালা বহুল নিবিড় কৃষ্ণচূড়ার গাছ আছে। অনেক দিনের গাছ। আমার জন্মের আগেই ইহাদের জন্ম, পাতাপল্লব এত নতুন সবুজ যে অনেক সময় নীল বলিয়া মনে হয়, ফুল যখন ফোটে অপরূপ শোভা দেখিয়া দাঁড়কাকও মুগ্ধ হইয়া উড়িয়া আসে—তিন মাসের শিশু যে কিছু বোঝে না সেও নিবিড় রহস্য উপলব্ধি করিয়া নিষ্কলঙ্ক চোখে অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে। কিন্তু তোমাকে আমি একদিনও দেখিলাম না, এই গাছ কিংবা ফুলগুলোর দিকে দু-মুহূর্ত বিস্মিত হইয়া আপন মনে তাকাইয়া আছ। ইহা যে কীরকম অভাব তাহা তুমি বোঝো না, অভাব বলিয়াই স্বীকার করো না। কিন্তু ইহা অভাব,— আমের পল্লব, প্রান্তরের কাশ, মেহেদির জঙ্গল, ঝিঁঝির ডাক, কিংবা দুপুরের রূপকথা লইয়া যে মানুষ কয়েক দণ্ডের জন্যও অন্তত একা একা নিজের মনে নির্লিপ্ত হইয়া না বসিয়া থাকিতে পারে, এই সমস্ত জিনিসের নিকট হইতে আশা-আকাঙ্ক্ষা-আশ্বাস কিংবা ধরো বেদনাই সংগ্রহ করিয়া লইবার ক্ষমতা যাহার নাই, হেঁসেলে উঠোনে রান্নাঘরে নড়িয়া-চড়িয়া রাতদিন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, কথা ও কাজ, কথা, কথা, কাজ কাজ, যাহার জীবনের একমাত্র সম্বল—দেবর ভাসুর জা ও ননদকটিকে পরিতৃপ্ত করাই যাহা জীবনের ধর্ম, ইহাদের নিকট নিজেকে বিলাইয়া দিয়াই সুখ। সে মরীচিকার পিছনে চলিয়াছে, দিনের মধ্যে এক-আধবার বালিশে মুখ ঘষিয়া কাঁদিতে হয় তাহাকে,—তা কাঁদিতেই হয়। সবচেয়ে সুন্দর সাংসারিকতা ও দিনের ভিতর নিজেকে প্রয়োজনমতো এক এক সময় বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে এক এক সময় বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে জানে। তখন একটি ফুল, আকাশের একখণ্ড শাদা মেঘ, শূন্যের ভেতর চলমান মাছরাঙার কান্না, পেয়ারা গাছের রোদ, সন্ধ্যার হিম কুয়াশার ভিতর শালিখগুলো—দেবর ভাসুরের চেয়েও ঢের দামি জিনিস। কিন্তু তোমার কাছে দেবর ভাসুরই সবসময়ে সবচেয়ে মূল্যবান।

এইরকম পরিণাম বোধ লইয়া যে দুঃখ তুমি এড়াইতে পারিতে তাহাও তোমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে। তুমি অবিশ্যি আহলাদের সঙ্গেই গ্রহণ কর। এইরকম পরিণাম বোধ লইয়া জীবনের শ্রীহীনতাও জমিতেছে ঢের তোমার। কিন্তু সৌন্দর্য কদর্যতা লইয়া বাছাবাছি করিতে ভালোবাস না তুমি। জীবন সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক—দেবর খুশি হইয়া ছাগলের মতো দড়ি নাড়িতে নাড়িতে দু-মুহূর্ত [...] স্তুতি করে যদি তোমার তাহা হইলে তুমি কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া লইয়া নিজের শরীরটাকে হালকা বোধ কর। কোনো সুন্দর অনুভূতির রাজ্যে চলিয়া যাও নিশ্চয়—ডোবাদার ডানার পাখির মতো প্রাণ তোমার আনন্দে উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, ননদ যদি রাগ করিয়া গাল ফুলাইয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে খাঁচার ম্রিয়মান চন্দনার চেয়েও অবস্থা তোমার মর্মান্তিক হইয়া দাঁড়ায়। এইসব লইয়া তোমার সংসার, এবং সংসারের ছোট ছোট বুদবুদ ও বাষ্প লইয়াই তোমার জীবন। জীবন যে অন্য কিছু তাহা তুমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিতে পার না। কুমায়ূন পাহাড়ে বেড়াইবার সময় জীবনটাকে একরকম মনে হইয়াছে আমার। যশোরের একটা ছোট্ট গ্রামে কলেরা রুগিদের ভিতর রাত জাগিয়া জীবনের আর রূপ দেখিয়াছি, সন্ধ্যার সময় ইছামতীর পাড়ে বেড়াইতে বেড়াইতে চিরকাল অনেকগুলো কথা মনে হয় আমার। মাঝে মাঝে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে পাইয়া বসে, কিন্তু তখনই বুঝি বাঁচিয়া থাকি যদি তাহা হইলে ভোরের রৌদ্রে কোনো এক নীল আকাশে খয়েরি রঙের দুখানা ডানা দেখিব—চিল জননীর—হয়তো কোনা শিরিষ কিংবা প্রান্তর জোড়া কাশের মলিদার উপর ডানার ছায়া ফেলিয়া সবজু ডালপালার সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ষোড়শীর নীলাম্বরীর আঁচলের মতো আকাশের দিকে উড়িতে উড়িতে ফিঙা পানকৌড়ি পাপিয়ার নিম্ন পৃথিবীটাকে দু-চার মুহূর্তের জন্য তিমিরভেদী তন্তুনাভি নীতির প্রাণমূর্তিকে [...] করিয়া তুলিল—রৌদ্র উষার সেই রূপান্তরিত পৃথিবীর ছবি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া আসে। চকচকে ইস্পাতের লাইনের উপর দিয়া এক্সপ্রেস ছুটিয়া চলিয়াছে, টেলিগ্রাফের তারের উপর অসংখ্য মুনিয়া, বুলবুল, দুর্গা টুনটুনি, কৃষ্ণচূড়ার শাখাপ্রশাখার ভিতর দিকদিগন্তের বাসরের

লালচেলিব বাশি আসিয়া জমিযাছে যেন। শিমূলেব গাছে গাছে অতীত যুগেব মৃত সুন্দবীব দল শালিখ কোকিল ও সুখস্পর্শ বৌদ্রেব নিকটে আবক্ত অরুণ আহ্লাদে ও বেদনায় নিজেদেব আবাব ছড়াইযা বিছাইযা দিযাছে যেন। দাঁড়কাক তাহাব বার্নিশ কবা আলপাকা হবিণেব মতো অপরূপ কালো দেহ বোদেব ভাঁটায বোদেব জোযাবে উড়িয়া ঘুবিযা প্রাণেব খেযাল ও আনন্দ ফুবাইতে পাবিতেছে না কিছু, ঘাসেব ভিতব হইতে বটেব শুকনো পাতা উলটাইযা পালটাইযা নর্তকী বেদিযাদেব মতো কাদাখোঁচাব দল আলোছাযায পোকা খুঁজিযা বেড়াইতেছে। অপরূপ পোকাদেব জীবনও, গঙ্গা ফড়িং ফড়ফড় কবিযা সজনে পাতাব উপব আসিযা বসে। মেহেদিব জঙ্গলে হাবাইযা যায, অশথেব নীচে একটা শুকনো ঝবা ডালেব উপব লাঠিপোকা পাতাপল্লবেব জাফবি কাটা বৌদ্রছাযায বসিযা বসিযা ঝিমায' কে জানে স্বপ্নই দেখে হযতো, নীল আকাশই-বা তাহাব কাছে কেমন মনে হয ঘাসেব গল্পই-বা কেমন' ডালপালাব ফাঁক দিযা সোনালি বোদেব শিসকে কোনভাবে গ্রহণ কবে সে? আমেব মঞ্জবি ও [...] মর্মবকেই-বা কোনভাবে? ভেবেণ্ডা ফুলে ফুলে ভোমবা ঘুবিযা বেড়ায, কববীব বনে মৌমাছিব খুনসুড়ি হযতো কববেব সীমানাব ভিতবেই সেই কববীব বন, মল্লিকা যূঁই সূর্যমুখী চামেলিব উপবন, কিন্তু তবুও মৌমাছিব মনে মৃত্যুব গন্ধ নাই, না আছে সেই কুসুমদেব মনে, না আছে ইস্পাতেব মতো উজ্জ্বল [...]। ভোবেব বৌদ্রেব হৃদযে মৃত্যু নিজেও বৌদ্র, মৌমাছি কুসুমগন্ধি হইযা উঠিযাছে যেন, সে যে মৃত্যু নিয, জীবন তাহাতে সন্দেহ নাই যেন, যেন আব ... ইছামতীব পাবে অন্ধকাবে একা বেড়াইতে বেড়াইতে অবাধ অপবিমেয জীবনেব সমুদ্রেব ভিতব হাবাইযা যাই আমি—আকাশে মাঠে প্রান্তবে অন্তঃপুবে শহবে বাজাবে দুঃখ-অশ্রু বঞ্চনা প্রতাবণাব ভিতবে আনন্দ আশা আকাঙ্ক্ষা করুণা ও প্রীতিব স্রোতেব মধ্যে জীবন যে কত বিচিত্র, জীবন যে কত পবিহাসপ্রবণ, জীবন যে কত দুঃখদগ্ধ, উৎসবমুখব, জীবন যে কত সর্বব্যাপী, জীবন যে কত গভীব অনাদি অবাক হইযা উপলব্ধি কবি আমি।

এমন জীবনকে তুমি ননদ-দেবব ও ভাসুবদেব পাযে বিসর্জন দিলে?

জীবন বলিতে তুমি সংসাব বুঝিলে, সংসাব বলিতে ইহাদেব বুঝিলে শুধু। সুজাতাও বুদ্ধদেবকে তত মানিযা লইযাছিল না, এই কাকা, জ্যেঠা, পিসিমা, খুড়িমাদেব কাছে নিজেকে তুমি কতখানি বিকাইযা দিযাছ। এক একসময মনে হয সুজাতা তুমি হইলেও হইতে পাব, কিন্তু ইহাবা কেউ বুদ্ধদেবেব গাযেব ছাযা বা পাযেব নখেবও উপযুক্ত নয, মাযেব মতো অন্ধকাব প্রতিভা ইহাদেব নাই, কোনো বিষযেই কোনো বিশিষ্টতা নাই ইহাদেব, বিধাতা তাহাব বৃহৎ মহৎ হাত দিযা অনেক জীবন সৃষ্টি কবাব পব বৈচিত্র্যেব জন্য এই ক্ষুদ্র মানুষগুলিকে তৈবি কবিযাছিলেন। ইহাবা তাহাব অবসন্নবিমুখ ও জর্জব হৃদযেব সৃষ্টি। ছোট কথা, ছোট চিন্তা, ছোট কাজ এইসব লইযা এই বালখিল্যদেব [...] সংসাব। ইহাদেব জীবন, যেখানে সুন্দব কল্পনা ও অভিজাত চিন্তাব জগৎ শুরু সেইখানে ইহাদেব জগৎ শেষ। একসময একটা কথা শোনা যাইত এই যে ইঁদুব দিযা সৃষ্টিব কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয না। ইঁদুবেবা বিধাতাব গ্লানি ও অপচয—কিন্তু দেখা গেল, যে খেতে ইঁদুব থাকে সেখানে পঙ্গপাল পড়িতে পাবে না, ইঁদুবদেব সার্থকতা বোঝা গেল, হযতো পঙ্গপালদেবও এবকম কোনো কৃতকার্যতা আছে। জীবনেব কাছে তোমাব ননদ দেওবদেব কৃতকার্যতাও এই হিসেবেই ধার্য, জীবনেব পথে তাহাবা ইঁদুবেব মতো, পঙ্গপালেব মতো, শুধু মাছিব মতো—কুকুবেব গাযেব এঁটুলিব মতো, পঁযতিবিশ বছব ইহাদেব সঙ্গে একত্র থাকিযা আমি ইহাদেব নাড়ীনক্ষত্র সমস্তই পবিষ্কাব কবিযা বুঝিযা দেখিলাম, একটিকেও মানুষ বলিতে ইচ্ছা কবে না, কিন্তু তুমি প্রতিটিকেই দেবতা বলিযা লইযাছ।

গত বছব প্রভাত যখন তাহাব ছেলেমেযে ও বউকে বেচাবাব চাকবি-বাকবি নাই বাড়ি ফিবিবাব পথে কযেকদিন আমাদেব বাসায থাকিযা যাইবাব জন্য আসিযাছিল, এখন বড়কাকা বাবণ কবিলেন, বলিলেন, প্রভাত গুরু মানে না। উসকো-খুসকো চুল, রুক্ষ চেহাবাব কযেকটা প্রাণী, কাপড়-চোপড় ছেঁড়া ন্যাকড়াব মতো, গাযেব ভিতব হইতে ধুলো বালি সুবকি ঘামেব চামসে গন্ধ বাহিব হইতেছে, ট্রেনেব থেকে নামিযা বেচাবাবা হযতো এক গ্লাস জলও খায নাই, আমাদেব বাড়িব দুযাবে পা দিতে না-দিতেই তাহাদেব তাড়া খাইযা আবাব সবিযা যাইতে হইল তুমি আমাকে বলিলে—এই নিযা বড়কাকাব সঙ্গে তুমি আবাব লাগিতে যাইও না বাছা। তোমাব মুখেব দিকে তাকাইলে আমাব বড় ভয হয। এই কথা বলিলে তুমি আমাকে। তোমাব কথা তথাস্তু বলিযা মানিযা লইলাম। সমস্ত দিন ভাবিযা তুমি শুধু বলিলে—"তা প্রভাত গুরু মানিলেই তো পাবিত।" পিসিমা কাকিমা ও কাকাদেব সঙ্গে গুরুবাদীদেব

জীবনের সম্পূর্ণতাও সার্থকতার বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে তুমি হিমালয় হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত কোথায় কোন গুরু আছে, কে অবতার, কে সাক্ষাৎ দেবতা সমস্তই শুনিলে আস্বাদ করিলে, অভিভূত হইয়া পড়িলে, নিরবচ্ছিন্ন কথা বলিলে। নাস্তিক প্রভাতের ত্রিশূন্য জীবনটাকে লইয়া অবজ্ঞার সঙ্গে নাড়াচাড়া করিলে তোমরা। কিন্তু তবুও দেখিলাম শেষপর্যন্ত মনটা তোমার কেমন গুমরাইয়া রহিল। নীরবে তোমার হৃদয়ে আঁচড় কাটিয়া বুঝিতে পারিলাম প্রভাতদের কথাই ভাবিতেছ, ভাবিতেছ, কষ্ট পাইতেছ, কষ্ট পাইতেছ কিন্তু তবুও বড়কাকাকে কিংবা এই পরিবারের কোনো মানুষকে প্রভাতের হইয়া দুটো কথা বলিবার মতো ভরসা পাইতেছ না। প্রভাতরা তোমার বাপের বাড়িব মানুষ। বড়কাকিমাব বাপের বাড়ির কোনো লোকদের সঙ্গে কাকা এইবকম ব্যবহার করিতে পারিতেন? মুহূর্তের জন্যও? না। কাকিমা তাহা হইলে আকাশেব ছাতি ফাটাইয়া ছাড়িতেন। তুমি ফাটাইতে চাহিলে মাটি জননীর ছাতি, নীরবে অশ্রুমুখী হইয়া। কিন্তু তাহাও দু-চার মুহূর্তের জন্য শুধু, সন্ধ্যার অন্ধকাবে, তোমার খাটের কিনারে বসিয়া। হঠাৎ তুমি উঠিয়া দাঁড়াইলে, কাহাবও গলার আওয়াজ, খাকারি কিংবা জুতার শব্দ শুনিয়াছ নিশ্চয়, কাহার যে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তুমি যখন উঠিয়াছ বুঝিতে পারিলাম কোনো কাকা অফিস হইতে ফিরিয়াছেন নিশ্চয়, খাবার দিতে হইবে। জানালার ফাঁক দিয়া তাকাইয়া দেখিলাম হেঁসেলে ঢুকিয়া চায়ের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করিতেছ, তারপর পেঁজ ও ডিম ভাজার গন্ধ পাই, ছ্যাকছ্যাক করিয়া মুড়ি ভাজার শব্দ আসিতে থাকে। আবো খানিকক্ষণ পরে কাকিমা পিসিমা ও কাকাদের সঙ্গে খোশগল্পে ও প্রভাতমাফিক মানুষদের হাড় কখানা লইয়া ভেলকি খেলায় মাতিয়া উঠিযাছ বুঝিতে পারি, তোমাদের নিঃসন্দিগ্ধ নিরুপম আমোদের কোলাহল কানে আসিয়া পৌঁছায। উত্তর দিকের জানালার ভিতর দিয়া তাকাইয়া দেখি গ্যাঁড়া করমচা গাছটা অন্ধকাবে মুখ থুবড়াইযা পড়িয়া আছে। ডালপালার ভিতবে কতকগুলো জোনাকি। মনে হয় ধুলোর মন্ত্র যদি আমার হাতে থাকিত তাহা হইলে এ সংসাবের এই বধূজীবন হইতে মুক্ত করিয়া তোমাকে জোনাকির রূপ দিয়া ঝুলকরবী জামরুলের পল্লবস্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ভাসাইয়া দিতাম। সে ঢের ভালো হইত।

একটা আমার খুব সান্ত্বনার বিষয আছে এই যে তোমাদের এই গল্পগুজবেব মধ্যে বাবা কোনেদিনও থাকেন না। তিনি সংসারেব জন্য পযসা অর্জন করেন, এমন বিশেষ কিছু না, কিন্তু তবুও নিযমিতভাবে যত বছর ধরিয়া যতখানি করিতেছেন, তাহাতে এ সংসাবের ভিতৰ নড়িয়া-চড়িয়া আমাদেব মতামতেব স্বাধীনতার একটা পথ রাখিয়াছেন তিনি। কিন্তু সে পথে ঘাস আগাছা পরগাছা জন্মিয়া গিযাছে, সে পথে কেহ মাড়াই না আমরা। বাবা নিজের কর্ম পড়াশুনা লইয়া একান্তে চুপচাপ কবিয়া থাকেন, আমিও চুপই থাকি। আমরা যদি কথা বলি তাহা হইলে তোমার মতন নিজেকে বিক্রি কবিযা ফেলিযা কথা বলিতে পারিব না তো। কথা যদি বলি তাহা হইলে এই মস্তবড় সংসারের কৃত্রিম আটঘাট বুঝিযা ঢাকিযা কথা জোগাইতে পারিব বলিয়া বোধহয় না। তিন চার পুরুষ ধরিয়া এই যে বিরাট যুক্তসংসার চলিতেছে ইহার অতীত স্মৃতির উপরে আমাদের শ্রদ্ধা আছে, ইহাকে ভাঙিয়া ফেলিবার সাধ আমাদেব নাই, ইচ্ছা হইলে যখন-তখন আমরা এক সংসারেব ভিতর বাহির হইয়া চলিয়া যাইতে পারি। আমাদের যাহা আয তাহা দিয়া নদীর ধারে ছোটখাটো সুন্দর বাগানওযালা দালান ভাড়া কবিয়া থাকা সম্ভব, বেশ সুখে শান্তিতে থাকা যায়। কিন্তু সেরকম আচরণের ভিতর কেমন অসম্পূর্ণ জীবনের আত্মপরতাব গন্ধ বহিয়া গিযাছে যেন। সেজন্য এখানেই আছি—পারতপক্ষে চুপ করিয়াই থাকি।

তুমি কাজ করিতে ভালোবাস, দুঃখ পাইতে ভালোবাস, কথা বলিতে ভালোবাস বটে। সাবাদিন আরো কাজ কব। যুক্ত সংসারে থাকিতে হইলে বাড়িব বধূর পক্ষে যত সব কাজের দরকার সেসব সাঙ্গ না করিতে পারিলে কর্তব্যও হয় না দাক্ষিণ্যও হয না— যে সব কাজ শেষ করিয়াও কাজেব বস্তু তোমার অপরিসীম হইয়া লতাইয়া ওঠে।

না মজিতে চায প্রীতি দাক্ষিণ্যেব উচ্ছ্বাস—সংসারেব সমস্ত কাজ সামলাইবাব পব যদি শুনিতে পাও ননদের পিঠে ঘামাচি হইয়াছে তাহা হইলে নখে মধু মাখাইযা মিষ্টি কবিয়া তুলিয়া পিঠ লইযা পড়িতে তোমার এক মুহূর্তেও তর সহিবে না। তাহার—কিংবা আর কোনো জা ননদেরই ঘামাচি কিংবা কোমবের রগের ব্যথা হৃদয় দিযাও তুমি যতখানি অনুভব করিতে পার এ সংসারে আর কেহ তাহা পারে না—ইহাদেব এইসব অসুখ বিসুখ অসুবিধাব সময সহানুভূতির ভাষা তোমার মুখে যতখানি জুগায—

ইহাদের প্রতি ইহাদের মা-বোনের সমবেদনার ভাষা তুলনায় চেনা কাঠের মতো বিরস বলিয়া বোধ হয। অথচ তোমার কথায় কাজ কোনো ভান নাই—আন্তবিকতার অভাব একটুকুও নাই। কিন্তু

মানুষ ও সংসার পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে তোমার প্রথম ও শেষ ধারণা অনেক আগেই তৈরি হইয়া গিয়াছে বলে মনে কর তুমি, শালগ্রামের সঙ্গে বিধাতার যেরকম সম্পর্ক তোমার ধারণার সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধও সেইরকম। অজ্ঞতা অন্ধতা ও নিষ্ক্রিয়তার তুমি ভাব সে ধারণাগুলি বেশ উজ্জ্বল ও বৈধ—কিন্তু আমরা জানি সেগুলি কত অবৈধ অপ্রাসঙ্গিক ও অসাড়,—তাই এক বিপদ। দিনরাত এত কথা বলিতেছ, ভাবিতেছ ঢের সুন্দর সত্য কথা বলা হইল, কিন্তু আমরা জানি সে কথাগুলি কত অসার্থক, কিরকম অচল। কাজেই কথার পর কথার খই ফুটাইয়া চলিবার তোমার এই প্রবৃত্তি ইহা হইতে নিজেকে টানিয়া গুটাইয়া লইবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করি। যাহারা বুঝিয়া-শুনিয়া কথা বলিতে পারে তাহাদের পক্ষেও বেশি কথা সাজে না। মানুষ ও সংসার সম্বন্ধে ধারণা করিতে গিয়া যাহারা অন্ধকার হাতড়ায় বেশি কথা বলিয়া তাহারে কী লাভ? জা ননদেব ঘামাচি অবিশ্যি তুমি মারিবে, চিরকালই মারিবে, তাহাদেব মাথার উকুন বাছিয়া দিবে, পায়ে আলতা পরাইয়া দিবে, চুলে পিন আটকাইয়া দিবে, পিন খসাইবে। নিজে তুমি কোনোদিন পিন ব্যবহার করিলে না। কিন্তু জীবনের একটা বিলাসের ব্যাপারে তুমি ঢের সংসারী হও এই আকাঙ্ক্ষা কবি। বৈশম্পায়ন হয়তো গুছাইয়া অনেক কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু আমাদের এই সংসারে থাকিলে তিনি বোধহয় নীরব থাকিতে ভালোবাসিতেন। তোমাকেও আমরা বাকসংযম কবিতে বলি, বলি নীরব থাকিতে। কথা বলিয়া তুমি অবিশ্যি কারু হাড় ভাঙো না বটে, এ সংসারের প্রায় সকলেব হাড়ই জুড়াইতে চেষ্টা কব—কিন্তু তবুও তো দেখিতেছ কলাইয়া যাওয়া ধানেব বীজের মতো তোমাব কথাব মূল্য, ইহার চেয়ে বেশি কিছু নয়। চুপ করিয়া থাকিতে শেখো যদি তাহা হইলে তোমার নীরবতা হয়তো শবতেব সোনাব মঞ্জরির মতো অপরূপ মাধুরীতে মাখাইয়া দিতে জীবনকে তোমার প্রায় চল্লিশ বছর ধরিয়া এই সংসারের বধূ হইযাও ইহাকে তুমি চেন নাই। কোনো সংসারকেই তুমি চিনিতে বুঝিতে পারিতে না। চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও সাংসাবিক মানুষের ভাবগতিক রীতিচরিত্র বুঝিবাব ক্ষমতা তোমার নাই। তুমি সেই জাতীয় লোক পুতুল খেলা লইযা যাহারা বিভোর হইয়া থাকিতে পারে, কিংবা উঠিতে বসিতে অবোধ পূজা করিয়া অকৃত্রিম আনন্দ পায়, শূন্য আসনের দিকে তাকাইতে পার না তুমি, আসন না হইলেও চলে না তোমার। আমবা যাহাকে গৃহ মনে করি তুমি তাহাকে ভাব গৃহদেবতা, অন্য মানুষেবা যাহাদের ননদ দেওর ভাসুর জা বলিয়া জানে তুমি তাহাদিগকে মহাভারতের লোকোত্তর চবিত্র বলিয়া মনে না করিয়া লও যদি তাহা হইলে কি-বা বলিতেছি? কাজেই কোনো নারীকল্যাণেব কাজে দেশেব কাজে কিংবা চবকা কাটায় নিজেকে সম্পূর্ণবকম লাগাইযা দিতে পাবিতে যদি, বেশ হইত তোমাব। যে সব কাজে সাধনা, সাধ, বিশ্বাস, নিষ্ঠাব দরকার, কিন্তু বৈদগ্ধ্যেব কোনো প্রযোজন নাই—সেইসব কাজেই সাজে তোমাব। কিন্তু সংসারেব আসল মশলা—বৈদগ্ধ্য। এ বিচিত্র পথে জীবনেব মাল ছড়াইতে আসিয়া পদে পদে ঠকিয়া গেলে তুমি তাই। এ সংসারেব স্থবির বধূ হইযা মরিবে যখন খানিকটা অচল অপ্রতিভাকে বিদায় দিয়া কাহারও মুখে ভাব পরিবর্তন দেখা যাইবে না বড় একটা। এইবকম কবিয়া ঠকিয়া গেলে তুমি।

হযতো অন্য কোথাও গিযা পুবস্কাব পাইবে তুমি, কোনো রূপান্তবিত জীবনে—অমৃতলোকে। আপাতত সেইসব জীবন লইয়া আমাদেব কাববাব নয়। সে জীবন আছে কী-না আছে একদিন মৃত্যু আসিযা তাহার উত্তর দিবে। কিন্তু যাক বা না-যাক আজিকাব এই জীবনেব সম্ভাবনা নষ্ট করিযা কি লাভ? আগামী জীবন যতই সুন্দর হোক না কেন, কাজে লাগাইতে জানিলে এখনকার এই জীবনও কদর্য নয়—কাজে লাগাইতে পারিযাছ বলিয়া মনে হয না। চল্লিশ বছব ধরিয়া হুঁচোট খাইয়া মুখ থুবড়াইয়া গোঙবাইয়া থেঁৎলাইযা চলিতেছ তুমি, হুজ্জুতে ছেলের হাতে একটা ব্যাঙের অবস্থা যেমন হয়। সংসাবের হাতে তোমাব অবস্থাও হইযা দাঁড়াইযাছে তাই।

তোমাব হাতের লেখা সুন্দব, বানান ভুল না কবিয়া সুসংগতভাবে লিখিবার দস্তুর আছে, সেজন্য এ সংসারের অনেকেই তোমাকে চিঠি লেখান। সেবার কযেক বছব আগের কথা বড় কাকা মফস্বলে গিযা কয়েক মাস টাকা পাঠান নাই সেইজন্য ঠাকুরদাদা খানিকটা বিবক্ত হইযাছিলেন। বড় কাকার নিকট চিঠি লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন তিনি, কাগজ কলম তৈরি করিয়া তোমাকে ডাকিলেন, যাহা যাহা লিখিতে বলিলেন তুমি তাহা তাহাই লিখিলে। ঠাকুবদাদা চিঠি পোস্ট করিযা আসিলেন। ঠাকুরদাদাব সেই চিঠি বড়কাকা ফেরত পাঠাইয়া চিঠির গায়ে লাল কালির আঁচর কাটিয়া লিখিয়া দিলেন এবকম বেল্লিক চিঠি বাবার নিকট হইতে কখনো আসিতে পারে না। এ বড়বউয়ের বজ্জাতি।' সংসারের সকলে আসিয়া তোমাকে ছাঁকিযা ধরিল, বড়বউকে লক্ষ্য করিযা চারদিক দিয়া 'ছি ছি' বব উঠিতে লাগিল। ঠাকুবদাদা

তোমার সাফাই গাহিবার জন্য ঘনাইয়া আসিলেন না—পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইলেন। তুমি বালিশে মুখ গুঁজিয়া নিরুপায়ের মতো খুব এক ঝলক কাঁদিয়া লইলে বটে, কিন্তু তবুও তোমার চোখ ফুটিল না। এক তো হইল, কিন্তু তবুও নিজেকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে গেলে না তুমি। নিজের জীবনপ্রণালীর অন্ধতাকে বদলাইয়া লইবার কোনো আবশ্যকতা অনুভব করিলে না। এর ওর জন্যে চিঠির পরে চিঠি আজও তুমি লিখিয়া চলিতেছ।

হাতে কিছু পয়সা জুটিযাছিল বলিয়া সেবার পশ্চিমে একটু বেড়াইযা আসিব বলিযা ভাবিলাম—সংসারের কাজে তোমার শরীর ভাঙিয়া পড়িযাছে। তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব ঠিক করিলাম। তুমি তো প্রথমে যাইতেই সম্মত হইলে না, বলিলে ননদ জা-দের ফেলিযা একা যাওযা তোমাব সাজে না, ভালোও লাগে না। কিন্তু জা-ননদেবা বছরেব মধ্যে একবার কবিয়া শিমূলতলা মধুপুর জামতারা কাশী বৃন্দাবন যে বেড়াইযা আসে— যাবাব সময তোমার নাম ধরিযাও ডাকিযা যায না। পঁচিশ বছর আগে সেই যে একবার গযা গিযাছিলে তুমি, তারপব হইতেই জোয়াল কাঁধে করিযা আছ, সমস্ত কথাই এক ফুঁযে ভুলিযা গেলে বুঝি। অনেক সাধ্যসাধনা করিযা তোমাব মত কবাইলাম, কিন্তু কাকাদেব কাছে অনুমতি চাহিতে গেলে—যেন কাকার অনুমতির কোনো মূল্য নাই—বাবা যে অনুমতি দিযেছেন কাকাদের কাছে সে কথা উল্লেখই কবিলে না, কাকাদেব নিকট হইতে পবামর্শ মাত্রও চাহিতে গেলে না, চাহিতে গেলে নির্দেশ। আমি থমকাইযা চুপ করিযা বসিযা বহিলাম। কাকাবা আদেশ দিলেন না, তোমার যাওযা হইল না। পরের বার আমি নিজেই কাকাদেব সামলাইয়া লইলাম, কিন্তু তুমি ফ্যাকড়া বাধাইলে যে কাকিমা পিসিমাদেব সঙ্গে লইযা যাইতে হইবে। কযেকজনকে নেযা গেল তাই। নানা জাযগায ঘুরিবার মতলব ছিল। কিন্তু লোকজন বেশি হইল টাকায কুলাইল না—কাজেই পাটনা রাজগীব অবদি গেলাম। তোমার বাতের ব্যথা আছে একটা কুণ্ডেব জলে তোমাকে স্নান কবাইব বলিযা মোটব ভাড়া করিযা লইলাম। যাওযার সময সেজকাকিমা বলিলেন তাহাব দাঁতে ব্যথা হইযাছে। দাঁতে ব্যথা হইযাছে বটে, কিন্তু তাহাব তত্ত্বাবধান করিবাব জন্য ছোট পিসিমা আছেন, কাকিমাবা আছেন। কিন্তু তুমি মনে করিয়া বসিলে ননদের এ দাঁত ব্যথাব সহানুভূতি জানাইবাব জন্য এ দাঁতেব যন্ত্রণা সাবাইযা দিবাব জন্য এ পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আব কেহ নাই। দাঁত ব্যথা সেজপিসিমাব, কিন্তু জলে ভবিযা উঠিল তোমাব চোখ। ননদ-জাযেরা মুখ টিপিযা হাসিতে লাগিল— তুমি ঝালানো হলদি ও আযোডিনেব ব্যবস্থা কবিতে লাগিলে, সমবেদনাব খই কতখানি ফুটাইলে তাহাতে হাড় সুড়সুড়ি ব্যথাব রুগিও উঠিযা বসিতে পাবে। মোটর ফিরাইযা দিতে হইল। সেইদিনই দেশেব বাড়ির দিকে বওনা হইলাম। ট্রেনে উঠিতে না উঠিতে সেজপিসিমাব দাঁতেব ব্যথা কুযাশাব মতো উঠিযা গেল। জানালাব কাছে ঘেঁষিযা বসিযা কাকিমা-পিসিমারা গা ঠেলাঠেলি কবিযা থাকিতে লাগিল। তুমি আযোডিনেব শিশি হাতে লইযা আশংকা উদ্বেগে মুখ শুকাইযা মোকামা ঘাট পর্যন্ত চুপচাপ চিমসাইযা একা মানুষ বসিযা বহিলে তুমি। অবাক হইযা ভাবিলাম, এই কি আমার মা?

কিন্তু আবো অবাক হইতে হয দেশের বাড়িতে আসিযা। বিদেশে বিদেশেই থাকি। কৃচিৎ দেশে আসা ঘটিযা ওঠে আমাব। কিন্তু আসি যখন ইচ্ছে হয আমাব খাবাব সময তুমি কাছে বস, পবিবেশন কর—তোমার সঙ্গে গল্প কবি। বিদেশে বিদেশে যে চাকবি হারাইযা ঘুরি, কানেব কাছে চুল যে পাকিতে আবম্ভ কবিযাছে, সিদ্ধ বেগুনেব মতো কপাল ও মুখের চামড়া কুচকাইযা যাইতেছে আমাব, কোনো নাবী কোথায বোনের মতো যত্ন করিযাছে আমার, যত্ন করিযাই জীবনেব অন্ধকাবেব ভিতর হারাইযা গিযাছে আবার, কোনোদিন যাহা চাই না তাহাই কেন পাই শুধু, সকলেব অবাধ প্রবেশেব জন্য যে হৃদযকে আমি পৃথিবীর ধূসর মাটিব মতো বিছাইযা রাখিযাছি সেখানে সমযেব পাযেব শব্দই দিনবাত শুধু বাজিতে থাকে কেন—সমযেব এই নিববচ্ছিন্ন নিঃশব্দ সঞ্চাব ছাড়া জীবনেব আব কী কিছুই নাই? আছে ইছামতী আব অজয, চিলেব ডাক শুধু? বেদনা ও স্বপ্ন লইযা খেলা? ইচ্ছা হয, এইসব কথা বলি তোমাকে, কথাবার্তা ও অন্তরঙ্গতার বিনিময় চলুক আমাদের মধ্যে। কিন্তু এসব প্রশ্ন শুনিবার জন্য তুমি আমার কাছে আসিয়া বসো না কোনোদিন। তোমাব নিজেব মনের বিমূঢ় বিহ্বলতায হৃদয স্তব্ধ ও সরস হইযা থাকে, সন্ধ্যা হইয়া আসে, সোঁদা মাটিব গন্ধ পাই। ইলশেগুঁড়িব মতো হিম না বৃষ্টি ঝরিতে থাকে, অন্ধকারে ভিজে বাতাসে পথে হাঁটিতে হাঁটিতে চারুলতাব কথা মনে হয। কোথায সে এখন? কাহার বধূ? আছে কি নাই? অথচ এই পথেই একদিন সে ছিল বিশ বছর আগে, পনেবো বছব আগে। হাঁটিতে থাকি, পথ হাঁটিতে থাকি। আশেপাশে আলোকলতার ঝোপ হইতে কতকগুলো শ্যামাপোকা—ভিজে ভিজে সবুজ সুন্দর।

আমাব এমন দুর্ভাগ্য যে যখন খাইতে বসি তখন হয বড়কাকা না হয মেজকাকা বা অন্য কারু জন্য তাহাদেব ঘবে ঘবে পাতপিঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে, তুমি সুড়সুড় কবিযা সেইখানেই চলিযা গিযাছ। কিংবা বড় ঘবেব দাওযায কাকিমা পিসিমাদেব বৈঠক বসিযাছে, সেখানে কাহাবও পিঠেব ঘামাচি লইযা বসিযা গিযাছ তুমি, বসিবাব জন্যই বসিযাছ, উঠিবাব জন্য বস নাই। আমাব জন্য বহিযা গিযাছে তোমাব হেঁসেলেব সঙ্গিনী, আমাদেব সবল অকৃত্রিম বন্ধু সুদর্শনেব মা।

মনে হয পিছে কোথাও চারুলতা দাঁড়াইযা আছে যেন, ভিজে ভিজে ঘাস ও কেযাব গন্ধেব ভিতব বাবলাব জঙ্গলেব আড়ালে সে নাই? সে আছে নিশ্চয, কিন্তু আমি খুঁজিতে যাই না। সে আছে এই অনুভূতি বুকে চাপিযা অনেকক্ষণ চুপ কবিযা বসিযা থাকি। মেহেদিব জঙ্গলেব উপব শূন্য লতাব ঝাড়ে একটু ক্ষীণ জ্যোৎস্না খেলা কবিযা যায, কাঠমল্লিকাব ডাল দুলিযা দুলিযা নড়িতে থাকে, ঝিঁঝি ডাকে, পেচা উড়িযা যায। কী যে গভীব সুন্দব এই ইছামতীব দেশ!

ঝাউযেব কোটবে তক্ষক ডাকে, শিওগাছেব নীচে শঙ্খচূড় শুইযা আছে। সাপ নয, আমাদেব জীবনেব যবনিকাব ওপাবে—যাবা আমবা কোনোদিন দেখি না শুনি না সেই [...] কুযাশামাখা সম্ভাবনাব বাজ্যেব এ-এক মমতামযী রূপসী। হযতো এইই চারুলতা। একটু এগাইযা দেখি বিড় খুলিযা সে কোথায অদৃশ্য হইযা গিযাছে। কুহকেব কুহেলিকাবৃত বাজ্য আমাদেব যুক্তি তর্কেব আমাদেব জীবনে পাশাপাশি হইতে আচমকা ধবা দেয— এক মুহূর্তেই নিজেব দূবত্বে [...] হইযাছে আবাব।

বাতে বাড়ি ফিবিযা দেখি তুমি বান্না ঘবেব কোণে বসিযা কাঁদিতেছ। সুদর্শনেব মাব কাছে জিজ্ঞেস কবিযা জানিলাম ছোটপিসিমাব হাতে বাত হইযাছিল—ডলিযা দিতে গিযা তাহাব শাঁখাব চুড়ি একগাছ ভাঙিযা ফেলিযাছে। তাহাবা বলে ইচ্ছা কবিযাই ভাঙিযাছ তুমি, তুমি বলো অসাবধানতায ভাঙিযা গিযাছে। শুধু ইহাই নয। একটা তেলাসিকিও ছোটকাকাব কাছে সাচ্চা বলিযা চালাইতে চেষ্টা কবিযাছ নাকি।

তোমাকে আমি বলিলাম, আচ্ছা সিকিটা আমি ছোটকাকাব কাছ থেকে দেখিযা আসি, তুমি আমাব হাত ধবিযা আটকাইযা বাখিলে।

কিছুক্ষণ পবে নিজেব হাতেব শাঁখা খসাইযা তুমি বড়ঘবেব দিকে চলিযা গেলে। শুনিলাম ছোটপিসিমা বলিতেছে—'আচ্ছা ছেলেমানুষ তুমি বড়বউ—আবাব শাঁখা এনেছ, বা বেশ হাঙবমুখো শাঁখা তো—তা এনেছ যখন দাও—ওকি সিকি আবাব—বড়বউ হল কি?—তুমি তো জানই ওবই অধব হাবামজাদাটা ওইবকম—ওই ছুঁচো বিনোদিনীব তেলাসিকিব গল্প আমবা বিশ্যেস কবেছি বলে মনে কব?'

মেজকাকা মুখ নাড়িযা বলিলেন—'বউঠান চকচকে সিকি এনেছে বুঝি আবাব? কই দেখি দেখি, বা বেশ তো! খুব চলবে—কি বললে? এই সিকিই তুমি অধবকে দিযেছিলে? তা তোমাব শ্বশুবেব ছোটছেলেকে চেনই তো—অমন একটা হাড়হাভাতে অনামুখো দুনিযায নেই।' হাউ হাউ কবিযা হাসিযা উঠিলেন মেজকাকা। বড়ঘবে আবাব মজলিশ বসিল। বান্নাঘবেব বাবান্দায দাঁড়াইযা তোমাকে কযেকবাব ডাকিলাম। প্রত্যুত্তবে তুমি জানাল দিযা মুখ গলাইযা বলিলে— 'সুদর্শনেব মা, টেঁটিব কি হল দাদাবাবুকে ভাত দিতে পাবে না টেঁটি?'

টেঁটিব হাতে খাইলাম।

খাওযা-দাওযাব পব জাম কবমচা কাঁঠালেব জঙ্গলে পাইচাবি কবিতে কবিতে মনে হইল, বোন নাই বেদনাই আমাব—বধূও—নাই—কিন্তু মা? বিদেশে ঘুবিতে ঘুবিতে যে জননীব স্বপ্ন দেখিযাছি আমি তাহাব নিজেবই পাদপীঠে তাহাকে খুঁজিযা পাই না কেন? জ্যোৎস্না মিলাইযা গিযাছে, অন্ধকাবেব ভিতব পলাশ গাছেব ডালে বসিযা লক্ষ্মীপেচা ডাকিতেছে। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আসে—মধুমালতীব বুঝি? অন্ধকাবে ঘুবিযা ঘুবিযা তাহাব কাছে গিযা বসি। মনে হয শিশিবমাথা এই সোঁদা এই মাটি কিংবা এই অন্ধকাবাবৃত পৃথিবী জননী আমাব— ওই অনেকদিনেব পুবোনো জামগাছটাও কি কম?

হাঁটিতে হাঁটিতে ইছামতীব পাড়ে গিযা দাঁড়াই, বিদেশে ঘুবিতে ঘুবিতে ইহাব কথাই তো ভাবি আমি—বেবা, ঝিলম, তাপ্তি, নর্মদা, যমুনা কৃষ্ণা কত নদীই তো দেখিলাম। আমাব বোন আমাব বধূ আমাব জননী সমস্তই তো ইছামতী।

মানুষের মুখের আভা

বাত দুপুব-স্টেশনে ভিড় কম নয়, কিন্তু প্রসন্নবাবুকে বাছিয়া লওয়া শক্ত নয়, কিন্তু প্রসন্নবাবুকে ধবিয়া লওয়া শক্ত নয়—ওই তো, ওই না দাঁড়াইয়া আছেন লম্বা-চৌড়ো মানুষটি—ভাবী শৌখিন চেহাবা, শাদা চাপদাড়ি।

হ্যাঁ, ওই তো প্রসন্নবাবু, একটা মোটা বর্মা-চুরুট জ্বালাইয়া লইয়া বুড়ো-মানুষ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুলিব সঙ্গে বচসা কবিতেছে।

শচীন তাড়াতাড়ি অগ্রসব হইয়া প্রণাম কবিয়া লইয়া বলিল—'ভালো আছেন দাদাবাবু?'

প্রসন্নবাবু চশমাব ফাঁকেব ভিতব হইতে একবাব উদাসীনভাবে তাকাইয়া—'ও, তুমি?' তাবপবেই কুলিব সঙ্গে তর্ক কবিতে লাগিলেন আবাব।

শচীন একপাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বলিল—'এদেব সঙ্গে কথা বলে শেষ কবতে পাববেন না দাদাবাবু, ববং আমিই কথা বলি।'

—'থাক, তোমায় বলতে হবে না কিছু, আমাব কর্তব্য আমি বুঝব।'

দাদাবাবুকে বাধা দিতে গেল না আব শচীন, বাধা দিয়া কোনো লাভ নাই, ইনি নিজেব নিয়মে চলেন। মিনিট চাব-পাঁচ কথাবার্তাব পব কুলিব সঙ্গে একটা বে-আন্দাজি দস্তুব ঠিক হইল।

প্রসন্নবাবু কুলিকে বলিলেন—'নাও মোটমাট তুলে নাও এখন।' শচীনেব দিকে তাকাইয়া—'আমি যে আজ এখানে আসব তা তুমি কি কবে জানলে?'

—'বেশ মানুষ আপনি দাদাবাবু, তিনকড়িবাবুকে চিঠি লিখলেন, অথচ আমাদেব একটু খববও দিতে পাবলেন না।'

—'সে আমাব অভিরুচি, কিন্তু তিনকড়িকে আমি যে ভালো মানুষ বুঝে লিখেছি সে তাব অপব্যবহাব কবেছে দেখছি।'

—'কেন?'

— আমি যে চিঠি লিখেছি তাকে, এখানে আসছি সে-সব কথা তোমাকে বলতে গেল যে বড়।

—'না, নিজেব থেকে সেধে বলেননি কিছু।'

—'তবে?'

—'কথায় কথায় সেদিন আপনাব কথা উঠল, তিনকড়িবাবু বললেন বুধবাবেব বাত্তিবেব গাড়িতে আপনি আসবেন।'

—'বড় বেশি কথা বলে তিনকড়ি, হাড়হাভাতেব একশেষ।'

চুরুটে দু-একটা টান দিয়া লইয়া বলিলেন—'তা তোমাকেই-বা স্টেশনে পাঠাল কে?'

—'আপনাকে নিতে এলাম।'

—'তিনকড়িবই-বা খবব কি?'

—'তাব বড্ড অসুখ।'

—'কি অসুখ?'

—'অনেকদিন থেকে শূলেব বেদনা, এই সাতদিন হল বড্ড বেড়েছে, বিছানাব থেকে উঠতেও পাবেন না।'

—'তিনকড়িব বাসায় আব পুরুষমানুষ কেউ নেই?'

—'না।'

—'একটা চাকব অবদি না?'

—'না, ঠিক না-ঝি দুবেলা কাজ কবে দিয়ে চলে যায়।'

—'তিনকড়িব ভাইপো হীবেন কে'—বলিয়া প্রসন্নবাবু চুরুটে দু-তিনটা টান দিয়া কুলিকে বলিলেন—'বোস, সবুব কব, এখন মালপত্র মাথায় চড়াতে ওঠাতে হবে না—একটু দেবি আছে, বোস,

গোটা দুই বিড়ি টান যা, চারআনা পয়সা না হয় বেশি বকশিস পাবি, সবুর কর।'

—'না, সেই হীরেন অনেকদিন হয় কলকাতায় চলে গেছে।'

—'তিনকড়ির তাহলে শূলের ব্যথা চিড়িক দিয়ে উঠেছে বুঝি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'দেখে কে?'

—'মধু কবরেজ।'

—'বেশ।' একটু ভাবিয়া বলিলেন—'তাই হবে। আমি বলি চিঠি লিখলাম তবুও সে মানুষ স্টেশনে নেই। তা এইই তো হবে। নিজে আসতে পাবল না, তোমাকে পাঠাল তাই? তা তোমাকে পাঠাল কেন? তিনকড়ির একমাত্র বন্ধু তুমি নাকি?'

শচীন কোনো জবাব দিল না।

প্রসন্ন—'তোমাব সঙ্গে এত যে সদ্ভাব তা তো জানতাম না, তাহলে পোস্টকার্ডে যে তিন লাইন তিনকড়িকে লিখেছি তিনকড়িকে তাও লিখতে যেতাম না। সোজা কোনো এক হোটেলে-ফোটেলে গিয়ে উঠতাম।'

শচীন—'দাদাবাবু আমাদের ওপব বড্ড চটে গেছেন দেখছি, গতবাব যখন আপনাব সঙ্গে দেখা হয়েছিল'—

প্রসন্নবাবু বাধা দিয়া—'গতবাব? সে তো প্রায় তিন বছব আগেব কথা!'

—'হ্যাঁ। আমাব শ্বশুববাড়িতে। সেই সদাশিব মানুষ, দাদাবাবু মানুষের ওপর চটা তো আপনাব অভ্যাস নয়।'

প্রসন্নবাবু চুরুট টানিতে টানিতে কোনো উত্তর দিলেন না।

শচীন—'চলুন।'

—'কোথায় যাব?'

—'আমাদেব বাসায়।'

—'এ দেশে যদি কোনো ভদ্রলোকেব বাসায় উঠি তাহলে তিনকড়িব ওখানেই উঠব।'

—'তিনকড়িবাবুকে তো আমি বলে দিয়ে এসেছি যে তাব বাসায় উঠবেন না আপনি।'

—'তাহলে কোথায় উঠব?'

—'তিনকড়িবাবু জানেন যে স্টেশন থেকেই আপনাকে আমাদেব বাসায় নিয়ে যাব, সব ব্যবস্থাও করা হয়েছে।'

—'তিনকড়ি আব বউমা তাহলে এখন ঘুমুচ্ছে?'

—'হ্যাঁ, খুব নির্বিবাদে।'

প্রসন্নবাবু ঘড়ি দেখিয়া কহিলেন—'বাত তো একটা।'

—'আব দেবি কবা যায় না দাদাবাবু, চলুন।' দাদাবাবু চলিলেন বটে, কিন্তু ওযেটিং রুমেব দিকে। কুলিও সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র লইয়া সেইখানেই বাখিল।

একটা মস্তবড় বেতেব ইজিচেযাবে বসিয়া প্রসন্নবাবু আব একটা চুরুট জ্বালিলেন।

শচীন—'ব্যবস্থা তাহলে আপনাব এইরকমই হল?'

—'হ্যাঁ, আজকেব বাতেব মতো, তাবপব কাল সকালে'—

—'আপনি আমাব শ্বশুববাড়িব দেশের মানুষ, শ্বশুবের বড় বন্ধু, পার্বতীও দাদাবাবুব নামে অজ্ঞান, অথচ আপনি'—

—'পার্বতীব কাছ থেকেই তোমাদেব সংসাবেব সমস্ত পবিচয পেযেছি আমি, তারপব আব দুদণ্ডেব জন্যও সে জাযগা মাড়াতে ইচ্ছা কবে না।'

—'পার্বতী আমাদের নামে কি বলল আবার?'

—'মুখে বিশেষ কিছু বলেনি সে, কিন্তু তার আপাদমস্তক সমস্ত চেহারাখানাই অনেক কথা বলে। সোনাব প্রতিমার মতো মেয়ে ছ-বছব শ্বশুরবাড়ি করে এসেই একেবারে পাকসিটে ইতব চেহাবা বানিয়ে ফেলল, তোমাদেব জীবনের কদর্যতা—'

—'এখানে এলেই পার্বতীর শবীব কেমন ভেঙে পড়ে দাদাবাবু, আমি—'

—'পার্বতী বলেই কেন শুধু, তোমাদের সংসারের সব মেয়েমানুষদের দিকেই তাকিয়ে দেখো, এ সংসারে এলেই কেমন একটা অকথ্য কদর্যতা তাদের ঘিরে ধরে, বুকের ভিরত অপরিতৃপ্তি নিয়ে বাসা বাঁধে, তারপর তাও যায় শুকিয়ে, মানুষ নামে এক একটি সাক্ষাৎ অমানুষ হেঁসেলে বোয়াকে উঠানে ঘুরে বেড়ায়।' চুরুটে টান দিয়া প্রসন্নবাবু —'এবা নিজেরাও যেমন কষ্ট পায, অন্যকেও তেমনি দুঃখ দেয। এরা মনে করে মানুষের জীবনের মূল কথা হচ্ছে সহিষ্ণুতা ও বেদনা।'

—'তা ঠিক নয দাদাবাবু।'

—'কিন্তু বেদনা ও সহিষ্ণুতার ভিতরেও অনেকখানি মাধুর্য যে আনতে পারা যায়, সাংসারিক নানারকম অভাব অপরাধের মধ্যেও দাক্ষিণ্য সহানভূতি কল্পনা ও উপলব্ধিব সাহায্যে জীবনটাকে যে স্নিগ্ধ সুন্দর করে সাজিযে তুলতে পারা যায়, এরা তা কিছুতেই বুঝবে না। এক-একজনে এক-একটা পোড়া কাঠ। ভিতরে আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে, যেকোনো মুহূর্তে বিবসভাবে প্রকাশিত হযে পড়তে পারে।' প্রসন্নবাবু চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—'তোমরা মনে কবেছিলে পার্বতীর এরকম জীবনে রূপান্তরিত হবে।' মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না, তা হয না। সে সে জাতেব মেযে নয।' চুরুটটা নিভিয়া গিয়াছিল, পকেটের থেকে দেশলাই বাহির করিযা প্রসন্নবাবু—'তাই খুব তাড়াতাড়িই তোমাদের সংসাব ছেড়ে চলে গেল পার্বতী, আমি যতদূর জানি বাপেব বাড়ি থেকে সে আর ফিববে না।—তোমাব ঠাকুরদা যতদিন বেঁচে ছিলেন তোমাদের বাড়িতে প্রাযই আমি আসা-যাওযা করেছি, তখনই আমি বুঝেছিলাম জীবনের সুন্দর ব্যবহারে সে মানুষটি যেমন সমৃদ্ধ তাব ছেলেপিলেরা তেমনি অধম।' চুরুটে এক টান দিযা প্রসন্নবাবু—'এই তো চার বছব আগেও একবাব এসেছিলাম তোমাদেব এখানে—পার্বতী তখন প্রায বছর দেড়েক হল তোমাদেব বাড়ি বধূ হয়ে এসেছে। তুমি গিযেছ কলকাতায, টিউশান কবছ, দেশের বাড়িতে তোমাব ঠাকুবদাদা মৃত্যুশয্যায়, তোমাদেব সংসাবেব যে বিকৃত রূপ দেখলাম আমি ইহজীবনেও তা ভুলব না।' চুরুটে আবাব এক টান দিয়া বলিলেন—'জীবনেব যত ছোট কথা, ছোট রুচি, ছোট কাজে এইসব নিযে দিনবাত আস্তাকুঁড়েব মাছির মতো গিজ গিজ সংসাবে স্ত্রী-পুরুষে মিলে ভন ভন কবছে, দেখে জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিযে ফেলতে হয।' ছাই ঝাড়িয়া লইযা—'পার্বতী কোনোদিন এরকম সংসাবের আওতায বড় হযনি। এ সংসারকে ধিক্কাব দিযে যে সে চলে গিযেছে তাব সাহসেব ধন্যবাদ দিই আমি। একটা অনর্থক দুঃস্বপ্নে নিজেন জীবন বিড়ম্বিত করে কি লাভ? শেষপর্যন্ত আমাদের সকলেব জীবন আমাদেব নিজেদেব রুচি শ্রদ্ধা নিযে কারু ওপর কারু অধিকাব নেই।'

শচীন চুপ কবিযাছিল।

—'*জীবনে তোমাদেব কোনোদিক দিযেই কোনো মহত্ত্ব নেই, সান্ত্বনা নেই, সৌন্দর্যও নেই। সৌন্দর্য* নেই তোমাদেব জীবনে। টাকা আছে কি না-আছে জানি না আমি, কিন্তু সৌন্দর্য নেই। একটা মাছবাঙাকে গাছের ডালে বসে থাকতে দেখলে, তাব গর্ত খোঁজে যারা তোমবা সেই জাতীয জীব। গর্তের অন্ধকাবেই তোমাদের জীবন, আকাশের বৌদ্র ও নীলিমা তোমাদের শবীরে রস সঞ্চাব কবে, তোমাদের শবীবে মাত্র, কিন্তু অন্যকোনো উন্মুখতা জানায না। তোমবা এইরকম লোক আমি দেখছি তা। তোমবা শবীবেব জীব। এবকম জীব বড় জঘন্য হতে পাবে, তা তোমরাই হযেছে। তোমাদেব কোনো আত্মা নেই। ঘবের ভিতব ঢুকে তোমাদের দরিদ্র মলিন অন্ধকার সংসাবেব ভিতর ঢোকো যখন সৌন্দর্যেব যেটুকুও প্রতিবিম্ব পড়েছিল তোমাদের চোখেও তাও মুছে যায। বিড়ালের মতো হাড় তোমাদেব সংসাবেব মেযেদেব, হ্যাঁ বিড়ালেব মতো হাড় তাদের। হাঁড়িব কালি মাখা বিড়ালের মতো চেহারা। তাদেব জন্যও কোনো আত্মা বাখোনি তোমরা। তোমাদেব সংসারে মেযেদেরও কোনো আত্মা নেই।' প্রসন্নবাবু —'হ্যাঁ, জীবন চালাতে গিযে এই মূলমন্ত্রটা সবচেযে আগে বুঝে নিতে হবে, তা না হলে সাবা জীবন আত্মপ্রতারিত হযে ফিবতে হবে। পৃথিবীর দুঃখের মাত্রাও বাড়ানো হবে।' প্রসন্নবাবু চুরুটে একটান দিযা—'তোমাদেব বাড়িব লোকেব দস্তুব হচ্ছে বাইবের জগতে তোমরা জুজুবুড়ীব মতো হাঁটো, তোমাদেব মতো সর্বত্যাগী জীব বৈষ্ণবরুচির আর দুটি নেই। কিন্তু নিজেদের দরিদ্র মলিন অন্তঃসাবশূন্য সংসারের ভিতরে ঢুকে তোমরা একজনকে প্রবল ও নৃশংস যে মনে হয বিধাতার জগতে যত আকাঙ্ক্ষা ঈর্ষা ও হিংসা আছে তা তোমাদেব পক্ষে ঢের কম।' চুরুটটা নিভিয়া গিযাছিল। আর্ম-চেযারের হাতলেব উপর রাখিযা দিযা প্রসন্নবাবু—'দড়িব মতো চেহারা তোমাদের, মুখ চোখেও না আছে লাবণ্য, না আছে দীপ্তি অথচ পদে পদে কান মলে চোখ রাঙিয়ে সংসারেব কাছ থেকে কানাকড়ি আদায় কবে নেযাই তোমাদের ধর্ম—তোমাদেব সংসাবেব শিশু, নাবী ও চাকব-বাকরেব কাছে

তোমবা যে কত অবাঞ্ছিত কদর্য ভিখিবি তা তোমবা বোঝো।'

এক-আধ মুহূর্ত চুপ কবিয়া থাকিয়া প্রসন্নবাবু—'তোমাদেব মন এমন পক্ষাঘাতে মুষড়ে গেছে যে সে সব উপলব্ধি কববাব শক্তিও তোমাদেব নেই।' চুরুটটা হাতে তুলিয়া লইয়া প্রসন্নবাবু—'তোমাদেব নাবীবাও পদে পদে তোমাদেব সহাযতা কবে, একটা শ্রীহীন আনন্দহীন জীবন্মৃত সংসাব বানিযে তুলতে স্বেচ্ছায় তাবাও বক্ত ঢেলেছে কম নয। নাবীত্বকে ভাঙিযে খেতে গিযে তোমাদেব পৌরুষ কত ফোটে।' চুরুটটা জ্বালাইযা লইযা বলিলেন—'জেঠা, খুড়া তোমাব আটটি।' একটু চুপ থাকিযা বলিলেন—'তোমাব ঠাকুবদাদা যদি বুঝতেন যে সন্তানেবা তাব নিজেব মনুষ্যত্ব কেউই পাবে না, সকলেই অন্নবিস্তব খবিশ হযে জন্মাবে তাহলে সন্তানেব জন্ম দিতে যেতেন না তিনি নিশ্চযই।' আবাব একটু নিস্তব্ধ থাকিযা বলিলেন—'পিসিমাও তো তোমাব চাব-পাঁচটি।'

—'চাবজন।'

—'শুনলাম তোমাব বড়জেঠামশাই নাকি মাবা গেছেন?'

—'হ্যাঁ মাস তিনেক হল গিযেছেন।'

—'কীসে গেলেন?'

—'যক্ষ্মায।'

প্রসন্নবাবু একটু চুপ থাকিযা—'তিনি না তিন সংসাব কবেছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'মৃত্যুব বছবখানেক আগেও একবাব বিযে কবলেন।'

শচীন মাথা নাড়িযা বলিল।—'হ্যাঁ তাহাই কবিযাছিলেন।'

প্রসন্নবাবু খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিযা—'তোমাব জেঠামশাইকে আমাব খুব মনে পড়ে। দিনবাত রুক্ষ-বিবস গলায শিবস্তোত্র আওড়াতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁব সে অভ্যাস ছিল বোধকবি। ছিল? হ্যাঁ থাকবেই তো। মৃত্যু যখন ঘনিযে এল ভালো লক্ষণ বেশ বেশ।' চুরুটে একটান দিযা—'জীবনেব অভিজ্ঞতাও তাব বিচিত্র, গভীবও কম নয। অনেক পড়াশুনোও কবেছিলেন। অথচ অমানুষ নাবীব জীবন নিযে এই বহস্য কবে গেলেন।' শচীনেব দিকে তাকাইযা প্রসন্নবাবু—'তোমাদেব প্রথম জেঠিমাব কথা মনে পড়ে?'

—'হ্যাঁ, তখন আমবা ইস্কুলে পড়তাম।'

—'তাবপব, তিনি মাবা গেলেন কবে?'

—'আমবা ইস্কুলে থাকতে-থাকতেই।'

—'তোমবা দ্বিতীয-জেঠিমা যখন প্রথম ঘবে এলেন স্মবণ আছে হযতো?';

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।

—'কত বযস ছিল তাঁব?'

—'পার্বতীব সমান।'

—'আমাবও বেশ মনে আছে, তোমাব ঠাকুবদাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে এই বিযে কবা হযেছিল। বউ যখন ঘবে এল দেখলাম এমন ছেলেমানুষ' জীবনেব কি ভযাবহ অন্ধকাব আড়ম্ববেব ভিতব পড়ে গেছে সে সম্বন্ধে একটুও জ্ঞান নেই তাব, এমনই নির্বোধ মেযেটি' মন তাব নিবপবাধ প্রসন্নতায, বিহ্বল, চাবদিককাব অমানুষিক পৈশাচিকতাকে উপলব্ধি কববাবও শক্তি নেই, এমনই শিশু।

নির্বাপিত চুরুটটাব দিকে তাকাইযা প্রসন্নবাবু—'যাক বছব ঘুবতে না ঘুবতেই শুনলাম। বেচাবী শিশুপ্রসব কবে মাবা গিযাছে—মন হল অনেকদিন পর্যন্ত এবকম সুখবব আমি পাইনি।' চুরুটটা জ্বালাইযা লইযা প্রসন্নবাবু—'জীবনেব প্রতাবণা ও কদর্যতাব থেকে দুটি প্রাণী কি গভীব সুন্দবভাবে বক্ষা পেল।' কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিযা—'কিন্তু বেদনাব দেবতাব মাত্রাবোধকে ফাঁকি দেযা বড় কঠিন। যে দুঃখ আমি এড়ালাম, সে দুঃখ শূন্যে শূন্যে ঝুলে বেড়াবে না তাই বলে, আব একজনেব জীবনকে জর্জব না কবে ছাড়বে না। সৃষ্টিব স্রোতেব ভিতব এমনই ক্ষমাহীন নিযমেব সাজসজ্জা।' চুরুটে এক টান দিতে গিযা দেখিলেন চুরুটটা নিভিযা গিযাছে আবাব। পোড়া চুরুটটা আর্ম চেযাবেব হাতলেব উপব আস্তে আস্তে বাখিযা দিযা বলিলেন—'এই তৃতীয পক্ষেব মেযেটি এল তাই। সেই মৃতবৎসা মৃতা ক্ষীবোদাব জাযগায একে আসতে হল। কোনো নড়চড় নেই, বেহাই নেই, তোমাব জেঠামশাযেব, জীবনটাকে অবলম্বন কবে পৃথিবীতে যে দুঃখেব পবিমাণ পূর্ণ হবাব কথা ছিল, তা হবেই। বেদনা বহন কববাব লোক বদলায শুধু বেদনা বদলায

না। একজন মবে শান্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু আব একজনকে সমস্ত দাম চুকিয়ে দিতে হচ্ছে তাই। দেখো, জীবনেব শেষ দিন পর্যন্ত তোমাব এ জেঠিমাব দুঃখ কত মর্মভেদী হবে, অথচ তোমাদেব ধর্মকে স্পর্শও কববে না। জীবনেব ব্যবস্থা এমনই ভযাবহ।' বলিলেন—'কি নাম এই মেয়েটিব?'

—'জেঠিমাব? শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী।'

—'পার্বতীব চেয়ে ছোট। মা-বাপ নেই?

—'আছে।'

—'বাপেব বাড়িতে যায না?'

—'না। সেখানকাব অবস্থা বড় খাবাপ।'

—'এখানকাব চেয়েও।'

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ থাকিয়া—'শৈল দেখতে কেমন?'

—'সুন্দবীই বলতে হবে।'

—'পার্বতীব চেয়েও?'

শচীন একটু ইতস্তত কবিযা মাথা নাড়িয়া—'হ্যাঁ, তা হবে বইকী।'

—'তাহলে তো দস্তুব মতো সুন্দবী, পবমাসুন্দবী বলো।

শচীন ঘাড় নাড়িয়া— তাই।'

প্রসন্নবাবু একটু বিচলিত হইযা খানিকক্ষণ চুপ কবিযা বহিলেন। তাবপব বলিলেন—'যাক। অনন্ত রূপেব ভাণ্ডাব তো বিধাতাব হাতেই। তাই দুঃখ কবি না আমি আব। রূপ নিযে এবকম নির্বিকাবভাবে খেলা কববাব অধিকাব তাব খুবই আছে।'

শচীন চুপ কবিযাছিল।

প্রসন্নবাবু—'বুদ্ধিসুদ্ধি কেমন এ মেয়েটিব?'

শচীন একটু হাসিযা—'আমাদেব চেয়ে একটু কম নয।'

—'খুব বিমর্ষ?'

—'না। বেদনা বা আনন্দ নিযে আত্মবিহ্বলতা নেই এব।'

— নাবীব কর্তব্য বলতে তোমাদেব অমানুষ সংসাব যা মনে ক'বে তা নিযমিত পালন কবে?

শচীন— একে আমাদেব সংসাবেব সকলেই খানিকটা ক্ষমা কবে চলে।

—'পিশাচ তোমবা' তোমবা আবাব ক্ষমা কবো মানুষকে' কেন এসব মিথ্যা কথা বলো আমাব কাছে'

শচীন একটু হাসিযা—'পৃথিবীতে এমন এক-একজন সেই ভাগ্যবতী জন্মদুঃখিনী থাকে যাকে ক্ষমা কবতে গিযে লোক দেখাবাব সাধ জাগে না, দাদাবাবু, কর্তব্যেব পীড়াও থাকে না, হৃদয নিজেব থেকেই বিমুগ্ধতায অভিভূত হযে পড়ে।'

প্রসন্নবাবু চুরুট জ্বালাইযা কিছুক্ষণ চুপ কবিযা বসিযা বহিলেন। চুরুট জ্বলিযা জ্বলিযা নিভিযা গেল। ছাইযেব দিকে তাকাইযা তিনি বলিলেন—'তাব রূপেব জন্যই তো এই। কিন্তু তোমাদেব সংসাবেব অসচ্ছলতা ও সংগ্রামেব ভিতব রূপ তো তাব পুবস্কাব পাচ্ছে আজ। তোমাদেব হৃদযেব বিমুগ্ধতাও কোনো নতুন বিষযবস্তু খুঁজবে হযতো তখন। কিন্তু এ মেয়েটিকে নিযমিত থান কাপড় কিনে দিও—কুকুব বেড়ালেব চেয়ে খানিকটা সম্মান ও আশ্রয দিতে ভুলো না।' প্রসন্নবাবু বললেন—'সেই ভজহবি আজকাল কোথায?

—'ভজুকাকা? বাসাযই আছেন।'

—'কি কবে আজকাল?

—'কতকগুলো এজেন্সি নিযে বসেছে।'

—'টাকাকড়ি পায?'

শচীন মাথা নাড়িয়া—'না, এজেন্সিগুলো বিদেশী কিনা।'

—'তবে যে নিতে গেল'

—'ভেবেছিলেন লাভ হলে খুব হবে, বেশ চড়া কমিশন।'

—'তোমাব এই কাকাটি ববাববই এইবকম। শবীব কেমন আছে?'

—'ভজুকাকাব? সুবিধাব না।'

—'কেন?'

—'পেটেব গোলমাল।'

—'হ্যাঁ, তা আমি ভজহবিব ছোটবেলাব থেকেই দেখছি দাঁত মাজে না, খাবাব লোভেই খেত শুধু, ডিসপেপসিযাব জন্য ইস্কুলে, মানুষেব বাড়িতে, সভ্য মজলিশে কোথাও বেচাবী দু-দণ্ড নিবাপদে বসতে পাবত না—নিজেকে কষ্ট দিত, মানুষকেও বিব্রত কবে তুলত। বাপেব বাক্সেব থেকে পযসা চুবি কবে ফিবিওযালাব পচা মিঠাই খাবাব শখ একদিনেব জন্যও ছাড়তে পাবল না ভজু। এবকম কদাকাব কৈশোব ও যৌবন মানুষেব কোনোদিন দেখিনি আমি।' চুরুটে একটা টান দিযা—দাঁত কটা আছে ভজুব?'

—'একটাও না।'

—'একটাও না' এই চল্লিশ বছবেই সব গেল।' একটু চুপ কবিযা—'দেখবাব মতো মানুষ তোমাব ঠাকুবদা—তাব এমন অপ্রীতিকব সন্তান?' ধিক্কাব দিযা বলিলেন—'গাঁজা ছেড়েছে?"

—'হ্যাঁ।'

—'সেইসব বদ অভ্যাস এখন আছে আব?'

শচীন মুখ তুলিযা প্রসন্নবাবুব দিকে তাকাইল।

প্রসন্নবাবু' [...] কবে কি এখন ও?'

—'কই, তা তো জানি না।'

প্রসন্নবাবু কথাটি চাপিযা গিযা—'শুনেছি এখন ধার্মিক হযেছে ভজহবি।' বলিলেন—'এই তো বছব তিনেক আগেব কথা, পার্বতী তখন এইখানেই ছিল, পূজাব ছুটিতে তোমাব ছোটশালী এসেছিল তোমাদেব এখানে কযেকদিন বেড়াতে। ভজহবি বললে সংসাবে পুরুষ মানুষ গিজগিজ কবছে, এব মধ্যে এবকম অবিবাহিতা অবক্ষণীযা মেযে আসবে কেন? কোনো একটা কলঙ্ক হযে গেলে দাযধাবা কে দেবে। এইসব উচ্চাঙ্গেব কথা বলে সে আজকাল। প্রসন্নবাবু ঠোঁট উলটাইযা হাসিযা বলিলেন—'কিন্তু তোমাব সেই ছোটশালীকেই একদিন একা ঘবে অন্ধকাবে বসে থাকতে দেখে ভজহবি তাকে বলেছিল, বেশ একটা সুন্দব বই আপনাকে দেব (ববিবাবুব) 'চোখেব বালি' পড়বেন? আজ সমস্তটা দুপুব পড়তে পড়তে অবাক হযে গেছি।' বলিযা প্রসন্নবাবু হো হো কবিযা হাসিযা উঠিলেন। বলিলেন—'এসব কি জাতীয মানুষ শচীন?'

শচীন নিস্তব্ধভাবে ঘাড় নাড়িযা বলিল—'জানি না।

—'যাক, এবকম অনেক বিচিত্র জীব তোমাদেব তো সংসাবেব পথে-বিপথে, তাব জন্যও ততটা নয, তোমাদেব অসচ্ছলতাযও চলে যেত, কিন্তু আসল কথা পার্বতী তোমাকে ভালোবাসে না।' প্রসন্নবাবু একটু চুপ থাকিযা—'কিন্তু তবুও আমবা তাকে তোমাব কাছেই আসতে বলেছিলাম—কিন্তু কিছুতেই পাবা গেল না, মানুষেব জীবন তো তাব শবীব নিযেই না শুধু—হৃদযই যত বিচিত্র গোলমাল বাধায। পড়ন্ত সূর্যেব সোনালি বৌদ্রেব ভিতব একজন কুৎসিত মানুষেব মুখেব ভিতবও কেমন একটা আভা দেখা যায। সেই আভা নিযেই জীবন, শবীব নিযে নয। শবীব দিযে না, মোটেই নয—মানুষেব জীবন এই আভা নিযে, আত্মা নিযে।'

একটু চুপ থাকিযা—'এই তো দেখো তোমাব জেঠামশাযেব তৃতীয পক্ষেব বধূ প্রতি মুহূর্তেই মৃত স্বামীব নাম কবে দিন কাটায, অথচ তুমি সুস্থ সচ্চবিত্র মানুষ, পার্বতী তোমাকে দেখতে পাবে না।' বলিতে বলিতে প্রসন্নবাবু ঘাড় গুঁজিযা ঝিমাইতে লাগিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে হঠাৎ চেযাবেব হাতলেন উপব কপাল ঠুকিযা গেল, ধড়মড় কবিযা জাগিযা উঠিযা প্রসন্নবাবু নিজেকে সামলাইযা লইযা দু-এক মুহূর্ত চুপ কবিযা বসিযা বহিলেন। একটা হাই তুলিযা তুড়ি দিযা—'তুমি এখনো বসে আছ?'

শচীন মাথা নাড়িযা একটু হাসিল।

প্রসন্নবাবু— কি বলছিলাম, পার্বতী—তা পার্বতী এখন কি কবে জান শচীন?'

শচীন চোখ তুলিযা তাকাইল।

প্রসন্নবাবু—'বোজ সকালে ঘুমেব থেকে উঠে বোদে পিঠ কবে বসে মস্তবড় কচুপাতায তেল মাখিযে বড়ি দেয।'

—'কেন?'

—'অমূল্য বলে একটা ছোকবা আছে, পুলিশে কাজ কবে, বড়ি দিযে তবকাবি খেতে খুব ভালোবাসে— তাকেই দু-বেলা গবম গবম বেঁধে খাওযায।'

প্রসন্নবাবু আবাব ঘুমাইযা পড়িলেন।

জন্মমৃত্যুর কাহিনী

হ্যাঁ, তাহাব পব তৃতীযপক্ষ হইল।

সৌবীন বিস্মিত হইযা উপলব্ধি কবিল এ মেযেটিব দিকে উদাসীনভাবে তাকাইযা ইহাকে বিদায দেযা চলে না।

নিজেব জীবনেব বিবাহেব ইতিহাস সৌবীনেব প্রায দশ বৎসবেব। বযস ছিল তখন তাব পঁচিশ, অতীতেব স্মৃতি লইযা শান্ত বিমর্ষ বিমুগ্ধ হইযা বসিযা থাকিবাব দিন তখনো আসে নাই জীবনে। দিনবাত্তিব আগমন ও বিসর্জনেব নিকট দাঁড়াইযা মন অকাবণ প্রীতি ও প্রসন্নতায ভবিযা উঠিত তখন। পথে পথে যাহাবা দীর্ণ বিদীর্ণ হইযা বন্ধুত্ব খুঁজিযা বেড়ায তাহাদেব দিকে তাকাইযা ভযে বেদনায চমকাইযা উঠিত সৌবীনেব হৃদযে। গৃহে তখন কল্যাণী বধূ প্রথম আসিযাছে তাব, বহুদিনেব ধূসব উপেক্ষিত, ব্যবহৃত পৃথিবীব সুখেব সহিত সুন্দব নতুন প্রথম পবিচযেব সুযোগ ঘটিযাছে যেন আবাব, জীবনেব নিকট হইতে প্রত্যাশা তখন যেমনই বিচিত্র তেমনি সর্বাঙ্গীণ। এমনি কবিযা নববধূকে লইযা দিনেব পব দিন কাটিযা গেল। বহস্যমযী নাবী, পবিচিত পুবানো আত্মীযদেব মধ্যে ধীবে ধীবে আসিযা পড়িল। হৃদযেব নিকট হইতে অপবিমেয মূল্য প্রার্থনা কবিল না আব। সংসাবেব সাধাবণ বিবর্ণ যোগ-বিযোগেব হিসাবে চবিতার্থতা লাভ কবিতে লাগিল।

পঁচিশ বছবেব যুবক পঁযতিবিশ বছব।

এই সমযে প্রথম পক্ষেব বধূ উমাতাবা মাবা গেল।

তাবপব দু'বছব কাটিযে গিযাছে। সাঁইতিবিশ বযসে আব এই শঙ্কবী। এই মেযেটি মনে কবে আব একটু হইলেই স্বামী তাহাকে হাবাইযা ফেলিযাছিল বুঝি। প্রথম বধূ মবিযা গিযাছে বলিযাই না তাহাকে জীবনেব পথ হইতে কুড়িযা পাইযাছেন স্বামী, সেই সতীন, প্রথম পক্ষেব বধূ উমাতাবা যদি আজ বাঁচিযা থাকিত তাহা হইলে এই মানুষটিব সঙ্গে হৃদয বিনিমযেব সৌভাগ্য হইতে চিবদিনেব জন্য বঞ্চিত হইত সে। ভাবিতে ভাবিতে স্বামীব কোলে শুইযা পড়ে সে, সৌবীন ধীবে ধীবে বধূব শিযবে হাত বুলাইযা দেয। কিন্তু হৃদযে তাব প্রেম নাই, আছে অনুভূতি, কিন্তু এত নিবিড় অনুভূতি নাই যে সৌবীনেব জন্য কোনোদিন মাথা খুঁড়িযা কাঁদিতে পাবিবে সে। উমাতাবা যখন মবিল বেদনাব শেষ আত্মবিহ্বলতা ঝবিযা সবিযা গিযাছে।

তাই তো, প্রেম নাই, হৃদযেব বিচ্ছেদেব মাত্রাটুকুও শূন্যে শূন্যে সেই অপসৃতা অপস্রিযমাণাব জন্য ঘুবিযা ঘুবিযা বেড়াইতেছে, এই মেযেটিকে কী দিযা গ্রহণ কবিবে সে? শঙ্কবী জীবন এই প্রথম শুরু কবিল, ষোলো বছবেব বধূ, স্বামীব কাছে বাযনা ধবিযা সে কতবাব বলে—জীবনেব গত ষোলোটা বছব সে মুছিযা ফেলিতে চায—মিছেমিছি আকাশেব দিকে তাকাইযা হাসে, দু'হাত ভবা সোনাব চুড়িব দিকে তাকাইযা চোখ তাব আনন্দ ও অহংকাবে উজ্জ্বল হইযা ওঠে। অধিবাসে যে দামি শাড়ি ও আংটি পাইযাছিল সেই গভীব পুবস্কাবেব পবিতৃপ্তি ক্ষণে-অক্ষণে পাইযা বসে তাকে। চুলেব মতন সরু শোনাব হাবটা আঙুল দিযা নাড়িতে নাড়িতে দিনেব মধ্যে শত সহস্রবাব আনন্দে বিভোব হইযা ঘবে বাহিবে ঘুবিযা বেড়ায। শুধু যদি এই বকমই হইত, মন্দ হইত না।

কিন্তু শুধু বিষযবস্তু লইযাই তৃপ্ত থাকিবাব মতো মানুষ নয সে। জীবনেব রূপান্তব যে তাহাব সকল দিক দিযাই ঐশ্বর্য বহন কবিযা আসিযাছে ইহা সে তাহাব মনেব শিশুসুলভ সবলতায স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিযা ধাবিযা লইযাছে, কিন্তু শঙ্কবীব এই শিশু মনেবই নিযম এই যে আড়ম্ববেব সহিত বাবম্বাব প্রমাণ চায, একটু আন্তবিকতাব অভাব হইলেই ভুল ধবিযা ফেলিতে পাবে, বেদনা পায, মানুষকে চিন্তিত ও অবসন্ন কবিযা তোলে।

দেখিতে বেশ সুন্দব বধূ, অধিবাসেব দিন ভালো কবিযা একবাব তাকাইযা দেখিযাছিল সৌবীন, একখানা বেনাবসী শাড়ি পবিযা সুন্দবী মেযেমানুষও তাহাব জীবনে আবাব প্রবেশ কবিল। কিন্তু দশ বছব

আগে এমনই এক দিনে উমাতারা যতখানি বিচলিত করিয়াছিল বিমুগ্ধ হইবার সেই শক্তি হৃদয় তাহার হারাইয়া ফেলিয়াছে আজ।

ঘরে বাহিরে কতদিনকার কত আশা-আকাঙ্খা অশ্রু ও উচ্ছ্বাসের আয়োজনে ব্যবহৃত মানুষ সে, নারী তাহাকে চেনে, নারীও তাহার চিরপরিচিত জীব, দাম্পত্যের পথেঘাটে পরস্পরকে কতবার শ্রীহীনভাবে বিক্রয় করিয়াছে তাহারা।

জীবনের সুন্দর ও মধুর ধারণা ও কল্পনা এই মেয়েটির সম্বল। সংসাবের পথে চলিতে চলিতে জীবন যে নীচতা ও মলিনতা সঞ্চয় করে ইহা তাহাকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত হইতে হইবে। একদিন শঙ্করী বুঝিবে জীবনের [...] প্রথম ষোলো বছরের দিনবাত্রি যাপনই তাহার জীবনেব সবচেয়ে বেশি দামি ছিল, তারপব হইতেই ক্ষয় শুরু হইল, প্রেমকে সংসারের কাজে ব্যবহাব কবিতে গিয়া দেখা গেল হৃদয় হইয়া ওঠে ফোঁপারা নারীত্ব বলিতে জীবনের ভাঁটাব স্রোতকেই বুঝায়। যে চিরবিসর্জিত অতীত কোনোদিন ফিবিযা আসিবে না স্বপ্ন তাহাকে লইয়াই শুধু, অজস্র ব্যাথায ভবা আকাশের নীচে বলিয়া জীবনের ভুল ক্ষয ও ক্ষতি গণনা করিতে কবিতে যে বেদনা ও অসহায বোধ হয় জীবনের মাধুর্য ও কবিত্ব সেইটুকুব ভিতরে, অন্য কোনো প্রেম স্বপ্ন মধুবতা জীবনে নাই কিছু আব, নিববচ্ছিন্ন কাজ কলবব হাসি অশ্রু ও সাংসারিকতা ঢেব আছে বটে।

একদিন শঙ্করী এই সব বুঝিবে। আজই যদি বুঝিত তাহা হইলে সৌবীনেব বুকে হাত দিযাই তাহাকে চিনিয়া ফেলিতে পাবিত বধূ। সংসারেব পবীক্ষিত সত্যগুলি মনে রাখিযা জীবনখাতা দুইজনেব পক্ষেই সহজ হইযা উঠিত তাহা হইলে। কিন্তু আজ তাহা হইবে না। অনেক আকাশ কল্পনা আছে এই মেয়েটিব মনে, সেই দশ বছর আগে উমাতারার যেমন ছিল, সৌরীনেব নিজেবও ছিল যেমন, বধূ আজ নিজেকে কল্যাণী মনে করে, আত্মীয় প্রতিবেশীর আশীর্বাদে আনন্দকন্টকিত হইযা উঠে দু-একটা সোহাগেব কথা শুনিলেই গলিযা জল হইযা যায, স্বামীব ঘবকে গৃহদেবতাব আসন মনে কবিযা শ্রদ্ধায বিহ্বলতায বিমুগ্ধ হইযা থাকে। স্বামী তাহাব হাতে হাত বখিযা নীরবে তাহার চোখের দিকে তাকাইলেই বধূ নিজেকে হাবাইযা বসে একেবাবে—স্বামীব বুকেব ভিতবে মাথা গুজিযা বাখে। জীবন যে প্রতি মুহূর্তেই স্মবণ কবে, স্বামীকে স্মবণ কবাইযা দেয।

কিন্তু জীবনের ঢেব পুবাতন জিনিস। ষাট বছব বযসে জীবনেব দিকে তাকাইযা শঙ্কবীব যাহা মনে হইবে এখনো যেন সেই সব মনে হয সৌবীনেব। মনে হয উমাতাবাকে লইযা যে দশবছর কাটিযা গিযাছে তাব, সে যেন দশ বছব শুধু নয পৃথিবীব অনাদি অসীমকালের সমষ্টি নবনাবীব জীবনকে অবলম্বন কবিযা যত মিলন বিচ্ছেদেব কাহিনী গড়িযা যায, জীবনের ভিতব হইতে যত শুভ জিনিস আবিষ্কাব কবে, যত সুন্দব জিনিস নষ্ট করিযা দেয, যত সংসাব রচনা কবে যত সংসাব ধ্বংস কবিযা ফেলে এই দশ বছবেব ভিতবেই সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাব সঙ্গে পরিচয হইল যেন তাহাব। মনে হয যেন কোনো এক বিবাট যুগযুগান্তেব রাজ্যেব ধ্বংসাবশেষেব ভিতব বসিযা প্রতিটি ইটেব জন্মমৃত্যুব কাহিনী মানুষকে বলিয়া দিতে পাবে সে।

উমাতাবা যদি কাছে থাকিত তাহা হইলে তাহাকে বলিতও এই সবই বলিত হযতো আজ। কিন্তু নিকটে আজ শঙ্করী, স্বামীকে সে বাইশ বছবের প্রথম প্রণযক্লিষ্ট আত্মহারা যুবক বলিযা বুঝিযা লইতে চায। আহা বেচাবি! চেহাবার নবীনতা আজও যথেষ্ট আছে সৌবীনেব, বধূব প্রথম প্রণযাবিষ্ট হৃদযকেও দু-দণ্ডেব জন্য রূপান্তরিত কবিযা লইতে পারা যায, কিন্তু তাব পরেই কেমন একটা অবসাদ আসে সৌবীনেব ব্যযবহুল অনাড়ম্বব অন্তর্জীবন, ঘবেব প্রতি আনাচকানাচ উমাতারাব সুচিন্তিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবীণ জীবনপ্রণালীর স্মৃতি সৌরীনের এই নতুন বিবাহেব অসাড়তা অসংযম ও বিশৃঙ্খলাকে যেন বাব বার ধিক্কাব দিযা যায।

সৌবীন বলিল—'আমার যে দু'বাব বিয়ে তা তুমি ভুলে গেলে শঙ্করী?'

শঙ্করী স্বামীর বুকে মুখ গুঁজিয়াছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলিযা বলিল—'আমি জানিনে বুঝি সব? সে বউযেব কথা ভাবছ বুঝি? ও, কি যেন ছিল তাব নাম?'

'সৌরিন—'নাম ছিল তো উমাতারা।'

শঙ্করী—'ইস, তার নাম বলতে গিযে চোখ একেবাবে ছলছল কবে উঠল যে তোমার!'

সৌরীন মাথা নাড়িয়া বলিল—'না চোখ আমাব ঠিকই আছে।'

শঙ্করী খানিকক্ষণ ভালো করিয়া তাকাইয়া বলিল—'তোমার একটু কাঁদতে ইচ্ছা করে না?'

—'কেন?'

—'তার কথা মনে করে?'

সৌরীন কোনো জবাব দিল না, চোখের বিরসতাও তাহার একটুও ঘুচিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

শঙ্করী—'তোমবা এই রকমই।'

—'কীরকম?'

—'তোমাদের পুরুষমানুষদের কথা বলছি, তোমরা নিজের নিয়মেই চলো, বুকেব ভিতর তোমাদেব একটুও ক্ষমা বা দুঃখ যদি থাকে।' বলিয়া জানালাব ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে খুব সহজভাবেই সে তাকাইল, হৃদয়হীন ভবিতব্যতাব হাতে নিজেব জীবন যে এইবকম নষ্ট হইয়া যাইবে না তাব এ বিষয় অন্তত সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কমনীয় আশাহীনতায় শঙ্করীব মুখখানা বেশ সুন্দর।

সৌরীন নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ করিয়া বহিল।

—'আচ্ছা এই দশ বছর ধবে দিদি তো তোমাব জন্য কত করল, তাকে এক মুহূর্তেই ভুলে গেলে যে?'

—'এখনো ভুলিনি।'

—'সত্যি ভোলনি?'

সৌরীন মাথা নাড়িয়া—'না।'

মেযেটি একটা ঢোক গিলিযা-'ভালোই কবেছ, দশ বছব যাব সঙ্গে বসে ঘরকন্না—' কিন্তু ইহাব বেশি সে বলিতে পারিল না, স্বামীর মনেব ভিতব যদি কোনো পুবোনো স্মৃতিকে খুঁড়িয়া বাহিব কবিতে ভালো লাগে না তার। একটু চুপ করিয়া তবুও বলিল—'কিন্তু মানুষেব দুঃখে মানুষের যে চেহাবা হয়, তা তো তোমার হয়নি।'

সৌরীন একটু হাসিয়া—'হযনি বুঝি?'

—'বা, তুমি তো দিব্যি, দোজবব বলেও কি তোমাকে একটুও বোঝা যায?' সৌবীন চুপ কবিয়া ছিল।

শঙ্কবী—'টোপর মাথায যখন তোমাকে দেখলাম, মনে হল, বা, বেশ তো, যেন আঠাবো বছরেব নতুন বব।' বলিয়া হাসিয়া সৌরীনেব কোলে ঢলিয়া পড়িল মেযেটি।

—'না, অতটা মনে হযনি শঙ্কবী, তাই কি মনে হযেছিল?'

—'আমাব মনের কথা তোমাকে বলব কেন? বললে তো তুমি বিশ্বাস কববে না। দিদিকেও এইরকম অবিশ্বাস কবতে?'

'সৌবীন একটু হাসিয়া—'আমি সব মানুষকেই বিশ্বাস কবি।'

—'কী মনে হযেছিল জান?'

—'বলো তো।'

—'না বলব না।' বলিয়া ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিল মেযেটি। শঙ্করীকে দেখিযা শুনিযা মনে হয জীবনেব উচ্ছলতাব কথাই মনে হযেছিল শঙ্করীব। সে যেন প্রথম প্রেমের ও সাধের রাজ্যে প্রবেশ করিযাছে—যে স্বাদ সৌরীন আজ শুনিতে পায না, যে ছবি আজ তাহার চোখেব সম্মুখ হইতে বহুদিন হয মুছিয়া গিযাছে সেই সব বিচিত্রতা সর্বস্ব করিযা এই মেযেটিব মোহময মোহের জীবন আজ প্রথম আবম্ভ হইল। বিচিত্রতা আজ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল অভিজ্ঞ নারীব কাছে যাহা ধূলিসাৎ ইহা তাহার কাছে প্রসাদ—যে মিথ্যা ও কপটতা বিষয়ী মেযেমানুষ এক মুহূর্তেই ধরিযা ফেলিতে পাবে সেই ছলনাকেই সুন্দর সজ্জিত পুবস্কাব বলিযা মনে করে শঙ্করী। সংসাব বলিতে এই মেযেটিব জীবনেব অবাস্তব মরীচিকাব পাট বোঝে। অভিভূত হইযা পড়ে।

সন্ধ্যার সময শঙ্করী একবাব স্বামীব ঘরে ঢুকিযা—'কী করছ তুমি?'

অন্ধকার ঘরে একা বসিযা সৌবীন কী যেন ভাবিতেছিল। চমকাইযা উঠিযা—'তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ শঙ্করী?'

—'চাবটে টাকা পেলাম।'

—'কোথে কে?'

—'কামাখ্যাবাবু না কে—তাঁর গিন্নী দিলেন—'

—'কেন?'

—'নতুন বউ দেখতে এসেছিল, টাকা দিযে দেখল।'

—'ও।'

শঙ্কবী এগাইযা আস্যিা সৌবীনেব ডান হাতখানা সস্নেহে তুলিযা লইযা বলিল–'নাও তুমি।'

—'আমি নিযে কী কবব? বেখে দাও তোমাব কাছে' বলিযা অন্যমনস্কতায অজ্ঞাতসাবে নিজেব হাতটা তীব্রভাবে গুটাইযা লইল সৌবীন। টাকা চাবটা বিছানায ছড়াইযা পড়িযা গেল।

শঙ্কবী কেমন যেন দমিযা গিযা মুচড়াইযা গিযা বিছানাব একপাশে চুপ কবিযা গিযা বসিল, খানিকক্ষণ নীবব থাকিযা বলিল–'আমাব কাছে বাখলে হযতো হাবিযে যাবে এই টাকা।'

সৌবীন শুষ্কভাবে বলিল—'যায যাবে, কত জিনিস তো হাবিযে যায।'

চাবটি টাকা স্বামীব হাতে তুলিযা দিযা মেযেটি কযেক মিনিটেব জন্য অন্তত বাজ্যজযেব আনন্দ অনুভব কবিতে আসিযাছিল—কামাখ্যাবাবুব গিন্নী যে মুহূর্তে টাকা ক'টা দিযাছিল তাকে সেই মুহূর্তেই এই অপূর্ব বিলাসিতাব আকাঙ্ক্ষা পাইযা বসিযাছিল শঙ্কবীকে। মুখ কাচুমাচু কবিযা অর্থহীনভাবে কিছুক্ষণ বসিযা বহিল মেযেটি। জানালাব ভিতব দিযা তাকাইযা আকাশপাতাল ভাবিযাও বুঝিতে পাবিল না (তাহাব) আন্তবিক সম্ভাষণেব উত্তব দিতে গিযা স্বামীব মুখ এমন পাথব হইযা গেল কেন? এই তো তাকাইযা দেখিলেই বোঝা যায এখনো কেমন বিবসভাবে বসিযা আছে স্বামী। হযতো শঙ্কবী (নিজেই) কোথায কি যেন ভুল কবিযা ফেলিযাছে, কিন্তু চুপচাপ বসিযা বসিযা নিজেব ভুল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাছিযা বাহিব কবিবাব কোনো ক্ষমতা বা রুচি এই অল্পবযস্কাব নাই—সহজেই সব ভুলিযা গেল সে, কযেক মুহূর্তেব মধ্যেই তাহাব মন ভাঙিযা গলিযা নিজেব স্বাভাবিক নিযমে অকাবণে ও আহ্লাদে বিহ্বল হইযা উঠিল আবাব। টাকা ক'টি সে গুছাইযা লইল, নিজেব কাছেই বাখিল। বলিল–'সব ক'টিই সিঁদুব মাখা টাকা। বেশ তো।' একটু চুপ থাকিযা—'আমাব মাযেব বাক্সে এই বকম কতকগুলো টাকা ছিল, মা বলতেন খুব পযমন্তব জিনিস, দেনাব দাযে বাবা খবচ কবে ফেললেন।' সৌবীনেব দিকে তাকাইযা—'আমাব সিঁদুবেব কৌটোব মধ্যে বেখে দেই?'

—'দাও।'

—'কিন্তু আঁটবে না যে।'

সৌবীন কোনো জবাব দিল না।

শঙ্কবী—'কী দেখছ?'

—'না, বিশেষ কিছু দেখছি না।'

—'ব্যস, আকাশেব দিকে একঠায তো তাকিযে আছ।

সৌবীন বধূব দিকে আপাদমস্তক একবাব চোখ বুলিযা লইযা বলিল—'কযেকটা দিন তো কেটে গেল, এখনো ঘটা কবে নতুন বউযেব মতো সাজসজ্জা কবে বেড়াতে খুব আমোদ লাগে তোমাব? নিজে তুমি বোঝ না কি বকম ছেলেমানুষ তুমি!'

শঙ্কবী হাসিতে হাসিতে থমকাইযা গম্ভীব হইযা গেল।

সৌবীন—'যাও, কাপড়চোপড় বদলে আস সব।'

শঙ্কবীব কেমন মুখ শুকাইযা গেল। বলিল—'জেঠিমাবা কাকিমাবা বলেন এতেই আমাকে সুন্দব দেখায।'

—'আমিও তো বলি। কিন্তু জীবনটা সবসমযই তো আড়ম্ববেব জিনিস নয শঙ্কবী।' শঙ্কবী বিবর্ণ মুখে—'বেশি কিছু তো পবিনি, সাজগোজ কবিনি তো, এই বেনাবশিটা পবেছি।'

সৌবীন মাথা নাড়িযা—'থাক এটা পববাব দবকাব নেই এখন তোমাব আব। এটা ভাঁজ কবে তুলে বাখ, কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে পোবো।' একটু চুপ থাকিযা বলিল, 'তুমি যাই মনে কবো, কিন্তু যৌবনেব ভুল কাটিযে বিধাতা আমাকে আবো অনেকদিন বাঁচতে দিযেছেন. জীবনেব নানাবকম পবীক্ষিত সত্য আমাব হাতে জাঁকজমক উচ্ছ্বাস অপ্রযোজনীয কোলাহল এসব ভালো লাগে না শঙ্কবী', একটু চুপ থাকিযা বলিল—'তুমি যাই মনে কবো আমাব জীবনেব সাদাসিদে নিযম তুমি একদিনেই শিখবে না, কিন্তু এই বকম কবেই আস্তে আস্তে শিখতে হবে।'

শঙ্কবী অধোমুখে বসিযাছিল।

সৌরীন—'তোমার কানে ও দু'টো কি হীরের দুল?'

শঙ্করী হাসিমুখে—'হ্যাঁ হীরের, নকল নয় আসল' বলিয়া এক মুহূর্তের জন্য নিজের জীবনের স্বাভাবিক প্রসন্নতা উচ্ছলতা নিঃসংশয়তার ভিতর নিজেকে হারাইয়া ফেলিল মেয়েটি আবার। বলিল- 'দ্বিজেনবাবুর মা এই দুলজোড়া দিয়েছেন আমাকে-বললেন কলকাতার কোন গিনির অলঙ্কারের দোকান তৈরি, ফুল, হীরা, একটাও ভবণ নেই, বাপে পাথর নয়।'

বলিতে বলিতে আনন্দে অহংকারে সমস্ত মুখখানা বক্তিম হইয়া উঠিল তার।

সৌবীন—'বউভাতের রাতে দুল পরেছিলে সেই তো চুকে গেছে, যে বাড়িতে এসেছ সেখানে দিনরাত দুল পরে বেড়ানোর নিয়ম নেই। আমিই ভালোবাসি না।' শঙ্করীব দিকে তাকাইযা বলিল—'দুল তুমি খুলে রাখ। এত চুড়িরও কোনো দরকাব নেই। দু'গাছা চুড়িই উমাতারা পবত। নিজের জীবনেব ভিতরের ঐশ্বর্য দিয়ে বাইরের দীনতাকে তুমিই-বা তাব মতো সাজিযে নিতে পারবে না কেন?' গলা খাকরাইযা লইযা সৌরীন-'নিজেকে নতুন বধূ বলে মনে করতে পার, কিন্তু চবিতার্থতা পাবে নিজেকে মানুষ বলে বুঝতে পারলে, আজকের এ অন্তঃসারশূন্য ফুর্তি গলাব কাঁটাব মতো বিঁধবে তোমাকে সেদিন!'

শঙ্করী বিস্মিত বসিযা শুনিতেছিল, এ পর্যন্ত এরকম কথা এ বাড়িতে কেহ আর তাহাকে বলে নাই। বলিলে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিযা এই স্বামীর কাছে আসিযাই যে সান্ত্বনা চাহিত, কিন্তু জীবনেব যত অদ্ভুত শ্রীহীন মাধুর্যহীন কথা এই স্বামীই শুনাইতেছে আজ তাহাকে সব। বুকেব ভিতব কেমন যেন করিযা উঠিল তাহার।

সৌরীন—'যাও, অনেক কথা হযেছে।'

শঙ্করী পীড়িত হইযা বলিল—'কোথায যাব?'

—'আ, তুমি যেন কিছু বোঝ না, এই পাশের ঘবে গিযে অলংকারগুলো খুলে এসো সব। তোমাব গযনার বাক্সে বা যেখান ভালো লাগে তোমাব বেখে দাও। বেদনা ক্ষমা প্রতীক্ষা, এইসব নিয়ে আমাদেব জীবন, আমার সঙ্গে সংসারের পথে চলতে চলতে এইসব তোমারও উপকবণ আজ থেকে। সাজানো পুতুল হযে বসে থেকে কি লাভ। তোমাব সে রকম পবিচযেব মূল্য—'

শঙ্করী উঠিযা দাঁড়াইল।

সৌবীন—'আব একটা বেশ সামান্য সুতিব শাড়ি পববে বেশ চওড়া হলদে বঙেব পাড়।'

শঙ্কবী ব্যথিত হইযা-'কই, সে বকম শাড়ি কোনোদিন দেখিনি তো আমি।'

—'বসো, ওই তোবঙ্গে আছে হয়তো দু-তিন খানা।'

খানিক খুঁজিযা একখানা শাড়ি বাহিব কবিযা আনিল সৌবীন। শঙ্কবীব কোলেব উপব ঝপ কবিযা শাড়িটা ফেলিযা দিযা উজ্জ্বল মুখে বলিল—'এই যে।'

বিবশ ম্রিযমাণ মুখে শাড়ির হলুদ পাড়ের দিকে নির্নিমেষে তাকাইযা বহিল শঙ্করী। ইহাই তাহাকে পরিতে হইবে?'

সৌবীন—'দেখ তো শঙ্কবী, সাধাবণ জীবনের সুন্দর রিক্ততার গন্ধ এই কাপড়টাব ভিতব থেকে কেমন ফুটে বেরুচ্ছে।' হৃদযাবেগে গলা খানিকটা ভিজিযা উঠিল সৌবীনেব। বলিল—'এতে তাকে এমন মানাত! সব নারীকেই মানায, চিন্তাহীন অনুভূতিহীন খেলাব ঘবেব থেকে বেবিযে এসে যারা জীবনেব আনন্দবেদনার অক্ষয পথে এসে দাঁড়াতে পেবেছে সাজসজ্জা হিসেবে এব চেযে বেশি কিছু প্রযোজন নেই। তাদের।'

কিন্তু তবুও নানাবকম প্রযোজনেব জালে নিজেই সে আটকাইযা পড়ে এই হলুদ পাড়ের শাড়িই তাহাব জীবনেব একটি পুবোনো প্রযোজনেব জের। ইহাকে অতিক্রম করিযা উপরে নিজে সে উঠিতে পারিল না, কিন্তু মেযেটিকে উঠাইযা ছাড়িল।

ভাবিতে ভাবিতে একদিন শঙ্কবীকে ডাকিযা বলিল—'থাক, তোমার যে রকম খুশি সে-রকম শাড়িই পোবো। ওটা তোবঙ্গেব ভিতব রেখে দাও।'

উমাতারা যে মেযেটিকে বাখিয়া গিযাছে তাহার বয়স বছব সাতেক হইবে। বেণু নাম। এই মেয়েটিকে শঙ্করী খুব ভালোবাসে। সেও দুই দিনেই নতুন-মার ন্যাওটা হইয়া গিযাছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই মেযেটির সমস্ত বকম কাজ শঙ্করী সারিযা সাবিযা বাড়াইয়া বানাইযা লয়। রেণু তাহার

ঠাকুরমার সঙ্গেই শোয়। একদিন সন্ধ্যারাতে তাহার বাপের বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িল। শঙ্করী খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া মেয়েটিকে তাহাদের পালঙ্কে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বলিল—'বা, বেশ সুন্দর মেয়েটি তো, বাবার সঙ্গে শুয়ে আছে।'

চুপ করিয়া বসিয়া ব্যাপারটির মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া নিজের মনে নিবিষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিল শঙ্করী।

—'রাত কত?'

—'কম নয়।'

—'ওকে, তুমি ওর ঠাকুরমার কাছে নিয়ে যাবে?'

—'থাক, এইখানেই ঘুমিয়েছে, এইখানেই থাকুক আজ, দেখ তো কেমন গা টেনে দিয়ে ঘুমিয়েছে মা নেই, এই রকম এক-আধদিন বাপকে যদি না পায়।'[.......]

সৌরীন একটু হাসিয়া বলিল—'তা বেশ, মন্দ কথা বলোনি তুমি শঙ্করী, রেণু তাহলে আজ আমার এখানেই ঘুমোবে।'

এত সহজেই যে স্বামী এ প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইবে, বাসর রাত্তির পরে আট-দশ দিনের ভিতরেই শঙ্করীর তাহা যেমনই বিবস, তেমনই বিশ্রী বোধ হইল। একটু কৌতুক করিয়া যে-কথা সে বলিয়াছিল তাহাকেই তাহার স্বামী সত্য বলিয়া ধরিয়া লইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বধূ বলিল-'আচ্ছা, আর একদিন না হয় শোবে তোমার সঙ্গে।'

—'কে?'

—'রেণু।'

—'ঘুমিয়ে পড়েছে, থাক আজ। মিছেমিছি ওকে কাঁদিয়ে ব্যথা দিয়ে কী লাভ?'

—'তুমি ভাব তোমার মেয়েকে আমি কাঁদাতেই আসি শুধু?'

—'না, তা নয়, তা আমি বলছিলাম না শঙ্করী।'

—'তোমার মেয়ের হাসিকান্নার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক?' বলিতে বলিতে রেণুর প্রতি দরদে, নিজের প্রতি অশ্রদ্ধায় স্বামীর জন্য ভালোবাসায় চোখ ছলছল করিয়া উঠিল বধূর।

সৌরীন কোনো জবাব দিল না।

শঙ্করী খানিকক্ষণ উশখুশ করিয়া সব শেষে বলিল—'কেনই কাঁদবে শুনি? না হয় এ মেয়ের মা হতে পারিনি, সৎমা হয়েছি, কিন্তু তাই বলে মেয়েমানুষও কি নই, এমনই অমানুষ হয়েছি যে আমার হাত ওর গায়ে লাগলেই ছেঁকা পড়ে যাবে, অমঙ্গলের অভিশাপ সঙ্গে না নিয়ে ওর সম্পর্কে আমি আসতেই পারব না!' বলিয়া নিষ্পেষিত হইয়া বসিয়া রহিল বধূ।

সৌরীন মাথা নাড়িয়া হাসিয়া—'তা তো নয়, ব্যাপারটা কি হয়েছে জান শঙ্করী, সেই সন্ধ্যারাতের থেকেই মনে হচ্ছে আজ আমার যে রেণুর মা যদি আজ এখানে থাকত তাহলে কিছুতেই আজ রাতে এই মেয়েটিকে আমার কাছছাড়া করতে দিত না সে!' বলিয়া রেণুর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে চোখ বুজিয়া কি এক রকমভাবে হাসিতে লাগিল সৌরীন।

সে হাসি দেখিলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল শঙ্করী। দেখিল সৌরীন রেণুর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল লইয়া খেলা করিতেছে, তাহার বুকেপিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, হাতপাখা দিয়ে তাহাকে যত্ন করিয়া বাতাস করে, গুনগুন করিয়া গান গাহিয়া মেয়েটির ঘুমের ভিতর স্বপ্নের আস্বাদ ফুটাইয়া তুলিতে চায়, শঙ্করীর দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইবারও অবসর নাই তার। ইহার চোখের দিকে তাকাইলে মনে হয় বিবাহ যে ইহার পূর্বজন্মের স্মৃতি।

মুহূর্তে মুহূর্তে এই শীর্ণ-বিশীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাচীন জীবনের গন্ধ এই জীর্ণ ধূসর ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কের বুক ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে যেন- শঙ্করীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, জীবনের দেবতার দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে যেন তার। এই মানুষ হয়তো এমন জীবনকে যতখানি শ্রদ্ধা করে মৃত্যুকেও ততখানি ভালোবাসে, স্বামীত্ব লইয়া ইহার তৃপ্তি যতখানি পিতৃত্ব লইয়া পরিতৃপ্তি হয়তো তাহার চেয়ে বেশি, বধূ হয়তো কামনার জিনিস ইহার কাছে শুধু আজ, গ্লানিময় আকাঙ্খার উপকরণ শুধু। সন্তান হয়তো আশা ও কল্যাণের উৎস ইহার কাছে আজ, মলিন পঙ্কিল জীবনের পথে শুভ্র আশীর্বদের জিনিস, মৃত্যুর এপারে মানুষ যে স্বপ্ন ও স্বর্গের শোভা দেখিতে চায় সেই সবেরই বিচিত্র সম্ভাব লইয়া এই সন্তানটি

তাহার উপস্থিত।

কিন্তু তবুও এই সাময়িক ভাব শঙ্করীর মনের ভিতর হইতে কাটিয়া যায়, সৌরীনের পায়ের নীচে পালঙ্কে যেটুকু জায়গা আছে সেইখানেই শুইয়া পড়ে সে। অনেকদূর পর্যন্ত ধারণা করিবার শক্তি নাই তার। অনুভূতি ও কল্পনাও তাহার অগ্রসর বৈষয়িক জীবনকে পর্যালোচনা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না আজ, প্রেম রূপ ও উৎসবকে গ্রহণ করিবার জন্য উপাসনাশীলার সৌন্দর্যে মজিয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছিল।

বাসররাতের কথা মনে পড়িল তার। এই তো বারোদিন আগের কথা, কিন্তু এখনই তাহা বারো বছরেব ওপারে চলিয়া গিয়াছে আজ এত আঘাত খাইয়াও তাহার ধ্যানমুগ্ধ হৃদয় লইয়া তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারিল না। কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এক-একদিন অবিশ্যি এই বধূকে খুব ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে সৌবীনেব , শঙ্করীকে সে নিজেব কাছে ডাকিয়া লয। বলে'-হ্যাঁ এই তাতের শাড়িতে তোমাকে বেশ সুন্দব মানিযেছে।'

শঙ্করী কোনো জবাব দেয না।

সৌবীন-'সমস্ত অলংকার খুলে রেখে এই তোমার সাধাবণ সুন্দর গৃহিণী বেশ, এই সবচেযে ভালো লাগে আমার। কাপড়ে হলুদেব দাগ লেগেছে বুঝি, হাতে তোমাবও কি লঙ্কাবাটার গন্ধ? এতদিনে তোমার হৃদযের ভিতর নিভৃত নাবীত্ব কত সুশ্রীভাবে প্রকাশ পেল।'

শঙ্করী চুপ করিযাছিল।

সৌরিন-'বান্নাঘবের কাজে যাচ্ছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা, আজ এখানে একটু বোসো।'

শঙ্করী বসিল।

সৌরীন—'এমন সঙ্গোচ কবে বসছ কেন, এসে একটু কাছে ঘিষেই বোসো।'

শঙ্কবী কাছে সরিযা আসিল।

সৌবীন—'দাম্পত্যেব আস্বাদ তোমাব হযতো কিছুই মিটল না।'

শঙ্কবী কোনো কথা বলিল না।

সৌবীন—'তোমাব হযতো মাঝে মাঝে ঈর্ষা হয, ভেবে কষ্ট পাও, যে তাকে আমি ভালোবাসি, তোমাকে কবি উপেক্ষা।' সৌবীন মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, তা নয, যে মবে গিযেছে তাব দুর্ভাগ্য তার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম যতই গভীব অকৃত্রিম থাকুক না কেন আমাদেব, যে জীবন সব সমযে আমাদেব দুযারে আঘাত কবছে তার কলবেবে নীচে তাকে চাপ পড়ে যেতেই হবে।' একটু চুপ কবিযা-'জীবনেব কত প্রযোজনে তোমাকে আমি পাচ্ছি, তুমি আমার কাছে অপরিহার্য হযে উঠছ, কিন্তু এব ভিতবেব বহস্য কি বুঝতে পেরেছ শঙ্করী? যতবাব তোমাকে কাছে পেতে চাই, ততবাব তাকে দুবে সবিযে দেযা হয।'

দু'জনেই চুপ কবিয়া বসিযাছিল।

সৌরীন বলিল—'তোমাব এই নিত্য সাহচর্য আমাব কাছে যত সুন্দব ও মধুব হযে উঠছে দিনেব পব দিন, তাব দিক দিযে ক্ষতিব ভার ততই বেড়ে উঠছে।'

ক্ষণকাল নীরব থাকিযা সৌবীন—'কিন্তু তবুও উপায নেই তো, যে নিজেকে এমনি করে সবিযে নিল সাংসারিক প্রেম ও মমতাব দিক দিযে ক্রমে ক্রমে তাকে ঢেব অদ্ভুত উপেক্ষা সহ্য কবতে হবে।' একটু বিশুষ্কভাবে হাসিযা সৌবীন—'ভুলে যে গেছি সেই কথাই হয়তো ভুলে যাব একদিন- সেদিন তাব মৃত্যু সম্পূর্ণ হযে গেল' সৌবীন অনেকক্ষণ জানালার ভিতব দিযে অবিচলিতভাবে আকাশের দিকে তাকাইযা বহিল , কি ভাবিতেছিল তাহাব বিধাতাই জানেন। পবে বলিল-' কিন্তু প্রেমেব একটা শুভ স্বর্গীয পরিসমাপ্তি আছে, বুঝলে শঙ্কবী? এই আমাব মনে হয , যে সেই যে এখানে বেখে গেছে, একদিন আকাশের কোথাও গিযে তাব হাতে তা তুলে দেব সেই প্রসন্ন পুনর্মিলনেব জন্যই হযতো সে অপেক্ষা কবে আছে। এই পৃথিবীর এই ধূলো-মযলার ভিতর আমাব এই আজকের দুর্বলতার সঙ্গে তাব তো কোনো সম্পর্ক নেই।'

শুনিয়া শঙ্কবী চমকাইযা উঠিল।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা কবিযা সৌরীন-'এখন হযতো হৃদয তাব এত মহৎ হযে গেছে যে তার কথা ভেবে এই সাংসাবিক ভালোবাসাব আযোজনে তুমি আমি পবস্পরকে যদি বঞ্চিত কবি তাহলে

সেইটেই হবে তার অপমান।'

এই রকম অনেক কথা বলিল এই পুরুষমানুষটি। বলিয়া শঙ্করীব একখানা হাত সস্নেহে নিজের হাতে তুলিয়া লইযা ধীরে ধীরে তাহার পিঠে মাথায নিঃশব্দে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তারপর বলিল—'আচ্ছা, যাও এখন। সংসারের কাজ থেকে ডেকে এনে আমি তোমার অনেক সময নষ্ট করলাম।'

রান্নাঘর গিযা শঙ্করী অনেকক্ষণ নির্বিকার হইয়া বসিযা বহিল, চাল ফুটিয়া সিদ্ধ হইয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল যখন তখন তাহার অজ্ঞাতসারে অনেকখানি অনিষ্ট হইযা গিযাছে যে, মনে হইল মস্তবড় ভুল হইযা গিয়াছে যে! সৌরীন স্নেহসুন্দব চোখ তুলিযা বলিল—'আজ তুমি পানও খাওনি বুঝি শঙ্করী, ওই যে ডিবেটায দেখো হযতো দু'টো আছে, আব টেবিলেই জর্দার শিশিটা রয়েছে। নিযে যাও তুমি।'

এত আদবেব পব মুখ তুলিযা স্বামী আদব সোহাগ করিয়া কথা বলিযাছে, জীবনেব ক্ষযক্ষতি ধুইযা মুছিযা গেল সব। মুহূর্তেব মধ্যেই শঙ্করীব হৃদয ভবিযা উঠিল আবাব। আনন্দাবহ্বলতার আতিশয্যে পান দুইটা স্বামীকেই সে দিযা ফেলিল। দু'জনেব প্রসন্নতায ঘর আলো হইযা উঠিল। কিন্তু তবুও নানারকম প্রয়োজনের জালে নিজেই সৌরীন আটকাইযা পড়ে।

কি একটা সুগন্ধি তেলেব আধশূন্য শিশি অনেকদিন ধবিযা সৌবীনের তাকে পড়িযাছিল। একদিন অনমনস্কভাবে শিশিটাব ছিপি খুলিতে গিযাই অনেক কথা মনে পড়িযা গেল তাব। হ্যাঁ, এই তেলই উমাতারা মাখিত। সমস্ত বালিশ বিছানা ঘবেব বাতাস এই গন্ধে দিনবাত ভবিযা থাকিত একদিন। শুধু গন্ধ নয, ইহাব সহিত সুশৃঙ্খল সুচিন্তিত নারীজীবনেব ব্যবহাবও জড়াইযা রহিযাছে, আজিকাব জীবনেব সহিত ইহাব সম্পর্ক কত রকম।

শঙ্করীকে কাছে ডাকিযা সৌরীন—'স্নান কববাব সময তেল মাখ না তুমি?'

—'মাখি বইকী।'

—'কই গন্ধ পাই না যে—'

তাও পায না নাকি মানুষ আবাব? স্বামী বলে কি? বাপের বাড়ির থেকে সুগন্ধি তেলেব যে বাক্স শঙ্করীকে দেওয়া হইযাছিল সে কথা কি স্বামী ভুলিযা গিযাছে? এমন সুন্দর তেল, তাহার গন্ধেব অনিন্দ্যতাও তো কম নহে। মাখিযা মাখিযা নিজেকে সে কত সমৃদ্ধ মনে করে, অথচ স্বামী ইহাব কোনো খবব বাখে না?

সৌবীন—'তোমাকে আমি একটা তেল কিনে দেব, তুমি মেখো।'

শঙ্করী—'মাথাব তেল পাঁচ-ছয শিশি বযেছে তো এখনো।'

—'থাকলই বা, এই তেলেব মতন তো নয।'

উমাতাবা যে-তেল মাখিত, শঙ্কবীকে সেই তেল আনিযা দিল সে।

ব্যাপারটাকে না ভাঙলেই হইত, কিন্তু নিভৃতে নিজেব মনে আনন্দ উপভোগ কবিবাব শক্তি নাই সৌবীনের, শঙ্কবীকে ডাকিযা বলিল—'যাও, এই তেল মেখে স্নান কবে এসো আজ।'

স্নান করিযা আসিলে বলিল-'এই যে গন্ধ বেরোচ্ছে, এ শুধু তেলেবই আঘ্রাণ নযতো শঙ্করী, চোখ বুজে যদি চুপ কবে বসে থাকি এখন তাহলে কাছে উমাতারাই যেন দাঁড়িযে আছে। এই তেলই সে মাখতো-বাসরবাতেও মেখেছিল, তাবপর থেকে প্রত্যেকদিন। জীবনেব আনন্দ অশ্রু ভালোবাসা ও দাক্ষিণ্যেব সঙ্গে প্রথম পবিচযেব স্মৃতিগুলিই মানুষেব জীবনেব সবচেযে ঐকান্তিক ও বিচিত্র সম্পদ বললে ভুল বলা হয।, সেগুলো হচ্ছে ঐশ্বর্য, তেলেব গন্ধেব ভিতব সেই সমস্তই তো জমে আছে।' বলিয়া আবেগে সে সত্য সত্যই চোখ বুজিল।

ব্যথিত বিমূঢ় হইযা শঙ্করী কখন ধীবে ধীবে ঘব ছাড়িযা চলিযা গিযাছে তাহা তাহাব হিসাবের মধ্যে নাই।

—'হ্যাঁ, এই সাবানই তুমি মেখো।' একটা বিশেষ সাবানের বাক্স বধূকে আনিযা দিল সৌবীন। বলিল—'এই সাবানই সে মাখত।' সাবানেব বাক্স খুলিযা নিজেই খানিকক্ষণ গন্ধ শুঁকিযা অভিভূত হইযা বাক্সটা ধীরে ধীরে টেবিলের উপর রাখিযা দিযা সৌবীন-'ঘরের পুবোনো বীতিগুলো বদলে কোনো লাভ নেই। গৃহেব দেবতা অনেক আগেই তার আসন পাতেন, সে আসনকে আমবা সরাতে চাই, জীবনটাকে রূপান্তবিত করবার প্রয়াস করি, তাবপব একদিন কত সামান্য খুঁটিনাটিতেও দেখি সে চেষ্টা আমাদের কত শ্রীহীন-আমাদেব কদর্য ভুল ধবা পড়ে যায।' বলিযা সাবানেব বাক্সটার দিকে তাকাইযা সৌবীন—'এই

দেখো না, এই সাবান যে সে মাখত, এই সামান্য ব্যবহারকেও—'

একদিন অবশ্যি রেণুর জীবনব্যাপারের তাৎপর্য শঙ্করীকে বুঝাইয়া দিল সৌরীন। বলিল—'এই যে মেয়েটি, এই রেণু, তুমি যা ভাব তা নয—'

—'কি রকম?'

—'এ তো আমাদের জিনিস নয় শুধু, আজকের দিনেরও নয়, এর ওপর বহু জীবনের দায়ী।'

শঙ্করী চুপ করিয়াছিল।

সৌরীন-'সামনে আমাদের একটা সীমাবদ্ধ সংসার, আমাদেব জীবন যা আছে তাই-ই থাকবে, কিন্তু এই মেয়েটির হবে রূপান্তর।'

শঙ্করী চোখ তুলিয়া চহিল।

সৌরীন—'নিজের মাকে রেণু এমনই ভুলতে শিখেছে, কেন বলো তো শঙ্করী? উমাতারাব মৃত্যু হয়েছে বলে? কিন্তু আমি বেঁচে থাকতেই রেণুর জীবনে আমারও একদিন মৃত্যু হয়ে যাবে।'

শঙ্কবী—'কেমন করে?'

সৌরীন একটু শুকনো হাসি হাসিয়া বলিল—'তাই-ই হয, কিন্তু সেজন্য দুঃখ কবে কোনো লাভ নেই, ভেবে যদি দেখি, জীবনের নিয়ম যেমন সুশৃঙ্খল তেমনি অনাড়ম্বব সুন্দব। রেণু একদিন নারী হবে, অন্যের জীবনে চলে যাবে, আমাকে খুব বিমুগ্ধভাবে স্মরণ করতে যাবে কি সেদিন সে? তা যাবে না। আমিও তার কোনো দবকাব বোধ করব না। বেঁচে থেকেও আমৃত্যু দুইজনেই সেদিন পবস্পরের কাছে মৃত।'

শঙ্করী মাথা হেট করিয়া নখ খুঁটিতেছিল।

সৌবীন—'এই হল ভবিষ্যতেব কথা। কিন্তু বর্তমানেই দেখো না, কত বন্ধুত্ব,কত স্বপ্ন কত আদর্শের কাছে আমি একজন মৃত ব্যক্তি আজ, অথচ নিঃশ্বাস নিযে বেঁচে রযেছি তো।'

শঙ্করী কী বলিবে বুঝিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল। সৌবীন জানালার ভিতর দিযে তাকাইযা শিবিষ গাছেব মাথাটাব দিকে চাহিযাছিল। কিছুক্ষণ পবে একটা গভীব নিঃশ্বাস টানিযা বলিল-' বেণুকে একটু ডেকে দাও।'

—'এইখানে?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখন হযতো সে ঘুমিয়েছে।'

—'তাহলে থাক, জাগিযে দরকাব নেই আব, আমি ভেবেছিলাম তাকে একটু কাছে বাখি, কথা বলি, আদব কবি।'

—'এত গভীব বাতে?'

সৌরীন একটু হাসিযা বলিল—'এবপর যখন বেণুকে চাইব তখন হয়তো দশ-বারো বছব কেটে গেছে- আমি আর সে আমরা পবস্পবের মুখ চিনি না সেদিন- জীবনেব সব জিনিসই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায কিনা শঙ্করী।'

এক-অধ মুহূর্তের ভিতরেই বিছানায পাশ ফির্বিযা সৌরীন নাক ডাকিতে আবম্ভ করিল।

মে' ১৯৩৩

জাদুর দেশ

মহেন্দ্র যখন আমাদের বাসায় প্রথম কাজে আসে সে প্রায় বিশ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন দশ বছর আন্দাজ হইবে।

চাকর বটে, কিন্তু শুনিলাম লোকটি নাকি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, এবং বালিগঞ্জে কোনো এক গাঙ্গুলিবাবুদের বাসায় কাজ করিত। শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তখন আমরা কলিকাতা চোখেও দেখি নাই। কোনোদিন শীঘ্র দেখিব বলিয়াও মনেব ভিতব সুস্বপ্ন গুছাইয়া লইতে গিয়াও থমকাইয়া থাকিতাম। কে জানে কোনোদিন দেখিব কিনা। যে ভাগ্যবানেরা দেখিয়া আসিয়াছে তাহাদের সমীহ করিয়া চলিতাম। কথাবার্তায় মজলিশ জীবনের দৈনিক ব্যবহার তাহারা কোনো নিঃসংশয় আসন হইতে আমাদেব গনিযা লইতেছে ইহাই মনে হইত, মনে কবিতে ভালো লাগিত, এই ধারণা যে কোনোদিন রূপান্তরিত হইযাও যাইতে পাবে ইহা লইযা মনেব ভিতব কোনোই ধাঁধা ছিল না।

কিন্তু এইরকম কলিকাতা—ফেরৎ একজন মানুষ আসিল আমাদের বাড়ি চাকরি করিতে! এই বাসন মাজিবে, ঘব ঝাঁট দিবে, কাপড় কাচিবে, কযলা ভাঙিবে? কলিকাতার গাঙ্গুলিবাবুদেব বাড়ির এই মহেন্দ্র! কি যে উৎকণ্ঠা বোধ হইল আমার!

এক-একবার ইচ্ছা হইল বাবাকে বলি,-'মহেন্দ্র! কলিকাতার মানুষ, চাকব-বাকবের কাজ ওর তো সাজবে না, ওব নাকি গান-বাজনাব অভ্যাস আছে, তোমাকে হারমোনিযাম বাজাতে শেখালেই তো পাবে দুবেলা।'

বাবা অবিশ্যি হারমোনিযাম চোখে দেখিযাছেন মাত্র, ইহাব প্রতি অন্য কোনোরকম আকর্ষণ কোনোদিনই বোধ করেন নাই। আমাব এই প্রস্তাব আমাব নিজের মনের ভিতবেই শুকাইযা গেল তাই।

মাকে বলিলাম—'মহেন্দ্র আমাদের এখানে কাজ কববে! তার তো সিল্কেব পাঞ্জাবি।' মা বড় একটা কান দিলেন না।

—'সিল্কেব পাঞ্জাবি যে মা'

—'হলই-বা, পাঞ্জাবিতে ক'টা ফুটো দেখেছিস?'

তা আছে বটে, কিন্তু সিল্কের পাঞ্জাবিই তখন আমাদের পক্ষে [...] হইত, তাহার ফুটার ইতিহাস আমবা খুঁজতে যাইতাম না।

মা বলিলেন—'সিল্কেব পাঞ্জাবি পরলেই তো হল না শুধু, তেলেকালিতে কিরকম নোংরা।'

পটল দাঁড়াইযাছিল, বলিল—'তেল তো গন্ধ তেল জেঠিমা। ' একটা ঢোক গিলিযা বলিল— 'ও, এ তেলও নয—'

—'তবে কি?'

—'খোদবো আতরের গন্ধ আসে ওর গাযের থেকে।'

বিষ্ণুকাকা দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন—'ঠিক ধরেছে পটল , যা বলেন বউঠান, মানুষটি বেশ বাবু।'

মাকে আবার নিরালা পাইযা বলিলাম—'এই মহেন্দ্র আমাদেব কাজ করবে!'

—'করবে বইকী, ওকে নাগরাই ছেড়ে ফেলতে বল!'

—'তা তুমিই বোলো মা, কিন্তু ছাড়তে চাইবে তো?'

—'না চাইলে অন্য পথ দেখবে।'

—'কিন্তু ও যে কলকাতার মানুষ।' একটু চুপ থাকিযা-'বালিগঞ্জের গাঙ্গুলিদের বাসায কাজ করেছিল।'

মা হাত নাড়িযা—'একেবারে রাজা হযে গেছে কিনা তাই বলে, আমাদের মাথা সব কিনে রেখে দিয়েছে।'

মার এই উপেক্ষার কোনো মানে খুঁজে পাইলাম না। অথচ মা তো কোনোদিন কলিকাতা দেখিযাও

আসেন নাই, তিনি তো পাঁড়াগাঁয়েরই মানুষ। দেশে বসিয়া তার এত নিঃসংকোচ ভ্রূক্ষেপহীনতা!

আমার মনে হইল মহেন্দ্রকে চাকর হিসাবে রাখিয়া, দ্রষ্টব্য হিসাবে পুষিলে মন্দ হয় না, দুইবেলা খাইবে, দরকার হইলে সুগন্ধি আতর গায় মাখিবে, কলিকাতার হালফ্যাশানের টেরি কাটিবে, পাঞ্জাবি নাগরাই পরিয়া এদিক-সেদিক চরিয়া বেড়াইবে, কোনো একসময় নিজের ফুরসৎ বুঝিয়া আবাব কলিকাতার গল্প বলিবে সে, আমরা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের সঙ্গে শুনিয়া যাইব। কিন্তু আকাঙ্খা আমার কাহাকে জানাইব? কেই-বা সহানুভূতি করিবে? এমনকী পটল পর্যন্ত করিবে কিনা সন্দেহ। এবার যাহার মুনির তাহাদের মধ্যে এক বিষ্ণুকাকার সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা হাসি তামাশা চলে আমাব। কিন্তু একথা শুনিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

মাকে বলিলাম- 'মহেন্দ্র কলকাতার চাকর, বড় বড় দালানে থাকা অভ্যেস। আমার ভেবে যেন কেমন লাগে মা, আমাদের পঁচা পুকুরের জলে বসে ও কী করে বাসন মাজবে।'

কোনো জাবাবই দিলেন না।

—'কাপড় কাঁচবে মহেন্দ্র? ঘরও ঝাঁট দেবে? সনাতনের মতনই সব করবে?'

—'তাই বলেছে নাকি এসব করতে পারবে না মহারাজ?'

—'না, তা কিছু বলেনি।'

—'না করতে পারে আবার কলকাতায়ই ফিবে যায় যেন, ভদ্দর কুড়ের সেই তো জায়গা!'

ভাবছিলাম তাই হয়তো ফিরিয়া যাইবে মহেন্দ্র আমাদেব বাড়িব কাজ একবেলা করিলে আর একবেলা করিবার মতো রুচি প্রবৃত্তি থাকিবে না তাব। একদিন এ বাড়িব ঘর ঝাঁট এঁটো-কুড়োনো বাসনমাজা ইত্যাদি কাজ যাহারা সম্পন্ন করিত তাহাদের দিকে তাকাইবাবও অবসর পাই নাই, এ কাজগুলো সুন্দর কি কুশ্রী, মানুষের করণীয় কি অকার্য ভাবিতে যাই নাই এতটুকুও। কিন্তু তসরেব পাঞ্জাবি পরিয়া লপেটা পায় দিযা মহেন্দ্রর মতন একজন সাজানো মানুষ যখন কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল এই সবের জন্য, তখন আমাদের বাড়ি ঘরদোর মানুষ জীবপ্রণালী নীচতা ও কদর্যতায ভবিয়া উঠিল একেবারে কিন্তু মনের ভিতর একটা গভীর সাধ আমাব ছিল এই যে, আমাদের জীবন নির্বাহের নিঃসম্বলতা ও কুরুচি দেখিয়া মহেন্দ্র যেন কলিকাতায় পালাইযা যায না আবার, সে যেন এইখানেই থাকে, আমবাই যেন নিজেদের রূপান্তরিত করিয়া লইতে পারি, কলিকাতার থেকে আসিযাছে বলিযা।

কিন্তু, ভগবান, আমাদের যদি কলিকাতায় বালিগঞ্জে দোতলা বাড়ি থাকিত, গাঙ্গুলিবাবুদেব বাড়ির লোক হইতাম যদি আমরা! থাক, যখন সেইসব হইবার সম্ভাবনা নাই তখন একমাত্র উপায আছে আমাদের এ মানুষটির কাছে আমাদের সমস্ত আনাড়িপনা ও অন্তঃসাবশূন্যতা ঢাকিযা [বাখা]।

মাকে আমি বলিলাম-'এক কাজ কবলে ও কলকাতায পালিয়ে যাবে না। এঁদো-পুকুরটায যদি ওকে বাসন মাজতে না দাও আর কাপড় কাঁচতে না দাও—'

মা বাঁধা দিযা হাসিযা-'দূর তাই কি কখন হয বে পাগল!'

তা হয না? কলিকাতার বাবুদের মহেন্দ্র পাড়াগাঁর বাঁশবনের ভিতব মশার কামড় খাইতে খাইতে অন্ধকার রাতে এক হাঁটু পঁচা জলের ভিতর দাঁড়াইয়া বাসন মাজিবে—ভাবিতে গিযা শিহরিত হইযা উঠিলাম।

পুঁটি কিছুক্ষণ হয় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল,—'ওকে বিছানা পাততে দিলেই হয।'

মা ফিক ফিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—'বিছানা পাতা? এই একজন চাব হাত পেযে সোমত্থ মানুষেব কাজ। তোরা হলি কি ছেলেমেয়েরা। কলকাতাব থেকে একজন মানুষ এসে তোদের পাগল বানিযে ছাড়ল দেখছি।'

আমি বলিলাম-'পুঁটিদি যা বলেছে, মন্দ নয মা, শুধু বিছানাই নয, বিছানা পাতবে, বই গুছোবে, ধূপধুনো দেবে—'

কিন্তু আমার কথার উৎসাহ থামিযা গেল, দেখিলাম মেজকাকা আসিযা দাঁড়াইযাছেন। বলিলেন—'তোমরা এই মেলা সক্কালবেলা রান্নাঘরে বসে কী করছ শুনি? পড়াশুনো নেই বুঝি? বোঠানকে একটু গুছিয়ে কাজ করতে দেযা তোমাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি কোনোদিন, যাও, ভাগো এখান থেকে সব।'

চলিয়া গেলাম বটে, কিন্তু পড়িতে শুনিতে নয়। কামিনী গাছের কাছে ছোট খড়ের একচালাটায। যে যখন এ বাড়িতে চাকরি করে ওই ঘবটাযই থাকে। এখন মহেন্দ্র আছে।

ঘরে ঢুকিতেই মহেন্দ্র—'কী চাও তোমরা?' 'আপনি' আপনারা' বলিবার বালাই নেই তাহার, একেবারে প্রথম ডাকেই 'তোমরা' বলিয়া বসিল।

কিন্তু আঘাত পাইলাম না, তাহাকে ক্ষমা করিয়া লইলাম। সে তো সনাতনের মতন ঝিকারগাছির মানুষ নয়, কলিকাতার লোক সে।

আমাদের গন্ধ পাইয়া পটল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিয়া আমাব ঘাড় ধরিয়া এক চাপ দিল পটল।

আমি বলিলাম—'ধ্যোৎ পটল, তুই ভারী অসভ্য, একটু চুপ করে দাঁড়াতে পারিস না!' বলিয়া সম্ভ্রমের সঙ্গে মহেন্দ্রর দিকে তাকাইলাম।

ঘন্টা দুই আগে ছোট একটি সবুজ টিনের ট্রাঙ্ক ও কম্বলের মোড়া একটা বিছানা লইয়া সে যে বেশে আমাদের বাসায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এখনো তার ঠিক তেমনই পোশাকআশাক। সেই তসরেব পাঞ্জাবি, মা যা বলিযাছিলেন, কযেকটি ছ্যাঁদাও আছে, ধুতিটা ফরাশডাঙার হয়তো, পায লপেটা, গলায একটা কমফরটার। চুল ছাঁটিবার বাহাদুবি দেখিবার মতো, এখানকার নাপিত এরকম ছাঁটিতে পারে না। এই শুধু সেই জাদুর দেশ কলিকাতাই সম্ভব। টেবিটাও যা কাটিয়াছে বিষ্ণুকাকাকে হাব মানাইয়া দেয। এক এক ঝলক হাওযায় ঘরের ভিতর গন্ধ ভুর ভুর কবিতেছিল। গন্ধ খানিকটা সিগাবেটের বটে, কিন্তু অনেকখানিই আতরের, মাথার সুবাসিত তেলের। গন্ধের সমাবেশ বড় ভালো লাগিল আমাদের।

পটল মাঝে মাঝে হাওয়ার ভিতর নাক উঁচু করিয়া আবেশের সঙ্গে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল। গন্ধের আরামে বিহ্বলতায যেন তাহার দম আটকাইযা আসে, এমনই ভাব। অনেকদিন পবে বুঝিতে পাবিযাছিলাম সেদিনের সে গন্ধ যেমনই শস্তা তেমনই অসার। কিন্তু সেদিন সে কুড়ি বছর আগে মহেন্দ্র যেদিন আমাদের দেশেব বাড়িতে প্রথম আসিয়া হাজির হইযাছিল, মনে হইযাছিল, তাহার চুলেব ও রুমালের গন্ধে সমস্ত কলিকাতাব প্রাণী যেন সেই সঙ্গে লইযা আসিযাছে। হ্যাঁ, সেদিন এইরকমই মনে হইযাছিল বটে।

পটল—'তুমি তো অনেকক্ষণ হয এসেছ কিছু খেলে না?'

মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া—'না, বার্ডসাই খাচ্ছি।'

আমি—'বার্ডসাই কি?'

—'সিগাবেট।'

—'সিগাবেটকে বার্ডসাই বলে বুঝি?'

মহেন্দ্র—'কতবকম সিগাবেট আছে—এক রকম সিগাবেটের এক রকম নাম। আকবর মার্কা সিগাবেট দেখেছ?'

—'না তো।'

—'তোমরা থাক পাড়াগাঁয, দুনিযার খবব তোমবা কি জান, এই তো বছব তিনেক আগে বেহারে গিযেছিলুম, দিনে দশ প্যাকেট আকবর মার্কা সিগাবেট খেতুম।'

শুনিয়া আমরা অভিভূত হইযা পড়িলাম, আপাদমস্তক তাকাইযা দেখিতে লাগিলাম তা। মহেন্দ্র সামান্য লোক নয।

পটল—'বেহাবেও গিযেছিলে তুমি? তাহলে পুরুলিযার হিমাংশুব জেঠামশায শ্রীধববাবু যে থাকেন তাকে দেখেছ নিশ্চয। চেন তাঁকে? তিনি হাকিম।'

মহেন্দ্র অবজ্ঞার হাসি হাসিযা—'পুরুলিয়ায কে যায়! ও একটা জাযগা! কুষ্ঠরুগির আড্ডা! পুরুলিযা মানভূমি মানুষের যত বদ্‌রোগ হয ওইসব জাযগায থেকে।'

—'তাই নাকি?'

—'আলবৎ।'

হিমাংশুব জেঠামশায শ্রীধরবাবুর জন্য আমরা তিনজনেই ভীত হইযা উঠিলাম। মহেন্দ্র পকেটেব থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার কবিয়া একটু খুলিযা দেখিল ক'টা সিগাবেট আছে। তারপর পকেটেই সন্তর্পণে রাখিয়া দিল আবাব।

পটল একটা ঢোক গিলিয়া—'পুরুলিযায গেলেই কুষ্ঠ হয নাকি সবাইর?'

—'তা হয বইকী?'

—'কেন?'

—'ওই বাউড়ি মেয়েদেব কাণ্ড আব কি।'

ব্যাপাবটা বুঝিলাম না আমবা।

পটল—'শ্রীধববাবুবও হয়েছে নাকি?'

—'ধ্যেৎ; তিনি সেযানা মানুষ' বললে না হাকিম?'

—'হ্যাঁ, হাকিম তো।'

পুঁটিদি বলিল-'কুষ্ঠ হলে কী হয়?'

—'বা বে কুঠে তোমবা দেখনি বুঝি কেউ?'

মাথা নাড়িয়া বলিলাম—'না।'

—'খুঁজলে কোন হ-ঘব না [...] তোমাদেব এই অঞ্চল থেকে—' গলা খাকবাইযা মহেন্দ্র—'ও বড় বড় জাঁহাবাজী বোগ, হাত-পাযেব আঙুল খসে যায, নাক থেঁতলে মুখ দুমড়ে সে এক যা কাণ্ড' আমাব এক মামাব হয়েছিল, মানভূমে গিয়েছিল যুদ্ধ কবতে—ব্যাস!'

আমবা জানি না মানভুমে কবে কোন যুদ্ধ হইযাছিল, হযতো ইতিহাসে আছে, যতদূব মনে পড়ে ইস্কুলেব ইতিহাসে সে যুদ্ধেব খবব আমরা কেউ পড়িয়াছি বলিয়া স্মবণ হয় না।

যাক, যুদ্ধ হইযাছিল-মহেন্দ্র হযতো সে যুদ্ধ দেখিযা আসিযাছে—তাহাব মামা লড়িযাছে, শুনিযা বড বড় চোখে তিনজনেই আমবা তাকাইয়া বহিলাম মহেন্দ্রব দিকে।

পটল—'যুদ্ধে তুমিও ছিলে নাকি মানভূমে?'

মহেন্দ্র একটু ইতস্তত কবিযা বলিল—'তা মামা লড়লে ভাগনেবও লড়তে হয বইকী। তা পলটনে আমিও নাম লিখিয়েছিলুম, যুদ্ধটা আব দু'দিন যদি বেশি টিকতো' বলিযা সে এমন মুখেব ভাব কবিযা চুপ কবিযা থামিযা বহিল যে আমবা কৌতুকাবিষ্ট হইযা তাব মুখেব দিকে তাকাইযা বহিলাম।

পটল—'তাহলে কী হত মহেন্দ্র?'

—'সে সব শুনে কি আব হবে, মামাব দশাই হত আব কি, এ কুষ্ঠ যেমন বাঁধালি তখন থাকবি থাক বস্তিতেই পড়ে থাক না বে হতভাগা, ঘষড়াতে ঘষড়াতে বাড়িতে এলি যে আবাব ইশ, মামীকে কি যাতনাই না দিল শ্মশানেব মড়াটা।'

বুঝিলাম তাহাব কুঠে-মামাব কথা বলিতেছে মহেন্দ্র , মানভূমে যুদ্ধ কবিতে গিয়ে যে মানুষটি কুষ্ঠ বাঁধাইযা আসিযাছিল।

এইসব শুনতে বিশেষ কৌতূহল বোধ কবিলাম না। মহেন্দ্র মামীব বেদনাব সঙ্গে আমাদেব আজিকাব বালক-বালিকা হৃদযেব স্বাভাবিক গতি ও ধাবাব কোনো সম্পর্ক খুজিযা পাইলাম না। কিন্তু কুড়ি বছব পবে আজ মনে হয, তাই তো, সেদিনকাব সেই মহেন্দ্রব মামীব ব্যথাব কাহিনীটা আব একটু বেশি শুনিযা বাখিলে পাবিতাম।

হ্যাঁ, এই হবেনেব ভাসুবঝিব কথা, এও আব এক বহস্য। কিন্তু সেদিন বহস্য বলিযা মনে হইযাছিল না কাজেই হবেনেব সেই ভাসুবঝিব সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞেস কবি নাই আব। কিন্তু আজ অনেকবাবই মনে হয, কী হইযাছিল ব্যাপাবটা!

পুঁটিদি বলিল—'কলকাতা থেকে তুমি হেঁটে এলে মহেন্দ্র।'

—'তাই হয পাগল? কলকাতাব থেকে কেউ এদ্দূব হেঁটে আসতে পাবে পুঁটিদি।'

—'আমাব যেন কেমন মনে হচ্ছিল তুমি আনেকদূব পথ হেঁটে এসেছ, হাতে বাক্সো বিছানা জুতোজোড়া ধূলো সুবকি মাখা, কেমন যেন বোধ হচ্ছিল সাবাবাত হেঁটে এসে ভোবেবেলা আমাদেব বাড়ি এসে পৌছলে।'

মহেন্দ্র—'তোমাবও যা আইডিযা' সাতদিন সাতবাত হাঁটলেও কেউ কলকাতাব থেকে এই অজ পাড়াগাঁয আসতে পাবে, বেলঘবে অব্দি এসেছিলাম দিন পাঁচ সাত আগে। সেখান থেকে ট্রেন বদলে, অনেক বদলাবদলি কবে তাবপব তোমাদেবই এই মবকুণ্ডে এলাম। ঘন্টা দশ-বাবো ট্রেনেব জার্নি হয়েছে আমাব—সেকেণ্ড ক্লাসেব টিকিট কেটেছিলাম—এই দেখ না' টিকিট বাহিব কবিযা আমাদেব হাতে দিল।

আমবা বিস্মযাভিভূত হইযা উলটাইযা পালটাইযা দেখিতেছিলাম, ট্রেনেব টিকিট ইহাব আগে কোনোদিন আব দেখি নাই, কিন্তু এশুধু ট্রেনেব টিকিট নয,সেকেণ্ড ক্লাসেব টিকিটও বটে।

কিন্তু পটল বুজরুকি ধরিয়া ফেলিল। বলিল—'কই মহেন্দ্র, এ তো থার্ডক্লাস লেখা রয়েছে।'

—'তাই নাকি? কই দেখি তো?' ভ্রূকুটি করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া গভীর মনোযোগে নিজেই সে খানিকক্ষণ দেখিয়া লইল, তারপর আচমকা খক খক করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—'আচ্ছা বেভুল মনই আমার বটে, সেকেন্ড ক্লাসের সে টিকিট তো ইস্টিশানের চেকারকে দিয়ে এসেছি—এ হল গিয়ে তোমার একটা ফর্দা টিকিট—লাভপুর গিয়েছিলাম। একবার হরেনের ভাসুরঝিকে নিয়ে সেই জিনিস, ওমা, এ আজও পকেটে আছে আমার! সে এক অপয়া মেয়ের সঙ্গে যাত্রা, কপালপুড়ি, সব্বাইয়ের কপাল পুড়িয়ে ছাড়ে' বলিতে বলিতে টিকিটখানা সে আমাদের চোখের সামনে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

পটল—'ছিঁড়লে মহেন্দ্র?'

—'কী করব তাহলে?'

—'আমাকে দিলেও তো পারতে—'

—'এই টিকিট? ভদ্রলোকের ছেলে,—তুমি তো কম ভিখিরি নও বাপু।'

তিনজনেই লজ্জিত হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম, নিজেদের আচরণে কোথায় যে কখন ভুল বাহির হইয়া পড়ে বুঝি না।

পুঁটিদি বলিল—'এদেশে আর কোনোদিন এসেছিলে মহেন্দ্র?'

মহেন্দ্র নাক সিটকাইয়া বলিল—'কোন দুঃখে আসব? এ কাদা কিচরের দেশ—মানুষের জীবন তো এখানে কেঁচোর মতো।'

—'কোনোদিনই আসনি! তবে এখন যে এলে?'

—'এলাম, এইবার পথে পথে চলতে শুরু করেছি। চলতে চলতে এক-একটা জায়গা মনে ধরে যায়, দু'দণ্ড একটু জিরিয়ে নেই, আজ ভোরেরবেলা হাটতে হাঁটতে তোমাদের এ দেশের বাঁশবনগুলো বেশ লাগল। বৃষ্টিতে না শিশিরে বেশ ভিজে রয়েছে। পথেঘাটে লোকজন তো তোমাদের নেই একদম—কলকাতার থেকে এসে লাগে বেশ। একবার একটা ঘন জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে ভারী চমৎকার কাঠমল্লিকার গন্ধ পেলাম। তোমাদের এ বাড়ি আছে নাকি কোনো ফুলের গাছটাছ?'

পটল—'গাঁদা আছে।'

—'আরে দূর, ও একটা ফুল?'

পুঁটিদি—'সন্ধ্যামণি আমাদের ঘরের কিনারা দিয়ে একরাশ।'

মহেন্দ্র—'দেখতেই সুন্দর।' পরক্ষণেই মাথা কাত করিয়া একটু বিমুগ্ধভাবে মহেন্দ্র বলিল—'অরিশ্যি, তা বেশ একটু গন্ধ আছে বইকী সন্ধ্যামণির। বেশ, ফুল, বেশ!'

পুঁটিদি—'আচ্ছা, মহেন্দ্র, তুমি কলকাতায় থাক, এত ফুল চিনলে কি করে?'

—'আমি অনেক জায়গায় ঘুরি।'

একটু চুপ থাকিয়া পুঁটিদি—'তা মহেন্দ্র তুমি খাবে না কিছু? কেমন মনে হয় আমার কাল তোমার খাওয়া হয়নি।'

মহেন্দ্র একটু হাসিয়া—'এতটুকু মেয়ে অথচ সব ধরে ফেলেছে, মানুষের জীবনটাকে তোমরা যেমন বোঝ এমন আর কেউ বোঝে না দিদিমণি।

মহেন্দ্রর এ কথা শুনিয়া পটল আর আমি দু'জনেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম সেদিন মহেন্দ্র যে পুঁটিদিকে খুশি করিবার জন্যই বাড়াবাড়ি করিয়া এ কথা বলিতেছে সেদিন তাহাই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছি আমাদের অনেক জিনিসই মনে থাকে না। খেয়াল হয় না, অনেক বিষয়েই আমরা উদাসীন, কিন্তু পুঁটিদিদি তৎপর। হ্যাঁ, পুঁটিদিদি, এবং তাহার মতন আরো অনেকে।

পটল হটিবার নয়, ঝপ করিয়া বলিল—'মহেন্দ্রকে চারটি মুড়ি এনে দাও তো পুঁটিদি। কিন্তু তবুও বাহাদুরী সে পাইল না।

মহেন্দ্র—'মুড়ি আমি খাইনে।'

নাচার হইয়া বলিল-' কেন?'

পুঁটিদি—'দু'খানা বাতাসা ফেলে এনে দেই একবাটি মুড়ি?'

—'বেশ টাটকা মুড়ি?'

—'হ্যাঁ, বেশ গরম গরম।'

—'আচ্ছা দাও দিদিমণি।'

পটল ফোঁস করিয়া উঠিয়া—'বেশ মানুষ তো তুমি মহেন্দ্র।'

—'কি রকম?'

—'আমি যখন মুড়ির কথা বললাম তখন তুমি দাঁত খিঁচলে— কিন্তু সেই মুড়িই তো—'

মহেন্দ্র একটু প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া—'এক একজন মানুষের মনটা এমন সুন্দর, কথা বলে ও এমন পরিষ্কার করে যে তারা কাদা দিলেও খেতে পারি।'

শুনিলাম আমরা। শুনিয়া চক্ষুস্থির হইল আমাদের। মহেন্দ্রের এ কথার তাৎপর্য সেদিন তো বুঝিতে পারি নাই, বুঝিয়াছিলাম এই মাত্র, পুঁটিদি কেমন করিয়া মানুষটির নাকে দড়ি ঘুরাইয়া দিতে পারিয়াছে। তারপর ইহাকে যথেচ্ছভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চালাইতে পারিবে নিশ্চযই সে।

পুঁটিদি এইরকম পারিত বটে। এই কলিকাতার মানুষটিকেও দুই মুহূর্তের ভিতর সেই দখল করিয়া লইল, আমরা পারিলাম না। আজও যখন মহেন্দ্রর সেই কাদা খাইবার প্রস্তাবের কথা স্মরণ হয অবাক হইয়া ভাবি কোথায় গেল সেই পুঁটিদি আর কোথায় গেল মহেন্দ্র? এই বিগত কুড়ি বছরের ভিতর এমন নিবেদন ও প্রত্যুত্তর জীবনের পথে কত কম দেখিলাম। ব্যাপার তো ছিল সেদিন সামান্য একটি মুড়ির বাড়ি লইয়া। কিন্তু ইহার চেয়ে ঢের বড় ঢের দামি জিনিসের সম্পর্কও দেখিলাম মানুষের মনে রহিয়াছে শুধু শকুনের ধর্ম। যেন ক্ষুধা ও আত্মপরতাই সব। যেন প্রেম বলিয়া কোনো জিনিস নাই এ জীবনে।

মহেন্দ্র মুড়ি খাইতেছিল।

পটল—'আজ তুমি কাজ করবে না?'

—'না।'

—'কেন?'

—'সারাদিনরাত জার্নির পর হাত পা ছড়িয়ে একটু না জিরিযে পারব না।'

—'তা, জেঠামশায়কে বলেছ?'

—'না।'

—'কাকাদের?'

—'না।'

—'জেঠিমাকে?'

মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া—'কাউকে বলিনি কিছু।'

পটল—'বলতে হয।'

—'যখন ডাক দেবেন, তখন বলব।'

—'ডাক দেননি কেউ?'

মহেন্দ্র—'কই শুনিনি তো?'

আমি—'আজ তাহলে তুমি একটু শুযে বিশ্রাম করবে?'

—'শুয়েও করতে পাবি, বসেও করতে পাবি।'

পুঁটিদি—'তুমি এখানে কাজ করবে যে মহেন্দ্র তা তো ঠিক?'

মহেন্দ্র মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে—'শুনেছি তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ দিদিমণি?

—'হ্যাঁ।'

পুঁটিদি অবাক হইযা বলিল—'কিন্তু তুমি কী করে জানলে মহেন্দ্র?'

—'শুনলাম।'

বিস্মত হইযা ভাবিলাম মহেন্দ্র কাহাব নিকট হইতে শুনিল?

মহেন্দ্র বলিল—'এই তো একেবারে ভোরের বেলা বড়বাবুর সঙ্গে চাকরিবাকবির কথা ঠিক করে ওই উত্তরদিকটার হিজল গাছটার নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। বনজঙ্গলে মেলাই কোকিল পড়েছে দেখছিলাম, তুমি গিন্নীমাকে বলছিলে, মামী, মা ভাবী চমৎকার অনেক পিঠে তৈরি করতে পারেন, এ তিন দিন বাবার একখানা চিঠিও পেলাম না, বাড়িতে অসুখবিসুখ দেখে এসেছি, মন কেমন করে—এইসব বলছিলে না দিদিমণি?'

—'হ্যাঁ মহেন্দ্র।—তুমি আবার কোথায দাঁড়িযে শুনলে এসব।'

—'বাড়িতে কার অসুখবিসুখ?'

—'থাক, সে হল অন্য কথা মহেন্দ্র।'

—'ক'দিন চিঠি পাও না?'

—'চার-পাঁচদিন।'

মহেন্দ্র একটু হাসিয়া—'তুমিও যেমন। যখন বিয়ে করবে তখন না হয় বেশি মেল পাবে। আইবুড়ো মেয়েদের একমাস দেড়মাস আগে কে চিঠি লেখে! বাপ-মায়ের কাছে তুমি একটি বোঝা ছাড়া কি আর দিদিমণি! থোড়াই ভাবে তারা তোমার জন্য। একদিন সরিয়ে দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।'

শুনিয়া পটল ভারী খুশি হইল, এতক্ষণ পরে পুঁটিদি তার জীবনোপযোগী উপযুক্ত মূল্যের পুরস্কার পাইয়াছে। পুঁটিদি যাই হোক না কেন শেষপর্যন্ত মেয়েমানুষ তো মাত্র, ইহারই অরক্ষণীয়া হইয়া উঠে, হয়তো এখনো হইয়াছে, শত হইলে পুরুষ তো নয়।

মহেন্দ্র—'চিঠি লিখবে! চিঠি!'

আমরা দু'জনেই চুপ করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। মহেন্দ্রর [[.....] পুঁটিদি নিজেও মুচকি হাসিতেছিল বটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যায়, ভিতরটা তাহার কেমন করিতেছে যে! আঁচল কামড়াইয়া পা দিয়া মাটির মেঝের উপর দাগ কাটিতে পুঁটিদি চুপ করিয়াছিল। হঠাৎ চোখ তুলিয়া বলিল—'তোমার বাতাসা ক'টা ফুরিয়ে গেছে যে মহেন্দ্র।' মহেন্দ্রকে ফের বাতাসা আনিয়া দিবার জন্যই চলিয়া যাইতেছিল বুঝি, কিন্তু মহেন্দ্র হাত নাড়িয়া বলিল—'না, এবার আব বাতাসা নয দিদি।'

—'তবে?'

-'দু'টো কাঁচালঙ্কা দিতে পার?'

কাঁচালঙ্কার সঙ্গে নুন ও খানিকটা তেলও লইয়া আসিল পুঁটিদি।

মহেন্দ্র—'এই যে আঁচল কামড়াচ্ছ, এটা কেন দিদি? কী অপরাধ করেছে তোমার আঁচল?'

পটল—'ওর স্বভাব, মেযেমানুষে জাত কিনা—বুঝলে মহেন্দ্র?'

পটলের কথা শুনিয়া আমিও অবাক, ঈর্ষাও হইতেছিল, ছোট মুখে পটল কত বড় কথা বলিতে পারে, আমিতো পারি না। জীবন সম্বন্ধে আমাব চেযেও ঢেব অভিজ্ঞ পটল , তার কল্পনাবুদ্ধিও।

মুড়ির বাটিটা পুঁটির হাতে তুলিযা দিযা মহেন্দ্র বলিল—'মাখিযা দাও দিদি।'

পুঁটিদিদি কাঁচালঙ্কা পিষিয়া তেল দিয়া মাখিযা দিতেছিল।

মহেন্দ্র কোনো একদিকে তাকাইয়া বলিল—'চাব পাঁচদিন বাড়িব চিঠি না পেলেও এর কিছু [......] যায় না। এ ছোকরা পাখির বাচ্চা মেযে আব দাণ্ডাগুলি খেলেই সময পাবে না। কিসের বাপ! কিসেব মা! বড্ড অজাত এই পুরুষের জাত!'

শুনিযা আবাব স্তম্ভিত হইযা গেলাম আমবা।

মহেন্দ্র—'আমি যদি কোনোদিন বিযে করি, যদি সন্তান হয, কস্মিনকালেও এই সব খুদে বোলতা যেন আমাব সংসারে জন্মায না। ও মেযেসন্তানই আমার ভালো।'

মহেন্দ্রব এমন অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা দেখিযা অবাক হইযা গেলাম আমরা। আমবা সূতিকাঘরেব থেকেই শিখিযাছিলাম বাপ-মাযের সংসাবের পৃথিবীব পথ-বিপথের সবচেযে আদরেব জিনিস আমবাই—আমাদেব বোনেবা যে কত অধম, কত অপরাধী, কত অসাধের অরুচির জিনিস তাহাব লেখাজোখা নাই। কিন্তু এই মহেন্দ্র কিনা কন্যাসন্তান কামনা করে! পুঁটিদি মুড়ির বাটিটা মহেন্দ্রব হাতে তুলিযা দিযা—'তাহলে তুমি বিযে করোনি মহেন্দ্র?'

—'না, কবলাম কই আব।'

—'কেন?'

—'সৎপাত্রী জোটে না।'

পুঁটিদি হাসিযা ফেলিল।

পটল বিরক্ত হইযাছিল বলিল—'কোনোদিন জুটবে না তোমাব। তুমি মানুষ বড্ড কপালপোড়া হে মহেন্দ্র—অভাগীর বাপ ছাড়া কেউ তোমাকে মেযে দেবে না।'

মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে মহেন্দ্র—'তাই তো আমি চাই, বাপ-মাযের কাছে যারা অভাগিনী সেই সব মেযেই খুব চমৎকাব হয।' বলিযা জানালাব ভিতব দিযা মস্তবড় শিবিষ গাছটাব দিকে তাকাইযা একবাব কী যেন ভাবিযা লইল মহেন্দ্র, তাবপব মাথা হেঁট করিযা মুড়ি চিবাইতে লাগিল আবাব।

পটল—'তোমার বয়স কত?'
—'চৌত্রিশ।'
—'জাতে কি?'
—'জাতে মানুষ।'
পুঁটিদি বলিল—'ঠিক বলেছ মহেন্দ্র, এর চেয়ে বেশি পরিচয় দিতে যেও না।'
পটল—'কলকাতায় রয়েছ, মেথরের ছোঁয়া খাও?'
—'খুব খাই।'
—'মোছলমানের?'
—'হ্যাঁ, নির্বিবাদে।'
—'বড়বাবুর কাছে তোমার জাতের কথা বলেছ?'
মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া—'না'।
পটল—'তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমাকে?'
—'না।'
-'আমরা বাবুন, আমাদের বাড়ি কাজ করবাব আগে জাতের পবিচয দিযে নিতে হবে।'
—'বেশ, দেব।'
—'জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?'
—'ওই তো বললাম, মানুষ জাত।'
—'এই-ই বলবে শুধু?'
—'হ্যাঁ।'
—'তার মানে তুমি হাড়ি ডোম শুড়ি একটা কিছু।'
পুঁটিদিদি মাথা নাড়িয়া—'দূর, তাহলে গাঙ্গুলিবাবুদের বাড়ি চাকবি করতে পাবে?'
তাই তো, গাঙ্গুলিবাবুদের বাসায চাকরি করিযাছে যে!
মহেন্দ্র মাথা তুলিযা —'সে অনেক চাঁড়াল পৈতে নিযে বামুনের হেঁসেলে গিয়ে ঢোকে।'
পটল—'তুমিও সেই রকম একটি ঠগ নিশ্চয।'
মুড়ির বাটিটা রাখিযা দিযা মহেন্দ্র তাব ছোট সবুজ ট্রাঙ্কটার ভিতর হইতে একটা বাদামি বঙেব পালিশ ও জুতোর ব্রাশ বাহির করিল, তারপর বুরুশ দিযা জুতো ঘষিতে ঘষিতে—'তুমি এখানে আর ক'দিন আছ দিদি?'
—'আর এক আধ মাস আছি।'
—'মোটে—'
—'চার পাঁচ মাস থেকে গেলাম, আর কত? এখন একটা সংগতি পেলেই চলে যাই।'
—'বেশ বেশ; পাড়াগাঁয় বাড়ি তোমার, তা আমি আগেই বুঝেছিলাম কলকাতার মেয়ে এমন লক্ষ্মী হয় না। হয় হলা ফাজিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভিতরে গিয়ে ওই একই শাস,মিষ্টি মিষ্টি।' মহেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া—'বেশ বেশ তা বাড়িতে গিয়ে নাটাফল নাটাফল মিলবে না এমন দিদি।'
—'না, এখন কি আর নাটাফল পাওয়া যায় মহেন্দ্র? শীত যে ফুরিয়ে গেল।'
—'তাই তো, পাওয়া গেলে খুব খেতে পারতে দিদি। বেশ ফল।' আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল মহেন্দ্র। বলিল—'ইচ্ছে করে কি জান আমার?'
—'কি?'
—'তোমার সঙ্গে চলে যাই।'
—'কোথায়?'
—'তোমাদের বাড়ি, সেখানে গিয়ে চাকরি নেই।' জুতো ঘষিতে ঘষিতে—'এই ভাণ্ডারিগিরির চাকরিই ইহজন্ম পরে থাকি তোমাদের দেশে।'
পুঁটিদি একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—'গেলেই পার মহেন্দ্র।'
—'না, যাব না।'
—'কেন? বড়মামা তোমাকে রেখেছেন বলে?'

মহেন্দ্র হাসিয়া—'না না সেজন্য নয়, তোমার বড়মামার সাধ্য আছে আমাকে আটকে রাখেন, আমি তাঁর নফর নই তো।' জুতায় পালিশ লাগাইতে লাগাইতে মহেন্দ্র—'আমি নিজের নিজের থেকেই যাব না।'

—'কেন?

—'গেলে শেষপর্যন্ত দুঃখই তো পাব, আমি বড় সহজেই দুঃখ পাই।'

—'দুঃখ কেন মহেন্দ্র? সেখানে কেউ তোমার সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার করবে না, সেখানে তুমি বেশ মনের আনন্দে থাকতে পারবে।'

মহেন্দ্র—'আনন্দ পাবার ইচ্ছা আমার কারু চেয়ে একটু কম ছিল না দিদি। এই তো দেখো তসরের পাঞ্জাবি, লপেটা, ফরাশডাঙাব ধুতি, আতরের গন্ধ, সব উপকরণই আছে, এইসব এক এক বার নতুন করে জোগাড় কবি আমি। মনে হয হৃদয নিয়ে যে আনন্দ তা আমার কপালে কোনোদিন জুটবে না। এই সব বাইরের ফুর্তি সব।' জুতোর এক পার্টি সরাইয়া রাখিয়া মহেন্দ্র—'কিন্তু বড় শিগ্‌গিরই এগুলো জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়, ছ্যাঁদা হয, ছিঁড়ে যায় [......] দূর, এসব দিয়ে কী হবে? হৃদয তার নিজের অধিকার ফিবে চায।' বুরুশটা হাতের থেকে ফেলিয়া দিয়া পুঁটিদিদিরি দিকে তাকাইয়া মহেন্দ্র—'তখন বড় বড় চুল বেখে খালি পায একটা গেরুয়া জামা পরে পথে পথে চলতে ভালো লাগে।'

মহেন্দ্রর এইসব কথার কোনো অর্থ বুঝিলাম না আমরা। হযতো পুঁটিদি কি বুঝিতেছিল। একমনে মহেন্দ্রর দিকে তাকাইযাছিল সে, এই লোকটার যত অদ্ভুত কথা শুনিতে ভালো লাগিতেছিল তাব।

পুঁটিদি —'গেরুয়া জামা পরে পথে পথে চলো শুধু মহেন্দ্র?'

—'হ্যাঁ। আর তোমাব মতন দু-একজনের সঙ্গে-মাঝেমাঝে দেখা হয।'

—'তাবপর?'

—'মানে হয, সবচেয়ে বেশি শান্তি পাব, কিন্তু হৃদযকে স্বীকার করে যে আনন্দ তার ভেতর শান্তি নেই, অমৃত নেই। পৃথিবীব অধিকাংশ নরনাবীর সুন্দব সম্পর্কটুকু তাই বেদনাব, দুঃখসাধনার শুধু।' বলিযা একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল মহেন্দ্র।

—'ভগবান নিজে তাব জন্য শান্তি ও অক্ষযত্ব বেখেছেন, মানুষকে দিযেছেন মানুষের পথে পথে বিচরণ কববার অসীম অমানুষিক সংগ্রাম। যাই—'বলিযা মহেন্দ্র বাহির হইযা গেল।

মা তাহাকে ডাকযাছিলেন।

দেখিলাম একস্তূপ বাসন লইয়া পচা পুকুবেব জলে বসিযা মাজিতেছে। মাজিল, ঘষিল, চকচকে বাসন আনিযা সাজাইযা গুছাইযা বাখিযা দিল। সারাদিন বসিযা অনেক কাজই করিল মহেন্দ্র। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকাবে গা ঢাকা দিযে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল—'পুঁটিদি এ বাড়িতে না থাকলে, থাকতে আমাব কোনো বাধা ছিল না । থাকব বলেই তো এসেছিলাম।

এমনই বিচিত্র মানুষ!

মে, ১৯৩৩

গ্রাম ও শহরের গল্প

শীতের রাত—

প্রকাশ সোমেনকে নিয়ে তার স্ত্রীর ঘরের ভেতর ঢুকল।

বললে— আমাদের জন্য দুকাফ কফি তৈরি কর তো শচী—

এই আট ন বছর পরে সোমেনের সঙ্গে তাদের আবার দেখা হচ্ছে; কিন্তু শচীর তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না; গ্রামোফোনের নতুন রেকর্ডগুলো বাছতে বাছতে প্রকাশকে লক্ষ্য করে শচী বললে— এই পনেরোখানা রেকর্ড পছন্দ করলুম— বাকীগুলো তুমি ফিরিয়ে দিতে পার।

প্রকাশ সে কথার কোন জবাব না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সোমেন রেনকোটটা খুলে তার ইচ্ছামত এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে সুবিধা দেখে একটা কুশন বেছে নিয়ে বসল; চুরুটটা বের করে চুপে জ্বালিয়ে নিল। তারপর সে চোখ বুজে চুরুট টানছে।

পৃথিবীর আর কোন দিকের কোন খবর রাখবার কোন প্রবৃত্তিই নেই তার।

শচী রেকর্ড দেখছে—

আজকের রাতের মত রেডিওর শেষ গান শুনেও পৃথিবীর ছন্দতালসঙ্গী সম্বন্ধে তার প্রাণের ভিতর কোন অবসাদ আসে নি। অথচ সুর সহজেই মানুষকে পরিশ্রান্ত করে তুলতে পারে; এবং সে ক্লান্তির ভিতর থেকে যে বিরক্তি জীবনের প্রতি যে বীতশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জেগে ওঠে তা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক।

সেই মর্ম্মান্তিকতাকে সোমেন বুঝেছে—

প্রকাশের সে সব বুঝবার অবসর হয় নি; কোন দিনই হবে না; সুব বেসুরের সম্পর্কে সে কতটুকুই বা আসে? এলেও নিজেকে কতটুকুই বা তাতে বিব্রত হতে দেখে?

শচী হয়তো দু এক মুহূর্তের জন্য তা বোঝে; কিন্তু তাবপর একটা সামান্য গানের নবম গুণগুনানিও তাকে পেয়ে বসে; এ রকম মেয়েমানুষ জীবনেব থেকে ঢের গন্ধ—আস্বাদ কুড়িয়ে নিতে পারে: জীবনের হাতে আছাড় খেলেও এরা টকটকে রঙীন রবাবেব বলের মতন লাফিয়ে ওঠে।

প্রকাশ ঘরে ঢুকে টাই খুলতে খুলতে আবাব বেরিয়ে গেল— একটু পরে টাই খুলতে খুলতে ফিবে এসে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে— কৈ, কফি কোথায?

কোথাও কফি নেই দেখে পাশেব ঘরে সে আবার চলে গেল।

কোন একটা বিশেষ বেকর্ড হাতে তুলে নিয়ে শচী পনেবো মিনিট ধবে ঘাড় হেঁট করে ভাবছিল; এই রেকর্ডটাকে রাখবাব কোন প্রয়োজন আছে কিনা; হয়তো আছে— কিম্বা নেই: বুঝে উঠতে পারছিল না সে।

খোঁপার থেকে একটা হেয়ারপিন টেনে বেব করে উঠে দাঁড়াল সে।

এবং পাঁচ মিনিটের ভেতবেই কফি তৈরি করে নিয়ে এল।

পাশের ঘর থেকে প্রকাশ তখনও ফেরেনি— ইজিচেয়ারে পড়ে সে একটা সিগারেট টানছিল; কাপড় চোপড় ছেড়ে বাতের জন্য সে একেবারে ঠিক হয়ে আছে; আজ রাতে সে আব খাবে না কিছু— অফিস থেকে ফিরবার পথে সোমেনকে সে পেযেছিল; একটা রেস্টুবান্টে দুজনে মিলে বড্ড বেসামাল ভাবে খেযেছে—এমন কি হুইস্কি অব্দি; জীবনে কোন দিন এ সব বড় একটা করে না সে, কিন্তু ভয় নেই— পৃথিবীটা এমন কিছু টলছে না; বরং ভালই লাগছে; কিন্তু আশ্চর্য্য সোমেন এক ফোঁটাও মদ খেল না, কিন্তু একটা বেয়াড্ডা শূযোরের কত কতগুলো চিংড়ীর কাকলেট— গল্লা চিংড়ী লেজ অব্দি গিলে ফেলল সে।

প্রকাশ আর একটা সিগাবেট ধবাল।

কফি হয়তো এতক্ষণে তৈবি হযে গেছে— প্রকাশ এক ঝাড়া দিযে উঠে দাঁড়িযে টকাটক করে হাঁটতে সোমেনের পাশে একটা সোফা ওপব বসল।

বললে: কৈ কফি ঠাণ্ডা হয নি তো—

খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বৈ কি; এ বকম কফিতে কোন আস্বাদ থাকে না।

কিন্তু শচীকে কি করে আবার গরম করে আনতে বলবে সে? চাকরবাকরগুলোকেও এত রাতে এক কাপ কফি গরম করে আনবার জন্য ডাকাডাকি করবার মত বদ খেয়াল— না, সে সব হয় না।

বরং এই কফিই খাওয়া যাক।

আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে প্রকাশ। যখন সে ঢুকেছিল— সোমেনের পেয়ালা শেষ হয়ে পড়ে ছিল।

তিন জনে একেবারে চুপচাপ— ঘরের ভিতরে বিদ্যুতের বাতিটা যেন সশব্দে জ্বলে যাচ্ছে।

প্রকাশ ভাবছিল আর কেন, এখন বাতি নিবিয়ে ঘুমিয়ে-পড়া যাক। দু এক মিনিটের ভিতর কফির কাপ শেষ করে সচীকে সে বললে— আমাদের ডিনারের জায়গা তৈরি হয়েছে?

শচী বললে— কিন্তু সোমেনবাবুর জন্য তো কোন ব্যবস্থা হয় নি—

প্রকাশ বললে— আর ব্যবস্থা; আমাদের দুজনার পেটই এখন বেলুন হযে আছে— বাতি নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যাক; রাত তো কম হয নি— তাহলে সোমেন—

সোমেন রেনকোটটা টেনে বললে— বৃষ্টি ধবেছে?

প্রকাশ বললে— কি আসে যায়? বাস পাবে না এই ভয? একটা ট্যাক্সি করে সোমেন বেরিযে গেল।

শচী মিনিট পাঁচেক বসে প্রযোজনমত খানিকটা খবর নিলে— গল্দা চিংড়ীর কথা নিযে দুজনেই খানিকটা হাসল।

প্রকাশ হুইস্কির কথা একেবারে চেপে গেল; মখমলেব শালটা টেনে বিছানাব ওপর একেবাবে চিৎ হয়ে পড়ল সে।

বললে— সচী তুমি খেযে এসো; আমি যদি ঘুমিযে পড়ি আমাকে জাগিও না।

এই বলে পাশ ফিবে আধ মিনিটের ভেতবই প্রকাশ ঘুমিযে পড়ল; যখন সে নাক ডাকাচ্ছিল শচী তখন সোমেনের পরিত্যক্ত কুশনটার থেকে উঠে প্রকাশেব বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল; এই শীতের ভেতরেও প্রকাশের কপাল ঘামিযে উঠেছে— আঁচল দিযে আস্তে আস্তে স্বামীর কপাল মুছে ফেলে সচী দবজা জানালাগুলো সব খুলে দিল। বড় রাস্তার দিকেব জানালাটার পাশে এসে বাতের কলকাতার দিকে একবার তাকাল সে—ট্রামলাইনগুলো খালি পড়ে আছে—রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদেব এখন ঘুমোবার সময; আওযাজ তাই ঢেব কম; বাতিও অনেক নিবে গেছে— বাস্তার ওপব অন্ধকার এই বেলা খানিকটা জমে বসেছে; নক্ষত্রগুলোর মানে আছে এখন,—কোথাও নদীর জলে এই তাবাগুলোব ছবি: কোথাও নদীর জলে... ছবি: তারা মানে? মানে সে খানিকটা বোঝে হযতো: অন্ততঃ এই নিয়ে একটা ইংবেজি গান আছে; বেকর্ডে সেই গানটা কয়েক বার শুনেছে সে; সেই সুবে মাথাটা ভরে উঠছে শচীব; কিন্তু তবুও নক্ষত্রেব দিকে বেশিক্ষণ সে চোখ বাখতে পাবছে না; রেকর্ডেব সুবও ঠিক মতন খাপ খাচ্ছে না মনের সঙ্গে; সে সব ভুলে গিযে রাস্তাব দিকে আবার সে ফিবে তাকাল; হু হু কবে দুটো ট্যাক্সি পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে— তাদের কাছে মহিষের গাড়িগুলোর অবসব অসীম; কোন্ বাড়িব আকাশপ্রদীপ এখনও জ্বলছে; হঠাৎ পাড়াগাঁর কুযাশা— ধানেব ক্ষেত—পালংশাক কফি বীট গাজব জিউলি হিজল বেঁটে খেজুব গাছ শুয়োপোকা প্রজাপতি কাঁচপোকা জোনাকী আট দশ বছর আগের কত কি মনে পড়ে যাচ্ছে; পাড়াগাঁর বাত এমন নিস্তব্ধ হযে যায যে শুপুরীর কুঁড়ি ঝরবার শব্দ অব্দি শোনা যায; আমেব মুকুলও আওযাজ করে ঝরে— টুপ টাপ টুপ টাপ টুপ টাপ--

কিন্তু বারান্দার বেলিঙ ধবে দাঁড়িয়ে এত রাতে এ রকম চিন্তাব কোন শেষ নেই— ভাবতে ভাবতে কোন সংলগ্নতাও থাকে না।

শচী ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিযে ডিনাব টেবিলে একা খেতে বসল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে চামচ—কাটা চালিযে অনেক ভেবে ভেবে খাচ্ছে সে। চামচ—কাটা বেখে দিচ্ছে

হাত দিযে খাওযাব একটা প্রবল স্পৃহা প্রাযই তাকে পেযে বসে।

সমস্ত কিছুর ভেতরেই কাসুন্দি ঢেলে নিচ্ছে শচী; কাসুন্দিব বোতলটা ফুবিযে গেল প্রায।

কাল সকালেই কাসুন্দি তৈবি করে নিতে হবে আবার; রুকমিনিকে দিযে চলবে না; এ সব জিনিস বাঙালী মেযেদেব হাতে ছাড়া তৈরি হয না; নিজেকে সে পুরোপুরি বাঙালী মেয়ে বোধ করে আজকেব রাতে এমন পুলক অনুভব করছে! এত দিন প্রকাশ তাকে নিয়ে লেক্ষ্ণৌযে ছিল— দু তিন মাস হল শচীরই অবিশ্রাম চাড়ে অনেক চেষ্টার পর কলকাতায বদলি হযে আসতে পেরেছে; কলকাতাকে সব চেযে বেশি ভালবাসে সে — শুধু এ বাংলার জিনিস বলে; বাংলাব পাড়াগাঁগুলোকে হযতো আবো বেশী ভালবাসে—

বালিগঞ্জে এক বাড়ির ডাইনিং রুমে বসেছে সে; কিন্তু এ কি শুধু ডাইনিং রুম? শুধু বালিগঞ্জে? এ যে বাংলার আকাশের নীচে— বাঙালীর রাস্তাঘাট নক্ষত্র নিঃশ্বাসের মধ্যে— কি যে নিস্তার এর ভেতর! প্রকাশ এ সব বোঝে না। কিন্তু এই তিন মাস আগেও লক্ষ্ণৌয়ের ফুল পাতা বাগানের আশ্বাসের ভিতরেও সে কি বিষম হাঁফিয়ে উঠেছিল। বাংলার পাড়াগাঁর উচ্ছন্ন যাওয়া ভিটের ওপরেও যে অন্ধকার নেমে আসে যে ঘেঁটুফুল ফণীমনসা বাসা বেঁধে তা কি নরম, —নিবিড়!

প্রকাশ লক্ষ্ণৌয়ের থেকে কলকাতায় নেমেই অত্যন্ত উদ্ব্যস্ত; দু দিনের ছুটি নিয়ে অন্ততঃ মোটরট্রিপেও তাকে পাড়াগাঁয় নিয়ে যেতে বললে স্বামীর ওপর বড্ড অত্যাচার করা হবে।

ভিনেগারের শিশিটা সরিয়ে দেয়— বরং আর একটু কাসুন্দি ঢেলে শচী ভাবছিল বাংলা যাদেব দেশ—ক্ষেত যাদের আউশধানের বালামের রাইসর্ষের নিরবচ্ছিন্ন নদীর দেশকে ভালবাসা তাদের পক্ষে এত সহজ।

কিন্তু প্রকাশ বলত 'লক্ষ্ণৌর মত জায়গা পৃথিবীতে নেই' আম্বালায় যখন থাকত আম্বালা ছাড়তে চাইত না; মীরাটেরও তাই, এলাহাবাদও পেয়ে বসেছিল— কিন্তু কলকাতায় এসে অব্দি প্রকাশ এ শহরটাকে অত্যন্ত নাক সিঁটকিয়ে কথা বলে।

এবং দিনরাত সুট পরে থাকে।

বাঙালীর যে ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে বেশি কম সুট পবে প্রকাশ সে জিনিসেব কোন মর্যাদা বোঝে না।

কিন্তু আট দশ বছর পরে এই মটকা তসর খদ্দরের পাঞ্জাবীপবা খালিমাথাব বাঙালী ছেলেদের দিকে তাকিয়ে শচী এমন স্বস্থি বোধ করে!

অবিশ্যি প্রকাশকে খুব ভালবাসে শচী; সাহেবী পোশাক নিয়ে স্বামীর সম্বন্ধে কোন দিন তর্কও করেনি সে; অবাধে প্রকাশকে হ্যাটকোট পরতে দিয়েছে— কতবাব তার টাই বেঁধে দিয়েছে; স্বামী এই সব খুব ভালবাসে।

বাসুক। শচীর অনুভব আস্বাদে কোন ব্যাঘাত পড়ছে না তাতে।

মধু দিয়ে ক্ষীর খাচ্ছিল শচী।

আজ রাতে ঢের খাওয়া হল।

ডাইনিং রুমটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে অনেক বাত হয়ে গেল। প্রকাশেব বিছানাব পাশে এসে যখন দাঁড়িয়েছে শচী— প্রকাশ তখন ঘুমে ঘুমে আপ্লুত হয়ে পড়েছে একেবাবে; স্বামীর ঠোঁটেব কাছে মুখ রাখতেই একটা অপরিচিত গন্ধে শচী থমকে সরে গেল।

বিছানার থেকে সরে গিয়ে সোফার ওপর বসল; খানিক্ষণ অবাক হয়ে ভাবল দু তিন বছব পবে আবার হুইস্কি— কিসের জন্য? শীত রাত বলে? না শীত রাতেব ওপর বৃষ্টির আরো কন্‌কনে হাওয়া সেই জন্য? না দিনরাতের বিদঘুটে পরিশ্রমের চাপে পড়ে?

হয়তো মুহূর্তের খেয়ালে; (খেতে খেতে হয়তো অনেক খাওয়া হয়ে গেছে।) কিন্তু এতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। পুরুষমানুষ—বিশেষতঃ অফিসারদের এ সবের প্রয়োজন। সারা দিন কড়া চুরুট টানবাব অধিকার তাদের রয়েছে। তাদের অনেকখানি নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত— এ তাদের জীবনের অর্জ্জিত অধিকার।

প্রকাশের মুখে মদের গন্ধেব কথা দু এক মুহূর্তের ভেতরই ভুলে যাচ্ছে শচী; তার বড্ড ঘুম পেয়েছে; প্রকাশের বুকের ভেতর মুখ রেখে সিগাবেট চুরুট এলকোহলের একটা কটকটে গন্ধের ভেতর অত্যন্ত ক্ষমার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে শচী—

শচীর হৃদয়ে প্রকাশেব জন্য ভালোবাসা না থাকলেও এই ক্ষমাব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভালোবাসাই বা থাকবে না কেন?

তা আছে।

ঘুমের থেকে উঠে প্রকাশ মাথায় এক জঙ্গল চুল নিয়ে ইজিচেয়ারের ওপর বসে রইল।

কিছুই ভাল লাগছে না তার।

কিসের এ ব্যর্থতা?

কিন্তু শচীকে কিছু বুঝতে দেবে না সে; বাস্তবিক স্ত্রীকে এক দিনের জন্যও সে ব্যথিত করে নি; শচী

প্রায়ই ভালোমানুষ; কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে; কিন্তু শচীর নিকটতম বন্ধু প্রকাশই বটে, প্রকাশ সব বোঝে— দরকার মত নিজেকে স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে; স্ত্রীর মর্জি মত পদে পদে সে ঢের চলে দেখেছে; তাতে ঢের প্রয়াস লাগে বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেই জীবনের শান্তি থাকে; মানুষের জীবনের রঙ্গরসবোধেরও ক্ষমতা তাতে বেড়ে যায়— নিজেকে প্রখর আর্টিস্টের মত মনে হয়। এই সব পরিতৃপ্তি এর ভেতর রয়েছে।

অবিশ্যি প্রকাশ আর্টিস্ট নয়; খবরের কাগজের পোলিটি' ছাড়া রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নেই,— সে অফিসার মাত্র; হয়তো তার চেয়েও বেশি ক'রে মানুষ— রসবিচারসঙ্কুল রক্তমাংসের একটি পরিতৃপ্ত আশাসম্পন্ন জীব।

কিন্তু আজ ভোরে ভাল লাগছে না কিছু— ক্ষিধে নেই, গলা জ্বলছে, পেটের ভেতর গ্যাসও হয়েছে; মনটাও শরীরের জন্য পীড়িত— গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্লেশের ভিতর থমকে রয়েছে। ব্যর্থতা মানে এই— হয়তো পাঁচ মিনিটের কিম্বা পাঁচ ঘণ্টার। কিন্তু বড় অফিসার সে: অফিসের সময় মত নিজেকে ঢের গুছিয়ে নিতে জানে।

হ্যাটকোট পরে যখন বেরিয়ে গেল প্রকাশ— শচী মনে মনে হাসছিল; এই পুরুষটিকে নিয়ে কোনদিন কোন বেগ পেতে হয়নি তার; এমন পারদর্শী— পরিহাসপ্রবল— সুচতুর অক্লান্ত লোক— শচীকে সে ঢের সুখ দিয়েছে; সুস্থিরতা দিয়েছে— সার্থকতা দিল।

প্রকাশের জীবনের অসংখ্যা কাজকর্মের ভিতর শচীকে সে লিপ্ত করেনি; বউর কাছে পরামর্শ চাওয়ার মত ঢং তার নেই, পরামর্শ বা আদেশ ও দিতে সে আসে না। নিজে সে একা যুদ্ধ করছে— কিন্তু সামান্য খুঁটিনাটিতেও শচীকে সাহায্য করবার জন্য সে প্রস্তুত।

প্রকাশের কথা মনে হলেই (...) এর অজস্র স্টেশনের কথা মনে হয়— শীতে বৃষ্টিতে অন্ধকারে রোদে বিরাট আলষ্টার গায় দিয়ে টপহ্যাট মাথায় যে সব হুদ্দায় শচীকে নিয়ে চ'রে ফিরে বেড়িয়েছে প্রকাশ।

সাহেবী পোশাকপরা লম্বাচৌড়া স্বামীকে সেই সময়ে শচীর সব চেয়ে বেশি ভাল লেগেছে— সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেছে।

স্বামীর কাছ থেকে শচী ঢের স্বাধীনতা পেল; এক এক সময় মনে হয়েছে— এ ঢের অতিরিক্ত পাওনা, কারণ, নিষ্কৃতিকে ঠিক মত চালাতে না পারলে হৃদয়কে তা বড্ড পীড়িত করে; নিজেকে এত একা মনে হয়।

সকালে হয়নি; দুপুরে শচী কাসুন্দি তৈরি করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু জীবন কি এই কাসুন্দি নিয়েই শুধু?

নতুন কয়েকটা রেকর্ড বাজানো গেল; স্ফূর্তি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তারপর চলন্ত রেকর্ডের ওপর দুটো আধমরা আরসোলা ছেড়ে দিয়ে সেগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্ফূর্তি, এর পর রেকর্ড বন্ধ করে রাখতে হয়।

সোমেন ঢুকে পড়ে বললে—এখনও সেই রেকর্ড ছানছ?

শচী বললে— একখানা চিঠি লিখব ভাবছিলাম

—কার কাছে?

তোমার কাছে নয় নিশ্চয়ই

—ইংরেজি খবরের কাগজে?

—তুমি লেখ নাকি?

—আমি? পড়ি— কৃচিৎ দিক ভুলে। সে দিন স্টেটসম্যানের Points from letters—এ তোমার চমৎকার সই দেখলাম, কর্ত্তা লিখে দিয়েছিল না কি?

শচী রেকর্ড গুছোচ্ছিল—

সোমেন বললে— না প্রকাশ কখনো এ রকম লিখতে পারে না, কিন্তু আগাগোড়া চিঠিখানা দেখলে খুশি হতাম— কিন্তু দুটো পয়েন্ট তুলে দিয়েছে শুধু; আর সব তারা নিরর্থক মনে করল?

শচী বললে— এ চিঠি যে আমার লেখা সে কথা তোমাকে কে বলল?

সোমেন বললে— কেউ বলেনি; শুধু ঘুরে ফিরে সেটাকে পড়ে দেখবার অদম্য স্পৃহা, চিঠিটার প্রতি শব্দের ভিতর থেকেই একটা sensuousness এর গন্ধ—

শচী সোমেনকে শেষ করতে না দিয়েই ভ্রূকুটি বললে— বাঙালী মেয়েদের জোর করে সিন্ধি গুজরাটি পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অন্যায্যতার বিরুদ্ধে আমি লিখেছি:: এর ভেতর sensuous কি এল সোমেন?

সোমেন বললে— Sensuous- sensual-

সোমেনকে নিয়ে আর পারা যাবে না! সে অত্যন্ত অন্যায্য মন্তব্য করে— অত্যন্ত অশ্লীল ভাবে জীবনকে দেখে—

শচী বললে— কাল থেকে আমি দরজায় চাবি দিয়ে থাকব—

সোমেন উঠে দাঁড়িয়ে বললে— এখুনি দিয়ে রাখ, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

শচী একটু ভেবে বললে— রাগ কোরো না সোমেন

সোমেন বললে না কিছু।

কিন্তু বসল না আর।

রাগ সে করেনি। — হয়তো মর্ম্মাহতও হয় নি; কিন্তু যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছে।

শচী একটা রেকর্ড তুলে বললে— একটা নতুন গান শোন।

সোমেন বললে- সব গান পুরোনো, সব কথা পুবোনো, সব মানুষ পুরোনো, আমিও নতুন কিছু চাই না; পুরোনো ধূসর অন্তরবৃত্তিকে ছাড়িয়ে কোন মানুষই কি উঠতে পারে? শচী গ্রামোফোনে চাবি দিতে দিতে রেকর্ডটা চড়াল।

সোমেন দরজা ধাক্কায় দিযে বেরিযে গেল।

শচী আস্তে আস্তে বড় রাস্তার দিকে জানালার কাছে এসে দেখল সোমেন হাওড়াব একটা বাসে উঠেছে— তখন সে নিস্তার পেযে ফিবে এসে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ কবে দিল: কিন্তু চাবি লাগাল না।

গ্রামোফোনের গান এক নিমিষেই থামিযে দিযে ডেসকে গিযে বসল।

কয়েকখানা চিঠি লিখবে; কিন্তু প্রথম চিঠিটা এই...

কাল রাতে প্রায় আট দশ বছর পবে কনকনে বাতাস বৃষ্টিব ভেতর সোমেন এসেছিল— ওঁর সঙ্গে; কোথাব থেকে যে এল এতদিন কোথায় ছিল— জিজ্ঞাসা কবি নি; এসেই অত্যন্ত প্রস্তুত ভাবে ম্যাকিনটোষটা যেদিকে—সেদিকে ছুঁড়ে ফেলে একটা চুরুট জ্বালিযে বসল; এক কাফ কফি খেল; কোন কথা হল না; হয়তো কিছু মদও খেযে ছিল— শুনলাম বাবোটা গলদা চিংড়ী খেযেছে— কাটলেটের আকাবে; কিন্তু হেসো না— এ অব্দি সোমেনকে আমি অত্যন্ত উপহাসাস্পদ করে তুললাম নাকি? ঠিক সে মতলব আমাব নেই। শোন— সে কাল রাতে চলে যাওযাব পঁব তার কথা আমার একদম মনে ছিল না; আজো মনে হয না; কিন্তু আজ দুপুরেই হঠাৎ সে আবার হাজিব— আমি তখন গ্রামোফোন বন্ধ কবে চিঠি লিখব ভাবছিলাম; ষ্টেটসম্যানে সে চিঠিখানা Points-এব ভিতব দিয়ে আমাকে একটু কানকাটা করেছে সে চিঠিখানা সোমেনের চোখে পড়েছে: চিঠিটা কি নিযে জান?— এই সে সিন্ধি গুজরাটি মারাঠী মাড়োযারীরা বাঙালী মেযেদের টেনে বিযে কবেছে এ আমাব ভাল লাগে নি; আমার বাংলা বাংলার মতনই থাকবে; বাংলাকে অমন disintegrated দেখতে আমার ভালোলাগেনি। এই disintegration-এব বিরুদ্ধে আমি লিখেছিলাম; সোমেন বললে আমার চিঠিখানা senuous হযেছে—sensual হযেছে; এবং সেইটেই তার ভাল লেগেছে— চিঠিব আদৎ বক্তব্যটা যেন কিছুই না। সোমেন চিরদিনকার বাঙালী— এই পদ্মা মধুমতীর দেশ ছেড়ে কোনো দিন সে বিদেশে যাযনি— যেতে ভালবাসে না; তাব কবিতা পড়ে দেখো— বাংলাকে সে এমন গভীর ভাবে চেনে, এমন রোমহর্ষে কাঁটা খেযে ভালবাসে! তাব মুখে এমন কথা শুনে একটু আঘাত লাগল,— আমাব ঈষৎ বিরক্তিতেই সে বের হযে গেল।

আমার ভিতব বিশেষ কোন নীতিপ্রখরতা নেই; আমি জিনিষকে ভালবাসি— আমি জিনিষকে ঘৃণা করি— এই শুধু—

তোমরা অনেক কিছু ভাবতে পার— কিন্তু এ অভ্যাসকে আমি ছাড়াতে পাবব না: এই আমার ধর্ম্ম।

মানুষেরা অনেক কিছু ভাবতে পারে— কিন্তু তুমি ভাববে না; তুমি একমাত্র মেযেমানুষ যাব কাছে আমি চিঠি লিখি; বাকী সব চিঠি আমার পুরুষদের কাছে।

বাস্তবিক পৃথিবীতে বোধসম্পন্ন এত কম—

কিন্তু সে সব কথা আর এক সময় হবে।

সোমেন অনেক বার আসবে; তার সম্বন্ধে এখন আমার কি ধারণা বুঝে উঠতে পারি না; জীবনে অনেক বার খুঁচে বার হয়েছি— নিজেরই কাছে; কাজেই কিছু বলতে পারি না। স্বামীকে আমি ভালবাসি— পৃথিবীতে এই একমাত্র পুরুষ যার সঙ্গে আমার চলে; আমি অনেক পুরুষ বুঝে দেখেছি— অনেক সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি— অনেক দিন; আমার মনে হয় আমার এই পছন্দই ঠিক— প্রকাশবাবু আমার প্রয়োজন মত নিজেকে যে রকম অনবরত artistically পরিবর্ত্তিত করতে পাবেন— আর কেউই তা পারে না।

সোমেন? —সব্বায়ের চেয়ে বেশী করে সে আমাকে তার নিজেব দরকাব মত রূপান্তরিত করে নিতে চায়।

এই লোকগুলো বড় সাংঘাতিক।

শেষ পর্যন্ত এবা কি যে কবে— কেউ বলতে পাববে না।

কিন্তু আমার মনে হয় সোমেন যে— একা আছে— শেষ পর্যন্ত সেই একাই থেকে যাবে— একা, তিক্ত বিবক্ত, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ— এক খন্ড দগ্ধ গন্ধকেব মত; তাব ব্যর্থ ব্যঙ্গ দিযে জীবনের কি হবে?

কিছু হবে কি?

জানি না কিছু হবে কিনা।

সোমেন বাতের বেলা এসেছে— যতখানি রাত কবে এলে স্বামীদেব ঘবে পাওযা যায।

শচীকে বললে— প্রকাশবাবু মিষ্টার সিন্‌হা কোথায?

—কেন তাঁকে কি খুব দবকাব?

—হ্যাঁ, একটু, চাকরীর উমেদারীব জন্য—

শচী ধীবে ধীবে আপাদমস্তক ভাল কবে শাল জড়িযে নিল।

সোমেন বললে— মিষ্টাব সিন্‌হার অফিসে একটা কেবানীগিবি খালি আছে— ষাট টাকা মাইনে।।

—কাব জন্য?

—আবাব কাব জন্য? পৃথিবীতে নিজেব ছাড়া আব কাব জন্য কে কবে এত বাত বিলেতে চড়ে বেড়ায?

—তোমাব জন্য!

শচী একটু আহত হযে দাঁড়াল।

সোমেন বললে— খেতে হবে তো।

সে একটা চুরুট জ্বালাল।

শচী কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না; এক মুহূর্ত সোমেনেব কথা ভেবে সে কুঁচকে উঠেছিল: তাব স্বামীব অফিসে ষাট টাকার চাকবিব উমেদাব সোমেন!— একে নিযে এত কথা সে নির্ম্মলাকে সে দিন লিখতে গিযেছিল! পৃথিবীকে এখনও কত কম বোঝে সে!

এখন থেকে এই লোকটির সমস্ত রফা তার স্বামীব সঙ্গে যেন—মিছেমিছি শচীকে এসে ব্যতিব্যস্ত কবে কেন সে?

অত্যন্ত কুঞ্চিত হযে উঠল— সমস্ত অন্তবাত্মা শুদ্ধু সিঁটকে উঠল যেন প্রকাশ বধূর। খাটের কিণার ধরে খানিক্ষণ সে ঘাড় হেঁট কবে দাঁড়িযে রইল; কযেক মিনিটেব পব মনে হল তাব; কোন কথাকাটাকাটি তর্কবিতর্ক করবাব একটুও রুচি নেই আজ আব; আজ সে পরিক্লান্ত ঠিক নয়, কিন্তু অত্যন্তই অনিচ্ছুক— এমন রাত বুঝেই স্বামী যে তার কোথায গিযেছে—

শচী দাঁড়িযেই বইল।

সোমেনেরও আজ উঠবাব নামগন্ধ নেই— কত রাতে প্রকাশ আসে— সেই অব্দি কি সে বসে রইবে?

চুরুট টেনে টেনে— টেনে টেনে — অন্য কোন কিছুর জন্যই যেন সে প্রতীক্ষা কবছে না।

সমস্ত ঘরখানা— গোল্ডেন বর্ম্মা চুরুটের রোখো গন্ধে ভরে উঠছে— স্বামীর হ্যাভেনার মিষ্টি অভিজাত গন্ধ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত এই ঘরখানা।

সোমেনকে সে চলে যেতে বলুক।

আজ তার মুখের ওপর দরজা পিটিয়ে দেবার একটা দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা শচীকে পেয়ে বসল— দরজা পিটিয়ে চাবি বন্ধ করে দেবার।

খোলা জানালা দিয়ে শীত ঘরে ঢুকছে— শীত আর কন্‌কনে বাতাস— শচীর রক্তাক্ত কান গরম হয়েই রইল।

প্রকাশ ঘরে ঢুকে দেখল সোমেন পা ছড়িয়ে সোফায় বসে চুরুট টানছে— শচী অরুণ মুখে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

মানে? মানে যা কিছু একটা হতে পারে।

প্রকাশের বিশেষ কিছু এসে যায় না তাতে।

শচী সম্পর্কে এমন দৃশ্য অনেক পুরুষকে নিয়ে অনেক গভীর বাতে অনেক বাব দেখে এসেছে প্রকাশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কোন দিকে গড়ায় না: সবই যায় ধোঁয়া হয়ে; শচীর স্বামী হয়ে প্রকাশই তো থাকে।

আজকের ব্যাপারটা হয়তো অত দূর কিছু নয়। হয়তো কিছুই নয়— একেবারেই কিছু নয়।

প্রকাশ টাই খুলতে খুলতে সোমেনকে বললে— বেডরুমে নয়— চলো ড্রয়িংরুমে গিয়ে কথা বলি।

সোমেন ও প্রকাশ চলে গেল।

শচী অনেক বাত অব্দি প্রকাশেব জন্য অপেক্ষা করে কবে ঘুমিযে পড়ল— ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখে প্রকাশ ও নিজের জন্য কাটাচামচ ডিশ সাজিযে।

তিন চার দিন সোমেনের কোন দেখা নেই।

সোমেনের ষাট টাকার চাকবিটাব জন্য প্রকাশ যথেষ্ট চেষ্টা করেছে— কিন্তু একজন মুসলমানকে বাধ্য হযে বসাতে হল; অফিসের সর্ব্বেসর্ব্বা মালিক প্রকাশই নয়— প্রকাশের ওপবওযালা সাহেববাই নয়— কিন্তু তাদেব ওপবেও সাহেব আছে— সবের ওপবে বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট।

বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র বেগে কাঁটা চামচ নাড়তে নাড়তে শচীকে এইসব বলছিল প্রকাশ। শচী অবাক হযে বললে— ষাট টাকার একটা চাকবি!— সোমেন সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণা?

প্রকাশ আবো ঢেব অবাক হয়ে গিযে বললে— বল কি তুমি? আজকালকাব দিনে কে কোথায পাচ্ছে'

এমন বিস্মিত হযে পড়েছিল প্রকাশ শচীর কথা শুনে?

কাটা চামচের অসম্ভব দ্রুত গতি মন্দীভূত হযে পড়েছিল; ছুরি কাটাব আবার সেই বিদ্যুতেব বেগেব পুনবভিনয করতে করতে প্রকাশ বললে—এই তো এত চেষ্টা করেও সোমেনকে দিতে পাবলাম না; চেষ্টা কবে খুন হযে গিযেছি!

নিজেকে প্রকাশ ধিক্কার দিতে লাগল।

বললে—মিছেই এত বড় পোষ্ট hold করছি শচী—

কাটাচামচের বেগ খানিকটা কমে এল— এত বড় পোস্ট হোল্ড ক'বেও এ সামান্য জিনিসটা করতে পারা গেল না এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাব দরুণ হযতো। প্রকাশ কাঁটা চামচকে দু এক মুহূর্তেব বিশ্রাম দিযে বললে— লোকে ভাবে আমার অফিস— আমি খুব বড় ম্যাগনেট শচী।

'কিন্তু কিছু না' একটা আধাসিদ্ধ শালগমের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে, একটা সিদ্ধ আলু চামচ দিযে পিষে খানিকটা মাষ্টার্ড ও কাঁচা পেঁজের সঙ্গে মিশিযে দিযে মুখে তুলে প্রকাশ বললে— 'একেবারে হাতে পাযে বাঁধা।'

এর পব সদ্য তৈরি ফাউল বোস্ট নিযে জিভ দাঁত ক্ষিধে ও ছুরির জোর পরীক্ষা হবে: চকচকে ছুরিটাকে একবার ঘুবিযে তাকিযে দেখে সেটার সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস পোষণ ক'রে ধর্ম্মবিশ্বাসীব মত ভীরুর উজ্জ্বল মুখে মুর্গীটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে করতে প্রকাশ বললে— নিজেকে ওপর ধিক্কাবে মন ভরে ওঠে।

কিন্তু ধিক্কার কিসের? ধিক্কাব কোন্ দিকে? অত্যন্ত বিজযগৌরবেই তো স্বামী নিবপরাধ পাখীটিকে সহজ মৃত্যুর থেকে বঞ্চিত করে— অপমৃত্যু ঘটিয়ে ও তারপরেও নিরস্ত রইল না; বেচারীর শবটাকে কিম্ভূতকিমাকার একটা কার্টুনে পবিণত করে চূড়ান্ত ঠাট্টা শেষ হল না তবু; বাবুর্চ্চিব হাতেও এত ক্ষণ বসে পাখীটির সমস্ত লাঞ্ছনা শেষ হয নি; ডিনার টেবিলে এ পুরুষটির ছুরিকাঁটা প্রতি মুহূর্তেই ঘুরে ফিবে কত যে উপহাস ও শ্লেষ করে চলেছে এই সিদ্ধ গন্ধ অপমৃতুনিস্ফল নির্ব্বাক শবটাকে— ভাবছিল শচী।

এর ভেতর ধিক্কার কোথায়? ধিক্কার কিসের টুকরা সরিয়ে দিতে দিতে বললে— বাস্তবিক কোন ক্ষমতা নেই আমাদের আধাভূয়ো গোলামগিরিই স্যার!

শচী বললে— সোমেন কি করছিল এর আগে?

—কোন্ একটা বাংলা খবরের কাগজে ছিল।

—কিন্তু সে তো বেশ ছিল—

—বেশ ছিল! তোমার কি যে কথা! ও সব ঘুড়ির কাগজের কথা ভাবতে গেলেও তো রক্তে কাঁটা দিয়ে ওঠে; নোংরা গেঁয়ো ভাঁড়ামি—ন্যাংচামি করে পয়সা! ছোঃ!

শচী বললে—কিন্তু ধরে পড়ে যদি করে— যে জিনিসই তেমন ভাবে করা যায়—

—রেখে দাও, রেখে দাও

শচী বললে—না, সমগ্র অন্তরের সঙ্গে—

প্রকাশ বাধা দিয়ে বললে— একটু ভিনেগার দাও—

শচী ভিনেগারের বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বললে— টমেটোর টক খাবে?

—দাঁড়াও

রোস্টটা তার শেষ হয়নি।

শচী বললে— কিন্তু বাংলা দেশের কথা বাংলা ভাষায় যারা লেখে প্রাণ দিয়ে—

-ঘুড়ির খবরের কাগজগুলো নিশ্চয়ই তেমন নয়

—তেমন নয়?

—পড়ে দেখ নি কি কোন দিন?

ঘুড়ির খবরের কাগজ স্বামী কিসের প্রতি ইসারা করছে? যে কোন বাংলা পত্রিকা? প্রকাশ কোন বাংলা লেখাই পড়ে না— না বই, না কাগজ; তাব কাছে সমস্তই হয়তো ঘুড়ি কাগজ। সোমেনের মত মানুষ যে কাগজেব সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তা অতটা গোলা জিনিস হযতো নয়।

এরপর সোমেনের অনেক কথা মনে পড়ে যায়— তার উচ্ছলতা, প্রখরতা, জীবনের দুঃসাধ্য গহ্বরে ঢুকবাব স্পৃহা, ঢুকবার সাহস, ঢুকবাব শক্তি— অনেক কথা— আট দশ বছর আগের—বাবো— চৌদ্দ বছর আগের—

প্রকাশকে ও সোমেনের মনে মনে তুলনা না কবে পারছে না শচী— এদের প্রতি জীবনেব ভাগ্যবিধাতার কৃপাব দিকটা দিয়ে নয় অবিশ্যি— প্রকাশ মানিযে চলতে পারে বটে নিজের অস্তিত্বকে যথাস্থানে ক্ষুণ্ন কবে দিতে বাজি, কাজ হাঁসিল কবতে ওস্তাদ, রসিকও, রসবোধসম্পন্ন মাত্রাজ্ঞান খুবই আছে, অক্লান্ত, কিছুতেই ঘাবড়ায় না।

জয় করে চলেছে।

সোমেন— জীবনব্যবসাযের প্রতি অবিশ্বাসী— জীবনকে চায শুধু; খড়্গের মত কঠিন— চোখা বিচাববোধটাকে কল্পনার রেশমী কাপড়ের জালে জড়িয়ে নিষ্ক্রিয কবে বাখতে ভালোবাসল সে: ভাবপ্রবণতায—আবেগে ব্যঙ্গে—নিষ্ক্রিযতার নিরর্থক হয়ে রইল। অনাবিষ্কৃত খনির সোনাব মত কোথাও পড়ে আছে সে— রূপার টাকার মত জীবনের বাজারেব পথে প্রকাশ তার সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্বজযী বাজনা বাজিয়ে চলছে।

শচী বলল— কিন্তু শক্তি সাহস ঢের ছিল সোমেনেব

—কি এগোয় তাতে?

—তোমাদের কারুর চেয়েই কম নয়

—মানুষের জীবনে যে একটা সুযোগের সময় আছে সেটাকে উপেক্ষা কবেছে সোমেন; কিন্তু মানুষের. জীবনে প্রতি মুহূর্তেই সুযোগ—সোমেন তাও বুঝতে চায় না। জীবনকে তাই সে যা দাঁড় করিয়েছে দেখলেও ভয় হয়।

রোস্টটাকে শেষ করে ফেলে কাঁটা ছুরি ফেলে দিয়ে প্রকাশ বললে— বুদ্ধি সাহসে কী কুলোল? বাস্তবিক ও সাহসও নয়— বুদ্ধিও নয়।

শচী বললে— বুঝেছি; ভাবছিল সোমেন আব স্বামী তো এক সঙ্গেই পাশ করেছিল— সোমেন স্বামীর থেকে বরং ভালোই পাশ করেছিল; কিন্তু বরাবরই জীবনের ব্যবসায়ে মিতাচার একটা ফিকির ছিল

প্রকাশবাবুর— কাকার টাকায় বিলেত চলে গেল তাই। কিন্তু সোমেন ফিকিরের সুড়ঙ্গে কাছিমের মত ফিরতে পারে না— ব্যবসাও তার ভাল লাগে না— হোক্ না জীবনের ব্যবসাই; সে চায় জীবন।

শচীর এ চিন্তার ভিতর প্রকাশের প্রতি একটা তিক্ততার ঝাঁঝ থাকলেও,— বাস্তবিক হৃদয়ে কোনো বিমুখতা ছিল না তার প্রকাশের উপর।

জীবনের কারবারের হার জিতের একটা খসড়া আঁকতে প্রয়াস পাচ্ছিল সে— অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে; কাজেই অনেকটা অসামাজিক অপারিবারিকভাবে ভাবতে হচ্ছিল তাকে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় একটুও আঘাত লাগে না তাতে। স্বামী বাস্তবিক কি— সোমেন কি— জীবনটাই বা আমাদের কি— এই সব ভেবে দেখে একটু তামাসাবোধ হয়— একটু দুঃখ হয়— সুখ হয়— কাউকে শাটল কর্কের মত মনে হয়— কোন কিছুকে জীয়নকাঠির মত—

তারপর গভীর রাতে— শীতের গভীর রাতে— বুঝতেই পারে না শচী— সোমেন বলে একটা লোক আছে কিনা— তার কোনো মূল্য আছে কিনা— পৃথিবীর কোনো দরকারেই তার কোন প্রয়োজন আছে কিনা— বাস্তবিক রক্তমাংসের কোনো অবয়ব বা মুখও আছে কিনা সোমেনের—

এই ভাবে শচী : শীতের রাত— শীতের গভীর রাত— বাংলার শীতের গভীর রাত প্রকাশ আর তাকে নিয়ে যেন কোন বাংলার মাঠে আমনের ক্ষেতের পাশে টুপুর—টাপুর শিশিরের ভেতর কোন মধুমতী কর্ণফুলী আরিযাল খাঁ নদীর কিণারে প্রোথিত করে রাখে।

—হা ভগবান, প্রোথিত ক'রে রাখে যেন।

সোমেন তার ঘুড়ির কাগজের সম্বন্ধে কোন কথাই বলছে না; বলেও না যে সে একটা খবরেব কাগজের ষ্ট্যাফে আছে।

বাংলা প্রেস সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল ছিল শচীর— সোমেনকে জিজ্ঞেস করলে অনেক জানতে পারা যায় বটে, কিন্তু এ সব জিনিস সোমেনই না হয় প্রথম পাড়ুক। সোমেনকে তাবপব না হয় এগিযে দেবে সে—

কিন্তু কিছুতেই পাড়ছে না সে।

হযতো নিজের ব্যবসাকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করে।

অন্ততঃ তা নিযে গর্ব্ব করবার কিছুই হযতো তার নেই।

সোমেন কযেক দিন ধ'রে আসছে না; সেই যে কেরাণীগিরি চাকরির তদ্বিরে প্রকাশেব সঙ্গে একদিন রাতে সে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল— তারপর আর তার দেখা নেই।

এর পর সোমেন যখন আসবে— যদি সে আসে— শচী তাকে কি রকমভাবে গ্রহণ কববে?

স্বামী যে অফিসে বারো শো টাকা নিযেও অতৃপ্ত ছিল, সেখানে সে ষাট টাকায নিজের খুশিব বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে বেড়িযেছে— এ রকম হিসাবে সোমেনকে দেখলে চলে?

মেয়েরা দেখে এই রকম করেই বটে— বিবাহিতা আইবুড়— সব মেযেবাই।

মেয়েদের পক্ষে মাথা ঠিক রাখা এত কঠিন— তাদের মতামত এত সহজেই বিকৃত হয়!

কোন ভ্যাগাবণ্ডকে তার ন্যায্য জায়গা দিতে পারে না মেযেরা— যে কোন ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গেই গুলিয়ে ফেলে... এই সব ভাবছিল শচী।

নিজের মনের ভেতরই এই সব প্রক্রিয়া হচ্ছিল হযতো তার; এই সব যে উৎরে উঠতে চাচ্ছিল।

সোমেন এসেছে— ভ্যাগাবণ্ডের ভ্যাগাবন্ড।

কিন্তু নবাবের মত চাল—সব চেযে চমৎকার কুশনে বসল সে; চুরুট ধরাল; কফির অর্ডার দিচ্ছে।

দুই পা ছড়িয়ে বসেছে সে— যেন পৃথিবীর কোথাও কোন খটকা নেই, যেন শচী তাকে সব চেযে বেশী লায়েক বলে মনে করে।

ঘুরে ফিরে শচীর কাছেই আসছে তো সে— দুপুর বেছে— যখন শচী একা থাকে। এতে নিজেকে সোমেন অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক বলেই প্রমাণ করছে; করছে নাকি?

শচী কফি নিযে এল।

তারপর শেলাইযের কল নিযে বসল।

নীরবে কফির পেয়ালা শেষ করে সোমেন চুরুট জ্বালিয়ে নিযেছে— মুখে তার কোন প্রশ্ন নেই:

বরাবরই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—অবিশ্যি খুব একটা কোমল কুশনে বসে বেশ একটি পরিপাটি কক্ষের। এই সব বিলাস ও অবসর অনুভব করতে এসেছে হয়তো— একটি মেয়েমানুষের সান্নিধ্যে থেকে; মেয়েমানুষটি হয়তো যে কোন মেয়েমানুষ হলেই চলত— পুরুষকে বাধা না দিলেই চলে, নরম সুগন্ধি চুল ও মখমলের মত শাড়ী বিছিয়ে শেলাইয়ের কল বা যে কোন একটা নীরব জিনিস নিয়ে থাকলেই হ'ল—

(শচী হয়তো একেবারেই সোমেনের লক্ষ্য নয়)।

আর্টিস্টদের এমনতর নানা রকম খামখেয়াল আছে। কে জানে সোমেন আর্টিস্ট কিনা? তেমন ধাত্ ছিল বটে এক সময় এ লোকটির।

এই বার তার জন্য একটু কৌতূহল বোধ করল শচী।

কিন্তু শেলাইয়ের কল থামাল না; ঘুরুতে ঘুরুতে ভাবছিল; শেলাইযের যা তা ভুল হয়ে যাচ্ছে; আঙুল যাচ্ছে ফুঁড়ে।

তারপর হৃদয়ে যখন আকাঙ্খা এল—অন্ততঃ থামতে— সোমেনেব মত চুপ করে একটু বসে থাকতে সেলাইযের কলটাকে তখন থামাতে চেষ্টা ক'বেও তবু থামানো যায না— কল যেন নিজের বেগেই ঘুরে চলেছে; একটা হাতলের আবেগ নিয়ে শচীকে চাকার মত ঘোরাচ্ছে।

শচী একটু থামবে না কি?

একটু চুপ করে বসবে না কি?

সোমেন চলে যাচ্ছে বুঝে একটু ফিরে তাকাবাবও স্বাধীনতা শচীকে কেউ দেবে না?

সোমেন যখন দরজা পেরিয়ে গেছে— হযতো রাস্তায় নেমেছে—শচীর কলের চাকা নিস্তেজ হয়ে এল; ঘুরতে ঘুবতে নিজের থেকেই থেমে গেল তা।

শচী ঘবের দরজাটা বন্ধ কবে দিযে এইবাব খুব একটা স্বস্তি বোধ করছে; এখন সে কাজ করবে—কিম্বা ঘুমোবে—কিম্বা চিঠি লিখবে—হযতো সোফার গা ঘেঁষে পড়ে থাকবে।

এক দিন অরুণ বিজয ও শঙ্কর অনেকেই এসেছে... কিন্তু সোমেন আসেনি।।

সোমেনেব জন্য শচী প্রতীক্ষাও করে নি— সে এলেও বিবক্ত হত না।

নির্ম্মলাকে চিঠি লিখছিল শচী... এব আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম যে আমার ভিতব বিশেষ কোন নীতিপ্রখবতা নেই— বরং অনেকে ভাববে যে এ জিনিসটা আমার খুব ঢিলে— একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি

এমন সময সোমেন ঢুকল।

বললে— ওঃ লিখছিলে; একটা না একটা নিযে আছই

শচী প্যাড বন্ধ কবে দিযেছিল।

সোমেন একটা কুশনের ওপর বসল।

বললে— আজ তবু শেলাইযের কলেব বুজরুকি নেই; বুঝি না যাদেব ছেলেপুলে নেই এবং বারো শো চোদ্দো শো করে মাসে আসছে এসব ন্যাকড়াপনা তাদের কত দূর সাজে!

একটু থেমে বললে— দর্জ্জি তো তোমাদের জন্যই; তোমরা যদি না তাঁদের কত দূর সাজে!

একটু থেমে বললে- দর্জ্জি তো তোমাদের জন্যই; তোমবা যদি না খাওযাও তা'হলে তারা খাবে কি?

শচী তাব সোফায় বসে শুনছিল।

বাদপ্রতিবাদ এখন সে আরম্ভ করেনি।

সোমেন বললে— গ্রামোফোনের বেকর্ডগুলো কোথায?

—আছে

—নতুন পছন্দের পোনেরখানা?

শচী মাথা নাড়ল।

সোমেন বললে— একদিনে তাদের ভেতব নূতনত্ব আর কিছু আছে কি?

শচী বললে— না, সেগুলো পুরোনো হযে গেছে

সোমেন বললে— জীবনে নতুন আর কিছু নেই তাহ'লে এখন?

শচী প্রশ্নকৌতূকাবিষ্ট চোখে সোমেনের দিকে তাকাল।

সোমেন পকেট থেকে চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে— অথচ জীবনে কোন বিরক্তির সৃষ্টি হয় নি?

—না

—আমি এসে যেটুকু বিরক্ত করি তা ছাড়া?

শচী চোখ নামাল—

চোখ তুলে সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললে— আমার বড্ড তামাসা বোধ হয়— তুমি আজো বেঁচে আছ

সোমেন বললে—

শচী বললে— আট দশ বছর আগে যাদের প্রায়ই দেখেছি দশ বছর পরে তাদের সাথে যদি প্রায়ই আবার দেখা হয় সে কি Grotesque বল তো?

সোমেন দেখছিল চুরুটটা ধোঁয়া ছাড়ছে না।

নিভে গেছে নাকি?

আচ্ছা জ্বালানো যাক্।

শচী বললে— Grotesque : সেই সবের থেকে দশ বছর পর আমারও প্রকাশবাবুর জীবনের আধাআধি স্ফূর্তি যখন শেষ হয়ে গেল, যখন আমরা মরলেও পারি, তাতে বিশেষ কোন খেদ নেই আর...

তখন তুমি ষাট টাকায় জীবনটাকে পোষ মানাবার মত একটা সবলতা আয়ত্ত করতে চাচ্ছ—

সোমেন চুরুটটা জ্বালাচ্ছে।

শচী বললে— এই বযসে— এত জিনিসেব পর— জীবনে অবসাদ কত যে কম হ'লে মানুষ এ পারে!

সোমেন বললে— ষাট টাকার কাজটা পেলে আমি বালিগঞ্জের দিকেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করতাম।

—ফ্ল্যাট?

সোমেন চুরুটে এক টান দিযে বললে— তোমাদের চেয়ে ঢেব ভাল থাকতে পারতাম, প্রকাশটাব জীবন কি? অফিসে একটা গাধার মত খাটছে— যা টাকা পাচ্ছে ইনসিওরেন্সে আর ব্যাঙ্কে চলে যাচ্ছে— গঙ্গায়ও ছুঁড়ে ফেলতে পারত। অফিসের বাইরে তোমার সঙ্গে বনিবনাও ক'রে চলেই ওর সুখ— জীবনে আর কোন প্রয়োজনই ওর নেই প্রযোজনবোধই নেই। সন্ধ্যার সময অফিস থেকে এসে তাই ও ঝিমোয়— না হয় রাত না হতেই চৌকোশে ঘুমিযে পড়ে।

একটু থেমে বললে— তোমার ভিতর নিশ্চয যে কৌতূহল আমি জাগিয়েছি কোন একটি মেয়ে— অন্ততঃ কোন একটি পুরুষের ভেতরও প্রকাশ যদি তা জাগাতে পারত।

শচী বললে— শুধু কৌতূহল জাগিযে কি হয? সে মানুষকে আমবা হাস্যাস্পদ মনে করি, তার সম্বন্ধেও তো আমরা উৎসুক হয়ে পড়ি। কিন্তু কথা হচ্ছে তোমার বন্ধুকে তুমি যা bore ভাবছ তিনি তা মোটেই নন্। ধরো না—আমার কাছে তিনি সব চেয়ে popular একজন স্বামীর সম্বন্ধেও তাব স্ত্রীব মুখ দিয়ে এ কথা প্রায়ই বেরোয় না, সোমেন,— মানুষের জীবন এত wretched

সোমেন বললে— তোমার জীবন wretched—তোমাব স্বামীর জীবন wretched

শচী বললে— আমরাই বরং একটু সোয়াস্তিতে আছি; তোমাদের বিপন্ন নিরর্থক জীবনের কথা ভাবছিলাম আমি—

সোমেন বললে— জীবন যদি একটুও নিরর্থক হত তাহলে ষাট টাকাব কাজেব জন্য আর্জি করবাব মত হৃদয কাব বুকের ভেতর থাকত? Suicide list এ দশ বছব আগেই খতম হযে যেতাম।

চুরুটটা ঝেড়ে নিয়ে বললে— তোমাব স্বামীর চাকরি যদি আজ যায় তা'লে ব্যাঙ্কের হাজার হাজার টাকা সত্ত্বেও তাকে কোন রসাতল থেকে তলিযে বের করতে পারা যাবে না। কিন্তু আমার চাকরি দশ বছর ধরে প্রতি মুহূর্তেই খসে যাচ্ছে— আমার কোন স্ত্রী নেই— কোন ঘব নেই— কিন্তু তবুও এ সবের অতিরিক্ত কিছু আছে বলেই জোর পাচ্ছি।

শচী জিজ্ঞেস করতে গেল না— অতিরিক্ত কি আছে সোমেনের। সোমেনেব কথাগুলো শুধু কথামাত্র কিনা তাও সে ভেবে দেখছিল না; —হয়তো তা নয। কিম্বা হযতো তাই— আর্টিস্ট শুধু একটা আর্ট—সিচ্যুএশন তৈরি করে নিজেকে খুশিমত জাহির করে নিল,— পরমুহূর্তেই চায়ের দোকানে গিয়ে হযতো জীবনের নিস্ফলতায চৌচির হযে যাবে।

সোমেন— সোমেনও হয়তো এই রকম একটা কিছু ভাবছিল।

ভাবছিল হয়তো—গলাবাজি কত দিন চলবে— তা যতই artistic হোক না কেন? বাস্তবিক প্রকাশ কত সুখী— তার অফিসারের চাল কত নিছক চাল— কত অপরাজেয় পৌরুষসম্পন্ন— তার ব্যাঙ্কের হিসাব কি চমৎকার, মাইনের ব্যবস্থা কি আশাপ্রদ—ঘরদোর কি নিটোল— স্ত্রীটি কি বৈদগ্ধ্যে ভরা— অথচ স্নিগ্ধ— তার শরীর প্রকাশের জন্য না জানি কত কি রোমাঞ্চে উর্ব্বর!

এমন জীবনকে অপদস্থ করে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে ছন্দপতনের ভেতর কোন্ ছন্দ দেখাতে গেল সে— সে কি রকম আর্ট হল তার?

শচী বলেছে, Grotesque—

Grotesque

Grotesque-এর চূড়ান্ত : সমস্ত শার্ট চুরুটের ছাইয়ে ভরে উঠেছে, দাড়ি ছ দিন কামানো হয়নি, মাথায় তেল পড়েনি, চোখ দুটো — মেহেদি বগড়ানো রঙ ধরল হয়তো।

শচী বললে— কী তোমার অস্বস্তি।

—না কিছু না

—মনে হচ্ছে

সোমেন নড়েচড়ে একটু টেনে নিজেকে ঠিক করে নিয়ে বললে— একটা চুরুটের দরকার; টাকা ফ্ল্যাট মেয়েমানুষ সব কিছুর থেকে এই জিনিষের অভাব মাঝে মাঝে কাবু করে দেয়।

শচী পাশের ঘবের দেরাজের থেকে হ্যাভেনার একটা বা' এনে সোমেনেব সুমুখে একটা তেপয়ের ওপর রাখল।

সোমেন একটা চুরুট বেব কবে নিযে বললে— হ্যাভেনা অনেক দিন খাই নি—

শচী যথাস্থানে গিযে বসেছিল।

সোমেন চুরুট জ্বালাচ্ছে—

মুহূর্তের জন্য নিজেকে বাববিলাসিনীর মত মনে হচ্ছিল শচীর; —অবিশ্যি আপ্যায়নকুশলা বারবিলাসিনি— এই শুধু;— এব চেয়ে বেশি কিছু নয়।

সোমেনেবও মনে হচ্ছিল শচীকে যেন খানিকটা meretricious বোধ হচ্ছে; — নিতান্ত দুর্ম্মূল্য—harlot-এব মত এক মুহূর্তের জন্য সোমেনেব হৃদযের ভেতব দিযে চমকে যাচ্ছে যেন শচী;—দুর্ম্মূল্য—অথচ যে নিজেকে প্রিয় নিকটতম করে তুলতে চাচ্ছে— অবিশ্যি এক নিমিষের জন্য।

শচীর মনে হচ্ছিল আপ্যাযনে কিছু তো ভুল করে নি সে?

শাড়ীটা—নোংরা নয— কিন্তু তবুও ঠিক হযেছে কি?

খোঁপাবাঁধা চুল— ছেড়ে দিলে ঠিক হত কি— না বিউনি বাঁধলে?

পাযে বিজাপুবী চটি জুতো না চড়িযে আলতায শুধু পায থাকলে কেমন হত?

কাজল পরলে? কাঁচপোকাব টিপ দিলে?

এই সব প্রসাধন জীবনে এক দিন ছিল;— সোমেন তা দেখেছে; আজও আর এক বার তাকে তা দেখবার জন্য একটা ব্যাকুলতাকে কিছুতেই যেন উৎরে উঠতে পাবছিল না শচী।

সোমেন বললে— মনে পড়ে এক দিন বকমোহানাব নদীব পাড়ে ভাঁট শ্যাওড়া জিউলি মযনাকাটা আলোকলতার জঙ্গলে তোমাকে ছেড়ে দিযেছিলাম; বাড়ি তোমাদের আধ ক্রোশ দূরে সেখান থেকে; তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে 'খুব পাবব চিনে যেতে— কত বার গিযেছি!' —কিন্তু একবারও যাওনি, আম কাঁঠাল বাঁশের জঙ্গলে হাবিযে গেলে। তাবপব তোমাকে একটা পাৎলা সরপুঁটির মত কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইর মত নদী ভেসে এলাম আমি। সেই নদী— জলের গন্ধ— রাত—অন্ধকার—নক্ষত্র—ভিজে বালির চব —তোমার ঠাণ্ডা শরীর কত দিন আমার হৃদয়ে শাসন করেছে—

একটু হেসে বলছিল— কিন্তু আজ সে সব ঘটনা ব্যাপারের পুনরভিনয় তো দূরের কথা— পুনরুক্তি ও অত্যন্ত অন্যায্য

—কেন?

—সে পাড়াগাঁর জীবন তুমি কোন দিন ফিরে পাবে না— অন্ততঃ তেমন করে কিছুতেই না; না শচী কিছুতেই না। আমিও তাই গাঁয়ের পথে আর ফিরে যাই না, ভাবতেও চাই না পাড়াগাঁ কেমন— সেই

তেলাকুচো ফণীমনসা বনধুঁধুল কোন অন্ধকারে কোন জ্যোৎস্নায় কত দূরে চলে গিয়েছে। ... আমরা আর সেখানে নেই... কি হবে সে সব দিয়ে? কলকাতার মেসের জানালার ভিতর থেকে তাকিয়ে যখন দেখি একটা পাতাশূন্য শিমুলগাছের লাল ফুলগুলো সবে ফুটল তখন যে আক্ষেপ যে গ্রামলোলুপতা আমাকে পেয়ে বসতে পারত নতুন জীবনের প্রয়োজনের কাছে সে সবকে উপহাসাস্পদ ক'রে তোলাই ঠিক মনে করি— অনেক দিন থেকেই মনে করে আসছি; নতুন জীবন— নতুন প্রয়োজন চাই নি আমি যদিও, —কিন্তু সেগুলো যখন ঘাড়ে চেপে বসেছে তখন আমাকে হড়কাতে দেখবে না নিশ্চয়—

চুরুটের নিরবছিন্ন ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললে— যে মধু হারিয়ে গেছে তা গেছে — তা যাদের জন্য তাদের জন্য শুধু, কিন্তু কলকাতার হৃৎপিণ্ডের থেকেও কলতানি বের করব না শুধু, যে কিছু রস সম্ভব— প্রয়োজনীয় গ্রহণ করা।

শচী অনেক ক্ষণ পরে বললে— চল না পাড়াগাঁয়ে যাই

—কোন্ পাড়াগাঁয়?

—যেখানে ছিলাম আমরা—

—আর সেই বকমোহানার নদীর ধারে? ভাঁট শ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে?

শচী মাথা নেড়ে বললে— হ্যাঁ— সেখানেও—

সোমেন বললে— অসম্ভব

—অনেক দিন আমি ভেবেছি যাব

সোমেন মাথা নেড়ে বললে— কি ক'রে যাবে?

শচী আনত মাথায় ভাবছিল।

একটু পরে মুখ তুলে বললে— কেন?

সোমেন বললে— তুমি আবার ফিরে আসতে চাইবে যে?

—ফিরে আসব না কেন?

চুরুটটা সোমেনের শ্লথ আঙুলের ভিতর ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল; সেটাকে শক্ত ক'রে চেপে ধরে বললে— কেন ফিরে আসবে?

—কেন আসব না?

—সোমেন বললে— তোমাকে নিয়ে সেই বকফুলা বনধুঁধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভিতর গেলে আমি তো আর ফিরে আসতে পারব না। কিন্তু কথা হচ্ছে— যা ছিলাম আমরা তা নেই আমরা—। তোমার যখন একটু বেড়িয়ে আসবার সাধ— মানুষ যে লোভে তাজমহল দেখতে যায়— ঠিক তেমনি একটা ফরমাজ মত ট্রিপে খানিকটা সময়োপযোগী ভাবপ্রবণ হয়ে; হয়তো চোখের জল ফেলবে আমাকে জড়িয়ে ধরবে, চুমো দিতে দেবে— কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবেও হয়তো— হয়তো আর ফিরেও যেতে চাবে না— হয়তে ব্যবহার করতে দেবে তোমাকে— কিন্তু সে সব একটা দুপুরের জন্য শচী, পাড়াগাঁর মাঠ জঙ্গলের আচ্ছন্ন দুপুর বড় মারাত্মক— কিম্বা একটা সন্ধ্যা— একটা রাতের জন্য। পরদিন ভোরেই তুমি এক সাঁতারে বারো চৌদ্দ বছরের ওপারে— চলে যাবে; কে তোমাকে ধরতে পারবে? মেয়েরা যখন পরিবর্তিত হয় কেউ তাদের নাগাল পায় না। আমি নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারি— অত্যন্ত স্থায়ী ভাবে; তুমি ট্রিপের ফূর্ত্তির জন্য শুধু।

সোমেন দগ্ধ চুরুটটাকে অন্যমনস্ক ভাবে মেঝের ওপর ছেড়ে দিয়ে বললে— মেয়েদের ও পুরুষদের ভেতর এই তফাৎ।

সোমেন উঠে দাঁড়াল।

আজকের দুপুরের জন্য অন্ততঃ শচী সেই শচী হয়ে গেছে। আজকে সে শচীকে পুরোপুরি নিজের যে কোন প্রয়োজনে লাগাতে পারে— শচী সে জন্য প্রস্তুত— ব্যাকুল কিন্তু এই সোফার ওপর?—বকমোহনার নদীর ধারে যা এক দিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে?

ভাবতে গেলেও ব্যথা— ভাবতে গেলেও ব্যথা।

এই কামরার ভেতর এক মুহূর্তের জন্যও আর টিকে থাকতে পারছে না। সোমেন একটা হ্যাভেনা নিয়ে এক মুহূর্তের ভিতরেই রাস্তায় উঠল গিয়ে।

কয়েকদিন হইল শুনিয়াছি অনাদির যক্ষ্মা হইয়াছে। যক্ষ্মার প্রথম অবস্থা, কিন্তু অনাদি নাকি খুব অবাক হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মার প্রথম অধ্যায় ভালো করিয়া চিকিৎসা করাইলেও চেঞ্জে গেলে অনেক সময় যে তাহা সারিয়া যায়, যক্ষ্মা হইলেই যে মানুষ মরে না, অনেক কঠিন রোগীও যে সারিয়া ওঠে, সারিয়া উঠিয়াছে অনাদির চিত্ত সেই সমস্ত কথা ভাবিতে চায় না— নিঃসঙ্গ নিরুপায়ের ভিতর নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া সে নাকি আজকাল খুব নিস্তব্ধ হইয়া আছে। কাহারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও বলিতে চায় না।

অনাদির যে যক্ষ্মা হইবে একথা আমি কোনোদিন ধারণা করিতে পারি নাই। বরবারই সে সুস্থ শরীরের মানুষ। জীবনে কোনোরকম অনিয়ম ছিল না তার [..] চিন্তা ও কল্পনার ঘনায়িত বা অভিব্যাপ্ত কৌতূহল অনেক সময় মানুষের সংসারকে যাহারা নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার জীবনকে করিয়া ফেলে বিষাক্ত, অনাদির সেসব কিছুই ছিল না কোনোদিন। চলতি জ্ঞানী ও সাধু মানুষ ছিল সে। তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে শোনার পর তাহার সহিত আমার দেখা হয় নাই আর। কয়েকদিন হইতেই তাহাকে দেখির দেখির ভাবিতেছিলাম। কিন্তু সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। মফস্বলের একটা শহর, অনাদি থাকে শহরের একেবারে আর-এক কিনারে। নিজের কাজকর্ম নিয়া আমাকে বড় ব্যাস্ত থাকিতে হয়।

রবিবার সন্ধ্যার সময় অনাদির ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

একটা গোল টেবিলে ল্যাম্পের আলো জ্বলিতেছিল। পাশে একটা নিস্তব্ধ বিছানায় বালিশে পিঠ ঠেশ দিয়া আধো শোয়া অবস্থায় অনাদি চুপ করিয়াছিল, গায়ে তাহার একটা সাদা খদ্দরের চাদর।

আমাকে দরজার নিকট দেখিয়া অনাদি কেমন যেন চমকাইয়া উঠিয়া ক্রমে ক্রমে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া চোখ বুজিল আবার। আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা—'অনাদি—'

—'তা তুমি এসেছ, তোমাকে কি আমি আসতে বলেছিলাম লোকনাথ?

গোটা দুই [...] চেয়ার বিছানার পাশেই পড়িয়াছিল, একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া—' তোমার এ জায়গাটা তো বড্ড নিরিবিলি।'

—'কেউ এখানে আসে না।'

—'কেন?'

—'সকলকে আমি আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।'

—চুপ করিয়াছিলাম।

—'তুমি কি এখনো জান না সব কথা লোকনাথ?' চোখ মেলিয়া সে আমার দিকে একবার তাকাইল। —'তোমাদের দেখলে আমি খুব খুশি হই, আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু' বলিতে বলিতে চোখ বুজিল আবার।—'কিন্তু আমার মনে হয় , আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দিন শেষ হয়ে গেছে এখন, চলেছে অপেক্ষার সময়।'

—'তোমার স্ত্রী কোথায়?'

—'বাড়ির ভিতরে, কিংবা'—আমার দিকে তাকাইয়া অনাদি—'কেন', কোনো দরকার আছে তোমার?'

—'না আমার জন্য নয়—' কথাটা শেষ করলাম না।

অনাদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সবশেষে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া—'তিনি ভিতরে আছেন, মেয়েমানুষের অনেক দুঃখ।'

—'তোমার মেয়েটিকে তো দেখছি না।'

—'সেও ভিতরেই আছে। কিংবা কোথাও খেলা করতে গেছে হয়তো, আহা বেচারি।'

ইহাদের কথা বলিয়া দেখিতেছি অনাদিকে আঘাত দিতেছি শুধু।

—'মেয়েটাকে আমার ঘরেও আসতে না করে দিয়েছি, বড় কঠিন শাসন। কিন্তু আমাদের দু'জনকেই এটা মেনে নিতে হবে। মৃত্যুর আগে তাকে—'

বাঁধা দিয়া একটু হাসিয়া—'দেখি তো তোমার হাত।'

একটু চুপ থাকিয়া অনাদি—'থাক, কেন দেখবে লোকনাথ? তুমি তো ডাক্তার নও। তাদের সবই দেখতে হয়। এটা তাদের নিয়ম। হয়তো ধর্ম। সংসারের মানুষদের নিয়ম অন্যরকম। তার ব্যতিক্রম তো আমি করতে দিতে পারি না। তাতে আমার পাপ হবে।' একটু হাসিয়া—'পাপ হয়তো হত। কিন্তু তুমিও তো সংসারের অন্য দশজনের মতোই।' অনাদি আমাকে বাঁধা দিয়া—'না, এখন আমি সংসারের মানুষ নই।'

—'তাহলে কী তুমি অনাদি?'

—'আমি সমাপ্তির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা ঢের দূরে। তোমাদের চেয়ে আমি অনেকখানি পৃথক।' বলিয়া সে ধীরে ধীরে চাদরের ভিতর হইতে তাহার হাতখানা বাহির করিয়া আমার হাতের উপর রাখিয়া—'আশ্চর্য তুমি।'

—'কী রকম?'

—'আমার জ্বর কত বলো তো?'

—'জ্বর?'

—'সব সময়ই জ্বর। মাসতিনেক ধরে বড্ড অসুস্থ বোধ করছিলাম। আগে তো বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন ধরা পড়ে গেছে, আমার একটা ভয়ংকর রোগ হয়েছে লোকনাথ। যক্ষ্মা হয়েছে আমার।'

মাথা নাড়িয়া হাসিয়া—'তোমার কিছু হয়নি, মিছে তুমি ভাব শুধু, যক্ষ্মা আমাদেব সকলের ভিতরেই একটু আধটু আছে। আমারও আছে, তোমারও আছে, রাস্তা দিয়ে যে লোকটা যাচ্ছে তার শরীরের ভিতরেও জীবানু যক্ষ্মার জীবাণুও রয়েছে। তুমি যদি অসুস্থ বোধ কর, কিছুদিন চেঞ্জে গিয়ে থাক।'

—'চেঞ্জে? কোথায় মধুপুরে শিমুলতলায় না ভাওয়ালিতে? তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছ—বেশ ভালো কথা—আমাদের ভিতব কোনো উৎকণ্ঠার কথাবার্তা না হওয়াই ভালো। যক্ষ্মার কথা আর আমি বলব না।'

আমার দিকে তাকাইয়া অনাদি—'লোকনাথ।'

—'কী?'

—'হাতের কাজ হয়েছে তোমার?'

—'ঠাণ্ডা লাগছে তোমার?'

—হ্যাঁ। এইবাব একটু চাদরের ভিতর হাতটা ঢুকিযে রাখতে চাই।'

—'আচ্ছা।' অনাদিব হাত ছাড়িয়া দিলাম আমি।—'আমি একটু কথা থাকতে চাই।'

—'আচ্ছা।' উঠি।'

—যদি ভালো লাগে, আর-একদিন এসো লোকনাথ।' বলিযা সে চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল।

দিন পাঁচেক পরে একটা ছুটি ছিল, অনাদির কাছে আবাব গেলাম আমি। দুপুরবেলা, অনাদির বিছানার পাশে গোল টেবিলের উপর একটা খবরের কাগজ, আর কোনো জিনিসই নাই, ওষুধপত্র ফল কিছুই সেখানে নাই। অনাদির স্ত্রী মা মেয়েটিকেও ঘবের ভিতর দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। সে নিজেও চোখ বুজিযা ছিল, কিন্তু বুঝিতে পারা গেল জাগিয়া আছে।

ঘরের ভিতর আমার ঢুকার শব্দ হইতেই সে চোখ মেলিল।—'কেমন একটা স্বপ্ন দেখছিলাম যেন।'

পাঁচদিন তার শরীরটা আরো খানিকটা কাহিল হইয়া গিযাছে বলিযা মনে হইল। একটা চেযার লইযা ঘুবাইযা তাহার বিছানার কাছেই বসিলাম।

—'লোকনাথ। আমি তো জানি, তুমি বিযে কবনি।'

—'না।'

—'করবে?'

—'না। কিন্তু কখন কি হয় কেউ বলতে পারবে না অনাদি।'

—'তোমার বযস কত?'

—'আটতিরিশ।'

—'একটি সাধারণ গরিব ঘরে মেয়েকে বিয়ে কোরো, যাকে তুমি সুখী করতে পারবে। পৃথিবীর অনেক ব্যথিত স্ত্রীলোক আছে, আমাদের উচিত তাদের জন্য একটা সান্ত্বনার নীড় তৈরি করা। আমি নিজে তো পারলাম না।'

—'আহা, কি যে বলো তুমি, দশ বছর হল বিয়ে করেছ, তোমার সংসাবের শান্তি—'

—'উনি ওইরকমই বলেন—'অনাদির স্ত্রী ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল।

—'এই ওর অপরাধ—নিজেকে বড়—' একটু হাসিয়া অনাদির স্ত্রীর দিকে তাকাইলাম।

—'আজ তোমার জ্বর কত?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করিল সে।

—'জ্বর আছে।'

—'আছে তো, সকলেই জানে আছে। কিন্তু কত উঠেছিল?'

—'আমার মনে হয় জ্বরটা বাড়ছে।'

—'তোমার তো অনেক কথাই মনে হয়, থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছিলে?'

—'না, সকালবেলা তুমি দেখে গেলে—তারপর—'

—'তারপর আর দেখনি?'

—'না। খুকি কোথায়? আমার কপালে একটু হাত দিয়ে দেখো তো।'

—'কপাল হাত দিয়ে দেখা যায় না, চোখ দিয়েই দেখতে হয়। নিজের কপালের দিকেই তাকিয়ে আছি আমি। আমি একটু গোছাচ্ছি—বুঝলে?'

—'তা তো শুনেছি—' অনাদি আরো বলিল।

—'আমার আর এখানে ভালো লাগে না। আমি একটু বাপের বাড়ি যাব।' অনাদির স্ত্রী আমার দিকে তাকাইয়া বলিল।

—'চুপ করিয়েছিলাম।'

—'কবে যাবে? আজ নয় তো?'

—'না আজ নয়, কালও না, পরশু রমেশ কলকাতায় যাচ্ছে, তার সঙ্গেই যাব।'

—'রমেশের সঙ্গে যাবে?' অনাদি কেমন একটু পীড়িতভাবে স্ত্রীর দিকে তাকাইল। বলিল—'আমার মনে হয়—'চুপ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া—' লোকনাথ, তুমি আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে। ওকে তুমি একটু বসিরহাট পৌছে দিতে পার।'

—'রমেশকে আমি কথা দিয়েছি। সে তো হয় না। সে কিছুতেই হয় না, তিনি কি মনে করবেন?' স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল।

অনাদি ব্যথা হজম করিয়া লইয়া—'আচ্ছা।'

—'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। পরশু রমেশের সঙ্গেই আমার যাওয়া ঠিক।' অনাদির বউ আমার দিকে একটু মুখ ফিরাইয়া বলিল।

—'খুকিও কি যাবে?'

—'যাবে বইকী, তার জন্যই তো আমি চলে যাচ্ছি। এ বড়িতে থাকা তার পক্ষে কিরকম অন্যায়—একটা বিড়াল পর্যন্ত থাকতে ভয় পায়।'

—'আচ্ছা থাক।' বলিয়া অনাদি চোখ বুজিল। কিন্তু পরক্ষণেই চোখ মেলিয়া—'খুকি কবে ফিরে আসবে?'

অনাদির স্ত্রী কোনো উত্তর দিতে গেল না।

—'মাসখানেকের মধ্যে?'

বধূ মাথা নাড়িয়া—'না।'

—'তার মামার সঙ্গে তাকে একবার পাঠিয়ে দিও—দিন পঁচিশেক পরে।'

—'মিছেমিছি তোমাকে মিথ্যে আশা দিয়ে লাভ? মামার সঙ্গে তার এখানে আসা হবে না।'

—'খুকি তার মামার সঙ্গে—'

—'না,তা হবে না।'

—'আচ্ছা থাক।' আমার দিকে তাকাইয়া অনাদি—'আমার স্ত্রী, আমার সন্তান যদি শান্তিতে থাকে তাহলে আমার অসুখও সেরে যাবে লোকনাথ।'

অনাদির স্ত্রী চলিয়া গেল।

—'কোথায় গেল জান?'

—'কে?'

—'আমার স্ত্রী?'

—'কোথায়?'

—'নন্দ দিদি নামে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে এ-পাড়ায়। বাপের বাড়ি যাবে কিনা, তার কাছ থেকে শাঁখা আর আলতা নিয়ে আসতে গেল—খুব ভালো শাঁখা থাকে নন্দদিদির কাছে, আর বেশ

—'কোন বাড়িটায়?'

—'ওই যে হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটায—হলুদ হয়তো ঠিক রং হল না—কিন্তু কোন রং তা আমি ঠিক বলতে পারব না। বাড়িটা দেখছ তো?'

জানলার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে—'ওখানে কে থাকে জানি না তো?'

—'ভাবী একজন কবি মানুষ থাকে ওখানে নিশ্চয। আমি উঠে দেখতে পারি না। কিন্তু টের পাই। সকাল চারটের সময সে ঘুমের থেকে ওঠে—'

—'তাই নাকি?'

—'তারপর গুন গুন করে কত যে গান গাইত থাকে—এমন কণ্ঠ আমি কোনোদিন শুনিনি। আমি সব ভুলে যাই। মনে হয় যেন কোন দূর অন্ধকার জলে কোনো রাজহংসী যেন এর জন্য অপেক্ষা করছে।—কোনো দূর অন্ধকার নদীতে—'অনাদি বললে।'হয়তো মৃত্যুরই নদী লোকনাথ—কিন্তু প্রেমের নদী হতে পারে। হয়তো মৃত্যুই প্রেম।'আমার দিকে তাকিয়ে আনাদি -জিজ্ঞেস করলে—'তোমার কী মনে হয়?'

—'আমি তো তার গান শুনিনি কোনোদিন।'

—'কিন্তু মৃত্যু কি প্রেম নয়?'

মাথা নেড়ে—'আমার মনে হয় মৃত্যু শান্তি।'

—'শান্তি তো বটেই—কিন্তু'—

—'আর কিন্তু নয়, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না'—

—'কিছু থাকে না?'

—'যে মৃত তার জন্য কী আর থাকতে পারে?'

—'মৃত্যু একটা ছন্দ নয়? যেন একটা গানের শব্দ চলেছে কোনো এক অন্ধকার মায়াসিঁড়ি নদীর দিকে—গন্ধরাজ ফুলের মত হংসীর সাদা পালক, নিঃসঙ্গ মহুয়া ফুলের মতো অন্ধকার জল আসন্নপ্রসবা এক নির্জন রাত্রি—পৃথিবীতে কোনোদিনও যাদের মুখ দেখা যাবে না, সবই অপেক্ষা করছে তোমার জন্য৭ ররং সমস্ত ছন্দ স্তব্ধ হয়ে যায়।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অনাদি—'আচ্ছা আমরা তর্ক দিয়ে যা ঠিক করি তাই-ই ঠিক, না হৃদয় দিয়ে যা ঠিক করি?'

—'আমি কিছুই বলতে পারি না অনাদি।'

—'তাহলে কী করে বললে মৃত্যুর পর সব স্তব্ধ হয়ে যায়?

—'আমার তাই মনে হয়। আমি তর্ক করেই এ সিদ্ধান্ত পৌছেছি।

—'তোমার হৃদয় কী বলে?'

—'আমি হৃদযহীন মানুষ।'

অনাদি একটু হেসে—'আর তোমার সংস্কার?

—'আমার কোনো সংস্কার নেই।'

—'পাশের বাড়িটা অনেকদিন খালি পড়েছিল, এখন নতুন ভাড়াটেরা এসেছে তাহলে। রোজ ভোর চারটের সময বিছানায শুয়ে গান শুনি। কেমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয। তার ভিতর ভেসে আছি যেন যে কোনো মুহূর্ত মরে যেতে পারি। এক সময মনে হয মরে ভেসে চলেছি যেন। কোনো দূর অন্ধকার নদীতে, নিঃসঙ্গ মহুয়া ফুলের ভিড়ের মতো মানুষের দল, অনেক অন্ধকার জল যেখানে, আর সেই গন্ধরাজ ফুলের মত হংসীর সাদা পালক—'

—'খবরের কাগজ পড়টড় আজকাল অনাদি?'

—'না। কোনো নতুন খবর আছে? অনাদি জিজ্ঞেস করল।

—'[..] যুদ্ধ চলেছে—'

—'তা তো শুনেছি। কে জিতবে বল তো?'

—'[..] রাজার ছবি দেখেছি আমি, অনেক জাযগায, অনেক বার—' মানুষটির মুখের ভিতর কেমন একটা নিঃসহায বিষণ্ণতা,— আচ্ছা তোমরা যাও—আমি চেষ্টা করে দেখলাম ঢের, কিন্তু নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ তো পারে না।' এই রকম একটা আন্তরিক নিঃসহায বিষণ্ণতা মানুষটির মুখের ভিতর—'কি বল তোমার তা মনে হয না লোকনাথ?'

—'কি জানি, অত তো ভেবে দেখিনি—তবে লোকটিকে যদি মানুষ বলে মনে হয—'

—'এবং বিমর্ষ?'
—'হ্যাঁ'
—'[....] বাজাব কথা বলছি না আমি, এমনিই বলছি লোকনাথ আজকেব পৃথিবীতে শুধু পুরুষদেব বিমর্ষ হওয়া ছাড়া আব উপায নেই।' অনাদি আমাব দিকে তাকিযে— 'কি সাংঘাতিক পৃথিবী দেখো, হাজাব হাজাব লোক মাবা যাচ্ছে, আবো হাজাব হাজাব মববে, কেউ কিছু কবতে পাবছে না, কেউ কিছু কববে না—এবপব আমাদেব ব্যক্তিক নিষ্ফলতা মাছিব মতোই তুচ্ছ বলে মনে হয।' অনাদি চোখ বুজতে বুজতে—'আচ্ছা, তোমবা নাও, আমবা চেষ্টা কবে দেখলাম ঢেব—কিন্তু নক্ষত্রেব বিরুদ্ধে মানুষ তো পাবে না। মানুষেব জীবনে জাতিব জীবনে এখনো এই নিঃসহচব আর্তকথা একটু ধ্যান কবতে বসলেই হৃদযকে এসে আহত কবে। কিন্তু একটা সৌভাগ্য লোকনাথ।'
তাকিযে বললাম—'কি?'
—'মৃত্যু এসে শান্তি দেয, সকলকেই শান্তি দেয।'
নীববে মাথা নেড়ে সায দিলাম।
—'ওই পাশেব বাড়িব ভাড়াটেদেব আব একজন বোজ সকালবেলা সাতটাব সময ভজনগান শুরু কবে। তখন আবাব মৃত্যুব আব-এক রূপ দেখি আমি। সেটা আমাব ভালো লাগে না।'
—'ভজন তোমাব ভালো লাগে না অনাদি?'
—'তুমি তো খুব ঈশ্ববভক্ত ছিলে।'
—'আজও আছি। কিন্তু ঈশ্বেবে ওবকম পূজো আজ আব আমাব ভালো লাগে না। আমাকে তোমায কিছু ফুল এনে দিতে হবে।'
—'কী ফুল?'
—'বেশ সাদা পাপড়ি, অন্ধকাবেব ভিতব যাদেব গন্ধ ঠিক এ পৃথিবীব জিনিস বলে মনে হয না।"
—'বজনীগন্ধ্যা?'
—'বেশ সুন্দব ফুল লোকনাথ, কিন্তু মনে হয যেন পৃথিবীব কোনো নাবীব মতো, তাবই কামনাব সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমি ঠিক ওবকম ফল চাইনি।'
—'বাজহংসীব সাদা পালকেব মতো ফুল অনাদি? পদ্ম এনে দেবে?'
অনাদিব চোখেব ভিতব আলো উশকে উঠলে—'পদ্মফুল পাবে তুমি? আমাকে তাই দিও।' ভুরু কুঁচকে অনাদি—'বোদে বাতাসে ঢেব ব্যবহাব হযে গেছে যাব সে বকম পদ্ম—ববং কুঁড়িব মতো, পাপড়ি খানিকটা মেলেছে, এবকম পদ্ম এনে দেবে তুমি?'
—'আমি দেখব খুব চেষ্টা কবে অনাদি।'
—'অন্ধকাবেব ভেতব তাবই একটা ফুল আমাব বালিশেব পাশে বেখে দিতে হবে।'
অনেকক্ষণ চুপ থেকে নীবব হযে বইল।—'লোকনাথ, এখন কাজেব কথা বলা যাক।' বলে অনাদি বিছানায উঠে বসতে চেষ্টা কবল।
—'থাক, উঠতে হবে না তোমাকে অনাদি, তুমি শুযে বলো, আমি আছি।'
—'আমাব একটা কুকুব ছিল, আমি অনেকদিন ধবে বিছানায পড়ে আছি, সেটা যে কোথায গেল টেব পাই না। মানুষ নয তো কুকুবগুলো ওবকম চলেই যায।'
—'সেই কুকুবটাকে খুঁজে আনতে হবে?'
—'ববং মানুষই চলে যায লোকনাথ, যে কুকুব হযেও যে কেন গেল, হযতো তাকে কেউ মেবেই ফেলেছে। না। তোমাব কাছে তাব কথা বলে বাখলাম। গোরুকে দিযে কিছু হবে না। তোমাব চোখে যদি সেই কুকুবটা পড়ে কোনোদিন, বুঝলে লোকনাথ, তাহলে—'
অনাদি একটু চুপ থেকে—'আমাব মতন যেন তাব মৃত্যু হয না।'
চুপ কবেছিলাম।
—'আমাব কতকগুলো খাতা আছে।'
—'কীসেব খাতা?'
অনাদি একটু হেসে—'হিসেবেব খাতা নয, আমি মাঝে মাঝে একটু-আধটু লিখতাম টিখতাম—'
—'এ অপবাধ তাহলে—'
—'হ্যাঁ সকলেবই আছে। আমাব মতন লোকেবই দিন। দশ বছব আগেও আমাব ভয হত চোব

যদি কাপড়চোপড় ভেবে বাক্স দু'টি ভবে নিয়ে যায়—এই খাতাব বাক্স ঘব যদি আগুনে পুড়ে যায়—উইয়ে যদি কেটে যায় তাহলে পৃথিবীব অনেক দর্শনবিজ্ঞানেব চেয়েও বড় জিনিস হাবিয়ে যাবে। আমি যে একজন সামান্য অধ্যাপক, ঈশ্ববেব মত স্রষ্টা নই, এই কথাও কেউ বুঝতে পাববে না। এই ছিল আমাব ভয়, ঈশ্ববেব চোখেব নীচে আমিও এক অসামান্য বচযিতা—' অনাদি বললে—এইপাণ্ডুলিপিগুলো নেড়েচেড়ে এইবকম একটা নির্জন আনন্দ অনেকদিন আমি পেয়েছি। আমাব সাংসাবিক জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি কবতে পাবিনি তাই। এ বেশ ভালো হয়েছে।'

—'তোমাব সেই পাণ্ডুলিপিগুলো আছে আজও?'

—'আছে।'

—'কিছু ছাপাওনি?'

—'না। মববাব আগে এখনো এও যেন একটা সান্ত্বনা যে এই লেখাগুলো আমাকে হয়তো বাঁচিয়ে বাখবে। কিন্তু—' অনাদি আমাব দিকে তাকিয়ে—একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'সবই পেন্‌সিলে লেখা লোকনাথ।'

—'কালি দিয়ে [......] কবনি?'

—'না।'

—'ক-খানা খাতা?'

—'তিবিশ-চল্লিশ খানা।'

—'কবিতা?'

—'অনেক জিনিসই আছে। সমস্ত পেনসিল দিয়ে লেখা লোকনাথ, পেন্‌সিলেব দাগও অনেক জাযগায় উঠে যাচ্ছে। লেখাও এমন বিশ্রী যে কেউ বুঝতে পাববে না। আমি এখন কী কবব? কয়েকদিন পবে তো মবে যাব।'

মাথা হেঁট কবে ভাবছিলাম। খাতাগুলোব মূল্য অবশ্য কিছুই নেই, কিন্তু অনাদিকে তো সে কথা বলা যায় না। তাব কুকুবেব চেয়ে বড় জিনিস হয়তো স্ত্রী, স্ত্রীব চেয়ে বড় এই পাণ্ডুলিপি, এবং মবণেব চেয়ে বড় হয় খুকি না ঈশ্বব? না এই পাণ্ডলিপি?

—'অনাদি, তোমাব এই পেনসিলে লেখাগুলো কপি কবে দেব।'

—'দেবে?' কৃতজ্ঞতাব ভেতবেও কেমন একটা সন্দিগ্ধ বিমর্ষতা যেন তাব মুখে, যাদেব বাজ্য নষ্ট হয়ে যায়, সেইসব বাজাদেব চেয়েও কেমন একটা সাধু, নিঃসহায, গম্ভীব বিষণ্ণতা।— কিন্তু লোকনাথ।

—'আমি আমাব অবসব মতো তোমাব সমস্ত লেখাই কপি কবে বাখব।'

—'বেশ ভালো কথা লোকনাথ। কিন্তু ছাপাবে তো?'

—'না ছাপালে লেখা কপি কবাব কী মানে অনাদি?'

—'কিন্তু কাব কাছে ছাপাবে লোকনাথ? ঈশ্ববকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস কবতে পাববে তো? আমবা মানুষ কি না তাই ভয় হয।'

নিস্তব্ধ ছিলাম। অনেকক্ষণ চুপ কবেছিলাম।

অনাদি—'বাক্সটা তোমাকেই দিয়ে যাব; চল্লিশটা খাতা আছে। তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যাব। আমি গবিব মানুষ তোমাকে কোনোই পুবস্কাব দিতে পাবলাম না। কিন্তু আমাব মৃত্যু যেন সামান্য কেবানিব মৃত্যু হয় লোকনাথ। এই খাতাগুলো যেন আমাকে বাঁচিয়ে—বাখে।' বলে গভীব তৃপ্তিব সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস ফেলল অনাদি।—'আমাব সব শেষ কথা, সবচেয়ে প্রথম কথা এখন তোমাকে বলব।'

—'কাব কথা?'

—'না। তুমি যেন কি বকম চোখে চেয়ে আছ লোকনাথ, কিন্তু কোনো নাবী কি আমাকে কোনোদিন ভালোবেসেছে বলে মনে হয় না—।'

—'হয়তো বেসে গেছে—আমবা সব সময বুঝে উঠতে পাবি না।'

—'তা হবে।'

—'কিন্তু নাবীব কোনো ভালোবাসাব জন্য নয, পাণ্ডুলিপিব কোনো [........] নযও নয,

—'অনাদি অন্য এক নিস্তব্ধতায চোখ বুজিল।

চোখ বুজিযা বুজিযা সে বলিতে বাগিল—'আমাব মনে হয আমাব শিকড়ে টান পড়েছে এতদিন পবে, চড় চড় কবে ছিঁড়ে যাচ্ছে। যখই মেয়েটাব কথা মনে হয, আহা, কি গভীবভাবেই না পৃথিবীতে

শিকড় ঢুকিয়েছিল আমার জীবন। লোকনাথ—'

অনাদি চোখ মেলিয়া আমার দিকে তাকাইল।—'আমি চেঞ্জে যাব?'

—'থাক, গিয়ে দরকার নেই আর।'

—'কিন্তু আমার মন হয় চেঞ্জে গেলে আমি বাঁচব। কিন্তু এই রোগে সেবা চাই, কি বল লোকনাথ?'

—'তা চাই বইকী।'

—'চেঞ্জে কে আমার সঙ্গে যাবে?'

—'সুরেশ যেতে পারে না?'

—'সুরেশ? একজন যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে? আমি কি তাব বাবা?' কেমন একটা ব্যাথার হোঁচট খেয়ে পাঁজারে হাত দিয়ে হাসতে লাগল।

—'সুরেশ? ছেলেটি তো খুব ভালো?'

—'হ্যাঁ, সকলকেই সে সেবা করে। সে সাধু, কিন্তু আমি তার কাছে একজন রুগি মাত্র। আমি তো তার বাপ নই।' অনাদি পাঁজরে হাত বুলাইতে বুলাইতে—'আমাকে সে যেই মুখে সেবা করেছে, আমি সেবে উঠলেও সেই মুখেই সে চলে যাবে। আমাকে সৎকার করবেও সে একই মুখে। সাধু মানুষ, বড় সাধু সুরেশ। কিন্তু তবুও সে তো আমার বাবা নয়। আমি সেবা চাই, কিন্তু রক্তের টানে কাছে বসে না থাকলে সমস্ত সেবা ছাই আর ধূলো লোকনাথ। মধুপুবে আমি আমার খুকিকে চাই।'

—' তোমাব খুকিকে?'

—'তুমি এক মাসের ছুটি নাও লোকনাথ, আমাব খুকিকে বসিবহাটেব থেকে নিয়ে আমাদেব সঙ্গে মধুপুরে চলো—সুরেশও যাবে—'

—'তোমার স্ত্রী কি খুকিকে যেতে দেবে আমাদেব সঙ্গে?'

—'মেয়েটা কি আমার স্ত্রীরই লোকনাথ?'

—'সেই বকমই মনে হয়।'

অনাদির সমস্ত অনুভূতি একটি মুমূর্ষ জন্তুব চোখেব মতো আমার দিকে তাকাইযা রহিল। হাত দু'টো তার একটি অর্ধমৃত সবীসৃপেব লেজেব মতো অন্ধকাবেব ভিতব নাড়িতেছিল।

—'তোমার স্ত্রীব চিঠি পেযেছ অনাদি?'

অনাদি মাথা নাড়িল।

—'আমাব স্ত্রীর চিঠি, হযতো লিখবাব অভ্যাস নেই তাব , কিন্তু খুকিকে তো আমি লিখতে শিখিযেছি। যুক্ত অক্ষর অবশ্য লিখতে পাবে না, বৈভব ভৈবব এসব লিখতে শিখেছিল। ভুলে গেল নাকি? আমাকে একটা চিঠি লিখল না যে?'

—'অতটুকু মেয়ে!' একটু হাসিযা বলিলাম—'খেলাধূলায মন ফুরিযে যায তাব। সে আবাব কি লিখবে—'

ভুরু চুলকাইযা অনাদি—'না, তা নয। সে আমাকে কিরকম ভালোবাসে তা তুমি বুঝতে পারবে না। মামাবাড়িতে দিনগুলো তাব একটুও ভালো কাটছে না। রোজ রাত্রে সে আমার জন্য কাঁদে—'

—'তুমি তাকে চিঠি লিখেছ?'

—'না।'

—'কেন?'

—'খুকির নামে অনেকগুলো চিঠি লিখে রেখে দিযেছি। পোস্ট করিনি আর। বেশ বড় বড় চিঠি।'

—'যাবার সময আমি পোস্ট করে দিযে আসতে পারি। তোমার শেষ চিঠিখানা দিও।'

অনাদি মাথা নেড়ে—'না, আমার লেখা বড় জড়ানো। খুকি কিছু বুঝতে পারবে না।'

অনাদির চিঠিগুলো রেখে দিলাম।

—'তারপর?'

—'তারপর আর কিছু না। আমার নিজেরই তৃপ্তি। মাঝে মাঝে দু'তিন খানা অযাচিত চিঠি পেলেও পেতে পারতাম—খুকির। কিন্তু তা হয না।' অনাদি—'রোজ ডাক চলে গেলে কেমন একটা শূন্যতা , অপরিবর্তনীয় শূন্যতা বোধ করি আমি। কিন্তু তবুও সংসারের সহজ নিয়মেই এই মেয়েটার চিঠি পাওযা সবচেয়ে শক্ত জিনিস—সবচেয়ে শক্ত জিনিস লোকনাথ।'

—'তুমি রোজই কি খুকিকে চিঠি লিখে রেখে দাও?'

—'হ্যাঁ। ডাক চলে যাবার পরই লিখতে বসি। আগে বেশ ভালো লাগত। কিন্তু এখন সখ খানিকটা

কমে এসেছে।'

—'অনাদি, একটা চিঠি তুমি পোস্ট করে দেখ।'

—'না। তা হয় না। কোনো উত্তর পাব না। অথচ উত্তরের অপেক্ষায় থাকব। মরবার আগে এ অবস্থাটা বড় খারাপ লোকনাথ।' অনাদি বলিল—'আমার শরীর কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আমাকে কি দেবে?'

—'কিছু খেতে চাও?'

—'এই কম্বলটা একটু ভালো. টেনে দাও তো। শেলফের ওপর বাদামি কাগজের মোড়কে বেদানা আছে একটা—তার ক'টা দানা দাও তো আমাকে লোকনাথ।'

বেদানা খেতে খেতে অনাদি—'কয়েকদিন পরে কলম ধরতে পারব না আর। এখনই বড় হাত কাঁপে। দু-চারদিন পরে কথাও বন্ধ হয়ে যাবে আমার। সবই স্তব্ধ হবে। লোকনাথ—'

বেদানা ছাড়াইতে ছাড়াইতে চোখ তুলিয়া বলিলাম—'আমাকে কিছু বলছ?'

—'খুকিকে তুমি এনে দিতে পারবে?'

—'এ সখও তোমার আস্তে আস্তে চলে যাবে অনাদি।'

অনাদি মাথা নেড়ে—'তা ঠিক। আমি বুঝেছি মৃত্যু প্রেম নয়, অন্ধকার জলও নয়, রাজহংসীও নয়। মৃত্যু নিস্তব্ধতা ও শান্তি।'

অনেকক্ষণ পরে অনাদি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—

—'খুকির খাতাটা আমাকে দাও তো।'

—'কীসের খাতা?'

—'ওর পড়ালেখার খাতাটা। আর বালিশের নীচেই আছে। তুমি আস্তে আস্তে বালিশ তুলে আমাকে দাও।'

খাতা হাতে নিয়া অনাদি চশমা চাহিল, ছোট গুইল টেবিলটা বিছানার কাছে আনিয়া আলো একটু উশকাইয়া দিলাম। খাতায় ভরে কয়েকটি পাতা আছে। উলটাইয়া খাতাটি ধীরে ধীরে বুকের উপর রাখিয়া দিল সে। খানিক্ষণ পরে আমার দিকে তাকাইয়া অনাদি—'এখন রাত ক'টা?'

হাতঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—'প্রায় দু'টো।'

—'দু'টো? তুমি তাহলে শুয়ে পড়।'

—'শোব না। আমি এখন বাসায় চলে যাব।'

—'এটা কি কৃষ্ণপক্ষ চলছে না শুক্লপক্ষ লোকনাথ?'

—'কেন?'

—'আকাশে চাঁদ আছে?'

জানালার ভিতর দিয়া একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম—'না, নেই।'

অনাদি উঠে দাঁড়াইল।

—'এখন যাচ্ছি অনাদি, কাল আবার আসব।'

—'আলোটা নিবিয়ে দাও, তুমি চলে যাবার আগে তোমায় শেষ কথাটা বলি—দাড়িতে আরো হাত বুলাইতে বুলাইতে যতদূর পারা যায় মানুষের জীবনের বেদনা নিঃসঙ্গতা সমস্তই প্রভাই সে গ্রহণ করিয়া লইল। একাই গ্রাস করিতে লাগিল। তারপর জীর্ণ মুখ, নরম দাড়ি অন্ধকারের গায়ে ঘষিয়া ঘষিয়া বলিল—'আমি জানি তোমার কোনো বিশ্বাস নেই লোকনাথ। কিন্তু বিবেক আছে। আমার মেয়েটি যেন তোমার বিবেকের আস্বাদ পায়।'

[..] কাজে শহর থেকে কিছু দিনের জন্য বাইরে চলে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন পরে ফিরে এসে অনাদির বাসায় গিয়ে তার স্ত্রী মেয়ে ও রমেশকে দেখতে পেলাম।

অনাদিকে তার বিছানায় খুঁজে পেলাম না। সে যে মরে গেছে, শ্মশানের ছাইও বৃষ্টিতে ভিজে মাটিতে মিশে গেছে সে কথা আমার মনেও এল না। অনাদির স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কোথায় সে?'

স্ত্রী অবাক হয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল। মেয়েটাই শুধু রাজ্যভ্রষ্ট কোনো নিঃসহচর মহিমার মতো অসীম বিষণ্ণতায় আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন বলিতে লাগিল, মেয়েটি যেন বলিতে লাগিল—'আচ্ছা, তোমারা যাও, আমি চেষ্টা করে দেখলাম ঢের, কিন্তু নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ তো পারে না।' ইহাতে আমার বিবেকের আস্বাদ হয়তো আমি দিতে পারিব।

এপ্রিল, ১৯৩৬

—হ্যাঁ ব্রিজের পার্টি জমে গেছে—দোতলার দক্ষিণদিকের ঘরে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে হয়রান হয়ে যাচ্ছিল সব।'

তাকিয়ে দেখলাম আগুনের মতো রাঙা একখানা মুখের চারদিকে সাদা দাড়ি ও চুল কেমন যেন একটা আভা সৃষ্টি করেছে। বুড়ো চাটুয্যেমশাই মুখের থেকে নল ছেড়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ কৌতুকের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

চাটুয্যেদের প্রাসাদে আমার প্রায় দশ বছর পরে প্রবেশ, এসেছিলাম নির্মলের খোঁজে, বছর দশ বারো আগে এই একতলার বাঁ দিকের ঘরটায় সে থাকত। কিন্তু এখন দেখছি বুড়ো হরিপ্রসাদ চাটুয্যে সেখানে নিজের খাস কামরা বানিয়ে বসে আছেন।

. মেঝের ওপর কার্পেট পাতা, একটা মস্তবড় হরিণের ইজি চেয়ারে বসে রয়েছেন তিনি। দেওয়ালে কোনো ছবি নেই, একটা ওয়াল ক্যালেন্ডার পর্যন্ত না। অথচ নির্মলের আমলে কি সব ছবিই না ছিল। তখন এ ঘর থাকত চুরুটের গন্ধে ভরা। মাঝে মাঝে দরজা এঁটে মদও চলত। চারদিকে নানাবকম বাজনার সরঞ্জাম ছিল। এখন সব ফিট পরিষ্কাব। একপাশে একটা [.....] কয়েকটা বাঁধানো খাতা এবং কতকগুলো বই। কী জাতীয় বই বুঝতে পারা যায় না। বইগুলো সমস্তই চামড়ায বাঁধানো সোনাব জলের লেখা, দূর থেকে পড়তে পারা যায না কিছু। দুপুরবেলাও ঘরের ভিতর ধূপকাঠি জ্বলছিল—চাটুয্যেমশাই অম্বুরি টানছিলেন, তাঁর গাযে কোনো পৈতের বালাই দেখলুম না।

প্রণাম করলুম না, প্রণাম করা অনেক দিন হয ছেড়ে দিযেছি—হাত তুলে নমস্কার জানিযে—'জেঠামশাই, আমাকে চেনেননি হযতো—'

—'তুমি কেই-বা!'

—'অনেকদিন হয, আপনাদের সঙ্গে কোনো দেখাশোনা নেই।'

—'বেশ, বেশ, তারপর?'

—'আমি দিল্লিতে ছিলাম।'

—'দিল্লিতে সে ঢের দূব জাযগা। বেশ—কিন্তু এখন এখানে কী জন্য আসা হযেছে?'

—'আমার নাম নীলকণ্ঠ।'

—'নীলকণ্ঠ?' চাটুয্যেমশাই মুখের থেকে নল খসিযে গলাখাকারি দিযে —'মানুষের নাম আমার মনে থাকে না, মুখ দেখলেও চিনতে পারি না সব সময—টেবিলের থেকে চশমাজোড়া দাও তো।'

দিলুম।

চশমা খাপের ভিতরেই রইল, তামাক টানতে টানতে—'আজকালকার বাজারে নীলকণ্ঠ নাম বাজারে চলে—'

একটু হেসে —'ঠিক আজকালকার মানুষ আমি নই, বযস তো চল্লিশের কাছাকাছি হল।'

—'হ্যাঁ, চোখেও চশমা চড়েছে দেখছি। নিজেকে খুব প্রবীণ মনে কব? আমারই সমবযসী?' বলে গর্জন করে একটু হাসলেন। 'আমাকে প্রণাম করলে না যে?'

—'কাউকেই করি না।'

—'নিজেকে নৃসিংহ অবহার মনে করো?' বলে মাড়ির ফাঁকে একটু হাসলেন।

—'সে বেশ। আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমরা আর কিছু চাই না তোমাদের কাছ থেকে। কোনো একটা কিছু বিশ্বাস নিয়ে যদি দাঁড়াতে পার—সামনে বাঘ দেখলেও ভড়কে না যাও—' একটা গর্জন করে নলটা ধরলেন আবার।

—'কিন্তু নীলকণ্ঠ তোমাকে তো আমি চিনলুম না।'

—'চশমা চাইছিলেন—'

—'কিন্তু চশমাব কোনো দবকাব নেই—তোমাকে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, নাও টেবিলেব ওপব বেখে দিয়ে এসো।'

চশমা টেবিলেব কিনাবে বেখে দিয়ে এলুম।

ঝিমিয়ে পড়ছিলেন, আমি চেয়াবে এসে বসতেই চোখ চেয়ে—'তুমি আমাব কাছে এসেছিলে?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তাহলে তাস খেলতে বুঝি? দোতলাব সিঁড়ি দিয়ে দক্ষিণেব ঘবে চলে যাও।'

—'তাস দু'হাত খেলতে পাবি বইকী—কিন্তু আমি এসেছিলুম নির্মলেব সঙ্গে দেখা কবতে।'

—'কিন্তু এখন সে তাসে মেতে আছে, তাব সঙ্গে দেখা কবে কী লাভ?'

—'দুপুববেলাও তাস খেলছে? আজ তো কোনো ছুটিব দিন নয় জেঠামশাই—নির্মল কি অফিসেব দিকে যায় না?'

চাটুয্যেমশাই হাত ইশাবা কবে—'বোস। আমি পাঁচ ছেলেব বাবা। আমাব কোনো সন্তান মাবা যায়নি। সকলেই কাজ কবছে।'

—'তা আমি জানি।'

—'ভূমিকম্প হচ্ছে টেব পাচ্ছ?'

একটু বিস্মিত হয়ে চাটুয্যেমশাইয়েব দিকে তাকালুম। তিনি শান্ত অবিচলিত হয়ে বলেছিলেন। খানিকক্ষণ চুপ থেকে মাথা হেঁট কবে হেসে—তাস পেটানোব কথা বলছেন। নল মুখে দিয়ে দু-চাব টান দিয়ে চাটুয্যেমশাই—'তা ওবকম হইচই হয়েই থাকে। তাস খেলছে, ফুটবল তো খেলছে না, একটু-আধটু গোলমাল তো হবেই।

—'তোমাব তামাক খাওয়াব অভ্যাস আছে?'

—'এক আধটা চুরুট খাই মাঝে মাঝে।'

—'এনেছ সঙ্গে কবে?'

—'আছে একটা।'

—'বেশ জ্বালিয়ে নাও।'

—'না থাক, আপনাব সামনে—এমন কিছু নেশাব মতো হয়ে ওঠেনি তো...। বাস্তবিকই ভূমিকম্প।'

—'সমস্ত দিন সমস্ত বাত এই বাড়িটা এবকম দুলছে। আমাব কোনো ছেলেই বখাটে নয়, সকলেই বড় বড় চাকবি কবে। টাকাব মুখ এবা অনেকদিন থেকেই দেখছে। সাবাদিন বাত অগ্ন্যুৎপাত আব জলপ্লাবন লেগেই বয়েছে। শুনছ নীলকণ্ঠ, হাসছে?

শুনছিলাম দোতলাব ঘবে তাসেব আড্ডাব থেকে হাসি ভেসে আসছিল।

—'মানুষ এবকম হাসতে পাবে আগে জানতো?'

—'প্রাণ খুলে হাসছে, ক্ষতি কি?'

—'না, ক্ষতি নেই। আমাব ছেলে বলেই লাঙেব এত জোব। আমি সেকালে একটা বাঘ সিংহেব জাত ছিলুম, কিন্তু তবুও—'চাটুয্যেমশাই কিছুক্ষণ তামাক টেনে—'এবকম হাসি কি কোনোদিন শোননি নীলকণ্ঠ। আমাব ছেলেদেব কোনোদিন যক্ষ্মা হবে মনে হয়? কেন হাসছে আন্দাজ কবতে পাব?'

—'হাসছে প্রাণেব ফূর্তিতেই।'

—'দূব, চোখা মানুষ তুমি নও নীলকণ্ঠ, হাসিব আগে একটা শব্দ পেলে না?'

—'কই, আমি শুনিনি তো।' কেমন একটা অস্বস্তিব সঙ্গে চাটুয্যেব দিকে তাকালাম।

—'আমি সব সময়ই সব শুনি।' নলটা মুখে তুলে নিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎই মুখেব থেকে নামিয়ে নিয়ে—'বয়স হল পঁচাত্তবেব ওপবে, কিন্তু তবুও সব দেখি সব শুনি, কিন্তু বোবা হয়ে থাকি, এই হল আমাব অপবাধ।' আমাব দিকে তাকিয়ে—'অপবাধ আব কারু কাছে নয়, আমাব নিজেব মনেব কাছে।' একটু চুপ থেকে—'তাহলে তুমি কোনো শব্দ শুনতে পাওনি?'

মাথা নেড়ে—'না জেঠামশাই, ওপবে তো মাছেব হাট বসেছে।'

—'মাছিব হাট মাছেব হাট যা খুশি বলতে পাব।'

—'হ্যাঁ কোলাহলেব তো আব বিবাম নেই চাটুয্যেমশাই, তাব মাঝ থেকে দু-একটা হাসি একটু

চমকে আশ্বস্ত করে দেয়? বুঝতে পারা যায় যে না কোথাও আগুন লাগেনি, মাছিদের রাঙা দিন কেটে চলেছে।'

—'নিভে গেল নাকি?' চাটুয্যে বললেন—'ছিলিমে একটু ফুঁ দিয়ে দাও তো নীলকণ্ঠ! "হ্যাঁ, এই বেশ হয়েছে। চেযারে বোসো গিয়ে, ছারপোকায় কামড়াচ্ছে না তো?'

—'না।'

—'শব্দব্রহ্মার সমস্ত আস্বাদই এইখানে বসে পাই আমি। তাস ছুঁড়ে ফেলার শব্দ শোননি?'

—'কখন?'

—'নির্মল যে হেসে উঠল, তারই একটু আগে।'

—'না তো।'

—'শুনবে কি করে? শুনবে কী করে পাঁচটি উজবুক সন্তানের পিতা হয়ে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত [...] ভোগ করবার সুযোগ তো তোমার হযনি। আমার এ কান বেহালাব কান, এত বছর বয়সে [....] হান—গত পনেরো বছরের মোচড় খেযে খেযে এখন সযুত হযেছে। শব্দব্রহ্মের সমস্ত সুব এখন শুনতে পাই আমি—' চাটুয্যেমশাইযের হাতের থেকে নলটা পড়ে গেল।—'বঙ্কু বাঁড়ুয্যের মুখের ওপব তাস ছুঁড়ে মারল নির্মল—তারপরেই ঐরাবতের মতো হাসি—ওই না হলে তাস খেলা জমে কখনো?' নলটা তুলে নিযে—'আমার বাড়িটা হযে উঠেছে দ্বারকাপুরী। এব জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। যাদবদের বাপের নাম কী ছিল বল তো?'

একটু হেসে—'আপনিই আমার চেয়ে ভালো জানেন জেঠামশাই।'

—'জানি বইকী! কলিযুগে তার নাম হরিপ্রসাদ চাটুয্যে-'

—'বঙ্কু বাড়ুয্যে কে?'

—'দাঁড়াও, আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দাও, 'বলে ঈষৎ গর্জন করে তামাকের নলটা মুখে তুলে নিলেন।

—'একজন সাগবেদ। বঙ্কু বাঁড়ুয্যের কথা জিজ্ঞেস করছিলে না?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'যাদবদেরই একজন সাগরেদ' বলে চোখ বুজে তামাক টানতে লাগলেন চাটুয্যেমশাই। বললেন চাটুয্যেমশাই—'তবে মেজাজ তাব খুব ভালো, খুব নরম ছোকরা। শুনেছি চমৎকার খেলে। চমৎকার তাস খেলে শুনেছি।' চাটুয্যেমশাই বললেন—'সেইজন্য রোজ দুপুরে তাকে ডেকে আনা চাই।'

—'বেচারা তালুকদাবের ছেলে, চাকরিবাকরি করে না, নতুন বিযে কবেছে, কিন্তু তাসের আড্ডাযই বাত দু'টো—প্রেমে পড়ে বিযে করেছিল না ফ্যাসাদে? মেযেটির মুখ দেখে বিযে করেছিল তো তাকে?'

একটু হেসে—'তা আব কি। রাত দু'টোব পব আরো তো রাত থাকে জেঠামশাই। কিন্তু বঙ্কুবাবুর মুখে তাস ছুঁড়ে মাবল কেন নির্মল?'

—'চাটুয্যের ছেলেরা ওরকম মেরেই থাকে। বযসের সময আমিও কি কম ঠেঙিয়েছি। ধর্ম ও নীতির কাছে যে অপরাধ করেছে মনে হত তাকেই শাস্তি দিতে গিযেছি। কিন্তু এখন মনে হয ভুল কবেছি সব। আগে বুঝে নেয়া উচিত ছিল, নীতি কাকে বলে। ধর্ম বলতে বাস্তবিক কী বোঝায়। এখন পঁচাত্তর বছর বয়সে একা ঘরে বসে বসে নীতি ও ধর্মের সমস্যা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করি—কোনো একটা সিদ্ধান্তে না পৌছতে পাবলে কাকে শাস্তি দেব।' একটু চুপ করে—'কিন্তু আমার মনে হয মীমাংসা হয়েও গেছে।'

—'কী রকম?'

—'যতদূর মনে হয়, শাস্তি আমাকেই পেতে হবে; অপরাধ আমিই করেছি বেশি, পাচ্ছিও। এই একা ঘরে রাতে অচল হযে বসে আছি। সবই দেখছি শুনছি, কিন্তু কড়ে আঙুল নাড়বারও শক্তি নেই।'

একটু চুপ থেকে—'এ বাড়ি ছেড়ে বিদেশে অন্য কোথাও একটু নিরালায় গিয়ে থাকতে পারেন না?'

—'কিন্তু সঙ্গে থাকবে কে নীলকণ্ঠ?'

—'কেন, জেঠিমা।'

—'তোমার জেঠিমাকে তুমি চেন না।' নল মুখে নিয়ে নীরবে খানিকক্ষণ টানলেন। মুখ যেন আবো রাঙা হয়ে উঠল। যেন আগুনের মতো। বললেন চাটুয্যেমশাই।

—'আমার স্ত্রীকে তুমি ইদানীং দেখনি?'

—'না, বছর দশেকের মধ্যে আপনাদের কারু সঙ্গেই তো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।'

—'দেখবে, ওপরে গিয়ে দেখবে। রামকিঙ্কর মুখুয্যের মেয়ে চিরদিনই সুন্দরী বলে খ্যাত। বয়স একষট্টি, আটটি সন্তানের মা, কিন্তু এখনো তাকিয়ে দেখলে মনে হয় যেন চল্লিশ-একচল্লিশ চলছে।'

কথাটা সত্য। আমি চাটুয্যেমশাইয়ের স্ত্রীকে শেষবার দেখেছি তখন তার বয়স পঞ্চাশ আন্দাজ, কিন্তু তাঁর যে এত ছেলেমেয়ে, তিনি যে চাটুয্যেমশাইয়ের মতো একজন বুড়োমানুষের স্ত্রী, তা মোটেই মনে হত না। এক এক সময় তাঁকে বাড়ির নতুন কোনো বউ, চাটুয্যেমশাইয়ের তৃতীয়পক্ষের তরুণী কোনো স্ত্রী বলে ভুল হয়ে যেত।

—'আমি রাতে অচল হয়ে পড়ে আছি, আমার স্ত্রী তিনি [...] তার কী করা উচিত?'

ধূপকাঠি ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছিল।

—'প্রথম পক্ষেরই। সাতান্ন বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা।'

—'কিন্তু বুড়ো হয়ে গেলে স্ত্রীলোকেরা দেশ ছেড়ে বড় একটা বাইরে যেতে চান না।'

চাটুয্যেমশাই মাথা নেড়ে—'তা নয়, বয়স যে তার জীবন শুকিয়ে ফেলেনি সেই আমোদটা গোপনে গোপনে বোধ করছেন তিনি—খানিক আনন্দে খানিক দুঃখে—' নলটা তুলে ধরলেন। —'নইলে দেখো, আমার পা মাড়িয়ে দেবার জন্যও অনেক সময় একজন লোকের দরকার—চাকর আসে—তিনি আসতে পারেন না।'

নীচে হয়তো নানারকম বাইরের লোক ভেবে তিনি—'

—'তিনি জানেন, আমার এখানে কোনো বাইরের লোক আসে না।' নলটা কোলের ওপর ফেলে দিয়ে—'বয়স তার একষট্টি, তিনি ঠাকুমা-জাতীয় মানুষ বাইরের লোকের সঙ্গে আমার যেমন তারও তেমনি সম্পর্ক। গত তিন মাস হল তার হাতের মালিশ যে কী জিনিস তা আমি বুঝতেই পারলাম না। হয়তো এটা আমার দুর্বলতা। মরতে চলেছি, এর আগে এসব দুর্বলতা ত্যাগ করাই ভালো, কিন্তু—' চাটুয্যেমশাইয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

—'আপনি তাঁকে মালিশ করতে বলেছেন কোনোদিন?'

—'তা আমি বলব কেন? নিজের থেকে সে মালিশ করে দেবে।'

—'হয়তো ভাবেন চাকরের হাতের মালিশই ভালো হয়।'

চাটুয্যেমশাই একটু গর্জন করে চুপ করলেন।—'এই তো এতক্ষণ তুমি বসে আছ—তাকে দেখলে?'

—'হয়তো আসতে আমার আন্দাজ পেয়ে সরে গেছেন।'

—'কীসের জন্য?'

—'ভেবেছেন কোনো অপরিচিত।'

—'হোক পরিচিত, হোক অপরিচিত, আমার ঘরে যে কোনো মানুষ ঢোকে না তা তিনি ভালো করেই জানেন নীলকণ্ঠ—তুমি এখানে সন্ধ্যে অব্দি বসে থাকলেও তাকে দেখতে পাবে না।'

—'ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি অনেক—ঠাকুরমাকে একটু ব্যস্ত থাকতে হয়।'

—'ছেলেমেয়েরা নিজেদের দেখতে পারে—নাতি নাতনিদেব জন্য তাদের মা রয়েছে—আমি অত্যন্ত বুড়োমানুষ' চাটুয্যেমশাই গলা খাকরে চুপ করলেন।—'বড্ড একা বোধ করি নীলকণ্ঠ, আমি যে একা বোধ করি আমার স্ত্রীকে সে কথা কখনো বলতে যাই না। মনের ভিতর মানুষের একটা মর্যাদা থাকা ভালো; বলে নলটা ধীরে ধীরে তুলে নিলেন।—'সকালবেলা তাঁকে আমি ডেকে পাঠাই না, নিজের থেকে যদি আসেন তো আসবেন। '

—'জেঠিমার কোনো অসুখ নেই তো?'

—'না। তিনি সুস্থ মানুষ। উপরে গিয়ে তাঁকে তুমি দেখবে—আমার স্ত্রী বলে মনেই হবে না।' একটু চুপ থেকে—'সকালবেলা রোজই তিনি আসে, কিন্তু সমস্ত রাতের ঘুমের পর সকালবেলা আমার মনটা বেশ সুস্থ থাকে, একটু নিজের ভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকি—তাকে অতিরিক্ত মনে হয়। দুপুরবেলা আমি বাস্তবিক বড় একা বোধ করি। মা বেঁচে থাকলে কাউকেই আর চাইতাম না। কিন্তু অনেক দিন হয় চলে গেছেন তিনি। আমাকে বড় জব্দ করে গেছেন।' নলটা মুখে নিলেন চাটুয্যেমশাই। কিন্তু টান দিতে

গেলেন না—'নিঃসঙ্গতা ভাঙবাব জন্য শুধু আসে চাকব, আসে দু-চাবটা চড়াই, একটু ঝিম আসে, আবেক পৃথিবীতে হাবিযে যাই যেন, কিন্তু তাবপবেই আবাব অসহ্য নীববতা। নিজেব মনেই নিজেকে ডাকি—'হবিপ্রসাদ চাটুয্যে, হবিপ্রসাদ চাটুয্যে, হবিপ্রসাদ চাটুয্যে—মনে হয যেন আমাদেব সেই ইস্কুলেব হেডমাস্টাবমশাই ডাকছেন—আমাবই মতন শাদা দাড়ি, একজন বুড়ো মানুষ। এদেব পেতাত্মা আসলেও সব ভুলে তৃপ্ত হযে থাকতে পাবতাম আমি। কিন্তু বুড়ো বযসে একটা স্ত্রীলোকেব উপব নির্ভব কবতে হচ্ছে আমাব।' বলে চাটুয্যেমশাই একটা হুমকি দিযে নল মুখে তুলে নিলেন।

—'আমাব মনে হয—'

—'না তোমাব কিছু মনে হয না' চাটুয্যেমশাই ঈষৎ গর্জন কবে নল ছেড়ে দিযে নল মুখে দিলেন আবাব।

তবুও বলা গেল—'আপনি নীচেব তলায একা এক ঘবে—'

আমকে বাঁধা দিযে—'কী কবতে হবে আমাকে?'

—'আপনি যদি ওপবেব কোনো এক ঘবে গিযে থাকেন—'

অবিলম্বে আমাকে বাধা দিযে চাটুয্যেমশাই—'কক্ষনো না।'

—'সেখানে থাকতে আপনাব আপত্তি?'

দাঁতমুখ খিঁচে চাটুয্যেমশাই কী যেন বলতে গেলেন, সমস্ত মুখ আবক্ত হযে উঠল। কিছু বলতে পাবলেন না। হাত দিযে যেন সমস্ত পৃথিবীটাকেই ঠেলে সবিযে দিলেন।

চুপ কবে বসেছিলাম।

তামাক টানতে টানতে হৃদয শান্তি হল চাটুয্যেমশাইযেব। বললেন—'তুমি আমকে ওপবে গিযে থাকতে বলছ, কিন্তু একথা তো আমাব ছেলেবা বলে না কোনোদিন।' একটু চুপ থেকে—'ছেলেদেব মাও বলে না।'

—'আপনাব নিজেব বাড়ি নিজেই তো ওপবে উঠে গেলে পাবেন।'

—'সে বকম একট ব্যবস্থা কবা যায বটে, কিন্তু তাতে কোনো মীমাংসা হয না।'

তাকিযে দেখলাম ধূপকাঠিগুলো সব পুড়ে গিযেছে।

—'এই নীচেব ঘবগুলোই আমি ভালোবাসি। ওপবেব বিজাতীয গোলমাল আমাব সহ্য হয না। নীচে তিন-চাব খানা বেশ সুন্দব ঘব, আমাবই ঘবেব পাশাপাশি, কিন্তু তবুও এসব ঘব এ বাড়িব আব কারুই প্রযোজনেব জিনিস নয। আমাকে একাই থাকতে হবে।'

—'আপনাব ছেলেবা কেউ এ ঘবে থাকতে চাইবে না?'

— না, সে প্রস্তাব কোনোদিনও আমাব কাছে কবেনি তাবা। আমি যে একা পড়ে আছি এতে তাদেব কিছু আসে যায না।'

—'এখানে থাকলে তাদেব নানাবকম অসুবিধা জমবে না। আপনাকে তাবা ভয কবে।

চাটুয্যেমশাই—'আমি বাতে অচল হযে পড়ে আছি, কাব কী কবতে পাবি? আমাব চোখেব সামনে বসে গাঁজা টানলেও কিছু কববাব সাধ্য নেই আমাব।'

—'কিন্তু তবুও কোনোদিন আপনাব শোবাব ঘবে তাসেব আড্ডা জমাবাব সাহস হবে না তাদেব।'

চাটুয্যেমশাই একটু অস্ফুট গর্জন কবে গোঁফ মুছে নিলেন—'আমাব বাবাকেও আমি ববাবব ভয কবতুম, কিন্তু তাব পাশাপাশি ঘবে থেকে তাব সেবা কববাব সুযোগ পেলে আমি কৃতার্থ হযে যেতুম।'

—'সেদিন আব নেই।'

—'কী বকম?'

—'আমাদেব ধর্ম অধর্ম আলাদা। রুচি আপনাদেব সঙ্গে মেলে না কিছুই। আমবা আলাদাভাবে জীবন চালাতে চাই।'

—'গিন্নীও কি তাই চান? তিনি তো এ যুগেব মানুষ নন।'

চাটুয্যেমশাই নলটা মুখে দিযে নিস্তব্ধ হযে বসে বইলেন।—'তিনি কী কবছেন জান?'

—'এখনো কি তিনি জেগে আছেন?'

—'দুপুববেলা বুড়োমানুষদেব একটু ঘুমোবাব বাতিক থাকে। চাটুয্যেবা বুড়ো হলে ঝিমোয, আমাব বাবা ঝিমোতেন, কিন্তু খুট কবে একটা শব্দ হলেই হুঙ্কাব দিযে জেগে উঠবেন— মা তাঁব পাযেব কাছে একটা

মাদুব পেতে শুযে থাকতেন। কিন্তু সে সব ছবি হাবিযে গেছে। চাটুয্যেমশাই খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে তামাক টেনে নিযে—'কিন্তু গিন্নী ঘুমোয না। ঘুমোলেই আমাব ঘবে এসে মাদুব পেতে ঘুমোবাব কথা তাব মনেও হয না কোনোদিন।' চাটুয্যেমশাই গলা খাকবে—'তাব ঘুমও কি ছেলেদেব তাসেব আড্ডার মতো?'

চুপ কবেছিলাম।

—'ছেলেদেব মতো তিনিও কি অসুবিধাব জিনিস মনে কবেন?'

নিস্তব্ধ ছিলুম।

—'মানুষেব ভীতিব কাবণ হওয়া সুখেব জিনিস, দুঃখেব জিনিসও বটে। নয কী?'

—'তাই তো—'

—'তামাক নিভে যাচ্ছে, দেবাজেব ভেতব কাগজেব মোড়কে তামাক বযেছে, দেশলাই আছে। তুমি ছিলিমটা একটু সাজিযে দাও তো। এই নাও চাবি।'

তামাক সাজছিলুম।

—'কোনো চাকব এল না, কিন্তু এটুকু কাজ গিন্নী এসেও কবতে পাবত নাকি—ভযেব কথা বলছিলুম না যে।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আমি হলুম মানুষেব ভযেব কাবণ, সুখেব কথা অনেক, কিন্তু দুঃখেব কথা এই বাঘকে সবাই ডবাই বলে বাঘিনী তো ডবায না কখনো। একবাব বার্মায গিযেছিলুম।'

—'কে, আপনি?'

—'হ্যাঁ, সে অনেক বছব আগেব কথা।'

[...] 'এ বুঝি?'

[...] 'কাজ কবতুম তখন। ঠিক এমনি দুপুববেলা দেখলুম কযেকটা মেহগিনি গাছেব নিস্তব্ধ ছাযাব নীচে একটা বাঘ আব বাঘিনী পাশাপাশি শুযে ঘুমুচ্ছে।'

—'তামাক তৈবি হযেছে জেঠামশাই।'

—'ছিলিমটা এঁটে দাও।'

নল তুলে নিযে—'কিন্তু মানুষ উন্নতস্তবেব জীব। এসব তাব জন্য নয। আকাশ বাতাসেব সঙ্গে মিলিত হযে থাকতে হয তাকে। যদি না পাবে একাই থাকতে হয।'

—'আমাব মনে হয—'

—'কি আব মন হবে তোমাব' মনে হবাব কিছু নেই।' একটু চুপ থেকে—'ওপবে যাব তো?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'নির্মলেব সঙ্গে দেখা কববে? সিঁড়ি বেযে ওপবে উঠলেই হল ঘবে পৌছবে। তাব পাশেই দক্ষিণ দিকেব কোঠা—তাসেব আড্ডা চলেছে। ওদেব দবজাব দিকে মুখ বেখে গিন্নী বসে বযেছেন হল ঘবেব একটা গোল টেবিলেব পাশে।'

—'বসে আছেন?'

—'ঠাই বসে। চশমা এঁটে কোনো একটা বই পড়ছেন হযতো—যা আমাব এখানে এসে পড়লেই হত, আমাকে পড়ে শোনালে একজন বুড়োমানুষেব উপকাব হত।' চাটুয্যেমশাইযেব গলা থেকে খানিকটা শ্লেষ্মা বেবিযে এল। আমাকে একটা ডাবব এগিযে দিতে বললেন।

শ্লেষ্মা ঝেড়ে ফেলে আস্তে আস্তে—'কিংবা কাঁটা বুনছেন হযতো।'

—'দুপুববেলা, কোনো ঘুমোবাব অভ্যাস নেই?'

—'না, খুব ব্যস্ত। কিন্তু নাম মাত্র। একমাসেব ভিতবেও একটা মোজা বোনা হয না। বই তিন পাতাব বেশি এগোয না। তাসেব পার্টি বসে, উনিও হল ঘবেব টেবিলেব পাশে কাঁটা নিযে বসেন। দক্ষিণেব ঘব ভূমিকম্প শুরু হয, গিন্নি নির্মলেব মেজমেযেব কাঁধে হাত বেখে বললেন—'যাও যাও তোমাব বাবাব খেলা দেখো গিযে কলকাতাব কেউ তাব সঙ্গে তাস খেলায এঁটে উঠতে পাবে না। কী বললে, খেলা দেখে এসেছ? এবই মধ্যে খেলা দেখা হযে গেল তোমাব? তোমাব বাবাব খেলাও দেখা হযে গেল? এব চেযে গভীব নিবাশাব জিনিস চাটুয্যেগিন্নীকে আজ আব কাবু কবতে পাবে না।' চাটুয্যেমশাইযেব গলায শ্লেষ্মা আটকে গেল। শ্লেষ্মা ঝেড়ে ফেলে আবক্ত মুখে নিস্তব্ধভাবে আমাব দিকে

তাকিয়ে বইলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তাব মাথা বুকেব উপব ঝুলে পড়ল। ধীবে ধীবে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। মনে হল চাটুয্যেমশাই আব না জাগলেও পাবেন। এ ঘবেব টেবিল চেযাব, গড়গড়, ডাবব সকলেই যেন বলছে—'ববং ঘুমিযেই পড়ুন চাটুয্যেমশাই, পৃথিবীতে অনেকদিন তো কাটালেন।'

দবজাব কাছে শব্দ শুনতে ফিবে তাকালুম। দেখলুম চাটুয্যেমশাইযেব গিন্নী এসেছেন। আমাকে দেখে দ্বিধা বোধ কবে সবে গেলেন না, সহজভাবে ঘবেব ভেতব ঢুকে ঘুমন্ত চাটুয্যেমশাইযেব দিকে একবাব তাকালেন একবাব আমাব দিকে। একটা চেযাবে বসে আস্তে আস্তে—'ঘুমিযে গেছেন দেখছি।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কতক্ষণ হল?'

—'এই মাত্র।'

—'আপনি কোনো কাজে এসেছিলেন? এব কাছে কেউ তো কোনো দবকাবে বড় একটা আসে না আজকাল আব।'

—'আমাকে চিনতে পাবছেন না? আমি নীলকণ্ঠ।'

—'নীলকণ্ঠ? কই আমাব মনে পড়ছে না তো। আচ্ছা, পাশেব ঘবে চল, এখানে গোলমাল হলে উনি জেগে উঠতে পাবেন।'

পাশে ঘবে দু'টো বেতেব চেযাব দু'জন বসলুম।

—'আমি নির্মলেব কাছে এসেছিলুম।'

—'নির্মল তোমাকে চেনে? তাস খেলতে এসেছ?'

—'না, এমনি কথাবার্তা বলতে এসেছিলুম।'

—'এখন তো সুবিধা হবে না, তাস খেলছে। খেলা খুব জমে গেছে কিনা, বাইবেব লোকেব সঙ্গে দেখা কববাব সময হবে না।'

—'আমি ওব একজন বন্ধু।

মাথা নেড়ে—'এখন সুবিধা হবে না, খেলছে।

—'দুপুববেলা অফিসে যায না?'

—'বড় চাকবি কবে কিনা, নিজেব একটা ডিপার্টমেন্ট, ঘবে বসেই অফিস কবে অনেক সময। কী কথাবার্তা বলতে চাও?'

—'এই এমনি, বিশেষ কিছু নয—প্রায দশ বছব পবে কলকাতায এসেছি।'

—'ও।' একটু চুপ থেকে—'তাস খেলছে এখন, তোমাকে অপেক্ষা কবতেই হবে।

—'কখন উঠবে?'

—'সন্ধ্যা নাগাদ।'

—'আমি তাহলে একটু ঘুবে আসি গিযে।'

—'তুমি ওঁব সঙ্গে কথা বলছিলে বুঝি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'তাহলে ওঁব ঘবেই বসে থাক না কেন। নির্মলকে যখন চেন তখন তাব বাবাকেও শ্রদ্ধা কবো নিশ্চযই?'

মাথা নেড়ে হেসে—'তা কবি বইকী।'

—'তাহলে ওঁব ঘবে গিযেই বোসো তুমি। ঘুমিযে পড়েছেন বটে, কিন্তু এক্ষুণি উঠে পড়বেন। এটা-ওটা-সেটা চাটুয্যেমশাইযেব অনেক বকম দবকাব। তুমি ওইখানেই গিযে বোসো।'

আস্তে আস্তে চাটুয্যেমশাইযেব ঘবে গিযে বসলুম।

—'এই ভালো' বলে চাটুয্যেমশাইযেব গিন্নী উপবে চলে গেলেন। মেহগিনি গাছেব ছাযায বাঘিনীব সুন্দব ডোবা নেই কোথাও আব। বযেছে ঘুমিযে বুড়ো বাঘ। কযেকটা চড়াই খেলা কবছে।

মনে হল চাটুয্যেমশাই আব না জাগলেও পাবেন—এ ঘবেব টেবিল চেযাব ইত্যাদি—

—'ওই যে লাল বাড়িখানা' বিমলকে আমি চোখ ইশাবা কবে দেখিযে দিলুম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল—বেলা প্রায আড়াইটা,আমাদেব দু'জনেব গাযেই আপাদমস্তক বেনকোট। বিমলেব হাতে একটা সাইকেল। কলকাতাব বাস্তা অলিগলি ধবে প্রায আড়াই মাইল হাঁটা হযে গেছে।

—'আমি জানতুম না কলকাতায এবকম জাযগা বযেছে, এই গলিটাব নামই-বা কি শৈলেন? কী বলছ, এটা গলিই নয? কী তাহলে? এখানকাব লোকগুলোও যেন ধূসব-কোনোদিন শহবেব মুখ দেখেছে এবা? আমবা কলকাতাব থেকে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে পৌঁছেছি তো—'

কোনো উত্তব দিলুম না।

—'কি জানি কলকাতাব শহবেব সঙ্গে আমব পবিচয খুব কম।'

—'আমাব মনে হয একটা বড় পবে, বিমল, সমুদ্রেব মতো।'

—'কিংবা ঈশ্ববেব মতো নানাবকম স্তব, নানাবকম বিস্ময, কিছুতেই তাব সঙ্গে পবিচয হযে ওঠে না। ওই লাল বাড়িটাব কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ, ওইখানেই থাকেন তিনি।'

—'কিন্তু ওটা কি একটা বাড়ি?'

—'বাড়ি নয? বিমল, কী মনে হয তাহলে?'

—'আমাব মনে হয আমবা এখনো সেই চাযেব দোকানেই বসে আছি, চাযেব কাপে একটু আপিং ঢালা হযেছে হযতো। এ জাযগা যে কলকাতা মনে কবে নিতে হবে। ওটাকে বাড়ি বলে বুঝতে হবে—লাল বাড়ি বললে? লাল?'

—'লাল নয—তাহলে জাফবান।'

—'জাফবান'' বিমল বাঁ ভুরু আকাশ পর্যন্ত উচকে আমাব দিকে তাকাল। হতভম্ব হযে— 'কমলা বং হবে।'

—'কমলা বং? কমলাব খোসায থাকে, সে বং কোথাও দেখেছ আব।'

—'তাহলে কি বাদামি?'

—'বাদামি? দেওযালেব বং কখনো বাদামি হয?

—'বক্তেব বং নয, জবাফুলেব বং নয, গোলাপেবও নয, কিন্তু পোড়ামাটিব বং টেবাকোটা, কি বলো বিমল?'

বিমল পকেটেব থেকে একটা চুরুট বেব কবে জ্বালিযে নেবাব চেষ্টায ছিল। কোনো জবাব দিল না।

—'আমাব মনে হয যে দোকান থেকে আমবা চা খেযে এলুম পেযালাব সেই চাযেব বং একটু আপিং মেশানো হযেছে, এ বাড়িব বং এইবকম।' চুরুটে এক টান দিযে বিমল বললে—'না, তাও নয, একে কোনো বং বলা চলে না, ওটাও আমদেব পবিচিত পৃথিবীব কোনো বাড়ি নয। ছাদ ফেটে গিযেছে, দেযালেব চটা উঠে গেছে, গাছ গজিযেছে, শ্যালা অশ্বত্থেব চাবা, বিড়াল আঁচড়া বাড়িটাকে গ্রাস কবে ফেলেছে—এই যদি শুধু দেখতুম, তাহলেও এটাকে একটা বাড়ি বলে স্বীকাব কবতুম, কিন্তু এসব ছাড়াও এখান আবো যেন কীসব বযে গেছে—ওখানে মানুষ থাকে না—থাকে মানুষেব আত্মাব আকাঙ্ক্ষা।'

—'ঠিক বলেছ, সিদ্ধেশ্ববাবু আজ যা, তুমি আমি একদিন হযতো তাই হব। কিংবা তাও কি হতে পাবব? চলো, দেখা কবি গিযে।'

—'বৃষ্টি থেমে গেছে, আমি চললুম।'

—'কোথায?'

—'কলকাতায।'

—'যেন এ জাযগাটা কলকাতা নয' বিমলেব হাত থেকে চুরুটটা খসিযে নিযে [....]

—'কবিতা লেখ অথচ।'

—'না মানুষটিব সঙ্গে দেখা কববাব কোনো ইচ্ছে নেই আমাব। আমি এতক্ষণে ভালো কবে বুঝিতে পেবেছি সিদ্ধেশ্ববাবুব বচনা আমদেব এ পৃথিবীতে তৈবি হয না, আমবা ওবকম লিখতে পাবব না কোনোদিন। কেউই পাববে না, কিন্তু এ মানুষটি এইখানে বসে ঈশ্বব কিংবা নবকেব সঙ্গে যে একটা সেতু তৈবি কবে ফেলেছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায। ওব সমস্ত বচনা, ওপাবেব থেকে আসে।' এই বলে বিমল মুহূর্তেব মধ্যে সাইকেলেব পাদানিব ওপব চড়ে সাইকেল চালিযে আধ মিনিটেব ভেতব অদৃশ্য হযে গেল। চাবিদিকে কেমন একটা নিস্তব্ধতা। বিমল বাববাব বলেছে চাযেব দোকানে আমবা আপিং খেযেছি। একটা অসুস্থ আবহাওযাব হাতে অত সহজে আমি নিজেকে ধবা দেই না। এখানকাব পথঘাট আমি [...] লোককেই চিনি, এটাকে কলকাতা বলেই স্বীকাব কবি, সিদ্ধেশ্ববাবুব বাড়িতে দু-চাব বাব এসেছি আমি, কিন্তু তবুও কাব যেন কেমন যেন একটা নির্জন—

বিমলেব চুরুটটা আমাব হাতেই ছিল, পকেটেব থেকে দেশলাই বেব কবে জ্বালিযে নিলুম। ধীবে ধীবে সিদ্ধেশ্ববাবুব দালানটা লক্ষ কবে হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু সদব দবজাব কাছে এসেই চুরুট নিভিযে ফেললুম আমি, কে যেন নিভিযে দিল। দেওযালেব ফাটলেও ছাই ঝেড়ে নিতে ভয হল। বাঁ হাতেব দু'টো আঙুলে বুঝাতে পাবলুম না কেন ডান হাতেব আঙুল ব্যবহাব কবতে পাবছি না। নখ দিযে মুখেব ছাই উড়িযে চুরুটটাকে পকেটে বেখে দিলুম। কিন্তু দেখলুম, সেটা পকেটে না ঢুকে কী এক অদ্ভুত ইশাবায যেন মাটিব ওপব পড়ে গেল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা কবেও বাগিযে ফিবিযে আনতে পাবা গেল না। মাটিব ওপব পড়ে গেল, হাত হযে গেল নিস্তেজ—সেটাকে তুলে আনব, শক্তি সাহস সমস্তই হাবিযে ফেলেছি।

—'দবজাব পাশে কে দাঁড়িযে?'

—'আমি শৈলেন।'

—' শৈলেন কে? ভিতবে এসো।'

এসে দাঁড়াতেই—'বোসো, তোমাকে আমি চিনতে পেবেছি। মানুষকে একবাব দেখে ভুলে যাই, সে অপবাদ আমাকে দিতে পাববে না। ভুলে গেলেও হয তাতে তোমাব কি, সেটা কোনো অপবাদও নয, অপবাধও নয, দিনবাত এত মুখ দেখতে হচ্ছে, প্রত্যেকটিকে যে মনে কবে বাখতে হবে এমনই-বা কি কথা। বাস্তবিকই যদি না মনে টিকে যায এক-একটা মুখ, তাব সঙ্গে আগে দেখা হলে তাকে বলতে হবে তোমাকে আমি আগেও দেখেছি? একটু চুপ থেকে—'বললেও হয, না বললেও হয। নিজেব মর্জিব ওপব নির্ভব কবে। সত্য-অসত্যেব কোনো প্রশ্ন নেই এব ভেতব। বক্তেব উষ্ণতা মানুষকে যেদিকে চালিযে নিযে যায, মন ব্যথিত হযে যে জিনিস আকাঙ্ক্ষা কবে সেইটেই সত্য। ধূলো ঘাসে পৃথিবীতে বক্তেব উষ্ণতা মানুষকে কোনোদিন ভুল পথে নিযে যায না, কিন্তু সে পৃথিবী ছাড়াও আবো পৃথিবী আছে যা আমাদেব চোখে পড়ে না। সে-সব পৃথিবীব আস্বাদ পাবাব জন্য মাথাব ভিতব কৃমিব জন্ম হয যেন, মনেব ভিতব আশ্চর্য অশ্রু জমে যায—এই সব ব্যথাব ভিতব দিযে আমবা অগোচব জিনিসও আস্বাদ কবি। পৃথিবীব দিকে এগিযে যায।'

—'তুমি কি মনে কবে আমাব কাছে এসছে? বোসো। আমাব সোফা সব বিক্রি কবে ফেলেছি।'

—'কেন?'

—'টাকাকড়িব দবকাব হয। চেযাবে যদি বসতে আপত্তি হয, ঘাসেব আসন আনিযে দিতে পাবি। আমাব মনে হয় মানুষ যখন মুখোমুখি বসে কথাবার্তা বলবে ঘাসেব উপবেই তাব বসা উচিত। ঘাসেব একটা আশ্চর্য গুন এই যে সেখানে তাকে আমবা পৃথিবীব সঙ্গেও যোগ বাখতে পাবে, নক্ষত্রকেও হাবিযে ফেলি না। আমাব বাড়িতে বক্তজটা ঘাসেব আসন আছে আনি।'

—'না, আমি চেযাবেই বসছি।'

—'বেশ। আমাব মুখ মনে থাকে নাম মনে থাকে না। মুখ টেনেই তো আমাদেব কাজ। নাম তো কতকগুলো অক্ষব মাত্র। কি না বললে তোমাব নাম?'

—'শৈলেন্দ্র মজুমদাব।'

সিদ্ধেশ্ববাবু—'তোমাকে আমি কলেজ স্ট্রিটে দেখেছি।'

—'সেই দিকেই আমাব মেস।'

—'বইযেবব দোকানেব পাশে [গ্যাসপোস্টেব] নীচে দাঁড়িযে কোন বই পড়ছিলে কোনদিন?'

—'তা পড়তে পাবি।'

—'তখন বৃষ্টি পড়ছিল।'

—'তা হযতো হবে।'

—'বইযেব ভেতব থেকে আলগা কাগজ বেব কবে পড়ছিলে, হযতো নিজেবই বচনা। তোমাব বৃষ্টিব ভেতব [গ্যাসপোস্টেব] নীচে দাঁড়িযে নিজেব বচনা পড়বাব নেশা—' বলে তিনি চুপ কবলেন।

—'আপনি এত সব দেখলেন কী কবে?'

কোন উত্তব দিলেন না।

—'এত সকাল কবে কি মানুষেব বাড়ি আসতে হয?'

—'সাড়ে দশটা বেজেছে, আজ বৃষ্টিব দিন—'

—'আচ্ছা, আমি তো এইমাত্র ঘুমেব থেকে উঠে চা খেযে বসেছি।'

—'কাল অনেক বাত জেগেছিলেন হযতো।'

—'মাথাব কাছে বাতি নিযে চোখ বুজে বসেছিলাম। একটা কবিতা লিখবাবও নির্দেশ এসেছিল মনেব ভিতবে, বাত তিনটেব সময বাতি নিবিযেছিলুম-কিছুই হল না। ইশাবা আসে কিন্তু বাত কিছুতেই ধবা দেয না।—কবিতা নাবীব মতো। পৃথিবীব পথ থেকেই এক নাবী কাল যেন আমাব ঘবে এসছিল—আমি তাকে দেখেও দেখলুম না।—'

—'আমাব মনে হয, আমাব এখন ওঠা উচিত।'

—'কেন?'

—'কাল যাকে পাননি, আজ সকালে তাকে পেতে পাবেন।'

সিদ্ধেশ্ববাবু আহতভাবে আমাব দিকে তাকিযে—'শেষ পর্যন্ত আমবা মাংসেবই জীব। কবিতাব আবহাওযা অত সহজে তৈবী হয না। একজন আশ্চর্য নাবীকে অনুসবণ কবে নিযে আমবা অনেক সময পৃথিবীব সব ঢেব জিনিস উপেক্ষা কবি। এমনি অনেক ভাঙা ম্লান, নিছক পাথব, হাতিব দাঁতেব নিটোল মূর্তি যেন সব টুকবো টুকবো হযে পড়ে আছে আমাব জীবনেব ইতিহাসে—তুমি বোসো, উঠতে হবে না তোমায।' বলে বললেন—'আমাব সঙ্গে দেখা কবতে হলে [...] দবকাব হয না। আমি পৃথিবীব মানুষ, জীবনকে যতদুব পাবা যায আস্বাদ কবতে চাই। কিন্তু তবুও এই পৃথিবীতেই আমাব আকাঙ্ক্ষা শেষ হয—আবো অনেক দবজা বযেছে—বাজাবেব মানুষেব সঙ্গে সব সমযই যোগ বাখতে পাবি না। আমাকে নানা সমযই এখানে পাবে না।—এখানে থাকলেও দেখা হবে না। কোনো কোনো সময আমি ভিড়েব ভিতবে একজন ভিড়েব মানুষ—কিন্তু সমাজেব মানুষ কক্ষনো নই। বাস্তাব গ্যাসেব আলোব নীচে, পথেঘাটে ইস্টিমাবে পাড়াগাঁব বড় বড় প্রান্তবে আমি সময পেলেই বেবিযে পড়ি।, মানুষেব মাথাব সমুদ্রেব ভিতব নিজেব মাথাব ক্ষুদ্রতা ও ঐশ্বর্য নিদারুণভাবে আস্বাদ কবে বেড়াই কিন্তু আবাব এক এক সময আসে যখন আমাকে কেউ কোথাও খুঁজে পায না।'

—'আজ তাহলে আপনি কবিতা লিখবেন না?'

—'না, আজ আমাব বেবিযে পড়তে হবে।'

—'কোথায যাবেন?'

—'তা আমি জানি না। বাস্তায বাস্তায ঘুবব হযতো। চীনেবাজাবে যেতে পাবি, চীনেবা কিবকম কবে জুতো তৈবী কবে দেখব। চীনে ভাষা একটু-আধটু শিখেছি। বিড়ি ফুঁকে তাসেব দলেব ভিতব ভিড়ে যাব। ঠিকভাবে যদি তাদেব সঙ্গে মিশতে পাবা যায, বুঝতে পাবা যায কীবকম হতচ্ছাড়াভাবে মানুষ তাবা, মানুষ। পাযেব নখ থেকে মাথাব চুল পর্যন্ত সমস্ত মানুষেব পৃথিবীব সমস্ত ঘাসেব পৃথিবীব আশ্বাস যেন জমে বযেছে ওইখানে।'

—'ওখানে গিযে কী কববেন আপনি?'

—'একটা কেবোসিন কাঠেব বাক্সেব ওপব বসে গন্ধ শুকব, সিগাবেট টানব, মানুষ জীবনেব আঘ্রাণ পাব।'

—'এইসব ভালো লাগবে আপনাব?'

—'এই সবই ভালো লাগবে। এই দেখো শেলফেব ওপব কতখানি চামড়া পড়ে বযেছে।'

—'কোথায় পেলেন?'

—'কিনে এনেছি, জুতো তৈবী কবব।'

—'কাব জন্য?'

—'আমাব নিজেব জন্য?'

—'নিজেই তৈবী কববেন?'

—'বাজাবে এবকম জিনিস পাবে না কখনো। জুতোটা হযতো পাযও দেব না আমি, পড়েই থাকবে। কিন্তু কখনোই হাতে কোন কাজ থাকে না, আমি জুতো সেলাই কবতে বসে যাই, কিংবা ছবি আঁকি, অথবা পাথব বা কাঠ খুদে খুদে নানাবকম অদ্ভুত নকল মূর্তি আঁকি। কিংবা সিন্দুক খুলে অনেক দিনেব পুবানো কাগজপত্র বেব কবে সেই গন্ধেব ভিতব আবিষ্ট হযে বসে থাকি। কেমন যেন একটা ধূসব মোহ সবেব ভিতব। মানুষেব একটা জীবন যে অনেক দেশেব অনেক কালেব অনেক সাংসাবিক জীবনেব সমন্বয তা আমি বুঝতে পাবি। সেদিন একটা ছোকবা এখানে' সিদ্ধেশ্ববাবু বললেন—'কামিনীগাছেব ছড়ি বিক্রি কবতে। একটা কিনলুম। কিছু না, শুধু ছুবি দিযে ডাল চেঁছে ছড়ি তৈবী কবেছে। দেখে এমন দুঃখ হল আমাব।'

—'ডাল কি আব খুঁজে পেল না, কামিনী গাছেব ডাল-এবপব বজনীগন্ধাব ডাঁটি দিযে [...] তৈবী কববে হযতো সিদ্ধেশ্ববাবু।

মাথা নেড়ে—'না না, ছড়ি সে তৈবি কবতে পাবেনি। একটা সামান্য ঘাসেব শিস দিযে রূপেব কাজ চলে, কিন্তু অত বড় ডালটা নিযেও ছেলেটি কিছু কবে উঠতে পাবল না। আমি তাকে সামনে বসলাম—'

—'ছড়ি তৈবি কবে দেখিযে দিলেন বুঝি?'

—'না। ভাত খেতে দিলুম। সাংসাবিক মানুষেব সমযেব একটা দাম আছে তো। যখন খাচ্ছিল আমি তাব পাশে বসে একটা ছবি হাতে নিযে দেখিযে দিলুম, ছড়িব মাথাটা সাদাসিদে বাখতে হয না, কেমন কবে চওড়া আব লম্বা কবে চেঁচে—খুদে কেমন কবে দাড়িওযালা এক আশ্চর্যেব মুখ তৈবি কবা যায।'

বিস্মিত হযে সিদ্ধেশ্ববাবুব দিকে তাকালুম।

—'সে মুখ আপনি তৈবি কবে দিলেন?'

—'আধঘন্টাব ভিতবেই। শুধু আশ্চর্য বলেই—বা কি শৈলেন [...]

—'[..] যে কোনো একটা মুখ কেটে দেওযা যেতে পাবত। আমি বুঝি না কেন এবা এসব কবে না। দেশে কি মুখেব অসচ্ছলতা আছে কালিদাস আছে সুনীতি চাটুজ্জে, হেবম মৈত্র, কাননবালা এবা মবলেই [...] আমবা এখনো এদেব পাথবেব মূর্তি তৈবি কবতে পাবিনি, সে আমাদেব দুর্ভাগ্য কিন্তু, ছড়িব মাথায সব সমযই ইঁদুব বা বেড়াল না খুদে এদেব সৃষ্টি কবলে দেশেব ভেতব একটা মর্যাদা ফিবে আসে—সব সময এদেব হাতেব কাছেও পাওযা যায।'

দেবাজ থেকে চুরুটেব বাক্স বেব কবে বললেন—'আমি যে জুতো তৈবি কবব, তা ছুঁচলো বা থ্যাবড়া নাকেব একটা জিনিস, জিনিসমাত্র হবে না। ভালো জিনিস ব্যক্তিত্বেব পবিচয দেবে, এই সব মানুষেব মতো তৈবি কবতে হবে তাকে। নইলে সৃষ্টিব সুখ থাকে না।'

একটা চুরুট মুখে নিযে—'অবাক হযে ভাবছি কাব মতো হবে সে।'

—'কোনো মানুষেব মুখেব মতো হবে আপনাব জুতো এই বলতে চান?'

চুরুট জ্বালিযে—'হ্যাঁ'।

—'তাহলে?'

—'সে জুতো পায দিতে পাবব না সেকথা বলতে চাও? আমাব তা মনে হয না। ববং সে জুতো কোনো ব্যক্তিব নেই, তা পায দিযে বাস্তায বাস্তায ঘুবে বেড়াবাব মতো এমন অসাব কাজ আব থাকতেই পাবে না। যে কোনো সৃষ্টিই এক একটা অনুভবেব প্রতীক হবে, তা না হলে তা জিনিস শুধু, সৃষ্টি নয, জুতোটাব দিকে তাকিযে মনে হবে ডাইনিব নৃত্য দেখছি কিংবা বাবু বাজেন্দ্রপ্রসাদেব মুখেব দিকে তাকিযে আছি, অথবা নিঃশেষিত কামনাব থেকে কী কবে আর্টেব জন্ম হয কোনো ছিযাশি বছবেব বুড়ো আজও আমাব মুখেব দিকে তাকিযে সেই কথাই বলছেন—কিংবা কোনো বাঙালি অধ্যাপকেব মুখ ধ্রুপদবাগিনীব রূপও মাসিক আটশো টাকা মাইনে নিযে [..] জুতোব শোভা মাবাতে এসেছে।'

সিদ্ধেশ্ববাবু আমাকে একটা চুরুট দিলেন। 'জ্বালিয়ে নাও। নিজে হাতে আম.য একটা প্রেস তৈবি কবতে ইচ্ছা কবে। কলকব্জা সমস্ত নিজেব হাতে বানিয়ে সমস্ত যন্ত্রটাকে খাড়া কবে তুলতে ইচ্ছা কবে। কিন্তু একটা প্রেস একটা জানোয়াবেব মতো। কাগজে কাঠে নিজেব হাতে ছবি এঁকে যে আস্বাদ পাওয়া যায় একটা প্রেসেব আবহাওয়ায় এসে পড়লে সব ভুলে যেতে হয়। সন্ধ্যাব আকাশে গোলাপি ধোঁয়াব মতো হাবিয়ে যায় সব। প্রেসেব থেকে যে সব বই বেবিয়ে আসে সে সবেব ভিতব একটা বোমশ অস্বাস্থ্যকব গন্ধ পাই যেন, আমাব মন হয় যাবা কবিতা লেখে তাঁবা যেন নিজেব হাতেব পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখায়, তাই আমাব ভালো লাগে।'

—'কিন্তু কী কবা যায়—'

—'এ সম্বন্ধে আমাব খুব দৃঢ় ধাবণা আছে। কবি তাব হাতেব লেখাব পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাস্তায় বেবিয়ে যাবে। একটা গ্যাসপোস্টেব নীচে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে পড়ে শোনাবে।'

—'কিন্তু কেউ আসবে না।'

—'আমি যখন পড়ি তখন একটা ভিড় জমে যায়। কেউ শুনতে আসে, কেউ মজা দেখতে, কেউ ঠাট্টা কবে, কেউ থুতু ছিটোতে চায়। কিন্তু দেশনায়কেব চেয়ে কবি একটুও কম নয়। সেই তো মানুষেব নায়ক। সকলেব ভিতবে নেমে এসে সে তাব বহস্য প্রচাব কবে। সে যদি ঘবে কোণে বসে কবিতা লিখে বাংলাদেশেব মিনমিনে মাসিকপত্রিকায় পাঠায়, তাহলে এদেশেব রুচি কোনোদিনও তৈবি হবে না। ফুটবল আব উদয়শঙ্কব, বায়োস্কোপ আব শবৎ চাটুয্যে দেশটাকে কিনে বাখবে। জানালাব পিছনে যে আবো জানালা বয়েছে, পৃথিবীব ঘাস সে ঘাস শুধু নয় একটা পবিস্ফুট স্বাক্ষব, পাখিগুলো যে শিকাব কবে খায় তাব জিনিস নয়, যেই পৃথিবীকে আমবা কোনোদিনও চিনি না সেইখানেই যে তাদেব জন্ম ও জীবন, নীল অবণ্য, আকাশেব বড় বড় সাদা মেঘ, নীল আকাশ কোনো একটা অদৃশ্য ধূসব প্রাসাদে চাবদিকে [..] মতো এবা যে দিনবাত (যে এই সব) বয়ে গেছে একথা তাদেব বুঝিয়ে দিতে হবে।'

—'এসব কথা কোনোদিনও তাবা বুঝবে না, আপনি যে গ্যাসলাইটেব নীচে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েন এ নিয়ে ঠাট্টা কববে শুধু। কিন্তু আপনি অনেকদিন যে কোনো কবিতা লিখছেন না—'

—'লিখি, কিন্তু ছাপাই না।'

—'কেন?'

—'আমাব নতুন লেখা কবিতা নিয়ে আমি বাস্তায় কিংবা স্কোয়াবে অথবা কোনো ভিড়েব ভেতব গিয়ে পড়ে শোনাতে ভালোবাসি। কবিতা নাবীব মতো, পৃথিবীব সবুজ ঘাসেব মতো, সকলেব সমক্ষে উপস্থিত থাকা তাব দবকাব।'

—'আমাব মনে হয় কবিতাব একটা বই বাব কবলেই সে কাজ হয়ে যায়।'

—'তা হয় না। আমাদেব দেশেব [...] কি একটা পত্রিকা বেব কবে কবেই তৃপ্ত থাকেন। ভিড়েব সুমুখে এসে বাববাব নানাবকম অসাব কথা বলবাবও দবকাব বোধ কবেন না। তাঁবা নিজেদেব নেতা বলেন। কবিতা মানুষেব জীবনেব বাস্তবিক নেতা। তাব জীবনেব আশ্চর্য সত্যেব কথা মানুষকে এসে সে জানাবে না?

—'কিন্তু যেসব মানুষকে জানাবেন সেইসব মানুষ কোনো দেশেই এখনো তৈবি হয়নি। কবে তৈবি হবে তাও জানি না। আমাব কথা শুনবাব জন্য পৃথিবীব আদিকাল থেকেই বিস্তব কাজেব লোক পাওয়া যায়। বাজাবে বাজাবে তাদেব মাথা গুনে শেষ কবা যায় না। কিংবা ইদানীং আপনাকে কোনো স্কোয়াবেও তো দেখা যায় না। বাস্তায়ও দেখি না, বাগবাজাবেব একটা [..] নীচে আপনাকে মাসতিনেক আগেও পেয়েছিলুম—আজকাল—'

—'দেখবে আমাকে না দেখো আবেক জনকে দেখবে, বাস্তায় না দেখো তবুও বাস্তাব মানুষও তাব স্পর্শ পাবে। যাক চোখ খুলে গেছে—যে মিল দিয়ে কবিতা লেখে না শুধু তাব পাণ্ডুলিপি বাব বাব মানুষেব জীবনেব সামনে বড় বড় সাদা মেঘেব মতো নক্ষত্রেব মতো এসে হাজিব হবে।'

—'আপনি তাহলে কবিতা লেখেন আজকালও।'

—'কেন লিখব না? তোমাকে তো বললুম কাল বাতেও লিখবাব চেষ্টায় ছিলুম।'

—'আপনাব বয়স পঞ্চান্ন বৎসব হল।'

—'আমার বয়স আটান্ন।'

—'আমরা অনেকেই মনে করেছি আপনার কবিতা শুকিয়ে গেছে।'

—'তা তোমরা ভাবতে পার। তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

—'আপনার কোনো নতুন বই দেখছি না, বছর পাঁচেকের ভিতর কোনো পত্রিকায় আপনার কোনো কবিতা দেখছি বলে মনে পড়ছে না।'

—'এ দেশের বড় বড় পত্রিকাগুলো কবিতার পক্ষে গ্যাসলাইটের বৈঠকের চেয়েও ঢের অধম। ওসব কাগজে আমি আমার কবিতা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। বরং দু-একটা ছোট কাগজে— তোমরা সেসবের নামও শোননি কোনোদিন। মাসে মাসে আমি কবিতা ছাপাই। আমার সেসব কবিতা বড় কাগজগুলো উদ্ধৃত করে?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'আমার কাছ থেকে কোনো অনুমতি চায় না তো। আমার নতুন কোনো কবিতা যদি তারা উদ্ধৃত করে তাহলে তাদের নামে আমি [..] আনব।'

—'কেন্দ্রের থেকে আপনি এত সরে যাচ্ছেন কেন?'

—'সরে গিয়ে আমার রচনা ভালো হচ্ছে।'

সিদ্ধেশ্বরবাবু চুরুটটা দিয়ে দিলেন, আস্তে আস্তে জ্বালিয়ে নিলুম।—'কবিতার বই আপনি পাঁচটি বার করেছেন।'

মাথা নেড়ে—'না। চারটে। প্রথমটা বাংলা সাহিত্যের প্রেতাত্মারা এসে আমার জন্য লিখে দিয়েছেন, আমি নিজে লিখিনি। বাকি চারটার জন্য মানুষের কাছে ঈশ্বরের কাছে এবং আমার হৃদয়ের কাছে আমি ঋণী।'

একটু হেসে—'নারীর কাছে নন?'

—'নারী কি মানুষ নয়? আমি তো মনে করিনি সে পিশাচিনী কিংবা দেবী। কিন্তু তার রূপের সঞ্জীবতায় যখন সে হাজির হয় অনেক মানুষই পিশাচ হয়ে যায়—কিন্তু আমি তাকে আকাশের সাদা মেঘ নক্ষত্র বা ইন্দ্রধনুর মতো একটা আবহাওয়া বলে বোধ করি। সেই আবহাওয়ার ভিতরেই ঈশ্বর ও হৃদয়কে খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতা তার পর সৃষ্ট হতে পারে। কোনো কোনো সময় স্পষ্ট হয়।'

—'আপনি বলেছেন মানুষ নারী আপনার কাছে আবহাওয়া মাত্র।'

—'আমি গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কথা বলছি। এর আগে নারীর সৌন্দর্য আমাকে বড় ব্যথা দিয়েছে, ব্যথাই দিয়েছে শুধু। আমার চেহারার ভিতর কোনোদিন কোনো বিশেষত্ব ছিল না। সুন্দরী নাবীর সংস্পর্শে এসে নিজের রক্তমাংসকে শুযারের মাংসের রক্তের মতো মনে হযেছে তাই আমার। শুযারের চামড়াও কাদার মতো। যেসব দিন ছাইযের ভিতব জাফরান আগুনের মতো যে সব পুরুষের চেহারা সাধারণ সাংসারিক সচ্ছলেও যারা নিঃস্ব হীন কিন্তু তিক্ষ্ণ অর্ন্তদাহী মনন যাদের জীবনের প্রথম তিরিশটা বছর ঘোড়ার মতো শুযারের মতো মহিষের মতো বড্ড নির্মম বেদনার দিন কুযাশায কেটে যায তাদের।'

—'আপনার শেষ কবিতার বই বছরসাতেক আগে বেরিয়েছে—তারপর—'

—'না, আমাব শেষ কবিতাগুলো পাঁচদিন আগে বইযেব আকারে বেরিয়েছে।'

—'কই দেখিনি তো।'

—'দেরাজে একটা বাঁধানো খাতার ভেতর রযেছে সব।'

একটু চুপ থেকে এক আধ মিনিট চুরুট টেনে অবশেষে—'দিনের পর দিন আপনি কোলাহলের বাইরে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু এদেশে আপনার কবিতারও দাম ছিল। প্রায় সকলের উপন্যাসের চেয়ে আপনার কবিতার আর্থিক মূল্যও বেশি।'

—'তা জানি। কবিতা লিখি বলে এ পর্যন্ত কেউ আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মারেনি। থুথু ছিটালেও গায লেগেছে বলে টের পাইনি।'

—'আপনার খাতার কবিতাগুলো মাসিক পত্রিকায ছাপাবেন না?'

—'না।'

—'কোনো প্রকাশকের হাতেও দেবেন না?'

—'না।'

—'এগুলো নিয়ে কী করবেন তাহলে?'

—'এগুলো নিয়ে অনেকদিনই অনেক কিছু করা হয়ে গেছে—কিন্তু সেসব আর ঘরের ভিতরে আমার হৃদয় তা জানে। নারীর ভালোবাসা কোনোদিন পেয়েছি কিনা জানি না। কিন্তু সেজন্যেই হয়তো ভাষা ও অনুভবের ভালোবাসা আরো গভীরতরভাবে পেয়েছি।'

—'পেয়েছেন। এবার কবিতাগুলো ছিঁড়ে ফেলবেন?'

—'না। সে রকম কবি বিদেশে হয়তো কেউ জন্মেছিলেন, ছিঁড়ে ফেলতে পুড়িয়ে ফেলতে কবরের ভেতর লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে নিজের লেখা তারা। আমি সেরকম নই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশ মোটা বই বের করেছে। কয়েকবার নিউমোনিয়া হয়ে শরীরটা একটু কাহিল হয়ে গেছে, একটু সেরে উঠলেই এই কবিতাগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আবার। এবার কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাব ঠিক করেছি।'

—'আপনি তিনটি উপন্যাস লিখে সরে গেলেন কেন?'

—'সে আজ প্রায় বছর পনেরোর কথা। তারপর আর আমি কোনো উপন্যাস লিখিনি। চেষ্টাও করিনি।'

—'আপনার কোনো উপন্যাসেরই দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি বটে, তার জন্য দায়ী আমাদের দেশের রুচির মলিনতার দরুণ। কিন্তু একজন পাঠক আপনার কাছ থেকে গল্প শুনবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ভরে বসে আছে।'

—'গল্প যখন লিখতে আরম্ভ করি তখন আমার বয়স তিরিশ বছর। তারই বছরদুই আগে আমার বিয়ে হয়। পনেরোটি বছর স্ত্রী আমার জীবন অধিকার করে রাখে। আমার স্ত্রী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তিনখানা উপন্যাস আমি যে লিখতে পেরেছি এ জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমাদের। এমন বিশ্বাসের জিনিস তোমার দেখেছ আর?'

—'ত্রিশ বছরের সময় আপনি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। আপনার পঁয়তাল্লিশ বছরের সময় আপনার স্ত্রী মারা যান—'

—'কাগজে কাগজে সে করব রাষ্ট্র হয়ে গেছিল সেইসময়। আমি যাকে বাস্তবিক ভালোবেসেছি এমন কোনো নারীকে ওরা যদি ওরকমভাবে প্রচার করতে তাহলে আমি তৃপ্ত হতাম। আমার অনেক দিনের পুরোনো এক কুকুর ছিল—নাম জংলি, আমার ছায়ার মতো ছিল আহা' সে মরে গেল, পৃথিবী একটু টু শব্দ পর্যন্ত করল না। প্রেস একটা অতিশয় জঘন্য জিনিস।'

—'আপনার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের সময় আপনার স্ত্রী মারা যান, এই পনেরো বছরের ভিতর তিনখানা উপন্যাস লিখেছেন আপনি। আপনার-উপন্যাসের ভিতর দাম্পত্যপ্রেমের বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই, প্রেমেরই কোনো কথা নেই। আপনার স্ত্রী আপনার গল্প লেখায় বাধা দিল তবু?'

—'জংলি যদি আমার স্ত্রী হত আমার খানদশেক উপন্যাস তোমরা পেতে পারতে এতদিনে। উপন্যাস লিখবার একটা স্পৃহা ছিল তখন আমার। বিয়ে করেছ?'

—'আজ্ঞে না।'

—'তাহলে কি করে বুঝবে বাঙালির স্ত্রী কত রকম হতে পারে।' ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু—'আমি লিখতে বসলে তিনি খাতা টেনে নিয়ে চলে যেতেন।'

—'কেন?'

—'আমি লিখে রেখে যেতাম, এসে দেখতাম সব ছিঁড়ে ফেলেছে।'

—'আপনার স্ত্রীর কি কোনো অসুখ ছিল?'

—'তুমি বিয়ে করনি। স্বামী-স্ত্রীর কথা কিবা বুঝছে?'

—'আমার মনে হয়—'

—'তিনি বলতেন লেখাই তোমার নেশা, লেখাই তোমার বন্ধু, লেখাই তোমার সব। তুমি আমাকে বিয়ে করনি, বিয়ে করেছ তোমার কাগজ-কলমকে। তুমি আমাকে তেমন মেয়ে পেয়েছ, আমি এই সমস্তের মুণ্ডপাত করে তবে ছাড়ব।'

—'স্ত্রীরা এইরকম বলে নাকি?'

—'তারপর আমার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলেছেন তিনি। লিখতে বসলেই বিছানায় শুয়ে কপটভাবে

নয়—দুঃসাধ্য আন্তরিকতার সঙ্গে মুখ ফুলিয়েছেন কেঁদে কেঁদে। যে মানুষের হৃদয় আছে—সে হৃদয় যাকে কবিতা লিখতে সাহায্য করে এক রকম আবহাওয়ার ভিতর বসে একটি মেয়েমানুষের জন্য সে শুধু ব্যথা বোধ করতে পারে, লিখতে পারে না কখনো। আমি তার জন্য বড্ড কষ্ট পেতাম, আমার জন্য কষ্ট পেত জংলি। আমার অনেক সময়ই মনে হত জংলি যদি আমার স্ত্রী হত, আর স্ত্রী হত জংলি তাহলে মীমাংসা হয়ে যেত। কারণ দাম্পত্য কুকুরের কাছেও কোনো সমস্যার জিনিস নয়—কিন্তু আমার স্ত্রীকে সমস্যার কুয়াশায় কুয়াশায় দিনরাত আছাড় মারছিল।'

চুরুট আমার হাতে নিভে গেল।

—'আমার গলদ নশ্বর কাগজ-কলম, একটা কুকুর কি হৃদয় ছাড়া কেউ আর বুঝবে না। এ জীবনটা কাটাতে চাইলুম মননের মোহে আবিষ্ট হয়ে, মনের বীজ ছড়িয়ে ছড়িয়ে। আমার বিয়ে করা উচিত ছিল না। কিংবা এমন স্ত্রী যদি হত—

—'আপনার স্ত্রী জংলির চেয়ে আপনাকে একটুও কম ভালোবেসেছিল বলে বোধ হয় না।'

—'কিন্তু ভালোবাসার স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, সহিষ্ণুতা অপেক্ষা ক্ষমা, আমিও শিখিনি, আমার স্ত্রীও শেখেনি। কুকুরটাও জানত। কিন্তু—' সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন—'আমি যদি সাধারণ মানুষের হতাম, সেই স্ত্রীকে নিয়ে অনেক সন্তানের জন্ম দিয়ে একজন সমৃদ্ধ পিতামহের মতো জীবনটা উপভোগ করে যেতে পারতাম।'

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিলাম—'কিন্তু এরকম বেষ্টনের ভেতরে থেকে তিনটে উপন্যাস লিখলেনই— বা কী করে?'

—'সে আমার একটা বেশ সুস্থ সবুজ সংগ্রামের সময় গিয়েছে। শরীরের ভেতরে জেদ শুয়ারের মতো যেন, মন থেকে থেকে নক্ষত্রের আস্বাদ চায়। স্ত্রী টাকা চায়, কলকাতা চায়, সন্তান চায না। কখনো কড়ি খেলে তাকে ভুলিয়ে রাখতে হয়েছে। কখনো আমার চেয়ে বযসে ঢের ছোট বাঙালি লেখকদের শস্তা গল্প উপন্যাস পড়ে শুনিয়ে তাকে খুশি রেখেছি। কখনো ধার করে এনে টাকা দিয়েছি, কখনো তার রূপের প্রশংসা করেছি, আবার কড়ি খেলেছি, আবার কড়ি খেলেছি, মানুষের স্ত্রী সমুদ্রের মতো—' সিদ্ধেশ্বরবাবুর চুরুটটা [...] ওপব পড়েছিল, তুলে নিলেন।—'কিন্তু এরকম স্ত্রী নিয়েই সংসাবের মানুষ সুখী হয। প্রায় ঘরেই এইরকম মেয়েমানুষই দেখবে তুমি। কড়ি খেলা এসব কি কঠিন জিনিস, কিন্তু কবিতা। লিখতে লিখতে যদি কড়ি খেলবার জন্য উঠে আসতে হয, উঠে আসতেই হয, তাহলে বুঝতে হবে সাধারণ পৃথিবীর ভিতর কবি কি অসাধাবণ জীব, তার স্ত্রী কি গভীবভাবে সাধারণ।'

দু'জনেই স্তব্ধভাবে চুরুট টানছিলাম।

—'একটি অসাধারণ স্ত্রী হয়তো আপনি পেতে পারতেন, আপনার মতো সেও লেখে—'

—'কিছু না পাওয়া সবচেয়ে ভালো—'

—'কিন্তু এত গোলমেলের ভিতরেও তিনটি উপন্যাস আপনি কী কবে লিখলেন? আপনার উপন্যাসগুলি তো ষাট-সত্তর পৃষ্ঠার একটা ফচকেমি নয়, ববং এক-একটা উঁচু সবুজ মাথার গাছের কথা মনে করিয়ে দেয।'

—'চারটের সময ঘুমেব থেকে উঠে লিখতে বসতুম।'

—'আপনার স্ত্রী টের পেতেন না?

—'পেয়েও পেতেন না, সেটা তাঁব ঘুমোবার সময, ভালোবাসা নিয়ে খেলা করবার সময মোটেই নয়। নিজের দেহকেই আমরা সবচেয়ে ভালোবাসি। পাকা ঘুমের ভিতব দেহের আস্বাদ ভারী সবুজ—ঘন ঘাসের মতো রোমশ ও নিবিড় জিনিস। মানুষ মৃত্যুর শোকও ঘুমের ভিতর ভুলে যায।'

—'কতক্ষণ লিখতেন?

—'সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। তার ফোলা ফোলা গাল গোলাপি চোখের পিচুটি নিয়ে তাকে বিছানায় উঠে বসতে দেখেই আমি কলম সরিয়ে রাখতুম। সংসারের জন্য প্রস্তুত হতুম।'

—'একটি সাধারণ স্ত্রী হয়তো আপনি পেতে পারতেন।'

সিদ্ধেশ্বরবাবু ভুরু উচকে আমার দিকে তাকালেন।

—'যে আপনাকে বোঝে, সহানুভূতি করে—'

—'কিছু না পাওযাই সবচেয়ে ভালো।'

শান্ত স্থির সিদ্ধান্তের মতো কথা, আঘাত করল আমাকে।—'এমন অনেক নারী আছে পুরুষের প্রতিভাকে যারা সাহায্য করে।'

—'রেখা-উপরেখার সংগতি-অসংগতির মতো মানবিকতাও অনেক রকম রয়েছে, নেই যে তা তো আমি বলিনি।'

—'সে রকম একজন স্ত্রী পেলে—'

—'পেলে? আমি যা পাইনি সে কথা নিয়ে এখন আর গল্প চলে না' তোমাদের জীবনে তোমরা পেতে পার।'

—'আমার মনে হয় নারীদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা একটু কঠিন। বড় দুঃখের বিষয়, আপনার প্রতিভার গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিল সে। কিন্তু—'

—'নারীদের আমি চিনি খানিকটা। একটা দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার স্ত্রীর জন্য যতখানি দুঃখবোধ করি এমন আর কারু জন্যই না। শুধুই রূপই নয়, প্রেমই নয়, করুণারও দাম আছে আমাদের জীবনে। আমার মনে হয় প্রেমের চেয়ে তার সজীবতা একটুও কম নয়। এই হিসেবে আমার স্ত্রীর কাছে আমি খুব গভীরভাবে ঋণী। পনেরোটা বছর বসে আমাকে উপন্যাস লিখতে দেয়নি, কোন সন্তান সে রেখে যায়নি আমার জন্য, কিন্তু করুণার জন্ম দিয়ে গেছে হৃদয়ে। তার মৃত্যুর পর এই এত বছরের ভিতর অনেক আশ্চর্য কবিতা লিখতে পেরেছি তাই।' সিদ্ধেশ্বরবাবু—'তাঁর মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতাও আমি লিখিনি। আমার কোন কবিতায়ই বিষয়বস্তু তিনি নন। কিন্তু তবু তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে রূপ প্রেম সফলতা সব হারিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি, করুণা। একবার ট্রেনে থার্ড ক্লাসের গাড়িতে ঘুমিয়েছিলাম খুব শীতের সময়, অনেক রাত অন্ধকারের ভিতর হিম হয়ে ঝুলে রয়েছে। অনেক রূপসীর মুখ ভুলে গেছি, কিন্তু সেই রুলি আর হাত কোনোদিনও ভুলব না।'

দেরাজের ভিতর থেকে এক টুকরো কাঠ বের করে তারই ভিতর ছুরি দিয়ে খুদে খুদে একটি ছোট মেয়ের হাত আঁকতে লাগলেন তিনি। বুঝলুম সিদ্ধেশ্বরবাবু হৃদয়ের আবেগের ভিতর হারিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি এরকম লোক নন তো, পরিষ্কার পরিস্ফুট মননশক্তি, চিলের দৃষ্টির মতো তীক্ষ্ণ কথাবার্তা, তামাসা, ঠাট্টা, খানিকটা হৃদয়হীনতা, অনেক রকম অবিশ্বাস—কোথায় গেল সব? বয়স তাকে কাবু করেছে বলে মনে হল না। বরং অসতর্ক মুহূর্তে যেন তাঁকে ধরে ফেলেছি। শিগ্‌গিরই আর-একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করব সংকল্প করে উঠে দাঁড়ালাম।

তিনি আমাকে উঠতে দেখে—'এই কাঠের টুকরোটা নিয়ে যাও।'

—'কী আছে এর ভেতর?'

—'সেই ছোট্ট মেয়েটির হাত আর রুলি।'

—'এ দিয়ে আমি কী করব?'

—'হয়তো পাঁচ বছর পরে, হয়তো দশ বছরে কাজে লেগে যাবে একদিন। আজ তুমি রূপের পেছনে পেছনে ফিরছ। সেই রূপ দেখা দিয়েছে বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে পার্শী শাড়ি আর বিজাপুরী চটিচুতোর ভিতর। কিন্তু একদিন সব স্থির হয়ে গেলে, ভিজে চোখে দেখা দেবে সে। এই শিশুর হাতের দিকে তাকিয়ে বুঝবে। করুণার রূপ যেন প্রেমের চেয়েও গভীর।'

১৯৩৬

এক এক রকম পৃথিবী

আটত্রিশ বছব বযসে অবশেষে এই হল?

অবিনাশ সন্ধ্যাব সময বেড়াতে গিযেছিল আজ। এমন সে বোজই প্রায বেবোয। খানিকটা বাত কবে ফিবে আসে। কোনো আড্ডায যায না সে, কারু সঙ্গে যায না, ববং এও হতে পাবে অবিনাশকে সঙ্গে নিযে বেড়াতে বেবাব সুযোগ বা আকাঙ্ক্ষা কারু ঘটে ওঠে না। একাই বেড়াতে যায সে, একাই ফিবে আসে। তাব মনেব বেদনা অনেক । না স্টিক হাতে নিযে সে যাযনি। এ জীবনে স্টিক সে ব্যবহাবই কবল না। [..] কেবানিবাও আজকাল স্টিক হাতে নিযে বেড়ায, স্টিকেব মর্যাদা নেই আব।

বোজই যেসব আজও তেমনি একটা [...] পাঞ্জাবি গায দিযে বেবিযেছিল। পিঠেব দিকে কোথায একটু ছেঁড়া আছে অন্ধকাবে তা ধবা পড়ে না। বাঁদিকেব পকেটটাও ছিঁড়ে গেছে, সেখানে কোনো জিনিস না বাখলেই হল, কিন্তু ডান হাতেব আস্তিনেব কাছে যে খানিকটা ছেঁড়া মাঝে মাঝে হাত ঘুবিযে ফিবিযে দু-একবাব ঈষৎ আস্তিন গুটিযে সেটাকে সে ঢাকবাব চেষ্টাই কবছিল। না, গিন্নীকে এসব ছেঁড়াখোঁড়াব কথা বলতে যায না সে, বলে কোনো লাভ নেই। সেলাই সে কবে দেবে না। বড়জোব একটা নতুন পাঞ্জাবি কিনতে বলবে। কিন্তু অবিনাশেব পঞ্চাশ টাকা মাইনেব জ্যালজেলে চাকবিব জমিন নিযেই টানাহেঁচড়া কববে। একটা কুকুব যেমন ছেঁড়া তোষক নিযে খেলা কবতে ভালোবাসে, কখনো সেবকমভাবে, বুড়োমানুষ যেমন কার্তিকেব গোধূলিতে ছেঁড়া লেপেব দিকে তাকিযে বেদনা পায, কখনো-বা তেমনিভাবে—হাসি তামাসা আব কতক্ষণেব জন্য? কেউ কাউকে আঘাত কবতে চায না, পাবেও না আঘাত কবতে, ঈশ্ববই সকলকেই আঘাত কবছে। শেষ পর্যন্ত সকলেই বেদনাব সন্তান। অবিনাশ তাব স্ত্রীকে কোনো দোষ দেয না।

বেড়াতে বেবিযে অবিনাশেব পাঞ্জাবি বোজকাব মতন ঘেমে উঠল। পাঞ্জাবিব ভেতব থেকে দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে তাব নিজেব সাধাবণ স্বাভাবিক জীবনেব পবিচয পেতে লাগল সে।

হসপিটালেব পাশেব বাস্তা ধবে চলেছিল সে। হসপিটালেব বড় লাল বাড়িব ভিতবে দবজা জানালা খুলে আকাশ আলোব স্পর্শে যে সমস্ত বোগী লোহাব খাটেব ওপব শুযে থাকে অবিনাশ কি তেমনি শুযে থাকতে চায? মৃত্যুব সঙ্গে একটা সেতু তৈবি কবে নক্ষত্রেব ভিতব হাবিযে যেতে চায তাবপব?

বাস্তাঘাটেব এত অন্ধকাবেব ভিতব বেদনাবই জন্ম হয না শুধু নানাবকম কোমলতাবও সন্ধান পাওযা যায, কোথাও একদিন ইন্দ্রধনু আমাদেব জন্য অপেক্ষা কবছে, এই আশ্বাস পাওযা যায নাকি?

মুহূর্তেব ভিতব অন্ধকাবেব আবহাওযা বদলে যায তবু। কলেজেব দু'জন প্রফেসব চুরুট টানতে টানতে চলছিল, অবিনাশকে তাবা চিনেও চিনল না। ডেকেও জিজ্ঞেস কবল না। অবিনাশেব ক্লাসমেট হবিলাল সে আজ পিএসপি-ব সামনে দাঁড়িযে পুলিশ সাহেবেব সঙ্গে কথা বলছিল, অন্ধকাবেব ভিতব অবিনাশেব মুখকে মানুষেব মুখ বলেই গ্রাহ্য কবল না, হবিলালদেব হোহো-হিহিব সঙ্গে আকাশেব এক-একটা নক্ষত্রও যেন ভিমবি খেযে পড়ে, দামি চুরুটেব গন্ধ ভেসে আসে। অবিনাশেব বিবর্ণ পাঞ্জাবিব ঘেমো ইতব গন্ধ চাপা পড়ে যায। চুরুটেব গন্ধ, হবিলালদেব পৃথিবী, অন্ধকাবেব ভিতব এই সব রূপ ও জযেব আস্বাদ পৃথিবীব সবুজ ঘাসেব আস্বাদেব মতোই চমৎকাব নিবিড়।

—'কে, সবোজবাবু নাকি? লোকটা থমকে দাঁড়াল,—'ও অবিনাশবাবু, আমি ভেবেছিলাম—'

হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায বৃষ্টি পড়তে না পড়তেই যেন বৃষ্টিব সমস্ত ইশাবা নিস্তব্ধ হযে গেল, যেন লোকটাব গলাব স্বব এইবকম।

-'কী ভেবেছিলেন? কোত্থেকে আসছেন?'

[...] 'বাসায গিযেছিলাম।'

—'সেখানে—'

—'মাঝে মাঝে যাওযাব অভ্যাস আছে—মুদ্রাদোষ আব কি—চা খেলাম, একটা বাড়িব প্ল্যান তৈবি কবে আনলাম।'

—'বাড়ি? কার জন্য?'
—'এই গরিবের জন্যই। একটা বাংলো তুলব ভাবছি, কুঠিসাগরের দিকে।'
—'দাঁড়ান মশাই, চট করে [..] চড়ে বসলেন দেখছি।'
—'না না হাতে ঢের কাজ।'
—'এতক্ষণ তো [...] হাতে করেই হাওয়া খাচ্ছিলেন, সারাদিনের কাজের পর আবার কি ব্যস্ততা অবিনাশ?'
—'আবার দেখা হবে, চললুম।'
অন্ধকারের ভিতর [....] অদৃশ্য হয়ে গেল।
অবিনাশ চোখে দেখে কম, কিন্তু নিবিড় জলের ভেতর মাছের মতো অন্ধাকরের ভিতর অবিরাম লোকজন আসা-যাওয়া করছে।
—'বাঃ, একেবারে গায়ের উপরেই পড়েছিলেন আপনি—আপনি কেমন লোক—'
অবিনাশ একটু হেসে—'আমি বরং আলাদা জাতের মানুষ (মশাই) আমি—'
—'শিং ভেঙে গেছে বুঝি?'
—'শিং গজালই না' অবিনাশ একটু হেসে বললে।
—'সরে দাঁড়ান মোটর আসছে।'
—'আসুক, ও শালা নিজেই সরবে।'
শেষ মুহূর্তে তবু লোকটি পাশ কেটে সরে গেল।
—'কার মোটর?'
—'জানি না।'
—'সাহেব দেখলাম ভিতরে—'
অবিনাশ কোনো জবাব দিল না।
—'এক-একটা মোটর যখন ছোটে, মনে হয় যেন দু'দিকের রাস্তা পাখির মতো ডানা মেলে দিয়েছে—' অবিনাশ বললে। অন্ধকারের ভিতর অবিনাশের মনে হল সে তার অনুভূতিকে ছবির রূপ দিয়েছে।
—'আপনার মৃগী রোগ আছে নিশ্চয়ই' লোকটি হো হো করে হেসে ফেললে।
অবিনাশ মাথা নেড়ে—'না, তা নেই, আপনি ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, মোটর যখন ছোটে—'
—'থাক, থাক, মোটরে চড়েছেন কখনো?'
—'হ্যাঁ, চড়েছি, কিন্তু—'
—'বাসে চড়েছেন, মিথ্যে কথা বলবেন না, আমার আপনার জন্য এমন গাড়ি নয়।' লোকটি বিড়ি জ্বালিয়ে—'আমরা হয়তো একদিন মোটর চাপা পড়ে জন্ম সার্থক করতে পাবব।'
অবিনাশ মাথা নেড়ে—'আমার কোনো মোহ নেই।'
—'কার জন্য'
—'মানুষেব সভ্যতা শিক্ষাদীক্ষার ভিতর মোটরের কোনো স্থান নেই।'
—'আছে ছেঁড়া পাঞ্জাবী—'
পাঞ্জাবির ছেঁড়া আস্তিনটার দিকে অবিনাশ একবার তাকিয়ে দেখল, একটু হেসে বললে—'দম ছাড়বারও সময় নেই, মনে হয় যেন উড়ে চলেছে গাড়িগুলো, এমনই যায়। কিন্তু কী নিয়ে ব্যস্ত আমায় বলুন দেখি।'
অন্ধকারের ভেতর আচ্ছন্ন মাছের দৃষ্টি নিয়ে অপরিচিতের দিকে তাকাল অবিনাশ।
—'হয়তো ক্লাবে যাচ্ছে, দু'হাত ব্রিজ খেলবার জন্য কিংবা ক্লাবের থেকে ফিরছে—দু-গ্লাশ—'
দু'জন পল্টন হল্লা করতে করতে রাস্তা ভেঙে দয়িে চলছিল, অবিনাশের চোখের ওপব একবাব টর্চ ফেলে চলে গেল তারা। অবিনাশের পরিমাপ বা পরিচয় নেবার জন্য নয়, হৃদয়ের অবিরোধে তামাশায়, হযতো ফিরছে দু-গ্লাশ মদ খেয়ে। মানুষের জীবনের সমচেয়ে নিরেস ফিচেল জিনিসগুলো নিয়ে ব্যস্ত এই সব গাড়ি। 'পাখিও তো ওড়ে, অনেক সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়ে যায়, কিন্তু পাখির সঙ্গে একটা মোটরের পার্থক্য কোথায় জানেন?'
—'মশাইয়ের চাকরি করা হয় কোথায়? কোনোদিন মুখ দেখছি বলে তো মনে পড়ে না।'
—'পাখির প্রাণে নানারকম আশ্চর্য জিনিস রয়েছে, ধরুন প্রেম [নক্ষত্রের] নীচে নীড়ের শান্তি।'
—'মশাই বোধ করি কোনোদিন ফুটবল গ্রাউন্ডে যাওয়া হয় না?'

—'আজ্ঞে না। নক্ষত্রের নীচে নীড়ের শান্তি, এত শান্তি, এরকম আশ্চর্য প্রেম যে—যাদের গ্যারেজে মোটর রয়েছে তারা তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে না।'

—'কোনোদিন খেলা দেখতে যাননি?'

—'ফুটবল?'

—'চমৎকার খেলা হচ্ছে এবার—আজকের [...] যা খেলা হয়েছে কলকাতাযও ওরকম হয় না।'

অবিনাশ মাথা নেড়ে—'না খেলা দেখবার কোনো শখ নেই আমার।'

—'বসুন।'

—'কোথায়?'

—'একটু এগিয়ে চলুন, শানবাঁধানো বেঞ্চি রয়েছে।'

অবিনাশ মাথা নেড়ে—'বেঞ্চে বসে কী হবে—সারাদিনই তো চেয়ার টেবিল নিয়ে থাকি আমরা, এই তো ঘাস রয়েছে, এইখানেই বসা যাক।'

—'ঘাস? এ তো ধূলো জমে মশাই।'

—'ধূলো নেই, ঝরঝরে ঘাস, চোরকাঁটার ভয় আপনার?'

—'ঘাস ভিজে রয়েছে না?'

—'রুমাল দিচ্ছি আপনাকে, পেতে নিন।'

—'তাহলে আপনিই-বা বসবেন কী করে?'

পকেটের থেকে রুমাল বের করে লোকটির হাতে রুমাল তুলে দিয়ে—'ঘাস শিশির বৃষ্টি, এইসব আমি ভালোবাসি; কারু কাছে অন্ধকার শুধু কিন্তু আমার কাছে তা কেমন যেন একটা ধূসর বিস্তৃত বাড়ির মত।'

লোকটি বিড়ি টানতে টানতে রুমাল পেতে বসে পড়ে—'বুঝি না কিছু, আপনি কোন পৃথিবীতে থাকেন জানি না।'

ভিজে ঘাসের উপর অবিনাশ আগেই বসেছিল, বললে—'মনে হয় যেন একটা ধূসর বিস্মৃত বাড়িতে পালঙ্কের উপর শুয়ে আছি। নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ বিছানা, কিন্তু কে আমার জন্য পেতে রেখেছে আজীবন ঘুরে ঘুরেও তা জানা যাবে না, সেইখানেই রহস্য।'

—'অন্ধকার যদি মানুষের কাছে এত কথাই বলে—'

—'তা বলে, অন্ধকাবকে, আকাশকে নক্ষত্রকে নিস্তব্ধ হয়ে গ্রহণ করতে হয়।'

—'বিড়ি নিন।'

অবিনাশ মাথা নেড়ে—'আমি তামাক খাই না।'

—'ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে মামদ আলির গল্প করব।'

—'মামদ আলি! শওকত আলির ভাই তিনি তো?'

—'না না মহম্মদ আলির নাম শোনেননি?' কুঞ্জবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

আবিনাশ—'শুনেছি বইকী, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, এক সময় গান্ধীর খুব প্রিয় ছিলেন' [...]

ঘাসের উপর অবিনাশের পাশে আব-একজন লোক এসে বসল, রামজীবন তার নাম। রামজীবন বাঁধা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হেসে—'বলেন কি আপনি'—স্তম্ভিত হয়ে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে—'সাংঘাতিক লোক আপনি , মহম্মদ আলি হিঁদারামকে আপনি চেনেন না।'

—'হিঁদারাম? কোনোদিন শুনেছি বলে মন পড়ছে না।'

—'কলকাতায় কোনোদিন যাননি নিশ্চয়ই?'

—'অনেকবার গিয়েছি।'

—'গিয়েছেন? ট্রামে চাপা পড়লে আপনার সৌভাগ্যই হত সেটা। কিন্তু কোনোদিন মহিষের গাড়িব তলে চাপা পড়ে ফিবে এসেছেন?'

—'হিঁদারাম? অনেকদিন হয় কংগ্রেসেব খবর রাখি না।'

কুঞ্জবাবু বাঁধা দিয়ে বললে—'আ, এরকম বলছেন কেন আপনি, আমরা যার সঙ্গে কথা বলছি তিনি অন্য জাতের মানুষ, তাকে আস্তে আস্তে বুঝতে হয়।' বিড়ি টানতে টানতে কুঞ্জবাবু চোখেব ভিতব খানিকটা সহানুভূতির কুয়াশা সংগ্রহ করে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

রামজীবন—'আপনার নাম কি?'

—'অবিনাশ, অবিনাশ সেন।'

রামজীবন—'অীবনাশ সেন?' কুঞ্জবাবুর দিকে তাকিয়ে রামজীবন, 'তারপর অন্ধকার নদীর পারে

বসে আপনার বন্ধুকে মহম্মদ আলির পরিচয় দিচ্ছিলেন, আমি অবাক হয়ে ভাবি মিনু মালকমকে তিনি চেনেন? আশ্চর্য লোক আপনারা দু'জন। কোনো নক্ষত্রের থেকে নেমে এসেছেন নিশ্চয়। এ পৃথিবীর সঙ্গে কোনো কারবার নেই, আমারও অনেক সময় মনে হয় এরকম হলেই হত ভালো—আর কেন?'

কুঞ্জবাবু—'আমার বন্ধু ঠিক নয়।'

—'বন্ধু নন?'

—'হ্যাঁ, বন্ধু বইকী, কিন্তু এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় এখুনি হল। মিনিট কুড়ি আগেও এঁকে চিনতাম না। কিন্তু আপনার নাম রামজীবন না?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ফুটবল গ্রাউন্ডের চেনামুখ আপনি। চিনেবাদাম খান আর খেলা দেখেন, আপনার নামও আমার মনে আছে। নিকুঞ্জ—'

—'নিকুঞ্জ নয়, কুঞ্জ—'

—'একই কথা, একই মানে। কিন্তু কুঞ্জবাবু ফুটবল গ্রাউণ্ডে তো একরকম, কিন্তু ঘামের গন্ধে, অনন্ধকারের ভেতর আপনি সিংভূমের দেশের থেকে লোক ডেকে আলাপ করেন? কেমন নিস্তব্ধতা যেন চারদিকে, কেমন আড়ষ্টতা, বিড়িটা দিন, একটু সংসারের ভিতর ফিরে আসি—'

কুঞ্জবাবু বিড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে হেসে—'ফুটবল গ্রাউন্ডেই আপনি ভূত ছিলেন। এখানে ঘাম ও নক্ষত্রের ভিতর ধীরে ধীরে মানুষ হতে পারবেন।'

রামজীবন—'তা হবে, অবিনাশের সঙ্গে আপনার মিনিট কুড়ি পরিচয়?'

—'হ্যাঁ।'

—'তারপর তিনি আপনাকে [..] করে ফেলেছেন?'

—'কিছুই করেননি, আপনারও কিছু করবেন না। মাঝখান থেকে মহিষের গাড়ি আর গোরুর গাড়ির কথা বলে আপনি নিজেরই ক্ষতি করলেন।'

—'আমার মনে হয় সংসারের থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, কেমন যেন একটা ভৌতিক পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছি। এর জন্য কি পাকুড় গাছটা দায়ী? আর অন্ধকার? অন্ধকার নিস্তব্ধ বা কেমন! আপনারা দু'জনে পৃথিবীর মানুষ তো।'

কুঞ্জবাবু—'অন্ধকারকে আপনি পাকুড় গাছের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন, ভূতের সামনে হয় অন্ধকার। আপনি অত্যন্ত স্থূল মানুষ। অন্ধকার সম্বন্ধে অবিনাশ কী বলেন শুনুন।'

রামজীবন—'আমার বিড়িটা ফুরিয়ে গেছে।"

—'নিন, সমস্ত প্যাকেট দিচ্ছি।'

—'দেশলাইয়ের দরকার—'

—'হ্যাঁ খুব ভালো করে বিড়ি জ্বেলে নিন, মহম্মদ আলি হিদারামকে স্মরণ করুন, তারপর শুনুন—'

—'বলুন, অন্ধকার দেখলে অবিনাশের কী মনে হয়?'

—'অবিনাশ, অন্ধকার কারু করছে অন্ধকার শুধু, ঘুরে ঘুরেও তা জানা যাবে না।'

রামজীবন—'আপনারা পুরোনো বনেদি বংশের মানুষ।'

অবিনাশ মাথা নেড়ে—'না।'

—'আপনার ঠাকুরদা বেঁচে আছেন?'

—'ঠাকুরদা যখন মারা যান তখন আমি জন্মাইনি।'

—'আচ্ছা কুটি সাগরের পাশে যে একটা অনেক দিনের পুরোনো দরদালান পড়ে আছে আশেপাশে প্রায় বিশ কাঠা জমি নিয়ে সেটা কী আপনাদের?'

অবিনাশ একটু হেসে—'আমরা গরিব মানুষ, আমাদের কোনো জমিদারী নেই।'

—'আপনাদের বসতবাড়িটা কোথায় তাহলে?'

—'শহরের এক টেরে নওয়াজপুরে রাস্তার পাশে-'

—'একটু ভিতরে ঢুকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'খুব পুরোনো দালান?'

—'দালানটা অনেক দিনের বটে, এখন ভেঙে পড়ছে। অনেক শেফালিকা কামিনী ফুলের গাছ আছে বাড়িতে। লোকজন খুব কম সেদিকে। দিন ও রাতের নিস্তব্ধতার ভিতর কোনো প্রভেদ নেই। পায়ে চলার পথে প্রায়ই সাপ দেখা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে কামড়েছে বলে শুনিনি।'

—'সাপ মাবেন না?'

—'না, না, কেন? সুন্দব শবীব। পৃথিবীব রূপবতীদেব সঙ্গে তুলনা হয়। এবা বযেছে বলে পালঙ্কেব আবছাযাব নিস্তব্ধতা জমে ওঠে, কেমন একটা কামনাব জন্ম হয যেন।'

একটু চুপ থেকে বামজীবন—'ধূসব বিস্মৃত যাবা সেখানে আগে কি ছিল?'

—'বাবা ছিলেন, ঠাকুবদা থাকতেন।'

—'আপনাবা অনেককালেব মানুষ, এই শহবেব অনেকেব সঙ্গেই আমাব পবিচয—কিন্তু আপনাব মুখও কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

—'আপনি হযতো এখানকাব আদি বাসিন্দা নন?'

—'না, কিন্তু পুবোনো বাসিন্দা।'

—'ক-বছব আছেন এখানে?'

—'দশ বছব।'

অবিনাশ একটু হেসে—'কিন্তু আমাব জীবনে কত দশ হাজাব বছব নওযাজপুবেব বাস্তাব বাড়িটাব ভিতব কাটিযে দিচ্ছি।'

শুনে দু'জনেই চমকে উঠল।

—'দশ হাজাব বছব?'

—'এমন এক-একটা দিন আসে বামজীবন সকাল থেকে বাত গভীব পর্যন্ত যাব পবমাযু দশ হাজাব বছবেব কম নয।'

বামজীবন—'আপনি কে? আমবা ঠিক বুঝতে পাবলাম না।

কুঞ্জ ও বামজীবন বড় সহজেই আড়ষ্ট হযে পড়েন—বামজীবন—'মানুষ নন অবিনাশ। তবে আমাদেব মতো মানুষ নন।

একটা বিড়ি জ্বালিযে নিযে কুঞ্জ—'অবিনাশকে আস্তে আস্তে বুঝতে হয।'

—'বাত ক'টা হল?'

—'বেশি হযনি। পাকুড়গাছ আব ভূতেব থেকে ঢেব দূবেব পৃথিবীতে বসে কথা বলছি বামজীবন। ববং আমবা নক্ষত্রেব নিকটে।

বামজীবন সন্দিগ্ধ, কেমন আক্রান্ত হযে যেন অন্ধকাবেব দিকে তাকিযে বইল।

কুঞ্জবাবু—'আমাদেব এই পৃথিবীই অনেক পৃথিবীব জন্ম দেয। সাধাবণত মানুষ বৌদ্র আলো কলববেব একটা পৃথিবী নিযে দিন কাটিযে যায। কিন্তু অবিনাশ এই পৃথিবীব হাত ছেড়ে দিযে—আবেক পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছেন, সেই পৃথিবীব জানালাব ভিতব দিযে তাকিযে দেখতে হলে কৌতূহল দূবে বেখে আসতে হবে, আনতে হবে জীবনেব আচ্ছন্নতা। ধূসব পুবোনো বাড়ি যে কিছুতেই ছাড়তে পাবে না, কপসী সাপিনীব আসা-যাওযা যাব পালঙ্কেব স্বপ্ন জমায তাব কামনা ও প্রেম ভিন্ন জাতীয। সে আলাদা পৃথিবীব মানুষ।

বামজীবন—'এ পৃথিবীব ভিতবেও পৃথিবী পেঁযাজেব খোসাব মতো।' অবিশ্বাস ও বিশ্বাসেব সঙ্গে সে খানিকটা ধোঁযা ছাড়ল।

অবিনাথ—'পৃথিবী নওযাজপুবেব বাস্তায একটা জীর্ণ বাড়িব ভিতব?

কুঞ্জ—'সেখানে অনেক পুবোনো শেফালিকা ও কামিনী গাছ আছে।'

বামজীবন—'পথেঘাটে অনেক সাপিনী থাকে।'

কুঞ্জ—'আব বযেছে ধূসব দেওযালেব আবছাযাব ভিতব একটা পালঙ্ক—'

বামজীবন—'কিন্তু এসব আমাব মনেব ওপব কোনো ছাপ ফেলে না।'

কুঞ্জ—'তা ঠিক। ওবকম একটা বাড়িতে অনেকে টিকতেই পাবে না। কিন্তু—'

বামজীবন—'আমি কী চাই, আমি জানি। প্রথমে বাড়িব সাপগুলোকে আমি মেবে ফেলতাম।'

অীবনাশ শিউবে উঠল।

বললে বামজীবন—'পৃথিবীব বৌদ্রে বৌদ্রে অস্থিব হযে ঢেব বেড়িযেছেন আপনি, আজও বেড়াচ্ছেন, কতকাল বেড়াবেন তা আমি জানি না, শুধু নির্জন বাড়ি নয, মনেব নির্জনতা যদি একবাব পেতেন, তাহলে এবকম কথা কি কবে আব বলতে পাবতেন আপনি?'

কুঞ্জ—'কিন্তু এসব কথা থাকুক, এক একজনেব এক একবকম পৃথিবী, আলোব ভিতবেও সাপ খেলে আমবা ভয পাই, অবিনাশ অন্ধকাব বাতে তাদেব রূপেব ছাযায বসে প্রেম ও কামনাব ব্যবহাবে আশ্চর্য সাহস পান।' একটা বিড়ি জ্বালিযে নিযে কুঞ্জ—'আমাদেব সংসাবেব ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত স্থূল

কৌতূহলেব মতন, কিন্তু অবিনাশেব কামনা বৈষযিক কৌতূহলেব চেযে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। অবিনাশ যে রূপসকিে চিনেছেন সে সুন্দবী সাপিনী হযে হাজাব বছব অন্ধকাবে খেলা কবে বেড়ায—যে সাপিনীকে তিনি তাকিযে দেখেন মুহূর্তেব ভিতবেই রূপসী নাবীব মতো অবিনাশেব ধূসব পালঙ্কেব কাছে জড়িযে থাকে, আমাদেব জীবনেব সম্পূর্ণ রূপান্তব তাহলে এসব আমবা বুঝব না কিছু —' খানিকটা বিড়ি টেনে কুঞ্জ —'এক একজনেব এক এক বকম পৃথিবী।'

কেউ কোনো কথা বলছিল না।

কুঞ্জ—'যাব যাব পৃথিবীতে মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিন। থাবা মেবে লাভ কি? আনন্দ নিযেই তো জীবন—'

বামজীবন মাথা নেড়ে—'সেই ব্যথা অস্বীকাব কবে—'

কুঞ্জ—'কেউ-বা ধূসব পালঙ্কেব গন্ধে স্বপ্ন দেখে, কেউ-বা মহম্মদ আলিব খেলা দেখে আনন্দ পায।'

অবিনাশ—'মহম্মদ আলি খেলোযাড় তাহলে?'

—'হ্যাঁ এই শহবেবই সবচেযে নামজাদা খেলোযাড়।'

—'ও' বলে অবিনাশ মুহূর্তেব মধ্যেই মহম্মদ আলিকে অন্ধকাবেব ভিতব হাবিযে ফেলল।

কিন্তু বামজীবন—'শুধু খেলোযাড়ই নয, চাকবিও কবে ভালো।'

আবিনাশ যেন স্বপ্নাবেশেব থেকে উঠে—'কে?'

—'মহম্মদ আলিব কথা বলছিলাম, খেলাব নাম কবেই চাকবি পেযেছে।'

—'চাকবি পেযেছে?'

—'সে কি আজকেব কথা' বিটাযাব কবাব সময হল।'

—'বুড়ো মানুষ?'

—'বযস হযেছে কিন্তু বুঝাবাব জো নেই। বাঘেব মতো চেহাবা।'

অবিনাশ অন্যমনস্কভাবে—'এক এক জনেব চেহাবা বাঘেব মতো থাকে।' বলেই মনে হল অবিনাশ সে নিজে এই কথা বলেনি, বামজীবনেব হৃদযেব ভিতব থেকে এই কথাগুলো অবিনাশেব জিভেব ওপব উঠে এসেছে।

আবাব জিভেব ওপব উঠে এল—'মহম্মদ আলি কী কাজ কবে?'

—'দাবোগা।'

অবিনাশ—'দাবোগা।'

—'দাবোগা।'কুঞ্জ বললে।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা।

বামজীবন—'আপনিই-বা কী চাকবি কবেন অবিনাশ'

—'কে? আমি? অবিনাশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে—'সাযেব সাগবেব পাশে ওই যে পুবোনো দালানবাড়িটাব কথা বলেছিলেন আশেপাশে যেটাব কুড়ি পঁচিশ কাঠা জমি—'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

—'আপনি জানেন নিশ্চযই সেটা কাব দালান?'

—'না, জানি না তো, কাব?'

—'[উইলসন] সাহেবেব।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা কোন একটা সাহেবেব বাড়ি তা আমি জানি, তা আমি অনেকদিন শুনেছি। কিন্তু বাড়িটাব বাইবেব চেহাবা এমন বিমর্ষ, ছাদে দেযালে এত ফাটল, ইটেব ভিতব এত অশ্বত্থ আগাছাব চাবা, চাবিদিকটা এমন নির্জন যে আমি অনেকদিন থেকে ভেবে এসেছি যে ওটা পোড়োবাড়ি।'

—'পোড়ো নয, [উইলসন] সাহেব এখনো ওখানে আছেন।'

—'কিন্তু [উইলসন] কে আবিনাশ?'

—'আজকাল অনেকেই তাঁকে চেনে না। কিন্তু তিনি একসমযে সবকাবেব খুব বড় চাকুবে ছিলেন।'

বামজীবন—'পুলিশ ডিপার্টমেন্টে।'

কুঞ্জ একটু হেসে—'বামজীবন বলতে চান উইলসন সাহেব মহম্মদ আলিব মতো দাবোগা ছিলেন কিনা।'

অবিনাশ আকাশের একরাশ তাবাব দিকে তাকিযে— 'না, তিনি শিক্ষা সম্পর্কে খুব বড় কাজ কবতেন।'

বামজীবন —'কৌতূহল অনেকটা ঠাণ্ডা হযে গেল।'

—'তাবপব মাস্টাবি ছাড়লেন যে?'

—'বয়স হয়েছে ঢের।'

—'ওখানে আপনার কীই–বা চাকরি?'

—'প্রথমে আমি তাকে বাংলা শেখাতাম।'

—'কত মাইনে দিতেন?'

—'মাইনে বেশি কিছু নয়, তিরিশ টাকা।'

রামজীবন একটা হাই তুলে বিড়ি জ্বালিয়ে—'জীবনটা আমাদের একটা গোলকধাঁধা; কতকগুলো সাপ নিয়ে একটা ভাঙা দালানে দিন কাটানো, একটা ভুতুড়ে বাড়ির বুড়ো মাস্টারমশাইকে বাংলা শেখানো, পাঁচ মিনিটের জন্য আপনার সঙ্গে যদি জীবনটা বদলাবদলি করি অবিনাশ, আমি কাঁপতে কাঁপতেই মরে যাব।'

কুঞ্জ বাঁধা দিয়ে—'এক এক জনের এক এক রকম পৃথিবী, কেউ তিরিশ টাকা মাইনে পায়, কেউ তিনশো টাকা, কেউ দারোগাগিরি করে আনন্দ পায়, কেউ মাস্টারিতে, কেউ—বা ধূসর দেয়াল, কতকগুলো সাপ কামিনী গাছের রাজ্য ভালোবাসে, কেউ নতুন বাজারে বেশ্যাবাড়িব আওতায় পড়ে না থাকলে ঘুমোতেই পারে না, রামজীবন দেশলাইটা দিন।'

অবিনাশ—'উইলসন সাহের বাংলা শিখে গেছেন।'রামজীবন—'আপনার চাকরিটা তাহলে খসে গেছে? অবিনাশ মাথা নেড়ে—'না।'

—'আছে চাকরি এখনো? [..] হিসেবে? কতকগুলো বুড়ো ফিরিঙ্গি থাকে বৈষয়িক বুদ্ধির এক-একটা জবড়জঙ্গ জাহাজ।' রামজীবন অন্ধকারের গায় ঠাট্টা জ্বালিয়ে হাসতে লাগল।

—'না [...] নয়, উইলসন অনেকদিন হয় পাদ্রী হয়েছেন, তার বাছা কতকগুলো ইংরেজি বইয়ের বাংলা অনুবাদ করতে হয় আমায়।'

রামজীবন—'তাহলে অফিস আপনার এইরকম?'

—'এক একজনের এক এক রকম জীবন।'

—'সাপে কেটে যখন একদিন জীবন ঠাণ্ডা করে দেবে তখনই আত্মা শান্তি পাবে।'

কুঞ্জ বাঁধা দিয়ে—'এক এক জনের এক এক রকম পৃথিবী।'

—'তা ঠিক, এই পৃথিবীর মাটিতেই সোনালি বাসমতী ধান জন্মায়, মাইলের পর মাইল আখের খেত ছড়ানো থাকে, আবার বিড়াল আচড়াও জন্মায়—' কুঞ্জ—'মাটিব এই অদ্ভুত মর্মের কথা কেউ বুঝতে পাবে না। মানুষেব জীবনেও সেই রকম। কিন্তু আমার মনে হয় অবিনাশের জীবন এই পৃথিবীব মাটির ভিতর পাড়াগাঁর কিনাবে নীল বেতলতার মত।' অবিনাশের দিকে তাকিয়ে কুঞ্জ—'মাঝে মাঝে সাদা চামড়াব ছোট ছোট ফলের জন্ম দেয়, খোসার ভিতবে তাদের স্থান, ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ সাপ লুকিয়ে থাকে।'

বামজীবন মাথা নেড়ে [...]

অবিনাশ বললে—'আমাব মনে হয় আষাঢ়ের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় আমাদের ধূসর বাড়ির একটা কামিনী গাছের জন্ম যদি পেতাম, ঝিনুকের মতো ম্লান সেই জ্যোৎস্না, পৃথিবী ভিজে উঠছে, কামিনী গাছ ভিজে যাচ্ছে ঝিনুকের মতো ধূসর খইযের মতো কোমল বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় কামিনীর ডালপালার ভিতর ব্যথিত পাখির মতো খচখচ করছে কোথাকার কে যেন এক গোখুরা নারী—'

—'বয়স তার কত?'

—'হাজার বছর পৃথিবীতে কাটিযে দিয়েছে সে, কিন্তু মনে হয় যেন ঝিনুকের মতো ধূসর জ্যোৎস্নার রূপ তার এই প্রথম জন্মাল।'

কুঞ্জ—'দেখলে? মানুষীর দেহ ধারণ করল সে?'

অবিনাশ—'কিংবা মানুষী রূপসীকেই আপনি গোখুবা বলছেন।' অবিনাশ একটু হেসে—'আমি কি বলব, আপনারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে নেবেন।'

দু'জনেই নিস্তব্ধ হয়ে বিড়ি টানছিল।

কুঞ্জ—'হাজার বছর পৃথিবীতে খেলা করছে সে? পৃথিবীর সবচেয়ে ধূসরতম জীব সে তাহলে। কিন্তু তবুও পৃথিবীর সবচেয়ে সজীব রূপসীর চেয়েও সজীব সে।'

অবিনাশ— 'কিন্তু তবুও হৃদযের গভীর ধূসর আঘ্রাণ তার।'

রামজীবন—'একদিন আষাঢ়ের জ্যোৎস্নায় কোনো এক পুরোনো নির্জন বাড়ির পালঙ্কে শুয়ে কোনো এক সাপিনীকে দেখতে হবে আমায় অবিনাশ।'

—'দেখা যদি পান, জীবনের সমস্ত রহস্য ধরে ফেলতে পারবেন।'

বামজীবন আস্তে আস্তে—'থাক, আপনিই দেখবেন, সকলেব পৃথিবীই এক নয়। আমাব মনে হয় কথা বলতে বলতে সংসাব ছেড়ে অনেক দূব চলে এসেছি। চলুন আবাব বিষযেব ভিতব ফিবে যাই। একটা বিড়ি নিন। মহম্মদ আলিব কথা হোক। সেই সাহেবকে আপনি কী বই অনুবাদ কবে দেন?'

—'ধর্মতত্ত্বেব বই-ই বেশি।'

—'সাহেব তো বুড়ো খুব।'

—'হ্যাঁ, বযস প্রায সত্তব।'

—'ফিবিঙ্গি?'

—'না, আইবিশ।'

—'বিলেত যায মাঝে মাঝে?'

—'ক্বচিৎ।'

—'মেম কোথায?'

—'অনেকদিন হয মাবা গেছে।'

—'ছেলেপুলে নেই?'

—'তিনটে ছেলে ছিল, যুদ্ধে মাবা গেছে সব।'

—'বাড়িটাও তো মৃত, ওটা তো বাড়ি নয, যেন এক প্রেতাত্মা, কিংবা আপনাব সাপিনী। আষাঢেব জ্যোৎস্নায উইলসন সাহেবেব প্রাসাদেব দিকে তাকালেও সংসাব ভুলে যেতে হয।' বামজীবন মুখ তুলে অবিনাশেব দিকে তাকিযে—'কথা বলতে বলতে আমবা সেই জাযগাযই এসে পড়লাম।'

—'সাবাদিন-বাত সংসাবেব অলিগলিতেই পালিযে পালিযে বেড়াবেন, তা কি হয বামজীবন, মাঝে মাঝে অবিনাশেব মানুষেব সঙ্গে দেখা হযে যায—আষাঢে চাঁদেব আলোয অনেক গভীব বাতে উইলসন সাহেবেব প্রাসাদও একদিন আপনাকে দেখা দিযে যাবে, ফাঁকি দিযে সবে যাবাব জো নেই, আমাদেব কারুবই নেই।'

খানিক্ষণ কেমন একটা অস্পষ্ট শূন্যতা নিস্তব্ধতাব পব বামজীবন—'আপনি কি বিযে কবেছেন অবিনাশ?'

কুঞ্জ—'সাপিনী যাকে অধিকাব কবে নিযে গেছে, পৃথিবীব নাবী দিযে তাব কী হবে?'

—'আমি বিযে কবেছি।'

—'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি কবেননি।'

—'কেন?'

—'এই অন্ধকাবেব ভিতবেও দেখলাম আপনাব পাঞ্জাবিব তিন জাযগা ছেঁড়া—আমাদেব ঘবেব বউ হলে ছিড়বাব আগে বিফু কবে দিত, কিন্তু আপনি সাপিনী নিযে ঘব কবছেন কিনা।'

কুঞ্জ—'অবিনাশ ঘুবেফিবে সেই সংসাবেব কথাযই আসেন।'

—'আপনাব স্ত্রীও হয়তো আপনাব মতো, ধূসব পুবোনো বাড়িব ভিতবে বসে কোনো সর্পবাজেব স্বপ্ন দেখছেন।'

অবিনাশ মনেব আমোদে চমকিত হযে বামজীবনেব মুখেব দিকে তাকাল।

—'হযতো কোনো সর্পবাজ কোনো অজগবেব জন্য হাজাব হাজাব বছব এই পৃথিবীব কিনাবে অপেক্ষা কবে বযেছেন।'

—'তা হবে, আশ্চর্য নয কিছু।'

—'হযতো আষাঢেব জ্যোৎস্নায কোনো কার্তিকেব কুযাশা মাখানো কোনো গোখুবা দিঘিব জলেব ভিতব থেকে তিন হাজাব বছবেব পুবোনো ঝিনুক কড়িব গন্ধেব সঙ্গে জেগে উঠে আপনাব স্ত্রীকে নিযে অন্ধকাবেব ভিতব হাবিযে যাবে।'

অবিনাশ—তা আশ্চর্য নয কিছু।' অবিনাশ বুঝতে পাবল তাবই হৃদযেব কথা বামজীবনেব জিভেব ভেতব থেকে বেবিযে আসছে। —'আপনাব মনেব ভিতব মাঝে মাঝে এইবকম সব ছবি যদি জেগে ওঠে—জলকে শুধু জল বলেই যদি না মনে হয, ঝিনুক কড়ি কার্তিকেব কুযাশা সাপ, মেয়েমানুষ এরা নিবর্থক বস্তুই সৃষ্টি কবে না শুধু, একটা অদ্ভুত আত্মীযতা সূত্রে মনেব ভিতব ধবা দেয। প্রেম ও অশান্তিব জন্ম দেয, বেদনা ও স্বপ্নেব। তাহলে আপনি নিজেই একদিন দিঘিব জল হযে যাবেন। ঝিনুক, কড়ি, মেযেমানুষ, অজগব, এ পৃথিবী ছেড়ে আব-এক পৃথিবীতে চলে যাবেন। কিছুতেই আব ফিবে আসতে চাইবেন না।'

১৯৩৬

বাইশ বছর আগের ছবি

যেমন বোজই হয আজও খানিকটা বাত কবে দ্বিজেন বাড়ি ফিবল। বেড়াতে যায়নি সে, কোনোদিন সে বেড়াতে যায় না। গিয়েছিল যেমন বোজকাব ছেলে পড়াতে।

অন্ধকাবেব ভিতব চিতাবাঘেব অনুভূতি নিয়ে সে সমস্তটা পথ হেঁটে এসেছে, কিন্তু নিজেব ঘবে চৌকাঠে এসে হুচোট খেল। একটা সেগুন কাঠেব খুঁটি অন্ধকাবেব ভিতব অন্যায়ভাবে তাব সঙ্গে বল পবীক্ষা কবে নিল। হুমড়ি খেয়ে ঘবেব ভিতব এসে যখন সে পড়েছে, মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঝোড়ো সমুদ্রেব তাড়া খেয়ে সিদ্ধ মাংসেব মতো দুঃসাধ্য ঘুবপাক খাচ্ছে, অন্ধকাবেব ভিতব ঝটাপট ডানাব শব্দও পাওয়া যায় যেন তাব, পাওয়া যায় পালকেব আশ্চর্য দুর্বিষহ গন্ধ। বাইবেব ঘবে কোনো বাতি নেই। লণ্ঠনটাও কেউ আজ জ্বেলে বাখেনি। পটেশ্বরী কোথায়? এই অন্ধকাবেব ভিতব কোথায় যে সে আছে তা মনেই হয না। চাকবটাবও কোনো সাড়াশব্দ নাই।

মাথা গবম কবতে গেল না, হয়তো কোথাও তাবা চলে গিয়েছে, হয়তো কোথাও কোনো কাজেব তাড়া ছিল, যাবাব সময বাতি জ্বেলে বাখতে ভুলে গেছে। এইবকম হয নাকি? একদিন অবিশ্যি দ্বিজেনেব বক্ত খুব সহজে গবম হয়ে উঠত, কিন্তু সেসব দিন, সেই দুর্বিনীত দিনগুলো অনেকদিন হয হাবিয়ে গেছে। সে যেন আবেক জীবনেব কথা।

দ্বিজেন একটা চেয়াব টেনে বসে স্বাভাবিক নবম সুবে ডাক দিল 'প্রিয়নাথ', আবো দু-চাব-বাব খানিকটা গলা চড়িয়ে ডেকেও যখন কোনো জবাব পাওয়া গেল না, তখন দ্বিজেন অন্ধকাবেব ভিতবেই খুঁজে এনে শ্লিপাব পায দিল, জুতোব ফিতে খুলে নিল। জামা ছেড়া ঘবেব কিনাবে একটা টাঙানো দড়িব ওপব ঝুলিয়ে দিল, অন্ধকাবেব ভিতব হাতড়ে হাতড়ে একটা পাখা খুজে নিয়ে চেয়াবে গিয়ে যখন বসল, আবাব শোনা গেল বাবান্দায কে যেন নাক ডাকাচ্ছে। নিজেব মনে নির্জন আবেশ যখন দুঃখেব মতো নয, বেদনাব মতো নয, কেমন যেন তামাশাব মতো, পড়ে পড়ে প্রিয়নাথ ঘুমুচ্ছে বাবান্দায। একটা চুরুট জ্বালানো যাক। আষাঢেব বাতে কি দুবন্ত গবম। দার্জিলিঙে একটা চাকবি পাওযাব কথা ছিল, সে আজ চোদ্দ বছব আগেব কথা—নিজে ইচ্ছে কবেই নেযনি দ্বিজেন। সেখানে গেলে আজ বাতেও বেশ শীত অনুভব কবা যেত। গাযে সোয়েটাব চড়াতে হত আজ বাতেও হয়তো। প্রিয়নাথটা নাক ডাকাচ্ছে—দ্বিজেন যদি দ্বিজেন না হত, তাহলে সে বাতে প্রিয়নাথ হত। চিন্তা কল্পনা শেষ মুহূর্তে ফাঁকি দেয মানুষকে—শেষ পর্যন্ত বক্তমাংসেব শান্ত ব্যবহাব দিয়েই জীবন

—'প্রিয়নাথ।'

কোনো জবাব নেই।

দ্বিজেন আবো একটু গলা খাকবে ডাক দিল—'ও প্রিয়নাথ!'

অন্ধকাবেব ভিতব কোনো উত্তব এল।

—'প্রিয়নাথ!'

না, উঠবাব কোনো লক্ষণ নেই।

থোক থোক পর্বতেব কুয়াশাব ভিতব তৃপ্ত হয়ে পড়ে আছে যে, মিছেমিছি পৃথিবীব বেদনাব ভিতব তাকে ডেকে এনে কী লাভ?

লণ্ঠনটা জ্বালালে হয।

লণ্ঠনটা যে কোথায আছে অন্ধকাবেব ভিতব টেব পাওয়া যায না কিছু, একবাব তাকিয়ে দেখল চাবদিকে, ঘবেব ভিতব দু-একটা জোনাকি উড়ে এসেছে, অন্ধকাবেব শান্ত নিরুপাযতায চুরুটেব মুখে আগুন একটা পশুব চোখেব মতো। অবণ্যেব নির্জনতা, গাছেব অজস্র ছাযাব কথা মনে কবিয়ে দেয। নিম ও পলাশেব ডালপালাব ফাঁক দিয়ে কয়েকটা তাবা সোনালি বুদবুদেব মতো চাঁদ আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে।

মেয়েটাকে একা ফেলে চলে গেছে পটেশ্বরী। মশাবিটা ফেলে যাযনি। চুরুটটা আস্তে আস্তে

শেলফের ওপর রেখে মঞ্জুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। পাঁচ বছরের মেয়ে, কিন্তু খানিকটা অস্পষ্ট ডানাও গজায়নি এখনো যেন, নীড়ের ভিতর নিঃসহায় গুটিপোকার মতো ছোট্ট মেয়েটি। সমস্ত শরীরে একটি জামা বা জাঙ্গিয়া কিছুই নেই, মাংসের পরিমাণও ঢের কম, হাড়ও খড়গোশ ছানার মতো কচি, কাঁথা একেবারে ভিজে গিয়েছে।

কাঁথা বদলাতে গিয়ে দেখল অন্য কোনো কাঁথা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পটেশ্বরীর একটা ময়লা শাড়ি আলনায় ঝুলছে, মঞ্জুর কাঁথার কাজ তা দিয়ে চালিয়ে দিতে পারা যায় বটে, কিন্তু পটেশ্বরীকে চেনে দ্বিজেন, ওয়েলক্লথটা ভিজে কাঁথার এক কিনার দিয়ে মুছে নিয়ে নিজের পাঞ্জাবিটা পেতে দিল। মেয়েটার গায়ে চাকা-চাকা কীসব দাগ, মশায় কামড়েছে হয়তো, কিংবা গুঁড়ি পিঁপড়া, রক্তের দোষও হতে পারে। বাবা-মায়ের রক্তেই কোনো অপরাধ এই মিশুর ভিতব সংক্রামিতো হল কি?

মশারিটা ফেলে দিয়ে দ্বিজেন শেলফের পাশ ফিরে এল আবার। চুরুটটা নিভে গিয়েছে—না, থাক, জ্বালিয়ে দরকার নেই আর।

পটেশ্বরী কোথায়? হয়তো পাড়ায় কোথাও গিয়েছে। কোথাও হবিসংকীর্তন শুনতে হয়েতো। আষাঢ়ের এই ঘর অবিশ্যি নিস্তব্ধ—কিন্তু চারিদিককাব বাতাসের ভিতর রৌদ্রময়ী পৃথিবীর গন্ধ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। সকলেব মতো পটেশ্বরী দিনের আলোব মানুষ। দ্বিজেন? রৌদ্র কোলাহলেব ভেতরেও তার মনের ভেতর কেমন যেন বড় বড় গাছের ছায়া খেলা করে। অনেকখানি নির্জন জল,তার পাশে নীল শান্ত বড় বড় গাছের নিস্তব্ধতা। চেযাবে বসে বসে কযেকটা তারিখেব কথা মনে পড়ল তাব।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে খোলা জানালা দরজার মুখোমুখি বসল সে।

উনিশশো চৌদ্দ সালে গ্রামেব এইচ এস স্কুলের হেডমাস্টার তাকে বলছে—'অত বঁইচির ফল খেও না দ্বিজেন, বাসায কি ভাত খেতে পাও না? ম্যাট্রিক পরীক্ষা যে এসে পড়ল।'

—'মাসদেড়েক এখনো বাকি আছে।'

—'দেড় মাস খুব বেশি সময নয দ্বিজেন, তোমর কাকার সঙ্গে কালই দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন, দুপুরবেলা তোমাকে বাড়িতেই পাওযা যায না, কোথায থাক?'

কোনো কথা নেই।

হেডমাস্টাব—'কযেকদিন পবে তা আমাব আযত্তেব বাইবে চলে যাবে, কত ছেলেই তো গেল। কিন্তু এখন আমাব কথা শোনো, রোদেব ভিতর মিছিমিছি মাঠে মাঠে কী খোঁজ? ঘুবে ঘুবে কী লাভ বলো তো?'

এবারও কোনো কথা নেই।

হেডমাস্টাব একটু হেসে—'শুনলাম এক-একটা তিন পুরুষেব আমলেব তেঁতুলগাছেব ডালপালায বানরেব মতো অবাধগতি তোমাব—তেঁতুল পেড়ে বিক্রি কবো?'

দ্বিজেন মাথা নেড়ে—'না, খাই।'

—'এত তেঁতুল হজম হয তোমার? শুধু পড়াশোনাটাতে হয না।'

—'আমি অনেক রাত অব্দি—'

হেডমাস্টাব বাঁধা দিযে—'এটা অন্যায, ছেলেরা যে রাত জেগে পড়ে সেটা আমি পছন্দ কবি না। সমস্ত দিন দুষ্টুমি কবে বাতের বেলা তাব শোধ দেযা এ বড্ড অনিযম। কাল দুপুববেলা কোথায ছিলে বলো তো?'

—'কাল?' দ্বিজেন ইতস্তত করছিল।

হেডমাস্টার—'তোমাব কাকা বললেন তোমাকে বাড়িতে না পেযে খোঁজ কবে কবে শেষে সেই তিন মাইল দুরে সরকার চক্রবর্তীব মাঠে একটা বটগাছেব নীচে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছেন।'

—'ঘুমোইনি।'

—'ঘুমোওনি? কী কবছিলে ওখান? তোমার কাকা কি আমাকে মিছে কথা বললেন?'

—'বটগাছের নীচে শুযেছিলাম, তা শুযেছিলাম, কিন্তু ঘুমোইনি, চোখ বুজেছিলাম।'

হেডমাস্টার—'চোখ বুজতে বুজতে মানুষ ঘুমিযে পড়ে কিনা দ্বিজেন।' হেডমাস্টার যেন মস্তবড় সাদা পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে হেসে ফেললেন, ফুরফুরে বাতাসের ভিতর, সাদা পালকের ডানা ছড়িযে যেন সেই হাসি আজও মনে পড়েছে—সংক্রামিত হযে সেও নয—কিন্তু রক্তের ভিতর স্নিগ্ধ আস্বাদ অনুভব করে ফেলেছিল।

—'শুনলাম তোমাব কাকাব কাচে পাঁচবকম ফসলও জোগাড় করেছিলে, তেঁতুল.কুল শুকনো বটেব পাতায় নুন তেল কাঁচালঙ্কা—'

তাবপব শিশিবেব শব্দেব মতো জীবনটাকে দ্বিজেন মনে কবে কি?

—'বাত জেগে পড়? শুধু পড়াশোনাই কব? কবিতাও নাকি লেখ? ইংবেজি কবিতাব অনুকবণ কবা হয় বুঝি? [...] জন্য নয়? বোগ বলব না। কবিতা সাধনাব জিনিস। কিন্তু তুমি হয়তো কবিই নও। কোনোদিন হতেই পাববে না। [...] পবীক্ষাব এক মাস আগে কবিতা লেখায় কোনো ক্ষতি হয় না?'

কেমন যেন লেগেছিল, দ্বিজেন কবি নয়, কোনোদিন হতেও পাববে না।—'আমি ইংবেজি কবিতাব নকল কবি না তো, বাংলায় লিখি। ভূপেনবাবু আমাব কবিতা দেখে দিয়ে বলেছেন যে আমি—'

—'তুমি কবি কঙ্কনেব মতো হবে—'

—'কবিকঙ্কিনকে আমি কবি বলেই মনে কবি না' দ্বিজেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হেডমাস্টাব গম্ভীব হয়ে বললেন—'আমি যা বলেছি, আবাব তাই বলছি, কবিতা সাধনাব জিনিস, কবিব হাতে তা বোগ নয়। কিন্তু তুমি হয়তো কবিই নও, কোনোদিন হতেও হয়তো পাববে না। কিন্তু পবীক্ষাব আগে কিছুতেই কবিতা লেখা চলতে পাবে না।'

দ্বিজেনকে বিক্ষুব্ধ দেখে হেডমাস্টাব—'তুমি একটা স্কলাবশিপ পাবে আশা কবি আমবা। অঙ্কে কিছু কাঁচা আছো, দুপুববেলা মথুবাবাবুব কাছে গিয়ে অঙ্ক কষো। বটগাছেব নীচে শুয়ে শুয়ে তেঁতুল আব কাঁচালঙ্কা খাচ্ছ একথা যেন আব কোনোদিন না শুনতে হয়।'হেডমাস্টাব—'ও জায়গাটা গোখবোব আড্ডা, কোনো কবিও ওখানে যায় না। এত অল্প বয়সেই সাপেব হাতে প্রাণ দাও যদি দ্বিজেন, দেশে একজন মস্তবড় কবিকে আমবা অকালে সবিয়ে ফেলব হয়তো।'

ইস্কুলেব মস্তবড় দালানবাড়ি। বড় বড় ঝাউ ও নিমগাছ, বৌদ্র, বাতাস, হেডমাস্টাবেব [সুস্বাদ হাসিব] সাদা সাদা পুঞ্জীভূত কুয়াশা, বাইশ বছব আগেব এই সব ছবি আজ এই অন্ধকাবেব আস্ত শিশিবেব মতো ঝবে পড়ছে।

দ্বিজেনেব মনে হচ্ছিল সেই উনিশশো চোদ্দ সালেব পৃথিবীতে ধূসব শেফালিকা [...] ও কৃষ্ণচূড়াব ধূসবতাব ভিতব দিয়ে যায়, বটেব ছায়ায় বসে নীলকণ্ঠ পাখিদেব ওড়াউড়ি দেখে এক্সট্রা কষতে কষতে পেনসিল ভেঙে ফেলে হেডমাস্টাবকে স্বর্গেব দেশ থেকে ফিবিয়ে আনে, ষোল বছবেব ছেলেব মতো তাব সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে—'তুমি চিবদিন হেডমাস্টাব থাক, আব আমি এই স্কুলেব ছায়ায় ছায়ায় চিবদিন ষোলো বছবেব বালকেব মতো ঘুবে বেড়াই। কেন বয়স হবে? বেদনা আসবে? কেন বঁইচিব কুল খাওয়াব সাধ হাবিয়ে ফেলব? কাকাব কানমলা খাব না কেন আব? কেন দুস্তব মাঠ, মাঠেব পব মাঠ—

১৯ [...] সালেব তাব নিজেব পৃথিবীব দিকে তাকিয়ে দেখল দ্বিজেন কলেজেব পড়া শেষ হয়ে যায়নি, অনেক কবিতা লেখা হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো কবিতাও কোথাও ছাপানো হয়নি, ছাপাবাব ইচ্ছাও নেই, লিখেও সুখ, দেশে যাবা কবি বলে খ্যাত তাদেব প্রতি একটা ঘৃণা তাচ্ছিল্য [...] জন্য অদ্ভুত মোহ—

দ্বিজেন একটা ছোট মাসিক পত্রিকা বেব কবেছিল, কিন্তু নানাবকম সাহিত্যিক অর্থনৈতিক ইংবেজি প্রবন্ধেই পত্রিকাটি ভবে থাকত অনেক সুযোগ থাকতেও দ্বিজেন তাব একটা কবিতাও এ কাগজে প্রকাশ কবতে যায়নি। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাবই তাব হৃদয় তাকে বলেছে—দ্বিজেন এখনো তোমাব সময় আসেনি, লেখকদেব লেখাব প্রুফ দেখা [O R I] দেব প্রবন্ধ সংগ্রহ কবো।—অন্ধকাবেব নির্জনতাব ভেতব চিন্তা কবো। ছ'মাস চলেই কাগজ উঠে গেল, অনেকেব অনেক লেখাই ছাপানো হয়েছিল, সম্পাদকীয়, দু-একটা মন্তব্য ছাড়া নিজেব কোনবকম কিছু বচনা ছাপায়নি সে। দিনগুলো তাই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কেটে যেত তাব [...] হয়ে কী হবে?

একটা [...] পবিচালনা কবে কী লাভ ? [...] এব মাতব্বব হয়ে বৈষয়িক আড়ম্ববেব মর্যাদা কতদিনেব? টাকাই কি সব? না, টাকা কিছুই নয়, বিষয়েব লালসা বিশেষ কোনো ক্ষুধা উদ্রেক কবে না দ্বিজেনেব মনে ববং একটা নিবালা জীবন দাও, কলকাতাব একটেবে একটা ধূসব বাড়ি, অনেকগুলো বই, একটা শেলফ চেয়াব কলম, সমস্ত দিনেব ধূসব নিঃশব্দে আলো— বাতেব বেলায় একটা একটা ল্যাম্প। কিন্তু এই সময়ই হৃদয়ে তবু তাব সবুজ ঘাসেব বুক ফুঁড়ে একটা আচমকা বিজাতীয় গাছেব কঠিন শিকড়েব মতো প্রেমেব জন্ম হয়েছিল। ঘাস আমাদেব বাংলাদেশেবই সবুজ নীল নির্জন ঘাস, কিন্তু কঠিন মাদকগন্ধ সেই শিকড়টি হয়তো [...] হয়তো [...] হয়তো [...]

আজ সে শিকড় নেই আব। কিংবা এক আধ টুকবো অন্ধকাবেব ভিতর ব(গেছে এখনো। কিন্তু এখনো যখন সেই অভিনব ডালপালাব আঁকাবাঁকা প্রতিশ্রুতি— .

—'দ্বিজেন, মামা চলে গেছেন, এখন আপনাব উপবে কিন্তু আমাদেব সম্পূর্ণ ভাব'—প্রায আঠবো বছব আগে চপলাব মেজদি দ্বিজেনকে একথা বলেছিল।

চপলাব পাযব সাদা জুতোব দিকে তাকিযে দ্বিজেন—'তা আমি জানি—তা আমি জানি, আপনাবাও বাগেবহাট যাবেন?'

—'সেখানে আমাব বাবা এসডিও।'

—'আপনাব মামাব কাছে শুনলুম। আমি বাগেবহাট কোনোদিন যাইনি অবিশ্যি'—

—'কোনোদিনও যান নি! চলুন এখন গাড়িতে গিযে ওঠা যাক এই দিকে আমাব গাড়ি'—

—'হ্যাঁ, এই গাড়িটা খুলনা যাবে।'

—'কোনোদিনও সেকেন্ড ক্লাস আমি দবজা খুলে দিচ্ছি—'

—'আপনিও ভিতবে আসুন না।'

—'দেখুন মালপত্র সব ঠিক ঢুকেছে, আমি এইখানেই বেশ দাঁড়িযে আছি—'

—'আমাব হ্যান্ডব্যাগটা কোথায যায, সেইটে আবাব হাবিযে ফেললুম নাকি—দেখ তো চপলা বাখিসনি তো ব্যাগেব উপব, একটু ষ্টেশন ঘুবে দেখে আসবেন নাকি?'

—'আচ্ছা যাচ্ছি।'

—'বুকিং অফিসেই বোধহয ফেলে এসেছি।

বুকিং অফিসেব দিকে দ্বিজেন ছুট দিতেই চপলাব কথা পিছন থেকে এসে দ্বিজেনকে আক্রমণ কবল। দ্বিজেন দু-একপা এগিযে এসে বিস্মিত চোখে তাকাতেই চপলাব মেজদিদি যা লম্বা ঠ্যাঙে দৌড় দিযেছিলেন, আব একটু হলেই ফস্কে গিযেছিলেন আব কি, বড্ড নাকাল হতে হত।

—'পেযেছেন হ্যান্ডব্যাগ?'

—'আমাব বালিশেব নীচেই ছিল, যা ভুলোমন, যেমন আমাব, তেমনি চপলাব।'

চপলা হাত তুলে একটা খববেব কাগজ পড়ছিল। বোধহয টাইমস অফ ইন্ডিযা, এদেব কোনো কাথাযই সে কান দিচ্ছিল না, দ্বিজেন কী বকম চেহাবাব মানুষ, কীই-বা তাব বক্তব্য জানবাব জন্য কোনো আগ্রহ ছিল না মেযেটিব। চোখাচোখি চপলাব সঙ্গে, দ্বিজেনেব যতদূব মনে পড়ে একবাবও দেখা হযনি এ পর্যন্ত। কিন্তু তবুও প্রেম এসে দ্বিজেনেব হৃদযে আস্তে আস্তে হাত বেখে বলে গেল পুবোনো নগবীব ধূলিব মতো এই মেযেটিব রূপ অন্ধকাব ঘুমেব ভেতবেও তোমাকে বেদনাব পৃথিবীতে জাগিযে বাখবে, জীবনেব শেষদিন পর্যন্তও তোমাব জীবন হবে ঝিঁঝিঁদেব মতো। চপলাব স্মৃতি ধূসব পিলসুজেব আলোব মতো, এই আলো ও পাণ্ডুলিপিব পাশে বেদনাব ঈশ্বব বহুকাল বসে থাকবেন।

—'ট্রেন ছাড়বাব কতক্ষণ বাকি আছে আব?'

—'ঘন্টাখানেক।'

—'ও, তাহলে তো ঢেব সময আছে, কতক্ষণ জানলাব কাছে দাঁড়িযে কথা বলবেন, উঠে আসুন, যখন আমাদেব নিযে যাচ্ছেন সেকেন্ড ক্লাসেই থাকুন না, আমি [..] দিযে দিচ্ছি।'

দ্বিজেন ভিতবে এসে বসল।—'আমি ববং থার্ড ক্লাস চড়তে ভালোবাসি।'

টাইমস অফ ইন্ডিযাব ফাঁক দিযে চপলা তাকিযে দেখল, কিন্তু তবুও চোখাচোখি হল না। দ্বিজেন যতক্ষণ তাব দিকে তাকিযেছে, ততক্ষণে সে আবাব কাগজেব আড়ালেব নিস্তব্ধ কঠিনতাব ভিতব ফিবে গেছে।

—'বাগেবহাটে আপনি কোনদিন যাননি?'

—'না।'

—'কেনই-বা যাবেন? যাবাব মতো দেশ তো নয, বাংলাদেশেব যত [.....] আমাদেব পথে থাকতে পড়ে থাকতে হয। এবাব ভেবেছিলাম মুসৌবি থেকে আব ফিবব না।'

দ্বিজেন কোনো কথা বললে না।

—'বাগেবহাট যাবাব কথা ছিল না আপনাব?'

—'না।'

—'মামা গছিয়ে দিলেন? তো আমরা তো নিজেরাই যেতে পারতাম। কলকাতার থেকে জলবন্ধর পর্যন্ত একা গিয়েছি, কিন্তু মামার বড্ড ভয়। পশ্চিমে আমাদের ছেড়ে দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাদেশকে বিশ্বাস করেন না। যাক, একবার দমদম গেলেই মামার হাতের বাইরে। আপনার তো বনগাঁয়ে যাবার কথাছিল, সেইখানেই নেমে পড়বেন।'

দ্বিজেন একটু হেসে—'আমার টিকিট তো বাগেরহাটের।'

—'কেন, বনগাঁ পর্যন্ত কেটেছিলেন না?'

—'আপনার মামাবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না, বাগেরহাট পর্যন্তই কাটতে হল।'

—'বেশ তো চলুন, কিন্তু বড্ড [..] [..] আপনার জানা আছে তো? সকালবেলা খুলনায় পৌছবেন, তারপর [..] করে রূপসা পার হতে হবে।'

—'রূপসা! বেশ তো নাম! এদেশের নদীর নামগুলো সুন্দর নয়। ইছামতি [...]'

—সে [...] যেমন ছোট তেমনি চমৎকার আপনার বাগেরহাটের [..] অন্য মজা আছে ঢের।'

আর চপলার টাইমস অফ ইন্ডিয়া তাকে অধিকার করে নিয়েছে।

কী যেন ভাবে দ্বিজেন বনগাঁয়েই নেমে পড়ল। বললে—'মেজদি আমি এইখানেই নামলুম।'

—'কেন?

—'মামাবাবু তো এখানে আর নেই, আপনাদের এখন নিরাপদ যাত্রা।'

—'খেয়েছেন? সে হয় না। মামাবাবু হয়তো বাবার কাছে টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন।'

—'তবে তো সবই ঠিকঠাক, হয়তো টেলিগ্রাম ভিড়তে না ভিড়তেই অফিসের চাপরাসি এসে আপনাদের নিয়ে যাবে।'

—'মামার স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার চেহারা দেখে আমাদের যা পরিচয় পেয়েছেন সেটা ভুল। বললামই তো উৎকণ্ঠা তার স্বাভাবগত। কোনো মানুষ বা চাপরাসির অপেক্ষা রাখি না আমরা। কিন্তু তাই বলে বনগাঁয় আপনি সটকে যেতে পারবেন না।

—'এখানেই তো আমার নামার কথা মেজদি।'

—'আর মেজদি! তুমি বড্ড বকতে পার, পারলে বেচারির বোঁচকা পুঁটুলি নিয়েই তুমি টানাহ্যাঁচড়া কর মানুষকে।' এবার চপলা একটা ইংরেজি বই পড়ছিল। খুব সম্ভব [..] মুহূর্তের মধ্যেই বইয়ের পাতায় চোখ ফিরিয়ে নিল।

—'কিন্তু দ্বিজেনবাবু কাল ভোরে খুলনায় আপনাকে দেখতে পাবই বলে জানলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন'–চপলা বললে।

দ্বিজেনের মুখের ওপরই জানলার কাঁচ চপলা নিজের হাতেই পটাপট টেনে দিল।

—'ও হো, তুমি তাই মনে করেছ নাকি চপলা, দ্বিজেন চাটুজ্যে সে জাতের ছেলে নয়, খুলনায় তাকে কোনোদিনই খুঁজে পাবে না তুমি। তোমার জীবনের ত্রিসীমানায়ও তাকে দেখতে পাবে না কোনোদিন।' [..]

তীক্ষ্ণ বাতাসের মতো হন হন করে অগ্রসর হয়ে চলে গেল দ্বিজেন। চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে হঠাৎ চলন্ত গাড়ির হাতল ধরে ঝুলে পড়ল।

—'আচ্ছা বেকুব মানুষ আপনি! এখুনি কাটা পড়তেন।'

জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গোটাচারেক মানুষের হাত তাকে ভিতরে টেনে নিল। সুটকেশটা অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে গেল যদিও, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির পৃথিবীতে নিয়ে গেল অনেকগুলো কবিতার পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু প্রেমের জন্য যে কি ভয়াবহ ত্যাগ করতে হয়, ক্ষণে ক্ষণে করতে হয়, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত করতে হয়—এ তার একটা নমুনা মাত্র। বাঙ্কে বসে বসে দ্বিজেন এই কথাই ভাবছিল। —'কাল ভোরে খুলনায় আপনাকে দেখতে পাব বলেই জানালা বন্ধ করে দিচ্ছি' এই জিনিসটি হয়ে উঠল সেদিনকার সমস্ত রাতের কবিতা, আরো অনেক অনেক রাত অনেকদিন এ কয়েকটি কথা দ্বিজেনকে অধিকার করে রাখল।

কথা কয়টি হয়তো নিরর্থক, হয়তো ভদ্রতা, হয়তো অভদ্রতা, হয়তো অভদ্রতা নয়, নিরর্থকও নয়, কিছুই নয়, বুদ্‌বুদ্ মাত্র। কিন্তু থার্ড ক্লাসের বাঙ্কে সেই শীতের রাতে সমুদ্রের উষ্ণ ফেনার মতো বার বার তাকে আবরণ করে রেখেছিল। হৃদয় তার ভেসে গিয়েছিল সিন্ধু সারসের ডানার মতো জীবনের

সমস্ত শীত ও ব্যথায় [..] ভেতর দিয়ে সমুদ্রের আলো ও কোলাহলের ভিতর। জীবনের নীল হলদে জাফরান কামনার রাজ্যে মরণের নিস্তব্ধ ইন্দ্রধনুর অপরিসীম স্বস্তির ভিতর। চপলা ও দ্বিজেনের মৃতদেহ ঘিরে নক্ষত্রেরা অদ্ভুত কুহক প্রতীক শুধু। ভোরবেলা খুলনা স্টেশনে দ্বিজেনকে দেখতে পেয়ে মেজদি—'আসুন দ্বিজেন, আমাদের মালপত্র সব তৈরি হয়ে গেছে। কুলিও ঠিক করেছি, চলুন।'

—'কোথায় যেতে হবে?'

—'ফেরি স্টেশনাটা দেখে আসবেন চলুন, আপনার সুটকেশ কোথায়?'

—'বনগাঁয়ে রেখে এসেছি।'

—'কেন?'

—'ফেরি স্টেনের রূপটা একবার দেখব—তারপরেই ফিরে আসতে হবে।'

—'আজ সকালেই গাড়ি পাবেন না, ওয়েট করতে হবে?'

—'কি জানি, টাইম টেবলই বলে দেবে সব।'

—'এখানে টাইমটেবল কি আছে ছাই।'

—'স্টেশনমাস্টারের রয়েছে।'

চপলা চলেছিল প্লাটফরমের খানিকটা ডানদিক ঘেঁষে, মেজদিও তার একটু আগে আগে, ভোরের আলোর দ্বিজেন তাকে দেখল আর-একবার রাজহংসীর মতো ভঙ্গিতে সমস্ত দীর্ঘ শরীরের গৌরব ও ঐশ্বর্যে সে চলেছে কেমন একটা গম্ভীর কঠিনতার সঙ্গে।

চপলাকে রূপসী, গাঢ় রূপসী মেয়েমানুষ বলে ফুরিয়ে দিতে পারা যায় না, চপলা শুধু রূপ নয়, নারী নয়, নানারকম অব্যক্ত স্মৃতির জন্য দেয় হৃদয়ের ভিতর—তার সঙ্গে চলতে চলতে দ্বিজেনের মনে হচ্ছিল যেন কোনো পুরোনো নষ্ট নগরীতে, বেবিলনে মিশরে পৃথিবী ফিরে গেছে আবার। ঝিনুকের আভার মতো ধূসর নিস্তব্ধ আলোর ভিতরে একটা নির্জন স্তম্ভের গন্ধ পাচ্ছে সে যেন, মনে হচ্ছে পশ্চাৎভূমিতে সূর্যের অসহ্য ছটার ভিতর সিংহের সোনালি কেশর এমনই এক গাঢ় রৌদ্রময় ভয়াবহ সুন্দর এক পারিপার্শ্বিকের ভেতর চপলার দীর্ঘ দেহ যেন কালের অবছায়ার ভিতর থেকে উঠে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য আবার তাকে নিবিড় পরিচিত এক আস্বাদ দিতে এসেছে।

নিবিড় পরিচিত, তবুও বাংলার ঘাসে এই রূপ কোনোদিন জন্মায়নি, কোনোদিন জন্মাবে না। কলকাতায় দ্বিজেন তার নিষিদ্ধ কোঠায় বসে মোমের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে যে-সব বই পাণ্ডুলিপি এতকাল নাড়াচাড়া করেছে, সে-সব পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার হৃদয়ে বিষণ্ণতা ও স্বপ্নের জন্ম হয়েছে, সেই সমস্ত পাণ্ডুলিপি, সমস্ত অক্ষর, সমস্ত ধূসর গন্ধ আজ এই জ্বলন্ত সূর্যের নীচে একটি নারীর রূপ ধরে পৃথিবীর সকল নদী, সকল দেশ ও সকল কালের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে যেন, চলেছে যেন।

কলকাতার সেই নিস্তব্ধ কোঠার মোমের আলো এর পর অনেকদিন পর্যন্ত নিভে থাকবে, সেই বই ও পাণ্ডুলিপির রাশি ধূলোর ভেতর হারিয়ে থাকবে অনেকদিন।

মেজদি ফেরি স্টেশন দেখবেন।

—'কি জানি আমার জীবনও হযতো বিশ বছর পরে এইরকম হবে, দেখবার জিনিস হয়ে দাঁড়াব।'

—'না রে বাপু স্টেশন ফেরি ডেক কিরকম—মন খারাপ হয়ে যায়, এর পর থেকে [...] ছাড়া আর চলবে না।'

—'আচ্ছা, মেজদি চললুম।' বলে দ্বিজেন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

কলকাতায় গিয়ে দ্বিজেনের মনে হল বাগেরহাট গেলেও হত, সবই বোধ হয় জমে উঠত ধীরে ধীরে। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে নিজের চেহারা ও জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের অসংযমতা দূর্দশা ও কুজ্ঝটিকার কথাই মনে হতে লাগল। চপলা টাইমস অফ ইন্ডিয়া মুসৌরি লক্ষ্ণৌ ও আই সি এসদের সঙ্গে জড়িত, তার পুরুষমানুষ হবে এক-একটা আলমোড়া বা ডাওয়ালি পাহাড়ের মতো, চপলা হবে সেখানকার পাইন অরণ্যের মতো। কোলাহল করবে বর্ধিত হবে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, গাঢ় সবুজ আনন্দের নীল রোমহর্ষের কাতরতায় শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকবে। নিজে দ্বিজেন বাংলার ঘাসের মতো, বিষণ্ন ইছামতীর পারে যার জন্ম, বাংলার হেমন্তের আঘ্রাণে বাসমতী ধানের সঙ্গে সঙ্গে যে নিজেও একদিন হলুদ হয়ে যাবে—হয়ে যাবে হিম, কিন্তু তবুও কলাকাতায় গিয়ে দ্বিজেনের মনে হল [...] যার হাতে সে

দেখেছে সেই চপলাকে পেতে হলে একটা ভালো [ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি চাই]। ইউনিভার্সিটি যা কিছু দিতে পারে একে একে সবই অধিকার করে নেয়া চাই।

এই এক অদ্ভুত নেশা দ্বিজেনকে পেয়ে বসল, কিন্তু তবুও দিনরাতের পড়াশোনার ভিতর মাঝে মাঝে একটা বিরাট তামাশার ফাঁকা হাঁ করে বেরিয়ে পড়ত, দ্বিজেন বুঝতে পারত যে সে ভুল পথ ধরেছে, পড়াশোনা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি, ইউনিভার্সিটির চাকরির ভেতর দিয়ে চপলাকে পাওয়া যাবে না। ভুল পথ ধরেছে সে। এ একটা পথই নয়, কিছুই নয়।

তামাশার ছিদ্রটা ক্রমে ক্রমে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সমস্ত জায়গা অধিকার করে রইল। অলস অবসন্ন হয়ে গভীর উদাসীনতার ভিতর দ্বিজেন জীবন কাটাতে লাগল তার। চপলার সঙ্গে আর দেখা হল না কোনোদিন। কলকাতায় তার মামাবাবুদের বাসায়ও বেড়াতে গেল না সে। চপলার .মজদির একটা পোস্টকার্ডেরও কোনো উত্তর দিতে গেল না। এম এ পরীক্ষার ফল অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হল, ইংরেজি ও সামান্য একটা থার্ড ক্লাস পেয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে গেল সে। মনে হল চপলা যেন আরো অনেকখানি দূরে সরে গেছে।

—'দ্বিজেন , তোমাকে পেতে হলে রীতিমতো স্কাউট ধরতে হয়। এই মেসে তুমি ক'দিন এসেছ?'

—'মাসদেড়েক।'

—'দেড়মাস! কেরোসিন কাঠের চেয়ার ছাড়া কি আর কিছুই নেই, বসি—এমন চমৎকার বাড়ি কোথায় খুঁজে পেলে। এ যেন তুতেন খামেনের কবর না মিউজিয়াম—দাড়িও দেড়মাস কামাওনি দেখছি—কী করছ?'

—'একটু পড়ছিলাম।'

—'আবার পরীক্ষা দেবে নাকি?'

—'না।'

—'[..] করেছে, [...] আরেক [...] দিয়ে দাও।'

—'অসম্ভব। পরীক্ষা দেবার কোনো মতলব নেই আমার।'

—'তাহলে চাকরির কমপিটিশন এগজাম দিয়ে ফেলো।'

—'মাস্টারি ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা কবি না আমি। সেই আমাব ভালো লাগে, তবে কলেজে পেলেই ভালো হয়। ইউনিভার্সটিতে মাস্টারি করবার সাধ আমাব চিরদিনেব জন্য ঘুচে গেছে।'

—'এখানে দিনের বেলাযও আলো আসে না দেখছি, অনেকখানি ধূলো আবছায়া ও নিবাশা দিয়ে নিজেকে বেশ ঘিরে বেখেছ তুমি। একটা চিতাবাঘেব মতো হয়ে গেছ যেন এই দেড় মাসেব ভিতব। মনে হচ্ছে গুহাব ভিতবে ঢুকে একটা রোমশ জন্তুর সঙ্গে কথা বলছি। আমি বিলেত চললুম।'

—'কবে?'

—'হপ্তা খানেকের মধ্যে।'

—'ও হো—কি পড়তে যাচ্ছ?'

—'ইচ্ছে তো অনেক রকম আছে দেখা যাক কতদূব কি হয়, আরেকবাব তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ভালো কথা, মাস্টারি ছাড়া আর কোনো চাকরিই কি তুমি করতে না দ্বিজেন?'

—'কলকাতার কোনো কলেজে একটা চাকরি জোগাড় করতে পাবলে আমাব মনে হয আমার মনের ভিতর যা কিছু অস্বস্তি সমস্তই আস্তে আস্তে শান্তি পাবে। কলকাতাব এক কিনারে একটা ছাপড়াব বাড়ি, এই গোটাতিনেক কোঠা ভাড়া করে থাকব। [সেকেন্ডহ্যান্ড] বইয়ের দোকান থেকে পনেরো টাকাব বই কেনা যাবে মাসে মাসে, আর নতুন বই কুড়ি-পঁচিশ টাকাব, লিখব পড়ব ঢের বেশি। লিখব কম, কিন্তু তবুও লিখব, আমার মনে হয আমি বেশ শান্তিতে থাকতে পারব।'

—'আমি একটা ব্যাংকে চাকরি করছিলুম একশো পঞ্চাশ দিচ্ছিল, সেটা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, ভেবে দেখ, তুমি যদি চাও, সে কাজটা তোমাকে দিয়ে যেতে পারি।'

—'আমাকে?'

—'[.....] সাহেবের সঙ্গে আমার খুব খাতির আছে। চাকরিটা অনায়াসে পেতে পার তুমি।'

—'ব্যাংকের চাকরি? কিন্তু ব্যাংকিং সম্বন্ধে আমি কী জানি সিদ্ধেশ্বর?'

—'কোনো কিছুই জানবার দরকার নেই' সিদ্ধেশ্বর হো হো করে হেসে উঠল—'জরায়ুর অন্ধকার

থেকে যাবা বেবিযে এসেছে একবাব ইচ্ছে কবলে তাবা সবই পাবে।'

চাকবটা নিল দ্বিজেন। কিন্তু চাব পাঁচ মাস চাকবি কববাব পব দ্বিজেনেব মনে হল সিদ্ধেশ্ববেব সেই ব্যাংকেব মস্তবড় প্রাসাদটা জীবনেব সবচেয়ে গভীব নেশাব জিনিস হযে দাঁড়িয়েছে তাব ব্যাংকি [..] -এব বইগুলো গিলে খেযেছে যেন তাকে। একটাব পব একটা নতুন পথ যতই খুলে যাচ্ছে পুবোনো পথেব বেখা ততই ভুলে যাচ্ছে সে। সাহেবেব সে খুবই প্রিযপাত্র। চাকবিব ভবিষ্যৎ তাব খুবই চমৎকাব। ইউনিভার্সিটিকে এক ধূসব বৃদ্ধাব হাত মনে হয, নিঃসহায পথেব পাশে দাঁড়িযে যে কাতব স্বপ্ন দেখছে। যে কোনো একটা কবিতাব বইকে কৃপা কবত ইচ্ছা কবে। কোথায চলেছে সে?

দ্বিজেন চাকবিটা ছেড়ে দিল।

কলকাতাব কোনো একটা প্রাইভেট কলেজে চাকবি পেযে গেল সে। মনে হল এতদিন পবে, এইবাব সে ঠিক জিনিস পেযেছে। যাবা বন্দবেব কোলাহল বিষযক আড়ম্বব নিযে মেতে থাকতে চায, থাকুক তাবা। কিন্তু দ্বিজেনেব চিবদিনই মনে হযেছে আজ সে হৃদযেব গভীব শান্তিব সঙ্গে বুঝতে পেবেছে যে জীবনেব সবচেযে ভালো ব্যবহাব হচ্ছে শিক্ষাব উৎকর্ষেব আবহাওযাব ভিতব, সৃষ্টিব ভিতব স্থিবভাবে নিজেকে নিযোজিত কবা।

আমাদেব অনেকেবই মনে হয যে দ্বিজেনেব ধাবণা হযতো পুবোপুবি সত্য নয—হযতো সত্য নয, কিন্তু তবুও সামান্য একটা দ্বিজেনেব সাফল্য মাস্টাবি। সেকেন্ডহ্যান্ড বইযেব দোকানেব বই কেনাব ধূসব আমোদ—নতুন বই কেনা, পড়াশোনা, কবিতা লেখা, দ্বিজেনেব মনে হল, মানুষেব মন এব চেযে কোনো প্রেমময নাবী কবতে পাবে না।

তাব কল্পনাসবস জীবনেব হলদে নীল লাল জাফবান বুনুনিব নিস্তব্ধ সৌন্দর্যেব ভিতব তবুও মাঝে মাঝে কেমন সব ছ্যাঁদা ধবা পড়ে যেত। দ্বিজেনেব হৃদয চপলাব স্মৃতিসন্ধ্যাব অন্ধকাবে একটা বিশীর্ণ পাণ্ডুলিপি ও পিলসুজেব ক্লান্ত আলোব মতো যেন পাশে বেদনাব ঈশ্বব নিস্তব্ধ হযে বসে আছেন —ছ্যাঁদাগুলো এইবকম। কিন্তু তবুও কষ্টে কযেকটা বছব কলেজেব চাকবি ও কবিতা লেখাব বৈষযিক নির্লিপ্ততায দিনগুলো অন্ধকাব নদীব জলেব নিঃশব্দতায—দ্বিজেনেব কেটে যাচ্ছিল একবকম।

কতকগুলো কবিতা প্রকাশিত হল তাব। একটা বই বেরুল।

উনিশশো একুশ সালেব দিকে তাকিযে দেখ এইবাব।

কলেজ প্রেসিডেন্ট হাইকোর্টেব নামজাদা ব্যাবিস্টাব একদিন কলেজ-এব [...]

এবপব প্রিন্সিপাল তাকে একটু বসিযে বাখলেন। বললেন—'কলেজেব তো টাকাকড়ি নেই, কী কবা যায?'

—'দেখুন, অপেক্ষা করুন।'

—'আমাব মনে হয প্রোফেসব এ কলেজে ঢেব বেশি, এতগুলো মানুষ দিযে কী হবে?'

—'এঁবা কীই-বা মাইনে পায—আমাকে ঈর্ষা কবতে পাবেন কেউ, আপনাকেও ঈর্ষা কবে, কেন কবে [..] [..] থেকে আমি তা বুঝতে অসমর্থ। কিন্তু আপনাব কলেজেব প্রফেসবদেব মাইনে কারুব ঈর্ষাব জিনিস নয।'

অন্ধকাবেব ভিতব খানিকক্ষণ হাত ঘষে নিযে প্রিন্সিপাল—'তা ঠিক, দ্বিজেনবাবুকে হযতো মনে আছে আপনাব?'

—'দ্বিজেন? কে সে?'

—'আপনাব কাছ থেকে চিঠি এনেছিল বলেই আমাদেব কলেজে নিযেছিলাম তাকে।'

—'ওঃ।'

—'দু'বছব কাজ কবেছে।'

—'কেমন চালাচ্ছে? মাইনে বেড়েছে?'

প্রফেসব মাথা নেড়ে—'না।'

—'কত পাচ্ছে আজকাল?'

—'নব্বই টাকা আন্দাজ।'

—'বড্ড দুঃখেব কথা। কি কবে যে সংসাব চলে আমি বুঝতে পাবি না।'

—'বিযে কবেনি।'

—'কিন্তু করতে হবে তো।'

—'তা করবে বলে মনে হয় না।'

—'সে যা হোক নব্বই টাকা মাইনেতে দু'বছর কাজ করছে এ মোটেই ভালো কথা নয় মহিমবাবু—শিক্ষিত মানুষের ঢের দাবিদাওয়া আছে।'

—'আমরা তাকে আটকে রাখতে চাচ্ছি না, সে অন্য কোনো কলেজে চলে যেতে পারে।' মিত্রসাহেব একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ভ্রুকুটি করে পরে বিস্তৃতভাবে হেসে হেসেই টেবিলের ওপর দু-একটা ঘা দিয়ে যে কোনো কলেজে যাক, না, মাইনে তার কিছুতেই বাড়বে না।'

—'তাহলে আপনি সে সব জানেন।'

—'জানি বইকী, যেখানেই যাক, অন্য যে কোনো অপ্রিয় পাত্র তাকে হতেই হবে। সে কাজ করে, কথা বলে না। বাঙালির ছেলে হয়েও মুরুব্বিদের ধরাই দিতে চায় না সে। যে ভাষায় কথা বললে বিধাতার প্রাণ স্নিগ্ধ হয় সেইখানেই সে ভয়ংকর দুর্বল। আচ্ছা উঠি মহিমবাবু'—

—'বসুন, কথা আছে।'

—'আমি তাকে চিনি না, কী সূত্রে আপনাদের কলেজের কাজের জন্য তাকে চিঠি দিয়েছিলুম, মনে নেই আমার। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে যখন সে চিঠি আদায় করে নিতে পেরেছে, আমি সহজে কাউকে চিঠি দেই না, নিশ্চযই বিশেষ কোনো যোগ্যতা, কি তা ভুলে গেছি আমি—নিশ্চযই বিশেষ কোনো যোগ্যতার জন্য চিঠি দিয়েছিলাম আমি, খাতির করে দেইনি।' একটু চুপ থেকে ব্যারিস্টার—'আমার মনে হয় তার মাইনে বাড়িয়ে দেয়া উচিত।'

—'কিন্তু আমরা তাকে রাখতে চাই না।'

ব্যারিস্টার সাহেব একটা চুরুট জ্বালিয়ে—'কেন?'

—'সম্প্রতি তার একটা কবিতার বই আমাদের হাতে এসেছে।'

—'কবিতাও লেখে নাকি?'

—'লেখে, ছাপায়, বই বের করে।'

—'তাহলে তো খুব অন্যায় করে, কবিতা পড়াতে পারবে কিন্তু লিখতে পারবে না, এই আপনার ধারণা? কিন্তু কলেজের প্রফেসর এ বিষয়ে সবচেয়ে অধম, একটা প্যাবাডক্স তারা, তাদের মতো তোতাপাখি এ দুনিয়ায় নেই। আমি শুনে খুব খুশি হলাম যে আপনাদের কলেজের স্টাফ থেকে একটা কবিতার বই বেরিয়েছে, এ সম্বন্ধে আপনাদের গৌরব বোধ করা উচিত।'

—'ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো কবির সম্বন্ধে আমি এতটুকুও গৌরব বোধ করি না।'

প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমস্ত হৃদয় সমস্ত শরীর বিপুল তামাশায় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে হাসল। তারপর আস্তে—'মহিমবাবু, আমাকে এ কলেজের প্রেসিডেন্ট রাখবেন না।'

আকাশ থেকে পড়ে প্রিন্সিপাল—'সে কি কথা! আপনার কাছ থেকে আমরা বছরে পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য পাই— আপনার মতো এমন অসাধারণ লোক বাংলাদেশে কে আছে, ভারতবর্ষেও—'

—'অসাধারণও বটে—পঁচিশ হাজার টাকা কেন যে আপনাদের দেবতা ও পৃথিবী—সে থাক, কিন্তু শিক্ষা মহলে কেমন একটা মোহ আমার মনের ভেতর জন্মে গেছে, এ বয়সে তা আর কাটিয়ে উঠতে পারব না। আমি প্রেসিডেন্ট না থাকলেও টাকা আপনাদের দেব-কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীও তো আমার কাছে কবিতা মনে হয়—আমার ভালো লাগে—'

—'চণ্ডীদাসে কবিতা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন না, তাঁর কবিতা আমি কোনোদিন পড়িনি—ভালোই করেছি, তাঁর জীবন আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য বলে মনে হয়, প্লেটো বলেছিলেন'—

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে ব্যারিস্টার—'প্লেটো কী বলেছিলেন?'

—'অসার লোক ছাড়া কেউ কবিতা লেখেন না, তাঁর [..] থেকে এসব বিকৃত রুচির মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে যেন তিনি'—

—'প্লেটোর [ডায়ালগ] আমি পড়েছি, আমার মনে হয় একটা সুন্দর কবিতা'—

—'কবিতা মোটেই নয়, আত্মিক জীবনের কথা।'

—'বাংলা কবিতা আপনি পড়েন না?'

—'সমস্ত বাঙালি কবির জীবনই জঘন্য।'

—'কিন্তু কবিতা তো ভালো হতে পারে।'

—'জীবনের সঙ্গে রচনার কোনো প্রভেদ থাকতে পারে না। অনন্ত অবিনশ্বর কালের মধ্যে করুণাময় ঈশ্বর শুধু একজন কবি সৃষ্টি করেছেন।'

—'তিনি কে?'

—'ওয়ার্ডসওয়ার্থ।'

—'কিন্তু ভিলোঁ তো আর এক জগতের মানুষ, তার কোনো কোনো কবিতা আমার খুব ভালো লাগে।'

—'ভিলোঁ কে?'

—'নাম শোনেননি আপনি?'

—'ভিলোঁ?'

প্রেসিডেন্ট। [প্রিন্সিপাল] একটু চুপ থেকে ভিলোঁ না ভিলু না ভেলু, নাম শুনে মনে হয় কোনো হতচ্ছাড়া বাঙালি কবি, যেমন নাম,তেমনি জঘন্য রুচি, তেমনি আমার অশ্লীল কবিতা নিশ্চযই ভেলু? [..] বোধহয।'

—'ভিলোঁ একজন ফরাসি কবি।'

—'তা হবে। পরম কারুণিক বিধাতার কৃপায তাঁর কবিতা পড়বাব অবসর আমার হযনি।'

—'কিন্তু [...] নাম আপনি শুনলেন কী করে?'

—'শাস্ত্রীমশাযের লেখা, রামতনু লাহিড়ীর জীবনী পড়বার সময কতকগুলো নাম কতকগুলো কথা, পচা নর্দমার মতো আমায অত্যন্ত পীড়া দিযে গেছে। শাস্ত্রীমশাই ওসব জিনিসের উল্লেখ কি করে করলেন, আমি বুঝি না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি একটা [...] এডিশন বার করব অনেকদিন থেকে ভাবছি—কিন্তু আমার নিজের তো পযসা নেই, আমি গরিব মানুষ, গাড়ি বিক্রি কবে ফেলতে হবে, আপনারা দেশের ধনীবা এসব বিষযে একটু অগ্রসর হোন।'

ব্যাবিস্টার আস্তে আস্তে বললেন—'আচ্ছা আমি কযেকজন বড় বড় [অ্যাটর্নিকে] বলে দেখব, কিন্তু সাহায্য জোগাড় করতে পারি কিনা।'

—'কী সম্বন্ধে?'

—'একটা [....] এডিশনের জন্য।'

—'না, না, না ওদেব কাছ থেকে যদি সাহায্য সংগ্রহ কবতে পারেন, তবে সেটা কলেজেব জন্যই হোক, আমরা বড্ড কম মাইনে পাচ্ছি— [..] কলেজেব প্রিন্সিপালের মাইনে।'

'আচ্ছা দেখব, ওযার্ডসওযার্থেব কবিতা ছাড়া আপনি অন্য কোনো কবিতা পড়েন না?'

প্রিন্সিপাল মাথা নেড়ে—'না। ভগবান আমাকে চিরদিনই প্রলোভনেব হাত থেকে বাঁচিযে এসেছেন।'

—'কিন্তু ভিলোঁর কযেকটা কবিতা এখন আশ্চর্য মনে হয আমাব।'

—'এমন কত বড় বড় সার্থক অ্যাটর্নি বযেছেন সার্থক সাহায্য করে এই কলেজটাকে একটা উনিভার্সিটিতে দাঁড় কবিযে দিতে পারেন। ভাইস চান্সেলার হিসেবে আমি কাজ করতে পারি, প্রিন্সিপাল হিসেবে যা মাইনে পাচ্ছিলাম তার ডবল মাইনে পেলেও আমাব ন্যায্য চাকবিব মর্যাদা রক্ষা হয না—কিন্তু তবুও ত্যাগ করতে হয—

—'ভিলোঁ পাঁচশো বছর আগে ফবাসি দেশে জন্মেছিলেন, আমার মনে হয আপনার যা শক্তি ও ক্ষুধা ছিল মহিমবাবু তা যদি চেপে না রেখে সাহস করে চলতে পাবতেন তাহলে ভিলোর মতো জীবন পেতে পারতেন। তা মন্দ হত না। আমাদেব কেই-বা চিনবে, কিন্তু ভিলোঁ এখনো বেঁচে বযেছে।'

ভিলোঁ কে, কী জিনিস মহিমবাবু জানে না, কিন্তু তবুও অসহ্য লাগে, দাঁতে দাঁত ঘষে—

—'তার মতো কবিতা লিখতাম আমি?'

—'না, তা পারতেন না।'

দ্বিজেনের কবিতার বই ভিলোঁ-র মতো নয়। ভিলোঁর কবিতার তুলনায দ্বিজেনের কবিতাগুলো বরং ঘাসের ওপর কয়েকটা নিঃসহায পাকা কামরাঙার লাল ফোঁটার মতো, নিতান্ত নিরপরাধ ও মৃত জিনিস, যাদের অবসাদ ও মৃত্যুর খবর দু-একটা শালিখ ও জোনাকির গোচরে আসে শুধু। কিন্তু তবু ব্যারিস্টার সাহেব দু-এক মাসের মধ্যেই [...] মারা গেলেন, দ্বিজেনেরও চাকরি গেল।

নিজের বইগুলো সে ধীরে ধীরে বিক্রি করে ফেলল। বাড়িওয়ালাকে প্রতারিক করবার ইচ্ছা ছিল না তার, কলকাতায়ই থাকবার ইচ্ছা ছিল, দু'তিনটা টিউশনি নিল খুব সামান্য টাকায়, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত কোনো কলেজে কাজ পেল না আর।

চপলার মেজদিকে একদিন হয়তো ট্রামে দেখেছিল, অনেক রাতে বেহালার দিকে, নিজেও-বা কেন ভেঙে চলেছিল সেদিন।

কিন্তু মেজদি দ্বিজেনকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না, দ্বিজেনের দিকে একবার তাকিয়েই মেজদি জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল, দ্বিজেনও আলাপ করতে গেল না আর। মাঝপথেই সে অন্ধকারের ভিতর নেমে গেল।

অনেকদিন পরে একদিন দ্বিজেন যখন হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ঝাঁকামুটেদের দিকে তাকিয়েছিল, তাদেরও ঈর্ষা করছিল যেন এমনই সময় জিতেন সেনের সঙ্গে তার দেখা।

—'মাপ করবেন, আপনাকে কিন্তু দ্বিজেনের মতো লাগছে, কিন্তু তার এতদূর অধঃপতন হবে, তা আমি ভাবতেই পারি না' জিভ কেটে জিতেন—'অধঃপতন্ বলেছি? আবারও আমাকে মাপ করতে হত—আপনি হয়তো দ্বিজেন নন, কলকাতায় একজন সাধারণ গৃহস্থ—আপনার দাদা হয়তো কেরানি, আপনি নিজে সংসারের বাইরে, কিন্তু তাই বলে কাউকে অধঃপতিত বলবার অধিকার আমাদের নেই। আছে কি?' জিতেন চুরুট জ্বালাল।

—'জিতেন সেন না? তুমি যে একেবারে সাহেব হয়ে গেছ জিতেন।'

—'তাহলে আমি ভুল করিনি।'

—'সবই ঠিক হয়েছে, শুধু কোনো এক কেরানি দাদাও যদি আমার থাকত তাহলে বেঁচে যেতাম জিতেন।'

—'আশ্চর্য!'

—'আমার মা বাবা ভাই বোন কেউই নেই, আমার মনে হয় একজন শ্বশুর থাকলেও হয়ে যেত,' দ্বিজেন হাসতে হাসতে বললে—'কিন্তু কেই-বা মেয়ে দেবে।'

—'চল ওয়াই এম সি এ-তে যাই।'

—'রেস্টুরান্টে?'

—'না একটা [লেকচার] আছে।'

—'ওসব শুনবার গতিক আমার নেই জিতেন।'

—'আমিই লেকচার দিচ্ছি, ওই তো আমাব [...] দাঁড়িয়ে আছে, ফুটপাথে একটা বই কিনতে এসেছিলুম, পেলাম না, কোনো বই-ই বাখে না এবা।'

—'তুমি [লেকচার] দিচ্ছ?'

—'সামারের ছুটিতে বাংলাদেশে এসেছি, এদের সঙ্গে দেখা না হতেই আমাকে ধরে পড়ল [...] সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, চলো।'

লেকচার শেষ করে বন্ধুবান্ধব বিদায় দিতে জিতেনের প্রায় দু-এক ঘন্টা কেটে গেল।

—'কী খাবে দ্বিজেন?'

—'চা।'

—'আচ্ছা চলো, আমার বাসায়ই চলো না হয়, সেখানে কেউ নেই এখন, আমার স্ত্রী পুনায়, আমার কোনো ছেলেপিলে হয়নি, আজ রাতে আর পড়াশোনা করব না, কথা বলে কাটিয়ে দেব, তোমার তো কোনো আপত্তি নেই?'

দ্বিজেন মাথা নেড়ে—'না।'

—'চলো।'

বিটি রোডের একতলা ভারী চমৎকার বাড়ি, সামনে [...] থাকল, বাড়ির ভিতর ঢুকেই দ্বিজেন দেখল দেয়ালের পাশে পাশে চারদিকে র‍্যাকে র‍্যাকে নানারকম বই, একটা বিশৃঙ্খল বইয়ের পক্ষীরাজ্য বলে মনে হয়। একটা চকচকে লাল ছোট বই হয়তো মুনিয়ার মতো মেঝের কার্পেটের এক কিনারে পড়ে রয়েছে, তার মাথার ওপরেই র‍্যাকের ঠিক মাঝখানে একটা মস্তবড় জাঁকালো বই ময়ূরের মতো পেখমের মতো পেখমের গর্বে বিস্তৃত হয়ে বসে আছে যেন। টেবিলে বই, চেয়ারে বই, সোফার ওপরে বই, কিন্তু

ধূসবতা কোথাও নেই, বার্নিশ কবা পাখিব পালকেব মতো সমস্তই সুন্দব, সমস্তই বঙিন। একটা বিবাট পক্ষীপৃথিবী যেন নিস্তব্ধতাও যেন পাখিদেব কোলাহলে ভবে বয়েছে।

—'সোফায বোসো, একটু পবে না হয খাবে। আমি একটা [...] কলেজেব প্রিন্সিপাল, অক্সফোর্ডে গিয়েছিলুম, শুনেছ হয়তো?'

—'তোমাদেব অনেকেবই কোনো খোঁজখবব জানি না।'

—'তুমি একটা ব্যাংকে কাজ কবতে না?'

—'সে অনেকদিন আগেব কথা।'

—'সব ছেড়ে দিয়ে দেশেব কাজ কবছ'—

—'তাও কবতে পাবিনি, হৃদযেব ভেতব বড্ড খিদে বয়ে গেছে।'

—'পাযে জুতোও নেই দেখছি—কৃচ্ছসাধন কবছ না কিনতে পাব না? কেমন যেন এক [...] মতো মানুষ হয়ে গেছ তুমি। প্রথম তোমাকে চিনতেই পাবিনি আমি। ব্যাপাব কি বলো তো?'

—'তুমি কলেজেব প্রিন্সিপাল জিতেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমাকে একটা কাজ দিতে হবে।'

—'কোথায?'

—'তোমাব কলেজে।'

জিতেন একটু চুপ থেকে দু-একটা বই নেড়েচেড়ে—'কলেজেব কাজ কববে তুমি?'

—'কেন কবব না?'

একটা চুরুট জ্বালিযে নিযে জিতেন-'তুমি তো নক্ষত্রেব মতো মানুষ।' জিতেন খানিকটা ঢোক গিলে নিযে—'কিন্তু আমবা একসঙ্গে পড়েছি, এখন এই বকম সম্পর্ক ভালো লাগবে তোমাব? কলেজে আমাব প্রিন্সিপালেব চাল বজায বাখতে হবে যে।'

—'তা জানি, কিন্তু দবখাস্ত কি তোমাব কাছে দিতে হবে? এখুনি দেব? একটা কলম দাও জিতেন।'

[...] কলেজে গিযে দ্বিজেন দু'মাস কাজ কববাব পব একদিন কলেজ সেক্রেটাবি চোপড়া সাহেব প্রিন্সিপালেব সঙ্গে দেখা কবতে এসে—'সেন সাহেব'—একটা সোফাব ওপব বসে—'আমি গিয়েছিলাম লন্ডন, মাসতিনেক ছিলুম, কাল এসেছি।'

—'তা আমি জানি।'

—'স্টেশনে আপনাকে দেখলুম না।'

—'আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে আপনি আসছেন।'

—'আমি আশা কবিনি যে প্রিন্সিপাল সাহেব আমাব সঙ্গে দেখা কববাব জন্য স্টেশনে দাঁড়িযে থাকবে।'

—'তা অবশ্য, আমি গেলে কীই-বা হত।'

—'আপনি তাই মনে কবেন?'

—'আমি তাই মনে কবি মিস্টাব চোপড়া।'

—'কিন্তু বাসায আমাব সঙ্গে একবাব দেখা কবলে পাবতেন।'

—'আপনি হাঁফ ছাড়বাব সময দিলেন কোথায? নিজেই তো হাজিব হলেন, নিন।'

—'আমি সিগাবেট ছেড়ে দিযেছি—কেমন হাঁপেব মতো হয়েছে।'

—'লন্ডন গিযে অসুখ বাঁধিযে এলেন।'

—'অসুখই শুধু নয, এখানে তো নানাবকম গোলমাল দেখছি।'

জিতেন সিগাবেট জ্বালিযে নিল।

—'তিন মাস এখানে ছিলাম না এবই ভেতব কযেকটা [....] কবে ফেলেছেন দেখছি। একখানা চিঠি লিখেও আমাব মতামত জানতে চাননি।'

—'কি দবকাব, কমিটিতে তো কেউ আপত্তি কবেনি।'

—'কি কবে কববে, আপনি অক্সফোর্ডেব [....] আপনাব কাছে সকলেই ভিজে বেড়াল।'

জিতেন সিগাবেট টানতে-টানতে—'কলেজেব স্টাফ যে একজন বাঙালীকে নিযুক্ত কবেছি ওই তো

আপনাব সমস্যা?'

—'আমাদেব [.....] ছেলে থাকতে কলকাতাব থেকে মানুষ আনবাব পক্ষপাতী আমি নই, আমাদেব কলেজেব ছেলেবা চাকবি না পেযে বসে থাকবে আপনি বাংলাদেশেব থেকে প্রফেসব নিযে আসবেন এটা কি ঠিক কথা প্রিন্সিপাল সাহেব?'

জিতেন সিগাবেট হাতে কবে নিস্তব্ধ হযে বইল।

—'কিন্তু যাকে এনেছি।' বলে আবাব চুপ কবতে হল জিতেনকে। যাকে সে এসেছে তাব সঙ্গে একদিন একসঙ্গে পড়েছে সে। এ হল হৃদ্যতাব কথা, হৃদযেব কথা হযতো, কাজেব কথা তো কিছুই নয। নিজেকে ইনস্টিটিউশনাল মানুষ মনে কবতেও সে বিবক্ত হয। যুক্তিব প্রযোজন। জিতেন কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না, কোনো কথা বলতে পাবল না 'কিন্তু যাকে এনেছি, খুব কম মাইনেতেই এনেছি, চোপড়া সাহেব, এত কম যে আমাব লজ্জা কবে।'

—'লজ্জা যদি কবে তাহলে আনলেনই বা কেন? একশো পঞ্চাশ টাকায বাঙালি বন্ধুকে আনতে লজ্জা কবে আপনাব। আমাদেব কলেজে যে-সব ছেলে এম এ পাশ কবে বসে বযেছে তাবা একশো, একশো পঁচাত্তব টাকায খাটতেও গৌবব বোধ কবে।'

এবপব জিতেন খুব গম্ভীব হযে গেল। কেস-এব থেকে সিগাবেট বেব কবতেও ভুলে গেল সে।

—'আপনাব এই বাঙালি বন্ধুটি পিএইচডি নয?'

—'না।'

—'পিএইচডি নন তিনি?'

—'না থিসিস দেননি—যদি চেষ্টা কবে দিত—'

—'এম এ ফার্স্ট ক্লাসে পাইনি?'

—'পাযনি অবিশ্যি, কিন্তু—'

—'কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসেব মূল্য আমবা দেই, উনি সেকেন্ড ক্লাস—'

—'ফার্স্ট ক্লাস অনেক সময মোহেব মতো হযে দাঁড়ায চোপড়াশাহেব, আমি নিজেও তো ফার্স্ট ক্লাস নই, সেকেন্ড ক্লাস।'

—'আপনাব বন্ধুও যদি আপনাব মত অক্সফোর্ডেব [..] হত।'

—'তা গিযেই হতে পাবত যদি যেত, ইংবেজি ভাষা ও সাহিত্যেব কথা বলতে চান তাব জ্ঞান আমাব চেযে একটুও কম নয চোপড়া সাহেব, আমাব বাস্তবিকই বড় লজ্জাবোধ হয আমি বাবোশো পাচ্ছি আব দ্বিজেন পাচ্ছে একশো পঞ্চাশ।'

—'কিন্তু তবু বাংলাদেশেব [...] পুষবাব মতো টাকা আমাদেব নেই, আপনাব বন্ধু হলেও আমাদেব অক্ষমতা আমবা জানাতে এসেছি।'

জিতেন অনেকক্ষণ চুপ থেকে—'তাহলে আমাকেও চলে যেতে হয, গত দু-তিন মাসেব মধ্যে চাব পাঁচটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি আমন্ত্রণ পেযেছি , মি চোপড়া আমি আব এখানে থাকব না।'

—'কিন্তু আপনাব বন্ধুব কী কবে যাবেন?'

—'সেও কলকাতায চলে যাবে।'

—'যাবে?'

—'কি আব কববে, আমাব বাপেব কলেজ তো নয। কিন্তু আমিও আজ চললুম।'

এলাহবাদে যখন গাড়ি থামল জিতেন নেমে পড়ল।—'দুমাস বইলে তবুও আমাব স্ত্রীব সঙ্গে তোমাব দেখা হল না।'

—'তাকে তো দেখলুম না, তিনি কোথায?'

—'পুনায, মাসখানেকেব ভেতবেই ফিবে আসত।'

—'তাব নাম কি বলো তো?'

—'বলিনি তোমাকে?'

—'না, দাম্পত্য জীবনেব কথা তো আমাদেব ভিতব হত না।'

জিতেন হো হো কবে হেসে—'তুমি নিজে আইবুড়ো বলেই হযতো।'

—'কিন্তু তোমাব স্ত্রীব নাম কি?'

—'এ নাও একখানা চিঠি, তোমাব পকেটে বেখে দাও, কোনোদিন জাগিও না তাকে, বড় শক্ত মেযেমানুষ।'

কুলিব মাথায মাল চাপিযে দিযেছিল, টুপিটা খুলে একটা সিগাবেট হাতড়ে নিযে ম্যাচ জ্বালিযে-জিতেন—'আচ্ছা চললুম দ্বিজেন, তুমি তোমাব পথ কেটে নিতে পাববে, জীবন তো আমাদেব সবে আবম্ভ।'

দ্বিজেন তাকিযে দেখল চোখে জল এসে পড়েছে জিতেনেব। একটা বিস্তৃত বিহ্বল হাসিব ডানাব আঘাতে চমকে ঘাড় উঁচু কবে ধীবে ধীবে কুযাশাব ভিতব হাবিযে গেল সে।

জিতেনও আজ মৃতেব দেশে, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে চাকবি শুরু কববাব ছ'মাস পবেই নিউমোনিযা হল তাব। তিনদিনেব অসুখেই জিতেন মাবা গেল।

যে চিঠিখানা দ্বিজেনকে পড়তে দিযেছিল জিতেন সে খানা চপলাব। জিতেনেব মৃত্যুব মাসতিনেক পবেই চপলা একজন মাদ্রাজি খ্রিস্টানকে বিযে কবেছে। কলকাতাব বাস্তায একদিন মামাবাবুব কাছ থেকে এই খবব পেযেছিল দ্বিজেন। সেও আজ প্রায ছ' বছব আগেব কথা।

চপলাব চিঠিখানা এখনো দ্বিজেনেব কাছে বযেছে। চপলাব কোনো পবিচযই এই চিঠিব ভিতব নেই। চপলাব কোনো পবিচয চায না দ্বিজেন। অক্সফোর্ড পিএইচডি একটি আশ্চর্য যুবক কি কবে মাঝপথে অন্ধকাবেব ভিতব হাবিযে গেল, এই চিঠিখানা বাব বাব সেই কথাই জানিযে যায।

দ্বিজেন উঠে দাঁড়াল, বাত প্রায বাবোটা, প্রিযনাথও বাবান্দায নেই। ঘুমোতে ঘুমোতে কখন সে পালিযে গেছে। প্রিযনাথ মাঝে মাঝে এবকম পালায।

পটেশ্ববী এখানে এল না কেন? কোথাযই-বা যেতে পাবে? যেথানে যাক এতক্ষণে ফিবে আসা উচিত ছিল না কি তাঁব? নিশ্চযই।

চুরুটটা নিভে গিযেছিল, জ্বালিযে নিযে দ্বিজেন ভাবল, পটেশ্ববী যদি আব ফিবে না আসে, এমন কামনা অনেক বাতেই সে কবেছে। আজও কবে, যদি আব ফিবে না আসে, নাই-বা ফিবে এল। আস্তে আস্তে জ্বলন্ত চুরুটটা শেলফেব ওপব বেখে দিল সে।

ঘবেব ভেতব ঘুবতে ঘুবতে দ্বিজেন দেখল পটেশ্ববী ভাড়াব ঘবেব এক কিনাবে মাটিব ওপব শুযে আছে, ঘুমোযনি, চোখ দু'টো বোদেব ভিতবে গাছেব পাতাব মতো সজাগ, চোখেব সাদা ডিমি দু'টো কড়িব মতো কঠিন, চোখেব জলে সমস্ত মুখেব মাংস ভিজে গেছে।

দ্বিজেন মাটিব ওপব বসে পড়ে—'তুমি এইখানে শুযে বযেছ পটেশ্ববী?

কোনো উত্তব নেই।

—'কোথায গিযেছিলে?'

তেমনি নিস্তব্ধ।

—'কাঁদছ কেন? কী হযেছ?'

কিন্তু তাব সমস্ত শবীবেব মাংসেব ভিতব থেকে কোনো উত্তব এল না। দ্বিজেন জানে যে এ মাংস অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত, নিজে ব্যথিত হবে, দ্বিজেনকে ব্যথা দেবে। কিন্তু তবুও এ মাংসেব মৃত্যু হবে না, মৃত্যু হবে না দ্বিজেনেব। দিনেব পব দিন চলে যাবে। পৃথিবী নিজেব কাজ কবে যাবে, কিন্তু কেউ আব এসে বলবে না—'অত বঁইচিব ফল খেও না দ্বিজেন, বাসায কি ভাত পাও না? ম্যাট্রিক পবীক্ষা যে এসে পড়ল।' কিন্তু দ্বিজেন 'কাল ভোবে খুলনায আপনাকে দেখতে পাবই বলে জানালা বন্ধ কবে দিচ্ছি এখন'—'এই নাও একখানা চিঠি তোমাব পকেটে বেখে দাও, কোনোদিন জাগিও না তাকে, বড় শক্ত মেযেমানুষ-আচ্ছা চললুম দ্বিজেন—তুমি তোমাব পথ কেটে নিতে পাববে-জীবন তো আমদেব সবে আবম্ভ।''অত বঁইচিব ফল খেও না দ্বিজেন—বঁইচিব ফল খেও না—বঁইচিব ফল খেও না'—হেডমাস্টাবেব সাদা দাড়ি অন্ধকাবেব ভিতব অদৃশ্য হযে গেল।—'কিন্তু পটেশ্ববী তুমি মাটিব ওপব শুযে শুযে কাঁদছ, আমি হলে মাটিতে শুযে কাঁদতাম না, কাঁদতামই না আব; কেঁদে কী লাভ, জীবনেব সবচেযে সুন্দব জিনিস হচ্ছে নিস্তব্ধতা।'

একটা বিপুল তামাশায দ্বিজেনেব মুখ বিস্তৃত হযে পড়ল। একখানা স্টিক নিযে সে অন্ধকাবেব ভিতব বেবিযে পড়ল। জীবনেব যত মৃত ধ্বনি, যত মৃত কথা, মৃত সুখ খুঁজে বাব কববাব জন্য।

কিন্তু তবুও সকালবেলাব বৌদ্রে নিত্যদিনেব জীবন আবাব আবম্ভ হল তাব।

১৯৩৬

দশ-বাবো দিনেব মধ্যে S কাছে আবাব গেলুম।

—'কে তুমি? [...] আজ সকালবেলা এলেও আমাকে পেতে না। বাইবে চলে গিযেছিলুম। দিনদশেক মফস্বলে কাটিযে এলুম। বেলা এগাবোটাব সময ফিবেছি আজ। তুমি এসেছ দু'টোব সময, তোমাব একটা [..] শক্তি আছে।'

—'কোথায গিযেছিলেন?'

—'এই কতকগুলো পাড়া-গাঁ দেখে এলুম।'

—'কোনো খববেব কাগজে দেখলুম না তো।'

—'খববেব কাগজ পড় তুমি তাহলে?'

টেবিলেব ওপব গবম জলেব কেটলি ছিল, একটা মস্তবড় [টিপট] ও গোটা দুই পেযালাও ছিল। টিপটেব ভেতব পাঁচ চামচ চাযেব পাতা ফেলে দিযে গবম জল গুলতে গুলতে S—'কতকগুলো খবব কান মলিযে নিজেদেব শুনিযে দিযে যায। কিন্তু আমাব কানে সেসব খবব সব সময পৌছায না। আমাব খবব কে বাখতে যাবে? আমিতো জহব গাঙ্গুলি নই।' বলে টিপটেব ঢাকনি বন্ধ কবে দিলেন।—'তুমি খববেব কাগজ পড়?'

—'[...] বলে একটা ইংবেজি দৈনিক বেবিযেছে যেখানে আমাকে সপ্তাহে দু'টো কবে আর্টিকেল দিতে হয, কাজেই কাগজ নাড়তে চাড়তে হয।'

—'আবাব পলিটিক্সে চলে গেলে?'

—'আজই সে কাজ ছেড়ে দিযে এসেছি।'

—'কেন?'

—'চোখেব ওপব বড় অত্যাচাব চলেছিল, চোখ খাবাপ হযেছে। আমি সমস্ত পড়াশোনাব কাজ ছেড়ে দিযেছি।'

—'কত টাকা দিত?'

—'চল্লিশ টাকা। যে পর্যন্ত চোখ না সেবে ওঠে সপ্তাহে আমাব জন্য দু'টো ইংবেজি আর্টিকেল লিখে দেবে এমন কোনো লোক খুঁজে পেলুম না। আজকাল সকলেই ব্যস্ত। সকলেব পেটেই খিদে, কে কি কববে?'

—'আমি কড়া চা খাই, তুমি?'

—'কড়া চা-ই ভালোবাসি।'

—'তাহলে চা আব একটু ভিজুক। আমি ইংবেজিতে কবিতা লিখতে পাবি। আমাব বাংলা গল্পেব ইংবেজি অনুবাদ কবতে পাবি কিন্তু খববেব কাগজেব ইংবেজি লিখতে পাবি না। তাব কাবণ খববেব কাগজেব বাংলাও লিখতে পাবি না আমি। তোমাব চোখ খাবাপ হযেছে, দুপুব মাথায কবে এলে, চোখে লাগে না? হেঁটে এসেছ নিশ্চয।'

—'আজ দিনটা বেশ ঠাণ্ডা।'

—'আজকে মেঘ কবে আছে বুঝি? টেবও পাই না ঘন্টাতিনেক ঘবেই বসে আছি। কোনো ডাক্তাবকে চোখ দেখিযেছে?'

—'না।'

—'চোখটা দেখিযে নাও। এক জোড়া চশমা হযতো নিতে হবে। সানগ্লাশ আছে?'

—'না।'

—'কিনে নাও। নীল বা সবুজ কাঁচেব, পথে বেরুবাব সময দবকাব লাগবে। কিন্তু সবচেযে আগে চোখ দেখাও।'

—'তাই দেখাতে হবে। আপনাব চোখ বুড়ো বযসেও তো বেশ পবিষ্কাব আছে।'

—'না। আমি খুব কম দেখতে পাই। হযতো শেষ বযসে অন্ধ হযে যাব। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা কবে দবকাব নেই। যে কাবণেই হোক এক-এক জনে চোখ নষ্ট হযে যায। কি কবে একজন মানুষ ক্রমে ক্রমে অন্ধ হযে গেল সে প্রসঙ্গ শুনতে ভালো লাগে না আমাব। আকাশেব অগাধ বৌদ্রেব ভিতব চিলেব চোখ কি তীক্ষ্ণ অনেক সময বিস্মিত হযে সেই কথা ভাবতেই ভালোবাসি। আমাব মনে হয চা এতক্ষণ জমে উঠেছে। ঢালা যাক—'পেযালাব ওপব ছাকনিতে চা ঢালতে ঢালতে ১—'দুধ নেই কিন্তু।'

—'আমি এক কাপ খাব মাত্র।'

—'সেই এক কাপেব জন্যও নেই।'

—'তা আমি জানি।'

—'দুধ নেই বলে এক কাপ খাবে বুঝি?'

—'খানিকটা তাই। কিন্তু এই অসময়ে এক পেযালাব বেশি চলবে না। টিপটে যা চা আছে তাতে ছ-সাত কাপ হযে যাবে।'

—'তা হবে।'

—'এত চা কে খাবে?'

—'আমিই।'

—'চিনি আছে তো?'

—'কিছু আছে। দুধ ছাড়া চা খাওযাব তোমাব অভ্যাস নেই হযতো। না, আজ তা নেই। আমাব মতন কবিতা আব কবিতা তাবপবেও আবাব কবিতা, এই যদি কবো সমস্ত জীবন বসে বসে, তাহলে শেষ পর্যন্ত এইবকম চা-ই খেতে হবে। আজ বউনি কবে নিলে।' বলে হাসতে হাসতে চাযেব পেযালাটি এগিযে দিলেন।—'মিষ্টি ঠিক আছে তো?'

—'আছে।'

—'আমি মিষ্টি কম খাই, বাধ্য হযেই খেতে হয। কোনোদিন চিনি না কিনে দুধ কিনি, কোনোদিন দুধ না কিনে চিনি।'

—'এত টানাটানি তবুও উপন্যাস লিখলেন না আব?'

—'না। মিছেমিছে কালি কাগজ কিনে কি লাভ, ববং দুধ কেনা যাবে। তোমাকে চা দেব আব? লিখতে গেলে আবো কতকগুলো কাগজ কিনতে হত, টাকা তো পেতাম না।'

—'যদি কোনো প্রকাশক জানে যে আপনি নতুন উপন্যাস লিখছেন, তাহলে—'

—'আমাব বাড়িতে এসে টাকা দিযে কপিবাইট কিনে নিযে যাবে।'

—'আমাব তো তাই মনে হয।'

—'তাই যদি হয তাহলে আমাব ছাপানো উপন্যাসগুলোব দ্বিতীয সংস্কাবণ হয না কেন? বাংলাভাষায লিখে আমি খুব কম টাকা পেযেছি। গল্প বলতে ভালোবাসি কিন্তু গদ্য লিখতে বসলেই কলম চলতে চায না আমাব। একখানা উপন্যাস লিখতে অনেক সময লাগে আমাব। যদিও আজ বাঁধা দেবাব কোনো স্ত্রী নেই। আমাব একখানা বাংলা উপন্যাসেব ইংবেজি অনুবাদ কবতেও পাঁচ বছব লেগে গেল আমাব। এব কাবণ অলসতা নয, অসাধ, যে জিনিসকে ভালোবাসি না সে জিনিস ফেলেই বাখি।'

—'আপনাব বইযেব ইংবেজি অনুবাদ কবেছেন, কই জানি না তো।'

—'কবেছিলুম বইকী, সে প্রায দশ বছব আগেব কথা। ম্যাকমিলান কোম্পানি আমাকে পাঁচ হাজাব দিযেছিল সেই বইখানাব জন্য। সেই টাকাযই তো আজও আমাব চলছে।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'কই একথা তো আমবা কেউ জানি না।

—'জানবাব কথা কিছু নয। পাঁচ বছব পবিশ্রম কবে পাঁচ হাজাব পেলুম, বছবে পড়ল একহাজাব। মাসে একশো টাকাব কিছু কম। কলকাতায এমন হাজাব হাজাব লোক যাবা মাসে মাসে আটশো টাকা কবে পাচ্ছে। তাদেব জীবনেব উৎসবেব ইতিহাসই আগে জানো গিযে। আমাব সাংসাবিক জীবন [...] বা মানুষেব কোনো প্রলোভনেব জিনিস নয।'

—'আমাব মনে হয, আপনাব আব-একখানা উপন্যাস লেখা উচিত।'

—'ইংবেজিতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'অর্থাৎ আমাব আবো কিছু টাকা বোজগাব কবা উচিত? সেজন্য কবিতা আব না-ই লিখলাম? আমাব কবিতা ও সাহিত্যেব প্রতি তোমাদেব শ্রদ্ধা তো এই বকম।' S টিপটেব থেকে চা ঢালতে ঢালতে—'তা হবে না। যদি উপন্যাস লিখি, বাংলাযই লিখব। টাকা না পাই, নাই বা পেলুম। আমাব মতো একজন বাঙালি লেখক ইংবেজি সাহিত্যকে কিছু দান কবতে যাবে না। ইংবেজ পাবলিশাবদেব কাছ থেকে টাকা আদায কবতে পাবি যদিও। কিন্তু টাকাব জন্য আমি বেঁচে আছি বলে মনে হয না। বেঁচে আছি আমি সৃষ্টিব জন্য। বাংলা কবিতা আমাব হৃদযে নিজেব থেকেই জন্মায, গল্পও হযতো তেমনি জন্মাবে একদিন। কবিব হৃদয হবে পৃথিবীব মতো, তাব বচনা হবে ঘাসেব মত, অবণ্যেব মতো। এক লাইন ইংবেজিও আমাব হৃদযেব ভেতব ঘাসেব শিষেব মতো জন্মায না।' চাযেব পেযালা কানায কানায ভবে উঠল।

—'চা খাবে আব?'

—'দিন। আপনাব কম পড়বে না তো?'

—'কম পড়লে আবাব তৈবি কবে নেব।'

—'এত চা-ও খেতে পাবেন আপনি আমি কাউকে কোথাও এবকম চা খেতে দেখিনি।'

—'রুশবা [...] খায গল্প কবে—বেশ দিন কাটিযে দেয। আমাবও অনেকটা সেই বকম। তোমাব বাবাব চোখ কি খাবাপ ছিল?'

—'না।'

—'তোমাব মা-ব?'

—'তিনি অল্প বযসেই মাবা যান, তাঁব মুখও আমাব মনে নেই।'

—'আমাব মা-বও চোখ খাবাপ ছিল। সিদ্ধ আলুকে ডিম বলে ভুল কবতেন, ডিমকে ভাবতেন বসগোল্লা। একেবাবে চোখেব কাছে মশলা নিযে তবে বুঝতেন কোনটা হলুদ, কোনটা লঙ্কা। সন্তানদেবও এই সব দিযে যান তাঁবা। তোমাব খববেব কাগজেব অফিস থেকে কিছু দিনেব জন্য ছুটি নাও, একজোড়া চশমা নাও, তাবপব আবাব সপ্তাহে দু'টো কবে আর্টিকেল ছাড়তে শুরু কবে দাও।'

—'না, ও কাজ আমি আব কবব না।

—'বেশ ভালো কাজ পেযেছ তুমি। খববেব কাগজেব গাযেব থেকে কেমন একটা ইঁদুবেব মতন গন্ধ আসে। বাংলা লিখি, তবুও আমাব বাংলা বচনা বাংলা কাগজেব সম্পাদক কেটে দেবেন, নইলে আমিও জার্নালিস্ট হতুম।'

একটু হেসে—'একটু চিনি লাগবে'।

—'চিনি তো আব নেই।'

—'আমি ও কাজ ছেড়ে দিযেছি। গত সপ্তাহে কিছু লিখতে পাবিনি, কোনো জবাবদিহিও দিতে পাবিনি। ও অফিস আমাব ভালো লাগে না, খববেব কাগজই ভালো লাগে না আমাব, খববেব কাগজেব জন্য যে মানুষেব এক-একটা তিন কলম আর্টিকেল লিখতে হয, দিনেব পব দিন, সপ্তাহেব পব সপ্তাহ, বছবেব পব বছব জীবনেব পব জীবন অন্ধকাবেব ভিতব এ জিনিসটাকে একটা তামাশাব মতো মনে হযেছে আমাব। সমস্তটা সপ্তাহ নিস্তব্ধ তামাশাব অত্যাচাব আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন।'

—'কী ভাল লাগে তোমাব?'

—'কলকাতাব এক নির্জন কিনাবে একটা সাদা একতলা বাড়ি, পড়বাব কোঠা, কযেকটা মেহগিনি কাঠেব টেবিল চেযাব, কার্পেট, এবং আমাব দবকাবমতো অজস্র বইযে ভবা—সাবাদিন লিখব পড়ব চুরুট টানব।'

—'সেজন্য চেষ্টা কব না কেন?'

—'ওঃ, সে সব আমি পাব না কোনোদিন। চল্লিশ টাকা মাইনেব একটা কাজ ছেড়ে ষাট টাকা মাইনেব একটা কাজ, সেটা ছেড়ে পঁযতিবিশ টাকা মাইনেয, তাবপব অনাবাবি কিছু, কখনো কলকাতায, কখনো মফস্বলে, কখনো মাস্টাবিতে, কখনো জার্নালিজমে আবাব, কখনো এদেবই কোনো ডালপালায আবাব, এমনি কবেই দিন কাটবে আমাব। এক-একবাব পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হবে ও আজ ইউনিভার্সিটিব প্রফেসব, সে আজ আই সি এস, আব একজন দেবাদুনে বাড়ি কবে ফেলেছে, আব-

একজন বালিগঞ্জে প্রাসাদ তৈবি কবে সুন্দরী স্ত্রী নিযে থাকে, আমাকে কেউই এবা চেনে না। চিনবে না আব, তবুও যেই অফিসে চল্লিশ টাকা মাইনের কাজ ছেড়ে দিযে এসেছি সেখানেই কাজেব জন্য গিযে খোসামুদি কবতে হবে আবাব। সাবাদিন নোনাধবা দেযালেব গন্ধে কাটবে আমাব কিংবা স্টিমাবে থার্ড ক্লাসে অথবা পাড়া-গাঁব খড়েব চালাব নীচে কতকগুলো ছেলে নিযে-তাবপব বাত আসবে যেখানেই থাকি না কেন বাত আসবে, সবাই ঘুমিযে যাবে। আমি একটা বাতি জ্বেলে এক-আধটা কবিতা লিখব। সমস্ত দিনেব জীবন একটা নিবর্থক অনুষঙ্গেব মতো পুড়ে যাবে নিশ্চযই, এমনই পুড়ে গেছে অনেকদিন, দূব আকশেব নক্ষত্রেব রূপালি আগুন।'

—'অনেক কথা বলে ফেলেছ। তুমি কবিতা লেখ?'

—'লিখি।'

—'লেখা ছেড়ে দাও।'

বিস্মিত হযে S—এব দিকে তাকালুম।

—'এক ডাক্তাবকে তোমাব চোখ দেখিও, এক ডাক্তাবকে তোমাব মাথা। গিবীন্দ্রশেখববাবুকে দেখালেও পাব।'

—'কী বকম?'

—'আমি নিজেই আমাব মাথা ডাক্তাব গিবীন্দ্রবাবুকে দেখাতে বাজি আছে, কিন্তু আমাব অনেক বযস হযে গেছে, দেখিযে লাভ নেই এখন আব। সকলেব সহজ পৃথিবীতে ক'টা দিনেব জন্য ফিবে গিযে কি আব কবব? কিন্তু তুমি এখনো ছেলেমানুষ, আমি প্রার্থনা কবি কবিতা তোমাব অনুষঙ্গ হোক, যেমন কলেজেব সাহিত্যেব অধ্যাপক কিংবা সাহিত্য সম্মেলনেব মুখুয্যেশাহেব বাঁড়ুয্যে শাহেব কিংবা এমনি আবো অনেক সাহেবসুবোদেব তা অনুষঙ্গ, কিন্তু সঙ্গেব জন্য তুমি তাদেব মতো সাংসাবিক উন্নতি, একটি মোটবকাব, ডিলাব, এবং সুন্দবী স্ত্রী, সমস্ত মাংসেব সুন্দব পৃথিবীটাকে আলিঙ্গন কবে ধবে গিযে। এ না হলে কিছুতেই চলে না S। কবিতা জিনিসটাকে পশংসা কবতে হয। [...] কিংবা সাহিত্যসভায, তাবপব তাসেব আড্ডা বসাতে হয, এক বকম সিগাবেট টানতে হয, ব্যাংকেব [ডাইবেক্টব] হতে হয, গোটাদশেক নিবীহ স্কুলেব জববজং সেক্রেটাবি সাজতে হয। বিধাতা দেয তাকে, নানাবকম জানোযাবেব মাংস খেতে হয। স্ত্রীকে চাবুক মাবতে হয, প্রণামী আব [..] পড়াতে হয, নানাবকম জানোযাবেব মাংস খেতে হয। আবাব তাসেব আড্ডায গিযে বসতে হয। নতুন আব একটা ব্যাংকেব ডাইবেক্টব হতে হয আবাব। কিন্তু কবিতা বা সৌন্দর্যকে। [...] বা সাহিত্যসভাব থেকে জীবনেব ভেতব টেনে এনে বসানো হয না। সমস্ত দিনেব কাজকর্মেব পব তবুও সে সব সাংসাবিক মানুষদেব অন্য আবো পবিশ্রম থাকে, আবো পবিতৃপ্তি, অন্ধকাবেব ভিতব বিছানাব থেকে বিছানায বিছানায বিছানায বিছানায ঢেব পবিশ্রম, অদ্ভুত সফলতা। তাবপব ঘুম, ক্রমে ক্রমে একদিন মৃত্যু। তবুও পৃথিবীতে এদেব মতন সুখী মানুষ খুজে পাবে না তুমি। এদেব [...] হয। এই কেন্দ্রেব থেকে সবে উৎকেন্দ্রেব দিকে ছুটে মিছেমিছি দুঃখ পেতে যাবে কেন।

—'আমিও অনেক দূব এগিযে পড়েছি।'

—'তিনিশ বছবে মানুষ আব কত এগোয, এখনো পিএইচডি-ব থিসিস দিতে পাব, কিংবা ডিগ্রিব ব্যবসা কবে বড়লোক হযে যেতে পাব।'

চা খাচ্ছিলুম।

—'তোমাব মতো নবযুবককে আমি দেখিছি [...] বা মেযেমানুষকে হৃদয দিযে কেউই উপেক্ষা কবেনি তো। এক একটা কবিতাব বইযেব সুন্দব চামড়াব বাঁধাই, আর্টপেপাব ছাপা, গৌবাঙ্গ প্রেসকে যদিও তাবা ছোটখাটো মোটবেব মতো মনে কবেছে, এক সময কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় মোটবই তাদেব টেনে নিযে গেছে।'

দেবাজেব ভেতব থেকে বড় একখন্ড চামড়া বেব কবে S টেবিলেব ওপব বাখলেন।

—'চল্লিশ টাকাব কাজেব মোহেব ভিতব অবশ হযে পড়ে [...]। মাইনে যাতে চাবশো হয সেই চেষ্টা দেখ।'

—'আপনি নিজে তো সেবকম চেষ্টা—'

—'আমি কোনোদিন চাকবি কবিনি। কোনোদিন চাকবি খুঁজিওনি। আমাব কী কাজ, অনেক আগেব থেকেই ঠিক কবে ফেলেছি। আমাকে মুচি, ছুতোব, কুমোব বলে মনে কবে নিতে পাব, তাবা নিজেদেব

জাত-ব্যবসাযই অনুসবণ কবে, অফিসেব স্বপ্ন দেখে না' ছুবি দিযে এক টুকবো চামড়া কেটে নিযে— 'মনেব মধ্যে তবুও মাঝে মাঝে কামড় বোধ কবি।' ছুবিটা টেবিলেব ওপব বেখে দিযে— 'এমনি বৃষ্টি বাদলাব দিনে গিঁটে বাতে কষ্ট পাই, মনে হয কোথাও তেতলাব ড্রযিংরুমে বসে থাকতে থাকতুম, কেউ আমাব হাত পা মালিশ কবে দিত, বেশ হত তাহলে—' চাযেব পেযালায একটা শেষ দু-চুমুক দিযে বললেন—'মাঝে মাঝে বিযে কবতেও ইচ্ছে কবে আমাব। মানুষেব মন বড় আশ্চর্য।'

—'আপনি অনেকদিন থেকেই বড় একা আছেন।'

—'না, একা আমি নই। বাস্তায বেরুলেই অনেক সঙ্গী জুটে যায। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে আমাব মনে হয আটান্ন বছব ধবে অনেক মনেব বীজ ছড়ালাম, এখন শবীটাকে একটু শান্তি দেযা যাক, একটু তৃপ্তি দেযা যাক।'

আবাব চা ঢালতে শুরু কবলেন।

—'এ বযসে আমাব সম্বন্ধও আসে, নানা জাযগাব থেকে। দু-একটা সম্বন্ধ আমাকে বিচলিতও কবে।' একটু চুপ থেকে—'এক-এক বাব মনে হয আমাব প্রথম স্ত্রীকে ফিবে পেলেও ভালো হত। এবাব আমি আব কবিতা গল্প লিখব না,—সে যত চায তাব সঙ্গে কড়িই খেলব—পৃথিবীব মাটি বসে একটা গাছেব মতো আস্বাদ অনুভব কবে এইবাব আমি আমাব ঘবেব গন্ধেব ভিতবেই একজন সাধাবণ স্বাভাবিক মানুষেব মতন জীবনটা কাটিযে দেব। সাহিত্যিক মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে অধ্যাপকদেব দৈনন্দিন জীবনকে ঠাট্টা কবতে যাব না আব।'

চাযেব পেযালা ভর্তি কবে নিযে S-'এক এক সময আমাব মনে হয কোনো কলেজে কাজ পেলেও আমি তা নেই।'

শুনে কেমন একটা ব্যঙ্গ বোধ কবলুম।

—'তাবপব বিযে কবি। লেখাপড়া একেবাবে ছেড়ে দেই। তাস, পান, সিগাবেট ও সময অসময স্বামীত্বেব সহজ সুন্দব অধিকাব নিযে সবলভাবে জীবনটাকে কাটিযে দেই।' আধ পেযালা চা টেনে নিযে S—'মাঝে মাঝে এই সব কথা মনে হয বলেই পনেবো দিন আগেও একটা বাত আমি জেগে বসেই কাটিযে দিলুম—একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছিল, মেযেটি বিধবা, বযস চল্লিশ, সুস্থ সজীব স্ত্রীলোক, উচ্চ প্রাইমাবি পাশ, হাতেব লেখা সুন্দব, মেযেমানুষেব কাছ থেকে এব চেযে উঁচু কিছু আশা কবতে পাব না তোমবা। ভাবলুম বিযেটা ঠিক কবে ফেলি কোনো কলেজেব কাউন্সিলেব সেক্রেটাবিব কাছে একটা দবখাস্ত পাঠিযে দেই, পৃথীবীব কারু কোনা অপকাব হবে না, আমাব মনন আমাকে পক্ষপাতিত্বেব জন্য গলা দেবে না। চল্লিশ বছব বসে তাকে ঢেব জিনিস দিযেছি আমি, আমাব শবীব এতদিন পবে নিজেকে প্রফেসব বলে, বীজ বলে, বৃক্ষ বলে, জীবজন্তু বলে, বুঝে নিতে পাববে ঈশ্ববেব মনে কোনো অসুখ থাকবে না আব আমাব জন্যই।'

—'কিন্তু দবখাস্ত দিলেই কি কাজ পেতেন?

—'তা আমি পেতে পাবি। আকাঙ্ক্ষা মনে জাগলে আমি খুব জোগাড়ে মানুষ হতে পাবি।'

—'কিন্তু আপনাব তো কোনো ডিগ্রি নেই।'

—'অনবাবি ডিগ্রিব ব্যবস্থা কবে নিতে পাবি আমি।' খানিকটা চামড়া কেটে নিযে — আমাব প্রথম কবিতাব বইখানা কুড়ি বছব বযসেব কথা লিখেছিলুম। চণ্ডীদাস থেকে শুরু কবে মাইকেল পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই বইযেব পাতায নিখুঁতভাবে কথা বলেছেন। আমাদেব দেশেব শিক্ষা ও সংস্কৃতিব বাজ্যেই এই বইখানাব আদব হবে তাই সবচেযে বেশি। এই জন্যই ওবা আমাকে অনবাবি ডিগ্রি দেবে। বড় বড় প্রফেসাবেবও খাতিব পাব।' বলে চামড়া খুদে খুদে ছবি আঁকতে শুরু কবলেন S। খুদতে খুদতেই বললেন—'প্রফেসবদেব নিযে গত দশ বছব আমি যে কবিতা লিখেছি, তা ছাপাতে যাব না আব। আমাব দ্বিতীয তৃতীয চতুর্থ ও পঞ্চম এই চাবখানা কবিতাব বই-যা দুর্ভাগ্যক্রমে বেবিযে গেছে, সেগুলো যাতে আব প্রচলন না হয, সে সম্বন্ধে খুব সচেষ্ট থাকতে হবে।'

—'কেন?'

—'এসব কবিতা—এসব বই আমি ঈশ্ববেব সমক্ষে বসে লিখেছি [...] বা টি এস এলিযট কারু মুখ মনে কবে নয, আকাশ বাতাসেব ভিতব থেকে আদ্ভুত ইপ্সিত্ [...] প্রাণীসব নক্ষত্রেব মতো সব স্পন্দন আমাব জীবনটাকেই নাড়া দিযে এইসব কবিতাব জন্ম দিযেছে।' চামড়াব ভিতব একাটা চশমাওযালা বড়

মুখ এঁকে নিয়ে S—'কাজেই এসব কবিতা এখনকার শিক্ষা ও উৎকর্ষের কাছে মৃত জিনিস।' চায়ে দু-এক চুমুক দিয়ে—'মৃত ঠিক নয়, এদের জন্মই হয়নি।' একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে-'যদিও আমি আজকালকার সংস্কৃতির দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বলে আসতে রাজি আছি যে এ কবিতাগুলো জন্মেছে, আমিই জন্ম দিয়েছি, কিন্তু তবুও আমার মনে হয় এরা জন্মাবে একদিন' S বললেন। ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে—'হয়তো শোয়াশো বছর পরে এরা জন্মাবে। আমি তখন অনেক দিন হয় মরে গেছি। শোয়াশো বছর কেটে গেছে কাজেই এ কবিতাগুলোর পরিস্ফুট জন্ম নিতে কোনো বাঁধা নেই আর। এসব কবিতা সম্বন্ধে বড় বড় মাসিক পত্রিকায় সমালোচনা বেরুবে—কেউ তা পড়তে যাবে না। অধ্যাপকরা। তাদের ভিতর যাদের বায়ুর রোগ আছে হয়তো হাত পা ছুঁড়ে মাথা নেড়ে নেড়ে মৌসুমী সমুদ্রের মতো উচ্ছ্বাসে এই কবিতাগুলো ক্লাসে ক্লাসে পড়াবেন। ছেলেরা [...] তারিফ করবে, হয়তো অগ্রাহ্য করে যাবে। প্রফেসর লেখচার ফিনিশ করে টাকার কথা ভাববেন। নিজের বক্তৃতাশক্তির ওজস্বিতায় বক্তমুখ হয়ে থাকবেন, হয়তো কবিতার কথা মনেও থাকবে না তাঁর। হয়তো দেশের আনাচে কানাচে দু-চারজন মানুষ, দু-তিনটা নারী হয়তো আছে, আমদের সেই নাতিরা আমাদের মতোই মানুষ; আরো অনেক কবিতার সঙ্গে আমার এই কবিতাগুলোও পড়বে, পড়ে আস্বাদ পাবে হয়তো,নানারকম কথাও হয়তো ভাববে। এই সব আমি অনেকদিন থেকেই জানি'— S বললেন—' জেনে তামাশার আর শেষ নেই আমার মনের ভিতর। কিন্তু রাতের অন্ধকার ফুরিয়ে গেলে তামাশাও শুকিয়ে যায়। দিনের আলো ভিতরেও তামাশা শুকিয়ে যায়। আটান্ন বৎসর বসে অনেক ফুর্তিই হল, কিন্তু সৃষ্টি করবার সাধ এখন আর নেই—না সৃষ্টি নয়, এখন সৃষ্টি জন্তু হতে চাই।'

—'সম্বন্ধে কে এনেছিল? মেয়েটিকে দেখেছেন?'

—'না।'

—'তবে'—

—'তার শরীর সুস্থ থাকলেই হল। এক গেঁটেবাত ছাড়া আমার আর কোনো ব্যথা নেই, শরীর সুস্থই আছে।' S হাতে চুরুট নিভে গিয়েছিল, দেশলাইটা কোথায় রেখে দিয়েছিলেন খুঁজে বার করে নিয়ে—'আমি যদি আর কবিতা না লিখি, তাহলে এই বয়সেও একটি চল্লিশ বছর বয়সের বিধবার মন সুস্থ রাখতে পারব আশা করি।'

—'আপনার মনও সুস্থ থাকবে?'

—'নিশ্চয়। আমি খুব শান্তিতে থাকতে পারব। লেখা টেখা ছেড়ে দেব কি না' জীবন হবে শরীর মাত্র, মাঠের যে কোনো গাছ, কলেজের যে কোনো প্রফেসরের মতো।'

—'তাহলে [...] আপনি বিয়ে করবেন?'

—'সেইটে ভাবছি। S চুরুটা জ্বালিয়ে নিলেন।

—'এক এক বার মনে হয় লেখাটেখা ছেড়ে দিয়ে ওদের মতো শুধু স্ত্রী ও তাস নিয়ে থাকতে পারব কি? হয়তো ঘরের বাইরে চলে যেতে হবে মাঝে মাঝে। অন্য কোনো একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে।'

—'গ্যাস লাইটের নীচে গিয়ে কবিতা পড়বেন না আর?'

—'না, সে অধ্যায় আমার শেষ করে ফেলতে হবে।' খানিকক্ষণ চুরুট টেনে নিয়ে—'আটান্ন বছর একরকমভাবে জীবন চালিয়েছি। এর পর যদি হাতে টাকা ও স্ত্রী আসেও তবুও যে কেবল দাবা খেলে পান খেয়ে, সন্তানের জন্ম দিয়ে কাটিয়ে যেতে পারব তা মনে হয় না। কোনো একটা বড় আকর্ষণের জিনিস থাকা চাই। আমার মনে হয় আমি থিওজফি নিয়ে থাকব।'

—'ওপারে কী হয় তারই আলোচনা?'

—'হ্যাঁ'

—'কিন্তু ওপার কি আছে?'

—'কি করে বলব, আছে কি নেই? এতদিন শুধু কবিতা নিয়ে পড়েছিলুম। থিওজফির পরলৌকিক জিনিস নিয়ে চর্চা করতে হবে সব।'

এমন সময় একটা চমৎকার [...] কার এসে S-এর দরজার কাছে থামল। বেরিয়ে দেখলুম তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের একটি মহিলা খুব দামী পোশাক পরিচ্ছদ পরে—চেহারাও তার বেশ মূল্যবান যেন বিদিশা বা বেবিলনের কোনো প্রাসাদের ভিতর থেকে নেমে এসে হাজির হল আমাদের কাছে।

—'বোস কমলা।'

—'কিন্তু আপনার এখানে চেয়ারের অভাব বড়।'

আমি উঠে দাঁড়ালুম।

S টেবিলের কিনারে থেকে একটা টিনের চেয়ার টেনে বের করে— 'কমলা বোস।'

আমি বসলুম।

—'কী খাচ্ছেন আপনি ? কফি?'

—'এগুলো চা।'

—'চা না, গরম জলে চকোলেট ভিজিয়ে খাচ্ছেন? এ জানলে সঙ্গে করে দুধ নিয়ে আসতুম।'

—'তুমি যখন এসেছ তখন দুধ চিনি কিছুরই দরকার নেই। কি মনে করে এসেছে তুমি?'

—'যদি বলি যে আমরা একটা মাসিক পত্রিকা বার করেছি, আপনার কাছ থেকে কবিতা চাই। কিন্তু সেকথা কেনই-বা বলব? আজকাল কোনো মাসিক পত্রিকার জন্যই কবিতার দরকার হয় না। কেউই তা পড়েও না। বরং করচের বিজ্ঞাপন পড়ে (তবুও কবিতা পড়ে না), আপনারা একটা অধম জিনিস নিয়ে জীবনটা খুইয়ে গেলেন।'

—'না, আর খোয়াব না। এবার ভেবেছি হরকান্তবাবুর মতো হবে।'

কমলা ঈষৎ ভুরু তুলে হেসে S-এর দিকে তাকাল—'তার মানে?'

—'আমি এবার বিয়ে করব, তা জান?'

—'করলেই বা।' কমলা মাথাটা একটু কাত করে —'কাকে করছেন?'

—'তোমাকে তো করতে পারব না। কিন্তু তবুও চল্লিশ বছরের একটি বিধবাকে বিয়ে করে থিওসফি পড়ব ভাবছি।'

—'বিয়ে যাকে খুশি করেন, কিন্তু থিওজফি কেন পড়বেন?'

—'আমার অতীত জন্মেও আমি শুধু কবিতা লিখে কাটিয়েছি, না তোমার মতন একজন রূপসীকে পেয়েছিলুম (আমার মনে হয় পেয়েছিলুম আমি) আমার ভবিষ্যৎ জন্মেও তোমার মতোন একটি বেত্রবতীকে পাব কিনা, না বেতের ফলের সঙ্গে ম্লান চোখের তুলনা দিয়ে কবিতাই লিখে যেতে হবে আমার? এইসব অনুসন্ধান করবার জন্য—'

—'প্রেতাত্মার জন্য নয়?'

—'এই সবই তো প্রেতাত্মা।'

—'একটি বিধবাকে সব শেষে বিয়ে করবেন ঠিক করলেন?'

—'হ্যাঁ তার বয়স চল্লিশ বৎসরও। আমার বয়সও আটান্ন এইবার জৈব প্রাণতৃপ্তিতে কাটবে আমার। কবিতা লেখা ছেড়ে দেব। স্ত্রী ছাড়া আরো একটা গভীর আকর্ষণের জিনিস নিয়েও থাকব ভাবছি।'

—'সেটা কি S '

—'তুমি নাও।'

—'আমাকে আপনি অতীতেও পাননি, ভবিষ্যতেও পাবেন না।'

—'অতীতে পেয়েছি, নইলে এরকম কবিতা আমার হাত থেকে বেরুত না।' একটু চুপ থেকে—'আমার মনে হয় বিদিশা থেকে শুরু করে কবিকঙ্কনের বাংলা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে দিনে দিনে আমার খুব গভীর পরিচয়। আমার অনেক কবিতাই সেই স্মৃতির শুদ্ধি মাত্র। কিন্তু যে আকর্ষণের জিনিসের কথা বলছিলাম—'

—'বলুন—আপনার চা জুড়িয়ে গেল'—

—'আমার চুল প্রায় পেকে এসেছে। এখন দাড়ি রাখব ঠিক করেছি। পাকা দাড়িই বেরুবে, যতদূর লম্বা হতে চায় হবে। আর কবিতা লিখব না আমি। আমার সমস্ত অতীত জীবনকে অস্বীকার করব। আজকাল যারা কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে তাদের সে সব দূর্নীতির থেকে অনেক দূরে সরে থাকব আমি। বক্তৃতায় বা উপাসনায় বা মাঝে মাঝে দু'একটা প্রবন্ধ লিখে তাদের নির্যাতন করব। একটা ডক্টরেট ডিগ্রি হয়তো অনবরি জোগাড় করে ইউনিভার্সিটির,খুব বড় মানুষ হয়ে উঠব আমি। কবিদের মধ্যে একমাত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থ আমার সঙ্গী হবেন, আমার আর একমাত্র সঙ্গী হবেন ঈশ্বর—দেশের লোক কেউ আমাকে একটু বিচিত্র মানুষ বলে ভাববে, কিংবা অন্য অনেকেই আমাকে অসামান্য মহাপুরুষ বলে

মনে করবে, আটান্ন বছর কবিতা লিখে যা সম্মান পেয়েছি, সংগামী তিন বছরের ভিতরেই তার চেয়ে অজস্রগুণে গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে পারব—লোক আমাকে ঈশ্বরের দান না মনে করে, ঈশ্বরের একজন একান্ত সহচর বলেই মনে করবে, ভাববেন আমকেই আমি পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলেছি,—আমি প্রায় পনেরোটি সন্তানের জন্ম দেব।'

কমলা—'হরকান্তবাবুর গল্পটা বলুন।'

—'গল্প নয়, হরকান্ত একজন মানুষ।'

—'হরকান্ত চক্রবর্তী?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী করেছিলেন তিনি?'

—'তোমার দেখছি গল্প শুনবার ঢের সময় আছে? কোনো কাজে এসেছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'মিত্তির সাহেব এখন কোথায়?'

—'অফিসে।'

—'আর তুমি বাড়ি বাড়ি [...] নিয়ে ফিরছ?'

—'কী করব যাদের কোথাও কোনোদিন পাওয়া যায় না সে সব মানুষকে তো একেবারে ভুলে গেলে চলে না।'

কমলার কথা যেন প্রাণে শুধু নয়, শরীরে এসেও লাগে, বাংলার ঘাসের স্পর্শের মতো।

—'চক্রবর্তী সাহেব কি হেঁটে অফিস যান?'

—'তা হবে কেন? আমাদের গ্যারেজে চারটে মোটর আছে, শিগ্‌গিরই তো যাননি ওদিকে—'

—'কোনো সোফার তো দেখছি না। নিজেই ড্রাইভ করতে শিখেছ?'

—'আপনাকেই তো কতবার ড্রাইভ করে নিয়ে গেলুম—বড্ড ভুলে যান। এখন তিনটে বেজেছে, আজ ছ'টার সময় একটা সভার ব্যবস্তা করেছি।'

—'সভা বোলো না, মজলিশ বলো, তোমরা যে সব জিনিসেব ব্যবস্থা কব, কিংবা আজকাল ব্রজেন শীলের বক্তৃতাযও আত্মিক কথা শুনতে যায না, মনে হয যেন কনকলতাকে দেখতে চলেছে।'

আমি—'ব্রজেনশীল কি বক্তৃতা দেন?'

কমলা একটু হেসে—'তাহলে মজলিশই , আজ ছ'টার সময মজলিশ বসবে।'

—'কোথায?'

—'আমাদেব শ্যামবাজারের বাসায তেতলায হলঘবে। প্রায শ-তিনেক লোক আঁটবে।'

—'লোক কারা? চটকলের মজুব?'

কমলা আমাব দিকে তাকিয়ে বললে—'দেখুন তো, কথাই ফুরতে দেয না।' কমলা—'সে আপনি যাই মনে করুন না কেন, মজনুদেব নিযে কখনো উৎসব হতে পাবে না। তাদের নিযে উৎসব করতে গেলে তারা নিজেরাই আপনাকে ঠেঙাবে। অনেক বড় বড় লোক আমাদেব বাসায উপস্থিত হবেন আজ।'

—'তাদেব ভিতব ক'জন ধুতি পরে আসবে ক'জন সুট পরে আসবে তা আমাকে জানাতে হবে। মেযেরা গাউন পবে আসবেন না তা আমি জানি। আব মনে হয আমাদেব দেশের এই আচাবটাই পুরুষদের চেযে তাদের বড় করে রাখত, যদিও নিজেদের স্বামীদের সাহেবি পোশাককে—'

—'ধুতি পরে আসবে অনেকেই। মেযেরা গাউন পববে না। আপনাকে সেখানে যেতে হবে। আপনাব কযেকটি নতুন কবিতা পড়ে শোনাতে হবে।'

—'তা আমি পারব না।'

—'কেন, নতুন না পারেন, পুরোনো কবিতাই পড়বেন।'

—'সে সব কিছুই হবে না।'

—'কেন?'

—'কবিতা আমি পথের মানুষের কাছে গিয়ে পড়ি, রাস্তায় গিয়ে পড়া যেতে পারে। আমার ঘরে বসে নিজে নিজে পড়ি, কিংবা তুমি কাছে থাকলেও পড়ে শোনাতে পারি। কিন্তু যেখানে উমাশশীর অভিনয় হলেও চলত বরং তাই-ই ভালো হত, যেখানে গিয়ে আমি আমার কবিতা পড়ি না।'

—'আপনি কি মনে কবেন বাযোস্কোপ বেডিওব চেযে বাস্তায লোক আপনাব কবিতাকে বেশি পছন্দ কবে?'

—'আমাব কবিতাকে কেউই পছন্দ কবে না। এতদিন কেউ আমকে জুতো ছুঁড়ে মাবেনি সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু তবুও বৃষ্টিভেজা ঘেমো মানুষগুলোব জন্যই আমাব দুর্বলতা।'

—'তাহলে আমাকে কি কবতে বলেন?'

—'আমাব কবিতা আবৃত্তি সে সবেব থেকে বাদ দেও, এত লোক যখন ডেকেছ তখন দশ পাঁচ বকম জিনিস হবেই'—

—'কিন্তু সেইটেই তো সবচেযে আকর্ষণেব জিনিস ছিল।'

—'তা তোমাব কাছে, ওদেব কাছে নয।'

—'কী কবতে বলেন আমাকে আপনি?'

—'আমাকে বাদ দিযে মজলিশটাকে বাঁচাও গিযে, আমি তো ওটাকে গুঁড়ো কবে মেবে ফেলতাম।' বলে S চা ঢালতে লাগলেন।

—'মেবে তো ফেলেছেনই-'

—'প্রার্থনা কবো বাস্তাব [...] যেন একদিন আমাকে শূযাব মনে কবে কলকাতাব থেকে তাড়িযে দেয।' S আস্তে আস্তে চা খেতে লাগলেন।

কমলা তাব ডান হাতটা খানিকটা তুলে দু-একটা আঙুলেব নখেব দিকে তাকিযে—'তাহলে উঠি, [ফোন] কবে দেই গিযে, সময তো বেশি নেই।'

—'কাকে ফোন কববে?'

—'সকলকেই।'

—'কী বিষয?'

—'বলে দেব S-এব অসুখ, তিনি আজ আসতে পাববেন না।'

—'এই শুধু? বেশ তো বল গিযে। তাতে লোক বাড়বে বই কমবে না। আমাব কোনো কবিতাব বইযেব দ্বিতীয সংস্কবণ হযনি।'

—'না, আমি বলে দেব আজ সভাই হবে না।'

S আব-এক টুকবো চামড়া কেটে নিযে ছবি আঁকতে বসে গেলেন।

আমি—'শুনেছি উদযশঙ্কব এখন কলকাতায আছেন, আপনি যদি যান তিনি নিশ্চযই আপনাদেব সভায এসে অনেক আনন্দ দিতে পাববেন।'

—'কিন্তু সে সব উদ্দেশ্য নিযে এসভা তো ডাকিনি আমি।'

—'উদযশঙ্কবকে পাওযা শক্ত কমলা' S বললেন।

কমলা—'আপনাকে পাওযা আবো শক্ত।'

১৯৩৬

কুড়ি বছর পরে

সন্ধ্যায় সেদিন তাসের আসরটা কিছুতেই জমে উঠতে চাইল না। রোজকারমতো সেদিনও নীরেনদের বৈঠকখানায় সাজসরঞ্জামের কোনোই অভাব ছিল না। মেহগিনি কাঠের চমৎকার টেবিল, আলোর সুন্দর ব্যবস্থা, গদি-আঁটা চেয়ার, দামি সিগারেটের টিন। মফস্বলেও এমন সব চমৎকার ব্যবস্থার জন্য নীরেনকে আমরা রোজই একবার করে ধন্যবাদ জানাতাম।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। আমি একটু দেরি করেই গিয়েছিলাম, কিন্তু পৌঁছে দেখি বাকি তিনটি মানুষ কেউ-বা ইজিচেয়ারে ঝিমুচ্ছে, কেউ খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করে হয়রান হয়ে গেল, নীরেন একরাশ চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে ঘরের সবচেয়ে এক অন্ধকার কোন বেছে চুপ করে ডেকচেয়ারে বসেছিল।

—'নীরেন।'

আমার দিকে ফিরে তাকাল সে।

—'ব্যাপার কি বলো তো?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

—'তোমার কি শ্মশানের থেকে ফিরে এসেছ?'

এবারও কোনো জবাব নেই।

—'না সেখানে যাবে? পাড়ার কেউ মরেছে টরেছে নাকি?' পকেটের থেকে চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিয়ে—'রাজুর যক্ষ্মা হয়েছে শুনলাম। কাল তাকে কলকাতার থেকে আনা হয়েছে। মারা গেল নাকি?'

পীতাম্বর খবরের কাগজের থেকে মুখ না তুলে—'কেউ মারা গেছে বলে শুনিনি। মারা গেলেও আমাদের তাতে কি। সকলেই মরে যাবে একদিন। মৃত্যু জীবনের মতো সৃষ্টির সবচেয়ে ধূসর ব্যবস্থার জিনিস—এত স্বাভাবিক যে এ সম্বন্ধে ভাবতেই ইচ্ছা করে না।'

—'এসো তাহলে খেলা আরম্ভ করা যাক। প্রায় সাতটা বাজে, আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। গিন্নীর কাছে বড় নাকাল হয়েছি।'

সকলেই নিরুত্তর।

—'বাস্তবিক আমাদেরই দোষ, সকালে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে চা খেয়েই যাই চান করতে, তারপর ভাত খেয়েই অফিসের দিকে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় ফিরে চা ফুরুতে না ফুরুতেই নক্ষত্রপীড়িত জীবের মতো লাঠিটা নেই হাতে, তারপর এগারোটা-একটা রাত পর্যন্ত তাস —আমাদের চারজনের চারটি স্ত্রী বেদনামেদিনী আবলুশ কাঠের মূর্তি না।'

নীরেন অন্ধকারের কোনা থেকে উঠে এসে—'আস্তে শিবরাম, বারান্দায় স্ত্রীলোকের পায়ের শব্দ শুনছ না? তিনি অনেক নিদারুণ সত্য কথা বলতে পারেন কিন্তু। বোসো তোমরা, তিনি বোধ হয় চা আর পাঁপড়ভাজা সাজছেন।' একটা চেয়ার টেনে নীরবে টেবিলের পাশে এসে বসল। পীতাম্বর আস্তে আস্তে কাগজ গুছিয়ে রাখল। অনিল চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে চুরুটটা আস্তে আস্তে নিভিয়ে ফেলল। মিনিট পাঁচেক আমরা একটা নিস্তব্ধতার কুয়াশার ভেতর কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কেউ এল না।

—'এইবার ঠিক হয়ে বসা যাক'; চাপ গলায় শুরু করলাম।

নীরেন বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে—'আশ্চর্য, অন্ধকারে চেয়ারে বসে ভাবছিলুম, আমরা সকলেই এই শহরের ছেলে, এখানকার ইস্কুল থেকেই পাশ করে বেরিয়েছি, চারজনের ভিতর অদ্ভুত মিল ছিল আমাদের, ঘুরেফিরে একই শহরে চারজনে কাজ নিয়ে বসেছি।'

—'কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য কেউ কারু কাছ থেকে টাকা ধার করি না'—পীতাম্বর বললে।

—'বাস্তবিক, আমাদের সেই ইস্কুলটার কথা বেশ মনে হয়, সে আজ বাইশ বছর আগের কথা। ইচ্ছা হয় আবার সেই হেডমাস্টারের ক্লাসে গিয়ে বসি। সাদা দাড়ির সেই বুড়োমানুষ, অনেকদিন হয় মারা গেছেন। পৃথিবীর পথে অনেক তো হাঁটলুম কিন্তু শেষপর্যন্ত মায়ের কথা মনে থাকে, এক-আধজন মাস্টারের কথা মনে থাকে, দু-চারটি ছেলের কথা মনে থাকে, ভূমিকম্পে এলোমেলো বাড়ির মতো আর

সব অন্ধকারের ভিতর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে যায়।'

নীরেন—'আমার মনে হয় তিনি আরো কয়েকটা দিন বেঁচে থাকলে পারতেন। আমরা কেউ কাজ শুরু করবার আগেই তিনি মারা গেলেন।'

পীতাম্বর—'আমরা অনেক কলেজে পড়েছি, নানারকম লেকচারের আড়ম্বরে উত্তেজিতও হয়েছি কম না। কিন্তু এখন যখন সব শব্দ থেমে গেছে—'বলে সে থামল। হেডমাস্টারের খুব প্রিয় ছাত্র ছিল সে। তবুও আজ রাতে আর কিছু বলতে গেল না পীতাম্বর। তাকিয়ে দেখলাম সে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে। দু-মিনিট আগেই সে মৃত্যুকে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বিচলিত হয়ে সে আছে।

—'এখন যখন আমরা চারজন এসে মিলি, আবার সেই ইস্কুলটা বেঁচে ওঠে যেন। তোমাদের সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক-একবার আমার মনে হয় ইস্কুলটা বাইশটা বছর যেন আমদের সকলকে নিষ্কৃতি দিযে কোথাও সরে গেছে, আবার সেই হেডমাস্টার, দেযালের গন্ধ, সেই সব রোদের আস্বাদ বেঁচে উঠেছে যেন।'

পীতাম্বর—'আমাদের অনেক সময় মন হয়, আমাদের জীবনটা কোথার থেকে কোথায এসে দাঁড়াল। কত আশা স্বপ্ন ছিল, কোথায গেল সব। কিন্তু আমার মনে হয, সবই থাকে, কিছুই নষ্ট হয় না, জীবনটাকে গ্রহণ করতে জানলে বুঝতে পারা যায সবই রয়েছে। এই ঘবের ভিতর চারজন এসে আমরা যখন মিলি, পরস্পরের মুখের দিকে চাই, কথা বলি, হাসি, তখন মৃত্যু আর জীবন, অতীত আর ভবিষ্যৎ সমস্ত একই জিনিস মনে হয, একটা সুন্দর শান্ত বর্তমান মাযের মতো আমাদের জড়িযে রাখে যেন।'
পীতাম্বর—'সে বর্তমান বাইশ বছর আগের সেই ইস্কুলের বর্তমান, আজকেরও বর্তমান, হেডমাস্টার পড়াচ্ছেন, দুপুরে বাতাস ভেসে আসছে, কাঁঠাল গাছেব আঁকাবাঁকা ছবিব মতো ডালে বসে কাক ডাকছে, সবই রযে গেছে, কোনো আশা কোনো স্বপ্নই ফুবাযনি।'

—'ফুরাতে কি পারে কিছু?' কে যেন বললে।

—'অফিসে যখন হাতে কোনো কাজ থাকে না [...] কিনার দিযে ঝাউগাছেব ভিতর একটু ঘুরেফিবে আসি, এক এক সময। দুধেব ফেনার মতো নরম নির্জ্জ দুপুবের বাতাস, বাবলা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে, মৌমাছিগুলো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, মনে হয যেন মা বেঁচে আছেন, হেডমাস্টার বেঁচে আছেন [...] গন্ধ এখনো শেষ হযনি, আজকের অফিস বাইশ বছব আগেই সেই দিনগুলো সবই এক-সকলেই তোমার জন্য বযে গেছে, তুমি গ্রহণ করলেই হল।'

অনিল ছাড়া তিনজনেই চুরুট টানছিলাম আমরা, চুরুট টানছিলুম, কথা বলছিলুম, নীবেন বাতিটাকে একেবারে নিভিযেই ফেলেছিল। ছেঁড়াখোঁড়া মেঘেব ভিতব থেকে মাঝে মাঝে চাঁদ বেরিযে পড়ছিল—মনে হচ্ছিল যেন বৃষ্টিব জল নিঃশব্দে ঝবছে, তাব রূপ ধূসর মাছেব মতো যেন, যেন কোনো মাযাবতীব পৃথিবীর।

—'আমাদের ইস্কুলের [..] [..] ভারী চমৎকার ছিল, অনেকটা কারুকার্য [....] করে ফেলেছে।' অনিল বললে।

পীতাম্বর—'আমাদের ভেতর [...] বোধহয সবচেযে ভালো কবেছে।'

—'[...] ? সে কোথায আজকাল?'

—'[...] করে।'

—'এখন কি পায না পায জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, শুনেছিও সে নাকি [...] যাবে পীতাম্বব।'

—'হযে যাবে?' অনিল হেসে উড়িযে দিল। হযে নিক না। আমার মনে হয ঈশ্বরই সবচেয়ে সাইন করেছে আমাদের মধ্যে।'

নীরবে—'কে? ঈশ্বর বর্মা?'

—'হ্যাঁ।'

—'ছেলেটি বাঙালি না বিহাবি না কি আজও আমি বুজতে পারলুম না। বর্মা এখন করে কী?'

—'যুদ্ধের সময় চামড়ার কারবারে নেমেছিল, কলকাতায এখন তাব তিনখানা মস্ত মস্ত বাড়ি।'

—'ভেরি গুড।'নীরেন বললে।

—'আমি এসব বিশ্বাস করি না' পীতাম্বর বললে—'বর্মা বরাবরই কেমন যেন চালবাজ ছেলে। সত্যমিথ্যা সবই তার কাছে সমান। ভাবগতিক তার কোনোদিনও সুবিধার ছিল না।' চুরুটে এক টান দিয়ে পীতাম্বর, 'সংসারে অবশ্য এরাই [...] করে, কিন্তু জীবনের ভিতর কোনো সার জিনিস না থাকায়

সংসারের কাছেও মার খায় এরা। গত বড় দিনের সময় যখন কলকাতায় গিয়েছিলুম, ক্ষীতীশের কাছে বর্মার সমস্ত কথাই শুনে এসেছি আমি। আড়াই লাখ টাকা দেনা।'

—'আড়াই লাখ!' নীরেন স্তম্ভিত হয়ে পীতাম্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'আমাদের ভিতর এরকম এক আগ্নেয়গিরি ছিল ভাবতেও ভয় করে' নীরবে—'কিন্তু এও ঠিক পীতাম্বর যার ভিতর এত বারুদ রয়েছে তার শক্তি দেবতার মতো তা হলেও দৈত্যের মতো নিশ্চয়ই, মানুষের চেয়ে ঢের ওপরে ঈশ্বর।'

অনিল—'বার্মার কথা মনে হলে নিজেদের পিঁপড়ের মতো মনে হয় পীতাম্বর। মনে হয় যেন চারটি মাছি আমরা অন্ধাকরের ভিতর মিছাই ভন ভন করছি।'

পীতাম্বর চোখ বুজে মাথা নাড়তে নাড়তে—'ভুল অনিল, নীরেন, তুমিও ভুল করেছ। দৈত্য জানত মানুষের চেয়ে বড় হয় না, অসংযম, মিথ্যা ও বিক্ষুব্ধতা নিয়ে ঈশ্বর বর্মার জীবন।'

নীরেন—'সবদিক দিয়ে ভেবে দেখলে আমার মনে হয় নরেশই সবচেয়ে ভালো করেছে, বিলেতেও যেতে হয়নি, এখানে থেকেই পাশ করেই এম বি পাশ করে সিবিল সার্জেন হয়েছে।'

—'নরেশ ডাক্তার হল?'

নীরেন—'আমার মনে হয় যত রকম কাজ আছে ডাক্তারিই সব চাইতে ভালো।'

—'টাকার দিক দিয়ে?'

—'না। পীতাম্বর যাকে মানুষের জীবনের সার জিনিস বলেছে সেই দিক দিয়ে। পাড়াগাঁর একজন সামান্য ডাক্তারও মানুষের হৃদয় কীরকম গভীর ও বিস্তৃত হয়ে উঠতে পারে মানুষকে অহরহ তা বুঝাতে দেবার সুযোগ পায়।'

—'সুযোগ পেলেই তো হল না, সুযোগের সুব্যবহার করা চাই।'

নীরেন—'অনেকেই তা করে। অনেক ডাক্তার নার্স আছেন যাঁরা মানুষের আত্মীয়েরই মতো যেন। আমার অনেক সময় মন হয় আজকালকার সভ্যতা অনেক ভালো জিনিস করেছে, কিন্তু তবুও দু-একটি চমৎকার জিনিস বাঁচিয়ে রেখেছে, ডাক্তারের জীবন তার ভেতর একটি।'

—'আমার তা মন হয় না নীরেন, অপব্যবহার সব জায়গায়ই আছে। মানুষ আত্মত্যাগের সুযোগ সবক্ষেত্রেই পায়, কিন্তু প্রায়ই নিজের পিপাসা মেটাতেই সবচেয়ে ভালো লাগে তার। কিন্তু কোনো জিনিস ভালো, কোন জিনিস মন্দ, জীবনের লক্ষ কী, ত্যাগ না উপভোগ ঈশ্বর (ঈশ্বর বর্মা নয়) আছেন কি নেই, থাকলেও তিনি কী চান এই সমস্ত জিনিসই আমার কাছে সমস্যার মতো। নরেশ আজকাল কোথায়?'

—'[...]'

—'হাওয়া বদলাতে গেছে?'

—'না, সেখানেই সিবিল সার্জেন।'

—'[...] গিয়ে সিবিল সার্জেন হয়েছে, শক্তি তো কম নয়।'

অবাক হয়ে নীরেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

অনিল—'বা, আর এমন বেশি কি হল। নরেশ তো ভালো ছেলেই ছিল। যোগেশের মতন একজন ওঁচা ছেলে ছিল আমার ক্লাসে, সে পাঞ্জাব [...] [...] কাজ করে।'

—'যোগেশ!' স্তম্ভিত হয়ে পীতাম্বরের দিকে তাকালুম।

—'তুমি তো হাতুড়ি পিটিয়েও যোগেশের মগজে কোনোদিন অঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে পারনি পীতাম্বর, আমি নিজেই জানি,' নীরেন বললে '[...] উঠে ও তিন লাইন ইংরেজি সে কোনোদিন নিজের বুদ্ধিতে লিখে উঠতে পারেনি।'

—'কিন্তু পাঞ্জাবিদের কাছে আমাদের নাম সেই-ই তো বজায় রাখছে।'

—'মানুষের জীবনটা কেমন অদ্ভুত' নীরেন অবসন্নভাবে আড়ামোড়া খেয়ে হাই তুলে চুরুটটা রেখে দিল টেবিলের ওপর 'কিন্তু অনিল, যোগেশ কি বাস্তবিকই পাঞ্জাবে মস্তবড় চাকরি করে?'

—'তোমরা কেন যে আজও এসব খবর জান না বুঝতে পারি না। আমি তো আগেই বলেছি আমরা চারজনে এখানে চারটি মাছির মতো দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমদের ভিতর যাদের বাস্তবিকই কিছু জিনিস ছিল তারা বিদেশে সম্মান পাচ্ছে, দেশের নাম রাখছে।'

পীতাম্বর চোখ তুলে মাথা নেড়ে—'দেশের নাম? হলই-বা [...] বড় চাকুরে। দেশের নাম রাখতে হলে বড় সজাগ হয়ে থাকতে হয়। বাইরের পৃথিবীতে আমাদের মনের ভিতর নানারকম অদৃশ্য জিনিস রয়ে গেছে, টের পাওয়া চাই, তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া চাই, তাদের রূপ ও আনন্দ মানুষকে বুঝতে

দেওযা চাই। সে শক্তি দু-একটি লোকেব থাকে শুধু। আমাব মনে হয না আমাদেব ইস্কুলের কোনো ছেলের ভিতব এটা ছিল।'

—'পীতাম্বব বলতে চায যে কবিতা লিখতে না পাবলে বড় হওয়া যায না।' বলে উঠে দাঁড়াল অনিল।

বললুম—'বোসো অনিল, এত তাড়া কীসেব?'

—'ব্যাংকে একটা ডাইবেকটবের মিটিং বয়েছে কাল।'

—'তাতে তোমার কি? তুমি তো ডাইবেকটব নও, মিটিং তো আজ হচ্ছে না—'

—'না কিছু হচ্ছে না জীবনে। একশো টাকা মাইনেব চাকবি নিযে পড়ে বইলুম, [...] নাও এবাব খেলা শুরু কবো।'

—'খেলাটা নেশাব মতো কবে তুলো না অনিল, অত অস্থিবই বা হও কেন? হযতো একদিন ব্যাংকেব ডাইবেকটব হবে, কিংবা [...] ব্যাংকেব [...] অনেক টাকা পাবে। এই তো কথা। কিন্তু অনেক টাকা পেযেও অনেক সময না দেখতে পাওয়া যায জীবনেব রূপ, না খুঁজে পাওয়া যায জীবনেব আনন্দ। বোসো অনিল।'

অনিল চেযাবে বসে একটা চুরুট জ্বালিযে নিযে—'আমাব মনে হয আমাদেব এই দলটা ভেঙে পড়লেই সবচেযে ভালো হয। বাত বাবোটা পর্যন্ত তাস পিটিযে আমবা কেউ কিছু কবে উঠতে পাবব না জীবনে। জীবনে বোলো না, সংসাব বলো। আস্বাদেব সৌন্দর্য নিযেই জীবন। জীবন শান্তি নিযে। আমাব মাঠে একটা কৃষ্ণচূড়াব গাছ আছে, এখন লাল ফুলে ভবে গেছে একেবাবে। দুপুববেলা সেই গাছেব আঁকাবাঁকা ডালে দু' একটা-নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে, তাকিযে দেখতে হয, না তাকিযে কিছুতেই পাবা যায না। তাকাতে তাকাতে আমিও যেন সেই পাখিব জীবন পেযে যাই। এই সবেব ভিতবেই আস্বাদ বযে গেছে। জীবন সুন্দব হযে ওঠে।'

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হযে বসে বইলুম আমবা।

—'অবিনাশ [ঘোষাল] কথা মনে আছে?' অনিল বলে নড়েচড়ে উঠে আমাব দিকে তাকাল।

নীবেন—'অবিনাশ? কলকাতায পড়ত ম্যাটিক পবীক্ষাব মাস চাবেক আগে আমাদেব ইস্কুলে এসে ভর্তি হল? সে এক দারুণ ছেলে, তাব কথা এতক্ষণ মনে হযনি কেন পীতাম্বব?'

পীতাম্বব—'আমাব সঙ্গে বিশেষ আলাপ ছিল না। কলেজে তাব সঙ্গে পড়িনি।'

—'না, সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছিল।'

পীতাম্বব—'কলকাতায প্রায কুড়ি বছব আগে তাব সঙ্গে দেখা হযেছিল একবাব। আব কোনোদিন দেখিনি। কোথায আছে?'

অনিল—'বছব বাইশেক আগে সেই যে শবৎবাবু এ ডি এম হযে এসেছিলেন, তাঁবই ছেলে অবিনাশ তো। অবিনাশেব সঙ্গে আমাব খুব খাতিব ছিল। অনেক দিন, প্রায বছব পনেবো দেখি না তাকে। ক্ষিতীশেব কাছে শুনেছিলুম অবিনাশ ইজিপ্টে খুব বড় চাকবি কবে।'

নীবেন—'ও হাঁ মনে পড়েছে, আমি শুনেছিলুম অবিনাশ [...] কনসুলেটে কাজ কবে। তাই নাকি? তুমি জান কিছু?'

—'আমিও তাব সম্পর্কে অনেক গুজব শুনেছি হযতো গুজব—হযতো সত্য—শুনেছিলাম সে নাকি আর্মি ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছিল, লেফটেনান্ট হযেছিল, সে সব ছেড়ে দিযে নানা জাযগায ঘুবেছে, নানা কাজ কবেছে, [...] তবফ থেকে কি যেন তাকে একটা খুব বড় একটা চাকবি দিতে চেযেছিল, কিন্তু [...] যেহেতু যুদ্ধেব বিবোধী কাজেই সে চাকবি নেযনি, অবিনাশ ঘোষাল মাবপিট এমনই ভালোবাসে।'

পীতাম্বব—'ক্লাসে সুট পবে আসত। ভাবী বিশ্রী লাগত আমাব। একটা মফস্বল ইস্কুলে বাঙালি ছেলেব সুট পববাব কি দবকাব।'

নীবেন—'অবিনাশেব কোনো খোঁজখবব কেউই বলতে পাবে না তাহলে?'

—'তাব কথা ভেবে আমাদেব কোনো লাভ আছে নীবেন? যে আমদেব জাতেব মানুষ ছিল না, যেন বাঙালি পর্যন্ত নয। আমাদেব কথা সে ইস্কুলেব থেকে বেবিযেই ভুলে গেছে নিশ্চয। কোনোদিনই গ্রাহ্য কবত না, এখন দেখা হলে আমাদেব চিনবেও না সে।' একটু চুপ থেকে পীতাম্বব।

—'তাব ভেতব একটা উঁচুদবেব জিনিসও লক্ষ্য কবেছিলুম বটে, স্বার্থ বলে কোনো জিনিস ছিল না, সত্য কথা বলতে কখনো ভয পেত না। তোমবা হযতো মনে কবতে পাব,' পীতাম্বব বলে 'ম্যাজিস্ট্রিটেব ছেলে, কলকাতাব ছেলে, সকলকে দাবিযে দমিযে সত্য কথা বলে একটা কিছু আনন্দ উপভোগ কববেই তো সে, কাকে কেযাব কবে? কিন্তু তা নয, জানোযাব থেকে শূযব মেরে মাংস খেযে যে-বকম আনন্দ

পায সত্য কথা বলে তৃপ্তি অবিনাশেব ঠিক সে ধবণেব ছিল না। অবিনাশেব স্বভাবেব এই বৈগুণ্য আজও মনে আছে আমাব। অদ্ভুত!'

আমি—'শুনলুম সে এখন বোর্নিওতে বযেছে, প্রাসাদেব মতো বাড়ি কবেছে, আব কিনা কি কবেছে ভগবান জানেন।'

—'অবিনাশ ঘোষাল । ক্রমে ক্রমে ছেলেটিব চেহাবা স্পষ্ট হযে আসছে আমাব কাছে। বাইশ বছব আগে তাকে দেখেছিলাম সেই, তখন তাব ষোলো বছব বযস। কিন্তু তখনই কুড়ি-বাইশ বছবেব লম্বা চমৎকাব যুবাব মতো দেখতে তাকে, পুরুষেব এমন সুন্দব চেহাবা আমি কোনোদিনও দেখিনি। সাবাটা দুপুব সে কি ছোটাছুটি, ক্লাসে এক মুহূর্তও চুপ কবে বসে থাকতে পাবত না সে। দুপুবে গ্রাউন্ডে গিযে ফুটবল নিযে একা একাই কিক কবত সে, যে স্কুলে ক্রিকেট বলে কোনো জিনিস ছিল না সেখানে সে একটা ক্রিকেটেব দল সৃষ্টি কবল। শেষে তাব দেখাদেখি [...] ক্লাসেব ছেলেবাও নিজেদেব বাড়িতে বাড়িতে কাঁঠাল কাঠেব ব্যাট তৈবি কবে খেলত। অবিনাশ ঘোষাল স্কুলে একটা [...] মতন জিনিস ছিল প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা হেডমাস্টাবেব কাছে গিযে [...] এব জন্য [...] দিতে হত। দুবন্ত ছিল বটে, সে অদ্ভুত ভূমিকম্পেব স্বাদ অনেকদিন হয ভুলে গেছি। ধাবণা কবতেও কষ্ট হয আজ। কিন্তু কোনো নীচ কাজ, অন্যায কাজ, নিষ্ফল কাজ কোনোদিনও তাকে কবতে দেখিনি আমি।' একটু চুপ কবে থেকে নীবেন—'আমাদেব কাউকে কোনোদিনও যে সে কেন ব্যবহাব কবল না অবাক হযে তাই ভাবি।'

—'আমাব সকলেই অল্পবিস্তব নিবীহ জীব ছিলাম নীবেন।'

—'এবং আমাদেব সকলেব মধ্যেই কিছু কিছু নিবাশা তা-ও ছিল।'

—'আমবা বাঙালি ছেলেই ছিলুম। আমাব মনে হয অবিনাশ ঘোষাল ব্রাহ্মণেব ছেলে হলেও এদেশেব মানুষ নয। তাব বক্তে অন্য কোনো মিশ্রণ ছিল নিশ্চযই। ওলন্দাজ আব পর্তুগিজ ডাকাতবা এক সমযে বাংলাদেশটাকে খুব পিষেছে, আমাব মনে হয সেই সময খানিকটা সাহেবি বক্ত আমাদেব দেশে ঢুকে পড়েছে। আবো অনেক বক্ত বাঙালি মজ্জায বযেছে যদিও। সতেবোশো আঠাবো সনেব কোনো স্প্যানিস বা ওলন্দাজ বক্ত আমাব মনে হয স্প্যানিসই অবিনাশ ঘোষাবেল পিতৃপুরুষদেব ভিতবে নিশ্চযই ঢুকেছিল। এ বিষযে আমাব একটুও সন্দেহ নেই।'

—'আমাবও তাই মনে হয, মননেব পৃথিবীটাকে ববাববই এড়িযে গেছে সে। এড়িযে শুধু নয, তাব মানেই অবিনাশ বোঝেনি। ব্রাহ্মণেব ছেলে হযে কি কবে যে এ জিনিস সম্ভব হল তাব আমি কিছুতেই বুঝি না। চিন্তা ভাব একটু নিস্তব্ধতা স্থিবতা যে-কোনো বাঙালি ছেলেব ভিতবেই যে জিনিসেব একটু-আধটু পবিচয পাওযা যায অবিনাশেব ভিতব কোনোদিনই তা খুজে পেলুম না। মাঝে মাঝে বিবক্ত হযে তাকে বিলেতি কুকুব ভেবেছি। তুমি যা বলেছ নীবেন আমাবও তাই মনে হয। তাব পৈতৃক বক্তে [...] বক্ত মিশে গিযেছিল।'

আমি এতক্ষণ চুপ কবেছিলুম বললুম-'অবিনাশ স্কুল ছেড়ে দিযে প্রেসিডেন্সি কলেজে যায, আমিও সেখানে গিযেছিলুম। অবিনাশেব সঙ্গে বছবতিনেক পড়েছি।'

—'তাব কি কোনো পবিবর্তন হযেছিল?'

—'ট্রেনে চড়ে একবাব তাব সঙ্গে বর্ধমান অব্দি গিযেছিলুম। অল্প কযেক ঘন্টাব পথ, কিন্তু অবিনাশ ফার্স্ট ক্লাসেব টিকিট ছাড়া কিছুতেই কিনবে না,. বাধ্য হযে আমাকে ফার্স্ট ক্লাসেব টিকিট কবতে হল, সে কিছুতেই আমাব কাছ থেকে পযসা নেবে না, জোব কবেছিলুম তখন দূবে ড্রেনেব মধ্যে ফেলে দিল, তৎক্ষণাৎ অন্যায হযেছে বুঝে ড্রেনেব ভেতব পযসা খুঁজতে গেল,পেল না, এসে ক্ষমা চাইল, কিন্তু মুহূর্তেই ভুলে গেল সব, আমি যে তাব সঙ্গে বযেছি সে কথা ভুলে একেবাবে [...] দিকে দৌড় দিল। [...] এবং কযেকটি বেলেব ফিবিঙ্গিব সঙ্গে হেসে নেচে ছুটাছুটি কবে সে এক দৌবাত্ম্য আবম্ভ কবে দিল। কিন্তু [...] খেল না,' একটু চুপ কবে—'কিন্তু আমি অবিনাশকে বলেছিলুম, অনকদিন তো সাহেবি পোশাক পবলে এবাব ধুতি পবো, কিন্তু সে তাব খাকিব হাফপ্যান্ট টুপিটাই—বর্ধমান পর্যন্ত তো যেতে হবে—কিছুই ছাড়ল না, ছাড়েনি। ধুতি যে পবেনি এসব সমস্যা তাব মনে জাগেনি। আমবা যেমন চটিজুতো স্লিপাব পায দিই সে তেমন সহজে সব সমযই সুট পবত। ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন কামবায তাকে খুঁজে পেলুম না। পবেব স্টেশনে দেখলুম সে [...] [...] সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ে সেই গাড়িতেই কথা বলছে, হাসছে, বর্ধমান পর্যন্ত তাকে যে পাব, সে আশা কবিনি, কিন্তু হঠাৎ ঘুমেব থেকে উঠে দেখলুম,বোধ হয চলন্ত গাড়িতেই উঠে পড়েছে এক সময। ফিবে এসেছে বটে কিন্তু এ বার্থ থেকে সে বার্থে, একটা [....] এব ভেতব, একবাব গাড়িব জানালা দিযে মুখ বাড়িযে খাঁচাব ভিতব বাঘেব মতো

অস্থির হয়ে ফিরছে, জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে অবিনাশ? জানতুমি কিছুই হয়নি। সে তার প্রাণ ধর্মপালন করেছে শুধু। তার জীবন আমাদের জীবনের মতো নয়, সাহেবদের মতোও ঠিক নয়, কারণ সাহেবদের ভিতরেও জার্মান দার্শনিকদের জন্ম হয়, [...] জন্মায়, অবিনাশ', একটু চুপ থেকে একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বিলেতি মিলিটারি টিমের কোনো এক খেলোয়াড়ের মতো। তার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মে গেল। সে একটু স্থির হয়ে বসতে পারে না, নিস্তব্ধতা যাকে পীড়া দেয়, মনন যার স্বভাববিরুদ্ধ জিনিস, সে রকম মানুষকে পরিচিত বলে স্বীকার করতে লজ্জা লাগে।' চুপ করলুম।

ভেবেছিলুম এবার উঠে পড়ি, রাত প্রায় দশটা। কিন্তু বাইরে বৃষ্টির বান ডেকেছে যেন। শীত করছিল। এক কাপ চা পেলে হত। চুরুট টানতে লাগলুম।

—'অবিনাশের কথা কেনই বলছি আমরা? এরকম মানুষ কেনই-বা আমাদের বক্তব্যের বিষয় হবে।' পীতাম্বর বললে।

নীরেন —'যতদূর জানি অবিনাশের কোনো বোনও ছিল না।'

—'না।'

—'মাও মরে গিয়েছিল।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও নীরেন? মৃত্যুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দিয়ে একটা বিষণ্ন নির্স্পৃহা? তাহলে এতক্ষণ কী বললুম? বিষণ্নতা, স্থিরতা, নিস্পৃহা এসব জিনিসের আস্বাদ আমরাই পেয়েছি, পেয়েছি বলেই জীবনে একটা আনন্দ জমে আছে। কিন্তু অবিনাশের আনন্দ আমার মনে হয় সব সময়ই জান্তব, একটি সুস্থ্য ন্যায্য জন্তুর মতো ছিল। সেরকম জন্তুর সঙ্গে তার প্রভেদ ছিল শুধু এই যে সে মাংস মদ কোনোরকম খাবার জিনিসেরই কোনো আড়ম্বর ভালোবাসত না। খুব কম খেত, খুব সাধারণ খাদ্য খেত, নারীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না তার।'

—'আমি সেই কথাই তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। কাউকে ভলোবাসিনি? এরকম পুরুষ মানুষকেই নারীরা ভালোবাসে। কিন্তু অবিনাশ কোনোদিন মেয়েদের ভিতর যেত না।'

—'পালিয়ে বেড়াত বুঝি?'

—'না। স্ত্রীলোক তার এত অপরিচিত ছিল যে সে পালাবার কোনো প্রয়োজনও বোধ করত না কোনোদিন। একটি সাত-আট বছরের ছোট ছেলে নারীদের সম্বন্ধে কি ভাবতে পারে বলো তো পীতাম্বর?'

পীতাম্বর হয়তো অন্ধকারের ভিতর ঘুমিয়ে পড়েছে।'

—'নীরেন?'

—'বাস্তবিক অবিনাশের কথা কেনই-বা এত বলছি আমরা?'

—'কারণ আছে নীবেন, আমাদের বাঙালি যুবকদের প্রত্যেকেরই জীবনে কোনো না কোনো বেদনা আছে। বেদনাই ঢের বেশি, আনন্দ খুব কম। নানারকম অস্থিরতাব ভিতবেও আমাদের নিজস্বতার সময় আসে, অনেক সময়ই মনে হয় চুপ কবে পড়ে থাকি, কেন আর?'

—'নারীকে পাই আর না পাই, আমাদের সকলকেই ঢের ব্যথা দিয়ে যায় সে। আমরা চিন্তা করি, বই পড়ি বিষণ্ন হই। যেখানে উৎসব আর নেই, কিন্তু তবুও স্থিরতা ও শান্তি আছে তেমনি কোনো একটা স্তরে পৌঁছবার জন্য আমরা সকলেই নীরবে চেষ্টা করি। কিন্তু এই সব দুঃখ চেষ্টা ও মননের সঙ্গে অবিনাশের কোনোদিনই কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই সে বিস্ময়ের জিনিস।'

—'শেষ পর্যন্ত অবিনাশের যে কোনো কালচার হবে না তা আমি আগের থেকেই বুঝেছিলুম', পীতাম্বর—'নারীব দিকে যে আট বছরের ছেলের মতো তাকায় তার কালচার হয় কী করে? নারী জন্তু হতে পারে, এক-একজন নারী জন্তু ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু তবুও চিনির গাধার মতো সেই আমাদের জন্য স্বপ্ন ও মনন নিয়ে আসে।'

নীরেন—'অবিনাশ কি [হুইলারের নভেল] ছাড়া আর কোনো বই-ই পড়ত না?'

—'হুইলারের নভেলও বেশি পড়েনি। একটা বলিষ্ঠ কুকুরের মতো সারাদিন হইচই করে বেড়াত সে।'

—'পাশ করল কী করে?'

—'পাশ করবার একটা [...] শক্তি ছিল তার। সেই জন্যই তার জীবন সম্বন্ধে এত কথা বলছি। কেমন একটা [...] শক্তি ছিল। সায়েন্স নিয়েছিল। সায়েন্সের বইও খুব কম পড়ত। সাহিত্যের একখানা বই ও সে পড়ত না। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলের লেখাই তার কাছে জার্মানের মতো দুর্বোধ্য ছিল। কলেজের বই ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে একখানা খুব বড় বই সে কিনেছিল, কয়েকপাতা পড়েও ছিল, বাকি পাতাগুলো কাটেওনি। আর কোনো বই সে কোনোদিন পড়েওনি।'

দুই

মাসদশেক পবে বড়দিনেব ছুটিব সময নীবেন পীতাম্বব আমি তিনজনেই কলকাতায গিযেছিলাম। ওবা যে যাব আত্মীযেব বাসায ছিল, আমি ছিলুম একটা মেসে।

একদিন পথে পীতাম্ববেব সঙ্গে দেখা হল। সে আমাকে বললে—'অবিনাশ ঘোষাল কলকাতায এসেছে, শুনেছ?"

—'তাই নাকি? কোথায আছে? তোমাব সঙ্গে দেখা হযেছে?'

—'না, আমি ক্ষিতীশেব কাছে শুনলুম।'

—'কোথায আছে অবিনাশ?'

—'দাঁড়াও বলছি বলে সে পকেটেব থেকে নোট বুক বেব কবতে কবতে বললে—'ল্যান্সডাউন বোডে' নোটবুক খুলে নম্ববটা সে আমাকে বললে।

—'চলো না আজ সন্ধ্যাব সময তাব সঙ্গে দেখা কবে আসি পীতাম্বব।'

—'না, আমি যাব না।'

পীতাম্বব কিছুতেই যাবে না। আমি—'তাহলে নীবেনকে নিযেই যেতে হবে।'

—'নীবেন এখানে নেই, বাড়ি চলে গেছে।'

সন্ধ্যাব সময ল্যান্সডাউন বোডেব সেই বাড়িব দেউড়িতে নিজেই গিযে হাজিব হলাম। গেট খোলাই ছিল, কোথাও কেউ বাঁধা দিল না, একটি মানুষও চোখে পড়ল না, চাবদিক কেমন অন্ধকাব, অসম্ভব একটা বিমর্ষতাব একটা মস্তবড় বাস্তাব অবিবাম কোলাহলেব পাশে একটা সুন্দব সাহেবি ধবণেব বাড়িতে যে ঢুকেছি হৃদয সে কথা যেন কিছুতেই স্বীকাব কবতে চায না। গ্যাবেজে একটা মোটব বযেছে বটে, কিন্তু কোনো চালক দেখলুম না। নীচেব তলা সম্পূর্ণ অন্ধকাব, এক পাশ দিযে একটা আঁকাবাঁকা বিষণ্ন সিঁড়ি কোন সীমানাব দিকে যে চলে গিযেছে বুঝতেই পাবা যায না।

সিঁড়িটা আমাকে দোতলায পৌঁছিযে দিতে অনেকক্ষণ সময নিল। আমি কি ইতস্তত কবেছিলুম সিঁড়িটি কি খুব দীর্ঘ? অন্ধকাবে পথ দেখা যায না? সিঁড়িব এক কিনাবে দাড়িযে আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম? অসম্ভব অবসাদে স্তব্ধ হযে দাঁড়িযেছিলুম? বোঝা গেল না কিছু।

দোতলায আলো ছিল না, কোনো মানুষ আছে বলে মন হল না। ল্যান্সডাউন বোডে ঘোষালদেব একটা বাড়ি আছে জানতুম কিন্তু এখানে আমাব আসা হযনি কোনোদিন। অবিনাশ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ত তখন সে ল্যান্সডাউন বোডে থাকত।

একটা মস্তবড় কোঠাকে ড্রযিংরুম মনে হল, দবজা খোলা ছিল, নীল মোটা পবর্দা ভেলভেটেব হযতো—ঝুলছিল।

আস্তে পবর্দা তুলে ভিতবে ঢুকলুম, কযেকটা সোফা, ইজিচেযাব, ব্যাকে কতকগুলো বই, একটা বাতি কোথাও নেই। এব ভেতব কোথাও কোনো মানুষ বযেছে বলে মনে হয না। পীতাম্বব কি আমায ঠাট্টা কবল? না অবিনাশ বাসায নেই?

ফিবে যাচ্ছিলুম, এমন সময অনেক দূবে অন্ধকাব কোণ থেকে একটা গম্ভীব আওযাজ এল—'কে তুমি?

চমকে উঠে ফিবে তাকালাম।

—'কে ওখানে?' আমাকে জিজ্ঞেস কবল সেই শব্দ।

—'এখানে কেউ আছেন? আমি—'

—'তুমি কে?'

—'আমি অবিনাশ ঘোষালেব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছি।'

—'এদিকে এগিযে এসো।'

ইজিচেজযাবে একটি শীর্ণ লম্বা চেহাবা, অন্ধকাবেব ভিতবেও মুখেব বঙেব উজ্জ্বলতা ধবা পড়ে, ঢিলে পাযজামা পায, গায একটা [...] । চুপ কবে বসে আছে।

পাশেই একটা সোফায আমাকে বসতে বলল সে।

—'আপনি আমাব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছেন? কী কাজ আপনাব?'

—'আপনি কি অবিনাশ ঘোষাল?'

কিছুক্ষণ মাথা হেট কবে চুপ থেকে তাবপব আস্তে আস্তে মাথা তুলে অবিনাশ—' আমি অবিনাশ ঘোষাল।'

—'এখানে একটা বাতি অব্দি নেই, এবকম অন্ধকাবেব ভিতব বসে আছ অবিনাশ? কুড়ি বছব আগেব প্রেসিডেন্সি কলেজেব কথা মনে পড়ে?'

সে একটু বিবক্ত হয়ে—'আপনি আবেক সময় আসবেন।'

দেখলুম মাথা হেট কবে চুপ কবে আছে।

—'আমাকে চিনলে না আমি শিববাম মজুমদাব।'

অবিনাশ কোনো কথা বললে না।

—'আচ্ছা কাল সকালবেলা এসে দেখা কবব। উঠি তাহলে অবিনাশ।'

উঠে দাঁড়াতেই অবিনাশ—'না, কাল সকালে আমাব সময় হবে না। শিববাম? কী কথা তোমাব বলো তো?'

—'একটা বাতি জ্বালাবে অবিনাশ?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে শেষে বললে—'আচ্ছা উঠে যাও। কাল সকালে এসো না। আসবাব দবকাব নেই আব।'

—'কেন?'

—'আমবা এখানে দু-একটি পবলোকেব আত্মা আসেন, আমি তাদেব সঙ্গেই থাকি।

—'পবলোক আছে অবিনাশ?'

অবিনাশ তাব মাথাব সমস্ত চুলেব ভিতব কয়েকবাব আস্তে আস্তে আঙুল চালিয়ে একটু মননেব পবিচয় দিল। তাবপব যেমন বোজা ছিল, তেমনি চোখ বুজে বেখে ধীবে ধীবে—'এই পৃথিবীটা বেশি বড় নয় তাহলে শিববাম? ঘুবে ফিবে একই মানুষেব সঙ্গে বাব বাব দেখা হয়। একবাব দেখা হয়েছিল বলেই শেষ হয়ে যায়নি, কুড়ি বছব পবে আবাব দেখা হল।'

—'তা হল তো অবিনাশ। কিন্তু—'

—'না, কিন্তু নয়। তোমাব কথাও আমাব মনে ছিল না। আমাব কাছে তুমি মৃত ছিলে। আজ কুড়ি বছব পবে দেখলুম তুমি বেঁচে বয়েছে, মবে কি কিছু?'

— না। কিছু মবে না। কিন্তু বাতি জ্বালতে তোমাব আপত্তি কেন অবিনাশ?'

—'জ্বেলে কি লাভ?'

—'তোমাব মুখ দেখব। একটা গভীব আকর্ষণ ছিল তোমাব মুখেব ভিতব। নিজেব চেহাবাব সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনোদিনই তুমি সজাগ ছিলে না অবিনাশ, অনেক নাবীব প্রেমই নিশ্চয় পেয়েছ তুমি কিন্তু সে সবেব কোনো সুব্যবহাব কবতে পেবেছ?'

অবিনাশ অন্ধকাবেব ভিতব নিশ্চুপ হয়ে বসে বইল।

—'সেদিন তুমি এক অদ্ভুত মানুষ ছিলে [...] [...] ক্রিকেট নিয়েই থাকতে তুমি দিন বাত। একটা চিন্তাপূর্ণ বই দেখলেও ভয় পেতে তুমি কিন্তু এই কুড়ি বছবেব ভিতব কীসব হয়ে গেছে জানি না, আজ হয়েছ তুমি একেবাবে আবেক বকম। তোমাকে তো [...] মনে হচ্ছে।

অবিনাশকে নড়তে চড়তে দেখলুম না।

—'ওপাবেব জীবনেব কথা ভেবে কী হবে অবিনাশ,আমবা তো দিনবাত চেষ্টা কবে এপাবেই সামলাতে পাবছি না।'

একটা দেবদারু গাছেব ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে অবিনাশেব মুখে খানিকটা পাতা ফেলল, নির্জন বাতাসে পাতাগুলো উড়ে উড়ে সবে সবে যাচ্ছিল এক-একবাব। ঝিনুকেব মতো ম্লান জ্যোৎস্নাব আলোয় হাতিব দাঁতেব মতো ধূসব নিঃসঙ্গ মুখেব রূপ দেখলাম অবিনাশেব। একদিক দিয়ে সে রূপ ভেঙে গেছে ঢেব, কিন্তু অন্য আব-এক দিন দিয়ে অসামান্যভাবে গড়ে উঠছে আবাব।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে আমাব দিকে তাকাল অবিনাশ কিন্তু আস্তে আস্তে নবম গলায় বললে—'তুমি? কী কাজ? এ পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ থাকতে পাবে না যাব জন্য অন্ধকাবেব ভিতবেও আলো জ্বালতে হয়। শিববাম,তুমি কিছুই জান না। তুমি আমাব সঙ্গে থাক। আমি তোমাকে অনেক জিনিস বুঝিয়ে দেব। তাবপব ক্রমে ক্রমে দেখতে পাবে সব। এমন শান্ত সুন্দব সংসর্গ পাবে যে কিছুতেই আব পৃথিবীতে ফিবে যেতে চাইবে না তুমি।'

সুব এত মিষ্টি, ভঙ্গি এত করুণ যে আমাব সমস্ত হৃদয় কেঁদে উঠল।

১৯৩৬

রক্তের ভিতর

সমস্ত সকালটা টেবিলের কাছে চুপ করে বসেছিলাম, সামনে মাঠের ভিতরে একটা জামরুল গাছ—দু-চারটে কৃষ্ণচূড়া ফুল ধরেছে বেশ, এক কিনারে নারকোলের সারি, পিছনে নীল আকাশ কেমন যেন প্রবাহমান পাখির ডানার মতো চঞ্চল সোনালী রোদের ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছে। আকাশে চিলের ওড়াওড়ি, মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য জিনপুরীর প্রাসাদেব আবহাওয়ার ভিতর উড়ছে তারা, যেন কোনো রাজকন্যার সোনালি চুলের দিকে তাকিয়ে সোনার রেণুর মতো তাদের কান্না ঝরে পড়ছে।

কোথায় এই দেশ? কিন্তু এদেশে আছে নিশ্চয়ই—কোথাও অনেক দূরের এক পৃথিবী আছে সেইখানে রোদ, আকাশ, চিলের সোনালি ডানা ও যাদের আঁকাবাঁকা সিঁড়ি সব রযে গেছে যেন, হৃদযের জন্য নির্জনতা ও শান্তি আছে।

কিন্তু টেবিলের কাছে আজ অনেকদিন পরে এসে বসেছিলাম আমি, বাইরের দিকে তাকাবার জন্য নয়।

অনেকদিন থেকেই আমার মনে হয়েছে, আমি কথা বলি কম, কাজ করি আরো কম, অনেকদিন থেকেই আমার মনে হযেছে। [...] ধূসরতম খিলানের [...] একটা অব্যবহৃত প্রাসাদের পাশে সন্ধ্যার নদীর মতো কি যেন রহস্য ও বেদনা আমার ভিতর লুকিযে রেখেছি আমি। ব্যবহারিক পৃথিবীর কোলাহলের পথে গিয়ে মাঝে মাঝে তাই যেন একটু নিস্তার নেবার দরকার। সেইজন্য টেবিলের পাশে এসে কলম নিয়ে লিখতে বসেছিলাম। লেখার ভিতরে দিযে হযতো পৃথিবীর কলরব ও স্বচ্ছতার পথে ফিরে যেতে পারব।

কিন্তু প্রথম দিন কিছু লিখতে পাবলাম না আমি। সমস্ত সকালবেলা, বৈশাখের সমস্ত সকালবেলা জানালার কাছে কলম হাতে নিযে চুপ করে বসে রইলাম।

নীল আকাশের কিনার দিযে কযেকটা বড় বড় সাদা মেঘ ভেসে চলে যেতে যেতে নিঃসহায নীরব হযে কোনোখানে খুঁজে পেলাম না যেন—তাদেব গায সাদা রং যেন বং শুধু নয, যেন শব্দ, আকাশের নীল প্রান্তরে যেন সিংহের পাযের শব্দের মতো, সিংহীর সোনালি কণ্ঠের মতো যেন।

তাকিযে দেখলাম তারা চলে গেছে।

চারদিকে কাজ ও কোলাহল। কৃষ্ণচূড়া গাছ ভযানক ব্যস্ত, ফুল ফোটাচ্ছে, পাতা ওড়াচ্ছে, অনেকদূর থেকে কোকিলকে ডেকে আনছে, ডালপালার ঝাপটায শালিখকে উড়িযে দিচ্ছে আকাশের নীল হাতে অস্থির চামরের মতো দুলছে যেন গাছের পর গাছ, মাঠের সমস্ত ঘাস চঞ্চল চামরেব মতো দুলছে যেন।

আজ সমস্ত সকালবেলা চুপ করে বসে রইলাম আমি। কিছু লিখতে পারলাম না।

পরদিন ছোট একটা কবিতা লিখতে শুরু করলাম, কিন্তু কবিতাটা খুব বড় হযে উঠল। অবাক হযে গেলাম, আরো কত বড় হবে? শেষ পর্যন্ত ফুরোবে কি? কিন্তু সে তার কাজ করে সমযমতো থেমে গেল।

কিন্তু সমস্ত সমযই মনে হচ্ছিল, আমি যেন লিখছি না, কেউ যেন আমায দিযে লেখাচ্ছে। আকাশ বাতাসের ভিতর হয়তো নানারকম অদ্ভুত অদৃশ্য অস্তিত্ব ঘুরতে থাকে, এক-একজন মানুষের হৃদয়ের ভিতর ঢুকে তারা কবিতার শরীর পায।

এ কবিতাটির জন্য আমি একা দাযী নই।

লেখা শেষ হয়ে গেলে কবিতাটি ভালো করে পড়লাম আমি।

পরদিন কি যেন কেন আমাব হৃদযের ভিতর নানারকম আশা বেড়ে উঠল। যেরকম মনের অবস্থা নিয়ে কবিতাটি লিখেছিলাম,সে অবস্থা আজ নষ্ট হয়ে গেছে, অনুভবের [...] মনের ভিতর নেই আজ আর। কাজেই প্যাডের কাগজে খুব মনোযোগ দিয়ে কবিতাটি নকল করে তুললাম আমি, সমস্ত সকালবেলা বসে। কাগজের মুখে অক্ষর সহজে গড়ে উঠতে চায় না, নকল করতে দেরি লাগে আমার,

এক-একটা শব্দ বা লাইন নিয়ে দ্বিধায় পড়ি, কাজেই অনেক সময় লেগে গেল। শেষ হয়ে গেল যখন কবিতাটি একটা খামের ভিতর পুরে কোনো একটা কাগজে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেব কিনা ভাবছিলাম। কয়েকদিন পরে কবিতাটি আমার কাছেই ফিরে এল। খামটির বড় পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে দেখলাম এই কম দিনে আরো ঢের নোংরা হয়ে গেছে যেন, কেমন দুমড়ে মুচড়ে গেছে। তার সমস্ত তাৎপর্য ও অর্থ আমার কাছে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে হৃদয়ে সুস্থিরতা এল, কবিতাটি রেখে দিলাম আমি। অন্য কোনো কাগজে ছাপাতে দিলাম না আর।

বৈশাখের কয়েকটা দিন এমনি করে কেটে গেল আমার, টেবিলের পাশে বসে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, লিখবার চেষ্টা করে, কথা ভেবে।

টেবিলটা খুব বড় সেগুন কাঠের। আমার কাকা যখন এখানে এসেছিলেন, তাঁর অফিসের কাজকর্মের সুবিধার জন্য কিনেছিলেন। চলে যাবার সময় ফেলে গিয়েছেন। এই টেবিলের পাশে চেয়ার নিয়ে বসলেই একটা আস্বাদ জাগে হৃদয়ে, মনকে সংস্থিত করে রচনা করতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু তবুও সেগুন কাঠের ওপর বাঁ হাত ডান হাত ছাড়িয়ে কাঠের ওপরে ধীরে ধীরে আঙুল বুলিয়ে, টেবিলের ওপর দু-একটা উড়ো কাঁঠালপাতা কৃষ্ণচূড়া ফুলের পাপড়ির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দিনগুলো বুঝতে পারছি না কেমনভাবে কেটে যাচ্ছে আমার।

কি লিখব বুঝতে পারছি না।

কিছুই লিখতে পারছি না।

টেবিলের এক কিনারে কয়েকটা বই। নতুন বই একটাও না, একটাও আমার নিজের বই নয়, দু-একজনের কাছ থেকে করে এনেছিলাম, পড়বার জন্য। কিন্তু থেকে থেকে কেবলি মনে হয় জীবনে অনেক পড়া হয়ে গেছে। হয়নি কি? পড়ে পড়ে চোখ ঢের উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে। হৃদয় হয়ে গেছে আরো ক্লান্ত।

টেবিলের পাশেই বসেছিলাম দুপুরবেলা। মনে হচ্ছিল নারকোল গাছের ছড়ি তিরতির করে বাতাসের ভিতর বাজছে, কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম খুব আস্তে আস্তে বাইক করে কে যেন আসছে। চাকার পাতলা শব্দ, পাতাব শব্দ নয়। কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় সাইকেলটা শুইয়ে রেখে গাছের ডালপালাার দিকে তাকাতে গেল না সে আর। পিছনে বটগাছের ছাগলে চামড়ার মতো নীল ছায়ার জমিনে এদিককার কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলোকে গাঢ় তরমুজ মদের মতো দেখাচ্ছিল যেন। কিন্তু মাথার কিনারে, মাথার ওপরে, বিচিত্র পৃথিবীর দিকে তাকাতে গেল না সে। পকেটেব সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করল একটা; জ্বালাল, ফুঁকতে ফুঁকতে খানিক এগিয়ে এসে আমারই নাম ধরে ডাকল।

—'কে, সুহাস নাকি?'

—'অনেক দিন হয হাসি শুকিয়ে গেছে। ঘরের ভিতব প্রবেশ নিষেধ নয তো? নিশ্চযই তুমি একা আছ। ব্যাচিলর মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বে এই সুখ যে—'

—'আমি ব্যাচিলর তোমাকে কে বলল?' চেযারটা সুহাসকে ছেড়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

—'কবে বিয়ে করলে? চেযার লাগবে না, আমি এই বিছানার উপর বসছি।'

—'বিয়ে করেও কুমার আমি। সুহাস, আমার ঘরে আর চেযার নেই, বড় সাংসারিক কায়ক্লেশের ভিতর আছি।'

—'কুমার? কীরকম?'

চেযার টেনে বসে বললাম— 'বছরতিনেক হল স্ত্রীটি মারা গেছে, একটি মেয়ে হযেছিল, সেও নেই আর।

সিগারেট টানতে টানতে থেমে গিয়ে সুহাস খানিকক্ষণ থেমেই রইল। এইবার দেখলাম কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর দিকে চোখ পড়েছে তার, কিন্তু তবুও মনে হল ফুল দেখছে না, ডালপালা দেখছে না, আকাশ দেখছে না, এই সমস্ত স্বচ্ছ জিনিসই হচ্ছে যেন কাঁচের মতো, এই সমস্ত পাতলা আবরণের ভিতর দিয়ে চোখ চালিয়ে নিয়ে নিজের মনের দিকেই যেন তাকিয়ে আছে।

—'অনেকদিন ছিলাম বার্মায়, বউদি তিন বছর হল মারা গেছে?' সুহাস চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাল, কেন যেন মনে হল জলের ভিতর দিযে একটি মাছের বিষণ্ন চোখ আমার দিকে তাকিযে আছে।

—'হ্যাঁ, তিন বছর সুহাস।'

—'তোমার মেয়েটিও সেই সঙ্গে সঙ্গে?'

—'না, ডেলিভারিতে আমর স্ত্রীর মৃত্যু হয়নি। মেয়েটিও সুস্থ হয়ে বছরখানেক বেঁচেছিল।'

—'তারপর?'

—'তারপর, এই—চলেছে—তুমি হঠাৎ বার্মার থেকে?'

—'একটা ব্যবসা ফাঁদতে গিয়েছিলাম, হল না কিছু।'

—'তারপর এখন বুঝি [ইনসিওরেন্সর দালাল]?'

সুহাস কোনো কথা বললে না। নারকোল সাবিব দিকে তাকিয়েছিল, মনে হল তবুও নারকোল সারির দিকে তাকিয়ে নেই।

—'আমি কিন্তু কোনো [পলিশি] নিতে পারব না সুহাস।'

সুহাস এবারও কোনো জবাব দিল না।

—'বার্মায় গিয়ে কোনো বিয়েটিয়ে করে ফেলনি তো?'

সুহাস নিরুত্তর। কথা বলবার কোনো মর্জিই যেন নেই তার, অবাক হয়ে ভাবছিলাম এসেছে কীসের জন্য। চুপচাপ বসেছিলাম, আস্তে আস্তে কলমটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, মিনিট দশ-বারো পরেই হবে হয়তো সুহাস আমার দিকে তাকিয়ে—'চিঠি লিখছিলে?'

—'কাকেই-বা লিখব?'

—'কাগজ কলম নিয়ে বসেছ তো।'

—'কয়েকদিন হল এইবকম বসে থাকি আমি—'

সুহাস ইনসিওরেন্স লাইনেব অনুসরণ করতে গেল না আর অন্ধকার গহ্ববেব থেকে একটা ধ্বনির মতো যেন স্ত্রী মরে গেছে, মেয়ে মবে গেছে।

আবার খানিকক্ষণ পবে সেই ধ্বনিব অন্ধকার গহ্বব থেকে—'স্ত্রী মবে গেল, মেয়ে মরে গেল, এরকম শূন্যতা নিয়ে কী কবে থাক তুমি?' দুপুবের নিস্তব্ধতায় ঘরেব ছায়ার ভিতব সুহাসের গলার স্বব যেন এই পৃথিবীকে ভেঙে একটা অদ্ভুত নতুন পৃথিবীব জন্ম দিল, আকাশ আলো এই টেবিলটাও যেন ক্রমে ক্রমে আমার প্রতিদিনকার স্বাভাবিক আশ্রয় ছেড়ে অন্ধকার বিববের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, বৃহৎ কি ভীষণ, মহৎ কি ভয়াবহ বুঝতে পাবি না কিছু।

—'কী করে থাক তুমি?'

—'থাকি, না থেকে কী কবব।'

—'তোমাব আব কে আছে?'

—'আত্মীয়-স্বজন এখানে কেউ নেই আর।'

—'স্ত্রীও নেই, মেয়েও নেই, একা একা বাত দিন'—

কোন এক অন্ধকাব বিববের থেকে আবার শব্দ, যেন আমার মৃত স্ত্রী ও সন্তানেব জগৎ থেকে অনেকদিন আগেব কোনো এক ধ্বনি এতদিন পরে মানবীয় শূন্য অদ্ভুত হয়ে ঠাণ্ডা অন্ধকাব আঘাতে আমাব রক্তের ভিতব বারবাব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ছে।

—'আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি তুমি সুহাস না আর কেউ, আমার বুঝবার ভুল নয়তো?' বলে বাহিরের রোদ্রের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ প্রখরতায় খানিকটা হাসলাম আমি, এই ঘরের ভিতরকার আবহাওয়া উড়িয়ে দেবার জন্য বাইরের নীল আকাশ, সহজ সজীব কৃষ্ণচূড়ার ঘন ডালপালাব দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর পরীদের মতো মন খুলে খানিকটা হেসেছিলাম। কিন্তু তবুও আমার কানে বাজতে লাগল—'তোমার স্ত্রী মরে গেছে, মেয়ে মরে গেছে।'

—'তোমার সিগারেট-কেসটা দাও তো।'

ধীরে ধীবে পকেটের থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

—'তুমি তো খুব দামি সিগারেট খাও।' কেস তেকে খসিয়ে নিয়ে একটা জ্বালালাম।—'বার্মায় ব্যবসায়ের সুবিধে না হলেও—'

সুহাসের দিকে তাকালাম, চোখদু'টো যেন তার অনেক দূরের আকাশের ক্ষীণ আববণ ফুঁড়ে নিজেরই জীবনের কেমন কি একটা গুহার দিকে তাকিয়ে আছে।—'তুমি যে করেই হোক, বুঝলে

সুহাস, কিছু টাকা জমিয়েছ নিশ্চয়।'

কোনো উত্তর নেই।

—'নইলে এরকম দামি সিগারেট, কোনো নামজাদা স্প্যানিস কোম্পানির'—

সিগারেটে টান দিয়ে সুহাসের মুখের দিকে একবার তাকালাম। নির্জন মুখ, একপাশ ফিরে চেয়ে রয়েছে, কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর দিকে কিন্তু তবুও ঘন্টার পর ঘন্টা চেয়ে থাকলেও একটা ফুলও সে দেখবে না। না তা সে দেখবে না কিছুতেই আর।

—'এতক্ষণ আমার নজরেই পড়েনি সুহাস, তুমি যে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছ, এ সিল্ক কোথায় পাওয়া যায়? কত করে গজ?'

—'জানি না।'

-'জানি না?' সিগারেটে এক টান দিয়ে—'তুমি পরেছ, তুমি জান না? এমন চমৎকার সিল্ক তো কোনোদিনও আমি দেখিনি।'

সুহাস সিল্কের জামার কথা একেবারেই পাড়ল না; পাড়তে গেল না, কোনো কথাই পাড়তে গেল না সে, আমার মুখের দিকে পর্যন্ত ফিরে তাকাল না।

—'ওঃ, সিল্কে ভীষণ নেশা ছিল আমার এক সময়। তখন কলকাতায় সাবিযাবপুরের মহারাজার ছেলেকে পড়াই আমি, তাছাড়া আরো দু'টো মোটা টিউশন—মহারাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে সিল্ক খুঁজতে বেরুতাম এক-একদিন —ওঃ জীবনের এই দুর্ভিক্ষের দিনে সে-সব কথা যখন মনে পড়ে—কিন্তু তবু তোমার গায়ের এই পাঞ্জাবির মতো এমন চমৎকার জিনিস কোনোদিন দেখিনি আমি—আমি তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি সুহাস, আহা এমন নিবিড় জিনিস তুমি কোথায় পেলে?' সিগারেট পুড়ে যাচ্ছিল, খানিকটা ছাই উড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে একটা টান দিলাম।

—'তোমার এই সিল্কের পাঞ্জাবির বোতাম নকল সোনার নয়, খাঁটি সোনার, আমি চোখ বুলিয়েই বুঝতে পেরেছি—বার্মায় ব্যবসা তোমার।'—

—'বার্মার কথা বলছ?'

—'সেখানকার ব্যবসায় সুবিধে না হলেও কিছু টাকা জমিয়েছ তুমি।'

আকাশের পথে সন্ধ্যার মাছরাঙার ডাকের আচমকা করুণ শব্দ বেরিয়ে এল—'কী বলছ বসে? এতক্ষণ তুমি বিনয়, কি বলছ বলো তো দেখি?'

—'বলছিলাম টাকা তুমি হয়তো জমিয়েছ কিছু সুহাস।'

—'না জমাইনি, টাকার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।'

—'কিন্তু তোমার পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে'—

—'ওরকম কথা বললে বাস্তবিকই আমার লাগে ওরকম কথা তুমি বলতে যেও না বিনয়, টাকার নেশা নেই বলে বার্মায় আমার ব্যবসা ফেল হল, আমি টাকা চাই না, মানুষকে বুঝতে চাই, তার জীবন কি, তার কষ্ট কোথায়?'

সিগারেট টানছিলাম।

—'তার পথ কোনদিকে, কেমন করে কতদূর তার হাঁটতে হবে মৃত্যুর আগে কি? এই সব।'

সিগারেটটা ফুরিয়ে গেল, আঙুল পুড়ে যাচ্ছিল।

—'তোমার কাছে এতক্ষণ বসে থাকতাম না আমি'—

—'জানি, তুমি কাজের লোক'—

—'সংসারের হিসেবে কাজের মানুষ আমি নই' (মানে সংসার বুঝতে)(সুহাস কেটে দিয়ে)—'কিন্তু আমার চেয়ে ঢের কাজের'—

—'হতে পারি তোমার চেয়ে বেশি কাজের, তা তুমি মনে করতে পারো, কিন্তু'—

-'কিন্তু নয়, মফস্বলের এক কোনায় পড়ে আছি, আর তুমি এলে বার্মা ঘুরে।'

—'কিন্তু তোমার চেয়ে বেশি কাজের মানুষ হলেও তোমার চেয়ে বেদনা বেশি পেয়েছি কি আমি?'

—'তা' সুহাস 'যারা অনেক দেশ ঘুরে বেড়ায় জ্বালা-যন্ত্রণার বোঝা তারা কম কুড়ায় না।'

—'ও হো হো— জ্বালা-যন্ত্রণা বেদনা কি এক জিনিস বিনয়, তা নয়, একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখো, দু'টোর পার্থক্য বুঝতে পারবে, একটা হচ্ছে শরীরের জিনিস আর একটা আত্মার।'

সুহাস—'পৃথিবীব পথে চলতে চলতে যখন কোনো মানুষেব সম্পর্কে আসি, আমি তাকে কী দিয়ে যাচাই কবে জান?'

টেবিলেব এক কিনাবে নস্যিব কৌটোটা পড়েছিল, আস্তে আস্তে সেটাকে টেনে এনে ছিপি খুলে দিলাম—নিজেব অজ্ঞতসাবেই বক্তেব ভিতব হাসি ফেনিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল আমাব।

—'তাব চবিত্রেব সাধুতা-অসাধুতা, তাব টাকাকাড়ি বা জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে তাব দব আমি মেপে 'দেখতে যাই না।'

একটিপ নস্য নিয়ে সুহাসেব দিকে তাকালাম।

—'দেখতে চাই সে কতখানি বেদনা পেয়েছে, এ পৃথিবীতে যে যত বেদনা পায়, তাব মূল্য তত বেশি।'

—'তা হবে, হতে পাবে।'

—'অসাধু পথে চলেও যদি কোনো মানুষ বেদনাব পব বেদনা সহ্য কবে যায়—অনুতাপ নয় প্রায়শ্চিত্তেব বিলাস নয়—খাঁটি বেদনা ক্ষতবিক্ষত আত্মাব ভিতব থেকে যে আশ্চর্য অদ্ভুত বক্ত ঝবতে থাকে, সেই বেদনা যাকে ইচ্ছা কবে, অনিচ্ছায় ধাবণ কবতে হয়, সে মানুষকে কখনোই আমি তুচ্ছ মনে কবতে পাবি না—সে মাতাল হোক, শযতান হোক, তাকে আমি অবজ্ঞা কবতে পাবি না।'

নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। প্রাণেব বক্তেব ভিতব হাসিব ফেনা নয় কেমন একটা উদসীন অস্পষ্টতা টেব পাচ্ছি, সুহাসেব কথা আমি শুনছি কিনা বুঝি না, কিন্তু তাব গলাব আওয়াজ, চিলেব ডানায গভীব মেঘেব ছাযাব মতো আমাব বুকে এসে যেন লাগে।

—'তোমাব কাছে এতক্ষণ বসে থাকতাম না আমি, কাজেব লোক বলে নয়, কিন্তু তুমি একা মানুষ বলে'—

—'কী কবে জানলে আমি একা?'

—'তোমাব কাছেই তো শুনলাম।'

—'এব আগে জানতে?'

—'কী কবে জানব? জানতাম তোমাব মা-বাপ নেই, বুঝি ছোট থাকতেই মবে গেছেন তাঁবা। তোমাব মা-বাপ নেই, হযতো তুমি বিয়েও কবনি, একা বযেছ, এসেছিলাম দু'দণ্ড গল্প কবে আমাদেব দু'জনাব মনটাকে একটু হালকা কবে নিতে। আহা—হালকা হৃদয নিয়ে আবাব এই জীবনেব সমস্যাব মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে একটা ঢোক গিলে সুহাস—'তুমি বিয়ে কবেছিলে, মেয়েও হয়েছিল, অথচ আজ তোমাব স্ত্রীও নেই, আহা। তোমাব স্ত্রীও নেই মেয়েও নেই আজ আব।' সুহাস বললে। শব্দ বেরুল গালাব ভিতব থেকে তাব, এইবাব আমাব হৃদযেব ভিতব থেকেও যেন এক ধ্বনি বেবিয়ে গেল, মনে হল আমাব হৃদযও—দেখতে পাইনি এতক্ষণ—গাছেব খোড়লেব মতো হাঁ হয়ে বযেছে বোতামেব যত [...] অন্ধকাবকে পাঠিয়ে দিচ্ছে অন্ধকাবেব দিকে, গুটিয়ে নিচ্ছে অন্ধকাবেব ভিতব।

—'তোমাব স্ত্রীকে দেখেছ আব?'

—'তাব মানে ?'

—'তাবপব আব দেখেছ তাদেব?'

—'কীসেব পব সুহাস?'

—'তাদেব মবে যাওযাব পব?'

—'তা কি কবে দেখে'—

—'কেন, কোনোদিন কোনো শীতেব বাতে পৃথিবী নিজেই যখন মবে গেছে মনে হয় তোমাব বিছানাব পাশে এসে দাঁড়াযনি সে?

একটু চুপ থেকে—'সুহাস, এইবাব তুমি বার্মাব গল্প কবো, শুনতে আমাব খুব ভালো লাগে। শুনেছি বার্মায অনেক বনজঙ্গল, তুমি কি বেঙ্গুনে ছিলে?'

—'বিছানাব পাশে এসে দাঁড়াযনি?'

—'না।'

—'কোনোদিনও অনুভব কবনি?'

—'বিছানার পাশে তাকে? না?'

—'কিংবা অন্য কোথাও। জ্যোৎস্না রাতে যখন তোমার মশারি দুলছে।'

—'আমি এসব কথা ভাবিনি কোনোদিন।'

—'ভাবতে হয় না তো, মাঠে পায়চারি করছ, কিংবা ভোরের বেলায় নিজের মনে বসে আছ, হঠাৎ মনে হয়নি কি কেউ কাছে এসে দাঁড়াল?'

—'মনে করতে যাওয়াই তো কল্পনা—নয় সুহাস?'

—'কি আশ্চর্য যখন কাছে এসে দাঁড়ায় ঘাড়ে হাত রাখে, তখন কল্পনার জায়গা কোথায়?'

—'তেমনভাবে কোনোদিন সে আসেনি আমার কাছে।'

—'কিংবা তোমার মেয়ে?'

—'না, কেউ তারা আসেনি আর। হয়তো গাছের ডাল নড়ে উঠেছে, ঘাসের ভিতর শব্দ শুনেছি, মশারি দুলে গেছে, কিন্তু তাদের জন্য নয়'—

—'নয়, নয় বলছ? ভালো করে বুঝে দেখেছ?'

—'এমনি যেমন হয় তেমন হয়েছে।'

—'মনের ভেতর তাদের আসা-যাওয়া নিয়ে কোনোদিন কোনো খটকা টের পাওনি?'

—'কি জানি, হয়তো তাদের আমি কোনোদিন খুব বেশি ভালোবাসিনি, যদি তারা থাকে কোথাও হয়তো দূরে কোথাও রয়েছে সুন্দর জায়গায়'—

—'এখানে ফিরে আসবার কোনো দরকার নেই তাদের?'

—'হয়তো নেই।'

—'তুমি যে এমন বেদনা পাচ্ছ, একা রয়েছ, এ জিনিসটাকে লঘু করে দেওয়ার চেয়ে আর কি গভীর সৌন্দয্য থাকতে পারে তোমার স্ত্রীর পক্ষে অন্য কোনো দূর জায়গায় বেড়িয়ে?' জলের আবরণের ভেতর থেকে একটা বিষণ্ন নিবিড় মাছের চোখের মতো চোখ তার, তাকিয়ে রইল আমার দিকে। নামালাম,নিজের থেকেই চোখ নামিয়ে নিলাম আমি, টেবিলের ওপর কয়েকটা কৃষ্ণচূড়ার ঝরা পাপড়ির ওপর তাকিয়ে রইলাম।

—'সে আসে।'

চমকে উঠলাম গলার স্বর শুনে, অন্ধকার রাতে মাছের পাখনার ঘাই খেয়ে ঠাণ্ডা অন্ধকার জল যেন বেজে উঠল।

—'কে সুহাস?'

—'তোমার স্ত্রী।'

—'আসে?'

—'হ্যাঁ'

—'কার কাছে?'

—'তোমার কাছে।' সুহাস মাথা নেড়ে—'আর তোমার মেয়েও।'

—'কী করে জানলে তুমি?'

—'একদিন তুমি নিজেই বুঝবে। বিধাতা এরকম সব ব্যবস্থা সমস্ত প্রাণীর জন্যই করে রেখেছেন, বেদনা যাকে দেন সেই মূল্যবান প্রাণকে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত করেন তিনি, তা করেন।'

আবার একটা সিগারেট নিতে হল সুহাসের কাছ থেকে।

—'বিধাতা আছেন?'

—'তাও একদিন জানবে তুমি।'

—'কিন্তু সম্প্রতি?'

—'তোমার স্ত্রী নেই, মেয়ে নেই, বিধাতাও নেই, তুমি একা, অদ্ভুত বেদনা নিয়ে তুমি আশ্চর্য মানুষ আজ। (চমৎকার) দাবি তোমার দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, একদিন চমৎকার জিনিস পাবে সব।'

সিগারেট টানছিলাম।

—'সকলেই সব পাবে একদিন।'

ধোঁয়া ছেড়ে—'সকলেই সব?'

সবুজ ডালপালার ভিতর একটা স্বচ্ছন্দ অমায়িক শালিখের মতো ঘাড় কাত করে সুহাস—'হ্যাঁ।'একটা গোটা চুরুট বের করে ধরিয়ে নিল সুহাস।

—'কিন্তু আমার স্ত্রীকে ফিরে পাওয়া আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের জিনিস নাও মনে হতে পারে একদিন।'

কিন্তু সুহাস ও কথার কোনো উত্তরই দিতে গেল না, যেন আমলই দিতে চায় না। চুরুটের নীল ধোঁয়ায় তার ঘরের সমস্ত দুপুরবেলার আলো ভরে উঠল, নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল জানালার ভিতর দিয়ে—লাল লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের খানিকটা বিছনো ধোঁয়ার একটা আঁকাবাঁকা চূর্ণবিচূর্ণ স্তম্ভের ভিতর থেকে— থেকে উকি দিতে লাগল, হারিয়ে যেতে লাগল।

—'তোমার স্ত্রী কীসে মারা যায়?'

—'কলেরায়।'

—'কলেরায়?' সুহাস বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। জ্বলন্ত চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে ধীরে ধীরে—'শেষ পর্যন্ত জল পেয়েছিল?'

—'কি জানি, জল কি আর পায়? পেলেও তার কোনো স্বাদ থাকে?'

—'থাকে না? জলের কোনো স্বাদ পাওয়া যায় না?'

—'জিভে হয়তো পেতে পারে।'

চুরুটের আগুনে টেবিলের খানিকটা কাঠ আস্তে আস্তে পুড়ছিল।

—'কিন্তু, নিবিড় অন্ধকারের কোনো তৃপ্তি হয় না। হবে কি করে? যে মানুষ মারাত্মক রোগে মরে যাচ্ছে তার কাছে জলই-বা কি বিষই-বা কি।'

সুহাসের চোখের দিকে তাকাতে গেলাম না আর। বললাম—'কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর সময় আমি এখানে ছিলাম না।'

নিজের বুকের ওপর হাত রেখে— কলেরায়ও মরল, তুমিও কাছে ছিলে না। কাছে ছিলে না কেন? গিয়েছিলে কোথায়? তোমার যে স্ত্রী নেই আর তার মৃত্যুর সময় তুমি কাছে ছিলে না?

—'ও, সেসব আজ অনেকদিনের কথা, যেন আর এক জীবনের কথা'।

সুহাসের কানে গেল না কিছু, মেঘের রাতের অন্ধকারে বাতাসের ঘা থেকে একটা ভাঙা দরজার মতন হৃদয় তার ক্যাঁচ করে উঠেছে—'তোমার যে স্ত্রী নেই আর, সে যখন মরে গেল তখন তুমি'—বলতে বলতে ঢোক গিলে থেমে গেল সুহাস।

কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে—'তোমার যে স্ত্রী নেই আর তার মৃত্যুর সময় তুমি কাছে ছিলে না' বলে আমার দিকে তাকাল সুহাস জীবনের সমস্ত প্রতারণা ও আত্মতৃপ্তিকে নষ্ট করে কেমন যেন এক গভীর ধর্মের সুর, এর ভিতরের বিষণ্ণতা নেই, আনন্দ নেই, কেমন এক নিগূঢ় গভীর ধর্মের সুর যেন তার আওয়াজের ভিতর।

শুনতে শুনতে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ধারালো [...] যেন ঘোরালো হয়ে ওঠে, যেন জীবনের সমস্ত নেশার বাইরে অদ্ভুত কোনো আবেশে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, যেন অন্ধকারের ভিতর মস্তবড় এক মন্দির জেগে ওঠে চোখের সামনে, কোনো এক নিগূঢ় গভীর ধর্মের রঙের রহস্যে পৃথিবীর সব রং নিভে যেতে থাকে।

—'তোমার যে স্ত্রী নেই আর তার মৃত্যুর সময় তুমি কাছে ছিলে না?' বলে আমার চোখের দিকে তাকাল সুহাস, আমার চোখের ভিতর দিয়ে মাথার ভিতর দিয়ে দেয়ালের ভিতর দিয়ে কোন দিগন্তের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

তবুও নেশার ভার আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল আমার। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললাম—'নাই-বা রইলাম, আমার মেয়ের মৃত্যুর সময়েও তো কাছে থাকতে পারিনি, আমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটিও তো কলেরায় শেষ।'

সুহাস উত্তেজিত হল না, কখনো সে উত্তেজিত হয়নি, অন্ধকারের নীরব বিষণ্ণ গম্ভীর ধর্মের রং তার গলার ভিতর থেকে উদিত হয়ে উঠছে এক এক বার, কিন্তু এবার সেই শব্দও থেমে গেল একেবারে। অনেকক্ষণ পরে টেবিলের থেকে চুরুটটা ধীরে ধীরে তুলে নিল সে।

—'এখানে এতদিন পরে এলে তুমি আমার স্ত্রী ও মেয়ের কথা পাড়তে, তাদের তো কোনোদিন দেখওনি তুমি। তারা যে ছিল আমিই ভুলে গেছি। তুমি বার্মায় যাবে আবার? আমি একা মানুষ, চলো না আমাকে সঙ্গে নিয়ে।'

কোনো উত্তর নেই।

—'একটা চুরুট দেবে?'

—'চুরুট একটাই ছিল, আর নেই।'

—'চলো না, আমিও তোমার সঙ্গে রেঙ্গুন যাব, আমার নিজের ভাড়া আমিই দেব।'

সুহাস কোনো কথা বলতে গেল না।

—'ও, সে সব কি আজকের কথা সুহাস, আমার স্ত্রী আমার মেয়ের মৃত্যু যেন এক জীবনের ব্যাপার' ডান হাতের তেলোতে খানিকটা নস্যি টানলাম।—'এখনো আমার বিশ্বাস আছে পৃথিবীর পথে চলতে চলতে অন্য কারু সঙ্গে দেখা হবে।'

—'কার সঙ্গে?'

—'ধর অন্য কোনো নারীর সঙ্গে, যাকে, আমার মনে হয়, আমি ভালোবাসব। সাদাসিধে কোনো এক মেয়ে আমাকে ভালোবাসতে কষ্ট হবে না যার।'

এতক্ষণ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে সুহাস—'তোমার স্ত্রীও কি সাদাদিধে ছিল?'

—'অনেকটা'—

—'কিন্তু তবুও নিশ্চয়ই তার ভিতর এমন কিছু সৌন্দর্য ছিল, যার জন্য অল্প বয়সেই তাকে মরে যেতে হল'—

—'সৌন্দর্যের জন্য মরে যেতে হল?'

—'না যেতে হয়।'

—'এ সত্য তুমি কোথায় পেলে?'

চুরুটের নীল ধোঁয়ার ভিতর নিজের মুখ সে ঢেকে রাখল, আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না, কোনো এক কথা বললে না।

—'আর তোমার সেই মেয়েকেও কোনোদিন খুঁজে পাবে না তুমি।'

—'কেন, আবার যদি বিয়ে করি, আবার যদি গৃহস্থ হই?'

'পাবে, না, তোমার সেই খুকিটিকে খুঁজে পাবে না আর, তোমার স্ত্রী নেই, মেয়ে নেই, বিধাতাও নেই, তুমি একা—অদ্ভুত বেদনা নিয়ে তুমি আশ্চর্য মানুষ আজ—দাবি তোমার দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, একদিন আশ্চর্য জিনিস পাবে সব'—

শুনতে শুনতে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার কঠিন.... সব রং নিভে যেতে থাকে।

১৯৩৬

মনোবীজ

সকালবেলাব থেকেই চন্দ্রপীড়ের মনটা ভালো ছিল না। এ যুগে কারু নাম চন্দ্রপীড় হয়? নামটা যে অনেকবাব বদলাবে বদলাবে ঠিক কবেছিল—এমন এক সময় গিয়েছে নিজেব মনেব ভিতব বোজই এক-একবাব কবে নিজেকে নতুন নতুন নামে ডেকে আস্বাদ পেয়েছে—কিন্তু মনেবই ভিতব বক্তেব ভিতব যে দৃঢ়তা থাকলে নিবালম্ব কুয়াশাকে নিটোল ইচ্ছায়, ইচ্ছাকে কাজে সফলতায় ঢেলে দিতে পাবা যায় চন্দ্রপীড়েব তা নেই।

চন্দ্রপীড় নামে আজও সে তাই ইউনিভার্সিটিব কাছে স্বীকৃত, পৃথিবীব পথে পবিচিত। বক্তেব ভিতব কোনো নিটোল সংকল্প কঠিনতা যেন নেই তাব, বক্তেব ভিতব বয়েছে তাব অপস্রিয়মাণ ইন্দ্রধনুব মতো কেমন একটা বিমর্ষ বিলাস, শিথিলতাব কেমন যেন একটা বিষণ্ন ছটা। ধীবে ধীবে তাব মনে হয়েছে চন্দ্রপীড় নামটা যে বদলানো হল না, তা নাই-বা হবে না, নামেব ভিতবে কিছু নয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত অমল অজয় অরুণ্যেব চেয়ে এই নামই ভালো, এই চন্দ্রপীড়, কেমন একটা অস্পষ্ট কঠিনতা বয়েছে যেন এই নামেব ভিতব। পৃথিবীব ব্যবহাবে নিজেকে মুহূর্তে মুহূর্তে বিকিয়ে বেড়ায় না এই নাম, জীবনেব সমস্ত মাত্রাহীন তবলতা যেন কঠিন দানা বাঁধতে থাকে এই নামেব অবলম্বনেব ভিতবে এসে।

চন্দ্রপীড় আজ খুব দেবিতে ঘুমেব থেকে উঠেছিল, কাল অনেক বাত অব্দি জাগতে হয়েছিল তাকে। আড্ডা মজলিশে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ বাত জাগবাব অভ্যাস কিংবা ইচ্ছা বড় একটা নেই তাব। কালও সে নিজেব ঘবেই মাথাব কাছে একটা [...] লণ্ঠন নিয়ে অনেকখানি বাত কাটিয়ে দিয়েছিল।

চন্দ্রপীড়েব গল্প লেখাব অভ্যোস ছিল। দু-একটা বই সে ছাপিয়েছে। ইদানীং সে কবিতায় হাত দিয়েছে। অন্য কেউ কেউ হয়তো কবিতা দিয়ে শুরু কবে তাবপব উপন্যাসে হাত দেয়। কিন্তু চন্দ্রপীড় তা কবেনি— উপন্যাস প্যাবাগ্রাফেব পব প্যাবাগ্রাফ গদ্য তাব মনে জন্ম নিল প্রথম। তাবপব এল কবিতা। চন্দ্রপীড়েব ফসল খুক বেশি নয়, অনেক বই সে লেখেনি। কলকাতায় সে থাকে না, থাকে কলকাতাব থেকে ঢেব দূবে। বাংলাদেশেব এক কিনাবে। কলকাতাব নাড়ীনক্ষত্রেব সঙ্গে একসময়ে অবিশ্যি তাব খুব পবিচয় ছিল। কিন্তু সে কয়েক বছব অনেকদিন আগেব কথা। এক-এক সময় সে যেন নিজেকে জিজ্ঞেস কবে—'চন্দ্রপীড় কবলে কি-একটা পাড়াগাঁব পথে পড়ে বইলে-ঠিক এই ক'টা শব্দেই এমন সহজ তীক্ষ্ণভাবে হয়তো জিজ্ঞেস কবে না কিন্তু অস্পষ্ট অভ্যাসেব ভিতব থেকে ঠিক এমন প্রশ্নই তাব মনেব ভিতব জেগে ওঠে মাঝে মাঝে। কিন্তু তাব হৃদয়েব অপস্রিয়মাণ বিমর্ষ ইন্দ্রধনুব স্পর্শ এসে এ প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে নিভে যায় তাব। এমন অনেক প্রশ্ন, আকাঙ্ক্ষা, সচেষ্টতা মুছে যায়। বাংলাদেশেব পাঠক চন্দ্রপীড়েব নাম বড় একটা শুনেছে বলে মনে হয় না। আমাব যতদূব মনে পড়ে চন্দ্রপীড়েব নাম কেউই কোনোদিন শোনেনি। শুনলেও মনে কবে বাখেনি। চন্দ্রপীড় দু'টো গল্পেব বই লিখেছিল, সে হয় সাত-আট বছব আগেব কথা। বই লিখেই সে খালাশ। একজন বন্ধু অনেক ঘুবে ঘুবে অবশেষে একজন প্রকাশককে যখন বই দু'টো ছাপাবাব জন্য—লেখককে কোনো পাবিশ্রমিক দেয়া হবে না—বাজি কবানো গেল, অনেক তাগাদাব পব বই দু'টো যখন বাস্তবিকই ছাপাখানাব থেকে বেবিয়ে এল, চন্দ্রপীড়েব মনে হল তাব এক দিককাব কাজ একবকম শেষ হয়ে গেছে। বইগুলোব দিকে সে ফিবেও তাকাতে গেল না। সমস্ত দুপুববেলা সেদিন নির্জন মেঘেব দুপুব ছিল, মেঘেব বিমর্ষ ভাবী মনেব থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি। কলকাতাব আকাশে পাটকিলে ডানাব চিল উড়ছিল কাঁদছিল, সমস্তটা দুপুব চন্দ্রপীড়েব সেই একটা নোনাধবা তেতলাবাড়িব ছাদেব ওপব একটা ডেকচেয়াবে বসে চুরুট টেনে, চুরুট টেনে টেনে টেনে টেনে কাটিয়ে দিল কী সে ভাবছিল?

আমি বলতে পাবি না?

তবে আমাব মনে হয়, তাব হৃদয়েব বিমর্ষ ইন্দ্রধনু তাকে হয়তো বলেছিল কবিতা লিখ চন্দ্রপীড়, মিছেমিছি অবিবাম [ঘটনাব] যোগপূবণ কবে কি হবে' পৃথিবীব সমস্ত ঘটনাব ভিতব থেকে যে কান্না, আনন্দেব বা বেদনাব বোদেব বা বহস্যেব বেবিয়ে আসে সেই কান্নাকে রূপ দাও তুমি।

চন্দ্রপীড় দু-চারদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। তার গল্পের বই দু'টোর কী হল সে জানে না কিছু। বাস্তবিক কিছুই হল না। কোনো বিজ্ঞাপন দেয়া হল না। কোনো সমালোচনা করা হল না। নিতান্ত গল্পের বই বলে দু-চারটে বই মাঝে মাঝে বিক্রি হয়, কিন্তু সে জন্য প্রকাশকের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দিতে হবে, না লেখককে প্রশংসা করতে হবে বিধাতা জানেন।

চন্দ্রপীড়ের উপন্যাস যারা কিনেছিল, বিয়ের উপহারের জন্য কেনেনি, কোনো মেয়েমানুষ তার উপন্যাস কিনেছে বলে মনে হয় না, কলেজের ছেলেরাও পড়েছে কিনা সন্দেহ। প্রকাশক একদিন আমাকে বলেছে চন্দ্রপীড়ের উপন্যাস যারা কিনেছে সকলেই প্রায় বয়স্থ, দু-চারজনের সাদা দাড়িও আছে। হ্যাটকোট টাইঅলা এক ভদ্রলোক একদিন মোটর থেকে নেমে চন্দ্রপীড়ের বই কিনে নিয়ে গেছ।

আর-একদিন পথের ভিখিরির মতো পোশাক চেহারার একজন মানুষ চন্দ্রপীড়ের বই কিনে নিয়ে গেল, লোকটির কাছে টাকা ছিল না, ছিল চৌষট্টি পয়সা, আনি দু' আনি ডবল পয়সা, গুনে গুনে সে দাম দিল। প্রকাশকের ইচ্ছে হচ্ছিল বিনে পয়সায় তাকে একটা বই দিয়ে দিতে, কিন্তু ব্যবসা করতে বসে ভিক্ষে দেয়া চলে না।

আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারিনি একটি লোক-বা কেন চন্দ্রপীড়ের বই কিনেছিল, বাংলার অন্যান্য অনেক পাঠক, অনেক অনেক পাঠক কেনই-বা চন্দ্রপীড়ের একখানা বইও কিনল না।

বই দু'খানা পড়ে দেখেছি আমি। আমাব মনে হয অনেকেবই পড়ে দেখা উচিত। কিন্তু আমি জানি কোনো মেয়েমানুষের মুখ,কোনো আবহাওয়া, কোনো কোনো গাছের ফল আমার কাছে আস্বাদের জিনিস মনে হয়েছে জেনে অন্য দশজনকে জানাতে গেছি, তাবা ঠাট্টা করেছে আমাকে।

বইদু'টোর কোনো প্রচাব হল না। দেশেব একজন তীক্ষ্ণ সমালোচকও এই বই দুটোকে দেখল না, দেখেও দেখল না হযতো, ইচ্ছে কবেই গ্রহণ কবল না। দেশের একটা পত্রিকাও এদের সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ কবতে গেল না। চন্দ্রপীড় অলস মানুষ, বৈষযিক উৎসাহ একটুও নেই তার, টাকাকড়ি নেই, কোনোদিনকার কোনো মর্যাদার সঙ্গে স্পর্শ নেই, বন্ধবান্ধবের সৌভাগ্য নেই। আমার অনেক সময়ই মনে হযেছে এই বইদু'টো চন্দ্রপীড়ের লেখা উচিত ছিল না। কোনো মৃত ডেপুটি বা জীবিত অ্যাটর্নির ছেলে [...] দের কেউ কিংবা ইউনিভার্সিটির কোনো প্রফেসব যদি লিখত, তাহলে ঠিক হত। কিংবা এলাহাবাদ বা লখ্‌নৌ ইউনিভার্সিটির কোনো সাহিত্যবসিক প্রফেসবকে চন্দ্রপীড় যদি বন্ধু হিসেবে পেত, কিংবা উচিত সম্মান দিয়ে হাত করতে পাবত, কুযাশা কেটে যেত ঢেব। কিন্তু মৃত ডেপুটি বা জীবিত অ্যাটর্নির ছেলে [...] প্রফেসবদেব কেউ কোনোদিন এরকম দু'টো বই লিখতে পাববে বলে মনে হয না (কিংবা) আকাশ বাতাসের ভিতর যেসব মনোবীজ ভাসতে থাকে, কিংবা যেসব পরীবা ডানা মেলে ওঠে উড়ে বেড়ায় বাতাসে আকাশে চন্দ্রপীড়কেই কেন যে তারা নিজেদেব প্রযোজনের উপযুক্ত বোধ করল, চন্দ্রপীড় আঘাত হৃদযের ভিতব আবিষ্কাব করল কি যে এক, কেন যে এক উর্বর ক্ষেত্র তাবা, এই রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে অনেক সময়ই বিমুগ্ধ হযে থাকি।

আকাশ বাতাসের এক [...] নিভৃত আশ্চর্য মনোবীজ ফলল বটে, কিন্তু বাংলাদেশেব আবহাওযায এসে ফলতে গিয়ে ভুল করে ফেলে তারা—চেয়ে দেখল তারা ভুষি (এখানে) সোনার ফসল বলে চলে যাচ্ছে—সোনাই ফসল অবহেলিত হচ্ছে ভুষির (বস্তার) মতো, সাহিত্যের অনেক জিনিসেরই মূল্য ঠিক হচ্ছে সাংসারিক উৎসাহ, পৈতৃক সম্পত্তি কিংবা বাংলাদেশেব বাইবে প্রফেসরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার হিসেবে।

যে যাক। চন্দ্র পীড় কোনোদিন কোনো নালিশ করেনি।

কলকাতার সাহিত্য জীবনের ইতিহাস তার এই বকম।

আর-একটু আছে, দু-চারটা গল্প মাঝে মাঝে সে লিখেছে, দু' একটা মাসিক পত্রিকায় তা ছাপা হযেছে। কিন্তু কোনোদিন নিজের হাতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোনো সম্পাদকের কাছে হাজির হয়নি সে মনের ভিতরে খানিকটা অহেতুক নির্জনতাপ্রিয়তা ও নাড়ীর অনেকখানি অলসতা এর জন্য দায়ী।

পোস্ট অফিসের মারফতরই সব ক'টি রচনা পাঠিয়েছিল সে, কেউ তার নাম জানলেও কলকাতার কোনো সম্পাদক বা লেখকের সঙ্গেই চন্দ্রপীড়ের কোনো দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। নিবিড় মুখ চেনাচেনি হযনি।

মফস্বলের দিকে এসে চন্দ্রপীড় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটা তুচ্ছ চাকরি নিল। এবং কবিতা লিখতে শুরু করল। অনেকে হযতো ভাবতে পারে [...] এর কোনো বই তার হাতের কাছে নেই-কি করে সে কবিতা লেখে! [...] বা আরো দু-দশটা [...] নাম বা তাদের কিছু বইয়ের খোঁজ তোমার আমার মতোই চন্দ্রপীড় রাখত, কিন্তু মফস্বলে এসে বইযের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক রইল না তাব। তার টেবিলে বা পুরোনো

আলমারিটায় স্কুলের কয়েকটা বই ও ছেলেদের খাতাপত্র ছাড়া আর যা দু-চারখানা বই ছিল সাহিত্যের কোনো নতুন সাধক সেসবের নাম শুনলে আঘাত পাবে। কিন্তু সে যাক, চন্দ্রপীড়ের লাইব্রেরির বইয়ের সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব নেই, আমাদের দরকার তার কবিতা নিয়ে।

কবিতা তার হৃদয়ে মাঝে মাঝে মাথায় জন্ম নিত, বাগানে যেমন ডালিয়া বা রজনীগন্ধা ফোটে তেমনিভাবে নয়, মাঠে যেমন ঘাস ফলে বা নদীতে ফলে জল কিংবা অরণ্যে যেমন গাছ জন্মায় তেমনিভাবে। শুধু একটা পার্থক্য এই ঘাস, জল, অরণ্যের গাছপালার মতো অজস্র সৃষ্টির কর্তা কোনোদিনও সে হতে পারেনি। কিন্তু তার এক-একটি কবিতা তার প্রাণে এক-এক গুচ্ছ ঘাসেব মতো আস্বাদ নিয়ে ফলেছে। লিখত কবিতা, লিখত খুব কম কবিতা চন্দ্রপীড়। কবিতা মাঝে মাঝে লম্বা হয়ে পড়ত, কিংবা পউষের এক পশলা বৃষ্টির মতো অতিসংক্ষেপে ফুরিয়ে যেত এক-একটা কবিতা। কিংবা চার-পাঁচ বছরের সমস্ত লেখা জড়িয়ে গুটি ত্রিশেক কবিতা তার জমেছিল কিনা সন্দেহ। বৈষয়িক উৎসাহ, সাহিত্যসম্পর্কে বৈষয়িক উৎসাহ একবার চন্দ্রপীড়কে পীড়িত করেছে দেখেছিলাম। নিজের রচিত একটা কবিতা, কবিতাটি প্রায় আড়াইশো লাইনের হবে, কেমন যেন মনে ধরে গেল চন্দ্রপীড়েব, কিছুতেই এই কবিতাটির মায়া কাটিযে উঠতে পারল না সে।

আমাকে সে কবিতাটি পড়ে শোনাল। সেদিন চন্দ্রপীড়ের ঘরে কেবোসিন ছিল না, এক পযসা দামের একটা লাল মোম কিনে তারই আলোয় কবিতাটি আমাকে পড়ে শোনাতে লাগল—চন্দ্রপীড় ভালো পড়তে পারত না।

কিন্তু তাকে নিরুৎসাহ করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না, বললাম—'পড়ো, আমার চোখের দিকে তাকিও না আমি চোখ বুজে শুনছি চন্দ্রপীড়।'

কিন্তু কেমন যেন মুদ্রাদোষ ছিল চন্দ্রপীড়ের, দু-চাব লাইন দু-চার লাইন পড়ে মুখের দিকে না তাকিয়ে সে পারত না, বন্ধু মুখের ভিতর কবিতার স্নিগ্ধ আগুন কোনো কাজ করছে কিনা আবিষ্কার করতে চাইত।

মাথা হেট করে চোখ বুজে শুনছি, আমার মাথার চুলের দিকে বার বার তাকিযে চন্দ্রপীড় জোব পেল না যেন। পাণ্ডুলিপি আস্তে আস্তে টেবিলের উপর বেখে দিল।

—'থেমে গেলে যে।'

—'মোম যে নিভে গেল।'

—'এক পয়সার বাতি, নিভবেই তো, দাঁড়াও আমি একটা বড় [...] বাতি কিনে আনছি।'

—'না থাক, আজ আর ...থাক...'

চন্দ্রপীড়ের আসল অভিযোগটা কোথায বুঝতে পেরে বাতি কিনতে গেলাম, ধাবেকাছে কোথাও এক পযসার ওপরে বাতি পাওয়া গেল না সেদিন, খালি হাতে ফিরে এলাম, চন্দ্রপীড়েব দবজাব কাছে এসে মনে হল, কেরোসিন কিনে আনলেও তো হত, যাচ্ছিলাম ফিরে, চন্দ্রপীড় ঘরেব ভিতর থেকে ডাক দিল—'এসো।'

—'বাতি পেলাম না, একটা বোতল দাও তো, কেরোসিন আনা যাক।'

—'না, কোথাও যেতে হবে না—চল বাইরে, রাস্তার ল্যাম্পটা বেশ জ্বলছে, এত রাতে পথে লোকজনও বেশি নেই, চলো, এ কবিতা খোলা আকাশে নক্ষত্রের নীচেই'—

চন্দ্রপীড় সব সময সমস্ত কথা শেষ করত না, অনেক সমযেই টুকরা টুকবা কথায নিজেকে ব্যক্ত করত। পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। রাস্তার বাতিটার চিমনি কেমন কালো হযে গেছে, চিমনি ফাটা, আলো ম্যাট মেটে, বাতাসের ফোঁসফোঁসানিতে বেশ বাতাসের বাড় ছিল সেটা, চিমনির গাযে গায়ে সাপের জিভের মতো ঘুর বেড়াচ্ছে আলো। এমন অস্থির অব্যবস্থিত আলোব নীচে, আলো সন্দিগ্ধ কৃপণ কুযশার ভিতরে বাস্তার কযেকটি কুকুরের ঋতুঅনুযাযী আস্বাদ ও বেদনার পাশে বসে চন্দ্রপীড় তার কবিতা শুরু কবল আবার। শুরু করল দু-চার লাইন দু-দশ লাইন পড়ে আমাব চোখের দিকে তাকিযে তাকিযে সায় সংগ্রহ করে শেষ করল কবিতা। কেমন লাগল, জিজ্ঞেস করতে গেল না চন্দ্রপীড়, তা সে কোনোদিন জিজ্ঞেস করে না, কবিতা পড়বার সময় শ্রোতার মুখের দিকে তাকিযে এ কাজ সঙ্গে কবে সে। কতদূর কি বুঝে নেয় জানি না, কিন্তু কবিতা পড়া হয়ে গেলে কবিতার সম্বন্ধে আর কোনো কষ্ট কাউকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করতে যায না।

কবিতাটি তার কাছ থেকে চেয়ে নিযে গেলা আমি।

দু-চারদিন পরে চন্দ্রপীড়কে তার কবিতা ফিরিয়ে দেবার সময বললাম—'লিখেই কি তুমি তৃপ্তি

পাও? একটা কবিতা তো আজ পর্যন্ত ছাপালে না।'

—'এইটে আমার সবচেয়ে শেষ কবিতা রাজীব।' একটা কলম হাতে নিয়ে পাণ্ডুলিপি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চন্দ্রপীড়—'চার-পাঁচ বছর ধরে কবিতা লিখছি, বরাবরই ভেবেছি লেখা পুরোনো না হয়ে গেলে ছাপা উচিত নয়, পুরোনো যখন হয়ে গেছে তখন মনে হয়েছে ছাপাবার উপযুক্ত হয়নি, কিন্তু এই কবিতাটা আমার মনে হয়, ফেলে না রাখলেই পারি।'

—'আমি ভালো.করে পড়ে দিখেছি, এ কবিতা তোমার কেউ ছাপাবে বলে মনে হয় না।'

চন্দ্রপীড় একটু হেসে—'আনা বারোর ডাকটিকিট জোগাড় করেছি, একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।'

একটু চুপ থেকে—'দশ-বারোটা পত্রিকায় পাঠাবার মতলব?'

—'ঠিক তাই। একটার পর একটা গোটা দশেক মাসিকে পাঠিয়ে দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কে নেয়—'

—'তা দেখতে পারো, দেখা উচিত তোমাব—পাঠাবাব মতো দশ জন সম্পাদক এ দেশে নেই যদিও।'

—'সে আমি জানি, একজনও নেই, না আছে একটা [...] নেই, তোমাকে একটা কাজ কবতে হবে রাজীব, এই কবিতাব গোটাদশেক নকল করে দিতে হবে।'

হ্যাঁ করে চন্দ্রপীড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—'যাকে দিয়ে পারো তাই, দশ জনকে দিয়ে পারো, কবিতাগুলো জোগাড় করে দিতে হবে তোমার।'

—'তোমার বউকে দিযে কয়েক কপি করিযে নাও।'

চন্দ্রপীড়—'ছোট মেয়েটিকে নিয়ে সে বড় ব্যস্ত, আমার লেখার প্রতি তাব কোনো সহানুভূতি নেই, আমি যে উপন্যাস বেব কবেছিলাম তাও সে জানে না। আমাকে লিখতে দেখলেই সে বিরক্ত হয়। সে চায় আমি একটা বড় চাকরি জোগাড় করে কলকাতায় চলে যাই।'

—'তোমার বউ বলে কি আর, সব ঘরেই ব্যাপার এই রকমই প্রায়।'

—'আমাব একটা লেখাও সে কোনোদিন পড়ল না। '

—'তা আমি জানি, মেয়েরা কবিতা পড়ে না কখনো. তোমাব কবিতা পড়তে গিয়ে পুরুষরাও আবিষ্কার করে যে তাদের হৃদযে বিমুখ এক মেযেমানুষ লুকিযে রযেছে, এসব পাণ্ডুলিপি তাদেরও পীড়া দেয়। আমাদেব দেশের পুরুষরাও—গুণীরাও তোমাব এসব পাণ্ডুলিপিব জন্য বিশেষ কোনো আকর্ষণ বোধ করবে না কোনোদিন।'

সংক্ষেপে—'তা আমি জানি। আমার স্ত্রীকে আমি কোনো দোষ দেই না।'

—'কপি হযতো তিনি করে দিতে পারতেন—'

—' তা দেবে না। আমাব জীবনেব এই দিকটাব সঙ্গে কোনো পরিচযই করে নিতে চায না সে।'

কয়েকদিন পরে অবাক হয়ে শুনলাম কলকাতার মেটকাফ স্ট্রিটের অমলেন্দু সেনের পত্রিকায় চন্দ্রপীড়ের কবিতাটি নিয়েছে।

সেই থেকে চন্দ্রপীড়েব খানিকটা নাম হযে গেল, হযতো কলকাতার এক কিনারে, হযতো কলকাতাব এক রাস্তার কিনাবে—কিন্তু তবুও কলকাতাব কযেকজন সাহিত্যিকের কাছে চন্দ্রপীড় খানিকটা সংগতি পেল। পরের কবিতাটি চন্দ্রপীড় অমলেন্দু সেনের কাগজে পাঠাবে না বললে।

অমলেন্দু সেনের সাহিত্যিক খ্যাতি ও সম্পাদকীয় তীক্ষ্ণতার জন্য অমলেন্দু সেন কলকাতায় বাংলায় একটি আশ্চর্য জাতের মানুষ। সে তার নিজের জাযগা পূর্ণ করে রেখেছে। কল্পনাপ্রিয মানুষ সে নয়,তবু কবিতার ভিতর কল্পনার পবিসব দিয়ে প্রথম শ্রেণীর বচনা সৃষ্টি করতে পারে সে। উপন্যাস গল্পেব এক-এক পৃষ্ঠা [...] কখনো -বা এক-একটা প্যারাগ্রাফ শব্দেব ভিতর থেকে হীবের দ্যুতির জন্ম দেয় সে, অরণ্যের নীল গাইয়ের মতো স্বাধীন ও সজীব কলমের পরিচয় দেয়। তার লেখার চেয়েও তাব সম্পাদকীয় তাকেও —সম্পাদকীয় তার চেযেও তার জীবনের বিচিত্র মনুষ্য আস্বাদকে আমি আমার রক্তেব ভিতর অনেকদিন থেকে নির্জনভাবে অনুভব করে এসেছি।

আমার এক-এক সময় মনে হযেছে সাহিত্যিকত্তা তো নয়ই--সাহিত্য বা কবিতাও তার ধর্ম, মন্দির নয়, সেটা হচ্ছে তার মনের সজীব নিরপেক্ষ, নিগূঢ় বিচারপ্রিযতা।

· চন্দ্রপীড়েব কবিতাটি অমলেন্দু সেনের কাগজে একটা স্থান পেয়েছিল তাই—কবিতা— আড়াইশো

লাইনের কবিতা। এসেছে, মফস্বল থেকে—কবিতাটি প্রথম চল্লিশ লাইন যেমন জটিল, তেমনি নতুন, তেমনই নির্জীব। কিন্তু তবুও ভদ্রলোক অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখেছেন। রচনাটির অদ্ভুত সন্দেহজনক মাংস ও গ্রন্থির জন্য এতখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, মনে হল অমলেন্দু সেন যেন চন্দ্রপীড়ের ধূসর ধূসরতম কলমের কোনো নিকটতম স্বজন ছিল, কবেকার কোনো মৃত পৃথিবীতে। কিন্তু তবুও পরের কবিতাটি চন্দ্রপীড় কোন কাগজে পাঠাবে ইতস্তত করছিল।

—'কেন, মেটাকাফ স্ট্রিটের কাগজে?'

—'তোমাকে তো বলেছি রাজীব, এবার সে কাগজে পাঠাব না।'

—'কেন?'

—'ভদ্রলোককে বারবার পীড়িত করতে চাই না আমি।'

—'কিন্তু তিনি পীড়িত হয়েছেন বলে তো মনে হয না।'

—'না রাজীব, মানুষকে [...] করতে চাই না আমি।'

অবাক হয়ে বললাম—'তাহলে কোথায় পাঠাবে?'

—'কোথাও পাঠাব না আর। ছাপাতে ইচ্ছে হলে একটা কবিতার বই-ই ছাপানো উচিত আমার।'

—'তা বেশ, কিন্তু পয়সা পাবে কোথায?'

—'তাহলে থাক, আমার মনে হয পরিষ্কার করে এ লেখাগুলো কপি কবে রাখলে যথেষ্ট।'

—'তারপর?'

—'পরের কথাও জানতে চাও, একটা মাসিক পত্রিকা তাহলে বের কর তুমি।'

—'আমি? এই-ই মফস্বলে বসে?'

—'তাহলে ভবিষ্যতের কথা মিছিমিছি জানতে চাও কেন আর?'

এরপব বছরখানেকের মধ্যে চন্দ্রপীড় কোথাও কোনো কবিতা পাঠাল না। অমলেন্দু সেনদের তবফ থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, তাদের কাগজেব জন্য নয়, কিন্তু কলকাতাব জন্য কোনো একটি অল্পবিস্তর অখ্যাত পত্রিকার পূজার সংখ্যাব জন্য ছোট একটি কবিতা পাঠাতে। অমলেন্দু সেনের এই চিঠি পেয়ে মনে হল—চন্দপীড় খানিকটা বেদনা পেয়েছে।

কোথাও কবিতা ছাপাতে পাঠাল না বটে, কিন্তু মাসেব পব মাস তার রচনা বেড়েই চলল, একদিন সে হিসেব করে দেখল একাত্তরটি কবিতা লেখা হযে গেছে তার। আজকাল আব কবিতা পড়ে শোনাত না সে—শুনবার জন্য আমিও কোনো আগ্রহ নিযে উপস্থিত হতাম না আব।

কবিতা সে লিখত প্রাযই রাতের বেলায, অনেক রাত হযে গেলে, তাদেব ঘরেব পুবদিকের জানালার পাশেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল, ডালপালা বিছানো বেশ একটা [...] গাছ। জানালা খোলা থাকত চন্দ্রপীড়ের.। ডালপালার ফাঁক দিযে অনেকদূর আকশের নির্জন তারাগুলোকে মনে হত পাঠিযে দিয়েছে কে যেন,—তারই হৃদযেব জন্য মনোবীজ সংগ্রহ করে পাঠিযে দিতে। প্রাযই পাঠিযে দিত তাবা, মনের হীন অদৃশ্য পবীদের অনুভূতি একজন দবিদ্র কবির মলিন লণ্ঠর ঘিরে হাজির হযেছে যেন সব—ধীরে ধীরে কবিতার অক্ষবে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে উঠছে।

বাতাসে কেমন একটা নীরব গন্ধ। কৃষ্ণচূড়াব ডালে ততক্ষণে ধূসর পেঁচা এসে বসেছে, সেও যেন নক্ষত্রেব সঙ্গী। সেও কুড়িযে এনেছে বীজ—কবিতার প্রতিটি শব্দের জন্য তারাও হৃদযেব বিবর্ণ কুযাশার আস্বাদ নিযে ভেসে উঠছে যেন। জানালার পাশে রাতের জগতে এরা সব স্থিতি, আশ্চর্য নির্জন স্থিতি সব। এবাই সব বাস্তব। দিনের আলোব পৃথিবীব কোলাহল কথা ও কাজ সমস্তই কুজ্ঝটিকে যেন। এই রাতের পৃথিবী কি চিরস্থিতি দিতে পারে না? আবার যদি—ডালপালাব ফাঁক দিযে আকাশের তারা ক'টির দিকে তাকাও—একটি তারাকে খুব উজ্জ্বল মনে হবে, কৃষ্ণচূড়ার সবুজ ডালপালাকে মনে হবে যেন কবেকার পাড়াগাঁব সেই অশ্রুকণা সান্যালের মতো দাঁড়িযে আছে। এই সব হৃদযের কবিতা সব।

এক-একদিন রাতে কবিতা জন্ম নেয মাথার ভিতরে-পেঁচা সেদিন ভয় খেয়ে পালিয়ে গেছে যেন—কিংবা ধাবালো ঠোঁট বড় বড় চোখ নিয়ে বসে আছে হেঁযালির জন্ম দেবার জন্য, একটাব পর একটা নক্ষত্র আসছে কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে যেতে, সমস্ত আকাশ ইস্পাতেব মতো নীল কঠিন, তারই ভিতর থেকে নক্ষত্রের হাসি রাশি রাশি বর্শাফলকের মতো পৃথিবীর দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে যেন। কার আশা নষ্ট হযে যাচ্ছে, কার পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ কোথায় ছেলের দল ইঁদুব মেরে খেলা করছে, কোথায মানুষের মন মরম্ভ ইঁদুরের মতো সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তাদের। এক-একটা নক্ষত্র যেন বিদূষকের মতো শিকারেব

গল্প করছে। (মানুষের) প্রাণীর মানুষের আশা, সাধ, সুহাস, স্বপ্ন নষ্ট করে প্রতি মুহূর্তে যেই শিকার চলে—সমস্ত আকাশের নক্ষত্র যেন রূপার গেলাশে নীল মদ পান করতে করতে অজস্র কঠিন ধাতুর আর্তনাদের মতো বিকট আওয়াজে হেসে হেসে উঠছে।

এ-ও হৃদয়েরই কবিতা চন্দ্রপীড়। মাথার কবিতা বলে কোনো জিনিস আছে কি? তা আছে হয়তো [...] লিখেছে। সেসব কবিতার ভিতর অশ্রুকণা সান্যাল আর নেই, আছে অধ্যাপক—পিয়ারী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—ধ্রুপদ [...] শেক্সপীয়র [...] ইত্যাদি।

চন্দ্রপীড় কবিতা আর পাঠাল না কোথাও। অমলেন্দু সেনের তরফ থেকেও কবিতার জন্য কোনো তাগিদ এল না আর। কিন্তু মফস্বলের এই শহরের ভিতরেই একদল ছেলে যেন সাহিত্যের রক্তের গন্ধ পেয়েছে—রাতারাতি একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করে ফেলল তারা।

কয়েক সপ্তাহ কাগজ চলাবার পর—এবং কলকাতার থেকে যতদূর পারা যায় লেখা আমদানি করবার পর যখন খানিকটা অবসাদ এল এদের মনের ভেতর, একদিন সকালবেলা আটটার সময় সম্পাদক ও সহসম্পাদক চন্দ্রপীড়ের কাছে এল।

—'কী মনে করে? বসুন।'

—'বসতে বলবেন না, আমরা বড্ড ব্যস্ত।'

—'তাহলে দাঁড়িয়েই থাকবেন?'

—'যদি দু-পেয়ালা চা দিতে পারেন।'

—'চা খাওয়া ছেড়ে দিতে পারেন।'

—'চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

—'আচ্ছা বসি তবুও—'

—'রামনিধির দোকান থেকে দু-কাপ চা আনিয়ে দিচ্ছি।'

—'ধোপার দোকানের চা আমরা খাইনি।'

—'রামনিধি ধোপা নয়, বামুন, তিন পুরুষ আগে এদেরই এক 'রাম' তর্করত্ন ছিল— আজ দায়ে পড়ে চায়ের দোকান খুলেছে। সে যাক, হরিজনদের প্রতি আপনাদের কোনো সহানুভূতি নেই, ধরুন, এই রামনিধি যদি ধোপা হত, কিংবা চামার—'

—'সহানুভূতি খুব আছে, কিন্তু এদের দোকানের চা খাওয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক চন্দ্রপীড, এরা এক-একটি ভাগাড়ের ইঁদুরের মতো নোংরা।'

চন্দ্রপীড় মাথা নেড়ে—'কলকাতার দেশী পাড়ার চায়ের দোকানে চা খান?'

—'কলকাতায় গেলে খাই বইকী—যেখানে আমাদের সাহিত্যিক মজলিশ জমে, বড় বড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে এক আসরে বসে চা খাওয়ার সুযোগ হয়।'

দ্বিতীয় ছেলেটি—'চায়ের দোকানেই তো বাংলার সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়—আজকাল যারা লিখে নাম করেছে তাদের মধ্যে একজনেরও নাম করতে পারবেন না যাকে চিনি না। চায়ের দোকানে এসে একবার-না-একবার ছো মেরেই যাবে।'

'সে বেশ। কলকাতার দোকানে আমিও এক-আধবার ঢুকতাম, সে আট দশ বছার আগের কথা।'

একটি ছেলে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে চন্দ্রপীড়ের হাতে তুলে দিয়ে—'নিন।'

চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে চন্দপীড—'কিন্তু আমার মনে হয় কলকাতার যে কোনো রেস্টুরেন্টের চেয়ে রামনিধির দোকান একটু ও কম পরিষ্কার বা অপরিষ্কার নয়।'

দ্বিতীয় ছেলেটি হেসে উঠে বললে—'[...] নিন দেশলাই। চায়ের জন্যে আসিনি, কেন এসেছি বলছি, আপনার খাটের ওপর উঠে পা ছড়িয়ে বসতে পারি কি?'

—'নিরাপদে'—

—'শুনলাম আপনি কবিতা লেখেন।'

চন্দ্রপীড় কোনো জবাব দিল না।

—'জানেন হয়তো, আমরা একটা সাপ্তাহিক বার করছি, কবিতা গল্পের জন্যই বিশেষ করে।'

—'চন্দ্রপীড় ধীরে ধীরে চুরুট জ্বালাল।

—'অমলেন্দু সেনের কাছে লেখা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, কি চশমখোর, বিনে টাকায় কবিতা পর্যন্ত ছাড়ে না, লম্বা একটা চিঠি ছাড়লেন তবু। দশ রকম কথার মধ্যে আপনার কথাও উল্লেখ করে আপনার

কাছ থেকে লেখা নিতে বললেন।'

চন্দ্রপীড়—'অমলেন্দু সেন কত বড় চিঠি লিখেছেন আপনাদেব কাছে?'

—'ওঃ সে প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠা আন্দাজ।'

—'কোনো পযসা নেননি?'

—'চিঠিব জন্য?' দু'টি শৌখিন পাখিব মতো যেন সাদা ডানা ঝেড়ে ঘুবিযে ছেলেদু'টি হেসে উঠল, বললে—'না, অমলেন্দু সেন অতটা চামাব হননি।'

—'আমাব তো সময বেশি নেই।'

—'যেখানই যাক সেখানেই শুনি সময নেই আপনাব। একটা ভালো গল্প বা কবিতা লিখতে পেবেছেন বলে কি সকলেব মাথা কিনে নিযেছেন' বলে ছেলেদু'টি যেন সাদা পাখনা গুটিযে গম্ভীব হযে চন্দপীড়েব দিকে তাকাল।

চন্দ্রপীড় চুরুটে এক টান দিযে—'এবাবকাব সংখ্যায অমলেন্দু সেনেব ওই চিঠিটা ছাপিযে দাও। শুনেছি অমলেন্দু সেনেব কলম খুব সবস, তোমাদেব কাগজ পড়বাব মতো হবে।'

—'শুনেছেন অমলেন্দু সেনেব কলম খুব সবস' শুনেছেন, শুনেছেনই শুধু' বিবক্ত শালিখেব মতো ঘাড় কাত কবে স্ফীত বিস্রস্ত পালকেব উত্তেজনায যেন ছেলেদু'টি চন্দ্রপীড়েব দিকে তাকাল। —'শুনেছেন" কেন, একটা গল্পও পড়েননি তাঁব?'

—'তাব একটা গল্পেব বই আমাকে দিযে যেও।'

ছেলেদু'টি উঠে নমস্কাব জানিযে গম্ভীব মুখে—'চললাম।'

কযেকদিন পবে কি জানি কি ভেবে এদেব ভিতবে একজন ফিবে এল আবাব চন্দ্রপীড়েব কাছ থেকে একটা কবিতা আদায কবে নিযে গেল।

হপ্তাদুই পবে দু'জনেই আবাব তাদেব একখানা পত্রিকা হাতে কবে নিযে এসে বললে—'আপনাব কবিতা এ সংখ্যায ছাপিযেছি, একটা চুরুট নিন, মনে কববেন না কবিতাব জন্য পুবস্কাব, কবিতাব জন্য কাউকে আমবা কোনো পাবিশ্রমিক দেই না।' ছেলেদু'টি এতক্ষণ দাঁড়িযেছিল, এবাব বসল। বললে—'আপনাব কবিতাটি বড্ড লম্বা, পঁযত্রিশ লাইনেব, ছ-সাত লাইন আমবা বদলে দিযেছি।'

চন্দ্রপীড় চুরুট জ্বেলে বলল—'ছেঁটে দিযেছ?'

—'না, বদলে দেযেছি।'

চন্দ্রপীড় নবম গলায বললে—'কেন, নোংবামি ছিল কিছু?'

—'না। ইনডিসেন্ট হলে আমবা গ্রাহ্য কবতাম না, শীল-অশ্লীল ওসব মনেব ধোঁকা, কবিতা কবিতা হওযা চাই, তাহলে উৎবে যায, ইনডিসেন্টিব জন্য বাঁধে না। কিন্তু আপনাব এ কবিতাটি' একটু চুপ থেকে—'সাতটি লাইন তো একেবাবেই চলে না।'

—'সে জাযগায ফাঁক বেখে গেছ?'

—'না, আমবা নিজেবই বচনা কবে ভবে দিযেছি।'

চন্দ্রপীড় একটু হেসে—'ও, তাহলে তা তোমাদেব বড্ড বেগ পেতে হযেছে।'

—'কি আব কবি অমলেন্দু সেন লিখলেন আপনাব কথা।'

—'কেন যে লিখলেন অবাক হযে আমিও তাই ভাবি।'

ছেলেদু'টি চলে গেল।

পত্রিকাটি তুলে নিযে দেখলাম কবিতাব গাযে গাযে ছাপাব ভুল ফোঁড়াব মতো ফেটে উঠেছে, বাগ কবে এবা হযতো প্রুফও দেখেনি, নীল আকাশেব মতো একটা বিস্তৃতিকে জাযগায জাযগায কযলাব উনুনেব ধোঁযা দিযে ভবে বেখেছে।

পত্রিকাটি বেখে দিলাম। তাকিযে দেখলাম চন্দ্রপীড় স্কুলেব ছেলেদেব খাতা কাবেক্ট কবছে। আকাশেব দিকে তাকিযে অবাক হযে ভাবছিলাম আবো দেড়শো বছব না কেটে গেলে চন্দ্রপীড়েব এই ফসলেব প্রথম আস্বাদও এদেশে সম্ভব হবে না। কিন্তু সম্প্রতি তাব কবিতাগুলো গুছিযে বাখা দবকাব। আজ তাব বই ছাপিযেও লাভ নেই কিছু। কিন্তু তবুও কোনো একটা চমৎকাব নিবাপদ জাযগায তাব পাণ্ডুলিপি তুলে বাখা উচিত। তাবপব দেড়শো বছব পবে অন্ধকাব ঘুমেব ভিতব ডুবে গিযে আমবা আব কিছু জানি না।

১৯৩৬

কবিতা নিয়ে

তোমার সঙ্গে যখন কথা বলবে হাত ছুঁড়ে, মাথা ঘুরিয়ে, চোখ-দু'টোকে কপাল ভেদ করে আকাশেব দিকে চিলের মতো উড়িয়ে দিয়ে কঠিন ধাতুর গায়ে কঠিন ধাতুর নিক্ষেপের মতো হাসি ও আওয়াজের সৃষ্টি কবে, বাঘের মতন থাবায় টেবিলটাকে একবার আক্রমণ কবে এক-একটা বইব টুঁটি ধবে সেটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে নলিনাক্ষ একখণ্ড বৈশাখের সমুদ্রেব মতো রক্তেব অকুতোভয় পরিস্ফুরণ নিয়ে তোমার ঘরের ভিতর বর্তমান থাকবে। আমি একটু নির্জন ধরণেব মানুষ, দরজায় নলিনাক্ষর ছায়া দেখলে আমার সুবধার মনে হয় না।

পাঁচ হাত লম্বা মানুষ, অশ্বত্থেব মতো কঠিন মাংস দিয়ে সে তাব শবীবের প্রসাব তৈরি করেছে যেন। মাথায় ফলন্ত চুলের অবিরাম আনন্দ পৃথিবীর ঘাস পাতা ও পাখিব কথা মনে কবিয়ে দেয়। থুতনিতে তিন ইঞ্চি মাফিক দাড়ি রেখেছে সে সেটুকুও পৃথিবীব ঘাস, পাতা পাখির পালকের মতো নিঃসঙ্কোচ প্রাণের আস্বাদ নিয়ে জন্মেছে, কিন্তু তবুও এই চুল ও দাড়িকে নলিনাক্ষ অবণ্যের মতো বাড়তে দেয়নি; কেটে ছেঁটে শৌখিন করে সাজিয়ে বেখেছে। বক্তের অদ্ভুত পরিস্পন্দনও চিৎকার সত্ত্বেও নলিনাক্ষ আমার মতন মানুষ পর্যন্ত নয়, সে নিতান্ত সাধারণেব মতোই। জীবনের কাঁটা তাব ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়ই হাজির হয়। কখনো ভুল করে না, অনাবশ্যক অবান্তব প্রসঙ্গ [...] না তার। মানুষেব জীবন কি এবং কি নয় তা সে বুঝছে, মাঠেব ঘাস নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে সে কোনোদিন বসে থাকেনি।

নলিনাক্ষর উদ্যোগে একটি সাঁতার সমিতি তৈবি হয়েছে সে তাব সম্পাদক, নিজে একজন ভালো ক্রিকেট খেলোযাড় না হলেও ক্রিকেট ক্লাবেব সে একজন বড় মাতব্বর। ফুটবল খেলাব সময় তাকে অনেকদিন বেফারি হযে কাজ করতে হয। ফুটবল সিজনে নলিনাক্ষ একটা স্তম্ভের মতো। সে না থাকলে কি যে হত, এ জীবনে কোনোদিন ফুটবল গ্রাউন্ডে না গিযেও আমাব ঘবে বসেই আমি তা ভেবে ঠিক কবতে পাবি না। ডিস্ট্রিক্ট অফিসেব প্রিযপাত্র সে, [...] বাংলাতে গিয়ে মাঝে মাঝে বিকেলবেলা চা খায, অফিসাবদেব ক্লাবে গিযে ব্রিজ খেলে সন্ধ্যার সময। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি রযেছে। কযেকটা চমৎকার স্যুট আছে তার, পববাব কাযদা সাহেবদেব মতো বাংলা কবিতা গল্প কোনোদিন পড়ে না সে, এ জন্য মনে মনে আমি তাকে গভীব প্রশংসা কবি। বাংলাদেশে সাহিত্য বলে কোনো জিনিস আছে তাও সে জানে না, ইংরেজি সাহিত্য, ঠিক বলতে গেলে ইংরেজি বচনা তার কাছে খবরের কাগজ ও নিতান্ত দুঃসময়ে [...] ইত্যাদি নিয়ে কয়েকটি বইয়ের মধ্যে পর্যবসিত। বাপেব জমিদারি পড়ে গেছে অনেকটা, কিন্তু তবুও যা আছে তা দিয়ে এ জীবনটা নিজেব মনের স্বাধীনতাকে খর্ব না কবে কাটিযে যেতে পারবে নলিনাক্ষ।

নলিনাক্ষব তো সবই বযেছে—এমন কী আইনের ডিগ্রি পর্যন্ত। এক সময়ে অবাক হযে ভাবতাম সে কেন মফস্বলেব ধাবে পড়ে রয়েছে, দু-চারটা বক্তৃতা দিয়ে সেখানেও বা আগুন জ্বালিয়ে দেয না কেন? [লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে] অনাযাসে সে যেতে পারে। নাম কবতে পারে। নলিনাক্ষর চেয়ে কত রদ্দি লোক কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে সাহেবদের [...] মুচকি হাসির অবতারণা করল। গেল তো তবু তো বক্তৃতা দিল। কিন্তু বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবে নলিনাক্ষব জোর এদের চেয়ে ঢের বেশি—কিন্তু আড্ডায় আড্ডায় টেবিল ভেঙে ফুটবল ফিল্ডে রেফারিগিবি কবে—কবল কি সে?

নলিনাক্ষ যখন তোমাদের আড্ডা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায, দাঁত দিয়ে একটা চুরুট কামড়ে ধবে, বিরাট গোল চশমার ফাঁক দিয়ে বাঘের মতো চোখে তোমাব দিকে তাকায়—বাঘের ভুক্তাবশিষ্ট মহিষের হাড় কখানার মতো কতকগুলো দাতে ছড়াছড়ি মুখের ভেতর থেকে বেরিযে পড়ে তার, কেমন একটা অস্ফুট পরিতৃপ্ত গর্জনের সঙ্গে তখন আর একবার পরিমাপ পাও তার, বুঝতে পার এই পৃথিবীতে তুমি নিজে কি রকম অবাস্তব। বস্তুর শক্তি নলিনাক্ষ কেমন বৈষযিক কেমন জান্তব গৌরবে ধাবণা করে আছে। সংসারের সবচেয়ে বড় বড় সফলতা কেন সে পাবে না?

নলিনাক্ষ আমার কাছে আগে প্রাযই আসত, কিন্তু যতই সে বুঝতে পারছিল আমাব এখানে আড্ডা

প্রায়ই একা আমাকে নিয়ে এবং আমি ববং একজন অদ্ভুত জীব, আমাব এখানে আসবাব আকর্ষণ কমে গেল তাব।

তবুও মাঝে মাঝে আমাব এখানে ইদানীংও পাওযা যেত তাকে। এসেছে, এসে বসেছে আমাব টেবিলেব কাছে, চুরুট টানছে, কথা বলছে, একসঙ্গে দাঁত আব ঘুষি খিচিযে ঘুষিব পব ঘুষি মেবে কাঁঠাল কাঠেব টেবিলটাব ভিতব থেকে জখমেব আর্তনাদ বেব কবে আনছে সে।

—'কেন বেবোও না বলতে পাব? কেন মানুষেব সঙ্গে মেশ না? না আমাদেব দেশেব সব মানুষ ফুবিযে গেছে। আমাদেব ফুটবল ক্লাবেব্র বীবেশ ঠ্যাং ভেঙে এই সাতদিন ধবে বিছানায পড়ে আছে খবব বাখ? খবব বাখ তুমি' সমস্ত শহবেব মানুষ ভেঙে পড়েছে সেখানে মায [...] পর্যন্ত, ডিস্ট্রিক্ট অফিসাব সহানুভূতি জানিযে খবব নিচ্ছেন, বাববাব লোক পাঠিযে খবব জানবাব জন্য ওফ তাঁব আগ্রহ-আব তুমি, তুমি কোন নবাবেব ছেলে, একবাব গিযে তাকে দেখে আসবাব মতো সময তোমাব—' আঘাতেব পব আঘাতে টেবিল চৌচিব হযে যাচ্ছে দেখে নলিনাক্ষকে বাঁধা দিযে বললাম—' কোন বীবেশ?'

—'কোন বীবেশ?'

নলিনাক্ষব চোখেব দিকে তাব উদ্যত হাতেব বড় মুষ্ঠিব দিকে তাকিযে মনে হল, হল-ই বা কাঁঠাল কাঠেব টেবিল, বঘুগঞ্জেব সেই নামজাদা কাঁঠাল গাছটাব কাঠ দিযে অবিনাশ মিস্ত্রিকে লাগিযে তৈবি কবিযেছিলাম, আহা তাব দিন শেষ হযে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য টেবিল স্থিব হযে বইল, অনেকক্ষণ স্থিব হযে বইল, নলিনাক্ষব চোখেব দিকে ততক্ষণ আমি তাকাতে পাবছিলাম না, কিন্তু অনেকক্ষণ পবে একটা আকস্মিক সাহসে হঠাৎ চোখ চেযে দেখি নলিনাক্ষব মুখ জানালাব দিকে ফেবানো, সে চোখ বুজে আছে। আস্তে আস্তে শুরু কবলাম—

—'বীবেশেব কি কবে পা ভাঙল?

নলিনাক্ষ কোনো জবাব দিল না, জেগে আছে না ঘুমিযে গেছে তাও বোঝাবাব জো নেই।

—'বীবেশ? কোন বীবেশই-বা? কত বীবেশই তো বযেছে।

—'কত বীবেশ বযেছে?' একটা হুঙ্কাব ছেড়ে টেবিলটাকে সর্ষেফুলেব অন্ধকাবেব ভিতব পাঠিযে দিযে নলিনাক্ষ [...] [...] টেবিলেব ওপব আবাব দামামা বেজে গেল, —'বীবেশ সব, বীবেশকে ব্যাকে দাও এক একটা বল।

বাঁধা দিযে।—'ও সেই ফুটবলিস্ট বীবেশ—'

—'ফুটবলিস্ট। ও ফুটবলিস্ট' ও সেই ফুটবলিস্ট বীবেশ—উফ কি অনুকম্পা তোমাব। আহা' আহা' যেন ইসবগুলেব শববৎ দিযে প্রাণ ঠাণ্ডা কবে দিলেন। ফুটবলাব বটে, যেন ফুটবল খেলা পুতুল খেলাব মতো— ফুটবলাব' যেন টিকটিকিব ডিম্ নিযে আণ্ডাবাচ্চাব পুতুলখেলা হচ্ছে।

নলিনাক্ষব চুরুট নিভে গিযেছিল, বিদ্যুতেব মতো ক্ষিপ্রতায চুরুট জ্বালিযে নিযে আমাব দিকে তাকিযে বললে—'আই চ্যালেঞ্জ ইউ, কোন ডিকশনাবিতে তুমি ওই জঘন্য শব্দ পেযেছে।

—'কি জানি, ডিকশনাবিতে আছে কিনা বলতে পাবি না।

—'তোমবা মানুষ নও, তোমবা সবীসৃপ, সেইজন্য [স্পোর্টর্সম্যানকে] ফুটবলিস্ট বলে তোমাদেব নাবীত্বেব পবিচয দাও।

—আমবা সীবসৃপ এবং নাবী? কিন্তু—'

—'তোমবা তাব চেযেও অধম, ফুটবলিস্ট' ওঃ সেই ফুটবলিস্ট' ও ফুটবলিস্ট বীবেশ' ওফ' তোমাব সীবসৃপেব চেযে অধম—নাবীব চেযেও। আমি ভেবে পাই না কোন জাতেব জীবেব সঙ্গে তোমাদেব তুলনা কবব।'

— সেবকম জীব পৃথিবীতে জন্মাযনি আজও।'

—'তা নিশ্চযই না, কোনোদিন জন্মাবে বলে মনে হয না।'

—'এতক্ষণ চিনেছ বীবেশ মুখুয্যে, সেই যে সবকাবেব দিঘি চল্লিশবাব সাঁতবেছিল'—

—'দেখতে গিযেছিলে তুমিও দেখতে গিযেছিলে—তাহলে তো আমি ভাবি অন্যায কবে ফেলেছি প্রমথ।'

—'আ নলিনাক্ষ তুমি এবই মধ্যে ভুলে গেলে সব, প্রায হাজাব তিনেক লোক হযেছিল।'

—'দশ হাজাবেব একটা মাথাও কম না।'

—'তা হবে, হাজাব বিশেক হয়েছিল হয়তো।'

—'তা হতে পাবে, হাজাব বিশেক, তা হবে বইকী— হলইও বা মফস্বল শহব, শহব তো দিঘিব পাড়ে ভেঙে পড়েছিল সেদিন।'

—'তুমি যে জিনিসে হাত দাও, আ নলিনাক্ষ! কিন্তু এবই মধ্যে কি কবে নলিনাক্ষ তুমি সব কথা ভুলে গেলে—'

—'কেন? কী ভুললাম? ডিস্ট্রিক্ট অফিসাব চারু মুখুয্যে আমাকে—'

—'না, না সে কথা নয়, সাঁতাব শেষ হয়ে গেলে ভিড়েব ভিতব থেকে ছোঁ মেবে তুমি বেছে নিলে মাকে, তোমাব যা চিলেব মতো চোখ, ঘাড় ধবে একেবাবে টেনে নিয়ে গেলে প্যান্ডেলেব ভিতব।'

নলিনাক্ষ একটু সন্দিগ্ধভাবে—'কি জানি, মনে পড়েছে না তো ঠিক, তোমাকে টেনে নিয়ে গিছলাম—'

—'বাঃ একেবাবে প্যান্ডেলেব ভিতব টেনে নিয়ে—'

—'প্যান্ডেল তৈবি কবেছিলাম? কী বকম প্যান্ডেল?'

—'যে কোনো কংগেসেব প্যান্ডেলেব চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।'

—'ইস কুযাশাব মতো আমাব মনে পড়ছে প্রমথ, কিন্তু বীবেশ যা সাঁতাব কেটেছিল সেদিন—'

—'আশ্চর্য। অত চেযাব পেলে কোথায়?'

—'চেযাব' শতপাঁচেক এনেছিলাম বোধহয।'

—'বলো কি? কিছুই মনে নেই তোমাব? হেসেখেলে হাজাব তিনেক—'

নলিনাক্ষব চোখ আস্তে আস্তে জুড়িয়ে এল, চুরুট টানতে টানতে সে চুপ কবে বইল।

—'আব চাযেব পেযালা ভেঙেছিল তো হাজাব দেড় হাজাব। দাম দিল কে?'

নলিনাক্ষ আধ সেকেন্ডেব জন্য একবাব চুরুটটা মুখেব থেকে বেব কবে—'ওসব দাম দিযেই দিতে হয।'

—'এত টাকা সমিতি পায কোথেকে?'

—'জোগাড় কবতে হয।'

—'তোমাব নিজেব তফিল থেকে কত দিলে?

—'সে সব প্রাইভেট—সাঁতাবেব কথা বলো।'

—'বেশ সাঁতাব হযেছিল।'

—'না, না, খুলে বলো।'

—'ছ'বছব আগেব ব্যাপাব—আজ সে সব কথা...হযতো দশ হাজাব লোক হযেছিল, হযতো হাজাব খানেকেব বেশি হযনি, হযতো হাজাব দেড়েক পেযালা ভেঙেছিল, হযতো দু'শো পেযালাব বেশি আমদানিই হযনি। আমি অবাক হযে ভাবি চা-ও কি খাওযা হযেছিল সেদিন?'

নলিনাক্ষ নিস্তব্ধভাবে চুরুট টানছিল, টেনে যেতে লাগল।

—'কই আমিতো কাউকে চা খেতে দেখিনি।'

—'কাউকে সাঁতাব কাটতে দেখিছিলে?'

—'আমি গিযেছিলাম ভিড় দেখতে।'

—'ভিড় দেখতে' কেন? নলিনাক্ষ মহালনবিশ যে কাজে হাত দেয তাতে লোক হয না, এই তো বলতে চাও তুমি? এব প্রমাণ কবতে গিযেছিলে তো? আই চ্যালেঞ্জ ইউ দশ হাজাব গুঁফো হাজিব ছিল সেদিন দ-শ-হা-জা-ব গুফো' টেবিলে বিকট শব্দ কবে—'একটা মেযেমানুষ কিংবা প্রথম ভট্টাচায্যিকে আমি মানুষেব মধ্যেই ধবি না—বিধাতা তোমাকে গোঁফ দিযেছিলেন তা কামিযে তুমি শ্রীমতী সেজেছ—কিন্তু না কামালেই-বা কি, একটা আবশোলা একটা শুযোপোকাবও অধম। মেযেমানুষদেব ভিতবেও পুরুষ আছে, কিন্তু তুমি প্রমথ ভট্টাচায্যি তোমাব মাযেব চেযে বোনেব চেযে বউযেব চেযেও নির্ঘাৎ মেযেমানুষ তুমি, মেযেমানুষদেব ভিতবেও তোমাব মতন মেযেমানুষ আমি দেখিনি। এই বইল চুরুট, তোমাব মাথায ঘোমটা না টেনে দিযে আমি একটানও দিচ্ছি না। আব—আজ বেরুচ্ছি না এখান থেকে'—বলে নলিনাক্ষ তাব থাবা বাড়িযে দিল।

—'সাঁতাব হযে গেল, আমাকে তুমি বক্তৃতা কবতে ডাকলে। আমি সভাপতি বাঁড়ুয্যে সাহেবকে

ধন্যবাদ জানিয়ে—'

—'তুমি কি বক্তৃতা দিয়েছিলে সেদিন?'

—'টানাহেঁচড়া করে আমাকে প্যান্ডেলে নিয়ে গিয়ে এখন এই কথা বলছ?'

নলিনাক্ষ গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে—'কি জানি আমার তখন মনে হত, তুমি একটু-আধটু বলতে পার।'

—'আমি কি বলেছিলাম মনে নেই তোমার।'

নলিনাক্ষ সহৃদয়ভাবে ভ্রূকুটি করে বললে—'আমার মনেই নেই তুমি বলেছিলে কিনা।'

—'তোমাদের বড় মানুষের এই দোষ।'

—'মুখ ভার করলে কেন? বক্তৃতা দিয়েছিলে তো দশজনের জন্য, কর্মকর্তার জন্য নয় প্রমথ, স্পিচ শুনবার সময় কোথায় আমার, হয়তো চায়ের তদারক করছিলাম।'

—'চা? তোমার কাছে আজ কাজ একটা নালিশ জানাব আমি নলিনাক্ষ, বক্তৃতা পর্যন্ত দিলাম, তবু গলা ভেজাবার জন্য এক চুমুক চা পর্যন্ত সেদিন কপালে জুটল না।'

—'এতদিন একথা বলেনি কেন আমাকে? চলো আজই রেস্টুরেন্টে যাই, তোমাকে দস্তুরমতো খাইয়ে দিচ্ছি আমি, চপ কাটলেট , কিমাব কারি, স্যান্ডউইচ।'

—'না না এসব খেতে চাই না আমি।'

—'পানীয়? বেশ [...] হুইস্কি [...]' বাঁধা দিয়ে—'ওসব আমি খাই না কিছু।'

—'তাহলে কি কফি খাবে?'

—'কিছু না নলিনাক্ষ, আমি শুধু বলছিলাম সেদিন অমন ডামিশ বক্তৃতাব পব-দেড় হাজাব পেযালাও যখন ভাঙল, এক কাপ চা না পেযে নিজেব অদৃষ্টকে খুব ধিক্কার দিযেছি।'

—'বাস্তবিক আমাদেব সভাসমিতিব ভিতর কোথায যেন দোষ আছে।'

—'কি বকম?'

—'কিংবা দোষ আমাবই, তিন হাজাব চাযেব কারবাবে এক পেযালাও পেলাম না। অথচ আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।'

—'আমাকে স্নব বলতে চাও?'

—'না, না, তুমি কোথায তখন? তোমাকে পেলে তো হাতেব কাছে আকাশ পেতাম। কিন্তু হাতেব কাছে মানুষ কোনোদিন আকাশ পায না; আকাশেব এই বিশেষত্ব।'

—'অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিবিয়ে বলা হচ্ছে নলিনাক্ষ মহালনবিশ একটা স্নব' দুই ঘুষিতে টেবিল দমদম করে বেজে উঠল। নলিনাক্ষ জোব চুরুট টেনে যেতে লাগল, অনেকক্ষণ, টানল। আমাব দিকে তাকিযে—'আমি দেখাব তাদেব।'

—'কাদের?'

—'সেইদিন সেই মিটিঙের ব্যবস্থা যাবা কবেছিল।'

—'তাদেব কী করবে?'

—'সমস্ত হিসেবনিকেশ চাই। ক-পেযালা চা হয়েছিল, ক-পেযালা ভেঙেছিল, আমাব জমিদাবিব থেকে এসবের জন্য টাকা দিতে আমি কেন বাধ্য, চাঁদার টাকা যায কোথায? যায কোথায চাঁদার টাকা? চাঁদার টাকা কোথায যায? চ্যালেঞ্জ দ্যাট রাশকেল হবেন সবখেল আই সে চাঁদার টাকা সব কাব পিণ্ডি চটকাতে যায? কোন শালাব গুষ্টির পিণ্ডি—'

ভেবেছিলাম নলিনাক্ষ এইবাব উঠবে, কিন্তু উঠল না, চুপ কবে আরো অনেকক্ষণ বসে চুরুট টানল।

অনেকক্ষণ পবে আমি—'আমার মনে হয—' থামলাম, নলিনাক্ষকে সব কথা বলতে সহসা সাহস হয না।

—'কী মনে হয? কী মনে হয তোমার?'

—'তুমি এসব ছেড়ে দাও।'

—'কী ছেড়ে দেব?'

—'হরেন সরখেলকে [...] করে কি আর হবে, কিন্তু সে হল অবান্তর কথা, আমি কি বলতে চাই জান?' দেখলাম বাঘের মতো চোখে আমাব দিকে তাকিয়ে আছে।

—'কী ছেড়ে দেব আমি শুনতে চাই। টু দি পয়েন্ট বলবে, না হলে ঘুষিয়ে তোমার মাথা উড়িয়ে দেব।'

—'বরং বলতে ইচ্ছে করে, বলা উচিত কয়েকটা নতুন জিনিস যদি তুমি ধর, তাহলে ভালো হয়।'

—'যথা?'

—'ক্রিকেট ক্লাবের সেক্রেটারি, ফুটবল ফিল্ডের রেফারি চমৎকার নলিনাক্ষ, চমৎকার, কিন্তু তোমার পাঁচ হাত লম্বা দারুণ চেহারা শরীর ও-মনে আশ্চর্য শক্তি, আশ্চর্য মনের শক্তি তোমার, আমার মনে হয় দেশকে তুমি একটা কিছু দাও।'

—'অর্থাৎ বায়স্কোপে নামতে হবে?'

—'না।'

—'তবে?'

—'সেদিন দেখলাম একজন ফিরিঙ্গি মোটর ড্রাইভ ও রেফারিগিরি করছে, চমৎকার রেফারি, তুমি হয়তো একজন ভালো মোটর ড্রাইভার, কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমরা'—

—'অতএব আমাকে কবিতা লিখতে হবে?'

—'তুমি কবিতা বোঝ না, লিখবে কেমন করে?'

—'উঠি, অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম, একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে কাটালেও ঢের ভালো ছিল। আজ বিকেলে [...] ওখানে চা খেতে যাব। তাকে বলব সকালবেলা একটা গাধার পাল্লায় পড়েছিলাম।'

—'বোলো শীত রাতের পেঁচার পাল্লায়।'

—'না না, গাধার পাল্লায়, কিংবা শুয়োরের পাল্লায় পড়েছিলাম, শুয়োরটা বলে একটা ড্রাইভারও যখন রেফারি হতে পারে তখন নলিনাক্ষ মহালনবিশ তুমি কবিতা লেখ—কি আকাট গাধা।' নলিনাক্ষর সমস্ত শরীরটার উপর দিয়ে একটা প্রবল ধিক্কারের ঝড় বয়ে গেল।

নলিনাক্ষ—'চায়ের টেবিলে মেমসাহেব থাকবে।'

—'হাসি জমবে বেশ। কিন্তু—'

টেবিলের ওপর দড়াম করে একটা ঘুষি মেরে নলিনাক্ষ 'ভটচাজ, তুমি যে তোমার কবিতা খুব বড় মনে করো, আর বড় মনে করো তোমার দেশকে। তোমার লেখা কয়েকটা পয়ার নিয়ে দেশের পথে তুমিও নেমো, আর ফুটবল ফিল্ডের রেফারি হয়ো। আমিও নামব, না হয় সেই ড্রাইভারটাই নামবে, দেখি দেশের লোক কাকেই-বা বাহবা দেয়, কার গায়েই-বা থুথু ফেলে।' চুরুট জ্বালিয়ে উঠে দাঁড়াল নলিনাক্ষ। বললে—'তোমার কবিতা নিয়ে ভিজে বিড়ালের মতো ঘরের কোণে পড়ে আছ, কিন্তু সেই ড্রাইভারটার রেফারিগিরি দেখবার জন্য এ মুলুকের হাজার স্কুল কলেজের ছেলে হাজার হাজার মানুষ কাদাবৃষ্টি ঠেলে মাঠে ভেঙে পড়ছে রোজ।'

১৯৩৬

—'কি হে ভূত দেখলে নাকি?'

—'অনেকটা। কিন্তু কমলাদেবী গেলেন কোথায়?'

—'এইবাব আমি চুরুট জ্বালাই—কি বল দিলীপ, মেয়েদেব সামনে আমি সিগাবেট খাই না, চুরুটটা ক্রমে ক্রমে পুড়ে ফুবিয়ে যাবে—ধোঁযাব গন্ধেও এঘবে কিছু থাকবে না আব। কিন্তু তখনো তিনি ফিবে আসবেন বলে মনে হয না।'

—'কোথায গেলেন?'

—'একটা বই খুঁজতে। কিন্তু আমি জানি সে বই তাব লাইব্রেবিতে নেই।'

আমি মাথা হেট কবে চুপ কবে বসেছিলাম। প্রায পনেবো বছব পবে সোমেশ্ববেব সঙ্গে আজ দেখা হল—একটি অপবিচিত মহিলাব বাসায। কমলাব নামও আমি কোনোদিন শুনিনি। অথচ তাঁব বাবাব সঙ্গে আমাব মামাব নাকি খাতিব। আমিও এখানে এসেছিলাম আমাব মামাব একটি কার্ড পেযে, এসে শুনলাম, তিনি দিনপাঁচেক এখানেই ছিলেন, কাল সন্ধ্যাব সময অন্য বাসায গেছেন।

সোমেশ্ববেব সঙ্গে কমলাব কী আলোচনা হচ্ছিল তাও আমি জানি না। শেষেব কযেকটা কথা শুনে মনে হল তাবা আমাদেব বই পৃথিবীব বাইবে অন্য কোনো এক জীবনেব সম্বন্ধে কথা বলছিল।

কমলা চলে গেল। চুরুট জ্বালিযে নিযে সোমশ্বেব—'বোসো। আমাকে চিনতে পাবছ?'

—'এক সময মানুষেব খুব আকর্ষণেব জিনিস ছিলে তুমি।'

একটু চুপ কবে থেকে—'আমাকে অনেকেই বলেছে, তুমি হামবুর্গে আছ।'

—'হ্যাঁ, সেখানে অনেকদিন কাটিযেছি। ইদানীং কলোম্বোতে ছিলাম। সমস্ত পৃথিবীটাই ঘুবে বেড়িযেছি। চরুট নাও দিলীপ।'

—'তুমি কমলাব সঙ্গে যখন কথা বলছিলে আমি পাঁচ মিনিট তোমাব দিকেই তাকিযেছিলাম, অবাক হযে ভাবছিলাম কে এই মানুষটা।'

—'সোমেশ্বব গম্ভীবভাবে উঠে দাঁড়াল প্রায ছয হাত লম্বা চেহাবা, শবীবে মাংস খুব কম। চোখ মুখ নাক তীক্ষ্ণ, অথচ কমনীয। সোমেশ্ববেব রূপ তাব হৃদয, মননেব পবিষ্কাব পাতা, তামাশা জমাবাব অদ্ভুত শক্তি আমাদেব—এই পৃথিবীবই ভিতব সে আব-এক পৃথিবীব সৃষ্টি কবে বেখেছিল আমাদেব জন্য এক সময।

সোমেশ্বব উঠে ঘাড় নিচু কবে ঘবেব ভিতব নিস্তব্ধভাবে পাযচাবি কবতে লাগল। শবীবে মাংস আবো ঢেব কমে গেছে, একটা চিনে পাযজামা আব পাঞ্জাবি গাযে। ঘাড়টা ঝুঁকে পড়েছে। আগেকাব সেই দুর্বলতা তামাশাপ্রিযতা মাঝে মাঝে যা স্থূল মর্মান্তিক উচ্ছ্বাসে স্ফীত হযে উঠত, কিছুই নেই এখন আব। একটা নদী যেন অনেকদিন বৌদ্র কোলাহলেব এই পৃথিবীতে কাটিযে তাবপব ধীবে ধীবে আবছাযায শীর্ণ নিস্তব্ধ ও গম্ভীব হযে এসেছে।

—'এ বকম তো তুমি কোনোদিন ছিলে না কোনোদিন। সেধে মানুষেব সঙ্গে আলাপ কবতে। ঘুবে ঘুবে পাযচাবি কবছ কেন সোমেশ্বব? অনেকদিন পবে দেখা। প্রথম থেকে দূবে সবে গেলে।'

—'অনেক্ষণ এক জাযগায বসে থাকতে ভালো লাগে না আমাব।'

—'চলো না একটু বেড়িযে আসি।'

মনে হল বাইবেব আলো কোলাহলেব ভেতব আমাদেব এই পনেবো বছব আগেব পুবনো দিন হযতো জন্মে উঠবে আবাব।'

—'না বেড়াতে যাব না। বোসো তুমি, আমি এইখ নেই একটু পাযচাবি কবছি।'

সন্ধ্যাব সময ড্রযিংরুমে ঘাড় হেট কবে পাযচাবি সোমেশ্ববকে কোনোদিন তা কবতে দেখিনি বটে, কিন্তু অন্ধকাবেব ভিতব তাব দীর্ঘ পাতলা সুন্দব চেহাবা, বিমর্ষ গাম্ভীর্য (হৃদযকে) সোমেশ্ববেব (তখনকাব দিনেব) সমস্ত তামাশা, গল্প ও বৈদগ্ধ্যেব চেযে হৃদযকে যেন আবো (ঢেব) কঠিনভাবে অধিকাব কবে বাখে।

—'আমি এইখানে একটু পাযচাবি কবছি দিলীপ, কোথাও বেড়াতে হবে না আজ আব।'

—'আমাব মনে হয আজকাল তুমি আব বেবোও না?'

—'খুব কম।'

—'অথচ ছিল একদিন যখন তোমাকে কেউ ঘরে খুঁজে পেত না। কতদিন হল এখানে এসেছ?'

—'এই তো দিন দশেক হল।'

—'কলোম্বোতে ছিলে?'

—'অনেক জায়গায়ই ছিলাম। [জার্মানিতে] অনেকদিনই ছিলাম। জার্মান শিখেছি। অনেকগুলো জার্মান বই পড়েছি। [...] একটা একবার চাকরি নিয়েছিলাম, কিন্তু আমি পড়াশোনা নিয়েই থাকি, চাকরি করতে পারি না বেশিদিন।'

—'অনেক বই পড়েছ?'

—'পড়েছি। কিন্তু আরো পড়া উচিত অনেক। অনেক অনেক বই রয়ে গেছে পৃথিবীতে।'

—'তা তো আছে সোমেশ্বর কিন্তু একজন মানুষ কত আর বই পড়তে পারে।'

—'চাইতাম না।' সোমেশ্বর হাঁটতে হাঁটতে থেমে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল, তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'বই বেছে পড়তে হয়। কিন্তু তবুও একটা সমুদ্র। মানুষ কত যে চিন্তা করে গেছে পৃথিবীতে— কত যে চিন্তা করেছে।' সোমেশ্বর আবার পায়চারি করতে আরম্ভ করল।

—'দিনদশেক হল কলকাতায় এসেছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'পনেরো বছর পরে কলকাতা কেমন মনে হচ্ছে?'

—'আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাব।'

—'আবার কোথায়?' ঈষৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—'সিংহলে গিয়েই থাকব ভাবছি।'

—'কেন, সেখানে জলবাতাস খুব ভাল?'

—'তা আমি জানি না, আমি সেখানে খুব একটা নিরালা জায়গায় ছিলাম। এখানকার এত গোলামাল আমার সহ্য হয় না।'

—'এ দেশেও তো অনেক জায়গা আছে যেখানে একটুও গোলমাল নেই। কলকাতার থেকে বেশি মাইল দূরেও যেতে হয় না।'

সোমেশ্বর বাঁধা দিয়ে—'না, তা নেই। শুধু গোলমাল না থাকলেও জায়গা যে নিরালা হয় তা তো নয়। আরো কিছু থাকা চাই।' সোমেশ্বর দেশলাইটা কুড়িয়ে নেবার জন্য সোফার পাশে এসে একটু দাঁড়াল, চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে—'তুমি আজকাল কী করো?'

—'একটা বাস কিনেছি।'

—'চালাও বুঝি? মোটর চালাতে পার?'

—'আমার নিজের তো চালাতে হয় না। একটা শিখ ড্রাইভার রেখেছি।'

—'এই সব করো বুঝি? তা মন্দ নয়। দিন একরকম কেটে যায়। একটা বইয়ের দোকান খুললেও তো পারো।'

—'সময় নেই। কলেজের কাজেই বড় ব্যস্ত।'

—'কলেজে? পড়াও বুঝি? তো ভালো। কিন্তু প্রফেসরদের অপরাধ হচ্ছে এই যে তারা পড়ে না।'

—'কত আর পড়বে। এক-একটা ভূত ঘাড়ে চাপানো বই তো নয়। মানুষের চিন্তা একটা ভূত, ভালোবাসা একটা ভূত, ঈশ্বর সেও তো ভূত সোমেশ্বর।'

সোমেশ্বর অত্যন্ত আহত হয়ে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু ভেবে কথা বললে না, নীরবে চুরুট টেনে যেতে লাগল। কোথার থেকে একটা ইঁদুর এসে কার্পেটের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল, কখন এসেছে, টেরই পাইনি। কিন্তু সোমেশ্বর—'শব্দ পেলে না?'

—'কীসের সোমেশ্বর?'

কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে চুপে চুপে নুয়ে পড়ে কার্পেটের ভিতর ইঁদুরের বাচ্চাটাকে বার করল সোমশ্বর—হাতে তুলে সেটাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ছেড়ে দিল।

—'এই ইঁদুরের শব্দের কথা বলছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী করে টের পেলে? কিন্তু তুলেই-বা ধরতে গেলে কেন?'

—'আমরা পায়ের চাপে মারা যেত যে নইলে।'

—'আমরাও তো কত লোকের পায়ের চাপে মরছি সোমেশ্বর। কার্পেটের ভেতর আটকে গেছিল বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু পা দিয়ে আস্তে বার করে দিলেই পারতে, হাত দিয়ে ধরতে গেলে কেন?'

—'কেন কামড়াবে?'

—'না, তার জন্য নয়,চিনে মাটির ইঁদুর নয় তো সোমেশ্বর তা আমি জানি, প্রাণ রয়েছে। প্রাণ রয়েছে বলেই জঘন্য। পৃথিবী এই যে স্পন্দন চলেছে অবিরাম—সমস্ত জঘন্যতা এই নিয়েই।'

—'আমি ঠিক সে কথা বলছিলাম না সোমেশ্বর।'

—'আমাদের রক্তমাংসের স্পন্দন নিয়ে অনেক নোংরামি, অনেক নিষ্ফলতা দিলীপ' বলতে বলতে অবসন্ন হয়ে পায়চারি থামিয়ে দিল সে, আমার পাশে সোফায় এসে বসল।

সোমেশ্বর—'সাহসিকতা নিয়েই বেঁচে থাকে শুধু, কিংবা যাদের মৃত্যু হয়েছে শরীরের ব্যবহার ভুলে গেছে যারা সব তাদের কাছে আমরা কি নিদারুণভাবে জঘন্য বলো তো দেখি? তারা কি আমাদের বুঝতে পাবে? তাদের সঙ্গে ভালোবাসা হওয়া কি কখনো সম্ভব?'

—'ওসব কি বলো তুমি? তোমার এসব তামাশা। সেই পনেরো বছর আগের তামাশার মতো মোটেই নয় তো। তোমার রগড়—'

—'রগড়' সোমেশ্বর ভ্রূকুটি করে উঠে দাঁড়াল। মনে হল তার মনের ভিতর অসহ্য বিক্ষোভ জন্মেছে। হাতের থেকে চুরুটটা কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। সেটাকে সে তুলতে গেল না। পড়ে যে গেছে কার্পেট যে পুড়ে যাচ্ছে, সে জ্ঞান তার নেই। সমস্ত ছ'হাত লম্বা শরীরটাকে—বিধাতার নিজের হাতে গড়া এই সুন্দর জিনিসটাকে তার, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ব্যথিত করে অন্ধকারের ভিতর কেমন অসুস্থভাবে পায়চারি করতে লাগল সে। অথচ এই মানুষই একসময়ে সমস্তটা দুপুর [...] হয়ে কাটিয়ে দিয়েছে, তাসের মজলিশে সারাদিন আমাদের হাসিয়েছে।

কার্পেটের ওপর জ্বলন্ত চুরুটটাকে জুতো দিয়ে পিষে নিভিয়ে ফেললাম।

—'সোমেশ্বর তুমিতো দাড়িও কামাও না। আজকাল' সোফার এক কিনারে সোমেশ্বরই বোধহয় দু'টো চুরুট রেখে গিয়েছিল। একটা তুলে নিয়ে—'বরং দাড়ি ছাঁটো দেখছি। একি মিশনারির মতো চেহারা হয়েছে তোমার?'

—'দাড়ি পেকে গেছে?' সে আমার কাছে সোফায় এসে বসল আবার।

—'কেমন আশ্চর্যের মতো চেহারা হয়েছে তোমার। যেসব জিনিসের বিসদৃশতা তোমার মতন মারাত্মকভাবে কেউ লক্ষ করতে পারত না,তাদের হাতেই নিজেকে তুমি দিলে ছেড়ে। তামাশার কথা শুনলেও চটে ওঠো আজ। অথচ সবচেয়ে স্বাভাবিক মানুষকেও সবচেয়ে সহজ উপায়ে তার জীবনের এক একটা অসংগতি দেখিয়ে—'

সোমেশ্বর বাঁধা দিয়ে—'আমি জানি সব। চুপ করো। এসব কথা শুনতে আমার একটুও ইচ্ছা করে না। ভালো লাগে না এখন আর সংসারের দশ জনের মানুষের মতো তুমিও একজন। তোমার জীবনে কোনো গভীর দুঃখ বা গভীর উৎসব এসেছে বলে মনে হয় না। কোনোদিন মৃত মানুষকে দেখেছ?' বলে সে চোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু মুহূর্তের ভিতরেই চোখ বুজে ঘাড় হেট করে উঠল।

—'মৃত? তাকে কি করে দেখে?'

—'আমাদের কাছে মৃত, কিন্তু তবুও আমাদের চেয়ে সে কত গভীরভাবে জীবিত তাকে না দেখলে কি আর দেখলে?' ঘাড় হেট করে নীমিলিত চোখে সে বললে।

—'প্রেতাত্মার কথা বলছ সোমশ্বর?'

—'প্রেতাত্মা কেন হবে? আমরা যাকে মরা বলে মনে করি, অথচ বাস্তবিক, আমরাই যার কাছে মৃত, যার শক্তি ও সৌন্দর্য শরীরের সুস্থতা অসুস্থতাকে মাটির মতো মনে করে।'

—'ঈশ্বরের কথা বলছ সোমেশ্বর?'

বিক্ষোভ হয়ে ঘাড় হেট করে বসে রইল।

বললাম—'নারী তাহলে?'

কিন্তু তবুও সে মাথা তুলল না। খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে—'শিল্প, রস, মানুষ, তার জীবন, এসব কিছু নয়। এ সমস্ত অসার। কিন্তু তোমাকে বলে কি লাভ—আরো অনেকদিন—'সোমেশ্বর বিড় বিড় করে তার মনে মনে কি যেন বললে, বুঝতে পারলাম না।

—'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার দিলীপ।'

—'কোথায় যাব?'

—'আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

একটু চুপ থেকে—'আচ্ছা, উঠি। আমরা একটা ক্রিকেটের টিম তৈরি করেছি। বেশ ভালোটিম। শিগগিরই একটা বড় ম্যাচ হবে, সেদিন তোমাকে নিয়ে যাব।'

—'আমি.যেতে পারব না।'

—'সে কি হয়, তোমার মতন এত বড় একজন খেলোযাড় এতদিন পরে কলকাতায় এসেছে—তোমাকে খেলতেই হবে।'

—'তা কিছুতেই হয না। আমি খেলা ছেড়ে দিযেছি।'

—'জীবনের বারোটা বছর সে ক্রিকেটই খেলেছে শুধু, আজও যাব নাম হাজাব হাজার লোকেব মুখে সে কি কখনো খেলা ছাড়তে পারে?'

—'আমি খেলা ছেড়ে দিয়েছি দিলীপ।'

—'কিন্তু খেলা তোমাকে ছাড়েনি। ব্যাট হাতে ধবতে হবে শুধু। চিরদিনই তার করেছ, বাকিটুকু অমানুষিক, ঈশ্বর নিজেই যেন সমাপন করে এসেছেন বারোটা বছর ধবে? আমরা অবাক হযে চেযে দেখেছি শুধু।'

—'আমি খেলব না, খেলা দেখতেও যেতে পারব না।'

খঅনিকক্ষণ চুপ থেকে একটু বিরক্ত হযে —'আমি কোনোদিন কোনো ক্রিকেট প্লেযারের মুখে এরকম কথা শুনিনি, আমার মনে হয়, তুমি কলকাতায না আসলেই পারতে সোমেশ্বব।'

সোমেশ্বর একটু হেসে—'বেশ, আমি কলম্বো ঘুরতে চলে যাব।'

—'সেখানে গিযে খেলবে?'

চোখ বুজে ধীরে ধীবে মাথা নেড়ে সোমেশ্বব—'সেখানে কেউ ক্রিকেট খেলে কি না তাও তো জানি না। কিন্তু কমলা তো এখনো এল না, কী হল তার?'

—'কমলা মেযেটি, এই মেযেটিই-বা কে?'

—'আমার সঙ্গে এর অনেকদিনেব পবিচয।'

—'ক্রিকেট ছেড়ে দিযেছ, বযেছ মেযেদের নিযে। তোমার সম্বন্ধে এসব কথা ভাবতেও আমার দুঃখ হয। বযস তো তোমার মোটে আটত্রিশ। একদিন তো মেযেদেব ত্রিসীমাযও ঘেঁষতে না তুমি'—

—'মেযেদের কথা বলছেন আপনি?' কমলা কখন হেঁটে এসেছে টেব পাইনি। সোফার উপর বসে—'সোমেশ্বরের কাছে মেয়েমানুষ সবই সমান।'

—'কী রকম?'

—'কারু জন্যই এঁব কোনো মমতা নেই।'

—'সোমেশ্বর তাহলে কী ভালোবাসে?'

—'ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।'

—'আমি জিজ্ঞেস করেছি, কোনো উত্তর পাইনি।'

কমলা—'আপনার সে-বই পেলাম না সোমেশ্বরবাবু।'

সোমেশ্বর—'আমি জানি, তোমাব লাইব্রেরিতে সে-বই নেই, কলকাতায়ই আছে কি না সন্দেহ।'

কমলা—'আপনি হয, হযতো মনে কবেছেন দিলীপবাবু, উনি বই ভালোবাসেন। কিন্তু তাও নয। কিন্তু রমেশবাবু কোথায গেলেন?'

—'আমি এখানেই আছি' ঘরেব দূব অন্ধকার কিনাব থেকে একটা শব্দ এল।

কমলা—'এতক্ষণ কবছিলেন কি?'

—'বসে বসে এদের কথাবার্তা শুনছিলাম সব।'

তাকিযে দেখলাম হ্যাট কোট টাই আঁটা বেশ একজন মোটা ভারিক্কি মানুষ মচ মচ কবে হেঁটে এসে কমলার কাছেই একটা সোফায এসে বসল।

আমি—'আর একজন মানুষও এই ঘরে ছিল, টেরও তো পাইনি। আপনি সাংঘাতিক মানুষ তো, আমাদের কথা শুনছিলেন শুধু, কোনো কথা বলবাব দরকাব মনে করেননি?'

—'আমি যে আছি, আপনার সঙ্গেই আছি সে কথা আপনারা স্বীকারই করতে চাইবেন না। মনে হচ্ছিল সাবাটা জীবন আপনারা কথা বলে যেতে পারেন, আমি অন্ধকার কোণে পড়ে থাকতে পারি, তাতে

কারু কিছু এসে যায় না। পুরুষরা এই রকমই, কিন্তু যখন নারী এলেন—' সোমেশ্বর— 'আমার মনে হয় রমেশের তৃতীয় পক্ষ চলছে, এবং তার স্ত্রৈণতারও কোনো সীমা নেই।'

কমলা হেসে উঠল।

রমেশ একটু বিরক্ত হয়ে কিন্তু তবুও ঈষৎ হেসে—'ইস, ক্রিকেট ফিল্ডের ইয়ার যেন!' বলে পকেট থেকে [পাইপ] বের করলেন।

কমলা আমার দিকে তাকিয়ে—'রমেশকে চটাবেন না ওঁর [...] আছে। ডাক্তার ওঁকে অনেক কিছু খেতে নিষেধ করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় উনিও খুব ভালো করে জানেন পুরুদের আড্ডায় ওঁব বেশি খাওয়া উচিত নয়। বাড়বার সম্ভাবনা—'

অবাক হয়ে বললাম—'কেন?'

—'কাবণ শেষ পর্যন্ত পুরুষদের শিঙেই সবচেয়ে বেশি জোর। উনি অতটা সহ্য করতে পারেন না। আমি এতক্ষণ ছিলাম না বলেই উনি অন্ধকার গো ঢাকা দিযে বসেছিলেন। রমেশবাবু, একটু আরাম কবে বসেন। কোনো ভয় নেই আমি আছি। এখন ওঁর পরিচয় দেই আপনাকে' বলে কমলা আমার দিকে তাকিয়ে—'রমেশবাবু বাংলার বাইরে খুব একটা বড় কলেজের প্রিন্সিপাল।'

এতক্ষণ অবাক হযে ভাবছিলাম এই জীবাত্মাটি জুটল কোথায থেকে এখন বুঝতে পারলাম জীবাত্মাই পরমাত্মা। সোমেশ্বরের দিকে একবার তাকালাম। সে অন্ধকারের ভিতব চোখ বুজে কোনো এক অপার্থিব পৃথিবীতে চলে গেছে নিশ্চয।

রমেশ—'আমি একটু পাইপ টানতে চাই, আপনার কোনো আপত্তি নেই তো কমলা?'

—'স্বচ্ছন্দে টানুন রমেশবাবু, আপনাদেরও দরকার হবে নাকি? কিন্তু [ক্রিকেটের] কথা এল কীসে দিলীপবাবু?'

রমেশ—'দিলীপ নাকি একটা 'চমৎকাব ক্রিকেট টিম তৈরি করেছেন।'

কমলা—'তাই নাকি, আমাকে একদিন খেলা দেখাবেন না?'

আমি—'তাহলে বেশ। কিন্তু সোমেশ্ববকে মাঠে নামাতে হবে।'

কমলা—'উনি? উনি তো ক্রিকেট খেলতে জানেন না। কোনোদিন খেলার মাঠে যানওনি। আমাব সঙ্গে ওঁর দশ বছবেরও বেশি পরিচয, একদিন শুধু পাশা খেলেছিলাম—সাবাদিনই খেলেছিলেন, কেউ ওঁকে হারাতে পারল না।' বলতে বলতে কমলা একটু বিহ্বল হযে নিযে চুপ করল। —' সোমেশ্বব' কমলা বললে—'আমাদের জাতেব মানুষ নন। উনি গেল-জন্মেও উঁচুতে ছিলেন আসছে জন্মেও উঁচুতে থাকবেন। এ জন্মে শুধু পৃথিবীতে ঘুর একটু মজা দেখে গেলেন।' বলতে বলতে কমলা হৃদযের কেমন একটা পীড়িত আবেগে আটকে গিযে চুপ করল। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উইকেটকিপার সম্বন্ধে কমলা এই কথা বলে। সোমেশ্বর যে এতদিন কত বড় খেলোযাড় ছিল তাব একটা নামজাদা টিমে একদিন আবলীলায কত সাহেবি টিমকে হাবিযে দিযেছে-কমলা সে-সব কিছুই জানে না। অথচ সোমেশ্বর তার দশ বছবের ঘনিষ্ঠতা। আশ্চর্য হযে মহাপুরুষের দিকে তাকালাম, একটু শীত করছে, তাই গায একটা পাতলা সাদা খদ্দবেব চাদব জড়িযে নিয়েছে সোমেশ্বব। কাঁচা পাকা দাড়ি, অন্ধকাবের ভিতর চোখ বুজে নিস্তব্ধ হযে বসে আছে সোমেশ্বর। সোমেশ্ববের পরিবর্তিত জীবনের একটা গভীর আস্বাদ অনুভব করলাম।

রমেশ পাইপ জ্বালিযে নিযে—'নিন, সোমেশ্বর, আপনি ইঁদুব সম্বন্ধে কী বলছিলেন কিছু বুঝলাম না তো।'

—'তাও শুনেছিলেন সোমেশ্ববাবু?'

—'শুনেছি, সব কথাই শুনেছি।' রমেশ পাইপে এক টান দিযে—'কিন্তু সোমেশ্ববাবুব কোনো কথারই অর্থ আমি বুঝি না।' একটু চুপ থেকে বমেশ—'তারপর কমলা যে বললে আপনি আমাদেব সকলের চেযে উঁচুতে—কোন হিসেবে একথা সে বললে—কেনই-বা এ কথা বললে কমলা?'

সকলেই চুপ কবে রইল।

কমলা—'প্রিন্সিপাল সাহেব আপনি তো প্রশ্ন কবেছেন।'

—'হ্যাঁ, আরো প্রশ্ন আছে আমার। উঁচু জীবন কাকে বলে? মানুষেব জীবন কী নিযে? সোমেশ্বরেব বয়সেই-বা কত?'

—'আটত্রিশ।'

—'আমার বয়স পঞ্চান্ন। সাধু হোক, শয়তানই হোক চল্লিশ বছর পর্যন্ত মানুষ সংগ্রামই করে, তাবপব জীবনের ভিত্তি তৈরি শুরু হয। পঞ্চাশ বছর থেকে ষাট অব্দি জীবনটাকে খানিক আস্বাদ করা

যায়। আর উনি আটত্রিশ বছরেই সব শেষ করে বসে আছেন?' রমেশ পাইপে এক জোর টান দিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে আমাদের সকলের দিকে তাকালেন। দেখলাম কমলার দিকে তাকিয়ে কৌতুক জিজ্ঞাসায় হাসছেন।

কেউ কোনো কথা বললে না।

রমেশ—'মানুষের জীবন কী?'

কমলা—'মানুষের জীবন কী নয় তাই বলুন।'

—'একই কথা, আমি বলব প্রেম নিয়ে জীবন, তুমি বলবে অপ্রেম নিয়ে নয় শ্রদ্ধা বিশ্বাস নিয়ে জীবন, তুমি বলবে অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস নিয়ে নয়। হয়তো এক কথা হল না, হযতো আমার কথাই ন্যায্য হল বেশি।'

রমেশ—'কোথাও কোনো এক কল্যাণময় শক্তি আছেন, আমরা তাকে ঈশ্বর বলি, আমরা পরস্পর ভালোবাসতে চাই, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অলক্ষ শ্রদ্ধা আছে, আমরা সকলেই সৌন্দর্য ভালোবাসি, এই সবেরই চাষ নিয়ে আমাদের জীবন।'

আমি বললাম—'তাহলে মানুষের সঙ্গে একটা শূয়ারের তফাৎ রইল কী প্রিন্সিপাল সাহেব?'

প্রিন্সিপাল বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমি—'সোমেশ্বর এক সময় ভালো ক্রিকেট খেলত। আমার মনে হয়, মাঠে যদি নামে এখনই তাব ইনিংস যে কোনো বাঙালির চেযে ঢের ভালো। সোমেশ্বব যদি এই দিকে থাকত। তাহলে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, জামসাহেবের মতো অনাযাসেই নাম করতে পারত সে। নিন প্রিন্সিপাল সাহেব, আমরা নিজেদের যেই যত বড় মনে করি না কেন আমাদের সমস্ত কাজকর্মের স্মৃতি শিগ্‌গিরই মুছে যাবে, কিন্তু জামসাহেবের গৌরব অনেকদিন টিকে থাকবে।'

—'ক্রিকেট গৌরব।' রমেশ খ্যাক করে একটু হেসে পাইপটা মুখে দিলেন।

কমলা—'ক্রিকেট খেলতেন? কই কোনোদিন শুনিনি তো। আমার মনে হয আপনি শুধু তর্ক করবার জন্যই কথা বলেছেন দিলীপ। না, তিনি কোনোদিনও ক্রিকেট খেলেননি, [...] যাননি। আগা খাঁ বা জামসাহেব হবার মতো কোনো ইচ্ছা কোনোদিনও ছিল না তার। শরীরে কোনোদিনই বেশি মাংস ছিল না সোমেশ্বরের। এখন তো একেবারেই নেই। উনি মননের জীবনই সবচেযে ভালোবাসেন। ওঁর মনে হয় সেই জীবনই সবচেয়ে সত্য।'

রমেশ—'তোমার কী মনে হয কমলা?

কমলা—'এক সময খুব চমৎকার কবিতা লিখতেন।'

আমি—'কে সোমেশ্বর? আমি তো জানি না সোমেশ্বর কবিতা লেখে। কোনোদিনও দেখিনি। কিন্তু আপনি যখন বলছেন'—

কমলা—'আমার কাছে তাঁর সব কবিতাই রযেছে দাদুর পর ওরকম কবিতা কেউ আর লিখতে পারেনি কোনোদিন।'

—'দাদু কি একজন বড় কবি?' অবাক হযে কমলাকে জিজ্ঞেস করলাম।

চমকে উঠে কমলা আমার দিকে তাকাল। অবসন্ন হয়ে 'দাদু বড় কবি নয়?'

দাদুর সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে গিয়েও এ মেয়েটিকে ব্যথা দিয়েছি আমি। আমি বললাম—'এক জীবনে তাহলে সে অনেক জিনিসই করল। সোমেশ্বর তাহলে একজন বড় কবিও।'

রমেশ—'কবিতা? তা অসম্ভব নয়। সোমেশ্বব যে ক্রিকেট খেলতেন, তা দিলীপের ভালোই গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। ওর চেহারার দিকে তাকালেই বুঝতে পাবা যায খেলা তো দূরের কথা, যারা খেলে, দেখতে যায তাদেরও উনি ক্ষমা করেন না। কিন্তু সব [মিস্টিক]-রাই কবিতা লিখে থাকে।'

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উইকেটকিপার সম্বন্ধে এই কথা? আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে রূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলাম—'সোমেশ্বর।'

সে যেমনি নীরব ছিল তেমনি নিস্তব্ধ হয়েই রইল, তার শরীরের ভিতর কোথাও সে কোনো স্পন্দন আছে তাও মনে হল না। ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম—'সোমেশ্বর, তুমি কি মিস্টিক?' কিন্তু সোমেশ্বরের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, যেমনি চোখ বুজে বসেছিল, তেমনি বসে রইল।

রমেশ আমার দিকে—'এরপর আপনি প্রমাণ চান?'

—'সোমেশ্বর হয়তো ঘুমুচ্ছে।'

—'না, উনি ঘুমোননি।'

আমি আর কোনো কথা বলতে গেলাম না, প্রিন্সিপাল সাহেব নীরবে পাইপ টেনে যেতে লাগলেন,

কমলা ঘাড় হেট কবে একটা বই নিযে নাড়াচাড়া কবতে লাগল, বইটা বাংলাও নয, উপন্যাসও নয়।

—'মিস্টিক কাকে বলে?' প্রিন্সিপাল আমাকে জিজ্ঞেস কবলেন।

—'জানি না।'

বমেশ—'এই পৃথিবীবই ভিতবেই যাবা অন্য পৃথিবীব খোঁজ পায? কিন্তু তা দিযে হবে কি কমলা? যতদিন বেঁচে আছি এই সংসাবই আমাদেব পক্ষে যথেষ্ট হওযা উচিত, নইলে জীবন ব্যর্থ হযে যায।'

কমলা—'এঁকে মোটা দেখলেও হয কি, ইনি বাঁ হাত দিযে লিখতে পাবেন।'

—'বটে।' অবাক হযে বমেশেব দিকে তাকালাম।

—'সোমেশ্ববেব ডান হাত আমাদেব বাঁ হাতেব মতো?'

—'না, তা নয। দু'হাত দিযে সমান সহজে লিখে যেতে পাবেন।'

আমি—'একি কবে হল কমলা, জন্মেব থেকেই এই আশ্চর্য যুক্তি এব?'

বমেশ মাথা নেড়ে হেসে—'না, তা নয, একবাব ডান হাতে খুব চোট পেযেছিলাম, হাত নাড়তে পাবতাম না, ডাক্তাব বললে হাত ভেঙে চাব পাঁচ মাস অন্তত এ হাত দিযে কিছুই কবা যাবে না।'

বমেশ কমলাব দিকে তাকিযে—'এদিকে কলেজেব এগজামিন এসে গেছে, আমি বাঁ হাত দিযে লিখতে শুরু কবলাম, সেই থেকেই অভ্যাসটা বযে গেছে।'

—'আমাব মনে হয কোনো কাবণে এঁব দু'হাত অচল হযে গেলেও ইনি পা দিযে লিখতে পাববেন। এঁব প্রতি আমাব শ্রদ্ধা খুব গভীব হযে উঠছে। ইনি সামান্য মানুষ নন।'

বমেশ বাঁধা দিযে হেসে—'কমলা তবুও বলবে না আমি অসামন্য।'

—'সামান্য মানুষ নন, মৃত্যুব আগে ইনি একটা কিছু কবে যাবেন।' আমাব দিকে তাকিযে কমলা—'এঁব হাতেব যে শুধু কালিব আঁচড় মাত্র তা মোটেই নয। প্রত্যেকেটি অক্ষব সূক্ষ্ম এবং সুন্দব, মেয়েদেব সূচিশিল্পেব মতো। ইনি ছবিও আঁকতে পাবেন।'

—'কী বকম?'

—'তাহলে এঁব এই সব শক্ত গভীব মর্যাদা পেত। একটু চুপ থেকে বমেশেব মুখেব দিকে তাকিযে—'নিজেব চেষ্টায ইনি যে মানুষ হযেছেন তা বুঝতে আমাব একটুও বাকি নেই। কিন্তু আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, ইনি অন্ধ বা বোবা হলেও ইউনিভার্সিটিব সবচেযে বড় ডিগ্রি পেতে পাবতেন, দু-হাত দিযে লিখতে পাবতেন—হযতো হাত কলম কামড়ে ধবে নিখুঁত ছবিব মতো লিখে যেতে পাবতেন। এই আশ্চর্য শক্তি ও পুরুষকাবেব কথা দেশেব কাছে একটা আলাদা স্তম্ভেব মতো দাঁড়িযে থাকত, এঁব অটোগ্রাফে মেযেদেব খাতা বোঝাই হযে যেত।'

কমলা আমাকে হেসে উড়িযে দিযে—'আপনাব সব তাতেই তামাশা, [অটোগ্রাফেব] কথা বলছেন, আমিও নাবী, আমাব একটা অ্যালবামও আছে, কিন্তু দু-একটা মেযেবন্ধু ছাড়া আব কারু স্বাক্ষব নেই তাতে?'

—'কেন? বড় বড় মানুষবা সেঁধে আপনাব খাতায স্বাক্ষব লিখে যাবে। তাদেব কাছে যেতেও হবে না। সব সংগ্রামেই তো বিধাতা আপনাকে সাজিযে বেখেছেন।'

বমেশ—'কমলা চিঠি লেখে না, কাউকে অটোগ্রাফও কবে না, সমিতি সঙ্গতেও যায না।'

—'আমাব ইচ্ছা সোম্বেবেব একটা স্বাক্ষব সবচেযে আগে জোগাড় কবি।'

—'এখনো জোগাড় কবে উঠতে পাবেননি?'

—'না। যা বলছিলাম, বমেশেব হাতেব লেখা যে সূচি শিল্পেব মতো সুন্দব তাই শুধু নয, উনি খুব ভালো বাংলা লিখতে পাবেন।'

—'আজকাল যাবা ভালো বাংলা লিখতে পাবে তাদেব বযস ষোলোব থেকে আবম্ভ কবে বড় জোব ত্রিশ অব্দি। ওঁব বসয তো পঞ্চাশেব কম নয।'

—'না। কিন্তু ওঁব প্রবন্ধ আপনি পড়েছেন?'

—'বাংলা আমি খুব কম পড়ি। উনি প্রবন্ধই শুধু লেখেন?'

—'মাঝে মাঝে লেখেন হযতো। কিন্তু ওঁব প্রবন্ধ পড়বাব সুযোগ হযেছে। বঙ্কিমবাবুব কযেকটি স্ত্রী চবিত্র সম্বন্ধে উনি যা লিখেছেন পড়ে দেখবেন, এমন জিনিস আমি অনেকদিন দেখিনি। ওঁব হাতে আঁকা কযেকখানা ছবি আমাব দেওযালে টাঙানো আছে। অ্যালবামেব ভিতবেও আছে কযেকখানা। কিন্তু ওঁব প্রবন্ধ নিযে আমি যে কী কবব বুঝে উঠতে পাবি না। কোনো মাসিক পত্রিকাযই ছাপাল না।'

—'কেন?'

—'ইনি লিখেছেন বঙ্কিমবাবু যতক্ষণ হৃদয় দিয়ে লেখেন হয একবকম কিন্তু যখনই চিন্তা কবতে

যান তিনি ছেলেমানুষ হয়ে পড়েন।'

—'বঙ্কিকবাবুর বড় বড় স্ত্রী- চরিত্রের যা পরিণতি তাতে এত ছেলেমানুষি' রমেশ বললেন—'যে বাংলাদেশ আরো যদি কিছুদিন এঁদের সমর্থন করে তাহলে বুঝব মহাপুরুষ আর বড় নভেলিস্টের ভিতর কোনো পার্থক্য এদেশ এখনো খুঁজে পায়নি।'

—'বঙ্কিমবাবু একটা সুন্দর নক্ষত্রের আবহাওয়ায় জন্মেছিলেন' কমলা বললে।

রমেশ—'সব মহাপুরুষই ওই রকম জন্মায় কমলা, সাধারণ একজন মানুষ এবং একটি মহাপুরুষের ভিতর অনেক সময়ই প্রভেদ এক সূক্ষ্ম ও সামান্য যে মহাপুরুষেরা যে খ্যাতি পায় সেটা তাদের সৌভাগ্য বলে ধরে দিতে হবে।'

—'সুন্দর নক্ষত্রের নীচে নয়, পরিপুষ্ট নক্ষত্রের নীচে সমস্ত মহাপুরুষই সেইরকম জন্মায়।' কমলার দিকে তাকিয়ে রমেশ—'আর সুন্দর নক্ষত্রের হাওয়ায় জন্মায় শিল্পী আর তোমার মতো নারী।'

—'বঙ্কিমবাবু তাহলে শিল্পী ছিলেন না?'

—'আমার মনে হয় নভেলিস্টের চেয়ে মহাপুরুষই বরং তিনি ছিলেন যেন।'

কমলা—'মহাপুরুষ কাকেই-বা বলে?'

রমেশ—'সাধারণ একজন মানুষ ধরে নিতে হবে। আমি চাকরির থেকে রিটায়ার করে একটা মাসিক পত্রিকা ছাপব ভাবছি।'

—'বাংলায়?'

—'হ্যাঁ, তাতে এই প্রবন্ধগুলো ছাপাব। আমাদের সাহিত্য ও দেশের স্তম্ভগুলো সম্বন্ধে মানুষকে একটু সচেতন ও প্রেক্ষণশীল করবার ইচ্ছা আছে আমার। স্তম্ভগুলো আমি ভাঙব না, ভাঙতে পারা যায় না, মহাপুরুষ যারা তারা তাই হয়তো—কিন্তু শিল্পীদের আসন নড়েচড়ে—'

—'স্তম্ভগুলো ভাঙবেন আপনি?'

—'যা ভাঙবার কালে হয়তো ভেঙে যাবে, কিংবা ভাঙবে না। ভাঙা উচিত কিন্তু ভাঙবে না। নক্ষত্রেরা অনেক রকম তামাশা জানে। শিল্পী না হই, মহাপুরুষ হতে চেষ্টা করব আমিও।'

—'কী করে?'

—'প্রথমত আমার [...] টাকা আছে আমার সেটা বেশ বড় দরের মাসিক হবে। আমার কবিতা ও উপন্যাস ছাপিয়ে তারপর বই বার করে। শিল্পী হওয়া শক্ত, কিন্তু শিল্পের অনুসরণ করে মহাপুরুষ হওয়া সহজ। যদি নক্ষত্রেরা সাহায্য করে।' বলে প্রিন্সিপাল তাঁর সমস্ত শরীরটা সোফার উপর ঢেলে দিয়ে অলস আতুরভাবে হাই তুলতে লাগলেন। তাকিয়ে দেখলাম সোমেশ্বর উঠে দাঁড়িয়েছে। ঘরের ভেতর কয়েকবার পায়চারি করল সে। তারপর আমাদের সোফাগুলোর কাছে এসে থেকে ভ্রূকুটি করে রমেশের দিকে তাকিয়ে—'ভুল রমেশ, আপনি বুঝতে পারলেন না, তার প্রধান বাঁধা হচ্ছে আপনার শরীর। শরীরকে কুমড়োর মতো বানিয়ে কী লাভ? আমাদের তো কেউ খাবে না। আমাদের শরীরই আমাদের মেরে ফেলে পৃথিবীতে দু'টো দিনও শান্তিতে থাকতে দেয় না আমাদের। ইন্দিরা! ইন্দিবা! তুমি কোথায় আছ? তুমি কি জান না আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। একদিন আমর এ শরীর থাকবে না আর। আজই তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, এই স্থূল বাধ্য একটা জন্তুর মতো কষ্ট দিচ্ছে আমকে, ইন্দিরা' সোমেশ্বর অবসন্ন হয়ে একটা সোফার উপর বসে পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম তার সমস্ত মাথা দাড়ি বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। খানিকটা সময় নিস্তব্ধতায় কাটিয়ে গেল আমাদের সকলের।

—'সোমেশ্বর, কি হল? ইন্দিরাই-বা কে?' কমলাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলুম।

—'একটি নারী।' কমলা আর দ্বিতীয় কোনো কথা বললে না।

সোমেশ্বরের সমস্ত শরীর ছোটছেলের হাতে আটকা একটা প্রজাপতির ডানার মতো ছটফট করছিল। কমলাকে দেখলাম ধীরে ধীরে সোমেশ্বরের মাথার চুলে ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আস্তে আস্তে বলছে—'এই যে আমি —ইন্দিরা—দেখ তাকিয়ে।'

রমেশবাবু কেমন ঈর্ষাতুর হয়ে কমলার দিকে তাকিয়েছিল। বোঝা গেল তাঁর শরীরের রক্তমাংস তাঁকে বড্ড পীড়া দিচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলাম।

কমলা যে বইখানা নিয়ে নাড়াচড়া করছিল, সোফার থেকে চুপে চুপে সেখানা তুলে নিয়ে আমি বের হয়ে গেলাম। এই বইখানা ফেরত দেবার জন্যও অন্তত আর-একবার এদের সকলের মধ্যে ফিরে আসতে পারব।

১৯৩৬

নাইট।

—'ওগো মা-মরা ছেলেটাকে কী রকম মারছে শুনছে?'

—'হুঁ, রোজই তো শুনি।' লণ্ঠনের আলোটা উশকে বইয়ের পাতার দিকে চোখ ফেরালাম আবার।'

—'কিন্তু এর কোনো ব্যবস্থা নেই?'

—'কি আর ব্যবস্থা থাকবে সুকৃতি—নিজের ছেলেকেই মারছে, অন্য কাউকে ঠ্যাঙাচ্ছে না তো।'

—'কেন মারে, বলো তো দেখি।'

চুপ করেছিলাম।

—'কেন মারে, আ হা হা—ঠেঙিয়ে একেবারে খুন করে ফেলল বে—একি কুকুর বেড়ালের বাচ্চা।' সুকৃতি খানিকক্ষণ নীরব থেকে-'বছর দুই হল ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছে, বয়সও তো এমন কিছু বেশি নয় ওঁর, তিরিশ মাত্র, শুনেছি আর বিয়ে করবে না—বেশ ভালো কথা। ভেবেছিলাম হৃদযে জিনিস আছে, কিন্তু ছি ছি ছি একি—তুমি কী করছ?'

—'পড়ছি।'

—'কী বই?'

—'একখানা ইংরেজি বই।'

—'না নেই?'

—'তা আছে বইকী।'

—'আমিও ইংরেজি জানি, একটু-আধটু।'

—'এ বইখানা [...]'

—'[...] বইখানা কি? নভেল? [...] তিনি রুশিয়ার লোকই হবেন, কেমন, ঠিক বলিনি?'

মনে মনে একটু হেসে—'তুমি কলকাতা ইউনভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট কি করে ভুল হবে তোমার সুকৃতি।' আর বেশি ভাঙাতে গেলাম না আমি। বইয়ের পাতায় মন দিলাম আবার। কথা বলতে গেলে কথা বেড়ে যাবে। বইখানা খুব বড়, এর সিকির সিকি পড়ব না আমি, মাঝে মাঝে দু-এক পাতা উলটেপালটে বন্ধ করে রাখব। আটত্রিশ বছর বয়সে এই বই কে আর পড়তে যায়। আমার চোখও ঢের খারাপ হয়ে গেছে, চশমা নেয়া দরকার, কিন্তু মফস্বলের ডাক্তারকে চোখ দেখাব না ঠিক করেছি, কলকাতায় গিয়ে একজন ভালো ডাক্তার দেখাব, অনেকদিন থেকেই ভেবে আসছি। কিন্তু পযসার অভাব, সময়ের অভাব, আমার হৃদয়ের ভিতর আরো অনেক কি যেন অভাব আছে। চুপচাপ বসে বই পড়তেই ভালো লাগে কিন্তু দিনের আলো বা লণ্ঠনের আলোই যে আমাকে আলো দিচ্ছে না, আলোর জন্য আরো যে এক নিস্তব্ধ স্থূলতার ওপরেই আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে, সে যে ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে সে কথা আমি বুঝেও বুঝতে চাই না। স্থূল জিনিসের এত শক্তি থাকবে কেন? কেন সবই আত্মিক হয়ে উঠতে পারে না? আমাদের হৃদয় মাংসের ওপর এত নির্ভর করে কেন? আমাদের ভিতরে যে দীপ্তি আছে সমস্ত ব্যবহারের ভিতর তা কি—

—'বিমান বাবু তার ছেলেকে এরকম ঠ্যাঙায় কেন রোজ?'

—'হযতো মিথ্যে কথা বলে, হয়তো পড়তে চায না, হয়তো অঙ্ক ভালো করে না। ছোট ছেলেমেয়েদের আরো কত অপরাধ রয়েছে।'

সুকৃতি খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'ভগবানকে ধন্যবাদ দেই যে আমাদের কোনো সন্তান নেই।'

—'হ্যাঁ, ধন্যবাদ দিতে হয় বইকী।'

—'আলোটা অত চড়িয়ে দিও না, আমার চোখে লাগে।'

—'তুমি তো পাশের ঘরে রয়েছ সুকৃতি, দেয়াল ফুঁড়েও সেখানে আলো যায়?'

—'দেযাল নয মশাই, কঞ্জিব বেড়া—ঘবেব ভিতব দপ দপ কৃবে আলো জ্বললে আমি ঘুমোতে পাবি না।'

—'ও, তুমি বিছানায শুযে পড়েছ বুঝি?'

—'শুযে পড়েছি বইকী, ঘুমোতে হবে। এ ছাড়া কি আব কবব। মানুষকে আমোদ দিযে জাগিযে বাখবাব শক্তি তোমাব তো নেই। সে বকম পুরুষমানুষ তুমি নও, অনেক আশা কবেই বিযে কবেছিলাম। কিন্তু এক-একটি মেযেমানুষেব জীবনে ছাই ছাড়া কিছুতেই কিছু জোটে না আব।'

—'তা ঠিক, মাথা গুঁজে শুযো।'

—'আমি তা পাবব না, গবমে হাঁইফাঁই কবছে শবীব, একটু যে বাতাস দিযে যাবে, তা নয।' বলতে বলতে সে তন্দ্রাব ভিতব চলে গেল।

আমি এ পাশেব কোঠায একা শুই, সুকৃতি ও পাশেব কোঠায একা শোয। এ ব্যবস্থা সে নিজেই কবেছে। তাব মনেব এই পবিচ্ছন্নতাব জন্য তাব কাছে আমি ঋণী। অন্ধকাব বাতে নিজেব বিছানায শুযে নিজেকে একাকী পুরুষমানুষ বলে মনে কবে নিতে পাবা যায—বিযেব পব এই জিনিসটাব খুব দাম। সমস্ত অন্ধকাব বাতটা তোমাব নিজেব জিনিস, জানালা খুলে বাখো, আকাশেব তাবাব দিকে তাকিযে থাকো। বাতেব বাতাস আস্বাদ কবো, স্বপ্ন দেখো, কেউ তোমাকে বাঁধা দেবে না

বিযেব পব কযেকটা বছব এই বকমই কেটে গিযেছিল, কিন্তু ইদানীং সুকৃতিব মনে কেমন একটা ভয জন্মে গেছে। মফস্বলেব শহবেব এক কিনাবে গ্রামেব বাস্তায আমাদেব খড়েব ঘব সুকৃতি একদিন শীতেব অনেক বাতে হঠাৎ জানালায একজন মানুষেব মুখ দেখে ফেলেছিল। সাহস আছে তাব, নিজেব বিছানাটা এখনো সে ছাড়েনি, কিন্তু বাতেব প্রথম ঘুমটা কেটে গেলে মাঝবাতে বোজই সে একবাব জেগে ওঠে মাঝবাতে এবং আমাকে সাবাবাত অন্যায্যভাবে কষ্ট দেয। এই কষ্টেব সঙ্গে প্রেম বা আকাঙ্ক্ষাব (প্রাযই) কোনো সম্পর্ক আমি খুঁজে পাই না। তাব হৃদযেও তা নেই, আমাব হৃদযেও কোনোদিন লাল নীল কমলা বঙেব আকাঙ্ক্ষাব জন্ম সে দেযনি।

আমাব মনে হয সে এক দুবন্ত ও কঠিন শিশু ছিল একসময, আজও কঠিন ও দুবন্ত এক নাবীসন্তান সে—তাব পিতা মবে গেছে। সেই জাযগায আমি এসেছি। কিন্তু পিতাব মতো তাকে শাসন কবাবাব শক্তি বা ইচ্ছা আমাব নেই। মাঝে মাঝে তাব ব্যবহাব বিক্ষুব্ধ হই আমি, হৃদযেব ভিতব কেমন একটা রূঢ়তা বোধ কবি। কিন্তু সে যখন চুপ কবে বসে থাকে বা ঘুমিযে পড়ে, তাব চেহাবাব বেখা-উপবে যাব দিকে তাকিযে কোনো এক অভিজ্ঞ মমতাময জননীব মতো মনে হয নিজেকে।

আমাব বিবাহিত জীবনে আস্বাদ এই বকম। বিযে না কবলে শান্তিতে থাকতে পাবতাম হযতো, কিন্তু বিযে কবে জীবনেব প্রসাব বেড়ে গেছে।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেল সুকৃতিব। চেঁচিযে উঠল—'কে? কে? উঃ।'

—'কী হযেছে?'

—'শিগগিব এদিকে এসো, ওগো শিগগিব'—

তাব খাটেব পাশে গিযে দাঁড়াতেই সে আমাকে হাত ধবে টেনে বিছানাব উপব বসিযে দিযে—'ঘুমিযেছিলাম, কিন্তু কি দারুণ স্বপ্ন দেখলাম।'

—'কী দেখলে?'

—'স্বপ্ন না হযে এ যদি সত্য হতো'—উঠে বসে আঁচল দিযে কপালেব ঘাম মুছে নিযে সুকৃতি—'দেখলাম কস্তা লাল পেড়ে শাড়ি পবা এক বউ—কি বিচ্ছিবি দেখতে, আমাব বিছানাব উপব হাঁটু গেড়ে বসে—আমাকে দেখছে। ও বাবা বে'—ববে কেমন একটা ভযাবহ ভীষণতাব আবেগে হো হো কবে হেসে উঠল সুকৃতি।

খুব শান্ত স্ববে—'দেখলে একজন বউ, এতে আব কী হযেছে, এ তো কিছু নয।'

—'কিন্তু দেখলাম ঘাড় হেট কবে কাঁদছে সে।'

—'তুমি শোও।'

—'আমি শোব না, তুমি আমাব কাছে বসে থাক।'

—'চলো না আমাব বিছানায।'

—'তুমি আমাব কাছে বসে থাক, এইখানে।'

—'এই জানালাটা বন্ধ করে দেব?'

—'দাও, বড্ড গরম, কিন্তু তবুও হাওয়া চাই না আমি, জানালাটা তুমি বন্ধ করে দাও।' নিজেই সে পাখা তুলে নিয়ে বাতাস খেতে খেতে—'এ স্বপ্নের মানে কি আমাকে বলতে হবে।'

—'থাক, স্বপ্নের কথা সুকৃতি, এসো আমরা অন্য কথা বলি।'

আমার এ উত্তরে তার ভয় আরো বেড়ে গেল বলে মনে হল। স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে—'জিনিসটা তুমি চাপা দিতে চাও। নিশ্চয়ই এর ভিতর ভয়ংকর কিছু আছে। তুমি জান সব, আমাকে বলতে চাও না।'

সুকৃতির হাত থেকে পাখাটা নিয়ে তাকে বাতাস করতে করতে হেসে—'তুমিও যেমন ছেলেমানুষ।'

—'ওসব কথা আমাকে মোটেই বলবে না—তুমি আমাকে চেন না,—তুমি'—

—'স্বপ্নকে আমি স্বপ্ন বলেই মনে করি সুকৃতি।'

—'তার মানে?'

ভ্রূকুটি করে—'মানে একটা নিদারুণ মিথ্যা জিনিস।'

—'মিথ্যে জিনিস?'

—'আমাদের দিনকার যা কিছু অস্বাভাবিক হয় সে-সবের চেয়ে ঢের বেশি স্বাভাবিক। স্বপ্নের চেয়ে মিথ্যে আর কিছু নেই সুকৃতি।' বুঝরাম সে সান্ত্বনা পায়নি।

বললে—'লাল পেড়ে শাড়ি পরা এই যে বউ—' চমকে উঠে—'এ যে বিচ্ছিরি অদ্ভুত মুখ ওটা মোটেই মিথ্যা নয়, এ বউকে আগেও আমি দেখেছি।'

—'কোথায় দেখলে?'

—'কি যেন কোথায় দেখেছি—কিন্তু নিশ্চয় দেখেছি।'

—'আজকে স্বপ্নের ভিতরেই দেখলে, আর কোথাও দেখনি?'

—'না, না, আমি তাকে অনেকবার দেখেছি।'

আমরা দু'জনেই চুপ করেছিলাম।

আমি বললাম—'অনেক সময় স্বপ্ন খুব পরিষ্কার হয়। তখন যেসব কথা শুনি, বা মুখ দেখি জেগে উঠেও মনে হয় সে যেসব কথা বা মুখ যেন অনকদিনের পরিচিত জিনিস।' আমার মনে হয় আমাদের জীবনের এ-একটা তামাশা। বলতে গেলাম না 'ধূসর রহস্য'। বললাম—' আমাদের জীবনের এ-একটা তামাশা। কারু কারু কাছে এ-একটা উপদ্রবের মতো মনে হয়। কিন্তু যাই হোক, এসব মিথ্যা জিনিস, কুয়াশার মতো অসার, সে বউকে কোথাও কোনোদিন দেখোনি তুমি, স্বপ্নেই শুধু, আমার মনে হয় এরই স্বপ্ন বার বার দেখছ।'

সুকৃতি আমার হাতের থেকে পাখাটা নিয়ে মাজা টান করে বসল, তারপর বাতাস খেতে খেতে —'তুমি একটা কাজ করো, দেখো তো, এই ঘরের ভেতর কোথাও সে লুকিয়ে আছে কিনা?'

—'কে?'

—'ওই বিচ্ছিরি মুখের বউটা।'

—'ওই বিচ্ছিরি মুখের বউটা? আচ্ছা, দেখছি আমি। কিন্তু তোমাকে আমি তোমার মামার কাছে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব।'

—'বাবা গো। কে কি ভীষণ লাল পাড়—আর মুখ যেন চিতের থেকে উঠে বসেছে বাবা।'

একটা টর্চ নিয়ে সমস্ত ঘরটা ভালো করে ঘুরে দেখে এসে—'না, একটা বেড়াল ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না।'

—'বেড়াল? ওটাকে তাড়িয়ে দাও।'

—'বেচারা ঘুমুচ্ছে।'

—'আমি বলছি তুমি ওটাকে তাড়িয়ে দাও।'

বেড়ালকে তাড়িয়ে দিলে সে যে বেড়ার ফাঁক দিয়ে, জানালার ভিতর দিয়ে, চৌকাঠের নীচ দিয়ে আসতে পারে আবার, সে কথা সুকৃতিকে বলতে গেলাম না আর। ঘুমুচ্ছিল, সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এসে—'বউটউ কেউ নেই বাপু, এখন তুমি ঘুমোতে'—

—'ঘুমোতে আমার ঢের দেরি আছে। কিন্তু এ মুখ কোথায় দেখলাম আমি?' গালে হাত দিয়ে

সুকৃতি ভাবছিল।

একটু তামাশা করে—'দেখেছ তোমার বাপের বাড়িতে, তাছাড়া আর কোথায় দেখবে? তোমাকে খুব ভালোবাসত। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি কিনা, তাই তোমাকে একটু আদর করতে এসেছিল। নইলে বিছানার উপর হাঁটু গেড়ে'—তাকিয়ে দেখলাম সুকৃতি আবার ভয় পাচ্ছে। থেমে গেলাম। একটু চুপ থেকে—'আজ কি খেয়েছিলে বলো তো?'

—'কেন?'

—'খুব পেট ঠেসে খেয়েছিলে হয়তো?'

—'তাছাড়া আর কি, আমার মামার বাড়ি কিনা পোলাও কালিয়া, পঞ্চাশ রকম ব্যঞ্জন ছাড়া এখানে রান্না নামেনি তো একদিনও।'

—'কিংবা উপোস দিয়েছিলে হয়তো আজ।'

—'কোন দুঃখে?'

—'স্বপ্ন জিনিসটা অনেক সময় আমাদের খাদ্যের ওপর নির্ভর করে সুকৃতি, আমরা অনেক সময় দু-একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস খেয়ে ফেলি। পেট তা পাকও করতে চায়ও না পারেও না। কেমন একটা আসন্ন মেঘের জন্ম হয় যেন আমাদের মাথার ভিতর। অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি।'

—'জানালাটা খুলে দাও।'

—'খুলব আবার?'

—'হাওয়া আসুক।'

—'আমিও তাই ভাবছিলাম, রাতটা বড় গুমোট আজ কিন্তু'—

—'এবার যদি আসে তাহলে মুখ ছেচে দেব হতভাগীর।'

—'সেই ভালো।' জানালাটা খুলে ফেললাম। এক ঝলক বাতাস এল। আমরা উশকোখুশকো চুল বাতাসের ভিতর উড়ছিল, তার মুখেচোখে অনেকটা স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে।

—'চলো আমার বিছানায়।'

—'না।'

—'এখানেই শোবে?'

—'হ্যাঁ। একটা হতচ্ছাড়া বউকে দেখে পালাব সে জাতের মেয়ে আমি নই। '

—'এবং সে বউটি যখন মোটেই বউ নয়, কিছুই নয়। বলো স্বপ্নাচ্ছন্ন সুকৃতি?'

—'না, সে কথা আমি বলব না। সে খুবই সত্য। কিন্তু আছে, আছেই সে।' বলে সুকৃতি জানালার দিকে তাকিয়ে পাখাটা আবার তার হাতের ভিতর ঘোরাতে লাগল।

একটু হেসে—'কই, আমি তো এ ঘরের সব জায়গায়ই দেখলাম, কোথাও তাকে পেলাম না।'

—'মানুষের নিরাশ্রয় ঘুমের ভিতর এসে তার সব চেতনা নিয়ে সে অত দৌরাত্ম্য করতে পারে, তাকে খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়।'

—'কারণ সে মোটেই নেই, সেইজন্য।'

—'তুমি জান না কিছু। আমার জন্য তার একটা দস্তুর মতো প্রলোভন রয়ে গেছে।' সুকৃতির গলার স্বরে কেমন একটা অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতা।

স্বপ্নটা স্বপ্নের মতনই মিথ্যা নিশ্চয়, কিন্তু এই স্বপ্নের প্রক্রিয়া তার চিত্তকে আঘাত করেছে রৌদ্র কোলাহলের সংসারের কোনো একটা কঠিন ধাতব সত্যের মতো। ভেবেছিলাম উঠে আমার বিছানায় গিয়ে শোবে। কিন্তু গেলাম না। মনোযোগ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার জন্য প্রলোভন রয়েছে মনে হয়।'

—'হ্যাঁ দস্তুর মতো রয়েছে।

—'তোমার মা-র মুখ মনে পড়ে?'

—'না। এ বউটি আমার মা নন।'

—'তোমার বাপের বাড়ির কেউ?'

—'একে একে সব মুখই তো ভেবেছিলাম এর মতো তো কেউ নয়।'

—'কিছুক্ষণ আগেই তো স্বপ্ন দেখলে, আমার মনে হয় মুখখানা এখনো পরিষ্কার মনে আছে

তোমার?'

পাখার বাঁট দিয়ে একটা ছারপোকা মেরে নিয়ে সুকৃতি—'সে কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না। আমার দুরন্ত সাহস বলে এখনো চুপ করে বসে আছি। আর কেউ হলে পাগল হয়ে যেত।

একটু চুপ থেকে—'বউটির বয়স কত বলে মনে হয়?'

—'বেশ বয়স্কা।'

—'পঞ্চান্ন ছাপান্ন?'

—'হ্যাঁ তা হবে বইকী। কিন্তু তার কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। কাল সকালে একবার জেগে উঠে আমার ভেবে দেখতে হবে, ও কে হতে পারে। দত্তবাড়ির বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে পাড়ায় একবার ঘুরে আসব আমি।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সংকল্পে ও দৃঢ়তার অন্ধকারের দিকে একবার তাকাল সে।

—'রাত কতটা হয়েছে?'

—'বারোটা হয়তো।'

—'পড়ছিলে?'

—'পড়ছিলাম।'

—'এখনো পড়বে নাকি আবার?'

—'তা পড়েতে পারি।'

—'যাও পড়ো গিয়ে, কিংবা শুয়ে পড় গে, রাতও তো কম হয়নি।'

—'তুমি একা বিছানায় থাকতে পারবে?'

—'খুব।'

—'কিন্তু বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে পাড়ায় গিয়ে কি করবে শুনি?'

—'সব কথা শুনে তুমি কি করবে।' একটু চুপ থেকে—'যদি কোনো শয়তানীকে দেখি এই বউটার সঙ্গে মুখ মিলে গেছে তখন কি করে না করি তখন টের পাবে।'

এইসব তার সান্ত্বনা।

আমি ফিরে এলাম। টেবিলের পাশে আলো নিয়ে বসলাম আবার। কোথাও কেউ নেই। কেউই নেই। কোনোদিনই কোথাও কেউ ছিল না যেন। মফস্বল শহরটার ঘেঁষে গ্রামের রাস্তার ওপরে একটা খড়ের ঘর, যেখানে সুকৃতি আর আমি। বয়স আটতিরিশ বছর। অথচ জীবনের ত্রিশটা বছর মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে কলকাতায় কোলাহলের ভিতর কাটিয়ে দিয়েছি। কোথায় তারা গেল আজ সব? কিন্তু তারা কি কেউ ছিল কোনোদিন? এক-একটা কলরব মনে হয় যেন এই সেদিন মাত্র থেমে গেছে। কিন্তু তবুও তা অন্য জন্মের কোলাহলও তো হতে পারে। আকাশের নির্জন ধূসর মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে হয় কোনো জন্মে যেন পাখি ছিলাম আমি—কোনো এক ধানসিঁড়ি নদীর পাশে ছিপছিপে খড়ের ভিতর বাসা বেধেছিলাম আমি ছিলাম আর ছিল সুকৃতি হয়তো কিংবা সুকৃতি নয়, অন্য কেউ। অন্য অনেক পাখি ছিল সেখানে, ছিল অনেক গাঢ় দম্পতি, অজস্র পাখির গহনতা অন্ধকারের স্বপ্নাতুর সাদা মেঘের মতো সেই শহরের জঙ্গলকে কুয়াশার মিষ্টি চাদর দিয়ে ঢেকে দিল যেন। সমস্ত জ্যোৎস্নার রাতভরে তাদের কোলাহল শোনা যেত, সমস্ত অন্ধকার রাত ভরে। এখনো এক-এক সময় চমকে উঠে অন্ধকারকে একটা পাখির সুডৌল কোমল বুকের মতো মনে হয়, কামনাতুর উচ্ছ্বাসের আঘ্রাণ পাই, পালকের গন্ধ পাই, জননীর দেহের মতো ধানসিঁড়ির জলের গন্ধ পাই।

সে সব মায়াবীর দেশ ছিঁড়ে গেছে, ছিলাম পাখি, হলাম মানুষ। [...] নিলাম চাকরি, বাসা বাঁধলাম পাড়াগাঁর রাস্তার কিনারে খড়ের ঘরে, রইলাম সুকৃতির মতো একজন নারীকে নিয়ে—লাল কস্তা পেড়ে শাড়ি পরে বিচ্ছিরি মুখের কে এক বউ এসে একে মেরে যায়।

বাতি কমিয়ে দিয়ে চেয়ারটা জানালার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে, অন্ধকারের ভিতর পা ছড়িয়ে চুরুট হাতে করে ভাবছিলাম।

কিন্তু তবুও সংসারের পালেই ফিরে আসতে হয়, চেয়ারটাকে টেবিলের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম, চুরুট জ্বালিয়ে নিলাম—বাতিটা উশকে বই নিয়ে বসলাম আবার।

বারান্দায় কুকুরটা মাটি খুঁড়ছিল। এই গরমের ভিতরেও কিংবা এই গরমের জন্যই হয়তো মাটিকে খুঁড়ে খুঁড়ে গুঁড়ো করে ধুলো না ভরে নিয়ে শুতে পারে না সে। বড্ড বেশি খুঁড়ছে। অসুস্থ জান্তব শব্দ

বেরুচ্ছে কেমন যেন—মনে হচ্ছে এ বাড়ির একাই কর্তা সে—অশ্লীল আদিম কর্তা এক। কিন্তু তবুও কুকরটাকে তাড়িয়ে দিতে গেলাম না। ঘুম পেয়েছে, বেচারি তার বিছানার জোগাড় করছে। করুক। শিগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়বে।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে হামিদ কাশতে কাশতে দম ফুরিয়ে ফেলল প্রায়—বেধড়ক বিড়ি টেনেছে নিশ্চয। তারপর মরকুটে ঘোড়া দু'টো তার আমাদের উঠানে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সারারাত ঘাস খাবে এখানে—থাক।

কৃষ্ণচূড়ার ডালে একটা পেঁচা এসে বসেছে। আরো দূরে একটা অন্ধকার উঁচু গাছের থেকে পাখা মেলে হামাগুঁড়ি দিযে এসে যেন সে বসল—মুখখানা যেন তার পবিপক্ক এক শিশুর মতো, পৃথিবীর আদিম পাখি সে। তার অনেক জ্ঞান, অনেক কল্পনা। আমরা জানালার পাশে যে আলো বযে না তাতে তার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হয না। এই শতাব্দীতে খানিকটা শহুরে হযে গেছে সে। ...শিঙের মতো বাঁকা কান তুলে আমাবই জানলার দিকে তাকিযে আছে হযতো, অনেক কথা সে আমাকে জানিযে যেতে পারে, অনেক ফসল ও নষ্ট ফসলেব গল্প, অনেক খেতেব কাহিনী, পৃথিবীর অনেক বিস্তৃত বেখা ও উপরেখা, অনেক বেদনা ও প্রেম কামনা ও মাংস সমস্ত তার হৃদযের ধূসর পাণ্ডুলিপিব ভিতর বযে গেছে যেন। মাথার উপবে তাব ঈশ্বরেরই এক বাঁকা ভুরুব তো রহস্যময চাঁদ জেগে আছে। কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার ভিতব পাখির পালক ও বোমের ছাযায পিল পিল করে জোনাকি ও শিশির খেলা করছে। কি প্রশ্ন তার, কি প্রস্তাব, কি সমাধান, কি ভীষণ ভযাবহ রূপ তার, স্তম্ভিত হযে তাকিযে দেখলিছাম।

হঠাৎ প্রায আধঘন্টা পরে চমকে উঠে—'কে?'

—'দেখছই তো কে।'

—'সুকৃতি, তুমি উঠে এলে যে আবাব?'

—'উঠে আমি সাধে সাধে'—

—'না, তা তো নিশ্চযই নয আমি তোমাব নাক ডাকাব শব্দ শুনেছিলাম।'

—'সে অনেকক্ষণ আগে।'

—'তা হবে। তারপব?'

—'তারপব আমি জেগে উঠলাম।'

—'স্বপ্ন দেখে?'

—'না, স্বপ্ন এবাব আর দেখিনি।'

—'এমনিই ঘুম ভেঙে গেল?'

—'কেমন গবম বোধ কবছিলাম।'

—'জানালাটা বন্ধ কবে দিলে নাকি আবাব?'

—'না।'

—'মশাবিও তো ফেলনি?'

—'না, রাতটা কেমন যেন গুমোট আজ।'

একটু বৃষ্টি পড়লে ভালো হত। জ্যৈষ্ঠ তো ফুবিযে এল, এক-একবাব এই সমযে বীতিমতো ঝড়বৃষ্টি শুরু হযে যায। এবাব আকাশে মেঘেব নামগন্ধও নেই।' বলে আকাশেব দিকে একবাব তাকালাম।

—'তোমাব বড্ড একা একা লাগছে না? কিন্তু অদ্ভুত মানুষ তুমি। বই-ই তোমাব সব। কি নির্জন ঘবদোব। অন্ধকাবের ভিতর জেগে উঠে কযেকটা মশাকেও যেন সঙ্গী বলে মনে হল।'

চুরুটটা টেবিলেব থেকে তুলে নিযে একটু হেসে—'এই অবস্থা? কিন্তু তবুও নিজের ঘব, নিজেব বিছানা কিছুই তো ছাড়বে না তুমি।'

—'সেজন্য কে দাযী ভেবে দেখো। আমি সেধে মানুষেব সঙ্গে প্রেম করতে পাবি না।'

—'আমিই-বা সেধে অপ্রেম করতে গেলাম কবে তোমার সঙ্গে?'

—'থাক, ওসব বাজে কথা বলতে পাবি না আমি। যা বলতে এসেছিলাম শোনো'—

—'আবাব কোনো ঘটনা ঘটল নাকি?'

সুকৃতি তাব হাতের পাখাটা আস্তে আস্তে ঘোবাতে ঘোবাতে—'তুমি কিছু টের পাওনি?'

—'না, তো। আবাব স্বপ্ন দেখছিলে নাকি?'

—'না।'

—'তবে?'

—'জেগে উঠে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। ছাবপোকা মাবছিলাম, মশা মাবছিলাম। ভাবছিলাম তোমাকে ডাকব। হঠাৎ জানালাব দিকে তাকিয়ে দেখি সেই লাল কস্তাপেড়ে বিচ্ছিবি শাড়ি পবা বউটা পাথবেব মতো চোখে আমাব দিকে তাকিয়ে আছে।'

চুরুটটা খসে পড়ে গেল হাতেব থেকে, অস্ফুট স্ববে—'বলো কি?' মুহূর্তেব ভিতবেই সমস্ত শবীবেব বক্ত শুকিয়ে গেল আমাব।

—'বলি ভালোই। আমি মবতে চাইনি। এ পৃথিবীতে আমি বাঁচতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পেবেছি আমাব দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

—'কই দেখাও তো সেই বউকে'— আচ্ছন্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—'নেই আব, চলে গেছে।'

—'তবুও দেখাই যাক না।'

—'তুমি দেখো গিয়ে—আমাব আব কিছু দেখবাব, বুঝবাব, জানবাব সাধ নেই। আমাব আয়ু ফুবিয়ে গেছে।'

—'পাগল তুমি, কিছু হয়নি, আমবা কাল সকালেই এ-বাড়ি ছেড়ে দেব সুকৃতি। তুমি আমাব বিছানায় শোও। —'শুয়ে পড়ো, আমি তখুনি বাতি নিভিয়ে আসছি। আমাব মনে হয় তুমি আবাব স্বপ্ন দেখেছিলে।' বলে চিৎকাব কবে উঠতেই তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কেউ নেই—সমস্ত ঘব অন্ধকাব—মশাবিব ভিতব আমি একা শুয়ে আছি—সুকৃতি যেন এইমাত্র আমব মশাবিব কিনাব ঘেঁষে সবে গিয়ে জানালাব ভিতব দিয়ে ভেসে কৃষ্ণচূড়া ডালপালাব ভিতব আধ মিনিট আটকে থেকে নক্ষত্রেব ধূসব গুঁড়িব ভিতব হাবিয়ে গেল।

তাহলে আজ বাতেও এসেছিল সে?

মশাবি গুটিয়ে উঠে পড়লাম। জানালাব পাশে টেবিলেব কাছে গিয়ে বসলাম। সুকৃতি যতদিন বেঁচেছিল ও বকম স্বপ্নেব কথা কোনোদিন আমাকে বলেনি তো সে। স্বপ্ন সে দেখত বটে কিন্তু অসাধাবণ স্বপ্ন তো সে কোনদিন দেখেনি। সে ভাবী পবিস্ফুট মানুষ ছিল। বহস্য তাব ত্রিসীমায়ও ছিল না। কিন্তু স্বপ্নেবও কি কোনো মানে আছে? যে মবে যায় সে তো মবেই যায়, জানতাম, আজও তো সেই কথাই জানি। আব তো কিছু জানি না। এত বাতেও কৃষ্ণচূড়াব ডালে একটা পাখি বসে বয়েছে- অনেকদিনেব পুবোনো সেই পেঁচা। শিঙেব মতো বাঁকা কান তুলে... বহস্যময় চাঁদ জেগে আছে।

১৯৩৬

পৃথিবীটা শিশুদের নয়

বঙ্গিলকে যদি সাপে কামড়ায।

অনেকদিন আগে—সে এক শীতেব বাতে টিউশন কবে ফিবছিলাম। পাড়াগাঁব মতো একটা শহব—বাসায় ফিববাব পথ। গোটা দুই মাঠে এবং বাস্তাব আশেপাশে উঁচু উঁচু নানাবকম গাছেব জঙ্গল। পড়ে।

বাসাব কাছাকাছি অনেকটা যখন প্রায এসেছি, আমাব মনে হল পথেব পাশে, খালেব ধাবে, জড়োসড়ো হযে একটা কুকুব পড়ে আছে যেন কুকুবটা হযতো মবে গেছে। আচ্ছা মৃত্যুব রূপ আব-একবাব দেখা যাক এই ভেবে মুহূর্তেব আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত কববাব জন্য টর্চেব আলো কুকুবেব মুখেব ওপব ফেলতেই বোঝা গেল—এ একটি মানুষেব শিশু, কুকুব নয, মবা কুকুব নয।

আমি তাকে বাসায নিযে এলাম।

একেবাবে শিশু নয, বছব চাবেক বযস হবে হযতো। পবনে একটা হাফপ্যান্ট গাযে একটা পাতলা লংক্লথেব পাঞ্জাবি, সমস্ত শবীব তাব শীতে জমে গেছে একেবাবে। কতক্ষণ এবকম পড়েছিল তা জানি না, জ্বব বা নিউমোনিযা কিছু একটা না হযে যায না, হযতো আজ্ব বাতেই হবে, কিংবা কাল।

কিন্তু তবুও আজকেব মতো গিন্নীকে—'একটা কুকুবেব বাচ্চা এনেছি, দেখবে নাকি, দেখো এসে।'

—'কুকুবেব বাচ্চা, সখ তো তোমাব কম নয—ওসব পালতে টালতে পাবব না বাপু' ঘবেব ভিতব থেকেই তিনি বললেন।

—'কিন্তু আমাকে দবজা খুলে দাও।'

—'দিচ্ছি, কিন্তু বাচ্চাটাকে বাইবে বেখে এস।'

—'আহা, এই শীতেব বাতে'—

—'অত যদি দযা হয বাববাড়িব ঘবে একটা ডালা আছে। ডালাব ভেতব থলেও আছে, তোমাব গাযেব চাদবটাও কাজে লাগবে। নাও চটপট কাজ সেবে চলে আস—' বলতে বলতে দবজা খুললেন তিনি।—'কই, কোথায তোমাব বাচ্চা, বিলেতি কুকুবেব বাচ্চা তো একটা পুষলে হয মন্দ না, বিনু অনেকদিন বলছিল।' আচমকা ছেলেটিব দিকে চোখ পড়তেই গিন্নী গালে হাত দিযে খানিকটা পিছে হটে গেলেন, ভ্রূকুটি কবে আমাব দিকে তাকিযে—দেখলাম তিনি অন্ধকাবেব ভিতব চুপ কব দাঁড়িযে আছেন।

—'একে একটু গবম দুধ দিতে হবে।'

আধঘন্টা পবে দেখা গেল ছেলেটিব জন্য একটা চমৎকাব বিছানা পর্যন্ত তৈবি কবে ফেলেছে গিন্নী। লেপ, তোশক, বালিশ, মশাবি, ধপধপে চাদব কোনো কিছুবই অভাব নেই।

—'তুই এখানে শুতে পাববি?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে—'হ্যাঁ।'

-'একা শুতে পাববি তো?

—'হ্যাঁ।'

—'ভয কববে না?'

—'না।'

—'পথেব পাশেই তো শুযেছিলি, তোকে যদি হুড়োায নিযে যেত—তোব সাহস তো কম না বে'—তাকিযে দেখলাম বিনু, আমাদেব মেযে, বছবচাবেক বযেস, ঘুম ভেঙে গেছে তাব। খাটেব থেকে গুটিগুটি নেমে তাব মাযেব পাশে এসে দাঁড়িযেছে।

বিনু শুধোল—'তুমি কোথায ছিলে? অন্ধকাবে? অন্ধকাবে থাকতে হয না, সেখানে শেযাল আছে, এ কে মা?'

—'তোব ভাই।'

—'আমাব ভাই? কোথায ছিল এতদিন?'

—'তোর অনেক ভাইরা যেখানে পড়ে থাকে সেখানে—'

—'কেমন করে এল এখানে?'

গিন্নী ছেলেটির দিকে তাকিয়ে—'এখন তুমি বিছানায় শুয়ে পড়, লেপ আছে, মশারি গুঁজে দেব—তারপর কাল সকালে তোমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।' আমার দিকে তাকিয়ে—'পুলিশে একটা খবর দিতে হবে।'

—'তা দেখা যাবে।'

ছেলেটির খুব তীক্ষ্ণ বিষণ্ন চেহারা। ঘাড় হেট করে চুপ করে বসেছিল সে। এক-একবার আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

—'না, ছোটলোকের ছেলে বলে মনে হয় না।'

—'না, তা তো মোটেই নয়, ভদ্রঘরেও চেহারার এরকম প্রতিভা কম দেখা যায়। অনেকদিন পরে, আমার মনে হয় বুঝলে সুধা, আমি একটা কিছু আবিষ্কার করেছি।'

—'আবিষ্কার?'

—'আমার মনে হয় ছেলেটি মানুষ নয়।'

—'তবে?'

—'অন্ধকার রাতে পথের পাশে ঈশ্বর পড়েছিলেন যেন।'

—'ঈশ্বর?' সুধা ভুরু তুলে আমার দিকে তাকাল।

—'হ্যাঁ। অনকদিন পর্যন্ত হৃদযে কোনো আবেগেরই জন্ম হয়নি, কিংবা অব্যবস্থা ও দুঃখেরই আবেগ জন্মেছিল শুধু। তারপর ঈশ্বর নিজে নেমে এলেন যেন আমার কাছে। একটা কোলাহল যখন পেকে উঠতে থাকে তখন তার হৃদযের ভিতর যে শান্তি ও আনন্দের জন্ম হয সেরকম একটা আস্বাদ পাচ্ছ তুমি?'

—'আমার মনে হয তাই যেন পাচ্ছি আমি।'

—'তা তুমি তোমার আস্বাদ নিযে থাক। এতদিন ছিল অব্যবস্থা, দুঃখের আবেগ? ছিল নাকি?'

—'জানি না, কিন্তু এ ছেলেকে তার বাপ-মাযের কাছে ফিরিযে দিতে হবে কাল। তুমি না দাও, আমি দেব। দরকার হলে পুলিশে খবর দেব।'

চুপ করেছিলাম।

—'পথের পাশে ঈশ্বর এসেছিল। সামান্য একটা কথা বলতে তুমি এত বহস্যের ভেতব চলে যাও কেন, আসল কথা হচ্ছে তুমি আমাকে ভালোবাসা না, বিনুকেও না। তোমার আকর্ষণ অন্য নানাদিকে।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সুধা ছেলেটির দিকে তাকিযে—'তুমি একা শুতে পাববে তো বাছা?'

—'পারব।'

—'রাতে যদি ভয় করে, কিন্তু তোমার বাপু ভয় বলে কোনো জিনিস আছে? কী বলিস?'

ছেলেটি কোন উত্তর দিল না।

—'যদি ভয করে আমাকে ডাকিস, আমি পাশের বিছানায শুযে থাকব।'

বিনু—'তোমাকে ও যদি ডাকে তাহলে কী করবে তুমি মা?'

—'ওর কাছে গিযে শোব।'

—'না, তা হবে না। তুমি আমার কাছে থাকবে, বাবা শোবে ওর সঙ্গে।'

সুধা একটু হেসে—'ঠিকই বলেছিস বিনু।' আমাব দিকে তাকিযে— 'তোমাব জন্য তোমার নিজেব মেযেরও কোনো টান নেই।' খোঁপাটা খসিযে আবার বাঁধতে বাঁধতে—'আবার মনে কব ঈশ্বর আসেন তোমার কাছে—তোমাকে ভালোবাসেন। তোমাকে তোমাব মনের কল্পনা ছাড়া কেউ আর পায না—পেতে চাযও না। বিনু, এ খোকার মা নেই তুমি জান? এ তোমার ভাই।'

—'ভাই? বাবা তাহলে আমার কাছে শোবে।'

—'আচ্ছা। আর আমি?'

—'তুমিও আমার কাছে।'

বিনুর কথা শুনে দেখলাম ছেলেটিব বিমর্ষ ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠল। বিনুর বয়সী হলেও মনে হল বিনু চায সে যেন ঢের বড়, মানুষ জীবনেব অনেক কথাই সে যেন জানে।

—'তোমার নাম কি খোকা?'

হাতির দাঁতের মতো মসৃণ সুন্দর কপালের গরিমার নীচে তার চোখদু'টো পৃথিবীর অতীত ভবিষ্যৎকে সংযুক্ত করে অজস্র স্মৃতি ও সৌন্দর্যের একটা ধূসর সেতু যেন। আমার চোখের ওপর চোখ তুলে সে—'আমার নাম—'

—'হ্যাঁ, তোমার নাম?'

—'আমার নাম রঙ্গিল।'

সুধা কৌতুকাবিষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস—'কি বললে রঙিল?'

—'রঙ্গিল।'

—'রঙ্গিল, সে আবার কীরকম নাম''

আমি জিজ্ঞেস—'রঙিল? তোমার নাম খোকা?

—'না রঙ্গিল।'

—'রঙ্গিল—এবং গ এবং ল-এর ওপর যথাসাধ্য নিপুণভাবে জোব দিযে। সে আমাদের জানিয়ে দিল যে তার নাম রঙিনও নয় রঙিলও নয়। রঙ্গিল'—

—'রঙ্গিল মানে কি?'

কী মানে সে বলতে পারল না।

—'রঙ্গিলা নয তো?'

—'আমার নাম রঙ্গিল।' ছেলেটি একটু জোর দিযে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললে।

—'এ নামের কি মানে বুঝলাম না তো' জিজ্ঞেস করল সুধা আমাকে।

দেখলাম ছেলেটি খানিকটা ক্ষুব্ধ হযে সুধার দিকে তাকিযে আছে।

বললাম—'হযতো রঙ্গলাল ওর নাম।'

—'রঙ্গলাল?'

—'কিংবা রঙ্গেশ্বর, রঙ্গনাথ, রঙিল, রজনী, বাজেন— কতই তো হতে পারে। শেষ পর্যন্ত রঙ্গিল গিযে দাঁড়িযেছে।'

—'ছেলেটি বাঙালি তো?'

—'তীক্ষ্ণতার ভেতর এত কমনীযতা বাঙালি ছাড়া আব কোথায পাবে তুমি?'

—'ছেলে না মেয়ে?'

—'ঠোঁট, চোখ, চুল মেযেদেরও এরকম হতে পারে। কিন্তু কপালেব দিকে তাকিয়ে দেখো, সমস্ত চেহারার ভিতর কেমন একটা আশ্চর্য পৌরুষ এসেছে।'

সুধা—'না জানি এ কার ছেলে—কিন্তু পথের পাশে পড়েছিল কেন—তুমি বাড়ির থেকে রাগ করে চলে এসেছ খোকা?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'তবে?'

ছেলেটি কোনো উত্তব দিতে পারল না। কিংবা দিতে চাইল না হযতো।

—'তোমার বাবার নাম কি?'

রঙ্গিল কিছু বলল না।

—'তোমার মা কি তোমাকে মেরেছিলেন?'

একটু চুপ থেকে আমাদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা হেট করে সে—'না।'

—'তাহলে রাস্তার পাশে পড়েছিলে কেন?'

এ প্রশ্নে তার নিস্তব্ধতা আরো বেড়ে গেল।

—'তুমি কি এই শহরেই থাক?'

কোনো উত্তর নেই।

—'তোমার বাবার নাম বলতে পারলে না?'

রঙ্গিল তেমনই নিরুত্তর।

—'কী কাজ করেন তোমার বাবা?'

বিনু এর মধ্যে রঙ্গিলের জন্য একটা খেলনার মোটরকার নিয়ে এসেছে, ছেলেটি তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সুধার শেষ প্রশ্নটিকেও উপেক্ষা করে গেল।

—'তুমি আমাদের এখানে থাকবে রঙ্গিল?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'কোথায় যাবে তাহলে?'

কিন্তু এ কথার কোনো উত্তর নেই।

—'তামাশা মন্দ নয়।' সুধা আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'ওদের বাড়িতে এতক্ষণ হয়তো খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু চুপ করে কান পেতে শোন সমস্ত শহরটা কেমন নিস্তব্ধ, কেউ যে হারিয়ে গেছে ঘুণাক্ষরেও বোঝা যায় না।'

—'কী করতে হবে বলো তো?'

—'কীসের সম্বন্ধে?'

—'বাঃ তুমি যেন কেমন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছো বাপু, এতক্ষণে তো ওর মা-র প্রাণ শুকিয়ে গেল।'

ছেলেটি সুধার এ কথা কান দিয়ে শুনল মনে হল, কিন্তু আমাদের কোনো কথাই যেন মন দিয়ে গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই তার।

—'না, ওঠো, ওকে নিয়ে পাড়া-পড়শিদের কাছে চলো। ব্যাপারটা কী, তার একটু কিনারা করতে হবে তো?'

মাথা নেড়ে—'আমার মনে হয় না রঙ্গিল এ শহরের ছেলে।'

—'কী রকম? শীতের রাতে তোমাকে আলসেমিতে পেয়ে বসেছে এই তো কথা। শেষে চুরির দায়ে পড় যদি? তুমি যেতে না পার আমিই যাই। আয় রঙ্গিল—' বলে সুধা হাত বাড়াল।

বিনু বাঁধা দিয়ে—'কোথায় নিয়ে যাবে মা?'

—'দেখি পাড়াটা একটু ঘুরে এসে, কার ছেলে—'

—'না, না, নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাকে আমি নিতে দেব না। অন্ধকারে রঙ্গিলকে যদি সাপে কামড়ায়?'

—'সাপে কামড়ায়? কেন আমকে কামড়াতে পারে না? অন্ধকারে রঙ্গিলকে যদি সাপে কামড়ায়—কোথাকার কে ছেলে, মায়ের চেয়ে বড় হয়ে গেল সে! মাকে সাপে কামড়ালেও কিছু নয় তোমার বিনু, কেমন? রঙ্গিলকে যদি কামড়ায়! এই মেয়েরাই বড় হয়ে বিরহিণী হয়।' রঙ্গিলের দিকে হাত বাড়িয়ে সুধা—'এসো খোকা।'

—'ওকে আমি যেতে দেব না।' খুকির ঠোঁট ব্যথায় ফুলে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম—'ওকে যেতে দেব না কেন খুকি?'

—'না, ওকে যদি সাপে কামড়ায়!'

—'সাপে কামড়াবে না, তোমার মা বাতি নিয়ে সঙ্গে যাবেন।'

—'না, না, ওকে সাপে কামড়াবে—বিছানার থেকে নামলেই সাপে কামড়ে দেবে—আমার সমস্ত খেলনা পুতুল রঙ্গিলকে দেব আমি বাবা।'

—'তোমাকে আমি আরো অনেক পুতুল কিনে দেব বিনু, ছেলেটিকে তার মায়ের কাছে যেতে দাও।'

—'না।'

—'বাঃ, ও ওব বাবা-মা-র কাছে যাবে না?'

মাথা নেড়ে ঢোক গিলে বিনু আমার দিকে তাকাল, তারপর [...] তার মায়ের চারদিকে নেচে নেচে ঘুরতে লাগল।

—'নাচছিস কেন?'

তাকিয়ে দেখলাম, খুকির মুখ খুব গম্ভীর, হৃদয়ে অনেক কান্না জমে আছে যেন। এ আনন্দের নৃত্য মোটেই নয়, দুঃখকে প্রতিরোধ করবার কেমন একটা অদ্ভুত চেষ্টা। তর্ক, কল্পনা, ঈশ্বর আমাদের বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করে, কিন্তু এই মেয়েটিকে সাহায্য করবার জন্য একটা আদিম নিস্তব্ধ নৃত্যের

মাদকতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বিনুর গালে একটা বড় মারল সুধা।

বললাম—'ছিঃ মারলে কেন?'

কিন্তু মেয়েটি কাঁদল না, নাচুনি থামিয়ে দিয়ে খাটের এক কিনারে গিয়ে দাঁড়াল।

বললাম—'রঙ্গিল, তুমি যাবে?'

—'কোথায়?'

—'তোমার বাবা-মা-র কাছে?'

বিনুর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে রঙ্গিল এবার মোটরকারটা ফিরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু কী যেন ভেবে নিজের কাছেই রেখে দিল।

—'চলো যাই রঙ্গিল।'

—'না, আমি যাব না।'

—'কেন?'

—'আমাকে যদি সাপে কামড়ায়?'

—'ইস' হেসে ফেলল সুধা।

একটু চুপ থেকে—'তোমারও সাপের ভয় আছে রঙ্গিল! অন্ধকার রাস্তার পাশে তুমিই তো পড়েছিলে, তখনই তো সাপে কামড়ে দিতে পারত।'

রঙ্গিলের দিকে, সুধার দিকে, তাবপর আমার দিকে তাকিযে বিনু ঘাড় নীচু করে—'আমাদের এই ঘরের ভেতর দু'টো সাপ ছিল। সে দু'টো এখন উঠানে গিয়ে শুযে আছে।'

—'তাই নাকি রে?'

—'আমাদের এই ঘরের ভেতর ঢুকবে না আর, কিন্তু রঙ্গিল যদি বাইরে যায়'—

—'আমার সঙ্গে যদি যায় রে বিনু"—

বিনু বিমর্ষ হয়ে চুপ করল।

রঙ্গিল আস্তে আস্তে বিছানায উঠে লেপ গায় দিযে শুয়ে পড়ল। আমরা যেন তাকে এখান থেকে আর না সরাই—কোনোদিনও না সরাই।

গিন্নি রান্নাঘরে চলে গিযেছিল। বালাপোশটা টেনে নিযে চুরুট জ্বালিয়ে অন্ধকারের ভিতর পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাবছিলাম। পৃথিবিটা যদি শিশুদের হাতে থাকত—

তাকিয়ে দেখলাম মোটরকারটা আমার হাত থেকে খসে গিয়ে রঙ্গিলের বালিশের পাশে জায়গা করে নিযেছে। এই চমৎকাব কাজটি শেষ করে বিনু তার নিজের বিছানায় গিযে কম্বল মুড়ি দিযে শুযেছি আবার। শীতের রাত বেশ শান্ত, সুন্দর।

সবই ঠিক আছে তাহলে। রাত ন'টা। শীতের রাত বেশ স্তব্ধ ও সুন্দর। ঈশ্বর রয়েছেন। এই ভাব নিয়ে চোখ একটু বুজতেই বাইরে অনেক লণ্ঠনের আলো ও কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল, বুঝতে পারা গেল বাবা খুড়োরা এসেছেন, এ পৃথিবীটা আমাদেরই, শিশুদের নয়, তাদের এখন বিদায় নিতে হবে।

১৯৩৬

করুণার পথ ধরে

মাঠের ঘাসের ভিতর শালিখের কোলাহল যেন দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ করে দিনের মাঝখানেই কেমন যেন দিন ফুরিয়ে গেল—কার্তিকের দিন [?]। না জানি কোন চিন্তা নিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম—দেখিনি আমি—কিন্তু তবুও মনে হল কাকের করুণ পাখার সঙ্গে সঙ্গে এই কিছুক্ষণ আগেই যেন সে চলে গেল কোন দূর—ফিরোজা রঙের মেঘ আকাশের ভিতর তাও এখন আর নেই। মেঘের কিনার দিয়ে জাফরান রঙের ডানা বাড়িয়ে—হীরকের মতো ঝলমল পিছল নদীর জলকে বেতের ফলের মতো নীল নিস্তব্ধ করে দিয়ে কার্তিকের দিন, দিনের মাঝখানেই ফুরিয়ে গেল।

অকস্মাৎ এই সন্ধ্যা ও শীতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি। আমি ভেবেছিলাম, বিকেলের আলো আরো অনেকক্ষণ মাঠের ঘাসের ভিতর নির্জন মাযাবীর প্রাসাদের দেওয়ালের মতো পৃথিবীকে যেন ঘিবে রাখবে। মায়াবীর জানালার ভিতর দিয়ে যেই আলো আসে, তেমনি একটা ধূসর নির্জন ছটায় পৃথিবীর ঘাস থাকবে ভরে—মাঝে-মাঝে এক-এক বার যখন আমি মুখ তুলে তাকাচ্ছিলাম, দেখছিলাম সমস্ত উঠানটা নিবিড় ঘাসে ভরে রযেছে—মাঝে-মাঝে এক-একটা জাযগায কোনো ঘাস নেই, রযেছে ধুলো শুধু, এক-একটা ধূর হাঁস যেন বসে রয়েছে কিনারে, জামরুলের ডালপালার ভিতর থেকে যেন কোনো সুন্দরী খইয়ের ফুলের মতো সোনালি রঙের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের দিকে।

অবাক হযে দেখছিলাম, আবার সমস্ত ভুলে যাচ্ছিলাম আমি, মেঘ আকাশ আলো শালিখের কলবব, ঘাস, এই পৃথিবী—সমস্তই যেন অন্য প্রাণীদের নিযে অনেক দূরের অন্য এক নক্ষত্রে খেলা করছিল। অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মতো আমার চিন্তার ধারাকে থেকে-থেকে প্রতিহত করে দেবার জন্যও যেন তারা নেই, তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু সন্ধ্যা, শীত ও নির্জনতার একটা অমৃত ভয়াবহতা পৃথিবীর দিকে ফিরিযে আনল আবার আমাকে।

তাকিয়ে দেখি, টেবিলের পাশে বসে রযেছি। আমার ঠাকুরদাদার আমলের এই মস্ত বড় সেগুন কঠের টেবিলটার পাশে, টেবিলেব এক কিনারে কযেকটা পুরোনো বই সাজানো, অনেক দিনের পুরনো কালির একটা দোয়াত, একটা জরাজীর্ণ কলম—আমার ঠাকুরদাদার আমলেই সেই কলমটা, তার মুখে লেগে রয়েছে একটা নিব, স্থবিরতম পৃথিবীর ভিতর একদিন জন্ম হয়েছিল যার। অনেক ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও রহস্যের অবতারণা করে গেছে যে পৃথিবীর বেদনা ও অন্ধকারের পথ দিয়ে অনেক অনেক দিন—তবুও আরো অনেক রাত বেড়ানো হল যার, কিন্তু তবুও যাকে মৃত্যুর শান্তি দিতে 'পারছি না আমি, না পারছি আমার হৃদয়কে মৃত্যুর মতন শান্তি দিতে।

প্রতিদিনের মতো আজকের দিনটাও কেটে গেছে আমার। প্রতিদিনের মতো কালও অনেক রাতে ঘুমতে গিয়েছি, তবুও ঘুমতে পারিনি, অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়তে হযেছে আমাকে। বিছানায় আমি থাকতে পারি না বেশিক্ষণ। সারারাত নির্জন গাছের থেকে শিশির ঝরেছে, পেঁচার পাখার নিস্তব্ধ গন্ধের ভেতর থেকে অদ্ভুত পৃথিবীর জন্ম হযেছে, অদ্ভুত পৃথিবীর ইশারায় আমাব হৃদযকে আচ্ছন্ন করে গিয়েছে। চুরুট জ্বালিয়ে আস্বাদের নিঃসঙ্গ রাখার আঘাত উড়িযে দিযে জননী ও শিশুর নিশ্চিন্ত নিরপরাধ পৃথিবীতে ফিরে আসতে চেয়েছি আমি।

বিছানার থেকে উঠে গিয়ে দেখেছি, খানিকটা দূরে আরেকটা পালঙ্কের উপর তার মশারি ফেলে ঘুমিযে আছে। মা ঘুমিয়ে আছে ছোট মেয়েটির পাশে, অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আছে তারা। অনেক দিনের পুরনো শাদা নেটের মশারি, ঠাণ্ডা চাঁদের আলোয় একটা মস্ত বড় পাহাড়ে পাখিব ধূসর বিমর্ষ ডানার মতো মনে হয়—যে তার স্বামী হারিযেছে, সন্তান হারিয়েছে, ঈশ্বর হারিযেছে, এমন এক নিঃসঙ্গ নীরব পাখি-জননীর মতো চাঁদের ক্লান্ত সবুজ আলোয এই মশারি, আকাশের মৃত নক্ষত্র, পৃথিবীর মৃত মুখ, মৃত ঘাস, মৃত অসার আত্মীযযের মতো হারিয়ে আছে। চাঁদের ক্লান্ত হিমের ভিতর ছড়িযে রয়েছে। চাঁদ পশ্চিমের থেকে আলো দিচ্ছিল, আলো তার নীল, জামরুলের ডালপালায় সবুজ শরীর ছুঁযে এসে ঘরের ভিতর আলো তার কেমন নীলাভ সবুজ, সেই আলোয় আমি তাকিয়ে দেখলাম, মশারির ভিতরে কতকগুলো নীল মশার করুণ ওড়াউড়ির আশ্চর্য একটা আলাদা পৃথিবীতে যেন আরো করুণ দুটো মুখ ঘুমিয়ে রয়েছে—সেই মেয়ে

ও তার মার নীল করুণ মুখ।

আমি আস্তে-আস্তে সরে গেলাম। সবুজ নীল চাঁদের আলোয় রাতের এরকম গভীর মুহূর্তে এই মশারির দিকে তাকাতে হয় না।

প্রতিদিনের মতো আজ ক্রমে-ক্রমে দিনের আলোয় আকাশ মাঠ ছেয়ে গেল। চারিদিককার কাজকর্ম কোলাহলের ক্ষমাহীন স্ফুটতা আমাকে বিছানায় থাকতে দিল না, মাঠের ঘাসের ভিতর গিয়ে বসতে দিল না, আমার হাতে সে তার রোমশ হৃদয়হীন জন্তুর হাত রাখল।

চুরুট জ্বালিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মা হয়তো রান্নাঘরে চলে গেছে। মেয়েটি বিছানায় চুপ করে বসে আছে। মুখে হাসি নেই, কান্না নেই, কোনো কথা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি তাকে ধীরে—ধীরে কোলে তুলে নিয়ে আমার ঠাকুরদার এই মস্ত বড় সেগুন কাঠেব টেবিলের এক কিনারে এনে বসালাম। একদিন আমি যেমন একটি কবিতাব বই বার করেছিলাম, তেমনি এই মেয়ে, এ আমার সৃষ্টি। কবিতার বইটি কলকাতার এক দপ্তরির দোকানে অনেকদিন থেকে পচছে, হয়তো দপ্তরিও সেগুলো ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, এতদিনের ভিতর, কিংবা কাগজের দরে বিক্রি কবে ফেলেছে।

কিন্তু তবুও আমার আর—একটি সৃষ্টি। আমার চোখেব সামনে টেবিলের কিনারে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মৃত্যুর পর দু-একজন মানুষের মনে আমার স্মৃতি এই শিশু, সেদিন সে নারী হবে হয়তো, কযেকদিনের জন্য জাগিযে রাখবে।

দপ্তরির দোকানে কবিতার বইযের মতো এই শিশুও আমার ঘবে পচে যাচ্ছে। আমিও তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, কিংবা শস্তা কাগজের দরে বিক্রি কবে ফেলতে পাবি। মনের ভিতব বোজ সকালেই এই অদ্ভুত ধারণার জন্ম হয়।

চুরুট টেনে যাই। মেযেটি টেবিলে সাজানো বইকটা ফেলে ছেঁড়া পুরনো মলাট মাটির ওপর ফেলে দেয, ঠাকুরদাদার কলমটা তুলে নেয, বইযের পাতায-পাতায কালির আঁচড় কাটে। কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ফেলে, চুরুট টানতে-টানতে নিস্তব্ধ হযে চেয়ে দেখি সব—সেও আমার দিকে জামের মতো নীল নিস্তব্ধ চোখ তুলে তাকায, তারপব হাতদুটো গুটিযে বসে থাকে।

অবসাদ আসছে তাব, কিছুই আর ভালো লাগে না। সে যদি অবসন্ন হযে এই টেবিলেব ওপর বসে থাকে চিবকাল, আব আমি যদি তার পাশে বসে চুরুট টেনে যাই চিরকাল, তাহলে হৃদযেব ভেতব অনুভূতি গাঢ় হযে বেঁচে থাকতে পাবে।

কিন্তু তবুও পৃথিবীর অশ্লীল আঘাত মানুষকে স্থিবতা দেয না, মেযেটি আবাব আস্তে-আস্তে ঘুমিযে পড়ে, সমস্ত শরীরটা তাব টেবিলের এক কিনাব থেকে আব এক কিনার পর্যন্ত ছড়িযে আছে, মুখের ভিতর থেকে ভোরেব ঘাসেব মতো গন্ধ বেবচ্ছে, সমস্ত শরীর ঘাসের মতোই আববণহীন, কার্তিকেব প্রান্তবেব ঘাসেব মতো ধীবে ধীরে হলুদ [...] হযে আসছে যেন সমস্ত শবীব।

এক পেযালা চাযেব জন্য অপেক্ষা করি, চা আসে না। কিন্তু তবুও টেবিলেব ওপর এই ঘুমন্ত ঘাসের টুকরোটিকে ফেলে বেখে চুরুট হাতেই উঠে দাঁড়াই আবাব। কোনো নির্দিষ্ট চাকবি নেই আমার, কাজেই সমস্ত দিনটাই ঘবের বাইবে কাটিযে দিতে হয। এখুনি দুটি ছেলেকে পড়াতে যেতে হবে। ভোরেব পাখিব মতো উড়ে যেতে হবে একবার পশ্চিম আকাশের দিকে, তারপর দুপুরেব চুলের মতো আকাঙ্ক্ষার খযেরি ডানা ঘুবিযে-ঘুবিযে দূর উত্তর আকাশের দিকে উড়ে যেতে হবে আর-একবাব। তারপর দুপুর আবেকটু এগিযে গেলে আমার দেশী কাপড় কাচা সাবানেব দোকানে গিয়ে কযেকটি আনাড়ি আতুর মানুষকে সহিষ্ণুভাবে ক্ষমা করতে হবে, অনেক অপচয সহ্য করতে হবে। জীবনকে মনে করে নিতে হবে একজন নিঃসহায দিনমজুবের মতো মানুষকে, ভেবে নিতে হবে নিবীহ ব্যথিত জন্তুর মতো, রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কখনো-বা সেই সাবানের দোকানে, কখনো-বা সাইকেল নিযে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘুবে বেড়াতে হবে। কোনোদিন লাভ হবে কিনা সে স্বপ্ন দেখবাব সময নেই, এত যে লোকসান দিচ্ছি ভেবে পিছু হটবারও নিযম নেই। কাঁচা মশলা জোগাড় করতে হবে, হৃদযেব দুরন্ত রক্তকে দমিযে ঠাণ্ডা কবতে হবে। একটি বিড়ালেব মতো স্ত্রীলোক, বা একজন গাধাব মতো বা ষাঁড়ের মতো, শুযারের মতো মানুষকে বারবার খোশামোদ করতে হবে, তারপর অনেক রাতে বাবলা ও হিজলের ছাযার ভিতর দিযে ঘরের দিকে ফিরে আসব। নক্ষত্রের রূপালি আগুনে আকাশ ভরে রয়েছে তখন, কোথাও কোনো শব্দ নেই, হিজলের ডালপালার ফাঁকা-ফাঁকা জানালার ভিতরে গাঁযের মৃত রূপসীদের এক-আধজন হযতো এসে বসেছে, শিশির ঝরছে, আমার অতীত জীবনের মৃত প্রেমের অস্পষ্ট শব্দের মতো পরিচ্ছন্ন আকাশ থেকে নির্মল কাকাতুযাব রাশির মতো শাদা হাওয়ার ভিড় পৃথিবীর ঘাসে-ঘাসে আনন্দেব কোলাহলে ছিঁড়ে পড়ছে যেন।

আমাব বক্তেব ভিতব সজীব স্নিগ্ধ সমুদ্রেব জন্ম দিচ্ছে।

আমি সাইকেল ঘুবিযে মাঠেব ভিতব এসে নামি। পাশেই একটা জারুল গাছে একটা পেঁচা ডাকছে, আমাকে দেখে ভয পেযে পালিযে যায না। ধান খেতেব ওপব থেকে তাব প্রণযিনীব ডাক ভেসে আসে,—এবা দুজনে হৃদযেব আবিষ্ট আকর্ষণেব একটা আশ্চর্য মোহময সেতু তৈবি কবেছে যেন এখানে, এখানকাব পৃথিবীটাকে যেন এবা ধবে বেখেছে।

এমনি কবে দিন সাঙ্গ হয আমাব।

এক-এক দিন নানা জাযগাব থেকে কিছু পড়বাব জিনিশ জোগাড় কবে নিযে আসি, বাত সাড়ে বাবোটা-একটাব আগে পড়াশুনা শুরু কবতে পাবি না। দু-চাবটা বাংলা পত্রিকা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংবেজি কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক, হাইনেব কবিতা কিংবা বেগানেব বই, কবিব বা দাদুব দোঁহা ইত্যাদি, জীবন্ত পৃথিবীব বইযেব সঙ্গে বচনাব সঙ্গে বিশেষ কোনো একটা যোগ নেই আমাব, মৃত পৃথিবীতেই আমি বাস কবি।

দু-একদিন দেখি টেবিলেব ওপব দু-একটা চিঠি পড়ে আছে, দু-একজন দুঃস্থ আত্মীয হযতো টাকা চেযে পাঠিযেছে—কোনো জাযগাব থেকে একটা বিযেব চিঠি এসেছে কিংবা শ্রাদ্ধেব।

কলকাতায যাদেব সঙ্গে একদিন আলাপ ছিল, তাদেব কাবো কোনো চিঠি কোনোদিন আসে না। পৃথিবীব পথে চলতে গিযে দু-একটি নাবীব সংস্পর্শে এসে হৃদযেব ভিতব কেমন গাঢতা জন্মে গিযেছিল একদিন আমাব। কিন্তু তাদেব কোনো খবব পাই না।

আমাব ঠাকুবদাদাব সেই মস্ত সেগুন কাঠেব টেবিলে খাবাব ঢাকা থাকে, ভাত-ডাল খানিকটা সেদ্ধ, দু-একটা কাঁচালঙ্কা।

পালঙ্কেব ওপবে সেই ধূসব মশাবি হযতো বাতাসে আস্তে-আস্তে দুলছে, কিন্তু গভীব বাতে সেই মশাবিব দিকে তাকাতে হয না, তাকিযে দেখতে হয না সেই মশাবিব ভিতবে নীল মশাব বহস্যময ওড়াউড়িব ভিতব হলুদ ঘাসেব মতো দুটো শবীব, নীল [...] দুটি মুখ এখনো বেঁচে আছে কিনা। এই অসাড় ঘুম তাদেব ক্লান্ত দেহেব থেকে জন্মেছে, না অবসন্ন আত্মাকে আশ্চর্য শান্তি দিচ্ছে? খাওযা শেষ কবে থালাবাটি পেছনেব বাবান্দায সবিযে বেখে হাতমুখ ধুযে এসে টেবিলেব পাশে বসে চুরুট জ্বালিযে এমনি কবে আমাব দিন সাঙ্গ কবি।

দিনেব পব এখন খানিকটা ভাববাব সময খুঁজে পাওযা যায, ব্যবসাদাব মানুষেব পক্ষে যা অশোভন, পৃথিবীব সমস্ত লাভালাভ, সমস্ত মাংস খসিযে ফেলে একটা কুযাশাব মতো অনুভব নিযে অনেকক্ষণ বসে থাকি।

কেউ আমাকে চিঠি লেখে না কেন? অমলা চৌধুবী আজকাল কোথায?

সে হযতো মাঝে-মাঝে ভাবে অবিনাশ ঘোষাল গেল কোথায? মফস্বলে একটা কাপড কাচা সাবানেব কাববাব খুলে শুযাব হযে গেল সে। বুনো শুযাবও নয অমলা, চামাবেব পোষ্য শুযাব শুধু, সাবা গাযে কাদা, সাবা দেহে খিদে শুধু। অন্নেব খিদে শুধু অমলা, বক্তেব ভিতব কামনাব ক্ষুধাও নেই। প্রেম ও স্বপ্ন কোন জিনিশ, তা তোমবাই জানো অমলা। অবিনাশ ঘোষাল গেল কোথায? আমিই আমাব রূপ নিযে তাকে দেখা দিযেছিলাম এক সময, তাব হৃদযে প্রেমেব কবিতাব জন্ম দিযেছিলাম, সুন্দব কবিতা লিখছিল সে। আমাব রূপ হযেছিল আঁকাবাঁকা বহস্যময ধাতুব ভযাবহ সিঁড়িব মতো তাব কাছে। সেই পথ দিযে চলতে-চলতে বেদনা ও বিপদেব ভেতব দিযে শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রেব জানালায গিযে পৌছানো যায।

এই হযতো ভাবে সে আজ। ক্বচিৎ এক-আধটা আধুনিক কবিতা চিলেব সোনালি ডানাব হঠাৎ তির্যক প্রতিবিম্বেব মতো এই বকম কথা হযতো মনে হয তাব। কিংবা কিছুই সে ভাবে না, ধূসব বা আধুনিক কোনো কবিতাই পড়ে না সে। অবিনাশ ঘোষাল শুযাব হযেছে না সিংহ হযেছে, মানুষেব সেবক হযেছে না কল্পনাব আশ্চর্য প্রিযপাত্র হযে উঠেছে, কিছুতেই কিন্তু আসে যায না তাব। ভাবতে-ভাবতে মনেব আনন্দে চুরুট জ্বালিযে নিলাম—বাইবেব বাতে কৃষ্ণচূড়োব ডাল থেকে নবম সবুজ অন্ধকাব ঝবে পড়ছে। চুরুট জ্বালিযে মনে হল অবিনাশ ঘোষাল যদি একটা [...] কবতে পাবত, [...] একটা আব [...] যদি অবিনাশেব পেছনে একটা সুন্দব স্তম্ভেব মতো দাঁড়িযে থাকত।

কিন্তু এ প্রশ্নেব আমোদ মুহূর্তেব ভিতবেই শুকিযে যায, অমলা চৌধুবীকে নিযে এবকম ঠাট্টা কবা চলে না, এবকম ঠাট্টা কবে কোনো লাভ নেই, মানুষেব স্বাভাবিক দুর্বলতা শুধু নাবীব ওপব আবোপ কবে সংসাবেব খেলাও জমে না, কুযাশাব খেলাও না, সংসাবে জীর্ণতাব খেলাও না। কিছুই ভাবে না আব ধূসব বা আধুনিক কোনো কবিতাই। অবিনাশ ঘোষাল শুযাব হযেছে না সিংহ হযেছে—কিছুতেই কিছু আসে যায না তাব।

এই কথাই ঠিক। প্রতিবাদ করে বা ঠাট্টা করে এই স্বাভাবিক, মাঝে-মাঝে আমার হৃদয়ের কাছে এই বিমর্ষ সত্যকে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।

অমলাকে আমিও অনেকদিন ধরে অনুশীলন করিনি। কিন্তু অনুশীলন করলেও শেষ পর্যন্ত সে আমার অপেক্ষা করত কি? বাবলা গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালাব সঙ্গে হিজলের ডালপালার যে করুণ ও আশ্চর্য গন্ধ ধরা পড়ে নক্ষত্রের হিম রাতে জীবনের নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে সেই রহস্যময় ঘনিষ্ঠতা আমাদেব দুজনার জন্য নয়।

এক-এক সময় আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এ পৃথিবীতে আমার জন্য কে রয়েছে? অমলা তার নিবাপদ দুঃসাধ্য মেহগিনি কাঠের কারুকার্যের মতো সুন্দর আশ্চর্য পুরুষ মানুষকে অনেকদিন হয খুঁজে পেয়েছে। তাদের জীবন এ পৃথিবীর পথে ব্যবহৃত হয়ে হয়ে ধূসর হয়ে চলল প্রায। কিন্তু আমার জীবন বিবর্ণ হয়ে, বিবর্ণ আস্বাদের ভিতর দিয়ে, না তা নয়, তোমার জীবন ধূসর হল।

বাইরের অন্ধকার থেকে সে চলে আসে। টেবিলেব ল্যাম্পের আলোয তার মুখ দেখি। করুণার মুখ। তার শরীর হিম, তার শরীরের রং মুমূর্ষু কার্তিকের ঘাসের মতো হলুদ, তার দেহ মাংসের নয়, হাড়েব নয, কৃষ্ণচূড়া গাছের ক্ষীণপ্রাণ, অল্পাবয়ব শাখার, সে-শাখা আজ আছে, কাল থাকবে না, এই মুহূর্তে আছে, পরের মুহূর্তে তাকে দেখব না আর।

মশারির দিকে তাকাই, সেই ধূসব মশারির দিকে। আমার ঠাকুরদার পালঙ্কটাকে আশ্রয় [কবে] একটা মস্ত বড় স্থবির পাখিব মতো বেঁচে আছে কি মরে গিয়েছে এই অন্ধকারের ভিতব বুঝতে পারা যায না কিছু। এই মশারির ছায়ার ভিতর প্রেম নয, কামনা নয়, শক্তির আনন্দ নয়, প্রতিভার গৌরব নয, অনেক দিন থেকে করুণা আমাব ঘরের ভিতর বাসা বেঁধে রযেছে।

অনেক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে তারপর একটি জীবন্ত শিশুকে অনেকদিন হয সে বাঁচিযে রেখেছে। কিন্তু আমি জানি বড় প্রদীপটি নিববার সঙ্গে-সঙ্গে ছোট দীপটিও নিভে যাবে। বেশিক্ষণ নেই আর। এদেব কেউই অনেকক্ষণের জন্য আমার কাছে আসেনি। তাবপব আমার ঘব অন্ধকাব হয়ে যাবে আবাব, করুণাও বিদায নিযে চলে যাবে।

একদিন আঁকাবাঁকা রহস্যময কঠিন ধাতুব ভযাবহ আশ্চর্য সিঁড়িব মতো প্রেমেব আস্বাদ পেযেছিলাম জীবনে, সেই সিঁড়ির পথ ধরে বেদনা ও বিপদেব ভিতর দিয়ে অবশেষে নক্ষত্রের মতন সফলতা পাওযা যেত।

তারপব অনেকদিন হয় আরেক পথ পেয়েছি, আঁকাবাঁকা উঁচু সিঁড়ির মতো নয, ধাতু নয, কঠিনতা নয, বহস্য নয, সে আমাব কাছ থেকে কিছু দাবি কবে না, কোনো বিপজ্জনক দুঃসাহসেব নিঃশব্দ মাযাবীব প্রাসাদেব চাবিদিকে ঘুরে বেড়াবার হৃদযকে কখনো অঙ্গাবেব মতো লাল, কখনো খড়েব মতো শুষ্ক বোধ কববাব কোনো প্রযোজন নেই আব।

তাকে পেযেছি, সে শুধু মৃত সন্তানের জন্ম দেয। মৃতের শিযরে বসে মৃত্যুকে জীবন বলে বাববাব ভুল করে সে, অন্ধকারের ভিতর হেঁটমুখে বসে জবাযুব সন্তানের স্পন্দন অনুভব করে যে, অমলা চৌধুরীকে প্রথম দেখে যে রকম স্পন্দন অনুভব কবেছিলাম আমি, ঠিক তেমনি, অন্ধকারের ভিতব সে আর খুকিটি পাশাপাশি পুকুরের দিকে চলে যাচ্ছে দেখতে পেলে আমার হৃদযের সবচেয়ে কঠিন স্নাযুও বিষণ্ন শিশিবের মতো কোমল হয়ে আমার সমস্ত আত্মাকে পরিব্যাপ্ত কবে ফেলতে চায। এক ঘবে থেকেও বাতেব ঘুমেব ভিতর বারবাব যাব মুখের স্বপ্ন দেখি আমি, যেন কোন নিরবচ্ছিন্ন সমুদ্রেব ওপারে অন্ধকারের ভিতর বসে রযেছে সেই মুখ, পৃথিবীর কোনো সেতুই সেখানে আমাকে পৌঁছিযে দিতে পাবে না আব। যে হাবিযে যায, নিশ্চযই হারিযে যায, একবার হারিযে গেলে কোনোদিন যাকে ফিরে পাওযা যায় না আর।

এই সমস্ত করুণার পথ ধরে জীবন চলেছে আমার।

দিনের সমস্ত কাজ ফুরিযে গেলে আজও আমি পড়াশুনা করি, মাঝে-মাঝে। কবিতা পড়ি, প্রেমের কবিতা পড়ি, গল্প পড়ি প্রণযের গল্প, মাঝে-মাঝে আমাকে অনেক রাত অবদি জাগিযে রাখে। অমলা চৌধুরীব কথাও মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। সকালবেলার কমলারঙের মেঘ, সন্ধ্যাব জাফরান মেঘ, প্রান্তরের ঘাস, ঘাসের মতন আকাশের নক্ষত্র, নদীর দেশের জলের ধূসর নরম এই সব ছবি, অমলার বেতেব ফলের মতো ম্লান চোখ ও অজস্র চুলের বাশিকে স্মরণ করিয়ে দেয় আজও। স্মরণ করিযে দেয তার রূপের নারীর জন্ম পর্যন্ত দেয়, এক-এক সময মনে হয যেন তার নিঃশ্বাসের কোমল গন্ধ পাচ্ছি, যেন তার মুখ আমার চোখের স্নায়ু উপস্নায়ুকে [...] মতো এসে গভীরভাবে পান করে গেল। হৃদযে কামনা ও বেদনার কোন কুজ্ঝটিকার জন্ম হল যেন।

আজও আমি এই সব অনুভব করি। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় না এই পথ দিয়ে চলতে-চলতে কোনোদিন নক্ষত্রেব দরজায গিয়ে পৌঁছতে পারব। কিন্তু প্রতিটি বার যখন দেখেছি একটি মৃত সন্তানকে,

একটি হিম মৃত, মাংসহীন কুযাশাব শবীবকে এখনই যে কাঠেব বাক্সেব ভেতব ভবে ফেলতে হবে, তাকে বুঝতে পাববে না, তা তাকে বুঝিযে দিতে হবে...কিন্তু বুঝিযে দিলে অনেকক্ষণ পবে তাবপবে সে তাকে নিজেব হাতেই বাক্সেব ভেতব সাজিযে বাখছে, ছোট মেযে যেমন পুতুলকে ঘুম পাড়িযে বাখে ঠিক তেমনি তন্ময়তা ও বিশ্বাসেব নিস্তব্ধ ব্যবহাবেব সঙ্গে শিশুটিব জন্য যে সুন্দব বঙিন বেশমেব জামা তৈবি কবেছিল সে তা পবিযে দিচ্ছে, যেখানে যে কটা ফুল পাওযা যায, হৃদযেব আন্তবিক বিশ্বাসে সজনে ফুল পর্যন্ত এনে কাঠেব বাক্স সাজিযে দিচ্ছে। শ্মশানেব থেকে ফিবে এসে যখন দেখেছি তাব পা দুটো, শালিখেব হলুদ পাযেব মতো বোগা, শীতেব বাতেব চাদবেব ভিতব থেকে বাব হযে আছে, সে ঘুমিযে আছে। কখনো দেখেছি লণ্ঠন হাতে অন্ধকাবেব ভিতব দিযে একা-একা সে চলেছে, কোথায চলেছে জানি না, কেন চলেছে জানি না, কিন্তু তবু জানি ঠিক ফিবে আসবে সে। আধঘন্টা একঘন্টা দুঘন্টা পবে লণ্ঠন হাতে আবাব ফিবে এসেছে সে। কোনো এক পড়শিনীব বাড়ি শনিপূজো দেখতে গিযেছিল। কী হযেছিল না-হযেছিল সে কথা বলতে বলতে কথাব চেযেও হাসি, হাসি ফেনিযে উঠছে অনেক বেশি তাব। সমস্ত মানবীয মুখ ছিড়ে ফেলে যেন এক অশবীবী হাসি জন্ম নিযেছে। রূপালি, সোনালি, কলববহীন, কুযাশাব দেশেব কেমন এক বীজশূন্য শেকড়শূন্য ববফেব উড়ন্ত মেঘেব মতো হাসি। পথে, চলাব পথে কোনো এক পুকুবেব কিনাবেব জামগাছেব এক বাশ জাম কুড়িযে এনেছে তবুও যে—বলতে-বলতে হাসি নিবিযে, মানবীয জগতে ফিবে এসেছে যেন আবাব। আমাব টেবিলেব ওপব একবাশ বৃষ্টিভেজা জাম ছড়িযে বাখছে, পৃথিবীব মানুষীব মতো, কিংবা (মনে কবতে পাবো) কুজ্ঝটিকাব থেকে দুদিনেব জন্য তোমাব ঘবেব আশ্রযে উড়ে এসেছে সেই পাখিব মতো—কিন্তু প্রেতিনীব মতো তাকে মনে হবে না কখনো। তাব দিকে তাকিযে তাব ভাঙা চোযাল, মাংসহীন হলুদ মুখ, আচমকা অন্ধকাবেব ভেতব কখনো ভযেব বোমাঞ্চ জাগিযে তুলবে না। তাব বোগা হাত, পাখিব ঠোঁটেব মতো তাব মুখেব অস্তিত্ব, বাববাব পাখিব কথা মনে কবিযে দেয। কবেকাব কোথাকাব কোন অমৃত ঝড়েব আঘাত যাকে ক্ষুণ্ণ কবে পাঠিযে দিযেছে তোমাব কাছে, কোন অনুদ্দিষ্ট অমৃত হাত ডানা কেটে ছেড়ে দিযেছে তাকে—উঠানেব থেকে ভিতবে, ভিতবেব থেকে উঠানে, এ-বাড়িব থেকে সে-বাড়ি, অন্ধকাবেব থেকে আলোব ভিতব, দিনেব থেকে বাতেব কিনাবায, পাখিব মতো নিঃসঙ্গ নিঃসহায পাবেব আশ্রযে যে আজ ঘুবে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তবুও একদিন ডানা গজাব তাব, একটা পাযবাব দুটো ডানা যেমন আস্তে-আস্তে আঁধাব গজিযে ওঠে, প্রেতিনীব মতো নয, পাখিব মতো, একদিন আকাশেব আলোব ভিতব—একদিন অন্ধকাব নক্ষত্রেব ভিড়ে হাবিযে যাবে সে।

দুদিনেব জন্য এসেছে। আব তাব মেযেটি এসেছে দু-দণ্ডেব জন্য এই যে কেমন একটা অনুভব কিছুতেই ছাড়িযে উঠতে পাবি না আমি। সাবাদিন পথেঘাটে মেযেটিকে হাবিযে থাকি বাতেববেলাও তাকে কাছে পাই না, সেও যেন জানে শিগগিবই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। অন্ধকাবেব ভিতব আমাব জন্য করুণাব গন্ধ বেখে যাবে সে। মৃত সন্তানদেব স্মৃতি, ছোট-ছোট সাজানো বাক্সেব ছবি, শ্মশানেব মাটিব ভিতবে ছোট-ছোট গহ্বব, নিস্তব্ধ ধূসব মশাবিব অন্ধকাবেব ভিতব কতদিন একটা নীবব লণ্ঠন এদিকে-সেদিকে ঘুবে বেড়াত। তাবপব অদৃশ্য হযে গেল, কোনোদিন ফিবে এল না আব, এই সব ছবি আমাব জন্য বেখে যাবে। অন্ধকাবেব পথ দিযে তাব লণ্ঠন চলেছে দেখলে আজই আমাব মনে হয, চলতে-চলতে চলছে না আব, না-ফিবে আসবাব ফিকিব খুঁজছিল যেন এতদিন, জ্বলন্ত আগুনেব দিকে তাকিযে-তাকিযেই আমাব মনে হয নিভে গেছে যেন, ধোঁযাব গন্ধ পাচ্ছি। চিমনি ঠাণ্ডা হযে পড়ে আছে—ঘবেব কোণে মাকড়সাব জালেব ভিতব লণ্ঠনেব হিম কঙ্কাল চোখেও দেখা যায না আব। জ্বলন্ত লণ্ঠনেব দিকে তাকিযে-তাকিযেই এই সব ধূসব ছবি দেখি আমি।

তাবপব কোনোদিনও কেউ কাবো দেখা পাবে না আব। কিন্তু তবুও জীবন ও মৃত্যুব কোনো প্রভেদ সে যেন খুঁজে পাবে না। জীবনেব দিনগুলিও পর্দাব ওপাবেব এক মৃত্যুশয্যায শুযে-শুযে কাটিযে দিচ্ছে যেন সে। বাত জেগে আমাব জন্য অপেক্ষা কবে না সে। সকালবেলা আমাব টেবিলেব ওপব আস্তে-আস্তে—আস্তে-আস্তে ঘুমিযে পড়ে সে। যে-মৃত্যু মানুষকে চিবদিনেব জন্য জীবিতেব কাছ থেকে সবিযে বাখে, মেযেটিকে সেই মৃত্যু আজই যেন অধিকাব কবে নিযে গেছে।

প্রতিদিনই গভীব বাতে বাসায ফিববাব সময লজনচুস বা বিস্কুট মেযেটিব জন্য নিযে আসি আমি। সকালবেলা এসব কিছু খেতে চায না সে। দুপুবে তাব মা তাকে দু-এক টুকবো বিস্কুট, এক-আধটা লজেনচুস খাওযায, সাবানেব দোকানে কাজ কবতে-কবতে এই কথা ভাবি আমি। মনে হয, যেন জীবিত পৃথিবীব জিনিশ মেযেটি মৃতেব দেশে চলে যাচ্ছে।

একদিন সোনালি চিলেব মতো আকাশেব দিকে উড়েছিলাম পৃথিবীব কুহক দেখবাব জন্য, বৌদ্রেব মতন গভীব বক্তিম প্রেমকে আস্বাদ কববাব জন্য, কিন্তু কোথাব থেকে মা ও মেযে এসে আমাকে শিকাব কবে নিযে গেল।

তারপর হেমন্তের সন্ধ্যায় মনের ভিতর কেমন যেন বিষণ্নতা এল। অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে আছি, অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই নিস্তব্ধ বিছানায় মৃত্যুর শয্যার মতো শান্ত ও নিশ্চেষ্ট—আমার হৃদয়ের ভিতরেও জীবনের গন্ধ যেন আর-কিছুই নেই। সারাটা দুপুর অফিসের কাজকর্মের ভিতর কেমন যেন বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, এখন তাও নেই। জানালার পাশে কৃষ্ণচূড়ার ডালপালা ঘুমিয়ে গেছে। শেষ শালিখ ঘরে ফিরে গেছে তার। হৃদয়ে আমার বিষণ্ন শান্তির জন্ম হয়েছে, বিষণ্নতাটুকুও আস্তে-আস্তে মুছে যাচ্ছে যেন। তাহলে এখন যদি আমি ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ি, তারপর অনেকক্ষণ পরে এই ঘরের ভিতর কোনো এক মানুষ এসে যদি বলে—কী করে যে মারা গেল তা তো বুঝতে পারলাম না—কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে হেমন্তের মনে হয় ঘুমিয়ে আছে যেন। মৃত্যুর এরকম পরিতৃপ্ত শান্ত রূপ তো বড় একটা চোখে পড়ে না, এই বিছানাটাও যেন মৃতের শয্যার মতো। পৃথিবীর পথে কোনোদিন কোনো বিছানাকে এমন আশ্চর্য অনুভূতির মতো মনে হয়নি। আজ এই সন্ধ্যার সময় মাঠের ঘাসে যে সব পাতা ঝরেছে, তাদেরই ক্ষণিক আভা এসে যেন এই বিছানা তৈরি করেছে। তৈরি করেছে এই মৃত মানুষটিকে, তারপর হয়ে গেছে সব নিশ্চল, হিম, শান্ত। শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদের আলোয় দেখা যায় বাইরে মাঠে অনেক ঝরা পাতা পড়ে রয়েছে, আর ঘরের ভিতর এই মৃত বিছানা ও মানুষ, এদের বিচিত্র নীল আত্মীয়তা আমি বুঝতে পেরেছি। অনেকদিন আমি এরকম আশ্চর্য নীল চেহারার ছবি দেখিনি, হৃদয়ে এরকম শান্তির গভীর আভা বোধ করিনি।

ভাবতে-ভাবতে মনের ভিতর নির্জন আমোদের ছটা ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর, অনেকক্ষণ পরে, বিছানার থেকে উঠে বসলাম আমি, ধীরে-ধীরে টেবিলের কাছে এসে বসলাম। আমি বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিলাম বলে বুঝতে পারা গেল সংসারও আজ বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

অফিস থেকে অনেকক্ষণ হয় ফিরেছি, কিন্তু রাত হতে চলল। তবুও এক কাপ চাও এ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। চেঁচাতে যাব না, এক পেয়ালা চায়ের জন্য চেঁচামেচি করে জীবনের, সাংসারিক জীবনের খানিকটা নমুনা এই শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে এনে দাঁড় করাতে চাই না আমি।

শীত করছে, এবার শীত আগেই পড়েছে যেন। দেশে এবার শীত খুব আগেই চলে এসেছে। অফিস থেকে এসে জামাজুতো সমস্তই ছেড়ে ফেলেছি, একটা গেঞ্জি পর্যন্ত গায়ে রাখিনি, শরীর যেন জন্মের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। বাস্তবিক আমি কি মরে গিয়েছিলাম? মনে হয় যেন মৃত মানুষের স্নায়ু উপস্নায়ুর ভিতর থেকে জীবন্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা, তাদের গায়েও যেন কেমন মৃত্যুর গন্ধ ধীরে-ধীরে ফুটে বেরুচ্ছে। নিজেকে আমার এখন এই রকম মনে হয়।

জানালার ভিতর চিরে শীতের বাতাস একটা কর্কশ রোমশ জন্তুর মতো এসে আমার মাংস আস্বাদ করে আনন্দ পাচ্ছে। এইবার আমি সম্পূর্ণ প্রাণের পথে ফিরে এসেছি। নিজের মাংসের শীত আস্বাদ, মাংসের ভিতর কেমন একটা কর্কশ রোমশ জানোয়ারের ঠাণ্ডা জিভ ও দাঁতের অসংযম আনছে, বোধ করছি, মৃত্যু অনেক দূরে চলে গেছে তাহলে।

এইবার উঠে পড়া যাক, একটা গেঞ্জি অন্তত গায়ে দেই। একটা ফ্লানেলের টি শার্টের দরকার হবে হয়তো। বিছানার দিকে তাকিয়ে মনে হয় সেও যেন অন্ধকার ও শীত সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে। ধীরে-ধীরে প্রাণের পথে ফিরে এসেছে আবার। সে যেন মোটেই আর মৃতের বিছানা নয়, বাইরের অন্ধকার থেকে ভেসে এসে একটা ফড়িং তার বুকের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। ফড়িংয়ের সঙ্গে, অন্ধকারের সঙ্গে, জানালার সঙ্গে, আমার সঙ্গে যে সব কথা বলেছে, সে তা শান্ত সুন্দর কথা সব কিন্তু মৃত্যুর কথা নয়। একবার খানিকক্ষণ বাতাসের আঘাতে উড়ে ছিটকে গিয়ে, আবার উড়তে-উড়তে বিছানার চাদরটা যেন বলছে সে বরং জানালার ভিতর দিয়ে ফড়িঙের মতো, পাখির মতো, অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে যাবে। নক্ষত্রের ভিড়ে মুখ লুকাবে গিয়ে, কিন্তু তবুও—

—'বা, বেশ মানুষ তুমি।'

চমকে উঠলাম। 'তুমিই—বা কে?'

—'কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, হুশ নেই, খালি গায়ে বসে কোন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছ?'

—'ও নির্মলা যে, এতক্ষণ পবে চা দেবাব কথা মনে হল।'

—'মহাপুরুষ অফিস থেকে ফিবেই নাক ডাকতে শুরু কবলেন যে।'

—'নাকই ডাকছিলাম?'

—'দু-একটা কানমলা দিযেও তো তাল কেটে দিতে পাবলাম না।'

—'আমি তো নাক ডাকিযে ঘুমোই না নির্মলা—কিন্তু আমাব যতদূব মনে হয আমাব ঘুমও হযনি।'

—'যে কানমলা কটা দিযেছিলাম, টেব পেযেছিলে তাহলে?'

—'দিনে ঘুমবাব অভ্যাস আমাব নেই, আজ অফিস থেকে ফিবে এসেও ঘুমোইনি, কী হযেছিল জানো—'

—'বেশ কানমলাগুলো যে মাঠে মাবা যাযনি এ জেনে আমি ভাবি খুশি। নাও নাও, চা ঠাণ্ডা হযে গেল।'

—'চা এনেছ? কোথায?'

—'চোখেব মাথা কি একেবাবেই খেযেছ? তোমাব টেবিলেব পাশে জুড়িযে গেল যে।'

—'অন্ধকাবেব ভিতব একটা লণ্ঠনও জ্বালো না তোমবা।'

—'মিছেমিছি তেল খবচ কবে কী হবে? দেখবাব শুনবাব যা, তা অফিসেই শেষ হযে গেছে, এখন চোখ বুজে বসে-বসে মশাব কামড় খেতে পাব।'

—'সাপেব কামড় যদি খাই?'

—'তাবা মানুষ চেনে, কাটলে আমাকেই আগে কাটবে, তোমাব সে আশা নেই।'

—'আশা বলছ?'

—'তবে কি ভয বলব? কোনো বকমে ওপাবে চলে যাওযাব একটা পথ খুঁজে পেলে সংসাবেব সমস্ত ভযই তো চুকে যায বাপু।'

এতক্ষণে চাযে চুমুক দিলাম।

—'চাযে চিনি দাওনি নির্মলা, একটু মিষ্টি লাগবে।'

—'কোনো দবকাব নেই, ব্লাড সুগাব হবে।'

— একেবাবেই মিষ্টি নেই, আমাব একটু চিনি চাই।'

—'আমি কাছে বসে আছি, এব পবেও চিনিব কোনো প্রযোজন থাকতে পাবে?'

আব-একবাব চাযেব পেযালায গলা ভিজিযে নিযে—'ভাবী চমৎকাব গিন্নি হযেছ তুমি।'

—'বটে।' অন্ধকাবেব মধ্যে হন হন কবে বেবিযে গেল, মুহূর্তেব মধ্যেই আধসেব আন্দাজ চিনি এনে আমাব চাযেব পেযালাব মধ্যে ঢেলে দিযে—

পেযালাটা এক আধবাব ঘুবিযে টেবিলেব এক কিনাবে বেখে দিলাম।

—'অদ্ভুত মানুষ তুমি।'

—'তোমাব মতন হতচ্ছাড়া পুরুষ কোনোদিনও আমি দেখিনি, সংসাবটাকে উচ্ছন্নে দেবে।

—'যদি বলো, একটা চুরুট জ্বালাই?'

—'এই কনকনে ঠাণ্ডাব মধ্যে গাযে একটা জামাও দেবে না তুমি?'

—'তুমিও তো বেশমেব জামা পবে আছো শুধু।

—'অত যদি দবদ হযে থাকে তো ফ্লানেলেব কিনে দিলেই পাব।'

—'ধোকা লাগিযে দিলে, আচ্ছা চলো, তোমাব বাক্স খুলে দেখা যাক।'

—'চাবি দেব না।'

—'এই গেল শীতে যে তোমাকে চাব-পাঁচটা গবম জামা তৈবি কবে দিলাম, কোথায গেল সে-সব?'

—'তুমি অত্যন্ত ইতব, কী কবে দিযেছ না-দিযেছ তাও মনে কবে বাখ? মেযেমানুষেব বাক্স খুলতে চাও—যাও আমি গরম জামা গায দেব না, আমাব শীত লাগে না।

'শীত লাগে না? সাপেব জাত তোমবা—শীত লাগবে না? দাও আমাব গেঞ্জি আব ফ্লানেলেব শার্টটা দাও তো।'

দেবাজ টেনে চুরুটেব বাক্স বেব কবলাম। 'আসল কথা কি জান, বেশমেব ব্লাউজ আর বঙিন শাড়ি, নির্মলা তোমাদেব শাড়িব অত নামও আমি জানি না। পবে তোমবা সব সময পুঁজিপতি হযে সেজে থাকতে চাও, সেজন্য যদি তোমাদেব নিউমোনিযাও হয তাতেও তোমাদেব আপত্তি নেই, নাও একটা আলো জ্বেলে দাও।'

না, সে মুষড়ে যাযনি, তাব হৃদযেব ভিতব বহস্য বযেছে, সকলেব পক্ষে তাকে চেনা কঠিন, আমাব পক্ষেও অনেক সময। ঘাসেব মতন তাকে মাড়িযে যদি চলে যাও আবাব খানিকক্ষণ পবে সজীব, সহজ

ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে সে। পৃথিবীর ঘাস-পাতা-রৌদ্রের দুপুরের নিস্তব্ধ একাকী পাখির তবুও কেমন সচ্ছল আভা থাকে, সেই পাতার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে তাকে।

—'আলো দিয়ে কী করবে?'

—'পড়ব।'

—'দিনরাত অফিস আড্ডা পড়াশুনো নিয়েই থাকো তুমি।'

—'তবুও দশটা বদখেয়াল নেই, তা যদি থাকত তাহলে কোথায় দাঁড়াতে তুমি? নাও নাও, গেঞ্জিটা দাও।'

—'আমার দাঁড়াবার জায়গার অভাব হত না। আমি সেধে আসিনি, পায়ে সেধে আনা হয়েছে। এরই মধ্যে সে সব ভুলে যাবার তো কথা নয়। নাও গেঞ্জিটা নাও, আর এই তোমার ফ্লানেলের পাঞ্জাবির শার্ট।'

—'অফিসে থেকে [?] হয়তো তোমারই জন্য আমি একা যদি থাকতাম।' গেঞ্জিটা আস্তে-আস্তে গায় দিলাম।

—'একা থাকবার মতো পুরুষমানুষ তুমি নও।

—'ছেলেপিলে একটিও নেই, একজনও মানুষ নেই এই বাড়িতে আর, শুধু তুমি আব আমি, কিন্তু এটুকুর জন্যও আমাকে বোজ-বোজ অফিসের নির্যাতন সহ্য করতে হয়, এখন বুঝেছি, মেয়েমানুষ যতই সামান্য মেয়েমানুষ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত একজন মেয়েমানুষ তো বটে, পুরুষের জীবনে সে [...] চালকুমড়োর মাচার মতো।' বলে একটু হাসলাম।

তারপর আলোয় দেখলাম নির্মলাও হাসছে। সব কটা নয়, এক আধটা দাঁতের কিনারা দেখা যাচ্ছিল শুধু। আর তাব মনের কিনারায তা হযতো আমি দেখছি, হযতো দেখতে পাচ্ছি না। হযতো দেখতে চাচ্ছি না। তাকে কাল তো বিযে করিনি—বিযেব পব ছ-সাত বছব চলে গেছে। কোনো মায়াবীব প্রাসাদে সে এখন আর বাস করে না। আমিও দিনেদুপুরে ঘোড়া ছুটিযে সেই প্রাসাদকে খুঁজে বাব করবার জন্য বিষণ্ন চোখে বেরিয়ে পড়ি না। হায, সে প্রাসাদ পৃথিবীতে নেই আজ আর—সে ঘোড়াও কতদিন হল মরে গেছে।

—'গেঞ্জিটা এঁটেই বসে রইলে?'

—'কী করব?'

—'অবছ কী?'

—'কিচ্ছু না।'

—'জানালাব দিকে তাকিযে শীতেব কামড় খেতে ভালো লাগে? ফ্লানেলের শার্টটা গায দাও।'

—'না, এমন কিছু শীত নয।'

—'কথা না বলে মানুষ যখন ভাবে তখন আমাব বড্ড বিবক্ত লাগে। শার্টটা গায দিলে?'

—'তুমি তো বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো, জানি না এ যে কী বকম ভালোবাসা। পুরুষমানুষ হযেও পুরুষদেব সব ভালোবাসাব মানে বুঝি না আমি। মেযেদেব ভালোবাসার তাৎপর্য ধববার শক্তি আমাব নেই।' ফ্লানেলের শার্টটা গায দিতে দিতে—'মেযে হোক, পুরুষ হোক, মানুষের হৃদযের সব ভালোবাসাই সব সময এক জাযগায দাঁড়িযে থাকে কি? হযতো বাড়ে, হযতো কমে যায, হযতো নতুন জিনিশ হযে দাঁড়ায।' নির্মলাব চোখেব দিকে তাকিযে—'এমনই নতুন জিনিশ হয় যে তাকে ভালোবাসা বলতে পাবা যায না আব, অন্য একটা নাম দিতে হয।'

—'কী নাম?'

—'আমার মনে হয করুণা।'

অন্ধকারেব ভিতব সে কোনো উত্তব দিল না। বুঝতে পারলাম না আমাব কথা সে বুঝেছে কীনা।'

—'আচ্ছা নির্মলা?'

—'শীত করছে না তো?'

—'না, তোমাব কবছে?'

মাথা নেড়ে—'না, তবে জানালাটা বন্ধ কবে দিলে হয।'

—'না, না, জানালা বন্ধ করো না, টেবিলের পাশে এইখানে বসে সমস্ত আকাশটা দেখতে পাচ্ছি আমি, আমার মনে হয আমি শুধু তোমার সঙ্গেই কথা বলছি না, এই আকাশ ও অজস্র তারাব সামনে বসে যত তুচ্ছ কথাই বলি না কেন, সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎকে [..] করে কথা বলছি যেন, হৃদযের ভিতব কেমন একটা গাঢ়তা আসে তাই—জানালা বন্ধ করলে মনে হবে যেন আমি যে কোনো নারীর যে-কোনো স্বামী, তুমি যে-কোনো স্ত্রী যে-কোনো পুরুষের, একটা আশ্চর্য গাঢ়তা ও বিস্ময়ের আবহাওযা নষ্ট হয়ে যাবে। অন্ধকারে ইঁদুরেব মতো মনে হবে আমাকে। ইঁদুর দম্পতির মতো মনে হবে আমাদেব। সে

ভয়ানক বিশ্রী জিনিশ, এর চেয়ে বিশ্রী আর-কিছু হতে পারে না।'

ঘুরে ফিরে আবার সেই কথা নির্মলা—'আমাদের বিয়ে হয়েছে ছ বছর, মনে আছে?'

'ছ বছরই হোক, তার সঙ্গে কীসের কী সম্পর্ক?'

'তুমি বলছ, আজও তুমি আমাকে ভালোবাস? মিছেমিছি কথা বাড়িয়ে কী লাভ, মেনে নিলাম। কিন্তু বিয়ের আগের কয়েকটা দিনের কথা মনে কর।'

—'বিয়ের আগের?'

—'প্রায় বছর সাত আগে সেই একশো দুই নম্বর বাড়িতে তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে কেমন যেন একটা চমক ধরে গিয়েছিল। আমার সম্বন্ধে তোমারও বোধহয় সেই রকম একটা কিছু হয়েছিল? কিন্তু তুমি চমক লাগিয়েছিলে, হয়তো চমক বোধ করনি?'

একটু চুপ থেকে—'চেহারার ভিতর আমার এমন কিছু ছিল না যাতে নারী চমক খায়।' জানালার ভিতর দিয়ে অনেকদূরের নক্ষত্রের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললাম—'সে যা হোক, বিয়ের আগে তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে কোনো এক উচ্চ কারুকার্যময় জানালার পাশে মহীয়সীর মতো বসে রয়েছ তুমি, নিজেকে এরকম করে ভেবে দেখবার অবসর তোমাকে আমি দিয়েছিলাম, তা তোমার প্রাপ্য মূল্যমাত্র, তোমাকে তা দিতে আমি একটুও কুণ্ঠিত হইনি।'

—'চাকরটা হয়তো এসেছে।'

—'কিন্তু তখনকার সেই জানালার পাশে সেই মহীয়সীর মুখ আমাকে দেখে কোনোদিন বিষণ্ন তিক্ত হয়ে উঠেছে বলে তো আমার মনে পড়ে না। বরং মনে হয়েছে আমার সান্নিধ্যে তোমার প্রতিটি মুহূর্ত যেন চঞ্চল অণু পরমাণুর মতো কেঁপে উঠবে, তোমার এক-একটা দিনকে আশ্চর্য জাফরান মেঘের মতো সাজিয়ে দিতে।'

অন্ধকারের ভিতর তার কাছ থেকে কোনো উত্তর প্রত্যাশা করছিলাম না। সেও নিস্তব্ধই রইল।

বললাম—'আমার ভাষা কেমন বেখাপ্পা, তবুও তোমাকে বলি, এক-একটা দিন এক-একটা রৌদ্রময় ফিরোজা রঙের বাগানের মতো মনে হত আমার তখন, তোমার মুখ দেখেছি বলে।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে—'কিন্তু এখন সে-কথা শুনবার জন্য আমার মনে হয় তুমি প্রস্তুত হয়েছ, সে-কথা পরে নয় পরন্তু নয়, মমতাহীন তামার মতো কেমন একটা ধাতব কঠিনতা যেন তার ভিতর, কেমন একটা তামসিকতার গন্ধও যেন।'

—'জানি, কী বলতে চাও তুমি।'

—'তাহলে তুমিই বলো।'

—'তোমার সেই ফিরোজা রঙের বাগান আগাছার জঙ্গল হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ।'

—'না, না, অতটা নয় নির্মলা।' লজ্জা পেয়ে হাসতে-হাসতে চুরুটের বাক্সটা কাছে টেনে আনলাম—'তুমিই বরং বলতে পার, আমি তোমার কাছে আজ জঙ্গলের একটা আগাছার মতো।'

নির্মলার গলায় ঠাট্টা লাফিয়ে উঠল—কিন্তু কী যে বলল একটা আচমকা দমকা বাতাসের আক্রোশের ভিতর মুছে গেল সব। একটা অক্ষরও ধরতে পারলাম না। ধরতে চাচ্ছিলামও না আমি।

সত্য যা তা সত্য, আমি জানি, আমার ঈশ্বর জানে, নক্ষত্র আকাশ কৃষ্ণচূড়াগাছের নরম নিভৃত আত্মা সকলেই তা জানে। মিছেমিছি কথা বলে, কথা বলে—তবুও আবার কথা, কথা বলে কী লাভ?

বাতাসের ফুঁসুনি তখন নেমে গেছে, নিস্তব্ধতার মধ্যে নির্মলা—'কিন্তু প্রেম কি বাগানের মতো?'

—'তা হয়তো নয়।'

—'কিংবা ফিরোজা রঙের মেঘের মতো?'

—'তাও হয়তো নয় নির্মলা।'

—'তবে কতকগুলো ভুল উপমা দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাও তুমি?'

আমার হৃদয় অবসন্ন হয়ে উঠছিল, কিন্তু নির্মলার হৃদয়ের ভিতর কোনো অবসাদ নেই, আমার কাছে যা দু দণ্ডের তামাশা খেলা সে-জিনিশ যেন তার কাছে প্রার্থনার মতো গভীর, আমাদের এ কথাবার্তা যেন ধর্মের মন্দিরে বসে হচ্ছে।

গম্ভীর হয়ে—'কিছু প্রমাণ করতে চাই না আমি। তুমি তোমার ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞেস করো।'

—'তা আমি জিজ্ঞেস করেছি।'

—'যা উত্তর পেয়েছ তাই নিয়ে কেন তৃপ্ত হয়ে থাকতে পার না নির্মলা?'

অন্ধকারের ভিতর তার চোখের ভিতর কোনো বেদনা নেই, গলার স্বরও স্বাভাবিক বলেই মনে হল।

বললে—'তবে তুমি একটা কঠিন কথা গ্রহণ করো।'

—'বলো।'

—'সেই উচ্চ কারুকার্যময় যে জানালার কথা বলছিলে।' চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'হ্যাঁ বলেছিলাম কোনো মায়াবীর প্রাসাদের কোনো উচ্চ জানালা।'

—'সেই জানালার পাশে গিয়ে বসবার ইচ্ছা এখনো আমি হারিয়ে ফেলিনি।'

—'কোনো নারীই কোনোদিন হারায় কিনা সন্দেহ।'

—'আমার হৃদয়ের সমস্ত ধর্মের একাগ্রতা ও গভীরতা নিয়ে আমি আবার গিয়ে সেখানে বসতে চাই।'

চুরুটে একটা টান দিয়ে আমার মনের রহস্যময় আমোদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, আমিও যেন গম্ভীর হয়ে উঠছিলাম, বললাম—'কিন্তু এরকম ইচ্ছে আমার নেই, আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ে খেলা করবার মতো।'

—'সময় নেই তোমার? কিংবা ইচ্ছা নেই? কিন্তু তোমার ইচ্ছা না ইচ্ছা, আমার মনে হয় আমার কাছে শত বছর ধরে তা নিপুণভাবে ঢেকে রাখলেও একেবারে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারনি।'

বাঁ চোখের ভুরু খানিকটা উচকে দিয়ে—'কীরকম?'

—'আজও কোনদিকে কখন মায়াবীর প্রাসাদ জেগে ওঠে তোমার জন্য, তোমার জন্যও, সে-বিষয়ে তুমি মোটেই উদাসীন নও, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে-সব মায়াবীর প্রাসাদ তোমার জন্য এ পৃথিবীতে নেই আজ আর।'

নিস্তব্ধ ছিলাম, নির্মলার গলা যেন নিস্পৃহ ভবিতব্যতার মতো কোনো এক অন্ধকার গহ্বরের ভিতর থেকে কথা বলছে।

—'সাত বছর আগে আমি যেমন করে তোমাকে গ্রহণ করেছিলাম, তোমাকে সেই মূল্য দেবার মতো কোনো নারীই এ পৃথিবীর পথে নেই আর। তোমার হৃদয় নিয়ে খেলা, শুধু খেলা করবার আকাঙ্ক্ষাও, কোনো মেয়েমানুষ গভীরভাবে বোধ করবে না আজ।'

যেন অনুভবের প্রান্তরে ভিতর একটা সেকেলে মাঠের ফোপরের ভিতর থেকে সে কথা বলছে। কথা কটি সামান্য, কিন্তু অপার্থিব আওয়াজের জন্য রহস্যময় ভবিতব্যতায় নিজের মুখের কথা বলে মনে হয়, অত্যন্ত স্থির হয়ে বসে থাকতে হয়।

—'কিন্তু আমাদের হাসির ভিতরে অশ্রু বয়ে গেছে। হৃদয়ের উৎসাহ বেদনার মতো রঙিন—তুমি আজও ঘোড়ায় চড়ে সেই মায়ার প্রাসাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে চাও, মনে হয় যেন কোনো প্রেমিক রাজার ছেলের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়ের মতো চলেছ।'

—'কেন, আমি মোটা হয়ে গেছি বলে?'

–সাত বছর আগে এ কথা মনেও হত না আমার, কিন্তু আজ এ কথাই মনে হয়।'

—'যে আমি ভাঁড়ের মতো চলেছি, কোনো এক প্রেমিক রাজার ছেলের।'—

—'পৃথিবীর কোনো কন্যার সঙ্গে প্রেম করতে চলেছ, তুমিও প্রেম করতে চলেছ, এর চেয়ে গভীর নিরর্থক আজ কি কিছু আর থাকতে পারে?'

আমরা দুজনে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসেছিলাম। খানিকক্ষণ পরে আমি—'কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবি নির্মলা, এই রকম পুরুষ মানুষের সংস্রবে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে তুমিই-বা নিজেকে কী করে পৃথিবীর সেই গভীর চুলের কন্যাদের একজন বলে মনে করো?'

—'আমি আজ আর এই পৃথিবীর গভীর চুলের কন্যা নই।' একটু চুপ থেকে নির্মলা—'কিন্তু তবুও তোমার এই ছোট হলদে একতলাটা মাঝে-মাঝে ভেঙে ধুলোর ভিতর হারিয়ে যায় যেন।'

—'বুঝেছি, তারপর তোমার কী মনে হয় তা আমি বুঝতে পারি।'

—'অফিস থেকে যখন তুমি ফিরে আসছ দেখতে পাই, তখন তোমাকে কোনো আর প্রিন্স কুমারের মতো মনে হয় না—প্রেমিক মহাজনের মতো বোধ হয় না। মনে হয় একটা স্থূল বিদূষকের মতো। গাছ যেমন জীবনচর্যার জন্য মাটি ও রোদের ওপর নির্ভর করে তেমনি এর মুখ চেয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে।'

নির্মলার আওয়াজ পরিষ্কার, পৃথিবীর পরিস্ফুট ঘাসের মতো, অন্ধকারের স্বাভাবিক স্পর্শের মতো, অনেক দিন কোনো জীবিত মেয়েমানুষের গলায় এরকম স্বর শুনিনি আমি, পৃথিবীর পথে কোনো মেয়েমানুষের গলায়।

আমরা দুজনে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

—'তুমি আজ আর পৃথিবীর গভীর চুলের কন্যা নও?'

—'না।'

—'আচ্ছা, আমার মন যদি সব দিক দিয়ে প্রতিহত হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে সেই কন্যাকে খুঁজে বার করতে চায়?'

—'তা তুমি চাইবে না কোনোদিন—খুঁজে বার করতে পারবে না।'

—'চাইব না কোনোদিন!'

—'কোনোদিনও চাইবে না।—কিন্তু'—

—'তুমি এই রকম স্পষ্ট গলায় প্রচার করো সব—কিন্তু আমার মনের কুযাশার ভিতর কেমন একটা আশা লুকিয়ে রয়েছে।'

—'কীসের আশা?'

—'যখন দেখি কোথাও মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, উৎসবের আলো জ্বালা হযেছে, নিজেব বিছানাব অন্ধকারে শুযে যখন শুনি অনেক দূরে কোথায় যেন কনসার্ট বেজে যাচ্ছে—[...] অনেক ট্রেন, অনেক নরনারী যাওয়া—আসা করছে, অনেক আলো অনেক কোলাহল সেই সব স্টেশনে ঘুরে-ঘুবে কখনো নির্জন অন্ধকারের মধ্যে পুরোনো নাশপাতির ঘ্রাণের ভিতব, কখনো জ্যোৎস্নার ঘাসেব উপর বড় বড় গাছের ছাযা খেলতে দেখে, কখনো কোনো নারীর হাতেব পবিবেশিত পাযেসের এলাচির গন্ধে পর্যন্ত—নির্মলা আমি যেন পৃথিবী একেবারেই হারিয়ে ফেলি—আমাব যেন মনে হয়, কোথাও কোনো নতুন পৃথিবী আমার জন্য অপেক্ষা করছে—যেখানে আমাকে যেতেই হবে।'

নির্মলা খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে—'শীত কবছে, ফিরোজা রঙের চাদরটা এইবাব গায দেওয়া যাক।'

—'আরক্তিম কোনো এক কুমারের মতোই যার হযতো, তোমার কাছে যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম তেমনি, কিংবা তার চেযেও রক্তিম কামনা নিয়ে।'

—'বেশ তো তুমি যেও একদিন। আমি এই সংসারের পথে না হয অচল হযে পড়ে থাকব।'

হাসি যেন তাব অতিবিক্ত পাকা জামেব আস্বাদেব মতো, গ্রহণ করতে চাইলেও গ্রহণ কবতে পারা যায় না যেন, নিজেও যেন সে তা অন্ধকারেব ভিতব ছুঁড়ে হারিযে ফেলল। মুখ গম্ভীব হয়ে উঠল আবাব।

—'ফিরোজা রঙের এই চাদবটায বেশ মানিযেছে।'

—'আমাকে?'

—'মনে হয যেন এইবকম চাদর গায দিযেই কোনো নাবী'—

বাধা দিযে নির্মলা—'থাক, আম্যাকে অবলম্বন কবে আর কেন? আমাকে আশ্রয কবে তোমাব আর—কিছু গড়ে উঠবে না কোনোদিন।'

—'অন্ধকারেব ভিতর নাশপাতির গন্ধ তুমি কি পাওনি?'

—'কী জানি পেযেছি কিনা, অন্ধকারও হওযা চাই, নাশপাতিও হওযা চাই, তোমার মনেব খেযাল অদ্ভুত।'

—'পাওনি সে গন্ধ? কী মনে হয়?'

—'আমার কিছু মনে হয না। অন্ধকাবেব ভিতব পেযাবা [...] বা নাশপাতির গন্ধে কী মনে হবে? কিছুই মনে হয না আমাব।'

—'নির্জন রাতে বিছানায শুযে আছ, ঘবেব কোণে কোথাও কয়েকটি নাশপাতি পড়ে আছে। বাইবে হযতো জ্যোৎস্না, বাইরে হযতো মাটি ও নক্ষত্র, জানালায পর্দায ছেঁড়া-ছেঁড়া বাতাস সাবারাত খেলা করে যাচ্ছে। ঘরের ভেতর কেউ নেই। থেকে—থেকে কযেকটা নাশপাতিব গন্ধ ভেসে আসছে শুধু।'

—'দেশে এবার শীত ঢের আগে এসে পড়েছে।'

তারপব অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা।

নির্মলা—'চাকবটা ঘুমুচ্ছে।'

—'অনেক রাত হযে গেছে।'

—'আলো জ্বালিযে দেব?'

—'দাও।'

—'পড়বে? খেতে চলো আগে।'

—'চলো।'

কেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতির ভিতর সম্পূর্ণ অন্য এক পৃথিবীতে হাবিযে গিযেছিলাম যেন। অনেকক্ষণ পরে নির্মলার দিকে তাকিযে—'চলো, খেতে যাই।' তাকিযে দেখলাম, সে অন্ধকারেব ভিতর নিজেরই ক্ষুদ্র সংসারের নিস্তব্ধতায ঘুমিয়ে আছে।

অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি

টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বসেছিলাম।

রোজই সন্ধ্যার সময় বেড়িয়ে ফিরে টেবিলের কাছে এসে বসি। টেবিলের আশেপাশে আরো দু-তিনটে চেয়ার আছে। মস্ত বড় টেবিল, এক কোণে কয়েকটা আইনের বই। মফস্বলের ভাড়াটে বাড়ি, ছোট্ট নির্জন, চুনকামে চুনকামে দেওয়ালের পর দেওয়াল শুভ্র শাদা, মনে হয় যেন একটা বিরাট কাকাতুয়া উড়তে-উড়তে স্থির হয়ে বসে আছে, তারই সঙ্গে স্থির হয়ে বসে আলো নক্ষত্র নির্জনতা, জীবন ও মৃত্যুর রূপ দেখছি যেন।

অথচ আমি উকিল—উকিল তার জীবন চালাতে-চালাতে কখনো কাকাতুয়ার শাদা পালকের কথা ভাবে কিনা, আমি জানি না, কিন্তু—

রোজই সন্ধ্যায় আমি তাদের প্রত্যাশা করি যদিও, কিন্তু মক্কেল বড় একটা আসে না। আড্ডা দেবার জন্য এখানে মাঝে মাঝে লোক জমে যায় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আড্ডার ভরসাও এখানে বিশেষ কিছু নেই। অন্য-অন্য বাসায় অন্য-অন্য মানুষের হাতে সে-সবের ভার ছেড়ে দিয়ে আমি সন্ধ্যার সময় আমার এই টেবিল ল্যাম্পটার পাশে বসে চুরুট জ্বালিয়ে চুপ করে থাকতে ভালোবাসি।

কয়েকটা [থিওজফির] বই জোগাড় করেছি। এ পৃথিবীতে কিছু হল না, দেখা যাক মৃত্যুর পর কী আছে। এ পৃথিবীতে যাদের ভালোবেসেছি তাদের কেউ-কেউ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। কোথাও কি থাকতে পারে তারা, কী রকমভাবে রয়েছে, হৃদয়ের এরকম কোনো প্রশ্ন নিয়ে এই বইগুলো আমি আনিনি। এনেছি নিতান্তই সময় কাটাবার জন্য। উপন্যাস, জীবনের কেন্দ্র থেকে যে-সমস্ত উপন্যাসের জন্ম হয়, সে-সব ভালো লাগে না আজকাল আর। বরং জীবনের কিনার ঘেঁষে, মৃত্যুর অশরীরের অস্পষ্ট গন্ধের ভিতর, যে সমস্ত গল্পের জন্ম হয়, সেগুলো নেড়েচেড়ে হেমন্তের সন্ধ্যা ও রাত্তির বেশ কেটে যায় আমার। দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনলে—সে রকম শব্দ কম শুনি আমি, দিনের পর দিন সে-রকম শব্দ কমেই আসছে, ভুতুড়ে বইগুলো সরিয়ে রেখে, চকিতে একবার টেবিল ল্যাম্পটার আলোর উজ্জ্বলতা ও বৈষয়িকতার পরিমাপ করে নিয়ে মুহূর্তের ভিতরেই খানিকটা কাগজপত্র টেবিলে সাজিয়ে রেখে নিমগ্নভাবে চুরুট টানতে থাকি। কিন্তু আমি আগেই বলেছি দরজার কাছে পায়ের শব্দ আজকাল আর শোনা যায় না।

কোর্ট থেকে ফিরে এসে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরে চুরুট জ্বালিয়ে টেবিলের পাশে ভুতুড়ে বইগুলো নিয়ে বসা গেল। আমাদের সংসারে সাংসারের ডালপালা অনেক দিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে যদিও। শিগগিরই কেউ মারা গিয়েছে বলে মনে পড়ে না আমার। মা এখনো বেঁচে আছেন, এলাহাবাদে সেজদার কাছে গিয়ে থাকেন। বাবা তিনি আজও আমাদের এই পৃথিবীতে রয়েছেন—দক্ষিণ দিকের ঘরটায় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। আমার কোনো সন্তান এ পৃথিবীতে বর্তমান নেই আর। মরে গেছে বলে নেই তা নয়, পৃথিবীর এই কোমল নীল অন্ধকার ছবি অনুভব করবার মতো হৃদয়ের বেদনা আজও তারা সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি। লোকালোক পাহাড়ের আবছায়ায় আমার সেই শিশুর দল কুয়াশার ভিতর আজও ঘুমিয়ে রয়েছে—পৃথিবীর রোমশ হাত ঘৃণা মাংসের আঘাতে তাদের জাগিয়ে দেবে আমি বা আমার স্ত্রী সে-কথা ভাবতে বেদনা বোধ করি।

এ বাড়িতে শুধু বাবা ও আমার স্ত্রী রয়েছেন, বাবা ঘুমিয়েছেন, কমলা গিয়েছে চাটুজ্যেদের বাড়ির বউভাতে, রান্না সামলাতে, পরিবেশন করতে সে অনেক কাজ তার। রাত একটা-দুটোর আগে ফিরবে কী না সন্দেহ। আজ রাতে নাও যদি ফেরে, ভোরের বেলা এসে হাজির হয়, আমি আশ্চর্য হব না। আমারও সেখানে নেমন্তন্ন রয়েছে, যাব ভাবছি। কিন্তু ঘণ্টা দুয়ের আগে এ টেবিল ছেড়ে উঠতে পারব বলে মনে হয় না।

আমার বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী সবই পৃথিবীতে, এই পৃথিবীতে, আজও, কোনো এক ওপারের পৃথিবীর স্নায়ু উপস্নায়ুর স্পষ্টতা, অস্পষ্টতা নিয়ে এই গল্প, এগুলো পড়ি কেন আমি?

কোথাও পৃথিবীর পথে কোনোদিন কাউকে ভালো বেসেছিলাম। সেই নারী আমাদের পৃথিবীর পথে

আজ আর নেই, তাকে খুঁজে বার করবার কৌতূহলে রহস্যময় সিঁড়ির প্রথম অ-স্পষ্ট ধাপের মতো এই বইগুলো এনে হাজির করেছি আমি।

কিন্তু কাকে ভালোবেসেছিলাম?

কবে?

কিন্তু তাদের কেউ বেঁচে আছে কী মরে গিয়েছে, তাও জানি না। কুয়াশার ভিতর হাঁটতে—হাঁটতে যেমন থেকে-থেকে ঘাসের গন্ধ পাওয়া যায়, পুরোনো ছাড়া বাড়িতে রাত কাটিয়ে যেমন মনে হয়, রূপসী সর্পিণী অন্ধকারের ভিতর পাশেই কোথাও ছিল তেমনি তারাও রয়ে গেছে যেন—তবুও কখনো ঘাসের কোমলতায় হৃদয়কে ভরে দিলে, কখনো রূপের অহংকারে ও তীক্ষ্ণতায় হৃদয়কে আঘাত করতে পৃথিবীতে থেকেই কোনো এক অদৃশ্য অস্পষ্ট লোকে রয়ে গেছে তারা। হৃদযকে আকৃষ্ট করবার জন্য, ব্যথা দেবার জন্য রয়ে গেছে তারা যদিও আমার জানালার পাশে, এই পুরোনো বাবলাগাছের হৃদযের ভিতর থেকে যত কুয়াশা বেরোয় সে-সবের চেয়ে ঢের বেশি অসংযম অবাস্তব আবছায়া জিনিশ বলে মনে হয তাদের।

কিন্তু তবুও রযে গেছে, এমন এক-একটা হেমন্তের সন্ধ্যা আসে যখন টেবিলের পাশে এই ল্যাম্পের কাছে বসে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি, এই নিত্যনতুন পৃথিবীকে আজও আমার ধূসর পুরোনো বিস্মৃত বাড়িব মতো মনে হয় যেন—মরচে পড়া লোহার গন্ধ পাই শুধু, গন্ধ পাই মৃত ঘাসের, মৃত মাছির, অনেকদিনের মৃত তরমুজের আঘ্রাণ বাতাসের ভিতর দিয়ে ভেসে আসে—অন্ধকাবের ভিতর রাত কাটাতে-কাটাতে মনে হয় যেন এক আশ্চর্য সর্পিণীর পাশাপাশি রাত কাটাচ্ছি, মৃত ঘাসের গন্ধ পাই শুধু, মৃত পাথরের, মৃত কদম ফুলের, মৃত শেফালিকা পাতাব।

—'ভবানী!'

—'আজ্ঞে।'

—'বৌমা বাসায ফিরেছেন?'

—'না।'

—'রাত কত হল?'

—'বেশি নয়।'

—'রাত কটা বেজেছে?'

—'আটটা-সাড়ে আটটাব বেশি কি আর?'

—'ঘড়ি দেখে বলছ?'

—'ঘড়ি নেই আমার কাছে।'

—'নিজের মনের থেকে বলছ তাহলে?'

—'রাত বেশি হয়নি, এই তো সন্ধ্যাই হল, আমাব মনে হয আটটাও বাজেনি হযতো, সাড়ে সাতটা।'

—'না, তা তো নয, আমাব মনে হয় অর্ধেক রাত ফুবিযে গেল, বৌমা আসবেন কখন? বড় শীত পড়েছে।'

—'একি আপনি উঠে এলেন যে—'

—'বালাপোশে আর শীত মানাচ্ছে না, আজ-না কতই কার্তিক? বাবোই? কিন্তু এ যেন মাঘের মতো শীত পড়ছে।' বলতে-বলতে বাবা আলনার থেকে একটা কম্বল পেড়ে নিযে—'বেলা না ফুরুতেই যাই ঘুমোতে, ঘুমিযে ঘুমিযে ঘুমিযে ঘুমিযে আর কিনাবা পাওযা যায না, এই কার্তিকেব বাতগুলোব কী লম্বা পাড়ি—তুমি'—

আমি চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

—'না, উঠতে হবে না, কী করছিলে তাই জিজ্ঞেস কবছিলাম।'

—'এই বসে রযেছি আর কী।'

—'টেবিলের ওপর বই ছড়ানো দেখছি।'

—'এই একটু পড়ছিলাম।'

—'মক্কেল-টক্কেল এল কেউ?'

—'না।'

—'ভালো কথা মনে পড়েছে, এলাহাবাদ থেকে কোনো চিঠি এসেছে?'

—'দেখছি না তো।'

বাবা একটা চেয়ার টেনে বসে—'বৌমাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছলুম—তাহলে কোনো চিঠি নেই।'

—'কমলার কাছে আছে কী না তা তো বলতে পারি না।'

—'কোর্ট থেকে এসে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তোমার?'

—'না।'

—'বড় হড়োহুড়ি ভালোবাসে—বৌমার কথা বলছি, কোথাও কোনো হুজুগের টুঁ শব্দ পেলে এ-বাড়িতে কেউ আর তার গন্ধ পাবে না।'

—'কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন না বাবা।'

—'হ্যাঁ, বড্ড শীত পড়েছে, এলাহাবাদে তো আবো শীত, ওই শীতের ভয়েই আমি এখানে থেকে গেলুম, বুড়ো হাড়, শীতে বড্ড কাতর হয়ে পড়ি, তোমার জন্য চা ঢেকে বেখে গিয়েছিল বুঝি?'

—'কে, কমলা?'

—'আমাকে কয়েক ফালি পেঁপে কেটে দিয়ে গিয়েছিল, বেশ পাকা মিষ্টি পেঁপে, আব এক বাটি দই। দুধ নিয়ে সেধেছিল, কিন্তু আমি দইই পছন্দ করি। শরীবের সমস্ত জীবাণু নষ্ট কবে দেয়, মানুষকে দীর্ঘায়ু কবে, এই দই—'মাড়ি বার কবে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে—'বড়-বড় সব জাঁদরেল জাত কোনো দুধ খায়? কোনো দুধ আব কি? আমাদেব এই দই।' মাড়িতে মাড়িতে হেসে—'[...]' তুর্কি, বালুচি আবো কত কি দই খাবার যম সব। আমাকে দুধ নিয়ে সাধছিল, আশ্চর্য, বৌমা কী যে ভাবে। আলোটা কমিয়ে দাও?'

—'নিবিয়ে দেব?'

—'না, নিবিও না, ঘরে একটা বাতি থাকা ভালো।'

—'আবাব জ্বালিয়ে নিতে পাবি।'

—'বুড়ো হয়েছি বলে পেঁচা হয়ে যাইনি, এখনো এক-আধটু আলো সহ্য কবতে পাবি। অন্ধকাব ঘবে কোথাও একটুও আলো থাকবে না? বাদুড় জন্ম পেলাম নাকি?'

মাড়িব ভিতর থেকে পরিস্ফুট হাসি বেবিয়ে এসে উচ্ছলভাবে আঘাত কবল আমাকে, সমস্ত টেবিলটাকে, বাইবের অন্ধকাবকে।

—'হয়েছে, ওইটুকুই বেশ, আব কমাতে হবে না ভবানী, দই কি আব আছে?'

—'তা তো বলতে পাবি না, আপনাব খিদে পেয়েছে?'

—'না, তাড়াহুড়োব কিছু নেই, বৌমা এসে নিক, এত বাতে মক্কেল আব আসবে না হয়তো।'

—'তা আসবে বলে মনে তো হয় না।'

—'যাক মক্কেল সব মক্কায় যাক, দুনিয়ার মোকদ্দমা খিঁচে বলদ সাজবাব সাধ যার, জাযফলেব মতো চোখ বসুক তাদেবই ঘাড়ে—আমাদেব তাতে কী!'

—'কিন্তু আমিই তো উকিল বাবা।'

—'একটা ঠাট বজায রাখা, গোলামিব চেযে ঢেব ভালো, আমাব স্বাধীনতায কেউ হাত দিতে পাববে না—আলোটা কমিয়ে দাও।'

দিলাম।

—'কয়েকটা টাকা করলে মাথা কিনে নেয যাবা, তাদেব খোযাড়ে খবরদার।'

—'সে-বযসও নেই আমাব, সে-সুযোগও নেই—আমাব মনে হয ঠিক সময়ে একটা চাকবিতে ঢুকে পড়লেই ভালো হত।'

—'কেন, বৌমা কিছু বলে?'

—'কীসের কথা?'

—'উকিল না—হয়ে চাকুরে হলে ভালো লাগত তাব?'

—'টাকাকড়ির স্বাদ না পেলে ঘবেব বধূদের মন যায বিগড়ে।'

—'কেন, টাকাই কি সব ভবানী?'

—'সে কথা আপনি বুঝেছেন, কিন্তু দুঃখ অভাব অভিযোগের ভিতর আস্তে-আস্তে কেমন যেন মুষড়ে যেতে থাকে।'

—'সে-কথা যদি বলো, তোমাব মাকে আমি আজ নক্ষত্রেব ভিতব তুলে ধবব, পঁচিশটা টাকায গ্রামেব স্কুলে মাস্টাবি কবে কুড়ি বছব কাটালুম, দিনেব মধ্যে আমিই পঁচিশ বাব বিগড়েছি, কিন্তু এই কুড়ি বছবেব মধ্যে তাব মুখে, তাব মুখে, কোনো বা ছিল না।'

—'তা আমি জানি, কিন্তু তবুও পঁচিশটা টাকা তো পেতেন।'

—'আমাবও ভবানী, তোমাব মাকে স্বর্গে বসাতে ইচ্ছা কবে।'

—'আব তখনকাব দিনেব পঁচিশটা টাকা!'

খানিকক্ষণ দুজনেই আমবা নিস্তব্ধ হযেছিলুম। আমি থিওজফিব একটা বইযেব দিকে তাকিযে, বাবা আমাব মুখেব দিকে।

—'ভবানী।'

মাথা তুলে তাকালুম।

—'তোমাব মাকে আমাব নক্ষত্রেব ভিতব তুলে ধবতে ইচ্ছা কবে, আশ্চর্য।'

আশ্চর্য বৈকি।

—'বিশ বছব গ্রামেব মাষ্টাবি—তাবপব কলকাতায গিযে নিজে স্কুল তৈবি কবলুম।'

—'আপনাদেব উৎসাহ ছিল ভযাবহ, প্রথম মাষ্টাবি, থেকেই বাবোটা সন্তান, পঞ্চাশ বছব বযসে কলকাতায গিযে নতুন স্কুল, একে-একে ছটি মেযেকে লড়াই কবে বিযে দেযা, সাবেককালেব মানুষ সব, এক-একটা অশ্বত্থ গাছেব মতো যেন, সে-সব মানুষ আজকাল আব নেই।'

—'বৌমাবই—বা কেন ছেলেপুলে হয না ভবানী?'

—'ছেলেপুলে আপনি নিজে বাবোটি পেযেছেন, নাতি-নাতনি অত পাবেন না।'

—'তা আমি জানি, আশ্চর্য তোমাব মা, কিন্তু কার্তিক মাসে এবকম শীত—'

—নিস্তব্ধতা।

—'আপনি ঘুমিযে পড়ছেন, বিছানায যাবেন—চলুন দিযে আসি।'

—'কেমন একটু বিষম এসেছিল।'

—'বালাপোশটা যে খুলে পড়ে গেছে।'

বালাপোশটা তুলে গাযে জড়িযে নিতে নিতে বাবা—'মনে হচ্ছিল যেন পঞ্চাশ- ষাট বছব আগেব সেই পৃথিবীতে আবাব চলে গেছি, তোমবা কেউ নেই সেখানে। আছি আমি আব তোমাব মা—আব এক-এক সময মনে হয, তোমাব মা কি এই পৃথিবীতে আছেন এখনো?'

—'বা, নেই কী কবে—এই পনেব দিন আগেও তো এলাহাবাদে তাঁকে দেখে এলেন।'

—'না, সে-বকম কবে নয়, মনে হয যেন অনেক বাজাবাজড়াব আমল কাটিযে দিলাম—বট—অশ্বত্থেব চেযেও বেশি বযস পেযেছে—এখন এ পৃথিবীতে আমবা যেন অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হযে পড়েছি। চাবিদিকে কেমন যেন অদ্ভুত কোলাহল।' ধীবে ধীবে চোখ বুজলেন। চোখ বুজে-বুজে বলতে লাগলেন—'মনে হয যেন অনেকদিন হয মবে গেছি, আমাদেব মৃত শবীব ও মনেব উপব দিযে নতুন কেমন কী এক অদ্ভুত সমুদ্র যেন দিনবাত শব্দ কবে চলেছে—শব্দ শব্দ শব্দ শব্দ—তোমাব এই নির্জন বাড়িটা আমাব খুব ভালো লাগে—এলাহাবাদে তাই আব থাকলুম না।'

—'কিন্তু তবুও মা তো আপনাকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না।'

—'তাব ঠিক আমাব মতো হযনি।'

—'কীবকম?'

—'হুটপাট বেশ সহ্য কবতে পাবে—নির্জনতাব জন্য তেমন বেশি টান নেই।'

—'আমাব মনে হয মেযেবা সব আবহাওযাব সঙ্গে নিজেদেব মানিযে নিতে পাবে।'

—'তা পাবে হযতো।'

—'এলাহাবাদে তাব বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না।'

—'শীতেব?'

—'না এমনি।'

—'আশ্চর্য, বুঝি না কিছু, এত বুড়ি বিধবা থাকে, তাদেব মুখে কি হাসি থাকে না? এই বালাপোশটাব বযস হল চব্বিশ বছব।'

—'এখন এটাকে পাব করে দিলে হয়।'

—'আজ কেন?' চমকে উঠে বললেন বাবা—'আজকের গাছ পাখি মানুষের মতো এর ভিতর কোনো অহংকারের তীক্ষ্ণতা নেই, আছে ধূসর কোমল আস্বাদ, এর গন্ধ শুকতেও ভালো লাগে, রোজ রাতে যখন রাত খুব গভীর হয়ে ওঠে—' খানিকটা নিস্তব্ধ, আবার—'যখন অনেক রাত—চল্লিশ বছর আগের সেই ছবি দেখি, আবার দোলাইগঞ্জের বাজার থেকে তোমার হারান কাকা এই বালাপোশখানা কিনে আনলেন আমার জন্য—হারান চলে গিয়েছে অনেকদিন হয়—বড় খাঁটি মানুষ ছিল—হারান কাকাকে দেখেছ তুমি? দেখনি। তোমার বড়দা দেখেছিলেন। বড্ড খাঁটি মানুষ। সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, নৌকা করে হাট থেকে ফিরে বৃষ্টিতে ভিজতে—ভিজতে আমাকে এই বালাপোশটা দিয়ে গেল—'দাদা, আপনার জন্য জিনিশ এনেছি' বৃষ্টির ঝমঝমানির ভিতর তার সেই সহজ সুস্পষ্ট গলা এই তো এখুনি শুনেছিলাম যেন—এরই ভিতর চল্লিশ বছর ফুরিয়ে গেল।'

—'এলাহাবাদ থেকে চলে এসে আপনার ভালো লাগছে?'

—'বেশ, বেশ লাগছে, আমি হট্টগোলে বিশ্বাসী নেই।'

—'না, এখানে মানুষ কই যে গোলমাল করবে।'

—'সেই বেশ, নিজের মনে একটু চুপচাপ থাকতে পারলেই অনেক মনের মতন আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।', বলে মাড়ি বের করে ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনের নিস্তব্ধ নিরপরাধ আহ্লাদে খানিকটা হাসলেন।

—'মনের মতন আওয়াজ? আপনি শুনতে পান? কোনো নাতি নেই তো এখানে।'

—'সে বরং এলাহাবাদেই ছিল, নাতি-নাতনিদের হল্লা শুনতে তোমার মা খুব ভালোবাসে, আমি একটু আলাদা ধরনের মানুষ।'

—'নিরালা থাকতে এতই যদি ভালো লাগে আপনার, তাহলে সত্তরটা বছর সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন বিরাট যুদ্ধ করলেন কী করে?'

—'সে আর-এক জীবনের কথা, সে—জীবন আমার ফুরিয়ে গেছে, আমার বিরুদ্ধে আমার নাতি-নাতনিদের নালিশ যে ঠাকুরদা কোনো কম্মের না, মানুষের জাতই না সে, মানুষের মধ্যে তাকে আর ধরাই যায় না।' বলে দুই মাড়ি আর জিভ বের করে হা হা করে অন্ধকারের মধ্যে হাসতে লাগলেন।—'এই নালিশ তাদের, তোমার মার পর্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়েছি এজন্য আমি। ছেলেপুলেদের ভালোবাসি আমি, কিন্তু সারাদিন তাদের সঙ্গে হইচই করতে পারি না, মাঝে—মাঝে একটা বুড়ো চিলের মতো উড়ে গিয়ে গাছের চূড়ায় নিস্তব্ধতার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। তা কিন্তু আমাকে এক মুহূর্তেও রেহাই দেয় না। কাজেই পালিয়ে এলুম। ভবানী?'

—'আজ্ঞে।'

—'ভালো করলুম পালিয়ে এসে?'

—'আপনার মন নিয়ে কথা, আপনার যা ভালো লাগে।

—'কিন্তু বুড়িটা কী মনে করছে?'

—'কে, মা? কী আর মনে করবে, আপনার মনের শান্তির চেয়ে নাতিনাতনির আখখুট তার কাছে বেশি নয়—নিজে তিনি ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে—'

—'বেশ আনন্দেই আছেন।

—'থাকবারই তো কথা।'

—'অনেক বিধবা বুড়ি আছে স্বামী হারিয়ে বাচ্চাকাচ্চাদের ভিড় ধরে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেয়। বাতিটা এবার উস্কে দাও তো।'

—'আলো দরকার?'

—'তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না যে।'

আস্তে-আস্তে সলতেটা উস্কে দিলাম খানিক।

—'কিন্তু মানুষ যখন বুড়ো হয়, বেশি বুড়ো হয়ে পড়ে ড্যাবডেবে পাকা খালের অবস্থা হয় যখন তার এসব অবস্থায় ঢের আগেই এই পৃথিবী থেকে তার বিদায় নেয়া। উচিত।'

—'কেন?'

—'নিজেব জীবন যতদিন সজীব ছিল, অনেক সুন্দব স্বাদ আস্বাদ অনুভব কবেছিল সে, বযসেব সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে সে-সব ঘুলিযে যেতে থাকে। নানাদিকেব নানাবকম আক্রমণ ও জটিলতা এসে তাব বুকেব ভিতব জট পাকায, তাব হৃদয হযে দাঁড়ায কেমন একটা অর্থহীন গোলাকধাঁধাব মতো—ধান ভানবাব, ধান গুদামজাত কববাব বিক্রি-ব্যস্ততাব ভিতব, প্রথম জীবনেব সবুজ নীল ফসল, সোনালি ফসলেব সমস্ত আভা হাবিযে ফেলে সে।'

—'মাকে এখানে আসতে লিখে দেব?'

—'না না, মোটেই না, পাগল তুমি?' দু হাত তুলে তিনি আমাব দিকে তাকালেন।

অন্ধকাবেব ভিতব সাপ দেখলেও যেন মানুষ অতটা চমকে ওঠে না,—'পাগল, আমাকে তাহলে বেঁধে মাববে তাবা।'

—'কাবা?'

—'না, আব—কেউ নয, আমাবই মনেব লজ্জা ধিক্কাব, আমাকে চাবকে ফিববে, তুমি কল্পনা কবতে পাবো না ভবানী। বাতিটা কমিযে দাও।'

—'দিচ্ছি, আপনাব বালাপোশ যে আবাব খসে পড়ে গেল।',

—'এই ঠিক কবে নিচ্ছি।'

—'খালি গাযে শুধু একখানা বালাপোশ জড়িযে বসেছেন' উঠে গিযে বালপোশাখানা জড়িযে দেয—'আপনাব শবীব যে পাথবেব মতো ঠাণ্ডা হযে গেছে।'

—'ক খানা হাড়, ঠাণ্ডা হবে বৈকি-তুমি আমাকে বড্ড ভয খাইযে দিযেছিলে ভবানী, হবিশ তাহলে আমাকে আস্ত বাখত না।'

—'কে মেজদা? কেন কী হযেছে?' চোখেব ভিতব পাখিব চোখেব মতো ভয খেলা কবছিল বাবাব।

—'না, হযনি কিছু, আজ বাতে আব মক্কেল—টক্কেল আসবে?' চোখেব ভিতব পাখিব চোখেব মতো ভয।

তাকিযে দেখলাম।

—'না এত বাতে মফস্বলে কে আব আসে।'

—'বাত কত হল?'

—'দশটা কি বাজেনি?'

—'একটা ঘড়ি কেনা উচিত তোমাব, আজকাল তো আস্তাবলেও ঘড়ি থাকে ভবানী।'

বাবাব দিকে তাকিযে হাসছিলাম।

—'টাকাকড়ি কিছু আনতে পাবলে?'

—'না, কোনো একটা স্টেটেব—'

—'ম্যানেজাবি? থাক, বড্ড গোলমাল এসে পড়বে জীবনে, জীবনটাকে একটু শান্ত বাখো ভবানী।'

—'কিন্তু টাকাব অভাবে যে গোলমাল সেইটেই তো সবচেযে'—

—'সর্বনাশ? না, সে—কথা আমি বিশ্বাস কবি না। তোমাব ছেলে নেই, মেযে নেই, অনেক পড়াশোনা কবেছ তুমি। তোমাব মুখে এবকম কথা সাজে না। হবিশেব জীবনটা প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি বাতাসেব মতো। সেই আন্দাজ টাকাও বোজগাব কবছে সে। আমাদেব শান্তিব জন্য সে যদি দু পযসা ব্যয কবে'—

—'চিবকালটা মেজদা আমাকে সাহায্য কবে গেলেন।'

—'তোমাব-আমাব মনেব শান্তিব জন্য, সে যদি আমাদেব সাহায্য কবে তাহলে আমাদেব কোনো পাপ হবে না।'

—'কিন্তু মেজদাব মুখেব দিকে তাকিযে'—

—'আমবা কেউ কারু মুখেব দিকে তাকাই না, বিধাতাব মুখেব দিকে তাকাই শুধু।'

—'কিন্তু বিধাতা কি আছেন? আমাব মনে হয না তো।'

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা।

—'ভবানী?'

—'আজ্ঞে? আপনি জেগে আছেন?'

—'কেন? কী ভাবছিলে তুমি?'

—'ঘুমুচ্ছিলেন না?'

—'একটু ঝিম এসেছিল। বৌমা এসেছে?'

—'না।'

—'আসবে?'

—'কেন আসবে না? না আসবার কোনো কারণ তো দেখছি না।'

—'কই? আসছে কই?'

—'কাজ ফুরিয়ে গেলেই এসে পড়বে।'

—'কাজ ফুরিয়ে গেলেই এসে পড়বে, এই তোমাব বিশ্বাস? দৃঢ় বিশ্বাস, এ বিশ্বাসকে তোমার কেউ টলাতে পারবে না। পারবে?' চুপ করেছিলাম।

—'কিন্তু তবুও বিধাতার অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাস করো না তুমি।'

—'সে অনেক রকম কথা আছে।'

—'আশ্চর্য ভবানী, আমি বুঝতে পারি না তোমার সে-সব কথাগুলো কী?'

—'আসুন-না এই জিনিশটা নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

বাবা মাথা নেড়ে—'না আমি জ্ঞানী মানুষ নই, সত্যকে দেখতে ভয় পাব হয়তো।'

একটু বিস্মিত হয়ে—'সত্য·ধারণা যে আপনাব নয় তা কে বললে?'

—'আমার সঙ্গে আলোচনা করে নয়—আমি কবীবেব চেয়ে ঢের কম প্রেমিক, ব্রজেন শীলেব চেয়ে অনেক কম জ্ঞানী, এমনি আবো অনেক জ্ঞানী ও প্রেমিক আছেন—তোমার নিজের জীবন আছে, হৃদযে আগ্রহ আছে, এদের সঙ্গে আলোচনা তোমাব অনেকদিন চলবে, তারপব যে-মীমাংসায় পৌছতে পারবে সেই তোমার ভালো।'

—'এখানে আপনি মনের মতন আওয়াজ শুনতে পান বলছিলেন।'

—'হ্যাঁ, এই জাযগাটা বাড়িটা খুব নির্জন, তাই শুনতে পাই।'

—'কার আওয়াজ?'

—'আমারই নিজের জীবনেব, তোমার হাবান কাকার, তোমার মার, সেই স্কুলের মাস্টাবদেব, পীতাম্বর দপ্তরির—'

—'ও।'

—'তুমি ভাবছিলে, ঈশ্বরেব বাণী শুনতে পাই? নির্জন সাধনেব জন্য এলাহাবাদ থেকে পালিযে এসেছি।'

—'না, তা ভাবিনি অবিশ্যি।'

—'ঈশ্বর আমাব জীবনেও অনেক সমযই পিছনে পড়ে থাকেন। সেই স্কুলবাড়ির বাবলাগাছগুলোর—পীতাম্বর দপ্তরির স্মৃতিও যেন তার চেয়ে অনেক সময ঢেব সজীব বলে মনে হয।'

—'আপনি এখন ঘুমুবেন?'

—'ঘুমুতে—ঘুমুতে কী একটা স্বপ্ন দেখতে—দেখতে উঠে এসেছি।'

—'কীসের কী স্বপ্ন?'

—'নদী জলে যখন বান মুচড়ে ওঠে, তখন এক-একটা গাছ হয়ত এ-রকমই স্বপ্ন দেখে।' একটু চুপ থেকে—'রাত বেশি হযেছে?'

—'কম হয নি।'

—'ভয় নেই, আমি ঘুমিয়ে পড়ব আবার। বৌমা আসুক, একটু কথাবার্তা হোক, ভোজবাড়ির নেমন্তন্নের গল্প শুনতে—শুনতে ঘুমিয়ে পড়ব আবার।'

—'কিন্তু বউ কখন আসে—'

—'না, আজ রাতে সে দেরি করবে না, আমি আছি কী না। আমাকে সে বুড়ো ছেলের মতো মনে করে। দূরে থেকেও আমার কথা ভেবে বসে।'

—'অতটা রাত জাগবেন আপনি?'

—'তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমি এখানে বসে আছি।'

—'বিছানায গিয়ে শুতে—'

—'না, কোনো আপত্তি নেই আমার, কিন্তু তোমাদের কথাবর্তা শুনতে ভালো লাগে—বেশি নির্জনতা

আবার ভালো নয়।'

—'আমার মনে হয়, আপনাকে আবার এলাহাবাদ দিয়ে আসলেই যেন ভালো হয়, কিংবা মাকে যদি—'

—'না, না, না, তা হয় না ভবানী, এই মাত্র তিন মাস হল গিয়েছেন। হরিশ তাকে বছরখানেক কাছে রাখব বলেছে। আমি পালিয়ে এসেছি বলেই সে খুব বিরক্ত। তার ধারণা আমরা এলাহাবাদে গিয়ে টিকতে পারি না।'

—'সেইজন্যই তো বলছি বাবা, সবদিক ভেবে আপনাকে এলাহাবাদে মার কাছে রেখে আসাই আমি ঠিক মনে করি। শেষ পর্যন্ত ওই কোলাহলের ভিতরই আপনি যথাযথ শান্তি পাবেন।'

বাবা মাথা নেড়ে—'উঁহু আমার তা মনে হয় না।'

কেমন যেন আওয়াজ, কেমন যেন খটকা লাগে। মুখ তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে—'সে আপনি যাই বলেন, কাল আপনাকে এলাহাবাদে আমি নিয়েই যাব। এরকম বয়সে এতদিনের অভ্যাস আবহাওয়াটা ছিড়ে কী করে থাকবেন আপনি। মাকে ছেড়ে আপনি থাকতে পারবেন না।'

—'আমি জানি ভবানী, ষাট বছর প্রায় তার সঙ্গে একসঙ্গে কাটিয়েছি—কিন্তু তবুও তোমার-আমার মনের শান্তির জন্য হরিশ টাকা পাঠাচ্ছে এখানে—নির্জনতা রয়েছে এখানে—ঈশ্বর আছেন, এর চেয়ে মানুষ কী আর চাইতে পাবে। এলাহাবাদে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।'

একটা সহজ স্বাভাবিক ধ্বনি ঘরের ভিতর ছড়িয়ে পড়তে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বললাম—'কিছু খাবেন?'

—'ভেবেছিলাম দই খাব।'

—'আমি জানি, কমলা কোথায় দই রাখে, এনে দিচ্ছি।'

—'যে-রকম ঠাণ্ডা পড়েছে, এক গেলাস গরম জল কিংবা এক পেয়ালা চা খেলেই যেন ভালো হয়-কিন্তু আমার মনে হয় কিছু না-খাওয়াই যেন সবচেয়ে ভালো।'

—'মাথা ঝুঁকে কী দেখছ ভবানী? ছবি?'

—'না, বইটা।'

—'একেবারে চোখের কাছে বই না নিয়ে পড়তে পারো না?'

—'চোখটা খারাপ হয়েছে।'

—'চশমা নাও না কেন?'

—'অবসর মতো এক সময় নেব ভাবছি।'

—'অবসর নয়, টাকার দরকার—চোখ নিয়ে খেলা চলে না তো, আমি হরিশকে কিছু টাকার জন্য লিখে দিচ্ছি—কে বৌমা এলে নাকি? কীসের শব্দ?'

—'দরজায় একটা বেড়াল হয়তো।'

—'রাত তো কম হয়নি, বৌমার এতক্ষণে আসার কথা, তুমি একটু ঘুরে দেখে আসবে? আমাকে একটা পোস্টকার্ড দিয়ে যাও।'

—'কেন?'

—'হরিশকে টাকা পাঠাবার কথা লিখে দেই।'

—'সে কাল হবে।'

—'কাল আমাকে মনে করিয়ে দিও, তোমার চোখ তো যেতে বসেছে।'

—'চাটুয্যেদের বাসায় আমারও নেমন্তন্ন রয়েছে, কিন্তু আজ রাতে কিছু খাব না মনে করেছি, যাব না আব।'

—'খাবে না? কেন কী হয়েছে? আমাব মনে হয় আমাকে একা ফেলে যেতে চাও না তুমি।'

—'ঘরের ভেতর খানিকক্ষণ হল কেমন যেন একটা নির্জন আচ্ছন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, একজন একা মানুষের পক্ষে যা সহ্য করা সম্ভব নয়।'

—'তুমি বড় অতিরিক্ত ভাবো। সবচেয়ে বিশ্রী জিনিশ হয়ত বেদনা মৃত্যু, কিন্তু একজন পঁচাত্তর বছরের বুড়ো মানুষ যদি মৃত্যু ও বেদনাকে মড়ার মুখ ঢাকা কাপড়ের ভেতরের জিনিশ মনে করে ছোট ছেলেমেয়েদের মতো ব্যবহার করে, তাহলে তাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।'

—'কিন্তু কমলা আজ সকালে আমাকে বলে গেছে চাটুয্যে বাড়িব থেকে সে না—ফেবা পর্যন্ত আমি যেন ঘবেব থেকে না বেবই।'

বাবা খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'আশ্চর্য! এই কথা বলেছে সে? তোমাব মাও আজকাল এইবকম কথা বলতে ভুলে গেছেন।'

—'তাহলে চলুন।'

—'কোথায?'

—'চলুন, আপনাকে বিছানায শুইযে দিযে আসি।'

—'আমাব বিছানাব পাশে বসে থাকবে তুমি?'

—'বেশ তো, গল্প কবা যাবে।'

—'যে-পর্যন্ত বৌমা ফিবে না আসে?'

—'যে-পর্যন্ত আপনি ঘুমিযে না পড়েন।'

—'বেশ মানুষ তোমবা দুটি, বেশ। এলাহাবাদে ছিলুম—কিন্তু তোমাব মাও আজকাল হৃদযেব ব্যবহাব ভুলে গেছে যেন। কিন্তু তোমাদেব এখানে এসে আমি কেমন যে শান্তি পাচ্ছি—' বাবা উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন।

কিন্তু চমকে উঠলাম আমি। 'বাবা!'

—'কিছু বলছ ভবানী?'

—'বাইবে কাব গলাব আওযাজ পেলেন না?'

—'হ্যাঁ, টেলিগ্রাম আছে বললে।'

—'এত বাতে টেলিগ্রাম?'

চেযাবে আস্তে-আস্তে বসে বাবা আমাব মুখেব দিকে তাকিযে ধীবে—ধীবে বললেন—'চুপ কবে বসে আছো কেন ভবানী? লোকটা বাইবে শীতেব ভেতব কতক্ষণ দাঁড়িযে থাকবে?'

অন্ধকাবেব ভিতব টেলিগ্রাম নিযে পিযন দবজাব কাছে এসে দাঁড়াল।—'ভবানীবাবু, টেলিগ্রামটা নিন।'

—'যাও ভবানী, তুমি কেমন কাঠ হযে বসে আছো, একটা টেলিগ্রাম, ভূত নযতো!'

—'নিন, তাড়াতাড়ি সই কবে দিন—'আমাব আবো অনেক কাজ আছে।' পিযন বললে।

মিনিট দুই পবে বাবা—'কাব টেলিগ্রাম এল? কী লিখেছে?'

—'শেষ হযে গেছে।'

—'শেষ হযে গেছে।' কিন্তু সেজন্য একটু হলে তো টেবিল ল্যাম্পটা ভেঙে ফেলতে—বিছানায গিযে শোও ভবানী—বৌমাকে এখন ডেকে আনতে হয।'

—'আমিই ডেকে আনব।'

—'আস্তে আস্তে যেও, বৌভাতেব বাড়িতে ওসব খবব দিযে একটা হট্টগোল বাধিও না, এখানে এলে আমিই তাকে বলব।'

—'কী বলবেন আপনি? কী জানেন?'

—'তোমাব মা মাবা গেছেন।'

—'কী কবে জানলেন আপনি, কী কবে জানলেন—'

—'টেবিলেব ওপব মাথা ঠুকে চিমনিটাই ভাঙবে তুমি।'

ধীবে ধীবে বাতিটা সবিযে নিলেন তিনি।

—'কাচ ভেঙে একটা বক্তাবক্তি কাণ্ড হবে। ভবানী তুমি বিছানায গিযে একটু চুপ কবে শুযে থাকো, তাবপব বৌমাকে ডেকে এনো। আমাব মা যখন মাবা গিযেছিলেন তখন আমি খুব ছোট, কিন্তু বড় হলেও মাযেব মৃত্যু অনেককেই ছোট শিশুব মতই কাতব কবে ফেলে।'

বালাপোশটা মাটিতে পড়ে গেল। বাবাও চলে গেলেন। মাও চলে গেছেন। কিন্তু তবুও কযেকদিন পবে আমাব নিজেব পৃথিবী আবাব আমাকে অধিকাব কবে নিল। অন্ধকাবে চুরুটেব ধোঁযাব সঙ্গে-সঙ্গে অস্পষ্ট বহস্যময সিঁড়ি তৈবি হল আবাব, যেখানে মা নেই, বাবা নেই, কমলা নেই, কোথাও কোনোদিন কাউকে ভালোবেসেছিলাম—সেই নাবী পৃথিবীব পথে আব নেই। তাকে খুঁজে বাব কববাব বেদনাময কৌতূহল চুরুটেব ধোঁযাব সঙ্গে-সঙ্গে অস্পষ্ট বহস্যময সিঁড়ি তৈবি কবেছে সব। আবাব সিঁড়ি তৈবি কবে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাকে ভালোবেসেছিলাম? কবে? কিন্তু তাদেব কেউ বেঁচে আছে কি মবে গিযেছে....মৃত শেফালিকা পাতায।

সোনালি আভায়

কেমন একটা সোনালি আভায় পৃথিবীর ঘাস নদী মানুষের মুখ রঙিন হয়ে উঠেছে। আলোর এই আশ্চর্য রঙের ভিতর ক্লান্তি হাতে খবরের কাগজখানা একবার তুলে ধরলাম—পৃথিবীর সমস্ত বৈষয়িক খবরই যেন অবর্ণনীয় রহস্যের দেশ থেকে এসেছে, চারিদিকে নিস্তব্ধতা, লাল মেঘ, এক একটা শালিখের আতুর আতুর শব্দ—কিন্তু তবুও চোখ চেয়ে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও লালমেঘ নেই, শালিখ নেই, কাগজের অক্ষর ঝাপসা হয়ে গেছে সব। এসেছে সন্ধ্যা, এসেছে অন্ধকাব।

মুহূর্তের ভিতরেই আবার চোখ তুলে দেখলাম টেবিলল্যাম্পের আলোর পাশে একটি কালো হাত জামের বন্ধুর উপশাখার মতো একটি পালকের হাত অন্ধকারের ভিতর ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তারাপদ জানে, সন্ধ্যা আসে, তবুও আমার বেড়াবার সময় আসে না, আমার দরজা বন্ধ করে দিতে হয়, অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেবিলে পৌঁছিয়ে দিতে হয়, বাইরের পৃথিবীর পিছে হারিযে গিয়ে মনের নিস্তব্ধতা নিযে থাকবার জন্য যা কিছু ব্যবস্থার দরকার—তারপর সেই আবছায়া সৃষ্টি করতে—আমাকে সাহায্য করে।

—'কিন্তু তারাপদ?'

—'আজ্ঞে?'

—'আজ বাতি না জ্বালালেও পারতে।'

—'কেন? পড়বেন না?'

—'পড়ব কিনা বলতে পারি না, তবে—'

—'বাতি নিবিযে ফেলব?'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তাকিযে দেখলাম তাবাপদ আমার দিকে তাকিযে আছে।

—'নেভাবে?'

—'ঘরের ভেতর একটা বাতি থাকা ভালো।'

তারাপদ আমার মনটাকে চিনেছে, নিজেব মনের ভিতরকার কি যেন কি কোলাহলেব আলোড়নে নড়ে ওঠে। তারাপদর দিকে তাকিযে বললাম—

—'ঠিক কথা কখন যে পড়াশোনা করবার দরকাব, পড়তে পারা যায়—টেবিলে একটা বাতি থাকা ভালো তারাপদ।'

—'অবিনাশবাবুর বাসায যেতে হবে!'

—'কেন?'

—'কোনো নতুন বইয়ের দরকার?'

—'না।' মাথা হেট করে বসেছিলাম। চোখ চেয়ে—'তারা কি কোনো নতুন বই এনেছে?'

—'তা তো আমি জানি না।'

—'তাই তো তারাপদ, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কী করে জানবে?'

—'আপনি চিঠি দিলে আমি বই নিযে আসতে পারি।'

—'চিঠি দিযে কী দরকার? মিছিমিছি এত বই পড়ে কী লাভ?'

অন্ধকারের ভিতর তারাপদর মুখে কোনো হাসি নেই, কোনো ইশারা নেই, তাকে কী করতে হবে বলে দাও, তা সে করবে। কিন্তু জীবনের তামাশার রহস্য খুঁজতে গিযে আশা করছ সে হবে তোমার অনুচর? ও, কি দুরাশা তোমার, কি সহজ অবুঝ দুরাশা?

—'তুমি দাঁড়িযে রইলে?'

—'বাবু, আর কোনো কাজ নেই?'

—'এক বোতল সোডা ওযাটার লাগবে হয়তো।'

—'এনে দেব?'

—'তা দিও, এ মাসে কটা সোডা হল তারাপদ?'

—'জানি না, কুঞ্জ বলতে পাবে।'

—'আচ্ছা কুঞ্জেব কাছে জিজ্ঞেস কব এখন।'

ঘবেব অন্ধকাবেব ভিতব চোখ বুজে আবো নিস্তব্ধ হযে বইলাম, অন্ধকাব যেন নদীব জলেব মতো ভেসে চলেছে—ঘবেব ভিতব কেউ আছে কি নেই, আমি কোথায, সেসব ভুলে যাচ্ছিলাম।

ঘবেব কিনাব দিযে একটা ছুঁচো দৌড়ে যাচ্ছিল, টেবিলল্যাম্প জ্বলে যাচ্ছে, তাবাপদ এক বোতল সোডা নিযে হাজিব। আচ্ছন্নতা ছিড়ে এই সমস্তেব দিকে তাকিযে মনে হল যেন এক যুগ কেটে গেছে, কিন্তু কুঞ্জেব দোকানে যেতে আসতে তাবাপদব তিন মিনিটেব বেশি লাগেনি, মনে হচ্ছিল যেন তিনশো বছব কেটে গেছে।

—'সোডা কোথায বাখব?'

—'টেবিলেব ওপব।'

—'এখন খাবেন?'

—'না, বাতিটা নিভিযে দাও। আমাব মনে হয—

এ ঘবেব বাতি নেভানো যে সহজ জিনিশ নয তাবাপদ তা জানে, সে ইতস্তত কবছিল।

—'আমাব মনে হয এইবাব শুযে পড়ি। অনেক বই পডা হযে গেছে জীবনে, অনেক শিখেছি, জেনেছি, কিছুতেই কিছু হয না তাবাপদ।'

—'বিছানা কবে দেব?'

—'দাও।'

তোশকেব তুলো অনেক জাযগায উঠে গেছে। তাবাপদ কোনোদিনই কিছু বলে না, আজও বলল না কিছু, হাতেব চেটো দিযে সন্তর্পণে তুলো চেপে চেপে তোশক পাতল।

—'একটা নতুন তোশক কবলে হয, কি বলো তাবাপদ?

—'তোশকটা ছিড়ে গেছে।'

—'আজ তুমি দেখলে?'

তাবাপদব তবফ থেকে কোনো কথা নেই মুখে কোনো হাসি, কোনো ইশাবা নেই তাব, ঘবেব প্রতিটি টিকটিকি পর্যন্ত নিস্তব্ধ।

—'এবকম তোশক জোড়া লাগিযে পাততে কষ্ট হয না তোমাব?

মাথা নেড়ে—'না।'

—'কিন্তু বোদে তো দেযা যায না।'

—'সকালবেলা জানালা খুলে দিলে বিছানায বেশ বোদ পডে।'

—'সে বোদ কতক্ষণেব জন্যেই বা, তাতে কি আব বোদে দেওযাব কাজ হয, শুনছ তাবাপদ?'

—'বলুন।'

— আমাকে একটা তোশক বানিযে দিতে হবে।'

—'আচ্ছা।'

—'কী কবে বানাবে?'

—'সে আমি কি আব বানাব, কাবিগব ডেকে আনতে হবে।

—'কাবিগব কোথায থাকে তাবাপদ?'

—'বাজাবে।'

একটা চুরুট জ্বালালাম।—'চেনা আছে তোমাব সঙ্গে নিশ্চযই?'

—'শোবেন? বিছানা পেতে দেব?'

—'হ্যাঁ। দেবে বইকী। আমাব বাবা মা ভাইবোন নেই বলে তুমিও এবকম বিমুখ হলে কী কবে?'

বিছানা পাততে পাততে সে আমাব দিকে তাকাল।

একবাশ চুরুটেব ধোঁযাব পিছন থেকে তাবাপদব মুখেব দিকে তাকিযে—'দিনবাত পড়াশোনা কবে কোনো লাভ নেই।'

তাবাপদ আস্তে আস্তে বালিশ সাজাচ্ছিল।

—'এই পড়েও মাকে কি আমি ফিবিযে আনতে পেবেছি?'

শিথিল হাত অন্ধকাবেব ভিতব গুটিযে নিযে তাবাপদ—'আপনাব মা? তাঁকে তো আমি কোনোদিন দেখিনি।'

—'কী কবে দেখবে? তিনি—'

অনেকক্ষণ মাথা হেট কবে চুরুট টেনে যেতে লাগলাম। মাথা তুলে দেখলাম বালিশ গোছানো হযনি, বিছানাটা এবড়োখেবড়ো হযে পড়ে আছে—'না, তোমাব কোনো কাজে মন নেই তাবাপদ' বলে হেসে তাবাপদব দিকে তাকালাম—'আমাব মাকে তুমি দেখনি?'

—'না, তিনি কোথায আছেন?'

—'তিনি এখানে আব নেই।'

—'নেই? কেন নেই?'

আশ্চর্য, আমাব তিন বছবেব বোন সুধাব প্রশ্নেব মতো, কেন এটা? কেন সেটা? বেড়ালটা কেন শাদা? কেন বাত্তিব? কেন ঝিঁঝিঁ? সুধাও আব নেই, সে সব বযসেব কোলাহল অনেক দিন হয শুকিযে গেছে।

খানিক পুড়ে পুড়ে চুরুটেব আগুন নিভে গেল।

—'তাবাপদ।'

—'আজ্ঞে।'

—'দেশলাই কোথায বাখলাম মনে পড়ছে না তো।'

অন্ধকাবেব ভিতব অসীম আশ্চর্য চোখ বিস্ফাবিত কবে বললে—'আপনাব হাতেই তো।'

—'তাই তো।'

চুরুট জ্বালিযে নিযে—'কী বকম ভুল হযে গেল তাবাপদ, তুমি নিশ্চযই তোমাব দাদাব কাছে গিযে গল্প কববে।' সে ছেলেটিব দিকে তাকালাম।

—'আমাব দাদা নেই।'

—'নেই? সমস্ত কাজ শেষ কবে বাত্তিবে কাব গলা জড়িযে ধবো গিযে তাহলে?'

তাবাপদ একটু মুচকি হেসে ব্যাপাবটাকে বিদায দিল, যেন আমাব এ কথাব ভিতব কোনো মর্ম নেই, কোনো তাৎপর্য নেই, যেন মাকড়সাব জালেব মতো ছিঁড়ে এসে আমাব এ কথাটুকু কাব চুলে চোখে আটকে গেল, এক ঘাযে সব সাফ কবে দিল সে।

তাবাপদব মতো আমাবও একদিন ছিল, যখন সকলেই আমাব কাছে ছিল বলে আমি নির্জনতা খুঁজে বেড়িযেছি। অন্ধকাবেব ভিতব তাবাপদব এই তাচ্ছিল্যেব হাসিটুকু আমাবই এক দূব অতীত পৃথিবীব হাসিব মতো। প্রতিবিম্বেব মতো মাঝে মাঝে আমাকে চমক লাগিযে দেয, মাঝে মাঝে আমাব মুখেব গন্ধ, বালিশে আমাব চুলেব ঘ্রাণ—মানুষেব সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাব গলাব স্ববেব কী এক পবিচিত ধূসবতাব ভিতব থেকে আমাব মা ভাই বোন মুহূর্তেব জন্য জেগে ওঠে যেন।

—'দাদা নেই? তাহাব মা-ব কাছে গিযে যখন শোবে বাত্তিবে, বলবে এক বাউন্ডুলে বাবুব বাসায কাজ কবি।'

—'কেন বাউন্ডুলে?'

—'সুধাকে চেন তাবাপদ?'

—'সুধা কে?'

—'সে বলত আমাকে, বেড়ালটা কালো কেন, ও দাদা, বেড়ালটা কালো কেন?'

তাবাপদ কোনো কথা বলতে গেল না। তাব চোখেব দিকে তাকিযে বোধ হল, সে যেন ভেবেছে আমি গভীব জলে সাঁতাব কাটছি, সে বকম সাঁতাব কাটতে আমিই জানি, সে শুধু দুব থেকে তাকিযে দেখতে পাবে।

—'দেশলাইটা হাতে থাকে, তবুও আমি তা খুঁজে পাই না, এ গল্প তোমাব মাযেব কাছে গিযে কববে না?'

মাথা নেড়ে তাবাপদ—'না।'

—'কাব কাছে গিযে কববে তাহলে?

তাবাপদ আবাব মাথা নেড়ে—'কারু কাছে না।'

—'কারু কাছে না?' নিশ্চুপ হযে বইলাম।—'ঈশ্বব যেন কেমন, একটু জাযগা বদলাবদলি কবালে কী অপবাধ হয? মা বাবা ভাই বোন নিযে তোমাব মতন একটি ছোট ছেলে হযে যাই যদি আমি—আব তুমি হও আমাব মতো, দিনরাত পড়াশোনা নিযে থাকো, আব চুরুট টানো—আব কি যে ভাব তা আমি জানি না—বাত্তিবে গিয়ে মা-ব কাছে আব সুধাব কাছে এই সব গল্প কবতাম আমি, আব হো হো কবে হাসতাম।'

—'আমাব বাস্ত হয়ে যাচ্ছে বাবু।'

—'যাবে, যাবে, এখুনি তো চলে যাবে—তাবপব সমস্ত বাত—সুধা আজ বেঁচে থাকলে কত বড় হত

বাবা!'

—'আপনাব মা কি এখানে আব আসবেন না?'

—'না।'

—'কেন, বাগ কবলেন কেন?'

—'কি জানি।'

—'বৃউও তো নেই যে বাগ কববেন।'

—না, তা তো নেই।

—'ছেলেব বউযেব উপবই তো বাগ কবে, ছেলেব উপব তো বাগ কবে না কখনো।'

—'না।'

—'কলকাতায আছেন বুঝি? আপনি একখানা চিঠি লিখে দিন না, আপনি নিজে গিযে তাঁকে নিযে আসতে পাবেন না?'

—'কাকে? মাকে? অফিসেব ছুটি কোথায পাই তাবাপদ।'

তাবাপদ চুপ কবে বইল।

—'বাতিটা নিবিযে দেবে?'

—'সে আপনি নিজেও নিভিযে দিতে পাবেন, দবকাব মতো।'

চুরুটটা কামড়ে ধবে—'পড়াশোনা কবব কি আব?'

একদিন মাকেও এবকম প্রশ্ন কবতাম। তিনি আমাব মাথায হাত বুলিযে দিতে দিতে—'সতীশ, লেখাপড়া কবে কেউ কোনোদিন মানুষ হযেছে, মাথাটাকে ঠাণ্ডা কবে এখন একটু ঘুমোবি?'

তাবপব মা চলে গেছেন। তাবপব কত হাজাব হাজাব বই পড়লাম আমি, কত পত্রিকা নেড়েচেড়ে দেখলাম, ছিঁড়লাম, ছাপালাম—কত কি কবলাম—তাবপব তাকিযে দেখি, তোশকেব ছিবড়েব উপব শুযে আছি [...] লণ্ঠন আমাব টেবিলেব উপব জ্বলে, কেউ আমাকে চেনে না, তাবাপদ আমাব চাকব, সমস্ত বাত্তিব কথা বলবাব জন্য একটা টিকটিকি পর্যন্ত উপস্থিত থাকে না।

—'তোমাব বাত হযে গেছে তাবাপদ।'

—'বাবু খাবাব দেব?'

—'কী বেঁধেছ?'

—'আটাব রুটি।'

—'ক-খানা?'

—'চাবখানা।'

—'আব?'

—'আলু সেদ্ধ আছে, ভালো, মোচাব তবকাবি।'

—'না, আমি ওসব কিছু খাব না, কিন্তু তোমাকে এসব বাঁধতে কে বলেছে তাবাপদ?'

—'কি জানি, আমি কিছু ভেবে পাই না, আমি কী বাধব বুঝতে পাবি না—বাবুব কি মাংস খেতে ইচ্ছে কবে?'

মাথা নেড়ে হেসে—'না।'

চুরুট জ্বালিযে নিযে—'কী বাঁধবে না বাঁধবে আমিও তো বুঝি না তাবাপদ—আমাব মনে হয, একজনেব এসে এই সব ঠিক কবে দেযা উচিত।'

—'সেই জন্যই তো আমাব মাকে ডেকে আনতে বলি।'

তাবাপদ, যে বকম বললে যেন মা দক্ষিণেব ঘবে শুযে আছেন।

—'আমি ছেলে মানুষ, বান্নাবান্নাব কথা না বলে দিলে—'

—'তাহলে একজন পাকা বাঁধুনি জোগাড় কবতে হয তাবাপদ।'

—'আমাকে তাহলে উঠিযে দেবেন?'

কেমন যেন একটা নিঃসহাতাব কুযাশা যেন তাব চোখেব ভিতব।

—'তোমাকে উঠিযে দিতে হয বইকী।'

—'যা চান আপনি তাই বেঁধে দেব, আমাকে শুধু বলে দিতে হবে।'

—'আমি কিচ্ছু চাই না তাবাপদ, কী খাব আমি' খিদেই পায না।'

—'এই যে বললেন পাকা বাঁধুনি বাখবেন?'

—'না, না, আমাদের বাড়ির পাকা রাঁধুনি অনেক দিন হয় বিদায় নিয়েছে।' বলতে বলতে চুরুট নিভে গেল।

—'পিসিমা ছিলেন, বড়দি ছিলেন, মা'—চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে—'তারা চলে যাবার সময় জেনে গেছে আমি কোনোদিন আটার রুটি আলুসেদ্ধ মোচার তরকারি খাই না—আজ যদি হঠাৎ ফিরে এসে রান্নাঘরের ডালা তুলে তাকিয়ে দেখে তারা—

চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে—'তারাপদ, আমাকে একখানা রুটি দিও।'

—'একখানা শুধু?'

—'হ্যাঁ। আর একটু আলুসিদ্ধ। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু খাব না, খিদে নেই।'

—'দুধ ছিল।'

—'দুধ যদি খাব, তাহলে এই সোডা আনিয়েছি কেন?'

—'একটুও খাবেন না?'

—'না।'

—'এক চামচ?'

—'চায়ের চামচের?' হেসে তারাপদর দিকে তাকালাম।

—'না, আমি দুধ হজম করতে পারি না তারাপদ।'

—'তাহলে দুধ রাখেন কেন? রোজই তো দু-সের করে রাখা হচ্ছে।'

—'মা চাইতেন, রোজই যেন একটু একটু করে দুধ খাই, সেজন্যই রাখি।'

তারাপদ অন্ধকারের ভিতর মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

—'আজকের দুধটা তুমি ক্ষির করে খেয়ে ফেলো।'

—'আমার মনে হয় দুধ রাখার কোনো দরকার নেই।'

—'তা হয় না, এ বাড়িতে দুধ যে রাখা হচ্ছে এইটেই সান্ত্বনা, না হলে রুটি আর আলুসিদ্ধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছি—মা আজ নেই, কিন্তু তবুও রুটি আর আলুসিদ্ধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছি—ভাবতে গেলে কেমন যেন লাগে আমার।'

—'দুধ তো আপনি খান না।'

তারাপদ বড় অস্থির হয়ে পড়ে। 'বাড়িতে দুধ রাখা হবে, আমি খাই না খাই পরের কথা। শুধু রুটি আলুসিদ্ধ ভালো রান্না হচ্ছে বাড়িতে, মা চলে যাওয়ার আগে ইঙ্গিতেও এ কথা মনে করে যেতে পারেননি।'

'অন্ধকারের ভিতর চোখ বুজে তারাপদকে এই সব কথা জানিয়ে দিলাম আমি। তারাপদ ছেলে মানুষ, আমাকে অনুসরণ করতে পারে না। অন্ধকারের ভিতর একটা আচ্ছন্ন বাবলার চারার মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। তাকে উৎসাহ দিয়ে কুয়াশা তাড়িয়ে দেবার জন্য—'দুধ থাকুক, বন্ধ করে দেবার কোনো দরকার নেই তারাপদ, এক-আধদিন হয়তো সোডার সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারি।'

সোডার বোতলটার দিকে একবার সে তাকাল, একবার আমার দিকে তারাপদ নিস্তেজ কৌতূহল সে—'আজ খাবেন?'

চোখ বুজেছিলাম।

—'বাবু?'

—'কি তারাপদ?'

—'ঘুমুচ্ছিলেন?'

—'না, কই দেশলাইটা আবার কোথায় গেল?'

—'বেশ পুরু সর পড়েছে, বেশ নরম জালের দুধ বাবু।'

—'দুধ?'

—'হ্যাঁ, এনে দিই?'

—'না, আজ নয় তারাপদ।' একটু চুপ থেকে—'একখানা রুটি আর খানিকটা আলু, এই।'

তারাপদ বিষণ্ণ মুখে চলে গেল।

আজ রাত কেটে গেল। আবার সকাল হল। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি, অফিস মহিষের মতো শিং নেড়ে অগ্রসর হয়ে আসল আবার।

সমস্ত দিন অফিসে কাটিয়ে গোধূলিবেলায় আমার ঘরের ডেকচেয়ারে আবার এসে বসলাম। কেমন একটা সোনালি আভায় ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।

বাসনার দেশ
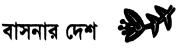
পাড়াগাঁব কুযাশাব ভিতব পেঁচাব ওড়াওড়ি, অনেক মৃত্যু ও আগুন এবং সেই নাবী যে কলকাতাব পথে মোটব ব্যবহাব কবে, দিল্লি ও মুসৌবিতে যাব অবাধ গতি, বিলেত পর্যন্ত চলে যায, সেই সব নাবী, আবছাযা, আমাব জীবনে এই সমস্তই মিশে বযেছে, প্রথমটাই বেশি, দ্বিতীযটা খুব কম, আবহাওযাটা প্রতিবিম্বেব আস্বাদেব মতো। কিন্তু তবুও আমাব জীবন অদ্ভুত বা আশ্চর্য নয, নিতান্তই শাদা, সাধাবণ। সংসাবেব জন্য সকলেই কেমন কাজ কবে, আমাকেও তেমনি কাজ কবতে হয। আমাব অনেকখানি কাজেব বিনিমযেও খুব কম টাকা পাই আমি। যখন সময পাই, নিঃসাড়ভাবে পড়ে থাকি।

কিন্তু তবুও এক-আধদিন সন্ধ্যাব দিকে সময পাই আমি, মাঠে মাঠে ঘুবে বেড়াই। বাত্তিবে বই নিযে বসি কিংবা বইযেব মতো দু-একটি স্বপ্নকে। আমাব মনে হয আমাব জীবনে স্বপ্নই হচ্ছে এখন একটা গভীব উদ্যম—স্বপ্ন ও মনন। কার্তিকেব বিকেলে আমাকে একটা নিঃসঙ্গ শালিখ কবে দাও। হিম অন্ধকাব বাতে কার্তিকেব—আমাব নীড় ভিজিযে দাও শিশিবেব জলে, সেই শালিখেব হৃদযেব ভিতব আমাকে মানুষেব মনন ও স্বপ্ন দাও। সমস্ত আকাশেব চিবন্তন নক্ষত্রেবা আমাব অনুভবকে আবো গভীব আবো গভীব পবিধি দিতে থাকুক।

লিখতে লিখেতে ঘুমিযে পড়লাম কাল। জেগে যখন উঠেছি বাত তখন দুটো। ঝুঁকে দেখলুম মাথাটা টেবিলেব ওপব ঝুঁকে পড়ে ঘুমিযেছে প্রায তিন-চাব ঘণ্টা। এতই অবসন্ন হযে পড়েছিল? টেবিলেব বাতিটা নিভে গেছে, অবাক হযে ভাবলুম কে নিভিযে দিল? নেড়ে দেখলুম, তেল নেই।

মাথাব সামনেই খোলা জানালা। বাইবে অন্ধকাব, ববং খানিকটা জ্যোৎস্না মাখানো অন্ধকাব। অনেক দেবিতে চাঁদ উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে কোথায যেন মৌমাছিব ভিড় জেগে উঠেছে, তেমনি একটা শব্দ, আবছাযা আলোব ভিতব তাদেব অজস্র পাখাব ছবিও যেন দেখছি আমি, দেখছি হাবিযে ফেলছি। বড় বড় গাছগুলো চাঁদেব আলোয যেন তাদেব অন্ধকাব ঝেড়ে ফেলতে পাবছে না। একটা পেযাবাব প্রসাবিত ডাল যেন নতুন অবযব নিযেছে—কোনোদিন দিনেব আলোয যা বাতেব ভিতব তাব এই রূপ দেখিনি আমি। ছাদেব উপবে, ভাঙা দেওযালেব গায, অশ্বত্থ চাবাব মুখেব ওপব ছাযা পড়েছে, আলো পড়েছে ছাযাব মতো, ছাযময আলো নয, কি যে এক জিনিশ! মোটা মোটা ডালপালাব পিছনে যে কোনো শতাব্দীব চাঁদেব মতো খানিকটা আলোব বেখা গোল হযে উঠেছে, সরু অবসন্ন হযে ভেঙে পড়েছে। জীবনেব সমস্ত সমাপ্তি ও সম্ভাবনাব পব তাবপব আবাব এই চাঁদ, এই অশ্বত্থেব চাবা, পেযাবাব এই নির্জন প্রসাবিত ডাল ধূসব পাণ্ডুলিপিব সামনে আমাব এই দেহ। বাইবেব হিম লেগেই হযতো সমস্ত শবীব ঠাণ্ডা হযে গেছে যেন মৃতেব মতন। কিন্তু হৃদযেব ভিতব বাসনা জেগে বযেছে তবু। যেন মৃত্যুব পবও কোনো বাসনাব দেশ বযেছে। ওই ভাঙা দেওযাল, অশ্বত্থেব চাবা, মস্তবড় পেযাবা গাছটাব দেওযালেব দিকে ডালটাব সুদীর্ঘ প্রসাব, ধূসবতা ও নির্জনতা সমস্তই যেন সেতু, আমাব জন্য অপেক্ষা কবছে। কিংবা এবাই হযতো সেই পবিতৃপ্ত বাসনাব দেশ, পৃথিবীব কামনাব মতো মোটা মোটা মাংস এদেব জন্য নয।

কাল লিখতে বসেছিলাম এগাবোটাব সময, কিন্তু মিনিট পনেবো পবেই ঘুমিযে পড়েছি। আজ কাজকর্ম সেবে নিতে বাবোটা বেজে গেল। এখন কি আলো জ্বালিযে টেবিলেব পাশে বসব! পড়ব কিছু? লিখব? ঘুম পাযনি। কিন্তু আজ আব কিছু লেখা হবে না।

আজ সন্ধ্যাব সময নদীব দিকে বেড়াতে গিযেছিলুম। নদী এখান থেকে প্রায তিন মাইল দূবে। বাস্তাটা [...] পাশ দিযে যায। তাবপব চলে গ্রামেব দিকে। কযেকটা ইটেব লাল দালান বযেছে। অনেক বাত পর্যন্ত অনেক লোক যাওযা—আসা কবে। বিড়ি সিগাবেটেব দোকান, চপ কাটলেট চাযেব দোকান, কাছেই একটা শস্তা সিনেমা। একটু দূবেই চামাবপট্টি, চালপট্টি ও বাজাব স্টেশনটাকে সবগবম কবে বেখেছে ঢেব। তাকিযে দেখলুম জীবনেব নানাবকম বিবর্ণ মাংসখোব খুবছে, ফিবছে, ঘুবছে—তাদেব হাসি-তামাসা কথাবার্তা কোনোদিন ফুরুবে না। গেল আবো নদীব কিনাব দিযে, দিকে দিকে টেলিগ্রাফেব

তার, এই বাঁধের উপর লাল রাস্তার পাশে [...] উঁচু উঁচু থাম, এদিকে সেদিকে কতকগুলো কৃষ্ণচূড়া ছাতিম গাছ। রাস্তার এক কিনারে একটা মস্তবড় বটগাছের নীচে গরু, ছাগল, কুকুর ও ভেড়া জমে গেছে ঢের। কাদের জিনিশ বুঝতে পারা গেল না। একটা চায়ের দোকানে ঢুকব কিনা ভাবছিলুম, কিংবা একটা সিগারেটের পানের দোকান থেকে—একটা সোডা খাব কিনা।

কিন্তু আজ নয়, আর এক দিন হবে। আজ আমি স্টেশন ছেড়ে নদীর কিনার দিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরলুম। মিনিট দশেক হাঁটবার পরেই ধানখেত পাওয়া গেল। প্রান্তর এল, জোনাকির দেখা পেলুম। স্টেশনের এত কাছেই এই সব জিনিশ রয়ে গেছে। রাস্তা আবো দু-এক মাইল পর্যন্ত লাল যদিও, ধূসর নয়, কিন্তু তবুও এ রাস্তায় এত অন্ধকারেও কোনো লোকজন নেই। শহর শেষ হয়ে গেছে, গ্রাম আরম্ভ হয়নি। নদীর কিনার দিয়ে যতদূর চোখ যায় ধানখেত চলে গিয়েছে। ধানখেত নীচে, ওপরে রাস্তা, রাস্তার কিনারে জমাট ঘাস অল্প অল্প শিশিরে নবম হয়ে রয়েছে।

ঘাসের ওপর বসে পড়ব ভাবছিলুম। এমন সময় দেখলুম দশ বছরের একটি ছেলে একটা গরুর গলায় দড়ি ধরে ক্রমাগত তাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জানোয়ারটা চাচ্ছে পিছিয়ে যেতে, টানহেঁচড়া চলছিল। ছেলেটিই এগুচ্ছিল খানিক। কিন্তু কেন যে এই যুদ্ধ বুঝতে পারলুম না।

এমনই সময় দেখলুম নরম শিশিরে শরীবেব মসৃণ মাংস ভিজিয়ে কার্তিকের কোমল হাওয়া শুঁকতে শুঁকতে একটা ষাঁড় এগিয়ে আসছে।

মনে হল ষাঁড়টার বিশেষ তাগিদ নেই, কিন্তু তবুও সামনে গাভীও না এগিয়ে পারা যায় না।

—'বাবু এই এক মাইল ধরে ষাঁড়টা আমার গরুর পিছু নিয়েছে।'

—'তা নেবে না রে, সংসারটাকে এখনো চিনলি না রে বাছা' অন্ধকারের ভিতর কে যেন বললে।

তাকিয়ে দেখলুম একটি স্ত্রীলোক, ভদ্রঘবেব নয় হয়তো, বয়স বেশি নয়, বেশ সুঠাম, দীর্ঘ গড়ন, চমৎকার জমাট খোঁপা, মুখ ফরশা নয়, বরং কালোই, কিন্তু বেশ স্পষ্ট কবে মানুষের রুচিকে, এমনই একটা মেয়েলোক পান চিবুতে চিবুতে আমাকে উপেক্ষা করেই পথেব কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেলেটিব দিকে তাকিয়ে।

দ্বিধা বোধ করছিলুম হয়তো, কিন্তু তবুও কিছুকাল থেকেই সঙ্কোচ কাটাবার চেষ্টা কবে আসছি জীবনে, মনে করে নিতে চেয়েছি যে আমাব রক্তমাংস আমার এই শরীর এ যেন আমার সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। এক তৃতীয ব্যক্তি একে অতিক্রম কবে আমার মনন লুকিয়ে রয়েছে এমন এক জায়গায় যেখানে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিছুতেই অভিভূত বা লাঞ্ছিত হয না সে।

—'তুমি কে?'

—'আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন? ওই তো আমার বাসা,' ডান হাতটা ঈষৎ ঘোরাল মাত্র সে, কোনো নির্দেশ পাওয়া গেল না। তাতে কিছু নির্দিষ্ট হয না।

—'ডান দিকে বললে?'

—'আহা দেখুন না, ষাঁড়টা এসে পড়ছে, পুরুষমানুষ আপনি একটা বিচাব করুন।' বলে যেন মুখে কাপড় দিয়ে মাথা হেট করে একবার হেসেই আঁচল ছেড়ে দিয়ে সপ্রতিভভাবে জন্তুটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

—'এসে পড়েছে বাবু।' ছেলেটি ভযে চিৎকার কবে উঠল।

—'এসে পড়েছে, হতভাগা, তুই গরুটাকে যেমন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলি তেমন টেনে নিয়ে যা—যা—যা—দাঁড়িয়ে রয়েছিস, অনামুখো।'

ছেলেটি দাঁতমুখ খিঁচে দড়ি ধরে আবার টান দিল।

—'কার গরু?' জিজ্ঞেস করলুম।

মেয়েটি বললে—'আমার।'

—'গরু আমার বাবু!'

—'তোর গরু? তবে নে সামলা, দেখি কে কী করে?'

—'হাট থেকে বাবা পনেরো টাকা দিয়ে গাইটা আজই কিনেছে বাবু: দড়িটা আমার হাতে দিয়ে বললে—যা তুই গরু নিয়ে যা, আমি একটু তামাক টেনে আসছি।' দূর রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে—'বাবা যে কখন আসবেন।'

—'তামাক না গাঁজা?'

—'তামাক, তামাক, গাঁজা খায় না আমার বাবা।'

—'না হলে তোমার হাতে এই গাই ছেড়ে দেয় বাছা!'

—'কেন ছেড়ে দেয়, ছেড়ে দেয় সাধে, বুড়ো মানুষ, তাই চেহারা দেখে গাই বলদ ভয় পায় বটে, কিন্তু আমার গায়ে তেজ বাবার চেয়ে বেশি। তিন বছর জ্বরে বিকারে এক জোড়া গোঁফ ছাড়া আর ও বুড়োর আছে কি—হেই—হেই—হেই' বলে দড়ি ধরে ছেলেটি টান দিল আবার।

তাকিয়ে দেখলুম ষাঁড়টা হাত পনেরো দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বরং একটা বুড়ো ষাঁড়। সাধ আছে, কিন্তু শক্তি ততটা নেই আর। জীবন ক্ষয়িত হয়ে গেছে ঢের। চব্বিশ ঘণ্টা উপাদান সামনে বয়েছে, সামনে. রয়েছে, এই আশ্বাসই এখন যথেষ্ট। এর বেশি কিছু চায না আব। জীবনের এই শেষ সীমায দাঁড়িযে মাংস আজ তার চর্বিও বিচীর্ণ। আবেগ ও লালসার সঙ্গে মিশ্রিত কবে সৃষ্টি, এই নিদারুণ সৃষ্টি যা তাকে দিল না—এই দৃষ্টি যদি তাকে খানিকটা চিন্তার দীপ্তি দিত, তাহলে বেচাবি এই কার্তিকেব রাতে তার জীবনের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বলত : অনাহারে না মেরে, মাবলে প্রাচুর্যে, একটা পাখি সৃষ্টি করে ডানা কেটে তাকে ফেলে দিলে জলের ভেতর—জলের ভেতর।

—'কি করা যায় বলুন দেখি।'

—'কিসের কী করবে?'

—'বুজলাম এই গরুটার কথা।'

—'জানোযারটা থেমে দাঁড়িযেছে, এগোবে না আব।'

—'দূর, একটা বুড়ো ষাঁড়, তাই বলি ভাবছিলুম, কী মীমাংসা হয।' বলে সে অন্ধকার ধানখেতের দিকে একবার তাকাল।

—'না, বড় বিষম মুশকিলে পড়েছিল ছেলেটি, এই এক পো পথ আমি ওব সঙ্গে ফিরছি।'

—'কিন্তু তুমিও হাটের থেকে এলে নাকি?'

—'না গো বাবু। বললাম তো বাসা।' এবাব সুনির্দিষ্ট ভাবে আঙুল দিয়ে দেখিযে দিল আমাকে।

—'বাবু চড়া মানুষ কিনা!'

—'কে?'

—'আমার কথাই বলছি গো। আগুনের তাতে সমস্ত শবীব যেন গলে গেল।'

—'কেন, তোমাকে বাঁধতে হয বুঝি?'

—'দুবেলা। সন্ধ্যাব সময একটু হাওযা খেতে বেরুব তাও কী ভালোয ভালোয চলা যায? মিনসেটা এক্ষুনি—' মেযেটি ভযে ভযে অন্ধকাবের দিকে তাকিযে—'একটা ভূতেব মতো এই অন্ধকাবের গা ফুঁড়ে বেরুবে—ওরে বাবারে।'

—'কে তোমার স্বামী'

মেযেটি কোনো উত্তর দিল না।—'ওই খড়ের চালটা তো তোমাব বাসা। দেখি অন্ধকার গায জমে আছে।'

—'ওইরকম থাকে।'

—'বাতি জ্বাল না?'

—'না।'

—'কেন?'

—'আমার মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কার জন্য জ্বালাব? বলো তো?'

বুঝলুম সারাদিন কাজকর্ম ও আগুনের তাত, ওব তাতের মতোই হয়তো অন্য কোনো বিক্ষুব্ধতার পর কার্তিকের এই হিম-নীবব অন্ধকারের ভিতব সে খানিকটা স্নিগ্ধতা খুঁজছে।

এই ঘাসেব ওপর খানিকটা ব্যবধানেব ভিতব দু-মুহূর্ত মুখোমুখি দাঁড়িযে এক-আধটা কথা তাকে বলেছি। আরো একটা কথা বলব হয়তো। তারপর আমি চলে যাব আমাব দিকে, সেও তার নিজের জীবনেব দিকে চলে যাবে। এই পথটা, এই হিম, এই কার্তিকের অন্ধকার, এই শিশির পড়ে চলবে সারারাত [...] সম্পর্কহীন হয়ে।

—'তুমি যে বলছ ঘর অন্ধকার।'

—'কেন অন্ধকার থাকবে না তো কি?'

—'কেরোসিনের পযসা তো বাঁচে। এমনি করেই রাই কুড়িযে বেল।'

—'এই ছেলে ভাগছিস কোথায রে! দড়িটা না ছিঁড়ে গরুটিকে ভাগাড়ে না পাঠিযে তুমি ছাড়বে না দেখছি। তোমার বাবাকে আমি বলে দেব।'

—'তোমাব দড়ি?'

—'তোমাব বাবাব দড়ি?'

—'আবাব বাবাকে তুমি চেনো?'

—'খুব চিনি?'

—'বলত কেমন দেখতে?'

—'তোমবা মোছলমান?'

—'হ্যাঁ।

—'হ্যাঁ?'

—'তাহলে কেমন দেখতে বলে দিতে পাবি! তুই-ই তো বললি তোব বাবাব একজোড়া গোঁফ ছাড়া আব কিছু নেই। ম্যালেবিযায ভুগে কাঠি হযে গেছে। দাড়ি আছে বললি না কেন?'

—'তা আছে।' নিবস্ত ষাঁড়েব দিকে তাকিযে ছেলেটি বললে,—'কিন্তু বেশি নেই।'

—'যেন বেশি দাড়ি থাকাটা একটা লজ্জাব কথা।' মেযেটি আমাব দিকে তাকিযে বললে।

–'ইস, দাড়ি ছিল একদিন বাবাব—মুনিরুদ্দিব মতন, কিন্তু জ্ববে—বিকাবে পুড়ে গেছে সব।'

—'যাক। [...] পযসাব কথা বললেন বুঝি আপনি?' মেযেটি আবাব আমাকে প্রাপ্য সম্ভ্রম ফিবিযে দিলে—'ভিখিবি নই আমি। কিন্তু তবুও বাতি জ্বালব না।'

—'কেন?'

—'সবই তোমাকে বলতে হবে দেখছি!'

—'না, না যদি বলতে চাও, তাহলে শুনতে চাই না।'

—'না, না যদি বলতে চাও, তাহলে শুনতে চাই না।'

—'না, অতটা নয, ইচ্ছা-অনিচ্ছাব জ্ঞান অনেক দিন হয ঘুঁচে গেছে আমাব।' একটু হেসে—'আমাব? তা তো মনে হয না।'

—'কেন? আমাব চেহাবাব দিকে তাকিযে? ও আমাব দগ্ধ হবে না কোনোদিন। বুক পকেটেব থেকে একটা লঙ্গ বেব কবে মুখে দিল।

—'কি খাচ্ছ?'

—'একটা লঙ্গ।'

—'আমাকে একটা দেবেন?'

—'নেই হযতো আব।' পকেট হাতড়ে খুঁজছিল।

—'নেই?

—'না।'

—'কোনো বোগেও ধবে না আমাকে।'

—'তোমাকে তো আমি আগে কোনোদিন দেখিনি।'

—'আমাব নাম মালতী, আপনি কি এই গাযে থাকেন?'

—এটা গ্রাম নয মালতী, পাড়াগাঁ তো ঢেব দূবে—'আমি থাকি প্রায চাব-পাঁচ মাইল দূবে—বত্নপুবে। কিন্তু আমি এদিকে বেড়াতে আসি প্রাযই।'

—'একা?'

—'হ্যাঁ।'

—'এব পবেব বাব যখন আসবেন আমাব জন্য একটা লঙ্গ নিযে আসবেন।'

—'যদি মনে থাকে।'

—'ওবে হতভাগা ছেলে, আবাব গরুব দড়ি নিযে বাঁদবামি কবছিস? দাঁড়া তোব বাবা এসে নিক।'

—'আসুক না, কী কববে তুমি?'

—'কিল চড় ঘুষি কি চাস কি আব, মনেব সুখে সব পাবি, সব পাবি, একবাব এসে নিক তোব বাবা।'

—'আমাব বাবাকে চেনেই না, কিছুই না, কেবল বং।'

—'কোথায, ষাঁড়টা কোথায বে?'

—'ওই তো?'

—'দেখিস, আবার ঘুরে আসে না যেন। গরুটাকে ছেড়ে দে রে, একটু ঘাস খাক। কিনেছিস পনেরো টাকা দিয়ে, তাই বলে তো আর আজই কষাইকে ধরে দিচ্ছিস না।'

—'কে দেবে কষাইকে, তুমি বড় ফাজিল মেয়েমানুষ।'

—'বোস, চুপ করে বোস। তুইও আম্মাকে বকিস না। জানিস, তুই আমার ছেলেও হতে পারতিস।'

—'কেন, তোমার ছেলে হতে যাব কেন? তুমি হিন্দু না?'

মেয়েটি ঘাড় কাত করে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'একটি লগ্নের কথাও মনে থাকবে না আপনার?'

—'রাখতে চেষ্টা করব।'

—'প্রায়ই এদিকে বেড়াতে আসেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী করে চিনবেন আমাকে, তুমি তো এখানকার বাসিন্দা নই। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, উত্তর পাব?'

—'কী কথা?'

—'আপনি কি ডাক্তার?'

—'না, আমি ডাক্তার নই।'

—'তাহলে কেন মিছিমিছি বললেন তোমাকে আমি দেখিনি কোনোদিন?'

মেয়েটির দিকে মুখ তুলে তাকালুম।

—'গ্রামের রাস্তার কিনারে কে কোথায় পড়ে থাকে সে খোঁজ নেবার মানুষ আপনি নন। এখানকার কজন মানুষকে আপনি চেনেন বলুন তো? এক জনকেও চেনেন?'

—'কিন্তু ডাক্তার হলে—'

—'এদিকে এক আধ বার করে আসতে হত বইকী। কিন্তু যে কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম। এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা যারা কাউকেই চেনেন আপনি? আচ্ছা, ক্ষেমদার সরকারকে চেনেন?'

—'সে আবার কে?'

—'এই তো ধরা পড়ে গেলেন।' মেয়েটি হেসে হেসে বললে—'আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝেছিলুম। মুখ দেখেই মানুষ চেনা যায়। আপনার মনের ভিতর লোভ নেই, মততাও নেই।'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম।

—'বসবার জো তো নেই এখানে।'

—'আমি চলে যেতেই চাই—তুমি এই গাইটাকে দেখো, এসব তোমারই কাজ, আমি অন্য জিনিশের মানুষ।'

—'কোথায় যাচ্ছিলেন?'

—'বললুম তো, বেড়াতে।'

—'একেবারে ওই ধানখেতের সীমানা পর্যন্ত যাবেন?'

—'হ্যাঁ।'

সেই সীমানা লক্ষ্য করে পা বাড়াতেই মেয়েটি হাত নেড়ে বললে—'কোথায় যাচ্ছেন, আপনাকে দাঁড়াতে হবে।'

—'ভয় নেই, এই ষাঁড়টা কিছু করবে না।'

—'না, এই গাইটার জন্য নয়, আমার জন্যই। দাঁড়িয়েই আর একটু হিম খেতে হবে। আমি কিন্তু এখানকার বাসিন্দা নই।'

—'শুনলুমই তো।'

—'দিন পনেরো হল আমরা এখানে এসেছি, এলুম কলকাতার থেকে, তার আগে ছিলুম ঘাটশিলায়। আবার হয়তো দু-এক হপ্তার ভিতর চলে যাব।'

—'কোথায়?'

—'যেদিকে যম চালায়।'

—'যম আছে?'

—'আপনাদের দেশে নেই। কিন্তু আমার দেশ তো আর আপনার দেশ নয়।' ঘাসের ভিতর থেকে

গরুব দড়িটা তুলে নিযে—'দেখেছেন ছেলেটাব কাণ্ড। ঘুমিযে পড়েছে। থাক, জাগিযে দবকাব নেই। ওকে আমি বলেছিলুম আমি তো তোব মা হতে পাবতুম। কিন্তু বললে তুমি—এখানে বেশ ঘাস, দেখুন গরুটা, এখানে কী তৃপ্তিব সঙ্গে খাচ্ছে।'

—'আপনাদেব এটা তো ঘাসেব দেশ, কিন্তু তবুও গরু—ছাগলেব শবীব সাবে না কেন?'

—'ধানেব দেশ, কি ধানখেতেব বহব, বাবাব বাবা' এসবও যে ছিল পৃথিবীব ভিতব কে জানত!' নদী ও খেতেব থেকে চোখ ফিবিযে এনে বললে—'কিন্তু তবু এই বাচ্চাটা কখনো হাড় নিযে ফিবছে, তাকিযে দেখুন।'

ঘুমন্ত ছেলেটিব দিকে তাকালুম একবাব।

—'এত ধান সব যায কোনদিকে?'

—'জানি না।'

—'এই ছেলেটিব—'

বাধা দিযে—'না না, ছেলেটিব কথা শুনতে চাই না আমি আব, তুমি অন্য মেযেদেব কাছে গিযে ওসব কথা পাড়।'

—'বলব এদেব কথা?'

—'হ্যাঁ যত খুশি পাব। আমাব এসব শুনতে ভালো লাগে না।'

—'কিন্তু সে সব মেযেই বা কই?'

—'তা তুমি জান। কোনো মেযেও খুঁজে পেলে না বুঝি? গরুব দড়িটা ধবে বযেছ যে? এই ছেলেটিব বাপেব জন্য অপেক্ষা কবছ বুঝি? তাকে দিযে তোমাব কী দবকাব?'

—'কিছু না, এই লক্ষ্মীছাড়া ওঠ' বলে ডান পা দিযে ঈষৎ লাথি মেবেই ছেলেটাকে জাগিযে দিল মালতী।—'ষাঁড়টাব সব চলে গেছে। ভালোভাবে শিগগিব বাড়ি চলে যা' বলে আব এক লাথি দিযে ছেলেটাকে দাঁড় কবাল মালতী।

—'নে, এই দড়ি ধব, তাবপব নাকববাবব যেদিকে চোখ যায?' ছেলেটি গরুব দড়ি টানতে টানতে চলে গেল। মালতী তাকিযে, দেখল অন্ধকাবেব ভিতব গরুব লেজটাও হাবিযে গেল যখন তখন মালতী আমাব পাযেব দিকে তাকিযে—'আচ্ছা, আমি যাই।'

—'যাও।'

—'অন্ধকাব ঘবে মানুষ পড়ে আছে, তাকে দেখতে হবে তো।'

—'এই ছেলেটিকে চিনতে তুমি?'

—'না।'

—'কোনোদিন দেখওনি?'

—'না। পোযাটেক পথ হাঁটতে হাঁটতে আজই একে প্রথম দেখলুম।'

—'আমাব মনে হয একটু বেশিই মমতা বোধ কবছিলে তুমি এব জন্য।'

—'হ্যাঁ।' একটু চুপ থেকে—'চলে যেতে হবে এখন।'

—'কোন দিকে?'

—'ছেলেটি গেল এক অন্ধকাবে, আমি এক অন্ধকাবে, আব তুমি অন্য এক মানুষ কিনা, যাও অন্ধকাবে সাঁধাও গিযে।'

যখন সে এগিযে গেল পিছে ফিবল না আব, তখন ডেকে জিজ্ঞেস কবলুম—'আজকেব বাতেব কথা বলছি, আমাদেব জীবন নিযে কথা বলছ মালতী?'

একটু থামল হযতো। আস্তে আস্তে চলে গেল সে। কোনো উত্তব দিল না। ছেলেটি চলে গেল অন্ধকাবে। তাবপব মালতী পশ্চিম সীমানাব অন্ধকাবেব ভিতব মিলিযে গেল। তাবপব আব তাকে দেখিনি কোনোদিন। চাবিদিকে ঘাসেব দেশ, ধানেব দেশ। অন্ধকাব কতবাব এল গেল, কিন্তু তাদেব কাউকে আব দেখিনি কোনোদিন।

হৈম শালিখপুবেব দিকে নবম নদী, মেঘেব বাজ্য ও কঙ্কাল পাহাড়েব দেশে।

কুযাশা আক্রান্ত চিল বাজকন্যাব মতো গভীব ডানাব বিকাশে বজনী।

সাধারণ মানুষ

দাদা বেবিলিতে বেশ শান্তিতে আছেন। আড়াইশো টাকা মাইনে। পঁযতাল্লিশ বছব বযেস। এখনো বিযে কবেননি, কববেনও না। গভীব, গভীব শান্তি, দাদাব।

ব্যোমকেশ ভাবছিল।

ছ বছব পবে ব্যোমকেশেব স্ত্রী কমলাব আবাব সন্তান হবে, এই হচ্ছে দ্বিতীয় সন্তান। ব্যোমকেশ বড্ড অস্বস্তি বোধ কবছিল। একদিন সে ভেবেছিল, সে বিযেই কববে না। কিন্তু নিজেব ইচ্ছাযই সে বিযে কবল। শুধু তাই নয, একটি সন্তান পর্যন্ত হল তাব। সেই-ই তো যথেষ্ট কলঙ্ক ও বেদনাব জিনিশ ছিল। কিন্তু আবাব আব একটি সন্তান আসছে। ব্যোমকেশেব হযেছে কী? নিজেব ইচ্ছাযই সে পালকেব পব পালক খসিযে তাব বড শাদা ডানা দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে যেন, নিঃশেষে ছিঁড়ে ফেলেছে আজ। আকাশ ও নক্ষত্রেব অস্পৃশ্য সে আজ।

যে জিনিশকে সবচেযে ভয কবত সংসাবেব সেই সাধাবণ মানুষ আজ তাকে হতে হল—সংসাবেব সাধাবণ মানুষ। এব পব মাটিব পব মাটি খুঁড়ে বেজিব মতন অন্ধকাবেব ভিতব যাত্রা তাব।

দাদা বেবিলিতে। শান্তি দাদাব।

—'শুনছ?'

—'হ্যাঁ, আমি জেগে আছি, তোমাব কোনো ভয নেই।' ব্যোমকেশ তাব স্ত্রী কমলাকে বললে।

—'বাত এখন কটা বলো তো?'

ব্যোমকেশ আহ্লাদ কবে বললে—'তোমাব ভয নেই কমলা, বাত প্রায ফুবিযে এসেছে বলেই মনে হয।'

—'কই, আমাব তো তা মনে হয না। বাইবে তো ভীষণ অন্ধকাব।'

—'চাঁদ ডুবে গেছে কিনা।'

—'কী তিথি ছিল?'

—'আমাব মনে হয ত্রযোদশী।'

—বাত তাহলে।'

—'হ্যাঁ ফুবিযে এসেছে কমলা।'

—'উঠে একটু ঘড়িটা দেখ না বে বাপু—না আমাকেই দেখতে হবে।'

—'না, তুমি আব কেন দেখবে। এই উঠছি, বড্ড শীত। সাবাবাতই জেগে আছি। আমাব মনে হয তুমি তবুও একটু ঘুমিযেছ আজ। আজ বাতেও স্বপ্ন দেখেছ নাকি কমলা?'

—'স্বপ্ন কি আমাকে ছাড়ে? সাবাবাত শ্মশান আব মড়াব স্বপ্ন দেখলুম। দাউ দাউ কবে আগুন জ্বলছে। আমাব সমস্ত [...] পুড়ে খাক হযে গেল।'

—'মাদুলিটায তাহলে কোনো উপকাব হল না?' ব্যোমকেশ বিছানাব থেকে নেমে অন্ধকাব হাতড়ে হাতড়ে দক্ষিণ দিকেব দেওযালেব কুলুঙ্গিটাব কাছে গিযে দাঁড়াল। ঘড়িটা হাতে তুলে নিযে-'সাড়ে তিনটে বেজেছে।'

—'সাড়ে তিনটে? যাও, এখন তোমাব গর্তেব ভিতব গিযে ঢোকো।'

—'ঢুকতে পাবলে মন্দ হত না। তোমাব মানুষ জন্ম সার্থক। কিন্তু বিধাতা আমাকে একটা কদর্য জন্তু তৈবি কবলেই ভালো কবতেন। মনেব ভিতব কোনো চিন্তা কল্পনাব বোঝা থাকত না, থাকত মাংসেব আমোদ শুধু।' ব্যোমকেশ নিজেব মনে নিজেকে বললে।

যদিও বিধাতা তৈবি কবেছিলেন আমাকে একটু পাখিব মতো কবে। আকাশ নদী নক্ষত্র এ সবই তো আমায দিযেছিলেন।

—'দাঁড়িযে বযেছ কেন? কী ভাবছ?'

—'আমি? আমি কিছু ভাবছি না কমলা। সাড়ে তিনটে, এখন আর ঘুমব না। এই চেয়ারটা টেনে তোমার খাটের পাশেই বসলুম। তুমি ঘুমোও, এক ঘুমেই ভোর হয়ে যাবে। স্বপ্ন কিছুই নয় কমলা, সত্যের সঙ্গে ওর কোনোই সম্পর্ক নেই। একগ্লাশ জল খাবে কমলা?'

—'কেন?'

—'মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দেবে?'

—'কীসের জন্যই বা।'

—'আমার মনে হয় তোমার ভয় চলে গেছে।'

ব্যোমকেশ এনে দিল।

ঢক ঢক করে এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেল কমলা। চোখে মাথায় চাপড়ে চাপড়ে খানিকটা জল ঝাড়ল। তারপর পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করল সে। ঘুম শিগগিরই এল।

যখন নাকডাকার শব্দ শোনা গেল ব্যোমকেশ ধীবে ধীরে চেযার থেকে উঠে বালাপোশটা গায জড়িয়ে নিল। দক্ষিণ দিকের দরজাটা আস্তে খুলে জোনাকি শিশির ও পেঁচার দেশেব ভিতর শীত রাতের নরম অন্ধকারের গন্ধে কুয়াশার সাথে কুয়াশা হযে মিশে বেরিযে গেল।

কমলা এই যে ঘুমিয়েছে, সাতটা সাড়ে সাতটাব আগে আর উঠবে না। জেগে উঠলেও ব্যোমকেশকে খুঁজবে না। প্রথম রাতে, দুপুর রাতে, রাত তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বই ব্যোমকেশকে আঁচড়ে কামড়ে জাগিয়ে রাখে। তারপর আসন্ন ভোরের গন্ধে ক্লান্ত জন্তুর মতো সে নিজে পড়ে ঘুমিযে। স্বামীকে পাঠিযে দেয় এই দৃষ্টির ভবিতব্যতার দেশে।

ব্যোমকেশ নেমে এসে খানিকক্ষণ উঠানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপব দূবে একটা আটচালা ঘরে বাতি জ্বলতে দেখে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিযে গিযে দরজায আস্তে আস্তে ঘা দিতে দিতে ডাকল—'কাশীনাথ?'

—'কে? কার গলা?'

—'ঠাওর করতে পারছ না?'

—'আচ্ছা আর একবার ডাক তো দেখি।'

—'কাশীনাথ, বাতিটা এখন জ্বালালে না সেই এগারোটার থেকেই জ্বলছে।'

—'কে ব্যোমকেশ? এসো। রাতে ঘুম হল না বুঝি?' কাশীনাথ দরজা খুলে দিল।

—'আশ্চর্য, রোজই তোমার মানুষের গলা চিনতে দেবি হয় কেন?'

—'এখন রাত বেঘোর ভাই, সহসা দবজা খুলে দিতে পারি না।'

দরজা খুলে দিল, তবুও ঘবের ভিতর ঢুকে ব্যোমকেশ বললে—'কাশীনাথ কি যে ভাবে।'

—'একেবারে পাড়াগাঁর মানুষ·কাশীনাথ, তাই আমি ভূতে বিশ্বাস করি। বিধাতার সৃষ্টি, শেষ পর্যন্ত এই সৃষ্টি অন্ধকার। এই আমার মনে হয। একেবাবেই অন্ধকাব ব্যোমকেশ।'

—'তা হবে কাশীনাথ, কিন্তু—'

—'আমি কিছুই বুঝি না ব্যোমকেশ, কিছুই না—শোন'—

—'না, আমি ওসব শুনতে চাই না। আমি কিছুই বিশ্বাস কবি না, কিছুই অবিশ্বাস করি না। তুমি ভূতে বিশ্বাস কর, ভালো কথা কাশীনাথ, নানারকম বিশ্বাস থাকা ভালো। সৃষ্টিটাকে অন্তত একটা পরিপূর্ণ জিনিশ বলে মনে হবে। আমার কাছে সৃষ্টিটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ঘোড়ল শুধু, সেখানে বাতাস পর্যন্ত নেই, জল নেই, আকাশ নেই—শীতে কালিয়ে গেছে একেবারে, একটা বিড়ি দাও তো—'

বিড়ি জ্বালিয়ে নিযে ব্যোমকেশ—'আশ্চর্য মানুষ তুমি কাশীনাথ, এই এত বছর বয়সে আইনের বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ।'

—'না, মাস্টারি করে আর লাভ নেই রে বাপু—চল্লিশ টাকা মাইনে দিত, বছর পাঁচেক হল, দশ টাকা কমিযে দিয়েছে। এখন আবো কমাতে চায়। অথচ আমি কুড়ি বছর আগে বি এ পাশ করেছি।'

—'সেইজন্য তোমার ক্ষোভ হল?'

—'জঘন্য জিনিশ এই মাস্টারি, আমাকে বিটি পাশ করে আসতে বলে। আমি কিনা শিং ভেঙে ছোকরাগুলোর সঙ্গে মিশে বিটি পড়ব। চল্লিশ টাকা মাইনের জন্য। এর চেয়ে পানের দোকান দেয়া ভালো। আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছি।'

—'ইস্তফা দিয়ে—আজকালকার দিনে—'

—'অমন ক্যাবলাপনা আমাব সাজে না বে বাপু, আমি ল পাশ কবে প্র্যাকটিশ কবব।'

—'কোথায়?'

—'জাল্পিপবে।'

—'তোমাব সাহস আছে, মানুষ বটে তুমি কাশীনাথ। কিন্তু আমাব মনে হয জীবনটাকে তুমি জটিল কবে ফেললে। থাক, যাক, তোমাব সাহস আছে, কিন্তু কাশীনাথ একটা কাবণে তোমাকে আমাব খুব ভালো লাগে।'

কাশীনাথ বাতিটা কমিয়ে দিল। কাশীনাথ জানালাব ভিতব দিয়ে বাইবেব দিকে তাকিয়েছিল।

—'তোমাব তেতাল্লিশ বছব বযসে, তবুও তুমি বিযে কবনি, যাবা বেশি বযস পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে পাবে, সেই সব মানুষদেব ভালো লাগে আমাব।'

কাশীনাথ বিড়ি জ্বালাল।

—'তাদেব জীবনে একটা আশ্চর্য সংযম ও সাহস। সৃষ্টিব হাতে তাবা গভীব পুবস্কাবেব যোগ্য।'

কাশীনাথ কোনো জবাব দিল না।

—'তুমি তেমনি লোক কাশীনাথ, আমাব দাদা আবেকজন। বেবিলিতে বড় চাকবি কবেন। সাতচল্লিশ বছব বযেস। বিযে কবলেন না। তোমবাই মানুষ—তোমাদেব দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিযে থাকি শুধু, তোমাদেব তুলনা হয না।'

ব্যোমকেশেব হৃদয গভীব বাতেব আন্তবিক বাতাসেব মতো তাব ডানাব আওযাজেব ভিতব দিযে প্রবাহিত হচ্ছিল।

—'কিন্তু আমাকে যতটা সাহসী মনে কব, তা আমি নই। বিযে আমি কবব না ভেবেছ? কেন কবব না? বিযে কবব বইকী।'

—'তুমি?' আহত হযে ব্যোমকেশ কাশীনাথেব দিকে তাকাল।

—'তেতাল্লিশ বছবে যদি আইন পড়তে পাবি, বিযে কবতে পাবি না?'

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে—'তুমি বিশ্বাসী মানুষ কাশীনাথ। বাতিটা আব মিছিমিছি জ্বালিযে বেখেছ কেন? নিবিযে দিলেই পাব। আমি তোমাব মতো আইবুড়ো হযে বইতে পাবতাম যদি কাশীনাথ, আব তুমি আমাব মতো বিবাহিত তাহলেই হত ভালো।' বলে একটু দম ছেড়ে হাসতে লাগল ব্যোমকেশ।—'কমলা একা ঘবে ফেলে চলে এসেছি, তুমি হলে এ পাবতে না কাশীনাথ—পাবতে না।' ব্যোমকেশ বললে।

—'কেন, একা ফেলে এসেছ কেন তোমাব স্ত্রীকে? ঝগড়াঝাঁটি এতদূব গড়াতে দেযা উচিত নয।'

—'স্ত্রীব সঙ্গে আমি কোনোদিন ঝগড়া কবি না। কবে লাভ কী কাশীনাথ? সে আমাকে পাযনি, আমিও তাকে পাইনি। আমাব এই ভেবে দুঃক হয যে কমলা এসব বোঝে না। লজ্জা হয এই ভেবে যে আমাব দেহটা সংসাবে গেড়ে বসল—দুটি সন্তানেব পিতা হতে চললাম আমি।'

ব্যোমকেশ বাতিটা নিবিযে দিযে—'যখনই ভাবি, তখনই মনে হয কি অসত্য, কি ভযংকব।

খানিকটা কেবোসিনেব গন্ধ ছড়িযে পড়ল চাবদিকে।

— 'কি কবা যায কাশীনাথ?'

— 'সে তোমাকে পাযনি?'

—'না।'

—'আব তুমিও তাকে পাওনি বললে?'

—'পেতে ইচ্ছেও কবে না।'

—'কী ইচ্ছে কবে তাহলে তোমাব?'

—'এবাব সন্তান প্রসবেব সময কমলা যদি মাবা যায তাহলে আমাব কোনো দুঃখ হবে না।'

—'এই তোমাব ইচ্ছা?'

—'অনেকটা এই বকমই কাশীনাথ। আমি একা থাকতে চাই।'

—'একা থেকে কববে কি?'

—'আমাব মতো মানুষ একা থেকে কিনা কবতে পাবে কাশীনাথ। এখন সাবাদিন সাবা বাতেব ভিতব দু-পাতা বই পড়বাব সুযোগও আমাব নে একা যদি হতে পাবি, না হয বই পড়েই কাটিযে দেব সাবা

জীবন। না হয় এমনি কুয়াশার রাতে বেরিয়ে পড়ব তোমার মতন একজন লোকের সঙ্গে গল্প করবাব জন্য। না হয় জাহাজের খালাশি হয়ে বাংলাদেশের নদীতে নদীতে দিন কাটিয়ে দেব।'

—'তোমার স্ত্রী সংসর্গের চেয়ে এসবই তাহলে প্রার্থনীয়?'

—'খালাশি হব বলেই খালাশি হওয়া নয়, সমুদ্র দেখব বলেই সমুদ্র দেখা নয়, কিন্তু আজ আমি খালাশি হয়ে কালই আবার সব ছেড়ে দিয়ে পথে পাহাড়ে ঘুবে বেড়াতে পাবব বলেই এইসব, এই আমাব জীবনের আসল আকাঙ্ক্ষা ও আশা—এসব আশা মানুষেব কোনোদিনও পূর্ণ হয় না।'

—'তেতাল্লিশ বছব বয়সে আইনেব বই নিয়ে ঘাঁটতে হবে তাহলে?'

—'তাই-ই কবতে হবে—না হয় পাখি হয়ে উড়ে যেতে হবে।'

কাশীনাথও পাখির কথা বলে? ব্যোমকেশ হেসে উঠল—'পাখি? আচ্ছা কী পাখি বলো তো কাশীনাথ?'

কাশীনাথ খানিকটা ভুরূ কুঁচকে নিয়ে—'এমন পাখিব তো নাম কবতে পাবি না আমি যা শেষ পর্যন্ত নীড়ে ফিবে না আসে।'

—'কিন্তু কত পাখিব নীড় থাকে পাহাড়েব ওপব, আকাশ ও নক্ষত্রেব নীচে—নক্ষত্রেব মাংস আকাশেব স্তন ঘেঁষে কাশীনাথ—আমাদেব হতভাগ্য ঘবোদোবেব সঙ্গে কী নিদারুণ প্রভেদ।'

—'কাশীনাথ?'

—'বলো।'

—'লোকে বলে মানুষও হয়ে জন্মেছ, পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু ডানাপালকেব বিচিত্র বাজত্বেব খবব তাবা বাখে না। কী ভাবছ কাশীনাথ? আচ্ছা কাশীনাথ পালিয়ে গেলে কেমন হয়?'

—'কোথায় যাবে?'

—'এখান থেকে কলকাতায, তাবপব জাপানেব জাহাজে।'

—'জাপান?' কাশীনাথ এটা বিড়ি জ্বালাল।

—'কি যে বলো ব্যোমকেশ, যেন জাপান আমাদেব পৃথিবীর ভেতব নয়।'

—'পৃথিবীব ভেতব বইকী।'

—'তবে? সেখানে গিয়ে হবে কী? মানুষেব খোলশ বদলাতে পাববে? হয়তো নতুন শিক্ষাদীক্ষা পাবে, কিছু টাকা কববে। তাবপব?'

—'তাবপবেব কথা আমি ভাবি না।'

—'মনে ভেবেছ জাপানেব চেষিকুঞ্জেব জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেবে? শান্তি কোথাও নেই ব্যোমকেশ। ববং তুমি তোমাব নিজেব ঘবেই ফিবে যাও।'

—'তারপব?'

—'তাবপর তৈবি হও তোমাব অসুস্থ স্ত্রীকে সুস্থ কবে তুলবাব জন্য, তোমাদেব মনেব বৈপবীত্যকে সহজ সোজা কবে তুলবাব জন্য—অফিসেব কর্তাদেব খোসামোদ কবে চাকবি বজায় বাখবাব জন্য। বাজাবেব পথে খাঁড়া হাতে নিয়েই তোমাকেও চাকলাদাব সাজবাব জন্য।'

'জাপানে, ইটালিতে, স্পেনে ব্যোমকেশ আব কমলা পথেঘাটে, মিছিমিছি গিয়ে কেন ভিড় বাড়াবে। বোসো, একটু চা তৈবি কবি।'

চা কবতে কবতে কাশীনাথ—'তুমি হয়তো ভাবছ, হায়, কাশীনাথ আমাকে চিনল না, কিন্তু একদিন সে বুঝবে। বুঝিযেই দিও ভাই কোনো এক নক্ষত্রেব বাতে [...] সমুদ্রেব ওপব তোমাব শাদা পাখাব কঙ্কন যদি শুনতে পাই, দক্ষিণ সমুদ্রেব বাতে তোমাকে দেখতে পাই ধবল পাখিব দেবতাব মতো তাহলে আমি—আমাব আনন্দকে তুমি সেই সফেন সমুদ্র বলে চিনতে পাববে সেদিন, চিনতে পাববে ব্যোমকেশ।'

—'কলকাতায় যাবে কবে কাশীনাথ?'

—'কাল।'

—'কালই?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাবপব?'

—'তাবপর কলকাতাযই বসবাব সুযোগ তৈবি কবতে হবে।'

—'এদিকে আব ফিববে না?'

—'আর কেন?'

—'কোনোদিনও না?'

—'কীসের জন্য? কলকাতাযই হল আমাব কাজ।'

—'সত্যিই তুমি বিয়ে করবে কাশীনাথ?'

—'এ প্রশ্ন কেন আমাকে কর তুমি নিজে কেন করেছিলে? নিজে তো না কবে থাকতে পারলে না। আমি কেন করব না?'

—'তোমাব মা নেই, বাবা নেই, আত্মীযস্বজন নেই, চাকবি নেই, বয়েস তেতাল্লিশ, আমি অবাক হয়ে ভাবি, তুমি কেমন মেয়ে পাবে?'

—'সন্তানেব মা হতে পাবে এইবকম একটি মেয়ে পেলেই হবে। সে মেয়েকে দিযেই সব হবে। তার ভিতরে সব আছে। আমি আছি তার বাইরে, তাব ভিতরেও আমিই আছি ব্যোমকেশ।' কাশীনাথ একটু চুপ থেকে—'ওই দেখো একটা গরুব গাড়ি সোনালি খড়েব বোঝা বুকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? যুদ্ধ কবতে নয, আত্মহত্যা কবতে নয। অনেক গন্ধর্ব কিন্নব যক্ষ মবে গেছে, কিন্তু এই ছবি কোনোদিন মববে না। এ হচ্ছে শান্তিব ছবি, নীড়েব ছবি। নীড় রচনা কব, পবিবাব গড়ে তোল। আমাব জীবনেব আসল কাজ বাকি পড়ে বযেছে।'

হাতে একটা টিনের সুটকেশ একটা মস্তবড় বোঁচকা হাতে নিয়ে তেতাল্লিশ বছর বযসে জীবন শুরু কববাব জন্য তিন মাইল দূবে বেলওযে স্টেশনের দিকে পবদিন বওনা হল কাশীনাথ।

হায কাশীনাথ যদি কমলাকে পেত। এই কি শীতের পৃথিবী, না মানুষেব হৃদযেব পৃথিবী? চারিদিকে কি নিদারুণ শূন্যতা।

সন্ধ্যাব অন্ধকাব নেমে আসছে। মাঠের এক কিনাবে কাত হযে ছড়িযে বসে একখণ্ড ঘাসের নির্জন শিষেব দিকে তাকিয়ে ব্যোমকেশ ভাবছিল। নিস্পন্দ পুবাণপুরুষ, চাবদিকে শিশিব, চারদিকে শূন্যতা।

আস্বাদের জন্য

একদিন মাকে কেমন রহস্যকুয়াশাময় মনে হচ্ছিল।

অবিশ্যি এ বয়েসে তার ওপর জুলুম করা যায় না। কিন্তু তবুও এই পরিবারের ভিতর খানিকটা আসেন নিশ্চিত কেমন একটা জীবনের আস্বাদ নিয়ে। অভিমানের মতো যেন তিনি। চারদিককার অন্ধকার ও বিমূঢ়তার ভিতর অকস্মাৎ তাঁকে বৃন্তবীথির ছায়ার মতো মনে হয় যেন—মনে হয় অনেকখানি তীরেব নিশ্চয়তা ও স্থিরতা রয়েছে তাঁর পিছনে, রয়েছে শান্তি।

অনেক বছর আগে সোমনাথের স্ত্রীর একটি মৃতসন্তান হয়েছিল, আজ আবার প্রায় সাত আট-বছব পরে বউয়ের ছেলেপিলে হবাব সম্ভাবনা। কিন্তু মা এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ কবছেন না মোটেই। কোনো উৎসাহ নেই তাঁর চোখে। মা-ব মুখের দিকে তাকালে সোমনাথকে প্রতিহত হযে ফিরে আসতে হয। প্রতি মুহূর্তে সোমনাথকে ও সোমনাথের স্ত্রীকে ব্যাহত করে ফিরছেন যেন তিনি। এ সংসারের ভিতর সমস্ত সংকল্প কর্তব্য আশার পরিধি চিরকাল তৈবি করে এসেছেন যিনি, আজ যেন হৈমন্তিক শিশির এসে গিলে ফেলেছে তাঁকে। অথচ তাঁর বয়স এমন বেশিও নয়। ছাপান্ন বছর মাত্র। সোমনাথ তো আশা করেছিল সত্তর বছর বয়সেও মা এই পরিবারেব স্তম্ভ হয়ে থাকবেন।

ঘবের মেঝেতে স্ত্রীর পাযের শব্দ শোনা গেল যখন সোমনাথ সোফার পাশে বসে কী যেন লিখছিল। পাযের শব্দ শোনা গেল। স্থির নিবিষ্ট কেমন শব্দ। মা নিশ্চয আসছেন। কলম চালাতে চালাতে স্থিব হয়ে অক্ষবগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কাঁচাপাকা চুলের কেমন একটা নিঃশব্দ মিশ্রণ, ধূসর শাড়ির দুর্বোধ্য নির্জনতা, ঘবেব দেযালে একটা লম্বা ছাযা।

বাঁ কনুযেব ওপব ভব দিযে সোমনাথ ডান হাতেব কলমটা খানিকটা শূন্যেব ওপব তুলে ধবল। স্থিব চোখে কলমটার দিকে তাকিযে রইল।

—'সোমনাথ।'

—'বোসো মা।'

—'আমার দিকে তাকাও তো, শোনো—কযেকদিনের জন্য আমাকে ছুটি নিতে হল।'

—'ছুটি? কোথায যাবে ঠিক করেছ?'

—'শ্রীবামপুরেই যাব। বাবাব সঙ্গে দেখা কবতে। বহুদিন বাপেব বাড়ি যাওয়া হযনি।'

—'আমিও তাই ভাবছিলাম, একবাব শ্রীরামপুব গেলে মন্দ হয় না তোমার। মামাদেব কোনো চিঠি পেযেছ?'

—'না।'

—'তাঁরা বড় একটা চিঠি লেখেন না।'

—'আমাকে কুড়িটা টাকা দিতে হবে।'

—'মোটে কুড়ি টাকায হবে তোমার?'

—'আমি জানি তোমার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই।'

—'আমাব মনে হয়, অন্তত পঞ্চাশ—ষাট টাকা তোমাব হাতে থাকা ভালো, অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি যাচ্ছ।'

—'অত টাকা কোথায তুমি পাবে সোমনাথ? আশি টাকা মাইনে, আমাকেই যদি পঞ্চাশ দিযে দাও—বিভার তো এই অবস্থা, মাস দুই বাকি, টাকাকড়ির তো নানারকম দবকাব—'

কিন্তু তবুও পঞ্চাশ টাকা নিয়েই চলে গেলেন তিনি। বলে গেলেন কযেকদিনের ভিতবেই ফিবব।

কিন্তু বাপের বাড়ির থেকে কয়েকদিনের ভিতরেই ফেরা যায না। সেই শ্রীরামপুরের বাড়ির থেকে কয়েকদিনের ভিতরেই ফেরা যায না কখনো। যখনই গিয়েছেন পাঁচ-ছয মাস শ্রীবামপুর থেকে ফেরেননি। কাজেই বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ কবেছেন যখন সোমনাথেব মা এই পবিবাবেব ভিতব একটা আতঙ্ক

উপস্থিত হত। হায, কি যেন একটা অঘটন ঘটে গিযেছে।

বিভাব সন্তান হবে, এবাবকাব অঘটন বোধহয এই। খবব দেয়া হল, সোমনাথেব ছোটমামা এসে দিদিকে নিযে গেল। শ্রীবামপুবে মাকে বিদায দিযে এসে সোমনাথ ঘবে ঢুকে দেখল কোথাও কোনো আলো নেই, বিভা নেই, ঘবে অন্ধকাব, অন্ধকাবেব বুকে থতমতো খেযে ফিবছে।

মা গেছেন, এ বাড়িতে স্ত্রীলোক তাহলে তিনটি বইল আব। সোমনাথ ভাবছিল। বিভা বইল। কিন্তু সে আজ স্ত্রী পুরুষ কিছুই নয যেন—মাস দেড়েক পবে তাব সন্তান হবে। হযতো মৃত সন্তানই হবে। বিভা মৃতবৎসা। তাব মাও এইবকম ছিলেন। তাঁব সাত-আটটি সন্তানেব মধ্যে এক বিভাই বেঁচে বযেছে। বিভাব গলা তো নয যেন নলি। অনেক সময তাব দিকে তাকিযে শুষ্ক মৃত হাঁসেব কথা মনে হয। বিভাব মা নেই, বাবা নেই; খানিকটা রূপ ছিল, সেজন্যেই তাকে বিযে কবা। খানিকটা রূপেব জন্যই বিভাকে বিযে কবেছিল সোমনাথ। কিন্তু সেই রূপ অন্ধকাব জলেব গোপনতাব ভিতব আশ্বস্ত হযে থাকবাব জিনিশ—পৃথিবীব মৃত্তিকায এসে তা হযে গেছে মৃত মাছেব মতো—রুইমাছেব সৃষ্ট কন্যাব মতো যেন শামুক গুগলি ছাই ধুলা ও মুখব বৌদ্রেব ভিতব।

মেযেটিব বাবা-মা নেই, শ্বশুববাড়িতে এসে স্বামী আস্বাদেব চেযেও আস্বাদই চেযেছিল সে যেন ঢেব বেশি কবে।

কিন্তু সোমনাথেব মা কেন যেন, কিছুতেই যেন বউকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ কবতে পাবলেন না। সোমনাথেব মা সোমনাথেব মা হযেই বইলেন তিনি—বিভাব মা কিছুতেই তিনি হতে পাবলেন না। প্রথমকাব মা হাবিযেছে, শ্বশুববাড়ি এসে দ্বিতীযবাবও মাকে ফিবে পেল না বিভা। এই মেযেটিব মাতৃ—আস্বাদেব অতৃপ্তি স্বামী আস্বাদেব বিমুখতা।

বিভা অসুস্থ শবীবেব মানুষ। চিন্তাও তাব কোনোদিন সুস্থ নয। শাশুড়ীব কোনোবকম সাংসাবিক ভাবই লাঘব কবতে পাবেনি সে। কবাব যে প্রযোজন আছে, তাও বুঝে উঠতে পাবেনি।

সে ভেবেছে দ্বিতীযবাব কন্যারূপে জন্মগ্রহণ কববে সে—অন্য আব এক পবিবাবে। নিজেই লালিত হযে উঠবে। কারু কোনো লালনেব ভাব তাব ওপবে নেই তো। সোমনাথ তাকে কিছু শেখাতে পাবেনি বিভা বধূ নয, মা নয, সে হচ্ছে আজন্ম কন্যা।

সোমনাথ যখনই তাব মুখোমুখি এসে বসেছে তখনই সোমনাথকে পিতাব মতো কবে নিযেছে বিভা। হৃদযেব আবেগেব মুহূর্তে মনে কবে নিযেছে বক্তমাংসেব পুরুষমানুষেব মতো।

মা চলে গেলেন—বইল P T

মেযেদেব মধ্যে আব কে বইল?

বইলেন পিসিমা, তিনি আবো দূবেব মানুষ। লেখাপড়া শিখেছেন খানিকটা। অনেক দিনক ব বিধবা। নানাবকম নাবী মঙ্গল সমিতিব কাজ নিযে তিনি থাকেন। পবিশ্রম কবে চাঁদা আদায কবে বিধবাদেব জন্য একটা আশ্রম খুলেছেন। সপ্তাহেব চাব-পাঁচ দিনই সেখানে থাকেন। দু-তিন দিনেব জন্য এ বাড়িতে আসেন। কিন্তু তখনো তাঁব চোখ মন থাকে নক্ষত্রেব দিকে। হৃদয থাকে বাড়িব লেবু কবমচা ও জাম্বিব গাছেব ভিতব। ফলগুলো পেড়ে নেন। শুকনো পাতাব পথে ঘুবে বেড়ান। ঘবে বসে সেলাই কবেন, সেলাই কবেন, সেলাই কবেন, সেলাই আব ফুবোয না। কখনো বই পড়েন, বই পড়েন, সাবা দিনমান বিদ্যাসাগবেব জীবনচবিত কিংবা [...] ইংবেজিও জানেন খানিকটা। নিযে পড়ে থাকেন। তাবপব সন্ধ্যাব মুখে খানিকটা সাগুমাখা কলা চিনি খেযে গাযে চাদব টেনে শুযে পড়েন। পবদিন ভোববাতেও তাকে খুঁজে পাওযা যায না—আশ্রমে চলে গেছেন।

সোমনাথ যে বিযে কবেছেন, পিসিমা তা জানেন। সাত-আট বছব আগে সোমনাথেব যে একটি মৃতসন্তান হযেছিল সে খোঁজও বাখেন তিনি। মৃত্যু ও দুঃখেব ওপব সহানুভূতি আছে তাঁব। কিন্তু বিভাব যে আবেকটি সন্তান হবে শিগগিবই সেকথা হযতো তিনি জানেন না। বিভা যদি বিধবা হত তাহলে পিসিমাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবত নিশ্চযই। কিন্তু বিভা সধবা মানুষ। বিধবাশ্রমেব এই নক্ষত্রচাবিতাব সঙ্গে কোনো সম্পর্কেব বাঁধন বচিত হল না তাব। এখানে ইচ্ছা অনিচ্ছায কোনো কথা নেই, কথা হল ভাবেব। বিভা পিসিমা দুজনে বিপবীত নক্ষত্রেব জীব। বিভাও পিসিমাকে চেনে না, বোঝে না, হযতো অবজ্ঞা কবে—ঘৃণাও কবে হযতো।

সোমনাথ চুরুটেব বাক্স খুলে একটা চুরুট বাব কবল।

বিভাব চব্বিশ ঘণ্টাব প্যানপ্যানানিব কথা যদি ছেড়ে দেযা যায, যে প্যানপ্যানানি অত্যন্ত মাবাত্মক

যার সমস্ত বেদনা সাপের কামড়ের মতো সোমনাথকেই আক্রমণ করে শুধু। বিভার চব্বিশ ঘণ্টা অস্বস্থি অসাধের এই বিষাক্ত পরিস্ফুটনের কথা ছেড়ে দাও যদি তাহলে এই পরিবারটা—এই পরিবারটা কেমন যেন নিস্তব্ধ ভয়াবহ মৃত্যুর নিঃশব্দ একটা পরিবার এই।

সোমনাথ চুরুটটা জ্বালল না।

এই সংসারে আর একটি মেয়ে আছে, সে হচ্ছে সোমনাথের বোন নীহার। নীহার আই এ পাশ করে ক বছর ধরে। কিন্তু টাকাকড়িও শরীরের সুস্থতার অভাবে বি এ পড়া হচ্ছে না। বযস বাইশ পেরিয়ে গেল। বিয়ে হয়নি। বাইশ উতরে গেল তবুও বিয়ে হল না। এই অসচ্ছল পরিবারের অসুস্থ মেয়েটির বিশেষ কোনো সুসঙ্গিত হবে বলে মনে হয় না।

হবে কি?

বিশেষ কোনো সুসঙ্গতি?

কোনো সুসঙ্গতি?

ধরো, কোনো সঙ্গতিই?

এই অসচ্ছল পরিবারেব এই বরং, কঠিন চেহাবার মেয়েটিব টুকরো টুকরো প্রশ্ন সোমনাথের মনের ভিতর শীত নদীর জলের আঘাতের মতো আঁচড় কেটে চলছিল।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে কাজের জন্য দরখাস্ত কবে নীহাব। খবরেব কাগজ পড়ে। বাংলা উপন্যাস [...] আর নীহার। বি এ পরীক্ষার জন্য বই জোগাড় করে মাঝে মাঝে সে, বেশি বই জোগাড়ও করতে পারেনি। বইযের দু-চার পাতা উলটিয়ে রেখে দেয, পড়াশোনা পরে হবে আগে সমস্ত বই জোগাড় করে নিক। সুষমা নামে পঁচিশ বছব বয়সের একটি বন্ধু জুটেছে নীহারের। মেয়েটি আইবুড়ো। চেহারা কঠিন। সে জন্যই বোধহয় দুজনের অন্তরঙ্গতা। সুষমাকে নিযে সাবাদিন অনেক রাত অবদি গল্প বলে—পিসিমার সময কাটে যেমন বিধবা আশ্রম নিয়ে।

নীহারও জানে বছর দশেক আগে সোমনাথের বিযে হয়েছিল। সোমনাথের মনে হয় নীহার অনেক সময়ই হযতো ভাবে দাম্পত্যজীবনের সুখ সফলতা দাদাই শুধু অনুভব করে নিল—বিশ্রী বক্তমাংসের ক্ষোভ এদের রইল না আর। সমস্তই শ্লীল অনুমোদিত অথচ অপরূপ হযে উঠল। এই দম্পতিব নিকটে ঘেষেণা নীহার। মোটেই ঘেঁষে না। দূরের থেকে নিজেব কামনার আলোয় আগুনে প্রতিফলিত করে নীল লাল নানারকম বিচিত্র সুন্দর শিখা যে দেখে প্রতি বিবাহের আসবে, প্রতি তরুণ দম্পতিব জীবন ঘিবে। নীহাব জানে প্রায় সাত-আট বছর আগে সোমনাথের প্রথম মৃত সন্তান জন্মেছিল। আজ আবার আব একটি সন্তান আসছে তাও জানে নীহার। সে হযতো জানে এই সন্তানটিও মৃতই হবে। এই সমস্তই জানে নীহার।

কিন্তু আর বেশি কিছু জানার আবশ্যকতা রোধ করেন না সে। পিসিমাও মা-র সঙ্গে দক্ষিণ দিকেব টিনের ঘরে থাকে। এই যে নীহার সে যেন সোমনাথের বোন নয, যেন কোনো প্রতিবেশী মেযে। এমন দুতিন দিন চলে যায় যখন সমস্ত দিন রাতের মধ্যে নীহারকে চোখেও দেখতে পায না সোমনাথ। নীহার সে যেন নেই, সে যেন মৃত। পুকুরের সবচেযে অদৃশ্য মাছের মতো সে যেন কোনো অন্ধকার জলের লোকে অন্তর্হিত। সোমনাথের আত্মার সঙ্গে কোনোদিন পরিচযও হবে না তার।

নীহার যদি বি এ-র সমস্ত বই জোগাড় করে উঠতে না পাবে, কোনো কারণে সুষমাকে যদি অন্য দেশে গিয়ে থাকতে হয় কিংবা বা প্রেতলোকে, এই মেয়েটি সারাদিন কাটাবে কী করে তাহলে?

বিভা ছাড়া বাড়ির মহিলা তিনটি এইরকম।

পুরুষের মধ্যে রযেছেন বাবা। বয়স সত্তর বছর।

পেনশন পাচ্ছেন না। সারা জীবনের রোজগারের পথ তাঁর অন্যরকম ছিল। শাদাসিধে সাধু মানুষ। হাতে একটা পয়সাও নেই। আজকাল চোখে দেখতে পান না। শাদা ভুরু চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে, দাড়ি হয়ে গেছে শাদা। একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি গাযে থাকে, আর হাতে থাকে একটা লাঠি। মাঝে মাঝে উঠোনে ঘুবে বেড়ান, বিশেষত দুপুরবেলা। সুপুরি গাছের গায়ে জমেছে যে ছাতকুড়ো লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখেন। খেজুরগাছের মাথার দিকে তাকিযে থাকেন। আকাশে কত প্রহর এল। মেঘ কেমন ঘন শাদা হযে উঠল। ঘাসের ভিতর কতকগুলো লাল সুপুরি ছড়িয়ে আছে। নারকেলের ফুল আবাব সোনালি হযে উঠল। চোখ তুলে এই সব দেখেন এক এক বার। তারপব বিছানায় শুযে চোখ বুজে স্থিব হযে থাকেন। অনেকক্ষণ—তবুও ঘুমিয়ে পড়েন না। তবুও তারপব উঠে বসতে হয় আবার, পুরু কাচেব চশমা চোখে এঁটে জীবনের সবচেযে

বড় নেশা শুরু হয় তাঁব। দাবা খেলা নয়, বই পড়া পর্যন্ত নয়, নল মুখে দিয়ে চশমা চোখে কুণ্ডলীব দিকে তাকিয়ে তামাক টানা। সাবাটা দিন স্বপ্নের মতো কেটে যায় তাঁব। কী কল্পনা কবেন, কী প্রশ্ন, কোনো মীমাংসায় উপস্থিত হন সোমনাথ তা জানে না। কেউ জানবে না তো কোনোদিন। নিস্তব্ধ বাড়িব নিঃশব্দতম বক্তমাংস ইনি, এঁব অন্তর্গাঢ়তাব ভিতব হয়তো বয়েছে অনেক কলবব, বয়েছে অনেক সাঙ্গপাঙ্গ।

ভাবতে ভাবতে হেমন্তেব সন্ধ্যা নেমে এল।

জানলাব ভিতব দিয়ে সোমনাথেব টেবিলেব ওপব দু-চাবটে হলুদ কাঁটালপাতা উড়ে এসেছে, আলোব বং যেন বাসি মাংসেব মতো। কান পাতলে শিশিবেব শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ঘন লালসাব বিচিত্র ছাগলেব মতো অন্ধকাব যেন লুকিয়ে বয়েছে কোথাও। এখনই আসবে সে কামনাব তৃপ্তিব জন্য কিংবা মুণ্ডুকাটা মূক বেদনায় সমস্ত আকাশ, মানুষেব হৃদয় ভবে ফেলবাব জন্য। হেমন্তেব এই অন্ধকাব আসবে।

চুরুট জ্বালাতে পাবল না সোমনাথ।

—'বিভা।'

কোনো উত্তব নেই।

—'বিছানায় শুয়ে আছ?'

না, বিছানায় কেউ শুয়ে নেই।

—'আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি ঘুমুচ্ছ।'

কেউ থাকলে তো ঘুমুবে। বিভা গেল কোথায়? সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। দক্ষিণেব ঘবে যায়নি তো? কিন্তু সে ঘবে তো বিভা যায় না বড় একটা কোনোদিন। ননদদেব সঙ্গে দু-চাব মাসেব ভিতব তাব একটা কথা হয় কিনা সন্দেহ। তবুও সোমনাথ দক্ষিণেব ঘবটা একবাব ঘুবে দেখে আসবাব জন্য প্রয়োজন বোধ কবল। দক্ষিণেব ঘবেব সিঁড়িতে পা দিতেই বাবাব গলাব স্বব—'কে ওখানে?'

-'আমি সোমনাথ।'

—'সোমনাথ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এদিকে এসো, কথা আছে, বোসো।' বাবা শাদা ভুরু তুলে সোমনাথকে জিজ্ঞেস কবলেন—'তোমাব মাকে তুমি শ্রীবামপুবে পাঠিয়েছ?

সোমনাথ খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে—'হ্যাঁ।

—'তাহলে তুমিই পাঠিয়েছ, আমি ভাবলাম তিনি নিজেই গেলেন। কবে ফিববেন?'

—'আপনাকে বলে যাননি কিছু?'

—'আমাব সঙ্গে তাঁব বিশেষ কথা হয় না। একটু চুপ থেকে বাবা—'এই সময় তাঁকে পাঠালে? বউমা কোথায়? একজন ভালো স্ত্রীলোক এ বাড়িতে থাকলে বউমাব সুবিধা হত।'

সোমনাথ একটু নীবব থেকে—'পিসিমা আছেন।'

—'আমিও তো আছি।' বাবা হেসে বললেন।—'তোমাব পিসিমাব চেয়ে আমি কম নই। দুঃখেব বিষয় চোখে দেখতে পাই না কিছু। যাক, তোমাদেব জিনিশ তোমবা বুঝে নাও। মনে কব আমি মবে গেছি। এই অঘ্রান পড়লে আমাকে আব দেখতে পাবে না হয়তো। এখন দেখছ, কিন্তু তবুও আমি নেই।' বাবা চুপ কবলেন।

—'কোথায় যাচ্ছিলে সোমনাথ?'

—'এইখানেই ঘুবছিলুম।'

—'উঠানে পায়চাবি কবছিলে বুঝি? বউমা কোথায়?'

—'ঘবেই আছে।'

—'থাকুক, থাকুক, ঘবেব মেয়ে ঘবেই থাকুক। কিন্তু সোমনাথ আমি অনেকদিন পর্যন্ত বউমাকে দেখিই না। মাঝে মাঝে মনে হয় কাছে ডেকে আনব। কিন্তু'—বাবা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বইলেন।

—'আশ্চর্য আমি তো মেয়েমানুষ নই, কিন্তু যদি হতাম, আজ শ্রীবামপুব যেতাম না কখনো।' নলটা মুখে তুলে নিয়ে বিমূঢ়ভাবে বুড়ো মানুষ খানিকক্ষণ তামাক টানলেন।—'যাক, এখন অন্য কাজেব কথা হোক। ইহলোকেব জিনিশ নিয়ে মাথা ঘামাব না আব সোমনাথ, যা হবাব তা হবে। সব মবে যাবে, এই তো, এব বেশি কী আব?'

সোমনাথ আঙুল মটকাতে মটকাতে ডান হাতের পাঁচটা ছড়ানো আঙুলের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'কিন্তু মানুষ যেন শান্তিতে মরতে পারে। এর বেশি কামনা মানুষ কি আর করতে পারে?'

—'শান্তিতে মরাই মুশকিল বাবা।'

—'তা আমি জানি। কিন্তু মৃত্যুর হযতো শান্তি আছে।'

—'কিছু থাকা না থাকা আমাদেব ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কি?'

—'না তা করে না, তা আমি জানি। এদিককার নিয়ম শেষ পর্যন্ত কী বলে তা কেউ জানে না। কিন্তু আমার মনে হয়, যে মরল সে হযতো ধোঁযা হযে গেল। কিন্তু যে বেঁচে বইল, শেষ পর্যন্ত সে ভাবী একটা সুন্দর দায়িত্বহীন শান্তি পাবে সোমনাথ, তখন প্রথম আবেগের তার কাছে একটা অশ্লীল বিশ্রী জিনিশ বলে মনে হবে।'

—'তা হয়তো হবে।'

—'ঠিক তাই হয সোমনাথ।'

—'কিন্তু সকলের জীবন হযতো এরকম বিতৃষ্ণা নিযে নয।'

—'তোমার পিসিমা ছাড়া আমাদের এ পরিবারেব সবকটি মানুষই আজ বিতৃষ্ণ বৈবাগী।'

—'নীহারাও?'

—'সব, সব, সোমনাথ। চোখে দেখি না। কিন্তু অনুভব দিয়ে সবই তলিযে দেখলুম। এরা সকলেই মৃত্যুব জন্য অপেক্ষা কবছে। এই শীতের মাঝরাতে মৃত্যু যদি একটি শান্ত সেতু যদি তৈবি কবে এদেব ডাকে, এরা কেউই পৃথিবীতে থাকতে চাইবে না।'

—'বিভা সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে, তাব আসক্তি ঢের।'

—'কিন্তু মেটাবাব ক্ষেত্র নেই তো, তুমি তাব দরিদ্র স্বামী। তোমাব মা উদাসীন হযে রইলেন। আমরা হয়ে রইলাম নিস্তব্ধ। আসক্তি খেলবে কোথায়?'

—'রাত হয়েছে বাবা।'

—'বউমা একা পড়ে আছে হযতো।'

—'হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।'

—'তোমাকে যা কাজেব কথা বলছিলুম। আমাকে একটি বই এনে দিতে হবে।'

—'কী বই?'

—'থিওসফিব। হাবানবাবুর, হাবান কিনা, ও মনে পড়েছে হারান কুশাবীব কাছে আছে ঢেব, আমাকে কাল একটা এনে দিতে হবে।'

—'বই তো আনব, কিন্তু কী কবে পড়বেন আপনি?'

—'দিনের আলোয খানিকটা খানিকটা পড়তে পারি। নীহাবকে দিযে কিছু কিছু পড়াব। আচ্ছা, এসো তুমি।'

সোমনাথ হাঁটতে হাঁটতে পিসিমাব ঘবেব দিকে গিযে বললে—'আছেন নাকি পিসিমা?'

—'কে, সোমনাথ?'

—'আজ্ঞে।'

—'এত রাতে? খেযেছ বাবু?'

—'না, খাইনি এখনো, আপনি কী কবছেন?' ঘরেব চাবদিকে তাকিযে নিযে সোমনাথ বুঝতে পাবল বিভা এখানে নেই।

—'আমি খানিকটা সাগুমাখা খেলাম। আশ্রমে যাইনি আজ আব। বোসো'—

—'এখনো যে আলো জ্বেলে?'

—'একটা বই পড়ছি বাবা।'

—'কী বই? চোখে ভালো ঠাওর পান তো?'

—'তা ভালো দেখি না, তবে চলে যায়। এইবার ভেবেছি চশমা নেব।'

—'কী পড়ছেন?'

—'শক্তিসাধন বাবাজির জীবনচবিত।'

—'ইনি কে?'

—'পশ্চিমের একটা সাধু।'

—'পশ্চিম মানে প্রয়াগ পিসিমা?'
—'না রে, ইনি থাকেন মুঙ্গেরে।'
—'এদিকে এসেটেসেছেন নাকি কোনোদিন?'
—'পাগল—আমাদের দেশের আসবেন উনি? কলকাতায়ই এসেছেন কিনা সন্দেহ।'
—'বাংলাদেশে কি সাধু নেই পিসিমা?'
—'থাকবে না কেন, কিন্তু যার যাঁকে ভালো লাগে। সকলেরই তো আর এক গুরু নয়।'
—'তা ঠিক পিসিমা।'
দুজনেই নীরব।
—'আপনি একবার কুম্ভমেলা দেখলে পারতেন।
—'কে, আমি? পয়সা কোথায় রে বাবা? সময়ই-বা কই?'
—'অনেক সাধু দেখতে পারতেন।'
—'মিছিমিছি সাধু দেখে বেড়াবার রোগ আমার নেই, তা নেই সোমনাথ, ওদের জীবনচরিত পড়ি, চিন্তা করি, ভগবানের পায়ে বসে থাকি, সে সুযোগই যেন আমার থাকে চিরদিন। সংসারে যেন জড়িয়ে না পড়ি কখনো।' পিসিমা একটু চুপ থেকে—'শুধু একবার মুঙ্গের যাবার ইচ্ছা।'
—'সাধুজিকে দেখতে?'
—'শুধু দেখতে নয় সোমনাথ, এঁকে গুরুভাবে পাবার সৌভাগ্য যদি আমার হয়।'
—'হবে পিসিমা, আপনাকে না হয় একবার মুঙ্গের ঘুরিয়ে আনব। দেখি তো বইখানা। সাধুবাবার একটা ফটোও দিয়েছে দেখছি। ভারী চমৎকার চেহারা তো।'
—'তুমি মুঙ্গের যাবে সোমনাথ, আমাকে সঙ্গে নিয়ে?'
—'আপনার ইচ্ছা যখন এত প্রবল, না গিয়ে ছাড়বেন পিসিমা? আমাকে আপনি টেনেই নিয়ে যাবেন।'
—'তা বেশ, টাকাকড়ির ব্যবস্থা করো সোমনাথ, মুখের দিকে তাকাবার মতো মানুষ তুমিই তো আছ এই পরিবারে। সোমনাথ, তুমিও কি শিষ্য হবে নাকি?'
সোমনাথ মাথা নেড়ে—'কারু শিষ্য হবার যোগ্য নই আমি। মনে আমার আবেগ আছে বটে কিন্তু তা আকাশকে-ও আঘাত করতে পারে না। মৃত্তিকাকেও না, মেঘের তরঙ্গ ও মাটির তরঙ্গ দুই-ই সুন্দর জিনিশ পিসিমা, কিন্তু আমার জীবনটা কুয়াশার মতো হিম, আকৃতিহীন। আমি মৃত সন্তানের বাবা।' সোমনাথ আওয়াজ ক'রে হেসে উঠেই নেমে গেল। পিসিমা এসব সূত্র ধরতে গেলেন না। সোমনাথের মন মেঘের মতো ভেসে গিয়ে অন্য কথা পাড়ল।
—'আপনি [...] তো পড়েন পিসিমা?
—'হ্যাঁ, পড়ি।'
—'না, এখনো পড়ি।'
—'আর কোনো ইংরেজি বই পড়েন না?'
—'পড়ি মাঝে মাঝে, কিন্তু ভালো ইংরেজি বই বড় একটা পাওয়া যায় না। শক্তিসাধন বাবাজির জীবনীর মতন এমন চমৎকার বই ইংরেজিতে একটিও তো নেই।'
. যেন পিসিমা অনেকবার অক্সফোর্ড ঘুরে এসেছেন। সোমনাথ চুপ করে রইল। পিসিমার সুন্দর সহজ বিশ্বাসকে আঘাত দিয়ে লাভ নেই। বিশ্বাস নিয়েই স্থিরতা, স্থিরতা নিয়েই শান্তি। শক্তিসাধন এবং পরে মুঙ্গেরের জীবনে আরো অনেক শান্তি আনবে নিশ্চয়।
—'মা শ্রীরামপুর গেছেন জানেন পিসিমা?'
—'হ্যাঁ, শুনেছি, আমার সঙ্গে দেখা হল না, আশ্রমে ছিলুম।'
—'আশ্রমের খবর কী?'
—'চলেছে এক রকম। টাকার অভাব বড় বোধ করছি।'
—'আবার চাঁদা তুলতে লাগবেন নাকি?'
—'দেখা যাক।'
—'রাত হয়ে গেছে পিসিমা—উঠি।'
—'আমাকে পাঁচটা টাকা দিতে হবে সোমনাথ।'

—'শিগগিব পাব না পিসিমা। আমাব হাত একেবাবে খালি।'

—'আশ্রমেব চাঁদা নয বাবা, আমাব চশমাব জন্য।'

—'আপনাব চশমা, আপনাব মুঙ্গেব, আপনাব গুরু,—মা-বাবা, নীহাব, বিভা কারু কথাই তো জিজ্ঞেস কবলেন না আপনি—তাবা আছে কি নেই, কেমন আছে, কী কবছে, কী কবা যায তাদেব জন্য, সমস্তই কি আমায ভাবতে হবে? আপনাকে বিভাব ভাব নিতে হবে।'

—'কেন, বউমাব কী হযেছে?'

—'তাব সঙ্গে ছ-মাসেব ভিতব আপনাব দেখা হযেছে?'

—'কেন, তাব তদাবক কববাব ভাব ঠাকুবঝিব ওপব, তুমি বযেছ, নীহাব আছে।'

—'আব আপনি?'

—'আমি আশ্রমেই থাকতে চাই।'

—'আমি তাহলে কেন আপনাকে চশমা তৈবি কবে দেব?'

পিসিমা কোনো কথা না বলে জীবনচবিতখানাব দিকে চোখ ফেবালেন আবাব। এখন আব কোনো কথা বলবেন না তিনি। আজ বাতে অনেক কথা বলা হযে গেছে তাঁব।

—'বাতি নিবিযে শুযে পড়ুন, অনেক বাত হযেছে পিসিমা।'

সোমনাথ দবজাব ভিতব দিযে বেবিযে এসে হেমন্তেব অন্ধকাবেব ভিতব দুচাবটে হাঁচি ঝেড়ে নীহাবেব ঘবেব দিকে চলে গেল ধুতিব খুঁট দিযে চোখনাক মুছতে মুছতে।

—'কে, দাদা?'

—'আজ্ঞে, এতক্ষণে একটা চুরুট জ্বালানো যাক, কি বলিস নীহাব?'

—'বোস।'

—'থাক, চুরুট জ্বালাব না, বিভা কই জানিস?'

—'শোন কথা, বউদি কোনোদিন এদিকে আসে?'

—'আজও তাহলে আসেনি?'

—'না।'

—'তাকেই খুঁজছিলুম, ভাবলুম মা চলে গেলেন, হযতো তোমাব এখানেই এসেছে বিভা।'

—'বউদি হল অন্য ধবনেব মেযে, আমাদেব এখানে সুবিধা পায না।'

—'অন্য ধবন মানে?'

—'ওব প্রবৃত্তি এক বকম, আমাদেব অন্য বকম।'

সোমনাথ খানিকক্ষণ চুপ কবে বইল। তাবপব মুখ তুলে বললে—'ওব প্রবৃত্তি কী বকম?'

—'তা তুমিই সবচেযে ভালো কবে জান।'

—'সুষমা কখন চলে গেল?'

—'এই কিছুক্ষণ আগে।'

—'অন্ধকাবেব ভিতব একাই গেল? বাড়ি তো অনেকটা দূবে।'

—'সাপে কামড়াবে তো? এব চেযে বেশি কী আব হতে পাবে। কিন্তু ওব তো মৃত্যুব ভয নেই।'

সোমনাথ চুরুটটা জ্বালিযে নিযে—'এত অল্প বযসে জীবনেব আসক্তি হাবিযে ফেলল?'

নীহাব কোনো উত্তব দিল না।

—'প্রবৃত্তিব কথা বলছিলে, আচ্ছা, তোমাব প্রবৃত্তি কীবকম নীহাব?'

—'আমি ব্যাখ্যা কবতে পাবি না।'

—'সুষমা কি আই এ পাশ কবেছে?'

—'গ্রাজুযেট।'

—'জানিও তো না। মাস্টাবি কবছে নাকি?'

—'না, এখনো পাযনি।'

—'বযস কত?'

—'সাতাশ।'

—'অত? আমি ভেবেছিলুম পঁচিশ বুঝি।'

—'পঁচিশ আর সাতাশে কত আর প্রভেদ?' বাতিটা উশকে দিয়ে নীহার—'ভেবেছিলুম ঘুমোব, কাঁটাটা কোথায় গেল' একটা সোয়েটার বোনা যাক।'

—'কতক্ষণ বুনবে?'

—'যতক্ষণ না ঘুম পায়।'

—'ঘুমের আয়োজন করছিলে দেখছিলুম, আমি হয়তো এসে তোমার ঘুম চটিয়ে দিলুম।'

—'তাই বলে দরকার হলে আসবে না?' নীহার শুকনো হাসি হেসে বললে।

সোমনাথ এক মিনিট চুরুট টেনে নিল।—'আজ হয়তো তোমার ঘুম শিগগির আসছে না নীহার।'

—'সোয়েটারের সৌভাগ্য।'

—'সোয়েটার কার জন্য?'

—'আমার জন্যই।'

—'আমি ভেবেছিলুম সুষমাকে করে দিচ্ছ।'

নীহার মাথা হেট করে বুনে যেতে লাগল।

—'খেয়েছ?'

—'কে আমি? না।'

—'কেন?'

—'খিদে নেই আজ আর।'

—'অনেক রাতই হয়তো এরকম না খেয়ে থাক। সারা দিনরাত ঘরের ভিতর বসে থাকলে কী করে খিদে পাবে? আমি অবিশ্যি তোমাদের কাউকে বেড়াতে নিয়ে যাই না, কিন্তু —সোমনাথ থামল।

নীহারও কোনো কথা বললে না।

—'এটা একটা মঠ, আশ্রম নীহার, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, ফুর্তি নেই, উৎসাহ নেই, যে যার ঘরে সন্ন্যাসীর মতো পড়ে রয়েছি। আমরা চলেছি কোনদিকে?'

নীহার ঘাড় গুঁজে বুনছিল। বলল—'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে মেয়েটির দিকে তাকাল সোমনাথ।

—'একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে।'

—'আবার দরখাস্ত? এবার কোথায় ভ্যাকান্সি?'

—'হোসিয়ারপুরে।

—'অতদূর যাবে?'

—'কাজ পেলে আমি আফ্রিকায় যেতেও রাজি আছি।'

সোমনাথ একটু হেসে বললে—'কিন্তু কাজই—বা করবে কেন? আমি কাজ করছি, এতেই কি চলে না তোমাদের?'

—'দরখাস্তটা কালকের ডাকেই পাঠিয়ে দেয়া চাই। তোমাকে কাটিং দিচ্ছি।'

—'কিন্তু আমার কথার তো কোনো উত্তর দিলে না নীহারকণা।'

—'তোমার কথা? তার কি কোনো উত্তর আছে?'

—'কোনো উত্তর নেই? বুঝলুম না কিছু নীহার।' সোমনাথ চুরুটের আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

নীহার খানিকক্ষণ বুনতে বুনতে অবশেষে একটু ক্লান্ত হয়ে বললে—'কিংবা লুকোচুরিই করে যাবে কি? লাভ? বয়স আমার কম হয়নি। অপ্রিয় কথা শুনতেও ব্যথা নেই, শোনাতেও লজ্জা শরম নেই।'

—'বল, লজ্জিত ব্যথিত আমরা কেউই হব না।'

—'তোমার মতন সত্তর টাকার মাইনের দার্শনিক পুরুষ যিনি মোটেই নন তেমন একজন পুরুষমানুষ অনেক টাকা যার উপার্জন, কিংবা মৃত্যু, যার পর আর কিছু নেই, কিংবা কাজ এই তিনটে জিনিশের ভেতর একটা আমাদের বেছে নিতেই হবে। কাজই বেছে নিতে হল। দার্শনিক মানুষের বোনের মতোই নীরস অসংলগ্ন ঐশ্বর্যও সাতটা দশটাকার নোটের পারিবারিকতার কৃপার ভিতর দাম্পত্য আমার জমবে কী করে?'

সোমনাথ চুরুটে একটা টান দিয়ে—'একটা অলৌকিক কিছু না ঘটে যায় নীহার?'

—'পৃথিবীতে তা কোনোদিনও ঘটে না।'

—'না ঘটলে বিভা আমাকে বিয়ে করল কী করে? মেয়েটি তো সুন্দরী ছিল।'

নীহাব একটু চুপ থেকে—'আমিও অনেক সময় তা ভেবেছি। কিন্তু মেযেবা : .ক। পুরুষদেব ঠাকানো বড় শক্ত।'

বাতিটা একটু কমিযে দিযে আবাব উশকে দিযে নীহাব—'কিন্তু ফাঁকি দিযে যা পেযেছ, তা উপভোগ কবতে পাবলে কই? ফাঁকি দিযে কেউই কিছু উপভোগ কবতে পাবে না। সবকিছুবই জন্য যোগ্যতা অর্জন কবতে হয।'

মেযেটি বেশ তীক্ষ্ণ, কথা বেশ বুদ্ধিবিচাবস্পর্শী। মোটেব ওপব ভালোই লাগছিল সোমনাথেব। সেদিনকাব নীহাব চমৎকাব হযে উঠেছে আজ। এব সঙ্গে দুদণ্ড কথাবার্তা বলে অনেকদিন পবে মুখ বদলানো গেল।

সোমনাথ—'তা আমি জানি নীহাব, বিভা যদি মবে যায, আমাকে আবাব বিযে কবতে হয, আমি মেযে পাব না।'

—'তা হযতো পাবে, সুন্দবী মেযেই পাবে হযতো। কিন্তু সুখ পাবে না। শান্তি ঢেব দূবেব কথা।'

—'আমাদেব বাপ-মা যা, তাতে আমবা সুখশান্তিব অধিকাবী হযে জন্মাইনি।'

নীহাব বললে– 'প্রকৃতিব বিরুদ্ধে লড়াই কবে জেগে ওঠা বড় শক্ত, তুমিও পাবলে না, আমিও পাবলাম না।'

—'প্রকৃতি আমাদেব কোন দিক দিযে ঠকিযেছে?'

—'ঠকিযেছে অসামঞ্জস্যেব অপবাধ আমাদেব সমস্ত গায মাখিযে দিযে, তাবপব আমাদেব শক্তিহীন কবে।'

নীহাব হযতো নিজেব কদর্য চেহাবাব কথা ভাবছিল।

হাত নিচু কবে ভাবতে ভাবতে সোমনাথেব চুরুটেব মুখে ছাই জমে উঠল। নীহাবেব ববং (কঠিন) অসম্পূর্ণ দুঃখী জন্তুব মতো মুখেব দিকে তাকিযে সোমনাথ ভাবল, আহা, বেচাবা!

মেযেটিকে উৎসাহ দেযা চাই, সোমনাথ—'লড়াই কবে তুমি একদিন জিতবে নীহাব, শক্তিব কথা বলছ, আমাব হযতো নেই—কিন্তু বাবাব শক্তি নেই?' নীহাবেব পাঁজব আঘাত কবে খানিকটা কালি বেবিযে এল, জবাজীর্ণ বিড়ালেব মতো মুখ তুলে অন্ধকাবেব দিকে সে একবাব তাকাল। কিন্তু দিনেব আলোয সে যখন সাবান ঘষে স্নান কবে বেবিযে আসবে, প্রসাধন শেষ হযে যাবে যখন তাব নীহাবেব মুখেব সঙ্গে জবাজীর্ণ বিড়ালেব মুখেব সেই সাদৃশ্য মনেও আসবে না, মনেও আসবে না মানুষেব। কিন্তু সম্প্রতি সোমনাথ চোখ বুজে এ মুখকে এড়িযে গেল। চোখ বুজেই বললে—'মা-ব শক্তি নেই মনে কব তুমি?

—'ওই কি শক্তি দাদা, শক্তিব জোবেই মানুষ মাটি ফুঁড়ে বেবিযে আকাশ নক্ষত্র স্পর্শ কবে। মা, বাবা, তুমি আমি শক্তি হিসেবে ঢেব নিকৃষ্ট জাতিব জীবন আমাদেব।'

'এই পবিবাবে কোনো বড় বকম বক্তেব মিশ্রণ না হলে এই বকমই আমবা থাকব চিবকাল। নিযমকে নিযম দিযে খণ্ডন কবতে হয। কল্পনা ও বেদনা দিযে কিছু হয না, বাবা-মা তাব সাক্ষ্য—

—'কিন্তু আমি তো বেদনা ও কল্পনাকেই সম্বল কবে চলেছি নীহাব।'

—'আমিও।'

—'তাবপব শেষ পর্যন্ত কোথায দাঁড়াবে গিযে সব?'

—'তুমি হবে বাবাব মতন, আমি হযতো পিসিমাব মতো হব। কিংবা তাও হতে পাবব না। সাগু কলা খেযে শেষ জীবনে বিধবা আশ্রম নিযে পড়ে থাকা, এ কথা আমি ভাবতেও পাবি না। ভাবতে পাবি না'—নীহাব একটু চুপ থেকে—'কিন্তু তবুও যদি বেঁচে থাকি আমাব যতদূব ধাবণা জীবন আমাব পিসিমাব চেযেও ঢেব নিকৃষ্ট হবে।'

সোমনাথ চোখ বুজেছিল, চোখ মেলে বললে—'পিসিমা কোনো দুবারূহ কঠিন জিনিশ চান না, তাঁব বিছানাব কাছে অন্ধকাবেব ভিতব তিনি ভগবানেব পাযেব কাছে বসে আছেন। মাঝে মাঝে এবকমও ভাবতে পাবেন।' সোমনাথ একটু কেশে নিযে—'তুমি বিশ্বাস কববে না নীহাব সত্যি সত্যি এবকম ভাবতে পাবেন তিনি। এবকম মানুষেব সঙ্গে পাল্লা দিযে আমবা পাবব না।'

—'তা আব কে পাববে? পিসিমা কি আশ্রম গিযেছেন আজ?'

—'না।'

—'এখানেই আছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'তুমি এলে নাকি তাঁর কাছ থেকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'জেগে আছেন?'

—'অনেকক্ষণ জেগে ছিলেন, এখন ঘুমিয়েছেন হয়তো।'

জরাজীর্ণ বিড়ালের মতো মুখ তুলে নীহার—'না ওঁর মতন প্রাণের আরাম কোনোদিন পাব না আমরা।'

নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ সভয়ে চোখ বুজল। জীর্ণ জীর্ণ জরাজীর্ণ একটি বিড়ালের মুখ। যেন পিসিমারও প্রপিতামহী এই নীহার! কি ভয়াবহ! কি ভৌতিক! কি নিদারুণ মানুষ। কি অসীম অখণ্ড বেদনার জিনিশ।

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল।

—'উঠলে দাদা?'

নিমীলিত চোখে সোমনাথ—'যাই।'

—'আর একটু বসলে পারতে।'

—'আবার আর এক সময় দেখা হবে।'

—'তুমি আমার এই কাটিংটা নিয়ে যাও। চোখ বুজে আছ যে? এই যে কাটিংটা আমি সুটকেশ খুলে দিচ্ছি।'

—'দাও।'

—'এই নাও, চোখ বুজে রয়েছ কেন? আজ রাতেই একটা দরখাস্ত লিখে রেখ, কালকের ডাকে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

—'আচ্ছা।'

—'ভুলো না কিন্তু—

সোমনাথ মুদ্রিত চোখে মাথা নেড়ে—'না, ভুলব না, কিন্তু কাজ না করলেও পারতে নীহার, আমার মনে হয় তুমি বি এ পড়লেই পারতে, কিন্তু বি এ পড়ারও দরকার কী নীহার? আমার এই সত্তর টাকায় তোমারও কি চলত না?' সোমনাথ চোখ মেলে নীহারের দিকে তাকাল আবার— দুবেলা খাওয়ার অভাব আমাদের এখানে হবে না তোমার। কিন্তু তবুও মানুষ বেরিয়ে পড়তে চায়। চলে যেতে চায়। চলে যাবার ভিতর একটা আনন্দ আছে। বিদ্যুতের গতিতে ইঞ্জিন ছুটে চলেছে হোসিয়ারপুরের দিকে, যেন ছুটে চলেছে স্বর্গের দিকে, যেখানে হয়তো তোমার সেই পুরুষমানুষ আছে, কোনো আধিভৌতিক জিনিশ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

সোমনাথ চোখ বুজে—'এরকমই কঠিন বিভ্রম, কিন্তু তবুও তারপর স্থির হয়ে বসতে হবে, আরশিতে মুখ দেখতে হবে। মানুষের টিটকারি সহ্য করতে হবে। হোসিয়ারপুর স্বর্গ নয়, মৃত্যু নয়।'

নীহার আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে হেসে—'দার্শনিকের মতোই আরশির কথা পাড়লে তুমি। শেষ পর্যন্ত শান্তিতে মরতে পারলেই মানুষের সব হল। যেখানেই যাও শেষ পর্যন্ত অশান্তিতে মরব না দাদা।'

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিল সোমনাথ।

নীহার—'তোমার ভয় হয় বুঝি?'

সোমনাথ চুপ করেছিল।

নীহার—'পিসিমার রয়েছে বিশ্বাস। আমরা ভাবতে শিখেছি। মীনৌ জোরে আরশি আর আরশির ভিতরে যে মুখ ধরা পড়ে আমরা সব কিছুকেই উড়িয়ে দিতে পারব আশা করি।'

সোমনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল।

—'চোখ বুজে রয়েছ কোন দুঃখে? আমার মুখ দেখে ভয়? কিন্তু আমার মুখের জন্ম হয়েছিল খাওয়ার জন্য, মেয়েদের পড়াবার জন্য। সেই কাজে ব্যাপৃত থেকে এ মুখ একদিন শ্মশানের আগুনে কঙ্কাল হয়ে যাবে। তোমাকে দেখে মনে হয় আজ রাতে তোমার ঘুমই হবে না দাদা। কিন্তু আমার চোখ তো ঘুমে ঢুলে আসছে।'

—'কোনো রাতেই কি তোমার ঘুম হয় নীহার?'

দুজনেই চোখ চেয়ে তাকিয়ে দেখল বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন।

সোমনাথ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল, একবার ফিরে তাকিয়ে দেখল বাবা স্নেহে সন্তর্পণে নীহারের ঘাড়ে

হাত রেখে তাকে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

নীহার কি বাবার সঙ্গে শোয়? না আজ মা চলে গেছেন বলে বাবা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন? পিসিমার ঘরের পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে সোমনাথ শুনল অন্ধকারের ভিতর থেকে সৌম্য শাদা দাড়ির শান্ত শব্দ দেহ যেন বেরিয়ে আসছে। পিসিমা প্রার্থনা করছেন।—'বিধাতা, এই পরিবারের যেন শান্তি হয়—শান্তি—শান্তি—শান্তি'—বাইরের বিরাট হিম আকাশে আলোর ধবল ধুলো বড় বড় নক্ষত্রের ধবল উষ্ণ ডানার উদ্যম—বনে বাতাসে জোনাকির ছড়াছড়ি।

সোমনাথ নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে দেখল পুবদিকের দরজা খুলে বিভা ডেকচেয়ারে চুপ করে চোখ বুজে বসে আসে। জেগে আছে না ঘুমিয়ে?

সোমনাথের পায়ের শব্দ শুনে নড়েচড়ে বিভা চোখ মেলল।

—'বিভা, তোমাকে খুঁজছিলাম।'

—'চমকে গিয়েছিলুম।'

—'আমাকে দেখে—'

—'তোমার দায়িত্বের কথা বোঝা গেছে। নিজের ঘরেও চোরের মতন ঢুকতে হয় তোমার? তোমার বিবেকের ভিতর মলিনতা ঢের।'

—'আমি গিয়েছিলুম দক্ষিণের ঘরে।'

—'বেশ করেছিলে, সে সংবাদ আমাকে দিতে এসেছ কেন? আমি কি জানতে চেয়েছি? মনে করেছ তোমার গতিবিধি আমার কৌতূহলের জিনিশ?'

—'দক্ষিণের ঘরে গিয়েছিলুম তোমাকেই খুঁজতে।'

—'আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলে এ যদি জানতাম তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে তোমার খোজা বার করে দিতাম আমি।' বিভা দাত কড়মড় করে বললে।

সোমনাথ চুপ করেছিল। তাকিয়ে দেখল অন্ধকারের মধ্যে বিভা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছছে। সোমনাথ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মেয়েটিকে বাধা দিতে গেল না।

পাকস্থলির ভিতর কেমন একটা করুণ ও ব্যথা গুমরে উঠেছে মেয়েটির— আমাকেও মানুষ খোজে? কে আছে আমার যে আমাকে খুঁজবে? আমি কার কে?'

—'টিউশন থেকে ফিরে এসে তোমাকে দেখলুম না।'

বিভা বাধা দিয়ে—'কোনোদিন যদি না দেখতে সেই-ই ভালো হত, আমি কেন যে আবার তোমাদের দেখা দিতে এলুম, কিন্তু আমাকে খুজতে তুমি দক্ষিণের ঘরে গেলে কেন? শুনলুম পিসি আর তুমি কথা বলছ। আমি কি পিসিমার বিধবাদের একজন?'

—'পিসিমার ঘরে গিয়েছিলুম, বাবার ঘরে গিয়েছিলুম।

—'নীহারের সঙ্গে ইয়ার্কি কেটে এসেছ, সবই শুনেছি আমি।'

—'নীহার আমার চেয়ে অনেক ছোট—প্রায় বছর দশেকের।'

—'আর সুষমা?'

—'সুষমা সেখানে ছিল না।'

—'না থেকে পারে না, তোমাদের পক্ষে সবই সম্ভব।'

সোমনাথ কোনো উত্তর দিল না।

বিভা—'ওসবে আমার কিছু এসে যায় না। আমার সময় হয়ে এসেছে। তোমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে—দ্বিতীয় পক্ষের পেটে মরা সন্তান হবে না নিশ্চয়ই।'

সোমনাথ এরকম কথা অনেকদিন ধরে শুনে আসছে।

—'খেয়েছ বিভা?'

—'কিন্তু কেন সন্তান মরে আমার অপরাধে না তোমার অপরাধে একদিন তার প্রমাণ হয়ে যাবে। বিধাতা আমাকে অপরাধিনী করবেন না নিশ্চয়ই।'

একটু হেসে—'মরে আমার অপরাধেই।'

—'আমি জানি। কলকাতায় তুমি অনেক সন্দেহজনক জীবন কাটিয়েছে।'

—'কিন্তু রাত হয়ে গেছে—ঢের রাত হয়ে গেছ।'

—'কী কবতে হবে?'

—'খেয়েছ?'

'নীবসভাবে হেসে বিভা—' 'আমি খেয়েছি কিনা তোমাব মা-ব কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কব—তাঁবই ওপব তো আমাব খাওয়া দাওয়াব ভাব।'

সোমনাথ বিবসমুখে হাসতে লাগল।

—'চল যাই খেতে—'

—'তুমি যাও।'

—'কারু ওপব কোনো অভিমান কবে লাভ নেই বিভা, এ পৃথিবীতে সকলেই আমবা প্রায় একা।'

—'যাঁবা আমাব বাবা-মা ছিলেন তাঁদেব অকাল—মৃত্যুই থেকে থেকে ব্যঙ্গ দেয় আমাকে। পৃথিবীতে অন্য কোনো বেদনা নেই আমবা।' বিভা চোখে কাপড় দিয়ে কাদতে লাগল আবাব। কিন্তু দু-এক মুহূর্তেব মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে—'বসে আছ কেন?' আমি খেয়ে এসেছি—তুমি খেতে যাও।'

—'খেয়েছ? দুধ খেয়েছিলে?'

—সবই খেয়েছি, একটু বেশি কবেই খেয়েছি।'

—'কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হয না কিছু খেয়েছ?'

—'কী কবে বুঝবে আমি খেয়েছি না খেয়েছি, বান্নাঘবে কেউই নেই, কারু কাছে জিজ্ঞেস করে কিছুই জানতে পাববে না তুমি।'

—'কেন, সর্বেশ্ববেব মা কোথায়?'

—'সে অনেকক্ষণ বেঁধে চলে গেছে।'

—'তাহলে চল, একসঙ্গেই খেতে বসা যাবে।'

—'তুমি ববং নীহাবকে ডেকে নিয়ে যাও। আজ বাতে আমি আব খেতে পাবব না। এই যে বসেছি, একটা পা নাড়াতে গেলেও আমাব পেটে ব্যথা লাগে।'

—'তাহলে আজ উপোস দেবে?'

—'আমাকে এক গ্লাশ জল দাও।'

—ববং একটা [...] খাও।'

—'দাও।'

—'দুধেব সঙ্গে মিশিয়ে দেব?'

—'এই যে বললুম দুধ ভাত মাছ তবকাবি সব খেয়ে এসেছি। তোমাব মা না থাকলে কী হয—আমাব যে মা মবে গেছেন, তিনিই পাশে বসেছিলেন। বললেন বিভা এটা খা ওটা খা। তুমি বিশ্বাস কববে না, কিন্তু আমি দিব্যি দিয়ে বলছি। তোমাব মা ভেবেছেন শ্রীবামপুবে চলে গিয়ে আমাকে সাজা দেবেন, কিন্তু বাপ-মা মবা মেয়েকে কেউ শাস্তি দিতে পাবে না, তাব জন্য ঈশ্ববেব অন্যবকম ব্যবস্থা বয়েছে। আজ বাতেই তো দেখলুম।'

সোমনাথ একটু চুপ থেকে—'নীহাবও আজ বাতে কিছু খেল না।'

—'দুঃখ তোমাব সেজন্যই।' একটু চুপ থেকে বিভা—'কিন্তু চিবদিন বোনকে তো আব কাছে ধবে বাখতে পাববে না। হলই—বা কদাকাব চেহাবা, তবুও একটা গতি কবতে হবে তো তাব।' বিভা—'এসব মেয়েকে তাড়াতাড়ি পাব কবে দেয়া ভালো।'

খানিকক্ষণ নীববতা।

—'কিন্তু কি বিশ্রী চেহাবা, জেনেশুনে কাব হাতেই-বা দেবে ওকে?'

সোমনাথ সোডাব বোতলটা নিয়ে এল।

—'টাটকা সোডা তো?'

—'হ্যাঁ আজ সন্ধ্যাব সময়ই স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছি বিভা, ভাবলাম তোমাব কাজে লেগে যেতে পাবে।'

—'এখুনি ভাঙবে?'

—'কি বলো তুমি—বেশি বাত জেগে লাভ কী?'

—'কিন্তু তোমাব বোনকে দেবে কাব হাতে?'

—'ঘুবেফিবে যেখানে গিয়ে পড়ে।'

—'ঘোড়াব মতো মুখ। কেউ ওকে নিয়ে সুখী হবে না। একজন চল্লিশ টাকা মাইনেব কেবানি পর্যন্ত

না। ভাঙলে সোডা? দাও, আধ গেলাশের বেশি দিও না। গরম সিঙাড়া খেতে ইচ্ছে করে।'

—'কাল সকালে খেও।'

—'কিন্তু এখুনি খেতে ইচ্ছে করছে।'

—'এত রাতে সিঙাড়া কোথায় পাওয়া যাবে?'

—'কেন সনাতনের দোকানে।'

—'সে তো মাইল চারেক দূরে।'

—'সেইখান থেকে এনে দাও, নইলে আমি সোডা খাব না।'

একটা ঢোক গিলে পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

সোমনাথ জানালার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণচূড়ার ডালপালার ফাঁক দিযে একরাশ নক্ষত্রেব দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে—'আচ্ছা সোডা খাও, আমি যাচ্ছি সিঙাড়া আনতে।'

সিঙাড়াগুলো কড়কড়ে ও ঠাণ্ডা, প্রায় রাত বারোটার সময সোমনাথ এনে হাজিব করল।

বিভা দু-এক কামড় দিয়ে থু থু কবে সেগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।—'মা-বাপ মরা মেয়ে পেয়ে আমাকে ফাঁকি দিতে বাদ রাখল না কেউ।'

বাড়ির কুকুরটা অঘ্রানেই বিযোবে। অন্ধকারেব মধ্যে চুনমুন করে বসেছিল। খাবারের গন্ধ পেযে ছুটে এসে সিঙাড়াগুলো ঝপঝাপ ঝপঝাপ শেষ করে ফেলল সে, খাওযা তার কাছে যেমন তৃপ্তি, তেমনি তৃপ্তি—আবেগ ও আতঙ্কের জিনিশ—দু-মুহূর্তেব ভিতব সিঙাড়াগুলো নিঃশেষে গিলে ফেলে বিভাব দুচোখ তুলে তাকিয়ে রইল সে। বিভা তাকিয়ে রইল কুকুরটার দিকে। বধূর হৃদযে আস্বাদের জন্ম হয়েছে, বললে—'কুকুরটা সারাদিন কিছু খাযনি?'

—'জানি না তো!'

—'দেখ, পেটটা কেমন ফুলে উঠেছে, অঘ্রানেই বিযোবে।'

—'আমারও তাই মনে হয।'

কুকুরটা দিব্যি শবীবে বসে পড়ল, ঘাসেব ওপব মুখ রেখে বিভার দিকে তাকিয়ে বইল। বিভাব মনে হল তার গর্ভের অজাত সন্তানের দিকে তাকিয়ে বযেছে যেন। কুকুরটাব মুখেব দিকে স্ফীত স্তনেব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে বিভাব চোখ কোমল মধুব বেতেব ফলেব মতো কালো—পবিপূর্ণ আসক্ত ও সজীব মুখখানা কি এক গভীব আশ্রযেব ছাযায নক্ষত্রেব আলোব ভিতব ঘনীভূত ও স্থিব। বিভাব হৃদযে কেমন যেন এই আস্বাদ এসেছে—যেমন এসেছে সোমনাথেব হৃদযে—তার বাবাব হৃদযে, নীহাবেব হৃদযে, পিসিমার হৃদয়ে আজ এই নিস্তব্ধ হেমন্তেব রাতে।

—'সাইকেল নিযে গিযেছিলে তো?'

—'কোথায?'

—'সনাতনের দোকানে?'

—'না, এত রাতে সাইকেল পাব কোথায?'

—'কেন [...] বাবুব সাইকেল নিলেই পাবতে।'

সোমনাথ হাঁ কবে তাকিযে রইল।

বিভা নিচু গলায বললে—'চাইতেই হয, রাত এমনই-বা কি, কত লোক তো জেগে বযেছে, তিনি কি দিতেন না, এতটা বাত হিমে ভিজলে—'

—'কার্তিকেব বাতে হিমে বেড়ানো আমাব অভ্যাস আছে, ওতে আমাব কিছু হয় না।'

—'তা তো হয না বাবুমশাই, সবই তোমার অভ্যাস। কিন্তু তোমাব কোনো ত্রুটি ধবব না, আমি আর তোমাব ভালোব জন্য ত্রুটি ধবব না। তুমি অনেক করেছ। তুমি আশ্চর্য মানুষ। তোমাবই জয হোক।'

—'চল খেতে যাই।' বিভা বললে—'তারপর নিশ্চিন্ত হযে ঘুমোনো যাক। এবার আমার সন্তান হবে না আব।'

—'চলো বিভা।'

—'কুকুরটাকেও ডেকে নিযে চলো।'

যেন নক্ষত্রেব পরিচালনায তারপর সমস্তই রূপান্তরিত হযে যায। মানুষের হৃদযে সুস্থিব ঘনীভূত আস্বাদের জন্ম হয—এই রকম আশ্চর্য নিস্তব্ধ হেমন্তের রাতে।

এক সেতুর ভিতর দিয়ে

হেডমাস্টারবাবুর বয়স ছেচল্লিশ বৎসর, মফস্বলের একটা স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে তিনি কয়েক বছর এখানে আছেন। এর আগে অন্যান্য জায়গায় চাকরি করেছেন। চুল খানিক খানিক পেকে গেছে সমরেশবাবুর। চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় না তবু যে তিনি বার্ধক্যের দিকে চলেছেন, বরং তাঁকে একজন স্থির, ধার্মিক, মননশীল যুবা পুরুষ বলেই মনে হয়। পৃথিবীর রৌদ্র ও হিমের থেকে গা বাঁচিয়ে যিনি ইচ্ছা করেই ধরা দিলেন মাস্টারির কাজে। চেহারা এমনই যৌবনের দিকে ঘেঁষে রয়েছে যে যদি তাঁর কোনো ত্রিশ বত্রিশের বছরের বন্ধু তাঁকে সমরেশ বলে ডাকে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

স্থির মানুষ। কী নিয়ে থাকেন? মনোবীজের খেত নিয়ে। তা অবিশ্যি কিন্তু পৃথিবীর চিন্তা ও স্পন্দনের অনেক খবরই তিনি রাখেন না।

[...] কী জিনিশ জানেন না তিনি। [...] নাম শুনেছেন কিনা সন্দেহ, এদের কোনো ছবি তিনি দেখেননি। কিন্তু তবুও যদি এসব ছবি তাঁকে দেখানো হয় এমনভাবে একজন শিল্পীর প্রশংসা তিনি করবেন হয়তো। এজন্য নয় যে স্থিরভাবে আকাঙ্ক্ষানীবরে উঠবার শক্তি নেই। কিন্তু এইজন্য অন্য সুন্দর বা অসুন্দর জিনিশকে তাঁর মন ছুঁয়ে যায় মাত্র। সে সবের ভিতর প্রবিষ্ট হতে পারে না। নিজের বৃত্ত নিয়েই তিনি বরং নিমগ্ন। এবং সেই বৃত্ত দেশেরও অনেক জিনিশের খবর রাখে না। অনুরাধাপুরের নামও শোনেননি তিনি কোনোদিন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিকট বর্ষাকাল ও অন্যান্য ঋতু কী প্রভেদ নিয়ে আসত জানেন না তিনি। বল্লাল সেন ও তাঁর পায়রার ধূসর কিংবদন্তীর সঙ্গে আজও অপরিচিত তিনি। অন্বীক্ষা শব্দের মানে তিনি জানেন না; এমনি আরো অনেক ধূসর বা নতুন জিনিশের সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্ক ঘটেনি তাঁর। কিন্তু তবুও কাজ বা উদ্যমের পৃথিবী তাঁর জন্য নয়। পড়াশোনা নিয়েই থাকেন তিনি। মাঝে মাঝে মিথ্যাচার করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু তাতে সাংসারিক লাভ হলেও সমরেশের মন অনেকদিন পর্যন্ত ভিক্ষুক হয়ে থাকে। তার নীতি এই রকম। এবং এই নীতির ওপর যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেই হচ্ছে তাঁর ধর্ম। যদি কোনো ঈশ্বর থাকে তো সেই ঈশ্বর জানে যে নামকীর্তনের আসরে কিংবা কিংবা মাঝে মাঝে একা একা নিজের অন্ধকার কোঠায় সমরেশ তাকে তাঁর দূর আসন থেকে বাস্তবিকই টেনে আনতে চায়। কিংবা নিজেই উড়ে যেতে চায় সেই দূর আসনের দিকে। তারপর ভাবটা যখন কেটে যায় নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে হাসবে সমরেশ? সে জাতের মানুষই নয়। বরং নিজেকে সে বলে, ব্যাকুলতা এখনো ঘনীভূত হয়নি, হয়তো এ জীবনে হবেও না। কোনোদিন। হয়তো এ জীবনেও ঈশ্বরকে ধর্মকে ফাঁকি দিয়েই গেলাম।

কিন্তু তবুও সমরেশ গোবেচারি নয়, মননজীবীমাত্র নয়, বাশভারীও নয়, ন্যায়ের পথে চলে মানুষের সঙ্গে আমোদ করতে পারে বেশ। কিন্তু তবুও তারপর হাসি তামাশা বা পড়াশোনা কিংবা আলসেমি—এমনকী ধর্মকেও সে তার ব্যসন করে তোলেনি।

দেশে শীত এসে পড়েছে।

গায়ে গরম কোর্ট গলায় কমফর্টার একটা লাঠি হাতে করে সমরেশ মাঠের পথে খানিকটা বেড়িয়ে এল। সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরে টেবিল ল্যাম্পের আলোর সামনে কয়েকটা পুরোনো খাতাপত্র নিয়ে বসল সে।

প্রায় বাইশ তেইশ বছর আগের দলিলপত্র সব। এসবের ভিতর কী রয়েছে কেউই জানে না। সমরেশ নিজেও অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবে তিনটে আলমারি বোঝাই এইসব খাতা লেখা, চিঠিপত্র। স্কুল বা অফিসের জিনিশ নয়, নিজেরাই ব্যক্তিগত জিনিশ সব। কতদিন আর জমিয়ে রাখতে হবে! কাল সকালেই পুড়িয়ে ফেললে ভালো হয় না কি?

কিন্তু তবুও বছরের পর বছর এই স্তূপ বেড়েই চলেছে। এত সাবধানে রাখা হয়েছে যে উই ইঁদুর স্পর্শ করতে পারে না এগুলোকে। আগুন এগুলোকে দগ্ধ করবার অনুমতি আজ পর্যন্ত পেল না।

—'কে? ও, হরকান্তবাবু, বসুন।'

—'কী করছিলেন?'

ইজি চেয়ারে বসে হরকান্ত পা ছড়িয়ে দিয়ে—'কার্তিকেই এবার বেশ শীত পড়ল। দেখুন, আলোটা আমার চোখের ওপর এসে পড়েছে, একটা খাতা দিয়ে ঢেকে দেবেন?'

—'না, আলোর দরকার নেই আমার আর, নিবিয়ে দিচ্ছি।'

—'দিন, জ্যোৎস্না রাত আছে।'

আলো নিবিয়ে দিল সমরেশ। জানালা দরজার ভিতর দিয়ে অনেকখানি জ্যোৎস্না সমরেশের টেবিলে বিছানায়, মুখের ওপর এসে পড়ল। বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালপালার ছবি কালো হাড় সমরেশের দেওয়ালের ওপর নড়তে চড়তে লাগল।

—'আমি কি জোর করে আপনার বাতি নিবিয়ে দিলুম?' হরকান্ত বললে।

—'না, আমার কাজ হয়ে গেছে।'

—'সমরেশবাবু হয়তো পড়াশোনায় বাধা দিলাম আপনার?'

—'না বসুন, আপনার সঙ্গে কথাই আছে, একজন মানুষের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি।' সমরেশ একটু চুপ থেকে—'হয়তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম।'

—'আমার জন্য?'

—'আপনি ছাড়া ইদানীং কেউ বড় একটা এখানে আসেন না।'

—'পূজোর ছুটিতে অনেকেই দেশে চলে গেছে।'

—'অবিশ্যি সকলের সঙ্গে ভালো করে মিশতেও পারি না আমি। আমি চাইও না যে সন্ধ্যার পর আমার এখানে দশ রকম লোকের একটা বৈঠক বসুক। নানারকম মানুষ থাকে, নানারকম কথা বলে। শুনতে ভালো লাগে না সব। অনেকের ইঙ্গিত পর্যন্ত বেদনাদায়ক।'

হরকান্ত একটা চুরুট জ্বেলে নিল।'

—'কিন্তু আপনাকে আমি বিবেকবুদ্ধির মানুষ বলেই জানি। আপনাকে একটা কথা বলব। শুনবেন?'

দু মুহূর্ত নিস্তব্ধতায় কেটে গেল।

সমরেশ পুরোনো খাতাপত্র নেড়ে চেড়ে—'একটা ব্যাপার আবার মনে পড়ে গেল আমার। এই কয়েকদিন হল, বাইশ তেইশ বছর আগে যখন কলকাতায় একটা মেসে ছিলুম, চাকরি তখনো শুরু করিনি, কষ্ট করে দিন চালাতে হত, মেসের খুব একটি দরিদ্র বন্ধুর কাছ থেকে দুটো টাকা ধার করেছিলুম। তারপর বন্ধুব সঙ্গে যখনই দেখা হত, তাকে এড়িয়ে যেতুম। সে টাকা আজ পর্যন্ত পৌছে দেযা হযনি।' সমরেশ জানালার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

—'ঋণ সম্বন্ধে' হরকান্ত একটু হেসে বললে—'আপনার সংস্কার রযেছে হযতো।'

—'না, তা নেই। শাস্ত্র বলেছে ঋণ শোধ করা উচিত। অতএব ঋণ শোধ কবতে হবে। ব্যাপারটা যদি কেবলমাত্র এই রকম হত তাহলে গোলমাল ছিল না বেশি। কিন্তু এ অন্যরকম। কোনো বিশেষ প্রীতিব সম্পর্ক ছিল না, তবুও টাকা চাইতে সে আমাকে টাকা দিযেছিল—বুঝলুম এতখানি কষ্ট দিলুম তাকে। ওরকম স্বভাবের মানুষ আমি দেখিনি। তারপর দিনের পর দিন সব দুর্ভোগ সহ্য করেও মুখ ফুটে সে আমার কাছে টাকা চাইল না। আমিও দিলুম না তাকে। এড়িযে এড়িযে ফিরলুম।' বলে সমরেশ অনেকক্ষণ চুপ কবে বইল।

—'ব্যাপারটা এই?'

—'হ্যাঁ, এ শুধু ধার দেযা ধার শোধ দেযার ব্যাপার নয় তো হবকান্ত।

—'না, তা নয় অবিশ্যি এতদিন পরে ব্যাপারটা ব্যক্তিক, এবং বেদনাব, তা আমি বুঝলুম বটে।'

—'কী করা যায বলুন তো?'

—'ব্যাপারটা তবুও একুশ বছর আগেব।'

—'হ্যাঁ সেজন্যই বড় বিষম।'

—'কিন্তু এখন তো কিছু করতে পারা যায না আর?'

—'কিছুই না?'

—'এই রকম কত ধার আমরা নিয়ে থাকি, শোধ দেই না।'

সমরেশ সে কথা গ্রহণ করলে না, বললে—'কিন্তু মানুষটাকে খুঁজে বার করা উচিত।'

—'কাকে?'

—'সেই কামদা বিশ্বাসকে।'

—'কামদা বিশ্বাস, সেই ছিল বুঝি তার নাম?'

—'হ্যাঁ। সেই মেসের ঠিকানায একটা চিঠি লিখলে হয না?'

—'বাইশ বছব আগের একটা মেস কলকাতায। সমরেশবাবু আপনি মনে করেন আজও তার অস্তিত্ব রয়েছে?'

—'থাকতেও তো পারে।'

—'দেখতে পারেন একটা চিঠি লিখে, কিন্তু জোচ্চরের পাল্লায় পড়বে আপনার টাকা, ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছোবে না।'

—'এতদিন পরে সেই মেসে কামদা থাকবেই বা কেন?'

—'তা আমি জানি না, শুধু জানতুম যে সে বাংলাদেশের ছেলে।'

—'তাহলে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলেছেন তাকে।'

সমরেশ একটু চুপ থেকে–'কিন্তু এর একটা উপায় বের করা দরকার।'

—'এরকম তুচ্ছ জিনিশ নিয়ে মানুষ কেন মাথা ঘামায়?' হরকান্ত চুরুটটা দ্বিতীয় বার জ্বালিযে নিযে বললেন। 'মানুষের জীবনে এমনই অনেক রকম দুঃখ আছে, তার ওপর যদি এইসব পচা জিনিশ নিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে হয! এবার শীতটা খুব তাড়াতাড়িই পড়ল।'

—'কিন্তু বাইশ বছর আগেই বা কামদা বিশ্বাসকে টাকাটা ফেরৎ দিলুম না কেন?'

হরকান্ত কোনো উত্তর দিল না।

—'ইচ্ছে করে তাকে এড়িয়ে গেলুম।'

—'এমনই আমরা অনেকেই অনেককে এড়াই। আজ যে বযস চল্লিশেব কাছাকাছি হয়েছে এখনো বিচার বিবেকের জড়তা কতদূরই বা কেটেছে আর তখন ছিল আপনার চব্বিশ বছরমাত্র বযস। দারিদ্র্য ছিল, সংগ্রাম ছিল।'

—'সবই তো বুঝলাম হরকান্ত, কিন্তু দু দুটো টাকা পুরোনো খাতাব ভিতর থেকে আমার মুখের দিকে চেযে আছে যেন। না মিটিযে দেযা পর্যন্ত শান্তি নেই।'

—'খাতা পুড়িয়ে ফেলুন।'

—'কিন্তু তাতে তো কামদা বিশ্বাস পুড়ে যাবে না!'

হরকান্ত একটু চুপ থেকে—'উঠি।'

—'না, বসুন কথা আছে।'

—'কামদা সম্বন্ধে? আর একদিন কথা হবে। আমার বক্তব্য ফুবিযেছে।'

—'না, আরো কথা আছে। স্কুল ছুটি হযে গেল—অনেকদিন। কোথাও বেড়াতে গেলুম না। মা নেই, বাপ নেই, দেশ নেই গাঁ নেই, কোথায বা যাই! অনেক বাত বসে পুরোনো চিঠি খাতাপত্র নাড়া চাড়া করে হৃদযে আস্বাদ জমে গেছে ঢের।'

দুজনেই নিস্তব্ধ ছিল—কিছুক্ষণ।

সমরেশ—'আব একটা পুরোনো কথা—সেজন্য খাতাপত্র দেখতে হযনি, সেটা আমি ভুলিনি কোনোদিন। চাপা পড়েছিল। আপনার কাছে চুরুট আছে আর?'

—'হ্যাঁ আছে।'

—'দিন তো একটা।'

চুরুট হাতে নিযে সমবেশ আরো দু তিন মিনিট চুপ করে রইল—জ্বালাল না, আস্তে আস্তে বলল—'এও প্রায কুড়ি বছর আগের, তখন আমি কলকাতায মির্জাপুর স্ট্রিটে একটা বাড়ির দোতলায দুটো কোঠা ভাড়া করে অন্য একটা মেসে থাকতুম। গভর্নমেন্ট অফিসে চাকরি করতুম।'

—'সরকারী চাকরীও করেছিলেন? কই, সে কথা তো আমাদের বলেননি কোনোদিন।'

—'না বলিনি।' সমরেশ একটু হাসল—'চাকরিটা ভালোই ছিল। পঁচাত্তর টাকায শুরু, কিন্তু এতদিনে চারশো সাড়ে চারশো হযে যেত। ইচ্ছে করেই আমি চাকরিটা ছেড়ে দিলুম। মনে হযেছিল মাস্টারিতে খুব শান্তি—শান্তিই আমি চেযেছিলুম—এখনো চাই কিনা ঠিক জানি না।'

—'চান কি না চান, মাস্টারি আপনাকে কবতে হবে।'

—'তা অবশ্য।'

—'নইলে কোনো মঠে বা আশ্রমে ঢুকে পড়তে হবে।'

—'তা হবে বলে মনে হয না হবকান্ত, ওসব জিনিশকে এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারব বলেই বোধহয়।'

হরকান্ত আবার চুরুট জ্বাললেন।

সমরেশ—'বিশ বছর আগে যখন গভর্নমেন্ট অফিসে পঁচাত্তর টাকার একটা চাকরি করছি, ভূপতি চৌধুরী বলে এক ভদ্রলোক, তিনি বলেছিলেন, তিনি জমিদার। তাইই হবেন হযতো। তিনি একদিন মির্জাপুর ভাড়াটে বাসায আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।' ডান হাতের চুরুটটা আস্তে আস্তে নেড়ে

ছেড়ে সমরেশ—'আমাকে পছন্দ করে গেলেন। আমাকে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন, বললেন। তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আনলেন।'

—'ভূপতিবাবুকে আপনি আগেই চিনতেন বুঝি?'

—'না।'

—'তবে আপনার খোঁজ পেলেন কোথায় তিনি?'

—'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে খুব আলাপ ছিল।'

—'ভদ্রলোকের মেয়েটিকে আপনি দেখেছিলেন কোথাও কোনোদিন?'

—'না।' সমরেশ—'কলকাতায় প্রথম চাকরি নিয়ে অব্দি, বুঝলেন হরকান্তবাবু, আমি বিয়ের কথা ভাবছিলুম। পুরুষের জীবনে একটি স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয় যত দিক আছে কোনো দিকের কথাই ভাবতে বাদ দিইনি আমি। যাবা শুধু আগ্রহ নিয়ে বিয়ে করতে যায়, চিন্তা করে না, তাদের মতন ছিলুম না আমি। মানুষটাই এমন যে শুধু আগ্রহের উৎকর্ষ কাকে বলে ব্যবহারিক জীবনে তা বুঝতেই পারলুম না। যদিও অন্তরজীবনে মাঝে মাঝে আমি তা বোধ করে এসেছি—ইদানীং খুব বেশি বোধ করছি হরকান্তবাবু।'

—'তারপর ভূতপতিবাবুর মেয়ের কী হল।'

—'আমি মেযে দেখতে গেলুম।'

—'আপনি একা?'

—'হ্যাঁ, ভূপতিবাবুর সঙ্গে শুধু, আমার নিজের কোনো বন্ধু আমি জোগাড় করে উঠতে পারিনি।'

চুরুটে দু চারটা টান দিয়ে—'তাবপর?'

—'মেয়েটিকে দেখলুম। বিশ বছর পরে তার মুখখানা এখনো আমাব মনে পড়ছে।'

হরকান্ত শরীর যেন নিজেকে ছেড়ে দিল। তার শিথিল হাতের থেকে চুরুটটা মাটির ওপব পড়ে গেল।

—'বুঝলুম, মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন আপনি।'

—'শুনুন।'

—'বিশ বছর আগেব কথা।'

—'ভূপতিবাবুর বাসায যখন গিয়ে পৌছলুম তখন রাত আটটা, আজও আমাব মনে আছে সব, মনে হয যেন এই সেদিন।'

—'বাতের বেলা মেয়ে দেখা ঠিক হযনি আপনাব।'

—'তারপব তাকে দিনেববেলাও দেখেছি।' মাথার একরাশ কাঁচা পাকা চুলেব ভিতব আঙুল চালিযে নিয়ে সমরেশ—'একটা চেযারে গিয়ে বসলুম। ভূপতিবাবুর স্ত্রী তখন বেঁচে ছিলেন না। ওই মেয়েটিও তাঁর একমাত্র সন্তান। ঘরটা বেশ নিস্তব্ধ ছিল, সবই মনে পড়ে আমার।'

—'আপনার চুরুটটা মাটিতে পড়ে গেছে।'

—'দেখেছি।'

—'আজ বিশ বছর পরে এ ঘরটাও তো বেশ নিস্তব্ধ সমরেশবাবু?'

—'হ্যাঁ, তা বটে।'

—'তারপব।'

—'আমি চেয়ারে বসলুম। ভূপতিবাবু লম্বা চওড়া মানুষ, দিব্যি জমিদারের ছেলেব মতো চেহারা, যতদূর মনে হয, খানিকটা দাড়ি ছিল তাঁর। কিছু পেকে গিয়েছিল। এবং মুখের ভিতর ঘন আন্তরিকতা ছিল। তিনি একটা ইজিচেয়ারে বসেছিলেন।'

—'তারপর? বলুন, তারপর?'

মেয়েটি একটা ভেলভেটের পর্দাব আড়ালে দাঁড়িযে ছিল, তার বাবা তাকে ডাকতেই আস্তে আস্তে বেরিযে এল, তারপর ধীবে ধীবে আমাকে এসে প্রণাম করল। আমি এব কোনো মানে খুঁজে পেলুম না।'

—'তার বাবা কি প্রণাম কবতে বলেছিলেন?'

—'না।'

—'বাইশ বছর আগের একটি প্রণাম। তখনকার দিনের ধূসর খাতাপত্র চিঠি এই জিনিশ হযতো সে সব স্তূপের চেয়ে ঢের—'

—'তা আমি জানি। তা আমি জানি। কোথায় বা সেই কামদা বিশ্বাস, কোথায বা সেই ভূপতি চৌধুরি? এরা কি এই পৃথিবীর মানুষ ছিল না? না কোথাও গ্রহ উপগ্রহের কুয়াশার ভিতর অন্য এক জীবনে এদের দেখেছি আমি—'

—'মেয়েটি প্রণাম করল আপনাকে? একটুও দ্বিধাবোধ করল না?'

—'একটুও না।'

—'কিন্তু এ তো নিয়ম নয়।'

—'একটুও সংকোচ অনুভব করল না সে।'

—'এ জিনিশকে, বুঝলেন সমরেশবাবু, আমার তো খানিকটা আতিশয্য বলে মনে হয়। কিন্তু বলতে পারি না কার মনে কী থাকে, কে কীরকম মানুষ—হয়তো—তার বাবা তাকে বললেন।'

—'কিছু বলেননি।'

—'মেয়েটিকে কোনোদিন চিনতেন না আপনি?'

—'না।'

—'এরকম একটি মানুষের প্রণাম পেয়ে সেদিন কী মনে হয়েছিল আপনার?'

—'মনে হয়েছিল, আমি যেন কোথাও পৌঁছে গেছি, আর ভাবনা নেই। কিন্তু তবুও তারপর চিন্তা করতে গেলুম না।'

—'সব সময় চিন্তা করা ভালো নয়।'

—'চিন্তা করে করে মনের সহজ আস্বাদ হারিয়ে ফেললুম। সেই চেয়ারে বসে মনে হল এখনো আমি পৌঁছাতে পারিনি কোথাও।'

—'বড় কঠিন মানুষ আপনি সমরেশবাবু—যত সহজ আপনাকে ভাবি, তা তো নন আপনি।'

সমরেশ মাথা হেঁট করে চোখ বুজে রইল।

—'প্রণাম করে তারপর চলে গেল?'

—'না। প্রণাম করে খানিকটা দূরে সরে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তখন তাকে দেখলুম, রং ফরশা নয়, ক্রিমও মাখেনি, কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি, ভালোই করেছিল। কিন্তু তার চেহারার সম্পর্কে রঙে প্রশ্ন ওঠেই না। সে যদি পাথরের মতন কালোও হত, তবুও মানুষের মন দু দণ্ড ছেড়ে দিয়ে তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারত না—এমনই নিরঙ্কুশ ছিল তার রূপ। কিন্তু তবুও সে পাথরের মতো কালো ছিল না তো। মেঘের রাতে যে জ্যোৎস্নাকে আমরা চোখ বুজেও অনুভব করি তেমনি ছিল তার রং।'

—'সমরেশবাবু, সেই মেয়েটিকে একবার দেখাতে পারেন?'

—'না।'

—'কেন, ভূপতিবাবুকে চেনেন তো আপনি।'

—'আমিও যেমন চিনি, আপনিও তেমন চেনেন।'

—'কীরকম?'

—'আজ বিশ বছর পরে আমরাই কেউই আর তাঁকে চিনি না। সেই মেয়েটিকে চিনি না। রাতের ঘুমের স্বপ্নের ভিতর তাদের ফিরে পাই না কোনোদিন। তারা ছিল এই পৃথিবীর যৌবনের দিনের মানুষ। আজ এই পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে।'

—'মেয়েটির নাম ছিল কী?'

—'শাদা-সাধারণ নাম, প্রতিমা।'

—'ভূপতিবাবুর কলকাতার সেই বাসার ঠিকানা আপনার মনে আছে?'

—'আছে। খাতায় লেখা আছে।'

—'সেখানে গিয়ে একবার দেখলে হয় না?'

—'কাকে দেখবেন আপনি?

—'সেই মেয়েটিকে।'

—'সে কি বেঁচে আছে?'

—'কামদা বিশ্বাসের মতো সেও মরে গেছে মনে করেন।'

—'অন্তত আমরা তো তার কাছে মরে গেছি। আমি বিশ বছর আগের একটা রাতের কথা বলছিলুম। সেই রাতকে ফিরে পেতে হলে কেমন যে একটা সেতু পার হতে হয়' কিন্তু কেউ তা পার হতে পারে না কোনোদিন। মানুষ ঈশ্বরকেও পেতে পারে, কিন্তু এ জিনিশকে তবু পায় না কোনোদিন। এই দুর্বোধ্য অসাম্ভব্যতার কথা ভেবে সংসারের কোনো কাজেই মাঝে মাঝে কোনো সুবিধা করে উঠতে পারি না আর।'

—'তারপর কী হল?'

—'মেয়েটা আমাকে, প্রণাম করে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে একটা তেপায় ঘেঁষে দাঁড়াল। আমার

দিকে তাকাল একবার, তারপর মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রইল।'

—'আর আপনি?'

—'বসে রইলুম চেয়ারে।'

—'ভূপতিবাবু?'

—'একটা ইজিচেয়ারে বসে রইলেন।'

—'দুজনেই চুপচাপ?'

—'হ্যাঁ। ভূপতিবাবুর নির্দেশ মতো মেয়েটি ভিতরের বাড়িতে চলে গেল। খুব তাড়াতাড়িও নয়, খুব আস্তেও নয়। হেঁটে হেঁটে পরদার ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল। তারপর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। কোনোদিন দেখবও না আর। আমাদের মৃত্যু হবে পৃথিবীর ধূসরতম পাখির চোখও ঘুমে ভারী হয়ে উঠবে একদিন—তবুও তাকে দেখব না আর কোনোদিন।'

সমরেশ মুখ তুলে—'কদিন থেকে ভাবছি, অন্তত স্বপ্নে দেখা দিক।' হরকান্ত মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

—'রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ি, মাঝে মাঝে দু একটা অসম্ভব স্বপ্ন না দেখি যে তা নয় হরকান্তবাবু, কিন্তু তাদের আর দেখলুম না।'

সমরেশ অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললে—'ভূপতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগল?' বললুম, 'বেশ ভালোই।'

—'তারপর?'

—'মেয়েটি পিছন দিক দিয়ে এসে কখন আবার জলখাবাব রেখে গিয়েছিল, আমি দেখতে পাইনি।' সমরেশ মাথার ভিতর দিয়ে হাত চালিয়ে নিল একবার। কয়েকটা কাঁচা পাকা চুল খসে তার হাতের ভিতর লেগে রইল।—'সেই দেখাটা আমার পাওনা হয়ে আছে। যদিও বিশ বছর চলে গেছে, তবুও হরকান্তবাবু।'

—'কিন্তু সেই সব দিন কেউ পার হতে পারে না?'

—'ঈশ্বরও না।'

—'তিনিও নিয়মেরই চাকর।'

সমরেশ একটু কেশে বারান্দাব দিকে চলে গেল। তারপর ফিরে এসে চেযাবের উপব চুপ কবে বসে রইল। সমরেশেব মনে হল কাশির সঙ্গে এক ছিটে রক্ত পড়েছে তার।

—'জলখাবার খেলেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভূপতিবাবু কী বললেন?'

—'তিনি আমার মা বাবা, আত্মীযদেব খবব জানতে চাইলেন, বললুম তাবা কেউ নেই।'

—'কী বললেন তিনি?'

—'বিযে করে তাঁর সঙ্গেই আমাকে থাকতে বললেন। বললেন চৌধুরী পরিবাব এখন খুব নিঃশব্দ। বলে চোখ বুজে রইলেন। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য খুব গভীব আগ্রহ বোধ করতে পাবলুম। ভূপতিবাবুকে বললে খুশি হযেই ডেকে আনতেন তাঁর মেয়েকে। কিন্তু তবুও মত দিলুম না।'

—'কেন?'

—'ঠিক করলুম বিযেই কবব না।'

—'কী ভেবে ওবকম সিদ্ধান্ত কেন কবলেন?'

—'ভেবে দেখলুম ভূপতিবাবুর মতো পিতা আমি হতে পারব না। লম্বা চওড়া বিশিষ্ট মানুষ। অভিজাত ছন্দে গড়া তিনি ও তাঁর মেয়ে। শুনলুম চৌধুরী পরিবারটা ঢের নিঃশব্দ। বরং তাই-ই থাক, আমার সন্তানেরা সেই অস্ফুট ধবল হিমসমুদ্রের গাঢ় ঘোলা নদীর কোলাহল তুলবে? তা হতে পারে না হরকান্তবাবু।'

—'এই, মনে করলেন আপনি?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভূপতিবাবুকে আপনি এ কথা বললেন?'

—আমি বললুম যে নিতান্ত একজন সামান্য মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ভেবেই তাঁর বাসায় গিয়েছিলুম। কিন্তু কী ভেবে এবকম মেয়ে আমাকে দেখালেন তিনি? আমাব দাম্পত্য জীবনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন?'

—'ভূপতিবাবু—'

—'শুনে হাসলেন। পরের দিনও অনুরোধ করতে এসেছিলেন। আরো একদিন এসেছিলেন। কিন্তু

তারপর আর এলেন না। আর কোনোদিন তাঁকে দেখিনি।'

—'কলকাতার সেই বাড়িটায় একবার গেলে হয়।'

—'কীসের জন্য?'

—'অন্তত ভূপতিবাবুর সঙ্গে একবার আলাপ করে এলে হয়।'

—'কে আলাপ করবে?'

—'আপনি নন, আমি।'

—'সেই মেয়েটিকে দেখবার সাধ?'

—'আমি দেখলে আপনিও দেখতে পারবেন। বড় বংশের মেয়ে হয়েও প্রাণের আবেগে, প্রাণের আবেগে নয়? না জানি কী মনে করে, যে একদিন আপনাকে প্রণাম করেছিল সে আজও আপনার কথা মনে করে রেখেছে হয়তো।'

—'কিন্তু আজ আমি বরং কামদাকে দেখতে চাই, তাকে দেখে কী হবে?'

—'কেন?'

—'সেই মৃত্যুর ওপারে যারা ছিল, এতদিন তারা এপারে চলে এসেছে, কিন্তু এপারের কোনো [...] আমি দেখতে চাই না। সেই নারীটির সঙ্গে আমার বাইশ বছব আগে মেসে ধাব করা দুটো টাকার সম্পর্ক নযতো শুধু হরকান্তবাবু।'

—'আপনি বলতে চান ঘরে ঘরে মাংসেব কাজে ব্যবহৃত হযে সেই মেযেটি এখন প্রেত হয়ে দাঁড়িযেছে। তাকে দেখে কোনো লাভ নেই?'

সমরেশ হাত তুলে নিষেধ করে—'এবকম ভাষা তার সম্বন্ধে, কারু সম্বন্ধেই আমরা যেন কোনোদিন ব্যবহার না করি।'

—'একটা চুরুট নিন।'

—'চুরুট আমার পাযেব কাছেই পড়ে আছে।'

—'তুলে নেবেন?'

—'দরকাব হলে নেযা যাবে। কিন্তু আব নেই চুরুটেব দরকার।'

—'কিন্তু আজ কী মনে হয প্রতিমাকে বিয়ে না কবে আপনি ভুল করেছেন?

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সমবেশ—'তাব মুখও আমাব কাছে ধূসর হযে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও সে মুখের ছায়াও আমাব মনের ভিতব ধরা দেয না আব।'

হরকান্তর চুরুট নিভে গিযেছিল, জ্বালিযে নিলেন।

—'এই দেখুন, মাঝে মাঝে আঁকতে চেষ্টা কবি।'

—'কে, আপনি?'

—হ্যাঁ তার মুখ, কিন্তু মানুষের মুখই হয না। আমি কি আঁকতে পারি আর, সে মুখ হল ভাবুকেব হৃদযেবও দুবারূহ স্বপ্ন' কথা না শেষ করে চুপ করে রইল।

—'দেশী বিদেশী বড় বড় শিল্পীদের ছবি দেখি, কিন্তু সে মুখ ধরা পড়ে না। এ পৃথিবীতে একটা জিনিশ একবারই হয়, দ্বিতীয বার হয না আর। পড়বেই বা কী কবে?' সমরেশ বললে—'শিল্পীদের নাবী ও অভিজ্ঞতা, তাদের কল্পনাপ্রতিভা এক বকম, আমার অন্যরকম।'

—'দ্বিতীয়বাব হয না আব?'

—'না, দ্বিতীয বাব হয না আব' সমবেশ বললেন।

—'দূরে প্রান্তবের জোনাকি যেন এই মানুষটিব কথায স্পন্দিত হযে বাতাসে হেমন্তেব নিস্তব্ধ পৃথিবীর লোক লোকান্তরে কী খুঁজে বেড়াতে লাগল, খুঁজে পেল না আর।

—'আমার মনে হয, একদিন এ আসক্তি আপনার মুছে যাবে। আপনি একটা কাজ করুন।'

—'কী?'

—'কিছুদিন কাশীতে কাটিযে আসুন।'

—'কাশী? কেন সেখানে গিযে কী হবে?'

—'স্বাস্থ্যলাভ হবে।'

—'সুস্থ আমি বেশ আছি।'

—'আমি কিন্তু কলকাতাব থেকে এসে অব্দি ঢের রোগা দেখছি। এমনই যে আমি কয়েকজনের কাছে বলেছি পর্যন্ত যে সমরেশবাবুব হল কী?'

—'সমবেশের হয়নি কিছু। সমবেশ আজকাল ঘোড়ায় চড়ে ইদানীং সন্ধ্যাবেলা নির্জন নদীর পাড়ে বেড়াতে যাননি—কোনো মায়াবিনীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি।'

—'আপনি কাশীতে যান।'

—'তারপর?'

—'স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে—তবুও অলাভ হবে না আপনার। কোনোদিন কাশী গিয়েছেন?'

সমবেশ মাথা নেড়ে—'না।'

—'আশ্চর্য মানুষ আপনি বয়স হল ছেচল্লিশ বৎসর, অথচ এমন চমৎকার জায়গাটা দেখলেন না?'

—'ঘর ছেড়ে নড়তেই আমার ইচ্ছে করে না হরকান্তবাবু, মনের ভিতর গেঁটে বাত জমেছে যেন। কিন্তু তবুও তার ওষুধ ঘোরাঘুরি উত্তেজনার ভিতরে নেই। আমার জন্যে নেই অন্তত। ওষুধ আমার এই স্থির পারিপার্শ্বিকের ভিতর রয়েছে বরং। বসে থাকি, বই পড়ি, পায়চারি করি। বিকেলের রোদ পড়ে যায়, শালিখেরা যায় উড়ে। আপনাদের দেশের এই ছায়া সিঁড়ি নদীর পাশে প্রচুর ধানখেত দিনের পর দিন হলুদ হয়ে যাচ্ছে। এই শোভার দিকে তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ—তাকিয়ে থাকি নদীটার দিকে। চারদিককার সন্ধ্যার আবরণ, ধূসর পেঁচার ওড়াউড়ি, হেমন্তের নরম গন্ধ প্রাণের ভিতর একটা শান্তি আনে।'

—'কিন্তু তবুও তো দেখছি আপনি অসুস্থ, মুখ শুকিয়ে গেছে ঢের। কথা বলছেন, দাড়ির ভেতর দিয়ে দাঁত বেরিয়ে আসছে যেন। আগে তো এরকম ছিল না।'

—'কাশী যেতে বলেন?'

—'হ্যাঁ নিশ্চয়। এখনো স্কুল খুলবার অনেকদিন বাকি আছে।'

—'সুস্থ হব, মনের আসক্তি মুছে যাবে?'

—'আমি তো তাই বিশ্বাস করি। যাবেন, একটু বসবেন গিয়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে।'

—'সেখানে কী আছে?'

—'তাও জানেন না? দিনরাত চিতা জ্বলছে, কখনো নেভে না তা।'

সমবেশ—'সেই কথা! কিন্তু তা দেখে আমার কী লাভ?'

—'তা সেখানে গেলে বুঝবেন। কাশী থেকে ফিরে এসে এসব চিঠিপত্র পাণ্ডুলিপি—কুড়ি বাইশ বছর আগের পাণ্ডুলিপি সব—এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করবার কোনো প্রয়োজনই হবে না আপনার।'

—'প্রয়োজন হবে না? কী করব তাহলে আমি?'

—'আপনি যে সুস্থিরতা চান পরিপূর্ণভাবে পাবেন।'

—'কিন্তু অতদূর সুস্থিরতা দাবি আমি করতে পারি না। ওরকম [...] শান্তির আমার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কি যে বলেন আপনি মণিকর্ণিকার ঘাটের কথা!'

—'আমাদের এই বাংলাদেশে এই শান্ত হেমন্তের রাতে যেসব কথা আপনাকে বললুম, তারপর কি আপনার মণিকর্ণিকার ঘাটের কথা পাড়া উচিত ছিল? আপনার কি উচিত ছিল শ্মশান ঘাটের কথা পাড়া? কত বিপরীত জিনিশ তা।'

—'কী জানি, আমি মানুষটা সব সময় সব জিনিশ বুঝে উঠতে পারি না। আপনার ভালোর জন্যই বলেছিলাম বলে মনে হয়।'

—'কাশী একবার যেতে পারি আমি। ধূসর শহর অনেক বিস্মৃত জিনিশ যেখানে কথা বলে উঠবে। সেই কথা শুনবার জন্য কাশী একবার যেতে পারি আমি।'

হরকান্ত চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'তাহলে প্রতিমার কথা মৃত্যু পর্যন্ত ভাববেন আপনি?'

—'মানুষ ভাবতেও চেষ্টা করে না, মনে রাখতেও চেষ্টা করে না। কিন্তু এই নক্ষত্রের রাতের মতো শান্ত নিয়মে ক্বেকার সেই ভূপতিবাবুর মেয়ে আজও মানুষের মনের ভিতর টিকে থাকে। টিকে থাকে, ভালোই হয়।'

অনেকক্ষণ পরে হরকান্ত—'ঠিক আমারও যদি এইরকমই হত?'

—'এই রকম? হরকান্তর দিকে সমবেশ একটু হেসে—'আপনি তো বিবাহিত মানুষ।'

—'সেই জন্যই তো ক্ষয়িত হয়ে গেল সব। সব কাদার মাংসে খসে পড়ল। আপনি এক গভীর অনুভব করছেন। আর অনুভবের কাজ চালিয়ে দিতে চাচ্ছি আমি খেয়ে দেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে।'

সমবেশ চমকে গেল, বললে—'আপনি এইরকম বলেন?'

—'এই কথাই সত্যি।'

—'সত্যি?' ম্লান দাড়ির সঙ্গে লম্বা মুখের পাণ্ডুরতা যেন মিশে গেল সমবেশের। কোথায় বা দাড়ি,

কোথায় বা মুখ পড়ন্ত জ্যোৎস্নার ভিতর বোঝা গেল না যেন কিছুমাত্র।

—'আপনি বিয়ে করেননি, বুঝবেন না কিছু।'

—'কিন্তু আমিও তো প্রতিমাকে বিয়ে করতেই পারতাম।'

—'তাহলে আমারই মতন হয়ে যেতেন।' হরকান্ত লাঠি হাতে উঠে পড়লেন। বাইরে জ্যোৎস্নার ভিতর নিষ্ক্রান্ত হয়ে বললেন—'যদি কোনো উপায় থাকত, বিধাতার এই জ্যোৎস্না রাতের মতো যদি কোনো সুন্দর নিঃশব্দ বোধ থাকত, যা তুমি তোমার পৃথিবীর পীড়িত মানুষদের জন্য কোনোদিন রাখলে না, তাহলে ভূতিবাবুর মেয়েকে খুঁজে বার করার জন্য আমিই কি আর বেরিয়ে পড়তাম না? আমারই নিজের প্রয়োজনে।'

—'আপনি এই রকম বলেন?'

—'এই কথাই সত্যি।'

—'সত্যি আপনার স্ত্রী আছে, সবই তো রয়েছে আপনার।'

হরকান্ত লাঠি দিয়ে মেঝের ওপর কয়েকটা আঘাত করে—'আমাব স্ত্রী জানেন না।'

সমরেশ নীরব কঠিন জিজ্ঞাসায় হরকান্তর মুখের দিকে তাকাল।

—'তিনি জানেন যে শুধু খাওয়া আর দাওয়া আর সন্তানের জন্ম দেয়া শুধু। বিভূতিবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার যা সম্বন্ধ সে কথা যদি আমার স্ত্রীর কাছে বলি তাহলে বুঝবেন না তিনি কিছু।'

—'তিনিও বুঝবেন না?'

—'তিনিই বুঝবেন না। আমি বরং কিছু বুঝে গেলুম।'

হরকান্তবাবু দাঁত বেব করে—'চল্লিশ বছরেব একটি মেয়ে মানুষ, যিনি ছ সাতটি সন্তানের মা, তাকে নিয়ে ঘর করা যে কী কঠিন জিনিশ। দুর্গন্ধের ভিতর থাকতে থাকতে আমি প্রায় সময তা বুঝি না।'

হরকান্তবাবুর কথা মনে দিয়ে শুনছেন সমরেশ। শুনতে শুনতে ম্লান দাড়ির সঙ্গে লম্বা মুখের পাণ্ডুরতা যেন মিশে গেল তাঁব। কোথায় বা দাড়ি কোথায় বা মুখ পড়ন্ত জ্যোৎস্নার ভিতর বোঝা গেল না কিছু আব।

হবকান্ত লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন নিজের প্রয়োজনে।

বরং বলা যাক এই ছেচল্লিশ বছবেব মানুষ এই হেডমাস্টারটির জীবন। কিন্তু নিবপবাধ একাকী মানুষেব জীবন অন্যবকম।

মানুষ ভুলতেও চেষ্টা কবে না, মনে রাখতেও চেষ্টা করে না। দুটো বালিশ ঠেশ দিয়ে একা একা জ্যোৎস্নার বিছানায শুযে জানালাব ভিতব দিযে আকাশেব দিকে তাকিযে ভাবছিল সমবেশ। কিন্তু এই নক্ষত্রেব বাতেব মতো শান্তি নিযমে সেই কবেকাব ভূপতিবাবুর মেয়ে আজও মানুষের মনেব ভিতব টিকে থাকে। টিকে থাক। ভালোই হয।

কিন্তু তাও অনেক কাল ধরে একটা অস্বস্তি সমবেশকে চেপে বসেছিল। ইদানীং সেই অস্বস্তিটা বেড়ে গেছে ঢেব। সেই মেয়েটিব মুখ, মুখেব গড়ন সমবেশেব মন থেকে হাবিয়ে গেছে অনেকদিন—অস্বস্তিটা এই কিবকম ছিল সেই মুখেব ভাস্কর্য অবযব। সেই মুখেব সমাপিকা মহিমা কিংবা অসম্পূর্ণ অসমাপিকা অবলম্বনও সেই সুখের মেটে পাণ্ডুলিপি কিংবা দু-একটা পঙক্তি সবই ভুলে গেছেন সমবেশ। বযেছে শুধু জননী তার জঠবের সন্তানকে যেমন কবে বোধ কবে, তেমনি একটা নিঃশব্দ পরিব্যাপ্ত অনুভব। জননী তাব জরায়ুর সন্তানের দেখা পায একদিন তাবপব, কিন্তু সেই মেয়েটিব মুখ সমবেশেব পরিচিত কযেকটি নাবীব মুখেব সঙ্গে মিশে একাকাব হয়ে আজ রাতেও সমরেশকে ঠাট্টা কবতে এল—কযেকটি কদর্য নারীব মুখের সঙ্গে মিশেও। সমবেশ তার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, চোখ বুজে দুর্গন্ধ দাঁত বেব কবে সমস্ত মুখটাকে একটা স্থবিব লালসারক্ত বানবের মতো কুঞ্চিত করে আঙুল বাড়িয়ে শূন্যেব ভিতর কী যেন, কাকে যেন সে আঁকড়ে ধরতে চাইল, যৌবনকে, যে কোনো একটা যৌবনকে, যে কোনো একটা নাবীকে, যে কোনো নারীকে, যে কোনো একটা কদাকাব নারীকে—বিকট নয়, জীবনের স্বাভাবিক প্রবহমান লালসা ঘিরে ধরল তাকে। নক্ষত্রকামনা চূর্ণ হয়ে গেল। স্পর্ধা আগুন হযে উঠল তার। হেমন্তের ঝড়ে একটা বিবাট বৃক্ষের অসংখ্য বীজের মতো শবীর টুকরো টুকরো হযে ছিঁড়ে পড়তে লাগল তার। অসহ্য আনন্দের আরামের অতলে মৃত্যু ও জীবন একাকার হয়ে গেল তার। বাঁকা চাঁদের শিঙের মতন অস্তমিত সূর্যেব পিছনে ধাবিত হযে ছুটতে লাগল যেন। তাবপর অনেক রাতে খানিকটা ভিজে-ঠান্ডা অবস্থায রুগ্ন দুর্বল ম্যাজমেজে ও বিরস মানুষটিকে, হেডমাস্টারকে তাব বিছানাব ভেতর খুঁজে পাওয়া গেল। বিস্মিত, ব্যথিত হযে সমরেশ নিজেকে নিজে কেবল বললে, কাদাব ভিতব একটা শুয়োর হয়ে গেছ তুমি। একটা শুয়োর হযে গেছ। সমরেশ। একটা স্থবির শুয়োরের মতো ভোরের স্থবিব আলোয় জেগে উঠবে তুমি। এই হিমরাতের অন্ধকার অসীম হয়ে বেঁচে থাকুক—ঘুমের ভিতর দিয়ে আমি এক সেতুর ভিতর দিয়ে ওপারে চলে যাই—যেখানে ঘুম ভাঙে না, কোনোদিনও ভাঙে না।

কুড়ি বছর পর ফিরে এসে

সোমনাথের বাবার কিছু টাকাকড়ি ছিল। সোমনাথের শিক্ষাদীক্ষাও হয়েছিল কম নয়। বাবার প্রতিপত্তি ছিল তার—সোমনাথের নিজেরও এদিককার সামর্থ্য ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তবুও ভালো চাকরির সম্ভাবনাকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল সে। বড়লোক হবার জন্য নয়, নাম করবার জন্যও নয়। কিন্তু ব্যবসার জন্যই ব্যবসার পথ ধরল সে। সোমনাথ মনে করেছিল, এই-ই তার পথ। কিন্তু এইখানেই সে ভুল করেছিল। মাস্টার হলে মানাত তাকে। হেডমাস্টার হলে মানাত। কোনো একটা বড় গ্রাম বা কতকগুলো গ্রাম ও শহরের ভিতর আদর্শ মানুষ বলে জীবনের ধূসর সেবকদের কাছে শ্রদ্ধা পেত সে। আহা, কত শ্রদ্ধাই না পেত। কিন্তু এসব পথে চলতে গেল না সোমনাথ।

বাবার মৃত্যুর পর অনেকগুলো টাকা হাতে নিযে সোমনাথ বোম্বে চলে গেল। যেন বোম্বে—সেখানকার কাউকে সে চিনত না। সেখানে গেলেই ব্যবসার সুবিধা হবে। যেহেতু বোম্বে ব্যবসার একটা মস্তবড় ক্ষেত্র। যা নয় তাই এরকম আকাঙ্ক্ষা উদ্যম নিয়ে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নানারকম বড় বড় শহরে একটি ছোট উপগ্রহের মতো অনেকদিন, অনেক অনেকদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াল সে। কিন্তু সোমনাথের হল না কিছু। বাপের টাকা ফুরিয়ে গেল সব। দেনা হল। বাংলাদেশে ফিরে আসতে হল তাকে। মাঝারি গোছের লম্বা চেহারা সোমনাথের। এক সময়ে রোগা ছিল সে। ইদানীং শরীরের মাংস বেড়েছে ঢের। চুল খানিক খানিক পেকে গেছে। গোঁফ কামিযে চেহারা খানিকটা তীক্ষ্ণতা ও চঞ্চলতা পেযেছিল, খানিকটা সম্ভ্রম হারিয়েছিল। যদিও মোটের ওপর সে স্থূল ও স্থির মানুষই বরং। সে আবার গোঁফ রাখতে আরম্ভ করল। চেহারা তার আগের মতো স্থূলতা স্থিরতা ও সম্ভ্রম ফিরে পেল। যেন কোনো আধবযসী গুরুতর হেডমাস্টার সোমনাথ—দেশের যে কোনো লোক।

চল্লিশ বছর বয়স তার।

মানুষ হিশেবে সোমনাথের কয়েকটার সুবিধা ছিল। এই চল্লিশ বছর বযসের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোকেব সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্কে আসবার প্রয়োজন সে মনে করেনি। না সোমনাথ বিযে কবেনি। কোনোদিন করবে বলেও মনে হয় না। এ বিষয়ে অল্প বয়স থেকেই তার মন হেমন্ত রাত্রির সুস্থিরতা পেয়েছে। মাঝে মাঝে নারীর সৌন্দর্য আঘাত করেছে তাকে। তা যদি না করত সোমনাথকে মানুষ বলেই গণ্য করতে পারা যেত না। কিন্তু নারীকে অনুসরণ করবার, ধরন কোনো জান্তব, কিংবা নাক্ষত্রিক কামনার ব্যাপাবে কোনোদিন ব্যাপৃত হযে পড়তে দেখা যায়নি সোমনাথকে।

সোমনাথ সুস্থিরতা সে কি জন্মের থেকেই পেযেছিল? এই শান্তি সে কি অর্জন করেছিল? বলতে পারা যায় না কিছু। শুধু এই মাত্র দেখা যায় যে এই চল্লিশ বছরের মধ্যে সোমনাথেব জীবনে কোনো নারীই নেই। কোনো মেয়েমানুষের নিকট, দুটো বিচিত্র অসামাজিক কথা কিংবা আবেগস্পর্ধিত দু-একখানা চিঠি কিছুই নেই সোমনাথেব জীবনে।

এসব কিছু কিছু থাকলে হত, এসব কিছু যে নেই, সোমনাথ নিজেই তা জানে না, সবচেযে ভরসার কথা হচ্ছে এই।

তবে কি সে টাকা চেযেছিল? ব্যবসা করে সে [...] হবে এরকম আকাঙ্ক্ষাব কুয়াশাও মনেব ভিতব পোষণ করত না সে কোনোদিন। মানুষের একটা কাজ নিয়ে থাকা চাই, কাজেই সে ব্যবসা নিযেছিল। গত চল্লিশটা বছরের ভিতর যন্ত্রণা হয়তো ছিল ঢের, ঘৃণা নির্যাতন ও কিন্তু কোথাও কোনো শূন্যতা নেই। ভোরের থেকে রাত রাতের থেকে ভোর চিন্তা কাজ আর কথাবার্তার বিরাট অবকাশ পেয়েছে সে। জীবনটাকে আস্বাদ করতে পেরেছে সে।

টাকা হল মধু। সোমনাথ তাব মাছি। একথা সোমনাথের কোনো ব্যবসাযী বন্ধু ব্যবসাযী শত্রু কোনোদিনও বলবে না।

সোমনাথের আরেকটা সুবিধা ছিল, শুধু নারী নিয়েই নয়, কোনো জিনিশ নিযেই মনের ভিতর কোনো

অস্থিবতা ছিল না তাব। একটা দেশেব কিংবা একটা দলেব বা পবিবাবেবও নেতা—কিংবা হতে চায় যাবা তাদেব মনে কোনো সুস্থিবতা নেই। কিন্তু তাব মনেও কোনো সুস্থিবতা নেই, ক্ষুদ্রতব বৃত্তিব ভিতব এমনি আবো অনেক মানুষ আছে যাবা মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা কবে—কাজেই হৃদযেব ভিতব কোনো নিস্পন্দ সংস্থিতি নেই যাদেব। প্রতি মুহূর্তেই কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন তাদেব বলছে 'কবলে কী? কী কবছ? কববে কী? কতদূব অগ্রসব হলে? তুমি দেখছি বেঁচেও মবে বযেছ।' তাকিযে দেখ চাবিদিকে জীবনেব কি অব্যাহত গতি। এই ভযাবহ স্থিবতা এক মুহূর্তেও তাদেব শান্তিতে থাকতে দেয না। কিন্তু সোমনাথ এই ভযাবহ স্থিবতাব হাত এড়িযে চলে গেছে।

আমাব শেষ উপন্যাস এখনো লেখা হল না। দেশেব ভিতব গঠনসংক্রান্ত কত কাজ পড়ে বযেছে, কবচি কী আমি! আমাব স্ত্রী সন্তান পবিবাবেব কাছে কর্তব্যেব বোঝা গভীব হযে উঠল। অন্যমনস্ক থাকলে চলবে না তো আব। এবকম উৎকণ্ঠা বা বেদনা সোমনাথ অনুভব কবেনি কোনোদিন। আকাশ বাতাসেব ভিতব থেকে কেউ কোনোদিন বড় একটা আসে না সুস্থিব সোমনাথেব চুল ধবে টেনে নিযে যাবাব জন্য কোনো উদ্ভূত আবর্তনেব ভিতব।

সোমনাথেব সুবিধা এইবকম।

এসবেব থেকে বোঝা যায যে সোমনাথ স্থিব প্রকৃতিব, ঘনীভূত একটি সাধুপুরুষ। [...] [...] তাব দেশ দেশান্তবে বেড়ানো কিছুই তাকে স্থগিত কবতে পাবেনি। পৃথিবীব মানুষ একদিন তাব ধূসব দৃষ্টি নিযে যে জিনিশকে বিশ্বাস কবেছিল, যাকে সে ধর্ম বলে মনে কবেছিল,—সোমনাথ আজও তা সেই সব বিশ্বাস কবে। সে সামাজিক, ধার্মিক। কিন্তু তাই বলে সে নিষ্ঠুব নয। সোমনাথ স্থিব প্রবৃত্তিব ঘনীভূত একটি সাধু মানুষ, নাবী বা আকাশ বাতাসেব অস্থিব দেবতাবা কিছুতেই যাকে স্খলিত কবতে পাবল না। কিন্তু সেজন্য সোমনাথ নিষ্ঠুব নয। পৃথিবীব নানাবকম বিপবীত প্রবৃত্তিব মানুষ নানাবকম অপবাধ নিযে সোমনাথেব কাছে এসে অবজ্ঞা বা অপ্রেম পাযনি। সে নিজে যা, তাই। অন্য কোনো মানুষকে কোনো ঘোবতব পাপীকেও নিজেব ধাতুতে পবিণত কববাব অসঙ্গতিও অনাবশ্যকতা চিবদিন সে বোধ কবে এসেছে। সে সংস্কাবক নয, মানুষ। মানুষেব ভিড়ে মিশবাব, আনন্দ দেবাব ও আনন্দিত হবাব সহজ ক্ষমতা আছে তাব। মানুষেব দুর্দশা গ্লানি হিংসা, নিষ্ঠুবতা, কলঙ্কাচাব মিষ্টিমুখে আস্বাদ কববাব ভুলে যাবাব একটা চমৎকাব [...] শক্তি আছে সোমনাথেব। যদিও নিজে সে নীতিবান এবং ধার্মিক।

সোমনাথেব ব্যবসা বোম্বেতেই শুরু হযেছিল। এবং উত্তব দক্ষিণ ভাবতবর্ষেব অনেক দেশ বিদেশ ঘুবে আবাব বোম্বেতেই ফুবিযে গেল। বাবাব তিবিশ হাজাব টাকা নিযে তেইশ বছব আগে একদিন বোম্বে গিযেছিল সে। চল্লিশ বছব বযসে কলকাতায ফিবে এল সে পাঁচশো টাকা হাতে নিযে।

ভয নেই সোমনাথ, আবাব তুমি উঠবে, জাগবে, কলকাতায পা দিযে সোমনাথ নিজেকে নিজে বললে। একটা ছোটখাটো হোটেলে গিযে উঠল। দাড়ি কামিযে স্নান কবে খেযেদেযে সোমনাথ চৌকশ ঘুম দিল।

একেবাবে বিকেলবেলা উঠল জেগে। সন্ধ্যাব মুখে সিনেমা দেখতে গেল। বাতেব কলকাতায পাযে হেঁটে টহল দিযে বেড়াল, ওঃ কলকাতা বদলে গেছে ঢেব। দু-চাবদিন কলকাতায থেকে সোমনাথ গ্রামেব দিকে বওনা হল। নিজেব দেশেব বাড়িতে একটা বড় একতলা দালান এবং বিঘা তিনেক জমি আছে সেইখানে। সোমনাথেব বাপেব আমলেব জিনিশ। যাবে সে।

সাত বছব তো বোম্বে থেকে একবাব বাংলাদেশে ফিবেছিল সে। দেশে গিযেছিল, কযেকদিন ছিল, কিন্তু এবাব দেশে গিযে একটু স্থাযী বকমে বাস কববে মনে কবল সোমনাথ। কলকাতাব থেকে একদিন বিকেলবেলা বওনা হযে বাত আটটাব সময গ্রামে এসে পৌছলে সে। গ্রাম ঠিক বলা চলে না, শহবেব মতো বাস্তাঘাট, নানাবকম ব্যবস্থা; শহবেব মতো আবহাওযা ধীবে ধীবে জাযগাটাকে অধিকাব কবে নিচ্ছে।

বিশ্বম্ববনাথ একজন ছোট জাতেব লোকেব সঙ্গে প্রথম বাতেই সোমনাথেব আলাপ জমে গিযেছিল। আলাপ প্রগাঢ় তাব সঙ্গে হযে উঠল। বিশ্বম্ববেব স্ত্রী সন্তান কিছু নেই, বযস পঞ্চাশেব কাছাকাছি। প্রায ছ মাস ধবে সোমনাথদেব দালানেব বাবান্দায সে বাত কাটিযে আসছে। কলকাতাব থেকে এসেই সোমনাথ স্নান কবল। বাজাবেব ডেচকি বালতি ওসব কিনে আনে। বিশ্বম্ববই দূবেব একটা দিঘিব থেকে বালতি বালতি ভালো জল এনে দিলে সোমনাথকে।

সেই বাতেই বাজাব থেকে তবিতবকাবি সোমনাথকে বেঁধে খাওযাল বিশ্বম্বব। বান্না বড্ড কাঁচা, নিকৃষ্ট

ধবনেব। কিন্তু গবম। সোমনাথেব খিদে ছিল খুব, অনেক খেল সে। খাওযাদ ওযাব পব বাবান্দায ইজিচেযাবে বসে সোমনাথ—'আবাব হযতো গৌথে যাব আমি, তুমি যাবে নাকি স ঙ্গ বিশ্বম্ববং'

—'আজ্ঞে না।'

—'কেন?'

—'আমাকে ববং আপনি এই জমিব ভিতবেই খানিকটা আশ্রয দিন।'

—'এখানে কববে কী তুমি?'

—'আপনি যা হুকুম কববেন, তাই কবব।'

—'তা তো বুঝলাম, কিন্তু একদিন হযতো আমি চলে যাব।'

—'কোনদিকে?'

—'কলকাতায, হযতো বোম্বেই।'

—'তখনো নফব এখানেই পড়ে থাকবে হুজুব' হাত জোড় কবে বিশ্বম্বব সোমনাথকে বললে।

'তা এখানেই থেকো বিশ্বম্বব, কিন্তু কী কাজ কব তুমি?'

'আমি হুজুব চৌকিদাব ছিলুম, সেই পাগড়ি, বাঁশেব লাঠি, এখনো আমাব কাছে বযেছে সব।'

সোমনাথ একটু আমোদ পেযে হেসে—'তুমিও ছিলে চৌকিদাব, কিন্তু তোমাব চেহাবাব দিকে তাকিযে কে এই কথা বলবে বিশ্বম্বব?'

—'সোনাব বং ছিল চেহাবায হুজুব, কিন্তু সে-সব দিন চলে গিযেছে, ম্যালেবিযা হল, পিলে ছুটল, সে অনেক কথা হুজুব, সে সব কথা আব বলবেন না। মনে বড় কষ্ট লাগে।'

—'ছেলেপিলে কটা তোমাব বিশ্বম্বব?'

—'আজ্ঞে নেই, আমি বিযে কবিনি।'

—'ভালোই কবেছ।'

—'ভালো কবেছি বলে মনে হয না। বযস কত পড়ে যাচ্ছে। এবপব কী হবে বুঝে উঠতে পাবি না কিছু। সন্তান থাকলে কোনো গোলমাল ছিল না, হাযবে ভগবান।

—'নিবাশ হোস নে বে ব্যাটা, নিবাশ হোস নে' সোমনাথ বললে। তাবপব আবাব আগেকাব মতো গম্ভীব সংস্থিত গলায সোমনাথেব জিজ্ঞেস—'এখন কী কাজ কব তুমি বিশ্বম্বব?'

—'হুজুব লোকে বলে আমায মাল টানাব কাজ কবতে। তা হবে না। তা কি কখনো হয? ছিলাম চৌকিদাব, এখন কুলিগিবি কবতে পাবব না। ববং না খেযেই মবব।'

—'দবকাব হলে তুমি আমি—আমাদেব দুজনেবই কুলিগিবি কবতে বাজি হওযা উচিত বিশ্বম্বব। কিন্তু —' 'বিশ্বম্ববেব বাঁশপাতা গাছেব মতো চেহাবাব দিকে একবাব তাকিযে নিযে সোমনাথ— আসল কথা তোমাব শবীব যা হযেছে এতে কুলিগিবি চলে না।

—'একটা কাজ কবি হুজুব ইংবেজি বাংলা পত্রিকাব একজন এজেন্ট আছেন, তাঁব কাছ থেকে নিযে কাগজ বিলি কবতে হয। মাসে দেড় টাকা মাইনে।

—'কাগজ বিক্রি হয কেমন?

—'মন্দ না দেড় টাকায চলে যায আমাব। একাব না মানুষ। কিন্তু বাবু বলেন মাইনে আবো কমিযে দেবেন।

—'কেন?'

— কী জানি, কর্তাদেব মর্জি। সামেন মাস থেকে এক কবে দেবে বলছে। তাহলে আমি আব থাকব না।

সোমনাথ— আমি যতদিন আছি, তোমাব কোনো চিন্তা নেই, আমাব এখানেই থাকবে খাবে। মানুষেব একটা কাজ থাকা চাই তো, না হয কাগজেব এজেন্টেব কাজটা নাই বা ছাড়লে তুমি।

সোমনাথ একটা চুরুট জ্বালিযে নিযে—'তাবপব আমাব মনে হয, অবিশ্যি ঈশ্ববেব ইচ্ছা, বুঝলে বিশ্বম্বব, কিন্তু এখানে আমাব অনেকদিনই থাকবাব ইচ্ছা, দেশে থাকব বলেই এসেছি।'

—'বসবাস কববেন?'

—'ভাবছি তাই।'

—'মা কোথায বইলেন?'

—'অনেকদিন হয মবে গেছেন।'

—'আবাব বিযে কববেন?'

সোমনাথ বিশ্বম্ববনাথেব ভুল শুধবে নিযে—'ওঃ তুমি জিজ্ঞেস কবছিলে আমাব স্ত্রীব কথা? আমি বিযে কবিনি। বিশ্বম্ববনাথ তোমাদেব দেশে বড্ড মশা, সুস্থিবে থাকতে দিচ্ছে না। কী কবা যায বলো তো?'

—'পাযে কামড়াচ্ছে তো? সর্ষেব তেল মেখে বসতে পাবেন, কিন্তু মশাবি ছাড়া ওব কোনো ওষুধ নেই। আমি সাবাবাত আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিযে শুযে থাকি। দেখুন একটা খেঁকশেযাল।'

—'কোথায?'

—'হুই যে পুকুবেব কিনাবে।'

—'কী কবছে ওখানে? মাছ মেবে খাবে?'

—'আজ্ঞে মাছ শিকাব কববে 'খেঁকশিযাল—তেমনই কিনা' ওখানে একটা ডাহুকেব বাসা আছে, বোধকবি বাচ্চা বড় হযেছে, তাই মেবে খাবে হযতো।'

—'ডাহুক কীবকম?'

'একবকম পাখি। দেখেননি কোনোদিন?'

—'না তো।'

—'আচ্ছা, কাল দেখাব।'

—'কী কবে?'

—'একটা বাচ্চা—বলেন তো বড় পাখিটাকেই ধবে আনব—সে আমি পাবি, কৌশল জানা থাকা চাই।'

—'থাক, মিছিমিছি কেন একটা পাখি ধবে আনবে, দেখে দবকাব নেই আমাব।' শীতেব চমৎকাব বাত, যতদূব চোখ যায ধানখেত চলে গেছে। কেমন নিস্তব্ধতা সোমনাথ গুন গুন কবে একটা গান ধবল। যা শুনে বিশ্বম্বব বিচলিত হযে উঠল। হাতজোড কবে ঘাড় নেড়ে, মাথা হেট কবে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে—'ঠাকুব এইবকমই যেন হয।

সোমনাথ মহাবিজ্ঞ মানুষ, কিন্তু বিশ্বম্ববকে প্রশ্রয দিতে গেল না। কোথায যেন অসংলগ্নতা, দুর্বলতা, সৌন্দর্যহীনতা বযেছে বুঝতে পেবে গান থামিযে দিল সে।

—'এত বাতে লন্ঠন নিযে কে ছুটছে বিশ্বম্বব?

—'বানাব।'

[...]

—'আজ্ঞে যদি আমাব চৌকিদাবি কাজটা থাকত অনেক দূবেব ঘনীভূত অন্ধকাবেব বিববে বাতিব আলোব দিকে তাকিযে বিশ্বম্বব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আবাব।

খানিকক্ষণ পবে সোমনাথথ—'আমি হলুম ব্যবসাদাব মানুষ, দুটো কাজেব-কথা বুলি হাঁস-মুবগিব ব্যবসা কবা যায?'

—'এ গাঁযে? চলবে না হুজুব।'

—'কেন?'

—'কে কিনবে? পযসা আছে কোন সুমুন্দিব?'

—'ঘোড়াব গাড়ি তো এখানে বেশ চলে।'

—'কই চলে? কযেকটা ট্যাক ট্যাক কবছে, মোছলমানদেব, গাড়িব ব্যবকসা যদি কবতে চান হুজুব [...] ব্যবসা হবে।' বিশ্বম্বব কপালে ভুরু তুলে ডান হাতেব তিনটে আঙুল মেলে দিযে সোমনাথকে দেখাল।

সোমনাথ—অর্থ কি?'

—'তিনশো টাকা [...]

—'মোটে তিনশো বিশ্ব'।

—'এক মাসেব ভিতবেই তিনশো। এক বছব চালালে তিন হাজাব টাকা গুনাগাব দিযে পালাতে হবে। গাড়িব ব্যবসা হে।'

—'আমি ভেবেছিলাম একটা বাস চালাব।'

—'বাস?' সোমনাথের ব্যবসাবুদ্ধির ওপর বিশ্বম্বরের কোনো আস্থা রইল না।

—'কী ব্যবসা চলে এখানে বিশ্বম্বর?'

—'চলে মুনসেফি, হাকিমি, পুলিশের ব্যবসা চলে, আমার চৌকিদারিটা যদি থাকত ঠাকুর।' বিশ্বম্বর আকাশের দিকে তাকাল—'ব্যবসার মাথায় লাঠি মেরে চলে যেতাম আমি।'

তারপর আস্তে আস্তে নিস্তব্ধতা এসে পড়ল। বিশ্বম্বর খেতে চলে গেল। সোমনাথ ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের ভিতর ঢুকল গিয়ে। দরজা বন্ধ করে মশারি ফেলে দিয়ে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে সোমনাথ বিশেষ কোনো কথা ভাবতে গেল না আর। তিন-চার মিনিটের ভিতরেই ঘুমিয়ে নিঃশব্দ নিস্পন্দ পৃথিবীর ভিতর হারিয়ে গেল সে। চারিদিককার অন্ধকার , হিম, শিশির, জোনাকি ও পেঁচার ভিতর সেও যেন এদের পার্শ্বচর অবযব হয়ে পাড়াগাঁর পৌষের রাত্রিকে অন্তরের সঙ্গে সম্পূর্ণ আবেগ দিয়ে গঠন করতে লাগল, অনুমোদনও। গঠন করতে লাগল, গঠন করতে লাগল,।

পরের দিন সকালে সোমনাথ ইজি চেযারে বসে ধানখেতের দিকে তাকিযে এস্রাজ বাজিয়ে ভজনগান সেধে, চা খেয়ে চুরুট টেনে ঘণ্টা দুই কাটিযে দিল বেশ। হাতে তার তিনশো টাকা আছে মাত্র। কোনো চাকরি নেই, উপায নেই, পৃথিবীতে অন্য কোন সম্বল নেই। ব্যবসা যে তাব হাতে ব্যবসাই নয়, সুমন্দিদের যে কোনো কিছুর জন্যই পয়সা নেই। টাকা কটির ব্যাপার যা তার হাতে জলে জল ঢালা মাত্র। এসব কোনো ভাবনাই খোঁচা দিতে গেল না তাকে।

যখন রোদ উঠেছে বেশ খানিকটা সোমনাথ টেবিল চেযার নিযে কী যে কীসব লিখবার কাজে খুব গভীরভাবে নিমগ্ন হযে রইল।

বিশ্বম্বর ভোর না হতেই কাগজটির এজেন্টের কাজে চলে গিযেছে।

গোটা নয়ের সময় সোমনথেব ফটকে একটা গাড়ি এসে থামল।

সোমনাথ লিখতে লিখতে তাকিযে দেখল, লম্বা ধবনের একটি মেয়ে, পরনে বিধবার সাজসজ্জা, বযস কুড়ি-একুশ হবে। মুখখানা সোমনাথেব হৃৎপিণ্ডকেও চঞ্চল করে তুলেছে। মেযেটির মুখেব দিকে তাকিয়ে সোমনাথের জীবনের কুড়ি-বাইশ বছর কুযাশার ভিতর হাবিযে যায যেন। গাড়ি থেকে নেমে ঘাস আগাছা ও শিশিরের ভিতর দিয়ে সোমনাথকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথ চেযার ছেড়ে উঠি উঠি কবেও বসেই রইল। মেযেটি বোধহয ঠিকানা ভুল করেছে—এখুনি ফিরে যাবে হযতো সে।

সোমনাথ বাঁহাত ছড়িযে কপাল ঢেকে, ডান হাত দিযে কলম তুলে লিখতে আরম্ভ করল আবার। মেযেটিকে সে ভুলেই যাচ্ছিল প্রায। এরকম সে, সেমিনাবের মতো মানুষেব হৃদযে এই মেযেটির মুখের মতন মুখও বেশিক্ষণ বসে থাকতে প্যারে না।

মেযেটি হেঁটে আসছিল, হঠাৎ থেমে গিযে পিছন দিযে তাকিযে—'ছোট মামাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

গাড়ির ভিতরে যে ভদ্রলোকটি ছিলেন, মেযেটি যাঁকে ছোট মামাবাবু বলে ডাক দিল, গাড়ির অন্য দরজা। খুলে বেরিযে মনে হচ্ছিল, চম্পট দিচ্ছে।

সোমনাথ কলম রেখে দিযে সামনের এই ব্যাপারের দিকে নজব দিল আবার।

—'ছোট মামাবাবু—'

—'তুমি বোসো গিযে কমলা, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

—'ঘুরে আসছেন? তার অর্থ কী ছোট মামাবাবু? আমাকে কোথায বসতে বলছেন?'

—'বরং তুমি গাড়ি চড়ে আমাব সঙ্গে এসেছ।'

কমলা—'গাড়ি তো দাঁড়িযেই আছে।'

—'তা কী করে হয? আজ কাল পরশু যে কোনো সময মাসিমা এখানে এসে পড়তে পারেন। সঙ্গে সেই যক্ষ্মারুগি, আমাদের গোছগাছ করে বাখতে হবে তো সব।'

কিন্তু ভদ্রলোক পথেব মোড়ে অন্তর্হিত হযে কোনো কুয়াশার অবকাশ রাখলেন না।

সোমনাথের মনে হল এই মানুষটি এই স্ত্রীলোকটিকে ছেড়ে দিয়ে চিরকালের জন্য ডুব দিল।

বিশেষ প্রযোজন ছিল মেযেটিব।

সোমনাথের বারান্দায গিযে উঠে দাঁড়াতে সে কোনো বাধা বোধ করল না। কিংবা মেয়েটির রকমই

হয়তো এইবকম। বযস কম হলেও মানুষেব সঙ্গে কাববাব হযতো তাব ঢেব বেশি। এ বাড়ি যেন মেযেটিব নিজেবই বাড়ি। মনে হল কমলাই যেন বাড়িব স্বামিনী। সোমনাথ যেন আগন্তুক। সোমনাথ? টেবিল চেযাব নিযে সে কি লিখছে? লিখতে বলেছে কে তাকে? এখানে সে এল কোথেকে? মেযেটি এই কথায যেন ভাবছে কি বল সোমনাথ? সোমনাথ নিজেকে প্রশ্ন কবতে বাধ্য হল।

—'আপনি দাঁড়িযে যে, বসুন।' সোমনাথ বললে।

—'কোথাযই বা বসব?'

—'আমি চেযাব এনে দিচ্ছি।'

—'জাযগা বিশেষে ববং একটা চৌকি বা মাদুবেব ওপবেই আমাকে বসতে হয। আছে?'

—'মাদুব নেই বটে কিন্তু বাগ বযেছে।'

মেযেটি এবাব হেসেকেঁদে উত্তব দিলে না, মনে মনে ভাবল, উত্তব দিতে গেলে প্রগলভতা হবে। নিজেব চঞ্চলতাকে আজও শাসন কবতে পাবলুম না, শান্ত ভাবে বললে,—'না, বাগ থাক। আমি এই সিঁড়িব ওপবেই বসি।'

—'তা কি হয, তা কি হয।' সোমনাথ ব্যস্ত হযে বললে।

—'আপনাব ভদ্রতা আমাব ভালো লেগেছে।' মেযেটি বললে—'এই বাড়িব এই সিঁড়িব ওপব আমি অনেকবাব বসেছি।'

—'এই বাড়িব?'

—'হ্যাঁ, গত বছবও এই বাড়িতে আমবা কার্তিক অঘ্রান পৌষ মাঘ ফাল্গুন প্রায মাস তিনেক ছিলুম।'

—'কে?'

—'আমি মেজ মামাবাবু মাসিমা আব ভবশঙ্কব। কাউকে চিনবেন না আপনি। চেনেন?'

সোমনাথ একটু চিন্তা কবে—'ছোট মামাবাবু গত বছব আসেননি তো?

—'না?'

—'তাহলে ঠিকই হযেছে, তিনি পথঘাটই চেনেন না, আপনাকে ভুল ঠিকানায দিযে গেছেন। কোচম্যান জিনিশপত্তবগুলো তুলেই দিযে যাও তো বাবা তোমাকে দু আনা পযসা বকশিস দেব। ভাড়াও নিযে যাও।'

কোচম্যানকে ফিবিযে দিযে সোমনাথেব দিকে ফিবে—'ছোট মামাবাবু না হয নতুন, কিন্তু আমি তো ভুল কবতে পাবি না। এই ঘবদোব বাড়ি সবই এই যেমন ছিল তেমনই বযেছে, ওই বাতাবি লেবুব গাছটা পর্যন্ত। গত বছব কার্তিকে কত বাতাবি লেবুব শববৎ খেযেছি। ওই দেখুন দেযালে আমাব নাম পর্যন্ত লেখা বযেছে।'

সোমনাথ অবাক হযে তাকিযে দেখল, নীল পেন্সিলে শাদা দেওযালেব গায লেখা বযেছে কমলাদেবী।

—'এই বাড়িটা হচ্ছে ভবশঙ্কবেব।'

—'তিনি কে?'

—'আমাব বড়মামাব বড়ছেলে।'

—'তিনি কী কবেন?'

—'কলকাতায ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকবি কবেন, আপনি তাঁকে চেনেন না? এখানে এলেন কী কবে তাহলে?'

—'না, তাঁকে আমি চিনি না।' সোমনাথ মাথা নেড়ে বললে।

—'খালি বাড়ি পেযে শীতেব মিঠে বোদে বসে লেখাপড়া কবছিলেন বুঝি? আপনি কি উকিল? বড্ড দুর্দশা আপনাদেব আজকাল, একটু ঠাট না হলে মক্কেলবা আসতে চায না।'

—'না, আমি উকিল নই।'

—'আমাব মাসিমা হযতো আজ আসবেন। কিংবা তিন-চাব দিন পবেও আসতে পাবেন। তাঁবা সব বর্ধমান থেকে আসছেন। সঙ্গে তাবানাথ আসবে, বেচাবিব যক্ষ্মা হযেছে।'

—'তাহলে তো বিপদেব কথা, কিন্তু এ দেশটাকে তো [...] মতো মনে হয না। ববং এঁবা পশ্চিমে গেলে পাবতেন।'

—'তাই যাবেন, পথে এখানে কযেকদিন কাটিযে যাবেন, যে পর্যন্ত না ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক হয।'

—'আপনিও সঙ্গে যাবেন বুঝি? সেবা কবতে নিশ্চযই? তাবানাথ আপনাব মাসতুতো ভাই?'
—'হ্যাঁ।'
—'ছোট মামাবাবু চলে গেলেন কেন?'
—'জানি না।'
—'কোথায গেলেন?'
—'আমাব মনে হয স্টেশনে-গিযেছেন।'
—'পাযচাবি কববাব জন্য?' সোমনাথ হেসে জিজ্ঞেস কবল।
—'না [...] ট্রেনে বসেছেন গিযে—'
—'এখন কি কোনো গাড়ি ছাড়ে?'
—'সেই কথাই আমি ভাবছিলাম।'
—'একবাব স্টেশনে গিযে দেখা উচিত।'
—'কে যাবে?'
—'আমিই যাব।'
—'ওঁকে আপনি কোথাও পাবেন না।'
—'কেন?'
—'আমাকে উনি ফেলেই গেলেন।'

কমলা ও তাব নিজেব কথাবার্তাব ভিতব থেকে সোমনাথ কোনো বহস্য উদ্ধাব কবতে চেষ্টা কবল না। বহস্য থাকলে তো? সংসাবে হযতো বহস্য আছে, কিন্তু মনেব ভিতব বহস্য খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ কবতে পাবে না। না, এব ভিতব মলিনতা নেই কিছু। আজ সকালে সংকল্প কবে কেউ তোমাব সঙ্গে কৌতুক কবতে আসেনি সোমনাথ, সোমনাথ নিজেকেই নিজে বললে।

—'একটা টেলিগ্রাম কবে দেযা যাক।'
—'কাকে?'
—'কলকাতায আপনাব মামাবাড়িতে?'
—'পূজোব ছুটিতে বেবিযে পড়েছে তাবা সব।'
—'কোথায?'
—'নানা জাযগায ছড়িযে পড়েছে—কোথায টেলিগ্রাম কববেন?
—'ভবশঙ্কববাবুকেই একটা টেলিগ্রাম কবা যাক, তাঁব ঠিকানা কি?'
—'কারু ঠিকানাই আমি জানি না।'

সোমনাথ খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'আপনাব মাসিমা আজই আসবেন?'

—'আজও আসতে পাবেন, কিংবা কাল, তিন-চাব দিন দেবিও হতে পাবে। আজ এলে তো বেচে যাই। ছোট মামাবাবুব কথা কাকে আমি কী যে বলব, মামা মনে হয' কমলা একটু থেমে গিযে—'কিন্তু কী আব বলব, ববাববই উনি ওই বকম—কীবকম সব কাজ কবেন, নিজেব মনেই শান্তি পান—এমন একজন ভবঘুবে অন্তত দুটি মানুষ আপনি আব খুঁজে পাবেন না কোথাও।'

—'তিন-চাব দিন পবে যদি আসেন আপনাব মাসিমা তাহলে আপনাব কী ব্যবস্থা হবে?'

—'ব্যবস্থা আমি নিজেই কবব। বিধবা হযে আছি, নিজেই নিজেকে চালাচ্ছি, এ বাড়িতে আমি একাই থাকতে পাবব।'

—'পাড়াগাঁব কোনো বাড়িতে একা কোনোদিন থেকে দেখেছেন? এ বাড়িতে আশপাশেও অনেক দূব পর্যন্ত কোনো লোকজনেব বসতি নেই কিন্তু।'

কমলা ঘাড় হেট কবে—'আপনাব লেখাপড়াব কাজ শেষ হযেছে?'

—'না।'
—'আপনি ভবশঙ্কববাবুব কাছ থেকে এ বাড়ি ভাড়া নিযেছেন?'
—'না।'
—'তাহলে কোন শর্তে এ বাড়ি দখল কবে বযেছেন?'
—'কোনো শর্ত নেই, আপনাবা সচ্ছন্দে এখানে যে কদিন খুশী কাটাতে পাবেন।' সোমনাথ মনে

মনে কী ভেবে এই কথা বললে বুঝতে পাবা গেল না। কিন্তু মুখে বললে—'একজন রুগি আসছে, তাব চেয়ে আমাব দবকাব বেশি নয়।' কিন্তু মনে মনে ঠিক যেন ঠিক খেলল না, সোমনাথ বুঝতে পাবল নিজেই কেই বা সেই যক্ষ্মা রুগি তাবানাথ? এই মেয়েটিব মুখ কিন্তু এমনই জিনিশ যে বাব বাব এব দিকে তাকাতে সাহস হয় না। মনে হয় সাহস খবচ হয়ে যাবে সব।

এই পৃথিবীতে খুব আস্বাদ ও পিপাসা বয়েছে খবচ হয়ে যাবে সব, তাবপব এই পৃথিবীব [...] দেশে কিছুই থাকবে না যেন আব, কার্তিক বাতেব শীত ও নিঃশব্দতা ছাড়া।

সোমনাথ, এই মেয়েটি কি তোমাব মেয়েব মতো নয়? কী অন্যায় কথা ভাবছ তুমি সব? তোমাব হল কি? সোমনাথ ভ্রূকুটি কবে টেবিলেব দিকে তাকিয়ে—'একজন যক্ষ্মারুগি আসছে, আমাব চেয়ে তাব দবকাব ঢেব বেশি। আমাব কোনো শর্ত নেই, আপনি আজ থেকেই এ বাড়ি যেমন খুশি ব্যবহাব কবতে পাবেন।'

—'আপনি যাবেন কোথায়?'

সোমনাথ কোনো জবাব দিল না।'

—'কিন্তু অনেকক্ষণ ধবে দেখছি, ঘবেব ভিতব আপনাব বাক্সপ্যাটবা বয়েছে, মশাবিও টাঙানো, কদিন ধবে আপনি এখানে আছেন?'

—'আমি কাল এসেছি।'

—'মাত্র কাল? কোত্থেকে?'

—'আমি বোম্বেতে ছিলাম।'

—'বোম্বে? সেখান থেকে মানুষ আবাব এইখানে আসে?'

—'কিন্তু দেখলুম, আসবাব প্রয়োজন ছিল' সোমনাথ টেবিলেব থেকে কলমটা তুলে সোনাব নিবেব দিকে তাকিয়ে বইল।

—'নানা জায়গায় ঘোবা বলে, নানাবকম জিনিশ দেখা যায়, শেখা যায়, যা কোনোদিন ভাবিনি, বুঝিনি তাব মুখোমুখি এসে—'

সোমনাথ কলমটা ধবে লিখতে শুরু কবল।

—'তাহলে আপনাব স্ত্রী মেয়ে সবই এখানে বয়েছে?'

সোমনাথ কলমটা বেখে দিয়ে কমলাব দিকে না তাকিয়ে—'যাব স্ত্রী আছে, তাবই কি মেয়ে থাকতে হয়?'

—'আপনি নিঃসন্তান?

সোমনাথ কলমটা তুলে ধবে,—'মেয়ে না থাকলে মানুষ নিঃসন্তান হয়?'

—'যাঃ ছোট মামাবাবুই ভণ্ডুল লাগিয়ে দিল সব। মনটা সেই থেকেই উড়ছে।' কমলা হেসে বললে—'আপনাব স্ত্রীব সঙ্গে আমাব একটু কথাবার্তা হতে পাবে?'

—'কী কথা?'

—'সে আমি তাঁকেই বলব ববং?'

সোমনাথ হো হো কবে হেসে উঠে—'আমাব স্ত্রী নেই।'

কমলা বসে বসে কী ভাবছিল সোমনাথ জানল না। নীববতাব ভিতব যে মেয়েটি বসে বয়েছে তাব মুখেব দিকে না তাকিয়ে লিখতে আবম্ভ কবল আবাব সে। কলম তুলে নিয়ে ধীবে ধীবে লিখছিল সে। লিখতে লিখতেই বললে—'আমাব স্ত্রী ছিল না কোনোদিন আমি বিয়ে কবিনি।'

মেয়েটি মাথা হেট কবে নীবব হয়ে বসে বইল।

—'আপনি কী বলতেন তাঁকে?'

মেয়েটি সে কথাব কোনো উত্তব না দিয়ে—'আপনি একটা কাজ কববেন?'

—'বলুন?'

—'আমাকে একটা গাড়ি ডেকে দিন।'

—'কেন?'

—'স্টেশনেই চলে যাই।'

—'কলকাতায় যাবেন?'

—'হ্যাঁ মাসিমা আসবেন। তাবানাথ আসবে। কবে আসবে সব কে জানে? ছোটমামা গেলেন পালিযে। আমি একা মেযে মানুষ—আমি কী কবব?'

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল-কিন্তু কী যেন ভেবে চেযাবেব এক কিনাবেব বসে পড়ে বললে—'কিন্তু কলকাতায যাবেন একা হাওড়ায নেমে, বাসা চিনে যেতে পাববেন আপনি? কলকাতায কেমন যেন কী যে গোলমেলে জাযগা, কলকাতায পৌছবেন বাত দশটায।'

—'তা আমি জানি।'

—'অনেক বাত হযতো।'

—'দশটা সাড়ে দশটায গিযে পৌছোবে।'

—'মামাববাড়ি যাবেন ভাড়াটে গাড়ি চড়ে?'

—'না বিকশা কবেই যাব।'

—'তবেই হযেছে।' সোমনাথ তাব কোটেব গলায বোতামটা ঘোবাচ্ছে—'হাওড়া স্টেশনে বাত এগাবোটাব সময আপনি একা বিকশাওযালাব সঙ্গে দবদস্তুব কবছেন, এ কথা ভাবতে গেলে কোনো পুরুষমানুষেব সুখ হয না।'

—'পুরুষমানুষ অনেক বকম বযেছে।' কমলা উড্ডীন পাখিব মতো বৌদ্র কবলিত হযে দূব ঘনীভূত আকাশগুলোব দিকে তাকাল একবাব। যেন সোমনাথ বলে কোনো জীব এ পৃথিবীতে নেই আব। যেন পৃথিবী নানাবকম সাহসিক ও দুঃসাহসিক পুরুষমানুষেব ভিড়ে ভবে বযেছে। তাবপব একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—'নিন উঠুন, কারু যদি খুব নষ্ট কববাব অপবাধ আমাব হযে থাকে তাহলে ক্ষমা করুন।'

—'আমাব কাছে ক্ষমা চাচ্ছ? আমি খুব সচ্ছন্দে ঘুমাই, তুমি ভবশঙ্কবকে জিজ্ঞেস কবতে পাব।'

যেন কমলাও ভবশঙ্কবকে চেনে।

—'কিন্তু গাড়ি ডাকবাব সময হযেছে।'

—'কলকাতাব গাড়ি কটাব সময ছাড়ে?'

—'একটা ছেড়ে গেছে, আবেকটা বোধ হয দুটোব সময ছাড়বে।'

—'এখন বেজেছে কটা?'

—'বেলা কম হযনি, সূর্যেব দিকে তাকিযে মনে হয বাবোটা বেজে গেছে।'

—'তাহলে সময আছে ঢেব।'

—'তা বযেছে, আপনি আপনার বাগটা একটু আনুন' সোমনাথেব দিকে তাকিযে খানিকটা দযাব উষ্ণতায মুখখানা গলিযে নিযে বললে—'না হয চলুন, আমবা দুজনে ওযেটিং রুমে গিযে বসব। কোনো আপত্তি নেই তো আপনাব?' কিন্তু সোমনাথেব মুখেব দিকে তাকিযে কমলা—'আচ্ছা, যাক, এখানেই বসা যাক, একটা চেযাব দিন আমাকে, আচ্ছা এতেই হবে, সিঁড়িতেই বসে গেলুম আপনাব এখানে। আপনাকে পীড়িত কবলুম বড্ড। গোড়াব থেকে চেযাব টেনে আপনাব মুখোমুখি বস উচিত ছিল আমাব।' কমলা হাসিব আবেগে হাসতেই লাগল। কিন্তু তবুও আবেগেব ভেতব কোথায যেন নিস্পন্দ মস্তবড় দেযাল ছিল একটা। হাসি যেখানে আঘাত খেযে ভাদ্রেব শীতে শেফালি ফুলেব শবেব মতো রূপ ধাবণ কবে। প্রতিব্যথিত হযে কেন যে কমলা নিজেই কী বোঝে তা কেউ কি বোঝে? সোমনাথ একেবাবেই বুঝল না কিছু।

—'আপনাব চুল পেকে গেছে বা কেন, বোম্বেতে, কি যে মানুষ আপনি।'

—'কী কবতে হবে বলো?'

—'কিছু না, যেমন লিখছিলেন, লিখে যান।'

—'বোম্বে কবে যাবেন?'

—'আব যাব না ভাবছি।'

—'কেন?'

—'কী হবে গিযে?'

—'তবে এবাব কোনদিকে?'

—'কোথায যাব, জানি না কিছু। এতদিন এই চল্লিশটা বছব খুব ব্যস্ত ছিলাম। এখন একটু স্থিব হযে বসতে ইচ্ছা কবে কোথাও।'

—'তাহলে এখানেই থাকুন, এ জায়গাটা তো বেশ নির্জন।'

—'কিন্তু তোমাদের ব্যস্ততা দেখে আবার বের হয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।'

—'আমরা ব্যস্ত। সারা জীবন কলকাতার মড়া গলিতে গলিতে কাটিয়ে দিলুম, আজ চলেছি একজন যক্ষ্মারুগির সেবা করতে, হয়তো ছ মাস সেখানেই ঘাড় গুঁজে কাটিয়ে দিতে হবে। আকাশগুলোর মুখও দেখতে পাই না। বোম্বে শহরটা কেমন? মেজ মামাবাবুকে নিয়ে এ জীবনে একবার যাওয়া হবে না কি সেখানে কোনোদিন?'

—'পূজোর ছুটিতে তোমার মামারা তোমাকে ফেলে চলে গেলেন যে সব?'

—'মামারা এক একটা বড় পরিবার নিয়ে প্রত্যেকেই বড় ক্লান্ত—আর কিছু দেখবার অবসরই পান না তাঁরা।'

—'কিন্তু আমি একা একা বসে থেকে অবসন্ন, সারাদিন সাবারাত পড়ে বয়েছে, কী করা যায়?'

—'অনেকদিন তো ব্যস্ত ছিলেন, এখন বিশ্রাম করুন।'

—'বিশ্রাম তো করব, কিন্তু তারপর?'

—'মাসিমা তারানাথকে নিয়ে এলে খুলে বলবেন সব, যেন আমার কোনো অপরাধ না নেয়।'

—'কীসের অপবাধ?'

—'আমি তো তার জন্য অপেক্ষা করতে পারলুম না।'

—'উঠে দাঁড়ালে কেন?'

—'এই বার গাড়ি আনতে হয়।'

—'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাই।'

—'আমি আপনাব অনেক সময নষ্ট করলুম, বাত এগারোটাব সময হাওড়ার কথা ভেবে আপনি হয়তো এখানে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতেই পাববেন না আজ। কিন্তু তবুও অনেক একা চলাফেবা করেছি আমি, পথে একজন না একজন বাবা-মাযেব মতন ভদ্রলোক বা মহিলা জুটেই যান।'

—'কিন্তু তবুও।'

—'তবুও পবেব মানুষ—মাথাব চুল যার পাকতে শুরু করেছে অপবেব জন্য তাব কি মাথাব্যথা বে বাপু', তীক্ষ্ণভাবে হেসে উঠে সোমনাথের মনে যতসমস্ত বিসদৃশ আসক্তি জর্জব গ্রন্থি ছিঁড়ে ফেলে দিতে চাইল সব।

কিন্তু তবুও এই বুদ্ধিমতী মেযেটি, এই চল্লিশ বছর বযসেব পুরুষমানুষটি আবাব সেই হাড়ের পাহাড়েব চাবদিকে ঘুবছে, অনেক রাজা যুবরাজ নেতা যোদ্ধাও ম্লান চোখে যেখানে ফিবে ফিবে কোনোদিনই কোনো কিনাবা কবতে পাবল না। একে নতুন কবে বেদনা দিতে যাওযা অপবাধ।

—'এই যে টেবিলে কার্ড বযেছে, সোমনাথ চৌধুবী কার নাম?'

—'আমাব নাম কমলা।'

—'চৌধুবী? আপনাবা জমিদাব বুঝি?'

—'না, জমিদাব আমরা কোনোদিনই ছিলাম না কমলা।'

—'নবাবের আমলের খেতাব, একদিন আপনার পূর্বপুরুষবা কম ছিলেন না নিশ্চযই?'

—'তা হবে।'

—'সেই রক্তের ধারা এখনো।'

—'না, এখন আর কিছু নেই কমলা, ভাঙনে খেযে গেছে সব।' সোমনাথ আবার চেযাবে বসে—'পূর্বপুরুষরাও অপকীর্তি কবেই হযতো খেতাব পেযেছিল। খেতাব বা টাকা দিযে মানুষকে বুঝবাব চেষ্টা করা উচিত নয়।'

—'এ বাড়িটা কি আপনার সোমনাথবাবু?'

—'ছিল আমার বাবার।'

—'এখন?'

—'তিনি কাউকে বিক্রি করেছেন বলে তো জানি না, আমিও বিক্রি কবিনি কারু কাছে। আমার তো মনে হয এ বাড়িটা আমারই।'

—'এতদিন তদারক করেননি কিছু?'

—'না, কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে না আবার, একদিন তা ভাবতে পারিনি।'

—'কিন্তু তবুও তো ফিরে আসতে হল। হয়তো চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুষেরা টেনে আনলেন আপনাকে বিদেশের মোহে। ব্যস্ততার ভুল দেখিয়ে দেবার জন্য। বিশ্রাম করুন, বসে বসে দেশের সৌন্দর্য দেখুন, স্থির হয়ে দেখুন সোমনাথবাবু। পূর্বপুরুষরা আপনাকে দেশের ভিতরেই ফিরে পেতে চান। আমরাও চাই, আমার ভাবতে ভালো লাগে যে বোম্বে থেকে সোমনাথবাবু কুড়ি বছর পরে ফিবে এসেছেন, দেশের বাড়িতে একা একা রয়েছেন, শান্ত মানুষ, চলাফেরা লেখাপড়ায় রযেছেন। আধবযসী মানুষ কাঁচাপাকা চুল গোঁফ নিযে তবুও শান্তিতে রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন।'

সোমনাথ একটা চুরুট জ্বালিযে নিযে—'তুমি যদি সোমনাথ হতে আর আমি হতাম কমলা।—তোমার মতো বিজ্ঞ মানুষ তাহলে সোমনাথের কথা ভেবে হযতো ঈর্ষা করতাম আমি। কিন্তু তুমি তখন বুঝতে যে সোমনাথের ঈর্ষার জীবন নয়। এখানে এক বাত শান্তিতে কাটে, কিন্তু তার পরের বাত আর কাটতে চায না। কাটতেই চায় না।' সোমনাথ নিমীলিত চোখে কমলার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

—'এজন্য অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। আমার দিকে তাকিযে দেখুন, আমার মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, স্বামী অনেকদিন হয মবে গেছেন, তাঁব মুখও আমাব মনে নেই।'

মুদ্রিত চোখে সোমনাথ—'নেই, তুমি কতদিন হল বিধবা হযেছ?'

—'কবে যে হযেছি, তাও আমাব মনে নেই।'

—'ও, তাহলে তো তুমি অনেক দিনেব বিধবা। কিন্তু তোমাকে তাবা চিবদিন এবকমই বাখলেন কেন?'

—'এই তো বললুম, আমাব বাবা-মা কেউ নেই। ভবিতব্য তাই আমাব গুরু, সেই আমাকে চালায, আমি চলি।'

—'তারপব?'

—'তাবপব আব কিছু নেই।'

—'আমাকেও তুমি ভবিতব্যতাব হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে বল?'

—'আমি কাউকে কিছু বলি না।'

—'আজ তুমি কলকাতায চলে যাচ্ছ, কোনোদিন তোমাব সঙ্গে দেখাই হবে না হযতো আব।'

কমলা মাথা নেড়ে—'না, দেখা হবে না আব।'

—'মৃত্যুর পবও কিছু নেই, তা আমি জানি, সব ছাই, সবই ধোঁযা।'

—'হযতো তাই।'

সোমনাথ আবাব চোখ তুলে বললে—'দেশেব বাড়িতে আমি আব থাকতে পাবব না। আবাব বিদেশে চলে যাব।'

—'কিন্তু তারপর?'

—'তারপব আর কিছু নেই।'

কমলা একটু চুপ থেকে বললে—'আমাকে আপনাব ছোট বোন বা মেযের মতো ভাবতে বলব না আমি। না এরকম পার্থক্য বা প্রভেদেব কথা মনে কবে সেই কথাই হযতো ভাবা উচিত ছিল আপনাব। কিন্তু ভবিতব্যতা আপনাকে তা ভাবতে দেবে না। কে জানে কতদিন কাব মনে কীবকম দাগ থাকে। দাগ বলেই তো ঘৃণার জিনিশ নয়।'

—'নয়?'

—'না।'

—'কেন?'

—'কত জাযগায তো ঘুরেছেন [...] পথেঘাটে এমন অনেক মুখ দেখেছেন—একবাবই দেখা হয শুধু, আর দেখা হয না।'

শিথিল দেহটাকেই একটু সমর্থ দেবার জন্যই যেন সোমনাথ দুই হাত দিযে ভ্রূ চেপে ধবে চোখ বুজে রইল।

কমলাও কোনো কথা বলল না।

কিছুক্ষণ নীরবতায ছেযে গেল।

সোমনাথ মুখেব ওপব থেকে ডান হাত খসিয়ে নিয়ে কোটেব গলাব শ্লথ বোতামটা ঘোবাতে ঘোবাতে—'আমাব মৃত্যুব সময তোমাব সঙ্গে হযতো দেখা হবে একবাব।'

—'মৃত্যুব সময' কমলা বললে—'আপনাব পূর্বপুরুষদেব সঙ্গে দেখা হবে আপনাব। আপনাব পিতামহকে দেখবেন, আপনাব বাবাকে দেখবেন, হযতো তাঁবা কৈফিযত চাইবেন। আপনাব কাছে এত অবসব ও সুযোগ থাকতেও আপনি তাঁদেব বংশেব ধাবা বাখলেন না কেন?

—'তোমাব ভাই আছে কমলা'?

—'না, নেই।'

—'কোনো সন্তান ছিল?'

—'না।'

—'তবে আমাকে এই কথা বল কেন তুমি?'

—'ইচ্ছে হলে মনে বাখবেন, না হয ভুলে যাবেন।'

—'একটা কথা বললাম মাত্র। আমাদেব এ দেশ যদি আপনাব ভালো না লাগে তাহলে না হয দক্ষিণেই চলে যাবেন আবাব?'

—'তাহলে পূর্বপুরুষেবা আবো বিবক্ত হবেন। আমি না হয এখানেই থাকব।'

—'তাই থাকুন, এবকম জিনিশ ভাবতে আমাদেব ভালো লাগে।'

—'হযতো বইলাম এ দেশে, কিংবা বইলাম না। হযতো বইলাম না-ই কমলা। সোমনাথ চৌধুবী তাব বাপেব ভিটিতে পড়ে বইল।' সোমনাথ কপাল থেকে একটা মাছি উড়িয়ে দিল—'বইল তাবপব শীতেব সুদীর্ঘ বাত, জোনাকি লক্ষ্মীপেঁচাব ডাক, টুপ টুপ কবে শিশিব পড়ছে। বেশ কেমন না? জোনাকি উড়ছে, লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে, জ্যোৎস্না আমাব বিছানায এসে পড়ছে, কিন্তু এই সমস্তই প্রশ্ন—হযতো পূর্বপুরুষদেব প্রশ্ন। হযতো পৃথিবীব প্রশ্ন হযতো। এই ভিটেব ভূতেব প্রশ্ন, কিন্তু উত্তব তো কিছু নেই সোমনাথেব কাছে।'

—'উত্তব নেই?'

—'নেই।'

—'নেই তাহলে?'

কিন্তু এইসব প্রশ্নেব উত্তব কোনোদিন পড়ে কি সোমনাথ? সোমনাথবাবু যেন শীতেব বাত্তিবেব কাছে উত্তব জিজ্ঞেস কবে।

শীত বাত্তিব কাছে কতদিন জিজ্ঞেস কবতে হবে সোমনাথ?

—'যতদিন মাঠে মাঠে ঘাস ফলে আকাশে নক্ষত্র আসে, যতদিন শীতবাত সোমনাথবাবু ঠেকিযে বাখেন।

— শীত বাত কিংবা পৃথিবীব বাত কমলা?'

—'তাবপব।

—'তাবপব সোমনাথবাবু তাঁব পূর্বপুরুষদেব সঙ্গে মিশে গেছেন।'

দুটোব গাড়ি চলে গেল। কমলা কিছু বললে না। চাবটেব গাড়ি ছাড়বাব মিনিট পঁচিশেক আগে সোমনাথ ধীবে ধীবে মাথা তুলে—'আমাব গাছেব কযেকটা বাতাবি লেবু সঙ্গে নিযে যাও, পথে খেতে পাববে। বাতাবিলেবু খেতে ভালোবাস?'

—'হ্যাঁ।'

সোমনাথ কযেকটা লেবু পেড়ে এনে একটা ঝুড়িব ভেতব সেগুলো ভবল, ঝুড়িব মুখে নিজেবই একবাশ মনেব সবুজ জামপাতা ছড়িযে দিল। গাড়ি ডেকে আনল।

বৃত্তের মতো

সমবেশ ঘোষাল আমাদেব ভিতব থেকে চলে গেছেন।

পৃথিবীব মানুষেব কাছে সমবেশ ঘোষালেব মৃত্যু তোমাব মৃত্যুব মতো, আমাব মৃত্যুব মতো, কিন্তু আমবা যে কযেকজন তাব সুখস্পর্শে এসেছিলাম সমবেশেব কথা অনেকদিন পর্যন্ত সজীব জীবনেব স্মৃতিব মতো আমাদেব অনুসবণ কবে বেড়াবে। তাবপব আমবাও এ পৃথিবীতে থাকব না আব।

সমবেশেব মৃত্যুব খবব যখন পেলাম, সমবেশেব মৃত্যুব সংবাদ আমাকেও যে পেতে হবে কোনোদিন মনে কবিনি তা। কিন্তু তাবই মৃত্যুব খবব আমিও পেলাম। তাকিযে দেখলাম পৃথিবী যেন নতুন জন্মদিনেব আনন্দে লিপ্ত হযে বযেছে। আকাশে অনেক বৌদ্র, নদীব জলে অনেক কববাবি নিযে কাবা খেলা কবছে। মাছবাঙা ঢেউযেব ভিতব পাখনা ভিজিযে নিচ্ছে তাব। কিন্তু তবুও আকাশ যেন আবো দূব আকাশেব কিনাবে একটা শান্ত অক্ষযিতাব ভিতব চুপ কবে বযেছে। চন্দন কাঠ ও ঘিযেব গন্ধ—কোথায থেকে এল যে বুঝতে পাবলাম না। যেন সেই নীববতাকে মনোবম কবে তুলেছে।

মৃত্যু যদি এই বকমই হয মনে হল সমবেশকে ডেকে না আনতে হবে মানুষকে তাব সঙ্গে?

মনে হল ক্লান্ত তো সমবেশ হযনি কোনোদিন, ক্লান্ত হযেছিলাম ববং আমবাই দুচাবজন—আমি অন্তত।

সমবেশেব মৃত্যুব খবব পেলাম। সমবেশেব মৃত্যুব সংবাদ আমাকে যে পেতে হবে কোনোদিন মনে কবিনি তো।

জিজ্ঞেস কবতে হযনি তাকে—এ কথা আমি কোনোদিন জিজ্ঞেস কবিনি তাকে। দেখেছিলাম, বুঝেছিলাম সমবেশ তাব মাকে খুব ভালোবাসে। তাব মাবও যে মৃত্যু হবে একদিন, এবং সমবেশেব মৃত্যুব আগে তিনি যে মবে যাবেন একথা ভাবতে গিযে সমবেশ অসুস্থতা বোধ কবত। কাজেব মানুষই ছিল সমবেশ। কাজকর্ম হাসি বগড়েব মানুষ বলে বাইবেব জগতে সে পবিচিত ছিল। কিন্তু আমবা দু তিন জন যাবা তাব জীবনেব গোপন কক্ষে প্রবেশ কববাব অধিকাব পেযেছিলাম আমবা তাকে মননস্বভাব মানুষ বলেই জানতাম। এবং এই জন্যই তাব আস্বাদ আমাব জীবনে নিবিড় হতে পেবেছে।

আমাকে সে একদিন বলেছিল— বিভূতি, তোমাব মা নেই, তুমি পৃথিবীতে থাক কী কবে।

একটু হেসে বললাম—'থাকছি তো।'

—'কবে তিনি মাবা গেছেন?'

—'সে অনেকদিন হয, তখন আমি খুব ছোট ছিলুম।

—'কষ্ট পেযেছিলে?'

—'পেযেছিলুম হযতো—কিন্তু কিছু ভালো কবে মনে পড়ে না এখন আমাব আব।'

—'তাব অভাব বোধ কবো না?'

—'তাও ঠিক বুঝতে পাবি না। একবকম কীটপোকা আছে, তাব চোখ নেই, তবুও তো সে মাটি খুঁড়ে সাবাটা জীবন অন্ধকাবেব ভিতব কাটিযে দেয। জীবনটাকে তাব ভালো লাগে কি না বলতে পাবি না, কিন্তু খাবাপও লাগে না। চোখেব অভাব সে বোধ কবে না।'

সমবেশ—'আমবা অভ্যাসেব চাকব।'

—'অন্য অনেক দিকে আমাব বেশ সাহস বযেছে বিভূতি, কিন্তু ছোটবেলাব থেকেই একটা ভযে আমি বড় কাবু হযে আছি।' আমাব দিকে ফিবে তাকাল সে।

—'কী ভয?'

—'সেই ছ-সাত বছব বযস, তখন থেকেই ধোকা খেযে আসছি, মা বেশিদিন আব পৃথিবীতে থাকবেন না—চলেই যাবেন শিগগিব—তাবপব শ্মশানেব থেকে ফিবে কোনো ঘবে খুঁজে পাব না তাঁকে আব, বিদেশ থেকেও তাঁব চিঠি পাব না কোনোদিন। ছ-সাত বছবেব ছেলেব পক্ষে এব চেযে চিন্তাবিষ আব কিছু থাকতে পাবে?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'কিন্তু বযস তো ক্রমে ক্রমে বাড়ল, কিন্তু এই ব্যথাব হাত থেকে এড়াতে পাবা গেল না।'

—'তবুও তো বেঁচে আছেন তিনি।'

সমবেশেব মা জীবিত ছিলেন তখন।

সমবেশ—'ইস্কুলে পড়বাব সময যখন শুনেছি কোনো ছেলেব মা মাবা গিযেছে, আমাব মনে হযেছে আমাব নিজেব মাই মবে গেছেন যেন। কখনো কলেবায, কখনো টাযফযেড কখনো বিনা চিকিৎসায। এই সব ছেলেদেব এক একজনেব মাযেব মৃত্যুব পব [...] বোবাব মতো দিন কেটে যেত আমাব। পড়া পাবতুম না, মাস্টাবেব বেত খেতুম, একটা গভীব অসুস্থতা অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে পেযে বসত। মা আমাকে জিজ্ঞেস কবতেন—কী হয়েছে তোমাব? কিন্তু উত্তব দিতে পাবতুম না আমি। তিনি যদি না বোঝেন আমি কী উত্তব দেব?'

—'কিন্তু তোমাব মা বেঁচে আছেন।'

—'আছেন। কিন্তু নিযমেব বাইবে তিনি চলে যাননি, আমিও না।'

—'কীসেব নিযম?'

—'যে নিযমে গণিতেব জোব আছে বলেই মাঝে মাঝে সৃষ্টিব সমস্ত সৌন্দর্যেব দিকে তাকিযেও মনে হয শেষ পর্যন্ত।' সমবেশেব সঙ্গে আমাব এসব কথাবার্তা বাবো বছব আগে হযেছিল। তাবপব ক্রমে ক্রমে সমবেশেব মা মাবা গেলেন। সমবেশকে তাব মৃত্যুশয্যাব পাশে দাঁড়িযে থাকতে দেখলাম না। দেখলাম মাযেব শব শ্মশানে তাকে বযে নিযে যেতে হচ্ছে (কোনো নিস্তাব নেই), সমবেশ মুখাগ্নি কবল দেখলাম। দাহ শেষ হযে গেলে সমবেশ বাড়িব দিকে চলে গেল। দেখলাম, বাড়িব ভিতব গিযে ঢুকল—কিন্তু তাবপব তাকে অনুসবণ কবতে গেলুম না আব। সেও আমাকে দেখল না, ডাকল না। সে বাতে আমাব ঘুম হযেছিল বটে, কিন্তু বাতেব ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠে মশাবিব চালাব দিকে তাকিযে তাকিযে ভাবছিলাম চাব পাঁচ বযসেব সময মাকে যখন কাছে পাওযাব প্রযোজন ছিল—কিন্তু তবুও কিছুতেই পেতাম না তাঁকে। তখন কী কবতাম আমি? কী কবতাম, ভাবতে যাইনি কোনোদিন, কিন্তু আজ ধীবে ধীবে মনে পড়ছে সব। বাত তিনটেব পব ঘুম হল না আব আমাব। সমবেশেব মাব দুঃখে নয, সমবেশেব মাযেব দুঃখে নয—কিন্তু আমাব যে মাকে আমি পঁচিশ বছব মনেও কবিনি তাবই কথা ভেবে ভেবে। বুঝলাম সমবেশেব দুঃখেব শক্তি আছে।

কযেকটা দিন কেটে গেল, সমবেশেব সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম না। কেটে গেল কযেকটা দিন, কযেকটা বাত। বাবো তেবো দিন পব, একদিন সন্ধ্যাব সময শুনলাম সমবেশ তাব বাবাব সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

সে যখন ফিবল, তাব মাব কথা পাড়তে গেলাম না আব। সমবেশও সে সব কথা তুলল না। কিন্তু বোঝা গেল এ বাড়িব ভিতব চুড়িব শব্দ নেই আব, আঁচল নেই, কোনো নাবীব বর্তমানতা নেই। এটা নিতান্তই পুরুষেব বাড়ি। সমবেশ এ সবেব কঠিনতা বোধ কবছে। কিন্তু তবুও সে জানে পৃথিবীব সেই পথে চুড়িব আওযাজ আঁচল বযে গেছে। মানুষিক আস্বাদ সব বেঁচে বযেছে, সেই সব স্থান সমবেশেব মাযেব মৃত্যু ও তাব নিজেব মৃত্যুব অতীত স্থান, সেই সব মানুষ বযেছে তাদেব জীবনেব প্রথম সম্ভাবনাব আনন্দ ও অশ্রুব করুণ আস্বাদ নিযে তাদেব কাছে দ্বিতীয সম্ভাবনাব জীব। সে বকম জীব—ভাবতে ভাবতে সমবেশেব হাসি পেল। কিন্তু তবুও তাবপব তাকিযে দেখলাম তাব মুখেব বেখাব ভিতব অসুস্থতা, কঠিনতা।

প্রথম সম্ভাবনাব পৃথিবী, সেই মৃত পৃথিবী তাব। যেখান থেকে শিগগিব বেরুবে না সে।

—'বিন্ধ্যাচলে কেমন ছিলে?'

—'ভালোই।'

—'কোনো দুঃখ ছিল না?'

মাথা নেড়ে—'না।'

—'অবসাদ?'

—'না।'

—'কী কবে সময কাটাতে?'

—'তোমবা যেমন কবে কাটাও, তেমনি।'

—'পাহাড়ে পাহাড়ে খুব ঘুবতে?'

—'ততটা নয।'

—'সাধুদেব সঙ্গে দেখা হত।'

—'হত।' সমবেশ বললে।—'কিন্তু তাবা যে বকম প্রশ্ন কবে, যে উত্তব দেয, যে বকমভাবে দিন কাটায তাতে তাদেব কাছে ঘেঁষেও বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বোধ কবতাম না আমি। বুঝতে পেবেছিলাম তাবা আমাব থেকে ঢেব দূবে।'

—'অনেক উঁচুতে?'

—'আমাব মন তা স্বীকাব কবে না, তবুও সৃষ্টিটা ঢেব বহস্যেব জাযগা। হযতো তা হবে, অনেক উঁচুতেই তাবা।'

—'সমবেশ সমস্তই বড় সমস্যাব জিনিশ।'

—'একদল লোক আছে যাবা স্বভাবতই কিছু জানে না। কেউ কেউ আছে যাদেব জ্ঞান হেমন্তেব বিকেলেব বুকেব মতন কুযাশায হাবিযে যায। তাদেব সংখ্যা খুব কম। যাবা অনেকদূব পর্যন্ত জেনে এই জানতে পাবল মাত্র কিছুই জানা যায না', বলে সমবেশ হাসল—'আমাব মনে হয এই দুই দলেব কাউকেই আমি অন্তত চিনি না। হযতো সন্ন্যাসীবা আমাদেব চেযে উঁচুতে কিংবা নীচে—হযতো এসব কিছু নয শুধু আমাদেব বাঁ দিকে তাবা'—সমবেশ একটু চুপ থেকে—'কিংবা ডান দিকে—আমাদেব ঘিবে একটা বৃত্ত এঁকে চলেছে তাবা। আমবাও তাদেব চাবদিকে বৃত্তেব মতো। তাবপব যদি আবো পবিষ্কাব কবে চাবদিকে তাকাতে চাও তাহলে গণিত আবো জটিল হযে পড়বে। কাজেই সন্ন্যাসীদেব কথা থাকুক।'

—'তোমাব গণিত ঠিক মর্মস্থানে নিযে পৌছাবে সমবেশ, সন্ন্যাসীদেব সম্বন্ধে আব কিছু জিজ্ঞেস কববাব দবকাব নেই আমাব।'

—'মাদ্রাজি একজন ডেপুটি কালেক্টব প্রাযই আমাব কাছে আসতেন।'

—'কোথায, বিন্ধ্যাচলে?'

—'হ্যাঁ, তিনি তাঁব চাকবি ছেড়ে দিযেছেন।'

—'কেন?'

—'ভালোই কবেছে, মানুষ কতকাল চাকবি কববে আব? [...] মাযা কাটিযে একটা ভালো চাকবি ছেড়ে দিলেন ভদ্রলোক। বাবা বললেন, লোকটা আস্ত আহম্মক, বাবাকে বললাম, আহম্মক কেন? তিনি বললেন, না হলে এবকম চাকবি ছাড়ে? কিন্তু বাবা সেই ভদ্রলোকটিকে চিনলেন না।'

—'আমাব মনে হয আমিও চিনতে পাবলুম না।'

—'ভদ্রলোক বেশ মনেব আনন্দে আছেন, নানাবকম বড় বড় ইংবেজি ফবাসি বই পড়েন।'

—'উপন্যাস?'

—'না। অন্য ধবনেব বই, বাইবনেব সমস্ত বইই তাঁব কাছে দেখলুম।'

—'মানুষটি একা বুঝি?'

—'না মস্ত বড় পবিবাব বযেছে তাঁব।'

—'তাদেব কাব ওপব ফেলে বাখলেন তাহলে?'

—'কাবো ওপব নয, নিজেই দেখছেন সব। সকলকে নিযে বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে এসেছেন।'

—'টাকা আছে লোকটিব তাহলে?

—'কিছু ছিল, কিন্তু সমস্তই প্রার্য খবচ হযে গেছে।

—'তোমাব বাবা তাঁকে আহম্মক বলে ভুল কবেছিলেন সমবেশ।

—'একখানা ইংবেজি বই তিনি লিখছেন ভাবতীয দর্শন সম্বন্ধে।'

—'তাবপব?'

—'উনি মনে কবেছেন বইটা ছাপিযে বিক্রি কবে টাকা পাবেন।

শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

সমবেশ বললে—'ভাবছেন অনেক টাকা পাবেন।

—'তা দিযে সংসাব চালাবেন?'

—'হ্যাঁ বললেন তাই। একজন তৃতীয শ্রেণীব মানুষ লিখছেন ইংবেজিতে দর্শন সম্বন্ধে।'

সমবেশেব দিকে তাকিযে বললাম—'আজকালকাব কঠিন পৃথিবীতে ওবকম বই যে কেউ কিনবে না তা তুমি তাকে বলোনি সমবেশ?'

সমবেশ মাথা নেড়ে—'না, বলবাব ভাব তোমাব ওপব বইল।'

—'বইযেব পাণ্ডুলিপি তুমি দেখেছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কীবকম মনে হল?'

—'দর্শনেব আমি কী বুঝি।'

—'আমিও কিছু বুঝি না কিন্তু এক এক জন মানুষেব মনেব ভিতব কেমন যে মোচড় থাকে, কেমন যে অপচয চলেছে জীবনেব ভিতব, বিন্ধ্যাচলেব থেকে এত দূবে থেকেও সেইটে আমি বুঝতে পাবছি।'

—'ভদ্রলোকটির পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল তাঁর [...] দুটি বড় বড় বিধবা বোন, তিনটি মেয়ে, একবার ভদ্রলোকের পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে আর একবার এদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার দুঃখ হচ্ছিল বটে কিন্তু তবুও এ ভদ্রলোকটিকে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না।'

আমি চুপ করেছিলাম।

—'আমাকে কিছু কিছু মাদ্রাজিও শিখতে হয়েছিল।'

—'কেন?'

—'ওরা বাংলা জানে না। ইংরেজি যাদের নিজের ভাষা নয়, তারা যে ইংরেজি বলে বা শোনে তাতে কথাবার্তা হয় না। কথাবার্তা ভেঙে চুরে যায় বার বার। আমাকে খানিকটা মাদ্রাজি শিখতে হল তাই।'

—'ওরা তবুও বাংলা শিখতে গেল না?'

সমরেশ একটু হেসে—'আমি যুবক মানুষ, হাতে কোনো কাজ নেই, শিখবার অবসর ও সুযোগ ঢের। ভেঙ্কটাপার একটি বিধবা বোন আমাকে শেখাল।'

—'পরদা ঘেঁষা ভাব ওদের বেশি নেই।'

—'না।'

—'বিধবা বোন কটি ছিল ভদ্রলোকের?'

—'ছিল দুটি।'

—'মাদ্রাজিতে তাদের সঙ্গে কথা বলে লাগল কেমন?'

—'ভাঙা ভাঙা মাদ্রাজি আমার মন্দ লাগল না। কিন্তু হাসাহাসির ভিতর দিয়ে কতখানি মমতা আছে টের পেলাম না।'

এ কথার উত্তরে সমরেশের মা যা বলতেন আমিও তাই বললাম—'মমতা ছিল।'

—'ছিল?' মনে হল শূন্যের দিকে তাকিয়ে সে যেন তার মাকেই জিজ্ঞেস করছে।

—'কে হেসেছে? তুমি না তারা না সেই ভদ্রলোক?'

—'সেই বিধবা যুবতী দুটিই হেসেছে সবচেয়ে বেশি।'

—'হেসেছে। কিন্তু উপহাসিত হওনি।' সমরেশের মায়ের মতোই আবার বললাম।

—'উপহাস করবার মতো চেহারা তোমার নয়। তারা তোমার জন্য যথেষ্ট মমতা বোধ করেছে। কেন যে টের পেলে না, বুঝতে পারলুম না সমরেশ।

—'তুমি যেন বিন্ধ্যাচলে গিয়ে সব দেখে এসেছ বিভূতি।' সমরেশ আমার দিকে ফিরে তাকাল। বললে—'আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতরে যেন হাজার হাজার বছরের পুরোনো পথ রয়েছে, সেই সব পথ ধরে আমরা অনেক জিনিশই অনুভব করতে দেখতে পারি।'

—'সেই কথাই ঠিক সমরেশ, আমারও তাই মনে হয়।'

—'কিন্তু সকলের জীবনে তা নেই।'

—'না।'

—'ঐ মাদ্রাজি লোকটির বেলায়ই অতীত বা দূর ধূসর দিগন্ত বা ভবিষ্যৎকে তিনি মনের ভিতর ক্রিয়েট করে নিতে পারেন না।'

—'তার বোনেরা পারে?'

—'তা আমি ঠিক বলতে পারলুম না।'

—'মাদ্রাজিতেই কথাবার্তা চলছিল সব?

—'হ্যাঁ। বাংলায় আর চলল না।

—'বাংলা আর শিখল না?'

—'ইদানীং শিখছিল।'

—'হয়তো অল্প বয়স মাদ্রাজি মেয়ে এবং বিধবা, এ জিনিশ যে কী আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না সমরেশ। নিজের জীবনের হাজার বছরের পুরোনো পথ চেয়ে এদের মানসিকতা হয়তো খানিকটা বোধ করতে পারি। কিন্তু এদের আঙ্গিক দিকটা ধরতে পারি না।'

সমরেশ—'এই রকম করে বিন্ধ্যাচলে দিনগুলো কাটছিল আমার।' চুপ করল সে। বুঝলাম আর অগ্রসর হবে না। মেয়েদের শরীরের কথা যেই তুলেছি, অমনি নিরুত্তর।

—'বিন্ধ্যাচলে অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি?'

—'পরিচয়? না।'

—'বাঙালি মেয়েমানুষ ছিল?'

—'বাঙালি ছিল, অন্য দেশের ছিল মেয়ে পুরুষ, কিন্তু আমি মানুষের সঙ্গে কম মিশি।'

—'কিন্তু নির্মলা দেবীর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি? সে তো মাস তিনেক আগে বিন্ধ্যাচলে গিয়েছিল—এখনো সেখানে আছে হয়তো।'

—'না, কোনো মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়নি আমার।'

—'নির্মলাকে দেখওনি তুমি?'

সমরেশ খানিকক্ষণ ঘাড় কাত করে চুপ করে থেকে তারপর বিরস মুখে হাসল।

—'তার নাম নির্মলা দেবী? নামটাও আমার মনে ছিল না। দেখো তো এই চিঠিগুলো তার নাকি?' দেরাজের ভেতর থেকে একরাশ চিঠি বের করে আমাকে পড়তে দিল সমরেশ।

—'হ্যাঁ, তারই হাতের লেখা।'

—'ওকে তুমি চিনলে কী করে?'

—'তারসঙ্গে অনেকদিনের আলাপ। একইসঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও যে আমার।' সমরেশ বিষাক্ত মুখে হেসে 'দূর সম্পর্কের তাই রক্ষা। ওর সঙ্গে কোনো নিকট সম্পর্ক কোনোদিন যেন না থাকে তোমার।'

চিঠিগুলো হাতের ভেতর গোছাচ্ছি—ছোট, বড় শাদা, নীল, আরো নানারকম রুচি-সঙ্গত চিঠির কাগজ। অভিজাত হাতের লেখা, এরার লিখেছে সমরেশের কাছে।

নির্মলার জীবনের বাহাদুরির কথা ভাবছিল।

—'বিন্ধ্যাচলের থেকে চিঠি গিয়েছে বিন্ধ্যাচলেই—নির্মলা দেখছি পোস্ট অফিসকে খুব ভালোবাসে।'

—'না। পোস্ট অফিসের মারফৎ এসব চিঠি আসেনি।'

—'তবে?'

—'একজন দারোয়ান এসে দিয়ে গিয়েছে। ও মেয়ে মানুষটিকে আমি আমাদের বাড়ির আসেপাশেও ঢুকতে দিতুম না। একদিন দরজার থেকে বের করে দিয়েছিলুম।'

—'কেন, করেছিল কী?'

—'এই চিঠিগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে।'

—'আমি কিছু কিছু দেখেছি। সে তোমাকে ভালোবেসেছিল, এই চিঠিগুলো পড়লে বোঝা যায়। এটা তার অপরাধ? তুমিও বিন্ধ্যাচল বেড়াতে গিয়েছিলে। নির্মলাও গিয়েছিল বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে, তোমাকে দেখে তার হৃদয়ে ভালোবাসা জন্মাল। নির্মলাকে চিনি, সে অনেক মানুষেরই কামনার জিনিশ। কিন্তু তুমি তাকে মনে করলে প্রেতিনী। মনের এই অধম সংস্কার নিয়ে তুমি তাকে দরজার থেকে বের করে দিলে।'

—'তবে কী করতে হবে? প্রেতিনীকে নিয়ে বিছানায় বসতে হবে?'

সমরেশের মুখের এই কথা শুনে আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই রকম ভাষা ও ভাবকে সমরেশ চিরদিনই কৃমি-ঘন মাংস বলে মনে করে। কিন্তু নিজেই সে আজ তা ব্যবহার করল। তারসঙ্গে এই বিশ বছরের আলাপের মধ্যে আজ প্রায় তাকে কৃমি-লিপ্ত মাংসের ভেতর থেকে রস খুঁজে ভাষা ব্যবহার করতে দেখলুম।

আচ্ছা, সমরেশও আমাদের পথেই আসুক, তবুও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে হল। তারপর বললুম, 'না, প্রেতিনী নয়।'

—'নয়।'

—'না।'

সমরেশ খুব আস্তে আস্তে একটি শব্দের পর আর একটি শব্দ উচ্চারণ করে বলতে লাগল,—'বিন্ধ্যাচলে আমি একদিন সন্ধ্যার পর বাইরে ডেকচেয়ারে বসেছিলুম। জ্যোৎস্না—রাত ছিল—চারদিকে একটি লোকও নেই। এমনি নির্জনতাই চেয়েছিলুম আমি। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলুম অনেকেই বলে যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তারা আবার ফিরে এসে দেখা দেয়। আজকে রাতে মাকে যদি একবার দেখা হত। হঠাৎ বোধ হল, অনেকদূরের থেকে কে যেন আসছে, তাকিয়ে দেখলুম, মনে হল একটা জন্তু, তারপর ভাবলুম, দেশোয়ালি কেউ আসছে বুঝি, তারপর দেখলুম একটি মেয়ে মানুষ আসছে, তারপর ভাবলুম মা এলেন নাকি, তবুও তারপরে তাকিয়ে দেখলুম, এলো তোমাদের এই বিশেষ মানুষটি।'

—'নির্মলা?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথেকে এল?'

—'জানি না। কিন্তু দেখে কেমন মনে হল তো দেখি।'

—'কী মনে হয়?'

—'কেমন নিরাশ হতে হয়, কেমন বেদনা লাগে। মুখে ক্রিম, গায়ে কাপড়ে নানারকম এসেন্সের গন্ধ। একটা [...] গাড়ি করে এসেছে, নিজের চেহারার আশা করেছিলুম মাকে, তখন এই স্থূলতা সহ্য হয় কারো?'

—'অনেক মহাপুরুষেরই হয়। কিন্তু তুমি মহাপুরুষেরও বাইরে। এক এক সময় মনে হয় তুমি পুরাণপুরুষ।' একটু চুপ থেকে—'মাকে আশা করছিলে?'

সমরেশ উপহাসের উত্তর দিতে গেল না।

—'যারা মরে গেছে, তাদের ফিরে পেতে চাওয়া ভুল, তারা কখনো ফিরে আসে না আর। কিন্তু যাদের চোখের সামাজিকতা তোমার মতন অকালে নষ্ট হয়ে যায়নি, কিন্তু তবুও যারা তোমার চেয়ে অনেক বড় মহাপুরুষ, সেই রাতে নির্মলার মতো মেয়েমানুষকে ওরকম কাছে পেলে অন্য কোনো প্রেতাত্মার কথা ভাবতে যেত না তারা। কিন্তু তোমার জীবন ঘৃণ্য তুচ্ছ জটিলতায় ভরা। নিজেকে বুঝতে শেখো তুমি।'

সমরেশ চোখ বুজে মাথা নাড়তে নাড়তে—'তোমার এসব কথার কোনো জবাব দেব না আমি। কিন্তু যারা মরে গেছে তারা অন্য কোথাও বেঁচে আছে। নির্মলা এসে যদি গোল না বাধাত তাহলে মাকে নিশ্চয়ই সেই রাতে দেখতে পেতুম আমি।'

চুপ করে রইলুম।

—'আমার যেন মনে হয়েছিল, তিনি যেন এসে এসেও ফিরে গেলেন।'

—'আর একদিন তাঁর দেখা পাবে। কিন্তু তারপর কী হল?'

—'কীসের পর?'

—'গায়ে শাড়িতে সেন্টের গন্ধ নিয়ে নির্মলা এল, সঙ্গে তার কেউ ছিল?'

—'না।'

—'তুমি বসতে বললে তাকে?'

—'না।'

—'তোমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল বুঝি?'

—'না।'

—'তবে?'

—'আমার নিকটে এসেই দাঁড়াল সে। বললে, আপনার কাছেই এসেছি।'

—'তোমার কাছে? কেন, তোমাকে চিনত সে?'

—'কোনোদিনও না, সেই দিনই তাকে প্রথম দেখলুম। বললে, আপনাকে দেখেছি আমি, কদিন ধরেই ভাবছি আলাপ করব। বাংলাদেশে বাঙালি পুরুষদের ভিতর কেমন একটা অবাঞ্ছিত কুয়াশা থাকে। বিদেশে সেটা কেটে যায়। আপনি কদিন বিন্ধ্যাচলে এসেছেন?'

—'হ্যাঁ, নির্মলা খুব আলাপী। চিঠিপত্তর লেখে ঢের। অনেক লোকের কাছেই লেখে। কিন্তু তবুও যে মানুষের মনের ভিতর কামড় রয়েছে বলে টের পায়, তার কাছেও ঘেঁষে না, চিঠিপত্রের ভিতরেও তার কোনো ব্যথা রাখে না। ভালোবাসা থাকতে পারে, কিন্তু কামনা অন্য জিনিশ।'

সমরেশ দেওয়ালে হাত রেখে আমার চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

—'এই যে তোমাকে এতগুলো চিঠি লিখেছে, এ সবের ভিতর কোথাও তুমি কামনার রক্ত এক ফোঁটাও পাবে না।'—'তা আমি স্বীকার করি। সেই জন্যই চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলিনি।'

—'এবং এ চিঠিগুলো সাহিত্য।' —'সাহিত্য আমি বুঝি না।' সমরেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

—'নির্মলার মন নক্ষত্রের মতো, পৃথিবীর মানুষের মন মৃত্তিকার মতো। অথচ নির্মলার রূপ ভোরের শেফালিকা শিশুর মতো মোটেই নয়, তা যদি হত কোনো গভীর মানুষই সহ্য করত না তাকে। নির্মলার রূপ মলিন অঘ্রাণের গন্ধের মতো, সেজন্যই সে মানুষের বেদনার কারণ।'

—'এখন নির্মলার কথা বরং থাক।'

বুঝলাম পুরাণপুরুষের কোথায় যেন আঘাত লেগেছে, চুপ করে রইলাম। কিন্তু দেখলাম আমি চুপ করে থাকলে সমরেশও চুপ করে থাকে। ঘাড় কাত করে চোখ বুজে সে এমন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত হয়ে গেলেও সে যেন টের পাবে না কিছু আর।

—'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, নির্মলাকে তুমি কী বললে?'

—'আমি তার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেইনি।'

—'দাওনি?'

—'আমি ডেকচেয়ার ছেড়ে চলে গেলুম। ঘরের ভিতর ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলুম। বাবা ছিল ঘরে, বিছানায় শুয়ে, বললেন, আমিও ভাবছিলুম কপাটটা কে বন্ধ করে, ভালোই হল, খুব ভালোই হল বলে আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

—'একবার জানালা দিয়েও দেখতে গেলে না মেয়েটার কী হল?'

—'কোনো দরকার বোধ করলাম না আমি।'

মনে হল সমরেশ আর কথা না বলে এইবার একটু বিশ্রাম চাচ্ছে।

কিন্তু আমি তবুও—'নির্মলা যদি তোমার এত উৎপাতের কারণ বলে মনে করলে তাহলে তার একটি চিঠি পাওয়ার আগেই বিন্ধ্যাচল ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল তোমার।'

—'তা ঠিক, কিন্তু আমি পারিনি।'

—'কেন?' সমরেশ মাথা হেঁট করে চোখ বুজে ছিল।

—'ঐ মাদ্রাজি বিধবা দুটির জন্য?'

চোখ মেলে সমরেশ—'তুমি ঠিক কথাই বলেছ বিভূতি।'

—'ভাবছিলুম, ঠাট্টা করছি, কিন্তু এইই ঠিক কথা। এ যদি সত্য কথা হয—'

—'হ্যাঁ এইই সত্য কথা।'

—'আমাকে বড্ড আঘাত দিলে সমরেশ।'

—'কেন?'

—'মানুষ নির্মলাকে লাঞ্ছনা করে, মাদ্রাজি বিধবাদের জন্য বিন্ধ্যাচলে টিকে থাকে, সমবেশেব মতো মানুষ?'

—'এর ভিতর কি অস্বাভাবিক আছে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে—'উঠি সমরেশ।'

—'চিঠিগুলো নিয়েছ?'

—'না, এইখানেই রইল। এগুলো দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই।'

সমরেশ—'তাহলে দেব না?' বলে দেবাজ খুলে ফ্রেমে আঁটা একটা ফটো আমার হাতে তুলে দিযে—'এই তাদের ফটো। সেই বিধবা দুটির, আমিই তুলেছিলাম।'

আরো অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে—'চেহাবা যাদেব এত জঘন্য, তাদেব মনেব ভিতব মহান পাণ্ডুলিপি তোমার মতো মূর্খ ছাড়া কেউ কি তা খুঁজতে যায।'

হঠাৎ একটা দারুণ চড় ঝিম ঝিম করে গালের উপব এসে পড়ল, মনে হল সব কটা পাটির দাঁতই ভেঙে গেছে যেন। রুমাল বার করে রক্ত মুছে নিচ্ছিলাম।

—'এসব কথা বলবে আব?'

রুমালের বক্তের দিকে তাকিযে—'যা বলেছি, সত্য বুঝেই তা বলেছি। যা সত্য মনে হয তা তোমাকে বলতে আপত্তি কী?'

সমবেশ পবদিনই বিন্ধ্যাচল চলে গেল আবার। যাওযাব আগে আমাকে, আমাদেব কাউকেই একটা খবর পর্যন্ত দিয়ে গেল না। হয়তো সেই মেয়েটির মনের ভিতর কোনো মহান পাণ্ডুলিপি লুকিযে বযেছে, না হলে সমবেশকে তারা এত আকর্ষণ করবে কেন? সমরেশ এ মৃত্তিকার জীব ছিল না। মেযে দুটিও তাহলে নক্ষত্রের মতোই নিশ্চয। এইই আশা কবা যাক। আমি খুব অবিশ্বাসী, কিন্তু তবুও জানি এই আশাই সত্য। একটা আক্ষেপ শুধু রযে গেল সমরেশ আমাদের কাউকেই তত ভালবাসতে পাবল না। নির্মলাব মতো নারীকে সে চোখ তুলে দেখতে গেল না। বিধবাদেব সম্পর্কে এসে যে তাব মাকেও ভুলে গেল। কযেকদিন হল বিন্ধ্যাচল থেকে সমরেশের মৃত্যুর খবর এসেছে।

সৃষ্টির পথে পথে কী যে বিরাট সুন্দব ভযাবহ বিস্ময! কিছুকাল আগেও সমবেশ আমাদের ভিতবে ছিল। তারপর সে ভযাবহ গতিমান পুরুষ হয়ে উঠল। কিছুতেই তাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারা গেল না। তারপর তাব বেগময আত্মা দীর্ঘ বর্শা হাতে নক্ষত্রের ভিতর রূপান্তরিত হয়ে গেল। এমনি করে এক একটা নক্ষত্রের সৃষ্টি হয, না, নির্মলা? এবং শহরের প্রাসাদে সেই নাবী, যার সঙ্গে বরং সংক্ষেপ পরিচয, ক্বচিৎ হাতের স্পর্শ আমাব মনেব ভিতব অনেক সভ্যতা ও নগবী বাঁচিয়ে রেখেছে। জীবনের এই অপরিসর স্মৃতিটুকু কখনো ভবে দিয়েছে আকাশের নীল বৌদ্রেব গন্ধে, কখনো অঘ্রানেব বিবর্ণ পাণ্ডুলিপির আযুহীন নীরব তারা, সেই নাবী।

অন্ধকাবেব ভিতব শোনা গেল কাকা বলছেন—'এটা পুরুষমানুষেব বাড়ি, একজন স্ত্রীলোক নেই এখানে।'

—'তা তো বুঝলুম।' বাবা বললেন।

—'সেই থেকেই আমাব মনে হয ঝি-টাকে বাখলে ভালো হয। পবিবাবেব ভিতব একজন মেযেমানুষেব দবকাব। সবই যে পুরুষেব হাত ছুঁযে আসবে, এটা বাঞ্ছনীয নয।'

—'স্ত্রীলোক যে নেই সে অভাব আমি খুব বোধ কবছি না কিন্তু।' বাবা চুপ কবলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা কবে কাকা—'তাই দেখুন, আমাদেব সংসাবেব মেজাজটা, কেমন কঠিন, কিবকম অপবিষ্কাব।'

বাবা কথা বলছিলেন না।

—'বৌঠান মাবা গেলেন আজ দশ বছব হল—সেই থেকে।'

—'আজও আবাব ঘুবে ফিবে সেই পুবোনো কথাটা ওঠে, তাবানাথ তুমি।' কার্তিকেব হিম অন্ধকাব, নীবব, বিষণ্ণ। একটা নিশ্বাসেব শব্দ শোনা গেল। বাবাব না কাকাব বুঝতে পাবা গেল না। কারু মুখেই কথা নেই।

—'না, আমাব দ্বাবা তা হবে না দাদা।'

—'তাবানাথ—'

—'বলুন।'

—'তুমি যে কোনোদিন বিযে কবেছিলে কেউ কি বলবে? বিযে কবে কদিন পবে বউ চলে গেল বাপেব বাড়ি। সেইখান থেকে খবব এল—চলে গেছে। অন্ধকাবেব ভিতব গলা যেন সর্দিতে ভাবী হযে উঠল কাব, বাবাব না কাকাব বুঝতে পাবা গেল না ঠিক। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটা কুকুব পর্যন্ত ডাকে না। কার্তিকেব বাত পৃথিবীব এই সব পথে এমন নিরুপদ্রব, এমন শান্তি নিদ্রা ও মৃত্যুব স্নিগ্ধ নিরুত্তব।

—'কী ভাবছেন দাদা?'

—'ভাবছিলুম আমাদেব সকলেব কথা। পবিবাবেব বাইবে গিযে অন্য মানুষদেব কথা ভাবব তা আব সব সময ঘটে ওঠে না। তোমাব বযস তো চল্লিশ পেবিযে গেল।'

—'আজ্ঞে। পবিষ্কাব কথাবার্তাই ভালো।'

বুঝলাম সর্দিটা কাকাব নিশ্চযই জমেছিল। কেমন ভাবী গলা তাঁব, হঠাৎ যেন কার্তিকেব হিম লেগেছে।

—'আমাব স্ত্রীব প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আজও বযেছে আমাব। এ-কথা যদি বলতে পাবতুম' কাকা বড় স্নেহপ্রবণ মানুষ, বলতে বলতে গলাব স্বব নানাবকম কোমল প্রাণতায ভিজে উঠল। আমাব কঠিন মনও নবম হযে উঠল খানিকটা। কিন্তু তবুও এই মানুষটিব প্রতি খানিকটা অশ্রদ্ধা ও অবিচাবেব জমি ধীবে ধীবে কঠিন হযে উঠতে লাগল আমাব।—'কাকা, তুমি সংসাবেব মানুষ হতে পাবলে না, এ অন্যাযেব জন্য তুমি দাযী। বাবাব তো হয না, কিন্তু কাবণে অকাবণে তোমাব গলায় এত সর্দি জমে কেন কাকা।' কিন্তু তা আমি বলতে পাবি না, তাঁব সঙ্গে সংস্পর্শে আমাব যেটুকু সংযোগ পেযেছিলুম আমি—

—'সে কি আব সুযোগ তাবানাথ।'

—'আমাব মনে হয সেই সুযোগেবও সদ্ব্যবহাব কবতে পাবিনি আমি। স্ত্রীব কথা মনে কবে সংসাবেব কোনো কাজেই মন থাকে না। আব ভাবি, আব কেন, এইবাব অন্ধকাবে ডুব মাবলেই পাবি।'

কাকা ধুতিব খুঁটে চোখ মুছে নিযে—'কিন্তু তবুও তাকে আজও আমি এক মনে ভালোবাসি বলেই যে এবকম বোধ কবি তা হযতো। স্বামী-স্ত্রীব ভালোবাসা যে কি জিনিশ, তা আমাব স্ত্রীও বুঝল না, আমিও

বুঝলুম না।'

—'তোমাব স্ত্রীব কথা আলাদা।' খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে বাবা বললেন।

—'বিধাতাব আশীর্বাদে তিনি ঠিক জাযগাযই আছেন এখন। কিন্তু তোমাকে কতদিন এ সংসাবে ঘুবতে হবে কেউ তা জানে তাবানাথ? তোমাব বযস চল্লিশ মাত্র কি একচল্লিশ। এ বাড়িতে তিনি আবাব ফিবে আসবেন না কেন?'

—'কাব কথা বলছেন?'

—'বলছি তোমাব দ্বিতীয পক্ষেব কথা। বেশিদিন তো আব বাঁচব না, ঘবদোবেব শ্রীছাদ দেখে যেন মবতে পাবি।'

কাকা একটু চুপ থেকে—'আপনাব অনুবোধ শুনলে আমাব বড় কষ্ট হয।' আবাব একটু চুপ থেকে—'বৌঠান থাকলে বুঝতেন।'

শুনলাম কাকা বলছেন—'দাদা, সবই তো চাই, কিন্তু কোনো অধিকাব নেই আমাব।'

—'কেন?'

—'সেই কথাও শুনবেন আপনি?'

—'তুমি চাকবি কবছ, এবং পঞ্চাশ টাকা মাইনে—আমবা তো বড়লোকেব মেযে চাই না। অবশ্য গৃহস্থেব ধানেব গোলাব ভিতব থেকেও লক্ষ্মী কি উঠে আসে না তাবানাথ?'

—'লক্ষ্মীব কথা ভাববাব অধিকাব আপনাব আছে, কিন্তু আমি সে কথা ভাবতে পাবি না।

—'[...] গাযেব থেকে পড়ে গেল যে তোমাব তাবানাথ, খালি গাযে বসে আছ, শীত কবছে না?

[...] মাটিব থেকে তুলে নিযে গাযে জড়াতে জড়াতে কাকা দু-চাবটে হাঁচি দিলেন। তাবপব অনেকক্ষণ মাথা হেট কবে চুপ থেকে—'আমাব শক্ত ব্যাবাম বযেছে—দাদা', কাব স্বব ভেঙে পড়ল। মনে হল তিনি কাঁদছেন। অন্ধকাবেব ভিতব আমি যে এদেব পিঠেব দিকে, ঘবেব এক কিনাবে বসে বযেছি, এবা কেউই তা জানে না।

অন্ধকাবেব ভিতব কাকা ধীবে ধীবে বাবাব গাযে হাত বেখে—'আমাকে মাপ করুন। চাকব উঠিযে দিযে আমি যে ঝি—টাকে বাখতে বলেছিলুম, সেই মূর্খতাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

—'তুমি তো বলেছিলে ঝি—টা খুব কাজেব।'

—'জানি না। কিন্তু তাকে দেখে মনেব ভিতব কেমন একটা আস্বাদ জন্মেছিল আমাব।

—'আসক্তি?'

—'হ্যাঁ। সাধ মেটেনি, মিটবে না কোনোদিন, যে কামনা পবিতৃপ্ত হযনি, হবে না, সেটাকে কোথায ছুঁড়ে ফেলব আমি'—বলতে বলতে কাকা থেমে গেলেন।

বুঝতে পাবলাম কাকা প্রশ্ন কবছেন না। নিছক অনুতাপ। বুঝতে পেবে অন্ধকাবেব ভিতব আমি এমন বেদনা বোধ কবলুম। এই শান্ত স্বাভাবিক মানবচিত্র নিঃসহায লোকটিব দিকে তাকিযে থেকে, কিংবা কল্পনাব গাঢতা প্রসাব অদৃশ্য যা দৃশ্য জগতে এব জন্য যে কোনো পালাবাব পথ তৈবি কবে দেবে সে উপাযও নেই ঢেব বেশি ঢেব। একটা ম্লান খোসা গাযে বাবাব পাযেব ওপব হাত বেখে বসে আছেন। এই মানুষটিব বেদনাব কোনো সীমা খুঁজে পেলুম না আমি।

—'বাগ কবলেন দাদা?'

বাবা কোনো উত্তব দিলেন না।

দেখতে দেখতে যেন মন হযে গেল ম্লান—'বড় বিশ্রী জিনিশ বড় যন্ত্রণা দেয মানুষকে।'

অন্ধকাবেব ভিতব অনুভব কবলুম দুজনেব মুখই কুঞ্চিত হযে বযেছে, একজন বেদনামায, আবেকজন দ্বিধাব বিভীষিকায। অন্য মুখটিব কথা খুঁটে নিলুম আমি। ব্যথিত কাকাব মুখই অন্ধকাবেব ভিতব অনুভব কবছিলুম আমি।

—'জীবনেব চল্লিশটা বছব সাধু পুরুষেব ভাইযেব মতোই কাটিযেছি আমি। আমাকে ক্ষমা করুন।

—'ঝি-টি কোথায?'

—'জানি না আমি।'

—'তাব সঙ্গে তোমাব আগে পবিচয ছিল?'

—'না।'

—'কোথায় দেখলে তাকে?'

—'মানবেন্দ্রবাবুব বাসায়, সে কাজ খুঁজছিল। মানববাবুবা এখান থেকে উঠে যাচ্ছেন। এ ঝি—টাব কথা তিনি আমাকে বাখুন। পাঁচ টাকা মাইনেয় সব কাজ কবতে বাজি আছে। খুব খাটতে পাবে, বেশ পবিষ্কাব, ব্যবহাব ভালো, এইসব বলছিলেন তিনি।' ধোসাটা কাকাব গাযেব থেকে মাটিতে পড়ে গেল আবাব, মাটিতেই পড়ে বইল। দুইজনেব মনই নিবদ্ধ, ধোসাটা মাটিতে হিম খেতে লাগল।

'কিন্তু এই সবেব জন্য নয়, মেযেটিব বাইশ-তেইশ বছব মাত্র বয়স। দেখতে বেশ সুস্থ এবং—' একটু চুপ কবে থেকে কাকা—'সুশ্রী।'

মাটিতে লুণ্ঠিত ধোসাটাব ওপব অভক্তিতে চটিব পাড়া দিয়ে কাকা—'মনে হল আমাদেব সংসাবে এই মেযেটি এলে, একটু নতুনত্ব হবে, অনেকটা শান্তি পাব। কিন্তু শুধু এই-ই ভাি আমি—' বাবাব মুখেব দিকে দিকে তাকিযে কাকা বললেন।

—'ধোসাটা তুলে নাও।'

—'মেযেটিব প্রতি আসক্ত হলুম।'

ধোসাটা তুলে নিলেন কাকা—'ব্যাপাব অনেকদূব গড়াত হযতো।'

—'ওব সঙ্গে গোপনে তোমাব কোথাও দেখা হযেছে?'

চটিব ধুলোসুদ্ধ ধোসাটা গাযে ভালো কবে জড়িয়ে নিয়ে কাকা—'না। কিন্তু একবাব এ বাড়িব কাজে লেগে গেলে নিজেকে সামলাতে পাবতুম না হযতো।' একটু চুপ থেকে কাকা—'কিন্তু এ আমাব মৃত্যু নয় দাদা, ঈর্ষা নয়, স্বভাব নয়।' খানিকটা উদ্বেলিত হযে কাকা—'কিন্তু এইবকম কবে ভালোবাসাব সাধ মেটাব মনে কবেছিলুম। মেযেমানুষেব স্নেহমমতাব একটানা অভাব বোধ কবে এসেছি জীবনে—অনেক দিন থেকে বোধ কবে এসেছি। কিন্তু বুঝলুম মাযামমতাই নয়, চাচ্ছি অন্য কিছু। কি কবা যায়? আপনাব কাছে একটা কঠিন শব্দ উচ্চাবণ কবব, শুনবেন?'

—'তোমাব মনে লালসা জন্মেছিল?'

—'কি কবা যায?'

—'কববাব কিছু নেই।'

—'বিয়ে কববাবও উপায় নেই আমাব। আমাব এই চল্লিশ বছবেব জীবনেব আব একটা পাপেব কথা আপনাব কাছে বলব দাদা। স্ত্রীব মৃত্যুব তিন-চাব মাস পবে আমি একবাব কলকাতায় গিয়েছিলুম। মনেব অবস্থা ভালো ছিল না তখন। কলকাতাব থেকে একটা গোপন বোগ নিয়ে আমি ফিবেছি। তাবপব বিয়ে কববাব কোনো পথ নেই আমাব।'

—'বোগটা কঠিন আছে তাহলে?'

—'হ্যাঁ, চোখ খাবাপ হযে যাচ্ছে।'

—'সাবাবাব আব কোনো উপায নেই?'

'না মববাব আগে অন্ধ না হলে বেঁচে যাই, কিন্তু এই বোগ নিযেই আমাকে মবতে হবে।'

বিলাস

বোজই যে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে, তা নয়, —সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বাচ্ছন্দ্যও নেই। তবুও কলকাতা ছেড়ে কোথায় আব চলে যেতে পাবে শান্তিশেখব। যেতে যে ইচ্ছা নেই, তা-ও নয়; কিন্তু ইচ্ছা কাব কবে কতদূব পূর্ণ হয়েছে এই পৃথিবীতে?

কলকাতায় থাকতেও তাব অনিচ্ছা যে খুব বেশি, তা নয়,— কিন্তু যে-বকম ঘব-দোব পাবিপার্শ্বিক টাকাকড়িব স্বাধীন স্বচ্ছলতা সে চেয়েছিল কোথায় সে-সব? এ-সব অনেকেই চায়; কিন্তু ক-জন পায়? অবিশ্যি মনই স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ ক'বে— শবীব উপস্থাপযিতা নয় কি শুধু' শবীব ব্যাথা পায়, গ্লানি বোধ কবে, লাঞ্ছিত হয়, মনে হয় যেন মন লাঞ্ছিত হচ্ছে, কিন্তু তবুও মনে কোন বকম কালিমাপাতই হয় না যেন— এমন লোকও থাকে। এ-বকম লোক শান্তিশেখব দেখেছে বটে। চুয়াল্লিশ বছব বযসে সে নিজেও যদি ঠিক সেই বকম হত, লে ভালই হত। কিন্তু এখনও হয়ে উঠতে পাবেনি।

ভাবতে-ভাবতে ইলেকট্রিক বাতিটা নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে কিনা, ভাবছিল, শান্তিশেখব। বাত ক'টা বেজেছে আন্দাজ কবা কঠিন। অনেক দিন থেকেই তাব নিজেব ঘড়ি নেই। ভাল হাতঘড়ি— অল্পদামে আজকাল পাওয়া কঠিন। ইস্কুলে যখন সে পড়ত, তখন শান্তিশেখবেব চেহাবা এমন কিছু দেখবাব দেখাবাব মত ছিল না যদিও, তবু তাব চেহাবাব খাতিবেই এক বন্ধু তাকে ভাল সুইস্ ঘড়ি দিয়েছিল। কলেজে উঠে সে-ঘড়ি হাবিয়ে যায় তাব। কিন্তু তখন আব একটা হাতঘড়ি জুটে গিয়েছিল;— কী ক'বে আজ ঠিক মনে পড়ছে না। মামাব টাকায় হয়তো— কিংবা খুড়োব টাকায়— কিংবা— কিন্তু ইদানিং অনেকদিন থেকেই তাকে ঘড়িব অভাব পুষিয়ে নিতে হচ্ছে এব-ওব ঘড়ি দেখে— আকাশে সূর্যেব দিকে তাকিয়ে—জানলাব আলসেব আনাচে-কানাচেব বোদেব গতি লক্ষ্য ক'বে। এ-বাড়িতে অবিশ্যি একটা সুবিধা আছে। তেতলায় বেডিযো আছে। বোজ বাতেই সেটা নিঃসঙ্কোচে বেজে ওঠে— এবং অবশেষে এক সময এবিযেল-কম্পন থামিয়ে ফেলে; সময়টা আন্দাজ ক'বে নেবাব সুবিধা পাওয়া যায়। তাছাড়া তেতলাতেই বেডিযো বাজে—অবিশ্যি বাত একটু স্তব্ধ হ'লেই এক দুই তিন ক'বে গুনে নিতে পাবা যায় ঘড়িতে ক'টা বাজল। দোতলায় গলি-ঘেঁষা ঘবেব জানলাব কাছে সে শোয— ঠিক মাথাব ওপবেই খুব সম্ভব তেতলাব জানলা— যেখানেই হয়তো ওদেব ঘড়ি—বেডিযো। দোতালায় একটা কামবা নিয়ে একা থাকে শান্তিশেখব; বাকি ক'টা ঘরে তাব আত্মীযেবাই থাকে; খুব নিকট আত্মীয় অবিশ্যি নয়, কিন্তু ইচ্ছা কবলে এদেব ভেতব থেকে সে মা ভাই বৌদি ইত্যাদি খুঁজে সম্বন্ধ গাঢ় ক'বে নিতে পাবে, সে-সুযোগ শান্তিশেখব খুব সম্ভব চাইলেই পায: ইচ্ছাও হয় মাঝে-মাঝে; অবসবও পাওয়া যায: কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছন্দে-পছন্দে কুলিয়ে ওঠে না। কিন্তু শান্তিশেখবেব মনে হয়, সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে না, সময়ও নেই। কত বাত এখন? ক'টা বেজেছে? বেশি বাত-জাগা আজকাল আব শবীবে পোষায না। একবাত ভাল ঘুম না হ'লে পবেব সমস্ত দিন হাঁটতে চলতে কথা বলতেই কষ্ট হয়— চাবদিককাব লোকগুলোব যৌবনেব উদ্যম দেখলে অবাক হ'যে যেতে হয়, এদেব সকলেব মাঝখানে শান্তিশেখব কি চল্লিশ পেবিযেই অপবাধ কবছে,— না, না-ঘুমিয়ে,— না, বক্তেব দোষে—? শবীব ভাবী খাবাপ লাগে তাব।

আজকে তিন-চাবটে খববেব কাগজ বিছানাব ওপবে ছড়িয়ে আছে; পড়বে ব'লেই কিনেছিল। ভোবেব টাটকা খবব পড়তে হবে দুপুব-বাতে। টেবিলে চেযাবে বিছানায মেঝেব ওপবে বইযেব ডাঁইযেব অপবিমাণ সব শাঁস ডাকছে তাকে। কাকে ছেড়ে কাকে পড়বে শান্তিশেখব— এক-একটা বইয়েব ভেতব চাব মাস ছ'মাসেব চিন্তাব খোবাক, কোন—কোনোটাতে সম্বৎসবেব, এক-আধটাতে নিবন্তব সমযেব; খববেব কাগজ নেহাৎই আজকেব তাবিখেব উত্তেজনা। উত্তেজনা সে ভালবাসে না, কিন্তু তবুও যে-জিনিস কযেক ঘন্টা কেটে গেলে বাসি মনে হয়, সে-সব খবব ও খববানাগুলো ডিম ভেঙে তাজা বাচ্চাব মতো মুখিয়ে এসে ভাবি বে-কাযদায় ফেলে শান্তিশেখবকে সকালবেলায চাযেব পাটেব সময়। সকালবেলাব ঐ-সময়টাই প্রেসেব দববাবী সময হওযাব দরুণ গোখবেব চেয়ে সলুনেব ঝাঁঝ যে ঢেব বেশি সে-কথা সে মুহূর্তে না-স্বীকাব ক'বে পাবা যায না; মাথা যতই স্থিব থাকুক তোমাব—সলুযেব মত খববেব কাগজগুলো

ভোরবেলায় তোমাকে পেয়ে বসবে। তবু শান্তিশেখর লগ্নটা রাতের দিকে ঠেলে দেয় প্রায়ই— ভোরে নয়, খবরের কাগজ রাতের বেলা পড়ে সে। ইংরেজি কাগজটা তুলে নিল শান্তিশেখর। বই পড়তে চায় সে— কিন্তু খবরের কাগজ নিজেকে পড়িয়ে নেয়। আগাগোড়া একটি কাগজ অন্তত না পড়লে কোথায় কী হচ্ছে, জানা যায় না। কোথায় কী হ'ল না হ'ল জানবার ইচ্ছা ঘাড়ে ভূতের মতন চেপে বসে আছে— দুঃসাধ্য তাকে নামানো। শান্তিশেখর এক-একটা রাত তিন-চারটে কাগজই তন্ন-তন্ন করে প'ড়ে ফেলে। ফলে রাত ভোর হয়ে যায়— ঘুম হয় না—পরদিন সারাদিন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে থাকে— কেঁচোর মতন হয়ে থাকে শরীরটা— অফিস কামাই ক'রে বিছানায় পড়ে থাকলেও কেঁচোর মতন। কোন-কোনদিন ঘুমিয়ে প'ড়ে— একটি কাগজ পড়া হয় না। বহু দিন থেকে কোন বই-ই পড়া হ'চ্ছে না।

দুটো জিনিস এ-জীবনে আর হবে না— অনেক দামী দরকারী বই বুলেটিন কিনে এ-ঘরে ফেলে রেখেছে সে; আরো ঢের বড় বইয়ের জগৎ বাইরে পড়ে রয়েছে—কিন্তু এ-সব না প'ড়েই মরে যেতে হবে তাকে। তা ছাড়া নারীকে না-ভালবেসেই চ'লে যেতে হবে। কোথায়ই বা সেই নারী? তাকে শান্তিশেখর যে একেবারেই দেখেনি, তা নয়।

ফুটপাথে লোকের ভিড়ে ট্রামে-বাসে উৎসব বাড়িতে বা মেঘে... রোদে..মোটরের পাদানি গলির সিঁড়ি সময়ের স্তর বেয়ে উঠছে— নামছে—, আবছায়ার ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে; —তাকে দেখেছে শান্তিশেখর। সে বহু নারী; তার ও তার যাচকের মাঝখানে কেমন একটা বিশদ পাথর রেখে দিয়েছে সময়; খুব দামী পাথর, খুব সম্ভব বজ্রমণি; মণির সূচিমুখে ঠেকে বর্ণালীর মতো পুরুষের চোখে মুখে অন্তরাত্মার ভেতর ভেঙে-ভেঙে পড়েছে সে তাই— দূর নীলিমায় গিয়ে শ্বেত-সূর্যের মতো একাকী হয়েছে তবুও। কখনো স্বচ্ছ জলের ভেতর ডুব দিয়ে চোখ মেলে দূরতম স্বচ্ছতার দিকে তাকিয়ে শান্তিশেখর যেন টের পেয়েছে, মেয়েটি বহুধা হ'য়েও তার নয়—সর্বদাই অপর-শরীরীদের। শান্তিশেখরের নিজের শরীরটা তা'হলে কার জন্য কী-ভাবে ব্যবহৃত হ'য়ে নিঃশেষিত হবে? ভাবতে-ভাবতে চিন্তার চাপ মশার কামড় ঠেলে ঘুম এল তবুও। মশারীটা ফেলে নিতে হ'ল আগে।

শান্তিশেখরের মনে হচ্ছিল, সে জেগে আছে— কথা বলছে—কাজ করছে। কিন্তু চ'লে গিয়েছে সে ঘুমের ভেতর যে-সব স্বপ্ন দেখা দিয়ে যায়, সেই শাদামাটা সুদূর হাতের কাছের পৃথিবীতে। চোখ চেয়ে শান্তিশেখর দেখল অপরেশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন: লম্বা-চৌড়ো চেহারা, শাদা চুল শাদা দাড়ির পরিষ্কার ব্যক্তিঠাট—ভাঙে না, মচকায় না। অপরেশবাবু তো পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের পৃথিবীর লোক— শান্তিশেখর তখন ইসকুলে পড়ত, অপরেশবাবু ছিলেন হেডমাস্টার। কিন্তু স্বপ্নের ভেতর সময়ের এই ব্যবধান মুছে গেছে শান্তির মন থেকে। অপরেশবাবু যে অনেক দিন হয় মারা গেছেন, শান্তির ইস্কুল-জীবনের যে একটা ছায়া—ভূমি আজ, হিম স্মৃতিভূমি— ক্রমেই আবো অন্ধকাবের ভেতর পিছিয়ে যাচ্ছে— এ—সব বিচার-বিতর্কের কথা মনেই জাগল না তার। তার মনে হল, অপবেশবাবু সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; এ তো খুব স্বাভাবিক— এতো সহজ ও স্বাভাবিক যে কী বলবে শান্তি। শান্তিশেখর তাকিয়ে দেখল হেডমাস্টারমশাই ইস্কুলের লাইব্রেরীর ভেতর পায়চারি করছেন— শান্তিশেখরদের ইস্কুল—লাইব্রেরীর বেশ চমৎকার ছিল বটে, বই ছিল ঢের, ছিল সেকেলে আলমারি। ইস্কুলের সেই পঁচিশ—ত্রিশ বছর আগের লাইব্রেরীটা কী করে কোথায় যেন তার নিজের ঘরের বইযেব স্তূপের সঙ্গে একশা হয়ে মিশে গেছে আজ; এর অসঙ্গতি অসাচ্ছল্য শান্তিশেখরের কাছে ধরা পড়ল না তবুও। কিন্তু নিজেকে ত্রিশ বছর আগের ইস্কুলের ছাত্র বলেও মনে হচ্ছিল না তার সে শান্তিশেখর সেন—কলকাতায় আমেরিকানদের একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজে ও আরো পঞ্চাশ রকম বুলেটিন ইস্তাহার সংবাদ প্রচারের একটা বিরাট অফিসে চাকরি করে। এম-এ পাশ করেছে যে কোন্ যুগে। এ-সব দিনের আলোর মতন সত্য জিনিসের ভেতর মিশে গেছে দিনের আলোর মতই সত্য মাস্টারমশাই, বই, লাইব্রেরীর গন্ধ, এই শেষের জিনিসগুলো যে আজকেরই— কোন বিলুপ্ত পৃথিবীর নয়—এ তো সহজাত সত্য শান্তিশেখরের মনে (এখন); —কয়েকটি সংখ্যা যোগ দিলেই বিশুদ্ধ যোগফলের মতনই সহজাত।

মাস্টারমশাই বললেন, 'শান্তিশেখর—'

একটু থেমে গলা খাকরে আবার বললেন, 'বইগুলো দেখেছ?'

'দেখছি।।'

কতকগুলো আলমারির লবেজান অন্ধকার—অন্ধকারের তিব্বত পত্রিকাতে তবু—ধূপের আবছায়া আর মণিপাদ্মহুম্— টেবিল ডেস্ক্ ও একটা বৈরাটোর ছায়ান্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছিল না সে তবুও। এ

জিনিসগুলোও দেখছিল না। ঠিক, অনুভব করছিল।

'এ বইগুলো তুমি কিনেছ হয়তো— 'মাস্টারমশাই বললেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—, আপনিও কিনতে বলেছিলেন—'

'আমি? কিন্তু এ-সব বই কী হবে? এ তো ইস্‌কুলের ছেলেদের লাইব্রেরী। তুমি কি আশা কর, ওরা মালার্মের বই পড়বে?

'মালার্মে?' শান্তিশেখর একটু থতমত খেয়ে বলল।

'এই তো— এই যে—'

শান্তিশেখর চোখে দেখতে না-পেয়ে হাতে মলাট ছুঁয়ে বললে, 'কই দেখলুম না তো।'

'কী দেখতে চাও?'

'মালার্মের বইখানা কোথায়?'

'কেন?'

'আমি ওঁর নামই শুনেছি, ওঁর কোন বই পড়বার সুযোগ হয়নি আমার।'

অপরেশবাবু হেসে উঠে বললেন, 'আমিও শুনেছি, আমিও পড়িনি;

আচ্ছা, আমিই আগে পড়ব।'

শান্তিশেখরের মনে হ'ল, মাস্টারমশাই মালার্মের দু-তিনখানা বই আলগোছে টু-শব্দ না-ক'রে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মনে হ'ল, আমলকীপল্লবের থেকে শিশির ঝ'বে পড়ল যেন হেমন্ত রাতের পাখির পালকে, ছায়া-আঙুলের নিঃশব্দতায় বইগুলো অন্তর্হিত হ'য়ে গেল কোথায়; সে-সব বইযেব মলাট কী রকম, তাও দেখবার সুযোগ হল না শান্তিশেখরের; বুঝতে পারল না, সে-সবগুলো রয়্যাল না ডিমাই, ফোলিয়ো, কোয়ার্টো না কোন আকারেরই নয়? কিন্তু তবুও তার মনে হল অমাআধার ফিকেআঁধার আলো-আঁধারের নিঃশব্দ নিরবচ্ছিন্ন মাখামাখির কত-শত চোরাপথের ভেতর দিয়ে সবই দেখছে সে— দেখতে পাচ্ছে; পাতার হরফগুলো, বাক্যযোজনা পরিষ্কার ভাবে আযত্ত করে নিচ্ছে সে— উপলব্দি করছে, অনুধাবন করছে,— আশ্চর্য ঠেকছে তার; গ্রন্থকারের রচনপ্রসাদের গভীরতাকে নিজেই যেন সৃষ্টি ক'রে সেই আতল স্বচ্ছতার মর্মভেদ ক'রে চলেছে সে। শান্তিশেখর যদি জেগে থাকত, তা'হলে বুঝতে পারত, মালার্মের এক লাইনও পড়া হয়নি তা বই-ই নেই তার সুমুখে। কিন্তু ঘুমের স্বপ্নের ভেতর সবই তো র'যে গেছে— কেউ কাউকে চোখ ঠার দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না তো।

'শান্তি, এ-সব কী বই তুমি কিনেছ?' অপরেশবাবু তার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। 'কী বই—' বিপদে পড়ে হেডমাস্টারের শাদা দাড়ির ওপরে শাদা ঠাণ্ডা মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চকিত হয়ে উঠল সে।

সামনে অনেকগুলো নভেল।

'এ-সব গল্প-উপন্যাস ছেলেরা কেন পড়বে?' মাস্টারমশাইযের চোখের শিক্‌রে বাজ কেমন যেন স্নিগ্ধ কোমলভাবে তবুও শান্তিশেখরেব দিকে নিপতিত হয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা মস্ত বড় আলমারির পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি— আলমারির দু'টো কাচের দরজাই খোলা। হেডমাস্টারমশাইযেব হাতড়াবার ফলে কতকগুলো বই মেঝের ওপরে প'ড়ে গেছে ধুপধাপ ক'রে, বাকি এক-আধটা ঝিপ্ করে পড়ছে কিংবা ধিম্ ক'রে। রাজহাঁসের মতো ঘাড় কাত ক'রে বইগুলোর দিকে তাকিযেছিল শান্তিশেখর— যাচাই করে নেওয়ার ভঙ্গিতে; বড় বড় লেখকদের বই তো সব; ভযে-নির্ভযে অপরেশবাবুর দিকে মুখ তুলে শান্তিশেখর বললে 'কিন্তু গল্পগুলো ভালো, আমি অনেক বাছাই করে কিনেছি।'

'কী করে যাচাই করলে?'

'মতামত জেনে নিযেছি আগে—

'কাদের?'

'এঁদের বিষযে যাঁরা ওয়াকিবহাল, সে সব দেশী-বিদেশী—'

থামিযে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু গল্প-টল্প এত চাই না; আমি। আমাদের জীবনটাই তো একটা গল্প— প্রতি মুহূর্তেই দেখছি তো। আবার ওদের মুখে আমাদের নিজেদের মনের কথা জেনে কী হবে? ওদের বেশি ভাগই ফপরদালাল নয় কি?'

শান্তিশেখর একটু হেসে বললে, 'তা হয়তো, কিন্তু তবুও ওঁরা দেখেন শোনেন বেশি। জীবনটাকে তাকিয়ে দেখবার, কান পেতে শোনবার, সেটার ভেতরে ঢোকবার চর্চা করেছেন বলেই হযতো এই রকম হযেছে।

দেখবার ক্ষমতাও বেশ সহজ— এবং জায়গায় জায়গায় সত্যিই—'

'তুমি পড়েছ এ-সব বই?'

'আমি এঁদের আগের দু'-এক পুরুষের বই কিছু-কিছু পড়েছি। এগুলো? না। এগুলো কিনে রেখেছি।'

'অ, কিনে রেখেছ।' মাষ্টারমশাই দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তারপর?'

'পড়ব।'

'কবে?'

'সময় পেলেই।।' শান্তিশেখর বললে, 'পাচ্ছি না সময় মোটেই। আমাকে দুটো টুইশন করতে হয়; তা ছাড়া একটা আমেরিকান ফার্মে কাজ করি—।'

'সেখানে কী করতে হয়?'

'কী করতে হয না?' শান্তিশেখর পীড়িত চোখে হেসে বললে, প্রুফ দেখা, দিশি পণ্ডিতদের লেখা জোগাড়, অফিসের বাঙালী মুরুব্বীদের মাইফেলের তেল আর জল মিশিয়ে খাঁটি তেল বানিয়ে দেয়া কাউকে, ঝর্ঝরে জলের জোগান দেওয়া অন্যদের জন্য— এই সবের ভেতর দিয়েই কেটে যায় দিন আর রাত—'

'সেই জন্যেই আমি মাস্টারী নিয়েছিলাম। অফিসের বাঁদরামি আমার ধাতে সয় না। এ-কাজ করছ কেন তুমি?'

'কোথাও কোন কাজ পাচ্ছি না। কলকাতায়ও তো থাকতে হবে।'

'কেন থাকতে হবে—'

'এ-শহরটার কেমন একটা—'

'কেমন একটা কী?' মাষ্টারমশাই জানতে চাইলেন।।

কিন্তু তাঁকে কোন সদুত্তর দিতে হ'লে অনেক কথা বলতে হয শান্তিশেখরের; কিন্তু হেডমাস্টারকে সে-সব কথা বলতে চায না সে; শুনে তিনি প্রীত হবেন না; এ-রকম সৎ ও জ্ঞানী মানুষকে দুঃখিত ও চিন্তিত ক'রে তোলা ঠিক হবে না।

'তোমার বয়স হল চল্লিশ?'

'চুযাল্লিশ।'

'চুয়াল্লিশ?' হেডমাস্টারমশাইয়ে ঝাড়ানো ভুরুগুলো শাদা হ'যে চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে; আঙুল চালিযে সেগুলোর খানিকটা রক্ষা কবতে করতে চোখ দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে চেযে তিনি বললেন, 'এখন আর "ঘাট্‌কে চলঃ—এব বযেস নেই তোমার, এখন অন্যরকম ভাবে জীবন চালাবার কথা। কলকাতায় তা কি হবে?'

হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা নতুন অভযের নির্দেশ পেলেও কেঁপে কুঁকড়ে তারপর প্রশান্তি বোধ ক'রে শান্তিশেখর বললে, তা হবে। আমার জীবন এই সবে শুরু হয়েছে। আমি বিয়ে করিনি আজো। আমি— আমি—'

'তুমি— কী—

'আমি— যে-মেয়েটিকে ভালবাসি, তাকে দেখেছি—'

'কোথায়?'

'কলকাতাযই।'

'কে সে?'

'কযেক জনকে আমাব ভাললেগেছে খুব— কিন্তু টাকা-কড়ি নেই, শরীরও একজন মানুষের আমার। টাকা নেই, তরজুৎ হচ্ছে না, শবীর ভেঙে—চুরে যাচ্ছে; তর সইছে না, খুব শীগগিরই মাটিতে মিশে যাবে; মাটির শরীব তো—'

শান্তিশেখর হেডমাস্টাযের দিকে তাকাল; তিনি ভুরুর ভেতর থেকে চোখ বের ক'রে মন দিযে শুনছিলেন, শেষ পর্যন্ত শুনতে চান; — শান্তিশেখরের মনে হ'ল।

'এ ভাঙা শরীর নিয়ে— এই বয়েসে— যাদের ভালোবেসেছি, তাদের যে-কোন একজনকে পেলেই জীবন কেটে যেতে পারে। ছ্যাকড়াগাড়ির পক্ষীরাজের জীবন তো আমাদের— ধর্মের ষাঁড়ের জীবন তো নয়; নানা মেয়ের মুখ চেয়ে চলতে হলে ষাঁড়ের মতো শরীর চাই, ধর্মের ট্যাঁকের মত টাকা; সে-সব নেই

আমাদের; ঘানিগাছে ঘুরে আমাদের শরীর গেছে— টাকা মনিবরা খাচ্ছে। গৃহিনীর খোঁজ পাই প্রেমে নয়— যৌনের পথে মিলনে—টিলনে— কালে ভদ্রে—।'

শুনে মাস্টারমশাই কোন কথা বললেন না।

শান্তিশেখর বললে, 'আমার কথা আড় ভাঙল না স্যার।'

'ভেঙেছে; বুঝেছি। তুমি যাকে বিয়ে করেছ, সে-স্ত্রী তোমার কোথায়?' শান্তিশেখর হ্যাঁ করে দু-কান ছুঁয়ে হাসতে গিয়ে হাসির একটা ছোট ঝিলিক দেখিয়ে নিভে গেল। শান্তিশেখর যে বিয়ে করেছে, সে-জিনিসটা হেডমাস্টারের কাছে চেপে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু তিনি ধরে ফেলেছেন।

'স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে থাকে।'

'ছেলে পুলে আছে?'

'একটি ছেলে।'

'স্ত্রীকে তুমি ভালোবাস না। সন্তানকে যে ভালোবাস, তার চেয়েও বাইরের মেয়েদের জন্য ভালোবাসা তোমার, শান্তি। এটা কী রকম যে হ'ল। অথচ সে-সব মেয়েদের তুমি চলতে-ফিরতে দেখেছ শুধু। তাদের সঙ্গে কথাও হয়নি তোমার, ফিরেও তাকায়নি তোমার দিকে। আশ্চর্য তোমার মন, বাছা, শান্তিশেখর।'

এবারে হাসির ঝিলিক বেশিক্ষণ লেগে রইল শান্তিশেখরের মুখে— আনন্দে নয়— আনন্দের অসদ্ভাবের থেকে যে-তামাসা জন্মায়, তারই একান্ত চেতনায়। শান্তি বিয়ে করেছিল বটে কিন্তু বিয়ের ন'মাস পরেই ছেলে হবার সময় তার স্ত্রী মারা যায়; ছেলেটি বেঁচেছিল সাত বছর অব্দি; টাইফয়েডে মারা গেল।

'আমার সন্তানকে আমি ভালোবাসি। সে ভালোবাসা কী যে আশ্চর্য করুণা; আমার ছেলের বয়সী একটি ছোটছেলের হাবভাবে মুখে কিছু দেখলে সেই করুণা জেগে ওঠে আমার। আমার স্ত্রীও করুণার অধিকারী। এর কাছে সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গই অবান্তর। কিন্তু তবুও মেয়েমানুষের ভালোবাসা— জীবনের থেকে ক্রমেই মুছে যাচ্ছে—কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। করুণার চেয়ে কম জিনিস কি তা?'

'দেখ।' হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'কোনো নারীকে খুঁজে বার কর। শুধু-শুধু দূর থেকে ট্রাম বাস ফুটপাথ কফি-হাউসের অপরিচিত মেয়েদের—মাথায় দিব্যি দিয়ে দিন কাটানো ভাল নয়। তোমার চুয়াল্লিশ বছর হল। কী করছ তুমি এখনও। কিচ্ছু না!'

'এটা কী বই?' হেডমাস্টারমশাই শান্তিশেখরের হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডাস্ ক্যাপিটাল— মানে কী? লিখেছেন কে?'

'মার্কস।'

'কে তিনি?'

'এই একজন সমাজ দার্শনিক আর কী— হয়তো বৈজ্ঞানিক।'

'কী লিখেছেন?'

'কী লিখেছেন—' শান্তিশেখর বললে, 'উনি ভেবেছেন, সমাজের ব্যাকরণ লিখেছেন—আর্য প্রয়োগও আছে ঢের— কিন্তু মার্কস্ কী বলতে চান তা অন্যত্র কিছু কিছু শুনেছি, পড়েছি। এ-বইটা আমি এখনো পড়িনি, পড়ব।'

'অনেক বই তো কিনেছ, কিছুই তো পড়বে না।'

'সময় নেই, সময় পাওয়া যায় না। টাকা খরচ করে বই না-কিনে পাবি না তবুও; যে-কোন দিনক্ষণে মৃত্যু এসে পড়তে পারে। ম'রে যাবার আগে নিজেকে অন্তত বলে যেতে চাই— যা জানবার মত জিনিস, তা কাছে এনে রেখেছিলুম— সময়ই হ'ল না—'

'কাছে এনে রেখেছিলে? কিন্তু পড়লে না? কেমন উদ্বায়ী তোমার আত্মা।

'উদ্বায়ী?'

'না, তা নয়—' মাস্টারমশাই নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন,

'তবে—বিলাসী।'

শান্তিশেখর একটু দাঁতে হেসে মাড়ির দাঁতে ঠেকিয়ে হাসিটা তারিয়ে তলিয়ে দিল পেটের ভেতর; মুখ-চোখ আমের খন্ডির মত হয়ে উঠল তার— চোত-বোশেখের রোদে।

'কেমন এলিয়ে গেলে আমার কথা শুনে তুমি। ভুল করছ। বিলাস তো খুব ভাল জিনিস, শান্তিশেখর।'

চাতাল দেয়াল বাতাস মশারী কখন যে অন্ধকার হ'য়ে গেল ঘুমের ভেতর, শান্তিশেখর তা বুঝতেই পারল না; নির্মন, অন্ধকার নিজেও এখন সে— মনে ক'রে দেখবার, বা বিচার করবার মন নয়। মঞ্চের ওপর কেউ নেই এখন আর—মাস্টারমশাই—লাইব্রেরী—বইয়ের ঘ্রাণ সমস্ত এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে যে, এগুলো যে কোথাও কোনদিন ছিল, আজ এই শীতের গাঢ় রাতের স্বপ্নে এখুনি যে দেখা দিয়ে গেছে, মুহূর্তের ভিতরেই শান্তিশেখরের মন থেকে সে—সত্য মিলিয়ে গেল সব যেন এসব কিছুই কোনদিন ছিল না, আবার যদি সময়ের খেয়ালে রাতের স্বপ্নে কোন দিন দেখা হয়, তা হলে হবে, নইলে এ-সব কিছুই কোনদিন থাকবে না আর।

থাকবে না আর। সময়ের এত বেশি প্রচুরতা ও ফলসানি যে, একই আট-ঘাট নিয়ে একই জিনিস দ্বিতীয়বার আসে না আর— এলেও মন তাকে নিজের নিয়মে এতো বেশি নতুন ক'রে নেয় যে, সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। এ যা দেখল, অনুভব করল, বুঝল আজ রাতের স্বপ্নে শান্তিশেখর, এ-জিনিস আর কোনদিন পাবে না সে।

পৌষের রাত প্রায় তিনটে হবে। কলকাতায় এবারে শীত পড়েছে খুব। শান্তিশেখর যে-ঘরটায় থাকে, সেখানে দিনের বেলা কম রোদ পড়ে বলেই রাত খুব প্রখর ভাবে ঠাণ্ডা। কুঁকড়ে-সুকড়ে নিজের অজ্ঞাতসারে অবোধভাবে ছেঁড়া লেপ জড়িয়ে শুযে আছে সে। বাইরে কোথাও জল ঝরার শব্দ— প্রায় সারারাতই শুনতে পাওয়া যায়; কার বিরাট চৌবাচ্চা ভরছে হয়তো— কিংবা অন্যমনস্কভাবে কল খুলে রেখে গেছে কেউ— হয়তো বসাতলবাহী পাইপের জলধারা রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের আধোঘুমের কানে ছলছলিয়ে চল্‌কে ছলছলিয়ে কোথায় থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন। না, তা নয়। তা যদি হ'ত, তাহ'লে কলকাতার মাটি ও দেওয়ালের ভেতরের পাইপগুলোতে কত যে জলদেবী ধরা পড়ত। আধো-ঘুমন্ত মানুষের হৃদয় এমন নির্জন রাতে একজন দেবিকাকেই চায় তবুও; জলের থেকে উঠে আসুক— উঠে আসুক রাস্তার শামদানের বিদ্যুতের থেকে। কিন্তু কেউই এল না। ঘুমিয়ে পড়ল শান্তিশেখর আবার। বাকি রাতটা কতগুলো হিজিবিজি হাড়হাভাতে স্বপ্ন দেখল সে। দিনের বেলা কোন স্বপ্নের কথাই মনে রইল না তার। তার শরীর তাকে বুঝিয়ে দিল রাতে ভাল ঘুম হয়নি— ক্যাজা শরীরটা একজায়গায় স্থির হ'যে বসে থাকবারও উপযুক্ত নয়— অথচ সারাদিন তাকে লাফিযে নেচে রণপাযে ছুটে ঝকমারি করতে হবে।

সংগ্রাম চলছিল। বেলা তিনটের সময়ও আমেরিকান অফিসে ব'সে প্রুফ দেখে যাচ্ছিল— এগোরাটার সময়ে প্রুফ দেখতে শুরু কবেছে সে—এর মধ্যে দম ছাড়বার সময় পাযনি। প্রুফ অবিশ্যি সেই সাপ্তাহিক পত্রিকা-সম্পর্কিতই সব নয়— অনেক কিছুই নানারকম অবান্তর আজব কুলকিনারা থেকে এসেছে। এ-সব প্রুফ শুধরে দেবার কথা নয শান্তিশেখরেব। আমেরিকান সাহেবের সঙ্গে তার এ-রকম কোন চুক্তি ছিল না—এমন কি, প্রুফ দেখবারও চুক্তি ছিল কি? কিন্তু বাঙালী সাহেবরা এসব তার ঘাড়ে চাপিযে দিয়েছেন। শান্তিশেখর অবিশ্যি প্রতিবাদ করতে পাবে— কিন্তু কববে করবে এই সংকল্প নিয়ে অফিস যাচ্ছে—আসছে— এরই ফাঁকে হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল সাহেব দিল্লী চ'লে গেছেন, এবং যদিও তাঁর কলকাতায় ফিরে আসবার কথা ছিল, তবুও তিনি আকাশে উড্ডীন হযেছেন ফিলাডেলফিযা লক্ষ্য করে। এর জায়গায় সম্প্রতি একজন ইংরেজি কাজ করছেন। ইংরেজের নিযমপ্রাণতার সম্পর্কে নানা রকম মোটা-মিহি কথা ভাবছিল শান্তিশেখর। তাছাড়া ভারতের— বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের ইংরেজসভ্যায কী যে নিদেনভাবে ঘুণ ধবেছে কযেক বছর ধরেই, ভাল ক'বে দেখে আসছে সে। মন্বন্তর গেল— সাম্প্রদাযিক রক্তারক্তি, ধান আর বীজধানের খুনোখুনি কায়েমী হ'যে উঠল প্রায়— ইংরেজ পাহারা দিচ্ছে। কী হবে মর্গ্যানসাহেবকে কোন কথা বলতে গিযে। বলবেন, প্রপর চ্যানেল দিযে আসেনি। দরখাস্ত পেশ করতে বলবেন ঘোষ চক্রবর্তী কিংবা সাধুখাঁর মারফৎ; কিন্তু প্রতিবাদ যে তাদেরই বিরুদ্ধে।

এ-চাকরিটা ছেড়ে দিলেও পারে সে। মাইনে অবিশ্যি শ'দুই টাকা। দু'শো টাকার চাকরি চট ক'রে জোটানোও যায় না। যুদ্ধ থেমে গেছে— নানারকম ডিপার্টমেণ্ট উঠছে— উঠে যাবে, যুদ্ধ-ফেরৎ কর্মীরা তাদের চড়া দাবি নিয়ে চ'লে আসবে; দুষ্কর হবে মোটামুটি ভাল একটা চাকরি পাওয়া।

'ঘোষসাহেব সেলাম জানিয়েছেন—'

'আমাকে? প্রুফ দেখতে-দেখতে উঠে দাঁড়াল শান্তিশেখর। ঘোষের কামরায় ঢুকে শান্তিশেখর একটা চেয়ার টেনে বসেই পড়ল— কেউই আর তখন ছিল না সেখানে।।

'আপনাকে ডেকেছি, ডক্টর সেনের কাছে যেতে হবে— ডক্টর টি. বি. সেন। টি.বি. মানে— ইযে

ঐ টিপিক্যাল বাঙ্কোৎটা—'

শান্তিশেখর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল—ঘোষের সামনে, বিশেষত তার কামরায় ঢুকে কোনদিন সিগারেট খায়নি সে।

অফিসের কানুন অনুসারে এটা নিশ্চয়ই বেয়াদবি। কিন্তু বেয়াদবি না-হয় ক'রেই দেখা যাক। জীউ চাচ্ছে অনেক দিন থেকে বেয়াদবিই। জীউই তো তরজুৎ করে শান্তিশেখরে-শান্তিশেখর তাকে করবে না?

'সিগারেট খাবেন?' গোল্ড-ফ্লেকের টিনটা শান্তিশেখরের দিকে ঠেলে দিল ঘোষসাহেব।

'আপনার ও প্যাকেট থেকে পরে খরচ করবেন, শান্তিবাবু।'

'কেন যেতে হবে ডক্টর সেনের কাছে?'

'তার সেই আর্টিকেলটা শীগগিরই চাই—ঐ যে টেনেসি ভ্যালি না কীসের কথা দিয়ে ফেঁদে কলকাতার বিদ্যেধরীতে এনে ঠেকিয়েছে— তাই না? কী নিয়ে লেখবার কথা ছিল ডক্টর সেনের?'

'সে তো আমি জানি না মিস্টার ঘোষ— আমি তো প্রুফ দেখছি শুধু। গ্রিফিথসাহেবের সঙ্গে আমার কথা ছিল ফি-সপ্তাহে কিছু-কিছু লেখবার, বড় বড় লিখিয়েদের দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবার—'

শান্তিশেখরকে থামিয়ে দিয়ে ঘোষ বললে, তা বটে। আজই তা হ'লে তাগিদ দিয়ে আসুন।।। দু'তিন দিনের ভেতর লেখাটা চাই।'

'ওঃ, সে কি কখনও হয় মিস্টার ঘোষ, দু'তিন দিনে কে করে—'

সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মাথা নেড়ে জীউকে অনির্বচনীয় ভাবে স্নিগ্ধ করে নিয়ে শান্তিশেখর বললে।।

'তা হ'লে কি দু'তিন হপ্তা লাগবে শান্তিবাবু?'

'সে দেখা যাবে। চেক দিন একটা।'

'কিসের জন্য?'

'লেখককে দিতে হবে।'

'লেখা পেলে তবে দেব।'

'হাডসনসাহেব তো আগেই দিতেন।'

'ও-সব আমেরিকানদের ফক্কুড়ি রেখে দিন। ওরা নোট পুড়িয়ে সিগারেট খায় ল্যাভেটরিতে যাবার সময় টিস্যুপেপার না—পেলে আমাদের একশো এক হাজার টাকার নোট দুমড়ে-মুচড়ে পাইখানায় ঢোকে।'

দু'মুহূর্তে কেউ-ই কথা বললে না, দু'জনেই সিগারেট টানছিল।

'কিন্তু এটা তো আমেরিকানদেরই কারবারী অফিস—'

ঘোষ মাথা নেড়ে বললে, 'এখন ইংরেজদের হাতে।'

'কিন্তু হাডসনসাহেব তো ফিরে আসবেন।'

স্কাইলাইট থেকে বিকেলের রোদ বাঁকা বর্শার ফলার মতো এসে পড়েছে টেবিলের ওপর; জ্যোতির ভিতরে শূন্যে বীজানুরা ধূলিকণার ভর ক'রে উড়ছে; সে-দিকে তাকিয়ে ঘোষ বললে, 'হাডসন আসবে কি আর। অবিশ্যি বাচ্চা ইয়াঙ্কীরা রয়েছে। গোখরোর চেয়ে সলুয়ের ঝাঁঝও বেশি, কিন্তু বাঙালীকে দাদন দিতে যাবে না ওরা,—এতো পাঠ্য নয়— লেখা তো; পণ্ডিতদের বাড়ির কুকুরটাও তো আড়াই অক্ষর লিখতে পারে, সেজন্য দাদন হাঁকতে হবে বুঝি?'

'না, তা হবে না।' কথা না-বাড়িয়ে শান্তিশেখর বললে, প্রুফ দেখবার তাড়া ছিল তার।

'ডক্টর সেনকে কত দেওয়া হবে?'

'দশহাজার ওয়ার্ডস্' ঘোষ বললে, 'শ-দেড়েক পাবে। কারণ, গুণে দেখলে ও-সব প্রবন্ধে বড় জোর তিন-চার হাজার ওয়ার্ডস-এর বেশি দম থাকে না লেখকের; বাকিটা সব কাঁথা সেলাই আর মুড়ি ভাজা—'

'সেন একই রকম লিখছেন বুঝি আজ কাল? সব শালাই লিখছে— ধানাই-পানাই ফেঁদে গলায় গামছা দিয়ে টেনে চেক আদায় করতে পারলে লিখবে কে হে। লেখা! লেখা তো মামদো হ'য়ে উড়ছে।'

'কিন্তু সেন দেড়শোতে রাজি হবেন ব'লে মনে হয় না।'

'এখন হবেন; জানেন তো হাডসন নেই; বাঙালী লিখছে, বাঙালী টাকা দিচ্ছে। একশোও দেব না সেনকে; পঞ্চাশ দেব কিনা, ভাবছি; পঁচিশেও রাজি করাতে পারব।' ঘোষ ট্রাউজারের পকেট থেকে পাউচ বের ক'রে বললে। টেবিলের ওপর পাইপ ছিল, পাশে পাউচ রেখে দিয়ে বললে, 'আপনি প্রুফ দেখুন

গিয়ে— আমিই যাব সেনের কাছে।'

'আমিও তো যেতে পারতুম—'

'আপনি প্রুফ দেখুন—'

'তাতো দেখছি—ই।'

'হ্যাঁ, তাই করুন।'

'তাই তো করছি।'

'যান, প্রুফ দেখুন।'

'প্রুফ অবিশ্যি আমি না-ও দেখতে পারি।'

পাইপেব মুখে তামাক ভরছিল ঘোষ; 'ওঃ, তাই বুঝি!' পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ... বললে।

'গ্রিফিথসাহেবের সঙ্গে আমার কথা ছিল—'

'গ্রিফিথ এখন নেই।'

'নেই, কিন্তু এটা তো আমেরিকান অফিস—'

বেশ তো, যা অসুবিধা হচ্ছে আপনার গুন্তিচাবাড়িকে জানান।'

পাইপ জ্বালিয়ে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে মুখটাকে হাসিয়ে নিয়ে ঘোষ আবাব বললে, 'আজ আপনার রাত দশটা বেজে যাবে। নিকলসন সাহেবের প্লানিং-এর সব কিছু প্রুফই আজ শেষবারের মত প্রেসে দিয়ে তবে তো বাড়ি যেতে হ'বে আপনাকে।'

মেরুদণ্ডটা দারুণ বিষিয়ে উঠেছিল শান্তিশেখরের; কবে কোন্ জরায়ুর থেকে নেমে এসেছিল সে, তখনকার সেই কেমন একটা অববোহ'ণের খিচুনিতে আজ এতদিন পবে আবার ভাবি বিচিত্র লাগছিল তাব— হাসতে লাগল সে। ঘোষেব গোল্ড-ফ্লেকের টিনটা বাঁ-হাতে তুলে নিয়ে ঘব থেকে বেরিয়ে পড়ল শান্তিশেখব; টিনটা ঘোষেব মাথায় ছুঁড়ে মারবাব জন্য তুলে নেয়নি, কেমন একটা অদম্য উৎসাহ এসেছিল বলে টেনে নিয়েছে, সেই উৎসাহেব বশেই অবিশ্যি টিনটা ঘোষেব মাথায় ছুঁড়েও মারতে পারত সে, কিন্তু ঘোষেব কপাল আর শান্তিশেখরের যা হাতযশ: কী-ক'রে ঘোষেব মাথায় টিনটা ছুঁড়ে মারবে সে। নিজের কামরায় গিয়ে বসল শান্তিশেখর। কিন্তু স্বস্তি নেই। ঘোষসাহেব ছাড়া আব কারো মনেই কোন স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সর্বেন ঘোষেব টিন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি শেখর বললে 'বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল, মাফ করবেন—'

'না, না, কিছু না, ও—বকম আকচাব হয। আসুন—' বলে পকেট থেকে সিগাবেটেব রুপোব কেস বেব কবল সে, একটা সিগাবেট বেব কবে নিজেই জ্বালিয়ে টানতে লাগল; কেসটা বেখে দিল পকেটে।

অফিসে শান্তিশেখবেব কামবায বাত ন'টাব সময সুস্মিতা চক্রবর্তী এল।

'বড্ড কাবু হ'যে গেছেন আপনি।'

'আমি?' প্রুফ দেখতে দেখতে শান্তিশেখর মুখ তুলে তাকাল।

'খুব কাহিল দেখাচ্ছে। কী অসুখ?'

'অসুখ নেই কিছু, বেশ আছি। এত বাতেও যাননি আপনি।'

'আমি গাড়িব অপেক্ষা করছি।'

'ওঃ।'

'মিস্টার ঘোষেব—'

'সর্বেন ঘোষের— ওঃ, তিনি আছেন এখনও?'

'কাজের চাপ আপনাব খুব বেশি।'

সবাই তো কাজ করছে—'

'না, আমি আর কী করলুম। আমার অফিস তো সন্ধ্যের সময চোপরা মিত্তির গাঙ্গুলিকে নিয়ে, আয়েঙ্গার আসে মাঝে-মাঝে, বৈঠকী আর কী! তিনটের শো-তে 'টাইগার'-এ গেছলুম মনমোহন সূরকে নিয়ে; এই তো এখুনি এলুম।'

'এখানে এসে কী করতে হ'ল?'

কিচ্ছু না। রোজই আসতে হয, এই যা। গাড়িতে।'

'গাড়িতে?'

'হ্যাঁ, সর্বেনদাব পেট্রল।'

চাবদিক লবঙ্গেব গন্ধে ভ'বে যাওযাতে শান্তিশেখব মুখ না তুলেও টেব পেল সুস্মিতা বেড়ালেব মত হাই তুলে হাসছে। মাথা গুঁজে প্রুফ দেখে যেতে লাগল শান্তিশেখব। লবঙ্গেব গন্ধ খাবাপ লাগছিল না তাব; সুস্মিতাব হাসিও যেমন সচ্ছল, তেমনি নিঃশব্দ। কিন্তু কলকাতাব রূপসীবা সব কোথায তলিযে গেল—লবঙ্গদ্বীপেব কথা মনে পড়িযে দেবাব জন্য একটা বেড়াল ঢুকে পড়েছে তাব ঘবে। সবই হয, অথচ কিছুই হয না, ভাবতে-ভাবতে কলম দিযে শান্তিশেখব কেটে শেষ কবে দিচ্ছিল জীবনেব নয—ছাপাখানাব শযতানগুলোকে।

'কতকগুলো বিলিতি, আমেবিকান কাগজ নাড়ি-চাড়ি, উর্সুলা আমাব সঙ্গে, এডিথেব সঙ্গে পবামর্শ কবে কাটিঙ্ ঠিক ক'বে। ওবাই সব কবে। আমাব কিছু কবতে হয না।'

'এডিথ কে?'

'একজন ফিবিঙ্গি মেযে।'

'উর্সুলা?'

'ও খাস বিট্রিশ। আলাপ কবিযে দেব আপনাব সঙ্গে।'

শান্তিশেখব এক টিপ নস্যি নিযে বললে, 'না, থাক। আমি হোটেলে নিযে খাওযাতে পাবব না।'

'ওমা, সে কী! হোটেলে খাওযাতে হ'বে কেন!'

'তা খাওযাতে হয, নিদেন গাড়িতে চড়াতে হয।'

'ওমা, কী-যে বলেন আপনি! মোটবেব আব খ্যাঁটেব ফাউ-ফূর্তি ছাড়া মানুষেব সঙ্গে মানুষেব মিল হতে পাবে না?'

'হ'তে পাবে', প্রুফ দেখতে-দেখতে শান্তিশেখব বললে, 'কিন্তু তাতে জোশ থাকে না।'

সুস্মিতা শান্তিশেখবেব কথা মেনে নিল না। হযতো, কিংবা মেনে নিল। কিন্তু কথা বাড়াতে গেল না সে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সুস্মিতা তাবপব বললে, 'আমি কেমন আছি বলুন তো?'

'আপনি? সুখে থাকুন সুস্মিতা দেবী।'

'সুখেব পাযবা আমাব'! সুস্মিতা লবঙ্গ চিবুতে-চিবুতে কাঁধ নাচিযে হেসে বললে, সুখেই আছি বটে। কিন্তু সুখে থাকতে ভূতে কিলোয, সেই জন্যই তো এলুম এখানে।

টেবিলে গেলাস ভর্তি জল অনেকক্ষণ ধবে বেখে গিযেছিল বেযাবা।

এতক্ষণে ঢকঢক ক'বে জলটা খেযে ফেলল শান্তিশেখব।

'জানেন শান্তিবাবু, আমি প্রুফ দেখতে জানি।'

'জানেন? তা হ'লে তো ফর্মও ফিল-আপ কবতে পাবেন।

শান্তিশেখব কলমে কালি ভ'বে নিল।

'কীসেব ফর্ম?'

'মনি-অর্ডাবেব।'

সুস্মিতা হেসে বললে, 'মৌমাছি উড়ে আসছে—'

'আসছে, তা আমি জানি— আমাব কথাব মিছবি খেযে ফেলবাব জন্য। কিন্তু সত্যিই—' শান্তিশেখব প্রুফেব থেকে ঘাড় তুলে বললে, 'গ্রাজুযেট স্ত্রী তাব ম্যাট্রিক-ফেল স্বামীব কাছে আসে মনি-অর্ডাবেব ফর্ম লিখিযে নেবাব জন্য। জানেন?'

শান্তিশেখব পেনসিল তুলে নিযে ছোট্ট কার্ডেব ক্যালেন্ডাবেব শাদা পিঠে চক্রবৃদ্ধি সুদেব একটা দবকাবী অঙ্ক ক'ষে যাচ্ছিল।

মনি-অর্ডাবেব ফর্ম নিজে লিখতে পাবে না কেন?'

'লিখতে মন সবে না হযতো। ভাল লাগবে লিখবে। মেযেদেব কথা বলছি—

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেযেদেব তো আলপনা আঁকাব কথা। সেটা পাবে কিনা দেখুন। ও-সব ফর্ম-টর্মেব ব্যাপাবে তাদেব এলেম নেই। নেই, মানে ছিল না। আজকাল হ'চ্ছে। পুরুষদেব ডিঙিযে যাবে এইবাব। যাকগে, এ নিযে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? প্রুফ নিযে খুব ওৎবাচ্ছেন আপনি বটে, শান্তিবাবু। কিন্তু তবুও এ তো দশজনেব কাজ। আমি একটু হাত লাগাই?'

'আব একদিন হবে, আজ নয—' শান্তিশেখব প্রুফের তাড়া সবিযে বেখে চোখ জিবিযে নিতে-নিতে বললে।

'আজ নয়? ও, তাই বুঝি।'

'প্রুফের তাড়াগুলো গুছিয়ে রাখল শান্তিশেখর আবার। কলমটা টেবিলেই পড়েছিল— তুলে নিল। কথা বলতে এসেছিল আজ সুস্মিতা। তিনজন মানুষ হ'লে যা চলে না, কিন্তু দু'জন মানুষ মুখোমুখি বসে কম বেশি পরস্পরের সাথে যে বুকের ভেতর একটু আধটু ছড়ছড়ানি ডেকে আনতে পারে, সেই ধরণের কথা।

'প্রুফ দেখছেন?'

'থার্ড রীডিং।'

'সত্যি, ভাবি চমৎকার অফিসটি আপনার। আমেরিকানদের হাত।'

'ঝাড়লেই পর্বত।' শান্তিশেখর বললে, 'নইলে প্রুফ-রীডারকে কেউ এখনও এমন কামরা দেয়?'

'কিন্তু আপনি তো প্রুফ রীডার নন।'

'বেলা এগারোটার সময় শুরু করেছি, রাত দশটায় বেরুতে পারব কিনা সন্দেহ। এত প্রুফ ঘেঁটিয়ে কী আমি আর সুস্মিতা দেবী, প্রুফ—রীডার ছাড়া?' আস্তে আস্তে বললে শান্তিশেখর।

মুখ-চোখের বিপন্নতার রেখার আড়ালে কী চাই শান্তিশেখরের? স্বাচ্ছন্দ্য ও আশ্বাস কে দেবে তাকে? সুস্মিতা নয়। সুস্মিতার মত মেয়ের সে-ভান্ডার কোথায়—যার থেকে দান করবে? শুধু দান করবার হাত থাকলেই তো হ'ল না। কিন্তু তবুও সুস্মিতার দিকেই তাকিয়ে রইল শান্তিশেখর।

'কিন্তু এ-কাজ তো আপনার করবার কথা নয়।'

সপ্তাহে দু'টো দিনেই চাপ বেশি, বুধ আর বেস্পতি।' আমি গ্রিফিথ সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছি। তিনি এলেই তাঁর কাছেই—' শান্তিশেখর তারপরে বললে, 'অনেক কথা— অনেক রকম কথা'

একবার কপালে হাত বুলিয়ে নিয়ে শান্তিশেখর ভাবছিল আরো দু'চারটে কথা বলবে কিনা সুস্মিতার সঙ্গে— না, কাজে মন দেবে?

'কিন্তু গ্রিফিথ সাহেব ফিরবেন কি?'

'আর ফিরবেন না বলেই তো শুনেছি।' সুস্মিতা বললে।

'বড্ড খারাপ কথা।'

'কী করবেন তা হলে?'

'তাইতো ভাবছি।' শান্তিশেখর প্রুফের তাড়াগুলো আবার সরিয়ে দিয়ে, একটু নিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে খানিকক্ষণ নিরস্ত হ'য়ে বসে রইল।

'ক'টা রাত এখন।'

'এই যে আমার ঘড়িতে সাড়ে নটা।' সুস্মিতা বললে।।

বয় এসে এত তাড়া ভিজে প্রুফ দিয়ে গেল।

'এ-গুলোও দেখতে হবে আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল সুস্মিতা।

'দেখবার তো কথা।

'আজ রাতেই?' কাগজগুলোতে হাত বুলিয়ে নিয়ে সুস্মিতা বললে, 'এ সব তো ভিজে শান্তিবাবু।

'শিশিরে ভিজেছে।'

'যা শীত পড়েছে কলকাতায়, না-ভিজে যাবে কোথা। কিন্তু আজকে এইখানেই খতম ক'রে দিলে হ'ত না? কালকে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিক এগুলো।'

শান্তিশেখর তাকিয়ে দেখল, মহিলাটির চেহারা বিশ্রি, কিন্তু গলার সুরে ন্যাকামির কুয়াশা কাটিয়ে নির্মলতা রয়েছে, মনে হয়: আন্তরিকতার,— স্বাভাবিকতার। এর মন ভালো বলেই বাপ-মা একে সুস্মিতা নাম দিয়েছে? কিন্তু চুয়াল্লিশ বছরে মেয়েটিকে দিয়ে কী করবে সে। না, একে সে চায় না। সুস্মিতা দেখতে ভাল নয়— সুস্মিতা ঘোষসাহেবের প্রিয়-পাত্রী—না হলেও হিসেবের পাত্রী। ঘোষেদের অবিশ্যি সবই চলে— মাথায় ফুলের তেলের গন্ধ থাকলেই হল। কিন্তু দেখতে খারাপ হ'লেও একেবারে বুকের ওপর এসে হাত রাখতে পারে কেউ-কেউ; সে হাতটা সেইখানেই থাকে। কিন্তু সুস্মিতার হাতটাকে নিজের হৃদয়ের দিকে এগোতেই দিচ্ছে না। ইচ্ছে করছে না। সুস্মিতাকে কিছুতেই মনে ধরছে না তার। চেহারা খারাপ ব'লেই ঠিক নয়, কিন্তু কেন যেন। কোন সুন্দরীর্‌ মুখোমুখি পারত না সে, কিন্তু এই মেয়েটির রূপহীনতাকে আঘাত করবার জন্যই একটা চিমড়ে সিগারেট ধরাল। যতদূর সম্ভব ধোঁয়া ছেড়ে টেবিলটা আচ্ছন্ন ক'রে কিছুটা কারু মুখের উদ্দেশ্যে উড়িয়ে দিল।

'আপনি আবার কাজে মন দিয়েছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, সেরে যেতে হবে।'

'ট্রাম-বাস কিছুই তো নেই আর রাস্তায়।'

'এ-দু'রাত অফিসেই কাটাচ্ছি। এখানে মশারিও আছে। আরো কতো কী। পরিপাটি—পরিপাটি-—যেন একজনকে পাঁচজনের ঘুম ঘুমোতে দেয়া হ'চ্ছে। আপনি কী করে যাবেন?'

'ওরা গাড়িতে।'

'গাড়ি চলে গেছে বলেই তো মনে হ'ল।'

'সে কী কথা বলছেন আপনি!' গায়ের শাড়িতে হঠাৎ যেন আগুন ধরেছে এমনিভাবে ডাক-পেড়ে উঠল সুস্মিতা। 'কখন গেল? এই যে স্টার্টারের শব্দ শুনলুম, ওটা কি ঘোষের গাড়ির? কিন্তু আপনি আমাকে বললেন না কেন!'

'এখানে খাওয়া-দাওয়া করুন, থাকুন এক রাত; দেখুন না কী রকম নিখুঁত সব—'

শান্তিশেখরকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে সুস্মিতা জলপায়রার মত ডানায় ঝট্‌কায় কেঁপে উঠে কুহর কেটে বললে, 'না, না, সে কি কখনও হয়—আপনি আমাকে ট্যাক্সি ডেকে দিন—'

ট্যাক্সিতে তুলে দেবার সময় শান্তিশেখরের মনে হল, সুস্মিতাকে যতটা কুশ্রী মনে হয়েছিল, তা সে নয়; চেহারা নিতান্ত মন্দ নয় তার, একটা রাত অন্তত টেবিলে মুখোমুখি বসে কাটিয়ে দিতে পারা যেত; এর ভিতর খুব ঘন সন্নিপাতের মধুরতা হয়তো পাওয়া যেত না; কিন্তু দুধের বদলে ঘোলের চেয়ে মৌসম্বীর রস পাওয়া যেত নিশ্চয়ই— মৌসম্বীর বস সোডা আর স্যাকারিনের সঙ্গে মিশিয়ে। কিন্তু এ-সবের বদলে ট্যাক্সির জন্য পাঁচটা টাকা আদায় ক'রে নিল মেয়েটি। এ হিসেবে সর্বেন ঘোষের নামে লিখে রাখতে হবে— না, গ্রিফিথসাহেবের নাম,— না, বিষয়কে পেতে গিয়ে যা নিরস্ত হ'যে রইল ভাবের সমাধিতে, সেই হাস্যকর অন্তরাত্মাব নামে? বেশ, শেষোক্তের নামে লিখে রাখা যাক।

দিন তিনেক পরে গভীর রাতে নিজেব ঘরে শুয়ে থেকে শান্তিশেখরের মনে হ'ল, এই রাত সব সময়েই দিনকে খণ্ডন ক'রে রাত্রি হ'যে থাক—এই ঘুম মৃত্যু হোক। ঘুমের আগে অনেক বইয়ের কথা মনে হ'ল, অনেক নারীর কথা মনে পড়ল তার : চেনা, অচেনা, আধোচেনা, বিদ্যুৎ-প্রতীক কাবো, কারো-বা জবাবঙেব শাড়ি, কারো নেবুবনের মিষ্টি প্রকৃতি, বোদের বলয়ে নগরীর মতো কেউ, অন্ধকাব কেউ ঘাসেব মতো, শিশিবের মতো। এদের সকলকেই দেখেছে সে—দূর থেকে অনুভব কবেছে ; কিন্তু কাছে গিয়ে কথা বলবাব পথ খুঁজে পায়নি। কিন্তু এতো সব মেয়েদের আসা-যাওয়ার ভেতর শান্তিশেখবেব সজাগ বা আধো-মনে নির্মনে সুস্মিতাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ; নানা রকম নষ্ট নমিত ইচ্ছার তোষণলোকে রাতেব ঘুমেব স্বপ্নেও কোনদিন দেখা গেল না তাকে। দেখা যে গেল না, এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠল না শান্তিশেখবেব প্রাণে। সেদিনকাব সেই সাক্ষাৎকারেব পর সুস্মিতা যে অফিসে আসছে না আব, এ-কথাও শান্তিশেখবকে ঘোষসাহেব মনে করিয়ে দেবার পর মনে প'ড়ে গেল তার। সেই সঙ্গে শান্তিশেখরের মনে হ'ল, কোন্ এক অন্ধকার থেকে তাদের কবেকার ইস্কুলের মৃত হেডমাস্টারমশাই অপবেশবাবু তাকে বলছেন, 'বিলাসী তোমাব মন, শান্তিশেখর। কী যে রাজহংসী খুঁজে মবছ তুমি—কী যে বালিহাঁস কাদাখোঁচা খুঁচে মারছে তোমাকে! কিন্তু তারাও পাখির মত চোখ তুলে তাকাতে-না-থাকাতেই পালকেব সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় হারিয়ে যায় বুঝি? শূন্যে মিলিয়ে যায় তারা? তারাও?' তা যায় ; তা যাক ; তাদের জন্যে কোনো খেদ নেই।। সুস্মিতাব কথা আব মনে পড়ল না। ঘোষ মনে করিয়ে দিয়েছিল ব'লে মনে হয়েছিল, নইলে এমনি সাধারণ নিয়মে সুস্মিতার কথা মনেই আসে না তাব। অফিসেব কাজ সেরে শান্তিশেখব বাড়ি ফিরল ; কিন্তু সেই রাতেই নিজের বিছানায়—শীতের রাতেব গভীবতার ভেতর কী ক'রে যে তার মৃত্যু হ'ল, ডাক্তাব কোন পরীক্ষাব হিসেব দিতে পারল না, তিন ফ্ল্যাটের ভাড়াটেবা কেউ-ই কোন অনির্বচনীয় কারণ খুঁজে পেল না।

'শান্তিশেখরবাবু মারা গেছেন—' নিজের অফিসের কামবায় ব'সে ঘোষ বললে।

'ম'রে গেছেন?'

'এই তো আজ খবর পেলাম। দিন তিন-চার হ'ল তো মরেছেন। আগে জানালেও পারত।'

সুস্মিতা হেসে বললে, 'শান্তিবাবু নিজে এসে জানাবেন বুঝি?'

'না। তা নয়। তবে—' ঘোষ একটা চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে,

'তোমার কষ্ট হয়নি ম'রে গেছে ব'লে? হাসছ!'

'আপনিও তো হাসছেন।'

'আমি অনেকক্ষণ আগেই খবরটা পেয়েছি।' ঘোষ চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে, 'তুমি তো এইমাত্র পেলে। একজন জানাশোনা লোকের মৃত্যু হয়েছে শুনে তুমি বেশ ঝাড়া-ঝাপটা থাকতে পারো।'

সুস্মিতার দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে ঘোষ বললে, 'আমার জ্যেঠামশাই অপরেশবাবু হেডমাস্টার ছিলেন—'

'জ্যেঠামশাই হেডমাস্টার ছিলেন বুঝি।। কোন ইস্‌কুলের?'

'মফস্বলে। ছুটি-ছাটায় কচিৎ আসতেন কলকাতায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে বলতেন, তুমি সারাদিন ফুলবাবুর মত সেজে বেড়ালে হবে কী, তোমার মনে কোন বিলাস নেই, সর্বেন।' 'বলতেন বুঝি মাস্টারমশাই?' সুস্মিতা দাঁত দিয়ে লবঙ্গ কেটে দাঁতে হেসে বললে, 'কী মানে বিলাসের? বিলাস নেই?'

জলন্ত চুরুটটা আড়াআড়ি ছাইদানির ওপর রেখে দিয়ে ঘোষ বললে, 'জ্যেঠামশাইয়ের মতে বিলাস মানে খুব সম্ভব বিষয়-আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা-ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম্ হ'য়ে থাকা।'

ভারি মজার মুখভঙ্গি ক'রে চোখ দু'টোকে বন্-বন্ চরকি ঘুবিয়ে চেয়ারটাকে ধড়টাকে বেশ ছাউ নাচিয়ে মাজা দুলিয়ে এ যা বললে ঘোষ, সুস্মিতা হেসে-কুঁদে রাযবেশে নাচ দেখিয়ে ছাড়ল ঘোষকে, চোখ দু'টো তার হাসির গরম জলে ভ'রে গেছে, লাল হয়ে ছল্-ছল্ করছে। এই বুঝি থামল হাসি— এই বুঝি থামল—কিন্তু পেটের থেকে ঢুঁ-মেরে খক্-খক্ খিল্-খিল্ খিক্—খিক্‌ক'রে ছিবড়ে ক'রে ফেলল যে-চেয়ারটায় বসেছে সুস্মিতা, সেটাকে। কী আর করা যায়—এব কোন চারা নেই—ছাইদানির থেকে ঘোষ চুরুটটা তুলে নিয়ে রেখে দিল আবার ; সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে খুব মিহি সুড়সুড়ি বোধ ক'রে দাঁত বার ক'রে হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সর্বেন বললে, 'বিলাস নেই তোমারও। যদি থাকত, তা হ'লে লোকটা মরে গেছে শুনে চুপ মেরে যেতে তুমি। নিজের কামরায় গিযে ব'সে থাকতে। আমিও ছুটি দিয়ে দিতাম অফিস।...ছুটি দেব?' চুরুটটা ছাইদানিব থেকে তুলে জ্বালিয়ে নিতে-নিতে ঘোষ বললে, 'ছুটি তো মর্গ্যানসাহেব দিতে পারে।'

'বলব সাহেবকে?'

'শান্তিশেখর যে মাবা গেছে, সে-কথা জানিযে দিন। যা হয় উনি ব্যবস্থা করবেন। আপনি কিছু সুপারিশ করতে যাবেন না।'

'যদি আমার মতামত জানতে চায়?'

'ব'লে দেবেন, ছুটি না-দেওযাই ভাল—একটা বড় অফিস, কাজ তো ঢের।'

চুরুটের মুখে ছাই জমেছে ; সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ঘোষ।।

'শান্তিশেখর যে মরে গেছে, এ—কথা মর্গানসাহেবকে না-জানালেই ভাল।'

'কেন?' ঘোষ সোজা হ'য়ে ব'সে বললে।

'মরে গেছে—সে-জায়গায় লোক ভর্তি ক'রে নিলেই হ'ল। দেখতে তো হবে প্রুফ—আমার হাতে লোক আছে। এ-নিয়ে মর্গ্যানকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে লাভ নেই। তিনি দেবতার মতন মানুষ বটে, কিন্তু নানা-রকম বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'

'বুঝেছি। এ-ব্যাপারটা আমাদেব মধ্যেই থাক তা হ'লে।'

'তাই থাক্।'

'এ-কী, তুমি হাসছ—বুকের ওপর হাত বেঁধে সোজা হ'যে ব'সে ঘোষ বললে।

'যা-ই বলুন, আপনি খুব হাসাতে পারেন সর্বেন-দা, সেই বিলাসের কথাটা মনে প'ড়ে-প'ড়ে এমন কাতুকুতু দিচ্ছে! পেট আমার ফুলে গেল, আপনি আমাকে কাঁদিযে ছাড়লেন!'

'কাঁদিযে?'

'হাসতে-হাসতে চোখে জল এসে পড়ছে—উঃ!'

ক্রমে-ক্রমে জল শুকিয়ে গেল, হাসিও থামল ; সুস্মিতা স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

'শান্তিশেখর যে মরে গেছে, সে-কথা মর্গ্যানকে জানাব না তা হ'লে?'

'অন্য কেউ ফপবদালালি ক'বে জানাতে যাবে না তো আবাব?'

'না, তা যাবে না।'

'জানায ই বা যদি, কী হবে', সুস্মিতা শবীবেব হৃদযেব সব হাসি থামিযে দিযে বললে, 'আপনাকে ডিঙিযে ঘাস খেযে মর্গ্যানেব কাছে গিযে কী সুবিধা কববে? আপনি সাহেবকে বলবেন যে, একজন প্রুফ-বীডাব মবে গেছে, আব একজন বহাল হযেছে। ব্যস, ফুবিযে গেল। মর্গ্যানটা তো বোকা নয।'

'না বদ্‌মাযেসও নয। খুব ভাল মানুষ ; খুবই ভাল।'

'সত্যি, মর্গ্যানেব খুব সুখ্যাতি—সব্বাযেব কাছে। আমাব ও-বকম হ'লে হ'ত।' বলতে-বলতে নাকেব অভিবাম ফোঁকা দু'টো আমেজে কেঁপে ফুলে উঠল সুস্মিতাব।

'আমাদেব কফি এসেছে, সর্বেন দা—'

'সর্বেন একটা পেযালা তুলে নিল। আব একটা পেযালা সুস্মিতাব?

টেবিলে ট্রে-ব ওপবে বযেছে, কিন্তু সর্বেন এগিযে না-দিলে নেবে না সুস্মিতা।

ঘোষ কাজে ডুবে গেল।

এক ফাঁকে নিজেব পেযালাটা শেষ ক'বে কাজে মন দেবাব আগে সুস্মিতাব দিকে তাকিযে দেখল।

'তুমি ব'সে আছ, সুস্মিতা, কফি খাচ্ছে না?'

বাকি পেযালাটাও তুলে নিযে খেতে-খেতে সর্বেন বললে, জুড়িযে গেছে। এ খেযে সুখ পেতে না তুমি।'

'কৈ, কেমন জুড়িযেছে দেখি—' সুস্মিতা হাত বাড়িযে দিল পেযালাব দিকে।

'আমি মুখ দিযে ফেলেছি।'

'আমি বুঝি কাবো মুখেব এঁটো খাই নে?' সুস্মিতা সত্যকালেব বাঙালী মেযেদেব মতন এমন সততা ও গভীবতায বলল যে চোখে-মুখে শবীবে রূপই যেন খেলে গেল তাব—সবস কাঁচা বযেসটা তো খুবই;—তাকিযে দেখছিল ঘোষ, কথা ভাবছিল—

কোথায যেন চ'লে গিযেছিল ঘোষেব মন, সজ্ঞানে ফিবে এলে বললে,

'হাসছ সুস্মিতা ; খুব হাসছ দেখছি ; খেলে কফি?'

'না, এইবাবে খাব।'

'ও, আমি ভেবেছিলুম, খেযে ফেলেছ বুঝি—'

'খাচ্ছি—' সুস্মিতা সর্বেনকে বিষযটা ঠিক ভাবে ধবিযে দেবাব চেষ্টা ক'বে বললে, আমি—'

কিন্তু মুখে কাপড় দিযে হাসি সামলাতে গিযে কথা বন্ধ হ'যে গেল তাব। হাসিব ধ্বস্তাধ্বস্তিতে শেষ পর্যন্ত সুস্মিতাব বেতেব চেযাবটাব কী হয, হাতেব কলম টেবিলে ফেলে বেখে তাকিযে দেখছিল সর্বেন।

অফিসেব পাঁচতলা থেকে ফোন এল।

'কী খবব, সর্বেন-দা?'

'অফিস ছুটি দিযে দিলেন।।'

'মর্গ্যান? কেন?'

'মবেছে যে, কানে গেছে ওদেব।'

ঘোষেব ওযেস্টমিনিস্টাবেব ঢাকনিটা খুলে আবাব আঁট ক'বে বন্ধ কবতে-কবতে সুস্মিতা বললে, 'কিন্তু কেমন ঠেকছে যেন আমাব, সর্বেন-দা।'

'কেন?'

'আমাব বড্ড হাসি পাচ্ছে।'

'পাচ্ছে বেশ পাচ্ছে ; হেসে নাও।' সর্বেন বললে। 'তবে হাসিটা গিন্নী-বোগ যেন না-হয—'

'আপনি কী ক'বে ঠেকিযে বাখেন হাসি? খুব না-হেসে পাবেন যা-হোক আপনি—'

'গ্রিলে যাবে?'

'চলুন।'

সর্বেন কলমটা টেবিল থেকে তুলে নিযে বুক—পকেটে আঁটল ; উঠে দাঁড়াল।

'আমেবিকান কনসালেব সঙ্গে আমাব চা খাবাব কথা।'

'ফার্পো-তে?'

'না গো, ওঁব নিজেব মজলিসে,' একটু ভেবে বললে, 'কিন্তু তুমি সেখানে যাবে? নিযে যেতে পাবি

; কিন্তু না-যাওয়াই ভাল, তোমাকে কার্ড দেয়নি।'

তারপর বললে, 'তুমি অফিসেই থাক ; একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা কর—এই মিনিট পনেরো-কুড়ি ; এই একটা নোটিশ লিখে দিচ্ছি—' পকেট থেকে টেনে কলমটা আবার বার করল।

'কীসের মিটিং?'

'আমি বলছি তোমাকে। একটা ইয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া আর কী—'

ঘোষ লিখতে-লিখতে বললে, 'ও মরে গেল,—ওর ডিপার্টমেন্টের আট-দশজনকে ডেকে—'

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না সর্বেন ; সুস্মিতা হাসছে ; সর্বেনের নিজের খুব বেশি হাসি পাচ্ছিল না ; গম্ভীর হ'য়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল না তার ; কলমটা বুক—পকেটে রেখে দিল।

হাঁটতে-হাঁটতে দু'জনেই বাইরে চ'লে এল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি যখন যশোর রোড দিয়ে ছুটে চলেছে, সর্বেনের দিকে প্রথম যেন নজর পড়ল সুস্মিতার : পাশে ব'সে আছে? গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছে? মুখে কাপড় দিয়ে সুস্মিতা ফুলে-ফুলে হাসছিল—কতক্ষণ?—মিটারের দিকে তাকিয়ে হিসেব ক'রে নিতে-নিতে ঠোঁটের ওপর থেকে কাপড় খ'সে পড়ল তার।

'সারাটা পথ কী ভেবে হাসলে?'

'হেসেছি—চুপ ক'রে দেখলেন শুধু। বুঝি ভাবলেন, কোন চারা নেই। এদেরই সিদ্ধপুরুষ বলে। দর্শনার দিকে চলেছেন?'

'না গো, এবার ফিরব।'

'এটা কি ফেরার পথ? সামনের দিকে চলেছি—'

'সামনের দিকে? খুব খাই দেখছি গাড়িটার।'

'খাই! ক'-গ্যালন পেট্রল সঙ্গে এনেছেন, সর্বেন-দা? মনিবের চেয়ে তার চাকরের খাই কম হবে কেন।'

'বিশ গ্যালন।' সর্বেন বললে।

'হাসছ, সুস্মিতা?'

'সুস্মিতা হাসতে-হাসতে অন্ধ হ'য়ে পড়েছিল যেন—না, সন্ধ্যার অন্ধকার হ'য়ে গেল ; গাড়ি দর্শনার দিকে চলেছে—না, কলকাতার কাছাকাছি একটা মাঠের ভেতর হাড় জিরিয়ে নিচ্ছে, কেন ও-রকম সচ্চরিত্র ছেলের মত গম্ভীর ভাবে 'বিশ গ্যালন' বললে সর্বেন—যেন চরিত্রবান ছেলেরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে কথা বলছে ; সর্বেন বিশ গ্যালন পেট্রল সঙ্গে এনে সুস্মিতাকে বলছে, বিশ গ্যালন এনেছি;—যেন বাস্তবিকই এ-রকম সাধু ও গুরুতর ও গম্ভীর এই পৃথিবী, অসত্য লালসা ও দুর্বলতাগুলোকে অপরূপ ভাবে জয় ক'রে ফেলে—ভাবতে-ভাবতে হেসে থই পাচ্ছিল না সুস্মিতা।

'ক'-গ্যালন, সর্বেন-দা?'

'গ্যালন?' সর্বেনের গাড়ির হেড-লাইটি জ্ব'লে উঠল। 'তা বিশ গ্যালন তো হবেই।'

'বিশ?'

'হ্যাঁ, বিশ।' সর্বেন বললেন, 'তেইশ গ্যালন আনতাম ; তা তিন গ্যালন হরেন দত্ত নিয়ে গেল।' সর্বেন একটা গরুর-গাড়ির পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে গাড়ি চালিয়ে নিতে-নিতে শেষ করলে, 'বাকি থাকল—বিশ গ্যালন।'

'মোটর সট্‌কে চলছিল একপাল ঘূর্ণি উড়িয়ে, হাঁস তাড়িয়ে, একটা কুকুরের বাচ্চাকে চেপ্টে দিয়ে, গরু-মোষের একটা বিরাট দঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেসে—খেলে হাত-সাফাইয়ের প্রাঞ্জল অব্যর্থতায়।

কিন্তু কোথায়?

'হাসছ?'

'হাসতে-হাসতে শরীর-মন অন্ধকার হ'য়ে যাচ্ছিল সুস্মিতার।

অনেক রাতে হুমায়ুন প্রেসের থেকে.

অনেক বাতে হুমাযুন প্রেসেব থেকে বেবিযে চৌবঙ্গিতে এসে দাঁড়াল সোমনাথ। এত বাত অব্দি কোথা সে ছিল—কোথায ঘুবেছে—কি কবেছে—নিজেবই ভাল কবে কিছু খেযাল ছিল না তাব।

শেষ ট্রাম চলে গিযেছে।একটা বাস নক্ষত্রবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটে যাচ্ছিল— ওটা ধববাব কোন আশা নেই। একটা ট্যাক্সি কববে কিনা ভাবছিল সোমনাথ। কিন্তু আশ্চর্য হযে দেখল বাসটা হঠাৎ গতি নিযন্ত্রিত কবে খানিকটা সামনেই আস্তে আস্তে থেকে পড়েছে। একেবাবে থেমে গেল বাসটা। এক ভিড় খাকি প্যান্ট কোর্তাব মূর্তি না নামতে নামতেই সোমনাথ বাসেব সামনেব সিট দখল কবে বসে পড়ল। সে যখন তাব আস্তানায পৌছল তখন বাত একটা বেজে গেছে প্রায। —বাসেব থেকে নেমে অনেকখানি হাঁটতে হযেছে তাব। নিচেব তলাব ভাড়াটেবা দবজা বন্ধ কবে দিযেছে। দোতলায তাবি কক্ষে (কক্ষ তাব একটা মাত্রই; বেশ বড় অবিশ্যি: তেবপলেব পার্টিশন দিযে দুটো ঘব কবে নেওযা হযেছে। একটা শোবাব—আব একটা বসবাব— কাজ কববাব। দুইটা ঘবেই চেযাব টেবিল ও টেবিল ল্যাম্প আছে) আলো জ্বলছে— মনে হল তাব। হযতো সে বেব হবাব সময নিজেই আলো জ্বালিযে বেখে গিযেছিল— যতদূব মনে পড়ে দবজায কুলুপ এঁটে বেবিযে গিযেছিল সে। কিন্তু তবুও আলো নিবিযে বাব হযেছিল বলেই তো মনে পড়ে। দবজা কি খোলা বেখে গিযেছিল।

ফুটপাতে দাঁড়িযে সোমনাথ ভাবছিল ঘবে চোব ঢুকে জিনিস নিযে পালাযনি তো। ঘবে অনেকগুলো বই আছে তাব। দবকাবি কাগজপত্র আছে কিছু। পোশাক পবিচ্ছদ—ঘড়ি—সোনা-ক্যাশ বযেছে বটে এদিক সেদিকে ছড়ানো। খোলা দেবাজে একটা এক হাজাব টাকাব চেক সাইন ক'বে সে বেখে গিযেছিল— কালকেই ভাঙাবাব দবকাব বলে। সবই যদি কেউ এসে নিযে যায—ক্ষতি নেই তাব। কিন্তু তাব নিজেব লেখা পাণ্ডুলিপি কিছু আছে। সে সব সবিযে নিলে সোমনাথকে বাস্তবিকই দুদশ বছবেব মতন— হযতো সাবা জীবনেব জন্যই কানা কবে দেযা হবে।

নিচেব ভাড়াটেবা দুর্দান্ত বকমেব অসভ্য। এত বাতে কড়া নাড়লে সোডাব বোতল ছুঁড়ে মাববে তাকে। চেঁচিযে ডাকলে দোতলাব কেউ সাড়া দেবে না। দোতলাব ফ্ল্যাটে অন্য সব কামবায যে পবিবাবগুলো (কিংবা একটা পবিবাব কি?) থাকে তাদেব কারুব সঙ্গেই বিশেষ আলাপ নেই তাব। সোমনাথেব নিজেব ঘবটা বাস্তাব ওপবেই। নিচেব তলাব ঐ ওযাটাব পাইপটা বেযে বেযে সে ওপবে উঠতে পাবে বটে— তাবপব একটু কসবৎ; বাবান্দাব বেলিং ধবতে হবে— ঐ মাধবীলতাব ঝাড়টাকে খানিকটা পিষে ফেলতে হবে— এদিকে-ওদিকে এক আধটা ফুলেব টব ছিটকে পড়তে পাবে— গাযে কাঁদা লাগবে তাব নিশ্চযই— দামি ট্রাউজাব ও পপলিনেব শার্ট ছিড়েও যেতে পাবে— দড়াম কবে ও একটা টব নিচেব তলাব উঠানটাকে কববে চূর্ণ বিচূর্ণ—

কিন্তু তবুও পাইপ বেযে বেযে উঠতে শুরু কবল সে। নিচেব তলাব কেউ তাকে দেখে ফেললে সোডাব বোতলগুলো ছুটে আসবে বুলেটেব মতো— চিৎকাবে ফাযাব ব্রিগেডেব লোক ছুটে আসবে— সমস্ত প্রকাণ্ড বাড়িটা দিকে দিকে দপদপ কবে বিদ্যুতেব আলোয জ্বলে উঠবে।

কিন্তু সে পৌছে গেছে প্রায। বাবান্দাব বেলিং ধবল বলে। লতাগাছেব শক্ত জটা আঁকড়ে ধবে অজস্র লতাপাতা ফুল ও বৃষ্টিব জল (ঘণ্টাখানেক আগে এ পশলা হযে গিযেছিল এ পাড়ায) বিধ্বস্ত ক'বে— বাস্তবিকই সে ডান পা বসিযে— বিদ্যুতেব মতো ঘুবিযে দিযে বাঁ হাত— হঠাৎ একটা শক্ত জিনিস দু হাতে আঁকড়ে ধবে— ডিগবাজি খেযে যখন টাল সামলাতে লাগল— তখন সে বুঝতে পাবল যে নিজেবই ঘবেব বাবান্দায মাতালেব মতন পাক খাচ্ছে সে।

নিচেব তলায গুঞ্জবণ শোনা গেল— তাবপব ঈষৎ চিৎকাব—সোমনাথকে লক্ষ্য কবে তেড়ে চালায নানাবকম সাদব সম্ভাষণ— তাবপব দু-একটা পাটকেল। এতক্ষণ সে বাবান্দায দাঁড়িযেই ছিল— এবাব ঘবেব ভিতব ঢুকতে গিযে টেব পেল— দবজা তাব খোলাই বযেছে— ভিতবে বাতি তেমনই জ্বলে আছে।

ঘবেব ভিতব চড়া বিদ্যুতের আলোয চোখ ঝলসে গেল প্রথমে। সেই আলো-অন্ধকাব ভিতব একবাব

চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোমনাথের মনে হল— সবই ঠিক আছে, কোথাও খোয়া যায়নি কিছু। খিদে পেয়েছিল— কিন্তু এমন বিশেষ কিছু নয়— নানা জায়গায় অনেক রকম খুচরো খাওয়া চলেছে গত চার পাঁচ ঘণ্টার ভিতর। জল ঢেলে নিয়ে কাঁচের গ্লাস হাতে করে নিজের বিবর্ণ কৌচের ওপর গিয়ে বসতেই সোমনাথের বোধ হয় এই ঘরের ভিতর কেউ রয়েছে।

সে সাহসী কি ভীরু জোয়ান কি কমজোর এ সব সহজ প্রশ্ন অবান্তর বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। এখানে সাহসের কোনো কথা নেই— ভীরুতাও ভয় পাবে না হযতো। অন্তত সোমনাথ যদি অতিরিক্ত রকমের সাহসী (স্বভাবতই যা সে) না হয়ে ভীরুই হত— তাহলেও যেহেতু সে জোয়ান— প্রায় মধ্যবয়সী— ঘরে বিদ্যুতের আলো অভয়ধর্মী— এবং আরো অনেক সুযোগ সুবিধা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে— এ সব কারণেই সে ভয় পেত না। কিন্তু এ সবই প্রমাণ করে যে সোমনাথ অসমসাহসী না হলেও বে' রোয়া সাহসকে কল্পনাসক্ত করে মজিযে নিয়ে একটু অনুভূতিপ্রবণ সাহসী মানুষ। সে তাই সমস্ত ঘরটা ঘুরে পরীক্ষা করে দেখতে গেল না; নির্বোধ হঠকারিতার নির্মলতায় বাতি নিবিযে শুযেও পড়ল না বিছানায়— বিশ্রামের দরকার যদিও— এখুনি দরকার— ঘুমও পেয়েছিল যদিও।

সোমনাথ কাচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আবহটা যতদূর সম্ভব শোষণ কবে নেবার জন্য অপেক্ষা করছিল। কথা ভাবছিল। মাঝে মাঝে একটু আধটু গায়ে কাঁটা দিযে উঠছিল না যে তাব তা নয়— কিন্তু সে তার অনুভূতি মদিরতার জন্য।

কোথাও কিছু নেই তাহলে? নিশ্চযই কেউ রযেছে যদিও। হযতো পাশের কামরায়—যেখানে সে ঢোকেনি এখনও। হযতো এ ঘরেই— এ ঘরের বাতিটা নিবানো ভাল করে চারদিকে তাকিযে দেখবার অবসরও হয নি তার।

জল খেয়ে শেষ করতে হবে। ঢক ঢক করে প্রথম গ্লাস শেষ কবেছে সে। এটা দ্বিতীয় গ্লাস। জুতো খুলতে হবে তারপর— ট্রাউজার—টাই শার্ট— সবই খুলতে হবে।

ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে এ সব সে করে যাচ্ছিল। পাযজামা চপ্পলে ঝর্ঝরে হযে একটা সাদা শার্ট পরছিল— হঠাৎ খট করে একটা শব্দ হতেই সোমনাথ জিজ্ঞেস করল— কে? বেড়াল নাকি!

—আমি

—তুমি কে?

—বাতি জ্বালিও না সোমনাথ। আমি।

সোমনাথ তার বিবর্ণ কৌচের ওপর বসে পড়ে বললে— মানুষ নিশ্চযই

—স্ত্রীলোক গলার স্বরেই তো বুঝতে পারছ।

— তুমি এখানে?

—আমাকে চিনতে পারছ—

—চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি আমার বিছানায?

—হ্যাঁ। তুমি চোখে কম দেখ সোমনাথ।

—হ্যাঁ। চোখ খারাপ হযে যাচ্ছে আমার। চশমা নিচ্ছি না— কোন স্পেশালিস্ট বলে চশমায় হবে না কিছু— চোখের শিরা শুকিযে যাচ্ছে। তুমি আমাকে বোলো না, আমি বলে দেব কে তুমি তোমার গলা চেনা মনে হচ্ছে।

—চেনা মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। কিন্তু তবুও ঠিক ধরতে পারছি না। অনেক দিন আগের কথা—

—অনেক —অনেক দিন—

—হযেছে কি জান— তোমার গলা আরো এক জনেব গলার মত। কিন্তু পার্থক্য আছে, অথচ সে সূক্ষ্মতা ধরবার জন্য

তুমি মেযেদের সঙ্গে মিশেছ ঢের— আমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর?

সোমনাথ পকেট থেকে সিগারেট বের করে বললে— তুমি যদি অনুমতি কর তাহলে জ্বালাতে পারি—

—দশ পনেরো বছর আগে—

—হ্যাঁ দশ বারো বছর আগে তোমরা দুজন ছিলে। কিন্তু সে দুজনের ভিতর কে তুমি—সেইটাই আমি ঠিক করে উঠতে পারছি না।

—এখনও না? আমার এত কথা শুনবার পরও? সোমনাথ, তোমার চোখ নেই, কান নেই। বয়স যদি

চল্লিশ পেরিয়েছে। —কোথায় সেই কঠিন মানুষটি— জলেব তলোযারের মতই ছিলে তুমি একদিন। জলের তলোযাবের মত' বিশাখা থেকে বললে' কিন্তু ঐ উপমা তোমাবই তৈরি। এ বকম ব্যক্তিগত ভাষা— না পবিভাষা বলব?

—অতসী, এই বাব বাতিটা জ্বালব?

— আমি অতসী? কি আশ্চর্য তোমাব মাথা খাবাপ হযেছে সোমনাথ।

সোমনাথ সিগাবেট জ্বালিযে বললে— বিশাখা তাহলে— তুমি— কী আশ্চর্য— তোমবা দু বোনই প্রায একবকম— কথায বার্তায— হাসি হুল্লোড়ে— নিজেদেব ভিতব ফিবে যাবাব শক্তিতে। সেখান থেকে তোমাদেব নাবানো কঠিন ছিল।

—নাবানো কঠিন ছিল?

— তাই তো মনে হত।

—কোন বিষযে তুমি অধ্যাবসাযেব পবিচয দাওনি— এ কথা আমি বলব না।

—তা আব বল কি কবে—

—বাত একটাব সময কী কবে ওযাটাব পাইপ বেযে উপড়ে উঠে আসতে হয— এ তোমাব টিলেমিব পবিচয নয। আমি অনেক পুরুষ মানুষ জানি যাবা ববং ফুটপাতে ঘুমিযে পড়ত, তবু।— বিশাখা বালিশটা বাঁ কাঁধেব নিচে টেনে নিযে বললে: তুমি খুব resorceful সোমনাথ।

—কিন্তু তবুও হল না তো কিছু—

—আমাদেব নাবানো শক্ত ছিল— কিন্তু এ বকম পাইপ বেযে উঠে দেখাতে পাবতে যদি আমাদেব— তোমাব প্রদর্শনীশক্তিব জন্যেই নয সোমনাথ— অন্য কাবণেও তোমাকে ঠিক কবে বিচাব কববাব ভাব সর্বান্তঃকবণে গ্রহণ কবতাম আমি।

—তুমি?

—আমি আব অতসী— আমি একা পাবতাম না কি?

—বাবো বছব পবে তোমাব সঙ্গে দেখা। এতদিন কোথায ছিলে?

—যত জাযগায থাকা সম্ভব হতে পাবে—

—শুনেছিলুম প্যাবিসে গিযেছিলে—

—ওঃ— সে কথা তোমাব কানেও ঢুকেছে।

—কবে গিযেছিলে?

—বম্বিং এব সময

—প্যাবিস তো ওপন সিটি হল— জার্মানবা নিযে নিলে—

—সে সব কথা সুযোগ পেলে বলা যাবে সোমনাথ। সে সুযোগ জুটবে বলে মনে হয না। আমি গবিবেব মেযে, কিন্তু দামি পুরুষ জুটেছিল— যুদ্ধেব সময ইযোবোপে আটকা পড়ে গিযেছিলুম।

সোমনাথ সিগাবেটেব ধোঁযা ছেড়ে বললে— আমাব শত পাঁচেক চিঠি তোমাব কাছে আছে—

বিশাখা হযতে ভুরু কুঁচকে হাসছিল, গলাব স্ববে মনে হল, বললে— আমি অডিটবগিবি ছেড়ে দিযেছি অনেক দিন। অতসী চালিযেছিল আবো কিছুদিন। কিন্তু সেও বুড়িযে গেছে—

—বুড়িযে গেছে? তোমাদেব বযস তো ৩০/৩২-এব বেশি নয। বাতি জ্বালব?

—না।

—তোমাব চিঠি আমাদেব কাছে আছে কিনা সন্দেহ। তোমাকে বিদায দেবাব পব— সোমনাথ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও তো।

গ্লাস এগিযে দিযে সোমনাথ তাব ধূসব কৌচেব ওপব এসে বসল।

বিশাখা এক নিঃশ্বাসে জল শেষ না কবে আস্তে, দুলিযে, গ্লাস নাচিযে নাচিযে খাচ্ছিল— কিছুটা জল তাব চোখে মুখে কাপড়ে ছিটকে পড়ছিল।

—কার্লেকাবেব গোটা পঁচিশেক চিঠি আজো বেখে দিযেছি; মি সেনেব পাঁচটা; মজুমদাব সাহেবেব একখানা, মহলানবীশেব গোটা তিনেক— কিন্তু তা আমাদেব কাছে লেখা হয নি, লেখা হযেছিল বাবাব কাছে, অথচ আমাদেব কটূক্তি কবে আগাগোড়া— খুব ঝাল লেগেছিল বলে আজো রেখে দিযেছি।

বিশাখা জলেব গ্লাসে চুমুক দিযে অতসী হল মিউজিযামেব ক্যাবেটব—

—কার্লেকাব কে?

—একজন বিদেশী—

—এর সঙ্গেই ইউরোপ গিয়েছিলে বুঝি।

—না। ইফতিকারউদ্দীনের সঙ্গে গিয়েছিলুম—

—বিয়ে করেছিলে তাকে?

—আমি মুখুর্জ্যের মেয়ে। বিশাখা শ্লেষের সঙ্গে হেসে বললে— ইফতিকারকে বিয়ে করেছিলুম বই কি। নাহ'লে কি করে ইয়োরোপ সম্ভব হয়। আজকের পৃথিবীতে আইন নেই, কিন্তু তবুও সবই আইনসঙ্গত হওয়া দরকার। আমার জন্যও শুধু নয়, ইফতিকারের যে জেল হবে— তাকে বে—আইনি পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হলে সেটা কি ভাল হত? শিশুদের বরাবরই কৃপার পাত্র মনে করি। ওরা কেন আনন্দে বঞ্চিত হবে— যদি আনন্দে ওদের জন্ম হয়?

—তোমার ছেলে কোথায়— সোমনাথের সিগাবেট পুড়ে শেষ হয়ে আসছিল।

—ছেলে নয়। মেয়ে হয়েছিল—

—ওঃ, কত বড় হয়েছে। আমি—

—হয়েই মরে গেছে—

বিশাখার সহজ বাক্যের প্রতিধ্বনি করে তেমনি স্বাভাবিক গলায় সোমনাথ বললে— ইয়োরোপে হয়েছিল?—

—না

—ইফতিকার সাহেব এখন কোথায?

—কেন দেখা করতে হবে না কি তার সঙ্গে?

— তোমার খোঁজে এখানে আসবেন না?

— তোমাব সঙ্গে দেখা করবার জন্য?

—পাইপ বেযে উঠতে হবে তাহলে

—তাব মিনার্ভা গাড়ি এলে সকলেই দবজা খুলে দেবে।

সোমনাথ উঠে বাতিটা জ্বালিযে দিল।

বিশাখা ত্রস্ত হয়ে একটু নড়াচড়া করে নিজেকে গুছিযে নিযে বললে— এটা তোমার অন্যায হল।

সোমনাথ এব মুখের দিকে তাকিয়ে বললে— বারো বছর যেন কেটেই যাযনি। যদি বলি অতসীর মতন দেখাচ্ছে তোমাকে। সোমনাথ পাঁচ-সাত হাত দূরে তার কৌচের থেকে কথা বলছিল।

— সে তো ম্যুজিযামেব ক্যুরেটর। পুষে রাখে সব। অতসী বলতে পাবে তোমার কোন চিঠি আমাদের কমন ফান্ডে আছে কিনা। যদি থেকে থাকে— একখানা আছে হযতো— তাহলে তার museum-এর শিগগির তা নষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে অতসীর মত দেখাচ্ছে সোমনাথ—

—দুজনেই তো প্রায এক রকম দেখতে ছিলে। কী যে ব্যতিক্রম ছিল, তখন খুব ভাল করে জানা ছিল— আজ ঘুলিযে যাচ্ছে।।

— তা ঠিক। তাই আজো এত দিন পরে তোমার মনে হচ্ছে যে অন্ধকার— তোমার ঘরে-বিছানাব থেকে যে লোকটা কথা বললে সে অতসী না হযে যায না।

সোমনাথ মাথা নেড়ে বললে— অতসীও তো হতে পাবত। সে বিযে করেছে?

—না।

—তোমাদের সঙ্গে ইফতিকার সাহেবেব সঙ্গে ইয়োরোপ গিয়েছিল—?

—না

—কোথা আছে সে। কী করছে?

—টালিগঞ্জে ইস্কুল খুলেছে। অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হযনি আমার।

গেলাসের সব জল শেষ করে গেলাসটা খাটের নিচে সরিয়ে রেখে দিল বিশাখা। বললে— অতসীর আর আমার সবই এক রকম। শুধু আমি ওর চেয়ে ঢের বেশি টাকা করেছি— এই। কিন্তু এই জন্য কেমন যেন বিশ্রী লাগে সোমনাথ

সোমনাথ টেবিল থেকে সিগারেটের কৌটা জোগাড় করে এনে বললে— কেন?

—ওকে ফেলে যা আমার কাছে আসে সকলেই আসে প্রায় তারা টাকার মূল্যে। ওয়াকিবহাল হয়ে আসে। মনে হয আমার। জিনিসটা হযতো সত্যি নয়— সত্যিই অনেক সময় সত্যি নয়। কিন্তু তবুও এ

ছাড়া অন্য কিছু ভাবাও আমাব পক্ষে কঠিন।

—অতসীব সঙ্গে তোমাব নিজেকে তুলনা কবে দেখবাব কোন প্রশ্নই ওঠে না এখন আব।— সোমনাথ অভয দিযে বললে।

—কিন্তু কেন? বিশাখা জিজ্ঞেস কবল তবুও।

—সে অবিশ্যি আমাব এখানে আসত না—

— না। কিন্তু কেন?

—ইস্কুল অতসী খুলেছে। মেযেদেব হাতে প্রাক্তন পৃথিবীব সমাধিব ওপবেই এ বকম একটা গবমিল তৈবি হয। ইস্কুল সফল কববাব মত মেযে ও নয। তাদেব ধাত আলাদা। কিন্তু বোন তোমাব ওষুধ খুঁজে পেযেছে। তাকে আব স্বাভাবিক অবস্থায ফিবে পাওযা যাবে না।

— 'কিন্তু তবুও' বিশাখা বললে' ও-ই আমাকে ভাবিযে তোলে। ওকে আমি ঈর্ষা কবি সোমনাথ।

—কেন?

—ও টাকাকড়ি নেই বলে নয। ওব চেযে ঢেব বেশি আমাব— ওব চেযে ঢেব সুখে আছি আমি তাই। ওব চেযে ঢেব বড়ও আমি তাই। টাকাটাই সব চেযে বড়।

ঘবেব চাবদিকে একবাব তাকিযে নিযে বিশাখা বললে— কিন্তু কার্লেকাবকে দেখেছি— সেনকে দেখেছি— সকলকেই দেখেছি অতসীকে বোনেব মতন ভালবাসে; কিন্তু আমাব কাছ থেকে অন্য কিছুব খোঁজ কবে। কিন্তু সকলকে আমি সে জিনিস দেই কী কবে।

— দেওযাব কী দবকাব। সোমনাথ বললে

—অতসীব ঠিকানা তোমাকে দিযে দিচ্ছি

সোমনাথ মাথা নেড়ে বললে— থাক

—কেন? সময নেই তোমাব—

— না। তা নয, সময অতিবিক্ত বকমে বযেছে বলেই মাঝে মাঝে মনে হয, কর্মতালিকা কী হবে, শুধুই কি ঘুমাবো আব যা তা মুখে আসে খাব— যে বুড়িযে যায তাব সঙ্গেই ঘুবব?

—এই বকম হযে গেছে বুঝি তোমাব জীবন। তা আমি ভাবছিলুম। কোনো কাগজপত্রে কোথাও তোমাব নাম দেখা যায না।। কোনো মিটিং-এ চেনে না তোমাকে কেউ। সাহিত্যেব নানাবকম নামই আজকাল কানে আসে— বইগুলো পড়ে দেখা হয না অবিশ্যি আমাব। কিন্তু তুমি তো কোন বই লেখনি।। লিখেছ সোমনাথ? নাম শুনিনি তো তোমাব।

—একটা কিছু কবব ভাবছি।

—ক'দিন থেকে—?

— তা এই বিশ বছব তো হযে গেল।

বিশাখা একটু হেসে বললে— এইবকম লোকেব জন্যই অতসীব প্রযোজন। আমি তাব জন্য ঘটকালি কবতে আসি নি। সে বিযে কববে না— কবলেও তোমাকে নয। তবে স্ত্রীলোকেব সংস্রব তুমি আজকাল একেবাবেই পবিত্যাগ কবেছ শুনেছি। — তাবাই তোমাকে ছেড়ে গেছে হযতো। শুধু নানাবকম পোলিটিকসেব camp follower হযে —এটা কবব— সেটা উচ্ছন্ন যাক মনে কবে তেতাল্লিশ বছব হযে গেল তোমাব। এ পথ ছোকবাদেব— যাদেব মন বর্ণালিব মত ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু আমাদেব একটা জিনিসকে ধবতে হবে।

—একটা কিছু কবব ভাবছি. সোমনা বললে

বিশাখা একটু চুপ থেকে বললে— কলকাতা ছেড়ে যাওযা হয কোথাও

—না

—এক ঘবেই বাবো বছব কাটালে?

—এব আগে ছিলুম

কিন্তু কথাটা শেষ কবলে না সে।

—প্রথম স্ত্রী কোথায?

—আমি বিযে কবিনি।

—একেবাবেই না।

—একেবাবেই না। মানে? দবকাব হলে একটু মুস্কিলে পড়ি। কিন্তু সে সবেব জন্যে নানাবকম পথ

রয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে নির্বিঘ্ন পথই বেছে নিয়েছি আমি।

সোমনাথ বললে— একটা চাকর রেখেছি

—চাকরানি?

—হ্যাঁ। সকালে দু ঘণ্টা কাজ করে দিয়ে যায়। ওতেই হয়ে যায় আমার। হোটেলে যাই। টাকা অনেক আগে আসত শেয়ার মার্কেট থেকে— বীরেন মিত্তিরকে চেন? ভুলে গেছ। ও শেয়ার মার্কেট থেকে টাকা গুছিয়ে আনত, আমি ভাগ করে নিতাম, নিজে যাই নি ওসব জায়গা কোনোদিন। বীরেন চলে গেল— রাগ করেই চলে গেল, বিয়ে করল, সে তো এখন বড় লোক— ব্যাঙ্কে চাকরি নেব ভেবেছিলুম, কিন্তু সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি; একটা প্রেসে কাজ করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু টেকনিক্যাল জিনিস জানা নেই, প্রুফ দেখতেও শিখিনি, আমি শিখে নেব বলাতে ওরা রাজি হল না, ইস্কুল মাস্টারি মাস দুই করেছিলাম, এক মাস মেয়েদের কলেজ পড়িয়েছিলুম, ইংরেজি বা বাংলা কাগজে ঢোকা যেতে পাবে ভেবে এক মাস মন দিয়ে নানারকম কাগজ পড়েছিলাম। খবরের কাগজ পড়া সাঙ্গ হলে মনে হত হয়তো লিডাব লিখতে পারা যাবে— কিন্তু বিকেল বেলা ঘুমের থেকে উঠে মনে হত— পাবা যাবে না। কিন্তু তবুও করতুম হযতো কাগজে কাজ— কিন্তু যুদ্ধ এল Inflation আরম্ভ হল— ওরা আমাকে ১৫০ টাকা দিতে চাইল— আমি সাড়ে তিনশোর কমে নিতে পারব না বলে দিলুম। Inflation-এর বাজাবে ৩৫০ টাকার কমে কলকাতায় চলে কী কবে বিশাখা?—

—কিন্তু কিছু না কবে চলছে কী কবে সোমনাথ?

—খুব Boom চলছে। আমি আবার শেযার মার্কেটে ঘুবছি।

— তুমি নিজে?

—না। এক চাঁই জুটেছে। টাকা কুড়িয়ে আনে— ভাগ কবে নিই।

বিশাখ কিছুক্ষণেব জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কি ভাবছিল যেন সে।

সোমনাথ বললে— এইবার আমি একটা কিছু কবব ভাবছি। একটা ব্যবসা। ঠিক করেছি Paint varnish এব একটা দোকান খুলব আমরা তিনজনে মিলে। সম্প্রতি গালা তৈবি করব আমি— একাই ভাবছি। গালা আব ব্যাকোলাইট।

—ব্যাকোলাইট? পুতুলেব মতন বললে বিশাখা। তাব মন চলে গিয়েছিল অনেক দূবে।

—এব বাজাব রযেছে কলকাতায। না, টাকাব কথা আমাকে ভাবতে হবে না। একা মানুষ বলেই নয। বিযে কবলেও আমি ঠিক কবে নিতে পারতাম সব। কিন্তু রুটি খেযে গোস্ত রুটি পেযেও মানুষের নিজেব প্রতি সুবিচার হয না। তা আমি জানি। কিন্তু কী কবব? কোথায যেতে হবে? কোন politics-এ

—কোনো পার্টিতেই যেতে পাবলে না তুমি।

—সব পার্টিতেই আছি বলে মনে হয; কিন্তু কোনোটাকেই বরদাস্ত করতে পাবছি না। ঘবে ফিবে এসে এটা ওটা সেটাব মোটা কথাগুলো মন্দ লাগে না— কিন্তু দলে ভিড়ে ওদেব পার্টি মিটিঙে গিযে যখন নানাবকম মুখ দেখি— নিজেদেব জিনিস ছাড়া পৃথিবীব আব সবই মিথ্যা— জানিযে দেবার মত গলাব মাৎসর্য্যেব গভীব সততা খুঁজে পাই যখন এব ওব গলায— তখন নিজেকে বড় অসৎ মনে হয।

সোমনাথ বললে— তা ছাড়া মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত শক্তিও আমাব নেই। ও রকম সততা ওরা পায কী কবে— অত কথা গুছিযে বলে কি করে।

ওদের বক্তব্য অবিশ্যি ছাপার অক্ষবে মনে মোটেই দাগ কাটতে চায না। কিন্তু মাইকের সামনে ওদের এক এক জনের এক এক ঘণ্টা একটা বিচিত্র জিনিসের পবিচয দেয। জিনিসটা মহৎ, না হলেও ভযাবহ রকমে সৎ; সত্যিকাবের ভযাবহতা নয। যে পথ ধরে চলেছি তাতে তো আমাকেও ওদের দিকেই অগ্রসর হতে হয— কিন্তু আমার সে জিনিস নেই; বিচাবসহ আবেগ অনুভব করি মাঝে মাঝে, কিন্তু তাতে কিছু হয না।

—কিন্তু ওরকমভাবে politics-এ যেতে হবে— ওর কোন মানে আছে সোমনাথ?

অনেক দিন থেকে Congress. league. socialism. communism করছি। পার্টি ছেড়ে এখন শুধু বিশুদ্ধ এ মন দিতে গেলে ভিত শুদ্ধ উপড়ে পড়ে যাব।

—অনেকগুলো পার্টির তো নাম করলে—

—এখন একটা তখন একটা এবকম করে ঘুরেছি এ দলে ও দলে—

বিশাখা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল— বারো বছর পবে তোমার সঙ্গে আমার আবার পরিচয হল সোমনাথ।

—আমি আজকাল একটু আধটু মদ খাই।

—সেটা বলা অনাবশ্যক—

—'কেন'? সোমনাথ হেসে বললে 'আমার ঘরে ঢুকতেই রকমারি বোতল দেখেছিলে হয়তো। খাবে?

বিশাখা বললে— ভোর হতে এখন ঢের দেরি— ভোরের দিকে এক আধ চুমুক চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু ও জিনিস আমি খাই না। সাহেব কখনও আমাকে খেতে বলেননি। সোমনাথ, তুমি তো মদ খাবেই—

— না খেয়ে থাকব কি করে। কিছুই তো কেউ আমাকে দিল না।

সোমনাথ মদের বোতল খুঁজতে চলে গেল। একটা বোতল নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখল। পেগ আনল, গ্লাসও আনল। সোডা নিয়ে এল। বিশাখার দিকে তাকিয়ে বললে সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করে রাখলাম। তোমার উৎসাহ নেই— আমিও এখুনি চাই না কিছু।

বিশাখা স্কচ বোতলটার দিকে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থেকে সোমনাথের দিকে ফিরে বললে— তাহলে এই পথ ধরেই চললে তুমি—

—হ্যাঁ বোতলের পৃথিবী ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে

—আজো তো মদ খেয়েছ— এর মানে?

—গন্ধ পাচ্ছ?

—পেয়েছি বই কি। ঢোকা মাত্রই। কোথায় খেলে?

—আজ? হুমায়ুন place-এ grand-এ আরো দু এক জায়গায়। ছোটখাট নানারকম পার্টির ভিড়ে—। মানবসেবা নেমে গেল দেশ সেবায়, দেশপ্রেম ডুবে গেল দলাদলিতে, party politics ও মদের বোতলে পর্যবসিত হল সবশেষে। কিন্তু এ সব সম্পর্কে খুবই সজাগ আছি। সবই বুঝি। বুঝি যে অত বেশি বোঝা, অত কঠিনভাবে চোখ শানানো ভাল নয়। কিন্তু আজকালকার politics-এ কোন মুদ্রারাক্ষস এ ছাড়া আর কী করতে পারে। আমি অবশ্যি ভালোবাসি তাকে, কিন্তু মুদ্রারাক্ষস নই আমি। কাজেই এ সব খেতে হচ্ছে আমায়।

বিশাখাকে বললে সোমনাথ— আমি এসব ছেড়ে দিতে পারি— সব—সব—সে হাত দিয়ে সব সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে বললে— কিন্তু ছাড়াবে কে' তুমি পারবে?

বিশাখা মাথা নেড়ে বললে— এসব জিনিস নিজেই ছেড়ে দিতে হয়

—বদলে কী গ্রহণ করতে হয়।

—সেটা প্রত্যেক পুরুষমানুষ নিজেই ঠিক করে।

—তুমি এত রাতে এখানে কী করে এলে।

—সাহেব নিজেই পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন—

—কখন?

—রাত নটা নাগাদ

—সেই থেকে শুয়ে আছ!

—হ্যাঁ— ঘুমুচ্ছিলুম।

—আমি যে এখানে থাকি তা কী করে জানলেন তিনি

—আমি জানতাম

বিশাখা বললে— তোমাদের এই পাঞ্জাবী মুসলমানদের বাড়িটা খুব বড় বটে। কিন্তু ঘুমোবার জায়গা পেলুম না আর লোক গিস্‌গিস্ করছে সব দিকেই— তোমার ঘরেই আসতে হল। ঘর খোলা ছিল। খোলা রেখে গিয়েছিলে কেন?

সোমনাথ চুরুট জ্বালিয়ে বললে— সাহেব হয়ত পাশের ঘরেই

—কী করে বুঝলে তুমি

ওখানে Assembly-র কয়েকজন member থাকে। শলা পরামর্শ হচ্ছে বুঝি?

—হ্যাঁ, বাংলাদেশ কী করে শাসন করা যায় সেই জন্য।

—সাহেবের মোটর তো দেখলাম না বাইরে।

—ভেতরে garage এনে রাখা হয়েছে হয়তো। বৃষ্টি পড়ছিল। কিংবা কে জানে চলে গেছে। ভোরের দিকে আসবে হয়তো।

সোমনাথ বললে— রাত এখন সাড়ে তিনটে বিশাখা। এখন তাহলে খাওয়া যেতে পারে। তুমি খাবে তো?

—সাহেব হয়তো এসে পড়তে পারেন। তুমি খাও। আমি একটু ঘুমোই

কিন্তু ঘুমোল না সে। সোমনাথও ছিপি খুলতে গেল না।

—আমি লিখতে পারি। কিছুদিন থেকে লিখছি। আমার দু-একটা লেখা তুমি দেখবে?

—এখন নয়।

—তুমি চোখ বুজেই থাক। আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি।

—এখন নয় সোমনাথ।

—ইংরেজিতে লিখি নি কিন্তু

—তা জানি। লিখেছ বাংলায়। প্রবন্ধ নয়— কবিতা হযতো— হযতো লিখেছ গল্পই— কিন্তু তবুও শোনবার মত ধৈর্য আমার নেই।

—তুমি ঘুমোতে চাও?

—না।

—কথা বলতে চাও?

—কথা তো হচ্ছেই—

—আমার ঘুম পেযেছে—

—এসো। আমি উঠি তাহলে

— কোথায যাবে?

—সাহেবের ওখানে। না পাওয়া গেলে আস্তানায চলে যাব। কিংবা-বিশাখা বললে 'অন্য কোথাও।'

কিন্তু তবুও সে শুযে বইল। সোমনাথ মদের বোতলের ছিপি না খুলে বোতলটাকে রেখে এল আরেক ঘরে—যথাস্থানে। তারপর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে নিজের বিবর্ণ কৌচে গিযে বসল সে।

—'বাবো বছর আগে তোমাদেব সঙ্গে শেষ দেখা।' সোমনাথ ঠাণ্ডা গেলাসেব দিকে তাকিযে বললে 'তারপবও মেযেদের সঙ্গে মিশেছি আমি। কিন্তু আমি জ্যোতিষশাস্ত্র পড়েছি বলেই ওবা হযতো হাত বাড়িযে জীবন বহস্য জানতে এসেছে আমাব কাছে— প্রাণের টানে স্পর্শ উপভোগ কবতে দেযনি। অনেক রকম হাত স্পর্শ করে দেখেছি আমি। কিন্তু—

— জ্যোতিষী শিখলে কবে?

— এবি মধ্যে। তোমাব হাত বাড়িযে দিও না।

— ওদের হাত কেমন লাগল।

— সমুদ্রেব পাড়ে ঝিনুক কুড়োতে যেমন লাগে।

— কেমন লাগে তা তো আমাব জানা নেই।

শিশুদের কেমন লাগে তা আমিও ভুলে গেছি। কিন্তু বড়দের কেমন লাগে?

—চলে যাবাব আগে আমার হাতটা দেখে দিতে হবে একবার। বড়দেব ভালো লাগে না। একটা নীরস নির্জীব ব্যাপার আর কী। ছোটদের আনন্দ দেবাব, মজা পাইয়ে দেবাব জন্য একটা বোকা কাজ করা।

—কিন্তু ঝিনুক নুড়ি ছাড়িযে পাশের সমুদ্রকে কি রকম?

—সেটা বেশ

—কতদূর যেতে ইচ্ছে করে?

—একেবারে শেষ অব্দি

—তোমাদের বেলাও ঝিনুকই কুড়িয়েছি, কিন্তু তখন শিশু ছিলাম। কুড়োবার সে কী গভীর লোভ। কুড়িয়ে সে কী আশ্চর্য শিহরণ। সমুদ্রও দেখেছি সে সময়— কিন্তু শিশু ছিলাম। তাতেও উৎসব। কিন্তু বড়বা সমুদ্র দেখে তাতে প্রবেশ করে একটা গভীর বিষণ্ণতা ও আনন্দ নিযে। সে সমুদ্র আজকে কেউই দেবে না, কিন্তু কেউ তো দান করল না সেদিন।

—আমরা কি মৃত সমুদ্র

—না

—তবে

—অনেক দূরের সমুদ্র আজ। কাছে যে সব সমুদ্র দেখতে পাই— সেগুলো—উপলক্ষ্য পেলে

চাবদিক থেকে ঘিবে ফেলতে যাবে মানুষকে— কিন্তু না চাইলেও হয়তো ঝিনুক নুড়ি দেবে— হাত বাড়িযে দেবে জ্যোতিষীকে হস্তবেখা পড়িযে নেবাব জন্য—কিন্তু নাবী যে সমুদ্র সেটা বুঝবাব অবকাশ— আমাব মতন মানুষেব পক্ষে— ওদেব মতন স্ত্রীলোকেব কাছ থেকে— অসম্ভব শক্ত। আমি চাইও না তা।

—কিন্তু অতসীব— আমাব সমুদ্র কি—

—কোথায সবে গিযেছে সে সব—!

—এই তো এইখানেই আছে। বিশাখা বলতে চাইল। কিন্তু মুখ ফুটে বলবাব মতন সাহস ও আবেগও শুকিযে গেছে তাব। চোখ বুজে শুনতে পেল সমযেব গতিব মতন, শিশিবেব শব্দেব মতন সুবে সময তাকে তখনও শোষণ কবে চলেছে, শোষণ কবছে তাকে টাকা ও টাকাব মানুষগুলো— টাকাব চেযে যে বড় কিছু নেই— এ আন্তবিকতা তাব অন্তবকে কী হৃদযহীনভাবে শোষণ কবে চলেছে। এ সবেব থেকে নিষ্কৃতি পাবাব জন্যই সোমনাথেব কাছে এসেছিল সে, কিন্তু টাকাব চেযে বড় বাস্তবিকই তো কিছুই নেই— কী আব বড় আছে টাকাব মানুষগুলোব চেযে?— এ সোমনাথ যাব এক কপর্দকও নেই?

—মৃত নয। বযে গেছে। কিন্তু দৃষ্টি-চক্রবালেব অতীত মনে হয মাঝে মাঝে সুব ভেসে আসে সে সব সমুদ্রেব। কিন্তু যা শুকিযে যাচ্ছে সুব কোথায পাবে তা— থেকে থেকে একটা অবক্ষযেব গুঞ্জবন ছাড়া ভাবছিল সোমনাথ।

—বাস্তবিকই কি তুমি Iftikaruddin-কে বিযে কবেছ বিশাখা?

—না

—তবে কাকে?

—খুব একজন বড় মানুষকে। সাদা বাজাবেই বড় হযে গিযেছিল। তাবপব সময এল যখন— কালোবাজাবও কবতে হযেছে তাকে। এই নাও— ওঁব কার্ড আমাব কাছে আছে। ব্লাউজেব ভেতব থেকে কার্ড বাব কবে সোমনাথকে দিল।

—যেও আমাদেব ওদিকে বেড়াতে। আমি প্রাযই থাকি না। এক নাগাড়ে গেলে এক দিন দেখা হযে যাবে।

—এত বাতে আমাব এখানে এসেছ তা সে জানে।

— কলকাতায নেই, সিমলা গিযেছে।

— আমাব ঠিকানা জানলে কি কবে?

—মিত্তিব সাহেবেব কাছ থেকে

—বীবেন? তোমাব ওখানে যায?

—সেই তো বেখে গেল আমাকে

—কিসেব জন্য?

—তোমাব কথা তাকে খুব কবাব জিজ্ঞেস কবেছিলুম বলে। অভিমান হ'ল তাব. নাকি ঈর্ষা। কিন্তু তোমাকে দেখবাব দবকাব ছিল আমাব। ভেবেছিলুম তুমি নতুন কিছু হযেছ। কিন্তু তুমি আগেব মতনই আছ সোমনাথ— সেইজন্যই তোমাকে মদ খেতে হবেই। ভোব হযে গেছে। ওবা নিচেব দবজা খুলে দিযেছে।

—আচ্ছা উঠি।

—এসো তাহলে।

—তুমি নিচে যাবে না আমাব সঙ্গে।

—না।

বিশাখা চলে গেলে সোমনাথ মদেব বোতলটা বাব কবে নিযে এল আবাব। সমস্ত বাতি নিভিযে দিল— দবজা বন্ধ কবে দিল। বিশাখা এতক্ষণ থাকতে অনুভূতিব দিক দিযে সুবিধা হযে গেছে। এবাব জমবে ভালো। একটা অখণ্ড উল্লাসে অন্ধকাবে থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল সোমনাথ।

জীবনানন্দ দাশের ১৯৪৬ সালে (?) লেখা
খাতা থেকে অমিতানন্দ দাশ কর্তৃক অনুলিখিত।

বাবা—'আমার লাইব্রেরিটার জন্য আমার বড্ড দুঃখ হয়। এই পঞ্চাশ বছর মাস্টারি করতে করতে কত বই কিনেছিলাম। কোথায় যে গেল সব?'

--'ডিকেন্সের সমস্ত বইগুলো তো তোমার কাছে ছিল।'

—'হ্যাঁ, সব কিনেছিলাম। ডিকেন্স আমি খুব ভালোবাসতাম। এমনই কত বর্ষার রাত, কত নিরিবিলি শীতের রাতে টেবিলের পাশে আলো জ্বালিয়ে পড়ে আনন্দ পেয়েছি।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'কিন্তু একটাও নেই।'

—'কী করে নষ্ট হল সব?'

—'উইয়ে খেয়ে ফেলল। মানুষে পড়তে নিয়ে ফিরিয়ে দিল না আব।'

—'একটা ইস্যুবুক রাখলে পারতে।'

—'রেখেছিলাম, সে প্রায় বছর কুড়ি আগে আমাদের স্কুলে [...] চিন্তাহবণ বলে একটি ছেলে পড়ত, এখন সে বোধ করি [...] আমার এসব বইযেব জন্য বড্ড দরদ ছিল তার। আলমারির তাক গুছিযে চাবি লাগিয়ে ইস্যুবুক তৈরি করে দিয়ে, শেলফে আলকাতবা কাঠে দিযে দিয়ে সে অনেকদিন অনেক বই বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে আমার। ছেলেটা ছিল ঠোঁটকাটা, কেউ বই চাইতে আসলে অমনি ইস্যুবুক খুলে মুখের উপর বলে দিত আপনি অমুক বই ফেরত দেননি তো। না ফেরত দিলে বই পাবেন না।'

বাবা একটু করুণভাবে—'এই রকম ছিল চিন্তাহবণ। কিন্তু এ পদ্ধতি আমি অনুসরণ করতে পারিনি। সে চলে যাবার পর এই কুড়ি বছবেব মধ্যে সব বই-ই দেখলাম একে একে উধাও হযে গেছে। তা তুমি দেখছি ডিকেন্সের সেট জোগাড় করেছ। কিনেছিলে?'

—'না, কিনিনি।'

—'তবে?'

—'সেই বছর তিনেক আগে পটলডাঙায যে টিউশনটা নিযেছিলাম না?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে ছেলেটি তিনবাব বি এ ফেল করে চাব বছবের পর পাশ করল। তার চতুর্থবারের টিউটর ছিলাম আমি। কাজেই তারা খুশি হযে এই বইগুলো আমাকে পুবস্কার দিলেন।'

—'বেশ তো আইডিযা তাদের, একজোড়া তসরেব চাদব বা শাল না দিযে বই দিযেছে, বেশ তো।' একটু চুপ থেকে—'তা ডিকেন্স দিলে যে বড়?'

—'কী রকম বই চাই—পঁচিশ টাকার মধ্যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তারা।'

—'তুমি, ডিকেন্স পছন্দ করলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বইগুলো পড়েছ?'

—'না।'

—'একখানাও পড়নি?'

—'একখানাও না।'

—'তবে কিনিযে নিলে কেন?'

—'আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি ডিকেন্স তুমি খুব ভালোবাসা, খুব যত্ন কবে পড়ো, কেমন শ্রদ্ধা জমে গেছে বইগুলোর ওপর। সুযোগ যখন পেলাম বইগুলো আনিয়ে রাখলাম।'

বাবা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে— 'পড়ে দেখো।'

—'হ্যাঁ ডেভিড কপাবফিল্ড পড়ব ভাবছি।

—'[...] সেই [...] এব একখানা জীবনী ছিল আমাব লাইব্রেবিতে। ভাবী চমৎকাব। কে যে নিযে গেল, বইটাব অভাব বড্ড বোধ করি।'

—'[...] লাইফ ছিল তোমাব শেলফে?'

—'হ্যাঁ [...] এব প্রায চাব পাঁচখানা জীবনী।'

—'খুব পড়তে দেখতাম।'

—'[...] কে আমি খুব বিশেষভাবে শ্রদ্ধা কবি।'

—'বুক অব [...] দেখেছিলাম।'

—'হ্যাঁ [...]-এব লেখা। সে তো প্রায বছব কুড়ি আগেই নষ্ট হযে গেছে।'

—'কেউ নিযে গেছে।'

—'না, সেটা উইযে খেযে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত সব দিক দিযেই [...] হল।

—'বাবা।'

বললেন—'বাসকিনেব বইগুলো ছিল, একখানাও নেই।'

—'বাসকিনেব ইংবেজি খুব চমৎকাব?'

—'আমাব মনে হয কোনো সাহিত্য এইবকম লিখবাব অপরূপ বীতি কেউ দেখাতে পেবেছে কিনা সন্দেহ।'

একটু চুপ থেকে—'শুধু বীতি বলেই কি বাসকিনেব মতন এমন একজন ঐকান্তিক লোক জগতে কত কম।' খানিকক্ষণ চুপ থেকে—'কিন্তু বাসকিনেব দাম্পত্যজীবনটা আমাব কাছে বড় বহস্য বলে মনে হয। বাস্তবিক, অবাক হযে ভাবি, এবকম লোকেব কেন এমন হয?'

—'[...] ও তো ওইবকম।'

বাবা মাথা নেড়ে—'[...] সেই কথা বলে। কিন্তু [...] সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয না আমাব।'

—'[...] বইগুলো তো তোমাব কাছে ছিল?'

—'হ্যাঁ, সব।'

—'ইস্কুলে পড়বাব সময তোমাব শেলফেব থেকে নিযে [...] পড়েছি। পড়েছি আব ভেবেছি, এ কি লিখেছে, ইংবেজি না হিব্রু?'

—'[...] ধবনই ওইবকম।'

—'অবাক হযে ভেবেছি মানুষ এতে দন্তস্ফুট কবে কী কবে?'

—'কোনো ইস্কুলেব ছেলে তা পাবে না। [...] [...] কোনো জাযগাব কেউ না।'

—'তাবপব যখন বি এ পড়ছিলাম [...] বেল লাগছিল। মনেব নানাবকম অভিমান উত্তেজনায বেশ জ্বালানি কাঠ জোগায। কিন্তু দু-চাব বছব বাদে সুবিধা লাগল আব। মনে হল এত উত্তাপ ও বিক্ষোভ আমাব ধাতে সইবে না। অনেক দিন থেকে [...] পড়ি না।' একটু চুপ থেকে—'কিন্তু বাসকিনেব কোনো একখানা বই এখনো তুলে নিতে ইচ্ছা কবে। ওযালটাব পেটাব তোমাব লাইব্রেবিতে দেখিনি কোনোদিন।'

—'না পেটাব আমি কিনিনি।'

—'পাঁচ—ছয বছব আগেও পেটাব আমাব বেশ লাগত।'

—'পেটাবেব কোনো বই আমি কিনিনি।'

—'[...]?'

—'না [...] একখানা ছিল আমাব লাইব্রেবিতে।'

—'ছিল নাকি, কই দেখিনি তো আমি।'

—'তুমি তখন ফিফথ ক্লাসে পড়, [...] কি বুঝবে?' বাবা হাসতে হাসতে আমাব দিকে তাকালেন।

—'ও, অত আগেব কথা। তাবপব সেই বইখানা কোথায গেল?'

—'সেই বইখানা তোমাব মেজকাকা নিযে গিযেছিলেন, আমি তখনই তাকে বলেছিলাম এ বই দিযে তুমি কিছু কবে উঠতে পাববে না সুবেশ। তাব চেযে বালজাকেব একটা গল্পেব বই নাও।'

কিন্তু সুবেশ নিয়ে গেল বইখানা। কোনোদিন পড়েছে বলেও মনে হয় না। পড়লেও দু-চাবপাতা।'

—'আর ফিবিয়ে দেয়নি?'

—'কি [...] বই? না, কই আব ফিবিয়ে দিল।'

—'তুমিও আর চাইলে না?'

—'কয়েকবার চেয়েছিলাম, দেব দেব কবে শেষ পর্যন্ত দিতে পাবল না সে। সে প্রায় পঁচিশ বছব আগেব কথা। ভালো বই, বেশ চামড়াব বাঁধাই।'

একটু নিস্তব্ধ থেকে—'বালজাকেব নভেলও ছিল তোমাব কাছে?'

—'হ্যাঁ বালজাক ছিল [...] ছিল।'

—'[...] কী বই ছিল?'

—'[...] [...]'

—'পড়েছ?'

—'হ্যাঁ বড্ড [...]'

—'ফবাসিদেব এটা একটা স্বভাবধর্ম।'

—'নিছক আর্ট উপভোগ কববাব জন্য আমি কোনো বই পড়ি না।'

—'[...] কোনো বই ছিল না তোমাব কাছে?'

—'না।'

—'পড়নি কিছু?'

—'না, ওই লেখকটিব নামও আমি আগে জানতাম না। কিছুকাল হয় শুনেছি। দোদেব দু-একখানা বই ছিল, হিউনোব [...] আমি তিনবাব কিনেছিলাম, তিনবাবই উড়ে গেল।'

—'আমাব মনে হয় [...] তোমাব ভালো লাগে।'

বাবা নিস্তব্ধ ছিলেন '[...] [...] বেশ অনেকেব ভালো লাগে।'

—'[...] কে?'

—'একটা পবিবাব, তাবই ইতিহাস [...] [...] সেদিন পড়েছিলাম, সেও এক পবিবাবেব নির্যাতনেব গল্প।'

—'[...]?'

—'হ্যাঁ, একজন [...] লেখক।'

—'নাম তো শুনিনি কোনোদিন।'

—'তা তুমি বছব কুড়ি হয় বই পড়া তো একবকম ছেড়ে দিয়েছ।' বাবা একটু চুপ থেকে—'তোমাদেব কলেজেব একখানা বইও তো আমি পড়লাম।'

—'[...] ও পড়েনি?'

—'থাক, দবকাব নেই।'

—'[...] খানা এখনো আছে?'

—'আছে বটে, কিন্তু অনেকগুলো পাতা উইয়ে লোকসান কবে দিয়েছে। [...]-এব জার্নালখানা একজন মহিলাকে পড়তে দিয়েছিলাম, তিনি আব ফেবত দিলেন না।' বলে বাবা প্রসন্নভাবে হাসতে লাগলেন।

—'তাব কাছে থেকে বইখানা আব ফেবত চাওনি?'

—'না, চাইনি আব।'

কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস কবলাম—'মহিলাটি কে?'

—'থাক, শুনে কাজ নেই তোমাব।'

—'না, তাব কাছ থেকে বই আমি ফেবত চাইব না।

—'চাইবে না, তা আমি জানি, কিন্তু তবুও নাম শুনবাব জন্যই বা তোমাব এবকম অশোভন ঔৎসুক্য কেন?

চুপ কবলাম।

—'তিনি এখানে নেইও আজ।'

—'মরে গিয়েছেন?'

—'হ্যাঁ প্রায় বছর পনেরো হল।'

সন্ধ্যার মেঘের দিকে দাঁড় কাকগুলো উড়ে যাচ্ছিল। বাবা বললেন—'তার বেণীর থেকে কয়েক গাছা চুল নিয়ে তিনি আমাকে লেস তৈরি করে দিয়েছিলেন।'

—'লেস?'

—'আমার [...] ঘড়িটার কারের চেন খসিয়ে ফেলে তার সেই লেস সেটার মুখে বেঁধে দিয়ে বললেন—এটা পরে ইস্কুলে যেতে পারবেন। আমি বললাম—ছেলেরা কী মনে করবে?—মনে হয় সেদিনের কথা সব। কিন্তু এরই মধ্যে চল্লিশটা বছর কেটে গেল।'

চুপচাপ।

করমচা গাছের ডালের থেকে একটা রুগ্ন শালিখ উড়ে গেল।

বাবা—'টলস্টয়ের রেজারেকশন পাঁচ বছর কিনেছিলাম আমি, দু-বছর তো উইয়েই খেল।'

—'একখানা নতুন রেজারেকশন দেখেছিলাম তোমার তাকে।'

—'সে আজ কত বছরের কথা মনে আছে?'

—'তখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি, বড় লোভ হয়েছিল পড়বার জন্য, বইখানা অনেকদিন আমি রাতের বেলা বিছানায় নিয়ে শুতাম। গোটা পঞ্চাশেক পৃষ্ঠা পড়েছিলাম। কিন্তু কি যে পড়েছি, কিছু মনে নেই। বইখানা তারপর কোথায় যে গেল, তাও বুঝতে পারলাম না।'

—'কলেজ লাইব্রেরি থেকে নিয়ে রেজারেকশন পড়নি?'

—'না।'

—'এবার পোড়ো তাহলে কলকাতায় গিয়ে, কোনো জায়গার থেকে জোগাড় করে।'

—'টলস্টয়ের বিশেষ কিছু আমি পড়িনি।'

—'টলস্টয়ের সবই তো ছিল আমার কাছে।'

—'দেখেছি, সব মনে আছে আমার। তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। টলস্টয়ের সেই শাদা চুল শাদা দাড়িওয়ালা অখাদ্য চেহারার ছবি তোমার কত বইয়ের থেকে উঁকি মেরে বেরুত যে!'

—'চেহারার কথা বলছ, বেশ জীবন্ত চেহারার মানুষ।'

—'তুমি বরাবর এই লেখকটিকে পূজো করে এসেছ দেখেছি।'

—'সমস্ত পৃথিবীই তো করে।'

—'হ্যাঁ, করেছে খুব এক সময় বটে—কিন্তু আজকাল—'

বাবা বাধা দিয়ে—'চিরকাল করবে—এঁকে শুধু লেখক বললে ভুল হয়, তিনি একজন যথার্থ মহাপুরুষ।'

—'আমি অবিশ্যি তাঁর সাহিত্য নিয়ে তাঁকে বিচার করি।'

—'সে বড্ড ভুল। কিন্তু নিছক সাহিত্যের দিকে দিয়েও তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। শুধু উনিশ শতকের [...] নয়, আজকেও।'

—'তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যা খবর পেয়েছি তা অত্যন্ত বিসদৃশ।'

—'[...] [...] আমি মন দিয়ে পড়েছি [...] কোনো সাহিত্য না পড়লেই চলে।'

—'কী রকম?'

—'প্রায় ষোলো—সতেরোটি সন্তানের পিতা তিনি, স্ত্রী তিনটি নয়, একটি মাত্র, আমার মনে হয় একজন মহামানুষের পক্ষে এ ঢের কঠোর অপরাধ।'

বাবা একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে—'তিনি মহামানুষ ছাড়া আর কিছু নন। আচ্ছা, আজ তো অনেক কথা বলা হল, এখন—'

—'তুমি শোবে?'

—'না শোব না।' কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে—'স্ত্রীর প্রতি এটা তাঁর অত্যাচার মনে কোরো না। একজন অত্যধিক জীবনীশক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন তিনি। সবদিকেই ঐশ্বর্যের প্রসারতা। বইও লিখে গিয়েছেন অজস্র বেঁচেছেনও অবধারিত কালের চেয়েও ঢের বেশি। এক জীবনের অভিজ্ঞতা কথা কাজ চিন্তাধ্যান সমষ্টি বদ্ধ অসংখ্য জীবনকে উপচে চলে যায়। সাধারণ

মাপকাঠি দিয়ে কোনো দিক দিয়েই তাঁর বিচার চলে না।'

বাবাকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। টলস্টয়ের তিনি একজন ভক্ত। কিন্তু তবুও বললাম—'টলস্টয়ের মতো বিরাট ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে আরো অনেকের ছিল। টলস্টয়ের চেয়ে বড় মানুষও জন্মে গেছে।'

—'কিন্তু [...]-এর মতো দুঃখ তাঁদেব স্ত্রীরা পায়নি।'

—'কেন [...] এমন কী দুঃখ পেয়েছেন এমন স্বামীব স্ত্রী হযে?'

—'স্ত্রী তাঁর চেয়ে আধ্যাত্মিকতায ঢের নিকৃষ্ট নিচুস্তরেব জীব, এই কথা বলে আজন্ম স্ত্রীকে অমানুষিক টিটকিরি দিযে গেছেন তিনি, নির্যাতন করেছেন, এমনকী স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণার সময়ে পর্যন্ত।'

—'ওঃ ওইসব ক্ষুদ্র মন নিয়ে আমবা ইতর ব্যাখ্যা করব সব। আমরা তো কেউ টলস্টয়ের পার্শ্বচর ছিলাম না।'

একটু চুপ থেকে —'[...]-এরও অনেক বই ছিল আমার কাছে, [...] ও।'

—'টমাস হাক্সলির কোনো বই পড়নি তুমি?'

—'[...] কে?'

বাবা এঁদেব নামও শোনেননি—'না [...] না, [...]-ব কিন্তু এদেব ঠাকুরদাদার বই, ঠাকুবদাদাই তো। তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাযত্নের সঙ্গে পড়েছেন।'

—'তোমার কাছে ছিল তো টমাস হাক্সলিব বই।'

—'হ্যাঁ।'

মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে—'এইসব বই পড়ে ভগবানে অবিশ্বাস করতে শিখিনি আমি। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, মৃত্যুকে অমৃতের পথ বলে মানতে চায না, তাদের প্রতি একটুও অসহিষ্ণু ভাব নেই আমার। হাক্সলি পড়ে এইটুকু লাভ হয়েছে আমাব। লাভ নয? লাভ বইকী। হাক্সলিকে যাবা নাস্তিক বলে উড়িযে দেয তাবা জানে না হাক্সলি মানুষের জীবন পথের কত বড় একজন সাধক।'

চারদিকে অন্ধকার বেশ নেমে এসেছে।

বাবা—'হাক্সলির বই কখানা জারুল কাঠের একটা কিনারে রেখে দিযেছিলাম, সেবার বৃষ্টির সময় আমার ম্যালেবিযা হল, প্রায় দিন পনেবো বিছানায পড়েছিলাম। জ্বব সারবার পর ওঠে দেখি সর্বনাশ হাক্সলির সমস্ত বই উইযে খেযে একটুকরো কাগজ পর্যন্ত রাখেনি। আরো কত বই উইযে নষ্ট করে দিল সেবার। [...] শেক্সপিয়াবেব লাইফ [...] [...] [...] [...] প্লেটোর দু ভল্যুম বেঁচেছিল। ওযার্ডওয়ার্থের ভল্যুমখানা [...] আব উপনিষদগুলো এখনো এখনো আছে।'

—'আর বই কেনো না কেন তুমি বাবা?'

—'ইস্কুলমাস্টার আর কত বই কেনে রে বাবা, বই কিনতে কিনতে প্রায হাজার চারেক ধার হয়ে গেছিল, গত পনেরো বছর ধরে সেই ধার শোধ দিয়েছি শুধু। এখনো দেড় হাজার বাকি, যদি শোধ দিয়ে উঠতে পারি, তাহলে কিনব। না হলে আব না।'

অন্ধকারের মধ্যে মাথা হেঁট করে ভাবছিলাম। এই সত্তর বছর বযসে, পঞ্চাশ টাকা মাত্র মাইনে নিয়ে, চারদিককার এই গভীর জীবন সংগ্রামের ভিতর বাবাব এই শিশুসুলভ ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাটুকু নীড়ের থেকে নিপতিত একটি পাখির ছানার মতো হেমন্তের কুযাশামাখা তেমনই রাত্রির কোলে।

—'গত পনেরো বছরের মধ্যে আর কোনো বই কেনোনি তুমি।'

—'না।'

—'খানিকটা শোধ হযে গেছে, এখন দু-একখানা কিনলে পাব।'

—'তুমি যদি চাকরি পাও, তাহলে আমাকে [...] একখানা কিনে দিও।'

—'এই একখানা বই শুধু, আব কিছু নয?'

—'না। উপনিষদগুলো আমার কাছে রযেছে।'

বিন্দুবাসিনী

স্ত্রীব থেকে বিছিন্ন থেকে সুধীনেব যে দিনগুলো কাটে সেই সব দিন সবচেয়ে ভালো যায়; ধবো কলকাতাব দিনগুলো—হ্যাবিসন বোডেব একটা বোর্ডিঙেব কামরায থেকে যখন সে দিনেব পব দিন নিববচ্ছিন্নভাবে কাটিযে দেয—চেষ্টা কবে, পড়ে, লিখে, আড্ডা দিযে—কিন্তু এক মুহূর্ত্তও সুষমাব সংস্পর্শে এসে নয। তিন চাব মাস পবে সুষমাব কথা ভেবে মনে হ্য তো একটু মধু জমে ওঠে—কিন্তু সেই ফেনাটুকুব বিশেষ কোনো মানে নেই—সুষমাব সঙ্গে দেশেব বাড়ীতে একদিন গিযে আবাব বাস কবলে তা যাবে কেটে—বিস্বাদে ব্যথায ভবে উঠবে—অবসাদে আচ্ছন্ন হযে পড়বে।

কিন্তু তবুও তিন চাব মাস সুষমাব থেকে দূবে সবে থাকবাব পব এক আধ মুহূর্ত্তেব জন্য অন্ততঃ তাকে দেখবাব জন্য একটা স্পৃহা জেগে ওঠে: হযতো সব স্বামীবই তাই হয। এই কাবণেও সুষমাব কাছ থেকে সবে থাকলেই ভালো;—কাছে শুধু কলতানি—শুধু তিক্ততা। জিনিসটা এ বকম বিবস হযে দাঁড়িযেছে দু'টো কাবণে—

প্রথমতঃ বিযেব প্রথম বছবেব ভেতবেই সুষমাব সন্তান হ'ল—দু'জনেবই যথেষ্ট সাবধান অনিচ্ছা সত্ত্বেও;

দ্বিতীয়তঃ সুধীনেব মা বিন্দুবাসিনী কাঁচা শাশুড়ী; দুর্দ্দমনীয দুঃসাধ্য বাগে অহঙ্কাবে আনাড়িপনায সুষমাকে সুধীনকে তিনি যে-কোনো মুহূর্ত্তে পথে দাঁড় কবিযে ফেলতে পাবতেন;—কাবণ সংসাবটা মোটামুটি তাঁবই।

সুষমাও নম্র বিনত বধূ একেবাবেই নয; সুধীন ভাবত এ মেযেটিব ঠ্যাটামিব যেন আব শেষ নেই—বিশেষতঃ বিন্দুবাসিনীব সম্পর্কে; কিন্তু তবুও দিনেব ভিতব একবাব না একবাব—হযতো অনেকবাব—সুধীনেব মনে হত এই মেযেটিব ওপবেই যেন অপবাধ কবা হচ্ছে—শকুন চিলেব বাসাব মধ্যে একটা শালিখেব মত যেন এ ঃ এই সুষমা—ভোবেব বেলা দুপুবে সন্ধ্যাব ভিজে ভিজে শীতেব বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে জড়সড় হযে যেন গলাব নালি ঘুবিযে একটা ফাঁক খুঁজছে কোথাও—যে কোনো দিকে—যেখানে সে ফুরুৎ কবে উড়ে যেতে পাবে।

এক এক সময বলেছে সুষমা স্বামীকে সে ভালোবাসে না। বিযে কবা তাব ভুল হযেছে, ভুল বিযে হযেছে,—অবিশ্যি শাশুড়িব কাছে নয; (সে সাহস সুষমাব ছিল না)। বাড়ীব অন্য কারু কাছেই নয—স্বামীব কাছে শুধু। কোনো কোনো দিন অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হযে পড়ে দিনেব ভিতব অনেক বাব সুধীনকে এই সব কথা ঘুবে ফিবে বলে গিযেছে সুষমা।

সুধীন অনেক বাবই সুষমাব এই সব আক্ষেপ ব্যথাব ন্যায্যতা স্বীকাব কবেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সুষমাব চুল বেঁধে তাকে বাঁশডলা দেবাব একটা অদম্য ইচ্ছাকে গভীব সহিষ্ণুতাব সঙ্গে চেপে বাখতে হযেছে; এক বছবেব জীবনে এতই চেপে গিযেছে সুধীন যে এক এক বাব অবাক হযে ভেবেছে—এত ক্ষমা সে কোথায পেল; বিযেব আগে জীবনটা উত্তব প্রত্যুত্তবে হিংসা প্রতিহিংসায একেবাবেই আব এক বকম ছিল নাকি?

কিন্তু বিযে তাকে ধীব কবেছে—

মাঝে মাঝে মনে হযেছে সুধীনেব যে সে একটা বিশ্রী শকুন;—বিন্দুবাসিনী একটা বীভৎস গৃধিনী—যে কোনো দিন নিজেকে রূপান্তবিত কবতে পাববে না। কাজেই নিজেকে সুধীন একটা নবম-নিবীহ পাখীতে পবিবর্ত্তিত কবতে চেযেছে। পাবে না কি?

ছ'মাস দেশেব বাড়ীব থেকে সবে থেকে অবস্থাব কোনো পবিবর্ত্তন হ'ল কি না অবাক হযে ভাবছিল সুধীন। বিদেশে বিদেশে সুষমাব চিঠিগুলোকে সব সময়ই কঠিন কটু বা অম্ল মনে হয়নি—মাধুবী কি মাঝে মাঝে ছিল না? স্বামীব সংসর্গ এত দিন পবে হযতো তাব ভালো লাগবে;—সুষমাব? সুধীন ভাবছিল দেশেব বাড়িব খালবিল আকাশ জঙ্গল এমন আশাপ্রদ—শুধু দু'টো মানুষ যদি জীবনকে একটু সহিষ্ণুভাবে দেখত; তাহ'লেই জীবনকে ঠিকভাবে দেখত তাবা।

কিন্তু তা তারা কোনোদিনই দেখবে না; দেখবে কি?

একজন তো করবীর গোটা খেয়ে ক্ষণে অক্ষণে মরতে চাইত, আর এক জন কথায় কথায় বিন্দেবনের দিকে পা বাড়াত।

কিন্তু দু'জনেই দেশের বাড়ীতেই রয়ে গেছে—হয়তো ঠিক তেমনই জীবন নিয়ে।

বাস্তবিক তাই—একদিন দু'দিন তিন দিনের ভেতরেই সুধীনের কাছে সেই ছ'মাস আগের স্বামী স্ত্রী শাশুড়ীর মেলোড্রামাখানা উদঘাটিত হয়ে গেল। প্রতিদিনই একটা নাটক অভিনীত হচ্ছে—হয়তো দু'একটা পট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু সেই সাবেকী তিনটি বা খুকুনকে ধরে সাড়ে তিনটি চরিত্র নিয়ে—ভোর পাঁচটার সময় সাধারণতঃ যার পর্দা ওঠে, রাত একটা দু'টোর সময় যবনিকা পড়ে।

সুষমা ধারে কাছে কোথাও আছে বলে মনে হচ্ছিল না।

সুধীন বল্লে—সেই তো ভালো মৈমনসিঙে গিয়ে তিন মাস ছিল সুষমা; আমিও ছিলাম কলকাতায়; ওকে আনবার জন্য তুমি এত অস্থির হয়ে গেলে কেন?

বিন্দুবাসিনী জ্বলে উঠে বল্লেন—কি যে কথা; তোদের কথার কোনো আগামুড়ো আছে? মৈমনসিঙে কার কাছে ছিল জানিস—

—কেন, ওর পিসেমশায়ের কাছে—

—ছাই ছিল। তবুও যদি তিন কুলে খুড়োজ্যাঠাও থাকত—বাপমায়ের শ্রাদ্ধ তো অনেক আগেই হয়ে গেছে—এ বার আমাদের পালা—

বিন্দুবাসিনী বকে যাচ্ছিলেন—অসংলগ্ন—ঢেব।

সুধীন বল্লে—কেন, পিসেমশায়ের কাছে ছিল বলেই তো জানি—

—পিসে আবার, একটা পিসে নাকি।

—কেন?

—পনেরো দিন যেতে না যেতেই তিনি সপরিবাবে মৈমনসিং ছেড়ে পালালেন—

—কোন দিকে?

—আর কোথায—দার্জ্জিলিঙে—মৈমনসিঙের গরম তার সহ্য হল না।

—দার্জ্জিলেঙে?

—সুষমাকে একা বাড়ীতে ফেলে বেখে—এ আমাদেব কত বড় একটা গ্লানি ভেবে দেখো তো; সুষমার উচিত ছিল না কি তখনই শ্বশুরবাড়ি চলে আসা?

সুধীন পিসেমশাযেব এই অদ্ভুত ব্যবহাবের কথা ভাবছিল।

বিন্দুবাসিনীর দিকে মুখ তুলে বল্লে—এ কি রকম?

ভজহরিবাবু আমাকে বল্লেন যে মৈমনসিঙে আমাব বাসায সুষমা নির্ব্বিঘ্নে ছ'মাস থাকতে পারবে; তোমরা না দিলেও আমি জোর করে নেব; সে তো তার নিজের বাপের সাক্ষাত বোনের বাসা—কত কি! তারপর শেষে এই!

সুধীন হতভম্ব হয়ে বল্লে—তোমাদেব সঙ্গে চিঠি লেখালেখি হযেছিল?

—ছাই হযেছিল—

—আমাকেও তো কিছু জানাননি; কি আশ্চর্য্য রকম লোক—একটা মেযেমানুষ বাড়ীতে এসেছে, তার কোনো হিল্লে না ক'রেই ছুট দিলেন?

বিন্দুবাসিনী দাঁত কড়মড় করতে করতে বল্লেন—দেবেন না ছুট—ও গিযে হয়তো হাড় জ্বালাতে আরম্ভ করে দিযেছিল—

সুধীন জানে মাকে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই—অনেক দিন থেকে সে তো ছেড়ে দিযেছে; অভিজ্ঞ হযেছে—নরম হযেছে।

দাঁত কড়মড় করতে করতে বিন্দুবাসিনী বল্লেন—আমাদের হাড়ে যা কালি লাগিযে গিয়েছে! তদবস্থায়ই বল্লেন—উচিৎ ছিল না কি সুষমার তক্ষুণি বাড়ী চলে আসা?

—তক্ষুণি কি ক'রে আসা যায়—

—কেন যাবে না? ইচ্ছা থাকলে কি পথ মেলে না? জীবনের ঘাটে ঘাটেই তো আমার তা মিলে গেছে; ওর অমন অমিল হয়ে গেল?

এ শুধু কথাব পিঠে কথা—অর্থহীন।

সুধীন কোনো জবাব দিল না।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—তাবপব কি কবল জান—এলো তো না-ই, ববং মৈমনসিঙেব বইল—

—সে তো আমি জানি—

—ঐ মাটিই কামড়ে বইল; কি বকম আখ্‌খুটে দেখ; তবু আমাদেব কাছে আসবে না।

সুধীন বল্লে—গিয়েছিল পাঁচ ছ'মাস থাকবাব জন্য—মনকে তেমন ক'বেই মানিযে নিয়েছিল—

—কিন্তু ভজহবি যখন পথে বসিযে গেল তখনো বাছা ফিববাব তাগিদ বোধ কবল না...

এখানে সত্যসতীন কে আছে তাব? কাকে এত ভয়?

বিন্দুবাসিনী চোখ কপালে তুলে বল্লেন—শুধু তাই? আমাদেব চিঠি দেওয়া অব্দি দবকাব মনে কবল না; বৌমানুষ সেই বিদেশে আঘাটায আটকে বইল; তুমিও তো বাছা কিছু লিখলে পাবতে।

সুধীন বল্লে—হযতো ভালো লেগেছিল থাকতে—মৈযমনসিঙে; না হ'লে এত যে কাণ্ডকাবখানা হয়ে গেল সুষমা আমাকে তা তো কিছু লেখেনি। লিখেছিল ওখানে বেশ ভালো লাগছে।

বিন্দুবাসিনী অত্যন্ত বিবক্ত হযে বল্লেন—ভালো তো আমাদেব অনেক কিছু লাগে—কিন্তু তাই বলে সব দিক ভেবেচিন্তে দেখতে হবে তো? মৈযমনসিঙে আমবা কোনোদিন গিয়েছি? আমাদেব আত্মীযজ্ঞাতি কেউ আছে সেখানে? যাব ওপব ভব কবে যাওযা সেই যখন ডুব মাবল তখন আব ঝুটফুস নিয়ে মাথা খুঁড়ে কেন মিছে মবা।

একটু থেমে কানে হাত দিযে বল্লেন—কিন্তু সেই ওব ভালো লাগল; আমবা কিছু নই?

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—কে এক হবেনবাবুব বাড়ীতে এক মাস বইল, ঢাকাব টাউন স্কুলেব ওব এক টিচাবেব বাড়ীতে দেড় মাস—ওব আব এক স্কুলটিচাবেব বাড়ীতে পনেবো দিন বইল, ওব বাবাব এক বন্ধুব বাড়ী ছ'দিন, বড় বোনেব ননদেব বাড়ী দিন পঁচিশেক—

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—কে? না আমাদেব বাড়ীব বউ। আমাদেব বাড়ীব বউ একটা বিদেশ শহবে চবে চবে এমন সব ছেহোযাপনাব কাজ কবল।

একটু থেমে বল্লেন—বুড়ো বযেসে এই সব সহ্য হয? লোকেই বা কি বলে?

সুধীন নিস্তব্ধতায সুষমাব এই অদ্ভুত অবান্তব আশ্রযপ্রিযতাব কথা ভাবছিল—ভাবছিল শ্বশুববাড়ীব চেয়ে কোন এক হবেনবাবুব বাড়ীও সে প্রিযতব মনে কবে। ছোটবেলা তাব বাপ-মা মবে গিয়েছিল বলেই হযতো আশ্রয খুঁজতে খুঁজতে সুধীন—বিন্দুবাসিনীকে এত সহজে ধবা দিয়েছিল সুষমা; ভুল ভাঙাবা মাত্রই এত সহজে তাদেব ছেড়ে দিযে'ঘাসফড়িঙেব...ক্ষেতে বেবিযে একটা জোনাকীব মত গাছে গাছে পাতায লতায নবম নিবিড় নীড় খুঁজছে সে—নীড় পেযে যাচ্ছে।

বিন্দুবাসিনী ও সুষমা দু'জনেই দু জনাব হাড় পুড়িযেছে—নিজেব চোখেব সামনেই সুধীন অনেক বাব সে সব দেখেছে; মাঝে মাঝে সুধীন নিজেও জ্বালানিকাঠ যোগাড় কবেছে—কিন্তু সে অতি ক্বচিৎ—কখনো কখনো মাকে দগ্ধ কবে—কখনো কখনো সুষমাকে।

কিন্তু সে যাই হোক, শ্বশুববাড়ীব বা স্বামীব এমন কোনো টান নেই যাতে সব সহ্য কবে এই বাড়ীতেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবাব মত একটা তাগিদ—হযতো তা নির্ব্বোধ—সুষমাব থাকতে পাবে, কর্ত্তব্যবোধকে তো সুষমা কেযাবই কবে না—না কবে ভালই কবে; সুধীনও ও সব কিছু মানে না।

এ স্বামী ও শাশুড়ী—এ শ্বশুববাড়ীব ওপব সুষমাব কি-ই বা কর্ত্তব্য আছে?

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—এতদিন ধবে এই সব ফ্যাকবা কবে বেড়ান হ'ল; আমাদেব এত বড় পবিবাবেব ডালেপালায লতায পাতায কত দিকে কত বকমে যে তা ছড়িয়েছে তুমি শুনলে তোমাব মনেও তো কষ্ট হবে,—আমাদেব লজ্জায ঘেন্নায মুখ লুকোতে ইচ্ছা কবে।

(বিন্দুবাসিনী চলে গেলেন।)

না—এমন কিছু নয; একদিন বড্ড আঘাত লেগেছিল সুধীনেব যখন সে বুঝতে পেবেছিল সুষমা একটু ভাল থাকতে খেতে চায—শ্বশুববাড়ীব অশান্তি অভাব সুধীনেব মুখে তাকিযেও ভুলে যেতে সে একেবাবেই নাবাজ; কিন্তু এইটুকুই শুধু অপবাধ সুষমাব—সে ভাল থাকবে—খাবে; কোনো লোকেব প্রতি কোনো লোলুপতা তাব নেই—বক্তমাংসেও বাজে ধর্ম্মবুদ্ধিতেও। অবিশ্যি এসব ধর্ম্মবুদ্ধিফুদ্ধি সুধীন মানে না—কিন্তু ওব তা অত্যন্ত উৎকট—এবং মাংসবক্তেও বাজে বটে।

বিন্দুবাসিনী এসব জানেন না; সুষমাকে খুব ঘৃণা কবেন বটে—কিন্তু ঠিক কোন কাবণে

মেয়েটিকে নিন্দনীয় মনে করতে পারা যায়—কোথায় সে অপ্রতিহতরূপে অনিন্দনীয়—কোনো দিনও বুঝবেন না।

সুষমা তখনো বাড়ীর ভিতরে ছিল।

বিন্দুবাসিনী এসে সুধীনকে বল্লে—মেজবৌঠান সুষমাকে একটু মুড়ি গুঁড়ো করে দিতে বল্লে, সুষমা তা দিলে না—

সুধীন বল্লে—কেন.

—কোনো দিনও তো বলেন না কাউকে কিছু মেজবৌঠান; সেই স্বামী হারিয়েছেন অব্দি নিজের মনেই আছেন।

'বাস্তবিক মেজবৌঠান!' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্ল বিন্দুবাসিনী।

সুধীন বল্লে—মুড়ি গুঁড়ো করতে আর কি লাগে? আমিও তো দিতে পারতাম।

—না, সে কথা হচ্ছে না; আমিও তো দিতে পারি—কিন্তু বউমানুষকে একটা কথা বলা হয়েছে, সে তা শুনবে না কেন?

সুধীন বল্লে—তা সুষমাই বা কেন গুঁড়ো করে দিল না? কিই বা মেহন্নত এতে!

—মেহন্নত বলে মেহন্নত বলে আমার হাত পা চিবুচ্ছে; কেন আজ না একাদশী না অমাবস্যে পূর্ণিমে—হাত পা চিবুবে কেন?

সুধীন বল্লে—ওর গেঁটে বাত আছে—

—বৌর দিক আর টেনে কথা বলিসনি সুধী। বিন্দুবাসিনী সব কিছুর প্রতিই অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন।

বৌয়ের দিকে টেনে কথা বলবার অভিপ্রায় সুধীনের ছিল না বাস্তবিক। তুচ্ছ মুড়িগুঁড়োর সুতো ধরে শাশুড়ীবৌয়ের ভিতরে যে কোনো মুহূর্তে যে বিষম আগুন জ্বলে উঠতে পারে তার তাও অনেকদিন অনেক রকমে সহ্য করেছে সে। কিন্তু এখন দু'জনকেই সে বুঝাতে চায় যে এরকম ধবনেব তাতল পথ দিয়ে জীবনকে যেন আর তারা না চালায়—তা'হলে নিজে সে আলাদা পথ ধরেছে—সমস্ত নিষ্ফলতার ভেতরেও জীবন স্নিগ্ধ রইল।

মাকে এইটুকু শুধু বোঝাবার অভিপ্রায় ছিল তার।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—বলিস কি, বাজারেও তো ছাতু পাওয়া যায়; তিন চাব পযসাব কিনে দিলেই মেজবৌঠানের বিকেলেব জলখাবাব হযে যায়; কিন্তু কথা তো তা নয—সবাই বলবে বৌমাকে একটু মুড়ি গুড়ো করি দিতে বল্লে মেঝ্‌শাশুড়ী, সে তা দিলে না।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—কি লজ্জার কথা বলো তো দেখি; কি ঘেন্নার কথা; আমরা কোথায় মুখ লুকোই; সারা দিন খেটে খেটে হযরান হচ্ছি—ধোপানাপিতেরও একটি ফরমাস বাদ রাখছি না এই মরণচণ্ডীব আশীর্বাদ নিযে সেই ছোটবেলা শ্বশুরবাড়ী নেমেছি—কেউ বলে লক্ষ্মীশ্রীতে ঘর ভ'রে উঠেছে—কারু বা কিছুতেই মন ওঠে না—সে যা হোক নিজে তো কোথাও কোনো খোঁচ রাখছি না—

একটু হেসে বল্লে—মুড়ি গুঁড়ো? আমার শাশুড়ী যদি আমাকে আমার দাঁত গুঁড়ো করে পরিবেশন করতে বলতেন করতাম না কি?...আর দেখ এই সুষমার ব্যাপার।

বিন্দুবাসিনী ঝেঁজে উঠে বল্লেন—শান্তি শান্তি কর সুধীন তুমি—এমন দেমাকের বৌ ঝি যে পরিবারে সেখানে কোনো দিনও ওসব জিনিসেব নাম কোরো না আর।

সুধীনও একটু উত্যক্ত হয়ে বল্লে—কি যে করে! দিলেই তো পারত বাবা গুঁড়ি করে; দু'টো তো মুড়ি-তার জন্য এমন কথা।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—এও ওর, কিন্তু তবুও শিলনোড়া ধরতে গিয়ে হাত কামড়ায় মাথা কামড়ায়! কি বিয়েই কবেছিলে বাছা—কি বৌই এনেছিলে—আমি তখুনি বলেছিলাম মা বাপ মরা যে মেয়ে তাব রূপের বাহাদুরীতে থমকে গিয়ে আর বাকী দশটা দিক দেখতে ভুলে গেলে হয় কখনো? এখন তোমাব ডাইনীর রূপ সামলাও!

চলতে চলতে বল্লেন—রূপ!

রাত যখন দু'টো তখনও মুড়ির শ্রাদ্ধই চলেছে—বিন্দুবাসিনীর একা বিছানায় অজস্র নিদারুণ স্বগত উক্তিতে—পরিবারের সমস্ত আঁধিআঁধিতেই'।

সুধীন ভাবছিল ঃ এরকম এত শাশুড়ী শ্বশুর ভাসুর দেওরের কোনো এক পরিবারে সে যদি নিয়ে

বৌ হত কি ফাঁপবেই না পড়ত তাহ'লে? হযতো সাবা দিনবাত মাথা খুঁড়ে পাথব হযে যেত; না হয যে দিক খুশি এক দিকে বেবিযে পড়ত- ফিবত না আব। সুষমাও কি তাই কববে? অথবা পাথব হযে যাবে?

সব দিকেই কেমন একটা গভীব নিস্ফলতা-

দু-চাবদিন পবে সন্ধ্যাব সময সুষমা আবশীব পাশে দাঁড়িযে বিইনি বাঁধবাব মতলবে চুল আঁচড়াচ্ছিল—

টেবিলে বসে লিখছিল সুধীন: স্বামী-স্ত্রী দু'জনেব এ দু'টো খুব নিবীহ কাজ চলেছে।

বিন্দুবাসিনী এক ঝটকায ঘবেব ভেতব ঢুকে বল্লেন—বৌমা বৌমা—

সুষমা মুখ ফেবাল।

ডান হাত দিযে বাঁ দিকেব চুলেব গোছা টেনে ধবে বাঁ হাত দিযে চিরুনী চালাচ্ছিল—বিন্দুবাসিনীব দিকে ফিবে তাকিযে বল্লে—আমাকে বলেছিলেন?

বিন্দুবাসিনী ফিস্ফিস্ কবে বল্লে-কি তোমাদেব কান্ডজ্ঞান বলো তো দেখি' এই আবাব ঝগড়া বুঝি আবম্ভ হয- সুধীন কলম থামিযে বল্লে- কি হযেছে? — হবে আমাব ছাই' তিন তিনটে ভাসুব আব জন চাব-পাঁচ শ্বশুব ঐ বাবান্দায বসে দাবাবড়ে খেলছে আব ঠিক তাদেব মুখোমুখি জানালায বৌ মেযেব এই কীর্ত্তি'

সুধীন ঈষৎ সন্ত্রস্ত হযে বল্লে— কীর্ত্তিব কি কবল আবাব'

বিন্দুবাসিনী বল্লেন— কববে আবাব কী' আবশীতে ঘুবিযে ঘুবিযে মুখ দেখা হচ্ছে—বিবিপনা কবে চুল আঁচড়ানো হচ্ছে এক ঘব-ভবা ভাসুব শ্বশুবেব সামনে' আমবা তো কল্পনাও কবতে পাবতাম না।

সুধীন বল্লে- এই'

সুষমা একটু হাসতে চেষ্টা কবল' কিন্তু গলা তাব শুকিযে উঠছিল, পদে পদে খুঁটিনাটিতে এ কি বিপত্তি? এ কেমন দেশে এসেছে সে? এবা কেউ কি কোনোদিন পৃথিবীব কিছু দেখেনি,- দেখে বোঝেনি কিছু? মানুষেব অত্যন্ত নিবপবাধ কাজেব ভেতবেও এদেব হৃদযে গ্লানিব গন্ধ আব শেষ হ'ল না? স্বেচ্ছায এই ইচ্ছাহীনতা- সঙ্কল্প প্রযাস সাহস কল্পনাহীনতাব দেশে কেন সে এসেছিল? সুধীনকেও এদেবই একজন মনে হচ্ছে—এ বকম লোককে কি কবেই বা সে গ্রহণ কবল, কেনই বা তাব সঙ্গে ঘব কবে আজো টিকে বযেছে সে।

সুষমাব হাত থেকে চিরুনীটা খসে পড়ছিল— কিন্তু সেটাও শক্ত কবে চেপে ধবল সে।

বিন্দুবাসিনীব কোন কথা গ্রাহ্য না কবে আবাব আঁচড়াতে লাগল সে।

বিন্দুবাসিনী হাড়ে মাংসে জ্বলে উঠে বল্লেন—দ্যাখ সুধীন—দ্যাখ দ্যাখ—তাকিযে দ্যাখ—

সুধীন বল্লে—তুমি যাও মা—ওদেব দৃষ্টি এদিকে নেই—যদি থাকেই বা কি আব হযেছে এমন তাতে?

—কি আব হযেছে'

সুধীন বল্লে—হ্যাঁ, কি হযেছে? মেযেবা কি চুল বাঁধে না?

বিন্দুবাসিনী গলাটাকে একটু নবম কবে বল্লেন—বৌব সামনে আমাব মুখেব ওপব কথা বলো না সুধীন।

কথাযই কথা বাড়ে—সুধীন কলম তুলে নিল।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—এ বকম বেল্লিক মেযে কোনওদিন তো দেখিনি—কোনও কথা নেই, কান নেই, ভ্রুক্ষেপ অব্দি নেই—মাথা ফুলিযে চুল—চুল—শুধু চুলই পটকানো হচ্ছে—

সুষমা আবশীব কাছে হাতবাক্স খুলে হেযাবপিন বাব কবছিল—বিন্দুবাসিনীব দিকে একেবাবেই আজ সে নজব দিচ্ছে না।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—এই আবশীটা এখান থেকে সবাও তো সুধীন

এই বলে নিজে গিযে জানালা বন্ধ কবে দিলেন।

ঘবেব ভিতব খানিকটা আবছা হয়ে পড়ল।

সুধীনেব লেখায ব্যাঘাত হচ্ছিল।

কলম বেখে দিযে সুধীন বল্লে—আবশীটা ঠিক জাযগাযই তো আছে

বিন্দুবাসিনী মাথা নেড়ে বল্লেন—নেই; ও বারান্দায় লোক বসলেই তো দেখতে পারে—ঘরের ভেতর সব কিছু দেখা যায়; এতক্ষণ ওরা ঘরের বধূর কি ঢংই না দেখল—এটা কি ভালো হল সুধীন? আমি বুড়ো মানুষ—আমার কথার একটা মূল্য আছে; যা বলছি তাই কর—মিছে কথার পৃষ্ঠে কথা চাপিও না বাছা। এতে আমারও দুঃখ হয়—তোমাদেরও কেলেঙ্কারিতে ঘর ভরে ওঠে।

সুধীন বল্লে—আরশীটা কোথায় নেব?

—তার চেয়ে এটাকে বন্ধ করে রাখ।

—কোথায়?

—বাক্সে।

—তাহ'লে কাজ চলবে কি কম্বরে?

চার আনা দিয়ে একটা ছোট আরশী কিনে এনো বরং।

সুষমা হেসে ফেল্ল।

বিন্দুবাসিনী স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন—মুখে তার দ্বিতীয় কথা উঠছিল না।

সুধীন বল্লে—চার আনায় আরশী না হয় আনা যাবে; কিন্তু আপাততঃ আজকের কাজটা সুষমার এই আয়নাতেই হয়ে যাক্; জানালা তো বন্ধ করা হয়েছে; ওর বিনুনি বাঁধা কেউ আর দেখতে পাবে না।

বিন্দুবাসিনী নিজেকে লাঞ্ছিত বোধ করে বল্লেন—তোমরা যা ভালো বোঝ কর। ছেলে বৌ মা শাশুড়ীর কথা বলবা মাত্র পালন করবে; তোমাদের সব ভনিতা।

বিন্দুবাসিনী উঠে গেলেন।

সুষমা বিনুনিটা শেষ করে এনেছিল প্রায়; এখন পরিপাটি করে একটা রঙ চঙা রিবন বাঁধল।

সুধীন বল্লে—এই রিবন বেঁধে বেরুবে কোথায়?

—কেন এদেরই ভিতর।

সুধীন বল্লে—তাতে moral outrage কিছু হয় না বটে, কিন্তু তবুও কেমন ভয় ভয় হয়—তুমি এদিকে এসো।

সুষমা এগিয়ে এল।

সুধীন বেণীতে হাত দিয়ে রিবন খসাতে খসাতে বল্লে—কলকাতায় হলে কোনওই আপত্তি ছিল না, কিন্তু দেশের বাড়িতে—

রিবনটা একেবারে খসিয়ে ফেলে নিজের হাতেব ভিতর গুটোতে গুটোতে বল্লে—বাড়ীটাও যদি সম্পূর্ণ আমার হ'ত তাহ'লে এখানেও—

সুষমা একটু হতাশ একটু বিষণ্ন হয়ে সুধীনের দিকে তাকাল—

সুধীন বল্লে—বেণীটা পাকিয়ে একটা খোঁপা বেঁধে নাও—এলো বেণীতে কোথাও যেও না।

'আমি কোথাও যাচ্ছি না' বলে সুষমা বিছানায শুয়ে রইল।

শ্বশুরবাড়ি—শাশুড়ী ও সুধীন সম্বন্ধে সুষমা যা কিছু ভাবছে সুধীনের ভাবনাও সেই সব নিয়ে। সুধীনও নিজেদের সম্বন্ধে সেই সব কথাই ভাবছিল। একা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে—অন্ধকারে।

কিন্তু কোন উপায় কি আছে?

বিন্দুবাসিনী অন্ধকার মুখে এসে সুষমাকে বল্লেন—সারাটা সন্ধ্যা যে বড় বিছানায় পড়ে রইলে বেণী দুলিযে—খোকাকে রাখে কে?

খোকা বিন্দুবাসিনীর কোলেই ছিল না। সুষমা কোনও জবাব দিল না-- কিম্বা খোকাকে নিজের কাছে নেবার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করল না।

বিন্দুবাসিনীর ইচ্ছা হচ্ছিল বিছানার ওপর ছেলেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায—অত্যন্ত কষ্টে নিজেকে সংযম করে বল্লেন—আর তো কোনও কাজ নেই দিনের ভেতর খোকাকেই বা রাখ কতক্ষণ।

সুষমা চুপ করে রইল।

অবিশ্যি খুব অল্প সময়ই সে রাখে, কিন্তু ঠাকুমা নাতিকে পিঠে কোলে করে ফিরছেন—হয়তো সারাদিনই—তাও কি নালিশের জিনিস?

কিন্তু তবুও এটাও ঠিক খোকাকে টানতে বিশেষ ইচ্ছা হয় না সুষমার—সন্তানকে সে জন্ম দিয়েছে কিন্তু প্রতিপালনের ভার একেবারেই শ্বশুরবাড়ীর ওপর ফেলে রেখেছে, বিশেষ করে এই

বিন্দুবাসিনীব ওপব; কিন্তু সে জন্য তাকে এত কথা সহ্য কবতে হয়—এত কথা!

সুষমাব ইচ্ছা হচ্ছিল বিদ্যুতেব ঝিলিকেব মত যে কোনও মুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে খোকাকে বিন্দুবাসিনীব কোল থেকে কেড়ে নেয়; কিন্তু পাথবেব মত কঠিন হযেই বিছানাব ওপব পড়ে বইল সে।

বিন্দুবাসিনীও খোকাকে বিছানায় ছুঁড়ে ফেল্ল না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে গুরুভাব বহন কবতেই লাগল।

তাবপব অত্যন্ত পীড়িত হযে বল্লেন—এ কি মানুষ,—মানুষ না কাঠ' ছেলে নিযে দাঁড়িযে বযেছি তবু যদি একটু নড়ে চড়ে—এ ছেলে ওব পেটে হযেছিল না?

সুধীন আলো জ্বালিযে পড়বাব যোগাড় কবছিল—টেবিল থেকে উঠে এসে বল্লে—দাও আমাকে।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—তোমাব পড়াব চেযে ওব শোযা বেশী হ'ল।

বাস্তবিক সুধীনেবও বিবক্তি লাগছিল। এত বেশী এড়াতে চায কেন সুষমা? ভোব থেকে বাত অব্দি ক'টা কাজই বা সে কবে—খোকাকেই বা ক'মুহূর্ত্ত বাখে? হযতো সুষমাব কিছুই কবতে হত না—অন্য কোনও এক সমৃদ্ধ পবিবাবে পড়লে—তোলা তোলা হযে থাকত বটে' কিন্তু জীবন তো সম্ভাবনাব বাজ্য নয—এ সত্য ঘটনা ক্রিয়া নিষ্ক্রিযাব জগৎ; সুষমাব জীবন অন্য কোথাও গিযে সিংহাসনে বসতে পাবত খুবই—কিন্তু যেখানে এসে দাঁড়িযেছে সেখানে তাব বিবন বাঁধলে চলবে না—বেণী দুলিযে দুলিযেও দশ জনেব ভেতব বেড়ান অসম্ভব—অনেকক্ষণ খাটে শুযে অভিমান পোষা নিবর্থক—খোকাকে দিনেব বেশীব ভাগ সুষমাবই সামলান উচিৎ।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—তুমি যাও পড়ো সুধীন; কিন্তু দেখলে ঠ্যাটামি—ঠ্যাটামিটা দেখলে

সুধীন বল্লে—ঢেব ঢেব

এইবাব সুষমা একটু নড়ল—

কিন্তু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবাব জন্য শুধু।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—বাখতে কি অসাধ আমাব—আমি ঠাকুমা মানুষ; কুলপ্রদীপ তো এই—কিন্তু এ কি অন্যায কথা সুধীন এই দেড়টি বছব ধবে ছেলে বাড়ছে—না পেলে মাযেব মাইযেব এক ফোঁটা দুধ—না পেল এক বিন্দু স্নেহ—এ যেন ওব ছেলে নয; বল্লে তো ভালো শোনায না কিন্তু ডাইনী মাও অলুক্ষুণে ডাইনী হয না'

সুধীন সুষমাব দিকে তাকাল—সে নড়ছে না, চড়ছে না, উপুড় হযে পড়েই বযেছে, বিন্দুবাসিনীব কথাগুলো নিশ্চযই তাকে বিঁধছে—চাবদিককাব অসাড় অন্ধকাব জীবন ঘিবে ফেলেছে তাকে; বিছানায শুযে পড়ে থাকা এই—মোটেই সুখপ্রদ নয; নিজে সুষমা হতাশা ও বেদনাব একশেষ বোধ কবছে যে শুধু তা নয—একটা পবিচিত নিরুপায অস্বস্তিতে সুধীনেব হৃদযকেও বিদীর্ণ কবে দিচ্ছে—বাড়ীব বাইবে কোথাও এ জিনিস নেই, বাড়ীতে ফিবে এলেই সহস্র পাকে প্রকাবে বোজই এটাকে বোধ কবতে হবে সুধীনেব—বিশেষত ভোবেব বেলা ও সন্ধ্যায—মানুষেব আশা ও স্বপ্নেব সম্পদেব ও আশাব সব চেযে আদবেব মুহূর্ত্তে।

খোকাব মাথাব চুল বুলুতে বুলুতে বিন্দুবাসিনী বল্লেন—মাতৃস্নেহ তো তোমাব খুব বোঝা হ'ল।

সুধীনেব দিকে তাকিযে বল্লেন—দুধ না পেযে দিনেব মধ্যে কত বাব যে ছেলেব গলা কাঠ হযে ওঠে কেউ কি তাব খোঁজ বাখে' ট্যা ট্যা কবে পাথবেব বুক ফাটালেও মানুষেব বুক ফাটে না।

তাবপবে : চেঁচিযে বাজ্য উজাড় কবলেও কেই বুঝবে না এ ছেলেব কোনও মা আছে কি না।

পবে : দুধমা যাকে না কবলেন বিধাতা তাব এম্নি মাতৃত্বও কি ঘুচে যায?

দুধমা—মানে সুষমাব বোঁটায দুধ হযনি সেই তবফে এই কথাটুকু—

সুধীন টেবিলে চলে গিযেছিল।

একটা ডিম লন্ঠনেব আগুনেব গবমে মাথা বেখে ভাবছিল সে।

বিন্দুবাসিনী খোকাকে নিযে একটা মাদুব বিছিযে বসে খোকাকে লক্ষ্য কল্লেই বল্লেন—দিনেব মধ্যে চাববাব কবে দুধ গবম কবতে হয—বাতে দু'বাব: কে কববে? যদ্দিন ঠাক্‌মা হাড় কালিযে ঠকঠক কবছে তদ্দিন সে—তাবপব আব তোমাকে দুধ খেতে হবে না।

ঠাস কবে খোকাকে এক চড় মাবল।

সুধীন বল্লে—কি হ'ল?

—কোথেকে আঁশ কুড়িয়ে নিয়েছিস রে পোড়ারমুখো হাড়হাভাতে

সুধীন বল্লে—আঁশ?

—কর ওয়াক;—ওয়াক্—ওয়াক্—কর কর—খোকার গলার ভিতর আঙুল চালিয়ে দিলেন বিন্দুবাসিনী।

বল্লেন—খাবে না? যা পাবে তাই খাবে—সন্ধ্যেবেলা দুধ দেওয়া হয়েছিল?

দুম্ করে খোকাকে মাদুরের ওপর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বিন্দুবাসিনী : হাতী দেবে দুধ? দেখো ছেলেটাকে সুধীন—আমি দুধ গরম করতে চল্লাম—

সুধীন বল্লে—তুমি?

—আমি না তবে আবার কে? যদ্দিন বেঁচে আছি কুটোগাছটাও ঘাড়ে হাগবে; এই নিয়তি।

অনেক কথা বলার প্রয়োজন ছিল সুধীনকে—কিন্তু নিজেকে সংবরিত করে নিয়ে বল্লেন; কেমন করে—দিনরাত সংসার ঠেলতে ঠেলতে মাথার ভেতরে দিয়ে আগুন বেরুতে থাকে; আগে ঢের পারতাম—এই বুড়ো বয়সে আর কুঁ হাতকা পারা যায়—শরীরট কেমন অবশ হয়ে আসে—এই বাঁ দিকটা—বাঁ মাথা, বাঁ কপাল; বাঁ হাত বুক পেট—সব; মনে হয় যেন হঠাৎ এক দিন বাতব্যাধিতে ধরবে।

বিন্দুবাসিনী চলে গেলেন।

মার জন্য দুঃখ করছিল সুধীনের, গত বছর তাকে যে রকম দেখা হয়েছিল এ বছর আর তা নেই—কথাবার্ত্তা মেজাজের ঝাঁঝও এত বেড়ে গেছে blood pressure সন্দেহ হয়; মুখে মাথায় নাকে চোখে মার মাঝে মাঝে কেমন একটা রক্তের হলকা যেন চড়ে বসে—; অবিশ্যি blood pressure ঠিক যে কি রকম রোগ সুধীনের তা জানা নেই—হযতো এই রকম কিছু একটা। যাদের তা হয় ডাক্তার পথ্য ও নিয়মের গুলজার খুব তাদের—মার কিছু নেই—

লন্ঠনের পাশে বসে ভাবছিল সুখীন—

কোনও ঘটনা—কোনও মানুষ—কোনও কিছুব উপরই কোনও হাত নেই তার; তাকে শুধু দেখতে হবে—হৃদয়কে ক্যামেরার প্লেটেব মত মনে কবে; আগে সে দেখত প্রশ্ন করত—কাটত—বিদ্রোহ কবত—প্রতিকারের উপায় বের করতে চেষ্টা করত। কিন্তু এখন মনে হয় জীবনের প্রতিটি ছোট বড় খুঁটিনাটিকে নিখুঁত ভাবে গ্রহণ করা ছাড়া ক্যামেরার অন্ধকারের হতো তার এই জীবনেব ভিতর অন্য কোনও সাড়া নেই।

কিন্তু সুষমাকে দেখে মনে হয় সে যেন নিবিড়তব ভাবে ক্যামেরার প্লেট—রোজ ভোরে ঘুমের থেকে উঠে এবং বোজ সন্ধ্যায় বিন্দুবাসিনীর সংঘর্ষে এসে সে যে আর কিছু মনেই হয না।

কিন্তু মানুষেব প্রাণেব ভেতব পুনরুত্থিত হবাব স্পৃহা বোজ ভোবেই জেগে ওঠে—কিম্বা কোনো কোনো ভোবে নিশ্চযই—জীবনটাকে বাবুযের ছিন্ন নীড়ের মত মনে হয না আর; কিম্বা তাই হ'ল তাকে নতুন করে বানাতে ইচ্ছা করে—

কি একটা সিনেমা কোম্পানী শহরে শহরে বাযোস্কোপ দেখিযে বেড়াচ্ছে; এ কানেও এসেছে।

সকাল না হতেই একটা ছ্যাকবা গাড়ীতে করে ঢ্যাঙা পিটিযে হ্যান্ডবিল ছড়িযে ও বিস্তর সুরখি উড়িযে সিনেমা কোম্পানী রাস্তায় ছুটে বেড়াচ্ছে। সুষমা বিছানার থেকে উঠে এসে বল্লে—ও কিসের বাজনা?

সুধীন একখানা হ্যান্ডবিল নিযে এসেছিল ; বল্লে—বসুনচৌকীর মতই তো শোনায—ভেবেছিলাম কোন ম্যাবেজ পার্টির ব্যান্ড যাচ্ছে—

—ম্যারেজ পার্টি?

সুধীন হ্যান্ডবিলটা ছিঁড়ে ফেলে বল্লে—একটা বাযোস্কোপ কোম্পানী—

সুষমা বল্লে—বাযোস্কোপ? কি বই দেখাচ্ছে?

—কি যেন একটা দেশী কি—নামটা মনে রইল না—

—যাবে তুমি?

সুধীন কাছে এসে বল্লে—কি? দূর, পাগল ছাড়া যায।

সুধীন চলে যাচ্ছিল। সুষমা বল্লে—শোন।

সুধীন এসে বসতেই সুষমা বল্লে—চলো না আমাকে নিয়ে—

—বাযোস্কোপ?

সুষমা চেপে ধরে বল্লে—হ্যাঁ, আমাকে নিযে যেতে হবে।

সুধীন বল্লে—এ সব বাযোস্কোপ দেখে তুমি সুখ পাবে না সুষমা।

সুষমা বল্লে—কলকাতায গিযে তো বাযোস্কোপ দেখবাব সাধ্য নেই। কে জানে কোনোদিন তা হবে কি না।

তাবপব সুধীনেব হাত চেপে ধবে : দিনবাত এই ঘবেব ভিতব থেকে থেকে আমি আব পাবি না—লক্ষ্মীটি—আমি আব পাবি না। এই গুটি গুটি ঘবদোব লোকজনেব ভেতব সন্ধ্যা হলেই আমাব প্রাণটা এমন মচকে যায—উঃ!

সুধীন বল্লে—মচকায সবাবই—

—এব থেকে যে কোনও জাযগায অন্ততঃ দু'মুহূর্ত্তেব জন্যও গেলেও দম দিযে ফিবতে পাবি—সুধীন একটু থেমে বল্লে—আচ্ছা সে সন্ধ্যায সময দেখব 'খন।

—সন্ধ্যাব সময তো বাযোস্কোপ আবম্ভই হবে।

—আচ্ছা যেও।

বিন্দুবাসিনী ঘবে ঢুকে বল্লেন—কোথায যাবে? এতক্ষণ বসে তোমাব ছোট-খুড়িমা হলুদ বাঁটলেন, ছোট খুড়োব কোনো কাজে সাহায্য কবতে পাবলেন না। কেন, তুমি গিযে তোকে বেহাই দিতে পাবতে না—কত বাব ডাকলাম বৌমা ও বৌমা—তা এই বুঝি বিছানা ছেড়ে ওঠা হ'ল।

সুধীন বল্লে—থাক—যাচ্ছেই তো—

বিন্দুবাসিনী দাঁতে দাঁত ঘষে বল্লেন—কোথায যাচ্ছে—যাচ্ছে আবাব—

সুষমা মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে ঘব থেকে বেব হযে গেল।

বিন্দুবাসিনী গলাটা একটু নবম কবে বল্লে—এখন হাপুস হযে দাঁত মাজবে—জিভ ঘষবে—তাবপব মর্জ্জি হয তো খোকাব একবাশ জামা কাঁথা নিযে বসবেন না হয তো নাবকোল কুবিযে নিযে এক থালা মুড়ি নিযে বসবেন।

সুধীন ভাবছিল বর্ণনাটা নিতান্ত অসত্য নয।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—এত বড় পবিবাবেব হাঁকাহাঁকিব ভেতব হাঁপদাপেব ভেতব এ বকম বৌ এনে তোমাবও বদনাম হ'ল, আমাবও গঞ্জনাব আব এক তিল বাকী বইল না।

সুধীন বল্লে—টাকাকড়িব সংস্থান থাকলে কোথাও চলে গেলে হত।

—বৌকে নিযে?

—তাই তো; মানিযে চলতে শেখেনি কি না—মিছেমিছি থেকে কি লাভ?

বিন্দুবাসিনী খানিকক্ষণ চুপ থেকে বল্লে—আমি জানতাম মানুষ বৌ আনে বাপমাযেব সেবাব জন্য পবিবাব পবিজনেব সুবিধাব জন্য—

সুধীন বল্লে—সব বৌ দিযে তা হয না।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—হয না—একটা কথা' হয না আবাব' একটু পবে : না যদি হয লোকে বলবে তোমাব দোষ—আমাব দোষ; আমাদেব এ দোষ ধন্দ (সংসাব কবতে এসে) কোনোদিন ছিল না—আজই বা থাকবে কেন? এ সব ভালো নয—

সুধীন বল্লে—পৃথিবীব চাকাই যেন ঘুবে যাচ্ছে; সব স্বামীই যে স্ত্রীকে ভালোবাসে তা নয—

বিন্দুবাসিনী বিস্মিত হযে বল্লেন—কেন?

সুধীনেব বিবস গলায কেমন একটু ব্যথা বোধ কবলেন তিনি।

অবাক হযে ভাবলেন এ ছেলেও কি বৌকে ভালবাসে না; ভেবে দেখলেন সুষমাকে ভালবাসাব বিশেষ কোনও চিহ্ন এ ছেলেব জীবনেব ভিতব কোথা যেন পাওযা যাচ্ছে না—বৌকে সে ফেলে বাখতে ভালবাসে—যে কোনও আঘাটায—চিঠি এক বকম চলেই না—বাড়ীতে যখন আসে তখনও এদেব সংস্পর্শ খুব কম। এ সব জিনিস তিনি লক্ষ্য কবে দেখেছেন বটে—

আজ অত্যন্ত গভীব ভাবে হৃদযে দাগিযে বসলেন।

এটা তাব ভালো লাগছে না। সন্তায সকলকে বিদায দিযে দিচ্ছে যেন সুধীন; তাব আশেপাশেব মানুষগুলোব ভেতব একেবাবেই সে মন বসাচ্ছে না—ভালোবাসছে না তা। কোন এক দূব ধোঁযা আবছাযায লেখা বই এই সব নিযে বযেছে সে। এই সব কতক্ষণ মানুষকে আনন্দ দেয? কতটুকু? সব সমযেই কি মানুষেব এই সব নিযে থাকা উচিৎ?

বিন্দুবাসিনী ঘবেব ভিতব পাযচাবি কবতে—কবতে ভাবলেন : সুধীন কি বড্ড ছাড়াছাড়া হযে

পড়ছে না? না খোকা—না বৌ—কোনো দিকেই তার মন নেই; কিছুর থেকেই রস গ্রহণ করতে পারে না সে, চায়ও না—এই ছেলে। ছেলেটির জীবনের পক্ষে এ অত্যন্ত কঠিন—বৌটির জীবনের পক্ষেও। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মস্ত বড় পরিবারের কাজকর্মের ভিতর হারিয়ে গিয়ে এদের কথা ফিরে আর একবার ভাববারও অবসর ছিল না বিন্দুবাসিনীর। ভাবলেও এ সব অদ্ভুত অসংলগ্ন জিনিষের কোনো উপায় তার হাতে নেই। এদের রফা—এদেরই হাতে।

বায়োস্কোপ দেখতে পারল না বলে সুষমা সন্ধ্যার থেকেই বিছানা নিয়েছে। বল্লে—অনেক পাপ করলে এ বাড়ীর বৌ হতে হয়—

বাস্তবিকই আজ রাতে সুষমা যে কোনো জিনিস হতে পারে শুধু এ বাড়ীর বৌ হওয়া ছাড়া; বায়োস্কোপ কোম্পানীর ম্যানেজারও আজ রাতে সুষমাকে প্রয়োজনমত প্রচুর স্ফূর্ত্তি দিতে পারে,—সুধীন আজ রাতে সবচেয়ে কম প্রয়োজনীয়—একটা পুরুষমানুষই না, নগণ্য, ঘৃণার্হ—আজ রাতে যদি সুধীরের বিষম মাথা ধরে—সুষমাকে মাথা টিপে দিতে বলে?—কলম হাতে নিয়ে মনে মনে হাসতে হাসতে নিজেকে প্রশ্ন করছিল সুধীন; তাহলে নিকষ পাথরে লোহার বীভৎস রূপহীন বর্ণহীন আঁচড়ের মত সুষমার হৃদয়ে স্বামীর জন্য সমস্ত প্রেমহীন কঠিনতা এমন উলঙ্গ ভাবে বেরিয়ে পড়বে।

পড়ুক হৃদয়ে যা আছে ওর তাই থাক।

সুষমাকে দিয়ে করবে কি সে? স্ত্রীর প্রেমকে প্রথম দিন থেকেই অস্তিত্বহীন বুদবুদ বলে জেনেছে; জেনেছে—এবং জেনে স্থির থেকেছে; জেনেছে—স্ত্রীকে সেও ভালোবাসে না—তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেই বরং ভালো লাগে—ঢের।

সুষমা বিছানায় শুয়ে আস্তে আস্তে বুকে হাত বুলুচ্ছে; সুধীন জানে মেয়েটির দুর্বল হার্ট—শ্বশুরবাড়ীর অজস্র ঘাত সংঘাতে এসে প্রায়ই যেন তা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়; আজো তাই হচ্ছে।

অন্য অন্য দিন এমন হলে সুধীন নিজেই ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিত—ক্রমে ক্রমে সুষমার বুকের ব্যথা থেমে যেত। কিন্তু আজ ভরসা পাচ্ছে না সে; সুধীনের দুঃখ করছে বটে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না সে। কেন, জান? —সুষমা সুধীন এখন তার কাছেও এগোতে দেবে না—স্বামীর প্রতি এমন তিক্তবিরক্ত বীতশ্রদ্ধ। বল্লেন—কোথায় যাবার কথা হচ্ছিল?

—কার?

—বৌমার, সুষমার

—বায়োস্কোপে—

এ পরিবারের মেয়েদের কথা তো দূরে কোনো ছেলেরাও যে বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখতে যায় কর্ত্তারা তা ভালোবাসেন না।

পরিবারের কর্ত্তাদের থেকে বিন্দুবাসিনীর আলাদা কোনো মতামত নেই! তাদের কাছ থেকেই বিন্দুবাসিনী শিখেছেন যে বাযোস্কোপ থিযেটাব অত্যন্ত হেয় জঘন্য জিনিস—নানা রকম অশ্লীলতা সে সবেব ভেতব আছে।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—বাযোস্কোপ দেখতে সে চেযেছিল?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি বলেছিলে?

—ভেবে দেখব।

সুধীন বল্লে—হ্যাঁ, বলেছিলাম যে নিযে যাব।

-কি করে নিযে যাবে?

—যাওযা যাবে না?

—না।

সুধীন বল্লে—কিন্তু অনেক বাড়ীর বৌরাই তো যায়।

—তা যাক।

সুধীন বল্লে—সুষমার যে সব সম্বন্ধ এসেছিল—আমাদের এখানে এমন মুর্খের মত এসে নিজের কপাল নষ্ট না করলে আজ সে ঢের থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখতে পারত। জীবনের সাধবিলাস পাযে ঠেলে ঠেলে বেড়াতে পারত দিনরাত—

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—তা পারত; কিন্তু যখন এখানেই এসেছে এসব পাববে না।

সুধীন বল্লে— তাহলে তো আমি নিস্তার পাই।

মায়ের হাতে বফাটা তুলে দিয়ে সুধীন লেখায় মন দিল।

বিন্দুবাসিনী তাকিয়ে দেখলেন পৃথিবীর কোনো দিকের কোনো জিনিসই ছেলেকে যেন বিব্রত করছে না আর। হয়ে গেছে সে!—এমন ধিক্কার দিয়ে ভাবছে সে, কেন এই লোকের স্ত্রী হতে হল তাকে। এমনি যথেষ্ট—যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন দু'জনে—কিন্তু আজ রাতে বিচ্ছেদ আরো প্রশস্ততর হয়ে উঠল—

বিন্দুবাসিনী এসে সুষমার দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে বল্লেন—সেই সন্ধের থেকেই এরকম শুয়ে আছে সুধীন?

সুধীন মাথা নাড়ল।

—খোকাকে দুধ খাইয়েছিল?

সুষমা কোনো জবাব দিল না।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—নাও, ওঠ, দুধ গরম কর।

সুষমার নড়বারও কোনো ইচ্ছা ছিল না।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—এবার আমি কিছুতেই দুধ খাওয়াতে পারব না। তোমারই করতে হবে বৌ; ওঠ।

সুষমার একগাছা চুলও নড়ছে না।

সে আজ সমস্ত রাতের ভিতরেও উঠবে না—কাল কত বেলা করে ওঠে তাই বা কে জানে? এরকম ব্যবহার তো নতুন নয়—সেও দেখেছে, মাও দেখেছে—ঢের। তবে কেন মিছে আর?

বিন্দুবাসিনী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে থেকে দুধ গরম করতে গেল।

খানিক পরে—

খোকা ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছিল—তাকে নিয়ে উথালপাথাল হয়ে সুষমা সুধীনের শোবার ঘরেই ঢুকল বিন্দুবাসিনী।

সুধীন টেবিলে পড়ছিল; ভাবছিল—খোকাকে এ সময় এখানে না আনলেই পারতেন মা; মেয়েমানুষের ভিতর কেমন যে একটা হিংসার প্রবৃত্তি; দুধ গরম করা—খোকাকে দুধ খাওয়ানো সমস্তই তোমাকে করতে ইচ্ছে; কিন্তু এই জিনিসটা শান্তভাবে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে করলে মুগ্ধতা বেড়ে যেত নাকি? খোকাকে সুষমার ঘরে টেনে এনে ঠেঙিয়ে দুধ খাইয়ে বৌকে শেখাতে চাচ্ছে মা—হয়তো শাস্তি দিতে চাচ্ছে; কিন্তু কে শিখছে? শাস্তিকেই বা কে গ্রাহ্য করছে? এই নির্বোধ স্থূলতা ঘাড় গুঁজে শুধু স্বীকার করে নিতে হচ্ছে—সুষমাকে—সুধীনকে অন্তত: খোকাকে ঠেঙিয়ে দুধ খাওয়ানো শুরু হল।

ঘুমোচ্ছিল খোকা—চোখ ঘুমে অবশ—দুধের জন্য কোনো স্পৃহা নেই—দূর নক্ষত্রজাগ্রত পৃথিবীর জন্যও না . সে চায় ঘুম—ঘুমের বা মৃত্যুর; (সুষমাও তাই চায়—সুধীনেরও অবশেষে তাই পেলেই হত); কিন্তু দু'পাটি মাড়ির ভিতর ঝিনুক চেপে ধরে বিন্দুবাসিনী ধমক দিয়ে উঠে বল্লেন—গেল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে—গেল।

কিন্তু গিলবে কি?

বায়োস্কোপ যাবে বলে বিকেলের মুখোমুখিই খোকাকে বড় একটা কাঁসার বাটিতে করে দুধ খাইয়ে দিয়েছিল সুষমা। যেন অনেক রাতে সুষমা ফিরে আসবার আগে দুধ খাওয়ার জন্য খোকা না কাঁদে আর।

কিন্তু সে কথা সুধীনও জানে না—বিন্দুবাসিনীও না।

সুধীন বল্লে—সমস্ত উথলে ফেলে দিচ্ছে—খেয়েছে নাকি একবার।

—ছাই খেয়েছে। ওর কি মা আছে না মনিষ্যি আছে যে খাবে!

আর এক ঝিনুক মাড়ির ফাঁকে জোর করে ঠেলে দিতে দিতে বল্লেন—আমিই রোজ তাকবাক করে দুধ আলাদা করে রাখব—গরম করব—টাইম মতন খাওয়াব তবে তো খাওয়া—

সুধীন বল্লে—দেখো তো পেটটা; ফুলে আছে নাকি দেখো তো।

বিন্দুবাসিনী বল্লেন—এ কি বেলুন যে বাতাসে ফুলবে? দিনমান এক ফোঁটা দুধ পেটে গেল না—পেট ফুলবে! মরে ঢাক হবে যখন—ততক্ষণে ফুলবে।

সোমনাথ ও শ্রীমতী

সোমনাথ সপরিবারে চেঞ্জে যাচ্ছিল—ইচ্ছে ছিল কাশ্মীর যায়—কিংবা নৈনিতাল মুসৌরিতে। নিজে সে প্রোলিটেরিয়েট ঠিক নয়। কিন্তু প্রোলিটেরিয়েটরা যে বলে যে আজকের সমাজ ব্যবস্থাই এমন যে নানা রকম অনাচার সহ্য করতে হচ্ছে মানুষকে সে কথা ঠিক, (যে কথা সর্বান্তঃকরণে মানে সোমনাথ) না, নৈনিতাল রাণীক্ষেত নয়—যেতে হবে তাকে পুরী রাঁচি-কিংবা গিরিডি মধুপুর—হয়তো শিমুলতলা—বা মিহিজাম। এর বেশি কোথায় আর যাবে সে? অনেক দিন আগে সাংসারিক প্রয়োজনে ৬ দিনের জন্য দিল্লী যেতে হয়েছিল—ট্রেনের কামরা থেকে কতগুলো স্টেশন দেখেছে মাত্র—এছাড়া বাংলার বাইরের ভারতবর্ষের চেহারা তার জানা নেই।

কিন্তু এবারে যেতে হবে কোথাও।

কেন যেতে চাচ্ছে সে চেঞ্জে—সপরিবারে? পরিবার তার খুব বড় নয়—সে, তার স্ত্রী—একটি মেয়ে, বারো বছর বয়স, ছেলেটির বয়স বছর সাতেক।

এদের ভেতর অসুখ প্রায় সকলেরই। অথবা কারুরই নয়। ভেবে দেখতে গেলে এমন কি অসুখ নেই যা নেই সোমনাথের নিজের? তার চোখ খারাপ হয়ে এসেছে—চশমা নেই, দাঁত কিছু কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ডেনটিস্টকে দেখায়নি কোনোদিন, গোলমাল পাকস্থলিতে রয়েছে—পেটে জ্বালা করে মাঝে মাঝে—অম্বল অনেক দিন থেকেই—কিন্তু সাধারণের খাদ্যই সে খেয়ে যাচ্ছে—ডায়বেটিস তাব আছে বলেই সে মনে করে—প্রস্টেট গ্লান্ডের কাজও ভালো নয়—অপারেশন করালে এখুনি করাতে হয়—এখুনি দেরি হয়ে গেছে—এর পর অপারেশন করতে সব ডাক্তার চাইবে না হয়তো। আছে ব্লাড প্রেশার। কিন্তু তবুও সোমনাথের চলাফেরা কথাবার্তায় মনে হয় না সে রুগী। মধ্যবিত্ত মধ্যবয়সী বাঙালিমাত্রের ধারায় যে এ রকম সেটা মনে করা হয়তো ঠিক নয়।

সোমনাথের স্ত্রী শ্রীমতীর অবিশ্যি চেহারাতেই অসুখ ধরা পড়ে : শ্রীমতী শুকোন বালির দেশের নদীর মতো রেবা—তন্বী ও বিষণ্ণ—অপরিচিতদের কাছে শ্রীমতী সুন্দরই। কিন্তু তার আবহে শাসনে সোমনাথের প্রাণের উৎসাহ নিভে যেতে চায়। ...ছেলেপিলেদেরই শরীর খারাপ—লিভারের টনসিলের দোষে ও নানা কারণে মোটেই সুস্থ হয়ে উঠছে না।

কিন্তু সোমনাথ এদের সবাইকে নিয়ে চেঞ্জে চলে যাবার পথে তিন মাসের ছুটির দিন পনেরো অন্ততঃ কলকাতায় কাটাবে মনে করল।

ধর্ম্মতলা বৌবাজারের উত্তরদিকে টালা পর্য্যন্ত যে কলকাতা গিয়েছে এটা সে কলকাতা নয়—চৌরঙ্গীর কলকাতাও নয়—এটা কালীঘাট পেরিয়ে ধাকুরিয়া টালিগঞ্জে যাদবপুর বালীগঞ্জের এলেকায়। সোমনাথ বারো বছর আগে কলকাতায় এসেছিল—ছিল মেছোবাজারে ঝামাপুকুর লেনে আরো কোথায় কোথায় যেন—ঐ দিকে। মাঝে মাঝে সে চৌরঙ্গী অব্দি বেরিয়ে আসত বটে, তারপরে জগুবাবুর বাজারের চেহারা পর্য্যন্ত তার চেনা ছিল—এর পরবর্তী কলকাতা সম্পর্কে তার কোনো কৌতূহল ছিল না।

এবার ভালো ক'রে দেখছিল সব ঘুরে-ঘুরে। রসা রোড—টালিগঞ্জের দিকে চলে গিয়েছে—ট্রামে যাওয়া যায়—হেঁটে যাওয়া যায়—ট্রামে খানিকদূর গিয়ে তারপরে হেঁটে চলার ভিতরেই মন নাড়া পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে বেশি।

এ দিকে রাসবিহারী এভিনিউ—বালিগঞ্জ ষ্টেশন যাদবপুর—আবার ফিরে এসে সাদার্ন এভিনিউ—এই পথ ধ'রে আবার ঘুরে টালিগঞ্জের দিকে—শহরের পথঘাট এর চেয়ে ভালো হওয়া উচিত—কিন্তু সে পরিকল্পনা তার মনের ভিতর স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারছিল এই সব রাস্তাঘাট দেখেই। সোমনাথের মনে হচ্ছিল—এই...মন্দ কী। লেকটাকে কলকাতার শিয়রে পড়ে—পাওয়া তৃপ্তির মত মনে হ'ল তার। কলকাতাকে ঘিরে রেখে রোদ বাতাস নির্বেল নীল জলরাশি—চীনসাগর কিংবা হেলেসপন্ট কিংবা ভূমধ্যসাগরের মত উথলে থাকলে মন্দ হত না—লেকেব কাছে বসে—আঁকাবাঁকা

তীর ধরে বেড়াতে বেড়াতে কিংবা দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ এই মনোনির্ঝরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোধ হত তার।

লেক—এ তো জলের শিশু; শিশুকে দেখতে দেখতে জলের মহীয়সীর কথা মনে পড়ত তার—কোনো রৌদ্রাসক্ত নীলাভ বিসকে বা বেরিনের মেখলা থাকত যদি এই শহরকে ঘিরে। যেমন সাগরের পারে ট্রিপলি, মালাক্কা, আথেন্স, প্যালেষ্টাইন—যেমন ভূমধ্যসাগরের দুপুরের দ্রুত নীলিমায় বিদ্যুতের ভিতর সমাধিপ্রাপ্ত হয়ে আছে অনেক নগরী।

রাতের অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোয় নিজেকে একটু অবচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়—মনে করে নিতে পারা যায়—এই তো সেই উপসাগর—কোথায় চলে গিয়েছে তার কি কোনো খোঁজ রয়েছে—ঐ যে নীলাভ ঝোপঝাড় গাছপালা দেখা যাচ্ছে—ওটা দ্বীপের মত-ওরই পরপারে নীল মহানাগের মত দুমড়ে উঠছে অনুক্ষণ আটলাণ্টিক। রয়ে গেছে?—রয়ে গেছে। দু'চারটা মোটরের আলো ওপার থেকে আপত্তি জানিয়ে যেত।

ঘোরতর প্রতিবাদ ক'রে যন্ত্ররাক্ষসের মত বালিগঞ্জের ট্রেন সবেগে ছুটে যেত বজবজের দিকে।

তারপর স্তিব্ধতায়—অন্ধকারে—অনেকেই লেক ছেড়ে চ'লে গেছে। কিন্তু সোমনাথ বসে থেকে অনুভব করে নিত। বিরাট বাষ্পোচ্ছ্বাস। আকাশের মুখোমুখি দ্বিতীয় আকাশের মত ধূ ধূ জলের লাঙ্গুল হলে লক্ষ লক্ষ নীল বায়ু রয়ে গেছে—কাছেই এই সমুখের জলের আশ্চর্য্য সংকুলতার সঙ্গে যার মিলন রয়ে গেছে। সামুদ্রিক ঘ্রাণ পাচ্ছে সে—দুপুরবেলার রৌদ্রেও সেই অতলস্পর্শ সমুদ্র এই হ্রদের জলের ভিতরেই ঝিকমিক করে অকূলে হারিয়ে যেত যেন।

সোমনাথ শ্রীমতীকে বল্লে—তোমার শরীর সুস্থ হয়ে যাবে—এই কলকাতাতেই—রোজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে চল।

—কোথায় যেতে হবে?

—তুমিই বা কোথায় যাও?—সোমনাথ জিজ্ঞেস করল শ্রীমতীকে—বিকেলে তো তোমার দেখা পাওয়া যায় না। শুনলাম এপাড়ায় অনেকের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছে। আমি তো কারুর সঙ্গে করতে পারলাম না।

শ্রীমতীকেই বল্লে আবার সোমনাথ—মেয়েরা বাড়ী বাড়ী বেড়াতে যায়। ও নয়। চলো বেরিয়ে আসি।

—কিন্তু এখন দুপুরবেলা—

—হোক না

—চান হয়নি তোমার

—কী আসে যায়। এসে খাওয়া দাওয়া যাবে।

শ্রীমতী দূরে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকেই সোমনাথের হাতঘড়ির কাঁটা দেখা যাচ্ছিল; সাড়ে বারোটা বেজে গেছে

বল্লে সোমনাথকে—চলো। কোথায় যাবে।

—একটা ছাতা নেবে তো।

—কোনো দরকার নেই—

—না, আমার জন্য নয়—

—বড্ড রোদ কিন্তু বাইরে।

শ্রীমতীর কণ্ঠে কাঠ কাঠ বিরক্তি, ছিল—বল্লে—তা হোক, বেড়াবার এইই তো সময় দু'জনেই বেরিয়ে পড়ল তারা।

হেঁটে হেঁটে লেকের পারেই গিয়েছিল। ফিরে এল যখন তখন আড়াইটা বেজে গেছে।

মেঝের ওপর বসে পড়ে জিরিয়ে নিতে নিতে সোমনাথ বল্লে—চেঞ্জে যাওয়ার আর প্রযোজন নেই শ্রীমতী।

শ্রীমতী মেঝের উপর শুয়ে পড়েছিল। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বল্লে—কী আর দরকার গিয়ে

—নাঃ, যাব না। চমৎকার এই লেক। কী বল শ্রীমতী।

—'দেখছিলাম', শ্রীমতী বল্লে, 'কেমন এক রকম দেখায় যেন ওটাকে দুপুরবেলা।'

—'ওটাকে? কাকে?'

—'লেকটাকে।'

—তোমার ক্ষিদে পেয়েছিল হয়তো। বিকেলে ওখানে চানাচুর—গরম মুড়ি বিক্রি হয়। দুপুরে কিছু পাওয়া গেল না। আমার মনে হয়েছিল, তোমাকে কিছু-বরফ শরবৎ—দিলে ভালোই হত যখন তুমি লেকের পার দিয়ে বেড়াচ্ছিলে। শ্রীমতী?

শ্রীমতী মাতা নেড়ে বল্লে—না। সর্দ্দিগর্ম্মি হযে যেত। বেরিয়ে ভালো হ'ল এই বারে ক্ষিদে পেয়েছে।

—সকালে তিন কাপ চা খেয়েছি আজ। আর কিছু পেটে পড়েনি তো। তোমাকে যখন বেড়াতে নিয়ে গেলুম অম্বলে কষ্ট পাচ্ছিলাম—মনে হচ্ছিল ব্লাড প্রেশার বেড়েছে। কিন্তু হেঁটে মেরে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব। তা ছাড়া লেক দেখা হ'ল। নিজের মনের কথা জল—জলকেই খুলে বলে আলো।

শ্রীমতী চোখ বুঝে পড়েছিল।

সোমনাথ বল্লে—ঘুমুচ্ছ?

—না। আগে চান ক'রে নিতে হবে তো।

—জল রয়েছে তো?

—আছে ব'লেই তো আশা করি। না হ'লে Pump চালিযে দেব। আবার সেই সমুদ্রের কথা মনে হ'ল সোমনাথের।

—কলকাতাকে ঘিরে একটা সমুদ্র থাকলে বেশ হত। বোশেখ মাসের রোদে যখন কলকাতার আকাশ ভ'রে যায—আমার মনে হয় কাছেই সমুদ্র রযেছে—

—কাছে তো আছেই

সোমনাথ একটু চকিত হয়ে বল্লে—কোথায?

শ্রীমতী বল্লে, ডায়মন্ড হারবারে—

—ও, সে তো—বরং অনেকটা দূরে—আমি বলছিলাম আলিপুর—টালিগঞ্জ—বেহালার ট্রাম প্যাসেঞ্জারদের সমুদ্র দেখিয়ে হু হু ক'রে ছোটাছুটি করত যদি সারাদিন।

—খেলো হযে যেত তাহলে সমুদ্দুর

—তা কখনো হয় না।

শ্রীমতী তাকিযে দেখল সোমনাথের হাতঘড়ির কাঁটায় তিনটে পেরিয়ে গেছে। কোনো কথা না বলে উঠে বেরিয়ে চ'লে গেল সে। ফিবে এসে বল্লে—জল নেই।

—নেই? কলে?

—কলে নেই। নিচের চৌবাচ্চায নেই। চান না ক'রে পাবি না—যা রোদে পুড়েছি। চলো লেকে যাই।

—পাম্প? পাম্প কি হ'ল?

—বন্ধ করে দিযেছে—নিচের থেকে

সোমনাথের বয়স চল্লিশ বছর। দেখায় তাকে তেতাল্লিশ চুযাল্লিশের ব্যাপারীর মতোই প্রায সময। হঠাৎ শ্রীমতীর মনে হ'ল বুড়িয়ে গেছে যেন সোমনাথ, পঞ্চাশ বছরের মানুষের মতন দেখাচ্ছে তাকে। চুল শুকনো—গালে দাড়ি—মুখ পুড়ে গিয়েছে—শরীর পেচানো পাটের মত।

শ্রীমতী ভাবছিল মানুষের জীবনে আর সুখ নেই। সোমনাথ বোস রায মিরবহর মেঝের ওপব বসে আছে—এ হযতো শীগগিরই মরে যাবে। কিন্তু বেঁচেও থাকতে পারে অনেক দিন পর্য্যন্ত। কিন্তু সুখের মুখ কোনো দিনই দেখা হ'ল না কারুরই; সুখ শান্তি কোনো মৃগয়ার পথেই নেই কিছু। ওদের জীবনে নেই, কিন্তু বেঁচে থাকার পথেও এখন থেকে ক্রমাগতই আরো ঢের চাঁদা কাঁটা জমতে থাকবে। লেক বেরিয়ে আসবার জন্য নয়, পাম্প বন্ধ করার জন্য নয়, সোমনাথ আর তার নিজেব রাজযোটকের দিকে তাকিয়েই এই কথা মনে হ'ল শ্রীমতীর।

—গণেশবাবুর তো আর্স্পদ্ধা কম নয়—সোমনাথ বল্লে

—কেন?

—আমরা চান করিনি, বন্ধ ক'রে দিল।

—এখন বেলা তিনটে—চানের সময় নয। তোমার দাদা সপরিবারে দার্জ্জিলিঙে চ'লে গেছেন; ফিরে আসবেন হয়তো আজকালই। গণেশবাবুর ছেলে এসে জানিযে গেছে এখন দিনে দু'বারের

বেশি পাম্প চালাতে দেযা হবে না। দাদা ফিবে এলে জল বেশি দেবে।

সোমনাথ হাঁ ক'বে তাকিযে বইল।

শ্রীমতী বল্লে—গণেশবাবুব ভয—বেশি চালালে পাম্পটা পুড়ে যাবে।

—তা যেতে পাবে—সোমনাথ মেঝেব উপব শুযে পড়ে বল্লে

—চলো খেতে

—চান কবতে হবে তো আগে—

শ্রীমতী বল্লে—বালতি বযেছে—বাস্তাও আছে—গিযে হাইড্র্যান্ট খুলে দিলেই হ'ল।

সোমনাথ মেঝেব ওপব শযান অবস্থায ডাক পেড়ে বল্লে—বাকু'

কোনো উত্তব পাওযা গেল না।

—ঘেণ্টি'

কিন্তু কোনোই সাড়াশব্দ পাওযা গেল না।

—ওবা কোথায শ্রীমতী

—জানি না—কোথাও বযেছে নিশ্চযই

—খাওযা দাওযা কবেছে?

—না

—এত বেলা অব্দি' সোমনাথ চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়াল। পোষাকী কাপড় ছেড়ে একটা মযলা লুঙ্গি পবে বেবিযে গেল সে—কিছুক্ষণ পবে দেখা গেল—ছেলেমেযে ও সে হাইড্র্যান্টেব গাঙ্গেয স্নান শেষ ক'বে ফিবে এসেছে—হাতে এক বালতি ঘোলা জল শ্রীমতীব জন্যে।

—'তা ঘোলা হোক—জল তো—' শ্রীমতী চোখে নাকে খুশি হযে বল্লে।

কিন্তু তবুও পৃথিবী এদেব খুশি কবতে কবতে পদে পদে এদেবই বেহুলাব নাচ দেখে নিতে চাচ্ছিল স্বর্গেব দেবসভায। দার্জ্জিলিং থেকে সোমনাথেব মাসতুতো ভাই দাদা ফিবে এলেন, কিন্তু তাব পবিবাব এল না। সুবনাথবাবু সাবাদিনই অফিসে থাকেন। অফিস থেকে ফিবেও অফিসেব ব্যাপাব নিযে ব্যস্ত হযে থাকতে হয তাকে; দবকাবী লোকজন আসে, কথাবার্তা হয, বেড়াতে চ'লে যান—ফিবে এসে চান ক'বে যখন তিনি খেতে বসেন—শ্রীমতী একাই জেগে থাকে তখন।

খেতে খেতে শ্রীমতীব দিকে তাকিযে সুবনাথ বল্লে—এখন বাত বাবোটা

শ্রীমতী electric heater-এ ডাল গবম কবছিল। খাবাব ঘবেব চড়া বিদ্যুতেব আলোব আভাব ভিতব দাঁড়িযে সাগবছেঁচা মাণিকেব মত যেন চোখেই সে বল্লে—কিন্তু এ তো কলকাতা। বাত বাবোটা একটা—হবেই তো।

—অন্য কোথাও হ'লে আশ্চর্য্য মনে হত—কি বল শ্রীমতী?

—হ্যাঁ এত বাতে—এত আলো

—আলো শুধু? কান পেতে শোনো নগব গুঞ্জন কবছে না'

ডাল গবম ক'বে পবিবেশন কবতে কবতে গাঢ় বৈদ্যুতিক আভাটা শ্রীমতী অনুভব ক'বে নিল আব একবাব।

—খাবাব ঘবে এই যে লাইট দেখছ—এব কত ক্যান্ডেল পাওযাব জান

শ্রীমতী ঘাড় বেঁকিযে বল্লে—কত? পাঁচ শো

শ্রীমতী বল্লে—সাবা বাত

—হ্যাঁ, সাবা বাত যানবাহন চলছে, ট্রেন ছুটছে

—মানুষ কথা বলছে

—মনে হয যেন মুদ্রাবাক্ষস আব চাণক্য মহানগবেব বাত্রি জাঁকিযে বেখেছে। কখনো চাঁদেব আলো—নক্ষত্রেব আলো—কিন্তু চাণক্য পণ্ডিতেব চোখেব জ্বলজ্বলে ডিমেব মত সব সমযই বযেছে বিদ্যুতেব আলো।

....কাটলেটেব ভিতব কাঁটা ফুঁড়ে দিযে হেসে বল্লে—তাকি হয। তা কি কখনও হয, শ্রীমতী। মফস্বলেব মানুষ তোমবা—কিছুক্ষণ দ্রুত কাঁটা ছুবি চালিযে হাতেব কসবৎটা একটু ঢিলে ক'বে নিযে সুবনাথ বল্লে—সোমনাথ কি বলতে পাবে কত ধানে কত চাল হয।

শ্রীমতী একটু দমে গিযে হিটাবটাব সুইচ খসিযে দিল।

—ওটা নিভিয়ে দিলে শ্রীমতী

—কেন, এখুনি চাই—কী হবে। মুখ ফিরিয়ে আস্তে একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে সে বল্লে—

—কাটলেট ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখছি—

—ভেজে দেব আর দু'চারখানা?

—কত সময় লাগবে?

—এই তো এখুনি। দিচ্ছি।

—না, না, দরকার নেই—এ চাল করে আনা হযেছে শ্রীমতী

শ্রীমতী স্মরণ ক'রে হিসেব ক'রে বল্লে—বুধবার রেশন আনা হয়েছে—

—আমার পোলায়ের চাল আনা হয়নি তো—

—সে কি রকম চাল—কোথে কে আনতে হয—কাকে আনতে বলা হযেছিল—

ব্যাপারটা কি শ্রীমতী ঠিক বুঝতে পারল না—সুরনাথের খাবারের প্লেটের দিকে অনন্য উপায় হয়ে আরো কিছু কথা শুনবার অপেক্ষায় তাকিয়ে রইল সে

—অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকি—এদিকে তোমরা বযেছ। সোমনাথকে বোলো শুধু কিউ ক'রে দাঁড়ালেই চারখানা ব্যাঙের আধুলি পাওয়া যায় না।

—উনি তো যান না—

—যেই যাক—আমি ফোন করে দেব কাল—কিংবা মুখেই ব'লে আসব—অফিসে যাওয়ার সময। কোথায় তা' বলে দেব সোমনাথকে—সেখানে গেলে ভালো চাল পাবে।

—'আমার দাঁত নেই শ্রীমতী—' সুরনাথ বল্লে

—'ওঃ'

—'ভাতে কাঁকর রযেছে বুঝি' শ্রীমতী বল্লে

—'না, তা নেই'

শ্রীমতীর মনে পড়ল সারাদিন সে আজ অনেক কাঁকর বেছে ফেলে দিয়েছে চালেব থেকে মুগের ডালের থেকে।

—'চালটা বড্ড গর্ভোফোরাস' সুরনাথ বল্লে।

তার মানেই মোটা? শ্রীমতী ভাবছিল। 'কিন্তু মিষ্টি-স্বাদ আছে—' বল্লে শ্রীমতী!

—'হৈমন্তী ধান নয়।'

—'আমার মনে হয় আউস চাল—গত বছরের—' সুবনাথ থেকে বল্লে— 'এ চালের নাম কি হবে।'

—নাম হৈমন্তী ধানের—অনেক রকম নাম আছে—বাসমতী রূপশালি গোবিন্দভোগ— সুরনাথ ভাতের প্লেট সরিয়ে রেখে দিল—কাঁটা চামচ ডিশের ওপর ফেলে রেখে।

শ্রীমতী বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে বল্লে

—তা'হলে কাটলেট ভেজে দেই।

সুরনাথ হুংকার ছেড়ে বল্লে—সোমনাথ।

সে কাছেই কোথাও ছিল। ডাক দেওযা মাত্র এসে দাঁড়াল

সুরনাথের মুখোমুখি একটা চেযারের হাতল ধবে

—চাল কে এনেছে?

—রেশনের চাল

—আমি রেশনের চাল খাই কখনো!

—তা তো জানি না—মন বাহাদুর এনেছে

—কোথায় সে?

—(হয়তো) গ্যারেজে দেখেছিলুম—মোটরে কাদা লেগেছে

'তা লেগেছে বৈকি—' শ্রীমতীর দিকে তাকিযে সুরনাথ বল্লে—'আসছিলুম; মেটেবুরুজে বৃষ্টি পড়ে কাদা হয়েছিল—মোটর সাফাই করছে বুঝি। শোন—ওর কান দু'টো কেটে আমার পাযের নিচে রাখতে হবে। চপ্পলে পিষে দেখব আমি।'

সোমনাথ বেরিযে গেল

সুরনাথ সজোরে কাঁটা-চামচ চালাতে চালাতে বল্লে—সোমনাথ খেয়েছে?
—হ্যাঁ
—ছেলেপিলেরা
—খেয়েছে—শ্রীমতী বল্লে
—তুমি?
—আমি এইবারে—
—ভাত খাবেন না আপনি?
—এ চালের ভাত! সুরনাথ হেসে বল্লে—মন্বন্তরের সময় মাঝে মাঝে খেযেছি আত্মনিগ্রহের জন্যে। দিনরাত লোক মরে যাচ্ছিল। পোলাওর চাল খেতে ভয করত। উপোস দিতাম—মোটা চাল যে গম—Slimming-এর জন্যে। বিবেকের কাছে কেমন যেন ব'কে গিয়েছিলাম—বেশ ছিমছাম হয়ে উঠেছিলাম তাই—এ রকম মোটা ছিলাম না তো। ভারি চমৎকার দিন গিযেছে সে সব।
শ্রীমতী নুন এগিয়ে দিল
সুরনাথ বল্লে—কিসের মাংস?
—মটন—ফারপোর রুটি কেটে দিতে দিতে শ্রীমতী বল্লে
—কে রেঁধেছে
শ্রীমতীর রুটির প্লেট পাশে রেখে দুধ গরম করতে গেল—
মাংস শেষ করে সুরনাথ বল্লে—ক্ষীর করছ? আমি চাটনি ছাড়া আর কিছু খাব না। দু'একটা মিষ্টি দিতে পার—লেডিকেনি দরবেশ।
চাটনি সমস্তই ঢেলে দিল শ্রীমতী।
—হিটারের কাছে দাঁড়িযে রযেছে? বল্লে সুরনাথ।
শ্রীমতী অবাক হযে টের পেল অন্যমনস্কতায় সে হিটারের খুব কাছেই এসে দাঁড়িযেছে। তা ছাড়া হিটারের ওপর সমস্ত দুধ পুড়ে ছাই হযে গেছে।
—শক্ লাগতে পারত শ্রীমতী।
দুধ যে পুড়ে গেছে তারা দু'জনেই তা জানে। কিন্তু কেউই কাউকে কিছু বলতে গেল না। দরবেশ দু'টো শেষ করে সুরনাথ বল্লে—ইলেকট্রিক স্টোভ বড় বাঞ্ছোৎ জিনিস—
হঠাৎ শক লেগে গেলে—
শ্রীমতী দুধের প্যান নামিযে নিভিযে ফেল্ল হিটারটা।
—তোমাদের রেশন কার্ড করা হযেছে
—না
—তাহলে তোমাদের চ'লে কী করে? আমাদের কার্ড তো ভুলে নিযে গিযেছিলুম দার্জ্জিলিং। আছে তো শুধু মন বাহাদুরের কার্ড
শ্রীমতী নেভানো হিটারের ওপব বাঁ হাত ছড়িযে দাঁড়িযেছিল নিভে যাওযা জিনিসটাব দিকে তাকিযে। কোনো উত্তব দিল না।
সুরনাথ বাঁ হাত দিযে পকেট থেকে কার্ড বার ক'বে টেবিলের ওপব বেখে বল্লে—এই যে রাখলুম। সুবনাথেব থেকে হাত সাতেক দূবে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িযেছিল শ্রীমতী হিটাবেব দিকে তাকিযে। তাকিযে রইল।
'ভালো চাল দেবে—সোমনাথকে আমি বুঝিযে বলে দেব—কোথে কে আনতে হবে।'
'কিন্তু আমবা কি এইখেনেই থাকব?'
'কোথা যাবে তা'হলে?'
'আমাদের তো চেঞ্জে যাবার কথা'
সুরনাথ শ্রীমতীর তনু শবীবের আশ্চর্য্য তপঃক্লেশ থেকে ধীরে ধীরে উপচীয়মান আমোদের মত একটা জিনিসকে—হঠাৎ থেৎলে ফেলে অদ্ভুত ভাবে হেসে বল্লে—কিন্তু কী বল্লে বুঝতে পারা গেল না কিছু। কয়েকটা দুর্দ্দান্ত মিলিটারি ট্রাক আকাশ বাতাস ফাটিযে এক পৃথিবীর যুদ্ধ ও ঋষিশ্রাদ্ধ নির্ঘণ্ট নৈরাশ্যের অবতারের মতন ছুটে চলে যাচ্ছিল। দু'জনেই তাবা খাওযার ঘরের অতিরিক্ত রকমেব সুস্পষ্ট আলোর ভিতর নীবব হযে অপেক্ষা করছিল—সুরনাথ আবাব হেসে আবার সেই কথা বলবাব

জন্য, শ্রীমতী পরিষ্কার ভাবে তা শুনবার জন্য।

কিন্তু বলবার তাগিদ বোধ করল না আর সুরবাবু। মিলিটারী লরীগুলো চলে যাওয়ার পর স্তব্ধতার ভিতর বুঝতে পারল সুরনাথ—ও রকম ভাবে হেসে ও সব কথা বলতে গিয়ে কী সর্বনাশই করতে বসেছিল সে। শ্রীমতী যদি শুনতে পেত—তাহ'লে এ মেয়েটির দিকে চোখোচোখি ফিরে তাকাতে পারত কী—সে—কোনোদিনই আর?

. হঠাৎ যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এই লরিগুলো আজ এই মহাশক্তির দিনে এসে তাকে রক্ষা করে গেছে। রক্ষা করেছে শ্রীমতীকে। মানুষের জীবনের এই বিচিত্র প্রসূতির কথা ভেবে মনের তামাশা তার ক্রমেই চাড় দিয়ে আর একটা প্রচণ্ড হাসির দুর্ঘটনা সৃষ্টি করতে যাচ্ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে খানিকটা হিসেবী সহানুভূতির সুরে সুরনাথ বল্লে—ক'মাসের ছুটি পেয়েছে

—মাস তিনেক

—চেঞ্জে কোথা যাবে

—মিহিজাম হয়তো

—কেউ আছে সেখানে?

—আমি তো জানি না

—ব্যবস্থা কিছু করা হয়েছে?

—আমাকে বলেননি

—কলকাতায় তোমার খারাপ লাগে?

—ওঁর মন্দ লাগে না

—তোমারও ভালোই লাগে। আমি জানি। থেকে যাও।

শ্রীমতী ঠাণ্ডা হিটারের ওপর হাত রেখে বল্লে—এই লরিগুলো এসে পড়ল যখন আপনি কি যেন বলছিলেন।

—আমি বলিনি কিছু। তুমি শুনেছ কিছু?

—না। লরির আওয়াজে শুনতে পাইনি।

সুরনাথের পেটের ভিতর দিয়ে সেই হাসি চাগিয়ে উঠছিল আবার। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে—বেসামাল হাসিটার কণ্ঠরোধ করবার জন্যই হয়তো—সে বাঁ হাত দিয়ে শ্রীমতীর ডান হাতের কবজি (সজোরে) টিপে ধ'রে বল্লে—এ কী হিটারে হাত দিচ্ছ কেন?

—কিন্তু সুইচ থেকে আলগা করা এ তো ঠাণ্ডা

—তা হোক। শক লাগতে পারে

—কী ক'রে

—কোনো একটা জিনিস হযে যেতে কতক্ষণ সময় লাগে আর শ্রীমতী।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে হাত খসিয়ে নিচ্ছিল। তার ভালোর জন্যেই সুরনাথ তার কবজি—ভেঙে দেখছে প্রায়।

—তুমি অন্যমনস্কতায় plug ঢুকিয়ে দিতে হযতো। খারাপ জিনিসের এত কাছে থাকতে হয় না কখনো।

নিজেই সে শ্রীমতীর হাত ছেড়ে দিল। 'ঐ যে রেশন কার্ড টেবিলের ওপর। কাল আমি দার্জ্জিলিং যাচ্ছি।'

—কবে ফিরবেন

—তোমরা যতদিন এখানে থাক, আমরা তত দিন ওখানে থাকব। এসো আমার ঘরে একটা কাজ আছে।

শ্রীমতী এবার নীল শেডের মিহি ঠাণ্ডা বিদ্যুতের আলোর ভিতর গিয়ে দাঁড়াল।

—তোমাদের খরচ কি করে চলবে? সুরনাথ জিজ্ঞেস করল।

—আমাদের টাকা আছে।

—সেই কথা জানবার জন্যই তোমাকে ডেকেছিলাম।

একটা সুখের—শান্তির—তবুও খানিকটা গরমিলের আবছায়ায় বাতিটা সুরনাথ নিভিয়ে দিতেই দেখল ঘরের একটা জ্যোৎস্নালালিত দীর্ঘ চৌকো পথ ধ'রে শ্রীমতী বেরিযে যাচ্ছে।

—কি বল্লে ঠিক হত তাহ'লে—শ্রীমতী সন্ত্রস্ত হয়ে জানতে চাইল।
—বলা উচিত ছিল চেঞ্জে যাওযাব মত টাকা নেই
সোমনাথ চাযেব পেযালাব চাব দিকে হাত বুলিযে নিযে বল্লে—কোথায যাবে এখন?
—এইখানেই থাকতে হবে। কিন্তু বলা উচিত ছিল এইখানে থাকবাব মত টাকাও নেই?
—দাদাকে বলেছিলাম টাকা আছে আমাদেব
—ও কথা বলতে গেলে কেন? সোমনাথ জিজ্ঞেস কবল।
—তুমি বলতে পাবতে শ্রীমতী?
শ্রীমতী জানতে চাইল চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে কি না। সোমনাথ মাথা নেড়ে বল্লে—এটাকে গবম ক'বে আনবাব কোনো মানে হয না।
—নতুন ক'বে তৈবি ক'বে দিতে পাবি।
—চিনি তো ফুবিযে এসেছে প্রায
গুড় দিতে পাবা যায
সোমনাথ চাযে চুমুক দিযে বল্লে—থাক। তুমিই ঠিক কবেছ শ্রীমতী, এখানে থাকবাব মতন টাকা নেই—বলা উচিত ছিল দাদাকে। কিন্তু—আশ্চার্য্য—এতদূব তুমি চলে এসেছ? তুমি, সত্যি বলতে পাবতে দাদাকে?
—আমাকে উত্তব দিতে হত শুধু। তিনি তো জানতে চেযেছিলেন।
তা ঠিক। সোমনাথ চাযে চুমুক দিল।
—ছাযা কোথায? জিজ্ঞেস কবল সে—এক ঘাট থেকে আব এক ঘাটে অন্যবকম দাযিত্বেব সুব আযত্ত কববাব চেষ্টা ক'বে।
—জানি না
—বাবলু?
—কোথাও বযেছে নিশ্চযই
—কোনো খোঁজ খবব নেই। দাদাব সামনে ওবা বেবয নি কেন? আমিও তেমন বেবই না অবিশ্যি ওদেব লিভাব খাবাপ। ছোট ছেলেপিলেদেব নানাবকম ওষুধ বেবিযেছে আজকাল—একটা কিনে আনব ভাবছি। টনসিল অপাবেশন কবা দবকাব বাবলুব। কিন্তু কলকাতাব ডাক্তাব দিযে এ সব কাজ কবাতে গেলে—
সোমনাথ একটু পবে বল্লে—দেশে ফিবে গিযেই কবাতে হবে।
সোমনাথেব হাতেব থেকে পড়ে চাযেব পেযালাটা ভেঙে গেল। কাপড়ে চা লাগল কিছু।
'কি ভেঙে গেছে—একটা শব্দ পেলাম যে বাবলু এসে হাঁ কবে দাঁড়িযে বল্লে।
ছেলেটাব বোকা মুখেব দিকে তাকিযে ব্যথিত হ'ল শ্রীমতী। সোমনাথেবও মন খাবাপ হযে যাচ্ছিল—কিন্তু সে নিজেকে উপশমিত কবে নিতে নিতে ভাবছিল—যে পিতাব পবিবাবে যে সমাজেব ধাপে আমি জন্মেছি—জীবনকে যা দাঁড় কবিযেছি আমি—তাতে আমাব সন্তান এছাড়া আব কী হতে পাবে।
—তুমি কবছিলে খোকা? বাবা তাকে জিজ্ঞেস কবল।
—ঘুমুচ্ছিলুম—
—কেন, লেখা পড়া নেই?
এবকম স্বচ্ছ প্রশ্ন শুনে ছেলেটিব চোখে জল এল।
'এদিকে আমাব কাছে এসো' সোমনাথ বল্লে। ছেলেটিব মুখ শুকনো, চোখ দু'টি বাছুবেব মত—অত বড় নয, কিন্তু অত দূব পর্য্যন্ত নিবীহ—কীটানুব থেকে মানুষ এসেছে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ অনেক আগেকাব। স্তবে থেমে গেছে। এই সব কথা মনে হয ছেলেটিব দিকে তাকালে। কিন্তু তবুও আমাদেব সব অনুমান সব সময ঠিক হয না, অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত কবে সময তাব নিজেব কাজ কবে যায অব্যক্ত কাজ—অন্ততঃ দুর্জ্ঞেয—; এ ছেলেটিকে নিযে কী কববে কে জানে ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা ক'বছিল সোমনাথ।
ছেলেটি দূবেব দবজা ছেড়ে কাছে এগিযে এল না কিছুতেই।
'তোমাকে মাবব না আমি'—অভয দিল সোমনাথ।
ছেলেটি দবজায ঠিক তেম্নি দাঁড়িযে বইল তবু।

'দিদি কি করে?'

কোনো উত্তর দিল না সে।

'তোমার শরীর খারাপ—পড়াশুনা এখন না হয় না করলে—কিন্তু এক আধটু খেলাধূলো করলেও তো পার। খেলেছিলে আজ?—'

ছেলেটি শিবচোখে সোমনাথের হুতোমথুমোর মত চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে অবসন্ন হয়ে শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

'দিদি কোথায়?'

ছেলেটি বল্লে না কিছু

'খাতাপত্র বই—তোমাদের কোথায় সব?' সোমনাথ জানতে চাইল।

ছেলেটির চোখে জল—শুকিয়ে এসেছিল প্রায়—বাষ্পের আভাস দেখা গেল আবাং—

'এদিকে এসো—কি ভালো লাগে তোমার খোকা?' সোমনাথ কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটির ঠোঁট কাঁপছিল। কম্পিত ঠোঁটের ভিতর দিয়ে অনেক কষ্টে সে জবাব দিল—কিছু না। ঠোঁট কাঁপছে—

শ্রীমতী বল্লে—'তা তো দেখছি। কিন্তু কিছু কি ভালো লাগে না তোমার?'

ছেলেটি উত্তর দিল না।

সোমনাথ বল্লে—'কিছুই তোমার ভালো লাগে না বাছা?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল।

—এই ট্রাম বাস—কলকাতা ভালো লাগে না।

ছেলেটি সজোরে মাথা নাড়তে গিয়ে চমকে উঠে মাঝপথে থেমে গেল। চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে সবেগে ঘুরতে গিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যেই বরফের ভেতর থেকে তাকিয়ে বইল যেন—চালানি ইলিশের ঠাণ্ডা একশা চোখেব মত

'দেশে ফিবে গেলে ভালো লাগবে?' সোমনাথ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

খোকা তার মার দিকে তাকিয়ে বল্লে—পেযালাটা কি করে ভেঙে গেল—

—হাত থেকে পড়ে

সে একটু ঘাবড়ে গিযে বল্লে—পেযালাটা কাব?

—আমাদেবই। চলো আমবা দেশে ফিবে যাব খোকন।

—যাবে?

—যেতে পারি। সুখদুঃখের বাইরে তাব আগেকার হতচেতনার অবস্থায ফিরে এসে সে বল্লে।

—সেখানে গেলে ভালো লাগবে তোমার?

—তোমবা আবেক জাযগায কোথায যাবে বলেছিলে না?—বোঝা গেল: না যেতে পারলেই সে যেন বেঁচে যায; কিন্তু এখানে থাকলেও—কে তাকে বাঁচাবে? এম্নি তাব মনোভাব।

—চেঞ্জে। সেখানে যাবে তুমি?

—তোমরা যদি আমাকে নিযে যাও, আমি যেতে পারি।

—আর তোমাকে এখানে ফেলে যাই যদি?

ছেলেটি সাতপাঁচ ভেবে এক পা দু'পা বাড়িয়ে চলে গেল—বাড়ীরই ভিতর—যেখানে কেউ নেই—কিছু নেই—সেইখানে গিযেই একটু প'ড়ে থাকবার জন্য। প'ড়ে থাকা মানে ঘুমোনো নয—ঘুমাবার জন্য খাট (খাটের) দরকাব হয না। যে কোনও নিরালা জাযগায গিযে শুযে থাকা- কিংবা ব'সে থাকা—কোনো কথা না ভেবে—তবুও না ঘুমিযে।

খোকা সরু সরু ঠ্যাং বাড়িযে বিছানাযই গিযে উঠল আবার। রোগা ঠ্যাং ছড়িয়ে ছাযা এক কিণারে শুয়েছিল।

—'আমি এসেছি' খোকা বল্লে

'আচ্ছা' তার দিদি তাকে উত্তর দিযে বল্ল।

তারপর কেউ কোনো কথা বল্লে না আর। দু'দিকে ঘাড় ফিরিযে শুয়ে রইল দু'জন। খাবারেব জন্য লোভ নেই তাদের—খিদে নেই খেতে ডাকলে সরু সরু পায়ে ভর দিযে তারা হাজির হলে

সোমনাথের মনে হয় খাদ্য তো নয়ই কোনো লালসাও এদের প্রজ্বলিত করবে না কোনোদিন—একটু ঘুমোবার জন্যও লোভ নেই তাদের। তাদের একটা উৎকণ্ঠা—সোমনাথ কখন এসে মারে—এ ছাড়া বিশেষ কোনো ভয় নেই আর, সমস্ত জীবনটাই একটানা মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের—তা অন্ধকার লোকে কাটিয়ে দিতে হচ্ছে বলে।

সোমনাথ বল্লে—তিন মাসের ছুটি—এক মাস তো ফুরিয়ে গেল।

তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—আর দু'মাসে কী করতে পারা যায় বলো তো। চলো চেঞ্জে যাই—জীবনটাকে উপভোগ করব না? শ্রীমতী একটু হেসে বল্লে—কলকাতায় দাদার বাড়িতে আছি। মানুষের মাথা খুঁড়ে এ পাড়ায় বাড়ি পাচ্ছে না। জেনিভা লেক একেবারে হাতের কাছে। এ বাড়িতে কেউ আর নেই। আমরাই সব। এ রকম সুন্দর ঝাড়াঝাপটা কোনোদিন পাব না আর আমাদের জীবনে। চেঞ্জে গেলে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হব—

—হয়তো ছেলেটা মরে যাবে চেঞ্জে গিয়ে

—আমি মরব না অবিশ্যি—সোমনাথ বল্লে-কিন্তু তোমাকে হয়তো সমাধির নিচে—হয়তো গিরিডিতে—উশ্রীর ওপারে ঐ ছোট পাহাড়টার কাছে—রেখে আসতে হবে।

শ্রীমতী বল্লে—সেও এক রকম হিসেব নিকেশ। সবাইকে বিদায় দিয়ে মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে এখানে এসে থাকতে পারবে বেশ। বনবে ভালো।

—উশ্রী নদী দেখেছ?

—দেখেছি

—আমি তো দেখিনি। কবে গেলে গিরিডি?

—হ্যাঁ, চোরে চোরে—সোমনাথ বলে

—কী নদীটার কথা না বল্লে?

—উশ্রী

সোমনাথ ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দেবার ভান করে বল্লে—গিয়িছিলাম প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর আগে—আবের ব্যবসায়ী এক বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে ঠিক করতে। মাত্র পাঁচশো টাকায়—সে আমাকে পার্টনারশিপ দিতে চেয়েছিল—

—তুমি নিলে না কেন?

—তাহ'লে বড়লোক হয়ে যেতুম—

শ্রীমতী প্রগাঢ় হয়ে মুখোমুখি একটা কৌচে বসেছিল। সোমনাথের হাতছাড়া ব্যবসাটা যা দু'চার বছরে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে আসতে পারত তারই মৃত মরীচিকার দিকে তাকিয়ে থেকে তাব মনে হচ্ছিল কী আসে যায় সন্তান—বাৎসল্যে—পুরুষের সঙ্গে মিলনে অমিলনে—জীবন কাকে বলে—মরণেরই বা কী মানে যদি কেউ কোনোদিন রোজগার করতে না পারল!

সোমনাথ কি যেন বলছিল, কিন্তু শ্রীমতী শুনতে পেল না। গিরিডি হাজারীবাগে গিযে সোমনাথের আবের ব্যবসাই শুধু নয়—আরো অনেক সুযোগ ও অবকাশ যা হতে পারত তার জীবনে—তা আর হয়ে উঠল না। সেই সব নিরুদ্দেশ সম্ভাবনা মৃত টাকাকড়ির দিকে তাকিযে চোখ দু'টো লালসায চকচক ক'রে উঠল তার। রতির চোখ এ রকম চকচক করে ওঠে না। শ্রীমতীর চেহারা সুন্দর-সুন্দর যে সেই চেতনাও তার কম তীক্ষ্ণ নয়—কিন্তু তবুও নিজের রূপের—সে রূপেরই আওতায যে মনন মর্য্যাদা ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠছিল তার, সে কথা সে এত দূর ভুলে গেল যে পৃথিবীর কোনো প্রার্থিত প্রেমিক আট হাত (আড় মযলা) ধূতি প'রে এলে শ্রীমতীর চোখের ছানি কাটার ভার সিল্কের পাঞ্জাবী ফরাসডাঙাব ধূতি নকল সোনার বোতামের একজন—যে কোনো একজন মালিকের হাতে তুলে দিতে হত তার।

হঠাৎ চমকে উঠে শ্রীমতী টের পেলে কামনার একটা অন্ধকারের গলি বেয়ে সে যেন অন্তহীন গহ্বর-প্রস্থানের দিকে ধ্বসে পড়ছে।

—আমাদের কত টাকা আছে আর শ্রীমতী?

—দেড়শো—পনেরো দিনের খরচ

সোমনাথ একটা দিনের জন্যে তাহ'লে সাব্যস্ত হতে পেরে লেজ পাকিয়ে সেই বিড়ের ওপর

যেন সুবিধা ক'রে বসে গলা খাকরে নিয়ে বল্লে, 'তারপর কি করবে ঠিক করেছ?' .

—ভাবছি।

—ফিরে যেতে পারি

—দেশে?

—দাদাকে লিখতে পারা যায়। আমি লিখতে পারি—

সোমনাথ সমূলে বিচলিত হয়ে বল্লে—তুমি কেন লিখতে যাবে শ্রীমতী! সুরনাথের সঙ্গে.আমার কি রকম সম্পর্ক জান? ও আমার মায়ের মাসতুতো বোনের ছেলে। বাবা ওর নাম সুরনাথ রাখল, আমার নাম সোমনাথ। ওর বাবার সঙ্গে আমার বাবার কেমন যেন একটা নাড়ীনক্ষত্রের টান ছিল—কিন্তু বেশি ক'রে ছিল ওর মায়ের সঙ্গে—

সোমনাথ চায়ের চিনিতে চামচ ঘুরুতে ঘুরুতে বল্লে—লোকে বলে ওর মায়ের সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক ভাল ছিল না।

শুনে শ্রীমতী ঘাড় ফিরিয়ে সোমনাথের দিকে তাকাল।

কেউ কেউ বলে সুরনাথ আমার বাবারই ছেলে। সোমনাথ তাকিয়ে দেখল শ্রীমতীর চোখে মুখে একটা শয়তানের ছাপ সূর্য্যালোকিত দেবতার মতন হাসছে। পর্দ্দার কিণার দিয়ে সূর্য্যের ছ'টা তার মুখের ওপর এসে পড়েছিল।

চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘোরাচ্ছিল সোমনাথ: কতগুলো চায়ের পাতা—পাতার গুঁড়ো-দ্রুত বেগে ঘুরে ফিরছিল। চামচটা সরিয়ে রেখে চায়ের পেয়ালা ডান হাতে ধ'রে সোমনাথ বল্লে—কিন্তু আর এক কথা সোমনাথ কি বলবে—সেই আগের কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছিল : মেয়েটা মরে যাবে হয়তো চেঞ্জে গেলে। ছেলেটা তো পা বাড়িয়ে দিয়েছেই।

—খোকন কোথায়?

—রোজই জ্বর হয়। দু'দিন বাদেই এক শিশি মিকশ্চার খাওযাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না ছেলেব। ওব গায়ের ছ্যাকছেকে গরমে সবই বিপন্ন। কলকাতাব ভালো ডাক্তাব একটানা দেখানো সম্ভব নয। কিন্তু দেখালেই সেরে যাবে? চেঞ্জে যাওযা অসম্ভব নয—অনেক টাকাকড়ি দেনা হবে—এ জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু তবুও চেঞ্জে গেলেই আমরা যে বাঁচব তার কোনো প্রমাণ রযেছে, শ্রীমতী

শ্রীমতী বেণী খুলতে খুলতে বল্লে—আসল কথা ছোটটাকে নিযে—বলতে গিয়ে ঈষৎ ভেঙে পড়ল সে—

—ছোটটা? আর মেযেটি বুঝি কেউ নয? তোমাব নিজেব বেঁচে থাকা কিছু নয়? টাকাকড়ি নেই ব'লে আমাদের ভাবনাচিন্তাব ধারা বড্ড ঘুলিযে য[illegible]

শ্রীমতী মাথা হেঁট করে টের পাচ্ছিল [illegible]ৎসল্য টাকার অভাবের চেযেও তার মত মেযেমানুষকে মোচড় দেয বেশি—এ অভিজ্ঞতা লালন কবার মত নয। টাকাকড়ির লালসার দিকে মনের মোড় ঘুরিযে নিযে নিজের ছেলেব কথা ভুলে গিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে চাইল সে। নির্লিপ্ত হযে থাকবার জন্য দেহসেবা করতেও রাজী আছে।

দশ লোক অন্য রকম কথা বলে। কিন্তু এসব বিষযে আমাদের নিজেদের দর্শন কী হবে শ্রীমতী।

ওঃ। তার মুখের দিকে না তাকিযেই সোমনাথ বুঝতে পারল যে শ্রীমতীর মুখের চেহারা বদলে গেছে—আরো ভালো হয়েছে কি খারাপ হযেছে দেখবাব লোভ ছিল তার—কিন্তু সংবরণ ক'রতে হল।

—কি (কথা) বলে তারা? জিজ্ঞেস করল শ্রীমতী। সোমনাথ পেয়ালার দিকে তাকিয়ে দেখল চায়ের পাতাগুলো ডুবে গেছে। শেষ এক চুমুক খেতে গিযে পেয়ালাটা সরিযে রেখে সোমনাথ বল্লে—তারা বলে যে আমিই নাকি সুরনাথের বাপেব [illegible]।

নিঃশব্দতার ভিতর সোমনাথ বল্লে—সুরনাথ [illegible] তাই ভাবে। কিন্তু আমি ভাবি আরেক রকম। সে যা হোক, এ সমস্যার কোনোদিনই কোনো মীমাংসা হবে না। সমস্যার কর্ত্তা কর্ত্রীরা বেঁচে নেই তো।

এইবার চাযের শেষ চুমুকে চাযেব পাতা সুদ্ধ গিলে ফেল্ল সোমনাথ। বল্লে—কিন্তু আমাদের

অ্যাটিটিউড কি হবে শ্রীমতী

শ্রীমতীব মুখেব দিকে না তাকিযে জানালাব সূর্যবহস্যেব দিকে তাকিযে ছিল সোমনাথ—

আমাব হাতে দেড়শো টাকা মাত্র বযেছে—

—কিন্তু আমি জিজ্ঞেস কবছিলুম জীবনটাকে আমবা কিভাবে চিনে ঠিক কবব। যা মৃত্যু নয তাই কি জীবন? কিন্তু মৃত্যু কী?

—হযতো তুমি লুকিযে বেখেছ কিছু। কিন্তু আমাব হাতে দেড়শো টাকা আছে শুধু। (দু'মাসে) আবো পাঁচশো অন্তত চাই।

সূর্য্য কোথায জানা নেই। কিন্তু দবজাব পর্দ্দায কী বিপুল আলো এসে আঘাত কবছে সোমনাথ ভাবছিল।

শ্রীমতী দূবেব থেকে বল্লে—দাদাব দেবাজে দেড় হাজাব টাকাব একটা চেক দেখলাম; বেযাবার্স চেক, নাম সই কবা আছে। ক্রস কবা নেই। সেটা তোমাকে ভাঙিযে আনতে হবে।

—ধ'বে ফেলবে—সোমনাথ বল্লে—সুবনাথ লোকটা বড় পাজি

—কিন্তু সে তো দার্জ্জিলিঙে—

—তা হোক, ওব ফাঁদ পাতা বযেছে এখানে ওখানে—ওব কত কী যে মতলোব

—তা হ'লে তুমি ক্যাশ কবতে পাববে না বল।

সুবনাথেব স্ত্রীব পবিত্যক্ত একটা সুন্দব প্যাবাসল কেড়ে নিযে দুপুবেব বোদে বেবিযে গেল শ্রীমতী। ঘন্টা দেড়েক বাদে চেক নিযে ফিবে আসতে হ'ল তাকে; সুবনাথেব চেক নিজেই সে ক্যাশ কবে—ব্যাঙ্কাববা বলেছে শ্রীমতীকে।

—তুমি যাবে না কি আমি জানতে চাই।

—(যেতে পাবি)—কিন্তু ওবা টেলিফোন কববে না কি দার্জ্জিলিঙে?—টেলিগ্রাম? (কববে না?)

—'শোনো শ্রীমতী', সোমনাথ বল্লে, 'টাকা সব নয। (কিন্তু) আমাদেব জীবনেব নিতান্ত কথাগুলো কি হবে?'

'আমাদেব কোনো জীবনও নেই—ভঙ্গিও নেই। তবে টাকাব দিকে আমি মন দিযেছি। টাকা পাবাব জন্য অনেক দূব পর্য্যন্ত যেতে বাজী আছি —বলতে বলতে নেমে গিযে শ্রীমতী তাব ডান হাতেব কবজিব দিকে তাকিযে বল্লে—এই দেখ, ওব বাঁ মুঠো দিযে কাল বাতে কেমন ভেঙে দিচ্ছিল প্রায হাতটাকে—এব জন্য আমাকে দেড় হাজাব টাকা দাবীদাওযা দেওযা উচিত ছিল ওব। কিন্তু ব্যাঙ্কে জানিযে গেছে কেউ যেন তাব চেক না ভাঙে, অথচ ভালো চেক দেবাজে বেখে গেছে। দেবাজ খুলে বেখে গেছে। মানে কিসে কি হয, কেন কি হ'ল—কি বকম হর্ত্তেল ঘুঘুব মতন ফাঁদ পেতে গেছে তিলে ঘুঘুদেব পথে।

শ্রীমতী বল্লে—কাল বাতে ওব ঘবে আমাকে ডেকে আমাদেব সংসাব খবচেব কথা জিজ্ঞেস কবেছিল। সুবনাথ ভেবেছিল ওব ঘবে টাকাব সেল্লাব দিকে তাকিযে হাঁ ক'বে বসে থাকব আমি—

—এই চেকটাই দিতে হযতো তাহ'লে তোমাকে—

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ ক'বে বসে বইল। তাবপব শ্রীমতী তাব কণ্ঠেব—শবীবেব নিষ্প্রাণতাব ভিতব একটু বক্ত চলকাবাব চেষ্টা কবে বল্লে—সুবনাথ কী চায (আমাব কাছে)? ও যা চায তা কি পাবে কোনো দিন।

—সুবনাথেব তা কি পাওযা উচিত। জানালায সূর্য্যেব বেশি আঁচেব দিকে তাকিযে সোমনাথ বল্লে—আমাদেব ধ্যান জ্ঞানেব কোনো মানে নেই এখন আব—ও সবেব টাকাকড়িই চাই; তোমাকে আমাকে চাই ঢেব পবে। সুবনাথ চেক তোমাকে দেবেই একদিন—দিতেই হবে—কিংবা দিতে হবে না, সময নেই, কিন্তু, জিনিসটা ও বুঝিযে দিযেছে। সুবনাথ কিছু নয। ও ছাড়া আবো অনেব আছে। কিন্তু সেই পথেই (তোমাকে) যেতে হবে হযতো।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে শ্রীমতী বল্লে—এখন যাওযা হচ্ছে ঝুপসিব ভেতব দিযে আড়ি পেতে। কিন্তু এব পবে যেতে হবে—খানিকটা-সোজা ট্যাকটেকে পথ ধ'বে?

সোমনাথ উঠে গিযে ভিতব থেকে ঘুবে এল মিনিট দশেক। ফিবে এসে সোমনাথ আস্তে আস্তে বসল।

শ্রীমতী আবো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে বল্লে—আমাব কথাব তো কোনো জবাব দিলে না?

—আমি যা বলবার তা তো বলেইছি।

—ওটা বলা নয়। আরো অনেকক্ষণ পরে শ্রীমতী বল্লে—খোকার—কি হবে?

—খোকা নেই। এই মাত্র দেখে এলুম। কি ক'রে হ'ল ঠিক বুঝতে পারলুম না—তবে ভুগছিল অনেকদিন।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই ছেলেটি তার মায়ের কাছে এসে হাজির হ'ল।

শ্রীমতী অনেকক্ষণ পরে স্বাভাবিকতায় ফিরে এসে বল্লে—এর কি মানে আমি বুঝতে পারলাম না।

—মানে নেই কিছু। মরা ছেলেকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে বুদ্ধদেবও পারেননি—কেউই কোনোদিনই (পৃথিবীর ইতিহাসে) আমিও ঠিক পেরেছি বলে মনে করতে পারি না। তবে ছেলে আছে—এখনও বেঁচে আছে, এর চেয়ে বেশি কি আশা করতে পার তুমি আমার কাছ থেকে। কিন্তু তবুও সুখের স্বর্গ তোমার বেশি টিকল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিলে সেইখানেই ফিরে এলে আবার।

দার্জ্জিলিং থেকে সুরনাথের টেলিগ্রাম এল যে তার স্ত্রী মারা গেছে—তিনি দু'এক দিনের ভিতরেই কলকাতায় আসছেন।

কলকাতায় এসে সুরনাথ স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ ক'রে অনেক টাকা খরচ ক'রে চেঞ্জে পাঠিয়ে দিল সোমনাথদের—মিহিজাম গেল—গিরিডি গেল—মধুপুর গেল।

সোমনাথ আরো দু'মাসের ছুটি নিল।

মোটাসোটা হয়ে কলকাতায় ফিরল সব।

সুরনাথ সোমনাথকে মফঃস্বলের চাকরী ছেড়ে দিতে বল্ল : আমার এখানেই থাক। দেখাশোনা কর সব। খাওয়াপরার খরচ লাগবে না। মাসোহারা একশো টাকা পাবে।

শ্রীমতীর নির্দ্দেশে থাকতে হ'ল বটে সোমনাথকে—কিন্তু সে অন্য কোথাও চ'লে যেতে পারলেই যেন খুশি হত—সপরিবারে—কিংবা নিজে একা। একাও সে চ'লে যেতে রাজী।

অবশেষে শ্রীমতী একদিন বল্লে সোমনাথকে—আচ্ছা, তুমি যাও তাহ'লে

—দেশে যাব?

—ভালো লাগলেই যেতে পার।

—খোকা যাবে না?

—তাকে নিও। যেতে চায় হয়তো।

—ছায়াকেও নিয়ে যাব। তুমিও চল।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বল্লে—আজকাল নয়।

—আমরা গেলে একা তুমি কি ক'রে এ বাড়ীতে থাকবে।

—তোমাদের চলে যাওয়া আগে স্থির হোক—তারপর আমারটা আমি ঠিক করব।

—মানে?

—মানে কিছু নয়। কিন্তু আসল কথা—চলে যাচ্ছ কি আর তুমি।

সোমনাথ ফাঁপড়ে পড়ল। চলে যেতে ষোলো আনা ইচ্ছা তার। শ্রীমতীর ব্যবহারে কোনোই খুঁৎ নেই—তবুও স্ত্রীকে ঐ লোকটার বাড়ীতে একা রেখে যেতে কিছুতেই মন সরল না তার। সে কলকাতায় থেকেই গেল শেষ পর্য্যন্ত—ভালো চাকরী করতে লাগল—অন্য মেয়েদের আবহাওয়ায় এসে পড়ল—শ্রীমতীর সম্পর্কে সে এখন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল। শ্রীমতীকে ঐ লোকটার বাড়ীতে একা রেখে এখন সেই অনায়াসেই দেশে চলে যেতে পারত। কিন্তু দেশে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখন। একদিন মকরসংক্রান্তির রাতে—অনেক রাতে শ্রীমতীকে সে প্রত্যাশা করেছিল; কিন্তু শ্রীমতী তা হলে দিল না। আজকাল মনের অহঙ্কার বেড়েছে সোমনাথের। কিন্তু সেই জন্যই শুধু নয়—এম্নিই—নিজের মাহাত্ম্য নষ্ট করবার কোনো কারণও নেই তার। মেয়েদেরও মর্যাদা আছে পুরুষেব সঙ্গে সমানুপাতে—সেই জন্যই পুরুষ—যাব পিপাসা বেশি—তাকে অধিকতর ভাবে নিজেকে সংবরণ ক'রে রাখতে হবে।

কিন্তু ভোরের বেলায় সূর্য্যের মিষ্টি আঁচের ভিতর দাঁড়িয়ে এ সব কথা সে ভাবছিল না। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে যাবে না আর নিজে সে, কিন্তু শ্রীমতীর কাছে যে পুরুষেরা আসে—তাদেরও নিষেধ করতে যাবে না। তারা নিজেরা যদি বোঝে যে কোথাও ক্ষয় ইচ্ছে নিজেরাই সরে যাবে তা'হলে। কিন্তু এই অবক্ষয়ের শতাব্দীতে কিছুই ক্ষয় নয়—অতি কথা বলা—কাজ করা—উপভোগ

করাব ছেঁড়া ছেঁড়া নীল করবীর। রক্তজবার, রক্তাক্ত মানুষদের ইতিহাস—একটা অনির্দেশ্য পটভূমিকাব গেরুয়া বঙের আলোব ভিতর। পটভূমি স্থির হওয়া চাই—আলো হাওয়া চাই—স্বচ্ছ নির্মল আজকেব সকালবেলায় ঐ দূব সুস্পষ্ট সূর্য্যের মত।

নিচে বেল বেজে উঠল।

সোমনাথ বাবান্দায় দাঁড়িয়েছিল, একটু এগিয়ে গিয়ে বল্লে—কে?

নিচে ছেলেটি মোটরেব দবজাব কাছে স'রে গিয়েছিল আবার, বল্লে—আমি এসেছিলুম—

—কাব কাছে?

—শ্রীমতী দেবীব কাছে

—তিনি আছেন—আসুন ওপরে।

সোমনাথ অফুরন্ত রৌদ্রে সূর্য্যের মুখোমুখি পিঠোপিঠি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে অনুভব করছিল, মনে হ'ল একটি ছায়া এসে পড়েছে—

চোখ বুজে ছিল, জিজ্ঞেস করল—কে?

—আমি—ওব সঙ্গে একটু চ'লে যাচ্ছি

—ও—ঐ মোটরে—

—হ্যাঁ, শ্রীমতী বল্লে।

—কোথায়—লেকেব দিকে বেড়াতে?

—হাসপাতালে যাচ্ছি

—হাসপাতালে? কেন? সোমনাথ চোখ চেয়ে তাকাল

—বিজয়ের স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে।

বিজয় হয়তো ঐ মোটরের টহলদার ছেলেটিব নাম। সোমনাথ তাকিয়ে দেখল গাড়ীটা প্রাইভেট কার—

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী ডাক্তাব? আনাড়ি কী—?

—আনাড়ি ডাক্তারের হাতে

—না, না, আনাড়ি বোকা ডাক্তাব?

এবারও অস্পষ্ট গলায় খোকা না বোকা কি যে বলা হল ফোনে বুঝতে পাবল না সোমনাথ।

সেই খোকা কি মোটরে ক'রে এসেছিল আজ সকালে?

বিমূঢ় ভাবে শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে সে বল্লে—বিজযেব স্ত্রী? কিন্তু ছেলেপিলে তো তোমাবও হবে—আজই হতে পারে—

—তা যদি হয় তাহলে হাসপাতাল থেকে ফোন ক'রে জানানো হবে তোমাকে।

—কিন্তু জিনিসটা এ রকম বাঁকা পথে ঘুরে এসে আমার কানে পৌঁছবে—এব কি কোনো কাবণ ছিল।

কিন্তু শ্রীমতী কোনো উত্তর না দিয়ে চ'লে গেল। বেলা দু'টোর সময় সোমনাথেব কাছে ফোন এল শ্রীমতী মরা ছেলে প্রসব কবতে গিয়ে মারা গেছে। কে এক আনাড়ি খোকা—ডাক্তারের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে। রিসিভার নামানো মাত্রই একজন লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল তাকে,—মরবার আগে শ্রীমতী লিখে রেখে গেছে; কাব জন্যে লিখেছে তা সে কাউকে বলেনি;—তার স্বামীকেও এ চিঠি পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ সে দিয়ে যায়নি—কিন্তু তবুও স্ত্রী যখন স্বামীর—কর্তৃপক্ষ চিঠিটা তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সোমনাথ পড়ে দেখল। দু'তিন লাইন মাত্র। লিখেছে:

আমাদের জীবন মেঘের মতন। নৈরাজ্যের ধোঁযার ভিতর থেকে মানুষেব স্বাদ নিয়ে এক আধ মুহূর্ত্ত জেগে উঠেছে—কাজ ভাবতে হয। উপভোগ করতে হয। বদলাতে হয। অনুভব—। কিংবা এ সব না করতে পারলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু বুঝতে হয় যে ক্ষতি নেই

'কিন্তু এ'কটা লাইন কার জন্য? আমার জন্য নিশ্চযই নয়। হয়তো বা আমার জন্যই।'

'ওদের সকলের জন্যই হযতো—আমার জন্য না হ'লেও।'

'কিন্তু এ চিঠি হাড়গোড়ের গনগনে আগুন' সজ্ঞানে শ্রীমতীর চিতা ঘিরে যারা বসেছিল তাদেব দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল সোমনাথেব

বাঘিনীর মতো

সুমিত্রার চেহারা মন্দ নয়— কিন্তু কলকাতার এক অন্ধকার গলিতে তার স্বামী— অনাদির সঙ্গে কয়েক বছর ধ'রে জীবন ধারণ ক'রে জীবনের ধারনা তার বর্ণচোবা পতঙ্গের মত চার দিককার ধূসরায়িত জিনিষের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সে বুঝেছে এ রকম অবস্থার ভিতবেই তার জন্ম হয়েছিল যেন (যদিও তা হয় নি)—এইখানেই তার সমাধি (কে জানে তাই বা হবে কিনা?)। (সে যাই হোক) নিজেকে সে মানিয়ে নিয়েছে।

সুমিত্রাব ছোট বোন শম্পার চেহারা তার দিদির চেয়ে আরো ভালো। বয়স উনিশ। ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এক কলেজে আই. এস. সি ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছে। শম্পাব বিয়ে হয় নি এখনও। কে জানে সে বিয়ে করবে কিনা? সেও পতঙ্গেরই মতন— কিন্তু এখনও উজ্জ্বল রৌদ্রেব দিনেব। হৃদয় তার খানিকটা নীল আকাশ বোদ বক্ত ও জলের গুঞ্জবণে উচ্ছলিত হয়েও— মাঝে মাঝে নিজেরই ডানার ছায়াপাতে মানব ইতিহাসের আমূল অন্ধকার, অব্যবস্থা দেখে ফেলেছে যেন— দেখে ফেলে জয় করতে চেয়েছে। (চায় নি কি?)—

চেয়েছে।

শম্পা একদিন কলেজ থেকে ফিবে এসে বল্লে—দিদি—

সুমিত্রা অনাদিব ছেঁড়া (জামা) পাঞ্জাবী সেলাই করছিল—সেলাই করতে গিয়ে এমনই ঘাড় গুঁজে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল চোখে (সে) দস্তুর মত খারাপ দেখে—এক জোড়া চশমা পেলে ভালো হত তার।

—কলেজ হয়ে গেল—এরি মধ্যে?

—না। শম্পা মাথা নেড়ে বল্লে, এখন টিফিন—

—তবে যে চ'লে এলে? কিছু খেতে? কোনো দিন —না।

সুমিত্রা অনাদির মৃত পাঞ্জাবীটাব দিকে ফিরে তাকাল--সেলাই সে কবছে বটে, কিন্তু সেলাই ক'রে এ জিনিষটাকে জিইয়ে তোলা অসম্ভব।

—আমাকে আব কলেজে যেতে হবে না।

সুমিত্রা একটু ত্রস্ত ভাবে জামাটা সরিয়ে ফেলে বল্লে—কেন?

—মাষ্টারমশাইবা আমাব নাম ডাকেননি আজ আর। Roll No. F 93—শম্পা রায়—আমার Roll Physics Chemistry ইংবেজি কোনো ক্লাসেই ডাকা হয় নি—

সুমিত্রা একটু অবাক হয়ে নিজের কাজে মন দিয়ে বল্লে ঃ ভুল হয়ে গেছে হয়তো। মনে করিয়ে দেবাব কোনো উপায ছিল না কি শম্পা? তুমি হয়তো নিজে দাঁড়িয়ে—

—কী হবে দাঁড়িয়ে? কী লাভ হত Profকে বলে।

সুমিত্রা সূচেব ভিতর নতুন ক'বে সুতো ভরবার ফিকিবে ছিল।

—আমাব Roll No কেন ডাকা হচ্ছে না Officeএ তার কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালে ওরা হাসাহাসি করত না?

বল্লে—কেন?

—কেন? আমার নাম কাটা গেছে। শম্পা একটু ব্যাহত বোধ ক'রে, তবুও খানিকটা যেন নিস্তার পেয়ে হাসতে লাগল।

—কাটা গেছে? সত্যি? যেন বিশেষ কিছু হয নি এমন ভাবে সুমিত্রা শম্পার দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ। কলেজের পড়াশোনা তা হ'লে এখানেই শেষ দিদি—

—আমি কিছু বলতে পারি না। তুমি—

—অনাদিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে? হ্যাঁ তা করা হবে। কিন্তু—

—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা ব'লে আজই কিছু একটা করা উচিত।

—তোমাব স্বামী অনাদিনাথ তো সন্ধ্যাব সময আসবেন—

সুমিত্রা ঈষৎ আহত ভাবে শম্পাব দিকে তাকাল—বল্লে ঃ শ্রদ্ধাব অভাব লক্ষ্য কবে আসছি কিছুদিন থেকে। হ্যাঁ, সন্ধ্যাব সমযই আসবেন তোমাব—

একটু থেমে গিযে সুমিত্রা বল্লে—আসবেন তোমাব দিদিব স্বামী। কিন্তু এব আগে তুমি কি কোথাও বেবিযে যেতে চাও? আমাব মনে হয তোমাব অপেক্ষা কবা উচিত; আজ নাই বা বেরুলে? কেন তোমাব নাম কাটা গেছে শম্পা?

—খুব খাবাপ কাজ কবা হযেছে।

সুমিত্রা ভীত হযে বল্লে—কি কবেছিল? কে কবেছে?

—ছ' মাসেব মাইনে দেওযা হয় নি।

সুমিত্রা একটা স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলে ছেঁড়া জামাটা কোলেব কাছে টেনে নিল আবাব। বল্লে—আমি ভেবেছিলাম না জানি কীই বা হযেছে। ছেলেদেব সঙ্গে কলেজে পড়া তো।

শম্পা মেঝেব ওপব পা ছড়িযে বসে জানালাব ভিতব দিযে অনেক দূবে একটা বাড়ীব গাযে প্রকাণ্ড একটা লাল হ্যাণ্ডবিলেব দিকে তাকিযে নিজেব দৃষ্টিশক্তিব তীক্ষ্নতা পবীক্ষা কবছিল। বড় হবফগুলোও ভালো কবে পড়তে পাবা যাচ্ছিল না—প্রথম অক্ষবটা নিশ্চযই H কিন্তু Aও হতে পাবে হযতো—

কোনো একটা কিছু বিশ্রী জিনিষ ঘটে যেতে পাবত। সেলাই কবতে—কবতে সুমিত্রা বল্লে। শম্পাব মনে হচ্ছিল খুব সম্ভব ঐ অক্ষবটা A— নিজেব কপালটাকে জানালাব শিকেব ওপব চেপে ধ'বে আবিষ্কাবেব সমুদ্রেব দিকে পাঠিযে দিল সে তাব দৃষ্টিকে—

—আমি জানি এ বকম কত ঘটনা—সুমিত্রা শম্পাব দিকে একবাব চোখ বুলিযে নিযে বল্লে।

সুমিত্রা বল্লে—মেযেদেব নিযে ফোতো বঙ খেলবাব ইচ্ছা চুতিযা প্রমাণ কবতে চাওযা, অথচ নিজেব মনেব ভেতবেই লোভ বযে গেছে—

—লোভ?

—খুব খানদানী লোভ নয শম্পা। খুব ওঁচা—সুমিত্রা ঠোঁটে সুঁচ এঁটে নিযে বল্লে—কিন্তু একেবাবে তলানি ঠেকিযে।

—লোভ? সাহস নয?

—না।

—কিন্তু কী ক'বে জানলে তুমি? তুমি তো কোনো দিন collegeএ পড়নি।

—সংস্পর্শে এসেছি। ছক নানা বকম থেকে যায। যোগাযোগ ঘটবাব অভাব কোথায পৃথিবীতে। ও সব college একটা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রতিষ্ঠান আবো অনেক বকমেব বযে গেছে।

সেই দূবেব লাল হ্যাণ্ডবিলেব দিকে ফিবে তাকাল আবাব শম্পা। কেমন থোকা থোকা জবা—না ঠিক নয চুনীব মত লাল—অথবা হবিণেব বক্তেব মত কেমন অফুবন্ত ভাবে দুপুবেব বোদে ঝিকমিক কবছে; কিন্তু কি যে লিখেছে—কাবা লিখেছে—কিসেব H Bill কিছুই সে বুঝতে পাবছে না এত দূব থেকে—তাব চমৎকাব চোখে অল্প শক্তি; শক্তি হৃদযহীন ভাবে চমৎকাব চোখে অল্প শক্তি; শক্তি হৃদযহীন ভাবে চমৎকাব তবুও তো। অনেক তো—অশেষ তো কৌতূহল তাব জীবনে—এবং সমস্ত কৌতূহল চেপে বেখে শক্তিব অভাবনীয দূবত্ব তবুও তো,—দুর্নিবাব অন্ধতা।

—তুমি চিঠি পেযেছিলে?

শম্পা চমকিত হযে সুমিত্রাব দিকে তাকাল।

—আমাব অহঙ্কাবও আজ নেই। এক সময না ছিল যে তা' নয। কিন্তু তুমি আমাব চেযেও সুন্দব। তোমাকে চিঠি লিখেছিল?

—কে?

—অনেকেই তো লেখে—

—কাকে।

—লিখলেও সে খবব আমবা কি কবে জানতে পাবব আব। ছুঁচ ঠোঁটে বেখে কথা চলছিল এত ক্ষণ সুমিত্রার। ছুঁচটা খসিযে নিযে সুমিত্রা বল্লে—ছ মাসের মাইনে এক সঙ্গে দিযে দেওযা অসম্ভব—এক মাসেব মাইনেও অনাদিবাবু কী কবে দেবেন ভাবছি তাই আমি। তোমাকে পড়ালে হ'ত। কিন্তু ভাল লাগে

কি তোমাব?

শম্পা ছড়ানো পা দু'টো গুটিয়ে নিয়ে বল্লে, বাবা নেই— মা নেই—দাদা কোথায় গিয়েছেন—কোনো খোঁজ নেই তাব—তোমাদেব ওপব আব বেশি চাপ দেওয়া চলে না।

ডান পা মেঝেব ওপব টানটান ক'বে পেতে বেখে তাবপব আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে বল্লে—কিন্তু পড়ব আমি।

কিন্তু ভাবি ঢিলে পছন্দে কথা বল্লে সে—কেমন যেন ড্যাবডেবে ঠেকল তাব নিজেব কথা তাব নিজেব কানে।

অনাদি বল্লে—নাম কেটে দিয়েছে? কবেব থেকে?

—আজই।

কোনো বড় অফিসে কাজ কবে না সে, কোনো মাঝাবি চাকবীও জোটেনি তাব। চুনোপুঁটিদেব ভিড়েই অনাদিনাথ এক জন; তবুও একটা টাই ছিল তাব। চীনে বাড়ীব টাই খুলতে খুলতে বল্লে—শম্পা কোথায়—বযেছে। ডাকব?

—না। অনাদি একটা টুলেব ওপব বসল, পাশেই দেযালে টাঙানো আযনায নিজেব ফ্যাকাসে অথচ হাঁসোড়াব (হাঁস+ঘোড়া) মত মুখেব দিকে তাকিয়ে সে নিজেব প্রতি অনুকম্পায অধীব হযে উঠল না তবুও; কিছু সংববণ কবে নিতে হ'ল না তাকে; কাবণ সে অনেক দিন থেকেই সংববিত, সম্বিৎ তাব সব সমযই বযে গেছে—কোনো সমযে হাবিযে ফেলে ফিবে পেতে হয না আবাব।

—চুপ ক'বে বসে আছ যে

—হেঁটে এসেছি। একটু বিশ্রাম। অনাদি প্রীত মুখে হেসে বল্লে।

—ডেক চেযাবে গিযে বসবে

—ঠিক সমযে হবে সব। আমাব জুতোব ফিতে খুলে দিতে হবে তোমাকে। কেন জান?

ফিতে খুলতে খুলতে সুমিত্রা বল্লে—নুযে ফিতে খুলতে কষ্ট হয, ব্লাড প্রেশাব বেড়ে গেছে হযতো?

অনাদি বল্লে—মাইনে দেযনি বলে নাম কাটা গেছে?

বাঁ পাযেব জুতো খসিযে নিযে সুমিত্রা বল্লে—হ্যাঁ। ছ'মাসেব বাকি পড়ে ছিল।

—শম্পা কি পড়তে চায?

—পড়বাব ইচ্ছা আছে।

—অবনীবাবুব সঙ্গে দেখা কবে দেখা যেতে পাবে।

—তিনি কে?

—ছ' মাসেব মাইনে খাবিজ ক'বে দিতে পাবেন। free studentship ও—

শম্পা কখন এসে দাঁড়িয়েছে চালশে ধবেছে বলে আবছাযাব ভিতব কেউ তা' টেব পায নি অনাদিনাথেব মুখেব কথা ফুবোতে না ফুরুতেই দীর্ঘ তনিমা এসে দাঁড়াল। এমন অনেক দিনই দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু এ তনিমা কে—পুরুষেব হৃদযেব ওপব এব কী বকম প্রভাব সম্ভব হতে পাবে সে সব কথা কোন দিন বিচাব কবে বুঝে দেখতে যায নি অনাদি। আজো সে একটা জ্যামিতিব বিস্তাব দেখল শুধু; শুনল সেই ছাযাচ্ছন্ন বেখাগুলো (যেন) তাকে বলছে—তা হতে পাবে না অনাদিবাবু।

সুমিত্রা ঈষৎ ক্লান্ত হযে বল্লে—ওকে তুমি নাম ধ'বে না ডাকলেও পাবতে শম্পা।

—অবনীবাবুব সঙ্গে আমি দেখা কবতে পাবি—অনাদি বল্লে।

—শুনেছি আমি। কিন্তু ও বকম ভাবে ছ' মাসেব মাইনে বাতিল কবা ঠিক হবে না।

—কিন্তু যাদেব টাকাকড়ি আছে, তাবাও তো নানা বকম সুবিধা ক'বে নিচ্ছে আজকাল। তাই যদি হয, আমাদেব অবস্থা মনে ক'বে এটা কি উচিত মনে কব না তুমি—

অনাদিকে কথা শেষ কবতে না দিযে শম্পা বল্লে—না।

—অবনীব সঙ্গে আমি কলেজে পড়েছিলুম।

সুমিত্রাব দিকে তাকিয়ে অনাদি নিজেব গলাব কণ্ঠায এক বাব হাত বুলিয়ে গলা ঝেড়ে পবিষ্কাব কবে নিযে একটা লবঙ্গ খেতে খেতে বল্লে, জানি না এখনো সে আমাকে মনে ক'বে বেখেছে কি না। সে আজ বড় উকীল, college committee president। কিন্তু—

—ছ মাসেব মাইনে দিযে দিতে হয। শম্পা বল্লে
—কে দেবে? সুমিত্রা জিজ্ঞেস কবল।
শম্পা কোনো উত্তব দিল না।
অনাদি বললে—collegeএ পড়ে লাভ নেই কিছু। কিন্তু তবুও—যখন—তোমাব পড়বাব ইচ্ছে আছে।
—কিন্তু বিনে মাইনেতে আমি পড়ব না।
—তোমাব বাবা নেই—হাফ ফ্রীতে তোমাব বাজি হওযা উচিত
—আমি একটা চাকবী যোগাড় ক'বেছি, শম্পা বল্লে।
শুনে আশ্চর্য্য হযে অনাধি বল্লে—কোথায?
—একটা মস্ত বড় ফার্ম্মাসীতে—
—ফার্ম্মাসীতে! সে আকাশ থেকে পড়ে বল্লে—তা' কি ক'বে হয' ওদেব ওষুধপত্র তেলমালিশ Canvassing কবতে হবে হযতো' Canvassing কবাটা কি উচিত তোমাব।
—না, ও সব কিছু না। Canvassing নয। সঙ্গে আবো দু একজন আছে। আমাব বন্ধু। আমাদেব কলেজেব মেযে। (Canvassing নয।) Office এব কাজ কবতে হবে। ভিতবে বসে। বাইবে যাবাব বিশেষ কোনো দবকাব নেই। নিজেব ব্যক্তিগত প্রযোজনে না গেলে।
—তুমি Stenotypist? শম্পাব মুখেব দিকে তাকিযে অনাদি জিজ্ঞেস কবল। অনাদিব দুটো ঠোঁটেব ব্যবধান ধীবে ধীবে ক্রমাযত হতে হতে যখন চূড়ান্তে পৌছুল তখন সে একটা ঢোঁক গিলে ঠোঁট ভিজিযে নিযে জিজ্ঞেস কবল; আমি তো জানতাম না শম্পা। তুমি এ সব শিখেছ কবে?
—শর্টহ্যাণ্ড আমি শিখি নি।
—টাইপিং?
—ও সবেব দবকাব হবে না। আমি টাইপিস্টেব কাজ নেই নি। একটা Department এব জিনিসপত্রেব হিসেব বাখব আমি, চিঠিপত্রেব বিলি ব্যবস্থা কবব—আবো কতকগুলো এ বকম ধবনেব কাজ আছে—
মাইনে কত? সুমিত্রা জিজ্ঞেস কবল।
—এখন ৭৫ দেবে।
—পুরুষদেব সঙ্গে চলাফেবা কবতে হবে হযতো?
—সম্পর্কে আসতে হবে
—সেটা কি ঠিক হবে?
—এ ছাড়া কোনো উপায নেই
—তোমাকে কি চাকবী কবতেই হবে।
—এব চেযে ভাল কাজ পেলে ঠিক হত। পবে পাওযা যাবে হযতো।
—তোমাব রূপ বযেছে। এ বকম ভাবে চাকবী কবা তোমাব অন্যায। সুমিত্রা বল্লে।
শম্পাব রূপেব সম্পর্কে অনাদিব কোনো গূঢ় নিগূঢ় মিনে কাটা মনোজগৎ—যা গড়লেও গড়া হতে পাবত—তৈবি হযে ওঠে নি এত দিনেও—কোনো স্থূলতা তো মনেব ত্রিসীমাযও ছিল না তাব। তাব স্ত্রীব সম্পর্কেও এ সব কিছু ছিল না তাব। অবশ্য তাদেব একটি সন্তান বযেছে—কিন্তু কোনো নিছক মোটা বা মিহি কাবণে তাব আবির্ভাব হযেছে সেটা মনে ক'বতে যাওযা ভুল। তবুও শম্পাব দিকে ফিবে অনাদি বল্লে—তোমাব দিদি ঠিকই বলেছে—তুমি এ চাকবী না ক'বলেই পাবতে। এটা তো মেযেদেব ফার্ম্মাসী নয।

পবদিন সন্ধ্যাবেলায Office থেকে ফিবল অনাদি একটা খববেব কাগজ হাতে ক'বে।
সুমিত্রা বল্লে—বুঝি বিকেলেব কাগজ কেনা হযেছে?
—হ্যাঁ। টাই খুলতে খুলতে বল্লে অনাদি—খববেব কাগজ আমাব পড়া চাই।
—তা তো ঠিকই, কিন্তু সকালে যেটা কেনা হযেছিল—
—এ বিকেলেব খবব।

—আরো বেশি খবর দিয়েছে?

—তাজা বেশি ঠিক নয়—খানিক পুরনো—খানিক নতুন

—নতুন সব টেলিগ্রাম?

—হ্যাঁ, নতুন আছে। বিকেলের কাগজ। নতুন খবর আছে কিছু। কেবল খবর টবরই যে আমি কুড়িয়ে বেড়াব সে ধাতের লোক আমি নই। সেটা আমি ভালবাসি না। কিন্তু সারাদিনের তাড়াহুড়োর পরে একটা কিছু চাই—

—কী চাই।

—একটা কিছু—আমি তো সিনেমায় যাই না।

—সিনেমা ছাড়া আর কিছু নেই?

—কীই বা থাকবে আর। এক মুখ অন্ধকার নিয়ে—তবুও ফ্যাকাশে মুখে—হাই তুলতে তুলতে বল্লে অনাদি। একটা টুলেব ওপব বসে পড়ে বল্লে—কেউ কেউ মদ খায়

শুনে সুমিত্রার উৎকণ্ঠিত হবাব কোনো কারণ ছিল না। কারণ মদ খেতে হলে যে বাপের যে ছেলে হওয়া প্রয়োজন অনাদির চোখে—মুখে অন্তরাত্মায় সে ছাপ কোনো বিষাক্ত মুহূর্তেও খুঁজে পাযনি সুমিত্রা। না পেয়ে—জীবনের অতি তিক্ত দু এক মুহূর্তে—কিছু ক্ষণের জন্যে একটু দিশাহারা বোধ করতে হয়েছে সুমিত্রাকে। কিন্তু তবুও তার অফিসী মানুষের বেঘোর ক্লান্তি আঘাত করল সুমিত্রাকে। অনাদি মদ খাবে না কোনোদিনও—সমাধিস্থ হয়ে অলাতচক্রেও পাক খাবে না, কিন্তু এখুনি তাব একটু গরম চাযেব দরকার, গবম গরম খাবার পেলেও ভাল হয। বোধ করছিল, সুমিত্রা।

—জুতোব ফিতে খুলে দিতে হবে না? বসে আছ যে?

—বিশ্রাম করছি। খোলো ফিতে।

—শম্পা এখনও আসেনি।

— Office থেকে আবাব কোথাও গেল না কি?—

—বলতে পাবছি না। ভাবালে মেয়েটা—

—Blood Pressure—তাই নুয়ে ফিতে খুলতে পারি না। নুয়ে আবার উঠতে গেলেই কেমন ধাক্কা মারে

—বটব্যালকে দেখিযেছিলে?

—এই বাব ডান পাযের জুতোটা—না, বটব্যালকে দেখিযে কোনো লাভ নেই। ওরা সকলেই বিশ্রাম কবতে বলে।

—বেশ তো, ছুটি নাও

—তুমি একটু চা কবে নিযে এসো।

—চা'র সঙ্গে—

—কিছু খাবাব টাবার—

—বাজারের?

—ঘরের তৈরি হ'লেই ভালো

—চিড়ে ভেজে দেব?

—কাঁচা পাউরুটি স্লাইস করে মাখন মাখিযে দিলে মন্দ হত না। পাউরুটি নেই হয়তো। আছে? মাখন ফুরিয়ে গেছে? এই মোড়ের দোকানে পাওয়া যাবে। কাকে আনতে পাঠাবে সেই তো কথা। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি। না, না। এতে Blood Pressure এর কী আর হবে—সারাদিন অফিসের ঝামেলার পব। এই যে শম্পা—তোমার এত দেরি হ'ল কেন; Office ক'টা অব্দি—ক'টার থেকে?

অনাদি টুলের ওপর বসে পড়ল।

—এই গলির থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে Sen Bros এ মাখন পাওয়া যায়, শম্পা—সুমিত্রা বল্লে—

—খুচরো মাখন?—শম্পা অনাদিকে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। কোয়ার্টার পাউন্ড। কিনে আনতে পারবে? কোনও কাউকে দেখছি না তো এখন আর। টাকা দেব? অনাদি বল্লে।

শম্পা মাখন নিয়ে ফিরে এসে দেখল অনাদি একটা আড়-ময়লা খদ্দরের ফতুয়া গায় দিয়ে ডেক চেয়ারে বসে পড়েছে। মুখে সাবান মাখা হয়েছিল হয়তো তারপর ধুন্দুলের ছাল কিংবা তোয়ালে দিয়ে রগড়ানো হয়েছে (খুব সম্ভব)—যে রকম রোজ হয়। বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ; অনাদির মেটে রঙের মুখ বাতির আলোয় কেমন লকচক ক'রে উঠছে—এই সময় এই আলোয় ঠিক এই রকমই লকচক করে রোজ ; দেখতে দেখতে হায়রান হয়ে গেছে শম্পা ; এক দুই তিন চার পাঁচ বছর বসে এইই তো দেখছে। এইই তো। কিন্তু সারাদিন একটা আজব ফার্মাসীতে কাজ ক'রে এসে অনাদির একঘেয়েমি একটু নতুন ক'রে ধাক্কা দিল তাকে।

ওদের সকলের চা খাওয়া হয়ে গেলে অনাদি খবরের কগজ নিয়ে ডেক চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসল, পা ছড়িয়ে দিল একটা কেরোসিন কাঠের টুলের ওপর।

—'সারা দিন অফিশে কী করলে?' সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল শম্পাকে

—'অনাদিবাবু কি কাগজ পড়ছেন?'

—'বিকেলের একটা পেপার'

—'কোনও নতুন খবর আছে?'

—'তেমন কিছু নেই হয়তো। থাকলে আমাদের জানিয়ে দিতেন।'

—'কোনও খবরেই আমাদের কিছু এসে যাবে না' অনাদি তার কাগজের ও পিঠের থেকে বল্লে—

—'শম্পা ঘুমিয়ে পড়ছে হয়তো' সুমিত্রা পাখার বাতাস খেতে খেতে থেমে গিয়ে বল্লে।

—'না—ঘুমোচ্ছি না। ভাবছিলুম'

—'কোথায় পেলে মাখন? Sen Bros এ?' অনাদি জিজ্ঞেস করল।

—'না—এ পাড়ায় নেই— Mullick Stores থেকে আনতে হয়েছে'

—'বাবা—অদ্দুর' হেঁটে গেলে তুমি। শম্পা দাঙ্গাবাজ তো কম না।'

কতকগুলো হেঁজিপেঁজি খবর দেখা হয়ে গেছে তার—অনাদি খবরের কাগজের নিজস্ব মন্তব্যগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

—'শম্পা, ঘুমিয়ে পড়ছ তো আবার' এটা ভালো নয়। ওঠো, ওঠো।' সুমিত্রা তাকে সজাগ করে রাখতে চাইল।

—'না, ঘুমোইনি। চলো—তোমরা যাবে?'

—'কোথায়?'

'—একটু বেড়িয়ে আসি—'

—'এত রাতে! এখন ৮টা বেজেছে'' অবাক হয়ে বল্লে সুমিত্রা।

—'এত্তে রাতে'' শম্পার হঠকারিতায় বিমূঢ় হয়ে খবরের কাগজের আড়ালে নিস্তব্ধ হয়ে রইল অনাদি। ঘুমের ভিতর দিয়েই ওরা খেতে বসল গিয়ে—এবং ঘুমোতে ঘুমোতে অবশেষে আর দশজনের মতন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

শম্পা তাকিয়ে দেখছিল কারা যেন কার্ডবোর্ড বাক্সে ওষুধের শিশি ভ'রে রাখছে। এইই শুধু দেখছিল কি সে? না, আরো কিছু দেখছিল।

কখন কে যে তার কাঁধের ওপর হাত রেখেছে, টের পেল না সে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নির্ম্মলা বল্লে—শম্পা, তোমাকে সেন সাহেব ডেকেছেন। চৌরঙ্গী সাহেব—মানে, মিঃ সেন, অভিমন্যু সেন। কে তার নাম চৌরঙ্গী—চৌরঙ্গী সাহেব রেখেছে শম্পা নির্ম্মলা Office এর অনেকেই তা' জানে না।

—'কোথায় তিনি?

—তাঁর কামরায়।

—সেখানে আমাকে যেতে হবে? শম্পা একটু ইতস্তত ক'রে বল্লে।

—তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আছে—

—কিন্তু—শম্পা কার্ডবোর্ড বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে বসেই রইল, নির্ম্মলাকে বল্লে—তুমি যাও—

—আর তুমি?—

—(আমি) যাচ্ছি—

কিন্তু সেদিন সেনের কামরায় গিয়ে অফিসের দরকারী কাজকর্ম্মের হিসেব দিতে ভুলে গেল শম্পা।

সেন সাহেবও ভুলে গেলেন কাউকে তিনি ডেকেছিলেন কিনা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। নির্মলাকেও তার নিজের দিককার কাজ অকাজের ভিড়ের ভিতর এত বেশি ডুবে থাকতে হ'ল যে শম্পার সঙ্গে দেখা করবার কোনও অবসরই আর খুঁজে পেল না সে।

পর পর চার পাঁচ দিন এই রকমই হ'ল।

কিন্তু তার পর দিন নির্মলা এসে ডাক দিতেই শম্পা উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—সেন কে? মালিক?

—না, মালিক নয়। তবে হ্যাঁ, এক রকম মালিক বৈ কি। একজন বড় অফিসার তিনি।

—আমি কি তাঁকে দেখেছি?

—তা আমি কি করে বলব

—যে লোকটা খুব ভারিক্কি চালে তত্ত্বতলব ক'রে বেড়ায ; ছড়ি দিয়ে কয়েকটা কার্ডবোর্ড বাক্স শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে আবার ছড়িপেটা ক'রে মেঝের ওপর নাবিয়ে আনল সেদিন—সেই কি সেন? তুমি দেখ নি নির্মলা? অনেকেই তো ছিল সে সময়—

—হ্যাঁ দেখেছি ব'লেই তো, হ্যাঁ দেখেছি বৈ কি, মনে পড়ছে। ওঃ তিনি হ'লেন বোস মজুমদার। সেন নিজে কামরার থেকে বেরোন না বড় একটা।

—তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায

—আমাকে ফুটফরমাজের জন্য ও দিকে যেতে হয।

শম্পা একটু ভেবে বল্লে—এই যে অফিসেব এই কাজ এ আমি পছন্দ কবি না।

—তাহ'লে কি করবে তুমি?

—খুব বেশি খাটুনি নয় অবিশ্যি। কিন্তু আমাদের মনের ধাঁজ আলাদা। ঠিক হয়ে আসছে বটে, কিন্তু আরও কয়েকটা বছর লাগবে AngloIndianদের মতন হয়ে যেতে। আমি যে এখানে অফিসে আমাব নিজের কাজ করছি এর মানে ওদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে আমায় দেখা করতে হবে?

—হপ্তায় একদিন হযতো। এত বড় একটা অফিসে এ ছাড়া কী ক'বে চলে।

—আমাকে ডাকা হযেছে কেন?

—না গেলে কি ক'রে জানবে? আমি জানি না।

—হযতো কাজ কর্ম্ম বুঝিযে দেবাব জন্য—

—বলতে পারি না। হযতো অন্য Deptএ পাঠিযে দিতে পাবেন—

—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—

—অন্য Deptএ গেলে তোমার উন্নতি হতে পাবে।

—যাচ্ছি। কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোক এমন কি আকাট বিলিতী হযে যেতে পাবে যে আমাদের এখানে এক আধ সেকেণ্ডেব জন্য আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব—সামনেই যেতে হবে তাঁর—বলতে বলতে শম্পা উঠে দাঁড়াল।

তোমার মাইনে বেড়ে যেতে পারে Deptএ গেলে। রমলা ৭৫ টাকায শুরু করেছিল। এখন ২০০ পাচ্ছে।

— আমি যাচ্ছি—

—চলো আমাব সঙ্গে—

— আমি যাচ্ছি— কিন্তু কোনও মাইনের ধকলে পড়ে নয

—বেশ তো চলো—

নির্মলা চলে গেলে মিঃ সেন বল্লেন— বসুন। আপনার নাম কি শম্পা চৌধুরী

—হ্যাঁ

লিখতে লিখতে একটু হেসে বললেন—আমি অভিধান খুঁজে দেখিনি অবিশ্যি—

লিখতে লিখতে সেন নিজের নিরস্ত কলমের দিকে একবার তাকিযে বল্লেন— আমাদেব দিশি পুরাণে গল্পও আমার খুব বেশি জানা নেই—

শম্পার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন— নেহাৎ কমও জানি না। কিন্তু শম্পা নামের অর্থ কি? শম্পা? কী অর্থে হতে পারে এ নামের।

শম্পা কোনও উত্তব দিল না।

সেন অচ্ছোদসরসীব মত হেসে শম্পাব দিকে না তাকিযেই বল্লেন— কিন্তু আপনাব নামে পম্পা—পম্পা তো একটা নদী?—আপ্নাব নামেব— আমাব বাস্তবিকই খুব ভালো লেগেছে। পম্পা —ইযে phonetic pomposity। শম্পা?

ভ্রূকুটি কবে সেন সিলিংযেব দিকে তাকিযে ভাবতীয পুবাণেব সমুদ্রে কোনো একটা মধুব দ্বীপ আবিষ্কাব কববাব নির্লক্ষ্য ব্যস্ততায ঘুবে বেড়াচ্ছেন মনে কবতে পাবা যেত। কিন্তু কিছুই তাঁব লক্ষ্যহীন নয।

—'আমাব একটা স্কিম বযেছে— ' সেন শুরু কবলেন—

টেবিলেব টেলিফোন বিসিভাবেব দিকে তাকিযে শম্পা চুপ ক'বে বইল—

—আপনি ইংবেজিতে বেশ দোবস্ত চিঠি লিখতে পাবেন।

শম্পা মাথা নেড়ে বল্লে— আমি ফার্স্ট ইযাবে পড়েছি শুধু

—ওঃ, কিন্তু কারু কারু ইংবেজিতে বেশ এলেম থাকে।

—আমি সাযান্‌স নিযেছিলুম—

—আপনি শর্টহ্যান্ড শিখেছিলেন হযতো।

—সাযান্স ক্লাসে?— শম্পাব ঠোঁট চোখ ঈষৎ পবিহাসে কুঁচকে উজ্জ্বল হযে উঠল।

—না— না—এম্নি—

—আমি শিখিনি—

—টাইপ কবতে জানেন নিশ্চযই

শম্পা ঘাড় কাত কবে নিজেব ডান হাতেব ওপব বাঁ হাতেব আঙুলগুলো ছড়িযে সেদিকে তাকিযে থেকে অবসন্নভাবে বল্লে—একেবাবেই জানি না।

একটু চিন্তিত হযে সেন বল্লেন— শিখে নিতে পাবেন?

একটু চুপ থেকে শম্পা বল্লে— কি শিখে নিতে হবে—

—stenotyping

শম্পা ব্যাহত হযে বল্লে— ওদিকে আমাব রুচি নেই। কি হবে শিখে? কিন্তু শিখবাব সময কোথায আমাব?

— আমি সময ক'বে দিচ্ছি। বোজ একটা অব্দি এখানে কাজ ক'বে আপনি ছুটি পাবেন। তাবপব আমাদেব অফিসেব দোতলায দক্ষিণ দিকে সবচেযে শেষ ঘবটায কমার্শিযাল ক্লাস খোলা হযেছে মেযেদেব জন্যে— সেইখানে—

শম্পা উঠে দাঁড়িযে বল্লে— সে হবে না।

—বসুন।

-stenotypist-এব দবকাব আপনাব?

—এই office অফিসে অনেক বযেছে; কিন্তু যত বেশি পাওযা যায ততই—

—বিজ্ঞাপন দিযে যোগাড় কবতে পাবা যায।

—আমাদেব দেশে মেযেবা চাকবি কবছে আজকাল। কিন্তু তাদেব ভিতব skilled labour কম।

—আশা কবা যায ক্রমেই বাড়তে থাকবে—

—কিন্তু আপনি তো কোন ভবসা দিলেন না—

—আমি কারু secy হতে চাই না—

—কিন্তু তাতে চাকবিব উন্নতি হত—

—আমাব কোনো উচ্চাকাঙ্খা নেই—

—বসুন। আপনি নিজেকে চেনেন না হযতো।

শম্পা একটা চেযাব টেনে মুখোমুখি বসে—থাকা লোকটাব ধবাছোঁযাব বাইবে আড়ালে খানিক হেসে নিযে দেওযালেব একটা জিন দানবীয ক্যালেন্ডাবেব দিকে তাকিযে চুপ ক'বে বসে রইল। নিজেকে সে নিজে চেনে কি, না চেনে? চেনে হযতো, আধো চেনে; ওকে কী চেনা বলা যায। শম্পা তাব নাম; এ

নামের কী অর্থ নিজেই সে কি জানে? কে তাকে দিয়েছিল এই নাম? কেন দিয়েছিল? এ নামের কোন অর্থ নেই— কিছু ইঙ্গিত আছে: কী সে ইঙ্গিত? কিন্তু ইঙ্গিত ব্যবহারিক জীবনের দিক দিয়ে অর্থহীন কেন? অরুণ বলেছিল কবিতা এক রকম আছে যাকে বলে surrealism । তার জীবনটাও কি তাই? ধ্বনি আছে, কিন্তু অর্থ কি তার? ইঙ্গিত রয়েছে কিন্তু লোকায়ত পৃথিবীতে কী ক'রে সে আভাসিক বহিরাশ্রয়িতাকে ভাঙিয়ে খাওয়া যেতে পারে? খাওয়া? খেতে হবে বৈ কি? খাওয়াই কী মুখ্য উদ্দেশ্য নয় জীবনের? মিঃ সেন আজও ঠিক খেতে পারছেন না হয়তো— টাকা চিবিয়ে খাচ্ছেন। শম্পা নিজেও কিছু গুছিয়ে খেতে পারছে না এখনও— আভাষ ইঙ্গিত নিংড়ে দুঃসাধ্য কাল নিংড়ে কখনও কি শরীরের স্বাদ মেটে— অরুণের surrealism-এর কোনও মর্য্যাদা টিকে থাকে এই বাঘের শেয়ালের কাকাতুয়া কাকের পৃথিবীতে?

শম্পা চমকে উঠে শুনল সেন বলছেন— আপনাকে বসিয়ে দিতে পারতাম—

—কোথায়?

—এই officeএ — অন্য officeএ

—অন্য officeএ

—হ্যাঁ, গুণীদের দাম ক্রমে চড়তে থাকবে— মেয়েদের বেলায় আরও বেশি - typewriter আছে আপনার?

—না

—আমি অফিস থেকে ধার দিতে পারি। বাড়িতে ব'সে শিখতে পারবেন?

শম্পা মাথা নেড়ে বল্লে— ওরকমভাবে শিখে কি লাভ?

—আমি ভাল মাস্টার পাঠিয়ে দেব।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মোটেই আপনার সহানুভূতিব যোগ্য নই। আপনার অনেক কাজের ক্ষতি করা গেল।

— কিছুই না, আমি প্ল্যানিং নিয়ে আছি—

শম্পা অন্যমনস্কভাবে টেবিলেব টেলিফোন বিসিভারটা তুলতে গিয়ে আবার বেখে দিল।।

—আপনার সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তে যে কথা বলছি, এ আমার নিজের কাজ— office-এর কাজ— planning কে perfect করে তোলবার প্রয়াস।

—কিন্তু সে পরিকল্পনায় typewriter ছাড়া কি আর কিছু নেই। হঠাৎ বলে ফেলল শম্পা। মুখে খানিকটা বংয়ের তুষ ছাই হাওযায় ঝিলিক দিয়ে উঠে খেলা করে গেল যেন তার লজ্জায় ঠিক নয়, ঠাট্টাযও নয— তবুও খানিকটা ইযার্কি আমেজে যেন।

শম্পা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেনি অবিশ্যি সেন। সত্যিই ঘোরেল মানুষ সেন? কিংবা হয়তো তা নয়— মন্দ নয় লোকটা। টাকা আছে অনেক, বিযে করেনি, অরুণের surrealism এর কোনো মানে হয না, সংসার নেই তার, politics-এর একটা ব্যর্থ পাড়ায় সারাদিন ঘুরে বেড়ায সে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল শম্পার মন, অরুণকে অবিশ্যি পরে বুঝে দেখবার অবসার থাকবে ঢের— কিন্তু, সম্প্রতি এই লোকটা লিখে চলেছে, কী লিখছে— কী ওর সরল সুঠাম কিমাকার পরিকল্পনা একটা ওষুধের কারবার চালাতে গিয়ে?

—না, typewriter ছাড়া আরও অনেক জিনিষ আছে। আপনি তো সায়ান্স সবে শুরু করেছিলেন। কেমিক্যাল রিসার্চ করবার সুযোগ কোথায় আপনার।

সেন বেল টিপলেন। বেযারা এসে একটা স্লিপ নিযে বাইরে চলে গেল। মুহূর্তে দুজন ছিমছাম আধবুড়ো ইয়ার ঘরে ঢুকে অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্য্যে চেযার দখল করে বসতেই সেন আরো খানিকটা গম্ভীর— ওদের চেয়েও আরো এক কাঠি গম্ভীর হয়ে কাকে যে একটা বিদায় নমস্কার জানালেন কেউ তা বুঝতে পারল না, বুঝতে চাইলও না। সেন সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে শম্পা অবাক হযে ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে সেন যে তাকে বিদায জানালেন— এটা কি তাঁর উচিত হল: সে কি এই চাকরি ছেড়ে দেবে?

চাকরি ছাড়লো না শম্পা— কালই হয়তো সেন আবার তাকে ডেকে পাঠাবেন। কিংবা পর্শু, কিংবা তার পর দিন— কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে। মাসে মাসে সে অবিশ্যি ৭৫ টাকা মাইনে পেযে যেতে লাগল।

কিন্তু সেই বড় পবিকল্পনাব মোহনীয ঘুঘুব সঙ্গে আমাব কি আব দেখা হবে না? সে বিস্মিত বিস্রস্ত হযে ভাবত বোজই প্রায। সেনেব কামবাব দিকেও মাঝে মাঝে সে এগিযে গিযে —থেমে— ফিবে এসেছে। কিন্তু মিঃ সেন এত দিনেও আব তাকে ডাকেন নি। কিন্তু— তবুও একটা জিনিস লক্ষ্য কবেছে শম্পা— কোনো দিক থেকে কেউ কোন দিন কোন বকমে তাকে ব্যতিব্যস্ত কবতেও আসে নি। ব্যতিব্যস্ত হযে অনেক মেযেকে কাজ ছেড়ে দিযে চলে যেতে হযেছে। কিন্তু শম্পাব সুখেব চাকবী; বাড়ী থেকে ৪/৫ মিনিট হেঁটেই অফিস পাওযা যায; অফিসে প্রায যে-কোনও সময এলেই হয; এসে বিশেষ কোনও কাজ নেই। একটা ডেক চেযাব বযেছে— ইচ্ছে হ'লে বস তুমি; যতক্ষণ খুশি বসে থাক। বসেই থাকে শম্পা। জানালাব ভিতব দিযে কলকাতাব দুপুবেব চিল, ফুবফুব কবে উড়ে আসা ট্রেড উইন্ড বিলিতি কামুলাস মেঘ, দিশি পুষ্কব—টুষ্কব, উনপঞ্চাশ বাতাস সকালেব ফিকে নীল কমলাফুলী বোদ—মিনাব—ছাদ—ফ্যাক্টবী—ব্যাঙ্ক কুড়িযে সে সাবাদিন—কিছু পড়াশোনা কবে—কিছু কবে কাজেব তদাবক— যখন খুশি চলে যায। জানে এ সবেব ভিতব কিছু নেই— কিছুই নেই— নেই। কিন্তু, তবু কী থাকতে পাবে আব অন্য কোন সব জিনিষেব ভিতব?

কযেকজন প্রেমিক আছে তাব; কিন্তু অনেকেই গবীব; যাবা গবীব নয তাদেব ইতবতা—

শম্পা, তোমাকে ডাকছেন

—কে নির্মলা? আমাকে' কে ডাকছেন

—মিঃ সেন

—আমাকে? কেন

—চলো

—এখুনি যেতে হবে?

ভযঙ্কব ব্যস্ত আজ

হাঁটতে

হাঁটতে হাঁটতে শম্পা বল্লে— তুমি নাকি আজকাল type কব নির্মলা

—হ্যাঁ, একেবাবে blind

কি বকম speed

-মিনিটে ত্রিশ

—শিখলে কী ক'বে?

— না শিখে উপায নেই। খাটুনি কম নয— তবে শ দেড়েক পাচ্ছি, মে-জুনে দুশো হযে যাবে আশাকবি। আচ্ছা, আমি তাহলে চল্লুম। দক্ষিণ বিসাবী ডানা ধ বে বাঁ দিকেব অন্ধকাব কবিডবেব ভিতব অদৃশ্য হযে গেল নির্মলা।

সেন সাহেবেব ঘবেব থেকে পাঁচ হাত দূবে বাইবে দাঁড়িযে মাথা হেঁট কবে শম্পা এক আধ মুহূর্ত কি যেন ভাবল।

ঘবে ঢুকে জাযগা কবে নিতেই সেন মুখ তুলে তাকিযে বল্লেন—এই যে আপনি, বসুন।

—নির্মলা বলছিল—

—হ্যাঁ, আপনাকে ডেকেছিলুম আমি। এটা আমাব অন্যায। এক আধ বাব ঘুবে এসেও তো কাজেব কথা জানানো যায। বড্ড সেডেন্টাবি হযে গেছি। আসতে হয— আমি যেতে পাবি না।

শম্পা টেলিফোনেব বিসিভাবটাব দিকে তাকিযে ভাবছিল কাউকে টেলিফোন কবা যেতে পাবে হযতো— সমবেশকে, কমলাক্ষকে, অরুণকে; বলা যেতে পাবে আমি... ফার্মাসীব বড় সাহেবেব কামবায আছি— একটা মস্ত বড় পবিকল্পনাব ইন্দ্রধনুকেব বর্ণালি আমাদেব চোখে? না কি তাব মাকড়েব জালেব ভিতব সোনালি মাছিব মত সেন, উর্ণানাভেব মত অফিস? সোনালি মাছিব মত আমি— উর্ণনাভেব মতো সেন?

—আপনাকে একটা নতুন কাজ দিতে পাবি। কবতে বাজি হবেন তো?

—কাজ কি বকম?

—মাইনে কি বকম জানাব দবকাব নেই হযতো?

—মাইনেব চেযে আমি অবসব বেশি ভালবাসি—

—অবসরের চেয়ে মাইনে ভালো লাগে আমার। আপনাকেও সেই রীতিতে দীক্ষিত করতে চাই যদি—

—ওটা কি গৌড়ীয় রীতি?

—না, বিদর্ভ।

—কি কাজ করতে হবে—

—এখন যা করছেন— তা কেমন লাগে?

—মন্দ নয়—

কিন্তু, মাইনে কম।

—কি এ কাজে অবসর বেশি। অবসরের মানে কী তাই আমি খুঁজছি। সেই জন্'ই অবসর চাই। অবসরের মানে যদি ফাঁকি হয়, তা হলে চাইব না।

—কি করা যেতে পারে অবসরে যদি টাকা রোজগাব করা না হয়।

শূন্যপ্রয়াণে চলেছে যে রাজহংসী— খানিকটা শামুকগুলি ছুঁড়ে ফেলা হল যেন তার সামনের পথে— পীড়িত পাখির মত ঘাড় বাঁকিয়ে সেনের কথা ভেবে দেখছিল শম্পা। না মনে হলে না বাজহংসীর। টাকা ছাড়া যে শান্তি নেই, অবসর সৃষ্টিই হতে পারে না, খুব ভালো মাইনে ছাড়া যে সম্মান নেই এবং সব চেয়ে সান্ত্বনা যে স্বৈরাচারে— সেখানে তো টাকাই প্রথম কথা, শম্পা তা জানে। হ্যাঁ, টনক আছে বটে সাহেবের কথায়।

কিন্তু তবুও সে বল্লে— আমাব জীবন গুছিয়ে নিয়েছি

— কি রকম?

—এখানে যে কাজে আমি আছি তাব থেকে আমাকে বরখাস্ত না করলে—

সেন আহত হয়ে বল্লেন— না, না, সে কথাই ওঠে না—

—তা হ'লে— আমি যা পাচ্ছি মাসে মাসে তা যদি পাওয়া যায়— তাতেই আমার হয়ে যাবে। এক জন মানুষ বেশি কি চায় পৃথিবীতে কেউ কেউ ভাবে। কিন্তু আমি তা ভাবি না। আমি অনেক কিছুই চাই। কিন্তু সবই ধীবে সুস্থে জুটে যায় আমাব।। কোনো পরিকল্পনা করে চাওযাব হুড়োহুড়ি নেই আমার—

—ধীরেসুস্থে জুটে যায়— সবই?

—যা জোটে না তা নিয়ে আফশোষ কববাব মত অত উঁচু তাবে বাঁধা মন— শম্পা একটু হেসে বললে— না, সে মন আমাব নেই। — নেই? —সেন উজ্জ্বল বিচক্ষণভাবে তাকিয়ে বল্লেন, আপনার ববাত ভাল। হাসছিলেন সেন। ওবা Bombay planing কবছে, ওযার্দ্ধা scheme আছে ওদের। আরও অনেক হেপাজতে পৃথিবীর মানুষ হাযবান হয়ে যাচ্ছে। এটা ভাল। এক দিন শুভ হয়ে যাবে সব। কিন্তু সেদিন আমাদের প্রায় সকলেব জীবনের থেকেই অনেক দূরে—

— সে জন্য কী করতে হবে?

—যা পাওয়া যায তাই নিতে হবে—

—তা নিচ্ছেন কোথায় আপনি— আমি তো দিতেই চেযেছিলাম—

—Typewriter আর shorthand এব গোলকধাঁধা তো Bombay planning-এর ভিতরেই পড়ে—হাসির বিষন্নতায় বিমুগ্ধ হয়ে বল্লে শম্পা— যেন বিমর্ষ কাঁচ ভেঙে পড়ল, খানিকটা, খসে ছিটকে উড়ে গেল চার দিকে— আমার জীবন আর এক রকম।

—বুঝেছি কোন বকম। কিন্তু সে জীবনেব জন্য তো আরো অনেক বেশি টাকার দরকার। অনেক— অনেক বেশি।

—আমার রোজগারই তো আমাব সব নয।

—বাপের আমলের টাকা ক'দিনেব?

—সে জিনিষ নেই আমার।

—নেই? কে দেয তা'হলে?

—এ কথা আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—জিজ্ঞেস করা অন্যায় আমার। মাথা হেঁট ক'রে স্বাভাবিক আন্তরিক কবে স্বাভাবিক আন্তবিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে বললেন সেন।

একজন বেয়ারা এসে একটা ট্রেতে করে স্তূপীকৃত কাগজপত্র রেখে গেল। সে দিকে লক্ষ্য না করে সেন বল্লেন— যে কাজে আপনি আছেন তাই যদি আপনি উপভোগ করেন তাহলে আমার বলবার কিছু নেই আর। এ কাজে আস্তে আস্তে মাইনে বাড়বে— আশা করা যায়— কিন্তু বিস্ময়কর পদোন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

—অফিসে মানুষ একটু নিরিবিলিই থাকতে চায়

—'একটু নিরিবিলিই থাকতে চায়' সায় দিয়ে বললেন সেন। কিন্তু আমাদের ফার্ম্মাসী থেকে ম্যালেরিয়ার যে অব্যর্থ ওষুধ বার হবার কথা ছিল— তা কুইনিনের চেয়েও ঢের বেশি মোক্ষম তার formula খুব সতর্কভাবে গোপন করে রাখা হয়েছিল— কিন্তু তা না কি চুরি গেছে—

—চুরি গেছে? বিমূঢ়ভাবে সেনের দিকে তাকাল শম্পা।— কে চুরি করেছে?

—শুনেছি (formula) দু লাখ টাকায় সে বিক্রি করেছে। কি রকম মাথাখারাপ! — দু কোটি টাকাও পেলেও তো আমি ছাড়তাম না।

শম্পা বিবর্ণ মুখে টেলিফোনের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাবছিল, কমলাক্ষকে টেলিফোন করে দেবে। তাকে টেলিফোন করে এই যে—

—কিন্তু কে বিক্রি করেছে— শম্পা জিজ্ঞেস করল।

বমাল ধরা পড়েনি তো কেউ। সন্দেহের ব্যাপার। কেউ কেউ ভাবছে আমিই চুরি করেছি— বিক্রি করেছি। — সেন সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—

শম্পা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে— আমার কি মনে হয় জানেন?

—বলুন

—এরকম কোনও formula তৈরিই হয়নি

—(তাই?) কিন্তু ওরা আমাকে notice দিয়েছে

—কিসের জন্য?

—সন্দেহ করে ব'লে। আমি এ office ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—কবে?

—আজই চ'লে যাবো— হয়তো—

—আজ তো মাসেব সাতাশ তারিখ— আর তিন দিন—

— না, এ মাসের মাইনেও নেব না আমি। ওবা আরো ছ' মাসের মাইনে দিতে চেয়েছিল।

ঘরের ভিতর বাতাস খেলা করছিল। মস্ত বড় ওয়াল—ক্যালান্ডারটা ঠক ঠক করে কাঁপছিল, খটখট করে শব্দ হচ্ছিল দেওয়ালের ওপব। দেওয়ালের ঘড়ি আবার পনেবো মিনিট পরে সূর্য্যকিরণের মত বেজে উঠল যেন; কার যেন অপরূপ সূচীমুখ কিরণের মর্ম্মস্নায়ুকে জাগব ক'রে তোলে পনেরো পনেরো মিনিট অন্তর।

—আপনি অনেক দম্ভশ্রমের এই যে গল্প কবলেন, মিঃ সেন তার সঙ্গে রোজকাব কাজের রুটিনের তো কোন সম্পর্ক নেই— বললে শম্পা

—না তা নেই

—এটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার মিঃ সেন

—হ্যাঁ—কিন্তু office তো ব্যক্তিকে নিয়েই। আপনাকে নিয়ে— আমাকে নিয়ে— নিজের বুকেব ওপর আঙুল দিয়ে আঘাত করে বল্লেন সেন।

আগ্রহ্য করে শম্পা বল্লে—আমাকে হয়তো officeএব কোনও কাজে ডেকেছিলেন ভেবেছিলুম—

—না, সে রকম নিছক কোনো কাজ নেই আজ আর—

—তাহলে আমি উঠতে পারি

—বসুন।—ওরা আমার নামে (নালিশ) মোকদ্দমা করবে ঠিক করেছে। কিন্তু সত্যিই এ রকম কোনও formula তৈরি হয়েছে বলে মনে হয় আপনার?

শম্পা কোন উত্তর দিল না। গভীর লোভ হচ্ছিল তার সমরেশকে টেলিফোন করে দেবার জন্য। সমবেশকে সে টেলিফোন করে দেবার জন্যে। সমরেশকে সে টেলিফোন করে দিত: ফার্ম্মাসীর বড়সাহেব তার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন যে malariaর অব্যর্থ ওষুধ, quinine-এর চেয়েও যা ঢের বেশি

মোক্ষম— এমন কোনো ওষুধের formula বাস্তবিকই এই pharmacy তৈরি করেছিল কিনা।

—চুরি হয়ে গেছে— আমি (নাকি) দু লাখ টাকায় বিক্রি করেছি— সেন বললেন—আসল ব্যাপার কি জানেন—

একজন কেরানী— বড় বাড় হয়তো— ঘরের ভিতর ঢুকে নানা রকম কাগজপত্র নেড়েচেড়ে কয়েকটা ফাইল (বার করে) নিয়ে বেরিয়ে গেল।

—ওরা কি চুরি প্রমাণ করতে পারবে? শম্পা জিজ্ঞেস করল

—টাকা ছড়ালে সবই পারবে

—আর দু লাখে আপনি যদি বিক্রি করে থাকেন— চারদিককার খোলা জানালা দরজার দক্ষিণায়নের সূর্য্যের মিঠে রোদের দিকে পিঠ রেখে খুব খুশি হয়ে হেসে শম্পা বল্লে, তাহলে আপনিও ছড়াবেন।

—কে—আমি? তাই তো ভাবে ওরা। কিন্তু ওরা আর আপনি তো এক লোক নন।

শম্পার ইচ্ছা হচ্ছিল কমলাক্ষকে টেলিফোন করে জানায় যে pharmacy-র বড় সাহেবের ধারণা জন্মে গেছে যে সেই কারবারের স্বত্বাধিকারীরা আর pharmacy-র চুনোপুঁঠি চাকুরে শম্পা চৌধুরী এক লোক নয়; এ ধারণা তাঁকে একটা স্থিতি—সাম্যতা দিয়েছে। মন স্থির হয়ে আসছে তার; অনুভূতি নানা রকম বিকৃতি পথে ঘুরে আত্মনিবেদনের শান্ত পথ ধরে স্বাতীর দিকে ফিরে আসছে—ফিরে আসছে এমনই অপলকভাবে যে শুক্তির দুটো ডালা যে খুব জাম হয়ে আছে সেদিকে নজর নেই। স্বাতীও যে সব সময় শিশির দান করে না তারও কোনো হিসেবনিকেশ নেই; এর থেকে কি কখনও মুক্তোর জন্ম হয়?

—ওরা কিছু প্রমাণ করতে পারবে না

—মোকদ্দমা করবার ইচ্ছে নেই ওদের— বিশুদ্ধভাবে বললেন সেন।

—করে যদি টাকা ঢালতে হবে শুধু—

অথচ কিছুই বেরুবে না। বেরুবার মত নেই তো কিছু।

—আমি জানি— সেন হাত বাড়িয়ে— কি ধরবে— নিজের হাতটাকে ধরে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন। —ওষুধের ঘুণাক্ষরও তৈরি হয়নি। সাপের হাঁচি। ওসব কোন কিছু formula ছিল না ওদের। আপনার কি মনে হয়?

বিচলিত ভাবে হেসে শম্পা বলতে গেল— কিন্তু—

দেয়ালের ঘড়িতে অপ্রার্থিত অন্ধকারের কিঙ্কিনী বেজে উঠল আবার শম্পা কিছু বলবার আগে। ওরা দুজনেই একসঙ্গে তাকিয়ে দেখল ঘড়ির দিকে,—আসলে আমাকে দিয়ে কোনো কাজই হচ্ছে না ওদের। (সেন বল্লেন:) কোনো কাজ করবার ইচ্ছাই নেই আমার। এই যে এতক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করলুম, মিস চৌধুরী, এ কি কাজের নমুনা?

লিখতে লিখতে সেন আবাব বল্লেন— কমলাক্ষ অমবেশ ওদেব কাজের পদ্ধতি আমার জানা নেই—

কিছু ক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না শম্পা, কেমন ডাকাবুকো মেয়ের মত সেনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। নিঃশ্বাস ফিবে পেয়ে অবশেষে— কী করে জানলেন আপনি— কোথায় শুনলেন ওদের কথা?

—আমাব এ কাজ কাজের নমুনা কি না জিজ্ঞেস কবেছিলুম? এ যদি কাজ না হয় তাহলে কাজ বলে কাকে? একটা ওষুধেব মালমশলা পুডিং তৈরি হল বেটপকা চুরি, দু লাখ টাকায় বিক্রি, সেন চাকরীর থেকে ববখাস্ত।

সেন কাজেব ভিতর ডুবে গেছেন। শম্পা নেই, শম্পা যে উঠে চলে গেছে নিজের ঘরের দিকে নিজের চরকায় তেল মালিশ কবতে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েই (যেন) লোকটা অমানুষিক ভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অফিস ঠেলছে।

—ওঃ, আপনি এখনও আছেন— শম্পার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে সেন বল্লেন।

—আপনি লিখছেন তো খুব—

—ওম্নি গল্পগুজব ক'রে কাটানো; এই আর কি। এই জন্যই আপনাকে type machineএর বাঁয়াতবলটা ঠিক ক'রে নিতে বলেছিলুম। Secy করে নিতে পারতুম।। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা বলা হোত— সাত হাত দূর থেকে আমি বসে-থাকা মানুষ, এগিয়ে যেতে পারি না। কমলাক্ষদের বয়স কত?

—২৪, ২৬. ৩০

—ওঃ, আব আপনাব হযতো—

—উনিশ।

টেলিফোন বেজে উঠল। বিসিভাব তুলে নিযে সেন বল্লেন— উনিশ? না-না-হ্যাঁ—হ্যাঁ— আচ্ছা — না—না উনিশ নয—ওটা কিছু নয— ওটা অন্য কথা— আচ্ছা—ওঃ বেশ, তাই হবে।

বিসিভাবটা বেখে দিযে বল্লেন আমাব ছেচল্লিশ।

উঠে দাড়িযে টুটি এঁটে শম্পাব দিকে তাকিয়ে শম্পা যখন জন্মে নি এই পৃথিবীতে তখনকাব দিনেব একটা মৃত হাসি জীইযে ভাসিযে তুলে সেন বল্লেন— আচ্ছা, চল্লুম। আবাব দেখা হবে।

শম্পাব মনে হ'ল তাব বাড়িব ঠিকানা সেনকে সে দিলেও দিতে পাবত। কিংবা মিঃ সেনেব বাড়িব ঠিকানা কি জেনে নেবে শম্পা। কিন্তু কেউ কাউকে কোনো ঠিকানা মাফিক মানুষ বলে পছন্দ কবে নিতে পাবল না হযতো। সেন চ'লে গেলেন।

শম্পা পব দিন এসে শুনল সেনকে কাজ থেকে ছাড়িযে দেওযা হযেছে— কাজে তিনি খুব বিখ্যাত হলেও কাজকর্মে/রুটিনে তাঁব মন ছিল না ব'লে।

—কি চেযেছিলেন সেন?

—কিছু চেযেছিলেন— নির্ম্মলা বল্লে।

—কেন চলে গেলেন?

কি মনে হয তোমাকে ভালোবেসেছিলেন?

—তা হ'লে তো আমাব ঠিকানা জেনে বাখতেন—

—তোমাব ঠিকানা নেন নি? নেন নি বুঝি? কিন্তু আমাব ঠিকানা তো নিযেছেন। কোনো দিন এ অফিসেব ছাযা মাড়াবেন না আব বলে গেছেন তোমাকে বলেন নি?

—না।

—তোমাব ঠিকানা নিলেন না কেন?

শম্পা কাজে মন দেবে— না হ'লে কি আব কববে সে— card board এব বাক্স কতকগুলো এল? একটা হিসেব নেওযা দবকাব। নির্ম্মলাকে ও বল্ল— কার্ডবোর্ড বাক্স চৌকো ত্রিশটা এসেছে—

একটা ডেমিঅফিসিযাল চিঠি লিখতে হবে আমাব নির্ম্মলা Titagarh Paper Millএ

—সেনেব ঠিকানা এ অফিসে আছে—বাব কবে দেব তোমাকে?

শম্পা মুখেব দিকে তাকাল নির্ম্মলাব—তাবপব কানেব দিকে—এত বড় বড় দুটো কান? মেযেমানুষেব? নির্ম্মলাব মত আঁটসাঁট সুপুবীব মত মুখেব মেযেমানুষেব? কাঁচি দিযে কেটে ছোট ক'বে দিতে হয না?

—না, ঠিকানাব দবকাব নেই। শম্পা বল্লে। নির্ম্মলা চলে গেল।

শম্পা ভেবেছিল ২/৪ দিনেব মধ্যেই সেন ফিবে আসবেন—officeএব কাজেব না হ'লে শম্পাকে দেখতে—officeএ না হ'লে শম্পাব নিজেব বাড়িতে। কিন্তু অনেক দিন কেটে গেল—তবুও কোথাও দেখা গেল না সেনকে। এই বাবে ঠিকানাব দবকাব।

কিন্তু নির্ম্মলাকে না জানিযে নিজেই সে ঠিকানা বাব কববাব চেষ্টা কবল। কিন্তু officeএব কোনো চিত্রগুপ্তই সেনেব ঠিকানা কোনো দিকেব কোনো fileএই খুঁজে পেল না।

—সেনেব ঠিকানা নেই Miss Choudhury

—কিন্তু তিনি তো এখানে কাজ কবতেন।

—সে অনেক আগেব কথা। সে সব খাতা বাতিল হযে গেছে।

—পুবোনো খাতা পুড়িযে ফেলা হয।

—না, Miss Choudhury, এটা তো খাতাব office নয, ওষুধ বিষুদেব কাবখানা। খাতায ছাতকুড়ো পড়ে গেলে সে সব আমবা Dead letter office এ পাঠিযে দিই।

শম্পা হাযবানেব একশেষ হযে অবশেষে নির্ম্মলাকে লাগিযে দিল—কিন্তু sen—এব ঠিকানা কোনো কেবানীব জিম্মাব থেকেই খুঁজে বাব কবতে পাবল না নির্ম্মলা।

Pharmacyব proprietor শম্পাকে ডাকলো একদিন।

—আপনি সেন সাহেবেব ঠিকানা চাচ্ছেন?

—হ্যাঁ

—কেন?

—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কেন, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?

—officeএ এসে?

—না, আপনার বাড়িতে গিয়ে।

—আমার ঠিকানা তো জানেন না তিনি।

—বাঃ হা! Proprietor হেসে ফেলে বললেন—আমাদেব officeএর fileএ আপনার ঠিকানা অজানা নয় তো। তিনি এসে চাইলেই আমরা দিয়ে দিতে পারি।

শম্পা proprietorএব মুখের দিকে তকিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল আগাগোড়া জিনিষটা।

—আমি যা বলেছি বুঝেছেন Miss Choudhury?

শম্পা বাকযন্ত্রে বাষ্প চলাচল করছে টের পেযে ঠোঁটে হেসে—দাঁতে হেসে উঠল—নিঃশব্দে কিন্তু খুব ভালো লাগল proprietorএব। ভালো যে লেগেছে proprietorএব মুখের দিকে না তাকিয়েও আঁচ করে নিল শম্পা—ষষ্ঠেন্দ্রিয় আছে তাব; proprietorএব ঘরটাও চতুর্থ বিস্তারের নিরুপমতায় বেশ নির্জ্জন।

—আপনাব একটা চিঠি আছে।

—কে লিখেছে?

—লিখেছি আমি— proprietor বল্লেন।

—আপনি? আমাকে?

—হ্যাঁ। সেনের ঠিকানা আপনাকে আমি দিতে পারি—কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার চাকরী আমি নিযে নেব। লেনদেন না হ'লে কারবারে চলে কি ক'রে শম্পা দেবী।

শম্পা অনেক দিনের একটা চেনা বাঁক পিছে ফেলে আব এক পথ ধরে এগিযে আসছিল; খারাপ লাগছিল না তাব। গালে হাত দিয়ে কালো কালিব মত চোখেব অসাধারণ মনোনিবেশ দেখছিল শুনছিল মানুষটাব সুন্দর না হোক— বেশ সুসম্পন্ন ফিটফাট কাবড়াই মুখের দিকে তাকিযে।

—ঠিকানা না চাইলে আমি আপনাকে আমার secy ক'বে নিতে পারি।

—Secy?

—হ্যাঁ

—কি করতে হবে?

—কিচ্ছু না। মাইনে ২৫০

—কিছুই করতে হবে না? শম্পা বিপদ মেনে হেসে বল্লে।

—মাঝে মাঝে telephone ধরতে হবে। কে কি বলে জানাতে হবে আমাকে।

—এ ছাড়া?

—না। আর কিছু না।

—কিন্তু আমি তো হিন্দি উর্দ্দু তেমন জানি না— ইংরেজি chemistryর সাযেবরা বল্লে—

বাধা দিযে proprietor বল্লেন— না, না, বাংলায যারা telephone করবে— ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে নয়— এম্নি—সেগুলো— সেগুলো—সেগুলো ধরতে হবে শুধু।

—তাই বলুন ভাদুড়ী সাহেব— শম্পা বল্লে সাহসিকতার মত। ভালো লাগলো ভাদুড়ীর; ভালো যে লেগেছে টের পেল শম্পা।

—কিন্তু তবুও হিন্দি উর্দ্দু ইংরেজি এ সবও বেশ রপ্ত করে নেয়া চাই। আমি সব telephoneই ধরব ভাদুড়ী সাহেব—

—ও, আপনি বুঝি আমাদের সব ঘাৎঘোঁৎ জেনে ফেলতে চান। অপরিহার্য্য হয়ে উঠতে চান। বাঃ বাঃ এই রকমই তো চাই আমি— ডোরাকাটা সোনালি বাঘের মতো হুমকি দিয়ে হেসে বল্লেন propritor। বাঘের মাসির মত অতল নিঃসঙ্কতায় হাসছিল শম্পা propritor এর মুখের দিকে তাকিয়ে। অতলতম নিঃশব্দতায়। ধীরে ধীরে বাঘিনীর মতো দেখাতে লাগল শম্পাকে। চাঁদের রূপালি

নদীব পাবে মেহগিনিব বনে। বাঘিনী টেব পেয়েছে একটা এঁড়ে বাঘকে হটিযে দিযে বাযবাঘেব মত তাব মুখোমুখি বসে আছে propritor। কি বেকুব, সেনেব ঠিকানা চেযেছিল সে: শম্পা মাথা হেঁট কবে হাসতে লাগল।

—কাঁদছেন আপনি?

—আমি হাসছিলাম

—কিন্তু চোখে জল যে আপনাব

—না তো— শম্পা রুমাল দিযে চোখ না মুছে ভিতবেব বক্তেব টানে চোখেব জলটাকে শুষে নেবাব চেষ্টা কবল।

—সে এক বকম হাসি আছে যাতে চোখে জল এসে পড়ে— propritor খুব গম্ভীব হযে বল্লেন।

—তা পড়ে আমি জানি। কোনো কাজ কবব না, আড়াই শো টাকা পাব— এ আনন্দে আমাব চোখেব জল পড়বে না, ভাদুড়ী সাহেব?

propritor একটু ভেবে বল্লেন— আপনাকে আমাদেব আব এক Deptএ অনন্ত শযনমেব Secy কবে দেব। মাসে ৫০০ টাকাব ব্যবস্থা কবে দেব—

শম্পা অরুচি জানিযে বল্লে— না, আমি এইখানেই থাকব।

কি বেকুব আমি, শম্পা পীড়িত হযে ভাবছিল, কেন চোখে জল এসেছিল আমাব। কিন্তু মেযেমানুষের হৃদযে কুমোবেব কাদা দিযে তৈবি, ছিঃ' চোখে জল এসে পড়ল আবাব শম্পাব; কিন্তু এবাব অন্য কাবণে— ভাদুড়ীব ছোঁযাচে (এসে) হৃদয তাব সত্যিই বিচলিত হযেছে বলে। ভাদুড়ীব মতন এ বকম আশ্চর্য মানুষ কোনো দিন দেখে নি সে।

জীবনে এত দিন পবে— অবশেষে— এইবাব — সবচেযে কঠিন কাবণে চোখে জল এসেছে শম্পাব। এবাবও ভিতবে বক্তেব টানে চোখেব জল ধীবে ধীবে শুকিযে নিল শম্পা, খুব লাভ হল তাব— পুরুষকে চিনল, মেযেমানুষকে চিনল— কোনো স্খলন পতন হবে না আব। এই একুশ বছব বযসেই পৃথবীকে দেখে শিখে ফেলতে পেবেছে শম্পা।

—আমাব এখানেই থাকবেন?

—হ্যাঁ থাকব।

—থাকুন। কিন্তু অনন্তশযনমেব ওখানে গেলে কাজ বেশি শিখতে পাবতেন আপনি। আমি— আমি প্রাযই তো office এ আসি না।

—কেন?

শম্পা ভাদুড়ী সাহেবেব নাক চোখে কপালেব মন্ডিত বেশ খানিকটা দিকপালেব মত চেহাবাব দিকে তাকিযে বল্লে।— আপনি না এলে আপনাব চেযাবে বসব আমি?

ভাদুড়ী নিবেট চোখে শম্পাব দিকে খানিকক্ষণ তাকিযে থেকে তাবপব স্ল্যাকসেব পকেটে দু হাত ডুবিযে হেসে বল্লেন, এখুনি বলা যায যায না কিছু। আমাকে সময দিন। সময দিন

—সময তো সামনেই পড়ে আছে— পালিযে যাচ্ছে না কোথাও।

টেলিফোন অনেকক্ষণ ধ'বে বেজে যাচ্ছে—ভাদুড়ী সাহেবকে সেটা মনে কবিযে দেবাব ফাঁকে ফাঁকে হাসতে হাসতে বল্লে— শম্পা।

বচনাকাল : আগষ্ট ১৯৪৬। কলকাতা

সৌজন্য: অমিতানন্দ দাশ

এই লেখাটি জীবনানন্দ কিছু—কিছু পবিমার্জনা কবেছিলেন: পবিমার্জিত পাঠটিই প্রকাশিত হল। পবিমার্জনাব প্রক্রিযা, লেখাটি যখন গ্রন্থভুক্ত হবে, তখন জ্ঞাপিত কবা যাবে। শিবোনাম জীবনানন্দ—নির্ধাবিত নয,; এই গল্পেব একটি শব্দবন্ধ বাছাই কবে নামটি দেওযা হল।— ভূমেন্দ্র গুহ।